

কান সভ্য দেশে জরুরী অবস্থা বজায় রেখে নির্বাচন হয় না



১৯শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ৥ শুক্রবার, ২৮শে জানুয়ারী '৭৭ ৥ ৪০ পঃ

প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে রাজ্য কংগ্রেসে খেয়োখেয়ি

(দুর্পণের সংবাদবাহতা)

লোকসভার নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে প্রার্থীদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে আর সেই সঙ্গে স্বাধীনতা স্তম্ভ হয়েছে। মাত্র ৪২টা আসনের জন্য কংগ্রেস লোক লাইন দিয়েছে মনোনয়ন পাবার আশায়। আবার একে কেন্দ্রীয় যুব নেতৃত্বের প্রতি রাজ্য যুব কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ শ্রমের রাজনীতি নির্বাচনকে উপলক্ষ করে অশান্তিতে প্রবাহিত করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দুর্পণ বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছে যুব নেতাদের মধ্যে বারো বর্তমানে এম পি আছেন তাদের মধ্যে কেউ যদি মনোনয়ন না পান তাহলে পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেস স্বাভাবিকভাবেই যুব কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে “রাজ্য পার্টি” নামে নতুন দল গঠন এবং পার্লামেন্টের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

এই রাজ্যে পার্লামেন্টের মোট ৪২টা আসনের মধ্যে বর্তমানে ১২টি কংগ্রেসের দখলে। যদি ধরে নেওয়া যায়, সেই ১২টি আসনে সিটিং এম পিরাই নমিনেশন পাবেন তাহলে বাকি থাকবে ৩০টি আসন। রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যেই আগল ভাগা-ভাগির প্রস্তাবে সি পি আইয়ের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন। ১২টি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক লালু বলেছেন যে, এখনও পর্যন্ত কোন রাজ্যকে সি পি আইয়ের সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনার কোন

অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে জিরাফু বাই বলুন সি পি আইয়ের সঙ্গে কংগ্রেসের নির্বাচনী সমঝোতা হবেই এবং তাহলে সি পি আইকে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ৩৭টি আসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। এই আলোচনায় বাদ দিলে থাকে ২৩২৪টি আসন। তার মধ্যে এই ২০-২৪টি আসনের জন্য কংগ্রেস দল দরখাস্ত করেছে প্রায় চাকরীর দরখাস্তের মত (এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এবার থেকে এম পিরা পেমসন পাবেন একবার (পৃষ্ঠা ২২ শেখাংশ))

দুর্পণের বিংশ বর্ষে পদার্পণ

এই সংখ্যা থেকে দুর্পণ বিংশ বর্ষে পদার্পণ করল। দুর্পণ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৮ সালের ২৩শে জানুয়ারী। একটি ক্ষুদ্র সাপ্তাহিক পত্রিকার মতো উনিশটি বছর অতি দীর্ঘ সময়, কেমসা শাসক দল তথা এন্টারপ্রাইজের মতো যার কোন পত্রিকা স্বাভাবিক বড় বড় বিজ্ঞাপনদাতা ও গডপেন্ডেন্টের কাছ থেকে এমন সহায়তা পায় না যাতে খাচ্ছোলের মধ্যে সে বেঁচে থাকতে পারে। গাছাড়া ১৯৭২ সালের পর থেকে ছাপার কাগজের দাম ও প্রেসের খরচ এত বেড়ে গেছে যে, কোন দলকে অতিদুঃস্বাদ করাটাও খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। গত ২২ এপ্রিল থেকে সরকারী একটি আদেশের জন্ত দুর্পণ সাত মাস বন্ধ থাকার ফলে আর্থিক দৃষ্টিকোণে তীব্রতর হয়েছে। তা সত্ত্বেও দুর্পণ বেঁচে আছে গণিত পাঠক ও তথ্যপ্রার্থীদের জন্য। তাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতাই দুর্পণের বাজাপথে একমাত্র পথের।

ট্রেড ইউনিয়ন কনভেনশনে জ্যোতি বসুর বক্তব্য

কলকাতার ফুটনানি হল সি আই টি ইউ, ইউ টি ইউ সি, টি ইউ সি সি, এইচ এম এস ও এইচ এম পি—এই পাঁচটি বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে ২১শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত কনভেনশনে জ্যোতি বসু বলেছেন, কোন সভ্য দেশে জরুরী অবস্থা বজায় রেখে নির্বাচন হয় না। কংগ্রেস দলের নিজেদের ওপর বিশ্বাস নেই। জনসাধারণের ওপর আস্থা নেই। তাই এমনভাবে নির্বাচন করা হচ্ছে যাতে বামপন্থী দলগুলি বিশেষ সুযোগ না পায়।

এই কনভেনশন থেকে দশ দফা দাবির তালিকায় প্রথম দফা কর্মচারী কৃষক ক্ষেত্রে মজুর ও সর্বশ্রেণীর গণতান্ত্রিক মতামতের ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী রাজ্যের প্রত্যেকটি কলকারখানায় অকিলে, হুগুরে দশ দফা দাবি সংবলিত শ্রায়কলিপি প্রমিত-কর্মচারীরা তাঁদের কর্মপন্থার কাছে পেশ করবেন এই সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে এই কনভেনশনে।

কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবেও সমর্থনে সি আই টি ইউ-র পক্ষে জ্যোতি বসু জরুরী অবস্থার বেহনতী মাহুকের জীবিকার ওপর কিভাবে আক্রমণ এসেছে তা বিশদভাবে বলেন। প্রস্তাব উত্থাপন কালে টি ইউ সি সি নেতা জীকানাই লাল ভট্টাচার্য বলেন, প্রমিত ও বেহনতী জনগণের জীবন ও জীবিকার ওপর আক্রমণের মোকাবিলায় মজুর আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এই কনভেনশন আহ্বান করা হয়েছে।

প্রস্তাবের সমর্থনে জ্যোতি বসু আরো বলেন, আগামী দু মাস ধরে সরকার সংবাদপত্র রেডিও ও

টেলিভিশন প্রভৃতিতে প্রচার করবেন জরুরী অবস্থা শিথিল করেছে, অনেক অধিকার হারিয়ে দিয়েছেন জনগণকে আরো উন্নত অবস্থার দিকে যাওয়া হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রচারের মাধ্যমে শাসক দল ও সরকার আমাদের যদি ভুল বুঝিয়ে দিতে পারে তাহলে সমূহ বিপদ। গত ১৮ মাস ধরে সরকার যা বলছেন আমরা তার বিপরীত কথা বলছি। সরকার বলছেন মাহুকের কল্যাণ বজায় হবে। আমরা বলছি এই সরকার মাহুকের অপকার করবে। ২০ দফার নামে জনগণকে ভাঙতা দেওয়া হচ্ছে। তবে মাহুকের কংগ্রেসের ভাঙতা ধরে ফেলছেন।

মূল্য বৃদ্ধির প্রসঙ্গে জ্যোতি বসু বলেন, ২০ দফা কর্মসূচীর প্রথম ধারার মধ্যে বলা হয়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রবিসম্পদের মূল্য নিয়ন্ত্রণ রাখা হবে। কিন্তু তা হয়েছে কি? ৭৫ সালের পর নিত্য প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যের মূল্য বেড়ে গেছে। তখন থেকেই আমরা বলে আসছি সরকারের নীতির মধ্যে যেহেতু বড় বড় কেমের পরিবর্তন ঘটেনি, সেহেতু এই সব দফা চফা দিয়ে কিছু করা যাবে না। দাম আবার বাড়তে শুরু করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দাম অত্যন্ত বাড়েনি। প্রধানমন্ত্রী মেনে চলে (শেখাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার)

আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে সি পি আইয়ের অক্ষয় ‘কীতি’

(দুর্পণের পর্যবেক্ষক)

13

লোকসভা নির্বাচন মার্চ মাসে হবে, এই ঘোষণার তিন দিন পরে সি. পি. আই-এর মহাসচিব মন্ডো কর্তৃক অর্ডার অব লেনিন-এ অলঙ্কৃত কমরেড রাজেশ্বর রাও প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি লেখেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ্যে চিঠিটি সি. পি. আই.-কর্তৃক বিতরণিত হয়েছে।

কমরেড রাও প্রধানমন্ত্রীকে রাজবন্দীদের সম্বন্ধে সচেতন করেছেন তাঁর পক্ষে। না, সব রাজনৈতিক দলের বন্দীদের কথা তিনি উত্থাপন করেন নি, এমন কি অস্ত্র বামপন্থী দলের বন্দীদের কথাও নয়। সি. পি. আই. তা করবে আশা করাই বোধ হয় বুধা। জরুরী অবস্থা ঘোষণা, আত্মসমিক বাধাবিধির আরোপ, কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলির নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার ইত্যাদি সব কাজ জোর তোলার সঙ্গে সমর্থন করে এসেছে তাই না, এই সব কাজে উৎসাহও বুঝিয়েছে আর দুই থেকে মন্ডোর বাহবা সুত্বিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই সহজ কিন্তু মহৎ পথ থেকে সি. পি. আই কী করে সরে আসবে?

সি. পি. আই.-র নেতা ও কর্মীদের যে “ব্যাপক হারে” গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বিশেষ করে উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, বিহার, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা আর মধ্যপ্রদেশে, কমরেড রাও এই ভাষ্য পরিবেশন করেছেন তাঁর চিঠিতে। একথাও বলেছেন, তাঁর দলের কোন কোন নেতা ও কর্মীকে রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের সংঘের পক্ষে প্রচার এবং ভারতীয় জাতি দল ইত্যাদির সত্য হওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়ার মত হাস্তবস্ত্র অভিযোগে (flimsy charges) বন্দী করা হয়েছে।

কমরেড রাও কিন্তু চিঠিটিতে তাঁর দলের বন্দীদেরও বুদ্ধির অস্ত্র দাবী করেন দি। শুধু জানিয়েছেন, আমাদের

দলের কমরেডদের ব্যাপকহারে বন্দী করে রাখার ফলে আমরা বক্তৃতা অধিবেশন পড়ব লোকসভা নির্বাচনে, বিশেষ করে উত্তর প্রদেশে, কারণ সেখানে বন্দীর সংখ্যা “বিগল” (very big)—৪২৭।

প্রধানমন্ত্রীকে কিছুই করার অনুরোধ কি করা হয় মি? হয়েছে, বলা—“হুজুর আমার অনুরোধ, আপনি বিষয়টির দিকে নজর দিন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।” (“I would, therefore, request you to attend to this matter and do the needful.”)

ছোট বেলার জুল বে প্রকারের এবং যে ভাষায় দরখাস্ত লিখতে শিখান হয় তা আপনার মনে পড়ে কি?

প্রসঙ্গত, ভারত সরকারের প্রতী-প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করে চেপে ধরলে কমরেড রাও বলেন, এই সরকার “বুর্জোয়াদের প্রতিদ্বন্দ্বি, তাদের আর্থিক সেরকা করে”। সি. পি. আই. বহু তেল-বড় পুড়িয়ে একে “অ-মনস্তন্ত্রী পথের” (non-capitalist path) দিকে পথক্ষেপ মেওয়ার্ডে পাবে নি। তা না পারলেও, নাগরিক অধিকার বর্ধ করাতে প্রচেষ্টা দিয়ে সকল হয়েছে।

বুর্জোয়া-পরিচালিত দেশে নাগরিক স্বাধীনতা বর্ধ করে সরকারের হাতে অসীম ক্ষমতা দেওয়ার কীতির নজির মার্কস থেকে শুরু করে আজ অবধি আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে আমাদের সি. পি. আই. প্রথম রাখলেন।

বস্তুত, মার্কসের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ ছিল প্রকৃতির বোঝাচারের বিরুদ্ধে; এতে তিনি সেসবশিপ ব্যবস্থাকে আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু করেছিলেন।

১৯০৩-এ রুশীয় সোশ্যাল ডেমক্রেটিক লেবার পার্টি (শেখাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার)

সম্পাদকীয়

মুণ্ডহীন গণতন্ত্রে নির্বাচনী প্রহসন

মুণ্ডহীন পাল্লিমেন্টারী গণতন্ত্রে পাল্লিমেন্টের নির্বাচন ঘোষিত হয়েছে। সময় ক্রমসংগত ক্রম। ১৯৭১ সালে জরুরী অবস্থার প্রজ্ঞাপন দিয়ে জরুরীকাল নাগরিক সহ বিরোধী দলের নেতা ও কর্মীদের কারাবদ্ধ করা হয়েছিল। গত ১৮ মাস শাসক দল ও সরকারের কোন সমালোচনা করা যায়নি কোন প্রকাশ সভায় বা সংবাদপত্রে। মাঠে মরদাশে নর, চার দেওয়ালে ঘেরা হলের মধ্যে স্বর্গত চৌ এন লাইমের স্বস্তিসভাও পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে। এই অবস্থায় অকস্মাৎ নির্বাচন ঘোষণা করার প্রধান উদ্দেশ্য কোন রকমে নির্বাচনটা সেয়ে নিয়ে ছয় বছরের জন্ত ভণ্ডে উপবেশন। আর এই উপলক্ষে যুবরাজের অভিষেক সম্পন্ন হয়ে যাবে।

এই নির্বাচন যে ক্ষয় ও অবাধ হবে তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কেননা জরুরী অবস্থায় সংবিধান সংশোধন এবং “আপত্তিকর বিষয়” প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আইন মাফকং পাল্লিমেন্টারী গণতন্ত্রকে মুণ্ডহীন করে দেওয়া হয়েছে। আজ দেশবাসীর নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার অপহৃত আর সরকারের হাতে দমন পীড়নের বহুবিধ হাতিয়ার।

ঘোষণা করা হয়েছে যে জরুরী অবস্থা শিথিল করা হবে। কিন্তু এখনও তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সভা-সমিতির ওপর নিষেধাজ্ঞা আগের মতই বলবৎ রয়েছে। যে সব কংগ্রেস-বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের জেলে পোরা হয়েছিল তাদের অনেকে মুক্ত করা হলেও বহুসংখ্যক এখনও কারাবদ্ধেই রয়েছেন। লোকসভার সি পি এম সদস্য ত্রিভোজ্যতির্গম বহুকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। চরম বিধেয়ের বশেই তাকে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরই প্রেপার করা হয় এবং সুদূর তিহার জেলে অতি অস্বস্তিকাবে তাকে রেখে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশে অনেক সরকারী কর্মচারীর চাকরী গেছে। এবং বিভিন্ন অফিসে সভাসের আবহাওয়া স্থিতি করা হয়েছে। কলে সরকারী কর্মচারীরা কি নিরপেক্ষভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন?

প্রাক-সেম্বর ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু জরুরী অবস্থায় প্রেস আইন বলবৎ করে “আপত্তিকর বিষয়” যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাতেও সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ। কেননা আইনে আছে “বৈধ সরকারকে হেয়” করার উদ্দেশ্য কোন লেখা বা সংবাদ প্রকাশ করলে সেই কাগজ অথবা যে প্রেস সেই কাগজ ছাপে তার বিরুদ্ধে শাস্তিহীন ব্যবস্থা নেওয়া হবে অর্থাৎ এই আইনের দ্বারা সরকারের সমালোচনাকে স্তব্ধ করা হয়েছে। বোধহয় শাসকদের মাথায় ঢোকেনি-যে, এই আইন এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচন পরস্পর বিরোধী। একই সঙ্গে এদের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। যদি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে সমান সুযোগ দিয়ে সরকার গঠনের

প্রতিদ্বন্দ্বিতার নামে দেওয়া হয় তাহলে “আপত্তিকর বিষয়” সংজ্ঞা প্রেস আইন এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। বিরোধী যে কোন রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনী প্রচারে নামতে গেলেই শাসক দলের বিরুদ্ধে নানাধিহীন ভূমিতি অপশাসন ও ভাঙতাবাজীর অভিযোগ (তারতের বর্তমান শাসক দল সম্পর্কে বা দিনের আলোর মত সত্য) আনতেই হবে। এই সব অভিযোগ বিরোধী দলের কাগজে ছাপা হলেই কংগ্রেস সরকার তার গলা হাড়িকাঠে চেপে ধরবে। আর এই সরকার ও শাসক দল নিজেদের সুবিধের জন্য গণতন্ত্রকে এমন গড়ে-পিটে নিয়েছেন যে এর বিরুদ্ধে আদালতেও বাওয়া যাবে না। প্রশ্ন হল, সরকারের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্যই যদি না রাখা যায় তাহলে নির্বাচন প্রহসন ছাড়া আর কি?

১৯৭২ সালের নির্বাচনে এই রাজ্যে ব্যাপকভাবে কারচুপি ও বিভিন্ন কেন্দ্রে গুণ্ডামী হয়েছে। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসী মন্তানরা বামপন্থী, বিশেষ করে সি সি এম কর্মীদের তার অনেক আগেই নিজ নিজ এলাকা থেকে উচ্ছেদ করেছিল বাহের মধ্যে অনেকেই এখনও পাড়া ছাড়া। বর্তমান নির্বাচনের আগে তাদের যদি এলাকায় ফিরতে না দেওয়া হয়, তারা যদি নিজেদের দলের পক্ষে প্রচার না করতে পারে তাহলে একে গণতান্ত্রিক নির্বাচন না বলাই ভাল।

আরও একটা কথা। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর গত ১৮ মাস ধরে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে শাসক দলের ছোট বড় অনেক নেতাই বিরোধী দল ও তার নেতাদের প্রায় প্রতিদিন নানা কটুক্তি করেছেন যেগুলো সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হয়েছে। অথচ এর বিরুদ্ধে বিরোধীদের কিছু বলার কোন সুযোগ ছিল না। বলা বাহুল্য জনসাধারণের কাছে বিরোধীদের হেয় প্রতিশ্রুত করাই ছিল শাসক দলের উদ্দেশ্য। শাসক দলের বক্তব্যে কোন সত্যতা থাকুক আর নাই থাকুক (না থাকাই স্বাভাবিক) এই প্রচার যদি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে থাকে তাহলে নির্বাচনে তার প্রভাব পড়বে, যার ফলে শাসক দলের জয়ের পথ সুগম হবে। এইভাবে বিরোধীদের যে উপায়ে বেকারদার ফেলা হল সেটা কি গণতান্ত্রিক পথ?

যেটা কথা কংগ্রেস সরকার আইন কাহুন পরিবেশ সব কিছু নিজেদের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের অহঙ্কর করে তবুই নির্বাচন ঘোষণা করেছেন। নির্বাচনে যদি অঘটন কিছু না ঘটে তখন প্রচার শুরু হবে কংগ্রেস সরকার এবং কংগ্রেস দল ও নেতাদের মত সাতটা গণতন্ত্রী ভূত্বারতে নেই। কিন্তু সত্য কথাটা এই যে, তাদের মত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও গণতন্ত্র বিরোধী অন্ততঃ তারতবর্ষে বর্তমানে আর কেউ নেই। এবং পাল্লিমেন্টের এই নির্বাচন একটা প্রহসন মাত্র।

প্রার্থী মনোনয়ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাল্লিমেন্টে যেতে পারলেই) জেলায় গাদা গাদা পড়ছে। জেলা কংগ্রেস কাপ প্রবেশ দপ্তরে সব নামগুলি বর্তমান জেলাতে ৪টি আসনে ৪০টি আবেদন পড়েছে এবং পড়ছে। কেননা এম এল এ, এ কর্মীরা অনেকেই পাল্লিমেন্ট চাইছেন।

এই অবস্থার স্বভাবতই তালিকা রাজ্য কংগ্রেস পাল্লিমেন্ট এবং দিল্লীর নেতৃবৃন্দ মনোনয়ন করে দেবেন। তাহলে একটি ব্যাপার এবং সেটি হল এই যে, দিল্লী গণতন্ত্রেরই বাছাই করবে সাম্প্রতিক প্রশাসনিক পরিবর্তন লড়াইয়ে প্রৌ-চেয়ার বলে কিনেছেন। আরও পরিষ্কার বললে বার সার মর্ম এই যে, সঞ্জয় গান্ধীর লেজুড হয়ে জোড় দলে নাম লেখাতে রাজি নয়। নাম প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়ার পাল্লিমেন্টের নির্বাচনকে করে এই রাজ্যে সঞ্জয় বিরোধী প্রভাব খর্ব করার চেষ্টা হবে।

কিন্তু বারা পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ রাজ্য সম্পর্কে খবর রাখেন তারা জানেন এই সংগঠনে সঞ্জয়-সমর্থকরা বড় সংখ্যালঘু। এর মধ্যে অনেক টা পান্টা ব্যাপার মটে গেছে। হামসুলী ও তথ্যমন্ত্রী স্বতন্ত্র মু নাম একসঙ্গে “প্রিয়-স্বতন্ত্র” রূপে উচ্চাখিত হতে সেই প্রিয়রঞ্জন স্বতন্ত্র এখন দুটি মেরুতে অবস্থ স্বতন্ত্র তার “প্রিয়দা”কে পবিত্র করে সঞ্জয়ের নৌকায় বেঁধেছেন।

রবিরঞ্জনের গৃহপ্রবেশ

রবীন্দ্রসংস্কৃতির প্রচারে রবিরঞ্জনের আত্মনিয়োগ করেছেন এদের উদ্যোগে গৃহপ্রবেশ না অভিনয় হয়ে গেল ২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদনে। অভিনয়ে গতি মধুর। ব্যক্তিগত অভিনয়ে তেমন প্রশংসার দাবি করতে পারেনা। অভিনয়ের মান আরো শীলনের অপেক্ষা রাখে।

পূর্ব ভাগে রবীন্দ্রসংস্কৃতির গৃহপ্রবেশে যথোপাধ্যায়ের গলা হার নিরবের আওয়াজে চাপা না জন্ত বরং ভাল লাগল। তুলনার সেনের গানে স্বর কম পাওয়া গে

ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের চিত্র প্রদর্শনী

(দর্পণের সমালোচক)

ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের নৈশ বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের শিল্প গাম-গ্রীর বাৎসরিক প্রদর্শনী সম্প্রতি সমাপ্তিত হয়ে গেল। ছাত্রছাত্রীদের প্রদর্শনী হলেও এটি রসিক জনের প্রশংসা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সন্দেহ নেই। অন্তত করেকজন তরুণ শিল্পী কলেজের মধ্যে পরিপূর্ণ হাতের ছাপ পাওয়া গেল। এই চিত্র প্রদর্শনীতে ৮২ জন তরুণ শিল্পীর ২৩৪টি নিদর্শন ছিল, এর মধ্যে বাণিজ্য-শিল্প বিভাগেরও ১৭ জন আছেন।

ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজ ভারতীয় শিল্পচর্চার জগতে একটি উল্লেখ্য নাম হওয়া সত্ত্বেও এই প্রাচীন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখার কোন প্রচেষ্টা সরকারী মহলে নেই। এমনকি এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারী সাহায্য থেকে

শিল্পীরা যে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছেন তার জন্যে তাঁরা ধন্যবাদার্থী। এই শিল্প প্রদর্শনীর শিল্পীদের বেশীর ভাগই কম বয়সী কলা বিভাগের প্রথম বার্ষিক থেকে ৫ম বার্ষিক শ্রেণী, বাণিজ্য বিভাগের চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী।

তৎসত্ত্বেও প্রদর্শনীর বেশ কিছু কাজ পরিপূর্ণ, প্রতিদ্বন্দ্বিতাসম্পন্ন। শিল্পী অশোক চ্যাটার্জীর তিনটি কাজ বিশেষ করে মাছ ও কুহুর, নিজের প্রতিভা বোধ ভালো। তেমনি দিলীপ ভট্টাচার্যের কম্পোজিশন, লাভ, দীপক দাসের সেলফ পোর্ট্রেট, রাধাবল্লভ মণ্ডলের ডায়লিনিস্ট, ব্রুচেস, হুনীল রায়ের কম্পোজিশন, শৈবাল দত্তের কম্পোজিশন, দীপক খানের কম্পোজিশন, অসীম সেন, বপন পোলে অরুণ সমাদারের কম্পোজিশন, প্রতীপ মুখোপাধ্যায়, জোহানাথ রায়, পীযুষ সরকার, হুম্মার রায় প্রমুখের কাজ সুন্দর।

বাণিজ্য বিভাগের প্রাণতোষ মণ্ডল, প্রবীর লাহিড়ী, অরূণ দত্ত, দীপক বসাক, কামিনাথ বেড়া, তাপস বিশ্বাস, রঞ্জন দে, রতনরায়, বপন দাস প্রভৃতির কাজ উন্নত। অবশ্য উল্লিখিত শিল্পীরা বেশীর ভাগই উচ্চ স্কুলের ছাত্র। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর দেবকুমার আদক, শঙ্কর সিংহ রায়, বক্রিম দে, রমা বাব্বা, প্রদীপ রক্ষিত, অভিজিৎ বহু, শিল্পী বেগম চৌধুরী, ভগেন্দ্র দাস, দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর বিমল মুখার্জী, হুনীল চ্যাটার্জী, অপর্ণেশ সোম, গণেশ চৌধুরী, তপন মুখার্জী, মনোজ বিশ্বাসের কাজ থেকে আরো ভালো কাজ আশা করব। জানাভাবে আরো অনেকের নামোচ্চারণ করা গেল না। তবে আগামী বছরে আরো ভালো কাজ দেখার আশা রইল।

আসন্ন নির্বাচন কি গণতান্ত্রিক ?

রমা প্রসাদ মল্লিক

অনেক গৌরচন্দ্রিকা এবং সম্মানে পর বিরোধী কথারাত্তর পর শাসক 'অকস্মাৎ' লোকসভার সাধারণ বাচন ঘোষণা করেছেন। কেন্দ্রের পীমহোদয়রা এবং প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ভিত্তি সময়ে নির্বাচন সম্পর্কে যে সবুজ ও বরান দিয়ে এসেছেন তাতে নির্বাচন যে ১৯৭৭ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত হবে এমন কোন নিশ্চয়তা ছিল না।

একতরফে শাসন দল যখন সম্প্রতি পার্লামেন্টে তাদের রাজ্য-দুর্যমুখ-পাড়ির মত অবদান সমগ্রটির স্বযোগ গ্রহণ করে এই নির্বাচন আরও এক বছর স্থগিত রাখার জন্ত বিল পাশ করাল তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আত্মত-বন্ধ মিত্র দল সি পি আইয়ের নব প্রতিনিধ ও অহুযোগ সাথেও তখন জনগণের মনে নির্বাচন সম্পর্কে ঐদানীন্তন সৃষ্টি করাই ছিল এই দলের লক্ষ্য—বিরোধী দলগুলিকে ভীতুতা দিয়ে অপ্রস্তুত রাখার উদ্দেশ্যে হয়তো সেই সজে ছিল।

ভবু হঠাৎ মত, বদলে গেল, বদলে গেল পথ। এই স্ট্র্যাটেজী পরিবর্তনের পটভূমিকার অসংশয়ই আন্তর্জাতিক কার্য-কারণ সঙ্কেত প্রভাব রয়েছে। প্রতি-বংশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে নির্বাচন হতে নাচ্ছে, ভারতে কেন হতে পারবে না— এমন প্রশ্ন উঠত, সলহ নেই। তাছাড়া আজ বহু বছর পর একদা মজরাজ্য (বদান্ত 'উত্তম' তো বটেই) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পুনরায় মিতালী হতে যাচ্ছে। সেখানে এসেছেন কল্পিত ভারত-বন্ধ ডেমোক্র্যাট দল এবং সে দলের মনোনীত ব্যক্তি জিমিকার্টার প্রেসিডেন্ট রূপে। মার্কিন দেশের লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামো অসুশাসিত প্রেস অর্থাৎ সংবাদপত্র-ভারতে এমার্জেন্সী ব্যবস্থায় আইন কাছন প্রয়োগ সম্পর্কে আশ্চর্য-জনক তুচ্ছতা অবলম্বন করে এসেছে গোড়া থেকেই অপার ধৈর্য ও অসীম উদারতা সহকারে।

নয়াদিল্লী তাই ওয়াশিংটন পার্টিয়েছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং দৌত্য পদ্ধতি অবলম্বনে নুক্ষন নতুন রাজদূত-রূপে কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের সবচেয়ে পুরনো পোক্ত এবং কাছ ব্যবহারবাদী (pragmatist) জীকেওয়েল সিংকে। আমেরিকা পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী রূপের সর্বস্বীকৃত সংসদীয় গণতন্ত্রের ঠীঠুমি। সেখানকার সংবিধানে প্রসিডেন্ট-কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার খাতি আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন মনে হলেও

তা সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল ধারা বদায় রেখেছে ব্যবস্থাপিকা আইন প্রণয়নকারী অল্প কংগ্রেসের দুই সভার সঙ্গে প্রেসিডেন্সীর শাসন সংস্থার ওতঃপ্রোতি সমন্বয় ঘটিয়ে। বস্তুত, ভারতের সংবিধান নির্মাতা 'পিতারা' একচোখের নজর বরাবর রেখেছিলেন মার্কিন সংবিধানের ঐ বৈশিষ্ট্যের ওপর। আজও শাসক দল কংগ্রেসের এক বৃহৎ অংশ মার্কিনী শাসক ব্যবস্থা সম্পর্কে মোহগ্রস্ত এবং ভারতে তা আমদানী করতে চায় নিজের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার উদ্দেশ্যে।

এ ছেন মার্কিন দেশের জনমত উপেক্ষা করা চলে না। সুতরাং নির্বাচন করিয়ে সারা পশ্চিমী দুনিয়া (প্রথম দুনিয়া) 'সমাজবাদী' সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ (দ্বিতীয় দুনিয়া) এবং আফ্রো-এশীয় দক্ষিণ আমেরিকার তৃতীয় দুনিয়াকে চীন সমেত দেখানো দরকার যে, ভারতের শাসক শ্রেণীও নির্বাচন পদ্ধতিতে বিশ্বাস রাখে এবং এমার্জেন্সীর মধ্যেও তারা নির্বাচন করতে পারে। প্রধানতঃ তাই এই নির্বাচন করানো হচ্ছে—আন্তর্জাতিক মত-সৌজন্দের খাতিরে, বিশ্ব-রাজনীতির মতানুর্নয় বিনিময় ক্ষেত্রে, যাতে ভারতীয় শাসক দলের স্ফূর্তি অক্ষুণ্ণ থাকে।

প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে বৈদেশিক প্রেস-প্রতিনিধিদের আশ্বাস দিয়ে গেছেন এই বলে যে, ভারতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ আছে এবং এমার্জেন্সী সম্পূর্ণ আইনানুগ পদ্ধতিতেই করা ও রাখা হয়েছে। শাসক দলের নেতৃবৃন্দ এই বক্তব্যের প্রতিশ্রুতি করে থাকে। প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য শুধু রাজনৈতিক টোনে, অর্থাৎ ছোঁর বা বোঁক দেবার ভঙ্গিতে।

বস্তুত বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক সমস্ত বিষয়েই কংগ্রেস দল ও তার নেতাদের স্বতা মত প্রধানমন্ত্রীর মতামতের প্রতিফলন মাত্র। প্রসবৃত বিরোধী হল বা বিরোধী মনোভাবাপন্ন নাগরিকের প্রতি শাসক দল বা সরকারের আচরণের কথা আসতে পারে। এই বিষয়ে গত দেড় বছরে যে সমস্ত প্রশাসনিক কার্যকলাপ এবং সরকারী তরফে বক্তব্য সারা দেশের গোচরে এসেছে তাতে সরকারের ও শাসক দলের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ থাকার কথা নয়।

ধাপে ধাপে কঠোরতা।
উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যাক

বিরোধীদের সঙ্গে সরকার পক্ষের ও শাসক দলের আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময়ের ভিত্তিতে জাতীয় মতৈক্যে পৌঁছানোর বিষয়। শাসক দলের বক্তব্য হল বিরোধীরা হিংসাব পক্ষপাতী এবং তারা নাকি গুজরাটের কংগ্রেসী সরকার ও সেখানকার বিধানসভাকে চাপ সৃষ্টি করে অচল করে দিয়েছিল। সুতরাং মতদিন না বিরোধীদের মত পরিবর্তন হচ্ছে তাদের অথবা জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা হবে না। এমার্জেন্সী ঘোষণার কয়েক মাসের মধ্যেই ত্রীনাগরণের সঙ্গে আলোচনা যে চলবে না সে সম্পর্কে ঘিঘাহীন ভাষায় বললেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জীওম মেহতা।

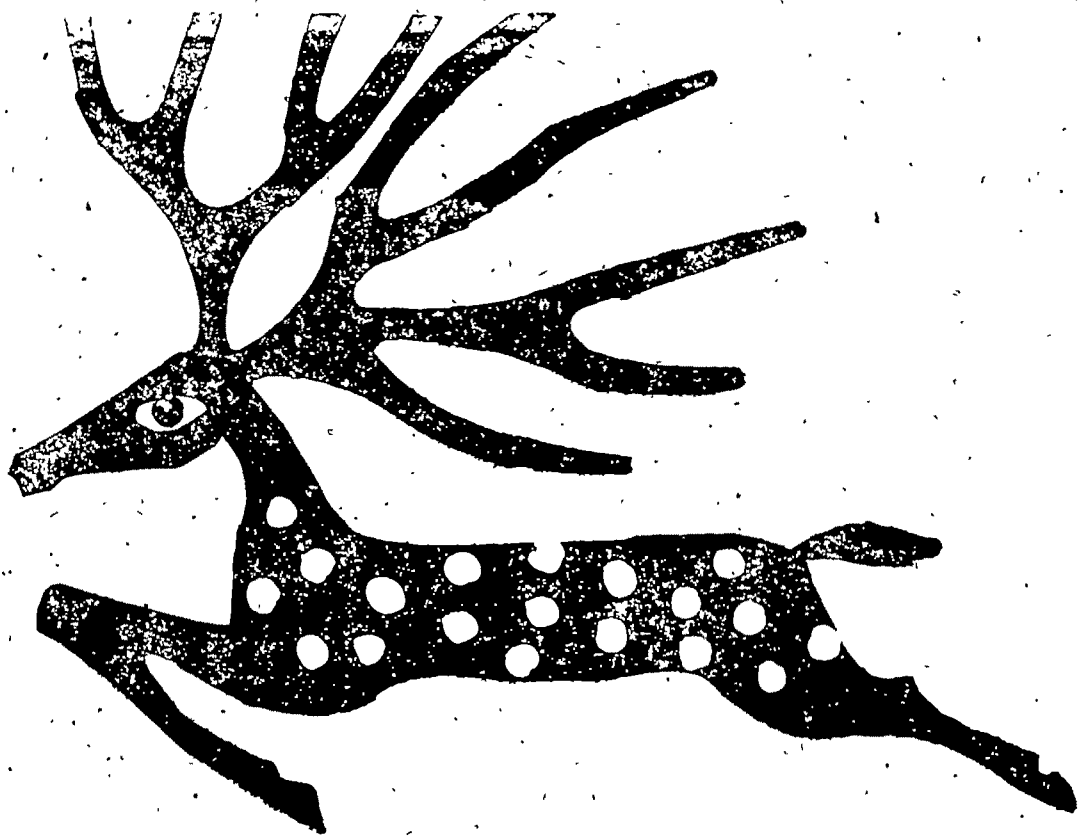
এখানে স্মরণ করা দরকার যে জয়প্রকাশজীর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে একমত হবার পক্ষে ছিলেন কংগ্রেস দলেরই সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দ—সর্বাধিক ভোট পেয়ে নির্বাচিত ওয়ার্ডিং কমিটির সদস্য

জীকেশবর ও তাঁর মতাবলম্বী ত্রীককান্ত এম পি, জীমোহন ধারিয়া ও অন্যান্যরা। এর পরেই দেখা গেল তাঁরা তিনজন এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর শের সিং ও ত্রীনতী লক্ষী কান্তাব্রাকে কংগ্রেসের পার্লামেন্টারী পার্টি থেকে বহিস্কার করা হয়েছে (১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ)। এঁরা সকলেই তখন মিসায় জেলে বন্দী।

এমার্জেন্সী ঘোষণার পর বিচার, ধাপে ধাপে কিতাবে আইনের বজ্রগুষ্টি দৃঢ় করা হল এবং সেই সঙ্গে বাড়ল শাসক দলের মনোভাবে অনমনীয়তা। ১৯৭৫-সালের ২৯শে জুন রাষ্ট্রপতির আদেশ জারী হল যে, ভারতীয় নাগরিকের গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার ১৪, ২১ ও ২২ ধারা নিষ্ক্রিয় করা হল। ১৯৭৬ সালের ৮ই জানুয়ারী ঘোষণা করা হল ১২ ধারাকেও অহরূপ ভাবে সাসপেন্ড করার কথা। মনে রাখা দরকার, এই ১২ ধারাই নাগরিক হিসেবে প্রাপ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বাধীনতার রক্ষাকবচ। এর পরে এসেছে তৃতীয়

দফার মিসা আইনের সংশোধনী যাঁর বলে মিসা বন্দির পক্ষে আর আনার অধিকার হইল না কিসের ভিত্তিতে তাঁর বাধীনতা অপহরণ করা হল। এমনকি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের আর হইল না গ্রেপ্তারের কারণ জামাবার। যদিও সরকার ও মন্ত্রীরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য মিসা আইন নয়, তবু বিস্তারলোক এর বিপরীত সাক্ষ্য দেবে।

এমার্জেন্সী আইন কেন্দ্রীয় সরকার অপপ্রয়োগ করেছেন এমন কথা বলার মত বৃকের পাটা কার আছে? আইন পাশ করে, সেলার আদেশ জারী করে সংবাদপত্রের কণ্ঠ বোধ করা হয়েছে। তারা আজ পার্লামেন্টের ভেতরে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা, কথা বা তাদের বিবেক অহুযারী রিপোর্ট করার অধিকার রাখে না। ২১ বছর আগে খর্গত ফিরোজ গান্ধীর (সম্রাট গান্ধীর পিতা) উত্তোলে পাশ করা আইনের জন্মই এই রিপোর্ট করার অধিকার সংবাদপত্র পেয়েছিল। প্রসবৃত বলা (শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)



ছুটন্ত কলকাতা

কলকাতা ছুটিতে চার।
মল্লের হুগলি যেমন কল্লের ছোট্ট বনে
ব্যগ্র এবং বাধাহীন। কিন্তু পাতের না।
শহরের এলাকার ভুলমায় বাড়ন্ত জনসংখ্যা,
জনসংখ্যার ভুলমায় অল্প শাস-বাহন,
শাস-বাহনের ভুলমায় সংকীর্ণ সড়ক
অভাবভীত ভান্ন অগ্রগতির পথে বাধা।
আমিরা জানি, কলকাতার মানুষ আজ
উদ্গ্রীব হ'লে তাকিয়ে আছে
সেই গতিময় যান্ত্রিক দিকে,
যার নাম ভূগর্ভ রেল।
কান্নন, ভূগর্ভ রেলের হাতেই সেই ভবিষ্যৎ,
যখন ছুটন্ত কলকাতা এক দৌড়ে পৌঁছে যাবে
তার সিদ্ধি এবং সমৃদ্ধির লক্ষ্যস্থলে;
ব্যগ্র এবং বাধাহীন।



কলকাতার নতুন মানচিত্র
রচনায় ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট
প্রজেক্ট (রেলওয়ে)

চীনের মুক্তিযুদ্ধ ও সোভিয়েট নীতি

আমার চিঠির (২৬শে নভেম্বর) সমালোচনা করে কয়েকটি পান্টা প্রশ্ন জুড়েছেন পঞ্চজ্যোতী (১০ই ডিসেম্বর) এই সংখ্যাটি বিলম্বে পাওয়ায় এবং অন্যান্য কাজের জন্য অবসরের অভাবে জবাব দিতে পেরেছি হলে বলে দুঃখিত।

তথ্য ও সত্যের মধ্যে সফলতার কথা জুড়েছেন পঞ্চজ্যোতী, কিন্তু বলেছেন আমার তথ্যগুলির সঠিকতা বৈধিকতা খাটাই করা তার পক্ষে বর্তমানে সম্ভব নয়। তাঁর উচিত ছিল না কী এই তথ্যে ভুল থাকলে অন্য তথ্য জুড়ে তাকে ধরুন করা? তা না করে তিনি অভিযোগ করেছেন, আমি যুক্তিসঙ্গত ভাবে চীনের পক্ষে দাঁড়িয়ে বক্তব্য পেশ করেছি, কেবল ষ্ট্যালিনকেই দোষী সাব্যস্ত এবং ষ্ট্যালিন ও সোভিয়েট সঙ্ঘে চীনের মূল্যায়নের গরমিলকে আড়াল করেছি, ইত্যাদি।

“বলশেভাইজ” শব্দের স্থলে অন-বদানতাবশত ‘সোভিয়েটাইজ’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলাম। পঞ্চজ্যোতী জুড়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এই ক্রটি স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সফল হু-একটি তথ্য উল্লেখ করতে চাই। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে (জুন ১৯২১) সি. পি. গুলির সংগঠন ও কর্মপদ্ধতি বিষয়ে প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়। এতে ‘বলশেভাইজ’ করার কথা না থাকলেও অসুস্থতা সফল লেনিন চতুর্থ কংগ্রেসে (নভেম্বর ১৯২২) ভাষণ দেন এবং প্রস্তাবটির কথা সমালোচনা করেন। পঞ্চজ্যোতী এই ভাষণ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আরও একটি উদ্ধৃতি থেকে লেনিনের বক্তব্য বুঝতে সহায়তা হতে পারে। প্রস্তাবটি সফল লেনিন বলেন, “It is almost entirely Russian, that is to say, everything in it is taken from Russian conditions... That is why it is quite unintelligible to foreigners, and they cannot be content with hanging it in a corner like an icon and praying to it”

সন্দেহের কি অবকাশ আছে যে, কর্মক্ষমতা নিয়ে বেঁচে থাকলে লেনিন প্রস্তাবটি অগ্রস্ত কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আনতেন? আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুর্ভাগ্য, ১৯২০-এ প্রায় সম্পূর্ণ বংসরই তিনি কর্মক্ষমতা রহিত হয়ে পড়েছিলেন। ১৯২৪-এর জানুয়ারীতে তাঁর মৃত্যু হয়। অচিরেই সি. পি. এস, ইউ তথা আন্তর্জাতিকের উপর

ষ্ট্যালিনের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২৪-এর জুনে আন্তর্জাতিকের পঞ্চম কংগ্রেস বসে। লেনিনের সতর্ক-বাণী সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে এখানে ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্ত বলবৎ হয়। এখান থেকেই নির্দেশ জারি হয়, সব সি. পি.-গুলিকে বলশেভাইজ কর।

তখন ইউরোপে বিপ্লবের স্রোতে ভাটার টান পড়েছে এবং ক্যাসিজমের জোয়ার দেখা দিয়েছে। “একক সোভিয়েট ইউনিয়নেই সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়া সম্ভব।” এই সিদ্ধান্ত চালু করেছেন ষ্ট্যালিন। আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (জুলাই-আগস্ট ১৯২০) আন্তর্জাতিকের “অংশ” (sections), অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের সি. পি.-গুলির ওপর ২১টি শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। তার মধ্যে একটি ছিল। সর্বপ্রকারে সোভিয়েট বিপ্লবকে সাহায্য ও রক্ষা করা। ইউরোপে কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভাটার টানের সময় থেকেই ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক মারকং মুখ্যত এই একটি শর্তই বিভিন্ন সি. পি.-গুলির ওপর বলবৎ হয়েছে।

সি. পি. আই, (বার মধ্যে ১৯৪৪ পর্যন্ত সি. পি. আই, এম-ও ছিল) সম্মত মনোপন্থী সি. পি.-গুলির দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসের প্রতি নজর দিলে এই তথ্যটি আবিষ্কার করতে, পঞ্চজ্যোতী, আপনার অসুবিধা হবে না। সি. পি.-গুলির নীতি ডিগ-বাজি খেয়েছে বহুবার, কিন্তু নীতির পরিবর্তন ঘাই হয়ে থাক না কেন, তা সব সময়ে সোভিয়েটের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থেকেছে; কখনও এই উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটে নি। ১৯২১-এ চীনে সি. পি. স্থাপনার প্রথম দশ বার বংসর তার উপরও এই নীতিই চাপানোর চেষ্টা চলে। ১৯৩৫-এই কেবল মাও-সে তুঙের অবিসম্বাদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এর বহু পূর্ব থেকেই কিন্তু মাও তাঁর নিজস্ব পথে চলছিলেন, বার অন্য ১৯২৭-এ তাঁকে চীন সি. পি.-র কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

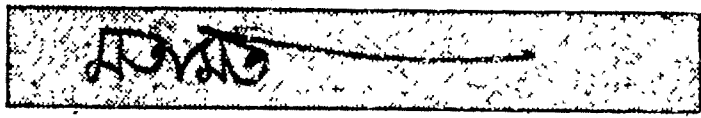
সোভিয়েটের জাতীয় স্বার্থের উল্লেখে পঞ্চজ্যোতী হয়ত আঁতকে উঠবেন। তাই এখানে বলে রাখি, ষ্ট্যালিনের নিকট সোভিয়েট জাতীয় স্বার্থ আবার Great Russian স্বার্থ থেকে অভিন্ন হয়ে পড়ে। ষ্ট্যালিন জর্জিয়ায় সন্তান, কশের নয়। ১৯২২-এ এই জর্জিয়ায়ই কারকিনস্কির সহ-যোগে ষ্ট্যালিন যে নীতি প্রয়োগ করেছিলেন সে সফল লেনিন মন্তব্য করেন,

“It is well known that Russified people of foreign birth always overshoot themselves in the matter of ture Russian disposition... It is necessary to distinguish the nationalism of the oppressing nations from the nationalism of the oppressed... It behooves us to hold Stalin and Dzerzhinsky politically responsible for this Great Russian nationalist campaign.”

আমাদের পরাধীনতার যুগে এমন ভারতীয়ের সংখ্যা কি নগণ্য ছিল যারা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের চেয়েও সাম্রাজ্যবাদের কটর সমর্থক বনে বসে ছিলেন?

যুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক সঙ্গীতটিকে সোভিয়েট ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় সঙ্গীতের মর্যাদাচ্যুত করে “Great Russia”-র জয়গানে মুখরিত একটি সঙ্গীতকে ওই মর্যাদাদানের মধ্যে কি ষ্ট্যালিনের Great Russian nationalism আরও স্পষ্ট অভিযুক্ত হয় নি?

এ কথা কে অস্বীকার করতে পারে যে, জার-আমলের পশ্চাদপদ বিরাট



একটি ভূখণ্ডকে আমূল পরিবর্তন এবং তাকে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামরিক দিক থেকে প্রচণ্ড শক্তিরূপে পুনর্গঠিত করেছেন ষ্ট্যালিন? কিন্তু যে পদ্ধতিতে এই কাজ করা হয়েছে তার মধ্যেই নিহিত আছে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল রোগ।

ষ্ট্যালিন আমলের সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থার অতি নিষ্ঠুর একটি দিকের প্রতি খুশ্চন্ড সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ১৯৫৬-তে। সব থেকে বেশি তীব্র হয়ে পড়ে মস্কো-পন্থী সি. পি.-গুলি। কিন্তু সবার উপর সোভিয়েট জাতীয় স্বার্থ, এই মূল নীতি থেকে খুশ্চন্ড কখনও বিচ্যুত হন নি। খুশ্চন্ডের পর এসেছেন ব্রেজনেভ—তিনিও এই নীতিই প্রয়োগ করে চলেছেন।

পঞ্চজ্যোতী বলেছেন, “খুশ্চন্ডের নেতৃত্বেই সোভিয়েটের রাষ্ট্র চরিত্রটি পরিবর্তিত হয়ে গেল এটা কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নয়। সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থা থেকেই তিনি উদ্ভূত হয়েছিলেন।” তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত। খুশ্চন্ড কর্তৃক ষ্ট্যালিন-বিরোধী ভাষণের (১৯৫৬) পর অনেকের মনেই ষ্ট্যালিন-কর্তৃক যুগ

সমাজ-ব্যবস্থা সফল প্রদর্শন। তদানীন্তন ইতালীয় কমিউনিস্ট নেতা ভোগলিয়াভি (যিনি আন্তর্জাতিকের কাজের ক্ষমতা বহু বংসর মস্কোতে বাস করেছেন) ওই ১৯৫৬-তেই সোভিয়েট ইউনিয়নের “structural faults”-এর আলোচনার সুপারিশ করেছিলেন। মস্কো এই আলোচনা এড়িয়ে গেছে; বিগত বিশ বংসরে কয়েকটি বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলন হয়েছে; কোনটিতেই বিষয়টি আলোচিত হয় নি।

সোভিয়েট ইউনিয়নের “structural faults”-এর লিপি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি কখনও বলি নি, অত্যাশঙ্কন-শোষণ করার ব্যাপারে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমি অবশ্যই বলেছিলাম, আবার বলছি, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায়ের নামে ওই যুদ্ধের সময়ের মিজ দেশ চীনের ঘাড় ভেঙেছে রাশিয়া, সমাজ-তান্ত্রিক পূর্ব জার্মানীরও ঘাড় ভেঙেছে। আশা করি পঞ্চজ্যোতী স্বীকার করবেন, একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে এ অতিশয় গুরুতর বিচ্যুতি। সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থার ঘুণ না ধরলে এই বিষয় কাণ্ড ঘটতেই পারত না।

পূর্ব জার্মানী লুণ্ঠনের পরিণতির

দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। পৃথিবীতে একটি মাত্র দেশ আছে যেখানে বিগত ৩০ বংসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি, হ্রাস পেয়েছে। সেই দেশটি পূর্ব জার্মানী। এখনও হ্রাস পাচ্ছে, বিখণ্ডিত বালিনের প্রাচীর এবং সীমান্ত কাটাটারের জাল দিয়েও হ্রাস বন্ধ করা যায় নি। পূর্ব জার্মান সরকার কর্তৃক ১৯৭৫-এ প্রকাশিত “Statistical Pocket Book of The German Democratic Republic” জানাচ্ছে, ১৯৪১-এ জনসংখ্যা ছিল ১,৮৮, ২২, ০০০; বালিনের প্রাচীর ভোলায় পূর্বের বংসরে (১৯৬০) ১, ৭২, ৪০, ৫২৬ এবং ১৯৭৪-এ ১, ৬১, ২৪, ৭০৭। একই সময়ে জনতান্ত্রিক পশ্চিম জার্মানীর জনসংখ্যা বিপুলভাবে বেড়েছে; পূর্ব জার্মানী থেকে পালিয়ে অনেকে পশ্চিম জার্মানীতে স্থান নেওয়া এই বৃদ্ধির বড় কারণ। যুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর দুই অংশে জীবন যাত্রার মানে এমন কিছু তারতম্য ছিল না। আজ পশ্চিম জার্মানীর জীবনযাত্রার মান বেশ উচ্চ। পঞ্চজ্যোতী, নিজেকে জিজ্ঞেস করবেন কি, কেন এমন হল?

আমাকে যদি উত্তর দিতে বলা হয় আমি বলব জার্মানীর দুটি অংশে জন ও সমাজতন্ত্র যুগোমুখি দাঁড়িয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ভবিষ্যৎ দিকে দৃষ্টি রেখে জনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তিশালী করতে অর্থ চলেছে পশ্চিম জার্মানীর বিপুল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনরুদ্ধারের জন্য। অতীতকে, ছোট দেশ পূর্ব জার্মানী থেকে বংসরের পূর্ব বংসর সম্পদ সরিয়েছে ক্রিশিরা আপন জাতীয় স্বার্থে। ফল আর কিছু হলেই হত বিশ্বের বিয়ম। Great Russian nationalism একটা সমাজতান্ত্রিক দেশকেও কতদূর অন্ধ বানাতে পারে।

আমেরিকার পয়ই সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ যুদ্ধোত্তর কারখানা। সে যুদ্ধোত্তর বিপুল করে পুরো দামে। যে দেশকে ও অল্প আর অল্প “সাহায্য” দিতে তার সমাজব্যবস্থা কী, কোন শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা এবং এই “সাহায্য” দ্বারা কোন প্রকৃতির সমাজ ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র শক্তিশালী হচ্ছে, এ নিঃসন্দেহ মাথাব্যথা নেই। এই সাহায্য মারকং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মস্কো সুবিধা হচ্ছে কিনা, এমন কি সামরিকভাবে হলেও, একমাত্র এই বিবেচ্য। মিশরই একমাত্র উদাহরণ। এই সাহায্যের ক্ষমতা যে সমাজব্যবস্থায় মিশরে শক্তিশালী হয়েছে সমাজব্যবস্থাই সৃষ্টি করেছে সাদাত ১৯৬০-এ মিশরের সি. পি. দেওয়ার ক্ষমতা মস্কো উৎসাহ যুগিয়ে তারপর থেকেই দরাজ হতে সোভিয়েট ইউনিয়ন ওই দেশকে সমরাত্মক আধিক “সাহায্য” দিতে শুরু করে চীনেও অসুস্থপ স্বার্থদ্বারা প্রণোদিত হয়ে সে চিরাগ কাই-শেখের বাড়িতে নিরস্তর কাজ করে গে। ১৯২৭-এ সাত্তাই ও অন্যান্য শহর বিরাট কমিউনিস্ট নিধনযজ্ঞের পর তৃতীয় দুনিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত কর পঞ্চজ্যোতী, আপনি দেখতে পা “non-capitalist path” অর্থভিষের ক্ষমতা মস্কো মূলত এই অসুস্থপণ করে চলেছে।

কোন শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্র রয়েছে, সোভিয়েটে সাহায্যের কোন শ্রেণী আধিক রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রচার করছে, এসব ব্যাপারে নজর দেওয়ার বালাই নেই। শ্রেণীই যে শেষঅবধি সাম্রাজ্যবাদী সঙ্কে হাত মিলায় সে তথ্য শির তুলে মস্কোপন্থী সি. পি.-গুলি ক্রিশিরা উৎসাহিত করছে “বিদেশী প্রতিক্রিয়ার” বিরুদ্ধে যাও।

(শেখাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

মতামত

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

আমার বক্তব্য এই নয় যে, মাও-এর নীতিতে কোথাও কোন ভ্রান্তি নেই। দুটি দেশেরই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতন্ত্র, পরস্পর স্বগড়ায় বেতে একে অপরের বিরুদ্ধে দুইয়েরই শত্রু আমেরিকাকে লেলিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় রক্ত হত না। কিন্তু মস্কো পূর্ব আর্ম্যানী ও মাল্‌দোভায় যা করেছে চীনের ব্যাপারে সে রকম দৃষ্টিভঙ্গ বা অস্ত্র প্রকারে অস্ত্র দেশ শোষণের দৃষ্টিভঙ্গ আমার মস্তিষ্কে আসে নি। পঞ্চমবার, আপনাকে এ বিষয়ে তথ্য যোগাড় করে আমাদের আনাচ্ছেন না কেন?

চীন সোভিয়েট সম্পর্কের অনেক তথ্যই আজ অবধি অপ্রকাশিত রয়েছে বলে মনে হয়। কিছু তথ্য অবশ্যই প্রকাশিত নেই। খুশ্চেভের বক্তব্যই প্রথমে ধরা যাক। চীনে বিপ্লব সফল হওয়ার পর পর চীনের সম্পদের সম্বন্ধে সোভিয়েট মালিকানা ও পরিচালনার চীনে শিল্পস্থাপনের উদ্দেশ্যে স্ট্যালিন কতকগুলি স্থপাতিশ করেন। চীন তা অগ্রাহ্য করে। খুশ্চেভ লিখেছেন, "Just as I had suspected, [by making such proposals] Stalin had offended Mao. No such cables proposing to exploit China were ever sent to Mao over my signature or the signature of our government in that time." "Exploit China" ক্যাংগুটির অর্থ কী?

চীন যেভাবে তার সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ছে তাতে রুশিয়ার অবস্থার একটি কারণের সম্মান মেলে খুশ্চেভের এই বক্তব্যে: "When China began its supposedly egalitarian reforms, literature on the subject came across the border and started circulating widely in Soviet Siberia. When I found out what was happening, I told my comrades, 'This must stop immediately. The slogans of the Chinese reforms are very alluring, you're taken if you don't think the seeds of these ideas will find fertile soil in our country.'"

যে দেশে ৬০ বৎসর ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ চলেছে এবং যে দেশ এখন না-কি সাম্যবাদের স্বরে উন্নীত হচ্ছে সে দেশের নেতার অস্ত্র এক দেশ কর্তৃক প্রচারিত egalitarian reforms কে এত ভয় কেন?

স্ট্যালিন মাও-কে কী চক্ষে দেখতেন? খুশ্চেভ লিখেছেন, "Stalin was always fairly critical of Mao Tse-tung. He had a name for him, and it describes him accurately from a purely Marxist point of view. Stalin used to say that Mao was a margarine

Marxist." আর কুশ্চেভের নিজের বক্তব্য হল: "Mao is a petty-bourgeois whose interests are alien, and have been alien all along, to those of the working class." তিনি আরও বলেছেন, "The fact remains that Mao, relying on the peasants and ignoring the working class, achieved victory. Not that his victory was some sort of miracle, but it was certainly a new twist to Marxist philosophy since it was achieved without the proletariat."

যে পন্থা রাশিয়া চীনের সি.পি.-র উপর চাপাতে সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছে এবং মাও অগ্রাহ্য করে নিজের পথে চলে বিপ্লব সফল করেছেন তার ইঙ্গিত খুশ্চেভের বক্তব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। চীনের সি.পি.-র প্রথম সাত বৎসর নেতা ছিলেন চেন তু-সিউ এবং পরের কয়েক বৎসর লি-সান। দুজনেরই কাজ ছিল আন্তর্জাতিকের অর্থাৎ স্ট্যালিনের নির্দেশ অনুসারে কাজ করা। ১৯২৫-এই মাও লেখেন, "The peasantry was the basic force in China's national democratic revolution and the chief ally of the working class." ১৯২৭-এ মাও-কে চীন সি.পি.-র কেন্দ্রীয় কমিটি থেকেও বের করে দেওয়া হয় কারণ "শহরে শহরে insurrection কর", আন্তর্জাতিকের এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করে গ্রামাঞ্চলে কৃষক সংগঠনের পথে তিনি চলছিলেন। চীনের সি.পি.-র প্রধান দপ্তর ছিল সাঙহাইতে ১৯৩৩ পর্যন্ত। এই বৎসর কেন্দ্রীয় দপ্তর হানানুদিত হয় মাও-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত কিয়াংসি প্রদেশের সোভিয়েট এলাকায়। আর দু বৎসরের মধ্যে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের চীনের সি.পি.-র প্রতি নির্দেশের সম্পূর্ণ অবসান হয়। খুশ্চেভ মাও-কে বলেছেন, petty-bourgeois।

সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতারা যখন মনে করেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একচেটিয়া এজেন্সি তাঁদের, তাঁরা সবই বলতে পারেন। কিন্তু খুশ্চেভকেও যেতে হয়েছে মূলত "মার্কসিস্ট" অপবাদে। ১৩ বৎসর যাবৎ এই এজেন্সির তদারক করছেন ব্রেনেনভ। সি.পি. এস. ইউ. কর্তৃক প্রচারিত বই-পত্র পড়লেই তা জানা যায়।

চিঠিটি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। আরেকটি বিষয় সংক্ষেপে বলে শেষ করছি। আমি লিখেছিলাম, স্ট্যালিন-আমলের সি.পি. এস. ইউ-র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অস্ত্রান্ত সি.পি.-গুলির নিকট যেমন পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মত ছিল চীন সি.পি.-র নিকট তা ছিল না। মাও থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে পঞ্চমবার বলেছেন, আমার তথ্য ভুল।

আমার বক্তব্য মোটেই এই ছিল না যে, চীনের কমিউনিস্টরা ওই বইটি

তথ্য মার্কসবাদের অস্ত্র বই মার্ক করতেন না। না করলে, কমিউনিস্ট বিপ্লবের স্বপ্ন দেখাই তাঁদের পক্ষে সম্ভব হত না। এগুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, আপন দেশের বিশেষ অবস্থা বিশ্লেষণ করে, বিপ্লবের উপযুক্ত strategy ও tactics তাঁরা নিজেরা আবিষ্কার করেছেন, তৃতীয় আন্তর্জাতিক বা স্ট্যালিনের নির্দেশে এবং সাময়িকভাবে রুশের আত্মীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিজেদের মাছিমারাকেরানীতে পরিণত হতে দেন নি।

পঞ্চমবার হযত হোক না-চি কর্তৃক লিখিত এবং ১৯৫২-এ চীন সরকারের Foreign Languages Press কর্তৃক প্রকাশিত "A History of Modern Chinese Revolution" বইটি পড়েছেন; না পড়ে থাকলে, পড়তে অনুরোধ করছি। ১৯৫২-এর চীন-সোভিয়েট বিরোধ বেশ জমে উঠেছে। তবুও বইটিতে বহু সোভিয়েট এবং স্ট্যালিন প্রশংসিত আছে। মস্কো-পন্থী চীন সি.পি.-র প্রথম দিকের নেতা চেন তু-সিউ এবং লি-সানের ভুল-ভ্রান্তিজনিত কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেক ক্ষয়-ক্ষতির উল্লেখ আছে, কিন্তু কোথাও বলা নেই যে, তাঁরা মস্কো-নির্দেশিত পথে চলে ভুলভ্রান্তি করেছেন। মাও-এর নেতৃত্বে এই সব ভুলভ্রান্তি-ভয়ে নিয়ে চীন আপন পথে বিপ্লব সফল করেছে, বইটির মূল বক্তব্য এই।

মাও এর স্ট্যালিন-প্রশংসিত উদ্ধৃতিটি নিয়ে পঞ্চমবার প্রশ্ন করেছেন, রণজিৎ-বাবু কী বলেন? ১৯৫৬-তে খুশ্চেভ কর্তৃক স্ট্যালিন-বিরোধী ভাবপের দুই মাসের মধ্যে, ওই বৎসরের ২৫শে এপ্রিল, মাও চীনের পলিটবুরোর নিকট একটি রিপোর্ট দেন। আংশিকভাবে হলেও পঞ্চমবার তাঁর প্রশ্নের জবাব এতে পেতে পারেন। সম্মতি চীন সরকার রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে। মাও বলেন—

"Our policy is to learn from the strong points of all nations and all countries, learn all that is genuinely good in the political, economic, scientific and technological fields and in literature and art. But we must learn with an analytical and critical eye, not blindly, and we must not copy everything indiscriminately and transplant mechanically. Naturally, we must not pick up their shortcomings and weak points...."

"In the Soviet Union, those who once extolled Stalin to the skies have now in one swoop consigned him to purgatory. Here

in China some people are following their example. It is the opinion of the Central Committee [of the CPC] that Stalin's mistakes amount to only 30 per cent of the whole and his achievements to 70 per cent, and that all things considered Stalin was nonetheless a great Marxist....

"Stalin did a number of wrong things in connection with China. The 'Left' adventurism pursued by Wang Ming in the latter part of the Second Revolutionary Civil War period and his Right opportunism in the early days of the war of Resistance against Japan can both be traced to Stalin. At the time of War of Liberation, Stalin first would not let us press on with the revolution, maintaining that if civil war flared up, the Chinese nation ran the risk of destroying itself. Then when fighting did erupt, he took us half seriously, half sceptically. When we won the war Stalin suspected that ours was a victory of the Tito type, and in 1949 and 1950 the pressure on us was very great indeed...."

"In the social sciences and in Marxism-Leninism, we must continue to study

Stalin diligently wherever he is right. What we must study is all that is universally true and we must make sure that this study is linked with Chinese reality. It would lead to a mess if every single sentence, even of Marx's, were followed. Our theory is an integration of the universal truth of Marxism-Leninism with the concrete practice of the Chinese revolution...."

"The Soviet Union differs from our country in that, firstly, Tsarist Russia was an imperialist power and, secondly, it had the October Revolution. As a result, many people in the Soviet Union are conceited and very arrogant."

পঞ্চমবার, আমার বিশ্বাস মাও-এর এই রিপোর্টেও চীন-সোভিয়েটের তিক্ত সম্পর্কের অনেক কিছু গোপন রাখা হয়েছে। আপনি কী বলেন?

মাও যদি তৃতীয় আন্তর্জাতিক তথ্য মস্কো নির্দেশিত পথে চলতেন তবে সম্ভবত সি.পি. আই. ভারতে যা করে চলেছে চীনের সি.পি.-কে আজও তাই করতে হত। তথ্য কমিউনিস্ট আন্দোলনই নয়, সমগ্র বামপন্থী আন্দোলনকে তছনছ করে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা "destabilisation" এর বিরুদ্ধে লালঝাড়া তুলে চিরাগ কাই-শেখের "বামপন্থী ক্রমবর্ধমান ভাবে করতে হত। Great Russian আত্মীয় স্বার্থ তাতে বঞ্চিত হত নিশ্চয়ই।

রণজিৎ বাবু
নতুন দিল্লী

আসন্ন নির্বাচন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বাংলা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বাক-স্বাধীনতার মতই গুরুত্বপূর্ণ এবং গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য।

কিরকম বিরোধী শাসকদল চান গত বছর ২০শে ডিসেম্বর প্রধান-মন্ত্রী বললেন, কৈ বিরোধী দল তো কবুল করেছি যে এমার্জেন্সীর পূর্বে তাদের কৃত কার্যাবলী গণতন্ত্র বিরোধী ছিল। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করার প্রস্তাব তিনি পাণ কাটিয়ে যান, যে প্রস্তাব মাত্র তার তিন দিন পূর্বে দক্ষিণ ও মধ্যপন্থী দলগুলির প্রতিনিধি সম্মেলন শেষে লৌকিক ভাবে সরকার এবং শাসক দলের কাছে রাখা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী চান বিরোধী দলগুলি পত্রিকার ভাবে তাদের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানকে বর্জন করুক, অর্থাৎ ঐ দলগুলি আপন রাজনৈতিক আদর্শ ও দর্শন পুরোপুরি নাকচ করে পুরোপুরি সরকারী দলের অভ্যুত্থান অনুযায়ী "বে আক্কে, জী হুজুর" করতে থাকুক। তবেই কংগ্রেস সরকার সার্ভিকিট দিতে পারবে যে, তারা শাসক দলের দৃষ্টিতে গ্রহণীয়। ফ্রেন্ডসের এই ধারণের কথাই নিলজ্জভাবে বললেন স্বাষ্ট দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জীওম মেহতা।

অরচিত কাঁদে

হঠাৎ ১৮ই জানুয়ারী নির্বাচনী ঘোষণা। গত বছর ২৪শে আগস্ট তারিখে সরকার ঘোষণা করেন যে, কোন রাজনৈতিক দলকে চাঁদা দেবার ব্যাপারে কোম্পানীগুলির ওপর যে বিধিনিষেধ ছিল তা তুলে নেওয়া হল। কারণ দেখানো হল আইন মন্ত্রী গোখলে সাহেবের ভাবায়: "অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, বিধিনিষেধের অভ্যুত্থান কল মেনেনি।" কি সেই অভ্যুত্থান কল? এই ঘোষণার পর ভারতে বদেশী ও বিদেশী পুঁজির বোম্ব সহযোগিতার পরিণামক যে উঠতি বনকুবের প্রণী তাদের মুখপত্রের মুখে সর্ব্ব সাগতবাণী শোনা গেল সরকারের এই নিবেদন। তুলে নেওয়ার ফলে।

কারণ পরিষ্কার। গত দেড় বছরের এমার্জেন্সীতে এই প্রণীর মত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক উৎপাদন তথা মুনাফা বৃদ্ধির ভিত্তিতে আর কোন প্রণী পায়নি। অতএব শাসক দল ছাড়া আর কোন দল তাদের চোখে বেশি কায়া? সংবিধান সংশোধনের ফলে গণতান্ত্রিক অধিকার অপহৃত, প্রেস আইনে সংবাদপত্রের গলায় কাঁয়। এদিকে দেড় বছরের এমার্জেন্সীতে বিরোধী দলের কার্যকলাপ তরু করে দেওয়া হয়েছে। এই উপযুক্ত সময় নির্বাচন মেয়ে নেবার।

কমভেনশন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অসত্য কথা বসছেন। কোন জিনিসের মাস বাড়েনি?

২০ হফা কর্মক্ষমতা সম্পর্কে জীবন্ত বলেন, এতে জিনিসের সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয় নি। কারণ কংগ্রেস সরকার জানেন জিনিসের ভাঙতা দেওয়া যাবে না। তাই জিনিসের ওপর প্রথম থেকেই আক্রমণ মেমে এসেছে। তাদের যোযা কমানো হল, মহার্য ভাতা কাটা হল, ইটাই লক-আউট লে-অফের মাধ্যমে পাইকারীভাবে কর্মহীন করা হল এবং কাজের বোঝা বাড়ানো হল। মালিকদের বিরুদ্ধে জিনিসের প্রতিবাদে অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। আর মালিকদের দেওয়া হল একের পর এক সুবিধা। তাই টাটা-বিজলা থেকে শুরু করে সমস্ত একচেটিয়া পুঁজিপতি জরুরী অবস্থার প্রশংসায় পক্ষপূর্ণ। জিনিসের প্রতিবাদ করতে না পারে তার অস্ত্রে কারখানার ভেতরে জুনিয়নের মোক চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেও জিনিসের প্রতিবাদ করেছেন আর সরকার মিরেছেন মালিকের পক্ষ। ৮ মাস ধরে এই অবস্থা চলছে। প্রয়োজন হলে এর বিরুদ্ধে জিনিসের বর্ষভট্টের পথে বেতে হবে।

জীবন্ত বলেন, প্রাচ্যের কৃষকরা ফসলের বেটু হার পেজেন এবার ভাত পান সি। কেতমজুরের সরকার নির্ধারিত মজুরি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। জোতদারের মোকোরা এবার ৩০ জন বর্গাদারকে খুল করেছে। বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীর ভুক্ত সেমে জালিকাজু বেকারের সংখ্যা ছিল ৪৫ লক্ষ, এখন তা এক কোটির ওপর।

বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জীবন্ত বলেন, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সরকার দরবার কবজা করার করেছেন। সংসদপন্থের ওপর প্রাক-কেন্সরশিপ প্রত্যাখ্যারের কথা বলা হলেও সংবিধান সংশোধনের দৌলতে সরকারের হাতে বে কবজা এসেছে ভাত বে কোন পেসে ভালা জুলিয়ে দিতে পারবে সরকার। এর বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়া যাবে না। সি পি আই (এব) এর কলকাতা কেন্দ্র কমিটির উদ্যোগে অরেন্জাশ পার্কে কল্যা হাউসের বিরুদ্ধে মিছিলের ডাক দেওয়া হয়ছিল। কিন্তু তা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় এবং এর না পেয়ে বারো সেখানে জমারত হয়েছিলেন তাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জীবন্তি বহু প্রশ্ন করেন:

বিকোড মিছিল করতে দেওয়া হবে না, প্রকাশে মিটিং করতে দেওয়া হবে না তাহলে মির্বাচন কি করে হবে? তিনি এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় জন্ত আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলার এবং মূল-মন্ত্রে নির্দেশে মিচের জলার ঐক্যকে জিনিসদের স্বার্থে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

ইউ টি ইউ সি নেতা জীবন্তীল দেনন্তপ্ত বলেন, লড়াই ও আন্দোলনই মেহনতী মানুষের বিচার পথ।

এইচ এম এস নেতা জীবন্তীল ব্যানার্জী বলেন, শাসক জেণীর আক্রমণ রুখতে জিনিস জেণীকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

টি ইউ সি সি পির পক্ষে জীবন্তীল দাশগুপ্ত প্রতিটি কলকারখানার যুক্ত মোর্চা গড়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ওপর জোর দেন।

এইচ এম পির পক্ষে জীবন্তীল অধিকারী ও আন্দোলনের জন্ত যুক্ত মোর্চা গঠনের কথা বলেন।

কমভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় জরুরী অবস্থা প্রবর্তনের পর জিনিস কৃষক ও সাধারণ মানুষের ওপর শাসক জেণীর আক্রমণ, মাগরিক ও গণ-তান্ত্রিক অধিকার হরণ, সংবিধান সংশোধন করে জমমমূলক রাজস্ব কার্যকর, অত্যধিক কর্তার, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, কৃষক উচ্ছেদ, মালিক জেণীর বেপরোয়া আক্রমণ, বিনা বিচারে আটক ইত্যাদি বেহনতী মানুষের জীবন হুঃসহ করে ফুলেছে।

এই পরিস্থিতিতে মেহনতী মানুষের জীবন ও জীবিকার সংগ্রামকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্ত এই কমভেনশনের আন্তারিক পাঁচটি কেন্দ্রীয় ইচ্ছা ইউনিয়ন ১৯৭৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর দশ দফা দাবি সংবলিত বে যুক্ত ঘোষণা পত্র প্রচার করেছে এই কমভেনশন সেই ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেছে এবং এর ভিত্তিতে দশ দফা দাবি পুরণের জন্ত দাবা পশ্চিম বাংলার জিনিস-কর্মচারী কৃষক ও কেতমজুর এবং সর্বস্তরের গণতান্ত্রিক মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন যথেষ্ট তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এই কমভেনশন হল সত্ত মির্বিষে লব ইচ্ছা ইউনিয়ন ও গণসংগঠন এবং গ্রাম ও শহরের সব মানুষের কাছে দশ দফা দাবি আদায়ের জন্ত যুক্ত আন্দোলনে যোগ দেবার আহ্বান জানিয়েছে।

পাতাল রেল ৮০ মাসে

(দর্পণের সংবাদমাতা)

আমরা তাহলে কবে পাতালরেল চড়ছি? প্রশ্ন করেছিলেন বেন্টি-পলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রোজেক্টের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রীমজিতকুমার চক্রবর্তীকে। সহান্তে উত্তর দিলেন তিনি, আশা করছি আপনাকে চড়াতে পারবো ৮০ সাল নাগাদ, তবে জনসাধারণকে চড়াব হরত বর্ষ পরি-কল্পনার শেষে। গত ২১ জানুয়ারী শ্রীচক্রবর্তী এবং ঐ সংস্থার জনসংযোগ অধিকর্তা শ্রীদীনার দাশগুপ্ত সাংবাদিকদের পাতাল রেলের অগ্রগতি কতটা হয়েছে তা দেখাতে নিয়ে গিরেছিলেন দমদম-বেলগাছিয়া এবং ময়দান এলাকায়।

বেলগাছিয়ার হুম্বাগান থেকে সোরা এক কিলোমিটার অকল জুড়ে সটির নীচে বে করবজ চলছে ওপর থেকে তা বোকার উপায় নেই।

শ্রীচক্রবর্তীর সঙ্গে আমরা যখন, শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি তখন তিনি বললেন, এখন আমরা বেখানে দাঁড়িয়ে আছি তা ওপর থেকে তিন মিটার নীচে। এর ওপর দিয়ে চলে গেছে রাজ্য। তার সঙ্গে আরও দুটি সেক্টর ঘুরে দেখলাম।

গোটা প্রকল্পের জন্ত বরাদ্দ ধরা হয়েছে প্রায় ২২০ কোটি টাকা। গত বছর এবং এ বছরে খরচ হয়েছে ২২ কোটি টাকা। আগামী বছর লগবে আরও ১১ কোটি টাকা। তবে পাতাল রেলের কাজের অগ্রগতি নির্ভর করছে টাকার ওপরে। ৮১ সালের পর টাকার বরাদ্দ যদি না বাড়ানো হয় তবে এর কাজ ব্যাহত হবে।

শ্রীচক্রবর্তী বললেন কেন্দ্রীয় সালের মধ্যেই দমদম বেলগাছিয়ার

কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর তা হবে টালিগঞ্জ এলাকার কাজ। ৮১ সালের শেষ নাগাদ টালিগঞ্জ-ময়দান এবং দমদম-বেলগাছিয়ার চারটি স্টেশন তৈরী হয়ে যাবে। যেটা ১৬টি স্টেশন হবে। পরীক্ষামূলকভাবে পাতাল রেল চলবে উত্তরে। কিন্তু এখানে পাতাল রেল চড়বার সুযোগ পাবে দক্ষিণ কলকাতার জনসাধারণ। যে জন্ত যেটা ১০০টি বসি তৈরী করা হবে। যষ্ট পরিকল্পনার শেষ নাগাদ (৮৪-৮৫ সালে) পাতাল রেলের কাজ শেষ হলেও (যদি প্রয়োজনমত অর্থ পাওয়া যায়) চিত্তরঞ্জন অ্যাডমিটর কাজ বাকী থেকে যাবে। শ্রীচক্রবর্তী বললেন, বরাদ্দ অর্থ, বিচারবার জন্ত আগ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। চেষ্টা করা হচ্ছে বতটা সন্তুর্ দেণী মাল ব্যবহারের। পাতাল রেলের কাজে অনেক বাধার প্রাচীর অতিক্রম করতে হচ্ছে। গত একবছরে কাজ বৃথেষ্ট এগিয়েছে বলেই মনে হয়। কিন্তু দুই থেকে তা বোকার উপায় নেই।

সি পি আইয়ের আক্রমণ কীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলশেভিক ও বেনশেভিকে বিচ্ছিন্ন করে যায় এবং পার্টিতে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। লেনিন-নির্দেশিত কার্যক্রম এই বংসর গৃহীত হয়। অর্থাৎ রুশীয় বলশেভিক (কমিউনিষ্ট) পার্টির প্রথম কার্যচর্চা এটি।

প্রোগ্রামটির সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়েছে ১৯৭০-এ মস্কোতে পোডিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশিত বইটিতে। একে পাঠ্যগতভাবে বলা যায় সি. পি. এস. ইউ-র ইতিহাসের ব্রেকনেড সংস্করণ। এর পূর্বে দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, একটি ট্যালিনের আমলে, ১৯৩৮-এ, অপরটি পুশ্কেভের আমলে, ১৯৬০-এ। সেটা বঙ্গের পরিগায়ে রুশীয় ইতিহাসবেত্তাদের সি. পি. এস. ইউ. দৃষ্টিতে ভাঙা ও জ্ঞান কী পরিমাণে বহুলায় তার প্রকট উদাহরণ হল ইতিহাসের এই ভিন্নটি সংস্করণ।

ব্রেকনেড সংস্করণে দেখতে পাচ্ছি, লেনিন-নির্দেশিত প্রোগ্রামের প্রায় পোড়ার দান পেরেছে এই দাবী, "বিশেষ, বহুতা, প্রেস, সভা, ক্রীড়ক এবং সংগঠনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।" ("unrestricted freedom of conscience, speech, the press, assembly, strikes and associations.")

১৯৩৫-এ কমিউনিষ্ট আতর্জাতিকের সঙ্ঘ (এব) শেষে) অধিবেশন বসে। বুর্জোয়া দেশে নাগরিক স্বাধীনতা সবচেয়ে আতর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নীতির ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বলেন, "বনজাতিক দেশে বুর্জোয়া-ডেমোক্রেটিক স্বাধীনতা (নাগরিক) রকার জন্ত আমরা প্রতি ইচ্ছা লড়ে যাব।"

বিশেষ করে কয়েক বংসর থেকে পশ্চিম ইউরোপের বড় বড় কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিও অগ্ররূপ ঘোষণা করে যাচ্ছে।

সোভিয়েট প্ররোচনার কোন কোন দেশে, বেনন মিশরে, সি. পি. ডলি কবজার অধিষ্ঠিত বুর্জোয়া পার্টিতে আত্মবিলোপ ঘটিয়েছে। আমাদের সি. পি. আই. অবশ্য অত্যন্ত এখনও অগ্রসর হয় সি।

এই সেদিন সি. পি. আই-র কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অধিবেশন হয়ে গেল বালালোরে। বহু উদ্বেগ মধ্যে, কারণ ওই সময়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বল সি. পি. বিরোধী বিবৃতির বৃত্তা এবেছিলেন। জরুরী অবস্থার মে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা করে বালালোরে একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "ভালার দিক (positive side) হচ্ছে, জাতীয় অর্থনীতির উন্নতির জন্ত নিঃসন্দেহে কতিপয় লাভ হয়েছে; খারাপের দিক (negative side) হচ্ছে, অর্থনীতির এই উন্নতি থেকে জনসাধারণের উপকার হয় নি; তাদের অবস্থার কোন জরূহা হয় নি।"

তবে লাভ হল কারের? বুর্জোয়াদের, সম্পত্তি-শালীদের? সি, পি, আই বলেন, "সরকারের মনোভাবের জন্ত সাহস সঞ্চার করে, একচেটিয়া শিল্পপতিরা লক-আউটের নামে কারখানা বন্ধ করে দিলে, জিনিসদের কাজের বোঝা বাড়ালে এবং তাদের ইটাই করছে।"

সি, পি, আই মিজেই যখন বলছে, আমাদের সরকার "বুর্জোয়ার প্রতিদ্বন্দ্বি" তখন সেই সরকার থেকে আর কিছু কি আশা কবেছিল সে? সে কি মনে করেছিল, বুর্জোয়া-রাই আমাদের দেশে সি, পি, আই লম্বাঅত্ম বসতে বা বোঝে সে রকম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে?

"ভালার দিক থেকে খারাপের দিকই প্রকট" সি, পি, আই। জরুরী অবস্থার না কিছু ঘটে বাই কেন, সি, পি, আই তার নীতিতে অবিচল। বালালোর থেকে সে তাক দিয়েছে, চল, তাই লব, এগিয়ে চল, "সব গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল শক্তির সক্রিয় ঐক্য স্থাপন কর—বিশেষ করে সি, পি, আই ও কংগ্রেসের ঐক্য।" না, তদুপাঞ্জ প্রগতিশীল কংগ্রেসীদের সঙ্গে ঐক্য নয়, একেবারে কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া।

বিগত সাত বংসর ধরে এই ঐক্যের কল জনসাধারণ ভোগ করে আসছে। আরও কত কল ভোগ তাদের তাগ্যে আছে ভগবানই জানেন, দত্তবত জুহু মস্কোতে বলে কমরতে ব্রেকনেডও।

সম্পাদক—হীরেন বহু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩১ আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র রোড কলিকাতা-৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ১৬ নং বেন কলিকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত



দিল্লীতে পঞ্চজের অফিসে হামলা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দিল্লীতে যুব কংগ্রেসের সদর দফতরে পঞ্চজ ব্যানার্জীর ঘরে হামলা হয়েছে বলে কলকাতায় পঞ্চজবাবুর শনিষ্ট মহল থেকে জানা গেল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সভানেত্রী অধিকা সোনী পঞ্চজবাবুকে অপসারিত করে বিরূতি দেন। কিন্তু পঞ্চজবাবু এই অপসারণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন জাতীয় কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় আমার অপসারণের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয় নি আর আমি পদ-

(শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

স্বৈরাচারী নেতৃত্ব নিজের কবর খুঁড়ছে

॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥

কংগ্রেস দল আবার দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার সম্মুখীন। ঠিক সেইভাবে নয় যেভাবে ১৯৬৯ সালে ইন্দিরার অহুগামী আর মোরারজী-কামরাজের অহুগামীরা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। সেবারের তথাকথিত প্রগতিশীল নেতৃত্ব দেশের বহুলোকের সমর্থন পেয়েছিল আর আজ ১৯৭৭র সূচনায় এবং নির্বাচনের প্রাক্কালে সেই নেতৃত্ব সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের কাছে জঘন্য অপরাধীর চেয়েও ঘৃণ্য। কেননা এই নেতৃত্ব দলের মধ্যে স্বৈরাচার চালিয়ে সব ক্ষমতা নিজেদের কন্ডায় রাখতে চেয়েছে এবং দেশের অভ্যন্তরে স্বৈরাচার ও স্বৈরশাসনের বোকার দিয়ে সমস্ত রকমের বিরোধিতাকে নিমূল করার চেষ্টা করেছে। মুখে এদের সমাজতন্ত্রের বুলি আর কাজে এরা একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রাণের বন্ধু এবং চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল।

চাকলাকর থবর : জগজীবন রাম কংগ্রেসের সঙ্গে ৪৫ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন দল গঠন করেছেন। সঙ্গে আছেন স্বৈরাচারী নেতৃত্বের হাতে লাহিত ও অপমানিত নন্দিনী সংপদী, এইচ এন বহুগুণা, কে আর গণেশ এবং আরও কিছু কংগ্রেসী। জরুরী অবস্থায় সমস্ত রকমের গণতান্ত্রিক অধিকার হারিয়ে সাধারণ মানুষ যেমন ভয়ে মরছিল, তেমনি কংগ্রেসীরাও স্বৈরাচারী নেতৃত্বের ডিক্টেটরী শাসনে অসহায়তা বোধ করলেও তাদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধছিল। এখন সেই বিক্ষোভ একটা আকার নিয়ে প্রকাশ্য রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হল। জগজীবন-নন্দিনী-বহুগুণার বিদ্রোহ আকস্মিক হলেও এর মধ্যে প্রভুত্ব রয়েছে এবং এরা অনেক কংগ্রেসীর সমর্থন পাবেন বলে মনে হয় যদিও প্রকাশ্যে অনেকে যোগ দিতে হয়ত রাজি হবেন না।

প্রায় সব রাজ্যেই শাসক দলে খেয়োখেন্ডি, ল্যাং মারামারি ও সশস্ত্র সংঘর্ষ দীর্ঘকাল ধরেই চলছে ক্ষমতার ও চাকা পরসার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে। জনসাধারণ কিম্বা দেশের স্বার্থের দিকে তাকাবার এদের অবকাশও নেই, ইচ্ছাও নেই। আর স্বৈরাচারী সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ক্ষমতাশীল থাকার জন্য কেবল খাঁট-ঘাট বাঁধছে। দেশের গলায় জরুরী অবস্থার কীস পরাবায় পরই সঞ্জয় গান্ধী হঠাৎ নেতা হয়ে গেলেন। এরকম ভূঁইকোড় নেতা দুর্নয় আর দেখা যায় নি। আকাশবাণী টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের প্রচারে সঞ্জয় আজ জাতীয় নেতা। সঞ্জয়কে নেতা তৈরি করার জন্য সরকারী প্রশাসনয়ন্ত্র আকাশবাণী ও টেলিভিশনকে কি নিল জ্ঞতায়ে ব্যবহার করা হয়েছে। মারুতি-খ্যাত সঞ্জয় এখন জাতীয় যুব নেতা আর জ্যোতির্ময় বহু ও রাজনারায়ণ জেলে পচে মরছেন। কি অদ্ভুত পরিহাস!

সঞ্জয় নেতা হয়েই যুব কংগ্রেসের একনায়কত্ব অভিযুক্ত হলেন যদিও তিনি যুব কংগ্রেসের সভাপতিও নন, সম্পাদকও নন। তাঁরই নির্দেশে যুব কংগ্রেসে ভাঙ্গাগড়া হতে লাগল। তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট হলে লাভ, না হলে ক্ষতি। তাঁর গোঁসা হলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ধরাশায়ী। বহুগুণা ও নন্দিনী গদিচ্যুত হলেন। সিদ্ধার্থ রায় বোধহয় ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেলেন (প্রিয় মুন্সী লক্ষী বহুকে ধন্যবাদ), কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদেরও রেহাই নেই। প্রবীণ শরণ সিং বিদায় নিলেন, সংস্কৃতিমান গুজরালের জায়গার ভোমামুর্দে শুক্লা এলেন।

এভাবে চলতে পারে না। রাজতন্ত্রের যুগ শেষ হয়ে গেছে। এটা সমাজতন্ত্রের যুগ—নকল নয়, আসল। হুতরাং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দলের মধ্যে বিদ্রোহ হবে, দল টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, সাধারণ মানুষ সংগ্রাম করবে গণতান্ত্রিক অধিকার ও রুটির জন্য।

জগজীবন রামের পদত্যাগ শুভ সূচনা। এতে শাসক দল দুর্বল হল এবং পার্লামেন্টের নির্বাচনে প্রতিপক্ষরা অর্থাৎ জনতা পার্টি ও বামপন্থী দলগুলোর শক্তি বাড়ল। আরও শুভ সংবাদ : বিরোধীরা ত্রিমুখী লড়াইয়ের কোন সুযোগ দিচ্ছেন না, তাঁরা সোজা হুজি কংগ্রেসের সঙ্গে লড়বেন। বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী যারা মনোনয়ন পাবেন না তারা নির্দলীয় রূপে দাঁড়ালে কংগ্রেসের ভোট ভাঙবে। কিন্তু কারচুপির সম্ভাবনাকে কি করে রোধ করা যাবে সেটাই একটা বড় প্রশ্ন।

বির্বাচনী তহবিলে তিন কোটি টাকা (দর্পণের সংবাদদাতা)

পার্লামেন্টের নির্বাচনী লড়াইয়ে কংগ্রেসের প্রচুর টাকার ব্যবহার। টাকা তৈরীলা শুরু হয়ে গেছে। জানা গেল, জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সম্প্রতি কলকাতায় এসে কয়েক দিনের মধ্যে তিন কোটি টাকা তুলে নিয়ে গেছেন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। এই মন্ত্রী একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত।

জরুরী অবস্থায় অর্থনৈতিক অগ্রগতির আসল চেহারা

ডঃ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী

শত সহস্র নাগরিককে বিনা অভিযোগে এবং বিচারে কারারুদ্ধ করে যেদিন 'আন্তর্জাতিক আপকাল' ঘোষিত হল তার পাঁচ দিন পরে, ১৯৭৫ সালের ১লা জুন শ্রীমতী গান্ধী জাতির কাছে 'অর্থনৈতিক কার্যশূচী' সম্বন্ধে এমন একটি হুঁশুপ্রের বিব্রান্ত বক্তৃতা দিলেন যা তার পরে '২০ দফা অর্থনৈতিক কর্মশূচী' নামে পরিচিত হয়ে পরবর্তী কালে এমন এক চিচিং ফাঁক মস্ত হয়ে দাঁড়াল যে, তার বলে জেলের দরজা আপনা থেকে খুলে গেল, মানুষকে বিপ্লবী চরিত্রের অপারিশ পাইয়ে দিল এবং আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের নতুন দেবী মূর্তির একেবারে করমর্দনের দৃশ্যে হাসির করে দিল।

কিন্তু এটা ছিল নেহাৎ বেতার বক্তৃতা। কোন লিখিত

কার্যশূচী প্রচারিত হল না। ফলত প্রথম থেকেই এ সম্পর্কে বিভ্রান্তি জন্মতে থাকল। প্রশ্ন উঠল : ২০-দফা না ২১-দফা কার্যশূচী? এটা কি এক বছরের জন্য না চিরকালের। সম্ভাব্য এই বিভ্রান্তি অনেককে প্রভূত অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলল। অনেক ব্যক্তি রক্ষা পণ দিয়ে এবং ২১-দফার কুর্ভাগ্যে গ্রেপ্তার থেকে অব্যাহতি কিনেছিল। বড় বড় সরকারী বিজ্ঞাপনে অবশ্য ২০-দফা কার্যশূচী ঘোষিত হল। তাহলে এই সব ব্যক্তিরা কি ভ্রান্ত কর্মশূচীর নামে শপথ নিয়েছিলেন? বিভ্রান্তি আরো জটিল হয়ে উঠল কারণ কেউ-ই দফাগুলি কি তা জানত না; তারা

(শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে তীব্র সঙ্কট

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্য রাজনীতি এখন নির্বাচন-যুগী। কংগ্রেসের দৃশ্য নির্বাচনকে ঘিরে নতুন রূপ নিয়েছে। গত ২৮শে জাভুয়ারী প্রদেশ কংগ্রেস কর্মসমিতির সভায় হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। সভা ডাকা হয়েছিল ৪২টি কেন্দ্রের কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করার জন্য।

নির্বাচনে মনোনয়ন পাওয়ার জন্য এত উমেদারি সচরাচর দেখা যায় না। রাজ্য কংগ্রেসের যত নেতা আছেন প্রত্যেকেই এক বা একাধিক প্রার্থীর জন্য তদ্বির করছেন। এখানে কিছু হলো না দেখে বাকি বেধেদেঁপে। পেনে, এয়ার বাসে দিল্লী পাড়ি দিয়েছেন দুবাই। উদ্দেশ্য—নির্বাচনে মনোনয়ন পাওয়া অথবা পাইয়ে দেওয়া। তবে এবার নির্বাচনে কংগ্রেস

প্রাণা বাছাইয়ের সময় শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি আহুগত্যের প্রমুখা প্রধান বিচার্য বিষয় হবে। সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জয় গান্ধীর প্রতি আহুগত্যের ব্যাপারটাও আছে। এবার নির্বাচনে মনোনয়ন দেবার ব্যাপারে সঞ্জয় গান্ধীর একটা বিরটি ভূমিকা রয়েছে। আর শ্রীমতী তাঁর বিরোধীদের সহজে মনোনয়ন পেতে দেবেন বলে মনে হয় না।

গোলমাল বেধেছে এখানেই। প্রিয় দাশমুখী, সৌগত রায়, সুদীপ ব্যানার্জী প্রমুখ প্রথম সারির সঞ্জয় বিরোধী যুবনেতারা সবাই মনোনয়ন প্রার্থী। এদের সঙ্গে মায়ী রায়ও আছেন। কিন্তু রাজ্যের সঞ্জয় সমর্থক যুব নেতারা এদের মনোনয়ন দানে ঘোরতর বিরোধী। অপর পক্ষও নাছোড়বান্দা।

প্রিয়বাবু, পঞ্চজবাবু, প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের জন্য ১২টি আসন চাইবেন। এর মধ্যে ছয়টা থেকে সাতটা আসন তাঁদের চাই-ই। না পেলে হয়তো তারা বিক্ষুব্ধ প্রার্থী দাঁড় করাবেন। অবশ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবী চট্টোপাধ্যায় প্রিয়বাবুকে মনোনয়ন দেবার পক্ষপাতী বলে জানা গেল। দেবীবাবু চাইছেন একটা মিটমাট হোক নির্বাচনের আগে। কিন্তু অন্তরা আপোষ বিরোধী।

সিদ্ধার্থবাবু দ্বিতীয় যাওয়ার আগে লক্ষী, পঞ্চজ, প্রিয়, সৌগত প্রভৃতি যুবনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে গেছেন। তিনি দিল্লীতে পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্যদের কাছে এই গোষ্ঠীর বক্তব্য তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন বলে জানা গেল।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কেবল জানত যে দফাগুলি ভারী 'ভাল এবং বিপ্লবী'। প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতাও এ ব্যাপারে তাঁদের খুব সাহায্য করল না কারণ সেই বক্তৃতা ছিল, আগেই বলা হয়েছে, আবোল তাবোল—সুশ্রুত এবং সুসংহত চিন্তার অভাবে। সকলেই জানেন যে, অর্থনীতি বিষয়টিতে শ্রীমতী গান্ধি খুব অস্বস্তি বোধ করেন, বিশেষত এই কারণে যে, তথ্য তাঁর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই মেঠো বক্তৃতা যাতে তিনি পারদর্শিনী তা অর্থনীতির মত বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সংক্ষেপে ভাল মিশ খায় না।

শেষ পর্যন্ত বিশ দফা নাম দিয়ে এই সমস্তার সমাধান করা হল যাকে এক বছরের মধ্যে কার্যকর করতে হবে। বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল আঠারো নং দফাকে নিয়ে যার মধ্যে লাইসেন্স শব্দে বলা হয়েছে। বেতারবক্তৃতায় এ সম্পর্কে উল্লেখকালে শ্রীমতী গান্ধি চোখ গিলে বলেছিলেন 'আমদানি লাইসেন্সের অপব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে'। এই যুক্তোড়গোকে যারা গুণছিলেন তারা তাঁর দম নেওয়াকে নতুন দফা বলে ভুল করে মনে করলেন যে, আঠারো নং দফাকে ভেঙে ছোট করা হয়েছে। জনগণকে অর্থনৈতিক কর্মসূচীর নামে তাক লাগিয়ে দেবার যে পদ্ধতি শ্রীমতী গান্ধি গ্রহণ করলেন তাতেও যে আদ্যোপান্ত গোলমাল তিনি করেছেন তা থেকে তাদের দৃষ্টি অন্তর ফেরাবার পক্ষে ২০ দফা কর্মসূচীর বুলি হল শ্রীমতী গান্ধির উদ্ভাবিত কৌশলের মধ্যে এক নম্বরের। ইহুদী নির্ধনকালে হিটলারের ২৫-দফা কর্মসূচীও অল্পরূপ ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচারিত হয়ে নাম পেয়েছিল 'বিপ্লবী এবং সমাজবাদী'। হিটলার ছিল অনেক সুসংগঠিত কাজেই তিনি বহুদিন ধরে এই শব্দনাট্য চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধির বেলায় অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁর শূণ্যগর্ততা এবং সাংগঠনিক দেউলেপনা মাত্র এক বছরের মধ্যেই ফুটে বেরল।

কথা ছিল এক বছরের মধ্যে বিশ দফা কর্মসূচী কার্যকরী হবে। কল কি হয়েছে? এই কর্মসূচীর নীট পরিণতি-গুলি লিপিবদ্ধ করার আগে যে পরিলক্ষিত এই কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছিল তা অস্থাবর করা আবশ্যিক।

পরিকল্পনা কমিশন একটি ষড়ঙ্গ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সরকারের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অগ্রাধিকারের বিবরণ এবং উন্নয়ন কৌশল ছকে দিয়েছিল। যদিও এই পরিকল্পনা কখনো ষড়ঙ্গের অবস্থা অতিক্রম করেনি এবং যদিও পাঁচ বছরের একটি বছর (১৯৭৪-৭৫) অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল তবু এটাই ছিল অর্থনৈতিক কর্মসূচী সম্পর্কে সরকারের একমাত্র দলিল যাকে তখনো অস্বীকার করা হয় নি। তাহলে বিশ দফা কি? এটা কি পঞ্চম পরিকল্পনার পরিবর্ত, সংশোধক, পরিপূরক, সম্পূরক অথবা তাকে কার্যে পরিণত করার জন্ত অথবা তার সংগে একেবারে সম্পর্কহীন? এই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, বিশ দফার অনেক দফার পঞ্চম পরিকল্পনাকে খণ্ডন করা হয়েছে। যেমন বিশ দফার ৬ নং দফায় বলা হয়েছে 'এক বছরের মধ্যে অন্তত ৫০ লক্ষ হেক্টর জমি' সেচের আওতায় আনা হবে। প্রথম দিকে বোঝা যায়নি বড় এবং মাঝারি সেচ এর অন্তর্ভুক্ত কিনা। পরে কৃষি মন্ত্রী সংসদে বলেন যে এগুলি অন্তর্ভুক্ত। পঞ্চম পরিকল্পনা হালিলের লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়েছিল যে পরবর্তী তিন বছরে (১৯৭৬-৭৮) বায়ুত্বিত কাজে লাগানো মোট সেচের পরিমাণ হবে ৩০-৩০ লক্ষ হেক্টর। আবার ১৯৭৫-৭৬ সালের বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল বায়ুত্বিত ০.১০ লক্ষ হেক্টর মাত্র। এখন কোনটাকে চূড়ান্ত ধরা হবে? প্রধান মন্ত্রী হলেন বিশ দফার জননী আবার পরিকল্পনা কমিশনেরও চেয়ারম্যান। একজন লোকই একই সময়ের জন্য ০.১০ লক্ষ এবং ৫০ লক্ষ হেক্টর কী করে

লক্ষ্য মাত্রা করতে পারে? কিন্তু শ্রীমতী গান্ধি ঠিক তাই করেছিলেন। শেষ প্রাপ্তি কী হল? শ্রীমতী গান্ধির সন্তাপতিত্ব পরিকল্পনা সম্পর্কিত এমপিসের পরামর্শ সমিতির এক সভায় ৫ আগষ্ট ১৯৭৬ উপস্থাপিত দলিল অমুসারে আকাজিক প্রাপ্তি আরো কম—০.৮০ লক্ষ হেক্টর মাত্র। বিশ দফা কর্মসূচীতে সেচের আওতায় আনীত যে মোট এলাকার কথা ভাবা হচ্ছিল তা নয়—এর দ্বারা সৃষ্টি হচ্ছে যে সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে তা। ১৯৭৬ এর ২৩ জুলাই লোকসভায় এক প্রশ্নোত্তরে সরকার জানিয়েছেন যে ১৯৭৫ এর ১লা জুলাই থেকে মাত্র ১২.৪০ লক্ষ হেক্টর জমির সেচ প্রকল্পে মজুরি দেওয়া হয়েছে যার কার্যে রূপায়ণ নির্ভর করবে রাজ্য সরকারগুলির প্রাপ্তব্য সংগতির উপর।

প্রথম মন্ত্রীর অর্থনৈতিক কর্মসূচীর অস্তিত্ব প্রশ্নেও একই ধরনের স্ববিরোধ বর্তমান। যেমন শক্তিউৎপাদন সম্পর্কিত ৮ নং দফা সম্পর্কে যার কল একই। মনে রাখতে হবে যে পঞ্চম পরিকল্পনা করা হয়েছিল জরুরী অবস্থার অনেক আগে ১৯৭২ সনে যখন আভ্যন্তরীণ অস্থিরতার কলনাও করা হয়নি। বিরোধী দলের এম পি এবং বিভিন্ন দলের সংগে আলোচনা করেই এটাকে গড়ে তোলা হয়েছিল। আর বিশ দফা বেতাবে প্রচারিত হয়েছিল জরুরী অবস্থার পরে। কিন্তু উপরের দুটি দৃষ্টান্তের প্রেক্ষিতে বিচার করে দেখা যায় কাজে যা পরিণত হল তা হল জরুরী অবস্থার আগেকার পরিকল্পনার দলিল। শ্রীমতী গান্ধি উভয় দলিলের ই রচয়িত্রী একথা মনে রাখলে বাস্তব ঘটনা বিশ দফা কর্মসূচীর প্রকৃত চরিত্রের উপরে আলোকপাত করে—এটি এমন সূচী যা নামেই আছে, কাজে নয়।

বিশ দফা কর্মসূচী সম্বন্ধে আরো কামেলার প্রশ্ন ছিল। এর আগে যে দশ দফা কর্মসূচী প্রচারিত হয়েছিল তার সংগে বর্তমান বিশ দফার সম্পর্ক কি? ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস এই দশ দফা কর্মসূচী প্রচার করেছিল। ১৯৬৯ সালে শ্রীমতী গান্ধি কয়েকটা অসংবদ্ধ চিন্তার কথা বললেন, অমনি তার বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে জনতা তার সমর্থনে গগন বিদীর্ণ করল। তার পরে ১৯৭১ সালে এল বিখ্যাত এক দফা কর্মসূচী—গরীব হঠাৎ। কলকাতার কাছে বিধান নগরে তাকে ঢোল শহরতে প্রচার করা হল ১৯৭২ সালে। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে নরোয়ার গোপন সলাপরাশের পরে একটা বারো দফা কর্মসূচী বানান হল যার কথা কোনদিন জানা যাবে না। তার কয়েক মাস বাদেই বিশ দফা। যারের সংগে পাল্লা দিয়ে তাঁর পুত্রও একটা চার দফা কর্মসূচী বের করে ফেলেছেন যাকে রূপায়িত করতে হবে সরকারকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে এই ধরনের কর্মসূচী উৎপাদনের ক্ষমতা এদের অসীম।

এখন মৌলিক প্রশ্ন হল এতগুলি পরিকল্পনার কোনটা

এখন পর্যন্ত চালু আর কোনটা বাতিল। বিশ দফা ঘোষণা করতে গিয়ে শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন যে, আর আত্মীয়করণ করা হবে না। অর্থাৎ আগেকার সব কর্মসূচী, বিশেষত: 'অসংবদ্ধ চিন্তা' আত্মীয়করণ ছাড়া কথা নেই। আত্মীয়করণের উদ্ভাদনা এমন পর্যায়ে উঠেছিল যে, কংগ্রেস-সভাপতিকে এক সময় শাসনো হয়েছিল যে, আইন ব্যবসায় আত্মীয়করণ করা হবে। শ্রীমতী গান্ধি কি এখন 'আত্মীয়করণের দায়িত্ব অস্বীকার করছেন? এতে কি এ কথাই প্রমাণ হয় যে, ১৯৬৯ সালে মোরারজী দেশাই-ই সঠিক ছিলেন?

একথা স্পষ্ট যে, বিশ দফা হল একটা জোড়াতালি—বিবেকের টুকরো জমিয়ে তাড়াহুড়ো করে বানানো, মানবিক অধিকারের আভ্যল্যমান লঙ্ঘন থেকে মাহুষের দৃষ্টিকে অস্ত্রদিকে কিরিয়ে নেবার এক কৌশল এবং আর্থিক ব্যাপারে অতীতের অপদার্থতাকে ঢাকবার আবরণ। এর উপরের সত্য এই যে, এই বিশ দফাকে রূপায়িত করার কোন সিদ্ধিছাও এদের নেই।

১৯৭৫-৭৬ সালের অর্থনৈতিক অবনতি

বিগত কয়েক মাসের প্রচারকৌশল এমন ধারণা সৃষ্টি করতে চেয়েছে যেন বিশ দফা কর্মসূচীর এক বিরাট সাফল্য লাভ হয়েছে। প্রচার সাহিত্যের মধ্যে বিশেষণ যত আছে তথ্য বা ব্যাখ্যা তত নেই যাতে সংখ্যা দিয়ে বোঝান যায় যে, জরুরী অবস্থা আগের সাফল্যের তুলনায় এবং বিশ দফার প্রতিশ্রুতির মাশে তার সাফল্য কতখানি। বস্ত্ত সরকারের পরিসংখ্যান শাখা যে অগাধিচুড়ি তৈরি করে বাজারে ছেড়েছে তাতে বোঝা যায় তাদের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। বিশ দফার ৩ দফা হল গ্রামীণ গরীবের জন্ত বাস্তব জমির ব্যবস্থা। 'গ্রামাঞ্চলের পুনর্গঠনের জন্ত' ভূমি সংস্কারের সংগে একে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে। বিশ দফা কর্মসূচীর বঙ্গরাস্তে সরকার যে সব সংখ্যা প্রচার করেছে তা জুলাই ১৯৭৫ এর পরবর্তী বছরের নয়—তা হল ১৯৭১ সনে বঁত জমি দেওয়া হয়েছে তার হিসাব। যদিও আগে থেকে কার্যকরী করে আইন পাশ করা শ্রীমতী গান্ধির একটা সালের জিনিস তবু ২০ দফা কর্মসূচী ১৯৭৫ এর জুনের আগেই কার্যকর ছিল এমন বক্তব্য সহজ নয়।

সরকারী প্রচারের চকানিনাধ বাদ দিয়ে সরকারী কাজ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাদের সাফল্যের দাবি জিবিধ : (১) মুদ্রাস্ফীতিরোধ (২) উৎপাদনের প্তিবৃদ্ধি (৩) নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের উন্নত জাত্য বণ্টন। এরপর এই সব কথিত দাবির সত্যাসত্য একটু বাচাই করে দেখা যাবে। (চলবে)

বারিদবাবুর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার

যুব কংগ্রেস সভাপতি বারিদবাবুর দ্বাশের পদত্যাগের খবর দর্পণে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতার অহরোধে বারিদবাবু তার পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করে নেন।

গত সপ্তাহে বারিদবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম পদত্যাগ করেও আপনি এখনো যুব কংগ্রেস সভাপতি রইলেন কি করে? তাহলে কি আপনি পদত্যাগ করেন নি? বারিদবাবু জানান আমি ঠিকই পদত্যাগ করেছিলাম তবে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতার পরামর্শে

অধিকা সোনী আমার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন নি। পরে দিল্লী থেকে জনৈক নেতা আমাকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করে নিতে বললে আমি তা মেনে নিই। আন্ত কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে বারিদবাবু জানান আপাততঃ পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

দিল্লীতে হামলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ত্যাগও করিনি। আমি এখনও যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আছি। দিল্লীতে গিয়ে পঙ্কজবাবু তাঁর জন্ত

নির্দিষ্ট ঘরটিতে ঘণারীতি বসতে শুরু করেছেন। প্রথম দিন বেশ কিছু লোক তার ঘরে ঢুকে অকথ্য গালিগালাজ শুরু করে দেয়। পঙ্কজবাবু ওদের কথার প্রতিবাদ করেন। কিছুক্ষণ বচসা হওয়ার পর ওরা চলে যায়। পঙ্কজবাবু দিল্লীতে অধিকা সোনীর সঙ্গে দেখা করেছেন। জানা গেছে শ্রীমতী সোনী পঙ্কজবাবুকে আর পদত্যাগ পত্র পেশ করার জন্ত চাপ দেন নি।

পঙ্কজবাবু তার অফিসে বসে বিভিন্ন রাজ্যের যুব কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে কথা বলছেন। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পঙ্কজবাবুর এই কর্মসূচীর প্রতি যুব নেতা সঞ্জয় গান্ধীর মনোভাব জানা যায় নি।

গিয়াছে দেশ....

অশোক মিত্র

২-২৩৬২৫



দেখে-তনে খ মেরে যেতে হয়।
হাজার-হাজার ছেলে-মেয়ে—বাদের
চোখে অপের নীল, যারা দেশকে,
সমাজকে নিটোল করে গড়তে চাওয়ার
অপরাধে অপরাধী—তাদের বছরের
পর বছর ধরে নিবর্তক আইনে জেলে
পুরে রাখা যায়, কিন্তু চোরাচালান-
কারীদের নাকি ঠিক যায় না।
কৌজদারি আইনের নানা ধারার বাহ-
পন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের বছরের পর
বছর বিনা বিচারে কয়েদ রাখা চলে,
অপরাধ প্রমাণ করা সম্ভব না হলেও
কোনো ক্ষতি নেই, এক ধারার মাফলা
ধারিত হয়ে গেলে আরেক ধারার
ছুতো হয়ে আবার আটক করা চলে।
জামিন পেলেও ক্ষতি নেই, এক দফার
অভিযোগে জামিন পেলে আরো
হাজার দফার অভিযোগ কেঁদে কেঁদে
কয়েদ করা চলে। অথচ কৌজদারি
আইনের কোনো ধারাবলে কোনো
মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত চোরাকারবারী-
কেই নাকি গ্রেপ্তার সম্ভব নয়।
হুতরাং অনেক চালবাহারার পর,
একবিধ মহারথীদের কয়েদ করার জন্য
আলাদা অভিনাশ জারি করা হয়কার
হয়ে পড়ে। যেদিন অভিনাশ ঘোষিত
হয়, সেদিন সন্ধ্যাবেলা খোদ প্রধানমন্ত্রী
জাতির উদ্দেশে বিশেষ বেতার ভাষণ
দেওয়া কর্তব্য বলে মনে করেন। কী
ব্যাপার? আমাদের বৈজ্ঞানিকতা
মতুন-কোনো পারমাণবিক বিস্ফোরণ
কটালেন, মাকি? না, সেরকম কিছু
নয়। সরকার চোরাচালানকারীদের
বন্দী করার উদ্দেশে বিশেষ অভিনাশ
জারি করেছেন। সমাজতন্ত্রের পক্ষে
এটা আরো মত নিতুণ একটা বাপ

কিনা, প্রধান মন্ত্রী তাই সমগ্র জাতিকে
জানিয়ে দিচ্ছেন যাতে তারা এই কৃত-
কারের জন্য তাকে অভিনন্দন জানাতে
পারেন, জানিয়ে নিজেরা কৃতার্থবোধ
করতে পারেন।

এ কোথায় এসে আমরা পৌঁছেছি?।
ভগবাদের হাতে রাজ্যভার, চোরা-
চালানকারীদের পদবিভক্তে ধবনী-
তল টলমল। হু সাত বছর আগেও
বে-ব্যক্তি হয়তো সামান্য পকেটমার
ছিল, চোরাচালানের প্রসঙ্গে সে আজ
কোটি কোটি টাকার অধীশ্বর, সে
খবর কাগজের লোক ডেকে গর্ব করে
গেল শাসকবর্গের নির্বাচন তহবিলে
তিন কোটি টাকা দান করেছে সে,
কোই হয়ল নেই, দরকার হলে আরো
সাত কোটি চালবে, প্রধানমন্ত্রীর সেই
বিশ্বস্ত মহচর কাপুর না কী বেন নাক,
একবার এসে সখ্যভাব নিয়ে অনুরোধ
করুক না তাকে। এই ধরনের
আশ্বালনের ঈশ্বর প্রতিবাদ পর্বত
শোনা যায় না কোনো মহল থেকে।
যদি বা কোনো সরকারী বিভাগ থেকে
সাহস জড়ো করে মাঝারি কোনো
চোরাকারবারীর নামে মাফলা রুচু
হয়, এমন ধারা বলে যাতে কোনো
জামিন সম্ভব নয়, কোন্ জাহ্নবলে
বিচারকের আদালতে মালিশের ধারা-
বল হয়ে যায়, মাতান সাহেব ছাড়া
পেরে হুক ফুলিয়ে বেরিয়ে আসেন।
কী বিচিঞ্জ সময়ের উপকূলে উত্তীর্ণ
আমরা যাকে দারী চোর বলে বেশছন্দ
লোক জামে, তার লগিগি বলে বাহা-
বাধা চিকিৎসকরা কটিতি পাশে এসে
জড়ো হল, তার বাহ্যের পর্বশেব হাল
বর্ণনা করে প্রহরে-প্রহরে রুলেটিন
ঘোষিত হয়, মহানগরের সংস্পর্শনতম
মহানগর মালি হোমে সে-মাতানের
চিকিৎসার সমারোহ চলে। অভিনাশ
জারি হবার পর অভি সতর্পণে তাকে
যদিই বা গ্রেপ্তার করা হয়, সেই
চোরাচালানকারীকে আটক রাখার
জন্ত, যে'জির্নেজি কোনো জারগার নয়
মহাত্মা গান্ধির স্মৃতিস্মৃত যারবেদা
কারাদারের মিত্ত-মির্জন কক
উজ্জল করে লাজানো হয়।
চোরাকারবারী মাতানরা কোথায়
কী ভাবে আহার বিহারে রত তা
প্রতিদিন সংবাদপত্রের প্রধান উপজীব্য
হয়ে দাঁড়ায়।

গান্ধী থেকে মাতান বাহাদুর,
দেশকে এ কোথায় টেনে নামানো
হয়েছে? ভারতীয় ঐতিহ্যের বড়াই
করি আমরা, আমাদের হুহান
সংস্কৃতির বাণী মক্কের কানে কানে

উচ্চারণ করতে সদা উদ্গ্রীব আমরা,
আমরা আদর্শের কথা বলি, নীতির
কথা বলি, ত্যাগের কথা বলি, জ্ঞানের
কথা বলি, সত্যের কথা বলি।
গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথ ধরে তারা
এগোচ্ছেন, শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও
সাহসসিক উচ্চারণে এই কথা বলে বলে
মেতৃহানীররা কানে তাল দাখিয়ে দেন।
বচল এবং ব্যবহারে দেখুন কী হুতর
তফাৎ। মাতানরা আজ সমাজের
চুড়োয়, চোরাকারবারীদের চোখ-
রাঙানীতে মুখ্যমন্ত্রী—রাজ্যপাল—
এমনকি খোদ দিল্লীর রাজদরবার তটস্থ
সম্মত। চোরাকারবারী মহাজন তার
ব্যবসার তথ্যে বিদেশে যাবে, পাস-
পোর্ট প্রয়োজন, সেই পাসপোর্টের
দরখাস্তে, খোজ নিয়ে দেখুন, হয়তো
সই করেছেন কোনো রাজ্যপাল।
বিদেশে উড়ে যাবার মুহূর্তে বিমান
বন্দরে মাতান সাহেবের বাত্রে বিদ্রুতম
অহুবিধা না হয়, সেজন্ত কোন করে
ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন স্বয়ং কোনো
মন্ত্রী। কোনো আসমই আর শূন্ত
নেই, চোরাচালানের বীর এসে তা পূর্ণ
করেছেন। মাতানরা আজ সমাজের
শীর্ষে অধিষ্ঠান করছে, কারণ নেতারা
লেখান তাদের চড়িয়েছেন। নেতৃ-
হানীররা এমন অবস্থায় পৌঁছেছেন যে
শত নিন্দাবাদেও তাদের চিত্তের
অটকল্য নষ্ট হবার নয়। তাঁদের
তত্ত্ব বলে অভিহিত করুন, মাতানসখা
আখ্যায় বিদ্রুত করুন, তাঁরা কানে
তুলো দিয়েছেন—পিঠে তুলো বেঁধে-
ছেন, তাঁদের জীবনদর্শন অতন্ত্র। লোকে
শাল পাড়ছে পাড়ুক, তারাতো পদিত্তে
সমাসীন আছেন, তারা তো নিজেদের
আখের তছোচ্ছেন, তারা তো মৌরনী
পাটীর ব্যবস্থা করে নিচ্ছেন। লোকে

অকথ্য কুখ্যা বলছে, বলুক না, বলতে
বলতে যখন মুখ ব্যথা করে যাবে,
নিজে থেকেই থামবে। আর যদি
তেনন বাড়াবাড়ি শুরু করে, কেব
একে-ওকে তাকে জড়ো করে
ক্যাপাতে তড়াত্তে শুরু করে, তাহলে
তো পুলিশ শাস্ত্রী আছে, কোজদারী
আছে, নিবর্তক আইন আছে। ইতি-
মধ্যে নেতারা চোরাচালানকারীদের
ছায়ার আরো নিবিড় হয়ে আসবেন।
চরিত্রহীন নেতৃত্ব, দেশকে সমাজকে
তাঁরা হাতে টেনে বর্তমানের মরকে
নামিয়েছেন। নিজেদের তাত্ত্বিক
বার্ষের জন্য নীতি বিসর্জন দিয়েছেন
আদর্শ আত্মাইড়ে নিষ্কিষ্ট। নেতারা
উপস্থিত মুক্ত পুরুষ; তাঁদের মনে
কীণতম পাপবোধ নেই। নির্বাচন
বৈতরণী যাতে টাকার ভেলায় উত্তীর্ণ
হতে পারেন সেজন্ত মাতানদের কাছ
থেকে হাত পেতে টাকা মেওয়া হয়েছে।
প্রতিদানে মাতান-চোরাকারবারীদের
স্বর্গস্থলের চালাত ব্যবহার উপচার।
মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি, অথচ সর্বদা
ভাবের মরে চুরি সংঘটিত হচ্ছে, কী
করে সমাজের দরিদ্রতমদের বক্ষিত
করে স্বজনপোষণ হুচাকসম্বল, সর্বদা
সেই চিন্তা, এবং সেই চিন্তাহারী
কাজ। আপাতত সমাজ তাই করাল
ব্যথির কবলে। যেখানে নেতারা
আদর্শ বিচ্যুত, বিবেকবিহীন, অত্রে
লেখানে কোন ছাড়। বিশ্ববোধের
কমতা পর্বত এখন বিলুপ্ত।...নেতাদের
কাছে নিবেদন : কয়েকটি পনের জন্য

হলেও, চোরাকারবারী হুহদের ইষ্ট-
চিন্তা স্বগিত রেখে, নিজেদের মবে-
বাওয়া বেজে বাওয়া বিবেককে আরেক
বার জাগিয়ে তুলুন, আপনারা ব্যস্ত,
কিন্তু দেখুন, কয়েকটি মুহূর্তের জন্য
হলেও একবার চোখ ফিরিয়ে দেখুন,
আপনাদের লোভ দেশকে, জাতিকে
আজ কোন সর্বনাশের উপাত্তে এবং
হাতির করেছে।
কিন্তু নেতারা ব্যাপৃত, তাঁদের
সময় নেই। সেই কবে, বহু দশক
আগে এক মহাশয় ব্যক্তি সঙ্কেদে গান
বৈধেছিলেন : গিয়াছে দেশ, দুঃখ
নাই, আবার তোলা মাহু হ'। না
খেতে পেরে কাতারে কাতারে দেশের
লোক মারা পড়ছে, চোরাকারবারীরা
প্রশাদের প্রাচুর্যে আয়োচিকৃষ্ণ হচ্ছেন,
কের মাহু হবার জন্য কাকে তাহলে
অনুরোধ জানানো, তখনবে কে ?
জাতীর আদর্শ বিশেষারা কোথায়
উদ্ধাস বাবিত, মহাত্মা গান্ধী থেকে
মাতান বাহাদুর মন্ত্রীরা আজ
কাকে জীবনের ক্রবতাবা করে
এগোচ্ছেন...
গিয়াছে দেশ, দুঃখ নাই, আবার
তোলা মাহু হয়। যে তন্ত্রলোক এই
গান বৈধেছিলেন, বিচক্ষণ মাহু তিনি।
পঞ্চাশ বছরেরও উপর তিনি বিগত।
তাহাড়া, এই গান এখন যারা উৎসাহ
ভরে গাইতে সাগবে, কে জানে, হয়তো
নিবর্তক আইনে তাদেরও পুরে রাখা
হবে।...
[১৯৭৪ সালের শারদীয় দর্পণ
থেকে কিয়দংশ বাহ দিয়ে পুনর্মুদ্রিত]

মুশিদাবাদ জেলার বাম নেতারা এখনো মামলায়

(দর্পণের সংবাদদাতা)

১৯৭৫ সালে অক্টোবর মাসে
বোম্বার পরদিনই (২৬ ৬ ৭৫)
মুশিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট রাজনৈতিক
নেতাদের নামে ডি আই আর বলে
গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হল।
দীর্ঘ দেড় বৎসর ধরে বহরমপুর কোর্টে
মামলাটি দিনের পর দিন পড়ছে।
২১শে জানুয়ারী ১৯৭৭ তারিখেও
বহরমপুর কোর্টে মামলাটি উঠল।
ভারত সরকারের অনেক দফা বোম্বা
হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বহরমপুর কোর্ট
পুলিশ মামলাটি প্রত্যাহার করলেন
না। স্বাপূর্বে আবার এই মামলাটির
দিন পড়ছে। সেই ডি আই আরের
কতোয়ার বিশিষ্ট নেতারা এখনো
আসামী। তারা হলেন—
(১) প্রাণরঞ্জন চৌধুরী সি-পি-
আই (এম),
(২) হুনীতি বিশ্বাস ঐ

(৩) নবজুহার চ্যাটার্জি আর
এস পি,
(৪) মোলাপটান বাগেরচা ঐ
(৫) শিবু সাত্তাল ঐ
(৬) কোনাল বিশ্বাস এস ইউ সি,
(৭) মঈমিকা সি পি আই
(এম),
(৮) দেবু ব্যানার্জি আর এস পি,
(৯) প্রাণসৌর বসাক এস ইউ
সি,
(১০) কল্পনা রায় সি পি আই
(এম)
অভিযোগে তদুভা বল হয়েছে—
Date and hour of occurrence
is between 26. 6. 75 to date
3. 7. 75". এই আর্টিকলে "u/s 43
read with sec. 36 (6) (a) (e)
(g) (h) (p) of D. I. R. 1971
Act 42/71". এই ধারাতলি

উল্লেখ ছাড়া আর কোন অভিযোগ
উল্লেখ করা নেই।
কোন অভিযোগ সরকার বেত
বৎসর কালের মধ্যেও দাঁড় করাতেই
পারলেন না। কোর্টে তদুই দিনের
পর দিন পড়ছে। তদুই হররাপি।
উল্লেখযোগ্য যে, "১ম আসামী"
প্রাণরঞ্জন চৌধুরী ও "৮ম আসামী"
দেবু ব্যানার্জি ১৯৭১ সালে বহরমপুর
বিধান সভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দিতা
করেছিলেন। আরো উল্লেখযোগ্য
যে, প্রচণ্ড সম্রাস স্বর্গীয় সাহায্যে কংগ্রেস
প্রার্থী জিতলেও প্রাণরঞ্জন চৌধুরী
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন।
অবশিষ্ট পাঁচ জনের জমানত অব হয়ে
ছিল এবং এই নির্বাচনে পাল'মেন্টের
অন্ততম প্রতিদ্বন্দী শ্রীমতী বত্টিচার্য
পুন হয়েছিলেন বহরমপুরে।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

৪ টাকার বাহ ১০

বার্ষিক ২২ টাকা

সাপ্তাহিক ১১ টাকা

জৈমসিক ৫.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠাবার ঠিকানা :

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, মট লেন। কলিকাতা ১৩

কলকাতা মেডিকেল কলেজে রোগীদের দুর্ভোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মেডিক্যাল কলেজের এমার-
জেন্সীতে সাধারণ বিভাগে অর্থপে-
কসে সর্বত্রই রোগীদের হুচিকিৎসার
অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। হুগলী
জেলা বিজ্ঞান ক্লাব এক সমীক্ষার
দেখেছে জীৱামপুরে শহরের বড়
হাসপাতাল ও কলকাতা মেডিকেল
কলেজে দুর্নীতির আখড়া আর ডাক্তার
ও কর্মীদের চরম অবহেলা। কলকা-
তায় মেডিক্যাল কলেজের মত জীৱাম-
পুরে জেলার বিভিন্ন উপস্থান্যকেন্দ্রে
প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থেকে রোগী
পাঠালেও কোন 'কেয়ার' মেওয়া হয়
না।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের
এমারজেন্সী ঘুরে ঘুরে হুগলী জেলা
বিজ্ঞান ক্লাবের সম্পাদক ডাঃ অজয়
মাস্তা, সভাপতি সাজেদুল হক চৌধুরী
(ডাঃ) ও মেডিক্যাল ছাত্র নেতা ডাঃ
সিনাযুর রহমান সমীক্ষা চালারার সময়
দেখেছেন যে (১) হাসপাতাল মেডিক্যাল
বা অন্ত কলেজের মত এখানে এমার-
জেন্সী মেডিক্যাল অফিসারের ব্যবস্থা
নেই।

(২) এমারজেন্সীতে হুতলায় ডাক্তার
হাউস স্টাক চারদিন পর আসেন।
অল্প বয়স্ক হাউস সার্জেনরা রোগীর
রোগ সম্পর্কে তেমন ধারণা করেন না।
তাদের জ্ঞানও কম।

(৩) হাউস স্টাককে 'কল বুক' করলে
তাদের পাত্তা পাত্তা যায় না। নিয়ম
হলো অকরী অবস্থায় ডাক্তারকে
রোগীরা নার্গের মাধ্যমে হঠাৎ ডাকতে
পারেন।

(৪) হাউস স্টাক বিকালে ছটার
সময় আসার কথা অথচ তারা সাত-
টার সময়ও আসেন না।

(৫) কোন রোগীর কোন হাউস
স্টাক তা জানা মুশকিল।

(৬) সবচেয়ে মজার কথা হলো
রোগীদের সীট দখল করে অল্প এক-
জন হঠাৎ গুরে পড়ছে কলে বাধ্য
হয়ে যন্ত্রপাতি কাতর বেডের নির্দিষ্ট
রোগী সীটে নেমে চেষ্টায়। শেষ
পর্যন্ত তাদের স্থান হচ্ছে সিঁড়ির ধারে।
ঠাণ্ডায় হি হি করে এবং রোগ আরও
বাড়ে—এখানকার নিয়ম নাকি
জোর বার মুখ ক তার গোছের।

(৭) সকাল বিকাল এমারজেন্সী
স্টাকরা রোগীদের চোখের সামনে
ভোজপুরী ভাষায় গালাগালি ও ঝগড়া
করে ছবের ছিটে কোঁটা নিয়ে।
ঝগড়া মাঝে মধ্যে চরমে দাঁড়ায়।

(৮) অহুসতান, অকিসে কেউ
কাউকে কিছু জানাতে চান না।

(৯) গেটে বেয়াদবী জোর করে

দর্শনপ্রার্থীর কাছে টাকা পরসা চায়, মাজার। কেবল হৃদয়হীন ব্যবহার।
এমারজেন্সীর রোগীরা কি ভাবে

(১০) সারা হাসপাতাল জুড়ে কাকে খবর দেবে, তাদের বস্ত্রপার কথা
কোথাও কোন সহায়ত্ব নেই সামান্য কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেবে কি

ভাবে? ডাক্তার হাউস স্টাক এবং
হাউস সার্জেনরা নিজেদের প্রাইভেট
প্রাকটিস নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। দুদিন
পরে রোগী দেখতে আসেন নাসের
বাড়ি দায়িত্ব চাপিয়ে। এ বিষয়ে
তদন্ত করা হোক। স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধিত

পাঁজা একদিন হঠাৎ দর্শন দিয়ে
মেডিক্যাল কলেজের এমারজেন্সীতে
রোগীদের দুর্ভোগ দেখে আহত।
সুখ, দুর্নীতি, ডাক্তারদের অহুসত্ব
তদন্ত করুন।



এতো ভাবনা কেন তোর
একুশ বছর
পেরোক আগে
বউ আনিম তারপর

তার আগে যে আইনের মানা

বিলাতে রামমোহন ও তাঁর আর্থিক সঙ্কট প্রসঙ্গ

প্রদীপ রায়

রাজা রামমোহন লিভারপুল পৌছান ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল। তিনি লিভারপুল, ম্যাক্লেডার, লণ্ডন প্রভৃতি শহরের বিদ্বৎ পণ্ডিতদের বিশেষ সমাদর লাভ করেন। এ-সব পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন ঐতিহাসিক উইলিয়ম রমো, সুপ্রসিদ্ধ কৃত্তবলিং স্মরনিম, স্নানামধ্য আধুনিক ব্যবস্থা দর্পনের প্রবক্তা জেরিসি বেহান প্রমুখ। এ-ছাড়া ইউনিটেরিয়ান, ইভানজেলিকাল ও ক্রিষ্টবাদীদের উপাদানালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের সঙ্গেও তাঁর নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এ-সব উপসনালয়ে তিনি সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেছেন। রাজনীতি সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন বিদ্বৎসমাজে এবং তিনি জনপ্রিয়তাও লাভ করেছেন।

রামমোহনের এই জনপ্রিয়তা যুগপৎ লক্ষ্য করা যায় তৎকালীন বিলাতের সমাজ পরিবেশে রামমোহনের সাদর অভ্যর্থনার। বিলাতে যে সব মহিলা রামমোহনের সম্পর্কে এসেছেন, রামমোহনের প্রতি তাদের মনোভাব সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে Miss Martinean-এর মায়ের কাছে লেখা এক পত্রে। তিনি লিখেছেন : "There is something about Rammohun Roy that melts one irresistibly, and the more, the more one looks at him." অস্বল্প মনোভাবের প্রতিফলন রয়েছে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর কুমারী লুসী একিন-এর ডাঃ চ্যানিংকে লেখা এক পত্রে : "Just now my feelings are more cosmopolite than usual ; I take a personal concern in a third quarter of the globe, since I have seen the excellent Rammohun Roy." রামমোহন বিলাতের বড় বড় পার্টিতে যোগ দিয়েছেন, 'বল'-রূপে উপস্থিত হয়েছেন। এ-সব সামাজিক আয়োজন-প্রমোদে অংশগ্রহণকালে বিভিন্ন মহিলায় সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়েছে। তিনি তাঁদের অনেকেরই 'লবন' জরী করেছেন। সোভিয়া ওবসন কলেট এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন : "His gracious manners and his especial deference to women greatly ingratiated him with the fair sex, several of whom have left on record warmly appreciative reminiscences."

বিলাতের নাট্যশালায় রামমোহনের যে গভীরাত ছিল তা জানা যায় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২তম কুমারী কিডেলকে লেখা রামমোহনের এক পত্রে। কুমারী কিডেলকে রামমোহন জানাচ্ছেন যে তিনি কুমারী কিডেল ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে লন্ডন 'আসলিম' থিয়েটারে যাবেন। তৎকালীন স্নানামধ্য অভিনেত্রী ক্যানি কেবল ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর তাঁর দৈনন্দিন লিপিতে লিখেছেন যে রাজা তাঁদের নাট্যশালায় অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। সেদিন 'ইজাবেলা' নাটকের অভিনয় হচ্ছিল। ডিউন-শাররের ডিউকের জন্ত নির্দিষ্ট আসনে রামমোহন বসেছিলেন। অভিনয় দেখে রামমোহন কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। ক্যানি কেবল-এর দিনলিপিতে আর একটি দিনের উল্লিখিত বিষয় অবশ্যই এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ মার্চ বেসিল মন্টেগু তাঁর বাড়ীতে 'পার্টী'র ব্যবস্থা করেছিলেন। উক্ত 'পার্টী-তে' ক্যানি কেবল একঘণ্টা নৃত্য প্রদর্শন করেন। রামমোহন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে পরিচয়ের পর ক্যানি কেবল লিখেছেন, "We presently began a delightful nonsense conversation, which lasted a considerable time, and amused me extremely."

His appearance is very striking. His picturesque dress and colour make him, of course, a remarkable object in a London ballroom." এই সাক্ষাতের তিনদিন পরে রামমোহন তাঁকে একটি মনোরম পত্র ও কয়েকখানি পুস্তক পাঠিয়েছিলেন বলে ক্যানি কেবল লিখেছেন। রামমোহন তাঁকে মহাকবি কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের উইলিয়ম জোনস্ অম্ববাদিত গ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন। অত্রদিকে ক্যানি কেবল তাঁকে সেক্সপীয়র রচিত 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাট্যগ্রন্থ উপহার দেন। এ প্রসঙ্গে কলেটের মন্তব্য লক্ষণীয়। কলেট লিখেছেন : "These visits to the playhouse in the society of one of the first peers of the realm and these gay frivolities with an actress would doubtless only confirm their (Baptists of Serampore Mission) theological misgivings as to future fate of the 'intelligent heathen.'"

রামমোহন বিলাতে প্রথমে সাধারণ মধ্যবিত্ত ভক্তলোকের মত সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেছেন, জাঁকজমক করেন নাই। কিন্তু বিলাতের সমাজ-পরিবেশে পরিচিত হবার কালে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বা তার কিছুদিন পূর্বে অথবা পরে কোন এক সময় ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আবাসস্থল রিজেন্ট পার্কের কাম্বারল্যাণ্ড টেরাসে প্রাসাদতুল্য সুন্দর ভবনে বসবাস আরম্ভ করেন। এ-সময়ে তাঁর জাঁকজমকের অস্ত ছিল না। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ ও রামমোহনের ঘনিষ্ঠ জেমস সাদারল্যাণ্ড সাহেবের মতে রামমোহন আর্থিকপ্রায়ণ কোন কোন ব্যক্তির কুপারামর্শে এরূপ জীবনযাপন শুরু করেন। বলা বাহুল্য এ-নয়র রিলাস-বাসনে তাঁর প্রচুর অর্থব্যয় হয়। উল্লেখ্য রামমোহন যোগল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর শাহের কাছ থেকে দৌত্যকর্মের জন্য ৭০,০০০ টাকা গ্রহণ করেছেন। তা-ছাড়া বিলাত যাত্রার পূর্বে তিনি বন্ধু ও ভোলায়তি কারবারের সুত্রে প্রাপ্ত 'অর্থ-দলিল' বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করেন এবং কলকাতার ম্যাকিন্টস কম্পানীকে। বিলাতে রিকার্ডস ম্যাকিন্টস কম্পানীকে তাঁর এজেন্ট নিযুক্ত করেন।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে রামমোহন ফ্রান্সে যান এবং সেখান থেকে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পুনরায় লণ্ডনে ফেরেন। বিলাতে ফেরার পর থেকেই রামমোহন ভেড়িড হোয়ারের ছই ভ্রাতা জন ও বোসলেক হোয়ারের সঙ্গে ৪৮নং বেডফোর্ড স্ট্রোয়ে বাস করতে থাকেন। কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর কলকাতার এজেন্ট ম্যাকিন্টস কম্পানী কেল পড়ে; বিলাতের এজেন্ট রিকার্ডস ম্যাকিন্টস কম্পানী তাঁকে অর্থ দেওয়া হুগিত রাখায় তাঁর আর্থিক সঙ্কট চরমে ওঠে। তাঁর এ-সময়কার আর্থিক দ্রববাহার কথা জানা যায় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর বাবু দ্বারকমল সেনকে লেখা হোরেস হেম্যান উইলসন-এর এক পত্রে। উইলসন লিখেছেন : "He (Rammohun) had become embarrassed for money, and was obliged to borrow of his friends as people in England would as soon part with their lives as their money. Then Mr. Sandford Arnot, whom he had employed as his secretary, importuned him for the payment of large sums which he called arrears of salary and threatened Rammohun In short Rammohun had got amongst

a low, needy, unprincipled set of people, and found out his mistake, I suspect when too late, which preyed upon his spirits and injured his health."

রামমোহনের এহেন আর্থিক সঙ্কটের কালে তাঁর পুত্ররায় রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ তাঁকে অর্থপ্রেরণে অবহেলা করেছেন, এ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন রামমোহন জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রামমোহনের অন্ততম শিষ্ঠ নন্দকিশোর প্রবন্ধ সাক্ষ্য অবলম্বনে। এ-প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রামমোহনের অপর জীবনীকার কলেট লিখেছেন : "a neglect which seems the less excusable in the light of the large pension he had secured for the family from the king of Delhi. His wealth, actual or prospective, being in India, he could not realize it in England." পিতা রামমোহনের প্রতি পুত্র রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদের এ-রূপ অবহেলা, আত্যন্তিক সমবেদনার সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয় পিতা রামকান্ত রায় ও দ্বৈত ভ্রাতা জগমোহন রায়ের আর্থিক সঙ্কটকালে যথাক্রমে পুত্র ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামমোহনের মর্মান্তিক উদাসীনতা।

যাহোক, নির্দাৰ্শ অর্থসঙ্কটে অসহায় বোধ করে রামমোহন শেষ পর্যন্ত ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর কোর্ট-অব-ডিরেক্টরস-এর দ্বারস্থ হন। তারত্রে ফেরার উদ্দেশ্যে ঋণ হিসাবে তাঁকে অর্থপ্রদানের জন্য তিনি কোর্ট-অব-ডিরেক্টরস-এর কাছে এক করণ আবেদন করেন। রামমোহনের এই করণ আবেদনের উত্তরে ১৬ই সেপ্টেম্বর কোর্ট-অব-ডিরেক্টরস রামমোহনের কত টাকার প্রয়োজন এবং কে এই ঋণের জন্ত জামিন হবেন তা নির্দিষ্ট করে জানানোর জন্য রামমোহনকে অজবাব করেন। পরেরদিন রামমোহন কোর্ট-অব-ডিরেক্টরস-কে লেখেন যে তাঁর ২১০ হাজার পাউণ্ড প্রয়োজন এবং তাঁর এ-তরঙ্গা আছে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া স্টকের মালিকদের মধ্যে কয়েকজন জামিন ঋণের জামিন অবশ্যই হবেন। কিন্তু ২৭শে জুন কোর্ট-অব-ডিরেক্টরস-এর সেক্রেটারী রামমোহনকে যে পত্র দেন তা থেকে রামমোহনের এই উপলক্ষি হয় যে তাঁর আবেদন পড়ে ঋণের জন্য উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট নয় এবং জামিন-এর নির্দিষ্ট নামও অজ্ঞেয়। এই ঋণপ্রসঙ্গে রামমোহন কোর্ট-অব-ডিরেক্টরসকে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই সর্বশেষ যে পত্র দেন তার শেষ দুই অঙ্কের অবশ্যই উল্লেখ্য : "Since my last letter to your Secretary, dated the 24th of June, I learnt from India that the members of the House of Messrs. Mackintosh Co. were permitted to establish a Mercantile House, designated Messrs. Calder & Co. and the state of my affairs there would not, consequently, receive in all probability, any serious injury from the want of Agency, though I could not expect a speedy supply from that quarter."

"To relieve myself from the present want, I, as a native of India, naturally first look up to you in difficulty and feel less reluctance in applying to you than to others. Should you think it proper to afford me your (শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

চলচ্চিত্র পুরস্কার দেবার অধিকারও সরকার কেড়ে নিলেন

ভানুসিংহ

কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রচারিত এক প্রেস-নোট মাধ্যমে সম্প্রতি জারি করা হয়েছে যে, অসংখ্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ছাড়া দেশের আর কোন প্রতিষ্ঠান চলচ্চিত্র শিল্প ও শিল্পীদের কোনরূপ পুরস্কার প্রদান করতে পারবে না। ফেলসমাজ ভাষা নাট্য অ্যাকাডেমি শিল্পীরা লাভ করতে পারবেন। যোগ্যতা স্বীকৃত হলে। এই নির্দেশ-নামার বলে সিনেমা-শিল্পীকে পুরস্কৃত করার অধিকারটিও সরকারের হুকুমত করা হল।

গণতান্ত্রিক দেশে শিল্পীদের স্বীকৃতি দানের অধিকারও জনসাধারণের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল শেষ পর্যন্ত। অকরী অবস্থার এও কি এক অকরী অস্থানসম-বিধি? এই অস্থানসম চালু করা কি এতই অপরিহার্য ছিল? কেন্দ্রীয় নির্বাচনের প্রকালে অকরী অবস্থা নিষিদ্ধ করার সরকারী ঘোষণা যখন উচ্চারিত হয়, তখনও কিন্তু উক্ত প্রেস-নোট বলে প্রোভোকে প্রোভিউসার ও আর্টিস্ট স্বল্পে প্রচার চলে, যেন কোন প্রয়োজক, শিল্পী কলাকুশলী প্রাইভেট প্রকল্পে অর্গানাইজেশনের ফিল্ম অ্যাকাডেমি কাঙ্ক্ষনে যোগদান না করেন। শিল্পী-স্বল্পই যদি এভাবে সতর্কবাণী শোনায়ে দেয়, তবে আর শিল্পীদের করারই বা কী আছে এ যেনে? কোন প্রতিষ্ঠান এই, কোন সমালোচনা পর্বত এ বাস্য নতুন পড়ল না। এখানে ই, আই, এফ, পি, এ-তেও সরকারী সানু লার এক পৌছে গেছে—আর কোন প্রকারকারী পুরস্কার বিভবনী অস্থানে-কিনেমা ট্রেডের পক্ষ থেকে কেউ বেন উপস্থিত না হন।

এ যাপারে কোন অতিভাষা জারি করার প্রয়োজনীয়তা সরকার বলে করেন সি। রাই অস্থানে উপস্থিত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করবেন, তাঁদেরই যদি সরকারী প্রভাব থাকে নিরন্তর করা হয়, তবে এরনিতেই তো অস্থান সামচাল হয়ে গেল। এখন প্রশ্ন, সরকার এই অস্থান প্রেস-নোট প্রচার করলেন কেন? কোন হিংসা-কটন বিহীন পুরস্কার-বক্তিত প্রভাব-শালী প্রয়োজকের প্রয়োচনায় কি? তবে হ্যাঁ, শিল্পীদের পুরস্কৃত করার ব্যাপারটি ইদানীংকালে একটা হুকুমে পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন রাজ্যে-কতক বছরের মধ্যেই বেশ কিছু সংসার-প্রস্তু হয়েছিল, যাঁদের একসময় কাঙ্ক্ষিত জনপ্রিয় শিল্পীদের আস্বাদন করে

অঁকজমকপূর্ণ অস্থানের মধ্য দিয়ে পুরস্কার বিভরণ করা। অধিকাংশ সংসারই উদ্বেগ লাগু ছিল না। এই অস্থানে তারা নানাভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জনও করে নিত। মোট কথা এ রেওয়াজটি এক নিছক ব্যবসাদারি মনোভাবের পরিচায়ক হয়ে উঠেছিল। সিনেমা-তারকা মর্শনেজু বিপুল জম-মণ্ডলীর কাছে থেকে মামা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা হত। অবশ্য প্রকাশ্যে ঘোষণা থাকত, সিনেমা শিল্পীদের স্বীকৃতি দানের বিরাট আয়োজন। এমন খবরও পাওয়া গেছে যে পুরস্কার-লোভী শিল্পী জমসমকে অভিনয়িত হবার উদ্দেশ্যে বাসনার গোপনে কত পক্ষকে প্রচুর অর্থ উৎকোচ দিয়েছেন। উদ্ভোক্তারাও শিল্পীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছেন অস্থানটিকে দাঁকল্যবস্তিত করে তোলার জন্য। আবার কোম কোম প্রতিষ্ঠান জুয়েলারি দোকানের সংশ্লে বন্দোবস্ত করে তাঁদেরই প্রস্তুত উপহার শিল্পীদের দিয়ে দোকানের অস্থানক পিঠিয়েছেন, বিজ্ঞাপনী প্রচারের চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন। এসব নিষ্করই সর্বদা-ব্যোম্বর। এগুলি অচিরে বন্ধ করারও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যে স্বীকৃতির প্রতিষ্ঠান সানু উদ্বেগ নিয়ে শিল্পীদের পুরস্কৃত করে আসছেন বহু বছর ধরে, তাঁদেরও যে আজ প্রেস নোটের শিকার হয়ে হন। নির্বাচনে এ হুকুমদারি-আজ তাই এই সমালোচনার সঙ্গীণ।

রাজবংশ ও সব্যসাচী

হুই হবিরই পরিচালক পীযুষ বহু এবং হুই হবিরই নায়ক চরিত্রে আছেন উত্তমকুমার। হবির পরিচালনার পীযুষবাবুর রতনালি অধিকার তার চেয়ে অনেক বেশি অধিকার উত্তম-কুমারের যুগ চেয়ে জীৱ ইন্ডের কথা স্মরণে রেখে, জীৱ জমপ্রিয়তাকে হবির কাছে আগামোয়। এর কমে হবি ভর্তি টিকই, কিন্তু তা বেক 'জনহবি'—বনে কোম বাস রাখে না—চোখের সানবনে ভেলে উঠে বিদিয়ে যায়। কোন জলধ বেই, বেই কোন ভাংপর্ব—হুইরাং উপলভি বা চিত্তার কোন ধোরাকও সেখানে থাকার কথা নয়। যেমন 'রাজবংশ' হবি। এহুসও সেই রাজ রাজভার ব্যাপার তাপার নিয়ে একই রাসরণে কিছু পরিবেশন করলে এবং প্রবান চরিত্রে উত্তমকুমার থাকলে হবি যে বিট্ট হবে—সে কথাটি তো পীযুষবাবুর অজানা নেই।

চলচ্চিত্র নটক চর্চা

হুইরাং শিল্প চিত্র হোল কিনা কিংবা যুগের দাবী মেনে নিয়ে সং-চিত্র জন্ম নিল কিনা—এ সব দিকে পীযুষবাবুর নমর থাকবে কেন? এক অজাতারী লম্পট রাজা ও তার এক অবৈধ সন্তানের মধ্যে সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে মধ্য যুগীয় ধ্যান ধারণার নাটক তৈরীৱ চেষ্টা বড় হাতকর অবাস্তবই হোক, উত্তমবাবুকে এই দুই চরিত্রে অবতীর্ণ করিয়ে মর্শকমল্লে চমক সৃষ্টির প্রলোভন-টুকু পীযুষবাবুর পক্ষে জর করা অসম্ভব। আবার উত্তমবাবুর ইন্ডের বাতে জ্বর না হয় সেকারণে হবির শেষ পর্বে খনী নায়কের বোধোদয় দেখিয়ে মহিমা আরোপের ব্যাপারটিও রাখতে হয়েছে। হবি বাই হোক—পীযুষবাবু যে উত্তম-সচেতন নন, একথা কি আর কেউ বলতে পারবে?

'সব্যসাচী' হবিটি দেখার পর প্রথমেই এ কথাটা মনেতে আগল—এ কোন্ সব্যসাচী? শরৎচন্দ্রের তো নয়। অথচ পীযুষবাবু শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' অবলম্বনেই হবিটি করেছেন। 'পথের দাবী' উপভাসের

নায়ক সব্যসাচী। পীযুষবাবু উক্ত উপভাস থেকে খেয়াল খুশীমত অংশ বেছে নিয়ে উত্তমকুমারের উপযোগী করে সেগুলি ঠিক মত সাজিয়ে গুছিয়ে 'সব্যসাচী' নামে হবিটি বখন বানালেন, তখন আর সেখানে 'শরৎচন্দ্র' থাকবেন কোথায়? আর সেজন্তেই তো দেখি সারা হবিতে জেম্ বও মূলত কাণ্ড-কারখানা রহস্ত রোমাঞ্চ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্ত বিদেশ থেকে অস্ত্র বোঝাই আবারের আগমন—সব্যসাচীর সুপ্রদক্ষিণ, ছদ্মবেশ রূপ-সজ্জার চূড়ান্ত সীলান্বেষণ, বহুতাবী বহুরূপী সব্যসাচীর আধুনিক অ্যাড-ভেকার। সবই উত্তম-চেতনার হুজু। 'পথের দাবী'র সব্যসাচী সে-পথ থেকে তখন উভাও। পীযুষবাবুর এ দাবী মিটিয়েছেন উত্তমকুমার—এ কথা স্বীকার করতেই হবে।...

'বি.এফ.জে.এ.'র চলচ্চিত্র বিচার

'বেবল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন'-এর বিচারে ১৯৭৬ সালে

আলাউদ্দীন মিউজিক সার্কেলের সম্মেলন (দর্পণের সংগীত সমালোচক)

এদের সহবিজ্ঞাপিত আলি আকবর বিলায়েতের সুসলব্ব দীর্ঘ হুজি বছর পর সংযুক্তি হলেও রনের দিক থেকে অনেক ভৈনি প্রথমত শিল্পব্রের নেতাজ এবং শৈলীপত বিভিন্নতার দরুন, দ্বিতীয়ত বোকাগড়ার অভাবে, এবং তৃতীয়ত ও-প্রবানত নেতাজী টেভিয়ারের (০৫ই জানুয়ারি) বিতপ শব্দপ্রক্ষেপ ব্যবহার জন্ত। নতুবা বিলায়েত সাহেব তার পছন্দ বড় রাগ ধরেছিলেন ইমম কিন্তু আলাপ অবে তার বৌকের নত প্যাচ এবং আলি আকবর সাহেবের পুন্ড বোড়কির কাছে জুজনের শিকা ও প্রণালীপত পার্ক্য ল্পট হয়ে উঠেছিল। এর চেয়ে বরং আলি আকবর বহি নিখিল বন্ধ্যোপাধ্যায় বা ইজদীলের সংশ্লে বসভেন তাহলে একটা মেলের অভাব হুটে উঠত না। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, নেতার-পরদের আলাপাৎ বাজনা সুসলব্বের প্রতিফল। পালাকমে দুই শিল্পীর আলাপগৎ বাজনা একজু জুজলে তার মহিমা কতটুকু বাড়ে বা থেকে বড়র কোম আবার পাওয়া যায়?

জিতালের গুণ্ড বিলায়েত সাহেব বেছেছিলেন কিন্তু হুন্দের বেলার

দেখা মেল তার বাবা জন্ত রকম। বিলায়েত সাহেব যদিও বেশী সময় বাজনার হুবোপ নিয়েছেন এবং পেয়েছেন কিন্তু তার বাজনা একক হিসাবে তারিক পেলেও সুসলব্ব হিসেবে উৎসাহাদি। বরং ভিলক-কানোয়ের আধারে বরজ-সংক্রমণ করে বখন তারা বাহার, কানোদ, হাবীর, ছারানট, তৈরবী, দরবারী প্রভৃতি রাসের ছারা দেখিয়েছেন তখন সাধারণ জোতা খুশি হয়েছেন।

এর পরে তৈরবীর আলাপ এবং গং বোটারুটি উপভোগ্য হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী শিল্পীদের কথা মনে রাখলে বাবরাতে বিলায়েত সাহেব তৈরবী ধরভেন না। কারণ তৈরবী এমন একটা রাগ বা বেকেউ বোটারুটি জমাতে পারে এবং বার পরে জন্ত রাগ অবানো সুশকিল।

পরবর্তী পারিকা পিরিজা দেবী রাত ভিনটের বসন্ত ধরতে বাধ্য হলেন। স্বীকার করতে হবে যে, থাকণেরানী মাইকের আভরাজ স্বেও তিনি আসবের বেজাজ ঘোরাতে পেয়েছেন বিশেষতঃ তার লিঙ্গুরাগাভিত শোরী টগা 'মিঞা যে আমেবালে' দিয়ে। হোরি এবং জজনের পরে

হুজি প্রাপ্ত ছবিগুলির মধ্যে যুগল সেন পরিচালিত হিন্দি হবি 'যুগল' সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মান লাভ করেছে। বাংলা ছবি পরিচালনার ক্ষেত্রে সত্যজিৎ-রায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছেন 'জন অরণ্য' হবির জন্ত। শ্রেষ্ঠ হিন্দি ছবির পরিচালক হলেন যুগল সেন 'যুগল' হবির জন্ত। বাংলা 'বিশিখা' হবিতে অভিনয়ের জন্ত শ্রেষ্ঠ অভিনেতা উত্তম-কুমার এবং হিন্দি 'মোসম' হবির নায়ক সঞ্জীবকুমার হলেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। বাংলা 'অসমর' হবির নায়িকা অপর্ণা সেন এবং হিন্দি 'মোসম' হবির নায়িকা শবীলা ঠাকুর শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর মর্যাদা লাভ করেছেন। বাংলা 'জন অরণ্য' হবির ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দ্র রায় ও হিন্দি 'যুগল' হবির ক্যামেরাম্যান কে.কে. মহাজন শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রীর সম্মান পেয়েছেন। বাংলা 'যুগল' হবির হবিতে সংগীত পরিচালনার জন্ত বিজয়বালা ঘোষ দস্তিদার ওকালিপদ সেন শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালকের মর্যাদা পেলেন। 'গীত পাতা চন্দ্র' হিন্দি হবিটিতে হারোপের জন্ত রবীন্দ্র জৈন পেলেন শ্রেষ্ঠের সম্মান।

আবার তিনি তৈরবী কুরী 'বাহুল মোরা মইহারি হুট বার' না গাইলেই পারভেন পরবর্তী শিল্পীর কথা মনে রেখে। আশ্চর্য্যের দিনে শেষ শিল্পীই তৈরবী গাইভেন বা বাজাভেন? পিরিজা দেবীর পান কিঞ্চিৎ পুঙ্খবালি স্বেও জোতাদের ভাল লেখেছে।

বেদিন আসবের অধিবরবীর ককীত পরিবেশন করেছেন নিখিল-বন্ধ্যো-পাধ্যায়। তার কোমল-ববতসুত আসাবরীর আলাপ জোতাজ কোমলিন ভুলবেন না। স্বীকৃ, গদক এবং বোলের জোড়ে তার আলাপ বেবদ অমবত তেরনি হঠান হয়েছিল তার হাতের ছেলেটা ভাল। ভিনজকের এমন অমর্গল সহজ তাঁদের কাঙ্ক্ষ ভনেছিলার রবিশংকরের হাতে পকাশের বহরভলিতে। তনু স্বীকার করতে হয় যে, শেষ রাতটা আসাবরীর বহলে তৈরবী ঠাটের পক্ষেই প্রথমত। কিন্তু নিখিলবাবুর ভদ্রয় বাজনা এই লামাত জটিকেও ছুলিয়ে দিয়েছে। মাইকের কাসেলার সেদিন সারারাত জোতারা যে অবজি ভোর করেছেন, শেষ রাতের একটি বটায় নিখিলবাবু সে অতিপূরণ করে কিছু উপুরি কাউ দিতে পেয়েছেন। বিলায়েত সাহেব পুরো সাক্ষে পাঁচ বটী সময় যদি বেদখল না করভেন তাহলে নিখিল বাবুকে আরো একই সময় বেতায় বেত।

শ্রাব্য কবির কর্মতালিকা

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী 'মনীষার অব-
স্থায়ন প্রসঙ্গে' প্রবন্ধের লেখক
শ্রাব্য কবির 'শ্রাব্যতার' ভাবলুতায়
বিস্মিত হয়েছি। জন্মদিনের প্রশংসা
বচন, যুগ্মদিনের শোকোচ্ছ্বাস কিংবা
সম্বন্ধনা বাসরে প্রদত্ত মানপত্রের
সালঙ্কার ভাষাকে কোন মনীষার
বর্ণনা সমালোচনা বলে গ্রহণ করা চলে
কি? কবির সঙ্গে নজরুল-শরৎচন্দ্রের
সৌজন্যমূলক ব্যক্তি-সম্পর্কও রবীন্দ্র-
মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দাবী করতে
পারে না। এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ-
বিবৃত কর্মতালিকা দৃষ্টেও যদি কেউ
কবিকে 'সত্যজিৎ কর্মযোগী' বলে
মেনে নিতে অস্বীকার করে, তবে
তাকে বেশ আনার একটা উপায়ই
হাতে থাকে। বল' বাহুল্য, উপায়টি
হলো—তার প্রশংসার স-যুক্তি উত্তর-
দান। কিন্তু রাবীন্দ্রিক বুদ্ধিবীরা
মূলত যজ্ঞধরবাবুর মতো গাজোয়ারি-
গালমন্দ করেই রাজিয়াং করতে চান;
তাই 'বিশ্বকবি' সমালোচকদের প্রতি
চোখ রাঙিয়ে বলে দেন: "দেশীয়
সংস্কৃতির চেয়ে বিদেশীয় সংস্কৃতির
প্রতি যারা সবিশেষ আস্থা বান, তাঁরা
জাতির বরোয়া মনীষীদের মূল্যায়ন
করার অধিকারী হতে পারেন না।"

একটি শিশু চিত্র প্রদর্শনী

ইন্দ্রনীল সেন

সম্প্রতি বিড়লা আকাদেমীতে কল-
কাতার চিলড্রেনস আর্ট ট্রেনিং সেন্টারের
বিভীয়া বাবীকী চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে
গেল। প্রদর্শিত সমস্ত চিত্রকর্মই
ছোটদের, যাদের বয়স মোটামুটি পাঁচ
থেকে পনেরো। হৃদয়ভাব সাঝানো
এই শিশুচিত্র প্রদর্শনীটি নানা দিক
থেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।
ছোটদের আঁকা ছবি এ ধরনের
বিপুল সমারোহ, সম্ভাবনাময় হুদে
শিল্পীদের চিত্রবিশ্বাস, শিল্প ভাবনা
দর্শকদের নিঃসন্দেহে বিপুল আনন্দ
দিয়েছে।

প্রদর্শনীতে যে সমস্ত শিশুচিত্রকর্ম
বন্দা গেল তার ভেতরে প্রথমই উল্লেখ
করতে হয় টিংকু সরকার (৬), মালিনী
কুমার আর (৬), পারমিতা কুণ্ডুর (৭)
ছবি। শিশু ভাবনার আশ্চর্য বিস্তার
লক্ষ করা গেল এই সমস্ত হুদে শিল্পী-
দের ছবিতে। ছোটদের ভাবনার
জগৎ যে কতো পরিধিহীন হতে পারে
তা ভেবে অবাক হতে হয়। এই
পর্দায় স্মৃতি সেনগুপ্ত, সোনালী রায়
এবং স্মৃতি রায়ের ছবিগুলিও দর্শকদের
কাছে টানে।

দ্বিতীয় পর্দায়, দশ বছরের প্রমিত
সেনের মধ্যে ইতোমধ্যেই একটা
বিশেষ স্টাইল লক্ষ্য করা গেল। রঙের

কিন্তু বিশ্বয় শোষণ আর শোষণিত—
এই দুটি মাত্র শ্রেণী এবং তাদের
সংস্কৃতির দুটিমাত্র মূল ধারায় যাদের
বিশ্বাস, সত্যের স্বার্থে মনীষী-মূল্যায়ন
তারা করবেই, এবং এরাপারে তথ্য
ও যুক্তিই শুধু প্রমাণ পাবে।

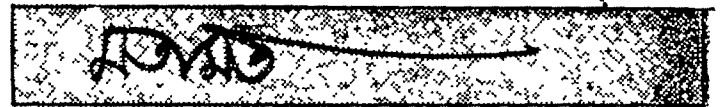
ভারতবর্ষের বিদেশী শোষণকে
আড়াল করে রবীন্দ্রনাথ নির্বিচারে
বলশেভিকদের বলে দিলেন, 'মামুষ-
থেকো'। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় শ্রম-
মুক্ত মানুষের কর্মপ্রেরণা দেখে এসেও
তিনি মার্কস-লেনিন বা মানবমুক্তির
নবীন আদর্শকে উপলব্ধি করার কোনো
চেষ্টাই করলেন না। দীনবন্ধু এগুজের
মতো অন্ধচেতন ইউরোপীয়ানদের
দেখেই তিনি মানুষের উপর হারিয়ে
যাওয়া বিশ্বাসটুকু ফিরে গেলেন।
রোমাঁ রল্যাঁ'র সম্পর্ক তাঁকে মুসোলিনী-
বিভ্রম থেকে উদ্ধার করলো বটে, কিন্তু
পরক্ষণেই তিনি হাজেরীর ফ্যাসিষ্টদের
সঙ্গে কর্মমর্দন করলেন। মাও-সে
তুঙের লঙ মার্চের ও পরে
১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথ চীয়াং কাই-
শেককে স্বল্প সংযোজন করে তাঁর
বিজয়-কামনা করলেন। আর তারও
আগে ইংরেজ রাষ্ট্রদূতের হাত ধরে
তিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মিলিত

কাজে প্রমিতের তুলির টান প্রাংশ-
নীয়। ওয়াশিংটনের কাজে তার আঁকা
পার্ক স্ট্রিটের গাছাঝীর প্রতিষ্ঠিত পরি-
বেশ রচনার অনন্ত হয়ে উঠেছে। এ
ছাড়া স্বল্প তুলির টানে টুয়া বন্ডো-
পাধ্যায়, ঈশানী মজুমদার দর্শক মনে
রেখাপাত করবে।

পরবর্তী পর্দায় রচনা ভাবনার
ক্ষেত্রে শ্রাব্য সেন (১৫) শিল্পী রসিক-
দের প্রশংসা অর্জন করেছেন। বিভিন্ন
দৃষ্টিতে তাঁর রচনা পদ্ধতিতে রঙের
সংমিশ্রণ, প্রবেশ্য রীতি যথেষ্ট মনক-
তার পরিচায়ক। বর্তমান পর্দায়ে
রচিতরা ঐতান, হৃদীপ্তা রায়, দেবদানী
স্বরাঙ্গণাম, সমীর রায় বিশেষ উল্লেখ-
যোগ্য। বিগত বছরে এঁদের চিত্র-
কর্ম যারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁরা
নিশ্চয়ই এই সময়ের মধ্যে এই সমস্ত
শিশু শিল্পীদের ভাবনার পালাবদল
লক্ষ্য করে থাকবেন। প্রদর্শনীতে হুদে
শিল্পীদের এক মিলিত চিত্রকর্ম
'কোলাজ'-এর রচনা বিশ্লেষণ অভিনব,
তবে সম্মিলিত একেট, বিশেষত ক্ষেত্র
বিশেষে বিরোধী রঙের সংযোজন
দর্শকচোখকে পীড়িত করে। প্রদর্শনী-
টির উপস্থাপনা প্রশংসনীয়। একান্ত
কলকাতার শ্রাব্য সেন ডিজাইন গ্রুপ
প্রাংশনার দাবী করতে পারেন।

হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন হোয়াইট
হাইজে। এবং সে অপ্রকাশিতবা
স্থের স্বতিকে তিনি আয়ত্ব মনের
মণিকোঠায় লালন করে গেছেন।
সাম্রাজ্যবাদীদের কিছু ঝুঁকিহীন
সমালোচনা করলেও আপন দেশে
রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মাহাত্ম্য-কীর্তনই
করেছেন বরাবর। তাঁর গল্প-নাটকে
তাই দেখি বিদেশী শোষণাত্মক
ভারতের অচলায়তনে আলোর
দিশারী; আচার-সংস্কারের তাসের
দেশে প্রাণবন্ত বইয়ে দেয় যে, সেও
এক বিদেশী রাজপুত্র। প্রকৃত
ভারতীয়ত্ব উত্তরণের অধিকার পেয়েছে
'গোরা' বিদেশী রক্তের জোরে, আর
তার অন্যত্রে বিদেশী সিপাহীদের
উচ্ছৃঙ্খলার ইজিত রাখতেও ভোলেন
নি কবি। অগ্নিধূগের স্বর্ষসেনাদের
আত্মত্যাগের ইতিহাসকেও তিনি
কলঙ্কিত করেছেন 'চার অধ্যায়' লিখে।
'মেঘনাদবধে'র দর্পিত দেশপ্রেমের
মহত্বটি তিনি আবিষ্কার করতে চাইলেন
না; উপরন্তু রোমান্টিক কবি হিসেবেও
তিনি মধুসূদনের উপরে তুলে দিলেন
আপন-বেয়াই বিহারীলালকে 'ভোরের
পাখি' করে। 'পথের দাবী' প্রসঙ্গে
ইংরেজ-উদারতার যে ফিরিস্তি দিলেন
তাতে মনে হলো এমন বই লেখা উচিতই
হয়নি শরৎচন্দ্রের। অবশ্য জালিয়ান-
ওয়ালাবাগে মিটিং ডাকা নিয়ে কবি
কোনো প্রশ্ন না তুলেই নাইট-উপাধি
ত্যাগের সাময়িক বাসনা জ্ঞাপন করে-
ছিলেন, বঙ্গ-ভঙ্গ বোধে গান আর
রাখীও বেঁধেছিলেন। কিন্তু সবই
ক্যাকাশে-পানলে মনে হয় ভাবলে যে
ফাঁসির মধ্যে মঞ্চে যখন দেশের তারুণ্য
জীবনের জয়গানে মুগ্ধ, তখন
এদেশেরই কবি বিদেশী অর্থে পুঁই বিশ্ব-
বিস্তার বিলাসী আশ্রমে আধিরস-সহ
নানারসের গানে মশগুল। 'সত্যজিৎ'র
একি নির্মম উদাসীনতা। তাঁর আর্থ-
গত সর্পিণতার একটি রোমাঁ রল্যাঁও
সমালোচনা না-করে পারেন নি।
ঘটনাটি এই: চিত্রকর হিসেবে কিছু
সাফল্য অর্জিত হতেই বৃদ্ধ কবি দেশ
ও দেশের সবকিছু তুলে বলে উঠে-
ছিলেন: "হিন্দিতে এখন যা-ই ঘটুক
না কেন আমার তাতে কিছু এসে যায়
না। আমি এখন আমার সত্যিকারের
আনন্দ খুঁজে পেয়েছি। আমি
ছাড়া আর কোনো চিন্তা আমার
ছিলো না। আমি যেভাবে শুরু
করেছিলাম, সেই ভাবেই শেষ করবো।
পাখি গান করে, যেমন স্বর্ষোদয়,
তেমনি স্বর্ষাস্ত।" এমন ব্যক্তির
বিপুলাকার সৃষ্টির মাঝে পদানত
স্বজাতির বেদনা-বিজ্রোহের আভাস না
থাকাটা তো স্বাভাবিক। এবং শরৎ
নজরুল স্বকণ্ঠ মানিকের বিপরীত পথ
ধরেন তিনি মানুষের এই বিজ্রোহ
বিন্দুতে এসে, যখন তাঁর আশ্রয় হলো
উপনিষদের নিরাকার প্রভু, আর তার
বর্বর পাখিও প্রতিভূ।

নির্মল সাহা



লিটল ম্যাগাজিন ও সরকারী বিজ্ঞাপন

কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক
সরকার বিশেষ করে আমাদের পশ্চিম-
বঙ্গ সরকার লিটল ম্যাগাজিনগুলোকে
পরিষ্কার ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার এক
নির্ভুল উপায় বাৎলেছেন যা সাধারণ
সরল মানুষের বোধ বুদ্ধির বাইরে।
সরকার রেডিও সংবাদপত্র মারফৎ
নানা জায়গায় হঠাৎ চিংকার শুরু করে
দিয়েছেন যে তাঁরা লিটল ম্যাগাজিনকে
বাঁচাবেন এবং তার চিকিৎসা স্বরূপ
সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন। কি
ধরনের সাহায্য, সহযোগিতা?
টাকা পয়সা বিজ্ঞাপন ইত্যাদি
দিয়ে।

ভালো কথা। খুব ভালো কথা।
আমরা একটু পুঙ্গলিত হলাম। আনন্দ
পেলাম। সরকারকে স্বস্তিবাদ জানাতে
বাধ্য হলাম।

হঠাৎ সংবাদ পেলাম জানি না
কোনো সংবাদ পত্রে অথবা রেডিও
টেলিভিশনে প্রকাশ পেয়েছে কিনা
কিন্তু সংবাদটা অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও জরুরী।
ডি এ ভি পি থেকে নাকি ঘোষণা করা
হয়েছে যে, সেই সমস্ত ম্যাগাজিনকেই
বিজ্ঞাপন দেয়া হবে, যে সমস্ত ম্যাগা-
জিনের কমপক্ষে ২২০০ সাবস্ক্রিপশন
আছে। এবং এই বাইশশো সাব-
স্ক্রিপশন প্রমাণ হলে তাকে ডি এ ভি পির
প্যানেল ভুক্ত করা হবে। যদিচ এই
প্যানেল ভুক্ত অহুগতরাত্তি বিজ্ঞাপন
পাবে কি পাবেনা তা নির্ভর করছে
সরকারী ভারপ্রাপ্ত মুদ্রকীদের মজি
মেজাজ ও খেয়াল শুরির ওপর।

কিন্তু হায় ২২০০ সাবস্ক্রিপশন
লিটল ম্যাগাজিনে! বোধ হয় গোটা
পৃথিবীতে অজাতি-ঘটেনি। এর
আগে আমরা তবু কিছু কিছু সরকারী
বিজ্ঞাপন ২ মাস ৬ মাসে ছিঁটেফোটা
পেতাম। কিন্তু এই ন্যূনতম স্বযোগটি
থেকেও বঞ্চিত হতে চলেছি।

এখন প্রশ্ন সরকার কেন আমাদের
মত ছোটখাট কাগজের ওপর এভাবে
আঘাত হানছেন। আমরা এই পুঙ্গল-
কর্ম-ইতর-অধঃপতিত সমাজে একটু
স্বল্প চিন্তা স্বল্প সংস্কৃতি নিয়ে বাঁচতে
চাই, শাস প্রকাশ নিতে চাই, তাতেও
তাঁদের বাগড়া? আপনারা আপ-
নাদের কাজ নিয়েই থাকুন না, আমা-
দেরকে আমাদের মতো থাকতে দিন।
আর দয়া করে ডি এ ভি পি বা
হু-হাজারের অধিক সাবস্ক্রিপশনের
নামে বা অঙ্কহাতের হাত ধরে আমা-
মতো বৎকিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপনগুলো পাও-
য়ার পথে দানব হয়ে দাঁড়াবেন না।
আমাদের ৫০০-৭০০-১১০০ কপি করা

লিটল ম্যাগাজিনগুলোকে অন্ততঃ
পূর্বের মতো স্থানীয় সরকারী সংস্থার
মাধ্যমে "একটু" স্বযোগ দিন। এতে
আপনাদের খুব বেশী ক্ষতি বৃদ্ধির
আশঙ্কা নেই।

অচিন্ত্য সত্যরা
(মুদ্রিত সম্পাদক)

কবি সন্মেলন

সংশ্লিষ্ট পত্রিকার উদ্যোগে গত
১৬ই ফেব্রুয়ারী বরাহনগর পৌর ভবনে
সারা বাংলা কবি সন্মেলন অহুষ্ঠিত
হয়। রাজ্যের জেলা থেকে ১৩৫ জন
প্রতিনিধি উপস্থিত হন। তিনটি
অধিবেশন পরিচালনা করেন
প্রেমোৎপল বন্ডোপাধ্যায়, জগদীশ
ভট্টাচার্য, ডঃ উমা রায়। আধুনিক
কবিতার গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা
করেন রাম বহু, স্বপন ঘোষ, সত্য দাস
মঙ্গল ধীরেন বহু প্রভৃতি। সংশ্লিষ্ট
পত্রিকার সম্পাদিকা রমা ঘোষ
সম্পাদকীয় বিবরণ পাঠ করেন।

আগামী সংখ্যায়

বিখ্যাত জার্মান নাট্যকার
বার্টোল্ট ব্রেশটের জন্মজয়ন্তী
আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী। এই
উপলক্ষে দর্পণের আগামী
সংখ্যায় ব্রেশট সম্পর্কে
কয়েকটি রচনা এবং মূল জার্মান
ভাষা থেকে অনূদিত তাঁর দুটি
কবিতা প্রকাশ করা হবে।

তরুণ অপেরা

প্রযোজিত

বিদ্রোহী সন্ন্যাসী

ও

বিপন্ন বন্ধুধা

নির্দেশনা ও অভিনয়ে :
শান্তিগোপাল

মার্কিনী গীস কর্পস তৃতীয় দুনিয়ায় গুপ্তচরবৃত্তি ও মুক্তি সংগ্রাম বানচাল করার কাজে নিযুক্ত

১৯৬১ সালের ১লা মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জন কেনেডী পীস কর্পস সৃষ্টি করেন এবং আন্তঃআমেরিকান কার্যকলাপের জন্য একটি প্রকল্পও তৈরি করেন যা পরবর্তীকালে অ্যালায়েন্স ফর প্রোগ্রেস রূপে গ্রন্থিত রূপ লাভ করে।

যেখানে অ্যালায়েন্সের কর্মক্ষেত্র শুধু লাতিন আমেরিকা সেখানে পীস কর্পসকে সংগঠিত করা হল সমগ্র তৃতীয় দুনিয়ার কার্যকলাপ চালাবার জন্য।

১৯৬০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণার সময় কেনেডী প্রথম পীস কর্পসের পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেন। পরে তিনি পীস কর্পস সম্পর্কে বলেন যে, এটি প্রশিক্ষিত নারী পুরুষ নিয়ে গঠিত একটি সংস্থা যাদের মার্কিন সরকার বা বেসরকারী সংগঠন অন্য দেশে পাঠাবে সেই দেশকে “বিশেষজ্ঞ” দিয়ে সাহায্য করার জন্য।

কর্পসের প্রথম ডাইরেক্টর রবার্ট সার্জেট প্রিন্সার কর্পসকে দ্রুত সংগঠিত করার সুপারিশ করে বলেন যে, এর উদ্দেশ্য হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের দেশগুলির উন্নয়নে সাহায্য করা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা ও সম্পর্ক গড়ে তোলা।

বিলাতে রামমোহন

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

assistance with a loan of £ 2,000, on my personal security, I shall gratefully repay the sum either within a year in this country or within three years in India from the day of the receipt of it.”

উপরিউক্ত পত্রে উল্লিখিত রামমোহনের ২৪শে জুন-এর পত্রের বিষয়বস্তু জানা যায় না। তবে আলোচ্য পত্রে তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় ঋণের পরিমাণ ২,০০০ পাউণ্ড বলে নির্দিষ্ট করেছেন এবং অপর ব্যক্তির জামিনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত জামিনে প্রার্থিত ঋণ প্রদত্ত হলে ঋণ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ১ বৎসরের মধ্যে বিলাতে অথবা তিন বৎসরের মধ্যে ভারতে উক্ত তিনি ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুলাই কোর্ট অব ডিরেক্টরস রামমোহনকে লেখা এক পত্রে ব্যক্তিগত জামিনে তাঁকে প্রার্থিত ঋণ প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। সুতরাং ইষ্ট ইন্ডিয়া কম্পানীর কাছ থেকে তার ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হল।

উপায়ান্তর না দেখে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে তিনি লণ্ডন ত্যাগ করে বৃটল শহরের শহরতলী Stapleton Grove-এ তাঁর দুই ভক্ত কুমারী কিডেল এবং কুমারী ক্যাসলের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। লণ্ডন থেকে তাঁর সঙ্গে গেলেন কুমারী হেয়ার। সে সময় বৃটলে উপস্থিত ছিলেন Dr. Carpenter এবং Dr. Estlin প্রভৃতি রামমোহন অসুস্থাগী ব্যক্তি। আর্থিক সমস্যা বিপর্যস্ত, পাণ্ডনাদারদের তাগিদে বিব্রত রামমোহন Stapleton Grove-এ উক্ত নির্ভরযোগ্য ধর্মপ্রাণ, সংস্কারবান ব্যক্তিদের সঙ্গে লাভ করেছেন এবং তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সহায় মহিলাদের সেবা ও যত্ন লাভ করেছেন। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ২৭ সেপ্টেম্বর তাঁর কর্মবহুল জীবনের অবসান হল। পরাগ্রয়ে সম্পূর্ণ নিঃশ্ব অবস্থায় ধনবান ভূস্বামী রাজা রামমোহন রায়ের এ হেন মৃত্যু অবজ্ঞানীয় এবং দুঃখজনক মনে হই।

সেই সময় পীস কর্পসের “স্বেচ্ছাসেবকদের” অনেক সদিচ্ছার কথা শোনা গিয়েছিল। তারা নাকি এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার পশ্চাদপদ জাতিকে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও কৃষি উন্নয়নে সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে চায়।

এর অন্তরালে “মার্কিনী জীবনযাত্রা” সম্পর্কে নিয়মিত প্রচার, “ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের পথ” সম্পর্কে গুণগান এবং কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে জোরদার করাও চলেছে। সেই সঙ্গে পীস কর্পসের “স্বেচ্ছাসেবককে” এটাও দেখতে হত যে দেশে সে কর্মরত সেদেশের মানুষ মার্কিনী নীতি সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করে কিনা।

এমন বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে যাতে প্রমাণ করা যায় যে, আরও অনেক সংগঠনের মত পীস কর্পস মারফৎ ওয়াশিংটন ঘাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে বানচাল করা এবং মার্কিনী নয়া ঔপনিবেশিক নীতি চালু করার চেষ্টা করে।

দৈনিক সংবাদপত্র নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন বলেছে যে, তথাকথিত শান্তি সেনারা মার্কিনী তরুণদের মার্কিনী বৈদেশিক নীতির শাখা হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনার একটি অংশ।

চিলিতে নিযুক্ত পীস কর্পসের একজন প্রাক্তন সদস্য বলেছেন, একথা সত্য নয় যে, কর্পস মানুষের প্রতি ভালবাসায় অনুপ্রাণিত হয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্যই তিনি এই সংগঠন ত্যাগ করেছেন।

বলা হয় যে, কর্পসের অধিকাংশ সদস্য হবে তরুণ যারা অন্তর্ক্রে সাহায্য করার জন্য সম্পর্কে সচেতন এবং সমস্ত রকমের স্বার্থত্যাগে যারা প্রস্তুত। এইসব তরুণরা আড়ম্বরহীন জীবন যাত্রা নির্বাহী করবে এবং এদের যে বেতন দেওয়া হবে তাতে তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন কেবল মেটানো সম্ভব হবে, তার বেশি নয়।

মার্কিন নাগরিকের ভাবমূর্তিকে বদলানোই হল এই প্রচারণার উদ্দেশ্য। অন্ত্যস্ত স্বত্রে এইসব তরুণদের সর্বকম স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সরবরাহের জন্য তাদের ভাল টাকা দেওয়া হবে।

যাদের রিক্রুট করা হয় তাদের যে দেশে পাঠানো হবে সেই দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। পরে পুর্টা রিক্রুট বিশেষ ক্যাম্পে গুপ্তচর বৃত্তি এবং অন্তর্গতমূলক কার্যকলাপের আধুনিকতম পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষ সাময়িক উপদেষ্টাদের তত্ত্বাবধানে তারা হাফা অস্ত্র ব্যবহার ও বেতারে বার্তা প্রেরণও শেখে এবং সেই সঙ্গে গোপন সম্বন্ধে কি ভাবে থবর পাঠাতে হয় তাও তাদের শেখানো হয়। তাদের ইতিহাস ও অর্থনীতিও শিক্ষা দেওয়া হয়।

শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার পর প্রত্যেককে চরত্বের জন্য একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, যে সময়ে জনসাধারণের প্রয়োজন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের অজুহাতে তাকে নানা ধরনের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়।

এইভাবে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শোষণের স্বার্থে সেই সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। তারা ট্রেড ইউনিয়ন ও ছাত্রদের কার্যকলাপ সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরি করে, বামপন্থী গোষ্ঠী ও জননেতাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে রিপোর্ট ও তাদের ঠিকানা দিয়ে এবং যারা মার্কিন বিরোধী তাদের নাম দিয়ে সি আই একে সাহায্য

করে। তারা জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও রিপোর্ট দেয়।

জোয়াও গুলার্তের বিরুদ্ধে ক্যু-র ঠিক আগে বিপ্লবী হস্তির উদ্দেশ্য দিয়ে পীস কর্পস ব্রাজিলে—প্রধানতঃ উত্তরপূর্ব অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে। এক বছর পরে ১৯৬১ সালে প্রায় একশো “স্বেচ্ছাসেবক” ডোমিনিকান রিপাবলিকে পাঠানো হয় এই সংগঠনের ৪৭ জন সদস্যকে সাহায্য করতে যারা মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগতিকে রোধ করার জন্য ইতিমধ্যেই সেখানে রয়েছে।

১৯৬৮ সালে চিলির স্টেট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা লক্ষ্য করে যে, যারা বৈপ্লবিক আদর্শে বিশ্বাসী তাদের সকলের সম্পর্কেই “স্বেচ্ছাসেবকরা” ফাইল তৈরি করছে।

এই কারণে পীস কর্পসের বহু ছাত্রবৈদ্য গুপ্তচরকে অনেক দেশ থেকে খেঁদিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই সংগঠনের ১৫ বছরের জীবনে এরা ৬২টি দেশে নিজেদের কার্যকলাপ প্রসারিত করেছে যাতে ৪০ হাজার মার্কিন নাগরিককে নয়া-উপনিবেশবাদের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

একথা এখন আর গোপন নেই যে, পীস কর্পস সরাসরি সি আই এর সঙ্গে যুক্ত যদিও সরকারী ভাবে এটি স্টেট ডিপার্টমেন্টের অধীন।

পীস কর্পসের ডাইরেক্টররা—সার্জেট প্রিন্সার, জ্যাক উড ভগ ও জোসেফ ব্রাটফোর্ড সি আই এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সার্জেট প্রিন্সার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সি আই এর এজেন্ট ছিল। ভগ “স্বেচ্ছাসেবক”দের বলত, যে সব দেশে নেতারা জাতীয়তাবাদের কথা বলে সেখানে তারা সতর্কভাবে, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে এই আদর্শের প্রচারে বাধা দেবে। আর ব্রাটফোর্ড ছিল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশানের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, যে সংস্থা লাতিন আমেরিকায় কার্যকলাপ চালানোর জন্য সি আই এর টাকা পেত।

যে-বিল মারফৎ পীস কর্পস সৃষ্টি করা হয় তাতে বলা হয়েছে এই সংগঠনের উদ্দেশ্য সহযোগিতা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে অন্যান্য দেশের লোকদের মনে ভাল ধারণা সৃষ্টি করে বিশ্বশান্তি ও বন্ধুত্বের পথ প্রশস্ত করা।

অন্যতঃ দেশগুলি দীর্ঘকাল ধরে শোষণ ও অবাধ লুণ্ঠন সহ করে আজ ভাল করেই জানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কি ধরনের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা তারা আশা করে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের সর্বকম প্রচেষ্টাকে বানচাল করতে তারা বদ্ধপরিকর।

মিহির আচার্য প্রণীত উপন্যাস	
জোনাকির আলো	৮.০০
পৃথিবীর বয়স	১৪.০০
জীবন নিরবধি	১৬.০০
ঘরে ফেরার দিন	৫.০০
দ্বিষ বিভাবরী	৫.০০
অতল প্রহরী	৬.০০
আলোর সহোদর	৪.০০
পারাবারের তীরে	১০.০০
শুকসারী ॥ ১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলকাতা-১৪। বিক্রয়কেন্দ্র ॥ নাথ ব্রাদার্স। দেবু ফোর্স। কথা ও কাহিনী।	

আসামীৰ কাঠগড়ায় কংগ্ৰেছ সরকার

(দৰ্পণের সংবাদদাতা)



বিশ্ব বর্ষ ৩য় সংখ্যা ৥ শুক্রবার, ১১ই ফেব্রুৱাৰী '৭৭ ৥ ৪০ পঃ

প্রার্থী মনোনয়নের পর রাজ্য কংগ্ৰেসের নির্বাচনী চিত্র

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্ৰেসে প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে সমঝোতা হলেও দুই বিরোধী গোষ্ঠী যারা পরিবর্তনপন্থী ও পরিবর্তন বিরোধী নামে খ্যাত, আরো পরিষ্কার ভাষায় যাদের সঞ্জয় গান্ধীর সমর্থক ও বিরোধী রূপে চিহ্নিত করা যায় তারা এখন পরস্পরের থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে কেউ কেউ ঐক্যের বুলি ছাড়লেও এদের (শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

জরুরী অবস্থায় অর্থনৈতিক অগ্রগতির আসল চেহারা

জরুরী অবস্থায় দেশের অগ্রগতি সম্পর্কে কংগ্ৰেছ সরকার যে প্রচার চালায় তা যে ভাঁওতাবাজী ছাড়া আর কিছু নয় সে কথাই তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন অর্থনীতিবিদ ডঃ হরপ্রসন্ন স্বামী উপরের শিরোনাম-বৃত্ত প্রবন্ধে এই লেখার প্রথম কিস্তি গত সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছে। বাকি অংশ কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

ডঃ স্বামী ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন থেকে পলাতক ছিলেন। গত মঙ্গলবার তিনি লণ্ডন থেকে দিল্লীতে পৌঁচেছেন। ১৯৭৪ সালের এপ্রিলে তিনি জনসংঘের সদস্য রূপে উত্তর প্রদেশ থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। গত আগষ্ট মাসে রাজ্যসভার অধিবেশন ডঃ স্বামী নাটকীয় ভাবে আবিষ্কৃত হন এবং তারপর সরকার নিযুক্ত কমিটিও যাবে রাজ্যসভা থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়।

৩৬ বৎসর বয়স্ক ডঃ স্বামী ১৯৬৪ সালের শেষদিকে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক স্মিথন কুজনেটের অধীনে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি লাভ করেন এবং সেখানে তিনি তিন বছর অধ্যাপনাও করেন। ১৯৭০ সালের জানুয়ারীতে

তিনি দিল্লী ফিরে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজিতে অর্থনীতিতে অধ্যাপনা শুরু করেন, কিন্তু ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজনৈতিক কারণে তার চাকরী যায়। ডঃ স্বামী কয়েকটি পুস্তকের রচয়িতা।

বার্টোল্ট ব্রেস্ট প্ররণে

১০ই ফেব্রুৱাৰী বিখ্যাত জার্মান নাট্যকার বার্টোল্ট ব্রেস্টের জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষে আমরা কয়েকটি বিশেষ রচনা প্রকাশ করব বলে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে পাতা বাড়ানো সম্ভব নয় বলে লেখা-গুলি দুটি সংখ্যায় প্রকাশ করা হচ্ছে।

এই সংখ্যায় মূল জার্মান থেকে অনূদিত (অনুবাদ : হাদিকা চক্রবর্তী) দুটি প্রতিবোধের কবিতা এবং হরচিত্র সেনের "ব্রেস্ট ও ভাইমার জার্মানি" ও সোমেন গুহর "বাকালী ব্রেস্ট এই দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। আগামী সংখ্যায় থাকছে দীপেন্দ্র চক্রবর্তীর "ব্রেস্ট বিশেষজ্ঞদের প্রতি" এবং রণজিৎ চক্রবর্তীর (নাট্যকার) "ব্রেস্ট নাটকে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা"। এই দুটি প্রবন্ধ।

গণ-আদালতে কংগ্ৰেছ সরকার এখন আসামীৰ কাঠগড়ায়। গত ছয় বছরের নানা দৃষ্টিতে তার হাত কলঙ্কিত। "গরীবী হটাও"য়ের ভাণ্ডার দিয়ে এর ভর। "গরীবী হটাও" আর সমাজতন্ত্রের বুলি আউড়ে এই সরকার আকর্ষণ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়েছে। ১৯৭৪ সালে এদের অপ-শাসন ও খেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন দানা বাঁধছিল তখন সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে হাজার হাজার লোককে জেলে পোরা হল। নাগরিকদের সর্বস্বত্বের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হল এবং সংবাদপত্রের গলায় সেন্সাংগের কাঁস পরানো হল। সর্বোপরি সংবিধান সংশোধন করে শাসকদল ভারতে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করেছে। বর্তমান নির্বাচনের পর কংগ্ৰেছ দল ক্ষমতায় এলে গণতন্ত্রকে কবরে পাঠাবার কাজ সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করবে।

হঠাৎ পার্লামেন্টের নির্বাচন ঘোষণা করেও কিন্তু জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়নি। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী এখনও মুক্তিশাল্য করেনি। বিরোধী দলের কর্মীদের মাথার ওপর মিসার খাঁড়া এখনও ঝুলছে। প্রেস আইনের বা বয়ান তাতে যে কোন সময় যে কোন সংবাদপত্রের গলা চেপে ধরা যাবে। এরকম বিধিনিষেধ ও সন্ত্রাসের মধ্যে আর কখনও পার্লামেন্টের নির্বাচন অহুষ্ঠিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে একদলীয় একনায়কত্বের মধ্যে বর্তমান নির্বাচন অহুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সমস্ত কিছুই শাসক দলের নিয়ন্ত্রণে, অতএব নির্বাচনী ফলাফলে কারচুপি ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক মতামতকে অস্বীকার করাও তাদের পক্ষে সম্ভব। শাসক দল যে এ ব্যাপারে কতদূর যেতে পারে তার পরিচয় পাওয়া গেছে ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে যখন মাস্তান ও পুলিশবাহিনী ভোটারদের ভোট দিতে দেখনি এবং ভোটের বাজ্ঞে কারচুপি হয়েছে।

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী) তাদের নির্বাচনী ইচ্ছাহারে জরুরী অবস্থার নিঃশর্ত প্রত্যাহার, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি ও সমস্ত প্রেক্ষারী পরোয়ানা প্রত্যাহার এবং গ্রিশা আইন, আপত্তিকর বিষয় সংক্রান্ত প্রেস আইন, ৪২তম সংবিধান সংশোধন প্রভৃতি তুলে নেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

কংগ্ৰেসী নীতি

নির্বাচনী ইচ্ছাহারে আরো বলা হবেছে, গত ছয় বছরে শ্রমজীবী ইন্দিরা (শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

এখন লড়াই গণতন্ত্র বনাম নয়া ফ্যাসিবাদী ডিক্টেটরী শাসন

—জ্যোতির্ময় বসু

বাতিলা লোকসভার সদস্য ও সি পি আই (এম) নেতা শ্রীজ্যোতির্ময় বসু চিন্ময় ১৯ মাস বন্দী থাকার পর গত ৬ই ফেব্রুৱাৰী মুক্তি পেয়েছেন। তাকে কেন প্রেক্ষার করা হয়েছিল সেটা কংগ্ৰেসের শাসক চক্রই জানে—একথা বলে শ্রীবসু আরো বলেন যে, সময় হলে বলব কি করে এখনও আমি বেঁচে আছি। তিনি বলেন, "যখন আমি হিসার জেলে ছিলাম তখন তামাক ভীষণ হাটের গুণগোল দেখা দেয়। তারা শুধু যে সেটা গোপন করে তাই নয়। তারা আমাকে কোন ঔষধও দেয় না, কোন চিকিৎসাও করে না।"

১৯৭৫ সালের ৬ই অক্টোবরে তার পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং তাকে কলকাতায় এনে পিতৃশ্রাদ্ধের জন্ত চারদিন প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু সেটা হঠাৎ দুদিন করা হলে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করা হয় এবং হাইকোর্টের নির্দেশে সরকার ক্ষান্ত হন।

শ্রীবসু আরো বলেন, "আমায় তিন মাস নির্জন কারাবাসে রাখা হয়। এখনও হাজার হাজার লোক জেলে রয়েছে। তাদের পরিবারবর্গ দুর্দশাগ্রস্ত। তাদের আগে মুক্তি দেওয়া উচিত।"

"একজন ব্যক্তির জরুরী অবস্থাকে মোকাবিলার জন্ত কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।"

"বিশ্বের হৃদয় বুদ্ধির লোকদের কাছে আমরা নিজেদের হাশু ল্পদ করেছি। মাইকেল ফুট ও জেনি লীর মত কয়েকজন 'দালাল'-রাষ্ট্রের পরসায় রাজসিকভাবে থেকে সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে।"

মার্কসবাদী নেতা শ্রীজ্যোতির্ময় বসু বলেন, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়-নিয়ে তার দলের মধ্যে ভাগাভাগি বন্ধ করার জন্তই ১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন প্রধানমন্ত্রী দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন।

সঞ্জয় গান্ধী সম্পর্কে শ্রীবসু বলেন, "সে আমার ছেলের চেয়ে কিছু বড়। তার সঙ্গে আমি কোন বিতর্কে প্রবেশ করতে রাজী নই।" তিনি আরো বলেন, "সে যা বলছে আর করছে তা বুঝতে পারবে আর একটু বড় হলে।"

শ্রীবসু বলেন, "এখন লড়াই গণতন্ত্র বনাম নয়া ফ্যাসিবাদী ডিক্টেটরী শাসন। জনগণ ঠিক করুক তারা কি চায়।"

এখনও বহু লোক জেলে পচছে

(দৰ্পণের সংবাদদাতা)

পার্লামেন্টের আগামী নির্বাচন জাতির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ দুটন।—এই কথা বলে পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ অ্যান্ড ডেমোক্রেটিক রাইটসের পশ্চিমবঙ্গ কমিটি একটি বিবৃতিতে দাবি করেছে যে, নির্বাচন যাতে অবাধ ও স্বাধের ভিত্তিতে হয় তার জন্তে সরকারের সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

কমিটি মনে করে গণতন্ত্রের অগ্রতম পরীক্ষা এই যে ভোটার নির্বাচন কেন্দ্রে গিয়ে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারছে কিনা।

কমিটি নাগরিকদের অনুরোধ জানিয়েছে তাদের মনোনীত প্রার্থী যে দলের হোক না কেন তাকে নির্ভয়ে ভোট দিতে।

ন্যায় ও অবাধ নির্বাচনের পট্টিবেশ সৃষ্টি কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। কিন্তু কমিটি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলো এখনও রাজনৈতিক বন্দীতে ভরে আছে।

গত ৩রা ফেব্রুৱাৰীতে বহরমপুর স্পেশাল জেল, দমদম সেন্ট্রাল জেল ও প্রেসিডেন্সী জেলে মিসা বন্দীর সংখ্যা ৫৭০ এবং মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল ও আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বিচারাধীন বন্দীর সংখ্যা ১৮৯ বলে জানা গেছে। কমিটি নির্বাচন যাতে পক্ষপাতীহীন হয় এবং নির্বাচনের স্ফুট আবহাওয়া যাতে তৈরি হয় তার জন্য এই সব বন্দীদের মুক্তির দাবি জানিয়েছে।

সমাজবাদ

সমাজবাদের ভাণ্ডাৰাজী

পাৰ্লামেণ্টেৰ নিৰ্বাচন যত এগিয়ে আসছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীৰ মেজাজ তত-চড়ছে। মন্ত্ৰিসভাৰ প্ৰবীণ, সদস্ত জগ-জীবন ৰাম ও অন্যান্য কংগ্ৰেচীয়েৰ পদত্যাগে তিনি কিছু বেসামালও হয়ে পড়েছেন। কেননা তিনি বোধহয় ভাবতে পারেন নি তাঁর এবং তাঁর পুত্ৰৰ যথেষ্টাচাৰেৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেচ দলে বিদ্ৰোহ ঘটতে পারে আর সেই বিদ্ৰোহীরা হবেন বিশিষ্ট কংগ্ৰেচী। ১৯৭৫ সালের ১২ই জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টৰ মাননীয় বিচাৰপতি শ্ৰীজগমোহন-লাল সিনহা জনপ্ৰতিনিধি আইনেৰ ১২৩ (৭) ধাৰাৰ নিৰ্বাচনে দুৰ্নী-তিৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰাৰ জন্তু শ্ৰীমতী গান্ধীকে দোষী সাব্যস্ত কৰে তাৰ নিৰ্বাচন নাকচ কৰে দেওয়াৰ পৰ থেকে প্ৰধানমন্ত্ৰী বক্তৃত্তাৰ তুৰতী ছোটাতে শুরু করেন প্ৰায় প্ৰতিদিন। তাৰপৰ জৰুৰী অবস্থা ঘোষণা কৰে তাৰ সাক্ষী গাওয়া। অৰ্থাৎ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ অজু-হাতে গণতন্ত্ৰ নিধনেৰ ব্যাখ্যা এবং বিৰোধী দল ও নেতাদেৰ বাপাস্ত কৰেছেন দীৰ্ঘদিন। নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰাৰ পৰ আবার শুরু হয়েছে দলেৰ বিশেষ কৰে নিজেৰ প্ৰচাৰ এবং সেই সঙ্গে পৰিবাৰেৰও প্ৰচাৰ।

এখন উনি-বলছেন তাঁৰা দেশেৰ ও দেশবাসীৰ সেবাৰ জন্তুই গদীতে বসেছেন এবং এটাই তাঁদেৰ একমাত্ৰ আৰাধ্য। কিন্তু এসব বেশিদিনেৰ কথা নয়, “মাত্ৰ” ৩০ বছৰ আগে স্বাধীনতা পাওয়া গেছে এবং শ্ৰীমতী ইন্দিৰাৰ পিতা জওহৰলাল-ক্ষমতাৰ এসেছেন আর শ্ৰীমতী ইন্দিৰা নিজে দশ বছৰ ধৰে পিতাৰ পৰিতক্ত আসনে।

দেশভাগ হল কেন? যাৰা স্বাধীনতা সংগ্ৰামে অনেক টালবাহানা কৰে আর ইংৰেজৰ সঙ্গে অনেক আপস ৰক্ষাৰ চেষ্টা কৰেও ডোমিনিয়ান ষ্টেটস পাননি এবং কাৰাগাৰে যেতে বাধ্য হয়ে-ছিলে তাৰা দেশেৰে ইংৰেজৰ সেই উগ্রমূৰ্তি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধান্তে শান্ত হয়ে গেছে। “ভাৰত ছাড়” আন্দোলন যাঁদেৰ টলাতে পারে নি তাৰা আজ ভাৰতবাসীৰ হাতে ক্ষমতা দিয়ে ভাৰতবৰ্ষ ছেড়ে চলে যেতে চাইছে। কিন্তু কাৰ হাতে শাসনভাৰ দিয়ে যাবে? মুসলিম লীগ বলছে আমৰা মুসলমানদেৰ একমাত্ৰ প্ৰতি নিধি আর কংগ্ৰেচৰ দাবি তাৰা সমস্ত ভাৰতবাসীৰ প্ৰতিনিধি। একটা ৰক্ষা হিচিল, কিন্তু জওহৰলালেৰ বেকাস কথ'য় তা বাচাল হয়ে যায়। অতএব দেশভাগ ছাড়া পথ কি। বয়স হয়ে যাচ্ছে, আর কবে ক্ষমতাৰ মসনদে বসা যাবে। অতএব দেশেৰ ওপৰ দিয়ে ছুৰি চালানো হল, যে ছুৰিৰ আঘাতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান নিহত হল, রাতা-রাতি লক্ষ লক্ষ লোকেৰ স্বদেশ বিদেশ হয়ে গেল, লক্ষ লক্ষ লোক-পথেৰ ভিৰীয়ে পৰিণত হল।

ক্ষমতা পেয়ে কিন্তু জওহৰলালেৰ নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেচ সরকার জনগণেৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ সমাধান ও দেশকে স্ব-নিৰ্ভৰশীল কৰাৰ পথে গেল না। শুক থেকে দেশী ও বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদেৰ তোষণ চলতে লাগল আর এদিকে মনোহৰ বুলিৰ আড়ালে স্বজন পোষণ ও দুৰ্নীতি। দেশেৰ অৰ্থনীতি গোপ্তায় গেল, শিল্পপতিৰা ফুলে টোল হল, জনগণ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতৰ হল, বেকাৰেৰ সংখ্যা বাড়ে লাগল এবং অনাহাৰ ও অপুষ্টিতে মৃত্যু নিয়মে দাঁড়াল।

এইভাবে চলে এসেছে ৩০ বছৰ। গণতন্ত্ৰেৰ নামে পেট ভৰে না তাই জওহৰলাল সমাজতন্ত্ৰেৰ কথা বললেন। অতএব লক্ষ্য : গণ-তান্ত্ৰিক সমাজবাদ। এটা ঠিক কি বস্তু ঠাওৰ হল না। জওহৰলাল তান্ত্ৰিক নন, সে এলুমও তাঁর নেই। অতএব ব্যাপাৰটা মুখে মুখেই ৰইল। তিনি গত হলেন, ঘটনাচক্ৰে বা ভাগ্যচক্ৰে এলেন তাঁৰ কন্যা। তিনি আরো বড় সমাজবাদী—বললেন, “গৰিবী হটাও”। কিন্তু গৰিবী হটল না, হটে যেতে লাগল গৰিব। দেশময় তুলকালাম কাণ্ড, জয়প্ৰকাশ মঞ্চে এলেন, নিৰ্বাচনী মামলাৰ ৰায় বেকাল। এখন নাকি জৰুৰী অবস্থাৰ সোনাৰ কাঠিৰ স্পৰ্শে দেশ শনে শনে এগিয়ে যাচ্ছে, সমাজবাদ এল বলে।

কিন্তু সবই ভাণ্ডা। ৩০ বছৰ ধৰে ভাণ্ডা দেওয়া হচ্ছে। সঞ্জয় গান্ধী সুযোগ পেলেও একই ভাণ্ডা ধবেন।

আসামীৰ কাঠগড়ায়

(১ম পৃষ্ঠাৰ পৰ)

গান্ধীৰ সরকার জনগণেৰ বিৰুদ্ধে এত অপৰাধ কৰেছে যা আর কোন সরকার কৰেনি। শোষণ ও সন্ত্ৰাসেৰ নীতি জৰুৰী অবস্থায় প্ৰতিক্ৰিয়াশীল সংবি-ধান সংশোধনে পৰিণতি লাভ কৰে, যাৰ ফলে জনগণ সমস্ত ৰক্ষাৰ অধি-কাৰ ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয় এবং সবকিছুর ওপৰ শাসন বিভাগকে স্থান দেওয়া হয়।

সভা শোভাযাত্ৰা ধৰ্মঘট আন্দো-লনেৰ ওপৰ নিবেদিতা জাৰি কৰে এক আঘাতে ভূমায়ী একচেটিয়া ব্যবসায়ী পুঁজিপতি সরকার ও অন্ত্ৰান্ত কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী কৃষি-কৰ্মী কৃষক শিল্পক ছাত্র অধ্যাপকদেৰ সংগ্ৰামকে ত্ত্ব কৰে দেওয়া হল।

হাজাৰ হাজাৰ লোকেৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জেলে পুৰে তাঁদেৰ সঙ্গে দুৰ্ব্যবহাৰ কৰা হল। তাঁদেৰ নিৰ্জন কাৰা-বাসে বেধে প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত কৰা হল। তাঁদেৰ পৰি-বাৰবৰ্গকে পাৰিবাৰিক ভাতা থেকে বঞ্চিত কৰে অনাহাৰেৰ মুখে তেলে দেওয়া হল এবং সবই প্ৰতিক্ৰিয়াশীল শক্তিৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰামেৰ নামে।

সংবিধান সংশোধন আইন

নিৰ্দেশক নীতি প্ৰতিষ্ঠাৰ অগ্ৰাধি-কাৰদেৰ নামে মৌলিক অধিকাৰেৰ গুৰুত্বকে নস্তাং কৰে ৪২ তম সংশোধন দ্বাৰা সংবিধানেৰ মৌল চৰিত্তকেই আঘাত কৰা হয়েছে এবং সম্পত্তিৰ অধিকাৰ ছাড়া আর সমস্ত অধিকাৰ কেড়ে নেওয়া হ'ছে। এই সংশোধন বিচাৰ বিভাগেৰ ভূমিকাকে ধ্বংস কৰেছে এবং বিচাৰকদেৰ শাসন বিভাগেৰ বেতনভোগী কৰ্মচাৰিতে পৰিণত কৰেছে।

এতে বিভিন্ন ৰাজ্য কেব্ৰেৰ সশস্ত্ৰ বাহিনী ও পুলিচ পাঠাৰ ক্ষমতা সহ কেন্দ্ৰীয় সরকারেৰ হাতে প্ৰস্তত ক্ষমতা দিয়ে সংবিধানেৰ সুক্ৰান্তীয় চৰিত্তকে আঘাত কৰা হয়েছে। ভাৰতবৰ্ষেৰ ঐক্যকে শক্তিশালী কৰাৰ জন্তু ৰাজ-গুলিকে স্বায়ত্বশাসনেৰ আৰো অধিকাৰ দেওয়াৰ পৰিবৰ্তে তাঁদেৰ ব্ৰিটিশ যুগেৰ একেটো প্ৰৱেশে পৰিণত কৰা হয়েছে।

এইভাবে শাসন বিভাগেৰ ওপৰ পাৰ্লামেণ্টেৰ প্ৰাধিক্ত নষ্ট হয়েছে। যদিও সব কিছুই পাৰ্লামেণ্টেৰ নামেই কৰা হয়, তবু একে সরকারেৰ ৰবায় স্ট্যাম্পে পৰিণত কৰা হয়েছে। এই অবস্থায় শাসন বিভাগ যে কোন গণ-তন্ত্ৰ বিৰোধী ব্যবস্থা নিতে পারে। পাৰ্লামেণ্টেৰ সদস্তদেৰ এমন কি শাসকদেৰ লোকদেৰও মিশাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়েছে।

মন্ত্ৰীসভা ও আৰগান্টাই ৰাজ্য চালায়। পাৰ্লামেণ্ট দুনিয়াকে দেখা-বাৰ বস্তবিশেষ।

অৰ্থনৈতিক অবস্থা

সি পি আই (এম)-এৰ নিৰ্বাচনী ইচ্ছাহাৰে বলা হয়েছে গত ছয় বছৰে, বিশেষ কৰে জৰুৰী অবস্থায় পৰ দেশেৰ মাহুৰেৰ কাৰ্ণে আৰো দুৰ্গতি ও অৰ্থনৈতিক বোকা চাপানো হয়েছে দেশী বিদেশী একচেটিয়া ব্যবসায়ী ও ভূমায়ীদেৰ মুনাফা বাড়াৰ জন্তু।

জৰুৰী অবস্থা ঘোষণাৰ দু বছৰ আগে চরম মুদ্রাস্ফীতি জনসাধাৰণকে পৰ্বদুস্ত কৰে দেয়। দ্ৰব্যমূল্য বছৰে ৩০ শতাংশ পৰ্বত্ব বৃদ্ধি পায়। কৃষি ও শিল্পশ্ৰমিক, কৰ্মচাৰী, শিল্পক সকলেই প্ৰকৃত আয় কমে যায় এবং তাঁদেৰ ঋণ বাড়ে। কৃষকৰা দুদিক থেকে বঞ্চিত হয়। তাঁদেৰ প্ৰয়োজনীয় জিনিস কেনে বেশী দামে। কিন্তু নিজেদেৰ উৎপাদনেৰ মূল্য মূল্য পায় না। জন-সাধাৰণেৰ অৰ্থনৈতিক অবস্থায় চরম অবনতি লাভ কৰে। সরকারী হিসেব থেকেই জানা যায় যে, জনসংখ্যাৰ ৭০ শতাংশ দাৰিদ্ৰ্যসীমাৰ নীচে বাস কৰে।

মুদ্রাস্ফীতি ৰোধ কৰতে গিয়েও সরকার সাধাৰণ মাহুৰেৰ ওপৰ আঘাত হানে। শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীদেৰ মৰ্যাদাতা কেটে নেওয়া হয়, বেতন বৃদ্ধি অগিত ৰাখা হয়, বোনাস কমিয়ে

দিয়ে এবং কৃষি প্ৰসিক্ষেৰ মানতম বেতন সংক্ৰান্ত আইন বলবৎ না কৰে সরকারী পুঁজিপতিদেৰ সুবিধা কৰে দিয়েছে।

আজ খাদ্যশস্ত্ৰ, সরষেৰ তেল, চিনি, কেরোসিন, দধ, ওয়ুধ কাপড় প্ৰভৃতি নিত্য প্ৰয়োজনীয় সব জিনিসেৰ দাম সাধাৰণ মাহুৰেৰ ক্ৰয়ক্ষমতাৰ বাইরে চলে গেছে।

গত ছয় বছৰ শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীৰ শাসনকালে প্ৰতি বছৰ বেকা-ৰেৰ সংখ্যা বেড়েছে। দশ বছৰ আগে বেজেন্দ্ৰীকৃত সংখ্যা ছিল ৪৫ লক্ষ আজ ৩০ এক কোটি। গ্ৰামীণ বেকা-ৰেৰ সংখ্যা প্ৰায় দু কোটি। পুৰো সময়ের জন্তু কাজ পায় না এমন মাহু-ৰেৰ সংখ্যা প্ৰায় পাঁচ কোটি।

যখন বাম্পাৰ ফসল ফলে এবং সরকার ও ব্যবসায়ীদেৰ শুদামে আর মাল সাধাৰ জায়গা থাকে না তখনও লোকেৰে অনাহাৰে থাকতে হয়।

জনসাধাৰণ একেবাৰেই দরিদ্র। এমন ক্ৰয়ক্ষমতা নেই যে, নিজেদেৰ শস্ত, চিনি, ফল, সব্জী, মাছ কিনে খাবে আর কাপড় কিনে পৰবে।

এভাবেই কংগ্ৰেচ দল অৰ্থ-নীতিকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে, কাৰণ এৰা একচেটিয়া ব্যবসায়ী ও ভূমায়ীদেৰ সেবাদাস।

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠাৰ)

কংগ্ৰেচের নিৰ্বাচনী চিত্ৰ

(১ম পৃষ্ঠাৰ পৰ)

মধ্যে এখনও খেয়োখেয়ি চলছে। বিভিন্ন জনসভায় এৰা প্ৰস্পাৰেৰ বিৰুদ্ধে কাদা ছুঁড়েছে এবং মুখোশ খুলে দিচ্ছে।

প্ৰাৰ্থী মনোনয়নে সঞ্জয় বিৰোধীরা সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰেছে বলে দাবি কৰেছে। হিঠেবটা হল এই : ৰাজ্যেৰ মোট আসন ৪২টি। গতবাৰেৰ ১৬ জন সিটিং এম পিৰ মধ্যে দুজন বাদ গেছেন। বাকি ১১ জন মনোনয়ন পেয়েছেন। এই ১১ জন এবং সি পি আইকে ছেড়ে দেওয়া ৮টি আসন অৰ্থাৎ ১৯টি আসন বাদ দিলে থাকে ২৩টি আসন। এই নতুন ২৩টিৰ মধ্যে ১১ পেয়েছে সঞ্জয় বিৰোধীরা আর ১২ পেয়েছে সঞ্জয় সমৰ্থকৰা। কিন্তু সঞ্জয় বিৰোধী-দেৰ দাবি : পুৰনো ১১ জনেৰ মধ্যে তাঁদেৰ গোষ্ঠীৰ লোকই বেশি।

সে বাই হোক এই ৰাজ্যেৰ কংগ্ৰেচীয়া ১৯৭১ সালেৰ মত ঐক্য-বদ্ধভাবে নিৰ্বাচনী লড়াইয়ে নামতে পারছে না। বরং তাঁদেৰ ঐক্য-বদ্ধ বিৰোধীদেৰ সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যাঁদেৰ সঙ্গে জগজীবন ৰামেৰ ‘কংগ্ৰেচ ফৰ ডেমোক্ৰাসী’ মিলেৰও সমঝোতা। এটাও নিশ্চিত যে কংগ্ৰেচের কোন গোষ্ঠী নিজেদেৰ কৰ্মীদেৰ বিৰোধী গোষ্ঠীৰ এলাকাৰ কাজ কৰতে দেবে না। সকলকে এনে নিজস্ব প্ৰাৰ্থীদেৰ এলাকাৰ কেন্দ্ৰীভূত কৰবে। এবং দুই গোষ্ঠী যেভাবে মারুমুখি হয়ে আছে তাতে প্ৰত্যেক সংঘৰ্ষ ঘটলে অবাক হবার কিছু নেই। এতে পুলি-শেৰ কাজ বাড়বে।

জরুরী অবস্থায়

অর্থনৈতিক অগ্রগতির

আসল চেহারা (২)

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ স্বামী

মুদ্রাস্ফীতিকে প্রেপ্তার করো মানুষকে নয়

পার্লামেন্টের সময়সীমা বা ড়য়ে দিয়ে শ্রীমতী গান্ধির সরকার দাবি করে-
ছেন যে, জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে ১,৭৫০০০ মানুষকে বিনা বিচারে জেলে
চুষিয়ে এবং বিশ দফা জাহির করে অদম্য মুদ্রাস্ফীতিকে তারা সংযত করেছেন।
তারা আরো দাবি করেছেন যে, ভারত একমাত্র দেশ যেখানে মুদ্রাস্ফীতিকে
দমন করা হয়েছে।

সরকারী প্রকাশনায়, সংসদে অথবা ধরে আনা প্রোভুগলীর সামনে রক্তাক্ত
পরিসংখ্যান সহ যুক্তি একই। সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে ঘে পাইকারী মূল্যসূচক
৩৩০.৭৭য়ে উঠে গিয়ে শতকরা ৩৪ বৃদ্ধি দেখিয়েছিল। ১৯৭৬ সালের মার্চে তা-ই
নাকি ২৮২.২২ য়ে নেমে শতকরা ১৫ কমতি দেখিয়েছে। এই ধরনের দাবি
চুটি চাবিকাঠির উপর নির্ভর করে—প্রথমত দফাওয়ারী খুচরা দামের তুলনা না
করে এক্ষেত্রে একটা গড়পড়তা পাইকারী মূল্যসূচক নেওয়া হয় এবং দ্বিতীয়ত,
তুলনাটা সব সময় ১লা জুলাই ১৯৭৫ এর সঙ্গে না করে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ এর
সঙ্গে করা হয়।

এই এভাবে যাওয়ার কারণটা বেশ বোকা যায়। প্রথমত পাইকারী মূল্য-
সূচকের ভিত্তি হল প্রধানত অভোগ্য পণ্যের দফাগুলি এবং হিসেব করা নিয়ন্ত্রিত
মূল্যের ভিত্তিতে যার মধ্যে প্রকাশিত বাজার দর প্রতিকলিত হয় না। তদুপরি
অর্থনৈতিক মন্দা ঘটলে যা বর্তমানে ঘটে চলেছে, পাইকারী বাজার দর অস্বাভা-
বিক ভাবে পড়ে যায় এবং মূল্যসূচককেও কমিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ত সেপ্টেম্বর
১৯৭৪ প্রচারের পক্ষে ভালো হাতিয়ার কারণ জুলাই ১৯৭৪ যে বিরোধী দলের
চাপে গুল বাবস্থা সংকুচিত করার ফলে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালের থেকে জুলাই
১৯৭৫-এর মধ্যে অনেক দ্রব্য মূল্য পড়ে গিয়েছিল অতএব যদিও ১৯৭৪
সালের সেপ্টেম্বর পাইকারী মূল্যসূচক ৩৩০.৭ ছিল, কিন্তু ১৯৭৫ সালের
জুলাইয়ে যখন ২০ দফা ঘোষিত হল মূল্যসূচক ইতিমধ্যেই ৩০১.৭৭য়ে নেমে
গেছে। এইভাবে ১৯৭৬ সালের জুলাইয়ে, অর্থাৎ এক বছর পরে, মূল্যসূচক দাঁড়াল
৩১২.৪ য ২০ দফা কর্মসূচী আরম্ভের সময়কাব চেয়ে একটু উর্ধ্বে। স্পষ্টতই
প্রচারের উদ্দেশ্য ১৭৫ সালের ১লা জুলাইয়ের সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ এবং জুলাই ১৯৭৫ এর মধ্যে
দ্রব্যমূল্য হ্রাস পেয়েছিল, কিন্তু তার সঙ্গে জরুরী অবস্থা বা ২০ দফা কর্মসূচী
অথবা নিষপাধ্য লোকদের কারাধিক্ত করার কোন সম্পর্ক নেই। এর জন্তে
কেবামতী যদি কাউকে দিতে হয় তা দেওয়া উচিত পার্লামেন্টের সেই পরিপ্রসঙ্গ
বিরোধী সদস্যদের (যাদের অনেকেই আজ জেলে) এবং ডঃ পি আর ব্রহ্মানন্দ
ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সহযোগীদের মত অর্থনীতিবিদদের যারা বারে
বারে মুদ্রাস্ফীতির আসল আসামীর কথা বলেছেন: দারিদ্রহীন ভাবে অর্থ
সংবরণ বৃদ্ধি। সরকার যেই ১৯৭০-৬৪ সালের ১৬% থেকে অর্থ সংবরণ
সঙ্কুচিত করল ১৯৭৪-৭৫ সালে ৬% য়ে তখনই দ্রব্যমূল্য হ্রাস পেতে লাগল।

উপরন্তু এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ ও মার্চ ১৯৭৬ এর
মধ্যে খাদ্যশস্য ও ভোজ্য তেলের দাম বেশ ভাল ভাবেই পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু
তার সঙ্গেও জরুরী অবস্থা বা ২০ দফা কর্মসূচীর কোন সম্পর্ক নেই। ১৯৭৫-৭৬
সালে ভারতবর্ষে বেশ ভাল বৃষ্টি হয়েছিল এবং যেহেতু আমাদের ৭৫ শতাংশ খাদ্য
উৎপাদন হয় বৃষ্টির জলে পুং সেচের দ্বারা সেইজন্য সে বছর রেকর্ড পরিমাণ
ফল হয়। যথার্থ সময়ে বৃষ্টিপাতের জন্য শ্রীমতী গান্ধি কোন কৃতিত্ব দাবি
করতে পারেন না।

ভাল বৃষ্টিপাতের পরে খাদ্যশস্য ও ভোজ্য তেলের মূল্য হ্রাস ভারতীয় অর্থ-
নীতির চিরকালীন চিত্র। ১৯৬৭-৬৮ সালে যথার্থ সময়ে বৃষ্টিপাতের পরে
সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ ও মার্চ ১৯৬৮ র মধ্যে পাইকারী মূল্যসূচক ৭০% পড়ে
গিয়েছিল। সেই সময়ে যোদ্ধা রাজ্যের আটটিতে বিরোধী এস ডি ডি সরকার
এবং পার্লামেন্টে শ্রীমতী গান্ধির সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুবই কম। ১৯৭৫-৭৬ সালেও

ভোজ্য তেলের দাম বেশ কমে গিয়েছিল শুধু ভারতে রেকর্ড পরিমাপ বাদাম
তেল উৎপাদনের ফলে, যে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ থেকে মার্চ ১৯৭৬ য়ে জন ফ্রন্ট
সরকার ক্ষমতায় ছিল।

আর একটি প্রচার হল মুদ্রাস্ফীতি শুধু ভারতেই রোধ করা গেছে, পৃথিবীর
আর কোথাও নয়। এই দাবি বিজ্ঞাতিকর, কারণ এই দাবি সত্য নয়।
রাষ্ট্রসংঘের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৭৫-৭৬ সালে ১৪৬টি দেশের মধ্যে
৫৩টি দেশে সামান্য মুদ্রাস্ফীতি আছে অথবা একেবারেই নেই। কিন্তু ভারত
সরকারের এই মিথ্যা দাবির মধ্যে একটি বিপজ্জনক দৃষ্টিকোণও আছে। পাকে
প্রকারে বলা হচ্ছে সরকার বা খুশি করতে পারে যেহেতু তারা মুদ্রাস্ফীতি রোধ
করেছে: এটা সকলেই জানেন যে বহু দেশে সামগ্রিক একনায়কত্ব মুদ্রাস্ফীতি
রোধ করেছে। বাটের দশকে গ্রীস, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ায় সামগ্রিক অভ্য-
র্থন দ্রব্যমূল্য কমিয়েছে। সত্তরের দশকে চিলি ও বাহুলাদেশে সামগ্রিক শাসন
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ হয়েছে। এইমতে কি শ্রীমতী গান্ধি
এই ধরনের একনায়কত্ব সমর্থন করেন?

কিছুদিনের জন্য, ভাল বৃষ্টিপাতের মত অক্ষুণ্ণ পরিস্থিতিতে যার দাবি
আরও বাড়তে পারে যেকোন এমনকি খুব বদ সরকারও দ্রব্যমূল্য হ্রাস করতে
পারে। কিন্তু কিছুদিন পরেই ভারতবর্ষে বর্তমানে যা দেখা যাচ্ছে, দ্রব্যমূল্য
বাড়তে শুরু করে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি, কর্মক্ষমতায় সমতা, নিত্যপ্রয়োজনীয়
দ্রব্যসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া, মূল্য রোধের কোন সংক্ষিপ্ত পথ নেই।
ভারতবর্ষে অমিতাভা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছি, বিশেষ করে শ্রীমতী গান্ধির
প্রধানমন্ত্রিস্থর দশ বছরে। জরুরী অবস্থার পরবর্তী পরিস্থিতি হল স্থিতি
অনিয়মিত বৃদ্ধির পূর্ববর্তী ব্যর্থতা আরো বাড়তির দিকে, কর্মবর্ধমান অসাম্য
এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য পেতে অসুবিধা। এটা এখন অর্থনৈতিক পরিভা-
ষায় উৎপাদন অমে-যাওয়া, ১৯৭৬-৭৭ সালের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা থেকে
বিচ্যুতি এবং মূল্যবৃদ্ধির আকারে দেখা দিয়েছে। (চলবে)

বেহালা হাই স্কুলে গণ্ডগোল চলছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বেহালা হাই স্কুলের (মালটিপার-
পাস) ছাত্র নম্বা বনমানী নন্দর রোডের
(বেহালা হাট) বাড়ীতে শিক্ষক
বনাম পরিচালক মণ্ডলীর লড়াই
চলছে। স্কুল নতুন পক্ষ এনের পর এক
শিক্ষককে অপমান করছেন নতুন শিক্ষক
নিয়োগ করে তাদের প্রোমোশন দিচ্ছেন
পুরনোদের টানা পন্থা বিল আটকে
রেখে রাখা করছেন হায়েগাল।

মন্ত্রীর কথা হলো স্কুল-টি এখন
এগার বার ক্রাশ পেয়ে কলকাতা হাট
প্রাপ্ত। তাই প্রধান শিক্ষকের রেকর্ডের
হস্তান্তর কথা। প্রধান শিক্ষক
আন্তোভাষ মট্টাচার্যা ৫দিন পাদেই
অবসর নেন। তাই এগার বারের
জগাচিচুড়ীতে নিজেকে জড়াতে চান
না। তিনি গুয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাউ-সিল
অফ হারার সে-ওয়ারী এডুকেশনের
(চলবে) (শেষাংশ ম পৃষ্ঠায়)

উৎপাদনে সব'কালীন রেকর্ড

১৯৭৫-এর পয়লা জুলাই অর্থনৈতিক কার্যসূচী ঘোষিত হবার পর থেকে
দেশ কৃতসংকল্প হয়ে কাজে নামে আর তার পুরস্কার:

* খাদ্যোৎপাদন ১১৮ মিলিয়ন টনের রেকর্ড সীত্রা ছুঁয়েছে এবং ভাণ্ডারে
মজুত রয়েছে ১৮ মিলিয়ন টন

* ১৯৭৬-৭৭ এর প্রথম ছ'মাসে শিল্পোৎপাদনের মাত্রা যেখানে বারো
শতাংশ সেখানে তার আগের বছরের ঐ কমাসের মাত্রা ছিল মাত্র
তিন শতাংশ

* ১৯৭৬-এর প্রথম সাত মাসে রপ্তানির পরিমাণ ৩৩৯ শতাংশের
রেকর্ড হারে বৃদ্ধি পেয়েছে

বার্টোল্ট ব্রেশট ও ভাইমার জার্মানি

মুচরিতা সেন

বার্টোল্ট ব্রেশটের সাহিত্যসৃষ্টি ঐতিহাসিক দিক থেকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়—ভাইমার জার্মানির পটভূমিকায় লেখা নাটক, কবিতা, গল্প বার মধ্যে প্রথম। তার পর আসে নাৎসি জার্মানি থেকে নির্বাসিত লেখকের, ও আরো পরে পূর্ব জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত নাট্য পরিচালকের পালা। ব্রেশটের প্রথম দিকের লেখার মূল স্বপ্নে পাওয়া যায় প্রথম যুদ্ধের অশান্ত জার্মানির বিচিত্র ও জটিল সামাজিক ব্যবস্থার, ও তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব।

ভাইমার জার্মানির ইতিহাস সর্বজনবিদিত হলেও, ব্রেশটের নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ-ত্রিশ দশকের ছবি আবার তুলে ধরা দরকার। মিত্র-শত্রুর কাছে পরাজয় ও আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের দু'মুখো চাপে বিসমার্কের হাতে গড়া সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল। ক্রাইজারের শুল্ক সিংহাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত হল প্রথম জার্মান প্রজাতন্ত্র। কিন্তু তার বনিয়াদ পাকা হল না। যে সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি গেনারালি ও আয়লাভের ক্ষমতার শীর্ষে ছিল তাদের যেমন সরানো হল না তেমনি ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও আয়ল পরিবর্তন করা হল না। নতুন প্রজাতন্ত্র গোড়া থেকে নির্ভর করল তার সব-চেয়ে বড় শত্রুর উপর। আবার যুদ্ধ পরাজয়ের খেদে ক্রাইজারের অস্থপস্থিতিতে তাদেরই দিতে হয়েছিল। ফলে জার্মানি দু'বার প্রচণ্ড অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের শিকার হল। আর প্রজাতন্ত্রের পনের বছর যেতে না যেতেই নাৎসিরা ক্ষমতায় এল। ভাইমার প্রজাতন্ত্রের এই গোচনীয় পরিণতির মূলে ছিল জার্মানির প্রমিত প্রণয়ী দুর্বলতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব। সোশাল ডেমোক্রেট এবার সরকার ক্ষমতায় আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্ট ও অস্ত্র বামপন্থীদের বিরোধে কঠোর হাতে দমন করেছিল। পুরানো সাথীদের শেষ করতে, নাৎসীদের পূর্বসূরী, চরম প্রতিক্রিয়াশীল "মুক্ত বাহিনী"কে (Freikorps) ডেকে আনতে বিধা করে নি। এর পর দু'টি সবচেয়ে বড় প্রমিত দলের স্বার্থ মিলন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। আর শত্রু বিরোধের সুযোগ নিতে ছাড়ল না।

কেন্দ্র ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের প্রচণ্ড সমস্ত ও অবক্ষয় বোঝানো অসম্ভব। তবে বিশ শতকের গোড়ার দিকের অবস্থা কয়েকটি পরিলক্ষণ থেকে আন্দাজ করা যাবে। ১৯২৩ সালে বার্লিনের একজন সাধারণ শ্রমিকের মজুরি ছিল ৩,০৩৮,০০০,০০০ মার্ক। একই সময় মূল্য সূচী ছিল ৫৮,৭১৭,১১৫,৩০০,০০০। ১ অকল্পনীয় মুদ্রাস্ফীতি কেবল প্রমিত প্রণয়ীকে চরম দুর্ভাগ্য মধ্যে তেলে দেয় নি। সেই সঙ্গে মধ্যবিত্তদের এক বড় অংশকে পথে বসিয়েছিল। আভ্যন্তরীণ ভাবেই, সমস্ত সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস, মূল্যবোধ, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবন ভেঙে পড়েছিল। বিদেশী ঋণের সাহায্যে সমস্ত সাময়িক সমাধান হলেও, শেষ রক্ষা হল না। ১৯২৩ এর বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের মধ্যে জার্মানির বেকারের সংখ্যা দেশের সমস্ত কর্মকর্ম-মাহুষের একটা বিরাট অংশকে গ্রাস করল। সম্ভবতঃ প্রত্যেক দ্বিতীয় জার্মান পরিবারে একজন হল বেকার বা আধা বেকার। সকলের মুখে শোনা যেতে লাগল, "এমন ভাবে আর চলতে পারে না।" অবশেষে পরিবর্তন এল, বিপ্লবের পথে নয়, নাৎসী প্রতিক্রিয়াবাদের মাধ্যমে।

অথচ ভাইমার প্রজাতন্ত্র এক হিসাবে জার্মান সাহিত্য সাঙ্কতির স্বর্ণযুগ ছিল। বিশেষতঃ পিঙ্কাটারের মত পরিচালক, টলার, ব্রেশট, জুকারমায়ার কাইজার, ইত্যাদির মত নাট্যকার, জার্মান সিনেমার মান সম্ভবতঃ রাশিয়া ছাড়া অন্য কোনো দেশের সিনেমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। অনেকের মতে, গোটে শিলারের পর জার্মানিতে এমন সাংস্কৃতিক নবজীবন দেখা দেয় নি। স্বভাবতঃ, সমকালীন সমাজের প্রতিফলনে এই থিয়েটার ছিল অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, বিদ্রোহের কেন্দ্র। রাজনৈতিক নাটক এখানে বিয়ল ছিল না।

জার্মান প্রণয়ী নাটকে রাজনৈতিক লেখার প্রচুর উদাহরণ আছে। গোটে "Egmont" শিলারের "Don Carlos" বা "Wilhelm Tell" ঐতিহাসিক নাটক হলেও তাদের বক্তব্য করাসী বিপ্লবের "আলোক প্রাপ্ত" যুগের। ক্রাইস্ট নেপোলিয়ন অধিকৃত জার্মানিতে স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রচারের উদ্দেশ্যে "Die Hermannsschlacht" (হার্মানের যুদ্ধ) মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করেছিলেন। হাউটম্যানের "তাতির দল" (Die Welter) সাইলিসিয়ার এক বিদ্রোহের নাট্যরূপ দিয়েছিল। যুদ্ধের নাট্যকাররা এই ঐতিহ্যে কিংবদন্তি, তবে তাদের বিদ্রোহের ছবি আরো স্পষ্ট আরো তীব্র। বিশেষ করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে স্থপা। যে সমাজ ব্যবস্থা মানুষকে যুদ্ধের বলি হিসাবে

ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, অনেক নাটকে কেটে পড়েছিল। যুদ্ধের মধ্যেও কিছু কিছু যুদ্ধ বিরোধী নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। জোয়াইগের "জেরামায়ার", হাঙ্গেনকোভারের "অ্যাটিগোন, প্রাচীন কিম্বদন্তির ছায়াবলম্বনে অধুনিক, যুদ্ধ বিরোধী বক্তব্য রেখেছিল, টলারের "পরিবর্তন" (Die Wardlung) যুদ্ধকে ক্রো ক্রালদের নাচের এক অবিচ্ছেদ্যপন্থী 'দৃশ্য' তুলে ধরেছিল।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর আসে বিদ্রোহের ঢেউ। কিয়েল বন্দরে নাবিকদের বিদ্রোহ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত পশ্চিম জার্মানিতে ও অংশত পূর্ব জার্মানিতে ছড়িয়ে পড়ে। বার্লিনে প্রমিত প্রতিনিধিরা সরকার গঠন করে। বাভারিয়া প্রদেশে কয়েক মাসের জন্য সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র (Räterepublik) প্রতিষ্ঠিত হল। বিপ্লবের মূল চালিকা শক্তি প্রমিত, শ্রম ও নাবিকেরা (বাভারিয়ার কিছু পরিমাণে কৃষকেরা) হলেও বুদ্ধিজীবীরাও এর শরিক হয়েছিলেন। বাভারিয়ার ক্ষণস্থায়ী প্রজাতন্ত্রের সরকারে অংশ নিয়েছিলেন সমকালীন জার্মানির শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কয়েকজন—নাট্যকার আর্নস্ট টলার, সাহিত্যিক জুডাচ লাগুওয়ার, অর্থ-নীতিবিদ অটো লয়ার ও সিলভিও গেসেল। টলার 'ক' কলম আর বন্ধু প্রায় সমান দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। প্রেসিডেন্টের পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন সমালোচক ও সাংবাদিক ফ্রিট আইজনার। এমন কি রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন কবি রিলকের মনেও সাময়িক উৎসাহের ছোঁয়াচ লেগেছিল। তাঁর চিঠিতে সাধারণ প্রমিত ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সহজ মেলামেশার বর্ণনা আছে—ক্রাইজারের আমলে। সোশাল ডেমোক্রেট দলের বাইরে বা অকল্পনীয় ছিল। একজন সৈন্য ওয়েবার প্রভৃতিকে আভ্যন্তরীণ ভাবেই বলতে পারত, "অধ্যাপক মশাইরা ত' ফরাসী আনেন। আমরা ফরাসী বন্ধুদের কাছে যে শান্তির প্রস্তাব পাঠাব আপনারা সেটা অস্বীকার করে দেবেন।"

তবে বুদ্ধিজীবীদের বিদ্রোহ সর্বদা ইতিবাচক বা জনমানসের কাছাকাছি ছিল না। অনেকে পুরানো সমাজকে অপহৃদয় করলেও, আয়ল পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারতেন না। যুদ্ধকে ঘৃণা করলেও, তার আসল কারণ অস্ব-সন্ধান করতেন না। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যেতে পারে, ব্রেশটের বড় আর্নস্ট

ব্রেনানের বিখ্যাত নাটক "পিতৃহত্যা" (Die Judirche Witwe) য বিবর প্রাচীন ইতিহাস বা কিম্বদ-ন্তির ব্যাখ্যাত্মক ব্যবহার। "বীরত্বের" জন্তু খ্যাতিলাভ যে অনেক সময় দশ-চক্রে ভগবান জুত হবার ব্যাপার, তা বোঝানো হয়। এর সঙ্গে তুলনা করা হয় সত্যিকারের বীরত্বের যার প্রকাশ যুদ্ধে নয়, শান্তিতে। ইতিহাসভিত্তিক "ক্যালের নাগরিক" এ (Die Burger von Calais) তে ছ'জন নাগরিকের নিঃস্বার্থ জীবন বিসর্জন যুদ্ধের পটভূমি-কায় মহান প্রতিপত্তি হয়। তবু ক্রাইজারের লেখা, মনে হয়, শেষ বিচারে নৈরাশ্রবাদী। তার সবচেয়ে বিখ্যাত নাটক "গ্যাস" ট্রিস্টার বক্তব্য, কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী নভেম্বর বিদ্রোহকে প্রথম দিকে সমর্থন করলেও পরে তার বিরুদ্ধাচরণ করেন। লেখক-দের এই ভাবে শিবির পাটানোর দৃষ্টান্ত বিয়ল নয় ও। তাছাড়া দুই বামপন্থী দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, বিপ্লবের পরাজয় ও সোশাল ডেমোক্রেটদের সাহায্যে বুর্জোয়া রাজত্ব কায়েম হওয়া অনেক প্রাক্তন বিপ্লবীকেও হতাশ করে। এমন কি টলারের লেখাতেও যে বিপ্লবের ছবি ফুটে ওঠে, তা পরা-জিত বিপ্লব। "আমরা বেঁচে আছি" (Hopl! Wir leben) নাটকের নায়ক এক জেলফেরৎ স্পার্টাকিস্ট। উনিশ শ সাতাশের জার্মানিতে দিশে-হারা হয়ে পড়ে। গেরগ ক্রাইজারের একাধিক নাটকে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। "অ্যালকিবিয়া-ডিজের উদ্ধার" (Der gerettete Alkibiades) ও "ইহুদী বিধবা,"

যখন আমেরিকান সৈন্যরা আমার কাছে গল্প করেছিল, কিতাবে পরাজিত জার্মানিতে ছুটপুট বুর্জোয়া মেয়েদের কেনা যায় সিগারেট দিয়ে পেটি বুর্জোয়া মেয়েদের কেনা যায় চকোলেট দিয়ে, তখন আমার গর্ব হয়েছিল সেই সব কল মেয়েদের কথা ভেবে যারা ছিল বন্দী শিবিরে দুর্ভাগ্য ক্রীতদাসী, কিন্তু তাদের কেনা যায়নি। [মূল জার্মান Stolz থেকে অনুদিত]

উন্টোপিষ্ট উনিশ শ' চৌত্রিশ সালে, গৃহযুদ্ধের অষ্টম বছরে, চিয়াং কাইশেকের গ্লেনগুলি ছড়িয়ে দিল পোস্টার, যার উপর লেখা, যে মাও-ৎসে-তুংকে ধরিয়ে দেবে, সে পাবে পুংকার। মাওয়ের নির্দেশে, সে সব কাগজ জড় করে, তার উন্টো পিঠে দরকারি কথা ছাপিয়ে, বিলি করা হল লোকদের মধ্যে। [মূল জার্মান Die Andere Seit থেকে অনুদিত]

অনুবাদ : সুরেন্দ্রা চক্রবর্তী

ব্রেনানের বিখ্যাত নাটক "পিতৃহত্যা" (Die Judirche Witwe) য বিবর প্রাচীন ইতিহাস বা কিম্বদ-ন্তির ব্যাখ্যাত্মক ব্যবহার। "বীরত্বের" জন্তু খ্যাতিলাভ যে অনেক সময় দশ-চক্রে ভগবান জুত হবার ব্যাপার, তা বোঝানো হয়। এর সঙ্গে তুলনা করা হয় সত্যিকারের বীরত্বের যার প্রকাশ যুদ্ধে নয়, শান্তিতে। ইতিহাসভিত্তিক "ক্যালের নাগরিক" এ (Die Burger von Calais) তে ছ'জন নাগরিকের নিঃস্বার্থ জীবন বিসর্জন যুদ্ধের পটভূমি-কায় মহান প্রতিপত্তি হয়। তবু ক্রাইজারের লেখা, মনে হয়, শেষ বিচারে নৈরাশ্রবাদী। তার সবচেয়ে বিখ্যাত নাটক "গ্যাস" ট্রিস্টার বক্তব্য, কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী নভেম্বর বিদ্রোহকে প্রথম দিকে সমর্থন করলেও পরে তার বিরুদ্ধাচরণ করেন। লেখক-দের এই ভাবে শিবির পাটানোর দৃষ্টান্ত বিয়ল নয় ও। তাছাড়া দুই বামপন্থী দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, বিপ্লবের পরাজয় ও সোশাল ডেমোক্রেটদের সাহায্যে বুর্জোয়া রাজত্ব কায়েম হওয়া অনেক প্রাক্তন বিপ্লবীকেও হতাশ করে। এমন কি টলারের লেখাতেও যে বিপ্লবের ছবি ফুটে ওঠে, তা পরা-জিত বিপ্লব। "আমরা বেঁচে আছি" (Hopl! Wir leben) নাটকের নায়ক এক জেলফেরৎ স্পার্টাকিস্ট। উনিশ শ সাতাশের জার্মানিতে দিশে-হারা হয়ে পড়ে। গেরগ ক্রাইজারের একাধিক নাটকে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। "অ্যালকিবিয়া-ডিজের উদ্ধার" (Der gerettete Alkibiades) ও "ইহুদী বিধবা,"

যখন আমেরিকান সৈন্যরা আমার কাছে গল্প করেছিল, কিতাবে পরাজিত জার্মানিতে ছুটপুট বুর্জোয়া মেয়েদের কেনা যায় সিগারেট দিয়ে পেটি বুর্জোয়া মেয়েদের কেনা যায় চকোলেট দিয়ে, তখন আমার গর্ব হয়েছিল সেই সব কল মেয়েদের কথা ভেবে যারা ছিল বন্দী শিবিরে দুর্ভাগ্য ক্রীতদাসী, কিন্তু তাদের কেনা যায়নি। [মূল জার্মান Stolz থেকে অনুদিত]

উন্টোপিষ্ট উনিশ শ' চৌত্রিশ সালে, গৃহযুদ্ধের অষ্টম বছরে, চিয়াং কাইশেকের গ্লেনগুলি ছড়িয়ে দিল পোস্টার, যার উপর লেখা, যে মাও-ৎসে-তুংকে ধরিয়ে দেবে, সে পাবে পুংকার। মাওয়ের নির্দেশে, সে সব কাগজ জড় করে, তার উন্টো পিঠে দরকারি কথা ছাপিয়ে, বিলি করা হল লোকদের মধ্যে। [মূল জার্মান Die Andere Seit থেকে অনুদিত]

অনুবাদ : সুরেন্দ্রা চক্রবর্তী

ব্রেনানের বিখ্যাত নাটক "পিতৃহত্যা" (Die Judirche Witwe) য বিবর প্রাচীন ইতিহাস বা কিম্বদ-ন্তির ব্যাখ্যাত্মক ব্যবহার। "বীরত্বের" জন্তু খ্যাতিলাভ যে অনেক সময় দশ-চক্রে ভগবান জুত হবার ব্যাপার, তা বোঝানো হয়। এর সঙ্গে তুলনা করা হয় সত্যিকারের বীরত্বের যার প্রকাশ যুদ্ধে নয়, শান্তিতে। ইতিহাসভিত্তিক "ক্যালের নাগরিক" এ (Die Burger von Calais) তে ছ'জন নাগরিকের নিঃস্বার্থ জীবন বিসর্জন যুদ্ধের পটভূমি-কায় মহান প্রতিপত্তি হয়। তবু ক্রাইজারের লেখা, মনে হয়, শেষ বিচারে নৈরাশ্রবাদী। তার সবচেয়ে বিখ্যাত নাটক "গ্যাস" ট্রিস্টার বক্তব্য, কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী নভেম্বর বিদ্রোহকে প্রথম দিকে সমর্থন করলেও পরে তার বিরুদ্ধাচরণ করেন। লেখক-দের এই ভাবে শিবির পাটানোর দৃষ্টান্ত বিয়ল নয় ও। তাছাড়া দুই বামপন্থী দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, বিপ্লবের পরাজয় ও সোশাল ডেমোক্রেটদের সাহায্যে বুর্জোয়া রাজত্ব কায়েম হওয়া অনেক প্রাক্তন বিপ্লবীকেও হতাশ করে। এমন কি টলারের লেখাতেও যে বিপ্লবের ছবি ফুটে ওঠে, তা পরা-জিত বিপ্লব। "আমরা বেঁচে আছি" (Hopl! Wir leben) নাটকের নায়ক এক জেলফেরৎ স্পার্টাকিস্ট। উনিশ শ সাতাশের জার্মানিতে দিশে-হারা হয়ে পড়ে। গেরগ ক্রাইজারের একাধিক নাটকে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। "অ্যালকিবিয়া-ডিজের উদ্ধার" (Der gerettete Alkibiades) ও "ইহুদী বিধবা,"

যখন আমেরিকান সৈন্যরা আমার কাছে গল্প করেছিল, কিতাবে পরাজিত জার্মানিতে ছুটপুট বুর্জোয়া মেয়েদের কেনা যায় সিগারেট দিয়ে পেটি বুর্জোয়া মেয়েদের কেনা যায় চকোলেট দিয়ে, তখন আমার গর্ব হয়েছিল সেই সব কল মেয়েদের কথা ভেবে যারা ছিল বন্দী শিবিরে দুর্ভাগ্য ক্রীতদাসী, কিন্তু তাদের কেনা যায়নি। [মূল জার্মান Stolz থেকে অনুদিত]

উন্টোপিষ্ট উনিশ শ' চৌত্রিশ সালে, গৃহযুদ্ধের অষ্টম বছরে, চিয়াং কাইশেকের গ্লেনগুলি ছড়িয়ে দিল পোস্টার, যার উপর লেখা, যে মাও-ৎসে-তুংকে ধরিয়ে দেবে, সে পাবে পুংকার। মাওয়ের নির্দেশে, সে সব কাগজ জড় করে, তার উন্টো পিঠে দরকারি কথা ছাপিয়ে, বিলি করা হল লোকদের মধ্যে। [মূল জার্মান Die Andere Seit থেকে অনুদিত]

অনুবাদ : সুরেন্দ্রা চক্রবর্তী

ব্রেশটের দুটি কবিতা

গর্ব

যখন আমেরিকান সৈন্যরা আমার কাছে গল্প করেছিল, কিতাবে পরাজিত জার্মানিতে ছুটপুট বুর্জোয়া মেয়েদের কেনা যায় সিগারেট দিয়ে পেটি বুর্জোয়া মেয়েদের কেনা যায় চকোলেট দিয়ে, তখন আমার গর্ব হয়েছিল সেই সব কল মেয়েদের কথা ভেবে যারা ছিল বন্দী শিবিরে দুর্ভাগ্য ক্রীতদাসী, কিন্তু তাদের কেনা যায়নি। [মূল জার্মান Stolz থেকে অনুদিত]

উন্টোপিষ্ট

উনিশ শ' চৌত্রিশ সালে, গৃহযুদ্ধের অষ্টম বছরে, চিয়াং কাইশেকের গ্লেনগুলি ছড়িয়ে দিল পোস্টার, যার উপর লেখা, যে মাও-ৎসে-তুংকে ধরিয়ে দেবে, সে পাবে পুংকার। মাওয়ের নির্দেশে, সে সব কাগজ জড় করে, তার উন্টো পিঠে দরকারি কথা ছাপিয়ে, বিলি করা হল লোকদের মধ্যে। [মূল জার্মান Die Andere Seit থেকে অনুদিত]

অনুবাদ : সুরেন্দ্রা চক্রবর্তী

এক গোলিশ বংশোদ্ভূত, ওলিকা-
কিক। আমাদের মধ্যে কোনো
“জাল রক্ষী” ছিল না। আমরা
কোনো ব্যক্তিগত আত্মীয়স্বজন বা গীর্জা
বন্ধ করি নি। দু’দিন পর “পুষ্কর
প্রবর্তক” সৈন্যপতি ভন এপ তাঁর
বাহিনীর এক অংশ নিয়ে আমাদের
কাছাকাছি এলেন। বিপ্লবী বাহিনীর
এক সর্ভা আমার বাড়িতে লুকিয়ে
ছিল, যতদিন না সে পালাতে পেরে-
ছিল। তারপর বাড়িরিগা অতীতে
মিলিয়ে গেল। এল বালিন, কবিতা,
মাটক...অবশ্য...একাকী ১৫

ব্রেস্টের এই অভিজ্ঞতার ফল
“স্পার্টাকাস”—সম্ভবতঃ তাঁর দ্বিতীয়
নাটক। ১৯১৯ সালে তিন দিনে
তিনি এই নাটক লেখেন, আর মার্চ
মাসে এর এক কপি দেখান প্রখ্যাত
লেখক লিও ফরেক্টভারকে।
বাভারিয়ার সোভিয়েটের পতনের পর
সৈন্য পুলিশ ফরেক্টভারের ঘরে
ধানতাল্লাস চালায়। “স্পার্টাকাস”-
মানে লেখা তাদের চোখে সন্দেহজনক
ঠেকে। লেখক কেবল তাঁর খ্যাতির
দৌলতে নিষ্কৃতি পান। এই ঘটনা
থেকে তখনকার আবহাওয়া আন্দাজ
করা যায়। পরে এ নাটক মঞ্চস্থ হয়
“রাতে দামামা” (Trommeln in
der Nacht) নামে।

“রাতে দামামা” বা “স্পার্টাকাস”
এর বিষয়বস্তু সমকালীন জার্মান
সাহিত্যে প্রচলিত Heinkkehr—
যুদ্ধক্ষেত্র, সৈনিকের অভিজ্ঞতা।
নাটকের নায়ক, অস্ত্রবিদ্যুৎ কাগলার,
আফ্রিকার রণক্ষেত্র থেকে ফিরেছে।
তাঁর কষ্টের হয়ে গেছে রক্ত, চামড়া
কুমীরের মত কর্কশ। সবচেয়ে বড়
কথা, তাঁর বাগদত্তা আনা ইতিমধ্যে
আর একজনের কাছে আত্মসমর্পণ
করেছে। (জী বা বাহুবীর বিশ্বাস-
ঘাতকতা Heinkkehr বাহিনীর এক
প্রধান উপজীব্য। এ বেন সৈন্যের প্রতি
দেশের অকৃতজ্ঞতার প্রতীক।) দৃষ্ট
হতাশ কাগলার বিপ্লবী স্পার্টাকিস্টদের
দলে যোগ দেয় কিন্তু শেষ মুহুর্তে অর্ধ-
তপ্তা আনা তাঁর কাছে ফিরে এসে,
সে বিপ্লবের কথা ভুলে ঘরে ফিরে
যায়। পরবর্তী কালে ব্রেস্ট নিজের
নাটকের এই পরিণতির সমালোচনা
করেন। তবে এ কথা অস্বীকার করে
লাভ নেই যে বালিনের একাংশের
শোভনামা ভাব, কর্তব্য সম্বন্ধে
অনিশ্চয়তা, হতাশা বা ব্যক্তিগত
জীবনে আশ্রয় খোঁজা এখানে নিষ্পত্ত
ভাবে ফুটে উঠেছে। হয়ত রাজনৈতিক
দিক থেকে “সঠিক” নাটকে এমন হত
না। নাটকের এক দৃষ্ট, রাইরের
ধবরের কাগজ বিক্রেতা চিত্রকার করে,
“ধবরের কাগজের পাড়া স্পার্টাকিস্ট-
দের ধবলে। চিত্রার গার্টেনে লাল

রোজার বহুত্যা” রেন্ডার্স—এক
মাতাল গান করতে থাকে,
“আমার ভাইরা বৃত, আমি নিজে
একটুর জেতাই বেঁচে গেছি।
নভেম্বরেতে লাল বনলেও
আজ জাহায়াগি মাসে বদলেছি।”
বস্তুতঃ নভেম্বর মাসের দেশজোড়া
বিপ্লবের ডেউ জাহায়াগিতে প্রথম থমকে
যায়। জনগণের মধ্যে দেখা যায়
বিভেদ। রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের পর যে
মাসে সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে। নাটকের
মাতাল একমাত্র রং বদলানো “লাল”
নয়।

ব্রেস্টের সব নাটক অবশ্য এতটা
প্রত্যক্ষ ভাবে জার্মান রাজনীতিকে
কেবল করে লেখা নয়। বরং অনেক
লেখার পটভূমিকা বিদেশ বা কোনো
আধা-কাল্পনিক দেশ। তবু ভাইমার

প্রজাতন্ত্রের ছায়া সেখানেও লক্ষণীয়।
উদাহরণ স্বরূপ “তিন পয়সার পালা”
(Die Dreigroschenoper)
“মাহুয় মাহুয়ই” (Mann irt Ma-
nn) বা ‘কসাইখানার সেন্ট জোন’
(Die heilige Johanna der
Schlachthofe) বা “মা” (Die
Mutter) প্রভৃতি নাটকের বিশ্লেষণ
করা যায়। ‘মাহুয় মাহুয়ই’র কাহিনী
বুটশ ভারতের সেনাবাহিনী নিয়ে।
কিন্তু ব্রেস্ট পরে বলেন, জার্মান যুদ্ধ-
নীতিও তার আক্রমণের লক্ষ্যস্থল
ছিল। ‘তিন পয়সার পালা’র ধনতন্ত্র
ও ভাষাভির মধ্যে যে মিল টানা
হয়েছে তা কেবল ঐতিহাসিক বৃত্তেমের
ব্যাপার নয়। কাহিনীর চিত্ররূপে এই
মিল আরো স্পষ্ট। ম্যাকি অপরাধের
পথ ছেড়ে ‘নং’ নাগরিক হয়, কারণ

ব্যাক লুঠ করার চেয়ে ব্যাকের মালি-
কানা বেশি লাভজনক। আইন
প্রণেতা ও রক্ষাকর্তারা যে আটমস্ত-
কারীদের চেয়ে বড় অপরাধী, এমন
কি অপরাধ বে অনেক সময় সাধারণ
মাহুয়ের পক্ষে বিচার একমাত্র পথ,
এরকম চিন্তা রূপদী জার্মান সাহিত্যে
একেবারে অমুপস্থিত নয়। দৃষ্টান্ত
স্বরূপ মনে পড়ে, ক্রাইস্টের ‘রাইকেল
কোলহাস’ বা শিলারের ‘ভাকাতের
দল’ (Die Rauler)।

‘সেন্ট জোন’-এর পটভূমিকা
আমেরিকার শিকাগো শহর ব্রেস্টের
চোখে ধনতন্ত্রের সবচেয়ে স্পষ্ট ও নগ্ন
প্রতীক। মাংস ব্যবসায়ীদের পার-
স্পরিক ঘৃণার মাতুল দিতে হাজার
হাজার শ্রমিক বেকার হয়েছে। জোন
ভার্ক ভালভেশন আর্সি জাতীয় এক

তরুণী। সে প্রথমে সব সমস্যার
সমাধান করতে চায় ধর্মের পথে কোটি-
পতি-মলারের হৃদয় পরিবর্তন করে।
ব্যর্থতার পর জোন নিজের ভুল বুঝতে
পারে, আর পুলিশের গুলিতে প্রাণ
দেয়। শিকাগোর কাহিনীর সঙ্গে
জার্মানির যোগসূত্র সৃষ্টি হয়েছে
দু’ভাবে। ব্রেস্টের নাটক অনেকাংশে
রূপদী জার্মান সাহিত্য বিশেষতঃ
শিলারের ‘সেন্ট জোন’ ও গ্যেটের
কাউস্টের প্যারডি। তাছাড়া নাটকের
ঘটনাস্থলের সঙ্গে সত্যিকারের শিকা-
গোর চেয়ে বিশ দশকের শেষের দিকের
বালিনের মিল বেশি। অর্থনৈতিক
রিপার, বেকারি ইত্যাদি এই জায়গায়
থাকলেও লড়াইয়ের পথ ঠিক এক ছিল
না। আমেরিকার সবচেয়ে বড় দল
ও সংগঠন নাটকে অমুপস্থিত।
(শেবাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

বাঙালী বাটোণ্ট ব্রেস্ট

সোমেন গুহ

১০ই ফেব্রুয়ারী জার্মান নাট্যকার বাটোণ্ট ব্রেস্টের ৭৯তম জন্মদিন।
১৯৫৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পর থেকে ব্রেস্ট পৃথিবীর মাহুয়ের কাছে পরিচিত
হতে থাকেন। মৃত্যুর পূর্বে পান্চাত্যেও ব্রেস্টের তেমন পরিচিতি ছিল না।
স্বাভাবিক কারণে আমাদের দেশেও তাঁর নাম এসে পৌঁছান তাঁর জীবনের শেষ
লম্বায়। তাঁর নাম প্রথম শোনা গেল শিশির ভাট্টার মুখে। ১৯৫৬ সালে
লণ্ডনে ব্রেস্টের নিজস্ব নাট্যাগোষ্ঠী বালিনার এককথন অভিনয় করতে আসেন।
শিশির ভাট্টা সেই সময় অশোক সেনের কাছে ব্রেস্টের লেখা কিছু বই
লণ্ডনের বইয়ের দোকানে খোঁজ করার জন্য চিঠি লেখেন। অশোক সেন দেশে
ফিরে শিশির ভাট্টাকে ব্রেস্টের লেখা দু-একটি অনূদিত নাটক উপহার দেন।
আরো পরে ১৯৬১ সালে গণনাট্য সম্মেলন দক্ষিণেশ্বর আড়িয়াদহ শাখা ব্রেস্টের
এক্সপোশন এও দি কল অবলম্বনে ‘আইন’ নাটক মঞ্চস্থ করেন। ১৯৬৪ সালে
উৎপল দত্ত ব্রেস্টের অভিনেত্রী স্ত্রী হেলেন ভাইনলকে সভানেত্রী করে প্রতিষ্ঠা
করলেন ভারতের ব্রেস্ট সমিতি। এবং এর মুখপত্র হিসেবে এপিক থিয়েটার
প্রকাশিত হতে লাগল। নান্দীকার জাঁকজমক করে তিন পয়সার পালা
মঞ্চস্থ করলেন ১৯৬৯ সালে। পরে তারা ‘ভালমাহুয়’ও মঞ্চস্থ করেন ১৯৭৪
সালে। ধীরে ধীরে ব্রেস্ট বাঙালী হয়ে গেলেন।

চেতনা (ভালমাহুয়ের পালা), থিয়েটার ইউনিট (আতুরো উই
(হিটলার), পদ্ম লাহা), সারভনি (আদালত থেকে), নান্দীনাড় (কলকাতা
৪ঠা মে), থিয়েটার গিল্ড (ভালমাহুয়ের মেয়ে), থিয়েটার ওয়র্কশপ (নাজীর
বিচার, পাঁচু ও মালি), আর্টজান (অরণ্যের দিন), থিয়েটার লাইব্র (সেনোবা
কারার রাইফেল) প্রভৃতি দল একে একে ব্রেস্ট প্রযোজনা করে চলেছেন।
ব্রেস্টের বিখ্যাত তত্ত্ব ‘এলিয়েনেশন এক্কেফ্ট’ (Verfremdungseffekt—
‘friend’=foreign—বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব) যাত্রার মাধ্যমে সজে সাযুজ্য রক্ষা
করে চলে এবং সেই কারণেই হয়তো ব্রেস্ট যাত্রার আসরেও পরিবেশিত
হয়েছে (চণ্ড উত্তম্যান অব সেজুয়ান অবলম্বনে ‘বহুবল্লভ’)। অবশ্য উৎপল
দত্ত পরে তাঁর দলের মুখপত্র ‘এপিক থিয়েটারে’ বলেছেন ব্রেস্ট এদেশে
অচল। এটা নাকি যাত্রা কথকতা পাঁচালীর দেশ। তবু প্রশ্ন থেকে যায়
প্রগতিশীলতার এত বড় বড় বুলি আওড়ো এদেশে দ্বন্দ্বিতা বস্তুবাদ প্রচারের
ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীদের এত কুঠা কেন? নাটকের মাধ্যমে মার্কস-এঙ্গেলদের
চিন্তা ভাবনকে পৃথিবীর শোষিত মাহুয়ের কাছে পৌঁছাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন
ব্রেস্ট, যদিও সোভিয়েট রাশিয়ায় ব্রেস্ট প্রযোজনা কিছুকাল বন্ধ করে দেওয়া
হয়েছিল। পরবর্তী কালে ১৯৫৫ সালে সোভিয়েট সরকার তাঁকে স্টালিন শান্তি
পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন। রাশিয়া এবং জার্মানীর কম্যুনিষ্ট পার্টির
সমালোচনার যুগোমুখিও তাঁকে হতে হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ১৯৪৭ সালে
আমেরিকার কালিকোনিয়া শহরে থাকাকালে তাঁকে Un-American acti-
vities Committee-র নামে সাক্ষাৎ দিতে হয়েছে চার্লি চ্যাপলিন, টমাস
মান, পল হুইজি প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মতো।

একাধারে নাট্যকার, প্রযোজক, নাট্য শিক্ষক এবং নাট্য তত্ত্ববিদ হিসেবে

বিশ্ব শতাব্দীতে ব্রেস্টের চেয়ে অল্প কোন নাম এত বেশীবার কোথাও
উচ্চারিত হয়নি। সমগ্র ইংল্যাণ্ডে সেক্সপীয়রের পরই ব্রেস্টকে বেশী সম্মান
দেওয়া হয়। এরিষ্টল বা ষ্টানিস্লাভ স্ক্রি নাট্য তত্ত্বকে ব্রেস্ট অস্বীকার করার
দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন এবং কিছু পরিমাণে যে সফল হয়েছেন এ বিষয়ে আর
কোন সন্দেহই নেই। এরউইন পিসকাটেরের সঙ্গে তিনি যে ‘এপিক থিয়েটারের’
জন্ম দেন তার সঙ্গে আজ সকলেই অবগতির পরিচিত। অন্ধকার যুগ বাস
করবে শিল্প সাহিত্য বিকাশে ব্রেস্ট কিছুমাত্র পিছ পান হননি—এ উদাহরণ
আমাদের দেশের নাট্যকর্মী এবং বুদ্ধিজীবীদের প্রেরণা জোগাক এটাই
আমাদের আজকের একমাত্র কামনা।

১৯৩৫ সালে রাশিয়ার অবস্থানকালে মস্কো আর্ট থিয়েটারের সঙ্গে চীন
দেশের পিকিং অপেরার নাটকে গেই লাউ ফাঙের অভিনয় দেখে ব্রেস্ট মুগ্ধ
হন এবং চীনা নাটকের পারিকল্পনার সঙ্গে নিজের পরিকল্পনার মিল বুঝে পান।
চীন জাপান ও ভারতীয় থিয়েটারের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন। ইদানীং
পৃথিবীর সর্বত্র ব্রেস্টের নাটক সম্পর্কে আগ্রহ দেখা দিয়েছে। আমেরিকার
বিখ্যাত নাট্য সমালোচক ও ব্রেস্টের সহকর্মী এরিক বেটলীর কল্যাণে ব্রেস্ট
সর্বত্র প্রচারিত।

জার্মান নাটকের ক্লাসিকাল ঐতিহ্যকে অমুসরণ করার তিনি পক্ষপাতী
ছিলেন না। নাটক রচনার মৌলিক সৃষ্টির চেয়ে রূপান্তরের দিকেই তাঁর ঝোঁক
বেশী ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে কুস্তীলক বৃত্তির অভিযোগ উঠলে তিনি বলেন,
‘সেক্সপীয়র নিজেও একজন চোর ছিলেন।’

ইবসেন, হাউপ্টম্যান ও বার্গার শ-এর মত স্বভাববাদী নাট্যকার তিনি
ছিলেন না। মনস্তাত্ত্বিক নাটক রচনার দিকেও তিনি বিশেষ মনোযোগ দেন
নি। মার্কসবাদী হিসেবে তাঁর নাটকের কুস্তীলবদের সঙ্গে সমাজের স্বাভাবিক
সম্পর্ক স্থাপনের দিকেই তার আগ্রহ ছিল বেশী।

রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে যেমন এপার বাঙালী ও ওপার বাঙালার মাঝে
মাঝে তিক্ততার দৃষ্টি হয়, পূর্ব জার্মানী ও পশ্চিম জার্মানীতেও ব্রেস্টকে কেন্দ্র
করে তেমন কিছু তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতায় জানি, ১৯৭১
সালে ভাইমারের (পূর্ব জার্মানী) স্ত্রাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর ফ্রিটশ
বেনিভিট্শের পরিচালনায় দিল্লীর স্ত্রাশনাল স্কুল অব ড্রামার ছাত্র ছাত্রীরা
হায়দ্রাবাদ ম্যাক্স মুলার ভবনে (পশ্চিম জার্মানীর অধীনে) ব্রেস্টের ‘বি. পেনী
অপেরা মঞ্চস্থ করার অমুমতি পাননি। পশ্চিম জার্মানীর চোখে কম্যুনিষ্ট ব্রেস্ট
সব সময়েই ‘The Embarrassing Mr. Brecht’ নামে অভিহিত। তবুও
আশার কথা ইদানীং অন্ত্যস্ত দেশ ব্রেস্টকে তাঁর যথোচিত সম্মান দিচ্ছে দেখে
ভার্যো আর চুপ করে থাকতে পারছে না।

সবশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমাদের দাবী এম, এ-র পাঠ্য
ভালিকার গোপিকেকে জায়গা দিতে তাঁরা যেমন বিধা করেননি তেমনি ব্রেস্টকেও
তাঁর যথোচিত সম্মান দিয়ে নিজেদের গৌরবাবিস্ত কল্পন।

ব্রেশট ও ভাইমার জার্মানি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

“মা” লেখা হয় ১৯৩০-৩১ সালে।
মঞ্চের ১৯৩২ সালের প্রথম দিকে,
কার্ল লিগনেশট ও বোজাল-জুয়বার্গের
মৃত্যু দিলে। এই সময়, কার্ল লিগনেশট
দল আবার বেশি সংখ্যক মেম্বেকে
সংগঠনের কাজে টানতে প্রস্তুত আনেন।
ব্রেশট বলেন, এই চেহারা নাটক লেখার
মূল ছিল। প্রধান চরিত্রের নাম
ছাড়া ব্রেশট নাটক ও গল্পের উপ-
স্থাপনা মতো মিল ‘সামাজিক’ এ
সম্পর্ক ব্রেশট বন্ধ কণ নাট্যকার
সংগঠিত ত্রৈমাসিকের মন্তব্য প্রণয়ন-
যোগ্য।
১৯৩৬ সালে তি এ-জন রুশ শিক্ষক
বিহারের সেন্টাল স্যামান বেবে, মানব-
জীবন পরিবর্তন করার উপায় নিয়ে...
বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করে সজ্ঞা কাটাত।
...রুশ ইতিহাসে কবে গ্রামের জন্ত
কৃষি শ্রমিকদের থেকে আবাদান করা
হত? তবেই বা তারা ধর্মব্রত করে
ধর্মব্রত ভাঙা দালালদের দিকে পাথর
ছুড়ত? ... ব্রেশট : এ সব প্রশ্নাবহার ছবি
নয়। আসলে এ হল জার্মানি।
নাটকের প্রাক-বিশ্লেষণ রাশিয়ার ব্রেশ-
টের জার্মানির আরো চিত্র দেয়া যায়।
কার্ল লিগনেশট ও তার বন্ধুদের
সঙ্গে সজ্ঞা শ্রমিক নেতাদের তর্ক হয়।
বিতর্কের বিষয়, বিপ্লব বনাম অর্থনীতি-
বাদ। এই প্রসঙ্গে আগে “ইউগা
জামা ও আন্ত জামার গান” এ
সমস্যা ও রাশিয়ার চেয়ে জার্মানির
ক্ষেত্রে বেশি প্রাসঙ্গিক। রাশিয়ার
অর্থনীতিবাদ (economism) এ-কো-
একো-একো ছিল না। এমন নয়
লোনকে তার বিরুদ্ধে লড়াই
করতে যেত। কিন্তু বৈরাচ্যে
জাতিভেদ ও বর্ণ, পুরুষ-মহিলা, বুদ্ধে-
শ্রমী রুশ শ্রমিক-শ্রেণীকে, যুগে-
যুগে প্রাণ দিতে পারে নি।
কাজের পে-দশে অর্থনীতিবাদ শিকড়
গাভাতে পারে নি, শ্রমিকদের মনে
এত লজ্জা-স্বপ্ন-মোহ-গড়ে
ঠেলে। অন্য দিকে জার্মানিতে
বিসমাক্ষেপ সময় থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে
“বন্দার” চেই, চলার অর্থনীতিবাদের
ভিত্তি অনেক গভীর হয়েছিল।
সবচেয়ে বড় শ্রমিক দল সোশাল
ডেমোক্র্যাটরাও কার্যতঃ একই নীতি
অনুসরণ করত। “ইউগা জামা ও
আন্ত জামার গান” প্রকৃতপক্ষে জার্মান
কম্যুনিষ্ট সোশাল ডেমোক্র্যাটদের
বিতর্ক।
রাশিয়ার জার্মানিতে বিতর্কের
শেষ হয় যেহেতু অন্য ভাবে। সে-
ই-সব ব্রেশটের পরবর্তী কালের নাটক
“তৃতীয় রাইখের উত্থান ও পতন”। তত্ত্ব
মন্তব্য আছে :

হিটলার বাহিনী বিধে ধরল
চারদিক থেকে
ওরা তর্ক চালাতে লাগল
বেবেল আর লেনিনের স্বপ্ন অর্থ
নিয়ে...
বৃত্তান্ত না তাদের মিলন হল
নাৎসি বন্দী শিবিরে।
ভাইমার জার্মানির দুই বামপন্থী
দলের ও ইউরোপের বৃহত্তম শ্রমিক
সংগঠনের—সেই সঙ্গে ব্রেশটের থিয়ে-
টারের এই পরিণতি।
জার্মানির অর্থনৈতিক ও সামাজিক
পটভূমিকা, বিশেষতঃ ১৯২৯-৩০
সালের প্রচণ্ড বেকার সমস্যা নিয়ে
ব্রেশটের স্পষ্ট লেখারও অভাব নেই।
এ সব নাটকে অ্যান্ড্রিট গ্রুপ খাঁচের
প্রচারের সঙ্গে নাট্যকার সমকালীন
সমাজের বিশেষ রূপ, বিভিন্ন শ্রেণীর
মধ্যে জটিল সম্পর্ক তুলে ধরার চেষ্টা
করেছেন। জার্মানিতে ছোট ব্যবসা-
দার দোকানদার চাকুরে শ্রুতির
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এরা অর্থ-
নৈতিক ভাবে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে
পড়ছিল, অথচ নিজেদের পুরানো
সামাজিক মর্যাদা আঁকড়ে ধরেছিল।
এরা একই সঙ্গে ধনীদেবের দ্বির্ভা ও
শ্রমিকদের অবজ্ঞা করত। এই মধ্য-
বিত্ত শ্রেণী শেষে নাৎসি সমর্থক হয়ে
পড়ে।
ব্রেশটের প্রথম দিকের এক একাঙ্ক
নাটক “পেটি বুর্জোয়াদের বিয়ের
উৎসব” (Die Kleirburgehochzeit)
এই শ্রেণীর বিষয়। এখানে
রাষ্ট্রনৈতিক বক্তব্য না থাকলেও সামা-
জিক পর্যায়ে ব্যঙ্গ আছে। ১৯২৯-৩০
সালের নাটক “রুটির দোকান” (Der
Brottader) অর্থনৈতিক ঝড়ের
পটভূমিতে শ্রেণী অবস্থান বিশ্লেষণ
করে। বড় মাল্ছ ছোট মাল্ছ খায়,
আবার মাল্ছকে খার হাদর। প্রত্যেকে
চেষ্টা করে নিজের টিক নীচের
লোকের উপর হুঁশার এক অংশ
চালান করতে। যে অস্ত্রের জন্ত
মাথা ঘামায় তার মৃত্যু অনিবার্য।
আমরা হুঁশী, কিন্তু
অস্ত্রেরা আছে
যারা আমাদের
হত্যা বলবে।
শ্রমিকদের একমাত্র অধিকার,
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, অস্ত্রের কাছে
লাগা। যখন বেকার শ্রমিকদের
অস্ত্রের যন্ত্র হবার উপায় থাকে না,
তখন তাদের আর কিছুই থাকে না।
এখন কাজ নেই,
ভদের দানের দরকার নেই,
তাই আমরা নেই কাজে অধিকার,
আমরা নেই অধিকারে অধিকার।

এই সময় লেখা “কুলে ওয়াপ্পে”
(বাগিনের এক সহরতলির নাম) এক
বিখ্যাত সিনেমার বিষয়বস্তু হয়েছিল।
কাহিনীতে এক বেকার শ্রমিক পরি-
বারের চরম দুর্দিন বর্ণিত আছে।
ছেলে আত্মহত্যা করে। মেয়ে আনির
অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তার প্রণয়ী ফ্রিৎসের
সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। এ পর্যন্ত “কুলে
ওয়াপ্পে” সমকালীন জার্মান সিনেমার
ছকে পড়ে কিন্তু ব্রেশট পরিণতিতে
আশার স্বর এনেছেন। ফ্রিৎস ও আনির
শ্রমিকদের তরুণ শিবিরে পুনর্মিলন
হয়। দু’জনে নতুন জীবন ও মিলিত
সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। সিনেমার
দুর্বলতা এইখানে যে খেলাধুলা
শরীরচর্চা ছাড়া সংগ্রামের কোনো
স্পষ্ট পথ দেখান হয় নি। শিবিরের
তরুণের দল নাৎসি সিনেমার
“বিদ্রোহী” তরুণদের থেকে বেশি নয়।
যে বেকার যুবশক্তির বিরাট অংশ
নাৎসি ও কম্যুনিষ্টদের মধ্যে দোহুল্য-
মান ছিল এ ছবি যেন তাদেরই
প্রত্যেক—যদিও ব্রেশটের উদ্দেশ্য অস্ত্র
রকম।
কেবল রাজনীতি ও অর্থনীতি নয়,
ব্রেশটের নাটকে ভাইমার প্রজাতন্ত্রে
ব্যক্তিগত জীবন পরিবার ও নারী
সমস্যার কথাও ফুটে উঠেছে। যুদ্ধো-
ত্তর জার্মানিতে সমাজের বাধন
অপেক্ষাকৃত ঢিলে হয়ে পড়েছিল।
মেয়েরা পুরুষ প্রধান পরিবারের কড়-
ধ থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু
ভাইমার সরকার নারী স্বাধীনতার
পক্ষপাতী হলেও, অর্থনৈতিক দুর্বলতার
জন্ত তাদের উৎপাদনের কাজের সঙ্গে
জড়িত করতে পারে নি। বরং
বেকারি ও মুদ্রাস্ফীতির যুগে মেয়েদের
অবস্থা আরো শোণোয় হয়ে উঠেছিল।
নাৎসি চিন্তাধারা অনুসারে মেয়ে-
দের উপযুক্ত স্থান ছিল-রান্নাঘর। তবু
আশ্চর্যের কথা এই যে ভাইমার প্রজা-
তন্ত্রের চেয়ে নাৎসি আমলে মেয়েরা
সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজকর্মে
বেশি অংশ নিয়েছিল। তার কারণ
অবশ্য নাৎসি আদর্শের পরিবর্তন নয়।
নিছক প্রয়োজন। যুদ্ধের সময় অধি-
কাংশ পুরুষ সৈন্যবাহিনীতে চোকার
উৎপাদন ও বস্ত্রের ব্যাপারে মেয়েদের
উপর নির্ভর না করে উপায় ছিল না।
ব্রেশট যদিও ইংলেন্ড, প্রিওবার্গ বা
বার্গার্ড শ’র মত বিশেষ ভাবে নারী
সমস্যা নিয়ে লেখেন নি, তাঁর অনেক
নাটকেই এ প্রসঙ্গকাহিনীর মাধ্যমে তুলে
ধরা হয়েছে। যে সমাজে সব কিছু
পণ্য, সেখানে মেয়েরাও পণ্য ছাড়া
আর কিছু হতে পারে না। এর চরম
দৃষ্টান্ত মেলে “মাহগানি শহরের উত্থান
পতন” (Der Aufstieg und Fall
der Stadt Mahoganne)।
কাল্পনিক আমেরিকান শহর মাহ-

গানিতে টাকার অভাবকে গণ্য করা
হয় একমাত্র অপরাধ। জেনি ও তার
বান্ধবীরা স্পষ্ট-ভাষার নিজেদের রূপ
যৌবন নীলামে বিক্রি করে। জেনি
পলকে ভালবাসে। কিন্তু টাকা না
থাকলে তাকে ছেড়ে যেতে বিধা করে
করে না। কোনো না কোনো ভাবে
সমাজের কর্তারা মেয়েদের কাজে
লাগায়। তাদের সব কিছু দাবি করে
—উৎপাদনের জন্য তাদের কর্মশক্তি,
যুদ্ধের জন্ত তাদের ছেলেদের। জেনের
বেলা কাজে লাগে তার নাম। যারা
জেনকে গুলি করে মারে, তারাই
নিজেদের প্রয়োজনে তার মৃত্যু গড়ে
পুঁজা করে।
মেয়েরাও অনেক সময় অবচেতন
মনে এই চিরচরিত্র বিধিব্যবস্থা মেনে
নেয়। বিদ্রোহ করার যুক্তি খুঁজে পায়
না। “মা” নাটকে যে মেয়ের ছেলেরা
যুদ্ধে প্রাণ দিতে যায়, তারা যুদ্ধ তহ-
বিলে দান করতে আসে। পেলাগিয়া
তাদের দিকার দিয়ে বলে, “জানোয়ার-
রাও এমন ভাবে তাদের বাচ্চাদের
মরতে পাঠায় না।” “বার্ণশ’র জন
ফাটজারের পতন” (Untergang
des Egoirter Fatzer) নামে খণ্ড
নাটকে যুদ্ধকালীন দেশের এমন এক
দৃষ্ট আছে। ময়দার দোকানের
সামনে মেয়েদের সারি দাঁড়িয়ে।
যুদ্ধের জন্ত তাদের ও তাদের ছেলে-
মেয়ের খাবার ভুটছে না। ফাটজার
তাদের দোকান ভেঙে ময়দা মিতে
পরামর্শ দেয়। কিন্তু মেয়েদের বিশ্বাস
তাদের দুর্দশার জন্য বিদ্রোহী শক্তির
দায়ী। তারা ফাটজারকেও শক্তির
দালাল বলে ধরিয়ে দিতে চায়। ফাট-
জারের মন্তব্য “লোকেরা এত বোকা
বলেই যুদ্ধ কখনো থামবে না।”
অজল ঘরের মেয়েরাও সর্বদা
নিষ্কৃত পায় না। “তৃতীয় রাইখের
উত্থান ও পতন, জুডিথ তার হৃদয় রক্তের
জন্ত স্বামীকে ছেড়ে, দেশ ছেড়ে যেতে
বাধ্য হয়। তার শেষ প্রশ্ন : “ওরা
আসলে কি চায়? আমি ওদের কি
করেছি? আমি কখনো রাজনীতির
ধারে কাছে যাই নি। আমি কি
খেলমানের (জার্মান কম্যুনিষ্ট নেতা)
পক্ষে ছিলাম?” জুডিথ আরো পাঁচ-
জন মধ্যবিত্ত মেয়ের মত সামাজিক
ব্যবস্থাকে বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়েছে।
স্বামীর উপর নিশ্চিতভাবে নির্ভর
করেছে। সমাজ মধ্যবিত্ত মেয়ের
কাছে আর কিছু আশা করে না। তবু
তার মনকে শান্তির ঘর বজায় থাকল
না।
পেলাগিয়া ভ্রূশোভা এর উপরে
উঠে সচেতন বিদ্রোহের স্বরে পৌঁছতে
পারে। সমাজ তাকেও নির্দিষ্ট ভূমিকা
দিয়েছে। সে নিজে কাজ করবে।
আর একজন শ্রমিকের ঘর করবে।

আর আগামী দিনের শ্রমিক হিসাবে
ছেলেকে মৃত্যু করবে। কিন্তু ছেলের
সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়েই সে স্বকীয়
ভাবকে শেখে। আর মেনে না নিয়ে
পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে। জেনের
যে পর্যায়ে মৃত্যু হয়, সেখান থেকে স্বক-
ীয় পেলাগিয়ার সংগ্রাম। যখন
পাভেল রুটি কাটে আর তার মা
গোপন প্রেমের কাজ করে, তখন দু-
জনের সম্পর্ক নতুন পথে ওঠে।
পেলাগিয়ার এক বছর পরে স্বামী
মধ্যে নামেন হিটলার। তত্ত্ব নাটক
বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ভাইমার প্রজা-
তন্ত্র বেঁচে থাকে তাব-সাহিত্যে—সর্ব-
প্রথম ব্রেশটের লেখায়।
১. A Short History of
Labour Conditions Under
Industrial Capitalism : Jürgen
Kuczynski. London 1944.
P. 222
২. Ibid. P. 237
৩. Die Verratene Revolution
by Sebastian Haffner : Sherz
Verlag, Bonn 1969 P. 65
৪. জার্মান Expressionist লেখক-
দের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক Walter
H. Sokel এর “The winter in
Extremis” এ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
৫. Brecht As They knew
Him. Editor Hubert Witt,
Seven Seas Books 1971. P. 71
৬. Brecht : A collection of
critical essays. Editor R.
Pemetz. Prentice Hall Pub-
lishers U. S. A. 1962. P. 25
৭. ব্রেশটের সিনেমার বিশ্লেষণ ও
সামাজিক পটভূমিক Siegfried
Kracauer এর জার্মান ছবি ও ইতি-
হাস “From Caligari to Hitler”
এ পাওয়া যায়
৮. The Social History of
the third Reich by Karl
Grunberg.

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

— চাঁদার হার —

বার্ষিক ২২ টাকা

সাপ্তাহিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫৫ টাকা

টাক কড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠ্যার ঠিকানা :

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, মট পেন। কলিকাতা ১৩



উল্লেখ্য হিন্দি ছবি 'হুসেন শকর'

ভানুসিংহ

প্রচারের কোন চকানিনাদ নেই, শুভ মুক্তির কোন সাড়ম্বর ঘোষণাও নেই। শহরের বুকে একটি প্রেক্ষাগৃহে হিন্দী নীরবতায় 'শংকর হুসেন' নামে একটি হিন্দি ছবির প্রদর্শনী শুরু হয়ে গেল। ছবির নামটি নিশ্চয়ই চমকপ্রদ, কিন্তু তার চেয়েও চমক রয়েছে ছবিটির আঙ্গিক পারিপাট্যে, যা শুধু হিন্দি কেন, ভারতীয় চলচ্চিত্রেরই কদাচিত্র দেখা যায়। ছবির নামকরণে যে বৈচিত্র্য, বিষয়বস্তুতেও তার প্রতিফলিত অনিবার্যভাবেই পড়েছে। কিন্তু হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়িক কলহ ক'রে যে-নাট্য সংঘাত রচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে প্রগতিশীল সাহিত্যিকতা প্রকাশের স্বযোগ যেটুকু ছিল, চলচ্চিত্রকার তা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। পরিবর্তে তিনি সমস্যার সহজ সমাধানের দিকেই ফুঁকেছেন প্রথাবিরুদ্ধ বিতর্কের আবর্তে, মধ্য না জড়িয়ে। ফলে

চিন্নাটো কিছু সাজানো ঘটনার প্রাধান্য যেমন দেখি, তেমনি কিছু মেলোড্রামা হুলস্থল জিরাকাতের অস্থ-প্রবেশ ঘটতেও দেখি। অবশ্য ছবিটির সমাপ্তি ঘোষণা হয়েছে—'This is just beginning'—এই জাতীয় ইংরাজী বচনের মধ্য দিয়ে। এ থেকে চলচ্চিত্রকারের উদ্দেশ্যটুকু কিছুটা স্পষ্ট হয়—যত সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না এখনই।

বস্তাপ্রীতি এক অঞ্চল থেকে হিন্দু ডাক্তার উদয়শংকর এক শিশুকে উদ্ধার করেন। শিশুটি তার নিজের নামটিই শুধু বলতে পারে 'হুসেন' আর কিছু নয়। অতঃপর সেই মুসলিম সন্তানটি প্রতিপালিত হয় হিন্দুগৃহে। উদয়-শংকর তাকে সন্তান হিসেবেই পরিচর্য দেন। হুসেন পরিবারের সকলের মন জয় ক'রে নেয়। কুলহুম নামে এক মুসলিম তরুণীর প্রেমের পড়ে

সে। এই কুলহুম ছবির এক উল্লেখ-যোগ্য রহস্যময় চরিত্র। সে-রাগে একাকী নিঃশব্দে পথে বার-বার অবচেতন মনে। মন্দিরে যায়, উদয়-শংকরের আপন ছেলে ডাক্তার অজয়-শংকরের সংগে সাক্ষাত হয়। গৌড়ী রক্ষণশীল পিতার অগোচরে রাতের অন্ধকারে এই মনোরোগিণীর বিহার। ছবিতে আশ্চর্য একেই ফুটেছে এই দৃষ্ট পর্যায়গুলিতে। যেমন রহস্যময় তেমনি নাটকীয় এই দৃষ্টগুলিতে সিনেমার ভাষা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। অবচেতন মনের শিকার হয়ে কুলহুম যখন চরম নাটকীয় সংঘাতের সন্মুখীন, তখনই হুসেনের কাছে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ হয়েছে—গ্রামবাসী অশান্ত মুসলিম পরিবারেরও গোচরে এসেছে। মুসলিম সমাজে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। বিস্ময়কর দৃষ্টময়তার রোমাঞ্চ অমূল্য না করে উপায় নেই। অবচেতন মনের ঘোরেই কুলহুম তার নাম বলে 'হুসুম'। হুসেনের মনে আগে সংশয়—কুলহুমের পিতাকে ধেরা করে—কে এই হুসুম? কুলহুমের পিতা শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয় সব কিছু প্রকাশ করতে। সে বলে, কুলহুম তার নিজের মেয়ে নয়। এক ভয়াবহ অগ্নি-কাণ্ডের মধ্যে থেকে কুলহুম নামে এক

ছোট্ট বালিকাকে সে উদ্ধার ক'রে যেতের মত মাহুস করে, তার নাম পাণ্টে রাখে কুলহুম। হুসেন এই ইতিবৃত্ত শুনে প্রকাশে তার ঘোষণা দাবী করে। কুলহুমের পিতা মর্যাদাহানির আশঙ্কায় তাতে অস্বীকৃত হয়। সন্দেহ জর্জরিত হুসেন শেষ পর্যন্ত অজয়শংকরের পথ কটক মুক্ত করার জন্য আত্মঘাতী হয়। কুলহুমের সংগে অবশেষে বিবাহ হয় অজয়ের। তাদের পুত্র সন্তানের নাম রাখা হয় 'শংকর হুসেন'—হুসেনের স্মরণে অবশ্যই। প্রথম দৃষ্টে কুলহুম এবং অজয়ের সন্তান শংকর হুসেনকে দেখিয়ে কুলহুমকে সমস্ত ঘটনাটি উন্মোচিত করা হয়েছে। মুসলিম তরুণীর সংগে হিন্দু যুবকের বিবাহ ঘটানো হয় নি বটে, কিন্তু মূলসমস্যা হয়েছে হিন্দু মন্দিরে যাওয়া, হোসি-উৎসবে আত্মীয় মাথা, হিন্দুর সন্তানের নাম শংকরহুসেন রাখা ইত্যাদি তো আছে। সর্বোপরি মানবিকতার ধর্ম ছবিটিতে বজায় রয়েছে।

কাহিনী, চিন্নাট ও সংলাপ রচনা করেছেন কামাল আমরোহী। কাহিনীর মধ্যে দুর্বলতাটুকু অবশ্যই নজরে পড়ে—কিন্তু motive এবং spiritটুকু অবশ্যই প্রশংসার দাবী

এদিনের উল্লেখযোগ্য অস্থগান শ্রীমণিলাল নাগের হেমন্ত রাগের আলাপ, জোড় এবং বোলকাঠা। তার আলাপের স্বরপ্রচার যেমন ধীর গভীর, তেমনি প্রগম তার বোল-বিস্তার। জোড় অংশের বোল শুনে মনে হচ্ছিল যেন কেশরবাইয়ের চিনে তান শুনিছি। মীড় এবং আশের কাজের স্বর সৌকর্য্য কেবল অস্থূতি-গম্য। তানের অংশে মনে হচ্ছিল তিনি সম্পূর্ণ অস্থপ্রাণিত হয়ে বাজা-ছেন। এ ধরনের তানতোড়ার নিটোল উপস্থাপনা একমাত্র নিমিলাল বানার্জি ছাড়া আর কারো হাতে শুনেছি বলে স্মরণ হয় না। দুই বা ততোধিক আঘর্ষের তান বাজানোর পর রবিশংকর পরবর্তী তান ভাববার সময় নেন কিন্তু নিমিলাল বা মণিলাল তা নেন না। নিমিলালের হাতেও এমনি অনর্গল তানের লহরী ছুটেছিল কোমল আসাবরী রাগে। অনিল ভট্টাচার্যের থামদানী লক্কো ঠেকার সঙ্গে মণিলালের গভীর সওয়াল-জবাব জমে উঠল একটা চ্যালোয়ের মত। চ্যালোয় বিশেষ কারো বিরুদ্ধে হয়তো নয়। হয়তো সেই সব ধনকুবেরতনয় এবং তাদের বেতনভোগী কলমচিদের বিরুদ্ধে যারা টাকার জোরে তাঁবেদার হাকজাতাকে শিল্পীর আসনে বসাতে চায়। অনিল ভট্টাচার্যের চক্রধার এবং তেহাইয়ের তোড়ে সেতার হয়তো

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

করতে পারে। চিন্নাট আশ্রয় ছলংবন্ধ হওয়ার অবকাশ ছিল। পরিচালনার ইচ্ছা নকুতি নৈপুণ্যের নিদর্শন রেখেছেন অনেকগুলি ফ্রেম। দৃষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর সেখানে স্পষ্ট। তবে ছবিতে গানের স্থায়িত্ব বড় বেশি। পরিচালকের এদিকে নজর দেওয়া উচিত ছিল। বৈধামের সংগীত পরিচালনা চিত্রাঙ্গ। ফটো-গ্রাফিতে শানি অভিনন্দনযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কুলহুমের পিতার, কুলহুমের জাগীরদারের অসামান্য অভিনয় বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। পালিতা কস্তার প্রতি অপার স্নেহ, মুসলিম গৌড়ামি আর সৌদভবোধের উদারতার সংঘাত, মর্যাদা সচেতন অহংচেতনা ও স্ত্রানিষ্ঠার ঘন্ব তাঁর আশ্চর্য অভিনয়ে চমৎকার ফুটে উঠেছে। কুলহুমের কুলহুম মনুষ্য সত্যিই রমণীয়।

বেঙ্গাল হাই স্কুল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সেক্রেটারীকে লিখেছেন তাঁকে বেকটর পদ থেকে রেহাই দিতে। সেক্রেটারী সাহের উত্তর দেবার সময় পাননি। ছবার চিঠির কথা মনে করিয়ে দেওয়াও হলো। স্কুলের সম্পাদক মশার এবার একজন জুনিয়ার শিক্ষককে বেকটর করে বসলেন। শৈলেন মুখার্জি নামের ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে গম্ভীর শিক্ষকদের বিরতি ক্ষোভ। তিনি নাকি ম্যানেজ-মেন্টের পেরারের লোক। এদিকে প্রধান শিক্ষক বেকটর না হলে সহকারী প্রধান শিক্ষকই ঐ পদের অধিকারী। কতৃপক্ষের জবাব সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীবীজনাথ সরকারের নাকি ডিগ্রীর অভাব। অথচ পূর্বনো শিক্ষক রবীজনাথবাবু ট্রেন এম, এ, বি, এ, বি, এড এবং শিক্ষণ প্রাপ্তও বটেন। হায়ার সেক্রেটারী শিক্ষা কাউন্সিল অস্থমতি না দিলে কি ভাবে কতৃপক্ষ এডহক কমিটি বানিয়ে জুনিয়ার শিক্ষককে বেকটর করতে পারেন। প্রধান শিক্ষক তাহলে কি কাজ করবেন? শিক্ষকদের বেতন আটকে তাদের আন্দোলন রূপে কমিটির সদস্যদের কে অধিকার দিয়েছে এ প্রশ্নও আছে। এদিকে হায়ার সেক্রেটারী কাউন্সিল কতৃপক্ষ বসছেন এসব আপনাদের ব্যাপার আপনারা বুঝুন।

সুরেশ সংগীত সংসদের সম্মেলন

(দর্পণের সংগীত সমালোচক)

এদের অস্থগানস্থচীতে (রবীন্দ্র-সদন, ২৭-২৯ ও ৩১ ফেব্রুয়ারী) বৈচিত্র্য কম থাকলেও বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন ভাষাতত্ত্ব সংগীত এবং যন্ত্রাদি সম্পর্কে তথ্যচিত্র প্রদর্শন। এবারে বন্ধুস্বাত-রম্-এর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই গান-টিতে বিবিধ স্বরপ্রয়োগ সম্পর্কে দৃষ্টান্তসহ আলোচনার ব্যবস্থা করা যেত। সংগীতের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের মতো পুরনো বাংলা গান, টপ্পা-লোকগীতি ইত্যাদির সংগে রাগ-সংগীতের সম্পর্ক আলোচনা করা যেত। প্রথম দিকে পুণ্ড্রভাষী ইত্যাদি গানের ব্যবস্থা থাকত। ইদানীং তার বিলোপ হওয়াজনক। ফলে এই জাতীয় জল-সাকে নিছক কালোয়াতী গানের বৈঠক ছাড়া অন্য নামে অভিহিত করা কঠিন। শিল্পনির্বাচনেও বিবিধ ঘরাণা বা গীতবাদন শৈলীসমাবেশের চেয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ এবং অহরোধ রক্ষার দিকেই নজর লক্ষ্য করা গেল।

প্রথম অধিবেশনের নতুন শিল্পী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর গোরখকল্যা-নের ব্যাল গানে (বিলম্বিত একতাল ও দ্রুত জিহাল) প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচর্য দিয়েছেন। তার বিলম্বিত বিভাযের মেজাজ বেশ ধীরগভীর, গলায় আওয়াজটিও মধুর এবং দৃঢ়।

কেবল স্বরপ্রচার ছাড়া গানের বাণীর স্বারা রাগভাবকে প্রকাশ করার দিকেও তার নজর ছিল। মূলত আশ্রী ঘরাণ-র শিক্ষা সত্ত্বেও অপরাপর ধারারও অস্থ সমন্বয় ঘটেছে তার গানে। গমক, সপাট এবং ছুট তানের যাতায়াতও বেশ সাবলীল। গানের মাধ্যমে তিনি বেশ একটা রসের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এইখানেই তার সর্বাধিক কৃতিত্ব। তিনি যদি স্বর্গত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছেও শিক্ষাগ্রহণ করে থেকে থাকেন তাহলে তাঁর নামাঙ্কিত সম্মেলনে গাওয়ার স্বযোগ পেতে ভীষণাচার্যের কেন এত বছর ফ্যাগ খাটতে হল সে প্রশ্ন এর পর অবশ্যজাবী হয়ে ওঠে। 'চুঁরী' গানের বদলে তিনি যদি বাংলা টপ্পা গাইতেন তবে আরো বেশী উপভোগ্য হত বলে আমার ধারণা।

শ্রীকৃষ্ণদেব দাসগুপ্ত বাঙালী তন্ত্র-কারদের মধ্যে এক বিশিষ্ট নাম। রাগের বিশিষ্ট রূপায়ণ এবং বোলের পরিচ্ছন্ন বাদনে তার দক্ষতা সর্বজন-স্বীকৃত। কৌশিক কানাদায় তার আলাপ যেমন সুকীর্ত্ত তেমনি রস-মণ্ডিত তার জোড় এবং পরপের কারু-কর্ম। জিতালের গতে তার লয়কারিও বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। তবু আনি

যাকে অস্থপ্রাণিত সংগীত বলি সেই পর্যায়ে এটি পড়ে না।

না পড়ার একটি হেতু প্রায় কঁাকা প্রেক্ষাকক্ষ। সমস্ত লোক বেঁটিয়েছে পাশের বন্ধ সংস্কৃতির কার্ণিকালে। এমন পরিবেশে শ্রীমতী মাহুদী মাস্টার ঠাকুরাল্যাপের বিলম্বিত বিস্তার (একতাল) নিতুল কিন্তু নিস্ত্রাণ হয়ে থাকলে গায়িকাকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। তার কণ্ঠ বেশ সুরটি, গায়নভঙ্গিও দক্ষতাপূর্ণ এবং তানের কাজও বেশ-নিটোল।

দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীমতী মীনাঙ্কী মুখোপাধ্যায়ের সুরত নাট্যম চলন-সই।

পাতিয়ালা ঘরানার অস্থগামিনী হওয়ার পরে শ্রীমতী আরতি বাগচির গায়নভঙ্গিতে যে পরিবর্তন এসেছে তা অনায়াস লক্ষ্য। মর্যাদা চণ্ডে মহিলা-দের গানকে একটা তারিফ করা হত; এখনো কেউ কেউ করেন। এ বিষয়ে এই কলমটির অক্ষমতা অকপটে স্বীকার্য। শ্রীমতী বাগচির কণ্ঠ সেদিন বেশ অধম ছিল। সে জন্ত তার অনেক চেঁচাই সেদিন সহজে আহার হয়নি। গলাও খুব স্বরে-বলছিল না। মেয়েদের পক্ষে মেয়েলি স্বরে গাওয়া বোধহয় উপভোগ্য হয় বেশী।

হাসানীর কাঠগড়ায় কংগ্রেস

(২য় পৃষ্ঠার পর)

চাকরীক্ষেত্রে আক্রমণ

একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের মনোকার্য স্বার্থে, শ্রমিক ও ভারতীয় জনসাধারণকে বঞ্চিত করে বাইরে সস্তা দরে বেচার চম্প সরকার চাকরীক্ষেত্রে আক্রমণ শুরু করেছে।

রাষ্ট্রীকৃত কয়লা শিল্পে লোক কমিষে কাজের মাথাপিছু বোকা বাড়ানো হচ্ছে।

স্বতন্ত্র, পাট ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে সরকার ১০০ কোটি টাকা দিচ্ছে আধুনিকায়নের জন্য অর্থাৎ আধুনিক যন্ত্রপাতি বসিয়ে হাজার হাজার লোক হুঁটাই করার উদ্দেশ্য।

সরকারের সঙ্গে বোগসাজসে পাট শিল্পে ইতিমধ্যেই এক লক্ষ শ্রমিককে কর্মচ্যুত করে কাজের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। সরকারী সংস্থা জালনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন আধুনিকায়নের জন্য ২০০ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং মোট নিযুক্ত শ্রমিকের দশ শতাংশকে কর্মচ্যুত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। যে সংস্থা সাড়ায় ১৮ হাজার এবং তার মধ্যে ২ হাজার ইতিমধ্যেই বরখাস্ত।

মন্দায় দুর্গাত বেড়েছে

১৯৩৩ সালের মন্দাস্থিতি ও মূল্য বৃদ্ধির ফলে চরম মন্দা দেখা দিয়েছে যাতে হাজার হাজার লোককে কর্মহীন করে তুলেছে। কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। উৎপাদন অধিক্রীত থেকে আছে। ইম্পাত, কয়লা, সিমেন্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রাফ, কাপড়, কাগজ সব কেবল জুটুত হচ্ছে।

মহার্ষি ভাতা আইন, মহার্ষি ভাতা হ্রাস ও বেতন বৃদ্ধি বন্ধ করে সরকার শ্রমিক-কর্মচারীদের আরো শোষণ করছেন। জাতীয় বেতন নীতির নামে তারা বেতন হ্রাসের মতলব আটছেন।

গত ২ বছরের বাম্পার ফসল সংগ্রহে দরিদ্র কৃষকরা অনাহারের সম্মুখীন হয়েছে। বাণ্যে প্রচুর শস্ত আর এদিকে প্রোকিওরমেন্ট এমনভাবে করা হল যাতে ছোট চাষীরা মারা পড়ে। তারা ফসলের দাম পেল না অথচ তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কেবল বেড়ে আছে। পাট ব্যবসায়ীদের মনোফা তোলায় জম্ম পাট চাষীদের জাহান্নামে পাঠানো হয়েছে।

এর ওপর কংগ্রেস সরকার করের বোকা অসম্ভব বাড়িয়েছে। নিত্য-প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কর চাপানো হয়েছে

এবং সরকারের পকেটে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকা।

অপরদিকে একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের প্রচুর সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। রপ্তানি বাজারের জন্য উপহার স্বপ্ন, বিনা লোকসানে বাইরে সস্তায় জিনিস বেচায় সাহায্যবান তাদের মেহনতী মাছঘের কাছ থেকে আদায় করা ৩০০ কোটি টাকা দেওয়া হল।

স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক

কংগ্রেস সরকারের নীতি আমাদের অর্থনীতিকে ক্রমশঃ সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার ওপর নির্ভরশীল করে ফেলছে। বর্তমানে ভারতের বিদেশী ঋণের পরিমাণ ১২ হাজার কোটি টাকা।

সরকারী সংস্থা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বিদেশে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের সাব-এজেন্ট রূপে সাব-কন্ট্রোলার জন্ত তাকে শুরু করে দিয়েছে। কোলাবোরেসনের জন্য ২০০০ চুক্তি তৈরি হয়েছে এবং ভারতীয় মূলধন ও বহুজাতিকদের মধ্যে চুক্তির জন্ত বর্মতৎপরতা চলছে। ভারতে বিদেশী মূলধন বিনা বাধায় প্রবেশের যে দাবি মার্কিন সাহায্যপুষ্ট বিশ্বব্যাংক বহুদিন ধরে করে আসছে তা মেনে নেওয়া হয়েছে।

জরুরী অবস্থার অর্থনীতি স্ব-নির্ভরতা বা বিদেশী সাহায্য গ্রহণ না করার দাবি করতে পারে না। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিশ্বব্যাংকের ওপর এত নির্ভরশীল যে অর্থমন্ত্রীকে ম্যাকনামারার কাছে সাহায্য বন্ধ না করার জন্য কংগ্রেসে আবেদন করতে হয়েছে।

২০ দফার ব্যর্থতা

কংগ্রেসের অসম্মত প্রতিশ্রুতির মত এই কর্মসূচীও কার্যে পরিণত হতে পারেনি।

কয়েক বছর আগের সরকারী হিসেব অনুযায়ী ৬৩ মিলিয়ন একর উর্বর জমি পাওয়ার কথা, কিন্তু সর্বশেষ সরকারী হিসেবে দেখা যাচ্ছে মাত্র ২৯ লক্ষ একর জমি উর্বর বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এর মধ্যে মাত্র ১৭ লক্ষ একর জমি সরকার দখল করেছে। তার মধ্যেও মাত্র ১০ লক্ষ একর জমি ৬ লক্ষ ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে পোড়ো জমি, জলে ডোবা জমি এবং যে জমির দখল দেওয়া হয়নি।

৭০ লক্ষ লোককে বাস্তবজমি দেওয়া

হয়েছে বলে গর্ব করা হয়। এক্ষেত্রেও রয়েছে এমন জমি যেখানে বাড়ি তৈরি করা যায় না, যে জমি বৃষ্টিতে ভেসে যায় অথবা জলে ডোবা জমি।

গ্রামে মহাজনের ঋণ নাকচ করার আইন হলেও তারা পুরোদমে রাজস্ব করে যাচ্ছে। কৃষকরা তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে আইনের সাহায্য নিতে ভয় পায়। কৃষি-শ্রমিকরা ভূস্বামীদের হাতে নির্ধারিত হচ্ছে।

নির্বীজকরণ

বিশ্বব্যাংকের চাপে জোর অবরুদ্ধি নির্বীজকরণ করতে গিয়ে এই সরকার জনসাধারণকে চরম অপমান করেছে। তাদের ক্রোধের সম্মুখীন হয়ে কর্তৃপক্ষ ভাব দেখাচ্ছে যে, তারা অবরুদ্ধি করতে চায় না। কিন্তু পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রীসহ সরকারী কর্তৃপক্ষ এর পক্ষে।

গরীব জনসাধারণের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ মত ব্যবহার করা হয়েছে। হাজার হাজার লোক ভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু কোন কোন জায়গায় বাধা দিয়েছে এবং জীবন দিয়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করেছে।

আদিবাসী হরিজনসমাজের দরিদ্র অংশের ওপর বেশি অত্যাচার হয়েছে।

অপরদিকে চাকরীর ভয় দেখানো হয়েছে। নির্বীজকরণের জন্য কৃষকদেরও ভয় দেখানো হয়েছে।

এই বক্তব্যের সঙ্গে সি পি আই (এম) আরো বলেছে যে, দেশের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রকে জবাই করে এখন কংগ্রেস দলের মধ্যেও গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। কত্থে রয়েছেন এখন কয়েকজন মাত্র নেতা। গণতন্ত্রবিরোধী ও কল্প স্বপ্নারূপ যুব কংগ্রেসকে ক্ষমতার বসানোর জন্যই নির্বাচন ঘোষণা করা হয়েছে।

সি পি আই (এম) দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী শক্তিকে, বিরোধী দলগুলিকে এবং মেহনতী মানুষকে এই অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করেছে।

কংগ্রেস দল হুনিয়াকে বোকাতে চাইছে যে, ভারতীয় জনসাধারণ কংগ্রেসের একনায়কত্বকে ররণ করে নিতে ইচ্ছুক।

সর্বত্র কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে এই মিথ্যার ঘোষণা খুলে দেওয়া সরকার।

জনসাধারণকে এবং তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির কর্তব্য হল একটি ব্যাপক কর্মসূচী তুলে ধরা। সি পি আই (এম) তাদের নির্বাচনে ১২ দফার কর্মসূচী উপস্থিত করে কংগ্রেসের

বিরুদ্ধে ভোট দেবার আহ্বান জানিয়েছে।

(১) জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার, ৪২তম সংবিধান সংশোধন এবং মিসা ও আপত্তিকর বিষয় সংক্রান্ত প্রেস আইন নাকচ।

(২) বিদেশী মূলধন বাজেরাধ-করণ, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ ব্যক্তিগত বিদেশী মূলধন নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা।

(৩) বিদেশী ঋণ পরিশোধী আপাততঃ বন্ধ করা।

(৪) একচেটিয়া ব্যবসায়ী সংস্থা জাতীয়করণ, চিনি, বস্ত্র, পাট, সিমেন্ট ও ঔষধ শিল্প জাতীয়করণ ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলিকে স্বাধীন অর্থনৈতিক ও অসম্মত সুবিধা দান।

(৫) বিদেশী ব্যবসা অধিগ্রহণ।

(৬) রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ থেকে দুর্নীতি ও আমলাতান্ত্রিকতা দূর করা।

সংগঠন

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

চাপা পড়ে যেত যদিও মণিলালের উপর সেদিন কোন কিছুই ভয় হত। এমন বাজনা বর্ণনা করা যায় না, উপভোগ করা যায়। সচরাচর শোনা যায় না, কদাচিত্ত ঘটে। মাঝা, গুণ্ডাও, সরগুণ্ডাও, লপেট, ঠোক, লরীলপেট, লরজ এই সব পিলে চমকানো বুলি দিয়ে নিজের অজ্ঞতা চাকবার এবং তাক লাগাবার চালিয়াতি বুধা, কেন না কেতাবে এই নামগুলো যে কেউ দেখতে পারে।

শ্রীজগদীশ প্রসাদের বোগকোশের খ্যাল পাতিয়ালা ঘরামুসারী, একটু সেকেলে এবং বাজবাই চমকের। কিন্তু তার বিস্তার এবং তানের মুন-লিয়ানা অনবীকার্য। তবে গোলাম আলি সাহেবের তর্কিতের অত্বকরণ তিনি না করলেই পারতেন। ও জিনিস নকল করা যায় না।

তৃতীয় অধিবেশনের স্থচনা বিল-খিত হলেও ভারতীয় তবলাবাডের তথ্যচিত্রের স্বাভাৱ-আরম্ভ। ইমন রাগে উত্তাদ আহিমুদীন ডাগরের আলাপ এক কথায় অনবদ্য। ডাগর সাহেবের আলাপ একটা বিশেষ রীতি-সম্মত কিন্তু প্রতিবারই একটা বিরল অভিজ্ঞতার আবাদ আনে। তার স্বরপ্রচার শুনে রাগের মূর্তি যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সোজা-সুজি গান্ধারে যাওয়ার আগে হুং দিয়ে রেখাবকে তিনি নানা রঙে লাজিয়ে তোলেন। তেমনি কড়ি মধ্যর এবং পঞ্চমের বেলায় নিষাদ থেকে তারার সাথে যাওয়া যেন

(৭) গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার পুনরুদ্ধার, প্রয়োজন-ভিত্তিক ন্যূনতম বেতন, বোনাস আইন প্রত্যাহার প্রভৃতি।

(৮) ভূস্বামীদের জমি দখল করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন, কৃষি-শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন, দৈনিক ৮ টাকা। কৃষক, ভূমিহীন শ্রমিক, গ্রামের গরীবদের ঋণ মুক্ত এবং তাদের স্বার্থে ও সুবিধাজনক ঋণ দান।

(৯) নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য হ্রাস করা এবং ঠিকমত সরবরাহের জন্য সর্বরক্ষম ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১০) কাজের অধিকার দান এবং বেকার ভাতার ব্যবস্থা।

(১১) ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ।

(১২) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতামূলক বৈদেশিক নীতি।

স্বল্পরীর অবগুষ্ঠন-উন্মোচন। বস্ত্র শিল্পের ধরজে খোলা গলায় যাওয়া ডাগর সাহেবের মত এমন অনায়াস আর কারো নয়। মীড় এবং আশ দিয়ে স্বর প্রচারের অদৃশ মঙ্গলীন বুনেছেন তিনি। তার গায়ন ভাল লাগাতে পারেনি এমন কোন ঘটনা স্মরণ হয় না।

সংগঠে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন হারমেনিয়াসে আসাদ আলি এবং সারদীতে শ্রীবাচ্চালাল মিত্র।

রবীন্দ্রসংগীতের আসবে ভাবী সম্ভাবনার উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি রেখেছেন শ্রীমতী নুপুর চক্রবর্তী। তার গায়ন যেমন শুদ্ধ এবং স্বরেলা তেমনি প্রাণবন্ত। শ্রীশোকতরু বন্দোপাধ্যায়ের গানে অভিনয় প্রবণতা একটু কম দেখা গেল। সমান মাত্রার বাণীকে আড়ে উচ্চারণ করার হেতু বোকা গেল না। শ্রীমতী হুচিঞা মিত্র এবং শ্রীহরিনারায়ণ তাদের মান অহুযারী গেয়েছেন। শ্রীমতী মিত্রর মুখে পর পর দুটো লম্বা গান (মরণ রে এবং প্রাচীর পাখী) এক্ষেত্রে লেগেছে।

তরুণ অপেরা

প্রযোজিত

বিদ্রোহী সন্ন্যাসী

বিপ্লব বন্ধুধা

নির্দেশনা ও অভিনয়ে :

শান্তিগোপাল

দপন

বিশ্ব বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা। শুক্রবার, ১৮ই ফেব্রুয়ারী '৭৭। ৪০ পৃঃ

মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী বিরোধিতার সম্মুখীন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কংগ্রেসীদের এক গোষ্ঠী-গোপন বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় ব্যক্তিগত ও রাজস্ব মন্ত্রী প্রণব মুখার্জীকে নির্বাচনে পরাজিত করতে হবে। কারণ, প্রণববাবুকে পরাজিত করে তদা প্রমাণ করতে চাইছেন পশ্চিম-বঙ্গের হয়ে কথা বলার দারিদ্র্য পশ্চিম-বাংলার স্বাস্থ্য প্রণববাবুকে দেয়নি।

ঠিক হয়েছে মালদহ জেলার এই গোষ্ঠীর সমর্থক সমস্ত কর্মীকে প্রণব-মুখার্জীর বিরোধিতার নামানো হবে। প্রণববাবুর বিরুদ্ধে যুব সংগ্রাম কমিটির প্রাক্তন জেলা সভাপতি অসিত বসুকে

নির্বল প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করানোর প্রস্তাব এসেছে। যদি কোন কারণে তা সম্ভব না হয় তবে অন্যকোন নির্বল প্রার্থী দাঁড় করানো হবে। এই কেন্দ্রের সংখ্যাগুরু ভোটারের কথা মনে রেখে একজন সংখ্যা লঘু মন্ত্রীদের লোককে প্রার্থী দাঁড় করানো হতে পারে।

এদিকে প্রণববাবুর নির্বাচনী অভিযানের প্রধান হোতা বাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী বরকত গণিখান চৌধুরী প্রণববাবুকে নিয়ে সক্রিয় হয়ে লড়ে যাচ্ছেন।

রাজ্য কংগ্রেসের বিরোধ চরমে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ এখন ভাঙনের পথে। ছাত্র পরিষদের সভাপতি কুমুদ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ছাত্র-কর্মীরা এখন শাসক কংগ্রেসের ওপর রীতি-প্রচলিত কর্মীদের এক গোপন সভায় ঠিক হয়েছে পরিচিত নেতৃত্ব বাদে নীচুতলার কর্মীরা কয়েকজন ছাড়া বাকী কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে কাজ করবে। একই ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রিয় দাসমুখী ও লক্ষ্মীকান্ত বসু গোষ্ঠী। ওরা ওদের নিজস্ব ১০ জন প্রার্থী ছাড়া বাকী কোন কংগ্রেস প্রার্থীর জন্য কাজ কর-

বেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। লক্ষ্মী-বাবুদের এই সিদ্ধান্ত নেবার পেছনে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়েরও সমর্থন আছে বলে অনেকেরই দাবী করেছেন।

লক্ষ্মীবাবু প্রিয়বাবু সঞ্জয় গান্ধীর সমর্থক গোষ্ঠীর প্রার্থীদের পক্ষে কাজ না করার জন্য তাদের সমর্থকদের নির্দেশ দিয়েছেন। বিভিন্ন এলাকায় এই গোষ্ঠীর সমর্থক-যুব-ছাত্র কর্মীরা হয় জনতা পার্টির প্রার্থী অথবা কোন নির্বল প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। নির্বাচনের দিন যত এগোবে পরিস্থিতি তত জটিল হবে।

কথা বন্ধ : সঞ্জয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য পুত্রকে বিসর্জন দিতে রাজী ?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পুরো উনিশটি মাস "বাত্তে কম" (কথা কম) ভনতে ভনতে আপনার কান কালাপালা হয়েছে। মাঠে ময়দানে ওই একটি ধ্বনিই নিরন্তর উচ্চারিত হয়েছে। রেডিও টেলি-ভিশনেও তাই। সমাচারের কল্যাণে সংবাদপত্র নামে সঞ্জয় গান্ধীর যে প্রচারপত্র আপনাদেরকে বিনতে হত ভাত্তেও ওই টি শব্দ পড়তে পড়তে আপনার দৃষ্টি হয়ত ঝাপসা হয়ে গেছে।

অতি দুঃখের সহিত জানাচ্ছি, অস্বস্তি নির্বাহন শেষ হওয়া অবধি ওই ধ্বনিটি আপনি আর ভনতে পাবেন না। আর মুখ থেকে "বাত্তে কম" প্রোগ্রামটি প্রথম নিঃসৃত হয় এবং থাকে দেশের সর্বত্রই ইনস্ট্যান্ট নেতা বানাবার জন্য জরুরী অবস্থা ব্যবহৃত হয়েছে এবং সরকারী-বেসরকারী প্রচারমাধ্যম অবিরাম "কাজ অধিক" করেছে সেই সঞ্জয় গান্ধী আজ নির্বাক। তাঁর উপর হুকুম হয়েছে, "তোমার বাত্তে বন্ধ।"

সেন্সরশিপ শিথিল করার সংশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্ট সরকারী অর্থে, বহু সরকারী হুকুমে, সর্বপ্রকার সরকারী কর্মতা ও বস্ত্র ব্যবহারদ্বারা উনিশ মাস ব্যাপী প্রচেষ্টায় যে নেতাকে এত উপরে তোলার হয়েছিল, সে কাহ্নসের মত উঠে ছাই হয়ে পড়ে গেছে। মাজ কয়েকদিনের মধ্যেই জনসাধারণের পুঞ্জীভূত মনোবেদননা এবং আক্রোশ কেটে পড়ল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, আপনারা দৈনিক সংবাদপত্রে দেখে থাকবেন, মিডীতে কংগ্রেসের প্রথম নির্বাচনী মিটিং-এ সঞ্জয় গান্ধী অজুপস্থিত থাকতে বাধ্য হলেন, অথচ ঘোষণা করা হয়েছিল কংগ্রেসের নির্বাচনী অভিযান তিনিই শুরু করবেন শুই সভায়।

(শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)



শহীদ মিনার ময়দানে বামপন্থীদের জনসভায় জেনারেশান গ্যাপ অবলুপ্ত। গুণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে সামিল হয়ে বুদ্ধা ও তরুণী তন্ময় হয়ে জ্যোতি বস্ত্র বস্ত্রব্য শুনছেন। পেছনে হাজার হাজার জনতা

এই নির্বাচন গণতন্ত্রের জন্য লড়াই দুই জনসভায় একই আওয়াজ

(দর্পণের প্রতিনিধি)

বলতে বাধা নেই, সংখ্যার দিক থেকে বিশাল বিপুল ছিল না, সচরাচর বা দেখতে আশ্রয় অভ্যস্ত। তবু বলতে হয়, এই এমন দিনে এত মাহুষের ভীড় আমি আশা করিনি। উনিশ মাসের অস্বস্তি বৈরাচারী রাজত্বের পর আবার মৌ-কঙলো কেমম হয়ে উঠেছে। শহীদ মিনার চারপাশ আলো আধার, কত পরিচিত মুখ, শিদিপুরের মনসুর থেকে শুরু করে জগদলের চটকল মজুব কিরমাত আলি, ভালহৌসির করণিক চক্রবর্তী একাকার হয়ে বার।

এই ছদ্মস, অর্থাৎ ১০ই ও ১১ই ফেব্রুয়ারী দুদিনের দুটো জমায়েতের মোটামুটি একই চেহারা, এক আওয়াজ। জনতা পার্টির নেতা মোবারকী দেশাই যখন বৈরতাত্ত্বিক একনায়কী ইন্দিরা সরকারকে হটানোর ডাক দিলেন তখন তাঁকে করতাল দিয়ে অভিনন্দন জানানো হাজার হাজার

জনতা। বলতে বাধা নেই, সংগঠন থেকে বিশাল বিপুল ছিল না, সচরাচর কংগ্রেসের নেতা হিসেবে মোবারকী কলকাতার বামপন্থী জনতার কাছ থেকে এতবড় অভিনন্দন কখনো পাননি। সংগঠন কংগ্রেসের নেতা হিসেবে তাঁর সভায় এত মাহুষের ভীড়ও কখনো আগে হয়নি। এতে বোঝা গেছে পশ্চিমবঙ্গের মাহুষ কী চাম।

অতীতের ১১ই ফেব্রুয়ারী বামপন্থী জোটের সভায় যখন জ্যোতি বসু ঘোষণা করলেন যে, ইন্দিরা কংগ্রেসকে হটানোর জন্যে আজ সমস্ত বিরোধী শক্তি, এক বললেন, ভোট ভাগা-ভাগি নয়, ইন্দিরা-কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিরোধীদের একজন প্রার্থীকেই দাঁড় করানো হবে, তখন সমস্ত মাহুষ জানিয়েছিল গভীর অভিনন্দন জ্যোতি বসুকে। অংশ রাখা সরকার, জনতা পার্টির সম্পর্কে বামপন্থী মাহুষের নানা (শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

সি পি আই কংগ্রেস মস্কো সংবাদ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জগজীবন রাম, হেমবতী নন্দন বহুগুণা, নন্দিনী সংপথী, কে, আর, পুণেশ এবং আরও কেউ কেউ ২রা ফেব্রুয়ারী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে গণতন্ত্রের জন্য কংগ্রেস নামক হল গঠন করেন। কংগ্রেসী রাজত্ব যে এক-নায়কত্বের সৃষ্টি করেছে তার কঠোর সমালোচনা করে, তাঁরা দীর্ঘ এক

বিবৃতি দেন। পরের দিন সি পি আই-ও ময়দানে নেমে কংগ্রেসী রাজত্বের উপর তীব্র আক্রমণ করে। এই বিবৃতি দুটি সারা ভারত ভোলপাড় করেছে, পৃথিবীর নানা দেশেও প্রকাশিত হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে এমন কি সি পি আই-র বিবৃতিটিও প্রকাশিত হয়নি। সোভি-

য়েটের তাবোদার দেশগুলোতেও নয়। কিন্তু বংগ্রেসের নির্বাচনী ইত্তাহার চটপট প্রকাশিত হয়েছে। প্রশংসা-বাণীও ছুড়িয়েছে সে সব দেশে। ১ক শুধু তাই নয়, ৩রা ফেব্রুয়ারী সি পি আই-র বিবৃতি সংবাদপত্রে দেওয়া হয় এবং পরের দিন প্রকাশিত হয়। (শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

গণতন্ত্রের জন্য লড়াই

অবশেষে জওহরলাল নেহরুর আপন ভগিনী ও গণতন্ত্র বাঁচাতে ভ্রাতৃপুত্রের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারে নামলেন। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ইন্দিরা গান্ধীকে পরাজিত করার জন্য তার কেন্দ্রীয় বৈরিতিতে প্রচারে অবতীর্ণ হবেন না তবু শ্রীমতী পণ্ডিত "কংগ্রেস ফর ডেমোক্রাসী"র সঙ্গে যে সংগ্রামে সামিল হয়েছেন সেটা সম্পূর্ণ ভাবেই ইন্দিরাকে ক্ষমতাচ্যুত করার লড়াই। ১৯৭৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারতবর্ষে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র মোটামুটি একই ধাতে প্রবাহিত হয়ে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন থেকে বিপথগামী। ক্ষমতাসীন ইন্দিরা গান্ধী বলছেন এটাই ঠিক পথ আর বিরোধীরা দেখছেন গণতন্ত্র/রক্ষার নামে গণতন্ত্রের গলা চেপে ধরে এক শাসনোচ্চারণী পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই পরিবেশ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বিরোধীদের নির্বাচনী লড়াই আর তাতে সামিল হলেন শ্রীমতী পণ্ডিত। শাসক দল ও সেই দলের সর্বমুখ কত্রী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পক্ষে বেশ ভালই চলছিল গত ১৮ মাস। কেউ টু শকটি করতে পারত না, এতদিন যারা পার্লামেন্টে বা জনসভায় বক্তৃতা অথবা সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে তাকে জালিয়েছে তারা জেলে, পার্লামেন্টে বিরোধীরা শাসক দলের ও তার নেত্রীর বিরুদ্ধে কি বললেন জানার উপায় ছিল না, বাস্তব অবস্থা গোপন করে প্রতিদিন সংবাদপত্র পাজাখুরি আবেল তাবোল প্রচার করা হত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টের নির্বাচন ঘোষণা করেই ভুল করে বসলেন। উনি ধারণা করতে পারেন নি যে গণতন্ত্রের জন্য লড়াইটা এমন জোরদার হবে—আপনজনরাও এই ভাবে তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রী ভেবেছিলেন জরুরী অবস্থায় সংবিধান সংশোধন ও অর্থাগত আইন চালু করে যেভাবে আটঘাট বেঁধে নিয়েছেন তাতে স্যাপ পোল বা হঠাৎ নির্বাচন মারফৎ আগামী ছয় বছরের জন্য ক্ষমতা দখল করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এবং পরবর্তী ছয় বছরে তাঁর এবং তার পরে তাঁর পুত্রের একনায়কত্ব কায়েমের জন্য সংবিধান ও গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার যা বাকি আছে সেটা সম্পূর্ণ করা যাবে। প্রধানমন্ত্রী আশা করতে পারেন নি গত ১৮ মাস জরুরী অবস্থার স্টীম রোলার চালায়ে তিনি বিরোধীদের এবং মেহনতী জনসাধারণকে যে ভাবে পিষ্ট করেছেন তাতে তারা অবার রুধে দাঁড়িয়ে গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ে নামতে পারে। এই সঙ্গে আরও একটা হিসেব ছিল যেটা বর্তমান পরিস্থিতিতে ভ্রান্ত প্রমাণিত। প্রধানমন্ত্রী ভাবতে পারেন নি মত ও পথের এত অমিল সত্ত্বেও বিরোধীরা একই প্ল্যাটফর্ম মিলতে পারবে। কিন্তু তাঁর হিসেবে একটু ভুল ছিল। তিনি নিজের ও পুত্রের স্বার্থে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে এতই আত্মমগ্ন ছিলেন যে, খেয়াল করেন নি বিরোধীরা সবাই সমানভাবে নিপ্পট হয়েছে, এক্ষেত্রে কোন পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ কেউ আনতে পারবে না। এই ঘটনাই সকলকে একই মঞ্চে দাঁড় করিয়েছে। তাদের সবার এক লক্ষ্য: বৈরচাদী শাসক হটাও এবং গণতন্ত্র রক্ষা কর।

এই সংগ্রামে প্রধান মন্ত্রীর ইতিমধ্যেই নৈতিক পরাজয় ঘটে গেছে। পুত্র সন্তকে বাণী দিতে তিনি নিবেদন করে দিয়েছেন, সি পি আই ও সি পি আই যেঁবা ব্যক্তির এখনি তাঁর পরামর্শদাতা এবং ক্রমশই তাঁর কণ্ঠ দুর্বল, বক্তব্য সামঞ্জস্যহীন ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কি ভয় পেয়ে গেছেন?

জ্যোতির্ময় বসুর অনেক "অপরাধ"

জেস থেকে ছাড়া পেয়ে পার্লামেন্টের সি পি এম সদস্য জ্যোতির্ময় বসু কলকাতায় এসেছেন এবং এসেই ডায়মণ্ডহারবারে তাঁর কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার পরই তাকে আটক করে হিসার জেলে রেখে দেওয়া হয়। জেলে তাঁর স্বদরোগ হয়ে গেছে এবং যেভাবে তিনি ছিলেন তাকে নির্ধাতন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। জ্যোতির্ময়বাসুর অনেক "অপরাধ"। তিনি মাতা-পুত্রকে শাস্তিতে থাকতে দেননি। পার্লামেন্টে একের পর এক কেলেকারীর তথ্য উদ্ঘাটন করে তিনি শাসক দল ও তার নেতৃবৃন্দের প্রকৃত চেহারা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি পার্লামেন্টের সদস্য না থাকলে কত কেলেকারীই খেচাপা পড়ে যেত। তাঁর মত সফল, সক্রিয়, তথ্যসংগ্রহকারী, শাসক দলের পক্ষে ভীতিজনক পার্লামেন্টারীয়ান চলত। আমরা তাঁর স্বাস্থ্য এবং নির্বাচনে জয়লাভ কামনা করি।

জনসভা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রশ্ন রয়েছে। বিশেষ করে, ঐ দলের নেতাদের কমিউনিষ্ট বিরোধ সুপরিচিত, তবে বর্তমানে শাসক কংগ্রেস যে রাস্তায় চলেছে, যে ভয়ঙ্কর একনায়কত্ব পথে দেশের গণতন্ত্রকে জবাই করছে তাকে প্রতিরোধ করার জন্য বামপন্থী আটাই জনতা পার্টি বা কংগ্রেস ফর ডেমোক্রাসীর সঙ্গে আসনের রক্ষা করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, গণতন্ত্র না, বৈরতন্ত্র? লক্ষ্য বিরোধী দল আজ একমত যে, ইন্দিরা গান্ধীর বৈর-শাসনকে রুখতে হলে সমস্ত বিরোধী দলকে এক জায়গায় কিছু কালের জন্য হলেও দাঁড়াতে হবে। তবু বামপন্থী মহল নয়, জনতা দলের মধ্যেও এই মনোভাব বহুতুল।

তবে, সবারের মুখে একটা প্রশ্ন যে, নির্বাচন কি, সত্যি সত্যি হবে? আর যদি তা হয়, তবে কতটা সেই ৩২ সালের মত রিগিং হবে? মাছুষের ভয় ভুজানে। কারণ 'সাজানো নির্বাচনে' বাস্তব বদল হওয়া, বন্যক উচিৎ বলা, 'মেসোমশাই ভোট হয়ে গেছে, বাড়ি ফিরে যান,' ইত্যাদি অভিজ্ঞতা পশ্চিম বাংলার মাছুষের ১৯৭২ সালে হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী এবার কোন পথটা বেছে নেবেন?

অন্তরিকে জগজীবন রাম শাসক কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসার পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস দলে চাকলা সৃষ্টি হয়েছে। বিজয় সিংহনাথর ইত্যাদির প্রভাব বড় কম নয়, পুরোনো বুদ্ধ বা বয়স্করা যে এবার কংগ্রেসকে ভোট দেবে না এটা বতদিন যাচ্ছে তত পরিষ্কার হচ্ছে। এদিকে দিল্লীতে আর একটা বোমা ফেটেছে। তা হল নেহরুর বোন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবার কংগ্রেস ফর ডেমোক্রাসীর হয়ে প্রচার চালাবেন। এতে তাঁর ভ্রাতৃপুত্রী যে একটু বিপর্যয় বোধ করছেন তা নিয়ে কংগ্রেস মহলেও সন্দেহ নেই। এছাড়া, যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ভাঙন ধরেছে তাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আপাত নির্বাচনে বিরোধীদের জয়ের ব্যাপারে কবেই নিশ্চিত হচ্ছে।

অন্তরিকে বামপন্থীরা যে সব অঞ্চলে ঢুকতে পারছিলেন না তাঁরা এবার সামলিত বিরোধীশক্তির জোরে কোন কোন অঞ্চলে যাচ্ছেন। দমবন্ধ হওয়া মাহুসগুলো এবার বেন আবার ছাঁপ ছোঁড় বাঁচছেন, এবং ক্রমেই বেশি লংঘ্যার বামপন্থীদের সভায় জমায়েত হচ্ছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, নগরভিত্তিক নৈহাটিতে বামপন্থী জোটের প্রার্থীর সমর্থনে যে সভা হয় তা ৭২ সালের তুলনায় আকারে অনেক বড় ছিল। এই জমায়েতমাত্র ৪৮ ঘণ্টার প্রস্তুতিতে

করা হয়েছিল। এটা ঠিক বহু অঞ্চলে এখনো সম্রাসের অবস্থা। পুলিশ এখনো বই বিরোধীকে আটকে রেখেছে বা আটক করেছে। তবে নির্বাচনী আনন্দোত্তাপ দেখে মনে হয় যে, পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের প্রভাব অনেক সম্রাস এবং অগপ্রচারণার পরও রয়ে গেছে। না, হলে শাসক কংগ্রেস মহল যে নৈহাটি কেন্দ্রি সম্পর্কে আশাবাদী ছিল সেই কেন্দ্র সম্পর্কে এখনই আতঙ্কগ্রস্ত কেন।

এবারের লোকসভা নির্বাচন হল প্রধানত বাস্তবনৈতিক লড়াই, গণতন্ত্রের জন্য লড়াই। বামপন্থী মহল মনে করেন যে, জগজীবন রামের কংগ্রেস ভাগ্যের কলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী বিরোধী প্রতিপক্ষ হওয়ার

সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যদি সি পি আই কংগ্রেসের সঙ্গে পট্টভেদ না বেঁধে বামজোটে আসত তাহলে ভারতের ইতিহাস হত-অন্তরকম এবং তার ফলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এক প্রগতিশীল প্রতিপক্ষের সম্ভাবনা উন্মুক্ত হত।

বামপন্থী মহল এই নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক লড়াই এবং হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চান। কেন্দ্র দখলের আকাশচুম্ব স্বপ্ন তাদের নেই।

কংগ্রেস মহলের খবরে জানা যায় যে, তাঁরা এখানে ৪২টি কেন্দ্রের মধ্যে দশটির কম কেন্দ্রে জয়লাভের আশা করছেন। অন্তরিকে বিরোধী মহল মনে করেন যে, রিগিং না হলে তাঁরা বেশির ভাগ আসন দখল করবেন।

কংগ্রেস সি পি আই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই ১৪ই ফেব্রুয়ারী ভারতের বহির্বিভাগের প্রধান সচিব জগৎ মেহতা সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী কোসিগিনের সংগে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারের সময় কোসিগিন নাকি মেহতাকে বলেছেন, ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের 'জনসাধারণ বহু কঠিন বাধা সত্ত্বেও অবিলম্বে সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নতিসাধনের নীতি অনুসরণ করে চলেছে এবং অল্প করেক বৎসরের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ভারতের অগ্রগতি হয়েছে কেনোমনাল।

অন্তত সর্ম্মচার এবং পেট্রিট তাই রিপোর্টে করেছে। কোসিগিন যেহেতু সাক্ষাৎকার বিষয়ে সোভিয়েট-ভারত সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা আলোচিত হয়েছে বলে দিল্লীতে সোভিয়েট ইনফরমেশনের বুলেটিনে জানান হয়েছে। কিন্তু কে কী বলেছেন তার উল্লেখ নেই।

যা হোক, সর্ম্মচার ও পেট্রিটের রিপোর্টে কাজ হয়েছে। যখন কোন বহু কমিউনিষ্ট পার্টি বা কোন বহু দেশ এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করে যা মস্তোর পছন্দ নয় তখন সে তার অসঙ্গতি প্রকাশ করে সে সব খবর বোম্বাসু চোপে দিয়ে। বরুন না চীন-ভারত হুত বিনিময়ের সিদ্ধান্ত। সোভিয়েট রেডিও টেলিভিশন সংবাদপত্র সংবাদটি চোপে দিয়েছে।

অন্ত কোন উপায়ে সি পি আই-র ইন্দিরা সরকার বিরোধী বিবৃতির জন্য মস্তোর অসঙ্গতির খবর অজ্ঞতভাবে পৌঁছেছে কিনা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু মস্তো যা চেয়েছিল সি পি আই সেই কাজই করেছে কংগ্রেসের সংগে নির্বাচনী সমঝোতা করে। জগজীবন-

বাসু কংগ্রেস জাগ করার ফলে সি পি আইর দর বেড়ে গেছে অনেক কংগ্রেসের কাছে এবং এই উচ্চ দরে কংগ্রেসের সংগে নির্বাচনী আসন স্তাগা-ভাগি করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে এই ভাগাভাগি সম্পূর্ণ। কেবলেও প্রায় তাই। সি পি এমকে কোণঠাসা করে রাখা যেমন কংগ্রেসের ভেতর সি পি আই-র উদ্দেশ্য। পশ্চিমবঙ্গ এবং কেবলেই তাই সর্বাত্রে এই টি দল একান্ত হয়েছে। যে কংগ্রেস এই সেদিন সি পি আইকে দেশজোহী বলে চিহ্নিত করে প্রচারের জোয়ার এনেছিল এবং যে জোয়ারে শক্তি দিয়েছিলেন যয় প্রধানমন্ত্রী এবং তার পুত্র মস্তোর গান্ধী সেই দলের সংগে কাঁধ কাঁধ মিলিয়ে সি পি আই "প্রতিক্রিয়া" বিরুদ্ধে লড়ে যাবার সিদ্ধান্ত করেছে।

কেবলে যে জোটে সি পি আই আছে সেই জোটে বোপ দিয়েছে ব্যারি সাতিন সোলাইটি এবং ইডাডা নামক পঞ্চাশতম শতাব্দীর সম্পূর্ণভাবে কমিউনাল সংগঠন। এই হুট সংস্থা হুট হবার কলে কেবলের সেই ১৯৫১-এর অবিকৃত সি পি আই-র সরকারের বিরুদ্ধে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে 'মুক্তিযুদ্ধ' বেরুপ নিয়েছিল কংগ্রেস-সি পি আই-র ফ্রন্ট টিক সেই রূপ নিয়েছে। এবার সি পি আই সরকার অপসারণের জন্য নয়, সি পি এম-এর প্রাধান্তে সরকার যাতে কোন মতেই গঠিত হতে না পারে সেই জন্য।

কংগ্রেসের ক্ষমতার দুর্গ ভাঙছে

রমা প্রসাদ মল্লিক

যে ক্ষমতাসীন শীর্ষ-শ্রেণী ভারতের রাজ্যশাসন ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক পদ্ধতি আজ প্রায় ত্রিশ বছর ধরে কঠোর রেখে আপন স্বার্থে ব্যবহার করে আসছিল, তার আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ গত ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে এক পরিষ্কার তেজ বিস্মৃতে পৌঁছেছে। কিন্তু অতঃপর এই ক্ষুণ্ণ বা বিক্ষোভিত যে পরিণাম আনতে চলেছে, তা কেবল শ্রীমঙ্গলী রামের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার থেকে পদত্যাগ এবং “গণতন্ত্রবাদী কংগ্রেস” নামে এক প্রতিদ্বন্দ্বী দলগঠনের স্তরে থেমে থাকবে না। শাসন-চালিকা শক্তি যে রাজনৈতিক সংস্কারমুখী হাতে বর্তমান শাসকশ্রেণীর সর্বোচ্চে অবস্থিত। সে শক্তিবাহী এলিটবর্গ নির্বাচন করানর সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশ্বদস্তীর ভূত (Ghost of Frankenstein) ফ্রান্সেইজের মত এক অনিশ্চিত ভবিষ্যিকা আমদানী করেছে। অবশ্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রভাব এবং সম্ভব রচনার অথবা সঠিক অর্থে পুনর্বিজ্ঞানের ভাগিদে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

না নিয়ে উপায় ছিল না। কারণ শাসকদলের মধ্যে সক্রিয় দুই মহাশক্তির তলোবাহক, দুই লবীর পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তুলে উঠেছিল। বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মাথা আমেরিকার এবং ভারতের মধ্যে পুনর্মিলনের মহড়া বহুদিন ধরে চলে আসছিল। বিশ্বব্যাঙ্কের তথ্য-আন্তর্জাতিক ঋণপ্রদায়ী সংস্থার সাহায্য ১০,০০০ কোটি টাকার ওপর ঋণভারবিদ্ধ ভারতের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন। অতীত উক্ত সংস্থার মহাধ্যক্ষ মাক্‌স ব্যারের ঘটলো ভারত-আগমন। ভারতে পদার্পণ করার প্রথম মুহূর্ত থেকেই তিনি এবং আমেরিকার প্রতিষ্ঠিত বিত্তশক্তির প্রতিভূ-স্বার্থগোষ্ঠীর মুখপাত্র ভারতীয় সরকার (এবং শাসক শ্রেণীর) দ্বারা গৃহীত এমার্জেন্সী আইনের মত স্পষ্টতঃ গণস্বত্ববিরোধী কাঠামোর কড়াকড়ি তুলে গিয়ে প্রশংসা শুরু করে দিল।

ভারতের শাসকদল এমনটাই চাইছিল। বিশেষতঃ ডেমোক্র্যাট দলের প্রেসিডেন্ট সেখানে নির্বাচিত হবার পর ভারতের পোস্ত-প্রবীণ রাষ্ট্রদূতরা (তত্পূর্ব রাতদূত টি এন কাউল সহ) আমেরিকা-প্রসে গদগদ হয়ে উঠলো। ময়াদিষ্টীর আন্তর্জাতিক রাজনীতিকেরের মুখের পবেষকরা নেহেরুজীর আমেরিকাকুসল ত্রৈ নীতি (আইজেনহুবার, রিপাবলিকান, এবং ডেমোক্র্যাট কেনেডির আমলে বা তাঁর পরিস্রবণকালে পরিষ্কারভাবে বিবৃত করা হয়েছিল) তা পুনরাবিষ্কার করলেন তাঁর “ডিস্কভারি অফ ইণ্ডিয়া” বই-এর দ্বিগদর্শী পরম্পরা অনুসরণে। নির্বাচনী ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিংটনে উপরোক্ত ক্ষমতাবাহী বিত্তবান্দের মুখপত্র “ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল” বাগত জানাল শ্রীমতী গান্ধীর “আন্তর্বিষয়িক” সিদ্ধান্তকে—নির্বাচন করানর এবং এমার্জেন্সী প্রত্যাহারের। ভারতীয় নাগরিকরা বিশ্বরে হতবাক হয়ে বাবে, আমেরিকান শাসকশ্রেণীর এই নবজন্ম জানের প্রদর্শনীতে যদিও তলিয়ে ভাবলে অবাক হবার কারণ থাকেনা। ১৯৭১ সালের শেষে, ভারতীয় উপমহাদেশে ভাঙত সরকারের রাজনৈতিক এবং সামরিক বিজয় (পাকিস্তানী সরকারের ওপর এবং পাকিস্তান-রাষ্ট্রের বিঘটন-ঘটনা) দেখার পর থেকে আমেরিকাকে বিশ্বরাজনীতিনির্ভরের প্রক্রিয়া’চলে সাজাতে হয়েছে; বৃহত্তে হয়েছে যে, নিষ্কনের আমলে পাকিস্তানের প্রতি সপ্রেম কৌকার যে কায়দা ভারত সরকারের গোস্ণা উৎপাদন করেছিল, তার পরিবর্তে এখন ভারতের প্রতি চলে পড়া দরকার—যেমন অর্থনৈতিক সহযোগিতা, পুঁজি নিবেশ এবং শিল্প বাণিজ্যে কারিগরী জ্ঞানের সাহায্য-চলে, তেমনি ভারতীয় স্বপ্নানীষালের ওপর থেকে ট্যারিফ-সুদের ছাড়ছুট দিয়েও।

শ্রীমায়ের দাপ্তরিকতম রাজনৈতিক পদক্ষেপ তাই

আমেরিকার অচ্যুত কোনো সরকারী স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করলেন। সেইটাই সেখানকার শাসকশ্রেণী অপেক্ষা করতে বাজী, ধৈর্য সহকারে দেখতে চায় নির্বাচনী কলাকল। এটা না দেখা তত্ সেখানকার নীতি নির্ধার করণ ১৯৭১-এর অবিদ্যুৎগতির ভেতর টানবেনা। বরঞ্চ চেষ্টা করে বাবে, দ্বিতীয় টাটপের “সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী” মহাশক্তি রাশিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিততে এবং ভারতকে রাজনৈতিক প্রভাবের অধীনে আনতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা বাড়াবে।

এমার্জেন্সীর দ্বারা তলোয়ার

এমার্জেন্সী আইনের সাংবিধানিক অঙ্গপ্রয়োগ বিশেষত অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে শুধু যে অসাধারণ ব্যাপার তই নয়, এমনি প্রয়োগের পাটুনি’য় বৈদেশিক রাজনীতি-গত পরিস্থিতির কার্যকারণ সম্বন্ধ সক্রিয় থাকে। ২১শে জুন ১৯৭৫-এর পর এমার্জেন্সী চাপানর স্বপক্ষে প্রধানমন্ত্রী অশুভি বিবৃতি বনাম বাখ্যা দিয়েছেন। কখনও বলেছেন মর্দপে, বাইরে কোনো শক্তিই চাপ দিয়ে “আমাদের পথ” থেকে সরাতে পারবেনা; আগার বলেছেন, বাইরের শক্তির সঙ্গে ভেতরের যে মিতানিবন্ধ বিবোধী শক্তির অপপ্রয়োগ তাও ভেঙেই তাঁর পক্ষে অনন্তর হবে উঠেছে এমার্জেন্সী ব্যবস্থাকে প্রত্যাহার বা হালকা করার, বা অন্য এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার যা বিবোধীরা চেয়ে আসছে। বস্তুঃ এটা একটা আপ্ত সত্য যে সেই ব্যক্তিই “আমি ভয় পাটনি” বা “আমাকে কেউ টলাতে পারবে না” গোচের কথা বলে, যার মনের সঙ্কোপনে ভয় ঢুকে রয়েছে, রয়েছে আপন ঘোষিত নীতিতেই পূর্ণ আস্থা না-থাকার দুর্বলতা। প্রধান মন্ত্রীর পদবী যে ভারতীয় জাতির “পিতা” বাপুজীকে স্বপ্নে করার তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে গেলেন যে পীড়ক-শক্তির প্রয়োগ বা তার মূলে যে হিংসা থাকে, সে-হিংসার জনক ভয়।

আমরা অস্ত্র একথা বলিনা, প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর সরকার অথবা তাঁর শ্রেণী-এলিটবর্গের শীর্ষ-নেতারা ভয় পেয়ে গেছেন। তবে এটা খুব বেরনামায়ক এবং কিছুটা হাস্যকর বাস্তব তথ্য যে, তাঁরা ভয় না পাওয়ার আড়ম্বর করে চলেছেন—কেন, তাঁরাই বোঝেন।

রাষ্ট্রের কার্যপালিকা শক্তিসমূহকে একান্তভাবে প্রয়োগ এবং সঞ্চালিত করার সুযোগ ও ক্ষমতা যে-কোনো দেশের সামন্ত তথা পুঁজিপতি-মুহুদী শ্রেণীজোটের পক্ষে এক দ্বারা তলোয়ার বিশেষ। এই অস্ত্র থেকেই কাটে। ভারতের শাসকশ্রেণীর ক্ষমতাপ্রয়োগপ্রেমী অপরিণাম-দর্শিতাকে স্বত্ববাদ, এমার্জেন্সী আইন-কাঠামোর অহেতুক বলৎপ্রয়োগ তাদের মতোই অস্ত্র উপাশ্রয়ীদম্ব, সংঘাত এবং শ্রেণীঅবক্ষের ঐতহাসিক প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে তুলেছে। দেখা দিয়েছে তাদেরই মধ্যে ঘর ভাঙা বিভেদী শক্তির অকুদয়। দেখা দিয়েছে, উক্ত শ্রেণীর অপর অংশ থেকে বেরনো, দক্ষিণ ও মধ্য-দ্বী বিরোধী দলগুলির প্রকৃত ঐক্য, যে ঐক্য নিছক তা স্মরণে জোড় দেওয়া সাময়িক রচনা বলে মনে করে উপরোক্ত শাসক-এলিট বিষম প্রমাদ করছে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের শাসকশ্রেণীর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী যত সহজ হবে মনে করেছিল এমার্জেন্সী চাপানর এবং বজ্রশাসন চালিয়ে যাবার কাজ, তত সোজা বা নির্বাধ নয় এর প্রত্যাহার। নিকপায় অত্যাচারীর মত যত এই গোষ্ঠী ব্যবহার করে চলেবে এমার্জেন্সী এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মিসা ভি. আই. আর. আপত্তিকর প্রেস-প্রকাশন-নিরোধ আইন ইত্যাদি হাতিয়ারগুলিকে, ততই প্রমাণ হবে যে পীড়ক রাষ্ট্রব্যবহার শেষ পর্যন্ত এক অনন্ত অচল প্রশাসনী

অভ্যাসে পরিণত হয়। এবং মুখে গতিশীলতা, প্রগতি সমাজবাদ ইত্যাদি কপ্‌চানো সস্তা বুলি হাঁকড়ালেও শাসক দল কংগ্রেস আসলে পরিণত হবে, ভারতের অচলায়নের রক্ষকরপী, সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর এক বৈরাচারী গোষ্ঠীতে। যুগে যুগে এই পথেই অত্যাচারী অলিগার্কির উদয় হয়েছে, ঘটেছে তাদের স্বধাত মলিলে নিরঞ্জন। শ্রীমঙ্গলী রামের পদত্যাগ এই সত্যকে পুনরী তুলে ধরলো।

সম্প্রতি ইলেকশন কমিশন রাজনৈতিক বিধির যে প্রসারণ শুরু করেছে, তার ফলে সরকারীদলের সমালোচনা অথবা খেটে খাওয়া গরীব জনগণের দাবীদাওয়া, দুঃখাভিযোগ প্রকাশ, প্রদর্শনী বা মিছিল করা প্রশাসনিক কড়পক্ষের, বিশেষতঃ পুলিশ রথীদের পূর্ব-সূচিত মতৈক্য ও মর্জি-নির্ভর হয়ে পড়বে। এর ওপর বাঁড়ার মত তুলছে সূচনা ও আকাশবাণী মন্ত্রকের মন্ত্রী শুকলা সাহেবের হুচাক-কৌশলের ভয়-দেখানো ধমক: “এখন যে সেন্সর-প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে তাতে আশা করা যায়, সংবাদপত্রগুলি এমন ভাবে ব্যবহার করে চলবে, যাতে সেন্সর ব্যবস্থার পুনঃপ্রয়োগ করতে না হয়!.....নির্বাচনে তাদের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।” অস্ত্রজ, অস্ত্রিবাচনমূলক আশ্বাসবাণী উপলক্ষে তিনি আরও জানান যে, প্রেস-রনিয়ার (The Fourth estate) ওপর কোনো বিধিনিষেধ চাপাতে সরকার চায়না, যদিও কোনো সংবাদপত্র তাদেরকে তা করতে বাধ্য করে। (জয়পুরে প্রদত্ত বয়ান ৩০ জানুয়ারী ৭৭)।

গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার অনিবার্য অঙ্গ মতপ্রকাশের এবং মত প্রকাশনার স্বাধীনতা; ব্যক্তির যেমন, সমষ্টিরও তেমনি মিলিতভাবে এক হবার ও সংগঠন রচনার স্বাধীনতাও আমাদের সংবিধানের মৌলিক অধিকার-আইনে দ্বিধাহীন ভাবে ঘোষিত। সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনীর প্রাবম বইরে এবং “মৌলিক কর্তব্য নিয়মাবলী”-যেজরিটি-অবরদস্তী বলে এই সংবিধানের মধ্যে ঢুকিয়ে বর্তমান শাসকদল কংগ্রেস জনতার চোখে আবুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, স্পটান-বাঁচের সর্বাঙ্গিকবাদী নিয়ন্ত্রণই (totalitarian regulation and control) তাদের অস্তিম রাজনৈতিক লক্ষ্য। বিশ্বয় লাগে না তাই যখন শোনা গেল, সন্ত জেল-মুক্ত শ্রীচন্দ্রশেখরের ক্রীককাক্তর (প্রাক্তন এম পি) জেলে ভয়বাহ্য-দশাপ্রাপ্ত শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের, এবং শ্রীমঙ্গলী রামের মুখে প্রায় এক সুরে উদ্বেগ প্রকাশ—আমাদের দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি হতে চলেছে। কেবল ভাবিনাডুতেই নয়, যে-প্রদেশের ডি. এম. কে. পাটি-সরকারকে এমার্জেন্সী আইন অপব্যবহার করার বিখ্যা অজুহাত তুলে সরানর পর সেখানে সভা সমাবেশ এমার্জেন্সী বলে বন্ধ করা হল (ডিসেম্বর ৭৮, ১৯৭৬), বন্ধ করা হল তথাকার বিদ্যৎ-সরবরাহ বিভাগীয় কর্মীদের হরতাল করার মৌলিক অধিকার (১২ ডিসেম্বর ৭৬)। বস্তুতঃ, এমার্জেন্সী কবলিত ভারতের বহু জায়গায় (বম্বেতে, ভূপালে, পশ্চিমবঙ্গে তো বাটেই) ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়াতে এই সন্দেহই জাগে যে, কংগ্রেস দলীয় সরকার এ দেশেরই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস আইন ও সংশ্লিষ্ট শ্রম-আইনে প্রদত্ত অধিকার ও স্ববিধাদি কেড়ে নিতে চায়।

নির্বাচন কিসের ঠীশারা ?

প্রকৃত বাস্তবতা বিরোধী দলগুলির কর্মবৃন্দ, কাভার ও নেতৃত্বের সামনে আজ সঙ্কটের আহ্বান সঠিকরাজনৈতিক পদক্ষেপ নেবার পরীক্ষারূপে এসেছে। যে পার্লামেন্টারী নির্বাচন অঙ্কশে এবং পোষ মানানো জনতাকে বৃশ্মিত চালিয়ে সম্পন্ন করার তালে ছিল শাসক দল, ভেবেছিল সহজে ভোট-কাচুপির কীকড়া কাটিয়ে আপন দলীয় শাসনের ওপর বৈধতার শীলমোহর লাগিয়ে নেবে, সেই (শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

চীন-রাশিয়ার বিরোধ প্রসঙ্গে

কোন তথ্যকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এই বিতর্ক অংশ গ্রহণ করিনি। রণজিৎবাবু দাবি যে সত্যি দিয়ে চীন রাশিয়ার মতাদর্শগত বিরোধটিকে বুঝবার চেষ্টা করছি মাত্র। রণজিৎবাবু তাঁর বর্তমান চিঠিতে (২৮শে জানুয়ারী) লিখেছেন, “আমার বক্তব্য এই নয় যে, মাও এর নীতিতে কোথাও কোন ভ্রান্তি নেই।” কিন্তু তিনি মাও সে তুং-এর নীতিগত কোন ভুলের প্রমাণ উপস্থিত করেন নি। রাশিয়ার সঙ্গে চীনের বিরোধ এবং উভয় দেশের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক দেখে কেবল অস্থান করেছেন, “১৯৫৭ সালের ‘সামাজ্যিক রাষ্ট্র কাঠামোর নিশ্চয় পলদ চুকেছে।’ না রণজিৎবাবু, বিষয়টাকে এত সরলীকরণ করেন না। বিষয়টি হোল অসমাপ্ত ও অসম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক বিতর্ক। অসম্পূর্ণ বিষয়কে যথাযথ ও সঠিক বিবেচনা করে বিচার করা উচিত। রণজিৎবাবু এখনও ট্যালিন এবং রাশিয়া সম্পর্ক চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পরবর্তী মূল্যায়নের পক্ষে দাঁড়িয়ে পূর্ববর্তী মূল্যায়নকে আড়াল করার চেষ্টা করে চলেছেন। তিনি যে “আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট

আন্দোলনের মূল গোপের” কথা বলেছেন সেই গোপের লক্ষণ কি ১৯৩৯-৪০ সালে প্রকাশিত হয়নি? তাহলে মাও সে তুং কেন তখন ট্যালিন নির্দেশিত পথের সঠিকতা এবং রাশিয়া থেকে ধনাত্মক উদ্দেশ্য হয়ে যাওয়া সম্পর্কে অস্বস্তি সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন? পরবর্তীকালে ট্যালিন এবং রাশিয়াকে সম্পূর্ণ নতুন করে মূল্যায়ন করার সময় মাও সে তুং কিংবা চীনের কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ববর্তী মূল মূল্যায়নের জন্য কোন আত্মসমালোচনা করেছেন বলে আমি অস্বস্তি ভুগি।

রণজিৎবাবু লিখেছেন, “তৃতীয় দুনিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করলে, পঞ্চদশাব্দে আপনি দেখতে পাবেন ‘non capitalist path’ নামক অর্থনীতির জন্য একজন বিদগ্ধ সাংবাদিক non-capitalist pathকে কেন যে অর্থনীতির অর্থ্যাৎ অস্বস্তি বললেন তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। Non-capitalist path যে non-socialist path এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তা বলে কোন মতেই

তাকে অস্বস্তি বলা যায় না। রাশিয়াতে ১৯২১ সালে লেনিনের নেতৃত্বেই এ পথের প্রথম সূচনা করা হয়েছিল। ১৯২২ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসে লেনিন বলেছিলেন “—State capitalism would be for us, and for Russia a more favourable form than the existing one. What does that show? It shows that we did not overrate either the rudiment or the principles of socialist economy, although we had already accomplished the social revolution. On the contrary, at that time we already realised to a certain extent that it would be better if we first arrived at state capitalism and only after that at socialism.” রাশিয়া ছিল একটি পঞ্চাদশ শতাব্দী তাই সেখানে সরাসরি সর্বস্বত্বাধীনের একমাত্রক প্রচেষ্টা করা সম্ভবই ছিল না। একারণেই অক্টোবর বিপ্লবের পর সেখানে প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ‘একমাত্রকত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ বা state capitalism এর



প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। প্রথম প্রচেষ্টার পাটের মেত্রে এই state capitalism বা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদই হোল non capitalist অর্থ বা non Socialist path, পুঁজিপতি প্রচেষ্টার আদর্শগত ধ্যান ধারণার দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের আদর্শ ভাবে পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাই হোল পুঁজিবাদী বা ধনাত্মক পথ। কিন্তু প্রথম প্রচেষ্টার আদর্শগত ধ্যান ধারণার দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বশত পণ্য উৎপাদন হয় তখনই সূচনা হয় অস্বস্তিকারক অর্থ বা অস্বস্তিকারক পথের। রণজিৎবাবু কি ‘either or’ এর সমস্যার জুগুপ্স, নাকি সূতিকারি ভাবে চীনের পক্ষে দাঁড়িয়ে ট্যালিনের বিরোধিতা করার এটাই সুসিদ্ধান্ত পরিণতি?

রণজিৎবাবু তাঁর নিজের মতকে প্রচেষ্টা করার অল্প সম্ভাব্য প্রকাশিত বলে ট্যালিন এবং রাশিয়া সম্পর্কে ১৯৫৬ সালের মাও সে তুং-এর বক্তব্য থেকে দীর্ঘ এক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাতে আছে, “It is the opinion (of the C P C) that Stalin's mistakes amount to only 30 percent of the whole, and his achievement to 70 percent and that all thing considered Stalin was nonetheless, a great Marxist...” চীনের সেক্ট্রাল কমিটি কি করে ৩০/৭০ পারসেন্টেজ কয়ে ট্যালিনের সামগ্রিক মূল্যায়ন করে তাকে Great Marxist বলে রাখা দিয়েছিলেন? সেই একই উদ্ধৃতিতে তার পরই মাও বলেছেন, “Stalin did number of wrong things in connection with China” কিন্তু চীন সম্পর্কে ট্যালিন বা তুল করেছেন তা তো তাঁর সমগ্র জীবনের অংশ মাত্র। ট্যালিনের সেই আংশিক তুলকে বিচার করেই চীনা পার্টি ট্যালিনের সামগ্রিক মূল্যায়নটি করে ফেললেন আর রণজিৎবাবু সেই আংশিক মূল্যায়নের উপর দাঁড়িয়ে চীনের অপক্ষে লড়ে যাচ্ছেন। আশ্চর্য! একটু চিন্তা করলে, রণজিৎবাবু, আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে রাশিয়ার ক্ষেত্রে ট্যালিন কি কি তুল করেছিলেন সে কথা রাশিয়ার কমিউনিস্টরা যত সঠিকভাবে বলতে পারবেন অল্প কোন দেশের কমিউনিস্টদের পক্ষে তত সঠিকভাবে বলা কিছুতেই সম্ভব নয়। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সর্বময় কর্তৃত্ব থেকে ট্যালিন অস্বস্তি দেশের ক্ষেত্রে কি কি তুল করেছিলেন তাও কেবল সেই সব দেশের কমিউনিস্টরাই যথাযথ ভাবে বলতে পারেন।

সেই একই উদ্ধৃতিতে মাও সে তুং-এর বক্তব্য, “The Soviet Union differs from our country in that, firstly, Tsarist Russia was an imperialist power and secondly, it had the October revolution. As a result many people in the Soviet Union are conceited and very arrogant.” বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু কোন সময় রাশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বলে পণ্য করা হোল সে কথা উল্লেখ করেন নি। রাশিয়ার রাষ্ট্র চরিত্র সম্পর্কে লেনিন বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মূল্যায়ন করেছেন ১৯১৪ সালে ‘আন্তর্জাতিক আন্দোলনের অধিকার’ নামক বইতে লিখেছিলেন, “কেবলমাত্র ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিই নয়, উদাহরণ স্বরূপ, এমনকি রাশিয়াও সাম্রাজ্যবাদী ধনী বুর্জোয়া দেশগুলির লবী পুঁজির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল।” কিন্তু একারণে কোন দেশকে আধা-উপনিবেশ বলা যায় না। তাই লেনিন রাশিয়াকে কখনই আধা-উপনিবেশ বলেন নি। কিন্তু সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে লেনিন পরবর্তী রাশিয়ার নেতারা বিপ্লব পূর্ব রাশিয়াকে আধা-উপনিবেশ বলে মূল্যায়ন করেছেন। দীর্ঘ হলেও লেনিন পরবর্তী সোভিয়েট নেতাদের রাশিয়ার রাষ্ট্র চরিত্র সম্পর্কিত বক্তব্যটি উদ্ধৃত করছি। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের বিভিন্ন সংস্করণ হলেও রণজিৎবাবু যে কোন একটি সংস্করণের (যদি অধ্যায়) সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন। আমার হাতের কাছে অস্বস্তি সংস্করণগুলি না থাকলেও সম্ভবত এ ক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য নজরে পড়বে না।

“রুশ দেশ যে বুটেন-ফ্রান্সের মিত্র শক্তির পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে প্রবেশ করে তা কোন আশ্চর্য ঘটনা নয়। আমাদের মনে রাখা দরকার যে ১৯১৪ সালের পূর্বে রুশ শিল্পের প্রধান শাখাগুলি ছিল বিদেশী ধনীদেব হাতে, প্রধানতঃ ফ্রান্স, বুটেন ও বেলজিয়াম অর্থাৎ মিত্র দেশগুলির হাতে। রুশ দেশের সবচেয়ে বড় খাতব শিল্প ছিল ক্রাসনো পুঁজিপতিদের অধিকারে। সর্বসময়ত খাতব শিল্পের প্রায় তিন চতুর্থাংশই (শতকরা ৭২ ভাগ) বিদেশী মূলধনের উপর নির্ভর করত। মাসেন্স নদী অঞ্চলের কয়লা শিল্প সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে। দেশের উপর ভেলের অর্ধেক সরবরাহ (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

রুশ বিপ্লবের ওপর কলঙ্ক লেপন

“হুভাচচর বহু এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ” নামক প্রবন্ধটিতে পঞ্চদশ চৌধুরী (২১শে জানুয়ারী ’৭৭) একজায়গায় হুভাচচরের “তত্ত্বের বহু” এই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, “বলশেভিকবাদ এবং মার্কসবাদের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর একথা ঠিক।” কেননা তাঁর মতে “.....সাম্রাজ্যবাদের যুগে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা না করেই যে বলশেভিকবাদ গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবের কোন পথনির্দেশ ছিল না অস্বস্তি লেনিনের মৃত্যুর পর লেনিনের নাট্যটিকে মার্কস এঙ্গেলসের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁর অবস্থানকে মার্কসবাদের অঙ্গভূক্ত করার পরিবর্তে ট্যা লন আলাদা ভাবে লেনিনবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর “এসব কারণেই পরবর্তী ভারতে হুভাচচর বহুর মত দেশপ্রেমিক নেতারাও মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ - নিয়ে বিভ্রান্ত হবার ফলে গান্ধীবাদের বিরোধী কোন কার্যকরী মতাদর্শ গ্রহণ করতে পারেন নি।” এই চমৎকার ইতিহাস জ্ঞানের বহুর দেখে যে কোন মানুষই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। কারণ ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানে যে রুশবিপ্লব কতখানি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিল। রুশ বিপ্লব যে সাম্রাজ্যবাদী আধ-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল, সেই আর ছিল ট্যালিনের ভাষায় “Tsarist Russia

was a major reserve of western imperialism, not only in the sense that it gave free entry to foreign capital, which controlled such basic branches of Russian national economy as the fuel and metallurgical industries, but also in the sense that it could supply the western imperialists with millions of soldiers. আরও শুধুন “Tsarism was not only the watch dog of imperialism in the east of Europe, but in addition, it was the agent of western imperialism for squeezing out of the population hundreds of millions by way of interest of loans obtained in Paris and London, Berlin and Brussels” (Stalin : Selected Works, Vol. 6, Moscow 1953 PP. 77 78)

তাই ট্যালিন বলেছেন “Whoever wanted to strike at Tsarism necessarily raised his hand against imperialism, whoever rose against Tsarism had to rise againstim-

perialism as well, ... (এ) হুভাচ “...the revolution against Tsarism varged on and had to pass into a revolution against imperialism, into a proletarian revolution.” (এ)

এত কথাই পর যদি কেউ বলেন যে বলশেভিক পার্টি পরিচালিত বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অর্থবা তাতে “সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবের কোন পথনির্দেশ ছিল না তাহলে এই কথাকে মিথ্যার বেসাতি ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি? এইরকম ভাবে রুশ বিপ্লবের উপর কলঙ্কলেপন করার মানে হল সেই বিপ্লবের বিরোধিতা করা — যে বিপ্লব পৃথিবীতে প্রথম শোষণ ব্যবস্থার উচ্ছেদ করেছিল, যে বিপ্লব প্রমাণ করেছিল মার্কসবাদের ঐতিহাসিক সত্যতাকে। তারপর থেকে পৃথিবীর অনেক দেশের প্রথম প্রচেষ্টা এবং প্রথম প্রচেষ্টার অগ্রগামী বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টি রুশ বিপ্লবের মহান শিক্ষাকে কেন্দ্র করে রুশ বিপ্লবের পতাকা তুলে ধরেছেন। যেমন কিছুদিন আগে ভিয়েতনামের মুক্তি লাভ।

সম্প্রদায়

ব্রেখট বিশেষজ্ঞদের প্রতি

দীপেন্দু চক্রবর্তী

আপনারা ব্রেখট পড়েছেন এবং পুরোটা ই বোধ করছেন। ভাবায়, এবং (কেউ কেউ) আত্মনিবেদনে ব্রেখট দেখেছেন। আমরা ব্রেখট পড়েছি নিতান্তই অল্প, তাও অল্পবাহে, ব্রেখট দেখেছি কলকাতায়, তাও অল্পবাহে এবং বাংলায়। তাই ব্রেখট বুঝতে আপনারা সাহায্য একান্ত দরকার। এই যে শহরের চারের দোকানে অসংখ্যবার এখনও ব্রেখট নিয়ে বিতর্ক এবং তারপর বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটে যাচ্ছে এটা মোটেই ভালো নয়। আসল ব্রেখট নকল ব্রেখট কে কোথায় পা চাকা দিয়ে আছে তার হৃদয় দিতে পারেন আপনারাই। আমাদের অনেকের কাছেই ব্রেখট মানেই বিতর্ক। বেশ কিছু কালে রীতিমত বাঁধা, অথচ ব্রেখট মানেই যে সকল ভক্তের মীমাংসা এই উপলব্ধি এতদিনে হওয়া উচিত ছিলো, কারণ কলকাতার আর কিছু না হোক ব্রেখট নিয়ে বাঁচাটা হচ্ছে বোধ প্রায় একমুখক হয়ে। এ সবই প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে। ব্রেখট বেঁচে নেই। কিন্তু আপনারা ভো আছেন, তাই এই জ্ঞানের অভাবটা পূরণ করার দায়িত্ব বর্তাচ্ছে আপনারদের ওপর। বলবেন, ব্রেখট চর্চার প্রসার তো কবেই বাড়ছে, কিন্তু তার কলে জ্ঞান বাড়ছে, না, বিজ্ঞান বাড়ছে বলা কঠিন হয়ে পড়ছে। একমুখে যদি বলেন ব্রেখট হলো এই আর-একমুখে বলবে, ব্রেখট হলো এই, তারার 'এই' আর 'এ' তার ভেতরেই বা ব্রেখট কৈ, বলে বসবে অল্প আর একমুখে। যেমন ধরুন, আত্মনিবেদন না জানলে ব্রেখট বোকা যায় না—কেউ হয়তো বললো, সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলে উঠবে, আত্মনিবেদন না পেলে ব্রেখট বোকা যায় না। একজন বললো, ব্রেখট বুঝতে হলে মার্কসীয় দর্শন জানা দরকার, আর একজন বললো ব্রেখট না জানলে মার্কসীয় দর্শন বোকা যায় না। একজন যদি বললো, ব্রেখট চাননি তাঁর নাটক ও তৎস্বের সূত্রান্ত কোনো পরিবর্তন ঘটুক, আর একজন বললো, (যেমন জি, ডি, আরের পত্রিকাগুলি) ব্রেখট অচল্যন্তন পড়তে চাননি। কি করণ অবস্থা তাহলে আমাদের। মনের ভেতরে ব্রেখটকে মিরে কত অজস্র প্রশ্ন পাক খায়, অথচ অনেকেই প্রকাশ করতে পারে না ভয়ে পাছে বোকা বনে যায়। ব্রেখট নাকি হিঃগালেও দর্শকদের প্রশ্ন আহ্বান করতেন, আর তাঁর নাটকগুলো নাকি প্রত্যেকটাই প্রশ্নের আকারে দর্শকমনকে ছুঁতে যায়। কিন্তু তারতের মাটিতে ব্রেখট যেদিন থেকে পা দিয়েছেন সেদিন থেকেই নাকি তাঁকে আপনারা মিরে রেখেছেন যাতে কেউ পাণ্ডা প্রশ্ন না করতে পারে, ঠিক যেমন রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঘটে গেছে।

এটা হয়তো নিম্নকদের অভিযোগ। ওদের না আছে প্রকৃত জ্ঞান, না আছে চালিয়াত্তি করার সংসাহস। একেই নিরক্ষর প্রধান দেশ, তার ওপর শিক্ষিতদেরও একটা অতি ক্ষুদ্রাংশ বিয়েটার বোকে। সুতরাং ব্রেখটকে মিরে একটু আধটু চালিয়াত্তি হবেই এবং তা ধরবেটা কে? শুধু কিছু বেলিসেবী রাগী অর্বাচীন যাদের অপদম্ব হবার ভয় নেই তারাই বারবার 'এটা কেন হলো' 'ওটা কেন হলো' এমনতর প্রশ্ন তুলে-স্থিতাবস্থায় বা ঘের এবং দিয়েই ব্যর্থ হয়। আসলে এদের আচরণে ছাত্রহুলভ বিনয় নেই—শিক্ষকের কাছে কিভাবে প্রশ্নের উত্তর ভিক্ষা করতে হয় তা জুড়ে গেছে এবং জুড়ে গেছে এটা কোন দেশ। যাই হোক এ সব কিছু নিজস্বগে ক্ষমা করে—আমাদের সন্নিয় আবে-ধন—আপনারা ব্রেখট সম্পর্কিত পরিচিত-অপরিচিত প্রশ্নের স্পষ্ট ও সহজ জবাব দিন, (প্রশ্নকারে, কিম্বা প্রশ্নকে, কিম্বা আলোচনা সভায়) তাতে উপকার হবে সবার—আপনারা-দের, আমাদের এবং যদিও বলতে ভয় পাবি, ব্রেখটেরও।

একবারে প্রশ্ন প্রশ্নই : ব্রেখট কাদের জন্ত—ভারতের-টিকু-আনা বুদ্ধিবীর্ষদের জন্ত, না, সাধারণ জনতার জন্ত?

হুই : যদি সাধারণের হয়ে থাকেন তবে ব্রেখটকে এতটা কঠিন লাগে কেন? ব্রেখট কি জনতার কথা বলে শুধু বুদ্ধিবীর্ষদের সন্তুষ্ট করতেন?

জিন : কেউ কেউ বলেন, এদেশের মানুষের জন্ত ভো ব্রেখট লেখেন মি। মিথেছেন আত্মনিবেদন মাহুনের জন্ত। এ কথা কি ঠিক? যদি ঠিক হয়, তবে কোন অর্থে ব্রেখটকে মিরিয়ার সব মাহুনের লেখক বলা যায়?

চার : কেউ কেউ বলেন, এদেশে ব্রেখটের দর্শক তৈরী হয় মি। তবে কি ব্রেখট আত্মনিবেদনেই একটা আসে থেকে তৈরী করা দর্শকের জন্ত লিখেছিলেন?

পাঁচ : আবার বলা হয়ে থাকে ব্রেখটের উদ্দেশ্যই ছিলো সমাজ সম্বন্ধে নানান প্রশ্ন তুলে নতুন দর্শকমণ্ডলী তৈরী করা, যে কারণে তাঁর বিচ্ছিন্নতা বা এস্ট্রেনজমেন্টের (estrangement) তত্ত্ব। তাহলে আত্মনিবেদন ব্রেখট বোকে তারতীয়রা বুঝবে না, এই সিদ্ধান্ত কি বৈধ?

ছয় : সমাজ বদলানোর সংগ্রামে ব্রেখট অবশ্য প্রয়ো-জন এই বিশ্বাসে ব্রেখট সোসাইটি ও এনিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করলার কিন্তু তারপর বললার, এদেশের লোক যাত্রা বুঝবে, শেক্সপীরের বুঝবে, ব্রেখট বুঝবে না এবং সেজন্য এমন নাটক করলার বা ব্রেখট আদৌ সমর্থন কর-তেন না—এটা কি ধরণের ভায়েলেকুটিন্স। এও কি ব্রেখটীয়?

ষাট : ব্রেখটের 'এনিক থিয়েটার' ও 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'—এ দুয়ের মধ্যে কোন্টি মার্কসবাদীরা বেছে নেবে, যে কোনো একটাই, না, পাশাপাশি দুটাই, না দুটির সিন্থেসিস?

আট : ব্রেখট ও আনিয়ান্ড্রির অভিনয় পদ্ধতি পরস্পর বিরোধী হলে সে ক্ষেত্রেই বা আমরা কাকে গ্রহণ করবো, একজনকে বা দ্বি-দিয়ে আর একজন, না বথম যেটির প্রয়োজন? এদেশে কেউ কি এ দুয়ের নতুন সম্ব-ধের চেষ্টা করেছেন বা করছেন?

নয় : ব্রেখটের নাট্যপদ্ধতি কি একমাত্র বৈজ্ঞানিক নাট্যপদ্ধতি? তবে কি শিকি অপেরার নাট্যপদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক? বিপ্লবী প্রচার কার্বে কোন্টি বেশী কার্য-করী হয় তার গবেষণা কেউ করেছেন কি?

দশ : সব নাটকেই কি দর্শককে 'বিচ্ছিন্ন' করার প্রয়োজন আছে? গোকির পাভেল যদি নারক হয়, তবে তার সঙ্গে দর্শকের একাত্মতা কতকর না লাভজনক?

এগারো : ব্রেখট পড়ে বা দেখে যদি দুটি পার্থক্য বা দর্শক মূল বস্তুবোয় দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা করার সুযোগ পায় তবে এর জন্ত দায়ী কে, পার্থক্য দুজন, না ব্রেখট, না উভয়েই অংশভ? সপ্তাহে এক আধটা দিন ধারাপ না হলে বাকী দিনগুলো ভালো মাহু হওয়া যায় না এইসব দেখে শুনে কেউ যদি ধারাপ হওয়াটাকেই সমর্থন-যোগ্য বলে ধরে নেয়, কিম্বা, আহা, মাদার কারেজকে ভো পেট চালাতে হবে তাই ভো একা একাই যুদ্ধক্ষেত্রে গাড়ি টানতে হয় এমন সিদ্ধান্তে যদি কেউ আসে (এবং অনেকেই আসে) তবে তার প্রতিকার কি? দর্শকদের সঙ্গে নানান তাবে আলাপ করে তাদের বিজ্ঞানি ধর করা, না মনে মনে বলা, 'এই সব দর্শকেরা নিপাত যাক'?

বারো : ব্রেখট পাচাত্য বুর্জোয়া নাট্যবিশাদদের কাছে এখন দারুণ জনপ্রিয়, অথচ গোকিকে অভিশপ্ত বলে তাঁরা পাচাই ঘেন না। এরপেছনে কি শুধু বুর্জোয়াদের কু-মতলব কাজ করেছে না ব্রেখটের নাট্যপদ্ধতিতে এমন কিছু আছে বা তাদের কাছে লাগে?

তেরো : সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা এসবে ব্রেখট ও

দুকাচের বিরোধকে কি চোখে দেখা উচিত? উভয়েই জুল, না উভয়েই অংশভ? ঠিক?

চৌদ্দ : ব্রেখট সম্পর্কে সমসাময়িক জার্মান ও রাশিয়ান কমিউনিষ্ট বুদ্ধিবীর্ষরা যে-সমালোচনা করে-ছিলেন এবং আজ বুর্জোয়া সমালোচকেরা তাঁর মতাদর্শগত যে-অভ্যর্থনের কথা বলে থাকেন, এ দুয়ের মধ্যে কোনটা নিষ্ঠে কথা?

পনেরো : কলকাতার এ পর্বত কোনো জনই সঠিক-ভাবে ব্রেখট মক্কে করতে পারে মি এমন বলা হয়ে থাকে। এ থেকে কি এই প্রকাশ হয় যে ব্রেখট আমাদের নাট্য পরিচালকদের নানালের বইরে? অর্থাৎ আবার সেই সিদ্ধান্ত, ব্রেখট বড় কঠিন? তাহলে এক কঠিন নাট্য-কারকে নিয়ে এদেশের কমিউনিষ্ট বাট্যকর্মীরা এত পণ্ডন করছেন কেন?

ষোল : নিজের ক্ষেত্রেই ব্রেখট জীবনধারণ কোন দর্শককে বেশী পেরেছেন—ব-বিভ না জ-বিভ প্রণী? মোতির মাদারের ক্ষেত্রে তাঁর কোনো নাটক কি সাধারণ জনতার কাছে এতটা জনপ্রিয় হতে পেরেছে?

সতেরো : অঙ্গীল ভাষা এখানকার কমিউনিষ্টরা স্বাভাব্য করতে পারেন না। ওটা অপসংস্কৃতি, কিন্তু ব্রেখট চরিত্রগুলি অঙ্গীল ভাষা ব্যবহার করলেও তা সমর্থন পায়। এটা কি আর্থপ্রয়োগ?

আঠারো : জি, ডি, আর দাবী করে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রেখট নাট্যপদ্ধতির উপযুক্ত সংশোধন অবৈধ নয়, বরং ব্রেখট নিজেই তা সমর্থন করতেন। এ যুক্তি কি বৈজ্ঞানিক, না শোষণবাদী?

উনিশ : কলকাতার অনেকে আছেন যারা মার্কসবাদে বিশ্বাস করেন না এবং বোঝেনও না অথচ ব্রেখটের নৈতিক অতিভাবক হিসেবে মন্বানিত হন—ব্রেখট কি এটাও সমর্থন করতেন?

বুড়ি : ব্রেখট সম্বন্ধে তাঁর এতটা মীরব কেন? সেখানে আনিয়ান্ড্রিকে ধারিত করা হয় ঢাক পিটের অথচ ব্রেখটও আরগা পায় না? চীনাগদীরা এ ব্যাপারে কি আদৌ চিহ্নিত?

হয়তো আরো প্রশ্ন আছে, কিন্তু এ কঠিন জবাব পেলেই ব্রেখটকে মিরে যে বেরাশার হুই হয়ে থাকে তা খানিকটা পাতলা হবে। প্রশ্নগুলো এর আপেও অস্তান্ত পত্রিকার রেখেছিলাম—গাল খেয়েছি বিভ্রম, উত্তর পাই মি। এবারেও আশা করছি কেউ না কেউ উত্তর দেবেন কারণ ব্রেখট পড়ে ব্রেখট বুকে ব্রেখট সম্পর্ক কোনো লম্বের সামনে চুপ করে থাকবেন সব ব্রেখট বিশেষজ্ঞ বোধহয় সে রকম নন। আর ব্রেখট না ব্রেখট না ব্রেখট না ব্রেখট প্রশ্নের চেয়ে মনে হয় ওপরের প্রশ্নগুলো অনেক বেশী প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ।

মিহির আচার্য প্রণীত উপন্যাস	
জোনাকির আলো	৮.০০
পৃথিবীর বয়স	১৪.০০
জীবন নিরবধি	১৬.০০
ঘরে ফেরার দ্বিম	৫.০০
দিবস বিভাবরী	৫.০০
অতল প্রহরী	৬.০০
আলোর সহোদর	৪.০০
পারাবারের তীরে	১০.০০

শুকসারী ৪-১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড।
কলকাতা-১৪। বিক্রয়কেন্দ্র ৥ নাথ ব্রাদার্স। দে
বুক হোস। কথা ও কাহিনী।

প্রশ্ন তিনটি : ন্যায় নীতি নির্বাচন

কালিদাস কুণ্ডু

সংসদীয় গণতন্ত্রের সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস, কি দেশে, কি বিদেশে অল্প কোন নির্বাচন যোগ্য ও অহুতার মধ্যে এত কম সময়ের ব্যবধান রাখেনি যা রেখেছে ভারত-বর্ষের পঞ্চম লোকসভা নির্বাচন। তৎসঙ্গে, রাজনৈতিক দিক থেকে এই আসন্ন নির্বাচন জাতীয় জীবনে যে বিতর্ক ও গুরুত্ব সৃষ্টি করতে পেরেছে তা পূর্ববর্তী অল্প সব নির্বাচনকে দূর করে দিয়েছে নিঃসন্দেহে।

এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে অস্থিতি হতে চলেছে '৭৭-এর নির্বাচন। জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকাকালীন সময়ে নির্বাচনের নজির গণতন্ত্রের ইতিহাসে শুধু বিস্ময়করই নয়, কিছুটা হাস্যকরও বটে। তবুও মন্দের ভালো, নির্বাচন একটা হচ্ছে।

বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত বৃহদায়তন এই দেশটিতে রাজনৈতিক দলের

সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। আগেকার নির্বাচনগুলিতে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল স্ব স্ব রাজনৈতিক বক্তব্য ও কর্মসূচী নিয়ে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত হয়েছে। বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে প্রতি-কলিত তাদের মতাদর্শগত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য কোন সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুর্বলতা না শক্তি-প্রমাণি ছিল বিতর্কের। আমাদের বুদ্ধি-জীবীরাও বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন দুটো পরস্পর বিরোধী শিবিরে। "শত পুষ্প বিকশিত হোক—শত বস্ত্র প্রস্তুত হোক"—এই চিন্তাবাগী আগরণের ভাবে ভাবে দেয় চেতনাকে যে আলোকের সঙ্গে তার কণাইকু পাইনি আমরা। হাত পেতে বেইকু পেতে চেয়েছি ইংরেজী শিক্ষা, প্রথা ও কৌলিন্যের মোহ-গুণে, সেইটুকু গুণে-গুণে দেখেছি কখনও পাই, কখনও হারাই। স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও

স্বাধীনতা মন্ত্রী বোনটির মতো পোড়া-কপালে কেঁটা দিয়েছে চিটে-কেঁটা কপালে যা জুটেছে কখনও টিকেছে—কখনও টিকেনি। এইভাবে ৪৭-এর আগে পঁচো দিম কেটেছে—বহুদিন। হঠাৎ ১৯৭৭-এর চংকু লাগানো ঘোষণার ঘুম ভাঙলো না কি জেগে দেখলাম পথ গিয়েছে ভাইনে—বাইরে, হয় গণতন্ত্র না হয় একনাকতন্ত্র। কথটা শুভিয়ে বললে ঠাণ্ডায়, স্বাধীনতার প্রায় ৩০ বছর পরে, হেঁটে হেঁটে কখনও গুটি গুটি ময়র পাবে, কখনও বা ভয়ভাঙা বিচ্ছিন্নের পথে ছোর কয়মে বে-চৌ-রাজ্যের মোড়ে ঝাড়িয়েছি আমরা ১৭৭-এর ভোরে সেখানে নির্বাচনটা সংকেত করেছ এক অজ্ঞাত আলোকের—স্বাধীনতা। নির্বাচনটা জরুরী হয়ে পড়েছে সেই নব 'নিরপেক্ষ-বুদ্ধিভী'দের কাছেও এত দিন যারা হা-পিতৃশ

করেছেন কুটিবিহীন একটু স্বাধীনতার ভক্তও—আরামে নিরাপদে এতদিন যারা ছুর সুরিয়ে রেখেছেন নিজেদের মুটে মজুরদের একটুকরো কটির লড়াই থেকে।

অদেশে কারা কটি পেলো না কটি চেয়ে মরলো ভাববার অবকাশ ছিল না তাদের। "বিদেশে কটির বিনিময়ে কোন্ চিল হৌ-বেরেছে স্বাধীনতা—" মিজের কান-মানের দিকে দৃকপাত না করে তার পেছনে ছুটে চলেছে যে "মুক্ত বিবেক" আজ অদেশে তার জায়-নীতি মূল্যবোধ ভূমিকা দিয়েছে।

অবশেষে অস্তিত্বতা বেড়েছে। এখন বেলা পড়ত। ঘেশের দু'লাখ বুদ্ধিভী যতের দিকে মুখ ফিরিয়েছে। মজুরের মজুরী নেই, চাষীর চাষ নেই, মাটির মাছের মাটি নেই। মধ্য-বিত্তের ঘরে চাল বাড়ত। এখন কী উপায়? হয় স্বাধীনতা না হয় দাসত্ব। বেছে নেওয়ার দায় পড়েছে আমাদের ভারতবাসীর উপর।

ভিকেশ্বর "দুই নগরীর কাহিনীর" শুরুটা নিচেরই মনে আছে। দুনিয়া কাপানো একটা ঘটনা—পদানতের অভ্যুত্থান। মারের সাগর পাড়ি দিতে

সিমে গরীবরা উঠেছিল ভয়ভাঙা নায়ে। এটাই উটল হওয়ার সাধনা। এই সাধনার বহুজন, বহুযত এসে পৌঁছেছে একটি প্রান্তসীমায়—রাজনীতির ভাষায় এটাকে 'পোলারাইজেশন' বলা যায় কিনা জানি না। কেউ কেউ বলতে পারেন, "তবে দুটো মক কেন, মশাই?"

ঠিকই। মক দুটো, কিন্তু মন্ত এক—'গণতন্ত্র'। জায়-নীতির পুনর্বাণন। সম্প্রতি অমরদাঁশকর তার বলেছেন চতুর্বার্গের কথা। সেতো মোক্ষ কথা। আমি বলি, তিনটি 'ন' এর কথা—জায়-নীতি নির্বাচন।

লোকের মনে ভয় ঢুকে গেছে। আজ চাই অস্তর মন্দের দীক্ষা। জায়-নয় নীতির জন্য লড়াইয়ের আর এক নাম গণতন্ত্র। সেই লড়াইয়ে ভোটের আগেই ভোট হয়ে গেল—জিতে গেল কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসি, হেরে গেলো সি. পি. আই। জগজীবনবাবু ভীতি জর করে ভোট দিলেন গণতন্ত্রের পক্ষে। দুটো জগন্নাথ সি. পি. আই নীতির মাথা খেয়ে ভোট দিলে সেই বাক্সে যে বাক্সের তলদেশে পড়ে আছে তার জন্য গুটিকয়েক আসনের প্রতিশ্রুতি।

সামাজিক প্রগতি

গত আঠারো মাসে দেশের সামাজিক ও আর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা শান্তিপূর্ণ বিপ্লব ঘটে গেছে।

* ১৯৭৬-এর নভেম্বর শেষ হওয়ার আগে প্রায় একশতের লক্ষ পরিবারকে বাস্তব জমি দেওয়া হয় (এই ধরনের জমি পাওয়ার কথা মোট ১১৩, ৬ লক্ষ পরিবারের)

* ভূমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতা সব কটি রাজ্য আইন প্রণয়ন করেছে

* এগারোটি রাজ্য এবং চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পল্লী-ঋণ মকুব করার জন্ম (ঋণ আদায়ের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া সমেত) আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছে

* ৮৯, ১৯৮ জন বেগারখাটা বা মুচলেকা মজুরকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে

সি পি এম বন্দীর ভাতা মিলছে না

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মীনা বন্দীর ভাতা দেওয়ার নিয়ম আছে অথচ কিছু বন্দী ছাড়া বা কীদের অনেকেই এ ভাতা এবং বকেয়া পাওনা পাননি।

হুগলী জেলার চণ্ডীতলা থানার বাদপুর গ্রামের প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দী এবং সি পি আই (এম)-এর কৃষক নেতা আদিবাসী কেট ধাড়া হুগলী জেলে ছিলেন ২০শে মার্চ ১৯৭২ সাল থেকে ২০শে জুন ১৯৭২ সাল পর্যন্ত। তার পাওনা হয় প্রতিমাসে সত্তর টাকা হিসাবে ভাতা। সামান্য টাকা। অথচ একটি টাকাও পাননি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অ্যাসিস্ট্যান্ট (হোম) সেক্রেটারী কৃষ্ণপদ শাওল্য

ডবলু বি, সি, এস মহাশয় এক চিঠিতে (নং ১৮৩১২, এইচ, এস ২২.১০.৭৩) ঐখাতার বৃদ্ধা স্ত্রী রাধাবালা ধাড়াকে লিখেছিলেন, 'এ টাকা হুগলী জেলা শাসক দিয়ে দেবেন।'

অথচ বার বার আবেদন সত্ত্বেও জেলা শাসক জে, ডি, আর প্রসাদরাও কোন উত্তর দেননি। ঐখাতা সম্প্রতি বস্ত্রারোগে আক্রান্ত এবং নিদারুণ অর্ধা-ভাবে দিন কাটাচ্ছেন। বার বার হুগলীতে চুঁচুড়ায় জাগাধা করে, মন্ত্রী-দের লিখেও ফল হয়নি। অরাজক দল-বের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ মোতাহার হোসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ধাড়ার ঠিকানা কেট ধাড়া, ডাক—আকুনি গ্রাম—বাদপুর, হুগলী।

মোরারজীর বক্তব্য

(দর্পণের প্রতিনিধি)

বলকাতায় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনতা পার্টির প্রধান ঐখোরারজী দেশাই বলেন, সংবাদ-পত্রকে পূর্ণ স্বাধীনতা না দিলে বই এবং অবাধ নির্বাচন কি করে সম্ভব? ঐদেশাই বলেন ক্ষমতা পেলে প্রথমেই দেশ থেকে জরুরী অবস্থা তুলে নেব।

তিনি আরও বলেন, আজ আমা-দের স্বাধীন ভারতেই আমরা পরাধীন হয়ে রইছি। দেশে গণতন্ত্র বিপন্ন। সাংবিধানিক অধিকার হরণ করে

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হ্রাস। এতদিন কংগ্রেস এবং সি পি আই ছাড়া অল্প কোন রাজনৈতিক দল নিজেদের মিছিল সমাবেশ করতে পারেন নি। আজ নির্বাচনের ক্ষমতা সমা-বেশ করতে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সবই সাময়িক। নির্বাচনের পরেই আমরা সেই স্বাধীনতা ফিরে যাব যে অবস্থা ছিল নির্বাচনের আগে যদি শাসক দল নির্বাচনে জয়ী হয়।

জরুরী অবস্থায় অর্থনৈতিক অগ্রগতির আসল চেহারা,

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সান্না

১৯৭৬ সনের মার্চ মাস থেকে পাইকারী মূল্যসূচকের বৃদ্ধি হয়েছে প্রতি মাসে ২% করে। ১নং টেবল এটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়। এই বৃদ্ধির আংশিক কারণ খরা এবং আংশিক কারণ এই যে, সরকার নিজেই কতগুলি মূল জিনিষের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাছাড়া অর্থের যোগান বেড়ে চলেছে যা দাম ১১% হারে। এর প্রধান কারণ এই যে, করনির্ধারণের দ্বারা সম্পদ সংগ্রহ না করে কেবল নোট ছাপিয়ে সরকার তার ক্রয়নীতি চালু করেছে এবং ৩৪০০ কোটি টাকার খাতবস্ত্র উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ভাজ্জব শোনালেও একথা সত্য যে, পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় জরুরী অবস্থায় এক বছরেই শ্রীমতী গান্ধির সরকার খুচরা ভাড়া মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে। কুড়ি দশাংশের দিন কয়লার দাম বাড়ান হয় ২০%। জরুরী অবস্থা যে যখন তখন মধ্যাহ্নের আগেই বাণিজ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, কাপড়ের মিলগুলির ক্ষতিপূরণ করার জন্য কন্ট্রোলের শক্তা কাপড়ের দাম ৩০% বাড়িতে তাদের অস্বস্তি দেওয়া হবে। ১ অক্টোবর ১৯৭৬ সরকার ঘোষণা করেন যে, সিমেন্ট, ইস্পাত এবং ইলেকট্রিসিটির দাম ১৫% থেকে ২০% বাড়ান হবে। এটা মার্কি দরকার হয়েছিল র্যাশনলাইজেশনের জন্য—জানি না কথটার মানে কি। ১ নভেম্বর ১৯৭৬ মূল্য বৃদ্ধির সংগে সংগতি রেখে কেরোসিন, রান্নার গ্যাস এবং ফার্মেসি অয়েলের খুচরা দাম বাড়ান হয় ২০%। ১ জানুয়ারি ১৯৭৬ বাসের ভাড়া—বাড়ান হয়েছিল নানা পরিমাণে। বোম্বাইয়ে হয়েছিল ২৫% আর সর্বাধিক অধ্যুষিত উত্তর প্রদেশে ১০০%। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ তিনি পরিবহন, ডাকমাস্তুল ও টেলিগ্রাফ মনিফেস্টার এবং টেলিফোনের দাম বাড়ান হয়েছে ১৫-৩০%। - যে ১৯৭৬কে কন্ট্রোল কাপড়ের দাম বাড়ান হয়েছিল ১২%, আবার জুলাই ১৯৭৬য়ে নতুন ছাপ দেওয়ার আছিলার আবার তাদের দাম বাড়ান হয় ১৫-২০%। এই জিনিসগুলো ত্রিভাঙ্গা রাজ্যের জন্য আইনের আওতায় পড়ে অথবা সরকারী একচেটিয়া ব্যবস্থার উৎপাদিত হয়। পাইকারী মূল্যসূচকে এগুলিকে ধরা হয়েছে। তাছাড়া মূল্যসূচকের তালিকার ৫০% জুড়ে আছে খাতবস্ত্র এবং ভোজ্য তেল। কিন্তু ১৯৭৬-৭৭ সনের বাজেটে রাজস্বখাতে বৃদ্ধির পরিমাণ যখন দেখি যে এই সব মূল্যবৃদ্ধির জন্তই দাঁড়াচ্ছে ২৫০ কোটি টাকা তখন সরকারী ওষুধ অধীকার করার উপায় থাকে না।

১নং টেবল

সরকারী পাইকারী মূল্যসূচক ১৯৭১-৭৬

১৯৬১-৬২ = ১০০

সপ্তাহান্ত	সপ্তাহান্ত	সপ্তাহান্ত	শতকরা	শতকরা	
৮.৮.৭৬	৩১.৮.৭৬	৭.৯.৭৬	পরিবর্তন	পরিবর্তন	
			সপ্তাহান্ত	সপ্তাহান্ত	
			৭.৮.৭৬	৭.৮.৭৬	
			৩১ জুলাই-	১ আগষ্ট	
			১৯৭৬-	১৯৭৬-	
			এর উপরে	এর উপরে	
১। খাতবস্ত্র	৩০৪.৬	৩০৮.৭	৩৪১.১	+০.৭	- ৩.৪
ক) খাতবস্ত্র	৩৮২.৪	৩১২.৮	৩১৫.৫	+০.১	- ১৭.৫
খ) কল ও সবজি	৩২১.০	৩০১.৪	৩০৬.৬	+১.৬	+ ২.৩
গ) দুধ ও চর্নি	৩৪২.৭	৩৪৩.১	৩৪০.৫	+২.২	- ০.৬
ঘ) ভোজ্য তৈল	৩৮.৫	২৩৫.১	২৩১.৪	+১.৫	- ১১.৬
ঙ) মাছ, ডিম ও					
মাংস	৩০১.৮	৩০১.৮	৩৫৫.৩	- ০.৩	+ ৩.০
চ) চিনি ও					
জল	৩৪২.৬	৩৪৪.৭	৩৪৩.৭	- ০.৩	+ ০.২
২। মদ ও তামাক	৩০৩.৬	৩২৭.২	৩২৭.১	- ০.৩	+ ৪.৬
৩। আলো, বিদ্যুৎ,					
আলো এবং					
সুত্রিক	৩৫৩.০	৩৭০	৩৭০.৩	+০.১	+ ৪.২
৪। শিল্প কাঁচামাল	২৮১.৮	৩০১.৪	৩০৫.৮	+১.৫	+ ৮.৫
৫। বাণিজ্যিক পণ্য	৩২৫.২	২১৩.১	২১৩.২	+০.০৩	- ১০.০
৬। বস্ত্র ও পরিবহন	২৫১.১	২৫৭.৭	২৫৭.২	+০.১	- ১.৫
৭। উৎপাদক	২৫৫.৪	২৬০.০	২৬০.২	+০.০৪	+ ৪.২
ক) অন্তর্বর্তী জিনিস	৩০৫.৮	৩০২.১	৩০৩.০	+০.০৩	+ ৮.১
খ) উৎপাদিত জিনিস	২৩৩.৫	২৪৬.১	২৪৬.১	শূন্য	+ ২.৮
সকল জিনিস	৩১১.২	৩০৬.৮	৩০৮.৪	+০.৫	- ০.১

সূত্র : কিস্তান্ডাল এক্সপ্রেস, ২১ আগষ্ট, ১৯৭৬

৩ অবস্থায় মজাদার সেই সব জিনিসের কথা বার খুচরা দাম সরকার 'অন-বার্ষিক' নামেতে অস্বস্তি দিয়েছেন। এগুলি হল মোটর গাড়ি, তাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, ঠাণ্ডা-কর, টেলিভিশন এবং রেলের বাতাসকুল প্রথম শ্রেণীর টিকিট। নিত্য প্রয়োজনীয় এই বস্তুগুলির আকারের 'গ্রামের গরিব' ৩২৭ বছরের 'অবস্থায়-কেন' কলঙ্কজনক বোধের আমাদের দিল্লীর ওমরাহদের কানে পৌঁছেছিল—কেবল একটি দাম কমাবার অপেক্ষা মাত্র।

মুদ্রাস্ফীতিবোধের বহুবিধোচিত দাবিও সমান ভাবে অস্বস্তি। এটা খাতে অবস্থা সরকার কিছুটা জাতিক বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছিলেন কারণ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ থেকে জিনিসের দাম-ক্রমাগত কমে আসছিল এবং আপদবস্থা জারীর পথেই স্থগিষ্টি হয়েছিল। এই সমাপ্তনকে তারা তাদের বিশ দশা কর্মসূচী বলে আহ্বি করলেন। কিন্তু এরকম শক্তির কিস্তি মাং করার ফল সর্বদা বিপরীত হয়ে থাকে। ইতিমধ্যেই সরকারকে প্রাণপণে ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে যে বর্তমান মূল্যবৃদ্ধি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবের সংগে বিশদকার সম্পর্ক নেই—তার আগের কারণ হচ্ছে অসাময়িক বৃষ্টি এবং বায়ুদারীত্বের অসন্তোষ। কম লোকই এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হবে। নির্বাচনিক হুঁশিয়ারি বাসট শ্রীমতী গান্ধি ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬য়েই বিস্মিত করেছেন।

কর্মসূচী নয়, জিনিস বানানো

শ্রীমতী গান্ধির বিখ্যাত বক্তার ভাষণের সূত্রমূল 'উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য প্রাণ পণ করতে হবে' পুনরাবৃত্তি করতে করতে কান বালাশালা করা হয়েছিল। 'এটা তার বাস্তবিক চিন্তার অন্ততম নয়—বরং এটা বাধা গত। কিন্তু তাঁর অস্বস্তি-সাময়িকের কেউ এক বারও ভেবে দেখতে চাইল না কথটার মানে কি। তিনি হয়তো একথাও বলতে পারতেন, 'আমরা সবারই মিলে নিশ্বাস নিই।' ক্ষমতা বতদিন থাকবে ততদিন আমরা তা অবশ্যই করব। 'অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজ উৎপাদন নিরূপণ ভাবে ধ্বংস করা হবে' বলে পঞ্চম পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে হু-আম্মান জানান হয়েছিল, তার একাংশকে এর দ্বারা অধীকার করা হল। কিন্তু কে কার কথা শোনে।

একজন আধুনিক ও হুশিয়ার নেতার কাজ হল জাতির সামনে অগ্রাধিকারের ফিগিষ্টি বাতালনা—উৎপাদন কর্মসূচী তৈরী করা এবং সেই লক্ষ্য-মাত্রাকে কার্বে রূপ দিতে যে, যে ধরণের সম্পদ সন্নিবেশ করা সরকার তার ব্যবস্থা করা। শ্রীমতী গান্ধি তাঁর বিশ দশা কর্মসূচীতে তার সামাজ্যই করেছেন—সবচেয়ে কম সম্পদ নিয়োগের ব্যাপারে। আর বছর গেলে আমরা কী কল দেখতে পাচ্ছি।

জাতিকে জ্ঞান দিয়েছে হুট বিভাগ কর্মসূচীলোম কথার ফলে '১৯৭৬-৭৭ সনে অভিযাত্রের যুগমুহুর্তকে আবার কল্যাণ করা-পেছে'। একটা হল প্রকৃত বাড়তি কল আর একটা হল প্রশমিতের বহিত উৎপাদন। অথ্যা বিশ্লেষণ করে কেউ যদি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, উত্তর ক্ষেত্রের উৎপাদনের কৃতিত্ব মিশ্র এবং যেখানে উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটেছে সেখানেও গলদ তথ্যবিক এবং শুষ্ক করা হয়েছে। চিরাচরিত ভাবে দীর্ঘকালীন গতির দিক ও ভিত্তিতে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিরান মোটেই সন্তোষজনক নয়।

প্রথমত বিশ্লেষণ করে দেখা যাক বহিত কলনের পরিধি। নিজের খতিয়ানে আমরা কেবল ১৯৭৫-৭৬ই দেখি, বরং তুলনামূলক বিচারের জন্য আরো কয়েক বছরের হিসাব দিলায়।

২নং টেবল

কৃষি উৎপাদনের পরিমিত : ১৯৭৫-৭৬

(১০ লক্ষের একক)

কল	একক	১৯৭০-৭১	১৯৭১-৭২	১৯৭২-৭৩
খাতবস্ত্র	টন	১০৮.৪	১০১.১	১১৮.৮
ইউলবীজ	টন	৮.০	৮.৪	৮.৫
ইক্ষু	টন	১২৭.৪	১৪০.২	১৪৪.৮
জুলা	বেল	৪.৫	৬.৭	৬.৪
পাট ও মেছা	বেল	৫.৬	৫.০	৫.৮

সূত্র : - আলোচ্য সূত্রের দিক। পরিকল্পনার জন্য এবং পণ্যের পরামর্শ-মিতি, নয়া দিল্লী ৫ আগষ্ট ১৯৭৬। ১৯৭০-৭১ কে একটা ভাল বছর হিসেবে বেওয়া চলে, কেননা এই বছর ভাল বর্ষা হয়েছিল এবং এই বছরেই শ্রীমতী গান্ধি তাঁর 'গরিবী হটাৎ' ম্যাগেট পেয়েছিলেন। ১৯৭৪-৭৫ ছিল আধা বর্ষার বছর।

উপরের টেবল দুটো প্রতীয়মান যে, কৃষি শক্ত উৎপাদনের দিক থেকে যদি ১৯৭৪-৭৫ কে ১৯৭৫-৭৬ রেখা লম্বা তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, খাতবস্ত্র এবং ইউলবীজ উৎপাদনে বেশ বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে।

(শেখাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

মতামত

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

কোরত বৃষ্টি ও করাসী পুষ্টি-শ্রীমতী দখলে যে তেলের খনিগুলি ছিল সেগুলি। কৃষ শিল্প থেকে যে মুনাফা আসত তার একটা মোট অংশ বিদেশী বিশেষতঃ বৃষ্টি এবং করাসী ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে বলে যেত। এ ছাড়াও কৃষ ও বৃষ্টির কাছ থেকে আর কোটি কোটি টাকা ধার করার ফলে আরও বৃষ্টি এবং করাসী সাম্রাজ্যবাদীদের শৃংখলাবদ্ধ হয়েছিল এবং কৃষ দেশ এই দেশগুলির করদগ্ধাত (tributary), আধা উপনিবেশ (semi colony) পরিণত হয়েছিল। তাহলে বিপ্লব পূর্ব রাশিয়ার রাষ্ট্র চরিত্রটি প্রকৃতই কি ছিল? কেনি বা বলেন নি লেনিন পরবর্তী রাশিয়ার নেতারা রাশিয়ার রাষ্ট্র চরিত্র সম্পর্কে তাই বলেছেন। কিন্তু আমরা কোন মতটিকে সঠিক বলে গ্রহণ করব?

সোভিয়েট জাতীয় পার্শ্বের উত্তরে আমি আত্মকে উঠব না। প্রকৃতপক্ষে রপ্তানিবাহু কোন বিষয়েই নতুন কোন তথ্য দিয়ে আমাকে চমকে দিতে পারবেন না। কিন্তু আমি বলি যে প্রত্যেক দেশেই সর্বহারা সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে বাধীন ভাবে সেই দেশের সর্বহারা জাতীয় একটি কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে, সেই দেশেরই জাতীয় ক্ষেত্রে। সর্বহারা কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে দুর্বল দেশগুলি শক্তিশালী দেশের দ্বারা প্রভাবিত হবেই এবং শক্তিশালী দেশগুলি দুর্বল দেশগুলিকে প্রভাবিত করবেই। এ কথা শুনে রপ্তানিবাহু কিসমত বিষয়টি নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করবেন মার্কি আমাকে অমার্কসবাদী বলে এই বিতর্ক থেকে ছুটি নেবেন?

পঞ্চম চৌপ্তী

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

১১ টাকার হার

বার্ষিক ২২ টাকা

মাসিক ১১ টাকা

ঐক্যমিত্র ৫.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠাবার ঠিকানা :

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, মট লেন। কলিকাতা ১৩

নির্বাচন ও মাতা-পুত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিগত উনিশ শতাব্দীর যাবত কথিত ছিল সরকারী ছক্কের মত, আর আদেশে সব রাজ্য সরকারগুলি ছিল কম্পান, যার অঙ্গুলিহেলনে করে কটি সুব্যমন্ত্রী পচাত হয়েছেন, অল্প কয়েকজন কোনমতে গদী আঁকড়ে বসেছেন, আর জীপ থেকে পড়ে যাওয়া চল্লিশ অল্প কাউকে তুলে আনতে না দিয়ে অনেক সুব্যমন্ত্রী খরং সেই মহৎ কাউটি সম্পূর্ণ করেছেন, সেই সঙ্গর গান্ধী কিনা এখন নির্বাচনী মিটিং-এ উপস্থিত হবার সাহস হারিয়েছেন।

নির্বাচন একপ্রকারের খ্যাতি। প্রধানমন্ত্রীও এই অবস্থা মেনে নিয়েছেন। এই না সেদিন নভেম্বর মাসের ২২শে, গৌহাটিতে তিনি বলেছিলেন যুব কংগ্রেস কংগ্রেসের পালের দ্বাৰা হাওয়া কেড়ে নিয়েছে? ২৩শে

ডিসেম্বর কংগ্রেস কর্মীদের ট্রেনিং ক্যাম্পে আরও একথা এগিয়ে প্রধান মন্ত্রী এও কি বলেন নি. যে, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে তাঁর নির্বাচন অবৈধ ঘোষিত হবার পর যখন তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন হল তখন তাঁর আশেপাশে খুব বেশী অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল না। সঙ্গর তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন, বা কহা সম্ভব তিনি ভাই করলেন। অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীকে সংকট মুহুর্তে বাঁচিয়েছে কংগ্রেস নয়, বাঁচিয়েছেন সঙ্গর। সংগঠন হিসাবে কংগ্রেসের উপর এর থেকে অধিক অমান্য প্রকাশ করা কি সম্ভব?

সি পি আই সঙ্ঘে সঙ্গর গান্ধীর মতামত বেড়িও টেলিভিশন ও নিরস্ত্রিত সংবাদপত্র মারফৎ বহুবার প্রচারিত হয়েছে—“সি পি আই একটি দেশ-

অর্থ নৈতিক অগ্রগতির চেহারা

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

আর্থ উৎপাদনে সামান্য বৃদ্ধি, পাট উৎপাদনে স্থিরতা এবং তুল্য উৎপাদনে কমতি দেখা দিয়েছে। কিন্তু ১৯৭৫-৭৬ কে যদি ১৯৭০-৭১-৭২র সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, এই পাঁচ বছরে পাঁচটি কৃষি পণ্যই সামান্য বৃদ্ধি ঘটেছে। ১৯৭০-৭১ রের সংগে ১৯৭৫-৭৬ রের এবং ১৯৭৪-৭৫ রের সংগে ১৯৭৫-৭৬ রের তুলনা করলে উৎপাদন-কৃতিত্বের বেলায়না পাওয়া যায় : তাতে শ্রীমতী গান্ধীর উপদেশটাদের কোন আত্মতৃপ্তি থাকা উচিত নয়। বাস্তবতা ও তৈলবীজ—স্বস্তির উপরে নির্ভরশীল এই ফসল দুটির উৎপাদন ১৯৭০-৭১ এবং ১৯৭৫-৭৬ সনগুলিতে ভাল হয়েছিল এবং স্বস্তির অন্তর্ভুক্ত বচরগুলিতে তাদের উৎপাদনের বৃদ্ধি-নামমাত্র। এর অর্থ হল এই দুটি ফসলের চাষে প্রযুক্তিবিদ্যাগত কোন উন্নতিই হয়নি। তবে খরাপ্রসূতি ১৯৭৪-৭৫ সনের পরিমাণকে যদি আমরা এই বছর দুটির সঙ্গে তুলনা করি তাহলে এই দুই ফসলের বৃদ্ধি খুব বেশি মনে হবে।

অপর পক্ষে আর্থ, তুল্য ও পাট বৃষ্টির উপর কম এবং মাহুকের তৈরি সেতের উপর অধিক নির্ভরশীল বলে এই চার বছরের উৎপাদন বৃদ্ধির ছবি ১৯৭৫-৭৬ সালের মতই শোচনীয়। এর মানে হল এই ফসলগুলির চাষে প্রযুক্তিগত উন্নতি প্রায় হয়নি বললেই চলে।

বছর ১৯৭১ সালের আগে এই পাঁচটি ফসলের বৃদ্ধির হারের সংগে ১৯৭১-৭২র পরবর্তী পাঁচ বছরের তুলনা করলে দেখা যাবে যে, প্রকৃতপক্ষে অবনতিই ঘটেছে। নীচের টেবিলে এই দুই কালের বৃদ্ধির হারের তুলনামূলক হিসাব তুলে ধরা হল।

৩ নং টেবিল

ফসল	১৯৪১-৪২	শতাংশ/বছর	৫ম পরিবর্তন
			মহামাত্রা
		১৯৭০-৭১	১৯৭০-৭৪
	১৯৭১-৭২	থেকে	থেকে
		১৯৭৫-৭৬	১৯৭৫-৭২
খাদ্যশস্য	২.৮	১.৭	৪.৪
তৈলবীজ	২.৮	১.৪	৪.৯
আর্থ	৩.৮	২.৬	৪.৩
তুল্য	৩.২	২.০	৪.৩
পাট	৪.০	০.৪	২.৩

পরিবর্তনের জন্য এম-পিদের পরামর্শ সমিতির ৫ আগস্ট ১৯৭৬ তারিখের কর্মসূচী টীকার ভিত্তিতে।

জোহী সংগঠন"। শুই ২৩শে ডিসেম্বরের সভারই শ্রীমতী গান্ধী সঙ্গের বক্তব্যের পুনরুক্তি করে বলেন, "সঙ্গের সঙ্গে আমার কোন মতভেদ নেই।" আজ কি তবে সঙ্গকেও বিসর্জন দিতে তিনি প্রস্তুত হয়েছেন নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার উদ্দেশ্যে? রাজেশ্বর রাও বলেই কলেছেন, সি পি আই-র সহযোগিতা পাবার জন্য কংগ্রেস নেতারা আমায়ের অফিসের চার দিকে ঘোরা ফোঁকা করছেন।

গত সপ্তাহে আমলবাড়ীর পত্রিকার এক টি সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদটি এই : নির্বাচনী নীতি নির্ধারণ এবং নির্বাচনের কাজ চালাবার জন্য একটি উচ্চসমতা-মূলক কমিটি গঠিত হয়েছে। এই : কমিটির সভ্য চার জন। তাঁরা হচ্ছেন, শ্রীদেবকান্ত বরুয়া, শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়, শ্রীজয়ী প্যাটেল এবং শ্রীচন্দ্রজিৎ যাদব।

এই চারজনই চাইতেন সি পি আইর সংগে মিলেমিলে কাজ করতে এবং এই চারজনের উপরেই সঙ্গর ছিল বশ্যবস্ত। বরুনা প্যাটেলকে বোম্বাই কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন শ্রীসঙ্গর গান্ধী আর কিছুদিন হল। সিদ্ধার্থ রায়কে বরাবরী জন্য এই সঙ্গর গান্ধীর জীড়নক হয়ে কাজ করেছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রবল মুখোপাধ্যায় আর গণিধান চৌধুরী। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে সঙ্গর কমল মাধবের অনুচরবৃন্দ। মুক্ত প্রদেশের চন্দ্রজিৎ যাদব তো এককালে সি পি আই-র সদস্যই ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী এদের হাতেই আজ নির্বাচনের সব দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন। একবার যদি সফলভাবে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া যায় তার পরে কী হবে তা তখন দেখা যাবে।

কংগ্রেসের একটি কমিটির নাম কেন্দ্রীয় অভিযান কমিটি (Central Campaign Committee)। সভাপতি ছিলেন জগজীবন রাম। তাঁকে দুটো অগম্য করে রাখা হয়েছিল, কমিটির সব কাজ করতে সঙ্গের অন্ততম অপারেটর যশপাল কাপুর। কাপুরের নাম আপনাদের মনে আছে হয়ত। প্রধান মন্ত্রীর নির্বাচনী মামলার লোকটিকে আদালতে বহা বাকী পোহাতে হয়েছিল। এই ক্যাম্পেই কমিটি পরিণত হয়েছিল যুব কংগ্রেসের একটি হাতিয়ারে। কংগ্রেসের অন্যান্য ফ্রন্ট সংগঠনের মত এর আর্থিক ক্ষমতা ছিল অসামান্য।

বরুনা সিদ্ধার্থ রায়, প্যাটেল ও যাদবের সংগে পরামর্শ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সিদ্ধান্ত হয়েছে নির্বাচনী কোন ব্যাপারে শুই ক্যাম্পেই কমিটির কোন হাত থাকবে না, অন্তত সঙ্গর, যশপাল কাপুর এবং তাদের সাহায্যদেয়। সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর নিকট দাবী সি পি আই-র নেতারাও—যশ্বরাজেশ্বর রাও, ভূপেশ গুপ্ত ও এন. কে. কৃষ্ণ—তুলেছিলেন। সমূহ বিপদ ত্রেকা দিতে প্রধান মন্ত্রী তা মেনে নিয়েছেন।

সি পি আই খুশিতে গদগদ। সি পি আই নেতৃবৃন্দের সংগে সঙ্গর-বিরোধী যুবকংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পদার-আড়ালে বে ঘোকাপড়া হয়েছিল তাতে কোন চিড় ধরে নি তো? এই সঙ্গর বিরোধীরাই শেষ অবধি সিদ্ধার্থ রায়কে বাঁচিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের ক্ষমতার দুর্গ ভাঙছে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

নির্বাচনে উক্ত রাজনৈতিক বিজ্ঞান শক্তি—আজ ভারতের রাজনীতিকে দ্বিমুখকরণের চরমাবস্থার নিয়ে যেতে উদ্ভূত। নির্বাচনের ফল কি হবে তা হতে পারে তা জনগণবিশ্বাসে বিশ্বাসী, জেগী-সংগ্ৰামের পদ্ধতি : অস্বাভাবিক রাজনীতিজ্ঞরাই জানেন। বজ্র কারও বুঝতে এখনও দেয়ী হয়, ভারতে কোন ধরনের সর্বাঙ্গিকবাদী সরকার কয়েক বছরে, তাহলে সে প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ার গুণ্ডাই কেন্দ্রীয় ভাষিবে প্রদত্ত রক্তাক্ত টোন ও বক্তব্য থেকে তা সমস্ত নিক : "আসন্ন নির্বাচনে কোনো বিধা অভিযোগ, কটুক্তি, বা অপমানকর ঘোষণারোপ বরখাস্ত করা হবে না।...—বিরোধী দলগুলি তিরস্কারের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অন্তর্গত প্রশংসা করে এবং ভারতে যে গণতন্ত্র চলছে তা খেলো করে দেখায়।" একথা বলার পর খর-

গ্রাম উচ্চ পর্যায় উড়িয়ে তিনি আরও জের টানলেন : "যদি তারা আমাদের দেশের গণতন্ত্র পছন্দ না করে তো তারা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে, অথবা যে-দেশ তাদের পছন্দ সেখানে। কিন্তু যাক তারা। আমরা তাদেরকে এখানে চাই না।"

হার পাঠক, যদি আপনার কখনও উদ্ভ্রাজ হয়ে থাকে, কোনো বিদেশী মুকুকে সকল ভাবে পরীক্ষিত রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রশংসা করার, তাহলে জেনে রাখুন, এদেশে আপনার ঠাই নেই। বর্তমান শাসকদল উন্মত্ত শতাব্দীর মূরোপে উদ্ভ্রাজ্যীয়কাবাদী দল বা সরকারের মনোভাবী অস্বভাবের অহুকরণ করে আপনাকে চিরতরে নির্বাসন দেবে। (চলছে)

ব্যবসায়ীরা টাকা দিলেন

(দর্পণের সংবাদমাতা)

কংগ্রেসী নির্বাচনী তরীতে পশ্চিম বঙ্গের ব্যবসায়ীদের পসরা তুলতে শুরু করেছে। দর্পণের সংবাদমাতা বিশ্বস্ত হুজ্জৎ জানতে পেরেছে যে, গত সপ্তাহে এ রাজ্যের ব্যবসায়ীদের তিনটি প্রধান সংস্থা কেন্দ্রীয় এই মন্ত্রীর হাতে তিনকোটি চোদ্দ লক্ষ টাকা নির্বাচনে খরচের জন্য তুলে দিয়েছে।

লোকসভার নির্বাচনে এক একজন কংগ্রেস প্রার্থীর খরচ করা হয়েছে দুই লক্ষ টাকা। নির্বাচনী ব্যাভারের সঙ্গে বাদের পরিচর আছে তাঁরা জানেন, কেবলমাত্র অফিস চালাতে আর কর্মীদের চা-পান বোগাতিতে, কংগ্রেস প্রার্থীরা খরচ করেন লাখখানেক টাকা। নির্বাচনের পুরো ব্যয় দশ লক্ষ টাকার কম হয় না। তবে এ হিসাব চিরকালই পাথর চাপা পড়ে থাকে।

দর্পণের সংবাদমাতার ধর, কেন্দ্রীয় দুইজন মন্ত্রী প্রথম কিস্তিতে এই টাকা সংগ্রহ করেছেন। আরও সাতকোটি টাকার তহবিল পূর্ণ করার জন্য তাঁরা এমালের শেষ সপ্তাহে আবার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিলিত হবেন। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যেম এখনই ছ হু করে নষ্ট যাচ্ছে তার জন্য মন্ত্রীদের ব্যবসায়ী সংস্থাগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তবে মন্ত্রীদের কাছ থেকে ব্যবসায়ী মহলের অবস্ত পাকা আশ্বাস মিলেছে, আখেরে তাদের কপাল খুবে। চালাও ব্যবসা আর চড়া বাজার দরে সরকার কোন বাগড়া দেবে না।

নির্বাচন কংগ্রেসের গরিষ্ঠতা লাভ

সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধী নিজেই সন্দিহান

দুপল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে খোদ ইন্দিরা গান্ধীই সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। নির্বাচন ঘোষণা করার সময় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর তাঁকে জানিয়েছিল যে কংগ্রেস তিনশো দশের মতন আসন পাবেই এবং আবার সরকার গঠন করবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি ঘনিষ্ঠ

(শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রে কেবল ব্যবসায়ীদেরই উন্নতি হয়েছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কংগ্রেস আমাদের দেশের মাথার মত একটি বিশাল দেশ সমাজতন্ত্রের সমাজতন্ত্রের ধরা পড়েছে। আর। নীতি কবল করেছে। অতএব যারাই কংগ্রেস বিরোধী নীতি আঁকড়ে আছে তারাই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শত্রু, তাদের বিনাশ কর। দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা কিছু কম হৈঁচৈ করেছে—ভারতের

(শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

সবত্র বিদ্রোহী কংগ্রেসীরা সক্রিয়

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মুখ্যমন্ত্রীর হুমকী সত্ত্বেও বিদ্রোহী কংগ্রেস প্রার্থী একজনও নাম প্রত্যাহার করেননি। বলাবাহুল্য রাজ্যের পনেরো জন কংগ্রেস কর্মী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিজদলের প্রার্থী অথবা সহযোগী সি পি আই এর বিরুদ্ধে মনোনয়ন দাখিল করেছেন।

নাম প্রত্যাহারের দিন শেষ হওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ মেসেজ দিয়ে জেলা কংগ্রেস সভাপতি ও সম্পাদকের ডেকে ডেকে ধমক দিয়ে বলেছেন যে, অবিলম্বে নিজ জেলার বিদ্রোহী প্রার্থীদের নাম প্রত্যাহার করতে বসুন না হলে আপনাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এতে ফল হয়েছে উল্টো। প্রথমে সংখ্যা ছিল বারো, এখন তা বেড়ে চোদ্দ জন প্রার্থী হয়েছে।

অনেক জেলা কংগ্রেস সম্পাদককে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কক্ষ ডেকে বলেন, আপনি অমুককে নাম প্রত্যাহার করতে বসুন, জেলা কংগ্রেস সম্পাদক মহাশয় উত্তরে বলেন ও তো হল ছেড়ে চলে গেছে, আমার কথা শুনবে না। এই কথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী চটে লাল। বলেন দরকার হলে আমি জেলা কংগ্রেস ভেঙে দেব, এ্যারেট্ট করব, আপনি যান প্রার্থীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

সবচেয়ে তোলপাড় হয়েছে তরুণকান্তি ঘোষের সি এ শ্যামল চ্যাটার্জীর প্রার্থীপদ নিয়ে। শ্যামলবাবু বারাসতে সি পি আই প্রার্থী রঞ্জন সেনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এ ব্যাপারে তরুণকান্তি ঘোষকে এবং জেলার অন্যান্য নেতাদের ডেকে শ্যামলবাবুর নাম প্রত্যাহার করে নিতে বলেছেন, কিন্তু তা শ্যামলবাবু প্রত্যাহার করেন নি।

মুখ্যমন্ত্রীর অসত্য ও আপত্তিকর উক্তির প্রতিবাদ

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায় সম্প্রতি বলেছেন যে, এই রাষ্ট্রে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং এখনও যারা আটক আছে তারা সকলে সমাজ বিরোধী। তাঁর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে জেলে আটক 'অনীক' পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক দীপংকর চক্রবর্তী শ্রীমতী মীরা চক্রবর্তী দর্পণ সম্পাদককে একটি চিঠি দিয়েছেন। চিঠিটি নীচে প্রকাশ করা হল।

দর্পণ সম্পাদক মহোদয়—

মহাশয়

সম্প্রতি সংবাদপত্রে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য পড়ে স্তম্ভিত হলাম। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে বর্তমানে আর কোন রাজনৈতিক বন্দী নেই, মিসার ১৬-এ ধারায় আটক সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, যারা এখনও আটক আছে তারা হচ্ছে 'সমাজ-বিরোধী'—হিংসাত্মক কার্যকলাপ, গুণ্ডামি, আগলিৎ ওয়াগন-ভাঙ্গা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত।

এদিকে সি পি আই প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে মুখ্যমন্ত্রীর ওপর। কারণ সি পি আই বুঝে নিয়েছে চাপানো সিদ্ধান্তে কংগ্রেসীদের প্রতিক্রিয়া মোটেই ভাল হয়নি। বর্তমানে যে অবস্থা চলছে তাতে বলা যায় যে আটটি আসনের মধ্যে একটি ছুটি ছাড়া বাকী সব কটি আসনে সি পি আই-এর পরাজয় নিশ্চিত।

মুখ্যমন্ত্রী হাঙড়া জেলায় ঘন ঘন-গিয়েও ওখানকার কংগ্রেসী বিরোধ মেটাতে পারছেন না। বরঞ্চ নিজস্ব মর্ফক-রাই এখন প্রচণ্ড চটে আছেন। মন্ত্রী প্রহস্তুকান্তি ঘোষের বাড়ীতে সভা করে মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসীদের একজোট কাজ করতে বলেছেন গত সোমবার রাতে। এতে কোন ফল হয়েছে বলে শোনা যায় নি।

প্রধানমন্ত্রীর তলব অগ্রাহ্য

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জানা গেল, গত শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা কলকাতার রাজভবনে যখন অবস্থান করছিলেন, তখন এই নির্বাচনে যেসব বিদ্রোহী কংগ্রেসী নির্ভল প্রার্থী রূপে দাঁড়িয়েছেন তাদের কয়েকজনকে ডেকে পাঠানো হয়। কিন্তু সরকারী স্তরে তাদের কাছে জরুরী বার্তা পাঠানো সত্ত্বেও তারা কেউ প্রধানমন্ত্রীর তলবকে মান্য করেন নি। প্রধানমন্ত্রী তাদের অন্ত রাজি এগারোটা পূর্ণ অপরূপ করেছিলেন বলে জানা গেছে। তারা কি সঞ্জয় গান্ধীর লোক বলে তাদের ডাকা হয়েছিল?

সাবধান! ডায়মণ্ডহারবার কেন্দ্রে কারচুপির চক্রান্ত চলছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত মঙ্গলবার প্রেস ক্লাব আয়োজিত 'মিট ড প্রেস' অস্ট্রানে এক প্রবন্ধের উত্তরে সি পি আই (এম) নেতা শ্রীজ্যোতি বহু বলেন যে এবারের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কারচুপি হতে পারে, তবে সারা ভারতে ব্যাপকভাবে হওয়ার সম্ভাবনা কম।

দর্পণ গোপন সূত্রে জানতে পেরেছে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দল বিরোধী দলের কয়েকজন প্রার্থীকে কারচুপি ও অত্যাচার উপায়ে পরাজিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত তালিকায় এক নম্বর নাম সি পি আই (এম) প্রার্থী শ্রীজ্যোতি বহু। গত পার্লামেন্টের বিভিন্ন অধিবেশনে শ্রীবহু যেভাবে শাসকদল ও তার নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মূখোশ খুলে দিয়েছেন তাতে ওরা ভীষণ সন্তুষ্ট, তাই যে কোন উপায়ে আগামী পার্লামেন্টে শ্রীবহুর আসন গ্রহণ রোধ করতে চায়। এবং ওরা এটাও জানে যে অবাধ ও ভ্রাসদত্ত নির্বাচন হলে শ্রীজ্যোতি বহুকে পরাজিত করার সাধ্য ওদের নেই।

রাজ্যের নির্বাচনী চিত্র

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্যে নির্বাচনী হাওয়া আর জনগণের কাছে আহ্বান বইতে শুরু করেছে। রাজ্যে ৪২টি লোকসভা আসনে অন্তত বারোটিতে শাসক কংগ্রেস বিরোধী দল ছাড়াও বিদ্রোহী কংগ্রেসীদের মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হবে। শাসক কংগ্রেস মহলে এখন এক-নিরাশার ভাব, যদিও রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি নানাভাবে তালি দিয়ে নিজেদের বাঁচাতে চেষ্টা করছেন। সর্বভারতীয় স্তরে যে বিরোধী প্রতিপক্ষের জয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাতে মাতান মহলেও আতঙ্ক দেখা দিচ্ছে। তবে শাসকদল পুলিশ ও মাতান যে ব্যবহার করবে না এটা মনে হয় না। ইতিমধ্যেই খড়দহ, ব্যারাকপুর, ডায়মণ্ড হারবার কেন্দ্রে শাসকদলের চমুরা হামলা শুরু করেছে। গুণ্ডামি ও হামলারাজি রোখার জন্য সম্মিলিত বিরোধী জোট, জনতা পার্টি ও গণতন্ত্রের অন্য কংগ্রেস

জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছে।

এই নির্বাচনের অন্ততম তাৎপর্য হচ্ছে যে, শাসক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমস্ত বিরোধী দল আজ এককাঠী। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি নিষ্ঠার সঙ্গে এই বিরোধী মোর্চা গঠনে তৎপর এবং পার্টির দৈনিক 'গণশক্তিতে' কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বামপন্থী জোট জনতা ও গণতন্ত্রের জুড়ে কংগ্রেসকে ভোট দেবার জন্য প্রত্যহ আহ্বান জানানো হচ্ছে। বিরোধী দলগুলোর অন্যান্য শরিকরা অবশ্য এখনো এই ভাবে যুক্তফ্রন্ট গড়ার জন্য এগিয়ে আসছেন না। তবে বহু অঞ্চলে সংগঠন কংগ্রেসের কর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট কর্মীরা কাজে নেমেছেন।

কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ কলহ এত (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

সংবাদ

ভাবুন এবং তারপর ভোট দিন

আপনি কী নিজ বাসভূমে পরবাসী হতে চান? না কি দেশটাকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসেন?

দেশের জ্ঞান স্বার্থত্যাগ কী আপনার কারুর থেকে কম? তাহলে এ দেশের ভাগ্যের সঙ্গে আপনিও জড়িত। কাজেই তার ভালোমন্দের দায়িত্ব আপনারও। আপনাকে দেখতে হবে দেশের জন্য এই চিন্তাকে লোপাট করে দিয়ে কেউ যেন সেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা না কায়েম করে। কারণ স্বদেশে থেকে পরবাসী থাকার বেদনা অসহনীয়।

বিগত কয়েক সালে আপনি দেখেছেন একজনের অন্যায় ভাবে গদি আকড়ে থাকবার জন্যে দেশকে বিপর্যয়ের পথে টেনে নামানো হয়েছে।

বিচার ব্যবস্থার পবিত্র ঐতিহ্যকে পদদলিত করে আওয়াজ তোলা হয়েছে 'আদালতের রায় মানি না, মানছি না'। পৃথিবীর ইতিহাসে এ-জাতীয় কুৎসিত নজির বিরল।

দেশের প্রতিটি মানুষের আত্মসম্মানকে বলাৎকার করে ঘোষণা করা হয়েছে 'ইণ্ডিয়া ইজ ইন্দিরা, ইন্দিরা ইজ ইণ্ডিয়া'। যেন এই দেশটা ব্যক্তিবিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি, আর দেশের মানুষ তার নোকর।

আপনি কী 'রাজবংশের' শাসন চান? একটি পরিবারের স্বৈচ্ছাচারের উপর আপনার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে?

একটি মানুষকে গদিতে চিরস্থায়ী করবার জন্যে জরুরি ব্যবস্থার শৃঙ্খল?

একটি মানুষের জন্যে দেশের প্রতিটি নাগরিকের বিনা বিচারে আটকাধীন হবার ঝুঁকু খড়গ?

চিন্তার স্বাধীনতা, বলবার স্বাধীনতা, লেখবার স্বাধীনতাকে কী আপনি বন্ধক দিতে চান?

বাঁচবার জন্যে লড়াইয়ে একতাবদ্ধ হওয়া, সংগঠন করা, আন্দোলন করার অধিকার কী আপনি হারাতে চান?

জেসপ কোম্পানীতে বন্ধ আক্রমণ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সরকারী পরিচালনাধীন জেসপ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ জরুরী অবস্থার অপব্যবহার করে কর্মচারীদের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছেন বলে কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সম্মতি অন্বেষণ করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ নিজেদের অপদার্থতা ক্রমে শ্রমিক কর্মচারীদের ওপর এই আক্রমণ চালিয়ে শিল্পে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছেন। ১৯৭৫-৭৬ সালে শ্রমিক কর্মচারীদের অস্বাস্থ্য পরিপ্রসার কলে কোম্পানী ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ের উৎপাদন করে যার ফলে দীর্ঘ দিনের ক্ষতি পূরণ করেও কোম্পানী ৩৮ লক্ষ টাকার মত লাভ করে। ১৯৭৬-৭৭ সালে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৮ কোটি টাকার উৎপাদন। কিন্তু গত দশ মাসে মাত্র ২৫ কোটি টাকার মত উৎপাদন হয়েছে। এই অস্বাভাবিক

উৎপাদন হ্রাসের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেই। আধুনিক যন্ত্রপাতি, দক্ষ শ্রমিক কর্মচারী কোন কিছুই ওভার নেই কোম্পানীর। ইউনিয়নের বক্তব্য বর্তমান কর্তৃপক্ষের অপদার্থতাই এর অন্য দায়ী।

কর্তৃপক্ষ সুপরিচালিত ভাবে শ্রমিক কর্মচারীদের ওপর নগ্ন আক্রমণ শুরু করেছেন। বরখাস্ত, শাসপেন্সন, চার্জশীট দেওয়া নিয়মিত চলছে। ১২০ জন এই আক্রমণের শিকার হয়েছেন। এর বিরুদ্ধে জেসপ কোম্পানীর কর্মচারীরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালাচ্ছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ইউনিয়ন চাইছে জেসপ কোম্পানীতে হুঁসিতি বন্ধ করার জন্য সি বি আইকে দিয়ে তদন্ত করানো হোক।

দুই মঞ্চ : এক লক্ষ্য

কালিদাস কুণ্ডু

আগামী লোকসভা-নির্বাচনকে সামনে রেখে পশ্চিম বাংলায় দুটি মঞ্চ নির্মিত হয়েছে। প্রথম হতে পারে, সমূহ লক্ষ্য বেখানে এক সেখানে একটি সাধারণ মঞ্চের পরিবর্তে দুটি মঞ্চ কেন?

বিগত তিন বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে। তীব্র অর্থনৈতিক সংকট শাসক শ্রেণীকে রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। সেই সংকটের মুখে পড়ে শাসক শ্রেণীর বা শ্রেণীগুলির স্থানীয় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলটি ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজনে সংসদীয় রীতিনীতিগুলিকে শুধু লঙ্ঘনই করেনি, বিচার ব্যবস্থার প্রচলিত নিরপেক্ষতাকে হুমকি করেছে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোকে সংকুচিত করেছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেছে, নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলোর পক্ষহীন করে দেছে এবং সর্বোপরি 'এক দল, এক নেত্রী' রণধ্বনি তুলে দেশের অভ্যন্তরে বৈরতন্ত্রের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে।

উপরোক্ত ঘটনাবলী যুগপৎ দুটো জরুরী অবস্থার খাসরোধকারী পরিস্থিতির মধ্যে সমগ্র দেশকে এক অভূতপূর্ব সংকটের মধ্যে নিমজ্জিত করেছে। এটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইতিপূর্বে ঘটেনি।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর আক্রমণ

বিগত আঠারো মাসে সংবাদপত্রের উপর যে ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তার নজির সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায়না। অথচ কে না জানে যে, আমাদের দেশের বৃহৎ ও বহুল প্রচারিত পত্রিকাগুলির অধিকাংশই বড় বড় শিল্পপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সব পত্রিকাগুলি স্বতাবতই বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে এমন একটা বিষম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে, এই সব পত্রিকার কঠোর কিছু কিছু প্রতিবাদ ও সমালোচনা বন্ধিত হতে থাকে। ক্ষমতাসীন দলের অহুদার, অসহিষ্ণু ও একনায়কত্ব-মূলক মনোভাব সেইটুকু বন্ধত্বপূর্ণ সমালোচনাকে বরদাস্ত করতে অস্বীকার করেছে। বিগত ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সব নেতা ও কর্মী সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন তাদের পক্ষে এমন

একটা অবস্থা ঘনসহ হয়ে ওঠে। তাঁরা অস্বপ্নাকার নারায়ণের নেতৃত্বে নাগরিকদের যৌথ অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে আসেন। সাধারণভাবে সমগ্র দেশে, বিশেষ করে হিন্দীভাষী প্রদেশগুলিতে এই সংগ্রাম ক্ষত বিক্ষত হয়ে গণঅভ্যুত্থানের রূপ ধারণ করে। সরকার বিচলিত হয়ে পড়েন। জরুরী অবস্থার মধ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। বিরোধী দলগুলোর হাজার হাজার কর্মী ও নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এমনকি শাসক দলের সর্বোচ্চ কমিটির সদস্যদেরও কারাবাসে রুদ্ধ করা হয়। সংবাদপত্রগুলির স্বাধীন কণ্ঠকেও স্তব্ধ করে দেওয়া হয়।

বিচার ব্যবস্থার উপর আক্রমণ
এলাহাবাদ হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়কে কেন্দ্র করে দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে। উত্তেজনায় সেই সব দিনগুলোতেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিকদের মধ্যে একটি মাত্র প্রশ্ন বিতর্কিত হতে থাকে—আমাদের বিচার-ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে কিনা? দেশের মানুষ স্তম্ভিত হয়ে দেখেছেন—বিচার ব্যবস্থার উপর পালিয়ামেন্টের আধিপত্যের প্রয়াম। তাঁরা দেখেছেন, Committed Judiciaryর নাম করে দীর্ঘ ঐতিহ্যের অবমাননা। অথচ কে না জানে, এই বিচার ব্যবস্থা জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্ত ও জনগণের বিচার ব্যবস্থা নয়। যে সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ইংরেজী শিক্ষিত পশ্চিমবঙ্গী গণতন্ত্রীরা এদেশে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পার হতে না হতেই তাকে লঙ্ঘন করে ব্যক্তি কর্তৃক গড়ে তোলার গরজ দেখা দিল। তাই শাসকশ্রেণীর প্রতিদু শক্তিগুলির মধ্যে ভারসাম্য টলে গেলো—তাঁরা বিস্তৃত হয়ে পড়ল। এটা সুস্পষ্টভাবেই শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক মতাদর্শগত রিস্রাস্তির প্রতিকলন। এখনও একথা মনে করার কারণ ঘটেনি যে, ভারতবর্ষের জাতীয় বুজোয়া বা বর্ধাঙ্গ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্ত তাদের ইতিহাস নির্দিষ্ট দেশ-প্রেমিক ভূমিকা পালনে এগিয়ে এসেছে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নাগরিকদের স্বাধীনতা, সভা সমিতি ও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার প্রাথমিক গণতন্ত্রের ন্যূনতম সর্বমাত্র। এই অধিকারগুলিকে সম্প্রসারিত করে

বৃহৎ ও ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্বমূলক পালন করতে পারে শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি স্থানীয় পার্টি।

কিন্তু অবস্থা এই যে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শে বিশ্বাসী পার্টি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সেই ভূমিকা পালনে এখনও যোগ্য হয়ে ওঠেনি। পশ্চিমবাংলা ও কেরালা ছাড়া সর্বত্রই তারা সংগঠনগতভাবে দুর্বল। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম একটি সর্বভারতীয় সংগ্রাম।

তাই অবশিষ্ট প্রদেশগুলিতে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনে উজ্জ্বল পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।

মার্চের আগামী লোকসভা নির্বাচন সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। এই নির্বাচনকে রাজনৈতিক সংগ্রামের পর্যায়ে উন্নীত করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির উপর এসে পড়েছে।

দুই মঞ্চ কেন?

একথা সুকোবার কিছু নেই যে, কংগ্রেসের বিকল্প শক্তি জনতা পার্টি নয়। জনতা পার্টির আভ্যন্তরীণ অংশীদারদের অনেকেই বিগত দিনে কংগ্রেস সরকার ও দলের নেতৃত্বে দিয়েছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের মৌলিক পার্থক্যও চোখে পড়বার মতো নয়। বগড়া আল আছে—কাল নাও থাকতে পারে। জনগণ বসে থাকবেনা। তাদের এগুতে হবে। সেখানে কারা নেতৃত্ব দেবে? সেই নেতৃত্বের শক্তিকেই সংহত করতে হবে। স্বাভাবিক বজায় রেখে। তার বর্তমান স্বতন্ত্র সত্তা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আজ দুর্বল হলেও আগামী দিনে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সেই হবে বিকল্প, সদর্থক শক্তি। তাই সমূহ লক্ষ্য এক হলেও, দূরবর্তী লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি দ্বিতীয় মঞ্চ নির্মাণের ও সম্প্রসারিত করার কাজ এসে পড়েছে।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

১১ চাঁদার হার।

বার্ষিক ২২ টাকা

বাৎসরিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার ঠিকানা :

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, মট লেন। কলিকাতা ১৩

নির্বাচনী বুলেটিন (১)

বিভিন্ন দলের কোণী বিচার

কালিদাস কাক্সিলাল

জনতা পার্টির বৈশিষ্ট্য

স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী সেনাপতিরা এই পার্টির নেতৃত্বে রয়েছেন।

এই পার্টি যারা পরিচালনা করছেন তাঁরা শুধু নেতৃত্ব ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক নন, নেতৃত্বের আত্মভাষন তথা প্রজ্ঞাভাষন সহকর্মীও তাঁরা।

ভারতের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী সমাজের সমর্থক দল এই পার্টি।

মহাত্মা গান্ধীর পুত্র, নেতাজীর ভ্রাতৃপুত্র, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, এমন কি ভি, ভি, গিরির পুত্রও সক্রিয়ভাবে মদত দিচ্ছেন এই পার্টিতে।

অবিভক্ত কংগ্রেসের প্রেষ্ঠ ও পরীক্ষিত নেতারা সবাই এই পার্টির সঙ্গে যুক্ত আছেন।

এই পার্টির নেতারা স্ববিধাবাদী নন এবং আদর্শ বিসর্জন দিয়ে বড় বড় সরকারী পদের জন্তে লালসিত নন। সেটা সংশয়ভীতভাবে প্রমাণ হয়েছে গত ১০ বছরে। কারণ অল্প অনেকের মত এঁরাও তো ইন্দিরা গান্ধীর বৈরাচারী শাসন সমর্থন করে যে কোনও সময়ে মন্ত্রী বা শাসন দলের হোমরা-চোমরা হয়ে বসতে এবং যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতেও পারতেন। কিন্তু নীতি বিসর্জন দিয়ে তা করেননি।

এই পার্টির নেতারা দেশে গণতন্ত্রের পতাকা উড্ডীন রাখতে গিয়েই ইন্দিরা-সরকারের কোপে পড়েছেন। এমন কি গত ১১ মাস বাবু নির্মম বন্দী জীবন পর্যন্ত বরণ করেছেন স্বাধীন ভারতের কারাগারে।

এই পার্টির একমাত্র সহায় লবল জনগণের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ।

এই পার্টির নির্বাচনী ইচ্ছাহারা সম্পূর্ণভাবেই ঘোষণা করা হয়েছে, দেশবাসীর ব্যক্তি-স্বাধীনতা এই পার্টি কখনও নষ্ট করবে না, কিংবা অকারণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারও কখনও খর্ব করবে না, যেমন করেছে ইন্দিরা সরকার সি পি আই নেতাদের মদত নিয়ে।

এই পার্টির টিকি, বিদেশের কোনো অগণতান্ত্রিক সরকারের কাছে বাধা নয়। এই পার্টি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং জাতীয়তাবাদী। এই পার্টির মধ্যে ভণ্ডামির স্থান নেই মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও শঠতাবৃত্ত স্থান নেই। একজন নিজেকে বাঁচানোর জন্তে 'ইমার্জেন্সী' ঘোষণা করলেন, অথচ সারা বিশ্বে বারংবার প্রচার করলেন, উনি নাকি দেশকে বাঁচানোর জন্তে 'ইমার্জেন্সী' ঘোষণা করেছেন। ইমার্জেন্সীর সাহায্য ছাড়া উনি কি স্বপদে থাকতে পারতেন আজ পর্যন্ত?

এই পার্টির কোনো নেতাই দিল্লীর সিংহাসনে কারেম্বী মৌরসী স্বপ্ন বর্তাতে চান না।

এই পার্টির নেতারা জনগণের সেবক মাত্র, জনগণের প্রভু নন, কিংবা জনগণের 'মাষ্টার মশাই' নন। হুতরাং এই পার্টির নেতারা ছড়ি হাতে দেশবাসীকে 'মাস্তব' করতে কিংবা দেশবাসীকে 'শিক্ষা' দিতে আসবেন না। শুধু দেশবাসীর চতুর্থাৎ কষ্ট লাঘব করতেই চেষ্টা করবেন।

এই পার্টির নেতারা এবং কর্মীরা মহাত্মাজীবীর অহিংসা মন্ত্রের পুজারী।

এই পার্টি রাজ্যের মন্ত্রিসভা ও বিধানসভাগুলিকে কার্যতঃ ক্ষমতাচ্যুত করে রাজ্য-প্রশাসনকে কেন্দ্রের তাবে-দারিতে আনবে না সংবিধানের সম্পূর্ণ নীতিকে বুদ্ধান্ত্র দেবিয়ে। অর্থাৎ এককথায়, এই পার্টির ভারী প্রধানমন্ত্রী 'দিল্লীর সত্রাট' হয়ে বসার উচ্চাশা পোষণ করেন না।

এই পার্টি ক্ষমতায় এসে সর্বোচ্চ দেশের বেকার সমস্যা, শান্ত-সমস্যা, প্রবাসী সমস্যা, ধনবন্টনের অসামাজিক সমস্যা, পূর্ববঙ্গ ও বাংলাদেশ প্রত্যাগত সংসোধন শরণার্থীদের সমস্যা, শিক্ষাজগতের পুঞ্জীভূত সমস্যা ও অজ্ঞান নানা বকম জাতীয় সমস্যার হুঁই সমাধানে আত্মনিয়োগ করবে।

সি পি আই এর বৈশিষ্ট্য

সি পি আইকে রাজনৈতিক দলই বলা চলে না। এটা হচ্ছে কতকগুলি চরম স্ববিধাবাদী আদর্শহীন ও স্বার্থপর মানুষের ক্ষুদ্র একটা গোষ্ঠী।

এই দলের জন্ম হয়েছিল একদা মক্কা শহরে হুদ্র অতীতের এক অশুভ দিনে। এর জন্মদিনটা অশুভ এই জন্তে যে এর কোনো প্রতিষ্ঠাই হল না এতদিন পরেও।

এই দলটি অতীতে ছিল যেমন নেতৃত্বের দু'চোখের বিষ, এখন আবার হয়েছে তেমনি নেতৃত্ব-কন্ডারও দু'চোখের বিষ। ইন্দিরার সাম্প্রতিক সি পি আই বিরোধী বক্তৃতা ই তার প্রমাণ। যদিও কংগ্রেস সি পি আই মৈত্রীর ভাঙ্গন এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

এই দল কোনো কোনো রাজ্যে শাসক পার্টির সঙ্গে, আবার কোনো রাজ্যে বিরোধী পার্টির সঙ্গে সমঝোতা করে বিশ্বাসীকে অবাক করে দিয়েছে।

এই দলের দুরূহীরা গণতন্ত্রের শত্রু এবং মক্কার এমেন্ট। হুতরাং এঁরা যে-কি বকম গণতন্ত্র-ভক্ত, তা সহজেই বোঝা যায়।

এই দল নাকি অ-সাম্প্রদায়িক দল। অথচ এরাই কিন্তু কেবলে মুসলীম লীগের প্রধান শরিক।

এই দল নানা কৌশলে ইন্দিরাকে ডুবিয়েছে, ডুবাচ্ছে এবং আরও ডুবাতে।

এই দল ভারতের জাতীয় মহলায়ল্য নিয়ে মাথা ঘামায় না—দলের নেতারা মুখে বাই বলুন। কারণ এঁদের আসল পিতৃভূমি হচ্ছে রাশিয়া।

ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি এই দলের আন্তরিক প্রজ্ঞা নেই।

এই দল আজ প্রায় প্রকাশ্যেই ইন্দিরা-বিরোধী। শুধু ইন্দিরা ক্ষমতায় আছেন—তাই সরকারী স্বযোগ স্ববিধা লুণ্ঠবার আশায় এরা এখনও ইন্দিরার পেছনে ঘুরছে।

কংগ্রেস ও কংগ্রেসী নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য

'কংগ্রেস' সম্বন্ধে সংক্ষেপে এইটুকু মাত্র বলা যায় যে এই দলের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান মাত্র একজন ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা বা মজির উপর নির্ভর করে।

এই দল আবার ক্ষমতায় এলে কি করবে বা আরো কত দূর পর্যন্ত এগোবে তা কেউ বলতে পারবে না। গত ১১ মাসের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে দেশবাসী আজ কংগ্রেসী শাসন সম্বন্ধে ভীত, সন্ত্রস্ত ও হতাশাগ্রস্ত। নুতন কংগ্রেসের বিগত ১১ বৎসর ব্যাপী কুশাসন ও খেচ্ছাচারী শাসন দেশবাসীর কোনো প্রত্যাশাই পূরণ করতে পারেনি। কোথায় গেল আজ নুতন কংগ্রেসের 'গরীবী হটাও' জোগানের সেই চমক। পুণ্যলোক এতাহাম লিঙ্কনের সঙ্গে হুই মিলিয়ে বক্তিত জাতি তাই আজ বলতে বাধ্য হচ্ছে—'you can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time. but you can not fool all of the people all the time.'

কংগ্রেসের সর্বসর্বা শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা না জািয়েই একথা আজ নিঃস্বার্থ বলা যেতে পারে যে ওর মধ্যে গণতান্ত্রিক মানসিকতার একান্ত অভাব। ত্যাগ, সঙ্কল্প ও পক্ষপাতশূন্যতা ছাড়া একটা স্ববিশাল

দেশের সকল প্রধানমন্ত্রী হওয়া যায় না। ওর মধ্যে দেখছি মাজাতিরিক্ত দস্ত। উনি সমালোচনা সহ্য করতেই পারেন না। শ্রামাপ্রসাদের মত বাগ্মী, বিচক্ষণ ও তেজস্বী বিরোধী নেতার পাল্লায় পড়লে ইন্দিরা তো পাগল হয়েই যেতেন। শ্রামাপ্রসাদের তীব্রতম ভৎসনায়ও নেহরু কিন্তু ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন নি। কিন্তু ইন্দিরা জুড় হয়ে কি কাণ্ডই মা করলেন।

বংগের-নেত্রী দিল্লীর সিংহাসনখানি এবং ভারতবর্ষ নামক ৬০ কোটি নর-নারী অধুষিত এই বিশাল দেশটিকে ঘেন পৈত্রিক সম্পত্তি মনে করেন। উনি বছবার বলেছেন উনি ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার উপযুক্ত লোক আর দেশে নেই। অত্যন্ত আপত্তিকর এবং অশোভন এই উক্তি।

অকারণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে দেশবাসীর ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করার ফলে ইন্দিরা আজ জনগণের আস্থা হারিয়েছেন। জনগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করার জন্তেই কি তাঁকে ক্ষমতার আসনে বসানো হয়েছিল? এবার ক্ষমতা পেলে উনি না জানি কি করবেন? দেশের সাধারণ নির্বাচন চিরতরে বন্ধ করার জন্তে আবার সংবিধান সংশোধন হবে কি?

রাজ্য সরকারের পৃথক অস্তিত্ব ইন্দিরা যেন স্বীকারই করেন না। দেখে অবাক লাগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব সদস্ত, বিধানসভার বংগ্রেসী সদস্যরা এবং রাজ্যের ছোট, বড় ও মাঝারি কংগ্রেসী নেতারা বছরের ১ মাস কিংবা তারও বেশী দিল্লীতেই থাকেন। তবে আর রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভা কিংবা মন্ত্রিসভার দরকার কি? এসব কি সংবিধান সম্মত কাজ?

শ্রীমতী গান্ধীর ব্যাপারে আমরা দেখে স্তম্ভিত হয়েছি শ্রীমতী গান্ধীর অগণতান্ত্রিক ও অসংবিধানিক কাজকর্ম বত দূর পর্যন্ত এগোতে পারে।

সি, পি, এম-এর বৈশিষ্ট্য

এই দলটি ষোল আনা স্বদেশী দল। কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে এর টিকি বাধা নয়। এই দলের নেতারা যদি নুতন গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জনতা পার্টির সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করেন, তবে বিরোধীরা এবার কংগ্রেসকে পরাজিত করতে এবং ট্রেজারী বেঞ্চে স্থান করে নিতে পারবে।

এই দলে এমন নেতা এবং এমন কর্মীর অভাব নেই, যারা নিছক আদর্শের জন্তে বৃটিশ ভারতে ও স্বাধীন ভারতে অশেষ দুঃখ-দুর্দশা বরণ করেছেন এবং এখনও করছেন।

এই দলের মধ্যে ভণ্ডামি ও মিথ্যাচারের স্থান নেই।

এই দলের সংগঠন ভারতের অস্ত্র যে কোনও দলের চেয়ে বেশী মজবুত।

এই দলের যুবক কর্মীরা শুধু অশিক্ষিত নয়, ওরা শৃঙ্খলা-পরায়ণ, বিশ্বস্ত ও নিঃস্বার্থপর। আদর্শের জন্তে ওরা প্রাণ দিতেও পারে। এরা স্বযোগ-সন্ধানী ও স্ববিধাবাদী কাপুরুষ নয়।

রাজ্যের প্রশাসনে কেন্দ্রের মাতবরী কমানোই এই দলের অন্যতম লক্ষ্য।

এই দলে স্বযোগ্য কর্মীর যেমন অভাব নেই, স্বযোগ্য নেতারও অভাব নেই।

কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসির বৈশিষ্ট্য

এই দলটি নবজাত হলও প্রচুর সম্ভাবনাময় এই দল।

এই দলটি সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার সময় এখনও আসে নি বটে তবে সাধারণভাবে একথা বলা যায়, জনতা পার্টির প্রায় সব বৈশিষ্ট্যই এই দলে বর্তমান। এই দলের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জল।

ফরওয়ার্ড ব্লকের বৈশিষ্ট্য

নেতাজী স্বভাষচন্দ্র হাতে গড়া ফরওয়ার্ড ব্লক সম্বন্ধে বেশী বলার প্রয়োজন হয় না।

এই দল গরীবের দল, জনগণের দল।

নির্বাচন : বামপন্থী দলগুলির কত'বা

হিতেন ঘোষ

যদিও বিরোধী দলগুলির কেন্দ্রীয় সমাবেশে প্রচুর জনসমাগম হয়েছে, সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় আসন্ন নির্বাচনের তেমন উত্তাপ বা উত্তেজনা অনুভব করা যাচ্ছে না। এটাকে ঠিক নির্বাচন সম্পর্কে জনমানসের উদ্যোগীনতার অভিব্যক্তি বলে ভাবলে ভুল করা হবে। অহুত্ব গভীর বলেই হয়তো তার বহিঃপ্রকাশ এত কম। তালিয়ে দেখলে, এই আপাত অনীহার আরও গভীর কারণ রয়েছে। গণমানদের এই প্রত্যয়ক শাস্ত বা নির্নিপুণ ভাব বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত।

বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীরা তো বটেই, সাধারণ মানুষের কেউই নির্বাচন আশা করেন নি। অনেকে এমনও ভেবেছিলেন যে, শ্রীমতী গান্ধী হয়তো নির্বাচন নামক বস্তুটিও অজ্ঞাত মৌলিক অধিকারের সঙ্গে একেবারেই বাতিল করে দিলেন। অতীত, অবি-
শাস্ত কত জল্লাহই না চলেছে কীভাবে তিনি নির্বাচনের প্রয়োজন এড়াবেন, তাই নিয়ে। আর নিতান্তই যদি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয়, তবে তা এমনভাবে করা হবে যাতে শ্রীমতী গান্ধীর জয় সম্পর্কে কোন সংশয় না দেখা দেয়—তা জনগণের রায় যাই হোক না কেন।

অবশ্য ধারা, একটু ওয়াকিবহাল তাঁরা বরাবরই ভেবে এসেছেন, আজই হোক কালই হোক, জনগণের রায় শ্রীমতী গান্ধীকে চাইতেই হবে। সংবিধানে এর কোন বিকল্প নেই। সে ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে উদার সমালোচকেরাও ভেবেছেন নির্বাচন তখনই আসবে যখন শ্রীমতী গান্ধী বুঝবেন জয় তাঁর অনিবার্য।

নির্বাচন সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধীর কলাকৌশল নিয়ে এই বিচিত্র জল্পনার উৎস তাঁর নিজেরই কার্যকলাপ। যেভাবে তিনি নিজের দলের মধ্যে এবং সমগ্র দেশে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অধিকার করেছেন, তাতে একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে সেই ক্ষমতাকে স্থায়ী করার জন্য তিনি ব্যালটবাক্সের অনিশ্চয়তাকে প্রণয় দেখেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরনোর পর থেকে তিনি যেসব কাজ করেছেন তাতে দেশের উপর তাঁর নিজের কতৃৎকে অগণতান্ত্রিক উপায়ে হস্তাক্ষিত করার প্রয়াস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য তাঁর এই কার্যকলাপকে তিনি বিরোধী দলগুলির সৃষ্ট বিশৃঙ্খলক পরিস্থিতির হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য জরুরী ছিল বলে প্রচার করেছেন।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার কালে খুব অল্প লোকেই শ্রীমতী গান্ধীর এই তত্ত্ব বিশ্বাস করেছে। এখন আরও কম লোকই এই প্রচারে বিশ্বাস হচ্ছে। তাঁর নিজের দলে অন্তর্বিরোধ এখন তীব্র। দেশের তো নয়ই, এমন কি তাঁর নিজের দলের এক বা স্থায়ী প্রতীকও আর তাঁকে বলা চলে না। বিরোধীদলের নেতারাও এখন জনগণের চোখে শরতান বলে প্রতিভাত হচ্ছেন না।

কংগ্রেসের হাতে অবস্থা এখনও তুফানের ভাস হচ্ছে, কেন্দ্রে একমাত্র কংগ্রেস দলই স্থায়ী সরকার গঠন করতে সক্ষম। কিন্তু এই রাজনৈতিক স্থায়ীত্বের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে বর্তমান বৈরচাচারী শাসনের স্থায়ীত্ব যুক্ত হওয়ার ফলে জনগণের কাছে এর আবেদন হ্রাস পেয়েছে। জাতীয় স্থায়ী বা সমৃদ্ধির সম্ভাবনাবাদি শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি দাসত্বের পুরস্কাররূপে আসে তবে জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য।

কাজেই শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ীত্বের প্রসঙ্গটাই এই মুহূর্তে লোকের কাছে ততটা জরুরী বলে মনে নাও হতে পারে। সেদিক থেকে শ্রীমতী গান্ধীর প্রধান নির্বাচনী মূলধনের ক্ষমতা সীমিত হয়ে গেছে। তবে তিনি দেশের লোককে বিশ্বাস করতে পেরেছেন যে ঘটনা যেভাবেই মোড় নিক, তিনি ক্ষমতায় আসীন থাকার কৌশল জানেন। লোকে এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না যে, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের চেয়ে নির্বাচনে জনগণের রায়কে তিনি বেশী মর্যাদা দেবেন। যে কোন কৌশলে তিনি হয়তো ব্যালট বাক্সের রায়কে নিজের অহুত্ব প্রভাবিত করতে পারেন। নির্বাচনের পরেও জরুরী অবস্থা বহাল রাখতে পারেন। শিথিল বিধিনিষেধগুলি আবার চাপিয়ে দিতে পারেন। বিরোধীদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ আবার নিষিদ্ধ হতে পারে, এমনকি নতুন লোকসভার বহু সভা নির্বাচিত সদস্য কারাকন্ড হতে পারেন। বর্তমান সরকার হয়তো বিরোধী দলগুলির সদস্য ও অহুগামীদের উপর বধেছ আক্রমণ চালাতে পারে। এমন কি বিরোধীদের ভোট দেওয়ার জন্য সাধারণ নাগরিকদের উপর প্রতি-
হিংসার খড়া নেমে আসতে পারে।

জনগণের এইসব ভীতি ও সন্দেহ হয়তো ভিত্তিহীন। তবু সাধারণের মন থেকে এগুলো একেবারে মুছে ফেলা যাচ্ছে না। এবার যে নির্বাচন

সম্পর্কে সাধারণ লোকের মধ্যে তেমন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়নি, তার প্রধান কারণ এটাই। শ্রীমতী গান্ধীর ক্ষমতা-
চ্যুতি তাদের যতই কাম্য হোক তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না যে শেষ পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রী তাদের রায়কে অগ্রাহ্য করবেন না। তারা অনেক মাথা ঘামিয়েও বুঝে ওঠতে পারছেন না দিল্লীস্থরী দেশের উপর সর্বময় কতৃৎ অর্জন করেও অবশেষে কেন এই নির্বাচনের আহ্বান দিলেন। হেরে গেলেও যে শেষ পর্যন্ত তিনি গদী ছাড়বেন না, এরকম সন্দেহের জন্য তাদের দোষ দেওয়া যায় না।

এই কারণেই কয়েকজন সর্বভার-
তীয় বিরোধী নেতা, বিশেষত জয়-
প্রকাশ নারায়ণ, দেশের মানুষকে বুঝাতে চেষ্টা করছেন যে, নির্বাচনের অহুত্বান-না করে শ্রীমতী গান্ধীর গত্যন্তর ছিল না। নিঃকুণ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েও প্রধান মন্ত্রীকে জন-
সমর্থন পেতে হবে নিজের শাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য। এই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাটুকু না নিলে শেষ পর্যন্ত সাম-
রিক চক্রের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হয়, আর তার অস্তিত্ব পরিণাম স্বরূপ দেশকে বিপ্লবের দিকে এগিয়ে দিতে হয়। রাজনৈতিক নির্বাচন ও আর্থিক দুর্দশায় জনমনে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে এখনই সাধারণ নির্বাচনের উপযুক্ত সময় বলে শ্রীমতী গান্ধীর মনে হয়েছে। আর কয়েক মাস দেরি হলে হয়তো নির্বাচনের ফল তাঁর দলের পক্ষে বিপর্যয়কর হতো। কেন জানি প্রধান মন্ত্রীর মনে হয়েছে, এই মুহূর্তে জনসাধারণ, পরবর্তী যে কোন সময়ের চেয়ে, কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ীত্বের মূল্য বেশী বুঝবে।

জনগণের রায় চাইবার পিছনে শ্রীমতী গান্ধীর মন্তলবের এই ব্যাখ্যা নির্বাচনের সার্থকতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সন্দেহ বা ভীতি দূর করতে সাহায্য করবে। কিন্তু বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার পরিণাম সম্পর্কে তাদের মনে যে আশংকা রয়েছে তা দূর করতে হলে বিরোধী দলগুলিকে যত শীঘ্র সম্ভব আরও সক্রিয় হতে হবে। খুব কম লোকই নির্বাচনে কারচুপি বা ভোটারদের ভীতি প্রদর্শনের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছে। জনতা পার্টি সারা দেশেই ভোটারদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম) ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি এখনও পর্যন্ত

অবাধ ও স্ফূর্তিত নির্বাচনের জন্য ও নির্বাচনী প্রচারে দলীয় কর্মীদের কাজ করার সুযোগের জন্য সরকারের কাছে প্রতিশ্রুতি চাওয়ার বেশী কিছু করেনি।

সন্দেহ নেই, সরকার প্রতিশ্রুতি খুব তৎপরতার সঙ্গেই দেবেন। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো ভোটারদের সঙ্গে দেখা করা ও তাদের ভোট দিতে বাওয়ার জন্য অহুত্ব করা। সি পি আই (এম) ও অন্যান্য বাম দলগুলি মনে হয় নির্বাচন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস রয়েছে তারই শিকার হয়েছে। কিন্তু তাদের এটা বুঝতে হবে যে শ্রীমতী গান্ধী কখনই সব সময়ে ঘটনাকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। ঘটনার একটা নিম্ন যুক্তি ও গতিধারা আছে, বাকি শ্রীমতী গান্ধী ও অগ্রাহ্য করতে পারেন না। তাঁর বর্ষে ছিন্ন আছে। বর্ষার মার্কসবাদীরা কখনও ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে শুভ মুহূর্তের অপেক্ষায় বসে থাকে না। ঘটনার নিম্ন গতিধারার নিয়ম অনুযায়ী তারা তাকে জনগণের স্বার্থে প্রত্যাশিত রূপ দিয়ে থাকে। চূঃধের বিষয় মার্কসবাদীরা নয়, জনতা পার্টির অন্ত-
ভুক্ত দলগুলিই বর্তমান ঘটনাধারাকে প্রভাবিত করার ক্ষমিকা নিয়েছে। শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্ব মার্কসবাদীরা অনেক নিধাতন করেছে, কিন্তু তাঁর শাসনকে দুর্বল করার ব্যাপারে তারা এতদিন প্রায় কিছুই করেনি।

এখন অবস্থা তারা অতিক্রান্ত ঘটনার আওতে গিয়ে পড়েছে এবং বর্তমান শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের চেউ জেগেছে তাতে তারাও সামিল হয়েছে। এই অবস্থায় তাদের কর্তব্য, ভয় ও অসহায় মনো-
ভাব ঝেড়ে ফেলা। তাদের এখন এই

আন্দোলনের পুরোভাগে তাদের ইতিহাস-নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করতে হবে। শ্রীমতী গান্ধীর বৈরচাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এই গণআন্দোলনের চেউকে একটা চূড়ান্ত লক্ষ্য দিকে পরিচালিত করার দায়িত্ব মার্কসবাদী-
দেরই। নানান অর্ধেই আসন্ন নির্বাচন এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে এসেছে। শুধু নিজেদের প্রার্থীর জন্যই নয়, বামপন্থী দলগুলিকে বিরোধী সকল প্রার্থীদের জেতাবার জন্যই চেষ্টা করতে হবে।

কংগ্রেস ও সি পি আই দলে এখন অহুত্বের বিশৃঙ্খল। কংগ্রেসের তথাকথিত প্রগতিশীল অংশ ও সি পি আই দল চোরকে চুরি করতে বলা ও গৃহস্থকে সজাগ থাকার নীতি নিয়েছে। ফলে প্রধান মন্ত্রীকে সমর্থন করেও যে তারা গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চায় একথা ভোটারদের বুঝানো তাদের পক্ষে আদৌ সহজ হবে না। বামপন্থী ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলি অন্যায়সেই তাদের মুখোশ খুলে দিতে পারবে। বিরোধীদের দলে গোপনে তাদের অনেকেই গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যথার্থ বাম দলগুলির সঙ্গে যোগ দেবে।

এতদিনে বামপন্থীদের উপলব্ধি করা উচিত যে, আসন্ন নির্বাচন শুধু কতগুলি তাত্ত্বিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম নয়। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম উন্নততর সমাজব্যবস্থার জন্য সংগ্রামেরই এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। আশু সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতেও এই সংগ্রাম সাধারণ মানুষের ক্ষমতা বোজগারের লড়াই। শ্রীমতী গান্ধীর সরকার সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপর কঠোর বিধিনিষেধ প্রয়োগ করেছে। দরিদ্র মানুষকে আজ মুখ বুজে দুঃখকষ্ট সহ্যে হচ্ছে। বামপন্থী দলগুলির কর্তব্য গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রসঙ্গটিকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করে উপস্থিত করা। ভবিষ্যতে বৃহত্তর ও গভীরতর গণ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা পর্ব হিসাবে এই নির্বাচনকে দেখতে ও দেখাতে হবে তাদের।

সরকারী কর্মচারীর ওপর অবিচার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সংখ্যালঘু ও মুসলিম সরকারী কর্মচারীদের প্রতি ওপরওয়ালার জুলুম ও বিমাতা হুলস্থল ব্যবহারের নানা অভিযোগ দর্পণে আসছে।

এই শ্রেণীর একজন ভুক্তভোগীর নাম রসিদ খোন্সা, বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। এর ক্যান্সার ছুটি নেই। আর্থ লীড নিলে গ্র্যান্ট করা হয় না। এর মাহিনা সব মাসে মেলা তার। ভয়ে ভয়ে থাকেন। অথচ অপরাধ কিছুই নেই। হের হন কর্তৃপক্ষের কাছে। প্রমোশন নেই পনেরো বছর।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিকিউজী বিহা-
বিলিটেশন দপ্তরের বদলি হয়ে গভর্ণমেন্ট রিকিউজী ৩৯ গোপাললাল ঠাকুর বোডে কেরাণীর পদে দিনগুজরান করছেন। দুচ্ছিত্তার ভাবনায় প্রায় পাগল হয়ে উঠেছেন। বছরে দুবার বদলীর অভিজ্ঞতাও আছে। এবার ওর ভয় কতৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত বিনা কারণে চাকুরী থেকে নেবেন হয়তো। দীর্ঘ বাইশ বছরের চাকুরীর দুঃখপূর্ণ অসহ। জাপ মন্ত্রী কিংবা মুখ্যমন্ত্রী কেউ কি এই হতভাগ্য সরকারী কর্মচারীর প্রতি দৃষ্টি দেবেন না?

জরুরী অবস্থায় অর্থনৈতিক অগ্রগতির আসল চেহারা (৪)

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ স্বামী

পূর্ববর্তী রাশিচক্র থেকে বোঝা যাবে যে ১৯৭১ এর পরবর্তী প্রত্যেকটি শতাব্দীর ফলে আমাদের কর্মক্ষমতা ক্রমাগত ভাবে নিম্ন থেকে নিম্নতর। তাছাড়া পঞ্চম পরিকল্পনার ধার্য প্রতিটি শতাব্দীর লক্ষ্যমাত্রা থেকে এদের বৃদ্ধিমাত্রা অনেক কম। এরূপ নিম্নগতি অল্প যে কোন সভ্যদেশের নেতাদের লক্ষ্যই অধোবদন করে দিত। কিন্তু ইন্দিরার ইতিহাসে শোচনীয়তার এই প্রদর্শনী-কেই 'উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব' এই গুল ভরা নামে আখ্যায়িত করা হয়।

আরো দুঃখের বিষয় এই যে, সরকারও জানে যে, তাদের বচনসর্ব্ব প্রচারের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে, প্রায় সমস্ত কৃষিশক্তির ক্ষেত্রেই তারা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নামিয়ে দিচ্ছে। যেমন ১৯৭৬-৭৭-এ খাদ্য শস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১৯৭৫-৭৬ এর চেয়ে ৩০ লক্ষ টন কম হবে। আবার পঞ্চম পরিকল্পনার শেষ বছর ১৯৭৮-৭৯ সনের লক্ষ্যমাত্রা ১৪ কোটি টন থেকে নামিয়ে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টন অর্থাৎ চতুর্থ পরিকল্পনার ১২ কোটি ২০ লক্ষ টন থেকেও কম করা হবে। তেমনি ১৯৭৮-৭৯ সনে ভোজ্য তৈলবীজের লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ২৫ লক্ষ টন থেকে কমান হবে ১ কোটি ২০ লক্ষ টনে। এই ঘটনাসমূহ থেকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, স্বয়ং শ্রীমতী গান্ধির নেতৃত্বে এই যে লক্ষ্যমাত্রাগুলিকে ছেঁটে দেওয়া হচ্ছে তা থেকেই সপ্রমাণ যে, 'কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখ্য' যে দাবি প্রচার করা হচ্ছে—সরকার ভালই জানেন যে, নির্বোধ জনতাকে ভুল বোঝানার ক্ষমতা কেবলই গরম হাওয়ায় ভরা; সার বস্ত্র তার মধ্যে কিছুই নেই। এর মধ্যে বিদ্যুৎমাত্র সত্যতাও যদি থাকত তাহলে তারা লক্ষ্যমাত্রা বাড়াতেন, কমাতেন না।

শ্রমশিল্পের উৎপাদনের ক্ষেত্রেও একই কাল্পনিক ছবি তৈরি করা হয়েছে। কয়েকটা পণ্যের ক্ষেত্রে যে উন্নতি হয়েছে তা হ'ল ১৯৭৩-৭৫ এর বছরগুলির মন্দার তুলনায়। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে পরিসংখ্যানগুলি যাচাই করলে 'শিল্পের ক্ষেত্রে অলৌকিক অগ্রগতির' আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে। বিশ্লেষণ এর পরে দেখা যায়।

সরকারী পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান যে, ১৯৭৫-এ শিল্পোৎপাদনের হ্রাসক সংখ্যা ৪% এর বেশি বেড়েছে, সম্ভবত ৪.৫%। এর সংগে তুলনীয় ১৯৭৪-৭৫ এর ২.৫% ও ১৯৭৩-৭৪ এর ০.২% বৃদ্ধিমান। কোন সরকারী বিজ্ঞাপনের তুলনাই ১৯৭৩-৭৪ এর পূর্ববর্তী উল্লেখ থাকে না। যেহেতু ইন্দিরা

প্রাক্তি প্রধান মন্ত্রী আছেন জাহ্নগিরি ১৯৬৬ থেকে অতএব সে প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক। 'কৃতিত্বের দশক' নামক প্রচার পুস্তিকায় একালের নব তরঙ্গের যে আলৌকিক কীর্তিফলতার স্তুতিবাদ করা হয়েছে, তার ত্রুটিই জাহ্নগিরি ১৯৬৬ থেকে জাহ্নগিরি ১৯৬৭ এই দশকের শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধিহ্রাসের কোন উল্লেখ নেই। আবার ইন্দিরাজীর পূর্বকার ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৬ সালের বৃদ্ধির কোন মানেরও উল্লেখ নেই। কিংবা শ্রীমতীর সভাপতিত্বে ১৯৬৬-৬৭ এর বার্ষিক বোজানায়, ১৯৬৯-৭৪ চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থবা ১৯৭৪-৭৯ এর পঞ্চম পরিকল্পনার বৃদ্ধির যে সকল লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল তারও কোন উল্লেখ নেই। থাকারও অবশ্য কথা নয়, কারণ তা থাকলে সরকারী প্রচার সাহিত্যে স্বপ্নাঙ্গল বুনে মানুষকে ঘুম পাড়ানোর যে চেষ্টা হচ্ছে তা নিম্নেই ছিন্ন হয়ে যেত।

অতীত সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করলেই ৪.৫% এর সরকারী দাবির সারবস্তা বোঝা যাবে। ১৯৫০-৫১ এবং ১৯৬০-৬১ এর মধ্যবর্তী সময়ের শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধিমাত্রা ছিল বার্ষিক ৭%। ১৯৬২ সনের চীনা যুদ্ধ, ১৯৬৩ সনের খরা, ১৯৬৫ সনের পাকিস্তানী যুদ্ধ, জবাজীর্ণ প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং তাঁর অগ্রাধ্য ক্যাবিনেট মন্ত্রিবৃন্দ সত্ত্বেও ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৫-৬৬ এই সময়ের বৃদ্ধিমাত্রা ছিল বার্ষিক ৮%। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধি প্রধান মন্ত্রী হয়ে যখন প্রথমে পার্টি, তারপরে পার্লামেন্ট এবং সর্বশেষে বিচার ব্যবস্থা, সংবিধান এবং স্বয়ং গণতন্ত্রের বন্ধন-গুলিকেই একের পর এক ছিন্ন করলেন সেই ১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৭৫-৭৬ এর মধ্যবর্তী বৃদ্ধিমাত্রা হয়েছে গড়ে বার্ষিক মাত্র ৩%—বৃদ্ধির ওঠাপড়া কখনো ০.২% এ (১৯৭৪) আবার কখনো উঠেছে ৭% এ (১৯৬৯-৭০) এর প্রমাণ এই যে, জাতীয় আয়ে শিল্প ক্ষেত্রের অংশ ১৯৬৬-৬৭ এর বার্ষিক পরিকল্পনায়, ১৯৬৯-৭৪ এর চতুর্থ পরিকল্পনায় ১৯৭৪-৭৯ এর পঞ্চম পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পো-

ৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হত সব সময় ১০-১২% এর কম নয় এবং সাড়ম্বরে আকাশবাণীর মাধ্যমে লোকের কাছে প্রচার করা হত। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীমতী গান্ধির কোন কাল্পনিক প্রকল্পেই এই লক্ষ্যকে কার্যে রূপান্তরিত করা যায়নি।

কাজেই দেখে অবাক লাগে যে, সব বছরের পরিসংখ্যান না দিয়ে কেবল এক বছরের ৪.৫% বৃদ্ধিমাত্রা নিয়েই সরকারী মহল নৃত্য করছেন। কোন কোন বিজ্ঞ পরামর্শদাতা বিশেষত যারা পবিত্র শহর মস্কো থেকে ইমিত নিয়ে থাকেন, তারা এই বৃদ্ধি মাত্রার তাৎপর্যপূর্ণ দিক হিসাবে পাবলিক সেক্টরের উৎপাদনে 'উল্লেখ্য' নির্দেশ করেছেন। ডি এ ভি পির সরকারী বিজ্ঞাপনে পাবলিক সেক্টরে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১৯৭৫-৭৬ ৩৬% বলে দাবি করা হয়েছে। এতো দৃষ্টত অসম্ভব। কারণ সে ক্ষেত্রে সার্বিক বৃদ্ধিমাত্রা ৪.৫% এর সংগে সংগতি রাখতে গেলে স্বীকার করে নিতে হত যে, পাবলিক সেক্টর উৎপাদন ১৯৭৫-৭৬ সালে ২৭% কমে গিয়েছিল। শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীটি-এ পাই সম্প্রতি প্রবন্ধে লিখেছেন যে, ১৯৭৫-৭৬ সনে পাবলিক সেক্টরে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে ১৫.৫%। কিন্তু তাও যদি সত্য হয় তাহলেও স্বীকার করতে হবে যে, পাবলিক সেক্টর উৎপাদনে ষাটটি হয়েছিল, সব সময়ে ৪.৫% এর শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধিমাত্রাকে বহি মেনে নিতে হয়।

পরিসংখ্যানের ভেলিকবাজি ছেড়ে দিলে একথা পরিষ্কার যে, ১৯৭৫-৭৬ সনের শিল্পোৎপাদনে কৃতিত্ব মিশ্র পর্যায়ের—বিশদকা কর্মহ্রাসের প্রবক্তারা একে 'বিরাট একটা উন্নতির ঠেলা' বলে আমাদের যা বোঝাতে চাইছেন-তা নয়। প্রচারিত পরিসংখ্যান থেকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য যে চিত্র মেলে তা হল: ১৯৭৫-৭৬ সনে শিল্পোৎপাদনের কৃতিত্ব মোটামুটি মারকারি। প্রাইভেট সেক্টর থেকে পাবলিক সেক্টরের বৃদ্ধি বেশী হয়েছে—প্রথমটির বৃদ্ধির মাত্রা সম্ভবত ১৫% এবং দ্বিতীয়টির সংকোচনমাত্রা মোটামুটি ৬%। পাবলিক সেক্টরের এই বিশৃঙ্খল বৃদ্ধির ফলে পাবলিক সেক্টর উৎপাদনে কয়লা, ইস্পাত, এবং সিমেন্টের ওদামে মজুতের পাহাড় জমে গেল। কলে শিল্পোৎপাদনের এই প্রচারিত প্রসার সমস্ত শিল্পব্যবস্থাকে তছনছ করে দিয়েছে। বর্তমান অবস্থা এই যে, প্রায় সমস্ত পাবলিক সেক্টর কারখানায়ই যখন প্রচুর কর্মচাকল্য তখন কিক্সি চেয়ারম্যানের মতো এর ফলে হাজার কোটি টাকার মূলধনী মাল অকেজো হয়ে রয়েছে। একমাত্র ব্যবসায়ী বারা ক'বজি উপচে মুনাফা লুটছে তারা হল রপ্তানিকারকেরা যাদের কাছে ১৯৭৫-৭৬ এর মতো স্ববৎসর আর কখনো আসেনি।

আবার পাবলিক সেক্টরে তৎপরতা খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় বৃদ্ধিমাত্রা ১৬% হলেও এই বৃদ্ধির ভিত্তি অস্থায়ী এবং সাময়িক। ৭৫টি পাবলিক সেক্টর উৎপাদন কেন্দ্রের সব কটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখাতে পারেনি। মূলত দেখানর মত তৎপরতা দেখিয়েছে পাঁচটি: ইস্পাত, কয়লা, সিমেন্ট, রাসায়নিক সার এবং বিদ্যুৎ যন্ত্রের বৃদ্ধিমাত্রা হয়েছে ১১% থেকে ২২%। অপর পক্ষে হুতী বজ্র, ধাতুশিল্প বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং পরিবহন যন্ত্রাদির তৎপরতা শোচনীয়। সার সেক্টর রূপে মূলধনী মালের তৎপরতাও ছিল আতঙ্কজনক।

'নায়ক' শিল্পের বেলায়ও বৃদ্ধির পরিমাণ যতটা ক্ষতিপূরণমূলক ততটা উল্লেখযোগ্য নয় যেমন ধরুন ইস্পাত। যদিও ১৯৭৫-৭৬ সালে বিক্রয় ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৭৪-৭৫ এর চেয়ে ১৬% বৃদ্ধি ঘটায়, দাঁড়িয়েছিল ৫৮ লক্ষ টনে তবু দেশের মধ্যে তার ব্যবহার কমে গেছে কারণ সিংহভাগ গেছে রপ্তানিতে। আরো লক্ষণীয় এই যে, ১৯৭৫-৭৬ সনের এই ৫৮ লক্ষ টন ১৯৭৩-৭৪ সনেও একই ছিল অর্থাৎ ইস্পাতের ক্ষেত্রে কোন বৃদ্ধি না হয়ে পূর্বকার মানোঙ্কিরে গেছে মাত্র। এর সঙ্গে আছে আরো অন্তত সংবাদ। ক্ষেত্রের অভাবে ওদামে ৮ লক্ষ টন ইস্পাত মজুত পড়ে আছে বলে ইস্পাতমন্ত্রক ১৯৭৬-৭৭ এর লক্ষ্যমাত্রা থেকে ১৩৪ কিলোমি দিয়েছেন। তার উপর মন্ত্রী সংসদকে জানিয়েছেন যে, ২০০০ ক্রীটাবে ইস্পাতের উৎপাদন বেড়ে হবে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন, তার মন্ত্রক ১৯৭৪-৭৫ সনে হিসাব করে যে দশ কোটি টনের কথা বলেছিলেন তা নয়। এর আংশিক কারণ ১৯৭৫-৭৬ সনে প্রায় ১০০ মিনি ষ্টীল প্ল্যান্ট মন্দার অন্ত বন্ধ হয়ে গেছে আর মোহন কুমারমঙ্গলম যে সরকারী মিনি ষ্টীল প্ল্যান্টের পরিকল্পনা করেছিলেন সেটিকেই ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। অর্থনৈতিক কার্যকারিতা নতুন করে খতিয়ে দেখার সময় এটার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সর্বশেষ শিল্পটি যে কেরামতি দেখিয়েছে তার পরিশ্রমকে পরিকল্পনা কমিশন আগেকার নির্ধারিত পঞ্চম পরিকল্পনার ১৯৭৮-৭৯ সনের ১ কোটি ৪ লক্ষের লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব নয় বলে তাকে কমিয়ে করেছেন ৮ কোটি ৮ লক্ষ টন। যে কেউ এই সব তথ্য বিচার করে দেখবেন তিনিই বুঝবেন যে, ইস্পাত শিল্প সম্বন্ধে বেসব গলাবাজি করা হচ্ছে তার কোনই ভিত্তি নেই।

কয়লা, সিমেন্ট, রাসায়নিক সার, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি শিল্পগুলির খোঁজ (শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসী গুণ্ডাদের হামলা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মগরাহাটে রাত প্রায় ৮টার সময় ভারতীয় গণনাট্য প্রগতি সংঘের সভ্যরা যখন সংঘের কার্যালয়ে তাদের আগামী বাজারস্থান ম্যাক্সিম পোর্কির "মা" নাটকের মহড়া দিচ্ছিলেন তখন বেশ কয়েকজন কংগ্রেসী গুণ্ডা হঠাৎ সেখানে লাঠিসোটা নিয়ে ঢুক আক্রমণ শুরু করে। সংঘের কার্যালয়ের সঙ্গে মগরাহাট থানা বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের অফিস। বাইরে মজদুর ইউনিয়নের যে পতাকাটি ছিল সেটা গুণ্ডারা ছিঁড়ে ফেলে। অল্লীল ও অকথ্য ভাষায় গুণ্ডারা সংঘের সদস্যদের গলাগালি দেয় এবং মারধোর করতে থাকে। এই আক্রমণের ফলে আবদুল হাই, হাতিয়ার রহমান, অমর চক্রবর্তী প্রভৃতি সংঘের সদস্যরা গুরুতররূপে আহত হন।

সাংবাদিকের মুক্তিলাভ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

১৫ই ফেব্রুয়ারী আলিপুর এস. ভি. জে. এম-এর আদালত থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার ভরণ সাংবাদিক বিশ্বনাথ চ্যাটার্জীকে ডিসচার্জ করে দেওয়া হয়। শ্রীচ্যাটার্জীকে গত ৯ই ডিসেম্বর টালিগঞ্জ পুলিশ নাটকীয়ভাবে গ্রেপ্তার করে ২৫শে (১) (এ) ধারামতে একটি মামলা দায়ের করে। ঐ সময় শ্রীচ্যাটার্জী কলকাতার একটি অস্থানে যোগ দিতে এসে অস্থায়ী হয়ে পড়েছিলেন। গ্রেপ্তারের পূর্বে তিনি ঐ জেলার একজন আই. এ. এস ও একজন আই. পি. এস অফিসারের অন্যান্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। কলে ঐ আই, পি, এস, অফিসার তাকে ডি, আই, আরে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করেন। কিন্তু সব ঘটনা স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ হয়ে গেলে তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং অফিসার ওই জেলা থেকে ২৪পরগণা র বদলী হয়ে যান। তাছাড়া জেলার কংগ্রেস মহল থেকে শ্রীচ্যাটার্জীকে গ্রেপ্তারের জন্য বহুবার চেষ্টা করা হয়।

জরুরী অবস্থায় অগ্রগতির নামে ধান্দা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

নিম্নেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবেন, উন্নতির অনেকটাই হল আগের মাল ফিরে পাওয়া, উৎপাদনের অনেকটাই অবিক্রীত অবস্থায় ওদামজাত হয়ে আছে যে কারণে সরকার ১৯৭৮-৭৯ সনের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে দিয়েছে। কয়লার উৎপাদন ১৯৭৪-৭৫ সনের ৮ কোটি ২০ লক্ষ থেকে ১৯৭৫-৭৬ সনে ৯ কোটি ২০ লক্ষ টনে বেড়েছে কিন্তু ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ সনের বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় একই। অর্থাৎ বনিমুখে মজুত মালের পরিমাণ যে ১৯৭৬ এ হয়ে উঠল ১ কোটি ৩০ লক্ষ যেখানে আগের বছর ঐ সময়ে তার পরিমাণ ছিল ৫৮ লক্ষ টন। এমন কি সরকারী শিল্পসংস্থগুলি পর্যন্ত আর্থিক অনটনের কারণে বেশী কয়লা কিনতে অস্বীকার করল। ফলত কয়লা উৎপাদনের বৃদ্ধিমাত্রা ১৯৭৬-৭৭ সনের জন্য ৩.১% কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ১৯৭৮-৭৯ সনের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি টন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের কথা বিশদভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, ১৯৭৫-৭৬ সনে স্থব্রটির ফলে হাইডেল বস্ত্রগুলি ভাল চলছিল বলে ১২.৫% হারে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৮.৫%, তাও চাহিদার অভাবে পুরো কাজে লাগেনি।

বিশদভাবে কর্মসূচীতে শ্রীমতী গান্ধি জানিয়েছেন যে, 'আরো ২০০০ মেগাওয়াট' বিদ্যুৎ যন্ত্র বসান হবে। এর ফলপ্রাপ্তি হয়েছে ১৪৪০ মেগাওয়াট এবং তার মধ্যে আছে এমন প্রকল্প যা শুরু হয়েছিল ১৯৭৪ সনে। ১৯৭৪-৭৫ সনে যে নতুন ১৭২০ মেগাওয়াট বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছিল তা ধরলে ১৯৭৫-৭৬ সনে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে কর্মসূচীপত্রের ঘাটতি হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধি আরো জানিয়েছিলেন যে রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ বোর্ডগুলিকে নতুন ভাবে সাজানো হবে। কিন্তু বাস্তবে পরিকল্পনা কমিশন প্রতিবেদন করেছে যে ১৫টি রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ বোর্ডের ১৯৭৫-৭৬ সনে ক্ষতি হয়েছে মোট ১৮০ কোটি টাকা এবং তাও আবার বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পরে। এদের আরো ক্ষতি হবে ১৩০ কোটি টাকা। সিমেন্ট এবং রাসায়নিক-সার ইত্যাদি পাবলিক সেক্টরের শিল্পের খতিয়ান। নিম্নে একটি ছবি ভেঙ্গে দিচ্ছি। মজুত মালের জন্য দুই ক্ষেত্রেই বিপুল লোকসান হচ্ছে। রাসায়নিক সারের ব্যবহার দারুণ ভাবে কমে গেছে। ১৯৭৫-৭৬ সনে কস্টফেক্ট সারের ব্যবহার কমেছে ১৫% আর পটাশিক সারের ব্যবহার কমেছে ১০%। বর্তমানে কৃষি এবং সার মজুত দুটি ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে পরস্পর বর্গাড়া করছে কারণ ১৯৭৩-৭৪ এর সার ব্যবহারের (২ কোটি ৮০ লক্ষ টন) থেকে ১৯৭৫-৭৬ এর ব্যবহারের মাত্রা সামান্য উপরে (২ কোটি ৯০ লক্ষ টন)।

পাবলিক সেক্টর শিল্পের কেরামতি সম্পর্কে সরকারী প্রচার এই পাঁচটি পণ্যই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এদের বিকাশের প্রকৃত চেহারা আমরা উপরে আলোচনা করেছি। একটি পেন্সনের পণ্য সম্পর্কে সরকারী প্রচারযন্ত্র কিন্তু খুব মৌন অবলম্বন করেছে। সেটি হল কাঁচা তেল উৎপাদন। ১৯৭৫-৭৬ সনে দেশীয় উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮৩ কোটি ৫ লক্ষ টন—আগের বছর-গুলির চেয়ে ১০% বেশী কিন্তু ১৯৭৪-৭৫ এর বৃদ্ধির চেয়ে অনেক কম যা ছিল ৭৩-৭৪ এর বৃদ্ধির কম। এর একটি কারণ এই যে, তৈলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বরফা-মালবীর কোম্পানী যে আঘাতে গল্প ছড়িয়ে থাকে তা প্রায়ই কাঁচা আওয়াজে পরিণত হয়। আর একটি হল আমেরিকান কোম্পানীগুলি বনোপসাগরে তৈল

কূপ খননের চুক্তি বাতিল করেছে কারণ ওখানে তৈল নেই। আর যেসব পণ্য-গুলিকে সরকার পর্দার আড়ালে রেখেছেন তাদের অবস্থা কেমন? ভারী বৈজ্ঞানিক শাখায় উৎপাদন পুরোপুরি পড়ে গেছে। ভরগন তৈরির ক্ষেত্রে উৎপাদন অমত ৮০% কমে যাওয়ার পরে তেল দপ্তর ঘোষণা করেছে যে তারা তাদের ওয়ানগন ক্রয়সূচী আরো হাঁটাই করবে। ৮০ কোটি ৫০ লক্ষ ডি আর টি থেকে ৪০.৭০ ডি আর টিতে কমিয়ে পঞ্চম পরিকল্পনার জাহাজ তৈরীর কর্মসূচীকে নির্দয়ভাবে হাঁটাই করা হয়েছে। ডেমনি অ্যান্টিমিনিয়ামকেও ৩.৭০ লক্ষ টন থেকে ৩.১১ লক্ষ টনে কমান হয়েছে। বস্ত্রত: পরিকল্পনা কমিশন ঘোষণা করেছে যে, পুনর্বিবেচনার পরে গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরগুলিতে পঞ্চম পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিশদভাবে কর্মসূচী যে একটা মুখরক্ষার ব্যাপার এটা বুঝতে না পারলে পরিকল্পনা কমিশন কখনো পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন বোধ করতেন না।

অবশ্যই পরতার দিক থেকে প্রাইভেট সেক্টরকে পরিপূরক বলা চলে কিন্তু তারা তাদের কাজের ব্যয়ভিত্তি চাকতে চায় না। বস্ত্রত সম্পত্তি মন্দা নিয়ে প্রাইভেট সেক্টর যে হেঁচকি বেরছে, সরকার তাকে অর্থনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করার হুনিচিহ্ন চেষ্টা বলে ধরে নিয়েছে। আসলে সব শিল্পপতি এবং পুঁজিপতিরাই যে অস্ববিধার পড়েছে তা নয়। দুই ধরনের ব্যবসায়ীর পোয়াবারো হয়েছে—একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং বহুজাতিক কর্পোরেশন। ইদানীং রাতারাতি কেঁপে ওঠার কথাটা এরা কিন্তু গোপন করার চেষ্টা করেননি। এই আনন্দসংবাদ আনবার জন্য শ্রীকে, কে, বিড়লা লঙন পর্যন্ত ছুটেছিলেন। শ্রীবি এম বিড়লা বাস্তবতার চূড়ান্ত করে বলেছেন, 'এখন যদি কেউ করে নিতে না পারে তাহলে আর কোনদিন পারবে না।'—শ্রীকে আর ডি টাটা নিউইয়র্ক টাইমসের একজন হস্তান্তর রিপোর্টারকে বলেছেন, 'এখন যে প্রগতি এখানে চলেছে তারপরে আর গণতন্ত্রের প্রয়োজন কি?' আমেরিকান বিজনেস উইকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বছরের গোড়ায় বহুজাতিক কর্পোরেশনের মালিকেরা গদগদ হয়ে বলেছেন, 'মহিলা কী হৃদয় একটা আবহাওয়া এনেছেন।'

তাহলে স্বর্গের আশীর্বাদ তাদের উপর বর্ষিত হয়নি সেই দুর্ভাগা কারা?—তারা হল ছোট এবং মাঝারি ব্যবসায়ী যারা একচেটিয়া পুঁজিপতির ক্ষমতা পাওয়ার পর থেকে অভিশপ্ত জীবন যাপন করছে। সরকার লাইসেন্স পদ্ধতির যে পরিবর্তন করেছেন তার ফলে আমলাতন্ত্রকে হাত করে বৃহৎ পুঁজিতন্ত্র যে ভাবে কলকাতা নেড়ে চলেছে তাতে কাঁচা মাল এবং বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়ার ব্যাপারে ছোট এবং মাঝারি কারখানাগুলিকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। জরুরী অবস্থার আগে হল এ সব কারচুপি নিয়ে কোন মণ্ডলিয়ারে বা জ্যোতিষের বহু হস্ত সংসদে ঝড় বইয়ে দিতেন এবং মাঝারীল্যাণ্ড কাগজে তার পুরো বিবরণ ছাপা হত। তখন সরকারকে নানা আইনের অঙ্কিলায় টালবাহানা করতে হত যতদিন না লোকের মন থেকে এই সব বিবরণের স্মৃতি মুছে যায়। তার পরে লাইসেন্স বা পারমিট দেওয়া হত ঠিকই তবু সরকারকে সতর্ক থাকতে হত।

কিন্তু এখন জরুরী অবস্থায় তো সতর্কতার কোন প্রয়োজন নেই। বিশদভাবে বলেছে, 'সর্বশক্তি নিয়ে উৎপাদন বাড়ান।' আজকাল নাকি 'একচেটিয়া কারবার' বলে কিছু নেই। ৬ জুলাইয়ি বিভাগীয় মন্ত্রী জাকা সেজে সংসদে জানিয়েছেন, 'বড় একচেটিয়া কারবার' কথাটা আইনে ব্যাখ্যা করা হয়নি, 'মামলা' কথাটার নির্দিষ্ট অর্থ নেই এবং 'নালিশ' কথাটা অনেক ব্যাপক। কাজেই 'এস-আর-টি-পি আইনে কত নালিশ ও মামলা হয়েছে।'—সরকার এই ধরনের প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। আবার ২৩ আগস্ট ১৯৭৬ একই মন্ত্রী বলেন যে, একচেটিয়া কারবারগুলিকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে 'জাতীয় স্বার্থে' এবং এম আর টি পি আইনে কত জনের বিরুদ্ধে নালিশ বা মামলা আছে তা বলতে তিনি রাজি নন। বোধ হয় একটাও নেই।

বিশদভাবে ১৮ নং দফায় বলা হয়েছে যে, লাইসেন্সিং পলিটিক 'উদার' করতে হবে। অতঃপর শিল্পমন্ত্রী এমন উদারতাই এনেছেন যে, দেশে এখন লাইসেন্স ব্যবস্থাই নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। 'বিভিন্নকরণ রপ্তানিমুখিতা, নিয়মানয়ন, এবং আবশ্যকীয়তা' ইত্যাদি-ধর্মের সহযোগ নিয়ে একচেটিয়া কারবার এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি এম আর টি পি বা এক ই আর এ আইন লঙ্ঘন না করেই তাদের কারবার ৩০০% বাড়িয়ে নিয়েছে। কাজেই এই সব মামলা মনোপলি কমিশনে পাঠানোর প্রশ্ন এখন আর কে তোলে?

[চলবে]

বিজ্ঞান চৌধুরীর চিত্র প্রদর্শনী

(দর্পণের সমালোচক)

সম্প্রতি আলিবাগ ফ্রান্সে শিল্পী বিজ্ঞান চৌধুরীর এক শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। শিল্পী বিজ্ঞান চৌধুরী শুধু একজন পরিণত শিল্পীমাত্র নন তিনি বক্তব্যও স্বাতন্ত্র্য অনন্ত। রং তুলি ব্যবহারের লাবলীল পতি তাঁকে বিশিষ্টতার মর্যাদা দিয়েছে। শিল্পী চৌধুরী স্বদেশ ও বিদেশে সম ব্যক্তিত্বমান। তাই দীর্ঘ তিন বছর পর এই নতুন প্রদর্শনী দেখে শিল্পবিশ্বজন সবিশেষ আনন্দ পাচ্ছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্তমান প্রদর্শনীতে শিল্পী চৌধুরীর মোট ৩৪টি কাজ রয়েছে—কাজগুলো তৈলচিত্র ও ড্রয়িংয়ের।

শিল্পী বিজ্ঞান চৌধুরী জীবন বিমুখ নন, তাই তাঁর প্রতিটি কাজে মানুষের ব্যথা বেদনা, সংগ্রাম ও আশীর্বাদ পেরেছে। নিপীড়িত মানুষের বলিষ্ঠ বিরোধ তাই শিল্পী চৌধুরীর শিল্পকে মহিমা মণ্ডিত করেছে। তাঁর তৈলচিত্র সীজন অফ সানফ্রান্সিসকোর পশ্চাৎপটে রয়েছে স্বর্ষমুখী ফুল, অশা-রোহী মানুষের হৃদয় অভিযান, অভি-যাত্রী দলনেতার হাতে সারেন্দ্রী, আর এই অভিযান হচ্ছে যে কোন এক স্বর্ষ-মুখী ভবিষ্যতের জন্য; প্রতিটি অবস্থাবে ফুটে উঠেছে এক প্রতিজ্ঞা, ভবিষ্য-ভোরের এক ব্যক্তনায় প্রতীকে শিল্পী আমাদের কাছে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। মোটামুটি এই একই বক্তব্য ও প্রতিজ্ঞা ফুটে উঠেছে তাঁর একটি ড্রয়িংয়ে, যেখানে উত্তম বাস্তবায়িত দাপটের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত লালস্বাভাবারী নারীপুরুষের এক প্রতিজ্ঞাদৃঢ় অভিযান। তৈলচিত্র উপাঙ্গ আর এক মহিমায় আলোকিত; বিশাল বিরাট এক দানবের শক্তির এক মানুষ যেন সমস্ত বাধার আগলকে ছপিয়ে ছিঁড়ে ফেলছে, তার আশেপাশের মানুষের চোখে এক আশার আলোক। কিন্তু বিনিময় দি স্বাধীন মনে হয় একই লক্ষ্যে নির্দিষ্ট; পশ্চাৎপটে রক্তবর্ণ প্রেক্ষাপটে আশ্রয় জলজলে মানুষের মুখগুলো ইঙ্গিতবহ। দি ম্যান অ্যাণ্ড দি বুল, আরচর প্রতিজ্ঞাদৃঢ় মানুষের সংগ্রামের মহিমায় উদ্ভীত, আরপর চিত্রটিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নারী পুরুষ একটি লক্ষ্যে তাঁর ছুঁড়েছে। ১৯৭৩ সালে ঝাকা পরিবার চিত্রটিতে আমরা দেখতে পাই সমকালের বেদনা, অসহায় পিতা মাথা ঘষে বসে, মার হাতে শিশু সন্তান—এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। শিল্পী চৌধুরী জীবনবাদী শিল্পী, তাই তাঁর ড্রয়িংমহিমামণ্ডিত হয়ে ওঠে কৃককায় মানুষের আগ্রহ। আর শিল্পী চৌধুরীর প্রতিটি কাজেই রয়েছে সংগ্রামী মানুষের জীবনবাদী এক দর্শন।

মিহির আচার্য প্রণীত উপন্যাস

জোনাকির আলো	৮.০০
পৃথিবীর বয়স	১৪.০০
জীবন নিরবধি	১৬.০০
ঘরে ফেরার দিন	৫.০০
দ্বিস বিভাবরী	৫.০০
অন্তিম প্রহরী	৬.০০
আলোর সহোদর	৪.০০
পারাবারের তীরে	১০.০০

শুকসারী ১১ ১৭২।৩৫ আচার্য জগদাশ বসু রোড।
কলকাতা-১৪। বিক্রয়কেন্দ্র ১১ নাথ ব্রাদার্স। দে
বুক স্টোর্স। কথা ও কাহিনী।

বলশেভিক বিপ্লব প্রসঙ্গে

আমার লেখা 'স্বাভাবিক বহু ও বহু থেকে আমি আমার ভুলটি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ' পড়ে শুভিত ধরতে পারলাম না। আরি লিখে- হয়ে সত্যেন বহু অভিযোগ করেছেন ছিলাম যে, বলশেভিক বিপ্লবের মধ্যে (১৮ই জানুয়ারী) : যে আমি নাকি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবের কোন ক্রম বিপ্লবের উপর কলঙ্ক লেপন পথ নির্দেশ ছিলনা। এই সিদ্ধান্তের করেছি। ইতিহাসের ছাত্র যখন ইতি- পেছনে আমার কিছু তথ্য এবং যুক্তি হাস নিয়ে চর্চা করে তখন তার তুল আছে। সত্যেনবাবু ট্যালিন থেকে হতেই পারে। কিন্তু সত্যেন বহু যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা ক্রম বিপ্লবের

আমড়া গাছে আম

পরেণ ধর

ভিথিরি বেকার চোর ত নেই

ভূমিহীন কোন কৃষক নেই

জোতদার পুঁজিপতিও নেই ত

সমাজতন্ত্র আছে,

সমাজবাদের সরল সংজ্ঞা

গুনে যাও-মোর কাছে।

ভিথিরি বেকার থাকুক থাকুক

ভূমিহীন চাষী থাকুক থাকুক

পুঁজিপতিরাও থাকুক, তবুও

সমাজতন্ত্র আছে,

মোদের ক্ষমতা—আমরা ফলাই

আম যে আমড়া গাছে।

ইতিহাস

পরেণ ধর

কখনো কখনো কারোর শক্তি

মনে হয় যেন দুর্নিবার

মনে হয় তাকে দুর্নিবার

স্পর্ধা নেই।

মনে হয় যেন ইম্পাতে গড়া

তার দু'টি কড়া শক্ত হাত

অক্লেশে করে রক্তপাত

মুহুর্তেই।

কিন্তু বড়-র বড় রয়ে গেছে

সেত জনতার রক্ত রোষ

দলিয়া নিজের ক্ষুদ্র তোষ

সে জাগবেই।

মুখ্যমন্ত্রীর অসত্য উক্তির প্রতিবাদ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তারা জেলে বন্দী আছেন। সন্ত্রাসি পশ্চিমবঙ্গ অধ্যাপক সমিতির পক্ষ থেকেও আমার স্বামীর সমস্ত বন্দী অধ্যাপকদের মুক্তি দাবী করা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি প্রকাশ কোর্টে আমার স্বামীকে 'সমাজ-বিরোধী' বলে প্রমাণ করতে পারবেন? আমি নিশ্চিত যে, আমার স্বামীর মত অনেকেই এখনও পর্যন্ত জেলে আটক আছেন, যারা কোনক্রমেই 'সমাজ-বিরোধী' নন। তাই তাঁদের সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তিজনক ও অপমানকর বক্তব্যের বিরুদ্ধে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং কেন তাঁদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না—এই প্রশ্নটাই আমি আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরতে চাই।

তাছাড়া স্বামী হিংসাত্মক পথে সমাজ-পরিবর্তন করতে নান, মুখ্যমন্ত্রী তাদের বিরোধিতা করতে পারেন, কিন্তু 'সমাজ-বিরোধী' বলেন কোন যুক্তিতে? তাহলে আমাদের

দেশের হৃদিরাম কানাইলাল স্বর্ষ সেন বিদেশের লেনিন-ট্যালিন মাও সে তুং-হো চি মিন প্রভৃতিরও 'সমাজ-বিরোধী' ছিলেন?

এ প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন। পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম প্রভৃতি কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বা জনতা পার্টির পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে বন্দী মুক্তির অন্ত যে সব দাবী এ সব পার্টির নেতারা পেশ করছেন, আর্চব ব্যাপার তাতেও আমার স্বামীর মত দাবী তাঁদের পার্টির সঙ্গে যুক্ত নন, সেই সব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির কথা বলা হচ্ছে না। তাঁদের পার্টি বহিষ্কৃত হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীকেও শোকার করে তোলার দায়িত্ব বা প্রয়োজনীয়তা কি তারা উপলব্ধি করেন না?

সীরা চক্রবর্তী

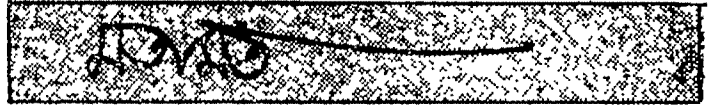
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

অনেক পরে লেখা। তাছাড়া এই বক্তব্যের মধ্যে ট্যালিনের মারাত্মক ভুলটিও প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তিনি জারতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবকে সরাসরি সর্বস্বাধীন সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে এক করে বলে-ছেন,—"against imperialism, into a proletarian Revolution."

কৃষকবিপ্লবের পরে ১৯৩৮ সালে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ইতি-হাসে বিপ্লব পূর্ব রাশিয়ার কিসাবে সাম্রাজ্যবাদীরা শোষণ করত তার বর্ণনা করে ট্যালিন বিপ্লব পূর্ব রাশি-য়াকে তো আধা উপনিবেশ বলে মূল্যা-রন করেছেন। অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে এই মূল্যায়নটি ছিল কোথায়?

লেনিন ১৯১৬ সালে 'সাম্রাজ্যবাদ : পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' বইটি লেখেন রাশিয়ার বাইরে বসে। ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারী-মার্চ-এর বিপ্লবের পর লেনিন রাশিয়ার ফিরে আসেন। এই বছরই তারা এপ্রিল এবং ৭ই এপ্রিল তিনি তাঁর বিখ্যাত 'এপ্রিল থিসিসটি' উপস্থিত করেন। সেই থিসিসে ১০টি পর্যায়ে আছে। আমি ২ নং পর্যায়ে উদ্ধৃত করছি—

- (9) Party tasks :
- Immediate Convocation of a party Congress.
 - Alternation of Party Programme, namely :
 - On the questions of imperialism and the war.
 - On our attitude towards the state and our demand for a "Commune State."
 - Amendment of our out of-date minimum programme,
 - Change of the party's name.



এই এপ্রিল থিসিসে লেনিন তৎ-ক্ষণাত্ পাটি কংগ্রেস ডেকে পূর্ববর্তী কর্মসূচীকে পরিবর্তন করে সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধেরও প্রত্যেক যুক্ত করতে চেয়েছেন, পূর্ববর্তী 'আন্তর্জাতিক' অচল বলেছেন। 'কমিউন রাষ্ট্রের' প্রসঙ্গটি এ প্রসঙ্গে অবাস্তব। অথচ বলা, রাশিয়ার কমিউন রাষ্ট্র বাস্তবায়িত করা সম্ভবই ছিল না, বাস্তবায়িত হয়ও নি। এই এপ্রিল থিসিসই সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে রাশিয়ার বল-শেভিকবাদ গড়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রণনীতি এবং রণকৌশল ছাড়াই। লেনিনের মৃত্যুর পূর্বে ট্যালিন রাই বলুন না কেন R. S. D. L. P. (B) এর কর্মসূচীতে সাম্রাজ্য-বাদ বিরোধী সংগ্রামের কোন কথা ছিল না। ১৯১৮ সালে R. S. D. L. P. (B) এর সপ্তম কংগ্রেসে লেনিনের এপ্রিল থিসিস অমুসারে সাম্রাজ্য-বাদের কথা পার্টির কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং R. S. D. L. P. (B) এর নাম পরিবর্তন করে R. C. P. (B) করা হয়। এই সপ্তম কংগ্রেস থেকে

কি প্রমাণিত হচ্ছে না যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রণনীতি এবং রণকৌশলের ভিত্তিতে বলশেভিকবাদ গড়ে ওঠেনি? সত্যেনবাবু নিশ্চয় আরেকটু ইতিহাস ঘেঁটে দেখবেন।

আসলে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী বিপ্লবের রণনীতি রণকৌশ-লের সঠিকতা প্রমাণিত হয়েছে চীনের জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে নয়। ট্যালিন তার রচনাবলীতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন তা কেবল মাও সে তুং-এর চিন্তাধারার ওপর ধবরদারী করার জন্যই। কারণ মাওয়েজ চিন্তাধারার ও নেতৃত্বে আধা-উপনিবেশিক দেশের চীনা জনগণ সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদ বিরোধী বিপ্লবে তখন একের পর এক অর-অর্জন করে চলেছিল। এ সম্পর্কে আপনি রণসিদ্ধান্তের কাছ থেকে কিছু তথ্য ঘেনে নিতে পারেন। আসলে সত্যেনবাবুও ট্যালিনের রচনাবলী পড়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন। হবারই কথা। ট্যালিন যখন লিখেছেন 'তাই না?' পক্ষের চৌধুরী

রাজ্যের নির্বাচনী চিত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গভীর যে, বহু অঞ্চলে শাসক কংগ্রেসের কর্মীরা, লোকজন বিরোধীদের হয়ে কাজ করছেন। যে সব অঞ্চলে কংগ্রেসের দোসর সি, পি, আই প্রার্থী রয়েছে সে-সব অঞ্চলে ব্যাপকভাবে কংগ্রেসীরা বসে গেছেন বা বিপক্ষে কাজ করছেন। ফলে, সি পি আই নেতৃব 'একা' সম্পর্কে আতঙ্কিত।

অত্মদিকে, এখনো জনগণের ব্যাপক অংশের ধারণা যে শ্রীমতী গান্ধী শেষ পর্যন্ত যে কোন অজুহাতে নির্বাচন বন্ধ করে দিতে পারেন। কারণ সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে বিরোধীদের সমাবেশে যে বিপুল পরিমাণ মানুষের জমায়েত হচ্ছে এবং বিরোধীদের পাশে মানুষ যে ভাবে এগিয়ে আসছেন তাতে এবার নির্বাচনে শাসক দলের পরাজয় প্রায় নিশ্চিত। অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার আশা কম।

কলকাতার বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে তাই প্রশ্ন, এবার শ্রীমতী গান্ধী রিগিংয়ের কী খেল খেলবেন?

অত্মদিকে, কংগ্রেস বিশেষ কোন জমায়েত করতে পারছে না। কংগ্রে-সের একজন মাত্র নেতা বা নেত্রী রয়েছেন বলে মনে হয়। কারণ শ্রীমতী গান্ধীই ভারতের সর্বত্র সভা করে বেড়াচ্ছেন। আর এবারকার বিশেষ এই যে শ্রীমতী গান্ধীর বক্তৃতা আক-ষণাত্মক নয়, বেশির ভাগই হচ্ছে

নিজের কাজের সাক্ষী গাওয়ার জন্যে জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়ার মত। কারণ তাঁর বক্তৃতায় এবার সে ধার নেই। এবার অনেকটা বিরোধীদের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে সাক্ষী। সভায় লোকজনও কম হয়েছে। এ ঘটনায় রাজ্যের সর্বত্র কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে এক হতাশার সৃষ্টি হয়েছে।

যতই দিন যাচ্ছে ততই বিরোধী-দের কর্মীরা বেশি সক্রিয় হচ্ছেন। তবে একটা প্রশ্ন, বত মাহুষ বিরোধীদের সভায় যাচ্ছেন তাদের সবাই এখনো সক্রিয় নন। বহু অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিরোধীদের ভোট কাটা হয়েছে। ফলে বিরোধীদের এই ব্যাপক সমর্থন কার্যক্ষেত্রে কতটা কার্যকর হবে এই প্রশ্নও দেখা দিচ্ছে।

গণতন্ত্রের উপর নয় আক্রমণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে আর সেই সব ঘটনা চোখের সামনে তুলে ধরবে

স্বৈরতন্ত্রে ভারত

ইন্দিরা সরকারের ১৯৭৫-৭৬ সালের রাজতন্ত্রের ঘটনাবলীর পটভূমিতে রচিত লেখক : আইউব রহমান
প্রকাশক : রমেননাথ শ্রব
(বিঃ দ্রঃ—এজেন্টদের কমিশন দেওয়া হবে) যোগাযোগ করুন :
বাবুরবাগ, বর্ধমান

কংগ্রেসী সমাজতন্ত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘোষণা করা হয়েছে—এই দাবী কংগ্রেস মত জোর দিয়ে করেছে তার থেকেও বেশী জোর দিয়ে তা সমর্থন করেছে সি পি আই। জনমত দাবিরে রাখার বত কলাকৌশল বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের সরকার আবিষ্কার করেছে তা সবই প্রয়োগ করা হয়েছে আমাদের সমাজতন্ত্রে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরাও এত সব কলাকৌশলের সন্ধান রাখত না। সি পি আই বাহবা দিয়েছে উসকানি দিয়েছে।

নিজেরা ঠেঁধানী খেয়েছে, নিজের দেয় ত্রৈট ইউনিয়ন বেদখল হয়েছে, নিজেরা সভাসমিতি করতে পারে নি, শ্রমিকদের বহু বৎসরের আন্দোলন দ্বারা আদারীকৃত সব স্বযোগ হুবিধা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তারা ছাটাই হয়েছে, তাদের শারেক্তা করতে কল-কারখানা বন্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু এতসব বীভৎস কাণ্ডের সংবাদটুকু প্রকাশের স্বাধীনতার অবশান ঘটান হয়েছে। তবুও সি পি আই তার বিশ্বাসে অটল : কংগ্রেস একটি প্রগতিশীল দল, সমাজতন্ত্রের দিকে দেশকে সে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

হায় হায়। যাদের জন্ত বামকূল ছাড়লাম, যাদের জন্ত এত গল্পনা সহ্য করেও বামপন্থীদের ঠেকিয়ে রাখতে কংগ্রেসকে সাহায্য করে যাচ্ছি এত বৎসর যাবৎ ঠিক সেই দুটি প্রদেশে যেখানে বামপন্থী শক্তি প্রবল। শেষে তারা কি না বলে আমরা দেশদ্রোহী। হালে, গত নভেম্বরে প্রথম সি পি আই বিরোধী হুজুর ছাড়েন বিহার কংগ্রেস সভাপতি সীতারাম কেসরী। ওই প্রদেশেই তো সি পি আই কত বৎসর থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। ইতিপূর্বে জরুরী অবস্থা-জ্ঞাত মহান নেতা সঞ্জয় গান্ধী ঠারে সি পি আই-র বাপান্ত করেছে বহুবার। তাঁর সঙ্গে পৌঁ ধরেছিলেন সি পি আই যাদের কংগ্রেসী প্রগতিশীল বলে তাঁদের প্রধান করে ক ব্যক্তি। শেষ অবধি স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধীও একই কাজ করে বসলেন।

গত সপ্তাহে সি পি আই-র মহা-সচিব রাজেশ্বর রাও নির্বাচনী ইস্তাফার প্রকাশের স্বযোগে দলের বৈপ্লবিক কার্যাবলীর এক রোমহর্ষক বিবরণ দিলেন একঘণ্টা ব্যাপী। হ্যাঁ, কংগ্রেস যেখানে প্রগতিশীল সেই সব রাজ্যে আমরা তার সঙ্গে নির্বাচনী জাঁতাভ বা সমঝোতা করব, যথা পশ্চিমবঙ্গ ও করল।

বিহার? না, সেখানে নয়, উত্তরে বললেন, কমরেড রাও। ঘোর প্রতি-

ক্রিয়শীল সীতারাম কেসরী সেখানে রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি। সি পি আইকে তিনি যাচ্ছেতাই বলেছেন। তাঁকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ না করলে আমরা সেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে কোন প্রকার বোঝাপড়া করব না। প্রশ্ন : সীতারাম কেসরীর উপর আপনাদের রাগের কারণ না হয় বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তো তাঁর থেকেও কয়েক বাপ চড়া হয়ে আপনাদের মুখুশাত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী সঘণ্টে আপনাদের মত কী?

উত্তর : আপনাদেরকে অনেক কথা বলেছি। আর নয়।

আত্মত্যাগ জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর কত সরকারী অর্থে কত শত পুস্তিকা কত ভাষায় কত কোটি কপি ছাপান হয়েছে সে হিসাব অডিটর-জেনারেল ছাড়া কারও পক্ষে সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। “জরুরী অবস্থার ফল”—পুস্তিকাগুলির প্রচারের বিষয়-বস্তু। ১৯৭৬ এর জাফরারী মাসে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর প্রধানমন্ত্রীর দশ বৎসর পূর্ণ করেন। ওই স্বযোগে আরেক দফা পুস্তিকা প্রকাশের হিড়িক পড়ে। বিস্ময়বস্ত—এই দশ বৎসরে দেশের স্পুটনিকগতিতে উন্নয়ন।

এই উন্নয়ন অবশ্য তুলনামূলক। স্বল্পন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্য। ১৯৬১-৬২-র মূল্যসূচকে যদি সূচক (ইনডেক্স) হিসাবে ১০০ ধরা হয় তবে ১৯৬৫-৬৬ তে খাদ্যসূচক মূল্যের সূচক ৫০ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৫০। আর পাঁচ বৎসরে—অর্থাৎ ১৯৭০-৭১-এ হয় ২০০। অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম পাঁচ বৎসর এবং তার পূর্বের পাঁচ বৎসর এই দশ বৎসরে মূল্যসূচক ১০০ পয়েন্ট বৃদ্ধি পায়।

১৯৬৯ সালে সিঙিকটকে হটিয়ে দিয়ে তিনি যেমন কংগ্রেস তেমনি সরকারের উপর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিক্রিয়শীলরা কোণঠাসা হওয়ার ফলে জনসাধারণের গরিবী হটানর রাজ্য নাকি প্রশস্ত হয়। এই হটানর প্রথম চার বৎসরে, অর্থাৎ ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭৩-৭৪ পর্যন্ত খাদ্য-বস্তুর মূল্যের সূচক ২০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩২২—বৃদ্ধি ১২২ পয়েন্ট। ১৯৭৪ এর অক্টোবর পর্যন্ত আরও ৬২ পয়েন্ট উপরে ওঠে। স্পুটনিক গতি বইকি। এরপর বৎসরখানেক মূল্যে কিছু ভাটার টান পড়ে। তারপর আবার উল্লসগতি সমানে চলছে।

শ্রীমতী গান্ধী যখন প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন তখন দেশের প্রায় অর্ধেক জন-

চেঙলিতে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ৪০/৪৫ লাখের মত ছিল। ১৯৭৬ এর জুলাই পর্যন্ত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭ লক্ষ ৪৪ হাজার। হিসাব করে নাকি দেখা গেছে, দেশে শতকরা ৭০ জনের অধিক লোক হারিদ্রাসীমার নীচে জীবনযাপন করে, অর্থাৎ অতুষ্ক বা অর্ধতুষ্ক থাকে।

দেশের অগ্রগতির পরাকাষ্ঠা। অস্ত্রপ্রকারের অগ্রগতির নির্দর্শনেরও অভাব নেই। যেমন ধরুন, ব্যবসায়ীদের অগ্রগতি। জৈন শিল্পগোষ্ঠীর দৈনিক ইকনমিক টাইমস শিল্পপতিদের অগ্রগতির এক অতুল্য ছবি তুলে বয়েছে। ১৯৭২-৭৩ এর পরের তিন বৎসরে অর্থাৎ ১৯৭৫-৭৬ পর্যন্ত হিসাবে দেখা যায় যে ১০টি বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর মোট শিল্প সম্পত্তি ৩৫১৬ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪২৬৬ কোটি টাকা (বৃদ্ধি শতকরা ৪১.২); এদের ব্যবসায়ের পরিমাণ ৩৮৮৮ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫৮৭৩ কোটি টাকা। আর মুনাফা ৭৩০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬০০ কোটি টাকা (বৃদ্ধি শতকরা ৫৭.৮)। এরা হচ্ছেন বিড়লা, চাটা, মকলমাল, সিংঘনিয়া, শিন্দিয়া, খাপর, বাজুর, শ্রীমাম, সরা-ভাই, বাজাজ, গরুর। দেশ শাসনের ভার এরা সরাসরি নিজহাতে রাখলেও এর থেকে বেশী কিছু নিজেদের জন্ত করতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

সকলের উপর টেকা অবশ্য মেয়ে-ছেন বিড়লারা। ইন্দিরার রাজত্বে সমাজতন্ত্রের দিকে পদচালনার দুই বৎসর পূর্বে বিড়লারা টাটাদের অনেক পিছনে পড়েছিলেন, যথাক্রমে তাঁদের মোট শিল্পসম্পত্তির পরিমাণ ছিল ২৮২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং ৩৭৫ কোটি টাকা। শ্রীমতী গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীর ছয় বৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ ১৯৭২-৭৩ এ বিড়লাদের সম্পত্তির পরিমাণ হয় ৭২৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, এবং টাটা-দের ৬৮৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

এর পরের তিন বৎসর ছিল গভীর-তম সংকটের সময়, মূল্যবৃদ্ধি আর-চোরাবাজার দেশকে পাগল করে তুলে ছিল, কত কোটি মানুষ যে নতুন করে হারিদ্রাসীমার নীচে চলে আসে তার হিসাব নেই। এই গভীর সংকটের সময়ই শিল্পগোষ্ঠীগুলির অগ্রগতি হয় সর্বাধিক দ্রুত হারে। ১৯৭৫-৭৬ এর হিসাবে দেখা বিড়লারা মোট ১০৬৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার মালিক হয়েছেন এবং টাটার ১৭৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার। অস্ত্র শিল্পগোষ্ঠীর অগ্র-গতিও বেশ দ্রুত—বিশেষ করে শ্রীমতী গান্ধীর বিরূপ সমাজতান্ত্রিক যজ্ঞের ১০ বৎসরে অগ্রগতি নিশ্চয়ই আরও অনেক দ্বিগুণিত হয়েছে—কারণ এই সময়ে জরুরী অবস্থা এবং নানা বাধা

নিবেশের ফলে ব্যবসায়ীরা জনসাধা-রণের বিরুদ্ধে খালি মাঠে একের পর এক গোল দিয়ে গেছে। বিড়লা সমেত শিল্পরাজ্যের সব রাঘব বোয়ালরা মহৎ নেতা সঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গে হরিহর আত্মা হবেন না কেন? আর স্বয়ং প্রধান-মন্ত্রীই তো কবুল করেছেন, “সঞ্জয়ের সঙ্গে আমার কোন মতভেদ নেই।”

শিল্পরাজ্যে কমল নাথ চুনোপুটি। এক সময়ে মনে হয়েছিল তিনি পশ্চিম বঙ্গের বাদশা বনে বসেছেন। খুঁটির জোরে মেড়া লড়ে। কমল নাথের খুঁটি সঞ্জয়, সঞ্জয়ের খুঁটি কে কে বিড়-লার মারকতে ব্যবসায়ের রাঘব বোয়ালরা এবং শ্রীমতী গান্ধী। কমল নাথের এতই প্রতিপত্তি হয়েছিল এক সময়ে যে, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী হোমরাজ্যোমহারায় রাইটার্স বিল্ডিং ছেড়ে কমল নাথের কুপা প্রার্থী হয়ে ওঠে বৈঠকখানায়—ভীড় জমাচ্ছিলেন। জনৈকি দিল্লীতে তিনিই ছিলেন সিদ্ধার্থ-শংকর রায়কে হটানোর উদ্দেশ্যে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রণব-মুখোপাধ্যায়ের মুখ্য উপদেষ্টা। সিদ্ধার্থ-বাবুকে হটান যারিনি, কারণ প্রিয়রজন

ইন্দিরা সন্দিহান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মহলে বলেছেন “আমাকে ভুল খবর দেওয়া হয়েছিল।”

তাঁর মতে হিসাব করার সময় কংগ্রেসের অন্তর্কলহের কথা ধরা হয় নি। এই কলহ বেড়েছে এবং ইন্দিরা সমেত অস্ত্রাস্ত্র কংগ্রেসী নেতাদের ধারণা ২৭০ এর বেশী আসন পাওয়া মুশ্কিল হবে।—পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসীদের একাংশের ধারণা ১০ এর বেশী আসন এই রাজ্যে পাওয়া যাবে না।

পশ্চিমবাঙালার বারোজন বিধু কংগ্রেসী নির্বাচনে নেমেছেন কংগ্রেস-সি পি আই-জোটের বিপক্ষে। গত সপ্তাহে বহু চেষ্টা করেও ইন্দিরা গান্ধী এঁদের নাম প্রত্যাহার কথাতে পারেন নি। এই ঘটনা এই প্রথম ঘটল গত দশ বছরে।

প্রকাশ্যে বিরোধিতা না করেও অনেকে জাফালে বিধুদের মদত দিয়েছেন। যেমন উত্তর কলকাতার এক নামকরা নেতা জনতা ও গণতন্ত্রী কংগ্রেসের ছুই নেতা অশোককুমার দত্ত এবং বিজয় সিং নাহারকেলোক এবং গান্ধী দিয়ে সাহায্য করছেন। লক্ষীকান্ত বহুর অনেক ছেলেকে আজকাল বিজয়-বাবুর বাড়ীতে দেখা যায়।

অবস্থা বাচানোর জন্ত ইন্দিরা পথ খুঁজছেন। দিল্লীর খবর তিনি হয়ত হঠাৎ জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করে নিয়ে জনতা ও গণতন্ত্রী কংগ্রেসীদের বলবেন, “আর কী আমি ত দাবী মেনে নিলাম এবার আমার দলে ফিরে

দাশমুদী, লক্ষীকান্ত বহু, পঞ্চজ বন্দ্যো-পাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন খুব নেতা বৈকি বলেছিলেন এবং পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণ দিল্লীর এই বড়বড়ের বিরুদ্ধে ফোঁড়ে ফেটে পড়েছিল।

সমাজতন্ত্র এবং গরিবী হটাৎ-এর ভেদ না ধরলে ব্যবসায়ীদের দ্রুত অগ্র-গতির রাজপথ তৈরী করার অহুবিধা হয়। না হলে, হিটলার কি তাঁর দলের নাম রাখতেন? জাশনাল শোশা-লিস্ট শ্রমিক পার্টি? লোকের চোখে খুলা দেওয়া আমাদের ভারতীয় সমাজ-তন্ত্রের দেশেও রাজকার্যের অত্যাশঙ্কক অঙ্ক। এই খুলা দেওয়ার কাজে সি-পি আই-র অবদান কংগ্রেস তথা ব্যব-সায়ী গোষ্ঠী কখনও ভুলবে না। এই দলটি অধুনা বলতে শুরু করেছে, “এক-নায়কত্ব এবং সংবিধান বহির্ভূত শাসনকে স্বাপনের প্রচেষ্টার দারিদ্র শ্রীমতী গান্ধীর।” নিজেরাও কিছু ঠেঁধানি খেয়েছে কিনা।

তবুও, সি পি আইর ধনুর্ভাঙ্গা-পণ কংগ্রেস সরকারকে বাঁচাতেই হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ ও করলে সি পি আই (এম) পুষ্ট বামপন্থীদের কণ্ঠেই হবে। মস্তোড় তাই চায়।

এস। শোনা যাচ্ছে যুক্ত প্রদেশে কিছু জনতা সমর্থক এই আফ্রানে সাড়া দিতে পারে। তবে এ নিয়ে বেশী কিছু এখনই বলা সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যে আরও শোনা গিয়েছে যে সম্প্রতি দেবকান্ত বড়ুয়া, সিদ্ধার্থ রায় রজনী প্যাটেলের এক বৈঠকে ঠিক হয়েছে যে ইন্দিরাকে এমনভাবে জিততে দেওয়া হবে না যাতে তিনি আবার “সর্বশক্তিময়ী” হয়ে ওঠেন। এঁরা চাইছেন কংগ্রেসসামান্য মাজিনে জিতুক যাতে এঁরা ছড়ি ঘোরাতে পা যেন না। প্রকাশ এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্ত এঁরা বিভিন্ন রাজ্যে গণ-তন্ত্রী কংগ্রেসীদের তলে তলে মদত যোগাবেন বলে ঠিক করেছেন।

সিদ্ধার্থবাবু জনতা দলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও কোন জনসভায় জগজীবনবাবুর দল সম্পর্কে কিছু বলছেন না। গত সপ্তাহে কলকাতা প্রেস ক্লাবে প্রস্তোত্তরের সময় তিনি নাং বা দিক দে র বলেন—“বাবুজীর বিরুদ্ধে আমার বলার কিছু নেই। তাঁর মত আমার থেকে ভিন্ন। তবে গণতন্ত্রে ত সকলেরই নিজস্ব মত থাকতে পারে।” অস্ত্রাস্ত্র রাজনৈতিক নেতা সম্পর্কে অবশ্য সিদ্ধার্থবাবু এই উদারতা দেখান না।

পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরার জনসভার চেহারাও ভাল নয়। বহরমপুর, ডায়মণ্ডহারবার সহ বিভিন্ন জায়গায় লোক বেশী হয় নি এবং বহরমপুরে জনসভা থেকেই সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে শ্লোগান উঠেছে। সব জায়গাতেই ইন্দিরাকে চিন্তাশ্রিত মনে হয়েছে, তাঁর আগের জোস লক্ষ্য করা যায় নি। এখন দেখা যাক মরীয়া হয়ে তিনি কী করেন।

অনেক চাঞ্চল্যকর খবর আসছে : ইন্দিরা গান্ধী এখন ভীষণ চিন্তিত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে
কংগ্রেসের অবস্থা তত খারাপ হয়ে
চাড়াচ্ছে। এই মত শ্রীমঙ্গলীবন করেন না, এমন কি অতি বিশ্বাস

রামের। সম্প্রতি কলকাতায় তিনি আমলাদেরও নয়। বিভিন্ন শহরে
প্রবাস সেনকে বলেছেন যে কেন্দ্রে টেলিভিশনের দপ্তরে বলা হয়েছে
অকংগ্রেসী সরকার অবশ্যস্বার্থী। বিরোধী সভাপতির ছবি তুলে
দিল্লী থেকে খবর পাওয়া গেছে পাঠাতে। এইগুলি লোককে দেখা-
যে শ্রীমঙ্গলী ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ে নোব জন্ত নয়, তাঁর নিজের জন্ত।
ছেন। তাঁর বিশেষ চিন্তার কারণ তিনি নাকি মনে করছেন যে তাঁর মন
ঘটিয়েছে বিরোধীদের বিরাট জন- রাবার জন্ত আমলারা এতদিন বিরোধী
শক্তি কম করে দেখিয়ে এসেছে। তাই এই ব্যবস্থা।
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

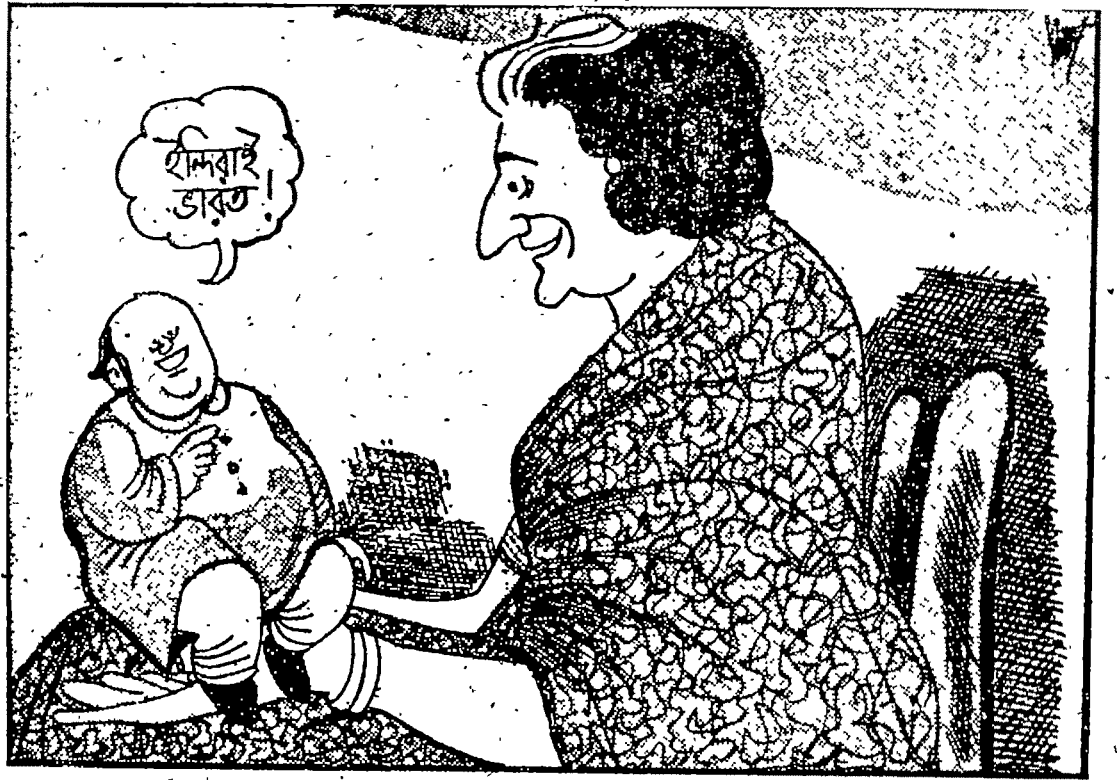
দর্পণ

বিংশ বর্ষ ॥ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ৪ঠা মার্চ '৭৭ ॥ ৪০ পঃ

রাজ্য কংগ্রেস টাকা খরচ করে বেকার ছেলেদের কাজে লাগাচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নির্বাচনের আর বারো দিন বাকি। শুধুমাত্র, ছিনতাই অথবা যে কোন
কিন্তু এখন পর্যন্ত জুটিনি শেষ হয়নি। ধরনের অপরাধ অচ্যুত করেও এক-
বিশেষ করে, বাম ও বিরোধী মহলে এই অবস্থা। পাড়ার পাড়ার জুটিনি আইনের শাসন থেকে বাঁচা যায়।
করতে গিয়ে বিরোধী মহলের কর্মীরা তবে বিভিন্ন অঞ্চলের পরিস্থিতি দেখা
এ ঘটনা দেখে অবাক হচ্ছেন যে, যায় যে, এই মানানসই আজ বিভক্ত,
বিভিন্ন অঞ্চলে অন্তত শতকরা চল্লিশ কোন কোন অঞ্চলে তারাও থমকে
ভাগ বিরোধী ডোট কাটা গেছে। দাঁড়িয়েছে।
শাসক কংগ্রেসীদের অবস্থা এসব সম- অন্তরিক্ত বিরোধী কংগ্রেসীরাও
স্তার বালাই নেই। তবে এখন রাজ্য তৎপর। তাদেরও মদত যোগাচ্ছে
রাজনীতিতে যে হাওয়া তাতে রাজ্য কর্মতাসীন কংগ্রেসের অর্থ যোগান-
কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ দিন দিন মুখে দাতাদের অস্ত্র একটি গোষ্ঠী। কলে,
পড়ছে। বহু অঞ্চলেই কংগ্রেস সংগ- কিছুকাল পূর্বে যে রাজ্য কংগ্রেস দপ্তরে
ঠানে ভাঙন, পুরোনো কংগ্রেস কর্মীরা জম-জমাট রমরমা অবস্থা ছিল এখন
বসে পড়ছেন। এমন কি যেসব ছাত্র সেখানে শোকের ছায়া নেমেছে।
যুবক কংগ্রেস সম্পর্কে মোহগ্রস্ত হয়ে শাসক কংগ্রেসের নির্বাচনের
ছিল তাদেরও একটা বিরাট অংশ/ হয় কাছে এবং কিছু বিরোধী বিরোধী
বসে পড়ছে বা সরাসরি শাসক কংগ্রে- প্রার্থীর কাছে কুখ্যাত একচেটিয়া
সেই বিরোধিতা করছে। অবশ্য অর্থ- পুঞ্জির গাড়ি ও অর্থ ব্যবহারের
মানস্তুরা এখনো কংগ্রেসী রাজ- সংবাদ শোনা যাচ্ছে। কিছু কিছু
নীতিতে প্রগাঢ় আস্থাবান কারণ (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



ডায়মণ্ডহারবারে কলকাতার কুখ্যাত মস্তানদের সমাবেশ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ডায়মণ্ডহারবার কেন্দ্রের সি পি আই (এম) প্রার্থী
জ্যোতির্ময় বহু অভিযোগ করেছেন যে, কংগ্রেসী মস্তানরা
তাকে এবং তাঁর কর্মীদের অনেক অঞ্চলে চুক্তি দিচ্ছে না।
দর্পণ খবর নিয়ে জানতে পেরেছে যে, উত্তর ও দক্ষিণ
কলকাতার অনেক কুখ্যাত মস্তানকে ডায়মণ্ডহারবার নিয়ে
বাওয়া হয়েছে সেখানে ভোটারদের মধ্যে সম্মান সৃষ্টি করার
জন্ত। জ্যোতির্ময় বহুকে পরাজিত করার জন্ত উঠে পড়ে
লেগেছেন পশ্চিমবঙ্গের তথ্যমন্ত্রী হরত মুখার্জী। বহু

প্রতিদ্বন্দ্বী বীরেন মহান্তি হরতর লোক। কলকাতা কর্পো-
রেশনে হরতর হাজার খানেক লোক ঢুকিয়েছেন বীরেন
মহান্তি তাদের অন্ততম। তবে মহান্তিকে একটি উচ্চ পদে
চাকরী দেওয়া হয়েছে—ডেপুটি ডেপুটি অফিসার।
পদটি আগে ছিল না, মহান্তির জন্যই তৈরি করা হয়েছে।
এবং নিয়োগের কোনরকম নিয়মকানুন না মেনেই তাঁকে
চাকরীতে বসানো হয়েছে।

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

প্রেসিডেন্সী জেলে এখনও অনেক রাজনৈতিক বন্দী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রের কয়েকজন মন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্য-
মন্ত্রীরা বলছেন যে, জেলে আর রাজনৈতিক বন্দী নেই।
সিদ্ধার্থ রায়ও বলছেন সব রাজনৈতিক বন্দীকে ছেড়ে
দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এদের কথা সত্য নয়। কারণ
পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা সহ অন্তরাজ্যে, বিশেষ করে বিহার
উত্তরপ্রদেশ পাকিস্তান রাজস্থানে বহু রাজনৈতিক বন্দী এখনও
জেলে আটক আছেন, যাদের মধ্যে বহু সি, পি, আই
কর্মীও রয়েছেন।

কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলের খবর সম্প্রতি দর্পণের
সংবাদদাতা জানতে পেরেছেন। সেখানে এখনও সি পি
আই (এম)-এর ২৪ জন মিসাবন্দী আছেন। সম্প্রতি
সি পি আই (এম)-এর কলকাতা জেলা কমিটির দুজন
সদস্য জ্ঞান সেন ও রাজদেও গোস্বালা ছাড়া পেরেছেন।
কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন কাউন্সিলার মুহুর
সর্বাধিকারী (ছ বহুরেরও বেশি বন্দীজীবন) সহ বিভিন্ন

গোষ্ঠী পরিচালিত সি পি আই (এম-এল) এর ৮০/৮২ জন
বন্দী আছেন। তাছাড়া প্রাক্তন সি পি আই (এম-এল)
কর্মী, কিন্তু বর্তমানে নবশালপন্থীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৪০
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

পাটনার বিক্ষোভ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পাটনা থেকে খবর পাওয়া গেছে, সেখানে ইন্দিরা বিরোধী
তরঙ্গপ্রচণ্ড জোরে বইতে শুরু করেছে। গত সোমবার পাটনা
শহরে ইন্দিরার সভা থেকে যে কয়েক হাজার লোক ফিরে
আসছিল তাদের মুখে ইন্দিরা গান্ধী বা কংগ্রেসের সমর্থনে
কোন স্লোগান ছিল না। তারা জয়প্রকাশের নামে জিন্দা-
বাদ ধ্বনি দিচ্ছিল আর ইন্দিরা ও দেবকান্ত বরুয়ার বিরুদ্ধে
স্লোগান তুলছিল : "দিল্লী বা দিল্লী ওয়াপস যাও", "দেবকান্ত
বরুয়া ইন্দিরা কা তেডুয়া"।

দর্পণের বিশেষ সংখ্যা

বিংশ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে দর্পণের আগামী সংখ্যাটি বহুতর
প্রকাশিত হচ্ছে। এতে থাকবে জরুরী অবস্থা, গণতন্ত্র, নির্বাচন, কংগ্রেস
ও বাধীনতা, এই নির্বাচনের তাৎপর্য, ইন্দিরা গান্ধীর নৈরাচারী শাসন
ইত্যাদি বিষয়ে সমরোপযোগী কয়েকটি লেখা। তাছাড়া থাকবে নির্বাচন
সম্পর্কে তথ্য ও সংবাদ, জর্জ ফার্নান্ডেজের ভাইয়ের ওপর জঘন্য পুলিশী
অত্যাচার সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে লেখা মায়ের চিঠি, হরিয়ানা, পরিবার
কিন্তু কল না বনা মে-অত্যাচার ও অন্যান্য সংবাদ এবং তৎসহ কার্টুন ও
ছবি।

দাম এক টাকা

সম্পাদকীয়

বিশ্বখলার নায়ক কংগ্রেস

বিরোধীরা বর্তমান নির্বাচনকে গণতন্ত্র বনাম এক নায়কত্বের সংগ্রাম বলেছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী থেকে শুরু করে কংগ্রেসী নেতা ও মন্ত্রী সকলেই এই নির্বাচনকে শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলা লড়াই রূপে চিত্রিত করে জনসাধারণকে বোকাতে চাইছেন যে, একমাত্র কংগ্রেস হলই এই দেশে আইনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেশ ও জাতিতে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু এই দাবি যে কীচের বাসনের মত ঠুনকো সেকথা শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর চামুণ্ডারা নিশ্চয়ই বোঝেন, তাই জোর-পলায় এবং যুক্তি দিয়ে এই দাবি উচ্চারণ করতে পারছেন না।

কংগ্রেস তিরিশ বছর এদেশে রাজত্ব করেছে। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সংক্ষিপ্ত প্রধানমন্ত্রিত্বের কাল বাদ দিলে শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর পিতাই ভারতের ভাগ্য-বিধাতা এই দীর্ঘ সময় ধরে। জওহরলাল নেহরুর কথা-বাদ দিলেও শ্রীমতী গান্ধী নিজেই দশ বছর গদীতে বসে আছেন এবং গিণ্ডিকোট হট্টের ১৯৬২ সাল থেকে সমস্ত ক্ষমতা নিজের কন্ডায় এনেছেন। কিন্তু এই দশ বছরে তিনি কি করেছেন? তিনি কি দেশকে অগ্রগতি পথে নিয়ে যেতে পেরেছেন? দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার কি চাকরী পেয়েছে? যে ৭০ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে ছিল তাদের অবস্থার কি উন্নতি হয়েছে? একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সম্পদ কি কমছে? ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কি উন্নতি হয়েছে? কালোবাজারী ও চোরাকারবারীদের দৌরাত্ম্য কি কমছে? কংগ্রেসী মন্ত্রী ও নেতারা কি চুরি চামারি ছেড়ে দিয়েছে? এই প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর নঞর্থক।

এর থেকে বিশৃঙ্খলা আর কি হতে পারে? বিরোধীরা এই বিশৃঙ্খল অবস্থার বিরুদ্ধেই আন্দোলন চালাচ্ছিল। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরো-বার পর আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। তখন ক্ষমতা হারাবার ভয়ে শ্রীমতী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলেন। কারণ নিজের দলের ভেতরেও বিক্ষোভ ঘুমায়িত হচ্ছিল। কিন্তু জরুরী অবস্থার মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেও কি বিশৃঙ্খলা ঘোষ করা গেছে? এই প্রশ্নের উত্তরও নঞর্থক। তফাৎ শুধু এইটুকু যে, ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন পর্যন্ত থেকে প্রচুর শ্লোগান তৈরী হয়েছে এবং ট্যান্ডি, বাস, ট্রাম, লরী প্রভৃতিতে এই শ্লোগান লিখেই শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

এখন আবার কবর থেকে যুক্তফ্রন্টের তথাকথিত “ভয়ঙ্কর” দিনগুলিকে টেনে আনা হচ্ছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় এত স্বত্বাধীন নয় যে, তাঁরা জুলে গেছেন এই রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও খুনোখুনি প্রচণ্ডভাবে চলে-ছিল ১৯৭০ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যাবার পর। প্রধানমন্ত্রী বোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন তাঁর নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ রিসার্চ ও অ্যানালিসিস উইংয়ের পরিচালনার কতগুলো খুন হয়েছে এই সময়। গত দশবছরে সারা ভারত-বর্ষে অনেক রহস্যজনক ঘটনা, অনেক খুনোখুনি, অনেক কিছু ঘটে গেছে। তার সত্য সংবাদ ও নেপথ্য ঘটনা জানা যায় নি এবং অদৃশ্য ভবিষ্যতে হয়তো জানাও যাবে না। তবে সত্যকে চিরকাল কবর চাপা দিয়ে রেখে দেওয়া যায় না।

চাঞ্চল্যকর খবর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এদিকে দিল্লীতে সরকারী কর্মচারী-দের এক বড় অংশের নাম ভোটের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে এই সন্দেহে যে তাঁরা বিরোধী সমর্থক। এঁরা ক্ষুব্ধ এবং ইতিমধ্যেই এঁদের অনেকে বিরোধী দলগুলিকে অর্থ সাহায্য করেছেন।

আরও অনেক খবর শোনা যাচ্ছে। ভারতের মক্কা রাষ্ট্রপুত্র শ্রীহর্ষর গুজরাল নাকি পদত্যাগ করে জনতা পার্টির পক্ষে দাঁড়াতে চেয়ে-

ছিলেন। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতির বহু ঘণ্টে এবং তাঁকে শেষ কালে মক্কার থাকতে বলা হয় যার ফলে তিনি দিল্লী আসতে পারেন না এবং নমিনেশন হাখিলের দিন পেরিয়ে যায়। তবে গুজরাল সাহেব পরে দিল্লীতে এসে-ছেন এবং শোনা যায় তিনি নাকি অগভীরবাবুর জন্ত সোল্ডিয়েট সর-কীরের কিছু বাণী বহন করে এনে-ছেন। অগভীরবাবুর সঙ্গে মক্কার সম্পর্ক ভাল।

কংগ্রেসকে পরাস্ত করুন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নিখিল বরু প্রাথমিক শিক্ষক কার্যকরী বার্ষিক ব্যক্তিগত মালিকা-মন্ডির সাধারণ সম্পাদক শ্রীপোহলা-নাম রাই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করার জন্ত রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেছেন, “আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী জোট জয়যুক্ত হলে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে। এক-নায়কত্ব পরাজিত হবে।”

জরুরী অবস্থা জারী করে কিছুতেই সারা দেশে এক অসহ্য অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে তার বর্ণনা দিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “পুঞ্জীভূত গণ বিক্ষোভ যোকাবিলা করার জন্ত দেশী ও বিদেশী এক চেটিয়া পুঁজিপতি জোতদার জমিদারদের শাসক প্রতিনিধিত্ব নিলক্ষ্যভাবে দমন পীড়ন ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বাঁচার আন্দোলনকে নস্ট্রা করে সংকটের বোঝা শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত কর্মচারী ছোট মাঝারি শিল্পমালিকদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে কেবল ধনতান্ত্রিক বিকাশের দেউলিয়া পথ। অতঃপরও জন্ত।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে, “প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য চলছে। আজও সঠিক গণতান্ত্রিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন প্রণয়ন হল না। সেই ১৯৬০ সালের ইংরাজ আমলের প্রাথমিক শিক্ষা আইন বারা গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা আজও পরিচালিত, সহরাক্ষরের প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৭২) সারা রাজ্যের মাত্র ১৭টি পৌর এলাকায় চালু হয়েছে। কলকাতা মহানগরীর প্রাথমিক শিক্ষা আজও

কার্যকরী বার্ষিক ব্যক্তিগত মালিকা-মন্ডির সাধারণ সম্পাদক শ্রীপোহলা-নাম রাই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করার জন্ত রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেছেন, “আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী জোট জয়যুক্ত হলে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে। এক-নায়কত্ব পরাজিত হবে।”

প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিকশিক্ষক সমাজের বাঁচার জন্য আজও প্রয়োজন তিত্তিক বেতন হার বাধা হোল না। প্রাথমিক শিক্ষকরা আজও নিয়মিত বেতন পান না। সাতিস বুক টিক মতন রাখা হয় না, চাকুরীর কনফারমেশন সার্টিফিকেট নেই বলে পেনসন পাবার কলস্ চালু হওয়া সম্ভব শিক্ষকরা পেনসন পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সারাজীবন শিক্ষাকর্তা করার পর প্রতিডেট ফাণ্ডের টাকার ন্যায্য সুদ পেতেও আজ অনেক শিক্ষকই বঞ্চিত হন। তাই শিক্ষা ও শিক্ষকের সমস্যা সমাধান হওয়া দূরের কথা, তা আরো জটিল ও অবহেলিত হচ্ছে। যতাবতই শিক্ষক সমাজ দেশের অন্যান্য অংশের মানুষের সমর্থন নিয়ে তীক্ষ্ণ গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করতে না পারলে সমস্ত সমস্যার সমাধানের আশা করা যায় না। কিন্তু দেশে গণতান্ত্রিক অধিকার না থাকলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হলে সংসদীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সুযোগ থেকে মেহনতী মানুষ বঞ্চিত হতে বাধ্য।

“আমাদের দেশে বর্তমানে এটাই সবচেয়ে বড় বিপদ। তাই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামই আজ এদেশে মানুষের মূল লক্ষ্য। বাঁচার সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সংগ্রামের প্রথম ধাপ গণতন্ত্রের অন্য সংগ্রাম।”

প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জনের মত বন্দী আছেন। জরুরী অবস্থা জারী করার পরে আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্ত বৃত্ত বন্দী আছেন পরিমল রত্নদাস, সোমনাথ ঘোষ, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, দীপক সাহা, কানাই মুখার্জী, প্রভৃতি। ‘গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির ভারত দাস, সঞ্জয় মিত্র, শিবাজী ভট্টাচার্য ও কল্লোল দাসগুপ্ত আটক আছেন।

ভারতীয় মহানগর সংঘের সভাপতি নরেশ পাঙ্গলীও আছেন। এস আই সি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা শ্রীশ্রামল নন্দী আছেন। এক সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল যে, আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের চাকটোক বাজার পথেও প্রেসিডেন্সী জেলের জেনানা ফটকে বারোজন রাষ্ট্রনৈতিক কারণে বন্দী মহিলাও আছেন। এঁদের মধ্যে লতিকা গুহ গ্যোবেল কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা ছিলেন। আজ প্রায় আড়াই বছর হল তিনি মিসার বন্দী।

এই বন্দীদের অধিকাংশই মিসার আটক আছেন। অনেকেরই মেয়াদ চার বছর হতে চলেছে। এছাড়া বিচারার্থী বন্দী জো আছেই।

রাজ্য কংগ্রেস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কেজে কংগ্রেস প্রার্থী সরকারী সম্পত্তি ব্যবহারে করছে। তবে, বেকার ছেলেদের নির্বাচনে কাজ হয়েছে, কংগ্রেস ও বিরোধী কংগ্রেসীরা ব্যাপকভাবে বেকার যুবকদের কাজে লাগাচ্ছে কোথাও দৈনিক পাঁচ টাকা, কোথাও বা তিরিশ চল্লিশ টাকা হারে, বিশেষ করে যে সব অঞ্চলে কংগ্রেস ও সি পি আইয়ের বিকল্পে সি পি এম প্রার্থী রয়েছেন সে সব অঞ্চলে। তবে সংশ্লিষ্ট কংগ্রেস মহলে এ বিষয়ে আতঙ্ক রয়েছে যে, এই টাকা কতটা তাদের পক্ষে বা বিশেষে কাজ করবে।

বাম ও বিরোধী মহলের ধারণা যে, অন্তর্গত আতঙ্কিত শাসক কংগ্রেস নির্বাচনের দিন বিভিন্ন বঞ্চলে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করবে। ইতিমধ্যেই বহু অঞ্চলে কংগ্রেসী চমুচা শাসানি দিচ্ছে। মুনি-দাবাদ, ২৪ পরগণা, মালদহের বিভিন্ন কেন্দ্রে এরা তৎপর। এদের ব্যাপক অংশ এসেছে কলকাতা ও শহরতলির মাস্তানদের হাত থেকে।

গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাইরে থেকে আনা হয়েছে, তবে, গ্রামাঞ্চল ও মফঃস্বলে যে ব্যাপক শাসক কংগ্রেস বিরোধী হাওয়া উঠেছে তাতে জনসাধারণের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়েছে বলে বিরোধী মহল মনে করেন। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে গাঁয়ের মানুষ এদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছেন।

যত দিন যাচ্ছে এ ব্যাপারটা স্পষ্ট হচ্ছে যে, এবার পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২ সালের মত ব্যাপক গুণ্ডারি সংগঠিত করা শাসকবৃন্দের পক্ষে সম্ভব নয়।

এ ছাড়া, সাধারণভাবে মানুষ মনে এ ধারণা বহুসংখ্যক, এবার কেউ কংগ্রেসের একচেটিয়া স্বত্বের অবদান হবে এবং বিরোধী প্রতিপক্ষের ক্ষমতা-সীন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

তবে সাধারণ লোকের ভয়, শেষ মুহুর্তে শ্রীমতী গান্ধী কোন অজুহাতে নির্বাচন বন্ধ করেও দিতে পারেন।

ডায়মণ্ডহারবার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জরুরী অবস্থা তথ্যমন্ত্রী রূপে সেকারের নামে সংবাদ পত্রের ওপর ছড়ি ঘোরাবার পর স্বতন্ত্র এখন সঞ্জয় শাস্ত্রীর ভক্ত হয়েছেন। সঞ্জয়ের আদেশেই স্বতন্ত্র ডায়মণ্ড-হারবারের সাপরিচাতে কয়েকটি ঘর ধ্বংস করে বাজি কামড়ে পড়ে আছেন জ্যোতির্ময় বহুকে হারাবার জন্য। সরকারী গাড়ি ও ক্ষমতার অপব্যবহার চলছে। বীরেন মহান্তি কর্পোরেশনের জীপ প্রতিদিন নিজের নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করছেন।

জানা গেছে, পুলিশকে কাজে লাগাবার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু সর্বোচ্চ পদে আসীন পুলিশ অফিসারদের এখন ভজানো যায় নি। কংগ্রেসীরা বোধহয় জুলে গেছে এটা ১৯৭২ সাল নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে পুলিশ অফিসারেরা নিষিদ্ধ কংগ্রেসের পক্ষে আসলে নামে রাজি নাও হতে পারেন।

নির্বাচনী বুলেটিন (২)

সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পরিবেশ

কালিদাস কাক্সিলাল

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর দলের নেতারা গর্ব করে বলেন, “আমরা ‘gains of emergency’ নষ্ট হতে দেব না।” এখন বিচারের কঠিনপাথে যাচাই করে দেখতে হবে এই তথাকথিত ‘gains of emergency’ অর্থাৎ জরুরী অবস্থার ফলগুলি কি কি?

শাসক পার্টি বাই বলুন, আমাদের বিচারে জরুরী অবস্থার প্রধান ফল যা ফলগুলি তো এই:

স্বাধীনতা-সংগ্রামের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের স্বাধীন ভারতের জেলখানার সুদীর্ঘ বন্দী জীবন যাপন করতে হয়েছে। মজা আরও এইখানে যে এই সব বিস্ময়কর নেতা আমাদের মহিয়সী প্রধান মন্ত্রীর পিতা পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর পরম প্রীতিভাজন সহকর্মী ছিলেন একটানা তিন চার দশকের কাছাকাছি।

এঁদের নামে অর্ধ সত্য, অসত্য ও অতিরঞ্জিত নানা রকম কুৎসা রটনা করে এঁদের চরিত্র হননের চেষ্টা চলছে সারা দেশে, তথা সারা পৃথিবীতে। অর্থাৎ এঁদের আত্মগত সমর্থনের সর্ব-বিধ সুযোগ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এক তরফাভাবে এঁদের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে কুৎসিতভাবে চিত্রিত করার সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে অপ-চেষ্টা চলছে অপ্রতিহত গতিতে। দেশের বাট কোটি লোকের মধ্যে এক-জনকেও প্রকাশে এঁদের নাম মুখে আনতে দেওয়া হয়নি।

দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তাঁর সরকার এবং তাঁর দলের লোকেরা বা মতেন বা বলতেন, তাতে সাং দিয়ে চললে কারো নিতাই ছিল না।

প্রধানমন্ত্রী যেমনটি চান, ঠিক সেই ভাবে দেশের প্রতিটি লোককে লিখতে হবে, চলতে হবে এবং বলতে হবে। লোকসভাকে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর দলকে দেশের সুপ্রীম কোর্টের উপরে স্থান দিয়ে নির্বিবাদে আইন পাশ করিয়ে নেওয়া হল বিরোধী নেতাদের জেলখানায় রেখে।

সমালোচনা ও বিচারের আওতা থেকে প্রধান মন্ত্রীকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে লোকসভার একটা অ-গণতান্ত্রিক আইন হুসে পাস করিয়ে নেওয়া হল।

দেশের সংবিধানকে ব্যাপকভাবে সংশোধন করা হল প্রধানমন্ত্রীকে আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁর আদেশটি স্বাক্ষর করার উদ্দেশ্যে দেশের

অ-রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীমহলেরও আপত্তি অগ্রাহ্য করে।

সমাজের বিশিষ্ট ও সম্মানিত ব্যক্তি-দের লোকচক্ষে হয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে সব রকম নোংরা ও অমানবিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে কাউকে একটি কথাও বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

প্রধানমন্ত্রীর পুত্রকে রাতারাতি দেশের ‘ডুপ্লিকেট’ প্রধান মন্ত্রী বানানো হল, যার বিরুদ্ধে প্রকাশে কোনো সুস্থ ব্যবস্থা করার উপায় ছিল না কারো।

উপরের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রধান মন্ত্রী জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে এমন অনেক চাকল্যকর কাজ করেছেন, যার সঙ্গে দেশের স্বার্থের কোনো সম্পর্ক নেই। নীতি শাস্ত্র বলে, মানুষ শুধু সং হলেই চলবে না, তাকে বুদ্ধিরেও দিতে হবে যে সে প্রকৃতই সং। গণতন্ত্রের মূল কথা এই, শাসক পার্টিকে শুধু গণতন্ত্রী হলেই চলবে না, তাকে বুদ্ধিরেও দিতে হবে যে সে প্রকৃতই গণতন্ত্রী।

কংগ্রেসী নেতারা পরোক্ষভাবে বলতে চান, জরুরী অবস্থার তথাকথিত ফলগুলি (অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নতি ও নিয়ন্ত্রণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা) গণ-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাওয়া যেত না। অর্থাৎ তাঁদের মতে গণতন্ত্রকে লাইন-চ্যুত না করলে দেশের সত্যিকারের উন্নতি সম্ভব নয়। ও বাবা, সে আবার কি কথা! সে তো বড়ই সাংঘাতিক ব্যাপার! তবে কি ভার-তের সংবিধান রচয়িতারা এসে গণ-তন্ত্র চালু করে ভুলই করেছিলেন এবং সেই ভুল আজ শ্রীমতী গান্ধী প্রকা-রান্তরে সংশোধন করার রাস্তা ধরে-ছেন? কিন্তু তিনি ও তাঁর দলীয় নেতারা অ’বার মুখে গণতন্ত্রের জয়-গানই বা করেন কেন? একই মুখে জরুরী অবস্থার জয়গান (অর্থাৎ ডিক্টে-টরশিপের জয়গান) এবং গণতন্ত্রেরও জয়গান—এটা কি ভণ্ডামি হল না? রাজনৈতিক সত্যতার খাতিরে শ্রীমতী গান্ধী উচিত খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করা যে বিজ্ঞ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশকে গড়ে তুলতে উনি অক্ষম। নির্বাচনের সময় আংশিক গণতন্ত্র এবং নির্বাচনের আগে ও পরে পুরোপুরি ডিক্টেটরশিপ জরুরী অবস্থার নামে—এ কেমন রাজনীতি!

শাসক দলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা লওনে সেদিন বলেছেন, ভার-

তের গরিবেরা গণতন্ত্র চায় না, তারা চায় রুটি। তাই যদি ঠিক হয়, তবে একটা নতুন পার্লামেন্ট গঠনের উদ্দেশ্যে আবার এই নির্বাচনী প্রহসনের দর-কার কি ছিল? ভারতের শতকরা নব্বুই ভাগ মানুষই তো গরীব।

এখানে যদি মানুষকে স্বাধীনভাবে লিখতে বা কথা বলতে না দেওয়াই হয়, তবে আর দেশের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে কি হবে? নিছক রুটির জন্যে? কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী কি লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন রুটির জন্যে? তাঁর পুত্রদের কি লেখাপড়া শেখানো হয়েছিল রুটির জন্যে? মহাত্মা গান্ধী, কবিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাষ-চন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিরা এবং বর্তমান ভার-তের জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ ব্যক্তিরা কি রুটির জন্যে লেখাপড়া শিখে-ছিলেন?—নিশ্চয়ই নয়। রুটির চেয়েও মূল্যবান জিনিষ দুনিয়ায় কিছু আছে—এই মহাসত্য যদি কংগ্রেসীরা অর্থাৎ দেশের শাসক পার্টি ভুলে গিয়ে থাকেন, তবে তো দেশের চরম দুদিন ঘুমিয়ে এসেছে বলতে হবে।

ব্রিটিশ শাসনের আমলে কি দেশে রুটির অভাব ছিল? নিঃসন্দেহে রুটির অভাব ছিল? তখন তো রেলগাড়ী এক মিনিটেও লেট করত না, ছেলে-মেয়েরা পরীক্ষায় অসুস্থপায় অবলম্বনের কথা ভাবতেও পারতেন না, কলকার-খানায় ধর্মঘট হত না, শহরের রাস্তায় ট্রাম বাস পুড়তো না, ‘মিছিলের শব্দ’ কাকে বলে লোকে জানতো না, আর প্লাটফর্মে ফুটপাথে মরণোন্মুখ মানুষের ভীড়ও দেখা যেত না। তবু কেন আমরা স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে পাগল হয়ে উঠেছিলাম? এমন কি রবীন্দ্রনাথের মত একজন বিশ্বকবিও সেই পাগলের দলে এসে ভিড়লেন? তার মানে, শুধু ‘material gain’ আমরা চাই না। শুধু খাদ্য-পরিচর্যা চিন্তা থেকে অব্যাহতি পেলেই আমরা ধ্বংস হয়ে যাই না। আমাদের মহান পূর্বসূরীদের মত আমরা চিরদিন চেয়ে এসেছি এবং আজও চাই যত না বস্তুতান্ত্রিক লাভ (material gain) তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক লাভ (moral psycho-logical and spiritual gain)। আর রুটি? ধনীরা পোষা কুকুর খুঁ-লিত অবস্থায় কি প্রচুর রুটি পায় না? মাংস পায় না? আর গু কত কি পায় না? তবে কি দেশের এই নতুন কংগ্রেসীরাও দেশে খুঁলি আনবার

ছলে আমাদের খুঁলিত কুকুর করে রাখবার ব্যগ্রই দেখছেন? কিন্তু রুটির লোভ দেখিয়ে আমাদের কষ্টান্বিত স্বাধীনতা হরণ করা করবেন, তারা যতই শক্তিশালী হোন না কেন, তাঁদের আমরা জাতির শত্রু মনে করবই।

অতীতের ব্রিটিশ-শাসক যদি বর্তমান কংগ্রেসী শাসকের মত দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে রাখতো-কারেমীভাবে জাতির মুক্তি আন্দোলন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে, তবে সেদিন পরাধীন ভারতে যতখানি বিক্ষোভের সৃষ্টি হ’ত, আজ কংগ্রেসী সরকারের ভাবগতিক দেখে স্বাধীন ভারতে তার চেয়েও বেশী বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যেহেতু জরুরী অবস্থা এখনও ভুলে নেওয়া হয়নি, তাই শান্তি আর পুলিশী অত্যাচারের ভয়ে দেশে ভীত-সন্ত্রস্ত জনগণ পুরোপুরি মুখ বলতে সাহস করছে না। জরুরী অবস্থা ভুলে না দিয়ে যে ধরণের সাধারণ নির্বাচন এখন দেশে হচ্ছে, একে ‘free and fair’ নির্বাচন আদৌ বলা যায় না। পৃথিবীর কোনো গণতান্ত্রিক দেশেই এই ধরনের সাধারণ নির্বাচন কখনও হয়েছে—এমন কোনো তথ্য আমরা ইতিহাসে পাই না। গত ৩০ বছরে স্বাধীন ভারতেও এমন নির্বাচন আমরা দেখি নি। ব্রিটিশ-শাসনের আমলেও অনেকগুলি সাধারণ নির্বাচন আমাদের চর্মচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হ’য়েছিল। সেই সব নির্বাচনেও মানুষ নির্ভয়ে প্রচার করতে এবং ভোট দিতে পেরেছে। সুতরাং আগে যা বলেছি, তারই পুনরাবৃত্তি করে বলছি, এটা হচ্ছে নির্বাচনের একটা প্রহসন মাত্র। বিভিন্ন দলের হাজার হাজার দক্ষ-রাজনৈতিক কর্মী যখন জেলে আটক এমন কি নির্বাচন-প্রার্থীদের অনেকের গায়েই যখন জেলের গন্ধ রয়েছে, তখন এই দুর্ভাগ্য দেশে কিন্তু free and fair ইলেকশন হচ্ছে? আমরা কোথায় আছি!

সহজেই বোঝা যাচ্ছে, শাসক পার্টির ডিক্টেটরী শাসন-যন্ত্র আজ শুধু চাইছে একটা লোক দেখানো সাধারণ নির্বাচন, অর্থাৎ তথাকথিত জনসমর্থনের একটা ‘ম্যান্ডেট’ মাত্র। বিদেশের বিরূপ সমালোচনার বিরত হয়ে ওঁরা গণতান্ত্রিক দুনিয়াকে দেখাতে চান, ভারতের জনমত ওঁদের বৈরতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থারই সমর্থক। অর্থাৎ ওঁরা প্রমাণ করতে চান, ভারতের মানুষ সত্যিকারের স্বাধীনতা চায় না, সত্যি-কারের গণতন্ত্র চায় না। ভারতের মানুষ চায় শুধু রুটি। যিনিই তাঁদের রুটি দেবেন তাঁকেই তারা অন্মন বদনে দিল্লীর সিংহা-সনে বসাবে। অর্থাৎ এই সরকার-

নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনকে free and fair নির্বাচন বলে চালিয়ে দিয়ে যেন তেন প্রকাশে একটা mandate আদায় করা যায়। সুতরাং একটা ব্রিটিশ শাসনের আমলে পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়তে আমাদের যতখানি বেগ পেতে হয়েছিল, আজ স্বদেশী শাসনের আমলেও পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়তে আমাদের হয়তো তার চেয়ে অনেক বেশী বেগ পেতে হবে। এই নির্বাচনের ফলে শ্রীমতী গান্ধীর দল ক্ষমতায় এসে দেশের ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান ইন্দো-বিরোধীদের ভবিষ্যৎ কি হবে, তাও কেউ বলতে পারে না। [চলবে]

প্রাথমিক শিক্ষক

সমিতির প্রতিবাদ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গুরুমাত্র সরকারী কর্মচারীদের জন্য বাড়ীভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধির সরকারী ঘোষণায় রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষক সমাজ প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ। ইতি-পূর্বে ১৬ টাকা মহাঘড়ীভাতা বৃদ্ধির সময়ও প্রাথমিক শিক্ষকদের বঞ্চিত করা হয়েছে। সবচেয়ে কম বেতন-ভোগী দরিদ্র প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের ঘটনা নূতন নয়। কিন্তু বর্তমানে ক্রমা-ঘয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি উপেক্ষা ও বঞ্চনা সমস্ত শাসনীয়তাকে অতিক্রম করে নির্লজ্জতার স্তরে উপনীত হয়েছে।

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমি-তির পক্ষ থেকে-সরকারের এই জাতীয় আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং অবিলম্বে সরকারী কর্ম-চারীদের অসুস্থ সুযোগ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে দাবী জানানো হয়েছে।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

৥ চাঁদার হার ৥

বার্ষিক ২২ টাকা

বাৎসরিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫.৫০ টাকা

টাকা কড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার ঠিকানা:

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, মট লেন। কলিকাতা ১৩

জরুরী অবস্থায় অর্থনৈতিক অগ্রগতির আসল চেহারা (৫)

ডঃ সুস্মানগিয়ম স্বামী

'রপ্তানি পক্ষপাতী' নতুন ছাড়গুলি দেখে বিদেশী কোম্পানীগুলি বিশেষ প্রীতি লাভ করেছে। বস্তুত এই ছাড়গুলি তাদের কাছে সুবিধাজনক যে, আগে তারা তাদের মূল কুঠিতে সরাসরি যে মুনাফা পাঠাত এই ব্যবস্থার পরে তা অপ্রয়োজনীয়। এখন রপ্তানি বাড়ানোর নামে কম দাম দেবিয়ে মাল পাঠিয়ে বদেশ থেকে তাই আবার দামের হেরফের করে রপ্তানি করতে পারে। এতে এক-ই-আর-এ আইনকেও কাচকলা দেখান যায়। সরকারী কাগজপত্রের বলা হয়েছে যে, বিদেশী কোম্পানী ভারতীয়করণ বা রাষ্ট্রীকরণের কোন ইচ্ছা তাদের নেই। গোটাটা ক্রাভের সম্ভার মতো পুণ্য অস্থানে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রীরা এইসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন।

সুযোগসুবিধা এবং খোশামোদের বাস্তবরণে মৌলিক কোন প্রশ্ন করা হয় না। যেমন প্রশ্ন করা যেত—এত সব সুবিধা দেওয়ার পরেও দেশী বিদেশী বৃহৎ কোম্পানীগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি সমাহুপাতিক হয়নি কেন? দৃষ্টান্ত আখের উৎপাদন বৃদ্ধি মন্ত্বে ১৯৭৪-৭৫ সনে চিনির উৎপাদন ৪৮ লক্ষ টন থেকে ৪৩ লক্ষ টনে নেমে গিয়েছিল। এই উৎপাদন পড়ে গিয়েছিল সেই সময় যখন 'চিনি স্ট্রাটজের' আগেকার লেভি থেকে অব্যাহতি দিয়ে পঞ্চম পরিকল্পনার 'শিল্পকে উৎসাহ দেওয়ার নামে' ১১০ কোটি টাকা উপঢৌকন দেওয়া হয়েছিল। আখের দাম এই সময়ে একই ছিল একথা মনে রাখলে প্রশ্ন ওঠা বাস্তবিক—তাহলে উৎপন্ন চিনির ২৫% রপ্তানি করে প্রাপ্ত বিদেশী মুদ্রা অর্জনের সুবিধা কারা পেলেন? স্বতীব্র, পাট এবং চা শিল্প সম্পর্কে অল্পরূপ প্রশ্ন।

সাধারণভাবে শিল্পপতি এবং বিদেশী কোম্পানী যাদের কারবার কৃষির কাচা মাল নিয়ে, তারা এইভাবে প্রচুর মুনাফা পিটেছে কারণ এই সময়ে উৎপাদন মূল্য সামান্য বাড়লেও কৃষির পণ্যের মূল্য ভীষণভাবে পড়ে গিয়েছিল। আত্মমানিক হিসাবে সুবিধাভোগী কতিপয় ব্যক্তি তাদের আভাবিক মুনাফার উপরেও ১৫০০ কোটি টাকার মুনাফা লুটছেন। এই সব ভাগ্যবান এবং তাদের রাজনৈতিক সহযোগীদের মধ্যে এই মুনাফা কী হারে ভাগ বাঁটোয়ারা হয়েছিল জরুরী অবস্থায় তা জানা বাবে না।

একটিকে বৃহৎ শিল্পকে অকুপন করণাবর্ধক করে যখন উৎপাদ-ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য ফল দেখা যায়নি (তখন কোন উদ্দেশ্য ছিল বলেও বোধ হয়না) তখন স্ববিধির কড়াকড়ি দ্বারা ছোট এবং মাঝারি শিল্পগুলিকে অনাহারে শুকানো হয়েছে এবং আয়মানি করা প্রবোর ব্যাপারে একচেটে কারবার এবং বিদেশী কোম্পানীগুলি তাদের কোণঠাসা করেছে। সম্প্রতি সরকার বাহাদুর স্বীকার করেছেন যে, এর ফলে ছোট শিল্পের 'হুতাহার' খুব বেড়ে গেছে। কেবল ছোট শিল্পই নয়, মাঝারি শিল্পও ঝাঁপ বড় করে দিতে আরম্ভ করে দিয়েছে। বিশদকা পরিকল্পনার বাচাল প্রচারকেরা যে স্বল্প পুতাকলের কথা বলে থাকেন এগুলি তা নয়—এগুলি হল ইঞ্জিনারিং কারখানা। এর মধ্যে কতগুলিকে কিছু তরুণ উদ্ভাস্তা হুঁতিন বছর আগে ৬৬ কোটি টাকা লব্ধি করে বসিয়েছিলেন। নভেম্বর ১৯৭৫ থেকে এপ্রিল ১৯৭৬ এর মধ্যে ডি-জি-টি-ভির দ্বারা পরিদর্শনের কালে ১১ টি ইউনিট বন্ধ হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে ৬১ টি ছিল ইঞ্জিনারিং কারখানা। স্প্রেয়ার পাট এবং আহুসংগিক শিল্পও ভীষণ দা খেয়েছিল। ছোট এবং মাঝারি রেডিও সেট উৎপাদন ৩০% কমে গিয়েছে। বস্তুত ১৯৭৫-৭৬ এর প্রথম আট মাসে প্রায় ৫০ টি শিল্পের উৎপাদন এই নীতির ফলে পূর্ববর্তী বছরের ঐ সময়ের তুলনায় পড়ে গিয়েছিল।

সরকার হুটি অর্থনৈতিক অগ্রের দ্বারা এই ইউনিট গুলিকে অতুষ্ক রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে একথা মনে রাখলে বোঝা বাবে যে ছোট এবং মাঝারি শিল্পের এই অপসৃত্য অবধারিত। প্রথমত ১৯৭২ সনে ক্ষুদ্র শিল্পকে দেওয়া ১১৮ কোটি টাকার আমদানি লাইসেন্স ১৯৭৫ সনে কমে দাঁড়িয়েছে ৫২ কোটি টাকা। যদিও প্রথম আমদানি লাইসেন্সের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৮৫৪ কোটি থেকে ২৫৩৬ কোটি টাকায়। দ্বিতীয়ত আত্মীয়কৃত ব্যাংকগুলি থেকে মঞ্জুর করা ঋণের পরিমাণ ১৯৭৫ সনের ১০৪৩ কোটি থেকে ১৯৭৬ সনে হয়েছিল ১১৮০ কোটি যদিও মোট মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ বেড়েছিল ৮৭৮৭ কোটি থেকে ১০,৯৬৭ কোটিতে।

'অনিচ্ছুরতা'-র স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত ছোট এবং মাঝারি শিল্পের উৎপাদনও কমে গিয়েছিল। মিলগুলিতে স্বতীব্র উৎপন্ন হয়েছিল ৪৪ লক্ষ মিটার। এটা ১৯৭৭ সনের উৎপাদনের অনেক কম তো বটেই, এমন কি ১৯৪৪ সনের চেয়েও কম। পাটে উৎপাদনের ঘাটতি হয়েছে ১৮%। বস্তুত ১৯৭৪ সনের প্রথম তিন মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় ২০ টির মধ্যে ১৪টি শিল্পে উৎপাদন আগের তুলনায় কমে গিয়েছিল। কাগজ উৎপাদন ১৯৬৭-৬৮ র চেয়ে আর কখনো বাড়েনি, ১৯৭৫-৭৬ সনে তো নয়ই। কাচ এবং সালফুরিক অ্যাসিডের একই অবস্থা। এত কন্সলেশন সত্ত্বেও বিদেশী কোম্পানীগুলি টারার এবং টিউবের উৎপাদন বাড়াতে পারেনি যা ৫৫ লক্ষ ইউনিটে স্থির হয়ে আছে। শিল্পের বস্তুত্ব হল মজুদ মালের পরিমাণ 'আতুষ্করণ'।

কাজেই সামগ্রিক ভাবে প্রাইভেট সেক্টরে ১৯৭৫-৭৬ সনে উৎপাদন পড়ে গেছে ৬% যদিও এম্বেদ মধ্য রপ্তানিবৃত্তী কারখানাগুলি ভাল করে থাকতে পারে। শিল্পের প্রবৃত্তি এর জন্য ঋণের অনটনকে দায়ী করেছেন যদিও আমাদের মতে এর কারণগুলি আরও গভীর। কিন্তু শ্রমতী ঋণের কড়াকড়ি তুলে দিয়ে এই শিল্পকে আর বহিত করতে পারেন না, তাহলে যে অন্ততঃ দু বছর ধরে মুদ্রাস্ফীতি প্রশ্রয় পাবে। রাজনৈতিক ভাবে তাড়ীর পক্ষে সম্ভব নয়। সরকার পড়েছে এই অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার উত্তর সংকটে।

'কুটির বদলে কেক থাক না'

সম্প্রতি ২৬ আগষ্ট ১৯৭৬ খ্রীস্টীয় শাঙ্কী করে জন-এম-পিকে বলেছেন যে, পরিকল্পনার কোন কোন অংশ কাজে পরিণত না করা শাপে বর হতে পারে। গোবর গ্যাসের উদ্ভব করে তিনি বলেন যে, হুঁটের অভাবে গ্রামের পরীষ লোকদের ভোগাতির একশেষ হয়েছে। আমাদের সমকালীন মারী আভো-দ্রানেত কী বলতে চাইছেন এম-পিরা বোধ হয় তা খুব ভালো করে বুঝতে পারছিলেন না।

২০ দফার কর্মসূচি জারি করার সময় এই বুদ্ধি বোধ হয় তার মাথার আসেনি। মাহুবক আধুনিক মৌলিক দ্রব্য সরবরাহ করার প্রয়োজনীয়তা তিনি তাঁর বেতার বক্তৃতায় বলেছিলেন। 'প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থাকে উন্নত' করা ছিল প্রথম প্রতিশ্রুতি। 'গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা' ছিল আরেকটি। 'নিয়ন্ত্রিত দরের কাপড় যাতে গ্রামে এবং শহরে সহজে পাওয়া যায় তার জন্য বৃত্তি, শাড়ী এবং কাপড়ের মান উন্নত করার ব্যবস্থা করা' ছিল তৃতীয় প্রতিশ্রুতি। এ ছাড়া ছিল সস্তা পাঠ্য পুস্তক হুঁটেলের খাবার এবং শিশুশ্রমীদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি। কিন্তু কাজ কতটুকু হয়েছে?

সরকারী বটন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সত্যিকারের অভিপ্রায় যদি সরকারের থাকত তাহলে তার লক্ষ্য প্রথম, দ্বিতীয় পড়ত রেলের মাল পরিবহনের পরিমাণে। ১৯৭৫-৭৬ সনে রেলের পরিবাহিত মালের পরিমাণ ছিল ২০ কোটি টন যা ঐ বছরের লক্ষ্যমাত্রার ১০% কম; ১৯৭৭-৭৮ সনের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩৪% কম; ১৯৭৮-৭৯ সনের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৫০% কম এবং ১০ বছর পূর্ব-বর্তী ১৯৬৫-৬৬ সনের চেয়ে ৩% কম। তার উপর প্লানিং কমিশন ১৯৭৮-৭৯ সনে মাল পরিবহনের লক্ষ্যমাত্রাকে কমিয়ে দিয়েছেন। অতএব সরকারী বটন ব্যবস্থাকে মার্জিত করার এইসব বাগাড়ম্বর নিছক ভিত্তিহীন অলং প্রচার মাত্র। আবার ইন্দিরা গান্ধীর সরকার পর্ষাপ্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করতে কী বোঝান তা অর্থমন্ত্রী সি হরম্মনিয়মের একটি বেকাস কথার বেরিয়ে পড়েছে। তিনি বলেছেন যে, 'প্রতি বছর ১ কোটি থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করতে পারলেই সরকারী বটন ব্যবস্থাকে পর্ষাপ্ত বলা যায়। ১৯৭৫-৭৬ সনে সরকার ১ কোটি ১১ লক্ষ টন বটন করেছে বলেই অভিও তিহুরাল পাবলিসিটির কতারা চাক পিঠিয়ে সরকারের এই কেরামতি আহির করেছে। এটাই যদি কৃত্তিমের নিরিখ হয় তাহলে তো ১৯৭৩-৭৪ সনে আমাদের সাধারণ বটন ব্যবস্থা আরো বেশী ফলপ্রসূ ছিল কারণ তখন ১ কোটি ১৪ লক্ষ টন মাল চলাচল করেছিল...তখন আবার সরকারকে অপ্রকাশ নামক দানব এবং আর-এস-এস নামক রাক্ষসদের সংগে পাক্ষা লড়ায়ে হয়েছিল। আরো ভালো ছিল ১৯৬৬-৬৭ সনে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ মাল চলাচল হয়েছিল যখন মোরারজি দেশাই তার ছুরি শাণাচ্ছিলেন। বলা বাহুল্য, বাস্তব ঘটনা খুব অসুবিধাজনক।

বিশদকা পরিকল্পনার আওতার কন্ট্রোলের কাপড় সরবরাহ আর একটা প্রত্যয়নামূলক প্রতিশ্রুতি। এই ব্যাপারে ইন্দিরা-সরকারের কপটতা বস্তুত প্রকট আর কিছুতে নয়। ১৯৬১-৭৪ এর মধ্যে (বার অধিকাংশ বছর খ্রীস্টীয় শাঙ্কী শাসনকালের অন্তর্ভুক্ত) মোটা এবং নিয়মাবলি কাপড়ের উৎপাদন ২৭% কমে গিয়ে অতিমিহি কাপড়ের উৎপাদন বেড়েছিল ৩৪%। অতিমিহি কাপড়ের উৎপাদনে আপত্তির কিছু থাকত না যদি না সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য মোটা কাপড়ের উৎপাদন এত বেশী কমিয়ে দেওয়া হত। আত্মীয় আয়ের বটন

(শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

মুর্শিদাবাদের নির্বচনী সংবাদ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বহরমপুরের এক সম্ভার মুর্শিদাবাদের বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে নাগরিক কমিটি গঠিত হয়। ওই কমিটি বাম-জনতা পার্টি সমঝোতাকে বাণত আনিরে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। সম্ভার গৃহীত এক সিদ্ধান্তে আসার লোকসভার নির্বাচনে বাম-জনতা জোটের প্রার্থীদের সমর্থন করার কথাও ঘোষণা করা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় এখন ভোটার হাওয়া কংগ্রেস বিরোধী রূপ নিয়েছে।

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেনজী হলে ছাত্র পরিষদ কর্মীদের সঙ্গে ওই কেন্দ্রের (জঙ্গীপুর) প্রার্থী হাজী লুৎফুল হকের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় জটনক ছাত্রনেতার হাতে ওই কেন্দ্রের এম-এস-এ অপমানিত হন। ছাত্র পরিষদ কর্মীরা সম্ভার বক্তব্য রাখেন যে-এই এলাকায় সম্ভার সৃষ্টি করা ছাড়া ভোটে জেতার কোন উপায় নেই। সম্ভার সৃষ্টি করতে হলে অবিলম্বে "আমাদের মুখপাত্রকে" মিসা থেকে যে ভাবেই হোক মুক্ত করতে হবে। ছাত্রপরিষদের মুখপাত্রটিকে মাত্র মাস খানেক আগেই পুলিশ রিগার আটক করেছে। ওই মুখপাত্রটি সরকারী দৈনিক বহুমতীরও ভেতকারী সংবাদদাতা। মিসা ছাড়াও তার বিরুদ্ধে জঙ্গীপুর আদালতে একটি মামলা চলছে। তা ছাড়াও তার বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে যা শুধরে কেউ প্রকাশে কিছু বসতে পারে না। তাই বর্তমানে তাকে মিসা থেকে বের করার জন্য বহু নেতাই বেশ তৎপর হয়ে পড়েছেন। স্বস্ত-রিক-রঘুনাথগঞ্জ শহরের উপর প্রকাশে কয়েকজন ছাত্র পরিষদ কর্মী হুঁ বেড়াচ্ছে বাঘেরনামেই মিসা রয়েছে।

জানা গিয়েছে কোন এক অদৃষ্ট হতক্ষেপে এইসব ছাত্র পরিষদ কর্মীদের ভোট শেব না হওয়া পর্যন্ত রেপ্তার স্থগিত রাখা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় যে তিনজন কংগ্রেসের প্রার্থী তাঁদের প্রত্যেককে কংগ্রেস থেকে ২ লাখ করে নগদ টাকা (প্রয়োজনে আরও দেবে) ও ৬টি করে জীপগাড়ী দেওয়া হয়েছে প্রচার করার জন্য। ২০শে ফেব্রুয়ারী বহরমপুর জেলার মরদানে ভাষণ দেওয়া প্রধানমন্ত্রী। এই জনসভায় যোগ দিয়ে ছিলেন মাত্র কয়েক হাজার লোক। ওই দিন বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে রিজার্ভ করা ট্রাক পাঠানো হয়েছিল জনতা জোগাড় করে জনসভায় আনার জন্য।

(শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

সুতীব্র শিল্প : মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের মিল মালিকদের জন্য সমগ্র দেশ লুণ্ঠন

রঞ্জিত রায়

অসহযোগ আন্দোলনের সময় মোহনদাস কেরমদাস পান্ডী জাতির উদ্দেশে বলেছিলেন : "ত্যাগ স্বীকার করেও এই [সুতীব্র] শিল্পের পূর্ণ উন্নয়নে সহায়তা করা প্রতিটি ভারত-বাসীর প্রধানতম কর্তব্য।"

বদেশী আন্দোলন থেকে অস্তিত্ব শিল্পের মালিকগণ যত মুনাকা লুটেছেন তার চাইতে অনেক বেশী লুটেছেন বস্ত্রবস্ত্রের মালিকগণ। সুতরাং বাধা-নতার পূর্বে তারা বিনা কারণে কংগ্রেসকে বিপুল অর্থ প্রদান করতেন না। কংগ্রেস তহবিলে সর্বাধিক অর্থ এখনো প্রদান করে থাকেন তাঁরাই।

প্রশ্ন করার সময় এসেছে : "দারিদ্র্য লাভিত, অর্থহীন ভারতবাসী অবশ্যই ত্যাগ স্বীকার করবে, কিন্তু কার জন্য আর কতদিন?"

১৮৫৪ সালে বোম্বাইয়ে সর্বপ্রথম লার্ববস্ত্রের কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। সেই সময় থেকেই ভারতে বস্ত্রশিল্প সুতীব্র শিল্পের শুরু। এই শিল্প সম্বন্ধে ব্রিটিশ ভারত সরকারের নীতিসমূহ ল্যাক্সাশায়ারের কাপড়ের কলগুলির স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নির্ধারিত হত। ল্যাক্সাশায়ারের সুতীব্র শিল্পের ৭৫ গুণে লড়াই করে এই শিল্প প্রসার লাভ করে। মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাষ্ট্রাই এই সুতীব্র শিল্পের প্রধান কেন্দ্র তথা সর্ববৃহৎ তুলা উৎপাদক অঞ্চল।

১৯০৪ সাল অবধি ভারতের সুতীব্র শিল্পকে কঠিন সমস্যার ভিত্তি দিয়ে চলতে হয়। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মুখ্য অস্ত্র হিসাবে "ব্রিটিশ পণ্য বর্জন" দিয়ে বাঙালার বিভাগ বিরোধী আন্দোলনের সুত্রপাত হয়। উক্ত আন্দোলনই এই শিল্পের অবস্থার এক মূলগত পরিবর্তন আনয়ন করে। দরিদ্র ভারতীয় তোক্তাদের শোষণ করে কাপড়ের কলের মালিকেরা অস্বাভাবিক মুনাফা আর করা শুরু করেন। বদেশী পণ্যের পক্ষে বাঙালীরা বতাই তাদের আন্দোলনকে তীব্র করতে থাকে এবং মেলে যেতে থাকে, ততই কাপড়ের কলের মালিকেরা মুনাফা লুণ্ঠনে থাকে বেশী করে। ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে দাদাভাই নওরোজি বলেন :

"আশা করি বাঙালিরা বদেশী প্রত্য বর্জন আন্দোলন চালিয়ে যাবে।... বদেশী আন্দোলন বোম্বাইয়ের মিল-গুলির পক্ষে বস্ত্রত: অতীব লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ব্রিটিশ ও জাপানী

বস্ত্র আমদানিতে প্রচণ্ড বাধাব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায় এবং ভারতীয় মিল মালিকদের আরেক দফা অকল্পনীয় দৌড়োণ্য এনে দেয়। যুদ্ধের পরে ভারতের বাজারে পুনরায় আসার জমাতে ব্রিটিশ ও জাপানী মিলগুলির লেগে যায় কয়েক বৎসর। তারা পুনরায় আসার জমাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় মিলগুলির পক্ষে তাদের উৎপাদিত বস্ত্র এ ব্যবস্থার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। দামের বিক্রয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনতখন এসে দাঁড়ায় তাদের পাশে। কংগ্রেস যে কেবল-মাত্র বস্ত্র বর্জনের আহ্বানকেই দেশের দুর্বৃত্ত প্রাণে পৌঁছে দেয় তাই নয়, ভারতীয় মিল মালিকদের স্বার্থে বদেশী বস্ত্রের উপর উচ্চহারে আমদানি শুদ্ধ বসাবার দাবীকেও সমর্থন করতে শুরু করে।

জাতীয় নেতৃত্ব ১৯২৭ সালের আগস্ট মাসে ভারতীয় কাপড়ের কল-গুলিকে প্রথম দফার সংরক্ষণ প্রদান করতে সরকারকে বাধ্য করে। মূল্যের হিসাবে শতকরা ৫ শতাংশ সংরক্ষণ শুদ্ধ বসান হয় আমদানিকৃত সুতার উপরে। কাপড়ের মিলের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিষপত্রের উপরে ধার্য ১০ শতাংশ আমদানি শুদ্ধ ইতিপূর্বেই তুলে দেওয়া হয়েছিল।

জাতীয় আন্দোলন যত শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে ততই সংরক্ষণ শুদ্ধর মাত্রাও হতে থাকে বৃদ্ধি। সুতার উপরে পূর্বে ধার্য ৫ শতাংশ সংরক্ষণ শুদ্ধ অ ব্রিটিশ কাপড়ের উপরেও ধার্য করা হয় ১৯৩০ সালে। সেই সংগে সর্বপ্রকার আমদানিকৃত বস্ত্রের উপরে ধার্য রাজস্ব শুদ্ধ ১১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে করা হয় ১৫ শতাংশ। ১৯৩১ সালে ব্রিটিশ বস্ত্রের উপরে ২৫ শতাংশ শুদ্ধ ধার্য করা হয় এবং অ-ব্রিটিশ বস্ত্রের উপরে ধার্য শুদ্ধ বৃদ্ধি করে করা হয় ৩১ শতাংশ। ১৯৩২ এবং ১৯৩৩ সালে আরও দুই দফার অ-ব্রিটিশ বস্ত্রের আমদানির উপর সংরক্ষণ শুদ্ধ বৃদ্ধি করে করা হয় আমদানি মূল্যের ৭৫ শতাংশ। অর্থাৎ ভারতের বাজারে আমদানিকৃত বস্ত্রের মূল্য এই পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। এই বর্ধিত মূল্যের স্বযোগে এদেশী মিল মালিকের তাদের বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি করে। তারপর শুদ্ধ হ্রাস করা হয় কিছুটা। অবশ্য তার পূর্বে ভারতের বাজারে ভারত ও ব্রিটেনের মূল্য প্রতিদ্বন্দ্বী জাপান থেকে আমদানিকৃত বস্ত্রের পরিমাণের উপরে

বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছিল। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে ব্রিটেন থেকে আমদানিকৃত বস্ত্রের উপর শুদ্ধ হ্রাস করে করা হয় ১৫ শতাংশ। এর অনতি-পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে ভেঁটে এবং সর্বপ্রকার শুদ্ধই নিরর্থক হয়ে পড়ে। কারণ সমস্ত বদেশী বস্ত্রই সরবরাহ যায় বন্ধ হয়ে। নিজ দেশের সম্পূর্ণ বাজার করায়ত্ত হয়ে যায় ভারতীয় মিল-গুলির। ভাছাড়া, বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৈন্যবাহিনীর জন্য ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদাও বৃদ্ধি পায় প্রচুর পরিমাণে।

১৯৩০-এর দশকে বিশ্বব্যাপী অর্থ-নৈতিক সংকটের কারণে অস্ত্র-সমস্ত শিল্প দারুণ দার বেলেও, প্রচুত পরি-মাণ সংরক্ষণ শুদ্ধের ফলে ভারতীয় এই লেখাটি প্রখ্যাত সাংবাদিক রঞ্জিত রায়ের প্রকাশিত "বঙ্গের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ" গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদ।

সুতীব্র শিল্প লাভের হার উচ্চমাত্রায় বজায় রাখতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বস্ত্র ত বা ঘটেছিল তা এই শিল্পের জনৈক ঐতিহাসিকের ভাষায় প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত হয়েছে :

"এই শিল্পের জীবুজি হয়েছিল অভাবনীয়রূপে।... লাভের ধারাবাহিক হুচক সংখ্যা ১৯৩৮ সালের ২০-৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৪২ সালে হয়েছিল ৭০-৭।"

কাপড়ের মিলগুলির খাতা-পাত্রে যে লাভ দেখান হয়েছিল, কেবলমাত্র সেই লাভই ধরা হয়েছে এই হুচকে। কালোবাজারে অস্বিকৃত মুনাফা এর মধ্যে ধরা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় কালোবাজারই ছিল প্রধান বাজার।

১৯৪৬ সালে দিল্লীতে অন্তর্বর্তী-কালীন সরকার গঠিত হয়। ব্রিটিশ-দের যে এই দেশ ত্যাগ করতে হবে, একথাটি ততদিনে শাই হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় থেকে সুতীব্র শিল্প আপন পছন্দ মালিক সরকার পেরে আসছে— শিল্প মালিকরা যা চাইবেন তাই দিতে প্রস্তুত থাকবে, এমন সরকার। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে আমদানিকৃত অ-ব্রিটিশ কাপড়ের উপরে আমদানি মূল্যের ১০০ শতাংশ এবং ব্রিটিশ কাপ-ড়ের উপরে ৬০ শতাংশ শুদ্ধ ধার্য করা হয়। ৫ আনুষ্ঠানিকভাবে এর হারই অস্ত্রাবধি বলবৎ রয়েছে। কিন্তু ১৯৪৭ সাল থেকে সুতীব্র আমদানি কার্যত হয়েছিল নিষিদ্ধ, কারণ ১৯৪৭ সালের ইমপোর্ট ট্রেড কন্ট্রোল আইনে ভারত

সরকারের বিশেষ অধুসত্তি ব্যতীত সুতীব্রের আমদানি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।" সেই সময় থেকে ভারতীয় সুতীব্র শিল্প মনের সাধ মিটিয়ে দেশের ক্ষেত্রেদের লুণ্ঠন করার স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে।

সুতীব্র শিল্পপতিদের সেবার ১৯৪৯ সালে সরকার আর একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৯৪৯ সাল অবধি সুতীব্র রপ্তানির উপরে ২৫ শতাংশ শুদ্ধ ধার্য ছিল। সরকার দৃষ্টত: রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সেই শুদ্ধ ১০ শতাংশে নামিয়ে আনে। দেশের বাজারে কাপড়ের ঘাটতি আগেই ছিল। রপ্তানি শুদ্ধ হ্রাসের ফলে সেই ঘাটতি আরো তীব্র হয়ে ওঠে, কারণ বেশী বস্ত্র রপ্তানি হতে থাকে। দাম বৃদ্ধি পায়। সংগে মুনাকাও।

কিন্তু পরবর্তীকালে সুতীব্র শিল্পকে যা দেওয়া হয়েছে তার তুলনায় এ সমস্ত হ্রাস নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। বহু বৎসর ধাবৎ চালু (ট্যাডিশনাল) শিল্প-সমূহের মধ্যে এই একটিমাত্র শিল্পই সার্বিক সংরক্ষণের সুবিধাভোগ করে থাকে। ১৯১২ সালে বস্ত্রশিল্প মালি-কেরা রপ্তানির জন্য "উৎসাহ" অর্থাৎ ভরতুকি দাবী করেন। শুই বৎসরই বাণিজ্যমন্ত্রক কর্তৃক নিষ্কৃত একটি কমিটি উক্ত দাবী নাকচ করে দেয়। সুতীব্র শিল্পকে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করা উচিত কিনা এই প্রশ্ন তুলে কমিটি অভিযুক্ত ব্যক্ত করে যে, "উৎসাহ" স্থপারিশ করলে সে অসুচিত উৎসাহ প্রদানের দোষে দোষী হবে।

১৯৫৭ সালে বৈদেশিক মুদ্রার গভীর সংকট দেখা দেয়। লগনে ভারতের হিসাবে ১,৫০০ কোটিরও বেশী টাকা মূল্যের মুদ্রাকালীন জমা ট্রান্সিট ইতিমধ্যেই সরকার অপব্যয় করে ফেলেছে। সুতীব্র শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে নতুন করে তদন্তের আদেশ না দিয়েই, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা বোম্বাইয়ের ভারতীয় সুতীব্র সংস্থার মাধ্যমে এই শিল্পকে নগদ অর্থ উৎসাহ বরূপ প্রদানের একটি পরি-কল্পনা ১৯৫৯ সালে অঙ্গমোদিত হয়। মাহুভাইশাহের বাণিজ্যমন্ত্রি "উৎসাহ" প্রদানের নাম করে ক্রমাগত বর্ধিত মাত্রায় ভরতুকি দেওয়া হতে থাকে। "উৎসাহ" পরিকল্পনার সর্বাধিক স্বযোগ সুবিধা ভোগ করে এই শিল্প। এই সমস্ত "উৎসাহ" দেওয়া হয় নানান আকা-বাকা পথে। এ সম্বন্ধে সরকার বরাবরই একটা গোপনীয়তারকা করে

চলেছে। কারণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি অঙ্গসারে দীর্ঘদিন ধাবৎ চালু কোন শিল্পকে ভরতুকি প্রদান করা যায় না। মাহুভাই শাহ মিশ্রকে বা কিছু করেছিলেন, সে সমস্তই কীস হয়ে গেছে সংসদীয় এসটিমেটস কমিটির একটি প্রতিবেদনে। ১৯৬৬ সালের শুই জুন তারিখে টাকার মূল্য হ্রাস করার সময় পর্যন্ত সুতীব্রের উপরে বলবৎ রপ্তানির শুদ্ধ "উৎসাহ" সম্বন্ধে ঐ কমিটি রিপোর্ট করেছে :

"বলা হয়েছে যে, ১৯৬৬ সালের জুন মাসে টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে রপ্তানি-উৎসাহ সংক্রান্ত সর্বপ্রকার উৎসাহ পরিকল্পনা বাতিল করে দেওয়া হয়। সুতীব্রের ক্ষেত্রে টাকার মূল্য হ্রাসের পূর্বে পর্যন্ত বলবৎ রপ্তানি-উৎসাহ পরিকল্পনা অঙ্গসারে প্রদত্ত উৎসাহের নগদ মূল্য কোন কোন ক্ষেত্রে রপ্তানি (এক. ও. বি.) মূল্যের ১০ শতাংশের বেশী দাঁড়িয়েছিল। পক্ষান্তরে, টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে এদেশের রপ্তানি-কারকদের বদেশী বাজারে সুবিধা হয় রপ্তানি মূল্যের মাত্র ৫-৭ শতাংশ।"

বদেশের বাজারে দামের ক্ষেত্রে টাকার মূল্য মাত্র ৫-৭ শতাংশ হ্রাস করার সুতীব্র শিল্প দারুণ অসম্মত হয়, কারণ রপ্তানি মূল্যের ৫-৭ শতাংশের অনেক বেশীই ভরতুকি হিসাবে এই শিল্প লাভিত। টাকার মূল্য হ্রাসের একজন সরব সমালোচক ছিলেন গুজ-রাট সন্তান এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের বস্ত্র শিল্পের স্বার্থের প্রবক্তা মাহুভাই শাহ।

টাকার মূল্য হ্রাসের শুই মাসের মধ্যেই মাহুভাই শাহ পুনরায় ভরতুকি ব্যবস্থার প্রচলন করেন। অচিরেই সুতীব্র রপ্তানির মস্ত বিভিন্নরূপে প্রদত্ত ভরতুকির নগদ মূল্য, প্রাক-১৯৬৬ সালের অংককেও ছাড়িয়ে যায়। আজও অবস্থা তদ্রূপই রয়েছে। বর্তমান বাণিজ্যমন্ত্রী বহুসন্তান দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্র-শিল্পের শুদ্ধ ভরতুকির নীতিতে কোন পরিবর্তন ঘটাননি।

নগদ উৎসাহ কিংবা ভরতুকির অর্থ আসে নিয়ন্ত্রিত উৎসগুলি থেকে :

- (১) প্রতি গাঁট আমদানিকৃত তুলার উপরে ভারতীয় সুতীব্র সংস্থা কর্তৃক আরোপিত ৪৫০ টাকা করে লেভি ;
- (২) কাপড়ের মিলসমূহের উপরে ধার্য টাক ও তাঁতের সংখ্যা অথবা মোট উৎপাদনের ভিত্তিতে আদায় ;
- (৩) ভরতুকি হিসাবে সরকারী তহবিল থেকে দেয় রপ্তানি মূল্যের ৬ শতাংশ (এই হার প্রচলিত হয়েছে ১৯৪৭ সালে ; ১৯৭১ সালে ছিল ১৫ শতাংশ এবং ১৯৭২ সালে ৫ শতাংশ) ;
- (৪) আমদানির শুদ্ধ রপ্তানি মূল্যের (শেষাংশ শুই পৃষ্ঠায়)

সমগ্র দেশ লুণ্ঠন

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

৬ শতাংশ পাউণ্ড, ডলার ইত্যাদি মুদ্রার প্রদান ১১ “আমদানী হকদারী” যে বিদেশী মুদ্রা পার তা প্রায়শই অতি-হিত মূল্য (ফেস্ ভ্যালু) চাট/পাঁচ গুণ বেশী দামে বাজারে বিক্রী হয়ে থাকে, এবং মিল মালিক তথা রপ্তানিকারকদের পকেটে বিপুল অর্থ এনে দিয়ে থাকে। ১৯৭০-৭৪ এ তুলা আমদানি বহুলাংশে হ্রাস পায়। ফলে আমদানিকৃত তুলার উপর লেন্ডির পরিমাণও হ্রাস পায়। বাণিজ্যমন্ত্রী হিসাবে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, লেন্ডির পরিমাণে যে বাটতি হবে তা কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে পূরণ করা হবে।

আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উৎস খুবই সীমিত। স্বতীকৃত শিল্প সেই দুর্লভ বিদেশী মুদ্রাই বিপুল পরিমাণে অপব্যয় করে থাকে। ১৯৬০-৬১ এবং ১৯৭১-৭২ এর (১২ বৎসর) মধ্যে মোট ৬৭৫ কোটি টাকা মূল্যের কাপড় ও সুতা বাইরে রপ্তানি করা হয়। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে বাইরে থেকে আমদানি করতে হয় ১,১৪০ কোটি টাকা মূল্যের কাঁচা তুলা ও কাপড়ের মিলের বস্ত্রপাতি।^{১২} অধিকন্তু, বস্ত্রশিল্পের অন্য প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক দ্রব্য ও রঙের আমদানি করতে হয়। এই সমস্ত আমদানিকৃত রাসায়নিক ও রঞ্জক দ্রব্যের মূল্যের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্তু খুব করে ধরলেও গড়পড়তা বাৎসরিক ২০ কোটি টাকা অথবা ১২ বৎসরে ২৪০ কোটি টাকার কম নয় বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। সব মিলিয়ে ১২ বৎসরে এই শিল্পের জন্ত আমদানি ব্যয় পড়ে ১,৩৮০ কোটি টাকা। অর্থাৎ রপ্তানির দ্বারা এই শিল্প উক্ত সময়ে যা আয় করে তার চাইতে তার জন্তে ব্যয়ের পরিমাণ ৬৮৮ কোটি টাকার বেশী। এরই অল্প মিল মালিকেরা আবার দেশ তথা ভারত সরকারের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে ভর্তুকি আদায় করে থাকেন।

আগেই বলা হয়েছে, টাকার মূল্য হ্রাস করার মিল মালিকেরা আদৌ খুশী হননি। কারণ, মূল্য হ্রাসের ফলে বিদেশের বাজারে দরের সুবিধা তারা পেয়েছিল মাত্র ৫৭২ শতাংশ। পক্ষান্তরে, মূল্য হ্রাসের পূর্বে ৫৭২ শতাংশের অনেক বেশী তারা পেত ভর্তুকি হিসাবে। ভর্তুকির পরিমাণ খুব কম করে রপ্তানি মূল্যের ৬ শতাংশ ধরলেও, মিল মালিকেরা ওই ১২ বৎসরে ৬৯৫ কোটি টাকা মূল্যের বস্ত্র ও সুতা রপ্তানির জন্ত সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন রূপে ৪১৭ কোটি টাকার

ভর্তুকি আদায় করেন। বস্তুত, ভর্তুকির পরিমাণ রপ্তানি মূল্যের ৭৫ শতাংশের কম নয়।

প্রচুর পরিমাণে কাঁচা তুলা বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। সুক্তি দেখান হয় যে, কাপড়ের কলগুলির রপ্তানি লক্ষ্য বজায় রাখার জন্ত এই আমদানির প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃত তথ্য হল, আমদানিকৃত তুলার ৫ কি ৬ শতাংশ মাত্র বিদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে বস্ত্র প্রস্তুতের জন্ত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রপ্তানির বাকী অংশের জন্ত ব্যবহার করা হয় ভারতীয় তুলা। আমদানিকৃত সমস্ত তুলাই হল অতিরিক্ত লম্বা আঁশের। এই ধরনের তুলা কিছুটা ভারতেও উৎপন্ন হয়ে থাকে। ভারত যে স্বতীকৃত রপ্তানি করে তার ৯০ ভাগই হল মাঝারি কিংবা মোটা শ্রেণীর এবং এ সমস্তই ভারতীয় তুলা থেকে প্রস্তুত করা হয়। অতি মিহি শ্রেণীর যে বস্ত্র রপ্তানি করা হয় তার অন্ততঃ ৫০ ভাগই ভারতীয় লম্বা আঁশের তুলা থেকে তৈরী করা হয়ে থাকে।

পঞ্চম পরিকল্পনার খসড়া নিয়ে একটি সংসদীয় কমিটির সভার পরিবেশনা পর্বদের সদস্য এম. এস পাঠক নিম্নলিখিত তথ্য পেশ করেন :

“আমদানিকৃত তুলার ব্যবহার সম্বন্ধে বলতে গেলে, ১৯৭১-৭২ সালে আমদানি করা হয়েছিল ৭৪৪ লক্ষ গাঁট তুলা। এর ভিতরে ০৪৬ লক্ষ গাঁট থেকে তৈরী বস্ত্র রপ্তানি হয়। অল্পরূপভাবে ১৯৭২-৭৩ সালে আমদানিকৃত ৩০৭ লক্ষ গাঁটের মধ্যে ০৩৮ [লক্ষ গাঁট] রপ্তানির জন্ত বস্ত্র তৈরীতে ব্যবহৃত হয়েছিল।”^{১৩}

অতিরিক্ত লম্বা আঁশ তুলা আমদানির জন্ত প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থ ব্যয় করা সম্বন্ধে বোম্বাইয়ের ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলী পত্রিকা মন্তব্য করে :

“অতিরিক্ত লম্বা আঁশের আমদানিকৃত তুলা দিয়ে বস্ত্র করা অতি মিহি বস্ত্রের এত বেশী ব্যবহার বিশ্বের আর কোন দেশে দেখা যায় না। এই ব্যাপারে দারিদ্র্যের দেশ ভারত সর্বাধিক সমৃদ্ধিশালী দেশগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে।”^{১৪}

লম্বা এবং অতিরিক্ত লম্বা আঁশের তুলা দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র খেয়া-খুশী মত দামে বিক্রয় হয়। এই সমস্ত বস্ত্র বস্ত্র সংখ্যক সেই শ্রেণীর মানুষেরই চাহিদা মিটিয়ে থাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি যাদেরকে ধনী করেছে। ছোট আঁশের তুলার প্রয়োজন হয় মোটা কাপড় তৈরী করতে। মোটা কাপড় ব্যবহার

করে দেশের অগণিত সাধারণ মানুষ। সরকার অতিরিক্ত লম্বা আঁশের তুলা আমদানি করার অল্পমোদন যেমন দিয়েছে তেমন দিয়েছে প্রচুর পরিমাণে এই দেশে উৎপন্ন ছোট আঁশের তুলা রপ্তানি করতে। চুক্তিমত শিথিল পরিমাণ মোটা কাপড় উৎপাদন করার “ভল্লোকেস চুক্তি” মিলগুলি ক্রমাগত অবজ্ঞা করে চলেছে বলে সরকার অবিরাম অপ্রবণ করে থাকে।^{১৫} অতিরিক্ত লম্বা আঁশযুক্ত তুলার আমদানি ও ছোট আঁশযুক্ত তুলার রপ্তানির নীতিই মোটা কাপড় প্রস্তুত করাকে নিরুৎসাহ করে থাকে; কারণ, অন্ততঃ তৎসমভাবে মোটা কাপড়ের দাম সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। পক্ষান্তরে মিহি কাপড়ের উপরে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এই ক্ষেত্রে কালোবাজারই আইনত অমুদোদিত হয়েছে। এতে মুনাফা হয় প্রচুর। ফলে অতিমিহি বস্ত্রের উৎপাদন হয়েছে উৎসাহিত।

স্বতীকৃত শিল্প দেশের উপরে যতখানি ভাববহন হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমনটা আর কোন শিল্প হয়নি। মুখ্যতঃ মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের স্বতীকৃত শিল্পপতিদের পকেটে সাদা অথবা কালো টাকা চালবার জন্ত সরকার দেশ-

বাসীকে বিপুল পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করতে বাধ্য করেছে। পরিবর্তে ওই শিল্পপতিরা দেশ তথা জনগণের প্রতি কী ধরনের ব্যবহার করে আসছেন? বাঙালার যখন বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন চরমে উঠেছিল, সেই ১৯৪৬ সালেই জনৈক জাতীয় নেতা স্বতীকৃত শিল্পপতিদের মুনাফা লোটার জন্ত তিরস্কার করে বলে-ছিলেন :

“বোম্বাইয়ের মিল মালিকেরা কাপড়ের দাম প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে বলে ১৯০৫ সালের দ্বর্গ পূবার সময় চারিদিক থেকে অভ্যয়োগ গুঠে। এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে জানতে পারি, অভিযোগ গুলি যথার্থ।”^{১৬}

বোম্বাইয়ের স্বতীকৃত সংস্থার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এই শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বৎসরগুলি এই শিল্পের পক্ষে ছিল “অতি তেজী বাজারের বৎসর” এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৎসরগুলি ছিল “সমৃদ্ধির বৎসর”।

বোম্বাইয়ের মিল মালিক সংস্থার ১৯৪৪ সালের প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যক্ষের শুরুই হয়েছে এই কথাগুলি দিয়ে :

“বিগত বৎসরগুলিতে বস্ত্র ও সুতার বাজারের ইতিহাস হল কম-বেশী কালোবাজার, নিয়ন্ত্রণ, এবং অধিকতর কালো বাজারের ইতিহাস।”^{১৭}

স্বাধীন ভারতের সরকার সারা দেশকে নির্বাচন স্বতীকৃত শিল্প কর্তৃক শোষিত হবার জন্ত ছেড়ে দিয়েছে। কালোবাজারের মুনাফা বাদ দিলেও এই শিল্প সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করেছে বিগত তিন বৎসরে। তৎসমভাবে সরকার, নিরস্ত্র বাস্তব দরে ৩৭২ শতাংশ বৃদ্ধি অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে ৩০ শতাংশ হল মিল মালিকদের জন্ত এবং ৭২ শতাংশ ব্যবসায়ীদের জন্য।^{১৮}

স্বাধীন ভারতীয় সরকারের নীতি-সমূহকে নিজেদের অতি মুনাফা লাভের মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার অহঙ্কে নির্ভর্য করতে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের মিল মালিকেরা যতখানি সক্ষম হয়েছে ততখানি ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের বর্ণ-রূপও ল্যাক্ষ্যনারায়ের মিলগুলি ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের নীতিসমূহকে নির্ধারণ করতে সক্ষম হয় নি।

বোম্বাই ও আহমদাবাদের মিল মালিকের অহঙ্কে একটা কথা বলা যায়। বাঙালার বঙ্গ-বিভাগ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে তারা যে বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করে আসছে তার সাহায্য হলেও একটি অংশ ভাগ করে দিয়েছে তাদের শ্রমিকদের মধ্যে। স্বতীকৃত শ্রমিকদের আর বৃদ্ধির সংগে পাটকল ও বিভিন্ন

শ্রমিকদের আর বৃদ্ধির তুলনা করলেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায়। ১৯০০ সালকে ১০০ হিসাবে ধরলে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত কাপড়ের কল, পাটকল ও আবাদী শ্রমিকদের বেতনের সূচকসংখ্যা পরিবর্তিত হয়েছে এই রকম ১২ :

স্বাধীনতা লাভের পরেও এই তিনটি ক্ষেত্রে শ্রমিকের আপেক্ষিক মজুরী বৃদ্ধির প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন হয়নি। সূচক সংখ্যাগুলি টাকার অংকে মজুরীর হিসাব থেকে তৈরী, আসল মজুরীর সূচক নয়, কারণ ব্যবহার্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে অত্যন্ত গতিতে, বিশেষ করে ১৯৪৭ সালের পরে।

পাটশিল্প পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ। স্বতীকৃত শিল্পের প্রধানতম কেন্দ্র হল মহারাষ্ট্র ও গুজরাট। মাসিক ৪০০ শত টাকার কম বেতনের কর্মচারীদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১৯৬৭ সালে টাকার অংকে ছিল—বস্ত্রকলে ২,৪৬০ টাকা এবং পাটকলে ১,৮৪৯ টাকা।^{১৯} এই অসাম্য অধিকতর প্রকট হবে যদি কেবলমাত্র মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের কাপড়ের কলের কর্মচারীদের আয়ের সংগে পশ্চিমবঙ্গের পাটকলের কর্মচারীদের আয়ের তুলনা করা যায়।

(১) N.H. Thakkar, The Indian Cotton Textile Industry during the Twentieth Century, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ২২১ এ উদ্ধৃত। এছাড়া, Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol. XXI, পৃষ্ঠা ৪৪ উদ্যে। “নৈতিকতার সর্বোচ্চ বিচারে বিদেশী বস্ত্রঃ স্বংস সাধন যদি সঠিক প্রস্তাব বলে নেওয়া হয়, তা হলে স্বদেশী বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনায় আমাদের ভীত হওয়ার কারণ নেই। যথাসাধ্য উৎপাদন উৎসাহিত করার পন্থা হল বিদেশী বস্ত্র বিনাশ করা।” ১৯২১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের Young India পত্রিকায় “বংসের নৈতিকতা” শীর্ষক প্রবন্ধে গান্ধী উপরিউক্ত বক্তব্য প্রকাশ করেন।

(২) বোম্বাইয়ের Textile Association (India) কর্তৃক ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত S.D. Mehta, The Cotton Mills of India 1854 to 1954, ২২ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত।

(৩) এই অধ্যক্ষের তথা পূর্ববর্তী অধ্যক্ষদের তথ্যাদি V.B. Singh সম্পাদিত Economic History of India : 1857-1956, ২৪৩-৫ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত।

(৪) N. H. Thakkar, The India Cotton Industry, পৃষ্ঠা ৬৫।

(৫) স্বতীকৃত শিল্প সম্বন্ধে সংসদ সদস্য (কংগ্রেস) কালী মুখার্জিকে লিখিত বাণিজ্য মন্ত্রী ডি. পি. চট্টোপাধ্যায়ের ১৯৭৪ সালের ১ই মে তারিখের পত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য।

(৬) এ

(৭) The Constituents Assembly (Legislative) Debates, (Part I—Questions and Answers), Official Report, vol. I. ১৯৪১ পৃষ্ঠা ৪১৩ উদ্যে; বাণিজ্যমন্ত্রী কে. সি. নিয়োগী কর্তৃক প্রদত্ত ৭৪৭ সংখ্যক তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর।

(৮) ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের Report of the Working Party for the Cotton Textile Industry, (সভাপতি : এ রামস্বামী মুদালিয়র), দিল্লী, ১৯৫২, পৃষ্ঠা ২৮ উদ্যে।

(৯) Estimates Committee (1971-72), Fourteenth Report : Ministry of Foreign Trade, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ১২৬।

(১০) কংগ্রেস এম. পি. কালী মুখার্জিকে লিখিত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পত্র, এবং ১৯৭০ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে রাজ্যসভার পাট (শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

অগ্রগতির আসল চেহারা

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

যেহেতু অত্যন্ত বিষম সেই হেতু এক প্রকার লোকের হাতে অপচয় করার মত প্রভূত পরমা, বিশেষত কালো টাকা কিছু সাধারণ মাগবের ক্রয়ক্ষমতা নেই বললেই চলে। ভারতীয় অর্থনীতির এই মৌলিক তথ্যের অজ্ঞাই মোটা কাপড়ের চেয়ে অতি মিহি কাপড় তৈরী করার মুনাকা অনেক বেশী। কারণেই মিলগুলিকে দস্তা কাপড় তৈরীর যে আর্থনিক ভাগ দেওয়া হয় তা তারা করতে রাজী নয়। বিরোধী এম-পিদের চাপে পড়ে ১৯৭০ সনে সরকার এই পরিমাণকে মোট ৪৪০ কোটি বর্গমিটারের মধ্যে ৮০ কোটি বর্গ মিটারে বেঁধে দিয়েছিলেন।

বিশ দফার তামাসা শুরু হওয়ার পরে বটা করে প্রচার করা হল যে, 'প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশানুসারে' এই ভাগকে বছরে ১২০ কোটি বর্গ মিটারে বাড়ান হবে। কটন মিলস্ ফেডারেশন তাদের অধুনাপ্রস্তুত গো-হুজুর এক টালকাহানার পরে এই বলে আপত্তি করল যে, কট্টালের কাপড় বানানো গিয়ে প্রতিবর্ষ মিটারে তাদের ৮০ পরমা করে লোকসান হচ্ছে। 'যাণী এই কট্টালের কাপড় কেনে তাদের বস্ত্র ক্রয়ক্ষমতার বাণিজ্যময়ী এত উদ্বিগ্ন হলেন যে, ১১ জুলাই ১৯৭৫ সনে তিনি ঘোষণা করলেন যে, প্রচলিত দাম ১২৫ পরমা দামের উপর ৮০ পরমা বাড়িয়ে এর দাম মিটার প্রতি ২৫৫ পরমা করা হবে। নবেম্বর ১৯৭৫ সালে স্বতী-বস্ত্রশিল্প থেকে অবসরপ্রাপ্তি দরবার করতে আসা হল এই কারণে যে, কট্টালের কাপড় নেওয়া হচ্ছে না বলে মিলের ওদামে ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গ মিটার অধিকতর কাপড় মজুদ পড়ে আছে। সরকার অবশ্য আশ্বাস দিলেন যে, জনসাধারণের স্বাস্থ্য একটু কাপস হলেই তাদের এই সমস্যার সুরাহা করার জন্য 'কয়েকটি বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া' হবে। প্রথম পদক্ষেপে সরকার জানালেন যে, কার্ভত তাদের তৈরি করতে হবে আগেকার পরিমাণ অর্থাৎ ৮০ কোটি বর্গ মিটার—১২০ কোটি নয়। কিন্তু মিলওয়ালারা তবু প্রতিবাদ জানাল যে, তাহলেও তাদের হাতে থেকে যাবে রম্যাসের মজুদ মাল যার ডেলিভারি নেওয়া হয় নি।

ডিসেম্বর ১৯৭৫ সনে সরকার ঘোষণা করল যে, সরকারের হাতে মেওর সব রুখ মিল এবং যাদের হাতে নেওয়া হবে, তাদের সকলকে এই কট্টালের কাপড় তৈরি করা থেকে এক বছরের জন্য অব্যাহত দেওয়া হয়েছে। তবু মিলওয়ালারা চোঁচাতে থাকল, 'অন্তদের কী হবে?' কাশাগাতারাক 'স্বাক্ষর উৎসবে 'বাণী' দিয়ে সভাপ্রত্যাগত বাণিজ্য মন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে সব স্বতী-কল যারা ডিসেম্বর ১৯৭৫-এর তিন মাসান্তে তাদের অতিমিহি বস্ত্রের ২০% এর বেশী রপ্তানি করেছে তাদের সকলকেই কট্টালের কাপড় বানানো থেকে বাঁচানো অধ্যাহতি দেওয়া হবে। 'কিন্তু অন্তদের কী হবে?' মিলওয়ালারা তবু চোঁচাতে থাকল।

বিশ দফা কর্মসূচীর পালিশ বস্ত্র ফিকে হয়ে এসে এবং জনসাধারণ এ লক্ষ্যে অস্বাভাবিক হয়ে উঠল তখন সরকার ভাবল এই উপযুক্ত সময়। জুন ১৯৭৬-এ সরকার ঘোষণা করল যে, কট্টালের কাপড় তৈরির ব্যাপারে স্বতী বস্ত্রশিল্পের দায়দায়িত্ব ৮০ কোটি থেকে ৫৫ কোটি মিটারে কমিয়ে দেওয়া হল। আরো ২০ কোটির দায়িত্ব পড়বে অসংগঠিত ও ভাত শিল্পের উপরে। মিলগুলির দায়িত্ব হবে কেবল ৩৫ কোটির জন্য। মিলওয়ালারা অবশ্য এখনো হাল ছেড়ে দেয়নি। কট্টালের কাপড়ের ব্যাপারে ইন্ডিয়া সরকারের কপটতা তাদের জানা আছে কাজেই তারা আরো স্থিতির স্তর তপ্পিত চালিয়ে যাচ্ছে। ২২ আগস্ট ১৯৭৬ সরকার নিয়মিত ঘোষণা করে, 'যে সব মিল তাদের সমস্ত মজুদ শেষ উজাড় করে দিয়ে প্রচলিত শর্তে কট্টালের কাপড় তৈরির ব্যাপারে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাওয়ার বোধ্যতা অর্জন করতে পারেনি, এখন তারা আত্মপাতিক সাহায্য পেতে পারবে। যে সব মিলের ৭৫% বিজ্ঞপ্তির কতি হয়েছে তারা ৭৫% পর্যন্ত কট্টালের কাপড় উৎপাদন থেকে অব্যাহতি পাবে (আজকালকার তিন নং খাতার যুগে এই ধরনের হিসাব তৈরি করা অবশ্য মোটেই কঠিন নয়)।

কট্টালের কাপড় উৎপাদনের শেষ হিসাব সরকার চেপে রেখেছে। অসম্মান অস্বায় নয় যে, এর পরিমাণ ২৫ কোটি মিটারের বেশী নয় বার প্রায় সবটাই অসংগঠিত ও ভাত শিল্পের দ্বারা তৈরি। এ থেকেই হিসেব পাওয়া যাবে যে, শ্রীমতী গান্ধির ২০ দফা কর্মসূচীতে কতটা গুরুত্ব আরোপ করা যায়।

বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে গেলেও নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্ত্র উৎপাদন ১৯৬৫-৬৬ পরে সাধারণ ভাবে কমে গেছে। ১৯৭৫-৭৬ সালের প্রকৃতির জন্য মিনিস-পল পাওয়া গেছে বিশেষত খাত শস্ত এবং ভোজ্য তেল কিন্তু অল্প মিনিসের উৎপাদন হয়েছে। কিন্তু নীচের রাশিচক্র থেকে দেখা যাবে খাত শস্ত এবং

ভোজ্য তেলের কেন্দ্রেও মাথাপিছু হিসাবে ৬০ এর বহুরূপিত উচ্চ মান কিয়ে পাওয়া যায়নি :

টেবল ৪

নিত্যপ্রয়োজনীয় মাথাপিছু বোয়ান : ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৭৫-৭৬

বছর	খাত	ভোজ্য	শস্ত	ভাল	তেল	বন্যপাতি	চিনি	স্বতী	চা	কফি
কি/মি	কি/মি	কি/মি	কি/মি	কি/মি	কি/মি	কি/মি	কি/মি	কি/মি	কি/মি	কি/মি
বছরে	বছরে	বছরে	বছরে	বছরে	বছরে	বছরে	বছরে	বছরে	বছরে	বছরে
১৯৬০-৬১	১৭১.১	২৫.২	৩.২	০.৮	৪.৭	১০.৮	১৮.৭	৮.০		
১৯৬১-৬২	১৭৫.৩	২২.৬	৩.৬	০.৮	৫.১	১৫.২	৩০.৩	৭.৮		
১৯৬২-৬৩	১৭১.২	১৮.৭	৩.০	১.০	৭.০	১০.৬	৩৮.৭	১১.৩		
১৯৬৩-৬৪	১৫১.৬	১৫.৮	৩.২	০.৬	৫.৮	১২.৯	৪০.৫	৬.৩		
১৯৬৪-৬৫	১৬৭.৬	১৬.২	৩.৬	০.৭	৫.১	১২.৭	৪১.০	৫.৮		

আকর : ১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৭৫-৭৬—ইকনমিক সার্ভে।

১৯৭৫-৭৬—অর্থমন্ত্রক কেন্দ্রকারি ১৯৭৬।

১৯৭৫-৭৬—মন্ত্রীদের বক্তৃতার সংবাদপত্রের প্রতিবেদন। এবং প্রানিং কমিটির সভা এবং পিদের পরামর্শদাতা কমিটির এজেন্ডা নোট, ৫ আগস্ট ১৯৭৬।

উপরের টেবলে যে সব সংখ্যা দেওয়া হল তার মধ্যে ১৯৭৫-৭৬ ছাড়া সবগুলিই হুজুরি বছর। কিন্তু অসম্মান অবস্থার পরবর্তী সরকারী পচায়ে ১৯৭৫-৭৬ এর কাজকে বরা পৌঁছিত ১৯৭৫-৭৬ এর সংগে তুলনা করা হয়েছে—১৯৭০-৭১ বা ১৯৬৪-৬৫ বা ১৯৬০-৬১ র সংগে নয়; কারণ সহজেই বোধগম্য। ১৯৭৫-৭৬ এ মাথাপিছু নিত্যব্যবহার্য মিনিস মিলেছে ৭০-৭১, ৬৪-৬৫ বা ৬০-৬১ র চেয়ে কম। কেবল ৭১-৭২ র সংগে তুলনায়ই ৭৫-৭৬ এর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য মনে হবে।

১৯৭৫-৭৬ এ ভাল এবং কাপড়ের মত নিত্যব্যবহার্য মিনিসের মাথাপিছু বোয়ান দারুণ ভাবে কমে যাওয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণ ভারতবাসী দীর্ঘাধিক প্রোটিন সংগ্রহ করে ভাল থেকে।

এই সংখ্যাগুলি হল মাথাপিছু বোয়ান সম্পর্কে। এর মানে এ ময় যে, প্রত্যেক ভারতবাসী এই পরিমাণ মিনিস ভোগ করেছে। বস্তুনিষ্ঠত্ব এত অতিপূর্ণ যে, ৫% এর বেশী লোক নিম্নতম গড়পড়তা মানে উঠতে পারেনি। লক্ষ্যবস্ত আনুমানিক ৪% মাত্র টেবলে নির্দেশিত মানের অর্ধেকও ভোগ করতে পারেনি না। দায়িত্বের এই নিদারুণ চিত্র ১ ৭৫-৭৬ এর পরে আরো খারাপের দিকে গেছে।

অজ্ঞতাই যেখানে স্বস্তি

১৭৫,০০০ মানুষের নির্বিচার কারারাস এবং জেলের ভেতরে তাদের উপরে অমানুষিক অত্যাচারকে সমর্থনকল্পে বিদেশে শ্রীমতী গান্ধির প্রচারকেই মুদ্রাস্থীতি ছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আর হুট মিনিসকে তুলে বয়েছেন। একটা হল ভূমিসংস্কার আর একটা খেজুর আর এবং সম্পত্তির হিসাব প্রকাশ করা।

আমাদের প্রাক্তন রাজদুতদের অর্কমণ্যতার কলে বাইরে ভারত সম্পর্কিত অজ্ঞতা এত বেশী যে, তার সুযোগ নিয়ে শ্রীমতী গান্ধির প্রচারকে বিদেশীদের কতগুলি ভুল ছবি কাজে লাগিয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, বিরোধী নেতারা হল হলবদ ডাকাত যারা কৃষকদের জমি কেড়ে নিয়ে মোটা হয়েছে এবং মূল্যবান কৃষকেরা প্রতিকারের জন্য ইন্ডিয়া গান্ধির কাছে এসে কঁদে পড়েছে। প্রকাশ্যে নারায়ণকে চিত্রিত করা হয়েছে কালো চশমা পরা, বেশিন গান হাতে এক চা বাগানের মালিক রূপে। পাশ্চাত্য বুদ্ধিদীপ্ত হনতো এই সব গাঁলাধুরি বিশ্বাস করবে না কিন্তু সাধারণ মানুষ টি-ভিতে ইউরোপীয় অভীত এবং লাভিন আমেরিকার বর্তমান অবস্থার যে সব ছবি দেখে তাতে তাদের পক্ষে বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু সত্যের একটা অসম্মানকর বদভ্যাস হল যে, তা প্রায়-ই কাস হয়ে যায়। এই রকম একটা কাস-হয়ে যাওয়া সত্য হল ভূমিসংস্কারের কাহিনী। ২০ দফা কর্মসূচীর 'কথামৃত'তে শ্রীমতী গান্ধি বলেছেন, 'যেগুণ উৎসাহ নিয়ে আমাদের জমির উদ্ধারী কড়া ভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং উদ্বুদ্ধ জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করতে হবে।' আর যে সব সংস্কার তাঁর মনে ছিল (অন্তত বেতার বক্তৃতার সময় পর্যন্ত) তা হল—'গ্রামীণদের কণ মনু', 'হুজুর চাবীর জন্য সাহায্যের প্রকল্প', 'কৃষি মজুরের জন্য নিম্নতম মজুরির ব্যবস্থা' এবং 'চুক্তি-বন্দী প্রেমের উদ্দেশ'।

কী চমৎকার। কিন্তু তার চেয়েও চমৎকার ঘটনা এই যে, স্বদীর্ঘ শ্রীমতী (শেষাংশ ৮ নং খাতার)

প্রতিক্রিয়া

মধু গোস্বামী

চলার বলার প্রতিক্রিয়া

প্রতিক্রিয়া কোর্টে,

বিদের বুক প্রতিক্রিয়া

করিয়ে কেবল ওঠে,

লেখার শেখার প্রতিক্রিয়া

প্রতিক্রিয়ার জোট,

বেকার বুকুর বিড়ম্বনায়

পাকাচ্ছিল ঘোঁট।

প্রতিক্রিয়ার উপর রেণে

বাজার হল আশুন,

মালিক বলে মজুরকে সব

কাজ নেই কো ভাগুন

প্রতিক্রিয়া কথতে শেষে

বোনাস নিল বেটে,

প্রতিক্রিয়া ডান দিকেতে

প্রতিক্রিয়া বামে,

দেশহুজুর ময় জপ

এখন আমার নামে,

প্রতিক্রিয়ার প্রতিবেদক

একমাত্র এটাই,

কেউ শোনে না আমার কথা

তাইতো ধরে পেটাই।

দোষটা কি ?

সুনীলকুমার বসু

পদটা আমার নামের আগে

বসলো বখন ধাই করে,

তখন তো কই, বুঝি নি তো

মোহ এত এর তরে।

প্রিয়জনের মুখের হাসি

কোঁটাই কেমন দিন রাতে,

শত্রুকে মোর ধোড়াই কেয়ার

ভরে রাশি জেল-টাতে।

আইন বখন বাগড়া বাধার

তখন করি সংশোধন ;

গদী যাতে অটুট থাকে,

ফিকির আমার সর্বধন।

গণতন্ত্র রক্ষা করার

দায় পড়েছে মোর বুঝি ?

দেশটা কেমন এগিয়ে গেছে—

চোখ বুজে তা' নাও খুঁজি।

আমার ছেলে রাজা বলে

তোমার ছেলের কোন্ কতি ?

রাজতন্ত্র আসলো বলে

চোঁচও মরে—আমার কি ?

মুর্শিদাবাদ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

অধিকাংশ গ্রাম থেকেই ট্রাক খালি অবস্থায় ফিরে আসে। নেতাদের সম্মান বাঁচাবার জন্য গ্রাম থেকে মজুরী দিয়েও জনসভায় যোগ দেওয়ার জন্য লোক সংগ্রহ করতে হয়। সভায় যোগ দেওয়ার জন্য সব সাংবাদিকদের অসম্মতি দেওয়া হয় নি। ওই সভায় যোগ দেওয়ার অসম্মতি দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের ডি আই বি রেকর্ড দেখা না।

ভোটের হাওয়া বিরোধীদের দিকে

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

রাজনৈতিক আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা এবারকার দল-সভা নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে খুব সতর্কতার সঙ্গে মন্তব্য করছেন। তবে গত পাঁচটি নির্বাচনে কেন্দ্রে বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। এই প্রথম বর্ষ নির্বাচনের প্রাক্কালে বহু ঝড় সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা কেন্দ্রে বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

কারণটিও স্পষ্টই অনুমেয়। ৭১ সালের নির্বাচনে প্রধানতঃ হিন্দীভাষী প্রদেশগুলিতে ইন্দিরা গান্ধীর অঙ্কুশ বে হাওয়া প্রবাহিত হয়েছিল, ৭৭ সালের নির্বাচনের পূর্বে ততোধিক শক্তিশালী ইন্দিরা বিরোধী হাওয়া পাকের উপত্যকার প্রদেশগুলিতে প্রবাহিত হচ্ছে বলে অনেকের ধারণা। ৭১ সালের নির্বাচনে যেমন “বাংলাদেশের মুক্তি” ও “গরিবী হঠাৎ”—প্রধানতঃ এই দুটি প্রসঙ্গে ইন্দিরা পরিচালিত কংগ্রেসের পক্ষে জনমত উত্তাল হয়ে উঠেছিল, কেউ কেউ মনে করেন ৭৭ সালের আচমকা নির্বাচন—যেটা প্রধানতঃ শাসক দলের পক্ষে অঙ্কুশ সময়েই ঘোষিত হয়েছে—তার চেয়েও প্রবলবেগে কংগ্রেস বিরোধী ঢেউ তুলি করতে পেরেছে। দেশের অভ্যন্তরে দীর্ঘ সময়ব্যাপী অকরী অবস্থা বলবৎ রাখা, রাজনৈতিক স্থিতি ও স্থায়িত্বের নাম করে ব্যক্তি কতৃৎ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও বিরোধীদের হাজার হাজার নেতা ও কর্মীকে কারাবাসে নিক্ষেপ করা, নির্বাচনের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার আইন প্রয়োগ করা সংবাদপত্রগুলির উপর কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করে জনমতকে তরু করে দেওয়া এবং সর্বোপরি ব্যক্তি স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া—যীর্বে যীর্বে জনসাধারণের মধ্যে যে অসন্তোষ তুলি করেছে নির্বাচনের পূর্বযুগে সেই অসন্তোষ কোথাও কোথাও গণজাগরণের রূপ ধারণ করেছে। তাই এবারকার নির্বাচনের মুখে কোন কোন রাজনৈতিক ভাষ্যকার কেন্দ্রে কংগ্রেস বিরোধী বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনার কথা খোলাখুলিই আলোচনা করছেন।

বাস্তব দিক থেকে নির্বাচনী চিত্রের সমীক্ষা করলে দেখা যাবে, এবারকার ভোট যুদ্ধে কংগ্রেস বিরোধী শক্তিগুলি একজোট হয়ে পেরেছে। অতঃপর কংগ্রেস বিরোধী ভোট (বার যোগফল বরাবরই কংগ্রেসের ভোট প্রাপ্ত ভোটের ভুলনার অনেক বেশী) এবার ভাগ হয়ে যাবে না।

দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেসের রাজনৈতিক শক্তি ও সমর্থনের চূর্ণরূপে বিবেচিত বিহার ও উত্তর প্রদেশে এবার হাওয়া উঠেছে। অগ্নীবন রাম ও হেমবতী নন্দন বহুগুণার মতো নেতা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে পাণ্ডা সংগঠন করায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভুক্ত ও হরিজন প্রভৃতি অল্পমত শ্রমীর সর্বধন থেকে কংগ্রেস বহুলাংশে বঞ্চিত হয়ে পাবে।

তৃতীয়তঃ, এই প্রথম কংগ্রেস প্রধানতঃ আত্মরক্ষামূলক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে নির্বাচনের মঞ্চে উপস্থিত হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সংবিধান বহির্ভূত কনভা কেন্দ্র স্থাপন—প্রায় প্রতিটি প্রসঙ্গে বিরোধী দলগুলোর তীর আক্রমণ থেকে কংগ্রেস নিজেকে রক্ষার ব্যতিব্যস্ত।

চতুর্থতঃ, কংগ্রেসের মিত্র সি. পি. আই পর্বত পশ্চিম বাংলা, কেরালা ও তামিলনাড়ু, ছাড়া দেশের সর্বত্র কংগ্রেসের সমালোচনার মুখর।

এই সব ঘটনাদৃষ্টে বিরোধী শক্তি ভোটের জয়ের সম্ভাবনা অনেক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভৎসনোত্তর একথা মনে রাখতে হবে যে, ১৯৬৭ সালে যখন কংগ্রেসের ভাঙন ও সংকট ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল তখনও শতকরা ৩৯ ভোট কংগ্রেসের পক্ষে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ইন্দিরা চেউ প্রতিহত হলো যেটা প্রাপ্ত ভোটের হিসাবে কংগ্রেস খুব দগু ভোট পায়নি। তাই, সাধারণভাবে কংগ্রেস বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচনী ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভোগ্যপণ্য আধিকারিকে দুর্নীতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শ্রীলঙ্কাস্থ মৈত্র যখন খাটুমারী ছিলেন তখন খাটুমারীতে এক আদেশ জারী করা হয়েছিল নতুন লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে কিছু কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করে, যাতে বেকার যুবকরা, বিশেষ করে স্থানীয় যুবকরা ব্যবসারে প্রতী হতে পারেন। তিক হযেছিল কোন ব্যক্তি বা তার পরিবারের কেউ কোনরূপ সরকারী লাইসেন্সধারী হলে তাকে কোন অবস্থাতেই নতুন লাইসেন্স দেওয়া হবে না। কিন্তু জানা গেছে এই আদেশ লঙ্ঘন করে বাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের ভোগ্যপণ্য আধিকারিক থেকে কয়েকটি লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

প্রকাশ, কলকাতা জেলার একজন বিখ্যাত সিমেন্ট ব্যবসায়ী ভট্টনৈক মজুমদার মহাশয় তাঁর বাবুদায় কৃষ-খামারের প্রয়োজনে একশ টন সিমেন্ট চাইতেই তাঁকে একটা সিমেন্ট ব্যবসায়ের লাইসেন্সই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কলকাতার আর একজন

সিমেন্ট ব্যবসায়ী—ইনি নদীয়া জেলার একজন কেরোসিন তেলের এজেন্টও বটে—তাঁর পুত্রের জন্য আদিলপুর মহকুমায় একটা সিমেন্ট ব্যবসায়ের লাইসেন্স উপহার পেয়েছেন। অতি সম্প্রতি উল্লেখ্যগম ও চালের ব্যবসা থাকা সত্ত্বেও সিমেন্ট ব্যবসায়ের জন্য দুটি লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই মহকুমাত্তেই জনৈক ক্রীড়াকিত (এস এস সি পাশ) এবং শ্রীমদা আইনসভা সদস্যদের স্থপারিশ থাকা সত্ত্বেও লাইসেন্স দেওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হলেন না।

এই আধিকারিকে সিমেন্ট কেরোসিন শিল্পাঙ্গ প্রভৃতির লাইসেন্স নবীকরণ-বা তৎসম্পত্তিকিছু করতে হলে দু চারজন ছাড়া সেখানকার কর্মচারীদের কাজের প্রকারভেদে ৫০ থেকে ৬০০ টাকা দিতে হয়। যদিও এই টাকা অধিকর্তা মহাশয় আধিকারিকের গোপন শাখার মাধ্যমে গ্রহণ করেন পরিদর্শক শ্রেণীকেও মাসিক ভেট পাঠাতে হয় ঘোষ-মজুমদারের মাধ্যমে।

এই আধিকারিকের কিছু কর্মচারী সগৌরবে নিজেদেরই প্রদত্ত লাইসেন্স

নিয়মে বেনামীতে ব্যবসা করে চলেছেন। কিছু কিছু কেরোসিন তেলের ব্যবসা এইভাবে চলছে। অজুর্নকৃত্যর সাউর (ক-ইল নং cg/K oir/11/71) কি কোন বাস্তব অস্তিত্ব পাওয়া যাবে?

১৯৬২ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ভোগ্যপণ্য আধিকারিকে সংগৃহীত সর্বপ্রকার মূল্য বাবদ আদায়কৃত নন-জুডিসিয়াল ট্রায়াল অফিস থেকে বাইরে-নিয়মে যাওয়া হয়েছে এবং পরবর্তীকালে বহুবার সময়মতো পুনরায় বিক্রীত হয়েছে রাসায়নিক শোধনের মাধ্যমে। এই ব্যবসা পরিচালনার অন্ততম নায়ক বর্তমানে সিমেন্ট শাখায় কর্মরত।

বড়বাজারের কিছু ব্যবসায়ী এবং সরকারী আমলাদের অপূর্ব যোগ-সাজসে বাজারে মাঝে মাঝে শিল্প-বাজ্যের হাহাকার লেগে যায়। কারণ কিছু কিছু শিল্পবাজ্য পরিবেশক বেনামীতে খুচরা শিল্পবাজ্য বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্স করিয়ে রাখে এবং নবীকরণ করায়। পূর্বোক্ত খুচরা লাইসেন্স-ধারীদেরই বেশীর ভাগ শিল্পবাজ্য খুচরা বিক্রয়ের জন্য দেওয়া হয় এবং তারপর যথারীতি উদ্বাও হয়।

অগ্রগতির অ'সল চেহারা

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

গান্ধির কংগ্রেস সরকার এর একটি কাণ্ড করে উঠতে পারলেন না। এর জবাবে শ্রীমতী গান্ধিও একটি-ই মাত্র গল্প রাখা জবাব, “ওরা আমাদের করতে দেয় নি।” এই “ওরা” সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয় না। ধারণা হতে পারে যে, “ওরা” হল বিরোধী দল, সংসদ, বিচারবাহিন্যা, সংবিধান অথবা অন্য যে কোন কর্তৃক তাঁর অপকর্মেও টানফিৎ তলব করেছে।

২৬ জুন ১৯৭৫-এ সমস্ত বাধাই অসংহত হল। কিন্তু ফল হল কতটুকু? জমির উর্বরীমা এবং উৎকৃষ্ট জমি বন্টনের কথাই ধরা যাক। ৫০-এর বছর-গুলিতে আবাদী কংগ্রেস এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ইত্যাদি প্রলাপের প্রভাবের মধ্যে কংগ্রেসের জ্যোতিষগা বলেছিলেন যে, দেশে আনুমানিক ৬ কোটি ৩০ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমি আছে। কিন্তু অচিরেই তারা তিনে যাবড়ে গেলে যে, এই জমির অধিকাংশই হয় তাদের নেতাদের দখলে নয় তাদের সর্বধনের। কলে তাদের উৎসাহে ভাটা পড়ল। কিন্তু তখন খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল কারণ কথাটা প্রচার হয়ে যাওয়ার গোমের গরিবেরা চকল হতে উঠেছিল। কাজেই নেতের সমস্ত তৎকালীন কংগ্রেস নেতারা সহজ পথ বেছে নিলেন। ১৯৬১ সনের ভূমি সংস্কার আইনে একসব বন্ধ রাখা হল যে, যে কোন বোকাও আইনকে কাচকণা চেবিয়ে জমি ফেরত দেওয়া থেকে অব্যাহতি পেরেছিল। কলে ১৯৬২ পূর্বভূ এদিক দিয়ে কিছুই হল না। এই সময় শ্রীমতী গান্ধি তাঁর বিপ্লবী সত্তা আবিষ্কার করলেন। জমির উর্বরীমা-বৈধে দেওয়াই হল সর্বাধিক আলোচ্য বিষয়। প্রধান আসামী রূপে আইনের ফাঁকে সনাক্ত করা হল এবং তাঁদের বন্ধ করার জন্য ১৯৭১-৭২ সালে নতুন আইন পাশ করা হল। আইনের ধাতাউপধারা শানিয়ে সরকার আবার আবিষ্কার করলেন যে, মধ্যপঞ্চাশে অচিরেই ৬ কোটি ৩০ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমির পাণ্ডা নেই—জমি আছে মাত্র ৩০ লক্ষ একর। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধি এর প্রতিটি ইকি দখল করতে বদ্ধপরিকর হলেন। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সুতী বস্ত্র শিল্পে লুণ্ঠন

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

নিম্ন সম্প্রদিত বিতর্কে তাঁর জগাব, সরকারীভাবে মিমিয়োগ্রাফ করা প্রতিবেদনের ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১১) বাণিজ্য মন্ত্রকের বিভিন্ন বংসরের ‘Import Trade Control, policy’, Vol. II, দ্রষ্টব্য।

(১২) এই বিষয়ে, কংগ্রেস সংসদীয় দলের বাণিজ্য বিষয়ক স্টাডিং কমিটির উদ্দেশ্যে প্রচারিত ১৯৭৩ সালের ৩০শে আগস্ট তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রতিবেদনে (মিমিয়োগ্রাফ) উল্লিখিত পরিসংখ্যান দ্রষ্টব্য।

(১৩) পঞ্চম পঞ্চাবিকী পরি-ল্লনার উপরে লোকসভা মহাকরণ পর্বদ ‘বি’ কতৃক প্রস্তুত Synopsis of Proceedings, পৃষ্ঠা ১০৮।

(১৪) ১৯৭৩ সালের ১০ই অক্টোবর, পৃষ্ঠা ১৮৪৫।

(১৫) বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রকের ১৯৭১-৭২ সালের বাজেট বরাদ্দ সম্প্রদিত বাজেট বিতর্কের জবাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্র বলেন: “দেশের মোট স্বতী-বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিরন্তর বস্ত্রোৎপাদন উৎপাদন হ্রাস এবং সাধারণ মানুষের জন্য উৎপাদিত স্বতী-বস্ত্রের দাম বৃদ্ধি হতে আমি খুবই উদ্বেগ।” বোম্বাইয়ের ভারতীয় স্বতী-বস্ত্র সংঘ তার Repo t for the Year 1971-72-তে নিজেই মন্তব্য করে: “পরিচালনা অধিদপ্তরে নির্ধারিত জরিমানা প্রদান করে নিয়ন্ত্রিত বস্ত্র উৎপাদন না করা, সম্প্রদিত সরকার প্রদত্ত অধিকারটিকে প্রয়োগ করাটাই কতিপয় মিস মালিক অধিকতর পছন্দ করেছে।” (পৃষ্ঠা ৫৪) এই জরিমানা অতি সামান্য। নিয়ন্ত্রিত বস্ত্র উৎপাদন কমিয়ে এবং অনিয়ন্ত্রিত বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করে মিলগুলি, “ভুল-লোকের চুক্তি” মান্য করলে বা লাভ করত, তার চাইতে বহুগুণে বেশী মুনাফা অর্জন করে থাকে।

(১৬) The Cotton Mills of India 1854 to 1954 গ্রন্থের ১২৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

(১৭) জি, পৃষ্ঠা ১১৭।

(১৮) ১৯৭৪ সালে ২২শে মার্চ তারিখে লোকসভায় উপ-বাণিজ্য মন্ত্রী এ. সি. জর্জ কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

(১৯) Wadia and Merchant, Our Economic Problem, ১৯৪৮, পৃষ্ঠা ৩৬৭ দ্রষ্টব্য।

সাল	কাপড়	পাট	চা, কফি, রবার বাগান
১৯৮০-৮১	৮০	২৪	—
১৯৮০-৮১	১০৬	১০৬	১০৪
১৯৮০-৮১	১৪২	১২৮	১২২
১৯৮০-৮১	২৭৩	১২৪	১৭০
১৯৮০-৮১	২৪২	১৪৮	১২১

(২০) Report of the National Commission on Labour, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ২০৪ দ্রষ্টব্য।

কংগ্রেসের নাতিশ্রাস

দপন

বিংশ বর্ষ ॥ ৭ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১১ই মার্চ '৭৭ ॥ এক টাকা

দেবীবাবু সিদ্ধার্থবাবুর গোপন কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শ্রীসিদ্ধার্থবাবুর রায় আর শ্রীদেবী-
প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় হাতে হাত
মিলিয়েছেন। মধ্যস্থতা করেছেন
অয়ং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে
তার ঝটিকা সফরকালে। রাজ্য
কংগ্রেসের নির্বাচনী অভিযানে এটি
অন্ততম ঘটনা। অবশ্য একত্রে
নির্বাচনী অভিযান পরিচালনায়
প্রতিজ্ঞা ওই হাত মিলানোতেই
সীমাবদ্ধ রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।
শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস
পরিণত হয়েছে নিজেদের মধ্যে অবিরাম
সংগ্রামরত কতকগুলি গোষ্ঠীতে।
গোষ্ঠীযুদ্ধ হয়েছে অতিশয় তীব্র।
এমন কোন নির্বাচনী কেন্দ্র আছে
কিনা সন্দেহ যেখানে এক গোষ্ঠী
অপর গোষ্ঠীর পেছনে ছুঁচি ঢালাচ্ছে

না। শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, তাঁকে
পেছন থেকে ছুঁচি মারা হচ্ছে। পশ্চিম
বঙ্গে এসে তিনি নিশ্চয়ই জেনে গেছেন
কে কাকে পেছন থেকে ছুঁচি মারছে।
১৯৭২-এর বিধান সভা নির্বাচনে
সিদ্ধার্থবাবু আর দেবীবাবু ছিলেন
হরিহরাঙ্গা। ওই নির্বাচনে কংগ্রেসের
অভিযানের প্রধান অঙ্গ ছিল টেকনি-
কাল প্রকৃতি যার দায়িত্ব ছিল দেবী-
বাবুর উপর। সিদ্ধার্থবাবু তখন ছিলেন
পশ্চিমবঙ্গের জল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর
দায়িত্ব রাজ্যের এবং কেন্দ্রের সমস্ত
বাহিনীগুলি এবং নির্বাচনে নিয়োজিত
সরকারী কর্মচারীরা যাতে উপযুক্ত
পথে চলেন তা নিশ্চিত করা। সে
বৎসর কংগ্রেসের জয়জয়কার।
(শেবাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসের ভাড়াভুবি রুখতে

পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এবার নির্বাচনে পরাজয় হুনিশিত
জেনে কংগ্রেস দল ও সি পি আই
নতুন কায়দার ত্রিগিং করার পরিকল্পনা
নিরেখে। পুলিশ বাহিনীকেও কংগ্রেস
ও সি পি আই প্রার্থীদের জয় হুনিশিত
করার জন্য সাহায্য করার অলিখিত
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ভোটের হাওয়া দেখে কংগ্রেসীরা
হতাশ। মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্যের কংগ্রেস
নেতারা প্রকাশ্যে যতই লম্বা চণ্ডা কথা
বলুন মা কেন, অবস্থা যে প্রতিফল সে
স্বক্ষে ওদেরও কোন সংশয় নেই।
বিভিন্ন জেলা থেকে নির্বাচন সম্পর্কে
পুলিশ রিপোর্ট দেখে কংগ্রেসী

নেতার আশঙ্কিত।
বাহিনীর আর সাতাত্তরের মধ্যে
যে শুধু কালগত পার্থক্যই আছে তা
নয় গুণগত পার্থক্য আছে একথা
কংগ্রেসীরাও বোঝেন। তাই বাহিনীর
সালের মত পাইকারী হারে বুধ দখল
করে ভোটের কারচুপির পথ না নিয়ে
এবার আগে থেকেই সন্ত্রাসের আব-
হাওয়া সৃষ্টি করার পরিকল্পনা।
এ বিষয়ে প্রধান লক্ষ্য সি পি এম
কর্মী ও সমর্থকরা। নির্বাচনের আগে
এলাকায় এলাকায় ব্যাপক হারে সি পি
এম কর্মী ও সমর্থকদের ওপর আক্রমণ
করার পরিকল্পনা চলছে এবং কোথাও

॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥
সারা দেশে ১৯৬৭ সালের কংগ্রেস
বিরোধী হাওয়া ফিরে এসেছে।
রাজ্য রাজ্যে চলছে একাধিক বিরোধ।
দলের অভিযান। তবে ১৯৬৭
সালের সঙ্গে একটা বড় তফাৎ এই যে,
এবার কেন্দ্রে কংগ্রেস বিপন্ন এবং
বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বিভিন্ন বেসর-
কারী স্তর থেকে যেসব খবর পাওয়া
যাচ্ছে তাতে মনে হয় কংগ্রেস ২০০-

টার বেশি আসন পেতে পারে না।
কংগ্রেসের ধস নামবে প্রধানতঃ
বিহার, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা,
পাঞ্জাব, উজরাট, তামিলনাড়ু এই
এই কটি রাজ্যে। এদের মোট
আসন সংখ্যা ২২২। পশ্চিম বঙ্গকেও
এর মধ্যে ফেলা যেতে পারে। এখানে
কারচুপির সন্ত্রাসনা ও সন্ত্রাস সত্ত্বেও
বিরোধীরা বেশির ভাগ আসন দখল
করবে বলে মনে হয়।

এদিকে রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসীদের
মধ্যে চলছে চূড়ান্ত খেয়োখেয়ি।
ত্রিংশ বছর ধরে কেন্দ্রে একচ্ছত্র
ক্ষমতার অধিষ্ঠিত থাকার ফলে কংগ্রেস
এখন প্রধানতঃ স্বার্থান্বেষীদের পীঠস্থানে
পরিণত হয়েছে। দেশের ও মানুষের
ভাল করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে
কংগ্রেস, তাই তার নাতিশ্রাস উঠেছে।
প্রায় প্রতিদিন দলে দলে কংগ্রেসীরা
(শেবাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)

জর্জ ফার্নান্ডেজের ভাইয়ের ওপর জঘন্য পুলিশী অত্যাচার রাষ্ট্রপতির কাছে মায়ের চিঠি ও টেলিগ্রাম

"MY SON LAWRENCE
FERNANDES AGED
FORTY-FIVE TAKEN BY
POLICE FROM RESI-
DENCE 3 LEONARD
ROAD BANGALORE 25.
SATURDAY NIGHT FIRST
MAY AROUND NINE
STOP WHEREABOUTS
UNKNOWN EVEN AFTER
SEVEN DAYS STOP
SEVENTY FIVE YEAR
OLD FATHER HEART
PATIENT AND MYSELF
FEELING DESPERATE
BECAUSE POLICE OFFI-
CIALS MECHANICALLY
DENY KNOWLEDGE

ABOUT DETENTION
STOP URGE IMMEDIATE
ACTION STOP ADVISE
HIS PRESENT CONDI-
TION.
ALICE FERNANDES"
এটি একটি টেলিগ্রামের কপি।
জর্জ ফার্নান্ডেজের মা এলিস ফার্নান্ডেজ
এই টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন ১৯৭৬
সালের ৭ই মে ভারতের রাষ্ট্রপতি,
প্রধানমন্ত্রী, স্বপ্রীম কোর্টের প্রধান
বিচারপতি, কর্ণাটকের রাজ্যপাল,
মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি, পুলিশ
প্রধান, কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, এম পি
এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের।
টেলিগ্রামের বক্তব্য : এলিস ফার্না-
ণ্ডেজের পুত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক
লরেন্স ফার্নান্ডেজকে ১লা মে রাত্রে

নটা নাগাদ তাঁদের বাসস্থান ৩ নং
লিওনার্ড রোড, বাঙ্গালোর ২৫ থেকে
পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। সাতদিন
পরেও লরেন্সের কোন খবর জানা
যাচ্ছেনা। তাঁর পঁচাত্তর বৎসর বয়স্ক
বুড় হৃদরোগে আক্রান্ত পিতা ও মাতা
হৃদযন্ত্রাঘাত কারণ পুলিশ তাঁদের
পুত্রকে আটক করা সম্পর্কে অজ্ঞতা
প্রকাশ করছে। টেলিগ্রামে আত্ম
ব্যবস্থা গ্রহণেরও আবেদন জানানো
হয়।
পুত্রের কোন খবর এবং টেলি-
গ্রামের কোন উত্তর না পেয়ে শ্রীমতী
ফার্নান্ডেজ ঘটনার বারো দিন পরে
অর্থাৎ ১২ই মে রাষ্ট্রপতিকে একটি চিঠি
লেখেন। কিন্তু এরও কোন উত্তর
(শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

বীরেন মহান্তি এবং মুরতর বিরুদ্ধে যুব নেতার অভিযোগ

ভারমণ্ডহারবারের যুব কংগ্রেস
নেতা বলরাম ঘোষ দর্পণ সম্পাদকের
নিকট একটি চিঠিতে ভারমণ্ডহারবার
কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী বীরেন মহান্তি
ও তথ্যমন্ত্রী স্ত্রুত মুখার্জীর বিরুদ্ধে
কতকগুলি অভিযোগ করেছেন, যার
কপি ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছেও
পাঠানো হয়েছে। নীচে চিঠিটির
কিছু অংশ বাদ দিয়ে প্রকাশ করা
হল—
মহাশয়,
আপনার দর্পণ পত্রিকায় ৪ঠা
মার্চ ৭৭ তারিখে প্রকাশিত ভারমণ্ড-
হারবারে দক্ষিণ কলকাতার কুখ্যাত
মন্তানদের সমাবেশ শীর্ষক ঘটনাটি

আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।
ঐ সমস্ত কুখ্যাত মন্তানদের ভিতর
যাহারা গাইঘাটা ও অন্যান্য জায়গায়
হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ও
বর্তমানে আদালতের আমিনে মুক্ত
আছেন তাহারা এই সমস্ত কুখ্যাত গুণ্ডা
বাহিনী। তাহা ছাড়া ১০০০ জন
লোকের চাকুরির ভিতর ৭৫০ ব্যক্তি
কলিকাতা কপোরেশনে নিয়োগ পত্র
পাইয়াছেন তাহাদের সর্ব হইল যে
তাহারা ৫০০০ টাকা অথবা ১০০০১৫০।
৫০ প্রতি মাসে বীরেন মহান্তি ও
বাবলু মুখার্জীর মারফৎ মাসের প্রথম
দিনে মাহিনা পাইয়াই জমা দিবেন।
(শেবাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)

ফার্মাণ্ডের মায়ের চিঠি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাওয়া যায় না। এরপর ২৪শে মে তিনি রাষ্ট্রপতিকে আর একখানি চিঠি লেখেন তাঁর পুত্র লরেন্স ফার্মাণ্ডের ওপর পুলিশের অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে যার কপি পুরোজ্ঞ উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তিদের সকলকে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য এও কোন উত্তর মেলেনি। নীচে এই চিঠিটি তুলে দেওয়া হল—

২৪শে মে ১৯৭৬

প্রেরক : শ্রীমতী এলিস ফার্মাণ্ড

৩, লিওনার্ড রোড

বাল্গলোর ৫৬০০২৫

প্রাপক : ভারতের রাষ্ট্রপতি

নতুন দিল্লী

বিষয় : আমার পুত্র লরেন্স ফার্মাণ্ডের ওপর নির্দয় অত্যাচার।

মহাশয়,

গভীর দুঃখ-কাতর হৃদয়ে আমি এই চিঠিটি লিখছি। আমার ১৯৭৬ সালের ১২ই মে তারিখের চিঠির (যার কপি সঙ্গে দেওয়া হল) জের হিসেবে আপনার কাছে বিচার পাওয়া এই আশায়। আমি ৩৫ বছরের বৃদ্ধা মহিলা এবং আমার ৭৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ স্বামী হৃদরোগে আক্রান্ত। নিয়ে বিবৃত সাম্প্রতিক ঘটনা আমাদের উত্তরকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে এবং দুঃখ তারাকান্ত করেছে।

১লা মে শনিবার রাত্রি মটা নাগাদ আমার ৪৪ বৎসর বয়স্ক মধ্যম পুত্র লরেন্স ফার্মাণ্ডকে পুলিশ আমাদের বাসস্থান থেকে ধরে নিয়ে যায় এই অজুহাতে যে, তাকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ১৯৭৫ সালের ২২শে ডিসেম্বর থেকে বিনা বিচারে মিসার আটক আমার তৃতীয় পুত্র মাইকেল ফার্মাণ্ডের (ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাস্ট্রিজের সে একজন অফিসার এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতা) কর্তৃক হাইকোর্টে ক্ষেত্রারী মাসে যে হেবিয়াস কর্পাস আবেদন করেছে সেই সম্পর্কে।

প্রায় একঘণ্টা এই অজুহাত দেবার পর পুলিশ আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্জ ফার্মাণ্ডের গতিবিধি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা বাদ করে এবং তারপর তাকে ভয়ঙ্কর অমাত্যিক বেষণোয়া ও নির্মমভাবে খাড়া ডিগ্রী পদ্ধতিতে নির্ধাতন করা হয় ভোর তিনটে পর্যন্ত। ডাঙা দিয়ে প্রহার করা ছাড়াও (পাঁচটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে বাবার পর) একটা কলাগাছের সঙ্গে তাকে বেঁধে বুটের লাগি ও চকু মারা হয়। তাকে এবং আমাদের পরিবারকে অসীল ভাষায় গালাগালি করা হয় এবং ভয় দেখানো হয় এই বলে যদি তার ভাই অর্জ ফার্মাণ্ডের গতিবিধির খোজ না দেয় তাহলে তাকে রেলের লাইনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলন্ত ট্রেনের নীচে হত্যা করা হবে তাদের হাতে তার মৃত্যুর কোন প্রমাণ না রেখে। তারা সত্যি সত্যি তাই করতে চলেছিল ভোর তিনটের সময় বধন তার শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে প্রায় নিরাময়ের বাইরে চলে যায়। এইভাবে তাকে শারীরিক, মানসিক ও মারাত্মক ভয়ঙ্কর নিরে যাওয়ার পর বিভিন্ন পুলিশী লক আপে অসহ্যকর পরিবেশে নির্জন কারাবাসে রেখে দেওয়া হয় ২০ শে মে পর্যন্ত যে সময় তাকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্ধাতন করা হয়। তাকে তিনদিন অনাহারে রেখে দেওয়া হয় এবং অস্বস্তি দিন উপযুক্ত খাদ্য দেওয়া হয় না, এবং সিগারেটও নয়। এই ২০ দিনের মধ্যে মাত্র ৩ দিন তাকে স্নান করতে দেওয়া হয় এবং ১লা মে তাকে গ্রেপ্তারের সময় সে যে পোষাকে ছিল সেই পোষাকেই তাকে থাকতে বাধ্য করা হয়। এই অমাত্যিক ব্যবহারের ফলে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। তাকে চিকিৎসার দ্বারা বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, প্রত্যেক-বার বিভিন্ন ও মিথ্যা নামে পুলিশ

অফিসারের পরিচয় দিয়ে। এক রাতে তার চিকিৎসার জন্য একজন ডাক্তারকে পুলিশ স্টেশনে আনা হয়েছিল।

২ই মে আমার পুত্রকে ৩০০ কিলো-মিটার দূরে ভাভাডেরে পুলিশের গাড়ি করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ১০ই মে সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করা হয় যেন আগের দিন ভাভাডেরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে নির্ধাতন করা হয় এবং ১১ই মে পর্যন্ত সেখানে লক আপে বেধে দেওয়া হয় এবং তারপর তাকে বাল্গলোরে ফিরিয়ে আনা হয়।

তাকে অবিরাম অর্জ ফার্মাণ্ডের গতিবিধি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাকে আইনজীবীর সাহায্য নিতে দেওয়া হয় না এবং চিঠিতে বা কোনো বাড়ি অথবা অস্ত্র কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয় না। তাকে সংবাদপত্র দেওয়া হয় না এবং নির্জন কারাবাসে রেখে দেওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেট অথবা অস্ত্র কাউকে নির্ধাতনের কথা জানালে চরম পরিণতির ভয় দেখানো হয়। শেষ পর্যন্ত ২০শে মে মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতির সময় তাকে বিত্তীয় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের চেম্বারে হাজির করা হয় এবং তারপর তাকে বাল্গলোর সেন্ট্রাল জেলখানায় নিয়ে গিয়ে একটি সেলে আটক রাখা হয় যেখানে সাতাশটি অপরাধী বা মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল অথবা জেলের আইন ভাঙ্গার জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের রাখা হয়।

মৌখিক অভিযোগ ছাড়াও আমি লিখিত অভিযোগও করেছি, সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন কর্তৃপক্ষের নিকট টেলিগ্রাম ও চিঠি পাঠিয়েছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি এবং কোন স্বীকৃতিও পাইনি এবং আমার পুত্র লরেন্স কোথায় আছে সে সম্পর্কেও কিছু জানানো হয় নি। ২০শে মে একজন আইনজীবীর কাছে থবর পেয়ে আমি জেলখানায় যাই এবং যদিও আমি আইনজীবীর সঙ্গে বিকেল ৬-৪৫ থেকে ৭-৩০ পর্যন্ত অপেক্ষা করি আমাকে আমার পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না। ২১ তারিখে সকাল ১০-৪৫ থেকে ২টা পর্যন্ত তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর তাকে দেখবার জন্য আমার কারাকক্ষে নিয়ে যাওয়া কিন্তু আইনজীবীকে নয়। আমি তাকে মৃতের মত দেখলাম। দুজন লোকের সাহায্য ছাড়া সে চলতে পারছে না এবং তাও কাতরে ও খুঁড়িয়ে; তার বাম দিক অব্যবহৃত যেন পছ এবং তার বাঁ পা ও হাত তখনও ফোলা। সে মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে ভয়ঙ্কর ভাঙা এবং ভোতলাপি ছাড়া সহ্য

ভাবে কথা বলতে পারছে না। সে স্পষ্টই স্নায়বিকারে ভুগছে এবং পুলিশ, থাকী পোষাকে যে কোন লোককে, জুতো পায়ে খটখট করে এগিয়ে আসা যে কোন লোককে বা অস্ত্র যে কোন লোক বাদে সে গ্রন্থ-কর্তা অথবা নির্ধাতনকারী বলে মনে করে তাদের সম্পর্কে ভীষণ ভীত। তাকে সম্পূর্ণ ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল এবং ২০ দিনে সে অন্তত ২০ কে জি ওজন হারিয়েছে।

তার আইনজীবীকে ২১শে মে বিকেল ৬-৩০শে দেখা করতে দেওয়া হল, তার মানে তাকে সেলে রাখবার ২৪ ঘণ্টা পরে।

আরো আঘাত করার অন্তেই যেন ২১শে মে তারিখে পুলিশ কমিশনার স্বাক্ষরিত এক আটকাদেশ তাকে জেলে ২০শে মে ধরিয়ে দিয়ে এবং মিনা বন্দী করে এই বীভৎশ, অমাত্যিক জিয়ালাপে আরো একটি পৃষ্ঠা যোগ করা হল, যার পরে তাকে একই সেলে রাখা হল অস্বস্তি মিসাবন্দীদের সঙ্গে পাবার সুযোগ বাদ দিয়ে।

বধন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তাঁর অস্ত্রান্ত মন্ত্রী আমাদের দেশের জনসাধারণকে এবং অস্ত্রান্ত দেশের জনসাধারণকে বলছেন যে, এখানে রাজনৈতিক বন্দীদের ভালভাবে দেখাশোনা করা হচ্ছে এবং পুলিশ তাদের নির্ধাতন বা তাদের সঙ্গে অমাত্যিক ব্যবহার করে না এবং যখন হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের উত্তরে স্বপ্রীত কোর্টের ২রা এপ্রিলের রায় বলছে যে, শাসন বিভাগ কর্তৃক কমতা অপব্যবহারের কোন ঘটনা স্বপ্রীত কোর্টের নজরে আসেনি ইত্যাদি তখন কি আমি মনে করব যে, আমার পুত্রের নির্ধাতন সরকারের পক্ষে মানবিক কাজ? অথবা আমি বিশ্বাস করব যে, এসব আমার পরিবারের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত, পূর্বপরিকল্পিত কার্যবলীর অংশ? অর্জ ফার্মাণ্ডের অন্তেই কি আমার দুই পুত্রকে আটক রাখা হয়েছে? যার বর্তমান গতিবিধি বা অবস্থা সম্পর্কে আমার সমগ্র পরিবারের কেউ কিছু জানে না। এটা কি নৈতিক বা সঠিক যে, আমার পুত্র অর্জ ফার্মাণ্ডের রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য আমার পরিবারকে এইভাবে ভুগতে ও নির্ধাতিত হতে হবে?

এখানে আমি যা বিবৃত করলাম তার সবই আমার পরিবারের লোকেরা লরেন্সের সঙ্গে দেখা করার সময় তার কাছ থেকে যা শুনেছে তার ভিত্তিতে। স্পষ্টই এটা খুব বিস্তারিত নয়। এই সমস্ত ঘটনার রাজনৈতিক তাৎপর্যের মধ্যে না গিয়ে, যা আমি সামান্যই বুলি, আমি মাতৃহ ও তার সরকারের সভ্য আচরণের মধ্যে যা ভাল তার

এবং বিচারের নামে এই বর্বর নির্ধাতন ইত্যাদি সম্পর্কে আপনার কাছে বিচার বিভাগীয় তত্ত্বের এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমি আরো অনুরোধ জানাই যে, তাকে একটা ভাল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হোক এবং তার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা ও মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা করা হোক এবং তার সঙ্গে তার পরিবারের প্রত্যহ সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হোক যাতে সে তার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে মাতৃহ হতে পারে। আমি নিশ্চিত যদি আমি বিচার না পাই তবে এই পৃথিবীর সমস্ত সর্বশক্তিমান ব্যক্তির উপরে যে সর্বশক্তিমান দৈব তিনি অন্যান্যকারীদের শাস্তি দেবেন অথবা আজ-হোক কাল হোক নিয়তি তার প্রাপ্য আদায় করবে।

আমি বিশ্বাস করি এই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকৃত হবে এবং ব্যবস্থা গ্রহণের প্রার্থনা শীঘ্রই কার্যকর হবে।

আপনার বিশ্বস্ত
খা: এলিস ফার্মাণ্ড

বিজ্ঞপ্তি

[কর্ম ৪-৮ নং দ্বারা অস্থায়ী বিবৃত]

প্রকাশস্থল : ৬৯ মট লেন
কলকাতা-১৩

মুদ্রাকর : হীরেন বহু

জাতি : ভারতীয়

ঠিকানা : ১৩/১ অহরলাল দত্ত
লেন, কলকাতা ৬৭

প্রকাশক : হীরেন বহু

জাতি : ভারতীয়

ঠিকানা : ১৩/১ অহরলাল দত্ত
লেন, কলকাতা ৬৭

সম্পাদক : হীরেন বহু

জাতি : ভারতীয়

ঠিকানা : ১৩/১ অহরলাল দত্ত
লেন, কলকাতা ৬৭

সহাধিকারী : হীরেন বহু

১৩/১ অহরলাল দত্ত
লেন, কলকাতা

আমি ঘোষণা করছি যে, উপরি-
উক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান বিশ্বাস
মতে সত্য।

খা: হীরেন বহু

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের পরেই শ্রীমতী গান্ধীর ঘোষিত অধরী অবস্থার পটভূমিতে, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই নির্বাচনেই নির্ধারিত হবেন দেশের ভবিষ্যৎ কি? গণতন্ত্র না স্বৈরতন্ত্র? ব্যক্তি স্বাধীনতা না একনায়কত্ব? এই নির্বাচনী সংগ্রামের একটি অপরিহার্য হস্তিয়ার।

শেখর বসু-র

গণতন্ত্র না স্বৈরতন্ত্র?

আজই অর্ডার দিন। মূল্য : দেড় টাকা।

সেই সঙ্গেই আরও একটি পুস্তিকা।

সাতাত্তরের নির্বাচনী ছড়া

মূল্য পঞ্চাশ পয়সা।

নবজাতক প্রকাশন। এ-৬১ কলকাতা পল্টন স্ট্রীট মার্কেট।

কলিকাতা-৭

গণতন্ত্রের উপর নগ্ন আক্রমণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে আর সেই সব ঘটনা চোখের সামনে তুলে ধরবে

স্বৈরতন্ত্রে ভারত

ইন্দিরা সরকারের ১৯৭৫-৭৬ সালের রাজত্বের ঘটনাবলীর পটভূমিতে রচিত

লেখক : আইউব রহমান

প্রকাশক : রমেন্দ্রনাথ সুর

(বিঃ দ্রঃ—এজেন্টদের কমিশন দেওয়া হবে) যোগাযোগ করুন :
বাবুরবাগ, বর্ধমান

নির্বাচন কারচুপি ও অন্যান্য কথা

(দুর্গার পর্বে)

নির্বাচনে কারচুপি বিষয়টি ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের পর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সেই নির্বাচনে 'পৃথক' সি পি আই (এম) ভোট প্রার্থীর দিন থেকে সেই অভিযোগ তুলেছে, বিধানসভা বর্জন করেছে। ৭২-এর নির্বাচন থেকে গিয়ে ওঠা সিদ্ধান্ত রায় সরকারকে অবৈধ আখ্যা দিয়েছে।

নির্বাচন হলোই যে সেটা অবাধ ও স্বতন্ত্র হবে, ভোটের মাধ্যমে যে জনমত স্বত্বাবে, সংগতভাবে প্রতিকলিত হবে, এটা স্বতঃসিদ্ধ নয়। বিদেশে এমন ঘটনা অনেক ঘটেছে। আমাদের দেশেও অভিযোগের অন্ত নেই। হিটলার নির্বাচন-অচ্যুত করতেন, কিশোরী করতেন তা জার্মানীর ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায়। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশে অনেক অঘটন ঘটে গেছে। সে সব অঘটনের অন্তরালে যে রাষ্ট্র আসল খেলোয়াড়, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার খোদ নিজ মূলকে এমন বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল নিম্নে আমলে। তবে পরিকল্পনাটা নেটিভদের দেশের মতো নয়, আরো উচ্চমার্গীয়। অনেক কিছু শরতী ও কলঙ্কজীবী সমাহার ওয়াটারগেট। ভারতে যে রাজ্যের নির্বাচনকে লোকে গ্রহণ বল পোড়া থেকে জেনে এসেছে, সে রাজ্য গুজরাট। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া দেশের জাতীয়তাবাদী সব সংবাদপত্র এনিরে তেমন উচ্চবাচ্য করে না কখনো, বোধহয় 'বৃহত্তর' কোনো সার্থকে তারা প্রাণান্ত দিয়ে কাশ্মীরী ভোটদলকে ধামাচাপা দিয়ে রাখে।

সেই একই অবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ৭২-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে। ক্রটিগার দুর্গা বাংলা দেশের মতো সাপ্তাহিক, বামপন্থী দলগুলির পত্র পত্রিকা ছাড়া এ নিয়ে তেমন কেউ সোচ্চার হলো না। জনমতকে বিলাস্ত করার উদ্দেশ্যে বাজারী সংবাদপত্রগুলি, সুপরিচিত রাজনৈতিক সংবাদদাতারা হয় মৌন হলেন, না হয় সামান্য মন্তব্যে বিষয়টিকে হালকা করতে চাইলেন। বার বার বললেন, জাল ভোট মতুম কিছু নয়। বার বারই কিছু না কিছু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। ৭২-এ হয়তো একটু বেশি হয়েছে। তারপরই তাদের কলমে 'কর্মবজ' না হওয়াতে একটু মিঠেকড়া সমালোচনা আর কংগ্রেস দলীয় কৌদল মাথাচাড়া দিলে তার অস্তিত্ব

কিঞ্চিৎ কটুজি। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবার ব্যাপক কারচুপির আশংকা দেখা দিয়েছে। সারা ভারতে এই কারচুপি প্রসঙ্গ উঠছে। কিছু কিছু রাজ্যে ১৯৭১ থেকে এটা কম বেশি চলছে, পশ্চিমবঙ্গে ৭২-এ ভয়াবহ আকার নিয়েছে—সর্বভারতীয় স্তরে কথাগুলি এখন অনেকটা বীজিত পেয়েছে। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার টি. স্বামীনাথনের কাছে নানা জায়গায় এসব আশংকার কথা পেশ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন হুঁ ও অবাধ নির্বাচনের জন্য নিয়মকানুন, আচরণ বিধি রচনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু যেহেতু প্রশাসন ও পুলিশ সতর্ক ও নিরপেক্ষ না হলে, সবটাই গ্রহণ বা গুণ্ডামি কিংবা জালিয়াতি হয়ে যাবে, সে ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের এস্তিয়ার সংকুচিত বা সামান্য বৈকি। গত ৪ঠা মার্চ পাটনার শ্রীস্বামীনাথন বলেছেন ভোটকে 'দখল' প্রতিরোধ করতে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভোটপত্র বাতিল অবাধ, স্বাধীন নিরপেক্ষ হয় তার মূল দায়িত্ব আসলে বর্তার সরকারের ওপর অর্থাৎ ক্ষমতাসীন দলের সংযম ও নীতি নিষ্ঠা একটি বড় শর্ত। সারা ভারতের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বর্তমান লেখকের অভিজ্ঞতা নেই। তবে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন দল কংগ্রেসের অতীত কীটিকলাপ, ৭২-এর অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাপক কারচুপির বড়বড় যে প্রশাসনিক পর্বায়ে, একেবারে উচু মহল থেকে হতে পারে এমন আশংকা কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তাই বিরোধী দলগুলির পক্ষে এ বিষয়ে জনমত তৈরী করা, জনমনকে কারচুপি মোকাবিলায় প্রস্তুত করার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রসঙ্গত জেল ফেরৎ সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্তের আনন্দবাজার পত্রিকার ৪ঠা মার্চ প্রকাশিত একটি নিবন্ধের কথা মনে পড়ছে। শিরোনাম : ভোটে জাল-ভেজাল বন্ধ করতে পারে কড়া প্রশাসন আর জনমত। হানা-ভাবে উদ্ধৃতি দিচ্ছি না। তবে মোটা-মুটি বক্তব্য : জাল ভোট পশ্চিমবঙ্গে সব নির্বাচনেই হয়েছে। ৭২-এ রিসিং একটু মাজাতিরিজ হয়ে গেছে। আর এবারেও কারচুপি ও জালিয়াতি হবে, তবে ৭২-এ যা হয়েছে, ৭৭-এ তা হওয়া অসম্ভব। কতকগুলি প্রশ্ন উকি দিয়ে যায়। ৭২-এ নির্বাচনের ঠিক আগে বরুণবাবু জাল ভোটের কথা লিখে-

ছিলেন বটে, কিন্তু অতুল্যাবাবু যখন ৬৭ সাল পর্যন্ত জিতলেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের এই চিরকোলে বোগ-টার কথা বরুণবাবু লেখেন নি কেন? পশ্চিমবঙ্গের কোনো নির্বাচনই যে অকংগ্রেসী সরকারের আমলে হয়নি সে প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়া কেন, যখন বরুণবাবু জানেন নির্বাচন হুঁ ও ছায়সংগত তখনই হতে পারে যখন প্রশাসন ও পুলিশ নিরপেক্ষ ও কড়া থাকেন। সেক্ষেত্রে প্রশাসনিক গাফ-লতী বা শঠতার দায়িত্ব ক্ষমতাসীন দলের অর্থাৎ কংগ্রেসের এবং পশ্চিমবঙ্গের গোটা কংগ্রেস নির্বাচন রাষ্ট্রপতির শাসনে হয়েছে বলে দায়িত্ব তখন কেন্দ্রীয় সরকারের। আসলে বরুণবাবু জানেন ঠিকই, কংগ্রেসী সরকারের সঙ্গে বিরোধী পক্ষকেও খানিকটা কালিমালিঙ্গ করতে চান বলে এই ওপর চালাকির আশ্রয় নেন।

বরুণবাবু তার লেখায় নল দিয়ে

দুধ খেয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকে ধরা না পড়া আর কাপ দিয়ে বেশি দুধ খেয়ে কিছুতকিমাকার হওয়ার এক গল্প দিয়ে ৭২-এর আগেকার জাল ভোট ও ৭২-এর ব্যাপক কারচুপির তুলনা করেছেন। গল্প নয়, একটা তুলনামূলক পরিস্থিতির কথা বরুণবাবুকে স্বরণ করতে বলি।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার টোকাটুকি, পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কারের ঘটনা তো আমাদের পিতামহদের আমল থেকে চলে আসছে। কিন্তু এতে সে সময় সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা বানচাল হওয়ার আশংকা ছিল না। ফলাফলে কিছু গোলমাল, ভুলভ্রান্তি নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষার কেল নিয়ে সাধারণভাবে কেউ সন্দেহ পোষণ করেন নি। কিন্তু বহুর কয়েক আগে থেকে টোকাটুকি যখন গণ-টোকাটুকিতে উত্তীর্ণ হলো তখনই সমস্ত সমাজ আতঙ্কে উঠেছিল। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে উদাসীন থেকেছেন, কখনো বা অবহাচ চাপে অসহায় ববেদামাল। গণটোকাটুকিতে পরীক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার মান, ছাত্রদের সাম-

াজিক নৈতিকতা নষ্ট হতে বসেছিল বলে সবাই প্রতিকারের দাবী করেছিলেন। বরুণবাবুকে স্বরণ করিয়ে দিই, পরীক্ষার টোকাটুকি অস্ত্র; গণটোকাটুকি আতঙ্কের। জাল ভোট বন্ধ করার জন্য নির্বাচনী কতৃপক্ষকে সতর্ক হতে বলুন। সঙ্গে জোর গলায় বলুন ভয়ংকর ব্যাপক কারচুপির জন্য দায়ী কে, কোন দল? পুলিশ প্রশাসন ক্ষমতাসীন দলের মস্তানরা বোগসাজসে সুপরিচিত উপায়ে পশ্চিমবঙ্গের শতাধিক ভোটকেন্দ্র দখল করে আসল ভোটদাতা ত্যাগালো, পূর্বার অন্তরালে ভোটপত্রে নিষেধ ছাপ দিল, ভোটগণনা কেন্দ্রে উটকো ভোটপত্র যোগ করলো,—এসব অভিযোগ কি দেশের কোনো বিরোধী দল সম্পর্কে করা চলে?

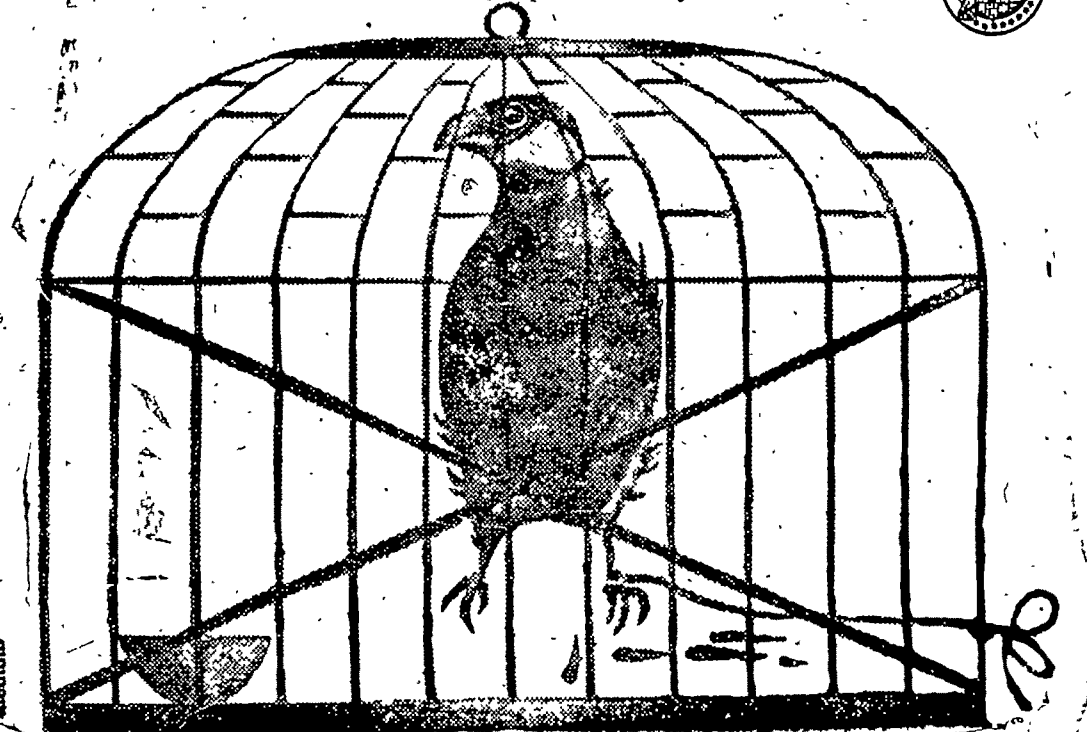
এবারের নির্বাচনে সামনে 'প্রলয়' আসছে বলে মনে হয় বরুণবাবুদের মতো সাংবাদিকরা পূর্বাঙ্কে কিছু গাওনা গেয়ে রাখছেন। তাতেও খানিকটা 'ধরি যাহ, না ছুঁই পানি' জ্ঞান। হয়তো ফলাফলের গতিপ্রকৃতি দেখে সময়মতো তারা আরো নরম বা গরম হবেন।

অসম্ভি আর দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচুন নিজের সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করুন।



অজ্ঞের নামে সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করে হয়ত সময়ে সময়ে পার পেয়ে গেলেন। কিন্তু অসম্ভি আর দুশ্চিন্তার কণ্টকিত এই বেনামী ভ্রমণের কথা নিশ্চয়ই আপনি মনে রাখতে চাইবেন না। যে কোন সময়েই তো রো পড়তে পারতেন। অজ্ঞার শেষ থাকত না। পুরো ডাড়া এবং জরিমানা, মাঝ পথেই বাধ্য হয়ে এনে যাওয়া; ২৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা তিনমাস পর্যন্ত হাজত বাস; ডাঙ্গা খরচ হলে হয়ত দুই-ই একসঙ্গে। অথৈ জলে শুধু শুধু আপ দিতে যাবেন কেন? মান-সম্মানের প্রশ্নও তো রয়েছে। পূর্ব রেলওয়ে-তে অজ্ঞের সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করতে গিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য লোক ধরা পড়ছেন। টাকা দিয়ে অজ্ঞাটো পোয়াবেন না। অনুমোদিত সংস্থা থেকেই শুধু আপনার টিকিট কিনবেন।

পূর্ব রেলওয়ে



জরুরী অবস্থায় অর্থনৈতিক অগ্রগতির আসল চেহারা (৬)

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ স্মাশী

জুন ১৯৭৫ নাগাদ ৩৮ লক্ষ একরের মধ্যে মাত্র ৩ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমির হদিস পাওয়া গেল। এর মধ্যে মাত্র ১ লক্ষ ৩০ হাজার একর সরকার দখল করতে পেরেছিল। তার মধ্যে মাত্র ৩৯ হাজার একর জমি বটন করা সম্ভব হয়েছিল। এর মধ্যে কতগুলি কার্ভিত সরকারি সীমাবদ্ধ করে চাষীদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে তা সরকার কখনো বলে না। এর দায়িত্ব নিয়ে না নিয়ে শ্রীমতী গান্ধি জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং তার অহুগামীদের উপর দোষ চাপিয়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন।

এই উদ্বৃত্ত জমি বিলি করাকে আবার সম্মানের প্রদান প্রেষ্টিজ ইত্যাদি করা হল—২০ দফা কর্মসূচীতে। সব মুখ্যমন্ত্রীকে দ্বিগুণে ডেকে পাঠান হল এবং তারা কানমলা খাওয়া ছাড়ের মত ঘোষণা করলেন যে, ৩০ জুন ১৯৭৬-এর মধ্যে ৩৮ লক্ষ একরের পুরোটা ই তারা বিলি করবেন 'যদি আইনগত কোন অসুবিধা' দেখা না দেয়। তারা স্বীকার করলেন যে, সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনের দ্বারা এই অসুবিধা দূর করা যায় যাতে তাদের কাজে আদালত হস্তক্ষেপ করতে না পারে। তারপর যথারীতি স্বীকারোক্তির তুফান বয়ে চলল। অজ্ঞের মুখ্যমন্ত্রী এক প্রেস কনফারেন্সে বললেন যে, জমির উর্ধ্বসীমা লঙ্ঘন করে তিনি যে জমি দখলে রেখেছিলেন তার ৫৬-৬০ একর তিনি খেঁচায় সমর্পণ করছেন। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীও একই ধরনের ঘোষণা করলেন এবং জানালেন যে, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি কোন ক্ষতিপূরণ নেবেন না। কিন্তু সম্মেলন স্ফোরক হতে সশঙ্ক কী প্রধানমন্ত্রী কী মুখ্যমন্ত্রীগণ কারো কোন আন্তরিকতা ছিল না। তারা জানতেন যে, ভূমিসংস্কার কার্ভে পরিণত করার কোন ঐকান্তিক আগ্রহ মনে উদ্ভিত হয়েছিল বলেই যে, এই সম্মেলন ডাকা হয়েছিল তা নয়—বরং এই সব কথাই শুদ্ধি দিয়ে নোংরা বাস্তব থেকে মানুষের মনকে অস্ত্র দিকে ঘুরিয়ে দেওয়াই ছিল এই সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্য। ভূমিসংস্কারে প্রগতি কতদূর এগিয়েছিল তা মালুম পাওয়া বাবে নীচের টেবল থেকে।

জমির উর্ধ্বসীমালঙ্ঘনিত উদ্বৃত্ত বটনে ১৯৭৫-৭৬-এর প্রগতি

জুন	ডিসেম্বর	মার্চ	জুলাই	জুন
১৯৭৫-এর	১৯৭৫-এর	১৯৭৬-এর	১৯৭৬-এর	১৯৭৬-এর
হিসাব	হিসাব	হিসাব	হিসাব	হিসাব
১৯৭১-৭২-এর	৩৮০০০০	৩৮০০০০	৩৮০০০০	৩৮০০০০
আইনে উদ্বৃত্ত				
উদ্বৃত্ত ঘোষিত	৩০০০০	৫৪১৫২৩	৬৫০০০	২০০০০০
দখল নেওয়া	১৩০০০	৩১০০০	৩২৩০০	১০০০০০
বিলি করা	৩২০০০	২০০০০	১৩৬০০০	১০০০০০
বিলির শতাংশ				
উদ্বৃত্ত জমি	১.০%	২.০%	৩.৬%	১৮.৪%

আরও ১৯৭৫: ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১ জানুয়ারি ১৯৭৬; মার্চ ১৯৭৬; টেটসম্যান ৪ এপ্রিল ১৯৭৬; জগজীবন রাম নিউ হরাইজন্স ইন কুরাল ইণ্ডিয়া; সোশালিস্ট ইণ্ডিয়া ১৫ আগস্ট ১৯৭৬; জুন ১৯৭৬; ডি. এ. ভি. পি-র বিজ্ঞাপন।

উপরের টেবল থেকে পরিষ্কার যে, মার্চ ১৯৭৭ পর্যন্ত উদ্বৃত্ত জমি বিলির অবস্থায় কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসেনি। তবে মার্চ ১৯৭৬ এবং জুন ১৯৭৬-এর মধ্যে অন্তত কার্গজ পত্রের হিসাবে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। সে ক্ষেত্রেও বটনিত উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ ছিল মোট প্রাপ্য উদ্বৃত্ত জমির ১৮.৪% (তার মধ্যে কতটুকু চাষীদের হস্তান্তর করা হয়েছিল কে জানে) ঘোষিত উদ্বৃত্তের পরিমাণও ছিল আশ্চর্য রকমভাবে কম—মাত্র ৫২%। জুন ১৯৭৬ নাগাদ ১০০% উদ্বৃত্ত জমি বিলি সম্পূর্ণ হবে বলে শ্রীমতী গান্ধি এবং মুখ্যমন্ত্রীরা যে শপথ নিয়েছিলেন তার-নিষিধে এই পরিমাণ শোচনীয়।

কিন্তু এই নীচ সংখ্যাগুলোও সন্দেহজনক, খুব সম্ভব কৃষি-মন্ত্রকের দ্বারা এগুলিকে কীপানো হয়েছে। খুবই রহস্যজনক যে, মার্চ ১৯৭৬-এ মুখ্যমন্ত্রীদের সামনে শ্রীমতী গান্ধি স্বীকৃতি অহুগামী 'জরুরী অবস্থার সাধারণ সুর' বখন

পড়ন্ত তখন জমি বিলির কর্মসূচ্যপত্রের এত ভাটা পড়ে গেল। এই সংখ্যার সন্দেহজনকতার একটা প্রমাণ এই যে, সরকারী প্রচার কার্ভে বিভিন্ন দপ্তরগুলি বিভিন্ন সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহার করেছে। ডাইরেক্টর অফ অডিও ভিসুয়াল পাবলিসিটি—সংখ্যাতত্ত্ব বোর্ডার ব্যাপারে যাদের খুব সুনাম নেই—বলেছে যে, ২০ দফা কর্মসূচীতে ১৬৬৭০০০ একর জমি উদ্বৃত্ত ঘোষিত হয়েছে, ৪২৪০০০ একর দখল করা হয়েছে এবং ১৮০০০০ একর বটনিত হয়েছে। তার মানে হল প্রাপ্য উদ্বৃত্তের মাত্র ৪.৭% বিলি হয়েছে বখন ঘোষিত উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল মোট ৩৮ লক্ষ একরের ৪৪%। মার্চ ১৯৭৬-এ ৩.৬% থেকে জুন ১৯৭৬-এর শেষে ৪.৭%-এ বৃদ্ধি ৩.৬% থেকে ১৮.৪%-এ বৃদ্ধির চেয়ে অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য, কারণ জুন ১৯৭৫ থেকে ডিসেম্বর ১৯৭৫ পর্যন্ত বখন 'জরুরী অবস্থার' খুব রব-রবা তখন বৃদ্ধির হার ছিল ১০০% থেকে ২.৪%। অস্ত্র সরকারী শাখা থেকে বলা হয়েছে যে, জুন ১৯৭৬-এর শেষ দখল নেওয়া এলাকার পরিমাণ উদ্বৃত্ত ঘোষিত পরিমাণের ২৫.৮৪%। এর সংগে ডি এ ভি পি-র সংখ্যার মিল আছে কিন্তু জগজীবন রামের ৩৬% এর সংগে মিল নেই। তাছাড়া কেবল কৃষিমন্ত্রক ছাড়া আর সবাই ভূমিসংস্কারের প্রসঙ্গে কবর দিয়েছেন মনে হয়। সম্প্রতি শ্রীমতীর সভানেত্রীয়ে প্রাণি কমিশনের এক সভায় সমস্ত ব্যাপারকে কয়েকটি বাক্যে বরাখাস্ত করা হয়েছে। ভূমিসংস্কার উপদেষ্টা বলেছেন যে, তামিলনাড়ু ছাড়া আর কোন রাজ্যেই ভূমিসংস্কারকে কার্ভকর করা হয় নি। কংগ্রেস সভাপতিকে বখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তার দলের কত জন সদস্য জমির পরিমাণ ঘোষণার ব্যাপারে তার নির্দেশকে মান্য করেছে—তখন হয় তার জিন্তে পক্ষাঘাত হয়েছিল, নয় তিনি নেশাগ্রস্ত হয়েছিলেন।

এই ভাবে ভূমিসংস্কারের যে চকানিন্দা হল, সন্দেহজনক সরকারী সংখ্যা-তত্ত্ব মেনে নিলেও দেখা যায় কার্ভে পরিণত জমি বিলির পরিমাণ প্রাপ্য উদ্বৃত্তের ১৮.৪% কিন্তু বলা হয়েছিল যে, ৩০ জুন ১৯৭৬ নাগাদ তার পরিমাণ ১০০%।

এই ১৮.৪% কারা পেলে? প্রাপকদের নামটিকানা জানানোর ব্যাপারে সরকারী কর্তারা যে সহজে মুখ খোলে না তার ভূমিসংগত হেতু আছে।

এ বছরের গোড়ায় শ্রীমতী গান্ধি তার নির্বাচনকেন্দ্রে 'পদযাত্রার' গিয়েছিলেন। জনসাধারণের সংগে তার কথোপকথনের যে বিবরণ ধরনের কাগজে বেরিয়েছে তার বেশীর ভাগ অসম। তবু একটা তাৎপর্যপূর্ণ দফা এই কীকে চুকে পড়েছিল। একজন ডাকবুকো লোককে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সমস্ত কি?' সে বলল, 'কিছুদিন আগে তাকে বিলি করা জমি সরকারী কর্তারা কি কারণে জানা নেই কেড়ে নিয়েছে।' শ্রীমতী গান্ধির বৃগা-স্তকারী মন্তব্য, 'তাহলে তো সত্যি তোমার কষ্ট।' এইজন্তই জমি বিলি সখ্যে শ্রীমতী গান্ধির সরকার কোন নির্দিষ্ট তথ্য প্রচার করে না। সত্য ঘটনা হয় তো কোন ভংগুর ব্যক্তি উদঘাটন করতে পারে।

তবে একথা ঠিক যে, ভূমিহীন বা 'হরিজনদের' মধ্যে এই ১৮.৪% উদ্বৃত্ত জমির খুব বেশী বিলি করা হয়নি। এপ্রিল ১৯৭৬-এ কৃষিমন্ত্রী শ্রী আম্রাসাহেব সিন্ধে সংসদকে জানান যে, যেহেতু তফসীলভুক্ত জাতির কমিশনার হরিজনদের মধ্যে জমি বিলির কোন নির্দেশনামা তৈরি করেননি অতএব এই উদ্বৃত্ত জমি 'সাধারণ'দের মধ্যেই বিলি করা হবে। পরে আগষ্ট মাসে জগজীবন রাম সংসদসভার প্রধানের জানান যে, এক তৃতীয়াংশ জমি তফসীলভুক্ত শ্রেণীর জন্ত রাখা হয়েছে।

ভূমিসংস্কারের আর যে সব ব্যবস্থার বাগাড়ম্বর করা হয়েছিল সে সব বিশ্ব-জিন্তে তলিয়ে গেছে। চুক্তিবদ্ধ মজুরদের সম্বন্ধে পাশ করা আইন অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে কারণ ১৯৩৫ সনে ব্রিটিশ সরকার অহরূপ এক আইন পাশ করেন। আবার ১৯৫০ সনে চুক্তিবদ্ধ মজুরির বিলুপ্তি সংবিধানের ২৩ ধারার অঙ্গীকৃত করা হয়েছিল। শ্রীমতী আবার এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন এবং উক্ত আইন পাশ করিয়েছেন। ভারত আবিষ্কারের দীর্ঘ ১২ মাস বাদে শ্রীমতী গান্ধির সরকার চুক্তিবদ্ধ মজুরদের মাত্র ৭৫০০ কে খুঁজে পেয়ে ৫৬০০ কে মুক্ত করে মুক্তদের মধ্যে মাত্র ৩০০০ কে পুনর্বাসিত করেছেন। জাতীয় মনুনা সমীক্ষা (২৭ তম চক্র) অহুগারে চুক্তিবদ্ধ মজুরের সংখ্যা ৫০ লক্ষ।

গ্রামাঞ্চলে ঋণ মজুরের ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধি তার বেতার ভাষণে পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, কেবল ব্যবসায়িক মহাজনদের ঋণই মজুর করা হবে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণসীমাকা থেকে জানা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে প্রদত্ত ঋণের মাত্র ১৩% ব্যবসায়িক মহাজনদের দেওয়া। ৫.০% এরও বেশী ঋণ দেয় ধনী কৃষকরা যারা চিরকাল গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের বড় সহায় এবং তার কারণ বোঝাও কঠিন নয়।

গ্রামের গরীব মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিজ্ঞাতী রূপে নিজেই নিজের ঢাক পিটিয়ে শ্রীমতী গান্ধি ছোট এবং গরিব চাষীদের জন্ত যে 'বিশেষ' পরিকল্পনা করেছিলেন (শেয়ার ১৭শ পৃষ্ঠা)

কৈচো খুঁড়তে সাপ

পরেণ ধর

কৈচো খুঁড়তে সাপ
আরে বাপ রে বাপ।
কে জানত লোকগুলো এমন
নেমকহারাম জাত,
বাগে পেয়ে আমার এখন
নিচ্ছে যে এক হাত।

দেশের সেবাতাই
জীবন কাটলাম
ভাল করাই পাপ
এখন যে বুঝলাম।
দেশ বাঁচাতে গিয়ে আমি
হচ্ছি কুপোকাৎ,
ইলেকশানের ডাকটা হল
কৈচো খুঁড়তে সাপ,
আরে বাপ রে বাপ।

গণতন্ত্রের ভিত
করতে অনিশ্চিত
আর যাতে হয় মোদের দেশে
সমাজবাদের জিত,
শত্রুতানদের মিসায় ধরে
তাইত ভরি জেল
ভারতবাসী বুঝলোই না
প্রগতির এই খেল।
কাজেই ইলেকশানটা হয়,
কৈচো খুঁড়তে সাপ,
আরে বাপ রে বাপ,
সবাই মিলে আমার এখন
দিচ্ছে অভিশাপ।

দেশটা বাঁচাতেই
শক্ত হতে হয়
প্রতিক্রিয়ার হাত
আনতো বিপর্যয়।

এমার্জেন্সী ছিল বলেই
কমছিল সব দর,
একটুখানি আলগা দিতেই
বাড়ছে যে চচ্চড়।
ব্যক্তি স্বাধীনতার কি আর
পেটটা ভরে ভাই?
ইচ্ছে ছিল এই কথাটা
সকলকে বোঝাই,
তাইত ইলেকশান ডেকেছি
কিন্তু হায় হায়
কৈচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে
আমাকে কামড়ায়,
আমি গেলে দেশটা হবে
কাহার ভরসায়?

ওঁকে বেহায়া বলা যাবে না

অশোক মিত্র

ভাষার ব্যবহার বড়ো গোলমালে ব্যাপার। সাধারণ কথাবার্তার আমরা প্রায়ই বলি, চোখের চামড়া নেই। লক্ষ্যহীন হয়তো বলা যায়, কিন্তু সেটা বড়ো পোশাকি পোশাকি। চোখের চামড়া নেই-তে তৎসম উচ্ছৃঙ্খলতা নেই, খাঁটি বাংলা, বাঙালি নিম্নাবাদ, আমরা বারং বারং ভাষার দিক থেকে যেমন প্রকাশের অস্পষ্টতা নেই, অল্পপক্ষে যিনি উদ্ভিষ্ট তিনিও মালুম ক'রে নিলেন আমরা কী বলতে চাইছি, যে বিশেষণে তাঁকে ভূষিত করা হলো, সেটা তিনি মাহন না-মাহন।

অথচ ইদানীং মুক্তি দেখা দিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে সবাইকে—অর্থাৎ আমাদের বিবেচনার দ্বারা কিনা বেহায়ায় মতো কাজ করে থাকেন, তাঁদের সবাইকে—লক্ষ্য করে আর বোধহয় বলা চলবে না চোখের চামড়া পর্যন্ত নেই। যেমন আমাদের দেশে নতুন নিধান হয়েছে প্রধান মন্ত্রীর ‘পদমর্যাদা’কে সর্বদা মাস্ত করতে হবে, না করলেই একুশে আইন। ব্যক্তি এবং সেই ব্যক্তি কর্তৃক অধিষ্ঠিত পদের মধ্যবর্তী ব্যবধানটির দৈর্ঘ্য অল্পমান করা তেমন সহজ নয়। আমরা হয়তো প্রধান মন্ত্রীর কোনো ব্যক্তিগত ক্রিয়াকর্ম আচরণের সমালোচনা করছি, কিন্তু তিনি স্বয়ং কিংবা তাঁর কোনো চেলাচামুণ্ডা উট্টা বুঝি রাম হয়ে ধরে নিলেন প্রধান মন্ত্রীর ‘পদমর্যাদা’র উপরে কটাক্ষ আরোপ করা হচ্ছে, আর যার কোথায় সঙ্গে সঙ্গে হয়তো আমাদের আপনাকে শুলে চড়বার ব্যবস্থা করা হলো।

অতএব মুক্তি দেখা দিয়েছে। যেমন ধরুন কয়েক সপ্তাহ আগে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান মন্ত্রী এসেছিলেন, তিনি আবার বিশ্বভারতীর আচার্য্য বটেন।

প্রধানমন্ত্রী একটু আবেগপ্রাণিত বক্তৃতা দিলেন অনেক ভালো ভালো কথা ঠালা বক্তৃতা। সমবেত স্বামীশ্রী ছাত্রছাত্রী পুলিশ গোয়েন্দা দাঙ্গা মন্ত্রী তদন্তমন হয়ে শুনলেন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ধারার আমাদের প্রতিদিন অবগাহন করা কর্তব্য, আমাদের চেতনার রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা যেন আঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে, এমন ধারা নানা বাণীতে ছাতিমতলা গমগম করে উঠলো।

ভালো ভালো কথা সব, শুনলে কেমন উদাস উদাস হয়ে যেতে হয়। প্রধান মন্ত্রী আরো যোগ করলেন, রবীন্দ্রনাথের সেই প্রার্থনার কবিতাটি, সেই যে গো, ‘চিন্তা বেধা ভয়শূন্য উচ্চ বেধা শির’, তাঁর প্রিয়তম, এমন কি তাঁর এক একবার মনে হয়েছে, ‘জনগণমন অধিনায়ক’ ভালো কিন্তু ‘চিন্তা বেধা ভয়শূন্য’ বেন আরো ভালো। এটাকেই হুঁরে বসিয়ে আমাদের জাতীয় সংগীত করে দিলে মন্দ হতো না। আমাদের ছেলেরা মেয়েরা ঘুরে ফিরে এই কবিতাটি বেন বার বার আবৃত্তি করে। এই কবিতাটির আদর্শে তারা বেন প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত হয়। এই কবিতা যেন তাদের চেতনার ধমনীতে মিশে যায়।

শোন সাধুর উক্তি কিসে মুক্তি সেই স্বমুক্তি কর গ্রহণ। এখানেই মুক্তি হয়েছে। দেড় বছর হয়েছে কি হয়নি। প্রধান মন্ত্রী ‘আপংকালীন অবস্থা’ ঘোষণা করলেন। শাসন পর্ব শুরু হলো। রবীন্দ্রনাথও শাসিত হলেন। কোনো বিশেষবিশেষ রবীন্দ্রসংগীত আকাশবাণীতে গাওয়া বারণ হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো কবিতাও সেই সঙ্গে পত্র পত্রিকায় ছাপানো নিষিদ্ধ হলো। এই সব গান গাওয়া হলে ছেলেরা মেয়েরা এই সব কবিতা পাঠ

করলে এখানে ওখানে বিদ্রোহী বিদ্রোহী ভাব আগতে পারে। ‘আপংকালীন অবস্থা’র শাসন শাস্তি বিদ্রিত হতে পারে। হুতরাং রবীন্দ্রনাথের গান বন্ধ করা হলো। শুধু করা হলো রবীন্দ্রনাথের কবিতার বাগাড়ম্বর, মানে প্রধানমন্ত্রীই করলেন। অল্প অনেক রবীন্দ্রনাথের গান কবিতার সঙ্গে ‘চিন্তা বেধা ভয়শূন্য উচ্চ বেধা শির’-ও জবাই হলো। ওসব প্রার্থনা টারনা বড়ো বিপজ্জনক জিনিস। সাধারণ লোকে কী থেকে কী মানে করে ফেলে, দরকার কী। হুতরাং প্রধানমন্ত্রীর কর্মচারীরা রাষ্ট্রদ্রোহ বলে ‘চিন্তা বেধা ভয়শূন্য উচ্চ বেধা শির’-এর সর্বত্র শিরশ্ছেদন করলেন।

সেই প্রধান মন্ত্রীই এবার শান্তিনিকেতনে এমন ভাব-বিস্মল বক্তৃতা দিয়ে গেলেন, এমন প্রার্থনার কবিতা আর হয় না, আচ্ছা ছেলেরা-মেয়েরা পড়ুক, বার বার করে পড়ুক, তাদের চেতনার ধমনীর সঙ্গে এর বাণী মিশে যাক। কিন্তু তাহলে কী হয়, মুক্তি হয়েছে প্রধান মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তো বলা যাবে না। চোখের চামড়া পর্যন্ত নেই, বলা যাবে না বেহায়া বেহায়া। ব্যক্তি এবং পদের দ্বন্দ্ববোধিত সমস্তা আছে কিনা—আর আছে একুশে আইন।

কিন্তু অল্প দ্বারা আছেন, তাদের সম্বন্ধে তো অন্তত সেরকম কোনো বাধা নেই। সেই দ্বারা প্রধান মন্ত্রীকে এখনো বিশ্বভারতীর আচার্য্যপদে বহাল রেখেছেন। সেই প্রধান মন্ত্রীকে, যিনি রবীন্দ্রনাথের রচনা পত্রপত্রিকায় প্রকাশ নিষেধ করে দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের গান দ্বারা কতোয় ‘আকাশবাণীতে’ গীত হতে পারছিল না। সেই কপট রবীন্দ্র ভক্তরা, দ্বারা এসব সম্বন্ধে, প্রধানমন্ত্রীর আশেপাশে ছাড়িয়ে হাত কচলাচ্ছেন, প্রধান মন্ত্রীর দ্বন্দ্ব প্রসাদকণা ছড়িয়ে দ্বাদের দিন কাটছে। তাঁদের তো বিস্ময় বাংলা ভাষায় গাল পাড়তে কোনো বাধা নেই? কী বলবো তাঁদের চোখের চামড়া নেই। দু'কান কাটা, না কি আরো ভয়ংকর কিছু?

নাসবন্দী ও হরিয়ানার একটি গ্রামের কাহিনী

হরিয়ানার পরিবার পরিকল্পনা কার্যকর করতে গিয়ে কংগ্রেস সরকার অনেক বীভৎস ঘটনার জন্ম দিচ্ছেন এ খবর নানা স্তর থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। দ্বিতীয় পক্ষিমে প্রায় ৪০ কিলো-মিটার দূরে এটি অব্যাত গ্রাম পিপলিতে ভিসেস্বরের প্রথম সপ্তাহে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটেছে। তাতে এই গ্রামটি বিখ্যাত হয়ে যাবার সম্ভাবনা। হরিয়ানার গ্রামাঞ্চলে চাবীদের ধারণা যে, পরিবার পরিকল্পনা শিবির হলে সকলকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্বাককরণ করে দেওয়া হবে।

৩০ শে নভেম্বর মাজরি গ্রামের বি ডি ও কয়েকজন ডাক্তার, নার্স ও পুলিশ নিয়ে পিপলি গ্রামে আসেন। তারা গ্রামের মোড়লকে বলেন যে এখান থেকে অল্পত দশটি কেস চাই। মোড়ল এদের সঙ্গে সহযোগিতার চেষ্টা করলেও ১লা ডিসেম্বর ছপুর পর্যন্ত কেস দিতে পারে না। ইতিমধ্যে বি ডি ও দেখেন যে, বছর তিরিশেক বয়েসের এক যুবক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তাকে ডেকে পাকা বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে একটা কাগজে সেই বা টিপ ছাপ দিতে বলেন যাতে ডাক্তাররা তাদের মত কাজ সমাধা করতে পারেন। যুবকটি ভড়কে গিয়ে বলে, “আমি গ্রামের পালোয়ান বলে গ্রামবাসীরা আমার ভরণ পোষণ চালায়। অতএব গ্রামের লোকদের সঙ্গে পরামর্শ না করে আমি হ্যাঁ না কিছু বলতে পারব না।”

যুবকটির বোন সেই সময়ে ঐ পাকাবাড়ি অর্থাৎ পরিবার পরিকল্পনা শিবিরের কাছে ঘটনা চক্ষে এসে পড়ে এবং উপস্থিত কৌতুহলীদের প্রশ্ন করে “এখানে কি ব্যাপার।” তারা বলে যে, এটা নাসবন্দী শিবির এবং এখানে তার ভাইকে বি ডি ও আটকে রেখেছে। মেয়েটি তখন বি ডি

ও-র কাছে যায় এবং বলে তার ভাই পরিবারের একমাত্র পুরুষ, সেই জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক। বি ডি ও বলে, এ ব্যাপারে তার নাক গলাবার কোন দরকার নেই। তার ভাইয়ের নিজের স্বার্থ দেখার মত বয়েস হয়েছে। তাকে চলে যেতে বলা হয়। কিন্তু সে চলে যায় না এবং ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে।

ইতিমধ্যে বি ডি ও জানতে পারে যে, ওরা সিমার (সজ্জি বিক্রয়) বাদের ঐ অঞ্চলে নীচু শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করা হয়। কি করে বি ডি ও একজন নীচ বর্ণের জীলোকের জিজ্ঞাসাবাদ সহ্য করতে পারেন? যখন দেখলেন জীলোকটি অল্প তখন তিনি তার গালে একটা চড় কবলেন। জীলোকটি তখন তার হাতের কাছে দিয়ে বি ডি ওকে সজোরে হবার আঘাত করে এর বদলা নেয়। বি ডি ও-র অনেকখানি রক্ত ঝরে এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। পুলিশ তা দেখে সিমারি অর্থাৎ জীলোকটির ওপর কাঁপিয়ে পড়ে তাকে লাঠি দিয়ে পেটায়। জীলোকটি অজ্ঞান হয়ে যায়।

গ্রামের লোক জমতে থাকে। এক ব্যক্তি ক্যাম্পের ভেতরে গিয়ে যুবকটিকে খবর দেয় তার বোনকে বি ডি ও এবং পুলিশ মেরেছে। যুবকটি তখন সাব-ইন্সপেক্টরের বাড়ি ধরে তাকে কাছাকাছি একটি টিউবওয়েলের কাছে নিয়ে গিয়ে তার মাথা জলে চোবায় এবং চীৎকার করে, “কোন সাহসে আমার বোনের গায়ে হাত দাও। সে শুধু আমার ইচ্ছা নয়, আমার গ্রামেরও ইচ্ছা। আমি যদি আমার গ্রামের ইচ্ছা না বাঁচাতে পারি তাহলে আমার বাঁচবার কোন অধিকার নেই। আমি যতদূর জীবিত ততদূর তোমায় নিঃশ্বাস নিতে দেব না।” সাব-ইন্সপেক্টর,

এত কর্তমাক্ত জল খেতে বাধ্য হয়েছিল যে সেও অজ্ঞান হয়ে গেল।

পুলিশ ও গ্রামের কৃষকরা উভয়েই নিরাহীন। পুলিশ তাদের হেড কোয়ার্টার রোটাকে খবর দিতে ব্যস্ত আর গ্রামবাসীরা তাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলিকে। গ্রামের লোকেরা ঢোলের শব্দে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। পুলিশ ও ডাক্তারদের হাত থেকে তাদের ভাইদের বাঁচাবার ভাব পড়েছে। কৃষকরা বিভিন্ন যানবাহনে চড়ে তাদের গন্তব্যস্থলে এগিয়ে চলে ২২ ডিসেম্বর। সকালে ২৬টি জীপ ও ভ্যান ৮০০ পুলিশ আশেপাশের গ্রামবাসীদের আসার আগেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং গ্রাম ঘিরে ফেলে।

গোপালপুর গ্রাম পিপলির সবচেয়ে কাছে। অতএব গোপালপুরের কৃষকরা সবচেয়ে আগে পিপলি পৌঁছয়। তারা অত পুলিশ দেখে অবাক হয়। কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র জগমোহন এস ডি এমের কাছে গিয়ে বলে, কলেজের মন্ত্রীরা অবরুদ্ধি নির্ভাবকরণের বিরোধী। এস ডি এমের মুক্তি দিয়ে বোরাবার মেজাজ ছিল না। পরিবর্তে তিনি গুলী চালাবার আদেশ দেন। জগমোহন ও পালোয়ানকে সোজা হুজি গুলী করা হয়। গ্রামবাসীরা বাড়ির ছাদ, ঘরের মধ্যে থেকে সব দেখছিল। একজন কৃষক দেখল একজন পুলিশ জনতার দিকে তাক করে গুলী চালাচ্ছে, যদিও অধিকাংশ পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য ওপরদিকে গুলী ছুঁড়ছিল। কৃষকটি সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে সেই পুলিশটাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। গ্রামবাসীরা পুলিশ বাহিনীকে প্রায় ঘিরে ধরে। কিছুক্ষণ ধরে তাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়।

হতাবতই এই ঘটনা কৃষকদের প্রায় ওপর চাপ হুজি করে এবং তারা আত্মনির্যাসের অধিপন্যায় সম্মুখীন হয়। (শেবাংশ ১৫শ পৃষ্ঠায়)

সংবিধান ও বিস্মৃত প্রতিশ্রুতি

রঞ্জিত রায়

[ভারতের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংকট যত তীব্র হচ্ছে তত বেশি কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তার বুলি আওড়াচ্ছেন। ১৯৬৭-র পর কেন্দ্রীয় সরকার বহুক্ষেপে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে চলেছে। রাজ্যগুলির ক্ষমতা ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। সংবিধানের সর্বশেষ (৪২-তম) সংশোধনের কালে রাজ্যের হাতে কোন ক্ষমতাই বাকি রইল না বলা চলে। সচেষ্ট সঙ্কল্পে সব ক্ষমতা প্রধান মন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ একনায়কত্বের ভিত্তি তৈরী হয়েছে।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে বর্তমান প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় তদানীন্তন কংগ্রেস-ওয়ার্মিং কমিটির নির্বাচিত সদস্য চন্দ্রশেখর কতৃক সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্র Young Indian-এর ১৯৭১-এর বাৎসরিক সংখ্যায়।। পাঠটিকা মারফৎ অধিক তথ্যসহ প্রবন্ধটি রঞ্জিতবাবুর “দি অ্যাগনি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল” নামক পুস্তকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে সন্নিবেশিত হয়। বাংলার লিখিত “স্বদেশের পক্ষে পশ্চিম-বঙ্গ” নামক পুস্তকেও প্রবন্ধটি স্থান পেয়েছে। পুস্তকটি এখন প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। বর্তমানের কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের উপর তরুণ ব্রিটনের পরিপ্রেক্ষিতে ছ বৎসর পূর্বে লেখা হলোও প্রবন্ধটির গুরুত্ব সমধিক বলে মনে করি। কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি কী ছিল এবং কেমন করে সংবিধান রচনার সময় এবং তারপর এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কংগ্রেস দেশে এক-কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ নিয়েছে, প্রবন্ধটিতে তথ্যসহ তার বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে।—সম্পাদক]

“বিভিন্ন অঞ্চলের স্বৈরাচারপ্রণোদিত সংযুক্তির দ্বারাই পণ্ডিত হয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলকে পরীক্ষিত স্বাধীনতা প্রদানের উদ্দেশ্যে সমস্ত এলাকার প্রয়োজ্য সাধারণ তথ্য প্রয়োজনীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহের ন্যূনতম তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়া, বিভিন্ন অঞ্চলের ইচ্ছাধারী গ্রহণযোগ্য সাধারণ বিষয় সমূহের অপর একটি তালিকাও প্রণয়ন করতে হবে।”

এই নীতি কে নির্ধারণ করেছিলেন সে কথা খুব কম কংগ্রেসসেবীরই আদ্য জানা আছে। কংগ্রেস দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গসহ কংগ্রেসসেবীদের থাকে থাকে আমি এই নীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছি তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই সমালোচনার যুগল হয়ে উঠেছেন। তাঁদের ধারণা, এমন কেউ এটি রচনা করেছিলেন যিনি ভারতকে একাবদ্ধ শক্তিশালী দেশ হিসাবে দেখতে চান নি। তাঁরা বিশ্বাসই করতে পারেন না যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাত্র দেড় বৎসর পূর্বে তাঁদেরই নেতৃবর্গ কতৃক এই প্রস্তাবটি রচিত হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে অল্পকিছু নির্বাচনে ঘোষিত যে কর্মসূচি নিয়ে কংগ্রেস লড়েছিল উদ্ভৃতিটি হল তারই অংশ বিশেষ। ১ ওই নির্বাচনের উপরে ভিত্তি করেই ১৯৪৬ সালে সংবিধান সভা গঠিত হয় এবং সেই সভা কতৃক রচিত সংবিধান অল্পসংখ্যকই ১৯৫০ সাল থেকে আমাদের দেশ শাসিত হচ্ছে।

কিংবা, এই অল্পকিছুটির কথাই ধরা যাক : “হুনিশিত ভাবে গঠিত কোন অঞ্চলের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারের প্রশংসা উপাধান করা হয়ে থাকে। তার সমর্থনে সোভিয়েত ইউনিয়নের নজির উল্লেখ করা হয়। ...[ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে] বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার প্রয়োগের পূর্বে ভারতকে হতে হবে হসংগঠিত, স্বাধীন একটি দেশ। বাইরের প্রভাব এবং আভ্যন্তরীণ আবেগ প্রবণতা যখন থাকবে না এবং বাস্তব সমস্তা এলে নীড়াবে দেশের সমুদ্রে তখনই এই ধরনের প্রশ্নের বিচার করা যেতে পারে বাস্তবোচিত, নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে। কারণ,

আভ্যন্তরীণ আবেগ প্রবণতা দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যেতে পারে আমাদের। সকলকেই হয়ত পরবর্তীকালে অস্বস্তি করতে হতে পারে। এ ব্যাপারে একটা সময় সীমা নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। স্বাধীনতার ষষ্ঠ বৎসর পরে উপযুক্ত সংবিধান সম্বন্ধে নিয়ম অল্পসংখ্যক এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের হৃদয় মতাহসারে [ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে] বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার প্রয়োগ করা যেতে পারে।”

১৯৪২ সালে তদানীন্তন অবিভক্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিও মোটামুটি একই মর্মে একটি নীতি গ্রহণ করেছিল। ২ তবে উপযুক্ত সিদ্ধান্তের জন্য সি. পি. আই. দায়ী নয়। স্বয়ং জওহরলাল নেহরু এটি লিখে গেছেন তাঁর দি ডিসক-ভারী অফ ইণ্ডিয়া গ্রন্থে। ৩ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আহ-মেদনগর দুর্গকারার নির্জনতার মধ্যে বসে তিনি এটি রচনা করেন। পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের কাছে প্রেরণ করার আগে কংগ্রেস ওয়ার্মিং কমিটির সমস্ত সদস্যের সংগে পরামর্শ করারও সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। তাঁরা পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করেছিলেন। নেহরু নিজেই ওই গ্রন্থের এক-স্থানে লিখেছেন, “বস্তুতঃ কংগ্রেসও এর-সংগে একমত হয়েছিল।”

১৯৪৬ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্বন্ধে যখন আর কোন সন্দেহ রইল না, রইল কেবল সময়ের ব্যাপার, তখনই কংগ্রেস নেতারা ভীতিভঞ্জন তাঁদের ভোল পাটে ফেললেন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটনের আত্মস্বাধীন ভারতীয় উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারদের অল্পতম ছিলেন বড়লাটের-রিকর্মস্ কমিশনার ডি. পি. মেনন। উক্ত পদে তিনি ওয়াশিংটন এবং মাউন্টব্যাটেনের অধীনেও কাজ করেন। ওয়াশিংটন কংগ্রেসের কাছে হয়ে পড়েছিলেন অস্ব-স্থিত ব্যক্তি। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতিসমূহ প্রয়োগের ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেন ছিলেন সব চাইতে বিচক্ষণ শাসক। তাই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মন তো তিনি জয় করেছিলেন, এমন কি ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে দেশ বিভাগের সময় মনে হয় যেন তিনিই ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য জাতীয় নেতা। গান্ধী পূর্বস্তু পড়ে গিয়েছিলেন নেপথ্যে।

মাউন্টব্যাটেন ভারতে আসেন ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে। তার অনেক আগেই বঙ্গভঙ্গই প্যাটেলের সহ-যোগিতায় ডি. পি. মেনন ভারত বিভাগ এবং পূর্ণ স্বায়ত-শাসনাধিকার অর্থাৎ ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে বিশেষ একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন। ব্রিটিশরাও ঠিক এই ভিত্তিটাই চাইছিল। দি ট্রান্সফার অফ পাওয়ার গ্রন্থে মেনন লিখেছেন, “১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে অথবা ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে” প্যাটেলের সংগে তাঁর আলোচনা হয়েছিল। “আমি বলেছিলাম, ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পিত অবিভক্ত ভারত হল একটা মারা। সব চাইতে কঠিন সমস্তা হল কোন ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। বিভক্ত ভারতে স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে গঠিত দুটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার উপরেই আমি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম।” প্যাটেল সংগে সংগেই প্রস্তাবটি মেনে নিয়েছিলেন। মেননও অবিলম্বে লণ্ডনে প্রভুদের সেই সংবাদ জানিয়ে দিয়েছিলেন। প্যাটেলের সমুদেই তিনি উক্ত আলোচনা সম্বন্ধে একটি মোট-প্রস্তাব করেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, সেই মোট, “পরে আমি বিশেষ দূত মারফত সেক্রেটারী অফ স্টেটকে দেবার জন্য লণ্ডনে প্রেরণ করি।” ৪ এই ভাবে মাউন্ট-ব্যাটেন দিল্লীতে পৌঁছানোর আগেই ভারতে তাঁর পথ মণ্ডল করে রাখা হয়েছিল। এই ধরনের একটি অতীব গুরুত্ব-

পূর্ণ বিষয়ে সম্মতি প্রদানের পূর্বে প্যাটেল কারো-সংগে পরামর্শ করেছিলেন এমন কোন লিখিত প্রমাণ নেই—অন্ততঃ অভাবমিহীন এমন কোন প্রমাণ প্রকাশিত হয় নি। গান্ধীর সংগে তিনি পরামর্শ করেননি বিশ্বাস করা কঠিন। তিনি নিশ্চয়ই জানতেন, গান্ধীর সাহায্য ছাড়া এই ধরনের একটি পরিকল্পনা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে দিয়ে গ্রহণ করানো যাবে না। বাস্তবে ঘটেছিলও তাই। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে অল্পকিছু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গান্ধীর সমর্থনের কারণেই কংগ্রেস ভারত বিভাগের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। ৫

নেহরুকে ব্যাপারটি জানানো হয়েছিল অনেক পরে। ৬ মাউন্টব্যাটেনের “প্রচণ্ড আকর্ষণ শক্তিতে” অভিভূত হয়ে নেহরু পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন। ৭ বস্তুতঃ ওই “আকর্ষণ শক্তি” এতই তীব্র ছিল যে, ব্রিটনের সংগে “সার্বজনীন নাগরিকত্বের” কথাটা নিয়েও কিছুদিন ভাবনা-চিন্তা করে-ছিলেন তিনি। ৮ প্যাটেল ডি. পি. মেননের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন কারণ “এই পরিকল্পনায় কংগ্রেস একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার লাভ করবে।” এইভাবেই ব্রিটিশদের তৈরী এবং মেননের পাতা কাঁদে বৃদ্ধ তথা রূপ-রাস্ত কংগ্রেস নেতৃবর্গ পা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সংবিধান রচনার প্রশ্ন যখন এলো তখন তার প্রাথমিক কাজ করার জন্য ডাক পড়ল ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের উচ্চপদস্থ আমলাদের। তাঁদের মধ্যে প্রবীণতম ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের নাইট থেতাধারী বেনেগল নরসিংহ রাও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা ও আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানে লিখিত অলিখিত সর্বোত্তম বা কিছু রয়েছে সেগুলির খোঁজে তিনি ওই সমস্ত দেশে সফরে বেরলেন। নেহরু ছিলেন সমাজতন্ত্রবাদের একজন অত্যন্তসাহসী সমর্থক, যদিও সেই সমাজতন্ত্রের কোন সংজ্ঞা তিনি কোথাও প্রদান করেন নি। রাওকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে গিয়ে তাঁদের সংবিধান পরীক্ষা করে দেখতেও নির্দেশ দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি তিনি।

ভারতে ব্রিটিশ ঐতিহ্য অল্পসংখ্যক “শক্তিশালী” কেন্দ্রীয় সরকারের একান্ত অল্পসংখ্যক থাকার শিক্ষা এই সমস্ত উচ্চ-পদস্থ আমলারা পেয়েছিলেন ব্রিটিশদের কাছ থেকে। সুতরাং, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে কংগ্রেস যে সমস্ত মৌলিক নীতি রচনা করেছিল সেগুলি সম্বন্ধে এঁদের বিন্দু-মাত্র আগ্রহ ছিল না। সংবিধান রচনার কাজ ঘরান্বিত করার অছিলায় ব্রিটিশরা নির্দেশ দিয়েছিল যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অল্পসংখ্যক ভোট দ্বারা সংবিধান রচয়িতাদের নির্বাচিত করতে হবে। এই ভোট গ্রহণ সম্বন্ধে ডি. পি. মেনন প্রশংসাত্মক উক্তি করে লিখেছেন, “ভোটাধিকার ছিল অতীব ব্যাপক। সব কটি প্রদেশের মোট ভোটাধিকার সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ কোটি। ১৯৩১ সালের লোক গণনা অল্পসংখ্যক ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশ-সমূহের মোট জনসংখ্যা ছিল ২৫ কোটি ৬০ লক্ষ। এই-ভাবে, ১১.৫ শতাংশ মানুষ ভোট দানের অধিকার প্রাপ্ত হয়।” সব চাইতে গোড়া সংরক্ষণশীল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদী ব্যক্তিও ব্রিটিশ কতৃক উপনিবেশিক ভারতে প্রবর্তিত অতিশয় সংকুচিত ভোটাধিকারের এমন জয়গান করতে-লক্ষ্য পেত।

মাত্র ১১.৫ শতাংশ মানুষকে ভোটাধিকার প্রদানকারী ব্যবস্থার সমর্থক যে নেহরু ছিলেন না তা হুনিশিতভাবে বলা যেতে পারে। তিনি বিশ্বাসী ছিলেন “সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের” ভোটাধিকারে। বিস্তৃতিভিত্তিক এমন কি শিক্ষাভিত্তিক সীমাবদ্ধ নির্বাচক মণ্ডলীর চাইতে ব্যাপকতম ভিত্তিতে গঠিত নির্বাচক মণ্ডলীর উপর আমি অনেক বেশী বিশ্বাস স্থাপন করতে প্রস্তুত। ৯ সার্বজনীন ভোটাধি-কারের মাধ্যমে নির্বাচিত একটি সংবিধান সভা কতৃক ভারতের সংবিধান রচিত হবে এই মর্মে বহুবৎসর থেকে (শেষাংশ ১৫শ পৃষ্ঠায়)

আমরা কি তবে তলিয়ে যাব

অনন্দাশঙ্কর রায়

জাতীয়ের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর দেখি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন রাজা। সারা পৃথিবী জুড়ে এই ছিল নিয়ম। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে এর কিছু ব্যতিক্রম ঘটত, যেমন প্রাচীন গ্রীসে। কিন্তু সেটাকে কেউ চিরস্থায়ী ব্যবস্থা বলে যেমনে নিত না। রাজতন্ত্রই ছিল সর্বশেষের সমান্তর সংবিধান।

সর্বময় ক্ষমতা কেমন করে রাজশক্তির হাত থেকে প্রজাশক্তির হাতে আসবে এ নিয়ে গত কয়েক শতাব্দীর অগ্রগামী মনীষীরা চিন্তিত ও বিলোহীরা সক্রিয়। যেখানেই তাঁরা সফল হয়েছেন সেখানেই তাঁদের সাক্ষ্যকে পাকা করার জন্তে একটি সংবিধানও প্রণয়ন করা হয়েছে। নয়তো তাঁদের সাক্ষ্য কাঁচা থেকে যেত। সংবিধান কাঁচাকে পাকা করে। ক্ষণস্থায়ীকে চিরস্থায়ী করে। এইখানেই তার মূল্য। নতুবা সংবিধান প্রণয়ন না করেও রাজশক্তির হাত থেকে প্রজাশক্তির হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটানো যায়।

মহাত্মা গান্ধীও ক্ষমতার হস্তান্তরের কথাই ভেবেছিলেন, সংবিধান প্রণয়নের কথা ভাবেন নি। পরে যখন ভাবতে আরম্ভ করেন তখন যে লাইনে ভাবেন তা কংগ্রেস যু মুসলিম লীগকে লীগকে পাকিস্তান ছেড়ে দেবার পর বাকী জ্ঞানের জন্তে সংবিধান রচনার সময় যখন আসে তখন কংগ্রেস সর্বময় ক্ষমতা ভুলে দেয় প্রজাশক্তির হাতে। প্রজারাই তখন থেকে ভারত রাষ্ট্রের সোভারেন। তখন থেকে তারা আর প্রজা নয়, তারা নাগরিক। আমার পাশপোর্টে আগেকার দিনে লেখা ছিল ব্রিটিশ সাবজেক্ট। পরবর্তী কালে লেখা হলো সিটিজেন অব ইন্ডিয়া। প্রত্যেকের বেলা তাই। কেউ কারো চেয়ে কম অধিকারী বা বেশী অধিকারী নয়। প্রত্যেকেরই ভোট আছে, যদি না সে নাবালক হয়, অথবা অন্য কোনো কারণে ভোটদানের অযোগ্য হয়।

আমাদের সংবিধানের প্রথম কথাই হলো আমরা সবাই মিলে ক্ষমতার মালিক কিন্তু রাষ্ট্র তো সবাই মিলে চালাতে পারে না। সেইজন্তে পাঁচ বছর অন্তর অন্তর সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে স্থির হয়ে যায় সরকার গঠন করবে কোন্ দল। যেক্ষেত্রে কোনো একটি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই সেক্ষেত্রে একাধিক দল মিলে সরকার গঠন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে সরকারের পতন হয়। মারামারি কাটাকাটি না করে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটানোর এই হলো সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়। যে ব্যাপার পাকিস্তানে শুধা বাংলাদেশে বার বার ঘটেছে সে ব্যাপার ভারত রাষ্ট্রে একবারও ঘটেনি। অথচ আমরা কত না সম্প্রদায়ের কত না জাতির কত না ভাষা গোষ্ঠীতে কত না আকলিক ভগ্নাংশে বিভক্ত। ভারতের সংবিধান একটা বিস্ময়।

তা হলেও স্বীকার করতে হবে যে এটা একটা রাজনৈতিক সংবিধান। ক্ষমতা নারক অধিকারে স্থানীয়কৃত করা হয়। তা ছাড়া আরো একটি অধিষ্ট আছে। তার নাম ধনসম্পদ। ধনসম্পদ যদি শতকরা দশজনকে মূঠোর মধ্যেই থেকে যায়, বাকী নব্বইজন যদি তাদের দ্বারা বঞ্চিত বা শোষিত হয়, তা হলে প্রজাশক্তির হাতে সর্বময় ক্ষমতা এসেছে বলে বতাই আওরাজ করি না কেন সেটা সেই নব্বইজনের কানে কাঁকা আওয়াজ। সমাজ যেমন শ্রেণীবদ্ধ ছিল তেমনই শ্রেণীবদ্ধ হয়ে গেল। উপরের দিকে যারা ছিল তারাই রয়ে গেল উপরের দিকে। নিচের দিকে যারা ছিল তাদের জায়গা রয়ে গেল নিচের। এই ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করাই কি সংবিধান প্রণেতাদের অভিপ্রায় তাই যদি হয়ে থাকে তবেই শতকরা নব্বই জনের

কাছে এসংবিধান অর্থহীন নয়। একে রক্ষা করার জন্তে তারা কেউ প্রাণ বিসর্জন দেবে না। বরঞ্চ একেই বিসর্জন দেবে। জাতি যদি কিছু হুঁহা হুঁহা হয়। সমাজতন্ত্র হচ্ছে শ্রেণীশূন্য সমাজ। তার জন্তে চাই হুঁদীর্ঘ প্রস্তুতি। মরণের জন্তে প্রস্তুতিও তার অঙ্গ।

রাজনৈতিক সংবিধান যে যথেষ্ট নয় একথা আমিও উপলব্ধি করেছি। সেটা সংবিধান রচনার পূর্ব হতেই। নানা দেশের সংবিধান নাড়াচাড়া করতে করতে দেখি মেক্সিকোর সংবিধানে নাগরিকদের প্রত্যেকের ক্লজ রোজগারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। সোভিয়েট সংবিধানে তো সেটা স্বতঃসিদ্ধ। আমাদের সংবিধানে সে রকম কিছু থাকলে তো ভালোই হয়। এই ছিল আমার তৎকালীন চিন্তা। কিন্তু সংবিধানটা এমনিতেই একথানা অষ্টাদশশতাব্দীর মতো সেটাকে আরো ভারাক্রান্ত করতে নেতারা নারাজ। ও রকম একটা অস্বীকার কার্যত পালন করা কি সহজ কথা? প্রাথমিক শিক্ষার বিধান দিয়েও কি সর্বসাধারণকে সেটুকুও দিতে পারা গেছে? বস্তুত সেটা সে সময় কাজের কথা ছিল না। ঐ যে বলে, প্রথম জিনিসগুলো প্রথমে। আমাদের সংবিধান সেই নীতি অনুসারে সংরচিত।

ইতিমধ্যে বহু পরিবর্তন হয়েছে। এখন আবার আমরা ভাবতে শুরু করেছি যে রাজনৈতিকের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক বিবিধিধানও থাকা উচিত। কেবলমাত্র একটা ভোট ধরিয়ে দিলে কী হবে, যদি না ঘরে ভাত থাকে, পরণে কাপড় না থাকে, মাথা গোঁজবার ঠাই না থাকে, অস্থখ করলে ওষুধ না থাকে, বেকার হলে ভাতা না থাকে বা কাজ না থাকে। আজকালকার দিনে সমাজতন্ত্র বলে নিজেকে ঘোষণা না করেও বহু দেশ সর্বসাধারণের জন্তে ক্লজরোজগারের ব্যবস্থা করেছে। সংবিধানে এমন কোনো বিবিধিধান না রেখেও পার্লামেন্টে আইন পাশ করিয়ে এসব সংসাধিত হয়েছে। ভারতে এসব যদি আজ এখনি হয় আমিই সব চেয়ে আনন্দিত হব। এর জন্তে যদি সংবিধান সংশোধন করতে হয় আমি বলব, আলবৎ। আমার তো মনে হয় না বিচারপতি বা বুদ্ধিজীবী মহল এ বিষয়ে ভিন্নমত হবেন। সরকারের দ্বারা বিরোধীপক্ষ তাঁদের মনে কী আছে জানিনে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তারা বাধা দেবেন না। বাধা দিতে সাহস পাবেন না। ভোটের জন্তে আবার তো সাধারণ নাগরিকের দুয়ারে দুয়ারে যেতে হবে।

কিন্তু সংবিধানটাকে যেভাবে সংশোধন করা হলো সেটা অস্বাভাবিক। রাতারাতি পাশ হয়ে গেল ৬১টা সংশোধক প্রস্তাব। তার জন্তে আমাদের ৬১টা দিনও ভাবতে দেওয়া হলো না। দিল্লী থেকে কলকাতার খণ্ডা বিল এসে শৌঁছয় একখানা কি দু'খানা। তা নইলে খবরের কাগজে বেটুকু বেরোয় সেইটুকুই আমাদের পড়া। এমন ভক্তিমতি আর এমন চুপি চুপি একটা সাধারণ আইনও পাশ হয় না। পার্লামেন্টের সদস্যরাও যে পুরোপুরি বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছেন তাও মনে হয় না। তাঁদের দলপন্থিতা তাঁদের নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা সে নির্দেশ অক্ষতাবে অনুসরণ করেছেন। একই দৃষ্ট অভিমত হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায়। একদিন শোনা বাবে সংশোধন পেয়েছে রাষ্ট্রপতির অহমোদন।

বতটুকু আমি বুঝি এটাও সেই ক্ষমতার রাজনীতির সংবিধান। ধনসম্পদের অর্থনীতির নয়। জমির মালিকানা, অস্বাস্থ্য সম্পত্তির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে আসেনি। কবে আসবে কেউ জানে না। আদৌ আসবে কি না তাও কেউ জোর করে বলতে পারে না। কেমন করে

আসবে তাও অনিশ্চিত। উপরে একটা লেবেল এঁটে দেওয়া হয়েছে 'সমাজতন্ত্র'। সে লেবেল তো হিটলারের নাসী পাটির পায়েও আঁটা ছিল। নাসী বলতে বোঝায় জাতীয় সমাজতন্ত্রী।

যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়। যা কিছু সমাজতন্ত্রী বলে চালিয়ে দেওয়া হয় তাই সমাজতন্ত্রসম্মত নয়। উৎপাদন, বন্টন, বিনিময় সব কিছু রাষ্ট্রের আয়ত্তে আনতে হবে। তাও পঁচ দশ বছরের মধ্যে যাতে সাধারণ লোক সমাজতন্ত্রের সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে। যাতে শতকরা নব্বই জনের দুঃস্থতা দূর হয়। কাইজারের রাজত্বে বিশমমার্কও জার্মান শ্রমিকদের জন্তে কয়েক রকম সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রের বিরোধী।

ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দল যে সমাজতন্ত্রী নয় সকলেই জানে একথা। তবু তারাও মেনে নিয়েছে লেবার পার্টির প্রবর্তিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা। তাকে ধনতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ হয়নি, কাটা গেছে কয়েকটা ভালপালা। লেবার পার্টিও কি মূলোচ্ছেদ করতে চায় নাকি? শ্রমিকদের মনের কথাটা এই যে, ধনতন্ত্র থেকে লাভ যেটা হয় সেটার বৃহত্তর অংশটা ধনীদেব পাতে না পড়ে শ্রমীদের পাতে পড়ুক। অর্থাৎ ধনতন্ত্র থাকুক, ভাগ বাটোরাবাটা রাষ্ট্রের মধ্যস্থতার শ্রমিকদের প্রতি আরো অহুক্স হোক।

ইকনমিটা ক্যাপিটালিস্ট থাকবে, সোশিয়ালিস্ট হবে না; শুধু কেকখানাকে এমনভাবে কাটতে হবে যে শ্রমিকদের ভাগে পড়ে তার বৃহত্তর খণ্ডটা, এইই নাম বিলেতের লেবার পার্টির সমাজতন্ত্র। গণতন্ত্রের সঙ্গে এটা দিব্য খাপ খায়। এর জন্তে গণতন্ত্রের বিলোপ বিলেতের সমাজতন্ত্রীরা চায় না। বলতে গেলে পশ্চিম ইউরোপের সমাজতন্ত্রী বলে পরিচিত কোনো দলই চায় না। এমন কি, পশ্চিম ইউরোপের কমিউনিস্ট শিবিরেও দ্বিতীয় চিন্তন আরম্ভ হয়ে গেছে। মনের কথাটা এই যে, ধনতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করে শ্রমিকরা এমন কিছু লাভবান হবেন। শ্রমিকরা যদি সওয়ার হয়ে পিঠে চেপে বলে তাহলে ঘোড়াটা ধনতন্ত্রীই থেকে যাক। আর গণতন্ত্রের বেলায় যদি কমিউনিস্টরাই জেতে তাহলে খেলার নিয়মটা পালটানোর দরকার আছে কি? যেমন দেখা যাচ্ছে ইটালীতে কমিউনিস্টরাই সংখ্যাগুরু হবে। ফ্রান্সে সোশিয়ালিস্ট আর কমিউনিস্ট যদি হাত মেলায় তবে তারাই পাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা। বলা বাহুল্য তারা কেউ গণতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করতে অধীর নয়। উদ্বেগটা ক্ষমতার আসনে বসা ও ধনসম্পদ ভাগ করে ভোগ করা। উদ্বেগ সিদ্ধিটাই আসল।

ইকনমিটা সোশিয়ালিস্ট হবে এটা যাদের লক্ষ্য তাবা সরাসরি বিপ্লববাদী। তারা সত্যিকার ভিত্তির দ্বিগ্নে বাবে ও বেঁচে থাকলে খেলার নিয়মটাই পালটে দেবে। ধনিক আর শ্রমিকের সহাবস্থানে তারা বিশ্বাস করেন। ধনতন্ত্রকে জিইয়ে রাখে যে গণতন্ত্র সে গণতন্ত্র তাদের মতে ঝুটা গণতন্ত্র। সত্যিকার গণতন্ত্র তখনই সম্ভব হবে যখন ধনতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও নিহত ও নিশ্চিহ্ন হবে। একটা বিপ্লবে যদি কাজ না হয় তবেবার বার বিপ্লব ঘটতে হবে। পার্লামেন্টারি নির্বাচনের নাম বিপ্লব নয়। পার্লামেন্টারি সংবিধান বা তার সংশোধন কখনো ধনতন্ত্রের বিরোধান চায় না। তেমন গণতন্ত্রের সঙ্গে সত্যিকার সমাজতন্ত্র কখনো খাপ খেতে পারে না। ধনতন্ত্র গোড়ায় কোপ মারতে গেলে যদি গণতন্ত্রের গোড়াতেও কোপ লাগে তো গণতন্ত্র নিপাত যাক। পরে আবার নতুন করে গজাবে। তখন সেটা হবে প্রকৃত গণতন্ত্র।

সাম্রাজ্যবাদ এদেশ থেকে বিদায় নিলেও ধনতন্ত্রবাদ বিদায় নেয়নি। বড়ো বড়ো কোম্পানীগুলো হাত বদল করে বা হাতে হাত মিলিয়ে এখন জাতীয়তাবাদী বনে গেছে। আরো অনেক কোম্পানী জুঁই ফুঁড়ে উঠেছে ও (শেবাংশ ১৬শ পৃষ্ঠায়)

স্থায়ী সরকার ও শক্ত কেন্দ্র

শ্রীকান্ত বসুরায়

বুর্জোয়া অনেক কথাই বলে: নিজেদের শ্রেণী বা গোষ্ঠীকে 'জাতি' ভাবে, জাতিবাদের 'চাবী' বলে, দেশী কার্যসমীপার্থের বাণী ও ডাঙা হাতে তুলে ধরাকে 'জাতীয়তাবাদ' ও 'দেশপ্রেম' বলে, প্রেমের ঠিকাদারকে 'শিল্পপতি' বলে। বিভিন্ন প্রকার ধাপা-বাক্যকে 'বুদ্ধিজীবী' বলে, তেমনি শৃঙ্খলের দাসত্বকে 'শৃঙ্খলা', শোষণের নিয়মকে 'আইন', শোষণ ও অত্যাচারের বাড়াবাড়ির কলে গড়ে ওঠা গণ-অসন্তোষের যে কোনও অভিব্যক্তিকে 'প্রতিক্রিয়া ও অসন্তোষ', প্রতিক্রিয়াবাক্যসমূহকে 'প্রগতিবাদ', বুর্জোয়া-বৈচ্ছ্যচারকে 'গণতন্ত্র', ব্যক্তিগত পুঁজি ও মহাজনী মূলধনের বাড়-বাড়ত্বকে 'দেশগঠন' এমন কি ধনতন্ত্রকে 'সমাজতন্ত্র', প্রতিবিপ্লবকে 'বিপ্লব'ও বলে থাকে। সারা দুনিয়ার বুর্জোয়া অভিধান একই। তাই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের নায়কেরা যখন জাতীয় সম্মেলন, চাবের জন্ত যত্ন, শিল্পপতিদের উত্তম, বুদ্ধিজীবীদের মতামত, আইন শৃঙ্খলা, প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রকে প্রভা, দেশগঠনে আত্মত্যাগ, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, বৈপ্লবিক কর্মসূচী ইত্যাদি বলে, তখন কথাগুলো স্বমধুর শোনালেও ক্রমে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতায় উপরোক্ত যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পায়। তাছাড়াও, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া শাসকবৃন্দ বিশেষ বিশেষ কতকগুলো প্রোগানে গলা চড়িয়ে থাকে; এমনি একটি প্রোগান আমাদের দেশে শক্ত বাস্তবশীল কেন্দ্র (strong centre) এবং আরেকটি 'স্থায়ী সরকার'।

একই সঙ্গে প্রশ্ন আগে: কেন্দ্র যদি শক্ত হবে, তবে নরম হবে কি, কিংবা কিসের বিরুদ্ধে শক্ত? অথবা কেন্দ্রীয় শাসক-গোষ্ঠীকে বা শাসন-যন্ত্রকে যদি শক্তিশালী করতে হয়, তবে কাকে দুর্বল করতে হবে এবং এ সবল করা ও দুর্বল করার উপায় কি কি? পাশাপাশি দ্বিতীয় কথা, এ সরকারকে যদি স্থায়ী করতে হয়, তবে কিসের জন্তে স্থায়ী করতে হবে, এ স্থায়ী কার্য পক্ষে এবং কার বিপক্ষে? ব্যাপারটা তাহলে 'কেন্দ্রে এমন একটা স্থায়ী সরকার চাই যা খুব শক্ত হবে।' বলা বাহুল্য, আমাদের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী (যিনি আবার প্রধানমন্ত্রী হতে চান) বলেন, "আমার হাত শক্ত কর।" তাহলে প্রশ্ন হলো—কাকে নরম করে বা কিসের বিরুদ্ধে তাঁর হাতকে শক্ত করতে হবে?

উত্তরে শাসকদল বলে—'ঐ যে একচেটিয়া পুঁজি, কালোবাজারী, মুনাফাবাজ, করকাঁকিবাজ ও চোরা-

চালানকারীদের নিকেশ করতে, আইন শৃঙ্খলা বাঁচাতে, দেশ গঠন করতে, গণ-তন্ত্রের বিকাশ করতে, প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত ব্যর্থ করতে, সমাজতন্ত্র কামেম করতে, পঁচিশ দফা বিপ্লব করতে কেন্দ্রকে শক্ত কর ইত্যাদি।

চুরি জোচ্চুরি প্রভাবণা বুর্জোয়া স্বভাব, বুর্জোয়া রাজনীতিকরা এদের খুঁতম শিল্পী। দুর্ভাগ্যবশত গড়ার ভয়ে এরা বোল পাল্টায়, সাধারণ মানুষের প্রোগানগুলো চুরি করে আপন মুখে বসায়। কিন্তু জনগণ বুদ্ধিমান, কেননা অভিজ্ঞতায় তারা শেখে আর যা শেখে তা আর ভোলে না। তার বিজ্ঞান দৃষ্টি কোটি কোটি জোড়া চোখে ছড়িয়ে থাকে। ওদেরই কীতির মধ্যে ওদের কীর্তনকে খুঁজে।

প্রশ্ন ১—এ স্থায়ী শক্ত হাত আজ পর্যন্ত কটা একচেটিয়া পুঁজিপতি, কটা বড় অর্থনৈতিক অপরাধীকে (Economic offenders) শাস্তি করতে এগিয়ে গেছে? যে ৭৫ টি পরিবার গোটা দেশের ৮০ ভাগ মূলধন নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের ক'জনের কালো টাকার বিরুদ্ধে অভিধান করেছে? উত্তর—একটিও না। কিন্তু, কতটাকাকে আইন করে সাদা টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে? উত্তর—প্রায় ৫০০ কোটি হবে।

প্রশ্ন ২—আর ওয়াশিংটন কমিশন কালো টাকাকে শাস্তি দেবার জন্তে যে মোক্ষম দাওয়াইগুলো বলেছিলেন, সে রিপোর্টটিকে প্রায় দশ বৎসর যাবৎ সময়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে কেন? উত্তর নেই।

প্রশ্ন ৩—যদি লিয়ারে যখন ওয়াশিংটন রিপোর্ট আংশিক উন্মোচন করে লোক-সভায় পড়ে শোনান অপ্রস্তুত সরকার পক্ষের সামনে, তার দুদিনের মধ্যেই বাজারে সোনা রূপোর দাম চড়তে থাকে, ক্রমশ: তা ২০০-৩০০ টাকা হয়ে ভরিপ্রতি প্রায় ৭০০ টাকা পর্যন্ত ওঠে। এর কারণ কি কালো টাকাকে সোনা দানার রূপান্তর করার জোয়ার নয়?

প্রশ্ন ৪—তা সত্যি হলে এ স্থায়ী সরকার শক্ত হাতে কমিশন রিপোর্ট-টিকে চাপা দিয়ে রেখে কাদের কত হাজার কোটি টাকার স্থায়ী আর্থ রক্ষা করলেন? বলা বাহুল্য এরও উত্তর নেই।

প্রশ্ন ৫—রপ্তানীমুখী (Export-oriented) শিল্পায়নের লাইসেন্স সংক্রান্ত নতুন আইনে আরও কালো টাকার সাধারণ রূপান্তর সম্ভব? বলা নিশ্চয়োজন, এ প্রশ্নটুকুর অধিকার চিরদিনের মত লোপ পেয়ে যাবে

যদি সংবিধানের ৪২তম সংশোধন স্থায়ীভাবে শক্ত হয়।

প্রশ্ন ৬—আর কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত শিকার (৭) বোম্বাইয়ের চোরা-কারবারী হাজী মন্ডান এমন একটা কেউ কেউ নয়; তার চেয়ে তাবড় তাবড় চোরাই নেতার সন্ধান কি রাজ-শক্তির জানা নেই? টাক্টোল পিটিয়ে এমন যে চোরাকারবারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আইন করা হলো, তাতে কজন 'মহাপুরুষের' সম্পত্তি আজ অবধি বাজেয়াপ্ত হয়েছে? এক-জনেরও না (লোকসভায় মজির স্বীকৃতি)। তাহলে, এ আইনে কি ২৪-পরগণার চালওয়ালীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে? নাকি, বিপুল অর্থের অধিকারী আগ্‌লার সমাজের পার্টিগত আত্মগত নিশ্চিত করে রাখার একটা হাতিয়ার তৈরী করা হল?

আর সঙ্গে সঙ্গে একচেটিয়া পরিবারগুলোর নথিভুক্ত মুনাফার হার পর পর চমকপ্রদ 'অলটাইম, রেকর্ড'

সৃষ্টি করে চলেছে।

তাহলে একচেটিয়া, কালোটাঁকা, চোরাকারবারী সম্পর্কে 'শক্ত ব্যবহার' এখন শত শত চকানিনাদ কোটি কোটি মানুষের কান বধির করে তুলে সাধারণ মানুষের চোখের সামনে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনয় হয়ে থাকছে এবং থাকবে।

কিন্তু, গণমানস বদ্বিনীত, তাই চোখ এখানেই থাকছে না। তাকে আরও গভীরভাবে তাকাত্তে হয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রায় রোদই বলেন, তিনি ও তাঁর দল 'ডেভিল-টেড' অর্থাৎ আত্মনিবেদিত। প্রশ্ন, এ স্থায়ী কেন্দ্র শক্ত হাতে কি কি মহৎ কাজে আত্মনিবেদিত? বিগত ত্রিশ বৎসরে, বিশেষত: গত দশ-এগার বৎসরে তাঁরা নিজেদের বিদ্যা, বুদ্ধি, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে যে মন্দির গড়ে তুলেছেন, যে বিদ্রোহের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার পুরোহিত, পুজারী সেবারেই বা কারা? আর কাদের ভিটেমাটি ও প্রেমের ঘাম, কিংবা কাদের বর্তমানের ত্যাগ ও ভবিষ্যতের আশা, এ দেবতা গ্রাস করেছেন? তাঁর পূজা, অঞ্জলি, আরতি ও বাদ্য সহকারে বলিদানের ব্যবস্থাই বা কেমন?

বিশদকা কীর্তিসূচী

কাগজে দীর্ঘদিন আগে একবার মাত্র উপায় হয়েছিল দেখবার—একদফা দফা। ক্রমে একদফা কেমন করে কোথা দিয়ে গলিয়ে গেল। অবশ্য, এজন্তে কেউ আক্ষেপ করেছে, এমনটি তুমি। হয়ত ভালই হল। বিশটাই তো যথেষ্ট! আরও তো কীর্তিসূচী রয়েছে।

১। কালোবাজারী শাস্তি—কালো টাকা সাদা করার চালাও ব্যবস্থা হলো।

২। লক-আউট, লে-অফ, নিবারণ—১৫ দিনের আগাম নোটিশে লক-আউট ইত্যাদি চলে।

৩। আরের বৈষম্য কমিয়ে আনা—প্রতিকর্মচারীদের বোনাস বাতিল মজুরী হ্রাস, বেপরোয়া ছাটাই ইত্যাদি অপরদিকে ধনিক শ্রেণীর দৃষ্টিতে বিভিন্ন প্রকার ডিউটি ট্যাক্স ছাড়, ভর্তুকী আয়কর হ্রাস, শিল্প আধুনিককরণে দরাজ আর্থিক সাহায্য, অটোমেশনের দ্বারা অবাধ মুনাফা অর্জনে মদত দান এবং (শেবাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায়)

॥ তবু...ভবি ভোলবার নয় ॥

নদ'মা দিয়ে আরম্ভ করে পৌঁছে যাব উপনগরীতে। নদ'মা-নালা, পাইপ বসানো, রাস্তা চওড়া করা, রাস্তা তৈরী করা, সেতু বানানো, সড়ক পথ বানানো, উড়াল পুল নির্মাণ, রাস্তায় আলো, বস্তীতে আলো, বস্তীতে জল, বস্তীতে পাকা-রাস্তা, পাকা পায়খানা, বস্তীতে শহরে এবং মিউনিসিপ্যালিটিতে খাটা পায়খানা সরিয়ে তার জায়গায় স্যানিটারী পায়খানা বানানো, হাসপাতাল বানানো, গ্রাম্যুলেজ চালানো, স্কুল বিল্ডিং বানানো ও মেরামতি, পার্ক তৈরী করা, বাগান তৈরী করা, গাছ লাগানো, খেলার মাঠ তৈরী করা, নীচু জমি ভরাট করা, বাজার বানানো, নাট্যশালা বানানো, এমন কি একটি গোটা উপনগরী নির্মাণ।

এই হোল'সি, এম, ডি, এর পরিচয়। অর্থাৎ কাজের বোঝা মাথায় নিয়ে হৌচট খেতে খেতে কাজগুলি করছে আর গালাগালও শুনছে।

ভরসা আছে, কারণ গালাগাল তাঁদেরই শুনতে হয় যাঁরা কাজ করেন। কাজ না করলে গালাগাল শুনতে হয় না।

আরো ভরসা আছে। বিভাসাগরের কথায় উপকার না করলে নিষেদ শুনবার কোন কারণ নেই।

"এগুলো বলে অত বড়াই করবার কি আছে? ট্যাক্স দিচ্ছি না? তোমাদের কোটি কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে না?"

তাহলে বলতে হয় যার জন্ত করি চুরি সেই বলে চোর, অর্থাৎ.....অর্থাৎ নিজেরাই-তো স্বীকার করছেন যে টাকা চুরি করছে সি, এম, ডি, এ।

না-না সে অর্থে বলিনি, বলছি যে মহানগরীর কোটিখানেক লোকের জন্ত আমরা ২০০ কোটি টাকা খরচ করলাম, তারাই আমাদের গালাগালটা দিলেন। "চোরের" মহা অপরাধ। সে চুরি করে গৃহস্থের বাড়ীতে কতগুলি মহামূল্যবান সম্পত্তি রেখে গেছে।

যেমন কলকাতার জন্ত প্রচুর জলের ব্যবস্থা। যেমন বহু চওড়া রাস্তা, যেমন কয়েকটা ব্রিজ, সাবওয়ে, উড়ালপুল ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভাবছেন প্রচার? ভাবছেন চোরের মায়ের বড় গলা? চোখ বুজে যদি না চলেন তাহলে বিস্তীর্ণ মহানগরীতে সি, এম, ডি, এর কিছু কিছু নিদর্শন-তো দেখবেনই। আর যদি জানতে চান তাহলে একটা পোর্টকার্ড খরচ করুন। লিখুন জনসংযোগ অফিসার-কে বা সি, এম, ডি, এর চেয়ারম্যান শ্রীভালানাথ সেনকে।

শ্রীমতী গান্ধীর জেলে

এস আর সুন্দররাজন

[শ্রীমদ্রাজন টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় সহ সম্পাদক এবং ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন বোম্বাইয়ের সাংবাদিকদের সভায় জরুরী অবস্থার প্রেস সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে প্রত্যাবৃত্ত ছিলেন।]

গত ২৪ সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় আমি যখন আমার অফিস টাইমস অফ ইন্ডিয়া থেকে বাড়িতে ফেরার উদ্ভোগ করছি তখন দুজন লোক আমার ঘরে ঢুকে বলেন, সহকারী পুলিশ কমিশনার হুশেপ পেণ্ডসে এখনই আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁদের একজন আমাকে তাদের পরিচয় পত্র দেখান। আমি তাঁদের বলি পেণ্ডসে যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী হন, তাহলে আমার সঙ্গে আগে যোগাযোগ করে আমার অফিসেই আসতে পারেন। তবে তাঁর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে আমি তেমন আগ্রহী নই। সাদা পোশাকের লোকটি খারাপ কিছু ঘটতে পারে এমন ঘরে বলেন : আপনাকে অবশ্যই আসতে হবে। বাই হোক, কয়েক মিনিটের বেশী লাগবে না। আমরা মাজ করেকটা প্রস্তুত করব। আমি পুনরায় তাঁদের ইচ্ছা পূরণের ব্যাপারে আমার অস্বীকৃতির কথা জানালাম। তখন একজন মিঃ পেণ্ডসের অফিসে টেলিফোন করে তাঁকে বললে : "মিঃ রাজন আসতে অস্বীকার করছেন।" তারপর আমার সঙ্গে সহকারী পুলিশ কমিশনারের কিছু ক্ষুদ্র বাক্য বিনিময় হল। পেণ্ডসে বললেন, "আপনাকে পুলিশের সদর দপ্তরে আসতেই হবে। আপনি জুলে যাবেন না যে, এখন জরুরী অবস্থা চলছে এবং আমাদের সাধারণ নিয়ম কাছন মেনে চলার দরকার হয় না।" তখন আমি তিন জন হেঁটে কয়েকটা বাড়ী পার হয়ে মিঃ পেণ্ডসের অফিসে গেলাম। ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল। বিনা ওয়ারেন্টে পুলিশের সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়ে আমার ও তাঁর মধ্যে কিছু বাকবুদ্ধি হল। জরুরী অবস্থার পুঞ্জীকরণের ক্ষমতা নিয়ে মিঃ পেণ্ডসে একটা বক্তৃতা দিলেন। তারপর তিনি কফি আনবার আদেশ দিলেন। আমার স্বাধীনতা হরণ করা হল এমন অনেক জলি কাগজে সেই করার পর মিঃ পেণ্ডসে সমস্ত পাঁচজন পুলিশ অফিসার একটা ট্রেন-ওয়ার্ডনে করে আমার বাড়িতে নিয়ে এলেন বাত্রে আমি আমার স্ত্রী ও দুই ছেলেকে বিদায় জানাতে পারি। লক্ষ্য করলাম, সাদা পোশাকে অন্তত তিনজন পুলিশ আমার স্ট্যাট পাছার দিকে। রাত

দশটার আমাকে বোম্বাই সেন্ট্রাল জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সেখান থেকে আমি ২৫শে জাভরাগী ছাড়া পাই। আমার গ্রেপ্তারের পর আমি একটু নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। প্রায় চারশাস বারুং বিভিন্ন গুপ্তচর সংস্থা আমাকে যেভাবে হরহানি করছিল, আমি জেলে যাওয়ার তার অবসান ঘটল। এই সময়ে আমার অফিস, কেবিন এবং বাড়ী তল্লাসী হয়, আমার টেলিফোনে নিয়মিত আড়ি পাতা হত, আমার ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ব্যক্তিগত করা হত এবং চকিবাদ আমায় উপর নজর রাখা হত। একদিন বিকেলে ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চে ২০ মিনিটের নোটিশে ডেকে নিরস্ত্রনির্ভরভাবে প্রস্রাবের অন্তরিত করা হয়। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চে অফিসাররা বলেছিলেন তাঁরা শুধু জানতে চান, আমি ইংল্যান্ড ও আমেরিকার কাগজে যে সব লেখা ছাপিয়েছি, তার টাকা দেশে এনেছি কিনা। তাঁদের একজন বলেছিলেন, "আপনার রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। আমাদের বিভাগ কেবল অর্থনৈতিক অপরাধ নিয়ে কাজ করে।" কিন্তু প্রথম থেকেই বোকা বাচ্ছিল যে এনফোর্সমেন্ট বিভাগকে রাজনৈতিক ডাইনীনিধনের কাজে লাগানো হয়েছে। একদিন সন্ধ্যায় আমার এক বন্ধু পুলিশ অফিসার আমার অফিসে এসে বলেন, জরুরী অবস্থার পর প্রশাসন ও কংগ্রেস দলের কুতর্ভিত্তি কীস করে পশ্চিমী সংবাদপত্রে লেখকের নাম না দিয়ে যে সব লেখা বেরিয়েছে, সেগুলি আমরাই লেখা বলে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেজন্য আমার একটু সতর্ক থাকি উচিত। "আপনি সতর্ক না হলে আপনাকে জেলে যেতে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনার রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্য আপনাকে গ্রেপ্তারের কথা ভাবা হচ্ছে না। আপনাকে 'চোরাই চালানকারী' হিসাবে আখ্যা দেওয়া হবে।" তারপর তিনি হেসে বললেন, "আপনি জানেন বোধহয় যে যারা বিদেশের সংবাদপত্রে নাম না দিয়ে লেখে, সরকারের চোখে তারা সোনা ও ফরাসী প্রসাধনী দ্রব্য চোরাইচালানকারী বদমায়েসদের চেয়ে বেশী বিপজ্জনক। আপনারা আদর্শের চোরাইচালানকারী।"

একবার মারাত্মক রকম জেবার সময় আমাকে টোয়েন্টী স্টার, লস এনজেলস টাইমস এবং বোসটন

গ্লোবে ছাপা আমার তিনটে লেখার কটোষ্টাট কপি দেখানো হয়। সম্পাদকের বিশেষ নির্দেশ ছাড়াই ছাপা হবে অস্বীকার করে লেখাগুলি পাঠিয়েছিলাম। বিয়য় ছিল, জরুরী অবস্থা চালু করার প্রতিবাদে বেসভ্যা-গ্রহ আন্দোলন হয়েছে এবং এই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ৮০ হাজার পুরুষ ও স্ত্রী গ্রেপ্তার বরণ করে। আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করা হয়, "এই লেখাগুলোর টাকা কোথায়?" আমার উত্তর ছিল, "আমার লেখা ছাপাই হয়নি কারণ পুলিশ আমার লেখাগুলি হস্তগত করার সেগুলি বিদেশে যেতে পারেনি।" সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে শ্রীমতী গান্ধীর তথ্যমন্ত্রী দিল্লীতে কয়েকজন পশ্চিমী সাংবাদিককে ডেকে উচ্চতর ঘোষণা করেন যে, "বিদেশী কাগজে গ্রেপ্তার করে বিদেশী কাগজে লেখেন এমন আশ ভরনের মতো সাংবাদিককে

নেওয়া হল।" তাঁর এই সদয় মনোভাব কেবল বিদেশী সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একথা উল্লেখ না থাকায় আমি জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে যুগ্ম সমালোচনামূলক লেখা "লস এনজেলস টাইমস" এবং একই রকম সতর্কতামূলক লেখা "ক্রিস্টিয়ান সারেনস মনিটর" কাগজে পাঠাই। এই লেখা দুটিতে নাগরিক শৃঙ্খলা ও কর্তব্যবোধের প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে ভারত সরকার যে বিমারবিহীন দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাতে আমার রাগ অপেক্ষা দুঃখই প্রকাশ পেয়েছিল। পরে আমি জানতে পারি ভারতীয় দুতাবাসগুলি এই সব লেখা ভীষণ অপছন্দ করেছিল। দিল্লীর বৈদেশিক প্রচার দপ্তরে চিন্তা-ভাবনা নিয়ন্ত্রণের কাজে নিযুক্ত জনৈক পুরনো অফিসার এই মত ব্যক্ত করেছিলেন যে, তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকলে তিনি ভারতীয়দের বিদেশী কাগজে লেখা বন্ধ করে দিতেন। যতাবতই আমাকে গ্রেপ্তার করে বিদেশী কাগজে লেখেন এমন আশ ভরনের মতো সাংবাদিককে

সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। এই সাংবাদিকরা বেশরোজ্যাবে দেশে গণতন্ত্রকে ক্রমে ক্রমে নষ্ট করার প্রচেষ্টার কিছু ধারণা বিদেশের কাগজে ছাপানোর চেষ্টা করেছিলেন। আমি শ্রীমতী গান্ধীর নিকট দুটো কারণে কৃতজ্ঞ। প্রথমটোরাইচালানকারী হিসাবে গ্রেপ্তার না করার জন্য। কারণ তাহলে জেলে আমাকে খুবই অসম্মানজনক অবস্থার মধ্যে কাটাতে হত। দ্বিতীয়ত, আমাকে বোম্বাই সেন্ট্রাল জেলে রাখার জন্য। কারণ এটি ভারতের সামাজ্য সংখ্যক জেলগুলির অন্ততম, যেখানে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি কিছুটা বিচার বিবেচনা দেখানো হয়। জনগণের সংগ্রামের কমিটি নামক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং মানবিক সৌজন্যবোধ প্রতিষ্ঠার তুলনাবিহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এই সংস্থা পুলিশের হাতে এবং জেলে বন্দীদের উপর নির্যাতনের এক বিবরণ প্রকাশ করেছে। এর যদি একাংশও সত্য হয়, তাহলে এই সব তথ্য মহাত্মা (শেবাংশ : ৪৮ পৃষ্ঠার)

আমরা বাগাড়ম্বরে বিশ্বাস করি না

না, আমরাও বাগাড়ম্বরে বিশ্বাস করি না। আর, যদি বলি আমরা এখন আর মোটেই দুর্বল বা রুগ্ন নই, বরং ওখাখিঁত স্বাস্থ্যবানদের সঙ্গে রীতিমত প্রতিযোগিতা করছি, তাহলে আপনারাও নিশ্চয় আমাদের দাবীকে বাগাড়ম্বর বলে উড়িয়ে দেবেন না।

আপনারা অবশ্য বলতে পারেন : প্রতিযোগিতার নামলেই যোগ্য প্রতিযোগী হওয়া যায় না। আমরাও আপনাদের সাথে একমত। তবে একটা নিবেদন : যোগ্যতার মাপকাঠিটা কি?

কাপড়ের উৎকর্ষতা, ডিজাইন ও মসৃণতাই যদি যোগ্যতার মাপকাঠি হয়, তাহলে আমরাও পিছিয়ে নেই।

যদি বিশ্বাস করেন আমরা বাগাড়ম্বর করছি না তবে বৃহত্তর কলকাতা এলাকায় আমাদের তিনটি শো-রুমের (১৪।১০ গভিয়ারাট রোড, হেপ্টিংস এবং বি. ডি. মার্কেট, সেন্ট লেক) যে কোন একটিতে সময়মত চলে আসুন। শুধু একটি প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, নিরাশ হবেন না।

ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন

(পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা) লিমিটেড,

৭, জওহরলাল নেহরু রোড, কলিকাতা-৭০০০১৩

টেলিফোন : ২৬-০১২১ (৪টি লাইন)

শৈরশাসনের ভিত্তিমূল কয়েকটি দানবীয় আইন

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

জরুরী অবস্থা জারি করার
অজুহাত ও জবাব

নির্বাচনে প্রাধান্য দান করা হয়েছিল বলে কোর্টে প্রমাণিত হওয়ার
তার শাস্তি হল। তাতেই দেশে
জরুরী অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। অজুহাত
দিয়ে জরুরী অবস্থা জারি করল
কংগ্রেস। আর আইনকাহ্না সংবিধান
নব বদলে দেওয়া হল, জনগণের সমস্ত
অধিকার কেড়ে নেওয়া হল, দেশের
একজন নাগরিক (প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা
গান্ধী) দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সারা
দেশে জরুরী অবস্থা আর প্রধানমন্ত্রীর
গদি শ্রীমতী গান্ধীর হাতেই ধরে রাখার
জন্ত সারা দেশের বাট কোটি মানুষের
ওপর বৈরতন্ত্র চালিয়ে দেওয়া হল।
দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্টরা এই বৈরতন্ত্রকে
সমর্থন করল। ১৯৭১ সালে জরুরী
অবস্থা একটা ছিল। তাতে বিনা
বিচারে আটক আইন 'মিসা' কংগ্রেস
সরকার করে। যুদ্ধ চললো ১৪ দিন।
সেই জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা হল
না, মিসাও নয়। দেশ যে ক'দিন যুদ্ধে
লিপ্ত থাকে, বা যুদ্ধের আশংকা থাকে,
সে ক'দিনই জরুরী অবস্থা রাখা যায়।
জরুরী অবস্থার যাতে অপপ্রয়োগ না
হয় তার জন্ত আমাদের দেশের সংবি-
ধান প্রণেতা ডঃ আবেদকারও সতর্ক
করে দিয়েছিলেন। সেই জরুরী
অবস্থা চলছেই, তার ওপর আভ্যন্তরীণ
জরুরী অবস্থা। এর পর বিনা বিচারে
আটক আইনকে পাণ্টে দেওয়া হয়।
মিসাতে গ্রেপ্তার হলে বিচার হবে না,
তবে কী অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে,
সরকারের তা জানানোর দায়িত্ব ছিল
এবং এক বছরের বেশি আটক না
রাখার বিধি। প্রধানমন্ত্রী আইন
পাণ্টে দিয়ে বললেন, কোন অভিযোগে
গ্রেপ্তার হয়েছে তা জানানো হবে না
এবং সরকারের যতদিন খুশি যে কোন
ব্যক্তিকে কোন অভিযোগ ছাড়াই
আটকে রেখে দিতে পারবে। সংবাদ-
পত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা এল, সরকার
যা বলে দেবে শুধুমাত্র তা-ই লিপ্যন্ত
পারবে সংবাদপত্র। ভারতের একজন
বিশিষ্ট সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেবার
বিরুদ্ধে আপত্তি জানালেন, সঙ্গে সঙ্গে
মিসায় গ্রেপ্তার করা হল তাঁকে।
কোর্টে তিনি আবেদন করলেন, অভি-
যোগ জানানোর জন্ত। হিজি কোর্টের
বিচারপতিরা রায় দিলেন, কি অভি-
যোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেটা
প্রমাণাদিসহ বিচারকদের কাছে সর-
কারকে রাখতে হবে। "অভিযুক্ত"র
অভিযোগ আনার অধিকার আগেই
কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বিচারকদের
সামনে সরকার কোন প্রমাণ হাজির

করতে না পেয়ে কুলদীপ নায়ারকে
ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে
প্রধানমন্ত্রী আইন আবার পাণ্টে দিলেন
ভারতের কোন নাগরিককে কি অভি-
যোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেটা
জানবার অধিকার বিচারকদেরও নেই।
আটক কুলদীপ নায়ারের বিরুদ্ধে
অভিযোগ জানতে চাওয়ার অপরাধে
বিচারক দুজনেরই শাস্তি হল।
বিচারক দুজনাঙ্কে বদলী করা হল
দিল্লী থেকে হুদ্র জিপুরায়। আর
বিচারক আগরওয়ালাকে নামিয়ে
দেওয়া হল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে।
এখন মিসায় গ্রেপ্তারের অর্থ—
যিনি আটক হলেন, তিনি জানবেন না
কী কারণে তাকে জেলে আটক রাখা
হয়েছে, বিচারকরাও জানতে পারবেন
না কী কারণে একজন লোককে সরকার
আটকে রেখেছে। আটক ব্যক্তির কোন
বিচার তো হবেই না, কবে মুক্তি
পাবেন তাও অনির্দিষ্ট। ব্যবজীবন
কারাদণ্ড হলো একটা সীমা থাকে যে,
১৪ বছরের জেল। কিন্তু মিসায়
গ্রেপ্তার করে কংগ্রেস সরকার যে কোন
লোককে কারাবাসে জেলে আটকে
রাখতে পারবে। এরকম জরুরী
আইন পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।
এই আইন বতদিন থাকবে, গণতন্ত্রের
কোন মূল্য আর থাকে না। দক্ষিণ-
পন্থী কমিউনিষ্টরা মিসা আইন গ্রহণের
সময় এবং সেটাকে আরও বর্ধন করার
জন্ত পাণ্টানোর সময় কংগ্রেসকে খাগত
জানিয়েছিল।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

সংবাদপত্রের ওপর একটা
নিষেধাজ্ঞা ছিল—সরকারের অজুহাত
ব্যতীত কোন কিছু ছাপাতে পারবে
না। নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে
এই কড়াকড়ি শিথিল করা হচ্ছে।
কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী আইন তৈরি করে
নিয়েছেন এবং সেই আইনে বলা হয়েছে
কংগ্রেস সরকার কোন লেখা বা সংবাদ
আপত্তিকর মনে করলে সেই সংবাদপত্র
ছাপাখানা সহ বাজেয়াপ্ত করতে
পারে। এই আইন এখনও আছে।
এটা থাকলে জনগণের হৃৎকর্ষ দর্শার
কথা, কংগ্রেস-বিরোধীদের কথা,
দেশের প্রকৃত বিরোধীদের কথা, দেশের
প্রকৃত অবস্থার কথা মাছব জানতে
পারবেন না। দেশের সর্বনাশ হচ্ছে
দেশেও সরকারের নিদে শমত সংবাদ-
পত্রকে লিপ্যন্ত হবে দেশের উন্নতি
হচ্ছে। এই আইন যে কোন সময়
সরকার প্রয়োগ করে সংবাদপত্র
বাজেয়াপ্ত করে নিতে পারে, এই ভয়ে
সংবাদপত্রগুলি মন খুলে লিপ্যন্ত পারছে

না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ
আইন গ্রহণের সময় দক্ষিণপন্থী কমিউ-
নিষ্টরা খাগত জানিয়েছিল কংগ্রেস
ও তার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে।
সংবাদপত্রকে সংবাদ সরবরাহ করার
কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ছিল,
যেমন পি টি আই এবং ইউ এন আই
প্রভৃতি।
সরকার এই রকম চারটি
প্রতিষ্ঠানকে হুক দিয়ে এক করে
দিল, নাম হল সমাচার। এর প্রধান
নিযুক্ত হলেন প্রধান মন্ত্রীর বিশ্বস্ত
অজুহাত ইন্ডুস। সমাচার এখন
কংগ্রেসের মাউথপিস। রেডিও-
টেলিভিশনও সরকারের কংগ্রেসের
প্রচার দপ্তর। সমাচার গঠনের সময়
যে পঃ কমিউনিষ্টরাই জোর গলায়
সমর্থন করেছিল।

সংগঠন বে-আইনী করার আইন

সংবিধান সংশোধনী আইনে বলা
হয়েছে, আত্মীয়তা বিরোধী সংগঠনকে
সরকার বে-আইনী ঘোষণা করতে পারে।
কংগ্রেস সরকারের আমলে মাছবকে
আন্দোলন করতেই হয়। সরকার যে
কোন সময় জনগণের যে কোন
আন্দোলনকে আত্মীয়তাবিরোধী আখ্যা
দিয়ে বে-আইনী করতে পারে।
কংগ্রেস সভাপতি বড়ুয়া বলেছেন,
শ্রীমতী গান্ধী ভারত, ভারতই শ্রীমতী
গান্ধী। কাজেই শ্রীমতী গান্ধীর অস্তায়
কাজের সমালোচনা করলে সেটা ভারত
বিরোধী আখ্যা পাবে এবং সেই
সংগঠনকে বে-আইনী ঘোষণা করার
অধিকার সরকারের আছে। কাজেই
কোন রকম সমালোচনা কংগ্রেসীরা
বরদাস্ত করবেন না। দক্ষিণপন্থী কমিউ-
নিষ্টরা এই জনবিরোধী ৪২তম
সংবিধান সংশোধন রিলকে সমর্থন
করেছিল।
কংগ্রেস দেশকে একনায়কত্বের পথে
নিরে যাচ্ছে। কংগ্রেস জিতলে
মাছবকে গোলামে পরিণত
করবে। অস্তমিকে জরুরী অবস্থার
শ্রীমতী গান্ধীর ওপর শোষণ অত্যা-
চার হয়েছে সবচেয়ে বেশি। দক্ষিণ-
পন্থী কমিউনিষ্টরা কংগ্রেসের বৈরতচারী
ও জনবিরোধী শাসনের নিত্যসঙ্গী।
এই নির্বাচনে আগনারা গণতন্ত্রের
পক্ষে ভোট দেবেন, না শৈরশাসন ও
একনায়কত্ব শাসনের এবং তার
লেজুদের ভোট দেবেন, সেটা বাছাই
করে নিন। দেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ
নির্ভর করবে আপনাদের মূল্যবান
রায়ে গণের ওপর।

নির্বাচনী আইন সংশোধন

প্রধানমন্ত্রী ১৯৭১ সালের লোক-
সভার নির্বাচনে ঘনীভূত আশ্রয় নিয়ে-
ছিলেন, সেটা এলাহাবাদ হাইকোর্টে
প্রমাণিত হওয়ার প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষা হয়
যে ছয় বছর তিনি আর নির্বাচনে প্রতি-
দ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। শ্রীমতী
কোর্টে প্রধানমন্ত্রী আবেদন করলেন।
সেখানে প্রাথমিক বিচারে বিচারক
আয়ার রায়ে দিলেন, প্রধানমন্ত্রী তিনি
থাকতে পারবেন, কিন্তু সংসদে তার
কোন ভোটাধিকার থাকবে না।
আমাদের দেশের সংবিধানে জন-
প্রতিনিধিত্ব আইন বা একটা নির্বাচনী
আইন আছে। সে, আইনে বলা
হয়েছে কোন সরকারী আয়লা,
কর্মচারী কিংবা সরকারী প্রশাসনিককে
কোন প্রার্থীর পক্ষে কাজে লাগানো
যাবে না। এছাড়া অস্তমিত কিছু বিধি-
নিষেধও আছে। শ্রীমতী কোর্টে
কথম প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী মাছলা
বিচার্য্যীন, তখন তিনি সংবিধানের
নির্বাচনী আইনটাকে পাণ্টে
দিলেন। সংশোধিত আইনে বলা
হল, প্রধানমন্ত্রীর কোন বিচার তদন্তে
আদালতে হতে পারবে না, তাঁর
অতীতের কোন কার্যকলাপ নিয়েও
কেউ আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মাছলা
করতে পারবে না। সংবিধান সং-
শোধনী আইনে আরও পরিষ্কার করে
বলা হল, প্রধানমন্ত্রী সমস্ত রকম আইন
আদালতের উর্দে। কোন সভ্য
দেশে এ ধরনের আইন থাকতে পারে
না।
প্রেস আইনও কোর্টে চ্যালেঞ্জ হবে
না, এ রকম আইন হয়েছে। জরুরী
অবস্থা সংক্রান্ত আইনকেও পাণ্টে
দেওয়া হয়েছে। আমরা দাবি করে-
ছিলাম, দেশ যে কদিন যুদ্ধে লিপ্ত
থাকবে, সে ক'দিনই শুধু জরুরী অবস্থা
জারি করা যাবে, অস্ত সময় নয়।
সংবিধান পাণ্টে দিয়ে বলা হল, যখন
বেখানে কংগ্রেস সরকারের অর্থাৎ
কংগ্রেস দলের খুশি, জরুরী অবস্থা
জারি করতে পারে। দেশের অভ্যন্তরে
বেখানে খুশি মিলিটারী পাঠানো
দানবীয় আইন, জনবিরোধী আইন।
সংবিধান সংশোধন বলে জন
হিতকর একটিও ধারা ছিল না, সব
কটাই জনগণের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের
বিরুদ্ধে। দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্টরা
লোকসভায় এই বিলকে খাগত
জানিয়েছিল।

কংগ্রেস সরকারের আইনমন্ত্রী
গোথলে কংগ্রেসের বৈরতন্ত্রের প্রধান
মুখপাত্র। উনি আইনও পাশ
করেছেন। অথচ সবরকমের বে-আইনী
কাজ উনি করেছেন শ্রীমতী গান্ধীর
রবার স্ট্যাম্প হিসেবে। উনিই
বলেছেন, কালোবাজারী চোরাচালানী-
দের শাস্তে করার জন্ত ইনাকি জরুরী
অবস্থা। অথচ একজন আইনজ্ঞ
হিসেবে উনি ভালো করেই জানেন,
জরুরী অবস্থা ছাড়াও বেসব আইন
আছে, তাতে কালোবাজারী চোরা-
চালানকারীদের শাস্তে করা যায়।
কিন্তু কংগ্রেস কালোবাজারীদের উৎ-
সাহিত করেছে, চোরাচালানকারীদের
মদত দিয়েছে। তাদের শাস্তে
করেনি। কালোবাজারী কি করে বন্ধ
করা যায় তার পথ আমরাই সংসদে
সোচ্চার গলায় বলেছিলাম। প্রধান-
মন্ত্রী সে পথে যাননি। জরুরী অবস্থা
কালোবাজারী চোরাচালানকারীদের
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার নতুন কোম
স্বযোগ দেখনি। জরুরী অবস্থার
সরকার এদের বিরুদ্ধে নতুন কোন
ব্যবস্থাও নেয়নি। এদের ক্ষমতা জরুরী
অবস্থার আরও বেড়েছে। জরুরী
অবস্থার আর একটি কারণ প্রধানমন্ত্রী
বলে আসছেন, সেটা হল, জরুরী অবস্থা
ছাড়া মূল্য হ্রাস করা যাচ্ছে না। এটাও
মিথ্যা কথা। জরুরী অবস্থার মূল্য-
বৃদ্ধির জন্ত সরকার অবাধ লাইসেন্স
দিয়েছে মালিকদের। সমস্ত জিনিসের
দাম বেড়েছে জরুরী অবস্থার।
জরুরী অবস্থা জারি করার একটাই
কারণ শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর পরিবারের
হাতে দেশের তাবৎ ক্ষমতা কায়স্থ
করা। জনগণের কঠোরোষ করা হয়েছে,
জনগণের সমস্ত মৌলিক অধিকার কেড়ে
নেওয়া হয়েছে, জরুরী অবস্থার মালিকরা
অবাধ লুণ্ঠন করেছে, শ্রমিকদের ওপর
নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে, সরকার
মালিকদের সবরকম স্বযোগ সুবিধা
দিয়েছে।
কংগ্রেস জনবিরোধী ও বৈরতচারী
ব্যবস্থাগুলি লোকসভায় গ্রহণ করার
সময় এই দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্টরাই
একমাত্র সেগুলি সমর্থন করেছিল।
কংগ্রেসী বৈরতচারের সঙ্গে দক্ষিণপন্থী
কমিউনিষ্টদের নামও যুক্ত। জনগণ
কংগ্রেসের সঙ্গে দক্ষিণপন্থী কমিউ-
নিষ্টদেরও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়
করিয়েছেন।
(১৯শে ফেব্রুয়ারি বেহালায় জনসভায়
প্রদত্ত ভাষণ থেকে। গণশক্তির
সৌজন্ম।)

নির্বাচনী বুলেটিন (৩)

ইন্দিরার শাসনে ভারত

কালিদাস কাক্সিলাল

শালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর ১৯৬০ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধান মন্ত্রীর পদে বহাল করেন কংগ্রেস হাইকমান্ড, যাকে সচরাচর বলা হত সিণ্ডিকেট। শ্রীমোরারজী দেশাইও প্রধান মন্ত্রীর পদের অন্যতম দাবিদার ছিলেন। কিন্তু কামরাজ, অতুল্য ঘোষ প্রভৃতির মোরালো সমর্থনে ইন্দিরার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। শ্রীমোহাইকে বুরিয়ে স্থিরে প্রতিযোগিতা থেকে নিবৃত্ত করা হয়। অগত্যা উনি উপ-প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ইন্দিরার আমলেই ১৯৬৭-৬৮ সালে সারাদেশে কংগ্রেসের ইয়েজ দারুণ খারাপ হয়ে যায়। অনেকগুলি রাজ্যের বিধান সভায় কংগ্রেস তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। কোনো কোনো রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন আরি ক'রে কেন্দ্রীয় প্রভুত্ব কৌশলে বজায় রাখা হয়। কেন্দ্রেও কংগ্রেস হয়ে যায় অতীতের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী।

১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি অবিস্তৃত কংগ্রেসের হাই-কমান্ড অর্থাৎ সিণ্ডিকেটের সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রাক্তন বিরোধ শুরু হয়—যার ফলে অচিরেই অবিস্তৃত কংগ্রেস ভেঙে ছুই টুকরো হয়ে গেল। সিণ্ডিকেট ছিল তদানীন্তন কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণক দল এবং আগেই বলা হয়েছে, এই দলই কার্যতঃ ইন্দিরার নিয়োগ কর্তা। যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের তরুণ কর্মীরা অনেকেই হংতো জানেন না, কোনো সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ইন্দিরা প্রথমে ক্ষমতায় আসেন নি। হুতরাং তখন এই সিণ্ডিকেটেরই ভেঙেছা ও মনোময়ন ধন্য প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা। অথচ রাজনীতির ঢাকা এমনভার ঘুরে গেল যে শেষ পর্যন্ত সিণ্ডিকেটের প্রধান নেতাদের সঙ্গেই হল ইন্দিরার বিরোধী, আর সেই বিরোধের ফলেই হল ইন্দিরার অগুণামীদের নিয়ে নতুন কংগ্রেসের জন্মলাভ। এতে ইন্দিরার রাজনৈতিক জয় হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু নৈতিক জয় হয় নি। অর্থাৎ ওঁর বৈধনিক লাভ কিছু হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু বিশ্বের উর্দ্ধে যদি কোনো লাভ থাকে তার থেকে উনি অবশ্যই বঞ্চিত হয়েছেন।

এখানে মনে রাখতে হবে, প্রধান মন্ত্রী রূপিনী বসু মান ইন্দিরার জনক হচ্ছে সিণ্ডিকেট, ভারতের জনগণ নয়। ক্ষমতা হাতে পাবার পর জনককে অস্বীকার করা খুব সোজা। এত বড় একটা দেশের প্রধান মন্ত্রী হবার পর জনগণকে কি করে স্বকৌশলে হাত করা যায়, তা ইন্দিরার চেয়ে কম চতুর রাজনীতিজ্ঞও বুঝতে পারে।

নেতাজী কংগ্রেস হাইকমান্ডের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নির্বাচনে জিতেও পদত্যাগ করলেন ভারতের জাতীয় ট্রাডিশানকে শিরোধার্য করে। আর, ইন্দিরা দিব্যি সিণ্ডিকেটকেই কাঁচকা দেখালেন।

১৯৬৯ সালের ১২ই জুলাই বাঙ্গালোরে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির মীটিংএ সজীব রেড্ডিকে রাষ্ট্রপতির পদে মনোনয়ন দেওয়া হয়। এখান থেকেই ইন্দিরার সঙ্গে সিণ্ডিকেটের প্রাক্তন বিরোধ শুরু। এই মনোনয়ন ইন্দিরার বনঃপুত না হওয়ার ইন্দিরা চটে গেলেন। বললেন, 'এর কনসিকোয়েন্স (অর্থাৎ পরিণাম) খারাপ হবে।' ঠিক তাই হল। কিছুদিন বাদেই উপপ্রধান মন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের হাত থেকে উনি হঠাৎ অবদপ্তর কেড়ে নিলেন সিণ্ডিকেটের সম্পূর্ণ অস্তিত্বই। দেশাই অপমান বোধ করলেন। কারণ ইন্দিরার পিতার মন্ত্রিদপ্তরও তিনি অর্ধমন্ত্রী ছিলেন এবং নেহরুর পরেই তাঁর স্থান ছিল। এ-হেন ব্যক্তিকে ইন্দিরা যেভাবে অপসারিত করলেন তাতে কংগ্রেসে কি দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয়ে পারে? যা

হোক, দেশাই পদত্যাগ করলেন। অথচ আশ্চর্য এই যে কংগ্রেস হাইকমান্ডের আস্থা হারিয়েও ইন্দিরা পদত্যাগ করলেন না। বরং কি ভাবে খপড়ে আকড়ে থাকা যায়, সেই চেষ্টায় পর পর ছোটো আপাত-চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত নিলেন সম্পূর্ণ একক ভাবেই। প্রথমঃ রাজসভা বিলোপ। দ্বিতীয়ঃ কমলাপুত্রি ও ব্যাক্স জাতীয়করণ। লোকসভার অবিশেষণের মাত্র ৪৬ ঘণ্টা আগে অভিজ্ঞাল আরি করে ব্যাক্স জাতীয়করণ হল। পৃথিবীর যে কোনো গণতন্ত্রবাদী বলবে, যে মুহূর্তে ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস হাই-কমান্ডের আস্থা হারালেন, সেই মুহূর্তেই তাঁর উচিত ছিল কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করা এবং নতুন দল গঠন করে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধান মন্ত্রীর পদ পুনরাধিকারের চেষ্টা করা। এখানে নেতাজীর কথা আবার উল্লেখ করছি। নেতাজী যদি তাঁর সমর্থকদের নিয়ে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি গঠন করতেন, তবে কি সেটা গণতান্ত্রিক বিচারে বৈধিক কাজ হত? কিন্তু তিনি প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে অহুদারতার পরিচয় দিতে চান নি।

যাই হোক, প্রধানমন্ত্রীর কমিউনিষ্ট দলগুলি এক যোগে ইন্দিরার মনোনীত প্রার্থী ভি, ভি, গিরিকে সেদিন সমর্থন করল। অর্থাৎ ইন্দিরার প্রধানমন্ত্রিত্ব পাকা-পোক্ত করল। আর যায় কোথা? কমিউনিষ্ট কমরেডদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অ-কমিউনিষ্ট নেতারাও দলে দলে এসে শাসক কংগ্রেসের অর্থাৎ ইন্দিরা-কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হন। রাতারাতি ইন্দিরা-কংগ্রেস দারুণ ক্রীত কলেবর হয়ে উঠলো। অর্থাৎ যুগ সন্ধানীরা মৌচাকের কাছেই এগিয়ে এলো। কমতাহীন আরি কংগ্রেসে যুগ কোথায়?

এই হল ইন্দিরার জয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কংগ্রেস ভাঙার ইতিহাসও মোটামুটি এই।

১৯৬৯ সালে শ্রীমুক্ত গিরির জয়লাভের পর থেকে ইন্দিরার কংগ্রেস দেখতে দেবতে আরি কংগ্রেসকে সারা দেশে একেবারে কোণঠাসা করে ফেললো। শক্তিশালী হয়ে ইন্দিরা পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত ফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করলেন রাষ্ট্রপতির শাসন আরি করে। বামপন্থী নেতারা এবার আকশোল করতে লাগলেন তাঁদের কৃতকর্মের জন্তে। কারণ তাঁদের ভোটেই তো ইন্দিরা মোরারজীর দলকে পরাজিত করতে পেরেছিলেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে। কিন্তু প্রগতিশীল ইন্দিরা অটলভাবে এগিয়ে চললেন দেশের তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক রূপায়ণে। সি পি আই নেতারাও তখন ইন্দিরার প্রধান উপদেষ্টা ও সহকর্মী। লক্ষ্য করেছি, ১৯৬৬ সালে ইন্দিরা ক্ষমতা হাতে পেয়েই কাজে না হোক মুখে তো 'সমাজতন্ত্র' কথাটি অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার করতে শুরু করেন। আর, মজাপন্থী কমিউনিষ্ট নেতাদের হয়ে হুর মিলিয়ে কথাবার্তা বলতে থাকেন! রাশিয়ার সঙ্গে ইন্দিরা সরকারের সাময়িক চুক্তি হয় পাক-ভারত লড়াইএর হুত্রে। তার অনেক আগেই নেহরু ট্রাডিশানের বিপরীত ভাবে নানা দিক দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ইন্দিরা গান্ধীর কার্য-কলাপে। সিণ্ডিকেট ও আরি কংগ্রেসের সুপারীকৃত ও বর্ষিয়ান নেতাদের চেয়ে মজাপন্থীদের তিনি উন্নততর দেশপ্রেমিকের মর্যাদা দিয়ে আসছেন বরাবর। —যা দেশের জাতীয়তাবাদী জনতার চোখে অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হয়েছে। ওঁর প্রধানমন্ত্রীর আসনটি সাময়িক ভাবে স্বরক্ষিত হওয়া ছাড়া এর দারা আর কি লাভ হয়েছে আনি না। অবশ্য ইদানীং কিন্তু ইন্দিরা ও তাঁর অগুণামীরা সি, পি, আইকে মানাতাবে আক্রমণ করতে পিছ না হচ্ছেন নী। আর, সি, পি, আই তো তার

দলের দিকে বাড়িয়েই দিয়েছে প্রাক্তনভাবে।

ভারতের জাতীয় কোষাগার থেকে প্রায় পাঁচ কোটি টঙ্কা রাজসভা বাবদ বেরিয়ে যেত। অত ঘটা করা হল, কংগ্রেসকে ভাঙা হল, দেশে সি, পি, আইকে প্রথম দেওয়া হল কি তবে রাজসভা বাবদ বাবিক পাঁচ কোটি টাকা মাত্র বাঁচানোর তাগিদে এবং কয়লার খনি আর ১৪টি ব্যাক্স জাতীয়করণের তাগিদে। কিন্তু এই দুটি আপাত মহৎ কাজে সিণ্ডিকেটের বা অবিস্তৃত কংগ্রেসের পার্লামেন্টারী বোর্ডের কে ইন্দিরাকে বাধা দিয়েছিলেন আনন্দা-আনি না। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার স্বভাবের অবকাশ তো থাকেই। দেশের ভালো ইন্দিরা ছাড়া আর কেউ কি চায় না? নিশ্চয়ই চায়। নেহরুর সহকর্মীরা কি তবে সবাই দেশদ্রোহী? ইন্দিরার এই বিবোধী বানতে হুগে-তো খরং নেহরুর চরিত্রেই কালিয়া লেপন করা হয়। মনে হয়, ইন্দিরা তাতেও পিছ না ন'ন। সে যাই হোক, তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক রূপায়ণের জন্তে ইন্দিরা যা যা করেছেন তার মধ্যে অভিনব কিছু নেই। সব কিছুই মিলে মিশে করা যেত। ইন্দিরা ইচ্ছা করলে প্রতিটি সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবেই নিতে পারতেন। কিন্তু ইন্দিরার অক্ষমতা এখানে প্রকাশ হল দুই প্রকারের। এক উনি ভিন্ন মতাবলম্বীদের বুরিয়ে শুকিয়ে স্বমতে আনতে পারেন না। দুই, উনি ভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে মিলেমিশে কাজ চালাতেও পারেন না। এই দুই ধরনের অক্ষমতাই ওঁর পক্ষে কোনো গণতান্ত্রিক দেশের প্রধান হওয়ার বাধা স্বরূপ।

১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই দিল্লীতে কংগ্রেস সংসদ দলের সভায় শ্রীমতী গান্ধী ঘোষণা করেন, "নীতি নির্ধারণে আরি বিধি নিষেধ মানব না। ব্যাক্স জাতীয়করণের পর বড় বড় সমাজ সংস্কারের কাজে হাত দেব। মোরারজী দেশাই অর্ধমন্ত্রী থাকলে কাজের অসুবিধা হবে।" আর মোরারজী দেশাই বলেন, "নীতি নির্ধারণ ব্যক্তি বিশেষের স্বাধীন নয়।" দুই ব্যক্তির দুই স্বকম কথা। কিন্তু এখানে ইন্দিরার উক্তি নিতান্তই ডিক্টেটর হুত্ব। মোরারজী দেশাই গণতান্ত্রিক রীতির কথাই বলেছেন।

প্রধান মন্ত্রীর পদে সিণ্ডিকেট যখন ইন্দিরাকে মনোনীত করেন, তখন হয়তো সিণ্ডিকেট সভ্যদের হিসাবে ভুল হয়েছিল। কিংবা খরং ইন্দিরারও ভুল হয়ে থাকতে পারে। কি কি সর্ভে তিনি প্রধান মন্ত্রী হ'তে পারেন, সেটা যদি তাঁকে প্রধান মন্ত্রীর পদে বসানোর আগেই আলোচনা করে নেওয়া হত, তবে বোধ হয় পরেও অনেক অশ্রীতিকর ঘটনা ঘটতো না।

রাজসভা বিলোপ হচ্ছে রাজনৈতিক ষ্টাট মাত্র। ব্যাক্স জাতীয়করণও ষ্টাটে পর্যবসিত হয়েছে। কারণ ব্যাক্স জাতীয়করণের মূল উদ্দেশ্যগুলি সফল হয় নি। বারা নিঃস্ব ব্যাক্স থেকে খণ পেতে পারে না। নানা রকম আইন কাহনের বেড়াঝালে এবং বিধি নিষেধের ক্যাকড়ার সোজা জিনিসকে বাঁকা ক'রে ফেলা হ'য়েছে। লক্ষ লক্ষ নিঃস্ব অথচ শিক্ষিত বেকার ন্য পাচ্ছে চাকরি, না পাচ্ছে ব্যবসা করার সুযোগ মূলধনের অভাবে। তাছাড়া জাতীয়করণ হয়েছে যে কয়টি ব্যাক্সের, তাতে-দুর্নীতি এত আমদানী হয়েছে যে আজকাল দেশের বুদ্ধিজীবীরা 'জাতীয়করণ' কথাটার উপরই খড়াহুত। জাতীয়করণের পর চৌদ্দটি ব্যাক্সের কয়েক হাজার কোটি টাকা তো সরকারি সম্পদে পরিণত হ'ল। তার দারা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত তথা গরিব শ্রেণীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হয়ে দিনদিন অবনতি হচ্ছে কেন? দেশের আপামর সাধারণের কোনো বাস্তব মঙ্গল বাতে না-হয়, তার প্রশংসা কেন করব? শুধু কংগ্রেস ও সি, পি, আই নেতাদের 'আপনজন' বারা,

(শেষাংশ ১২, পৃষ্ঠায়)

নির্বাচনী বুলেটিন

(১১শ পৃষ্ঠার পর)

ভাষ্যেরই অবৈধ মতল কিছু হয়তো হয়েছে ব্যাক্ত ও করলার খনি জাতীয়করণের ফলে। যাস।

করলাখনিগুলি জাতীয়করণের আওতার আসা রাজ করলার দাম বিত্তন বেড়ে গেল এবং উৎকৃষ্ট মানের করলাও বাজারে দুপ্রাপ্য হয়ে উঠলো। এই তো জাতীয়করণের প্রত্যক্ষ ফল। সুতরাং জাতীয়করণের নাম শুনেই এখন দেশে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। এইভাবে ইন্দিরা সরকার সমাজতন্ত্র আনছেন।

রাজতন্ত্রভাতা বিলোপের পরও চোখের সামনেই তো দেখছি দেশে হাজার হাজার ক্ষুদে রাজা রাজকুমারী হুটি হয়েছে এবং হচ্ছে। জয়পুরের মহারাজার চেয়ে কি টাটা বিড়লার ঐশ্বর্য বেশী নয়? শহরের অলিতে পলিতে কি আমরা নিত্য নতুন রাজা রাজকুমারী দর্শন পাচ্ছি না? ইন্দিরা প্রবর্তিত 'সমাজতন্ত্র' এর গতিরোধের জন্যে কি করেছে আজ পর্যন্ত? ইন্দিরার কমিউনিষ্ট বন্ধুরাও তো কেউ কেউ নাকি টাকার কুমীর। তাঁদের জন্যে যে সব স্ত্রী থেকে অবৈধভাবে ভাতা এসে থাকে, সেগুলি কি বন্ধ করার কোনো চেষ্টা হয়েছে আজ পর্যন্ত?

রাজন্যভাতা বিলোপের আসল কারণ মাথায় জানি। দেশের বেশির ভাগ প্রাক্তন নৃপতি বা তাঁদের পরিবারগণ ব্যক্তিগত দিন দিন কংগ্রেস বিরোধী হয়ে উঠছিলেন এবং সরকার বিরোধী দলগুলিকে মদত দিচ্ছিলেন। এই তাঁদের মূল অপরাধ। সুতরাং রাজন্যভাতা বিলোপ এবং অন্য নানা রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হ'ল তাঁদের জব্ব করার জন্যে। জয়পুরের মহারানী, মহীশূরের রাজমাতা এবং অন্যান্য অনেককেই নানা ভাবে জব্ব করেছে ইন্দিরা সরকার। বেহেতু ও'রা ইন্দিরা বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাই ইন্দিরা নানাতাবে এঁদের 'শিক্ষা' দিয়েছেন। টাটা-বিড়লার 'স্তন' এই যে ও'রা ইলেকশনে দাঁড়ান না বিরোধী দলের টিকিটে। সেই জন্যেই এঁদের গোপন সম্পদ উদ্ধারের জন্যে ব্যাপক সরকারি চেষ্টা হয় না জয়পুরে যেমন হয়েছে।

মোট কথা, ইন্দিরা বা কিছু করেছেন বা করেন, নিজের আসনটিকে পাকা পোক্ত করার জন্যেই করেন। সুতরাং ও'কে গণতন্ত্রের শত্রু বললে বিন্দুমাত্র অন্যাস হয় না, এবং এই দিক দিয়ে নেহরুর সঙ্গে ইন্দিরার কোনো মিলই নেই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ইন্দিরার ভূমিকা বসন্ত উজ্জল হোক, আমাদের তাতে কিছুই আসে যায় না। কারণ আজ দেখছি, বাঙালীরা তো দূরে গুরুত্ব একটি ভারতবাসীও সেই যুদ্ধের দ্বারা লাভবান হয় নি। ওদিকে পাকিস্তান যেমন ভারত' বন্ধু নয়, এদিকে স্বাধীন বাংলা দেশও তেমনই ভারতবন্ধু নয়। ভারতের কূটনৈতিক ব্যর্থতার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলবে বঙ্গবন্ধু তথা ভারতবন্ধু মুজিবর রহমানের শোচনীয় পরিণতিতে। আজ স্বাধীন বাংলাদেশের ইন্দিরা কি আগের চেয়েও অসহী নয়? আগের চেয়েও অসহায় নয়? কারণ অতীতে তাদের জন্যে ভারতের দরজা অন্তত খোলা ছিল, এখন তাও নেই। ইন্দিরা গান্ধীকে অশেষ প্রনয়াদ। স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে যারা না খেতে পেয়ে এক বস্ত্র ভারতে চলে এসেছে, তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না ইন্দিরা সরকার। ১৯৭৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কয়েক লক্ষ হিন্দু বাংলাদেশ থেকে ভারতে পালিয়ে এসেছে। ইন্দিরা সরকারের মতে এরা নাকি দেশভাগের বলি নয়, এমন কি সাধারণ ভাবে কৃপার পাত্রও নয়। এখনও প্রায় ১০ লক্ষ হিন্দু বাংলাদেশে রয়েছেন। তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখানে সরকারি পর্যায়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। অথচ ইন্দিরা সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার ষ্ট্রাইডদের জন্যে আর ভিয়েতনামে যুদ্ধবিস্তৃত

মাহুষদের জন্যে দিনরাত 'হার হার' করেন। এর চেয়ে ভয়াবহ আর কি হতে পারে?

ইন্দিরা শাসনের পোড়ার দিকে যে অস্বাভাবিকতার আধিষ্ঠান হয়, তা ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত কম বেশী অব্যাহতভাবেই চলে। দুর্নীতি ও কুশাসনের চরম পরিণতি দেখা গেছে এই হতভাগ্য দেশে। সমাজের উপরতলার 'ডিসিপ্রিন' নষ্ট করার কাজ সম্পূর্ণ করে ইন্দিরা সারা দেশের ডিসিপ্রিন নিয়েই নষ্ট করলেন। সুতরাং জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলাহীনতার জন্যে উনি নিজেই দায়ী সর্বতোভাবে। শাসন কক্ষতা হাতে পেয়েই ইন্দিরা সরকারে যেন সরা জ্ঞান করতে আরম্ভ করলেন। একে একে দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাদের দান ইন্দিরার চেয়ে চেয়ে বেশী এবং বয়সে মর্যাদায় বা অভিজ্ঞতায় যারা ইন্দিরার চেয়ে অনেক উপরে, তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অপমানের কর্মসূচি নিয়ে করতে লাগলেন উনি। যাদের কাছে চড়ে এসে ইন্দিরাজী দিল্লীর গদিতে বসলেন, তাঁদের উনি একেবারে ভূগবৎ জ্ঞান করতে লাগলেন! কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান নিয়েই যদি বুদ্ধি বুদ্ধি কুটিলতা স্থাপন করতে আরম্ভ করেন দেশবাসীর সামনে, তবে সে দেশের অবস্থা বা-হয়, ভারতের অবস্থা তাই হয়েছিল। শেষে-বেগতিক দেখে স্বাধীন সমালোচনা ও স্বস্থ আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্তে ইন্দিরাজী ইমার্জেন্সী ঘোষণা করলেন। পরে সংবিধান সংশোধনও করলেন। আরও কত কি করলেন। সব দোষ কারাও বিরোধী নেতাদের বাড়ি চাপিয়ে নিয়ে দিবা ভালোমাহুৎ সাজতে চাইলেন। কি দুর্নীতি।

১৯৭১ সালে গরিবী হঠাৎ দ্রোণান নিয়ে নির্বাচনে নেমেছিলেন ইন্দিরা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই এই নির্বাচন হয়। সুতরাং সারা দেশের স্বাভাবিক 'ইন্দিরা চেউ' ইন্দিরাকে সহজেই জয়বৃত্ত করে। দুঃখের বিষয়, ১৯৭১ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস যে সব প্রতিজ্ঞা দিয়েছিল, তার একটিও কার্যে পরিণত হয় নি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অল্পপাতের চেয়ে বেকারের সংখ্যা-বৃদ্ধির অল্পপাত এখন অনেক বেশী। এবারের নির্বাচনে অর্ধপূর্ণ কারণেই কংগ্রেসী নেতারা বেকার সমস্যার কথা কিংবা গরিবী হটানোর কথা একদম চোখে বাজছেন—যাতে এই দিক দিয়ে গত ১১ বছরের কংগ্রেসী অব্যোধ্যতা আপাততঃ ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু ঢাকা পড়ে না এবং পড়ছে না।

কংগ্রেস এবার স্বামী সরকার গঠনের আশাস দিয়ে দেশবাসীকে চাঞ্চা করছেন অর্থাৎ কংগ্রেস এবার স্বামী ভিক্টোরী শাসন চালু করতে চায়। একে তো জরুরী অবস্থা। তার উপর আবার সংবিধানের সাম্প্রতিক সংশোধন। এই সংশোধন মোটামুটি ভাবে প্রধান মন্ত্রীকে দেশের চৌদ্দ আনা ভিক্টোর বানিয়েছে। অর্থাৎ দেশের বাট কোটি মানুষকে প্রায় খাঁচার পাখীতে পরিণত করার আরোহণ হয়েছে।

এসাহাবাদ হাইকোর্টের রায় ইন্দিরার প্রতিকূলে যাওয়া মাত্র ভারতের বাট কোটি লোক ব্যক্তি স্বাধীনতা হারালো। এর পরেও ইন্দিরা কি করে বলেন, উনি গণতন্ত্র-ভক্ত? গণতান্ত্রিক নিয়মে কি তখনই ইন্দিরার পদত্যাগ করাই উচিত ছিল না? কিন্তু তা কি করে সম্ভব? ইন্দিরা ছাড়া দেশকে পরিচালনা করার যোগ্য ব্যক্তি ভারতে আর কে আছে? লজ্জার বিষয়, ইন্দিরা স্বয়ং এই কথা বলেছেন সেদিন। একবার নয়, দুইবার নয়, বারংবার এই কথা বলেছেন। তাঁর একজন প্রখ্যাত অম্বুচর তো আরও এক-খাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, 'ইন্দিরা মানে ইন্দিরা।' এই ধরণের ব্যক্তিপূর্ণা গণতন্ত্রে চলতে পারে কিনা ঐশ্বর্যই জানেন। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, ইন্দিরার দলে এখন যারা আছেন, ইন্দিরার পুজারী। যাদের আত্ম-লক্ষ্যন বোধ আছে, বিবেক বুদ্ধি আছে, তাঁরা একে

একে ইন্দিরাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

ইন্দিরার বনামধন্য পিতা স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রধান যোদ্ধা হলেন কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানে বা কংগ্রেস-সরকারে যে স্থান চান নি, পান নি কিংবা পাবার দাবিও করেন নি, ইন্দিরা সেই স্থানটি চান এবং কার্যতঃ সেই স্থানেই বসে আছেন সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে। জয় প্রকাশ, মোরারজী, রাজ-নারায়ণ ওভৃত্তিকে জেলে দিয়ে ইন্দিরা গণতান্ত্রিক ভারতে তথা গণতান্ত্রিক হিন্দুর নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। যানে অক্ষর কীভিষ্মত তৈরি করলেন। শুধু দেশের সাংবাদিক ও লেখক সম্প্রদায় নয়, দেশের পোটা বুদ্ধিজীবী সমাজকে ইন্দিরা 'শিক্ষা' দিতে চান। ১৯৭৫ সালের ২৬ জন থেকে এদেশের গণতন্ত্রকে 'লাইনচুড়' করে তিনি নাকি সমাজের সব স্তরেই ডিসিপ্রিন এনেছেন। দেশে যদি সত্যি সত্যি ডিসিপ্রিন আনা হত, তবে কি দেশের রাজ্য-পাল্লেরা, মুখ্যমন্ত্রীরা বিমাম বন্দরে ছুটে যেত ইন্দিরা তনয় সঞ্জয় গান্ধীর গলায় ফুলের মালা পরাতে? কিংবা শহরের রাজপথে তোরণের পর তোরণ তৈরি করা হত ইন্দিরা তনয়ের সম্মানে এবং সেই বুঝটিকে সন্তুষ্ট করার জন্তে তার চারপাশে কৃত্রিম জনতার ভীড় সৃষ্টি করা হত দেশের সর্বত্র? এই কি ডিসিপ্রিনের নমুনা? আগেই তো বলেছি, ইন্দিরা নিজেই সমাজের উপরতলা থেকে ডিসিপ্রিনক্ষসকাণী বিষবর কীট সারা দেশে ছড়িয়েছেন? ইন্দিরার হিমালয়-সমূহ বড় বড় অস্ত্রাগুলি সারা দেশে অস্ত্রস্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, কিন্তু ভয়ে কেউ হৈ চৈ করতে পারে নি। কিন্তু নতুন জেনারেশনের মনে এর ফলে যে নতুন কল্যাণবোধ সৃষ্টি হয়েছে, তার পরিণতি হয়ে দাঁড়িয়েছে মারাত্মক। সারা দেশের ডিসিপ্রিন এতে বর-বাদ হয়েছে। পুলিশ, আই কিংবা মিলিটারির সাহায্যে একটা প্রাচীন ও হুমত্যা জাতির উপর ডিসিপ্রিন চাপিয়ে দেওয়া যায় না। স্থিতি দিতে হ'লে আগে চাই সু-দৃষ্টান্ত। ইন্দিরা কি জানেন না, Example is better than precept? নেহরু প্রধান মন্ত্রী থাকাকালে তাঁর সহিয়সী কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা (এখন কি কেন্দ্রীয়-মন্ত্রী হবার পরে) কি সঞ্জয়ের মত অভ্যর্থনা কোথায়ও পেরেছেন, কিংবা পাবার আশাও করেছেন? সঞ্জয়কে নিয়ে এরকম বিসমৃদ মাতামাতি ইন্দিরা প্রশাসনকে সবচেয়ে কলঙ্কিত করেছে।

ইন্দিরার আমলে রাজ্যের মন্ত্রিনতা ও বিধান সভাকে কার্যতঃ খুঁটো জগন্নাথ করে রাখা হয়েছে। ১৯৩৫ সালে ইংরেজ যে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থা আমাদের দেশে চালু করে গিয়েছিল, ইন্দিরার আমলে সেটা প্রায় বিলুপ্ত হল। এই কি ডিসিপ্রিনের নমুনা? রাজ্যের মুখ্য-মন্ত্রীরা আর বিধান সভার মাননীয় সদস্যরা তো দিল্লীতেই স্বামী আন্তানা করে ফেলেছেন। রাজ্যের রাজধানীতে যে ও'রা দ্বারা করে মাঝে মাঝে ফিরে আসেন—এটা রাজ্যে-রই সৌভাগ্য! ইন্দিরার কংগ্রেস দলটিতে তো ডিসিপ্রিনের নামগন্ধ নেই। এই দলে আছে রাজা-মহারাজা, আছে টাটা-বিড়লা, আছে স্বযোগ-সন্ধানী, আছে দলভাগী, আছে গণতন্ত্রী, আছে সমাজতন্ত্রী, আছে রাইকেনতন্ত্রী, আছে জাতীয়তাবাদী, আছে ক্রশ-পন্থী, আছে চীন-পন্থী, আছে মার্কিনপন্থী, আছে মুসলিম লীগের চর, আছে গৌরাক-ভক্ত। অর্থাৎ না-আছে কে? সুতরাং বিরোধী দলকে 'অগাধিচ্ছি' বলা ইন্দিরার সাজে না। চর্যচর্যেই তো দেখতে পাচ্ছি, কংগ্রেসে যত মতভেদ আর যত কোন্সল তার সিকিভাগও বিরোধী দলে নেই। সুতরাং ইন্দিরা স্বামী সরকার গঠনের আশাস কেনন করে দেন বুঝতে পারিনা। ইন্দিরার পারের তলা থেকে তো মাটি মরে যাচ্ছে। যারা এখনও ইন্দিরাকে ধিরে বয়েছেন, তাঁরা শুধু ক্ষমতার আছেন বলেই ইন্দিরা-ভক্তি দেখাচ্ছেন। ইন্দিরা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ারাত্র ভক্তেরা সবে প'ড়বেন।

(শেষাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায়)

এই নির্বাচনের তাৎপর্য

চিরঞ্জীব চৌধুরী

ভারতে দেড়টি মনিব তাৎপর্য ভারত-বাসীর ভাগ্যের জিন্দাদার হয়ে বসেছেন। এবং এই দেড়জননের কমতালিঙ্গাই যখন তখন জনতার অভিপ্রায় রূপে ঘোষিত হচ্ছে। তাই জরুরি ব্যবস্থা উঠবে কিনা ঠিক করবেন এই দেড়জন মনিব, নির্বাচন হবে কিনা, তাও ঠিক করবেন এরা। ইতিমধ্যেই পাঁচ থেকে ছ'বছর লোকসভার মেয়াদ বাড়ানো হয়ে গেছে, বিরোধী মহাশয়ের কয়েদে পূর্বে বিরোধীহীন লোকসভার একটার পর একটা আইন পাশ করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত আটঘাট বেঁধে শ্রীমতী গান্ধী হঠাৎ ঘোষণা করে দিলেন, লোকসভা ভেঙে দেওয়া হল, নির্বাচন। যজ্ঞার ব্যাপার, নির্বাচন শুধু লোকসভার হবে, বিধানসভার নয়। কারণ? কারণ, নির্বাচনের ক্ষতিতে হলে লোকসভার বিধান সভার সহযোগিতা দরকার। এইসব ব্যাপারে হুল কোনো লাগেই নেই। শ্রীমতী গান্ধীর উপর তা নির্ভর করছে। অর্থাৎ তাকে তার আসন পাকা করবার জন্য যে পথ ধরা দরকার তাই তিনি চরম যাবেন। কারণ গমির মৌলি-টো নেহেরু পরিবারের। কারণ দেশের জন্য তিনি ঠিক পথ বাড়ি পর্বত দান করে এখন সরকারী বাড়ি ছাড়া তার আর বিত্তীয় আশ্রয় নেই। এই বাড়িও গেলে তিনি সপরিবারে বাস্তব চ্যুত হবেন।

নির্বাচনের ঘোষণা করেও শ্রীমতী গান্ধী পুনো ধূয়া বার বার উদগার করে যাচ্ছেন, আবার নাকি দেশে বিশ্বশ্রমচার আবহাওয়া সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। জরুরী অবস্থার আগে ও পরে দেশে কী ধরনের বিশ্বশ্রমচার সৃষ্টি হয়েছিল, একমাত্র শ্রীমতী গান্ধীই তা বলতে পারেন। এলাহাবাদ হাইকোর্ট তার নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করে তাকে গৃহ থেকে নামতে নির্দেশ করেছিল। সে নির্দেশ তো গান্ধী মানেনই নি, বরং রাডারভি জরুরী ব্যবস্থা থেকে বিরোধী নেতাদের বেহালুম গ্রেপ্তার করলেন। তার বিরুদ্ধে আদালতে যে রাজনারায়ণ নালিশ করে জিতেছিলেন সেই উদ্ভেলোককে পর্বত গ্রেপ্তার করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলেন। এ ধরনের চমৎকার ঘটনা ইতিহাসে তুলনারহিত। যেমন তুলনারহিত একটি দেশের প্রধান-মন্ত্রীর নির্বাচনের মামলার আদালতে

অভিযুক্ত হলেও বেআইনী ভাবে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখা।

কাজটা যে শ্রীমতী গান্ধী ভালো করেননি তার প্রমাণ শ্রীজগদীবন রায়ের মতো নেতার ইন্দিরা-কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ। বস্তুত কোনো বিবেকসম্পন্ন উদ্ভেলোক দেশের নাম করে এই ব্যক্তি ক্ষমতালোভকে সমর্থন করতে পারেন না। শ্রীমতী গান্ধীর শিমা শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পর্বত ভাইবির এই আচরণ মানতে পারেন নি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিগিরিও এই

ব্যাপারকে ভালো চোখে দেখতে পারেননি।

একদিকে নির্বাচনের ঝুঁকুমি অন্য দিকে জরুরী ব্যবস্থার চাবুকটাকে শাড়ির ভাঁজে তুলিয়ে রেখেছেন শ্রীমতী গান্ধী। বার বার তিনি জরুরী ব্যবস্থার শিথিলতার কথা বলছেন এবং পুরো ব্যবস্থা নাকি ভুলে নেওয়া যায় না, এমন কথাও বলছেন। কেন? না, চোরাকারবারী, সমাজবিরোধী-দের অত্যাচার এটা থাকা দরকার। একটা হুৎপোশ শিত্ত বোরে চোরাকারবারী

বা সমাজ বিরোধীদেবশায়েস্তা করবার জন্য দেশে উপযুক্ত আইনের কোনো অভাব নেই। আসলে শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচন হোক ভালো কথা; জরুরী ক্ষমতা তার ব্যক্তিগত স্বার্থেই রেখে দিলেন। যে কোনো মুহূর্তে বিশ্বশ্রমচার জিগির তুলে বিরোধীদের জব্বম করা যাবে।

এই অসীম অবস্থার মধ্যেও বিরোধীরা নির্বাচনের স্বযোগকে কাজে লাগাতে চান। তাদের ধৈর্যকে প্রশংসাই করতে হয়।

নির্বাচনের সময় বস্তু যাক্যের কংগ্রেসী সরকারের দখলে এবং তারা তার পূর্ণ ব্যবহারও করছেন। নির্বাচনের প্রাক্কর কী সব ভালো ভালো কাজ হতে চলেছে রেডিওতে নিয়মিত

তার কীর্তন করা হচ্ছে। বিহার সরকার এই মুহূর্তে সরকারী কর্মচারীদের মহাধন্যতা বাড়িয়ে দিলেন। পশ্চিম-বঙ্গ সরকারও এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকবেন না। এইভাবে নির্বাচনের আগে ভোটারদের ঘুং দেওয়াটা কী স্বস্থ অবস্থান নির্বাচনের দৃষ্টান্ত? সরকারী বেতার ক্রমাগত এক তরফা ঢাক বাজিয়ে যাবে, বিরোধী পক্ষের ঢাক বাজাবে কারা? ইউ, পি-তে মনো-নয়নপত্র দাখিল করবার সময় সঙ্গর গান্ধীকে অভ্যর্থনা করেছেন স্বয়ং মুখ্য-মন্ত্রী। এটাও কী স্বস্থ নির্বাচনের দৃষ্টান্ত? নির্বাচনের স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীরও নিরপেক্ষ হওয়া দরকার। কারণ তিনি এখন কেয়ারটেকার মাত্র। অথচ (শেষাংশ ১৬শ পৃষ্ঠায়)

ভারতায় অর্থনীতি ব্যাপক বিকাশের দ্বারপ্রান্তে উপনীত

ভারতে অর্থনীতির দ্রুত বিস্তার ঘটছে, মুদ্রাস্ফীতি শূন্যতার পর্যায়ে নেমেছে এবং মূল্যমান স্থিতিশীল হয়েছে :

- ঋণ খাতশস্ত্রের উৎপাদন ১১৮ মিলিয়ন টনের সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছে ; বর্তমানে দেশে ভাঙায়ে-মজুত খাতশস্ত্রের পরিমাণ হল ১৮ মিলিয়ন টন।
- আর্থিক বছরের প্রথম ছ' মাসে শিল্প বিকাশের মাত্রা ছিল প্রায় ১২ শতাংশের মতো ; গত বছরের ঐ সময়ে তা ছিল মাত্র ৩ শতাংশ ; ১৯৭৬-৭৭এ শিল্পোৎপাদন তার আগের বছরের তুলনায় দশ শতাংশের মতো বেশি হবে বলে অনুমান।
- ১৯৭৫-এর এপ্রিল-সেপ্টেম্বরের তুলনায় ১৯৭৬-এর ঐ সময় বিদ্যুৎ সরবরাহের মাত্রা ১৬.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ১৯৭৬-এর এপ্রিল-অক্টোবরে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ৩৩.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে.....ঐ সময়ে আমদানি কমে এসেছে ৯ শতাংশের মাত্রায়।
- অন্তান্ত দেশের প্রাপ্য পরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে ; স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা ভাঙারে ২৫,০০০ মিলিয়ন টাকা সঞ্চিত হয়েছে।
- সরকারী ক্ষেত্রে বিকাশের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ১২ শতাংশের মতো।
- টাকার ক্রয় ক্ষমতা ১৭ থেকে ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সাফল্য হল আমাদের এই বিশাল প্রগতিশীল রাষ্ট্রের সর্ব সম্ভাবনা কার্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত করার জন্য সরকার ও জনগণের দৃঢ় সংকল্পের বাস্তব অভিব্যক্তি।

স্থায়ী সরকার ও শক্ত কেন্দ্র

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

একচেটিয়া পুঁজির লাইসেন্স ও সম্প্রদায়ের চালাও উদ্বারনীতি।

৪। গরীবি হটাও—“মুঠো মুঠো কাকনের মিঠে মিঠে হাসি” হয়ে যে রোগাগান ‘ইন্দিরা হাওয়ার’ আকাশ ভরে দিয়েছিল, পাথরের টুকরো হয়ে সাধারণ মানুষের মাথায় তা পড়ছে কেন?

৫। মুদ্রাস্ফীতি রোধ—প্রকৃতির আশীর্বাদে প্রচুর ফলন হওয়ার এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নানা উপকরণের বিদেশী অর্ডারের ঘাটতি ঘটায়, বছরমুহুরত তাদের মরুমুখী ঝুঁকি বাজারে ছেড়ে দেন (এভাবে মধ্যে মধ্যে ঘটে থাকে), ফলে আন্তর্জাতিক জরুরী অবস্থা ঘোষণার ২/৩ মাস আগে থেকেই বেশ কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দর নামতে থাকে; এ মুঁকি জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরেও কিছুদিন বাবত চলছিল। একেই সরকারী মহল মুদ্রা-

শ্রীমতী গান্ধীর জেলে

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

গান্ধীর আদর্শ কার্যকর করছেন বলে দাবি করছে এমন সরকার সম্পর্কে খুব খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে।

কেউ জানেনা ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন সকালে জরুরী অবস্থা চালু করার পর ভারতের কত ব্যক্তিকে জেলে পোরা হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে দুই লক্ষের মতো ব্যক্তি জেলে গিয়েছে। এবং ১৮ আত্মসারী শ্রীমতী গান্ধীর “নিরস্ত্রত গণতন্ত্র” সত্যক ভাবে প্রত্যাবর্তনের দিনে জেলে কম পক্ষে ৮০ হাজার রাজনৈতিক কর্মী মিসায় আটক ছিল। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক ট্রাজেডি এই যে, ১৫ থেকে ২০ হাজার নারী-পুরুষ এই হাতকর অজুহাতে জেলে পচছে যে, তারা হচ্ছে চরমপন্থী এবং হিংসা ও চক্রান্তের মাধ্যমে শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের পতন ঘটাতে চেয়েছিল। বেশীরভাগ লোককে এমন যুক্তিতে জেলে নেওয়া হয়েছে; যে কথা শুনেলে গ্রাম্য বিচার-সভাও হাসবে। প্রচুর অধ্যাপক, আইনজীবী, ডাক্তার ছাত্রকে জেলে আটকে রাখা হয়েছে এই কারণে যে, উত্তম জরুরী অবস্থায় (এবং জগজীবন রামের পদত্যাগের পরে) কংগ্রেস দলের স্থানীয় নেতাদের পক্ষে যে রাজনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছিল, এই রাজ-বন্দীরা স্বাধীন নাগরিক হিসাবে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরলে সেই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে।

[লণ্ডনের নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকার ১১ ফেব্রুয়ারী ’৭৭ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অর্থবাদ]

স্ফীতি রোধ বলেন। কিন্তু রপ্তানি অর্ডারের বাজার আবার চালা হয়ে ওঠায় ও মহাজনী মূলধনের যোগাযোগ ব্যাপকভর হওয়ার মুদ্রাস্ফীতি আবার বেড়ে চলছে। প্রকৃতপক্ষে, ইতিমধ্যে সরকারী অর্থনৈতিক ইতিহাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু সহ রেশনের চাল, গম, চিনি ইত্যাদির দরদরকার মূল্যবৃদ্ধি ঘটে চলছে।

৬। বৈদেশিক ঋণ, বৈদেশিক মুদ্রা ও “শিল্পশিল্প”—বলা হয়ে থাকে রপ্তানি—বৈদেশিক মুদ্রা—শিল্পের ক্ষেত্রে যন্ত্র ও উপকরণ আমদানি। কিন্তু কয়লাটা অমন সহজ ও সরল হলো আসল ব্যাপারটা তেমন সরল নয়। দেশের আপাততঃ জনসাধারণের শাস্য ও নিত্য ব্যবহার্য উপকরণের ন্যূনতম চাহিদাকেও উপেক্ষা করে যে অসহ্য রপ্তানি কাত হয়ে থাকে (এমন কি বিপুল পরিমাণ সরকারী ভর্তুকী ও ডিউটি ছাড় দিয়ে) এতে লক্ষ সে বিদেশী মুদ্রার এক বিপুলমাণ চলে যায় লাক্ষিকী বৈদেশিক ঋণের বায়িক কিস্তি পূরণ, অর্থ পরিশোধ ও বিদেশী কোম্পানীগুলোর বদেশে চালান দেওয়া লভ্যাংশের নামে। বাকী অংশে আমদানি বাণিজ্যের এক ক্ষুদ্রাংশ হয় মাত্র। অর্থাৎ, আমদানির ক্ষেত্রে আবার নতুন করে আরও বেশী ঋণ করতে হয়। তদুপরি, রপ্তানির ক্ষেত্রে শিল্পায়ন (Export-Oriented Industrialisation) ও শিল্পের আধুনিকীকরণের নামে ঋণের অবশিষ্টাংশ গচ্ছা দিয়ে আর একশালা ভারতীয় প্রমিক হাটাই এবং ভারতীয় শ্রম, শনিজলব্য ও অন্যান্য কাঁচামালকে রপ্তানি শিল্পে সস্তায় প্রসেস করে বিদেশী মহাজনদের সস্তায় উপচৌকন দেওয়া হয়।

৭। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা—একদিকে বৈদেশিক ব্যক্তিগত শিল্প-পুঁজি ও বৈদেশিক রাষ্ট্রপুঁজি (পূর্ব ইউরোপীয়) এবং মহাজনী মূলধন একের পর এক চেউয়ের আকারে বৈদেশিক নীতির খাল হয়ে চুকছে ও রপ্তানিমুখী উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলছে, অপরদিকে বৈদেশিক ঋণের জোরাবে অর্থনৈতিক ভারত সরকার বিপুল ভর্তুকী দিয়ে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের রপ্তানি নামক কৃতান্তলি সাত সাগর আর তের নদীর ওপারে নিবেদন করে চলছে।

দেশে-বিদেশে সাম্রাজ্যবাদের এরূপ দুর্বল সহযোগীরা এ সমস্ত দায় মেটাতে গিয়ে ভারত সরকার তৃতীয় বিশ্বের মহলে মহলে “নিরপেক্ষ সাম্রাজ্যবাদ”-

বিরোধিতার পালাগামে প্রধানা সখীর অভিনয় করে চলেছে।

৮। আন্তর্জাতিক মর্যাদাবুদ্ধি ও আত্মনির্ভরতা—(ক) এত বেশী লংঘ্য দেশ থেকে এত বেশী পরিমাণ ঋণ পৃথিবীর ইতিহাসে কোন দেশ কখনও করেনি। আন্তর্জাতিক অর্থ-জগতের IDA আঁজ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে যত ঋণ দিয়েছে, তার মোট পরিমাণের ৪০ শতাংশ নিয়েছে একমাত্র একা ভারত সরকার। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর শাসনকালেই দেশের বৈদেশিক ঋণ চতুর্গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে—অন্য ১৫০০ কোটি টাকা। তাছাড়াও সরকারের আন্তর্জাতিক নীতিগুলির বৈদেশিক প্রতিফলনে দেশী বিদেশী হারনা হাওয়ারদের স্বার্থে বিপুল ঋণ, সোমাহীন বন্ধনা, অকথা অত্যাচার ও অবর্ণনীয় অপমানে স্টিট ৬০ কোটি মানুষের কোন্ হবি আঁকতে পারে? (খ) জাতীয় আত্মনির্ভরতার জয়যাত্রা নয় একেবারে গলাযাত্রা। শব্দধার বয়ে নিয়ে চলেছে দেশী বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি আর মহাজনী মূলধন।

৯। জাতীয় ঐক্য—(ক) সারা-

দেশে সন্ত্রাসের সাহায্যে জনসাধারণকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। (খ) আদর্শহীনতা ও স্বার্থপরতার লাগামহীন উচ্ছৃঙ্খলতার জনগণের প্রধান শক্তিকে পঙ্গু করার অভিযান চলছে।

১০। খাদ্য সমস্যার সমাধান—(ক) দেশের ন্যূনতম চাহিদাকে উপেক্ষা করে উৎকৃষ্ট খাদ্যসম্পদ বিদেশে বেপারোয়া রপ্তানির ঘারা ও (খ) প্রায় বাধ্যতামূলক নির্বাহকরণের পথে।

১১। ভূমিহীনকে ভূমিদান—এর নমুনা (ক) লক্ষ লক্ষ বর্গাদার উচ্ছেদ (খ) অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত চাষীর জমি অ-চাষীকে দান (দলগত স্বার্থে) গ) জমির বেনামী হস্তান্তরকে বৈধ করা হলো।

১২। দাস-শ্রমিকের মুক্তিলাভ—এ প্রাচীন ব্যবস্থার সামাজিক অর্থনৈতিক কারণটাকে ইচ্ছে করেই আড়াল করা হয়েছে। তা নাহলে একে শুধুমাত্র একটি আইনের সমতা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে কেন? কেনই বা একটা কাগজে আইনমাত্র পাশ করিয়ে সমস্যার নিকেশ করা হয়েছে এমন দাবী করা হচ্ছে। ফল

বা-হবার তাই হয়েছে; প্রকাশ, সারাভারতে এরূপ প্রায় ৭৫ লক্ষ দাস শ্রমিকের মধ্যে মাত্র কয়েকশ লোক-এ সরকারী ‘মুক্তি সার্টিফিকেট’ (Emancipation Certificate) নিতে উৎসাহ বোধ করতে পেরেছেন। বাকীরা (প্রায় সকলেই) চলতি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ববৎ অসহায়।

১৩। মাদকবর্জন—স্বহার উপর চাক্ষু বিগত ১১মাসে দরদরকার কমিয়ে আনা হয়েছে।

১৪। ধর্ম নিরপেক্ষতা—প্রকৃত অর্থে ধর্ম নিরপেক্ষতা নয়, ধর্ম উদ্বারতার নামান্তর আর বৈজ্ঞানিক অর্থে বুজোঁয়াদের পক্ষে ধর্ম নিরপেক্ষতা হওয়া অসম্ভব; তাইতো, ডাঃ জাকির হোসেন ও আহমেদকে রাষ্ট্রপতি করার ক্ষেত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারাভিযানের পক্ষে একটা বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করে থাকেন।

১৫। সংবিধান সংশোধন—জনগণের সার্বভৌমত্বের পক্ষে সংধন না করে জনগণের দারিদ্র্যের সংশোধন।

(শেবাংশ ১০শ পৃষ্ঠার পর)

ইন্দিরার শাসনে ভারত

(১২শ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহে স্বাস্থ্য কতক্ষণ চূপ করে থাকবে—সেটাও ভাবতে হবে। কতক্ষণ বিবেক-বিরুদ্ধ কথা বলবে?

সি, সি, আই-এর সঙ্গে কংগ্রেসের তো আজ শুধু প্রয়োজনেই আবার অস্থায়ী মিতালি হয়েছে। ১৯৬৬ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর যে সি সি আই ইন্দিরার সব চেয়ে বড় বন্ধু হয়েছিল বুদ্ধ স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ঠেঙানি দেওয়ার সময়, সেই সি, সি, আই, আজ এমন বদলে গেল কেন? ইন্দিরা জনসংস্কার সমালোচনায় নিয়ত মোচ্চার। জনসংস্কার নাকি ঘোরতর সাম্প্রদায়িকতাবাদী, বনিও জনসংস্কার মুসলমান সদস্ত রয়েছেন। কিন্তু কেবলের মুসলিম লীগ তো কেবলে ইন্দিরার দল ও সি সি আই-এর সঙ্গে দ্বিবি মিলেমিশে সরকার চালাচ্ছে? মানে ইন্দিরাকে যারা সমর্থন করবে, তারা সাম্প্রদায়িক হতেই পারে না। এই নীতি নিয়ে ইন্দিরা এসেছেন দেশকে নীতি শিক্ষা দিতে।

এক ফুৎকারে কয়েকদিনের মধ্যে ইন্দিরার ইচ্ছামত সংবিধান সংশোধন হয়ে গেল। অথচ দেশের যে কোনো একটা বালক জানে, সংবিধান-সংশোধনের একমাত্র উদ্দেশ্য প্রধান মন্ত্রীকে আরও ক্ষমতালালী করা। অর্থাৎ গণতন্ত্রের শিরশ্ছেদ!

ইমার্জেন্সী যতদিন কার্যকরী ছিল, ততদিন মানুষের মনে আতঙ্ক ছিল। দেশের লোক সরকারের ভয়ে মন খুলে কথা বলা ছেড়েই দিয়েছিল। এমন কি লেখকেরাও সত্যি কথা লেখা ছেড়ে দিয়ে শুধু ইন্দিরা সরকারের গুণ-গুণতি করেছেন এতদিন। সবাই বিবেকের বিরুদ্ধে মিথ্যার কারবার চালিয়েছে। ইন্দিরার রূপায় স্বাধীন চিন্তার স্থান দেশে বৃষ্টি আর থাকবে না। রাশিয়া ও অন্যান্য ডিক্টে-টার শাসিত দেশের যে হাল, ভারতেরও প্রায় সেই হাল। দেশের মানুষের এই নৈতিক অধঃপতন ঘটানোর ক্ষেত্রে কি

ইন্দিরা সরকার সম্পূর্ণ দায়ী নয়? এই কি দেশে ডি আনার ব্যবস্থা!

ইন্দিরা বলেন, দেশে গণতন্ত্র যদি না-ই থাকবে, নির্বাচন হচ্ছে কেন? অল্প সময়ের নোটিশে, নেতাদের কর্মীদের আটক রেখে এবং নানা রকম বাধাবিঘ্ন ও ভীতি পরিবেশ সৃষ্টি করে যে নির্বাচন হচ্ছে, তাকে স্বাভাবিক নির্বাচন বলা যায় না। নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকা হঠাৎ বিরোধীরা কোথায় পাবে? বাদের দলীয় কাজকর্ম গত ১১ মাস যাবৎ বড়, তারা স্বাভাবিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তুত হবে কি করে?

ইন্দিরা বিশ্বাসীকে দেখাতে চেয়েছেন, তিনি গণতন্ত্র চান। আসলে, তিনি চান লোক-দেখানো গণসমর্থনের একটা রবার স্ট্যাম্পের ছাপ মাত্র। ক্ষমতার ফিরে আসার দৃঢ় সঙ্কল্প তাঁর আছেই, নতুবা সংবিধানটা আত্ম সংশোধন করতেন না অত ঘটনা করে। অস্বাভাবিক সৃষ্টি নির্বাচন যদি তিনি চাইতেন, তবে ইমার্জেন্সী একেবারেই তুলে দিতেন এবং বিরোধীদের প্রস্তুত হবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় দিতেন। এত ভাড়া কিসের?

সব দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় ইন্দিরা শাসনের মহিমার ভারতের দুঃখ দুর্দশা লাঘব কিছু হোক বা না-হোক, ভারত একটিমাত্র পরিবারের অগণতান্ত্রিক শাসনে দীর্ঘকাল নিপীড়িত হবে—এই রকম একটা অন্তত সন্ধাননা মেন উকি দিচ্ছে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে—Now or never! অর্থাৎ এবারের নির্বাচনেই ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য দীর্ঘকালের ক্ষেত্রে নির্ণয় হয়ে যাবে। কংগ্রেসের অ-গণতান্ত্রিক ও বিশৃঙ্খল শাসনের হাত থেকে মুক্ত হবার এই বোধ হয় শেষ সুযোগ। আশা করা যায় ভারতের শেষরক্ষা এবার হবে, অর্থাৎ নির্বাচনের পর ইন্দিরার প্রত্যাবর্তন একটা নতুন গণতন্ত্রী সরকার দেশকে পরিচালনা করার সুযোগ পাবে।

বিস্মৃত প্রতিশ্রুতি

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করে আসছিল। অষ্টম কার্যকালে গৃহীত হল ব্রিটিশের এবং সি. পি. মেননের নীতি, কংগ্রেস নীতি হল পরিত্যক্ত।

১৯৪৬ সালে যে সংবিধান সভা গঠিত হয় তার অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন বিত্তবান শ্রেণীর। শিক্ষিত শ্রেণীর থেকেও কিছু সংখ্যক সদস্য এসেছিলেন, কিন্তু তাঁরাও ছিলেন বিত্তবান বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। সে সময়ে যে আবহাওয়া পরিব্যাপ্ত ছিল তাতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সুরাসরি নির্বাচন অস্বীকৃত হলে সংবিধান সভার মূল চরিত্র ভিন্ন প্রকারের হত, আমার বক্তব্য তখন। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রাহু নাইটদের পরামর্শক্রমে বিত্তবান শ্রেণী-গুলির প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত সংবিধান কোনক্রমেই কংগ্রেসের প্রচারিত আদর্শের বাহক হতে পারে না।

১৯৪৫ এবং ১৯৫১ সালের নির্বাচনের ঘোষিত কর্মসূচিতে কংগ্রেস নিজ দলের লক্ষ্য হিসাবে “কোঅপারেটিভ কমনওয়েলথ” বা “সহযোগিতা সম্পন্ন জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র” গঠনের উদ্দেশ্য প্রচার করে। সংগে সংগে আবার শ্রেণী-হীন সমাজ স্থাপনের কথাও বলা হত। ১৯৫৭ এবং ১৯৬২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস লড়েছিল “সমাজতান্ত্রিক স্বাধীন সমাজ” প্রতিষ্ঠার কথা বলে। ১৯৬৩ সালে সেই লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়ে হয় “সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র”। কোন সময়েই কিন্তু এই কথাগুলির নির্দিষ্ট কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নি। দলের নীতিসমূহকে অস্পষ্ট রেখেই কংগ্রেস সর্বদা সাক্ষ্য অর্জন করেছে। একমাত্র মোরারজী দেশাই-ই কংগ্রেসের “সমাজতন্ত্রের” মোটামুটি স্পষ্ট একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ১৯৬১ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে উৎখাত হবার পর তিনি বলেন, সমাজতন্ত্র শব্দটি যে অর্থে তিনি ব্যবহার করেন তা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশসমূহে প্রচলিত ব্যবস্থার অমিশ্রণ।

সবাই বলে থাকে, অতীব অস্থায়ী মানুষ হিসাবে মেহরুদর মৃত্যু হয়। চীন-ভারত যুদ্ধ তাঁকে করে দিয়েছিল বিবশ। কিন্তু মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে বঙ্গ সংখ্যক ব্যক্তির হাতে সম্পদ, পুঞ্জীভূত হওয়া সত্ত্বেও মহানবীশ কমিটির প্রতিবেদনই কি তাঁকে কম আশাত দিয়েছিল? সারা জীবন ধরে সমাজতন্ত্রের কথা প্রচার করে এবং ১৭ বৎসর ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পরে তিনি এই কথা মেনে যারা গেলেন যে, তাঁর সরকারের আমলে একদিকে সম্পদ গিয়ে অমেছে সামান্য সংখ্যক ব্যক্তির হাতে এবং অপরদিকে অধিকতর দারিদ্র্যে নিমগ্ন হয়েছে দেশের অবশিষ্ট মানুষ।

নেহরু প্রধান মন্ত্রী থাকাকালীন এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি নিয়ে তাঁর মৃত্যুর চার বৎসর পরে গুয়ার মিরডাল এশিয়ান ড্রামা গ্রন্থখানি লেখেন। উক্ত গ্রন্থে মিরডাল বলেছেন: “নেহরুর সমর্থন এবং কখনো কখনো তাঁর অল্পপ্রেরণায় কংগ্রেসের প্রগতিশীল বুদ্ধিजीवि অংশ তাঁদের প্রগতিমূলক প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করানোর জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করে গেছেন। ... তাঁদের সেই প্রগতিশীল প্রতিশ্রুতি-গুলিকে কংগ্রেস গ্রহণ করেছে। শিল্পপতি ও ব্যবসাদার শ্রেণী সেগুলিকে নীরবে মেনেও নিয়েছে অংশতঃ এই কারণে যে, তারা জানতো প্রস্তাব গ্রহণ করা এবং সেই প্রস্তাব কার্যকর করার মধ্যে রয়েছে বিস্তার কার্যকর। পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, তাদের হিসাব ছিল সঠিক।” ১০

সংবিধান কিংবা আদালতের প্রতি দোষারোপ করে লাভ নেই। কংগ্রেসের স্বেচ্ছা ধারণ করলেও বিত্তবান শ্রেণী এবং ব্রিটিশ ভারতীয় শোষণ তথা রাজনৈতিক দমন পীড়ন প্রথার একনিষ্ঠ সেবকগণ কিছুসংখ্যক সন্ত্রাস্ত্র প্রণোদিত আইন-জ্ঞদের সহায়তায় সংবিধান রচনা করেছেন। কংগ্রেসের

তত্ত্ব অথবা নীতির চাইতে এই সমস্ত আইনজ্ঞের অধিকতর আগ্রহ ছিল আইনের স্বল্প কচকচিতে। বঞ্চিত ও শোষিত মানুষকে মারামুগু ও প্রবঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে মূল নীতিগুলি (ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপলস) অলংকার হিসাবে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলিকে কার্যকর করার ব্যবস্থা নেই সংবিধান। অবশ্য প্রতিটি মানুষকে একটি করে ভোটাধিকার প্রদান করেছে। কিন্তু সংবিধানের প্রকৃত বাধ্যতামূলক শর্তগুলি রচনার ব্যাপারে দেশের মোট জনসংখ্যার ৮৮.৫ শতাংশ মানুষেরই কোন মতামত নেওয়া হয় নি। বিত্তবান শ্রেণীগুলি আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের মৌল আইনের বা বলবৎ করেছে তাই দিয়ে ওই ৮৮.৫ শতাংশ মানুষকে আঠেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ব্রিটিশরা বা সংকলিত করেছিল তার অতিরিক্ত আর বিশেষ কিছু বি. এন. রাও তাঁর বিদেশ সফরে আবিষ্কার করতে পারেন নি। যাতে শ্রমিক এবং কৃষক শ্রেণীর শোষণ অব্যাহত রাখা যায় সেই উদ্দেশ্যেই উক্ত আইনটি ব্রিটিশরা চালু করেছিল। পরিস্থিতি রাজনৈতিক আবহাওয়ার কারণে ব্রিটিশরা জানতো যে, এই শোষণ অব্যাহত রাখতে হবে ভারতীয় বিত্তবান শ্রেণী ও তাদের তৃত্যদের সহযোগিতা দ্বারা। সেই কারণেই বিত্তবান শ্রেণীর লোকদেরই ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছিল। সংবিধান সভার সুদীর্ঘ আড়াই বৎসরের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে স্বাধীন ভারতের সংবিধান। বাস্তবিক পক্ষে এই সংবিধান ১৯৩৫ সালের আইনের প্রায় অবিকল প্রতিরূপ। ব্যক্তিক্রম শুধু এই যে, শাসন ক্ষমতায় নৃপতিদের কোন স্থান নেই। বিধের আর কোন দেশের সংবিধান আমাদেরটার মত এত বিশাল কলেবর নয়। এমন বিশাল বপু হওয়া ছাড়া আর উপায়ও ছিল না কোন। কারণ, অতি বঙ্গ সংখ্যক নৃপতি তথা “বিত্তবান” শ্রেণীর সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তা প্রদানকারী বিভিন্ন শর্তসহ কত কিছু অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছে এর মধ্যে এবং একদিকে জনসাধারণকে অধিকার দিয়ে অন্যদিকে আবার সেই অধিকার খর্ব করার বন্দোবস্তও করতে হয়েছে।

ভারত মহাদেশে তুল্য একটি দেশ। নোভিয়েত ইউনিয়নকে বাদ দিলে যুরোপের বা আয়তন, ভারতের আয়তন তার চাইতেও বড়। এর উপরে রয়েছে বিভিন্ন ভাষা এবং বিভিন্ন ভাষা-ভাষী অঞ্চলের মধ্যে সংস্কৃতি, রীতি মীতি, আচার ব্যবহার, শোষক পরিচ্ছদ ইত্যাদি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈষম্য। এই বৈষম্যের কারণেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে কংগ্রেস প্রকৃত অর্থেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলত এবং ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত নির্দিষ্ট ভাষা-ভাষী জনসমষ্টি-গুলির এমন কি বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করত। কিন্তু ক্ষমতা হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাঁদের অভীতের প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হন। ব্যাপার দেখে মনে হয় যেন সম্পূর্ণ জাতীয় আন্দোলনটিকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল প্রতারণামূলক প্রচারের উপর। ১৯৩৫ সালের আইনে ব্রিটিশরা প্রদেশ-গুলির ক্ষমতা বতখানি সীমিত করে দিয়েছিল, আমাদের সংবিধান তার চেয়েও বেশী সীমিত করে দিয়েছে রাজ্য-গুলির ক্ষমতা। কোন কোন দেশের পৌর সংস্থাগুলি পর্যন্ত আমাদের দেশের রাজ্যগুলির চাইতে অধিকতর ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। আধিক দিক থেকে তাদের সম্পূর্ণভাবে পছন্দ করে ফেলা হয়েছে। অষ্ট জনকল্যাণমূলক সমস্ত কাজের দায়-দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের উপরে। রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের করে ফেলা হয়েছে কেন্দ্রের করণার উপরে নির্ভরশীল।

সম্প্রসারণযোগ্য প্রায় সব কটি রাজ্যের উৎসই কেন্দ্র আশ্রয় করেছে। অধিকতর তার রয়েছে নোট ছাপাবার একচেটিয়া অধিকার। প্রতিবৎসর সেই একচেটিয়া অধিকারের পূর্ণ সুযোগ কেন্দ্র গ্রহণ করে থাকে। ক্ষমবর্ধমান অবস্থায় রাজ্যসমূহের বাজেটকে নিয়মিত ভাবে তহন

করে দিচ্ছে। অব্যাহত বৃদ্ধির এই চাপ সহ্য করতে হচ্ছে জনসাধারণ তথা রাজ্যগুলিকে। আর-বারের, সমতা রক্ষা করা তাদের পক্ষে হয়ে পড়েছে চিরন্তন সমস্যা। কেন্দ্রের তহবিলে অর্থের অভাব নেই। সেই অর্থ দিয়ে তার কর্ম-চারীদের জীবনযাত্রার উর্ধ্বগামী মূল্যের কলে অতিরিক্ত ব্যয়ের খানিকটা অন্ততঃ কেন্দ্র ক্ষতিপূরণ করতে পারে এবং করছেও। রাজ্যগুলির সে উপায় নেই। কারণ, নিজেরা তারা নোট ছাপাতে পারে না। কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া মেটাতে তাদের জনকল্যাণ এবং জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্ম-সূচির কাট-ছাঁট করতে হয়।

অর্থনৈতিক নীতির ব্যাপারেও রাজ্যগুলি অসহায়। কেন্দ্র তাদের হাত পা বেঁধে রেখেছে। স্বাধীনতার পর এই কয়েক বৎসরে তাদের স্বপ্নের বোকা হয়ে উঠেছে অসহ-নীয়। তড়িঘড়ি আমাদের নেতৃবৃন্দ, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রথা অমিশ্রণে সব ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে তুলে দেন। রাজ্য-গুলিকে করে ফেলা হয় অতীব দুর্বল। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের মধ্যে যদি বিরোধ ঘটে থাকে তার প্রধান কারণ হল রাজ্য-গুলির অর্থনৈতিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা। এই সীমাবদ্ধতার কারণেই রাজ্যগুলি তাদের শাসনতান্ত্রিক দায় দায়িত্ব পালন করতে অসমর্থ হয়ে পড়েছে।

কীভাবে এবং কীপরিমাণে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আদায়কৃত কর ও গুদামসুদ কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে ভাগাভাগি হবে তথা রাজ্যগুলির অংশ তাঁদের মধ্যে বিত-রিত হবে তা নির্ধারণের ব্যাপারে সংবিধান অমিশ্রণে অর্থ কমিশনই হল সর্বসর্বা। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হিসাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বিবে-চনা অমিশ্রণে কেন্দ্র কর্তৃক অমিশ্রণে দেবার ব্যবস্থা আছে। সংবিধানে পরিকল্পনা কমিশন সত্ত্বেও কোন উল্লেখই নেই।

১৯৫০ সালে এক প্রশাসনিক আদেশ অমিশ্রণে পরি-কল্পনা কমিশন গঠিত হয়। অর্থনৈতিক কমিশন একটি অ-রাজনৈতিক সংস্থা। পক্ষান্তরে পরিকল্পনা কমিশন হল ভারত সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রকের অধিকার এবং অত্যা-ধিক ক্ষমতাসালী একটি মহাকরণ বই কিছু নয়। সংবিধান (শেবাংশ ১৮শ পৃষ্ঠায়)

হিরিয়ানার গ্রামের কাহিনী

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

সেই অসহায় অবস্থায় তারা দেখতে পায় দূরে গ্রাম থেকে কৃষকরা পিপলির দিকে ধরে আসছে। এস ডি এম পালিয়ে হান হেড কোর্টারের সংগে যোগাযোগ করার অজুহাতে। কয়েকজন সাব-ইন্সপেক্টরও একই রাস্তা ধরেন। শীঘ্রই ৮০ হাজারের এক কৃষক জনতা লাঠিদোঁটা নিয়ে চারদিক থেকে হেঁ হেঁ করে এসে পড়ে। উপস্থিত জনতার মধ্যে দুই তৃতীয়াংশের বয়স পঞ্চাশের ওপরে। তারা বলতে থাকে, “আমাদের জীবন শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের শীঘ্রই মরতে হবে। ডাক্তারদের হাতে মরার চেয়ে ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়ে মরা ভাল। আমরা আমাদের ছেলেদের শিকার হতে দেখতে চাই না।”

কৃষকরা পুলিশকে আক্রমণ করে এবং তাদের গাড়ি পুড়িয়ে দেয়। অনেক পুলিশ পালিয়ে যায়। রিজাক রাম নামে এক কংগ্রেস নেতা এবং হুলতান নামে একজন কংগ্রেস এম পি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তারা জনতাকে বলেন, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী চলবে, কিন্তু কোন অবরুদ্ধতা করা হবে না। জনতা তাদের কথা শুনে চায় না। তারা তাঁদের মারধোর করে এবং গাড়ি পুড়িয়ে দেয়।

নিকটস্থ গ্রামে তাদের অতিথি ও প্রয়োজনের বন্ধুদের জন্য ঢালাও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কৃষক রমণীরা বাস্তব ধারে চাপাটি তৈরী করতে লেগে যায় এবং নিকটস্থ গ্রাম থেকে খাদ্যদ্রব্যও আসে। আরগাটা মেসার চোহারা নেয়। জিন্দাবাদ ধনি ওঠে। কৃষকরা দুদিন দু’রাত্রি অপেক্ষা করে। কিন্তু পুলিশ ও ডাক্তাররা উধাও।

স্থায়ী সরকার

(১৪শ পৃষ্ঠার পর)

১৬। সমাজতন্ত্র—উত্তরপ্রকার সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীনে দেশী এক-চক্রিয়ার ভিক্টোরিয়ার ব্যবস্থাপনা।

১৭। সার্বভৌমত্ব—জনগণের সার্বভৌমত্ব অবশ্যই নয়; তবে কার? সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের ভারতবর্ষসহ গোটা বিশ্বকে লুণ্ঠন করার ব্যবস্থার ভারতের শাসক-শ্রেণীর জুনিয়ার পার্টনারশিপ। সবল কিংবা দুর্বল প্রায় সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসহ দুই মহাশক্তির সঙ্গে অসংখ্য বোম্ব কামিশন ও বোম্ব কাউন্সিল ভারতই সর্বশেষ দৃষ্টান্ত মাত্র।

১৮। ডিসিপ্রিন—মালিকশাহীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক শাসনের বেসীমুলে আত্মহত্যার ডিসিপ্রিন।

তাইতো নতুন করে ১৫ লক্ষ কর্ম-

নির্বাচনের তাৎপর্য

(১৩শ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আমাদের দেশে শাসক পার্টি প্রতিবারই নির্বাচনের সময় তার গদির সুবিধে গ্রহণ করে। নির্বাচনের প্রস্তুতি বড় করে বলা হয়। জনগণের মেজাজ প্রেত নিরাপত্তা তো জনগণই, যে জনগণ শ্রীমতী গান্ধীর শক্তির উৎস বলে কথিত। অথচ বার বার বিরোধীরা হুম্ব, অবাধ নির্বাচনের প্রস্তাব রাখেন। তাঁদের বৈধের উপর পুনরায় আমি প্রশংসা জানাচ্ছি। কারণ অবস্থা এমন জটিল যে এখন কিছু করার নেই। কারণ গণতান্ত্রিক চেতনার অজ্ঞ যে ব্যাপক শিক্ষার দরকার এই পৃথিবীর প্রেত নিরক্ষর দেশে তা নেই। বস্তুত অনশনে-অর্থাৎ নিমজ্জিত দুই দুঃস্থের মাহুকের কাছে নির্বাচনের কোনো বাস্তব তাৎপর্য নেই। এই ভোটের তাৎপর্য শুধু শহরকেন্দ্রিক অভিজাত ও মধ্যশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমাদের দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এই সীমাবদ্ধ শ্রেণীচেতনার দৃষ্টান্তে বাধা। এই সীমাবদ্ধ চেতনাকে আশ্রয় করেই আজো পর্যন্ত আমাদের নির্বাচন পর্ব চলছে। এই বাস্তব অবস্থার কারণে দুই দুঃস্থের অজ্ঞ মাহুকের ব্যবহৃত হবে। যে তাকে অধিক ব্যবহার করতে পারবে তারি জয় হবে।

যথার্থ গণতান্ত্রিক চেতনার আলোকে হুম্ব অবাধ নির্বাচনের অজ্ঞ আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে যেটুকু সুযোগ রয়েছে তাকে স্বেচ্ছাবে ব্যবহার করতেই হবে।

চ্যুতের রাস্তায়ের তালি মারার ব্যবস্থা হল গত ১১ মাসে। দেড় লক্ষ মাহুকের বাঁচাবল হল, লক্ষ লক্ষ চারী অমিচ্যুত হল, সরকারী ব্যক্তিচারের মন্দির-গুলোতে বিগ্ৰহদের টাকার মালার পুজো দিয়ে কত লোককে অহরহ ডিসিপ্রিনের সার্টিকিট নিতে হল; গণতান্ত্রিক লম্বাজতন্ত্রের সাজোয়া ও শিকারী বাহিনীগুলো সারাদেশে রক্তবাক সাধারণ মাহুকের অত্যাচার, অন্যায় ও ব্যক্তিচারে কোপঠাসা করে রেখেছে, খোদ শাসক শিবিরের অত্যন্তরও প্রাণহানি রক্তপাত হয়েছে। ক্রমে, সাধারণ পঞ্চাচরী থেকে শুরু করে নরাদিরী, মন্ত্রিসভা পর্যন্ত সমস্ত মাহুকের পদাধার ও সন্দেহের কয়েদী হয়ে চমকে চমকে উঠছিল। বলা যায়, শ্রীমতী গান্ধী নিজের চারিদিকে যে সংশয় ও অবিবাসের কালো-ছায়া দেখেছিলেন, তাকেই সারাদেশে নিশ্চিন্তরূপে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। আর আপনাদের জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক অবিবাস ও সন্দেহের বিষবাপ ছড়িয়ে দিয়ে, পচনশীল পুঁজিশাহীর রাজপ্রাসাদ থেকে হুকারসহ রণসজ্জা করে চলেছেন।

এ গণতান্ত্রিক সন্ত্রাস-কর্মচারীকুল সকাল দশটার আগেই হাজিরা দিয়ে কোন্ যত্ন আত্মার উদ্দেশে তর্পণ করবেন?

১১। অহুশাসন—ক) “অ হ ম একমেবাদিত্যীয়ম্” “মামেকং স্বরণং ব্রজ”—অর্থাৎ “আমিই একমাত্র সত্য, একমাত্র প্রেত,” “আমার পতাকা বয়ে নিয়ে চল।” খ) চিন্তাশ্রী, বস্তুব-ধর্মী সকল শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির দেশ থেকে নির্বাসন। গ) তামাম দেশবাসীর মস্তিকে বিস্তৃত “ব্ল্যাক-আউট”। ঘ) একমাত্র “অঙ্গীল ‘সাহিত্য’র উল্লসিত অভিসার।

২০। শিক্ষা-বিপ্লব—প্রথমে গণ টুকাটুর নৈরাশ্যবাদ, অতঃপর অনন্ত নৈরাশ্যবাদ।

বেগামাল মালিকশাহীর শেষ আশ্রয় চিনি-মাখা বুলেট, আর তখনই আসে আইনের খাতার অশান-চণ্ডালের পদাবলী।

বিশ দফা কর্মসূচীতে যে অশানের আমন্ত্রণ রয়েছে তার প্রত্যন্তর দিতে হবে। দেবীতে হলেও এগুলোকে প্রতিরোধ করতে হবে; অবশ্যই এগুলো ত্যাগিত যত বাড়ে, প্রতিরোধের শক্তিও ততই বাড়ে। মানব ইতিহাসে জনগণ—এবং একমাত্র জনগণই স্থায়ী শক্তি; কোটি কোটি শক্ত হাতে এ অশানহুঙ্কার অশান দেবতাকেও ইতিহাসের অঙ্গালে নিক্ষেপ কর।

আমরা কি তবে তলিয়ে যাব

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

সরকারী পুষ্টপোষকতার মহীকর হয়েছে। ভারতের পাবলিক সেক্টরটিও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে, কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরটাই বয়োবুদ্ধ তথা জ্ঞানবুদ্ধ। রাজনৈতিক দলগুলোর কোষাগার তো তারই দানপুষ্ট। সেই কার-খেয়টি বশিষ্টের হবে না বিশ্বামিত্রের হবে এই তো আমাদের অর্থনৈতিক চিন্তার প্রথম ও শেষ কথা। ক্যাপিটালিষ্ট ইকনমিকে সন্তুলে বিনষ্ট করে সোশিয়ালিষ্ট ইকনমির বুদ্ধরোপণ জাতীয়তাবাদী দলগুলির একটিরও কল্পনায় নেই। সাম্যবাদী দলগুলি মুখে বলে বটে ও কথা, কিন্তু তাদের মনের কথা হলো, “মরিতে চাহি না আমি স্বপ্নের ভুবনে।”

ধনতান্ত্রিক ইকনমিকে বাঁচতে দিয়ে বাড়তে দিয়ে সমাজ-তন্ত্রী ইকনমি তার স্থান নিতে পারে না। শূন্যতা বেধানে নেই পূরণও সেখানে নেই। কতকগুলো কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করাই সোশিয়ালিষ্ট ইকনমি নয়। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে ও পশ্চিম জার্মানীতে বিস্তার প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ ইতিমধ্যে পাবলিক এন্টারপ্রাইজ হয়েছে। এদেশেও হয়েছে, আরো হবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ধনতন্ত্রের যুলোচ্ছেদকারী নয়। অজ্ঞ প্রক্রিয়ার অজ্ঞ কেউ প্রস্তুত নয়।

এই যে দেশের অবস্থা সে দেশে হঠাৎ সাত তাড়াতাড়ি সংবিধান সংশোধন হয় কেন? হয় যদি তো এমন ঝাড়ে যুলে হয় কেন? একসঙ্গে ৫১টা সংশোধন। আমি এখনো কাগজপত্র পাইনি, সব কিছু পড়ে দেখিনি। মোটামুটি এই পর্যন্ত বুঝি যে পার্লামেন্টকে ১৯৫০ সালের সংবিধানে সোভারেনটি অর্থাৎ সর্বময় ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, হুতরাং ১৯৭৬ সালে তাকে সর্বশক্তিমান করতে হবে। এতে বাধা দিচ্ছে কে। দিচ্ছে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট। হুতরাং করতে হবে তাদের গর্ব ধ্বংস। পার্লামেন্ট বাই বলবে তাই বেদবাক্য, যা-ই করবে তাই শিরোধার্য। বাইরে পার্লামেন্ট যদিও আপনাকে সর্বশক্তিমান বলে জাহির করছে কার্যত পার্লামেন্ট হচ্ছে মন্ত্রী পরিষদ বা একজিকিউটিভের আত্মবাহ। তার যেটুকু স্বাভাব্য সেটুকু শুধু বিরোধী দলের ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতার নিবন্ধ।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে পার্লামেন্ট নয়, মন্ত্রিসভা বা একজিকিউটিভই এই জাতিবিশ বছর পরে সোভারেনটি করায়ত্ত্ব করল। আর এক নম্বর অন্তরায় জুড়িশিয়ারি। তাকে সে পার্লামেন্টের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে অবনমিত করেছে। দুই নম্বর অন্তরায় রাষ্ট্রপতি। ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী কনভেনশন অনুসারে তিনি কখনো মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেন না, কিন্তু ইচ্ছা করলে তিনি আপত্তি জানাতে পারেন, ভিন্ন পরামর্শ দিতে পারেন, দেরি করিয়ে দিতে পারেন। এখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি কনভেনশন গেল। তিনি আর উচ্চবাচ্য না করে অবিলম্বে মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্তে সায় দেবেন।—নয়তো বলবেন, “ছেড়ে দে, মা, কেন্দ্রে বাঁচি।” পদত্যাগ করবেন।

এক ভিলে দুই পাখী মারার পর বাকী থাকে আরো এক পাখী। তার নাম প্রেস। যদিও ফাণ্ডালমেণ্টাল রাইটগুলো যেমনকে তেমন থেকে যাচ্ছে তবু তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে একপ্রকার ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপল। সেইমুখে প্রবেশ করবে প্রেসের উপর কড়া পাহারা। সংবিধানের নবম তফসীলে প্রেসের স্বাধীনতার পরিপন্থী একটি আইনকে ইতিমধ্যেই কয়েম করা হয়েছে। লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশক, সম্পাদক সকলেই প্রহরাদীন। কার যাড়ে ক’টা মাথা কে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করবে। বন্ধিও সেটা তার মৌল অধিকার।

গণতন্ত্রের উপর অশুশের কাজ করে জুড়িশিয়ারি, কাজ করে প্রেস, কাজ করেন পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে শাসিত দেশের রাষ্ট্রপতি। এক এক করে প্রত্যেকটি অশুশকে কটকের মতো সরালে যেটা থাকবে সেটা নিরক্ষর ও নিষ্কটক একজিকিউটিভ। আর তার বশব্দ পার্লামেন্ট।

ক্ষমতার এতখানি কেন্দ্রীকরণ কি ভালো। আরো ধারণা হবে যখন বনসম্পদও একই কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হবে। সোভিয়েট রাশিয়া বা গণচীনের মতো।

পার্লামেন্টের দুই তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়া আর সারা দেশের নাগরিকদের দুই তৃতীয়াংশের সম্মতি পাওয়া এক এক জিনিস নয়। সাধারণ নির্বাচন যতদিন না হয়েছে ততদিন এই রায় জনগণের রায় বলে মেনে নিতে পারা যাবে না। জনগণের নাম করে যা খুশি করলেই যে জনগণ সায় দেবে এটা একটা বিলম্ব। একদিন না একদিন ধরা পড়ে যাবেই যে এটা জনগণের স্বার্থও নয়, সম্মতিও নয়।

জনগণের স্বার্থ হচ্ছে নিরপেক্ষ স্বাধীন বিচারকমণ্ডলী। জনগণের স্বার্থ হচ্ছে নিরপেক্ষ স্বাধীন সংবাদপত্রসমূহ। জনগণের স্বার্থ নিরপেক্ষ স্বাধীন বুদ্ধিজীবীসমূহ। জনগণের স্বার্থ এমন একজন রাষ্ট্রপতি যিনি কোনো দলবিশেষের ইচ্ছার পরিচালিত কিংগারহেড নয়, যিনি ইংলণ্ডের রাজার মতো সর্বসাধারণের জ্ঞান ও আত্মভাজন নিরপেক্ষ স্বাধীন সজ্জন। তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না, কিন্তু বিমত হতে বিধাবোধ করবেন না। জাতীয় স্বার্থ যদি তাঁকে পদত্যাগ করতে বলে তবে তিনি পদত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকবেন।

আমরা সাহিত্যিক হই না হই আমরা এদেশের নাগরিক। হুতরাং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা দেবও ভাবনা চিন্তা স্বাভাবিক ও ভাবনা চিন্তার প্রকাশ সত্যসত্য। কিন্তু যেটা স্বাভাবিক সেইটেই এখন অস্বাভাবিক ও যেটা সত্যসত্য সেটারই প্রকাশ এখন অজ্ঞায়। আমরা বারো স্বাভাবিকতায় ও সত্যসত্যতার অত্যন্ত তাড়ের পক্ষে এই আবহাওয়ার নিঃশাস গ্রহণ কষ্টকর। যেটা বুক ফুলিয়ে করতে পারতুম সেটা চোরের মতো চুপি চুপি করতে হচ্ছে। হাইকোর্টের প্রাক্তন মুখ্য বিচারপতি, সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র জ্যাজডোকেট এঁরাও তত্ব। খেলার নিয়ম যেভাবে বদলে দেওয়া হচ্ছে তা দেখে একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আশঙ্কা করছেন যে এদেশে প্রচলিত রোমান জুরিস-প্রুডেন্সটাই পরিভ্রান্ত হবে। তার আয়গায় কোন্টা প্রবর্তিত হবে, কে জানে। মোগল জুরিসপ্রুডেন্স না সোভিয়েট জুরিসপ্রুডেন্স।

এঁদের কাউকেই আমি কোনো আশার বাণী শোনাতে পারিনি, কারণ আমি নিজেই অন্ধকারে পথ খুঁজে চলেছি। নাগরিক হিসাবে আমিও এঁদেরই মতো সব কিছুর অজ্ঞ প্রস্তুত। তবে আমার আরো একটা সত্তা আছে। সেটা সাহিত্যিক সত্তা। বিস্তৃত সাহিত্যের কাজ নিয়ে থাকলে আমিও বিনোবাজীর মতো রাজনীতি বা আইন কাহন সম্বন্ধে মৌন থাকতে পারি। এখন পর্যন্ত আমার বিস্তৃত সাহিত্যিকত্ব তেমন কোনো বাধা আসেনি। প্রাক্সেনসর-শিপের কল্যাণে একটি গল্পের আসল মর্মটাই বাঁদ পড়েছিল। যখন বই হয়ে বেরোবে তখন সেটা ভুলে দিতে পারা যাবে। এখনো পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রাক্সেনসরশিপ জারী হয়নি। কিন্তু পরে সেসব করা অসম্ভব নয়। বই বাজেয়াপ্ত হতে পারে। ছাপাখানা বন্ধ করে দেওয়াও সম্ভব। সেই যে একটা কথা আছে Damocles-এর খণ্ড। এটাও সেইপ্রকার একটা গ্রহণ। প্রহরীর তদ্বা-বধানে প্রহরের ভয়ে লেখা কি স্বাধীনভাবে লেখা? স্বাধীনতাই হচ্ছে সেই লবণ যার অভাবে সব স্বাধীনই বিস্বাদ।

স্বাধীনতা কিরে না পেলে আমি নির্ভয়ে লিখতে পারব না। যাই লিখি না কেন। সংবিধান সংশোধন দ্বারা করে-ছেন তাঁরাও কি নির্ভীক থাকতে পারবেন, যদি শাসনযন্ত্র একদিন এমন একটি দলের হাতে পড়ে যে দল তাঁদেরই অজ্ঞ তাঁদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করবে? গণতন্ত্র ভিক্টোরিয়ার পেরিণত হলে শিকার হবে গণতন্ত্রীরাই। তাঁদের প্রাণে ভয়ভর না থাকতে পারে, আমাদের প্রাণে আছে। আজকের এই অবস্থা যদি চিরস্থায়ী হয় তবে আমরা রামন বা মেঘ বনে যাব। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এ সঙ্কট ছিল না। আমাদের জীবনেও ছিল না। এখন দেখা দিয়েছে। আমরা কি তবে তলিয়ে যাব?

দর্পণ ॥ শুক্রবার ১১ই মার্চ, ১৯৭৭

আসল চেহারা

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

তা একই-ভাবে ধরে পড়ছে। পড়বে যে লেখক শ্রীমতী গান্ধি নিজেই মনে মনে জানতেন। এর কারণ বুঝতে পারা কঠিন নয়। জাফর ১৯৭৬ এ রিভার্ভ ব্যাংকের গ্রামীণ সমীক্ষা বিভাগ ১৩টি ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন নমুনা এঙ্গেলি প্রজেক্টের সমীক্ষা ফল প্রকাশ করেছে। এই সমীক্ষার বলা হয়েছে ১৩টির মধ্যে ১০টি প্রকল্পে ক্ষুদ্র প্রজা চাষীদের এই প্রোগ্রামের আওতার বইরে রাখা হয়েছিল কারণ জমির মালিকেরা এই ভেবে তীব্র ভাবে এই প্রকল্পের বিরোধিতা করে ছিল যে 'এর দ্বারা এঙ্গেলি পাচ্ছে চাষীদের নাম জমির মালিক হিসেবে নথিভুক্ত করে'। সমীক্ষার ব্যাখ্যা বলা হয়েছে যে, 'বেশীর ভাগ প্রজার সংগে মৌখিক বন্দোবস্ত কারণ প্রজাধ্বংস বাতিল করে দেওয়া হয়েছে'। সমীক্ষার মন্তব্যে বলা হয়েছে যে 'এস এফ ডি এ প্রকল্পে বিরাট সংখ্যক ছোট চাষীকে বাদ দিয়ে শুল্কসংখ্যক বড় চাষীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে'। রিভার্ভ ব্যাংকের সর্বশেষ মন্তব্য এই যে, এই সব সম্পর্কিত ইতি এড়াতে গিয়ে এস এফ ডি একে বাস্তববাদী হতে হয়েছে। এ বিষয়ে শ্রীমতী গান্ধির সহায়ত্ব থাকে অসম্ভব নয় কিন্তু এই অবস্থায় প্রতিরুদ্ধ 'বিশেষ প্রকল্পগুলির' হাল কী হবে বলা দুঃস্বপ্ন। এই রূপে হাল ধরে আছে সেই শতকরা ১০ ভাগ কৃষক যারা শতকরা ৬০ ভাগ জমি দখল করতে পেরেছে।

মে ১৯৭৬এ রাজ্যসভায় প্রদত্ত কৃষিমন্ত্রকের কর্মতৎপরতা সম্পর্কিত প্রতিবেদনে কঁাহনি গাওয়া হয়েছে যে, 'ভূমিসংস্কার সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলিকে কার্যকর করার জন্য যথেষ্ট রাজনৈতিক সচেতনতা তৃষ্টি করা যায় নি (জরুরী অবস্থার পরেও)'। জানি না কোন বিবেকবান সরকারী আমলা প্রতিবেদনটির খসড়া করেছিলেন বা রাজ্যসভায় উপস্থাপিত করার আগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভার এটি পড়ে দেখেছিলেন কিনা। ব্যাপার যাই হোক উক্ত আমলা ভ্রষ্টলোক নিশ্চয়ই স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করছিলেন কারণ ভূমিসংস্কারব্যবস্থা করার জন্য শ্রীমতী গান্ধির দলের 'রাজনৈতিক ইচ্ছা'-র প্রয়োজন হয় না—প্রয়োজন 'রাজনৈতিক যত্ন' ইচ্ছার'। সর্বশেষ বিচারে কংগ্রেস দলের গ্রামীণ ভিত্তি হল বৃহৎ চাষী এবং জমির মালিক। তাদের পক্ষে ভূমিসংস্কারকে কার্যে পরিণত করার মানে হল নিজের পারে কুড়ুল মারা বা হারাকিরি করা। কংগ্রেস দলের ঐক্য সমর্থক এবং ভিত্তি কারা সে সম্পর্কে আরো দৃষ্টান্ত পেতে হলে ভূমিহীন চাষীদের অবস্থাটা পর্যালোচনা করলেই চলবে। পাঁচ কোটির উপর ভূমিহীন কৃষক অনাহার সীমারেখার বাস করে। বড় বড় কথা বলে আসার মত করা ছাড়া কোন কংগ্রেস নেতারই এ বিষয়ে করার কিছু নেই। হুড়ি দফা কর্মসূচীতে শ্রীমতী গান্ধি ধাক্কা করে ঘোষণা করলেন যে, 'নিয়ন্ত্রিত কৃষিমজুরি সম্বন্ধে আইন করা হবে'। কিন্তু গুজরাট ও তামিলনাড়ু এই দুটি বিরোধী শাসিত রাজ্য ছাড়া আর কোথাও এমন কোন আইন পাশ হয়নি। জরুরী অবস্থাকালে কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত কৃষিমজুরি সম্পর্কে আইন পাশ করতে পারত। কিন্তু না করতে পারার জন্য কংগ্রেস বাবড়ায় না—অন্যদিকে মনোহর রেড্ডি রাজ্যসভায় জানিয়েছেন যে, 'কৃষিমজুরি সম্পর্কে কোন জাতীয় নীতি উদ্ভাবনের চিন্তা সরকার ত্যাগ করেছেন'। যখন কৃষিমজুরিদের কোন সংগঠন দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে, স্বতন্ত্রি তাদের মোকাবেলা করে, পুলিশ এবং ধনীচাষী কংগ্রেসীরা তখন তাদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়। জরুরী অবস্থার পরে মিসা হয়েছে তাদের কাছে 'স্বর্ণের আশীর্বাদ'।

২০ দফা কর্মসূচীর আর একটি চর্চানিনাদিত বিষয় বার দ্বারা শ্রীমতী গান্ধির দলের শহরে ভিত্তি এবং সমর্থকেরা কীস হয়ে পড়েছে তা হল 'নিজে নিজের আর প্রকাশ করার প্রকল্প' (ভাসাটেরি ডিস্কোজার কীম)। পরিকল্পিত হয়েছিল কালো টাকা উদ্ধার করার জন্য কিন্তু কার্যত হয়ে দাঁড়াল কালো টাকাকে সাদা অর্থাৎ আইনসম্মত করার কৌশল। অবশ্য কংগ্রেসের কয়েকটি মাক্সি দল এর দ্বারা ধনী ব্যবসারী শ্রেণীর রক্তবহুল ধনীতে নথ বসানোর স্বপ্নবৃষ্টি পেয়েছে।

এক অর্থে এই 'নিজের আর নিজে কীস করার' নীতির দ্বারা কর্মসূচীর একটি দফাকে পুরো নষ্ট করা হয়েছে। কারণ ২০ দফা কর্মসূচীর ১১ নং দফায় বলা হয়েছিল যে, সম্পত্তির অস্থায়ী বোধ এবং কর-কীকি দাতাদের দ্বারা বিচারের জন্য বিশেষ স্কোয়াড গঠন করা হবে। কিন্তু ভাসাটেরি ডিস্কোজার কীমের দ্বারা গভ্যাস্তিক মার্গলাই তুলে দেওয়া হল—'সরাসরি বিচার' এবং 'বিশেষ স্কোয়াড'—এর কথা বলা বাহ্যিক মাত্র।

ভাসাটেরি ডিস্কোজার কীমে কালোটাকার এবং হিসাব-বহিষ্ঠ সম্পত্তির মালিককে ঘোষণা করতে হয় তার কত সম্পত্তি বা টাকা আছে। তারপর নানা

রকম ছাড় বাদ দিয়ে সরকার কালো টাকার ২৫% এবং হিসাব-বহিষ্ঠ সম্পত্তির মাত্র ১% সংগ্রহ করতেন। এই প্রাথমিক ঘোষণার পর জমায়েত সাময়িক ঘোষণা করে এর সংজ্ঞা পাল্টান হয়েছে। কেবল একটি কথা অনাস্তিক বলা হয়েছে—'মিল্লী মাতাজী ইচ্ছা যেন ঘোষিত অঙ্কের পরিমাণ বেশ মোটা হয়'। বাদের ঘোষণা করার মত লুকনো টাকা নেই তাদেরকেও মাতাজীর খুশির জন্য আর ঘোষণা করতে উপরোধ করা হয়েছে যেমন বেতনভুক্ত কর্মচারীরা।

লোকে হতভম্ব হয়ে ভাবতে থাকল—এটা আর ঘোষণা, না দক্ষিণা? উত্তর পরিষ্কার হয়ে গেল, আপাতত অর্থ ঘোষণা, অন্তত সরকারী ভাবে। একজন কবার ঘোষণা করতে পারে? উত্তর—যতবার খুশী কেবল ঘোষণাটি কোন একজনের পক্ষে হলেই হল। পুত্র, কন্যা, কুসু, বেড়াল ইত্যাদি বাদে এর সংগে কোন সম্পর্ক নেই, তাদের পক্ষেও কি তিনি ঘোষণা করতে পারেন? উত্তর হল—হ্যাঁ, যদি তারা 'আত্মীয়' হন। তবু পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সন্দেহ ছিল না। সেই জন্য দুটি অস্থায়ী কর্মী জারি করে সেই সন্দেহ নিরসন করা হল। প্রথমটি হল রাষ্ট্রপতির অভিনায় যার দ্বারা সোপর্দ করা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। দ্বিতীয় হল প্রত্যেক কর বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যানের বিবৃতি। ২৫ নবেম্বর ১৯৭৫ বোম্বাই থেকে আরকর কমিশনার তার বিবৃতিতে এর ব্যাখ্যা করে বললেন যে, কালো সম্পদের মূল্য ধার্য হবে এখনকার মূল্য নয়, ভাসাটেরি অ্যাসেসী তার ঘোষণায় যে সময়ে সম্পদ অর্জিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন সেই ভিত্তিতে। অর্থাৎ কেউ ইচ্ছা করলে এই আরকে ১৯২২ সনে অর্জিত বলে দেখাতে পারেন।

ব্যবসাধী মহলে আনন্দের কলরব উঠল। তারা বুঝলেন যে, শ্রীমতী গান্ধি তাদের চামড়া খুলে নিতে পণ করেননি; কালো টাকা নিয়ে জনসাধারণকে তিনি একটা ট্রাক্ট দিতে চান। ঘোষণা শুরু হল ভালই কিন্তু পরিমাণ বেশী নয়। বছর শেষে পরিকল্পনাটি অসিদ্ধ প্রসব করল—১৪৫০ কোটি গোপন আর ঘোষণা থেকে সরকারী কর আদায় হল ২৪১ কোটি। গলা কাটিয়ে জাহির করা হল যেন সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু ঘোষিত আর লুকায়িত সম্পদের মাত্র ১৬%। এই ঘোষণার বিবরণ অর্থাৎ কে, কার পক্ষে, কোন সময়ের জন্য কত পরিমাণ সম্পদ ঘোষণা করলেন সে সম্বন্ধে কোন খবর জানাতে সরকার অস্বীকার করল। কারণ তাতে ঘোষণাকারীরা একটু বিব্রত হতে পারত।

নিজে থেকে লুকনো আর ঘোষণার পরিকল্পনা এই প্রথম নয়—বাহিনীতার পরে এটি হল চতুর্থ। এর আগেও চলেছিল ১৯৬৫ সনে আগের তিনটির কর্মসূচি হয়েছিল শোচনীয়। ১৯৬৫ সনের পরে যে বিপুল পরিমাণ কালোটাকা ব্যবসায়ীদের হাতে জমেছে তার তুলনায় ১৯৭৫ সনের ১৪৫০ কোটি টাকা সম্পদ ঘোষণাকে খুবই অকিঞ্চির বলতে হবে। কেবল তফাৎ এই যে এবারের শর্ত অনেক উদার এবং কারচুপি করার সুযোগও অনেক বেশী। ১৯৭৫ সনের খেচ্ছা ঘোষণায় ২৬০০০ জন ১৪৫০ কোটি টাকার সম্পদ ঘোষণা করেছে আর ১৯৬৫ সনে করেছিল ১৬৪২২৬ জন। ১৯৫১ সনের পরবর্তী ঘোষণার পরিমাণ ছিল ২৬৭ কোটি টাকা। তখনকার শতকরা গড় ছিল ২৩% যা ১৯৭৫ সনে দাঁড়িয়েছে ১৭%-এ যদিও তখনকার আর্থিক ভিত্তি ছিল অনেক কম।

১৯৬৫ সনের বার্ষিকীর খতে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রত্যেক কর অস্থান কমিটি (১৯৭০) রীতি হিসাবে ভাসাটেরি ডিস্কোজার কীম অধ্যয়ন করে নিরলিখিত স্থপাশ করেন যেগুলি শ্রীমতী গান্ধি কর্তৃক পার্লামেন্টে সমর্থিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে লুকায়িত সম্পদ উদ্ধাটন সম্পর্কে কোন সাধারণ পরিকল্পনার অভাব আমরা তীব্র বিরোধী—সে রকম কোন ইচ্ছা আমাদের নেই'।

যুক্তির সারসংক্ষেপ হিসেবে কমিটি নিম্নোক্ত কারণ দেখিয়েছিলেন :

- (১) এই পরিকল্পনার ফলে সংসদে শাস্তি পায় এবং যাদের উদ্ধাটন করার কিছু নেই যেমন বেতনভুক্ত কর্মচারীরা, তাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিক করে।
- (২) অধোমুখিত আয়ের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ছাড়া এর দ্বারা কিছু উদ্ধাটন হয় না।
- (৩) আরকর বিভাগ তাদের দৈনন্দিন আয়কর কীকি ধরে—যে পরিমাণ অর্থ আদায় করে তা এর ২ বা ৩ গুণ।
- (৪) অস্থায়ীকৃত করাপহারী এর দ্বারা পুনর্বাসিত হয় না।
- (৫) বিভাগীয় অফিসারদের অধিকাংশ ভবিষ্যতে আর কোন আর উদ্ধাটন পরিকল্পনা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে দায়বদ্ধ ভাষায় মত প্রকাশ করেছে।

[বেশ বোকা যায় যে, কমিটির এই বিশেষজ্ঞ অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সনের খেচ্ছা ঘোষণা প্রকল্প একটি বিরাট ফাঁট বার তাৎপর্য কিছুই নয়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

আই এম এর রাজ্য সম্মেলনে কংগ্রেসী যুবদের হামলা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার কাটোয়ার ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার ছত্রিশতম সম্মেলনের প্রকৃষ্ট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় যুব কংগ্রেসের মন্তানরা এই সম্মেলন পণ্ড করার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। এই মন্তানদের হামলা ও উপক্রমে সম্মেলনের কার্যক্রম অনেকাংশে ব্যাহত ও বাতিল হয়ে যায়।

সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বের যখন সপ্তাহব্যাপী কার্যক্রমের পরিকল্পনা রচনার জন্য মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের স্থানীয় শাখা তাদের অফিসে মিলিত হয়েছিলেন, তখন একদিন যুব কংগ্রেসের কয়েকজন মন্তান সেখানে চড়াও হয়। তারা উপস্থিত চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে থাকে ও পরে অফিসটি তল্লাশ করে। শেষে স্থানীয় অধিবাসীদের হস্তক্ষেপে তারা ভয়ে পালিয়ে যায়।

যুব কংগ্রেসের গুণীদের এই নোংরামির নিম্নাকরে কাটোয়া মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ প্রচার পত্রের মাধ্যমে একটি কঠোর বিবৃতি দেন। এর ফলে ঐ কংগ্রেসী যুবকেরা কিন্তু হয়ে ওঠে। তারা গোপনে বন্ধন করতে থাকে কিভাবে সম্মেলন পণ্ড করা যায়।

ইতিমধ্যে কাটোয়া কলেজ প্রাঙ্গণে সম্মেলনের জন্য প্যাণ্ডেল তৈরীর কাজ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু ১৯শে ফেব্রুয়ারী প্রধান মন্ত্রীর নির্বাচনী সভার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে এই আয়োজন বন্ধ রাখতে হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের ধারণা যুবকংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের পরামর্শই কলেজ প্রাঙ্গণে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। বাতে চিকিৎসক সম্মেলন বানচাল হয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী সভা স্থানীয় হাসপাতাল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। হাসপাতালের নানা রকম অব্যবস্থা ও রুগীদের দুর্দশা প্রধানমন্ত্রীর চোখের আড়ালে রাখবার জন্য গরীব রুগীদের হেঁড়া ও নোংরা বিছানাপত্র ফেলে দেওয়া হয়। এমন কি অনেক রুগীকে সাময়িকভাবে মর্গে বন্দী করে রাখা হয় বলে জনৈক চিকিৎসক মন্তব্য করেন।

শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর সভা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে (শেবাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়)

বিস্মৃত প্রতিশ্রুতি

(১৫শ পৃষ্ঠার পর)

রচয়িতাগণ অর্থনৈতিক কমিশনকে যে সমস্ত অধিকার প্রদান করেছিলেন পরিকল্পনা কমিশন তার অনেকটাই অবহেলা করে নিয়েছে এবং কেন্দ্র থেকে রাজ্যসমূহে অর্থ হস্তান্তরের মধ্য যন্ত্রপাতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোভসভা মহাকরণের এক সমীক্ষার প্রকাশ, ১৯৫২ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে, অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ১৭ বৎসরে, কেন্দ্র কর্তৃক রাজ্যগুলিতে হস্তান্তরিত অর্থের ৭০ ভাগেরও বেশী ছিল পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে এবং ৩০ ভাগেরও কম ছিল অর্থনৈতিক কমিশনের সুপারিশ অনুসারে। ১১

পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানরূপে ডি. আর গ্যাভিন্স কোন ভিত্তিতে কমিশন এই সমস্ত তথ্যবিলের বিলি ব্যবস্থা করেছে, সে সম্বন্ধে ১৯৬১ সালে অমূল্যমান করেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে, কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নীতি সম্প্রদায়ী রাজ্যগুলিকেই সুবিধা প্রদান করেছে। যাদের আর্থিক “শক্তি সামর্থ্য” রয়েছে আর রয়েছে নিজেদের সম্পদ তারা অধিক সাহায্য পেয়েছে। এই ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন, “[রাজ্যগুলির মধ্যে] বড় ভাই-রাই পাচ্ছে বেশী।” ১২

কমিশন-কিভাবে ছোট ভাইদের চাইতে “বড় ভাইদের” বেশী সাহায্য করে, তার একটি মাত্র উদাহরণই স্ফুট। চিরদিনই পাঞ্জাবকে উন্নত এবং উদ্ভিষ্টকে অল্পমত রাজ্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনার আমলে, ১৯৫১ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত, রাজ্যের পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত মাথাপিছু সাহায্য উদ্ভিষ্টের জন্য ছিল ২০৩ টাকা অথচ পাঞ্জাবের জন্য ছিল ৩৪৩ টাকা। এমন কি চতুর্থ পরিকল্পনাতেও উদ্ভিষ্টের জন্য মাথাপিছু কেন্দ্রীয় সাহায্য ছিল ৭২ টাকা—পাঞ্জাবের চাইতে মাত্র ৬ টাকা বেশী। ১৩ যদিও তখন পাঞ্জাব ভারতের স্বাধিক সম্প্রদায়ী রাজ্য হয়ে উঠেছে। রাজ্যসমূহের পরিকল্পনার জন্য যা কিছু কেন্দ্রীয় সাহায্য সব প্রদান করা হয়ে থাকে পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে।

রাজনৈতিক ব্যাপারে রাজ্যগুলির অবস্থা আরো শোচনীয়। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব কর্তৃক নির্ধারিত পথে বত দিন তারা চলে ততদিন ভয়ের কিছু নেই। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তথা কংগ্রেস সরকার ততদিন তাদের সম্বন্ধে দেখাওনা করে। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে কোন কংগ্রেসসেবী বলতে পারেন কি, অ-কংগ্রেসী কোন সরকারের পথে বাধা বিরোধিতা করতে এবং সেই সরকার খুব বেশী একপন্থে হলে তাকে সরাসরি গদিচ্যুত করতে কংগ্রেস কেন্দ্র তার ক্ষমতার অপব্যবহার করেনি? একেই তো সংবিধান রচনা করা হয়েছে কেন্দ্রের মুখ চেয়ে। তার উপরে বিভিন্ন সময়ে বহু অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করে তার বদলে আপন মনোমত সরকারকে গদিতে বসাতে কেন্দ্র সেই সংবিধানের বিরুদ্ধে ব্যাখ্যা করেছে এবং এইরূপে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সাধন করেছে।

সংবিধান সভায় সংবিধানের উদ্দেশ্য প্রস্তাব পেশ করার সময় নেহরু একটি হৃদয়স্পর্শী ভাষণ প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অবশিষ্ট সমস্ত ক্ষমতা (রেসিডিউয়ারি পাওয়ার) রাজ্যগুলিকে প্রদান করা উচিত। স্বাধীনতা মহলের কারসাজির ফলে নেহরুর প্রস্তাব নিকৃষ্ট হয় বলে কাগজের ঝড়িতে। তিনি নীরবে আত্মসমর্পণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতভারতেও রাজ্যগুলিতাদের নিজেদের রাজ্যপাল নিজেরাই নির্বাচিত করবে, এই প্রস্তাবও একবার উঠেছিল। কিন্তু সেটাকেও বাতিল করা হয়। সংবিধান চালু হবার পর এই বিশ বৎসরে রাজ্যপালদের এমন সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে তাঁরা রাজ্য সরকার-

গুলির সর্বশক্তিমান অধীশ্বর হয়ে পড়েছেন। একই ধরনের সংকটের সময়ে বিভিন্ন রাজ্যপাল এমন সমস্ত বিপরীত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন যে, আজ নির্বাচিত সরকার সম্পর্কে রাজ্যপালের ক্ষমতা যথার্থভাবে নির্ধারণ করার দাবী উঠেছে। বিভিন্ন রাজ্যপাল—যত বিভিন্ন ধরনের পন্থাই অবলম্বন করে থাকুন না কেন, ফল হয়েছে একই—হয় অকংগ্রেসী সরকারের উৎখাত নতুবা অকংগ্রেসী বলগুলিকে সরকার গঠন করতে না দেওয়া এবং কংগ্রেস কর্তৃক সরকার গঠন নিশ্চিত করা। কেন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত রাজ্যপালেরা নিরপেক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বি হিসাবে কাজ করেন নি, করেছেন কেন্দ্রের ক্ষমতাবর কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে। সংকটজনক পরিস্থিতিতে রাজ্যপালেরা কিভাবে কাজ করবেন সে সম্বন্ধে তাঁদের একটি কমিটি এক ভারি প্রতিলেখন প্রস্তুত করেছে। প্রতিবেদনটির মোটামুটি বক্তব্য হল, রাজ্যপালেরা যা করবেন তাই দেশের মানুষকে সংবিধান মার্কিন কাজ হয়েছে বলে মনে নিতে হবে। এমনভাবেই রাজ্যসরকারগুলির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সেই সীমাবদ্ধ ক্ষমতাকেও আবার রাজ্যপালেরা আরো খর্ব করার তালে রয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংকটে এমন সমস্ত সাংঘাতিক লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে যা গণতন্ত্রের স্বীকৃত আদর্শের বিরোধী। রাষ্ট্রপতির শাসন রাজ্যে কতদিন চলবে সেটা কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক সুবিধার উপরে নির্ভরশীল একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নাম করে কেন্দ্র তার নিজস্ব-পুলিশ বাহিনী আমদানি করেছে রাজ্যের মধ্যে। সব চাইতে আশংকার ব্যাপার অসামরিক ব্যাপারে সামরিক বাহিনীর ব্যাপক নিয়োগ। পুলিশকে প্রদান করা হয়েছে বর্ণের ক্ষমতা এবং তাদের কার্যকলাপকে রাখা হয়েছে তদন্তের আওতার বাইরে। বহু লোক নিহত হয়েছে পুলিশের হাতে। বিগত কয়েকমাসের ভিতরে পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ বার বার উন্নত হয়ে জেলের

(১) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, Handbook for Congressmen, নয়া দিল্লী (তারিখবিহীন), পৃষ্ঠা ৯৮।

(২) ১৯৪২ সালের ১২শে সেপ্টেম্বর তারিখে সি. পি. আই.-এর কেন্দ্রীয় কমিটি জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৪৩ সালের মে মাসে সি. পি. আই.-এর প্রথম কংগ্রেস প্রস্তাবটি অনুমোদন করে। উক্ত প্রস্তাবের ৩(এ) ধারার অংশ বিশেষ নিচে দেওয়া হল:

“একই অমূল্যমি রয়েছে আর রয়েছে একই ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি, সাময়িক গঠন এবং অর্থনৈতিক জীবনধারা, এমন ধরনের ভারতীয় জনগণের প্রতিটি অংশকে স্বতন্ত্র এক-একটি জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে: এবং তাদের স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রসভার ভিতরে বশীভূত রাজ্য হিসাবে থাকার অথবা তার থেকে ইচ্ছামুখী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার প্রদান করতে হবে। (প্রস্তাবের পূর্ণ বরানের জন্য Pakistan: Military-Rule or People's power? পরিশিষ্ট ২, পৃষ্ঠা ২৫২-৫৪ দ্রষ্টব্য।)

(৩) The Discovery of India, বোম্বাই সংস্করণ, ১৯২১, পৃষ্ঠা ৫৬৭-৮।

(৪) ডি. পি. মেনন লিখেছেন: “১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কিংবা ১৯৪৭ সালের গোড়ারদিকে বহুভাষাই প্যাটেলের সংগে আমার বিস্তারিত আলোচনা হয়। আমি তাকে বলি, ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অনুসারে ঐক্যবদ্ধ ভারত হল একটি মারা।...কোন ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে সেইটাই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ভারত বিভাগ হলে ডোমিনিয়ন স্টেটস-এর ভিত্তিতে দুটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সহজেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা যেতে পারে। এই বিষয়টির উপরেই আমি সর্বাধিক জোর দেই।...এও বলি যে, ডোমিনিয়ন স্টেটস-এর ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর হলে কংগ্রেস একই সংগে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয়

ভিতরে প্রবেশ করে বহু রাজবন্দী এবং বিচারার্থী যুবককে হয় গিটিয়ে নয়তো গুলি করে হত্যা বা পঙ্গু করেছে। একটি ঘটনারও কোন তদন্ত অতঃ প্রকাশ্য তদন্ত হয় নি। আত্ম বিচাণীর তদন্ত যদি হয়েও থাকে, তার ফলাফল জনসাধারণকে জানানো হয়নি।

কেন্দ্রের হয়তো ধারণা, এই নীতি বাস্তবিক ফল দেবে—মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের প্রভাব হবে খর্ব। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬৯ এবং ১৯৭১ সালের নির্বাচন থেকে কেন্দ্র কোন শিক্ষালাভ করে নি। উচ্চপদস্থ আমলা-বর্গ কর্তৃক সর্বক্ষমতা কেন্দ্রের নীতিকে সমর্থন করাই স্বাভাবিক। ব্রিটিশ আমলে এই শিক্ষাই তারা পেয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের সাবধান হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে একটি মাত্র কথা বলা যেতে পারে—রাজ্যগুলিকে একেবারে ক্ষমতাহীন করার যে নীতি কেন্দ্র গ্রহণ করেছে তা কোনমতেই দেশের ঐক্য বজায় রাখার পন্থা হতে পারে না। অসুদর্শী এই নীতি ক্ষণস্থায়ী ফলদায়ক হতে পারে, কিন্তু কেন্দ্রের প্রতি এতে ঘৃণা কেবল তীব্রতর হবে এবং ভবিষ্যতে মারাত্মক ভাবে বিক্ষোভিত হবে।

পাকিস্তানের ঘটনাবলী থেকে ভারতের এখনো শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সহায়তায় “শক্তিশালী” এককেন্দ্রী সরকার বঙ্গকালের জন্য দেশের ঐক্য রক্ষা করতে পারে। স্থায়ী ঐক্য বজায় রাখার পন্থা ভিন্ন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কংগ্রেস সেই পন্থার কথাই প্রচার করত। ভারত যে বিভিন্ন, বিচিত্র ভাষা ও ভাষাধারার সমাবেশপূর্ণ একটি দেশ তা স্বীকার করে নিতে হবে। রাজ্যগুলিকে বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে তুমুল স্বায়ত্তশাসনের অধিকার। তাদের দিতে হবে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং প্রত্যেক অথবা পরোক্ষ কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা সহ প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার।

সরকারও পেয়ে যাবে।...তাঁর সামনেই আমি এই পরিকল্পনার এক মোটামুটি খসড়া প্রস্তুত করি। খসড়াটি বিশেষ দৃঢ় মারকত লগুনে সেক্রেটারী অফ স্টেট-এর হাতে প্রদানের জন্য প্রেরণ করি।...প্যাটেলের সুনামহানি হতে পারে বলে তাঁর সম্মতির কথাটা আমি সেক্রেটারী অফ স্টেটকে খোলাখুলি জানাতে পারি নি, তবে একথা অবশ্যই বলি যে, কংগ্রেস ডোমিনিয়ন স্টেটস মেনে নেবে একথা বিশ্বাস করার কারণ আমার রয়েছে।...প্রসঙ্গতঃ, ভারতে আসার আগে লগুনে উক্ত প্রস্তাব দেখেছিলেন বলে লর্ড মাউন্টব্যাটেন বলেছেন।” The Transfer of Power in India, পৃষ্ঠা ৩৫৮-৯।

(৫) “১৯৪৭ সালের ১৪ই এবং ১৫ই জুন তারিখে অস্থগীত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় পুরুষোত্তমদাস ট্যাগোরের নেতৃত্বে [ভারত বিভাগ সমর্থনসূচক প্রস্তাবের] তীব্র বিরোধিতা হয়েছিল। কিন্তু ওয়ার্নিং কমিটির সিদ্ধান্তকে মেনে নেবার জন্য গান্ধীজীর সমর্থন না থাকলে প্রস্তাবটি গৃহীত হত না।” J. B. Kripalani, Gandhi: His Life and Thought; ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ২৮৮।

(৬) Mission with Mountbatten গ্রন্থে ক্যাম্পবেল-জনসন ৩১শে মার্চ, ১৯৪৭, তারিখ দিয়ে লিখেছেন: “ব্রিটিশ সরকারের সংগে তাঁর [নেহরুর] আলোচনা আলোচনা এবং হিন্দুস্থানের অস্থগীত ডোমিনিয়ন স্টেটস স্বীকার করা ইত্যাদি অভিযোগপূর্ণ সাংঘাতিক একটি খবর আজ [লগুনের একটি কাগজে] প্রকাশিত হয়েছে।...নেহরু [ক্যাম্পবেল জনসনকে] বলেছেন, সম্পূর্ণ ব্যাপারটি হবে দু দিনের খেলা।” (পৃষ্ঠা ৫০)। যা ঘটেছিল তা মনে হয় এই যে, বহুভাষা প্যাটেলের সম্মতিক্রমে ডি. পি. মেনন ভারত বিভাগ তথা ডোমিনিয়ন স্টেটস স্বীকার করা সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন এবং তিন মাস পূর্বে লগুনে সেক্রেটারী অফ স্টেট-এর নিকট প্রেরণ করে-

(শেষাংশ ১৯শ পৃষ্ঠায়)

দেবী সিদ্ধার্থ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবারও দেবীবাৰু যতদূর সম্ভব জনতা এড়িয়ে বাচ্চেন। কংগ্রেসের জয়ের জন্য টেকনিক্যাল প্রস্তুতি নিয়েই তিনি ব্যস্ত। তাছাড়া টাকাপয়সার তদারিকণ তাঁকে করতে হচ্ছে। কেন্দ্রে তিনি ক্যাবিনেট মন্ত্রী। বৈদেশিক বাণিজ্যের মন্ত্রক তাঁকে দেখতে হয়। তাছাড়া পাট ও বস্ত্র শিল্প তাঁর মন্ত্রকের অধীন। দেবীবাৰুকে পাট ও বস্ত্রশিল্পের মালিকেরা আর রপ্তানি বাণিজ্যের কুই-কাতলারা দেবতা বলে মানেন। দেবীবাৰুর দায়ী তাঁরা মুনাফা লুটবার বড় বড় সুযোগ পেয়েছেন এত বড় সুযোগ আগে কখনও পান নি। টাকা পরসার তদারিকর ভার তিনি সহজেই সামলে নিচ্ছেন।

শিদ্ধার্থবাৰু কল্যাণে দেবীবাৰু কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্থান পান ১৯৭২-এ। মকমল শহরের দারোগার বুদ্ধি তিনি পৈত্রিক স্ত্রে লাভ করেছেন। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পেন - বলেছেন, তিনিই দেবীবাৰুকে কংগ্রেসে আনেন। অবশ্যই একদা দেবীবাৰু তাঁর এবং শ্রীঅতুল্য ঘোষের গভীর অহুয়ানী ছিলেন, যেমন ছিলেন শিদ্ধার্থবাৰু। রাজনীতিতে অনেক ভিপবাজী থেকে

শিদ্ধার্থবাৰু পুনরায় মুখিক হন এবং প্রফুল্লবাৰু ও অতুল্যবাৰুর ছায়ার কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯৬৬-তে। ১৯৬২-এ কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অতুল্যবাৰুর চারপাশে ঘুরঘুর করতেন। তার পরই তিনি অতুল্য-সংহারকের বৃত্তিতে আধিভূত হন।

তখন দেবীবাৰুর নাম কখনই বা জানতেন? ওই অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্ল সেনের দ্বারা ১৯৬৯-এ (কংগ্রেস বিভক্ত হবার পূর্বে) তিনি রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। মার্কস-গান্ধী সম্বন্ধে দার্শনিক কাজে মাকি তিনি তখন নিপু ছিলেন। ১৯৭২-এ শিদ্ধার্থবাৰুর দায়ী একলাফে কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি হয়ে দেখেন পৈত্রিক স্ত্রে লাভ করা বুদ্ধি যদি তিনি খাটান তবে তাঁর পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের অবিসম্বাদী নেতা হওয়া অসম্ভব নয়। শিদ্ধার্থবাৰু ইতিপূর্বেই শ্রীমতী গান্ধীর পদলেহন শুরু করেছেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কলকাতার আসার ফলে দৈনিক পাদোদক নেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (মাসে ৬ হাজার টাকা?) পরসার তিনি দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য একটি আবারের বন্দোবস্ত করে নেন তড়িৎগতি। ঘন ঘন দিল্লী যাতায়াতও শুরু করেন।

কিন্তু সাক্ষাৎ দিল্লীতে মন্ত্রিসভায়

থেকে দেবীবাৰু যতটা পদলেহন করতে পেরেছেন শিদ্ধার্থবাৰুর পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। দেবীবাৰু সাবধানে সয়ে সয়ে মই বেয়ে উপরে উঠেছেন। সত্যি-কারের তাঁর সুযোগ জুটল আভ্যন্তরীণ জঙ্গলী অবস্থা ঘোষণার পর। স্বাভা-ব্রাতি শ্রীমঞ্জরী গান্ধী মহান নেতারূপে আবির্ভূত হলেন। এমন অবস্থা সীড়াল ঘেন তিনিই ভারত সরকার পরিচালনা করছেন। কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী শ্রীমুখ্যমন্ত্রী তো ঘোষণাই করলেন, ভারতের গগনে সজয়রূপী নতুন সূর্য উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পরে বার মঞ্জরের জন্য কার আগে প্রাণ কে করিবে দান। মুষ্টিমেয় যে কয়জন মুখমন্ত্রী এভাবে নিজেদেরকে হের করেন নি তারা হচ্ছেন শ্রীশিদ্ধার্থ বাৰু, শ্রীশরৎচন্দ্র দিগ্গ, শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী এবং শ্রীহেমবতীনন্দন বহ-গুণা। শেখোক্ত দুজন গদীচ্যুত হয়েছেন, শিদ্ধার্থবাৰু পদী টলমল করে উঠেছিল এবং একই প্রক্রিয়া শুরু হবার সম্ভাবনা ছিল শরৎবাৰুর বিপক্ষে। পশ্চিমবঙ্গের বেরাড়া মাছুষ এবং প্রিয়রঞ্জন দাসমূলীসমেত কতিপয় যুবনেতা এই শিদ্ধার্থ বিরোধী যড়যন্ত্র বানচাল করে দেন, অন্তত তখনকার যত।

এই যড়যন্ত্রের খুঁটি ছিল দিল্লীতে। সেখানে বসে শ্রীমঞ্জরী গান্ধী পশ্চিম বঙ্গের একপাল কংগ্রেসীকে ফেপি-ছেন। টোপ ছেড়েছেন তাঁর সাগরেন্দ কমল নাথের মারফৎ। বাঙালি কংগ্রেসী পালের গোদা ছিলেন আমাদের স্বনামধন্য দেবীবাৰু। তিনি স্বয়ং অবশ্য মুখমন্ত্রীর গদী তৎক্ষণাৎ দখল করতে চান নি। লেলিয়ে দি-ছিলেন প্রথমে জনাব গণি খান চৌধুরীকে। গণি সাহেব ধোয়াব দেশছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হবার। ওর নাম প্রকাশ হয়ে পড়ায় সজয়ভক্ত কংগ্রেসী-দের মধ্যেই তাওব শুরু হয়। গণি সাহেবের স্থলে তখন শ্রীপ্রব মুখো-

পাধারের নাম ভোলেন দেবীবাৰু। প্রণববাৰু তৎক্ষণাৎ কঁদে পা দেন। এই ভো সেদিন বাংলা কংগ্রেস থেকে চুকেছেন তিনি কংগ্রেসে। এর মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর গদী? লোভ সাইলান দায়। ডিসেম্বরেই তিনি এই গদীতে বসবেন বলে তৈরী হয়ে-ছিলেন। কিন্তু সব ভেঙে গেলে। শিদ্ধার্থবাৰু ততদিনে নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছেন শ্রীমতী গান্ধীর বড় বেশা মোসাহেবীই করা হোক না কেন, তাঁর মন পাওয়া যাবে না যদি না তিনি শ্রীমঞ্জরেরও মোসাহেব হন।

যড়যন্ত্র সাময়িকভাবে ব্যর্থ হলো (শেবাংশ শেষ পৃষ্ঠার)

কংগ্রেসী যুবদের হামলা

(১৭শ পৃষ্ঠার পর)

পাতাল প্রাণে অহুতি হওয়ার কংগ্রেসী গুণীদের মেডিক্যাল সম্মেলন পণ্ড করার যড়যন্ত্র সাময়িক ভাবে ব্যর্থ হয়। কিন্তু এর ফলে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী কলকাতা প্রাণে বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত সম্মেলনের মূল প্যাণ্ডেলটি ভস্মীভূত হয়। স্থানীয় লোকজনের ধারণা, কংগ্রেসী ছেলেরাই প্যাণ্ডেল-টিতে অগ্নিদগ্ধযোগ করে। যদিও স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এটাকে বৈজ্ঞানিক শর্ট সার্কিটের পরিণাম বলে প্রচার করেছেন, কিন্তু স্থানীয় ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের তদন্তকারী কর্মী-দের মতে শর্ট সার্কিট সম্বন্ধে কোন ভিত্তি নেই। তাছাড়া ঘটনা-স্থলে মবিল ডেজানো ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো ও অস্ত্রাস্ত্র প্রমাণ পাওয়া গেছে। মেডিক্যাল এগেসিয়েশনের স্থানীয় শাখা উৎসাহকর্তৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। প্যাণ্ডেলটি পুড়ে যাওয়ার জন্য সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের প্রায় পকাশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে।

সন্দেহ নেই, আসন্ন লোকসভার নির্বাচনে অনিবার্য পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েই কংগ্রেসী গুণারা এই কাজ করেছে। আপাতদৃষ্টিতে কাটোয়ার একজনই কংগ্রেস প্রার্থী এবং তাঁর হয়ে কংগ্রেসের উত্তর গোষ্ঠীই কাজ করেছে। কিন্তু কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীধীরেন বহু প্রদীপ ও মুরুল এই দুই বিরোধী গোষ্ঠীর মন যুগিয়ে চলতে গিয়ে হিম-গিম খাচ্ছেন। উত্তর দলকে টাকা ও অস্ত্রাস্ত্র সুবিধা সমান ভাবে দিতে হচ্ছে। এতেও তারা একসঙ্গে কাজ করছে না ও পরস্পরকে বাধা দিচ্ছে; এমন কি এক গোষ্ঠী অস্ত্র গোষ্ঠীর গোষ্ঠীর হিঁড়ে দিচ্ছে। নির্বাচনী প্রচারাে কোন গোষ্ঠীই তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে না। অনেকের ধারণা এই কেন্দ্রে তৃতীয় (নির্দল) প্রার্থীটি

গোপনে এদের একটির সমর্থন পাচ্ছেন। কাটোয়ার কংগ্রেসী এম. এল. এ প্রদীপপন্থী। তাঁর সঙ্গে কথা বলে মনে হয় স্থানীয় ভোটারদের অনেকের মনোভাব কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ব্যব-সারীরা কংগ্রেস বিরোধী। সাধারণ মানুষের কাছে থেকে টাকা ভোটার চেষ্টা করেও কংগ্রেসীরা ব্যর্থ হয়েছে। হাওয়া এখন তাদের প্রতি-কূলে। তবে এম, এল, এ মহাশয়ের ভরসা এই যে, সি পি এম সব কটি বুধে এজেন্ট দিতে পারবে না। সি পি এমের ছেলেরা অনেকই বাইরে চলে গেছে। এখনও কিরে আসতে পারেনি। হয়তো জেলেও রয়েছে অনেকে। সি পি এমের কর্মীরা এখনও পর্যন্ত গোপনে কাজ করছে। কংগ্রেসী এম. এল. এ স্ত্রীলোকের কথা থেকে এই ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসে যে, কংগ্রেসীদের পক্ষে অনেক বুধেই কারচুপির আশ্রয় নেওয়া সহজ হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চিকিৎসক সম্মেলনের উপর কংগ্রেসী যুবকদের হামলা রাজনৈতিক দর্পপ্রসূত। মেডি-ক্যাল এগেসিয়েশনের স্থানীয় শাখার সম্পাদক ডাঃ হরমোহন সিংহ সি পি এমের জেলা কমিটির সদস্য। তিনি এক সময়ে বিধান সভার সি পি এমের সদস্যও ছিলেন। এ ছাড়া চিকিৎসক সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের অনেকেই আদি কংগ্রেসের লোক বা সি পি এমের সমর্থক। অপর দিকে স্থানীয় কংগ্রেসী এম, এল, এ. তাঁর কার্যকলা-পের দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীদের অনে-কের বিরক্তিকাজন হয়েছেন। কংগ্রেসী যুবকদের দলাদলি ও নোংরামির জন্যও অনেকে এদের উপর বিরক্ত। চিকিৎ-সক সম্মেলন উপলক্ষ্যে তাদের এই নোংরামি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। একদল স্থানীয় লোকজন ক্ষুব্ধ। ব্যাপক কারচুপি না হলে কাটোয়া কেন্দ্রে সি পি এম প্রার্থী মনসুর হবিবুল্লাহর জয় একরকম স্থানান্তিত।

সংবিধান ও বিস্মৃত প্রতিশ্রুতি

(১৮শ পৃষ্ঠার পর)

ছিলেন সেইটাই বিকৃতরূপে লগনের একটি কাগজে কাস করে দেওয়া হয়। ডোমিনিয়ন স্টেটস স্বীকার করে দেবার পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট প্যাটেলের পরিবর্তে জড়িয়ে দেওয়া হয় নেহরুর নাম। ডি. পি. মেনন প্যাটেল পরি-কল্পনার কথা নেহরু যে ১৯৪৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত জান-তেন না, সেটা তাঁর উক্ত উক্ত থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

(৭) ১৯৪৬ সালের ২২শে মার্চ তারিখে তাইসরর হিসাবে মাউন্টব্যাটেন নয়। দিল্লীতে আগমন করেন। নেহরুর সংশ্লিষ্ট প্রথম সাক্ষাৎ হয় ২৫শে মার্চ তারিখে। ক্যাম্পবেল-জনসনের বক্তব্য অমুসারে, এই সাক্ষাৎকার শেষে নেহরু মন্তব্য করেছিলেন: “আপনার [মাউন্ট-ব্যাটেনের] সাংবাদিক আকর্ষণ শক্তি বলতে সবাই কি বোঝাতে চায় সেটা এখন আমি বুঝতে পারছি।” (Mission with Mountbatten, পৃষ্ঠা ৪৫।) আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন: “লর্ড মাউন্টব্যাটেন কী ভাবে জওহরলাল নেহরুর মন জয় করে নিয়েছিলেন সে কথা ভেবে প্রায়ই আমার আশ্চর্য লাগে।” (India Wins Freedom, পৃষ্ঠা ১৮৩)

(৮) নেহরুর অতি অনুরক্ত ব্যক্তি ডি. কে. কৃষ্ণমেনন ক্যাম্পবেল-জনসনকে বলেছিলেন যে, “ভারত ডোমিনিয়ন স্টেটস চায় না, ব্রিটেনের সংগেই চায় সার্বভৌম নাগরিকত্ব Mission with Mountbatten, পৃষ্ঠা ৫০।) কৃষ্ণ-মেনন নেহরুর হয়ে কথা বলেছিলেন। নেহরু মাউন্ট-ব্যাটেনকে বা বলেছিলেন তাই থেকেই তাঁর অবস্থাটি স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি বলেছিলেন “ভারতের সবাই যে পূর্ণ স্বাধীনতা চায় এ কথাটা আপনাকে অবশ্যই অমুসারন করতে

হবে। অতীতের ঘটনাবলীর কারণে ‘ডোমিনিয়ন স্টেটস’ কথাটিই জনসাধারণকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে। আমি জানি ডোমিনিয়ন স্টেটস যে পূর্ণ স্বাধীনতার সমান তা তৎসংগতভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে। কিন্তু জনসাধারণ এত সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা বুঝবে না।” (Leonard Mosley লিখিত The Last Days of the British Raj গ্রন্থের জরকো সংস্করণের ১৩১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।) নেহরুকে সন্তুষ্ট করার জন্য ডি. পি. মেনন একটি সূত্র উদ্ভাবন করেন: “আমার পরিকল্পনা অমুসারে, একটি আদেশ-নামা মারফত King-Emperor পদবীটির থেকে “Emperor” কথাটি বাদ দেবার ব্যবস্থা থাকবে।” (এ, ১৩১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।)

(৯) The Discovery of India, পৃষ্ঠা ৬১।

(১০) Gunnar Myrdal, Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, পেজ ১৭৭ সংস্করণ, ১৯৬৮, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬১।

(১১) লোকসভা মহাকরণ বক্তৃক প্রকাশিত Union State Relations (A Study) 1970, পৃষ্ঠা ২৬ এবং ২৭ প্রস্তাব।

(১২) D. R. Gadgil, Some Aspects of Centre-State Financial Relations, Govt. of India, 1971, পৃষ্ঠা ৪-৮ প্রস্তাব।

(১৩) ১৯৭০ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে পরি-কল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রস্তুত “Central Assistance - State Plans”. Statement II প্রস্তাব।

অভিযোগ ৪ লক্ষাধিক ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ গেছে (দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের সবকয়টি নির্বাচনী এলাকা থেকে বিরাট সংখ্যক ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই প্রসঙ্গে গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীঅরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেছেন যে, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রায় লক্ষাধিক ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য বাহাদুরের ভোটার তালিকায় এদের নাম ছিল। শ্রীচট্টোপাধ্যায় বিবৃতিতে আরও বলেছেন যে, ইলেকটরাল রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে কেউই বাহাদুর সালের পর নতুন তালিকা প্রকাশ করার আগে সরঞ্জামিনে তদন্ত করতে আসেন নি, এবং বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে ব্যাপক হারে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে এই কাজে নিয়োজিত

অফিসগুলি তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে শাসকদলের আঙ্গুষ্ঠ হয়ে পড়েছে। আজকে বাস্তব সত্য যে, আসন্ন লোকসভার নির্বাচন অস্থিতি হবে যথিত ভোটার তালিকার ভিত্তিকে। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলার ঘুরে আমরা এই মর্মে বহু অভিযোগ পেয়েছি। প্রতিটি জেলাতেই সুপরি-কল্পিত ভাবে শাসক দলের পক্ষ থেকে পাইকারী হারে বামপন্থী ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অনেক ঘায়গায় যে সমস্ত ভোটার মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সমর্থক বলে চিহ্নিত তাদের নাম পাইকারী হারে বাদ দেওয়া হয়েছে। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে এই পার্টির সমর্থক প্রায় লক্ষাধিক ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ গেছে। এ সবই করা হয়েছে বামপন্থী ও মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রার্থীদের পরাজিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

নাভিশ্বাস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জগজীবন রামের দলে নাম লেখাচ্ছে। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে কংগ্রেসে ভাঙন তীব্রতর হবে। হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ কংগ্রেসের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এই দল নতুন কালের অমুণ্যযোগী—কেবল যুগোপযোগী কতকগুলো স্লোগান ভুলে মাহুকে ধোঁকা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এখন সেই ধান্না ধরা পড়ে গেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস নতুন পৃথক বাক নিতে যাচ্ছে। কিন্তু শাসক দল ও তার ক্ষমতালিপ্সু নেত্রী কি জনগণের স্বাভাবিক রাষ মেনে নেবেন, না তাকে উল্টে দেবার চেষ্টা করবেন? অনেকেই সন্দেহ যে, শেষ পর্যন্ত নির্বাচন হবে না কিংবা হলেও এমন পন্থা গ্রহণ করা হবে যাতে শাসক দল কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে। অর্থাৎ কোন স্বাভাবিক উপায়ে ভোটার বাক্সে কারচুপি অথবা অন্য কোনভাবে ফলাফল উল্টে দেওয়া হবে। তা যদি হয় তাতেও কিন্তু কংগ্রেস দল বা তার নেত্রীর নিজস্বিতা নেই। অনিবার্য ধ্বংস তখন আসবে অল্প পথে।

দর্পণের সংবাদদাতার খবর : বিবর্তন হচ্ছে জানা যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে নির্বাচনী পরিস্থিতি সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছে যে, এবার নির্বাচনে শাসক কংগ্রেসের পক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কঠিন

পশ্চিমবঙ্গে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পার্টির সমর্থক ভোটাররা হয়ত ভয়ে ভোট দিতে আসবেন না।

বামপন্থী ভোটারদের যদি ভোট-দান কেন্দ্রে আসা বন্ধ করা যায় তাহলে কংগ্রেস ও সি পি আই জাল ভোটের মাধ্যমে তাদের জয়ের পথপ্রশস্ত করতে পারে। কংগ্রেসীদের ধারণা বিরোধী প্রার্থীদের অস্ত্র কারদার সমস্ত করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

এই পরিকল্পনা মত বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে সি পি এম প্রার্থীরা যে সব জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সেই সময় এলাকায় ইতিমধ্যেই সম্ভাব্য শুরু হয়ে গেছে। নির্বাচনের দিন যতই আসছে ব্যাপকতাও বাড়ছে। পুলিশের ভূমিকা নিরপেক্ষ নয়। তবে এত কাঠ খড় পুড়িয়েও কংগ্রেস তার সহযোগী সি পি আই ভরাডুবির হাত থেকে নিজস্ব পায়ে বলে মনে হয়না।

ব্যাপার। ৫৪২টি আসনের মধ্যে শাসক কংগ্রেস কোনমতে ২১০ থেকে ২৬০টি আসন পেতে পারে বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও শ্রীমতী গান্ধীর নিজস্ব সংস্থা রিসার্চ গ্র্যান্ড অ্যানালিসিস উইং মনে করে। অবশ্য নির্বাচনের পাঁচ ছ দিন পূর্বে গোয়েন্দা সংস্থা আরও একটি সর্বশেষ বিশ্লেষণ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠাবেন।

আরও জানা যায় যে, শ্রীমতী গান্ধী গোয়েন্দা দপ্তর ও RAW-র ওপর ক্ষেপে গেছেন। কারণ RAW নির্বাচনী ঘোষণার পূর্বে যে বিশ্লেষণ করেছিল তার সঙ্গে বাস্তবের সঙ্গতি কম। অন্যদিকে, জগজীবন রামের কংগ্রেস ত্যাগের মত বোমা কাটানোর ঘটনা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর খাঁচ করতে পারেনি। পূর্বে ঘূর্ণাক্ষরে জগজীবন রামের দলত্যাগ পরিকল্পনার কথা যদি জানা যেত তবে, জগজীবন রামের ভাগ্যে যে কী ঘটত তা বলা যায় না। কারণ RAW ইতিমধ্যে সি আই এর মত বেশ দুর্নাম কিনেছে এবং সরকারের অধীন একটি সংস্থা হয়েও সে নিজে একটি সাম্রাজ্য হয়ে উঠেছে। বিরোধী পক্ষ RAW সম্পর্কে গুরুতর সব অভিযোগ করেছে। খুন লাশ গোপাট, দাঙ্গা হাঙ্গামা, ছিনতাই, ডম করা, জালিয়াতি, ব্র্যাকমেসিং ইত্যাদি কাজেনাকি RAW সবিশেষ পারদর্শী। তবে শোনা যায়, এই ঘুরুর বাসাতেও নাকি ইন্দিরা বিরোধী লোক রয়েছেন যারা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রধান মন্ত্রীকে ভুল পথে চালিয়েছেন। কলে শ্রীমতী গান্ধী এখন ভীষণ খাপ্পা।

সংশ্লিষ্ট আরও একটি মহলের খবরে জানা যায়, দিল্লীতে কংগ্রেসের উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন নেতৃত্ব সমীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, শাসক কংগ্রেস কিছুতেই ২১৫টির বেশী আসন পাবে না। এই আসনের মধ্যে জগজীবন রামের বেশ কিছু গোপন লোকজন থাকা অসম্ভব কিছু নয়।

উচ্চ নেতৃত্বের শিরঃপীড়ার আর একটি কারণ হল, রায়বেরিলি ও আমেথিতে প্রধানমন্ত্রী ও তৎপুত্রের সভায় জনসমাগম খুবই কম হচ্ছে। রায়বেরিলির একটি জনসভায় মাত্র তিন হাজার শ্রোতা ছিল। প্রকাশ, এই শ্রোতার মধ্যে অস্বস্ত কম করে ছশ সাদা পোশাকের পুলিশ ছিল।

উচ্চ নেতৃত্ব বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানায় শোচনীয়ভাবে কংগ্রেস পরাজিত হবে বলে মনে করেন। যে অঞ্চলে কংগ্রেস ভালো ফল পেতে পারে তার মধ্যে পশ্চিম-বঙ্গে ধরা হয়েছে। এই হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস জোট ২০টি আসন আশা করে, কিন্তু বিবর্তন হচ্ছে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব নাকি পশ্চিমবঙ্গে দশটির বেশী আসন আশা করছেন না।

দেবী সিদ্ধার্থ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

(শ্রীমতী গান্ধী সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে সিদ্ধার্থবাবুর আসন আবার টলমল করে উঠবে) দেবীবাবুর একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে। তিনি কেন্দ্রে রাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়েছেন। বেচারী প্রণব। দেবীবাবুর মত তিনিও রাজ্যসভার সভ্য। দেবীবাবু লোকসভা নির্বাচনে না লড়েই ক্যাবিনেট মন্ত্রী হলেন, আর প্রণববাবুকে পাঠান হল মালদহে নির্বাচনের প্রার্থী হিসাবে। শুধুসী তাঁর জনাব গণিধান চৌধুরী। আপন জেলা বীরভূমে তাঁর দাঁড়াতে সাহস হল না। জিতলে তিনি ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদ পাবেন এই আশায়ই না তিনি নির্বাচনে খাঁপ দিয়েছেন। এখন নির্বাচনী দরিরায় তিনি এবং কংগ্রেস ভুবে না গেলেই হয়।

দেবীবাবুর টেকনিক্যাল প্রজ্ঞতি এবার কতদূর সফল হবে বলা মুশ্কিল। সারা দেশে বিশাল কংগ্রেস বিরোধী চেটে দেখে পুলিশ সমেত সর্বস্তরের সরকারী কর্মচারীদের মনোও সন্দেহ হেগেছে হয়ত এবার কংগ্রেস হেরে বাবে এবং কেন্দ্রে কংগ্রেস বিরোধী সরকার গঠিত হবে। শ্রীমতী গান্ধীর আমলে ভারতে কেন্দ্রীয়-সরকারই তো একমাত্র সরকার। রাজ্যে যা আছে তা নামেই সরকার, আসল ক্ষমতায় মিউনিসিপালিটির চাইতেও অধম। যদি এদিক ওদিক কিছু হয়ে যায় তবে হয়ত অব্যবহিহ করতে হবে। তখন ?

যুব নেতার অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যে সমস্ত হত্যা প্রভারণা জালিয়াতি, রাহাজানি ইত্যাদি করিতে বলা হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিতে হইতে।

যে সমস্ত কর্মচারী তাঁহারা লইয়াছেন তাহাদের মধ্যে একজনও ২৪ পরগণা বা ডায়মণ্ডহারবার নিবাসী লোক নহে। তাহা ছাড়া এই ডায়মণ্ডহারবারের বহু লোক ও ব্যবসায়ীকে স্বতন্ত্র মুখার্জী ও বীরেন মহাস্তি নানারূপ ক্রিমিন্যাল কেস করিয়া হরণাপি করিয়াছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে ১০০টি হত্যা রাহাজানি প্রভারণা ও জালিয়াতির কেস আছে। গতকাল অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তীর উপর আক্রমণ স্বতন্ত্র মুখার্জী ও বীরেন মহাস্তির পরিকল্পনা অমুযায়ী করা হয়। উহাতে ইধন যোগান দেপুটি কমিশনার সাউথ, কলিকাতা পুলিশ এস, পি, ২৪ পরগণা ও ডি, আই, জি, ২৪ পরগণা এবং তাঁহাদের অমুগামী পুলিশ অফিসারেরা। উহার সোনারপুরে কোন এক বাড়ীতে বসিয়া এই অপরাধ চাকিবায় জন্য শ্রীদাশমুখীর মারফৎ একটি কলিল সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন তাহা আদৌ সত্য নহে।

ইতি—

বলরাম ঘোষ

কেন ?

জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়

ব্যাপার বোকা এতই সোজা ?

তাহলে আর ভাবনা কি ?

বোকার চাপে থাকতে সোজা যুক্ত করে বুজুকী !

চালের মধ্যে কীকড় কেন

সরবে কেন দেয় না তেল

লাইনে কেন হয় দাঁড়াতে

(কেন) পরীক্ষাতে পাশ আর

ফেল !

অন্যকে ছুঁ করে

বাড়ার কেন গুণগোল

কাল উপোসীর পাতে কেন

হচ্ছে ঢালা মাছের কোল

সবটাইতো হিসেব করা

তবু কেন মিলছে না

হবু চন্দ্রের রাজ্যে গবু

সামলাতে আর পাছে না।

ডাকতে হবে যত্নি এবার

আবোল ভাবোল বেশ থেকে

ভাবছি আমি, ভাবছো তুমি

ভাবছো সবাই ভাল কুঁকে।

মহাস্তির বিরুদ্ধে

শিক্ষক-বিরোধী

কাজের অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

যুব কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক এবং কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি এডুকেশন অফিসার বীরেন মহাস্তির বিরুদ্ধে শিক্ষক বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ পাওয়া গেছে। উল্লেখ-যোগ্য যে এবারের লোকসভা নির্বাচনে ইনি ডায়মণ্ডহারবার কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

জানা গেছে, বহুবার হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক এই বীরেন মহাস্তি তিলজলা ব্রজনাথ বিজ্ঞাপীঠের প্রশাসকরূপে ঐ স্কুলের তিনজন শিক্ষককে প্রধান শিক্ষকের প্ররোচনায় বিদ্যালয়ে চুকতে দিচ্ছেন না। শুধু তাই নয়, অতি সম্প্রতি মহাস্তি দুজন শিক্ষককে “কেন হাঁটাই করা হবে না” এই মর্মে শো-কজ নোটিশ দিয়েছেন। শিক্ষকদের প্রশ্ন : এইভাবে শিক্ষক বিরোধী কাজ করে, শিক্ষকদের চাকরী থেকে কি করে মহাস্তি লোকসভায় গিয়ে জনগণের সেবা করবেন ?

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বোড কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৩১ মট লেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

রুথ দখল গুণ্ডামী বিগিং

দপন

বিশ্ব বর্ষ ॥ ৮ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১৮ই মার্চ '৭৭ ॥ ৪০ পঃ

মস্তানদের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ

॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥

পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনে শাসকদল কংগ্রেসের ভাড়াটে মস্তানরা গুণ্ডামী, সন্ত্রাস, রুথ দখল, প্রিসাইজি অফিসারের কাছ থেকে ভোটপত্র কেড়ে নিয়ে বাক্সে ভর্তি করা, বিরোধী প্রার্থীর পোলিং এজেন্টকে বিতাড়ন প্রভৃতি সবই করেছে। কিন্তু ১৯৭২ সালে বিধানসভা নির্বাচনের মত ব্যাপক আকারে সারা রাজ্য জুড়ে তারা এই কুর্কম চালাতে পারেনি। নির্বাচনী হাওয়া এবার কংগ্রেস বিরোধী। সাধারণ মানুষ কংগ্রেসের প্রতি বীভৎস। কংগ্রেসী কুশাসনে তাদের জীবন অস্তিত্ব। তাই সর্বত্র দেখা গেছে ভোট দেবার জন্তে লোকের প্রচণ্ড আগ্রহ। প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রের প্রতিটি ভোট গ্রন্থ কেন্দ্রে লোকে

ভোর থেকে লাইন দিয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থেকেছে ভোট দেবার জন্ত। যেখানে কংগ্রেসী বা সি পি আই গুণ্ডারা রুথ দখল করেছে সেখানেও ভোটাররা সন্ত্রাস হয়ে পশ্চা-দপসরণ করেনি। বুথের একটু দূরে দাঁড়িয়ে থেকেছে ভোট দেবার আশায় এবং বন্ধুজ্ঞে গুণ্ডারা পালিয়ে যাবার পর তারা ভোট দিয়েছে। বোমা কাটিয়েও গুণ্ডারা তাদের ভীত করতে পারেনি। তারা পুলিশের কাছে অভি-যোগ করেছে, সংবাদপত্রের অফিসে টেলিফোন করেছে, রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছে অভিযোগ করেছে। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট নেতা জ্যোতি বসু ও ডায়মণ্ডহারবার কেন্দ্রের সি পি (শেখাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)



ভোটের দিন ডায়মণ্ডহারবার নির্বাচন কেন্দ্রের মহেশতলা অঞ্চলে একটি পোলিং বুথের কাছে কংগ্রেসী মস্তানরা সি পি আই (এম) প্রার্থী জ্যোতির্ময় বসুর গাড়ি ঘিরে ধরে তাকে নামাবার চেষ্টা করেছে। এখানেই শ্রীবসুর ব্যক্তিগত বডিগার্ড শ্রীদেব বর্মণের বন্দুক ছিনতাই হয়। পুলিশের সামনেই কংগ্রেসী মস্তানরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। ছবি : পলাশ দত্ত



এবারকার নির্বাচন

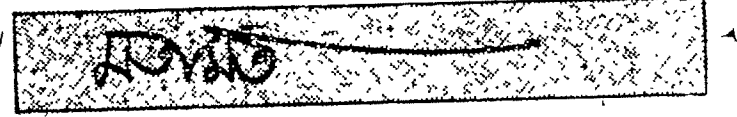
অন্নদাশঙ্কর রায়

এবারকার নির্বাচনের গুরুত্ব এই-খানেক যে, হারজিতের সম্ভাবনা এবার দুই পক্ষেই সমান সমান। কেউ জোর করে বলতে পারছেন না কোন পক্ষ অধিকাংশ আসন পেয়ে সারা ভারতে জয়যুক্ত হবে। যিনি বলছেন তিনি অনিশ্চিত তিনিও মনে মনে অনিশ্চিত। এখন থেকেই তিনি একটা কৈকিৎ খাড়া করে রেখেছেন। হেরে গেলে বলবেন, 'যত দোষ নন্দ ঘোষ।' মানে প্রতিপক্ষ।

এই প্রথমবার কংগ্রেস তার সমকক্ষ প্রতিপক্ষ পেয়েছে। কেউ ভাবতে পারেনি যে চারটে ভিন্নপন্থী দল রাতারাতি একদল বনে যাবে। এটাও তো অভাবনীয় যে তাদের সঙ্গে যোগ

দেবেন কংগ্রেস নেতা অগজীবন রায় ও তাঁর উপদল। আরো বড়ো বিস্ময় তাঁদের সঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিষ্টদের আপসে আসন ভাগাভাগি। রাজনীতিতে অঘটন আজও ঘটে। আমি স্বীকার করছি যে এসব আমার মাথায় আসেনি। আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলাম এই কথা ভেবে যে ভারত চলল রাশিয়ার পথে। এদেশে থাকবে একটামাত্র দল। তাকে চেক করার জন্তে, ব্যালান্স করার জন্তে পার্টি দল থাকবে না। রাজনৈতিক ক্ষমতা তথা অর্থনৈতিক ক্ষমতা সেই একটি দলেরই মুঠোর মধ্যে থাকবে; সে যদি নির্বাচনের নামে রুশ প্রথা (শেখাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় সমীপেষু



আনন্দনাথজীয়ে খবর বেরিয়েছিল যে কুলটিতে কোন এক নির্বাচনী সভায় আপনি নাকি বলেছেন যে, কেন্দ্রে যদি জনতা পার্টি আসে তাহলে ভারতবর্ষে মিলিটারী শাসন হবে। কথাটা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি. স্বামীনাথনের কানে তুলে দিয়েছেন বামপন্থী দলের নেতারা। স্বামীনাথন আপনার বক্তব্যের পূর্ণ বহান চেয়েছিলেন তাঁদের কাছে এবং এতদিনে হয়তো পেয়েও গেছেন। তিনি কথা দিয়েছিলেন এ বিষয়টার ওপর নজর দেবেন। আমরা ভাল করেই জানি স্বামীনাথন আপনার ভাষণের বোঝা দিল্লী অবধি বয়ে নিয়ে যাননি। ভি. আই. পি রোডের হৃদয় রাস্তায় এখনো তার ছেঁড়া পাতাগুলো হয়তো বসন্তের বাতাসে লুটোপুটি খাচ্ছে। এতদিনে এও মনেছি স্বামীনাথন এবং আপনি দুজনেই বার ভূত্যা সেই ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে আপনি অসতর্ক হুত্বর্থে ইন্দিরার এক গোপন বাসনা কুলটিতে বলে ফেলেছেন। বলেছেন বলেছেন, পরে আবার কাপুরুষের মত বললেন কেম, 'আমি ও কথা বলিনি'। এদেশের সাংবাদিকদের কিছু মিথ্যা লিখতেই হয় আর রাজনীতিবিদদেরও কিছু মিথ্যা বলতে হয় এসবতো সকলেরই জানা কথা।

কিন্তু যেটা সকলেই জানেন না সেটা বলার জন্তই আমার এই চিঠিলেখা। মিলিটারী শাসন হবে এটা যার নির্দেশে আপনি বলেছেন সেই ইন্দিরা গান্ধী মিলিটারীর-হাতে দেশটাকে

তুলে দিয়ে খুব একটা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবেন তো? ১৯৬৫ সালে পাক-ভারতের যুদ্ধের আগে থেকেই একটা কথা সামরিক বাহিনীতে চালু ছিল যে ইন্দিরা গান্ধী সামরিক বাহিনীর লোকসংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে একদম নারাজ। যদিও তখন তিনি তেমন কোন ক্ষমতায় আসেননি। সামরিক বাহিনীর অশিক্ষিত লোকেরা তখন থেকেই খালা ইন্দিরাগান্ধীর ওপর। তাদের ওপর দীর্ঘদিনের অত্যাচার-অবিচারের শোধ তারা নেবে। সে দৃষ্ট আপনি এখনও ভাবতে পারছেন না সিদ্ধার্থবাবু, কিন্তু আমি ভাবতে পারি। আপনি ভাবতে পারছেন না এখনও মেলে বেশব রাজনৈতিক নেতা শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের অকারণে বন্দী করে রেখেছেন তারা একদিন ঐ মিলিটারী সোলজারদের সাহায্যেই প্রতিশোধ নেবে।

রাষ্ট্রপতি যাকে স্বর্ণপদক দিয়েছিলেন সেই বিশিষ্ট অভিনেত্রী স্নেহ-লতা রেড্ডীকে অকারণে বাঙ্গালার জেলে বন্দী করে আপনারা যুদ্ধার মুখে ঠেলে দিয়েছেন, প্রবীর দত্তকে সেদিন শনিবারের বিকেলে কার্জন পার্কে খুন করেছেন। তার মাকে পর্যন্ত তার মৃতদেহ দেখতে দেন নি এবং আপনার ঠাক্কড়ে বাহিনী তার মাকে বাড়ি গিয়ে

নানারকম ভয় দেখিয়ে এসেছে। ২০শে জুলাই ১৯৭৪ সালে প্রবীরের যুদ্ধার দিনে যে ৫০ জন শিল্পী সাহিত্যিককে গ্রেপ্তার করেছিলেন তাদের

কমমকে মুক্তি দিয়েছেন জানতে পারি কি? প্রবীরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উৎপল দত্ত, যুগাল সেনরা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে যে সভা ডেকেছিলেন তাতে আপনি উৎপল দত্তকে ভয় দেখিয়ে-ছিলেন যে তাঁর মূচলেকার ফটোগ্রাফ কপি কাগজে প্রকাশ করে দেবেন এবং এও বলেছিলেন যে রাষ্ট্রনৈতিক নাটকের জবাব রাজনীতি দিয়েই করা হবে। সেই কারণেই অচিরেই কলকাতার হৃদয় সংস্কৃতির বর্ষ রোধ করলেন, বাদল সরকারের মত অরাজনৈতিক নাট্য-কারকেও মরদান থেকে দূরে নিষ্কিন্ত করলেন, বীর সেনের মত নাট্যকর্মীদের ওপর এক অদৃষ্ট বাহাদুর বোলসালেন অস্ত্রাঘাতের কর্মীদেরও পথে বসা-লেন এবং হিন্দী হাইস্কুল, রামমোহন লাইব্রেরী, বিশ্বকপা, সারকেনিরা মিনার্ভা ও লা মার্টিন হলে শেফালীর মত নৃত্যের টালাও বন্দোবস্ত করে দিলেন। স্বেবে দেখবেন যে দেশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির ভাদ্রাডি, ঋষিক ঘটকেরা কুকুরের মত মারা যান সেখানে বিড়সা-রাসবিহারী সরকার-শেফালী ও আপনাই কি দেশের সংস্কৃতির ধ্বংস ধরে থাকবেন? একজন ক্রমা গুহাভ্যুত্থার পেট ভরাবার ব্যবস্থা করে দিলে আমরা সবাই খালি পেটে তাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব?

অধ্যাপক দীপঙ্কর চক্রবর্তী এখনও জেলে আটকে রেখেছেন (দর্পণকে ও ক্রটিয়ারে মীরা চক্রবর্তীর চিঠি দুটো নিশ্চয়ই আপনার দৃষ্ট আকর্ষণ

করেছে।) সাংবাদিক কর্তব্য শেন-গুপ্তকে বিধানসভায় ডেকে নিয়ে অপ-মান করেছেন, আরো কত লেখক শিল্পীকে বন্দী করেছেন তার হিসেবে নেই। চলচ্চিত্র ঋষি ঘটকের আত্মীয় হইতে এমন নির্মম কাজ আপনি করতে পারলেন? যারের বুক থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নেবার যে কি যন্ত্রণা একথা আপনি অহুতব করতে পারতেন যদি আপনি নিজে পুত্রের শিক্তা হতেন।

জর্জ সিনহা রোডের ঘুঘুর বাসায় গোয়েন্দারা যেসময় শিল্পী সাহিত্যিক-দের জেরা করেন তারা অনেকেই তুমুছি উচ্চশিক্ষিত। তারা হয়তো জানেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শোভিত্রেত সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করে ডঃ রিকার্ড জর্জে ক্যাসিভাদের বিরুদ্ধে নানারকম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সরবরাহ করে ক্যাসিভাদকে পরাস্ত করতে সাহায্য করেছিলেন। আপনি এই গোয়েন্দাবাহিনীকে কী দেশো-দ্ধারের কাজে ব্যস্ত রেখেছেন সিদ্ধার্থবাবু?

বেশতো ছিলেন চিত্ত বজ্রন দাশের দৌহিত্র হিসেবে বিরোধী দলের একজন কর্মী হিসেবে ব্যারিষ্টারী করে। শুধু শুধু ঘুঘু রাজনীতির জালে জড়ালেন। দেশের জন্ত এক বিন্দু আপনার স্বার্থভাগ নেই, আছে শুধু অকারণে দেশের মানুষকে ফেপিয়ে তোলার হুঁঙ্কি। কেন্দ্রে ছিলেন বেশ তো ভাল ছিলেন, হয় আবার কেন্দ্রে চলে যান, নয় রাজ-নীতির থেকে সরে দাঁড়ান। গল্পের নায়ক গোপাল কাহার যেমন গণভরের মানে বোঝেনি আমরা অশিক্ষিত-রাও গণভর বস্তুটিকে আজও চিনতে পারলাম না। ওয়াকাস পার্টির পোষ্টার দেখলাম, 'প্রহসনের নির্বাচন বরকট করুন,' তাই ভোট নিয়ে এখনও কিছু ভেবে উঠতে পারিনি। আর নিজের কোন কাজ নেই বলেই আপ-নার মূল্যবান সময়টাকে নষ্ট করবার ইচ্ছাই আমার এই মুহূর্তে প্রবল হয়ে দেখা দিল। এইমাত্র খবর পেলাম বোম্বাই এর বুদ্ধিজীবীরা ইন্দিরাগান্ধীর কাছে আবেদন করেছেন অরবী অবস্থা তুলে নেবার জন্ত। কলকাতার বুদ্ধিজীবীরাও চূপ করে থাকার পাত্ত নন। আপনি নিজেই স্বাধীন ভারতের একজন সং নাগরিক হিসেবে ভাবতে ভালবাসেন বলেই অহ্লাদের আসনে নিজেকে নিশ্চয়ই দেখতে চাইবেন না।

অরিন্দম মিত্র

বন্দী মুক্তির দাবী

বিভিন্ন গণসংগঠনের সঙ্গে যুক্ত তরুণ কর্মী শ্রীশিবাজী ভট্টাচার্য ও শ্রীকল্লোল দাসগুপ্ত গত অক্টোবর থেকে কারাগারে আছেন। বহন সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে দাবী করা হচ্ছে সে সময় শ্রীভট্টাচার্য ও শ্রীদাসগুপ্তর কারাবাস ঐ দাবী অমূলক প্রমাণ করে। আমি অবিলম্বে শ্রীশিবাজী ভট্টাচার্য ও শ্রীকল্লোল দাসগুপ্তর মুক্তি দাবী করছি।

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক হিন্দু মজদুর
সভা (পশ্চিমবঙ্গ শাখা)

অমানুষিক নিপীড়ন

বনগাঁ ২৫/২/৭৭। বনগাঁ থানার এক ফার্ম ব্যবস্থানে মতিগঞ্জের অনিতা সেলুলয়েড কারখানার এক শ্রমিক নিপীড়নের ঘটনা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে ম্লান করেছে। কারখানার মালিক মন্টু দাস অধীনস্থ শ্রমিক রবি বিশ্বাসকে চিকুনি চুরি অভিযোগে খুশস্ত অবস্থার পুলিশী কারদার নির্মম প্রহার চালিয়ে গুরুতর আহত করে। তিন হপ্তার উপর অমিকটি স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে। মালিকের নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বনগাঁর সমস্ত চিকুনি কারখানার শ্রমিকেরা একদিন কাজ বন্ধ রেখে প্রতি-বাদ জানান। কিন্তু শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক তথা উত্তর ২৪ পরগণা জেলা যুব কংগ্রেসের অত্রতম সম্পাদক শ্রীধর বিশ্বাস বিরুদ্ধে মালিকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ও মালিকের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় না হওয়ার এবং পুলিশের আচরণে শ্রমিকেরা বিশ্বাস-প্রকাশ করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায় যে, মতিগঞ্জ ভবানীপুর রোডের উপর অনিতা সেলুলয়েড কারখানার অব-স্থান। উহার নীচ গ্রহিতা মালিক সৌমেন ওরফে মন্টু দাস কোন এক সময় পুলিশের কাজ করতেন। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সকালে মালিকটি কার-খানার অন্ততম শ্রমিক রবি বিশ্বাসকে চিকুনি চুরির স্বীকারোক্তি আদায়ে প্রবৃত্ত হয়। ফলশ্রুতিতে মালিকটি উক্ত শ্রমিকের হাত পা সজোরে বেঁধে মাথা নীচের দিকে ও পা উপর দিকে

দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বন্দী প্রসঙ্গে

সারা ভারতবর্ষে হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দী বছরের পর বছর ধরে কারাগারের বিভীষিকার মধ্যে দিয়ে ভিল ভিল করে অপমৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন, যাদের পিতা, মাতা, ভাই, বোম্ব এবং প্রিয়তমারা বুকচাপা ব্যর্থ জ্ঞান নিয়ে প্রহর, গুপ্তচর প্রিয়-জনদের শেষ সংবাদের প্রতীক্ষায়। তাঁদের প্রত্যেকের মানসিকতা ও মতভা সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশেষ কিছু জানি না। কিন্তু শিবাজী (দেবা-শীষ) ভট্টাচার্য ও কল্লোল দাসগুপ্ত (যাদের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আমি রীতিমত ওয়াকি-বহাল) সম্পর্কে অভিযোগ যে তাঁরা দেশদ্রোহী। সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় শিশাচদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ও অহুত পঙ্ক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে প্রকৃত অর্থে জাতীয়মুক্তির জন্ত ধারা নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তাঁরা যদি দেশদ্রোহী হন তাহলে হুদিরাম

বাঘা যতীন, বিনয়, বাদল, দীনেশ, হুমায় বহু, চিত্তবজ্রন দাস প্রমুখ প্রাক-সাতচল্লিশের বিপ্লবীরাও দেশদ্রোহী। কারণ তাঁরাও তদানীন্তন বিদেশী হায়না আর দেশী শহুনদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু বিপ্লবী চরিত্রে কালি লেপন করার পরিবর্তে সারা দেশব্যাপী তাঁদের প্রস্তর মূর্তি স্থাপিত করে, জয়জয়ন্তী উৎসব উদ্ঘাপিত করে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং এর দ্বারা সভ্য ও হুই মানসিকতার পরিচয়ই দেওয়া হয়। তাই যদি হয় তবে কেন শ্রীভট্টাচার্য ও শ্রীদাসগুপ্ত প্রমুখ সংগ্রাম সত্ব দেশমাতৃকার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অসহ অসহ্যকর গারদখানার মধ্যে আটকে রেখে নৃশংস অত্যাচার চালান হচ্ছে? তাছাড়া আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সব সময়ই জন-গণের রায়ের কথাটা উচ্চারণ করে থাকেন। নির্বাচন অহুত্বিত হবার পরও

প্রতিদিনই কয়েকবার করে বলেছেন জনগণের দায় তিনি বা তাঁর দল মাথা পেতে গ্রহণ করবেন। অতএব জন-গণের পক্ষ থেকে এ আমার চ্যালেঞ্জ যে, শ্রীভট্টাচার্য ও শ্রীদাসগুপ্ত প্রমুখ-দের মুক্তি দিয়ে তিনি জনসমক্ষে তাঁদের বক্তব্য হাজির করার সুযোগ দিন। এবং তিনি নিজেও শান্তি বক্তব্য রাখুন এবং এইভাবে বিচারের প্রহসন না করে জনগণের উপরে বিচারের পরি-পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করুন। সত্যিই তাঁরা যদি সমাজ জীবনের বন্ধু না হয়ে শত্রু হয়ে থাকেন তাহলে গত ৭ই ফেব্রুয়ারীর আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে খুব সঠিকভাবে বলা হয়েছে যে—“একদা যাহারাতরুণ ছিল, কিশোর ছিল, আজ বাহারা যৌবনে পা দিয়েছে অথবা সেই সব যুবা আজ যাহাদের যৌবন উত্তীর্ণপ্রায়—”। সত্যিই যুবক হিসাবে কারান্তরালে প্রবেশ করেছিলেন এইরূপ অনেকেরই যৌবন উত্তীর্ণপ্রায়। অতএব শান্তির আর কি বাকি?

তপন বসু

কংগ্রেস ও স্বাধীনতা সংগ্রাম

স্নেহাকর মল্লিক

মধ্য রাতে কংগ্রেসের সঙ্গে ইংরাজ সরকারের যোগসাজসে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর থেকেই স্বাধীনতার সরকারি ইতিহাসে কংগ্রেসকেই তার একমাত্র কৃতিত্বের অংশীদার করা হয়েছে। নয়া ইতিহাসে লেখা হচ্ছে গান্ধীজির দেখানো অহিংস নীতির পথেই স্বাধীনতা নামক ব্যাপারটা সংঘটিত হয়েছে। এবং এ-ব্যাপারে জবাবদার লাল নেহরুকেই মুখ্য নায়ক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

মার্কিনী হেনরী ফোর্ড একদা দৃষ্ট করে ঘোষণা করেছিলেন: 'History! It is I!' দৃষ্ট হলেও ব্যাপারটা মিথ্যে নয়। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে সব সময়ই ইতিহাস শাসক-শ্রেণী ও পার্টির মজি অজবাবী লেখা হয়। বলা বাহুল্য, সে-ইতিহাস বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ইতিহাস নয়।

সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো এ দেশে ব্রিটিশ শাসনের সহযোগী বে-ইংরাজি শিক্ষিত মধ্য শ্রেণী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাবে গড়ে উঠল ভবিষ্যতে তারাই শাসকশ্রেণীর পর্দায় উন্মীত হবে, এটা জানা কথা।

খুবদর সিবিলিয়ান হিউম সাহেব ভাইসরয় লর্ড ডাকরিনের সুপারিশে ১৮৮৫ তে কংগ্রেসের জন্ম দিলেন। বার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে শাসক ও শাসিতের মধ্যে ঢাল রচনা করা। এই মহান উদ্দেশ্যে তৃতীয় হয়ে হিউম সাহেব কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে স্বরেন বাড়ুজ্জ্য ও তাঁর ইতিহাস আলোসিয়েশনকে পাতা দেননি। যেহেতু সে কালে ইতিহাস আলোসিয়েশনের কাজকর্মে যথেষ্ট প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। যা কংগ্রেসের সহযোগী নীতির সঙ্গে খাপ খায়না। হিউম সাহেব কংগ্রেসের কাছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 'royal opposition' এর মতো একটি ভূমিকা মাত্র কল্পনা করেছিলেন। সেই কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসবে কলকাতায়। হিউম সাহেব সরেজমিনে তদন্ত করে দেখলেন কলকাতার স্বরেন বাড়ুজ্জ্যের সাহায্য ছাড়া কিছুই করা যাবে না। অগত্যা দ্বিতীয় কংগ্রেসে স্বরেন বাড়ুজ্জ্য-গোষ্ঠীকে আমন্ত্রণ জানানো হল।

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় রূপ দেবার প্রচেষ্টা শুরু হল। সমস্তা হল এই সর্বভারতীয় ফেস্টনের তলায় বিভিন্ন প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিকে এড়িয়ে রাখার মতলব। এরি ফলে বঙলা দেশে প্রথম প্রাদেশিক সংগঠন গড়ে

উঠল। ইতিহাসে বার নাম 'বেঙ্গল প্রভেনসিয়াল কনফারেন্স', ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সভাপতিত্বে তার প্রথম অধিবেশন হল ১৮৮৭-র মাঝামাঝি। এই অধিবেশনে স্পষ্টত চা বাগিচার অধিকার নিয়ে আলোচিত হল এবং ঘোষণা করা হল বিষয়টি মোটেই 'প্রাদেশিক' নয়, যেহেতু এই প্রশিক্ষণ এসেছেন বিহার, ইউ. পি., সি. পি এবং মাদ্রাজ থেকে।

"সর্বভারতীয়" কংগ্রেসের একমাত্র কাজ হল বার্ষিক একটি অধিবেশন করা। বার নাম দিয়েছিলেন অধিনীকুমার দত্ত ১৮৯৭-এর অমরাবতী কংগ্রেসে "তিন দিনের তামাশা"।

লক্ষ্য করা গেছে সে পর্বে অস্তিত্ব প্রদেশের তুলনায় বঙলা দেশের রাজনীতিমন্ডল অনেক পরিমাণে পক্ষিয়ার ছিল। এবং তাঁরা গোটা ভারতবর্ষের নেতৃত্বের লাগাম ধরতে উদ্যত হয়েছিলেন।

চতুর্থ লর্ড কার্জন বঙলা দেশের এই ভূমিকার গুরুত্ব বুঝেছিলেন। তাই তাঁর কাজ হল ভারতীয় জাতীয়তার উৎসমূলকে রুদ্ধ করে দেওয়া। ১৮৯২-এ তিনি কলকাতা করপোরেশনের ক্ষমতাকে খর্ব করলেন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেন। এবং তৃতীয়ত, তাঁর মোক্ষম কাজ হল বঙ্গভঙ্গ। ১৯০৬-এই তাঁর এই মতলব বোঝা গিয়েছিল। এই পরিকল্পনাকে কার্যকর করতে লাগল দুবছর।

বঙ্গভঙ্গের এই সিদ্ধান্তকে, পোস্তাগ্যের বিষয়, সর্বভারতীয় নেতৃত্ব জাতীয় আন্দোলন হিসেবেই গ্রহণ করলেন। এই আন্দোলন চলল ১৯০৫ থেকে ১৯১১।

বঙ্গভঙ্গ রথ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই সর্বপ্রথম এদেশে তুলনামূলকভাবে একটি জাগ্রত ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব দানা বেঁধে উঠল। একদিকে কংগ্রেসের তথাকথিত নরমপন্থী-চরমপন্থীর বর্ধনকে ছাপিয়ে গড়ে উঠল বঙলার মাটিতে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন।

কলকাতায় অচলিত কংগ্রেসের ছাত্রশতম অধিবেশন বসল ১৯১১-তে। পরবর্তীকালে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ডকে অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্তে আমন্ত্রণ করা হল। ওই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' গানটি গীত হল। শেষ মুহুর্তে ম্যাকডোনাল্ড সাহেব যোগদান করতে পারলেন না অকস্মাৎ তাঁর পত্নী বিয়োগের কারণে। সভাপতিত্ব

করলেন ইউ. পি-র নেতা বিষ্ণুনারায়ণ ধর। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব রদ করার কারণে ব্রিটিশ সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে অভিনন্দন পাঠানো হল।

এই বঙ্গভঙ্গ রদের কৃতিত্ব কী একা কংগ্রেসই বহন করতে পারে, নাকি এর পিছনে রয়েছে আয়ুগের বিপ্লবী সৈনিকের, আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত? কংগ্রেসের আরোহণ-নিবেদনের নিরাশ্রয় রাজনীতি থেকে বিপ্লবীদের সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক যে ব্রিটিশ সরকারকে কম্পিত করেছিল তারি সাক্ষ্য বহন করছে সরকারের প্রস্তাবে ১৯০৬-তে গজিয়ে ওঠা সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ। যে সাম্প্রদায়িকতাকে আশ্রয় করে ব্রিটিশ দীর্ঘকাল এদেশে তার ক্ষমতা বজায় রেখেছে। দ্বিতীয়ত, সর্বভারতীয় রাজনীতি থেকে বঙলা দেশকে কোণঠাসা করার জন্ত রাজধানী স্থানান্তরিত করা হল কলকাতা থেকে দিল্লিতে।

এমতাবস্থায় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতবর্ষের রক্তমাংসা আবিষ্কৃত হলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় বুরর যুদ্ধে

খেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের কৃতিত্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাইজার-ই-হিন্দ পক্ষ গলায় ঝুলিয়ে। একটা ভাষ্যত উঠতেই পারে, এই বর্বর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে মোহনদাস কী কোনো বক্তব্য রেখেছিলেন? বাই হোক শান্তিনিকেতনে পদার্পণমাত্র ত্রিকাল-দর্শী কবি তাঁকে মহাত্মা বলে বরণ করে নিলেন।

পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস এই মহাত্মারই ব্যক্তিগত দিকনির্দেশের ইতিহাস। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে মিশিয়ে ভক্তিধর্মের রূপে আশ্রিত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান মহাত্মার ব্যক্তিগুণের পরিণত হল। সদর্পে কংগ্রেস একটি সংগ্রাম পর্ববসিত হল না। এই মহাত্মা কংগ্রেসের এক পাইয়েরও সত্য হুন্নি অথচ মহাত্মার মতো তিনিই তার কলকাঠি নাড়তে লাগলেন। সাধারণ সভ্যদের ভোটেই, এমন কি কংগ্রেস হাই কমান্ডের সভ্যরাও তাঁর হাতের পুতুলে পরিণত হলেন।

বার বার তিনি দেশের মানুষকে আন্দোলনে ডেকেছেন এবং বার বার সে বৃহত্তর অত্যাচারের রূপ নিলে একটা না একটা অজুহাতে সে আন্দোলনকে অকুণ্ঠেই বিনষ্ট করেছেন।

বিনা বিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

কয়েকজন শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিক চলচ্চিত্র পরিচালক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজনীতিক কর্মীদের বিনা বিচারে দীর্ঘকাল আটক রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এক বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে: "দীর্ঘকাল যাবৎ বিচারের নাম করে যে সব রাজনীতিক কর্মীকে জেলে আটক রাখা হয়েছে, জেলে যাদের ওপর অমানুষিক ব্যবহার করা হচ্ছে, যেসব কর্মীকে বিনা বিচারে আটক রাখা হচ্ছে, আমরা তাদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করি। যেমন-বিনা বিচারে আটক রাখা গণতান্ত্রিক রীতির পরিপন্থী, তেমনি বিচারের নামে, কার্যত: বিনা বিচারে প্রায় একদশক ধরে কাউকে জেলে আটকে রাখাও তাই। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই অবস্থা চলতে দিতে পারে না।

"গুপ্ত রাজনীতিক কর্মীদেরই নয়, পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবী, কবি, শিক্ষক, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিককেও দীর্ঘকাল ধারণ বিনা বিচারে অথবা বিচারের নামে জেলে আটক রাখা হয়েছে। 'জনক' সম্পাদক অধ্যাপক দীপকর চক্রবর্তী, কবি সমীর রায়, কথাসাহিত্যিক রবি সেন, অধ্যাপক নিশীথ ভট্টাচার্য, অ্যাডভো-

কেট নরেশ ভট্টাচার্য এবং আরো অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে তাঁদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই দিনের পর দিন জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে। আমরা এইভাবে শিল্পীর বর্ধরোধের প্রতিবাদ বরি এবং অবিলম্বে তাঁদের মুক্তি দাবী করি।

"জেলে রাজনীতিক কর্মীদের সংগে আচরণের যে নিয়মান গত করেক বছরে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা সভ্য সমাজের পক্ষে কলঙ্করূপ। দৈহিক অত্যাচার, অধাত, অচিকিৎসা, ইত্যাদির অভিযোগ তো আছেই; আত্মীয় এবং বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারেও তাঁদের প্রতি নানা অসমত বাধা নিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। গুপ্ত রাজনীতিক কর্মীদেরই নয়, জেলে বন্দী যে কোনও মানুষের সঙ্গে মানবিক ব্যবহার করা হোক, তাঁদের খাতি, চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে সকল রকম বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার উর্ধে উঠে সভ্যজগতের নিয়মকানুনগুলি এখন থেকে মেনে চলা হোক, এও আমাদের অন্ততম জোবালো দাবী।"

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন: অমিয়কুমার বসু, অরুণা চৌধুরী, অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত, অশোক রুত্র, অসিত বসু, কমলেশ সেন, বিটা দত্ত, কান্তিশ মাইতি, ক্ষেত্র গুপ্ত, কল্যাণ

১৯২০র অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেই উচ্চ জনগণ যখন টোরিচো-রায় পুলিশের নির্ধাতনের বদলা নিয়েছে তিনি অহিংসার অজুহাত তুলে আন্দোলন প্রত্যাখ্যার করেছেন। দেশে সর্বত্র যখন তিনি কুটির শিল্পের উপর জোর দিচ্ছেন তখন তাঁরই ওজরটি প্রদেশে বৃহৎ বস্ত্রশিল্পে মনস্ত জোগাচ্ছেন। কখনো তিনি ইংরাজকে যুদ্ধে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন, কখনো চিত্তস্তম্ভিত জন্তে অনশন করছেন। আর, এই ধর্মকাতর দেশে যেখানে পাইকারী দারিদ্র্য আর অশিক্ষা পাহাড়প্রমাণ সেখানে মহাত্মার রাজনীতি বজিত গুরুগিহি সহজেই পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে।

গান্ধীজির এই নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছে এই বঙলা দেশ। কিছু পরিমাণে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং প্রধানত: হুভাষচন্দ্র। গান্ধীর একনায়কত্বকে নাকচ করে হুভাষচন্দ্রই সে কালে কংগ্রেসের মধ্যে একটি গণতান্ত্রিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। হুভাষচন্দ্রের একদা সংকল্পী জবাবদার লাল নেহরুই গান্ধীর উত্তরাধিকারী হবার সুবিধে অর্জন করবাব তাগিদে হুভাষচন্দ্রকেই ত্যাগ করলেন।

(শেবাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

সেন, গৌরকিশোর ঘোষ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, গিরীন্দ্র চক্রবর্তী, চক্ৰবর্তী চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, জ্যোতি ভট্টাচার্য, জ্যোৎস্না সিংহরায়, জ্ঞানেন্দ্র পজনবীণ, তারাপদ লাহিড়ী (অ্যাডভোকেট), তারাপদ মুখোপাধ্যায়, তরুণ মজুমদার, অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী (সম্পাদক, 'জনমহল') দেবী-প্রসাদ ভট্টাচার্য, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, নরেশ ভট্ট, নিখিলেন্দু রায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, পি. কে. মিত্র, পূর্ণীশ বাগচী (অ্যাডভোকেট), পবিত্র সরকার, প্রবুদ্ধ সেন, প্রদীপ সিংহ, পরেশ ধর, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বাহুদেব বর্মা, বিনয় ঘোষ, বীর্ষেন্দ্র চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, বৈজনাথ চক্রবর্তী, বিজয়কুমার বসু, ভারত-জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল সেন, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মানস রায়-চৌধুরী, মৃণাল চৌধুরী, মুরারি ঘোষ, রাণা বসু, রাখাল দত্ত, রামকৃষ্ণ ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু ঘোষ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শুভশীল বসু, সঞ্জনী মুখোপাধ্যায়, স্বপন মজুমদার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাগর চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধময় চক্রবর্তী (সম্পাদক, 'গণবর্তী') নৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, স্বরেশ মৈত্র, সুনীল দত্ত, হেমাক বিশ্বাস, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ পোদ্দার, সমর সেন।

সমাজতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র

পঞ্চজ চৌধুরী

আদি কংগ্রেস, নব কংগ্রেসের পর কংগ্রেস কর ডেমোক্রেসির আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের ভাঙ্গনটি সম্পূর্ণ হোল। গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের সংগে এবার যুক্ত হোল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শগত ভাঙ্গনটি সম্পূর্ণ হলেও সংগঠনগত ভাঙ্গনটি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। কংগ্রেস সদস্যরা কে কোন দলে থাকবেন না আর কিছুদিনের মধ্যেই তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। তখন হয়তো শুল্ক ভাসমান তিনটি সমাজতন্ত্রের মধ্যে ত্রুটি বিজ্ঞ মতবাদের ত্রিমূর্তিকে প্রত্যক্ষ করে আরেকবার ভারতবাসী অবাক হবে অথবা জাতীয় বর্তমান ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালকে একসঙ্গে দেখে চমকে উঠবে। কিন্তু সেটা হবে সাময়িক। তারপরই দেখা দেবে বাধাধারা উত্তাল আয়ার। নির্বাচনের ভোটের বাজের হয়তো জনতার সেই উচ্ছ্বাসকে আটকে রাখা যাবে না। তার আগেই যদি ভারতের ইতিহাসে আরেকবার তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়ে যায় তাহলেও হয়তো এবার আর ভারতের জনগণের প্রায় নৃত্যকে বোধ করা যাবে না। আগামী ঘটনাগুলি বর্ণিত ভারতবাসীর জন্য কোন দুর্ভব আশাস নিয়ে আসবে। কেবল ভবিষ্যতেই জানা যাবে।

‘ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা এবং ব্যক্তিরা যেন হবার হাজির হয়’ হেগেলের এই ঐতিহাসিক দার্শনিক বক্তব্যের পরে বস্তুবাদী কার্ল মার্কস বলেছিলেন, ‘প্রথমবার আসে ট্রাজেডি হিসাবে এবং দ্বিতীয়বার আসে প্রহসন হিসাবে।’ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এখন প্রহসনটির অভিনয় হচ্ছে। ট্রাজেডির অভিনয় হয়ে গেছে অর্ধশতাব্দী পূর্বে। সেই ট্রাজেডির নায়ক ছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। বর্তমান প্রহসনের প্রধান ভূমিকার অবতীর্ণ হয়েছেন জীৱনপ্রকাশ নারায়ণ। প্রহসনের নতুন দৃশ্য শুরু হবার পূর্বে ট্রাজেডি এবং প্রহসনের পূর্ববর্তী দৃশ্যগুলি স্মরণ করা যাক।

১৯১৮ সাল। ব্রিটিশ পদানত পরাধীন ভারতবর্ষ। মন্টেগু চেমস-কোডের রিফর্ম বিলকে সমর্থন করে স্বরেন ব্যানার্জী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অধিকাংশ মজুমদার ইত্যাদি পুণো কংগ্রেসী নেতারা কংগ্রেস ছেড়ে এসে জাতীয় লিবারেল ফেডারেশন দল করলেন। কিন্তু গান্ধীবাদী কংগ্রেসে নতুন এসেও প্রধান নেতা বনে গেলেন। গান্ধীবাদী এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে

অহিংস আন্দোলনের জন্ত প্রস্তুত হলেন। কিন্তু হিংস্র কৃষকরা চৌরী-চৌরায় বিদ্রোহ করে স্বরাজ আশার পথ বন্ধ করে দিল। গান্ধীবাদী তার আন্দোলন প্রত্যাখ্যার করে মেলে বসে গেলেন। কংগ্রেসের মধ্যে দেখা দিল আরেকটি ভাঙ্গন। স্বরাজের প্রোগাম দিয়ে চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে স্বরাজ্য-পন্থীরা একত্রিত হোল। শুরু হোল প্রো-চেঞ্জার এবং নো-চেঞ্জারদের মধ্যে বিরোধ। স্বরাজ্যপন্থী প্রো-চেঞ্জাররা শক্তিশালী হোল। চিত্তরঞ্জন দাসের যত্নের পর স্বরাজ্যপন্থীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন হুভাষচন্দ্র বসু। তার ফলেই ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত হোল। মোটামুটি ভাবে এই হোল ট্রাজেডির দৃশ্য-ভঙ্গি। তারপর গণা দিয়ে অনেক ঘোলা জল বয়ে গেল। ১৯৪৭ সালে হুভাষচন্দ্র বসুর অস্থিত্বের সুযোগে মুসলিম লীগ এবং জাতীয় কংগ্রেস বিদেশী শাসকদের মধ্যস্থতার ভারত-বর্ষকে বিভাজিত করে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিল।

তারপর প্রহসনের বনিকা উঠল ১৯৬৯ সালে। কংগ্রেসের ভাঙ্গনের দৃশ্য দিয়েই তার শুরু। মোরারজি, কামরাজ, পাতিল ইত্যাদি আদি কংগ্রেসী নেতারা রাশিয়ার সহযোগিতায় গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয় পুঞ্জির বিরোধিতা করে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে সরে আসতে বাধ্য হলেন। আর প্রধানমন্ত্রী নব কংগ্রেস গঠন করেও রাষ্ট্র ক্ষমতার রয়ে গেলেন। গুজরাটের আন্দোলন দেখে এগিয়ে এলেন জয়প্রকাশী। সেবার গান্ধীবাদী বিপ্লব ছাড়াই অহিংস ধর্মীয় আন্দোলন করে স্বরাজ আনার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আর এবার জয়-প্রকাশী প্রস্তুতি ছাড়াই অহিংস পথে টোটাল রেভলিউশানের কথা বলে বিহারে অধর্মীয় আন্দোলন শুরু করে দিলেন। কিন্তু তিনি গান্ধীবাদী মত আন্দোলন প্রত্যাখ্যার করার সুযোগ পেলেন না। তার পূর্বেই সশস্ত্র রাষ্ট্রশক্তি তার বিপ্লব বন্ধ করে জেলে ধরে নিয়ে গেল। তারপর পশ্চিমবঙ্গের শুরু হোল প্রো-চেঞ্জার এবং নো-চেঞ্জারদের বিরোধ। এবার নো-চেঞ্জাররা শক্তিশালী হোল। সেবার পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হবার পূর্বেই চিত্তরঞ্জন দাস কংগ্রেস ছেড়ে স্বরাজ্য দল গঠন করে-ছিলেন। আর এবার সংবিধানে সমাজতন্ত্রের প্রস্তাব গৃহীত হবার পরে জগজীবন রাম কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রোগাম নিয়ে করলেন কংগ্রেস কর ডেমো-ক্রেশি। ভারতের রাজনৈতিক ইতি-

হাসে ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৯ সালের ঘটনাবলীর ব্যক্তিগত হিসারেই যেন ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের ঘটনা-বলীর আবির্ভাব ঘটতে শুরু করেছে। অমিল যদি কিছু থাকে তবে তাও ট্রাজেডি এবং প্রহসনের খাতিরেই।

ইতিহাসেরও ইতিহাস থাকে। লিখিত ইতিহাসের পূর্বে আছে অলিখিত ইতিহাস। রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্তরালে আছে অর্থনৈতিক ইতিহাস। অর্থনীতি বিকাশের ইতি-হাসটি অচেতন এবং রাজনীতি বিকা-শের ইতিহাসটি সচেতন। অচেতন এবং সচেতন উভয় ইতিহাসের পার-স্পরিক ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মানব সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। ঐতিহাসিকরা জানেন যে, ইতিহাস তার আপন পেয়ালে সভ্যতা গড়ে এবং ভাঙে। কোন কোন সময় মানুষ তার

নিজের হৃদয়ামত সভ্যতাকে ভেঙ্গে গড়ে নিতে চায়। তখন তাকে নির্ভর করতে হয় নির্দিষ্ট দেশের জাতীয় পেকে আগত এবং প্রদত্ত মালমশলার উপর। সেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই হল সভ্যতা ভাঙা এবং গড়ার প্রকৃত কারি-গর। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থা-সারী হলেই কেবল ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা স্বীকৃতিস্বত্ব করে থাকে।

পর্যায় ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ এবং দালাল পুঁজিবাদের ঐক্য। তাই পরাধীন ভারতবাসী কোনদিন একত্রিত হতে পারেনি। রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তা-স্তরের পরে ভারতে গড়ে উঠেছে বিদেশী পুঁজি, দেশীয় পুঁজি এবং রাষ্ট্রীয় পুঁজির ঐক্য। তাই ভারতের জনগণ কেবলই বিভক্ত হচ্ছে। অর্থ-নীতি বিকাশের ইতিহাস ভারতের

গণতন্ত্র বনাম ব্যক্তি কতৃত্ববাদ

কালিদাস কুণ্ডু

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এশিয়ার রাজ-নৈতিক মানচিত্রে তিনটি দৃশ্যপট স্পষ্ট হয়ে উঠেছে (এক) চীন, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ও উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি দেশগুলিকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের দৃশ্যপট; (দুই) আপান থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়াকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের দৃশ্যপট; (তিন) ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, বর্মার মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াকে কেন্দ্র করে দুই অতিশয় শক্তির তীব্র প্রতি-যোগিতার দৃশ্যপট।

প্রথম দৃশ্যপটে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পরিবর্তে অব্যাহত রয়েছে জনগণতন্ত্রের জয়যাত্রা। সশস্ত্র প্রমিত শ্রেণীর নির-স্তর প্রহরার সেখানে গড়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দুর্জয় শক্তি। দ্বিতীয় দৃশ্যপটে গণতন্ত্রের সমাধির উপর গড়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থচক্রের প্রহরারীণ সামরিকতন্ত্র। তৃতীয় দৃশ্য-পটে গণতন্ত্রের পরিবর্তে গড়ে উঠেছে ব্যক্তিকতৃত্ববাদ।

বুর্জোয়া একনায়কত্ব

উপরোক্ত ব্যক্তিকতৃত্ববাদ বুর্জোয়া একনায়কত্ব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একদা উপনিবেশ, সম্ভাব্য পরাধীন ভূখণ্ডের অনগ্রসর দেশগুলোতে বুর্জোয়া এক-নায়কত্ব গড়ে উঠতে পারে না। ঐতি-হাসিক কারণেই জনতন্ত্রের স্বাধীন বিকাশ পরিণত স্তরে প্রবেশ করলেই উৎপাদন ও উৎপাদনের শক্তিগুলোর উপর বুর্জোয়াদের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে পারে এবং বুর্জোয়া একনায়কত্বের সড়ক তৈরী হতে পারে। জনতন্ত্রের

উত্থানের যুগে বুর্জোয়ারা দেশে দেশে একনায়কত্ব কায়েম করেছে। বর্তমান যুগ জনতন্ত্রের জন্ম অবস্থার যুগ। আজকের যুগের বুর্জোয়ারা নতুন ভূ-খণ্ডে একনায়কত্ব কায়েম করতে পারে না। রাশিয়ার সার্বক অস্ত্রাব্য বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার পর নবযুগের অভ্যুদয় ঘটেছে সর্বহারা বিপ্লবের যুগ। ইতি-হাসগত ভাবে আমরা সর্বহারা বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছি বলাই যে বুর্জোয়া একনায়কত্বের অবসান ঘটেছে, তা নয়। পশ্চিম দুনিয়ার বুর্জোয়া একনায়কত্ব অটল বর্ষান্তর মতো দাঁড়িয়ে আছে আজও। কিন্তু তার বৃদ্ধি নেই। সে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে প্রতি-নিয়ত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও কাসীবাদ বিরোধী সংগ্রাম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কলেএশিয়া ভূ-খণ্ডে যেমন জাপানী সাম্রাজ্যবাদ পশু-দন্ত হওয়ার আপানের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের একনায়কত্ব কায়েমের খণ্ড বর্ষ হয়ে গেছে, অন্তরিক ইউ-রোপ জার্মানী ও ইটালীয় পুঁজিপতি-দেরও বিপর্যয় ঘটে গেছে। চীনের স্বাধীন আপ বিরোধী যুক্তিসংগ্রাম প্রতিহত করেছে জাপানী সাম্রাজ্যব-দন্ত। অপর দিকে ইয়ালিনের নেতৃত্বে দুর্জয় লালকোঁজের পরাক্রম চূর্ণ করে দিয়েছে জার্মানীর অগ্রাণী লালসা। ইউরোপের দেশে দেশে গড়ে উঠেছিল বীরত্বপূর্ণ কাসীবাদ বিরোধী সংগ্রাম। কাসীবাদ বিরোধী সংগ্রামের ব্যাপক মঞ্চ বুর্জোয়া একনায়কত্বের

দর্পণ ৪ শুক্রবার ১৮ই মার্চ, ১৯৭৭

রাজনৈতিক ট্রাজেডি এবং প্রহসনের ভিত্তি হলেও উপরি কাঠামোর এখনও ঐপনিবেশিক সামন্ততান্ত্রিক এবং দালাল পুঁজিবাদী চরিত্র বাসা বেঁধে আছে আইন-কাহন এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে। তাদের উচ্ছেদ না করে ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়া আর যে সর্বের মধ্যে ভূত তাই দিয়ে ভূত ভাড়াতে যাওয়া সমান কথা। সেই কারণেই গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের অকার্যকারিতায় সাধারণ মানুষও বুঝতে শুরু করেছে যে ও দুটো পুঁজিবাদেরই পোষাকী নাম। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র মানে তো সর্বহারা একনায়কতন্ত্র। সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ এবং দালাল পুঁজিবাদ বিরোধী সমস্ত দেশে শ্রেণিকদের একটি ব্যাপক একত্রিত জাতীয় যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব জাতীয় স্বাধীনতা এবং জাতীয় গণতন্ত্রকে হুমি-স্বিত না করেই কি ভারতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? প্রহসনের আগামী দৃশ্য-গুলির মধ্যে নিশ্চয় এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে।

পশ্চাদপসরণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কৌশলগত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর ব্রিটিশ, ফ্রান্স ও পর্তুগীজ সাম্রাজ্য-বাদীরা হুকৌশলে এশিয়া থেকে হাত উঠাতে শুরু করলো। ঐপনিবেশিক দেশে দেশে চললো ক্ষমতা হস্তান্তরের নাটকীয় আরোজন। ঐপনিবেশিক ও শোষণের প্রয়োজনেই এই সব দেশ-গুলোতে কিছু কিছু সংসদীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। যেমন, ভারতবর্ষে ১৯৩৫ সালে ভারতশাসন আইন প্রবর্তিত হল। প্রাদেশিক স্বায়তশাসনের স্বীকৃতি আনিতেও কেন্দ্রের হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করা হল। কেন্দ্রের সর্বময় কর্তৃত্বের অছি-লার ব্যক্তি কর্তৃত্ববাদ গড়ে ওঠে— সংসদীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের মর্যাদা হ্রাসিত হয়। ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাস এই বেদনাদায়ক সত্যের সাক্ষ্য বহন করে। এই বেদনাদায়ক সত্যের সাক্ষ্য বহন করে ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঘটনাবলী।

(শেষাংশ ৩ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

জরুরী অবস্থায় অর্থনৈতিক অগ্রগতির আসল চেহারা (৭)

ডঃ সুরেন্দ্রশিরম স্বামী

২০ দশক কর্মসূচীর গুণগান শুনে যাহ্নবের কান কালাপালা। যে যেমন দেখতে চায় তেমনই দেখে। আরও একটি দেখার ভঙ্গি আছে যাতে কোন কোন বিষয় বাদ পড়েছে তা দিয়ে দেখতে হয়। ১৯৭১-৭২ এ শ্রীমতী গান্ধীর অতি পেয়ারের দুটি শ্লোগান এতে আশ্চর্যজনক ভাবে বাদ পড়েছে—সে দুটি হল চাকুরি এবং আত্মনির্ভরতা।

যাদের অস্থিবিধাঙ্গনক স্মৃতিশক্তি ১৯৭১-৭২ সনের ঘটনাগুলি স্মৃতিপটে আনতে পারবে তাদের মনে পড়বে তখন ভরনে ভরনে যেসব চাকুরি দেওয়ার পরিকল্পনা প্রচার করা হয়েছিল। যতগুলো পরিকল্পনা হয়েছিল ততগুলো চাকুরিও যদি তারা দিতে পারত। ১৯৭২ সনে জনসংঘ আত্মনির্ভরতা এবং স্বদেশী পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে বলেছিল বলে শ্রীমতী গান্ধী তাদের অবাস্তব-বাদী বলে আক্রমণ করে পূর্ণ আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণ কংগ্রেসের প্রচারের প্রধান মঞ্চ করেছিলেন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নতুন খণ্ড এই লক্ষ্য রেখে করা হয়েছিল যাতে বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ শূন্যে নেমে যায়।

কিন্তু এই লক্ষ্যে কতদূর পৌঁছান গেল? জরুরী অবস্থা এবং ২০ দশক কর্মসূচীর পরে বড় বড় কথাই ধরুন। এই লক্ষ্যে হারিয়ে গেল। আবার একে একেবারে অহেতুক ও বলা চলে না। প্রথমত চাকুরীর কথাই ধরা বাক। চাকুরির স্বযোগ বাড়ানর যে সব স্বীকৃতি করা হয়েছিল তা নীচে দেওয়া হল:

টেবল নং ৬

১৯৭১-৭৬ এ চাকুরীর স্বযোগ বাড়ানর স্বীকৃতি

বছর	শিক্ষিত	বিশেষ চাকুরীর	সংস্কৃত চাকুরীর	চাকুরি বৃদ্ধির
বেকারের ক্ষয়	কর্মসূচী	পরিকল্পনা	স্বীকৃতি	
বার্ষিক আংক	ব্যক্তি	বার্ষিক আংক	ব্যক্তি	বার্ষিক আংক
১৯৭১-৭২	৫০.০	১১.৩	অনারহ	অনারহ
১৯৭২-৭৩	৫০.০	৩৬.২	১৬.০	৪২.১
১৯৭৩-৭৪	৫০.০	১৫.৩	১৬.০	৩৫.৭
১৯৭৪-৭৫	৫০.০	১৫.৩	১৬.০	৩৫.৭
১৯৭৫-৭৬	৫০.০	১৫.৩	১৬.০	৩৫.৭
১৯৭৬-৭৭	৫০.০	১৫.৩	১৬.০	৩৫.৭

আকর : সুরেন্দ্রশিরম স্বামী ৪৭৬ নং তারিখিত প্রবন্ধ ২১ জানুয়ারি

১৯৭৬ পরিকল্পনা মন্ত্রীর দেওয়া জবাব।

উপরের টেবল থেকে দেখা যাচ্ছে চারটি বিশেষ জাতীয় কর্মসূচী ১৯৭৫-৭৭ সালে বাতিল করে দেয়া হয়েছিল—কোনটা তারও আগে। টাকার অভাবে যে এগুলি বাতিল হয়েছিল তা নয় কারণ বাজেটে ধার্য অর্থ কোম কর্মসূচীতেই নিঃশেষ হয়নি। সরকারী কৃতিত্বের এটি একটি উজ্জল নিদর্শন।

কর্মসূচীগুলি পরিত্যাগ করার কারণ হল গিমিক হিসাবে এগুলি আর সাধারণ মানুষকে ভোলাতে পারছিল না। কাজেই উদ্দেশ্য অর্থে তাদের প্রয়োজনীয়তা বহন আর থাকল না তখন তা বাতিল হয়ে গেল।

কিন্তু বেকারি বেড়েই চলেছে। এরও আগে বেকারি বেড়ে চলেছিল প্রতি দশকে ২.০% হারে। পাহাড়-প্রমাণ সংখ্যাভেদে তুপের মধ্যে একথা স্বীকার করতে প্রাণি কমিশনের বড়কর্তাদের দৃঢ়তা ও কপিত্ব হল যখন পঞ্চম পরিকল্পনার তারা স্বীকার করলেন যে, ক্রমবর্ধমান বেকার সংখ্যার সঙ্গে চাকুরির স্বযোগ তালি রাখতে পারছে না। এটা অবশ্য খুব মুরভাষা। ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬৫-৬৬ সালে সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে বেকারি বৃদ্ধির হার ছিল বছরে ৬%। গ্রামীণ চাকুরী বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল বছরে ২%। কাজেই গ্রামের বেকাররা শহরে এসে ভিড় জমাল। তারপর ১৯৬১-৬৬ সন থেকে আরম্ভ হল চমৎকার 'কৃতিত্বের দশক' যখন সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে চাকুরির স্বযোগের হার পড়ে গেল বছরে ২.০% এ। ১৯৭০-৭১ সন থেকে 'প্রগতিশীলতা' যখন থেকে ক্ষমতার এলেন, চাকুরির স্বযোগ আবার নেমে গেল বছরে ২% এ।

বেকারের সংখ্যা বর্তমানে ঠিক কত? ইন্দিরা গান্ধীর সরকার এই প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করে এই কারণে যে, 'বেকারের একটি একমাত্রিক

গুরুত্বের সংখ্যা উল্লেখ করলে বর্তমান আর্থিক অবস্থার পক্ষে তা না হবে অর্থপূর্ণ না হবে প্রয়োজনীয়।' (পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা)। যাদের মন এক পথ ছাড়া চলতে পারে না তাদের পক্ষে একমাত্রিক সংখ্যা অবশ্য নিশ্চয়োজনীয়।

তবে বিশেষজ্ঞদের হিসাবে সারা বছরে বেকারের সংখ্যা ৬ কোটি এবং বছরের বেশীর ভাগ বেকারের সংখ্যা ৪ কোটি। তার মানে আমাদের শ্রমিক শক্তির ২৫% ই বলতে গেলে বেকার এবং জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরে এই বৃদ্ধির হার ভীষণভাবে বেড়ে চলেছে। যদিও বেকারি সম্পর্কে সংখ্যাভেদ পাওয়া কঠিন কারণ সরকারী কর্তারা এটিকে ঘণাঘাণে চেপে রাখেন তবু শহর অঞ্চলে বেকারির লভ্য এবং সংগতিপূর্ণ সূচক হল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের রেজিস্টার। যদিও এই সংখ্যা প্রকৃত অবস্থার সূচক নয় কারণ বহু নিযুক্ত ব্যক্তি আরো ভালো নিয়োগের আশায় নাম লেখায় আবার অনেক বেকার হতাশ হয়ে নাম লেখাতেই যায় না। তবে মোটামুটি সূচক হিসাবে এদের সংখ্যা-ভুলো কাজের এবং বৃদ্ধি হারের সূচক হিসেবে নিশ্চয়ই সঠিক, কেন না, বিশেষ একটা সময়সীমা ব্যাপে এদের মূল অপরিবর্তিত থাকে।

এই সংখ্যাভুলো থেকে কী দেখা যায়? দেখা যাচ্ছে ৩১ মে ১৯৭৫-এ নাম লেখানো বেকারের সংখ্যা ৮৭ লক্ষ থেকে ৩১ মে ১৯৭৬-এ উঠল ১৬ লক্ষে। ডিসেম্বর ১৯৭২ এর শেষে এই সংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ। অল্প কথায় বলতে গেলে জরুরী অবস্থার এক বছরের মধ্যে বেকারি বেড়েছে ১.০০% হারে। এর সঙ্গে তুলনা করুন ১৯৭১-৭৪ এর ২.০% বৃদ্ধির হার এবং ১৯৭৪-৭৫ সনের ১.৮% বৃদ্ধির হার। এই যদি কল হয়ে থাকে তবে খুবই আশ্চর্যকর যে শ্রীমতী গান্ধী এই সংখ্যাভুলোকে তাঁর কার্পেটের তলায় ঢাপ দিয়ে রাখবেন।

বেকারির হার এত দ্রুত বাড়ার কারণও সহজেই বোঝা যায়। জরুরী অবস্থার পরে মালিকেরা সমস্ত আইন-কানুন খুঁটিয়ে রেখে খুশিমত পরমানন্দে শ্রমিকদের হাটাই বা বহাল করতে পেরেছে। ছয় মাসের মধ্যে ডিসেম্বর ১৯৭৫ মাসগান্ধী নির্দেশ ম্যানেজমেন্ট ৪৭১৩২৭ জনকে লে-অফ করেছে। জুন ১৯৭৬ নাগাদ এই সংখ্যা ৭০০০০০ এ দাঁড়িয়েছে হিসেব করা যায়।

ভারতীয় শ্রমিকের মত এত বহুনির্দেশিত আর কোথাও দেখা যায় না। 'গমজবাব' স্বভাবতই তার স্বার্থহানি করেছে। না হলে কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না কী করে ১৯৬৫-৭৬ সনে ১৯৬০-৬১ সনের স্তরের ১৫% কম প্রকৃত মজুরি এবং ক্রমবর্ধমান বেকারি সত্ত্বেও জাতীয় অর্থনীতির অপদার্থতার জন্ত ভারতীয় মজুরকে দায়ী করা যায়। ধর্মঘট এবং কাজের দিন নষ্ট হওয়ার জন্ত সরকার সর্বদাই তার অভিযোগের অঙ্গুলি নির্দেশ করে থাকেন শ্রমিকদের দিকে। কারখানায় কাজের সময় যদি কমে যায় তাহলে জাতিবিশিষ্ট কৃতি হয় কিন্তু তার জন্ত কি কেবল ধর্মঘটই দায়ী? বসন্ত ১৯৫২ সনের পরে যত ধর্মঘট হয়েছে তার মধ্যে মজুরি বা বোনাসের জন্ত হয়েছে মাত্র ১০ থেকে ১২%। ১৯৭৫-৭৬-এ মজুরদের ডাকা ধর্মঘটের সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু তার ফলে কাজের দিন নষ্ট হওয়ার সংখ্যা কমেই কারখানা মালিকেরা ক্লোজার, লক আউট, লে অফ এবং ৭০০০০০ শ্রমিককে হাটাই করে ঘাটতি পূরণ করে বেশী করে নিয়েছে। কিন্তু সব ক্যাসিটদের মতোই ভাণ করেন যে, এই বিস্তৃতকর তথ্যগুলির অস্তিত্ব নেই।

আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রে যে ডিগবাজি খাওয়া হয়েছে তাও একটু কপটতার আড়ালে ঢাকবার চেষ্টা হতে পারে। ১৯৭২ সনে শ্রীমতী গান্ধী ঘোষণা করেছিলেন যে, অতঃপর নীট বিদেশী সাহায্য এবং খাদ্য আমদানি ক্রমবর্ধমান হারে হ্রাস করে ভারত আত্মনির্ভরতার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবে। এই ধরনের বাগাড়ম্বর কত শৃঙ্খল, নীচের টেবল থেকেই তা বোঝা যাবে।

টেবল নং ৭

১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭-এ বিদেশী সাহায্য এবং খাদ্য দ্রব্যের আমদানি নীট অভিস্রোত

বছর	বিদেশী সাহায্যের নীট অভিস্রোত (কোটি টাকা)	খাদ্যদ্রব্য আমদানির নীট অভিস্রোত (লক্ষ টন)
১৯৭২-৭৩	১৫২	০.০
১৯৭৩-৭৪	৪০৪	৩৬.০
১৯৭৪-৭৫	৭১১	৪২.০
১৯৭৫-৭৬	১০২	৭৪.০
১৯৭৬-৭৭	১২০৬	৮০.০

আকর : ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৫-৭৬ ইকনমিক সার্ভে : ১৯৭৫-৭৬, অর্থ-মন্ত্রক : ১৯৭৬-৭৭, বাজেট দলিল।

বিদেশী সাহায্যের স্তর শূন্যে নামিয়ে আনার দিকে 'ক্রমবর্ধমান হ্রাসই' যে হয়নি তাই নয়, ১৯৭৫-৭৬ এ সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে ভারত পূর্ববর্তী সকল (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

পশ্চিমবঙ্গ নিম্নতম সরকারী কর্মচারী সমিতির সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ নিম্নতম (৪র্থ শ্রেণী) সরকারী কর্মচারী সমিতির ২৪ ও ২৫-তম রাজ্য সম্মেলন ৩রা মার্চ কলকাতার মল্লিক সোমনাথ হলে অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলি থেকে নির্বাচিত হয়ে ১৫০ জন প্রতিনিধি রাজ্য সম্মেলনে যোগদান করেন।

সকাল ১০টার শহীদ বেদীতে মাল্যদান এবং বর্গভঃ রাষ্ট্রপতি ককর-দিন আলি আমেদ ও দেশ বিদেশের বিশিষ্ট জ্ঞানীগণী ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শোক প্রস্তাব পাঠ এবং নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনের কাজ সূচনাতে পরিচালনা করার জন্ত ভজনকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী ৩৪ জনকে নিয়ে গিরাং ক্রমিটি গঠিত হয়। সভায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক শ্রী অরবিন্দ ঘোষ তাঁর দীর্ঘ ভাষণে রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও সারা ভারত সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের কর্মচারী স্বার্থ রক্ষার বসিষ্ট নীতি ও ভূমিকা এবং সাফল্যগুলি ব্যাখ্যা করেন। বরখাস্ত নেতৃত্বকে পুনর্বহাল, অর্থনৈতিক ও অগ্রাঙ্ক দাবীদাওয়া পূরণের জন্ত সরকারের নিকট আবেদন জানান। সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক শ্রী হরি-মোহন ভৌমিক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন ও কোষাধ্যক্ষ আরি ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। ৩৩ জন প্রতিনিধি প্রতিবেদন ও আরি ব্যয়ের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সাধারণ সম্পাদকের অধীনে ভাষণের পর প্রতিবেদন ও আরি ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নিম্নলিখিত এবং আরও কয়েক দফা দাবী সম্বন্ধিত খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক শ্রী চিত্তামণি সাহা।

১। পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনের জুজ অস্থায়ী প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম বেতন চালু এবং তৎসাপেক্ষ অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে অবিলম্বে ২৫০ টাকা বেতন প্রদান।

২। ত্রৈমাসিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে জীবনযাত্রার ব্যয়সূচীর প্রতি ৪ পয়েন্ট বৃদ্ধির অগ্রাঙ্ক স্মৃতিপূরণের ব্যবস্থা সম্বন্ধিত মহার্ব ভাতার পরিকল্পনা কমিশন প্রবর্তন এবং তৎসাপেক্ষ কেন্দ্রী সরকার প্রদত্ত ভাতার সমপরিমাণ মহার্বভাতার বকেয়া সহ প্রদান।

৩। কর্মচারীদের চাকুরী সংক্রান্ত স্বযোগ স্ববিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে ২১। ৫ ৭৪ তারিখের ৫০০২ এফ নং আদেশ যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তা প্রত্যাহার সহ ১৪ দফা দাবী সম্বন্ধিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ইহার পর সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বাংলা ছবির শোচনীয় হাল

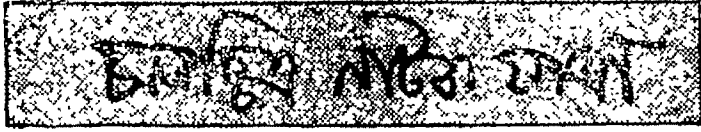
ভানুসিংহ

অনুনা বাংলা ছবির যে শোচনীয় হাল দেখা যাচ্ছে, তাতে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে সংকটের ছায়া খনীভূত হয়েছে। আশংকা হয়, এই শিল্পে যে যৌবনের হুদিন এগিয়ে আসছে তার হাত থেকে পরিচালকের কোন উপায় নেই। সরকারী সাহায্য যেটুকু পাওয়া যায়, তার দ্বারা ভরাডুবির হাত থেকে এই শিল্পটিকে বাঁচানো খুবই কঠিন। সত্যজিৎ রায়, যুগল সেন অথবা তরুণ মহম্মদার, তপন সিংহের ছবির একটা স্ট্যান্ডার্ড থাকে। কিন্তু বছরে তঁরা কটাই বা ছবি করেন? আর-সব পরিচালকের যে সব ছবি আমরা দেখতে পাই অধিক সংখ্যার সেগুলির গুণগত মান এতই নিম্নস্তরের যে, সাধারণ বাংলা ছবি সম্পর্কে দর্শক সম্প্রদায়ের এক তীব্র অনীহাই শুধু সৃষ্টি হয়। গরিষ্ঠ-সংখ্যক বাংলা ছবি যদি এই অসাক্ষ্য-ল্যের শিকার হয়, তবে চলচ্চিত্র শিল্পের মুয়ু অবস্থা ঠেকাবে কে?

কিন্তু পাই স্টুডিওর দুর্ব্যবহার কথা, স্বাভাবিক আমলের যন্ত্রপাতি ও ক্যামেরার কথা, কালার লেবরেটরির অভাবের কথা ইত্যাদি। এ সবের অভাব আছে সত্যি, কিন্তু দক্ষ চলচ্চিত্র নির্মাতার অভাবের কথা কদাচ কখনো উঠে যায় না। এখানেই আশ্চর্য লাগে। এখানেই এই স্টুডিওতেই ভাড়া যন্ত্রপাতি নিয়েই সত্যজিৎ রায়, কবিতা ঘটক প্রমুখ শ্রেষ্ঠাঙ্গ শ্রমগীর বাংলা

ছবি উপহার দিচ্ছেন। সৃষ্টি হয়েছে 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত', 'অযোজিত', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'গলা', 'নিমন্ত্রণ', 'অভিধি', 'স্বপ্নরেখা', 'কোয়ার্ট'-এর মত ছবি। এসব ভুলে গেলে তো চলবে না। আমাদের স্টুডিওর দৈন্যদশা যতই থাক, এখান থেকেই তো বাংলা ছবি তৈরী হয়ে জীবন জয় করেছে—একথা তো মিথ্যে নয়। তাহলে স্টুডিওর জীর্ণ অবস্থার চেয়ে অধিকাংশ চিত্রনির্মাতার ক্ষমতার অভাবটাই বাংলা ছবির এই শোচনীয় হালের জন্য দায়ী বলতে বিধা থাকার কথা নয়।

স্বীকার করি সবাই সত্যজিৎ রায় বা যুগল সেন হতে পারেন না। তার দরকারও নেই। উৎকৃষ্ট শিল্প-চিত্র সর্বত্রই মুষ্টিমেয়। কিন্তু সাধারণ রসাবেদন ধন্য ভাল ছবি তৈরী হওয়া তো চাই। তা হচ্ছে কৈ। মোট কথা, চলচ্চিত্র পরিচালনার সেই একান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা, বাস্তব জ্ঞান, উপযুক্ত বহুনা শক্তি এবং রসবোধ না থাকলে চিত্র পরিচালনার অধিকারটুকু কি করে বর্ডায়, তা তো ভেবে পাইনা। তুলনায় এ দেশে কিন্তু দক্ষ কলাকুশলীর অভাব নেই। নিপুণ ক্যামেরাম্যান, সাউণ্ড এঞ্জিনিয়ার এডিটর এখানে কম নেই, কিন্তু নিপুণ চিত্রপরিচালকের সংখ্যা এখানে খুবই কম। কথা উঠতে পারে, কলাকুশলীরাই তো চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন এবং যেখানে এত দক্ষ কলাকুশলী আছেন, সেখানে সাধারণ



ছবির মান এত নিম্নবী কেন? কিন্তু এখানে স্বরণ রাখতেই হয়, একটি চলচ্চিত্রের দায়িত্ব থাকে পরিচালকেরই ওপর। তিনিই সব বিভাগের কলাকুশলীকে নির্দেশ দেন এবং আপন পরিচালনা মত ছবির গতি প্রভৃতি রূপায়ণে কলাকুশলীদের সাহায্য নেন। স্বতরাং পরিচালকই হচ্ছেন সেখানে প্রধান। তিনি যদি অবোধ্য ও অপটু হন, তবে কুশলী কলাশিল্পী নিয়েও ছবির মান বজায় রাখা যায় না। এবং বর্তমানে এদেশে অপদার্ষ পরিচালকের সংখ্যাই বেশী, যার ফলে এই শিল্পটি আজ দুর্ব্যবহার মার খাচ্ছে

সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত পুরস্কার বিজয়ী উৎসবে কানন দেবী বলেছেন, গত ১৯৭৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির সাধারণ মান অত্যন্ত হতাশাজনক। কথাটা ভেবে দেখবার মত। এই হতাশার মূলে আছেন 'সবজাতা

মনোভাবাপন্ন' অথচ অবোধ্য চিত্র পরিচালকবৃন্দ—এ কথাটা মনে রাখা দরকার। তাঁদের মধ্যে কেউ কিছু পুঁথি পড়ে ইন্টেলেকচুয়াল সেজে ছবি করতে আসেন, কেউ আসেন নাথিকাকে সামনে ধরে প্রোডিউসার বধ করতে, আবার কেউ শ্রেয় ফাইন্যান্সিয়াল পাকড়াও করে নিজের গোপন বাসনা চরিতার্থ করতে আসেন কিন্তু কেউই নিজেকে যোগ্য করে ভুলে ছবির পরিচালনায় নিষ্ঠা দেখাতে আসেন না। এখানেই হয়েছে বত গুণগোল। আমাদের স্টুডিওর জরাজীর্ণ অবস্থার কথা স্বীকার করি। সে সবের সংস্কার ও সমৃদ্ধির যথেষ্ট প্রয়োজন—এও অনস্বীকার্য। কিন্তু এখনই সবার আগে প্রয়োজন শিক্ষিত, শিল্পকচিসম্পন্ন বোধ্য-চিত্রপরিচালকের—এ কথাটিতো সর্বাগ্রে গ্রাহ্য হওয়া উচিত—তাই নয় কি?...

বিপ্লব ও বিপ্লবীদের গান

(দর্পণের সমালোচক)

ক্যালকাটা পীপলস কন্সার্ট বিভিন্ন দেশের বিপ্লব ও বিপ্লবীদের গান এবং কর্মগীতি শোনালেন ৭ মার্চ অরুণ-মহলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিহত বনি মজুর জো হিল সম্পর্কে গানটির ভাব এই ধরনের গণসংগীতের বাণী বলা বলা যায়। সব গানই অনিবার্চিত এমন বলা যায় না। যেমন বেললাইনে হুলির গানটির তেমন প্রত্যক্ষ আবেদন নেই। পোর্তোরিকোর গানটি প্রচার মূল্যে উপরে উঠতে পারেনি। কর্মগীতির মধ্যে বাংলাদেশের বাইরেদের গানটি ছাড়া আর কোনটাই প্রকৃত কর্মগীতি বলা যত্ন। যেমন আসামের মাহত সম্পর্কিত গান লোকগীতি—কর্মগীতি নয়। মাহতের কর্মের আত্ম-বলিক গানই প্রকৃত কর্মগীতি বা কর্মগীতি। তবে ভারতীয় লোকগীতির মধ্যে এটিই ছিল অনিবার্চিত ও সঙ্গীত। প্রত্যক্ষপে পরিবেশিত গান-গুলি মোটামুটি সঙ্গীত।

ধর্মতীরাংশে দৃষ্টরূপ আং নৃত্য সমন্বিত গানে একমাত্র জয়পুরের লোকগীতিটি ছাড়া আর কোনটাই বস্তুনিষ্ঠ হয়নি। মহাবাহৌর জেলেদের অথবা বাংলাদেশের সারি গানের নাচ বা অঙ্গসজ্জা কোনটাই বস্তুনিষ্ঠ নয়। বর্তমান সমালোচকের প্রাক্তন বাসস্থান যদিও ময়মনসিংহ যেটা সারি গানের অঙ্গসজ্জা জয়পুরী পোশাক পরা

নৃত্যের সারি গানে কখনো দেখা গেছে বলে মনে পড়ে না। সারি গান নৌকা বাইচের গান—শ্রেণী থেকে সারি শেষের উদ্ভব। বহুজাতিক লোকগীতির সারল্য সর্বজনবিদিত। এর সঙ্গে বলা, অ্যাক্টিভিসম এবং স্প্যানিশ গীটারের সংগত খুব মানানসই বলা চলে না। কিন্তু খ্রীস্টের বন্দো-পাধ্যায়ের গায়ন ও পরিচালনার গুণে অস্বাভাবিক উপভোগ্য হয়েছিল, যদিও সব একক গায়কদের গলা বে খুব হয়ে বা পরিশীলিত এমন নয়। আমাদের লংমেলক গানের দুর্বলতা এখানেও দেখা গেছে—১৪ জন গায়ক গায়িকা মিলে মোট ১৫ আওয়াজ পদমা হয়েছে তা খুব প্রশংসনীয় নয়। তুলনায় বছর আটেক আগে ভাষাতাল ইয়ুথ কন্সার্টের যে গান শুনেছিলাম তার সংমেলক গান অনেক ভ্রমজমাট হয়েছিল। পরিচালক তরুণ ঘোষ এখন কোথায় আনি না। এরা স্বভাব যুগোপাধ্যায়ের অন্তর্নিহিত আত্মজাতিক পেয়েছেন। নজরুলের অল্লাহবাদ আরো স্বন্দর বলে আমার ধারণা। সেটাকে কেন বে গাওয়া হয় না আনি না।

ব্যক্তি কর্তৃত্ব বাদ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

গণতন্ত্রের পরীক্ষা

কিছুদিন আগেও পশ্চিম ঘনিয়া একটা কথা জোর চালু করেছিল 'Trials of Democracy'। এশিয়ার সম্ভাব্য দেশগুলোতে নাকি গণতন্ত্রের পরীক্ষা চলছে। বর্মা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ায় সেই পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। পরীক্ষা নাকি এখনও চলছে ঘনিয়ার 'বৃহত্তম গণতন্ত্র' ভারতবর্ষে। প্রকৃতপক্ষে, এই সব দেশগুলোতে পশ্চিমী ধাঁচের গণতন্ত্র চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বুর্জোয়া সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেনি। তাই সামন্ততন্ত্র ও সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন সহ্যবহান করেছে এশিয়ার অন্তর্গত দেশে দেশে।

কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির ভূমিকা
হুগুয়ের বিষয় কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি তাদের ইতিহাস নির্দিষ্টভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলেই প্রকৃত গণতন্ত্রের পরিবর্তে এই সব দেশগুলোতে গড়ে উঠেছে ব্যক্তিকর্তৃত্ববাদ। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অসম্পূর্ণতাই ব্যক্তিকর্তৃত্ববাদের উৎস। ডঃ সোয়েকর্ণের নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়াতে যখন 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র' পরীক্ষা চলছিল ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি তখন রাষ্ট্রকমতা ভাগ করে নেওয়ার structural theory-তে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল। সোয়েকর্ণের ব্যক্তিকর্তৃত্ববাদকে প্রতিহত করা হয়নি। ফলে সামরিক অভ্যুত্থানের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। বাংলা দেশে মুজিবের ব্যক্তি কর্তৃত্ববাদকে বাধা দেওয়া তো দুইয়ের কথা গলা বাড়িয়ে সমর্থন জানিয়েছিল যদি মিং-এর কম্যুনিষ্ট পার্টি। পরিণামে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সামরিকতন্ত্র। ইতিহাস এই কথাই বলে যে, আজকের যুগে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারেনা। প্রমিত শ্রেণী পার্টিকেই গ্রহণ করতে হবে সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব। বিচ্যুতি ঘটলে শিকার হতে হবে হয় ব্যক্তিকর্তৃত্ববাদের না হয় সামরিকতন্ত্রের।

কংগ্রেস ও স্বাধীনতা সংগ্রাম

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ক্ষমতা হস্তান্তর এবং পরবর্তী 'স্বাধীন' ভারতের প্রধানমন্ত্রিত্ব পেয়ে তিনি 'নতুন ভারতের' একমাত্র স্থপতির গৌরব করায়ত্ত করে নিলেন। এমনকি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট কালে হুভাষচন্দ্রের প্র্যানিং কমিশন গঠনের ভূমিকাকেও নস্ত্রাং করে দিয়ে তিনিই প্র্যানিং-এর প্রবর্তক রূপে ঘোষিত হলেন।

মহাক্ষার পরে কংগ্রেস সংগঠন ও সরকারের নেতৃত্ব জবাহরলালের হাতে ব্যক্তিতাত্ত্বিকতার পর্যবসিত হল। গান্ধীশিল্প নেহেরু সংগঠনে তাঁর কর্তৃত্বের সমালোচনা কোনোদিন পছন্দ করেন নি।

নেহেরুর হযোগ্য তনয়া শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বে কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সরকার পারিবারিক শাসনে

পরিণত হয়েছে। গণতন্ত্রের বাষ্পও আজ আর সংগঠনে ও সরকারে অবশিষ্ট নেই। তাই কংগ্রেসের সভাপতি দেবকান্ত বসুকে মিল'জের মতো বহুতে হল India is Indira, Indira is India.

কাছেই সরকারি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস যে গান্ধী এবং নেহেরু পরিবারের ইতিহাস হবে, সেটা আনা কবাই। এবং মহারাষ্ট্র পাণ্ডব বাড়লা দেশে হাজার হাজার বীর স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিলেও ইতিহাসে তাঁরা উপেক্ষিত থাকবেন। বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম, হুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ কোজ গঠন, নৌ-বিদ্রোহ ইত্যাকার জগত ঘটনাকে অহিংসার নামাবলীর তলায় প্রাণপণে চাপা দেবার চেষ্টা চলবে।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

৥ চাঁদার হার ৥

বার্ষিক ২২ টাকা

ষাণ্মাসিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠাবার ঠিকানা :

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, মট লেন। কলিকাতা ১৩

অগ্রগতির আসল চেহারা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

বছরের নজির ছাড়িয়ে গেছে (এর মধ্যে আছে, ১৯৬৭-৭৬)। অবশ্য শ্রীমতী গান্ধি যতই অস্বীকার করুন না কেন, এই সাহায্যের ৬০% মুক্তগাউ থেকে। এ ধরনের খবর পেয়ে দেওয়া যায় না তবু দেশের মানুষ এ সম্বন্ধে কী ভাবে তা ভাবলে সরকারের চলে না। এই রকম বেপরোয়া ভাবের অভিব্যক্তি দেখা যায় সেপ্টেম্বর ১৯৭৬-এ জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের সভায় যখন ঘোষণা করা হল যে, বিদেশী সাহায্য নেওয়া শুধু নামিয়ে আনার যে প্রতিশ্রুতি জনসাধারণকে দেয়া হয়েছিল তা পরিত্যক্ত হয়েছে।

উপসংহারের মন্তব্য

আপত্তি কি এই যে, ২০ দফা কর্মসূচী কার্যে রূপান্তরিত হয়নি? না, এটা কোন আপত্তিই নয়। তবে পরিকল্পনা যদি একটা করা হয় তাহলে ধরে নেয়া হয় যে কার্যে রূপান্তরিত করার জন্যই তা করা হয়েছে। বিশেষতঃ তাকে ঘেঁষা করতে গিয়ে যদি ১৭৫০০ নিরীক্ষণ মাস্থকে প্রেরণ করা, সংসদকে প্রহসনে পরিণত করা, সংবিধানকে জবাই করা, বিচার ব্যবস্থাকে অস্তিত্বহীন করা, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা এবং বন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে সাধারণ বিবেক দেশের মুখে কালিমা লেপন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই আশা করা উচিত হ'ল যে এই ধরনের কার্যসূচী কার্যকর হবে। কিন্তু তবু যদি তা না হয় তবে তা সেই কার্যসূচীর রচয়িতার নিম্না ঘোষণা করবে।

২০ দফা কর্মসূচীর বিরুদ্ধে একটিই মাত্র আপত্তি এবং সেটি এই যে, পরিকল্পনা খেলাধুলি মাত্রিক করা হয়েছে। এ হল কতগুলি ধারণার বস্তা, খবিরে, খিতাব, সমন্বয়—এ নানান প্রকল্পের এমন এক আগাধিচুড়ি এবং পুরোপুরি এমন সাময়িক যে, যে কারো মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এর প্ররক্তার্য এর সম্বন্ধে যে দাবি করেছে তাই সত্য—এ জিনিষ একজনকেই মস্তিষ্কগ্রস্ত এবং তিনি হলেন স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী। ২০ দফা ভারতীয় অর্থনীতিতে এমন সব ভারসাম্য নষ্টকারী জিনিসের সমাবেশ ঘটতে চেয়েছে যে ভাগ্য ভাল যে, এটা সম্পূর্ণ কার্যকরী হতে পারেনি। যতটুকু হয়েছে তার ফলে অর্থনৈতিক জীবনসাধারণের যে ক্ষতি হয়েছে এবং পরিকল্পনার অবশেষে যা আমাদের ছিল তার ক্ষতিপূরণ করতে আমাদের বহু বছর লেগে যাবে। ২০ দফা আমাদের অর্থনীতিতে একটা নতুন রোগের বীজ ইনজেকশন করে ঢুকিয়ে দিয়েছে—যাকে বলা যায় অর্থনৈতিক শিঙ্কোফ্রেনিয়া। একে যদি বাড়তে দেয়া যায় তাহলে দু বছরের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতিকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

‘উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সর্বশ পণ করতে হবে’ বলে যে ‘উদার আন্তর্জাতিক’ দেওয়া হয়েছিল তাই ধরা বাক না কেন। একমাত্র জটিল ঠাকুরমার সাধারণ একটা মানসিক উজ্জ্বল ব্যতীত অন্য কিছু হিসেবে যদি একে গ্রহণ করতে হয় তাহলে যে কোন সত্যিকারের অর্থনীতিবিদ এটা বুঝতে হিমশিম খেয়ে যাবেন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মূল সমস্যা এই নয় যে আমরা সর্বশ পণ করব কিনা, বরং আমরা তা করতে পারি কিনা এবং পারলে কোন পথে পারি। অর্থনীতির কার্য হল বস্তু বেনী সম্বল (সর্বাধিক নয়) উৎপাদনের জন্য দুপ্রাপ্য সম্পদের বিনিয়োগ সমাবেশ করা যাতে মানুষের কল্যাণ সর্বোচ্চ থাকে।

সিগারেটের উৎপাদন যদি তুলে ওঠে তাহলে তার দ্বারা সাধারণ ভারতবাসীর সর্বাধিক কল্যাণ কী করে হতে পারে? অথচ একটি বহুজাতিক সিগারেট উৎপাদক কোম্পানী তাদের বিজ্ঞাপনে ঠিক এই কথাই বলেছে যে, ‘প্রধান মন্ত্রী ২০ দফা কর্মসূচী অনুসারে...’। ভারতের জনগণের প্রয়োজন জীবনের মৌলিক উপকরণ বা তারা পেতে পারে যদি তারা কাজ (তাহলেই তাদের কর্মক্ষমতা হবে) এবং এই উপকরণগুলির সরবরাহ পায়। সেই মুহূর্তে আমরা সিদ্ধান্ত করব যে, ‘উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সর্বশ পণ করার’ কথা বলা মূর্থত কারণ তা আমরা করতে পারি না। আমাদের বাছবিচার করতে হবে, অগ্রাধিকার দিতে হবে, আবার কোন কোন পণ্যের উৎপাদন কমাতে হবে আবার কোনটার বাড়তে হবে। স্বসংগত ভাবে সম্পদসমাবেশ করতে হবে এবং সর্বশেষে এই সব কার্যে পরিণত করতে জাতীয় সমন্বয় গ্রহণ করতে হবে। ২০ দফা কর্মসূচীতে এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে নস্যাৎ করা হয়েছে। কট্টোলের কাপড়

এর মাসনাল পারমিট ফীস এই দুটির মধ্যে কোনটির অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত তা যদি কোন কংগ্রেসদস্যকে জিজ্ঞাসা করা যায় তাহলে তিনি বলবেন জানি না। কিন্তু জনাত্মকে তিনি বলবেন যে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা তামাশা। অ্যাপনি যদি তাকে কৌশল এবং সম্পদসমাবেশের বিষয়ে প্রশ্ন করেন তাহলে তার টপিক্যাল জবাব হবে, ‘এত সীরিয়াস হচ্ছেন কেন? চলুন, চা খেয়ে আসি’। যে সব আমাদের উপরে এই কর্মসূচী রূপায়ণের তার তাদের মধ্যেও একই রকম অবিশ্বাস।

একথাও বসতে পারি না যে, যেসব মানুষ লোকেরা বৈ চৈ করে জটলা করছে তারা জাতীয় সমন্বয়ের প্রতিনিধিত্ব করছে। অথবা হাত মুচড়ানোর ফলে যে সব লোকেরা রাতারাতি এই কর্মসূচীকে সমর্থন জানিয়েছেন তাদের এতে কোন আশা আছে। ২০ দফা কর্মসূচী হল তাই বার জন্ত এ অভিজ্ঞত—দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ডিক্টেটরের বিশীর্ণ চিন্তাধারা, গত দশ বছরের কুশাসন এবং কর্তব্যচ্যুতি আমাদের মহান দেশের যে ক্ষতি করেছে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার এক বিচিত্র সামাজিক প্রক্রিয়া হল এই কর্মসূচী।

গত এক বছরে এই কর্মসূচী যে ভারসাম্য নষ্ট করেছে তা স্পষ্ট প্রতীয়মান। জনতার প্রয়োজনীয় জব্যের মাধ্যমিছু উৎপাদন এবং মূলধনী উৎপাদন এবং মূলধনী বস্ত্রের উৎপাদন পড়ে গেছে, বেড়েছে মধ্যবর্তী জব্যের উৎপাদন। সেই জন্ত আমাদের দেশের ইতিহাসে এই প্রথম ষ্টীল, সীমেন্ট, কয়লা, রাসায়নিক মাঝ এবং অজ্ঞাত গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের মজুদ পাহাড়প্রমাণ হয়ে গেছে। পাবলিক সেক্টরের উৎপাদন বেড়েছে ১৫% কিন্তু তাকে ভোগ করে যে পাবলিক সেক্টর তার উৎপাদন ধসে গেছে মাইনাস ৬০%। লাইসেন্স প্রথা উদার করা হয়েছে যাতে ছোট এবং মাঝারি ব্যবসায়ীদের ব্যবসা থেকে হটান যায়। সম্ভাব্য ক্ষতি করে শ্রমিকদের ক্রীতদাস বানান হয়েছে কিন্তু মালিকরা অবাধে হাটাই চালিয়েছে। কট্টোলের কাপড় এবং আঁথের স্রোগান কম ছিল না। এত লম্বা কিম্বদী দেওয়ার জায়গা নেই। কিন্তু কল-কলতে আরম্ভ করেছে এবং সংশোধনের ব্যবস্থা এখনি না করলে দুই বছরের মধ্যে আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম আর্থিক সংকটে পড়ব।

২০ দফা কর্মসূচী আমাদের পরিকল্পনার পরিপূরক বলে যে দাবি করা হয়েছে তা সত্য নয়—বরং তার নেতি। ভারসাম্য ইতিমধ্যেই নষ্ট হতে আরম্ভ করেছে যেন সরকারী তাহেই স্বীকার করা হয়েছে যে, অকর্মী সেক্টরের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৬-৭৭-এর বাজেট-ধৃত অঙ্ক থেকে দেখা যায় আমাদের আগেকার পরিকল্পনার অগ্রাধিকার ধ্বংস হয়েছে। এই সর্বপ্রথম মোট উন্নয়ন যাতে ধার্য অঙ্ক ৪০ কোটি কমিয়ে দেয়া হয়েছে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সেবার মূলধনী বিনিয়োগ কেটে দেওয়া হয়েছে কিন্তু বাজেট বাটতি হয়েছে ২০০ কোটি টাকা। আবার ঋণ সংকোচ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফাব্রাহ ১৯৭৪-৭৫ এ ৬% থেকে ১১%-এ বেড়ে গেছে। এ প্রয়োজন এই জন্ত যে, সরকার নোট ছাপিয়ে তার যত জনবিরোধী কাজের ব্যয় সংকুলান করতে চায়—করপ্রাপ্ত অর্থ বদলি করে নয়। আর একটা অগ্রাধিকার সাধারণ সঙ্করের হৃদয় হার বাড়ান, শিকের তুলে রাখা হয়েছে।

কাছেই ২০ দফা কর্মসূচীর বিরুদ্ধে আপত্তি এ নয় যে, এটা কার্যে পরিণত করা হয় নি, আপত্তি এই কারণে যে, আদৌ এটা রচিত হয়েছিল।

তাহলে ভারতীয় অর্থনীতিকে কী করে নতুন গ্রাণে সজীবিত করা যায়? তার জন্য পূর্বক অধ্যয়ন এবং বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তবে আমার আগেকার অধ্যয়নে যে সব প্রস্তাব দিয়েছিলাম তা এখনো খাটে। (সমাপ্ত)

কেন এমন ভাগ্যি

অন্নদাশঙ্কর রায়

কেন এমন ভাগ্যি হলো

সরষের তেল মাগ'গি হলো

কেউ জানে না মাখনের কী খবর।

সরষের তেল নাকে দিয়ে

রাজা ঘুমান নাক ডাকিয়ে

মাখন মাখায় গায়ের তলায় নকর।

টুইডেলডাম রাজা, তোমায়

ছি ছি ছি।

এখন থেকে রাজা হবেন

টুইডেলডা।

কেন এমন ভাগ্যি হলো

শাক সবজি মাগ'গি হলো

কেউ, দেখেনি মাড়ের এত দর।

সব চলে যায় রাজার পাতে

এঁটো কুড়োয় হাড় হাভাতে

কেউ জানে না কী আছে এর পর।

টুইডেলডা রাজা, আরে

রাম রাম রাম।

এখন আবার রাজা হবে

টুইডেলডাম।

নিপীড়ন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

রেখে বুলিয়ে দেয়। এই দুর্কারে মটু দাস তার ভাই-এর সাহায্য নেয়। তারপর শালকাঠের হাক দিয়ে শ্রমিক-টির পায়ের তলায় জোরে জোরে মারতে থাকে। শ্রমিকটি পায়ের তলা ও হাত কেটে মেঝেতে রক্ত-স্রাবতে থাকে। পাশের কারখানার জনৈক মালিক শ্রমিকটির উপর নির্ভাতন বন্ধ করতে অহরোধ জানান। অহর আর এক কারখানার জনৈক শ্রমিক চুরির ঘটনা সাক্ষ্যে আখ্যা দিয়ে প্রতিবাদ জানালে মটু দাস তাকে ছুঁড়ে ঘর থেকে বাইরে ই.টর উপর ফেলে দেয়। শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক অধীর বিশ্বাস গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত শ্রমিকটিকে, হাসপাতালে না পাঠিয়ে স্থানীয় ডাক্তারকে দেখিয়ে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকেরা এই ঘটনার প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ বন্ধ করে দেয়। শ' মাস্তেক শ্রমিক ঘটনাস্থলে এসে ইউনিয়ন সম্পাদকের উপর চাপ সৃষ্টি করে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত শ্রমিকটিকে বাড়ী থেকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে বাধ্য করে। এরপর চিকিৎসা শ্রমিকরা স্থানীয় ঘোষ ফুলে এক সাধারণ সভা করার চেষ্টা করলে তা বানচাল হয়। হাসপাতালে শয্যাশায়ী শ্রমিকটির পাওনা বকেয়া টাকা মালিক দেবে না বলে জানিয়েছে। এই মালিক অতীতে অহরুপ অবস্থায় এক শ্রমিকের পাওনা না দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। শ্রমিকটি চিকিৎসা চুরি করেছে, তা অগ্রমাণ থেকে গেছে। আর গোটা পাঁচেক তথাকথিত খোওয়া বাওয়া চিকিৎসিগুলির দাঁত কাটা ছিল না বলেও প্রকাশ।

চাষীর অসুবিধা

(দুর্গেশের সংবাদদাতা)

মেদিনীপুর জেলার ডেবরা, এবং শিলা ও পাশকুড়া থানাগুলি সেচ এলাকা রূপে ঘোষিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে চাষের সময় চাষীরা প্রয়োজনীয় জল পান না। এসব অঞ্চলে রিভার ইরিগেশন অ্যাক্ট চালু ছিল কিন্তু তা বাতিল করে প্রজেক্ট আইন চালু করা হয়। প্রজেক্ট আইন হুসারে চাষীরা চাষের সময় জল পেতে বাধ্য। কিন্তু তা না করে শুধুমাত্র নদীতে জল থাকার সময় চাষীরা জল পান। ফলে চাষীরা রিভার ইরিগেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী জল পান এবং প্রজেক্ট আইন অনুসারে জমির খাজনা দিতে বাধ্য থাকেন।

কেয়া চক্রবর্তীর রহস্যজনক মৃত্যু

(দর্পণের নাট্যমালোচক)

গত ১২ই মার্চ শনিবার বিকেল ৩-২০/২৫ নাগাদ কলকাতার অজুর্ন সীকরাইলের মাকপাড়ায় স্বদেশ সুরকারের জীবন যে রকম ছবির গুটিং-এর বলয়ে কলকাতা থিয়েটারের শক্তিশালী অভিনেত্রী-নন্দীকারের কেয়া চক্রবর্তী হঠাৎপলে পড়ে যান। জলপুলিশ বর্তৃপক্ষ রবিবার সকাল ১০টায় সীকরাইলের থেকে এক ঘটীর উজানে হীরাপুরের কাছে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে। জলপুলিশের অজুত ব্যবস্থা অস্থায়ী প্রথমে মৃতদেহের কোমরে দড়ি বেধে লঞ্চে কিছুদূর টেনে আনা হয়, তারপর একটি নৌকায় তোলা হয়। মৃতদেহের দুটি হাত ভাঙা অবস্থায় পাওয়া যায়। জলপুলিশের সঙ্গে লঞ্চে পরিচালক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বক্ষণ ছিলেন। কেয়া চক্রবর্তী জলে কিভাবে পড়লেন তার সঠিক তথ্য এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এস আয়বি

নির্বাচন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অনুসরণ করে তাহলে তো জনমতের প্রতিফলন কোনো কালেই হবে না। জনমত বলতে বোঝাবে সরকারী বা সরকারনিয়ন্ত্রিত পত্রিকা। বুদ্ধিজীবীরা কুনিশ করতেই অভ্যস্ত হবেন। নইলে হবেন বিনা বিচারে আটক আর নয় তো লেখা-একেবারেই ছেড়ে দেবেন। এবারকার নির্বাচনে বরাবরের জন্ত ছির হয়ে যাবে যে, এদেশের নিয়ম হচ্ছে ইংলণ্ড আমেরিকার মতো জিপাধিক খেলা। কংগ্রেস যদি হয় রেপাবলিকান পার্টি তো জনতা পার্টি হচ্ছে ডেমোক্রাটিক পার্টি। কংগ্রেস যদি হয় ডেমোক্রাটিক পার্টি তো জনতা পার্টি হচ্ছে রেপাবলিকান পার্টি। কোন্ পার্টির চরিত্র কি রকম তা এখনো স্থনির্দিষ্ট হয়নি। ক্রমে ক্রমে হবে। বিবর্তন একদিনে বা একবছরে হয় না। হয় ধীরে ধীরে। দীর্ঘকাল ধরে। এদেশে জিশবছর লেগে গেল টু পার্টি সিস্টেম বিবর্তিত হতে। হার-জিত বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হচ্ছে লোকে একটা বিকল্প পেলো। অতিষ্ট হলে বিকল্পকেই বরণ করবে। এর ফলে কংগ্রেসও লোকের তোরাজ করবে, জনতা পার্টিও। ভোটের মূল্য ও ভোটদানের মর্যাদা বেড়ে যাবে। এত দিন ভোটদান ছিল দাবা খেলার বোঝে। এখন থেকে সেও খেলোয়াড়।

প্রোডাকশনের স্তরফ থেকে সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড থ্রাটার ট্রান্সপোর্টের পি টি মাহুয়া নামে একটি লঞ্চ ভাড়া করা হয় গুটিং-এর জন্ত। গুটিং-এর জন্ত জলপুলিশের কাছে নিয়ম অনুযায়ী অস্থায়ী চাকরা হয়েছিল। পুলিশের অস্থায়ী অপেক্ষা না করেই প্রয়োজক ভরত নন্দী এবং পরিচালক স্বদেশ সুরকার ১৭ জনের এক দল নিয়ে দুইটনা প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা না করেই মাকপাড়ায় লঞ্চ ভিড়িয়ে দেন। স্বদেশ সুরকার স্বীকার করেন তাদের সঙ্গে লাইফ বোট ছিল কিন্তু কোন লাইফ বোট ছিল না। তাঁর দায়িত্বহীনতার জন্ত কেয়া চক্রবর্তীর মৃত্যু ঘটেছে তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনলে তিনি তাঁর কোন সম্ভাবজনক উত্তর দিতে পারেন নি। ভরত নন্দী বলেন, কেয়া দেবীর অস্থরোধে তাঁকে তিনি বাবার ব্যবস্থা করে দেন। পরে একটা পান দেন। কেয়া দেবী জর্দা চাইলে পেটাও তিনি দিয়ে আসেন। কেয়া দেবীর হাতে জর্দা দিয়ে ফিরে যাওয়ার কয়েক মুহূর্ত পরেই কেয়া দেবীর দেহ জলে পড়ে যাওয়ার আওয়াজ পান। ঠিক তাঁর আগের মুহূর্তে পরিচালক সুরকার কেয়া দেবীকে লঞ্চে দোতলায় ডেকে রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে জিপ্ট পড়ে শোনাচ্ছিলেন। কেয়া দেবী একজন অল্প মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। তাঁর স্বামীর ভূমিকায় ভিনেতা বসন্ত চৌধুরী ঐ-একই লঞ্চে ছিলেন। একটি বাচ্চা হারিয়ে যাওয়ার দৃশ্যের গুটিং আগেই তোলা হয়েছিল। চলমা ছাড়া এমনতেই তিনি-চোখে দেখুতেন কম। তবু তাকে কনটাকট লেন্স পরান হয়েছিল। স্বদেশ সুরকার বলেন তিনি কেয়া দেবীকে জলে পড়ে যেতে দেখেন কিন্তু কিভাবে তিনি পড়লেন সেটা তিনি জানেন না। লঞ্চ তখন দাঁড়িয়েছিল এবং বাতাসে কোন বড় ছিল না। পরে নাকি কেয়া দেবীকে খোঁজার সম্ভাব্য চেষ্টা তিনি করেছিলেন। বিকেল পাঁচটা পাঁচে কেয়া দেবীর স্বামী রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রথম তাঁর মৃত্যু সংবাদ পান। তিনি নিজে স্বদেশ সুরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন সেদিনই গভীর রাতে। স্বদেশ সুরকার তাঁর ইউনিটের পক্ষ থেকে কেউই কেয়া দেবীর বাড়িতে কোনরকম খবর দেন নি। তাঁরা পরের দিন রবিবার দুটোর সময়

প্রথম কেয়া দেবীর মামিকণ্ডলার বাড়িতে যান। তিনি অবশ্য বলেন তাঁর আগের দিন নন্দীকারের পুত্রনো টেলিকোন নাথারে খবর দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেন কেয়া দেবী জলে পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে কোন গুটিং চলছিল না। জলে কাঁপ দেওয়ার একটা দৃষ্ট অবস্থা ফ্রেটে ছিল। তাঁর জন্ত তিনি ডামিও প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তিনি বলেন কেয়া দেবী নাকি তার কাছে বলেছিলেন যে তিনি ভাল সাতার জানেন, তার কাছে সাতা কিংকট আছে। এবং নিজেই কাঁপ দিয়ে দৃষ্টটা নাগি আরো বাস্তব হবে। স্বদেশবাবু যদিও তাঁর সেই প্রস্তাবে রাজি হননি। কেয়া দেবী জনৈক আত্মীয় তাঁকে প্রসন্ন করেন “আপনি কেয়াদি আত্মহত্যা করেছেন রটাচ্ছেন কেন?” তিনি বলেন “আমি একথা কখনও বলিনি।”

জল পুলিশ এস আর বি প্রোডাকশনের ক্যামেরা, জিপ্ট, ব্যবহৃত ছিল, অব্যবহৃত ছিল আটক করেছে। পুলিশ নাকি তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারও করেছে। জল পুলিশের ডেপুটি কমিশনার বরুণ মুখার্জী সব ব্যাপারটি তদন্ত করার জন্ত নির্দেশ দিয়েছেন।

কেয়া চক্রবর্তীর মৃত্যুর তদন্তের দাবী জানিয়ে কলকাতার আটটা নাট্য গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এক বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। নাট্য গোষ্ঠীগুলি হচ্ছে—বহুরূপী, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, চেতনা, থিয়েটার কমিউন, হুন্সবম, গুডব, নাট্যায়ন ও থিয়েটার ল্যাবারস গ্রুপ। নন্দীকার গোষ্ঠীর সমস্তরা প্রায় তুলেছেন গুটিং-এ এই ধরনের চিত্র গ্রহণের সময় অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিরাপত্তার ব্যবতীয় ব্যবস্থা রাখার নিয়ম আছে। এ ক্ষেত্রে তা ছিল না কেন?

মধ্য কলকাতায় নীলমণি সেন রোডের ওপর যে মর্গ সেখানে থেকে কেয়া দেবীর মৃতদেহ পাঠ মর্গের উপর পুলিশ ৪-১৫ মিনিটের সময় তাঁর আত্মীয় স্বজনের হাতে তুলে দেয়। ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় যে মর্গ সেখানে সরকারের উপাসীজ বড় চোখে লাগে। সেখানে কোন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বন্ধ নেই মৃতদেহগুলিকে স্থবক্ষিত রাখার জন্ত। গলিত পচা মৃতদেহের দুর্গন্ধে বাতাস বিবাক্ত হয়ে উঠেছে। সভ্য কলকাতা ও তার প্রশাসন বহু এখ্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে আছে দেখে অস্বস্তি লাগল। মর্গ থেকে কেয়া দেবীকে তাঁর মা বাবার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। একমাত্র সম্ভাব্য বিয়োগ ব্যাধি তারা পাখর হয়ে গেছিলেন। কেয়া দেবীর মা-অভিযোগ করেছেন, যে তাঁর মেরেকে জলে থাকা মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তিনি এব্যাপারে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করেছেন।

গুণামী রিনিং

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আই (এম) প্রাণী জ্যোতিষীয় বহু নির্বাচনের দিন সকালে পরিদর্শনে বেরিয়ে যখন ঐ নির্বাচন কেন্দ্রের অন্তর্গত মহেশভলার যান তখন সেখানে একটি বৃষ্টি কংগ্রেসী গুণ্ডারা দখল করে রেখেছিল এবং ভোটদানের চুক্তিতে দিচ্ছিল না। সেই সময় প্রায় পঞ্চাশ জন গৃহস্থ বহু জ্যোতিষীকে বলেন, “আমাদের এরা ভোট দিতে দিচ্ছে না। আপনি পুলিশকে বলুন।” দমদম কেন্দ্রে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। সেখানকার কয়েকজন অভিযোগকারীর নাম সেইদিনের হিন্দুস্থান ট্যাগার্ডে বেরিয়ে গেছে।

ভোটদাররা যেমন ভোট দিতে এবার দুঃপ্রতিজ্ঞ, তেমনি গুণ্ডাদের প্রতিরোধও করেছে কোন কোন জায়গায়। ১৯৭২ সালে এই প্রতিরোধ ছিল না। মনে রাখা দরকার এই প্রতিরোধ স্বতঃস্ফূর্ত। জনগণনিজেরাই এই প্রতিরোধ সংগঠিত করেছে। ভায়মগুহারবার কেন্দ্রের মহেশভলা, বাটানগর ও বজবজের কিসমৎশে বীরেন মহান্তি ও হরত মুখার্জীর গুণ্ডারা সম্মান সৃষ্টি করে এবং জ্যোতিষীয় বহু গাড়িতে হামলা করে তাঁকে গাড়ির মধ্যে থেকে টেনে বার করার চেষ্টা করে। কিন্তু দুপুরের পর থেকে সমস্ত ভায়মগুহারবার কেন্দ্রের চেহারা পাল্টে যায়। রাস্তার ধারে ধারে লাল পতাকা উড়ছে। কংগ্রেসের নির্বাচনী অফিসগুলো কাঁকা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সাধারণ মানুষ দলবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। তখন সাড়ে চারটে পাঁচটা হবে। এই সময় আরি ও আরও কয়েকজন জনৈক বহু গাড়িতে ঐ অফিস টল দিয়ে ফিরে ছিলাম। দু তিন জায়গায় পরিত্যক্ত গাড়ি পড়ে থাকতে দেখলাম। শোনা গেল এই সব গাড়িতে কংগ্রেসী গুণ্ডারা বোমা নিয়ে এসেছিল। জনসাধারণের সতর্ক প্রহরায় তারা ধরা পড়ে এবং বোমা ফাটিয়েও মিস্তার পারানি। শুনলাম রাকারহাটে কয়েকজনকে তারা আটক করে রেখেছে। এসব শহরাকল অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার ঘটনা। একই ভেতরের বিকে কংগ্রেস একেবারে বেপান্তা। সেখানে বেশির ভাগ ভোট জ্যোতিষীয় বহু রাস্তা পড়েছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে দেখছি তারা জ্যোতিষীয়বাব সম্পর্কে সন্দেহ। প্রথমে অবশ্য কেউই মুখ খুলতে চায় না। গাড়ি দেখলেই তাতে কংগ্রেসের লোক। কিন্তু দু একটা কথার পরই তাদের ভেতরের কথা বেরিয়ে পড়ে।

হরত মুখার্জী ভায়মগুহারবার জ্যোতিষীয় বহুর বিরুদ্ধে বীরেন মহান্তির লড়াইকে প্রেরিত ইচ্ছা করে কলে-ছিলাম। কিন্তু ভোটের অবস্থা দেখে তাঁর মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁর প্রেরিত থাকছে না এবং বীরেন মহান্তি জ্যোতিষীয়বাবকে কাছে চুমোপুটিরও অধম। তাই তিনি প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন। যাদের হাতে পুলিশ প্রশাসন, টাকা পরমা, গুণ্ডাবাহিনী, বারা ১৯৭২ সালে পশ্চিম বঙ্গে রিনিং-এর ব্যাপারে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছে তাদের মুখে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে রিনিং-এর অভিযোগে নিতান্ত শিঙা হাসবে। বেচারী হরত, দিল্লীতে মুখ দেখাবেন কি করে।

তবে এবার ব্যাপক সম্মান ও রিনিং না হলেও কোথাও কোথাও ১৯৭২ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। বিশেষ করে দমদম ও ব্যারাকপুর বেল্টে। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে চুকে গুণ্ডারা ভোট পত্র ছিনিয়ে ছাপ মেরে বাজ্ঞে কলেছে এমন ঘটনা বরানগরে ঘটেছে। কোন কোন জায়গায় ভোর রাতে ভোট হয়ে গেছে। একটি পোলিং বুথে একজন রিপোর্টার মেধেন প্রিজাইডিং অফিসারের সামনে প'থানেক লোক দাঁড়িয়ে। তারা অফিসারের কাছে থেকে ব্যালট পেপারগুলো চাইছে ছাপ মেরে বাজ্ঞে কলেবে বলে। কিন্তু অফিসার দুঃপ্রতিজ্ঞ, কিছুতেই ব্যালট পেপার ওদের হাতে দেবেন না। “আমি দোব না, প্রাণ গেলেও নয়।” তাঁর কথা শুনে রিপোর্টার স্তম্ভিত। এমন সংলোকও সরকারী প্রশাসনে আছে? রিপোর্টার অবশ্য জানেন না তারপর কি ঘটেছে। তাঁর দিকে গুণ্ডাদের নব্বয় পড়ার আগেই তিনি পালিয়ে আসেন। এটা খড়দহ অঞ্চলের ঘটনা। বরানগরেও ভোটপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে, যেখানে ১৯৭২ সালে বিধানসভার নির্বাচন সকাল সাড়ে দশটার মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সি পি আই দলভুক্ত গুণ্ডার সংঘাতও কম নয় এবং এবারকার নির্বাচনে দেখা গেল তারাও গুণামিতে কম যায় না। খড়দহ অঞ্চলে তারা পাইপ গান নিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। অনেক জায়গায় ভোটদানের ভোট দিতে দেয় নি। অনেকের ভোট তারা নিজেরা দিয়ে দিয়েছে।

সবচেয়ে বিরাট লাইন পড়েছিল বোম্ব হয় যাদবপুর কেন্দ্রে। আশংকা ছিল যাদবপুর অঞ্চলে গুণ্ডালাগ হবে। সে আশংকা অমূলক প্রমাণ হয়েছে। যাদবপুর সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ছিল। যেখানকার মানুষ ১৯৭০ সাল থেকে প্রথমে নকশাল তারপর কংগ্রেসীদের লক্ষ্যে সন্ত্রাস ছিল তারা প্রাণ খুলে দলে দলে ভোট দিয়েছে সি পি আই (এম) প্রাণী শোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে। সি পি আই প্রায় সর্বত্র ভোটদানের স্থগা কুড়োচ্ছে। তাই হরত তারা গুণামী করে দমদম ও বারানাত জয়ের পথ প্রশস্ত করতে চাইছে।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩১ আচার্য প্রমুদচন্দ্র বোড কলিকাতা থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৩১ মট লেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।



জনতার দাবী : জোচ্চোর সিদ্ধার্থ সরকার গদী ছাড়ে

দপন

বিংশ বর্ষ ॥ ৯ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ২৫শে মার্চ '৭৭ ॥ ৪০ পঃ

নির্বাচনের দিন পুলিশমন্ত্রী গৃহবন্দী ছিলেন

নির্বাচনের দিন রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল। চোদ্দই মার্চ থেকে তরুণবাবুর সমস্ত কর্মতা এক অদৃশ্য-হস্তক্ষেপে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তরুণবাবু জুয়োগের অপেক্ষার ছিলেন। এবার তিনি সিদ্ধার্থবাবুর বিরুদ্ধে সশাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

চোদ্দই মার্চ রাত থেকে মালদহ, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার প্রো-চেজার গোষ্ঠীর সমর্থকদের ব্যাপক হারে গ্রেফতার করা শুরু হয়। সেদিন রাত থেকেই তরুণবাবুর কাছে ঘন ঘন টেলিকোন আসতে থাকে

পুলিশী কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানিয়ে। পুলিশ যাদের গ্রেফতার করেছে এবং করার উদ্দেশ্যে পরোয়ানা জারী করেছিল তারা সবাই তরুণবাবুর গোষ্ঠীর সমর্থক।

পনেরো তারিখ বাবোটোর সময় তরুণবাবু আই জি ও খরাষ্ট্র সচিবকে ডেকে ব্যাপারটা জানতে চান। 'ওরা বলেন, "আমাদের কিছু করার নেই আর আমরা দয়া করে আর বিরক্ত করবেন না।" রাজ্যের নির্বাচনের আগে, পঁচিশজন রাজনৈতিক কর্মীকে মিসার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন তরুণবাবুর জেলার

ময়দানের ময়দানে জনতা পার্টি ও বামপন্থী মোর্চার সভায় ভোগান ছিল, "দুর্নীতিপরায়ণ জোচ্চোর সিদ্ধার্থ সরকার গদী ছাড়।" কয়েকটি ব্লক নেতা অশোক ঘোষ বললেন; "বেহায়া নির্ভর সিদ্ধার্থস্বরূপ হায় যদি জোচ্চোর শব্দভাগ না করে তবে তাকে রাইট স'বিলিডিন্স থেকে জনতা টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনবে।"

এই কথায় জনতা উল্লাস প্রকাশ করে সমর্থন জানিয়েছে।

সেদিন ছিল জনতার বাধ্যতাসী উল্লাস। শহীদ মিনার ময়দানের বত-

দ্বয় দৃষ্টি যার কেবল কালো কালো মাথা। নেতারা যখন মাইকের সামনে এসেছেন তাদের বক্তব্য রাস্তাতে জনতা আনন্দে অধীর হয়ে চীৎকার করেছে, তাঁদের নামে জয়ধ্বনি দিয়েছে।

এ যেন প্রলয়ের পরে নতুন সূর্যোদয়। তাই জনতার এত উল্লাস। অনেক অপকীর্তির স্বাক্ষর রেখে কংগ্রেস দল গদী থেকে বিদায় নিয়েছে। ১৯৭০ সাল থেকে পশ্চিম বঙ্গে ছিল জুগাধের রাজত্ব। তারা চুরি জোচ্চুরি রাহাজানি সাধারণ (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

লোক। খরাষ্ট্র সচিবের কাছে তরুণবাবু মিসার নামের তালিকা জানতে চান। খরাষ্ট্র সচিব এ ব্যাপারে তার অক্ষমতা প্রকাশ করেন।

তরুণবাবু নির্বাচনের আগে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তি দেবার আদেশ দেন এবং পুনরায় যাতে গ্রেফতার করা হয় তার উদ্দেশ্যে পুলিশকে সতর্ক করে দিয়ে লিখিত নোট দেন। কিন্তু সে আদেশ পালন করা হয়নি।

নির্বাচনের দিন তরুণবাবু বাড়ীতে বসেই খবর পাচ্ছিলেন খোদ বারাসতেই পুলিশের সাহায্যে সি পি আই কর্মীরা তাকে ধরে নিয়েছে। তরুণবাবু

বাড়ীর বাইরে আসতে চাইলে পুলিশ তাকে বাঁধে রেখে নিষেধ করেন। তরুণবাবু তবুও বাইরে যান। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেন পুলিশের সামনে সি পি আই এক চেলেচুরি ব্যালট পেপার নিয়ে তাকুণ করছে। কর্তব্যরত পুলিশকে তরুণবাবু এসব বন্ধ করতে বলেন, কিন্তু পুলিশ কৃকিসার তরুণবাবুকে ওখান থেকে চলে যেতে বলেন।

মালদহে প্রথম মুখার্জীর ১০০ জন নির্বাচনী কর্মীকে ভোটের আগের দিন গ্রেফতার করা হয়েছে বলে অভি-

ডুপ্লিকেট ব্যালট

পেপারের খবর

(দর্পণের সংবাদমাতা)

লোকসভার নির্বাচনে ব্যালট পেপার ছাপা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আলিপুর প্রেসে। ব্যালট পেপার ছাপার ব্যাপারে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। জনতা পার্টির নেতা প্রফুল্ল সেন, গণ-তান্ত্রিক কংগ্রেসের বিজয় সিং নাহার এবং মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির জ্যোতি বসু এই অভিযোগ তুলেছেন। বেশ বয়েকটি কেন্দ্রে ডুপ্লিকেট ব্যালট পাঠানো হয়েছিল, যা সাধারণতঃ হয় না।

এই প্রেসের কর্তব্যে কুখ্যাত পাঁচু-গোপাল মুখার্জীর বামপন্থী বিষেব হ'বদিত। বর্ধমানে ডি-আই-জি থাকাকালীন এত বামপন্থী কর্মীদের ওপর অত্যাচারের অনেক কাহিনী অনেকেরই জানা। পাঁচু মুখার্জীর নেতৃত্বে ব্যালট পেপার কারচুপির একটা বড়কল্প হয়েছিল বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে বেসরকারী তদন্ত হলে সব জানা যাবে।

(শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়)

গণতন্ত্রের জয়

নির্বাচনে জোটবদ্ধ বিভিন্ন দলের
নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন, জ্যোতি বসু,
বিজয় সিং নাহার, অশোক ঘোষ,
সমর গুহ, নিখিল দাস সকলেই
তাকে অভিনন্দন জানালেন। সব
বললেন, নির্বাচনে প্রমাণিত হয়ে
যে, ভারতের জনগণ বৈরশাসন এক-
নায়কত্ব চান না, তারা গণতন্ত্র
পছন্দী।

বীরেন মহান্তি ও স্বরত্ন বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ

ডায়মণ্ডহারবারের যুবনেতা বলরাম ঘোষ বীরেন মহান্তি ও স্বরত্ন মুখার্জীর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ এনেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকের নিকট লিখিত একটি চিঠিতে তিনি এই অভিযোগ করেছেন, যে চিঠির কপি আমাদের কাছেও পাঠানো হয়েছে। চিঠিটির কিয়দংশ কাটছাঁট করে নীচে উদ্ধৃত করা হল—

আপনার ১৫ মার্চ, ৭৭ তারিখে ডায়মণ্ডহারবারে এই প্রথম সংসদীয় সভায় শীর্ষক প্রবন্ধটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রবন্ধের প্রতিবেদনে রাষ্ট্রপতি শ্রীস্বরত্ন মুখার্জী ও কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি এডুকেশন অফিসার শ্রীবীরেন মহান্তির ভাল কর্মী ও নেতা বলিয়া উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাই-তেছি। আশা করি আমাদের এই প্রতিবাদ আপনাকে নিশ্চয় প্রকাশ করিবেন।

প্রথমেই ডায়মণ্ডহারবারের সমুদয় যুব কংগ্রেস নেতা ২৪ পরগণাকে নেতৃত্ব দিয়া থাকি। সেখানে হুযোগ সজ্ঞানী অস্ত্র কোন ব্যক্তি স্বরত্ন মুখার্জী বা বীরেন মহান্তি মোটেই কোন যুব কংগ্রেসের সং নেতা নহেন। তাঁহাদের ৮০ জায়গায় বক্তৃতা বাহা লিখিয়েছেন তাহা

সমুদয় স্বরত্ন ও বীরেন মহান্তির কল্পনা প্রসূত। ইহার আশ্রয় নিকট কলিকাতার কুখ্যাত মতান ছাড়া আর কিছুই নহেন। আপনার প্রতিবেদনে তাহাদের সম্বন্ধে বাহা বলা হইয়াছে তাহা সবই অসত্য। শ্রীগোবিন্দ নন্দর বা অস্ত্র কোন যুব নেতা বা কর্মী তাঁহাদের মনোনয়ন সমর্থন করেন না। তাহা ছাড়া তাঁহারা এখানকার অধিবাসীও নহেন। স্বরত্ন ও তাহাদের মতামত ও প্রচার বিভাগিকর ও সম্পূর্ণ অসত্য। এই স্বরত্ন মুখার্জী ও বীরেন মহান্তির অতীত দিনের কিছু ঘটনার কথা বলা বিশেষ দরকার। বীরেন মহান্তি মহাশয় উড়িষ্যা নিবাসী বর্তমানে বাহুড়ার আমবানী জেলার বসবাসকারী ও কলিকাতা কর্পোরেশনে হগ মার্কেটে ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্টের দায়িত্ব পালন করিতেছেন। তাঁহারা ঐ আমবানীতে বাহাজানি প্রবন্ধনা করিয়া তপশীল স্মি হইতে ৬০ টাকা মাত্র ১৬ টাকার দখল করার সময় প্রাক্তন ছাত্র বর্তমানে তথাকথিত যুবনেতা স্বরত্ন মুখোপাধ্যায় ও শঙ্কু দত্ত ইত্যাদি গিয়া ঐ জবরদখল করিতে বীরেন মহান্তিকে

সাহায্য করেন। এ বিষয়ে বাহুড়ার নানান আদালতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোমদারী দেওয়ানী মামলা চলিয়াছে।

স্বরত্ন মুখোপাধ্যায় ও বীরেন মহান্তি এবং তাঁহাদের অনুচরবর্গ রিলিফের সত্তর লক্ষ টাকা তহবিলের অভিযোগে অভিযুক্ত আছেন। এ বিষয়ে গত ১৭.৩.৭৬ তারিখ, বি, আই হইতে তাঁহাদের সম্বন্ধে এককোয়ার্টারী আয়ত্ত হয় ও বীরেন মহান্তির ভারেরা জড়িয়ে পড়েন। উহার মধ্যে কো-অপারেটিভের টাকাও অসং উপায় অবলম্বন করিয়া তহবিল তহবিলের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ৪২০, ৪৭৮, ৪৭১ ও ৪৭৩ ইণ্ডিয়ান পেন্ডাল কোডের দ্বারা অভিযুক্ত হন। উহার মর্ম হইল চিঠি প্রত্যর্পণ প্রবন্ধনা জাল জালিয়াতির অভিযোগ।

আমরা আরও দাবি করি যে কংগ্রেস হইতে পোস্টার মারা হইতেছে যে যুব জগৎ ইত্যাদির বহলে কংগ্রেস শাস্তি এনেছে, কংগ্রেসকে ভোট দিন। আমাদের বক্তব্য গত ৩০ বৎসরের ভিত্তর কংগ্রেস সরল ভারতীয়দের এতটুকুও শাস্তি দিতে পারে নাই এবং কংগ্রেস সরকারের আমলে হাজার হাজার যুবক যুবতীকে হত্যা করা কি শাস্তি ও শৃংখলা আনার যুক্তি?

বলরাম ঘোষ

জনতার বিচারে স্বৈরতন্ত্রের সমাধি কালিদাস কুণ্ডু

মহান ভারতীয় জনতার কল্পনায় স্বৈরতন্ত্র ভস্মীভূত। ক্রমশঃ ইতিহাসের রথচক্রতলে ক্ষমতালোভী ব্যক্তির দণ্ড ও স্পর্ধা চূর্ণ বিচূর্ণ। রায় দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত জনগণ: ব্যক্তিগত মানসিকতা—তানাহা নী মানি না। লক্ষ লক্ষ মানুষের নিঃশব্দ বিদ্রোহ—তানাহা নী এতকাল হোল ভারতবর্ষের মাটিতে স্বাধীনতা ও গণ-অস্ত্রের স্তম্ভ অদ্বাদয় স্থাপনা করে।

প্রশ্ন ছিল: দাসত্ব না স্বাধীনতা? আসমুখ হিমালয় বজ্রকণ্ঠে উত্তর দিয়েছে—“স্বাধীনতা।”

প্রশ্ন ছিল: স্বৈরশাসন না গণ-তন্ত্র? জায়াধীশ জনতা অকম্পিত রায় দিয়েছে—“গণতন্ত্র।” প্রশ্ন ছিল ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার কার, একটি পরিবারের না খেটে খাওয়া কোটি কোটি মানুষের? মহান দেশের মহান জনতা রায় দিয়েছে—“ভারতবর্ষ ভারতবাসীর।”

“শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পেরে”—ইতিহাসে যে কথাটি লেখা থাকে ভাঙের মতো সেটি হচ্ছে—জনগণই ইতিহাসের স্রষ্টা। ১৯৭৭-এর স্বচনা ঐতিহাসিক সেই সত্যের পুনরুজ্জীবিত হোল। এদেশের ইতিহাসের পাতায় বহু বীরাজনা, মহীয়সী নারীর নাম লেখা আছে অগ্নি অক্ষরে। আর একটি নাম লেখা থাকবে কালো অক্ষরে—বিনি পদগর্বে গবিতা হয়ে নিভৃতল্য লোকদের জেলে পাঠিয়েছিলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিনা বিচারে, নিবিচারে বন্দী রেখেছিলেন ক্ষমতার সিংহাসনে টিকে থাকবার জন্য, বিনি সংসদ সংবিধান, আইন ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থাকে নিজের গদী রক্ষার বস্ত্রে পরিণত করেছিলেন। জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে—স্বপ্রাচীন এই দেশের প্রাক্তন নাগরিক তর্জনী তুলে নিষেধের আজ্ঞা দিয়েছেন—“না।”

এখন ভারতবর্ষে জনসমুদ্র উত্তাল। রাজনীতির জটিল কথা নয়, অর্থনীতির কূটতর্ক নয়। বিতর্কের অবকাশ নেই এখন গণতন্ত্র না সমাজতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্র কোন রূপে কোন পথে। এখন সময় শপথ উচ্চারণের। শপথ পালনের। এখনও হাজার হাজার বন্দী কারাভাণ্ডারে। এখনও কারাগারের বহু দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন বীরপুত্রের বীরসাতা পুত্রের মুখদর্শনের জন্য। জনতা সরকার প্রতিশ্রুতি পালন করুন। মায়ের কাছে ছেলেরা ফিরে আসুক। সেই ফিরে আসার উৎসবই হবে নতুন সরকারের শ্রেষ্ঠ অভিষেক।

গণতন্ত্রের সৈনিকেরা হুঁশিয়ার। স্বাধীনতার প্রহরীরা সাবধান। বক্তব্য রাখা হয়েছে। সত্ত সমাপ্ত নির্বাচনে কোন একটি বিদেশী গুপ্তচর সংস্থা তিনশত কুড়িটি আসনে চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছিল। তাদের চক্রান্ত পর্যুদস্ত। কিন্তু নতুন কৌশলে চক্রান্ত চলবে। তাই জনতা ও জনতা সরকারকে সজাগ, অস্ত্রদৃষ্টি রাখতে হবে বৈদেশিক সেই মিত্রবৈশী শত্রুর প্রচেষ্টা সহযোগী শক্তির প্রতি।

আর একটি কথা। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী যুক্তফ্রন্টের কাছে জনগণের অনেক প্রত্যাশা। তাদের গণ-সংগঠন-ভুলো সক্রিয় ও শক্তিশালী থাকলে গণতন্ত্রের সুযোগ ও সম্ভাবনা সম্প্রসারিত হবে।—ত্রিশ বছরের দুঃশাসনের যুগ শেষ হয়ে গেল। নতুন অধ্যায় শুরু হয়ে গেল জনগণের জয়যাত্রার। যুগশুদ্ধির এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বামপন্থী মঞ্চকে প্রসারিত করতে না পারলে গণতন্ত্রের সার্থকতা নেই। উনিশ মাসের দুঃখপের রাত্রিশেষে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রায় দিয়েছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। জনমতের এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিকে প্রতিক্রিয়া পান্টাই পারে সংগঠিত রূপ দিতে। অর্জিত সাফল্য গণতন্ত্রপ্রিয়, স্বাধীনতা-কাষী মানুষের মনে নবতর অশ্রুপ্রেরণা সঞ্চারিত করেছে ইতিহাসের খেলালে নয়, ইতিহাসের প্রতিজ্ঞায়। পশ্চিম-বাংলার বামপন্থী আন্দোলনে সেই প্রতিজ্ঞা দুর্জয় সংগ্রামে পরিণত হোক এবং সেই সংগ্রাম ভারতবর্ষে প্রকৃত গণতন্ত্রের বনিয়াদ রচনা করুক—এই ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করে গেল ১৯৭৭-এর ঐতিহাসিক নির্বাচন।

কেয়া চক্রবর্তীর মৃত্যু রহস্য

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিভিন্ন মহল থেকে কেয়া চক্রবর্তীর হত্যা রহস্য উদ্ঘাটনের চাপ আসছে পুলিশের কাছে। গত ১৬ই মার্চ কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিক এক পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানিয়ে এক বিবৃতিতে থাকব করেছেন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন সত্যজিৎ রায়, যুগল সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, নীরেন চক্রবর্তী, সত্যজিৎ রায়, গোবিন্দ-কিশোর ঘোষ, হুমীল গঙ্গোপাধ্যায়, তৃপ্তি মিত্র, পূর্ণেন্দু গুপ্ত, বসন্ত চৌধুরী, শোভা সেন প্রভৃতি শিল্পী সাহিত্যিকরা।

থবরে প্রকাশ করোনার আদালতে এক তদন্ত কমিশন বসবে। কোরেন-সিক ইনস্টিটিউটের সাহায্যে পুলিশ এ কাজে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে। জল পুলিশের ডেপুটি কমিশনার স্বরূপ খার্জী পুরো ব্যাপারটির তদন্ত শুরু করেছেন। নীলমাধব সেন রোডের মর্গ থেকে সাউথ পোর্ট থানায় কেয়া চক্রবর্তীর ময়না তদন্তের রিপোর্ট জানান হয়েছে যে, জলে ডুবে কেয়া দেবীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহের দুটি

হাত ভাঙা অবস্থায় পাওয়া যায় এবং মুখে ও বুকেও আঘাতের চিহ্ন ছিল। জলে ডোবার আগের মৃতদেহে তাঁর এ অবস্থা ছিল অথবা পরে হয়েছে ময়না তদন্তে এর স্পষ্ট উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। ১৭ই মার্চের আনন্দবাজারে স্বদেশ সরকারের এক বিবৃতির মাধ্যমে যা প্রচারিত হয়েছে সেখানে অনেক তথ্য গোপন করা হয়েছে। অন্ততঃ আমাদের কাছে তিনি যা বলেছিলেন তার বেশ কিছু অংশ এখানে অল্পপ্রতি-থিত হয়ে গেছে। এই স্ববিরোধী কথাবার্তার জন্য বর্তমানই স্বদেশ সরকার ওপর মানুষের সন্দেহ দৃঢ় হচ্ছে। ফিল্ম কিনালা কর্পোরেশনের টাকায় যেখানে চলচ্চিত্র নির্মাণ হচ্ছে সেখানে অর্থপ্রয়োগের জন্য এত কার্পণ কেন? মাঝ গঙ্গার তটিক করার প্রয়োজনে জল পুলিশের তরফ থেকে কতগুলি শর্ত আরোপ করার প্রথা আছে। প্রযোজক ও পরিচালকের পক্ষে সেগুলি মানা সম্ভব ছিল না। তাই তারা বিনা অল্পমতিতেই লঞ্চ নিয়ে গেছিলেন। তদন্ত নন্দী আমাদের কাছে বলেন যে, গঙ্গায় তটিকের এই দৃশ্যটি তিনি বাদ দিতে অস্বস্তি করেছিলেন পরিচালককে। পরিচালক তাঁর কথা রাখেননি। তদন্ত নন্দী নয় জলে ঝাঁপ দেবার জন্য আর একবার

তিনি একজন প্রখ্যাত অভিনেত্রীকে বাধ্য করেছিলেন। জনৈক অভিনেতা সে রাজ্যের তাঁকে বাঁচান।

২০শে মার্চের যুগান্তর লিখেছে, “কেয়ার মৃত্যু না আত্মহত্যা।” তাঁরা ললিতা চ্যাটার্জীর কিছু মিথ্যা ভাষণও কাগজে ছাপিয়েছেন। ললিতা চ্যাটার্জী কেয়া দেবীর মার সামনে বলেছেন যে, বসন্ত চৌধুরী, তিনি ও কেয়া দেবী লঞ্চের ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে স্বদেশ সরকারের স্ক্রিপ্ট তুলেছিলেন। কেয়া দেবী গঙ্গার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ কেয়া দেবীকে জলের দিকে পা ছুটো সোজা করে পড়ে যেতে দেখেন। যুগান্তর কি স্বদেশ সরকারের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে আত্মহত্যার ব্যাপারটা প্রচার করেছে? স্বদেশ সরকার সাঁকরাইল থানায় ১২ই মার্চ ডাইরী করেছিলেন যে কেয়া দেবী জলে ঝাঁপ দিয়েছেন। কেয়া দেবীর মা মেয়ের আত্মহত্যাভিযুক্ত যুগান্তর প্রচারে ভীষণ আপত্তি করেছেন। নান্দীকার আয়োজিত এক শোকসভায় ২০শে মার্চ পরিচালক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, আত্মহত্যার কথা উঠলে আপনারা তার প্রতিবাদ করুন। মৃতদেহে একটুও ফোলাব চিহ্ন ছিল না। এবং এ কারণেই অনেকে সন্দেহ করেন যে, কেয়া দেবীকে ডেকের ওপর হত্যা করে জলে ফেলে দেওয়া হয়। আসল রহস্য উদ্ঘাটনের দায়িত্ব পুলিশের।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

৥ চাঁদার হার ৥

বার্ষিক ২২ টাকা

বাৎসরিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠাবার ঠিকানা:

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, মট লেন। কলিকাতা ১০

রুশ বিপ্লবের কোণী বিচার

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী দর্পণে আমার লেখার (১৮ই ফেব্রুয়ারী) অবশ্যে পক্ষ চৌধুরী মহাপ্রবলেছেন, আমার বক্তব্য থেকে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন নি। এমন কি জালিনের যে কথাকে আমি উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করেছিলাম, সেই কথা থেকেও তিনি জালিনের "মারাত্মক ভুলটি" আবিষ্কার করেছেন। যাই হোক এই ব্যাপারে আমি পরে আসছি। আগে দেখা যাক রুশ বিপ্লবের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের প্রকৃতিটা কী রকম? পক্ষ-বাবু জালিনের রচনাবলী না পড়ে বিভ্রান্ত না হয়ে, রুশ বিপ্লব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, "এপ্রিল থিসিসই সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে রাশিয়ার বংশৈতিকবাদের উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রণনীতি এবং রণকৌশল ছাড়াই" এবং তার মন্তব্য তিনি "এপ্রিল থিসিসের" ১০টি পয়েন্টের মধ্যে ১নং পয়েন্টটি উদ্ধৃতি করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হোল, তিনি ১নং পয়েন্টটি শুধু কেন উদ্ধৃত করলেন? কেন তিনি ১নং পয়েন্টটি উদ্ধৃত করলেন না? এই ১নং পয়েন্টে লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্য ছিল নাকি? এই পয়েন্টে কি নেই যে, "Without overthrowing capital it is impossible to end the war by a truly democratic peace, a peace not imposed by violence." আর capital কে উচ্ছেদ করার জন্য বিশেষ অবস্থায় বংশৈতিক পার্টিকে কী করতে হবে সেটা কি লেনিন এই লেখাতে বলেন নি? যদি বলে থাকেন তাহলে আপনি লেনিনের "এপ্রিল থিসিসের" সারবস্তটি প্রকাশিত হয়েছে এমন একটি পয়েন্টকে উদ্ধৃত করলেন না কেন? তাহলে কি রুশবিপ্লব সাম্রাজ্যবিরোধী ছিল না—এসত্যটা ধরা পড়তো?

এটা সত্য যে লেনিনের "এপ্রিল থিসিসে" অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে তখনই কোন বিরোধের ভাক দেওয়া হয়নি। বরং এই অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য তখনকার বিষয়গত অবস্থা অস্থায়ী রণনীতি ও রণকৌশল গ্রহণ করেছিলেন। এই ব্যাপারে কি পক্ষবাবু বিয়ত পোষণ করেন? তাহলে পাঠকগণ আপনার কাছে আমি "এপ্রিল থিসিস"-এর ৪নং পয়েন্ট-এর কিছুটা এখানে তুলে ধরি, যাতে আপনারা জানতে পারবেন ঐ সময় রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি কিরূপ কর্মনীতি গ্রহণ করেছিল।

"The masses must be made to see that the Soviets of worker's Deputies are the only possible form of revolutionary government, and that therefore our task is, as long as this government yields to the influence of the bourgeoisie, to present a patient, systematic, and persistent explanation of the errors of their tactics, an explanation especially adapted to the practical needs of the masses. As long as we are in the minority we carry on the work of criticising and exposing errors at the same time we reach the necessity of transferring the entire state

বিচিত্র দেশের বিচিত্র মানুষ

আমাদের দেশ বড় বিচিত্র। সে তো ডি. এল. রায়মহাশয় তাঁর নাটকে বলেছিলেন সেলুকাসের উদ্দেশে: সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র। এই দেশ। কথাগুলো বলেছিলেন আমাদের দেশের সৌন্দর্য ও অভুল বৈভব আর বিপুল ধনরাশি দেখে। কিন্তু যিনি-বাবু বেঁচে থাকলে আজো তিনি উক্ত কথাগুলোই 'একটু' পরিবর্তন করে ব্যবহার করতেন, ঠিক এভাবে "রিপেলি দি বিচিত্র এই দেশ মাইরি।"

আমাদের দেশে নিরীহ ও শান্তিকামী, নিরপেক্ষ মানুষের সংখ্যা সংখ্যা-তীত। তারই মধ্যে ঢুকে পড়েছে কালোবাজারী ভেজালদার প্রভুত্বের অনেক ডাকাত আর তথাকথিত রাজনীতির অবৈধ পাণ্ডারা। আর রাজনীতির এইসব পাণ্ডাগুলি অধিকাংশই 'চোরে চোরে ভাই' এবং এরাই দীর্ঘকাল মন্ত্রী উপমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত পদবিমান হয়ে বলেছিল, যা রাজ-তন্ত্রীয় শৃঙ্খলার ব্যতিক্রমহীন। আর এইসব খুনের দল, যাদের রক্তাক্ত হাত নিরবধি পোষাকে মুছেতে হতো, যারা গোটা দেশটাকে জেলখানা আর কবরখানার রূপান্তরিত করেছিলো, যারা কোটি কোটি বেকার তৈরী করে 'বালিয়াড়ি সমাজতন্ত্র' এনে ফেলে-ছিলো, যারা মায়ের কোলশূন্য করে নিজেরাই প্রবোধ দিতো আলখালা পরে মুখ ঢেকে, যারা বৌবনের উপবনে তরুণ জীবনকে বর্ষণ করেছিলো, জেলে পিটিয়ে পিটিয়ে পচিয়ে পচিয়ে

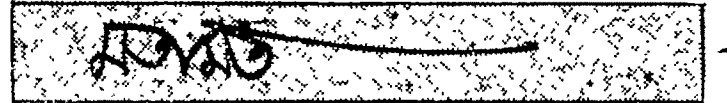
power to the soviets of worker, Deputies so that the people may overcome their mistakes, by experience."

পাঠকগণ, এছাড়াও এপ্রিল থিসিসে আরও অনেক পয়েন্ট আছে—যার দ্বারা ঐ সময়কার বংশৈতিক পার্টির কর্মনীতি ও কর্মকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত এই বাক্যগুলির দ্বারা খুব হৃদয়ভারে প্রমাণিত হয় যে বিষয়গত অবস্থা অস্থায়ী কিস্তাবে বংশৈতিক পার্টি ক্ষমতা দখলের অর্থাৎ "capital"-এর শৃঙ্খলাকে চূর্ণ করার কাজে ব্যাপ্ত ছিল। কেন "capital"-এর শৃঙ্খলাকে চূর্ণ করে ক্ষমতা দখল করতে হবে? এই প্রশ্নের উত্তর আপনারা পাবেন লেনিনের যে কথাকে আমি আগেই উদ্ধৃত করেছি তার মধ্যে। এছাড়াও আপনারা সামনে লেনিনের আরও একটি কথাকে

নারকীয় অত্যাচারে হিটলার, হিমলা-দেরও লক্ষ্য দিয়েছিলো তাদেরকে আশীর্বাদ করে যার, এই বিচিত্র দেশেরই ঐসব শুণ্ড-পাণ্ড শান্তিকামী পুরোহিত, জ্যোতিষী, ভবিষ্যবিদ আধ্যাত্মিকতাবাদের চামারেরা, তেমনি একটা ঘটনা একটি বহুল প্রচলিত সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় পড়ে-ছিলাম, বসে। অসম্প্রতি স্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন জনৈক জ্যোতিষী ইন্দিরা গান্ধীকে বিশেষ ভবিষ্যৎ বলেছিলেন "আপনার জয় হোক।" এবারে আপনার জয় হুনিচ্চিত—দেশ তখন আঙুনে পুড়েছে, জিনিষপত্রের দাম সাধারণ মানুষের জরুরকমতার বারবারই এক ইঞ্চি ওপরে। কালো পীচের রাস্তা-গুলো, জেলখানার গরাদগুলো রক্তে রক্তে কর্মমাক্ত। সেই গভীর পিচ্ছিল রক্তাক্ত কর্মমাক্ত ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে স্রীমতী ইন্দিরা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ চটুলহাসি হেসে প্রভুত্ব করছিলেন: "ধন্যবাদ।" আমার প্রাতি আপনার শুভকামনার জন্য ধন্যবাদ।

জ্যোতিষীটি এখনো বেঁচে আছেন বোধ হয়।

আর এদের নিয়েও আমাদের "এই বিচিত্র দেশ, বিচিত্র সংসার—" এই সব জনগণ বিচ্ছিন্ন আকাট শরতান-দের কি—যারা "বিষাক্ত ও ভুল ওষু-ধের" থেকেও ভয়ংকর ও ভয়াবহ ও ক্ষতিকর, তাদেরকে শাস্তি করা যায় না? অচিন্ত্য সীতারা



আমি এখানে তুলে ধরি: "It is impossible to slip out of the imperialist war and achieve a democratic, non-coercive peace without overthrowing the power of another class, the proletariat."

"The Russian revolution of February-March 1917 was the beginning of the transformation of the imperialist war into a civil war. This revolution took the first step towards ending the war but it requires a second step, namely, the transfer of state power to the proletariat, to make the end of the war a certainty. This will be the beginning of a 'break through' on a world wide scale, a breakthrough in the front of capitalist interests, and only by breaking through this front can the proletariat save mankind from the horrors of war and endow it with the blessings of peace."

এই কথাটা লেনিন বলেছেন Task of proletariat in our Revolution প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে তিনি নিজের "এপ্রিল থিসিসের" বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

এর থেকে কি প্রমাণিত হয় যে রুশ বিপ্লবে কোন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পথনির্দেশ ছিল না? কিন্তু আমাদের রুশবিপ্লব বিশেষজ্ঞ পক্ষবাবুর মতে "সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ বিরোধী বিপ্লবের রণনীতি, রণকৌশলের সঠিকতা প্রমাণিত হয়েছে চীনের জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে নয়।" পাঠকগণ, পক্ষবাবু যে চীন বিপ্লবের কথা উল্লেখ করেছেন আমি সেই চীন বিপ্লবের মহান নেতা কমুয়েড মাও-সে-তুং-এর কিছু বক্তব্য এখানে আপনারা সামনে রাখছি: "পার্টির বংশৈতিকরণ বত বেশী হবে, ততই সঠিকভাবে সে তার রাজনৈতিক লাইন নির্ধারণ করতে পারে এবং ততই যুক্তফ্রন্ট ও সমাজ সংগ্রামের প্রক্রিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারবে।" ৪ শুধু তাই নয়, চীনা

কমিউনিস্ট পার্টির "দি কমিউনিস্ট পত্রিকার" উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন "এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি বংশৈতিকরণের চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজে সহায়তা করা, যা ব্যাপ্তির দিক দিয়ে হবে জাতীয়, যার থাকবে ব্যাপক গণচরিত্র, আর মতাদর্শগত রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে যা হবে পুরোপুরি স্বাধীন" (বোল্ড টাইপ আমার লেখক)।

এটা কি রকম হোল? যে বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ বিরোধী রণনীতি ও রণকৌশলের সঠিকতা প্রমাণ করেছে অর্থাৎ যে বিপ্লবকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের সঙ্কেই লড়াই করতে হয়েছে—এই বিপ্লবে নেতৃত্বকারী পার্টির নেতা কি করে "বংশৈতিকরণ" ও "বংশৈতিকরণের" পার্টি তৈরী করতে অথবা গড়ে তুলতে চান? যে বংশৈতিকবাদে নাকি কোন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পথনির্দেশ নেই! পাঠকগণ, আপনারা এই ইতিহাসের ওপর কলঙ্কলপনকারীর কাছে প্রশ্ন রাখতে হবে যে রুশ বিপ্লব যদি সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদবিরোধী না হয় তাহলে সেখানে সাম্রাজ্যবাদের চরমশত্রু সমাজতন্ত্র কিস্তাবে জরলাভ করল। শুধু তাই নয়, আপনারা প্রশ্ন করুন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কারা দাবী তুলেছিল "এই বিশ্বযুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিবর্তিত" করার? কারা প্রমাণিত করেছিল যে সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে মৃত পুঞ্জিবাদ? যার আর বিকাশ নেই। তাঁরা কি এটা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রাম করে, ক্ষমতা দখল করে করেন নি, নাকি তাঁরা এটা করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করে। শুধু কি তাই, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শুরু কতখানি এবং কি পরিমাণে সেই বিপ্লব বিধে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল সেটা আমরা জানতে পারি মাও-সে-তুং-এর "নয়া গণতন্ত্র" কর্মসূচীর দ্বারা। মাও-সে-তুং রচিত এই "নয়া গণতন্ত্র" চীন বিপ্লবের ইতিহাস জানার ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাতে আছে চীন বিপ্লব কেন আর পুরনো ধরণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। কেন এই "নয়া গণতান্ত্রিক" বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ। এটা আপনারা মাও-সে-তুং-এর কাছ থেকেই শুধুন: "১৯১৪ সালে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার এবং ১৯১৭ সালের (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেস সরকারের অপকীর্তি

পাট চাষী ও পাট উৎপাদক রাজ্যগুলিকে লুণ্ঠন

রণজিৎ রায়

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং ত্রিপুরা—পূর্বাঞ্চলের এই কয়েকটি রাজ্যের প্রধান অর্থকরী ফসল হল পাট। চাল, ডাল, গম, তেল, লবণ চিনি, বস্ত্র প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য জব্যের অন্তর্গত যে দাম দিতে হয় এবং পাটের অন্তর্গত যে দাম পাওয়া যায়, এই দুয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের উপরে এই সমস্ত রাজ্যের চাষীদের আর্থিক অবস্থা বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল।

পশ্চিম ভারতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল হল তুলা। তৈলবীজ, আখ প্রভৃতি অন্যান্য অর্থকরী ফসলও পশ্চিম ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং পূর্ব ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে পাট যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, পশ্চিম ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে তুলা, তৈলবীজ কিংবা আখ এককভাবে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

অর্থকরী ফসলগুলির মধ্যে একমাত্র পাট ছাড়া অন্যান্য সবগুলি যাতে উচ্চ মূল্য পায় তার জন্য ভারত সরকার প্রচণ্ড উদ্যোগ প্রদর্শন করে থাকে। কেন্দ্রীয় নীতির ফলে একমাত্র পাট ছাড়া অন্যান্য সমস্ত অর্থকরী ফসলেরই দাম বৃদ্ধি পেয়েছে দ্রুতগতিতে।

১৯৬১-৬২ সালকে ১০০ ধরলে, ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে পাইকারী দরের হ্রাস ছিল—পাটের ১২৩ (২৩ শতাংশ বৃদ্ধি), তুলার ২১৪ (১১৪ শতাংশ বৃদ্ধি), ভোজ্য বাদামের ৩৬২ (২৬২ শতাংশ বৃদ্ধি), ডালের ৪৩০ (৩৩০ শতাংশ বৃদ্ধি), ভোজ্য তৈলের ৩৪৮ (২৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি), চালের ২৮৬ (১৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি), এবং গমের ২৪৫ (১৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি)। আখের দর বৃদ্ধি পেয়েছে তিন গুণেরও বেশী।

পাট ছাড়া পূর্ব ভারত উৎপাদন করে চা এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থ। এই পণ্যগুলি বিক্রয় করে পূর্ব ভারত চাল, ডাল, তেল, বস্ত্র, ইত্যাদি পণ্য অন্যান্য অঞ্চল থেকে ক্রয় করে থাকে। ১৯৬১-৬২ সালের চাইতে ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে যদি পাটের দর মাত্র ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে চাষের দর বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৩২ শতাংশ এবং খনিজ জব্যের মাত্র ৪৫ শতাংশ। পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহ ১৯৬১ সালে প্রতি কুইন্টাল পাট, চা এবং খনিজ পদার্থের পরিবর্তে যে পরিমাণে অন্যান্য জব্য পেয়েছে, আজ পাচ্ছে তার অর্ধেক অথবা এক-তৃতীয়াংশ কিংবা তার চাই-তেও কম। ভারত সরকার তার গ্রহীত মূল্য, শুদ্ধ তথ্য রেলে পরিবহনের ভাড়া সংক্রান্ত নীতির মাধ্যমে এই অসম পরিবর্তন সাধন করেছে। মূল্যের এই অসম পরিবর্তন হঠাৎ এক বৎসরে হয়নি; হয়েছে বৎসরের পর বৎসর ধরে। পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের পক্ষে সর্বনাশকর এই মূল্য পরিবর্তন সাধন আজো রয়েছে অব্যাহত।

পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি যে তাদের বর্তমানে উৎপাদিত পাট, চা ও খনিজ জব্যাদি বিক্রয় করে প্রয়োজন মত জিনিস ক্রয় করতে পারে না, তা হুম্বাট। সুতরাং প্রায় উঠতে পারে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহ তথা চাষীরা তাদের প্রয়োজনীয় জব্যাদির দাম দেয় কি ভাবে? এই সমস্ত রাজ্যে মাছবের এখনো যৎসামান্য বা কিছু পুঁজি রয়েছে, যেমন অসি-জমা, গৃহপানিত পুঁজি, বাড়িঘর, গহনোপকরণ এবং অতীতের সঞ্চয় ইত্যাদি তারা বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে। বতই দিন যাচ্ছে ততই এই বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সঠিক ভাবে বলতে গেলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই ভাবেই দরিদ্র করে দিয়েছিল ভারতকে। সত্যায় কেনা আর বেশী দামে বেচা, এই ছিল তাদের নীতি। ১৯৪৭ সালে কেন্দ্রে যারা ক্ষমতাসীন হয়েছেন, তাঁরাও এই একই

নীতি গ্রহণ করেছেন এবং অতীব নিষ্ঠুরতার সহিত সেই নীতি প্রয়োগ করেছেন পূর্বভারতের বিরুদ্ধে।

ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যেমন চট-কলের শ্রমিকেরা ছিল সর্বাধিক শোষিত, তেমনি চাষীদের মধ্যে পাট চাষীরা ছিল সর্বাধিক মর্যাদিক শোষণের শিকার। পাট শিল্প প্রায় একচেটিয়া ছিল ব্রিটিশদের। কাঁচা পাটের ব্যবসারে তাদের সহযোগী ছিল মাড়োয়ারীরা। ১৯৪৭ সালের পর মাড়োয়ারীরা পাট শিল্প তথা পাট ও পাটজাত জব্যের ব্যবসা সম্পূর্ণ কৃষিগত করেছে।

ব্রিটিশদের লোভাতুরা শাসনেও চাষীরা পাটের আয়-কর মত এমন সর্বনাশ দর কোনদিন পায় নি। পাট-চাষীরা যে সমস্ত ভোগ্যপণ্য ক্রয় করে থাকে সেগুলির দর বৃদ্ধি করতে এবং পাটের দর নিয়ন্ত্রণে রাখতে কেন্দ্র কর্তৃক সাধা সর্বপ্রকার কলি-কিকির অবলম্বন করেছে। পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থচন্দ্র রায়ের মত কেন্দ্রীয় সরকারের একনিষ্ঠ গোলামকেও “পাট চাষের মর্যাদিক দুঃখের কথা” বলতে হয়েছে বাধ্য হয়ে।

ব্রিটিশ শাসনকালেও নীতিগতভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল যে, পাট এবং ধান তথা অন্যান্য কৃষি পণ্যের দরের মধ্যে একটা স্থির মূল্যায়নপাত বা প্রাইস-প্যারিটি থাকা দরকার, এবং পাট ও ধানের মধ্যে সেই মূল্যায়নপাত হওয়া উচিত ১ : ৩, অর্থাৎ, ধানের হিসাবে, এক কুইন্টাল পাট হওয়া উচিত তিন কুইন্টাল ধানের সমান। অবশ্য এ কথা সত্য যে, ব্রিটিশ শাসনকালে পাটচাষীদের কোনদিন এই দাম দেওয়া হয় নি। দেওয়া হলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল চরিত্রই হত ভিন্ন প্রকারের। আবার এটাও সত্য যে, ব্রিটিশ আমলে পাট ও ধানের দরের হার কোন সময়েই ১ : ২ এর নিচে নেমে যায় নি; এমন কি, তৃতীয় দশকের বিরাট অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে যখন অন্যান্য কৃষিপণ্যের চাইতে পাটের দর অনেক বেশী নিচে নেমে গিয়েছিল, সে সময়েও নয়।

খাণীন ভারতীয় সরকারের আমলে পাটের দরের কী হাল হয়েছে দেখা বাক। পাটের দর সম্বন্ধে তথ্য অহসন্ধা-নের জন্য ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে একটি কমিটি নিযুক্ত করে। কমিটি অভিমত প্রকাশ করে যে, ধান ও পাটের দরের হার হওয়া উচিত “পূর্বতন কমিটিগুলি কর্তৃক সমর্থিত ৩ (ধান) : ১ (পাট) নয়, ২ (ধান) : ১ (পাট)”—এর কাছাকাছি। উক্ত “পূর্বতন কমিটিগুলি” ব্রিটিশ শাসনকালে এই সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিল। ১৯৫৪ সালের কমিটি উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত করে এই কারণ দেখিয়ে যে, দরের ওই হার ১৯৩০-এর দশকের সংকটের বৎসরগুলিতে বলবৎ ছিল।

১৯৭০ সালে সরকারের কৃষিপণ্য মূল্য কমিশন পাট ও ধানের মূল্যহার ১ : ১ হওয়া উচিত বলে সুপারিশ করে। বাণিজ্যমন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, পাট ও ধানের ১ : ৩ মূল্যহার হল “১৯৪০-এর দশকের সেকেন্ডে একটি ধারণা; বর্তমানে অচল।”

দেবীবাবুর উক্ত মন্তব্যের উদ্দেশ্য মোটেই এই ছিল না যে, ১৯৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে সুপারিশকৃত ১ (পাট) : ৩ (ধান) মূল্যায়নপাতের চেয়েও বেশী ধান পাট চাষীদের আজ পাওয়া উচিত। তিনি তাই বললে, সেটাই হত সত্য। কারণ, হেক্টর প্রতি পাটের ফলন কম-বেশী একই রয়ে গেছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য কৃষিপণ্যের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেবীবাবুর বাণিজ্য-মন্ত্রি-পাটের দর এমন ভাবে

নামিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ১৯৭৪ সালে পাট চাষী এক কুইন্টাল পাটের পরিবর্তে এক কুইন্টাল ধানও ক্রয় করতে পারে না। আসাম বটম নৌষক পাটের পাইকারী দর কলকাতায় ১৯৭৪ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে ছিল কুইন্টাল প্রতি ১২১.৯৪ টাকা; মোটামুটি ভাবে ধরা বাক ১৩০ টাকা। ৭ জেলাসমূহের প্রাথমিক বাজারে চাষীরা কলকাতার পাইকারী দরের চাইতে সাধারণতঃ এক-তৃতীয়াংশ কম দর পেয়ে থাকে। প্রাথমিক বাজার ও কল-কাতার বাজারের দরের পার্থক্য সরকারীভাবে ধরা হয় ২০ শতাংশ। কৃষিপণ্য কমিশনের মুখ-অধিকর্তা পি. সি. বানসিজ ১৯৭০ সালের জুন মাসে লেখেন :

“কলকাতার পাটের দামের তুলনায় চাষীরা ২০ শতাংশ দাম কম পেয়ে থাকে। পাট ও চালের মূল্যায়নপাত হিসাবের সময় এই তথ্য মনে রাখা হয়েছে। ধানের ক্ষেত্রে অল্পদূর ছুট দেবার প্রয়োজন নাই, কেন না ধানের দর বলতে চাল উৎপাদক এলাকার দরই বোঝায়।”

কলকাতায় যে সময় পাট বিক্রয় হচ্ছিল ১৩০ টাকা কুইন্টাল দরে, পশ্চিমবঙ্গের কোন জায়গায় সে সময় চালের দর ২ টাকা কিলো কিংবা ২০০ টাকা কুইন্টালের নিচে ছিল না। বরং ছিল তার চাইতে অনেক বেশী। বান-সিজের হিসেব অনুসারেও চাষীর জন্য পাটের দর ছিল ১৩০ টাকার ২০ শতাংশ অথবা ২৬ টাকা কম। অর্থাৎ, প্রাথমিক বাজারে তখন পাটের দর ছিল ১০৪ টাকা কুইন্টাল। চালের দর ২০০ টাকা কুইন্টাল ধরলে, ধানের দর হয় ১৩৩ টাকা কুইন্টাল অথবা পাটের দরের চাইতে কুইন্টাল প্রতি ২৯ টাকা বেশী।

পাট ও ধানের মূল্যায়নপাত সম্বন্ধে “১৯৪০-এর দশকের গোড়ার দিকের ধারণা”কে বস্তুতঃ এই ভাবেই ভারত সরকারের নীতিসমূহ দ্বারা “সেকেন্ডে” করে ফেলা হয়েছে। এই নীতিগুলিকেই অর্থমন্ত্রী যশোবন্তরায় বলবন্তরায় চ্যবনের সহযোগিতায় বাণিজ্যমন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহা উৎসাহে অহসরণ করে চলেছেন।

এই লেখকের কয়েকটি অর্থনৈতিক প্রবন্ধ ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর, প্রধান মন্ত্রীর তৎকালীন অর্থনৈতিক উপ-দেষ্টা এবং বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর সচিব পি. এন. ধর আলো-চনা প্রসঙ্গে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন : “আপনার কথা মত, পাটের দর যদি চাষীর পক্ষে এতখানি ক্ষতিকারকই হয়, তা হলে সে পাটের চাষ করে কেন?” আমার কাছেও এটা ছিল এক সমস্তার ব্যাপার। লেখক স্বীকারও করে-ছিলাম তাঁর কাছে।

এক শতাব্দী পূর্বে মাজাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষি দপ্তরের প্রধান ডব্লু. আর. রবার্টসনের বক্তব্যে বোধ হয় এর উত্তর পাওয়া যাবে। সে সময়েও সকলে বলত যে, চাষীরা তুলার যদলে ধাতুশস্ত্রের চাষ করলে লাভবান হতে পারে। তবুও তারা বিরাট পরিমাণ তুলার চাষ করে। চাষীদের তুলার চাষ উচ্চপদস্থ উক্ত ব্রিটিশ কর্মচারীকে হতবুদ্ধি করে দেয়। কোথাও সন্ত্রস্ত না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই এর কারণ অহসন্ধানের জন্য গ্রামে গ্রামে চাষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আমাদের বর্তমানের পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা অবশ্য গ্রামের চৌকিদার ও পাটোয়ারীদের প্রতিবেদনের উপরেই নির্ভর করে বলে থাকেন। যাই হোক, অহসন্ধানের পর তিনি লেখেন :

“আর্থিক দিক থেকে তুলা চাষ যদি এতই ক্ষতিকারক (শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

পাট চাষীদের লুণ্ঠন

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

হয়, তা হলে এমন ব্যাপকভাবে তুলার চাষ করা হয় কেন সে কথা আমি প্রশ্নই রাখতাম না। বরং জানতে চেয়েছি। সাধারণতঃ জবাব পেয়েছি যে, জমির খাজনা মেটাতে টাকা বোজগারের উদ্দেশ্যেই চাষীরা তুলার চাষ করে থাকে। আবার জিজ্ঞাসা করেছি, তুলা চাষের ক্ষতি যে ধরনের জমির প্রয়োজন, সেই ধরনের জমিতে খাজনা চাষ করলে আরো বেশী মূল্যের খাজনা পাওয়া যেতে পারে, সুতরাং তাঁরা খাজনার চাষ করে না কেন? জবাবে তারা বলেছে, অন্য কোন শস্যের চাষ না করে শুধুমাত্র খাজনার চাষ করলে, সরকারী-খাজনা দেবার ক্ষতি কোন নগর অর্থ তারা পাবে না; কারণ সে ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্যের সবটুকুই তারা খেয়ে ফেলবে। বর্তমানে তাদের তিন বারের বদলে দুই বার খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তুলা খাওয়া যায় না বলেই তুলা বিক্রয়ের টাকা দিয়ে চাষীরা সরকারী খাজনা মেটাতে পারেন।

পাট চাষের বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও অসহন্য হয়েছে। কলাকল হয়েছে মোটামুটি একই ধরনের। পাট উৎপাদক রাজ্যসমূহের গ্রামাঞ্চলে সমবায় প্রথা আদৌ গড়ে ওঠেনি, এবং ব্যাংক থেকে কড়িও মেলেনা। তাই চাষীদের আপন ইচ্ছামত চাষ করার স্বাধীনতাও নেই। চাষের সময় চাষীদের টাকার প্রয়োজন পড়ে সর্বাধিক। সুতরাং যে কোন শর্তে তাদের টাকা ধার করতে হয়। শস্ত কাটার পর উৎপন্ন শস্ত দিয়ে ঋণ শোধ দেবার শর্তে তারা দানদান দিয়ে থাকে। পাট ব্যবসায়ীদের টাকার অভাব নেই। তারা গ্রামাঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের শাখা-প্রশাখা। দানদানের দলিল এমন ভাবে রচিত হয় যে, মহাজনদের নির্দেশমত চাষ না করলে এবং আগল ও অতি উচ্চহারে হুদসহ ঋণের টাকার পরিবর্তে উৎপন্ন শস্যের চুক্তিমত অংশ প্রদান না করলে চাষী তার জমিজমাই খেয়েবে। আরো কারণ হয়ত রয়েছে। কিন্তু চাষীরা যে ধামের বদলে পাট চাষ করতে বাধ্য হয় তার প্রধান কারণ এই। অতীতে নীল চাষের ক্ষতিও ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা একই দানদান প্রথা প্রয়োগ করত।

চটকলের শ্রমিকদের চাইতে কাপড়ের কলের শ্রমিকদের বেতন বেশী। তুলা চাষীদের দ্বারা তুলার দরও ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেই সংগে বৃদ্ধি হয়েছে তুলা শিল্প মালিকদের অর্থ শিপাসা মেটাবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বিশ্বের বাজারে ভারতীয় স্থতীবস্ত্রের দর চড়ে যায় এবং ভারতীয় বস্ত্র বৈদেশিক বাজারে অচল হয়ে পড়ে। সেই সময়ে স্থতীবস্ত্র রপ্তানির উপরে কেবল প্রচুর পরিমাণে ভরতুকি দিতে শুরু করে। ভারতীয় স্থতীবস্ত্র যাতে পুনরায় বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে তার জন্য তুলার দর কম করা উচিত কিংবা বহুশিল্প শ্রমিকদের বেতন কম করা উচিত অথবা কাপড়ের কলের মালিকদের অর্থশিপাকে সংযত করা সরকার, এমন কথা সরকারের কেউই বলছেন না। স্থতীবস্ত্র রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কেবল অচল ভরতুকির ব্যবস্থা করেছে।

প্রধানতঃ মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের মিলগুলিই স্থতীবস্ত্র রপ্তানি করে থাকে। দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে এই দুটি রাজ্যে সম্পদ স্থানান্তরিত করার জন্য ভরতুকি একটি কৌশল মাত্র।

কৃষিপণ্য মূল্য কমিশনের প্রতিবেদন অনুসারে পর্যায়ক্রমে তিন বৎসর ধরে কাঁচা তুলার দর “হ্রাসিত” হয়। তারপর ১৯৭১-৭২ সালে প্রচুর তুলা উৎপাদন হওয়ার মূল্য হ্রাসের লক্ষণ দেখা যায়। সংগে সংগে চাষনের নেতৃত্বে অর্থ মন্ত্রক, ললিতনায়ারগ মিশ্রের নেতৃত্বে বাণিজ্য মন্ত্রক এবং তুলা লবিকে দেখা যায় তৎপর হয়ে উঠতে।

সংসদের তুলা লবি ভারত সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপিতে বিগত তিন বৎসরের সর্বোচ্চ মূল্য রেখায় তুলার দর বেঁধে দেবার দাবী করে। উক্ত স্মারকলিপির উপরে চাষনের অন্তর্ভুক্ত একটি মন্তব্যে অর্থ মন্ত্রকের অর্থ-বিষয়ক বিভাগ লেখে যে, তুলার দর মার খেয়েছে একথাটা ঠিক নয়। বস্তুতঃ সংশ্লিষ্ট সময়ে উচিত দরের চাইতে ক্যাণ্ডি প্রতি দর এখনও কয়েক শত টাকা বেশী। অর্থ-বিষয়ক বিভাগ আরো বলে যে, প্রকৃতপক্ষে বা ঘটক্রে তা হল, “অস্বাভাবিকরূপে উচ্চ মূল্য” থেকে তুলার দর “যুক্তিযুক্ত” রেখার স্থিতিশীল হচ্ছে। বিভাগটি উপস্থাপন করে যে, সরকারের শব্দে কোনরকম হস্তক্ষেপ না করে, আরো কিছুকাল তুলার বাজারকে এই ভাবেই চলতে দেওয়া উচিত। দর যদি খুব বেশী পড়ে যাবার-লক্ষণ দেখা যায়, তখন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই চলবে।

অর্থবিষয়ক বিভাগ একথাও নথিভুক্ত করে যে, কয়েকটি মাত্র রাজ্যে তুলা উৎপাদন হয়ে থাকে। সুতরাং অন্যান্য রাজ্যে পাট ইত্যাদি কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রেও আত্মপাতিক দর বাজার রাখার ক্ষমতা প্রবল না করে তুলার দর উচ্চরেখার বাজার রাখার ফল হবে তুলা উৎপাদক রাজ্যগুলিতে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্ত রাজ্যসমূহে মাথাপিছু আয়ের কমতি। মন্তব্যটির তাৎপৰ্য্য এই যে, এই ধরনের নীতি অন্যান্য রাজ্য থেকে তুলা উৎপাদক রাজ্যে সম্পদ প্রবাহিত করবে।

তুলা উৎপাদক রাজ্য মহারাষ্ট্রের সন্তান চাষন অর্থবিষয়ক বিভাগের উক্ত মন্তব্যের কোন যৌক্তিকতাও খুঁজে পাননি। তিনি তুলা চাষীদের স্ববিধার্থে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। বিভিন্ন রাজ্যে মাথাপিছু আয়ের উপরে বিভিন্ন রূপ কলাকল সত্ত্বেও তাঁর মন্তব্য ছিল, “যুক্তিটি বষ্টকল্পিত”।

(১) Economic Survey 1973-74 পৃষ্ঠা ৮৮-৮৯। ১৯৭০-এর ডিসেম্বরের পরে পাট ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য আরো চমকপ্রদ বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। ১৯৬১-৬২-কে ১০০ ধরে, ১৯৭৪ সালের আগস্টে পাইকারী মূল্যের হ্রাস ছিল নিম্নরূপ: তুলা—৩১৭ (বৃদ্ধি ২১৭ শতাংশ); চীনাবাদাম—৪৩২ (বৃদ্ধি ৩৩২ শতাংশ); ডাল—৫৩৩ (বৃদ্ধি ৪৩৩ শতাংশ); ভোজ্য তৈল—৪২০ (বৃদ্ধি ৩২৩ শতাংশ); চাল—৩০৯ (বৃদ্ধি ২০৯ শতাংশ); এবং গম—৮০ (বৃদ্ধি ২৮০ শতাংশ) অথচ পাটের হ্রাস ছিল মাত্র ১৪৪ (বৃদ্ধি ৪৪ শতাংশ)। (Reserve Bank of India Bulletin, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪, পৃ: ১৮২৪-২৫-এ প্রদত্ত পরিসংখ্যান)।

(২) ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসের চায়ের দর। Reserve Bank of India Bulletin, November 1973, “Index Numbers of Wholesale Prices in India (New Series)”

(৩) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Memorandum for the Sixth Finance Commission 1973 পৃষ্ঠা ১১

(৪) ভারত সরকারের Report of the Jute Enquiry Commission 1954 পৃষ্ঠা ৩০

(৫) ১৯৭৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে বাণিজ্য-মন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় রাজ্যসভায় এই তথ্য প্রকাশ করেন। Parliamentary Debates Rajya Sabha, Official Report, Part II, (সাইক্লোস্টাইলড) ডিসেম্বর ১২, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৫৫১

(৬) Parliamentary Debates Rajya Sabha, Official Report Part I (সাইক্লোস্টাইলড) নভেম্বর ২০, ১৯৭০ তারিখটিতে প্রদত্ত সংখ্যা ১৮১র উপর অভিব্যক্তি প্রদানের জবাব, ২৭ পৃষ্ঠা

১৯৭২ সালের ১০ই আগস্ট তারিখে চাষন লোকসভায় বলেন, তুলা চাষীদের “যুক্তিসঙ্গত দরের নিশ্চয়তা” প্রদান করা উচিত। তিনি আরো বলেন, “পণ্যমূল্য হ্রাসকে দেখা যায় মূল্য-হ্রাসকে নেমে এগেছে একমাত্র তুলার ক্ষেত্রে।” ১১ই মার্চ, ১৯৬১-৬২ সালকে ১০০ ধরলে, পাইকারী দরের হ্রাস ছিল তুলার ১৬৭ এবং পাটের ১৪০। বস্তুতঃ, সমস্ত পণ্যের মধ্যে সব চাইতে কম মূল্য বৃদ্ধি হয়েছিল পাটের ক্ষেত্রে।

তুলা চাষী তথা তাঁর নিজ রাজ্যসহ অন্যান্য তুলা উৎপাদক রাজ্যের সেবার আশ্রয়ে অর্থ হয়ে পাটের দরের কী হাল হল না হল সে খোঁজ নেবার কথা চাষনের খেয়ালই হয়নি। অথচ পাইকারী মূল্য হ্রাসকে সে সময় পাটের দর ছিল তুলার দর রেখার ২৭ পয়েন্ট নিচে। পাট চাষীদের ক্ষতি কেউ তাঁকে উদ্বেগ প্রকাশ করতে শোনে নি, এমন কি ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে বহন পাটের মূল্য হ্রাস ১২০-এ নেমে যায়, তখনও না। বাণিজ্যমন্ত্রকের সংগে সংযোগ করে অর্থমন্ত্রক যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তার ফলস্বরূপ ১৯৭২ সালের আগস্ট থেকে ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর—এই সময়ে মাসে তুলার দর বৃদ্ধি পায় ৭৭ শতাংশ।

১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেটে চাষন কাঁচা তুলার আয়দানের উপরে মূল্যায়নে ৪০ শতাংশ হ্রাস ধার্য করেন। ভারতীয় তুলার দরের উপরে এর প্রভাব অস্বস্তি হতে-এতটুকু সময়ও লাগে নি। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাস অবধি অর্থাৎ বারো বৎসরে পাইকারী দর (১৯৬১-৬২-১০০) ৬৪ পয়েন্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর অবধি, অর্থাৎ ২১ মাসে বৃদ্ধি পায় ১৩০ পয়েন্ট।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

(৭) ১৯৭৪ সালের, ১লা মে তারিখের কলকাতার The Statesman পত্রিকার দর সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন।

(৮) বোম্বাইয়ের বাণিজ্য সাপ্তাহিক Commerce-1৬ই জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১২১১

(৯) William Digdy, India for Indians—and for England, ১৮৮৫, পৃষ্ঠা ১০

(১০) এই অর্জুনের পূর্ববর্তী তিনটি অর্জুনে উল্লিখিত তথ্যাদি অর্থমন্ত্রকের নথিপত্র থেকে গৃহীত।

(১১) Lok Sabha Debates Supplement (মিনিগ্রাফ) ১০ আগস্ট ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৫৩৭০

(১২) Government of India, Economic Survey 1973-74, পৃষ্ঠা ৮৮-৮৯। ১৯৭৩ সালের ২১শে আগস্ট তারিখে বেশ কয়েকজন কংগ্রেসী সংসদ সদস্য—অধিকাংশই পাট উৎপাদক রাজ্য সমূহের—প্রধান মন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে “পাট উৎপাদকের হুদসহ এবং পাট উৎপাদক রাজ্যগুলির সমস্যা” সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁকে “প্রাথমিক বাজারে পাটের একটি লাভজনক দর” ধার্য করতে অহরোধ জানান। পাট এবং তুলার ক্ষেত্রে সরকারী নীতিগত দৃষ্টির মূলগত পার্থক্য তাঁরা বিপদভাবে ব্যাখ্যা করেন। সরকার তাতে কর্পাত করে নি। মন্ত্রিসভা তথা আমলাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজেদের লোক না থাকলে কোন লবিং পক্ষেই কিছু করা সম্ভব নয়। পাট ও তুলার মূল্যের ব্যাপারে সরকারের নীতি একই রকমের হওয়া উচিত বলে যে তিনি মনে করেন, এমন কোন ধারণা যাতে না জন্মায় সে ক্ষতি দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সদা সচেষ্ট। এই বিষয়ে তিনি হলেন চাষনের ঠিক বিপরীত। সম্ভবত তিনি বুঝে নিয়েছেন পাট চাষীদের স্বার্থের কথা তুললে অন্যান্য মন্ত্রী, আমলাতন্ত্র এবং তুলার লবি তাঁর মন্ত্রিত্বের থাকাই অসম্ভব করে তুলবে।

মতামত : রুশ বিপ্লব

(৪র্থ পৃষ্ঠায় পর)

রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের সাক্ষর ফলে চিনিয়ার ছয় ভাগের এক ভাগে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হবার পর চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা পরিবর্তন ঘটে। এর আগে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল পুনরোদ্বোধনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্তর্ভুক্ত এবং পুনরোদ্বোধনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরই একটি অংশ। ঐ সময় থেকে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্রের রূপান্তর ঘটেছে, তা নতুন ধরনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আভ্যন্তরীণ চলে এসেছে। বিপ্লবী ক্রান্তি গঠনের দিক থেকে দেখলে তা তখন থেকে সর্বহারা শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন এমন হল? কারণ প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অক্টোবর বিপ্লব, চিনিয়ার ইতিহাসের গোটা ধারায় পরিবর্তন এনেছে এবং চিনিয়ার ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করেছে। '৬ পঞ্চদশাব্দ' আপনিতো আলিন রচনাবলী না পড়ে বিভ্রান্ত হননি, বলুনতো কেন চীন বিপ্লবের গোটা ধারায় পরিবর্তন হোল? কেন এই চীন বিপ্লবের নেতা, কয়েক মাস-সে-তুং বলেছেন "চিনিয়ার ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করেছে"। কেন তিনি আপনার মতো "বলশেভিক বিপ্লবের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কোন পথ নির্দেশ ছিল না" বলে মন্তব্য করলেন না যে ঐ বলশেভিক বিপ্লবে যেহেতু কোন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পথ নির্দেশ নেই, অতএব চীন বিপ্লবে ঐ বলশেভিক বিপ্লবের কোন অবদান নেই? ইতিহাস নিয়ে যখন বিজ্ঞের মতো চর্চা করতে বসেছেন তখন আপনি নিশ্চয়ই জানেন কমিউটারের ঐতিহাসিক সপ্তম কংগ্রেসে ডিমিত্রভ যে ভাষণ দিয়েছেন সেটা তখন কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর আমাদের ভারতবর্ষে সেই ভাষণের সঙ্গে অনেকে পরিচিত হয়েছেন। United front of the working class Against Fasism এই পুস্তকের দ্বারা। আশা করি আপনিও হয়েছেন। পরিচিত হন বা না হন আপনি একবার এই পুস্তকের নীচের অংশটি পাঠ করুন: "The experience of the October Revolution has demonstrated hantently that the basic content of the proletarian revolution is the question of the prole tariat dictatorship, which is called to crush the resistance of the over-

thrown exploiters, to arm the revolution for the straggle against imperialism and to lead the revolution to the complete victory of socialism". ৭ "পঞ্চদশাব্দ" এর পরও কি বলবেন যে, রুশ বিপ্লবে কোন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পথ নির্দেশ ছিল না? তা যদি বলেন তাহলে পঞ্চদশাব্দকে বলতে হবে ক্যানিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে প্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যের জন্য কোন কয়েক ডিমিত্রভ রুশ বিপ্লবের কুজিত্যের থেকে উদ্ধৃত্ত মূল্যায়ন করলেন? তিনি কি করে ক্যানিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য রুশ বিপ্লব থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পথ নির্দেশ খুঁজে পেলেন। সেটা কি এই জন্য যে, রুশ বিপ্লব কোন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পথ নির্দেশ ছিল না বলে? কি জবাব দেবেন আমাদের এই রুশ বিপ্লবের পণ্ডিত মহাশয়?

এবার দেখা যাক আলিন সম্পর্কে তিনি কি বলেছেন। আলিনের ভুল আধিকার করা ছাড়াও তিনি আলিনের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ এনেছেন এই বলে যে "আলিন তার রচনাবলীতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন তা কেবল মাও-সে-তুং-এর চিন্তাধারার ওপর খবরদারী করার জন্যই।" এইরকম তথ্য তিনি কোথায় পেয়েছেন? রণজিৎবাবুর কাছ থেকে। আর রণজিৎবাবুর কোথায় পেয়েছেন? রণজিৎবাবু পেয়েছেন ক্রুশ্চেনের কাছ থেকে। আর সেই তথ্যই জানার জন্য পঞ্চদশাব্দ আমাদের অগ্ররোধ করেছেন। কিন্তু হুংখের বিষয় পঞ্চদশাব্দ অগ্ররোধ রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের ব্যর্থ হতে হল।

কারণ রণজিৎবাবুর (২৬শে নভেম্বর ও ২৮শে ডিসেম্বর) ও পঞ্চদশাব্দ (১০ই ডিসেম্বর ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী) লেখাতে কোন মার্কসবাদী এইরূপ ধারণা হবেনা যে আলিন মাও-সে-তুং চিন্তাধারার উপর খবরদারী করেছেন। বরং মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যদি কেউ ঐ লেখাগুলি পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন পঞ্চদশাব্দ উদ্দেশ্যটা কি? তাঁদের ঐ লেখায় সবচেয়ে মূল বিষয়টা হলো আলিনকে হের করার এক জবজ্ব প্রচেষ্টা। এইজন্য আমি পঞ্চদশাব্দকে অগ্ররোধ করছি তিনি যাতে ডাঃ নরেশ চৌধুরীর "চীন ও আলিন প্রসঙ্গে" লেখাটি পড়েন। এই লেখা ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে দুর্গা

প্রকাশিত হয়েছিল।

এবার আলিনের ভুল সম্পর্কে পঞ্চদশাব্দ মন্তব্যটি আপনারা একটু দেখুন: "তিনি ভারতীয় এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবকে সরাসরি সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে এক করে বলেছেন, - 'against imperialism, into a proletarian revolution'. পাঠকগণ, আমার পূর্বের লেখায় আমি আলিনের যে উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম পঞ্চদশাব্দ সেই উদ্ধৃতির আংশিকটাই এখানে উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, এই উদ্ধৃতিটি আমি দিয়েছিলাম আলিন রচনাবলীর ৬ষ্ঠ খণ্ডের "লেনিনবাদের ভিত্তি" নামক প্রবন্ধ থেকে। আর এই "লেনিনবাদের ভিত্তি" যেহেতু বিপ্লবের অনেক পরে লেখা সেইজন্য আলিন যাই বলুন না কেন পঞ্চদশাব্দ তাতে কিছু যায় আসে না।" পাঠকগণ, আমি পূর্বের মতো এবারও আলিনের সেই একই উদ্ধৃতি দেব। তবে পঞ্চদশাব্দ আলিনের ভুল ধরেছেন বলে যে দাবী করেছেন সেটা-যে আদৌ আলিনের ভুল নয় বরং পঞ্চদশাব্দ বুদ্ধির অপরিপক্বতাই পরিচয় এটা বোঝানোর জন্য আমি পঞ্চদশাব্দকে বলব যে আপনি "বাগ্যটাকে ঐ রকমভাবে না পড়ে এইভাবে পড়ুন: "whoever wanted to strike a Tsarism necessarily raised his hand against imperialism, whoever rose against Tsarism had to "Thus the revolution against imperialism, into a proletarian revolution."

এইবার পঞ্চদশাব্দ বলুন তো আলিন কি বলেছেন? এখানে আলিন কি বলেন নি যে, আরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে হবে? তিনি বলেননি যে আরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ করতে হবে? এছাড়া আলিন আর কি বলেছেন পঞ্চদশাব্দ? আলিন কি পরিষ্কারভাবে বলেন নি যে এইভাবে আরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব পরিণত হয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবে প্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবে। এই "পরিণত হয়" কথাটার মানে কি? আর বলুন তো পঞ্চদশাব্দ সাম্রাজ্যবাদী যুগে পৃথিবীর ছয়ভাগের একভাগে কি করে সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে উৎখাত করে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? নাকি, এই সাম্রাজ্যবাদ নতুন নয়।

প্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব সব সময়



'বাবুশশাই' দুর্বল ছবি

ভানুসিংহ

ছবিটি একটা 'পিরিয়ড পীস' হতে পারত কিন্তু তা হয়নি। হয়নি তার কারণ চিত্র নির্মাতার সেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্যই ছিল না। সেই উনবিংশ শতাব্দীর বাবুসংস্কৃতির যে রূপেখা একটা বিশেষ কালের চরিত্রকে ধরে রেখে তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে এক অর্ধ-পূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এবং সামন্ততন্ত্রের অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে এদেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছিল, তার বিন্দুযাত্র পরিচয়ও ছবিটিতে নেই। অথচ ছবির নাম 'বাবুশশাই' এবং ছবির ঘটনাকালও বাবুশ্রেণীর উনবিংশ শতক এবং সেই জন্যই বলতে হয় ছবিটি নামে ও ভঙ্গীতে যে প্রত্যাশা নিয়ে হাঙ্গির হয়েছিল, তা পূর্ণ করতে না পেরে, নিতান্ত বৈশিষ্ট্য বর্জিত এক দুর্বল চিত্র হিসেবেই গণ্য হল।

বিমল মিজের 'নবর সংকীর্তন'

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আর রাশিয়ার সেই প্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের থেকে ধাওয়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পথ নির্দেশ পাননা, তাঁরা সব সময় চেষ্টা করেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবকে নাকচ করতে। এই সময় পণ্ডিতম্যান্য ব্যক্তির সব সময় চেষ্টা করেন প্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক বিপ্লবকে—যে বিপ্লব চিনিয়ার ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করেছে তাকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নয় প্রমাণ করতে। আর পঞ্চদশাব্দ হলেন সেই পণ্ডিতগোষ্ঠীর বোধ হয় অভ্যস্ত নতুন সদস্য। তাই পঞ্চদশাব্দ কাছে আমার অগ্ররোধ, যে তিনি যেন তাঁর পূর্বসূরীদের পরিণতি ভেবে যেন। —সত্যেন বসু

V. I Lenin 'Selected Works' vol. 2. Progress Publishers, 1967 Page 14

2 ঐ, Page 14 15.

3 ঐ Page 32

৪ বাও. সে. ভুং 'নির্বাচিত রচনাবলী' ২য় খণ্ড। পৃ: ৩৩০, নব-ভাষ্য প্রকাশন।

৫ ঐ; পৃ: ৩৫০

৬ ঐ; পৃ: ৪৩৪

৭ Georgi Dimitrov: 'United front of the working class Against Fasism; Culture Publishers. 1968. Page 89.

অবলম্বনে সলিল দত্ত ছবিটি পরিচালনা করেছেন। চিত্রনাট্য রচনাও তাঁর। কিন্তু কি বিশ্ববর্ষ অক্ষমতার পরিচয়ই না তিনি দিয়েছেন। ছবিটির মধ্যে একটি চরিত্রও বিশ্বাস হতে উঠতে পারেনি। দর্শকের মনোভূমিতে চরিত্রগুলির মিছিল যদি শ্রেফ পুতুলের সারি হয়ে দেখা দেয়, কোন যুক্তি বাস্তববোধ বা বিশ্বাসময়তার কোন প্রতিষ্ঠা না পায়, তবে তা দর্শকগ্ৰাহ্য হয়ে উঠতে পারে না। শিল্প চেতনার কথা তো ছেড়েই দিলাম।

ছবিটি দেখে এমন ধারণার জন্ম হয় যে, সে যুগের বাবুসংস্কার সাধারণতঃ চরিত্রবান ও সুবিবেচক। কখনও ভুল করে পদস্থান হলে, অহু-শোচনার আর অন্ত থাকে না। তখন ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তুষের আন্তনে জলে পুড়ে মরতে হয়। অতঃ ছবির 'স্বর্ণ সেন' চরিত্রটি দেখে সেই ধারণাই হয়। কিন্তু এদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস তেমন কথা বলে না। 'বাবুশশাই' চরিত্রটিও সে যুগের প্রতিনিধিত্ব করেনা। ছবির বাবুশশাই হাবাগবা, নিতান্ত সরল ও অসম্ভব বোকা, বাবুয়ানির শব্দ আছে কিন্তু প্রচণ্ড কাপুরুষ—এক কথায় বেকদণ্ড-বিহীন। এমন চরিত্র সে যুগে ছিল না বলছি না। কিন্তু সেকালের তা 'সেনসিভেন' হয়ে উঠতে পারে না 'বাবুশশাই' নামসর্বস্ব হয়ে। এখানেই গোটা ছবির মারাত্মক রসহানি। ছবি দেখে মনে হয় সে যুগের বাবুরা ছিলেন ইদারাম, গোবেচারা—বাতের আসর বসাতেও সংকোচ আর লজ্জা। আর যাই হোক ব্যক্তিত্বহীন তাঁড় ছিলেন না সেকালের বাবুরা।

ছবিটি কি চরিত্রে আর কি আঙ্গিকে সেই বিশেষ কালটিকে চিনিয়ে দিতে পারেনি। কিছু পাজ-পাজীর পোশাক ও দৃশ্যসজ্জা কালো-সারী মনে হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একালের ছিঁ পপ্ট। এমন কি যে সংগীত সেই বিশেষ যুগের এক নিগ-নির্দেশকারী—সেখানেও দেখি চরম অবহেলা। কি কথার আর কি হুরে ছবির গান কোন তাৎপর্যই বহন করে আনে না। নাট্যের কথা না আনাই ভাল—কারণ শতকালানুক্রমিক বাংলা ছবিতে যে দুর্বল নাট্যের দৃশ্য থাকে—এখানেও তাই। ক্যামেরাম্যান বিজয় ঘোষের কিছু নিষ্ঠার অভাব ছিল না। কয়েকটি ক্ষেত্রে দৃশ্যগ্রহণ সত্যিই ভাল।

৪৬টি কেলেঙ্কারী

বোম্বাই থেকে নিজস্বী জনতা পার্টির প্রার্থী ডঃ স্বরূপনিয়ম বামী সাংবাদিকদের বলেছেন যে, অন্ততঃ ৪৬টি কেলেকারী ঘটনা আছে এবং এর প্রায় প্রত্যেকটিতে সত্তর গাছী জড়িত। তিনি আরো বলেন প্রয়োজন হলে পাইপার বিমান, বিদেশে টাকা জমানো বা বোম্বাই কেলেকারীর সমস্ত ব্যাপারেই ভদ্র হবেন।

ডঃ বামী বলেছেন, কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে বখেই সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে এবং তাদের নাম তিনি জানাবেন।

তিনি আরও বলেন তিনি ২০ জন লোকের নাম জানাবেন যাদের উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিদের যোগসাজশে আমেরিকার পাঠানো হয়েছিল তাঁকে হত্যা করার জন্য কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন বলে তাদের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয়নি।

এ লোকদের নাকি রিসার্চ আণ্ড অ্যানালিসিস উইং (RAW) চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করেছিল।

পুলিশ মন্ত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যোগ। মন্ত্রী জয়নাথ আবেদিন, স্বরূপ মুখার্জীরও একই অভিযোগ।

সিদ্ধার্থবাবুকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিতে তরুণবাবু, স্বরূপবাবু জয়নাথ দাহেবরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এখন দেখা যাক, এ ব্যাপারে তরুণবাবু দলত্যাগ করেন কিনা।

তার পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসীদের খেয়েখেনি এখন পুরোদেশে শুরু হয়ে গেছে। পারম্পরিক দোষারোপের পালায়, সকলেই পলা মেলাচ্ছেন। নির্বাচনে কোন কোন কেসে যে রিগিং হয়েছে এটা কংগ্রেসীরা স্বীকার করেছেন। কেউ কেউ খোয়া ভুলনীপাতা সাজছেন। তরুণবাবুর সাম্প্রতিক বিরুদ্ধিতাকে অনেকে সেইভাবে ব্যাখ্যা করছেন। তবে তাঁর বিরুদ্ধিতা এবং সিদ্ধার্থ বাবুর নিষ্পেষিত কংগ্রেস দলের আভ্যন্তরীণ চেহাযাকে স্টেট করেছে। এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে এই দল কতকগুলো ধাত্যবাজ লোকের সমাবেশ মাত্র।



দিল্লীর রাজপথে ইন্দিরার ছবি দেওয়া নির্বাচনী পোষ্টার। [দিল্লী স্টেটসম্যানের শোভাযাত্রা]

ইন্দিরার পতন ও সরকারী প্রচার মাধ্যম

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বাধীন ভারতে তিনটি দশকের শেষ। একটানা কংগ্রেসী শাসনের অবসান। প্রায় একনাগাড়ে একটি পরিবারের আধিপত্য, শেষদশকে যেটা ক্ষমতাসম্বল অপশাসনের রূপ নিয়েছিল, তার সমাপ্তি রচিত হল ১৯৭৭-র সাধারণ নির্বাচনে। এই রাজত্বের শেষ কুড়ি-একশ মাস অত্যাচার, অন্যায়, মিথ্যাচারের এক অভূতপূর্ব পর্ব। প্রধানমন্ত্রীর ঐশ্বর্যতন্ত্র, তাঁর মন্তান পুত্র ও স্ত্রীস্বতন্ত্রের দৌরাত্ম্য গণতন্ত্রের নামে একনায়েকতন্ত্র, বংশাধিকারিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, নাগরিক অধিকার ও সংবাদপত্রের বাধীনতা হরণ এবং সরকারী প্রচার মাধ্যমে গোয়েলসদস্য বীভিভে একটা নারকীয় মিথ্যার বেগতি—এই হল সংক্ষেপে জরুরীকাসীন অবস্থার পরিচয়, বাধীন ভারতের সবচেয়ে কলঙ্কিত অধ্যায়।

অন্যতঃ রায়ে এখন দিল্লীতে নতুন সরকার। ইন্দিরা সরকার শুধু নয়, বরং মহান নেত্রী ধুলার লুপ্তিত। জনতার জোয়ারে ভেসে গেল তার সাধের আসন। একটানা ত্রিশ বছর কংগ্রেসী শাসনের পর দেশে এখন পালাবদলের সূচনা: সরকারী দপ্তরে এখন খোল-নলচে বদলের পালা। সরকারী নীতি পদ্ধতির পরিবর্তনের ছায়া সব দপ্তরে আভ্যন্তরীণভাবেই পড়বে। তবে ব্যাঙাটা সবচেয়ে বেশি পড়বে বোর হয় প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরে আর তথ্য ও বেতার মন্ত্রকে। ইন্দিরা গান্ধী সারা দেশে যে জনীতি, মিথ্যাচার ও অত্যাচারের রাজত্ব কায়েম

করেছিলেন, তাতে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছে এই দপ্তরগুলি। অন্যায়সে কল্পনা করা যায় ইন্দিরা গান্ধীর সাধের সচিবালয়, রিসার্চ আণ্ড অ্যানালিসি-ক্যাল উইংয়ে, বেজরী গোয়েলা দপ্তরে আর তথ্য ও বেতার মন্ত্রকে, আর তার অন্তর্গত অফিসগুলিতে কাগজপত্র অপ-সারণের চেষ্টা হয়েছে। হয়তো বা কত দলিল আদেশ ইতিমধ্যে আগুনে ছাই হয়ে গেছে।

শুধু পালাবদল নয়, সরকারী প্রচার মাধ্যমের অবস্থাটা সত্যি মর্মান্তিক। গত ত্রিশ বছর ধরে এক ধাঁচে এসব মাধ্যম পরিচালিত হয়েছে। আবার ইন্দিরার রাজত্বের গত দশ এগারো বছরে সরকারী প্রচার মাধ্যমে যা কাজ হয়েছে তার অনেকটাই তো বাতিল। এই যে বিশদক্ষা পাঁচদফা নিয়ে প্রচারযন্ত্রের সর্বাঙ্গিক অভিযান তার সবটাই তো এখন ইতি-হাসেব আন্তর্জুড়ে। অনেক কিছু অবশ্য বিলিবটন হয়ে গেছে, কিন্তু যা হয়ে গেছে যা সঞ্চিত দিল ভবিষ্যতের জন্য, তার সত্যি তো আগুনে। এতোকাল ধরে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে বা তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে নতুন জমানায় বলতে পারে এমন সামগ্রী অবশ্যই কিছু রয়েছে, তবে তার পরিমাণ তো নেহাৎ নগণ্য।

তথ্য ও বেতার

তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের কয়েকটি দপ্তর প্রসঙ্গে একটু বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে। ধরা যাক, কিয়দ

ভিত্তিসনের কথা। বতরু জানি, তথ্য-চিত্র ও নিউজরীল তৈরীর ক্ষেত্রে সংখ্যার দিক থেকে বিধে এর একটা অগ্রগণ্য স্থান রয়েছে। গত এক দশকে এই দপ্তরে তৈরি নিউজরীল ও ডকুমেন্টারীর অন্তত নব্বই শতাংশ ইন্দিরা সরকারের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের ভাবমূর্তি রচনার উদ্দেশ্যে তৈরি। কিছু আবার হয়েছে এতোকালের বিরোধী দলগুলিকে বিরোধী নেতাদের জন-বিরোধী, প্রায় 'দেশদ্রোহী' রূপে চিত্রিত করার জন্য তৈরি। শেষ দিকের কিছু আবার বংশাধিকারিক রাজত্ব কায়েমের চেষ্টার সঙ্কল্পের ভাব-মূর্তি রচনার উদ্দেশ্যে। এদিকে শ্রীমতী ইন্দিরা গত দু'বছরে ব্যাকুণীত করলেন, মনে হয় শিতা অওহলালেরও তাতে সর্বনাশ হয়ে গেছে। নেহেরু-কেব্রিক ছবিও হয়তো অনেককাল দেশবাসী প্রত্যাখ্যান করবেন। শুধু সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক, শিক্ষামূলক ও জীবনীমূলক কিছু চলচ্চিত্র নতুন যুগেও গ্রহণযোগ্য হবে। ফলতঃ যিগ্মণ ভিত্তিসনের তৈরী কিয়দ ঠেকের এতটা বড় অংশ অকেজো হয়ে গেলো।

ধরুন, ডি. এ. ভি. পি, পাবলিশ-কেশন ভিত্তিসনের কথা। এদের অসংখ্য বই, প্রচার পুস্তিকা, প্যানফ্লেট ইত্যাদি এখন ওজনদরে বিক্রী করতে হবে ঠোঙার বাজারে। ডি. এ. ভি. পি-র এমন কোনো বিজ্ঞাপন বা এক্সজিবি-শন সেট নেই যেটা কংগ্রেসী সরকারের 'কীর্তি' কিংবা ইন্দিরা গান্ধীর

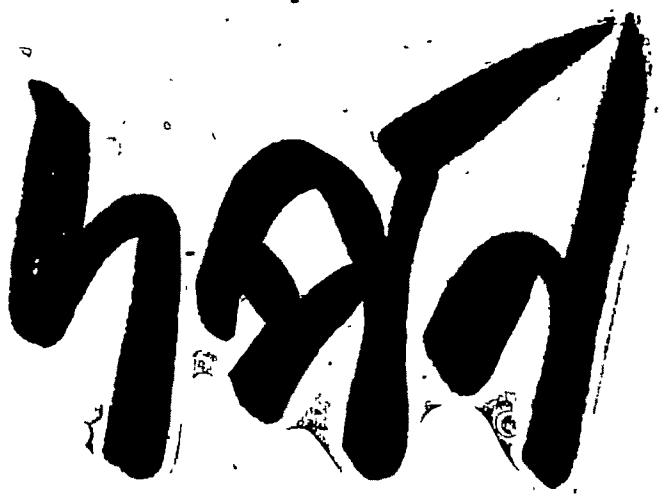
'মহান' নেতৃত্ব প্রচারের অত্র নয়। ডি. এ. ভি. পি-র ভাঙার সত্যি শূন্য হয়ে গেল। পাবলিকেশন ভিত্তিসনের ততোটা বিপদ হবে না, কেননা কংগ্রেস ও ইন্দিরার প্রচার পুস্তিকার বাইরে অল্প নানা বিষয়ের বেশ কিছু বই-পত্র এই দপ্তর থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

সবশেষে আসি অল ইন্ডিয়া রেডিও ও টেলিভিশনের কথা। বড় করণ পরিদপ্তর মধ্যে আজ এই দুটি দপ্তর। সারা দেশে দুটি বেজরী দপ্তর সবচেয়ে আলোচিত ও নিষিদ্ধ; সে দুটি হল আকাশবাণী ও দূরদর্শন। শুধু জরুরীকাসীন অবস্থায় নয়, আকাশবাণীর অল ইন্দিরা রেডিও না বহুদিন ধরে লোকমুখে চলে। আজকের ক্ষমতাসীন জনতা পার্টি ও কংগ্রেস কর ডেমোক্রাসি ও এদের সমর্থক সি. পি. আই. এম ও অন্যান্য বামপন্থী নেতৃবর্গ, দেশের বুদ্ধিজীবীগণ, সাধারণ মানুষ অনেক বছর ধরে আকাশবাণীর ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে আসছেন। এর উপযুক্ত দোষার হয়েছে নতুন মাধ্যম দূরদর্শন। এই দুইয়ে মিলে এতোকাল কংগ্রেসের প্রচার যন্ত্র হিসাবে মিথ্যা প্রচারে, অকংগ্রেসী নেতৃবর্গ ও দলগুলি সম্পর্কে অপপ্রচারে কিংবা এদের সংবাদ বিকৃত বা স্তব্ধ করে জ্ঞানজনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আকাশবাণীর অনেক বিশদক্ষা পরিবার পরিকল্পনার গান, নাটক, গিটার ইত্যাদি আর কোনোদিনই বাজবেনা। কথিকা, সঙ্গীত ধরণের অর্ন্তষ্ঠানগুলির বিষয়বস্তু নিয়েও তো গোলযোগ দেখা দেবে। নির্বাচনে তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের সত্তর-তাবক দুই মন্ত্রী ধরাশায়ী হয়েছেন বটে, কিন্তু এই দপ্তরের, ওর অধীনস্থ বিভিন্ন বিভাগের অনেক তাবড় তাবড় অফিসার কর্মচারী শুধু কংগ্রেসের দালালী করে গেল, যে সব কর্মী চাকরীর অতিরিক্ত চামচাগিরিতে অত্যন্ত পদোন্নতির আশায় ক্রীতদাসে পরিণত তাদের তো এখন শিষ্ট সংজ্ঞা। আকাশবাণীর সংবাদ ও কথিকা জাতীয় লেবায় আয়ুল পরিবর্তন অবশ্যস্বাভাবী। কিন্তু এতোকালের অজ্ঞায়ের যারা নায়ক ও তল্লাবাহক তাদের বিষয় আর কিছু না হোক অল্পত তদন্ত করে ন্যূনতম শাস্তির ব্যবস্থা নতুন সরকার করবেন আশা করি। সংবাদ পরিবেশনের নামে শঠতা, নির্বাচনের সময়ে নিরপেক্ষতার বদলে শুধু ইন্দিরা গান্ধীর ব্যাপক বাণী প্রচার, এমন কী তাঁর পরাজয়ের খবর যারা শেষমুহুর্তেও প্রোতার কান এড়িয়ে যাবার মতো করে ঘোষণা করেছেন, তাদের আচরণ সত্যিই বিষয়কর।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২০১ আচার্য প্রমুদচন্দ্র বোড কলিকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৩১ মট লেন কলিকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত।

স্পীকারের সরকারী গাড়ি প্রতারণার কাজে ব্যবহারের অভিযোগ



জরুরী অবস্থায় একশ্রেণীর রাজ-নৈতিক নেতা ও সমাজবিরোধীরা যে সামরাজ্য স্বরূপ হয় তাতে স্পীকার অপূর্বলাল মজুমদারের সরকারী গাড়ী প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে একটা পুলিশী মামলাও হয়। কিন্তু রহস্যজনক কারণে তা ধামাচাপা পড়তে যাচ্ছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, স্পীকার অপূর্বলাল মজুমদারের সরকারী গাড়ী প্রায় সবসময়েই চড়ে থাকে। এই গাড়ী নিয়েই সে জরুরী অবস্থার সময় একদিন হাওড়ার এন রোডের মাছুগাঁ আশ্রম কোম্পানীতে যায়। এই কোম্পানীতে যাবার আগে রাস্তায় একটি ট্যাক্সিতে বসে থাকে কিছু লোকের সংগে নূপেন কথা বলে যায়। নূপেনের সরকারী গাড়ীটি বেরিয়ে আসার পরেই এ ট্যাক্সিটি করে একজন পোশাকধারী পুলিশ সমেত ছ সাত জন কাংখানায় প্রবেশ করে। এরা নিজেদের গোয়েন্দা দপ্তরের লোক বলে পরিচয় দেয় এবং বলে কারখানার ভেতরে রাধা লোহার মালপত্র সবই চোরাই। এরপর খরচা করতে হবে। অবত্যা বেডিক দেখে কারখানার মালিকের ছেলে পরমাশ্রিত নূপেনের কাছে ছুটে যায়। নূপেন তখন স্পীকারের বাড়িতে বসে রয়েছে। মালিকের ছেলের সংগে নূপেনের বিস্তারিত কথাবার্তাও হয়। ঘির হয়, বারী পুলিশের লোক হিসেবে এসেছে তাদের গাত হাজার টাকা দিয়ে দিতে হবে। মালিক এতে বিপন্ন বোধ করেন। শেষমেশ স্বকা হয় চারহাজার টাকা।

বিধান সভার অবমাননা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের সিদ্ধার্থ সরকারের আমলে সংসদীয় গণতন্ত্র কীভাবে পদলিত হচ্ছে তার একটি নমুনা সম্প্রতি পাওয়া গেল। বিধানসভায় রায়ও বে অস্ত্রকে প্রস্তর দিতে সাহস করেন নি সেকাজ করেছেন রায় মন্ত্রিসভা।

সম্প্রতি প্রদেশ কংগ্রেসের একটি সভা বিধান সভা ভবনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। বিধানসভা ভবনকে কোন একটি দলকে ব্যবহার করতে দিয়ে বিধান সভার স্পীকার বিধানসভা তথা সংসদীয় গণতন্ত্রের অবমাননার কাজে সাহায্য করেছেন বলে নানা মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে। আমাদের ধরে নিতে হবে, বিধানসভার স্পীকার অপূর্ব মজুমদার এইসভা অনুষ্ঠানের কথা জানতেন না, কারণ স্নেনে শুনে তিনি কী করে বিধানসভা ভবনের পরিভ্রমণে মগ্ন করতে দেবেন? অভিযোগে প্রকাশ, সংশ্লিষ্ট কংগ্রেসী সভার সরকারী পরসায় চাইতাদি সরবরাহ করা হয়েছে। অনেক অপদার্থতা ও অপকর্মের নায়ক সিদ্ধার্থশংকর রায় এই অসুত নজীর স্থাপন করেছেন।

বিধানসভা ভবনে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সভা হলে কোন প্রশ্ন ছিল না কিন্তু আলোচ্যসভাটি কংগ্রেস দলের নিজস্ব রাজনৈতিক বৈঠক। এ ভাবে জনসাধারণের সম্পত্তি ব্যবহারের নজীর আমাদের জানা নেই। সিদ্ধার্থশংকর রায় আইনজ্ঞ হয়ে এই বৈঠকটিকে কান্ডটি করতে দ্বিধা করেন নি কী পরামর্শের প্রাণিতে বেসামাল হয়ে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেবেন বলে আমরা মনে করি।

বিংশ বর্ষ ॥ ১০ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১লা এপ্রিল '৭৭ ॥ ৪০ পঃ

কংগ্রেসে প্রচণ্ড সঙ্কট

সিদ্ধার্থ রায়ের সি পি এম আতঙ্ক

॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥

লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি হওয়াতে দিল্লী কলকাতায় গোষ্ঠী সভাই, প্রপঞ্চী, পারস্পরিক দোষারোপ, স্ববিধাবাদ এখন চরমে উঠেছে। ফলে কংগ্রেস দলে এখন প্রচণ্ড সঙ্কট। এই অবস্থায় এই দল আবার দু টুকরো হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কেন না কেন্দ্রীয় সংগঠনে ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ বিচ্ছিন্ন যেমন তীব্র বিদ্বেষ, তেমনি এই রাজ্যে সিদ্ধার্থ রায়ের বিচ্ছিন্নও পরিবর্তনপন্থীর সম্মুখ হয়ে উঠেছে। তাঁর দৃঢ় হিসাবে রাজ্য বিধানসভার স্পীকার অপূর্বলাল মজুমদারের দিল্লী গমন এবং জগজীবন রায়ের সঙ্গে দেখা করার খবর কীস হয় যে মাঝখানে এদের তৎপরতা বেড়েছে। সিদ্ধার্থ রায় বতই অস্বীকার করেন, শুধু অপূর্বলাল নন, তাঁর দৃঢ় হিসেবে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রদীপ ভট্টাচার্য ও জগজীবন রায়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন।

লোকসভা নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর সিদ্ধার্থ রায় সি পি এম জুড়ুর ভয়ে প্রচণ্ড ভীত হয়ে পড়েছেন। ১৯৭০-৭১ সাল এবং ১৯৭২ সালে সিদ্ধার্থ সরকারের আমলে নকশাল নামধারী গুণ্ডারা, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পুলিশবাহিনী (শেষাংশ চম পৃষ্ঠায়)

কলকাতায় আবার বামপন্থী মিছিল

(দর্পণের প্রতিনিধি)

দীর্ঘকাল বাদে গত সোমবার "মিছিল নগরী" কলকাতা বামপন্থী যুব ছাত্রদের শ্রোগান শুনে আশঙ্ক হলে, এই শহরে কংগ্রেসী মস্তানদের রাজত্ব চিহ্নস্বরূপ হয়নি। সেদিন মিছিল ছিল শান্তিপূর্ণ এবং শৃঙ্খলার সঙ্গে পথ-পরিভ্রমণ শেষ করেছে। ছাত্র যুবরা মিলিত কণ্ঠে দাবি জুড়েছে, "রায় মন্ত্রিসভার পদত্যাগ চাই", "সমস্ত রাজ-বন্দীদের মুক্তি চাই।"

এই মিছিল শহীদ মিনারের পাদদেশ থেকে বেরিয়ে ধর্মতলা স্ট্রীট ধরে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়েছে। মিছিল যত এগিয়েছে পথচারী মানুষের অংশ-এরূপে মিছিল তত দীর্ঘ হয়েছে। সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের দাবি উঠেছে।

তিনটের পর থেকেই কলকাতার ও শহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মিছিল আসতে থাকে। শহীদ মিনার ময়দানের পাদদেশে অস্থিত একটি সভায় পৌরোহিত্য করেন গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সভাপতি দীনেশ মজুমদার। এই কেন্দ্রীয় মিছিলের ডাক দেয় গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন বিপ্লবী যুব সংস্থা, যুব লীগ, সমাজবাদী যুব জনসভা, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন বিপ্লবী ছাত্র সংস্থা, ছাত্র ব্লক ও সমাজবাদী ছাত্র সংস্থা।

জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করে নেওয়া হলেও ছাত্রনেতা প্রভাত চট্টোপাধ্যায় সহ ২১ জন সি পি আই (এম) কর্মী এখনও প্রেসিডেন্সী জেলে আটক আছেন। এই দলের কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষে প্রশান্ত শুব, লক্ষ্মী সেন প্রমুখ গত সোমবার রাাতের বরাষ্ট্র সচিবের সুদে সাক্ষাৎ করে তাঁকে এক স্বাক্ষরলিপি দেন।

প্রেসিডেন্সি জেলে ২১ জন সি পি এম কর্মী

সি পি আই (এম) নেতারা বলেন প্রেসিডেন্সী জেলে এমন অনেক বন্দী আছেন যাদের দু বছরেরও বেশি সময় আটক রাখা হয়েছে। তাঁরা এটগুদে বন্দীদের নামের একটি তালিকাও পেশ করেন। এই ২১ জনের নাম হল: খোকন রায়, সম্পৎ মিত্র, হালিয়াস মহম্মদ, মহম্মদ মুস্তাফা, স্বদেশ গুহ, প্রভাত চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ পাল, সুনীল সামন্ত, স্বপন মণ্ডল, গোপাল দত্ত, দীপু দে, সঞ্জয় দে, শীতল বসাক, মিহির বসু, কমল ধর, কমল মিত্র, স্বপন দে, পঞ্চানন গাঙ্গুলী, বিজয়দাসগুপ্ত, তপন দাস, স্বপন মণ্ডল।

এখনও মস্তানি চলছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নেতারা কর্মীদের মাথা ঠাণ্ডা রাখতে বলছেন। এবং নেতাদের কথা মাস্ত করে পাড়ায় পাড়ায় মারসবাদী কমিউনিষ্ট কর্মী সহ সমস্ত বামপন্থী দল ও জনতা পার্টির কর্মীগণ শান্তি রাখতে বলেন। কিন্তু কংগ্রেসী মস্তানরা বামপন্থী ও জনতা কর্মীদের এই ঠাণ্ডা থাকার ব্যাপারটাকে কাজে লাগাচ্ছে। অতীতে এই সব মস্তানরা যে সয়াস, উজ্জানি, শাসানি, মারধোর ও বোমবাজী হত্যা করত, এখনো তা অব্যাহত আছে, বিশেষ করে বাদরপুর বেহালা, নেতাজী-নগর, বারাকপুং, শ্রীধামপুর, পাইকপাড়া দমদম প্রভৃতি অঞ্চলে এখনো এই সব ভয়াবহ প্রাণহানি চূড়ি, বিভ্রমবাত নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বামপন্থী কর্মীদের দামানি দিচ্ছে পুলিশ এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়। এ কল্পনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এক অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে। এই সব মস্তানরা যারা নিজেদের এন, এল, সি, সি, যুবকংগ্রেস বা ছাত্র পরিষদের নাম নিতে এবং নির্বাচনের দিন কংগ্রেসের ঝাণ্ডা উড়িয়ে সি পি এম ও জনতা পার্টির কর্মীদের উপর হামলা চাট্টিয়েছে তারা রাতারাতি নিজেদের জনতা পার্টির লোক বলতে শুরু করার বর্জমান কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে।

রাজ্যের জনতা পার্টির সভাপতি প্রফুল্লচন্দ্র সেন, গণতন্ত্রী কংগ্রেসের বিজয়সিংহ নাহার, সি পি এমের জ্যোতি বসু উপরোক্ত সমাজবিরোধীদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার হবার জন্ত বার বার আহ্বান জানাচ্ছেন। জনতা দলের নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন তাঁর কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, যাতে এই সব সমাজ-বিরোধীরা ভীড় কবিত না পারে।

এছাড়া রাজ্যে একটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জনতা-সি পি এম মোর্চার ফাটল ধরাবার জন্ত তৎপর এবং আনন্দবাজার মারফৎ আঘাতে গল্প ছেড়ে বাম-পন্থী-জনতা মৈত্রীতে ফাটল ধরাতে চাইছে। জানা গেল, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, ডক্টর প্রভাপচন্দ্র চন্দ্র, বিজয় সিং নাহার সি পি এম সহ বামপন্থী দলগুলোর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্ত নির্দেশ দিয়েছেন। অসুস্থ ভাবে সি পি এম নেতৃবৃন্দ তাঁদের সদস্ত ও অহুগামীদের বার বার তাই বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, উজ্জানিদাতারা মৈত্রীতে ফাটল সৃষ্টি করতে ব্যস্ত। আপনারা মাঝারি মণির মত জনতা বামপন্থী ঐক্য রক্ষা করুন, কারণ এই দুই দলের মৈত্রী ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ময়দানে, ইন্দিরা সরকারের কারাগারে।

সম্পাদক আক্রান্ত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

৩০ মার্চ রাত্রি ১১-৩০ নাগাদ দর্পণের সম্পাদক হীরেন বসু যখন ক্যানেল ওয়েস্ট রোড দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তখন কয়েকজন দ্রুতকারী তাকে ভোজালি নিয়ে আক্রমণ করে এবং তিনি বাধা দিতে গেলে তার পায়ে আঘাত করে। তারপর তার কাছ থেকে টাকা পরস্যা ছিনিয়ে নেয়। এব্যাপারে মানিকতলা থানায় ডায়রী করা হয়।

ইন্দিরা গান্ধির ক্ষমতারোহণের কল্পনা ও বাস্তবতা

নয়নতারা সেগল

[বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের কল্পা এবং ইন্দিরা গান্ধির পিতৃত্ব। বোন নয়ন-তারা সেগল একজন ঔপনাসিক এবং সাংবাদিক। ১৯৭৭ এর ১১ই মার্চ লন্ডন টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত তার নিবন্ধের বাংলা অনূবাদ নীচে দেওয়া হল]

২৬ জুন ১৯৭৫ তারিখে ইন্দিরা গান্ধি আপৎকাল ঘোষণা করে যখন হাজার হাজার নাগরিককে বিনা অভিযোগে এবং বিনাবিচারে আটক করে একটি পুলিশী রাষ্ট্র কায়ম করলেন তখন তার আচরণ একেবারে অভ্যবহিত ছিল না। গণতান্ত্রিক রীতি বা আচরণসকল রাজনীতিকের স্বজাগত নয়, এমন প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পর্যন্ত, এবং শ্রীমতী গান্ধি বিগত কয়েক বছর ধাবংই প্রমাণ দিয়ে আসছেন যে, একথা তার বেলায়ও থাকে। তার কার্যাবলী দুটি ঘটনাকে সত্যক ভাবে বিবর্তিত করেছে: অগ্রপ্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে তার কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে একটি বহুদলীয় সংস্থার রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ; এবং নির্বাচনী আইনের দুই দফা খেলাপের জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্ট তার ১৯৭১ সনের নির্বাচন বাতিল করে দিলে তার দলের লোকেরা নতুন নেতা নির্বাচনে উদ্যোগী হলে যখন তার পদত্যাগ ছাড়া গত্যন্তর থাকল না।

১৯৬৬ সনে তার দলের দ্বারা প্রধানমন্ত্রিত্ব আনুষ্ঠানিক মনোনয়নের পরে ১৯৬৯ সনে দলের স্বর্গোপার্জিত ভাঙ্গন থেকে তার জনপ্রিয়তা কমে যাওয়া পর্যন্ত তিনি এক বোড়ো পথ অতিক্রম করেছিলেন।

ভারতীয় সংবাদপত্রে ১৯৭১ সনে যাকে 'ইন্দিরা হাওয়া' নামে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ১৯৭৫ সনে বহুদলীয় জনতা ফ্রন্টের কাছে উপনির্বাচন-গুলিতে তার দলের পরাজয়ে যে কংগ্রেস বিরোধী তুফান দেখা গেছে এই দুইয়ের মধ্যবর্তী কালে এবং সর্বোপরি ঐ বছরের জুনে গুজরাতের রাজ্য নির্বাচনে তার দলের পরাজয়ের মধ্যে নিহিত

ছিল ব্যক্তিগত প্রভুত্বপরায়ণ ক্ষমতার অভ্যুদয় এবং উন্মুক্ত সমাজে এর দ্বারা যে পশ্চাৎ আঘাত সৃষ্টি হয়।

শ্রীমতী গান্ধি ঐ পশ্চাৎ আঘাতের মোকাবেলা করলেন সমস্ত গণ-তান্ত্রিক পদ্ধতির উপরে যবনিকা টেনে দিয়ে। মার্চ ১৯৭৬-এ ভাবী জাতীয় নির্বাচন এক বছরের জন্য স্থগিত হয়ে আবার এক বছর পিছিয়ে গেল। ঐ ঘোষণাকে অকস্মাৎ তার স্বভাবগত রাজনৈতিক রীতিতে পাগলটে দিয়ে ১৭ই জানুয়ারী তিনি জানানলেন যে, শেষ পর্যন্ত ঐ মার্চে নির্বাচন হবে।

তার বিবৃতি এবং রাজনৈতিক আচরণ উভয়েই তার নাটকীয়তা সুপরিচ্ছিন্ন। সম্প্রতি তিনি বলেছেন যে, তিনি শিক্ষালাভ করেছেন 'ভারতের জেলখানার' এবং 'ভারতের মার্চে ময়দানে'। স্বাধীনতা সংগ্রামে তার ত্যাগের কথা তিনি বহুবার বলেছেন। ১৯৬৯ সনে জনৈক সাক্ষাৎকারীকে তিনি বলেছিলেন যে, ব্রিটিশ সরকার তাকে এত ভয় পেতে যে, সাধারণ রাজবন্দীদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা না কি তাকে দিত না।

বারংবার কারাবরণের এবং সাধারণ ভারতবাসীর পাশাপাশি বেড়ে ওঠার দ্বিভিত্তিক দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারের এই দাবি যতটা কাল্পনিক ততটা বাস্তব নয়। 'ভারত ছাড়ো' নামে পরিচিত জাতীয় আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে সেপ্টেম্বর ১৯৪২ থেকে যে ১৯৪৩ মার্চ আট মাসের জন্য শ্রীমতী গান্ধি জীবনে মাত্র একবার জেলে গিয়েছিলেন। ১৯২০ এবং ৩০ এর দশকব্যাপী আইন অমান্ত আন্দোলনে তার কোন অংশ ছিল না। ১৯২০ সনে তিনি শিঙা এবং ১৯৩০ সনে ছাত্রী হিসাবে তিনি পিতামাতার সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণ করতে করতে অঙ্ককোর্ডে ঢুকে ছিলেন যদিও কখনো কোথাও কোন ডিগ্রি পাননি। ১৯৪২ সনে জেলে যাওয়ার ছ মাস আগে তার বিয়ে হয়েছিল ২৫ বছর

বয়সে। নৈনী সেন্ট্রাল জেলের যে ব্যারাকে তিনি আটক ছিলেন সেখানে তার পিসী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত পিসতুতো বোন চন্দ্রলেখা এবং আরো কিছু বন্ধুবান্ধব আটক ছিলেন।

জেলের অভিজ্ঞতার নিকে থেকে বলতে গেলে তখনকার ব্যবস্থাকে যুক্তিসঙ্গতই বলতে হয় অন্ততঃ শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তার 'রক্ত কারার দিনগুলি' (প্রীত্ন ডেজ)-তে এই সময়ের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে একথাই সমর্থিত হয়। নেহরু পরিবারের লোক বলে ইন্দিরা এবং তার পিসীর প্রতি ব্রিটিশ সরকার এবং জেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিবেচনা দেখাতেন। তাদের বই, চিঠিপত্র, ও ফলাদি পেতে দেওয়া হত এবং ঐ জেলেরই অল্প অংশে স্থিত তাদের স্বামীদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হত। স্বাস্থ্য ধারণা ছিল বলে ইন্দিরার নিয়মিত ভ্রমণ নেওয়া হত, তার শারীরিক অবস্থার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হত। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তার প্রকাশিত রোজনামচায় যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় ইন্দিরা এবং চন্দ্রলেখা তাদের কারাবাসের কঠোর লাঘব করার সাহস দেখিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধির ভায়ের সঙ্গে শ্রীমতী পণ্ডিতের বর্ণনার বিস্তার ফারাক। আরো অনেক পরে প্রধান মন্ত্রী হয়ে শ্রীমতী জনসভায় বলেন যে, বিরোধী দল, বিশেষত জনসংঘ তাকে হত্যা করতে চায়। ক্ষুদ্র জনসংঘ সদস্যরা পালা-মেটে এ বিষয়ে কৈফিরং দাবি করলে অবস্থা তাকে এ কথা প্রত্যাখ্যান করতে হয়।

শৈশব সৃষ্টি শ্রীমতী গান্ধির বর্ণনা অসুচ্ছল। যে স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা অবহরলাল নেহরু এবং তাঁর দ্বীর কাছে ছিল যখন এবং আলোকোজ্জ্বল, ইন্দিরার কাছে তা ছিল অন্ধকার এবং ভয়ংকর। তিনি বলেছেন যে, তার শৈশবের খেলা ছিল পুতুলদের সামনে জালায়গী বক্তৃতা, পুলিশের সঙ্গে কাল্পনিক মোকাবেলা এবং ১২ বছর থেকে সমাজ সেবার কাজ। অথচ ইন্দিরার পিতামাতা তাকে মাহুস করার জন্য যে কষ্ট এবং যত্ন করেছেন, কম স্নেহের একমাত্র সন্তানের ভাগ্যেই তা ঘটে থাকে। ১৮ বছর বয়সে তিনি দুঃখের আঘাত পান যখন তার মা মারা যান কিন্তু তার পরেও তার ভবিষ্যৎ জীবন পথকে হরণ করার মত পর্যাপ্ত সুবিধা এবং সুযোগ তিনি পেয়েছেন।

রাজনৈতিক জীবনে তার দাবিকে

ধরেই নেওয়া হয়েছে। নেহরু-ছহিতা রূপে তিনি কংগ্রেস দলের শীর্ষ মহলে প্রবেশ করলেন এবং এর জন্য তাকে কোন প্রযোজ্য প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হল না। ১৯৫০ দশকের মাঝামাঝি তিনি দলের কার্যকরী সমিতির সদস্য হলেন; ১৯৫৩ সনে হলেন কংগ্রেস সভাপতি; এবং সাত বছর বাদে হলেন প্রধান মন্ত্রী। তার প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল যত্ন এবং কংগ্রেসে প্রভাবশালী নেতাদের দ্বারা সাহায্যকৃত ও ঈর্ষিত। জাতীয় আন্দোলন কালে কংগ্রেস দল নারীর সুযোগের অল্পকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল এবং নারী জাতির কৃতিত্বের গর্ব অল্পভব করত। রোমাঞ্চক নেতৃত্বের অধিকারী নেহরুর কল্পা বিগুণ আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। নেতৃত্বাভিলাসিনী কোন নারী এর চেয়ে অল্পকূল এবং সহায়ক পরিবেশ পেয়েছে কিনা সন্দেহ। তিনি যখন দেশের কর্তব্য হলেন তখন এমন ভারতবাসী কম ছিলেন যিনি তার পরিবারের ত্যাগের কথা অগ্রণ করে অতিক্রম না হয়ে থাকতে পেরেছেন। যে পরিবার সারা দেশের স্বাধীনতাসম্প্রদায়ের প্রতীক, তার নন্দিনী যখন সর্বোচ্চ ক্ষমতার আসনে বসলেন তখন দেশের মানুষের কাছে তা যুক্তি-যুক্তই মনে হল। অথচ শ্রীমতী গান্ধির বিবৃতি পড়ে মনে হয় যে, এই উচ্চ আয়োজন করতে কত না প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে কত না শত্রু ঐ আসন থেকে নামিয়ে দেবার জন্য সর্বদা ভয়ংকর চেষ্টায় লিপ্ত।

শৈশবাস্থায় আত্মবিক হত এবং দেশাত্মবোধকে উদ্বুদ্ধ করত যদি তিনি নিজেকে শত্রু পরিবৃত জোয়ান অক আর্কের মত বিদেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নারীক রূপে কল্পনা করতেন। কিন্তু তার কল্পনার আবেশ শৈশবের সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়নি। রাজনৈতিক রূপে শ্রীমতী গান্ধি গণতান্ত্রিক সমাজ যে আইনসমূহ বিরোধী দল সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে শত্রু দেখতে থাকলেন এবং উন্মুক্ত, সংগতি ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মধ্যে যড়যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। ১৯৬৯ সনে মনে হল কংগ্রেসের যে শাসক চক্র তাকে প্রধানমন্ত্রীর গদীতে উন্নতি করেছে তারা যেন তাকে বাগ মানাতে না পেরে অস্ত্র কাউকে পদীতে বসাতে চায়। যে কোন সংসদীয় গণতন্ত্রেই প্রধান মন্ত্রীকে এই সমস্তার সম্মুখীন হতে হয়। তার পক্ষে অধিকাংশ সমর্থন আছে কি না তার জন্য দলে ভোট নিলেই হত। কিন্তু তিনি তা চাইলেন না কারণ

তার পরিণাম সন্দেহ অত্যন্ত সন্দেহান্বিত ছিলেন। কমিউনিষ্ট পার্টির সাহায্য এবং কায়দা রপ্ত করে তিনি তার প্রচারকে রাস্তার নামিয়ে আনলেন। এক আবেগপূর্ণ প্রচারের মাধ্যমে নেহরু পরিবারে অন্বেষিত দৌলতে (যিনি ভারতীয় জীবনের সব কিছু অসংগতিপূর্ণ জিনিসের বিরোধী তার এই ধারণাও অসংগতিপূর্ণ) নিজেই ভারতের স্বাভাবিক নেত্রী বলে ঘোষণা করে তিনি বললেন যে, তার বিরুদ্ধে দলের মধ্যে চক্রান্ত হচ্ছে। এই তিক্ত এবং হঠকারী কর্মপ্রণালী ভারতীয় রাজনীতির স্বাভাবিক গতি এবং বিকাশকে ব্যাহত করল।

এটাও রাজনীতি বটে, কিন্তু এ অত্যাধিক ধরনের। যে দেশে তার দুই পূর্বসূরীর দ্বারা সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি পুষ্ট হয়েছে এবং জীবনে এবং রাজনীতিতে একটি বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ধারা প্রবাহিত করার সর্বপ্রকারে চেষ্টা করা হয়েছে সেখানে শ্রীমতী গান্ধির আবেগপূর্ণ আবেদন ভারতবর্ষকে ২০০ বছর পিছিয়ে ব্যক্তিগত বংশাধিকারিক শাসনের যুগে নিয়ে গেল।

কিন্তু এই যুক্তির একটা আবেদন ছিল কারণ শ্রীমতী গান্ধি বললেন যে, তিনি কংগ্রেসকে গলদমুক্ত করে দেশে মৌলিক পরিবর্তন আনতে চান বা করতে গেলে তার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা দরকার। ১৯৭১ সনের নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি নতুন এক কংগ্রেসের নেত্রী হলেন। কিন্তু যে সব কংগ্রেসদ্বারা পুরনো নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিষ্ঠিত করল, ১৯৭২ সনে তারাই তার কৃতিত্বের বহর দেখে মোহমুগ্ধ হল। অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে অথচ সামান্য প্রস্তুতি নিয়ে যে শত্রু নীতি চালু করা হল তা এমন শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হল যে শত্রু সরবরাহ সম্ভব হল না। এই নীতির ফলে চাষীরা বিরুদ্ধে চলে গেল, খাতের জন্য ও ছাত্র বিদ্রোহ ও খাতের জন্য কিছু দেখা দিল। খাত শত্রু ব্যাণারে একচেটে ক্রেতা হওয়ার সরকারী প্রচেষ্টার নীতি দেউলে প্রমাণিত হল। বৃহৎ পুঁজির একাংশের সঙ্গে কংগ্রেসের নয়া আঁতাত একটা নৈতিক অবনতির পরিবেশ সৃষ্টি করল; তখন দলীয় স্বার্থে অর্থভাত্যর গড়ে তোলার পদ্ধতি এমন ভাবে অসুস্থ হল যার ফলে তার অনেক ঘনিষ্ঠ সহযোগী দলীয়তার দ্বারা অভিযুক্ত হল। দলীয় মধ্যে শ্রীমতী গান্ধির একমুখী ছক্কা প্রতিষ্ঠা, জনপ্রিয়তার ভিত্তিসম্পন্ন সহকর্মীদের মতামত সৃষ্টি তার ক্ষম-বর্ধমান অসহিষ্ণুতা এই ভয়ের সৃষ্টি করল যে তিনি প্রভুত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছেন। (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

কৃষ্ণকোষের যুদ্ধে পঞ্চপাতালের পিতৃস্বের দাবিদার দেবতাদেরও ছিল একটি বিশিষ্ট ভূমিকা। কুটনৈতিক নেতৃত্ব যেন আত্মনাক্ষত্রিক এক মহাশক্তির প্রভু বিতারেরই আকাঙ্ক্ষা।

দানিকেন তত্ত্বের আলোকে দেবতার স্বরূপ ব্যাখ্যা ও মহাভারতীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে দেবগণের উদ্দেশ্য বিচার করছেন

বীরেন্দ্র মিত্র

মহাভারতের স্বর্গ ও দেবতা

ধারাবাহিক রচনায়

সেই অভিনব বক্তব্য নিয়ে আগামী সংখ্যা থেকে দর্পণে প্রকাশিত হচ্ছে

আমরা কি অবস্থায় জেলে থাকি

বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়

[বিহারের একটি জেল থেকে প্রেরিত]

বাইরের জগতের কাছে জেল-খানা এক অজানা রহস্যজনক পৃথিবী যেখানে উঁচু দেয়াল, সত্য জগতের আলো প্রবেশের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। জেলখানার ভেতরের অবস্থা এখন কেমন? রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের মনোভাব কি? এই বন্দীরা বেঁচে আছেই বা কি করে?

আমরা বিচারার্থী বন্দী। আমাদের মধ্যে অনেককে ছয় দি লাভ বছর কোন আদালতে হাজির করা হয় নি। অজান্তেই আদালতে হাজির করা হয়েছে বটে, কিন্তু মামলা গ্রহণ করা হয়নি। অনেককে বহু দূর থেকে আদালতে আনা হয়। যেমন জ্যোতির্ময় রায়ের কথা ধরা যাক। তার মামলা হল ধানবাদে, কিন্তু ধানবাদ জেলার কারা-বর্জপক্ষ "নিরাপত্তার অভাবের" জন্য তাঁকে সেখানে রাখতে অস্বীকৃত। সেইজন্য তাঁকে হাজারিবাগ থেকে ধানবাদ এক দীর্ঘ কাতিকর পথ অতিক্রম করতে হয়।

আমাদের মধ্যে অনেকেই জানিনা আমাদের বিরুদ্ধে কতগুলো মামলা আছে বা সেগুলো কি ধরণের অথবা আদৌ কোন মামলা আছে কি না। বাইরে থেকে এ ব্যাপারে দেখবারও কেউ নেই। বাবলু রায়ের মামলা ধানবাদ কোর্টে, কিন্তু তাঁকে রাখা হয়েছে হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে। সে জানে না তার বিরুদ্ধে মামলাটা কি। আর একজন হল রজিত মুখার্জী যাকে ১৯৭১ সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে জেলের ভেতরে এক ঘটনায় তাঁকে প্রচণ্ড প্রহার করা হয় যাতে ১৬ জন বন্দীকে (সকলেই নকশালপন্থী যুবক)। পিটিয়ে বা ওলী করে মারা হয়।

জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের রাজনৈতিক বন্দী বলে মনে করে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করে সাধারণ করেদীর মত। যে মুহুর্তে আমরা জেলে প্রবেশ করি আমাদের ভাঙা-বেড়ী পরিচালনা দেওয়া হয়। ছয় লাভ বছর ধরে এই ব্যবস্থা চলছে। যেখানে আলাপ সেলে আমরা থাকি, উঁচু দেয়াল জেলকে ঘিরে আছে এবং বিহার মিলিটারী পুলিশ ও জেলখানার রক্ষী বাহিনী রাইফেল নিয়ে জেলের বাইরে সব সময় প্রহরারত সেখানে "নিরাপত্তার" অজুহাত হস্তকর। ১৯৭০-৭১ সালের পরে বিশেষ করে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যখন শাসক শ্রেণী জেল থেকে পালানোর ঘটনায় শত শত তরুণকে

হত্যা করেছে। প্রকৃতপক্ষে এটা হল "বাইনের" এবং বন্ধুকের নলের সাহায্যে নতুন ধরণের গণ হত্যা। তাদের ধারণা তারা মতাদর্শভেদে শেষ করে দিয়েছে। তবু এই সব মতাদর্শ ও আশা আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে প্রতিজ্ঞার শিখা প্রজ্জ্বলিত করেছে।

আমরা-ফকরখারী প্রচণ্ড শীতের দিনেও অথবা তিনটে বহুলা ও একটা মাসের পাই। কাগজ বসন্ত বা পেঙ্গল দেখলে কর্তৃপক্ষ কেপে যান। যদি কোন বইয়ে (এমন কি কংগ্রেস বা সি পি আইয়েরও) "চীন" শব্দটা থাকে সেটা বাজেয়াপ্ত করা হয়। একজন হামবড়া জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট বলেছেন, "আমি আমার স্টাফদের ওপর নির্ভর করি না।" কারণ তিনি যখন অস্ত্র একটি জেলের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন তখন তিন বার "জেল থেকে পালানোর ঘটনা" ঘটেছিল।

বন্দী, মিয় শ্রেণীর খাড়া ও পুষ্টি-হীনতার জন্য রোগ, আমাশা, অর্শ, চর্মরোগ প্রভৃতি আমাদের মধ্যে অনেকেরই আছে। ডাক্তার আসার মত সৌভাগ্য কচিৎ ঘটে থাকে। একটি জেলা কারাগারে যেখানে ১৫৬ জন বন্দী থাকে ডাক্তারের বক্তব্য হল : ১২০০ বন্দীর জন্য দৈনিক ২৫ টাকা ব্যয়। অতএব আমি এ সি সি বা সত্যার ওষুধ ছাড়া আর কিছু দিতে পারি না।" কেউ ময়রক বা বাঁচুক। প্রায়ই একজন বা দুজন বন্দী দুটো কথলে জড়িত হয়ে লোহার গেট পেরিয়ে অন্তরানে বা কবরখানায়

সমাজ বিরোধীদের হামলা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মাহুস কংগ্রেসের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। এ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের গদী আঁকড়ে বসে আছেন সিদ্ধার্থস্বর রায়ের মন্ত্রিসভা। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, জনতা পার্টি ও অজান্ত বামপন্থী দল ইতিমধ্যেই রায় মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করেছে। বিহারে বিহার কমিউনিস্ট পার্টিও বিহারের কংগ্রেস সরকারের পতন দাবি করেছে। কিন্তু এখানে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দলের আশ্চর্যজনকভাবে নীরব।

সিদ্ধার্থস্বর রায়ের পদত্যাগের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গের মাহুস সরকার হস্তক্ষেপ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র (পরিষদ) চৌরঙ্গী

বার। বন্দীরা বলাবলি করে, "ভাণ্ডা ভাল হলে দুটো কথল মিলবে।"

সপ্তাহে একটি মাত্র দিন আত্মীয় স্বজনরা দেখা করতে পারেন। আইনজীবীর সাহায্যে কোর্টের আদেশ (ম্যাজিস্ট্রেট বা দিয়ে থাকেন) নিয়ে দেখা করতে হয়। যদি সি আই ডি'র লোক জেলের অফিসে উপস্থিত থাকেন তাহলে ভাল। যদি না থাকেন তাহলে আত্মীয় স্বজনদের অনেক অসুবিধার পড়তে হয়। এত বেড়া ভিড়িয়ে মাত্র পনেরো মিনিটের সাক্ষাৎকার। শুল্কভিত্তিক বন্দী ও আত্মীয়দের মাঝখানে একটি জাল লাগানো জানলা। কখনও ম্যাজিস্ট্রেটের অসুপস্থিতি বা আদালতের ছুটির অন্তর্নিহিত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয় না। যারা দূর থেকে আসে তাদের অবস্থা সহজেই অসুস্থ হয়। তারা নিজেদের ভাগ্যকে বিচার দেয়।

কর্তৃপক্ষের মেজাজ অসহায়ী চিঠিপত্র বিলি করা হয়। কখনও কখনও এক গোছা চিঠি দেওয়া হয়। কখনও আমরা এক বছরের পুরনো চিঠি পাই। প্রায়ই চিঠিপত্র টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা হয়। জেলের নিয়ম অসহায়ী আমরা ১৫ দিন অন্তর পোষ্ট-কার্ড পাবার অধিকারী। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে তা গন্তব্যস্থলে পৌঁছয় না।

পোষাকের ব্যাপারটা আর এক বড় সমস্যা। জেলের নিয়ম একেবারে মানা হয় না। কোন কোন বন্দী বছরের পর বছর তাদের প্রাণ্য পোষাক পায় না। সাধারণ করেদীদের অবস্থা পোচনীয়। জেলে কেউ দুটো আঁটারওয়ার, দুটো গেঞ্জী ও একটি চাদরের বেশি পায় না শীত বা গ্রীষ্ম বাই হোক।

(শেখাংশ এম পৃষ্ঠায়)

একটি 'বিদ্যালয়ে'র কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

উন্টোভান্ডার ম্যারিগুয়র রোডে জন্মাব শিক্ষা শিবির জুনিয়র হাইস্কুল নামে বালিকাদের একটি বিদ্যালয় চলছে। এই বিদ্যালয়টির পরিচিতি অনেকদিনের।

কলকাতায় যত বালিকা বিদ্যালয় আছে তার প্রত্যেকটিতে কিছু না কিছু ছাত্রী আছে। ব্যতিক্রম শুধু আলোচ্য বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। এখানে এলে দেখা যাবে যে কোথাও ছাত্রীদের দেখা নেই। যেন এটা কারো একটা বসতবাড়ী। তবে কি আমরা ধরে নেব যে এই বিদ্যালয়টি একটি অননুমোদিত প্রাইভেট স্কুল? কিন্তু খবর আছে যে, বিদ্যালয়টি অনুমোদিত ছিল।

যতদূর জানা গেছে, বিদ্যালয়টি বালকদের জন্য স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যালয়টি বালিকা বিদ্যালয় হিসাবে অনুমোদন লাভ করে অস্থায়ী ভাবে ১৯৭১ সাল থেকে দু বছরের জন্য। কিন্তু শর্ত পূরণ না হওয়ায় বিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতানো হয় হয়নি। অর্থাৎ ১৯৭৩ সাল থেকে বিদ্যালয়টির অনুমোদন নেই। ছাত্রী সংখ্যা ১৫১২ জন হবে দুটি শ্রেণীতে। আইন অসহায়ী কমপক্ষে ৬০ জন ছাত্রী ছাত্রী থাকা প্রয়োজন।

অনুমোদনের অন্ততম শর্ত, অনুমোদনের চিঠি পাওয়ার তারিখ থেকে চারমাসের মধ্যে পরিচালক সমিতির নির্বাচন করতে হবে। (চিঠির নং ৩৬৩/J.R. D 14.8.77 of Board)। কিন্তু এখনও এই ছয় বৎসরের (১৯৭১-৭৩) মধ্যে পরিচালক সমিতির নির্বাচন হয় নি।

ছাত্রী নেই। পরিচালক সমিতির নির্বাচন হয়নি। প্রধান শিক্ষিকার চরিত্র সম্বন্ধে জনসাধারণ, অভিভাবকদের অভিযোগ আছে এবং বিদ্যালয়ের চার বছর অনুমোদন নেই। অথচ আশ্চর্যের বিষয় বিদ্যালয় ছাত্রীদের মাহিনা বাবদ কমপক্ষে হুড়ি হাজার টাকা জেলা ইন্সপেক্টর অব স্কুলস অফিস থেকে পেয়েছে। ২-শ্রেণী যুক্ত বিদ্যালয়। অথচ টাকা মজুর হয়েছে ৪-শ্রেণী যুক্ত বিদ্যালয় হিসাবে। যে বিদ্যালয়ের অনুমোদন নেই, ছাত্রী নেই, পরিচালক সমিতির নির্বাচন নেই, সেই বিদ্যালয় এত টাকা পায় কি প্রকারে? অভিযোগের পর অভিযোগ গিয়েছে তা সত্ত্বেও টাকা পাওয়ার বা দেওয়ার কোন বাধা নেই। শিক্ষিকারা ডি, এ-ও পাচ্ছেন। (634 (40) M. D. 8.9.76 of D. I. of Schools, Calcutta)

বিদ্যালয়টি অনুমোদন পেয়েছে

১৯৭১ সাল থেকে। আশ্চর্যের বিষয় কোন এক শিক্ষিকার নিয়োগ অনুমোদন হয়েছে ১৯৭০ সাল থেকে। [1128/1 (2) M Dt. 30.11.74 of D. I. of Schools, Calcutta.]

বিদ্যালয়টির বর্তমান প্রধানশিক্ষিকা (তৎকালীন সহশিক্ষিকা) বিদ্যালয় থেকে ব্যক্তিগত চরিত্রের জন্য অপসারিত হন। কারণ, কয়েক বৎসর আগে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আত্মহত্যা করেন ও অস্ত্র এক শিক্ষক পাগল হয়ে যান। পরে উক্ত শিক্ষিকার বাড়ীতে হামলা হলে প্রকাশ পায় যে, উক্ত শিক্ষিকা তাঁদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে তাঁদের ত্যাগ করেন ও বিদ্যালয় থেকে অপসারিত হতে বাধ্য হন। কিন্তু এইখানে তিনি নিরস্ত না হয়ে ১৯৬৯ সালে পুরাতন পরিচালক সমিতির পরিবর্তে এক নতুন পরিচালক সমিতি গঠিত করে পুনরায় বিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং রহাল তবিরতে তাঁর পুরাতন খেলা শুরু করেন। এতে স্থানীয় যুবক সম্প্রদায় আন্দোলন করার তিনি ১৯৭০ সালে অপসারিত হন। তিনি তখন এই অপসারণের বিরুদ্ধে আপীল করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর পুনর্বহাল হয় এই বিদ্যালয়ে।

এ শিক্ষিকার পুনর্বহালে অসন্তুষ্ট হয়ে অভিভাবকগণ তাঁদের মেয়েদের এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে অসম্মত হন। তাঁরা বলেন, কাছাকাছি অনেক বালিকা বিদ্যালয় আছে, হস্তান্তর প্রকল্প বিদ্যালয়ের কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া, যে বিদ্যালয়ের প্রধানের চরিত্র আমরা কেন, বারা তাঁর কাছে পড়বে, তারা পর্যন্ত জানে, সেই বিদ্যালয়ে আমরা মেয়েদের পাঠাব কি শিক্ষা গ্রহণের জন্য।

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান শিক্ষাদানের নামে অনুমোদন না নিয়েই ব্যবসা চালাচ্ছে এবং জনসাধারণের টাকা তহরুপ করছে, সে সম্বন্ধে কোন অসম্মত নেই। অভিযোগের পর অভিযোগ করা সত্ত্বেও কোন তদন্ত হয় না। এইভাবে কত বিদ্যালয় ধানসারাজধানীর বুকে চলে আসছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার যারা কর্তব্যর সেই মধ্যশিক্ষা পর্যদকে গ্রাহ্য করেন না এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। পর্যদের চিঠির উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না (2784/G.D. 13.3.76), এই রকম বিদ্যালয় হাজার হাজার টাকা নিয়ে গভর্ণমেণ্টের ব-কলমে জনসাধারণকে প্রতারণা করছে বছরের পর বছর। এই রকম বিদ্যালয় ডি আই অফিস থেকে হাজার হাজার টাকা পায় কি করে?

কংগ্রেস সরকারের অপকীর্তি

পাট চাষী ও পাট উৎপাদক রাজ্যগুলিকে লুণ্ঠন

রণজিৎ রায়

কয়েক বৎসর ধরে ভারতীয় তুলা কর্পোরেশন প্রচুর পরিমাণে তুলা খরিদ করছে। ১৯৭৩ সালে মহারাষ্ট্র সরকার স্টেট কো-অপারেটিভ মার্কেটিং কোর্পোরেশনের মাধ্যমে তুলার একচেটিয়া খরিদে নেমে পড়ে। তুলা কর্পোরেশন কিংবা রাজ্য সরকার কাউকেই অর্থাভাবে অহুবিধায় পড়তে হয়নি। তুলা খরিদের অল্প বাতে ব্যাকের গুণের কোন অভাব না হয় তার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ওই একই বৎসরে ভারতীয় পাট কর্পোরেশনও পরিমিত মাত্রায় পাট ক্রয়ের সিদ্ধান্ত করে এবং ব্যাংকগুলি যাতে গুণ হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অর্থ মন্ত্রককে অহুযোগ জানায়। কিন্তু পাট কেনা বেচার ভর-মরগুমে এই অহুযোগের প্রতি আদৌ কোন করণীয় করা হয় নি। এমন কি পাট কর্পোরেশনের কত টাকার প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসের পূর্বে কোন খোজ-খবরই করে নি। গুণ প্রদানের আদেশ অবশেষে দেওয়া হয় ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু ততদিনে পাটের বাজারের মরগুম প্রায় শেষ হয়ে গেছে। চাষীরা যাতে লাভবান হয় সেই উদ্দেশ্যেই পাট কর্পোরেশন পাট ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু কর্পোরেশনকে সময়মত প্রয়োজনানুসূত্রে গুণ না দেবার ফলে সেই উদ্দেশ্যই বানচাল হয়ে যায় এবং যাটির দরে চাষীরা পাট চলে যায় শিল্পপতি তথা মহাজনের ঘরে।

পাটের বিকল্প আবিষ্কৃত হবার কারণে পাটজাত জব্যের চাহিদা বিদেশের বাজারে পড়ে গেছে বলে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং পর পর সব কয়জন বাণিজ্যমন্ত্রীকে দিয়ে বারংবার ঘোষণা করান হয়েছে। রপ্তানি বাজার বজায় রাখার জন্য কেন্দ্র একমাত্র কাঁচা পাটের দর নামিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন ব্যবস্থাই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে নি। পাটের বিকল্প বস্ত্র সম্বন্ধে এই ধরনের প্রচার অবশ্য আশ্চর্যের নয়। ১৯৩০ এর দশকে ব্রিটিশরাই এই ধরনের প্রচার কার্য শুরু করে। বর্তমান প্রচারের মধ্যে নতুনত্ব হল, বিকল্প হিসাবে প্যাকিং কাগজের পরিবর্তে রাসায়নিক জব্যের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। এই সমস্ত প্রচার কার্য সম্বন্ধে, পাটজাত পণ্য থেকে বৈদেশিক মুদ্রার অর্জন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাটজাত পণ্য এককভাবে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের গৌরব আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

পাটের বিকল্প বিষয়ে একদিকে বন্ধন চালানো হচ্ছে অপরদিকে প্রচারকার্য, অতীতকে কেন্দ্র করে পাটজাত পণ্যের রপ্তানি শুধু থেকে প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব আদায় করছে। দরের অল্প যদি সত্য সত্যই পাটজাত পণ্যের বৈদেশিক বাজার পড়ে গিয়ে থাকত, তাহলে সরকারের কর্তব্য ছিল প্রচণ্ড রপ্তানি শুল্কের বোকা তার উপরে না চাপিয়ে হতী বজ্রের মত পাটজাত পণ্য রপ্তানির অস্ত্রও ভরতুকি প্রদান করা। পাটচাষী ও পাট উৎপাদক রাজ্যগুলির হিতসাধনের বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকলে সরকার কর্তৃক তাই। পাটশিল্প মালিকেরা শুধুমাত্র পাটশিল্পকেই নিয়ন্ত্রণ করে না, পাট তথা পাটজাত পণ্যের ব্যবসায় ও তাঁদেরই হুকুমগত। কিন্তু সরকার তাঁদের অতি মুনাফার মনোবৃত্তিতে কোন রকম বাধা প্রদান করেনি। রপ্তানি চালানো কম দর দেখানর (আন্তার ইনভয়েসিং) অস্ত্রও কারো বিরুদ্ধে কোন রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, যদিও সবারই জানা রয়েছে যে, ব্যাপকভাবে এই দুর্ভিক্ষ করা হয়ে থাকে। ১৯৬১-৬২ সালকে ১০০ ধরলে, ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে পাটের পাইকারী দরের স্চক ছিল ১২৩ এবং পাটজাত শিল্পজব্যের

স্চক ছিল ২০৪। ১৯৬২ বৎসর পাটের কলমালিক এবং পাট ও পাটজাত জব্যের ব্যবসায়ীদের মুনাফা হয়েছে গগন-স্পর্শী। সৃষ্টি হচ্ছে পাটচাষী আর দরিদ্র হচ্ছে পাট উৎপাদক রাজ্যগুলি। বাংলাদেশের পাট ব্যাপকভাবে চোরাকারাদানি করে ব্যবসাদারেরা। ভারতে পাটের দাম একেবারে নিম্নরেখার দাবিয়ে রাখার আরেক অযোগ্য পেয়েছে।

পাট চাষীরা আজ অবধি পাটের ক্ষয়ক্ষতি দর পায় নি। পাটজাত পণ্যের উপরে বার্ষিক রপ্তানি শুধু হল পাটের দর নামিয়ে রাখার একাধিক পন্থার মধ্যে মাত্র একটি। কারণ, শেষ পর্যন্ত রপ্তানি শুধু বোকাটা গিয়ে পড়ে পাট চাষীদের উপরেই। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে পশ্চিম বঙ্গ সরকার বার্ষিক অর্থ কমিশনকে জানায়:

“কৃষিপণ্য কমিশনের সুপারিশ সম্বন্ধে কৃষিতে উন্নত রাজ্যগুলি গম ও তুলার দর কম করার সর্বকম প্রচেষ্টার বাধ্য হান করে আসছে। প্রকৃতপক্ষে, পাট কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও পাটের দর নির্ধারিত হয়েছে, তাতে চাষের খরচাও ভাল করে ওঠে না। ১৯৬৬ সালে টাকার আন্তর্জাতিক মূল্য হ্রাস, রপ্তানি তথা কাঁচা পাটের দর বৃদ্ধির মাধ্যমে পাট শিল্প তথা চাষীদের খানিকটা হুবিধা করে দিতে পারত। কিন্তু কাঁচা পাট থেকে যে লাভ পাওয়া যেত তা আরো কমিয়ে দেওয়া হয় রপ্তানি শুধু বৃদ্ধি করে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক দর বজায় রাখার জন্য দেশের অধিকাংশ রপ্তানি পণ্যের উপরেই কেন্দ্র প্রচুর পরিমাণে ভরতুকি দিয়ে থাকে। ভরতুকির বোকা শেষ পর্যন্ত বহন করতে হয় দেশের ভোক্তাদের। কিন্তু পাটের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি হল অস্ত্র রকমের। পাটজাত পণ্যের উপরে আসলে ভরতুকি প্রদান করেন পাট উৎপাদক রাজ্যগুলির চাষীরাই। অথচ পাট হল দেশের মোট রপ্তানির এক-পঞ্চমাংশ তো বটেই, কেন্দ্রের রাজস্ব ভাণ্ডারে রপ্তানি শুধুর মাধ্যমে প্রচুর অর্থও সে চলে থাকে।”

পাট রপ্তানির উপরে সর্বপ্রথম শুধু ধার্য করে ব্রিটিশরা, ১৯১৬ সালে। সেই সময় শুধুর হার ছিল টন প্রতি (চট) ১৬ টাকা। পর্যায়ক্রমে সেই শুধু বৃদ্ধি করা হয়। ব্রিটিশ রাজত্বকালে সর্বোচ্চ শুধু ধার্য করা হয়েছিল ১৯৪৬ সালে, টন প্রতি ৮০ টাকা করে। ১৯৪৯ সালে স্বাধীন ভারত সরকার একদিকে স্বতীভবের রপ্তানি শুধু হ্রাস করে এবং অন্যদিকে পাটজাত পণ্যের রপ্তানি শুধু টন প্রতি চারগুণেরও বেশী বৃদ্ধি করে—৮০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকা। ১৯৫০ সালের মন্তেঘর মাসে এই অর্থক বিভণেরও বেশী করা হয়—টন প্রতি ৭৫০ টাকা। এর একমাসের মধ্যেই আবার বিভণ বৃদ্ধি করে টন প্রতি ১,৫০০ টাকা করা হয়। এই ৩ বার বজায় ছিল ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস অবধি। তার পর থেকে পর্যায়ক্রমে শুধু হ্রাস করা হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৫ সালে একবারে বিলোপ করা হয়। এক দশক পাটজাত জব্যের উপরে রপ্তানি শুধু ছিল না।

১৯৪৭ সালের পরে পূর্বপাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়ন্ত্রণে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সহ একটি পাট শিল্প গড়ে ওঠে। ভারতের পাটশিল্প নিয়ন্ত্রণকারীরা যে পন্থায় এবং যে পরিমাণে পূর্ব ভারতের পাটচাষী তথা শিল্প শ্রমিকদের শোষণ করেছে, পশ্চিম পাকিস্তানীরাও ঠিক একই পরিমাণে শোষণ করেছে পূর্ব বাংলার পাটচাষী ও শিল্প শ্রমিকদের। অধিকন্তু, সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির হুবিধা থাকার দক্ষতা তারা ভারতীয় পাটজাত পণ্যকে বিশ্বের বাজার থেকে হটিয়ে দিচ্ছিল। এই কারণেই

ভারত সরকার বাধ্য হয়ে ১৯৫৫ সালে পাটজাত পণ্যের উপর থেকে রপ্তানি শুধু উঠিয়ে দেয়।

বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের ৫৭৫ শতাংশ দরের হুবিধা দেবার অজুহাতে ১৯৬৬ সালের ৬ই তারিখে টাকার মূল্য হ্রাস করা হয়। দরের এই হুবিধা-টুকু পাটের ক্ষেত্রে যদি রপ্তানি শুধুর মাধ্যমে নিশ্চিত করা না হত, তাহলে এই হুবিধার খানিকটা অংশ পাটের উচ্চতর মূল্য হিসাবে পাটচাষীদের কাছেও পৌঁছত। বার্ষিক কমিশনের কাছে প্রদত্ত আরকলিপিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়টিই উল্লেখ করে। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু টাকার মূল্য হ্রাসের হুযোগ নিয়ে টন প্রতি (চট) ১০০ টাকা রপ্তানি শুধু ধার্য করে। ফলে, বৈদেশিক বাজারে টাকার মূল্য হ্রাসজনিত যে হুবিধা পাওয়া যেত তা সম্পূর্ণরূপে বানচাল হয়ে যায়। অপর যে ভোগ্য পণ্যের উপরে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি শুধু ধার্য করা হয় সেটি হল চা। চা-ও মুখ্যতঃ পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির উৎপন্ন জব্য। পাটজাত পণ্যের উপর থেকে রপ্তানি শুধু পর্যায়ক্রমে হ্রাস করে ১৯৭৩ সালে ২০০ টাকা করা হয়। কিন্তু ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে কাঁচা পাটের দর বহন অসম্মত কৃষি পণ্যের তুলনায় সর্বনিম্ন রেখায় নেমে যায় ঠিক তখনই ‘ওয়াই, বি, চাবন এবং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পাট রপ্তানি শুধু বৃদ্ধি করে করেন ৬০০ টাকা।

গালিচার ‘জুট চট, বস্তা, ক্যানভাস ইত্যাদির উপরেও উচ্চহারে রপ্তানি শুধু ধার্য করা হয়েছে। তাছাড়া সর্বপ্রকারের পাটজাত জব্যের উপরেই রয়েছে প্রচণ্ড আবগারী শুধু।

বস্তুতঃ, পাটজাত জব্যের উপরে রপ্তানি শুধু ধার্য না করে ভারত সরকারের গতাস্বর নেই। কারণ, এই শুধু তুলে দিলে, পশ্চিম ভারতে তুলাজাত বস্ত্রের রপ্তানির অস্ত্র ভরতুকির টাকার অভাব দেখা দেবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী হিসাবে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে পাট ও তুলার মূল্য এবং চট ও বস্ত্রশিল্পের তদারক করতে হয়। এই মন্ত্রকের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। তখন ১৯৬১-৬২-র তুলনায় তুলার পাইকারী মূল্যের স্চক ছিল ২০৬ আর পাটের ১৬০। অর্থাৎ তুলার যে পরিমাণ মূল্য বৃদ্ধি হয়েছিল তার থেকে পাটের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছিল অনেক কম। পাটচাষী এবং পাট উৎপাদক রাজ্যগুলির প্রতি সহানুভূতি থাকলে কেন্দ্রীয় সরকার পাটের মূল্যবৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করত। বাস্তবে ঘটছে ঠিক বিপরীত কাণ্ড। বাণিজ্য মন্ত্রকের তার গ্রহণ করার পর অর্থমন্ত্রকের সহযোগে দেবীবাবু যে সমস্ত নীতি কার্যে প্রয়োগ করেন তার পরিণামে ১০ মাসের মধ্যেই, অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে, একদিকে তুলার মূল্যের স্চক বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২২৪, অন্যদিকে পাটের মূল্যের স্চক মেমে আসে ১২৩-এ। পরের নয় মাসে কেন্দ্রীয় সরকার তুলার মূল্যে আরো চমকপ্রদ বৃদ্ধি ঘটান। ১৯৭৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর এই স্চক হয় ৪১৩, অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মূল্যের বিভণ ১৭ এই বৃদ্ধিতে দেবীবাবু শঙ্কিত নয়, উল্লসিত হন। ওই বৎসর ২৩শে আগষ্ট স্বতন্ত্র মূল্য সম্বন্ধে এক বিরুদ্ধিতে তিনি বলেন, “তুলা চাষীরা জ্ঞাত্য মূল্য পাক, এটা আপনারা চান। আমরাও তাই চাই। স্বতরাং স্বতন্ত্র মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে।”

দেবীবাবু বাহবা হুড়াজেন এই বলে যে, তার নীতির ফলে স্বতীভবের রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন প্রক্রিয়ার রপ্তানি বাড়ানো হচ্ছে তা প্রকাশ করা হচ্ছে না।

পাটকল মালিকদের অতি মুনাব্বা

১৯৭৪ সালের ২১শে নভেম্বর দেবীবাঁহ রাজ্যসভাকে জানান, "ভারতে তুলা ও স্বতী বস্ত্রের মূল্য অল্প বে কোন দেশের চাইতে অধিক।" ১৯ আসল ব্যাপার হল, রপ্তানি বস্ত্র ত্রুটি পাচ্ছে, ভারতীয় পরিমাণ তার চাইতেও ত্রুটি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতীয় টাকার বোগান দেশ সমগ্র দেশ। বেহেতু মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট সর্ববৃহৎ তুলা ও স্বতী বস্ত্র উৎপাদক অঞ্চল, সেহেতু সমগ্র দেশের মূল্যে লাভবান হচ্ছে এই দুটি রাজ্য।

১৯৭৩ সালে পাট উৎপাদনে রেকর্ড ত্রুটি হয়—৮০ লক্ষ বেল। প্রতি বেল থাকে ১৮০ কিলোগ্রাম পাট। ১৯৭৪ সালে পাট উৎপাদন নেমে যায় ৪৮ লক্ষ বেল। স্বত্ন উৎপাদনের কালে মূল্যে কিছু বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা দেয়। চাষীরা সর্বাধিক পাট বিক্রয় করে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তারিখের হাট থেকে সব পাট চলে যায় ব্যবসাদার ও চটকল মালিকদের হাতে। পাট বিক্রয়ের মরসুমের গোড়ার দিকেই মূল্য হ্রাস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় চটকল মালিক শ্রেণী এবং কেন্দ্রীয় সরকার। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথামার্ধে তাদের মধ্যে বিশদ শলাপসম্মেলন চলে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। ২০শে সেপ্টেম্বর বাণিজ্য মন্ত্রক কর্তৃক প্রচারিত একটি বেসরকারী (আন-অফিসিয়াল) নোট মারফৎ সাংবাদিকদের জ্ঞাত করা হয় যে, পাটের মূল্যে "তীব্র উল্লংঘন" (শার্প রাইজ) রোধ এবং কাটকাবাঁহী বস্ত্রের উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যবস্থাগুলি গোপন রাখার চেষ্টা ছিল, কিন্তু সাংবাদিকদের নিকট তা অজানা থাকে না। দেবীবাঁহ মন্ত্রক চটকলগুলির উপর হুকুম জারী করে যাতে তারা পাট ক্রয় হ্রাস করতে বাধ্য হয়। সংগে সংগে অর্থ মন্ত্রকের পরামর্শে রিজার্ভ ব্যাঙ্কও চটকলগুলিকেই নয়, সরকারী সংস্থা পাট কর্পোরেশনকেও প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্কের স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত করে। চাষীরা ভর মরসুমে বাজারে পাট নিয়ে এসে দেখে ক্ষেতা নেই। অচিরেই পাটের মূল্যে অধোগতি শুরু হয়। ২০শে সেপ্টেম্বর কলকাতার প্রতি হুইটাল পাটের পাইকারী মূল্য ছিল ২০৬ টাকা ৩০ পয়সা, ২৪শে ডিসেম্বর ২০৩ টাকা ৬২ পয়সা, এবং তারপর আরো হ্রাস পেতে পেতে ডিসেম্বরে এসে দাঁড়ায় মাত্র ১৭১ টাকা ৪৭ পয়সা। ২০ একেই অজ্ঞাত সামগ্রীর মূল্যের তুলনায় পাটের মূল্য ছিল চাষীর পক্ষে সর্বনাশা স্তরে। বাণিজ্য মন্ত্রক, অর্থ মন্ত্রক এবং চটকল মালিকদের কাবসাজির কালে, মূল্য আরো পড়ে যায়।

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রিয়াকলাপের প্রতিবেদনে কলকাতার একটি সংবাদপত্রে লেখা হয়, "ভারত সরকার পাটকল মালিকদের বোগসাজসে এমন কিছু ব্যবহার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা কার্যত পাটচাষীদের এবং পাট উৎপাদনকারী রাজ্যগুলির পিঠে ছুরি মারার সামিল। আর বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে সেই ছুরি চালানো হয়েছে।" ২১

দেবীবাঁহ স্বয়ং এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অজ্ঞাত অনেক মুখপাত্র ব্যবহার ঘোষণা করেছেন যে, পাটের মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে ভারত-বিদেশে পাটজাত দ্রব্যের বাজার হারাবে। ভারত পাট রপ্তানি করে না, করে পাটজাত দ্রব্য। স্বতন্ত্রাং রপ্তানি নির্ভর করে পাটজাত দ্রব্যের মূল্যের উপর। যুক্তি দেখান যেতে পারে যে, পাটজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ভর করে প্রধানত কাঁচা পাটের মূল্যের উপর। কিন্তু এই শিল্পের ক্ষেত্রে যুক্তিটি কি খাঁটি? পাটের মূল্য এবং পাটজাত দ্রব্যের মূল্যের গতি থেকে যুক্তিটি বিচার করা যাক। ১৯৬১-৬২তে ১০০ ধরে, পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের সূচক এবং তুলনামূলক তুলা ও কাপড়ের মিলে প্রাপ্ত দ্রব্যের মূল্যের সূচকের পরিবর্তন নিয়ে সারণিতে দেখান হল : ২২

পাইকারী মূল্যের সূচক					
বৎসর	পাট	পাটজাত দ্রব্য	তুলা-মিলেভেরী	কাপড় ও সূতা	মিলেভেরী
১৯৬১-৬২	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
১৯৬২-৬৩	১০২	১১২	১১২	১১২	১১২
১৯৬৩-৬৪	১০৫	১১১	১১১	১১১	১১১
১৯৬৪-৬৫	১০৭	১১২	১১২	১১২	১১২
১৯৬৫-৬৬	১০৮	১১২	১১২	১১২	১১২
১৯৬৬-৬৭	১০৯	১১২	১১২	১১২	১১২
১৯৬৭-৬৮	১১০	১১২	১১২	১১২	১১২
১৯৬৮-৬৯	১১১	১১২	১১২	১১২	১১২
১৯৬৯-৭০	১১২	১১২	১১২	১১২	১১২
১৯৭০-৭১	১১৩	১১২	১১২	১১২	১১২
১৯৭১-৭২	১১৪	১১২	১১২	১১২	১১২
১৯৭২-৭৩	১১৫	১১২	১১২	১১২	১১২
১৯৭৩-৭৪	১১৬	১১২	১১২	১১২	১১২
১৯৭৪-৭৫	১১৭	১১২	১১২	১১২	১১২
১৯৭৫-৭৬	১১৮	১১২	১১২	১১২	১১২
১৯৭৬-৭৭	১১৯	১১২	১১২	১১২	১১২
১৯৭৭-৭৮	১২০	১১২	১১২	১১২	১১২

উপরের সারণি থেকে দেখা যাবে কী নিষ্ঠুরভাবে পাটের মূল্য দাবিরে রাখা হয়েছে এবং পাটজাত দ্রব্যের মূল্যে বৃদ্ধি ঘটতে দেওয়া হয়েছে। ১৯৬১-৬২-র তুলনায় ১৯৭৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাটের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৮ শতাংশ কিন্তু পাটজাত দ্রব্যের মূল্যে বৃদ্ধি হয়েছে ১৮৪ শতাংশ। চাষী মেরে চটকল মালিকরা সরকারের সহায়তার সীমাহীন

(২৩) ১৯৭৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে নরেন ঘোষ রাজ্যসভায় বলেন যে, অর্থমন্ত্রী "পাট কর্পোরেশন যাতে স্বপ্ন পায় তার অল্প অল্পমতি প্রদান করেন নি" এবং "ডিসেম্বর মাস অবধি তারা কোনও স্বপ্ন কর্পোরেশনকে দেয়নি।" উত্তরে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, স্বপ্ন সংক্রান্ত নির্দেশাদি "বস্ত্র" নীতিগতভাবে সম্ভবতঃ ২০শে অক্টোবর তারিখেই দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কার্যকর হতে কিছুটা সময় লাগে। (Parliamentary Debates, Rajya Sabha, Official Report, Part II (মিমিগ্রাফ), পৃষ্ঠা ৫৪৪-৫ এবং ৫৪৯ জটব্য।) ১৯৭৩ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে ভারতীয় চটকল সংস্থার চেয়ারম্যান জে. পি. পোয়ঙ্কা বলেন : "ডিসেম্বর মাস নাগাদ ৭০ ভাগেরও বেশি পাট চাষীরা বিক্রয় করে গেলে কিন্তু আম অবধি ব্যাংক থেকে অতিরিক্ত কোন ঋণ পাওয়া যায় নি।" অল্প কথায়, স্বপ্নের সুবিধা এই মাসের শেষের দিকে যদিও পাওয়া যায়, দরের ব্যাপারে চাষীদের সুবিধা প্রদানের যে সুযোগ চলে গেছে, তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না। (ভারতীয় চটকল সংস্থা কর্তৃক ১৯৭০ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত "Chairman's Press Statement" জটব্য।) প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৭২-৭৩-এ কাঁচা তুলা ক্রয়ের অল্প মহারাষ্ট্র কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশনকে স্বপ্ন দেওয়া হয়েছে ১০০ কোটি টাকা এবং কটন কমপোরেশন অব ইন্ডিয়াকে ৪০ কোটি টাকা। কাপড়ের মিলগুলিকে কত কোটি টাকা স্বপ্ন দেওয়া হয়েছে এখনও হিসাব করা হয়নি। (বাণিজ্যমন্ত্রকের পার্লামেন্টারী কনসালটেটিভ কমিটির ১৯৭৪-এর ২৯শে অক্টোবরের সভায় প্রচারিত সরকারী তথ্য।)

(২৪) Economic Survey 1973-74, পৃষ্ঠা ৮৮ জটব্য।
(২৫) পশ্চিমবঙ্গ সরকার, Memorandum for the Sixth Finance Commission, পৃষ্ঠা ২০।
(২৬) বিভিন্ন প্রকারের পাটজাত দ্রব্যের উপরে ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭৩ সালের ২৮শে আগস্ট তারিখ অবধি রপ্তানি শুদ্ধের হারের অল্প Indian Jute Mills Association, Annual Summary of Jute and Gunny Statistics—Jute Year 1972-73, পৃষ্ঠা ৫৫ জটব্য। ১৯৭৪ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে বলবৎ রপ্তানি শুদ্ধের হারের জন্য ৬ই তারিখে ভারত সরকারের ঘোষণাটি জটব্য।
(২৭) পাট ও তুলায় মূল্যের সূচক Reserve Bank

মুনাকা সূচক চলেছে। এই মুনাকার ক্ষয় একাংশ শাসক রাজনীতিক দলকে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তা ক্ষয়ের ভাগ্যবিপর্যয় বোধ করার অঙ্গ নয়, অধিকতর নির্ভর আশ্বাস করার অঙ্গ।

১৯৭৪ সালের ২১শে নভেম্বর রাজ্যসভায় বাণিজ্য মন্ত্রকের একটি বিবৃতিতে জানান হয় যে, বিবেচনের বাজারে পাটজাত দ্রব্য যাতে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা না হারায় সেজন্য সরকারকে ব্যবহারী করতে হয় পাটের মূল্য "অস্বাভাবিকরকম উচ্চতরে" (আনকন্সনেবল্ লেভেলস্) উঠা বন্ধ করতে। আলোচনার সময় বিহারের ইন্ড্রীপ সিং এবং পশ্চিমবঙ্গের নীরেন ঘোষ জানতে চান, পাটের মূল্যের সংগে পাটজাত দ্রব্যের মূল্যের কোন সম্পর্ক এবং পাটজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সংগে সঙ্গতি রেখে পাটের মূল্য বৃদ্ধি হতে না দেবার যৌক্তিকতা আছে কি না। দেবীবাঁহ বলেন, "না, কোন যৌক্তিকতা নেই।" ২৩ যৌক্তিকতা যে নেই, তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু বাস্তবে সব বৃদ্ধি অগ্রাহ করে পাটের মূল্য দাবিরে রাখার এবং পাটজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

[লেখকের "ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ" গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদ। সম্প্রতি গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।—সম্পাদক, দর্পণ]

of India Bulletin, সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃঃ ১৫২৫, এবং ভারত সরকার, Economic Survey 1973-74, পৃঃ ৮৮ থেকে সংগৃহীত।

(২৮) লোকসভায় ৪৭৬ নং তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের উপর একটি অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তর।

(২৯) তুলায় মূল্য সম্বন্ধে একটি দৃষ্টি আকর্ষণ প্রস্তাবের উপর বিতর্ক জটব্য।

(৩০) বিভিন্ন তারিখের কলকাতার The stateman পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃত মূল্য।

(৩১) আমন্দবাজার পত্রিকা, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪।

(৩২) Reserve Bank of India Bulletin, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪, পৃঃ ১৮২৫, থেকে গৃহীত পরিসংখ্যান।

(৩৩) পাটের মূল্যের সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ প্রস্তাবের উপর আলোচনা জটব্য।

জালিয়াতি জোচ্চুরি

মিহির আচার্য

জালিয়াতি জোচ্চুরি করে' বেশিদিন ইতিহাসের চালিকাশক্তি যে সচেতন জনগণ তার বিচার থেকে কেউ রেহাই পায় নি। দেয়ালে আঁটা এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধের সহস্র বদন আজ ময়লা কাগজের রুড়িতে। বিশ দফার সরকারি টাকার বানানো তথ্যদণ্ডের ফিলিমগুলি শুদামজাত ইরের বিষ্ঠার দ্বর্গজময়। অধ্যাপক-নাট্যকার-গান-লেখক বিশদফার-কোরাবয়েরা রেডিয়ো থেকে বৃষ্টি হারালো। পদ্মশ্রী ঘোষকের গলায় কাপুনির ভাঁড়ামি 'দূর হ'। অথচ চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী—

মাসুকের আগ্রত চোখের আড়ালে কালো গাড়িতে সাত্তী পাহারায় যাদের হিঁচড়ে টেনে হাসপাতালে রক্ত দেবার অস্ত্র আনা হয় (জেলখানার অসাহসিক অত্যাচারে পুলিস দেবার গরজে) সেই বীর সন্তানদের মুক্তির দিন কি 'সমাজবিরাগীদের' অগ্রাধিকারে পিছিয়ে যায়?

শরৎচন্দ্র আজও রক্ষাকবচ

তালুসিংহ

সেই বিশ শতক থেকে আজ সত্তর শতকের শেষ পর্বের বাংলা চলচ্চিত্র শরৎচন্দ্রকেই পুরনো নিষ্ঠিততার নির্ভর করেছে শুধু তাই নয়, স্রীজীবিত রক্ষাকবচ হিসেবেই প্রকাশ করেছে। এটাও লক্ষ্য করছি বর্তমান বছরটা শরৎচন্দ্র শতবর্ষের জুড়ি হিসেবেই যে এমন শরৎচন্দ্রীয়তা, তা কিন্তু সত্য নয়। এমন ভাবটা বাংলা ছবির এখন সেই লক্ষ্য ছবির অঙ্গলয় থেকেই দেখা যায়। কিন্তু কারণটা কি? কারণ আর কিছুই নয়—বাঙালীর অনপ্রিয়তম কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কাহিনীকে রূপালী পর্দার হাজির করে বাজিমাং করা। এটা কিন্তু লক্ষ্যমাত্র, শরৎচন্দ্রের যে কোন কাহিনী অবশ্যই একটি বাদে, একাধিকবার চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে বঙ্গ-রক্ষিস অর করেছে অব্যর্থ নিশানায়। এজন্মই যখন বাংলা ছবির জগতে তাঁটা পড়েছে, শরৎচন্দ্রের চিত্ররূপ তখনই সেখানে জোয়ার এনে দিয়েছে। আর সে কারণেই শরৎচন্দ্র আজও বাংলা ছবির নির্মাতাদের কাছে আত্ম রক্ষাকবচ।

এই হালকিস ক্যাপারটাই দেখা যাক না কেন! 'কবচ' স্থাপারহিই হবে বেরিয়ে গেছে। 'সব্যাসাচী' আজও চলেছে দ্রুত পরাক্রমে। এই মধ্যে পুরনো দিনের একাধিক শরৎচন্দ্রীয় চিত্র ছুটিতে ব্যবসা করেছে। নতুন প্রযোজনার 'রামের হুমতি' রিলিজ শেষে অপ্রতিভ গতিতে এগিয়ে চলেছে। 'রামের হুমতি' নিউ থিয়েটার্স ব্যানারে আগেও একবার নির্মিত হয়ে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বর্তমানের রিবেক ছবিটিও ভাল ব্যবসা করেছে। ছবিগুলি যে বর্তমানে প্রদর্শন কর মুক্ত হয়েই বঙ্গ রক্ষিস অর করেছে না নয়? কয় মুক্তির অস্ত্র ব্যবসা আরও জোরদার হয়েছে টিকিট কিন্তু কয় মুক্ত না হলেও ছবিগুলি যে হিট করতই, তা তো আগেও সত্যি সত্যি থেকেই স্পষ্ট হয়। অথচ এটা ছবির সংগে বলতেই হয়, ছবিটিতে ছবি ছাড়া ব্যক্তি সব শরৎচন্দ্রীয় চিত্রই দ্রুত ও অক্ষম স্থিতি। শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্রাঙ্কন, যা কখনই চলচ্চিত্র ধর্মের অস্তিত্ব নয়—চলচ্চিত্রের নৈব ভাষায় তা রূপায়িত নয়। শুধু সেলুলয়েডের ক্ষিতির সাহায্যে শরৎচন্দ্রের গল্প বলা হয়েছে চলচ্চিত্র ধর্মকে হ্রাস করে—যেখানে শিল্পরস ও মানসিক তাৎপর্য অঙ্গশূন্য। যতোয় পরিবেশে ভাবাবেগের

জোয়ারে সব কিছু ভাসিয়ে দিয়েছে—বাঙালী দর্শকের সেন্সিটিভিটিকে একপ্রয়েক করা হয়েছে কাহিনীর নিজস্ব আবেগময়তাকে রূপালী পর্দার স্বেচ্ছা বলে। সেখানে পরিমিত বোধের কোন পরিচয় নেই, মনের কোন বালাই নেই, রসস্থির কোন ভাসিও নেই। তাই ছবিতে শুধু শরৎচন্দ্রের গল্পই বলা হয়েছে—তা 'চলচ্চিত্র' হয়ে যাওয়ার নি। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত মাধবী চক্রবর্তী নিবেদিত ও তরুণ রাগচী পরিচালিত 'রামের হুমতি' ছবিটিও বাংলা চলচ্চিত্রে কোন অতিরিক্ত সংযোজন হয়ে দেখা দেয়নি—সেই একই গজলিকা স্রোতের ধারা। শুধু তফাৎটা হচ্ছে—'রামের হুমতি' চলছে দ্রুত গতিতে আর

থিয়েটার ওয়াকশপ অভিনীত

'নরক গুলজার'

(দর্পণের সমালোচক)

থিয়েটার ওয়াকশপ বহুদিন পরে বাংলা দেশের নাটক অহুরাগীদের তাদের যে মতন নাট্য প্রয়োজনা উপহার দিল তা হোল নাট্যকার মনোজ মিত্রের 'নরক গুলজার'। এখানত থিয়েটার ওয়াকশপ তাদের যে সব নিরিয়াল মাটক প্রয়োজনা করে এসেছে যেমন রাজরজ, চাকভাড়া মধু ইত্যাদি তার মধ্যে 'নরক গুলজার' একটু কেমন বেমানান।

নাটকের আবেদন বুদ্ধির কাছে হলেও অহুত্বের কাছে আত্মসমর্পণ নিশ্চই ঘটবে এবং তাতেই নাটকের সম্পূর্ণতা। ওয়াকশপের পূর্বের নাটকগুলি দেখতে দেখতে আমরা দর্শকেরা আত্ম হতেছি যেমন করে, নরক গুলজারে তেমনটি কি হয়েছে? বিচার করলে দেখা যাবে নরক গুলজার একটি সমকালীন নাটক। শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামই এ নাটকের মূল বিষয়। অভিনয়ের দীপ্তি, আলোর ব্যবহার এসব থাকা সত্ত্বেও নাটকের মধ্যে দর্শক হিসেবে নিজেই হারিয়ে কেলতে পারিনি। মনে হয় নাটক আরো একটু আটোআটো হলে পারত।

দৃশ্যপটের পরিবর্তনের প্রয়োগ হ্রাস, কিন্তু নিখুঁত মনে হয়নি। নাটক দেখতে দেখতে মনে হয়েছে অভিনেতার হুঁতাবে অভিনয় করতে দ্বিধাগ্রস্ত, কিসের একটা অভাববোধ তাঁদের হ্রাস করেছে।

'নানা রঙের দিনগুলি' হাঁটছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। 'নানা রঙের দিনগুলি' ছবিতেও আবেগ আছে কিছু নাটকও আছে। আর আছে যুক্তিহীন কিছু জিয়ালাপ, মোটা মাগের ভাঁড়ামি। এও এক অক্ষম চলচ্চিত্র। কিন্তু এতো শরৎচন্দ্রের কাহিনীর ছবি নয়। কনক মুখোপাধ্যায় এ ছবির কাহিনী রচনা করেছেন। পরিচালনাও তাঁর।

এই তো বিগত কয়েক মাসের মধ্যে দেখা গেল, শরৎচন্দ্রের গল্প নিয়ে তৈরী প্রত্যেকটি ছবি স্থাপার হিই হয়ে বেরিয়ে গেল, আর অস্ত্রাস্ত্রের গল্প নিয়ে যে ছবিগুলি নির্মিত হয়ে মুক্তি পেল, প্রায় প্রত্যেকটিই 'কপ' হয়ে গেল। অথচ চলচ্চিত্র ধর্মের বিচারে কলা-ফলের এমন শোচনীয় পার্থক্য ঘটায় কোন মুক্তি খুঁজে পাওয়া ভার।

মঞ্চের উপর সর্বকণ ধরে নরকের দৃষ্টে এ রক্ষসী ব্যবহার মোটা ভুলির কাজ। নরক অর্থেই খড়ের রক্ষসী, তার চোখে লাল আলো থিয়েটার ওয়াকশপের মঞ্চ পরিকল্পনার পূর্ব-নাম আংশিক হ্রাস করেছে। তাপস সেন ও মহু দত্তের এমন কাজ কেন?

এ নাটকে একটি মাত্র নারীচরিত্র। মাতৃহ, প্রেম, বিকোভ সবকিছু চরিত্রটি রমণীয় করেছে, কিন্তু শিল্পীর নিপুণতার চরিত্রটি গড়ে উঠতে পারেনি, যেমনটি দর্শক আশা করেছে। অভিনয় তিনি হ্রাস করেছেন আর সেটাই বোধহয় ক্রটির কারণ।

নরক গুলজারে অভিনেতার তাঁদের দলের হুনাম সর্বজ রক্ষা করেছেন। প্রতিটি চরিত্র বিশেষ ভাবে ছাপ কেলছে দর্শকের উপরে। অশোক মুখোপাধ্যায় এক কথায় অনবদ্য। সৃষ্টিভীর 'দ্রুত কাজটি এত বাস্তবিক ভাবে না করলে নাটক হ্রাস হোত নিঃসন্দেহে। রাম মুখোপাধ্যায়, মানিক রায়চৌধুরী অভিনয় খুবই হ্রাস। নাটকে সাদীতের ব্যবহার ভাল। দেবশীষ দাসগুপ্ত তাঁর হুনাম রেখেছেন। কিন্তু একটা কথা পরিচালক বিভাস চক্রবর্তীর কাছে 'থিয়েটার ওয়াকশপ'-র শিল্পীদের কাছে আমাদের দর্শকের আশা অনেক তাই এনাটক দেখে অনেকেই আমার মত বলবেন—পিপাসা হার নাহি যিটল।

চলচ্চিত্র নিয়ে চর্চা

থিয়েটার কমিউনের 'দানসাগর'

(দর্পণের সমালোচক)

ভারতের জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ হোল ভূমিহীন ক্ষেত মজুর। তাদের একটি অংশ ক্রমাগত শ্রম থেকে বঞ্চিত হতে হতে শ্রম বিমুখ হয়ে পড়েছে। কলে তারা উপোষ কোরে, চুরি কোরে, ভিক্ষে কোরে কোন রকমে জীবন ধীপটু জালিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। তাদের কাছে খাদ্যদ্রব্য ছাড়া জীবনের অন্তকোন অর্থ নেই। তাদের কাছে জীবন এবং মৃত্যু সমান কথা। বর্তমান সভ্য জগতে এটাই মানব জীবনের সর্ব নিম্ন স্তর। এখানে, নামলে মাছ আর মাছ থাকে না। মায়া মমতা, লজ্জা-ভয়, এমন কি হিংসা ঘৃণাও লোপ পেয়ে যায়। তবুও ভূত-পেয়ী, বর্গ-মরক, বৈবহু কৈলাসের ধারণা তাদের ছেড়ে যায় না। তারাও ছাড়তে পারে না। হর-পার্বতীর সংস্কারকে। এ কারণেই তারা দুটো জগন্নাথ হয়ে আছে। শূন্যের আ-কিউ অবলম্বনে রচিত চেননার 'জগন্নাথ' দেখে ভারতীয় সমাজের বাস্তবতা বোকা না গেলেও থিয়েটার কমিউনের 'দানসাগর' বাস্তবতার এই তত্ত্বকেই উপস্থিত করেছে। বাস্তবতার সঠিক বিমূর্তায়ন (abstraction) বাস্তবকেই গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করে। সে কথা প্রমাণ করার জন্মই যেন দানসাগর নিয়ে থিয়েটার কমিউন হাজির হয়েছে।

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষেরা আবার বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। ভূমিহীন ক্ষেতমজুর শ্রেণীর সর্বনিম্ন স্তরের মানুষদের জীবনমাত্রা প্রাণালী বা সংস্কৃতিকেই দানসাগরে প্রচার করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী বাস্তবতার আংশিক প্রতিকলনই এ নাটকের সব। নাটকে এ ছাড়া অন্তকোন বস্তব্য নেই। কেন গ্রামাঞ্চলে এমন অবস্থা এখনও রয়েছে সে সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ইংগিত থাকলেও সমস্ত সমাধানের কোন অপ্রচ্ছন্ন নির্দেশ এ নাটকে নেই। এ কারণেই নাটকটি সত্যনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পেরেছে। পথহীনতার মধ্যে সে কোন ভুলপথের নির্দেশ দেবার চেষ্টা করেনি। দানসাগর একদিকে কলকাতার ভ্রান্ত-মাজিত-মহাবিশ্ব দর্শকদের পুরনো মূল্যবোধে কথাবাত করেছে গেছে অন্ধদিকে নতুন কোন মূল্যবোধের জন্ম দিয়ে দর্শকদের আকৃত করতে পারেনি। যে শিল্প

সাহিত্য শ্রেণীগত সামাজিক সমস্ত নিয়ে দর্শকদের কেবল ভাবাতে পারে, সমস্ত সমাধানের কোন ইংগিত বহন করতে পারে না, তা বতই রসোত্তীর্ণ হোক না কেন রাজনীতি সচেতন নয়। দানসাগরে শ্রেণীগত বাস্তবতা থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক সচেতনার কোন পরিচয় নেই।

নাট্যকার পরিচালক অভিনেতা কলাকুশলী সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় মধ্য দিয়েই একটি নাটকের বস্তব্য সার্থক হয়ে উঠতে পারে। বস্তব্য প্রকাশে বিঘ্ন না ঘটালে আদিকের ভুলত্রুটি এবং অপ্রাচুর্যের জন্ম কারো কিছু বলার থাকে না। দানসাগরে 'দাই বুদ্ধি' প্রবেশ মেধোর জীর মৃত্যু এবং দাই-বুদ্ধির প্রস্থান সব মিলিয়ে একটা ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে বস্তবাদী দর্শকের কাছে এটা বিস্ময় তৈরবে। এ সম্পর্কে পরিচালকের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। একটি বুদ্ধকে দেখলেই বোকা যায় সে জীবিত না মৃত। কোন জবা গাছের মধ্যে রসের অবশিষ্ট থাকলেও তার মধ্যে প্রাণ খোঁজার কোন অর্থ হয় না। একটি জীবন্ত গাছের মধ্যে বরাডাল শুকনো পাতা থাকতেই পারে, তাতে তার সজীবতা হ্রাস হয় না। দানসাগর সজীব না হলেও মৃত নয়। যীত তার সমস্ত সমাধানের সঠিক পথটি খুঁজে পেলেই দানসাগর সজীব হয়ে উঠতে পারতো। সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবেই দানসাগরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নি। আশা করি থিয়েটার কমিউন আগামী দিনে নিশ্চয় জীবন্ত নাটক উপস্থিত পারবে।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

৥ চাঁদার হার ৯

বার্ষিক ২২ টাকা

বাৎসরিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫.৫০ টাকা

টাকা কাড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠাবার ঠিকানা:

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, মট লেন। কলিকাতা ১৩

ইন্দিরা গান্ধির ক্ষমতারোহণ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

নিজস্ব শক্তির উৎস রূপে স্বাভাবিক রাজনৈতিক খাতের বহির্ভূত তিনটি আধা সামরিক বাহিনী, গুপ্ত-চরসংস্থার উপরে অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে রাজ্য সরকারগুলিকে উত্তোগ গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রমাণ পাওয়া গেল ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের যে প্রক্রিয়া তিনি চালু করেছিলেন। ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৫-এর মধ্যে পুলিশ বাজেট দ্বিগুণ হল এবং বাম, ডান ও মধ্য সব বিরোধী দলগুলির সঙ্গে পুলিশের সম্মুখ সংঘর্ষ হল। ১৯৭১ সনের শেষে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট (কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে পৃথক) পার্টিতে পুলিশী মোকাবেলার মাধ্যমে দুর্বল ও ছিম-ভিন্ন করে দেয়া হল। ১৯৭৪ সনে রেল ধর্মঘট এবং জরুরীকালের মেতুৎ বহুদলীয় অহিংস আন্দোলনকে দমন ও ব্যর্থ করতে পুলিশকে ব্যবহার করা হয়েছে। এই সব সম্ভব হয়েছিল ১৯৭১ সনে বিধিবদ্ধ একটি আইনের সাহায্যে যা সরকারকে ছয়মাস পর্যন্ত যে কাউকে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও আটক রাখার ক্ষমতা দিয়েছিল। জরুরী অবস্থায় এই মেয়াদ বেড়ে হয়েছে দু বছর।

তার পারিবারিক খ্যাতির তুলনায় ইন্দিরা গান্ধি যখন প্রধান মন্ত্রী হলেন তখন তার সম্বন্ধে লোকের জানাশোনা এত আশ্চর্য বকমকম ছিল যে, পরবর্তী প্রচলিত রাজনৈতিক পদ্ধতি থেকে যত

জেলের কয়েদী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

খাড়া ১ মোটা ৩ পোকা চালের ভর্তি ভাত, এত পাতলা কুটি বেঁ মনে হয় হাওয়ার উড়ে যাবে, আর বেগুন ও কুমড়া আঁষাদের প্রধান খাদ্য।

এটা সাধারণ অভিজ্ঞতা যে, মুক্তির আদেশ পেলেও গেটের কাছে গিয়ে আটক থাকতে হয়। কিছু অর্থ খরচ করলে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

সাধারণ কয়েদীদের কাছে নতুন প্রলোভন যাকে বলা হয় “খাসি আন্দোলন,” অর্থাৎ নির্বীজকরণ যুক্তহীন সুব্রাহ্মণ্য বা পয়সা করেছে। গত বছর যারা নির্বীজকরণে রাজি হয়েছে তারা ২০ কাটা এবং জেলের মেয়াদে ছাড় পেয়েছে। এখন তাদের দেওয়া হয় ১০০ টাকা। এদের মধ্যে পাওয়া যাবে বুদ্ধ ও তরুণ, বিবাহিত ও অবিবাহিত।

হয়ত এসবই একদিক থেকে শুভ। এর মধ্যে দিয়ে ইম্পাত কটিন হচ্ছে, বহু অজানা দেশপ্রেমিক তাদের চেতনায় শান দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

বার তিনি সরে এসেছেন তত বারই জনসাধারণ তার আচরণে চমকে গেছে। ব্যক্তিগত ব্যবহারে তিনি ছিলেন সতর্ক, দুর্বর্তিনী এবং স্বল্পবাক। যে প্রচলিত শিক্ষার সুযোগ তিনি পেয়েছেন তার কোন ছাপ তার ব্যবহারে ছিল না। লোকে তাকে জানত দুই পুত্রের জননী এবং স্বাধীনতার পরে নয়। দিল্লীতে তার পিতার গৃহকর্তা এবং সজিনী রূপে। ১৯৬০ সনে তিনি বিধবা হন এবং তার বিবাহিত জীবনের অধিকাংশও তিনি স্বামীসহ বেসরকারী ভাবে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। পারিবারিক মহলে তিনি ছেদী এবং বদমেজাজী বলে পরিচিত হলেও ১৯৬৬ সালে কংগ্রেস দল তাকে প্রধান মন্ত্রীর মনোনয়ন দিয়েছিল এই বিশ্বাসে যে, তিনি ব্যক্তিগত অহমিকাবিসর্জন দেবেন, উপদেশ গ্রাহ্য করবেন এবং তাকে সামলানো যাবে। পিতার ধীশক্তি, দীর্ঘস্থায়ী বহু-বাৎসল্য বা মেহপ্রবণতা তার নেই। তার চরিত্রের এই সব দোষ তার দাবির স্বপক্ষে গুণ বলে পরিগণিত হয়েছিল। কংগ্রেসে যখন একতার প্রয়োজন হয়েছিল তখন দলের নেতৃত্ব একজন বৈধবশীল সহযোগীকে খুঁজছিল।

তার গণতান্ত্রিক সুপারিশ-পত্রের কথা তখন কেউ ভাবেনি। ১৭ বছরের নেহরু আমল এবং তার উত্তরসাধক শাসক লালবাহাদুর শাস্ত্রী ১৯ সালে ভারতীয়রা মুক্ত রাজনৈতিক রীতিনীতি এবং বিতর্ক ও মতপার্থক্যের পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, ভারতীয় নেতা হওয়ার মানে হল এই সব মূল্যমানকে শ্রদ্ধা করা। এছাড়া ইন্দিরা হলেন নেহরুর কন্যা এবং নেহরুর গণতান্ত্রিকতা সর্বজনবিদিত। তাঁর রাজনৈতিক ভাবধারা, ব্যক্তিগত রুচি, শক্তি ও দুর্বলতার পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে, তার বইয়ে ও বক্তৃতায়, ছড়িয়ে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে ও পরে তার ঘটনাবলি লোকদৃষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রতি পর্বে।

একটি গুণ ছিল চরিত্রের সকল গুণের উপরে—অপটের মতামতকে নেহরু শ্রদ্ধা করতেন। জাতীয় বীর হিসেবে দেশবাসীর যে পূজোপম শ্রদ্ধা তিনি পেয়েছিলেন তাতে একমাত্রক হওয়ার ইচ্ছা থাকলে তার জন্ম আছিল বা সুযোগ তিনি তৈরি করতে পারতেন। কিন্তু নিজের ধ্যান বিশ্বাস অহুসারে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ শাসনের পথই তিনি বেছে নিয়েছিলেন; নেতৃত্বকে তিনি স্বাধীনতার

মধ্যে জনসাধারণের বিকাশের স্তম্ভ সম্পদ রূপে গ্রহণ করেছিলেন যতদিন না তারা নিজেরা তাকে রক্ষা করার মত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে-কংগ্রেস দল শ্রীমতী গান্ধিকে নেত্রী রূপে উন্নীত করেছিল এবং জনসাধারণও তা মেনে নিয়েছিল। আজ যারা তার সঙ্গ ভাগ করেছেন তারা মনে করেন এই বিশ্বাস তিনি ভুল করেছেন।

এই মাসের নির্বাচন হচ্ছে জরুরী অবস্থার আওতায়। প্রেস সেন্সরশিপ স্থগিত হয়েছে কিন্তু সংবাদমন্ত্রী বলেছেন যে, সংবাদপত্র দেশের আইন অস্বাভাবী চলবে বলে আশা করা হবে। এই সব আইনের একটি হল জরুরী অবস্থার আওতায় রচিত একটি আইন যার দ্বারা সরকার যাকে ‘আপত্তিকার বিষয়’ মনে করেন তার প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সংক্ষেপে ‘শ্রীমতী গান্ধি এবং তার মন্ত্রীদের সমালোচনা এবং ঐ ধরনের আরো কিছু বিষয় দণ্ডনীয় অপরাধ। সাম্প্রতিক এক সাংবিধানিক সংশোধনের বলে সরকার ‘জাতিবিরোধী’ কার্য-কলাপ এবং সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার অবাধ ক্ষমতা পেয়েছে। জরুরী অবস্থার পরে আইনে যে সব পরিবর্তন করা হয়েছে তার ফলে জেলের ভেতর যে সব হাজার হাজার ‘রাজনৈতিক বন্দী’ আছেন তাদের হয়ত অপরাধী বলে ব্যাখ্যা করা হবে। নামকরা কয়েকজন নেতার মুক্তি থেকে জেলের ভেতর হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীর মুক্তি সম্পূর্ণ পৃথক প্রশ্ন কেননা এদের উপরেই একটা দলের নির্বাচনী প্রস্তুতি নির্ভর করে। সরকারের হাতে এখনো রয়েছে খামখেয়ালী গ্রেপ্তারের অস্ত্র। মতপ্রকাশের এবং রাজনৈতিক কাজ করার স্বাধীনতা আজ একজিকিউটিভের স্বাধীন উপর নির্ভরশীল। গত বছর যে সব সর্বগ্রাসী সংশোধন পাশ করা হয়েছে তার ফলে একজিকিউটিভ মানে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী যিনি সংসদ বা দেশ কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।

তবে বিরোধী দল এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। এদের একাংশ এখনো বেআইনী-ঘোষিত, অপরাধ গত ২০ মাসের গ্রেপ্তার, হয়রানি এবং সেন্সরশিপের দ্বারা বিপর্যস্ত; এই চ্যালেঞ্জ নেওয়ার ভিত্তি হল এই যে, এই অবস্থায়ও তারা লড়াই করতে পিছ পাবে না। ঘটনাক্রমে প্রমাণ যে, এই প্রচেষ্টা নিরর্থক নয়। ২৬শে জুন ১৯৭৫ যে পদ্ধতিকে খামিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বহু দল মিলে যে জনতা দল গঠিত হয়েছে তার আকর্ষণ আজ এমন দুর্বল যে, হাজার হাজার মানুষ মাইলের পর

মাইল পায়ে হেঁটে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে শ্রীমতী গান্ধির বন্দীদের বক্তব্য শুনেছে। কংগ্রেসের মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত বিদ্রোহটি আজ ঘটেছে। জগজীবন রায় পদত্যাগ করে কংগ্রেস ফর ডিমোক্রাসি নামে দলগঠন করে বিরোধী দলে যোগ দিয়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণার প্রাক্কালে, ঘটনীয় ভাবনাকে সম্পূর্ণ করলেন।

আজকের বিচার্য প্রশ্নে দুটি কথাই এসে দাঁড়িয়েছে—স্বাধীনতা বনাম দাসত্ব এবং এই আওয়াজ আজ অগণিত শোষিত, মাহুষের সমর্থন লাভ করেছে; আদালতের ক্ষমতা নষ্ট করে আমি সম্পত্তি মামলা ফয়সালায় তার সরকার মনোনীত ট্রাইবুনালের হাতে দেওয়ার আগে যে চাচার শেষ বিচারের আশায় আদালতের দিকে চেয়ে থাকত; কারখানার শ্রমিক বার ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে; যে সব ফেরিআলা এবং দিন-মজুরদের তাদের বাড়ীঘর থেকে হটিয়ে দিয়ে জলহীন, কর্মহীন ও বানবাহন-হীন এলাকায় জ্বররুদ্ধি ঠেলে দিয়ে নালবন্দির জুলুম করা হয়েছে; জরুরী অবস্থার পরবর্তী ক্রমবর্ধমান জরাজয়ন্ত বৃত্তিতে বিপর্যস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাদের কাছে একমাত্র খাদ্যশস্ত্র ছাড়া আর

সবই নাগালের বাইরে এবং এই খাদ্য-শস্ত্রের কৃতিত্বও যতটা সৃষ্টির ততটা সরকারের নয়।

দেশের স্বাধীনতার জন্ম যারা সংগ্রাম করেছেন তাদের যত্না এবং যৌহুতিক প্রতীকিত হয়েছে যখন নেহরুর ভগিনী শ্রীমতী বিধয়লক্ষ্মী পণ্ডিত (শ্রীমতী গান্ধির পিসী) বিরোধী বিরোধী দলে যোগ দিলেন। ১৯৬৮ সনে সংসদসভার পদ ত্যাগ করে রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পরে তার ভ্রাতুষ্পুত্রী কার্য-কলাপ সম্বন্ধে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কোন মন্তব্য প্রকাশে সতর্ক ভাবে বিরত থেকেছেন যদিও বিগত কয়েক বছরে দেশে যে প্রভুত্বপ্রবণতা দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে তার মতামত সুবিদিত ছিল। চারিদিক থেকে ফেটে পড়া ভাবাবেগের সময়ে তাঁর রাজনীতিতে - প্রত্যাবর্তনের দ্বারা একধাঁই বোকা যাচ্ছে যে, ভারতকে আবার সত্য মূল্য-বোধে ফিরে যেতে হবে ফিরে যেতে হবে সেই মূল্যমানে যার প্রতিনিধি ছিলেন জবাহরলাল নেহরু এবং যার প্রতিনিধিত্ব করেন না ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে বর্তমান কংগ্রেস দল।

এ কে গোপালন

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

এ কে গোপালনের মৃত্যুতে ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে আর একটি ইলুপতন হল। ১৯২১ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে এ কে গোপালন দেশপ্রেমিক আন্দোলনে কাঁপিয়ে পড়েন। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে গোপালন একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ১৯৩৯ সালে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৫১ সালে ঐ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। ১৯৫৮ সাল থেকে তিনি ছিলেন পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। ১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগাভাগির পরও তিনি পার্টির বাম অংশের যা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি রূপে পরিচিত হয় তার পলিটব্যুরোর সদস্য হন। ১৯৫২ সাল থেকে পঞ্চম লোক লোকসভা পর্যন্ত দীর্ঘ ২৫ বছর তিনি লোকসভার সদস্য ছিলেন; তাঁর স্ত্রী সুনীলা গোপালনও এক সময় লোকসভার সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া গোপালন গত দু দশক ধরে সারা ভারত কৃষক সভার সভাপতি ছিলেন।

রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই গোপালন কৃষক আন্দোলনের মধ্যে নিজেই জড়িয়ে ফেলেছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কৃষক সাধারণকে সেবা করে গেছেন। গোপালনের জীবন শত শত সংগ্রামের ইতিহাস। ব্রিটিশ আমলেও তিনি যেমন শত শত গণ সত্যাগ্রহ অভিযান সংগঠিত করেছিলেন তেমনি কংগ্রেসী আমলেও। গোপালন মনে করতেন যে, ব্যাপক মাহুষের অংশ-গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রকৃত রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। বৈরাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে এটাই মোক্ষম অস্ত্র। এজন্মে ব্যক্তিগতভাবে গোপালনকে বহুবার কারাবাস, নির্বাসন ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় প্রাণ অবিচল থেকে হাসি মুখে সমস্ত কিছু সহ্য করেছেন। গোপালনের চরিত্র, সারল্য জনপ্রিয়তা মহাত্মা গান্ধীর কথা মনে করিয়ে দেয়; কেরালার মাহুষের কাছে তিনি ছিলেন কেরালার গান্ধী। তাঁর মৃত্যুতে ভারত প্রকৃত এক নেতাকে হারাল যখন ভারত নির্মাণে তাঁর নেতৃত্ব বড় প্রয়োজন ছিল।

বরখাস্ত শিক্ষকের বক্তব্য

গত ১৪ই জানুয়ারী তারিখে দর্পণে প্রকাশিত 'জনৈক শিক্ষকের চাকরি বন্ধন...' শিরোনামীয় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা বারুইপুরের শিক্ষক এ বং বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। আর এইভাবে নিজেদের মুখোশ খুলে পড়ায় প্রচণ্ড অস্থির এবং উদ্ভাদ হয়ে গেছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালক সমিতি। উদ্ভাদনার দৃষ্টান্তরূপ আমি পুনরায় নিম্নলিখিত ঘটনার প্রতি পত্রিকার পাঠক, বিশেষতঃ শিক্ষক ও ছাত্র-কিবহাল মহলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

সবল বিশ্বাসের স্বযোগে নিয়োগ-পত্রটি চেয়ে নিয়ে আমাকে চাকরি থেকে যেভাবে চক্রান্ত করে বরখাস্ত করা হয়েছে, তা পড়ে সহ্যহুঁতশীল ভক্ত বিবেকসম্পন্ন যে কোন মানুষ আমার বর্তমান মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে তা নিশ্চয় কিছুটা অনুমান করতে পারেন। অজ্ঞানভাবে হঠাৎ বরখাস্ত-পত্র পাওয়ার পর থেকে আমি আজ প্রায় ছমাস মারাত্মক অস্থিরে ভুগছি। বর্তমানে আমি ব্যক্তিগত ভাবে বার বার বিশেষ অনুরোধ করা সত্ত্বেও বিদ্যালয় বৃত্তপক্ষ আজও পর্যন্ত আমার প্রাপ্য বেতনাদি সম্পূর্ণ পরিশোধ করেন নি। আমি না কেন? ক্রমতাবস্থায়, বিদ্যালয়ের অন্ততম শিক্ষক প্রতিনিধি শ্রীজ্যোতির্ময় দত্ত (প্রধান শিক্ষক শ্রীবিজয়পদ সরকারের প্রধান চাটুকার) গত ১-৩-৭৭ তারিখে হঠাৎ আমার সংগে দেখা করেন এবং

প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক শ্রীতিনিকড়ি মিজের বিশেষ অনুরোধের কথা উল্লেখ করে আমাকে একটি পদত্যাগ পত্র লিখে দেওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন। আমি না। প্রায় সাত মাস আগে যে শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়েছে, তাকে আবার হঠাৎ এতদিন পরে পদত্যাগপত্র লিখে দিতে বলার কারণ কি? আমার পদত্যাগ পত্রের প্রয়োজন কি এখন আইন রূপ আয়ান ঘোষের লাঠি ঠেকাতে, না ভদ্রপন্থার সামনে হঠাৎ মুখোশ খুলে পড়ায়, মহামান্য সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষকের অনাবৃত্ত মুখ দেখানোর অহবিধে দূর করতে?

প্রসঙ্গত ভাবতে হয়, একজন শিক্ষক প্রতিনিধি হয়ে জ্যোতির্ময় দত্ত এই প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এসেন কি করে? তার এই নগ্ন এবং নিলজ্জ চাটুকারিতার প্রকৃত কারণ কি?

দরিদ্র, অল্পমত তপসিলী সম্প্রদায়-ভুক্ত একজন শিক্ষক নাগরিক হিসেবেই সরকার, বিশেষতঃ শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার বিনীত জিজ্ঞাসা: সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে আমার চাকরিটা কি আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না?

কণিষ্ণপ সরকার

বরখাস্তকৃত শিক্ষক

রামনগর উচ্চ বিদ্যালয়

বারুইপুর, চব্বিশ পরগনা

কংগ্রেসে সঙ্কট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং কংগ্রেসী মহানরা যেভাবে সি পি এম কর্মীদের ওপর হামলা করে শত শত সি পি এম কর্মীকে হত্যা করেছে তাতে পরিস্থিতি রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আগামী রাজ্য বিধান সভা নির্বাচনে বামপন্থীজোটের সঙ্গে জনতা পার্টি ও গণতন্ত্রী কংগ্রেসের আঁতাতের সম্ভাবনায় দেশবন্ধু-দোহিত্র প্রচণ্ড আতঙ্কিত। কারণ এই মোর্চা যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে তাঁর সমস্ত অপকর্মের কাহিনী ফাঁস হয়ে যাবে এবং মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য ও নেতা সহ তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। কেন দ্বিতীয় হুগলী সেতুর কাজ কয়েক বছর পিছিয়ে গিয়ে লোকসানের পরিমাণ বাড়ল, কেন সিদ্ধার্থ রায় বিচারপতি ওয়াক্ফর স্থাপন কাটছাঁট করে তাঁর পেরারের মজী-দের নাম তদন্তের আওতা থেকে বাদ দিলেন—এসব সম্পর্কে তদন্ত হলে তিনি বাঁচবেন কি করে?

একথা নিশ্চিত যে, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার বেশিদিন টিকবে না। তাই সিদ্ধার্থ রায় চেষ্টা করছেন আগামী রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচনে সি পি এমকে অস্ত্র হাল থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। তিনি জনতা পার্টি, গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও কংগ্রেসের মধ্যে নির্বাচনী জোটগঠনের সুখস্বপ্ন দেখছেন। দিল্লী গিয়ে তিনি এ ব্যাপারে আরও অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবেন। আর আশ্চর্যের কথা, সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে যে-আনন্দবাজারের তিফ্ত সম্পর্ক, যারা তাঁর সরকারের হাতে অল্পসী অবস্থায়

লাঞ্ছিত হয়েছে সেই আনন্দবাজারও একই প্রেষ্টী চালাচ্ছে।

আনন্দবাজারের মালিক ও সূত্রবাহিকরা রাজনৈতিক মতলব হাসিল করার জন্য মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেছে। তারাও সি পি এম ছুঁড়র ভায় ভীত, তাই সি পি এমকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে।

কিন্তু সিদ্ধার্থ রায় ও আনন্দবাজার যতই চেষ্টা করুক বামপন্থী জোট, জনতা পার্টি ও গণতন্ত্রী কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ আনি শক্ত ব্যাপার। বিজয় সিং নাহার সিদ্ধার্থ রায় ও তাঁর বশ-বশব্দ ছাত্র পরিষদের হাতে অনেক অপমান সহ্য করেছেন। তিনি সৈন্যবলেন নি। অতএব তিনি পশ্চিম-বঙ্গে কংগ্রেসকে কখনই পুনর্জীবন লাভ করতে দেবেন না। প্রফুল্লচন্দ্র সেনকেও ভাঙানো শক্ত। তিনি সিদ্ধার্থ রায়কে হাতে হাতে চেঁচেন।

নিজের দলের মধ্যেও সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্কটজনক অবস্থা। পশ্চিম-বঙ্গে কংগ্রেস দলের বিপর্যয়, তরুণ কান্তি ঘোষের মন্ত্রিসভা থেকে বিনায় গ্রহণ ও নির্বাচনে রিগিংয়ের অভিযোগ—এসব ঘটনায় পরিবর্তনপন্থীদের তৎপরতা অনেক বেড়ে গেছে। ফলে কংগ্রেস দলে অনৈক্যও অনেক জোরদার হয়েছে। আগে রাজ্যের কংগ্রেসীরা গোষ্ঠী কৌদল মীমাংসার জন্ত দিল্লীতে "মহান নেত্রী" কাছে ছুটতেন এবং তিনি যা দাওরায়ী বাতলাতেন তাঁর অচরিতরা তাই মেনে নিতেন। কিন্তু মুন্সলিমল, নির্বাচনে কংগ্রেস এবং "মহান নেত্রী" ও "জাতীয় নেতা"র ভ্রাতৃত্বের পর ইন্দিরা গান্ধীর হাত শক্ত করার শ্লোগানের পরিবর্তে তাঁরা নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই ঝিঞ্জোহ দেখা দিয়েছে। চক্রজিৎ বাদলের বাড়িতে ১২৫ জন এম পি ও এম এল ও সভা করে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের সমালোচনা করেছেন। বংশীলালের বিরুদ্ধে চরম বিদ্বেষ। কেউ দেব-কাজ বড়ুাকে হঠাৎ চাইছেন। কেউ আশর বলছেন যুগ কংগ্রেস সংগঠন ভেঙ্গে দেওয়া হোক। বংশীলাল ওরা ওম মেহতা স্বয়ং গান্ধী—এই "চায় ফুচকী"র বিরুদ্ধে অনেকেই এখন সরব। এট ঘোষণা হলে অনেকেই আবার মন্থা শিকারে ব্যাপ্ত। অর্ধাঙ্গী সোমী পদত্যাগ করায় প্রিয় দাসমুখী দেবকান্ত বড়ুয়ার রূপায় তাঁর হস্ত আসন ফিরে পেরেছেন। তিনি থোয়াব দেখছেন আগেকার ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার। কিন্তু এটা ১৯৭৭ সাল, ১৯৭১-৭২ সাল নয়। আর সময়কে পেছন দিকে ফেরানো যায় না।

দিল্লীতে কংগ্রেস দলের এই অস্থিরতা সঙ্কট পশ্চিমবঙ্গেরও স্পর্শ করেছে। মন্ত্রিসভায় এখন তুণুল বিরোধ। সিদ্ধার্থ রায় পরিবর্তনপন্থী অর্থাৎ বরকত গণিধান চৌধুরী আব-ছদ সান্তার ইত্যাদিদের স্তোকবাক্য দিয়ে ঠাণ্ডা করতে চাইছেন। তারা ঠাণ্ডা হবার পাজ নন। তরুণকান্তিও চূপচাপ বসে নেই। তিনি হিসেব না করে পদত্যাগ করেছেন বলে মনে হয়

স্পীকারের গাড়ী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

টাকাপয়সা নিয়ে ট্যাক্সি করে পুলিশ বলে পরিচিত ব্যক্তিরা সরে পড়ে। খবরটি পরে লিলুয়া থানায় যায়। তদন্ত শুরু হয়। তদন্তকারী অফিসারের কাছে জনৈক ড্রাইভার খীকারোক্তি করেন। অজ্ঞাত যারা এ সম্পর্কে জবানবন্দী দেন তাতে তারা বলেন, এই ঘটনার নুপেন হল নায়ক। তারই কারসাজিতে সংশ্লিষ্ট কারখানায় পুলিশের লোক হিসেবে পরিচয় দিয়ে একজন লোক জোর করে টাকা আদায় করতে বাধ্য। পুলিশ এই সব জবানবন্দীর ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির কয়েকটি ধারায় একটি মামলা রুজু করে। লিলুয়া থানায় এর নম্বর হল ১ (৩) ৭৬।

পুলিশ এই থানায় আরও একটু এগিয়ে গিয়ে জানতে পারে ট্যাক্সির ভেতর পুলিশের পোশাকপার লোকটি হাওড়া জি. আর, শি-র একজন এ, এস, আই। তিনি সম্পূর্ণ নিয়ম বহি-ভূত ভাবে এই থানায় কিছু বাগিয়ে নেবার ধান্দায় নুপেনের ষড়যন্ত্রে অংশীদার হন। তদন্তে প্রকাশ পায় যারা এই ঘৃণ্য প্রতারণার সংগে রয়েছে তাদের প্রায় প্রত্যেকেই স্পীকার অপূর্ব-ব্যবুর অংশে রয়েছেন। পুলিশ এ ব্যাপারে আরও এগুতে কিছুটা বিধা-গ্রস্ত হয়ে পড়ে। তবুও জেলার তৎ-কালীন পুলিশ সুপার সর্দার ভট্টা-চার্যের হাত ঘুরে বিষয়টি ডি, আই, জি রথীন ভট্টাচার্যের কানে গিয়ে পৌঁছয়।

সর্দারজীবাবু রথীনবাবু কাগজে কলমে বাই বলুন না কেন তারাও জানেন স্পীকার অপূর্বব্যবুর গাড়ী ও তার রাজনৈতিক পরামর্শদাতা নুপেন প্রতারণার ঘটনার সরাসরি জড়িত। এই অভিযোগে পুলিশ মামলাও করেছে। রথীনবাবু পরে এ নিয়ে একটি বৈঠকও করেন। কিন্তু তারপরে আর বেশীদূর এগোননি।

এখনকার খবর হল এই কেস বাতিল না ওঠে সেদিক উচু মহল থেকে বাধা-এসেছে। ইতিমধ্যে তা প্রায় ধামা চাপা পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু বিভিন্ন মহলের জোরদার দাবি: বিধানসভার অধ্যক্ষের সরকারী গাড়ী ও তার বিধিত সাক্ষেদ নুপেন সম্পর্কে যে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে অবিলম্বে সে সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী তদন্ত শুরু করুন।

না। তাঁর কোন একটা হিসেবআছে আর তিনি সেটা মেলাতে তৎপর। হুতরাং এখন ঘটনার পরিপত্তির জন্ত দিল্লী ও কলকাতা হুদিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে।

কেয়া চক্রবর্তীর মৃত্যুর ব্যাপারে গ্রেপ্তার

(দর্পণের সংবাদমন্তব্য)

শেষ পর্যন্ত 'জীবন যে রকম' ছবির পরিচালক ও তার-ইউনিটের অস্ত্রান্ত ৮ জন পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। পরিচালক স্বদেশ সরকার ও প্রযোজক ভরত নন্দী অবস্থা খারাপ বুঝে সিটি সোসানস্ কোর্টে অগ্রিম জামিন নিয়েছেন।

দুজন ক্যামেরাম্যান, দুজন সীতারু ও মেকআপ ম্যান সমেত আরো ৭ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সকলেই এখন জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। আগামী ৭ই এপ্রিল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তাঁদের বিচার হবে।

পুলিশী সূত্রে জানা গেছে যে, স্বদেশ সরকার অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তীকে নির্ভয়ে জলে কাঁপ দিতে বলেন এবং তিনি বধ্যভূমি কাঁপ দিলে দুজন সীতারু তাঁকে ধরে রাখতে পারেন নি। বড়বড়, প্রমাণ লোপের চিহ্ন ও মিথ্যা বিবৃতির জন্ত এই টিমের ১ জনকে গ্রেপ্তার করা

হয়েছে। এই টিমের অনেকে অভিযোগ করেছেন যে, খীকারোক্তি আদায়ের জন্ত তাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। তারা এই জন্ত পুলিশের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করেছেন।

২০শে মার্চ নান্দীকার কর্তৃক আয়োজিত কেয়া চক্রবর্তীর স্মরণ সভার স্বদেশ সরকার নিজে অথবা তাঁর কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। তুরূপা ওহর মৃত্যু রহস্যের মত কেয়া চক্রবর্তীর মৃত্যু রহস্যও যদি উদ্ঘাটিত না হয় তাহলে ধার নিতে হবে যে পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থা একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে।

শোনা যাচ্ছে 'জীবন যে রকম'র কামেলা মিটে না মিটে স্বদেশ সরকার তাঁর নোতুন ছবি, 'দ্বিধা' নিয়ে মেতে উঠেছেন।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বোস কলিকাতা ও থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৩১ মট লেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

ইন্দিরা-সঙ্কয়ের জন্য বেতারে দূরদর্শনে কত খরচ হয়েছে



বিশ্ব বর্ষ ॥ ১১শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, এপ্রিল ৮ই '৭৭ ৥ ৪০ পঃ

সামরিক শাসনের কল্পী হতে চেয়েছিলেন ইন্দিরা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নির্বাচনে তাঁর এবং দলের পরাজয়ে উদ্বলিত হয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দেশকে সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। দিল্লীর খবর, তিনি চাইছিলেন শাসনভার সামরিক বাহিনী হাতে নিক তাঁকে সর্বময় কর্তা হিসেবে রেখে।

বিপর্যয়ে থবর আসা শুরু হওয়া মাত্রই তিনি সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর কর্তাদের জেকে পাঠান এবং প্রস্তাবটি রাখেন। খানিক কণ নীরবতার মধ্যে কাটে তারপর নৌ ও বিমানবাহিনীর কারসেস্টজী ও মূলগাওকার বলেন, “আমরা এই প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নই।” সেনাবাহিনীর জেনারেল রাহনা তখন বলেন “আমার সত্যির্দেব বা মত আমারও সেই মত।” বৈঠক ভেঙে যায়।

পুরসভায় বর্গীর রাজত্ব

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা পুরসভার কেন্দ্রীয় জবনের তিন ডলার পার্সোনেল ভিপিআর্মেটে হঠাৎ দলিলপত্র পোড়ানোর ধুম দেখে কর্মচারীরা খুব ভীতুক বোধ করেছেন। মার্চের শেষের কয়দিন ঐ ডবনের দক্ষিণ দিকটি পোড়া কাগজ এবং ছাইয়ে ভর্তি হয়ে গেল।

গত সাধারণ নির্বাচনের পরই এই লালঝাড়িটি মন্তানদের আভ্যুত্থানায় পরিণত হয়। প্রফুল্লকান্তি ঘোষ কর্পোরেশনের শুল্ক পদে লোক নেওয়া বন্ধ রেখেছিলেন। নতুন মন্ত্রী স্বরূপবাবু আমলে মন্তানদের একেবারে পোড়া-বায়ে। চাকরি, কট্টাই, লীজ, জমি ইত্যাদি ব্যাপারে বর্গীর রাজত্ব চলতে থাকে।

চাকরির ব্যাপারে কংগ্রেসীদের

সেনাবাহিনীকে কাজে লাগানোর চেষ্টা আগেও হয়েছে। নির্বাচনের কিছুদিন আগে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বিভিন্ন শহরে মিলিটারী কট মার্চের নির্দেশ আসে। বলাকাতায় পূর্বাঞ্চলের সেনাপ্রধান জেনারেল জেকব তানান তিনি রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ছাড়া ওই আদেশ মানবেন না ঘটনা আর এগোয় না। ইন্দিরা গান্ধীর মতলব ছিল ওই কট মার্চের মাধ্যমে মাতবের মনে ভীতি সঞ্চার করা।

ইতিমধ্যে দিল্লী থেকে ইন্দিরাজীর্ হুর্নাতির আরও খবর এসেছে। জানা গেছে দিল্লীর কাছে এক বিরাট জমির তিনি বেনামদার। সেখানে খেত-মজুরদের সংগঠিত করার অপরাধে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরই শ্রীমতী প্যামেলা লুইসকে গ্রেপ্তার করা হয়।

(শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

দাবি বা প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু নিয়মকানুনের তোরাক না রেখে যোগ্যতার বিচার না করে যে সব লোক চোকান হয়েছে, দলীয় তাগিদ ছাড়াও তার পিছনে অন্য বাবের প্রেরণা ছিল বলে সন্দেহ স্বাভাবিক।

প্রমোশানের ব্যাপারে সংকীর্ণ গোষ্ঠী স্বার্থকে প্রস্তর দেওয়া এবং ঐ একই স্বার্থে বোগ্য অফিসারদের দাবি রাজনৈতিক ভাইনী সন্ধানের খাতিরে অগ্রাহ্য করে চামচা-শ্রেণীর লোকদের পদোন্নতি ঘটান এই কয় বছরের কুর্কর্মে অন্ততম। এর সঙ্গে সহযোগিতা করে লাভবান হয়েছে কতিপয় চামচা-শ্রেণীর ইউনিয়ন-নেতার মুখোশ-ধারী ভাগ্যাবধী। এদের যথেষ্টাচার

(শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পঁচাত্তরের ২৬শে জুন থেকে বিগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা বৈরাচ্যবিতার পূর্ণাঙ্গ যুষ্টি ধারণ করার পর তিনি এবং তাঁর পুত্র শ্রীমান সঙ্কয়ের ২০ দফা ও ৫ দফা কার্যযুচী এবং তাঁদের বক্তৃতা, ভ্রমণ ও বিবৃতি বাবদ সরকারী প্রচার মাধ্যম বেতার ও দূরদর্শনে কত ব্যয় হয়েছে, নব নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে তা তন্ন করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় বেতার ও তথ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন বেতার ও দূরদর্শন কেন্দ্রগুলির কাছে এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।

সপ্তাহ দেড়েক আগে প্রেরিত এই নির্দেশ অচ্যবাহী অনেক বেতার ও দূরদর্শন কেন্দ্র ইতিমধ্যেই এই রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সংগঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এল, কে, আদ্বানি সম্ভবত লোকসভায় কোন বিতর্কহুজে এই ব্যয়ের তালিকা দাখিল করবেন।

বিগত সরকারের জনবিরোধী কর্মকাণ্ড উদঘাটনে বর্তমান সরকার যে স্যবস্থা নিচ্ছেন, এটি তারই অঙ্গ।

জরুরী অবস্থার সময় দূরদর্শন ও বেতার কর্মীদের দিয়ে ভূয়া অগ্রগতির ২৫ দফা কার্যক্রম নিয়ে ঘাড়ে ধরে যে কাজ করানো হয়েছে, তার আর্থিক খরচ অস্বাভাবিক এমন কিছু শক্ত নয়।

যেমন শ্রীমান সঙ্কয় বখন ‘এশিয়ার যুবসুখ’ রূপে প্রথম একদিনের জন্ত পশ্চিম দিকের এলেন, সেটা ছিল তার ঝটিকা ভ্রমণ।

সারাদিনে কম করে ৮টি আয়গার তিনি বৈঠক মিটিং করেছেন। কলকাতার বেতার ও দূরদর্শন সেই যে

তাঁর আগমন মুহুর্তে থেকে তাঁর পেছন ধরেছিল, সেদিন ঘোর সন্ধ্যার ভাঙে বিদায় দিয়ে তবে তাদের ছুটি।

বিশেষ করে দূরদর্শনের দর্শক মাঝেই জানেন, সেদিন সঙ্কয়কে নিয়ে কি কাণ্ডটাই হয়েছে। দশ মিনিটের আয়গার ১৫ মিনিটের সংবোধে তাঁর জমাগত ছবি দেখানো হয়েছে। কোথাও ২১ বছর বয়স সঙ্কয় ২১টি পায়রা উড়িয়েছেন, প্রবল তৃষ্ণার ভাব

থেকেছেন, রাজ্যের কংগ্রেস নেতা শিক্ষক বুদ্ধিজীবির সংগে বৈঠক করেছেন, কোথাও হেসেছেন, এখানে সেখানে কর্মদর্শন করেছেন, মঞ্চে মঞ্চে গলাবাজি করেছেন, স্তাবকেরা তাকে মালা পরিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর পুত্র হিসেবে একজন আকস্মিক আবিষ্কৃত যুবনেতা দূরদর্শনে এই রকম ‘কভারেজ’ পেয়েছেন।

(শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

স্পীকারের কেলেকারীও

তদন্ত করতে হবে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

স্পীকার অপরূপাল মজুমদার ও তাঁর সাদপালদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত কয়েক দফা গুরুতর অভিযোগ এখন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের গোচরে আনা হচ্ছে। এ ব্যাপারে স্পীকার সম্পর্কে যাবতীয় অভিযোগ ও তার সাক্ষরেদ নুপেন মজুমদারের নানা অশকীতির বিস্তারিত তথ্য স্মারকলিপি আকারে তৈরীর কাজ শেষ। জানা যায় রাজ্যের বিশিষ্ট কয়েকজন নেতার কাছেও এই সব অভিযোগের কপি

পাঠানো হবে। এই স্মারকলিপির সংগে থাকছে রাজ্য বিধান সভার জনৈক মহিলা কর্মীর সংগে নুপেনের লীলাখেলার দৃশ্য।

স্মারকলিপিতে দাবী করা হয়েছে—মুখ্যমন্ত্রী, ই, এম, সি, কারবানার সংগে রাজ্য বিদ্যায় দপ্তরের লেনদেন সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। অতীত কয়েকটি ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রতিপক্ষ গোষ্ঠীকে চিঠি করার ভ্রম (শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

প্রফুল্লকান্তি ঘোষ রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি হতে চাইছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

খাজুরদী প্রফুল্লকান্তি ঘোষ (শতবার) প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার জন্য শেষ চেষ্টা করছেন। জানা গেছে এ ব্যাপারে তিনি সিদ্ধার্থ রায় এবং তাঁর গোষ্ঠীর সমর্থকদের সমর্থন পাবেন। তাছাড়া তিনি বিরোধী গোষ্ঠীর সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করছেন। এ ব্যাপারে তিনি তরুণকান্তি ঘোষের সঙ্গে কথা বলেছেন যাতে তাঁর ও তাঁর গোষ্ঠীর সমর্থন পান। কিন্তু তরুণবাবু এ ব্যাপারে তাঁকে কোন রকম সাহায্য করতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন।

এতে শতবার দমবার পাজি নম। তিনি দিল্লীতে গিয়ে সভাপতি ঘেঁষকাত বড়ুয়ার সঙ্গে কথা বলেছেন। সংসদে চলে সাআনোর প্রয়োজনের কথা তিনি সভাপতিকে বুঝিয়েছেন। এ ব্যাপারে তার হাত শক্তিশালী হবে বলেও আশাস দিয়েছেন।

জানা গেছে সর্বভারতীয় কংগ্রেসী রাজনীতির গোষ্ঠীস্বত্ব পরিপ্রেক্ষিতে তার নিজ গোষ্ঠী ভাঙী করার দন্য রাজ্যে রাজ্যে সভাপতি পদবর্জনের কথা দেবকান্তবাবু ভাবেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ চক্রজিৎ

যাদব, রাজনী প্যাটেল প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। যদি অবস্থা এমন হয় যে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে দেবকান্ত বারুকে চলে যেতে হয় তবে বাওয়ার আগে তিনি কিছু রাজ্য সাংগঠনিক অদল-বদল ঘটিয়ে যাবেন।

ভাঙনের টানে রাজ্য কংগ্রেস

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দীর্ঘদিন জমাগত অন্তর্কলহে ক্ষতবিক্ষত রূপে রাজ্য কংগ্রেস এখন চূড়ান্ত ভাঙনের দিন গুনছে। ব্যক্তিগত ভাবে কেউ কেই আপোষের উদ্যোগ নিলেও তা কলগ্রাস্ত হয় নি। সবাই অপেক্ষা করছে আগামী ১২ই এপ্রিল কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির বৈঠকের ফলাফলের ওপর।

এটা এখন নিশ্চিত শেষ মুহুর্তে আপোষ করার কোন স্থান না পাওয়া গেলে সর্বভারতীয় স্তরেও কংগ্রেস হ-ভাগ হয়ে যাবে।

রাজ্যের কংগ্রেসী মহলে প্রো-চেঞ্জার বলে পরিচিত গোষ্ঠীর সঙ্গে সিদ্ধার্থবাবুদের আর আপোষের কোন (শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

দ্বর্লভ বেইমানি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

[কংগ্রেসের মধ্যে ইন্দিরা বিরোধী যে আশুয়াজ উঠেছে এতে এখন সব থেকে বড় গলা সিদ্ধার্থ রায়ের। তিনি এখন চেষ্টা করছেন দেবকান্ত বড়ুয়াকে মদত দিয়ে ইন্দিরার সর্বনাশ করার।

অবশ্য এই আচরণে নতুন কিছু নেই। যে জ্যোতি বসুকে ধরে সিদ্ধার্থ রায় পশ্চিমবাংলায় দাঁড়ালেন পরে তাঁর-ই বিরুদ্ধাচরণ করেন। তারপর অতুল্য ঘোষকে ধরে কংগ্রেসে পুনঃপ্রবেশ এবং দলভাগের সময় ইন্দিরার লেজুড় হয়ে অতুল্যবাবু প্রফুল্ল সেনকে পদাঘাত। এবার ইন্দিরার পালা। সিদ্ধার্থবাবুর নীতিহীনতা, বেইমানির নজর কংগ্রেস দলেও দ্বর্লভ।

সঙ্গীত

এখনো রয়েছে আরো বন্দী

জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানের প্রসঙ্গটি আলোচিত হচ্ছে। নির্বাচনের পূর্বে জনতা পার্টি ও তার শরিক দলগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা ক্ষমতায় এলে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেবে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রের নতুন সরকার জর্জ কার্ণাওজের বিরুদ্ধে ইন্দিরা সরকারের ডিনামাইট মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কিন্তু বামপন্থী রাজনৈতিক বন্দী, অর্থাৎ বারী সি পি আই (এম) অথবা সি পি আই (এম এল) দলভুক্ত তাদের সম্পর্কে দেশাই সরকারের নীতি কি হবে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল না, যদিও নির্বাচনের পর জরুরী অবস্থায় প্রত্যাহারের অনেককে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার ও বুধবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিং লোকসভায় বন্দীমুক্তি সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতেও এ প্রশ্নের উল্লেখ করা উচিত না। সমস্ত বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে যদি পুলিশী অথবা আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তাহলে জনতা সরকার মন্ত তুল করবেন না। কেননা ভারতীয় পুলিশ বাহিনী স্বাধীনতার ত্রিংশ বছর পরও ব্রিটিশ ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ব্রিটিশ আমলে তাদের শেখানো হয়েছিল যে পরাধীন ভারতবাসীকে তাদের পেটাতো হবে আর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দেখলেই তাদের আটক করে তাদের বিরুদ্ধে খুন-খারাপি, ডাকাতি, বৈধ সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি অভিযোগে মামলা আনতে হবে।

আমরা এখানে পশ্চিমবঙ্গের কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করছি। প্রথমতঃ এই রাজ্যে রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং বিচিত্রতঃ তথাকথিত "হিংসার রাজনীতি"র জন্ম এখানে আর প্রয়োগও এই রাজ্যে অসম্ভব রাজ্যকে ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে এবং এই বছরের শেষদিকে নকশালপন্থীদের কর্মক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হওয়া কলকাতা শহরাকলে। মারা গ্রামে কৃষি বিপ্লব করতে গিয়েছিল তারা হঠাৎ শহরে অ্যাকশন শুরু করল কেন অনেকেই বুঝতে পারলেন না। এই অ্যাকশনের ব্যাখ্যা করে ভাল কাগজে, বন্ধককে অক্ষরে ছাপা প্রচুর লিকলেট বিলি হতে লাগল। নকশালদের সংগঠন ছিল গোপন। কলে অনেকেই অনেকে চেনে না এবং চূড়ান্ত বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এই অবস্থায় পাড়ায় পাড়ায় মস্তান ও গুণ্ডার দল নকশাল নাম নিয়ে ছলুম, খুন-খারাপি চালায়। প্রতিদিন দশ বাঁহাটা খুন। কখনও সি পি আই (এম) কর্মী বা নেতা, কখনও পুলিশ, কখনও নকশাল। কে কাকে মারছে জানা যাচ্ছে না। তবে অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন এই ব্যাপারে রাষ্ট্রপক্ষের একটা বিরাট ষড়যন্ত্র নিশ্চয় আছে। উদ্দেশ্যঃ বামপন্থী শক্তি ও আন্দোলন সম্পূর্ণ ধ্বংস করা।

সেই সময় বহু ছেলেকে পুলিশ সহায়িত হত্যা করেছে—হত্যাকারী যেভাবে হত্যা করে সেইভাবে, হাজার হাজার ছেলেকে জেলে পুরেছে আর কথা বার করার ক্ষমতা অথবা স্মৃতিশক্তি থেকে পুলিশ হাজার হাজার ছেলের ওপর যে অত্যাচার করেছে মধ্যযুগীয় বীরত্বের সঙ্গে তার তুলনা করা যায়। বহু সংখ্যক তরুণ জীবনের মত পজু হয়ে গেছে। হাজার হাজার তরুণ বিনা বিচারে জেলে পড়ে রয়েছে। আর অনেকের বিরুদ্ধেই পাইকারীভাবে খুন, বন্দুক হিন্তাই, ডাকাতি ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে, কিন্তু পুলিশ অভিযোগ প্রমাণের কোন চেষ্টাই করে না। কেবল হয়রানি। জেল থেকে আদালত, আবার আদালত থেকে প্রত্যাবর্তন।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমস্ত উপদলের ওপর থেকেই বখন নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে তখন সমস্ত বামপন্থী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে আপত্তি কি? যাদের বিরুদ্ধে মামলা, নির্দিষ্ট মামলা স্থলে আছে তাদেরও জামিন দেওয়া যেতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি বন্দীমুক্তির বিষয়টি দায়-সারাতাবে দেখেন, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বলে যদি গোঁজামিল দিয়ে যান তাহলে কিন্তু তারা পশ্চিমবঙ্গবাসীর বিশ্বাস হারাবেন। আর যদি সদিচ্ছা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের ওপর সমস্ত দায়িত্ব দেন তাহলেও তুল করবেন। কারণ এরাই ওদের জেলে পুরেছিল। নানা রকম প্যাঁচ কষে এরা ওদের জেলেই রেখে দেবার চেষ্টা করবে অথবা মুক্তির ব্যাপারে টালবাহানা করবে। আনন্দমার্গী ও আর এল এল কর্মীদের যখন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে তখন জনতা সরকার কি সমস্ত বামপন্থী রাজনৈতিক বন্দীদের ছেড়ে দিতে পারবেন না? আর বৈধ সরকারকে উচ্ছেদের প্রসঙ্গ তুললে ইন্দিরা গান্ধীর কথাই মনে পড়ে।

বেতার দূরদর্শন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যদিও প্রধানমন্ত্রীও একাদিক্রমে এরকম প্রচলিত হবার স্বযোগ নেননি।

সকলের সেদিন আবির্ভাব হেতু কলকাতা দূরদর্শন তাঁর ওপর আধ ঘণ্টার টি-ভি রিপোর্ট হয়েছে, তাছাড়া সংবাদে তাকে দেখানো হয়েছে, কম করে হ'লমিটি। এক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর জ্ঞাত কত খরচ হতে পারে?

একটা ১০০ ফিটের ফিল্মরোলে আড়াই মিনিটের ছবি তোলা যায়। আধ ঘণ্টার অল্পটানের জন্ত কম করে ফিল্ম দরকার ৪০০ ফিট। এছাড়া সংবাদে ছ' মিনিটের জন্ত ৩০০ ফিট। উপরন্তু বাড়তি আরও ৭০০ ফিট ধরা যেতে পারে, যা এডিটিং এর সময় 'থারাপ শট' 'ডি ফোকাস', এবং 'আওয়ার' বলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই ১৪০০ ফিট ফিল্মের দাম ১২০০ টাকা। এবার তার ওপর ফিল্ম প্রসেসিং এডিটিং রিপোর্টার, ক্যামেরাম্যান, লাইটম্যান, গাড়ী, ড্রাইভার এবং সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত কর্মীদের জন্ত ব্যয় বোণ দিলে দাঁড়াবে কম করে তিন হাজার টাকা। এতো মাত্র

স্পীকারের কেলেকারী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নানা কায়দার আশ্রয় নিয়েছেন। এর প্রত্যেকটিতেই তিনি দাবী করেছেন যে হুঁজুতি মুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলার জন্তই তার এই সব তদন্তের নির্দেশ। নেতৃত্বের দাবী মুখ্যমন্ত্রীর এই সব কথা মধ্যে কিছুমাত্র সততা থাকলে অবিলম্বে তিনি অপূর্ব নৃপেন কেলেকারী কঁাস করুন।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছেও স্বাক্ষর লিপিতে বলা হয়েছে আপনারা মার্কস কেলেকারী নিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন। নাগরওয়ালার ঘটনারও প্রকৃত সত্য এখন বের হওয়ার মুখে। কিন্তু হতভাগ্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিধানসভা,—যা গণতন্ত্রের পীঠ-স্থান বলে পরিচিত তার সর্বাধক্ষ স্পীকারের কার্যকর সম্পর্কেও আপনারা তদন্ত শুরু করুন। খোঁজ করে দেখুন অপূর্ব ও নৃপেন তার কথ্যাত সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে কিভাবে হাওড়া জেলায় জ্বালের সঞ্চার করেছেন। কিভাবেই বা হাওড়ার বেলগাছিয়া এলাকায় সাধারণ মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়েছেন।

এই স্বাক্ষরলিপিতে স্পীকারের বিরুদ্ধে সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার নৃপেন সম্পর্কে মহিলা, টাকাপয়দা, রাহাজানি সংক্রান্ত নানা অভিযোগ আনা হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়— স্পীকারের ব্যবহার ও আচার আচরণে জেলার অফিসাররাও বিভ্রত। স্পীকার অপূর্ববাবুর আবদার নানা রাখাও

একদিন সয়েক ঘণ্টার খরচ।

এই রকমটাই ছিল খরচের বহর।

এবার হিসেব বরুন, রাজ্যে রাজ্যে মন্ত্রীদেব ভূমিদান, জমিদান, পদযাজা, মুক্যাতক, জমনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি দৌ-রাষ্ট্রের কলে কত খরচ হতে পারে। ২৫ দফার যন্ত্রণায় বেতার ও টেলি-ভিশন কর্মীদের ঘুম ছিল না। চাকরী আতঙ্ক, পদোন্নতি, অবনতি সব কিছুই ছিল এর ওপর নির্ভরশীল।

সকল-ইন্দিরা শুধু এই রাজ্যেই নয়, সর্বত্র তাদের পারিবারিক ভাবমূর্তি রক্ষায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। সে খরচও এর সঙ্গে যোগ দিতে হবে। বোণ দিতে দূরদর্শনের জন্ত এখান থেকে সেখানে ফিল্ম পাঠানোর বিমান খরচ। বেতারের খরচটা কিছু কম। সেখানেও এই কাণ্ডই ঘটেছে। গানে বাজনার, সার্কাসে, ম্যাজিক সর্বত্রই ২৫ দফার দাপট। খ্যাত শিল্পী ও চিত্রশিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের নানারকম ভয় দেখিয়ে বজা করার চেষ্টা হয়েছে।

এ ব্যাপারে কোন খাতে কত খরচ হয়েছে, তা প্রকাশিত হলে বিগত সরকারের জনসাধারণের অর্থ অপচয়ের একটি কলঙ্কিত অধ্যায়ের উন্মোচন হবে।

স্পীকারের কেলেকারী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তৎকালীন পুলিশ সুপার সরোজ ভট্টাচার্যকে লালসাজার বদলী হয়ে আসতে হল বলে অনেক পুলিশ কর্মীর অভিযোগ। এদিকে অপূর্ববাবু ও নৃপেনের এলাকায় লিলুয়া থানার তৎকালীন অফিসার ইনচার্জ ইন্দু ভট্টাচার্যও এদের বোধ রোধের শিকার হ'ল বলে প্রকাশ। ইন্দুবাবু কোনক্রমেই নৃপেনের কাছে মাথা নত করেন নি। এতে এলাকার সাধারণ লোক আশঙ্কিত হলেও অপূর্ববাবু ও নৃপেন এই ঘটনা সহজে মেনে নিতে পারেন নি। তাই ইন্দুবাবুর ওপর চলেছে অস্ত্র চাপ। এতেও ঘটনার শেষ হয়নি। এর পরে তাকে বজ্রতর বদলী করার ঘটনা জেলার সাধারণ পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে করে তুলেছে।

অভিযোগ, অপূর্ববাবুও নৃপেনের পরামর্শমতই নাকি ইন্দুবাবুকে লিলুয়া থানা থেকে সরিয়ে বর্ধমান ডি, আই, জি, রেঞ্জ বদলী করে দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে সাকরাইল থানায়। এখানেও মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে আবার লিলুয়া থানায় ফিরিয়ে এনে আত্মতা, পরে শিয়ালদা জি. আর, পি-তে বদলী করা হয়। ইন্দুবাবু এখন শিয়ালদা জি, আর, পি-তেও নেই। তার ওপর নতুন বদলীর আদেশ—নদীয়ার তাঁকে যেতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী জি.এস.ইয়ের কাছে একজন সাধারণ পুলিশ অফিসারকে এভাবে হেনস্থা করার নেপথ্যে কারণও খুঁজে বের করার জন্ত অহরোধ জানিয়েছেন স্বাক্ষরলিপিতে স্বাক্ষরকারী বিশেষ ব্যক্তিবর্গ।

ভাঙনের টানে রাজ্য কংগ্রেস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মস্তাবনা নেই। বলতে গেলে এই গোষ্ঠীর অন্ততম নেতা প্রাক্তন পুলিশ মন্ত্রী সন্দেহ বিরোধী তো প্রায় 'যেখান থেকে কেহা যায় না' এমন অবস্থায় পৌঁছেছে।

এই লড়াইয়ে তরুণবাবু একা নন। সঙ্গে আবদুল সাত্তার, হুজুত মুখার্জী আনন্দ বিশ্বাস, গোবিন্দ নন্দ্র প্রমুখ মঙ্গলভার সদস্য সহ প্রায় শবানেক এম এল-ও আছেন। এই গোষ্ঠীর কাছে এখন পক্ষিয়ার যে সিদ্ধার্থ রায়, অরুণ মৈত্রদের সঙ্গে আর দল করা যাবে না। যদি অরুণ মৈত্রের আরগায় এই গোষ্ঠীর কাউকে অথবা নিরপেক্ষ কাউকে সভাপতি না করা হয়, যদি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সিদ্ধার্থ রায়কে সরানো না হয় তবে তাঁরা এক জোট হয়ে কংগ্রেস ছেড়ে চলে যাবেন।

কংগ্রেস ছাড়ার পর এই গোষ্ঠী কোন দলে যোগ দেবেন? এ প্রশ্নটারও মোটামুটি ফরসালা হয়ে গেছে। জানা গেছে তরুণবাবুর সঙ্গে গণতন্ত্রী কংগ্রেসের নেতা বিজয় সিং নাহারের আলোচনা হয়েছে। বিজয়বাবুরও এদেরকে দলে নিতে কোন আপত্তি নেই। গণতন্ত্রী কংগ্রেসের অনেকেই ধারণা এর কলে গণতন্ত্রী কংগ্রেসই প্রকৃত কংগ্রেসে পরিণত হবে।

এদিকে "নো-চেয়ার" গোষ্ঠীর একটা অংশ যাদের মধ্যে আছেন লক্ষ্মী বহ ও কুমুদ ভট্টাচার্য যারা প্রো চেয়ারদের সম্পর্কে খুব কঠোর। নিজ দলের অনেকের নিষেধ সত্ত্বেও এরা দিন দিন এমন অবস্থা সৃষ্টি করছেন যাতে বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর কেউ আর দলে না থাকতে পারে। "নো-চেয়ার" হলেও প্রিয়-পঙ্কজ কিন্তু একটা এ্যাডভ্যান্সমেন্টের পক্ষপাতি। কিন্তু অবস্থাটা এখন ওদেরও নিরস্ত্র বাইবে।

গত দোসরা এপ্রিল চ্যবনজীর সভায় মধ্যে দণ্ডায়মান প্রদেশ কংগ্রেসের অগ্রতম সম্পাদক হুজু ইসলামকে উদ্দেশ্য করে কুমুদ ভট্টাচার্যের সমর্থকরা নানা কট্ট মন্তব্য করেছেন। হুজুত মুখার্জীকে মধ্যে উঠতে বাধ্য দেওয়া হয়েছে। এই সব অপমানের বদলা নিতে প্রো-চেয়ার" গোষ্ঠী মঙ্গলভার পতন ঘটতে বদ্ধ পরিকর। এরজন্ত হুজুত সবাইকে এই মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

কয়লাখনিতে দুর্নীতির চক্রজাল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কয়লা খনি জাতীয়করণ করা হয় ৩১ জানুয়ারী ১৯৭৩ সালে। ৪৬৬৬৬৬ কেটে গেছে। কিন্তু আজও কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। লোক-মানের বহর বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খনিগুলি এখন পরিণত হয়েছে দুর্নীতির পীঠস্থানে। সরকারী অর্থের অপব্যবহার করে কিভাবে একশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ন-অফিসার লুটেপুটে থাকে তার দৃষ্টান্ত বিরল। বিদ্যুৎ প্রদান এবং অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে জেমেছি যে, কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক কায়দা চক্র। যারা দিনের পর দিন অসংখ্য ঠিকাদারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করছে।

কয়লাখনি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হবার পর নামকরণ হয় কোলমাইনস অথরিটি। পরবর্তী পর্যায়ে নামকরণ হয় কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড। এর অধীনে অঞ্চলভিত্তিক সংস্থা গড়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কয়লা খনিগুলি এখন দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে। অভিযোগে বলা হয়েছে যে, দুর্নীতির প্রচলনদাতা হচ্ছেন ইন্টার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। প্রিমায়াইজারী ভারী।

কয়লাখনিকে সোনার খনি বলা

হয়ে থাকে। এই প্রবাদ বাক্যকে সত্যি করে তুলেছেন কয়লাখনিগুলির এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ন অফিসার। দুর্নীতি আজ কয়লাখনি প্রশাসনের রাজ্য রাজ্যে। সেলস এবং পারচেজ এই দুই বিভাগেই দুর্নীতি রয়েছে। দুর্নীতি লোক নিয়োগের ক্ষেত্রেও রয়েছে। সব কিছু জানা সত্ত্বেও এই সব দুর্নীতির প্রশয় দিচ্ছেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীমতী।

বিভিন্ন মহল থেকে বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অপসারণ দাবী করে বলা হয়েছে যে, কয়লাখনি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হবার ৪ বছর পরেও এই সংস্থার কোন উন্নতি হয়নি বরং দিনে দিনে অবনতি হয়েছে এবং এর সব কিছুয় জটাই দায়ী ম্যানেজিং ডিরেক্টরের প্রশাসনিক অপদার্যতা। জানা গেছে যে, জনৈক মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার শক্ত হাতে এইসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার চেষ্টা করায় তাঁকে কোন অদৃষ্ট হাতের ইজিতে অপসারণ করা হয়। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে যে, বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর দুর্নীতির প্রশয়দাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন বিরোধী।

বলা হয়েছে যে, এই দুর্নীতিপরায়ন ম্যানেজিং ডিরেক্টর গত ২৫ বছর যাবৎ কয়লাখনি প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত

এবং সর্বক্ষেত্রেই তার অপদার্যতা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও আজ কোন এক অদৃষ্ট হাতের ইজিতে তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

গত ১ এপ্রিল তারিখের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরাবজী দেগাইকে প্রেরিত এক তারবার্তায় বর্ধমান জেলার জনৈক বিধানসভা সদস্য বলেছেন কিভাবে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারী অর্থের অপচয় করা হচ্ছে। বলা হয়েছে কিভাবে সরকারী গাড়িতে প্রমোদ ভ্রমণ হচ্ছে। অথচ একমুখ সমস্ত খরচা দিচ্ছে কয়লাখনি প্রশাসন। এই তারবার্তার অনুলিপি প্রেরিত হয়েছে কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় প্রথমমন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় বহর কাছে।

গত ২৭ জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করে ইন্টার কোলকল্ডসের বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অপসারণ দাবী করা হয়েছে। স্মারকলিপিতে ৩০ জন দুর্নীতিপরায়ন অফিসারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই সব দুর্নীতিপরায়ন অফিসারেরা হলেন, শ্রী বি. সিনহা (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, চিক অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)। শ্রীলক্ষ্মন সিং (জি, এম, এরিয়া ৮), এম. পি. সিং (এ সি পি ও এরিয়া-৮), জামালউদ্দিন (এ সি পি ও এরিয়া-৮),

আর এস. মাকু (চিক কন্ট্রোলার অব স্টোরস এন্ড পারচেজ), গজরাজ সিং (এ সি পি ও, এরিয়া-৮), এম. ভেঙ্কয়াসী (সাব এরিয়া ম্যানেজার, ফুয়ার্ডি, এরিয়া-৬), এস. ডি. রমণ (ডি সি ও এস, এরিয়া-৬), এম. কাশেম (সাব এরিয়া ম্যানেজার, ময়রা গুপ) পি কে দাস (অতিরিক্ত চিক ইঞ্জিনিয়ার), এস. পি. প্রীতানব (ম্যানেজার, শ্রীমহেশপুর কলিয়ারী, এরিয়া-৬), এম. পব (ম্যানেজার এরিয়া-৬), এম. পি. সিং (এ সি পি ও এরিয়া-৪), ডি. সি. মিল (সেলস অফিসার, এরিয়া-৫) জে. এন. গুপ্ত (সাব এরিয়া ম্যানেজার, এরিয়া-৭), আর. এল. গুপ্ত (ম্যানেজার কোটাতিহি কলিয়ারী, এরিয়া-৭), শ্রী বাজাজ (এ এক পি, এরিয়া-৬), শ্রীমুখা (জি এ সি, এরিয়া-৬), ডি. এন. চোপরা (এ এক এম, এরিয়া-৩), শ্রীমেনগুপ্ত (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চীফ কন্ট্রোলার অব একাউন্টস, সীকভোরিয়া), কে. পি. সিং (এস এ এম, রতিবাটি কলিয়ারী এরিয়া-৩), এ. এন. সিং (সাব এরিয়া ম্যানেজার, সাতগ্রাম, এরিয়া-৩), এ. বি. পাল (জি এম এরিয়া-১), জে. ব্যানার্জী (সেলস অফিসার, এরিয়া-১), এম. কে. সিং (এরিয়া ইঞ্জিনিয়ার-১), পি. এস. কাপুর (ডেপুটি চিক ইঞ্জিনিয়ার, ই সি এল), এন. প্রসাদ (ইঞ্জিনিয়ার,

এরিয়া-৪) শ্রী এইচ. কে. বুদ্ধটি (সেলস অফিসার, এরিয়া-৪), জে. কে. ভগাটি (সাব এরিয়া ম্যানেজার —৪)।

একই সঙ্গে ৫টি ঠিকাদারী সংস্থার মাঝে দেওয়া হয়েছে যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অর্ধেকভাবে ঠিকাদারী পাইয়ে দিয়ে দুর্নীতিকে প্রসার দিয়েছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীমতী। এই সব কোম্পানিগুলি হল, শ্রীদর্গা ট্রেডার্স (উধরা) বলরাম ট্রেডার্স (উধরা)। মালিক সিং ডিভেলপমেন্ট (আমানসোল), পারফেক্ট ট্রেডার্স (রাঙ্গীগঞ্জ), জগতো ইঞ্জিনিয়ার্স (বানবাদ-বিহার)।

কলিয়ারী প্রমিক সংগঠনের সমস্ত সংস্থা থেকেই এই সব অভিযোগের তদন্ত দাবী করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তদন্ত হলে আরও অনেক দুর্নীতির কথা জানা যাবে। জানা যাবে কিভাবে প্রমিকদের হাটাই করা হয়েছে কোন কারণ না দর্শিয়ে। কিভাবে লোক নিয়োগ করা হয়েছে কোন নিয়ম না মেনে সে কাহিনীও জানা যাবে।

সেলস এবং পারচেজস ডিপার্ট-মেন্টকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে দুর্নীতি। তদন্তের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে সব প্রমিক সংগঠন-গুলি। প্রমিক এবং সং অফিসাররাও চান এ বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত হলে অনেক গোপন কাহিনী জানা যাবে।

মস্তানরা জনতা ও গণতন্ত্রী কংগ্রেস দলে আশ্রয় চায়

(দর্পণের সংবাদদাতা)

লোকসভায় শোচনীয় পরাজয়ের পরও কংগ্রেস নামধারী মস্তানরা পাড়ায় পাড়ায় বণারীতি সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে, ২রা এপ্রিল ময়দানে চাবনের মত নেতার উপস্থিতিতে যেভাবে রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে তাতে এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এইসব গুণ্ডামির ব্যাপারে কংগ্রেসের উদ্বুদ্ধন-নেতৃত্বের যথেষ্ট প্রচলন আছে। ময়দানের সভায় কলকাতার দুটি দৈনিক পুড়িয়েই মস্তানরা ক্ষান্ত হয়নি, কিছু ফটোগ্রাফারকে গলা ধাক্কা পর্যন্ত দিয়েছে। কলে রাজ্যের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকরা নিরাপত্তাবোধ করছেন না। এছাড়া উক্ত সভায় মস্তানরা সাংবাদিকদের শাসানি পর্যন্ত দিয়েছে।

রাজ্যের সর্বত্র কংগ্রেস আশ্রিত সমাজবিরোধী এখনো পুরোনো কায়দায় সাধারণ মানুষের মনে জাল

ফুটি করছে। পুলিশ প্রতিটি ক্ষেত্রে নীরব বা নিষ্ক্রিয়। এসব সমাজ-বিরোধীদের ধারণা যে, এখানে রায়-মন্ত্রিসভা টিকে থাকবে। যতদিন এই মন্ত্রিসভা আছে ততদিন তাদের পাজ প্পর্শ করার সাধ্য কার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত পাঁচ বছর ধরে সমাজবিরোধীদের সাহায্যে কংগ্রেস দল কখনো এন এল সি সি, কখনো বা আই এন টি ইউ সি সি নাম করে রামশহীদের ট্রেড ইউনিয়ন অফিসগুলো ভবর দখল করেছে। এবং ট্রেড ইউনিয়ন অফিস দখল শুধু নয় তারা সংশ্লিষ্ট শিল্প সংস্থা বা ক্যাক্টরী থেকে বাস যেনা বেনারী ভাগ মাহুতকে তড়িয়ে দিয়েছে ফলে শত শত প্রমিক পরিবার এখনো অনাহারে বুঁকছে। কেন্দ্রে সি. পি. এম. সমর্থিত জনতা-গণতন্ত্রী কংগ্রেসের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মাহুত আজ স্ববিচার চাইছে, চাইছে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার,

বাঁচার অধিকার। অভিযোগে প্রকাশ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে কংগ্রেস পরিচরয়ারী মস্তানরা এই বলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ফুটি করেছে যে, আবার ট্রেড ইউনিয়ন করতে এলে বা কারখানায় এলে তোমাদের জ্ঞান নিয়ে নেব।

অতীতকালে বিভিন্ন অঞ্চলে এইসব মস্তানদের একটা অংশ হাওয়া বুকে নিজেদের জনতা বা গণতন্ত্রী কংগ্রেস বলে পরিচর দিয়েছে। এই সর মস্তানদের অপরাধ সম্পর্কে পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পর্যন্ত করা হয়েছে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে পুলিশ নীরব।

কংগ্রেসের পরাজয়ের মূল কারণ মাহুত স্বস্তিতে বাঁচতে চান। অর্থাৎ তারা গুণ্ডামি অনাচার ও সন্ধানের বিরুদ্ধে নীরবে রায় দিয়েছেন। কেন্দ্রে জনতা সরকারের প্রতিষ্ঠার পর মাহুত আশা করেছেন যে, সমাজবিরোধীরা ঠাণ্ডা হবে। কিন্তু সমাজবিরোধীদের

একটা অংশ ইতিমধ্যে শাসক জনতা পার্টির স্তাবক হবার চেষ্টা করছে। পর্যবেক্ষক মহলের মতে, যদি এই সব সমাজবিরোধীদের জনতা ও গণতন্ত্রী কংগ্রেসে স্থান দেওয়া হয় তবে জনতা পার্টির ভারমতি নষ্ট হবে এবং জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা ধুলিসাৎ হবে।

প্রকাশ, কংগ্রেসের একটা অংশ জনতা পার্টি ও গণতন্ত্রী কংগ্রেসের ভারমতি নষ্ট করার জন্য সমাজ-বিরোধীদের নির্দেশ দিয়েছে। ভোল পান্টাতে, এবং যে সব কংগ্রেস নেতা

নারী ধর্ষণে গোপ্তার

নারী ধর্ষণের অভিযোগে চুচুড়া সরকারী হাসপাতালের রুজম কর্ম-চারীকে পুলিশ গোপ্তার করেছে এবং এ সম্পর্কে আরো একজনকে ধোঁয়া করছে।

প্রকাশ, শ্রীমতী তরুলতা দেবী ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ইমামবাড়া হাসপাতালে তড়ি আছেন। তাঁর মেয়ে তাঁকে দেখাশোনা করছেন। গত

১৫ই মার্চ সন্ধ্যায় এক্সরে রিপোর্ট দেবার অছিলায় তরুলতাকে নিয়ে এসে এক্সরে ঘরের মধ্যেই ধর্ষণ করা হয়। অতীতত্যা অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ এ সম্পর্কে জরুরে বিশ্বাস ও অনিল দত্তকে গোপ্তার করেছে। আর আসামী গোঁড়ম দেবনাথ পলাতক।



আর শত্রুতা নয়

সারা বিশ্বের অধীশ্বর হতে চলেছিল, গণতন্ত্রপ্রিয় বিশ্বজনগণের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল যে হিটলার ১৯৩৩ সালে কিছু সংশোধনবাদী দৃশ্যমনের সঙ্গে যৌথ চক্রান্ত করে ও শত্রু শ্রমিক সংগঠন "কামফুট"কে (উচ্চারণের ত্রুটি থাকলে ক্ষমা করবেন) অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য করিয়ে কমিউনিস্ট নিধনযন্ত্রের বোলকলা পূর্ণ করার জন্তু কগাইয়ের ছুরি হাতে তুলে নেয় এবং ২৫ দফা কর্মসূচী গ্রহণ ও জরুরী অবস্থা জারীর মধ্য দিয়ে জন-জীবনের ওপর দিয়ে নির্ধৃতনের ঘোলাব চালিয়ে, সেই হিটলারের পরিণতিও করণ।

অনুরূপে, আমাদের দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও ১৯৭১ সালে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদের সক্রিয় সহযোগিতায় বাংলাদেশে সন্ত্রাস-বাদী অল্পপ্রবেশের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের বৃহত্তর অংশের জনগণকে ঘোঁকা দিয়ে তামাম ভাংতবর্ষের গণ-তন্ত্রপ্রিয় মানুষের বুকের ওপর দিয়ে অত্যাচারের পাগলা হাতি ছুটিয়ে দিলেন। আর তার বৈরাচারকে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করল বামপন্থী শক্তিগুলির অস্ত্র-বিরোধ। কিন্তু দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাগত অব-পতন ঘটতে লাগল। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জীবন ক্রমেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। এটাই পুঁজিবাদী শোষণ ও শাসন ব্যবস্থার সাধারণ নিয়ম। অতঃপর সংগ্রামী মানুষ বিক্ষোভে কেটে পড়ল। দেশের বিভিন্ন অংশে সংগ্রামী তরঙ্গ উত্থাল হয়ে উঠল। বীরানন্দের পরাজয়ের নাটকের প্রথম অঙ্কে, ষড়যন্ত্রপাত ঘটল এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের মধ্য দিয়ে, বিজ্ঞার শাহজাদীর, তথ্যে

তাউস কেঁপে উঠল। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে দ্বিভ্রাণী শেষ কামড় দিলেন জনগণের মাথার ওপর দিয়ে জরুরী অবস্থার তরবারি হাকিয়ে। একই প্রায় সারা বিশ্বের লুণ্ঠনকারী সওদাগরের পাণ্ডা চাটিলের বিরুদ্ধেও ইংল-ওয়ের গণতান্ত্রিক জনগণ জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন ব্যালট পেপারের মধ্য দিয়ে। আর আমাদের দেশের সংগ্রামী জনগণও একই কায়দার নেহের পরিবারের তিরিশ, বছরের একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান ঘটালেন।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। শেষ হোল শোষণ বনাম শোষণিতের অমী-মাংসের স্বপ্নের অবসানের মধ্য দিয়ে। তার অস্ত্র প্রয়োজন উত্থাল গণসংগ্রামের জোয়ার। এই গণসংগ্রাম সংগঠিত করতে সবচেয়ে প্রথমে প্রয়োজন মেহ-মতী মানুষের পারস্পরিক সংহতি। আমাদের তুলে বেতে হবে পুরাতন বৈরিতা। বাড়িয়ে দিতে হবে বন্ধুত্বের হাত। মাথার রাখতে হবে বনিক শোষণের হারার টেবিলে যেমন একই করে হালে, আমরা শোষণিতের স্বার্থ জ্ঞান একই করে কাঁদি। কিন্তু ময়ী-চিকার ছলনার আমরা নিজেদের রক্ষেই নিজেদের হাত রাখিয়েছি, বার দাগ আজও মোছিনি। অতএব বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের কাছে জনগণের তরফ থেকে আমার আন্তরিক নিবেদন আপনারা পুরনো শত্রুতাকে স্বাভাবিক প্রত্যাখ্যান করুন, পরস্পরের সব থেকে ভালো বন্ধু হোন, পরস্পরের তুল স্বীকার করতে শিখুন, সঠিকভাবে গ্রহণ করতে সাহসী হোন, সংগঠিত হোন, একাত্ম হোন, বিভেদ বন্ধ করুন। আর এই গণসংগ্রাম গড়ে তুলতে অগ্রপ্রকাশী ঘোষিত গণকমিটি গড়ে তোলার ব্যাপারে সহযোগিতা

করা আমাদের কঠব্য বলে আমি করি। তার পাশাপাশি অগ্রপ্রকাশ-জীর কাছে আমার ব্যক্তিগত নিস্তাণা-এই যে, বিহারের আন্দোলনের নেতৃত্ব দান কালে নিয়মিত সৈন্যবাহিনী তুলে নিয়ে জনতাকে শত্রু করার জন্তু তাঁর দাবীর কথা মনে করে বর্তমান সরকারকেও একই পরামর্শ দিতে তিনি আমার সাহসী হবেন কি? তিনি কি সাহসী হবেন সামরিক শাস্ত্রে বহু শত শত কোটি টাকা ব্যয় বাচিয়ে লেই অর্থকে শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে নিয়োজিত করার যুক্তি দিতে?

অনিম্মা বহু

কতৃ হুবাদের ভরাডুবি

ভারতবর্ষের সত্তমসাপ্তম্য বর্ষ লোক-সভার ঐতিহাসিক নির্বাচনে কোটি কোটি মানুষের একটি সুবিবেচিত ও গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ভোটের বাস্তবে প্রতিকলিত হয়েছে দার্ঘকভাবে। সেটি হচ্ছে এই যে, জনগণ কোনও ব্যক্তির বা দেশের কতৃত্ববাদকেই বরদাস্ত করতে অস্বীকৃত করে নিঃশব্দে ঘোষণা করেছে একটি রায় : কতৃত্ববাদ দূর হটো।

এই অভিমত রায় হিসেবে এসেছে ভারতীয় জনগণের জিশ বছরের বিপুল, ফুলসহ অভিজ্ঞতার মর্মকোষ ভেদ করে।

পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগে ঐতিহাসিক বান্দু সংঘসনের নীতি ও আদর্শের অন্ততম স্বশক্তি ও প্রবক্তা ভারতীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এশিয়া তথা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে যে আদর্শ ও প্রত্যয় উপস্থাপিত করেছিল বলিষ্ঠভাবে, কালচক্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জোটের গভীর চক্রান্তে সেই আদর্শ ও প্রত্যয় ভিত্তিত হয়ে গেল এশিয়ার মাটিতে।

ভারত, সিংহল, বর্মী ও ইন্দো-নেশিয়াতে দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটে গেল দ্রুত। পরিবর্তিত হোল পাকিস্তানের দৃশ্যপটও। যে পাকি-

স্তান নিজের অস্তিত্ব রক্ষার নামে ও জাতীয় স্বার্থের জিগির তুলে 'সিয়াটো' ও সেন্টোর মতো সামরিক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল সেই পাকি-স্তানই বিজোহ ঘোষণা করে বসলো সামরিক মৈত্রী সংস্থা সমূহের বিরুদ্ধে। এমনকি চীনের বিরুদ্ধে 'আমেরিকা' সাম্রাজ্যিকদের ঘাঁটি রূপে নিজেকে সে বৈবহুত হতে ছিলনা বরং চীনের সঙ্গে প্রতিবেশীমূলক বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হোল। পাকিস্তানের এই পরিবর্তিত ভূমিকা এশিয়া ভূখণ্ডে প্রভুত্বকামী রাজনৈতিক শক্তি সমূহের ভারসাম্য লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন সংঘটিত করেছে।

অপরদিকে, কোরিয়া-ভিয়েতনাম কষোড়িয়া রণাঙ্গণে আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদ পরাজিত হয়ে এশিয়াতে ক্রমশঃ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, চীনকে পরিবেষ্টন করে তার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা আজ তার

সংগঠিত সংস্কারের উপর বসে আছে।

এই পরিস্থিতিতে এশিয়ার দেশে দেশে চলেছে সমাজতন্ত্রের মুখোমুখি মৈত্রীর ক্রিবিগুলা নূতন শক্তির অন্তত পদার্পণ। অতিপূর্ণ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ নিঃস্বার্থ অর্থনৈতিক সাহায্যের নাম করে যে হাত বাড়িয়েছে এশিয়ার দিকে তার এক নিষ্ঠে বন্ধুত্ব, অপরদিকে কালো দ্রবভিত্তি। 'বৌধ নিদ্যাপত্তার' স্বজাধারী এই নয়া সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষে ব্যক্তিকতৃত্ব-বাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল নিজের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্ত। বিশ বছরের মৈত্রী চুক্তির আড়ালে যে অতিকার শক্তির মুখ ভেসে ওঠে সেট মুখে চক্রান্তের কুটিল রেখা ধরা পড়ে গেছে কোটি কোটি ভারতবাসীর কাছে। তাই তাঁরা হুস্পষ্ট রায় দিয়েছেন ৭৭-এর সূচনায়—'এশিয়া থেকে হাত ওটাও'।

কালিদাস কুণ্ডু

বরেণ্যদের সম্মান দিন

বৈরাচারের বিরুদ্ধে স্ত্রায়ের সংগ্রামে জয়ের আনন্দ উৎসবে একজন বরেণ্যের নাম অল্পচরিত থেকে যাচ্ছে- তিনি সাহিত্যিক অমরদাশকর রায়। চিন্তার স্বাধীনতার সরকারী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে তিনি একবছরের জন্তে সাহিত্য রচনা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত প্রকাশে ঘোষণা করেন, কিন্তু সে সংবাদ কোনও দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেনি এবং এক বছর পরে বৈরাচারী স্ত্রায়ের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা শুরু করেন।

কিন্তু যে দৈনিক পত্রিকা একদা শিল্পীর স্বাধীনতার জন্তে দাবি তুলেছিলেন সেসব বহুদ প্রচারিত পত্রিকা অমরদা-শকরের প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেনি, করেছে মাত্র দুটি বহু প্রচারিত পত্রিকা—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল সম্পাদিত 'আলোচ্য' (ত্রৈমাসিক) ও শ্রীহীরেন বহুর 'দর্পণ' (সাপ্তাহিক)। কিন্তু এই পর্যায়ের অমরদাশকরের অধিকাংশ রচনা আজও অপ্রকাশিত। যে প্রায়-সময়-ও-শক্তি তিনি এসব রচনার জন্তে ব্যয় করেছেন তা নির্যাস সাহিত্যের জন্তে ব্যয় করলে তাঁর ব্যক্তিগত লাভ-ই হতো। এই একজন সাহিত্যিকের মধ্যে আমরা সাহিত্যিকের কাছে প্রত্যাশিত বিবেক-নিষ্ঠা, স্ত্রায়-দৃষ্টি ও যুক্তিশীলতা দেখেছি।

আরও একজন সাহিত্যিকের মধ্যে বিবেক নিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করেছি—তিনি গৌরকিশোর ঘোষ। এজন্তে তিনি পূর্বতন সরকারের কাছে শান্তিও পেয়েছেন।

বর্তমান সরকারের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠা করতে ও আদর্শ ভাবমূর্তি গড়তে এই দুজন

সাহিত্যিককে এবং অল্পচরিত স্ত্রায়-পরায়ণ অস্ত্রাস্ত্র ভাষার সাহিত্যিকদেরকে জাতীয় স্তরে সম্মানিত করার জন্তে আপনার কাছে একজন নাগরিক হিসেবে আবেদন জানাচ্ছি।

আপনারা অমরদাশকর হোন।

স্বর্জিৎ দাশগুপ্ত

সিদ্ধান্তে খুশী

নিখিল ভারত লোকো রানিং ষ্টাক এ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব রেল শাখার সাধারণ সম্পাদক শ্রীপি কে দত্তগুপ্ত নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন।

"১৯৭৪ সালের ধর্মঘটের দক্ষন বরখাস্ত সাপেক্ষে সমস্ত স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মীকে বিনাশর্তে কাজে পুনর্-বহালের যে সিদ্ধান্ত মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রীদত্তবতে ঘোষণা করেছেন নিখিল ভারত লোকো রানিং ষ্টাক এ্যাসোসিয়েশনের পূর্বরেল শাখা তা অভিনন্দন জানাচ্ছে এই ঘোষণা সময় তিনি যে মনোভার ব্যক্ত করে-ছেন এ্যাসোসিয়েশন তাতে গভীর আনন্দ প্রকাশ করেছে।"

অনৈক্যের বদলে ঐক্য চাই

অবশেষে বন্দীমুক্তির দাবিতে মহানগরীর দক্ষিণাংশের কোন এক স্থানে পশ্চিমবঙ্গের দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ একত্রিত হয়ে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বন্দী মুক্তির দাবিতে যুক্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রে এতদিন যে অনৈক্যের কালো মেঘ জমেছিল তা বোধ হয় কাটিতে শুরু করেছে। সম্ভা কক্ষের আবহাওয়া ছিল যেমন বজ্রবৃষ্টি, কঠব্য পালনে অবিচল, তেমনি অনাবশ্যক আগেগবজিত। সমবেত ব্যক্তি বর্ণের প্রত্যেকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে ক্যাশিস্ট ক্লারাগারের রক্ষক কগাইদের প্রতি ঘৃণা, ধ্বনিত হয়ে ওঠে নির্যাতিত বন্দী ভাইদের মুক্ত করার শপথ বাক্য। আর এই সংগ্রামী মেজাজে আরও বেশী উদ্বীণনার ধোরাক জোগায় গত ৭ই এপ্রিল ষ্টুডেন্ট হলে লিগ্যাল এড কমিটি আয়োজিত কন-ভেনশনের ঘোষণা অর্থাৎ স্বাভাবিকই আর বৃহত্তর জন সমা-বেশ। যদিও উক্ত সমাবেশে লিগ্যাল এড কমিটি ছিল

একটি অংশমাত্র। তথাপি উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের সবাই সর্বাঙ্গিকভাবে ৭ই এপ্রিলের সম্মেলনকে কার্যকরীভাবে শকল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কিন্তু আমাদের অনেকেই-বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করি বন্দী মুক্তি আন্দোলনের ইত্যাকে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার না করার ফলে কোন এক বুদ্ধিজীবীর আচরণে যথার্থই জ্ব-চেতনভাবে ইয়ং সংকীর্ণতাবাদ প্রশ্রয় পায় বা ঐক্যের পক্ষে একাত্মই অস্বাস্থ্যকর।

উক্ত বুদ্ধিজীবীর কাছে আমার সরিনয় নিবেদন যে, তাঁর মত বিচক্ষণ ব্যক্তি যেন একথাটা খেয়াল রাখেন, এই সভায় এমন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন ও ভবিষ্যতের সভা-গুলিতে থাকবেন। যাদের উপস্থিতি কেবলমাত্র বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই। অতএব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অভ্যস্ত ও যোগ্য তাঁর মত বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা অনৈ-ক্যের বদলে ঐক্যের প্রতীক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তপন বহু

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

৥ চাদার হার ৥

বার্ষিক ২২ টাকা

ষাণ্মাসিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠাবার ঠিকানা :

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, মট লেন। কলিকাতা ১৩

ରମ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗାୟକ

(এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়)

ভারতবন্ধু হাইনশ মোদে

সোমবার বিশ্ববিখ্যাত জার্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ডক্টর হাইনশ মোদে এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, বাঙলা লোক-গাথা ও লোককাহিনী বিশ্বসংস্কৃতির এক অমূল্য সম্পদ। বাংলা সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতির এক বিশ্বজনীন আবেদন রয়েছে। ভারতবন্ধু ডক্টর মোদে কথায় কথায় বলেন, "কল-কাতার এল মনে হয় যেম বাড়িতে এসেছি। এখানে মাহুদ কত সুর, কত আপনায়।"

সম্প্রতি দিল্লিতে অচলিত বৌদ্ধ সম্মেলনে ডক্টর মোদে ভারত সরকারের বিশেষ আমন্ত্রণে ভারতে এসেছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে তিনি কল-কাতার যোববার এসেছেন। শান্তি-নিকেতন সফর করে এক হপ্তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করবেন। বিশ্ব বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ডক্টর মোদে বর্তমানে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের বৌদ্ধকেন্দ্রের ডাইরেক্টর। মহেন্দ্রোদ্যানে হরপ্পার ওপর তাঁর প্রমাণ গবে-

ষণা গ্রন্থ এই সভ্যতা সম্পর্কে মতুম আলোকপাত করেছে। এছাড়া ডক্টর মোদে বাঙলা লোকগাথার এক সংকলন জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেছেন, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের অপেক্ষায়। এই দুই গবেষণামূলক কাজে তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন কল-কাতার এক গবেষক অরুণ রায়। এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিপূর্বে ডক্টর মোদে ও শ্রীমতকে রবীন্দ্র পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। ডক্টর মোদের 'ভারতের নারী' গ্রন্থটিও বিশ্ব মনোহর। ৩৫ বছরের এই ভারতপ্রেমী অধ্যাপক মোদে অসহৃদয়তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে প্রাণের টানে চলে আসেন। ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বেখানে, তিরিশের দশকে তিনি (শান্তিনিকেতনে) কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই মধুর স্মৃতি ডক্টর মোদের কাছে এখনো মনে হয় এই সেদিনের কথা।

গাই বাছুরের গান

পূরুষ ধর

গাই মেরেছে বাছুরকে
বাহুর মারে গাই
সারাটা দেশ গাইছে শোন
তাইরে নাইরে নাই।
গাই বাছুরের কমতা
চূর্ণ করে জনতা
বা খুশি তা করার মেয়া
সাজ হল ভাই,
সারাটা দেশ গাইছে শোন
তাইরে নাইরে নাই।
গাই বাছুরের গুঁতোনি
সইবে না আর কেউ
জনমনের সমুদ্রে
লাগলো নতুন চেউ।
এমাসেই নী শেষ হোল
বন্দীরা সব বেহোল
এবার তার সঠিক পথের
হদিস করা চাই,
সারাটা দেশ গাইছে শোন
তাইরে নাইরে নাই।

আক্রমণের প্রতিবাদ

গত ১লা এপ্রিল বিধানসভার দুর্গা সম্পাদক শ্রীহীরেন বহুর উপর আক্রমণের ঘটনার তদন্ত এবং দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার এবং এ বিষয়ে পুলিশমন্ত্রী বিবৃতি দাবী করেছেন গণতন্ত্রী কংগ্রেসের বিধানসভা সদস্য শ্রীহরী বেরা।

শ্রী বেরা বলেন, এই আক্রমণ কোন সাধারণ ঘটনা নয়। তিনি বলেন, এই ঘটনা সমাজবিরাোধীদের কাজ বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

শ্রী বেরা বলেন, আগেও দুর্গা পত্রিকা দপ্তরে আক্রমণ চালানো হয়েছে। যে ঘটনার আজও কোন কিনারা হয়নি।

প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রশান্ত সরকার এবং সম্পাদক কঞ্চাময় মল্লিক দুর্গা সম্পাদক হীরেন বহুর উপর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবী জানিয়েছেন।

এই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সারাভারত মার্কসবাদী কংগ্রেস ব্লকের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমদ্র মল্লিক চৌধুরী এক বিবৃতিতে বলেন, "দুর্গার সম্পাদক হীরেন বহুর ওপরে সম্প্রতি সমাজবিরাোধীরা যে বর্বরোচিত আক্রমণ চালিয়েছে তার বিরুদ্ধে জন প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানানো হচ্ছে। লোকসভার ইন্দিরা কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ের পর এটা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দরকার যে, সমাজবিরাোধীদের সুগের অবসান হয়েছে। আর মাহুদ সমাজবিরাোধী-

দের দৌরাত্ম্য সহ করবে না। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা থাকার সুযোগে এখনও সমাজবিরাোধীরা দৌরাত্ম্য চালাতে পারছে। তবে, পশ্চিমবঙ্গের মাহুদ পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী শাসনের অবসান ঘটাবেন।

পশ্চিমবঙ্গের আর-এন-পিও সাধারণ সম্পাদক শ্রীমান পাল এক বিবৃতিতে এই সমস্ত হামলার তীব্র নিন্দা করে বলেন যে, গণতান্ত্রিক সাংবাদিকের ওপর এই বর্বর আক্রমণে আমরা সন্তুষ্ট। প্রতিটি গণতান্ত্রিক মাহুদ এই হামলার প্রতিবাদ করবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

এস এক আই ও ডি ওয়াই একেই পক্ষে যথাক্রমে শ্রীহরী চক্রবর্তী ও শ্রীমদ্র দেব ভট্টাচার্য সম্পাদকের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা করে এক বিবৃতিতে এই ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে এবং স্বাধীন মত প্রকাশ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সংগ্রামে সাম্প্রতিক নির্বাচনে অর্জিত বিজয়কে রক্ষা করতে ছাত্র যুব সমাজের কাছে তাঁরা আহ্বান জানিয়েছেন।

আক্রমণের নিন্দা করে এস ইউ সি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীমদ্র মল্লিক দাশগুপ্ত, প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও গণতন্ত্রী কংগ্রেসের দক্ষিণ ২৪ পরগণার অন্ততম সংগঠক শ্রী বিনয় সিংহ এবং পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু মজদুর সভার সাধারণ সম্পাদকও বিবৃতি দিয়েছেন।

শ্রীমদ্র দাশগুপ্ত রায় ও শ্রীনারায়ণ চৌধুরী দুর্গা সম্পাদককে লিখিত ব্যক্তিগত পত্রে তাঁর সমস্ত আরোপ কামনা করেছেন।

আবহুস সাত্তারকে হটানোর দাবী

কংগ্রেসী মহল থেকে পাওয়া এক সংবাদে জানা গিয়েছে ১০ জন এম, এল, এ ও জমৈক মন্ত্রী সহ বিভিন্ন কংগ্রেস নেতারা কৃষিমন্ত্রী আবহুস সাত্তারের বিরুদ্ধে এক স্মারকলিপি কলকাতার পাঠিয়েছে এবং অবিলম্বে আবহুস সাত্তারকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবীও জানানো হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে সাত্তারকে অবিলম্বে কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড করার জন্য জ্ঞাপন করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি নির্বাচনে এই জেলায় পাটি বিরাোধী কাজ করেছেন।

জানা যায় সাত্তার সাহেব মুর্শিদাবাদ জেলায় নিজেকে নবাব বলে প্রচার করতেন। লোকসভার নির্বাচনে সাত্তার তার ভাই সিরাজুল

ইসলামকে (বর্তমানে কংগ্রেস থেকে বহিস্কৃত) নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসাবে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে দাঁড় করান। উক্ত সিরাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ রয়েছে।

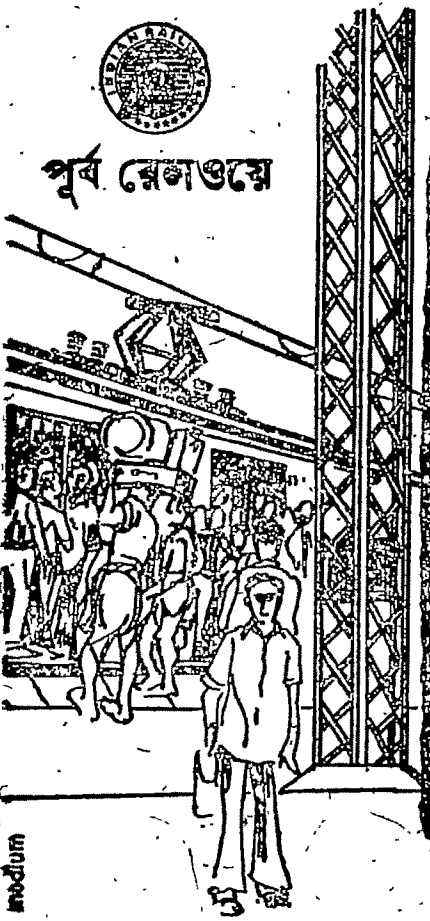
জেলায় কংগ্রেস নেতারা মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেসের পরাজয়ের জন্য আবহুস সাত্তারকে দায়ী করেছেন।

জমতা পাটি জেলার সঙ্গে লড়েই মুর্শিদাবাদ জেলায়ও জয় হয়েছে বং বদলের পালা। কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকরা যারা কলকাতার অপব্যবহার করে দীর্ঘদিন সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল তারাই রাতারাতি ভোল পাটে জনতা পাটি জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে জনতা ডেকে বয়েছে।

জাপানার সহযাত্রীরা বিরক্ত হতে পারেন, তা' ছাড়া তাঁদের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে। সম্রাতি বোম্বাই-এর শহরতলী ট্রেন-এ এরকমভাবেই একটি জাপান জাহাজের ব্যাগার ঘটেছিল।

যাত্রী গাড়ীতে দাঙ্গা ও বিক্ষোভের জিনিস নিয়ে যাওয়া সমস্ত কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। এই ধরনের কাজ জাইনত মনোনীত।

নিজেকে এবং জাপানার সহযাত্রীদের বিপন্ন করবেন না।



এই ধরনের জিনিস কখনোই সাজে নেবেন না।

কেন হারলেন

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

ভিত্তিরী অস্থায়

শংকরসে দেখা দিল শিল্প বাণিজ্যে মন্দার জের, উৎ-
পাদিকা শক্তিবৃদ্ধির ওপর সরকারী প্রচার ও জোরকদমে
শ্রমিকদের খাটিয়ে নেওয়া দেখা গেল না কিন্তু বোনাস,
চাঁটাই-তালারদী ইত্যাদি রুচী-হরণকারী গাঁড়াকস থেকে
মুক্তি পাবার কোনো পথ। অথচ, যুনিয়নগুলিকে—আই
এন টি যু সি এবং সি পি আই অধ্যুষিত সংগঠন এলাকার
বিশেষতঃ সরকার কাছাকাছি বসলদা বা করার পূর শ্রমিক
শ্রেণীকে যু ও বধিরের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হল। সক্রিয়
ট্রেড যুনিয়নী কার্যকলাপ শুরু করে শিল্পাঞ্চলীয় “শান্তি”
বজায় রেখে পুঁজিনিবেশকারী ব্যক্তি মালিকদের অর্থ-
নৈতিক প্রসারের সুযোগ বাড়িয়ে দেওয়া হল বটে, কিন্তু
শ্রমিকবর্গ এবং বে-রোজগার শহরাঞ্চলীয় অকুশলী এবং
অর্ধকুশলী ম'হুদরা দেখল যে গ্রামাঞ্চলে ফিরে যাবার পথ
আর নেই, আছে শুধু বেকার হয়ে দিনের পর দিন ভি-
তীর অবস্থায় দিন গুজরান করা ও ট্রেড-যুনিয়নী ‘নেতা’দের
জীবন দেখে যাওয়ার সম্ভাবনা। উত্তর প্রদেশের বৃহত্তম
শিল্পপ্রধান নগর কানপুরে সি পি আই সমর্থিত প্রার্থীর
শৌচনীর পরাজয়ে প্রমাণ হয়েছে, বিপ্লবাত্মক অভিজ্ঞত যে
সব তথাকথিত প্রগতিশীল ‘কমিউনিস্ট’ এবং ‘সমাজবাদী’
কংগ্রেসী শ্রমিকদেরকে নাগরের লোভ দেখিয়ে গাধা
খাটিয়ে নেওয়ার মত খাটিয়ে নিচ্ছিল, জনতার হাতে-তাদের
কি হুমকি সাজা। অথচ, কানপুরের এই ভেজাল কমিউনিস্ট
একটানা ২০ বছর ধরে এম, পি থেকে শ্রমিকদের ‘সেবা’
করে আসছিলেন; সম্প্রতি এর একমাত্র ‘কর্তব্য’ হয়েছিল
‘ইন্দিরা-দিদিজীর’ কাছে শ্রমিকদের হয়ে প্রসাদ যাচনা
করা, যদিও হয়ে গে প্রসাদ মোনোদিনই মেলেনি, একের
পর এক স্ত্রী, রোলিং মিল ইত্যাদি যুনিট বন্ধ হয়ে থাকা
যার প্রমাণ।

শাসকশ্রেণী ভারসাম্য হারাল কেন?

৭৭-এর নির্বাচন একটা গড়গড়তা নির্বাচন ছিল না।
এর আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অপরিণীম। প্রত্যুতঃ, ৭৪ সাল
থেকেই দুই বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তি—সাম্রাজ্যবাদের দুই চরিত্র
সম্পন্ন দুই মহাশক্তি এক পরস্পরাগত পুঁজিবাদ ভিত্তিক,
দুই ভ্রষ্ট সমাজবাদী—ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে
অত্যন্ত হস্তক্ষেপ করে আসছে। পুঁজিবাদের
বিশ্বব্যাপী সঙ্কট ভারতের অর্থনীতিকেও সঙ্কট জর্জর করে
ভুলছিল ১৯৭৩ থেকেই। ৭৪-এর গোড়া থেকে দেখা দিল
মন্দা ও মুদা‘ক্ষীতির সীড়ানী আক্রমণ। কংগ্রেস দল ২৭
বছরের একটানা শাসন দখলের অহঙ্কার বশতঃ এবং ১৯৮২
এর পর দলের আভ্যন্তরীণ সঙ্কট সাময়িকভাবে কাটিয়ে
ঠেতে পারায় রাজনৈতিক পদ্ধতির মূল ধরে টান দিল;
খাঁড় ভারতের সংবিধানে নিহিত ব্যক্তির গণতান্ত্রিক অধি-
কার ও মৌলিক স্বাধীনতার রক্ষাকবচ উপেক্ষা করল ও
বদলে দিল, গুটিকর ঝাপসা এবং নীতি বিরহিত “গরীবী-
হটাও” প্যাটার্নের নিছক প্রোগান।

অথচ এই কংগ্রেসই ক্ষমতা হারাবার ভয়ে বিরোধী
দলগুলির বিরুদ্ধে প্রোগানবাজীর অভিযোগ করে এসেছে
চিরকাল। কলে পার্টির মধ্যেই জেগে উঠলো বিরোধী
গোষ্ঠী: কখনও কংগ্রেস স্পেশালিস্ট কোরাম বনাম নেহরু-
বাদী, সমাজবাদী অংশগুলির অন্তর্ভুক্ত, কখনও প্রদেশ
অথবা রাষ্ট্রপায়ে ক্ষমতাস্বার্থী ও ক্ষমতাদল প্রয়াসীদের
প্রায় খোলাখুলি সম্মুখ সম্মুখ। দেখা দিল, নিরুশুণ সংখ্যা-
ধিকার ক্ষমতাস্বার্থের চূড়ান্ত ভারসাম্যহীনতা। প্রথমে
গুজরাট এবং পরে বিহার ও অন্ধ্র এই ধরনের অব্যবস্থিত
রাজনৈতিক দশা পাটিকে এত ভয় করে তুললো যে,
বিরোধী দলগুলিকে আর বঠ করতে হল না। জনতার
চোখে আঁজুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে কংগ্রেস আমলে কি।

একটি উদাহরণ নেওয়া বাক। সংবিধানে উক্ত বিচার
বিভাগীয় তদারক করার ক্ষমতা এবং বিচারকদের স্বাভাবিক
[Power of judicial review inherent in the
judiciary and independence of the judges]
অথচ বিচারকদের কিছুমাত্র কর্তৃত্ব দিতে নারাজ শাসকদল
ক্ষমতাই বিচার বিভাগের ওপর দখল দিতে আরম্ভ করেছে
১৯৭৩-এর এপ্রিল থেকে, যখন সুপ্রীম কোর্টের ১৩ জন
বিচারককে বেঞ্চ আইনের বেলে সংবিধান সংশোধনের সীমা
দর্শাবার চেষ্টা করে। আইন প্রণয়নকারী বিভাগের ক্ষমতা
সম্পূর্ণভাবে পার্লামেন্টের ওপর ক্ষত, এমনি অপ্রাসঙ্গিক
বখার, ধুস্তরাল সৃষ্টি করে, কংগ্রেস সেই থেকে কার্যপালিকার
(the executive wing of the state) ‘অপ্রতিহত
কর্তৃত্ব বাড়িয়ে চলেছে বিচার বিভাগের, বিশেষতঃ বিচারক-
দের কর্তৃত্ব তথা রাজনীতি নিরপেক্ষ ভূমিকাকে ক্ষুণ্ণ করে।
প্রথমে শ্রীহরীর প্রধান বিচারকরূপে নিয়োগ, পরে সম্প্রতি
শ্রীবেগের অল্পরূপ নিয়োগ আবহমানকাল থেকে স্বীকৃত
‘অভিজ্ঞতার জোষ্ঠ যে তার অগ্রাধিকার’ এই নীতির ওপর
অন্যায় আঘাত করল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা চলতে লাগল, বিচারকদেরকে
শাসকদলের দলীয় রাজনীতির দিকে অগ্রসর করে তোলার
জন্য—যার নয় মোসাহেবী রূপ দিলেন মোহন কুমার-
মহন্ত এবং প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীয়ার বিচারকদের
দর্শন প্রভৃতি কি হওয়া চাই সে সম্বন্ধে ফতোয়া দিয়ে।
সর্বশ্রী হেগড়ে, খান্না ইত্যাদি সিনিয়র বিচারকদের স্বাভাবিক
শ্রীতি এবং সেকারণে তাদেরকে উপেক্ষা করার নিয়োগ,
ভারতের আইনজীবী মহলে এক তীব্র আলোড়ন এনেছে,
যার প্রতিফল এই নির্বাচনে বাঙ্গালারের মত, শিক্ষাদীক্ষার
প্রাঙ্গণের কেন্দ্রে দেখা গেল। শ্রীহেগড়ে এখান থেকেই
নির্বাচিত হয়েছেন। লক্ষ্যনীয়, নেহরুর ইতিহাস প্রসিদ্ধ
উক্তি, নেহরুপুত্রী স্বয়ং তুলে গেলেন, যেমন তুলে গেল
শাসকদলের মাথাছানীয়রা। বিচার বিভাগের সদস্যদেরকে
আমাদের প্রজ্ঞা করা উচিত। জ্ঞানী বিচারকরূপে তাদের
কর্তব্য হল দেখা যে, মুহর্তের উত্তেজনার বশে জন প্রতি-
নিধিয়া তুল না করে; তুল করতে তো পারে তারা।”
অথচ মজার কথা, শাসক দল জনকল্যাণের ধূয়ো তুলে নাগ-
রিকের স্বাধীনতা হরণ করল সংবিধানের ওপর ৪২ বার
সংশোধনের ক্ষমতা আহির করে, কিন্তু গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা
ও সমানধিকার যে পরস্পরের পরিপূরক, তা বেমালাম চাপা
দিয়ে গেল, করল বৈরতন্ত্রের গোড়াপত্তন।

রাষ্ট্রের নবোদীয়মান শক্তি

এই নির্বাচন পরিষ্কার করে দেখিয়েছে যে জনতাকে
ডিঙিয়ে রাষ্ট্রশক্তির ব্যবহার এই দেশে আর সম্ভব নয়।
রিগিং করার যত্নবস্ত্র হয় নি যে এমন নয়। শ্রীচরণ সিং
সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন নির্বাচনের মাত্র
কয়েকদিন আগে যে, ডুপ্লিকেট ব্যালট শেপার ছাপা হচ্ছে
তিন আয়গার, সরকারী ছাপাখানায়। কারচুপি বিশারদ
বৃহৎ আমলা অফিসারদেরকে বদলি করে বিশেষ বিশেষ
স্থানে বসানো হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাকি ডি.
এম-এবং সমান মর্যাদার অস্ত্র অফিসাররা শাসকদলের
অহঙ্কলে কাজ করতে লেগে গেছে, অতি সন্তোষনে। কিন্তু
প্রশাসন যন্ত্রের সম্পূর্ণ কাঠামোটা মোটের ওপর দল নিরপেক্ষ
থেকেছে। এতে প্রমাণ হয় (১) ভারতের জনগণ পূর্বের
তুলনায় রাজনৈতিক পরিপক্বতা এবং হুঁশিয়ারী অর্জন
করেছে। (২) শাসকশ্রেণীর আভ্যন্তরীণ ঘন্ড এবং গোষ্ঠী-
যুদ্ধ এমন এক সমাহুপাতিক বিন্দুতে পৌঁছেছিল (Balanc-
ing point) যে, গড়পড়তাভাবে আমলাকুল ধিধাগ্রস্ত হয়ে
গেছিল এবং এই প্রথম তারা সরকার চালক দলের মজি
তুষ্ট করা অপেক্ষা জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা বাঞ্ছনীয় মনে
করেছে। এমনি পরিণতি, জাতির সর্বসাধারণের হাংব
নতুন শক্তিকেজীক গতিপ্রবাহের উৎস। ফলে, সমাজের
(শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

পুস্তক সমীক্ষা

গল্পে বলিষ্ঠ শ্রেণীচেতনা

সাম্প্রতিক ছোটগল্পকারদের
শিবিরে সাধন চট্টোপাধ্যায় একটি
পরিচিতি নাম। বয়সে তরুণ এই
লেখকের দু একটি উপজাতিও ইতি-
মধ্যেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম
হয়েছে। বলাই বাহুল্য, সাহিত্যের
নাম করে আদ্রিস বা রহস্যরোম্যাকের
কারবার কৈদে সত্যায় বাজিয়াং করা
সাধনের উদ্দেশ্য নয়। বয়সে তরুণ
হওয়া সত্ত্বেও, মানুষের প্রতি এক
প্রকার ক্রপদী, গভীর ভালবাসা ও
জীবনের প্রতি এক প্রকার উদ্বোধ,
স্বস্তির পক্ষপাতই শিল্পী সাধনের
একান্ত বাজাত্ম্য। তার সাম্প্রতিক
গল্পগ্রন্থে (মনোনয়ন। সাধন চট্টো-
পাধ্যায়। লেখক সমাবেশ, এ-২৮-এ
বলেচল্লিট মার্কেট, কলিকাতা-৭।
দাম ৮-০০) সংগৃহীত গল্পগুলি পড়ার
পর ঐ ভালবাসা ও পক্ষপাতের
আবেগই সর্বাগ্রে পাঠকের মনকে স্পর্শ
করে।

গল্পগুলির চরিত্র, ঘটনা, ঘট-
প্রতিঘাত সব কিছুই লেখকের নিঃস্ব
অভিজ্ঞতার স্রোতে অধ্বিত একটি বিশেষ
শ্রেণীর জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে
আবর্তিত—যে শ্রেণী বঞ্চিত, অব-
হেলিত এবং আশাবাদী। আমার
বখা, এ শ্রেণীপক্ষপাতকে প্রকাশ
করতে গিয়ে সাধন কোথাও নিজের
শিল্পীসত্তাকে ধ্বংস করেন নি। তাই
তার গল্পগুলির আড়ালে সক্রিয় সমাজ
চেতনাও কোথাও গুচ্ছ প্রচার না হয়ে
সজীব প্রকাশের স্বাক্ষর রেখে গেছে।
লেখকের গল্প বর্গার ভদ্রী, ভাবা ও
শব্দের প্রয়োগ, চরিত্র চিত্রণে নৈপুণ্য,
কর্ণনা ও পর্যবেক্ষণ শক্তি সব কিছুর
মধ্য দিয়েই এ গল্পের পাঠকেরা একটি
সচেতন শিল্পী তরুণের উপস্থিতি লক্ষ্য
করেন। সব চেয়ে বড় কথা, সাধনের
ঐ জীবন ভাবনা কোথাও অতি সরল
জীবন-ভাবানুভূতির ভদ্রীতে হাজির হয়
নি। জীবনের জটিলতা ও মানব
চরিত্র বিকাশের স্বাভাবিকতাগুলিও
তার দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায় নি। ‘কচ
ও দেববানী’র পৌরাণিক প্রেমিক,
‘বুড়ি বুড়ি’র প্রায় পঞ্চ বয়স্ক, ‘দারোদা
ঠাকুর’এর দজ্জাল প্রোটা বা
‘লোবেল্ল দত্তিদার’এর Ante-hero
লোকোজন্য প্রায় সব চরিত্রগুলির
মধ্যেই জীবন ও বিকাশের এ দৃশ্য ও
জটিলতার স্বাক্ষর রয়ে গেছে।
‘ভারত তীর্থ’ গল্পেও লেখক যখন প্রায়
সাংবাদিক স্বলভ ভদ্রীতে সমাজ
জীবনের একটি সম্পূর্ণ অবহেলিত
অংশের করুণতম আলোচ্য রচনা
করেন, তখনও এইসব মানুষের জীবনে
হৃদয় সংস্কার ও জড়বৈর অভিধান

প্রশ্নেও আশাদের দৃষ্টিকেও ভাবানু
হতে দেন না। এইখানেই সাধনের
স্বাধুনিকতা।

সাধন তরুণ শিল্পী। তাই
তার গল্পগুলির মধ্যে পূর্বস্রবীদের
উপস্থিতি, বিশেষ বরে মাপিক বা
গোর্কী-চেকভের প্রভাবও স্থানে স্থানে
বেশ স্পষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু এ
প্রভাব কোথাও গল্পগুলির স্রোতে
ঝুলিয়ে দেওয়া পোষাক বলে মনে হয়
না। বরং একজন সত্যাবমান তরুণ
শিল্পীর প্রস্তুতিকালের আন্তরিকতাকেই
প্রমাণ করে।

পরিশেষে, আশা করবো—বহুতা
যুগ ও জীবনের কথক হিসাবে, বৃহত্তম
মানুষের কথা দেশজ লোক সংস্কৃতির
বিষয় ও প্রকাশ, উন্নয়নিকশ ঐতিহ্যের
প্রতিষ্ঠা তিনি তার দৃষ্টিপাত করবেন,
যে দৃষ্টি তার স্রষ্টিকে ব্যাপকতম
মানুষের মর্মমূলে প্রতিষ্ঠিত করবে।
এই লক্ষ্যের অস্তই তাকে প্রস্তুত হতে
হবে। কে না জানে, এ প্রস্তুতির
অন্ত নামই সংগ্রাম।

বইটির আর্থিক বেশ ভালো।
কথাসিল্পী, গল্পকার, প্রকাশক মিহির
আচার্য্য এ বিষয়ে কোন অমনযোগের
দৃষ্টান্ত রাখেন নি। তবে দাম আর
একটু কম হলে ভাল হত।

শতজ্ঞা চাকী

অভিনন্দন

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক আইন-
জীবী সংঘ সারা পশ্চিমবঙ্গের
আইনজীবীদের অভিনন্দন জানিয়েছে
তারা ব্যক্তিকর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে এবং
গণতন্ত্রের পক্ষে সামিল হওয়ার জন্য।
ব্যক্তিকর্তৃত্ববাদ যে ধূলিসাৎ হয়েছে
তার জন্ত তাঁদের কৃতিত্ব কম নয়।
সংঘ লক্ষ লক্ষ ভোটারকেও অভিনন্দন
জানিয়েছে যাদের গণতন্ত্রের স্বপক্ষে
অভ্যুত্থানের কলে ভারতীয় রাজ-
নীতিতে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে।

আইনজীবী সংঘ জনতা পার্টি ও
তার মিত্র দলগুলিকে গণতন্ত্র ও নাগ-
রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি
স্বরণ করিয়ে দিয়ে ৪২তম সংশোধন
আইন সহ সমস্ত দমনমূলক, অগণ-
তান্ত্রিক ও মৌল অধিকার বিরোধী
কাহন নাকচ করার কথা বলেছে
এবং সেই সঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক ও
মিশায় আটক বন্দীদের মুক্তিদানের
কথাও বলেছে।

আইনজীবী সংঘ এ কে গোপা-
লনের যত্নে গভীর শোক প্রকাশ
করেছে।

রাজ্য নির্বাচনী জল্পনা

(দর্পণ সংবাদদাতা)

দিল্লীতে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার আমীনাখানের নির্দেশে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার রথীন সেনগুপ্ত দিল্লীতে গিয়েছিলেন। জানা গেছে রথীনবাবুকে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার আমদানি বিধানসভা নির্বাচনের জন্ত প্রস্তুত হতে বলেছেন।

রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা এবং দিল্লী থেকে বিভিন্ন পক্ষে পাওয়া খবরে ভিত্তিতে বলা যায় এ রাজ্যের নির্বাচন জুন মাসেই হওয়ার সম্ভাবনা।

সম্প্রতি কলকাতার সংসদে বিরোধী দলের নেতা ওয়াই বি চাবন কংগ্রেসী নেতাদের কাছে বিধানসভা নির্বাচনের জন্ত প্রস্তুত হতে বলে গেছেন। প্রাক্তন রাজস্বমন্ত্রী প্রবর মুখার্জীও তাই ধারণা। গণতন্ত্রী কংগ্রেসের নেতা বিজয় নাহার গত সপ্তাহে দু দিনের জন্ত কলকাতার

বন্দী মুক্তি নিয়ে টালবাহানা

বন্দী মুক্তির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানা টালবাহানা করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কোন কোন রাজনৈতিক মহল জানিয়েছেন যে, এমার্জেন্সীর পরে গৃহ সমত রাজনৈতিক বন্দীদের এখনও মুক্তি দেওয়া হয় নি। এদের মধ্যে অনেক সি পি এম ও মকশালপন্থী যুবক রয়েছেন। লোক সভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচরণ সিংয়ের সাম্প্রতিক ঘোষণার পর রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নেন সেটা কিছু দিনের মধ্যেই জানা যাবে। আমরা এখানে কয়েকজন ডি আই আর বা

এসেছিলেন। তিনিও তাঁর ঘনিষ্ঠদের কাছে আন্ত নির্বাচনের কথাই বলে গেছেন।

নির্বাচন জুন মাসে হচ্ছে ধরে নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক মহলে একটা বড় প্রশ্ন নির্বাচনী জোট নিয়ে। অর্থাৎ কে কার সঙ্গে জোট বাঁধবেন।

বিপ্লবী সতীন

জুলাই ২৫শে মার্চ সতীন সেন কল্যাণ মিশনের উদ্যোগে ভারত সভা হলে বিপ্লবী সতীন সেনের দাবি-পতন মুহুর্তাধিকী উদযাপিত হয়। অষ্ট্রা-নে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভট্টর অশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। উপাচার্য বিপ্লবী সতীন সেনের প্রতি প্রকট প্রীতি প্রকাশ করে বলেন, 'সতীন্দ্র-প্রসাদ সেনের মত বিপ্লবী শতাব্দীতে একজনই জন্মায়। বিপ্লবী সতীন সেনের কর্মমূল বিস্তীর্ণ ছিল না এবং বরিশালের মত একটি জেলার তাঁর কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকলেও তাঁর দমত ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রেরণা যুগিয়েছিল। বিশেষ করে, সতীন সেনের সত্যনিষ্ঠা ও মনোবল এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তিনি কখনো ক্ষমতালোভী ছিলেন না।' ডঃ মুখোপাধ্যায় বিপ্লবী সতীন সেনের জীবনানুসরণের জন্ত স্বদেশবাসীকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'এই মরণঞ্জয়ী বিপ্লবীর জীবন অধ্যয়ন অকারণে প্রয়োজন হাতে করে আমরা আমাদের সত্যকার চরিত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি।' এছাড়া, উপাচার্য মুখোপাধ্যায় সতীন্দ্রনাথের 'এক পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রকাশের ওপর জোর দেন।

বাংলা দেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীতবেশ নন্দী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, জাতির কল্যাণে সতীন মিসার আটক বন্দীর নাম উল্লেখ করছি যাদের এখনও ছাড়া হয়নি। ডি আই আরে আটক আছেন—সঞ্জয় মিত্র, শিবাজী ভট্টাচার্য, কল্লোল দাশগুপ্ত, সুধান্ত সেনগুপ্ত, দিলীপ ঘোষ, অরিনাশ ঘোষ, পরেশ ঘোষ এবং মিসার আটক আছেন তারক দাস, কপী বাগচী, সমীর রায়, পমিল মজুমদার, সোমনাথ ঘোষ শঙ্কর ভট্টাচার্য, অরুণ মণ্ডল, পিনাকি বিশ্বাস, জয়ন্ত চ্যাটার্জী, যশন চক্রবর্তী, রঘুবীর প্রামাণিক, গোপাল শীল।

কেন হারালেন

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়তম তর অবধি রাষ্ট্রশাস্ত্র অবনয়ন সম্ভব এবং প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্রীকরণ তখনই হয় যখন, ক্ষমতার হস্ত বিতাজন করে জনতার প্রতি অংশে অর্গণিত ক্ষমতাকেন্দ্রের ফোকাস দেখা যায়। এমন পরিণাম বহুকাঙ্ক্ষিত রাজ্যের চালিকা-শক্তি সম্পূর্ণভাবে সকল নাগরিকের আয়ত্তে আসবে যখন প্রশাসনে অংশ গ্রহণকারী হবে শাসিতরা।

কেন্দ্র মতন মন্ত্রিসভার প্রত্ন এবং বিভিন্ন মন্ত্রীদের রাজনৈতিক পটভূমিকা দেখে সকলের জানা। সুতরাং জনতাপাটী বহু-কেন্দ্রিক বার্ষ-সংলগ্ন ক্রিয় তা নিয়ে আলোচনা নিম্নয়োজন। সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায় যে, '৭৭-এর শুরুতে ভারতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের এক পর্যায় সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করলো, যার নাম দ্বিমণ্ডলীয় রাজনৈতিক পদ্ধতি। উদীয়মান শাসক দল, বা দলজোট, কংগ্রেসের মতই শাসক শ্রেণীর অসীমত; তথাৎ ঐতিহাসিক ভূমিকায়। বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস দলের মন্ত্রীমণ্ডলী টিকবে

রাজ্যের সি পি এমের নেতৃত্বে বামপন্থী দলগুলো জনতা পার্টি এবং সি-এফ-ডিআর সঙ্গে জোট বাঁধবে বলে মনে হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দলগুলো এ ব্যাপারে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত। এ সপ্তাহেই প্রমুখ সেন, বিজয় নাহার প্রমুখ নেতারা দিল্লী থেকে কিয়ে এলে খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে কথা হবে।

সি পি আই কি করবে এখনও ঠিক করে উঠতে পারে নি। কারণ সি পি আই-এর একটা গোষ্ঠী বাম-পন্থীদের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করতে আগ্রহী। অপর গোষ্ঠী

সেনের মৃত্যু বার্ষিকী

নাথ সেনের মত বিপ্লবী শতাব্দীতে একজনই জন্মায়। বিপ্লবী সতীন সেনের কর্মমূল বিস্তীর্ণ ছিল না এবং বরিশালের মত একটি জেলার তাঁর কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকলেও তাঁর দমত ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রেরণা যুগিয়েছিল। বিশেষ করে, সতীন সেনের সত্যনিষ্ঠা ও মনোবল এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তিনি কখনো ক্ষমতালোভী ছিলেন না।' ডঃ মুখোপাধ্যায় বিপ্লবী সতীন সেনের জীবনানুসরণের জন্ত স্বদেশবাসীকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'এই মরণঞ্জয়ী বিপ্লবীর জীবন অধ্যয়ন অকারণে প্রয়োজন হাতে করে আমরা আমাদের সত্যকার চরিত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি।' এছাড়া, উপাচার্য মুখোপাধ্যায় সতীন্দ্রনাথের 'এক পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রকাশের ওপর জোর দেন।

বাংলা দেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীতবেশ নন্দী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, জাতির কল্যাণে সতীন

না যাবে, এ নিয়ে গবেষণার আঙ্গ অঙ্গ নেই। অতীত অতীত গবেষণা গণতন্ত্রপ্রেমী কংগ্রেস (C. F. D.) বৈশিষ্ট্য বাঁধে, নাকি জনতা পার্টি? এখানে প্রাক্তন সমাজবাদীরা। আবার আর এক দিকে চিন্তাকর্ষক কল্পনার ধোঁরাক হ'ল, কংগ্রেসের মধ্যে পশ্চিমী পুঁজিবাদী অগতির দিকে কে বৈশিষ্ট্য ক'রে রয়েছে, সঞ্জয় গান্ধী, বা তত্ত্ব মাতা ইন্দিরাদেবী!

বর্তমানে কোঁকুহলোদীপক ব্যাপার হ'ল। সি. পি. আই. দলের নবতম আবিষ্কার: জনতাদলের মধ্যে সহযোগীরূপে সংযুক্ত সি. এফ. ডি. দলই নাকি একমাত্র প্রগতিশীল উপকরণ। সম্ভবতঃ, মস্তো থেকে দুর্বোপ-বিশারদ স্তম্ভরা ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সমীক্ষা করে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে। সুতরাং তাদের তদন্ত অসুগতর। আর একবার স্বমোহনাত্মক খেলা শুরু করবে, শাসকদলের ভেতর থেকে তাদের প্রতি অস্বস্তি ব্যক্তি বা গ্রুপ আবিষ্কারের এতে আশ্চর্য কি।

"প্রগতিশীল" কংগ্রেসীদের সঙ্গে। জাতীয় কার্য নির্বাহক সমিতির সভায় সি পি আই দল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

এস ইউ সি এবার লোকসভার নির্বাচনে একাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছে। খুব সম্ভব এবার বিধান সভায় সি পি এম সহ বামপন্থীদের সঙ্গেই জোট বাঁধবে।

বিপ্লবী কংগ্রেসকে এবার হস্ত শোচনীয়তম পরাজয় বরণ করার জন্ত নিঃসঙ্গ হয়েই লড়তে হবে।

পালিত হল

সেনের মত বিপ্লবীদের জীবন অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন, হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির জন্ত সতীন্দ্রনাথ যে অবদান রেখে গেছেন তা চিরকাল ভারত-জন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

বিপ্লবী পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত বলেন যে, ভারতীয় জনগণের সামাজিক উন্নয়নের জন্ত সংগ্রামের ক্ষেত্রে একদিকে সত্যগ্রহণশক্তি ও অতীতকে সশস্ত্র আন্দোলনের চিন্তা করতে সতীন্দ্রনাথ সেনকে তিনি দেখেছেন।

সতীন সেন কল্যাণ মিশনের সম্পাদক-শ্রীকৃষ্ণজ্যোতি দত্ত জানান যে, ২২শে ১২৪ বি ধর্মতলা ষ্ট্রীটে সতীন সেনের নামে একটি (বুক-ব্যান্ড) পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা তাঁরা করেছেন।

সামগ্রিক শাসন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্যাসেল। পাঞ্জাবী যেরে Oxford University Press এর লুইসের দ্বী। লুইসকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করা হয় এবং জেলে প্যাসেলকে অবসর অত্যাচার করা হয়। পরে তার পাস-পোর্টে কেড়ে নেওয়া হয়। এই ঘটনার মারক ছিলেন ইন্দিরার অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওম মেহতা।

নির্বাচনে পরাজয়ের পর দেখা যাচ্ছে ইন্দিরা সঞ্জয়কে বাঁচানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন এমন কি দলের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েও। এর কারণ কী শুধুই সন্তান প্রীতি? রাজধানীর খবর, সঞ্জয় মাকে লাগিয়েছে যে 'তুমি যদি আমাকে রক্ষা না কর তাহলে আমি তোমার সব কুকীর্তি ধ্বংস করে দেব।' এই কুকীর্তির তালিকায় ব্যক্তিগত ঘটনাও জড়িত বলে জানা যায়। সঞ্জয়ের প্রাকমেলের শিকার আঙ্গ ইন্দিরা।

বর্গীর রাজত্ব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কমিশনার, প্রশাসক ইত্যাদিকে সানন্দে মাথা পেতে নিতে দেখা গেছে। এর মধ্যে বর্তমান কমিশনার নির্মাল্য মুখার্জীর কৃতিত্বই সর্বাধিক। সংজ্ঞা কাল করত্রে চাওয়ার দরপ বদলি, পদোন্নতি বা ভিবিবিয়ে যাওয়ার চেষ্টা বিরল নয়।

লুটের মাল

কর্পোরেশনের ডমি পকেট ক্লাবে নামে দীর্ঘ দিতে গিয়ে এমন বে-আইনী কাজ হয়েছে যে, তা বিশ্বাস করা কঠিন। ভাব দেখে মনে ইচ্ছা যে একদল ডাকাত লুটের মাল বণ্টন করে নিচ্ছে। রিপোর্ট, কমিটি ইত্যাদির পরোয়া না করে কেবল একটি সংস্কার জনক নৈতিক চরিত্রের ব্যক্তিকে কমিশনারের পদ উৎকোচ দিয়ে গত কয়েক বছর ধরে এখানে বর্গীর রাজত্ব চলেছে যে, তা দেখে আগেকার দুর্দাস-প্রভ যে কোন কংগ্রেসী কাউন্সিলার পূর্বস্ত লজ্জা পাবেন।

শোনা যাচ্ছে বর্তমান কমিশনার এবং তার সাক্ষাত পার্সোনেল অফিসার নাকি তাড়াতাড়ি এখান থেকে বিদায় নিতে চেষ্টা করছেন। এ বিষয়ে সত্যানুসন্ধান এবং প্রতি-কাবের জন্ত মুখ্যমন্ত্রীর (গত নির্বাচন থেকে সামান্য শিক্ষাও যদি তিনি লাভ করে থাকেন) উচিত একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা।

তাহলেই বেরিয়ে পড়বে ১০ টাকা করে পোষ্টাল অর্ডার দিয়ে যে হাজার হাজার শিক্ষিত যুবকযুগতী (তাদের মধ্যে কংগ্রেসভক্তও আছে) পরীক্ষা দিয়েছেন কেবল রহস্যজনক কারণে তাদের পরীক্ষার খাতা না দেখে মন্ত্রীর পাঠান লিষ্ট থেকে প্যাসেল তৈরি করা হয়েছিল। টাইপিংয়ে যাদের মিনিটে ১০টা শব্দের ঘো-নেই তারা কেমন করে টাইপিং চাকরি পেয়ে কন্ফার্মেশন পরীক্ষার দলে দলে ফের করে আবার নতুন পরীক্ষকের হাতে সবাই পাশ করে গেল। কতজনকে বসাবার জন্ত মনুষ্য পদ পুষ্টি করা হয়েছে। কত অফিসারকে শুধু মাত্র স্ট্রাইকে দালানির পারিতোষিক স্বল্প ভিত্তি পদে উন্নতি করা হয়েছে, আবার কতজনের মন দাবি অগ্রাহ্য করে তাদের স্থপার করা হয়েছে।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী এস, ১৯৩১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বোস কর্তৃক তৈরি ও প্রকাশিত মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ হট লেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বর্তমান সংসদ সদস্যদের অনেকেরই ধারণা জরুরী অবস্থার স্বযোগ নিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, গুজ সপ্তয় গান্ধী প্রায়শতাতিক কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। এই বিপুল পরিমাণ টাকার অধিকাংশই রয়েছে বিদেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে। আয়ের স্রোত সম্পর্কে সদস্যদের বক্তব্য জরুরী অবস্থার সপ্তয় বেজীর মস্তিষ্ক প্রায় প্রত্যেকটি দপ্তরে নিজের আধিপত্য কায়েম করে বসেন। কোন সময় সরাসরি, কখনও বা চাপ তৃষ্টি করে দপ্তরগুলিকে নিজের কাছে লাগান। এমনই অবস্থা দাঁড়ায় যে কোন রকম ব্যবসায়িক চুক্তিই সপ্তয় বিনা হস্তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক আর্থিক কেন্দ্রের সময় সপ্তয় যে কোন মতেই হোক না কেন একজন 'পার্টি' হয়ে পড়ে। এই 'পার্টি' হতে গিয়ে সপ্তয় কোন সময় হন কোনও নামকরা কার্কে-এজেন্ট, কোনও সময় ডীলার, কোনও সময় বা সরাসরি নিজেই ব্যবসায়ী হয়ে পড়েন। বলা বাহুল্য, সরকারী পদস্থ অফিসাররা অধিকাংশ সময়েই সপ্তয়কে খুশী করতে বাধ্য হন। এইই সারফং সপ্তয় মাত্র ১১ মাসেই কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে ওঠেন। এই সব টাকা বিদেশের ব্যাঙ্কে রেখে সপ্তয় বিভিন্ন অভিযোগের পাস কাটানোর চেষ্টা করলেও অনেকেরই ধারণা শেষ পর্যন্ত সপ্তয়ের কোন জারি-জুরিই ধোঁপ টিকবে না।

তৎকালীন পেট্রোলিয়ম মন্ত্রী কে, ডি, মাপব্যকে টেকনিকাল বিশেষজ্ঞরা একথা আনিয় দেন। কিন্তু তাদের এই স্থপারিশ অগ্রাহ্য করে কারিগরি বিশেষজ্ঞের মত ৭৬ সনের ২২ জায়ায়ী রায় দিলেন—না, না হোয়েট নয় জার্মানীর দেমাগ জেন কেনার অন্যই অর্ডার দেওয়া হোক। বলা বাহুল্য এই দেমাগ জেন সর্বাধিক দরে টেণ্ডার দিয়েছেন সপ্তয়ের মার্কিতি হেভি ভেহিকেলস লিমিটেড। বিষয়টি আবার অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হল। অর্থ দপ্তরের সচিবরা মসৃণদিক বিচার বিবেচনা করে বললেন অয়েল এণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনের কথাই ঠিক। কেননা হোয়েট জেন নামকরা (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

কেন আন্দোলনে নেমেছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আহ্বানে গত ১১ ও ১২ এপ্রিল রাজ্যের প্রায় আট হাজার অধ্যাপক বেতন ও চাকুরির শর্তাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্ত দুই দিন ধরে কর্মবিরতি পালন করেন। ১১ এপ্রিল সোমবার অধ্যাপকেরা বেলা তিনটের সময় কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হন। তারপর তাঁরা মিছিল বয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্ত বিধান সভা ভবনের দিকে অগ্রসর হন। পুলিশ এসপ্লানেড ইন্সটে রাজভবনের সামনে মিছিলের প্রতিরোধ করলে অধ্যাপকদের একটি প্রতিনিধি দল বিধান সভা ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে অধ্যাপকদের দাবিদাওয়া সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন ও তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার অনুরোধ জানান। অধ্যাপকদের এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন অধ্যাপক সমিতির সভাপতি লোকসভার নব-নির্বাচিত সদস্য অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী।

এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের সময় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক প্রতিনিধিদের জানান যে তিনি ও শিক্ষামন্ত্রী সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে ১৮ এপ্রিলের আগে কোন আলোচনার বসতে অক্ষম। তারপর অধ্যাপক প্রতিনিধিরা ফিরে এসে এসপ্লানেড ইন্সটে অবস্থানরত অধ্যাপকদের সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন যে, গত কয়েক বছর ধরে রাজ্য সরকার অধ্যাপকদের দাবি সম্পর্কে যে মনোভাব দেখিয়ে এসেছেন তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুসারে এইদিন বেলা পাঁচটা থেকে পরের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার ১২ এপ্রিল বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অধ্যাপকগণ এসপ্লানেড ইন্সটে অবস্থান করেন।

অধ্যাপকদের বিভিন্ন দাবির মধ্যে রয়েছে অবিলম্বে নতুন বেতনক্রম ও বর্ধিত মহার্ঘ ভাতা দেওয়া, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ও তাদের অধীনে কলেজগুলির অধ্যাপকদের স্বযোগ সুবিধা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ অধ্যাপকদের (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

মল্লীকন্যার

বিবাহ উপলক্ষে

উপহার

নিয়ে তদন্ত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্যের জনৈক মল্লীকন্যার বিবাহ উপলক্ষে প্রাপ্ত খ্রীতি উপহার নিয়ে তদন্ত কমিশন বসানোর প্রস্তাব উঠেছে। মন্ত্রিসভার অন্ততম প্রস্তাব-শালী সদস্যের কস্তার বিবাহ হয়েছে সম্মতি। কেনেয়ারী দলে ছিলেন রাজ্যের তামাম শিল্পপতিরা। খ্রীতি উপহার স্বরূপ ভাগ্যবতী নববধূ পেয়েছেন আটটি ফ্রিড, কয়েক লক্ষ টাকার হীরা অহরতের গহনা আর নগদ টাকার ভোড়া।

গোটা ব্যাপারটি নিয়ে কানাকানি চলছিল অনেকদিন। রাজনৈতিক পালা বদলের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের কংগ্রেসী মহলের পরিবর্তনশীলতা এ নিয়ে সোরগোল তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, ছোটখাট মার্কিতি অনেক রয়েছে। পুঙ্খ তদন্ত হলে অনেক রহস্য ধরা পড়বে বলে তাঁদের বিশ্বাস।

তথ্য আহ্বান

অনামধ্যাত্ত এস পি, প্রাক্তন মিসাবন্দী, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান জরুরী অবস্থার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে সংঘটিত অবৈধ কার্যকলাপ, হুণীতি, অত্যাচার, আটক, খুন, মামলা ইত্যাদি সম্পর্কে আহ্বাপূর্বিক তথ্য গোপনে আহ্বান করছেন। দু কপি করে পাঠাতে হবে। বক্স নং ২০১, দর্পণ, ৩১ মট লেন, কলিকাতা-৭০০০১৩।

বিংশ বর্ষ ॥ ১২শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১৫ই এপ্রিল '৭৭ ॥ ৪০ পঃ

সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে মোরারজীর

কাছে তরুণকান্তির অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে তদন্তের যে কথা উঠেছে রাজধানীর বিভিন্ন মহলে তাঁর মূলে আছেন প্রাক্তন পুলিশ মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ।

সম্প্রতি তরুণবাবু দিল্লী গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে দেখা করেন। প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ ঘোষ মহাশয় প্রফুল্লবাবুর পারে লুটিয়ে পড়ে শ্রদ্ধা জানান। অবশ্য কারণ পরে বোকা গেল যখন তিনি প্রফুল্লবাবুকে অনুরোধ করেন তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার জন্ত।

এরপর প্রফুল্লবাবু মোরারজী দেশাইর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী, তরুণবাবুকে পরের দিন সকালে আসতে বলেন। নির্ধারিত সময়ে মোরারজী ভাইটের বাসভবনে উপস্থিত হয়ে তরুণবাবু জানান যে গত মাসের নির্বাচনে যে-রিগিংয়ের ব্যাপক চেষ্টা হয়েছিল তার মূলে ছিলেন স্বয়ং সিদ্ধার্থ রায়। কিছু কাগজপত্রও তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেন এবং মোরারজী দেশাই সেগুলি গ্রহণ করেন।

ঘটনার শেষ এখানেই নয়। শুভ যে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এতেই আত্মা দে আটখানা হয়ে তরুণবাবু ভাবলেন 'তব জয় হয়ে গিয়েছে এবং বলকাতায় কিরে সবাইকে বলতে শুরু করলেন, "মাক্কা আর নেই, এবার আমিই মুখ্যমন্ত্রী হব।" এই শুনে পুরমন্ত্রী স্বরূপ মুখোপাধ্যায় নাকি তরুণবাবুর রুদ্ধি সম্পর্কে ইংগিত করে কিছু বলেন। কংগ্রেসী মহলে ধারণা যে সিদ্ধার্থ রায়কে সরিয়ে যদি অন্ত কোন মন্ত্রিসভা হয় তাহলে তা পাঁচদিনও টিকবে না, কারণ তখন নিজেদের পেরোপেরির চরম প্রকাশ ঘটবে।

দিল্লী ঘটনা দেখে যাচ্ছে। কারণ জোর করে সরকার ভেঙে দেওয়ার পক্ষ-পাতী মোরারজী নন। তবে যদি নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সরকার ভাঙে তবে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হবে পরবর্তী নির্বাচন অবধি এবং মনে হয় তাই ঘটবে কারণ এই সরকারের মেয়াদ আর মাস দেড়েকের বেশী নয়।

আবার 'দ্বংসপ্লের নগরী'

সে দিনটি সকলেরই মনে আছে। সেই ২৬শে আগস্ট, ১৯৭৪। ষ্টার থিয়েটারের সামনে পিপলস থ্রিটল থিয়েটারের সদস্যদের প্রহার, গালি-গালাজ এমন কি পাঁচকাপ্রহার করে-ছিলেন কংগ্রেসের যুবকর্মীরা ও তাদের শিকশকেট সহযোগীগণ এক বিরাট পুলিশবাহিনীর স্বেচ্ছায় আশ্রয়ে। "দ্বংসপ্লের নগরী" নাটকের অভিনয় বন্ধ করার জন্য একজন অভিনেত্রীকে চুল ধরে কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার মনে হয়েছিল পুলিশ ও কংগ্রেসীদের। পরে মুখ্য-মন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় বিভিন্ন নাট্যদলের

প্রতিনিধিদের সামনে ঐ গুণামিকে ন্যায্য রাজনৈতিক আকশন বলে সমর্থন করেছিলেন।

তখনই পি এল টির পক্ষ থেকে বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিনিধিদের বলা হয়েছিল : ঐ ষ্টার থিয়েটারেই আবার আমরা "দ্বংসপ্লের নগরী" অভিনয় করবো। সেই অভিনয়ের দিন আগামী ২৭ এপ্রিল, সন্ধ্যা ৬-৩০। যে সব যুবমতীর হল পুলিশের আশ্রয়ে শিল্পীদের প্রহার করে, সাজ সরকার চুরমার করে, গণনাট্য সংঘের দপ্তরে আগুন দিয়ে, ছোরা মেয়ে বাংলার (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

সংবাদপত্র

সংবাদপত্রের রাহমুক্তি

এমার্জেন্সী বলবৎ করে ইন্দিরা সরকার যেসব গণতান্ত্রিক অধিকার অপহরণ করে নিয়েছিলেন জনতা সরকার সেসব আন্তে আন্তে কিরিয়ে দিচ্ছেন। সংবাদপত্র এমার্জেন্সীর পূর্বকার স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। নির্বাচনের আগেই এদের অনেকে স্বয়ং পার্টি "জনতা হাওয়ার" ভাসতে শুরু করেছিল। নির্বাচনের পরে একেবারে ঘোরন্ত ইন্দিরা-সঙ্ঘ তথা কংগ্রেস বিরোধী। যারা বৃহৎ হরফে ব্যানার হেডলাইন দিয়েছিল "পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের সঞ্জীবনী সফর" তারাই এখন মারুতি নাগরগুলা নিয়ে প্রচণ্ড মাতামাতি মরছে। এমার্জেন্সীতে যেসব সংবাদপত্র নির্বাচনীত হয়েছিল তারা যে এখন সুযোগ পেয়ে ইন্দিরা-সঙ্ঘ তথা কংগ্রেস বিরোধী জেহাদ চালাবে তাতে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রী এল.কে. আদবানীর সংবাদপত্রের মালিকানা সম্পর্কে বক্তৃত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে চাই জনতন্ত্রের পরিপোষক এই সংবাদপত্রগুলি চিরকাল জনস্বার্থের বিরোধিতা ও কার্যমী স্বার্থের দালালি করেছে। গণতন্ত্রের এরা ধোঁকাই পরোয়া করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানে এদের কাছে মালিকের স্বাধীনতা। তিরিশ বছর ধরে এরা শাসক দলের তল্লাহক। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের পরে পদত্যাগ না করায় এরা ইন্দিরার—কংগ্রেস দলের নয়—সমালোচনা শুরু করেছিল। কারণ তারা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে জীয়ে রাখতে চায়। প্রচলিত ব্যবস্থার বিধি-বিধান যদি না মানা হয় তাহলে যে পথেই হোক পরিবর্তন আসতে পারে এবং কার্যমী স্বার্থের অবসান ঘটতে পারে। তাই তথাকথিত গণতান্ত্রিক বীতিনীতি সম্পর্কে এরা এত সচেতন।

ভারতবর্ষের বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি হয় কোন একটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের লেজুড় আর না হয় নিজেরাই ইণ্ডাস্ট্রি। এরা নিরপেক্ষতার একটা ভাগ করে, কিন্তু আসলে পার্টিজান—শোষিতের পক্ষে নয়, শোষকের পক্ষে। অজান্তে জনতান্ত্রিক দেশে সংবাদপত্র আরও বড় ইণ্ডাস্ট্রি। কিন্তু সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন, সরকার বা সর্বোচ্চ সরকারী পদাধিকারী কারোর পরোয়া তারা করে না। যেখানে নিজেদের দেশ মুক্তে জড়িয়ে পড়েছে সেই ভিয়েতনামের সত্য সংবাদ প্রকাশে মার্কিন সংবাদপত্রের কোন কুঠী দেখা যায় নি। প্রকৃতপক্ষে ভিয়েতনামে মার্কিনী বর্বরতার কাহিনী ও সংবাদ চিত্র সবই মার্কিন সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরাই প্রকাশ করেছে। আর আমাদের দেশে কেবল সংবাদ স্নাক-আউট। মালিকদের কেলেঙ্কারীর কথা তো তাদের নিজেদের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ই না, এমন কি মালিক শ্রেণীর কোন দুর্নীতির কথাই—উপযুক্ত তদন্ত মারফৎ উদ্ঘাটিত হলেও—প্রকাশিত হয় না। গত তিরিশ বছরে এই রকম হাজার হাজার ঘটনার সংবাদ বৃহৎ সংবাদপত্রের অফিসে হত্যা করা হয়েছে মালিকদের নির্দেশে। আর আজমর্দাদা-সম্পন্ন সম্পাদককে পছন্দ না হলেই মালিকেরা তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করে ভেড়ুয়া জো-ছকুম সম্পাদক নিয়োগ করেছে। আজ পর্যন্ত বহু সম্পাদকের চাকরি গেছে। হিন্দুস্থান টাইমসের ভার্গিস বোধহয় এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে শেষ উদাহরণ।

বর্তমানে অধিকাংশ বৃহৎ সংবাদপত্রের মালিকানা একটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউস বা একটি পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু এই মালিকানা বিভাজন করে দিলেই, অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির মধ্যে ভাগ করে দিলেই, সংবাদপত্রের রাহমুক্তি ঘটবে না। ইতিমধ্যে ষ্টেটসম্যান পত্রিকার ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা হয়ে গেছে। এই পত্রিকা আগে ছিল বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অ্যান্ড্রু ইউলার ফুজিগত। বেশ কয়েক বছর আগে এর মালিকানা গ্রহণ করে টাটা মফংলাল ইত্যাদি কয়েকটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। তাতে পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি বা নীতির বিশেষ কিছু হেরফের হয়নি। এমনিতে ষ্টেটসম্যানের এফটা সুনাম আছে। কিন্তু তার সঙ্গে কাগজের চরিজের কোন সম্পর্ক নেই। সেটা এফিসিয়েন্সির জন্ত এবং কলকাতার আর পাঁচটা অপার্ট কাগজের তুলনায়। কিন্তু শ্রেণীস্বার্থের প্রস্নে সকলেই এফটা—এবং সংবাদ হননে কারো কোন কুঠী নেই। তাই সংবাদপত্রের প্রকৃত স্বাধীনতার জন্ত সংবাদপত্রকে মালিক শ্রেণীর কজা থেকে মুক্ত করতে হবে।

সি পি এম সহ বামপন্থী দলের সঙ্গে মোচা প্রসঙ্গে অশোককৃষ্ণ দত্তের বক্তব্য

(দর্পণের প্রতিনিধি)

সোমবার পশ্চিমবঙ্গের জনতা পার্টির সাধারণ সম্পাদক লোকসভা সদস্য শ্রী অশোককৃষ্ণ দত্ত দর্পণের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিতে জাতীয় পার্টি বলে অভিহিত করেন এবং একে পুণ্যের নায়ক রামের সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস সি-পি-আইয়ের মত পশ্চিম-বঙ্গ থেকে সম্মুখে বিনষ্ট হয়ে যাবে।

শ্রীদত্ত এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, "আমি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিতে বিভাজন পার্টি বলে মনে করিনা। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি একটি জাতীয় পার্টি। তাঁদের সঙ্গে রাজ-নীতির ক্ষেত্রে, বহু ব্যাপারে মত পার্থক্য আছে কিন্তু এটা বলতে দ্বিধা নেই যে, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কাজ করে নি, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির মত কোন বিদেশের দালাল নয়।

শিক্ষা সম্পর্কে প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

(দর্পণের প্রতিনিধি)

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর প্রতাপ-চন্দ্র চন্দ্র শিক্ষাকে মানুষ গড়ার কাজে নিয়োগের উপর সবিশেষ জোর দেন। দীর্ঘ তিরিশ বছরে কংগ্রেসী রাজত্বে শিক্ষার যে শোচনীয় হাল হয়েছে সে কথা স্বরণ করিয়ে দিয়ে জনতার মন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় জানান যে, তাঁর মন্ত্রণালয় এবারে ভারতের বিশ কোটি নিরক্ষর মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। তিনি বলেন, সমাজতন্ত্র মানে সত্য, অথচ নিরক্ষর কুড়ি কোটি বয়স্কের কোন শিক্ষা নেই। যে প্রাথমিক, চাষী বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর খরচ চালিয়ে চাচ্ছেন তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। আমরা এবার তাদের ওপর জোর দেব।

তিনি পাঠ্য পুস্তকের বোঝার কথা উল্লেখ করে বলেন, "রোজ যদি কাউকে দু'বেলা বিরিয়ানি খাওয়ানো হয় তবে হজমের গোলমাল হবেই। তাই আমরা এই বোঝা কমিয়ে সত্যকার সমাজসেবামূলক শিক্ষার ওপর জোর দেব। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বলিষ্ঠ এক শিক্ষিত সমাজ গড়ার দিকে আমাদের লক্ষ্য নির্দিষ্ট।

প্রসঙ্গত ডক্টর চন্দ্র শিক্ষা জগতের এক আসন্ন বিপ্লবের ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, শিক্ষার ব্যাপারটা শুধুমাত্র কোন

কমিউনিষ্ট পার্টি ও মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির তুলনামূলক প্রশ্নের এক অবাবে শ্রীদত্ত বলেন, রামের সঙ্গে রামচাঁদের তুলনা? সি পি আই অস্ত্রের সঙ্গে প্রতিপালিত দালাল, অস্ত্রের কাছে ভর দেওয়া এবং স্বভাব, কখনো কংগ্রেসের ঘাড়ে, কখনো মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির ঘাড়ে, এখন আরার জনতাও গণতন্ত্রী কংগ্রেসের ঘাড়ে চড়তে চাইছে।

নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনতা সি-পি-এম সহ বামপন্থী দল-গুলোর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীদত্ত বলেন, "শুধু আমার কেন্দ্রে নয়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় প্রথমে এই সহযোগিতার প্রস্নে আমাদের মনে দৃষ্টিগত ছিল, বিশেষ করে সি পি এম কর্মীরা কতখানি অস্ত্র দিয়ে এই সহ-যোগিতার ব্যাপারটা গ্রহণ করবেন। কিন্তু পরে, চ-চার জায়গার ব্যতিক্রম ছাড়া, আমাদের দু'দলে ব্যাপকভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ হয়েছে।

শিক্ষার উন্নয়নের কর্তা ব্যক্তি বা সরকারী প্রশাসকের ব্যাপার নয়, একটা জাতিকে সংস্কৃতিমান শিক্ষিত করতে হলে চাই শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র ও সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। কেন্দ্রে জনতা পার্টির সরকার কার্যম-হয়েছে জনতার স্বার্থ রক্ষার জন্ত জনতার শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলতে হইবে।

এ ছাড়া, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডক্টর চন্দ্র দু'ছ প্রাথমিক শিক্ষকদের আর্থিক উন্নতির ওপর বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন জাতির শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব বাঁদের ওপর তাঁদের আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় বলা যায় না, জনতা সরকার এই দেশের ব্যাপক প্রাথমিক শিক্ষকদের আর্থিক আ-কুল্যের ওপর বিশেষ জোর দেবেন। এ ছাড়া সর্বস্তরের শিক্ষকরা যাতে দেশ ও জাতির কাছ থেকে তথ্য সম্মান পান তাঁর জন্ত এক সাংস্কৃতিক পরিষদ গড়ে তোলার ওপর ডক্টর চন্দ্র বিশেষ জোর দেন। এ ছাড়া তিনি বলেন, বিরাট সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মত ছাত্ররা যেন বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপারটা গ্রহণ করে এবং বস্তি ও গ্রামে গিয়ে ছাত্ররা যাতে এই শিক্ষাদিতে পারেন তার ওপর জনতা সরকার জোর দেবেন বলে তিনি জানান।

এটা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ আমাদের কর্মীরা ও ছ' বামপন্থী অতীতে দীর্ঘদিন বাবং পরস্পরের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। কিন্তু এবারে কাজের মধ্য দিয়ে জনতা কর্মীরাও সি পি এম সহ বামপন্থী কর্মীরা উভয়ে উভয়ের আদর্শনিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধ দেখে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা প্রক্টার মনোভাব পোষণ করছেন।

প্রসঙ্গত তিনি আরও বলেন যে, "জনতার মধ্যে রয়েছে সংগঠন কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী, জনসংঘ দল; তাঁরা শুধু আদর্শবাদী নন, তাদের অনেকে আদর্শের জন্ত ইন্দিরা সরকারের নির্বাচন ভোগ করেছেন, তেমনি মার্কসবাদী কমিউনিষ্টদের মধ্যে রয়েছে অনেক আদর্শবাদী মানুষ যারা অহরুণভাবে আদর্শের জন্ত নির্বাচন সহ করেছেন। আর-এস-পি, কংগ্রেসের দল আরও অনেক ছোট, তাঁদের মধ্যেও রয়েছে বহু নিষ্ঠাবান মানুষ, তাদের মধ্যে দেখেছি সংখ্যার চেয়ে গুণের কবর বেশি।"

পশ্চিমবঙ্গের জনতা দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীদত্ত বিশ্বাস করেন যে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিম-বঙ্গের মানুষ পশ্চিমবঙ্গ থেকে ইন্দিরা কংগ্রেসকে মুছে দেবে। তিনি মনে করেন যে, এই রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনের মত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমস্ত দল একযোগে কাজ করবেন।

শ্রীদত্ত আরও জানান যে, ১লা মে দিল্লীতে জনতা পার্টির দলীয় কমিউনিষ্টদের পর তাঁরা রাজ্যে সংগঠন গড়ার ওপর বিশেষ জোর দেবেন। পশ্চিমবঙ্গের জনতা পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্র পরিষদের সভাপতি শ্রীসত্য মজুমদার সোমবার এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "আমরা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সি পি এম সহ সমস্ত বামপন্থী দলের সঙ্গে জনতা পার্টির মোর্চায় পক্ষপাতী। কারণ লোকসভা নির্বাচনে জনতা ও সি পি এম সহ বামপন্থী দলগুলোর যে মৈত্রী গড়ে উঠেছে তার সম্ভাব্য জনতার স্বার্থেই প্রয়োজন। কারণ এই মৈত্রী গড়ে উঠেছে ইন্দিরা-সরকারের কারাগারে, সংগ্রামের ক্ষেত্রে। শ্রীমজুমদার আরও বলেন যে, "এই মৈত্রীতে ফাটল ধরাবার জন্ত নানা স্বার্থান্বেষী মহল সচেষ্ট, আমরা তাদের বিরুদ্ধেই শিয়ারী দিচ্ছি।"

পুরসভায় নানা বেআইনী কার্যকলাপ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা পুরসভার কমিশনার নির্মাল্য মুখার্জী এবারে একটু প্যাচে পড়েছেন। তার ল্যাণ্ডলেভী যন্ত্র অধিকারীর সঙ্গে লাগতে বাওয়া তার কাল হয়েছে। না হলে ভরলোক চালাচ্ছিলেন মন্দ নয়। কর্পোরেশনের লাল বাড়ীটাকে জো তিনি কলির বুদ্ধাবন বানিয়ে ছেড়েছেন। কংগ্রেসী মন্তান রাজ্বে তিনি ধরাকে সরি করে ফেলেছিলেন। রুদ্রবর কক্ষে আলো-চমার অছিলায় তার লীলাংলোর নানান ছবি পুঙ্কর্মচারীরা এ কয় বছর দেখে দেখে মুচকি হেসেছেন। ছবিতে ছবিতে ছয়লাপ। সে কি কেবলই ছবি? যদি ছবিই হয় তাহলে কোন ছবি? সে কি শুধু খাদ্য-কালো না কি নানা রঙে রঙ করা?

প্রথম রিপূর প্রতাপ নির্মাল্য মুখার্জীর চরিত্রে বিলম্ব প্রবল এবং আদ্যম। নতুবা যে কালে তিনি সিলেকশন কমিটির মেম্বর নন সে-কালে তার পক্ষে গানের শিক্ষিকা এবং প্রধান শিক্ষিকাদের ইন্টারভিউয়ের সময় সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যানের আসন থেকে পালসোনেল অফিসারকে সরিয়ে বসে আসীন হওয়ার তেমন কোন সঙ্গত যুক্তি ছিল না।

যেমন গুরু তেমন চেলো

পুরসভার ভার নেওয়ার পরই নতুন পুঙ্কর্মচারী কমতার অপব্যবহারের একটি বিবল নজির রেখেছিল ২২'২ গড়িয়াহাট রোড বাড়ীটির ব্যাপারে। এই নতুন বাড়ীটির একটি ফ্ল্যাট মজী হুত্রতাবুর প্রয়োজন হয়েছিল। ফ্যানবেল ফ্ল্যাটের ভাড়া কম করেও হাজার টাকা। কিন্তু হুত্রতাবুর যদি আর দশ জনের মতই উচিত দামে জিনিস কিনবেন তাহলে কিসের তিনি মজী আর যুব কংগ্রেসের নেতা? তিনি বললেন, পাঁচশ টাকা। কিন্তু বাড়ীর মালিকের এতই স্পর্ধ। যে এতে তিনি অমৃত প্রকাশ করলেন। এর পরেও যে তার মতকটি তার ঘাড়ের উপর ঝাড়া রেখে তিনি বালিগঞ্জেই বহাল তবিরতে আছেন তার জন্ত হুত্রতাবুরকে তার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। এরপরে কমিশনার নির্মাল্য মুখার্জী যদি এই বাড়ীর জলের কালেকশন কেটে দেওয়ার, বাড়ী ভাঙার এবং অ্যাসেস-মেন্ট বাড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দিয়ে থাকেন তাহলে তার দ্বারা তার প্রভু-ভক্তিই প্রমাণ হয়।

হুত্রতাবুর শ্বশুরবাড়ী

এর পরের বাড়ীটি হল হুত্রতাবুর শ্বশুরবাড়ীর নামে ৪২ আমহার্ট স্ট্রিটের বাড়িটি যেখানে অনেক কালের

পুরনো ভাড়াটেয়া রয়েছে। এটাকে খালি করে নতুন ভাড়াটে বসাতে পারলে শ্বশুরবাড়ী-জামাইয়ের কত লাভ। কিন্তু কোন কোশলে এত কালের ভাড়াটে তোলা যায়? এইখানে প্রবেশ যোগ্য গুরু যোগ্য চেলো নির্মাল্য মুখার্জী। তিনি তার ভাড়া বাড়ী বিভাগকে রিপোর্ট দিতে বললেন। ইনসপেক্টর দেখে লিখলেন, বাড়ী ভালো, তাদের আওতায় আসে না। ডাক পড়ল নগর-স্থপতির। তার কৈকিয়ৎ চাওয়া হল। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলে নির্মাল্য মুখার্জী তাকে মারতে বাতি রাখলেন। সারা শহর বে-আইনী বাড়ীতে ভরে যাচ্ছে আর আপনায় বিভাগের লোকেরা ঘূষ খাচ্ছে। আরো, বে-আইনী বাড়ী ধরলে আপনাই তো মজীর নাম করে তাদের চেড়ে দিতে বলেন, আমি কি করব? অগ্নিতে ঘুতাহতি। নগর স্থপতি বে-ইজ্ঞত হয়ে অস্ত্র বদলি হলেন। এলেন নতুন বশংবদ।

এর পর কমিশনার চেষ্টা করলেন ২নং জেলা ইঞ্জিনিয়ারের লোকদের দিয়ে বাড়ী খালি করতে। কিন্তু বাদ সাধল স্থানীয় স্কোকেয়া। নির্মাল্য মুখার্জী ব্যর্থ হলেন। ব্যর্থ সিদ্ধির জন্ত জল বন্ধ করা, বাড়ী-ভাঙার আদেশ দেওয়া এবং বাড়ীর অ্যাসেসমেন্ট জ্যোতিষিক অস্ত্রে তুলে দেওয়া নির্মাল্য মুখার্জীর কাছে কোন নতুন ঘটনা নয়। তবে স্থানীয় মহিলার ছবি থাকলে তৎপরতা একটু বেশী দেখা যায় এই যা।

কলকাতা পুরসভার একদা নেতাজী-অধিকৃত আসনে বসে কমিশনার নির্মাল্য মুখার্জীর ভ্রাতৃপরাগতার পরাকাষ্ঠা হল স্বজন-পোষণ এবং দুর্বল-পেষণ। প্রথমটির দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখান যায় তার একটি ল্যাডুপুত্রকে তিনি কনসারভ্যান্সি ওভারসীরের পদে বসিয়েছেন। খুড়ো যেখানে কমিশনার সেখানে ভাইপো একটা ওভারসীরের চাকরি পাবেন, কংগ্রেসী রাজ্বে এটা এমন কিছু বিসদৃশ নয়। কিন্তু এ পদটিতে সরাসরি নিয়োগের নিয়ম বা নজির নেই। এ পদ পেতে হলে রক সরকার ইত্যাদি রূপে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। ভাইপোকে কনসারভ্যান্সি ওভারসীরের চাকরি দিতে গিয়ে এই নিয়মটি লঙ্ঘন করা হয়েছে। অবশ্য নির্মাল্য মুখার্জীর আমলে নিয়োগ, পদোন্নতির ইত্যাদির ব্যাপারে নিয়ম লঙ্ঘনের চাইতে নিয়ম রক্ষার সংখ্যা আজুলে গোনা যায়।

কমিশনার এখন অফিসের পরে রুদ্রবর কক্ষে তার সাক্ষাতদের নিয়ে বৈঠক করছেন। একটু বেকারদার পড়েছেন মনে হচ্ছে। কাগজপত্র পুড়িয়ে এবং মিথ্যা রিপোর্ট বানিয়ে তালবের চামচে নির্মাল্য মুখার্জী কি তদন্ত কমিশনের হাতে এড়াতে পারবেন? এবং সেই সঙ্গে তার মনিব মন্তানপ্রবর হুত্রত মুখার্জী?

রাজনৈতিক ডাইনি সন্ধান

দুর্বলপেষণের দৃষ্টান্ত অজস্র। আজল্যমান হিসেবে উল্লেখ করা যায় ডেপুটি অ্যাসেসর পদে নিয়োগের ব্যাপারটি। বর্তমান পদাধিকারীর দক্ষতা যেমন সর্বজন স্বীকৃত তেমন স্বীকৃত যে তিনি কাউকে খাতির করেন না এবং কাউকেই কোন কারণে বে-আইনী সুবিধা দেন না। কিন্তু গত পাঁচ বছরের মন্তানী রাজ্বে এ রকম লোকের কোথাও ভাত জোটেনি। আইন দেখাতে গিয়ে মহাকরণে পুরসেবা বিভাগের সিনিয়র ডেপুটি সেক্রেটারী অনিল বিশ্বাস রাইটাস থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। ডেপুটি অ্যাসেসর রমেন চ্যাটার্জিকে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন শর্তাপূর্ণ করার মারপ্যাচ করে ইন্টারভিউ থেকে বঞ্চিত করল। কমিশনের নির্বাচিত প্রার্থী শ্রীমাইতি একজনের জন্ত জট্ট করে চীফ ভ্যালুয়ারের উচ্চ বে পদে অ্যাকটিং করছিলেন সেখানেই থাকলেন। ডেপুটি অ্যাসেসরের পদে অস্থায়ী ভাবে নিয়োগের প্রকটি পর্যন্ত নির্মাল্য মুখার্জী সার্ভিস কমিশনে রেফার করে হুত্রতির দায় এড়াতে চাইলেন। কলকাতা পুরসভার ইতিহাসে এ ঘটনা আগে কখনো হয়নি। পুরপ্রশাসক এই ব্যাপারে মজীকে বোকাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে হাত ওটয়ে নিলেন। এই ব্যাপারে জিহন আলি খাঁর ভূমিকা নিলেন পুরসভার একদা বাস্তবযু, রিগিং মাধ্যমে এম-এল-এ নন্দলাল ব্যানার্জী। অস্থায়ী ডেপুটি অ্যাসেসর হলেন রাজ্য প্রশমজীর পি-এর ভাতা সমীর গাঙ্গুলি। তিনি লাইসেন্স ইনসপেক্টরের পদ থেকে ডবল প্রমোশন পেলেন। স্থায়ী এবং অস্থায়ী দুজন ডেপুটি অ্যাসেসরই সংশ্লিষ্ট বিভাগের বাইরের লোক। অ্যাসেসরের শূদ্ধ পদটিকে আটকান হল বিতাড়িত নগরস্থপতিক অস্থায়ী ভাবে বসিয়ে। রমেন চ্যাটার্জী বহুবার অ্যাসেসরের পদে অ্যাকটিং করেছেন অতএব এ পদে তার স্বাভাবিক দাবি। তা ছাড়া তার যোগ্যতা, সততা এবং চাপ

অগ্রাহ্য করার সাহস প্রমাণীত। একদা যুক্ত ফ্রন্টের সমর্থক বলে তার উন্নতির পথ বন্ধ করে এত বড় অস্ত্রার কাজের নজির স্থাপন করলেন মজী হুত্রত মুখোপাধ্যায়, তার কর্পোরেশন চেলার। এবং তার ল্যাণ্ডলেভী কমিশনার নির্মাল্য মুখার্জী। এতে তার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন পি-ও অজয় লাল এবং পুরসভার বহু কুর্কর্মের নায়ক নন্দলাল ব্যানার্জী।

এই ভাবে অ্যাসেসমেন্ট বিভাগের সিনিয়র কর্মচারীদের সকলের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তা তারা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়নি। বিভাগীয় কর্মচারীদের যৌথ সভীতের সম্মুখীন কর্তাদের শীঘ্রই হতে হবে। কাগজ পুড়িয়ে প্রমাণ লোপ করে আর গোপন সলা-পরামর্শ করে নির্মাল্য-অজয় অ্যাণ্ড কোম্পানী কত দূর যাবেন?

চাকরীর ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন ও পরিবহন দপ্তরের একটি পদে নিয়োগের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করা হয়েছে। জানা গেছে, গত ১২ট নভেম্বর বিভিন্ন কর্ম বিনিময় কেন্দ্রে থেকে প্রার্থীদের এই দপ্তরে একটি ইন্টারভিউয়ে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ যে, একেজো বোগ্যতার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচিত করা হয়নি। দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী এ. বি. বসু জটনৈক সিনিয়র পুলিশ অফিসারের পুত্র ডি গোশ্বামীর অস্থূলে কলকাঠি নেড়েছেন এবং তাকেই রিসার্চ অফিসারের পদে নিয়োগের জন্য সিলেক-

তদন্ত কমিশন চাই

হুত্রতাবুর আমলে কলকাতা পুরসভায় যত নিয়োগ, বদলি এবং পদোন্নতি হয়েছে তার অধিকাংশই এই রকম। চাকরি দেওয়ার নাম করে নগদনাথায়ের কাহিনীও শোনা গেছে। মজীর প্রাক্তন প্রাইভেট সেক্রেটারী কীতিমান কালিদাস শুষ্ঠাচার্জের (যার নামে সি-বি-আই তদন্ত হচ্ছে বলে শোনা যায়) আমলে তৎকালীন সিলেকশন কমিটির সচিব কালিদাসবাবুকে সই করা দ্বাংক অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠিয়েছিলেন। মামবিহীন নিয়োগপত্র নিয়েও অনেকে কাজে যোগ দিতে এসেছেন। কাউকে নিয়োগপত্র ছাড়াই কাজে বহাল করতে টেলিফোন করতেন মজীর সি-এ বাবলু মুখার্জী। বলতেন, এখন জয়েন করতে দিন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পরে পাঠানো হচ্ছে। রাম না হতেই রামায়ণ। এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করলেই বেরিয়ে পড়বে কুর্কর্মের মহাভারত। আমরা এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থস্বরূপ রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শাম বোর্ডের অন্যতম সদস্য এ. কে মৈত্রর কাছে স্থপাংশি করেছেন।

আরও জানা গেছে, ডি, গোশ্বামী পুলিশ অফিসারের পুত্র হওয়ার স্ববাদে নিজের অস্থূলে পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট পাওয়ার জন্য সব রকম সুবিধা নিয়েছেন।

যারা দর্পণের কাছে অভিযোগ করেছেন, তারা এ কথাও জানিয়েছেন যে, ডি, গোশ্বামী মোটেই বেকার নন। তিনি একজন আইনজীবীর সঙ্গে কাজ করেছেন এবং সন্ধ্যা শিল্পী হিসেবেও বোজগার করছেন। হতি-মধ্যে তাঁর দুটি বাংলা গানের বেকর্ডও বেরিয়েছে।

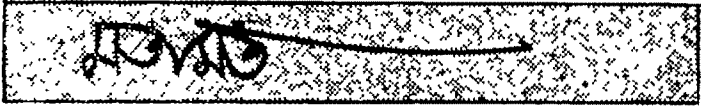
রিজ হোটেলে কর্মী ছাঁটাই

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রিজ কন্টিনেন্টাল হোটেল এম-প্রমীজ ইউনিয়ন এই হোটেল-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কর্মী ছাঁটাই, বণ্ড পেপারে অবরুদ্ধি স্বাক্ষর আদায় ইত্যাদি অভিযোগ এনেছে। এই ঘটনা ইন্দিরা গান্ধীর রাজ্বে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানিয়েও কোন কল হয়নি।

জানা গেছে, ১৯৭৫ সালের ১৮ই আগষ্টের মধ্য রাত্রে কর্তৃপক্ষ রিজ কন্টিনেন্টাল হোটেল লক-আউট ঘোষণা করেন। এই বছরেরই ২২শে ডিসেম্বর এন এল সি সি পরিচালিত একটি ভূয়া ও অননুমোদিত ইউনিয়নের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের প্রমিক স্বার্থ বিরোধী

চুক্তির ফলে লক-আউট প্রত্যাহার করা হয়। এই চুক্তি সব কর্মীদের পক্ষে বাধ্যতামূলক না হলেও কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক কর্মীর কাছে জোর করে বণ্ড পেপারে স্বাক্ষর আদায় করেন। কাজে বোগ দেবার কয়েকদিন পরে কর্মীরা এ বণ্ড আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান, যার ফলে ৩৬০ জনের ঘণ্যে ১৩২ জনকে ১৯৭৬ সালের ২৮শে জানুয়ারী থেকে হোটেল থেকে তুলে এবং কাজ করতে দেওয়া হয় না। এছাড়া আন্তর্জাতিক নারী বর্ষে ৩৪ জন মহিলা কর্মী চাকরী খুইয়েছেন। সাময়িক বরখাস্ত ১১ জন কর্মীকে ছ বছর ধরে দেয় ভাতা দেওয়া হয় না।



প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র সমীপেষু

আপনি লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন কেনে আমরা বাঙালীরা আন্তরিক খুশি। আমাদের অভি-
নন্দন গ্রহণ করুন।

বর্তমান লোকসভা মানাধি পরিবর্তন আনয়নের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করছে। সাধারণ পরিবর্তনের কথা বহু আলোচিত। কিন্তু বিশেষভাবে বাঙালীদের সমস্তাঙ্গি অবহেলিত। এমারজেন্সীর আমলে দিল্লী থেকে পূর্বে প্রত্যাহ আশ্বিনী বেতাবে বাংলাগান ইত্যাদি প্রচারের বে ব্যবস্থা ছিল তা বাতিল করে দেওয়া হয় কোন কারণ না দেখিয়ে এবং অহিন্দুতাবাদের ওপর হিন্দী বেতার প্রচারের বোঝা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এরকম আরও নানাধি বিষয় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নিম্ন-
লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করে দেখবেন :

(ক) বেতার ও টেলিভিশন, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থায় কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলির ওপর হস্ত করা হোক। তাতে স্থানীয় ভাষার স্বাধীনতা বাড়বে এবং স্থানীয় ভাষার প্রচারের ফলে স্থানীয় জনসাধারণের উপকার হবে। প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতির বক্তৃতা হিন্দী এবং ইংরাজীতে দিল্লী থেকে প্রচারিত হতে থাকুক; কিন্তু স্থানীয় বেতাবে তার অনুবাদ স্থানীয় ভাষাতেই প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন।

(খ) ব্যক্তি ও অস্বাভাবিক অর্থসাহায্য দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও অস্বাভাবিকভাবে বিবেচনাকৃত করে রাজ্যসরকারের

বর্তমানের আনা প্রদেয়। তাহলে অচিরেই পশ্চিমবঙ্গে, আসামে, বিহারে, উড়িষ্যায় বিনিয়োগের ক্ষমতা বর্তমান অপেক্ষা অনেক বেশি অর্থ পাওয়া যাবে কারণ বর্তমান কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় ঐ রাজ্যগুলি থেকে যে টাকা তোলা হয় তার অনেকটাই অস্বাভাবিক বিনি-
য়ুক্ত (invested) হয়।

(গ) সংবিধানের সংশোধন এমনভাবে করা প্রয়োজন যাতে কেন্দ্রীয় সরকার কোন রাজ্যের নির্বাচিত সরকার বরখাস্ত করতে না পারেন যা রাজ্য বিধানসভা ভাঙতে না পারেন বা রাজ্য সরকারের ওপর কোন আদেশ চাপাতে না পারেন।

সুচাযন্ত্র সরকার
বোম্বাই

জনগণ কি চায়

এটা খুবই দুঃখের ও দুর্ভাগ্যের সংবাদ হলেও, এটাই বাস্তব তথ্য সত্য যে অদ্যাবধি আমরা পৃথিবীর অত্যাচারী নারকদের যে কলংকিত ও রক্তাক্ত ধাধা দেখি, তাদের মধ্যে আরো একজন নবাবতের নাম ঘোষিত ও সংযুক্ত হলো। পৃথিবীর সর্বত্রের শান্তিকামী ও আশাবাদী মানুষেরা এঁদের গুণ ঘৃণাই করবেন তা নয়, মানবতার খাতিরে বরুণা পর্বত করবেন না, কারণ করা উচিত নয় বলেই, কারণ করলে মানবতার ভাব-
মূর্তি নষ্ট হয়।

আমি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কথাই বলছি। রাজীব সন্তানের মা,

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীই আ-বিশেষ প্রথম মহিলা যিনি ক্রান্ত, হিটলার, গোয়েরলস, মুসোলিনি, হিমলার, টুয়ান, টুজিলো প্রভৃতি নারকদের সঙ্গে "নারিকা হিন্দা"র তাঁর রক্তাক্ত হাত একেবারে মিলিয়ে মিশিয়ে দিলেন। আর সেজন্তাই ব্যাপারটা আরো যেন বেদনাময় ওয়াকর ও বিশ্বকর মনে হলো।

আমরা ভারতবাসীরা আমাদেরও অনেক কষ্ট দুর্ভাগ্য আর লজ্জার বিষয় এই যে এইশব্দ নারদীয় জগদেব সংগে একই টেবিলে বসে একই পান-পাত্রে, রক্তে চুমুক দিচ্ছেন, ধীরে অতিধীরে আবার একজন ভারতীয়—বিশেষ, তিনি একজন মহিলা। এখানেই শেষ নয় মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এবার থেকে আমাদের ধারণাও পাল্টাতে শুরু হবে। জীলোকেরা শুধুই নরনারী প্রাণময়ী দয়াবতী এবং ধারজী নন, ভয়াবহ ও বিধাতা অজগরও বটেন। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শাসক-দেরকে প্রজ্ঞার সংগে সঙ্গ করিয়ে দিতে চাই তাঁরা। কোন পথ বেছে নেবেন, টুজিলো-ইন্দিরা মানে জন-মানবের ঘৃণা, না তাঁদের অকৃত্রিম প্রজ্ঞা ও ভালোবাসা। মনে রাখবেন জনগণ চায় ন্যায়ত: অধিকার অর্থাৎ স্বাভাবিক পোষাক আর স্ব স্ব স্বাধীনতা। তারা চায় সম্মান ও শান্তি; চায় ভালোবাসার বাঁচতে। হিংসা-জে ল খা না-হ ত্যা-জু ধা-র তি ক, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও করুণা নিয়ে নয়। এসবের বিরুদ্ধে এরা সর্বদাই অশান্ত ও বিদ্রোহী। এং এর বা পরিণতি হয় তা-তো ইতিহাসের বাধা খপ্পরে নির্বাচিত।

অজিত্য সীতরা

সূর্য আবার ওঠে

আপনার পত্রিকায় ইংরাজ ও তাঁর সাগরবন্দ যারোয়াড়ীদের পূর্ব ভারতে শোষণের নগ চেহারা পড়ে শুকিত হয়ে গেলাম। আমি যেখানে আছি তার পাশেই হুজুমচাঁদ জুট মিল চিমনি দিয়ে ধোঁয়া তুলে গন্ধার এই নির্মল বাতাস কলুষিত করেছে। বন্ধনা ও শোষণের বিরুদ্ধে আজ গড়ে তুলতে হবে বিরামহীন সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে সিদ্ধার্থশংকর রায় (বাকি কেন্দ্রীয় সরকারের গোলাম বলে বর্ণনা করা হয়েছে) পূর্ব ভারতের এই বেদনার কথা তুলে ধরেছেন। গণতান্ত্রিক দেশে তিনি জনগণের গোলাম, ব্যক্তি বিশেষের নয়। তার প্রমাণ তিনি কোন হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা নেতাকে বিমান বলরে দখল দিতে যাননি। আগামী দিনের সংগ্রামে তাকে সাধী করতে হবে কমরেড। আজ লোকসভায় সি পি আই ট্রয়ের ঘোড়া বলে চিহ্নিত

হয়েছে। আপনি লিখেছেন সূর্য নির্বাচিত। আমার মনে হয় অন্তিমিত কথটাই ঠিক। সূর্য একা যখন আকাশে থাকে আর কাউকে পাতা দেয় না। অস্তের পরে চাঁদ ও অলংকার নক্ষত্র দেখা যায়। গণতন্ত্রের কথায় ওরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তবে ওদের আগমন প্রতীক্ষা করে রাজিতেই চোর নির্বিঘ্নে কাজ সারে। হাজী মস্তান প্রমুখ আরও কত চোরাকারবারী এই সূর্য অস্ত বাবার অপেক্ষায় ছিল। দেখুন এবার কি হয়। সূর্য আবার ওঠে। রাত শেষ হয়।

প্রভাতকিরণ মতিলাল

জয়প্রকাশ নারায়ণ

শ্রদ্ধেয় জয়প্রকাশ নারায়ণ আজ ভারতবাসী প্রত্যেকের হৃদয়ের অনেক-খানি স্থান জুড়ে আছেন। তিনি নব গণতন্ত্রের স্বার্থ প্রবর্তক ও প্রতীক। বিগত কয়েক বৎসর ধরে ভারতবর্ষে গণতন্ত্র বলে কিছু ছিল না। বামপন্থী দলগুলোর অধিকার অপহরণ করা হয়েছিল। স্বাধীন মত প্রকাশ ও সরকারী অপকর্মের সমালোচনা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে-ছিল। রাজনীতি করার অপরাধে হাজার হাজার যুবক জেলে নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছে, হাজার হাজার যুবক গৃহহীন হয়ে ভেঙ্গে বেড়িয়েছে। আজ দীর্ঘদিনের বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটবে জনগণ গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। জয়প্রকাশ নারায়ণ বিগত সরকারের বৈরতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জনগণের বাঁচার অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে দিবারাত্র পরিশ্রম করেছেন এবং মালের পর মাস কারাবাস করেছেন। তিনি স্বার্থহীন দেশকে ভালবাসেন। দেশের লীর্ঘস্থানীয় নেতৃবর্গের কাছে একান্ত অস্বস্তি, তারা যেন প্রতি মুহূর্তে দেখেন নাগরিকদের অধিকার হিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয় এবং বামপন্থীদের অস্তিত্ব বেন বজায় থাকে।

বিদ্যনাথ সাহা

প্রতিবাদ

দর্পণের ২৫শে মার্চ সংখ্যায় "কেয়া চক্রবর্তীর মৃত্যুর হস্ত" শীর্ষক সংবাদে লোজিতা চ্যাটার্জী সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে শ্রীমতী চ্যাটার্জী তার প্রতিবাদ করে লিখেছেন, "কেয়া দেবীর মার কাছে আমি যা বলেছি বলে আপনারা হেপেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এরকম কোন কথা আমি তাঁকে বলিনি। পোর্ট পুলিশের কাছে আমি যা বলেছি, কেয়া দেবীর মার কাছেও তাই বলা হয়েছে।" একথাও শ্রীমতী চ্যাটার্জী বলেছেন যে, তিনি কোন মিথ্যা ভাষণ করেন নি।

প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি বন্ধনা

প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি সীমাহীন বন্ধনার প্রতিবাদ করেছেন নিখিলবন্দ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীগোবিন্দানন্দ রায়। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন যে, পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সরকারী কর্মচারীদের জন্ত অন্তর্বর্তীকালীন পনের টাকা বেতন বৃদ্ধির এবং পে কমিশন নিয়োগের কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু, প্রাথমিক শিক্ষকদের সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারিত হয়নি। ইতিপূর্বেও সরকারী কর্মচারীদের জন্য বর্ধিত বোল টাকা মহার্য ভাতা থেকে প্রাথমিক শিক্ষকদের বঞ্চিত করা হয়েছে। বাড়ীভাড়া ভাতাও চিকিৎসা ভাতা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা এখনও হল না। কেন্দ্রে অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় হারে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্যভাতা নিতে না পারার জন্য যে মনোবেদনা প্রকাশ করেছেন সেটা যে সম্পূর্ণ কপট, আদৌ আন্তরিক নয়, প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি এই সীমাহীন বন্ধনাতেই তার প্রমাণ। আমরা এই বৈষম্যের ও বন্ধনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এর বিরুদ্ধে সর্বস্তরের প্রাথমিক শিক্ষকদের বৌধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনগুলির নিকট আহ্বান জানাচ্ছি।

বিজয় মিছিল

২২ শে মার্চ আর এস পির নেতৃত্বে এক বিরাট মিছিল বহরমপুর শহর প্রদক্ষিণ করে। ত্রিদিব চৌধুরী বিজয়ে উল্লাস ধ্বনি ছিল সোচ্চার।

২৩ শে মার্চ "মার্কসবাদী-কম্বী-সংস্কার" নেতৃত্বে কয়েকশত লোকের একটি সুসজ্জিত মিছিল থেকে জেলার তিনটি-কেন্দ্রেই কংগ্রেসের পরাজয়কে জনগণের পরিবর্তনাকাম্য রূপে তুলে ধরা হয় বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে।

২৪ শে মার্চ একটি মিছিল বের হয় সি পি এমের উদ্যোগে। তাঁদের প্রধান স্লোগান ছিল "রায় মন্ত্রিসভার" পদত্যাগ দাবী।

২৫ শে মার্চ জনতা পার্টি উদ্যোগে একটি মিছিল বের হয়। নির্বাচনে বিজয়ের উল্লাস ধ্বনি ছিল মিছিলের প্রধান স্লোগান।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় (৮ই এপ্রিল) মতামত কলমে "বরেন্দ্রের সম্মান দিন" এই শিরোনামের চিঠিটি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের উদ্দেশ্যে লিখিত। ভ্রমবশত একথা যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়নি।

বিচারাধীন বন্দীর মায়ের প্রশ্ন

আমি একজন বিচারাধীন বন্দীর মা। দেশের সমস্ত প্রচার যন্ত্র দেশ-বাসীকে জানিয়ে দিয়েছে-জনতা পার্টি যতদূর গণতন্ত্রকে উদ্ধার করেছে। বর্তমান সরকার নিশ্চয় জানেন, কয়েক হাজারেরও বেশী যুবশক্তিকে পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন জেলে এখনো আমাছবি অবস্থার মধ্যে কাটাতে হচ্ছে। যে বৈষাচার নিষিদ্ধারে মাহুষকে গুলি করে হত্যা করেছে—গোটা দেশকে পরিণত করতে চেয়েছে জেলখানায়—নির্বাচন করতে চেয়েছে একটা গোটা জাতকে সেই-তাদের প্রতিও যখন বর্তমান সরকারের মনোভাব ক্ষমার দৃষ্টি, তখন যেযুবশক্তি অস্ত্রের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে রূপে দাঁড়িয়েছিলো জীবনপণ সংকল্প নিয়ে, বৈষাচারের

উচ্ছেদ চেয়েছিলো—পথ ঘাই হোক না কেন—জনতা সরকারের করুণা তাদের ওপর সমাজও বর্ধিত হচ্ছে না কেন? অথচ তাঁদের নির্বাচনের অন্ততম স্লোগান তো ছিল, সমস্ত রাজবন্দীদের—মিলা অথবা বিচারাধীন—মুক্তি। অনেক ভাষা নিয়ে ছিলাম, কিন্তু আদালতের প্রণয়নিত আশা ভয়ের বেদনা দেখা দিচ্ছে। বুঝে উঠতে পারছি না নির্বাচনী স্লোগান অস্বাভাবিক সত্যিই কি আমা-দের ছেলেমেয়েরা বাইরের আলো দেখতে পাবে, না কি সেটা ছিলো শুধুই কথার কথা। তাদের ভাগ্য, ২১ শে মার্চের আগেও যেমন ছিলো, এখনো কি ঠিক তেমনি থাকবে?

মানসী চক্রবর্তী

ভারতে ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থানের পটভূমি ও যুব কংগ্রেসের 'যৌবন'

শ্রীকান্ত বসুরায়

ধনাত্ত বেকার সৃষ্টি করে—এ কোন নতুন কথা নয়, আর একচেটিয়া পুঁজিবাদ যে বাধ্যতামূলক বেকারীর জন্মদাতা, এ কথাটাও ভারতবাসীর কাছে আর কেতাব খুলে প্রমাণ করতে হবে না। বিপুল এই বেকারবাহিনীর একাংশ হয় বিদ্রোহী, একাংশ হয় সত্য প্রম ও সেনাবাহিনীর বোগানদার এবং বাকী অংশ হয় অন্ধকারের পতাকা-বাহীদের নেতৃত্বে খুন-নির্ধাতনের রিকার্ভার্ডস। এই শেষোক্ত দুই অংশ একচেটিয়া পুঁজিবাদের একান্ত কাম্য ও ফ্যাসিবাদের একটি অঙ্গরূপী সামাজিক রাজনৈতিক হাতিয়ার।

পশ্চিমী একচেটিয়াদের লীলাভূমিগুলিতে এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতেও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যুব সংগঠন ছিল বা আছে। কিন্তু যে যুব সংগঠন মাত্র ৭.৮ বছর আগে ভূমিষ্ঠ হয়ে ক'বছরের মধ্যেই তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন পার হয়ে একেবারে ভয়ঙ্কর মধ্যময় হয়ে পড়লো, দ্বিভ্রষ্ট চাষী-মজুর আর বেকারদের হত্যা উচ্ছেদ করে দেশী-বিদেশী একচেটিয়া স্বার্থগুলির 'মহাঅভ্যুত্থান' গড়ার রক্তপথে আজ হঠাৎ থমকে গিয়ে অজানা এক আশঙ্কায় থর থর করে কাঁপছে, সে সংগঠন অন্য, তার 'যৌবন' আর জন্মদাতাও (Parent organization) যে অন্য, এতে সন্দেহের কি আছে।

শাসক গোষ্ঠীর নেতৃত্বে সংগঠিত এই যুববাহিনীর জন্ম-রহস্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি (peculiarities) অবশ্যই শাসক-শক্তির চারিত্রিক বৈচিত্র্য, প্রবণতা ও তার সমসাময়িক গভীরে নিহিত।

পটভূমিকা

এ প্রসঙ্গে বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঠামোটর কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্যকে (principal peculiarities) বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে হয়; যথা—

১। নয়া-উপনিবেশবাদের উপর নির্ভরশীল ভারতে মধ্য-একচেটিয়া পুঁজিবাদ। এরূপ নয়া-একচেটিয়া পুঁজিবাদ অবশ্যই পরনির্ভর হতে বাধ্য আর একই কারণে এর শোষণ শাসন নীতি ও ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শিবিরের সাধারণ ক্রিয়া-প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকে না।

২। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী ব্যক্তিগত শিল্পপুঁজি ও মহাজনী মূলধন এবং পূর্ব ইউরোপীয় (সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী) রাষ্ট্রীয় শিল্পপুঁজি ও রাষ্ট্রীয় মহাজনী মূলধনের ভারতে যুগপৎ প্রসার।

৩। অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার (পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী) ও রাজনৈতিক-প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের পথে অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার (সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী)—ভারতে দুটি সক্রিয় শক্তি।

৪। ভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপরোক্ত দুই ধারা সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবের ফলে ভারতে শাসক শ্রেণীর আচরণে এক মিশ্র প্রক্রিয়া গড়ে উঠেছে।

৫। বিগত দু'দশকে, বিশেষতঃ গত এক দশকে ভারতীয় রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক মূলত্বগুলিতে যে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী অঙ্গপ্রবেশ ঘটেছে, তার প্রভাব পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবের থেকে আলাদা প্রকৃতির—তার প্রভাব স্বভাবতই বতটা রাজনৈতিক প্রশাসনিক ও তটা অর্থনৈতিক হওয়া সম্ভবতঃ ছিল না, কাজে কাজেই এর পরিপূরক হিসেবে তথাকথিত 'রুশ-ভারত শান্তি-মৈত্রী-চুক্তি' ও 'রুশ-ভারত অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি'-বৃহৎ উদ্ভব। (ঋণ্য: দর্পণ-এপ্রিল-মে, ১৯৭২)

৬। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এহেন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যতই মাথাভাঙ্গী ও এর ভিত্তি ততই দুর্বল হয়ে চললো, শাসকশ্রেণীর রাজনীতি, প্রশাসন, আমদানী-রপ্তানী ও বৈদেশিক-নীতি ততই কোণঠাসা জানোয়ারের মত একাধারে বেপরোয়া ও অসহায় হয়ে পড়লো। অবস্থাটা এমন যে, দেশের জনজীবনে যে শাসকশ্রেণী সর্বগ্রাসী, সর্ববিধবৎসী তবু ক্ষমার্ত, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে সে কাতর উচ্ছিন্নভোগী মাত্র।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে যে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট, নেতৃত্ব সঙ্কট, রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা, ভয়াবহ বেকার সমস্যা, সামরিক হতাশা, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা, সামরিক সম্প্রসারণবাদী প্রবণতা ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছিল, তাদেরই পটভূমিকার ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক প্রভাবে এক বিশেষ ধরনের ফ্যাসিবাদ ও তার অন্ততম হাতিয়ার যুব কংগ্রেসের এ তীব্র বড়ো তৎপরতার জন্ম।

উদ্যোগ-আয়োজন

(ক) রাষ্ট্র-কমতার কেন্দ্রীকরণ অনেক আগে থেকেই চলছিল; কালে কালে শাসনতন্ত্র ও শাসকদলের মর্যোকার পার্থক্যটুকুও রুশ ভারত প্রটোকলগুলির প্রচ্ছায় এ রূপ-ধাঁচ পায়। (ঋণ্য: দর্পণ-এ)

(খ) প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদের (Administrative Fascism) ক্রমপ্রতিষ্ঠা।

(গ) দেশী বৃহৎ ব্যক্তিগত বৃজ্জা জাতীয়করণ ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে তার দ্রুত সম্প্রসারণ এবং এতই মাধ্যমে আমদানী-রপ্তানীতে অর্জিত স্বার্থগুলি ও দেশী বিদেশী পুঁজি-বিনিয়োগের পদ্ধতিগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজে রাষ্ট্রীয় তদারকী ব্যবস্থা।

(ঘ) সাম্রাজ্যবাদী কিনাক্স ক্যাপিটেলের পৃষ্ঠ-শোষকতার ভারতীয় পুঁজির সম্প্রসারণবাদী উদ্যোগ; তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনা এই ঝুঁকিতে পুঁজি, পঞ্চম পরিকল্পনাকালে তৃতীয় বিশ্বের দেশে-দেশে বহুবিস্তারের আশায় সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিগুলির সহিত জয়েন্ট কম্পানি ও জয়েন্ট কাউন্সিল গঠন।

(ঙ) ইউরোপীয় 'ব্ল্যাক শার্ট' ও 'ব্রাউন শার্টের' ভারতীয় দুর্বল সংস্করণ—ভারতীয় যুব কংগ্রেস।

লক্ষণীয় উপরোক্ত প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির প্রথমটি ও চতুর্থটি যতটা প্রত্যক্ষরূপে ঘনিষ্ঠ, দ্বিতীয়টি ও তৃতীয়টি সেরূপ না হলেও ফ্যাসিবাদী দর্শনে এদের গুরুত্ব অপরিমিত। কিন্তু ভারতের বিশেষ পরিস্থিতিতে যে উদ্ভট ফ্যাসিবাদের ভয়, তার আয়োজন ও অভিযেকের ব্যবস্থা অবশ্যই এখানে শেষ হতে পারে না। তাই তো চতুর্দিকে পূর্ববঙ্গ বিজয়ের পর সিকিমের 'মুক্তিদান' তাই তো শিল্পক্ষেত্রে ও আমদানীতে অঙ্গ সংগ্রহের মস্ততা, আবহাওয়ার উগ্র জাতীয়তাবাদ, ও পার্ক-বিজয়ের আমেজ রক্ষার ভাগিদে বাহ্যিক জরুরী অবস্থা, জনমনে সংশয়, সন্ত্রাস ও আশঙ্কা সৃষ্টির লক্ষে আন্তর্জাতিক জরুরী অবস্থা, অনাবশ্যক আর্থিক আড়ম্বর, যেকোয় জাহাজে চড়ে আর্ষভট্টের মহাকাশ যাত্রার মাহাভাষ্য, প্রচারযন্ত্রের 'ইন্দিয়ান', 'মহান নেত্রী' বিশ্ব-ইমেজ কাহিনী, ভূমি বিশদকা-কর্মহুচী—এসমস্ত বাদশাহী সমাজতন্ত্র বা ফ্যাসিবাদের এক একটি কসরৎ ও পরিচ্ছদ। এসমস্ত ভূমি আশা-উত্তেজনার ধুলো-রঙের মাথায় চড়ে যে ফ্যাসিবাদ এই ভারত ভূমিকে ধক্ক করলো, তারই অঙ্গে বস্ত্রে আর যত্ন-আস্তিরে গড়ে উঠলো যে

আলালের ঘরের সমস্ত ছলান, যে তৃপ্তিহীন, অন্ন-স্বার্থ যুব কংগ্রেস তার ডান-গম্বি আর দেশসেবার কাহিনী আমরা বাস্তবের আলোচনা করবো।

যদি বাহ্যিক এ হেন ফ্যাসিবাদের সামগ্রিক কমতা ও অক্ষমতার উপরই নির্ভর করে তার অন্ততম হাতিয়ার যুব কংগ্রেসের শক্তি ও দুর্বলতা, তার বীতংগার ভীষণতা ও অক্ষমতা।

কমতা ও অক্ষমতা

শাসনশক্তির নেতৃত্বে এই ফ্যাসিবাদের, ও তার যুব-হাতিয়ার যুব কংগ্রেসের শক্তি ও দুর্বলতার উৎসও স্বভাবতই অভিন্ন। দেশী-বিদেশী ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিক একচেটিয়া পুঁজিগুলির যুগলক্ষেত্র এই ভারতভূমিতে পুঁজিবাদ নানা প্রকার সাধারণ ও বিশেষ সঙ্কটের (general and particular crises) এক জটিল আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। যেনমানে রাহুগ্রস্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গুরুপ্রায় উৎসগুলি যখন ভারতের পরিকল্পনা প্রভুদের বার বার হত্যাশ করে চললো, সঙ্কট আর আশঙ্কায় নিমজ্জিত ভারতীয় একচেটিয়ার বৃহত্তম অংশের পক্ষে তখন রুশ আমলাতান্ত্রিক একচেটিয়া পুঁজির 'বহুস্বয়মুক সহ-যোগিতা'র আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না। এই পরিস্থিতিতে ভারতের তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনার রূপায়ণে সোভিয়েত ভূমিকা ভারতীয় কার্যমী স্বার্থের মধুচক্রগুলিতে এক নতুন প্রবাহ এনে দেয়। ভারতীয় পুঁজিবাদী রাজনীতিতে সম্প্রসারণবাদী বৌদ্ধ এসেছে অনেক আগেই—তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনাগুলি ভারতীয় পুঁজির সম্প্রসারণবাদী উচ্চাশায় ক্ষীত।

অর্থনৈতিক পরিনির্ভরতা বাদের টিকে থাকার ব্যবস্থা বা উপায়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে তারা জাতীয় চরিত্রহীন হয়ে পড়ে; আর সম্প্রসারণবাদী ঝুঁকিটা বাদের বিনির্ভর হয়ে চলতে পারে না, বহিঃশক্তির সহায়তায় দেশের ভেতরে ও বাইরে তারা বলপ্রয়োগের উদ্যোগ নিতে থাকে। পরিস্থিতির এরূপ বিকাশে, নোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের আত্মকুল্যে ও ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির সমর্থনে এক উদ্ভট ফ্যাসিবাদের জন্ম অপ্রত্যাশিত ছিল না। বিধায়ন্ত অবস্থায় সতর্ক পদক্ষেপে এই অভিনায় শুরু হয়েছিল কয়েক বৎসর আগেই; কিন্তু ব্রেজনেভের ১৯৭০ সালের দিল্লী ভাষণ ও মস্কো-দিল্লী চুক্তিগুলির ফলে ভারতীয় বিভিন্ন পুঁজি রুশ আমলাতান্ত্রিক একচেটিয়া পুঁজিকে নতুন করে চিনলো আর কংগ্রেস চিনলো সি পি এস ইউকে! (দর্পণ: এ)। অর্থনৈতিক ব্যর্থতা রাজনৈতিক উগ্রতা পেল। কার্যমী স্বার্থগুলির বিচিত্র এক সমাবেশের এই পটভূমিকার—বিশেষতঃ ভারতীয় অর্থনীতিতে ইতিপূর্বেই প্রবল ভাবে অচ্ছত্রবিষ্ট মার্কিনী অর্থনৈতিক কার্যমী স্বার্থের তাপকে মোকাবিলা করতে—প্রবলতর এক নোভিয়েত রাজনৈতিক চাপ অপরিহার্য হয়ে পড়ে; অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের পঙ্কজও নিমজ্জিত শাসকগোষ্ঠী এই নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ও সুযোগকে অবলম্বন করে এক ফ্যাসিবাদের ও তার হাতিয়ারগুলোর জন্ম দেয়। ইন্দিরা-নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের অন্ততম হাতিয়ার যুব কংগ্রেসের শক্তি ও প্রেরণার বিশেষ উৎস এখানেই।

ব্যক্তিগত পুঁজি ও আমলাতান্ত্রী একচেটিয়া পুঁজির মর্যোকার সম্পর্ক সম্বন্ধে যারা আগ্রহশীল, তারা একটা কথা মনে রাখলে ভাল হয় যে, এই দুই প্রকার পুঁজির মধ্যে যেমন বিভেদ রয়েছে তেমনই মিলও আছে। উভয় পুঁজিবাদই ব্যক্তিগত কিংবা গোষ্ঠীগত স্বার্থে সামাজিক উৎপাদনকে বজা করে। উৎপাদন শক্তিগুলি সম্পর্কে এদের আচরণে পার্থক্য থাকলেও ট্রাটেজী মূলতঃ একই। ভারতের একচেটিয়া পুঁজি ও রাষ্ট্রীয় পুঁজির সঙ্গে রাশিয়া সহ পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিক একচেটিয়া পুঁজিগুলির (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

বুজোয়া পার্লামেন্ট ও সি পি আই

সত্যেন বসু

বুজোয়ায় নিজেদের স্বার্থকে সুরক্ষিত করার জন্য জনগণের কাছে 'পার্লামেন্টের' পরিচয় সব সময়ই প্রচার করে যেত। তারা যতদিন পারে জনসাধারণকে পার্লামেন্টের কথা উনিরে নিজেদের ক্ষমতাকে বজায় রাখার চেষ্টা করে। এই অস্ত্র মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন কোন সময়ই বুজোয়া পার্লামেন্টের উপর নিজেদের আক্রমণকে বন্ধ রাখেন নি। যাতে শোষিত মানুষ বুজোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বিপণে চালিত হয় এবং কখনোই যাতে বুজোয়াদের উচ্ছেদ করতে না পারে তার জন্য বুজোয়াদের লক্ষ্য হোল পার্লামেন্টের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য বুজোয়াদেরই নয়, বুজোয়াদের অত্যন্ত বিশ্বাস দালাল যারা বর্তমানে মার্কস-বাদের মুখোশ পরে আছে তারাও এই পার্লামেন্টের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার ব্যাপারে কোন রকম কুঠা বোধ করে না। বর্তমান সি. পি. আই. এমন এক দালাল, যারা নিজেদের কমিউনিস্ট পার্টি বলে প্রচার করে।

সি. পি. আই বর্তমানে যে ধরনের বিপ্লবের ওকালতি করে, সেটা তাদের ভাষায় 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব'। এই বিপ্লবের কথা তারা ঘোষণা করেছে নিজেদের কর্মসূচীর মাধ্যমে। এই বিপ্লবের কথা বলতে গিয়ে ওদের স্বভাবতই ভারতবর্ষের অবস্থাকে নিজেদের স্ববিধামতো বিশ্লেষণ করতে হয়েছে। তাদের বিশ্লেষণ অস্বাভাবিক ভাবে ভারতের পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্র বা সংসদীয় গণতন্ত্রকে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ালীলদেরা ভেদে দিতে চায়। কেবল ইন্দিরা সরকার সেটি চায় না। ভারতের তারা ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে জোট বেঁধে ঐ দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ালীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাটাকে যুক্তিযুক্ত মনে করে। প্রায় হোল সি. পি. আই. বাদের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ালীল বলেছে তারা সত্যিই পার্লামেন্টকে ভাঙতে চায় কিনা। পার্লামেন্টকে ধ্বংস করতে হবে—এই কথা তো একমাত্র কমিউনিস্টরাই বলে। শুধু তাই নয়, পার্লামেন্টকে কমিউনিস্টরা পৃথিবীর অনেক দেশে ইতিমধ্যে ধ্বংস করেছে। তাহলে সি. পি. আই কি কমিউনিস্টদেরও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ালীল বলে মনে করে? হ্যাঁ, তাই করে। গত ২৫শে অক্টোবর সি. পি. আই.-এর পক্ষিমবদ রাজ্য পরিষদের পক্ষ থেকে জ্যোতি-দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত 'দৈনিক কালান্তর' সম্পাদকীয় কলামে "আত্মহত্যার পথ"

নামে লেখাটা পড়লে খুব পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে যে তারা কমিউনিস্টদেরকেও—যারা বুজোয়া পার্লামেন্ট ধ্বংস করার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে—দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ালীলদের দলে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এখানে ঐ লেখার কিছুটা তুলে ধরছি: "সংসদ সম্পর্কে বার বার এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কেন? নির্বাচিত এই সংসদ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা সম্পন্ন নয় বা সাধারণ মানুষের আত্ম-শাসন নয় বা তার সার্বভৌম ক্ষমতা নেই—এমন প্রশ্নের যুক্তি কী থাকতে পারে? সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রসঙ্গটিকে ভারতের বৃহৎ বার বার পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কেবল ভারতের বৃহৎ নয় সর্বত্রই সংসদীয় গণতন্ত্র দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ালীলদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।"

এই উদ্ধৃতি থেকে এটা পরিষ্কার সি. পি. আই শুধু অস্বপ্নপ্রকাশেরই দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ালীল বলেছে তা নয়, বরং কমিউনিস্টদেরও বলেছে। কারণ কমিউনিস্টরা সর্বত্রই বুজোয়া পার্লামেন্টকে ধ্বংস করার জন্য সংগ্রাম করে। বুজোয়া পার্লামেন্টকে ধ্বংস না করে কমিউনিস্টরা নিজেদের রাষ্ট্র গঠন করতে পারে না বলেই করে। এটা কি সি. পি. আই জানে না, না তারা মার্কস-লেনিনের এই ধরনের বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত নয়? তারা সব জানে কিন্তু তবুও তারা প্রচার করে যে আমাদের এই পার্লামেন্টের ভিত্তি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ালীলদেরা ভেদে ও বাইরে থেকে ধসিয়ে দিতে চায়। অথচ কমিউনিস্ট ছাড়া আর কেউ বুজোয়া পার্লামেন্টকে ভাঙতে চায় না। কারণ পার্লামেন্টের ভিত্তিকে ধসিয়ে দেওয়ার অর্থই হোল ধনতন্ত্রকে ধসিয়ে দেওয়া।

পার্লামেন্টকে সি. পি. আই, ভারতবর্ষের মতো দেশের পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে। এটা পরিষ্কার করে সি. পি. আই-এর সাধারণ সম্পাদক রাজেন্দ্র রাও নিজেই বলেছেন। তিনি বলেছেন, "আমাদের দেশের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী হল সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং প্রয়োজন অস্বাভাবিক প্রগতিমুখে পথে সংবিধানকে সংশোধন করার ব্যবস্থা।" (দৈনিক কালান্তর ২১, ১১, ৭৬) বুঝুন তাহলে; যে পার্টি এই ভাবে নিজেদেরকে বুজোয়া পার্লামেন্টের কাছে বিক্রি করে দেয়, যে পার্টির সদস্য বলেন যে, এই পার্লামেন্ট হোল ভারতের—"৩০ কোটি মানুষের 'গণ-আদালত' এবং 'আমরা লোকসভার সার্বভৌমত্বকে উর্ধ্ব তুলে ধরার জন্যই

এখানে এসেছি।" (দৈনিক কালান্তর ৫, ১১, ৭৬) ইত্যাদি বার প্রচার করে তারা কি কোন সময় কমিউনিস্ট পার্টি বলে পরিচয় দিতে পারে? দিতে পারে না, কারণ কমিউনিস্টরা পার্লামেন্টে যোগদান করে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বকে তুলে ধরার জন্য নয়। বরং এই পার্লামেন্ট যে সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান নয়—এটা প্রমাণিত করার জন্যই কমিউনিস্টরা পার্লামেন্টে যোগ দেয়। অথচ সি. পি. আই-এর বক্তব্য থেকে এটা প্রমাণিত হবে না যে তারা পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করেছে পার্লামেন্টকে ভেদে দেওয়ার জন্য। পার্লামেন্ট সংক্রান্ত প্রশ্নে তারা মার্কসবাদকে এমন অর্থ-হীনভাবে পণ্ডিত্যপন করেছে যা আর কোন প্রশ্নে এমনভাবে করে নি। তারা কতখানি মার্কসবাদের থেকে দূরে সেটি প্রমাণ করার জন্য আমি এখানে ঘোঁট তিনটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এর মধ্যে একটা সি. পি. আই.-এর, দুটো কমরেড লেনিনের।

সি. পি. আই.-এর অষ্টম কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচীর বাংলা সংস্করণের ৬০ নং ধারা, ৩৩-৩৪-এ অত্যন্ত স্পষ্ট করে লেখা আছে: "সংকীর্ণ শ্রেণী স্বার্থের পরিপোষণ প্রযুক্তিবি জনতাকে দখল করার হাতিয়ারে পরিণত হবার চেষ্টার দ্বারা দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তিসমূহই পার্লামেন্ট প্রথার ভিত্তি ভিত্তর ও বাইরে থেকে ধসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কমিউনিস্ট পার্টি পার্লামেন্ট ও অন্ত্যাত্ত গণতান্ত্রিক সংস্থাকে ধ্বংস করে, তাকে আরো বিকলিত করে তোলার প্রয়াস পায় এবং সকলদু অন্য গণতন্ত্রকে পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তব করে তোলার চেষ্টা করে।" এবার কমরেড লেনিনের কথা শুনুন। "মধ্যযুগীয় অবস্থার তুলনায় বুজোয়া গণতন্ত্র একটা বিরাট ঐতিহাসিক উন্নতি হলেও ধন-তন্ত্রের অধীনে সে গণতন্ত্র সর্বদাই ধন-সীমাবদ্ধ, খণ্ডিত, মিথ্যা এবং প্রতারণা-ময় এবং এরকম না হয়ে পারবেই না। এ রকম গণতন্ত্র ধনীর পক্ষে হচ্ছে স্বর্গ আর শোষিত ও দরিদ্রের কাছে ফাঁদ ও প্রতারণা।" ("সর্বহারা বিপ্লব ও হলপ্রোহী কাউন্সিল"—লেনিন: সং-শোধনবাদের বিরুদ্ধে, বাংলা সংস্করণ, পৃ: ৪২২-৪২৩)

সি. পি. আই, চায় এই "ধর্গ"-কে রক্ষা করতে। আর লেনিন কি চান? লেনিনের কথায়, "আমরা অগ্রসর হয়ে অবিধাবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করব এবং সমগ্র শ্রেণী সচেতন মজুর শ্রেণী আমাদের সঙ্গে থাকবে—আমাদের

সঙ্গে থাকবে "শক্তি সম্পর্কে পরিবর্তন সাধনের" জন্য নয়, বুজোয়া শ্রেণীকে উচ্ছেদ করার জন্য, বুজোয়া পার্লামেন্টের প্রথা ধ্বংস করার জন্য, কমিউনের ধরণে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বা মজুর ও দৈনিক প্রতিনিধিদের শোভিত প্রজাতন্ত্র গঠন করার জন্য, মজুর শ্রেণীর বৈপ্লবিক একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যই সমগ্র শ্রেণী সচেতন মজুর শ্রেণী আমাদের সঙ্গে থাকবে।" ("রাষ্ট্র ও বিপ্লব"—লেনিন ঐ পৃ: ৪০৩)

মার্কসবাদ থেকে সি. পি. আই-কতদূরে! শুধু তাই নয়, সি. পি. আই, এর কথা মতো যদি আমরা লেনিনকে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ালীল বলে চিহ্নিত করি, তাহলে কি আমরা ভুল করব? কেননা লেনিন নিজেই পার্লামেন্টের উচ্ছেদ করতে আগ্রহী আর সি. পি. আই ঠিক তার বিপরীত অর্থাৎ পার্লামেন্টকে রক্ষা ও বিকলিত করে তুলতে আগ্রহী। এর থেকে কি বোঝা যাচ্ছে না যে সি. পি. আই-এর কত বড় শত্রু ছিলেন লেনিন? তা সত্ত্বেও সি. পি. আই, কেন মার্কসবাদ লেনিনবাদের

কথার নিজেদেরকে চেকে রাখতে চায়? কেন তারা পরিহারভাবে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে কথা বলে না, যেমন লেনিন বলেছেন বুজোয়াদের বিরুদ্ধে? এই না বলার কারণটি আরেকবার লেনিনের মুখেই শুনুন: "ইতিহাসের দ্বাদশিকতাটা এমন যে মার্কসবাদের তাত্ত্বিক অয়লাভের ফলে মার্কসবাদের শত্রুতা বাধ্য হোল নিজেদের মার্কসবাদী বলে পরিচয় দিতে।" (কাল মার্কসের মতবাদের ঐতিহাসিক নিয়তি"—লেনিন, ঐ পৃ: ১৩৫)

সি. পি. আই, হোল ভারতবর্ষের বৃহৎ সেই ধরনের একটি পার্টি। যারা "জাতীয় বুজোয়া শ্রেণী" বলে চীৎকার করে তাদের পায়ে তলায় ঘুমিয়ে থাকতে ভালবাসে, যারা প্রমিত শ্রেণীর জন্য নয় বুজোয়া সরকারের জন্য দালালি করে, যারা বুজোয়া সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রমিতশ্রেণীকে রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবিত করে তারা কোনদিন কমিউনিস্ট পার্টি হতে পারে? তাদের তাগো জনগণের পদাধাতের চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নেই।

একটি ফরাসী নাট্যাভিনয়

(নাট্য সমালোচক)

ইটালিয়ান নাট্যকার দাইগো ফেব্রি রচিত লা বুগিয়ার্ডা নাটকের ফরাসি রূপান্তর আজ রাগিন কর্তৃক লা কবিনের মঞ্চরূপে প্রদর্শিত হল কলকাতার আলিগাস ফ্রান্সেস-এর সদস্যদের দ্বারা কলামন্দিরের থিয়েটারে গত ২৪শে মার্চ।

আপাতদৃষ্টিতে ইসাবেলা একটি ছলনাময়ী মেয়ে, যে তার প্রেমিকদের সঙ্গে সব সময়েই প্রেমের অভিনয় করে, এমনকি দুজন প্রেমিকের মধ্যে থাকে সে সত্যিকারের ভালবাসে তার সঙ্গে সে অভিনয় করে। অ্যান্ড্রিয়ানোকে (যিনি একজন কাউন্ট) সে ভালবাসে কিন্তু তাকে বিয়ে করতে তার বাবা আছে কারণ অ্যান্ড্রিয়ানো একজন বিবাহিত পুরুষ এবং ইটালিতে তখনও বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা চালু হয় নি। বাধ্য হয়ে ইসাবেলা আলবিনো নামে একটি ছেলেকে বিয়ে করে কিন্তু তার সঙ্গে সে বরাবরই প্রেমের অভিনয় করে চলে। আলবিনোকে বিয়ের ব্যাপারে তার মাতা সব সময়েই ইসাবেলাকে উৎসাহিত করে চলে এবং মেয়ের প্রেমের অভিনয়েও মা সব সময়েই ইচ্ছন জুগিয়ে চলে।

ফরাসি বুলভার্ড নাটকের আদর্শে রচিত এটি একটি হাস্য হাসির নাটক। প্রযোজনায় যান খুব উন্নত না

হলেও একটা নিষ্ঠার ছাপ সর্বত্র লক্ষ্য করা গেছে। অভিনেতা অভিনেত্রীরা সকলেই বাঙালী হয়েও ফরাসি উচ্চারণে দক্ষতা দেখিয়েছেন, তার জন্য তারা প্রশংসা পাবেন। মার্স বাঁতা যিনি একজন স্প্যানিশ মহিলা তিনি এ নাটকের পরিচালিকা। তাঁকে অল্প-বোধ নাটকটিকে পরবর্তী অভিনয়ে যাতে আর একটু প্রাণবন্ত করে তোলা যায় তার দিকে দৃষ্টি রাখবেন। শোভা নাইডু তার মঞ্চ সাজানোর কাজ দায়িত্বের সঙ্গে পালন করেছেন। ইসাবেলার ভূমিকাভিনেত্রী নন্দিনী দে অভিনয়ে দক্ষতার ছাপ রেখেছেন, বিশেষ করে তার চোখের ভঙ্গিমা মনে রাখার মত। গলার জন্য আর একটু পরিচয় করলে তিনি একজন শক্তিশালী অভিনেত্রী হতে পারবেন বলে মনে হয়। ইসাবেলার মায়ের ভূমিকায় হৃদেঙ্গা চক্রবর্তীকে আলিগাস ফ্রান্সেস প্রযোজিত 'গুণ্ডার' নাটকের থেকে বধেই সাবলীল বলে মনে হল। চেষ্টা করলে অভিনয় তাঁর আয়ত্তে এসে যাবে। অ্যান্ড্রিয়ানোর ভূমিকায় নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ও বধেই শক্তিশালী মনে হল। স্বল্প অবকাশে লাকু দাস-গুপ্ত, তামল মুখাতি, প্রথম বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্গনা ভাড়াটিয়া অভিনয় করেছেন। নাটকটির বাঙালি অনুবাদ মঞ্চস্থ করা যায় কিনা সে বিষয়ে আলিগাস ফ্রান্সেস বক্তৃতা দিতে দেখতে অনুরোধ করি।

অধ্যাপকদের আন্দোলন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পকদের ক্ষেত্রে চালু করা, চাকুরির নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, পেনসন প্রণয়ন প্রবর্তন, পরীক্ষকদের পারিশ্রমিক দেওয়ার দীর্ঘতর পুনঃ প্রবর্তন, মাসের প্রথম দিন সরকারী অফিসের ও ভাতা সহ সম্পূর্ণ বেতন দেওয়া, ঘাটতি অফিসের ভিত্তিতে বেসরকারী কলেজগুলির দায়িত্ব সরকার কর্তৃক গ্রহণ ইত্যাদি।

কিন্তু বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার বিশেষতঃ জরুরী অবস্থা বহাল থাকার সময়ে সরকারী মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক সমিতি উপলব্ধি করেছেন যে, ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত করতে না পারলে সমিতির জায়গাত দাবিদাওয়াগুলি পূরণ করতে রাজ্যসরকার এগিয়ে আসবেন না।

সেজন্য সংস্থার কার্যনির্বাহক সমিতি সর্ব-সম্মতিক্রমে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলনের এক আন্তর্জাতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এই কর্মসূচী অনুসারে আগামী ২০ ও ২১ এপ্রিল কলকাতা ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও এদের অন্তর্গত কলেজগুলির অধ্যাপকরা কলকাতার আইন অমান্য আন্দোলনে নামবেন। আগামী ২৩ এপ্রিল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অন্তর্গত কলেজগুলির অধ্যাপকরা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসের সম্মুখে অবস্থান ধর্মঘট পালন করবেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অগ্রদূত আন্দোলনের জন্ত ২৫ এপ্রিল তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির তনৈক নেতা ও যুগ্মনেতা

ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থান ও যুব কংগ্রেস

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

পারস্পরিক ও অন্তর্ভুক্ত সম্পর্কগুলোকে অবশ্যই ব্যক্তিগত ভাবে দেখতে হবে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যদি ইন্দোচীনের গাড্ডার গলা-ডুবি না হতো আর ভারত সরকারের তৃতীয় ও চতুর্থ পরি-কল্পনার যদি আশাশ্রুত 'সহযোগিতা' করতে সক্ষম হতো, তাহলে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির এক শক্তিশালী অংশ মজ্জা সম্পর্কে এতটা উৎসাহী হয়ে উঠতো কিনা সন্দেহ। সেক্ষেত্রে, ভারতে কোনও ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থান ঘটলে তা মার্কিনী মদতে ঘটতো এবং অবশ্যই সামগ্রিক অভ্যুত্থানের রূপ নিত অর্থাৎ এ রূপ বেসামরিক প্রশাসনিক বা সাংবিধানিক ফ্যাসিবাদ (Administrative or constitutional fascism) হতো না। আর একথাও মনে করার কারণ আছে যে, ইন্দোচীন যুদ্ধের পর পরি-বর্তিত পরিস্থিতিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অন্ততঃ কিছুকাল এরূপ অভ্যুত্থানের পেছনে উত্তরাগী হওয়া সম্ভবপর হবে না। কিন্তু সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে এখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্ভবপর হতে পারে। বাই হোক, ভারতের শাসকশ্রেণীর রাজনীতি ও প্রশাসনে মজ্জার অগ্রবেশ যদি ভারতীয় অর্থনীতির বুনিরাদকে আংশিক রূপেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো তাহলে ভারতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয়-নিয়ন্ত্রণ আরো সম্প্রসারিত হতে পারতো। এটাই ধরে নেওয়া যায়। তেমন অবস্থায়, রাষ্ট্রীয় পুঁজির এই অভিযানে যুব কংগ্রেস ভারতের একচেটিয়া বুর্জোয়া শ্রেণীর এতটা আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে উঠতে পারতো না, মার্কিন ঠিক এই কারণে জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লবিত্ব ছড়াতে পারতো বিরোধী ভণ্ডামীতে ও বাহ্যিক রাজনৈতিক গলাবাজীর উত্তাপে নিজেদের সমাজবিরোধী জীবন-দর্শনকে কিছুটা চাপা দিতে পারতো—এক কথায়, আরো সার্থকভাবে ফ্যাসিবাদী হতে পারতো। আর এই হতে-না-পারটা যুব কংগ্রেসের ভিত্তির একটি দুর্বলতা।

তবু ফ্যাসিবাদ অয়োজন ও প্রস্তুতিতে এই সমস্ত ব্যর্থতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও একটি অনগ্রসর, দুর্বল ও পরনির্ভর শাসকশ্রেণীর এই ফ্যাসিবাদী যুব সংগঠন প্রতিক্রিয়ার ইতিহাসে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংযোজন—জনসাধারণের সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ সচেতক (important whip)। কেননা, একটি অনগ্রসর, দুর্বল দেশে ফ্যাসিবাদী অভ্যু-

দর্পণের সংবাদদাতাকে জানান যে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জয়ন মজুমদার একটি সার্কুলার জারি করে অধ্যাপকদের দিগ্রে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন অগণতান্ত্রিক শাসিত কলস গ্রহণ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। অধ্যাপক সমিতি এই শাসিত কলস চলু করার বিরুদ্ধে তীব্র মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। এই নতুন নিয়মাবলী অফিসের বিনা কারণে যে কোন স্থায়ী অধ্যাপকের চাকুরি ছয় মাসের নোটিশে চলে যেতে পারে। কারণ দেখিয়ে তিন মাসের নোটিশ দিয়ে যে কোন স্থায়ী অধ্যাপককে কর্তৃপক্ষ পদচ্যুত করতে পারবেন। অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে কোন নোটিশ বা কারণ ছাড়াই চাকুরি চলে যেতে পারে। সন্দেহ নেই, জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে, পরবর্তী কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশেই এই নতুন শাসিত কলস প্রণীত হয়েছিল এবং

খানের পেছনে অবশ্যই কোন বিদেশী বুহু শক্তির মদৎ থাকবে। ব্যাপারটার পটভূমিকার একটু নজর দিলে দেখা যাবে, এক নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদের (সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের) প্রভাব। সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বৈদেশিক নীতি বস্তুগতভাবে ব্যক্তিগত পুঁজির সম্পর্কে প্রকৃত বৈষম্যবাদের নয়, কিন্তু আত্মগতভাবে (subjectively) রাষ্ট্রীয় পুঁজির বিকাশে ঘড়াবড়ই আগ্রহশীল, অবশ্যই আমলাতান্ত্রিক সহযোগিতার তার বৈদেশিক স্বার্থ সম্প্রসারণের জন্তে) ভারতে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলি এ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে সক্ষম। নয়াদিল্লী ও মজ্জার মধ্যে স্বাক্ষরিত অসংখ্য চুক্তিপত্রের এ হাজারো দৃষ্টান্ত মিলবে। (গ্রন্থক: দর্পণ-এ)

সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রদায়বাদ উভয়েই বুর্জোয়া উপাদানে গঠিত—অন্ততঃ পরস্পর শ্রেণী-বৈরী নয়, বরং নিকটাত্মীয়; একে অন্তের শোকে গলা মিলিয়ে কাদে, নিজ নিজ স্বার্থে কোলাহুলি করে, বসদ যোগায়—এক কথায়, প্রয়োজনে নাড়ীর টানে নড়ে। তাই লক্ষ্যীয়, সোভিয়েত সামাজিক ফ্যাসিবাদের (Social Fascism) অগ্রপ্রেরণায় ও দিল্লীর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে গঠিত ফ্যাসিবাদী এই যুব সংগঠন পরিস্থিতির বাস্তব বিচারে তার অগ্রণ্ড যুব সংঘের (সি পি আই) চাইতেও রূপ-ভারত উভয় শাসক শক্তির কাছে অধিকতর কার্যকরী ও নির্ভরযোগ্য বলে গৃহীত। সি পি আই ও তার যুবসংঘ একেজো সাকরদৌ শক্তিমাত্র।

অনগ্রসর, দুর্বল, পরনির্ভর, বেকার সমুদ্র পরিবেষ্টিত বৈদেশিক ঋণে আপাদ মস্তক ডুবন্ত ভারত সরকার ও ভারতের শাসক শ্রেণী ফ্যাসিবাদের কতকগুলো জরুরী দাবী মেটাতে অক্ষম বিশেষতঃ নিজ শক্তিতে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের অভিযান করতে অপারগ; তাই বিশ্বের বিপুলতম বেকার বাহিনীর কোনও উল্লেখযোগ্য অংশকে সে অশিক্ষিত, সামগ্রিক বাহিনীতে নিয়োগ করতে পারেনা, যুব কংগ্রেস ও তবু ফ্যাসিবাদী সরকারের ক্রীণ প্রাণশক্তির এটা অন্ততম কারণ। ভারতীয় ফ্যাসিবাদের এই দুর্বল দিকটি সম্পর্কেও জানা থাকা ভাল। বিশেষ লক্ষ্যীয়, উপযোগী ভিত্তি ও পরিস্থিতির অভাবে বিশেষতঃ দেশের বিপ্লবী শ্রেণীগুলির মুখোমুখি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন না হওয়ায় এবং চূড়ান্ত দুরাচারী এক প্রশাসন কাঠামোকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠায়, এই যুব কংগ্রেস বতটা রাজনৈতিক তার চাইতে চেঁচ চেঁচ বেশী ভয়াবহ এক সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। (চলবে)

বংশবধ, উপাচার্য ও মজ্জার পদস্থ আমলাদের উৎসাহে তা বিধিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলছে।

কেন্দ্রের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পটভূমিকার নতুন শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে অগ্রসরদের যে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন সেকথা মনে রেখে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই অগণতান্ত্রিক প্রচেষ্টার দিকে তীব্র দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। সন্দেহ নেই, দেশের বুদ্ধিবীরা সম্প্রদায়কে ক্রীতবাস বানাবার যে সামগ্রিক প্রচেষ্টা ইন্দিরা সরকার করেছিল, এটা তারই একটা অংশ। নির্বাচনের ঠিক আগেই অধ্যাপক ও বুদ্ধিবীরা সম্পর্কে ত্রিমুখী গাঙ্কিত তীব্র বিবাদগাঁব এই প্রসঙ্গে অবগীর।

অধ্যাপক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার পত্রিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ও তাদের অধীন কলেজগুলির অধ্যাপকদের সুযোগ সুবিধার বৈষম্য নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা করেছেন বলে জানা গেছে। এ সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী লোকসভার আগামী অধিবেশনে একটি বিবৃতি দেবেন বলে অধ্যাপক চক্রবর্তী আশা প্রকাশ করেন। আশা করা যায় অধ্যাপক চক্রবর্তী অধ্যাপকদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের যে হীন প্রচেষ্টা বিগত সরকার করেছিলেন, সে বিষয়েও নতুন শিক্ষামন্ত্রীকে বিবৃতি দিতে অগ্রবোধ জানাবেন। আর এই অগ্রপ্রেরণার সহযোগী উপাচার্য ও শিক্ষাক্ষেত্রের পদস্থ আমলাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্ত দাবি তোলা হবে বলেও মনে হয়।

পেটোয়া পোষণের অপচেষ্টা

করেক মাস আগে অকজিলারী নাস-কাম মিডওয়াইক ট্রেনিং-এর অন্য মুর্শিদাবাদ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছিল। এই জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে বহু হঃঃ মহিলারা ওই ট্রেনিং এর জন্য ডাক খরচা করে আবেদন করেছিলেন। যথারীতি প্রত্যেক প্রার্থীকে বহরমপুর সদর দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয় এবং বাছাই করে শতাধিক মহিলা প্রার্থীকে ট্রেনিং এর জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার বাধ্যমে মনোনীত করা হয়। অখচ. জানা গেল যে ওই সব মহিলাদের প্যানেল কার্যকরী হয় নি। খোঁজা যাচ্ছে কোন ব্যক্তি নিজস্ব প্রার্থীদের চোকাণোর উদ্দেশ্যে চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই পদে কয়েকজন মহিলা প্রার্থী এই ব্যাপারে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের বিরুদ্ধে ওয়াগানীয়ার অভিযোগ এনেছেন।

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারদের আন্দোলন

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারদের জন্ত সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে টেকনিক্যাল কমিশন গঠন, টেলিফোনিক বেকন কাঠামো চালু, জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার ডেপ্লিমেন্টেশন চালু, মহার্ষি ভাতার আতীত কম্বা চালু করা এবং সেই সঙ্গে চাকরি ক্ষেত্রে পদোন্নতির সর্ব-প্রকার বাধা দূর করার দাবিতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়াররা সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। এ ব্যাপারে আগামী ১১শে এপ্রিল এক বিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। জম্মায়েতের স্থান সুবোধ মল্লিক স্কোরার। ঐদিন ইঞ্জিনীয়াররা সমবেত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গণ ডেপুটেশনে যাবেন।

সঞ্জয় গান্ধী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এক কালের। এ ছাড়া এই কেন্দ্রের অন্য সর্বনিম্ন টেওয়ারও জমা পড়েছে। এই সংস্রকে এড়িয়ে মার্কজিকে দেওয়া ঠিক নয়। তৎকালীন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী মালবিরাকে বিষয়টি পুনঃবিবেচনার জন্য অগ্রবোধ জানান হয়। কিন্তু তার উত্তরে মালবায় বলেন—‘আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না’। অর্থাৎ সর্বাধিক দূরে যে টেওয়ার জমা দিয়েছে সেই মার্কজি হেভি ডেহিকলিস লিমিটেডকেই কেন্দ্র সরবরাহ করার অর্ডার দেওয়া হোক।

জ্যোতির্ময়বাবুর অভিযোগ—তবু এ ধরনের এক আর্থট ঘটনা নয়। আরও ঘটেছে। চুরি দুর্নীতির তত্ত্ব এ সব ঘটনাও প্রাধান্য পাবে।

ইতিমধ্যে দাবী উঠেছে সঞ্জয় যেন পালাতে না পারে। হঠাৎ তার বিদেশে সরে পড়ার ঘটনাও অমূলক নয়। কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে তার পাসপোর্ট ও ভিসা সীল করুন।

হুঃঃপের নগরী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চাইলেন, তারা আজ জনগণের পদাঘাতে আতঙ্কিত নিকশিত। ২৭শে এপ্রিল ‘হুঃঃপের নগরী’ পুনঃপ্রতিষ্ঠা অধঃপতিত সংস্কৃতির শত্রুদের পরাজয়ের একটি প্রকাশ। দিপলস্ লিটল থিয়েটার এই উপলক্ষে বাংলার সংগ্রামী জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা জয়ের সঙ্গে সংস্কৃতির মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

ডি ভি সিতে পেটোয়া পোষণ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ডি ভি সির ডাইরেক্টর অফ পার্সোনাল পদ থেকে এ.এস.কে.রায় অবসর গ্রহণ করার পরে তৎকালীন চেয়ারম্যান শ্রীরাধবাচাণী ডি ভি সির বার্মা মাইনসের এজেন্ট এবং কোল সুপারিন্টেন্ডেন্ট এ.এস.এস.রায়কে ডি ভি সির ডাইরেক্টর অফ পার্সোনাল করে আনবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কারণ কলকাতার ঘাটতি সরবরাহ সম্পর্কে ডি ভি সির তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করেছিল তারা বোকারো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কলকাতার ঘাটতি সরবরাহ, কলকাতার নামে পাণ্ডুর ইত্যাদি সরবরাহের জন্য বার্মা মাইনস এবং তদন্ত কর্তব্যাক্তি এ.এস.এস.রায়কে দায়ী করে। এই খাতে ডি ভি সির ক্ষতির পরিমাণ মাপার কয়েক কোটি টাকা এবং ব্যাপারটা সম্পর্কে অসুস্থমান করার জন্য ডি ভি সি সি বি, আইকে অহরোধ করে। এতদিনে হরত বহুতত্ত্বদ হয়ে সত্য প্রকাশিত হত কিন্তু মজার কথা এই যে, তৎকালীন সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী কে.এল.রায় এবং সি.পি.ভুসি (বার্মা) এর সমস্ত টাটা রায়ের চাপে তদন্ত কার্য পরি-
ত্যাগ হয়। কিন্তু ডি ভি সি এমন কীর্তিমান এ.এস.এস.রায়কে পার্সোনাল ডাইরেক্টরের পদে নিযুক্ত করতে সম্মত না হয়ে যোগ্য প্রার্থীর জন্য কর্পোরেশনের বাইরেও ভিতরে বিজ্ঞাপন দিতে বলে। পরে দেখা যায় মুকুন্দ বরদাচারীর জোরে এ.এস.এস.রায় ঐ পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শ্রীবরদাচারী যেই ডি ভি সি ছেড়ে গেলেন অমনি এ.এস.এস.রায় আনবার নিয়ে হাজির হলেন যে ঐ চাকরিতে আসার তার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে এবং তা পূরণ করার ব্যবস্থা করা হোক। তৎকালীন আর্থিক উপদেষ্টা এ.এস.এস.রায় অভিযুক্ত ছিলেন যে, যেহেতু শ্রীরাও প্রকাশ্য বিজ্ঞাপনের শর্ত জেনেই নিয়োগ স্বীকার করেছেন, অতএব তার দাবির যৌক্তিকতা নেই। নির্বাচন বোর্ডও এমন কোনো বিবেচনার আশ্বাস দেয়নি কারণ শ্রীমৈত্র বোর্ডের অন্ততম সন্তান।

কিন্তু তাজব্ব কাণ্ড এই যে, যেই মাত্র শ্রীমৈত্র ডি ভি সি ছাড়লেন, তার আরগার শ্রীমুখির আগমন হল এবং বি এ.এস.রায়বন জেনারেল ম্যানেজার হয়ে এলেন তখন

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এপ্রিল মাসের শেষে চন্দ্রনগরে যে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে "চন্দ্রনগরের প্রগতিশীল সাহিত্য কর্মীদের" পক্ষ থেকে দর্পণের দপ্তরে অভিযোগ করা হয়েছে। তাদের প্রধান বক্তব্য—“বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন নামে যে জিনিসটি ঘটতে যাচ্ছে তাকে কোন ভাবেই সাহিত্য সম্পৃক্ত বলে ভাবা যায় না”।

এদের আরও অভিযোগ, সম্মেলন অর্গঠনের জন্য যে কর্মসমিতি গঠন করা হয়েছে তা অগণতান্ত্রিক এবং

কয়েকজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বার সঙ্গে চন্দ্রনগরের কোন সংস্কৃতি বা সাহিত্য প্রতিষ্ঠান বা লেখক বা কবির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে কয়েকটি উপসমিতি তৈরি করা হয় এবং উপসমিতির যারা সদস্য তাদের সঙ্গেও সাহিত্য সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক থাকে না। এখানে সব কিছুর জন্য উপসমিতি আছে, কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কিত অস্থানের জন্য কোন উপসমিতি নেই বলে অভিযোগ। চন্দ্রনগরের এই উপসমিতি কোন ব্যাপারে

বাধা পেলেন সমস্ত দোষ কলকাতার মূল সমিতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। অভিযোগ, চন্দ্রনগরের অধিবাসীরা যখন তাদের পছন্দ মত লেখকদের আনবার কথা বলেন তখন কর্মসমিতি বলে, একাজ আমাদের নয়, তাদের, মানে কলকাতার মূল সমিতির। অভিযোগকারীরা প্রশ্ন তুলেছেন যে, চন্দ্রনগরের অধিবাসীরা কি কর্মসমিতির কাছে অর্থ সংগ্রহের হাতিয়ার মাত্র?

হযোগ বুঝ আগেকার সমস্ত ঘটনাত কাগজপত্র বেমালুম চেপে এম এম রাও তার পেশাল পের দরখাস্ত পেশ করলেন এবং উচ্চতর দরবারের খাতিরে নতুন জমানার বিনা বাধায় তার জন্য মাসে ৩০০ টাকা বিশেষ বেতন মঞ্জুর হয়ে গেল আগষ্ট ১৯৭৩ এ, কিন্তু তা কার্যকর হল ১-৫-৭১ তারিখ থেকে। একেই বলে ফাঁটা কপাল। এম এম রাও এক দাঁড়িয়ে পেয়ে গেলেন ১১,০০০ টাকা।

যত পায় তত চায়

১-৬-৭০ তারিখে ডি ভি সির সাধারণ বেতন কাঠামোর পুনর্বিভাগের পর পার্সোনাল ডাইরেক্টরের বেতন বাড়ি ১৬০০-১৮০০ থেকে ১৮০০-২২০০। আবার এম এম রাও আনবার নিয়ে আসেন যে এই বেতন বৃদ্ধির ফলেও তার ক্ষতি পূরণ হয় নি কারণ তার বিশেষ বেতনের ৩০০ টাকা এই বর্ধিত হারের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আর্থিক উপদেষ্টা মত প্রকাশ করলেন যে বেতন পুনর্বিভাগের একমাস আগেই রাও ৩০০ টাকা বিশেষ বেতন পাওয়াতে তার দাবির কোনো সার্বভূতা নেই। ১৯৭৬ সালে ডি ভি সির সভায় এই প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার পরে চেয়ারম্যান শ্রীজগৎপতির দ্বারা প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়। পরে জেনারেল ম্যানেজার আর্থিক উপদেষ্টা এবং পেন অ্যাক্টমির চলে যাওয়ার পরে শ্রীজগৎপতি ব্যক্তিগতভাবে শ্রীরাওয়ের বেতন পুনর্বিভাগের প্রস্তাব তুলে প্রচুর করলেন যদিও তখন ডি ভি সির সভায় দেরি ছিল না। প্রস্তাব সম্বন্ধে অতিমত চেয়ে এ বিষয়টি আর্থিক উপদেষ্টার কাছে পাঠান হল না এবং বেতন পুনর্নির্ধারণের সমস্ত নিয়মকানুন জলাঞ্জলি দিয়ে শ্রীরাওকে ১.৬.৭০ তারিখ থেকে ৪৫০ থেকে ৭০০ টাকা পর্যন্ত বিশেষ আর্থিক সুবিধা দেওয়া হল। এর ফলে আগের পাওয়া ১১০০০ টাকা ছাড়াও তিনি পেয়ে গেলেন ২৫০০০ থেকে ৩০০০০ টাকা এককালীন।

এই কি শুনি

এত কাঠ খড় পুড়িয়ে যে জগৎপতি এম এম রাওকে এককালীন ৩৫ থেকে ৪০০০০ টাকা পাইয়ে দিলেন, তার মাত্র ৪/৫ মাস পরেই সেই জগৎপতি তথ্য এবং সত্য গোপনের অপরাধে এম এম রাওকে চার্জশীট দেওয়ার এবং সাময়িক বরখাস্ত করার প্রস্তাব আনলেন। বোনাস মঞ্জুরীর ব্যাপারে ডি ভি সিকে গুরুতর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে বার কলকাতার জেনারেল ম্যানেজার এ.কে.এম.হাসানকে বচিতি তার প্রাক্তন বিভাগীয় পদে পুনর্মুখিক হতে হয়েছে।

আশঙ্কা করা যায় নবগঠিত জনতা সরকার এ বিষয়ে শীঘ্র তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।

সিদ্ধার্থ-স্বরতর প্রতিহিংসার বলি মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেসের কর্মচারীরা বেকার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এক বছরেরও ওপর হয়ে গেল স্বরত-আর কি কাগজ ছাপেন আপনারা? উত্তর—অস্বীকার। স্বরত—সেটা কাগজের কাগজ? উত্তর—সমর সেন বার করেন। স্বরত—কোন পার্টের লোক? উত্তর—চামচা—সি.পি.আই। স্বরত—তাহলে ছাপতে পারেন। কর্মচারীরা তথ্যমন্ত্রী জানের বহর দেখে কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও তাকে প্রেস খোলার অহরোধ জানিয়ে একটি আবেদনপত্র দেন। তাদের কাছ থেকে লিখিয়ে নেওয়া হয় যে, মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস আর দর্পণ কাগজ ছাপবেন না। স্বরত আশ্বাস দেন প্রেস খোলার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন। কয়েকদিন পর স্বরত প্রেসের ম্যানেজারকে পুলিশ দিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংসে ডেকে পাঠিয়ে ধমক দেন এবং মিসার ভর দেখান। এরপর দর্পণ সম্পাদককে দেখা করার জন্য অহরোধ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়। তিনি দেখা করে প্রেস খুলে দেবার জন্য অহরোধ জানালে স্বরত বলেন, এটা আমার ব্যাপার নয়, সেটার থেকে বেরিয়ে, তবে আমি চেষ্টা করছি খুলে দেবার। পরে জানা গেছে স্বরত সত্য কথা বলেন নি। কারণ এর কিছুদিন পরে মুখ্য সেন্সর অফিসার কলকাতার এম সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, এই ব্যাপারের সঙ্গে দিল্লীর কোন সম্পর্ক নেই, এটা সম্পূর্ণ রাষ্ট্র সরকারের ব্যাপার। তারপর কর্মচারীরা কয়েকদিন স্বরতর বাড়ি ধর্মী দিয়েছেন, তাদের বহুশ্রী সিনেমায় দেখা করতে বলা হয়েছে, সেখানে তারা কয়েকদিন ঘটায় স্বরত ঘটা অপেক্ষা করেছেন স্বরত মুখার্জী ও প্রিয় দাদামুন্সীর সঙ্গে দেখা করার জন্য এবং দেখা হলে তারা প্রেস খোলার আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, গভর্নমেন্ট যাতে টেকওয়ার করে আমরা তার চেষ্টা করছি। দর্পণ সম্পাদক স্বরতকে ফোন করলেও একই উত্তর। কিন্তু মাসের পর মাস কাটতে লাগল। প্রেস খোলার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অতঃপর সকলে হাল ছেড়ে দিলেন। মেনিনে খুলে জমতে লাগল পুলিশ পাহারা সত্ত্বেও কিছু জিনিষপত্র চুরি হয়ে গেল। সকলেই বুঝতে পারলেন সিদ্ধার্থ রায় ও স্বরত দর্পণ ছাপার জন্য মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেসকে শাস্তি দিয়েছেন, কংগ্রেস দল ও তাদের অশকীতির খবর দর্পণ ছাপার জন্য প্রতিহিংসা প্ররুতি চরিতার্থ করেছেন ক্ষমতার অপব্যবহার করে এরা কতকগুলো লোকের চাকরী খেয়েছেন। মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেসের কর্মচারীরা আজও সে চাকরী কিংবা পাননি।

প্রেস সীল করার পরদিন অর্থাৎ ৩রা এপ্রিল প্রেসের কর্মচারীরা পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও জনসংযোগী দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরত মুখার্জীর বাড়ি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, এক ব্যক্তির সঙ্গে সকালবেলাই হাজির হন। অনেক লোকের ভীড়ের মধ্যে দিয়ে কর্মচারীরা স্বরতবাবুর কাছে কোন বকসে পৌঁছান সেইভঙ্গলোকের সহায়তায়। চামচা-পরিবৃত্ত স্বরতবাবু কর্মচারীদের ধমক দেন দর্পণ কাগজ ছাপার মত “অপরাধমূলক” কাজ করার জন্য। সেইদিনকার কিছু সংলাপের অংশ:

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপানী প্রেস, ১২৩১ আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র বসু কলিকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট সেন কলিকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত।

সিদ্ধার্থ রায় সি এফ ডি-র সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় সি-এফ-ডি নেতা জগজীবন রায়, নন্দিনী সংগীতী এবং এইচ. এন. বহুগুণার সঙ্গে বনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রাখছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পাওয়া গেছে এবং সি-এফ-ডি যাতে কোন মতেই জনতা দলের সঙ্গে না মেলে সে ব্যাপারে সিদ্ধার্থ-রায় খুব সচেতন।

কংগ্রেস জার্মানি কমিটির বৈঠকের আগে দিল্লীতে সিদ্ধার্থবাবু কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রায় এবং সি-এফ-ডির সাধারণ সম্পাদক এইচ. এন. বহুগুণার সঙ্গে বেশ কয়েকটি বৈঠক করেছেন বলে জানা গেছে।

সিদ্ধার্থবাবু জগজীবন রায়কে বলেছেন, “আমরা ইন্দিরাকে কংগ্রেস থেকে চলে যেতে বাধ্য করব। যে কারণে আপনি, বহুগুণা ও নন্দিনী কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন আমার ক্ষেত্রেও সে কারণ ঘটবে। কিন্তু যে কারণেই হোক আমি স্বপ্নে থেকে গেছি। আমি কথা দিচ্ছি, কংগ্রেসকে ইন্দিরা মুক্ত করব। দয়া করে আপনি সি-এফ-ডিকে জনতা দলের সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন না, অন্যতম ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে।”

(শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

এম্মাজেন্দীর বলি ২৩ জন রাজ্য সরকারী কর্মচারী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জরুরী অবস্থায় সিদ্ধার্থ রায়ের সরকার ২৩ জন সরকারী কর্মচারীর চাকরী থেকেছেন বলে জানা গেছে। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কারচুপি ও সশস্ত্র গুণ্ডামী করে ক্ষমতায় আসার পরই সিদ্ধার্থ ১৩ জন কর্মচারীকে বরখাস্ত করেন। ১৯৬৩ সালে লোকসভার শাখার ৫ জনকে ছাটাই এবং ১০ জনকে অকালে অবসর গ্রহণ করিয়ে দেওয়া হয়। জরুরী অবস্থায় ছাটাই ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনকে আবার মিসায় জেলে পুরে দেওয়া হয়। এদের অপরাধ কি? এদের একমাত্র অপরাধ এরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কো-অভিমেশন কমিটির সদস্য।

এতটুকু বাসা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীরা, বিশেষ করে যারা মকদ্দমার এবং কলকাতার যাদের নিজস্ব আস্তানা নেই, তারা নাকি সরকারী ফ্ল্যাট পাওয়ার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছেন। কথটা জানা গেল কয়েকজন সরকারী অফিসারের কাছ থেকে। এদের কেউ কেউ সম্প্রতি বদলি হয়ে কলকাতায় এসে বাড়ীর জন্য আবাসনমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দপ্তর দিয়ে তিনি তাদের জানান যে, বাড়ী দেওয়া কঠিন, কারণ মন্ত্রী এবং এম এল এরা বাস্তবায়ন হওয়ার আশঙ্কার আগে থেকেই সরকারী ফ্ল্যাট নিতে আরম্ভ করেছেন। হেষ্টিংস সরকারী ফ্ল্যাটগুলি এই বকম করেই জনের নামে অ্যালট হয়েছে। এদের মধ্যে আছেন জয়নাল আবেদীন আবদুল সাত্তার, গৌতম চক্রবর্তী ইত্যাদি।



বিংশ বর্ষ ॥ ১৩শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ২২শে এপ্রিল '৭৭ ॥ ৪০ পঃ

কংগ্রেসী নেতা, কর্মী ও গুণ্ডারা জনতা দলে ভেড়ার চেষ্টা করছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহল এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আগামী জুন মাসে এ রাজ্যে বিধান সভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচরণ সিং নয়াগুড়ি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে প্রেরিত প্রতিবেদনের যে নির্দেশ দিয়েছেন তাতে এদের পতন আসন্ন। পশ্চিমবঙ্গের রায় মন্ত্রিসভা ও রাজ্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এই নির্দেশে আতঙ্কিত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ঘোষণায় বামপন্থী দলগুলো সমেত জনতা-গণতন্ত্রী কংগ্রেস বৃহৎ প্রবল উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। তবে, এই নির্বাচনে লোকসভার মত বামপন্থী দলগুলো সমেত জনতা-গণতন্ত্রী কংগ্রেসের নির্বাচনী সমর্থকতা হবে কি না, এই প্রশ্নটি এখন মুখ্য হয়ে উঠছে। বিশেষ করে, কেন্দ্রে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠার পর বে-আইনি বিভিন্ন অঞ্চলে কংগ্রেস নামধারী গুণ্ডারা ও তাদের পৃষ্ঠপোষকরা রাতারাতি ভোল পাঁটে নিয়ে কোথাও জনতা, কোথাও গণতন্ত্রী কংগ্রেস

লাজছে তাতে আশাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের মধ্যে, বিশেষত জনতা ও গণতন্ত্রী কংগ্রেস সমর্থক মহলে কিছুটা হতাশা দেখা যাচ্ছে।

এদিকে তরুণকান্তি ঘোষ, অশোক সেন প্রমুখরা জনতার যোগদানের জন্য তীব্র চেষ্টা করে দিয়েছেন। কংগ্রেস ভবনে জনতার কাৰ্যালয়ে এতদিন কয়েকজন মানুষ বাক্সা আসা করত, এখন সেই অফিস ভবনটি, মানুষের ভিড়ে ঢলানো প্রায় অসম্ভব। এখন রাজ্যের জনতা নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে প্রমুখতর সেন, অশোককৃষ্ণ দত্ত মাস্কের ভিড়ে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করতে সময় পাচ্ছেন না। এবং মালা আর মিলি হাতে বহু “কংগ্রেসী” প্রফুল্ল সেনের পদপ্রান্তে নিবেদনের সূত্রে দিয়ে নিজেদের ঠাঁচবার চেষ্টা করছেন। জানা যায় জনতার রাজ্য নেতৃবৃন্দের ব্যাপক অংশ এই সব ছুটি কংগ্রেসীদের অগ্রবেশের বিরুদ্ধে দৃঢ়চিত্ত। জনতার ছাত্র পরিষদ (শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

অপকীর্তি ঢাকতে পুরসভায় পুরনো পাল্টে নতুন খাতা খোলার ব্যস্ততা

(দর্পণের পূর্ববেকক)

১লা বৈশাখ দোকানে দোকানে হালখাতার মত কলকাতা পুরসভার পার্লোনেল বিভাগেও হালখাতা অর্থাৎ পুরনো খাতা পাল্টে নতুন খাতা খোলার ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। পুরসভা সম্পর্কে কিছু খবর দর্পণে বেরো-নোর পরে কমিশনারের ঘরে হোমরা চোমরাদের রুদ্ধতার বৈঠক থেকেই একটু আঁচ করা গিয়েছিল। নির্বাচনের ফল বেরুতেই পশ্চিমবঙ্গের সরকারী এবং আধা সরকারী অফিসার-দের মত পুরকর্তাদেরও মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যায়। গত পাঁচ বছর মন্তান ভজনীর মাধ্যমে শহরের বা-তীর পৌর সেবার্কে জলাঞ্জলি দিয়ে

কেবলমাত্র বিশদকার বিজ্ঞাপন জাহির করে ভলার ভলার, মন্ত্রী মহোদয়ের অজ্ঞার আবদার চরিতার্থ করে পুর-কমিশনার নির্মাল্য মুখার্জি এবং তার সাহায্যে পুরসভায় অবিচার, অন্য-চার এবং বে-আইনী কাজের যে পাহাড় অমিরে তুলেছেন, পৌর জমা-দারদের সম্মার্জনী মার্জনেও তা সাফ হবে কিনা সন্দেহ।

অগত্যা মন্ত্রী হুজুত মুখার্জি এবং চেলা নির্মাল্য মুখার্জি প্রমাণ লোপের পথ ধরেছেন। পার্লোনেল অফিসার অজয় লাল গুটি কম অহুচরের সাহায্যে নিয়োগের তালিকা এবং (শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

বিদেশী ব্যাঙ্কে স্বরত টাকা রেখেছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

লোকসভার নির্বাচনে ডায়মণ্ডহারবারকেন্দ্রে ব্যয় করার জন্য প্রদত্ত টাকা থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আত্মগাং করেছেন রাজ্যের তথ্যমন্ত্রী হুজুত মুখার্জি এবং সেই টাকা তিনি কাঠমাণ্ডুতে একটি বিদেশী ব্যাঙ্কে জমা রেখেছেন। হুজুতের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছেন কংগ্রেস নেতা লক্ষ্মীকান্ত বহু মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়ের কাছে লিখিত একটি চিঠিতে। লক্ষ্মীবাবুর অভিযোগ, এই টাকাটা হুজুত খরচ করেন নি নির্বাচনের কাজে। এখানে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে কিছুদিন আগে তিনি দিল্লী যান এবং সেখানে থেকে ক্যান্টিনেভিহান এয়ারওয়েজে কাঠমাণ্ডু গিয়ে একটি বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকাটা জমা দেন।

হুজুতের বিরুদ্ধে লক্ষ্মীবাবুর আরও অভিযোগ যে, কল-কাতা পুরসভার কার পাকিংয়ের কন্ট্রোল পরিচিতির দায়িত্বে দিয়ে তাদের কাছ থেকে তিনি মাসে কয়েক হাজার টাকা রোজগার করেন। তাছাড়া হকারদের জন্য যেসব নতুন বাজার হয়েছে সেখানে হুজুত নিজের আত্মীয় স্বজন বহু বাসবদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন অন্তরাভাবে।

ফাটা কেষ্ট সংবাদ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দর্পণ পত্রিকা পোড়ানো ও বহু কীর্তির নায়ক ফাটা কেষ্ট ভরফে কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ধরা পড়ার পর খাতিমদ্বী প্রফুল্ল-কান্তি ঘোষ (শতাব্দী) তার বাড়ীতে সাধনা দিয়ে এসেছেন।

এই ফাটা কেষ্টকে পুলিশ বহু অসামাজিক কাজকর্মের দায়ে শেষ পর্যন্ত কিছুদিন আগে গ্রেপ্তার করে। তাকে হাজতেও পোরা হয়। ফাটার কালীপুজার উদ্বোধন করতে বহু কংগ্রেসী নেতাও প্রতিবার উপস্থিত থাকেন। তাই ওর গা ছুঁতেও এতদিন কেউ সাহস করেনি। এই ফাটা কেষ্টোই দর্পণ পত্রিকা পুড়িয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে। কেষ্ট ধরা পড়ার পর চতুর্দিক থেকে তীব্র তদারকি শুরু হয়ে যায়। পরে কেষ্ট জামিন পায়। কিন্তু এর আগেই শতাব্দী কেষ্টের বাড়ীতে গিয়ে পরিবারবর্গকে সাধনা দিয়ে আসেন। এদিকে খবর হ'ল ফাটা কংগ্রেসী নেতৃবর্গের বহু “কাজ” করে দিয়ে এখন প্রচুর টাকার মালিক। অন্যমে বেনামে মিনিবাস, প্রাইভেট কার, দোকান, ইত্যাদি করে ফাটা আখের গুচ্ছিয়ে নিয়েছে। এই ফাটা কেষ্ট কলেজ স্ট্রীট এলাকার পান-বিক্রী করতো বলেই অনেকে জানেন। তার এই বয়সের মেসখ্য কারণ খুঁজে বের করার জন্যও জনতা নেতৃবৃন্দের কাছে দাবী উঠেছে।

স্পীকারের বিরুদ্ধে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীজানারায়ণের কাছে স্পীকার অপূর্বলাল মজুমদার ও ভার সাগরেন্দ্র নুপেন মজুমদার সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ সন্থিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে।

সোমবার হাওড়া টাউন হলে শ্রীজানারায়ণ আসার পর হাওড়াবাসীদের থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি তার হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দিয়ে স্পীকারের বিরুদ্ধে অবিলম্বে তদন্ত শুরু করার দাবী জানান।

এদিকে দর্পণ পত্রিকায় স্পীকারের নানা অপকীর্তির সংবাদ বেরিয়ে পড়ার ফলে সংশ্লিষ্ট অপূর্ব মজুমদার ও নুপেনের দলবলের মধ্যে যথেষ্ট তৎপরতাও শুরু হয়ে গেছে। তারা চেষ্টা করছেন তদন্ত যাতে পুরনো কোনও ঘটনার কেউ সাক্ষী না দেন। এ ব্যাপারে ছলচাতুরী, লোভ দেখানোও শুরু হয়েছে। বেলগাছিয়ায় রঞ্জিত দাশকে প্রতারণার ঘটনার বাত্রে তিনি সাক্ষ্য না দেন সে ব্যাপারেও তাকে প্রতারণা করার চেষ্টা চলছে।

কমিউনিজমের আদর্শ 'অমর নহে'

কালিদাস কুণ্ডু

কত ছেলেকে পুলিশ হত্যা করেছে?

কেরালা হাইকোর্ট পি রাজন নামে রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের যে ছাত্রটিকে আদালতে হাজির করার জ্ঞপ্তি রাজ্য সরকার ও পুলিশের প্রতি আদেশ দিয়েছেন পুলিশ বলেছে তার হৃদয় তার মনে না—যদিও ছাত্রটিকে ১৯৭৬ সালের ১লা মার্চ গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে কলেজের অধ্যক্ষ সহ কয়েকজন সাক্ষ্য দিয়েছেন।

রাজনকে সম্ভবত আর এই পৃথিবীতে হাজির করা হবে না। যুগ্মমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণগারুদ, রাজ্যের পুলিশ এবং সরকারী উকিল হাইকোর্টে যে সব উটো-পান্টা বক্তব্য রেখেছেন, তাতে বৃষ্টিতে অহবিষা হয় না। হে, রাজনকে ঠাণ্ডা মাথায় খতম করা হয়েছে। ১লা মার্চ তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে পুলিশ তার ওপর অমাত্রব্যবহার করেছিল, যার ফলে রাজনের মৃত্যু ঘটেছে পারে অথবা তাকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছে তাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।

এই হচ্ছে আমাদের দেশের পুলিশ। জনসাধারণের টাকায় এদের পোষা হয়। এরা আইন শৃঙ্খলার রক্ষক। চোর-বাটপাড়-ডাকাত-ক্রিমিনালদের হাত থেকে নাগরিকদের রক্ষা করা এবং তারা যাতে শাস্তিতে বসবাস করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া পুলিশের অত্যন্ত কৰ্তব্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় এই সব চোর-ডাকাত-ক্রিমিনালদের সঙ্গেই অধিকাংশ পুলিশের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। কেন? নিয়মিত মাসোয়ারা বা লুণ্ঠিত অব্যবহৃত ভাগ বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা আছে বলে। “পুলিশ সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল” (এলাহাবাদ হাইকোর্টের জৈনক বিচারপতির মন্তব্য) যদি নাও হয় ক্রিমিনালদের সাহায্যকারী তো বটেই।

যারা সমাজে নোংরা ক্ষতের মত সেই ক্রিমিনালদের সঙ্গে পুলিশ বাহিনীর আতাত থাকলেও বামপন্থী রাজনীতির পক্ষ পেলেই কিন্তু একেবারে উগ্রচণ্ডী হয়ে ওঠে। আজ এমার্জেন্সী উঠে গেছে বলে ঘটনার এক বছর পরে রাজনের পিতা হাইকোর্টের দরজা হতে পেরেছেন। ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতার ফিরে এলে তাও সম্ভব হত না। কারণ আদালতের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে পুলিশকেই বিচারের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। আর পুলিশ বিচার মানেই অমাত্রব্যবহার হিংস্র নির্ধাতন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হত্যা।

গত ছ সাত বছরে কত ছেলেকে পুলিশ হত্যা করেছে? অসংখ্য রাজ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গে? পশ্চিমবঙ্গেই সম্ভবতঃ খুনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এখানে বহু যুবক এখনও নিখোঁজ। পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, তার পর আর তাঁদের খোঁজ কেউ জানে না। আত্মীয় বন্ধনরা অনেক চেষ্টা করেও তাদের হৃদয় হৃদয় করতে পারে নি। বারাসতের রাস্তায় এগারোটি মৃতদেহ বাতের অঙ্ককারে ফেলে রেখে গিয়েছিল কারা? সেই সময় সি পি আই (এম)-এর ডাবমুন্ডি নষ্ট করার একটা ষড়যন্ত্র চলেছিল। এটিয়ে দেওয়া হল এই দল তদের হত্যা করেছে। কিন্তু এগারোটি ছেলেকে খুন করে গোপনে বারাসতের রাস্তায় কেল দেওয়া পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। লোকের বন্ধন ধারণা পুলিশই ওদের খুন করেছে। সেইজন্য ষড়যন্ত্র তদন্ত হল না। এই ধরনের কোন হত্যাকাণ্ডেরই তদন্ত হয়নি। এই প্রসঙ্গে বরানগরের ঘটনারও উল্লেখ করা যায়। সেখানে পুলিশ নিজে হাতে খুন করে নি। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা ধরে এই অঞ্চলে কংগ্রেসী ও গুজরা খুনখারার লুণ্ঠন ও অত্যাচার চালায় পুলিশেরই পাহারায়। এবং এই ঘটনারও কোন তদন্ত হয় নি। কারণ তার ফলে এই সমস্ত দেশে পরিকল্পিত উপায়ে কি ভাবে নরহত্যা সংঘটিত হয়েছে সে তথ্য হয়ত উদ্ঘাটিত হয়ে যেত। সাঁইঘাড়ি নিয়ে কংগ্রেসীরা এবং বড় বড় কাগজগুলো খুব গলাবান্ধী করেছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরে অসংখ্য সাঁইঘাড়ি সৃষ্টি করেছে পুলিশ ও কংগ্রেসী গুণ্ডারা।

বেলেঘাটার ঘটনা নিম্নরূপ সাক্ষ্যের মনে আছে।—এরকম বহু ঘটনা তখন ঘটেছে। উল্টাডাঙ্গার কাঁকড়াগাছির কাছে কত ছেলেকে গুলী করে মারা হয়েছে ওখানকার পথঘাট গাছপালা যদি নির্বাণ না হত তাহলে তার সাক্ষ্য দিতে পারত। রাতের অন্ধকারে পুলিশের গাড়ি এসে থামত আর গাড়ী থেকে ছেলেদের নামিয়ে দিয়ে চলে যেতে বলা হত, তারপর পেছন থেকে গুলী। মৃতদেহ তুলে নিয়ে যাওয়া হত। শুধু ঘাসের ওপর লেসে থাকত চাপ চাপ রক্ত।

কত ছেলেকে পুলিশ হত্যা করেছে নিরপেক্ষ তদন্ত বলে জানা যেতে পারে।

অবশেষে রক্তপাতহীন একটি যুদ্ধের ঐতিহাসিক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে পুরাতন বঙ্গের বিদায় সন্ধ্যায় জানিয়ে মিলিয়ে গেল অস্তাচলে। শুভ নববর্ষের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের নেপথ্য ঘোষকের কণ্ঠে আমরা-তখনও পেলাম গণতন্ত্রের বিজয়বার্তা।

এটা বিপ্লব নয়। এ হচ্ছে এক পরিবর্তন যা নিঃশেষে ঘটে গেল ব্যালটের-যাচুতে, বাক্যে বিশেষিত করা যার বিরাট ও অস্বাভাবিকতায়, বহু মাহুষের প্রার্থনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যার অন্তঃ অভ্যুদয়। বিপ্লব দূরদর্শী। সে সমূহকে বিনাশ করে, সমূলে উৎপাটিত করে। তারপর মেতে ওঠে ভবিষ্যতকে গড়ে তোলার, উদ্ভাবনার। পরিবর্তন আনে পরিমার্জনা, পরিভূক্তি ও কিছুটা রূপান্তর। তাই, পরিবর্তন বিপ্লবের চেয়ে কম উগ্র ও স্থিতিবাহ্যর চেয়ে অধিকতর নম্র।

সন্ত-সমাপ্ত লোকসভার নির্বাচনে উক্ত “অধিকতর নম্র-তার” পক্ষেই রায় দিয়েছে।

কিন্তু হুঃখের বিষয়, কোন কোন রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতার অতি সাম্প্রতিক বক্তৃতা ও বিবৃতি জন মনে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করতে অপপ্রয়াসী হয়েছে যেন ভারতবর্ষে একটা বিপ্লব বা প্রতিবিপ্লব ঘটে গেছে। ব্যাপারটা গুরুতর কিছু না হলেও উল্লেখনীয় নয়।

গত শনিবার দমদম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে হারভার্ড ফেরৎ ডঃ সুরেন্দ্রনাথ খাসী যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে তিনি একটি কঠিন মন্তব্য করেন—ভারতবর্ষে নাকি মার্কসবাদ বা কমিউনিজমের আদর্শ ব্যর্থ হয়েছে। একদা জনসংঘী ও বর্তমানে জনতা পার্টির একজন তাত্ত্বিক নেতার এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সি, পি আই-এর সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাও এবং উক্ত পার্টির যুব নেতা গুরুদাস দাশগুপ্ত “গণতন্ত্রী মাত্রকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে” ঐ হুমকীর মোকাবিলার আহ্বান জানান।

আমরা সবিনয়ে সি পি আই নেতৃত্বকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, “বামপন্থী থোকামির” যুগ শেষ হয়ে গেছে। আপনাদের মূরদ জানা আছে। “দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার” বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে আপনারা চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে জোট বেঁধেছেন, তার অত্যাচারী হাতকে শক্তিশালী করেছেন। তরাকথিত ক্যাসীবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে আপনারা খাসরোধকারী জরুরী অবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন এবং গণতন্ত্র হত্যার প্রেত-নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। লোকে ভুলে যায়নি, ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত-সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে উগ্র জাতীয়তাবাদের হাতকে কারা শক্তিশালী করেছিল। একথাও মুছে যায়নি ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে, যে পণ্ডিত অহরলাল নেহরু মার্কসবাদকে “সেকেন্ড ও অচল” মতবাদ বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন আপনাদের বিদগ্ধ নেতা হীরেন মুখার্জী মহাশয় সেই নেহেরুকে “স্টেটল কলোয়াল” রূপে অভিহিত করে তাঁর স্তম্ভিগান করেছিলেন। ভুলে যায়নি জনগণ যে নেহেরু-তনয়ার নেতৃত্বে ও আত্মবিশ্বাসে কটর কমিউনিষ্টবিরোধী শক্তিগুলো কেরালার প্রথম কমিউনিষ্ট-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তাকে বে-আইনীভাবে উচ্ছেদ করেছিল তাঁর প্রতিটি বৈরতন্ত্রী পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়েছিলেন আপনারা।

“কমিউনিজমের আদর্শ ভারতবর্ষে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে”—এই মন্তব্যে বিদগ্ধ হবার কি মৈত্রিক অধিকার আছে আপনাদের? মার্কসবাদ বা কমিউনিজমের ভাবাদর্শের প্রতি কি আপনাদের বিন্দুমাত্র প্রত্যাখ্যান বা বিবাস অবশিষ্ট আছে? শ্রেণী সংগ্রামের পথ বর্জন করে আপনারা তো অনেক আগেই শ্রেণী-সহযোগিতার পথ গ্রহণ করেছেন।

ডঃ খাসীর মন্তব্য তো আপনাদের চামড়া ভেদ করার কথা নয়। নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে ইন্দিরা গান্ধী আপনাদের “দেশভ্রোহী,” “বিশ্বাসঘাতক” বলে গালমন্দ করেছিলেন। সেই ভংগনা হজম করে যারা কয়েকটি আসনের লোভে কমিউনিষ্ট বিরোধী শক্তির সঙ্গে আতাত করতে পারে তারা মার্কসবাদের পতাকা উত্তোলন করে কোন হাতে?

একদিন ভারতবর্ষের গান্ধীবাদীরা প্রশ্ন তুলেছিলেন—গণতন্ত্র না কমিউনিজম? ১৯৭৬ এর জুনে খাঁটি গান্ধীবাদীরা প্রশ্ন তুলেছিলেন—গণতন্ত্র না বৈরতন্ত্র? এই প্রশ্ন উদ্ভূত হয়েছিল বাস্তব অভিজ্ঞতার কঠিন আঘাতে। গণতন্ত্র প্রেমিক মানুষ ভোটের বাক্সে প্রমাণ করে দিয়েছেন—বৈরতন্ত্র ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে।

তবু যদি আজ একথা কেউ বলেন যে, কমিউনিজমের আদর্শ ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে, আমরা তাকে বিনীতভাবে স্মরণ করিয়ে দেবো কমিউনিষ্ট বিরোধী ডালেসের কথা—যিনি সদৃশে ঘোষণা করেছিলেন “Better dead than red,” লালাত্বকে বিকারগ্রস্ত তদানীন্তন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডালেসের প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপের শান্তিবাদী কয়েকজন বুদ্ধিজীবী। তাঁরা বলেছিলেন “Better red than dead.” অর্থাৎ মৃত্যুর চেয়ে কমিউনিজম শ্রেয়ঃ।

কমিউনিজম একটা বৈজ্ঞানিক মতবাদ। মানবোতি-হাসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণের উপর দাঁড়িয়ে আছে মহোচ্চ এই ভাবাদর্শ—শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী দর্শন। কোন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা বা আফালনে তা ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়ে যায়নি, যায় না।

তবে যারা মার্কসবাদকে বর্জন করে সংশোধনবাদ ও বিভেদের নীতি গ্রহণ করে মার্কসবাদের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করতে চেয়েছে ভারতীয় জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। মেকী মার্কসবাদ আজ সত্যিই অচল সিকিতে পরিণত।

সিদ্ধার্থ ও সি এফ ডি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জগজীবনবাবু সিদ্ধার্থবাবুর কথা গুরুত্ব দিয়েই শুনেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন বর্তমান অবস্থায় আমরা কোন মতেই কংগ্রেসে ফিরে আসা সম্ভব নয়। তবে সি-এফ ডিকে জনতা দলের সঙ্গে মিশিয়ে না দেওয়ার ব্যাপারটিই বিবেচনা করব।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, জগজীবনবাবু কংগ্রেস ত্যাগের পর কখনই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন নি। জগজীবনবাবুর দলত্যাগের একমাত্র কারণ ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর পুত্র সমগ্র গান্ধীর দলের মধ্যে সীমাহীন আধিপত্য।

সিদ্ধার্থবাবু ও নন্দিনী সংপর্ষকে বখন মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে তখন সিদ্ধার্থবাবু কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির যে সব সদস্যের সমর্থন পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে জগজীবনবাবু অন্যতম।

গত সপ্তাহে ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে সিদ্ধার্থবাবু ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ করেছেন এবং ওয়াকিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সরাসরি ইন্দিরা গান্ধীকে আক্রমণ করেছেন।

জানা গেছে, সিদ্ধার্থবাবু বে সি-এফ-ডির সঙ্গে যোগা-বোর্গ রাখছেন সে ব্যাপারে রজনী প্যাটেল ও দেবকান্ত বড়ুয়ারও সমর্থন আছে। রজনী প্যাটেল ও দেবকান্ত বাবুও এখন প্রচণ্ড ইন্দিরা বিরোধী।

পুর সার্ভিস কমিশনের অবিচার ও অনাচার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

১৯৫১ সনের কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন পাশ হওয়ার আগে কলকাতা পুরকর্মীদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যাপারে চুটি কমিটি ছিল—১নং ও ২নং সার্ভিস কমিটি। এরা প্রার্থীদের যোগ্যতা বিচার করে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিতেন। কিন্তু কালক্রমে এদের কার্যকরী পুরসভার ক্ষমতাচ্যুতগুলির কবলিত হলে মোট চাকুরি এবং পদোন্নতি এই চক্রগুলি আপোসে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিত। এর ফলে ধারাপ যেমন হয়েছিল তেমনি ভালোও—বহু রাজনৈতিক নির্ধাতিত নেতা ও কর্মী এই আমলে পুরসভার চাকুরি পেয়ে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন। আবার এর ফলে কাউন্সিলারদের মধ্যে কোটা বা ভাগপ্রথাও সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখান হত না। তৎকালীন প্রভাবচক্রের অন্ততম রূপে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই সব কারবার সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলেই ১৯৫১ সনের পুর-আইনে তিনি একটি সরকার নিয়ন্ত্রিত সার্ভিস কমিশনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এই কমিশন প্রথমাবধি তাদের কাছে প্রত্যাশিত সুবিচার, নিরপেক্ষতা এবং উচ্চ মহলের প্রভাব থেকে নিজেদের বিবেচনা ও সিদ্ধান্তকে মুক্ত রাখতে পারেন নি। এর প্রথম দৃষ্টান্ত অ্যাডিশনাল সেক্রেটারির পদে নিয়োগের ব্যাপারে তৎকালীন কমিশনার বি. কে. সেনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যোগ্য বিভাগীয় প্রার্থীর দাবি নস্যাৎ করে মুন্সিপালিটি থেকে বার্ষিক ভোগ্যদেবী শুল্ক বোসকে আনয়ন। এই ভুললোকের প্রভাব মনোজ বোসের মাধ্যমে এই ভুললোকের প্রভাব সরকারী এবং বেসরকারী বহু স্তরে বিস্তৃত ছিল নতুন শিক্ষাদীক্ষার বা কর্মনিপুণ্যে বিভাগীয় প্রার্থীর নবের যোগ্যতা তিনি ছিলেন না।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এই একই বিভাগের অ্যাডিস্ট্রাক্ট সেক্রেটারির পদে অরুণ ব্যানার্জীর নির্বাচন। তৎকালীন পুরসচিব তার বিভাগীয় প্রার্থী এককালীন টেষ্ট ক্রিকেটার মণ্টু ব্যানার্জীর উপরে খাপ্পা ছিলেন বলেই পদপুত্রির ব্যাপারে বিজ্ঞাপন দেওয়ার স্থগতিশ করলেন। পছন্দসই না হলে বা কোন কারণে কর্তৃপক্ষের বিরোধভাজন হলে বিভাগীয় প্রার্থীকে কাঁচকলা দেখানোর এটাই হল সহজতম কৌশল। মণ্টু ব্যানার্জীর আর দোষ যাই থাক না কেন, তার কাজকর্মের জ্ঞানশোনা বা ক্ষমতা কেউ অস্বীকার করে না। নবাগত ভুললোক বহুকাল পুরসভার জল বিভাগের কেয়ালি থেকে কোন সুবিধা করতে না পেরে আসান-সোলে মাইনিং লেবার ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সেক্রেটারির চাকরি নিয়ে চলে চান। কলকাতা পুলিশের ডি. সি. নর্থ কে, ডি. গাঙ্গুলি তার ভালক (বা সখদী)।

পুলিশ শালার জোর

লোকে বলে মামার জোর, দাদার জোর কিন্তু অরুণ ব্যানার্জীর বেলায় পুলিশ শালার জোর মোক্ষম হল। তার খাতিরে তৎকালীন এল. এস. জি. সেক্রেটারি এ. কে. দত্ত, কমিশনার এস. বি. রায় অরুণ ব্যানার্জীকে মনোনীত করলেন মণ্টু ব্যানার্জীর দাবি অগ্রাহ্য করে। এই দুইটি ধোরতর অবিচারে কার্যমানে সহযোগিতা করেছিল কলকাতা মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন ক্ষুদ্র ব্যক্তির কোন ওজর আপত্তিই তারা বিবেচনায় আনে নি। অতএব জোহরুস্তি এই কমিশনের কাছে জায়গারপায়গতা এবং প্রভাবমূলক থেকে প্রার্থী নির্বাচন যারা আশা করে তারা হয় মূর্খ না হয় বাতুল। ডাঃ রায়কে দিয়ে তৎকালীন এল. এস. জি. বি. যে সব বড়কর্তাব্য এই সার্ভিস কমিশনের প্রবর্তন করিয়েছিলেন তাদের দৃষ্টি ছিল চাকুরির এই বখারার দিকে—তাদের বক্তব্য ছিল কর্পোরেশনের চাকুরির ভাগ্যভাগি কেবল কাউন্সিলার চক্রের মধ্যেই হবে কেন, মন্ত্রী এবং

মাইটসের বড় কর্তারাই বা তার হিন্দা পারে না কেন? পরবর্তী কালে কর্পোরেশনের চাকুরির ঝোল এদের কোলে কত ঢালা হয়েছে অভিজ্ঞ লোকেরা তা জানেন।

মিথ্যা তথ্য জ্ঞাপন

সার্ভিস কমিশনগুলির আবেদনপত্রে একটি সাধারণতঃ দেওয়া আছে যে, কেউ কোন মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন প্রমাণ হলে তার প্রার্থিপত্র নাকচ পর্বত হতে পারবে। অরুণ ব্যানার্জী তার আবেদনপত্রে নিজেকে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ওয়াটার ওয়ার্কসের এককালীন সি-এ বলে দাবী করার পরে কর্পোরেশনের তৎকালীন কর্মচারী খতিয়ান খুলে দেখা গেল সে সময়ে (এবং তার পরেও) ঐ নামে কোন পদ কর্পোরেশনে ছিল না। এবার অরুণবাবু, তার মুকুন্নি এবং এম্. এস্. সি খুব গাউডার পড়লেন।

চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা

বিষয়টা সম্বন্ধে কর্পোরেশনকে খোঁজ নিয়ে জানাতে বলা হল। পেছন থেকে কলকাঠি নাড়া হতে লাগল এবং সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন অর্থ কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান স্বনামধন্য গোবিন্দচন্দ্র দে। তিনি প্রার্থীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রিপোর্ট দিলেন যে, ই ই ভল্লভব কোন সি-এর পদ না থাকলেও অরুণবাবু বেসরকারী ভাবে সি-এর কাজ করে থাকতে পারেন। তা হয় তো পাবেন কিন্তু আমাদের দেশের সার্ভিস কমিশন ছাড়া আর কেউ কি এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হতেন? আশ্চর্য এই যে, এর পরে অরুণ ব্যানার্জী নিজের সৌরবে অচিরায় ধাপে ধাপে প্রমোশন পেতে পেতে বর্তমানে পুরসচিবের পদে পাকা হয়ে কমিশনারের চেয়ারটির দিকে সজ্ঞত নজর দিতে আরম্ভ করেছেন।

বিদ্রোহ? সে কি বলব মশাই

বিদ্যাবুদ্ধি হিসেবে অরুণবাবু সম্বন্ধে শোনা যায় যে, কোন কাগজ কাকে পাঠাতে হবে, কার কত টাকা পৃথক ডেলিগেশন পৌর আইন মোতাবেক কোনটা কমিটি, কমিশনার বা কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ তা সম্বন্ধে দেওয়ার ক্ষমতা তাকে অল্প লোকের সাহায্য নিজে হয়। নিজের নামটান নাকি তিনি তিনবার তিন রকম লেখেন এবং দুই লোকে বলে ধমক খেলে বাপের নামও নাকি তিনি ভুলে যান। অতএব এমন সেক্রেটারির যাবতীয় শেট, ড্রাক্ট ইত্যাদি লিখে দেওয়ার ক্ষমতা যদি তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত লোকের বছরের পর বছর কাজের মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ গরজ বড় বালাই। এমন লোককে মন্ত্রীর স্থপারিশে রাজ্য পারলিক সার্ভিস কমিশন যদি পুরসচিব রূপে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন তাহলে তার দ্বারা তাদের নিরপেক্ষ জায়গারপায়গতা এবং বশবদতা দুইই প্রমাণিত হয়েছে।

মশা মারতে গালে চড়

এই সব তথাকথিত সার্ভিস কমিশনের সদস্য এবং কর্তা ব্যক্তির গত পাঁচ বছরের মতানী রাজস্ব প্রভুদের হুকুম-বরদারি করে কংগ্রেসী নায়কদের বখা নির্দিষ্ট ভাগ দিলে (এবং নিজেও তার ছিঁটে কৌটা প্রসাদ পেয়ে) ঢালা-চ্ছিলেন ভালই। কিন্তু মাঝখান থেকে এস, এস, সি, একটা বোকামী করে মশা মারতে গালে চড় খেয়েছেন। গত পাঁচ বছরে এদের হাতে পুরকর্মীদের জায় দাবি যে ভাবে পদদলিত হয়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই। হঠাৎ অ্যাডিস্ট্রাক্ট অ্যাসেসর পদ পূরণের অন্ত যোগ্য প্রার্থীদের কাছে স্বরখাতের নমুনা পাঠিয়ে তারা তা পূরণ করে পাঠাতে বললেন। কিন্তু একজন সাধাভাঙা সাব অ্যাসেসর লিখে বসলেন, আপনাদের কাছে দরখাস্ত করে লাভ কি? ডেপুটি অ্যাসেসরের পদে বাইরের বিভাগ থেকে মন্ত্রীর (শেবাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের হুঁশিয়ারী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কংগ্রেসের বিকৃত ও অনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তির যাতে জনতা পার্টি বা গণতন্ত্রী কংগ্রেসে স্থানলাভ না করতে পারে তার জন্য চন্দ্রনগরে সম্প্রতি অস্থিতি মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির সভায় হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়েছে। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে দর্পণ সম্পাদকের ওপর সমাজ বিরোধী দেয় আক্রমণের নিন্দাও দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবী এবং শহীদ মিনার ময়দানে কংগ্রেসের সভায় কলকাতার সাংবাদিকদের ওপর হামলার নিন্দা করা হয়েছে।

বিগত লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেসকে একচেটিয়া ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটি জনগণকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়েছে। এই অবস্থায় পশ্চিম বাংলার সিদ্ধার্থ রায় মল্লিকসহ এখনও গদি আঁকড়ে থাকার বিষয় প্রকাশ করে অবিলম্বে এই মন্ত্রিসভার পদত্যাগ

ও অবিলম্বে বিধানসভার নির্বাচন দাবী করা হয়েছে এবং খেচ্ছায় পদ-ত্যাগ না করলে এদের বিরুদ্ধে তীব্র গণ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিগত লোকসভার নির্বাচনে জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কংগ্রেসের সব নেতা ও নানা অপকীর্তির নায়করা বর্তমানে রাজনীতির নামাবলী বদল করার চেষ্টা করছে দেখে রাজ্য কমিটি বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং বিশেষ বরে জনতা পার্টি ও গণতন্ত্রী কংগ্রেসের প্রতি অহরোধ জানিয়েছে এদের দলে না নেওয়ার জন্য। আগামী বিধানসভার নির্বাচনে এরা যাতে কোন দলের মনোনিয়ন না পান সেদিকে দৃষ্টি দেবার জন্যও অহরোধ জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে কংগ্রেস বিরোধী ভোট যাতে ভাগ না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্যে বামপন্থী-জনতার সার্বিক এক্য কামনা করা হয়েছে।

লীগ্যাল এড কমিটির দাবী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি অস্থিতি লীগ্যাল এড কমিটির কনভেনশনে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়েছে। গৃহীত প্রস্তাবে মিসা ডি আই আরের মত সমস্ত কালাকাহন প্রত্যাহারেরও দাবী জানানো হয়েছে এবং সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণের নিন্দা করা হয়েছে।

এই সভা বিগত বছরগুলোতে কাহু সান্টাল, দৌরেন বহু, নাগভূষণ পট্টনায়ক, ভারতী তরুণদার প্রভৃতি যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত রাজনৈতিক নেতা সহ দলমত নির্বিশেষে সাজা-প্রাপ্ত সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তি দাবী করেছে। গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন মামলা ও অভিযোগে যে অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মীকে আটক রাখা হয়েছে তাদের সকলকে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বি অস্থায়ী মুক্তি দেবার আহ্বান জানানো হয়েছে। অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মীর বিরুদ্ধে এখনও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা রয়েছে। এগুলো এখনও প্রত্যাহার না করে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ সত্ত্বেও এখনও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কমিটি এবং প্রোগ্রেসিভ লেবার ইউনিয়ন (হুগলিপুর) নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এই সভা ২২শে মার্চ পর্যন্ত ভারী করা সমস্ত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা

এবং ঐ দুই সংস্থার ওপর থেকে নিষে-ধাজ্ঞা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে।

বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন জেলে বহু রাজনৈতিক কর্মীকে নির্মমভাবে শিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে জেল থেকে পালানোর অজুহাতে। ব্রিটিশ আমলেও এই ধরনের ঘটনার নজীর পাওয়া যায় না। এই সভার প্রস্তাবে এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে সমস্ত ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দায়ী ব্যক্তিদের সাজা দেবার দাবী জানানো হয়েছে।

মুন্সিপালিটি চিরকালের জন্য বাতিল করারও দাবী জানিয়েছে এই সভা এবং সেই সঙ্গে অরুণী অবস্থার স্বযোগ নিয়ে ১৯৭২ সালের ১লা ডিসেম্বর অজ্ঞের দুই রাজনৈতিক কর্মী কিশোর গৌড় ও জুয়াইয়াকে কানি দেও-রার তীব্র নিন্দা করেছে। নদীয়া জেলার তিনজন রাজনৈতিক কর্মী ভূদেব মণ্ডল, মিতাই বিশ্বাস ও কানী-পদ সর্দারের ওপর থেকে কানির আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়েছে।

এই সভা থেকে পীযুষ দে ও শৈবাল মিত্রকে মুক্ত আত্মায়ক করে বন্দীমুক্তি ও গণদাবী প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শিক্ষক বরখাস্ত প্রসঙ্গ

আপনার সম্পাদিত দর্পণ পত্রিকায় ১৯৭৭ সালের ১৪ই জানুয়ারী শুক্রবারের সংখ্যায় “জটিল শিক্ষকের চাকরী খতম প্রধান শিক্ষকের হীন খড়বস্ত্রের বলি” শীর্ষক সংবাদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। যেহেতু উক্ত সংবাদ ভিত্তিহীন, সেই হেতু উক্ত বিভাগের সম্পাদক হিসাবে পরিচালক সমিতির পক্ষে উক্ত সংবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ধারা পরিচিত আছেন, তারা অবশ্যই জানেন যে, একজন বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যকে জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষকপদে কোনক্রমেই স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা যায় না, যায় না বলেই জীবন বিজ্ঞানের উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে ত্রুটিপূর্ণ সর্দারকে অস্থায়ীভাবে কাজ করতে বলা হয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ঐ সময় বিভাগে সরকার অল্পমোদিত জীবন-বিজ্ঞান শিক্ষকের কোন পদও ছিল না। শিক্ষক হিসেবে কণিবাবুর অযোগ্যতার জন্ত ছয় মাসের মধ্যেই তাঁর ছাত্র-অভিভাবক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। তা সত্ত্বেও, কণিবাবুর লিখিত অল্পমোদে সম্পূর্ণ মানবিক কারণে আরও কিছুদিন কাজ করার সুযোগ কণিবাবুর দেওয়া হয় যাতে তিনি স্বীয় জট-বিচ্যুতি সংশোধন করে ছাত্র-ছাত্রীর নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরিচালক সমিতির সদস্যদের সদিচ্ছা ও সহায়ত্বতিকে তিনি কাজে লাগাতে সোঁচনীয়ভাবে ব্যর্থ হন, যার অবশেষে পরিণতি ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষকতার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দান (১৭ই আগস্ট—১৯৭৬)।

“২ জন শিক্ষক এবং একজন শিক্ষা কর্মীকে চাকরী থেকে নানা অজুহাতে বরখাস্ত করে বারুইপুর শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান লাভ করেন”—এই সংবাদেরও কোন ভিত্তি নেই। কোন শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী যদি ব্যক্তিগত কারণ বা better prospect-এর জন্য স্বচ্ছন্দ পদত্যাগ করেন, সেক্ষেত্রে বিভাগের কর্তৃপক্ষের কি করণীয় থাকতে পারে? কাজেই “নানা অজুহাতে” কোন প্রসঙ্গ উঠতে পারে না।

কণিবাবুর নিয়োগপত্র সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকের কারচুপির সংবাদটি যে শুধু কাকতালিগি তাই নয়, হাস্যকর ও উদ্বেগমূলকও বটে।

সংবাদের শেষাংশ আবুবকর মণ্ডলকে “নানা অজুহাতে বরখাস্তের” সংবাদটি পরিবেশিত হয়েছে। শ্রীআবুবকর মণ্ডল সেই প্রকৃতির লোক যিনি তিন বছর পূর্বে তদানীন্তন প্র, শি, শ্রীমুকন্দমুরারি মণ্ডলকে প্রহার কোরতেও দ্বিধা করেননি, কারণ মুকন্দমুরারি শ্রীআবুবকর মণ্ডলের অযোগ্যতার কথাটি পরিচালক সমিতির সভায় তুলেছিলেন ও তিনি বর্তমান প্র, শিক্ষকেও নানা অজুহাতে অপমান ও উৎপীড়ন করেছেন, যিনি প্র, শি, ও সহকারী প্র, শি, কর্তৃক রচিত provisional routine মানে নি এবং অস্বাস্থ্য শিক্ষকদেরও উহা অমান্য করতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্ররোচনা দিয়েছেন, যিনি শিক্ষকদের হাজিরা বহিতে অস্বাস্থ্য শিক্ষকদের সম্মুখেই প্রধান শিক্ষকের মন্তব্য কেটে নিজ সহি দিয়েছেন, যিনি প্রঃ শিক্ষকের অহরোধে সাড়া না দিয়ে বিভাগের matron মারকণ্ড প্রধান শিক্ষককে শিক্ষক কক্ষে বেতে উদ্বৃত্তপূর্ণ আদেশ কোরতে দ্বিধা করেননি, যিনি বর্তমান প্রঃ শিক্ষকের পদত্যাগের দাবিতে তাঁকে একাধিক দিন আটককোরেছেন, দৈহিক ও মানসিক পীড়ন চালিয়েছেন কারণ শ্রীমণ্ডলের মতে উক্তপদে তার সম্ভার্যত্ব লোকের বড় প্রয়োজন, বিভাগে পূর্ববঙ্গাগত (অধুনা বাংলাদেশ) কোন প্র, শি, রাখা চলবে না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য শ্রীমণ্ডল শাসক কংগ্রেসের এবং যুব কংগ্রেসের প্রতাবশালী গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য জাহির করে ছাত্র শিক্ষকের উপর অসন্ত প্রভাব বিস্তার কোরে বিভাগের শিক্ষা পরিবেশকে কলুষিত কোরেছেন, যিনি পূর্বতন প্র, শিক্ষকেত্যাগিয়ে নিজেই ছাত্র শিক্ষকদের সম্মুখে, অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বলে প্রতিপন্ন কোরতে সাময়িকভাবে সমর্থ হোয়েছিলেন, যিনি B. com. Hons. (after publication of review results in 1970) হোয়েও দশম ও একাদশ শ্রেণীতে বাগিত্যিক অঙ্ক করাতে অক্ষম, যার কলকলিত ছাত্র-ছাত্রীদের দিনের পর দিন শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ, অসন্তোষ ও বিক্ষোভ, কলে তদানীন্তন সম্পাদক কর্তৃক শ্রীমণ্ডলকে পদচ্যুত করার স্থপারিশ, তদন্ত কমিটি গঠন, অভিযোগ সত্য প্রমাণিত, পরিচালক সমিতির সহ সভাপতি ডাঃ হুশীল-হুমার লস্কর মহাশয়ের অহরোধে মান-

বিক কারণে তখনকার মত পদচ্যুত না করার সিদ্ধান্ত। অথচ এই ডাঃ হুশীলহুমার লস্কর মহাশয়কেই আপনার সংবাদদাতা বাবুশ্রীর ভবশ ব্যানার্জী হিসেবে চিত্রিত কোরেছেন। শ্রীআবুবকর মণ্ডল সেই চরিত্রের লোক যিনি কথায় কথায় পরিচালক সমিতির সদস্যদের চামড়া দিয়ে জুতো তৈরী কোরে ঐ জুতো পায়ে দেবার হুমকি দিয়েছেন। কারণ পরিচালক সমিতির সদস্যগণ তার কথামত চলা যুক্তিযুক্ত মনে করেননি এবং প্র, শি, নিয়োগ করেননি। শ্রীমণ্ডল বিভাগের পরিচালক সমিতির সভাপতির নিকট স্বীয় বহু অস্বাস্থ্য কর্মের জন্ত দঃ প্রকাশ করেও আবার পূর্ব অস্বাস্থ্যেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন একাধিকবার। এই কি আদর্শ শিক্ষকের নমুনা?

সম্পাদক, রায়নগর হাইস্কুল [পুরো নাম দেওয়া হয়নি। সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর সম্প্রদা—সম্পাদক]

দেখাই হয়নি

১লা এপ্রিলের দর্পণে “বরখাস্ত শিক্ষকের বক্তব্য” শীর্ষক বিবৃতিতে ত্রুটিপূর্ণ সর্দার বা বলেছেন আমি তার প্রতিবাদ করছি। একজন শিক্ষক বরখাস্ত হওয়ার আমি ব্যক্তিগতভাবে অস্বপ্নী, বিশেষ করে যিনি একদা আমার সহকর্মী ও বন্ধু ছিলেন, যদিও সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্ত। কিন্তু তার চাকরী বাবার পর তার সঙ্গে আজ পর্যন্ত আমার দেখাই হয়নি। অথচ কণিবাবু কি করে বললেন আমি ১৩/৭/৭ তারিখে তার সঙ্গে দেখা করেছি এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদকের অহরোধে-তাকে একটি পদত্যাগ পত্র লিখে দেবার জন্ত পীড়া-পীড়ি করেছি। এই ঘটনা সত্য নয়। আমি সবসময়ই শিক্ষকদের এবং বিভাগের স্বার্থের প্রতি সহায়ত্বশীল এবং বেশ কয়েকবছর ধরে সুনামের সঙ্গে শিক্ষক প্রতিিনিধিরূপে কাজ করছি। আমার মনে হয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার সম্পর্কে তিক্ততা তৃপ্তি করা এবং কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাকে এইভাবে নিজের স্বপক্ষে আনার উদ্দেশ্য নিয়েই ত্রুটিপূর্ণ এই ঘটনাটি সাজিয়েছেন।

জ্যোতির্ময় মন্ত রায়নগর হাইস্কুল

বন্দী মুক্তির দাবী

মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর অনেক-গুলো দিম কেটে গেল। বিশেষ করে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া সম্পর্কে টালবাহানা এবং বিভিন্ন বিবৃতি দেখে মনে হচ্ছে, নির্বাচনের আগে বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল কেতাবী ঘোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব দেখে আমরা কি অস্বস্তি করতে পারি

যে, বিশ্বব্যাংকের চেয়ারম্যান রবার্ট ম্যাকনামারা প্রথমবার আমাদের দেশে আসার পর বখনটেরীলাইজেশন (ব্যাংকভাবে না হলেও) শুরু হোল, এই মোরারজী দেশাই তখনও মন্ত্রিসভার সদস্য থাকা সত্ত্বেও কোন রকম প্রতিবাদের পরিবর্তে উক্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন, অথবা এই দেশাই সাহেব অতীতে অর্ধদণ্ডের থাকাকালীন তাঁর রচিত স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিলের শিকার হয়ে শত শত ক্ষুদ্র স্বর্ণকারকে আত্মঘাতী হয়ে হারিয়ে হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হয়েছিল, সেই দেশাই সাহেব-নিজেকে আজও পান্টানি? কিংবা ২০ মাসের বৈরশাসনে যে জগজীবন এবং বহুগণা ছিলেন ক্ষণান্তের রাজত্বের এক একজন রু-প্রিট রচিতা তাঁরা আবার অকীশাহীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চান এমন অস্বস্তি করাও কি ভুল হবে?

বাইহোক দাবী হোল, বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হোক, অস্বাস্থ্য ভারত-বর্ষের জনগণ নতুন সরকারের বিরুদ্ধে ম্যাগেট দেবেন এবং ঐ লোহুপাট চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে যেজনশ্রোত তা আসবে শুধু গম্বা বা ভাগীরথী কিংবা বিপাশা অথবা তিত্তা থেকে নয়। তা আসবে ভজা থেকে যেকং থেকে, তা আসবে ইয়াং-সি থেকে।

তপন বসু

নির্বাচনী জল্পনা

৮ই এপ্রিল সংখ্যার দর্পণে “রাষ্ট্রে নির্বাচনী জল্পনা” শীর্ষক লেখায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসবিরোধী এক্য-প্রস্তুতি সংবাদে আনন্দিত। বামপন্থী রাজনীতির সমর্থকরা কংগ্রেস বিরোধী সর্বব্যাপক বামপন্থী ফ্রন্ট এবং পশ্চিমবঙ্গে তো রুটেই, সর্বভারতীয় ভিত্তিতেও বিকল্প হিসাবে বামপন্থীদের অভ্যুদয় দেখতে চান। কিন্তু তাঁরা এ-ও আশা করবেন যে পূর্বতন যুক্ত-ফ্রন্টগুলোর পরিচালনায় যে গলদের জন্ত বিবাদ-বিসংবাদ এবং পরিণামে ভাঙন দেখা দিয়েছিল তা রোধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা ভবিষ্যতে নেয়া হবে। তবে আপনাদের রিপোর্টিং-এ একটি ভুল চোখে পড়ল যেখানে বলা হয়েছে যে এস ইউ সি লোকসভা নির্বাচনে একা লড়লেও খুব সম্ভব বিধানসভা নির্বাচনে সি পি এম গোষ্ঠীর সঙ্গে জোট বাঁধবে। যতদূর মনে আছে, লোকসভা নির্বাচনের আগে এস ইউ সি যুক্ত উদ্যোগের প্রস্তাব সি পি এম এবং জনতা উভয়পক্ষের কাছেই রেখেছিলেন, কিন্তু কোনো কারণে তাঁরা উভয়ের কাছেই প্রত্যাখ্যাত হন। এ-সম্পর্কে এস ইউ সি-র বিরুদ্ধে দৈনিক পত্রিকাগুলোতে সে সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

সমীর সেন

ক্যাসিবাদ প্রসঙ্গে

আপনার কাগজে “ক্যাসিবাদী অভ্যুত্থান ও যুব কংগ্রেস” পড়ে কতকগুলি প্রশ্ন দেখা নিয়েছে। ক্যাসিবাদ সম্পর্কে মোটামুটি এখন পর্যন্ত যে ব্যাখ্যাকে সঠিক বলে নেওয়া হয়ে থাকে তা হচ্ছে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসের বক্তব্য। আমার মনে হয় সেই মূল বক্তব্যকে সামনে রেখে এই বিশ্লেষণে গেলে অসঙ্গতিপূর্ণ পাঠকগোষ্ঠীর পক্ষে সুবিধা হবে। সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের উপর আরও একটু ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য রাখা এবং সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ আর সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে প্রমিকশ্রেণী, শ্রেণীসংগ্রাম ও সামাজিক আন্দোলনে আত্মকে কার ভূমিকা সর্বাঙ্গিক নেতিবাচক উদ্ভূতি ও উদাহরণ সহ রাখলে দর্পণের পাঠকগোষ্ঠী উপকৃত হবে। মনে হয় ঐ প্রবন্ধে শ্রেণী চেতনা, প্রমিক ও প্রমজীবী জনগণের আদর্শের লড়াইয়ে দেউলিয়াপণী যে ক্যাসিবাদের জন্মের একটি কারণ এই পর্যায়ে জোর দেওয়া হয় নি।

বিমল চ্যাটার্জী

ডাকাতের হাতে অস্ত্র দিচ্ছে থানা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হুগলী জেলার চণ্ডীতলা থানা এলাকায় চুরি ডাকাতির হিড়িক লেগেই আছে। সম্প্রতি দুমাসে এই থানার কুড়ি জায়গায় চুরি আর পাঁচ জায়গায় ডাকাতি হয়েছে। মশাট এক নম্বর ব্লকে ইন্সফ আলীর বাড়ী ডাকাতি হলো কদিন আগে। তার পরে পাশাপাশি গোপালপুরে, তার পরের দিন মণ্ডলিকার আগে একটি জায়গায়। দুজন গৃহস্থ ডাকাতদের হাতে সাংঘাতিকভাবে অধম হয়েছেন। কুমীরমোড়া এলাকায় চণ্ডীতলা থানা ব্লকের নবাবপুর অঞ্চলে নবাবপুর ভান্ডার, গুড়াপাড়া গ্রামে প্রায় প্রতিদিন রাতে ডাকাতি চুরি ছিনতাই হচ্ছে।

চণ্ডীতলা থানার জমা পড়েছে এমন সব ছুরি টাঙ্গী বস্ত্র ইত্যাদি রাতের আধারে একদল ডাকাতের হাতে তুলে দিচ্ছে থানার বাবু।

পেটোয়া চোর ডাকাতদের ডাকাতির মাল বথরা পাচ্ছেন বলেও অভিযোগ। তাছাড়া স্বরণ থাকতে পারে লুটের মালের বথরা বন্টন নিয়ে দুই কনস্টেবলের মধ্যে গুলি চলেছিল। একজনের মৃত্যুও হয় গতবছর। মশাট বাজারে চণ্ডীতলা থানার কিছু কনস্টেবল মাঝে মাঝে থাকেন। তাঁরা পঁচিশ গজ দূরে ডাকাতির খবর পেয়েও গ্রামরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে ঘটনাস্থলে যেতে অস্বীকার করেছেন। তাদের বক্তব্য ডিউটি অস্বস্ত। তাহলে ডিউটি কোথায়?

চণ্ডীতলা থানার চুরি ডাকাতির রেকর্ড বেড়েই চলেছে। ইতিমধ্যে থানার এক কর্মীকে লালবাজারের লোক গত বছরে চুরির দায়ে গ্রেপ্তারও করেছিল।

সুভাষচন্দ্র বসু ও ভারতের জাতীয় সংগ্রাম

পঙ্কজ চৌধুরী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ভারতের অতীতপূর্ব গণজাগরণের মধ্যে আই, সি, এস-এর চাকরী ছেড়ে সুভাষচন্দ্র বসু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আরেক গণজাগরণের সূচনায় তিনি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হলেন। ১৯২৭ সালে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, “স্বাধীন সংগ্রামের মূলে রহিয়াছে মতবাদের সংঘর্ষ—সত্য ও মিথ্যা ধারণার সংঘর্ষ।” (ভরুণের স্বপ্ন) কিন্তু আদর্শগত সংঘাত সর্বদাই যে সত্যের সঙ্গে মিথ্যার অর্থাৎ সঠিকের সঙ্গে বেঠিকের হয়ে থাকে এমন নয়, বরং অনেক সময়ই মিথ্যার সঙ্গে মিথ্যার বা বেঠিকের সঙ্গে বেঠিকের ঘন সংঘাতই দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আদর্শগত বিরোধ শুরু হয়েছিল চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর থেকেই। চিত্তরঞ্জন দাসের মতই সুভাষচন্দ্র ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯২৯ সালে তিনি বলেছিলেন, “যে সর্বাঙ্গীণ বিকাশে দেশবন্ধু এত বিশ্বাসী ছিলেন তাহাই এ যুগের সাধনা। এই সাধনা সার্থক করিতে হইলে স্বাধীনতার অধঃসুপ্ত দর্শন করা চাই। আদর্শের পরিপূর্ণ উপলব্ধি না হইলে মায়াবী কর্মক্ষেত্রে কখনও অগ্রযুক্ত হইতে পারে না।” (ভরুণের স্বপ্ন) ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করার ফলেই সুভাষচন্দ্র ছিলেন আপোষহীন স্বাধীনতা সংগ্রামী। আর সেই কারণেই ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হবার পর আপোষপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছিল।

কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করার পর কংগ্রেস হাইকমান্ড সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জহরলাল নেহরু তার ‘Discovery of India’ বইতে লিখেছেন যে, কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র আপান, জার্মানি এবং ইতালি বিরোধী কোন প্রস্তাব কংগ্রেসে অমুদায়ন করতেন না। “He did not approve of any step being taken by the Congress which was anti Japanese anti German and anti Italian.” ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আপান, জার্মানি এবং ইতালি কোন দিনই ভারতবাসীর শত্রু ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৭২২-২৭) জার্মান

অষ্ট্রো কোম্পানীর বণিকরা ভারতে এলেও তারা পাঁচ বছরের বেশী সময় ভারতে অবস্থান করতে পারে নি। ব্রিটিশ, ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার ইত্যাদি বণিকরা একমোট হয়ে জার্মান বণিকদের ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল। ইতালিয় কিম্বা জাপানী বণিকরা কোনদিন ভারতে এসেছিল বলে আমার কোন তথ্য জানা নেই। অথচ কংগ্রেস নেতৃত্ব দ্বিতীয় যুদ্ধের সূচনায় পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ না করে আপান, জার্মানি এবং ইতালি বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি কংগ্রেস নেতৃত্বের এই আপোষ-মুখীনতা সুভাষচন্দ্র কোনদিন মেনে নিতে পারেন নি। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিগুলির ঐক্যের উপর জোর দিয়ে বলেছিলেন, “দেশের প্রগতিশীল সমস্ত শক্তিকে ঘনিষ্ঠ সহযোগীতা এবং পারস্পরিক একতা বজায় রেখে কাজ করতে হবে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সব সংগঠনের প্রয়াসকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর আঘাত হানার লক্ষ্যে চালিত করতে হবে।”

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে ভারতকে স্বাধীন করার ভাবনায় অস্থির সুভাষ ১৯৪০ সালের ১১ই মে কয়েয়ার্ড ব্লকের সম্পাদকীয়তে লিখলেন, “কি করে আমরা আমাদের দেশকে রাজনৈতিক এই অচলাবস্থা থেকে উদ্ধার করব? এই মুহূর্তে এটাই প্রধান সমস্যা। এক একটা দিন চলে যাচ্ছে অসহায় আক্রোশে নিজেদের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে।” কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব সেদিন বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তীব্র করার বিরোধী ছিলেন। জহরলাল নেহরু তার কৈফিয়ৎ হিসাবে বলেছেন, “কেননা গান্ধীজির পুঁজাতন শিক্ষা আমরা সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারি না, প্রতিপক্ষের বিপদের সুযোগ লইয়া তাহাদের বিব্রত করা আমাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে না।” (আত্মরচিত) অথচ কংগ্রেস নেতৃত্ব সেদিন সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর কয়েয়ার্ড ব্লকের কাজকর্মকে নাৎসীদের সঙ্গে তুলনা করে ভারতের স্বাধীনতা প্রিয় জনগণকে বিভ্রত করতে একটুও বিধা বোধ করেন নি। বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে ব্রিটিশ সরকার ফ্যাসিবাদ এবং নাৎসীবাদ বিরোধী প্রচারে উৎসাহ দিতে শুরু করল। জাতীয় কংগ্রেস এবং ভারতের

কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রচার জোরদার করে তুললো। অথচ পদানত জাতির স্বার্থ আর পদানত-কারী জাতির স্বার্থ কখনই এক হতে পারে না। সুভাষচন্দ্র ছিলেন ব্রিটিশ জাতির সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের ঘোরতর বিরোধী। সেই কারণেই তিনি প্রয়োজনে ব্রিটিশ বিরোধী যে কোন বিদেশী শক্তির সাহায্য নিয়েও ভারত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করার কথা ভাবতেন। দেশপ্রেম বলতে তো যে কোন মূল্যে দেশের স্বার্থ রক্ষা করাই বোঝায়। পরাধীন ভারত থেকে বিদেশী শাসন এবং শোষণ ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে দেশকে স্বাধীন এবং মুক্ত করাই সেদিন ভারতের প্রধান স্বার্থ ছিল। গান্ধীজি ভারতের স্বার্থকে প্রধান গুরুত্ব দিতেন না। তিনি বলতেন “My idea of nationalism, is that my country may become free, that if need be the whole of the country may die so that the human race may live. There is no room for race hatred here. Let that be our nationalism.” (Discovery of India বইতে জহরলাল নেহরুর ব্যবহৃত উদ্ধৃতি)

একটা শ্রেণীর বাঁচার ইচ্ছা, নিজের পায়ে দাঁড়াবার ইচ্ছা এবং বড় হয়ে ওঠার ইচ্ছা যখন কোন দেশের সামগ্রিক স্বার্থের প্রতিনিবিশ্ব করে কেবল তখনই সেই দেশে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ বা জাতিশাস্ত্রের বিকাশ ঘটতে পারে। কিন্তু শ্রেণীগত ভাবে গান্ধীজির অবস্থানটি সুভাষচন্দ্রের তুলনায় ভারতের সামগ্রিক স্বার্থের অনেক বেশী প্রতিকূল ছিল। কোন

স্বার্থেই দেশের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে যেমন জাতীয়তাবাদী হওয়া যায় না। তেমনি মানবতাবাদীও হওয়া যায় না। ভিন্ন ভিন্ন এক একটি দেশের মানব গোষ্ঠিকে নিয়েই বিশ্বমানব জাতি গঠিত। তাই একটি দেশের মৃত্যু যেমন সমগ্র মানব জাতির অঙ্গহানি ঘটায় তেমনি এক জাতি বর্জ্য আরেক জাতিকে পদানত করা অথবা শোষণ করাও সমগ্র মানব জাতির পক্ষেই অকল্যাণকর। প্রয়োজনে ভারতবাসীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে পরাধীন ভারতের ব্যবসায়ী শ্রেণীর দার্শনিক গান্ধীজির বিশ্ব মানব জাতিকে বাঁচাবার চিন্তা জাতীয়তাবাদী নয়, মানবতাবাদীও নয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ জাতি বহুদিন ধরে ভারতবাসীকে শাসন এবং শোষণের নামে নিপীড়ন এবং লুণ্ঠন করে আসছিল। তাই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ জাতির প্রতি তীব্র ঘৃণা ছাড়া সেদিন কোন ভারতবাসীর পক্ষেই প্রকৃত দেশপ্রেমিক হওয়া সম্ভব ছিল না। গান্ধীজি তাঁর শ্রেণী দর্শন অনুসারেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ জাতির প্রতিও ঘৃণার বিরোধী ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ জাতির প্রতি তীব্র ঘৃণা ছিল বলেই সেদিনের মতো আজও সুভাষচন্দ্র ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক নেতা হয়ে আছেন। জহরলাল নেহরু কিন্তু সুভাষচন্দ্রের থেকেও গান্ধীজিকে বড় জাতীয়তাবাদী নেতা বলে মনে করতেন। তিনি লিখেছেন, “Gandhiji was an intense nationalist.” (Discovery of India)

গোপনে ভারত ত্যাগ করার পূর্বে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং ভারতের ভবিষ্যত সম্পর্কে খুব বেশী

শংকিত হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৪০ সালে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হবার পর তিনি জেল থেকে তাঁর দাদা শরৎচন্দ্র বসুকে লিখেছিলেন, “কংগ্রেস রাজনীতি সম্পর্কে যত ভাবছি ততই আমি হুনিশিত হচ্ছি, ভবিষ্যতে কংগ্রেস হাইকমান্ডের সাথে লড়াই করতে আমাদের আরও সময় ও শক্তি দিতে হবে। স্বরাজ পাবার পর এরকম প্রতিহিংসাপরায়ণ, নীচ, বিবেক বঞ্চিত লোকদের হাতে ক্ষমতা এলে দেশের হাল কি হবে? আমরা এখন থেকে এদের সঙ্গে লড়াই না করলে এদের ক্ষমতার আসা ঠেকাতে পারব না। আরও একটা কারণে এদের সাথে এখনই আমাদের লড়াই করা উচিত। জাতীয় পুনর্গঠনের কোন ধারণাই এদের নেই। স্বাধীন ভারতকে যদি গান্ধীবাদী অহিংস নীতিতে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয় তাহলে গান্ধীবাদ স্বাধীন ভারতকে দায় মজাবে। তাহলে যে সমস্ত শক্তি ঐং পেতে রয়েছে তাদের কাছে ভারত সব সময়ের জন্য শিকার হয়ে থাকবে।” (কোন পথে, ২য় খণ্ড) বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসন ভারতের বাইরে ব্রিটিশ বিরোধী শক্তির সাহায্যে “ভারতের জাতীয় ফোর্স” (INA) গঠন করতে ব্যস্ত তখন গান্ধীজি ভারতের জনগণের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে পিছন থেকে টেনে ধরার জন্যই অহিংস “ভারত ছাড়ো” আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের সংগ্রামী জনগণ ১৯৪২ সালের সেই দিনগুলিতে গান্ধীজির নিজস্ব আন্দোলনকে ব্যাক করেই যেন দেশীয় গণঅভ্যুত্থানের সূচনা করেছিল। কিন্তু হায়! সুভাষচন্দ্র তখন দেশের মধ্যে ছিলেন না। তিনি তখন দেশের বাইরে থেকে বিদেশী শক্তির সাহায্যে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা কার্য- (শেষাংশ ভর্তি পৃষ্ঠায়)

পুর সার্ভিস কমিশনের অবিচার ও অনাচার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

একজন দালালকে এনে বসিয়েছেন। তিনি সে পদে বসেন নি, যাত্রা একদিনের জন্য ডেপুটি অ্যাসেসর হিসেবে কাছে বোগ দিয়ে আরো বেশী মাইনের চীফ ড্যানুয়ারের পদে অফিসিয়েট করছেন। অস্থায়ী ভাবে যদি বর্তমান কর্তৃপক্ষকে রাখা হোত তাহলেও হত। পুরসভার কদাপি বা হয় নি, কমিশনার মন্ত্রীর ইজিতে তাই করলেন—অস্থায়ী নিযুক্তি পর্যন্ত সার্ভিস কমিশনে আনালেন। এরকম বেনজির ব্যাপারের হেতু সার্ভিস কমিশনের মনে বসন একবারও উদয় হয় নি তখন এদের কাছে কোন মূল্য স্ববিচার আশা করবে? লোকের অভিজ্ঞতাগ্রস্ত ধারণা এই যে, প্রার্থীর নামের তালিকা মন্ত্রীর বাড়ী থেকে আসে, ইণ্টারভিউ, দরখাস্ত এ সব হল লোক-দেখান। নতুবা অ্যাসেসরের পদে বায়ংবার অফিসিয়েট করা রমেন চ্যাটার্জিকে জব্ব করার জন্য বাইরের বিভাগ থেকে তিনধাপ

নিচের লাইসেন্স ইন্সপেক্টর স্মীর গাজুলিকে আনা হত না। ভদ্রলোকের বোগ্যভারূপ শোনা যায় তিনি মন্ত্রী স্বরূপ মুখার্জির প্রিয়পাত্র এবং বাগবাজারের কোন রিপোর্টার নাকি তথ্য ভ্রাতা। এসবই যদি কোন প্রার্থীর গুণ বলে বিবেচিত হয় তাহলে বিভাগীয় প্রার্থীরা এম এম সির কাছে কি স্ববিচার আশা করতে পারে?

ভদ্রলোক শূচ্য কর্ম ফেরত পাঠিয়ে আনিয়েছেন তিনি তার দাবি ছাড়ছেন না। কমিশন যা করার তা তার ফাইল এবং সার্ভিস বুক দেখেই করতে পারেন। কমিশন আবার তাকে কর্ম পাঠিয়ে পুরণ করে দিতে অস্বস্তি করলে ভদ্রলোক একই কথা বললেন যে, ডেপুটি অ্যাসেসর পদে স্মীর গাজুলিকে অসঙ্গত ভাবে বসানোতে অ্যাসেসরমেন্ট বিভাগের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তারপরে কায়-শনারের স্ববিচারে তার আর কোন আশা নেই।

একজন দালালকে এনে বসিয়েছেন। তিনি সে পদে বসেন নি, যাত্রা একদিনের জন্য ডেপুটি অ্যাসেসর হিসেবে কাছে বোগ দিয়ে আরো বেশী মাইনের চীফ ড্যানুয়ারের পদে অফিসিয়েট করছেন। অস্থায়ী ভাবে যদি বর্তমান কর্তৃপক্ষকে রাখা হোত তাহলেও হত। পুরসভার কদাপি বা হয় নি, কমিশনার মন্ত্রীর ইজিতে তাই করলেন—অস্থায়ী নিযুক্তি পর্যন্ত সার্ভিস কমিশনে আনালেন। এরকম বেনজির ব্যাপারের হেতু সার্ভিস কমিশনের মনে বসন একবারও উদয় হয় নি তখন এদের কাছে কোন মূল্য স্ববিচার আশা করবে? লোকের অভিজ্ঞতাগ্রস্ত ধারণা এই যে, প্রার্থীর নামের তালিকা মন্ত্রীর বাড়ী থেকে আসে, ইণ্টারভিউ, দরখাস্ত এ সব হল লোক-দেখান। নতুবা অ্যাসেসরের পদে বায়ংবার অফিসিয়েট করা রমেন চ্যাটার্জিকে জব্ব করার জন্য বাইরের বিভাগ থেকে তিনধাপ

একটি বিড়লা কারখানা আড়াই বছর বন্ধ : সরকার গ্রহণ করুন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হাওয়ায় অবস্থিত বিড়লাদের সরকারের অর্ডিন্যান্স কারখানা। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রাণ্ট নামক কারখানাটি ১৯৭৪ সালের ১৪ই ডিসেম্বর থেকে লক আউট হয়ে আছে। দীর্ঘ আড়াই বছর অতিক্রান্ত হবার পরও মালিকরা কিংবা রাজ্য সরকার কেউই কারখানা খোলার ব্যাপারে আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে না। এই সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে ২৪ আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও সরকার এই কারখানার আড়াইশো শ্রমিক কর্মচারীর কুটি কুজির প্রস্নে কর্পণাত করেন নি। কেন্দ্রে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার ফলে তারা আশাব্যস্ত। তারা চাইছেন এই কারখানা সরকার অধিগ্রহণ করে শ্রমিক কর্মচারীদের বাঁচার পথ সুনিশ্চিত করুন। যদিও এই সংস্থাটি বিড়লাদের মালিকাবাদী কিন্তু এর শতকরা ৯৫ ভাগ পুঁজি সরকারের। তাছাড়া এই কারখানায় উৎপাদিত যেসবের সবচেয়ে বড় ক্রেতা কেন্দ্রীয়

বিক্রীর দায়িত্বও সিতে রাজি।

শোনা যাচ্ছে, আই আর সি আই বিড়লাদের চাহিদা অস্থায়ী ঋণ মঞ্জুরেও সম্মত হয়েছে। এরপর হরত ব্যক্তিগত মালিকানার সরকারী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াবে শতকরা ৭৫ ভাগ। তাই এখানকার শ্রমিক কর্মচারীদের একান্ত অস্থিরতা, নতুন কেন্দ্রীয় সরকার এই সংস্থার গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়ে এই কারখানার পরিচালনা ভার সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনুন।

সুভাষচন্দ্র বসু

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

করী করতে সচেষ্ট। এ কারণেই তিনি "নেতাজি" নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদ এবং সর্বহারা জাতীয় বিপ্লবের যুগে পরাধীন আধা-সামন্ত-তান্ত্রিক ভারতে জাতীয় স্বাধীনতা এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে সংগ্রামের সর্ববৃহৎ যে কৃষকদের সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রাম যে সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের অস্থির বিরোধী একটি জাতীয় মুক্তকণ্ঠের নেতৃত্বই কেবল

পরিচালনা করা সম্ভব—এ সত্য সেদিন বলশেভিকবাদের যুগোপেক্ষী ভারতের সমাজতন্ত্রীরা আবিষ্কার করতে পারেন নি। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে এ সত্য আবিষ্কার করা সম্ভব ছিল না। কারণ তিনি মার্কসবাদী ছিলেন না। তথাপি তিনি মনে করতেন, "ভারত আজ যদি কায়মনোবাক্যে Socialism গ্রহণ করিতে সংকল্প লবে, তাহা হইলেই ভারত বিদেশী মনোভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে সে আশংকা আমি করি না। ইতিহাসের দ্বারা এবং বর্তমানের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিলে আমাদের স্বত্বিকার্ষ কখনও সার্থক বা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না।" (তরুণের বঙ্গ) আমদানী করা ভারতের সমাজতন্ত্রী-দের মতাদর্শের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আদর্শের পার্থক্য ছিল এখানেই। তথাপি তিনি ভারতের জাতীয় সংগ্রাম এবং শ্রেণী সংগ্রামের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে সঠিক বিপ্লবী নীতি গ্রহণ করতে পারেন নি। চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর তিনি যখন স্বরাজ্যপন্থীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তার পূর্বেই ট্যালিন বলশেভিকবাদের ভিত্তিতে লেনিনবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অথচ সাম্রাজ্যবাদের যুগে আধা-গণনি-বেশিক রাশিয়ার জাতীয় সংগ্রাম এবং শ্রেণী সংগ্রামের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ না করেই বলশেভিকবাদ গড়ে উঠেছিল। মার্কসবাদ এবং বলশেভিকবাদ নিয়ে বিভ্রান্ত হবার কয়েকসুভাষচন্দ্র গান্ধীবাদ বিরোধী কোন কার্যকরী বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ গ্রহণ করতে পারেননি। আপানী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চীনের প্রতিরোধ যুদ্ধে চীনকে সাহায্য করার জন্ত তাঃ কোটনিশের নেতৃত্বে ভারত যে মেডিক্যাল মিশন পাঠিয়েছিল তার শিছনে সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগ থাকলেও তিনি চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং দালাল পুঁজিবাদ বিরোধী চীন বিপ্লবের রণনীতি-রণকৌশল সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানতেন না।

সুভাষচন্দ্র মতাদর্শগত সংগ্রাম ছাড়াই কংগ্রেস নেতৃত্বকে 'বাম' এবং 'দক্ষিণ' দুটি ভাগে ভাগ করে নিজে বামপন্থী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। বামপন্থী অবস্থান মানে সঠিক অবস্থান নয়। মতাদর্শগতভাবে সঠিক অবস্থান গ্রহণ করেই কেবল কে বাম এবং কে দক্ষিণ তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়। কিন্তু মতাদর্শগত সংগ্রাম না করে কারো পক্ষেই রাজনৈতিকভাবে সঠিক অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব নয়। পার্শ্বদিককে দক্ষিণপন্থী বলে গণ্য করা সত্ত্বেও একই কারণে সুভাষচন্দ্র গান্ধিজির 'ইমেজ' তৈরীতে অনেক সময় সাহায্য করেছেন। আসলে কোন মাহুষের শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী

গুণগত পরিবর্তন হয় না। তারজন্ত সচেতন প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সুভাষচন্দ্র আই, সি, এস-এর চাকরী ছেড়ে সর্বকণের জন্ত দেশসেবার কাজে ততী হলেন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত (পেটিবর্জোয়া) শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর অস্ত্রই তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরই বেশী গুরুত্ব দিতেন। কলকাতায় যুব সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই "যে সকল দেশে বিশেষত আমাদের এই অভাগী দেশে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ই দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ। তাহারা যে শুধু মুক্তি পথের অগ্রদূত তাহা নয়, গণআন্দোলনেরও অগ্রদূত। যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণের প্রকৃত আগরণ না আসিতেছে ততদিন পর্যন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই গণআন্দোলনের অগ্রদূত হইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত, যাবতীয় গঠনমূলক কাজ করিতে হইবে।" (তরুণের বঙ্গ)

ভারতের মতো পশ্চাদপদ দেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিপ্লবী কর্মীদের রাজনৈতিক ভূমিকার গুরুত্ব অপরিণীম। কিন্তু ভারতের সংখ্যা-গরিষ্ঠ নিরক্ষর শ্রমিক কৃষক জনগণের রাজনৈতিক সক্রিয়তা ছাড়া ভারতের অর্থনীতি এবং রাজনীতির মৌলিক কোম পরিবর্তন হতে পারে না। এ জন্ত ভারতের সমাজ বিকাশের নিয়ম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বিপ্লবী কর্মীদের সহরও গ্রামের সর্বহারা বিশেষ করে গ্রামের সর্বহারা এবং আধা-সর্বহারা-দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের রাজ-নৈতিকভাবে সক্রিয় করে তোলার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। কেবলমাত্র এভাবেই বিপ্লবী কর্মীরা ভারতীয় সমাজে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করতে পারেন। সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্তর্যঙ্গীণ এই সমাজতান্ত্রিক সমাধান করার চেষ্টা না করেই বিদেশের সাহায্যে দেশের বাইরে থেকে মুক্ত করে দেশকে স্বাধীন করার ভুল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

৥ চাঁদার হার ৥

বার্ষিক ২২ টাকা

ষাণ্মাসিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠাবার ঠিকানা :

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, মট লেন। কলিকাতা ১৩

মাত্র কয়েকদিনের ভাড়া দিয়ে সারা মাসের টিকিট গেতে পারেন

SUN	7	14	21	28	
MON	1	8	15	22	29
TUE	2	9	16	23	30
WED	3	10	17	24	31
THU	4	11	18	25	
FRI	5	12	19	26	
SAT	6	13	20	27	

বিনা টিকিটে
একদিন চড়ার খেসারৎ
কয়েক মাসের ভাড়া

■ সুবর্ণ মাসিক টিকিট আপনি কত সুলাভে পান—জানেন কি? কোন কোন ক্ষেত্রে ট্রেডিং একপিঠের টিকিটের ভাড়া মাত্র।

■ আপনি একথা নিশ্চয়ই জানেন যে বিনা টিকিটে ধরা পড়লে ভাড়ার উপরে ন্যূনতম জরিমানার পরিমাণ হল ১০ টাকা। এছাড়াও তিন মাসের জেল ও ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

কাজেই টিকিট কেটে
জুনে চড়াই ভালো। নয় কি?

পূর্ব রেলওয়ে



TCR/ER 41676

‘শপথ’ প্রযোজিত দুটি একাক

(দর্পণের নাট্য সমালোচক)

হাওড়ার নোতুন দল ‘শপথ’ তাদের দ্বিতীয় নাট্যোৎসব দিলেন সওয়াল জবাব ও দুঃখপ নামে দুটি একাক মঞ্চস্থান মাঝে। ‘শপথ’ সংগ্রামী স্বভাব নিয়ে কলকাতার মধ্যে নিবেদনের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। শপথ নামকরণের সার্থকতা হয়নো সেখানেই।

একালের ছেলে শ্যামল সেকালের মানুষকে প্রাণে জীবিত করেছে। সেকালের মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে ধনি মঞ্চে উপস্থিত। পূর্বপুরুষের কাছে অভিযোগ উঠছে তাঁদের অকৃত-কার্যতার জন্য। পাঁচটা তাঁরাও প্রশ্ন করছেন, যে কাজ করতে আমরা অক্ষম ছিলাম সে কাজ সম্পূর্ণ করতে তোমরা কেন বার বার হেরে যাচ্ছ? এ প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারে না এ কালের ছেলে শ্যামল। তবে পরিচালক, নাট্যকার ও শ্যামলের চরিত্রাভিনেতা শ্যামল ভট্টাচার্য একটা সহজ সমাধানের রাস্তায় আমাদের সকলকে নিয়ে গেছেন। সেটা মিছিলের রাস্তা। বাদল সরকারের ‘মিছিল’ও যেমন ধোঁয়াটে ছিল, শ্যামল ভট্টাচার্যের এই ‘মিছিলের পথও আমাদের কাছে খুব

স্পষ্ট নয়, স্বভাবতঃ তাঁর নিজের কাছে নয়।

গতির অভাবে নাকি ক্লাস্তি-কর লাগে। তবে শপথের প্রথম নাটক অল্পের থেকে এটি এক ধাপ এগিয়েছে। এখানেই পরিচালকের কৃতিত্ব। ধনি চরিত্রে খোকন মুখার্জীর অভিনয় সংযত তবে সংলাপ উচ্চারণের ব্যাপারে অল্প কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, নতুবা এধরণের অভিনয়ের মধ্যে বিশেষ প্রাণশক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। অজ্ঞাত চরিত্রে শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায় পরিতোষ ভট্টাচার্য বলাই মল, অসীম ভট্টাচার্য, স্বকুমার কর আশ্রাণ চেষ্টা করেছেন তাঁদের চরিত্র ফুরণের জন্য।

দ্বিতীয় একাক ‘দুঃখপ’ কিছুটা রূপকধর্মী। একজন সাধারণ মানুষ দেখছে যে সে রাজ্যের রাজা হল। এবং রাজ্যাভিষেক পর্ব শেষ হবার পর সে যথেষ্টাচার ভক্ত করল এবং এ ব্যাপারে তার পারিষদবর্গ মদত দোপাতে লাগল। পরবর্তী কালে রাজার পতন হল এবং অতীনেরও দুঃখপ দেখা শেষ হল। রাজা ও অতীনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন

শ্যামল ভট্টাচার্য। সহায়ক ও সাংবাদিকের ভূমিকায় বধ্যাক্ষে খোকন মুখার্জী ও কুমুদ ভট্টাচার্য অভিনয়ের চেষ্টা করেছেন। অজ্ঞাত ভূমিকায় বলাইচন্দ্র মল, স্বকুমার কর, অসীম ভট্টাচার্য ও শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মোটামুটি ছাপ রেখেছেন। আলোক সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন খোকন মুখার্জী, রূপসজ্জা ও বেশভূষার দায়িত্ব পালন করেন পি, সঙ্গি-বিয়েট্রিক্যাল।

পরিচালকের কাছে অল্পবোধ নিয়ে কিছুদিন অন্ততঃ অভিনয় না করে সামগ্রিক অভিনয় বাকি থিয়েটারের ভাষায় চিমণ্ডার্ক বলে তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে, নইলে প্রবোজন্য মান উন্নত করা যাবে না। তিনি যদি নিজের নাটকই মঞ্চস্থ করা ঠিক করে থাকেন তাহলে সংলাপের বাঁধন সম্পর্কে আরও একটু সচেতন হবেন এটা আমবা আশা করব। জল্পরী অবস্থাতেও ‘দুঃখপ’ অভিনয় করে তিনি সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এবং তিনি আশা করেন ‘দিন

বদলাবে’।



বাংলা ছবির অর্থহীন নাম

ভানুসিংহ

যে সব নাম নিয়ে বাংলা ছবি মুক্তি পায়, সেগুলির বেশ কিছুই না আছে ছবির বিষয়ের সংগে কোন সম্পর্ক, না আছে কোন অর্থ অথবা কোন তাৎপর্য। ভারতে বীতিমত অবাধ লাগে, ছবির এমন সব নাম হয় কি করে। নামের অস্বাভাবিকতা বা উদ্ভটতা নিয়ে কোন কথা বলছি না। যে-বিষয়বস্তু নিয়ে ছবিটি গড়ে উঠেছে বা যে-কাহিনীকে আশ্রয় করে ছবিটি নির্মিত হয়েছে, ছবিটির নামকরণ তো সেই কাহিনীর ভাব-দোতাক রূপেই দেখা দেবে।

বাংলা ছবির অর্থহীন নাম আগেও দেখা গেছে কম নয়। তবে অধুনা একটু বেশী রকম নজরে পড়ছে। ছবির নাম দেখে মনে হোল হাসির ছবি, কিন্তু ছবি দেখে সারাক্ষণ কোথাও হাসির উৎস খুঁজে পেলাম না। আবার কোন নাম হয়তো বিশেষ কোন বক্তব্যের ইংগিতবাহী, কিন্তু গোটা ছবিতে কোথাও সেই বক্তব্যের হৃদিশই পাওয়া গেল না। ‘নানা রঙের দিনগুলি’ ছবিতে তো কোন রঙই ফুটল না, তাহলে নামটা? ‘অমৃতের স্বাদ’ ছবিতে কোন অমৃতের সন্ধান পাওয়া যায় কি? স্বাদ পাওয়া তো দুইয়ের কথা। অবসর-প্রাপ্ত পিতাকে সাহায্য করার জন্য কন্যা দার্জিলিংয়ে এক শিক্ষয়িত্রীর চাকুরী নিল মিথ্যা পরিচয় দিয়ে। সেখানে অবিবাহিতাদের চাকুরী হয় না। তাই কন্যা নিরালো অবিবাহিতা হয়েও এক সাহিত্যিকের নাম স্বামী হিসেবে লিখিয়ে চলনার আশ্রয়ে চাকুরী পেল। সেই সাহিত্যিকের সংগে নিরালার সত্যিকারের মন দেয়া নেয়া ও বিবাহ পর্বে সমাপ্তির কথা দিয়েই ছবির পরিণতিও এসেছে। এবরনের কাহিনী বাংলা ছবির পর্দায় মোটেই নতুন নয়। এর মধ্যে না আছে কোন মহিমা, না কোন অভিনব। কাহিনীকার পরিচালক পরিমল ভট্টাচার্য শুধু চর্চিত চর্চণ করেছেন এবং তা অমৃত নয় অমৃষ্ট। ‘অরবিন্দ মুখার্জী পরিচালিত ‘অজস্র ধনবাদ’ ছবিটি দেখে ভাঙ্কব বনে যেতে হয়। অজস্র তো দুইয়ের কথা—একটা ধনবাদও যদি দিতে পারতাম তবে কিছুটা নিজেও ‘অতি পেতাম। ধনী পিতার কন্যা ছবির নায়িকা যার জীবনে পর পর দুই সংগীতজ্ঞ নায়কের আবির্ভাব। ধনী পিতা কিন্তু সংগীতের প্রতি বিতৃষ্ণ। প্রথম বিবোধ নায়ক

হয়েছেন বোধের ‘ববি’ খ্যাত শৈলেন্দ্র সিং যিনি নায়িকা অপর্ণা সেনকে মারপথেই ‘দাঙ্গা’ দিয়ে চলে যান। দ্বিতীয় নায়ক আসেন রঞ্জিত মল্লিক। এর সংগেই নায়িকার মিলন ঘটে শেষ পর্যন্ত। এর মধ্যে ধনবাদের ব্যাপারটা আসে কি করে তা তো সহজ বুঝিতে ধরা পড়ে না। কাহিনীকার গৌরী-প্রসন্ন মজুমদার মশাই গান লিখেই অভ্যস্ত, ছবির গল্প লিখতে গিয়ে নামের সংগে বিষয়ের মিল রাখতে পারেন নি কারণ গানের নাম তো তাঁকে দিতে হয় নি কখনো। আলোচ্য ছবিগুলির মধ্যে একটা মিল আছে কিন্তু—কি রূপে আর কি চরিত্রে সবগুলিই অপদার্থ।

নাট্য প্রদর্শনী

বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগের অনন্ত ব্যক্তিত্ব, নট-নাট্যকার ও রাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ‘অভিনয়’ পত্রিকা নিজস্ব দপ্তর প্রাঙ্গণে তিনদিন ব্যাপী এক অভিনয় নাট্য প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

এই প্রদর্শনীতে রাসিক থিয়েটারের টিকিট, অমরেন্দ্রনাথকে পেখা গিহিন-চন্দ্র, বিপিনচন্দ্র পাল, অমৃতলাল বসু, কীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞাভিনোদের চিঠি ও অজ্ঞাত দুঃখপা স্মৃতিচিহ্নের সঙ্গে ছিলো ৭৬টি তৎকালীন হাওবিল ও প্রোগ্রাম। ১৮৯২-তে রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার (এখন যেখানে বিডন ষ্ট্রিট ডাকঘর) অভিনীত ভীষ্মের শরশয্যা ও প্রভাস মিলনের হাওবিল থেকে শুরু করে ম্যাডান কোম্পানী পরিচালিত বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোং-এর ‘বধুবীর’ (পরিচালক ও মুখ্য অভিনেতা শিশিরকুমার)-এর প্রচারপত্র এঁরা অসীম নিষ্ঠার সংগ্রহ করে দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। আগ্রহী দর্শকের কাছে বিজ্ঞাপনের ক্রমবিবর্তনের চিত্র খুব স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে এই প্রদর্শনীতে।

প্রদর্শনীর অন্ততঃ আকর্ষণ ছিলো ভারত ও বাংলাদেশের নাট্য প্রতিকার সমাবেশ। ১৮৮৭-তে প্রকাশিত ‘অমৃতদান’ থেকে ভারতে প্রকাশিত মোট ৭৬টি নাট্যপত্র প্রদর্শিত হয়। বাংলাদেশের ত্রিষক, থিয়েটার, রঙ্গরূপ পত্রিকা সহ মুক্তিযুদ্ধের পর প্রকাশিত ৫৬টি নাট্যগ্রন্থ দর্শকদের সঙ্গ্রহণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পুরাণের আলোকে আধুনিক সময় : সজল রায়ের ছবি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বর্তমানে আকাদেমী অফ ফাইন আর্টসের পশ্চিম গ্যালারিতে বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শ্রীসজল রায়ের বর্ষ একক প্রদর্শনী অয়োজিত হচ্ছে। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে শ্রীরায় একটি বিশিষ্ট নাম, নানা দেশে শ্রীরায়ের প্রদর্শনী হয়েছে। জার্মানিতে তাঁর গ্রাফিক ৭৬ শিল্প প্রদর্শনীতে শ্রীরায়ের ছবি ছিল।

সজল রায়ের বর্তমান চিত্র প্রদর্শনীর বারোটি কাজই অনন্ত। এই কাজগুলো সব ভৈলচিত্র। ভারতীয় পুরাণ, লোককাহিনী অজ্ঞাত-আম্বিক ইত্যাদির প্রকরণে বর্তমান যুগ যরণার প্রকাশে প্রতিটি কাজ শিল্পবৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। শিল্পী শ্রীরায় জীবন বিমুখ নন; মানুষের সংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা তাই তাঁর শিল্পের ভাষার মুখর হয়ে ওঠে। ঠাণ্ডা চিত্রশিল্পীদের মধ্যে শ্রীরায় এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যিনি একঘেরেমির পাগলামীতে ভোগেন না। রংয়ের স্বয়ম ব্যবহার, মাজা, পরিবেশ, বক্তব্য ও আঙ্গিকের সঙ্গতি ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীরায় সবিশেষ সচেতন। আরও একটি বিষয় সবিশেষ লক্ষণীয়, তিনি

গতাজগতিক বিষয়বস্তুকে তাঁর শিল্পের অবলম্বন করেন না। বা তথাকথিত কোন শিল্পীগোষ্ঠীর খেরাল মাফিক থাকেন না। এবারের প্রদর্শনীটিও এই সত্য তুলে ধরেছে।

‘বলি বধ’ চিত্রটি সবিশেষ উল্লেখ্য। এখানে একটি মানুষকে একটা খুনে ছুরি দিয়ে খুন করছে, অস্ত্র একটা খুনে পাহারা দিচ্ছে; আর এ খুনেটিকে নির্দেশ দিচ্ছে এক প্রিয়দর্শিনী নারী। চিত্রটির ওপরের দিকটায় পুতুল খেলার এক পরিবেশ সৃষ্টি করে এখানে দেখানো হয়েছে আঙুলে অনেক হীরা জহরৎ অর্থাৎ ধনপতিদের আশ্রয়ে থেকে এক বৈরাচারী শাসক নারীর প্রতীকটি ফুটে উঠেছে। ‘অভিমত্যা’ ছবিটিতে অভিমত্যা কে বীরের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এই অভিমত্যা পরাজিত নয়, বিদ্রোহী অভিমত্যা বন্দীদের মধ্যে রয়েছে খুনে কালোমাজারী, যুদ্ধপাগল, ধনপতি ইত্যাদি সাতজন শয়তান। ‘ত্রৌপদীর বস্ত্রধারণ’ প্রতীকে তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান নর্তকী জীবনের বেদনা, যেখানে নারী নিজের দেহ দেখিয়ে খেয়ে বেঁচে থাকে। চিত্রটিতে

অজ্ঞাতর প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ‘শ্রীকৃষ্ণের জন্ম’ চিত্রটিতে একালের ফুটপাতে পাইপের সংসারে একটি অসহায় শিশুর জন্ম দেখানো হয়েছে। ‘শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু’ চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে ফুটপাতে বাস স্ট্যাণ্ডে একটি অসহায় শিশুর মৃত্যু, তার অসহায় মৃত্যু দেখছে সম্পন্ন মানুষ, আর চিত্রটিতে চেউয়ের লক্ষণ রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের পদপ্রান্তের দিকে, এতে প্রলয়ের ইঙ্গিত আছে। কর্ণ চিত্রটি বলিষ্ঠ প্রমিকের প্রতীকে বিদ্রুত, বলিষ্ঠ হাত, কান, মুখ সব যেন সেই পুরাণের কর্ণ; সে কণ্ঠে একটা চাকা ঠেলছে বাকের রংয়ের চাকা বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে কর্ণ এখন একজন ঠেলাওয়াল। অস্বপ্নামা, সঙ্গর ও যুগরাষ্ট্র, কালমন্ডা, যজ্ঞবংশ, বিশ্বরূপ, একলব্য কাজগুলোও পুরাণের কাহিনীর আলোকে আধুনিক কালকে ধরে রেখেছে এবং এখানেই শিল্পী সজল রায়ের কৃতিত্ব।

চিত্রপ্রদর্শনীটি ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত বিকেল ৪টা থেকে ৮টা জন সাধারণের জন্য খোলা থাকবে।

জনতা পার্টির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাজ্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে জানিয়েছি যে, যদি সব এই লোকদের জনতার স্থান দেওয়া হয়, তবে তারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করবেন।

কৃতকর্মের দৃষ্ট প্রকাশে জনসাধারণের সামনে অল্পশোচনা করতে হবে এবং কাজের মধ্য দিয়ে তারা যে অল্পগুলি সেটা প্রমাণ করতে হবে।

তবে জানা যায়, জনতার রাজ্য জনতা দলের নেতৃত্ব এখনও নেতৃত্ব এই বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তিত কারণ কী ভাবে অল্পপ্রবেশ ঠেকানো যাবে, সেটাই প্রশ্ন। কারণ যদি কেউ জনতার কর্মসূচী মেনে নেবার শপথ নেন এবং এক টাকা চাঁদা হিসেবে দেয় তবে সেই ব্যক্তির জনতা বা সংগঠন কংগ্রেসের প্রাথমিক সমস্ত পদ প্রত্যাখ্যানের আইনত কোন নির্দেশ পার্টির সংবিধানে নেই। জনতা পার্টির জনৈক বিশিষ্ট নেতা বলেন যে, জনতার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত কোন কংগ্রেসী নেতাকে পার্টিতে নেওয়া হলেও তাঁকে পার্টির কোন উচ্চপদে রাখা হবে না। এই সব ব্যক্তিদের

জনতা দলের নেতৃত্ব এখনও উল্লিখিত ধ্যানধারণা নিয়ে চলতে চাইছেন। অতীতকে, যে-দল কংগ্রেসীরা এখনও স্থান পাচ্ছে না তারা বিজয়সিংহ নাহারের গণতন্ত্রী কংগ্রেসে গিয়ে ভিড়ছে। পশ্চিমবঙ্গের পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যদি সি পি এম সহ বামপন্থী দলগুলোর সঙ্গে জনতা গণতন্ত্রী কংগ্রেসের মোর্চা না হয় তবে পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেসকে জীয়ে রাখা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নির্বাচনের পর জনতা ও গণতন্ত্রী কংগ্রেসের মধ্যে অবস্থা নীচের তলার সি পি এমের বিরুদ্ধে নানা প্রচার

স্বকৌশলে চালানো হচ্ছে। তবে জনতার রাজ্যকমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত বামপন্থী দলের সঙ্গে সমরওতার পক্ষপাতী। ২১শে এপ্রিল এই রাজ্যে জনতার রাজ্য কমিটির বিশেষ বৈঠক হবে। এবং এই বৈঠকে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

নিবেদন

অনিবার্য কারণে "ভারতে ক্যাসি-বাদী-অভ্যুত্থানের পটভূমি ও যুব কংগ্রেসের যৌবন" প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না। আগামী সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হবে।

মানিকেন ভবের আলোকে দেবতার স্বরূপ ব্যাখ্যা ও মহাভারতীয় তথ্যের ভিত্তিতে দেবগণের উদ্দেশ্য বিচার করছেন

বীরেন্দ্র মিত্র

মহাভারতের

স্বর্গ ও দেবতা

ধারাবাহিক রচনার
সেই অভিনব বক্তব্য নিয়ে আগামী সংখ্যা থেকে দর্পণে প্রকাশিত হচ্ছে

পুরসভা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খাতা-পালটাতে শুরু করেছেন এবং তার অল্প ছুটির দিনেও কামাই দিচ্ছেন না। অল্পচরিত্রেরা, বলা বাহুল্য এর অল্প ওতার টাইম পারিতোষিক পাবেন। পুরোনো খাতাগুলি থাকলে কর্তৃত্বা বেকারদার পড়তে পারেন কারণ মাথা পিছু দশ টাকা দিয়ে দ্ব-খাতকারী হাজার হাজার ভক্তসন্তানকে বঞ্চিত করে মস্তুর প্রেরিত লিফ্ট অফ-যায়ী চাকরি পাওয়ার সৌভাগ্য বাদেই হয়েছে তাদের নামের পাশে লেখা আছে কার ভাগের প্রার্থী—যেমন এম মানে মিনিষ্টার, সি মানে কমিশনার, এম সি মানে মধু চ্যাটার্জি, এস এস মানে শান্তি সেন ইত্যাদি। এগুলি যদি ভদ্রভাবে প্রকাশ পায় তাহলে পরীক্ষা নেওয়ার অভিনয় ফাঁস হয়ে যাবে।

অ্যাড. হক

কংগ্রেস সংগঠনে যেমন অ্যাড হক কমিটির রাজত্ব, রাজ্য সরকার যেমন কর্মচারীদের অ্যাড হক পররাতি ঘুষ দিচ্ছে, পুরসভারও যেমন অ্যাড হক অ্যাপয়েন্টমেন্টের কলাও কারবার চলেছে। নির্বাচনের প্রথম শব্দ কেটে যাওয়ার পরই হস্ততাবু কেন্দ্রীয় পুর ভবনে ঘন ঘন আবিষ্কৃত হতে লাগলেন এবং অ্যাড হক নিয়োগে কমিশনারের হাত ধুলতে লাগল। সময় যে ঘনিয়ে এসেছে তা আঁচ করতে পেরে যাওয়ার আগে সব কটি শূন্য পদ হস্ততাবু ভর্তি করে যেতে চান। কী ভাবে পরীক্ষার নামে প্রহসন করে প্যানেল তৈরি করা হয়েছে তা সকলেই জানে। এই চাকুরি প্রদান মন্ত্রী মহোদয়ের নিছক পরোপচিকীর্ষী নয়—তার মধ্যে থেকে ঝুঁস ঝুঁস রক্তক্ষণিত মাকি অনেক চলেছেন। পার্সোনেল অফিসার অজয় লাল মাকি স্বস্থানে প্রস্থান করতে চান। তাতে কল-কাতার পুরবাসী বড় হুঃখিত হবে বলা কঠিন। তবে পুণ্ড্রীবিবর্ধন (বিসম-জীবন ঘোষের ভাবার হতভী গোবর্ধন) নির্মাল্য মুখাভি যদি পুরসভা ছেড়ে চলে যায় তাহলে কলকাতাবাসী যুগল সিন্ধুর নাটকীয় দৃষ্ট থেকে বঞ্চিত হবেন।

ছবির ছবি

কবি থেকে কবিতা হতে পারলে ছবি থেকে ছবিও হতে বাধ্য কোথায়? অ্যাসিষ্ট্যান্ট পার্সোনেল অফিসার ছবি রায়চৌধুরী যে কালে কমিশনার নির্মাল্য মুখাভির একজন "প্রিয়পাত্রী" সেকালে তার ভগিনী যদি পুরবিভাগের শিক্ষিকার পদে

বহাল হয়ে থাকেন তাহলে তাতে দোষের কি থাকতে পারে? একেই বলা যায় ছবির ছবি। এনাকে পার করার জন্যই কি কমিশনার সিলেকশন বোর্ডের সভাপতির চেয়ার বেদখল করেছিলেন? আরো এক-জনকে তাকে পার করতে হয়েছিল, সম্ভ্রতি যিনি সঙ্গীত শিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়েছেন। ঔপন্যাসিক একটি প্রস্তাবও জবাব দিতে পারেন নি, গান একটিও পুরো গাইতে পারেন নি। হরের কথা যদি ওঠে তাহলে গাথাও নাকি লজ্জা পায়। তবে তার বড় যোগ্যতা হল তিনি মস্তুর মনোনীত।

পুরকমিশনার এখন কে?

বর্তমান পুরকমিশনারের চাকুরির মেয়াদ গত ৩১ মার্চ শেষ হওয়ার পর আর কোন সরকারী মঞ্জুরী আসেনি। অতএব পুর-কমিশনার হিসাবে নির্মাল্যাবু যে সব আদেশপত্রাদি দিচ্ছেন তা কি আইন ও বিধিসম্মত? পি-আর-ও

পুরসভার তালবের পি-পি-আর-ও হুদর্শন বারিক পাখোয়াজ আদমি। ট্রাইক ভালা এবং কর্মচারি বিরোধী প্রচারে দালালি করে তিনি গ্রেস অ্যাণ্ড পাবলিক রিলেশনস অফিসারের পদেই পাকা হয়ে বসেননি। ঐ পদের গ্রেডটিকেও বেশ বাড়িয়ে নিয়েছেন। দালালদের পুঙ্খবদ্বিতে বা পদোন্নতি ঘটতে পুরসভার পরমা খরচ করতে কর্তাদের বিন্দুমাত্র বিবেকদংশন হয় না। পাবলিক রিলেশনের কাজ তিনি কী করেন—তা অবশ্য বাংলা দেশের পাবলিক আয়োজনে পাবে নি।

মেডিকেল কলেজে

ছাত্র পরিষদ খতম

গত ১৫ই এপ্রিল কলকাতা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচনে বামপন্থী স্কট, জনতা, সি, এক তি জোট সমন্বিত নির্দলীয় ছাত্রসংস্থা 'মেডিকেল কলেজ ডেমো-ক্রেটিক স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন' (MCDSA) ৩৫টি আসনের মধ্যে ৩৩টিতে জয়লাভ করে ইন্দিরাপন্থী তথা কংগ্রেসী ছাত্র পরিষদকে (মহাজাতি সন্দন) শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে। উল্লেখ্য বিগত সাত বৎসর ধরে কলেজের ছাত্র সংসদ ছাত্র পরিষদ কর্তৃক জোর জুলুমের মাধ্যমে বেদখল হয়েছিল। এই জয়ে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাপ্রেমী সাধারণ ছাত্রছাত্রী-ভক্তার-নার্স-কর্মচারীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

কলকাতা কালে কালে

কলকাতা একদিনে হয়নি। কালে কালে বদলেছে। মহানগরী হয়ে ওঠার পথে তাকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে অনেক ক্ষয়-ক্ষতি, অনেক দুর্বিপাক। ১৭০০ সালের কথাই ধরা যাক। সেদিনের কলকাতায় মা ছিল কলের জল, না গ্যাসের বাতি, না পাকা বাড়ি, না রাজপথ। যানবাহন বলতে একটিই। পার্কিং। বিদ্যুতের আলো কিংবা কল-চলা। গাড়ি কলকাতাবাসীর কাছে ছিল স্বপ্নেরও অতীত।

আজকের কলকাতায় ভূগর্ভ-রেল কিন্তু আর স্বপ্ন নয়। একটি বাস্তব পরিকল্পনা। কলকাতার বিপুল জনসংখ্যা, সীমিত আয়তন, অপরিমিত পথ এবং যানবাহনের সংখ্যাজতার পরিপ্রেক্ষিতে ভূগর্ভ-রেলের প্রয়োজনীয়তা আজ একমস্তভাবেই জরুরী। কিন্তু এই বিশাল পরিকল্পনাকে কাজে রূপ দেবার পথে সবার আগে প্রয়োজন কলকাতার মানুষের সহায়দয় সহযোগিতা।

কলকাতায় মানুষ সহনশীল তা জানরা জানি। এবং বিশ্বাস করি, এই বিপুল কর্মমজকে সার্থক করার প্রচেষ্টায় তারা কিছুকালের সাময়িক দুঃখ ও বাধা-বিপত্তিকে মেনে নেবেন আগামীকালের উজ্জল ছবিকে মনে রেখে। ভূগর্ভ-রেল যানবাহনের তালিকায় শুধু একটা নতুন নাম নয়, কলকাতার নতুন মানচিত্র গড়ে তোলার এক সুবহু উদ্যোগ।

কলকাতার নতুন মানচিত্র ভূগর্ভ-রেল



মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (মিট্রোপলিটান)

সম্পাদক—বীরেন বসু

সম্পাদক বর্জ্য দীপালী প্রেস, ১২০৯ আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র বোস কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ সম্পাদক ৩১ মার্চ কলিকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত।

জনতা প্রতিজ্ঞায় দৃষ্ট : নেতৃত্বের নিভুল পদক্ষেপ

দঙ্গল

বিংশ বর্ষ ॥ ১৪শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ২৯শে এপ্রিল '৭৭ ॥ ৪০ পঃ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আবার কেমন কলকাতার রং বদলে যাচ্ছে। মিছিল, মিটিং সেই আগে যেমন ছিল। বক্তৃতা, আলোচনা, কলকাতার আচ্ছন্ন ব্রিগেড প্যারেড। হাজার হাজার মানুষের ভীড়, আলাদা করে বিকেলের আলোয় চেনা যায় না, কিন্তু মনে হয় যেন একটা মুখ, একটা প্রতিজ্ঞা, সব একাকার হয়ে যায়। বাকুইপুত্রের, গোবিন্দ, পুত্রকল্যাণ ট্রু ওরাও, বজ্রবজ্রের ইসমাইল আর আসানসোলার অনিল সাহা সব এক।

এক মুখ, এক ভাষা : স্বৈরাচারী সিদ্ধার্থ সরকার নিশাত যাক, গণতন্ত্রের সংগ্রাম বাচার সংগ্রাম, সি পি এম-জনতা গণতন্ত্রী কংগ্রেসের মৈত্রী জিন্দাবাদ।

বিশাল বিপুল ভরাট জুড়ে এই আশুপাণ্ড। ব্রিগেড প্যারেড গাউণ্ড বেজ করে বোল বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে অনবরত মিছিলের 'বাণী' আশা, লক্ষ লক্ষ মানুষের পদচারণার শব্দ, সকাল থেকে রাত আটটা-নটা পর্যন্ত শত শত মানুষের মিছিল। ট্রাক্টিক

বানচাল, সমস্ত রাস্তাটা যেন হাটছে। ব্রিগেড প্যারেড গাউণ্ড থেকে করে কিলোমিটার পর্যন্ত লোড শেডিংয়ের দৌলতে নিশ্চয় অন্ধকার। মাঝে মাঝে পথপার্শ্বের দোকানের মোমের আলো ঝলকে ঝলকে যায় : যে মানুষগুলো যাচ্ছে—শিশু, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী তাঁদের ক্রাও মুখে যেন আশার ঝলকানি।

১৯৭০ সালের ১৫ই নভেম্বরের পর এই প্রথম মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি আবার ব্রিগেড প্যারেড গাউণ্ডে জমায়েত করলো। কমিউনিষ্টরা যে মরে যাবনি, তার প্রমাণ এই লক্ষ (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

সুত্রতবাবুর দান-খয়রাতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

অনুচরদের প্রতি সুত্রতবাবুর বদা-স্ততার অবধি নেই। এর পরিচয় পাওয়া গেল তার ২৩ মার্চের দান-খয়রাতে। সেদিন তিনি দরাজ হাতে তার অনু-চরদের নানা সুবিধা এবং পদোন্নতি পাইয়ে দিয়েছেন। এই ব্যবস্থার সুত্রতবাবুর চীফ চামচে বীরেন মহান্তির সম্মত নতুন পদ সৃষ্টি হচ্ছে—মার্কেট ডেভেলপমেন্ট অফিসার। তার শ্রু-ত্বপুটি এডুকেশন অফিসারের পদে যাচ্ছেন কমিশনারের স্নেহভক্তা ছবি বারচৌধুরী। লাইসেন্স, কালেকশন ইত্যাদি ইন্সপেক্টরদের গ্রেড বাড়ছে। আহা, এলোমেলো করে দে মা। মার্কেট বস্ত্রটি যে কী ফলপ্রসূ তার খাদ-সুত্রতবাবু বেশ বুঝতে পেরেছেন—বিশেষ করে নিউ মার্কেট। এখানকার কর্তা অনুগত থাকলে লাখ টাকার ঘরের বিয়ে দেয়া যায় বিনা পরিশায়। ষ্টল বিতরণ করে পকেটেও আসে মন্দ নয়। বীরেন মহান্তির মত সর্দার দায়িত্ব থাকলে নির্বাচনের খরচটা ওখান থেকেই তোলা যাবে।



কৈশোর কেটে গেল ইন্দিরাশাহীর কারাগারে

শিবাজী ভট্টাচার্য

এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধের প্রথম তাপ আজ আর নেই। বারবেরিলীর জনগণ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ইন্দিরা তো দূরের কথা বারবেরিলীর প্রতিনিধিও নয়, অথচ গত বছরের জাম্বুজারী মাসে বৃহৎ সংবাদপত্রগুলোর পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে-ছিলো 'প্রগতির দশক'। এবছরের জাম্বুজারী মাসে পূর্ণ হয়েছে তাঁর এক-টানা প্রধানমন্ত্রিত্বের একাদশ বর্ষ। ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে বখন জাবকেরা তাঁর কীত্তির নমুনা দেখিয়ে-ছেন, গোয়েবলসীর ঢঙে অল ইন্দিরা রেডিও, টেলিভিশন তাঁর প্রশংসা করছে, এই লেখক প্রেসিডেন্সী জেলের ঐতিহাসিক 'সাতখাতা'য় দেখেছেন, কিভাবে চোদ্দ বছর বয়সের সুস্থার মতি বিশোরগুলোর ভোট-

বিকারের কর্মে নাম লেখার বয়স এসে গেল জেলের মধ্যেই। ইন্দিরা শাহীর রাজত্বের শেষ সাত বছর ওদের জেলেই কেটে গেল। ভ্রমশ্রম নেই জেলা গোয়েন্দা বিভাগ (ডি, আই, সি), লর্ড সিমহা রোডস্থ স্পেশাল ব্রাক অথবা লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্ট-মেন্টের।

উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রীট অফিসের ৪নং যোগেন দত্ত লেনের ছেলে শ্রীযুগল হাজরা। সদাহাস্ত-ময়, প্রাণবন্ত এই ছেলেটি পড়েছিল গোয়েন্দা পুলিশের হস্তগত। ওর বয়স তখন মাত্র বোল। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের স্বাস্থ্য অফিসারদের মতে ও নাকি একজন মারাত্মক মকশালপন্থী। জনসাধারণের খাড়া ভেঙ্গে, ট্যাক্স বসিয়ে গোয়েন্দা বিভাগের বছর কে বছর খরচ বাড়ানো হয়েছে, অতএব কাজ দেখাতে হবে।

তাই অনেকের মতই শিকার হলো যুগলগলের মত গরীব ঘরের কিশোরের।

যুগল পাড়ার একটি বস্তি কমিটি আছে। সেই বস্তি কমিটির অধীনে একটি কোর্চিংয়ে ও রোজ সন্ধ্যাবেলা পড়তে যেত। ঐ বস্তি কমিটির সম্পাদক ছিলেন 'ওখানকার বিধানসভা সদস্য শ্রীবারিদবরপ দাসের অনুগত। ঐ সম্পাদক মশাই একদিন তাকে বলেন, 'তুমি কংগ্রেস বিরোধী কলারবার্তা প্রচার কর, তোমাকে এখানে পড়তে দেওয়া হবে না। তুমি এবানকার ছেলেকলোর মাথা খাবে। যদি তুমি কংগ্রেস করো তাহলেই তুমি পড়তে পারবে'। যুগল গরীব হতে পারে, কিন্তু সং ও আদর্শবান, তাই ঐ আদেশ অমান্য করে। অতএব প্রাক 'অশুশাসন পর্ব'ই শান্তি।

কয়েকদিন পরেই ১৯৭৩ সালের ২৩শে মার্চ লালবাজার থেকে গোয়েন্দা বিভাগের বেশ কিছু যুগলমার্কী চেহারা-ওখাল লোক তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। সেখানে সেন্ট্রাল লক আপে ওকে রেখে দেওয়া হয়। পরের দিন তিনটে সম্পূর্ণ মিথ্যা মামলা দিয়ে ওকে শিয়ালদহ কোর্টে হাজির করা হয়। এরপর লক আপ থেকে অফিস কল করে ওকে ডি ডি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয় ও চলে তারপর প্রচণ্ড নির্বাসন। অভিযোগ ও নাকি

আগামী সংখ্যায়

আগামী সংখ্যায় দর্পণ বন্দীমুক্তি এবং পুলিশের অত্যাচার ও ইত্যাদি সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ লেখা প্রকাশ করা হচ্ছে। সেই কারণে পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়িয়ে দায় করা হচ্ছে ৬০ পৃষ্ঠা।

নকশালপন্থী, অতএব ওকে 'বিশবপ দর্শন' করাও (এটা লর্ড সিন্ধা রোড ও ডি. ডি. অফিসের প্রচলিত ভাষা)।

কিন্তু ১৯৭৩ সালের ১২ই জুন ম্যাজিস্ট্রেট তাকে ঐ তিনটে মামলা থেকেই মুক্তি দেন। কিন্তু ঐ যে কথায় আছে বাঘে ছুঁলে আঠাআঠা যা, পুলিশে ছুঁলে... অতএব জেল গেট থেকে বেরুতে না বেরুতেই আবার গ্রেপ্তার। এবার আর অনর্থক আশুপন্থী মামলাও নয়। মামলা থাকলেই স্তন্যনীর দিনে আদালতে পুলিশ পক্ষকেও থাকতে হবে, তদন্তকারী অফিসারকে (আই, ও) ছোটোছুটি - করতে হবে অতএব নির্বাচনটি মিস। যুগল হাজরা বারিদবরপ দাসের অনুগত হতে রাজী হয়নি অতএব দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা করেনি, অতএব আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তাদের তাঁদের লাভ। কারণ ডি. ডি. পুলিশ কমিশনারের চোখে ভালো লাগবে, (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

সঙ্গীত

চিত্র যেথা ভয়শূন্য

পশ্চিমবঙ্গের ময়গাঙ্গে আবার আন্দোলনের বান ডেকেছে। সর্বত্রের শিক্ষক, শিক্ষাবর্মা থেকে শুরু করে কল কারখানার শ্রমিক মজুরেরা দীর্ঘদিন পর তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে রাস্তায় নেমেছে। অক্ষয়ী অরস্বার আঠাধো মাসে কলকাতার বে রাস্তাগুলো পড়েছিল প্রাণহীন, নিস্তর্র অবস্থায় কেজে জনতা সরকার গঠিত হওয়ার পর সেই রাস্তাগুলো মিছিলে মিছিলে প্রাণ-মুখর হয়ে উঠেছে। এই আন্দোলনগুলির চরিত্র মূলতঃ অর্থনৈতিক হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এর অগ্রগণ্যমূলক ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। মাহুঘের ভয় ভাঙছে। পায়ের জড়তা কাটছে। পায়ের পায়ের এগিয়ে আসছে মাহুঘ সংগ্রামের মরদান। কংগ্রেস ছেড়ে কে বা কারা গণতন্ত্রী কংগ্রেসে এলো কিংবা জনতার দ্বারা ধর্না দিল মাহুঘ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কংগ্রেস ছেড়েছে। ভাঙছে। এটা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু ইতিহাসের যে কথা শ্রেণী সংগ্রামের মহাকাব্য রচনা করে তার নাম সংগ্রাম। পশ্চিমবঙ্গ সংগ্রামের সেই মেলাজ কিংবা পেয়েছে।

এই সংগ্রাম জনতা সরকারের বিরুদ্ধে নয়। বৈরা শক্তি জনগণের আন্দোলনকে জনতা সরকারের বিরুদ্ধে চালিত করতে সচেষ্ট হতে পারে। তাই সংগ্রামী শক্তির নেতৃত্বকে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ এখনো সেদিন আসেনি।

বিধান সভার নির্বাচন আসন্ন। নির্বাচন শুধু সরকার দখলের আন্দোলন নয়, গণতান্ত্রিক সংগ্রামেরও অবিচ্ছেদ্য অংশ। নির্বাচন আসন্ন হতে পারে, কালও হতে পারে। শ্রেণী সংগ্রাম মূলতঃই থাকে না। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি অব্যাহত শ্রেণী সংগ্রামের নেতৃত্বদানের মধ্য দিয়ে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে চলবে মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে। বুর্জোয়া ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে মৃত থাকে। বুর্জোয়াদের লেজুড়শক্তি বিভেদের ছুরি শাণিত করতে থাকে। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি এগিয়ে চলে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর সাগর সঙ্গরে।

ইতিহাস একটি সুযোগ-দুবার উপস্থিত করে না। ভারতবর্ষব্যাপী গণতন্ত্রের লড়াইয়ে প্রথম রাউণ্ডে জনগণ বিজয়ী ঘোষিত হয়েছে। দ্বিতীয় রাউণ্ড বা শেষ রাউণ্ডেও জনগণকেই বিজয়ী হতে হবে।

বামশহী শক্তিগুলো সংহত ও ঐক্যবদ্ধ হলে পশ্চিমবঙ্গের বিভেদের শক্তির স্থান নেই। ২২শে এপ্রিলের ব্রিগেড গ্যারেজ গ্রাউণ্ডের মহতী সমাবেশের মতো আরও সমাবেশের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় প্রয়োজন নীচুতলা থেকে ঐক্যের বনিয়াদ গড়ে তোলা।

বিগত কয়েক বৎসরে পশ্চিম বাংলার যুব ছাত্রদের রাজনৈতিক উত্তম ও গতিশীলতা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। এলাকাভিত্তিক সংগ্রামী কমিটি গঠন করে সেই উত্তম ও গতিশীলতাকে কাজে লাগাতে হবে।

বামশহীরা ছাড়া অন্য কেউ যদি সংগ্রামে অঙ্গীকার হতে চায়, দরজা খোলা রাখা উচিত। গণতান্ত্রিক সংগ্রামে কেউ অস্পৃশ্য নয়। গুজরাটে নব-নির্মাণ সমিতি হয়েছিল। তারা কর্মোত্তমকে ধরে রাখতে পারেনি। বিহারে ছাত্র সংগ্রাম সমিতি সংগ্রাম করেছে। কিন্তু অক্ষয়ী অবস্থা ঘোষণার পর সেই সমিতি অধিত সাফল্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। গণসংগ্রাম সমিতি-গুলির নেতৃত্বকে মূল রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে রাখতে হবে। তবেই চূড়ান্ত জয় আসবে।

বেলেঘাটার অধিবাসীদের আবেদন

বেলেঘাটা ৩ঃ৩০ ওয়াড়ে বস-উপস্থিত হন। বাসকারী অধিবাসীরা গত ২২শে এপ্রিল তারিখে একটি গণডেপুটেশন নিয়ে তাদের স্থানীয় অফিসে অলকলের দাবীতে কলকাতা পুরসভার কমিশনার ওয়াটার ওয়ার্কসের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর প্রভৃতি কর্মকর্তাদের নিকট আবেদনসহ পাল্লা প্রভৃতি

যুব কংগ্রেসের 'যৌবন'

ত্রীকান্ত বসুরায়

পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের 'পরোপকার' হুবিমিত। এতে আবার এক সন্ত্রাসরপণ্যদ্রব্য হলে তো সোনার সোহাগা। এ জোড়ের অনেক 'মহান' সৃষ্টি—যুব কংগ্রেস তার একটি।

যুব কংগ্রেসের 'জেনারেল ডেসক্রিপশন' সবারই জানা। মুখভঙ্গীকে কঠোর করে রাখতে কুড়ল-মার্কী গৌফ, খড়্গ মার্কী গালপাটা, অঙ্গীল বিকারে ঠাসা ভাষ-জ্ঞানের মালিক এবং পুণিশের গোপালকৃষ্ণী এ সমস্ত মহাত্মাদের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খোলাখুলিভাবে চোখে পড়ে।

কংগ্রেসী জীবনদর্শনের ভিত্তি

'ভক্তলোক'দের আন্তর্জাতিক 'আদর্শ' অল্পপ্রাপিত আমাদের বাস্তবশ্রীর অপার সহায়। দেশী-বিদেশী মালিক-শাহীরা লেজ, হাত আর মাথা (Fags Functionaries and Philosophers) হয়ে আধা-নবাবী আর আধা-নায়েবীর খেতাব পেয়ে গভীর নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের প্রয়োগে তারা যা প্রতিষ্ঠা করেছেন তা হলো—

শিল্প-সমৃদ্ধ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের অন্তঃস্বার্থপর জলজ, স্থলজ, উদ্ভিজ্জ ২৮৮ রকমের খাদ্যপণ্যের স্বায়ী উৎপাদক বোগানদার (Producer-Supplier) এক বেকার সমুদ্র ভারতবর্ষ; কিংবা বলা যায়, মূলশিল্প ও ভারী শিল্পের দেশ ইংল্যান্ড আমেরিকা-রাশিয়ার পণ্য-আমদানীকারী ও প্রেসিং কারখানারূপে গড়ে ওঠা ভারতবর্ষ। এক কথায়, উভয় প্রকার সাম্রাজ্যবাদী মূলধনের বাজার, উত্তম খাদ্যের 'হঃহ' বাজার, খনির ইজারাধর, সভা শ্রমের বোগানদার ও সন্ত্রাসপ্রিত কারখানা রূপে ভারতবর্ষের পরিণতি লাভ।

অতঃপর, নয়া একচেটিয়ার সমাজতন্ত্র এগিয়ে বললো।

তবু, এত করেও সাধের হাফ-নবাবী, হাফ-নায়েবী বুরি টেকে না—উপরাসী দেশের মোট রপ্তানী-বাণিজ্যের এক ছবিপুল অংশ খাদ্যপণ্যে রপ্তানী সত্ত্বেও দেশী-বিদেশী মালিক আর বণিকদের বিপুল দেবে এনিমিয়া রোগীর নাকীকম্পন বেজে চললো, স্বাস্থ্যকর আমদানীর নিঃবাসে আর রপ্তানী-মুখী শিল্পায়ন ও স্বাণায়ক রপ্তানীর প্রসঙ্গে ঘনায়মান নাতি-শাসের অস্তিম ব্যাকুলতা ফুটে উঠলো। বিদেশী পুঁজির ও বাজারের অনিশ্চিত আকর্ষণ-বিকর্ষণের এক জটিল আবর্তে বধন গোটা উৎপাদন ব্যবস্থাটাই তলিয়ে যেতে বসেছে, এরূপ সঙ্কটাকীর্ণ পরিস্থিতিতে দেশী-বিদেশী কুবের-শাহীর লেজ, হাত ও মাথাগুলো একগাদা দানবীর যন্ত্র তন্ত্র নিয়ে কাজে নেমে পড়লো অর্থনৈতিক স্বার্থ ও রাজনৈতিক বন্দোবস্তগুলিকে স্বায়ী ও পাকা করতে।

এই দানবীর তন্ত্র ও যন্ত্রের বিষয় আমরা আগেকার সংখ্যায় আলোচনা করেছি, কিন্তু 'যন্ত্রাংশ'-বিশেষের মাহাত্ম্যও কিছু খাটো নয়।

'এক নেত্রী এক দল'

১৯৬৭-৬৯ সাল। এ.হেন আতঙ্কিত 'বিপন্ন ভারতীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রশক্তি' তখন, উৎপাদন শক্তিগুলির সঙ্গে এক চরম বৈরিতার পর্বে সজ্জিত। এদিকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শাসকশ্রেণীর প্রধান সংগঠন কংগ্রেস দল সংখ্যালঘি হয়ে পড়লো—কেরলে ও পশ্চিমবঙ্গে এক মিশ্র শক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। শাসকদলে সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট ও জনশক্তি কণ্ঠকগুলো নিতান্তই বুর্জোয়া সংস্কারের ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। অতঃপর, ঘায়ের যন্ত্রণা-যেখানে বেশী কংগ্রেসী 'চিকিচ্ছে'ও স্বল্প হল সেখানেই—একবারে 'এন্টিবায়োটিক' ব্যবস্থা; স্থানীয় রাজ্য পুলিশের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার পরিবেশে ও কেন্দ্রীয় শক্তিগুলির গোপন

তৎপরতার ও স্থানীয় প্রতিক্রিয়ার নেতৃত্বে শহর ও শিল্প-কলে যুব কংগ্রেস ভূমিষ্ট হওয়ারমাত্র খড়ির কাটা ঘুরানোর কাজে নেমে পড়লো। আকাশবাণী নানাভাবে আকাশ বিদীর্ণ করে চললো, প্রতিক্রিয়ার কণ্ঠগুলি ইংরেজী-বাংলায় তারতর 'ভূতমন্ত্র' আবৃত্তি করে চললো, কলমগুলো ককিয়ে চললো ('আমরা কোথায় আছি') কিন্তু দেশীমত্রে এ রোগ যার না, তাই এলো কুশীমন্ত্র।

প্রাক্তন রাজা-বাদশাহের এককালীন টাকার বস্তা উপহার দিয়ে বার্ষিক 'প্ৰাইভেট' (Prive Purse) চেয়ে নিল (রাজত্ববর্ণের ভাতা বিলোপ?), ভাগ্যবান রাজত্ব আরো ভাগ্যবান হলো—ভক্তলোকের 'গণতন্ত্রের' জয়ধ্বনি করলো, আর মতানৈরা 'সমাজতন্ত্রের'।

এতদিন ভারতীয় কিনাল ক্যাপিটাল এক বিশৃঙ্খল শোষণ-ভাণ্ডারে মত্ত ছিল, তাকে হুশ্রুদ শোষণ ক্রিয়ার 'স্ট্রিম লাইন' করাটা এক বুর্জোয়া দায়িত্ব। এ অক্ষয়ী কাজ সরকারী তদারকী ছাড়া সম্ভবপর নয়। অতঃপর দেশী বড় ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীকরণ হলো। যুব কংগ্রেস ততদিনে আলতো আলতো কথা লিখেছে, 'এক নেত্রী, এক দল' চিৎকারে আকাশ বিদীর্ণ করলো।

তা ছাড়াও, দেশী-বিদেশী বিভিন্ন পুঁজি স্বার্থের 'কো-অর্ডিনেশন' চাই। খাল কাটতে হবে, অনেক খাল। কুমীর বাবে, কুমীর আসবে। ভারতীয় পুঁজি-কুমীরটি কি চিরটা কাল শুধু ভারতীয় রক্তই খাবে? তার কি এক আঁধু বিদেশী রক্ত-পানের সাধ থাকতে নেই? বালাই বাই। সেও বিদেশী রক্ত পান করে 'মায়ের' হবে। কতই তো দেশ রয়েছে ভারতের চাইতেও শিহিরে। তৃতীয় বিশ্বের সে সব দেশে কুমীর হয়ে সে খাবে। তবে, তবে তো 'হাটি হাটি পা, পা', তাই বড়রা নিয়ে বাবে সঙ্গে করে (সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থগুলির সঙ্গে জয়েন্ট কমিশন ও জয়েন্ট কাউন্সিল ও রুশ-ভারত অর্থনৈতিক চুক্তি)। অতঃপর ভারতীয় পুঁজি বাইরে বাবে, বিদেশী পুঁজি ভারতে আরো আরো আসবে।

"দেশের অর্থনীতি এক শক্ত বুনিয়েদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে"—বুদ্বুদ্ধ করলো যুব কংগ্রেস।

জাতীয়-চরিত্রহীন শক্তি-যন্ত্র

আমরা ইতিপূর্বেই (দর্পণ—১৫ই এপ্রিল) দেখেছি, একচেটিয়া ধনতন্ত্র বাধ্যতামূলক বেকার সৃষ্টি করে, যার একাংশ অন্ধকারের পতাকাবাহী হয়। প্রকৃতপক্ষে, যদি এ না হতো, তাহলে ধনতন্ত্র ধনতন্ত্রই হতো না। তবু বেকার সমাজের এ অংশটি ক্রমশঃ হতাশা, শ্রমবিমুখতা সংগ্রামবিমুখতা ও আপন শ্রেণীবিরোধিতার পথ ধরে শাসক-শক্তির জালে পড়ে আত্মঘাতী হয়। আবার পদ্ম, অক্ষম জাতীয়-চরিত্রহীন ভারতীয় ধনতন্ত্রে এই যুব কংগ্রেসী কালো শক্তি যে মাত্রাতিরিক্তরূপে বিকারগ্রস্ত হবে, তাও ধরে নেওয়া যায়। অতঃপর, ভারতীয় যুব কংগ্রেসের অভ্যুত্থান, প্রস্তুতি, আকার ও বিকারগুলি সমসাময়িক ভারতবর্ষে অস্থিরতার উষ্ণঘা (hot bed) পশ্চিমবঙ্গে এবং তৎপর অন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার এক চরম অভিব্যক্তির রূপ নিল। নিচের দিনপঞ্জিকাটি লক্ষ্য করুন।

১৯৭০ সাল। মহাবীর সিদ্ধার্থস্বর্য বাংলায় মননদে। সীমান্তের ওপারে আর এপারে বুর্জোয়া পার্টিবুর্জোয়া শক্তিগুলো তখন পূর্ববঙ্গে লাশ ওপতে রক্ত; ওপারের হাড়-বাংসের 'হঃহে' এপারের বাজবাহীরা যেমন 'আকুল' তেমনই শশব্যস্ত। ছকের পর ছক আঁকা হয়ে চললো; পরসে আর পরদার লোভ দেখিয়ে আর পুলিশের রাক্- (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

আই আর সি আই পরিচালনায়

গলদ ও জরুরী তদন্ত প্রয়োজন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রূপ শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা ইণ্ডিয়ান রিকনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (আই আর সি আই) নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ১৯৭১ সালের ১২ই এপ্রিল সরকার এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। কলকাতায় এর হেড অফিস। টাকার এদের খুব অভাব নেই। আই আর সি আই ভালভাবে কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু যথাযোগ্য নীতি গ্রহণে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা, রূপ শিল্পে পুরাতন অপদার্থ ও দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তিদের বহাল তবিয়ে থাকতে দিয়েই আর্থিক সাহায্যদান, ক্রটিপূর্ণ প্রমিত বিরোধী নীতি, স্বল্প পোষণ প্রভৃতি কারণে আই আর সি আই অধোগতির পথে গেছে। তার ফলে আই আর সি আই বাদের সাহায্য করেছে সেই সব শিল্পসংস্থা কিছুদিন চলেই আবার বন্ধ হয়ে গেছে এবং হাজার হাজার প্রমিত বেকার দশায় নিমজ্জিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আই আর সি আইয়ের সাহায্য পেয়ে রূপশিল্প সংস্থার মালিকরা কেঁপে উঠেছে, কিন্তু শিল্প আরও রূপ নিয়েছে। কারণ এই সংস্থার নেতৃত্বে তারা আছেন তারা দুর্নীতিপরায়ণ এবং

যথাযোগ্য নীতিগত গ্রহণে অপারগ। ফলে যে উদ্দেশ্যে এই সংস্থা গঠিত সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে আর হাজার হাজার বেকার অনাহারে দুঃস্থ।

১৯৭৪ সালে আই আর সি আইয়ের কার্যকলাপ সম্পর্কে সমালোচনার স্বত্ব ওঠে। পরের বছর জাহ্নবী মাসে আই আর সি আইয়ের ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য জেনারেল কোম্পানীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীম্বর এন সেনকে নিয়ে একজন সদস্য বিশিষ্ট এক কমিটি গঠন করা হয়। এই সংস্থা তার কর্তব্যকর্মে কেন ব্যর্থ হল সেটাই ছিল তদন্তের প্রধান বিচার্য। কমিটি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তার সুপারিশগুলি পেশ করেছে বলে জানা গেছে। কিন্তু প্রাক্তন সরকার সেই সুপারিশ কার্যকর করেন নি এবং কার্যসীমার ব্যর্থ এই অবস্থার সুযোগ নিতে চেষ্টা করেছে। বর্তমান সরকার এই কমিটির সুপারিশ আশা করি পরীক্ষা করে দেখবেন।

আই আর সি আইয়ের অন্ততম ক্রটি এর মাধ্যমিকী প্রশাসন এবং নীচের তলার কর্মী সংখ্যার স্বল্পতা। এখানে অফিসারের সংখ্যা ৫৪ আর সাধারণ কর্মচারীর সংখ্যা ৭৪।

অফিসারের সংখ্যা আরও বাড়ানো হচ্ছে। কাজের অল্পপক্ষে অফিসারের সংখ্যা বেশি বলে অনেককেই অধিকাংশ সময় বসে থাকতে হয়। অথচ নীচের দিকে সাধারণ কর্মচারীর প্রয়োজন থাকলেও তাদের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে না।

বোনাস আইন সংশোধনের ফলে কর্মচারীদের বোনাস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বদিও আই আর সি আই কোম্পানী আইন অস্থায়ী একটি রেজিষ্টার্ড কোম্পানী এবং সংশোধিত আইনে তার বিশেষ সত্তা আছে, তাই এর নাম থেকে “লিমিটেড” শব্দটা বাদ দেওয়া হল।

অফিসারদের আর্থিক ও অন্যান্য নানা রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে যা আই আর সি আইয়ের দরবস্তার অন্ততম কারণ। অপরদিকে সাধারণ কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। দুজন জেনারেল ম্যানেজার (বেতনক্রম ২,৫০০-৩০০০ টাকা) অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার ও ম্যানেজারদের (বেতনক্রম ১৩৫০-২৫০০ টাকা) এবং ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও জুনিয়র অফিসারদের (বেতনক্রম ৬০০-১২০০ টাকা) বাড়ি ভাড়া বাবদ দেওয়া হয় বৎসকমে মাসে ১৪০০ টাকা, ৮০০ টাকা ও ৬০০ টাকা। অপর দিকে টেনোগ্রাফার, কেরানী, টাইপিষ্ট ইত্যাদিদের (বেতনক্রম ২০০-৬২০ টাকা) এবং পিয়ন ও অন্যান্যদের (বেতনক্রম ১২০-৩০০ টাকা) বাড়ী ভাড়া বাবদ দেওয়া হয় বৎসকমে মাসে ন্যূনতম ৩০ টাকা ও সর্বোচ্চ ৭৫ টাকা এবং ২৪ টাকা। অর্থাৎ আই আর সি আইয়ে জেনারেল ম্যানেজার ও পিয়নের মধ্যে বেতনের পার্থক্য যেখানে ২০৮৩ শতাংশ, সেখানে বাড়ি ভাড়ার পার্থক্য ৫৮০০ শতাংশ।

আই আর সি আইয়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শ্রী বি বি ঘোষ। তার আকস্মিক মৃত্যুর পর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন শ্রীম্বর সি দত্ত আই সি এস। তার এবং প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রী সি টি দাশের নেতৃত্বে আই আর সি আই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। ১৯৭৪ সালে বর্তমান চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ করেন এবং শ্রী সি টি দাসও এই সংস্থা ত্যাগ করেন। তারপর থেকেই এর অধোগতি শুরু হয়। এখন এই সংস্থা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছে যে একে হুহু করে তোলার জন্য বিস্তৃত তদন্ত প্রয়োজন। হাজার হাজার প্রমিতের জীবন-মৃত্যু নির্ভর করেছে আই আর সি আইয়ের যোগ্য পরিচালন ব্যবস্থার ওপর।

পুলিশের সাহায্যে ডাকাতি

(দর্পণের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি)

চণ্ডীতলা থানা অঞ্চলে ব্যাপক ডাকাতি ও চণ্ডীতলা থানার এও দল কর্মীর সঙ্গে ডাকাতদের যোগাযোগের সংবাদ (২২ এপ্রিল দর্পণ) প্রকাশিত হবার আগের রাতেই মশাট বাজারে দুঃসাহসিক ডাকাতি হল।

চণ্ডীতলা থানার পুলিশ পোষ্টিং ছিল মশাট বাজারে মার্শালের স্টেশনে। ডাকাতি হলো মাত্র দুহাতা দূরে। প্রায় বাইশ মিনিট ধরে। একটি দোকানের ক্যাস ব্যাল্ড ভাঙা হলো, ইংরাজ আমলের তিনমণ ওজনের সিন্দুক খোলা হলো গ্যাস চালিয়ে আগুন দিয়ে।

ডাকাতরা উধাও। বাজারের লোক স্পষ্ট দেখেছে ডাকাত দলের গাড়ীর পিছনে পুলিশের আল দেওয়া গ্যান। মিশেবে ধীরে ধীরে দুটি গাড়ী চলে গেল। রক্ষক ভক্ষক হলে মাফ বাচবে কি করে? মশাট বাজারের আর জি, পার্টির দাবী : থানার দাবী কর্মীদের সাজা চাই। কিছু কনস্টেবল বাবু ও অন্যান্য কর্মীরা তাল গাছের রস (এ সময়ে সন্ধ্যার দিকে তাল গাছে রস নামানো হয়। গেরানো রসই হলো তালি) খেতে রাতে সন্ধ্যার কোথায় যান? জানতে চেয়েছেন হুগলী জেলা জনতা দলের জনৈক কর্মী ও ভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

থানার বাবুরা বেআইনী তাল গাছে রস কাটাতে দিচ্ছেন বাদের তাল গাছ কাটার লাইসেন্স নেই। লালবাজার ও চণ্ডীতলা থানার ওপর হুক। কদিন আগে লালবাজার

থেকে পুলিশ এসে চণ্ডীতলা থানার নাকের ডগা কুমীরমোড়া অঞ্চল থেকে বে-আইনী সোনা ধরলেন। উদ্ধার করে চলে গেলেন চণ্ডীতলা থানাকে না জানিয়েই। ডাকাতির ব্যাপকতার চণ্ডীতলা মশাট জমল-পাড়ার মাফবের 'চোখে ঘুম নেই। থানার কিছু কর্মীর সাহায্যেই নাকি সরকারী ডিপ টিউবওয়েলের বয়সপাতি চুরি যাচ্ছে মাঠের মধ্যে। দর্পণে খবর বের হবার পর আর, জি, পার্টির কর্মীদের থানা থেকে ছমকী দেওয়া হচ্ছে এই সব খবর ফাঁসের জন্ত।

অথচ ইতিমধ্যে আবার চুরি হলো নবাবপুরে থানার কাছেই। ডাকাতের রেল ইয়ার্ডের জিনিস চুরি ওয়াগন রেকার্ডের সঙ্গে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে চণ্ডীতলা থানায় রগড়া হয় প্রকাশ্য দিনের বেলা।

শান্তিপ্রিয় লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত। চুরি ছিনতাই রোজ বাড়ছে। স্বরণ থাকতে পারে দুমাস আগে চণ্ডীতলা থানার কিছু পুলিশ থানার পাশে মুখিখানার হামলা করে ডাকাতি করে।

টহলদার বাইরের পুলিশের হাতে ধরা পড়ে চণ্ডীতলা থানার পুলিশরা। হতভাগ্য দোকানদার সব কটি পুলিশকে চিনিরে দিয়েছে। তবে প্রতিকার পায়নি বরং প্রাণভয়ে আছে।

চণ্ডীতলা থানার বাবুদের রক্তচক্ষু বলছে—জলে বাস করে ব্যাটা কুমীরের সঙ্গে লাগিস।

নির্বাচনী ঐক্য জিন্দাবাদ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দম্পতি বেহালার অভয়পদ বলে অস্বস্তি গণতন্ত্রী কংগ্রেসের দক্ষিণ ১৪ পরগণার সংগঠক ও সমর্থকদের কনভেনশনে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বামপন্থী দল সমেত জনতা ও গণতন্ত্রী কংগ্রেসের মোর্চা গঠনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীবিমল সিংহ। এই কনভেনশনে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ২৮টি বিধানসভা কেন্দ্রের ১১০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই কনভেনশনে বহু বাধীনতা সংগ্রামী ও প্রাক্তন কংগ্রেসের নেতা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কনভেনশনে শ্রীবিমল সিংহ, শ্রীসীতিকর্ণ ভট্টাচার্য, শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ভবেন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তৃতায় পশ্চিমবঙ্গে হুহু রাজ-নৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলার শপথ নেন। এছাড়া সভাপতি শ্রীসিংহ

তাঁর বক্তৃতায় এই বলে হুঁশিয়ারী দেন যে, সুযোগ সন্ধানী, বামবাজ কংগ্রেসীরা ও ওত্তারা এখন জনতা ও গণতন্ত্রী কংগ্রেসে ভীড়তে চাইছে। অন্তরিক্তে পুঁজিপতিদের দালালরা সি পি এম সহ বামপন্থীদল ও জনতা-গণতন্ত্রী কংগ্রেসের মোর্চায় কটল ধরাবার জন্য সচেষ্ট। তিনি আরও বলেন, “বেহা-চারী ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে একযোগে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বামপন্থী দলগুলোর সঙ্গে আমাদের মৈত্রী গড়ে উঠেছে। আমরা মাধার মণির মত সেই মৈত্রী অক্ষুণ্ণ রাখব।”

জানা যায়, গণতন্ত্রী কংগ্রেস এখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠন গড়ার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন। তবে, এখনো পশ্চিমবঙ্গের নানা স্তরে হুনির্দিষ্ট কমিটি গঠিত না হওয়ার কারণে বিঘ্ন হচ্ছে এবং সমর্থকদের মধ্যে হতাশা দেখা যাচ্ছে, এমন কি বেক্সর নেতৃত্ব সম্পর্কে উদ্ভা।

জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে

পরীক্ষা নিয়ে বিভ্রাট

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্রদের এখন ত্রিশতু অবস্থা। ছাত্রদের অভিভাবকদের অবস্থা আরও কলঙ্ক। এর মূল কারণ কলেজের চতুর্থ বার্ষিক ছাত্রদের পরীক্ষা বিভ্রাটকে কেন্দ্র করে কলেজে এক অশান্তির অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

চতুর্থ বর্ষের ছাত্রদের একটি পরীক্ষা গত ২৭ জুলাইর অস্বস্তি হয়। প্রথমে ছাত্ররা পরীক্ষা দিতে গয়রাজী হল। এদের বক্তব্য মাত্র তিনমাসের ক্লাসের পড়াশুনার বাৎসরিক পরীক্ষা তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

শেষে কলেজ কর্তৃপক্ষ আশাস দেন বতটুকু পড়ানো হয়েছে তারই মধ্যে পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরীক্ষা হলে ছাত্ররা অস্বস্তি হয়ে দেখেন কর্তৃপক্ষ সেকথা রাখেন নি। ক্লাশে পড়ানো হয়নি এমন সব প্রস্তরও উত্তর চাওয়া হয়েছে। প্রতিবাদে চতুর্থ বর্ষের মোট ১৭ জন ছাত্রের মধ্যে ১৪ জন ছাত্রই পরীক্ষা হল থেকে বেরিয়ে আসেন। তারা সিদ্ধান্ত নেন কর্তৃপক্ষের প্রতি-

শ্রুতি ভঙ্গের প্রতিবাদে তারা পরীক্ষা বরকট করবেন।

বিবরণটি শেষ পর্যন্ত পুলিশে গড়ায়। অভিযোগ—এই সময় বিখ্যাত বাগচী, জ্যোতির্ষ চ্যাটার্জী, স্থানালকাতি বহু পুলিশের হাতে হেনস্থা হন।

হোটেল থেকেও ছাত্রদের বিভ্রাটের ব্যবস্থা পাকা করা হয়। এরপর থেকেই ছাত্রদের অধিকাংশ কলেজ ছাড়া।

অভিভাবকদের পক্ষ থেকে বিবরণটি শিক্ষাবলী সহ বিভিন্ন দপ্তরে জানান হয়। জানা যায় এখনও কোনও ফরশালা হয়নি। কলে ছাত্র ও অভিভাবকরা দিশেহারা হয়ে এখন ঘুরছেন সামান্য সুবিচারের আশায়। ছাত্রদের বক্তব্য তারা পুনরায় পরীক্ষা দিতে রাজী। তবে অবশ্যই বতটুকু পড়ানো হয়েছে তার মধ্য থেকেই প্রশ্ন করতে হবে।

বলা বাহুল্য—চতুর্থ বর্ষের এই পরীক্ষা বিভ্রাটকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাত্রদের মধ্যে তুমুল বিভ্রাতি চলছে।



સજ્જ સંગ્રામ પ્રસન્ન

শ্রীমত্‌নারায়ণ সিংয়ের সঙ্গে
শ্রীচরণ সিংয়ের সাক্ষাৎকার, এবং
সাংবাদিক বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে
আমার কিছু বলার আছে।

নিম্নে সি. পি. আই (এম-এল) -এর সাধারণ সম্পাদক হিসাবে জাহির করার অধিকার তাকে কে দিয়েছে? একথা সত্যি দে সি পি আই (এম-এল) নামধারী কয়েকটা উপদল তৈরী হয়েছে, কিন্তু তার অনেক আগেই ১৯৭০-৭১ সাল নাগাদ খ্রীষ্টিয়ানের সংশোধনবাদী রাজনীতি পার্টির মধ্যে উদ্ঘাটিত হয়ে বার এবং সেই সময় থেকেই তিনি পার্টি তথা সংগ্রাম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। দীর্ঘ রাজনৈতিক দুই লাইনের লড়াই চলার ফলে, নানা উপদল থাকা সত্ত্বেও ভারতের বৃহৎ প্রকৃত সি, পি, আই (এম-এল) দৃঢ়ভাবে জনতার গভীরে আঁকড় বর্তমান। বিহারে, পশ্চিমবঙ্গে, অন্ধ্র এবং অসম তাদের পরিচালনায় সমগ্র সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের নিয়মিত কাগজও বেয়োর : দেশব্রতী, লাল বাঁতা (শ্রমিকের রাজ দখলের হাতিয়ার), লোক যুদ্ধ এবং লিবারেশন। খ্রীষ্টিয়ানের এই পার্টির সঙ্গে কোন সংস্রব নেই। সি, পি, আই (এম-এল) যবার স্ট্যাম্প থাকলেই সি, পি, আই (এম-এল) হয় না।

ক্রীসিং জেলে আটক নক্সাল
বন্দীদের অন্ত মারাকারা কঁদছেন।
এটা সব সংশোধনবাদীদের একটা
সাইড লাইন, বিশেষ করে নির্বাচনের
প্রাকালে। তারা ভাল ভাবেই জানে
যে, জেলে আটক ৩৫০০০ নক্সাল
বন্দীর (অর্জ কার্ণাণ্ডের হিসাব)
অন্ত দেশের প্রতি মানুষের সহানুভূতি
আছে তাই তাঁদের সহানুভূতিকে
ভাঙ্গিয়ে ভোট জেতার অন্ত এটা
একটা নোংরা প্রচেষ্টা। ক্রীসিং এই
শিবিরে যোগ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি
গোড়া থেকেই পার্টি তথা জনগণের
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে,
সংগ্রামী মানুষের কাছে তার 'সহানু-
ভূতির' কানাকড়িও দাম নেই।

শ্রীলিং বার বার বলেছেন 'যে
সি, পি, আই, (এম-এল)-এর কর্মীদের
উপর কংগ্রেস তথা ইন্দিরা সরকার
অকণ্ঠ্য নির্যাতন চালিয়েছে। শুধু
এটা বলে অ-কংগ্রেসী সরকারের সমর্থন
অর্জন করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু
এই ভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করা
যাবে না। পশ্চিমবঙ্গে এবং কেরলায়
তো অ-কংগ্রেসী সরকার ছিল, কিন্তু

তখন ভোঁ বিপ্লবীদের ওপর দমন-
পীড়ন একটুও কমে নি।

এবার নির্বাচন প্রসঙ্গ। শ্রীসিং বলেছেন, ভোটের ফলাফল শুধু ক্যাসিস্ট কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই রায় দেয় নি, সি, পি, আই, (এম-এল)-এর 'নির্বাচন বরকট করুন' লাইনের বিরুদ্ধেও রায় দিয়েছে। শ্রীসিংয়ের এই মত ভুল। নির্বাচন কি? লেনিন খুব সঠিক ভাবেই দেখিয়েছেন যে, দেশে যখন 'চমৎকার বিপ্লবী পরিস্থিতি' বর্তমান তখন কোন শাসক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি দল দেশের মানুষকে শোষণ করবে, সেটা ভোটের দ্বারা সমাধান করার মানেই হল নির্বাচন। আরও বলেছেন যে দলই ক্ষমতায় আসুক তারা শুধু গিরগিটির মত রং পাল্টায়। চরিত্র পাল্টায় না। ভারতের ক্ষেত্রে এই বক্তব্য চমৎকার ভাবে প্রযোজ্য। যে সরকারই ক্ষমতায় থাক, তারা জনগণের কোন কল্যাণই করতে পারবে না। ভারতে নকশালাভী এবং শ্রীকাকুলামের সশস্ত্র সংগ্রাম এবং আত্মজাতিক ক্ষেত্রে চীনের পর লাওস, কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনাম, সারা বিশ্ববাসীকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া শোষিত মানুষের মুক্তি নেই। তবুও ভারতবাসী এত উৎসাহের সঙ্গে ভোট দিয়েছেন কেন? প্রথমে স্বরণ রাখা দরকার যে ৪০ শতাংশের অধিক মানুষ ভোটই দেন নি। এই সংখ্যা যথেষ্ট বিপুল। এঁরা রাজনৈতিক সচেতনতার কলে ভোট দেননি এটা নাও হতে পারে তবে ভারতের সশস্ত্র সংগ্রাম যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করলে সচেতন ভাবে এই সংখ্যা বে বাড়বে, এটা ঠিক। কোন দল ক্ষমতায় আসবে, তাদের চরিত্র গণতান্ত্রিক কিনা, এটা ঠিক করার জন্য মানুষ মোটেই ভোট দেন নি। তাঁরা ভোট দিয়েছেন এই আশায় সে ক্যাসিস্ট ইন্দিরা গান্ধী বেন আবার ক্ষমতায় না আসতে পারে। তাঁরা ভোট দিয়েছেন পরিবর্তনের আশায় এবং সেই পরিবর্তনের 'প্রতিশ্রুতি' বে দিয়েছে, তাকেই তাঁরা সরল মনে ভোট দিয়েছেন। তার একটা কারণ হল যে ভোট দেওয়া মানুষের অভ্যাস হয়ে গেছে, কুসংস্কারের মত। তাই এই অভ্যাস ছ এক দিনে দূর হয় না। ভিয়েতনামে যখন সশস্ত্র সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করেছিল, তখনও নির্বাচনে বড় অংশের মানুষ অংশ

এহণ করেছিলেন। মানুষের এই
ভোটদানের প্রকৃতি সাত্ত্বিক সি, পি;
আই (এম এল)-এর 'নির্বাচন বরকট
কলন' লাইন থাকা খুবই প্রয়োজন
এবং সঠিক।

খ্রীস্টের পথ ‘হিংসার পথ’ নয়, তার পথ ‘মার্কসবাদ-লেনিনবাদ’। তার ‘মার্কসবাদ-লেনিনবাদ’ কি উনি বললেন না কেন ? তার বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। উনি স্বাস্থ্যবিধি চোরাম্যান-মাণ্ডের বিরোধিতা করেছেন। চোরাম্যান বলেছিলেন বিপ্লব-চলাকালীন যে আমরাও বন্দুক ধরতে চাই (শোষণ শ্রেণীর অভ্যুত্থান) কিন্তু তার অর্থ এখন আমাদের আরও দৃঢ় ভাবে বন্দুক ধরতে হবে। শত্রুর প্রতি হিংসার পথ (শ্রেণীশত্রু ধর্ম তথা নশত্র সংগ্রাম) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—এটাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ।

শ্রীমজ্জ কার্ণাণ্ডেয় আত্মগোপন
করেছিলেন, তার মুখ্য কারণ ছিল
প্রোথার প্রভাব। ৬৮ সালের পর
থেকে সি, পি, আই (এম-এল) আণ্ডার
গ্রাউণ্ড গেছে তার মুখ্য কারণ হল,
জনগণের মধ্যে প্রসার লাভ করা
এবং সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা।
এই দুই কারণের মধ্যে আকাশ
পাতাল তফাত।

গোপাল সেন

নতুন কর্মসূচী চাই

নকশালাবাজীর আন্দোলন যখন
জয়লাভ করে তখন এর সমর্থনে অনেক
কেই এগিয়ে আসেন। প্রথমে সি সি
সি আর এই নামে কমিউনিষ্ট বিপ্লবী-
দের দেশত্যাগী পত্রিকা সারফং একত্রিত
করার চেষ্টা হয়। এছাড়াও দক্ষিণ
দেশ নামক পত্রিকাও কমিউনিষ্ট
বিপ্লবীদের একত্রিত করার চেষ্টা করে।
তাছাড়াও এন এল ডি এফ এবং
আরও নানান গ্রুপ বিভিন্ন পত্রিকা
সারফং নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে
থাকে।

পরবর্তীকালে সি সি সি আর-ই
সি পি আই (এম-এল) পার্টি গঠন
করে এবং দেশব্রতী কাগজই সি
পি আই (এম-এল)-এর মুখপত্র
হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে
কিন্তু এর বাইরেও দক্ষিণ দেশের এস
সি সি এবং অন্যান্য গ্রুপও নকশালি
বাড়ীর রাজনীতি প্রচার করতে থাকে।
পরবর্তীকালে এই নকশালপন্থীরাই
শাসকদলের আক্রমণের প্রধান শিকার
হয়ে ওঠে এবং অসংখ্য আদর্শবাদী
যুবক পুলিশের গুলীতে এবং অন্যান্য
ভাবে নিহত হয়। এমনকি জেলগো
নির্মমভাবে গুলী চালিয়ে এবং লাঠি
পেটা করে অনেককে হত্যা করা হয়।
এত অত্যাচার সত্ত্বেও কিন্তু তখন এই
নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জনমত
বিশেষভাবে প্রতিবাদ মুখর হয়ে

ওঠেনি, অপর দিকে নকশালপাহীদের
কোন গণসংগঠন না থাকায় তার
মাধ্যমেও এর প্রতিবাদ করা সম্ভব হয়ে
ওঠেনি।

কিন্তু এখন ভারতের রাজনীতিতে
বিরাট পট পরিবর্তন হয়ে গেছে।
জনতা সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চরণ সিং
নকশালপন্থীদের সঙ্গে আলোচনা
করতে রাজী আছেন, এবং তার এই
আবেদনে সাড়া দিয়ে নকশাল নেতা
সত্যনারায়ণ সিং তার সঙ্গে দেখা
করেছেন।

এই মুহূর্তে অতীতের সমস্ত ভুল
ক্রটি ভুলে নকশাঅপন্থীদের উচিত গণ-
সংগঠনের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং
জনগণের দৈনন্দিন সংগ্রামে অংশগ্রহণ
করে তাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। গণ-
তান্ত্রিক রাষ্ট্রে মতবাদ প্রচারের যে
স্বযোগ আছে সেগুলোকে গ্রহণ করতে
হবে। এবং তার মাধ্যমেই সংগঠনকে
এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমরা
জানি যতদিন না শ্রমিক-কৃষক রাজ
কায়দা হচ্ছে ততদিন মানুষের ন্যূনতম
অধিকার অর্থাৎ খেয়ে পরে বেঁচে থাকার
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। কিন্তু
চাইলেই ত সব কিছু হয়ে যায় না।
তাই চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য গণ
তান্ত্রিক অধিকারের সমস্ত স্বযোগই
গ্রহণ করতে হবে, গণসংগঠন তৈরীর
দিকে এগিয়ে যেতে হবে, নির্বাচনে
অংশগ্রহণ করতে হবে, ফ্রেন্ড ইউনিয়ন
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হবে
এবং সেইভাবে পার্টি কার্যবলী রচনা
করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা
 দরকার, সি পি আই (এম এল) পার্টি
 কংগ্রেস ডেকে নতুনভাবে কর্মসূচী
 গ্রহণ করা উচিত। এই কংগ্রেসে এই
 দল ছাড়াও নকশালগহীদের অন্তর্ভুক্ত
 যে সমস্ত সংগঠন আছে তাদেরকেও
 আহ্বান করা উচিত এবং আলোচনার
 মাধ্যমে নতুন ভাবে কর্মসূচী গ্রহণ
 করে শ্রমিক-কৃষক রাজ গঠনের দিকে
 এগিয়ে যেতে হবে। তবেই যারা এই
 আদর্শের অন্তর্ভুক্ত শহীদ হয়েছেন তাদের
 প্রতি যথার্থ সম্মান,দেখান হবে এবং
 নিপীড়িত ভারতের জনগণের আশা
 পূরণের জন্য সঠিক ভাবে মার্কসবাদী-
 লেনিনবাদী পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব
 হবে।

ভিত্তিহীন অভিযোগ

দর্পণের ১৫ই এপ্রিল সংখ্যায়
“চাকরীর ব্যাশারে পক্ষপাতিত্ব” শীর্ষক
সংবাদে যে অভিযোগ করা হয়েছে
তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং আমি তার
প্রতিবাদ করছি। ইন্টারভিউয়ের দিন
আরও অনেক প্রার্থী ছিলেন এবং সাত
বা আটজন বিশিষ্ট অফিসারকে নিয়ে
গঠিত সিলেকশন বোর্ডের সামনে

সকলেই হাজির হওয়ার সুযোগ
পেয়েছেন। উপরন্তু ডেপুটি সেক্রেটারী
শ্রী এ বি বসু এবং শ্রী এ কে মৈত্রেয়
সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই।
আমার পিতা একজন সিনিয়র পুলিশ
অফিসার বলে আমার স্বপক্ষে পুলিশ
ভেরিফিকেশন রিপোর্ট পেয়েছি এ
কথাও সত্য নয়। আমি এখনও বেকার
এবং এ কথাও ভিত্তিহীন যে, আমি
কোন আইনজীবীর সঙ্গে যুক্ত থেকে
রোজগার করছি। এ কথা বলাও
অবৈজ্ঞানিক যে, আমি একজন দেশাদার
কণ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী। এর আগে আমি
অস্বাস্থ্যবোধে রাজ্য সরকারের চাকরী
করেছি। বর্তমানে আমি স্বল্পনাথ
কলেজে আইন পড়ছি। মনে হয়
কোন দীর্ঘকালের ব্যক্তি অন্তরা
প্রণোদিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে এই
ভিত্তিহীন অভিযোগ আপনাদের কাছে
পাঠিয়েছে। উদ্দেশ্য, উন্নয়ন ও পরি-
কল্পনা দপ্তরে রিসার্চ অফিসারের পদে
জামার কাজ করার অধিকার নষ্টাণ্ড
করে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ
করা। অথচ আমি চাকরী পেয়েছি
সম্পূর্ণরূপে আমার যোগ্যতায়। আমি
(বিশুদ্ধ অক্ষশাস্ত্রে) একজন এম এল
সি এবং রাজ্য সরকারের অফিসে
কাজ করার অভিজ্ঞতাও আমার
আছে।

রেল কতৃপাক্ষের অবিচার

রেলমন্ত্রী শ্রীমধু দত্তবতে, প্রথমন্ত্রী
শ্রীবীন্দ্র বর্মা এবং প্রধানমন্ত্রী
শ্রীমোবরাজী দেশাইয়ের কাছে
নিম্নলিখিত অবিচারের ঘটনা আনুষ্ঠি-
প্রতিকারের আশায়।

আমার স্বামী চণ্ডীদাস মুখোপা-
ধ্যায় কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্ক-
শপের ক্যারেন্স ও ওয়ার্গন শপের
প্রোডাকশান কন্ট্রোল অর্গানাই-
জেশনে একটি পদে দীর্ঘ ১৫।১৬
বছর কাজ করার পর হঠাৎ গত
২০।১।৭৭ তারিখে এক আদেশ বলে
তার বেতন ৭০ টাকা কমিয়ে তাকে
অন্তান্ত বদলী করা হয়। এখানে
উল্লেখযোগ্য হল—(১) কাঁচরাপাড়া
রেলওয়ে ওয়ার্কশপে তার বিভাগের
কর্মীদের মধ্যে আমার স্বামী বে শুধু
সবচেয়ে পুরনো তাই নয়, সাধারণ
শিক্ষাগত ও টেকনিক্যাল এবং অত্যন্ত
বিবিধ গুণগত উৎকর্ষতার সম্ভবতঃ
তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। (২) তার ছয়জন
সহকর্মীকে ১৯৭৬ সালের শেষদিকে
অসুস্থভাবে মূল বেতন ও ভেল কমিয়ে
শেখ বদলী করা হয়েছিল। কিন্তু পরে
গত ফেব্রুয়ারী মাসে তাদের ব্যক্তিগত
আবেদনে সাদা দিয়ে স্থানীয়
(শেখাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

দানিকেন তত্ত্বের আলোকে মহাভারতের সূচী ও দেবতা বীরেন্দ্র মিশ্র

রহস্যময় রশ্মিরূপ

‘দেবতার কি গ্রহাভ্যন্তর মায়া?’ এই এক অদ্ভুত প্রশ্ন উত্থাপন করে তরুণ হুইশ গবেষক এরিক ভন দানিকেন আমাদের চিন্তার অগতে নোতুন হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন। যেঁটেছেন তিনি অনেক পুরাণ গ্রন্থ, সভ্য অসভ্য আদিম জাতির প্রাচীন পুঁথি থেকে খুঁটে খুঁটে উদ্ধার করেছেন বিপুল তথ্যসমৃদ্ধি, ছুটে বেড়িয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তথ্য ও চিত্রাবলী সংগ্রহের জন্য এবং আমাদের সামনে রেখেছেন বহু প্রাচীন শিলাচিত্র ও শৈলযুতির আলোকচিত্র। তারপর বিচারে বসেছেন এই প্রশ্নটি নিয়ে: প্রাগৈতিহাসিক ইনিয়ার সর্বত্রই রহস্যময় রশ্মিরূপে চেপে ধরা আমাদের গোলকে অবতরণ করেছিলেন এবং তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানহীন মানুষ যে আকাশচারীদের দেখে বিশ্বয়ে আত্মশঙ্কিত হয়ে সেই আগন্তুকদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তারাই কি মানুষের চাক্ষুষ করা দেবতা? দেবতার কি গ্রহাভ্যন্তরই মায়া? আমাদের প্রাথমিক জ্ঞান ও শিক্ষা কি তাঁদেরই কাছ থেকে সংগৃহীত?

দানিকেনের যুক্তি-তর্ক-বিচার ও সংগ্রহে বস্তুতঃ মুগ্ধ হতে হয়। ব্যাখ্যাহীন আশ্চর্য বস্তুর নিদর্শন হিসেবে আজও পর্যন্ত পৃথিবীর নানা স্থানে যাকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, দানিকেন তাঁর এই একটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সব কিছুরই যুক্তিসম্মত বুদ্ধিগ্রাহ্য ও তথ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা হাঙ্গির করতে সক্ষম হয়েছেন। দানিকেনের লক্ষ লক্ষ পাঠকের অনেকেই হয়ত আজ আমরাই মতো অভিভূত। তাঁর যুক্তি অনেকে গ্রহণযোগ্য মনে করছেন, আর ধারা তা পারছেন না, পাণ্ডা যুক্তি উত্থাপন করে তাঁর ও কিস্তি দানিকেন-তত্ত্বকে এ পর্যন্ত অস্বীকার করতে এগিয়ে আসেননি। বরং তাঁর যুক্তির সারবত্তা সম্পর্কে মনে মনে আকর্ষিত হয়েছেন বলেই দানিকেন আজ পৃথিবীর যে প্রান্তে যাচ্ছেন সেখানেই সমর্থিত হচ্ছেন। এমন কি সরকারী দায়িত্বশীল পদস্থ ব্যক্তিরাও তাঁকে সম্মান প্রদর্শনে কৃতা প্রকাশ করেন নি। এ সবেই অর্ধ, আমাদের চিন্তায় দানিকেনতত্ত্ব বেশ ভালোভাবেই জারণা করে নিতে শুরু করেছে।

দানিকেন পাঠের পর আমার নিজের অবস্থা বেসামান্য হয়ে পড়েছে। হয়ত আরও অনেকের অবস্থাও অতরূপ। আমি আমাদের মহাভারতের পর্বে পর্বে দেবতে পাচ্ছি, দানিকেনের ব্যাখ্যার আলোকে মহাভারতের বর্গ ও দেবতা অনেক বুদ্ধিগ্রাহ্য বাস্তব বস্তু হিসেবে ও চরিত্রে দেখা দিচ্ছে। ঠিক এইভাবেই, দানিকেনের ব্যাখ্যা পাঠের পর, বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট পর্বের এক পরগণায় ইজেকিয়েলের দেবদর্শন ও দৈবদরশন সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছেন বর্তমান কালের প্রখ্যাত রকেট বিসারদ এবং N A S A-র নির্মাণ গবেষণা সংস্থার প্রধান স্বয়ং বোসেফ এফ রুমরিশ সাহেব। তিনি বিশেষ ভাবে প্রাচীন পিতা ইজেকিয়েলের দেখা দেবদর্শনটি বিচার করে বলেছেন, “যদি দেখছি, ইজেকিয়েলের (দেখা) মহাকাশবানের আয়তন সমূহ একান্ত বিশ্বাসযোগ্য।” কেননা “তাঁর কথা-মাঝার ফল

কেবল প্রযুক্তি সম্ভব নয়, প্রয়োগ সম্ভবও বটে,” (আমার পৃথিবী, দানিকেন। অল্পবাদ অজিত দত্ত, লোকায়ত প্রকাশন, পৃ: ১১)। বাইবেল অনেকেই পাঠ করেছেন, কিন্তু ইজেকিয়েল যে একটি বাস্তব রকেটকে সে যুগে এই গোলকে অবতরণ করতে দেখেছিলেন, এ প্রশ্নটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই হুইশ গবেষক দানিকেন। ইনিয়ার ধর্মগ্রন্থ ও পুরাণাদি যেঁটে তাঁর ধারণা হয়েছে, “It is impossible and incredible that the chronicles of the Mahabharata, the Bible, the Epic of Gilgamesh, the texts of the Eskimos, the Red Indians, the Scandinavians, the Tibetans and many, many other sources should all tell the same stories of flying ‘god’, strange heavenly vehicles and the frightful catastrophies connected with these apparitions, by chance and without any foundation” (‘Chariots of the Gods’—Erich Von Daniken)

দানিকেনের যুক্তি বিচার ভালো করে পড়ে পুরাণো-তিহাসগুলি নিয়ে বসলে সত্যিই মনে হয়—না, পৃথিবীব্যাপী সর্বত্রই বহন মহাকাশচারী দেবতাদের কথা ছড়িয়ে আছে, শুধু সভাই নয়, অসভ্য জাতির প্রাচীন পুঁথি ও কিংবদন্তীতেও তখন তাকে ভিত্তিহীন কল্পনা কেলি বলে সরাসরি অস্বীকার করা যায়না। বিশেষিত যে দেবতাদের তৎকালীন মানুষ চাক্ষুষ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে হয়েছিল তাঁদের দীর্ঘ বাক্যলাপ, যনিষ্ট সংযোগ, এমনকি যুদ্ধ ও যৌনমিলন, সে দেবতার দেহধারী জীব ছাড়া আর কিছুই হতে পারেন না। পৃথিবীর প্রধান ধর্মতত্ত্বগুলিই বহন একেশ্বরবাদী, বৈদিক চিন্তাও যখন এক পরমতত্ত্বে বিশ্বাসী তখন ‘দেবগণ’, এই বহুবচনও যথার্থ ঐশ্বরিক সেই পরম পুরুষকে বোঝায় না। তাছাড়া যে মহাকাশচারী দেবতার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নেমে দেব-আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করেছেন, পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন ও তাঁদের বশব্দ কিছু মানুষকে সংগ্রহ করেছেন নিজেদের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য, প্রকাশ করেছেন নিজেদের শৌকিক লোভ, হিংসা ও নিকট যৌনচাঁচার, তাঁরা আমাদের কল্পনার দীর্ঘ হতে পারেন না।

ঠিক এই অত্যাশ্চর্য থেকেই গোঁড়া হিন্দু বস্তুমন্ত্র ও তথাকথিত দেবতাদের দেবতা হিসেবে বাতিল করে দিয়ে বলেছেন, এরা সব মহাপাপিষ্ঠ, এদের আরাধনাও মহাপাপ। এবং দেহতত্ত্ব ‘প্রচার’ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ “দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম” লিখে বস্তুমন্ত্র সে যুগেই দেবতার স্বরূপ ব্যাখ্যার অগ্রসর হয়েছিলেন খাঁটি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তিনিও দেখিয়েছেন যে, দেবতা শব্দের অভিধামিক অর্থ কোনো দীর্ঘরকে বোঝায় না। ‘দিব-ধাতু দীপণে’। বা দেদীপ্যমান, উজ্জল ও তেজোময়, তাই দেবতা। বস্তুমন্ত্র মনে সেদিন যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। কারণ সেদিন আমাদের ধারণা ছিল না যে মানুষ গ্রহাভ্যন্তরে যেতে পারে।

মহাকাশে স্থাপন করতে পারে উপগ্রহ। যদি সেদিন তা সম্ভব হ’ত তবে হয়ত বস্তুমন্ত্র দানিকেনের মতই প্রসারিত হতেন। তাঁরও ভিজ্ঞান হ’ত, তবে কি উজ্জল নক্ষত্রলোক থেকে রশ্মিময় উজ্জল রূপে চেপে ধরা এসেছিলেন পৃথিবীর বুকে; বিস্মিত মানুষ তাঁদেরই নাম দিয়েছিলেন দেবতা বা উজ্জল দীপ্তিময় পুরুষ বলে? বস্তুমন্ত্র ব্যাখ্যার আলোকেও আমরা আজ বুঝতে পারি, দেবতা মানেই দীর্ঘ নয়, দেবতা এক জাতের উজ্জল পুরুষের নাম।

দেবতার স্থাপন প্রতিষ্ঠার জন্য এই পৃথিবীর কিছু বুদ্ধিমান মানুষ সংগ্রহ করে নিজেদের পৃথিবাসীর কাছে পুন্ডরীর করে তুলতে চেয়েছিলেন। ধারা এই দেবতাদের বস্তুতা স্বীকার করেছেন, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পন্ন তিন গ্রহবাসীগণ (দেবতার) তাঁদের অজ্ঞ শত্রু ও বুদ্ধি কৌশলের জ্ঞান দিয়ে শক্তিশালী করেছেন এবং বিরুদ্ধ শক্তির কবল থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরাই হয়েছেন আমাদের আদি ঋষি ও মাননীয় শাসনকর্তা। তাঁদের রক্ষার জন্যই দেবতার বা ভিন্নগ্রহবাসী বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষরা পুরুষাতপূর্ণ আচরণ করেছেন সর্বত্রই। এ যুক্তিও দানিকেনের।

এই ধারণার সপক্ষে আমি মহাভারত থেকে ভূরি ভূরি তথ্য উদ্ধার করতে পারি এবং সে চেষ্টাই করব। কিন্তু তা উপযুক্ত অবসরে। আমার প্রথম প্রশ্ন শুধু হবে দেবতা ও তাঁর রহস্যময় রশ্মিরূপগুলির স্বরূপ মহাভারত থেকে চরন করে পাঠের সায়নে তুলে ধরা এবং দানিকেন তত্ত্বের আলোকে পাঠকে সেগুলি বিচার করে দেখতে অহরোধ করা।

এখানে বলে রাখা ভালো, বর্তমানে আমি বিষয়টি নিয়ে কেবলমাত্র কাল শুরু করেছি। হাতের কাছে প্রচুর গ্রন্থাদি এখনও সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। তাই আলোচ্য এই ধারাবাহিক রচনায় নতুন মতন তথ্য সংবোধনার সময় আমাকে মাঝে মাঝে পুনরুক্তির সাহায্য নিতে হতে পারে। কেউ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার কাছে সাহায্য করতে এগিয়ে এলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

আমার বিশ্বাস, মহাভারতীয় দেবতাদের সঠিক স্বরূপে ধরতে না পারা পর্যন্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মেনে নেওয়ার মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থেকে যায়। দেবতার যদি অবাস্তব হন, তবে দেবপুত্র অর্জুনও অবাস্তব, অপর পাণ্ডবরাও অবাস্তব। কুরুজুন ব্যবহৃত অস্ত্রাদিও অবাস্তব। দেবতার মহাভারত জুড়ে যে ভূমিকার প্রতিষ্ঠিত তা আত্মপুঁকিক। মহাভারতের অরুণজুন থেকে যুদ্ধিরেয় স্বর্গারোহণ পর্যন্ত দেবতাদের ভূমিকা তত্ত্বগোভ-ভাবে যুক্ত আছে। তাই দেবতাদের বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত না হলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বাস্তবতাও প্রতিষ্ঠা পায় না। কিন্তু দেবতাদের সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে না পারলেও আজকের ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতগণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে বাস্তব ঘটনা বলে স্বীকার করেছেন। অন্তত তাঁর ঐতিহাসিকতা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। যুদ্ধটি কেমন হয়েছিল এ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, যুদ্ধ যে একটা অবস্টি হয়েছিল এ বিষয়ে আজ আর সংশয়ের অবকাশ নেই। তৎকালীন ভারতের ও যুদ্ধে যোগদানকারী রাজ্যগুলির মানচিত্র যেমন প্রস্তুত হয়েছে, সন তারিখের নির্ধারণ যেমন প্রায় স্থির, তেমনি অর্জুন পৌত্র পরীক্ষিতের আমল থেকে ভারতের ইতিহাস রচনার প্রয়াসও আজ শুরু হয়ে গেছে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ক্রায়মাইকেল প্রফেসর ডঃ এইচ সি রায়চৌধুরীর ‘পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব এম-লিটেইট ইণ্ডিয়া’ প্রকাশক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০ খ্রঃ)। যখনকার্যের ফলে অনেক প্রাচীন তথ্য, বস্তু ও ঐতিহাসিক প্রমাণাদি প্রায়ই উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে। এই সবেই পরিপ্রেক্ষিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে যদি ঐতিহাসিক ঘটনা বলে স্বীকার করা হয়, তবে সেই ভারত যুদ্ধের সাথে (শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

আভা মাইতি মস্তিষ্ক নিলেন না

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য শ্রীমতী আভা মাইতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে বিখ্যাত সূত্রে খবর পাওয়া গেছে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে একজন রাষ্ট্রদূত কর্তৃক ব্যাপারে সর্ব প্রথম শ্রীমতী মাইতির নাম বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে আরও দুইজনের নামও উঠেছিল। এরা হলেন, হুশীল ধাড়া ও অশোককৃষ্ণ দত্ত।

প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই সহ বেশ কয়েকজন জনতা পার্টির নেতা শ্রীমতী মাইতি যাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বোগ দেন সে ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর চেয়ে রাজনীতিতে নবীন কয়েকজনকে পূর্ণ মন্ত্রী মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, সেই হেতু শ্রীমতী মাইতি রাষ্ট্র মন্ত্রি গ্রহণে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেন। এরপরে শ্রীমতী মাইতিকে রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে একটি দপ্তর দেওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতেও শ্রীমতী মাইতি রাজী হননি।

মহাভারতের স্বর্গ ও নরক

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অতপ্রোতভাবে যুক্ত দেবতাদেরও ঐতিহাসিক ভিত্তিহীন উপর প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত প্রয়োজন। দেবতাদের কার্য-নিক চরিত্র হিসেবে সঠিকভাবে ভাবভঙ্গির কোনো ব্যাখ্যাই বাস্তবসম্মত হতে পারে না। আত্মকের রকেটচুপে দানিকেন-তত্ত্বের আলোকে এই দেবত্বব্যাপ্য অনেক বুদ্ধিগ্রাহ্য ও সরল হয়ে এসেছে। এই ধারার ব্যাখ্যাকে মানলে আমরা পুরাণেতিহাসের একটি বাস্তব ভিত্তি পাই। অতঃপক্ষে দেবতাদের অস্তিত্ব মহাভারতকে গোঁজামিলে ভরা কল্পকথার চেহারা দান করে। কলত বহু কুসংস্কারও আমাদের জাতীয়জীবনকে আচ্ছন্ন করে থাকে। টিকে থাকে পুরোহিততন্ত্রের বুদ্ধকলী, বা রবীন্দ্রনাথকে প্রতিবাদী করেছিল। অজ্ঞতার বাস্তবমিটে জমা হয়ে থাকে আবহ-মানের আবর্জনা।

দানিকেন যুক্তি বিচারসহ প্রমাণ করেছেন। বাইবেলের ইজেকিয়েল সে যুগে একটি মহাকাশযানকে মহীতটে অবতরণ করতে দেখেছিলেন। ব্রহ্মরিশ পবীক করে বলেছেন, ইজেকিয়েলের চাক্ষু্য করা মহাকাশযানটি সম্পর্কে অস্ত্র টেটামেন্টে যে প্রতিবেদন আছে তা বর্তমানের প্রাযুক্তিক জ্ঞানের বিচারে বাস্তব বলে প্রমাণিত হয়। এমন মহাকাশযান ও মহাকাশচারীর কথা জানিয়েছেন প্রাকৃত্যবন যুগের ইহুদি পুঁথির স্রষ্টা আবেদ পুত্র এনকও। এনক মহাকাশচারী দেবতাদের সঙ্গে মহাকাশে গেছেন এবং মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে কেমন দেখায়, মহাকাশই বা কী বস্তু পৃথিবীতে ফিরে এসে ঐ এনক পুঁথিতে তারও বিবরণ রেখে গেছেন। পরে যুধিষ্ঠিরের মত দেবগণসহ এনকও মহাকাশে, প্রাচীন-সুগের ধারণায় স্বর্গে মহাপ্রস্থান করেন চিরদিনের জন্য। বাইবেলের আর এক পরগণর এজরও জানিয়ে গেছেন মহাকাশচারী দেবতাদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলাপের বিবরণ। মহাকাশচারী আগন্তুকদের দেখেছেন তৎকালীন লভ্য ও অলভ্য জাতিরা। সকলেরই তই একই ধারণা, দেবতারা এসেছিলেন উত্তর আকাশ থেকে। এসেছিলেন তাঁরা রহস্যময় রশ্মিরূপে চেপে।

আমাদের অর্জনও বিভিন্ন দেবতাকে বিভিন্ন উজ্জল বিবানে চড়ে হিমালয় শীর্ষে ইন্দ্রকীল পর্বতে (মন্ডার বা অহেন্দ্র পর্বতশ্রেণী) একের পর এক অতি অল্প সময় মধ্যে অবতরণ করতে দেখেছেন। অর্জুনও এনকের মতই মহাকাশযানে চেপে তথাকথিত 'স্বর্গে' গেছিলেন এবং সেখানে পঁচ বছর অবস্থান করে যুদ্ধবিজ্ঞা, রাজনীতি ও পার্শ্ব

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, শ্রীমতী মাইতি অবি-ভুক্ত কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদিকা ছিলেন এবং দীর্ঘ দিন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় পূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন। এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় দুইজন সদস্য রবীন্দ্র বর্মা ও সিকন্দর বকৃত রাজনীতিতে শ্রীমতী মাইতির তুলনায় নবীন।

প্রাক্তন বাংলা কংগ্রেসী নেতা যুক্তকৃষ্ণ আমলের শিল্প মন্ত্রী হুশীল ধাড়া ও জনতা পার্টির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অশোককৃষ্ণ দত্ত দুইজনেরই নাম মন্ত্রিসভার ব্যাপারে উঠেছিল। হুশীলবাবু ও অশোকবাবু দুজনেই রাজনীতিতে গোস্ত। তবে হুশীল ধাড়ার রাজনৈতিক জীবন অনেক দিনের।

কিন্তু অশোকবাবুর আধিপত্য দ্বিতীতে হুশীলবাবুর থেকে বেশী এবং তিনি বোগ্য ব্যক্তি। তাছাড়া পশ্চিম-বঙ্গের জনতা পার্টির চেয়ারম্যান প্রফুল্ল সেনের আশীর্বাদও অশোকবাবুর প্রতি। অতএব অশোকবাবুর মস্তিষ্ক পাকা, শুধু আত্মনৈতিক ঘোষণার অপেক্ষার।

কৌতুকোশল ও সঙ্গীত নৃত্যাদি শিক্ষা করে আসেন।

মহাভারত খুলে অর্জুনের স্বর্গযাত্রা বিবরণ পর্বদ্বারা পাঠের সময় অভিভূত আমার চোখের সামনেও যেন 'স্বর্গ খুলিয়া গেল'। অর্জুনের সঙ্গে আমিও চাক্ষু্য করলাম মহাভারতীয় দেবতারা সাধারণ রক্তমাংসের জীব ব্যতীত আর কিছু নন। তাঁরা আসছেন মহাকাশ থেকে আবার প্রত্যাবর্তন করছেন নক্ষত্রলোকে।

আগেও অনেকেই মহাভারত পড়েছেন। মহাভারত বারবার অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু অর্জুনের স্বর্গযাত্রা কারও লক্ষ্যে পড়েনি। আমি এই অধ্যায়ে এসে স্তম্ভিত হলাম। যেন পড়ল দানিকেনকে। তিনি লিখে-ছেন, মহাকাশচারী দেবতাদের কথা। লিখেছেন পৃথিবীর সর্বত্রই তাঁরা নেমেছিলেন উজল অগ্নিপ্রাণী মহাকাশযানে করে। দানিকেন মহাভারতের এই অংশ সম্পর্কে লিখে-ছেন, "Like Gilgamesh Aryuna, the hero of Mahabharata, undertakes a long journey in order to seek the gods and ask them for weapons. And when Aryuna has found the after many perils, Indra, the lord of heaven, with his wife Sachi beside him, grants him a very exclusive audience. The two of them do not meet the valiant Aryuna just any where. They meet him in a heavenly war chariot and even invite him to travel in the sky with them."

দানিকেন এখানেই থেমেছেন, কিন্তু আমাদের সন্ধানী যাত্রা তারও আগে থেকে এবং সমগ্র মহাভারত জুড়েই চলবে। আমরা একটি তত্ত্বকে পেয়েছি দানিকেনের কাছে। আমি সেই তত্ত্বকে তার যুক্তি তর্কের আলোকে অস্বীকার করতে পারিনা। কারণ তাঁর তর্কের পক্ষে যত বাস্তব যুক্তি আছে তর্কের বিপক্ষে তেমন তো কিছুই নেই। থাকতে পারে শুধু গোঁড়া বিশ্বাস যে দেবতারা কোনো অলৌকিক বস্তু। বলা বাহুল্য, এই গোঁড়ামিই আমাদের মহাভারতকে পুরাণেতিহাস বলে গ্রহণ করতে এতোকাল বাধা দিয়ে এসেছে।

অতঃপর আমি মহাভারতের দেবতাদের দেখব অর্জুনের চোখে। বিচার করব দানিকেনের জিজ্ঞাসা নিয়ে। [চলবে]

সম্মেলন নিয়ে এত গোপনতা কেন?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

চন্দননগর বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে আরো খবর পাওয়া গেছে। জানাগেছে সম্মেলনের আয়গা ইতিমধ্যে তিন বার পাটানো হয়েছে। সম্মেলনের বহরনী কর্মকর্তারা স্থানীয় প্রগতিশীল লেখক, আধুনিক মনোভাবাপন্ন মাহুষ, বিশিষ্ট চাক, গ্রন্থাগার পরিচর প্রভৃতির চাপে পড়েও তাঁদের অগণ-তান্ত্রিক মনোভাব ও কয়েদী আর্থ আড়ৌ বর্জন করেন নি। সর্ব শেষ সংবাদ, তাঁরা তাঁদের দ্বারাই তৈরী পুরোনো কমিটি ভেঙ্গে দিয়েছেন ও স্থানীয় জনসাধারণকে খোঁকা দেয়ার জন্য ও নিজেদের গোপন স্বার্থ বজায় রাখার জন্য নতুন পুরোনো কিছু পাটোয়ারী লোকজন নিয়ে আবার নতুন কমিটি গঠন করেছেন। এইটিই খলিসালী নামক

মতামত

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

প্রশাসনের সর্বপ্রধান শ্রী এ বি সিং তাঁদের পুরনো আয়গার কিরিয়ে এনে পুরনো পে-কেল দেন। (৩) কিন্তু আমার স্বামী তার সম্পর্কে অবিচারের বিরুদ্ধে লিখিত আবেদন ও শ্রীসিংয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেও কোন স্থবিচার পাননি।

তার প্রতি স্থানীয় প্রশাসনের অবিচারের কারণ হয়ত তিনি প্রত্যা-শালী কোন দুইচক্রেয় শিকার হয়েছেন অথবা তার এইসব "অপরাধ"—(১) ১৯৭৪ সালের মে মাসে বিশ দিনব্যাপী ঐতিহাসিক রেল বর্মঘটের ৫ম দিন সকালে তাকে ভর ও প্রলোভন দেখিয়ে কাজে বোগ দেওয়াতে না পেয়ে ব্যারাক-পুর এস ডি সি ও পুলিশ ত্যানে করে ধরে নিয়ে বান। সারাদিন তাকে ধরে রেখে কিছু খেতে না দিয়ে নতুন করে প্রলোভন ও ভর দেখিয়ে কাজে বোগ দেওয়াতে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় নিতান্ত সেই সময়ে আমাদের শিশুপুত্র প্রাণসংসার রোগে ভুগছিল তাই। (২) এমার্জেন্টার সেই নিদারুণ আতঙ্কময় দিনেও তিনি অসুস্থ হতে যে নিজে ও সহকর্মীদের স্ত্রী দাবী দাওয়া নিয়ে লড়তে ছাড়েন নি, বার কলে তিনি উপরওলাদের বিরাগ-ভাজন হয়েছেন। (৩) তিনি জনৈক শপথপারিটেণ্ডেন্টের নামাবিধ ঘূর্ণীতি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরেছেন কিন্তু সেই ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের কাছে পুরস্কার পেয়েছেন। শোনা যায় এই ব্যক্তি খুব প্রভাবশালী। এছাড়াও আমার স্বামী এক ভীমরূলের চাকে আঘাত করেছেন যারা কর্মচারীদের কোয়ার্টার বিতরণের ব্যাপারে নামাবিকম ঘূর্ণীতিতে লিপ্ত।

গৌরী মুখোপাধ্যায়

কলেজে এখন সম্মেলন পরিচালনার কাজ করবে।

তাঁরা কিছুতেই স্থানীয় প্রগতি-শীল লেখক-কবি, লোকজনদের দাবী মত মঞ্চে নতুন মুখ নতুন কথা প্রবেশ ঘটতে দেখেন না। তাঁদের সাক্ষ্যে, আমরা কিছুতেই আন্দোলনমূলক সাহিত্যের কথাবার্তা এখানে বলতে দেব না। সাহিত্য প্রতিষ্ঠান বিরোধী আলোচনার স্থান বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন নয়।

অন্তর্ধানটিতে যাতে সাধারণ মাহুষ ও তাঁদের কাছে অব্যাহিত ধারা তাঁরা প্রবেশ করতে না পারেন, তার ব্যবস্থাও পাকা। কেননা হুদিনের অন্তর্ধানে সাধারণ মাহুষের বোগদানের জন্য লাগবে ২৫ টাকা। অর্থাৎ ওই অন্তর্ধানটিতে ২ টাকা কী দিয়ে কিছু নাবালক ছাত্রছাত্রী আত্মক, ১০ টাকা জরিমানা দিয়ে ২৫০০ জন শিক্ষক ও ২৫ টাকা দিয়ে ব্যবসায়ী, ক্যাসনবল মাহুষজন।

সাহিত্য মাহুষেরই জন্ম। সৃজন-শীল সাহিত্যের নানা দিক যদি সাহিত্য সম্মেলনে আলোচিত না হয় তাহলে এ প্রকারের প্রতিষ্ঠানের আদৌ কোন প্রয়োজন আত্মকের নতুন পরিপ্রেক্ষিতে আছে কি—চন্দন নগরের সাধারণ মাহুষের এটাই প্রশ্ন। ভাড়াটে লেখক, তথাকথিত জনপ্রিয় লেখক কবি, অগণসংস্কৃতির প্রচারক, স্রষ্ট বুদ্ধিজীবির হেঁদা কথা বক্তৃতা আমরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসম্পন্ন চন্দন-নগরবাসীরা শুনে চাই না।

তাই কর্মকর্তারা ভীত, জনরোকে সজ্ঞ হয়ে সম্মেলনটিকে একটি গ্রামের গোপন স্থানে নিয়ে গেছেন। নিরাপত্তা সেখানেও মিলবে কি?

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অবনতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ডেবরা বানার জিলোচনপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি জনকল্যাণ মূলক সরকারী প্রতিষ্ঠান হলেও সংস্কারের অভাবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি আজ অবনতির পথে। এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি বহুদিন ভাঙারবিহীন অবস্থায় ছিল। পরে ডাঃ হরিশাধন ঘোষকে এখানে ভাঙার হিসাবে নিয়োগ করা হলে স্থানীয় মাহুষ খুশি হন তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতির শুণে। কিন্তু ভাঙার ঘোষ প্রয়োজনীয় গুণ্য সরবরাহের অভাবের ফলে ঠিকমত চিকিৎসা করতে পার-ছেন না।

বহুদিন যাবৎ স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির গৃহগুলির কোন সংস্কার হয়নি। বহু স্বাস্থ্যকর্মী সপরিবারে বাস করেন। পানীয় জলের নলকূপগুলি বেশীরাগ অকেজো। পায়খানা আছে তবে তা ব্যবহারের অযোগ্য। যদিও স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির পাশ দিয়েই শিথ্য গিয়েছে তবু স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে বিদ্যাতের কোন ব্যবস্থা নেই।

জন দৃষ্টতা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লক্ষ মানুষের জন্মের। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের বক্তৃতায় পলিট-ব্যুরো সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্তের কণ্ঠে এই দৃষ্ট ঘোষণা: কোন একজন জনতা এম পি নাকি বলেছেন, ভারতে কমিউনিজমের স্থান নেই। এই সভা প্রমাণ করে বাংলার মাটিতে কমিউ-নিজমের স্থান আছে কিনা। লক্ষ হাতের করতালি কণ্ঠের উল্লাস শ্রবণে সভা ফেটে পড়ে। জনবরত শ্লোগান শোনা যায়, সাম্যবাদের জয়ধ্বনি। প্রশস্ত জীবাশ্মগুপ্ত বলেন যে, অনেকে পৃথিবী থেকে সাম্যবাদ মুছে দেবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি; সামাজ্যতান্ত্রিক দেশগুলোতে উড়ছে আজ সাম্যবাদের পতাকা।

এই বিশাল বিপুল সমাবেশের একটি বৈশিষ্ট্য হল, এখানে ধারা এবার জন্মের হইছে। তারা যেন বলছেন: ভীকৃত্যের মুখে লাগি মেয়ে আজ লাল বাঙা ওড়াই। অতীতের সি পি এম মিছিলে সত্যায় যে বাহ্য-পূর্ণ উজ্জ্বল দেখা গেছে, এবারের জন্মের তা সম্পূর্ণ বজিত। এবার জনতার আবেগ অনেক সংহত।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের পরিপেক্ষিতে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শুক্রবার ২২শে এপ্রিলের এই সভা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন। বিশেষ করে নেতাদের বক্তৃতা ছিল উগ্রতা বজিত, অনেক বেশি দারিদ্র্যশীল ও মুক্তিপূর্ণ। তাই জ্যোতি বহু বধন বললেন কেন্দ্রে যে জনতা পার্টির সরকার গঠিত হয়েছে তাদের, কিছু কাজ করার জন্য সময় দিতে হবে, তখন সভা থেকে শত শত কণ্ঠে জ্যোতি বহু সমর্থন-স্বত্ব ধ্বনি শোনা গেল। জ্যোতি বহু অবশ্য একথা জানিয়ে দিতে তুললেন না যে, সি পি এমের সঙ্গে জনতা দলের কিছু মৌলিক মত-পার্থক্য রয়েছে। তবে তিনি ইঙ্গিত দেন যে, সি পি এম যে-সব প্রসঙ্গে একমত সে-সব ক্ষেত্রে জনতা সরকারকে সমর্থন করে যাবে। জ্যোতি বহু আরও বলেন যে, ত্রিশ বছর ধরে কংগ্রেস, প্রতিষ্ঠিত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত শুধু করেছে, জনতার সরকারকে প্রমাণ করতে হবে যে, তারা অস্ত্র ধরনের সরকার যারা দেশের মানুষের মঙ্গল চান। অবশ্য এজ্ঞে কিছু সময় দেওয়া প্রয়োজন। পলিটব্যুরো সদস্য জ্যোতি বহু জনতা-সি পি এম-গণতন্ত্রী কংগ্রেসের একেবারে ওপর জোর দিয়ে বলেন যে, গণতন্ত্রের সংগ্রামে যে একা আঁমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে গণতন্ত্রের বার্ষিক প্রসারের সংগ্রামে সেই একা বজায় রাখতে

হবে। তুমুল হর্ষধ্বনিতে তার বক্তব্য অভিমুখিত হয়।

জ্যোতি বহু তাঁর বক্তৃতায় নকশাল সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির কথা বলেছেন। তিনি সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দেবার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, ১৯৭২ সালে নির্বাচনের পর কংগ্রেস সরকারের আমলে, সি পি এমের এগারো শত কর্মীকে খুন করা হয়েছে, এবং কংগ্রেসের অন্তর্কলহেও একশো সত্তরের মত মানুষ খুন হয়েছেন। তিনি খুনের কারবারীদের সম্পর্কে তদন্ত দাবি করেন। জানা যায়, জ্যোতি বহুর বক্তৃতায় এই অংশটি নকশাল মহলে ঘোষণাপত্র করেছে।

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

কারাগারে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্পেন্ডাল ব্রাককে কে কত মিসা করেছেন সেই সংখ্যায় টেক্স দেবে এবং পাঠকগণের ঘাড় ভাঙা দেয়-কর থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অর্থ পুরস্কার পাবে।

যষ্টিগুণল প্রেসিডেন্সী জেলে পচছে। পনেরো দিন অন্তর বাবা-মা জেলে গিয়ে দুদিকে ছুটো জালের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথা বলার সুযোগ পান। দম বন্ধ হবার উপক্রম প্রায় এ ছোট্ট যত্নে দশ মিনি-টের অন্তর পাঁচজন বন্দী দুটো জালের ওদিকে দর্শন আদায় করে ভালো করে দেখতেও পার না, পরস্পরের কথা শোনা তো দূরের কথা। বাবা-মা চোখের জল ফেলেন, যষ্টিরা আশাস দেয় 'হুদিন আসবে, মনে রেখো তোমার ছেলে কোন অম্মার করেনি'। ভাগ্য দৃঢ়তা তেজের জলন্ত প্রতিমূর্তি এরা কংগ্রেসকে যেতে নেয়নি তাই আজও জেলে পচছে।

সকাল থেকে রাতি পর্যন্ত একটানা একঘেয়ে জীবন। কোনো বৈচিত্র্য নেই। একই খাওয়া, একই চেনা মুখ, আকাশের একাংশই দেখছে ওরা। মিসায় পচছে তো পচছেই। অকস্মী অবস্থায় হেরিয়ার্স কর্পাসও বন্ধ, অতএব কোনো চিন্তা নেই পুলিশের। পাঁচবছর হয়ে গেল যাদের জেলজীবন তাদের কাছে পুলিশ বছর খানেক অন্তর রিভিউ করার নামে আসে, জেল অফিসে ডেকে আনেন তারপর মুচলেকার কাগজ বার করে সেই করার প্রস্তাব দেয়।

এমনিভাবে ১৯৭৭ সালের এই ফেব্রুয়ারী যষ্টিগুণলকেও মুক্ত (Released) বলে ওয়ার্ডে চিরকুট পাঠিয়ে দেল গেটে ভাঙা হয় কিন্তু গেটে জনৈক পুলিশ অফিসার ওকে বললেন, "এই কাগজে সই কর, এছনি ছেড়ে দেব," যষ্টি সেই মুচলেকার সই করেনি, অতএব মুক্তিও পায় নি। কিশোর যষ্টিগুণল জেলের মধ্যে বোঁবনে পা দিয়েছে, নির্ভাতন সহ করেছে, কিন্তু ভেঙ্গে পড়েনি।

[আরো কাহিনী আগামী সংখ্যায়]

যুব কংগ্রেস

(২য় পৃষ্ঠার পর)

মেইলংয়ে শহরে গ্রামে 'দেশপ্রেমিক' মস্তানবাহিনী দ্রুত গড়ে উঠলো। আর দিল্লী মস্তো শান্তি মৈত্রী চুক্তির আশীর্বাদ নিয়ে গোলা-বারুদের কসরতে যখন প্রকাশ্যে আওর-আওর উঠলো, সীমান্তের জেলাগুলিতে উত্তেজনার পটভূমিকার তখন রাজনৈতিক বোম্বাষণে অধারিত হয়ে এক বিশাল জাল বিস্তার করলো; তরুণ বেকার সমাজের যে ভগ্নাংশ ক্রমশঃ হতাশ ও সংগ্রামবিমুখ হয়েছিল, তাকে বিপণ্যময়ী ও নিম্নশ্রেণী-বিরোধী করে 'অবুঝ আর সবুজ'দের অস্ত্রসজ্জা হলো। যুব কংগ্রেস 'ঘোবনে' পা দিল। এবারে কাছের হাতে খড়ি সুরু হলো। "এশিয়ার মুক্তি স্বর্ঘ যুগ যুগ জিও!"

উত্তেজনা আর সন্ত্রাস চালিয়ে নিতে ইমার্জেন্সী স্থায়ী হলো; পুলিশ প্রশাসনের সহায়তার শ্রমিক কৃষক মধ্য-বিত্তের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান ছড়িয়ে পড়লো—'অবাধ্য কৃষকের জমি বাধ্য কৃষক' অবর দখল করলো, 'অবাধ্য শ্রমিকের বদলে বাধ্য শ্রমিক' এলো, 'অবাধ্য কেরাণীর বদলে বাধ্য কেরাণী'—রাজনৈতিক প্রয়োজনে পোষা লোক মাজ। 'যুব'দের কত কাজ! পুলিশের বাড়ীতে পাত্তার খবর দেওয়া, নিজেদের 'অ্যাকসন' করতে হবে, পুলিশের সঙ্গে 'জয়েন্ট অপারেশন' করতে হবে—বেলেঘাটা, দমদম, বেহাল, বাদবপু, টালিগঞ্জ, পানিহাটি, বর্ধমান, কালনা, কাটোয়, রাণাসাত, কালীপুর-বরানগর। 'সহস্রাধিক হত্যা হবে, ভিটেছাড়া হবে আরো কত। শুধু কাজ আর কাজ—দিনের চেয়ে রাতে বেশী! পুলিশেরই বা কম কিসের—ডায়মণ্ডহারবার, বারাসত, বেলেঘাটা, ভবানী দত্ত লেন আরো কত কি?

ক্রমে সারা পশ্চিমবঙ্গই একটা 'অপারেশন থিয়েটার' হয়ে উঠলো; পশ্চিমবঙ্গের 'যুবনেতা' তামাম হিন্দুস্থানে কীতি স্থাপনের কট্টাঠি পেলেন।

১৯৭২ সাল। নির্বাচনের হিংস্র তায়াসা। পরিশেষে 'অপারেশন বিভাভূন'—সন্ত্রাস, অগ্নি-সংযোগ, হত্যা ও সশস্ত্র 'স্বাবলম্বী' উপায় ব্যবস্থা (ভীতি-প্রদর্শনের সাহায্যে অর্থোপার্জন)। বিনাশ্রমে উপার্জন, উপীড়নের পথে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও খবরদারীর জন্তে কর্মতালিপা। বুর্জোয়া দর্শনের বোলকলা পূর্ণ হলো।

শান্তি মৈত্রী চুক্তি, অহুযায়ী যুব কংগ্রেসীরা ঘন ঘন মস্তো দর্শন করতে লাগলো আর আকাশবাণী আকাশ বিদীর্ণ করে চললো।

ধার্মিকেরা ধর্মপ্রচার করেন। যুব কংগ্রেসীদের ধর্মজ্ঞান নেই এমন কথা কেউ বলতে পারে না—দেশের যাবতীয় পুজো-আচ্চা সারা বছর ভুড়ে অহুষ্ঠান করে দেশে ধর্মের জোয়ার এনেছে। তার আরোজনটাই বা কি কম গণ-তান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক।

তাছাড়া, পরীক্ষাটাও তো একরকম নির্বাচন; তাই পাশ করার জন্তে 'সমাজতান্ত্রিক' পদ্ধতি চাই (গণটুকা-টুকির নৈরাজ্যবাদ)। যুব কংগ্রেসের ছোট ভাই ছাত্র পরিষদের 'আদর্শ' দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো।

সকলেই নিজ নিজ পার্টিকে বড় করতে চান। যুব কংগ্রেসও চায়। কিন্তু উপায় বৈশিষ্ট্য না থাকলে আর যুব কংগ্রেস কেন হবে? 'নিজ 'আদর্শ' যুব কংগ্রেস আত্মবান; অপরাধ-প্রবণ মানুষের সংখ্যা নগণ্য; নগণ্য সংখ্যক মানুষ নিয়ে নগণ্য পার্টি করা চলে; অতএব, নিরীহ গোবেচারাদের মনে অপরাধ প্রবণতা জাগিয়ে তুলে দিয়ে অপরাধ অহুষ্ঠান করিয়ে (বন্ধুকে দিয়ে বন্ধু হত্যা পর্যন্ত) অতঃপর তাকে ব্র্যাকবেইল করে স্থায়ী 'একটিভ' 'যুব-বাহিনী' গড়ে উঠতে লাগলো। হাড়-মাংসের বব্বা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কামড়-কামড়ি করলো—মরলোও। অঙ্গীল সাহিত্যের আর অপরাধমূলক পত্রপত্রিকার চালাও সরকারী রেজিস্ট্রেশনও এ কাজে সহায়ক হলো।

অতএব, যুব কংগ্রেস জন্ম নিল, অস্ত্রশিক্ষা নিল, পটীকা পাশ করে শিক্ষিত হলো, উপার্জন করলো, ধার্মিক হলো, সংগঠন গড়ে তুললো, দেশপ্রেম করলো, সমাজতন্ত্রের

'একটিভ' হলো, কণ্ঠ ভাষার সংস্কার করলো, তার পোষাক-আশাক, আচার-আচরণ ও বাচনভঙ্গী অন্তদের থেকে পৃথক হলো—এক কথায়, উপযুক্তরূপে 'গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক' হলো।

পয়সাশাহী জীবনদর্শন

বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও ভারতীয় বণিকবৃন্দের হাত, লেজ ও মাথা কংগ্রেস সরকারের নেতৃত্বে ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ অঙ্গপ্রেরণায় পড়ে-ওঠা যুব কংগ্রেস কোন জাতীয় শক্তি নয়, বরং সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদের এবং বিশেষ ভাবে, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সন্ত্রাসারণবাদের একটি দুর্বল বাহু মাত্র। এহেন শক্তির মৌখিক মার্কিনবিরোধিতা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার (এখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের) মধ্যকার বিরোধের প্রতি-ফলনের বেশী কিছু নয়, অর্থাৎ এ বিরোধিতা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়; আর এরূপ সহায়ক বাহুগুলি দুর্বল হতে বাধ্য। কারণ এরা সব সময়েই প্রতিপক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে।

অপরাধপ্রবণতা বুর্জোয়া স্বভাব। কিন্তু 'হাতী' বুর্জোয়ারা (big bourgeoisie) প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক রদমকে নামতে অপারগ। লোভী উচ্চাকাঙ্ক্ষী পাতি বুর্জোয়ারাই এই রাজনৈতিক দারিদ্র্য পালন করে। এহেন প্রশাসনশক্তি ধনতন্ত্রের প্রশাদভোগী এবং ক্ষমতাপ্রয়োগের দৌরাণ্ড্যে জনসারারণ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি শক্তি ও বস্তু। আর সে ধনতন্ত্র যদি কোনরূপ সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে এরূপ প্রশাসন ব্যবস্থার জাতীয় চরিত্রের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। দেশজোহী অতন্ত্রিত বুর্জোয়া শ্রেণীর জীবনদর্শনকে অবলম্বন করে, যুব সন্ত্রাসীদের অপরাধপ্রবণ একটি ভগ্নাংশকে এহেন নিরুপ্ত পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে সংগঠিত করে যে যুব কংগ্রেস সৃষ্টি হলো, স্বাভাবিক কারণেই সে অঙ্গদিনেই দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টির ঘৃণা, ক্রোধ, করুণা ও উপহাসের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ালো।

কিন্তু বিষয়টি শুধু ক্রোধ বা ঘৃণার নয়, দুঃখ এবং লজ্জারও। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ও দেশজোহী দেশী মালিকদের অর্থনৈতিক বন্ধকী ব্যবস্থা সারাদেশে রাজ-নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চরম সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতিতে লক্ষ্যহীন, অবসাদগ্রস্ত অবক্ষরী পাতিবুর্জোয়া যুব সমাজের একাংশ যদি বিকারগ্রস্ত ও আত্মঘাতী হয়ে ওঠে, যদি পয়সাশাহী (Rule of Money) জীবনদর্শনের কানাগলিতে মালিকশাহীর দৌবারিক ও গুপ্তঘাতকেরাশ্রয় নেয়, তাহলে এতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে আমরা সকলেই আশা করব, এদের একাংশ, বিশেষতঃ যারা আজো পাকা ক্রিমিনাল হয়ে উঠেনি, এখনও বৃহত্তর জনজোতে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু যে কোন সহজ চালাকীর পথে এই পাণচক্র থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। অবশ্যই রুত্বকর্মের সম্পর্কে আন্তরিক অহুতাপ ও ঘৃণাবোধ চাই। আর প্রকাশ্য স্বীকারোক্তিও।

চানের দুই লাইনের লড়াইয়ের অন্তরঙ্গ ছবি

- * চানের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গল্প—৬.০০
- * বিপ্লবের গান —৮.০০
- * আরব কবিতা (২য় সং) —৫.০০
- * নিগ্রো কবিতা (২য় সং) —৫.০০
- * ম্যাক্সিম গোর্কী :
আমার ভারেরী থেকে —১৫.০০

অনুবাদক : স্বশীল জানা

যে কোন প্রগতিশীল বইয়ের জন্ত

বুক মার্ক

৬, বক্স চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

কলকাতা পুরসভায় লুণ্ঠপাটের রাজত্ব

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পাঁচ বছরের সরকারী কর্তৃত্ব (তার মধ্যে অষ্টভূক্ত ১১ মাসের জরুরী অবস্থার একনায়কত্ব) কলকাতা পুৰসভার প্রমিত ও কর্মচারীদের উপর যে অকথ্য নিপীড়ন এবং অবিচার হয়ে এসেছে তার কলে সর্বস্তরে। বিক্ষোভ এবং অসন্তোষ ধূমান্বিত হয়েছে কিন্তু নানা দমনমূলক ব্যবস্থা এবং পরিবেশের জন্ত এই সর্বগ্রাসী অসন্তোষ প্রকাশিত হতে পারেনি। ১৯৭২ সনের মার্চ মাসে রাজ্যসরকার কর্তৃক পুৰসভা বাতিল হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে কংগ্রেস দল এখানে নির্বাচন করতে সাহস করল না। নির্বাচন না করার হেতু দ্বিবিধ—প্রথমত নির্বাচন ঘোষণা করলেই প্রার্থীর হিন্দা নিয়ে কংগ্রেসের উপ-স্থলীয় বিরোধ পারম্পরিক। দাঙ্গা এবং খুন-খারাবিতে পর্ববলিত হত; দ্বিতীয়ত আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে জয়ী হওয়ার আশা কংগ্রেস নেতাদের ছিল না। কলকাতা শহরে রিগিং করলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা।

কাজেই বছরের পর বছর বাতিলের
মেরাদ বাড়িয়ে-বাড়িয়া হয়েছে, নির্বা-
চনের ব্যবস্থা হয়নি। বিগত নির্বাচনে
রাজ্য কংগ্রেস এরকম গো-হারা না
হাৱলে এখনও নির্বাচন ঘোষণা হত
না। কিন্তু আগামী জুনে রাজ্য বিধান
সভার নির্বাচনের পর নতুন সরকার
এসে নিশ্চয়ই লুটেপুটে খাণ্ডারার অস্ত
পুরসভাকে এম এল এর প্রতিনিধি নাম-
ধারী কংগ্রেসী চামচাদেশ হাতে ছেড়ে
দেবে না। সেইঅস্ত পুরসভা নিজে চাকরী
থেকে বরখাস্ত হওয়ার আগে অপেষ
করুণ-পরবশ হয়ে আগামী সেপ্টেম্বরে
কলকাতা পুরসভার নির্বাচন হবে বলে
ঘোষণা করছেন। কিন্তু ততদিনে
তিনি কোথায় থাকবেন ? যে জিনিষ
হাতে নেই সে জিনিষ কাউকে দান
করা যায় কি ?

এম-এল-এদের চামিচা

৭২ এর নির্বাচনের পরে কংগ্রেসের
মন্ত্রী, এম এল এ এবং তাদের চামচারা
যেভাবে সারা পশ্চিমবঙ্গে লুণ্ঠাট
চালায়ে এগেছে তার নিজস্ব তত্ত্ব পশ্চিম-
বঙ্গে কেন, সারা ভারতে আছে কিনা
সন্দেহ। দারুণ বেকার সমস্যা
প্রশীড়িত এই রাজ্যের যুব সমাজকে
রোজগারের চোপ দিয়ে সিদ্ধার্থবাবুর
নেতৃত্বে রাজ্য কংগ্রেস ৭২ সালের
নির্বাচনী শুভামিতে সামিল করেছিল।
কিন্তু বিরাট এই বেকার বাহিনীকে
কুন্নি রোজগার দেওয়া দুঃসাধ্য। সেই
জন্য কিছু লোককে বাস-মিনিবাসের

পারমিট, কিছু লোককে ট্যান্ডার লাই-
সেন্স কিছু লোককে রাইটান' বিল্ডিংসে
দালালি করে দু পরসা কামানোর
অযোগ করে দেওয়া হয়। এমনি কিছু
লোককে পুংসভায় এম এম-এদের
প্রতিনিধি করে দেওয়া হল যাতে এই
তুম্বার জোরে বিল্ডিং, অ্যাসেসমেন্ট
ইত্যাদি কেসের দালালি করে এরা দু
পরসা কামাতে পারে। বলা বাহুল্য
এরা তা বিলক্ষণ পেয়েছে। আর এক
ধরণের লোক ব্যক্তিগত ভাবে দালালি
করে পরসা কামাত যেমন—মানিকবাবু
নামে এক ভদ্রলোক। বি সি গান্ধুর
আমিলে একে লোকে তার পোষুপুত্র
রূপে জানত। বলা বাহুল্য, এইসব
কর্মতৎপরতা হরিনামের :বিনিময়ে হত
না। এক্ষেত্রে পূর্ব কর্মচারীও
বিভিন্ন বিভাগে মামলার তদ্বির করে
উপরি রাজস্বার করত এবং এখনো
করে আছে।

উদ্ভল মাণিক

পুরসভার এমনি একটি উজ্জল মণি
হলেন মধু চ্যাটার্জি। পুরসভার ট্রেড
ইউনিয়ন আন্দোলনকে জয় করার জন্য
প্রাক্তন পৌর পিতা গোবিন্দচন্দ্র দে
বশম একজন যোগ্য দাপ্তারের সন্ধান
করছিলেন তখন এই মধু চ্যাটার্জির
আবির্ভাব যুক্ত কমিটির প্রতিদ্বন্দ্বী
কো-অর্ডিনেশন কমিটির মাতব্বর রূপে।
মধু চ্যাটার্জি ছিলেন আদার, বিভাগের
একজন বেলিক। এই কমিটির সাহায্যে
এবং গোবিন্দ দে, খান্না ইত্যাদির
পরোক্ষ মদতে রাতারাতি হৈড ইউ-
নিয়ন নেতা বনে গিয়ে মধু চ্যাটার্জি
যে কেবল কো-অর্ডিনেশন কমিটিরই
স্ববিধা করে নিলেন তা নয়, নিজের
অর্থাৎ এই বেলিক পদটিরও উন্নতিসাধন
করলেন। মধুবাবু এখন আর বেলিক
নন। এখন তিনি কালেকশন সাব
ইন্সপেক্টর। দল্লারী অবস্থায় আমলে
মন্ত্রী হ্রত মুখার্জির দৌলতে এই পদের
গ্রেডও অনেক বেড়েছে। অবশ্য হ্রত
মুখার্জির আমলে মধুবাবুই ছিলেন
কর্পোরেশন, কাংজেই সৌদিক থেকে
দেখতে গেলে মধুবাবু যদি একজন
ডেপুটি কমিশনার হয়ে বসতেন তাতেও
অবাধ হওয়ার কিছু ছিল না।

তিনি যে কেবল নিজের স্ববিধা করেই সন্তুষ্ট থেকেছেন তা নয়, যাদের প্রতি রাজনৈতিক বা অন্ত্র কারণে তিনি প্রসন্ন নন, তাদের যাতে অস্ববিধা হয় সেদিকেও তার মতবর্ক দৃষ্টি ছিল। প্রসঙ্গক্রমে বিল্ডিংয়ের ডেপুটি কমিশনার এবং অ্যাসেসমেন্টের ডেপুটি অ্যাসেসরকে সরানোর পেছনে তার তৎপরতা ছিল

অনেকখানি। সিলেকশন কমিটির সমস্ত হওয়ায় স্বাধীন মধুবাবুর নেতৃত্বপাতি তুচ্ছি ইদানীং বেসামাল হয়ে উঠেছে। এই কয় বছরে, বিশেষত স্বতন্ত্র মুখাঞ্জির আমলে কী পরিমাণ তিনি হাতিয়েছেন তা সঠিক বলা সম্ভব না হলেও তার পরিমাণ যেন গণ্য নয় একথা নিশ্চিত। বিভাগে গত করেক বছরে তাকে কোন কাজ করতে দেখা যায়নি কিন্তু তার বাতায়নের জন্ত কর্তৃপক্ষ তাকে একটি গাড়ি দিয়ে কুতাব হয়েছেন। পৌর অফিসারদের সঙ্গে তার কথা বলার ভক্তি দেখলে যেন হত যেন ফিল্ড মার্শাল গোরেরিং তার অচ-চরদের ধমকাচ্ছেন। তবে মধুবাবু মাথায় একটু খাটো। এই-সব চামচাদের হাঞ্জিরা খাতায় সেই করতে হত না। ছোট চামচেরা যখন খুশি অফিসে আসতেন ; তাদের লালদাগ না দেওয়ার জন্ত বিভাগীয় কর্তাদের কাছে বীয়েন মহান্তি ও মধু চ্যাটার্জির নির্দেশ ছিল।

চামুনি বলে ছুঁচকে

এ হেনমধুবাবু যখন কারো বিরুদ্ধে
 দুর্নীতির অভিযোগ আনেন তখন কার
 না হাসি পায় ? গত চারবছর বাবত
 বে-আইনী কাজ এবং দুর্নীতির বস্তা
 বইয়ে দিয়ে যে মধু চ্যাটার্জি নিজের
 আখের গুছিয়ে নিয়েছেন তার সুখে কি
 দুর্নীতির অভিযোগ শোভা পায় ? মধু-
 বাবু শান্তি সেনের কার্খাবলীর ব্যাপারে
 তদন্ত কমিশন চেয়েছেন। শান্তি
 সেনের সপক্ষে আমরা কোন কথা
 বলতে চাই না কিন্তু সেই সঙ্গে মধুবাবু
 তার নিজ কার্খাবলীতে কি এই তদন্তের
 নিবন্ধীকৃত করতে রাজি আছেন ?

রাতারাতি টুপি বদল

মধুবাবুকে আশ্রয়। এককাল একজন
পাচ্চা কংগ্রেসী বলেই জানিতাম।
সে হিসাবে তেরখা ঝাণ্ডাই ছিল তার
সম্মত, অর্থাৎ তিনি তার ধর্মপ্রাণী।
কিন্তু গত ২০-এপ্রিল কেন্দ্রীয় পৌর-
সভায় আশ্রয় একি দৃষ্ট দেখলাম?
মধুবাবু এবং তার চামচেরা জনতা
পাটির পতাকা হাতে নিয়েতাম ভাণ্ডার
সাহায্যে শান্তি সেনের পেছনে অহিংস
তাড়া করেছেন। হার হার, দেখব কত
দেখব আর হুঁচোর গলায় চম্‌চম্‌।

सर्वानिका दम्प्रमान

মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশনের
ব্যাপারে একেবারে ঘেঁষা ধরে গেছে ;
কানেই এ ব্যাপারে আর লেখার ইচ্ছা
ছিল না। কিন্তু তাদের সাম্প্রতিক
আর একটি কীর্তি আমাকে লিপ্যন্তরে
বাস্থ্য করছে। অ্যান্টিস্টাক অ্যাসোস

পদের ব্যাপারে গন্তব্যের যখন লিখি তখনই আমার সন্দেহ ছিল যে, এই ব্যাপারেও কমিশনের একটা কুম্ভলব আছে। আমার আশঙ্কা সত্ত্বেও প্রতিপত্ত হয়েছে—কমিশন ঐ পদে সীনিয়র-মোষ্ট বর্তমান অফিসিরেটকারীকে ডিজিয়ে তার তলার লোককে স্থপারিশ করেছে। কী হেতু? জ্ঞান বায় নি। তবে এটুকু জানা গেল যে, বর্তমান পদাধিকারী প্রশান্ত দত্ত যে কেবল যোগ্যতাসম্পন্ন তাই নয়; ১৯৪২-৪৫ পর্যন্ত তিনি একজন স্বাভাবিক ছিলেন। তারই পুরস্কার বোধ হয় এই স্থপার-সেশন। বোঝা গেল বিদগ্ধনের ঢাক যদিও বেজে উঠেছে তবু স্বতন্ত্র মুখাঙ্গি, মধু চ্যাটার্জি এবং সার্ভিস কমিশনে তাদের বেরোবার নন্দ বাড়ুজোর স্বভাব বোধ হয় যাবার নয়। প্রশান্তবাবুকে বোধহয় বিষয় গিং নাহারও জেলসঙ্গী হিসেবে চিনতে পারবেন। রমেন চ্যাটার্জি একসময়ে সেবাব্রাহ্মে গান্ধী-জীর আশ্রমিক ছিলেন। সে হিসাবে পুরাতন কংগ্রেসী (নন্দ বাড়ুজোর মত ভূইফোড় নয়) অনেকেই চিন-বেন। কিন্তু নন্দবাবু কতদিনের কংগ্রেসী? কংগ্রেস রাঙ্কয়ে আসার পরে তো। আর এম-এস-সির চেয়ার-ম্যান এস মল্লিক আই-সি-এস মহা-শয়ের দেশপ্রেম তো তার পদবীতেই সপ্রমাণ।

বিস্ফোভের বিস্ফোরণ

গত পাঁচ বছরের অবিচার এবং
অনাচারের ফলে পুরুষমানুষের যে
অসন্তোষ মনে মনে ঘুসারিত হচ্ছিল,
আজ ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পরে
তা ফেটে পড়বার উপক্রম করেছে।
অ্যাসেসমেন্ট বিভাগের কর্মীরা পূর্ব-
প্রশাসকের হাতে সমবেত স্মারকলিপি
দিয়ে বিভাগীয় প্রার্থীদের দাবি নানা
কৌশলে অস্বীকার করে, বাইরের
বিভাগের লোক দিয়ে উপরের পদ পূর্ণ
করে এম এল সি যে ঘোরতর অবিচার
করেছে তার সমস্ত প্রতিকার দাবি
করেছেন। প্রশাসক তাদের প্রতি সহানু-
ভূতি জানিয়ে পড়ে দেখবার জন্য সময়
চেষ্টা করেছেন। তিনি কী করেন তার
অন্ত কর্মীরা অপেক্ষা করছেন। প্রতি-
কার না হলে অ্যাসেসমেন্ট বিভাগে
সংকটাবস্থার সৃষ্টি হবে।

অন্তের মুখে রামনাম

৭৪ সালের পুর বর্ষঘটে বিদ্রোহ-
বাতকতা করে যে মধু চ্যাটার্জি পৌর
কর্মীদের ৩১ দিনের পাওনা ছুটি নষ্ট
এবং আরো নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত
করেছে সে-ই জাতির শক্তি সেনের
সঙ্গে দলীয় কলহের ফয়সালার জন্য বর্ষ-
ঘটের ভাক দিয়েছে। এই মজল্লুর
দরদ এককাল কোথায় ছিল? ভাড়া
লবির কনট্রাক্টবদের জন্য মধু চ্যাটার্জির
দরদের রহস্তও গোপন নেই। ভাড়া
লবির বন্ধ হলে মধু চ্যাটার্জির নিয়মিত
পাওনার হাত পড়বে বৈকি।

সাংবাদিকের বাড়িতে হ
গত ২৪শে মার্চ বেলু
সরিকটে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের
সাংবাদিক, সময় বন্দোপা
বাড়িতে স্থানীয় কিছু দুষ্
গুণ্ডামী ও হামলা করে।
সম্মুখস্থ সীমানা প্রাচীর ভেঙে
লোহার গেট ভেঙে সরিয়ে
তার। শ্রীবন্দোপাধ্যায়কে বাড়ি
ছয়কিও দেয়। শ্রীবন্দোপা
বালি পুলিশ থানার ডায়রি
কিছু বিষয়ের কথা, পুলিশের
তার ব্যবহারে সমাজবিবোধীর
আরও ভোঙ্কুর করে ও
সম্মুখের প্রাচীরটি সম্পূর্ণ ভেঙে
ও আসরে স্থিতি করে।

প্রতিবাদ

বেলুড় মঠের কাছে
রোডের ওপর সাংবাদিক সম্মেলন
সাধ্যাঙ্গের বাড়ীতে সম্মেলন
হামলায় সংবাদে গণতান্ত্রিক
শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী
কাজ প্রকাশ করেছে—“বাড়ী
মানা ও আসবাবপত্র ভাঙ
হয়েছে, সমরবাবুকে লালিত
হয়েছে। কয়েকদিন আগে
পত্রিকার সম্পাদক হীরেন বহু
বিরোধীদের দ্বারা আক্রান্ত
ছিলেন। আজও তিনি অসুস্থ
রাজ্যে কংগ্রেস শাসকগোষ্ঠীর
অনন্দবাজার, স্টেটসম্যান পা
পত্রিকার লিখিত বহু
সাংবাদিকদের ওপর দৈহিক
যে সে রাজ্যের আইন
নির্ধারিত যে কতখানি নিয়ম
নুহঞ্জেই অগ্রসর। আমরা এর প্র
ও দোষীদের শাস্তি দাবী করছি
সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের এই অপদা
ব্যবস্থার দ্রুত অবলান ঘটাবা
প্রতিটি গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের
মর্মেদন জানাচ্ছি।”

ଜନତା ଦଳ

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

এবারের সমাবেশের আরও
বিশিষ্টা, দীর্ঘকাল পর বহু
প্রিয়জনদের দেখা পেলেন।
স্বাস্থ্য দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাসে বা
কথক উৎখাত হয়ে কান্নিয়েছেন।
চাচ বহুরে কত অভিজ্ঞতা-
য়েছে, কত ছুখের কথা জমা
কত প্রাণের কথা, তাই
রশ্মিরের কথা বুঝের না।

বহুতার শেষে, লক্ষ লক্ষ
হলে উঠল মশাল। বিশাল
অন্ধকারে লক্ষ লক্ষ আলোর
মালোকিত হয়ে উঠল ব্রিগেড
প্রাউণ্ড। সঙ্গে ধনিত হচ্ছে
রাস্তিক সঙ্গীতের স্বর :
জাগো জাগো সর্বহার।। ত
আলোর মুখ আবেগে ক
আলোকের চোখে অর্ধ।
বাধে ওরা আন্তর্জাতিক সা
গান গাইছে।

जम्भापंक-हौवेनं वसु

সম্পাদক কর্তৃক বীণামণী প্রেস, ১২৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ হাট মেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নারকীয় হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য কাহিনী

দঙ্গল

বিংশ বর্ষ ॥ ১৫শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৬ই মে, '৭৭ ॥ ৬০ পঃ

ঘটনাস্থল : আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। সময় : ২৬শে নভেম্বর, ১৯৭৩। সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত এক নারকীয় আক্রমণ চলে নিরস্ত্র কয়েদীদের ওপর। যে ঘটনা প্রচারিত হয়েছিল এইভাবে, “জেল ভেঙ্গে নকশালপন্থীরা পালাবার চেষ্টা করার কারারক্ষী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মোট আটজন নিহত ও বেশ কিছু আহত হয়।” এমন কি মহামাফ প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীবি সি মিত্রের নেতৃত্বে ঘটনার প্রকৃত সত্য অল্পসঙ্কানের ক্ষুদ্র যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন বসানো হয়েছিল সেই কমিশনও (শেবাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়)

পুলিশের অত্যাচারে পশু ছেলের মায়ের আবেদন

আমার ছেলের নাম তপন সেন। জুড়ে তার গলার উপরিভাগে নির্যাতন লালবাকারে পৌছবার আগেই তার উপর যে অত্যাচার করা হয়েছিল তা আমি জানাতে চাই। ১৯৭৩ সালের ১লা অক্টোবরে বিকালে আলিপুর জেলে এবং বাইরের গেটে একটা বড় রকমের গণ্ডগোলের মধ্যে একটা গুলী হঠাৎ তার খালনালাই বা পাশে এসে লাগে। ফলে তিন চার ইঞ্চি জায়গা কাঁক হয়ে যায় এবং ভেতরের মাংস পেশী ও প্লাগু সব খুলে পড়ে এবং রক্ত স্রোত বইতে থাকে। এই অবস্থায় দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমার ছেলে ছুটতে থাকে। প্রায় মাইল খানেক ছুটে একটা রাস্তার ওপরে এসে পড়ে যেট রাখালদাস আড়ি রোড। (শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

নকশালদের ছাড়তে সরকার দ্বিধাগ্রস্ত কেন? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে জ্যোতির্ময় বম্বুর চিঠি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

লোকসভার সি পি আই (এম) সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় বম্বু সমস্ত নকশাল বন্দীদের ছেড়ে দেবার জন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট অনুরোধ জানিয়েছেন। শ্রীবম্বু বলেছেন, নতুন কেন্দ্রীয় সরকার জর্জ ফার্নান্ডেস ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে বরোদা ডিনামাইট মামলা প্রত্যাহার করে নিয়ে জনগণের স্বার্থের প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। তবে কেন নকশালদের সম্পর্কে অস্ত্র ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, বারা ইন্দিরা গান্ধীর স্বপ্ন রাজত্বকে উৎখাত করার সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল? শ্রীবম্বু প্রশ্ন করেছেন সর্বশ্রেণীর নকশাল বন্দীদের ছেড়ে দিতে সরকার দ্বিধাগ্রস্ত কেন?

শ্রীবম্বু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে লিখেছেন, “আপনি একটি নীতি নির্ধারক বিবৃতি দিয়েছেন এবং লোকসভায় বলেছেন যে, বারা আটক রয়েছে তাদের মধ্যে চারশ্রেণীর নকশালপন্থী আছে। যেসব ডেটিনিউয়ের বিরুদ্ধে কোন মামলা নেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। কিছু আছে

যাদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগ রয়েছে। তদন্ত চলছে এবং রাজ্য সরকারকে দ্রুত শেষ করতে বলা হয়েছে। কিছু নকশালপন্থী বিচারার্থী। তাদের ব্যাপারেও রাজ্য সরকারগুলিকে অনুরোধ করা হয়েছে বিচার তত্ত্বাবধি করার জন্ত। চতুর্থ

শ্রেণীর নকশালপন্থীদের মধ্যে আছে শান্তিপ্ৰাপ্তরা। তাদের পুরো দণ্ডভোগ করতে হবে।” (টাইমস অব ইন্ডিয়া ৭ই এপ্রিল ১৯৭৭—সম্প্রচারের পথ) শ্রীবম্বুর চিঠির সম্পূর্ণ বক্তব্য নীচে দেওয়া হল।

(শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

ছবিটিতে অভিনয়কে বীরের প্রতীক হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই অভিনয় পরিচালিত নয়। বিজয়ী অভিনয় বন্দীদের মধ্যে রয়েছে খুন, কালাবাজারী, যুদ্ধশাগল, ধনপতি ইত্যাদি। আদিম মুখোশ পরিহিত সাতজন শয়তান মহারথী।—শিল্পী সঞ্জল রায়



সভাপতি নির্বাচন নিয়ে খেয়োখেয়ি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসছে ৬ই ও ৭ই মে দিল্লীতে। রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসীদের খেয়োখেয়ি এখনও থাকেনি। দল-উপদলের লড়াই ক্ষমতাচ্যুত হয়ে আরও বেড়েছে। তারই প্রতিকূলন ঘটবে এ আই সি সি অধিবেশনে। কংগ্রেসে এখন প্রধানতঃ দুইটি ভাগ। এক গোষ্ঠীর নেতৃত্বে আছেন ইন্দিরা গান্ধী, অপর গোষ্ঠীর নেতৃত্বে আছেন দেবকান্ত বড়ুয়া, নিরঞ্জন রায়, রজনী প্যাটেল প্রমুখরা।

কংগ্রেস সভাপতি কে হবেন এই নিয়ে চলছে তুমুল আলোড়ন। উভয় গোষ্ঠীই চেষ্টা করছে নিজ গোষ্ঠীর প্রার্থীদের পদে বসাতে।

কংগ্রেস সভাপতি পদে ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থকরা ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি, পি

ভি নরসিংহরায়, মোহনলাল স্থাডী-র নাম করছেন। কেউ কেউ আবার কান্দ্রীর প্রাক্তন মহারাজা ডঃ করণ সিং-এর নামও তুলেছেন।

অন্যদিকে ইন্দিরা বিরোধী গোষ্ঠী চাইছেন স্বরাষ্ট্রী সভাপতি স্বরণ সিং-কেই স্বপদে রাখতে। তাছাড়া এই গোষ্ঠী দিল্লীতে, রজনী প্যাটেলের নামও তালিকায় রেখেছেন।

উভয় পক্ষই দাবী করছেন যে, এ আই সি সি-র অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন তাদেরই দিকে। সঠিক কথা বলা মুশকল। তবে সদস্যদের মধ্যে যে ইন্দিরা গান্ধীর প্রভাব এখনও আছে সেও অস্বীকার করার নয়।

বিপর্যয়ের মুখেও কংগ্রেস একত্রিত হতে পারবে না। কারণ লড়াইটা আদর্শের নয়, লড়াইটা স্বার্থের। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে কংগ্রেসে ব্যাপক দলভাগ্য ঘটবে।

বামপন্থীদের দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টা

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জনতা পার্টি ও বামপন্থী দলগুলো যাতে এক-সঙ্গে নির্বাচনে লড়তে পারে তার জন্ত এ সপ্তাহের শেষে জনতা পার্টির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বামপন্থী নেতাদের আলোচনা শুরু হবে।

জনতা পার্টির বেশ কিছু নেতার মধ্যে ইতিমধ্যেই ‘দাদা’স্বলভ ভাব-সাব দেখা যাচ্ছে। এদের বক্তব্য সি পি এম ও বামপন্থীদলগুলোকে কিছুতেই প্রাধিকার দেওয়া চলবে না। বিধানসভার আসন্ন বর্টনের ব্যাপারে দলীয় শক্তি ও জনপ্রিয়তার বিচার করতে এরা নারাজ।

জনতা পার্টির প্রভাবশালী মহল থেকে ইতিমধ্যেই তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে যাতে সি পি এম সহ বামপন্থী দলগুলোকে কিছুতেই ৮০টির বেশী আসন না দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে এই গোষ্ঠী দিল্লীতে বারা তীর্থ কমিউনিস্ট বিরোধী বলে পরিচিত ‘সেইসব নেতাদের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। আলোচ্য বিষয় কি তাহলে পশ্চিম-বাংলায় বামপন্থীদের দাবিয়ে রাখা যায়।

এদিকে বামপন্থী দলগুলো, বিশেষ করে সি পি এমের পক্ষ থেকে আসন্ন নির্বাচনে জনতা-বামপন্থী মার্চার জন্ত

ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। জ্যোতি বম্বু এবং প্রমোদ দাশগুপ্ত কর্মসূচী ভিত্তিক নির্বাচনী জোট চেয়েছেন, যাতে নতুন সরকার জনগণের অসীম দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্ত কিছু কাজ করতে পারেন।

বেহেতু পশ্চিমবাংলায় সি পি এম সবচেয়ে সংগঠিত ও শক্তিশালী দল স্বভাবতই এই দলেই বেশী আসন পাওয়া উচিত। তাছাড়া কংগ্রেসের ঐক্যচারা শাসনের অবসানের জন্ত বিগত লোকসভা নির্বাচনে এই দলের

(শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

সম্পাদকীয়

ସୁଖି ଚାହିଁ ତଦନ୍ତ ଚାହିଁ

সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের বিনা শর্তে এবং অবিলম্বে মুক্তি চাই। তথা-
কথিত প্রত্যেকটি জেল ভাঙ্গার ঘটনা ও জেলের মধ্যে বন্দী হত্যা সম্পর্কে নির-
পেক্ষ তদন্ত চাই। লক-আপে পুলিশের নির্যাতন এবং হত্যার বখাযোগ্য তদন্ত
করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে হবে। ১৯৭০ সালে রাষ্ট্রপতির শাসনের
পর ব্যাপক খুনোখুনি, বাবাসত ও বগানবরের স্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কেও
তদন্ত করতে হবে।

জ্যোতির্ময় বসুর চিঠি

(१५ पृष्ठावत् पत्र)

সমস্ত নকশাল বন্দীদের বিরুদ্ধেই
হিংসাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগ আনা
হয়েছে। অভিযোগের মধ্যে খুন থেকে
চুরি করে খুনের ষড়যন্ত্র, অগ্নি সংযোগ,
ডাকাতি এবং ভারত সরকারের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ ঘোষণার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত সবই আছে।
বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ বিভাগ এই সব
অভিযোগে সাক্ষ্য দিয়েছে। পুলিশই এ
ব্যাপারে তদন্ত করেছে, যারা সাক্ষ্য দেন।
অভিযোগে নকশালদের শাস্তি দিতে
আগ্রহী। যদি এদের ওপরই কেন্দ্র
তদন্তের দায়িত্ব দেন তাহলে তার ফল
কি হবে সহজেই অনুমেয়।

যেমন শ্রীএস ব্যানার্জীকে জামাল-
পুর ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত করা
হয়েছে এবং তার ও তার কমরেডদের
বিরুদ্ধে হত্যা, হত্যার চেষ্টা, ডাকাতি
এবং ভারতীয় কোঁজদারী দণ্ডবিধির
প্রায় সব অপরাধের অভিযোগই আনা
হয়েছে। তাদের দু'মাস অন্তর একবার
বর্ধমানের সাব ডিভিশনাল জুডিসিয়াল
ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজিরা দিতে
হয়। তাদের আইনজীবীরা ছবছর
ধরে পুলিশের তদন্ত ক্রম শেষ করে
চার্জশীট দেবার আবেদন জানাচ্ছেন।
তদন্তকারী অফিসার কেবল সময়
নিচ্ছেন, বোঝাই বাচ্ছে তিনি মিথ্যা
সাক্ষ্য ও সাক্ষীসাজাতে বাস্তব। পশ্চিম-
বঙ্গের গোয়েন্দা দপ্তর এদের প্রেস্তার
করে অমাহুষিক নির্ধাতন চালিয়ে
এদের কারো কারো কাছ থেকে স্বীকা-
রোক্তি আদায় করে। পরে অনেকেই
সেই বিরূতি প্রত্যাহার করে নেয়, বার
ফলে তদন্তকারী অফিসার এখন মামলা
সাজাতে গিয়ে বিপদে পড়েছেন।
যারা জেলে আছে আর যারা বেলে
খালাস তিনি তাদের সকলকেই শাসা-

অপাচেফা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ত্যাগ অসামান্য। সেই কথা যেন
নির্বাচনী সমঝোতার সময় জনতা
নেতৃবৃন্দ মনে রাখেন।

পশ্চিমবাংলা বামপন্থী রাজনীতির
প্রাণকেন্দ্র। কোন কৌশল বা চক্রা-
ন্তের মাধ্যমে বামপন্থীদের দাবিয়ে
রাখার অপচেষ্টা করলে জনতা নেতৃবৃন্দ
ভুল করবেন।

ছেন স্বীকারোক্তি করার জন্য! যারা
চাকরী জোগাড়ের বা আবার পড়াশুনা
করার চেষ্টা করছেন এই অফিসার
তাদের কে বল বিব্রত করছেন।
প্রায় সকলের বিরুদ্ধেই ছটা আটটা
মামলা। এরা জামিনে খালাস পেতে
চাইলে এবং যদি ম্যাজিস্ট্রেট রাজিও
থাকেন এদের পক্ষে সম্ভব নয়
প্রত্যেকটা মামলার জন্য জামিনের
টাকা বা সিকিউরিটি জোগাড় করা।

বিচার ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ পুলিশী
হস্তক্ষেপের ঘটনাও আছে। জামালপুর
ষড়যন্ত্র মামলার তদন্তকারী অফিসার
(গুরুচরণ সরকার) মামলার সুনানীর
সময় বর্ধমানের সাব-ডিভিশনাল জুডি-
সিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের পাশে দাঁড়িয়ে
জামিন প্রত্যাখ্যান ও পরবর্তী সুনানীর
দিন সম্পর্কে বলে দিচ্ছিলেন। সেই
এস ডি জে এমের নাম ডিকে
চক্রবর্তী।

সকলেই জানেন, বর্তমান আইন
ব্যবস্থা এমনই যে, বিচার দ্রুত নিষ্পত্তি
হওয়া শক্ত ব্যাপার।

যেমন শার্বভীপুরম ষড়যন্ত্র মামলার
নিষ্পত্তি হতে ছবছর লেগেছে। ১২৭০
সালের আহুয়ারী মাসে শুরু হয়ে এই
মামলা শেষ হয়েছে ১২৭৬ সালের
৩০শে আগস্ট। যাতে কান্ড সাক্ষাৎ,
সৌরীন বহু, নাগভূষণ পটনায়ক এবং
অগ্ন্যাজ্ঞ এগারো জনের যাবজ্জীবন কারা-
দণ্ড হয় এবং আরো কয়েকজনের
বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি হয়। এদের
বিচার কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। এরা
কলকাতায় পঞ্চম টাইবুনাতে আরও
একটি ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারাধীন।
বলতে পারেন যে, নিয় আদালতে দণ্ড-
প্রাপ্তরা রাজ্যের উচ্চ আদালতে এবং
তারপর সুপ্রীম কোর্টে আপীল করতে
পারেন। কিন্তু এই ব্যবস্থার আপীলও
যথেষ্ট সময় লাগে। আপীলের সময়
দণ্ডপ্রাপ্ত নকশালদের (যারা খুন বা ঐ
ধরনের অপরাধী) খুব কম ক্ষেত্রেই
আমিন দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি উদাহরণ। সি পি আই (এম-এল) সদস্য নিত্য সেন একজন গরীব চাষী। তাকে ১৯৭৪ সালের ৩-শে এপ্রিল কক্সবাজারে কোর্ট ৩০২ ৩৪ (খনের অভিযোগ)

ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়।
 নিত্যর মা তাদের একমাত্র সখল জমি-
 টুকু বেচে কিছু টাকা জোগাড় করেন
 এবং কলকাতা হাইকোর্টে আপীলের
 জন্তু সেই টাকা দিয়ে একজন আইন-
 জীবী নিযুক্ত করেন। কিন্তু সেই
 আইনজীবী যিনি একজন কংগ্রেসী
 (শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) গুনানীর
 দিন নিত্যর জন্তু সওয়াল করতে অপা-
 রগ হন এবং কলকাতা হাইকোর্ট ১৯৭৫
 সালের ৩য় মার্চ তার দণ্ড বাতাল
 রাখেন।

নিত্য সেন ও তার সঙ্গে একই
মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত তার দুজন কমরেডের
পক্ষ থেকে বিশেষ লীড পিটিসন করা
হয়। ১৯৭৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর
সুপ্রীম কোর্টে তাদের আবেদনের
সুনানী হয় এবং নিত্যকে বিশেষ অসু-
মতি দেওয়া হয়। কিন্তু তার অণু-
কমরেডদের আবেদন খারিজ হয়ে
যায়।

নিত্য সেনের আপীল এখনও
 তালিকা্য গুঠেনি। আমরা জানিনা
 কতদিন এই আপীলের মামলা চলবে
 এবং রায়ই বা কি হবে। কিন্তু ইতি-
 মধ্যে নিত্য সেনের পরিবারের যোজ-
 গাবের একমাত্র স্বত্ব জমিটুকু বিক্রী
 হয়ে গিয়ে তারা প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে
 রয়েছে। নিত্য সেন পারে ডাঙা-
 বেড়ি দেওয়া অবস্থায় বর্ধমান জেলের
 অধ্যক্ষ কক্ষে ২৪ ঘণ্টা তালাবদ্ধ হয়ে
 আছে।

যারা ইতিমধ্যে দণ্ডপ্রাপ্ত তাদের
পুনরো দণ্ড ভোগ করার আদেশ দেওয়া
কি যুক্তিসঙ্গত ? যখন আমরা জানি
নিয়ম আদালতে, এমন কি উচ্চ আদা-
লতে প্রদত্ত রায় সাক্ষ্যপ্রমাণ নিরপেক্ষ-
ভাবে বিচারের পরিচয় দেয় না ? না
হলে স্বপ্রীম কোর্ট লেই রায় উল্টে দেন
কি করে ?

তাছাড়া অনেক রায় দেওয়া হয়েছে
এনার্জেসীর সময়, যখন সি পি আই
(এম-এল) এবং অস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট সংগঠন-
গুলি বেআইনী ঘোষিত। এখন
নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে এবং
পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রায় পুনর্বিবেচিত
হওয়া প্রয়োজন।

একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এমার্জেন্সীর সময় কলকাতার লীগ্যাল এড কমিটি ও এই ধরনের অন্যান্য সংস্ঠনগুলির গুপ্ত নিবেদাজ্ঞা থাকার ফলে বিচারধীন বন্দীরা উপযুক্ত আইনজীবী পায়নি। পুলিশের ভয় দেখানোয় অনেক আইনজীবী এইসব বন্দীদের পক্ষে দাঁড়াতে চাননি। অন্তত ১৬ জন আইনজীবীকে ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবরে সেকেন্দ্রাবাদ জেলে আটক রাখা হয় যাদের একমাত্র ক্রটি তারা নকশাল বন্দীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন।

হিংসার ঝগড়া তোলা হয়েছে। বলা

হয়েছে প্রচলিত আইনেরধারাকে মান্য
করতে হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বরোদা ডিনায়াইট মামলার আসামী-দের বিরুদ্ধে অভিযোগও হিংসার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই মামলার অন্ততম প্রধান আসামী শ্রীসি জি কে বেডি ১৯৭৭ সালের ২২শে মার্চ তার জামিনের আবেদনে বলেছেন যে, যে সরকার বদ এবং অত্যাচারীতাকে উৎখাত করার অধিকার সকলের আছে। (টাইমস অব ইণ্ডিয়া, ৮ই এপ্রিল ১৯৭৭)। তিনি এবং জর্জ ফার্নাণ্ডেজ দুজনেই এই অপরাধ স্বীকার করেছেন যে, তারা সরকারকে উৎখাত করতে গিয়েছিলেন। তাহলে নকশালদের ব্যাপারেই বা অন্য দৃষ্টিভঙ্গি কেন ?

পুলিশের অত্যাচারে পঙ্গু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সেখানে কোঁতুহলী মানুষের ভিড়। আমার ছেলে আর ছুটতে পারে না। রাস্তার লোকেরা তখন কাছের বাড়ী থেকে জল এনে দেয়, এবং কি করা যায় এই নিয়ে কথা বলে। ইতিমধ্যে একটা গাড়ী যাচ্ছিল। সেটাকে তারা ধামায় এবং ড্রাইভারের পাশে আমার ছেলেকে তুলে দেয়। ড্রাইভার কিন্তু ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। এর মধ্যেই জেল থেকে সি, আর, শি রাইফেল নিয়ে ছুটতে ছুটতে এশে গাড়টাকে ঘিরে ফেলে। একজন আমার ছেলের জানলার পাশে যায় এবং জানলার ঠিক বাইরে থেকে আমার ছেলের দিকে গুলী করে। আমার ছেলের বাঁ হাতের উপর এসে গুলী লাগে এবং সে সিনেটর উপর লুটিয়ে পড়ে। তখন দরজা খুলে পুলিশরা গুলে দ্রুপা ধরে টেনে রাস্তার নায়ায় এবং মরা কুকুরকে যেভাবে টেনে নিয়ে যায় ঠিক সেইভাবে রাস্তা দিয়ে জেল গেট অবধি দীর্ঘ পথ টেনে নিয়ে যায়। পথে সারাক্ষণ তাকে রাইফেলের বাড়ি বৃকের উপর মার হয় কিন্তু তাতেও ও ক্ষতন হারায় না। ব্রিজের উপর প্রচণ্ড ধারাল ট্রাম লাইনের উপর দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যায়। তারপর জেল গেটের সামনে তাকে ছুঁড়ে ফেলে, দেওয়া হয় সেখানে গুণ্ডাগোলের কলে জেল গেটের সামনে আরও কয়েকজন ব্যক্তি আহত হয়েছিল। আমার ছেলের তখন প্রচণ্ড রক্তবমি হতে থাকে এবং খাসের ক হতে থাকে। এই অবস্থাতেও পুলিশেরা আমার ছেলের রক্তাক্ত শরীরে উপর দিয়ে মজা করার জন্তু ভারি বু পরে হেঁটে যায়। তখন বেলা প্রায় পাঁচটা কিন্তু ক্রমাগত রক্তপাত হতে থাকে। সন্ধ্যা রাত ১টার আগে তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় না। সেখানে ডাক্তারেরা আপ্রাণ চেষ্টা করে। আমার ছেলেকে মৃত্যুর মুখ থেকে

হিনিয়ে আনতে সফল হন। ডাক্তার-
দের মতে আমার ছেলের বেঁচে থাকা-
টাই একটা বিস্ময়।

আমার ছেলে আজ জীবিত বটে, কিন্তু আজ তার বাঁ হাতটা কোন কাজেই লাগেনা। আঘাতের ফলে কোন কাজের কাজই করতে পারে না ভাল চিকিৎসা হওয়া সত্ত্বেও। এবং ডাক্তারবা বলেছেন হাত একরকমই থাকবে। জীবনের বাস্তবিক ক্রিয়াকলাপের বস্তুর বাইরে থাকতে হবে তাকে। তা সত্ত্বেও আজ অবধি তাকে আটকে রাখার কি যুক্তি থাকতে পারে? তার বিরুদ্ধে যে মামলা আছে সেটা শেষ হবার কোন লক্ষণই নেই। নতুন সরকারকে আমি বলতে চাই তারা যেনো মানবিকতার দিক থেকে বিচার করে আমার ছেলেকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়।

সাবিত্রী সেন

৪০৪।৭ গড়িয়াহাট রোড
কলকাতা ৭০০০২৯

পুলিশা নিৰ্যাতন

(୧୧ମ ପୃଷ୍ଠାର ପର)

করেনি এই অন্তর্য আচরণের বিরুদ্ধে
প্রতিরোধ করেছে, ওরা জেলে যায় নি,
শিখ হটেছে জেল কর্তৃপক্ষ।

বেলেঘাটার ছেলে হৃষিকেশ চক্রবর্তী। বর্তমান বয়স বিশ বছর। ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ থেকে গ্রেপ্তার করে, তখন ওর বয়স সবে চোদ্দ হুঁয়েছে। ঐ বয়স জেনেও ওকে জুডেনাইল কোর্ট তোলা হয়নি, অপরূপ ও নকশালপন্থী। তারপর একটার পর একটা মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত ছটা বছর ও জেলের বাইরের মুক্ত আকাশ দেখেনি। ও দেখতে পায়নি ওর এলাকার ১৯৭২ সালে কিভাবে নির্বাচনে রিগিং হয়েছে। বর্তমানে ডি, আই, আরে আটক আছে। ছ' ছটা শীত-বর্ষা হাসিমুখেই জেলে কাটিয়ে দিল। ফুদিরাম তো ওর বয়সেই গ্রেফতার হয়েছিলেন, দেশের লোক তখন চোখের জল ফেলেছিল ঐটুকু ছেলের উপর ব্রিটিশ রাজের পাশবশক্তির প্রয়োগ দেখে। ফুদিরামের মৃত্তি বসেছে বিধানসভা ভবনের কাছে, মালা পরাচ্ছেন তাতে মুখ্যমন্ত্রী কিংবা বিধানসভার অধ্যক্ষ। সেই থবর পাঠ করে ওখান থেকে দু মাইল দূরবর্তী প্রেসিডেন্সী জেলের ঘোল নং ওয়ার্ডে গরাদের জানলার ধারে বসে হাসছে বেলেঘাটার সেই কিশোর হৃষিকেশ চক্রবর্তী। (চলবে)

চলবে)

পুরসভায় অনাচারের কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পুরসভা হ্রত মুখোপাধ্যায়ের অন্ততম দপ্তর যুব কল্যাণ বিভাগটি পেটোয়া পোষণের আর একটি আখড়া। এখানে চাকরি দেবার ব্যাপারে আশ্রয় এবং স্বজন পোষণের অভিযোগে তার একান্ত সচিব কালিদাস ভট্টাচার্যকে তিনিই সরাতে বাধ্য হয়েছিলেন। চাকরির বিনিময়ে প্রাপ্তিযোগ্য তিনি নাকি মজুরি সংগে ঠিক মত বণ্ডার করতেন না।

জানবাজারের লাল বাড়ীটি এক সময় আত্মবল নামে অর্জন করেছিল। হ্রতবাবু একে যা করে তুলেছেন তার পরে বোধহয় এর নতুন মালিক করণ প্রয়োজন। কুমার দত্ত যখন টাউন প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান তখন মালিকী সংবাদপত্রে পুরসভার রাস্তা বিক্রীর খবর বেরিয়েছিল। আসলে রাস্তা নয়, নিউ মার্কেট কল পট্টির পাশে ফুটপাথটির একাংশ উন্টো দিকের দোকানীরা ঝাঁপ বাখার কাছে ব্যবহার করত বিনা ভাড়া। এটি ভাড়া দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। সরকার তা করতে দেয়নি। ফল হয়েছে ওটি এখন দোকানীদের বাকস রাখার গুদাম হয়েছে। তার জন্য মাড়ুল আদায় করছে পাড়ার কংগ্রেসী মস্তানেরা। হ্রতবাবুরা এসে শুধু ফুটপাথ নয়, পুরো গড়িয়াহাট বুল-ভারতিতে বাজার বসিয়েছেন। পুরসভা এক পর্যায়ে পালঙ্ক না—তোলা ভুলছে হ্রতবাবুর চামচেরা। তাদের অবশ্য পর্যা কড়ির দরকার।

সারা গড়িয়াহাট মার্কেট এবং রাসবিহারী অ্যাডমিনিস্ট্রার ফুটপাথ এখন হ্রতবাবুর জমিদারি। স্ত্রী-প্রসাদ মুখার্জি রোড এবং তার আশে-পাশের হ্রতবাবুর হলেন লক্ষীকান্ত বহু, কলেজ কোয়ার আমহাট স্ট্রিটের হ্রতবাবুর কাটা কেইট, প্রভানন্দ পার্কের হ্রতবাবুর সোমেন মিত্র ইত্যাদি। সারা কলকাতার ফুটপাথ ভাগ করে এদের রাজত্ব এখন নেহাৎ মন্দ নয়।

জি বি ইউস্ট্রীজ

১৯৭২ সন নার্সাদ তৎকালীন পুরকর্তারা জি বি ইউস্ট্রীজ নামক সংস্থাকে বিনা নীলামে ততো কী পার্কিং এলাকা ইজারা দিয়েছিলেন। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এন দত্ত মজুমদার বিনা নীলামে দিতে রাজি ছিলেন না মন্ত্রী শতবাবুর অগ্রবোধ সত্ত্বেও। কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পর বি সি গাঙ্গুলির আমলে তৎকালীন স্থপারিশে এরা এটা বাগিয়ে ফেললেন। হ্রতবাবুর আমলে এদের ইজারার বেয়াই কেবল বাড়ল না, এলাকার সংখ্যাও।

এই প্রতিষ্ঠানের মালিক হ্রতবাবু এক সময়ে শতবাবুর দৌলতে আই এক এর অ্যাসিস্টেন্ট, সেক্রেটারি, কীরোদ ঘোষের বাজারের মালিক, ওষধের ব্যবসায়ী এবং 'অসমর' ছবির প্রযোজক। তালেবর লোক।

কিন্তু হঠাৎ সেদিন হ্রতবাবু পুরসভানে এসে এদের পার্কিং কী আদায় করার লীজ বাতিল করে দিয়েছেন। একটু খটকা লাগছিল। হ্রতবাবু ভেবে এদের পেয়ারের লোক, ক্রিয় দাসমুখী এলাকার টাকাও চেলেছেন কম নয়। তবে কেন? পরে রহস্য জানা গেল। জি বি ইউস্ট্রীজের কাছে পুরসভার বকেয়া পাওনা এখনো দেড় লাখ টাকার মত। লীজ বাতিল করার কালে পুরসভা এ টাকাটা আর আদায় করতে পারবে না। হ্রতবাবু ঘোষকেও টাকাটা শোধ করতে হবে না। আশা করা যায় ভুললোক অতঃপর এই টাকাটার একটা বড় অংশ হ্রতবাবুর আগামী নির্বাচনে খরচ করবেন।

অফিশিয়েটিং, সুপারসেসান, এক্সটেনশান

পুরসভার অধিকাংশ অফিসার এখন অফিশিয়েটিং করছেন। অ্যাসেসর, চীফ ভ্যালুয়ার, সিটি অ্যাক্টিং, ডেপুটি এডুকেশন অফিসার বীরেন মহান্তি, কমিশনারের পি-এ শক্তি ঘোষ (শ্যেওক্স হুজম হ্রতবাবুর চামচা), ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার আর কত লিখব। সুপারসেসনের দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছি। পার্সোনেল বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট পার্সোনেল অফিসারের পদে বিনয় মজুমদার নামে এক ভুললোক গত তিন বছর যাবৎ এক্সটেনশনে আছেন। কর্পোরেশনে তাকে সবাই বাগরা মজুমদার নামে জানে কারণ লোকের ভালায় বাগরা দিতে এবং কর্তাদের ইচ্ছিত পালনে তার ছুড়ি নেই।

অ্যাসেসমেন্ট বিভাগে বিদ্যারী অ্যাসেসর রবি বহুকে স্পেশাল অফিসারের পদ তৃষ্টি করে বসান হয়েছে। উদ্দেশ্য নতুন অ্যাসেসর এবং হ্রতবাবুর চামচা সমীর গাঙ্গুলিকে তালিম দেওয়া। শক্তি ঘোষ সবে তার ল' অ্যাসিস্ট্যান্ট পদটির নাম পালটে অ্যাসিস্ট্যান্ট ল' অফিসার হয়েছেন, এর মধ্যে কমিশনারের পি-এর পদটি খালি হলে অমনি শক্তি ঘোষকে সেখানে বসান হল বিশ বছরের পুরনো বিভাগীয় প্রার্থীদের দাবি অগ্রাহ্য করে।

থানেক কালোত্তীর্ণ হয়েও রেহাই পাননি কারণ তিনি চলে গেলে নতুন পার্সোনেল অফিসারকে চালাবে কে? ভাছাড়া এ জি ও ছবি রাইচৌধুরী সবে মাত্র প্রমোশন পেয়ে এসেছেন। এখন তাকে ডেপুটি পার্সোনেল ম্যানেজার করলে ভাল দেখায় না। তাই এই ভুললোককে এখন এক্সটেনশান দিয়ে চেয়ারটা বেদখল থেকে বাঁচিয়ে পরে বণ্ডারময়ে ছবি দেবীকে বসালেই হবে। এই ব্যাপারে অবশ্য হ্রতবাবুর তেমন গরজ নাও থাকতে পারে এটা কমিশনার নির্মাণা মুখার্জির নিজের ব্যাপার।

মুখ্য চিনে যুগের ডাল

কমিশনারের হযোগ্য পি-এ বিমল গুহ (হুই লোকে বলে বিমল ঘুহ) কৃতিত্বের সংগে কাজ চালিয়ে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। ল্যান্স-

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রসঙ্গে প্রফুল্ল সেন

(দর্পণের প্রতিনিধি)

দর্পণের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে রাজ্য জনতা পার্টির সভাপতি বর্ষাধান জননেতা শ্রী প্রফুল্ল সেন দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। তিনি মনে করেন যে, দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার দেশে গণতন্ত্র রক্ষিত হয়। তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন দল প্রতিশ্রুতি মত জনসেবা করতে না পারলে মানুষ প্রধান বিরোধী দলকে ক্ষমতায় বসায়। এক্ষেত্রে বিরোধীদল গঠনমূলক সমালোচকের ভূমিকা নেয় এবং এ ভাবেই সংশ্লিষ্ট দেশে স্বস্থ গণতান্ত্রিক আবহাওয়া গড়ে ওঠে।

বর্ষাধান গান্ধীবাদী নেতা শ্রী সেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, এর মানে এই নয় যে, সংশ্লিষ্ট কোন দেশে দুটি

সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

“এই সরকার—মানে সিদ্ধার্থ রায়ের সরকার রায়ের ভাল কিছু করার পরিবর্তে অপশাসন, অত্যাচার, নির্যাতন, হুন্সিতি, স্বজন পোষণ চালিয়েছে পাঁচ বছর।”

পুর্নুলিয়ার এম এল এ শ্রীমন্ত মুখোপাধ্যায় এই অভিযোগ এনে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন আরো তিন জন কংগ্রেসী—শ্রীপ্রেম গোখামী, শ্রীহরমণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীকাশীনাথ মিশ্র। এরা গণতন্ত্রী কংগ্রেসে যোগদান করেছেন।

শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য : আজই আমি একথা বলছি না। বিধানসভায় জনসভায় আমি একথা আগে বলেছি।

ডাউন মার্কেটে তিনি একটি কোয়ার্টার বাগিয়েছিলেন। শোনা যাচ্ছে প্রায় ছ মাস আগে অবসর নেওয়ার পরেও তিনি সেটি দখল করে আছেন। এটি নাকি এখন তাঁর পুত্রের নামে অ্যালট করার কথা হচ্ছে। তার পুত্রলাইসেন্স ইনসপেক্টর হিসাবে সম্প্রতি নির্মাণ-বাবুর দ্বারা বিশেষ অবস্থায় নিযুক্ত হয়েছেন। কোন লাইসেন্স ইনসপেক্টর দুইস্থান স্বয়ং লাইসেন্স অফিসারও কোয়ার্টার পান না। বহু মার্কেট টাক কোয়ার্টার পাচ্ছে না। বিমল-বাবুর পুত্রের প্রতি এই অধৈর্যক অগ্রগতির হেতু এখনো জানা যায়নি।

কাজির জোর

গত পাঁচ বছরে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের কারখানা এবং অফিস-কর্মীরা বিশেষত হুই ইউনিয়ন কর্মীরা কংগ্রেসী মস্তানদের কাজির জোরের আফ্রালনের সঙ্গে বিলম্ব পরিচিত হয়েছেন। গত ডিসেম্বর মাসে মজুরি উপহতিতে পি-পি-আইয়ের স্বদেশ

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রসঙ্গে প্রফুল্ল সেন

(দর্পণের প্রতিনিধি)

পার্টি ব্যতীত আর কোন পার্টির অস্তিত্ব থাকবে না। যে কথা বলতে চাই তা হল বহু মতামত, মতবাদ বা বহু পার্টি থাকলেও প্রথমত দুটি পার্টিই হবে প্রধান পার্টি যেমন আছে ব্রিটেনে লেবার আর কনজারভেটিভ পার্টি। এ-সঙ্গেও ব্রিটেনে আছে লিবারল আর কমিউনিষ্ট পার্টি। একবার কমিউনিষ্টরা পার্লামেন্টে হুটো আসনও পেয়েছিল। আমেরিকাতে দুটো প্রধান দল হলও রয়েছে কমিউনিষ্ট সহ আরও অনেক দল।

শ্রী প্রফুল্ল সেন এই বক্তব্য থেকে বলতে চান যে, সর্বদলের প্রতি সহিষ্ণুতার মনোভাবের মধ্যেই রয়েছে গণতান্ত্রিক মানসিকতার গ্যারান্টি। তাঁর দল এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অহ-

দাসগুণ প্রকৃত হওয়ার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় পুণ্ড্রবনে কলম ধর্মঘটের দিন মজুরি অন্ততম চামচা শব্দর ভট্টাচার্য হুমকি দিয়েছিলেন—কাজির জোরে তারা ধর্মঘটীদের লাগবাড়ীতে ঢোকা বন্ধ করে দেবেন। পুরসভাদের উপরে কাজির জোর তারা অবশ্য ১৬ নবেম্বর সচিবের ঘরে দেখিয়েছিলেন। সংসদীয় নির্বাচনের সময় বীরেন মহান্তিও বলেছিলেন কাজির জোরেই নির্বাচন জিতে আসবেন। সাধারণ মানুষের কাজির জোরের পরিচয় তখনো তিনি পাননি।

ভোল বদল

এখন বীরেন মহান্তি এখন ভোল বদলের কিকিরে আছেন। রাষ্ট্রপতি তার ‘জনপ্রিয়’ দলকে গদিচ্যুত করলে তিনি অনশন ধর্মঘট করবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন। অনশন ধর্মঘট কেন? বীরেন মহান্তির কাজির জোর এখন কোথায় গেল? আচ্ছা, সেই সাপ জ্যাঙ গোটা হুই আনতো।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রসঙ্গে প্রফুল্ল সেন

(দর্পণের প্রতিনিধি)

স্বরণ করবে বলে তিনি জানান।

শ্রী সেন প্রসঙ্গত জানান যে, গান্ধী-জির আহ্বানে ১৯২১ সালে যে গণ-আগরণ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তার চেয়ে এবারের গণআগরণের পরিধি আরও ব্যাপক ছিল। ভয়ের বিরুদ্ধে মানুষের এই বর্তমান সংগ্রাম ছিল অদ্বুতপূর্ব—তিনি এই মন্তব্য করেন। একটি প্রশ্নের অবশেষে শ্রী সেন বলেন যে, বৈরতচার ও অত্যাচার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছিল সমাজোতা বামপন্থী দলগুলি ও জনতা দলের মধ্যে। একনিষ্ঠভাবে পরস্পর একযোগে কাজ করেছেন বৈরতচারের বিরুদ্ধে। তিনি আরও বলেন যে, অদ্বুতপূর্ব গণ অত্যাচারের ফলেই জনতার এই নির্বাচনী সাফল্য সম্ভব হয়েছে।

সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গুরুত্ব কমিশনে হুন্সিতি প্রমাণিত হয়েছে। সিদ্ধার্থ রায় কাউকে গ্রহ করেন নি। ডিক্টেটরী চালিয়েছেন। কেউ কিছু বলতে পারেন নি, কারণ উনি প্রধান মন্ত্রীর বনিষ্ঠ ছিলেন। ভাছাড়া ইনি সকলের বিরুদ্ধে ফাইল রাখতেন। গুঁর বিরোধিতা করলেই উনি প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠতেন। উনি সাঁওতালদিতে আমার মিসার গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিলেন। জেলায় কোন উন্নয়নের কাজ হয়নি। কেবল হুন্সিতি। আমি হুন্সিতির নির্দিষ্ট ঘটনা জানিয়েছি, উনি স্বীকার করেছেন, কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। ভারতীয় ইম্পাত কোম্পানী একটি ধান্ধা, সিমেন্ট কারখানা সম্পর্কে কিছু না বলাই ভাল। মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার অননুমোদিত কুপ খননের সময় শ্রমিক নিহত নব, ছদ্দিন কেটে গেলেও মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়নি। লোকে অভিযোগ করলে মিসার ভয় দেখানো হয়। পালমা গ্রামে হেম মাহাতো ও রজনী মাহাতোকে গ্রেপ্তার করা হয়। কোন অভিযোগ নেই। আদালত ছেড়ে দিলেও তারা এখনও জেলে। কোন পুলিশ কেস না থাকলেও অহুপ সাহাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এসব এবং আরো অনেক ঘটনা জানানো সত্ত্বেও সিদ্ধার্থ রায় কেবল ব্যবস্থা নেননি।

যুব কংগ্রেসের 'গ্যাং অফ ফোর'র দৃষ্টি

শঙ্খশুভ্র বিশ্বাস

১৫ এপ্রিল দিল্লীতে কংগ্রেস প্রারম্ভিক কমিটির বৈঠকে প্রিয় দাসমুখী বলেন যে "একজন কংগ্রেস সমর্থক তাঁর বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়ান এবং জনতা প্রার্থী দিল্লী চক্রবর্তীর ওপর আক্রমণটি সংগঠিত করেন। এই প্রহারের ঘটনাটি না ঘটলে তিনি জয়ী হতেন।" অথচ ঘটনার পরে ঘটনা সম্বন্ধে প্রিয় দাসমুখী যে বিবৃতি দেন তাতে দেখি যে তিনি বলেন "ঘটনাটি হচ্ছে এলাহাবাদের যুবকদের সাথে পালিয়ে থাকা সি পি এম সমাজ বিরোধীদের সংঘর্ষ।" তাঁর সেদিনের বিবৃতিটি ছিল আক্রমণকারী সমাজবিরোধীদের দোষ, হালকা করার প্রচেষ্টা। আর আজকে তিনি বলছেন উল্টো কথা। আসলে নির্বাচনে হেরে গিয়ে বেসামাল প্রিয় দাসমুখী এলোমেলো কথা বলে চলেছেন।

প্রিয় দাসমুখীরা নাকি আত্মসমীক্ষা করছেন। কিন্তু বাবা নিজেদের নির্বাচনে পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে এখনও মিথ্যা কথা বলে চলেছেন, যারা এখনও জনতার Pulse feel করতে পারছেন না, তারা কী আত্মসমীক্ষা করবেন? দাসমুখী এখনও সেই পুরনো ক্যাসিট কায়দার ডাঙ্কা মিথ্যা কথা বলার অভ্যাসটি চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রিয় দাসমুখী আজ সঞ্জয় গান্ধী, প্রণব মুখার্জীকে বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, কাগজে বিবৃতি দিচ্ছেন, কিন্তু এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন? এতদিন তিনি সঞ্জয় গান্ধীকে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করতে এগিয়ে আসেন নি কেন? কারণ তাহলে তাঁর "মহান নেত্রী" বিরুদ্ধে হতেন। প্রিয় দাসমুখীরা

সেদিন তাঁদের "মহান নেত্রী"কে একটুও বিরক্ত করতে চাননি। এমনই দাশমুখীরা এই প্রিয় দাস। আজ প্রিয় দাসমুখীরা ইন্দিরা বিরোধী হয়ে বিপ্লবী সাজার চেষ্টা করছেন, কিন্তু এই সেদিনও তারা ইন্দিরা গান্ধীর নামে "যুগ যুগ জীব" ধ্বনি দিয়ে গলার শিরা ফুলিয়ে ফেলতেন। জনগণ কি এসব কথা ভুলে গেছে? দাসমুখীরা কি মনে করেন কেবল তাইই চালাক, আর দেশের লোক সব ঘাসে মুখ দিয়ে চলে? তার মত যুব-নেতাকে চিনে নিতে জনগণের বেশী সময় লাগেনি। তাই তিনি নির্বাচনে প্রচুর ভোটে হেরে গিয়েছেন। আজকে তিনি যে এত বড় বড় কথা বলছেন, কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কথা বলছেন সে সুযোগ তো তিনি জনতা পার্টির জয় এবং ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয়ের জন্যই পেলেন। কারণ জনতা পার্টির জয়ই তার ভয় ভেঙ্গে দিয়েছে। কংগ্রেসের হেরেও তিনি উনিশ মাসের জরুরী অবস্থায় যা বলতে পারেন নি, জনতা বিরোধী হয়েও একমাসের জনতা শাসনে তা তিনি বলতে পারছেন। অথচ নির্বাচনে তিনি এই জনতা পার্টির বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়েছিলেন।

তিনি এতবড় কংগ্রেসী যে প্রকাশ্য মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে বলেন যে "ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস ছাড়তে পারে, কিন্তু প্রিয় দাসমুখী কখনও কংগ্রেস ছাড়বে না।" তিনি কংগ্রেস না ছাড়তে পারেন কিন্তু জনগণ কংগ্রেসকে ছেড়ে দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের পরাজয় শুধু ইন্দিরা-সঙ্ঘের জয়ই হয়নি। এর

অন্ততঃ দায় দায়িত্ব যুব কংগ্রেসের "গ্যাং অফ ফোর"—অর্থাৎ প্রিয়-স্বতন্ত্র-কুমুদ-সুদীপ চক্রের। স্বতন্ত্র মুখার্জী অবশ্য এখন এই চক্রের বাইরে। কিন্তু সঞ্জয় গান্ধীর অভ্যুদয়ের আগে পর্যন্ত তিনি এই চক্রের পাণ্ডা ছিলেন। এই চার যুব নেতার বেপরোয়া কার্যকলাপ ও বেপরোয়া কথাবার্তাই একশ্রেণীর যুবকের মধ্যে বেপরোয়া ভাব জাগিয়ে তোলে। গত পাঁচ বছর ধরে এই যুব নেতারা কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে এমন ভাব দেখাতেন যেন তারা প্রত্যেকেই এক একজন ক্ষুদ্র হিটলার। পশ্চিমবঙ্গের গত পাঁচ বছরে যত সন্ত্রাস হয়েছে তার অন্য প্রধানত এই চক্রই দায়ী। এরা এতই উগ্র হিংস্র যে এরা নিজের দলের ছেলেদেরও খুন করতে পেছ পাহত না। যুব কংগ্রেসের নিজেদের মধ্যে স্বার্থান্বেষিত বহু ছেলে মারা গিয়েছে। কাশীপুর বরানগরে যে কুখ্যাত গণহত্যা হয় তাকে প্রিয় দাসমুখী জনতার অভ্যুদয় বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আমরা "মাই লাই" গণহত্যার নিন্দা করি, কিন্তু কাশীপুর-বরানগরের গণহত্যাটি কি ভিয়েনামের "মাই লাই" গণহত্যার থেকে কম নারকীয়? কয়েকশ নকশালকে সেখানে কচুকাটা করা হয়। 'মাই লাই' হত্যাকাণ্ডের জন্ত যদি উইলিয়াম ক্যালিদের বিচার হয়, তাহলে কাশীপুর-বরানগরের গণহত্যার ব্যাপারে প্রিয়দাস মুখীরা বেকসুর খালাস পাবে কেন? এই নির্বাচনে এদের একটা ছোটখাটো বিচার হয়েছে, আরো বড় বিচার অপেক্ষা করছে ভবিষ্যতের জন্য। সে বিচারের হাত থেকে কোন প্রিয়দাসমুখীই রেহাই পাবে না। পঁচাত্তরের ২৪ এপ্রিল কলেজ স্ট্রীটে অরপ্রকাশের যে মিটিং ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তাও সংগঠিত হয় প্রিয় দাসমুখীর নেতৃত্বে। আমি নিজে দেখেছি সেদিনকার যুব কংগ্রেসীদের তাণ্ডবনৃত্য। এই সেদিন ময়দানে চাবনের মিটিংয়ে সংবাদপত্রে আশুন লাগালো যে যুবকের দল তারা প্রিয়পন্থী যুব কংগ্রেসেরই সমর্থক। "রূপপ্রেম নগরী" সহ বিভিন্ন প্রগতিশীল থিয়েটারের উপর যারা এতদিন হামলা চালিয়েছে তারা সব প্রিয়পন্থী যুব কংগ্রেসেরই লোক। এক কথায় গত পাঁচ বছরে যত হামলাবাজী আর অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ ঘটেছে তার মূল দায়-দায়িত্ব প্রিয়দাসমুখীরা। এই গোষ্ঠীর যুব নেতারা এতই বেপরোয়া আর সন্ত্রাসবাদী যে এদের নেতা স্বতন্ত্র মুখার্জী প্রকাশ্য মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন যে "বিরোধীরা আমাদের আশা

ক্যাসিট বলে, দেশের প্রয়োজনে আমরা পুরো ক্যাসিট হবো।" আর এরা আজ গণতান্ত্রিক সাজতে চাইছে। স্বতন্ত্র মুখার্জীরা জানে না "আধা ক্যাসিট" "পুরো ক্যাসিট" কোন বাহিনীই জনতার অগ্রগতি রোধ করতে পারে না। তিনি তার "পুরো ক্যাসিট" বাহিনী নিয়ে ডায়মণ্ডহারবারে রিসিং করতে গিয়ে জনতার হাতে ঝাড় খেয়ে পালিয়ে এসেছেন। 'এই পুরো ক্যাসিট' যুব নেতাটি আগামী বিধানসভার নির্বাচনে পুরোপুরি পরাস্ত হবেন। জনতা এবার তার পুরো ক্যাসিট হবার বাসনা ঘুচিয়ে দেবে।

পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ডে দুর্নীতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ডকে কেন্দ্র করে যে যে সংস্থা গড়ে উঠেছে তার অধিকাংশই দুর্নীতির আখড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে একটি সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা ছাত্র পরিষদ। শফিকুর রহমান পরিচালিত এই মুসলিম ছাত্র সংস্থার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন এই সংস্থার কার্যকরী সমিতির সদস্য শ্রীফিরোজ হোসেন। শ্রীহোসেনের মতে এটি এমন একটি সংস্থা যার কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচি নেই, নেই কোন গঠনতন্ত্র। এই সংস্থার সভাপতি শ্রীরহমান শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বীকৃতি পাবার জন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে কাজ করছিলেন কংগ্রেসের অপর ছাত্র সংস্থা ছাত্র পরিষদের মত। সমস্ত মুসলিম সমাজকে ধোঁকা দিয়ে শ্রীরহমান মুসলিম সমাজের স্বার্থে লড়ার নামে মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করে তাদের মধ্যে ধর্ম বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলছিলেন। হাজিরাডা মাদ্রাসার শিক্ষক, মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শ্রী রওশন গান্ধীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে শ্রীরহমান মাদ্রাসা বোর্ড থেকে প্রাপ্ত out করা থেকে বহু বকম অপকর্মের আশ্রয় নিয়ে ছাত্রদের হাতে রাধার চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়, পর পর বেশ কয়েক বৎসর ধরে পাশ করিয়ে দেবার নামে ছাত্রদের কাছ থেকে অল্প টাকা খাওয়া হয়েছে বলে শ্রীহোসেন অভিযোগ করেন। এর সঙ্গে জড়িত আছে দমদম কৈথালির একজন সমাজ বিরোধী বাপী। বঠ জেলাতে পাশ করেনি এমন ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে তাদের বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে রেগুলার করা হয়েছে। তার মধ্যে অন্ততঃ মাদ্রাসাগুলি হচ্ছে নরপতি পাড়া (নহরী) নেতড়া, সরিষা ছাপনা প্রভৃতি। নরপতিপাড়ার চারজন ছাত্রের বাড়ি হচ্ছে ২৪ পরগণার মিনার্খা থানায়।

সর্বশেষ বলি যে সিদ্ধার্থ রায়ের ভাষায় "দ্বিতীয় নেতাজী" আনন্দ-বাজারের ভাষায় "ব্যালট বিপ্লবী" (বাহাদুর), যুব কংগ্রেসীদের "টাইগার প্রিয়দাস" যে আসলে একটি "পেপার টাইগার" তা এই নির্বাচনে প্রমাণ হয়ে গেছে। দক্ষিণকলকাতার এই দক্ষিণপন্থী যুবনেতাটি এখন বলছেন স্বার্থে যা রাজনীতি করতে হবে। তিনি দক্ষিণ বাম যে যে যা রাজনীতিই করুন না কেন আগামী দিনে জনগণ দেওয়ালে তার নাক ঘষে দেবে। প্রিয় দাসমুখী সাবধান।

তাছাড়া মাদ্রাসা বোর্ডে পরীক্ষার ব্যাপারে ধোঁকা করতে গিয়ে অনেক ছাত্রই বোর্ডের কর্মচারীরা দালালদের হাতে পড়েন। অবশ্যই টাকা পরস্যা খাবার খানায় এই অভিযোগ করেছেন জনৈক ছাত্র। শ্রীহোসেন এই সব কুকর্মের বিরুদ্ধে তদন্ত করে দাবী ব্যক্তিদের শাস্তি দিয়ে মাদ্রাসা বোর্ডকে স্বচ্ছ চালাতে করার দাবী জানিয়েছেন।

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারদের দাবী দিবস

অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারসের ডাকে সারা ভারতের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়াররা ১২শে এপ্রিল তাদের দাবী দিবস হিসেবে পালন করেন। অফিসে দাবী ব্যাজ পরিধান সহ ছুটির পর রাজ্য সুবোধ মজিক স্কোয়ারে তারা জমায়েত হন এবং রাজ্য ফেডারেশন অব এসোসিয়েশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারসের নেতৃত্বে মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা দাবী সনদ পেশ করেন। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারদের মূল দাবী হল, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারদের জন্য একটি টেকনিক্যাল কমিশন গঠন, মহার্য তাতার জাতীয় কমুলা চালু করা, জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার ডেজিগনেশন, সম কাজে সম বেতন, প্রমোশন ও চাকুরী-বীগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, বরখাস্ত কর্মীদের পুননিয়োগ ইত্যাদি। সমাবেশে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারদের বিভিন্ন সমিতির মুখপাত্ররা দাবীগুলির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন।

মিথ্যা অভিযোগে সাংবাদিক গ্রেপ্তার

(দর্পণের পর্ষবেক্ষক)

'মালদহ জেলার মন্ত্রী বরকত এবং এম এল এরা জরুরী অবস্থায় পুলিশ ও প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। মালদহ জেলার সাপ্তাহিক পৌড়ভূমির সম্পাদক দীপক চৌধুরী তাদের কার্যকলাপের সমালোচনা এবং কংগ্রেসী-ভুক্তদের তথ্য উদঘাটিত করতেন বলে জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে ১১৭৫ সালের ৫ই আগষ্ট রাত দুটোয় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগ সম্পূর্ণ সাল্লানো ও মিথ্যা। অভিযোগে বলা হয় যে, শ্রীচৌধুরী নাকি ভদ্রবিবাজারে সি পি এম অফিসে ৫ দিন অর্থাৎ ৫-৮-৭৫ এ রাত নটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত এক সভায় বসে হিংসাত্মক কার্যকলাপ পরিচালনার যত্ন করেন। যার মধ্যে রয়েছে পুলিশের আধেয়াস্ত্র জিনতাই, পুলিশ ও সরকারী

কর্মচারী হত্যা এবং ডাকাতির কর্মসূচী। আরও অভিযোগ, শ্রীচৌধুরী নাকি পত্রিকার ওপর থেকে সেন্সরশিপ প্রত্যাহারের দাবি সম্বলিত পোস্টার শহরের বিভিন্ন জায়গায় লাগিয়েছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ৫-৮-৭৫ তারিখে ওদরিবাজারে সি পি এমের কোন অফিস ছিল না, বছর দুয়েক আগে ওখান থেকে সি পি এমের অফিস নেতাজী মোড়ের স্থানান্তরিত হয়েছে। উপরন্তু দীপক চৌধুরী সি পি এমের সদস্য নন অথবা সক্রিয় কর্মীও নন।

পশ্চিমবঙ্গে শ্রীচৌধুরীই প্রথম সাংবাদিক যাকে মিসার গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে জেলে কোম মর্দাদা দেওয়া হয়নি এবং সাধারণ কয়েদীর মত রাখা হয়েছিল।

আটক রাজনৈতিক বন্দীদের সংখ্যা কত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ভারতের বিভিন্ন জেলে কত রাজনৈতিক বন্দী আছে? সি পি আই (এম) এম পি ত্রিভোজীর বহু বরাট্ট মন্ত্রী শ্রীচরণসিংকে লিখিত এক চিঠিতে এই সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন।

শ্রীবহু বলেছেন যে, ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে নকশাল বন্দীদের সম্পর্কে একটি জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সুপ্রীম কোর্টের অ্যাডভোকেট শ্রী এ কে গর্গের উদ্যোগে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন কংগ্রেসী শ্রীঅজুঁন অরোরা ও শ্রীচন্দ্রশেখর। এই কনভেনশনে বলা হয় যে, সারা ভারতে ৩২ হাজারেরও বেশি নকশাল বন্দী আছে (জাশনাল হেরাল্ড ২৯।৪।৭৩)। এর মধ্যে ৭৮৪ জন আছে অন্ধ্রপ্রদেশে এবং ১৬০ জন উড়িষ্যায় (নবভারত টাইমস ৭.৪.৭৩)। আরও একটি সংবাদে জানা যায় (ফ্রন্টিয়ার প্রকাশিত চিঠি ৭.৪.৭৩) কেরালায় ১০০ জন বন্দী আছে। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গের বরাট্ট বিভাগের তৎকালীন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীহরত মুখোপাধ্যায় রাজ্য বিধানসভায় বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ১৭,৭৮৭ জন নকশাল বন্দী আছেন, যার মধ্যে ১,৩২২ অল্প বয়সী ছেলে, ১১৬১৬ জন যুবক এবং ২,০২০ জন কর্মচারী (আনন্দবাজার, ১৭.৩.৭৩)। এই বছরেই সি পি আই (এম) এর দৈনিক গণশক্তি (২২.৬.৭৩) বলে যে, পশ্চিমবঙ্গে ১.৮০০ জন বন্দী আছে তাদের দলের এবং এদের নিয়ে

৪০০০ জন রাজনৈতিক কর্মী বিভিন্ন জেলে আছে তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শ্রীবহু বলেছেন, এরপর আরও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একজন পুলিশী মুখপাত্রের মুখে ১৯৭৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ঐ বছরের ৩রা আগস্টের মধ্যে ১৩০০ জনকে নকশালপন্থী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্টেটসম্যান ৪.৮.৭৪)। যখন অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টস্বরূপ মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া পশ্চিমবঙ্গের নকশাল বন্দীদের সংখ্যা উল্লেখ করে বলা হয় যে এই রাজ্যে বন্দীদের সংখ্যা ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজারের মধ্যে তখন সরকার আপত্তি করে বলেন যে, ১৯৭৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত এই প্রকার বন্দীর সংখ্যা ১৬০১ জন (হিন্দুস্তান ট্যাগার্ড ২২.১.৭৪) যার মধ্যে ১,০১৭ জন বিচারার্থী এবং ৫৯২ জন ডেটিনিউ।

শ্রীবহু বলেছেন, যদি আমরা ১৯৭৩ সালে দেওয়া শ্রীমুখোপাধ্যায়ের তথ্য ও ১৯৭৪ সালে দেওয়া সরকারের তথ্য মেনে নিই তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে এই সময়ের মধ্যে ১৬,১৭৮ জন নকশালকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত সংগঠনগুলি দাবী নকশালদের মামলা লড়ছে এবং নতুন গ্রেপ্তার ও মুক্ত বন্দীদের হিসেব রাখে অবশ্য দাবী করেছে যে এ পর্যন্ত যাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে তাদের প্রকৃত

সংখ্যা কয়েকশো মাত্র। তাছাড়া অধিকাংশ বন্দীকে ১০।১২ টা মামলায় ফুলিয়ে দেওয়ার জন্য যে আইনগত জটিলতা তাতে ১৬ মাসের মধ্যে অল্প বন্দীর পক্ষে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। শ্রীমুখোপাধ্যায় বিধানসভায় যখন বিবৃতি দেন তখন তিনি একথাও বলেন ছিলেন যে নকশালদের "একুনি" মুক্তি দেওয়ার কোন পরিকল্পনাত্মক নেই। বিচারে শাস্তিপ্রাপ্তদের নাম উল্লেখ করে শ্রীভোজীর বহু বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশ পাঁচজন (নবভারত টাইমস, ২৬.৪.৭৪) উত্তরপ্রদেশে দুজন ও পশ্চিমবঙ্গে দুজনকে মুক্তাদেও দেওয়া

হয়েছে যাদের সকলেই সি পি আই (এম-এল)-এর সঙ্গে যুক্ত। অন্ধ্র নাগ-ভূষণ পট্টনায়ক ও কৃষ্ণা রেড্ডিকে বাবাজীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কিশোরী গৌড় ও ভূমাইয়াকে ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে কাশী দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম-এল)-এর তিন জন বন্দী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত—নদীয়ার কাশীপদ সর্দার, নিতাই বিশ্বাস ও সুদেব বিশ্বাস। এদের কাশী দেওয়া হয়েছে কিনা এখনও জানা যায়নি। ১৯৭৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত অন্ধ্র ৪৪ জন বন্দীকে বাবাজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। শিপলস ইউনিয়ন অব সিভিল রাইটসের মতে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় প্রাপ্ত অল্পত ১০০ নকশালপন্থী বাবাজীবন কারাদণ্ড ভোগ

করছেন। এর মধ্যে কাশী সান্তাল, সৌরীন বহু ও অজ্ঞাতরা আছেন। বিচারার্থী বন্দীদের সম্পর্কে শ্রীবহু বরাট্ট মন্ত্রী শ্রীচরণসিংকে বলেছেন যে, অন্ধ্রপ্রদেশে ১৯৭৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বিখ্যাত পার্বতীপুর মন্ড-যন্ত্র-মামলা ছাড়াও ৭২টি মামলা আছে যেগুলো এখনও দায়রা আদালতে যায় নি। অধিকাংশ বন্দী ১৯৬৮ বা ১৯৬৯ সাল থেকে জেলে পড়েছে। ১৯৭৩ সালের ১০ই মে কেন্দ্রীয় বরাট্ট দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকে সি পি পি পাকে প্রকারে স্বীকার করেছিলেন যে, অধিকাংশ মামলা সাজানো এবং মিথ্যা অভিযোগে লোককে বিচারার্থী বন্দী হিসেবে আটক রাখা হয়েছে। মন্ত্রী (শেখাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়)

রাজনৈতিক বন্দী ও জনতা পার্টির সমস্যা

পঙ্কজ চৌধুরী

ভারতের সামাজিক সমস্যা অনেক। বিদেশী পুঁজি এবং দেশীয় ব্যক্তিগত বৃহৎ পুঁজির শোষণ বন্ধ করার সমস্যা; জমিদার জোতদার, হুদখোর মহাজন, কালোবাজারী-চোরাকারবারীদের শোষণ উচ্ছেদ করার সমস্যা; খাদ্য বস্ত্র গৃহ-শিক্ষা এবং কাজের অভাব দূর করার সমস্যা; অস্পৃহতা নিরক্ষরতা, নারীজাতির উপর পিগীড়ন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার সমস্যা। এ ছাড়াও আছে, একটি অর্থনীতি, একটি উপযুক্ত রাষ্ট্রতন্ত্র এবং একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার সমস্যা। এ সবই ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা এবং জাতীয় গণতন্ত্রের মৌলিক সমস্যা। ভারতের এই সমস্যাগুলি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল। তাই এই সব সমস্যাগুলির একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটির সমাধান করা যাবে না। এই সমস্যাগুলির জটিল ভারতের বন্দীদের সমস্যাটির উদ্ভব হয়েছে এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির সমস্যাটি একটি মৌলিক সামাজিক সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে।

জমতা সরকার তার দলীয় স্বার্থেই ভারতের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির সমস্যাটিকে অস্বাভাবিক বন্দীদের মতো রাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বারা অর্থাৎ পুলিশী রিপোর্ট, বিচার ব্যবস্থা এবং প্রচলিত আইন কাহিনের মাধ্যমেই সমাধান করার কথা ভাবছে। কিন্তু ভারতের কোন মৌলিক সামাজিক সমস্যাকেই পুরনো রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বারা সমাধান করা যাবে না। বন্দীমুক্তি সহ ভারতের অস্বাভাবিক মৌলিক সমস্যাগুলিকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বারা সমাধান করতে গেলে সমস্যাগুলি আরো বেশী জটিল হয়ে দেখা দেবে। কারণ ভারতের যে সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য নকশালপন্থীরা সি, পি, আই (এম) নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল সেই সমস্যাগুলি আজও বর্তমান। সেই ক্ষয়বর্ধমান সমস্যাগুলি সমাধান করার মতো আজও কোন সঠিক পথ আবিষ্কৃত হয় নি। জনতা পার্টি যদি সেই সমস্যাগুলি সমাধান করার মতো কোন সঠিক পথ আবিষ্কার করতে না পারে তবে তাকে কংগ্রেস সরকারের থেকেও অনেক বেশী বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হতে হবে। জনতা সরকার তাদের মোকাবিলা করবে কিভাবে? জেল, গুলি, লাঠি এবং গুলিঘাতকদের দিয়ে? জনতা সরকারকে এটা আগে স্থির করতে হবে। কারণ রাজনৈতিক সংগ্রাম, রাজনৈতিক বন্দী এবং বন্দী মুক্তির সমস্যা ভারতের অস্বাভাবিক মৌলিক সমস্যাগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তথাপি রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির সমস্যাটিকেই জনতা দলকে সর্বপ্রথম সমাধান করতে হবে।

পৃথিবীর সব দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থাই দেশবাসীর মধ্যে তিন ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। সমাজতান্ত্রিক চীনও তার ব্যতিক্রম নয়। সেই প্রবণতাগুলি হল—(১) প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার প্রবণতা, (২) প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার প্রবণতা এবং (৩) প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা অথবা পরিবর্তন করা সম্পর্কে আশেপাশে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকার প্রবণতা। যে দেশে বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা থাকবে সেই দেশে ততদিন কমবেশী পরিমাণে এই প্রবণতাগুলিও থাকবে। কংগ্রেস সরকারের রাষ্ট্র ব্যবস্থার যেমন এই প্রবণতাগুলি ছিল তেমনি জনতা সরকারের রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও এই প্রবণতাগুলি দেখা দিতে বাধ্য। কারণ কংগ্রেস সরকারের রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে জনতা সরকারের রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। গত লোকসভার নির্বাচনের পর কংগ্রেস দল যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর থেকে নেমে দাঁড়াল জনতা দল সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর আসীন হয়ে গণতন্ত্রী কংগ্রেসীদের নিয়ে জনতা সরকার গঠন করল। তার ফলে ইমার্জেন্সির রাজনীতি রোধ করা সম্ভব হলেও ভারতের সামাজিক সমস্যাগুলি এবং পুরনো রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

এই অবস্থায় জনতা দল যদি তাদের দলীয় স্বার্থের পরিবর্তে দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখার চেষ্টা করতে পারে কেবলমাত্র তাহলেই তার পক্ষে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির আশ্রয় সমস্যাটিকে সঠিকভাবে সমাধান করা সম্ভব। যারা দেশের সমস্যাগুলিকে সমাধান করার জন্যই তুল পথ গ্রহণ করেছিল তাদের মহৎ উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখেই জনতা দলকে বন্দীদের প্রতি অনেক বেশী সহানুভূতিশীল হতে হবে। দেশের সমস্যাগুলিকে সঠিক পথে সমাধান করার জন্যই সমস্ত রাজবন্দীদের বিনা শর্তে মুক্তি দিয়ে সকলের সঙ্গে সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করে একটি সঠিক পথের উদ্ভাবন করতে হবে। দলের জোরে অথবা রাষ্ট্রশক্তির জোরে কেউই কোনদিন নিজেদের সঠিক বলে প্রমাণিত করতে পারে নি। কংগ্রেসীরা দলের থেকেও ব্যক্তিকে বড় করে তুলেছিল। ক্ষমতাসীন জনতা দলকে পক্ষে কি দলের থেকেও দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখা সম্ভব হবে। যদি জনতা দলের পক্ষে তা সম্ভব না হয় তবে সেও তার পতনকে রোধ করতে পারবে না। সবটাই নির্ভর করছে রাজনৈতিক বন্দীদের সমস্যাটি জনতা দল কিভাবে সমাধান করবে তার উপর।

কবিতায় নিবেদন এই যে সমীর রায়

সম্পাদক মহাশয় সমীপে

কবিতায় নিবেদন এই যে

যেহেতু মিসায় বন্দী আমি

কেউ অগ্নিসাক্ষী করে বলে দিলেও আমার এই চিঠি

বা লেখা পৌঁছবে কিনা জানিনা।

একটা জলজ্যান্ত মানুষ যখন বিনা বিচারে বন্দী হতে পারে

তখন ছোট্ট একটা চিঠি বা কবিতা তো মানুষটার গলা জড়িয়ে

বসবাস করবে, এটাই নিয়ম।

তবু বেশিরভাগ কিছু কিছু ঘটছে

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সূর্যকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে গিয়ে

অনেকের আঙ্গুল ভেদেছে

মারুতি কারখানার একশ টাকার মালিক

একশ কোটি টাকা তুলে মদ না পেট্রল গিলবে ভাবতে পারছে না—

এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধ গ্রহ তারা নক্ষত্র

কাকের ডানার পাশে লুকাতে ব্যস্ত

তাই আমার চিঠি বা কবিতায় নিবেদন আপনার কাছে

আমার মাতৃভূমির মানুষের কাছে

যারা আমাদের কথা ভাবছেন, আমাদের কথা লিখছেন

ভাদের উষ্ণ হাতের পাশে, রক্তের পাশে

আমাদের উপস্থিতি অমর;

ফিস ফিস করে

কোন "অশ্বখামা হত ইতি গজ"র চালাকি এখানে চলবে না।

বন্দী জীবনের রাহমুক্তি

শ্রীকান্ত বহুরায়

বিশ্বের 'বৃহত্তম গণভক্ত' সব কিছুই বৃহত্তম—বৃহত্তম অশিক্ষা, বৃহত্তম দারিদ্র্য বৃহত্তম বেকার বাহিনী, বৃহত্তম কারাগার, বৃহত্তম পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা।

সাম্রাজ্যবাদী পুলিশের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল এক অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা করেছে। আবার উৎপাদন ব্যবস্থা, অর্থনীতি, শাসকশ্রেণী, শাসন-ব্যবস্থা, প্রশাসন পুলিশ—এগুলি অবিচ্ছেদ্য ও জাতীয় চরিত্রহীন উৎপাদন ব্যবস্থার, এ সম্বন্ধেই জাতীয় চরিত্রহীন হতে বাধ্য। অতএব, জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী ও গণবিদ্বেষী রাজনীতির এক মৌলিক উৎপাদন ভারতের অর্থনীতির বিনিয়োগে নিহিত রয়েছে এবং তার সমস্ত উপরি কাঠামোর বিস্তৃত। ভারতের এই উৎপাদন ব্যবস্থার তাৎপর্য, পুলিশ বিনিয়োগের এই পদ্ধতি ও এরূপ বিনিয়োগ-সম্পর্কের তাৎপর্য শুধু অর্থনৈতিক নয়, দেশের গণমুক্তির ইতিহাসে চূড়ান্তরূপে রাজনৈতিক। কেননা, কোন দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি পৃথক-দুই নয়, হতে পারে না। আমরা জানি রাজনীতি হলো প্রচলিত অর্থনীতির বনীভূত প্রকাশ ("Politics is the concentrated expression of economics"—Mao Tse Tung); অতএব, সাম্রাজ্যবাদের উপাদানে সংগঠিত উৎপাদন ব্যবস্থা অবশ্যই কোন জাতীয় চরিত্র সম্পন্ন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, অর্থাৎ এরূপ রাষ্ট্রশক্তি এমন কি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশে বাধা দিতে বাধ্য আর সমাজ-তান্ত্রিক শক্তিস্তরের বিরুদ্ধে আগ-বাড়িয়ে মার দেবার ব্যবস্থা তো থাকবেই। ভারতে বন্দীমুক্তির সমস্যা তাই একটা স্বাধীন সমস্যা এবং তার উৎসও সাম্রাজ্যবাদী উপাদানে ও নেতৃত্বে সংগঠিত এ হেন উৎপাদন ব্যবস্থার।

তাইতো বিগত ত্রিশ বছরের ইতিহাসে এমন কোন বছর ছিল না যখন ভারতের কারাগারগুলোতে হাজার হাজার রাজবন্দী ছিল না। একই কারণে ভারতে এমন কোন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন হয় নি যার বিরুদ্ধে পুলিশী ছলমূল ঘটেনি, কোন সরকারী আধা-সরকারী চাকুরীতে এমন লোক নিয়োগ হয় নি যেক্ষেত্রে সরকারী নীতির সামান্যতম বিরোধিতার পুলিশ রিপোর্ট রয়েছে। তাই তো কুখ্যাত পি ডি এ্যাক্ট ভারতীয় সংবিধানের অঙ্গীভূত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর করে কয়েকটি মৌলিক অধিকারের (Fundamental rights) অস্তিত্ব ঘোষণা করতো: আর অবিরাম ব্যবহারে এটিও যখন 'ভাঙ্গা কুলো'

হয়ে এলো, তখনই তার 'বাঁপের মতন বড়দান' কুস্তকর্ণ জি-আই আর তার দীর্ঘ বার বছরের নির্যাতনে ১৯৭২ সালে কর্ম-শূন্য করলো। তারপরও পি ডি এ, মিস।। সাম্রাজ্যবাদের রক্তহীন মাহু-ভলো উৎপাদন ব্যবস্থার 'ব্লাড ব্যাক্স' জমা পড়লো।

সাম্রাজ্যবাদের এগনিসিয়া যোগীরা তাদের রক্ত ফেরৎ চাইছে; তাই ইন্ডোনেশিয়ার বন্দীশালা, থাইল্যান্ডের কারাগার, চিলির কয়েদখানা আর ভারতের জেলখানার পার্থক্য ক্রমশঃ ঘুচে গেল। পশ্চিমবঙ্গের ১৩টি 'ট্র্যাটেক্সিক' জ্যামলেটে' (ভিয়েনামে মার্কিনী বাঁচা) কুখ্যাত 'মাইলাই'-এর পুনঃ পুনঃ বোলদকা পুনরাবৃত্তি চললো—শতাধিক মরলো, তিন শতাধিক গুরুতর আহত কিংবা বিকলাঙ্গ হলো। গোপন হত্যার ও হাজত-হত্যার হিসেব কে দেবে? আর বন্দীদের প্রতি জেল পুলিশ, থানা পুলিশের আচরণ? এ কাহিনী শুনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাও লজ্জায় 'রাডি' হয়ে উঠবে। এক

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের হাতে-গড়া পুলিশ-প্রশাসন ক্রমে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার শিকারী বাহিনীতে পরিণত হয়ে যে অক্ষয় দেশ-প্রেমের অধিকারী হয়েছে, দেবী-রুণ-পাঁচু-বিভূতিরা তারই পতাকা বয়ে নিয়ে চলেছে; ৬০ কোটি মানুষের রক্তমাংস কেনাবেচার এই বাজার যতই চিলে হয়ে আসবে ততই এই ব্যবস্থা গেড়ে-বসতে চাইবে, মাহুখী হবে, তাই পুলিশ বেটন ছেড়ে রাইফেল ধরেছে, আই পি সি, সি আর সি সি সি বদলে পি, ডি এ মিস। ধরেছে, প্রশাসন শবাসনে বসেছে, 'রাজ-নীতিক'রা ডিগবাজীর পর ডিগবাজী খেয়ে ঠাইল পালটাচ্ছে।

বন্দীমুক্তি একটি অক্ষরী কাজ—অতএব জনসাধারণের সমস্ত অংশকেই এ কাজে শুধু সচেতন নয়, সক্রিয়ও হতে হবে; এ কাজ ও দায়িত্ব শুধু বিভিন্ন গণতান্ত্রিক পার্টি ও সংগঠনের নয়, সমগ্র দেশের সমগ্র গণজীবনের। বিতরিত: মনে রাখতে হবে এই

উৎপাদন ব্যবস্থা, সম্পদ ও অধিকারের এই বন্টন ব্যবস্থা বর্তমান অপরিবর্তিত থাকবে, সাধারণ মানুষের অভিযোগ ততদিন, জমকে থাকবেই; অতএব বন্দীমুক্তি আন্দোলনের তাৎপর্য কিছুতেই কমছে না। আর সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় যে ব্যাপার সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে তা হলো বন্দীদের মুক্ত করাটা বা মুক্ত হওয়াটা একটা প্রতিকার মাত্র, কোন অধিকার নয়—মুক্ত থাকারই মূল অধিকার। আর এ অধিকার কোন মালিকী রাষ্ট্র জনগণকে দেয় না, একে অর্জন করতে হয়; মালিকশাহী দিতে পারে দাসত্ব, বেকারত্ব, জেল মার আর যত্ন, আর কিছুই নয়—নিরস্ত্র মানুষকে সশস্ত্র আলিঙ্গনে নিষ্ক্রিয়, নিস্তর্র বা 'নির্বোজ' করে দেবার স্বাধীন ব্যবস্থা। অতএব, উৎপাদন ব্যবস্থাটা মুক্ত না হলে, অর্থনীতির বিনিয়োগকে রাজনৈতিক মুক্তি না দিতে পারলে, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোন মুক্তি আসে না।

আমরা জানি, শুধুমাত্র ইট দিয়েই

কোন জেলখানা ভেদী হয় না; রাজ-নৈতিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীশাসন, আইন ও প্রশাসনের পেছাই-কলে এ বস্ত্র ভেদী হয়। সমস্ত মালিকশাহী রাষ্ট্রেই এরূপ বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার যখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শক্তির জন্ত ও কারামারা-হত্যার ব্যবস্থা পাকা হয়, তখন তার উৎপাদন ব্যবস্থাটাও বেশ শ্রমদাতার পক্ষিক হয়েছিল এটুকু নিঃসন্দেহে বলা চলে। শ্রমদাতার জীবনে যেমন আর শৈশব ফিরে আসে না, এরূপ রাষ্ট্রকেও তেমনি ক্যাসিবাদের পথ থেকে 'গণতন্ত্রী' বানানো যায় না—শত সাজে সাজিয়েও। উপরি-কাঠামোর দুর্বলতাগুলোকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, এক সম্ভাব্য হুমুয়া-গুলোকে কাজে লাগাতে হবে ঠিকই, কিন্তু জটিল আবর্তে অড়িত গণজীবনকে সমস্তরূপে মোহ থেকে মুক্ত হতে হবে। রাহুর কক্ষপথ থেকে মুক্ত হতে না পারলে বার বার রাহুগ্রাস হবে, প্রকৃত রাহুমুক্তি হবে না।

মানুষের অধিকার মণিভূষণ ভট্টাচার্য

"পিঞ্জরে বিহ্বল বাঁধা, সজীত না মানিল যখন।"

—'বক্সা দুর্গরাজ রাজবন্দীদের প্রতি': স্ববীজনাথ

কাল বারা জেলে অক্ষর গরাদের কঁকে চিবুক রেখে রাত-জাগা চোখে ভোরের আকাশে টুকরো টুকরো চলন্ত হৃদপিণ্ডের দিকে তাকিয়েছিলেন, আজ তাঁরাই সমস্ত জেলখানার মালিক।

আজ বারা প্রশাধ করতে গেলেও কোমরের শেকলের একপ্রান্ত দরজার বাইরে গৌকে তা-দেওয়া হাতে ধরা থাকে—

আজ বাদের ঘরা এনামেলের থালার উপর এক খাবলা ভাত ভাতের উপর দু'হাতা জলের মত ডাল, ডালের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে আখধানা শুকনো পোড়া লস্ক; আর উত্তর পূর্বদিগন্তে ভেসে বেড়াচ্ছে কালবৈশাখীর বজ্রগর্ভ মেঘমালার ভারতীয় আশ্বিনের শিরা উপশিরা—

বাদের শরীরের প্রতিটি অংশকে দিনের পর দিন খুবলে নেওয়া হয়েছে বারা রোজ উচু পাচিলের উপর এক টুকরো এলীয় রুটি নিয়ে রাহু দাঁড়কাক

আর চতুর

পাতিকাকের লড়াই দেখেন এবং ডান হাতে বন্দুক আর বাঁ হাতে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান-খোঁচানো সেপাই ছাড়া বছরের পর বছর মা-বাবা ভাই-বোন বন্ধু-বান্ধব স্ত্রী ছেলে মেয়ের মুখ কিংবা CENSORED AND PASSED ছাপমারা পোস্টকার্ডও দেখতে পান নি, অথচ বাদের বুকে নেচে ওঠা আত্মনে স্বাধীন মাহুখীর বিশাল স্বপ্ন এবং মধুরতম বন্দনগান— মশার ছল এবং গোয়েন্দার চোখ বাদের শরীর ফুড়ে ফুড়ে গণতান্ত্রিক কাঁথা সেলাই করছে— তাঁরাই একদিন ঐতিহাসিক নিয়মে নতুন সরকার গঠন করতে পারেন, এবং সমস্ত জেলখানার দরজা খুলে দেবেন।

যারা রোজ কলে কারখানায় ক্ষেতে খনিনে ধামারে দপ্তরে

কোটি কোটি মানুষের গায়ের ঘাম এবং কল্লের রক্ত চমৎকার ভাবে চুষে নিয়ে ক্যাকাশে হাতগুলো গ্রামে গ্রামান্তরে এগরে বন্দরে বস্তিতে ফুটপাথে ছুঁড়ে দেয়— তাদের একহাত যখন ট্রাম বাসের গারে লেখে "হিংসা বর্জন করুন নিজে বাঁচুন অন্যকে বাঁচতে দিন" অন্য হাত তখন লকআপে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্ত গুল্লবার দিয়ে লোহার রড চুকিয়ে দেয়, এবং বেলেঘাটা বায়ানাত বা বরানগরের রাজাঘাটে এ কোঁড় ও কোঁড় যুবকদের লাশ উটে রাখে জেলের ভিতরে যখন তখন পাগলাঘটিতে বিসর্জনের বাজনা বেজে ওঠে—তখন এদের মুখে 'ও শান্তি, ও শান্তি' শুনে 'হেরকুফ' ছাপমারা নামাবলী গারে জড়ানো একটা ঘেরো আর দুর্বল বাঘের লাক-দেওয়া তিনটে বড় বড় কষ দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে মাংসের আশ-লেগে-ধাকা-ছবি চোখের উপর ভেসে ওঠে।

হুতরাং উপদেশ নয়, নীতিবাক্য নয়, আবেদন নয়, প্রার্থনা নয়, লক্ষ লক্ষ বুকের খোলা উছনে টগবগ টগবগ করে ফুটে ছাি।

দাবি—

এই নিরস্ত্র স্তব্ধ মধ্যরাত্রির উদারতায় নীল নক্ষত্রের কোটি কোটি মশাল জ্বালানো মুক্ত আকাশের নীচে ভারতবর্ষ নামক এই বিশাল নিষ্প্রভ ভাবে নির্ধাতিত মনুষ্যত্বগ্রাসী জেলখানা থেকে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী সহ সমস্ত গরাব মানুষের শর্তহীন মুক্তি চাই।

পাল্লামেন্টের সদস্যবৃন্দকে খোলা চিঠি অমৃত মিত্র

মাননীয় সদস্যবৃন্দ। ওকতর রাজস্ব কেন্দ্রে আমার কথার কান লাগান একটু সেবকের কিছু নিবেদন আছে। ছোটবেলা থেকে নিরাকরণ অভাবের ভেতর মাহুয় হয়েছি বলে কথগুলো কী রকম একে বৈকে গেছে। আমাকে আড়ালে তাই অনেকেই তেতোবডি বলে। জ্ঞান হওয়া থেকেই আমার ভীষণ সাপ মারার নেশা ছিল আজও আছে। পিচ্ছিল শরীর দেপলে আমি আর কিছুতেই স্থির থাকতে পারিনি। পেশীর ভেতর রক্ত সঞ্চালন দ্রুত হয়। কপালের শিরাগুলো দপদপ করতে থাকে। পিচ্ছিল শরীরের মাথা যতক্ষণ না আমার হাতে ছেঁচে যায় স্থির থাকতে পারি না। হায়! সাপ মারার নেশাই আমার হয়েছে কাল আমার ক-অক্ষর গোমাংস (হিন্দু তো)। প্রায়শই ছোটখুঁতে বড় বড় কথা এসে যায় মুখের অশেষ দোষ, মহান সদস্যবৃন্দ নিবেদনে বাচালতা প্রকাশ পেল।

নিজগুণে ক্ষমা করবেন আশা করি। মহান সদস্যবৃন্দ। গৌরচন্দ্রিকার অভ্যন্তর নই আমি হক কথা সোজা হুজি বলে ফেলা আমার স্বভাব। আমি শুধু আপনাদের পূর্বপ্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনারা। হ্যাঁ, আপনারাই একদিন বড়োগলার বলেছিলেন বৈরাচারী জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপনাদের আপোষহীন অভিযান চলবে, চলতেই থাকবে। অত্যাচারিত ভারতবর্ষের শান্তিপ্রতিষ্ঠায় আপনাদের অগ্রবর্তী বাহিনী প্রথমেই উপড়ে ফেলবে নারকীয় হিটলারী জেলখানা বলেছিলেন। এ দেশের মাটিতে যতদিন একটি মাহুয়ও বিনা বিচারে বন্দী থাকবে ততদিন গণতন্ত্র মিথ্যা, স্বাধীনতা মিথ্যা, শান্তিপ্রতিষ্ঠার কথাও বেমাননি— আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত।

মাননীয় সদস্যবৃন্দ। স্মরণ করুন মাতৃভূমিকে ভালোবাসার অপরাধে সোমেনের জেলে যাওয়ার পর সোমেনের বৃদ্ধা মা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে রোদ্দুরের ভেতর একটানা হাঁটতে হাঁটতে এক বিশাল লাইনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়েছিলেন ভোটপত্র হাতে তাঁর ভোটদান ছিল বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সমস্ত পশুত্বের বিরুদ্ধে তাঁর স্বন্দর, ক্ষমাহীন আক্রোশে ভরা নির্ভর ভোটদান, গুটিকর মাহুয়ের। নিজেদের বাড় থেকে ডিনামাইটের মাথলা উপড়ে ফেলে স্বাধীন আর স্বচ্ছন্দ হবার জন্তে নয় গুটিকর মন্ত্রী বানানোর জন্তেও নয় তাঁর ভোটদান ছিল মাহুয়ত্বের অপক্ষে মাহুয়ত্বের এক আশ্চর্য ভালোবাসায় উজ্জ্বল।

মাননীয় সদস্যবৃন্দ! সোমেনের মা আজও ফিরে পায়নি বিনা বিচারে আটক থাকা তার ছেলেকে প্রতিদিন খবর আসছে জেলের ভেতর সে ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে প্রতিদিন খবর আসছে তার মা আবার ভোটপত্র হাতে এগিয়ে আসছেন দীর্ঘ লাইনের

শেষপ্রান্তে দাঁড়াবেন বলে প্রতিদিন ঈশান কোণে জড় হচ্ছে তাঁর প্রবল অভিলাষ। অত্যাচারী আর মিথ্যাচারীর বিরুদ্ধে, মেঘের মতো যে মেঘ থেকে আকস্মিক বজ্রপাত হয় যে মেঘ থেকে ২৪ ঘূর্ণিঝড় ওঠে সেই মেঘ আন্তে আন্তে ছেয়ে যাবে দশদিক এপার ওপার। সাবধান সদস্যবৃন্দ! মারের অভিলাষ মাথায় করে আজও কেউ শান্তিতে মরেনি পাপের রাজত্বে মহাপ্রলয়ের দিন আন্তে আন্তে ঘনিয়ে আসছে।

মাননীয় সদস্যবৃন্দ! জ্ঞান হওয়া থেকেই আমার ভীষণ সাপ মারার নেশা ছিল আজও আছে কেননা প্রতিটি সাপ বিশ্বাসঘাতক।

ব্যবহার করো সত্যের বন্দোপাধ্যায়

আসলে রাজনৈতিক কারণে ধৃত, যে-কোনো বন্দীর মুক্তি চাই।—লোকদাবী।

জঘন্ম হত্যাশার দিনগুলিকে আমরা উপড়ে ফেলেছি এখন চোখের সামনে নতুন আকাশ, গাছপালা চার দেয়ালের শিকের ভেতর আটকে থাকা বন্ধুরা আর বেশীদিন হাত পা-বাঁধা থাকতে পারে না। কেউ কেউ নেই। যেই কেউ সামনে পা বাড়ানো, অমনি হিঁতৈবী অনেকেই কিস্কিস্ করে, টেচিয়ে, কান্নাকাটি করে বলছিলো— যেও না, গেলেই সাক্ষাৎ মৃত্যু বিনিময়ে কিছু গাওয়াও যাবে না। ধীরে ধীরে লোকজনের ভিতরে একটা ভরসা আসছে আকাশ পরিষ্কার হয়ে নতুন আকাশ হয়ে আসছে চোখের জলে ভাসছে এমন কেউ চারদিকে নেই সকলেই চোখের জল ধরে রাখছে বুকের ভিতরে। ইতরেগাই একমাত্র সর্বনাশা শক্তির নামে পরম শান্ত থাকতে বলে। ছলে বলে যে ক'রেই চোক মাহুয়কে পাখর ক'রে রাখার বাসনা তাদের মিটিছে না। এমনি এমনি মিটিবেও না।

স্থির থাকো, অটল। চার দেয়ালের বন্ধুরা আর বেশীদিন আটকে থাকবে কিনা সেটা নির্ভর করে তোমার ওপরেই। প্রতিটি মুহূর্তকে ব্যবহার করো, আশ্রয় ব্যবহার করো। এখন চোখের সামনে নতুন আকাশ, গাছপালা জঘন্ম হত্যাশার দিনগুলিকে আমরা উপড়ে ফেলেছি।

মতামত

নকশাল বন্দী প্রসঙ্গে

বরাহমুখী চারণ সিং সম্প্রতি লোকসভা ও রাজ্যসভার রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি প্রসঙ্গে বলেছেন যে, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে দেখতে হবে তার মুক্তির সঙ্গে দেশের নিরাপত্তা জড়িত কিনা। প্রশ্ন এই যে, পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতেই তো নকশাল বন্দীদের আটক রাখা হবে? কিন্তু সমস্ত জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও কোর্টদারী আদালতের আহ্বানবীররা জানেন যে, অনেক পুলিশ রিপোর্টই মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক। পুলিশ রিপোর্ট প্রায়ই সেই সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়া হয় যারা শাসক শ্রেণীর চক্ষুশূল অথবা পুলিশ তাদের প্রতি বিকপ। এদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাধানো হয় অথবা কখনও পুরনো মামলার নাম জুড়ে দেওয়া হয় যার সঙ্গে এদের কোন সম্পর্কই নেই। পুলিশ কখনও স্বীকার করবে না যে, তাদের রিপোর্ট মিথ্যা ও সাধানো। ভারতীয় পুলিশ সম্পর্কে এলাহাবাদ হাইকোর্টের (লক্ষ্মী বৈষ্ণব) বিচারপতি শ্রীমোহন মত্বা স্মরণ রাখা দরকার, যদিও সেই মত্বা পরে স্প্রীম কোর্ট নাকচ করে দেন তা হলেও তার মধ্যে অনেক সত্য আছে।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক পরিবার কষ্ট পেয়েছে তাদের পরিবারে যারা রোজগার করে তাদের দীর্ঘকাল আটক রাখা হয়েছে বলে। বহু যুবককে দীর্ঘস্থায়ী মিথ্যা মামলায় আটক রেখে তাদের জীবন নষ্ট করা হয়েছে। জুজ-ভোগীরাই একমাত্র জানেন এই মামলা তাদের পরিবারের কাছে কি ভয়ঙ্কর। রাষ্ট্রের সম্পদ ও শক্তিতে বলীয়ান পুলিশের কাছে বা থানা, একজন উৎপীড়িত ও তার পরিবারের কাছে সেটাই মৃত্যু।

আইন না মানলে প্রত্যেক রাষ্ট্রই তা শক্ত হাতে দমন করবে সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু এ ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে কোন পক্ষ-পাতিষ হওয়া উচিত নয়। সকলেই জানেন পশ্চিমবঙ্গে অনেক রাজনৈতিক দল (বিশেষ করে 'মদিনীপুর জেলায় সি পি আই) বে-আইনীভাবে জমি দখল এবং তা করতে গিয়ে খুন করতে উৎসাহ দিয়েছে ও নিজেরা সংগঠিত করেছে। পুলিশ ও রাষ্ট্র সেই বে-আইনী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করেনি।

সুনীলকৃষ্ণ ঘোষ

সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মে-দিন আসবে, মে-দিন-যাবে। প্রতি বছরেই সে আসে; কখনও হাজার হাজার লাল পতাকার সমারোহ নিয়ে, কখনও চারদিকের নিষেধের রক্ত চক্ষুর পাহারায়, কখনও হয়ে খুঁড়িয়ে। গত কয়েক বছর পশ্চিম বাংলায় এমনই চর্চিন গেছে তারা। এবার হয়তো বরাত খুলবে, আবার মাঠে-ময়দানে কয়েক লক্ষ লাল ফুল ফুটেবে, গানের পাখিরা গলা খুলে গান গাইবে।

আমাদেরও ইচ্ছে হবে, ঐ শুভ-দিনটির জন্য একটি, অনেকগুলি কবিতা লিখতে। প্রতি বছরই তো লিখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সব সময়েই কি মে-দিনকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়? তবু, প্রতিবছর সময়ের মধ্যেও আমরা লিখেছি। সে-সব লেখা কেমন হয়েছে, অনারাসেই অহমান করা চলে। জরুরী অবস্থায় সয়াসরি মে-দিনের কবিতা—যে সময় সংবাদ-পত্রগুলির এবং সাহিত্য পত্রিকাগুলিরও পৃষ্ঠায় নিষেধের কীস—আমাদের মত সাধারণ কবিদের সাথো ছিল না। যা হোক, এখন তো জরুরী অবস্থা নেই, এ বছর আমরা অনারাসে মে-দিনকে নিয়ে একটি দুটি কবিতা লিখতে পারি। একদিন সেই না আমাদের চৈতন্যকে প্রচণ্ড আঘাত

করেছিল, বহু শ্রমিকের রক্তস্রাবের সঙ্গে লাল নিশানের শপথ ও গানকে একাকার করে দিয়ে। দেখা যাক, আমাদের বদেশে, ১৯৭৭ সনে ঐ দিনটি কীভাবে এসেছে? তবে তো আমরা একটি সত্যিকারের কবিতা লিখব।

বাইরে থেকে দেখতে তো বেশ ভাল। আগেই বলেছি, এবার কল-কাতার ময়দানে অনেক মে-দিনের ফুল ফুটেবে, অনেক লাল পতাকা আকাশ স্পর্শ করবে। ইন্দিরার অনেক বে-আইনী বেয়াদপীকে ইতি-মধ্যেই মাথায় গাধার টুপি পরিয়ে, দেশ থেকে হটানো গেছে। অন্তত কাগজে কলমে তো তাই মনে হয়। আমরা যে এই ময়দানে ঐ ময়দানে মে-দিনের সত্তা ডাকতে পারছি, মিছিল করছি, মাচা বাঁধছি—হুদিন ছাড়া এতসব তো আমাদের সাথের বাইরে ছিল।

ভেতরটা কিন্তু সত্যিই তত ভাল নয়। আধা-ক্যাসিস্ট ইন্দিরা সরকারের পতন ঘটেছে, খুব ভাল কথা। কিন্তু, ধারা ক্ষমতায় এসেছেন, মে-দিনের কোনো শপথ অথবা গানই তাঁদের জীবন-বেদকে সামান্য আলো-ভিত্তি করে না। তারা প্রায় সকলেই পুঁজিবাদী ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি,

আত্মীয় এবং বন্ধু। তাঁদের অধ্যাক্ষন এই দেশে শ্রমিকশ্রেণীর সামান্য স্ববিধা এনেছে বা আনতে পারে—তবু, তাঁদের সভা এবং মিছিলের অধিকার-টুকু অনিদিষ্টকালের জন্য ফিরিয়ে দেওয়া, এইটুকু ছাড়া—এমন কোন প্রতিক্রিয়াই তারা আমাদের লিখিত ভাবে জানাননি। এই দেশে এখনই এক কোটির মতো মানুষ স্বাভাবিক, ফুটপাথে এবং রেল স্টেশনের প্লাটফর্মগুলিতে পুষ্ট মতো রাত কাটায়। ঐখানেই তারা জমেছে, সন্তানের জন্ম দিয়েছে, এবং, আশু ফুলে ঐখানেই তারা কেউ চিং হ'য়ে, কেউ উপুড় হয়ে মরে থাকবে। এই দেশে এখন বিস্তৃত বেকারের সংখ্যা কয়েক কোটি। দেশের কলকারখানাগুলির অবস্থা ভয়াবহ। বহু কৃষকের বছরে নয় মাস উপবাস। এইসব বঞ্চিত, শোষিত, লক্ষ লক্ষ সর্বহারাকে বন্ধনা ও শোষণের হাত থেকে মুক্ত করবেন, অথবা মুক্ত করতে পারেন; সেই রাজনৈতিক পার্টীগুলি এখন পর্যন্ত ঘোর তিমিরে। নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে সর্বহারায় শোষণযুক্তির কোনো আন্দোলনই আজ তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর, এইখানেই আমাদের দুদিনের শেষ, এমন কোনো দিব্যপত্র দেখাও (বা মোটেই স্বপ্নের স্বপ্ন নয়) ঠিক নয়। ঠিক এই মুহূর্তেই, ১৯৭৭ সনের মে-দিনেই অন্ত নরক, অত্যন্ত অশ্রীল এবং উত্তম ভঙ্গীতে আমাদের হাজার লক্ষ লাল নিপানগুলিকে প্রকাশ্যেই ব্যঙ্গ ও বিদ্রোপ করছে—সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবার কোনো রাস্তাই আমাদের নেই।

আমরা তো একথা ভাল করেই জানি, মে-দিনের প্রথম শপথই হলো শৃঙ্খল-ভাঙার শপথ। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে, এই দেশের অনেক-গুলি জেলে হাতে শিকল পায়ে বেড়ি পরে বন্দীরা সমস্ত রাষ্ট্র নিরাজীকরণ বদেশীয় গণতন্ত্র আর ব্যক্তি স্বাধীনতার গোদা পারের লাধি সহ্য করছেন; সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁদের শৃঙ্খল-মুক্তি দূরে থাক, গত এক দশক ধরে এই দেশের প্রকাশ্য রাস্তায়, থানা-হাজতে, জেলে যে অমানুষিক অত্যাচার তাঁদের কাউকে পঙ্ক, কাউকে অধমিত এবং কয়েক হাজারকে পিটিয়ে খুন করেছে তার উদাহরণ পৃথিবীর যে কোনো সভ্য দেশে, এমনকি বর্বর দেশগুলিতেও বিরল। এখন শোনা যাচ্ছে, ক্যাসিস্ট-রাজত্বের অবসান হওয়া সত্ত্বেও আমাদের গণতন্ত্রী ব্যক্তি স্বাধীনতার ধরাজাধারী, এবং জনপ্রিয়

সরকার এইসব হত্যাকাণ্ড এবং অমানুষিকতার বিচার করতে অনিচ্ছুক। অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতেই বন্দীমুক্তি এবং বন্দীহত্যার প্রসঙ্গটা তারা উড়িয়ে দিচ্ছেন।

আর একটু গভীরে প্রবেশ করা যাক। বিনা বিচারে এবং বিচারের নামে বছরের পর বছর ধারা থানা-পুলিশের এবং জেলখানার সজ্জাদ বাহিনীর অত্যাচার সহ্য করছেন তারা কোথা থেকে এসেছেন? কি তাদের পরিচয়? মে-দিনের সভা ও মিছিলের সঙ্গে কোথাও তাঁদের বন্দীজীবনের যুক্তিগত যোগাযোগ আছে কিনা? এই প্রশ্নের সয়াসরি এবং অতিশয় স্পষ্ট একটাই উত্তর আছে। জেলের বাইরে থাকলে এদের প্রত্যেকের হাতে এখন একটি করে লাল পতাকা থাকতো। এবং এরা থাকতেন লক্ষ লোকের মিছিলের প্রথম দিকে। কিন্তু তারা এখন জেলের বাইরে নেই। মে-দিনে তো তারাও শপথ নিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের হাতে কোনো লাল পতাকা ছিল না। এমনকি কোথাও গাছে এক হাজার কৃষ্ণচূড়া অথবা গলাশ ফুটলে, তাঁদের চোখের আড়ালেই ঐ ফুল ফুটেবে; পাণ্ডি বেলবে, বয়ে বাবে?

এসব বন্দীদের মধ্যে এমন মানুষও আছেন, ধারা মে-দিনকে নিয়ে আমাদের মতোই কবিতা লিখেছেন, আজও লিখবেন। হয়তো আমাদের চেয়ে অনেক ভাল, সত্যিকারের কবিতা তাঁরাই লিখবেন। তাঁদের ওপর অজস্র অত্যাচার দিনের পর দিন চলেছে—এবং চলবে। তবু তাঁরা কবিতাই লিখবেন, যদি না ইতিমধ্যেই তাঁদের ডানহাতগুলিকে পঙ্ক করে দেওয়া হয়। অবশ্য এর পরেও তাঁরা বা হাত দিয়ে কবিতা লিখবেন। কিন্তু জেলের মধ্যে কোনও কবির বাঁহাতও তো চিরায়ু নয়—অন্তত, আমাদের দেশে, যেখানে মানুষকে সাত্রে নেকড়েদেরকোনোদিনই বিচার হয় না। কেননা, ধারাই যখন এই দেশের সিংহাসনে বসেন, নরহত্যা পোষা-নেকড়েদের জন্য তাঁদের কিছু শ্রীতি এবং তত্ত্বা থেকেই যায়। এদের সাহায্য এবং সদিচ্ছা ছাড়া রাজ্যশাসন নাকি একেবারেই অসম্ভব।

সুতরাং, মে-দিন যদি হয় শৃঙ্খল-মুক্তির, শিকল-ভাঙার একটি আত্ম-প্রাণিক তিথি আমাদের মনে নিতেই হবে, আমরা খুব হুদিনে নেই। 'সর্ব-হারার শৃঙ্খল' কথাটি ব্যবহৃত হয় ব্যাপক অর্থে। সত্যিই তো আর কোনো দেশের কোনো সর্বহারাকেই (যদি তারা রাজনৈতিক কর্মী না হন) কেউ হাতে শিকল, পায়ে বেড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে নি। তারা না

ধরে স্বাভাবিক মরে থাকছেন, শোষিত হচ্ছেন, উৎপীড়িত হচ্ছেন—এবং বৃহত্তর সত্যকথনের গুচ অর্থ মেনে নিলে—নিশ্চয় তারা খাঁচার বন্দী। মানুষের মতোই অসহায় জীবন যাপন করছেন। কিন্তু তাঁদের বন্দীজীবনটা অন্তরকম। ধারা তাঁদের পঙ্ক নিয়ে তাঁদের অসহায় অবস্থার প্রতিকার করতে জীবন পণ করেছিলেন, তাদের অবস্থা—অন্তত এই দেশের ধানায় এবং জেলে—'বৈচে থেকেও নেই'—এর মতো। অবশ্যই তাঁদের আত্মা বৈচে আছে, তা অবিনশ্বর। এবং ভাঙা হাতে তারা কবিতাও লিখছেন। কিন্তু আমরা, কয়েক লক্ষ স্বাধীন মানুষ, যখন মে-দিনের শপথ নিজে কেউ ময়দানে জমায়েত হয়েছি আমাদের মন কিছুতেই পুলকিত হচ্ছে না। 'জনতা পার্টির জয় গণতন্ত্রের জয়'—কথাটির মধ্যে যে সামান্য দিনবদলের ইংগিত থেকে যায়, এখন, মে-দিনের বিরাট সম্ভার কথা ভেবেও তার যথার্থ অর্থধাবন করতে আমার প্রচণ্ড অস্ববিধা হচ্ছে।

আর একথাও মনে হচ্ছে, বতর্দিন আমাদের ভাই বোন, পুত্র কন্যা—এক আশ্রয় পুলিশী ভাষাসার শিকার হয়ে (এবং সিদ্ধার্থ রায়ের ভৃত্যকে চরণ সিংদের কাঁধে-চড়ার প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে) এই স্বাধীন-রাষ্ট্র নামক অন্ধকার মহাদেশের থানা আর জেলগুলিতে রক্তমাংসের কর্ম হতে থাকবেন ততদিন আমাদের পক্ষে এই পুণ্য-তিথিতে একটি মাত্র কবিতাই লেখা সম্ভব—'সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে বিনামূল্যে এবং অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।' এই কবিতা, একে-বারেই গছের হতে পারে, যাতে বিন্দুমাত্র কাব্যরস নেই! কিন্তু জেলের বাইরে থেকে, হাজার লক্ষ লাল পতাকাকে বসন্তের হাওয়ায় অবাক উড়তে দেখে আমার যদি ইচ্ছে করে মে-দিনকে নিয়ে অন্য একটি কবিতা লেখার—তাহলে আমি নিজেই কক্ষ করতে পারবো কিনা সেটা একা সত্যিকারের, এবং কঠিন প্রশ্ন।

জল্লাদ মিহির আচার্য

এইসব বন্দীদের হত্যা নির্বাক্তন বা মুক্তি নিয়ে

আপনার বলবার কোনো অধিকার নেই।

কারণ এ-ঘটনা তো একদিনে ঘটেনি

তিলে তিলে জমে জমে পাথর হয়েছে।

আপনাদের চোখের দরোজার বখন এ দৃশ্য উঠেছে

আপনারা দরোজা দিয়েছেন শক্ত হাতে বন্ধ করে'।

আপনাদের মুখ কথা বলেনি, আপনাদের হাত কাজ করেনি।

মালিকের দেয়া সোনার কলমে এর একটি আখরও পড়েনি।

আপনারা 'স্বাধীনতা' 'মুক্ত সমাজ' নিয়ে বড় ব্যস্ত ছিলেন।

বে স্বাধীনতা ভাঙামি, আপনারা জানেন,

মালিকের স্বাধীনতা ছাড়া কিছু নয়।

যার অর্থ সাম্যবাদের বিরোধিতা করে'

মদ-মেয়েমাছুষ রঙ্গে বাবুর মোসাহেবি করা।

আপনারা ভুলে যাবেন না : একাধারে ঘাতক আর

কষিরাদির ভূমিকা, চতুরালির শাক দিয়ে ঢাকা বাঘ না।

নপুংসক ভদ্রদস্তানেরা, 'আমাকে বলতে দাও' চটকে

কাকে ভোলাবেন?

দীর্ঘকাল আপনারা বলবার কিছির শেয়েছেন।

সেদিন চূপ করে থাকার বদমায়েসগুলোকে চাকতে

আজ চোবের মায়ের গলায় বড় চিংকার শুরু করেছেন।

আপনাদের চূপ করে থাকারটাই এখন নিরাপদের হবে।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

৥ চাঁদার হার ৥

বার্ষিক ২২ টাকা

সাপ্তাহিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫৫০ টাকা

টাকাফড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠ্যবার ঠিকানা :

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, মট লেন। কলিকাতা ১০

দানিকেন অঙ্কুর আলোকে মহাভারতের সূচী ও দেবতা বীরেন্দ্র মিশ্র

হিমালয়ে দেবশিবির

মহাভারতে হিমালয় বা হিমাচল এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বিশাল কাব্যের মহান ব্যাপ্তি জুড়ে বারবার বর্ণিত হয়েছে হিমগিরি শীর্ষগুলি। বর্ণনা আছে গিরিশীর্ষে পৌছানোর বিভিন্ন যাত্রাপথের। তৎকালীন মহাবীরা তো বটেই, পাণ্ডবরাও হিমালয়ে গেছেন একাধিকবার। অর্জুন ও যুধিষ্ঠির মহাকাশ ভ্রমণে গেছেন, হিমালয়ের গিরিশীর্ষ থেকেই। স্বর্গ থেকে অর্জুনের প্রত্যাগমনের প্রতীকার পাণ্ডবরা বজ্রিনাথের পথে অর্জুনকে সর্ঘশনা জানানোর জন্য উপস্থিত হয়েছেন। পরশুরাম ভূভাগ ত্যাগ করে অবস্থান করতেন মহেন্দ্র পর্বতে। মহেন্দ্র, মতান্তরে, মল্লার পর্বত শ্রেণীর অপর নাম, ইন্দ্রকীল পর্বত। সেই ইন্দ্রকীল পর্বতের ওপর অর্জুন প্রত্যক্ষ করেছিলেন যুধিষ্ঠির দেবসমাগম। দেবতারা পার্বত্য শিখরে প্রত্যেকেই অবতরণ করেছেন রশ্মিময় আকাশযানে চেপে।

দানিকেন ইজেকিয়েল, এলিজা, এনক ও এজরা প্রমুখ বাইবেলীয় পয়গম্বরদের মহাকাশচারী দেবদর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রকেট বিজ্ঞানী রুমরিশের সার্টিফিকেটের বলে (আমার পূর্ববর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য) দাবি করেছেন তৎকালে ইজেকিয়েল বস্তুতই একটি মহাকাশযানকে নদীতটে অবতরণ করতে দেখেছিলেন বলে এবং এই ঘটনার পুঙ্খ নুয়ই দানিকেন ও তার প্রতিষ্ঠাও খুঁজে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে শুধু একটি নয়, পর পর একাধিক আকাশযানে অর্জুনের চোখের সামনে ইজরাইল দেবগণের ইন্দ্রকীল পর্বতে অবতরণ ও মহাদেবের সজ্জীক মহাকাশ ভেলায় চেপে আকাশ যাত্রা প্রত্যাবর্তনের ঘটনা তাকে ততদূর উদ্ভেলিত করেনি। বনপর্বের চত্বারিংশতম অধ্যায় (কালী প্রসঙ্গ, পৃ: ৪৫) থেকে সপ্তচত্বারিংশতম অধ্যায় (পৃ: ৫২) পর্যন্ত দেবদ্বারী দেবতাদের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ, বস্তুত স্বীকার এবং দেবকার্যে ইন্দ্র ও মহাদেব কর্তৃক অর্জুনের নিয়োগ, দেবতাগণের দ্বারা তাঁর সর্ঘশনা, দেবকৃত্যগণের বোঁদ-আবেদনপূর্ণ নৃত্যগীতে অর্জুনের তৃষ্ণাবিধান ও উর্বশী কর্তৃক অর্জুনের দ্বারা আপন কাম চরিতার্থ করার জন্য প্রয়াস—এসব ঘটনাগুলির প্রতি দানিকেন যথেষ্ট নজর করেন নি। তাঁর 'চারিটিস অব দি গডস?' গ্রন্থে তিনি শুধু এ বিষয়ে বলেছেন, অজ্ঞ লাভের জন্য মহাভারতের নায়ক অর্জুনও বহু পথ অতিক্রম করে দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন এবং স্বর্গের রাজা ইন্দ্র তাঁর পত্নী শচী দেবী সহ অর্জুনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছিলেন আকাশচারী ইন্দ্ররূপে। ইন্দ্র অর্জুনকে মহাকাশচারণার আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। (পূর্ববর্তী আলোচনা দ্র:)

অর্থাৎ দানিকেন খুবই জটিলতার সঙ্গে একটি মস্তব্যব ব্যাপারকে শুধুমাত্র উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মহাভারতকে খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করলে দানিকেনের চোখের সামনে প্রাগৈতিহাসিক দুনিয়ার মহাকাশচারী দেবগণের, সামগ্রিক কীটিকলাপ সম্পর্কে আর এক বিশ্ব উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তিনি দেখবেন, দেবগণ কত ঘনিষ্ঠভাবে এই পৃথিবীর জন-জীবনের সঙ্গে নিজেদের ভূমিকাকে ওতপ্রোত মিশিয়ে

দিয়েছিলেন। দানিকেন আনেন, দেবতারা কৃতীগর্ভে মানবপুত্র উৎপন্ন করেছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র কৃতী-গর্ভেই নয়, দেবতাদের আগমন, সন্তান উৎপাদন ও আপন প্রতিষ্ঠা স্থাপনের চেষ্টা মহাভারতীয় আমলেরও আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছিল আর্থাবর্তের বিভিন্ন অঞ্চলে, দক্ষিণ ভারতেও। দেবতাদের কীতি আছে রামায়ণে। রামায়ণ আরও অগ্রবর্তী কাব্য। রাম সূর্যবংশীয় রাজা। রাবণ ব্রহ্মার বংশধারীর জাত। হনুমান পবন পুত্র এবং বালী ইন্দ্রের ও সূর্যবংশীয় সূর্যের তেজে জন্মলাভ করেন।

কিন্তু সে যাই হোক, দানিকেনের সন্ধানী দৃষ্টি মহাভারতকে তন্ন তন্ন করে খোঁজার আকৃষ্ট হয়নি হয়ত এই কারণে যে, মহাকাশযান ও মহাকাশচারণা সম্পর্কে মহাভারতের বর্ণনা ইজেকিয়েল বা এনকের প্রতিবেদনের মত দীর্ঘ নয়। অর্জুনের বিস্ময়বোধও আকাশরথ সম্পর্কে আদৌ উঘেলিত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ইজেকিয়েল ও এনক মহাকাশযানের প্রথম দর্শনে চকিত চমকিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে সেই যানের ও নভচরদের দীর্ঘ বর্ণনা করেছেন। ইজেকিয়েলের চোখের ওপর 'বর্গ খুলিয়া গেছে।'

কিন্তু আকাশযানে দেব সমাগম লক্ষ্য করেও অর্জুন যে ইজেকিয়েল বা এনকের মত বিস্মিত হননি, তার বাস্তব কারণ হল এই যে, প্রাচীন ভারত আকাশযান সম্পর্কে তখন আদৌ অনভিজ্ঞ নয়। মহাভারত পূর্ব যুগে রাম, রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, হনুমান আকাশপথে যাত্রাস্রান্ত করেছেন। রামের ছিল পুষ্পক, পরশুরামের ছিল শক্তিশালী জেট বিমান (১)। পরশুরামের বিমান অবতরণের বিস্তারিত বর্ণনা আছে রামায়ণে। সে বিমানাবতরণ এমনকি একটি রকেট-কেও স্মরণে আনে। পরশুরামের আকাশযান অবতরণ করেছিল এইভাবে: "প্রচণ্ড বায়ু ভূমণ্ডল প্রকম্পিত ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল ভগ্ন করত বহিতে লাগিল; সূর্য অন্ধকারাবৃত হইলেন; সকলেরই দিকভ্রম হইল। ১—১৪। তখন, দশরথের সমস্ত সৈনিক-পুরুষও ভ্রমাবৃত হওত অজ্ঞানের ভ্রম হইয়া পড়িল। তৎকালে বশিষ্ঠ, অস্ত্রাঙ্ক শ্রুতি ও সপুত্র রাজা দশরথ ইহায়াই সজ্ঞান ছিলেন। অপর সকলেই অচেতন হইয়াছিল। অধিক কি, সেই বোরতর অন্ধকারের সময়ে রাজা দশরথের সেই গৈল্ড ভগ্নাঙ্গাদিতের ন্যায় প্রতীরমান হইয়াছিল। অনন্তর রাজা দশরথ, কৈলাসের ন্যায় দ্বর্ধবনীয়, কালাগ্নির ভ্রম হঃসহ, বীর তেজে জাজ্বল্যমান, সামান্যজনের দ্বিনিরীক্ষ্য, ক্ষত্রিয়ান্তকারী, অটমগুণধারী ও ভয়ঙ্করাকার ভগ্ননন্দন জামদগ্ন্য পরশুরামকে স্বল্প পরশু ও হস্তে বিদ্যুৎপুঞ্জসমগ্রভ (লেসর বশ্মিপ্রাস-সমান কোন অস্ত্র কি?) একটি ভয়ঙ্কর শব্দ ধারণ করিয়া ত্রিপুরান্তকর শব্দের ভ্রম অভিমুখে আগমন করিতে দেখিতে পাইলেন। ১৫—১৯।" পরশুরামের এই অগ্নিবর্ষী সচীংকার আগমনের প্রাকমুহূর্তে, "চারিদিক হইতে পক্ষীসকল বোরতর শব্দ" করেছে। বাস্তবিক সবই বলেছেন, কিন্তু তিনিও পরশুরামের উড্ডীন যানটির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। কেননা সেকালে এমন বহু আকাশযানের সঙ্গেই মুণি ঋষিরা সম্যক পরিচিত ছিলেন।

আজ একটি হেলিকপটার বা প্লেন অবতরণ করতে দেখে আমরা তাকে বর্ণনা করে অনভিজ্ঞ পাঠককে বস্তুটি ইবেমন জানাতে যাই না, রামায়ণ মহাভারতের কবিরাও তেমনি তার আবশ্যকতা অনুভব করেন নি। দানিকেন নিজেই তৎকালীন ভারতীয় ঋষি ভরদ্বাজ মুনির পুঁথির ফোটো-ট্র্যাট তাঁর 'আমার পৃথিবী' গ্রন্থে মুদ্রিত করেছেন এবং 'নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন' গ্রন্থে আছে পুঁথিবর্ণিত বিমান ও বিমান পরিচালনা বিষয়ক শ্লোকগুলির অম্ববাদ। অর্থাৎ বিমান তখন ভারতবর্ষে অনেকেরই আয়ত্তাধীন। কেবল-মাত্র তা মহাকাশচারীদের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। মহাকাশ-চারীরা ব্যবহার করতেন যে মহাকাশযান তা অবশ্য কোনো ভারতীয় রাজা রাজদ্বার ছিল না। নারদ এমনি এক আধুনিক ক্যামিও সাদৃশ্য রকেটের অল্পরূপ আকৃতির টেকি নামক যান ব্যবহার করতেন। তবে নারদও তো দেবতা। তিনি দেবর্ষি। যুযুতেন স্বর্গ মর্ত্য মাভাল। পরশুরামের যানটির বর্ণনা না থাকলেও তার আগমনের প্রতিক্রিয়া, তার ভয়াল অগ্নিনিঃসরণের কথা ও তার প্রচণ্ড গতির উল্লেখ আছে। গতি সম্পর্কে রামায়ণের বর্ণনা: রামের কাছে পরাজিত হয়ে পরশুরাম তাঁর সর্কল অস্ত্র সমর্পণ করলেন কিন্তু প্রার্থনা করলেন, "হে কাহুংহ। যখন আমি কণ্ঠপকে বহুক্ষর প্রদান করিয়াছিলাম, তখন আমার গুরু সেই কণ্ঠপ আমাকে বনিয়াছিলেন, 'আমার রাজ্যে বাস করিও না।' হে কাহুংহ!.....তদবধি তাঁহার বাক্যমুসারে কখন এই পৃথিবীতে-রজনী অতিবাহন করি না; ভ্রতরাং আমাকে মনের ভ্রাতৃভগমনে মহেন্দ্র পর্বতেবাইতে হইবে, অতএব আমার গতিশক্তি (আকাশযানটি) বিনাশ করিবেন না। ১—১৫।"

ইন্দ্রকীল পর্বতে অর্জুন প্রথম যে দেবযানকে নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন করতে দেখেন সেটি ব্যবহার করেছিলেন সজ্জীক পিনাকপানি শস্ত্র। শস্ত্র বা মহাদেব নামী এই মহাকাশচারী দেবতা যে একাধিকবার আর্থাবর্তে এসেছেন গেছেন রামায়ণের উপরে উদ্ধৃত অংশটি তারই সাক্ষ্য। দশরথ পরশুরামের ভয়াল আবির্ভাবকে শস্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে মনে মনে তুলনা করেছেন, অর্থাৎ তিনিও শস্ত্রের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ বিষয়ে কাল বীৰবান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রশ্ন হতে পারে যুগে যুগে একই দেবতার আবাসন কী করে সম্ভব হয়েছিল যদি তাঁরা অস্ত্র গ্রহণই জীব হয়ে থাকেন। এ সম্পর্কেও দানিকেন একটা বয়সের হিসেব দাখিল করেছেন 'হাওরুক অব পোপস'-এ লিখিত বৈজ্ঞানিক মতামুসারে। মহাকাশচারীর বয়স ও পৃথিবীবাসীর বয়সের কালগত তফাৎ সম্পর্কে সেই বৈজ্ঞানিক বক্তব্য জানতে হলে পাঠক তাঁর 'আমার পৃথিবী' গ্রন্থটি পাঠ করতে পারেন (পৃ: ২১-৩০)। এই গ্রন্থে দানিকেন সংগৃহীত প্রচুর চিত্রাবলীও পাঠককে গ্রহাণ্ডরবাসী মহাকাশচারীদের সম্পর্কে অনেক দৃষ্ট-তথ্যের যোগান দেবে।

অর্জুন দেবদ্বারগ্রহ লাভ করার জন্য ইন্দ্রকীল পর্বতে আসেন যুধিষ্ঠিরের আদেশে। তখন পাণ্ডবরা বনবাসে। বাস করছেন কাম্যক বনে। একদিন যুধিষ্ঠির অর্জুনকে গোপন মন্ত্রণায় ডাকলেন। বললেন, ভালো খবর আছে। বললেন, পাণ্ডবদের বনবাসকালের স্বযোগে দ্রবোধন শিবির আরও ক্ষমতা সঞ্চয় করতে পারবে। তাই পাণ্ডবদেরও এখন চুপচাপ বসে থাকার অবসর নাই। শক্তি সঞ্চয় তাদেরও করতে হবে। জানানলেন, মহর্ষি ব্যাসদেবের কাছ থেকে তিনি (যুধিষ্ঠির) যে রহস্যবিজ্ঞা জেনেছেন তা জানা থাকলে সমস্ত বিশ্ব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি সেই বিজ্ঞা খুবই গোপনে অর্জুনকে দান করবেন। (রন, পৃ: ৪০-৪১)

—কালী প্রসঙ্গ, সাক্ষরতা প্রকাশন)
যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা এই রহস্য বিজ্ঞাই তৎকালীন ক্ষমতা-
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়)

সাংস্কৃতিক যুক্ত ফ্রন্ট

নরেশ চৌধুরী

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে যুক্তফ্রন্ট একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বর্তমানে এক বিহ্বল অবস্থায় সাংস্কৃতিক বিরোধ করছে। লু-হুনের একটি সময়েচিত্ত দিকনির্দেশ তুলে ধরছি: “একটা যুক্তফ্রন্টের জন্ম প্রথমেই প্রয়োজন একটি অভিন্ন লক্ষ্যের। আমাদের ফ্রন্ট যে একাবদ্ধ নয় এই বাস্তব সত্য দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমরা আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি এবং কিছু লোক রয়েছেন যারা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর জন্ম বা বস্তুত: শুধু নিজেদের জন্মই কাজ করছেন। আমরা সকলেই যদি শ্রমিক ও কৃষক জনগণের জন্ম সেবার লক্ষ্য গ্রহণ করি তবে অবশ্য আমাদের ফ্রন্ট একাবদ্ধ হবে।” (লু-হুন সম্পূর্ণ রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড)।

ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অবৈতনিক সর্বস্বত্ব সাংস্কৃতিক কাগজাদির জন্ম “সর্বস্বত্ব বৈপ্লবিক” কর্মসূচীর অঙ্গ আর শ্রেণী বিভক্ত সমাজে এর অংশীদার থাকবে (at periphery) বৈতনিক বা প্রফেশনাল শিল্প ব্যয়সা। মাও সে তুঙ বলছেন: “...ব্যাপকতম ও একেবারে সাধারণ অর্থে সাহিত্য শিল্প বলতে যা বোঝায়, তা যদি আমাদের না থাকত, তাহলে আমরা বিপ্লবীরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে ও বিজয় অর্জন করতে পারতাম না। এটা বুঝতে না পারা ভুল হবে।” (ইয়েনান ভাষণ, রচনাবলী ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৩)।

শ্রমিক-কৃষক বনাম শোষকদের বা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মধ্য বন্দের সাংস্কৃতিক প্রকাশের বাইরে অপসংস্কৃতির সঙ্গে দৃষ্ট বাস্তবের আজ এক অভিশাপ রূপে নেমে এসেছে আর অবশ্যকার অবস্থায় ধারা হুহু মানবিকতা নিয়ে মঞ্চে এবং পালা মাটিকে গ্রামে গঞ্জে জনগণের মাঝে তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন তাঁদের যুক্তফ্রন্টে না টেনে আনলে, মাওয়ের চিন্তাধারার “বুঝতে না পারা ভুল হবে” এবং লু-হুনের ভাষায় “আমাদের ফ্রন্ট একাবদ্ধ নয়...লক্ষ্যের মধ্যে একাবদ্ধ হতে পারিনি,” কলবতী হবে। জনগণের সাংস্কৃতিক মিছিল থেকে এঁদের বাদ দেওয়া এইসব “মুদ্রাস্থানে” অচল। লেখকের একটি বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য। একটি মাসিক পত্রের লেখায় আমি শিশু বাগ ও শ্রীশান্তিপোষালকে জনগণের সাংস্কৃতিক মিছিলের সাক্ষী বলে উল্লেখ করেছিলাম। প্রত্যন্তরে উক্ত পত্রিকার জৈনিক ব্যক্তি প্রচণ্ড বৈরী আক্রমণ করে লিখলেন: “এই সম্পর্কে এক প্রবীণ মার্কসবাদী নেতার বক্তব্য-স্বরণীয়। ১৯৬৯ সালে একটি রাজনৈতিক ক্লাসে বক্তৃতা দেবার সময় উনি

রসিকতাজ্বলে বলেছিলেন, বর্তমানে পশ্চিম বাজলার জনগণের রাজনৈতিক চেতনার স্তরে এমন জোয়ার বইছে যে, যদি মার্কসবাদী বিড়ি নাম দিয়ে বিড়ি বাজারে ছাড়া হয় তাহলে সেই বিড়িও হাজারে হাজারে বিক্রী হবে। আমার মনে হয় শঙ্কু-শান্তি সম্বন্ধে এই উক্তি প্রযোজ্য।... তাঁদের এই উদ্দেশ্যের পেছনে নিছক অর্থ বোজগারের ধান্দা ব্যতীত আর কিছু ছিল বলে মনে হয় না।”

অর্থাত্তিক এর পূর্বেই সি, পি, আই (এম)-এর সর্বস্বত্বীয় মুখ্য নেতা কমরেড হুন্সওয়াকে প্রগতিশীল পত্র পত্রিকার বেশি মার্কস-কপী শান্তি-গোপালের সঙ্গে ছবি তুলছেন এবং প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করছেন। ভুললোক যে পাথরটা ছুঁতে যারবার জন্ম তুলেছেন তাতে সি, পি, আই (এম)-এর নাম এ ভাবে যুক্ত করে নেওয়ার পাথরটা বড় ভারী হয়ে গেছে, মূলত: এলোপাথরীভাবে সাংস্কৃতিক যুক্ত ফ্রন্টের উপরই তা পড়বে, নিজের পায়ে না পড়ুক। প্রতিবাদ স্বরূপ যে লেখা পাঠিয়েছিলাম সে গিয়ে ধুলোর আচ্ছন্ন হয়েছে।

বিষয়গত দৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক যুক্তফ্রন্ট গড়তে বৈপ্লবিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এক তিনটি তরে ভাগ করা প্রয়োজন। (১) জনগণের সাংস্কৃতিক মিছিল; (২) জনগণের বৈপ্লবিক সাংস্কৃতিক মিছিল; (৩) সর্বস্বত্বীয় বৈপ্লবিক সাংস্কৃতিক মিছিল। প্রথমটি হচ্ছে মাও কথিত “ব্যাপকতম ও একেবারে সাধারণ অর্থে” বলতে যা বোঝায় এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে জীবন বিমুখ অপসংস্কৃতির পাশাপাশি কম্যুনিষ্ট মানিকেন্ডো বর্ণিত “Parallel Literary Battle alone remained possible”—দৃষ্টিভঙ্গীর জীবন মুখী সংস্কৃতি। শঙ্কু-শান্তিকে “এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মূল্যায়ন বোধহয় সম্ভব। দ্বিতীয়টি জনগণের “বৈপ্লবিক সংস্কৃতি”; সমসাময়িক মুখ্য দৃষ্টান্ত বিকল্পে ধারা ধারাবাহিক আঘাত হেনে যেতে পারেন তাঁদেরই এ সংজ্ঞা প্রাপ্য বা “আমি উৎপল দত্তকে দিয়ে থাকি, “কল্লোল” থেকে “যুদ্ধে দেখি,” “হিমালয়ে জীবন্ত মানুষ” “ব্যারিকেড” ইত্যাদি সামনে রেখে। মাও সে তুঙের ইয়েনান ভাষণে (তৃতীয় খণ্ড) এই মূল্যায়নের সমর্থন মেলে: “...বিপ্লবী সাহিত্য ও শিল্প হচ্ছে বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের মস্তিষ্ক প্রতিকলিত জনগণের চিত্র।... লেখক ও শিল্পীরা সাহিত্য ও শিল্প-কর্মের সৃষ্টিগুলি অধ্যয়ন করবেন ঠিকই

বিন্দু সকল। বিপ্লবীকেই, লেখক ও শিল্পীরা তা থেকে বাধ পড়ছেন না, মার্কসবাদ লেনিনবাদের বিজ্ঞান-ধারণন করতেই হবে” (পৃ ১৬)। তৃতীয় সর্বস্বত্বীয় বৈপ্লবিক সাংস্কৃতিক কথা একটু কঠিন ব্যাপার। এটা উঠে আসে সর্বস্বত্বীয় কর্মকাণ্ডের মাঝখান থেকে, যেমন গণনাট্য সংঘ। এবং polarise না করে নিলে এটার পরিচালনায় একটা বিহ্বলতা দেখা দেয়। নিজেদেরকে Polarise করার পর Mass of the people এর মধ্যে কি কাজ করতে হবে? ওঁদের কর্তব্য হবে সাংস্কৃতিক যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে লেনিনের সাংস্কৃতি সম্বন্ধে এই আশু-বাক্যটি অহুসাবন করা: “Among the mass of the People we are after all but a drop in the ocean, and we can administer only when we properly express what the people are conscious of.” (আলিন রচনাবলী—খণ্ড ৩, পৃ: ৩২৬, ইং-সংস্করণ, মস্কো)।

চিত্তরঞ্জে শ্রমিক কর্মচারী সম্মেলন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

চিত্তরঞ্জন: বিরাট উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে এখানকার সংগ্রামী শ্রমিক ও লেবার ইউনিয়নের উদ্যোগে অসংখ্য শ্রমিক কর্মচারীদের বিশেষ সম্মেলনে আলোচনা প্রসঙ্গে সভাপতি শ্রীনির্মল মুখোপাধ্যায় বিগত তৈর-তাত্ত্বিক ইন্দিরা সরকারের সমর্থন পুঁই অগণতান্ত্রিক রাজ্য সরকারের এবং পুরনো আমলাতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে মেহনতী মানুষের কঠিন কলির সংগ্রামকে অগ্রসর করা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য বলিষ্ঠ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন। এই সঙ্গে তিনি নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও চিত্তরঞ্জন রেল কারখানার কর্মকর্তা উচ্চপদস্থ অফিসারের দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিবর্তন হয়নি। লেবার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীহরদরঞ্জন দাস ও অধ্যক্ষ সমস্ত মিসা বন্দী এখনো মুক্তি পাননি। কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের সভাপতি, সহ সভাপতিদের ও সম্পাদকের ওপর থেকে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ এখনও প্রত্যাহার করেনি। এই অবস্থায় এখানকার রেলকর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে

সংগঠিত আন্দোলন করা দরকার। সম্মতি দিলেই রেলমন্ত্রী শ্রীমুখুদত্ত-বস্তের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের বিবরণও তিনি সমবেত প্রতিনিধিদের কাছে বিবৃত করেন। সম্মেলনে রেল কারখানার বিভিন্ন বিভাগের এবং ডি ওয়াই এক, এস এক আই, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি এ বি টি এ (স্থানীয় শাখা), কো-অপারেটিভ ট্রাং ও ক্যান্টিন এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের প্রতিনিধি সমেত মোট ৭৫ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। স্থানীয় ক্যাজুয়াল শ্রমিক, ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস ও অ্যাপ্রেন্টিস ক্লাবের প্রতিনিধিরাও সম্মেলনে যোগ দেন। আসন্ন শ্রমিক আন্দোলনের কর্মসূচী ব্যাপকভাবে অহুমোহনের জন্ম সম্মেলনের শুরুতেই একটি থলু প্রস্তাব প্রতিনিধিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। দীর্ঘ ছ বর্টা আলোচনার পরে কিছু সংশোধনী সহ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, গত ১১/৪/৭৭ তারিখে ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীনির্মল মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদক শ্রীহরদরঞ্জন দাস সিং নতুন দিল্লীতে গিয়ে চিত্তরঞ্জনের সমস্তাবলী নিয়ে রেলমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। চারটি পৃথক স্মারকলিপির মাধ্যমে

প্রফেশনালদের সহযোগিতাকে লাগিয়েই যুক্তফ্রন্ট সম্ভব। গণ-জনের সঙ্গে যখন সাংস্কৃতিক চিত্তরঞ্জন জনগণ হন তার রক্ষাকর্তা। ফানিস্ত আক্রমণে গণ-আন্দোলন সাময়িক ভাবে স্তব্ধ হয়ে থাকে অবস্থায় “সাধারণ অর্থে” জনগণের সাংস্কৃতিক কেটে যদি সমাজের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থেকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় রক্ষা করে জনগণের মধ্যে নিয়ে বাবার সাহস দেখান তবে তাঁকে বিশেষ পরিস্থিতিতে মুখ্য কাজ হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে কেতাবি যান্ত্রিক উপায়ে “মূল লক্ষ্য” চ্যুত হয়ে বাধা সৃষ্টি করতে থাকলে পরে তার জন্ম বিবেচনা মূল্য দিতে হয়। “তোমার জন্ম জেনো এ অন্তর্য হয়েছো প্রবল (ত্বকান্ত)। মাও সে তুঙের চিন্তা-ধারাতেও আমরা পাই: “চীনের সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রের যুক্তফ্রন্টে শক্তিশালী মধ্য-পেটি বুর্জোয়া লেখক ও শিল্পীরা একটা গুরুত্বপূর্ণ শক্তি।... তাঁরা বিপ্লবের অহুকুলে এবং শ্রমজীবী জনগণের নিকট কর্মী।... কঠিন-বিচ্যুতিগুলি যাতে তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারেন তার জন্মে তাঁদের সাহায্য করা এবং শ্রমজীবী জনগণের সেবার নিয়োজিত যুক্তফ্রন্টে তাঁদের নিয়ে আসা উচিত।” (৩য় খণ্ড —পৃ: ১১৪)

ইউনিয়ন নেতারা রেলমন্ত্রীর কাছে চিত্তরঞ্জন শ্রমিকদের ওপর স্থানীয় রেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচার, রাজ্য সরকারের নানা জুলুম ও পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় সরকারের অগণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার ঘটনা তুলে ধরেন। স্মারকলিপিতে মিহির দেকে হত্যা, নেতৃত্ব সহ অত্যাচারের গ্রেপ্তার, সাময়িক বরখাস্ত, বিগত রেলধর্মঘটে ৪০ জনের চাকরী ছেদে ঘটনাও জানানো হয় এবং অন্যান্য বহু দাবীর সঙ্গে ইউনিয়ন স্বীকৃতির দাবী পেশ করা হয়।

আনা যায়, রেলওয়ে বোর্ডের পুরনো আমলারাও চিত্তরঞ্জনের আমলারা কংগ্রেসী উপদলীয় কৌশলের বলি বিখনাথ গিয়ারের হত্যাকাণ্ডকে লেবার ইউনিয়নের ঘাড়ে চাপিয়ে রেলমন্ত্রীকে বিরুদ্ধ তথ্য পরিবেশন করেছে। নেতারা ১৯৭৫ সালের ২১ শে জুন মধ্য রাত্রে কংগ্রেসী গুণ্ডারা সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে কিশোরী লেবার ইউনিয়নের সহ সভাপতি মিহির দেকে তার অস্থির ছেলের পাশে হত্যা করে এবং ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এস আর দাস ও সহ সভাপতি দিলীপ বহুর কোর্টগারে ও ইউনিয়নের জীপ গাড়িতে আগুন লাগায় সে ঘটনা রেলমন্ত্রীকে জানান।

মহাভারতের স্বর্গ ও নরক

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

শালী ঋষি ও দেবভূগৃহীত রাজভবর্গের শক্তির একমাত্র গোপন উৎস।

আমরা জানি, যিনি ঋষিরা পুরাকালে হিমালয়ে তপস্বী করতেন সেখানেই হত তাঁদের সিদ্ধি ও ভগবৎ-দর্শন। লাভ করতেন তাঁরা অলৌকিক ক্ষমতা। সে ক্ষমতা সাধারণের কী কী মঙ্গল করেছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় খুব কম পাওয়া গেলেও, ঋষিরা যে বিশেষ বিশেষ রাজ-শক্তির পৃষ্ঠ-পোষণা করেছেন এবং তাঁদের শক্তিবৃদ্ধির কারণ হয়েছেন এমন বহু কাহিনীই পুরাণে কাব্যে ছড়িয়ে আছে। ঋষিরা হিমালয়ে গিয়ে দেবগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ করে আসতেন, শিখে আসতেন নিশ্চয় এমন সব বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, যার প্রয়োগ অনভিজ্ঞ মানুষের কাছে অলৌকিক বলেই বোধ হত। ঋতুর প্রসঙ্গ লাভ করে পৃথিবীতে এক ধর্মীয় জ্ঞানের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিলেন দুর্বার। দুর্বারা রাগলে সব কিছু ভস্ম করে দেবেন। (তাঁর কাছে কি কোনো লেসর রশ্মির টর্চ থাকত ?) এই ভয়ে শক্তিশালী রাজভবর্গও প্রকম্পিত হতেন ? দুর্বারা বেশ ভালো রকম খাতিরই ছিল দেহধারী দেবগণের সঙ্গে। তাই দুর্বারা পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল কুত্বীকে এমন মন্ত্র দান করা (কোনো বেতারমন্ত্র) যে কৌশল প্রয়োগ করলে কুত্বী তাঁর অভিপ্রেত দেহধারী দেবতাকে পত্রিরূপে আহ্বান করতে পারতেন। কিন্তু সে সব অনেক কথা, অনেক কুট দেব-রাজনীতির ব্যাপার বা পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যবে। এখানে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, তখন সমস্ত বিভাটকেই রহস্যবিদ্ধা করে অতি গোপনে লালন করা হ'ত। আকাশচারা দেবতারা নিজেরাই এই গোপনীয়তা পছন্দ করতেন, তাঁদের স্তাবকবৃন্দও মন্ত্রগুপ্তির দ্বারাই তৎকালীন বিজ্ঞানকে সাধারণের শিক্ষার বহির্ভূত ম্যাজিক করে রেখেছিলেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানহীন মানুষের কাছে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াদি সবই ম্যাজিক বলে মনে হয়। পি. সি. সরকারের অনেক বৈজ্ঞানিক ম্যাজিক বিজ্ঞানের ছাত্ররাও চট করে ধরতে পারেন না। যাই হোক, হিমালয়ে যে দেবগণের নিত্য সমাগম হত এক কথা স্বয়ং অজুনের। অজুন রাজপুত্র, তিনি তা শুনেছেন। বুদ্ধিমান লোকেরা সে খবর রাখতেন।

যুধিষ্ঠির যে গোপন রহস্যবিদ্ধা (যা তিনি ঋষিগণের ব্যাসদেবের কাছে জেনেছেন) অজুনকে দান করলেন তা গুট কুটনীতি মাত্র। বললেন, "ববর আছে দেবতারা তোমাকে দেবভূগৃহীত রাজশক্তির প্রতিবিম্ব হিসাবে মনোনয়নে উৎসুক।" তুমি, শীঘ্র হিমালয়ে গিয়ে তপস্বীর দ্বারা তাঁদের ভূট কর। কিন্তু সাবধান, তোমার যাত্রার উদ্দেশ্য কাক-পক্ষীতেও যেন জানতে না পারে ('কাহাকেও পক্ষ-প্রদান করিও না')। - যুধিষ্ঠিরের কাছে যে গোপন বাতী এসেছিল তাতে এ বিষয়েও স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, অজুন দেবগণের মনোনয়ন লাভ করলে কী পরিমাণ অস্ত্র সাহায্য পেতে পারেন। তাই যুধিষ্ঠির আরও খোঁজা করে বললেন, "পূর্বে দেবগণ-বৃজ্রাসুর হইতে ভীত হইয়া ইন্দ্রকে সমস্ত দিব্যাস্ত্ররূপ সামর্থ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন। তুমি এক-স্থানস্থ (একই জায়গায়) সেই সমস্ত অস্ত্র দেবরাজ হইতেই প্রাপ্ত হইবে, অতএব তাঁহার নিকটে গমন কর, তিনিই তোমাকে সমুদয় অস্ত্র প্রদান করিবেন।" যুধিষ্ঠির খুবই ধূর্ত রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর ধূর্ততা সবলতার আবরণে আবৃত থাকত। তিনি খবর পাওয়ামাত্র 'আমি এক তিল দেরি করা পছন্দ করলেন না। কেননা, তিনি জানতেন, হিমালয়ে শত্রুপক্ষের চররাও যাত্রারাত করেন (হিমালয়ে যা ঘটেছিল পরে চরমুখে ধৃতরাষ্ট্র সে সংবাদ পেয়েছিলেন।) তাই তাইকে উপদেশ দিয়েছেন, তুমি আজই ইন্দ্র সন্দর্শনে

বেহিয়ে'পড়। দেরি করা ঠিক হবে না। এবং বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, খুব সাবধান, কেউ যেন তাঁর উদ্দেশ্য জানতে না পারে। [বনপর্ব, পৃ: ৪০-৪১ শ্লোক]।

এই ঘটনা আমাদের কী অবস্থার কথা জানায় ? বেশ স্পষ্ট হবে শুধু না কি একটি লৌকিক যুদ্ধ প্রস্তুতির ছবি ? বিতাড়িত পাণ্ডবরা বাচ্ছেন এক আশ্রয়স্থান (এখানে নিশ্চয়ই আশ্রয়নাক্ষত্রিক বলা উচিত) শক্তির কাছে অস্ত্র সংগ্রহ করতে। যে শক্তি এই অস্ত্রাদি দান করবেন, তাঁদের সঙ্গে গোপন শলাশরামর্শ আগেই হয়ে গেছে। মধ্যস্থতা করছেন স্বয়ং ব্যাসদেব, যিনি অন্তরক আগেই আসন্ন যুদ্ধের আশঙ্কা করে, হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্র মাতা অধিকা ও ঠাকুমা সত্যবতীকে নিয়ে হস্তিনাপুর ত্যাগ করে, সম্ভবতঃ হিমালয়ে চলে যান। [আদিপর্ব, কালীপ্রসঙ্গ, পৃ: ১০৩, সত্যবতীর গৃহাশ্রম ত্যাগ অংশ শ্লোক]। হিমালয়ে গিয়ে ইনি দেবতাদের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক যোগসূত্র স্থাপন করে ফেলেন ও বনবাসী পাণ্ডবদের মধ্যে 'কিরে আনেন। দেবতাদের যে আসন্ন ভারতযুদ্ধে অংশ গ্রহণে আপত্তি নেই, তাঁরা যে অস্ত্র সাহায্য ও যুদ্ধে আরও আত্মসম্মতি সাহায্য দান করতে প্রস্তুত, তাও যুধিষ্ঠিরকে জানিয়ে যান। সেই মত যুধিষ্ঠির চৌখস ভাইটিকে সমস্ত যুদ্ধবিদ্যা শিখে বাছাই করা অস্ত্রাদি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আসতে বলেছেন।

এই সব ঘটনাও কি এই বিশ্বাসই দান করে না যে, তৎকালীন দেবগণ মানুষের মতই দেহধারী একদল কুট রাজনৈতিক শক্তি ছিলেন। - তাঁরা আর্থাবর্তের রাজাদের মধ্যে যুধিষ্ঠিরকেই নির্বাচন করেছিলেন তাঁদের মতামতগমন-কারী এক শক্তিশালী নারকরূপ ? তাই সংবাদ পাঠিয়েছেন যে তাঁরা প্রস্তুত আছেন সব রকম সাহায্য প্রেরণের জন্য ? এই দেবতারা যে দেহধারী পুরুষ অস্ত্রান্ত্র প্রমাণ ছাড়াও তার এইখানে জাজ্জল্যমান প্রমাণ হ'ল, তাঁরা হিমালয়ের গোপন স্থানে সমবেত হ'ন এবং কিছু লোকের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেন আর্থাবর্তে নিজেদের পরোক্ষ প্রভুত্ব ও অহুশাসনের রাজত্ব কার্যকর করার জন্য। আমরা পরে দেখব কী অপূর্ব অত্যাধুনিক মিলিটারি কার্যদায় তাঁরা দেবকার্যে অজুনের নিয়োগপর্ব সমাধা করেছিলেন।

দেবতারা যদি দেহধারী পুরুষ ছাড়া অস্ত্র-কিছু হবেন, তবে এতোসব লৌকিক ঘটনা ঘটান উপযুক্ত কারণ কি ? কেন ব্যাসদেবকে আসতে হবে তাঁদের শিবির থেকে দূত হয়ে। কেন যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করতে হবে এমন প্রবল গোপনীয়তা। কেন অজুনকে কালবিষয় না করে দুটি অর্হোরাত্র অবিরাম পথপরিকল্পনা করে পৌঁছাতে হবে হিমালয়ে ? এবং কেনই বা মহমুদেহধারী দেবতারা অজুনের ঐর্ষ্য, সাহস, নির্ভীকতা, একাগ্রতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, আত্মগত্যা ও বীরত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে তবেই তাঁকে দেবকার্যে প্রাথমিক মনোনয়ন দেবেন হিমগিরি শীর্ষে ? প্রাথমিক মনোনয়নের সময়ও অজুনের পূর্ব নিয়োগ সম্ভব হয় নি। তাঁকে মহাকাশ ভেলায় করে মহাকাশে অবস্থিতকারী ইন্দ্রের ইন্দ্রলোকে (উপগ্রহে ?) নিয়ে যাওয়া হয়েছে অশ্বশূল ও শিকারী জন্তু। পাকা পাঁচ বছর ধরে তাঁকে নানাভাবে নিকিত করে তবেই ফিরিয়ে আনা হয়েছিল হিমালয়ে। যদি দেবতারা বস্তুতই ঐশ্বর হয়ে থাকেন, তবে এমন আগতিক উপায়গুলি নিশ্চয় তাঁদের গ্রহণ করতে হ'ত না।

আগামীবারে অজুনের নিয়োগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার আমরা এইসব প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজব।

[চলবে]

অমানুষিক পুলিশী নির্যাতনের ঘটনা

শিবাজী ভট্টাচার্য

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গেই আছে অসীম শীল। ১৯৬৭ সালে ওর জন্ম। বাড়ি, টালিগঞ্জ। ১৯৭৪ সালের ১২ই এপ্রিল লর্ড সিন্ধা রোডের একদল গোয়েন্দা অফিসার সাব-ইন্সপেক্টর জীতারামদেব বহুর নেতৃত্বে ওর বাড়িতে হানা দেয়। তখন ওর বয়স সবে ষোল ছুঁয়েছে। অসীম দশম শ্রেণীতে পড়তো। ঐ বয়সেই ও নাকি একজন বিপজ্জনক ন ক শা ল প নী। বাড়ি থেকে ওকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয় লর্ড সিন্ধা রোডে। তারপর তো আছেই সেই অকথ্য নির্যাতন। অস্ত্র বন্দীর উপর নিপীড়নের কাহিনী শুকে শোনানো হয়েছে প্রায়শঃ দুর্বল করে দেবার জন্য। ওর সামনেই কুমারেশ মিত্র নামক এক যুবককে ছুটা টেবিলের মাঝখানে রড দিয়ে ও রডের সঙ্গে তার দুটো পা জোড়া করে বেঁধে পায়ে তল্লাশ, গোড়ালিতে, হাঁটুতে, মাথায় ডাঙা দিয়ে অকথ্য যেরেছে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য। এতেও হয় নি, তখন অনেক সাব-ইন্সপেক্টর আর একটা ঘরে ঢুকিয়ে মলমল করে এক ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট রুল প্রায় ইঞ্চি তিন চার ঢুকিয়ে দেন। ঐ রুল ঢোকানোর করে কুমারেশের কোট যায় ও তিনটে সৈলাই করতে হয়েছে। আরও তিনি সহজে পাখানায় বসতে পারেন না, মলমল করে সব সময় ব্যথা করে। পেটের যোগ ধরেছে।

অসীম শীলকে তারপর ওরা টালিগঞ্জে আনার একটা মিথ্যামামলার অভিযুক্ত করে টালিগঞ্জ থানার একটা মিথ্যা মামলার অভিযুক্ত করে টা লি গ জ থা না ল ক আ পে রেখে দেন। তারপর হাজারো জেরা এবং নির্যাতন। সেখান থেকে স্পেশাল জেল। কিন্তু মিথ্যা মামলা বেশিদিন টিকবে না, তাই একদিন বিক্রেতে স্পেশাল ড্র্যাফের অফিসাররা এসে ওকে জেল গেটে ডেকে পাঠান এবং মামলা থেকে খালাস বলে জানান।

ভুলেও যেন ভাববেন না যে, মামলা থেকে সত্যিই খালাস। এবার তাই ও বাড়িতে বাবা-মায় কাছে যেতে পারবে। সেটি হবে না। ওকে ওরা জেল গেট থেকে একটা এ্যাডমিনিস্ট্রার গাড়িতে তোলে এক সোজা স্পেশাল ড্রাক অফিসে নিয়ে যায়। সেখানে মিসার কাগজপত্র সই করিয়ে স্পেশাল জেলের পরিবর্তে

প্রেসিডেন্সী জেলে নিয়ে আসে। কলকাতার মিসা বন্দীদের সাধারণতঃ প্রেসিডেন্সী জেলেই রাখা হয়।

তারপর আট দিনের মাথায় মিসা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পর্ষদের (Advisory Board) সামনে তাকে হাজির করা হয়। সে আর এক প্রহসন। তদন্তকারী অফিসার আগেই গিয়ে উপদেষ্টাদের শিবিরে পড়িয়ে দিলেন। গতানুগতিকভাবে অসীমকে বিচার-পত্রিকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকে পুলিশ ধরেছে কেন, তোমার কিছু বলার আছে।' বলার তো আছে অসীমের অনেক কিছুই। কিন্তু কে কার কথা শুনে। হাজির করাতে হয়, হাজির করানো হয়েছে। তারপর, সেখান থেকে তাকে আবার জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সাতদিন পর তাকে মিসা সমর্থনপত্রক কাগজ (confirmatory letter) ধরিয়ে দেওয়া হল।

শুধু কি এই, জেলের মধ্যেও অসীমকে সহ্য করতে হয়েছে নির্যাতন। ১৯৭৬ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্সী জেল থেকে পালানোর ঘটনার জের হিসেবে, জেলের ডেপুটি জেলার সিপাই-সামন্ত নিয়ে ওয়ার্ডে আসেন অসীম সহ রণধীরবোষ, হৃদাংক নিয়োগী মত কয়েকজনকে ওয়ার্ড থেকে আন্তিমূলক সেলে (Punishment Cell) জোর করে নিয়ে যাবার জন্য। অসীমরা একাধিকভাবে প্রতিবাদই শুধু (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠার)

জেলে নকশাল বন্দী

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

বিভিন্ন অজুহাতে দীর্ঘকাল লোককে বিচারধীন বন্দী হিসেবে আটক রাখার চাইতে মিসার আটক রাখাকে সমর্থন করেন (স্টেটসম্যান, ১১.৫.১৯৭০)।

এই সমস্ত সংখ্যা প্রাক-এমার্জেন্সীর। এমার্জেন্সীর মধ্যে গণ-গ্রেপ্তারের কালে বন্দীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। অস্ত্র প্রদর্শনের ছুটি জেলে ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বন্দীদের সংখ্যা ৮০০ হয়ে যায়, যেখানে থাকবার ব্যবস্থা আছে ৪০০ বন্দীর। এর মধ্যে অধিকের বেশি নকশালবন্দী বিচারধীন অথবা মিসা বন্দী। ১৯৭৫-৭৬ সালে বর্ধমান জেলে ১৫০০ জন বন্দীকে রাখা হয়, যেখানে থাকবার কথা ৭৫০ জনের। এখানে সবচেয়ে বেশি বন্দী সি পি আই (এম)-এর এবং তার পরের সংখ্যা সি পি আই (এম-এল)-এর।

নারকীয় হত্যাকাণ্ড

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জেল কর্তৃপক্ষের সাহায্যে মৃত্যুকে সন্তোষের মর্যাদা দিল। আবার ঐ ঘটনার আহত কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করা হল। অভিযোগ জেল ভাঙা ও হত্যার। ১৯৭৫ সালে মহামান্য বিচারপতির সুবিবেচনায় এক জনের দৃবছর এবং একজনের তিন বছর সাশ্রাও হল।

জেলখানাগুলিতে রাজনৈতিক বন্দীরা থাকাকালে জেল কর্তৃপক্ষ, জেল ডাক্তার ও দীর্ঘমেয়াদী সাজাপ্রাপ্ত দালাল কয়েকদেৱ বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, প্রথমতঃ জেলের খাবারদাবার অর্থাৎ কয়েকদেৱের 'ডায়েট' ওষুধপত্র ও অন্যান্য দ্রব্য চুরি করার ক্ষেত্রে দালাল কয়েকদেৱ ও কর্তৃপক্ষকে রাজনৈতিক বন্দীরা বাধা দেন। দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘমেয়াদী দালাল কয়েকদেৱা ব্যাপকহারে কম বয়েসী বিশেষতঃ 'বয়েজ কাইল' থেকে বাচ্চা ছেলেদের জোর করে সমকামিতার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে থাকে কর্তৃপক্ষের স্রাস্তসারে এবং সেই প্রচেষ্টাতেও তাদের রাজনৈতিক বন্দীদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তৃতীয়তঃ সাধারণ কয়েকদেৱের উপর জুলুম চালানোর জন্য কথার কথায় ভাড়াবাড়ী করা চলে না।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে

উপরোক্ত কারণগুলির জন্তই ১৯৭০ সাল থেকেই নকশালপহী বন্দীদের উপর জেল কর্তৃপক্ষ ও ক্রিমিনাল দালাল কয়েকদেৱের আক্রোশ জমা হতে থাকে। এর উপর ছিলো নকশালপহী নিধনে 'কেব্রের ইন্দিরা' সরকারের চালাও নীতি। ফলে ঐ জেলে বেশ কয়েকটি ছোটখাটো ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'এলার্ঘ' (পাগলা-ঘটি বাড়িয়ে ইচ্ছামতো পেটাই ও হত্যা করার রাস্তা) হয় ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি থেকে। যার চরম পরিণতি ঘটে ১৯৭১ সালের ২৬শে নভেম্বর।

ঐ দিনের 'এলার্ঘ' হত্যা করা হয় আটজন তরুণ নকশালপহীকে এবং আহত ৩ পুরুষ হয় দুই শতাধিককে। ঐ হত্যাকাণ্ডের সমস্ত ঘটনাটি ছিলো পূর্বপরিকল্পিত। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী বন্দীর জবানীতে শুধু সত্য ঘটনাটি :—

"১৯৭১ সালের ২৬শে নভেম্বর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আমাদের চোখের সামনে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড ও মধ্যযুগীয় অত্যাচার ঘটেছিলো তা এখনও আমাদের দেশের জনগণ জানে না। কারণ সেদিনকার ঘটনাকে সর্বত্র প্রচার করা হয়েছিলো যে জেল ভেঙে নকশালপহী বন্দীরা পালানোর চেষ্টা করলে কারারক্ষী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মোট আট জন নকশালপহী নিহত ও

বেশ কিছু আহত বলে।

"আগল ঘটনা কিছু ছিলো অস্তরকম। জেলে রামদেও, আশংকা সুনীল (এই নটোরিয়াস ক্রিমিনালটি ঘটনার সময় জেলের ডাক্তার এস. হাজরার আদালি ছিলো এবং এখন জেলার বাবুর আদালি), ইয়াকুব ও অন্যান্য কয়েকজন দালাল কয়েকদেৱ বয়েজ-কাইলের ছেলেদের ও অল্পবয়সী ছেলেদের সমকামিতার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করলে নকশালপহী বন্দীরা তাতে বাধা দেন। জেলের ১নং ওয়ার্ডে (বর্তমানে যেটা ক্লাব ঘর) ও ৭নং ওয়ার্ডে বহু নকশালপহী থাকতো। জেল কর্তৃপক্ষ নির্জন্দের চুরির অসুবিধা, জেল ডাক্তার এস. হাজরার (বর্তমানে জেলের এস. এম. ৩) ওষুধ চুরির অসুবিধা ও রামদেও আশংকা সুনীলদের বিরুদ্ধে যৌনাচারের অসুবিধাকে এক করে নিয়ে ঐ নকশালপহী বন্দীদের পাইকারী হারে হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে ঐ নকশালপহী বন্দীদের দিতে থাকে দালাল কয়েকদেৱের। যার ফলশ্রুতি হিসাবে ২৫শে নভেম্বর (১৯৭১) রাতে জেলের ১৩নং সেলে কুণ্ডলত ইহু মিত্র (ঐ সময় ১৩নং সেলে থাকতো) ও তার দোস্ত কিছু মাঝখর কংগ্রেসী কয়েকদেৱ (ভিকিসনের) একটা মিটিং করে ঐ হত্যা বজের প্লান তৈরী করে।

"পরদিন অর্থাৎ ২৬শে নভেম্বর সকাল ৮-৩০ মিনিটে—ঐ সময় জেলের অধিকাংশ কয়েকদেৱা জেল প্রেসে কাজে যায় ফলে আক্রমণ ঠেকানোর জন্য তাদের সাহায্য পাওয়া যায় না—৭নং ওয়ার্ডে রামদেও-র সঙ্গে কয়েকজন নকশালপহী কথাকটাকাটিকে কেন্দ্র করে পাগলা ঘটি বেজে ওঠে। আগের দিনের প্লান মার্কিত। ৩নং ওয়ার্ডে থাকতো নেতৃস্থানীয় নকশালপহীরা। তাই এলার্ঘের সঙ্গে সঙ্গে সিপাই ও দালাল কয়েকদেৱের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয় ২নং ওয়ার্ড। জেলে সিপাইরা ১৪টি রাইফেল ও পাকা বাশের ৭ ফুট লম্বা লাঠি (বেগুনি ঐ ঘটনার পরই সরিয়ে ফেলে তার বদলে বেতের লাঠি আনা হয়েছিল) নিয়ে ঢোকে বড় জমাদার চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ তেওয়ারীর নেতৃত্বে। ইয়াকুব, আশংকা, রামদেও, মহাবীর, কুঞ্জ ও অন্যান্য দালাল কয়েকদেৱ—এদের সকাল বেলাই মদ ও হসপিটালের স্পিরিট খাইয়ে মত্ত অবস্থায় রাখা হয়েছিলো—হাতে তুলে দেওয়া হয় ৬ ফুট বাশের লাঠি ও ছুরি। ইহু মিত্র ১নং ওয়ার্ডের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে দালাল কয়েকদেৱের এই খুনে বাহিনীকে পরিচালনা করে ওয়েল

ফেরার অফিসার অমরনাথ রায়ের (এখনো ঐ পদেই আছেন) প্রত্যক্ষ মদতে। এলার্ঘ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন জেল সুপার মিঃ ঘটক আদেশ ঘটনাস্থলে, কিন্তু ঐ হত্যাকাণ্ডে মূল কমান্ডার তদানীন্তন জেলার দিলীপ চৌধুরীর অহুয়োধে তিনি অফিসে ফেরে যান।

"বধ্যভূমির ছবিটা তাহলে হোলো এই—১নং ওয়ার্ডে নিরস্ত্র বন্দীরা একদিকে আর তাদের হত্যা করতে উত্তম জেলার দিলীপ চৌধুরীর সর্বাধিনায়ক বড় জমাদার চন্দ্রেশ্বর তেওয়ারী তার সিপাহী বাহিনী, ওয়েল ফেরার অফিসার অমরনাথ রায়ের সহ অধিনায়ক ইহু মিত্র তার খুনে কয়েকদেৱ বাহিনী, ডাক্তার এস. হাজরা ডেপু-মার্শালকেট দেবার অন্ত চামচা বাহিনী পম্বিত অবস্থায় তৈরী। শুরু হোলো আক্রমণ। আক্রমণ ঠেকানোর জন্য নকশালপহীরা হাতের কাছে যা পেলেন তাই নিয়েই চেষ্টা চালানেন কিছুক্ষণ। ওয়ার্ডের দরজা গামছা বুতি ইত্যাদি দিয়ে বেঁধে রাখলেন। কিন্তু জলন্ত মশাল দিয়ে তা পুড়িয়ে ঠেঙাড়ে বাহিনী, বিশেষতঃ দালাল কয়েকদেৱ ও কয়েকজন সিপাহী ওয়ার্ডের ভিতরে ঢুকলো। বাইরে রইলো রাইফেল বাহিনী। চললো এলোপাখারি লাঠি ও ছুরি। একদিকে জমাদার বাহিনীর উগ্রমুখ চিংকার, অন্যদিকে আহত বন্দীদের 'বাঁচাও বাঁচাও' আতর্জন—লাঠি ছুরি নিয়ে খুনে বাহিনীর পৈশাচিক আক্রমণ, অপর দিকে আহত বন্দীদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ওয়ার্ডময় ছোটোছুটি। এই বীভৎস দৃশ্যের শিকার জেলের সব বন্দীরাই। মোট ২৭৬ জন বন্দীর এমন একজনও ছিলেন না যিনি অক্ষত রইলেন। সব কজন বন্দীকে গুপীকৃত করে ওয়ার্ডের মেঝেতে রক্তাক্ত-আবমরা-অজ্ঞান অবস্থায় কেলা হোলো। তারপর বেছে বেছে তার মধ্যে থেকে বেঁধে করা হোলো নেতাদের। তাদের ওপর চললো লাঠি ছুরি বত্কণ না তারা মরে। দালাল কয়েকদেৱ ও সিপাইরা যখন মনে করলো তারা মৃত তখন কয়েকটা কবলে তাদের দেহগুলো জড়িয়ে মাটি দিয়ে টেনে নিয়ে বাগুরা হোলো হসপিটালে—ডাক্তার তাদের ডেপু মার্শালকেট দেবে তো। ১নং ওয়ার্ড থেকে হসপিটাল ১৫০ গজ দূরে। সমস্ত ১নং ওয়ার্ড ও সেখানে থেকে হসপিটাল পর্যন্ত গোটা রাস্তা হয়েছিলো আহত বন্দীদের রক্তে পিচ্ছিল কর্দমাক্ত।

"ডাক্তার হাজরা, দেখলেন—

আশ্চর্য! আহত বন্দীরা তখনো বেঁচে আছে। তিনি হুতুম দিলেন আশংকা ইয়াকুবদের—'গলার উপর ডা দিয়ে চ'দিক থেকে চেপে ধরে এদের মেরে ফেলো। চাকু চালাও যতক্ষণ না আমি বলবো মেরে গেছে।' ডিসপেন্সারী থেকে দালাল কয়েকদেৱা প্রচুর স্পিরিট খেয়ে শুষ্ক করলো দ্বিতীয় দফা। তদানীন্তন এস.এস.ও. ডাক্তার বশোদাহুসাল মণ্ডল ঐ বীভৎস অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড দেখে ওখানেই অজ্ঞান হয়ে যান। কয়েকজন সাধারণ কয়েকদেৱ ও সিপাই ঐ পৈশাচিক ঘটনার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলে এখানেই তাদের ওপর জমাদার বাহিনী কাঁপিয়ে পড়লো ছুরি লাঠি নিয়ে। কিন্তু ডাক্তার হাজরা নিরীকার—এদের মারতেই হবে। আশংকা, ইয়াকুব, মহাবীর আহতদের গলা টিপে ও পেটে চাকু মেরে ডাক্তার হাজরার সামনেই হসপিটালে ডাঃ হাজরার ওয়ার্ডে হত্যা করলো সাগর (অমির) চ্যাটার্জী, নিমাই দাস, রাজকুমার মিত্রী, গৌর দাস, মনজুদ্দিন মজুমদার ও শেখ আলাদকে। এদের প্রত্যেকের দেহের বিভিন্ন অংশ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছিলো। কাঁদী সেলে এদের মৃতদেহ নিয়ে বাগুরার পথে আমরা দেখেছি কয়েকজনের মূণের অধিকাংশই নেই, চোয়ালের হাড় বেরিয়ে আছে। বাকী কয়েকজনকে এস, এম, কে, এম, হসপিটালে পাঠানো হোল। সেখানে মৃত বলে ঘোষণা করা হোলো দীর্ঘকাল বোল মনোজ রায়কে।

"জেলের ভিতরে কি ঘটে তা বাইরের লোকের পক্ষে সঠিক ভাবে জানা সম্ভব নয় এবং জেলের যে কোন্ ঘটনা সম্পর্কেই কর্তৃপক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থনে অপপ্রচার করে। আর যেখানে তদানীন্তন স্বৈরাচারী ইন্দিরা সরকার নকশালপহীদের হত্যা করতে প্ররোচনা ও মদত জুগিয়েছে সেখানে তো কথায় নেই। কিন্তু আমরা দুটভাবে বিশ্বাস করি জনতা সরকার নিরপেক্ষ ভাবে বিগত সরকারের কুক্রিয়াকলাপকে তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির ও ভবিষ্যতে যাতে এই জাতীয় ঘটনা না ঘটে তার ব্যবস্থা করবেন। আলিপুর জেলের ঘটনাটির তদন্ত হোলো আমরা মনে করি এখন বহু দীর্ঘমেয়াদী কয়েকদেৱ ও সিপাহী সত্য সাক্ষী দিতে এগিয়ে আসবেন, যারা বিগত দিনে অত্যাচারের ভয়ে কমিশনের সামনে যেতে পারেন নি।"

কলকাতা পুরসভার মনীষিবন্দনা

তত্ত্ব ও তথ্য, ভাব ও ভাবনাসমৃদ্ধ কটি অনন্য প্রকাশন

- শরৎচন্দ্র ও মনসুভাবিক সংখ্যা : এতে আছে শরৎচন্দ্রের পাণ্ডুলিপি ও হাতে আঁকা ছবির প্রতিলিপি, হস্তাপ্য ছবি, চিত্রপত্র ও প্রথম সারির সাহিত্যিকদের লেখা বহু সরস ও মনোজ রচনা। দাম ৭'৫০
- অমল হোম বিশেষ সংখ্যা : লক্ষপ্রতিষ্ঠ লেখকদের ইংরেজী ও বাংলা রচনায় সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটিতে আছে অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত অমল হোমের একটি বহুবর্ণ ছবি। দাম ২'৫০
- নেতাজী জন্মশতবর্ষ সংখ্যা : এতে ইংরেজীতে ও বাংলার লিখেছেন স্রষ্টা সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কবৃন্দ। এ ছাড়া আছে নেতাজীর ১১টি ঐতিহাসিক ছবি। দাম ২'০০
- লেনিন জন্ম শতবর্ষিক সংখ্যা : লেনিনের ২১টি ছবি ও তাঁর হাতের লেখার প্রতিলিপিসহ ৩০ পৃষ্ঠাব্যাপী ইংরেজী ও বাংলা রচনায় সমৃদ্ধ। দাম ২'০০
- দেশবন্ধু জন্মশতবর্ষিক স্মারক সংখ্যা : এই স্মারক সংখ্যাটিকে আছে দেশবন্ধুর ৪৮টি ছবি ও পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি। এ ছাড়া আছে সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের ইংরেজী ও বাংলার লেখা সাড়া-আগানো রচনাসম্ভার। দাম ৫'০০

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দূরপ কাঁধায় ৬১ মট লেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড

যুবদের হামলা : প্রিয়-আনন্দের জুতো মারামারি

(দর্পণের সংবাদদাতা)



বিশ্ব বর্ষ ১৭ সংখ্যা ১১ শুক্রবার ২০শে মে '৭৭ ৪০ পঃ

বামপন্থীদের সঙ্গে সমঝোতা না হলে জনতা পার্টির অবস্থা শোচনীয় হবে

(দর্পণের পর্ষবেক্ষক)

জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্ব অঙ্ক কমিউনিষ্ট বিদ্রোহে তাক্তিত হয়ে নিজেদের যুক্ত্য নিজেরাই ডেকে আনছেন। তাঁরা বুঝতে পারছেন না যে এর পরিণাম-ভয়াবহ।

এই রাজ্যের বৃহৎ পুঁজি নিয়ন্ত্রিত বাজারী কাগজগুলো বামপন্থী জনতা জোটের বিরুদ্ধে যে পরিকল্পিত কুৎসা অভিযান শুরু করেছিল অবশেষে জনতা পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব তারই সর্বনাশা শিকারে পরিণত হলেন। অত্যন্ত হস্তাক্ষর অঙ্কের বোগ বিয়োগ করে তারা রাজ্যের বামপন্থী ফ্রন্টকে মাত্র ৮০টি আসন দেবার এক "সদয় প্রস্তাব" করে যেন বামপন্থী হলগুলোকে কিছুটা করুণা প্রদর্শনের ভাব দেখালেন, আসলে তাঁরা বুঝতেই চাইলেন না যে বামপন্থী কংগ্রেসীরা নানা

প্রলোভনে জনতার রাজ্য নেতৃত্বকে প্রলুব্ধ করে বামপন্থীদের কাছ থেকে দলকে বিচ্ছিন্ন করে দলের কবর রচনার পথটি হুমকি করে নিলেন মাত্র। ৫২ থেকে ৭২ সালে কংগ্রেসের প্রাণভোটের শতকরা আনুপাতিক হিসাবে তাঁরা আসন দাবী করেছেন। জনতা দলের রাজ্য নেতারা আনেনই না যে সে হিসেবেও এই দল ১৪০ এর বেশী আসন দাবী করতে পারেন না। যদিও প্রফুল্লবারু নিজেই পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় ৭২ সালের নির্বাচনী ফলাফলকে অবিদ্যমান বলেছেন তবু সেই ৭২ সালকে জুড়ে দিলেও কংগ্রেস ৭টি বিধানসভা নির্বাচনে গড়ে ৩০ শতাংশের ওপর ভোট পারিনি। পক্ষান্তরে বামপন্থীরা কংগ্রেস বিরোধী (শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে গত ক'দিনে এক তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে। শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাদের নিজেরাই হুটু ফ্রান্সনটাইনদের হাতে চরম লাঞ্ছিত হন গত শনিবার। দেবীবারু পার্ক স্ট্রীটের ফ্র্যাট একদল যুব কংগ্রেসীর তাণ্ডবে তখনই হয়ে যায়। ঐদিনই দেবীবারু বাড়ীতে আয়োজিত নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনা ও প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার ব্যাপার নিয়ে সর্বভারতীয় যুব নেতা প্রিয়রঞ্জন দাসগুপ্তী ও রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রাক্তন সদস্য শ্রী আনন্দ বিশ্বাসের মধ্যে জুতো মারামারি হয়। ঘটনার এখানেও শেষ নয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে কংগ্রেসের সদর দপ্তরও মঙ্গলবার (১৭ই মে) আক্রান্ত হয়। এর পরিণামে দপ্তরের প্রায় প্রতিটি ঘরেই চলে দক্ষয়জ্ঞ কাণ্ড।

দেবীবারু বাড়ীর ঘটনার সূত্রপাত সকালেই। ছপুর্ নাগাদ প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে নিজ নিজ প্রার্থীর সমর্থনে যুবকংগ্রেসীরা হাজির হতে থাকে। উপস্থিত যুবকর্মীদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা দেখা দিতে থাকে। এর মূল কারণ : কংগ্রেস অফিস থাকতে দেবী বাবুর বাড়ীতে কংগ্রেসের বৈঠক কেন? ছপুর্ হুটো তিনটা নাগাদ উত্তর কলকাতার সাধন পাণ্ডে, মধ্য কলকাতার প্রাক্তন এম, এল, এ সোমেন মিত্রের ঘনিষ্ঠ কর্মী পন্টুর নেতৃত্বে একদল যুব কংগ্রেসী পার্ক

ম্যানশনের দোতলায় হুড়হুড় করে উঠে আসে। স্লোগানে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে খেউর চলে। অকথ্য গালিগালাজ করতে করতে যুব কংগ্রেসীরা, কারও কারও মতে, ভৈরববাহিনী দোতলায় উঠে এসে চালায় বেপরোয়া ভাঙচুর।

বাইরের ঘরে তুলকালাম কাণ্ড চলার সময় ভেতরের ঘর থেকে নেতৃত্ব বেরিয়ে আসেন। বেরিয়ে আসামাত্র ভৈরব বাহিনী তাঁদের ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেবীবারু হাত থেকে নির্বাচনী কাগজপত্র একদল ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। মন্তান-বাহিনীর উত্তত হাতের কাছে এই সময় কেউই রেহাই পায় না। সাধন পাণ্ডের মারমুখি চেহারা দেখে প্রিয়বারু ওর হাঁটু জড়িয়ে ধরেন। মুখে প্রিয়বারুর অহরোধ—সাধন এমন করিস না, তুল হচ্ছে। সাধন এমন করিস না। কে কার কথা শোনে। সাধন হাঁটু জড়িয়ে ধরা দেয়ে বলে ওঠে, প্রিয়দা আর চব দিও না। অনেক দেখিয়েছে। এই সময় ভেতরের ঘর থেকে নেতৃত্বের মাঝখান থেকে হস্তবাবু হাত পা উঠিয়ে ঝাঁপিয়ে

পড়েন। হস্তবাবুর সঙ্গে হাত মেলান তারই ঘনিষ্ঠ আরও কিছু সহচর। বেশ কিছুক্ষণ এই অবস্থা চলার পর সাধন পন্টুর দল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। অবস্থা কিছুটা স্থিমিত হওয়ার (শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়)

সমস্ত বরখাস্ত কর্মচারীর পুনর্বহাল দাবী

(দর্পণের পর্ষবেক্ষক)

সত্তেরোই মে, ৭৭ সাল। বর্ণাঢ্য মিছিল এবং বিভিন্ন দাবীর সোচ্চার-কণ্ঠ উচ্চারণে সমুদ্রাল বলকাতা এসপ্লান্ডে ইষ্ট। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা রাজ্য কো-অডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে হাজারে হাজারে সমাবেশ হয়েছিলেন। উপলক্ষ্য রাজ্যপালের কাছে গণ্ডেপুন্টেশন এবং সমাবেশ।

অফিস ছুটির পরেই রাইটার্স বিল্ডিং থেকে বেরাট এক মিছিল করে সরকারী কর্মচারীরা নরনারী নির্বিশেষে এগিয়ে বান এসপ্লান্ডে ইষ্টের দিকে। মিছিল এসেছে নিউ সেক্রেটারিয়েট, পূর্বাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল এবং বি, জি, প্রেস থেকে। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের যে উন্নতিশির ঘোষণায় কণ্ঠ ছিল ক্রুদ্ধ এদিন সেই সহস্র কণ্ঠের বজ্রগর্ভ নিনাদ শোনা গেল পুনর্বার। রাজ্যপালের পক্ষে আরকলিপি গ্রহণ করেন রাজ্যপালের সেক্রেটারী। বারোমফা দাবী সম্বলিত এই আরকপজে ১৯৭১. ১২৭৫ ও ১২৭৬ সালে সংবিধানের ৩১১(২)(গ) ধারাবলে বরখাস্ত ১২ জন নেতৃত্বানীর্ষ কর্মী, কনট্রাক্ট প্রকার অজুহাতে কর্মচ্যুত লোকরঞ্জন শাখার ৫ জন শিল্পী, তথাকথিত পুলিশ রিপোর্ট ও অবরুদ্ধত্মক অবসর গ্রহণের আদেশ বলে বা অজ্ঞাত ভাবে চাকুরীচ্যুত সমস্ত কর্মীর পুনর্বহাল এবং আন্দোলনগত কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে প্রদত্ত সমস্ত শাসনোপদেশ আদেশ প্রত্যাহারের দাবী অজ্ঞাতম।

এসপ্লান্ডে ইষ্টের সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শ্রীশ্রামসুন্দর গুপ্তাচার্য, প্রতিবেদন পেশ করেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এবং সমস্ত দাবী বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন পর রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মিছিল ও সমাবেশে উৎসাহ ও উদীপনা সবিশেষ লক্ষণীয় ছিল।

জেলে আটক সি পি এম কর্মীদের সংখ্যা

(দর্পণের প্রতিনিধি)

মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কতজন কর্মী এখনও জেলে আটক আছেন তাদের নামের একটা তালিকা শ্রীজ্যোতির্ময় বহু কেন্দ্রীয় স্বরাই মন্ত্রী শ্রীচরণ সিংকে দিয়েছেন। শ্রীবহু বলেছেন, বিভিন্ন অভিযোগে ৮১ জনের বিরুদ্ধে মামলা চলছে যারা এখনও জেলে আটক। বিধান সভা, ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য ফ্রন্টে ৮৫০ জন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট কর্মীর বিরুদ্ধেও বিভিন্ন ধারার মামলা চলছে। এরা সকলেই জামিনে মুক্ত আছেন। রাজনৈতিক কারণে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত একমাত্র বন্দী হলেন একজন মহিলা, আসানসোলের ভারতী তরফদার। তাছাড়া কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় কৃষক, ছাত্র ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ২১৩ জন কর্মী এখনও মিসায় আটক আছেন। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির ৩৮ জন সদস্য ও সমর্থক বাবজীবন কারাদণ্ডে ভোগ করছেন। আরও ১ জন কর্মী পাঁচ অথবা দশ বছরের দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত। যারা মিসায় আটক এবং কারাদণ্ড ভোগ করছেন তাদের নামের তালিকাও নিয়েছেন শ্রীবহু।

‘আমার স্বামীকে পুলিশ পাগল করে দিতে চাইছে’

নকশাল নেতা মহাদেব মুখার্জীর স্ত্রীর চিঠি

“দর্পণ” সম্পাদক সমীপেযু, মহাশয়,

আমার স্বামী শ্রীমহাদেব মুখার্জীকে ১৯৭৪ সালের ৫ই ডিসেম্বর আসামের সিচং শহরে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সেই রাজ্জেই বিমান যোগে তাঁকে কলকাতার আনন্দ লর্ড সিনহা রোডে আই বি লক-আপে পুরে রাখে। তাকে দীর্ঘ ৬ মাস পর আই বি লক-আপ থেকে দমদম সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এই দীর্ঘ ৬ মাস তাহার উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়। দমদম জেলে এক অন্ধকার কুঠুরীর মধ্যে তাকে রাখা হয় যার নাম এক নম্বর কুণ্ডমন্ড সেল, ফাঁসীর আসামীদের যেখানে রাখা হয় সেই আয়গা। চাক্ষুশ ঘন্টা লক-আপ,

জান করতেও বেরতে দেওয়া হয় না। তার উপর চলে অকথ্য অত্যাচার গালাগালি।

আমি গত ৬ই মার্চ আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে বাই। তখন দেখি ৬ জন ওয়ার্ডার আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে আসে। একটি আবদ্ধ ঘরের মধ্যে মোটা কাঁচের অপর দিকে বোঁকের উপরে তাকে বসানো হয়। আমার স্বামী চলার শক্তিটুকু পর্যন্ত হারিয়েছেন। স্বামীর মুখে তুলনাম ওয়ার্ডার অধিকা সিংহের ভাইপো ওয়ার্ডার জীবন সিং আণের দিন রাজ্জে সেল খুলে অকথ্য অত্যাচার করেছে। আমার স্বামী কথাতো বলতে পারছেন না, কথা বলতে গেলে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে আসে, তারপর নাকি দিনে চারটে

তীব্র ঘুমের ঔষধ দিয়ে পাগল করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। জেলে যাবার আগে আমার স্বামীর ওজন ছিল ১০০ কে জি কিন্তু এখন হয়েছে ৪০ কে জি।

আমার ছেলে কিছুদিন আগে দেখা করতে যায়, তখন গিয়ে দেখে আমার স্বামী আরও অস্থির হয়ে পড়েছেন। তাকে এখনও সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে, আমার স্বামী কথা বলতে পারছেন না, তিনজন কর্মী ও চারজন ওয়ার্ডার মিলে আমার স্বামীকে কোলে করে নিয়ে আসে। আমার স্বামীর মুখে তুলনাম যে আগের দিন থেকে তাঁর খুব রক্তবমি (শেবাংশ ১য় পৃষ্ঠায়)

বামপন্থী ও জনতা পার্টি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভোটগুলোকে নিজেদের পক্ষে যুক্ত করে ৭০ শতাংশ আসন দাবী করেনি।

৬৭ সালে সি, পি, আই, এম প্রথম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং ৭১ এর নির্বাচনে জনতা দলের শরিক সংগঠন কংগ্রেস প্রথম নির্বাচনে নামে।

৭৭ সালে এই রাজ্যে বামপন্থী মোর্চার বৃহত্তম দল যেমন সি, পি, আই, এম, এই রাজ্যে জনতা পার্টির মধ্যে অধুনা বিদীন দলগুলোর মধ্যে তেমন সংগঠন কংগ্রেসই বৃহত্তম দল। সরকার গঠনের প্রসঙ্গে প্রথম বামপন্থী মোর্চা হয় '১৫৭ সালে এবং ১৯৬৭ সালে প্রথম এই রাজ্যে বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। অর্ধেক ভাবে সে সরকারের পতন ঘটবার পর ৬৯ সালে পুনর্ব্যবস্থা নির্বাচন হয়। জনগণই যদি হয় প্রধান বিচারক এবং নির্বাচনই যদি হয় সেই বিচারের মাপকাঠি (জনতা পার্টির মতে শ্রেষ্ঠ বিশ্বব) তবে ৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে উদ্ভূত কুৎসা প্রচারের পর ৬৯ সালে জনগণ কী রায় দিয়েছেন সেটাই বামপন্থীদের চারিত্রিক গুণবিচারের প্রধান ভিত্তি ধরে নিতে হবে। ৬৯ সালেও যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানো হয়। অতএব ১৯৭১ সালে লোকসভা এবং বিধান সভা নির্বাচনে বামপন্থীরা জনগণের সমর্থন কতটা পেলে সেটাও দেখা সরকার অবশ্যই। ৭১ সালেই বর্তমান জনতা পার্টিতে লীন সংগঠন কংগ্রেস প্রথম নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। এই পার্টি এবং জনতা পার্টির অস্ত্র শরিক এস, এস, পি ও জনসংঘই ৭১ এর নির্বাচনে কতটা জনসমর্থন পেয়েছে সেটাও বিচার্য। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে নিমূল করতে চেয়েছেন বামপন্থীরা এবং সেক্ষেত্রে তারা কংগ্রেসের দুই প্রভাব এই রাজ্যে ছোট করে দেখতে চাননা কিন্তু জনতা পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব সেই প্রভাবকে নিজেদের শক্তির অন্তর্ভুক্ত করে নিতে চাইছেন অর্থোজিক অধমানে। অবশ্য, কংগ্রেসের দুই চক্রের এক অংশ জনতা পার্টিতে আশ্রয় পেয়েছে বলেই হয়তো প্রফুল্ল বাবুবা এত উদ্ধারিত নৃত্যে মেতে উঠেছেন। যাই হোক ৬৯ এবং ৭১ এর নির্বাচনী কল্যাণকটী এক নজরে দেখা দেয়া যাক।

৬৭ সালে ২৮০ আসন বিশিষ্ট রাজ্য বিধান সভায় বামপন্থী মোর্চা পায় ১৫০টি আসন। এই সালেই 'সি, পি, আই, এম প্রথম ৪০টি আসন পায়। কংগ্রেস পায় ১২৭টি।

বিধান সভায় সংযোগ্যগঠিতা থাকা সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানো হয় রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করে। ৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে বামপন্থীরা অর্ধাং যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলো কংগ্রেসী বৈরচাচারিতার বিরুদ্ধে রক্তবা পেশ করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয় এবং ২৮০ আসন বিশিষ্ট বিধান সভায় লাভ করে ২২১টি আসন। কংগ্রেস পায় ৫৫টি আসন অর্ধাং ৬৭ সালের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগেরও কম কিন্তু 'সি, পি, আই, এম পায় ৮০টি আসন অর্ধাং শতকরা ৮২ ভাগেরও বেশী। ফরোয়ার্ড ব্লক ৬৭তে পেয়েছিল ১৩টি আসন কিন্তু ৬৯ এ পায় ২১টি এবং আর, এস, পি ৬৭তে পেয়েছিল ৬টি কিন্তু ৬৯ এ পায় ১২টি আসন। বিশেষভাবে মতব্যা মে, বর্তমানে জনতা পার্টিতে লীন এস, এস, পি দল ৬৯ সালে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত থেকে ১টি আসন লাভ করে অর্ধাং ৬৭ সালের তুলনায় ২টি বেশী। কিন্তু জনতা পার্টির অস্ত্র শরিক জনসংঘ একক দল হিসেবে ৬৭তে ১টি আসন পেলেও ৬৯ এ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

৭০ সালে আবার যুক্তফ্রন্টের পতন ঘটে। ৭১ সালে, আবার লোকসভা ও বিধানসভায় নির্বাচন হয়। ৭১ সালে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর মধ্যে ফাটল ধরে। 'সি, পি, আই, এম' এবং 'এস, ইউ, সি ও ফরোয়ার্ড ব্লক' মিলে একটি ফ্রন্ট গঠন করে। আর, এস, পি দল আলাদা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। জনতা পার্টির এই রাজ্যে প্রথম শরিক সংগঠন কংগ্রেস ৭১ সালেই প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ৭১ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রাজ্যের ৪০টি লোকসভা আসনের মধ্যে ২০টি দখল করে 'সি পি এম' এবং এই দল রাজ্য বিধানসভায় ২৮০টি আসনের মধ্যে দখল করে ১১১টি কিন্তু কংগ্রেস পায় ১০৫টি। ৭৭ সালের বামপন্থী মোর্চার অন্তর্ভুক্ত দলগুলো একত্রে ('সি, পি, আই, এম + আর, এস, পি + ফ, ব, + ফ, ব, মা + বি, বা, ক + আর, সি, পি, আই) ৭১ সালে দখল করেছিল ১২৫টি আসন। পক্ষান্তরে জনতা পার্টির ৩ টি শরিকদল সংগঠন কংগ্রেস, এস, এস, পি এবং জনসংঘ সাহুল্যে পেয়েছিল ৪টি আসন (সং, ক ২, এস, এস, পি ১, জনসংঘ ১)।

৭১ সালে মোট, ভোটের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ১৭ লক্ষ ১৪ হাজার ৭৭শ' ৪৫ এবং প্রদত্ত ভোটের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৩২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪৭শ' ৩০ অর্ধাং মোট ভোটারের ৬০.১৬ শতাংশ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের

প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ এবং শতকরা হারের হিসেবে 'সি, পি, আই, এম' ছিল শীর্ষে। এই দল সাহুল্যে পেয়েছিল ৪২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬৭শ' ৭০টি ভোট অর্ধাং প্রদত্ত ভোটের ৩১.২৮ শতাংশ। ৭৭ সা' লের বামপন্থী মোর্চার অন্তর্ভুক্ত দলগুলো একত্রে পেয়েছিল ৫০ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬৭শ' ৪৬ অর্ধাং প্রদত্ত ভোটের ২৮.২০ শতাংশ। কংগ্রেসী দলের 'সি, পি, আই' পেয়েছে ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার ২৭শ' ৩৬ ভোট অর্ধাং প্রদত্ত ভোটের ৮.১৩ শতাংশ। জনতা পার্টিতে অধুনা বিলীন ৩টি দল সংগঠন কংগ্রেস, এস, এস, পি এবং জনসংঘ পেয়েছিল বধাক্রমে ৭ লক্ষ ৩৯ হাজার ২৭শ' ১৬, ১০ হাজার ৪৭শ' ১৮ এবং ১১ হাজার ৩৭শ' ৫৫ ভোট অর্ধাং প্রদত্ত ভোটের শতাংশের হার বধাক্রমে ৫.৫৮, ০.৬১ ৩০.৬৮ এবং তিনটি দলের অর্ধাং বর্তমান জনতা পার্টির হিসেব ধরলে দাঁড়ায় ১ লক্ষ ২০ হাজার ১৭শ' ২২ এবং শতাংশের হিসেবে প্রদত্ত ভোটের ৬.২৫ ভাগ।

জনতা পার্টির দাবী এই যে, অতীতের কংগ্রেসীরা তাদের সমর্থন করছে। ঘটনাটা আদৌ সত্য নয়। যদি ধরেও নিই যে, জনতা পার্টির দাবীর ভিত্তি আছে তবে ফলটা কি দাঁড়ায়? বামপন্থীদের প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ যেখানে প্রদত্ত ভোটের ৩৮.৪০ শতাংশ সেখানে শাসক কংগ্রেস এবং জনতা পার্টির তিন শরিকের প্রাপ্ত ভোটের মিলিত পরিমাণ, দাঁড়ায় প্রদত্ত ভোটের ৩৫.১৫ শতাংশ অর্ধাং বামপন্থীদের তুলনায় ৩.২৫ শতাংশ কম। আমি এই তালিকা সরকারী পরিসংখ্যান থেকেই উদ্ধৃত করছি। সরকারী পরিসংখ্যানে বিভিন্ন দলের বিজয়ী প্রার্থীদের যে ভোটের হিসেব দেওয়া হয়েছে ৭১ সালে তাতে দেখা যায় 'সি, পি, আই, এম' পেয়েছে প্রদত্ত ভোটের ২১.৪১ শতাংশ এবং শাসক কংগ্রেস ১৬.৪২ শতাংশ। ৭৭ সালের বামপন্থী মোর্চার অন্তর্ভুক্ত দলের মিলিত বিজয়ী প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রদত্ত ভোটের ২৩.০৮ শতাংশ। শাসক কংগ্রেস এবং 'সি, পি, আই' দলের প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ ছিল প্রদত্ত ভোটের ১৭.৫২ শতাংশ ('সি, পি, আই-১১.১০)। সরকারী পরিসংখ্যানের হিসেব অনুসারে কংগ্রেস 'সি, পি, আই' এবং বর্তমান জনতা পার্টির তিন শরিকের প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ ছিল একত্রে প্রদত্ত ভোটের ২০.৮৫ শতাংশ (সংগঠন কংগ্রেস ৩.০২, এস, এস, পি ০.১৩ জনসংঘ ০.১১) অর্ধাং বামপন্থীদের তুলনায় ২.২৩ শতাংশ কম। ৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শাসকদলের চালাও

জালিয়াতি জনতা দলও স্বীকার করেছে।

এবার এই প্রেক্ষিতীর ভিত্তিতে জনতা-বামপন্থী আলোচনায় জনতা দলের দাবীর যৌক্তিকতা বিচার করা যাক। ৫২ থেকে ৬২ পর্যন্ত 'সি, পি, আই, এম' ছিলোনা, ৫২ থেকে ৬২ পর্যন্ত একাবদ্ধ বামপন্থী মোর্চাও ছিলো না। এতদসত্ত্বেও জনতা পার্টি বিগত ৭টি বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের শার্সেন্টেজের ভিত্তিতে আসন ভাগের যে অবাস্তব প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন সেটা বস্তুত আলোচনা ভেঙে দেবার পূর্বপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত অনুসারেই করা হয়েছিল। কারণ এই রাজ্যের বরখাস্ত তন্নীতি-পরায়ণ কংগ্রেস সরকারের অতীব তন্নীতিগ্রস্ত পাণ্ডারের সঙ্গে জনতার রাজ্য নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই একটা রফা করে নিয়েছেন। এবং 'এটাও খুবই সত্য যে, ৭২ সালের মত ৭৭ সালেও কংগ্রেসী খুনী বাহিনীকে জনতা পার্টির লেবেল পরিচয় এবং আর, এস, এস দলের ঠেংবর বাহিনীকে সম্মিলিতভাবে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে লেগিয়ে দেওয়া হবে। হয়তো আরও অনেক চক্রান্তই হবে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে কিন্তু এটা নির্বালোকের মতোই স্পষ্ট যে ৭৭ এর নির্বাচন যদি ৭২ সালের নির্বাচনী জালিয়াতির পুনরাবৃত্তি না হয় তবে এই রাজ্যে এবার জনতা পার্টিও জনগণ কর্তৃক আত্মকুণ্ডের আবর্জনা-রূপে নিষ্কিপ্ত হবে। আয়ুর পার-ঘটায় দাঁড়িয়ে ক্ষমতালোলুপ প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয় যদি ভেবে থাকেন যে তিনি আবার সদলবলে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের মসনদে ফিরে আসবেন তবে তাঁর অতি বার্কীকোর লোলুপতাকে করুণা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আগেই বলেছি, ৭১ সালেই জনতা পার্টির অস্ত্রশরিক সংগঠন কংগ্রেস প্রথম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, সেই নির্বাচনে এই রাজ্যে এই দলের বিরাট সাফল্যের চিহ্নটা একটু তুলে ধরা যাক। ২১৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সংগঠন কংগ্রেস আসন পেয়েছিল ২টি। সংগঠন কংগ্রেসকে ২১৭টির মধ্যে ১০০টি আসনে পরাজয় বরণ করতে হয় 'সি পি আই এম-এর কাছে এবং ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, বিশ্ববী বাংলা কংগ্রেস, আর সি পি আই এবং মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি পাঁচটি বামপন্থী দলের কাছে ১৪টি আসনে অর্ধাং বর্তমান বামপন্থী মোর্চার কাছে ১১৭টি আসনে। অতএব এই দলের নেতাদেরইতো এখন জনতা পার্টির বাতাবরণে বামপন্থী মোর্চাকে নিজস্ব দয়া করে ৮০টি আসন দেওয়ার প্রস্তাব করা সাজে।

জলপাইগুড়ি জেলায় মাত্র ১টি এস গোটা দাঁড়িয়ে জেলায় ১টি আসন বামপন্থীদের না দেবার প্রস্তাব করা ছিলেন জনতা পার্টির রাজ্য নেতারা। জলপাইগুড়ি জেলার ফলাফলটা একটু দেখা যাক। জেলায় ১১টি আসনে ৮টি পেয়েছিল কংগ্রেস, ১টি সি পি আই এম, ১টি আর এস পি এবং ১টি নির্দল। কংগ্রেস যে ৮টি আসনে জয়ী হয়েছিল তার চিহ্নটা একটু তুলে ধরি। কুমারগ্রামে কংগ্রেস পেয়েছে ১৬৬১১ এবং বামপন্থীরা পেয়েছে ১৭৩২২ ('সি পি আই এম-১২৮৪ + আর এস পি-৪০৮৩ + কং বং-৩২৬১) এবং সংগঠন কংগ্রেস পায় ৪০৮২টি ভোট। কালচিনিতে কংগ্রেস পায় ১০৬৮২ এবং বামপন্থীরা ১০২৮২ ('আর এস পি-৮৭৪৩ + কং বং-২২৩২) এবং সংগঠন কংগ্রেস ৩৭০, আলিপুর জুয়ারে কংগ্রেস পায় ২০৪৫৫ এবং বামপন্থীরা ২২২০৭ ('সি পি আই এম ১১২১১ + আর এস পি ১০২১০) এবং জনতা পার্টির অস্ত্রশরিক এস এস পি মাত্র ১২২, ফালাকাটার কংগ্রেস পায় ১০৪১০ এবং বামপন্থীরা ১৩৮২৩ ('সি পি আই এম ১১৪১৫ + আর এস পি ২৪০৮) এবং বর্তমান জনতা পার্টির দুই শরিক সংগঠন কংগ্রেস এবং এস এস পি মিলিতভাবে ৬৩২৭।

স্ত্রীর চিঠি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে। জেলার সামনেও রক্তবমি হয়েছে এবং কথা বলতে পারছেন না, 'একটুতেই' হাঁপিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু জেলার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না, উপরন্তু রাজ্যে সেল খুলে নানারকম মানসিক অত্যাচার করা হচ্ছে, যেমন দড়ির ফাঁস করে গলায় ঝুলিয়ে টানাটানি করে বলা হয় আত্ম 'কাঁসি দেব।' ছুতো পায়ের থেকে খুলে গ্রহণ করা হয়। আমরা জেলার হাঙ্গামাপাতালে ভর্তি করার অস্ত্র বায়বায়ন অহরোধ করলাম, কিন্তু কাকশ পরিবেদনা। আমি আলীপুরে পঞ্চম টাইমুনাল কোর্টে হাঙ্গামাপাতালে ভর্তি করার অস্ত্র অহরোধ আনলাম। অজমাহেব আলীপুর জেল হাঙ্গামাপাতালে পাঠাবার আদেশ দেন কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করল।

এরকম অত্যাচার চালালে মনে হয় বেশীদিন আর আমার স্বামী বাঁচবেন না। রাজনৈতিক বন্দীর প্রতি এইরূপ অত্যাচার কোন সভ্য সরকার করে কিনা জানি না।

শেকলী মুখার্জী
আসানসোল

স্বতন্ত্র মুখার্জী ইত্যাদির বিরুদ্ধে পুরসভা ইউনিয়নের তদন্ত দাবী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা শহর বেআইনী গৃহ নির্মাণে ভবে বাড়ে বলে পু-মন্ত্রী স্বতন্ত্র মুখার্জী প্রকাশে অনেক গলায়ালি করেছেন। কিন্তু অনেকটা বোধহয় জানেন না যে, এরা পেছনে তার নিজের উৎসাহও কম নয়। বে-আইনী বাড়ীর বিরুদ্ধে বিভাগ যখন ব্যবস্থা নিতে চেয়েছে তখন তিনি কিসের প্রেরণায় কমিশনারকে দিয়ে তাড়ো বাধা দিয়েছেন। জীর্ণ বাড়ীর ব্যাপারেও তাই। আবার তার স্বার্থে যেখানে যা লেগেছে সেখানে উন্টো কাঁজও তিনি করেছেন অর্থাৎ আইন-সম্মত বাড়ী বানানোতে কমিশনারের মাধ্যমে তিনি বাধা সৃষ্টি করেছেন এবং ভালো বাড়ীকে ভাঙা বাড়ী বলে রিপোর্ট দিতে কমিশনারের মাধ্যমে বিভাগের উপর চাপ সৃষ্টি করেছেন। ১৬১৬ রাসবিহারী এভিনিউর মালিক যখন প্রফুল্ল সেনের ভাগনে শ্রীদাসগুপ্তকে নিয়ে স্বতন্ত্রবাবুর জনতা পার্টিতে

গাটছড়া বেঁধেছিলেন কোন স্বার্থে? লরীর স্পোরার পার্টস কেনা, লরী কেনা এবং ডাইভারদের চাকরি ইত্যাদি ব্যাপারে দালালদের মাধ্যমে কি লক্ষ লক্ষ টাকা তার হাতে আসেনি? শান্তি সেন অবশ্য বহুকাল রাবৎ নিরক্ষর মজুরদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে মাঝে মাঝে কিছু পাইয়ে দেওয়ার সুবাদে তার নেতৃত্ব বজায় রেখেছেন এবং গত নির্বাচনে জনতা পার্টির ভয়ের পথে প্রতাপ চক্রকে ধরে জনতা পার্টিতে চোকার তালে আছে। এ বকম ছুটি বৃত্তে জনতা পার্টি তাদের মধ্যে স্থান দেবেন কিনা জানি না। সি-পি-এমের ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং জনতা-সি এফ ডি পরিচালিত ইউ-নিয়নগুলি ইতিমধ্যে শান্তি সেন, মধু চ্যাটার্জি, কমিশনার নির্মাল্য মুখার্জী এবং শালের গোদা স্বতন্ত্র মুখার্জীর হুমুটি তদন্ত করার জন্য কমিশন দাবি করেছে।

সি আর পি কর্তৃক নারী ধর্ষণ ও হত্যা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত ২০ জুলাই মুর্শিদাবাদ জেলায় আম সের গঞ্জ ধানার মালিক গ্রামের ফেলানি ঘোষ (১৮) নামী জনৈক তরুণী সি, আর, পিদের ধর্ষণের শিকার হয়ে মারা গেছেন। জানা গিয়েছে ঐদিন দুপুর বেলায় মৃত্যু তরুণী ক্যানেলের জলে স্নান করার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হয়। পথ থেকে সি, আর, পিরা জোর করে তাকে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে তার উপর দলবদ্ধ ভাবে বলাৎকার করলে ক্যাম্পেই তার মৃত্যু হয়। তারপর সি, আর, পিরা মৃত্যুর দেহটি সি, আর, পি ক্যাম্পের পাশেই ফেলে দেয়। মৃত্যুর পরে তার গলায় তার পরণের কাপড় দিয়ে দেওয়া হয়। সে সভ্যই মারা গিয়েছে কিনা সেটা পরীক্ষার জন্য গলায়, মুখে বিভিন্ন জায়গায় জগন্ত সিগারেটের ইয়াকা দেওয়া হয়। যেখানে তার মৃতদেহটি পাওয়া গিয়েছে তার আশেপাশে সবসময় সি, আর, পি, দল সশস্ত্র পাহারায় থাকে। সাধারণ মানুষের পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়।

কয়েক ঘণ্টা পরেই মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য অস্থায়ী মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। পোষ্টমর্টেম রিপোর্টেও বলা হয়েছিল তাকে মৃত্যুর আগে ধর্ষণ করা হয়। এবং গ্রাম-বাসীরা অনেকেই ঘটনাটি জাচ

করেছিলেন, কিন্তু মুখে প্রকাশ করতে সাহস হয়নি। জনৈক সাংবাদিক ঘটনাটি সম্পর্কে জনৈক সরকারী আম-লার কাছে জানতে চাইলে তিনি তাকে বক্তৃতা দেবান। তখন উপায় ছিল না। দেশে চলছিল জরুরী অবস্থা। পুলিশ দল গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের

সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

চৌঠা মে ধড়দেহে ডাঃ সম্মত ঘোষের সভাপতিত্বে “বন্দী মুক্তি এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কমিটি” তৈরী হয়। এই কমিটি মনে করে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত সরকারি রাজবন্দীদেরই মুক্তি পাওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে পনেরই মে একটি কনভেনশনের আয়োজন করা হয় এবং কনভেনশন-টিকে সকল করার জন্য ব্যাপক প্রচার সংগঠিত করা হয়। এ নিয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

পনেরই মে’র কনভেনশনে ডাঃ সম্মত ঘোষ বলেন, বাটের দশকে পুঁজিবাদী হুনিয়া তথা সারা বিশ্বে যে ব্যাপক সভ্যতার সংকট দেখা দেয় তার পরিপ্রেক্ষিতেই বন্দী মুক্তির ব্যাপার-টাকে বিবেচনা করতে হবে। পশ্চিম-বাংলার বিভিন্ন জেলে অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে এই সব জেলে বন্দীদের পাগল করে দেবার ব্যবস্থা আছে। নকশাল নেতা মহাদেব মুখার্জীর নাকি এমন অবস্থা যে তাকে পেথিড্রিন দিয়েও ঘুম পাড়ানো যায়

নয় দেবাতো থাকে যাতে ঘটনাটি নিয়ে কোনরকম বাড়াবাড়ি না করা হয়। তারপর হঠাৎ ক্যাম্পটি উঠিয়ে দেওয়া হল। এখন জরুরী অবস্থা নেই, এখন এই হত্যাকাণ্ডের পূর্ণ তদন্ত দরকার।

না। এইভাবে বহু বন্দী মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তিনি বলেন যে কেন্দ্রে জনতা সরকারই আনুক, যেই আনুক সেই সরকারকে সঠিক পথে চালনা করতে হলে চাই জনমত, গণ আন্দোলন। ভবিষ্যতে সে বকম আন্দোলন হলে তিনি তাতে সাহায্য থাকবেন বলে জানান। সভায় বিমান সেনাপ্ত বলেন যে কংগ্রেস সরকার জীবনের গানকে শ্রমোন্নতির কাম্যায় পরিণত করেছিল। সাধন চক্রবর্তী বলেন হিংসার বিশ্বাস করে বলে যদি নকশালপন্থীদের ছাড়া না হয়, তাহলে বাহ্যসতে, কালীপুরে, বিভিন্ন জেলে বারী হিংসাত্মক কাজ করলো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? তার মতে বন্দীদের না ছাড়ার কারণ, অস্ত্র জারগার। সাংবাদিক কুমুদ দাসগুপ্ত, পীযুষ দেব, ক্ষিতেশ রায়চৌধুরী, হরিপদ ঘোষ প্রত্যেকে বন্দীদের মুক্তি দাবী করেন। ক্ষিতেশ রায়চৌধুরী বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, বামজোট বা জনতা যারাই ক্ষমতায় আসুক, তারাই “বন্দীদের” মুক্তি দেবেন।

পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে পুলিশ কর্মচারীদের অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দীর্ঘ সাত বৎসর পর কলকাতা পুলিশ এসোসিয়েশনের এক সভা আহ্বান করা হয়। এই সাত বৎসর ধরে অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে, অনেক আত্মদানের মাধ্যমে এই সংস্থা নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। গত ১১ই মে “ভারত সভা হল” বসে-ছিল তাদের এই সভা। সভার প্রধান বক্তা এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীচিহ্নাচরণ দত্ত তাঁর ভাষণে বহু গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ করেন তাঁদের উপরওয়ালাদের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন যে, সরকার এবং উপর মহলের কর্তা ব্যক্তিরা তাঁদের এই সংগঠনকে ধর স করার চেষ্টা করেছিল।

বহু বক্তা তাঁদের বক্তব্যে পুলিশের উপর নির্যাতনের কাহিনী তুলে ধরেন, তুলে ধরেন স্তায়পব্যয় পুলিশদের কিতাবে বহু পক্ষের ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হয়েছিল। তাঁরা বলেন, পুলিশ বাহিনীকে নিজেদের স্বর্থে রাজনীতির কাজে লাগানো হয়েছিল, বহু পুলিশকে বরখাস্ত এবং সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এমন কি কিছু পুলিশকে গুলি করে মারার চেষ্টা করা হয়। অনেককে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে। এই সব মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল সভাকক্ষটি।

এখানে মিটিং চলাকালীন খবর পাওয়া যায় যে, কিছু পুলিশকে লাল-বাজারে আটকে রাখা হয়েছে তাঁরা যাতে মিটিংয়ে আসতে না পারে। সভা তখন “শেম শেম” ধরিতে পূর্ণ হয়ে যায়।

স্মারকলিপি

পশ্চিমবঙ্গ নন-গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী সমিতি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোহনদেবী দেশাইয়ের নিকট প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে সংবিধানের ৩১১ (২) (গ) ধারায় বরখাস্ত পুলিশ কর্মচারীদের পুনর্বহাল, এই সমিতির উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং সমিতির সভ্যদের উপর পরিকল্পিত ধারাবাহিক হস্তগতি অবসানের আবেদন জানিয়েছে।

স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, মিথ্যা রিপোর্টের ভিত্তিতে বিরাট সংখ্যক পুলিশ কর্মচারীকে প্রাথমিক বদলীর অজুহাতে থেরাল শুলি মার্কি যখন তখন স্থানচ্যুত করা, সমিতির স্বীকৃতি বাতিলের ইমকী দেওয়া, লম্বা অপরাধে তত্ত্ব শাস্তিদান, সাজানো মামলার কর্মচারীদের বন্দী

করা, পি ডি আইনে কর্মীদের আটক রাখা, এমার্জেন্সীর সুযোগ নিয়ে তাদের মিসায় বন্দী করা, সংবিধানের ৩১১ (২) (গ) ধারায় আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে, বিপুল সংখ্যক কর্মচারীকে সরাসরি বরখাস্ত করার মধ্যে দিয়ে একটি সরকারী স্বীকৃতি প্রাপ্ত সংস্থার অশ্রুযুক্ত ঘটনো হয়েছিল। অধিকাংশ মামলার রাই যখন সমিতির সপক্ষে যায় তখন সেই সমস্ত মামলা হুজুম কোর্টে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় যাতে হাইকোর্টের রাই কার্যকর না হয়। আর আর্থিক দুর্গতির জন্য কর্মচারীরা বিপুল ব্যয়সা-পেক্ষ বিচারের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনা।

সমিতির অভিযোগ : পুলিশ প্রশাসনে এমন ই আত্মকিতার যে বিবাহিত কনস্টেবলদের জন্য বাড়ি-ভাড়া বরাদ্দ মাত্র পাঁচ টাকা। উচ্চপদস্থ অফিসারদের বাড়িতে কনস্টেবলদের দিয়ে গক-বাড়ুর দেখা-শোনা, ছুধ দোয়ান, কাপড় চোপড় ধোয়া, ঘর পরিষ্কার ও রান্না ইত্যাদি কাজ করান (যা আদালী প্রথা নামে কথ্যাত) হয়। এইসব কারণেই সম্ভবত দিল্লী ও উত্তর প্রদেশের সমস্ত পুলিশে বিক্ষোভ ঘটছিল এবং বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে আন্দোলন ও অস্থিরতা শুরু হয়েছিল একসময়।

নতুন প্রধানমন্ত্রীর কাছে সমিতির প্রার্থনা—(ক) সমিতির ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হোক, (খ) সংবিধানের ৩১১ (২) (গ) ধারাবলে বরখাস্ত সমস্ত পুলিশ কর্মীকে পুনর্বহাল করা হোক এবং তাদের পাণ্ডনা মিটিয়ে দেওয়া হোক (গ) ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে পুলিশ কর্মচারী হত্যা সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হোক; (ঘ) এমার্জেন্সীর অজুহাতে পুলিশ কর্মীদের মিসায় বন্দী করা সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হোক এবং যথার্থ কারণ ছাড়া যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এবং ক্ষয়তার অপপ্রয়োগকারী অফিসারদের শাস্তি দেওয়া হোক।

দানিকেন তন্ত্রের আলোকে মহাভারতের সূচা ও দেবতা বীরেন্দ্র মিশ্র

দেবশিবিরে অর্জুন

হিমালয়ে দেবশিবিরের সন্ধান পেয়েছিলেন যুধিষ্ঠির মহর্ষি বেদব্যাসের কাছে। সংবাদ ছিল, দেবতার পাণ্ডব পক্ষকে অস্ত্র সাহায্য দানে ও সামরিক প্রশিক্ষা প্রদানে উৎসুক। অর্জুনকে তখনই হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়ে দেন রাজ্যচ্যুত এবং বনবাসী রাজা যুধিষ্ঠির। বাবার সময় অর্জুনের প্রতি তাঁর মূল্যবান উপদেশ ছিল, গোপনে যেও, পথে কারকে 'পথ প্রদান করিও না'। অর্থাৎ পথে শত্রুপক্ষের চর আছে, তাঁরা বেন অর্জুনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য জানতে না পারে।

ঘটনাটি পরিষ্কার রাজনৈতিক তৎপরতায় পূর্ণ। বোকা যায়, দেবতার এক বহির্জাগতিক শক্তি। তাঁরা জানেন কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন। তাঁরা হিমালয়ের নিরিখীর্ষে সমবেত হয়েছেন, সমতলবাসী আর্ষাবর্তের রাজস্ববর্গের জাতি-বিরোধে নাক গলাবার উদ্দেশ্যে। সেই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছেন দেবগণের দূত বেদব্যাসকে।

বলা বাহুল্য, কাম্যাকবনে বেদব্যাসের আগমন ও দেববার্তা প্রেরণকে কোনও ঐশ্বরিক বা অলৌকিক ঘটনা বলে তাই আর বিচার করা সম্ভব নয়। আমরা বুঝতে পারি, সমতলে ও পর্বতে একটি গভীর রাজনৈতিক বড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে, যে বড়যন্ত্রের নেপথ্যে আছেন দেবগণ। আয়ত্ত আলোচনার জানা যাবে, বন পর্বের শুরুতে নয়, এ বড়যন্ত্রের সূত্রপাত পাণ্ডব জন্মেরও আগে। কিন্তু সে অনেক কথা। সেই কূট রাজনৈতিক প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব। যদিও মহাভারতের জন্ম-কুলজি শেষ হ'তে না হতেই কুরুপাণ্ডব জন্মের সময় থেকে সেই বড়যন্ত্র প্রত্যক্ষভাবে দানা বাঁধতে শুরু করেছে তবু বনপর্ব থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু। কেননা 'দেবগণ' এখানে বার বার আকাশ ভেলা, চেপে অর্জুনের সামনে অবতীর্ণ হয়েছেন। নিজেদের পরিচয় জ্ঞাপন করে বলেছেন, তাঁরা 'লোকপাল'। আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি, লোকপালগণ ঈশ্বরের আর এক সৃষ্টি, যাদের জন্ম ঈশ্বরের রূপায়, স্থান সংসার সমুদ্রে এবং ষাঁরা আমাদের মতই ক্ষুধাতৃষ্ণার অধীন। অর্জুনের সঙ্গে হিমালয়ে পৌঁছালে দেখতে পাব, তাঁদের দেহ সাধারণ মানুষেরই মত। তাঁদের কীতিকলাপ ও বুদ্ধিবৃত্তি অতি-আধুনিক সামরিক কর্তার মত। তাঁদের ব্যবহৃত যান ও অস্ত্রাদি একান্তভাবেই বৈজ্ঞানিক। এ অস্ত্রই তাঁদের চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করার পর আমার হুঃসাহসিক ব্যাখ্যা আর ততদূর হুঃসাহসিক বলে পাঠকের মনে হবে না। যা বস্তুত অলৌকিক নয় তাকেই কোথাও যেচ্ছার-কোথাও বা বিভ্রান্তি বশত অলৌকিকতার আচরণে ঢাকা হয়েছিল একদিন।

পাঠক- নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, দেবগণের বার্তা যখন মানুষ বেদব্যাস বিশেষ গোপনীয়তা অবলম্বন করে যুধিষ্ঠিরের কাছে বহন করে আনেন এবং অর্জুনকে পাঠান এক বহির্জাগতিক শক্তি শিবিরের সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে, তখন আমরা নিঃসন্দেহে ভাবতে পারি না ব্যাপারটা ঐশ্বরিক বা অলৌকিক।

কিন্তু যখন তিনি, অক্লান্ত যাত্রার পর বহু গিরিনদী পার হয়ে অর্জুন হিমালয়ে পৌঁছে গেলেন মাত্র দুই অহোরাত্রের মধ্যেই তখন প্রস্র আগে, এতো শীঘ্র অর্জুন সেখানে পৌঁছালেন কী উপায়ে? বলা হয়েছে, অর্জুন একাকী পর্বত শিখরে ঝাঁড়িয়ে দেবতার সন্ধান করেছেন। কোনো যান অথবা সারথির উল্লেখ নেই। রহস্য ও অলৌকিকতা এইখানেই। অর্জুন কি উড়ে এলেন? পিঠে লাগানো দুটি ডানা মেলে?

ভগবান মূনির একটি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই পুঁথিতে আছে বিভিন্ন ধরনের বিমানের বর্ণনা। বিমানের সেই বর্ণনা যে সব স্লোকে বর্ণিত আছে তার কিছু অংশবাদও দানিকেন তাঁর 'রিটার্ন টু দি ষ্টার' গ্রন্থে তুলে দিয়েছেন। বিমানের বর্ণনা-বা উল্লেখ পাণ্ডুরা যায় রামায়ণেও এবং মহাভারতের বিশাল কলেবরের মধ্যে বিমান শব্দটি বহুবার উচ্চারিত। দেবতার ভাে বটেই, রামায়ণে রাম, রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, হুম্যান, পরশুরাম-বিমান ব্যবহার করেছেন। মহাভারতের রাজস্ববর্গকে বিমান ব্যবহার করতে বড় একটা স্তম্ভিত। তবে যুধিষ্ঠিরের সভায় আমন্ত্রিতদের অনেকে বিমানে এসেছিলেন বলে উল্লেখ পাণ্ডুরা যায়। ভীম তাঁর রাক্ষস পুত্রীর সঙ্গে আকাশপথে 'হনিমুনে' গেছেন। সেটাকে রাক্ষসী মায়ী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হস্তরাং অর্জুন যে বিমানে চেপে হিমালয়ে গেছেন একথা আমরা কোনো প্রামাণিকতার সূত্রে বলতে পারি না। কিন্তু একটা বিষয়ে সন্দেহ আগে, তা হ'ল, মহাভারতের কবি কি দ্রুতগামী যানের বর্ণনা অল্পক্ষেপে রেখেছিলেন কড়া মন্ত্রগুপ্তির প্রভাবে? ঘটনাবলীর মধ্যে অলৌকিকতা সৃষ্টি কি তাঁর বা তাঁদের (মহাভারতের বহু অংশ বিভিন্ন কবির কবিকৃতি বলে পণ্ডিতরা বলেন) জ্ঞানভ্রম উদ্দেশ্য ছিল? মূনি ঐবিরাম হস্তরাম হিমালয়ে যাওয়া আসা করতেন। তাঁরাই বা যেতেন কোন্ উপায়ে? এর কোনো স্পষ্ট জবাব নেই। এমন হতে পারে, বহু পূর্বে ঘটিত ঘটনা যখন পরবর্তী-কালে লিখিত আকার গ্রহণ করে, (ঘটনাকাল চোদ্দশত খৃঃ পূর্বাব্দে, আর লিখিত মহাভারতের জন্ম, পাঁচশত খৃঃ পূর্বাব্দ) তখন, লেখক অনবধানতা-বশত বিমানের কথা ছেড়ে গেছেন। কিংবা তখন বিমানের প্রচলন না থাকায় তার উল্লেখ করেন নি। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। কারণ অস্ত্র বিমানের উল্লেখ প্রচুরই পাণ্ডুরা যায়। তবে কি, অলৌকিকতা সৃষ্টিই ছিল আসল উদ্দেশ্য? সঠিকভাবে কোনো সিদ্ধান্তই করার উপায় নেই। অন্তত অর্জুনের ক্ষেত্রে। আমাদের মনে নিতে হয়, মাত্র দুই অহোরাত্রের তিনি হিমালয়ে উপনীত হয়েছেন। কেমন করে, কবি সে কথা জানান নি। বলা হয়েছে কাল ব্যবধানের কথা। অর্থাৎ সময় কত লেগেছিল। বাক, অর্জুন পৌঁছেছেন হিমালয়ে যেমন করেই হোক।

অর্জুনের বাহনটিকে যেমন জানা গেল না, তেমনিই আমাদের অজ্ঞাতে দেবতার ঐশ্বর্য পেয়ে গেলেন। অর্জুন আসছেন হিমালয়ে। কে দিল তাঁদের এই সংবাদ?

নিশ্চয় বেদব্যাস করে গিয়ে তাঁর দৌত্যকার্যের সাক্ষ্যের কথা নিবেদন করেছিলেন তথাকথিত দেবতার কাছে। হুঃসাহসিক বিষয় এ বিষয়েও মহাভারতকার কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত রেখে যান নি। কিন্তু বেদব্যাস যদি সশরীরে সে খবর পৌঁছে দিয়ে থাকেন তবে বুঝতে হবে তিনিও ব্যবহার করেছিলেন বিশেষ দ্রুতগামী যান। অর্জুনের হিমালয়ে উপস্থিতিকালে আমাদের সামনে বেদব্যাস কিন্তু আবিষ্কৃত হন নি। তাই এমনও হতে পারে, তিনি আর্ষাবর্ত থেকেই কারো মাধ্যমে অথবা কোনো দূরত্বাশ যন্ত্রের সাহায্যে দেব শিবিরে বার্তা প্রেরণ করেন। বিমান এবং আকাশযান যে যুগে দেব-মানুষের (দেবতার ও মনুষ্যকৃতি লোকপাল) বাহন, সে যুগে দুঃসাহসিক বহু ও লাউড স্পীকার থাকা আদৌ অসম্ভব নয়। দানিকেন দৈববাণীকে লাউড স্পীকারের ব্যবহার বলেই উল্লেখ করেছেন। দুঃসাহসিক যন্ত্রের আরও আশা পাণ্ডব আমরা কৃত্তীর প্রসঙ্গে। দেহতে পারি, মতর্ষি চর্চাসার কাছে তিনি যে মন্ত্রটি লাভ করেন, মন্ত্রগুপ্তির প্রয়োজনেই তার ধাতুকতা সম্পর্কে মহাকবি নীরব। কিন্তু এ সব প্রশ্ন যথোপযোগ্য স্থানেই আলোচ্য। এখানে আমরা অর্জুনকেই অগ্রসরণ করছি।

হিমালয়ে উপস্থিত হ'য়ে একাকী অর্জুন যখন বিহ্বল-ভাবে ইতস্ততঃ নেত্রপাত করছেন, তখন 'অস্তরীক' থেকে একটি গভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'তিষ্ঠ'। বাতাসে কণ্ঠস্বর। দৈববাণী? অর্জুনের সঙ্গে আমরা চমৎকৃত হই। যুধ তুলে তাকাই আকাশে। কিন্তু না, কণ্ঠস্বরের মালিক আকাশ থেকে নেমে আসেন না, তাঁর দর্শন মেলে নিকটস্থ এক পার্বত্য বৃক্ষের তলায়। যিনি এতো কাছে, তাঁর কণ্ঠস্বর অত বড় আকারে বাতাসে ভাসে কেন? দানিকেন বলবেন, বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ মানুষকে চমৎকৃত করার ক্ষেত্রে এও এক বৈজ্ঞানিক-বিজ্ঞান-পারদর্শী-মানুষের কৌশল। লাউডস্পীকারের খেলা। এবং ডেবে দেখলে, এই ধরনের ব্যাখ্যাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। কণ্ঠস্বর অহুসরণে আমরা দেখতে পেলাম এক ব্রহ্মী সম্পন্ন, পিঙ্গল বর্ণ জটাছুট-ধারী কৃষ্ণকায় পুরুষকে। নিছক মানুষ। এই মানবই অর্জুনকে নিজের পরিচয় দিলেন, 'আমি দেবরাজ ইন্দ্র।' এই অর্জুত কথা বলে। হ'তে পারেন ইনিও বস্তুতই এক ইন্দ্র, অর্থাৎ হিমালয়ে বসবাসকারী এক ডিভিন দেব সৈন্তের রক্ষক হিসেবে 'ইন্দ্র' পদবিপ্রাপ্ত। কিন্তু ইনি যে আসল ইন্দ্র নন, তা আমরা কিছু পরেই দেখতে পাব। যে ইন্দ্র মহাকাশে অবস্থান করেন; যিনি হিমালয়ে অর্জুনের অস্ত্র মহাকাশ-রথ পাঠান অবশুই ইনি সেই একই 'ইন্দ্র' নন। 'ইন্দ্র' কোনো ব্যক্তি নন, পদবি-মাত্র, এ আলোচনাও আমরা যথাস্থানে করব। এখানে যে ইন্দ্রকে পেলাম, তাঁকে বিশেষ ক্ষমতাবান বলে বোধ হ'ল না। অর্জুনকে অস্ত্র সাহায্যের কোনো প্রতিশ্রুতি ইনি দিতে পারলেন না। বলে গেলেন, দেব-আর্ষাবর্তের জন্ত পাক্ষিক মহাদেবের তপস্যা করতে হবে। তিনিই দেবানিনায়ক। তাঁর মনোনয়ন পেলে অর্জুন তাঁর অস্ত্রটি লাভ করতে পারেন। হস্তরাং এরপর অর্জুন শুরু করেন, কঠোর তপস্যা। তপস্যা চলল ইন্দ্রকীল রা মহেন্দ্র অথবা মন্দার নামক হিমালয়ের একটি পর্বতে যার ভৌগোলিক অস্তিত্ব বর্তমান।

পাক্ষা চারমাস ধরে চলল অর্জুনের কষ্ট সাধনা। তার পর পর্বতবাসী মহর্ষিগণ মহাদেবের কানে খবর পৌঁছে দিলেন: জানানো হ'ল, কঠোর তপস্যার দ্বারা তাঁর আত্মগত্যা প্রমাণ করেছেন অর্জুন। সন্তুষ্ট মহাদেব বললেন (সাক্ষাৎ কথোপকথন), "হে তপোধানগ! তোমরা অর্জুনের নিমিত্ত বিব্রণ হইও না সত্বর য য স্থানে প্রস্থান কর। আমি মহাত্মা ধনঞ্জয়ের অভিপ্রায় বুঝিয়াছি। স্বর্গ আয়: বা ঐশ্বর্য লাভে তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই। আমি অর্জুই তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিব।" (বন, কাশীপ্রসঙ্গ, ৪৩)। (চলবে)

নতুন রেলমন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গি ও বিভাগীয় প্রশাসন

সাধন গুহ

নতুন রেলমন্ত্রী শ্রীমধু দত্তবতেকে অল্প সময়ের মধ্যে, দায়িত্বপ্রাপ্তির প্রথম সপ্তাহেই তিনি বিগত রেল-ধর্মঘটের বরখাস্ত রেল কর্মীদের যাব-যাব পদে বিনা চাকরী ছেড়ে যাব-যাব ইনক্রিমেন্ট সহ পুনর্বহালের আদেশ দিয়েছেন। শ্রী দত্তবতে নিজেও রেল শ্রমিকদের অন্ততম নেতা। স্বভাবতই রেল কর্মীদের বহুবিধ সমস্যা সম্পর্কে তিনি গুরুত্ববাহী—এটা বলাই বাহুল্য। ৭৪ সালে বিগত রেলধর্মঘটের সময় এবং ৭৫ সালের ২৫শে জুন আভ্যন্তরীণ জরুরী ব্যবস্থা চালু হবার পর রেল কর্মীদের ওপর কি ধরনের অমানুষিক নির্যাতন চলেছে নতুন রেলমন্ত্রী সে সম্পর্কে বহুই সচেতন। এতদসত্ত্বেও গত ১ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত নয়া দিল্লীতে অস্থায়ী অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশনের ওয়াকিং কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলোর প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিশেষ করে ধর্মঘট ও জরুরী অবস্থার সময় বিভিন্ন বিভাগীয় প্রশাসনে যে সব অফিসার কর্মীদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছেন, যারা অবশ্যে লুট করেছেন রেলের সম্পদ, যারা উদ্ভূত দস্যব পদাধীনে মুহুর্তেই অনেকের চাকরী ধ্বংস করে দিয়েছেন তাঁদের সমস্ত কার্যাবলী সম্পর্কে ব্যাপক তদন্তের অন্ত ফেডারেশনের শ্রমিক প্রতিনিধিসহ তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ফেডারেশনের এই প্রস্তাব আমারা সমর্থন করি। এইসব অফিসারদের দস্ত চূর্ণ করা দরকার, তাঁদের বর্তমান আচরণ আচরণেরও তদন্ত হওয়া দরকার। নতুন সরকার গঠিত হবার পর এইসব আমলাতন্ত্র রাতারাতি আহুগতা বদল করে বুদ্ধিমানের সঙ্গে বসলেও তলে তলে যে এখনও তারা পূর্ব সরকারেরই বশব্দ তা তাদের সাম্প্রতিক কার্যকলাপেই বোঝা যাচ্ছে। বিশেষ করে কোন কোন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ যে এখনও আগেকার হিটলারী মেজাজেই চলছেন আর বড় প্রমাণ শিয়ালদহ ডিভিশন। বলাই বাহুল্য যে, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যদি কর্মীদের সঙ্গে স্বস্তি ও মধুর ব্যবহার না করেন তাহলেই শিল্পে অশান্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে।

শিয়ালদহ বিভাগে হেড টিকেট কালেক্টর এবং ভ্রাম্যমান টিকেট পরীক্ষক অর্থাৎ টি, টি, ইদের স্পেশাল গ্রেড সিলেকশনকে কেন্দ্র করে আবার অশান্তি ধুময়িত হচ্ছে। এখানে বলা দরকার ৪২৫—৬৪০ টাকার এই গ্রেডটি একমাত্র চেকিং ষ্টাক ছাড়া

রেলের অন্য কোন ক্যাটিগরিতে সিলেকশন গ্রেড নয়, এমনকি এই গ্রেডের ক্যাটগরী টি, টি, ইর ক্ষেত্রেও এটা নয় সিলেকশন গ্রেড। এই সিলেকশনের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণভাবেই সিনিয়রিটি প্রাধান্য পাবার কথা কিন্তু শিয়ালদহ বিভাগে রেল প্রশাসন সিনিয়রিটি ছাড়াও "সুইচবিলিটি" শব্দটি এই ক্ষেত্রে আরোপ করেছেন এবং এই সুযোগে less earning এর দোহাই দিয়ে অনেকের সিনিয়রিটিকে ক্ষুণ্ণ করে জুনিয়রদের (যারা কর্তৃপক্ষের অহুগত এবং গত রেল ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেননি) এই গ্রেডে নির্বাচিত করা হচ্ছে এবং অফিসাররা প্রকাশ্যেই মারি বলছেন যে বর্তমান রেলমন্ত্রীরও কোন পরোয়া তাঁরা করেননা।

টি, টি, ই, ইদের এই "earning" এর ব্যক্তিগত অথবা স্বেচ্ছাভোগত কোন টার্গেট কিন্তু অস্বাভাবিক নির্ধারিত হয়নি। অথচ, এই প্রসঙ্গে রেল ধর্মঘটের পর থেকে, বিশেষ করে জরুরী অবস্থার কালে টি, সি এবং টি, টি, ইদের কথায় কথায় শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কখনও সাসপেনশন, কখনও ইনক্রিমেন্ট বন্ধ, কখনও বদলী। হাওড়া এবং শিয়ালদহ বিভাগে এটা একটা জুলুমের পর্দায়ে এসে গিয়েছিল। হাওড়ার ক্ষেত্রে এই জুলুম নতুন রেলমন্ত্রীর আমলে অনেক কম কিন্তু শিয়ালদহে এখনও অব্যাহত। এই ডিভিশনের সিনিয়র ডি, সি, এস-এর পক্ষ থেকে এক সাকুলারে সম্প্রতি বলা হয়েছে "টি, টি, ইদের ... every batch er train of Lalgola trip will have to give the Railway administration 40 penalty cases per up and down trip and luggage cases of Rs 300'00. Any squad failing will be put off the Lalgola diagram" এই সাকুলারটি ১৪, ৪, ৭৭ তারিখে লালগোলা লাইনে সিনিয়র ডি, সি, এস-এর মোটর ট্রলি ইনস্পেকশনের পর দেওয়া হয়েছে। সাকুলারে কোন তারিখ দেওয়া হয়নি। এই সাকুলারের বৈজ্ঞানিকতা বিশেষভাবে বিচার্য। ধরা যাক লালগোলা একসপ্রেস অর্থাৎ ৩০৪ আপ এবং ৩০২ নং ডাউন ট্রেনের কথা। শিয়ালদহ এবং লালগোলার মধ্যে এই গাড়ীটির স্টপেজ আছে আপে ১ এবং ডাউনে ৮টি স্টেশনে। বর্তমানে বৃকিং কাউন্টারে বিক্রীর পরিমাণ যে বেড়ে

যে প্রচুর পরিমাণ বেড়ে গেছে তা পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের বার্ষিক বৃকিং সেল এবং টি, টি, ইদের আয়ের তুলনামূলক তালিকা থেকেই অত্যন্ত পরিস্কার ভাবে ধরে নেওয়া যায়।

বৃকিং সেলের তালিকায় ৭২ ৭০ সালে ভ্রাম্যমান বাজীসংখ্যা ছিল ১৬৬২ ৪২৩ এবং বিক্রীত অর্থের পরিমাণ ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৮ ১১ টাকা। ৭৩-৭৪ সালে বাজী সংখ্যা ১৮৪৭৮ ১৫৪৭ জন এবং বিক্রীত অর্থের পরিমাণ ৮ কোটি ৩২ লক্ষ ২৬ হাজার ৬১ টাকা। ৭৪-৭৫ সালে বাজী সংখ্যা ২১৪ ২১৬১৫ জন এবং বিক্রীত অর্থের পরিমাণ ১১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৬১ হাজার ১৮ ৬১ টাকা। টি, টি, ইদের আর কিছু গোটা শিয়ালদহ ডিভিশনের নয়, মাত্র শিয়ালদহ হেড কোয়ার্টারেরটা এখানে উদ্ধৃত করছি। ১১৭৩ সালে পেনাল্টি আদায়ের খাতে কেসের সংখ্যা ছিল ৫০১৩৬ এবং আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ৬০ হাজার ৭৮ ৪৫ টাকা। লাগেজের খাতে কেসের সংখ্যা ছিল ৪২২৫৬ এবং আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৮ ৬৭। মাসুল অনাদায়ে অভিযুক্তের সংখ্যা ছিল ১১৫৭৮ এবং প্রাপ্য মাসুলের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৭৮ ৪৩ টাকা। ১১৭৪ সালে পেনাল্টি কেসের সংখ্যা ছিল ৫৬৫৮৬ এবং আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ১১ হাজার ৬৮ ৩৭ টাকা, লাগেজের খাতে কেসের সংখ্যা ছিল ৩৮২৬২ এবং আদায়কৃত মাসুলের পরিমাণ ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪৮ ৩৪ টাকা এবং অভিযুক্তের সংখ্যা ছিল ৫৮৬৩৩ এবং প্রাপ্য মাসুলের পরিমাণ ছিল ৬৮ হাজার ১৮ ৩২ টাকা। ১১৭৫ সালে পেনাল্টি খাতে কেসের সংখ্যা ৭২১২০ এবং আদায়কৃত মাসুলের পরিমাণ ৮ লক্ষ ১২ হাজার ১৮ ৫৭ টাকা, লাগেজের খাতে কেসের সংখ্যা ৩৬২৭৩ এবং প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ ২ লক্ষ ১৭ হাজার ১৮ ৫৫ টাকা এবং অভিযুক্তের সংখ্যা ১২১৫৩ এবং প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৮ ৭৪ টাকা। ৭৬ সালের তালিকা বিভাগীয় প্রশাসন অস্বাভাবিক প্রকাশ করেননি। কিন্তু, এই সালে টি, টি, ইদের আর প্রত্যেক ষাটেই যথেষ্ট বেড়ে গেছে বলেই কি তালিকা প্রকাশ করা হয়নি? আমি জানি, কর্তৃপক্ষ জবাব দিতে পারবেন না।

এই তালিকার পরিপ্রেক্ষিতে সিনিয়র ডি, সি, এস-এর পূর্বোক্ত

সাকুলার কি তাহলে জুলুম বলে গণ্য করা অন্তর্য হবে? ৩০১ আপ এবং ৩০২ ডাউন লালগোলা এক্সপ্রেস লাগেজ কম আসে। মধ্যবর্তী স্টেশন-গামী যাত্রীও থাকেনা। কেমন করে সম্ভব ৪০টি পেনাল্টি কেস করা—এ কথাটা কর্তৃপক্ষের অবশ্যই ভাবা উচিত ছিল। মজার কথা হচ্ছে যে, শুধুমাত্র পেনাল্টি এবং লাগেজ কেস-কেই "earning" বলে ধরা হয়। একসটেনশন, চেঞ্জ (অর্থাৎ গার্ড সার্ভিসকেও যে টিকেট হয়) ইত্যাদিকে ডিটেক্টেড কেস বলা হবে না কেন? ১১, ৫, ৬২ সালের রেলওয়ে বোর্ডের সি. সি. টি. ২ নং সাকুলারে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, "The performance of individual T. T. E should be assessed on the basis of detection of number of cases" এই সাকুলারে পেনাল্টি কেসে ক্যাস এবং ডিটেক্টেড (অর্থাৎ প্রসিকিউশন) ডিটেকশনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বোর্ডের সাকুলারও মানতে নারাজ, তারপর আছে অফিসারদের উপদলীয় কারসাজি। নিজেদের বিশ্ব অহুচরদের তাঁরা যথেষ্ট আচরণের সুযোগ দিচ্ছেন শিয়ালদহ বিভাগের সিনিয়র ডি, সি, এস ডিবি, পি, বহু কি জবাব দেবেন কেমন করে সিসমীর দাঁ নামক জনৈক টিকেট কালেক্টর রেলব্যবস্থার পোষ্টিং থাকা সত্ত্বেও শিয়ালদহ প্রাটিকর্মী কাজ করেন এবং কখনওকখনও তিনি টি, টি, ই'র কাজও করেন? শ্রীবৎ কি জবাব দেবেন যে কেন তিনি একদল টি, টি, ইকে বোটেশন বোষ্টারে কাজ না করিয়ে প্রাটিকর্মী ডিউটিতে আসেন পর মাস আটকে রেখে তাদের ১১৫ থেকে ২২৫ টাকা টি, এ থেকে বঞ্চিত করেছেন? শ্রীবৎ কি জবাব দেবেন যে কেন তিনি শুধু তাঁর পছন্দসই লোককে ম্যানিভ, মোবাইল, টিডি এবং থাইমুডি স্কোয়াডে দিয়ে, তাদের হেল্পার এবং আর্মড গার্ডের সহায়তায় বেশী আয়ের সুযোগ দিচ্ছেন? অথচ ২৩, ৩, ৭৬ তারিখে সংসদ সদস্য শ্রীশংকরদাস সিং-এর ১৮৬১ নং ছাঁটাই প্রস্তাব জবাবে রেল দপ্তরের তৎকালীন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসকী কুরেশী লোকসভায় বসছিলেন যে, রেলওয়ে বোর্ডের ২৩, ৩, ৫৫ তারিখের ২৮২৭-টি সি ৫৫ নং সাকুলার অহুয়ারী "All T T Es of the individual squad working with common roster at each head quarter covering all the sections and trains by rotation within their respective jurisdiction yield standard performance." কিন্তু

শিয়ালদহ হেড কোয়ার্টার তথা বিভাগে বোটেশন বোষ্টারে কাজ হচ্ছেনা। ফলে, কর্তৃপক্ষের তাঁবদার কিছু (যারা ধর্মঘট এবং জরুরী অবস্থার সর্ববিধ অগতির নায়ক ছিলেন) নানাভাবে প্রসাদপুষ্ট হচ্ছেন। এভাবেই সিলেকশনের ক্ষেত্রে আনিংয়ের দোহাই দিয়ে সিনিয়র-টিকেট পদস্থ করা হচ্ছে এবং স্যুটে-বিলিটির পছন্দসই ব্যাখ্যার অন্তরালে নির্বাচিত জুনিয়রদের বাকপথে সিলেকশনের নাম করে স্পেশাল গ্রেডে আনা হচ্ছে।

১১৫৬ সালে স্পেশাল গ্রেডের সিলেকশন প্রথম হয়। ১৪ পে কমিশনের অন্তিমোদনক্রমে এই গ্রেড ছিল ২০০—৩০০ টাকার। ১১৫৬ সালেও সিনিয়রিটি ভীষণভাবে ক্ষুণ্ণ হওয়ার তৎকালীন টি, টি, ই শ্রীশান্তি ব্যানার্জী এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করলে মহামান্য হাইকোর্ট ৫৬ সালের সিলেকশন বাতিল করে দেন কিন্তু কর্তৃপক্ষ কার্যদা করে ষপ গ্যাপে প্রমোশন চালু করেন। ১১৬৬ সালে দ্বিতীয় পে কমিশন অন্তিমোদিত ২৫০—৩৮০ টাকার গ্রেডে আবার সিলেকশন হয় একই কার্যদার কিন্তু পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের ফলে তার তালিকা আর প্রকাশিত হয়নি। ৩য় পে কমিশনে সমস্ত ভাতা সহ ঐ একই গ্রেড পুনর্নির্ধারিত হয়েছে ৪২৫—৬৪০ টাকায়। ১১৭৭ সালে এই গ্রেডে আবার সিলেকশন হচ্ছে এবং এবারও সিনিয়রিটি ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে "লেস ইনকাম" এর দোহাই দিয়ে। কষ্টে কমিটির রিপোর্ট অহুসারে প্রত্যেক ট্রেনের যাত্রাত্তের বাস্তবিক ব্যয়, প্রয়োজনীয় রেলকর্মীর খাতে আনুষঙ্গিক খরচ এবং আনুষঙ্গিক লাভের অল্প যুক্ত করেই প্রত্যেক ট্রেনের প্রত্যেক বগীতে যাত্রী সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়। এর মধ্যে নির্দিষ্ট আসনের সঙ্গে ২৫ শতাংশ দণ্ডায়মান অবস্থায় গণ্য করা হয়। এই প্রেক্ষিতে বিচার করলে প্রত্যেকটি ই এম ইউ ক্রায়ে ১৬০০ X ২৫ অর্থাৎ ৪০০০ যাত্রী যাত্রাত্ত করেন। যদি ধরেই নিই যে এর মধ্যে ২৫ শতাংশ বিনা টিকেটের যাত্রী (অবশ্য তা কখনও হয়না) তবুও রেলের প্রতি গাড়ী বাবদ আর প্রায় বিগুন হয়। অতএব, "লেস ইনকাম" কথাটা বীতিমত ধাপ্পা। যদি বলা হয় "লেস অব ইনকাম" তবে সেটাও অগ্রাহ্য এমত্রে যে, "ইনকাম" কথাটাই এখানে অপ্রযোজ্য। যাত্রীদের কাছে রেলের প্রতিষ্ঠিত সুযোগ সুবিধা কিছুই পূরণ না করে শুধুমাত্র আয়ের কথা চিন্তা করাটাইতো অমানবিক। ভাবতে অবাক লাগে যে, (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

দলত্যাগ ও অন্য দলে যোগদান প্রসঙ্গে

বর্তমান ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বিভিন্ন দলের সভ্যদের দলত্যাগ অথবা দল পরিবর্তন একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। বর্তমান মূল্যবোধ সঙ্কটের পরিবেশে স্বভাবতই এবং প্রায়শ বিশেষ মানদণ্ডে তা হীন-স্ববিধাবাদী। কিন্তু এই পরিবেশেও মাত্রার সমস্যা। সযত্নে উদাসীন আর নিশ্চেষ্ট থাকা চলে না। তাই কোন রাজনীতিক দলের সভ্য বা সমর্থক না হলেও, সাক্ষাৎ ভাবে বিশেষতঃ শ্রীমদাশঙ্কর ত্রায়েভার ভাবনা-চিন্তার সম্পর্ক উৎসাহিত হয়ে সচা বিগত কংগ্রেস সরকার আন্তর্জাতিক জরুরী অবস্থা কার্যে করার পরে প্রথমে তার পরে পরিবর্তিত ৪২নং সংবিধান সংশোধন বিল লোকসভায় অসম্মত করবার প্রস্তাব উত্থাপনের পর এ বিষয়ে দেশের কিছু মোটামুটি সম্ভাব্যী মুখ্য ব্যক্তি (সর্বশ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রমোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ফণীভূষণ চক্রবর্তী, শৈবাল গুপ্ত, অরুণ দত্ত, চাক্র চৌধুরী, সলিল দত্ত, নারায়ণ চৌধুরী, রুদ্রেন্দ্র পাল, ভাষাচার্য স্বকুমার দেন, ক্ষুদিরাম দাস, উপাচার্য কুনীল মুখোপাধ্যায়, ডঃ সঞ্জিতকুমার সাহা, ডঃ বিমলেন্দু মিত্র, ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল, শঙ্ক ঘোষ, অধ্যাপক নির্মল চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক চক্রবর্তী আচার্য, গৌরী আইয়ুজ, অসীম রায় ও চাঁদমল চোপরা প্রমুখকে একত্র করে তদানীন্তন সরকারের ওই পক্ষের সমালোচনা এবং প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিলেন। সে সময় শাসিত ধর্মণ্যে আবহাওয়ার তলকাতায় আমরাই প্রথম অদলীয় বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে ইতিহাস এসোসিয়েশন হল-এ গত ১৬-১৭-৭৬-এ প্রস্তাবিত ৪২ নং সংবিধান সংশোধন বিল-এর সমালোচনা-মূলক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন। বিস্তারিত ভাবে না হলেও সংক্ষেপে সম্ভবত আটজন মুখ্য ব্যক্তি স্বাক্ষরিত আমাদের বক্তব্য ডাকযোগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায় নি। লেখা বাহুল্য যে এমন কত হীন ব্যক্তির বক্তব্য তিনি এবং তাঁর সরকার উপেক্ষা করেছেন। তবে আশা করা যায়, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রকে অসম্মতভাবে বিপর্যস্ত করার উন্মত্ততার তখন না বুঝলেও, এখন নিশ্চয়ই তিনি ও তাঁরা জবাব না দেবার ভাণ্ডার্য অন্তত কিছুটা অজ্ঞাবহন করেছেন।

বর্তমানে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে প্রচলিত পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র যে একমাত্র পথ এ সত্য অন্তত প্রকাশ্যে পরিচিত সমস্ত দল, এমন কি সি, পি, আই, এম, এল, -এর একাংশও স্বীকার করছেন, ক্ষেত্র বিশেষে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন। এ দেশে স্বাধীনতা পরবর্তী কালে ১৯৭৭ সালে লোকসভা নির্বাচনে এই প্রথম কংগ্রেসের পরাজয় ও পরবর্তী শাসকবর্গের বিজয় যদি প্রধানত সাধারণ দুর্বল মিত্রীহ নাগরিকদের সমর্থনে হয়ে থাকে, তাহলে সামাজিক রাজনীতিক মূল্যবোধের সাধ্যমত সামগ্রিক পুনর্মূল্যায়ন তাঁদের করণীয়। এবং সমাজ-বিরাগী শ্রেণী, যেমন অসাব্য ব্যবসায়ী কালোবাজারী চোরা-কারবারী গুদামদল ইত্যাদির এ যাবৎ কালের সামাজিক রাজনীতিক ভূমিকার মূল্যায়ন করা এবং সে সযত্নে বক্তৃত মনোযোগী হওয়া সরকার ও অন্যান্য শাসকদল সচ অন্যান্য রাজনীতিক দলের সাধারণ কর্তব্য বলা চলে। এ অবস্থায় পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন ব্যক্তি বা সমষ্টি দলত্যাগ করলেই অল্প দলে তাকে বা তাঁদের গ্রহণ করা সমীচীন নয়। যদি মতানুসার রাজনীতিক গুণগামী অসম্মত আর অস্বাভাবিক হয় তবে তার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করতে হবে। দায়িত্ব সব দলের, তবে প্রধানত শাসকদল ও সরকারের, যেহেতু শাসন ক্ষমতা থাকে তাঁদের হাতে। যদি পরাজিত শাসক-দলের বেশির ভাগ মতানুসার বিচরী শাসক দলে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে সে সমস্যা

সযত্নে চিন্তা করতে হবে। তেমনি মধ্যম এবং মুখ্য নেতারা নিবিশেষে দল ত্যাগ করে স্ববিধেজনক ভাবে অল্প দলে প্রবেশ করবেন এটা না সমীচীন, না বাঞ্ছনীয়। এই মুহূর্তে, সমস্যা বিশেষভাবে প্রকট পরাজিত শাসক দল ছেড়ে বিজয়ী শাসকদলে প্রবেশের চেষ্টা। যেমন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রী অশোককুমার সেন সগোষ্ঠী কংগ্রেস দলের সভ্যপদ ছেড়ে বিজয়ী শাসকদলের প্রধান শরিক জনতা দলে যোগ দেবার চেষ্টা করছেন। প্রসঙ্গত চিন্তা করা দরকার যে শ্রীমতী গান্ধী বনাম শ্রীযুক্তনাথায়ণ মামলার এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় ঘোষিত হবার পর, শ্রীসেন শ্রীমতী গান্ধীর সংবিধান সংশোধন পরিকল্পনার অন্ততম প্রস্তাবক তথা সমর্থক, অথবা অন্তত সমর্থক; এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় পরাজয়ের পর ভারতের রাষ্ট্রপতির আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণায় শ্রীপালকিওরাল শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে দাঁড়াতে অস্বীকার করার পর শ্রীসেন শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে নির্ভরযোগ্যভাবে জানা যায় শ্রীসেনের বিরুদ্ধে 'বহুমতী' দৈনিক তেল্লিক আর্থিক দুর্নীতির কারণে সি, বি, আই তদন্ত চলছিল। বর্তমানে সম্ভবত অজ্ঞান করা যেতে পারে যে, সুপ্রীম কোর্টের মামলার রায় পার্লামেন্টে তৎকালীন নির্বাচন আইন পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় পরিবর্তিত হবার পর শ্রীমতী গান্ধী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগ করে ডা চাপা দেন। অতঃপর সচা অসুস্থিত লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে পরাজয়ের পর শ্রীসেনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত বক্তব্য অনুযায়ী তিনি পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং সংশোধিত ৪২নং বিলের সংবিধান সংশোধনের বিরোধী, প্রধানত এই যুক্তিতে তিনি কংগ্রেস ছাড়লেন বলে জানিয়েছেন। বর্তমানে যখন শ্রীমতী গান্ধী ও শ্রীসেন গান্ধীর কার্যকলাপ সযত্নে তদন্ত কমিশন বসছে এবং পরাজিত শাসকদলের অন্যান্য সভ্য সম্পর্কেও; তখন তাঁর সম্পর্কেও বলতে পারে শ্রীসেনের দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত কি এই দৃষ্টিভঙ্গি আদৌ প্রভাবিত নয়? পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা যদি অনমানসে বজায় রাখতে হয়, তাহলে রাজনীতিক মতানুসারের মতানি ও সামাজিক স্বস্থতার অন্তরায় অন্যান্য শ্রেণীর এ-যাবৎকালের রাজনীতিক ভূমিকা সযত্নে যেমন সিদ্ধান্ত করা দরকার, তেমনি শ্রীসেন অথবা তাঁর মত চরিত্রের ব্যক্তিত্ব দলত্যাগ করলেই অল্প দলের পক্ষে কখনই তাকে অথবা তাঁদের নিবিচারে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। কিন্তু সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত সাম্প্রতিকতম খবর: প্রথমে গণতন্ত্রী কংগ্রেস দলের নেত্রী শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী ও অতঃপর জনতা দল কংগ্রেস দলের লোকসভা ও রাজ্যসভার সভ্যদের অবাধ প্রবেশের ক্ষেত্রে তাঁদের দরজা খুলে দিলেন। দলত্যাগীদের গ্রহণ সম্পর্কে প্রাক্তন লোকসভা-নির্বাচন ঘোষণা অনুযায়ী এটা কি তাঁদের নিজেদের ও জনসাধারণের প্রতি প্রবন্ধনা নয়? একই ভাবে বর্তমান সরকারের উত্তর ভারতের মটি বিধানসভা ভাঙার ঘোষণা, প্রয়াস তথা সাক্ষ্য প্রমাণ-সাপেক্ষ। লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ভারতে কংগ্রেসের প্রায় একপক্ষীয় বিজয় যদি সরকারের ভিন্ন নীতির কারণ হয়, তবে উত্তর আর দক্ষিণ দুই ভারতের ক্ষেত্রে কি দুটি লোকসভা গঠন প্রয়োজন?

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

একজন অফিসারের দুর্নীতি

পশ্চিমবঙ্গ ডেরারী অ্যান্ড পোলটি ভেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা। যদিও এটি একটি ক্ষুদ্র সংস্থা এবং মাত্র পাঁচ বৎসর এর কর্মকাল তবু এর মধ্যেই এটি একটি দুর্নীতির আধার পরিণত হয়েছে। প্রথম দুই বৎসর এই সংস্থা লাভ করার পর বর্তমানে এর ক্ষতির পরিমাণ দিনে দিনে বাড়ছে। ১৯৭৫ সাল থেকে এই সংস্থার দুর্নীতি ও কাঞ্চুপি ব্যাপক আকার পায়। ডঃ অরুণাল আবেদিন ছিলেন এর মন্ত্রী। ডঃ আবেদিনের প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীঅনিলবরণ চক্রবর্তী দুনিয়ার ভরিউ বি, সি, এস। তিনি মন্ত্রীকে হাত করেন এবং তাঁর সান্ত্বনের বহু দিনিয়ার অফিসারকে অস্তায় ভাবে অপারসিড করে ৭৪ সালের ডিসেম্বরে এই সংস্থার সেক্রেটারী পদে যোগদান করেন। এর আগে শুভলোকের কোম্পানী সেক্রেটারী পদে কাজের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, অর্থাৎ এই সংস্থা কোম্পানী আইন, ১৯৫৬ দ্বারা চালিত তাই চক্রবর্তী মশাই অল্পদিনেই বুঝলেন তাঁর পক্ষে সেক্রেটারী পদে কাজ করার অস্ববিধা। হলও তাই। অ্যাক্টুইটেট জেনারেলের আর্ডারে তাঁর অক্ষমতা খেঁচু সংস্থার ক্ষতির প্রতি দৃষ্টি আবর্ষণ করা হল। কিন্তু চক্রবর্তী মশাই দমবার পাজ নন, স্বয়ং মন্ত্রী তাঁর পিছনে। তিনি কিছু অর্থলোভী অফিসার সহ ঘোরতর চক্রান্ত শুরু করলেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে সরাস্রে এবং তাঁর কেদারে আগুন হতে। কথায় বলে পুরুষস্ত ভাগ্যম। আবেদিন সাহেবের যাহুকাঠিতে দক্ষ ও দিনিয়ার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীআশিশ পাইন তাঁর পুরোনো পারলিক আনভার-টেইকিমস্ ডিপার্টমেন্টে ফিরে গেলেন। চক্রবর্তী মশাই বহু সাধের চেয়ারটিতে গিয়ে বসলেন। চক্রবর্তী মশাই সরকারী অফিসার, ডেপুটি সেনে এসেছেন এই সংস্থায়। সরকারী অনুমতি ছাড়াই তিনি বে-আইনী ভাবে কর্পোরেশনের টাকায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হন এবং ক্লাস করেন। পরীক্ষার বসার সময় ছুটিও নেন তিনি বে-আইনী ভাবে সরকারকে না জানিয়ে। যে সব অফিসারকে তিনি ভালো মাইনে করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন তাঁরাও আজ বুঝছেন যে সে শুড়ে বাসি। বেশ

কিছু ভালো অফিসার এই সংস্থা ছেড়ে গেছেন চক্রবর্তী মশাইয়ের উৎপাতে। আরও কয়েকজন চলে যাবার চেষ্টা করছেন। চক্রবর্তী মশাই জানেন সৎ ও দক্ষ অফিসার থাকলে তাঁর দাপট বিস্তৃত হবে, কাজে বাধা আসবে। তাই প্রায় এই সংস্থায় যে সরকারী অর্থের অপচয় ঘটেছে তার জবাব কে দেবে? ম্যানেজিং ডাইরেক্টর পদে অল্পে যে বিজ্ঞাপন হয়েছিল এবং ইন্টারভিউ হয়েছিল তা ভেঙে গেছে কেন? অনিলবাবু কি ভাবে তাঁর সান্ত্বনের দুই শত অফিসারকে ডিজিজে এই পোটে বহাল হন?

ডঃ গুপ্ত

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

শুক্রবার ২০শে এপ্রিল তারিখে ৬পূর্ণ পত্রিকার (২০শ বর্ষ ৪শ সংখ্যা) ছয় পাতায় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৪০তম অধিবেশন সংক্রান্ত যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সে প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য জানাচ্ছি।

এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে যে তিনটি সাধারণ সভা হয় তাতে প্রচণ্ড মতবিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায়। একটি সাধারণ সভায় (২-৪-৭৭ তারিখ) দ্বারা আমোদনমূলক সাহিত্যের আলোচনা চাইছিলেন তাঁদের কয়েকজনকে সংগঠন সমিতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার আগেকার সক্রিয় সদস্যদের বেনীর ভাগই পদত্যাগ করেন। সংগঠন সমিতির কার্যকরী পরিষদ এক জরুরী অধিবেশনে মিলিত হয়ে পরিস্থিতি বিচার করে সংগঠন সমিতিকে অকার্যকরী ঘোষণা করেন এবং ২১, ৩১ এপ্রিল ও ১লা মে এই সংগঠন সমিতির পক্ষে সাহিত্য সম্মেলনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমি সাধারণ সম্পাদক হিসাবে এই সিদ্ধান্ত মূল সংগঠন বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের (২০তম অধিবেশন) ৪০তম অধিবেশন সরণী কলিকাতা সাধারণ সম্পাদককে জানিয়ে দিই এবং সংগঠন সমিতির প্রচার সম্পাদক যিনি তখনও পদত্যাগ করেন নি তাঁকে জানিয়ে দিই একথা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাতে এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে।

এই অবস্থায় মূল সম্মেলন অত্যন্ত অস্ববিধায় পড়েন এবং তাঁরা এই সমস্যা সমাধানের জন্য অন্ত্যস্ত অল্প সময়ের মধ্যে খলিসানী মহাবিভাগকে এই অধিবেশনের আয়োজন করবার (সেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

একটি স্কুলের তহবিল তহরুপ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি বেলঘাটা দেশবন্ধু হাই-স্কুলের (ব্রাঞ্চ) বিপুল পরিমাণ তহবিল তহরুপের কাহিনী উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। একটি তথ্যসম্বলিত কমিটির তদন্তেই এই অর্থ আত্মসাৎয়ের ঘটনাগুলি ধরা পড়েছে। তদন্ত এখনও চলছে। তহবিল তহরুপের সম্পূর্ণ হিসাব জানা গেলে স্কুলটির অর্থক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে বহু সহস্র টাকা। স্থানীয় জনসাধারণ এবং ছাত্র শিক্ষকদের এই ঘটনাটি বিশেষ উদ্‌গীর্ণ করে তুলেছে।

এই তদন্ত ত্রেই ধরা পড়েছে গত বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্রদের কাছ থেকে পরীক্ষার খাতা রিভিউয়ের ক্ষমতা দেওয়া এবং টাকা স্থল গ্রহণ করেছিল, তার কিছুই বোর্ড অফিসে জমা পড়ে নি। গত বছরের পরীক্ষার্থীদের খাতা রিভিউয়ের কাজ প্রায় সমাপ্ত। সম্ভবতঃ রিভিউ প্রত্যাপী ছাত্রেরা আশায় আশায় দিন গুনছে। কিন্তু তারা জানতেও পারল না যে তাদের ভাগ্যকল প্রধান শিক্ষকের একান্ত অবহেলায় স্থল অফিসে ড্রয়ারের অঙ্ককারে বন্দী হয়ে রয়েছে। রিভিউ সম্পর্কে এই গাফিলতির সংবাদ এখনও পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের জানানো হয় নি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সকাল ছপুর ও বিকালে বিভিন্ন সময়ে তিনটি উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানে আংশিক

বিভাগীয় প্রশাসন

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

রেলওয়ে বোর্ডের অগ্রমোদন থাকা সত্ত্বেও কোন কোন বিভাগীয় প্রশাসন দ্বিতীয় শ্রেণীতে দুয়ের কথা প্রথম শ্রেণীর বাজীদের প্রাপ্য ন্যূনতম সুবিধা দিতেও নারাজ। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, দুয়াজার গাড়ীতে প্রথম শ্রেণীতে কণ্ডাক্টর টি, টি, ই থাকার কথা কিন্তু শিয়ালদহ ডিভিশনে ৪০ আপ দার্জিলিং মেল, ১৭ আপ জম্মু এক্সপ্রেস ১০ আপ আপার ইতিয়া এক্সপ্রেস ইত্যাদি গাড়ীগুলোতে কোন কণ্ডাক্টর টি, টি, ই থাকেনা। রেলবার স্কোয়াডের একজনকেই তাই ব্যস্ত থাকতে হয়। অথচ শিয়ালদহের জন্ত কণ্ডাক্টর টি, টি, ই রেলওয়ে বোর্ড থেকেই বরাদ্দ করা আছে কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তা কার্যকরী করেন না। বোর্ডের নির্দেশকে উপেক্ষা করেই এ কাজ করা হচ্ছে। নতুন রেলমন্ত্রীকে তাই এসব বিভাগীয় প্রশাসনিক খেঁচাচারিতা কঠোর হাতে দমন করে রেলকর্মীদের মনে বেলোয়াড়-জগত উৎসাহ ও উদ্যোগের সঞ্চার করতে হবে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

সময়ে শিক্ষকতার চাকরি গ্রহণ করেছেন। তার ফলে দিনের অধিকাংশ সময়ই তিনি ব্যয় করছেন তাঁর পার্ট-টাইম গোল্ডগারের কাজে। অভিভাবক ও ছাত্রেরা গুরুতর প্রয়োজনে স্কুলে এসেও প্রধান শিক্ষকের দেখা পায় না। সরকারী অস্থান প্রাপ্ত একটি স্কুলের বৃহত্তর অর্থ-রক্ষার জন্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কি কোথাও কেউ নেই?

বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের জয়

দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের চারজন নেতা তাদের চাকরী ফিরে পেয়েছেন। ১৯৭২ সালে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সমস্ত রীতিনীতি লঙ্ঘন করে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে কর্মচারী আন্দোলনের এই চারজন নেতৃস্থানীয় কর্মচারীকে বরখাস্ত করেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে সমস্ত কর্মচারীরা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু রাজ্য জুড়ে সম্রাটের আবহাওয়ার কালে তাদের এই আন্দোলন সাকল্য লাভ করে নি। লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই কর্মচারীরা নেতৃবৃন্দের চাকরীতে পুনর্বহালের দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ২১শে মার্চ ইউনিয়নের নির্ধারিত গোট মিটিংয়ের কর্মসূচীতে তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ নৈতিক দাবির সঙ্গে সঙ্গে সহকর্মীদের অবিলম্বে পুনর্বহালের আওতাধীন তোলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নিং বডি কর্মচারীদের দাবি মেনে নেন এবং সমস্ত বকেয়া বেতন, অধিকারগত সুবিধা সহ চাকরীর অবিস্মিত ধারা-বাহিকতা বজায় রেখে কর্মীদের পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই ঘটনায় একাবদ্ধ আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে কর্মচারীরা উৎসাহিত হন।

মেডিক্যাল ছাত্রদের

মুক্তি দাবী

মেডিক্যাল ছাত্র বন্দী মুক্তি কমিটি কলকাতার বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, ডাক্তার, শিক্ষক, নার্স, কর্মচারী এবং মেডিক্যাল পেশায় নিযুক্ত অস্বাভাবিক গণতান্ত্রিক মারুত্বের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক কারণে বন্দী ছজন মেডিক্যাল ছাত্র বন্দন সাহা (আর জি কর) ভাস্কর ব্যানার্জী (আর জি কর) কৃষ্ণ চক্রবর্তী (আর জি কর) অজুন নায়ক (শ্রীশ্রী মেডিক্যাল কলেজ) কিশোর ব্রহ্ম (শ্রীশ্রী মেডিক্যাল কলেজ) এবং শঙ্কর সরকারের (এন আর এস) অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করা হয়েছে এবং এদের মুক্তি দিয়ে সরকারের কাছে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

মতামত

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

লিখিত অহরোধ জানান। ইতিপূর্বে চন্দ্রনগর থেকে এই অধিবেশনের আয়োজন করার দায়িত্ব মেওয়া হয়েছিল, কিন্তু একবার তারিখ বদল করা সত্ত্বেও এক মাসে এ বিষয়ে কিছু করা সম্ভব হল না। দায়িত্ব পালনে এই অক্ষমতার কলঙ্ক যাতে চন্দ্রনগরের না হয়, সে কথা চিন্তা করে এবং মূল সম্মিলনের অহবিধার কথা বিবেচনা করে থলিসানী মহাবিদ্যালয় এ দায়িত্ব গ্রহণ করে। এর সঙ্গে সংযুক্ত অর্থ নৈতিক এবং অস্বাভাবিক দায়-বহন কেউ বহন করতে এগিয়ে এলেন না, কেবলমাত্র তখনই থলিসানী মহাবিদ্যালয়, তাঁদের ওপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তা পালনে সচেষ্ট হয়েছিল, কোনও ভয় বা কোভের জন্ত নয়।

থলিসানী মহাবিদ্যালয় প্রধানতঃ তার সকল সুরের কর্মীদের নিয়ে এবং চন্দ্রনগরের সং সত্ত্ববুদ্ধি সম্পন্ন নির্বোধী নাগরিকদের নিয়ে একটি অধ্যর্থনা সমিতি মনোনয়ন করে।

এঁরাই চন্দ্রনগরের সমস্ত সত্ত্ববুদ্ধি সম্পন্ন মাহুতের সাহায্যে বিভিন্ন বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সম্মিলনকে সফল করেছেন। ধারা-সম্মিলনে আন্দোলন-মূলক সাহিত্যের আলোচনা চান আমরা তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করি। আমরা তাঁদের পরিষ্কার জানাই যে এটা বহু সাহিত্য সম্মিলন এই সংগঠনের ৪০তম অধিবেশন। এই মঞ্চ ওই সম্মিলনের মঞ্চ। এখানে কি আলোচনা হবে, কারা আলোচনা করবেন সে দায়িত্ব বহু সাহিত্য সম্মিলনের অধ্যর্থনা সমিতির নয়। তবুও তাঁদের বক্তব্য যাতে মূল সম্মিলন কর্তৃক গৃহীত হয় সে বিষয়ে আমরা সচেষ্ট হব। তাঁদের বক্তব্যের প্রতি আমাদের নৈতিক সমর্থন জানাই। কিন্তু তাঁদের পছন্দমত নয় এমন দু'এক জনের নাম আমাদের অধ্যর্থনা সমিতিতে থাকার তাঁরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতায় অস্বীকৃত হন এবং অপ্র-পচাবে প্রতী হন।

সম্মিলনের সমস্ত অধিবেশন সর্ব-সাধারণের জন্ত উন্মুক্ত ছিল, যে কেউ এতে অংশ গ্রহণ করতে পারতেন। এর

সঙ্গে তাঁরা দেওয়া বা না দেওয়ার কোন সম্পর্ক ছিল না। অধ্যর্থনা সমিতিতে প্রধানতঃ আর্থিক দিক দিয়ে সহায়তা করার জন্ত অধ্যর্থনা সমিতির সদস্য সংগৃহীত হয়েছিল।

বীরেন্দ্রনাথ দত্ত

অধ্যক্ষ, থলিসানী মহাবিদ্যালয়

এঁরা সং ব্যক্তি

সম্প্রতি আপনার পত্রিকায় ইষ্টার্ন কোলকাতা সম্পর্কে কিছু ত্রুটিটির অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। এ অভিযোগে কতিপয় ভাবপ্রাপ্ত কর্ম-চারীর নামও উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জীভি, সি মিশ্র (সেলস অফিসার এরিয়া ৯) নাম উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু উনি এরিয়া ৩-এর সেলস অফিসার। ইনি এবং জীএ, এন, সিং (সাব এরিয়া ম্যানেজার, সাতগ্রাম গ্রুপ) ও জীভি, এম, চোপড়া (এরিয়া ফিন্যান্স ম্যানেজার, এরিয়া ৩) ত্রুটিটির সঙ্গে যুক্ত একথা ঠিক নয়। এঁরা সং ব্যক্তি বলে সকলে জানেন। এইরূপ সং ব্যক্তিদের মিথ্যা অপবাদে কলঙ্কিত করা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

জনৈক পাঠক

একজন বাবু বগি করিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার বাটী কলিকাতা হইতে কিছু দূর। গাড়িখানি মন্ডর গতিতে অতি ধীরে ধীরে যাইতেছে। ঘোড়াটি টেকচাঁদ ঠাকুরের পত্নীরাজ বংশ বেতো ঘোড়ার বাবা। সমাপস চাবুক পড়িলেও চাল বিগড়ায় না। বাবু পশ্চিমধ্যে নিজ গ্রামস্থ কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কহিলেন, 'শিরোমনি মহাশয়। আমার গাড়িতে আসুন'। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, 'বাবু! আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, শীঘ্র বাটী যাইতে হইবে'।

(রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল একাল' থেকে)

কলকাতা/রাজনারায়ণের কলমে



রাজনারায়ণ বসুর কলমে যে-কলকাতার ছবি, সেটা গত শতকের গোড়ার। কিন্তু আজকের এই দ্রুতগামিতার যুগেও কলকাতার বহুমানুষের মনের কথাটা যেন সেকালের শিরোমনি মশায়ের মতই। শীঘ্র বাটী যাইতে হইবে, অতএব হাঁটাই শ্রের। এই মনোভাবের কারণ কি? কারণ একটাই। যানবাহনের গতিহীনতা। কলকাতা শহরে জনতা বেড়েছে। জনপদ বেড়েছে। জনপথ বাড়ে নি। বাড়ন্ত জনসংখ্যার তুলনায় পথ-ঘাট সংকীর্ণ। তাই প্রতি মুহূর্তেই যানবাহনের গতি মন্ডর দ্রুতগামী যানও যেন বেতো ঘোড়ার বাবা।

এই সংকটের একমাত্র সমাধান ডুগড রেল তারই প্রস্তুতিপর্ব চলছে। কলকাতার মানুষ এগিয়ে দিয়েছে সহযোগিতার হাত। আমরা এগিয়ে দিয়েছি শ্রমের মূর্তি। এই দুয়ের যোগফলে গড়ে উঠবে নতুন কলকাতা। গতি এবং প্রগতির।



কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ডুগড রেল মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

ডি ডি সির জৈনিক ভাগ্যবানের কথা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ডি, ডি, সির কোন কোন কর্তা-ব্যক্তির পেটোরা হলে চাকরী ছেড়ে দিয়েও অনারাসে পুনর্বহাল হওয়া যায় চাকরীতে ছেদ না ঘটিয়ে এবং পুরনো স্বযোগ সুবিধা সহ। বর্তমান অপরিস্কেটিং ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবি, ভট্টাচার্য ডি, ডি, সির চাকরীতে ইন্তাকা দিয়ে বোকারো কারখানার যোগদান করেন এবং ৩০, ১১, ৬৮ তারিখে তাঁর পদ-ভ্যাগপত্র গ্রহীত হয়। কিন্তু শ্রীভট্টাচার্য ভাগ্যবান, তাঁর পদভ্যাগপত্র বহলে ডি, ডি, সি, অস্বাভাবিকভাবে তাঁকে তিন বছরের ছুটি (লিয়েন) মঞ্জুর করে বোকারো কারখানার কাজের অন্ত।

তিন বছর পরে শ্রীভট্টাচার্যকে কাজে যোগ দিতে বলা হয়, কারণ ৩০, ১১, ৭১ তারিখে তাঁর ছুটি শেষ হয়ে যাবার কথা। ২৫, ১১, ৭১ তারিখে তিনি আরও কিছু সময় ছুটি চান। ৩০, ১১, ৭১ তারিখে তাঁর ছুটি শেষ হয়ে যাওয়ার পরও যেহেতু তিনি ডি, ডি, সিতে প্রত্যাবর্তন করেন নি সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ডি, ডি, সিতে শ্রীভট্টাচার্যের কর্মকাল শেষ হয়ে

যায় এবং তাঁর প্রভিডেন্ট কাণ্ড বোকারো ইম্পাত কারখানার স্থানান্তরিত হয়। অর্থাৎ কিছুদিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে ডি, ডি, সির সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

কিন্তু ১৯৭৫ সালে শ্রীভট্টাচার্য আবার ডি, ডি, সিতে, ফিরে আসেন এবং দেখা যায় তাঁর চাকরীতে কোন ছেদও পড়ে না। ১৯৭৪ সালে যখন ছয়জন অপরিস্কেটিং ইঞ্জিনিয়ারের পদ খালি হয় তখন রহস্যজনকভাবে শ্রীভট্টাচার্যের নাম ভেঙ্গে ওঠে। তাঁর ডি, ডি, সি থেকে যে ছুটি শেষ হয়েছিল ৩০, ১১, ৭১ তারিখে তাকে আরও তিন বছর অর্থাৎ ৩১, ১২, ৭৪ তারিখ পর্যন্ত বাড়ানো হয় এবং

মসজিদ নির্মাণে

বাধা দান

হুগলী রেলার শ্রীরামপুরের কাছে দ্বিতীয় অঞ্চলের পাঁচলখীতে একটি মসজিদ তৈরী হচ্ছিল মুসলমানদের নিজস্ব জায়গায়। মসজিদ নির্মাণ পর্যন্ত গাঁধার পর বিবহার একদল যুব কংগ্রেসী হামলা করে মসজিদ তৈরী বন্ধ রাখতে বাধ্য করেছে। কেউ কেউ বে-আইনীভাবে চাঁদা ও টাকা দাবী করছে, মতে মসজিদ তৈরীতে ভোর বাধা দেওয়ার হুমকী।

শান্তিরক্ষার স্থানীয় দলঘর মুসলমান থানায় যোগাযোগ করেও ফল পান নি। হুমকী চলছে।

বিভাগীয় প্রমোশন কমিটি ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তাঁর কাজের রেকর্ডের ভিত্তিতে তাকে এস ই (ডিভাইন) পদে প্রমোশনের সুপারিশ করে। বোকারোতে ১৯৬১ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত তাঁর কাজের কোন রেকর্ড আনানো হয় না যদিও ডি, ডি, সির, সার্ভিস রেকর্ডেশনে আছে যে বিভাগীয় প্রমোশন কমিটি অধুনাতন কাজের রেকর্ড দেখবে।

শ্রীভট্টাচার্যের ছুটি ৩১, ৩, ৭৫ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এবং আবার ৩০, ৬, ৭৫ তারিখ পর্যন্ত। তারপর সমস্ত নিয়ম কারুন জালাঞ্জলি দিয়ে ২৫, ৬, ৭৫ তারিখে তাঁকে ডি, ডি, সিতে এস, ই, (প্র্যানিং) পদে যোগ দিতে দেওয়া হল। অথচ এই পদে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা নেই এবং তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন এস, ই (ডিভাইন) পদে। কেন এই নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব?

দমকল কর্মীদের দাবী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

১১ই মে এক সাংবাদিক বৈঠকে ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশ্রীমোহন মণিগ্রাম তাদের নানা দাবী এবং অভিযোগের কথা তুলে বলেন। তিনি বলেন বাহাত্তর সালে এবং পঁচাত্তর সালে বেশ কিছু সংখ্যক কর্মীকে ভোর করে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয় ও বরখাস্ত করা হয়। তিনি এদের পুনর্বহাল দাবী করেন। অবসর গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে ইউনিয়নের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক রামেশ্বর ব্যানার্জী এবং প্রাক্তন সভাপতি নারায়ণ সাহা আছেন। শ্রীমোহনদাবার বলেন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা যেখানে সারা বিশ্বে শ্রমিকদের জন্য আটবন্টা ডিউটির পরিষর্ভে ছয় ঘণ্টা ডিউটির সুপারিশ করছে, সেখানে তারা একটি বাধীন ও সভ্য দেশের নাগরিক হয়েও দৈনিক ১২ ঘণ্টা ডিউটি করছেন। তারা আট

ঘণ্টা ডিউটি চালু করার দাবী জানান। তিনি একটি গুরুতর অভিযোগ তোলেন যে কার্যত অবস্থার আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন কর্মচারীরা কোন বেতন পান না। এই সমস্ত নানা দাবীর সঙ্গে তিনি দমকলের বহুদিনের স্বীকৃত ধোলাইভাতা, কুকিভাতা, পুলিশের অহরূপ রেশন, সপ্তাহে দেড়দিন ছুটি (বর্তমানে দমকলকর্মীরা দশদিন কাজ করে একদিন ছুটি পান) ক্রীনারদের স্থায়ী চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী রূপে গণ্য করা ইত্যাদি দাবী তোলেন। তিনি আরো বলেন দমকল বিভাগে অনেক ঘর্নাতি চলছে। যেমন একজনকে ডিউয়ে আরেকজনকে প্রমোশন দেওয়া হয়ে থাকে। এব্যাপারে তিনি নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করেন। এইসব দাবীর সমর্থনে ১৮ই এপ্রিল তাঁরা রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দেন।

কয়লা খনিতে নতুন ব্যবস্থা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এতদিন পর্যন্ত কয়লাখনির মধ্যে কর্মরত শ্রমিকদেরকে খনির উপরে কোন বার্তা পাঠাতে হলে অথবা উপর থেকে কোন মিনিস আনতে হলে নিজেদের উঠে আসতে হতো। এরফলে সময় নষ্ট ও উৎপাদনের ক্ষতি হতো। বিজ্ঞানের কল্যাণে কিন্তু উৎপাদনের অস্ত্র ক্ষেত্রের মত আজ এবিষয়ে খনি শ্রমিকরাও উপকৃত হলেন, খনি চূর্ণটনার মোকাবিলা এবার তারা অনেকাংশেই করতে পারবেন।

সেন্ট্রাল মাইনিং রিসার্চ-এর দেওয়া কারিগরী নকশার ভিত্তিতে কলকাতার ওয়েস্টিং হাউস স্যাক্সবি কার্খার তৈরী করেছেন কেন্দ্রীয় বাতা প্রেরণ ব্যবস্থার একটা পদ্ধতি যার ফলে খনির মধ্যে কর্মরত শ্রমিকদের সঙ্গে খনিমুখের কর্মচারীদের যোগাযোগ সহজেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই হবে, টেলিফোনের মত কাজ করবে।

বড় বড় খনিগুলোর অনেক রকম

সকট দেখা দেয় যেখানে নিয়ন্ত্রণ ও পারস্পরিক সমন্বয় করাটা কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই পদ্ধতি চালু করার সব থেকে বড় সুবিধে হল এই যে একনজরে খনির সমগ্র কার্যব্যবস্থা উপর থেকেই নজরে পড়বে এবং সহজে সমস্তার, সমাধানে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে যার ফলে উৎপাদনের অন্তরায়গুলো দূর হবে।

গত ১২ই মে অণ্ডলের নিকটস্থ মররা কোলিয়ারীতে এই পদ্ধতি উদ্বোধন করেন ইষ্টান কোল ফিল্ডস-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীমামজী বার্মা। উদ্বোধন অর্হুতানে উপস্থিত ছিলেন স্যাক্সবি কার্খার-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীপি. সি. সেন, সেন্ট্রাল মাইনিং রিসার্চ-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীবাগচি সহ অস্ত্রা পদস্থ অফিসারগণ। সাংবাদিকদের ঐ পদ্ধতির কার্যব্যবস্থা দেখানো হয়। ভারতে সম্ভবতঃ এই প্রথম এ ধরনের ব্যবস্থা চালু হল।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পর স্বতন্ত্র হওয়া চকিত দেবীবাঁহু ও অস্ত্রাভদের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন—না খামালে আজ আর রেহাই ছিল না। বিধব স্বতন্ত্র হওয়া এর পর যবে গিয়ে প্রবেশ করেন। তারপর আবার বৈঠক শুরু হয়। কিন্তু উত্তেজনা প্রশমিত হয় না। সন্ধ্যা নাগাদ বৈঠকে নদীয়া জেলার নীলকমলবাবুকে মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে গুণ্ডগোল ওঠে। প্রিয়বাবু নীলকমলবাবুকে মনোনয়ন দিতে রাজী নন। আনন্দবাবু তাঁর উণ্টো। ব্যস কথার কথার প্রিয়-আনন্দে তুমুল ঝুঁক হয়ে যায়। আনন্দবাবু মুখ ফসকে বলে বলেন জানা আছে কংগ্রেস অধিবেশনের টাকা কে মেবেছে।

অগ্নিতে ঘুতাইতি। প্রিয়বাবু বলেন, কি এতবড় কথা। জুতো খুলে প্রিয়বাবু সেটা আনন্দবাবুর দিকে ছুঁড়ে মারেন। সেটা আবার দেবী-বাবুর কাছাকাছি গিয়ে পড়ে। আবার হৈ চৈ। গুণ্ডগোল। এবই মধ্যে স্বতন্ত্রবাবু পূর্ববী মুখার্জি জয়নাথ আবেদিন সমেত অস্ত্রা করেকজন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।

প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে কংগ্রেসী কোঁদলের এখানেই শেষ নয়। ১৭ই মে মজলবার স্বকালে অশোক দেব প্রমুখ প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তর আক্রমণ করে বসে। দপ্তর এগারোটা নাগাদ কংগ্রেসের নিজস্ব ভৈরব বাহিনীর হাতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মৈত্র, হুসুল ইসলাম ও মহিলা কংগ্রেস অফিসের ঘর আক্রান্ত হয়। ফলে টেলিফোন, নেমপ্লেট, দরজা জানলার প্রচুর ক্ষতি হয়।

‘গ্রুপ থিয়েটার নতুন ঝাঁক নিচ্ছে’

ফোকাল
প্রযোজিত

মাঝপথে

নাটক / প্রয়োগ : নিমাই ঘোষ
২৬শে মে, সাতটায়, একাডেমিতে
৭ দিন আগে হলে টিকিট

পড়ুন

পড়ুন

রায় মন্ডিসভার পাঁচ বছর

সিদ্ধার্থ রায় মন্ডিসভার পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? সেই রিক্ততা, হতাশা প্রতিহিংসা আর আত্মকলঙ্কের ঘৃণা কাহিনী—কলংকিত ইতিহাস নিয়ে পড়ুন, সকলকে পড়ান।

অসংখ্য ছবি, স্কেচ আর কাঁচুমে সজ্জিত হয়ে এ মাসেই প্রকাশিত হবে।

লিখছেন:—

ভারত সরকারের প্রাক্তন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডঃ অশোক মিত্র, কবি-সাংবাদিক সমর সেন, আনন্দবাবুয়ের দ্বিতীয় প্রতিমিথি বণিত্যরায়, নট-নাট্যকার উৎপল দত্ত, ‘মারুতি নাগরওয়ালা কেলেকারী’-র রচয়িতা সাংবাদিক অমীর চক্রবর্তী, সত্যযুগ সম্পাদক জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলকান্ত দাশ, বসন্তকর গুপ্ত।

সম্পাদনা : বাধীন রায়

দাম—তিন টাকা মাত্র

পরিবেশক : গ্যাশনাল বুক এজেন্সি

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলি-৭০০০৭৩

নাচন রোড, বেনার্সিটি, দুর্গাপুর—১০

এজেন্টদের জন্য ২৫% কমিশন। অগ্রিম মূল্য দিয়ে গ্যাশনাল বুক এজেন্সিতে এখনই অর্ডার বুক করুন।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী গোস, ১২০১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ বট লেন কলিকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত।

স্পীকার ও তার সাক্ষেদ নৃপেনের মেয়ে ফুসলান ও ব্যভিচারের কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্য বিধানসভার স্পীকার অপরূপ মজুমদার ও তার অন্ততম সাক্ষেদ নৃপেন মজুমদার সম্পর্কে মদ্র মেয়েছেলে সংক্রান্ত কয়েকটি চাকলা-কর অভিযোগ বেশ কিছুদিন আগে পুলিশদপ্তরের তৎকালীন রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ মোতাসের হোসেন, ইনসপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, সুপারিটেনডেন্ট অব পুলিশ (হাওড়া) সার্কেল ইনসপেক্টর (বালিধানা) অফিসার ইনচার্জ (মিলুয়া বালি) প্রমুখের কাছে লিখিতভাবে পেশ করা হয়। এমনকি সংশ্লিষ্ট দুজনের বিরুদ্ধে মরাত্মক অভিযোগগুলি মুখ্যমন্ত্রীর গোচরেও আনা হয়। চাকরীর লোভ ও সিনেমার নামিয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েদের সর্বনাশ করার ব্যাপারে স্পীকারের সি. এ বলে পরিচিত নৃপেনবাবু সম্পর্কে যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তা এককথায় বলা যায় ভয়ঙ্কর ও পৈশাচিক।

মুখ্যমন্ত্রীর অজান্তেই অপরূপ ও নৃপেনবাবু সম্পর্কে অভিযোগটি পেশ করেন অপরূপবাবুই প্রাক্তন কনকিডেনসিয়াল এ্যাসিস্টেন্ট মীর রশিদ আমেদ। আমেদ দীর্ঘদিন অপরূপবাবুর সি. এ. হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু পরে ইনি এই পদে ইত্বকা দেন। ওরই ভাবায় "কতকগুলি অজ্ঞান অবিচার, ও ব্যভিচারের ঘটনা স্পীকার মহাশয়কে জানাই কিন্তু তিনি নিজেই জড়িত ছিলেন বলে কোনরূপ প্রতিকার না করাতে আমি তাদের সংগে কোনরূপ সম্পর্ক রাখিনি। আমেদ সাহেবের দীর্ঘ অভিযোগ পত্র উল্লেখ করার আগে দর্পণের পাঠককে নৃপেনবাবু সম্পর্কে কিছু পরিচয় দেয়া প্রয়োজন। কিছুকাল আগে এই নৃপেন

(শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

প্রফুল্ল সেন ১৯৭৭ সালেও বিশ্বাসঘাতক!

প্রফুল্ল সেন

প্রফুল্ল সেন সাতাত্তরক বিশ্বাসঘাতক। তাই দেখি বিগত লোকসভার নির্বাচনে সি. পি. এম.-এর ঘাড়ের চেপে পনেরটা কেন্দ্রে উৎরে গিয়ে এখন ভাবছেন তাঁরা একাই সব থাকেন। তাঁর লোভের মিথ্যা এতই বড় হয়ে গিয়েছে যে সি. পি. এম.-এর প্রতি সামান্য কৃতজ্ঞতাটুকুও তিনি দেখাতে পারলেন না। মনে পড়ছে লোকসভার নির্বাচনের আগে তাঁর একটি উক্তি। "সি. পি. এম. চাইলে আমি আরামবাগে বাঁড়াব।" ছেহটি

থেকে সাতাত্তরক এই এগারো বছরে একটা মানুষের জীবনে কত পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু প্রফুল্লবাবুর চিন্তাধারায় কিম্বা পরিবর্তন ঘটে নি। তিনি হয়ত ছেহটির জন বিবেকের এবং সাতাত্তরক পরাজয়ের কথা ভুলে গেছেন। জনতার সঙ্গে বেইয়াসি করলে তার জীবনে আবার সেই দিন কিরে আসবে। সেবার বয়স কম ছিল, এবার এক বৃদ্ধ বয়সে হয়ত থকল আর সামলাতে পারবেন না। তার "কৃষ্ণনগর ডুবুড়ু, নদে ভেসে যায় রে"র কাহিনী

দর্পণের বিশেষ সংখ্যা

বিধানসভার নির্বাচন উপলক্ষে দর্পণের আগামী সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হচ্ছে। এতে থাকবে নির্বাচনী সমীক্ষা, সিদ্ধার্থ সরকারের অকৃতি ও চুক্তি সম্পর্কে তথ্য, যুক্ত ফ্রন্ট শাসনে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা, সংবাদ কাটুন প্রভৃতি। তাছাড়া এই সংখ্যার সঙ্গে থাকবে পুস্তকাকারে একটি কোড়পত্র যাতে পাশাপাশি দেওয়া হবে ১৯৭১ ও

১৯৭২ সালের নির্বাচনের ফলাফল এবং ১৯৭৭ সালের প্রার্থীদের তালিকা। ৭১ ও ৭২ সালের তালিকা তুলনা করে দেখলেই পাঠকরা বুঝতে পারবেন কি বিরাট আকারে ৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে রিগিং করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে ৬৯ সালে বামপন্থী ফ্রন্ট কোন জেলার কত আসন পেয়েছিল তাও থাকবে। এই সংখ্যার দাম দু টাকা।

কে এই ডি এন লাহিড়ী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এই ব্যক্তি কে? শ্রীদীপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ওরফে মিঃ ডি এন লাহিড়ী যিনি জনতা পার্টির রাজ্য নির্বাচনী কমিটির সেক্রেটারী? অনেকের মনেই এই প্রশ্ন। কেননা এর আগে কখনও লাহিড়ী সাহেবের নাম শোনা যায়নি। অথচ নির্বাচনী সমঝোতার ব্যাপারে তিনি বামপন্থী জোটের সঙ্গে যেভাবে কথা বলেছেন তাতে মনে হয় জনতা পার্টিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁর আচরণে মনে হয় তিনি যেন এই রাজ্যের প্রথম সারির একজন নেতা। হায় পশ্চিমবঙ্গ! হায় জনতা!

আনা গেল শ্রীলাহিড়ী এককালে ফেডারেশন অব এসোসিয়েশন অব রূপ ইনডাস্ট্রিয় বা ক্যানী নামে পরিচিত, তার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৬৮ সালে এই ক্যানীর সহ সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তিনি ভোট যুদ্ধে ছেড়ে যান। এরপর তার ক্যানীর সঙ্গে কতটুকু সম্পর্ক আছে জানা নেই। শোনা যায় ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন তিনি শ্রীমামানন্দ দাস নামক প্রাক্তন এম-পিকে ইলেকশনে সাহায্য করেছিলেন। এবং এই শ্রীদাস নাকি আমাদের মাননীয় বাবু জগজীবন রামের নিকট (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

জনতা আন্দোলন বহরমপুর

স্পেশাল জেলে ভয়াবহ অবস্থা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বহরমপুর স্পেশাল জেলে কেবল-মাত্র নকশালপন্থী বন্দীদেরকেই রাখা হয়। নকশাল জেল নামে পরিচিত এই জেলটিতে গুরু থেকেই রাজনৈতিক বন্দীদের উপর বীভৎস অত্যাচার চালানো হয়েছে। কিন্তু বর্তমান জনতা সরকারের প্রশংসামুখর দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর প্রচারের কল্যাণে মনে হতে পারে যে, সেই অত্যাচারের দিন বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। না, তা হয় নি, এখনো চলছে অত্যাচার।

গত পাঁচ বছর ধরে প্রায় সমস্ত বন্দীদেরকেই চরিত্র বর্জিত লোক আশ করে রাখা হচ্ছে। আলোর প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘরগুলোতে তিন তিন করে শুকিয়ে বাজে তারা জীবনগুলো। আর চিকিৎসা? সে তো একটা প্রশ্ন মাত্র। বাছাই করা কিছু দাওয়াই গেলানো, তা সে যে রোগই হোক না কেন। মাঝখান থেকে ফুলে কেঁপে উঠছেন ভক্তার মহাশয়।

সেলগুলোর অবস্থা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কোনওরকম বারান্দা বিহীন, পারদার খোপের মত এই ঘরগুলোর বছর পর বছর থাকতে হচ্ছে। এও যথেষ্ট নয়। এর উপর রয়েছে কর্তৃপক্ষ, ওয়ার্ডারদের অমানুষিক ব্যবহার। এরা বন্দীদের মানুষ বলেই মনে করেন না। কয়েকদিন আগে অনেক বন্দী রাতে খাবার দু মুঠো চিড়ে ভেজাবার অল্প একটু জল আরতে চেয়েছিল। একারণেই তাকে করা হয়েছে নিদ্রা প্রহার। এই ঘটনার কয়েকদিন আগে, জনৈক বামজীবন দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীকে জেলার নিজের অফিসে ডেকে এনে যেতে মাথা কাটিয়ে দেন। অপরাধ? অপরাধ (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

বিংশ বর্ষ ॥ ১৮শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৭শে মে, '৭৭ ॥ ৪০ পঃ

ইন্দিরা-সিদ্ধার্থের রাজত্বে

পুলিশ ছিল সর্বেসব

আদালতের রায়ও মানেনি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত ২৯শে এপ্রিল যুগান্তরে "মারার হয়ে মীনাক্ষি সেন জেনানা কাটক ছাড়তে নারাজ"—এই শিরোনামের সঙ্গে সংবাদ বেরিয়েছে ষেরাচারী শাসন সম্পর্কে অজ্ঞতাবশতঃ তা স্রাস্তিযুক্ত। ৭০—৭৭ এ ষারা বন্দী হয়েছেন তাঁরা জানেন জামিন চাইলেই জামিন পাওয়া যায় না আর কাগজে কলমে জামিন পেলেও মুক্ত হওয়া যায় না পুলিশের অসহমোদন না থাকলে। "রি-এয়ারেট" এই শব্দটা শুধুতে যতই সামান্য হোক এর তাৎপর্য অনেক গভীর। এই শব্দটা অক্ষর হয়ে এস. বি. ডি. ডি. র পুলিশের কাছে লুকিয়ে থাকে, আদালত প্রাক্ষে অথবা জেলের বন্ধ দরজার ঠিক বাইরে। আদালতের রায়ে মুক্তির রোয়ানা নিয়ে বন্দীরা যেই মাজ মুক্তির ঠিক চোকাঠটার পা দেন তখনই ঐ অক্ষরগুলো শব্দ হয়ে আবার তাঁকে নিয়ে ঢোকে অজ্ঞকার পুলিশ কাঠিতে। অত্যাচারের দাগ আর নতুন কয়েকটা কেস উপহার নিয়ে সে কিরে আসে জেলখানায়।

"আমরা যা বলি শোন, নইলে বাইরের আলো আর কোনোদিন দেখতেপাবিনা।"—পুলিশের হাতে ৭০—৭৭ সালে ষারা পড়েছেন তাঁরা জানেন জামিন মিথ্যা, আদালত মিথ্যা, সত্য শুধু পুলিশ। ইচ্ছে করলেই তারা হত্যা করতে পারে, ইচ্ছে করলে ছেড়ে দিতেও পারে। আমাদের দেশে তারা অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তাই পুলিশের হাতে পড়ার সঙ্গে

প্রফুল্ল সেন সাতাত্তরক বিশ্বাসঘাতক। তাই দেখি বিগত লোকসভার নির্বাচনে সি. পি. এম.-এর ঘাড়ের চেপে পনেরটা কেন্দ্রে উৎরে গিয়ে এখন ভাবছেন তাঁরা একাই সব থাকেন। তাঁর লোভের মিথ্যা এতই বড় হয়ে গিয়েছে যে সি. পি. এম.-এর প্রতি সামান্য কৃতজ্ঞতাটুকুও তিনি দেখাতে পারলেন না। মনে পড়ছে লোকসভার নির্বাচনের আগে তাঁর একটি উক্তি। "সি. পি. এম. চাইলে আমি আরামবাগে বাঁড়াব।" ছেহটি

এন টি সিতে পেটোয়া পোষণ ও দুর্নীতি

মিলগুলি রুগ্নতর হচ্ছে : কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জাতীয় টেক্সটাইল কর্পোরেশনের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার চেয়ারম্যান ত্রিচিত্ত-রঞ্জন গুহস্বর্নমদারের পেটোয়া পোষণের একটি তালিকা তুলে দিচ্ছি—(১) এস কে বর্ধন রায়, অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মী, পেয়েছেন ৩ এস ডি-র পদ, বেতন ৫০০ টাকা, নিয়োগ ৬ই জুলাই, ৭৬; (২) এন জি ব্যানার্জী, ছিলেন সিনিয়র স্টেনোগ্রাফার, বেতন ছিল ৪২৫-৮০০ টাকা, উন্নত হয়েছেন এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের পদে, বর্তমান বেতন ৭০০-১৩০০ টাকা, নিয়োগ ২রা ফেব্রুয়ারী '৭৬; (৩) কে ভৌমিক ও পি, গুপ্তা, ছিলেন সিনিয়র ইনভেস্টিগেটর, বেতন ছিল ৪২৫-৮০০ টাকা; উন্নীত হয়েছেন এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) পদে, বর্তমান বেতন ৭০০-১৩০০ টাকা, নিয়োগ ২১শে ফেব্রুয়ারী, '৭৬; (৪) এন কর ছিলেন চুঁচুড়ার ডি এম অফিসে সিনিয়র স্টাক অফিসার, পেয়েছেন এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের পদ (ডেপুটেশনে আছেন) বর্তমান বেতন ৭০০-১৩০০ টাকা, নিয়োগ ১৮ই মার্চ '৭৬; (৫) এম এল চ্যাটার্জী, ছিলেন রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের আপার ডিভিশন ক্লার্ক, পেয়েছেন এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের পদ (পারচেজ), বেতন ৭০০-১৩০০ টাকা, ২রা এপ্রিল '৭৬; (৬) এস এন মুখার্জী, ছিলেন সিনিয়র এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, বেতন ছিল ১১০০-১৬০০ টাকা; হয়েছেন ম্যানেজার (প্রশাসন) বর্তমান বেতন ১৩০০-১৭০০ টাকা; নিয়োগ ২৩শে এপ্রিল '৭৬; (৭) এস এন সরকার ও এক কে ব্যানার্জী, ছিলেন হোলসেল কন জি উ মা র কো-অপারেটিভের কেরানী, হয়েছেন ইন্সপেক্টর; বেতন ৩৩০-৫৬০ টাকা নিয়োগ ২৭শে এপ্রিল '৭৬; (৮) এস সেনগুপ্ত, ছিলেন সিনিয়র ইনভেস্টিগেটর (টেকনিক্যাল) হয়েছেন এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, বেতন ৭০০-১৩০০ টাকা নিয়োগ ১১শে মে ৭৬; (৯) এ, কে, চক্রবর্তী, ছিলেন দুর্গাপুর ইন্সপেক্টর কলকাতা শাখার এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার; হয়েছেন ডেপুটি ম্যানেজার (সেলস) বেতন ১১০০-১৬০০ টাকা নিয়োগ ৪টা জুন, (১০) অসিত-কুমার দত্ত, ছিলেন বিষ্ণুপুর সাব ডিভিশন অফিসে ল' রিকম অফিসার পেয়েছেন এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের (রিটেল সেল) পদ, বেতন ৭০০-১৩০০ টাকা, নিয়োগ ৫ই জুলাই '৭৬; (১১) এইচ এন ভট্টাচার্য ছিলেন

এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, (বি এল সি এম) হয়েছেন এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, বেতন ৭০০-১৩০০ টাকা, নিয়োগ ৩১শে জুলাই '৭৬; (১২) স্বপনকুমার ঘোষ, সরাসরি নিয়োগ, পারচেজ অফিসার; বেতন ৭০০-১৩০০ নিয়োগ ২রা আগস্ট '৭৬; (১৩) বিবেক বোস, ছিলেন দুর্গাপুর ইন্সপেক্টর পারচেজ অফিসার, হয়েছেন ডেপুটি ম্যানেজার (পারচেজ) বেতন ১১০০-১৬০০ টাকা, নিয়োগ ১৮শে আগস্ট '৭৬; (১৪) তপন চ্যাটার্জী, ছিলেন দুর্গাপুর ইন্সপেক্টর ট্রাফিক এ্যাসিস্ট্যান্ট, এখানে ওয়েলফেয়ার এ্যাসিস্ট্যান্ট, বেতন ৫৫০-৯০০ টাকা, নিয়োগ ১২শে আগস্ট '৭৬, (১৫) জি, সি, মুখার্জী, ছিলেন দুর্গাপুর ইন্সপেক্টর ট্রাফিক অফিসার, বর্তমানে মেনারেল ম্যানেজার (বি এক সি এম) বেতন ১৫০০-২০০০ টাকা, নিয়োগ ৩১শে আগস্ট '৭৬; (১৬) টি, সি, চ্যাটার্জী অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার, হয়েছেন ও, এস, ডি (ডিভিল্যান্স) বেতন ১০০০ টাকা, নিয়োগ ২২শে ডিসেম্বর '৭৬ (১৭) এ, এল, মুখার্জী, ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলের প্রাক্তন অফিসার, বর্তমানে ও এস ডি, বেতন ৫০০ টাকা নিয়োগ ১লা নভেম্বর ৭৬ (১৮) পি, কে, মুখার্জী, ছিলেন এক্যাউন্টস এ্যাসিস্ট্যান্ট, হয়েছেন এক্যাউন্ট্যান্ট, বেতন ৫০০-৯০০ টাকা, নিয়োগ ১লা নভেম্বর '৭৬, (১৯) জি, গুপ্তাভিষ্মন, ছিলেন সরকারী কেরানী, পেয়েছেন ইউ, ডি, সির পদ বেতন ৩৩০-৫৬০ টাকা, নিয়োগ ৪টা নভেম্বর ৭৬; (২০) শিবসামন ঘোষ, সরাসরি নিয়োগ, সেলস অফিসার, বেতন ৫৫০-৯০০ টাকা, নিয়োগ ১৯শে মার্চ, ৭৭ (২১) শ্রীমতী গীতা ব্যানার্জী, দুর্গাপুর ইন্সপেক্টর কর্মী, বর্তমানে কাজ করেন সি, এম, ডিভিশনে, বেতন ৫৮০-৮০০ টাকা, নিয়োগ ২২শে মার্চ ৭৭ (২২) মোমেন ভট্টাচার্য, দুর্গাপুর ইন্সপেক্টর কর্মী, পেয়েছেন ওয়েলফেয়ার অফিসারের পদ, নিয়োগ ২রা এপ্রিল ৭৭।

এন, টি, সিকে গত দেড় বছরে চিত্তবাবু বেড়িয়ে দিয়ে গেলেন তার বড় প্রমাণ গত বছরে এই প্রতিষ্ঠানের লোকসান হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা। কেন লোকসান হল? সে এক মহা ভারত। রাজ্যের ১৪টি মিলের ১৮ হাজার কর্মীর সামনে এখন অন্ধকার। রুগ্ন মিলগুলি চিত্তবাবুই হাড় তিরজিয়ে

করে দিয়ে গেলেন, তার বিচার হবে না? চিত্তবাবু যাবার বেলায় জনদরবারে এন, টি, সির অগ্রগতির যে চিত্রটি তুলে ধরেছেন তা রীতিমত একটা ধাপ্পা। যেমন ধরা যাক, বিভিন্ন স্থান-কলগুলিতে স্পিণ্ডল-এর সংখ্যা হল প্রায় ৩ লক্ষ। তার মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ অকেজো অবস্থায় কলে রেখে মাত্র আড়াই লক্ষের মতো স্পিণ্ডল কাজ করেছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে এই কর্মরত স্পিণ্ডল-এর সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৬৪৭। কিন্তু চিত্তবাবু বিজ্ঞাপনের হিসেবে দেখাচ্ছেন তার অমানার এই পরিমাণ বেড়ে মাত্র ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ১১৭ দাঁড়িয়েছে। মোট ৩ লক্ষ স্পিণ্ডল, বাকীগুলি অকেজো হয়েই পড়ে রইল। অন্তরিক্তে মিলগুলিতে কর্মরত 'লুম' বা তাঁতের সংখ্যা যেখানে মাসে গড়ে ৪ হাজারের বেশী, সেখানে ১৯৭৪-৭৫ সালে এর ব্যবহার ছিল ২ হাজার ২১২ এবং চিত্তবাবুর অমানার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ১১৫। এই অগ্রগতিতেই চিত্তবাবুর গর্ব দেখে কে! আবার উৎপাদিত পণ্যের আরও নাকি বেশী হয়েছে। সেটা কি রকম? ১৯৭৪-৭৫ সালে উৎপন্ন কাগড় থেকে যেখানে মাসিক আয় ছিল ১১ লক্ষ টাকা, চিত্তবাবু তাকে বাড়িয়ে ১১৯ লক্ষ টাকা করতে পেরেছেন। কিন্তু এই হিসেবের গুণগোল ধরা পড়বে কীচামালের দরকার হিসেব নিলে। চিত্তবাবুর বিজ্ঞাপনী চিত্র বলছে, তার সময়ে তুলোর দাম বেড়েছে শতকরা ৭৫ ভাগ। তিনি বলেছেন, তা সত্ত্বেও আহুপাতিক হারে এন, টি, সির উৎপাদিত পণ্যের দাম বাড়েনি। কিন্তু সামান্য যা বেড়েছে, ১১ লক্ষ টাকা থেকে, ১১৯ লক্ষ টাকা তাতে বেড়ে যাওয়াটা কোন অগ্রগতি নয়, একথা একটি শিশুও বোঝে। তাহলে চিত্তবাবু তাঁর অমানার এন, টি, সির অধীন মিলগুলিকে আধুনিকীকরণ সম্প্রসারণের ক্ষমতা কি করলেন? পূর্বাঞ্চলের এই মিলগুলির আধুনিক রূপদানের ক্ষমতা সর্বস্বকারের বাণিজ্য মন্ত্রকের কাছ থেকে তিনি ১২ কোটি টাকা পেয়েছেন এক বছর হল। এই টাকা কি করা হল, চিত্তবাবুই তার হিসেবে দেখাচ্ছেন, বিভিন্ন মিলে

নতুন মেশিনপত্র বসানোর ক্ষমতা ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া আরও মেশিনপত্র ক্রয়ের ক্ষমতা (যার এখনও কোন ছায়া দেখা যাচ্ছে না) ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। বাকী সাড়ে তিন কোটি টাকা কোথায় গেল। যেখানে বিভিন্ন মিলের বর্তমান মেশিনগুলিকেই কাজে লাগানোর কোন চেষ্টা নেই, সেখানে কোটি কোটি টাকায় নতুন মেশিন কিনে কি লাভ হল? মিলগুলির উন্নত কর্মীদের কি কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে? এই নতুন মেশিনগুলির অধিকাংশই এখনও অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে। এই যে উৎপাদন, কর্মীদের দক্ষতা, এবং মিলগুলি সম্প্রসারণের কাজ কিছুই এগোয় নি, তার ফলে এন, টি, সির অযোগ্য চিক্ টেকনিক্যাল এডভাইজার ডঃ ইউ ভট্টাচার্যের অবদানও কম নেই। তিনি মোটেই কারিগরি বিষয়ক লোক নন; আগে ছিলেন টেক্সটাইল কমিশনার। সেক্ষেত্রে মিলগুলির উৎপাদন কি করে বাড়বে? আমেরিকা ফরেন অনৈক বিশেষজ্ঞ দীপককুমার শীলকে গত বছরের মে মাসে বসানো হয়েছিল। তাঁর পদব নাম ছিল ডেপুটি ম্যানেজার রিসার্চ এ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট। মিলগুলিতে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য তিনি নতুন করে টেলে সাক্ষাৎকার কথা বললেন। একের পর এক প্রজেক্ট রিপোর্ট দিলেন। এ হেন ব্যক্তি চিত্তবাবুর স্বার্থের পরিপন্থী বলে তাকে দিন কয়েক আগেই তার পদ থেকে হটানো হল। দেশে ১টি সাবসিডিয়ারী অধীনে যে ১০৫টি মিল রয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই তার কাজকর্মে বীভরণ পোষণ করেছে। সরকার হিসেব নিয়ে দেখেছেন সামগ্রিক হিসেবে ১৯৭৪-

৭৫ সালে যেখানে সব কটি মিলের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৬১ কোটি টাকা, ৭৫-৭৬ সালে তা নেমে ৩৬ কোটি টাকা দাঁড়িয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মোহন খাড়িয়া সরাসরি বলে দিয়েছেন, এন, টি, সিকে সরকারী অস্থান থেকে আর চমতে দেওয়া সম্ভব নয়; এই অস্থান যাতে না দিতে হয়, সেই ভাবেই এন, টি, সিকে টেলে সাক্ষাতে হবে। বলাই বাহুল্য ৭৫-৭৬ সালে এন, টি, সি, যে ৩৬ কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি বহন করেছে, তার মধ্যে বেশী টাকার দায় পূর্বাঞ্চলের। সরকার এন, টি, সির অধীন যে রাজ্যের মিলগুলি নিয়ে সবচেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন তার মধ্যে রয়েছে গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ এবং পূর্বাঞ্চল। পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে বাণিজ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে, ক্ষতির পরিমাণ ৭৪-৭৫-এর তুলনায় ৭৫-৭৬-এ কিছুটা হ্রাস পেলেও পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতি অথবা সম্পদের মোটেই সদ্যবহার হয় নি। সম্প্রতি কলকাতার ইকনমিক টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে সরকার পূর্বাঞ্চলের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিতে চলেছেন: The subsidiary (eastern region) has been asked to submit a detailed report about the state of things in the mills under its control. It is also to suggest how the "ills" could be cured. A number of representations pointing (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

স্বাস্থ্যকেন্দ্র দখলের চেষ্টা
(দর্পণের সংবাদদাতা)

হাওড়া জেলার ডোমজুড় থানার বনুহাটি অঞ্চলে গিয়াসপুর গ্রামে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল। নানা কারণে সেটি এখন বন্ধ। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাড়ী এবং নিদ্রস্থ দু'বিধা জমিও আছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিত্যক্ত বাড়ীতে যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ক্লাব তৈরী করার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং চেষ্টা ছিল জমি দখল করার। গ্রামবাসীদের যুক্ত প্রচেষ্টায় তা বন্ধ হয়েছে কিছুদিনের মধ্যে। তবে হুমকী চলছে। প্রায় বিশ বছর আগে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের কাজে নিযুক্ত ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে যায়। এখনও পুরাতন বাড়িঘর চেয়ার টেবিল রয়েছে স্থলর ভাবে শুষ্ক

দরকার স্বাস্থ্য-কেন্দ্রটি চালু করার আর সরকারী সাহায্যের। গ্রামবাসীদের আশা সি, এম, ডি, এ, টাকা দিয়ে হাসপাতালটি চালু করবে। প্রকাশ বে, পাশের গ্রামে সি, এম, ডি, এ, দুটি স্থল তৈরী করে দিয়েছে এবং সমাজহিতকর প্রতিষ্ঠানে টাকা সাহায্য করেছে। প্রি, সি, সোসাইটির সম্পাদক, কামরুদ্দীন আহমদ এবং শেখ কওসর আলী আবেদন জানিয়েছেন বেড ক্রশ বা অস্ত্র কোন প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে সংস্থাটিকে বাচান। যোগাযোগের ঠিকানা শেখ কওসর আলী, গ্রাম গয়েশপুর, ডাক বহলহাটি, ভায়া ডোমজুড়, জেলা হাওড়া।

মুন্সিপুর ইসলাম ইউ বি আই থেকে টাকা নিয়ে শোধ দেননি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

তিন বছর আগে প্রদেশ কংগ্রেসের অন্ততম সাধারণ সম্পাদক মুন্সিপুর ইসলাম ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন কিন্তু আজ পর্যন্ত সে টাকা শোধ করেন নি বলে ব্যাঙ্ক স্বত্ত্বজানা গেছে।

১৯৭৪ সালের ২৩শে মার্চ মুন্সিপুর ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের রয়েল এক্সচেঞ্জ ব্রাঞ্চ থেকে ২০ হাজার টাকা ধার নেন। চুক্তি হয় ৩৬টি সমান মাসিক

কিস্তিতে এই টাকা শোধ করা হবে। আমিন হিসেবে থাকেন প্রদেশ কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ ধীরেন বসু। মুন্সিপুর টাকাটা নেন একটি প্রেসিডেন্ট প্রিমিয়ার গাড়ী কেনার জন্য।

১৮ মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও শর্ত অনুযায়ী মুন্সিপুর টাকা না দেওয়াতে ব্যাঙ্কের হেড অফিস থেকে মুন্সিপুর নামে কিস্তির টাকা শোধ করতে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু ফল হয় না।

পরে হেড অফিসের নির্দেশে রয়েল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের সিন্ডিকেটটি অফিসারকে পাঠান হয় মুন্সিপুরের আমিনদার ধীরেন বসুর কাছে। ধীরেনবাবু ভুলেই গিয়েছিলেন যে, তিনি মুন্সিপুরের আমিনদার। তাকে মনে করিয়ে দেওয়ার পর শ্রীবসু কিস্তির টাকা ঠিক মত দেওয়ার ব্যাপারে আশ্বাস দেন। তারপর মাত্র একটি কিস্তি পাঁচশো টাকা দেওয়া হয়। তারপর আবার চুপ। আর কোন টাকা শোধ হয় না।

এখন হুদে আসলে মুন্সিপুরের কাছে ব্যাঙ্কের পাওনা ২৫, ৩১৪ টাকা ৩৬ পরশ।

মুন্সিপুর জীবীদের অধিকার অস্বীকৃত ৪ জেলা শাসক বেআইনীভাবে ৪২ মাইল জলকর লীজ দিলেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জলপূর মহাকুমার গঙ্গাপাথে ইসলামপুর জলকর ৪২ মাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। ফরাসী, বেগীবাগ্রাম, নন্দনহাট, জগতাই ও রঘুনাথগঞ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ১৫ হাজার মৎস্যজীবী পরিবার গঙ্গাপাথে এই জলকর মাছ ধরে জীবন যাপন করে। এদের অধিকাংশই উদ্বাস্তু পরিবার। জানা গিয়েছে স্বাধীনতার আগের বছর (১৯৪৬) বিদেশী শাসকরা জলকরটি কানুন তলার (খুলিয়ান) জমিদারকে ৩০ বছরের জন্য চিজ দেয়। স্বাধীনতার পর মৎস্যজীবীরা ভেবেছিলেন নিজস্ব জমিদারকে খারিজ করে দিয়ে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের অবাধ এবং স্বাধীন ভাবে মাছ ধরার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হবে। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি।

জলপূর মহাকুমা মৎস্যজীবী সমিতি কানুনতলার জমিদারের (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থবাবুর নিকট আত্মীয়) হাত থেকে জলকরটি নিয়ে মৎস্যজীবীদের মধ্যে বন্টন করার দাবি বারবার করেছে, কিন্তু সেই দাবি উপেক্ষিত হয়েছে। ১৯৭৬ সালে লিজের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মৎস্যজীবীদের মনে হয়েছিল এবার বুঝি জলকরটি জমিদারের হাত থেকে মুক্ত করে তাঁদের মধ্যে বন্টন করা হবে। কিন্তু সেই আশাও তাদের পূরণ হয় নি।

মালদার জেলাশাসক এটি পুনরায় কানুনতলার ভূতপূর্ব জমিদারের নামে ৬৪ হাজার টাকার বন্দোবস্ত করেছেন।

এবং প্রতিবাদের প্রতিবেদন মালদার জেলা শাসক থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভার অনেক সদস্যের কাছে পাঠান। জলপূরের মহাকুমা শাসকের কাছেও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কিন্তু মৎস্যজীবীদের আলোচনাকে জরুরী অবস্থার ভয় দেখিয়ে দাবিরে বাধা হয়। মৎস্যজীবী সংক্রান্ত আইনে বলা হয়েছে, (১) সরকারের হাতে কোন জলকর এলে সরকার সেই জলকর এলাকার মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিতে জানাবেন সরকার-নির্ধারিত মূল্যে সামতি জলকর নিতে ইচ্ছুক কিনা (২) মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতি না থাকলে এলাকার মৎস্যজীবীদের মধ্যে জলকর বন্টন করতে হবে এবং যদি এলাকার সমবায় সমিতি বা মৎস্যজীবী না থাকে তবেই জলকর মৎস্যজীবী ছাড়া অন্য কাউকে বন্টন করার আইনগত অধিকার থাকবে। এক্ষেত্রে এই এলাকার হাজার হাজার মৎস্যজীবী এবং সমবায় সমিতি থাকা সত্ত্বেও মালদার জেলা শাসক কার ছকসে ৭ (১২) ৭৫-৭৬ নম্বর মেমোতে ৩৫৫৭১১ ভৌজির জলকরটি কানুনতলার ভূতপূর্ব জমিদারকে বন্টন করলেন।

অবিলম্বে জলকর বন্টনের সত্য উদ্ঘাটনের জন্য এলাকার ক্ষুব্ধ মৎস্যজীবীরা দাবি তুলেছেন। তারা আরও দাবি তুলেছেন গঙ্গাপাথে ৪২ মাইল ইসলামপুর জলকরটি অবিলম্বে এলাকার মৎস্যজীবীদের মধ্যে বন্টন করা হোক।

গান শেল ফ্যাক্টরীতে কর্মী নিয়োগে যথেষ্টাচার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কান্দিপুর গান এ্যাণ্ড শেল ফ্যাক্টরীতে নতুন কর্মী নিয়োগে যথেষ্টাচার চলছে।

কারখানার কর্মী ইউনিয়ন থেকে এর এক ভয়াবহ চিঠি-তুলে ধরা হয়েছে।

রাজ্যের নিয়োগ সংস্থার (এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ) অগ্রমোদন

ছাড়াই কতৃপক্ষ ব্যাকডোর দিয়ে বেশ কিছু লোককে ভাল ভাল পদে বসিয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। আরও প্রকাশ তৈরিক প্রাক্তন মন্ত্রী রাজ্যের মন্ত্রিসভা ভাঙ্গার প্রাক্কালে কারখানার জেনারেল ম্যাজারের সঙ্গে খানাপিনার আসর বসিয়েছিলেন। সেই মজলিস থেকেই নাকি ঐ মন্ত্রীর

ভাইদের নিয়োগ পাকাপোক্ত হয়। গান এ্যাণ্ড শেলের কর্মীরা এই ঘটনায় অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। তাঁদের অভিযোগ, যে সমস্ত সং কর্মী এখানে দীর্ঘদিন কাজ করার পর অবসর গ্রহণ করেছেন তাঁদের পুত্রেরা চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল। অথচ সরকারের মাকের ডগার ওপর এমন নীতিবিরুদ্ধ কাজ হল কী করে?

মুন্সিদাবাদ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সম্পর্কে অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মুন্সিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অভিযোগ উঠেছে জেলা স্বাস্থ্যদপ্তর ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা রদবদলের ব্যাপারে ব্যাপক কারচুপি, নতুন হাসপাতাল নির্মাণে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কনট্রাক্টরদের অবৈধ লেনদেন, বহরমপুর শহরে যে সময় ইন্দিরা তনয় সঞ্জয় এসেছিল সেই সময় ছ' একজন কর্মকর্তার ইচ্ছা অনুযায়ী স্বাস্থ্য দপ্তরের সমস্ত মেলিনারিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। তাছাড়া কংগ্রেসের দলীয় সভার

ধরচাপ বহন করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, শ্রীমতীনারায়ণ সিন্ধা যার বাড়ী এই জেলার তিনি এই জেলায়ই ডিষ্ট্রিক্ট ক্যামিলি প্ল্যানিং অফিসার ছিলেন, সেখান থেকে প্রমোশন পেয়ে তিনি মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক হয়েছেন। তিনি কংগ্রেসের একজন বিশ্বস্ত সেবক, ফলে তার স্বাস্থ্য দপ্তরের সমস্ত কাজকর্ম চলত কংগ্রেসী-ইচ্ছা অনুযায়ী। সময়ে অসময়ে কংগ্রেসীরা স্বাস্থ্য দপ্তরের গাড়ী ব্যবহার করতো। তাই কংগ্রেসীদের রাজস্ব তিনি ছিলেন মুন্সিদাবাদের মুকুটহীন সম্রাট। তাছাড়াও নাসবন্দীর ক্ষেত্রে জুরা অপারেশন দেখিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তারা হাজার হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ। শ্রীমিন্দি ছিলেন প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর প্রিয়পাত্র।

মনিগ্রাম, বামেশ্বর ব্যানার্জী, নারায়ণ সাঁহা, জুলাল চক্রবর্তী, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। পরে পাঁচজনদের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করে আরকলিপি পেশ করেন। তিনি দাবীগুলি বিশেষ আগ্রহ সহকারে শোনেন এবং অবিলম্বে রাজ্যপালের সঙ্গে ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের আলোচনার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

বন্দীদের জন্য

মধু গোস্বামী

বন্দিনী বোম ভাঙতী আর হাজার ভাঙের মুক্তিপণ পালন করার জন্য শুধু আরকলিপি, সম্মেলন?

প্রতিশ্রুতির পাহাড় দেখো রাত পোহাতেই নামায় ধস, বুড়ো সাপের সলুইগুলো দুধ কলাতে মানবে বশ?

আল্গা মুঠোর বলগা ধরে ভাবছ হবে চড়াই পার, নেই প্রয়োজন বোধহয় এখন ইতিহাসের চারুকটার?

গত বুধবার বেলা তিনটের দমকলের সদর কার্যালয় থেকে প্রায় সহস্রাধিক দমকল কর্মচারী ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কাস ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে একটি গণ-ডেপুটেশন দেন। এসপ্লানেড ইষ্টে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। সেখানে একটি পথসভা হয়, সভার আরকলিপি উত্থাপন করেন শ্রীশিব-প্রসাদ ঘোষ। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশ্রামচাঁদ

আপনার অফিস

চুই মেসার্স জেলা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ঠালু কর্তৃ

কন্টেইনারাইজড

ফ্রেট সার্ভিস



পরিবহনের সুযোগ পাবেন—

কলিকাতা থেকে বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর সেকেন্ডারি ও বিজয়ওয়াড়া এবং টাটানগর ও কান্দি থেকে বোম্বাই এবং পুনে পর্যন্ত

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন

মারাকটিং এবং সেলস ডিভিসন

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

ফোন নং ২৩-৯৯৪৪, ২৩-৩৪০৩, ২৩-২১২২

রেল ও সড়ক পরিবহন সমন্বয়ে শুদাম থেকে শুদামে।

এ ব্যবস্থা শুধু এবং নিরাপদ

অথচ সুলভ

৭৩৩ মেসার্স বিজিও—

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

মানবিক তত্ত্বের আলোকে মহাত্মার তত্ত্বের স্বরূপ ও দেবতা বীরেন্দ্র মিশ্র

সমরকুশলী মহাদেব

মহাত্মার তত্ত্বের মহাদেব এক সামগ্রিক অধিকর্তা। তিনি বৃষ্টি হয়েছেন অজুনের ওপর নিত্য জাগতিক কারণে। অজুন যে স্বর্গ বা মোক্ষলাভের নন, বরং তাঁর উদ্দেশ্য অজলাভ ও যুক্তিকা, মহাদেবের প্রীতির কারণ সেটাই। বলা বাহুল্য, আমাদের আরাধ্য মহেশ্বরকে আমরা এমন যুক্তোন্মাদ সামগ্রিক অধিকর্তা রূপে কষ্টকল্পনাও করতে পারি না। আমরা ভাবতে পারি না, আরাধ্যবর্তের যে রাজ পরিবারে পাঁচটি মাত্র গ্রাম দরলের অল্প একটা জাতিযুদ্ধের সন্তাননা পরিপকতা লাভ করছে, সর্বস্বীভের রক্ষক ভগবান মহেশ্বর আসবেন সেই সামান্ততম সম্পত্তির লড়ায়ে স্তম্ভতম অংশ গ্রহণকারী হিসেবে। হিন্দুধর্ম ভগবানকে অসীম অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যুগীভূত শক্তিরূপে কল্পনা করে। তাঁর অনন্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে আমাদের এই ভূমণ্ডলই যে কত ক্ষুদ্র এক গোলোক, এখানে আমরা বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েও সেটাই সম্যক জানে উঠতে পারিনি। এমনি যখন অবস্থা তখন যদি কেউ বলেন, সেই অসীম অনন্তের একমাত্র অবশিষ্ট আকাশ থেকে উজ্জ্বল রণে চেপে ছুটে আসছেন অজুনকে সামগ্রিক নিয়োগ দান করতে, তবে সেই বাতুলকে উন্মাদ ছাড়া আর কী ভাষা বেতে পারে?

দেব প্রতিষ্ঠা এভাবে অসম্ভব বুরে বুদ্ধিমান যদি কেউ বলেন, আসলে দেবতার অংশটি প্রাকৃতিক এবং কবি কল্পনা ও অজুনকে মত্ত হিরো বানানোর জন্যই এ সব করা হয়েছিল। তাহলে আমার উত্তর, রামায়ণ মহাত্মার তত্ত্ব যুগে দেব দেবতা নিয়ে এমন দুঃসাহসিক কাব্য করার প্রকৃত অবসর ছিল কি? যখন মাহুঘের জীবনে ধর্মের প্রাধান্য জীবনচর্যার সকল দিককেই নিয়ন্ত্রণ করছে, তখন ধর্ম ও দেবতা নিয়ে বলগাহীন কল্পনা এবং সামান্ত মাহুঘের (রাজত্ববর্ণ ও সে যুগে ধর্মীয় নেতাদের তুলনার সামান্ত মাহুঘ) প্রতিষ্ঠার জন্য দেবতাকে ছোট করার প্রচণ্ড বিকোভ স্থিতি হওয়াই ছিল বরং স্বাভাবিক।

সুতরাং মহাত্মার তত্ত্ব কবিতা দেবতাদের দেবতারূপে মানতেই ও মানাতেই হবে। শুধু এই আত্মতুষ্টির জন্য একটা অসম্ভব ও উদ্ভট কল্পনাকে আর প্রাচীর দেওয়া যায় না।

ঈশ্বর সর্বকালে আমাদেরই কল্পনার স্রষ্টা। প্রাচীন প্রপিতামহগণ উন্নত জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী একদল আকাশ-চারী বৈজ্ঞানিককে নৃকৃতে না পেয়ে কেবলমাত্র বিভ্রান্তির বসে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন দেবতার আসনে। আকাশচারী নভাশ্রদের কতিপয় প্রধানকে মনে নিয়েছিলেন তাঁরা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর নিয়ন্ত্রকরূপে। সম্ভবত বুদ্ধিমান নভাশ্রগণই তাঁদের মনে এমন ভয় বিভ্রান্তি ও ভক্তির সঞ্চার করিয়েছেন নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য। সেই দেবপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যেসব পৃথিবী পুত্রেরা তথাকথিত দেবগণের সহায়ক হয়েছেন প্রভুবাতিলাষী দেবতার। তাঁদের মধ্যে বটন করেছেন কিছু বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মপাতি। প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তাঁদের ভগবৎ দর্শনকারী পরগণধর পদে।

বুদ্ধিমানরা পরগণধরদেরও জানাননি বিজ্ঞানের কোনো প্রাযুক্তিক জ্ঞান। শুধু শিথিলে দিয়েছেন কিছু ব্রহ্মপাতি ও অজ্ঞপত্র ব্যবহার করতে। বলে দিয়েছেন, সমস্ত গুলি মস্তপুত। সে মস্ত বুদ্ধিমান তথাকথিত দেবতারাই জানেন। তাই পরগণধররাও দেখেছেন পি, সি, সরকারের ম্যাজিক ও অ-বৈজ্ঞানিকের কাছে বিজ্ঞান ম্যাজিক ছাড়া আর কিছু নয়। আকাশচারী বুদ্ধিমানরাই শিথিলে গেছেন, ধর্মীকে বতদিন ম্যাজিক করে বাবা যায়, ধর্মের দাপটও ততকালই স্বাধীন; না হলেই পরগণধরের পূজা বিজ্ঞানীর পায়ে গিয়ে পড়ে। ধর্মীয় মস্তপুত্র আর কার্যকর থাকে না।

বিজ্ঞানকে সেদিন কতিপয়ের মতলব হাসিলের হাতিয়ার করা না হলে পূর্ণাঙ্গ যুগেই আমরা পেতে পারতাম বৈজ্ঞানিক কলকারখানা। মাহুঘকে অপেক্ষা করতে হ'ত না যুগ যুগ ধরে। কিন্তু দেবতার তা চান নি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে তাঁরা দ্বিতীয় কোনো ভূবনের গ্রন্থাগারে জমা করে দিতে আদৌ উৎসুক ছিলেন না। কে আর নিজের অজ্ঞ অপরের হাতে দিয়ে প্রকৃত হারাতে চায়। তবু কিছু তাঁদের দিতে হয়েছিল নিজেদেরই স্বার্থে। সেই কিছু মধ্যে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক অঙ্গই প্রধান। এ অঙ্গই আমরা দেখতে পাচ্ছি, মহাদেব যেকালে অজুনকে তেজোজ্বল অঙ্গ দান করে যাচ্ছেন, সেকালে ভারতের সভ্যতা মুখ্যত কৃষিভিত্তিক। বৈজ্ঞানিক উন্নতির কোনো ধবংই নেই, অথচ বিমানের কথা আছে। মনে রাখতে হবে, বিমানগুলি দেবদত্ত। রাবণ তাঁর পুষ্পক রথ আনেন কুবেরের কাছ থেকে। ইঞ্জিনীয়ারিং বিজ্ঞানের প্রচলন ছিল না। অথচ ময়দানব সুশিষ্টির আশ্চর্য সভাগৃহ নির্মাণ করেছেন। আশ্চর্য সব পাথরের মন্দির তৈরী হচ্ছে, ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন ধাতু। বিজ্ঞানের এক এক শাখার আশ্চর্য উন্নতি অথচ সাধারণের জীবন অন্ধকারে আবৃত। এই বৈষম্য প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে সম্ভব নয়। কিন্তু সভ্যতার সম্পর্কহীন দুর্ভেদ্য জঙ্গলেও অজ বস্ত্র মাহুঘের অবাক করে আমরা বাজিরে আনতে পারতাম টেপ রেকর্ড, রেডিও, চালিগে আনতে পারতাম যে কোনও আধুনিক যানবাহন। বস্ত্ররা তাকে বস্ত্রই থাকত, অথচ ব্যাটারি চালিত বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম তাদের সামনে ম্যাজিকের মতই ব্যবহার করে নিজেদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রমাণ করে আনতে বৈজ্ঞানিক মাহুঘের কিছুমাত্র বেগ পেতে হত না। তখন যদি টেপ রেকর্ডকে তারা দৈববাণী ভাবে, রেডিও সঙ্গীতকে মনে করে স্বর্বেশ্বর স্বর গৃহরী, তবে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। তাদের বুদ্ধিমান করেকল্পনের হাতে কিছু ডিনামাইট দিয়ে দেওয়া যায় যদি, আর তাই নিয়ে তারা পাহাড় কাটিয়ে রাজ্য বানিয়ে বস্ত্র দেশবাসীদের যদি বলে, তপস্কার দ্বারা দেবতার আশীর্বাদ লাভ করে তারা যে শক্তি সঞ্চার করেছে, এ হ'ল তাঁরই প্রকাশ, ইচ্ছে করলেই তারা স্থিতি ধ্বংস করে দিতে পারে; তবে সেই বস্ত্র পরগণধরের পায়ে ওদের গোষ্ঠীপতি কি-মাথা হুইয়ে দিতে বাধ্য হবে না?

পূরায়ুগে পৃথিবীর পরগণধররা তপস্কার শক্তি সংগ্রহ

করে আসতেন পর্বত শিখর বা নির্জন প্রদেশ থেকে, আজ যা সম্ভব হয় না। শিবপ্রহের বুদ্ধিমানরা প্রধানত পর্বতেই শিবির পাড়তেন। আমাদের মুনীরা তো বটেই, মোক্ষগও পর্বতে গিয়ে দেবতার বাণী শুনে এসেছেন।

ইজেকিয়েলোর দেব দর্শন যাটেছে কোবর নদীর তীরে। তবে ভারতীয় দর্শন ও ওল্ড টেস্টামেন্টের মধ্যে পার্থক্য আছে। ওল্ড টেস্টামেন্ট আকাশচারী দেবতাদের যেমন ভাবে দেখেছেন, যেমন নির্দেশ পেয়েছেন, যথার্থ তারই প্রতিবেদন রেখে গেছেন তার ওপর সর্বত্রই কোনো কাব্য ও দর্শন চাপানি। কিন্তু আরাধ্য দর্শনের কারবার করছেন বহু হাজার বছর। তাই শিবপ্রহের বৈজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা তাঁরা দিয়েছেন দর্শনের তত্ত্বের সঙ্গে নভাশ্রদের একাকার করে নিয়ে। সে অঙ্গই কি ঐশ্বর্যের উপনিষদের দেহধারী দেবতার। কাল্পনিক প্রকৃতি দেবতাদের স্থানে অভিব্যক্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন? ওল্ড টেস্টামেন্টে দার্শনিকতা কম তথ্য বেশি। হিন্দুদর্শন অতি স্থল বৈজ্ঞানিক বক্তব্যকেও দার্শনিক কাব্যের বিষয়বস্তু করেছে।

কথায় কথায় অনেকদূর এসে পড়েছি আমরা। ফলে মহাদেবের হিমালয়ে আগমন সেই প্রথম পৃষ্ঠাতেই ঠেকে আছে।

স্বর্গ বা মোক্ষ তাঁর কাল্পনিক নয়; অজুন বুদ্ধার্থী, এই সংবাদে প্রীত মহাদেব হিমালয়ে এসে অবতরণ করেছেন। একটি উন্নত সামগ্রিক শিবিরের দায়িত্বশীল অধিকর্তার মতই মহাদেবের হুচতুর পূর্ণাঙ্গ আচরণ। নেশথো থেকে ইতিপূর্বে তিনি পরীক্ষা নিয়েছেন অজুনের ধৈর্য। এক-নিষ্ঠতা, সাহস, মনোবল ও কষ্ট সহিষ্ণুতার। এই পরীক্ষার মেয়াদ ছিল সুদীর্ঘ চার মাস কাল। তারপর দুতমুখে যখন শুনেছেন, অজুনের একাগ্রতা অতুলনীয়, সে রণে ভক্ত দেওয়ার মত সাধারণ প্রাপ্তি নয়, সামগ্রিক সাহায্য লাভের জন্য একাকী সর্ব রকম কষ্ট সাধনার প্রস্তুত, তখনই মহাদেব আসছেন নিজে। অজুনের সাক্ষাৎ সমুখে।

প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, ধ্যানে নয়, মহাদেবকেও সংবাদ সংগ্রহ করতে হয়েছে দুত মুখে। প্রথম বেদব্যাস, পরে দেব শিবিরের অঙ্গগত তপোধনগণ মহাদেবের কাছে সংবাদ আদান প্রদান করেছেন। এ ব্যাপারে কোথাও কোনো অলৌকিকতা নেই। এখানে শুধু দুটি তথ্যগত উল্লেখ আছে। অর্থাৎ তথ্যগত সূত্রহীনতা কাব্যিক অলৌকিকতা সৃষ্টি করেছে। এক মহাদেব তখন কোথায়, কৈলাসে, না মহাকাশে অবস্থান করছেন, তা আমাদের বলা হয় নি। 'হুই, তপোধনগণ' সেখানে কেমন করে উপস্থিত হলেন, কবি সে ধরনও বোঝানু চপে গেছেন।

বেথানেই থাকুন, মহাদেব যথাসীল ইন্দ্রকীল পর্বতে এসেছেন। এসেছেন সঙ্গীক। উমা দেবী-সহ। মহাদেব জানেন, সামগ্রিক ঘটাপট্ট হ'লেও তিনি তাঁর নিজস্ব শিবিরেই সুরক্ষিত আছেন। আসছেন তাঁর শিবিরে একজন বৈদেশিক মানব রাজপুত্রকে সামগ্রিক শিক্ষার্থী হিসেবে নিয়োগ করতে। উদ্দেশ্য, নিষ্ঠা পরীক্ষার পর এবার দ্বিতীয় স্তর, অজুনের শক্তি পরীক্ষা নেওয়া। সামগ্রিক কাজে চাটুকার নিয়োগ করলে চলে না, প্রার্থীকে সব রকম ভাবে পরীক্ষা করে বাজিরে নিতে হয়। তাই উন্নত সামগ্রিক জ্ঞান সম্পন্ন দেবাবিপতিকে সামান্ত এক কিতাতের ছদ্মবেশ ধারণ করে অজুনের শক্তি পরীক্ষা করতে আসতে হল।

(চলবে)

সংগ্রামী এক্য ছাড়া বাঁচার পথ নেই



আবেদন একেবারে। এই অভাগা বাংলাদেশের বাঁচবার আর কোন উপায় নেই, বিরাট সংগ্রামী এক্য ছাড়া। কারা এক হতে পারে? লড়াইতে পারে এই চরম জরুরী লক্ষ্য নিয়ে? বাবাই বাংলাদেশ, ভারতকে ভালবাসে। যারাই তাদের স্বাভিমান্যগার ঘোষণা বাংলাদেশ মাটিতে। তাদের ভাষা বা ধর্ম বাই হোক না কেন। এক হতে পারে তারাই বাবা! ভালবাসে বাংলার প্রগতিশীলতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, বিজোহ করার ঐতিহ্যকে। তাদের কাছেই এই ডাক।

বিরাট সংকটের মুখে আজ পশ্চিমবঙ্গ। গত ৩০ বছর ধরে এদেশের জনগণের দারিদ্র্যের সংগে ভাল বেখে বেড়েছে বেকারী। উঠে গেছে বা বন্ধ হয়েছে কারখানা, অফিস। বিদ্যুৎ বাটতি বাড়তে বাড়তে হয়েছে চিরস্থায়ী, হালকা রাজনৈতিক বিভেদ ভাগ করেছে মজুর আর চাষীদের। এদেশের শিল্পের মেরুদণ্ড পাট, ইঞ্জিনিয়ারিং, চা। সেই শিল্পগুলি থেকে প্রথমে বাঙালী মালিক হয়েছে বিভাঙিত তারপর তাদের শুধে বানানো হয়েছে স্থায়ীভাবে "অস্থ"। নিজ ভূমে পরবাসী বাঙালী আজও "রেফুজী"—ছিটকে বেড়াচ্ছে ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে।

এই প্রক্রিয়া তীব্রতর হতে চলেছে। কারণ কেন্দ্রে আজ যারা ক্ষমতার আসল দখলদার, তাদের বাটের দশকে

ছিল ভীত বাংলা ওবা পূর্বাকল বিরোধী জুমিকা। সেই বাটের দশকে যে ব্যক্তিগত বাংলার স্বার্থ বেচে দিয়েছিল কেন্দ্রের ছকুমতামার তারা আজ আবার হাত বাড়িয়েছে মীথাকরের মসনদের দিকে।

প্রমাণ? প্রমাণ গত মাত্র ৩৫ দিনে দিল্লীর সরকারের কার্যকলাপ। তার কয়েকটি মঞ্জীর দিচ্ছি

১। ফরাক্কা : গঙ্গার যে জল সঙ্গীবনী রূপে কলকাতা ও হলদিয়ার গ্রাম সঞ্চার করতো, সেই জল ও বা চুক্তি করে দান করে দিয়েছেন। তিল তিল করে মরবে কলকাতা মহানগরী।

২। হলদিয়া বন্দর : তাই জন্মালো যুত্বর শমন হাতে নিয়ে।

৩। হলদিয়া পেট্রোকেমিকাল : হলদিয়াতে তৈল শোধনাগার থাকা সত্ত্বেও পেট্রোকেমিকাল শিল্প ওখানে হবে না। হবে বিদেশী মালিকনার বোম্বাইয়ে। (বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ২১.৩.৮.৭৭)

দুর্গাপুর ইম্পাত : কারখানার সম্প্রসারণ হবে না। ভবিষ্যতে ইম্পাত বিনিয়োগ হবে কুস্তম্বধর্মে বিদেশীর কাছে গচ্ছিত। (বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ৩১.৩.৭৭)

চা শিল্প : যেখানে প্রায় দু-লাখ বাঙালী মজুর কাজ করে তার উপর বসলো রপ্তানী শুক ও কোটা।

পাট শিল্প : বার উপর ২০ লাখ বাঙালী চাষী ও প্রায় ২০০,০০০

বাঙালী মজুর নির্ভর শিল্পের পুঁজি পাবার পথ বন্ধ করা হচ্ছে।

পাতাল রেল : যাতে অসংখ্য বাঁদাণী কাজ পেয়েছে, অনেক ছোট ব্যবসায়ী বাজার পেয়েছে, লাখ লাখ কলকাতা নাগরিকের কাছে ঘর ভীষণ প্রয়োজন, তাকে বন্ধ করার জন্য ঘোষণা করা হয়েছে যে এটা "বাল্গে থরচ"। (বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ৩০.৩.৭৭)

দ্বিতীয় ছগলী ব্রীজ : যেখানে ২০ লক্ষ লোকের শহর দিল্লীতে সাত সাতটা ব্রীজ গড়তে কুঠী হয় নি, সেখানে কলকাতা-হাওড়ার দেড়কোটি লোকের আবাসিক এ ব্রীজকে কোলানো হয়েছে অনিশ্চয়তার কাদে। (কিনাসিয়ালা এক্সপ্রেস ২৮.৩.৭৭)

নতুন রেলপথ : মার্টিন লাইন, জুম্বরন লাইনের স্বপ্ন চুরমার করে নতুন রেলমন্ত্রী বলেছেন যে এগুলো তিনি ক্ষের খতিয়ে দেখবেন।

বরাদ্দ : পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পশ্চিম বাংলা পেয়েছিল (জন পিছু হারে) পাঞ্জাব বা হরিয়ানা অধেক। সে বরাদ্দও ২০ থেকে ২৫ শতাংশ কমানো হয়েছে। ছাঁটাই হয়েছে সি, এম, ডি, -এর বরাদ্দ।

বাংলাকে এইভাবে বঞ্চিত করে যদি ভারতের উন্নতি হোত তাহলে বাংলা সেই ত্যাগ মেনে নিতো। অতীতে বছবার মেনেছে। কিন্তু কার স্বার্থে এই বঞ্চিত? বর্তমান সরকারের

আসল ক্ষমতাবাহীদের ইতিহাস কি দেখায়? কি দেখায় গুদের ঘোষিত আয়কর, আমদানী-রপ্তানী লাইসেন্স নীতি? ওরা দেখায় যে এই সরকার (এবং রাজ্যে রাজ্যে তাদের বশবদেয়) দেখবে শুধু :

বিদেশী পুঁজির স্বার্থ
দেশী দেশ জোড়া-পুঁজিপতি
পরিবারদের স্বার্থ

বিরাট জমি-মালিকদের স্বার্থ।

দেশবাসীর স্বার্থ এরা দেখবে না। দেখবে না, মাঝারী ও ছোট মালিক-স্বার্থ। তা যদি দেখতো তাহলে দেশের অসম বিকাশকে তীব্রতার মুখে ঠেলতো না ওরা। তা যদি দেখতো তাহলে খামাবার চেষ্টা করতো বাজার সঙ্কটন। চাষীর স্বার্থ দেখবে না ওরা। দেখবে না বলেই ভূমিভাড়া ঘোষণা : ভূমি সীমা কমানো হবে না। (স্টেটস-ম্যান ৪.৬.৭৭)

সেই কারণেই গুদের অসীকার : সামনের পাঁচ বছর 'মৌলিক অর্থ-নৈতিক' কাঠামোর কোন পরিবর্তন করার চেষ্টাই করা হবে না। (ইকনমিক টাইমস, ২৬.৪.৭৭)

দেশের দেড়কোটি খেকারের জালা এরা জুড়াবে না। দশ বছর বা আরো দুটো ভোটের জন্য অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে বেকারদের।

মজুরদের স্বার্থ দেখবে না ওরা। তা যদি দেখতো তাহলে ইম্পাত মন্ত্রী থেকে প্রথমন্ত্রী এবং সবাই এতো ভয় দেখাতেন না প্রমিকদের। বলতেন না যে "শান্তিষ্ট থাকো, নইলে আগের চেয়েও প্রতিহিংসাময় এমারজেন্সী নামাবো। (ইকনমিক টাইমস, ১১.৪.৭৭)

গম্বীরের স্বার্থ দেখবে না ওরা। তাই তো ৪৪ কোটি ভূখানাকার দেশে যেখানে লাখখানেক লোক শুধু চরম বিলাসিতার পরস্রা ওড়ায়, ওরা বাতায় ত্যাগ, অস্থিরতা আর কল্লুখাণের দাওয়াই।

জনগণের জন্য নয় গুদের গগতন্ত্র। তা যদি হোত তাহলে হিংসাত্মক আর এস, এসদের বেকসুর বালাস করে, বাংলার ১৫০০০ বিপ্লবীদের কাছ থেকে হীন প্রতিজ্ঞা চাইতো না এরা। জাতিদের সম্মান দেবে না এরা। তা যদি দিতো তাহলে বাংলার সি, পি, এমকে ৮০টা বিধান সভা সীটের জুতো মারতো না ওরা। দেশপ্রেম লাচ্চা নয় গুদের। সং যদি হোত তাহলে এতগুলো চিহ্নিত সি, আই, এ, কর্মীদের ওরা অস্ত্রসভার স্থান দিতো না।

বাংলাকে বঞ্চিত করে, যুগান্তকে

বেকার রেখে, কারখানা বন্ধ করে, উন্নয়নকে শুক করে, বাংলার চাষী-মজুরকে পিটিয়ে ভারতবর্ষ এগোতে পারবে না। তাই শুধুমাত্র বাংলার স্বার্থে নয়, গোটা ভারতবর্ষের তাগিদে এক হতে হবে বাংলার স্বাধিকার ও সমৃদ্ধির জন্য লড়াই করতে।

আরো একটা হুঁশিয়ারী : রাজনীতি চলে ক্যাডারশক্তি দিয়ে। কংগ্রেস সি, এক, ডি, এম, পি, কারুরই ক্যাডার নেই। মস্তান ওতা, যারা কেশর ছিলিয়ে, লাল সবুজ আবির্মেখে "জনতা দলে" ভীড় করেছে তারা ক্যাডার নয়। কেন্দ্রের ক্যাডার হবে আর এস, এস, আর, এস, এস, আসছে। ভারতের সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে সংগঠিত, সবচেয়ে সমৃদ্ধ, সবচেয়ে অগতান্ত্রিক ও প্রগতিবিরোধী সংগঠন এই আর, এস, এস। সৈন্ত-বাহিনী সি, আর পি, বি, এস এক ও পুলিশে তাদের আছে বিরাট অধঃপ্রবেশ। জাতি উৎপীড়ন, হিন্দী চাপানো, অবরুদ্ধিত ধর্মান্তরকরণ, ধর্মঘট ভাঙ্গা, বামপন্থী হত্যা সবই এদের আদর্শ-নীতি। বুক ফুলিয়ে এসব করবে ওরা। অগজীবন রাম, বহুতপা, ফারনাগেস, দত্তবতে বা চন্দ্রশেখর যদি আর, এস, এসের কাছে মাথা নীচু না করেন তাহলে উৎখাত হবেন তারা। জয়প্রকাশিনী এ বিপদ বোঝেন। তাই যুগান্তের স্বাক্ষর হয়ে পান্টা সংগঠনের গোড়াপত্তন করলেন তিনি। (স্টেটস-ম্যান, ১.৫.৭৭)

এই সব দেখে, মেনে, বুকে তাই আমাদের আর্ত আবেদন : এক হোন। লড়াই-রূপ কল্পন।, যারাই বাংলার মাটিতে কুট-কুঞ্জি পাম, তাদেরই স্বার্থ আছে বাংলার সমৃদ্ধিতে। এক হোন! সরকারী কলকাটি হাতে পেলেও ওরা ইতিহাসের ধারা বদলাতে পারবে না। আজ দেশের স্বাধীনতা চাইছে, জাতির চাইছে মুক্তি, জনগণ মুখিবে আছেন বিপ্লবের জন্য। তাই লড়াই শুরু হলে সমর্থন সে লড়াই পাবেই। দরকার শুধু দেশের প্রতি ভালবাসা আর সাহস। আশা করি এই ভালবাসা আর সাহস আপনাদের আছে। সেই ভরসাতেই এই চিঠি।

হৃদয় রাই

আর এস এস ও ডঃ সুরক্ষণ্য স্বামী সম্পর্কে

আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে আর, এস, এস ও হঠাৎ নেতা ডঃ সুরক্ষণ্য স্বামী সম্পর্কে সামান্য বক্তব্য রাখতে চাই। জনতা সরকার নির্বাচিত হওয়ার পরই কারা বেন রাতারাতি এই বিভক্তিত সংগঠনটির উচ্ছল তাব-মুতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। গান্ধী হত্যার কলঙ্কিত এই উগ্র মুসলিম বিরোধী ও কমিউনিষ্ট বিরোধী দলটি যে ভারতের অন্ততম ক্যাসিষ্ট সংগঠন তা কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট সর্বল দলই স্বীকার করে। এই দলটির পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি অফিস ছাড়া আর কোন অস্তিত্ব নেই। আজ হঠাৎ এই দলটির কেন্দ্রীয় নেতাদের এখানে আগমন, প্রাদেশিক নেতাদের বিবৃতি সব কাগজেই অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ঘন ঘন প্রচারিত হচ্ছে, আর সেই সঙ্গে ম্যাটিনী আইডল করে তোলা হচ্ছে ডঃ স্বামীকে প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে।

আর, এস, এস, -এর অন্ততম সংগঠক ডঃ স্বামীর সব রকম বিবৃতি ও

চবি ছাপানোর প্রতিযোগিতা চলছে কয়েকটি সংবাদপত্রের মধ্যে। একটি কাগজ তো আগ বাড়িয়ে তার ধারাবাহিক রোসহর্ষক জীবনী ছাপিয়ে তাকে রাতারাতি রেভিমেড হীরো বানিয়ে দিল। একদিন ঠিক এ রকম ভাবেই এই কাগজগুলি সঞ্জয় গান্ধীকেও জাতীয় নেতা বানিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু অর্থনীতিতে পণ্ডিত এই নব স্বামীজি যে রাজনীতিতে এখনও শিক্ষা-নবায়ন একটি বালাখিলার মতো উদ্ভি করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি তাত্ত্বিক নেতা হওয়ার থেকে তাকে বরং "০০৭" মার্কা বোম্বাকের নারক হিসেবেই ভাল মানাবে।

আর, এস, এস, -এর আর এক নেতা বালা সাহেব দেওরাসও শেষ পর্যন্ত ডঃ স্বামীর এই প্রগলভ উক্তি ঢাকার জন্য বলতে বাধ্য হয়েছেন মার্কসবাদীদের সঙ্গে শর্তাধীন সমঝোতা করবেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে তিনিও একটি অর্বাচীন উক্তি করে বলেছেন, তা হল কমিউনিষ্টদের মার্কসবাদের

'সর্বহারার একনায়কত্ব' এই তত্ত্বকে বাস্তব করতে হবে। তিনি বোধহয় জানেন না এই তত্ত্বটিই হল মার্কসবাদ।

আর স্বস্তর ঘটনা হল, যে সব কংগ্রেসী ওতা জনতা পার্টিতে ঢুকতে পারে নি তাদেরকে হুকোশলে কমিউনিষ্ট বিরোধী জিগির দিয়ে আর, এস এস, -এ সংগঠিত করা হচ্ছে এই আশাস দিয়ে যে জনতা পার্টি ও আর, এস, এস, -এর কোন তফাৎ নেই। এবং এই কারণেই আর, এস, এস এর লড়াইগুলিতে জনতা নেতাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এবং এই ভাবে সরকারের একটা অসী সংগঠনে আর, এস, এসকে রূপান্তরিত করা হচ্ছে কেন্দ্র করা হয়েছিল জার্মানীতে নাজী বাহিনীকে ও মুসলিম লীগের মুজাহিদ বাহিনীকে এবং অগুন কংগ্রেসের যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ বাহিনীকে। জনগণ সচেতন না থাকলে, এই আর, এস, এসই কালক্রমে যুব কংগ্রেস ও ছাত্রপরিষদের ভয়াল রূপ নেবে।

ভাস্কর মজুমদার

একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

আতা চক্রবর্তী

দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্যঃ হিমালয় সরকার। কার্মা কে-এল মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ৪১২।

দ্বীপময় ভারত বলতে আমাদের থেকে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল বোঝালেও লেখক বিশেষ করে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জকেই বুঝিয়েছেন। অবশ্য মাঝে মাঝে শ্রাম, কবোজ এবং চম্পার উল্লেখ আছে। ইন্দোনেশিয়ার ভাষা সংখ্যা ২৫০-এর কাছাকাছি। এর মধ্যে বলিহীপীয় কবি ভাষার সাহিত্য প্রাচীন সংস্কৃত প্রভাবিত। জাভার প্রাচীন ভাষা বালীহীপীয় নামে পরিচিত। এই ভাষার প্রাচীন সাহিত্য গল্পে এবং পণ্ডিত। খ্রীষ্টীয় যুগের প্রথম দিকে ভারতীয় অভিযাত্রীদের সংগে ভারতীয় ভাষা, ধর্ম, দর্শন এবং সাহিত্য পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলিতে বিশেষত ইন্দোনেশিয়া, কবোজ, মালয় এবং শ্রামদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর সংগে গিয়েছিল বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য এবং সংস্কৃত মহাকাব্য চুটি। প্রাচীন রাজাদের শিলালিপিসমূহে এই ভাষাগুলির প্রাচীন নিদর্শন রক্ষিত আছে। ভারতীয় রাজবংশগুলির উপনিবেশ স্থাপনের সংগে সংগে ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বালীহীপ, বলিহীপ শ্রাম এবং কবোজে বিস্তার লাভ করে। প্রথম দুটি দেশ অর্থাৎ বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন সাহিত্য এবং তার উপরে ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব আলোচ্যমান গ্রন্থটির উপজীব্য। রাজ্য স্থাপন, উপনিবেশন এবং বহিরাগমনের মাধ্যমে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির প্রভাব মালয় এবং সিঙ্গাপুরেও বিস্তৃত হয়েছিল। এই সাংস্কৃতিক বাণিজ্য বৌদ্ধ যুগে আরো ব্যাভি লাভ করেছিল।

বোরোবুদুর এবং আঙ্কোর ভোটের ভাস্কর্যের কথা শিক্ষিত ব্যক্তিমাজেই জানেন। এই অঞ্চলের ভাষা এবং সাহিত্যে সংস্কৃত ও পালির প্রভাব আমাদের কাছে সুপরিচিত ছিল না। কেবল রাজনৈতিক নেতাদের নামের মধ্যে সংস্কৃতের অবশেষ দেখা গেছে যেমন স্বর্কর্ণ, শাস্ত্রমিত্রজ, বিপুল সংগ্রাম, জেনারেল কান্তিকের ইত্যাদি।

আগম-সাহিত্য, পুরাণ ইত্যাদির চেয়ে মহাকাব্য চুটির প্রচলন সাংস্কৃতিক প্রভাবের দিক থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধের রাজা ভর্তৃহরিকৃত রামায়ণের অঙ্গসরগে তার রামায়ণ কাব্যবিন রচনা করেন। মহাভারতের অঙ্গবাদে নির্বাচিত পর্বগুলির অঙ্গবাদ যা সারসংক্ষেপ করা হয়েছে।

এইসব কাহিনীগুলিই পরবর্তীকালে প্রাধান্য এবং আঙ্কোরের মন্দিরগাঙ্গে প্রস্তর ভাস্কর্যে রূপময় হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার হিন্দু সংস্কৃতি প্রথমে স্থানচ্যুত হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা এবং পরে দ্বিতীয়টি হয়েছে ইসলামের দ্বারা। কিন্তু এই ইসলাম আরব বা ভারতের মত নয়—একে বলা যায় বৌদ্ধ ইসলাম। ধর্মের চেয়ে ভারতের স্থায়ী দান ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে। এই অঞ্চলের ভাষাগুলির সংস্কৃতমূলক শব্দের ভাগ কোন কোন জায়গায় শতকরা ৫০ থেকে ৬০ পর্যন্ত। তার পরেই আসে মহাকাব্য-ইতিহাস, পুরাণ এবং বৌদ্ধ কাহিনীর প্রভাব। সংস্কৃত শব্দসম্ভার ভাষাকে গতি দান করেছে। আর ইতিহাস (মহাকাব্য) পুরাণ এবং বৌদ্ধ কাহিনীগুলি একটা বিশিষ্ট জাতীয় মানসিকতা (ethos) তৈরি করেছে যেমন করেছিল গ্রীক এবং লাতিন সাহিত্যের মাধ্যমে খ্রীষ্টীয় ধ্যানধারণা মধ্যযুগের ইউরোপে।

স্বয়ংদহন তত্ত্ব ইত্যাদি আখ্যান এবং নীতি কাহিনীর প্রভাব একটা বিশেষ জাতীয় উপকথা রুত্তির জন্ম দিয়েছিল যার সংগে মিশ্রিত হয়েছে পোলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের আদিম উপকথাগুলি। যেমন স্বয়ংদহন-কাব্যে কুমার-সম্ভব কাব্যের এবং কামন্দকতন্ত্র পঞ্চ-তন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব। বৈদিক এবং আর্যের সংস্কৃতির সংঘাত এবং সংশ্লেষের ফল যেমন ভারতের বিবিধ ভাষা সাহিত্য এবং সামগ্রিক সংস্কৃতি, তেমনি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এই দেশ-গুলির। অবশ্য এই সংশ্লেষে দেশজ আদিম অট্টক উপাদানগুলির ভূমিকাও কম নয়। তবে ভাষা ও সাহিত্যের দিকটাই লেখক সন্ধান করেছেন, সামাজিক বা জীবনীচরণের দিকটা নয়। তা করতে পারলে এই অঞ্চলের সংস্কৃতি সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় জীবনচর্যার দ্বারা কতখানি প্রভাবিত তার হিসাব করা যেত। তবে বিশেষ জাতীয় মনোভূমি গঠনে এই সব দেশে ভারতীয় ধর্ম এবং সাহিত্যের ভূমিকার একটি স্পষ্ট চিত্র, ভাষা ও সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণে ও বিকাশের এক বিস্তৃত ও জটিল প্রক্রিয়ার গ্রন্থিযোচন লেখক করেছেন তার গ্রন্থটিতে। প্রচুর তথ্য আহরণ করে তিনি তার আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বর্ষমালা থেকে আরম্ভ করে ব্যাকরণ, ভাষা এবং সাহিত্যের বিস্তৃত বিবরণ তিনি তুলে ধরেছেন। ইন্দোনেশীয় প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে

এর চেয়ে বিস্তৃত আলোচনা এর আগে

কখনো দেখেছি স্বপ্ন হয় না।

তবে 'দ্বীপময় ভারত' কথাটা একটু বিশদগামী করতে পারে। ভারতীয় ভাষা এবং সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হলেও এই সব দ্বীপের সঙ্গে ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক দিক থেকে ভারতের কোন কালেই কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। হিন্দু বা বৌদ্ধ উপনিবেশগুলি কখনো মাতৃভূমির সাম্রাজ্য-ভুক্ত ছিল না। সংস্কৃতি এবং নীতিগত ভাবেও তারা চিরকাল স্বতন্ত্র। সেই হিসাবে বইটির অল্প নামকরণ বাহিনীর ছিল বোধ হয়।

একটি উপন্যাস

শেষ স্নাতকের স্বপ্নঃ খেত কেউটে। খেত কেউটে পারলিশিং কনসার্ন, ২৭।৪৫ কে, এম, মন্ডর, রোড, টালিগঞ্জ, কলিকাতা ৭০০০৪০। দাম নয় টাকা।

খেতকেউটে ছদ্মনামে লেখকের ২৬৩ পৃষ্ঠার উপন্যাস। নায়ক দেবব্রত একজন উদীয়মান ফুটবল খেলোয়াড়। হঠাৎ প্রেম, প্রেমজ বিবাহ এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনে চাকরির বন্ধনে আটকা পড়ে তার খেলোয়াড় জীবনে বিচ্ছেদ নেমে এল। দুর্ভাগ্যক্রমে দেবব্রত গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার মৃত্যুশয্যায় প্রিয়তমা স্ত্রী শ্রামলীকে বন্ধু হুকুমত হাতে সমর্পণ করে দিয়ে চূড়ান্ত আত্মত্যাগের প্রমাণ রাখল।

এই কাহিনী লেখকের অগাধ ঐর্ষ্য এবং সদিচ্ছার পরিচ্ছন্ন নম্রির একে বীকার করেও অল্প প্রশ্ন থাকে। সেটা উপন্যাসের শর্ত। লেখকের নিম্নস্ব সদিচ্ছা উপন্যাসের শরীরের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে গেলে পার্বতী পরমেশ্বর সম্মিলন হত। সেটা হয়ে উঠতে পারে নি। চরিত্র চিত্রণ, সংলাপ-বয়নের সঙ্গে বাস্তবিক কার্য-কারণের দিকে মনোযোগ দিলে লেখক পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারতেন। লেখকের বিষয়-নির্বাচনে অনন্ত দৃষ্টি রয়েছে, তিনি অন্যায়সে এই দীর্ঘ কাহিনী রচনা করতে পেরেছেন, ভবিষ্যতে ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি যদি সংযম ও যুক্তিশীলতার দিকে আগ্রহ দেখান তাহলে তিনি লাভবানই হবেন এবং পাঠক-সমাজে সমাদৃত হবেন।

মতামত

অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীর আবেদন

আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত রেল-কর্মচারী। ১৯৪২ সালে যে রেল-ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয় তার একজন সংগঠক অভিযোগে রেলধর্মঘটের ঠিক প্রাক্কালে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। দীর্ঘদিন বাদে ১৯৫০ সালের জানুয়ারীতে আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তির পরও কিছুদিন সাময়িক বরখাস্ত রেখে কর্তৃপক্ষ আমাকে ফিরে পাই ১৯৫৩ সালে অনেক লেখালেখি, আবেদন, নিবেদন এবং সংগ্রামের পর কিন্তু আমাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল না করে করা হয় পুননিয়োগ ফলে আমি যে কম বেতনের কর্মচারীই হই তাই নয় দীর্ঘ চাকরির বৎসরে চাকুরীর নিরবচ্ছিন্নতা ব্যাহত হওয়ার আমার পেন্সন বর্ধাদ করা হয় মাত্র আঠাশ টাকা (যা বেড়ে সাঙ্কুল্যে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৮৬ টাকার) এবং অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মচারীরা যে রেলওয়ে পাশ এবং চিকিৎসাদির সুযোগ সুবিধা পেরে থাকেন তা থেকেও আমাকে বঞ্চিত করা হয়। অবশ্য অনেক লেখালেখির পর রেলওয়ে পাশ এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত আংশিক সুযোগ সুবিধা কর্তৃপক্ষ আমাকে দিতে বাধ্য হয়েছে।

অসম্মানজনক জেনেও কর্তৃপক্ষের ঐ নিকৃষ্ট গ্রহণে আমি বাধ্য হয়েছিলাম এই কারণে যে আমার পরিবার তখন চরম আর্থিক সঙ্কটের ভিতরে দিয়ে চলছিল এবং অধীহার অনাহার ছিল পরিবারের তখন নিত্য-সঙ্গী। এছাড়া আমি স্থির করেছিলাম যে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করার পরও আমি আমার উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার বিক্ষোভ লড়াই চালিয়ে যাব। বাস্তবিক অর্থেই আমি চাকুরীরত অবস্থায় বা অবসর নেওয়ার পর উভয়বস্থাতেই রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী থেকে শুরু করে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার, পার্গোনেল অফিসার এমনকি কাঁচরাপাড়া ওয়ার্ক-সপের ওয়ার্কস সুপারিনটেন্ডেন্ট সহ সর্বত্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দাবি আবেদন জানাই আমার উপর যে অবিচার হয়েছে তার প্রতিকারের জন্য। সংসদ সদস্য নীরেন ঘোষ পর্যন্ত একবার আমার প্রসঙ্গ উৎকালীন রেলমন্ত্রী রামহৃদয় সিংয়ের গোচরীভূত করেন, কিন্তু সমস্তই কাকাস্ত পরিবেশনা।

আজ যখন নয়া রেলমন্ত্রী অধ্যাপক যশু দত্তবতে ১৯৭৪এর ধর্মঘট দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত রেলকর্মচারীদের উপর থেকে সমস্ত দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়ে

সমস্ত তরফের দণ্ডবাদাই হ্রাসছেন তখন আশা করব আমরা একই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা এবং একই দোষে দোষী সার্বস্তের দণ্ডও একই বিচার পাই।

আমি দাবী করছি আমার পেন্সনের পুনর্মূল্যায়ন করা হোক আমার সমগ্র কার্যকালের নিরিখে এবং আমি আরও দাবী করছি যে আমার অজিত বেতনের যে অংশটুকু কেটে রাখা হয়েছে কম মজুরী দিয়ে তাও ফেরৎ দেওয়া হোক।

আমি আশা করব আমার শেখোক্ত দাবীও গৃহীত হবে যেহেতু রেলমন্ত্রী সংসদে ঘোষণা করেছেন জনতা সরকার নীতিগতভাবে মনে করে বোনাস হল 'বিল ঘে প্রদত্ত বেতন' সেক্ষেত্রে অজিত বেতন ফেরৎ দিতে তার কোন কার্য্য থাকাই উচিত নয়। আশা করব আমাদের এই পর্যায়ের সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে।

রমেশচন্দ্র কুজু
কাঁচরাপাড়া

ললিতা চ্যাটার্জীর
প্রতিবাদ প্রসঙ্গে

দর্পণের ১৫ই এপ্রিল সংখ্যায় ললিতা চ্যাটার্জীর প্রতিবাদ পত্রটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শ্রীমতী চ্যাটার্জীকে অস্বরোধ তিনি কেয়া চক্রবর্তীর মার কাছে যা বলেছেন, দর্পণের পাঠকদের-অন্ত সেই সত্য ভাষণটুকু আর বিলম্ব না করে দর্পণে প্রকাশের জন্য বেন-পাঠিয়ে দেন। বসন্ত চৌধুরীর মত ভবিষ্যৎ নষ্ট হবার ভয় হয়ত তাঁর নেই কারণ বাজার আসরে তিনি পাকাপাকি ভাবে যুক্ত হয়েছেন। এমতাবস্থায় কেয়া চক্রবর্তীর মৃত্যু বহুত উদ্বাটনের জন্য তাঁর মত দারিদ্রশীল মহিলারই এগিয়ে আসা উচিত। বিশেষ করে কেয়া চক্রবর্তীর মৃত্যুর প্রায় দু মাস পরেও আসল সত্য এখনও উদ্বাটিত হয়নি দেখে সকলেই বিচলিত বোধ করেছেন। জীবন যে রকম ফিল্ম ইউনিটের প্রোডাকশন ম্যানেজার গোরাচাঁদ ডগু সমেত ১০ জন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছেন, যখন স্বদেশ সরকার এবং তার ইউনিটের লোকেরা বাঁচবার জন্য নানাবিধ মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন, তখন বসন্ত চৌধুরী এবং ললিতা চ্যাটার্জীর উচিত স্পষ্ট ভাষণে আসল সত্য উদ্বাটিত করা।

অনৈক পাঠক

স্পীকার ও নৃপেনের কাহিনী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মজুমদারই স্পীকারের গাড়ি প্রত্যাহার করে।

লালবাজারের পদস্থ পুলিশ অফিসারসহ কয়েকটি দায়িত্বশীল মহলের অভিযোগ নৃপেন মজুমদারের মদ মেয়েমাছুষ নিয়ে ক্ষুতি করার একটি অন্ততম আরগী হলে কলকাতার পার্কেট এলাকার কারনানী ম্যানসনের তিনতলার একটি কক্ষ। খানে প্রায় প্রতি সন্ধ্যাই বসে গোপনে মধুচক্রের আসর। এই আসরের অন্ততম, নায়ক, হলেন নৃপেনবাবু। আবার এই নৃপেনবাবুই বিধানসভার বহু সদস্য, ও পুলিশ দপ্তরের পদস্থ অফিসারের কাছে অপূর্ববাবুর 'রাজ-নৈতিক পরামর্শদাতা' বলে পরিচিত। অপূর্ববাবু নৃপেনবাবুর এই পরিচিতিটা মেনেও নেন। আর এই সুযোগ নিয়েই নৃপেনবাবু বিভিন্ন কারদায় মেয়ে বোগাড় করেন। এবং কারনানী ম্যানসনের সংশ্লিষ্ট কক্ষটিতে এনে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। নৃপেনবাবুর এই কদর্ষ আচরণ সম্পর্কে সম্প্রতি কয়েকজন নিগূহীতা মহিলা দর্পণ প্রতিনিধির কাছে এক বিস্তারিত তথ্যও পেশ করেছেন। মহিলাদের কয়েকজন আমার কাছে বলেন, চাকরীর লোভে ছুটে আসা মেয়েরাই হন নৃপেনবাবুর শিকার। দু একদিন কথা বলার পরেই নৃপেনবাবু তাদের হয় কোন হোটেলে নয়ত কারনানী ম্যানসনের সংশ্লিষ্ট কক্ষটিতে, এনে তোলেন। এরপর প্রায় প্রতিটি মেয়েকেই জোর করে মদ খাইয়ে বেহ'স করে অত্যাচার করা হয়। জনৈক মহিলা বলেন, এর প্রতিবাদ করারও কোন ভাষা আমাদের নেই। রাত্তায় এসে দাঁড়ানোর পরে হুমকি আসে সবাইকে বলে দেবো। আমরা মেয়ে। আমাদের কেলেঙ্কারী ছড়িয়ে পড়লে আমাদের কি হবে বলুন?

আশ্চর্যের বিষয়, এই নৃপেন মজুমদারই স্পীকার অপূর্ববাবুর সরকারী সকারস্বতীয় অন্ততম অংশীদার। বেশ কিছুদিন আগে নৃপেনবাবু অপূর্ববাবুর সংগে দার্জিলিং যান। মজার কথা এই সময় বড়গাজার এলাকার এক ব্যবসায়ী ব্রিখনাথ সরাফের ডবলু এম এ ১৯৭১ নম্বরের গাড়িটি নিয়ে বড়গাজার এলাকার এক ব্যবসায়ী সন্দ্বীনারায়ণ আগরওয়ালার তাদে'র সঙ্গে যান। বলা বাহুল্য, এই দার্জিলিং ট্রা প্রোগ্রামে মহিলাদের নিয়ে চরম স্তম্ভকর ঘটনা ঘটে। এখানে লক্ষী ও রাজ্য বিধানসভায় ব'নৈক মহিলা কর্মীকে নিয়ে এক অপরাধ বেলোপনা চলে।

স্পীকারের দিল্লী ট্রা প্রোগ্রামেও ব্যবসায়ী লক্ষীবাবু, নৃপেনবাবু অংশীদার হন। এখানেও লক্ষী নামে মেয়েটির সংগে চলে চরম ব্যভিচার। নৃপেনবাবু বিধানসভায় চাকুরী দেবার নাম করে জনৈক তরুণীকে বেশ কিছুদিন নিয়ে ক্ষুতি করেন। তবে তরুণীটির চাকুরী বিধানসভায় স্পীকার অপূর্ববাবুর অধীনে হয়েছে সত্য, কিন্তু তার জন্য তাকে যে মান্ডল দিতে হয়েছে তা অবর্ণনীয়।

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সহ অধ্যক্ষদের কাছে অপূর্ব মজুমদারের প্রাক্তন সি,এ রশিদ আমেজ অপূর্ববাবু ও তার নিত্য সঙ্গী নৃপেন মজুমদার সম্পর্কে অভিযোগ সখলিত পত্র বলেন, "স্পীকারের নাম ভাঙিয়ে নানা কারদায় নৃপেন মজুমদার মেয়ে বোগাড় করে। দীবা, দিল্লী ও দার্জিলিং নিয়ে গিয়ে নৃপেনবাবু ও তার অন্ততম সঙ্গী তাদের সঙ্গমহানি ঘটায়। প্রায় প্রতিটি

প্রফুল্ল সেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সেই 'অতুল্য-প্রফুল্ল চক্রের' প্রফুল্ল সেন। এই প্রফুল্ল সেই 'আনন্দ-হরি-হরুলের' হত্যাকারী প্রফুল্ল সেন। এই প্রফুল্ল সেন আনন্দবাজারের দ্বারা হঠাৎ তৈরী করা 'জননেতা' প্রফুল্ল সেন। তিনি আরামবাগের গান্ধী না ভাস্ট-বিনের পোকা? আমরা বুঝে পাই না এই একাশি বছরের বৃদ্ধের এত লোভ কেন? তারা মুখ্যমন্ত্রী হবেন, মন্ত্রী হবেন? তারা ভুলে বাচ্ছন পশ্চিমবাংলায় কোন জনতা হাওয়া নেই, এখানে কংগ্রেস বিরোধী হাওয়া। এই হাওয়াতেই তারা লোকসভার নির্বাচনে পুনরুত্থিত হতে চেয়েছেন। তিনি জ্যোতিবাবুদের উনসত্তরের জমিকার কথা ভুলেছেন, কিন্তু তাঁর আটচল্লিশ থেকে ছেয়টি জমিকার কথা যদি ভোলা হয়? তাঁর হাতে তো আনন্দ-নুরুল-হরি এবং আরো অনেক শহীদে'র রক্ত লেগে আছে, যদি সে রক্তের কথা ভোলা হয়? তিনি পরোক্ষে সি, পি, এম-এর "গুণামীর" কথা ভুলেছেন, কিন্তু এই সেদিন কংগ্রেস ভবনে শান্তি দাশগুপ্তর মনোনয়ন নিয়ে যে মারামারি হয়ে গেল এবং প্রায় প্রতিদিন হচ্ছে তার কি ব্যাখ্যা হবে? দলের নেতা ময়ূ লিমায়ের গাড়ী ঘিরে যে উচ্ছৃঙ্খল বিক্ষোভ হল তাকে কি বলবো? একি অহিংস গুণামী? যে সি, পি, এম-এর বিরুদ্ধে এত উচ্ছৃঙ্খলতার অভিযোগ আনা হয় সে সি, পি, এম কি

কেন্দ্রেই মদ ও ট্যাবলেট খাইয়ে মেয়েদের অচেতন করার পর তাদের সর্বনাশ করা হয়। দার্জিলিং ভি, আই পি বাংলা ও রিচমন্ড হিল বাংলার দুটি মেয়ের সর্বনাশ করার পর একটিকে চাকুরী দেয়া হয়। লাক্ষিতা অপ'টিকে কিছু পরসাক্ষি দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। এভাবেই কারনানী ম্যানসনের তেতলার একটি কক্ষে মধুচক্রের আসরে জনৈক স্ত্রীমতী দাসকে এনে ভোলা হয়। ওখানেই আরও বেশ কয়েকটি মেয়ে তাদের সর্বস্ব হারান।

রশিদ আমেদের আরও অভিযোগ — "আমার চাকরীর বেতনের খাতায় আমাকেই সই করতে হতো কিন্তু সমস্ত টাকাটাই স্পীকারকে দিয়ে দিতে হতো। মাঝে আমি একবার আপত্তি করি। এরপর আমার কাছ থেকে 'অথরাইসড' লেটার নিয়ে বেতন তুলে নেয়া হতো। এভাবে কখনও শালা শালীর নামে, কখনও বা ভূয়া নামে টাকা ভোলা হয়। এবং এখনও তা হচ্ছে।"

পুলিশের কাছে আমেদের অসু-

মনোনয়ন নিয়ে কোন গোলমাল নেই। চৌরঙ্গি, ভবনে মনোনয়ন নিয়ে যত গোলমালই থাক, আলিমুদ্দিন ষ্ট্রাটে কোন গোলমাল নেই। তা হ'লে কারা বেশী হুশংখল—গান্ধীবাদী জনতা না মার্কসবাদী সি, পি, এম? বন্দে-মাতরম জাগান দেনওয়লা যুবকের দল না 'লাল সেলাম' বলে চীৎকার করা যুবকের দল? প্রফুল্লবাবুদের এখনও জ্যোতিবাবুদের কাছে হুংগলা শিখতে হবে?

প্রফুল্লবাবুদের ধারণা সি, পি, এম, একটি গুণ্ডা পার্টি। কিন্তু বহাস্তর লালে কংগ্রেস ভবনে র'সামনে অনশনের সময় আতা মাইতির কাপড় ধরে টান মেয়েছিল করা? সি, পি, এম, না যুব কংগ্রেস? সেই যুব কংগ্রেসীদের গুণামীর বিরুদ্ধে তো তিনি কখনো কিছু বলেন না। তিনি উনবাট-সালের সি, পি, এম-এর "গুণামীর" কথা মনে করে রেখেছেন, কিন্তু বাহাস্তর থেকে সাতাস্তর পর্যন্ত যুব কংগ্রেসীদের গুণামীর কথা তো কিছু বলেন না? এই গুণামী যুব কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই উচিত ছিল এই নির্বাচনে সি, পি, এম-এর সঙ্গে হাত মেলানো। লোকসভার নির্বাচনে জয়ের পর শহীদ মিনারে বিজয় সমাবেশে তিনি সি, পি, এমকে একটি গণতান্ত্রিক দল বলেছিলেন আর বলেছিলেন যে অর্থনৈতিক ব্যাপারে যে সামান্য মতপার্থক্য আছে তা মিটিয়ে ফেলা যাচ্ছে। অথচ এখন তিনি অস্তরকম ভাবছেন, অস্ত কিছু আবিষ্কার করছেন। আর সামান্য 'মতপার্থক্য' এখন বিরাট মতপার্থক্যে তখন পান্ট/ উদারতার পরিচয় দি-

রোধ আদালী ডাইটার ভা' ও সিকিউরিটি গণেশ পাল এসব ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। তদন্তের খাতিরে গোয়েন্দা পুলিশ যেন এদের কাছে একটু খোঁজখবর করেন। বড়বাজারের সাতার অন্ততম পরিচালক রমন লাল, চেতলা বোডের সাবান ও চৌরাই জেলের কারবাবী নরসিং ও গুপ্ত প্রভৃতি বহু লোককে পারমিট পাইয়ে দেয়ার, নামে কাউকে মিসার ভয় দেখিয়ে নৃপেন চক্র প্রচুর টাকা আদায় করে।

রশিদ আমেদের উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে রাজ্য পুলিশের জনৈক পদস্থ অফিসার বলেন, ঘটনাটি নিয়ে ইতিমধ্যে তদন্তের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

অফিসারটি বলেন, নৃপেন প্রথম স্বরওয়ার্ড ব্লকের সংগে যুক্ত ছিল। অপূর্ববাবুর সংগেই নৃপেন এই মহলের কাজ করতো। কিন্তু নৃপেন চিরদিনই হাওড়া অকলে গুণামী বাহাজানি করে এসেছে। পুলিশের খাতায় নৃপেন 'এ' ক্যাটিগরির গুণ্ডা চরিত্র বলে চিহ্নিত। গুণামী বাহাজানি

পরিণত হয়ে গেছে। একে সুবিধাবাদ বলে না? এত ঘন ঘন কেউ মত পান্টার?

যে লোক এত ঘন ঘন মত পান্টার তার উপর লোকে আস্থা রেখে ভোট দেবে কি করে? প্রফুল্লবাবুদের কথার কোন দাম নেই। একান্তর সালে ইন্দিরা কংগ্রেসের বিপুল জয়ে প্রফুল্ল সেন বিগলিত হয়ে গিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসকেই বললেন জাতীয় কংগ্রেস। এই রকমই তো কথাবার্তা প্রফুল্লবাবুর। এই রকম কথাবার্তাই তিনি আগাগোড়া বলে থাকেন। প্রফুল্লবাবু উল'বাহ হয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসে ঢুকতে চেয়েছিলেন সিদ্ধার্থ রায় বাধা না দিলে তিনি আজ কংগ্রেসেই থাকতেন।

আজ যে পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস বিরোধী একা বিনষ্ট হল এর অন্ত দায়ী প্রফুল্লবাবু। প্রফুল্লবাবুদের যুক্তি আজ পশ্চিমবাংলা তথা সারা দেশে জনতা হাওয়া বিব্রাজ করছে। কাজেই তাদের বেশী আসন পাওয়ার কথা। যুক্তিতর্কের খাতিরে যদি একথা মেনে নেওয়া যায় তা হলেও একটা প্রশ্ন করা যায়। লোকসভার নির্বাচনের ঘোষণার পরপরই দেশে কোন জনতা হাওয়া ছিল না। আর পশ্চিমবাংলায় জনতা পার্টির তখন কোন সংগঠনই ছিল না। জনতা পার্টির সেই ধারণা সময়ে পশ্চিমবাংলায় সি, পি, এম, তাদের পুনরুত্থিত হতে ছেড়ে দিয়ে কম উদারতার পরিচয় দিয়েছিল? কাজেই আজকে জনতার বাঘার যখন রমরমা বলে তাঁরা ভাবছেন

সাধারণ মানুষকে উত্তাক্ত করার দামে ৩০ সনে নৃপেনের বিরুদ্ধে সি, ডি, আক্ট প্রয়োগ করা করা হয়। কিন্তু ও গা ঢাকা দেয়। ৬১ সনে পুলিশ ওর বিরুদ্ধে "প্রক্রেমেশন এণ্ড গ্রায়েন্ট অর্ডার" জারী করে। এসবের নৃপেন বিভিন্ন স্থানে ছলচাতুরী করে চোরা-গোপ্তাভাবে বাহাজানি হামলা ইত্যাদি অব্যাহত রাখে। অপূর্ববাবুর ভোল পাণ্টানোর সংগে সংগে নৃপেনও বড় বহলায়। ৭২ সনে অপূর্ববাবুর স্পীকার মনোনীত হন।

দেখা যায় অপূর্ববাবু সংগে হাওড়ার কুখ্যাত দাসী সি, ডি, আক্টের নৃপেনও "বিধানসভার পরিচয় চক্রে" প্রবেশ করেছে। শুধু তাই নয় কয়েকদিনের মধ্যে দেখা গেলো নৃপেন অপূর্ববাবুর ঘর জাঁকিয়ে বসেছে।

পদস্থ অফিসারটি জানান, নৃপেনের ব্ল্যাকমার্কেটিং, চুরি, জোচ্চুরি, বাহাজানি, মহিলা-সংক্রান্ত নানা অপকর্মের কথা রাজ্যের বরাই দপ্তর ভালোরকমই জানেন। তাদের নির্দেশেই একবার নৃপেন সম্পর্কে এক বিস্তারিত রিপোর্ট লেখানো পাঠানো হয়।

তারা সি, পি, এম-এর সঙ্গে সম্মানজনক শর্তে আসনের যীমাংসা করতে পারলেন না? নাকি তারা ভেবেছেন যে মাথার উপর কেল আছে তাই এখানে বা খুশি তাই করা যাবে? ওপরের একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। ওপরে গিয়ে যে কি হাল হয় তা ইন্দিরা গান্ধী আর তার কংগ্রেস খুব ভালভাবে বুঝে। প্রফুল্লবাবুদের কি এতে শিক্ষা হয় নি? প্রফুল্লবাবুদের আরেকটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়। সেটা হচ্ছে যে গুণামী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে জনতার যোগ দিচ্ছে কেন? কই তারা সি, পি, এমে তো যোগ দিচ্ছে না? তবে কি এটাই ধরে নেব যে গুণামী বুঝে গেছে যে গুণামীর অন্ত উপযুক্ত জায়গা

এন টি সি

(২য় পৃষ্ঠার পর)

out administrative irregularities like out of the way promotions and finding berths for officials from other undertakings have caused dismay in the ministry. The CBI is reportedly keeping an eye on one on two officials of the subsidiary against whom there are allegations of irregular practices. All this will be independently enquired into by the Government.

পুলিশই সর্বোত্তম।

(१५ प्रश्नवि पत्र)

তাকে জেলে পাঠান - হল, আশ্রয়দে
সমর্থনের কোনো সুযোগই তিনি
পেলেন না। তাঁর স্বামী শ্রীগৌতম
স্বাধা এখন বর্ধমান জেলে বন্দী
আছেন। অঞ্জনা গৃহ, লজিকা গৃহ,
গৌরী চ্যাটার্জীকে হঠাৎ বাড়ী থেকে
ভুলে নিয়ে আসা হল। কি হল, কেন
হল—এই বিহ্বলতা কাটিয়ে ওঠার
আগেই নেমে এল তাদের গুণের অত্যা-
চার। একটানা ছাব্বিশ দিন। জেলে
এসে শুভলেন তাঁদের বিরুদ্ধে কতক-
গুলো কেস দেওয়া হয়েছে। আবলেন
কেন বখশ দেওয়া হয়েছে বিচারকের
সামনে একবার না একবার উপস্থিত
করা হবেই। কিন্তু তিন মাস পর
তাঁদের বিরুদ্ধে কেসগুলো ভুলে নিয়ে
মিসা করা হল। আজও তাঁরা
কোমোডরনের বিচারকের সামনেই
উপস্থিত হতে পাবেননি এক পুলিশ
ছাড়া।

পুলিশই সব। আগে পিছে
স্বাক্ষর্যমে কেউ কোথাও নেই।
ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত ও অস্বাস্থ্য
অনেক রোগে শয্যাশায়ী বাষট্টি বছর
বয়স্ক। শান্তিরাবী মেবকে ডাক্তারের
নির্দেশ সত্ত্বেও বাইরের হাসপাতালে
ভর্তি করা হয় নি, কারণ পুলিশের
অহুয়োদন ছিল না। শেষে যখন
তার জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে তখনই
তাকে অনেক টালবাহানার পর এস
এস কে এসে ভর্তি করা হয়।

পুলিশের ইচ্ছা অনুসারেই রীতা
 যারকে যখন ইচ্ছে হয়েছে জেল থেকে
 পুলিশ কাঠিভিড়ে নিয়ে বাওয়া হয়েছে।
 কোনো আইনের প্রয়োগন হয়নি।
 শোনা যায় গুয়ারেট নামে কয়েকটা
 কাগজ আছে সেগুলোই বন্দীর হয়ে
 আইন কাহ্ননের বেড়া পার হয়। রীতা
 রাসকে ধরে অস্ত্র নামে রেখে দিল
 পুলিশ। আর জেলের কাগজপত্রে
 দেখা গেল তার ধরাপাড়ার তারিখ
 লেখা হয়েছে সে প্রকৃত পক্ষে যেদিন
 ধরা পড়ে তার পনের দিন পরের।

আমরা রাধের অভিজ্ঞতাও একই।
কারখানার কাজ করতেন। বাড়ী
এসে শুনলেন পুলিশ এসেছিল।
কোর্টে গেলেন খবর কি জানতে।
পুলিশ ধরে ভেলে পুরে দিল। এক-
বছরের মধ্যে তিনবার মাজ আদালত
প্রাকর্ণে উপস্থিত হতে পেয়েছেন,
বিচারকের সামনে কখনও নয়।

মিতালি ভট্টাচার্যেরও একই
অভিজ্ঞতা। যেদিনীপুরে ধরা পড়ার
পর থেকেই তিনি পুলিশকে বলতে
শুরু করেন কলকাতায় তার বাড়ী,
কলকাতার ভেলে যেন তাকে পাঠিয়ে
দেওয়া হয়। মাস পাঁচেক পরে
কলকাতায় তাকে পাঠান হল সত্যিই,
কিন্তু অনেকগুলো কেস দিয়ে।

শিবানী চক্রবর্তী তাঁর এটালী
 ষড়যন্ত্র মামলায় জামিনের জন্ত
 যেই চেষ্টা শুরু করেছেন ঠিক তখনই,

এই সেদিন ৩০শে এপ্রিল তাঁকে
জানানো হল ব্যাংকপুর কোর্টে তাঁর
আর একটা কেস আছে এবং সেটা
নাকি আছে ৭৩ সাল থেকেই।

“বেল করবেন? কটা জায়গায়
বেল করবেন, আমাদের আঙে ৩৬টা
থানা।” পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের
শিক্ষাপাট্রিক এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক
বাড়ীর ‘লোকে’ই বলতে হয়েছে
“খেটে খাওয়া মানুষ আমরা।
আমাদের তো কালো টাকা নেই।
৩৬টা থানায় বেল করব কি করে।”

শৈৱাচাৰী শাসন পুৰিণেশ্বৰ হাতে
সমস্ত ক্ষমতা দিয়েছে। তাই বীৰাঙ্গী
সেন জামিন পেয়েও বেরোতে চান
না এ যুক্তি নিতান্তই শৈৱাচাৰী শাসন
সম্পৰ্কে অজ্ঞতাগ্ৰস্ত। একথা সবাই
জানেন বাইৰে আছে আত্মীয় স্বজন
আৰ বিয়াট সংখ্যক মাছবৰ ভালবাসা,
আছে মুক্ত আকাশ আৰ বাতাস, অস্ত
দিকে মেল হ'ল শৈৱাচাৰী শাসনৰই
একটা হাত নিপীড়ন চালানোৱা যন্ত্ৰ
—অত্যাচাৰ, অবমাননা, বন্দীত্ব।
বহুৱপুৰ, ধৰ্মদম, মেদিনীপুৰ, আলি-
পুৰ স্পেশাল প্রজু তি জেলে বন্দী
হত্যার কথা কে না জানে। ৭০এৰ
জেলেৰ দিনশঞ্জীৱ প্রতিটি পৃষ্ঠা জেল
কৰ্তৃপক্ষের সঙ্গে মকশালবন্দীদের
সংঘর্ষের কাহিনীতে ভৰা। জেনানা
কাটকে এই কাহিনীৰ ব্যতিক্রম নয়।
কলনা বহু, রাজশ্রী দাসগুপ্ত সহ
অনেকেই ওই জেনানা কাটকেই
অজ্ঞকার, অস্বাস্থ্যকর সেলে দীৰ্ঘ দীৰ্ঘ
দিন ধৰে আটক রাখা হয়েছিল।
কৰ্তৃপক্ষের দুৰ্ব্যবহার আৰ আক্রমণের
শিকার হয়েছিলেন ওখানকার
মহিলা বন্দীরাও—অসংখ্যক। হীতা
রায়েৰ, মাধৱ অনেকগুলো সেলাই
দিতে হয়েছিল জেল কৰ্তৃপক্ষের আক্রমণ
জনিত ঘটনায়।

যুগান্তরের সংবাদদাতার যুক্তি
আরও হস্তাকর থেকে যখন স্তন্যে
পাই মীনাক্ষি সেনকে স্বয়ং পুলিশ
যখন তাদের ইচ্ছে হয়েছে জেল থেকে
লালবাজার নিয়ে গেছে। যার
সবটাই বাইরে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে না
থেকে জেলের মধ্যে থাকলেই বেশী নয়
কি ? মীনাক্ষির বিরুদ্ধে ‘সি-এয়ারেটের’
অর্ডার থাকতেই তিনি বোরোতে
পারেননি।

পুলিশের ইচ্ছাই সব, ছাকিমের
 রায় নয়। তাই আমিন পেলেও বেরোন
 অস্বার্থে রাজনৈতিক বন্দীর পক্ষেই
 সম্ভব হয় নি। আদালত আমিন দিলে
 কি হবে? পুলিশ আর একটা কেস
 দিয়ে আটকাবে। পুলিশের ঘরে
 কেসের অভাব নেই আর। তাদের
 আছে ৩৬টা ঘানা।

প্রফুল্ল সেন

(१५ प्रश्नार्थ संज्ञ)

সি, পি, এম, নয়, কংগ্রেস অথবা
অনতা? অনতা নেতারা, এর কি
ব্যাখ্যা দেবেন? এর পয়েন্ট তারা
কি করে সি, পি, এমের বিরুদ্ধে কুৎসা
প্রচার করেন?

ইন্দিরা বিরোধিতা বা কংগ্রেস বিরোধিতায় আসল ভূমিকা পশ্চিম-বাংলায় মোটেই জনতার নয়। এটা সি, পি, এম.এর এবং নকশালদের। প্রফুল্লবাবুদের কটা ছেলে। ইন্দিরা গান্ধীর পুলিশের হাতে মারা গেছে। কটা ছেলে তাদের অত্যাচার সহ্য করেছে। তাদের ছেলেই ছিল ন। তা অত্যাচার কি সহ্য করবে। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে অত্যাচারিতের তালিকায় সবই সি, পি, এম, আর নকশাল। ছেলে পিটিয়ে মারা, পাড়া থেকে উৎখাত করা, রাতের অন্ধকারে বাড়ী থেকে ডেকে এনে হত্যা ইত্যাদি সব বড়ই তাদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। এদের জীবনের করুণ পরিণতি এরা এখনও বহন করে চলেছে। এর উর্দোনদিকে ছ' একজন স্থলীল থাকার প্রেষার মোটেই গুরুতর ব্যাপার নয়। কাজেই আজ ইন্দিরা গান্ধী আর কংগ্রেসের অবসানে ক্ষমতার সিংহভাগ তারা পাবে কেন? এতো হতে পারে না। কষ্ট করবে একদল, লালুনা সহ্য করবে একদল আর সুদিন এলে ক্ষমতা দখল করবে আরেক দল, তা কি করে হয়? প্রফুল্লবাবুরা তো অরপ্রকাশের খুব ভক্ত। পাঁচাত্তরের দোসরা এপ্রিল কলেজ স্ট্রীটে অরপ্রকাশের মিটিং ভেঙে দেওয়ার প্রতিবাদে ছুনের পাঁচ তারিখে ব্রিগেড থেকে যে মহা মিছিল বের হয় তাতে প্রফুল্লবাবুদের ক'জন লোক ছিল? সবই তো সি, পি, এম-এর। কাজেই পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস বিরোধিতা সংগঠিত করার ব্যাপারে আসল ভূমিকা সি, পি, এম-এর। একখাটা জনতা নেতারা মনে রেখেই বেন আগামী দিনে তাদের কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যান। নচেৎ, অন্য আরগার কথা বলতে পারবো না, পশ্চিমবাংলায় তাদের ডুবতেই হবে।

ডি এন লাহিড়ী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আজীব। শ্রীমাহিড়ী সর্বভারতীয়
কেন্দ্রে তার সংযোগ এবং প্রভাব খুবই
বাড়িয়েছেন। তিনি নিঃসন্দেহে
করিতকর্য, কেননা "দেশসেবার" মধ্যে
দিয়েও তিনি সুযোগ্য ভাবে পাইও-
রীয়ার স্থিতি এও ছিল কনগ্রেস প্রাইভেট

লিমিটেড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাই-
রেক্টর, যার বাবাসত ও কলবাতে দুটি
ফ্যাক্টরী আছে, আরো রবেছে দুটি
ব্রাঞ্চ বোর্ডে ও বেনারসে। দেশসেবা
এবং ব্যবসা দুটিকে এক হাতে চালানো
কম যোগ্যতার কথা নয় ?

কিন্তু মুক্তিঙ্গ হয়েছে যে জনতা পার্টির অনেকেই শ্রীলাহড়ীকে গ্রহণ করতে পারছেন না। এর মধ্যে অনেক বিপ্লবী আত্মত্যাগী রয়েছেন, যারা বলতে চাইছেন যে এখন আর বিশৃঙ্খলা বাড়ার সময় নয়। ব্যবসা বাড়ারও সময় নয়। কংগ্রেসী শাসনে-বিগত ত্রিশ বছরে সমাজের যে অবস্থা হয়েছে তার পরিবর্তন আনা জরুরী। তারা বলতে চান রাজনীতি ও ব্যবসায় মধ্যে দুই মেরুর ব্যবধান। কেননা, এক রয়েছে ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষার উদ্বুদ্ধ, অন্ডের হচ্ছে সামাজিক স্বার্থ। জনতা পার্টি সভ্যদের তাই ব্যবসা থেকে দূরে থাকতে হবে। সঞ্জয় গান্ধীর বন্ধু কমল নাথের মতো ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের নাকি আগমন ঘটছে জনতা পার্টিতে। তাই জনতা পার্টির অনেকে ভীত হয়ে পড়ছেন এই ভেবে যে যদি এই সব ব্যবসায়ী এবং যুব কংগ্রেসের মস্তানরা জনতা পার্টিতে যোগ দেয়, তাহলে ইন্দিরা কংগ্রেসের পরিণতিই তাদেরও ঘটবে। জনতা পার্টি নেতৃত্ব ঘোষণা করছেন বারবার যে তাদের গঠনতন্ত্রে এমন কোনো কানুন নেই যাতে কোনো সদস্তপদ অস্বীকার করা যায়। কিন্তু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জনতা পার্টিতে যোগ দিতে চাইলে, তাকেও কী নেয়া হবে ?

বহরমপুর জেল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হলো, ঐ বন্দীটি জেলায়ের রাজিকা-
লীন রাউণ্ডের সময় শুয়েছিল, মাথায়
বস্ত্রপায়।

আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাতের
ব্যাপারেও সমস্ত সুযোগ-সুবিধে
কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সেই জালের
ব্যবধানে দেখা সাক্ষাতের চিড়িয়া-
খানার নিয়ম চলছে অবধি। বহু
দূর দূর থেকে আসা বাড়ীর লোক-
দেরকে হয়রানি করার ব্যাপারে
অনেক ডেনুটি জেলার দফা হয়ে
উঠেছেন। কলকাতা থেকে ভোরের
লালগোলা প্যালেঞ্জারে বহরমপুর
এসে যে কষ্ট ভোগ করেন আত্মীয়-
স্বজন বন্দীদের দেখার জন্য, তা জনতা
সরকারের আমলেও হচ্ছে দেখে বন্দীরা
সব বিস্মিত।

সোমবার প্রকাশিত হচ্ছে

ରାୟ ଶାନ୍ତିସନ୍ଧାର ମାତ୍ର ବହୁତ

ভোট দেওয়ার আগেই অবশ্য পড়ুন

এতে সিদ্ধার্থ রায় মল্লিকভার পাঁচ বছরের ছুটি ইনোভেটিভ অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বক্সী নির্ধাতন, শিল্প লংঘনিত্তির ওপর দমনপীড়ন, সংবাদপত্রের ওপর আক্রমণ, প্রশাসনের, বণেচ্ছাচার সহ রায় মল্লিকভা স্বেষ্ট্রি নেপথ্য পটভূমিকার সাধে থাকছে বিগত পাঁচবছরের কংগ্রেস দলের আত্মকলহের ঘৃণা ইতিহাস।

লিখছেন : প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডঃ অশোক সিং,
কবি-সাংবাদিক সমর সেন, পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে বহু পুস্তকের লেখক প্রবীণ
সাংবাদিক স্বর্গজিৎ বার, প্রখ্যাত সাংবাদিক অধীর চক্রবর্তী, মটনাট্যকার
উৎপল দত্ত, সত্যযুগ সম্পাদক জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলকান্ত দাস, তরুণ
সেনগুপ্ত, ও নিতাই মুখোপাধ্যায়।

उत्पादना.—शरीर वायु

দাম—তিন টাকা মাত্র

পরিবেশক :

গ্রাশানাল বুক এজেন্সি

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

নাচন রোড, বেনাচিতি, দ্বর্গাপুর-১৩'

सम्पादक—हीरेन बन्धु

সম্পাদক কর্তৃক হীদালী প্রেস, ১২৩১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত। এর মূল্য কার্যনির্বাহী ৩১ নম্বর কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

গুপ্তা পার্টি কংগ্রেস সারা রাজ্যে খুন ও সন্ত্রাস চালিয়েছিল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এবারও কংগ্রেস আসন্ন বিধান সভা নির্বাচনে সি, পি, আই (এম) বিরোধী খেউর নিয়েই আসন্ন মতি করবার চেষ্টা করছে। ওয়া জানে, এই খেলা পুরোনো এবং এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রচার যে জনমনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না তার প্রমাণ ৬৭-র কুংসার বিরুদ্ধে ৯১-এ সি, পি, আই (এম) এর বৃহত্তর শক্তি অর্জন এবং ৬৯-এর কুংসার বিরুদ্ধে ৭১ সালের নির্বাচনে (লোকসভা এবং বিধানসভা) বৃহত্তম দলের গৌরব লাভ। ৭২-এর মধ্যবর্তী নির্বাচনের কেলেকার পুনরাবৃত্তি না করাই ভাল। দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, জনতা পার্টির রাজ্য নেতৃত্বও বামপন্থীদের সঙ্গে সমঝোতার না এসে নির্বাচনী প্রচারে সি, পি, আই (এম)-এর বিরুদ্ধে উন্নত কুংসার পশরা নিয়ে নেমেছেন। এমন কি বাঁকড়া জেলার পাথরবন্দী গ্রামের মৃৎস হত্যাকাণ্ডের কোন প্রাথমিক তদন্তও হবার আগেই প্রবীণ নেতা বিজয় (শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



প্রশান্তবিহারী গান করছেন। কলকাতা হাইকোর্টের শতবার্ষিকীতে তাঁকে গান করতে দেখা যাচ্ছে।

প্রার্থী মনোনয়ন ও টাকা পয়সার ব্যাপারে কংগ্রেসে তুমুল বিক্ষোভ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কংগ্রেসের প্রার্থী মনোনয়ন থেকে শুরু করে নির্বাচনী রসদ যোগানোর ব্যাপার পর্যন্ত সর্বত্রই পক্ষপাতিত্ব ও গোষ্ঠী রাজনীতির অভিযোগ উঠেছে।

মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে প্রিয়দাসমুন্সীর ভূমিকায় অনেক কংগ্রেসী ক্ষুব্ধ, এমনকি তাঁর সমর্থকরাও।

প্রিয়দাসের নিজের জেলা পশ্চিম দিনাজপুরেও প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে কর্মীরা ক্ষুব্ধ। প্রিয়দাস এই জেলাতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডাঃ জয়নাল আবে-

দিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উপস্থিত দাবীদারদের বঞ্চিত করে খেয়াল খুশী মত নিজেদের বংশবৃদ্ধ প্রার্থীদের মনোনয়ন দিয়েছেন। এমন কি গতবারের নির্বাচিত এম এল এ প্রবোধ সিংহ রায়েকও মনোনয়ন দেন নি।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গংগা-রামপুর কেন্দ্রে জয়নাল আবেদিনের ভাগ্যকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে জেলার স্থপারিশ অগ্রাহ্য করে। ফলে এই কেন্দ্রে জেলার ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব মিত্র জেলার

যুব ছাত্রদের সমর্থন নিয়ে বিজোহী প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই কেন্দ্রের বেশীর ভাগ কংগ্রেস কর্মীই বিপ্লব মিত্রকে সমর্থন করছে। ফলে কংগ্রেসের সরকারী প্রার্থীর অবস্থা খুবই খারাপ।

জয়নাল সাহেবের নিজের এলাকা ইটাহারেও বিজোহী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

আলদহ, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলাতে (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

মুখ্য নির্বাচনী অফিসার দায়িত্ব পালনে অক্ষম?

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

কয়েকটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের কয়েকজন আমলা আলোচিত ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। বলা বাহুল্য এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব দায়িত্ব তিনি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার। গত লোকসভা নির্বাচন ও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার হলেন প্রমদচিৎ প্রবীণ সেনগুপ্ত। ১৯৭১ সালে মুখ্য নির্বাচনী অফিসার ছিলেন শ্রীবি, এস, রাঘবন। ১৯৭২-এ ছিলেন শ্রীদিলীপ গুহ। তিন জনই আই, এ, এস। শ্রীরাঘবন ভাল বাংলা জানতেন, যোগ্যতার সঙ্গে দপ্তরের কাজ ও নির্বাচনের কাজ পরিচালনা করেছিলেন। দিলীপবাবু সম্পর্কে এটুকুই শুধু পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিই ৭২-এ নির্বাচনে রিগিং-এর পর লোকমুখে তিনি বেশ আলোচিত। গত বছর হুগুলা গুহর রহস্যজনক মৃত্যুর পর

সাঁউথ পয়েন্ট স্কুলের খবরে যখন সব সংবাদপত্র সরব, আর সত্যীকান্ত গুহর ববীন্দ্র গুহর প্রাপ্তি নিয়ে যখন কলকাতা বুদ্ধিজীবী মহলে তোলপাড় তখনও শিলা কলিশনার, দিলীপবাবু বিশেষ আলোচিত ব্যক্তি।

উপক্রমণিকা ছেড়ে আসল কথা

আসি। প্রাক্তন কংগ্রেসী সরকারের আমলে প্রমদচিৎ রথীন্দ্রবাবু প্রমদচিৎ ডাঃ গোপালদাস নাগের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন বলে শোনা যায়। সিকিয়ারে ভারতভুক্তির পর সেখানকার প্রথম নির্বাচন পরিচালনার অভিজ্ঞতা

(শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

দর্পণের বিশেষ সংখ্যা

দর্পণের বিশেষ নির্বাচনী সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে আগামী বুধবার। এতে থাকবে সিদ্ধার্থ রায় সরকারের অকৃত্রিম ও চক্ৰবর্তী সম্পর্কে তথ্য, পাঁচ বছরের কংগ্রেসী দুঃশাসনের কাহিনী যুক্ত ফ্রন্ট শাসনে পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনী সমীক্ষা, অস্তিত্ব সংবাদ, কার্টুন প্রভৃতি। তাছাড়া এই সংখ্যায় সঙ্গে থাকবে পুস্তকাকারে একটি জোড়পত্র যাতে পাশাপাশি দেওয়া হবে ১৯৭১

ও ১৯৭২ সালের নির্বাচনের কলাকল এবং ১৯৭৭ সালের প্রার্থীদের তালিকা। ৭১ ও ৭২ সালের নির্বাচনী কলাকল তুলনা করে দেখলেই পাঠকরা বুঝতে পারবেন ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে কি বিরাট আকারে রিগিং করা হয়েছিল। এই সঙ্গে থাকবে ৬৩ সালের জেলাস্তিত্তিক কলাকল।

এই সংখ্যার নাম 'টাকা

চৌরঙ্গী কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী বিচারপতি পি বি মুখার্জির দুর্নীতির তদন্ত রিপোর্ট

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হাইকোর্টের বিচারপতি সমাজের কলকাতা হাইকোর্টের অস্ত্রতম প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় আগামী নির্বাচনে চৌরঙ্গী কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী। কিন্তু এই প্রশান্তবিহারীর আসল রূপটি কি? আপনারা কি জানেন, ইনি যখন কলকাতা হাইকোর্টেই অস্ত্রতম বিচারপতি ছিলেন তখন ১৯৭২ সালে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি একটি তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রশান্তবিহারীকে বরখাস্ত করার স্থপারিশ করেছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি এস আর দাস তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরাই-মন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্ডের কাছে ১৯৫৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর একটি ডি. ও চিঠিতে প্রশান্তবিহারী সম্পর্কে বলেছিলেন, "বেসব ঘটনা ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে চূড়ান্ত শাস্তি বরখাস্তই ওই প্রাপ্য তবে অপমান প্রদানোব অন্তে ওকে পদত্যাগ করতে বলা যেতে পারে।" কিন্তু লজ্জার কথা, প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করেননি, বরং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দোহাই দিয়ে তিনি নিজের পদটি জঁকড়ে বসেছিলেন। বিচারপতিদের নিয়মিত উপেক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট জজেরা পদত্যাগ করেন।

তদন্ত বিচারপতিকে ডিঙিয়ে এ, এন, রায়েক সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি করায় বিচারপতি হেগড়ে ও বিচারপতি সেলাট পদত্যাগ করেছিলেন। সেদিনও বিচারপতি ধারা সুপ্রীম কোর্ট থেকে পদত্যাগ করলেন। বেননা তাঁর নিয়মিত উপেক্ষা করে বিচারপতি হামিলা বেগকে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ করেছিলেন কংগ্রেসী সরকার। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি প্রশান্তবিহারী কিন্তু আত্মমর্দাদার ধার ধারেননি। ওই নিয়মিত উপেক্ষা করে পর পর দুজন বিচারপতি এইচ, কে, বহু, ও বিচারপতি ডি, এন, সিংহকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে। প্রশান্তবিহারী সেই অসম্মান বিনা প্রতিবাদে হজম করেছেন। তারপর অনেক তদ্বিরের পর কংগ্রেসী সরকার ওকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করেছিলেন।

প্রশান্তবিহারীর বিরুদ্ধে তদন্ত করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের অস্ত্রতম প্রধান বিচারপতি কলদারজনা দাশগুপ্ত। অভিযোগ ছিল, তিনি দুবছর (শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

খুন ও সন্ত্রাস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সিং নাহার মহাশয় সি, পি, আই, (এম)-কে দোষী সাব্যস্ত করে ভাষণ দিলেন। কংগ্রেসের কথা না বলাই ভালো। তবুতো খেউর গাইবেই কিন্তু প্রফুল্লবাবু বিজয়বাবুসহ মাত্র ৩ মাস আগেও (লোকসভা নির্বাচনের প্রাকালে) বিগত কয়েক বছরে সি, পি, আই (এম)-এর ওপর কংগ্রেসীদের নির্মম হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন। রাতারাতি আবার সেই সি, পি, আই (এম)-এর নিন্দার তাঁরা মুবরিত হলেন কেন? প্রফুল্লবাবু বারবার ৬১ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে দারী করছেন খুন ও সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য। কংগ্রেসের নিন্দা তিনি এবং তাঁরা করছেন ঠিকই কিন্তু তাঁরা একবারও কংগ্রেস সরকারের বিগত কয়েক বছরের খুন ও সন্ত্রাসী রাজনীতির উল্লেখ করছেন না। জনতার রাজ্য নেতৃত্ব কি তাহলে কংগ্রেসের সঙ্গে নেপথ্য আভ্যন্তর কোন চেষ্টা করছেন?

এবারের নির্বাচন অর্থাৎ ষষ্ঠ সাধারণ বিধান সভা নির্বাচনের সঙ্গে এই রাজ্যের মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন জড়িত। স্বভাবতই বিচার্য খুন এবং সন্ত্রাস রাজ্য রাজনীতিতে আমদানী করেছে কারা, কংগ্রেস না সি, পি, আই (এম)? এ কথা ঠিক যে যুক্তফ্রন্টের আমলে শরিকী সংঘর্ষের ফলে কিছু কিছু হত্যাগাজনক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সেই সংঘর্ষের নেপথ্য রহস্য কি? বাংলা কংগ্রেস সি, পি, আই এবং এস, ইউ, সি দলের মিলিত চক্রান্ত কি এর জন্য কোন-অংশে কম দায়ী? এ কথাও মিথ্যা নয় যে, সি, পি, আই (এম)-এর কিছু কিছু ক্যাডারও সে সময় উদ্ভূত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাদের কেউ তো মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পিঙ্গল আর ছুরি হাতে নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরে বেড়ায় নি বক্তব্য নেশার। শরিকী সংঘর্ষে তো ঘটনো হয়েছে। এবং সেই সংঘর্ষও সীমাবদ্ধ ছিল জমির সীমানায়। পরবর্তীকালে যা ঘটেছে তা ছিল সি, পি, আই (এম) নকশালপন্থী সংঘর্ষ এবং সেই সংঘর্ষের নেপথ্য বাশ ছিল তৎকালীন শাসক দল কংগ্রেস এবং পুলিশের হাতে। হত্যার পর হত্যা যা তৎকালে ঘটেছে তার প্রায় সবগুলোই আজও রহস্যবৃত্ত কিন্তু বাজারী কাগজগুলোই তৎকালীন শাসক দলের এই চক্রান্তকে মদত দিয়ে এইসব হত্যার জন্য সুপারিকল্পিতভাবে কোন-ক্ষেত্রে নকশাল এবং কোন ক্ষেত্রে সি, পি, আই (এম) ওপর চাপিয়ে আসল সত্যকে চাপা দিয়েছে। সি, পি, আই (এম) সহ সমস্ত বামপন্থীদলই এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেছে বারবার। সিদ্ধার্থ সরকার তদন্তে রাজী হয় নি। এর কারণ নিশ্চয়ই দুর্বোধ্য নয়। এবার একটি তুলনামূলক তথ্য উদ্ধৃত করছি।

সারা পশ্চিমবঙ্গের কথা বাদই দিলাম। শুধুমাত্র বর্ধমান জেলার কথাই আগে বলছি, কারণ সাইবাড়ীর ঘটনা নিয়ে কংগ্রেস এবং বাজারী সাংবাদিকরা ৭০ থেকে আজ পর্যন্ত সি, পি, আই (এম)-এর বিরুদ্ধে কুংসা চালিয়ে

যাচ্ছে। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে একমাত্র বর্ধমান জেলাতেই কংগ্রেসী গুণ্ডারা পুলিশী প্রহার খুন করেছে ২৩২ জন। এর মধ্যে ৩ জন মহিলাও আছেন। সাইবাড়ীর ঘটনায় সি, পি, আই (এম)-কে আসামীর কাঠগড়ার দাঁড় করিয়ে ৭১ এর নির্বাচনে নেবেছিল কংগ্রেস কিন্তু ৭১ সালের সাধারণ নির্বাচনে জেলার ৪টি লোকসভার আসন এবং ২৫টি বিধান সভার আসনে ২৪টি দখল করে সি, পি, আই (এম)। বর্ধমানের ৫০৩৭০ নং মামলা অর্থাৎ সাইবাড়ী মামলার যিনি প্রধান আসামী সেই বিমর কোড়ার এই নির্বাচনে জেলে বন্দী থেকেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বর্ধমানের ডাকসাইটে যুব কংগ্রেসী প্রার্থী তুহিন সামন্তকে ১৮২০০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। বর্ধমানে বিগত কয়েক বছরে যে নারকীয় বিভীষিকা চলেছে তার কয়েকটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করছি।

সাইবাড়ীর মামলার বিমর কোড়ারদেহ পক্ষের কৌশলী সর্বজনপ্রিয় ভবদীশ রায়কে ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল বেলা সাড়ে দশটার খানার ঠিক পেছনে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয়। ভবদীশবাবু কোর্টে আসছিলেন। খোস-বাগান রোডের ওপর গুণ্ডারা প্রথম তাঁর ঘাড়ের গুলী করে, সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গুলী করে কপালে। তাতেও খুনীদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ হলো না। গুণ্ডারা তাঁর দেহে ১০টিরও বেশী ছুরিকাঘাত করে। মজার কথা এই যে, খানার ঠিক পেছনেই ঘটনা ঘটলেও পুলিশ সেখানে আসে নি তত্ত্বাবধান পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না খুনীরা নিরাপদে স্থান ত্যাগ করেছে।

একই বছরের আগস্ট মাসে হত্যা করা হয় সাইবাড়ী মামলার অভিযুক্ত পক্ষের তদ্বিরকারী শিবশঙ্কর চৌধুরী ওরফে কালোদাকৈ। রাত ৯টার খানা থেকে ১০০ গজের মধ্যে তাঁকে হত্যা করে খুনীরা নিরাপদে চলে যায়।

৭১ সালের ২ জুলাই কালনা স্টেশনে পাশবিকভাবে হত্যা করা হয় কালনার সি, পি, আই (এম) নেতা মহাদেব ব্যানার্জীকে। খুনীরা তাঁর দেহে ৬৪টি ছুরিকাঘাত করেন। কিছুদিন পরই নির্মমভাবে হত্যা করা হয় কাটোয়ার মহিলা নেত্রী পূর্ণিমা ব্যানার্জীকে। এবার যুববদ্ধ আক্রমণের কাহিনী বলছি।

১৯৭১ সালের ১২ই জুন। খণ্ডঘোষ খানার অন্তর্গত আহ্লাদিপুর গ্রাম আক্রমণ করে কংগ্রেসী মস্তান বাহিনী। পুলিশ ছিল একটু পেছনে। কলে মস্তান বাহিনী প্রথম দিকে ঐক্যবদ্ধ গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের ফলে পিছু হটতে বাধ্য হয়। জীবন দেন শংকর মল্লী, আনসার মির্জা, সৈয়দ মির্জা এবং জালচাঁদ বান্দা। মস্তান বাহিনীর প্রধান পাণ্ডা নবকুমার সাইও গ্রাম নিয়ে কিংবদন্তি পড়ে নি। এর পরই বাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ। সেই বীভৎস কাহিনী অবর্ণনীয়।

১৯৭১ সালের ৩রা নভেম্বর সি, আর, পি, এবং কংগ্রেসী মস্তান বাহিনী মিলিতভাবে আক্রমণ করে মেমারী খানার চকদলারামপুর গ্রাম। সকাল ৮টার। ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে হত্যা করা হয় ৭ জন গরীব খেতমজুরকে। এরা হলেন- হরিপদ বাগ, কালিপদ বাগ, গোবিন্দ বাগ, নবী শেখ, এককড়ি মাল, গোপাল কোঁড়া এবং গোপাল মাল।

প্রফুল্লবাবু ৬১ সালে যুক্তফ্রন্টের সন্ত্রাসের কথা বলেছেন। ৬২ থেকে ৭১ সালের মধ্যে কংগ্রেসী মস্তান ও পুলিশ সি, পি, আই (এম) কর্মীদের হত্যা করেছে নিম্নলিখিত হারে : ২৪ পরগণা—১৬২, কলকাতা—১১৬, বর্ধমান—৮১, নুদীয়া—২৩, বীরভূম—৪, হাওড়া—৩৮, হুগলী—৩১, মেদিনীপুর—২, বাঁকুড়া—২, মর্শিদাবাদ—১০, পুর্নুলিয়া—২, মালদা—৭, পশ্চিম দিনাজপুর—১১, দালিমিং—২, ঢালপাইগুড়ি—২৩, কোচবিহার—৮ এবং সাহুল্যে ৫৪০ জন।

[আগামী সংখ্যায় এসম্পর্কে আরও তথ্য দেওয়া হবে]

পি বি মুখার্জী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হল ৩৬ নং বালীগঞ্জ পার্কের যে বাড়ীতে থাকেন তার বাড়ীভাড়া দেননি। দ্বিতীয়, এই বাড়ীটি তিনি হাইকোর্টের জজ হিসেবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে কম দামে কিনতে চেয়েছিলেন। চুটি অভিযোগই প্রমাণিত হয় এবং সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি এস আর দাস তার চিঠিতে প্রশান্তবিহারীকে বরখাস্ত করার সুপারিশ করেছিলেন। কম দামে এই বাড়ীটি কেনার অভিযোগটি আরো বেশী চাকল্যকর। তেইশকাঠা জমির ওপরে ৩৬ নং বালীগঞ্জ প্লেনের বাড়ীটির দাম হাইকোর্টের একজন অধ্যক্ষমণ্ডিত জ্য. লুয়ার দ্বারা করেছিলেন, মাত্র ৫৩,০৮৭ টাকা। তাই প্রধান বিচারপতি এস আর দাস বলেছিলেন, “বালীগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাবের একটু দূরে, ট্রায় লাইনের কাছে, অভিজাত এলাকার ২৩ কাঠা জমির দাম ৩৩,৫০০ টাকা দ্বারা একটি বিস্তৃত ঘর ঘটনা। ...এই বাড়ীটির বার্ষিক ভাড়া ছয় হাজার টাকা। নিম্ন অস্থায়ী হুড়ি বছরের ভাড়া যোগ দিলে বাড়ীরটির দাম হবে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। তাই ৩৬নং বালীগঞ্জ পার্কের বাড়ীর দাম ৫৩০০০ টাকার মতো বলা একটি আশ্চর্য ব্যাপার। তাই তদন্তকারী প্রধান বিচারপতির মর্মেত্রে সঙ্গে আমি একমত যে, কোনো ক্ষমতাবান লোককে হবিধে পাইয়ে দেওয়ার জন্যে এই রকম করা হয়েছে মনে করা ছাড়া আর কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা।” এই ক্ষমতাবান ব্যক্তিটি ছিলেন তদানীন্তন বিচারপতি প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়।

দর্পণের কাছে এই গোপনীয় রিপোর্টটি আছে। প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও প্রধান বিচারপতি থাকার সময় দর্পণ পর পর দুবার এই রিপোর্টখনন ছেপেছে। একবার দর্পণ কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিদের কাছে প্রকাশিত রিপোর্ট সম্পর্কে তাদের কৈফিয়ৎ (হুও মোটো) তলব করার জন্যে আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু, হুওয়ের কথা কোনো কল হয় নি। একজন অদাযু ব্যক্তিরূপে প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসন কলংকিত করে গিয়েছেন। এখন দাঁড়িয়েছেন বিধান সভার কংগ্রেস প্রার্থীরূপে। এখানেও সন্ত্রাসের পরিচয় দেন নি। ধর্ষণ দিয়েছিলেন জনতা পার্টির রাজ্য শাখার চেয়ারম্যান প্রফুল্ল সেনের কাছে মনো-নয়নের আবেদন নিয়ে। কিন্তু নিশ্চিত ছিলেন না। কেননা, মধ্যমরীকপে

প্রফুল্ল সেনের কাছে প্রশান্তবিহারীর আসল চেহারা অজানা ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসী মনোনিয়ন নিলেন। প্রফুল্লবাবুকে সিংহলেন, “আপনাদের মধ্যে এতো গোলমাল। তাই নমিনেশন চাইছি না।” কংগ্রেসী নমিনেশন পেতে ওর অহুধিধে হয় নি। কেননা, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কলকাতা হাইকোর্টের ব্যাটিকার। প্রশান্তবিহারীর আসল পরিচয় জানলেও হাইকোর্টের পুরোনো খাতিরে সিদ্ধার্থ রায় ওকে নমিনেশন পাইয়ে দিয়েছেন। এবার দেখা যাবে, কলকাতা হাইকোর্টের হুদাম কলংকিত করা প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়কে চৌরঙ্গীর ভোটাবরা ভোট দেন কিনা।

আরও একটি তথ্য এখানে পেশ করছি। প্রশান্তবিহারী ১৯৫২ সালের ২৪শে নভেম্বর সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি এস আর দাসকে লিখেছিলেন, “আমি এই বাড়ীটি কিনতে চাইনি কিংবা কেনার কোনো প্রস্তাবও নেই। বাড়ীটির মূল্য দ্বারা করার ব্যাপারে আমার কোনো দাবিও নেই।” কিন্তু আমাদের এখানকার খবর হচ্ছে প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় এই বাড়ীটি (৩৬নং বালীগঞ্জ পার্ক) কিনেছেন এবং এখন এখানেই আছেন। সত্যবাদিতার একটি নিদর্শন হচ্ছে প্রশান্তবিহারী ওর বিরুদ্ধে মেরেমাছুষ ঘটনানা কলংকারীর অভিযোগও সর্বভারতীয় সাপ্তাহিক কাগজে বেরিয়েছিল। এ সব উপেক্ষা করে বেহায়ার মতো উনি হাইকোর্ট আকড়ে ছিলেন। এখন এসেছেন জনসাধারণের দরবারে।

বিনা শর্তে মুক্তি দাবী

ইঞ্জিনিয়ারিং প্রমক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কপী বাগচী সহ দলমত নিবিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি দেবার জন্য চার শতাধিক কর্মচারীর স্বাক্ষর সম্বলিত এক আরকলিপি কেন্দ্রীয় প্রধান হজী ও খরাত মজীর নিকট পেশ করা হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং প্রমক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কপী বাগচী ১৯৭৫ সালের ১২ই জুলাই থেকে মিলার আটক আছেন। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়া সত্ত্বেও তাকে চিকিৎসার পরিবর্তে প্রেসিডেন্সী জেল থেকে পুর্নুলিয়া জেলা জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এবং ওখানে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ার পুনরায় আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে তাঁকে আনা হয়। এখন তিনি আলীপুর জেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

আরকলিপিতে উল্লেখ করা হয় যে, দলমত নিবিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত গণতন্ত্রের মর্যাদা বধ্যবধ ভাবে রক্ষিত হয় না। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি দিয়ে, সরকার তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করুন।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

১১ টাকার হার।

বার্ষিক ২২ টাকা

বার্ষিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠাবার ঠিকানা:

ম্যানেজার, দর্পণ

৬১, মট লেন। কলিকাতা ১৩

স্পীকার অপূর্ববাবু ও তাঁর সাগরেদ বাগদার পঞ্চরত্নের কীতিকলাপ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নির্বাচনের প্রাকালে বিধান সভার স্পীকার অপূর্ববাবু মজুমদার এবং নুপেন মজুমদারের কীতিকলাপের আর এক দফা বাগদা অঞ্চলের নিপীড়িত জনগণ আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। এই সমস্ত কীতিকলাপের সঙ্গে যারা জড়িত, তারা এই অঞ্চলে পঞ্চরত্ন বা পঞ্চরত্ন বলে পরিচিত। এই পঞ্চরত্ন হলো বাগদার ডাঃ অমূল্য রায়চৌধুরী, কুমোরখোলার অমূল্য বিশ্বাস, আউসডাঙ্গার চিত্ত রায়, আরামডাঙ্গার সুপদ আচার্য এবং হেলেকার বিমল বাগচী। এরা স্পীকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যে সমগ্র বাগদা জুড়ে এক তুঘলকের রাজত্ব কায়েম করেছে।

কুমোরখোলার অমূল্য বিশ্বাস কিছুদিন আগে জনৈকা সহায় সফল-হীন বিধবা শ্রীমতী উমিলা রায়ের ৫ কাটা পরিমাণ জমি কেড়ে নিয়ে তাকে পথে বসাতে এতটুকু বিধা করেনি। গত বছরে সরকারী ধানজমি এক অজুত উপায়ে বিতরণ করা হয়েছে। যারা জমি পাওয়ার বোগ্য তাদের ভাগ্যে জুটেছে ছিটেফোটা। কিন্তু এই পঞ্চরত্নের আত্মীয় স্বজন, পরিবারবর্গ এক এক-জনে বিশ থেকে ত্রিশ বিঘা জমি দখল করেছে। এই জমি বিতরণের সময় জমির মোরসী পাট্টা দেন, বিগত মহিলাসভার মন্ত্রী জরুগবাস্তি ঘোষ। কিন্তু এই টুকুই। পাট্টা নিয়ে উদ্বাস্তগণ কাগজে কলমেই জমির মালিক, কার্ভত মালিক পঞ্চরত্ন।

টেস্ট রিলিফের অর্ধেক এই পঞ্চরত্ন সহ নুপেন এবং পরোক্ষ অপূর্ব মজুমদার সমান ভাগীদার। টেস্ট-রিলিফের ১ লক্ষ টাকার মধ্যে কাজে লাগানো হয় ২৫ হাজার টাকা, বাকী টাকা সপ্তধির গর্তে। হেলেকা থেকেও সেই এক ধরন। পুতুর কাটা নিয়ে পুতুর চুরি হয়েছে এখানে। হেলেকা বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে একটা পুতুর খনন করার ব্যয় বলা হয়েছে ২৫ হাজার টাকা অথচ খরচ হয়েছে মাত্র পাঁচ হাজার। পুতুরে আঁচ ও জলের দেখা মেলেনি।

টাকা আত্মসাতের ঘটনা ভূরি ভুরি গ্রামীণ রাস্তা উন্নয়নের জন্ত পরকৃষ্ণ-চন্দনপুরে ৮ মাইল রাস্তা তৈরীর খরচ আদায় করা হয়, কিন্তু রাস্তা হয়েছে ৪ মাইল।

সমগ্র অঞ্চলে জায়া মূল্যে খাত বিতরণের জন্ত সর্ববিধ খাতের লাই-সেল হোল্ডার পঞ্চরত্নের দু-তিনজন।

এই লাইসেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খাত এনে বিতরণের কথা। কিন্তু তা না হয়ে সবটুকুই পাচার হয়ে যায় চোরাপথে। কয়েকদিন আগে বঙ্গবান থেকে দুপুরি চাল এনে পাচার করার সময় আমতালি খানার ও সি পান্ডাও করেন। কিন্তু যেহেতু স্পীকারের মাল, তাই কোন মামলা রুজু হয়নি। দুর্গা পূজার সময় রিলিফ হিসাবে (১৯৭৬) বিতরণের জন্ত বেশ কিছু চাল চিনি আনা হয়। কিন্তু বাগদার কোমলোকের ভাগ্যে তা জোটেনি। এ বিষয়ে জনমনে এক বিক্ষোভ দানা বাঁধে এবং তারা এই চাল চিনি আটক করেন। কিন্তু

সুযোগ্য ও. সি (বাগদা) অমূল্য দেব হনিপুণ হস্তক্ষেপে তা যথাস্থানে পৌঁছে যায়।

হেলেকা মান্টিপারপাস স্থল সাক্ষ্য বহন করে এক অরাজকতার। এই স্থলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বনগী দীন-বন্ধু কলেজের অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। বিশ্বাসবাবু বলেন ১৯৭৫ সালের পর থেকে একবারও এই স্থল কমিটির নির্বাচন সর্বসম্মত ভাবে ওরা হতে দেয়নি। সব সময় চলেছে গুণ্ডামী। এ ভাবে ক্ষমতা দখল করে প্রতি বছর বার্ষিক অমদান ৫০,০০০ টাকা আত্মসাৎ করা চলেছে। ফলে এই স্থল এখন বন্ধ হয়ে কয়েক শত ছেলের ও শিক্ষক

কালনায় পিনাকী-হত্যার কাহিনী : পুলিশ নির্বিকার দর্শক ছিল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দিনটা ছিল ৫ই আগস্ট ১৯৭১। ১৯৭১-র দিনগুলো সাধারণ মানুষের কাছে অজানা নয়। শুধু আতঙ্ক আর আতঙ্ক। মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রশাসনের সহায়তায় সারা রাজ্যব্যাপী হত্যাকাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। বহু ছাত্র যুবকই শিকার হয়েছিল যারা শোষণের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। তারা হরত আনডো না তথাকথিত আধীন ভারতের গণতন্ত্র বলতে কি বোঝায়। কিন্তু কত অরাজনৈতিক নিরীহ ছাত্র যুবকও যে এই সময়ে ও পরবর্তী সময়ে শিকার হয়েছে কে জানে?

এইরকমই এক নিরীহ ছাত্র পিনাকী চক্রবর্তী খুন হয় ৫ই আগস্ট ১৯৭১ সালে কালনায়। কিন্তু পিনাকীর বিধবা মা আজও উত্তর পাননি, কেন তাঁর ছেলেকে নৃশংসভাবে প্রকাশ্য পথে খুন করা হল? সে তো কারও ক্ষতি করে নি, সে তো রাজনৈতিক কর্মীও নয়। ১৯৭১-এর উক্ত সময়ে কালনায় একের পর এক খুন হয়ে চলেছে—লক্ষ্মী নায়ক, মহাদেব বানার্জী প্রভৃতি সি. পি. এম সমর্থক রাজনৈতিক কর্মীগণ। এই সময়ে সি পি এম কর্মীরা সচরাচর শহরের বকে চলাফেরা করে না। এবং সি পি এম-এর কর্মীদের পরিবারবর্গের সকলকেও খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। এমনকি বিভিন্ন অস্থানে মোটা অঙ্কের টাঁদা দিয়ে, পাড়ার উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের সম্মুখে রাখতে হয়। কালনার বকে যে সব যুবক তখনও আছে তারা হয় গুণ্ডাবাহিনীর কেউ,

নতুবা রাজনীতি থেকে নিজে থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চায় এমন কয়েকজন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর যুবক ছিল পিনাকী। পিনাকীর বাবা গোপীমোহন চক্রবর্তী আই সি আই-এর কর্মী ছিলেন এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী ছিলেন। তিন পুত্র ও দুই কন্যা রেখে তিনি অনেকদিন পূর্বেই গত হয়েছিলেন। যার কলে পিনাকীর মা তিনছলে ও দুই মেয়ে নিয়ে কঠিন দারিদ্র্যের সম্মুখীন হন। আই সি আই থেকে পুত্রের পড়াশুনার ভাতা তিন পেতেন। এইভাবেই সংগ্রাম করে পিনাকীর মা সংসারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছিলেন। পিনাকী ও তাঁর ভাই সুল ও কলেজ জীবনে কুঠী ছাত্র ছিল। এমনকি কয়েকজন সহস্র শিক্ষক বিনা অর্থে শিক্ষকতা করে অনেক সহায়তা করে ছিলেন তা দে র। পিনাকী পাট্টা গিওরিক্যাল পরীক্ষা কালনা কলেজে দেয় এবং পরে জানা যায় শতকরা ৬০ ভাগ নম্বর পায়। কিন্তু প্রায়কটিকাল পরীক্ষা আর দিতে হয়নি, তার আগেই যাকের নৃশংস ধা বা র পিনাকী এ অগণ থেকে অনেক দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়।

পিনাকী ভাবতেই পারেনি তার উপর আঘাত আসবে। সে প্রতিদিনের মত বৈকালে বেড়াতে বেড়িয়েছে এবং একটু ডাড়াডাড়া বাড়ি ফেরে, কারণ সে কিছু ছাত্র পড়ায় যাতে মাকে কিছুটা সংসারে সাহায্য করা যায়। কিন্তু বাড়ি আর ফিরতে হয়নি, কালনা সিঙ্কেবদী মোড়ে প্রকাশ্য রাস্তায় (৬-১৫ মি:) ঠিক সন্ধ্যার মুখে গুণ্ডারা

তার উপর কাঁপিয়ে পড়ে। আশে-পাশে বহু মানুষই ছিল, কিন্তু কেউই ভয়ে প্রতিবাদটুকু করেনি। কারণ যেখানে শান্তি রক্ষার জন্ত সি. আর পি. বাহিনী মোতায়েন ছিল এবং তাদের সম্মুখেই যখন হত্যাকাণ্ড হলো আর সেই সি. আর পি. যখন পিনাকীকে বাঁচাতে এল না, সাধারণ মানুষ কোন সাহসে ছুটে আসবে? হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত করে গুণ্ডারা আত্মগোপন করলো নেভাদের আত্মনায়। তার পরই কিছু বোমা ফাটানো হয় পাট্টা আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য। কিন্তু হয় কেই বা পাট্টা আক্রমণ করবে। পিনাকীর কয়েকজন বন্ধু সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং দেখে পিনাকী হত্যাগত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছে। তারা তৎক্ষণাৎ তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাবে বলে রিক্সা দেখতে থাকে। পরমুহুর্তে আর একদল গুণ্ডা বোমা ফাটানো ফাটানো ঘটনাস্থলে এগিয়ে আসে। তখন বহুরা পিনাকীকে ফেলে চলে যায় নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে। অপরদিকে গুণ্ডারা পিনাকীকে পুনরায় আঘাত করে।

তারপরই স্থপরিকল্পিতভাবে পুলিশবাহিনী বেরিয়ে পড়লো এই গুণ্ডাবাহিনীকে বাঁচাবার জন্ত, যদি কোন আঘাত আসে। এই শান্তি রক্ষক বাহিনী এমনই নিলজ্ঞ ও অমাহুষ যে ঘটনার পর ঘটনা পিনাকীর হত্যাগত দেহটা রাস্তায় পড়ে থাকা সত্ত্বেও একবার হাসপাতালে স্থানান্তর করার প্রয়োজন তারা বোধ করেন না। অবশেষে তারা থানার সামনে মাঠে পিনাকীর দেহটা ফেলে রাখে।

সন্ধ্যার পর জনমানবহীন রাস্তা। কেবল মাঝে মাঝে বোমের আওয়াজ আর পুলিশ ভ্যানের ছোট্টাছুটি। সারারাত কোন সংবাদ না পেয়ে সকালে পাগলিনীর ভায় ছুটেছেন পিনাকীর মা পুত্রের সন্ধানে। জানলেন থানায় আছে। ছুটেছেন সেখানে, দেখেন রক্তাশ্রুত পুত্রের অসার দেহ। স্থানীয় দারোগা পথরোধ করলেন এবং তাঁর পুত্রের প্রমাণ চাইলেন। নির্বাক হলেন মা। কাঁপিয়ে পড়লেন পুত্রের অসার দেহের ওপর এবং পুত্রের আঙুলটা কোথায় জানতে চাইলেন। আঙুলটিই পিনাকীর নাম লেখা আছে জানালেন।

মায়ের মুখে এক কথা, আপন-রাই আমার ছেলেকে খুন করেছেন। কেন? কেন?

নিঃ পিনাকীর মা এর উত্তর আজও পাননি। কালনার গণতান্ত্রিক মানুষের সর্ব জিজ্ঞাসা: পিনাকীকে কেন হত্যা করা হল? পুলিশ অফিসার সব জেনেও কেন হত্যার কিছুই করলেন না? তাঁর পুত্রও এ ব্যাপারে জড়িত বলে?

আজ পিনাকীর মায়ের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রী মানুষের বক্তব্য এই হত্যার তদন্ত করা হোক ও অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হোক। নতুবা এই অপরাধীরাই আবার সুযোগ পেলে পিনাকীর মায়ের ভায় অনেক মায়ের কোল থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে দেবে।

কর্মচারীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিয়েছে। শিক্ষক কর্মচারীগণ অনাহার অজ্ঞাহারে দিন কাটাচ্ছেন।

এই সর্ববিধ কার্যকলাপ স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের সাহায্যে বিনা বাধায় চলছে। এদের কেউ কেউ ভারত বাংলা দেশের মধ্যে চোরাই চালাবে লিখ। জানা গেছে এই সমস্ত বে-আইনী কার্যকর্ম বন্ধ করতে যখনই কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো, সঙ্গে সঙ্গেই কল-কাতা থেকে স্পীকার ফোনে বা সশস্ত্র হাঙ্গির হয়ে বলতেন এ আমার জিনিষ, আমারই কাজ, করেছেন কি? প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ দ্বিতীয় কামড়ে ভুল স্বীকার করতেন।

বাগদা সীমান্ত অঞ্চল, নীমান্ত পার্শ্ব লোকচলাচল বেশী এবং গুরুত্বপূর্ণ অপরিণীম। কিন্তু এ অঞ্চলের ব্যবসা চলে রাতের অন্ধকারে। চোরাচালান-কারীদের দোদগু প্রতাপ। তাই পুলিশ বা পুলিশকে নিরস্ত্র করতে

পারেন এমন ব্যক্তির সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। সেদিক দিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত বশব্দ স্পীকারের প্রভাব পুলিশ ও প্রশাসনের ওপর সব থেকে বেশী। তাই এ অঞ্চলে পুলিশ বা প্রশাসনে যারা আসতেন তারা জানতেন অপূর্ব মজুমদার মানাই সিদ্ধার্থ রায়। আর যারা গুর বিরোধিতা করেছেন বাগদার জল তাদের সহ্য হয়নি।

কিছুদিন আগে বাগদার সমস্ত জনসাধারণ স্পীকারকে কালো পতাকা প্রদর্শন করলে স্পীকারের অস্তচরিতা নিরীহ জনসাধারণের ওপর হামলা করে। জনসাধারণ তার প্রতিরোধ একযোগে শুরু করলে স্পীকার গুণ্ডা বাহিনী সহ বাগদা ছেড়ে পলায়নে বাধ্য হন। এমন কি বাগদা রক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীকালিদাস অধিকারীর সঙ্গে এ নিয়ে প্রচণ্ড বিরোধের হয়েছে সৃষ্টি।



বামপন্থী ফ্রন্টকে ভোট দিন

গত লোকসভা নির্বাচনে আমরা ইন্দিরার বৈরতন্ত্রী সরকারের পতনের জন্য জনগণের স্তায়সত্ত্ব আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে জনতা পার্টি ও ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থন দিয়েছিলাম, এবং ভোটবয়স্কদের আওয়াজ বৈরতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে এটা স্থানিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেছিলাম। আমরা এখনো সেই-সাইনের উপর দাঁড়িয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও সি, পি, আইকে পরাজিত করে গণতান্ত্রিক শক্তিশালীকরণে জয়যুক্ত করতে আস্তান করছি।

পশ্চিম বাংলার আমরা দুঃখের সঙ্গে দেখেছি গণতান্ত্রিক শক্তিশালীকরণে একদল স্বতন্ত্রকারী বিভেদমূলক কার্যকলাপ করেছে, যার ফলস্বরূপ জনতা পার্টি ও বামপন্থী ফ্রন্টের মধ্যে ঐক্য হল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন নির্বাচনে বামপন্থী ফ্রন্টকে জয়যুক্ত করার জন্য ডাক দিচ্ছি।

নতুন কেন্দ্রীয় সরকার, যে সব গণতান্ত্রিক পরিক্ষণ নিয়েছেন তা আমরা পূর্ণ সমর্থন করি। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দী মুক্তির প্রসঙ্গে যে রকম টালবাহানা শুরু করা হয়েছে তাতে ভারতীয় জনগণ নতুন সরকার সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ছেন। মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার কিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নটির সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দী মুক্তির প্রশ্নটি অস্বাভাবিকভাবে জড়িত। নিঃশর্তভাবে সব রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি ছাড়া পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

সত্যনারায়ণ সিং এবং তার কিছু কর্মকর্তা গত লোকসভা নির্বাচনে ভোট বয়স্কদের কথা বলেছিলেন এবং আজ শুধুমাত্র নকশালপন্থী রাজনৈতিক বন্দীদের সর্ভাধীনে মুক্তি চাইছেন তারা। একই ভাবে বারবার জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিভ্রান্তিমূলক কাজ করছেন। ভারতীয় জনগণের সহানুভূতিহার বিরুদ্ধে গিয়ে আমরা এবং অন্য কোন রাজনৈতিক বন্দী সর্ভসাপেক্ষ মুক্তি চাই না। বর্তমানে সারা ভারতে জনগণ বন্দী-মুক্তির জন্য যে আন্দোলন করছেন তা আমরা দৃঢ় ভাবে সমর্থন করি। শেষ বিশ্লেষণে সেই আন্দোলনই বন্দী মুক্তির প্রশ্নটির সমাধান করবে।

নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ভারতীয় জনগণের বিরাট আশা। আমরা আশা করি সেই ইচ্ছাপূরণের

জন সরকার বন্দীমুক্তির প্রশ্নটির দ্রুত মোমাংসা করবেন। হিংসা অহিংসার অসংস্কৃত প্রশ্নটি এনে টালবাহানা করবেন না।

রাজারাম চৌধুরী কাজল পাল তরুণ চক্রবর্তী অশোক ঘোষ অমলেন্দু সেন দীপক বসু বিমল রায়চৌধুরী (চতুর্থ টাইব্রুনেলে বিচারার্থী)।

কংগ্রেসী আমলে কলকাতা পৌরসভা

কলকাতা পৌরসভার দুর্নীতির ভীমরূপ চাকে আপনারা যে সার্থকভাবে খোঁচা দিতে পেরেছেন গত কয়েক সংখ্যায় তথ্যবহুল লেখার মাধ্যমে, স্বতন্ত্র মুখার্জী মণ্ড শান্তি কবল মূল কর্পোরেশনে এম্টি সজাগ চোখে বুঝেই সকলেরই তানজরে পড়বে। নতুন শাসকরা আসবার আগেই কমিশনার থেকে নীচে পর্যন্ত নব কংগ্রেসী সব চামচার অত্যন্ত সমস্ত হয়ে সব সামাল দিতে ব্যস্ত। শুধু যে দশহাজার কর্মপ্রার্থীর (যারা ১০ টাকা দিয়ে দরখাস্ত করেছিল ও পরীক্ষাও দিয়েছিল, কিন্তু চাকরী পায়নি) খাতা সরাতে ও মেরামত করতেই ব্যস্ত না, আরো যে সব মস্তানদের নিয়োগ করা হয়েছে বেআইনী ভাবে সমস্ত নিয়ম বিধি লঙ্ঘন করে, তা 'ঠিকঠাক' করার অপচেষ্টায় ব্যস্ত পুরা পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট। এছাড়া লম্বী ও অস্বাস্থ্য ঠোরপারচেছে যেসব দুর্নীতি ও বেআইনী লেন-দেন ঘটেছিল সেগুলি ঠিকঠাক করতে ওরা প্রায় ঘেরবার।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা-নাগরিকরা প্রায়ই যে কথা বলেন তার উল্লেখ না করে পারছি না। কর্পোরেশনের দুয়ারোগ্য অর্থাৎ অর্থকষ্ট থাকা সত্ত্বেও 'জরুরী অবস্থার' স্বযোগ নিয়ে ২ জনের 'হানে আড়াই হাজারী মাইনের ৭ জন ডেঃ কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছে। এঁরা কমিশনারের কাজগুলি করে দেন, যাতে কমিশনার সার্বক নিশ্চিন্ত অবকাশে 'ছবি-টবি' নিয়ে সময় কাটাতে পারেন—অফিসের কাছে যাতে তাঁর বিশ্রান্তিলোপে ব্যাঘাত না ঘটে। আর এঁরা কারা? কেউবা দালাল 'শ্রমিকনেতা', ধর্মঘট ডাঙার পুঙ্খবহু এই চাকরী উপহার পেয়েছেন; কেউ বা মজুর-নিকটাত্মীর বেআইনী প্রাণ পাশ করিয়ে দিয়ে এই পদ পেয়েছেন, কেউবা দরজা হাতে কংগ্রেসী বাড়ীগুলাদের ট্যাকস

কমিয়ে দিয়ে এই বখশিস লাভ করেছেন। এইখানে কলকাতাদের বক্তব্য যে ২ বছর আগে পর্যন্ত একজন কমিশনার ও ২ জন ডেপুটি কমিশনারে যখন কাজ চলতো তখন কর্পোরেশনের এই অর্থকষ্টের দিনে কেন এই মাথাভাঙ্গী শাসনব্যবস্থা? এই পাঁচজন সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ডেপুটি-কমিশনারের টাকায় ৫০ জন আরো মেথর কাড়বার বহি নিয়োগ করা যায়—তাতেই কলকাতার বন্দী মুক্তি হবেন। সত্যিই স্বতন্ত্র মুখার্জী এই চামচদের জন্য অকারণ অর্থব্যয় না করে কর্পোরেশনের মৌল কর্তব্যে বহি টাকাটা খরচ হয় তাহলে টাকাসিলিংও সম্ভাব্য বাচে।

অনেক পৌর কর্মচারী

মায়ের আবেদন

আমার শত্ৰুকে আজও কারাগারে হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে ভিলেভিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। হাঙড়া জেলে রাজনৈতিক জুঘাধেলার খোরাক প্রাণচকল কিশোর প্রবীর রায়চৌধুরীকে তার মায়ের বুকে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকার যে আগুন তার মায়ের বুকে জালিয়ে দিয়েছে, তার মত মায়ের বুকের জালা শত্ৰুর মা হয়ে আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। আমার শত্ৰুর মত বহু দেশপ্রেমিককে ছলে বলে কৌশলে আজও যে সকল অশুভ শক্তি কারাগারের অন্ধকারে ঠেলে রেখে দেশদ্রোহিতার পরিচয় দিয়ে চলেছে আমার মত মায়েরা তথা সমস্ত অদেশবাসী তাদের কমা করবেন না।

১৯৭০ সাল থেকে শত্ৰুকে পুলিশ বাধা করে ঘর এবং চাকুরী হলে থেকে পালিয়ে বেড়াতে। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে মাত্র ১০২০ বছর বয়সী শত্ৰুকে পশ্চিমবঙ্গের পেনশাল ব্রাঞ্চ এর পুলিশ প্রেষ্টার করে। পুলিশ হামতে ও কারাগারের অন্তরালে অকথ্য নিধাতন চালানো হয় তার ওপর। লর্ড সিন্হা রোডের এস, বি., অফিসে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে প্রহার থেকে শুরু করে বিভিন্ন পৈশাচিক অত্যাচারের শিকার হয় শত্ৰু।

শত্ৰু আজও কুখ্যাত কালাকানন মিসার অটক ববছে প্রেসিডেন্সি জেলে, আর ইন্দিরার খেচ্ছাচারের বর্বরতম অত্যাচারের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে 'জনতা সরকারের' রাজত্বেও। তাই পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতবর্ষের দেশপ্রেমিক মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার রূপ আজকের জোরালো দাবী সমস্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের (সাজাপ্রাপ্ত সহ) নিঃশর্ত মুক্তির জনতা সরকার অবিলম্বে ব্যবস্থা করুক।

স্বর্ণা দত্ত

গুণী চালনা ও হত্যার তদন্ত করুন

১৯৭০ সালের পর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে তথাকথিত জেল ভাঙ্গার ঘটনা উপলক্ষে পুলিশ নির্মম ভাবে লাঠি চালিয়ে, গুলী বর্ষণ করে অনেক তরুণ, যুবকের ভাঙ্গা প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছে। যারা নিহত হয়েছে তাদের অধিকাংশই নকশালপন্থী।

আমরা জানি বৃটিশ আমলে জেলে বন্দীদের উপর লাঠিচালনার প্রতিবাদে জনগণ বিক্ষোভে কেটে পড়েন। তদানীন্তন কংগ্রেসও এটাকে নির্মম বলে অভিযুক্ত প্রকাশ করে। কিন্তু কি আশ্চর্য বখন এই কংগ্রেসই শাসন ক্ষমতার অধিষ্ঠিত ছিল, তখন তাদেরই সরকার জেলে লাঠি চালিয়ে, গুলী চালিয়ে শত শত তরুণ যুবককে হত্যা করেছে, তাদের বিধে একটুও বাধেনি, সামান্ততম প্রতিবাদ তাদের মুখে শোনা যায়নি। তাদের এই অত্যাচারের শাস্তি ইতিহাসই তাদের

মাথায় তুলে দিচ্ছে, জনগণ তাদেরকে ইতিহাসের ডাঠবিনে নিক্ষেপ করেছে। নতুন জনতা সরকারের কাছে আমাদের আবেদন প্রতিটি লাঠি ও গুলী চালনার তদন্ত করুন এবং দোষী অফিসারদের শাস্তি বিধান করুন। তবেই নিহতদের মা, বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রী, সন্তানরা সান্ত্বনা পাবে এই ভেবে যে বারা ক্ষমতা পেয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে তাদেরকে শাস্তি দিতে জনতা সরকার পিছপা নয়।

এছাড়াও নকশালী আন্দোলন দমনের নামে সেই সময় পুলিশ নিবিচারে অনেক যুবককে ধরে নিয়ে গিয়ে সরাসরি গুলী করে হত্যা করেছে। আজকে জনতা সরকারের কাছে আবেদন এ ব্যাপারেও তদন্ত হোক এবং দোষী অফিসারদের শাস্তি বিধান করে নিজেদের ভাবমূর্তিকে উজ্জল করবেন।

শচীন্দ্রনাথ মিত্র

প্রাক্তন এম এল এর গুণা বাহিনীর হাতে সাংবাদিক প্রহৃত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শান্তিপুরের দৈনিক সংবাদপত্রের সাংবাদিক শ্রীসামন্তলক্ষ নন্দী গত ৩১শে এপ্রিল বেড়া এলাকা দিয়ে বাড়ী ফেরার পথে শহরের প্রাক্তন কংগ্রেসী সাস্পেন্ডেড এম. এল. এর কতিপয় গুণাবাহিনী দ্বারা ভীষণভাবে প্রহৃত হন। পরে শ্রীনন্দীকে স্থানীয় বাসপাড়ালো পাঠান হয়। শান্তিপুর থানায় সমস্ত ঘটনা জানানো হয়। প্রকাশ, কিছুদিন আগে শান্তিপুরের বেড়াপাড়া অঞ্চলে একটি "মিনি পাইপ গান অস্ত্রাগার আবিষ্কার" শীর্ষক একটি সংবাদ দৈনিক পত্রিকার প্রকাশ পায়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শ্রীনন্দীর উপর গুণা বাহিনী এই আক্রমণ চালায়। আক্রমণকারীদের মধ্যে একজন নাইটগার্ড শান্তিপুর পি এইচ থলুরের ওয়ারটার ওয়ার্কসের কর্মচারী বলে জানা যায়। বারা উপরোক্ত ঘটনার প্রেষ্টার হয়েছে এবং শান্তিপুর ওয়ারটার ওয়ার্কসের যে কর্মচারীর নেতৃত্বে শ্রীনন্দী প্রহৃত হয়েছেন তারা বেড়াপাড়া এলাকার বহু গুণামী ও অপকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকার শান্তিপুর থানায় তাদের নাম প্রথম শ্রেণীর ক্রিমিনাল লিটে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এছাড়া এই গুণাবাহিনী শান্তিপুরের সর্বপ্রকার অপকর্মের মেতা ও খুনের মামলার জড়িত প্রাক্তন এম. এল. এ অসমত্ব দে-র গুণাবাহিনী বলে সমাজে খ্যাত। নদীয়া জেলা প্রেস ক্লাব এবং আনালিষ্ট সংস্থা এক সভার শ্রীনন্দীর ওপর আক্রমণের

তীব্র নিন্দা করে জেলা শাসক ও পুলিশ হুপারকে অবিলম্বে গুণকর্মীদের প্রহার দাবী জানান। স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এই অসমত্বের তীব্র নিন্দা করেন।

দল বিরোধী কার্যকলাপে বহিষ্কৃত

শান্তিপুর পৌরসভায় সভাপতি নির্বাচনে গত ৩ই এপ্রিল জনতা ও বাম মোর্চার প্রার্থী শ্রীমিত্র বাক ভোট না দেওয়ার এবং কংগ্রেসের সাস্পেন্ডেড প্রার্থী শ্রীমমত্ব দে-কে ১০-১০ ভোটের ব্যবধানে জয়যুক্ত করতে নাহায্য করার বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির (ঠাকুরপন্থী) দলবিরোধী কার্যকলাপের দরুন শান্তিপুর পৌরসভার কমিশনার শ্রীবেত্তমাথ প্রামাদিক ও শ্রীসৌমেন্দ্রপ্রসাদ ব্রহ্মচারীকে পার্ট থেকে বহিষ্কৃত করেছেন গত ১০ই মে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশানুযায়ী।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব

শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী হলে গত ১৫ই মে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে এক অস্থগানে কলকাতার "দেশাত্মবোধক সংগীত পরিষদ" রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন। এই অস্থগানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ শুভকর চক্রবর্তী। তিনি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তার উপরে এক মনোজ্ঞ ভাষণ কেন।

কংগ্রেসী ও বামপন্থী ফ্রন্ট শাসনে পশ্চিমবঙ্গ

উবারঞ্জন ভট্টাচার্য

অতীত থেকেই বর্তমানের সৃষ্টি এবং ইন্দিরা কংগ্রেসের দশ বছরের ব্যক্তিচরী শাসনের ফসলই হলো ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষের অসহ। এই দশ বছরে যে নির্দয়তা, যে নৃশংসতা তা ক্রমে ছর্ব্বার হয়ে ওঠে ১৯৬৯ সাল থেকে। বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে ধ্বংস করার মুখ্য নায়ক তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী পদ্মবিভূষণ শ্রীমঙ্গল মুখোপাধ্যায় যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, তা আজো জীতিয় সঞ্চার করে। আমরা সাধারণ মানুষ যেন পদ্মবিভূষণ অঙ্গর মুখোপাধ্যায়ের হাতে দাখ্য ফুলার ঘুটিতে পরিণত হয়েছিলাম। পরবর্তী নায়ক ছিলেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তিনি ভেবেছিলেন যে বাংলার মানুষ অস্ত্র সমতুল, সেই হেতু রেশনের চাল খানিকটা বাড়িয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হবে। তিনি ময়দানের সত্য ঘোষণা করেছিলেন “আমি আনি আপনারা কী চান—হস্তায় রেশনে ঘেড় কিলো চাল।”

বখন বাংলার মাটিতে একটা আশার আলো দেখা গেলো ১৯৬৭ সালে পশ্চিম বাংলা বিধান সভা নির্বাচনে তখন আমরা সাধারণ মানুষ আশাবাসিত হয়েছিলাম। কেন এই আশা, যে আশা ১৯৬৭ সালের পূর্ববর্তী ইতিহাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, যে ইতিহাসের অর্থনৈতিক দিকের আলোচনা এখানে করছি না, কেন না ১৯৬৭ সালই ছিল পূর্ববর্তী ইতিহাসের প্রতিবাদ। আমি শুধু সেই ইতিহাসের খানিকটা অংশ এখানে আনিছি।

পুলিশী রাজত্ব

“পুলিশ বিভাগ পুষ্টিতে খরচ হইতেছে রাজস্বের ২৫ ভাগ। ১৯৫১ সালে পুলিশের অস্ত্র বরাদ্দ ছিল ৭ কোটি টাকা; ১৯৫৬ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১ কোটি টাকা।”

“সাধারণ গরীব লোকের উপর পুলিশের এতো দাপট বোধহয় বৃটিশ আমলেও ছিল না। গ্রামে ১০৭ ধারার অত্যাচার লাগিয়াই আছে, লোকে পুলিশের ভয়ে ভট্ট। শহরে বস্তীর অধিবাসী, ছোট দোকানদার, কেরিওলা ইত্যাদি সবাইয়ের দৈনন্দিন জীবনে পুলিশ প্রায় বিভীষিকার সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

“স্বাধীনতার নয় বৎসর পরেও বিনা-বিচারে আটক অথবা আইন অটুট আছে। পূর্ব পাকিস্তান পর্যন্ত এ-আইন প্রত্যাহার করিতে পারে, কিন্তু এই ঘণিত আইনের বেচ্ছা-

চাতিতা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার নিজেকে নিরাপদ মনে করেন না। ১৯৫৭-৫১ সাল পর্যন্ত মাত্র তিন বৎসরে প্রায় ৪৫০ জন রাজনৈতিক বিরোধীকে বিনা প্রমাণে মেলে আটক রাখিয়াছেন।

“তাহার উপর পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ “নিরাপত্তা আইন” আছে। মাত্র দুই-বৎসরের মধ্যে এই আইনের বলে ৫,৭৭৬ জনকে মেলে পাঠাইয়া তাহারা নিরঙ্কুশ জবরদস্তির ইতিহাস রচনা করিয়াছেন।

“তাহাদের পাইকারী প্রেষ্টার নীতি অনেক সময় বৃটিশ আমলকেও হার মানার। ১৯৫৩ সালে শ্রমিক ও কৃষিকারীরা কোনাস চাহিয়াছিলেন, তাই তাদের ৩৬১ জনকে প্রেষ্টার করিয়া মালিকদের মনোস্তম্ভিত করা হইয়াছিল। ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ করার অপরাধে মেলে পাঠানো হইয়াছিল ৪৬১০ জনকে। আর সংযুক্তি বড়বস্ত্রের [পশ্চিম বাংলাকে বিহারের সঙ্গে যুক্ত করার—লেখক] বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া হিংস্র প্রতিশোধে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল পশ্চিমবঙ্গের ১২ হাজার নাগরিককে—অর্থাৎ পূর্ব বঙ্গ ও সরকারী প্রতিহিংসার ভাণ্ডার হইতে রক্ষা পান নাই।”

“প্রথম পাঁচ বছরে ৪৭ জন নারী হত্যা করিয়া গবর্ণমেন্ট দমননীতিতে হাত পাকাইয়াছে। লতিকা প্রতিভা-গীতা বন্দনাদের রক্তের (দা গ) উকাইতে না শুকাইতে অস্ত্রপূর্ব-বর্তিনী মহিলাকে ঘরের মধ্যে গুলি করিয়াছে এই কলকাতা শহরে—উপলক্ষ ছিল। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দাবির বিরুদ্ধে জাম সঞ্চার। ষড়ঙ্গপুরে শ্রমিকদের ঘরে ঘরে ঢুকিয়া নারী-পুরুষ নির্বিচারে সকলকে আক্রমণ করিয়াছে—১২ বছরের অর্ধবৃদ্ধকে বেহাই দেয় নাই। তিন বছরের বালিকা শিশুকে মারিতে মারিতে পিতার কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া অজানা পথের মাঝখানে ফেলিয়া দিয়াছে, পিতাকে লইয়া গিয়াছে জেলখানায়।” (স্বত্ব: গণতান্ত্রিক ঐক্যের কর্মসূচী—১৯৫৬, পৃষ্ঠা ৩২ ৪০-৪১)। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনী ইচ্ছাহার।

হত্যা আর হত্যা

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬, এবং ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৬ এই অতীত ইতিহাসের প্রতিবাদই প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৭ সালে পশ্চিম বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে।

অতীত ইতিহাসের ব্যক্তিচরী শাসন ছর্ব্বার হয়ে এগুতে লাগলো। পশ্চিম বাংলা চলে বাবে কমিউনিস্টদের শাসনে—জনজীবন কমিউনিস্ট হলে ভয় নেই, মেয়ে-শিটে ঠাণ্ডা করা হবে, কিন্তু মস্তিষ্ক কমিউনিস্টদের হাতে দেয়া যায় না। তাই ১৯৬৯ সালে দুর্নীতি-প্রস্তু, ব্যক্তিচরী ইন্দিরা কংগ্রেস উত্তর ভারতের রাজনীতিকে এক দিকে কোণঠাসা ও অন্তরিকে ঐক্যবদ্ধ করে কেন্দ্রে শক্তিশালী হয়ে উঠলো এবং নজর দিল বাংলার চিরন্তন বৈপ্লবিক গৌরবকে ধ্বংস করতে। পশ্চিম বাংলা যেন সশস্ত্র সংগ্রামের মুক্তির-দুর্গ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বামপন্থী সরকারকে ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসেই উৎখাত করা হলো এমন এক অদ্ভুত নাটকের মধ্যে দিখে যা এই পৃথিবীর বুকে প্রথম মঞ্চস্থ হলো। তারপর হত্যার রাজনীতির দায়িত্ব অস্ত্রের কাঁধে চাপিয়ে নিজে যুগিষ্ঠির প্রমাণ করার দমন নকশাল থেকে সি পি এম দলের ওপর এলো। নকশাল এবং সি পি এম হলো “নন্দঘোষ”। তাই পূর্বতন কংগ্রেস এবং ইন্দিরা কংগ্রেস এই “নন্দঘোষের” উপর দোষ চাপিয়ে নির্বিবাদে চালালো হত্যা আর হত্যা, আর অনিশ্চয়তা। নকশাল ও সি পি এম নামের যথা দিয়ে চতুরভাবে ইন্দিরা কংগ্রেস আমদানী করলো কংশাল-রাজনীতি। এই কংশাল-রাজনীতি ক্রমেই উদ্ভাস হয়ে উঠলো দীর্ঘমেয়াদী খুনী বন্দীদের “মাকির” স্বযোগ দিয়ে, ঘুনের স্তম্ভ মেলে থেকে ছুটি দিয়ে, প্রধান মন্ত্রীর রিসার্চ এণ্ড এ্যানালিসিস উইংয়ের নির্দেশে এবং সি-আর-পির তত্ত্বাবধানে হত্যা আর হত্যার মধ্যে দিখে বিভীষিকার অনিশ্চয়তায়। ঘুমেতে যাওয়ার আগে কেউ জানে না যে কোথায় তার ঘুম ভাঙবে—লর্ড সিন্ধা বোড অথবা লালবাজারের কারাকক্ষে অথবা ভোরের অন্ধকারে ময়দানে বা গুলার ধারে একটি বা দুটি গুলির আভ্যন্তরে। আসলে যে ঘুম আর ভাঙবে না, চিরতরে ঘুমিয়ে পড়বে বাংলার যুবক সম্প্রদায়। কেননা, যুবকরাই তো সংগ্রামের অগ্রদূত।

এক এক করে কেবল হত্যা আর নির্যাতন, আমরা হারালাম সবোজ দত্ত, হেমন্ত বসু, স্বশীতল বারচৌধুরী জীবন মাইতি, বিবেক পাণ্ডা এবং আরো অনেককে।

সি-আর-পির তৎকালীন সর্বাধিমি: ইমদাদ আলীর বক্তব্যে জানা যায় যে ১৯৭০ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৭১ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত তেইশ হাজার উগ্রপন্থীকে বন্দী করা

হবেছিল। (স্টেটসম্যান, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১)। বায়াসতে যে এগারোটি যুবকের নাম পাওয়া গিয়েছিল কারা ভাদের হত্যা করেছিলেন? এবং কারা এই হত্যার একক অঙ্গসন্ধান কমিটির বিচারপতি জীটি পি মুখার্জীকে ছুরিকা-বাতে আহত করেছিল, যা থেকে এই বিচারপতি অঙ্গসন্ধান নিবৃত্ত হন। তেইশ হাজার যুবক যদি কেবল মাত্র বন্দী হয়, তাহলে নিহতের সংখ্যা কত? পাতনা সময় কালে শ্রীজ্যোতি বহুকে কারা হত্যা করতে চেয়েছিল—এবং কেন?

এই প্রত্যেকটি হত্যা সম্পর্কে বলা হতে লাগলো যে হত্যাকারী হলো alleged নকশাল অথবা alleged সি পি এম, এবং তা কোন অঙ্গসন্ধান ছাড়াই। কোনো প্রমাণ ছাড়াই ইতিহাসে আমরা তৈমুয়লদ, চেঙ্গিস খাঁ, মহম্মদ ঘোবী ইত্যাদি ইত্যাদি রাষ্ট্রনায়কের হত্যালীলার কাহিনী পড়েছি—পড়েছি বাল্যকাল থেকেই। এবং সেই অতীতের ইতিহাসকে যে আমরা বর্তমানের ইতিহাসে মিশে গিয়ে প্রত্যক্ষ করবো সে ভাবনা কখনো আসেনি। নকশাল বা সি পি এম আকাশ থেকে উড়ে আসা বা বিদেশ থেকে জুড়ে বসা কেউ নয়। বাংলার চিরচরিত কৃষ্টি ও সম্ভ্রাতার যে আভ্যন্তরীণ ভিত সেই চিরন্তন সমাজই তাদের উৎস। সমাজ হলো সকলের সম-অধিকার ভিত্তিক—এক থাকবে প্রাচুর্যের মধ্যে, অস্ত্রের স্তম্ভে নিঃস্বতা—এতো কোনো প্রাকৃতিক নিধান নয়। ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শও ছিল তাই। মুষ্টিমেয়ের সম্পদ বর্বনের সঙ্গে স্বাধীনতা নয়। ১৯২২ সালে পুরলা নবেম্বর দেওয়ানে অহুষ্ঠিত পোলিটিকেল কনফারেন্সে দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন ঘোষণা করেছিলেন: “The liberals fight shy of revolution. What is revolution but a part of that growth the totality of which we call evolution... Revolution means complete change and we want complete change. I am sorry most of our non-co-operator are still enamoured of parliamentary Government.”

“I dont want sort of Swaraj (Self Government) which will be for middle class alone. I want Swaraj for the masses. I dont care

for the bourgeoisie. How few are they.” [স্বত্ব: কমিউনিজম ইন ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা ৪৭]

ঠিক তদ্রূপ, নেতাজী স্বভাষচন্দ্রের ও আত্মা হিন্দু কোংয়ের জীবনীকার হিউ টর তার প্রিন্সিং টাইগার রচনার উল্লেখ করেছেন: “So Bengal dreamed dreams of Revolt, and her poet sang great songs of Freedom. These were the songs of Bose's boyhood.”

বাংলার চিরন্তন কবি কণ্ঠে সেই একই স্বর: “হাতুড়ি শাবল গাইতি চড়ায়ে ভাবিল যারা পাহাড় পাহাড় কাটা পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাতুড়ি তোমারে সেবিতে হইল যারা মজুর মুটে ও কুলি।”

অথবা “বাংলার মাটি দুর্জয় মাটি বুকে নিক ছবুত।”

অথবা “সহসা জানালায় দেখি হৃদয়ের স্রোতে জনতা মিছিলে আসে সংঘবদ্ধ প্রাণ অদ্ভুত রোমাঞ্চ লাগে সমুদ্র পর্বতে; সে মিছিলে শোনা গেল জনতার যুগ্মগায়ী গান।”

১৯৬৭ সালে সি পি এম তথা বামপন্থী ঐক্যে যে যুক্তফ্রন্ট, তার সরকার পরিচালনা ইন্দিরা কংগ্রেস চায়নি। তাই বতো বকমের হুজুত, মিথ্যা প্রচার, নির্ধাতন, ব্যক্তিচার সবই করেছিল। কিন্তু এই কয়েক মাসের শাসন থেকে আমরা পাই অনেক সাক্ষ্যের নিদর্শন। তার হ'একটা তুলে দিচ্ছি:—

যুক্ত ফ্রন্টের সাক্ষ্য

১৯৬৬ সালে পশ্চিম বাংলার মোট শ্রমিক সংখ্যা ছিল ১,৪৭,০১৪ জন, ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট শাসনে সে সংখ্যা দাঁড়ালো ২,৪৩,৬৮৬ জন। কয়েক মাসের ব্যবধানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ১,০৬,৬৭২ জন শ্রমিকের কর্ম সংস্থান বাড়িয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস শাসনে ১৯৬৫ সালে শ্রমিক সংখ্যা ছিল ১,৫৩,৩১৫ জন, কিন্তু ১৯৬৬ সালে তা দাঁড়ায় ১, ৪৭,০১৪ জন, অর্থাৎ ৬০০১ জন শ্রমিক বেকার হয়ে যায়।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে:—১৯৬৬ সালের পূর্বে ছাত্রিণ হাজার হেক্টর জমিতে চাষ হতো। কিন্তু ১৯৬৭ সালে সি পি এম ও বামপন্থী নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার চাষযোগ্য জমি পাঁচ লক্ষ সাতশটি হাজার হেক্টর বাড়ানো হয়। চাউল উৎপাদনের হার ১৯৬২ থেকে ১৯৬৩ এবং ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৫ সাল অবধি যথাক্রমে (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ

আনিংয়ের প্রশ্ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনার বাবার আগে টি, সি এবং টি, টি, ইদের প্রতি কড়া পক্ষের অসামান্য আচরণের দু'একটি তথ্য তুলে বলতে চাই। অনসাধারণ এ

সব তথ্য থেকেই বুঝতে পারবেন
বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের অত্যাচার এবং
জুলুম অসহ্য। অবস্থায় কোন পর্যায়ে
পৌঁছেছিল। ২৮, ২, ৭৫ তারিখে
বেলা প্রায় ১২টার সময় হাওড়া
প্ল্যাটফর্মের সজ্জিতকুমার দাস, অলোক
মুখার্জী, কে, সি, তরফদার, জি, বি,
গোস্বামী, এম, আর, বিশ্বাস এস, সি,
দেব, বি, এন, মিত্র প্রমুখ টিকেট
কালেক্টররা যখন মধ্যাহ্নকালীন
ভোজনের অন্ত ক্যান্টিনে যান তখন
হাওড়ার তৎকালীন সিনিয়র ডি, সি,
এস শ্রীআমেদ প্ল্যাটফর্মে এসে পূর্বোক্ত
টি, সিদের না দেখে শাস্তিধ্বংস
প্রত্যেকের ১ বছরের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ
করে দেন। অথচ এই টি, সিরা কিন্তু
পারস্পরিক বন্দোবস্ত করেই খেতে
গিয়েছিলেন। শেয়ালদার টি, সি
সমীর মুখার্জীকে বদলী করা হলো
সোনারপুরে। কারণ? কারণ,
বাহুতঃ সমীরবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ
এই যে, তিনি ডিউটিরত অবস্থায়
ইউনিফর্ম না পরে নাকি গল্প কর-
ছিলেন। কিন্তু, নেপথ্য কারণটা
অজ্ঞাত, রেলের আইনে প্রত্যেক ষ্টেশনে
নূনতম যা বা রাখা দরকার, তার
মধ্যে বুকিং কাউন্টারের সামনে ফেরার
লিষ্ট অথবা ভাড়ার তালিকা সংরক্ষণ
অজ্ঞাতম। বহু ব্যতীরা প্রায়শই
অভিযোগ করেন যে তাদের কাছ
থেকে বেশী ভাড়া নেওয়া হয়েছে।
এ ধরনের অভিযোগ প্রায় নিত্য
নৈমিত্তিক। শেয়ালদা ষ্টেশনে এই
ভাড়ার তালিকা নেই। সমীর
মুখার্জী ঐ ফেরার লিষ্ট সংরক্ষণের
দাবী আনিয়ে ছিলেন। ফলে
তৎকালীন সি, এস শ্রীএ আর
দেওয়ানজী খুবই কষ্ট হন এবং
বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করে
মুখার্জীকে বদলী করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ
করেন এবং, সমীরবাবুর ১ বছরের
ইনক্রিমেন্টও বন্ধ করা হয়। যদি
বলি সমীর মুখার্জী যেহেতু টিকেট
চেকিং ষ্টাফ এসোসিয়েশনের শেয়ালদা
বিভাগীয় শাখার সম্পাদক সেই হেতু
তাকে বদলী করা হয়েছে এবং শাস্তি
দেওয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষ কি তার
প্রতিবাদ করতে পারবেন? তবু জানি
তাঁরা প্রতিবাদ করবেন। কারণ
ইন্দিরা জয়ানার তাঁরা ঐশ্বর্যচাকরের যে
দীক্ষার দীক্ষিত হয়েছেন তার দাবীতেই
তা করবেন। সবচেয়ে চিন্তার কথা
এই যে, এই দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনই
এখনও জুলুম অবরোধ চালিয়ে যাচ্ছে।
পূর্ববর্তের প্রচাৰ বুলেটিনের মার্চ
৭৭ সংখ্যার কয়েকজন দক্ষ টি, সি,

ইব ছবি ছাপা হয়েছে—তাদের কর্তব্যপরতার প্রশংসা করা হয়েছে। এদের মধ্যে সি, কে, দে একজন। সবিনয়ে প্রশ্ন করি, শ্রীদের বিরুদ্ধে দিল্লী থেকে যে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত চলছিল, তার কি পরিণতি হল? সবিনয়ে কি প্রশ্ন করতে পারি সমীর মুখার্জীর সঙ্গে আরও যে ৩ জনকে বদলী করা হয়েছিল তার মধ্যে স্থানীয় নন্দীকে শেরালদার ফিরিয়ে আনলেও রাকী ৩ জনকে ফিরিয়ে আনা হলো না কেন? কারণ কি এই যে, স্থানীয়ের দাদা, বালীগঞ্জের আই, ও, ডব্লু ষার কাজ হচ্ছে বেলভেডিয়ার পার্কে রেলের অফিসারদের কোর্টাটারের তদারকি করা এবং সেই সুবাদে অফিসারদের সমুদয় করে তাইকে ফিরিয়ে এনেছেন? শেরালদার যে সি, এল. দেওয়ানজীর কারসাজিতে সমীরবাবুরা বদলী হলেন সেই দেওয়ানজীকে দুর্নীতির অভিযোগে বদলী হতে হয়েছে। যে সব টি, টি, ইদের ছবি ফলাও করে ছাপা হয়েছে সে সম্পর্কে কোন আপত্তি আমি করছি না। শেরালদার এডিশনাল সি, আই, টি, শ্রীএস, এস চ্যাটার্জীও আছেন। শ্রীচ্যাটার্জী স্বাক্ষর টি, টি, ই এবং চেংকি-এর স্বাক্ষরিত পদ্ধতি তাঁর করা হয়। অবশ্যই তিনি নগদ পুরস্কৃত হওয়ার আমি আনন্দিত। কিন্তু শ্রীচ্যাটার্জী কি দাবী করবেন যে তাঁকে প্রদত্ত এই পুরস্কার তাঁর কর্মক্ষমতার স্বীকৃতি? আদ্যেই তা নয়। হজে পারেনা। টি, টি, ইদের আন্তরিকতা এবং সত্যভাই যদি হয় পুরস্কারের মাপকাঠি তবে রানাঘাট হেড কোয়ার্টারের টি, টি, কর্তব্যরত অবস্থায় গাড়ী থেকে পড়ে নিহত হওয়ার সম্বন্ধে তাঁর ছবি অত্যন্ত সৌজন্যবশতও রেলের প্রচার বুনেটীন ছাপা হলো না কেন অথবা নিহত টি, টি, ই, এন, সি দাস মরণোত্তর পুরস্কার পেলেন না কেন? আমি আমি বিভাগীয় প্রশাসন এই মৃত্যুর দায়িত্ব অবৈধভাবে চেপে দিয়েছেন। কারণ এই দুর্ঘটনাটা ঘটে ৭৬ সালে জরুরী অবস্থার কালে। তখন টি, টি, ইদের ওপর কর্তাদের জরুরী দেওয়া ছিল গাড়ীতে চেন টানা হলে দুর্ঘটনাকারীর পেছনে টি, টি, ইকে ধাক্কা করতে হবে। ৩৬৭ আপ শেরালদা গেদে প্যালেস্জারে চেন টানা হলে এন, সি, দাস গাড়ী থেকে নামতে গিয়ে ক্যালভার্ট দিয়ে নীচে পড়ে যান কারণ বগীটি ক্যালভার্টের ওপর ছিল। ভাড়াভাড়ি নামতে হুটীভেদে অন্ধকারে

শ্রীক୍ରোড়ে লাগাতার ধর্মঘট

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিদেশী ঋণ প্রস্তুতকারক গ্র্যাক্সো
ল্যাবরেটরীজ (ই) লিমিটেডের আলি-
গড় ফুড ফ্যাক্টরীতে লক আউটের
প্রতিবাদে গত ১৬ই মে থেকে সারা
ভারত শাখা এবং ডিপো অফিসে
লাগাতার ধর্মঘট চলছে। কলকাতা
শাখা অফিসের গ্র্যাক্সো ওয়ার্কিং ইউ-
নিয়নের পক্ষ থেকে মালিকগোষ্ঠীর এই
একতরফা এবং প্ররোচনামূলক কার্য-
কলাপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ
জানিয়ে ম্যানিফেস্ট ডিবেক্টরের কাছে
স্বাক্ষরিত পিটিয়ে দাবী জানানো
হয়েছে অবিলম্বে লক আউট প্রত্যাহার
কর। ইতিমধ্যে কোম্পানী ছ-জন
রিপ্রেজেন্টেটিভকে অস্বাভাবিক ছাটাই
করেছে। তার প্রতিবাদে গ্র্যাক্সো
সেন্ট্রাল কমিটির পক্ষ থেকে হেড
অফিস এবং বোম্বাই ফ্যাক্টরীতে বর্ণা
এবং পর্যায়ক্রমে অনশন ধর্মঘটের
ডাক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখের
বিষয় সারা ভারতের গ্র্যাক্সো অফিস
এবং কারখানার ইউনিয়নগুলির মধ্যে

বধেই পরিমাণে কো অর্ডিনেশন না থাকায় আন্দোলন বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বা ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। কলকাতা শাখার সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউনিয়নকে (গ্ল্যাক্সো ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন) সেক্ট্রাল কমিটি অত্যন্ত অসহ্য কারণে মনোনয়ন না দেওয়ার উক্ত ইউনিয়ন সক্রিয় ভাবে আন্দোলনে অংশ নিতে পারেনি, কিন্তু মালিক গোষ্ঠীর অন্ত্য এবং অবিচারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত তীব্র এবং কঠোর প্রতিবাদ জানাচ্ছে। গ্ল্যাক্সো ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে সারা ভারতে ৫০০০ হাজার কর্মীর যেখানে ভবিষ্যত জড়িত সেখানে সেক্ট্রাল কমিটির কোন কোন শাখা অফিসের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউনিয়নকে স্বীকৃতি না দিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন সংগঠিত করার পরিকল্পনা শুধুমাত্র অন্ত্য নয়, অবিবেচনাপ্রসূতও বটে।

পুলিশী অত্যাচারের বিক্ষা

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত
জৈন মন্দিরে অসুষ্ঠি গণতান্ত্রিক নাগ-
রিক অধিকার রক্ষা সমিতির সভায়
পুলিশী অত্যাচারের নিন্দা করে
কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব-
গুলিতে বলা হয়েছে নিম্নোক্ত নাগরিক-
দের পুলিশী হেঁকাজত থেকে মুক্তি
দিতে হবে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে
পুলিশী জুলুম বন্ধ করতে হবে, পুলিশ
কর্তৃক নারী নির্ধাতন বন্ধ করতে
হবে, দোষী পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে
অবিলম্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ
করতে হবে। সমিতি কর্তৃক প্রচারিত
এক ইস্তাহারে 'গণতান্ত্রিক জনগণের

প্রতি আহ্বান' জানিয়ে বলা হয়েছে
কংগ্রেস দলের উপদলীয় সংঘর্ষে
কলে এই এলাকায় জনজীবনে অসা-
ভাবিক অবস্থা বিদ্যমান করেছে।
আশেপাশের গ্রামের বহু মানুষ
পুলিশী অত্যাচারের ভয়ে বাড়ীঘর
ছেড়ে বনে বাগানে রাজি যাপন
করছেন। পুলিশ শতাধিক নিরীহ
মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে। সবচেয়ে
আশ্চর্যের বিষয় যে সব কংগ্রেসী
এ সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করেছিল
বর্তমানে তারাই পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে
ঘোরাফেরা করছে।

রাজ্যের নির্বাচনী দপ্তর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিম্নে রথীন্দ্রবাবু রাজ্যের লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন পরিচালনার কিছুটা যোগ্যতা ও তৎপরতার পরিচয় দেবেন এটা আশা করা গিয়েছিল। যুগ্মের কথা, তিনি রং-বেরঙের বেশবাস ও চলন-বলনের চটক নিয়ে ব্যস্ত। আসল কাজের ব্যর্থতা বুঝনি নিয়ে ঢেকে ভদ্রী দিয়ে লোক-ভোলাতে চাইলেন। এই অভিযোগের কারণ-গুলি একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জিটি, বামীনাথন ক'দিন আগে কলকাতা সফরে এলে বামপন্থী ফ্রন্টের প্রতি-নিষিদ্ধা তাকে ডুপ্লিকেট ভোটপত্র ছাপা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে অনুরোধ করেন। জিটি বামীনাথন আশ্বাস দিয়েছেন সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হবে যাতে এমন অন্তর্ভাবিক কাণ্ড আর না ঘটে। অথচ, গত লোকসভা নির্বাচনের সময় ডুপ্লিকেট ভোটপত্র উদ্ধার নিয়ে যখন

রাজনৈতিক মহল ও সংবাদপত্রে ভোল-পাড়, তখন রথীন্দ্রবাবু ঘটনাটি নেহাৎ স্বাভাবিক ঘটনা বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। ডুপ্লিকেট ভোটপত্র ব্যবহৃত হবে না বললেই যেন মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের দায়িত্ব মিটে গেল। রাজ্যে নির্বাচনে ব্যাপক রিগিং-এর অভিযোগ উঠলো। পুনরায় ভোট গ্রহণ হ'ল মাত্র তিরিশটি ভোট কেন্দ্রে।

এতো গেল আসল ভোট পর্বের কথা। নির্বাচন সংক্রান্ত খবরা-খবর দেখুন। ৩০শে মে এ-প্রতিবেদন লেখবার সময় পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের পূর্ণ প্রার্থী তালিকা সরকারীভাবে প্রকাশিত হয় নি। অল্প সময়ের মধ্যে নির্বাচন হচ্ছে, সেটা সব রাজ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বাকী সব রাজ্য পারলো, পশ্চিমবঙ্গ এখনো পারলো না কেন? আর

আরবী সিলেকশন মিলছে না

(দর্পণের সংবাদদাতা)

১৯৭৭ সালের পঁচ মাস প্রায় কেটে গেল, কিন্তু এখনও আরবী সিলেকশন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করলেন পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু ছাত্র সংস্থার একজন প্রতিনিধি। তিনি বললেন, এই বই সরবরাহ করার দায়িত্ব মধ্য শিক্ষা পর্ষদের। কিন্তু পর্ষদ এই বই ছাপার দায়িত্ব প্রকাশক-দের উপর ছেড়ে দিয়েছে। এর ফল

নিবেদন

অনিবার্য কারণে এই সংখ্যা এবং আগামী সংখ্যায় ধারাবাহিক রচনা "মহাভারতের স্বর্গ ও দেবতা" প্রকাশ করা যাচ্ছে না। আগামী ১৭ই জুন থেকে এটি আবার নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

ভোগ করতে হচ্ছে হাই মাস্টার্স এবং মাধ্যমিক স্কুলের প্রায় দশ হাজার ছাত্রছাত্রীকে।

প্রকাশকদের কাছ থেকে খোজ নিয়ে জানা গেল - তাঁরা পর্ষদের পক্ষ থেকে ছাপার কোন অঙ্গমাত্র পাননি এ বৎসরের অঙ্ক। শুধু এ বৎসর কেন বেশ কয়েক বৎসর ধরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলছে। কিন্তু কেন বোর্ড এই ভাবে কিছু ছাত্রের জীবন নিয়ে হিনিমিনি খেলছে? কেনই বা পর্ষদ এই বইটা নিজেদের দায়িত্বে ছাপছেনা? বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত সমস্ত সাহিত্য রচনা বোর্ড ছেপে থাকে তখন শুধু আরবী সাহিত্য কেন ব্যবসারীদের হাতে তুলে দেয়, মুষ্টিমেয় ব্যবসারীকে কালোবাজারীর হযোগ করে দিয়ে?

পশ্চিমবঙ্গ মাস্টার্স ছাত্রদের পক্ষ থেকে ত্রিকিরোজ হোসেন জানান, যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী ১৯৭৮ সালে হাইমাস্টার্স বা মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে তাদের অধিকাংশই এখনো বই পাচ্ছেনা বলে তাঁরা কাছে অভিযোগ করেছেন, বিভিন্ন স্থল ও মাস্টার্সার শিক্ষকরা। এই বই যাতে ছেলেরা হুঁ ভাবে পায়, এবং বোর্ড যাতে নিজেরা এই বই প্রকাশের দায়িত্ব নেয়, তার অত্র তারা পর্ষদ এবং শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে একটি স্মারকাদিাপ গৌণ করবেন বলে মাস্টার্স ছাত্রদের তরফ থেকে ত্রিকিরোজ-হোসেন এবং সংখ্যালঘু ছাত্র সংস্থার পক্ষ থেকে প্রয়োজন হ'ক জানিয়েছেন।

আশ্চর্য ঘটনা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত ২৪মে এক আশ্চর্য ঘটনা দেখলাম হাওড়ায়। ৫৮-নং বাসে একটা ছেলে (শুধু) একটি মেয়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। দুজনেই একপাড়ার থাকে। সেখানে এ পাড়ার একটা ছেলে প্রতিবাদ করলে, কিছুক্ষণের মধ্যে লাঠিসোঁটা রড ছুরি নিয়ে প্রাস্তন কংগ্রেসীদের হু হু বাহিনী কাঁপিয়ে পড়ে। দেখলাম স্থানীয় থানার ও, সি, এবং কয়েকজন কর্মচারী সিলিং ড্রেসে দূর দূর করে দূর থেকে দেখছেন। অনেক পরে চাপে-পড়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তখন থানার দেখা যায় কংগ্রেসী তুর্কি উৎপল ভৌমিককে। হার জনতা।

প্রার্থী বা আসন সংখ্যা উত্তরপ্রদেশ বা বিহারে তো পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক বেশি। ২১শে মে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার দিন তরেকের মধ্যে মনোনয়নপত্র দাখিল, প্রত্যাহার, মোট প্রার্থী-সংখ্যা ইত্যাদির খবরাখবর সব রাজ্যের নির্বাচনী দপ্তর দিতে পেরেছে। পারে নি রথীন্দ্রবাবু দপ্তর। গত লোকসভা নির্বাচনের পর কয়েক লক্ষ ভোটাভাড়া বেড়েছেন। ভোটাভাড়ার পাকাপাকি সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের এখনও কেউ জানেন না।

রথীন্দ্রবাবুকে আমাদের জিজ্ঞাস্য— বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যের নির্বাচনী দপ্তর যে কাল রথীন্দ্রবাবুকে শেষ করতে পারে পশ্চিমবঙ্গে তিনি কেন তা পারেন না। নির্বাচন সংক্রান্ত জরুরী খবরগুলো তিনি কেন সরবরাহ করতে অক্ষম? সরকারী দপ্তরে শুধু কেতা-কায়দা-কৌশল এক যোগ্যতা নির্ণয় ও মজুর প্রিয়পাত্র হবার পথ?

নাসবন্দীর শিকার

মুশিবাবাদ জেলার হুজি ব্রুকের আহিরণ গ্রামের গণেশচন্দ্র দাস নামে এক ব্যক্তি সম্প্রতি নাসবন্দীর শিকার হয়ে মারা গিয়েছেন। তিনি কয়েক মাস আগে নাসবন্দী করান, তারপর থেকেই তাঁর মাথার গোলমাল দেখা দেয়। কয়েক মাস তিনি উন্মাদ হয়ে ঘুরে বেড়ান।

বহু আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও তিনি সেন্টাল হাসপাতালে যেতে পারেননি পরসর অভাবে ও সরকারী আমগানের অবহেলায়।

কংগ্রেস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রিয়বাবুদের মনোনয়ন দানের নীতি দলীয় কর্মীদের ক্ষুদ্র করেছে। কলে কর্মীরা সর্বত্রই হয় বলে গেছেন, নতুবা চাপানো প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিরোধ ঘোষণা করেছেন।

এরপর নির্বাচনে প্রার্থীদের টাকা পরসর দেওয়ার ব্যাপারেও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করেছেন অনেক প্রার্থী। প্রত্যেক কংগ্রেস প্রার্থীকে দুই হাজার টাকা ও পঁচ হাজার পোষ্টার দেওয়ার কথা কংগ্রেস অফিস থেকে বলা হয়েছে। কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেসের অফিসিয়াল গ্রুপের সমর্থক প্রার্থীদেরকে আরও অনেক বেশী সাহায্য করা হচ্ছে। আবার কাউকে কিছুই দেওয়া হচ্ছেনা। কলে প্রার্থীরা ক্রমেই বীভৎশ হয়ে ভোটের আগেই সাময়িক দিক থেকে পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

একর প্রতি-৪২৭ কেজি ৩.৪৫২ কেজি চাউল উৎপন্ন হতো। কিন্তু ১৯৬১ সালে সি পি এম ও বামপন্থী নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার চাউল উৎপাদনের রেকর্ড তুটি করেছেন: The output of rice touched an all-time high of 6.35 million-tones—the highest among the States of India. The potentialities in the sphere of jute cultivation are also inspiring. [পশ্চিম বাংলার ইতিহাস, রাজনৈতিক পর্ব, ১৯৪৭-১৯৭১, পৃ: ১০৩]

কলকাতা ট্রাম কোম্পানীর বহাল তবিয়তে লভ্যাংশ গুণে গুণে বিলতে পাঠাচ্ছিল। সি পি এম এবং বামপন্থী নেতৃত্ব ইংরাজ মালিকানার ট্রাম কোম্পানীকে জাতীয়করণ করলেন, বা কোনো কংগ্রেসী সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। [পশ্চিম বাংলার ইতিহাস, রাজনৈতিক পর্ব ১৯৪৭-১৯৭১ থেকে গৃহীত]

সি পি এম তথা বামপন্থী নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার উৎপাদনের ক্ষেত্রে সামান্য সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছেন। আঠাশ বছরের একটানা শাসনে কংগ্রেস যা করতে পারেনি বামপন্থী নেতৃত্ব তা করতে পেরেছেন। কংগ্রেস শাসনের ব্যাপারে কয়েকটি মতামত এখানে তুলে দিচ্ছি: West Bengal's decline started with independence and along with it or as a result of it, other state of the eastern region suffered. The centre's deliberate policy began bearing fruit even from the first plan. The congress was in power in the state till '67 and Dr. Bidhan Chandra Ray was Chief Minister for most of these years. [উল্লেখ করতে হয় যে ১৯৬২

সালের ২রা জুলাই ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পর ত্রিপ্রকল্পের সেন মহাশয় ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে পরাজিত হবার পূর্ব অবধি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন—বর্তমান প্রবন্ধের লেখক] No one can say that he encouraged gherrao and lawness. In fact, ideal conditions for a rapid growth of industries prevailed in the state. There were resources in abundance and trained men were available. But even Dr. Roy was powerless to make the centre change its policy of diverting the eastern region of its economic importance except as an earner of foreign exchange in high sounding name of dispersal of Industries and development of

of the backward State. [রঞ্জিত রায়, হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড, ২৫শে মার্চ ১৯৭০]

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল অবধি এই দীর্ঘ ত্রিশ বছরের মধ্যে পশ্চিম বাংলার মাটিতে একতরফা আঠাশ বছরের বেশী ছিল কংগ্রেস রাজত্ব—স্বনামে ও বেনামে। কেবল মাত্র ক'ম বেশী আঠাশো মাস ছিল যুক্তফ্রন্ট শাসন। এই যুক্তফ্রন্টে সি পি এম নেতৃত্বে বামপন্থী ফ্রন্ট ছিল অত্যন্ত শরিক। এই শরিকী ব্যবহার কারণে সি পি এম তথা বামপন্থী দল প্রত্যেক কৃতিত্বের মূল খাঁচা সত্ত্বেও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জী এবং কেন্দ্রীয় সরকার বামপন্থী ফ্রন্টকে "নন্দ ঘোষ" হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল।

অসার স্লোগান

১৯৭১ সালের নির্বাচনী প্রহসনের মধ্যে দিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেস সম্প্রতিষ্ঠিত—আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধীও তাই ভেবেছিলেন যে তিনিই হয়ে দাঁড়ালেন একমাত্র নেত্রী। অজুত লাগে মাহুকের জীবন, নিয়ে হিনিমিনি খেলতে। এরা ভাবে যে মাহুয় বুকি। সব স্বপ্ন, নির্বোধ। এদের কাল্পনিক দেখে মনে হয়, ডাঃতরুণ যেন একটা বৃহৎ নাট্যমঞ্চ—আমরা বাস্তবে এই ত্রিশ বছরের নাটকে দেখলাম পেশাদার অভিনেতাদের মতো "খণী মিকেশ"—এক একটা স্লোগান: (১) পণ্ডিত নেহরুর শাসন কালে—সুমান্ত্রাত্মক ষাট, তথা সমাজতন্ত্র। (২) লালবাহাদুর শাস্ত্রীর শাসনে—জয় জোয়ান জয় কিসান। (৩) তারপর নরহত্যা-কারিণী মাতৃহনন থেকে উচ্চারণিত হলো—গরিবী হটাৎ। (৪) এই বৃহত্তর নাটকের প্রেষ্ঠতম অভিনেতা, শাসন ক্ষমতা ছাড়াই হয়ে উঠতে চাইলো জাতির আদর্শ, জীবন সঞ্জয় গান্ধী শোনাল আমাদের—হাম দো, হামরা দো।

এই ত্রিশ বছরের শিক্ষা যেন এখনো পশ্চিম বাংলার বিধান সভা নির্বাচনের প্রাকালেও অনেকে গ্রহণ করেনি। তারা এখনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে চায়। কিন্তু আমি তাদের অন্তর করাতে চাই যে এই ত্রিশ বছরে সমাজ জীবনও প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছে—রাজনৈতিক অর্থনৈতিক। পশ্চিম বাংলার উপরে দৃষ্টি ফেরালেই দেখতে পাবো যে একদিকে প্রাচুর্যের পাহাড় অমে উঠেছে ত্রিশ বছরে, আর অপরদিকে হত্যার পর হত্যার মধ্যে দিয়ে বাংলার সমাজে আমরা এখনো বেঁচে আছি এক গভীর নিঃশ্বাসের মধ্যে। আমাদের ছেলেরা হা অন্ন হা অন্ন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের অন্ন সংস্থান আর জীবনের নিরাপত্তা এনে দিতে পারে একমাত্র বামপন্থী ফ্রন্ট।

সারা রাজ্যে এবার নির্বাচনী হাওয়া সি পি এমের পক্ষে

শঙ্কুপ্রস্থ বিখ্যাস

কথা হচ্ছিল ব্রিটিশ পত্রিকার রত্নের সঙ্গে। রত্নলাক জিন্সের রত্ন-লাম, তোমাদের দক্ষিণের অবস্থা কেমন? কে জিতছে? রত্ন বললো সি পি এমই বেশী ভাগ সিট পাচ্ছে। আমি বললাম, ঠিক জিতছে তো? রত্ন বললো, হ্যাঁ একদম ঠিক। পরে রাজ্যে খড়কা টেনে দুই যুগ কংগ্রেসীয় তর্ক শুনছিলাম। একজন আরেকজনের সঙ্গে একশ টাকা বাজী ধরে বললো, উল্টোভাঙ্গা থেকে রাণাঘাট পর্যন্ত সবকটা সিট “শালা” সি পি এম পাবে। কালকে কৃষ্ণনগর থেকে আমার বড়দা বললো নদীয়ার পনেরটা সীটের মধ্যে তেরটাই সি পি এম পাবে। একমাত্র কল্লুর রহমান আর কৃষ্ণনগর পূর্বকেন্দ্রে কালীকান্ত মৈত্র জিতলেও জিততে পারে। কালীঘাটের শিবাজী ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা হচ্ছিল রাসবিহারী কেল্লা নিয়ে। শিবাজীর মতে রাসবিহারীতে সি পি এম-এর ডঃ অশোক শিখ শুধু জিতবেনই না। চেট্টা হচ্ছে যাতে লক্ষী বোসের আমানত জব্ব করে দেওয়া যায়। এই হচ্ছে অবস্থা। সব জায়গার এই অবস্থা। গ্রাম শহর সব জায়গা থেকে খবর পাচ্ছি সি পি এম জিতছে, বিরাট ভাবে জিতছে। জ্যোতিবাবু মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। লাল বাংলা আবার লাল হচ্ছে।

সি পি এম হাওয়া এতই প্রবল হয়ে উঠেছে যে “উগ্রপন্থী” প্রিয় দাস-মুনসী দক্ষিণপন্থী প্রফুল্ল সেনকে কোন করছে “সি পি এম অত্যাচার করছে আপন একটু দেখুন।” (কি লজ্জা! কি লজ্জা! দাসমুনসী মহাশয়ের শেষ পর্যন্ত প্রফুল্ল সেনের কাছে ধরনা?) প্রিয় দাসমুনসী, সাতগাঁহি গিয়ে সি পি এম হাওয়া দেখে ঘাবড়ে গিয়ে প্রফুল্ল সেনকে কোন করেছেন।

সি পি এম হাওয়া যে প্রবল তা নির্বাচনী সমাবেশগুলো দেখলেই বোঝা যায়। জনতার মিটিংয়ে লোক হয় না। ফাঁকা মাঠে জনতা নেতারা বক্তৃতা দিচ্ছেন। আর সেই সব শ্রোতাহীন মিটিংয়ের বক্তৃতা আনন্দ-বাজার বিরাট করে ছাপাচ্ছে। এই ভাবে জনতার হয়ে প্রচার করছে। অন্তর্দিকে প্রমোদবাবু জ্যোতিবাবুর মিটিংয়ে আসছে প্রচুর লোক, হাজার হাজার লোক। জ্যোতিবাবু যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই সাড়া পড়ে বাচ্ছে। কেন এরকম হচ্ছে? পশ্চিম বাংলার যদি জনতা হাওয়াই এত প্রবল হবে

তো তাহলে প্রফুল্ল সেনের মিটিংয়ে লোক হয় না আর জ্যোতি বহর মিটিংয়ে এত লোক হয় কেন?

প্রবল সি পি এম হাওয়া দেখে বেঙ্গা-পত্রিকা আনন্দবাজারের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই তারা জনগণ দ্বারা আবর্জনা সূপে নিক্ষেপ সি পি এম বিরোধী পচা গুলা কুংসার হাতিয়ারগুলোকে এই আবর্জনা সূপ থেকে তুলে এনে তাকে ঘবে মেজে আবার বাজারে চালু করার চেষ্টা করছে। বর্ধমানের মাইবাড়ী নিয়ে প্রচার করেছে একাত্তর সালে সি পি এম-এর বিজয় তারা কথতে পারেনি। বাঁকুড়ার পাথরবন্দীর ঘটনা নিয়ে অপ-প্রচার করেছে তারা সাতাত্তর সি পি এম-এর বিজয় রোধ করতে পারবে না। ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুনের মতো ঠাণ্ডা মাথায় সত্য সংবাদ নিহত হয় আনন্দবাজারে। বাঁকুড়ার ঘটনা কেন ঘটেছে তা আনন্দবাজার খুব ভাল করেই জানে। তবুও শুধু সি পি এমকে হের করার জন্য এই ঘটনার সঙ্গে সি পি এমকে জুড়ে দিল। এরা কাপুরুষ। এদের ক্ষমতা নেই সি পি এম এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রচার করে তাকে হারায়। তাই এরা প্রচারের বদলে বেছে নিয়েছে অপপ্রচার। এরা নিলজ্জ তাই যে প্রিয় দাসমুনসীর ছেলেরা এই সেদিন ময়দানে আনন্দবাজার টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো রাজনৈতিক ভাবে খতম হয়ে যাওয়া সেই প্রিয় দাসমুনসীকে আনন্দবাজারের পাতার বাচিয়ে ডোলায় চেঁচাচ্ছে। যারা এভাবে রাতকে দিন, দিনকে রাত করতে পারে তারা ক্রিমিনাল, তারা সমাজবিরোধী। তাই আনন্দবাজারের কলমধারী গুণ্ডার দল সি পি এম বিরোধী মেহাদে নেবেছে। এরা এতই বেহায়া যে, যে কংগ্রেস জরুরী অবস্থার সময় এদের দুই সাংবাদিককে জেলে আটকে রেখেছিল সেই কংগ্রেসকে এরা আবার কবর থেকে উঠে আসতে সাহায্য করছে। এদের ঘৃণিত গণ-বিরোধী চক্রান্তের বিচার একদিন গণ-আদালতেই হবে। আনন্দবাজারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই বলছি, হাজার সি পি এম-বিরোধী চক্রান্ত করেছে সি পি এম হাওয়া রোধ করতে পারবে না তারা।

এই সি পি এম-হাওয়া প্রবল হওয়ার জন্ত তিনটে কারণ প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। প্রথম কারণ জনগণ দেখ-

ছেন যে সি পি এমই সত্যিকারের একপন্থী। আগাগোড়া এই পার্টিই জনতার সঙ্গে। এই কারণে কথা বলছে। বাইশে-এপ্রিল ব্রিগেডে বিশাল জন সমাবেশে জ্যোতি বহু নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে একসঙ্গে সরকার গঠনের জন্ত জনতাকে আহ্বান জানালেন। সি পি এম-এর পত্র-পত্রিকাগুলোতেও আগাগোড়া একেবারে সমর্থনে প্রচার চালানো হতে থাকে। কিছু “আমরা একাই সব খাবো” এই চিন্তা জনতার নেতাদের মাথায় চুকে যাওয়ায়। এক-আলোচনা ভেঙে যায়। বামপন্থীদের ৮০টা সিট দেওয়ার কাজসমিতি লোকে বিরক্ত। বামপন্থীদের ৮০টা সিট দিচ্ছে আলোচনা শুরু করা আসলে আলোচনা ভেঙে দেওয়ারই সাক্ষি। অথচ এর পাশাপাশি জনগণ দেখছেন যে সম-ঝোতা ভেঙে যাওয়ার পরও প্রমোদ দাশগুপ্ত বলছেন যে নির্বাচনে বামফ্রন্ট জিতলেও সরকারে জনতাকে নেবে। অতএব এরা সত্যিকারেরই একা চান। আর রাজ্য জনতা পার্টি এতই একা বিরোধী যে এরা দলের নেতা চন্দ্র-শেখরেরও নির্দেশও মানছে না। এমন কি একা ভেঙে দেওয়ার জন্ত মধু লিমায়ের গাড়ী পর্যন্ত আক্রমণ করা হল। এসব ঘটনার জনতা দলের উপর জনগণ ক্ষিপ্ত।

সি পি এম হাওয়া প্রবল হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে জনগণ দেখছেন যে দুনিয়ার “উচাটে মাল” সব জনতার চুকেছে। এই সেদিন পর্যন্ত যে সব নেতা “ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জীও” বলে ধ্বনি তুলেছে, কংগ্রেসের হয়ে জনগণের বিরুদ্ধে বড়বন্দ করছে তারাই যদি রাতারাতি জনতা দলের লোক হয়ে যায়, তাহলে লোকসভার নির্বা-চনে এদের বিরুদ্ধে এত বিপুলভাবে ভোট দেওয়ার কি দরকার ছিল? জনতা দলও তো তাহলে আসলে আরেকটা কংগ্রেস। যে সমাজ বিরোধীদের হাতে গত ছয় বছর মানুষ নির্বাচিত হয়েছে তারা সব দলে দলে জনতা পার্টিতে ঢোকাতে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত যে, জনতা পার্টি ক্ষমতায় এলে সমাজবিরোধীরা আবার অত্যাচার শুরু করতে পারবে। জন-গণ বুঝতে পারছেন আসলে গুণ্ডা পার্টি কংগ্রেস এবং জনতা।

সি পি এম হাওয়া প্রবল হওয়ার তৃতীয় কারণ হচ্ছে মনোনিয়নের জন্ত

জনতা পার্টিতে খেয়াখেয়ি। জনতা পার্টির এই “অহিংস” লোকেরা মনো-নিয়নের জন্ত মারামারি রক্তপাত পর্যন্ত ঘটিয়ে বসলো। জনগণ ভাবছেন দেশসেবার থেকে এম. এল. এ. হওয়ার খালি-যাদের তাদের ভোট দিয়ে কি হবে? এরাও তো সেই কংগ্রেসের মতনই নিজেদের মধ্যে খেয়াখেয়ি করছে কিছু শুছিয়ে নেওয়ার জন্ত। যাদের নিজেদের মধ্যেই এত বিশৃঙ্খলা, যাঁরা নিজেদের পার্টিতে নিজেবাই মারামারি করছে, তারা দেশে শৃঙ্খলা আনবে কি করে? আর কোনমুখেই বা স্তারা সি পি এমের বিরুদ্ধে বলে? সি পি এম তো কত হৃৎহল-ভাবে তাদের মনোনিয়নপর্ব মিটিংয়ে

প্রাথমিক শিক্ষকরা বঞ্চিত ও ক্ষুব্ধ (দর্পণের সংবাদদাতা)

প্রাক-লোকসভা নির্বাচন মুহূর্তে কংগ্রেসী রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে রাজনৈতিক উদ্বেগপ্রণোদিতভাবে প্রমিক-কর্মচারী শিক্ষকদের নানাক্রম আর্থিক হুমিধা মঞ্জুর করার প্রতি-যোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। নির্বাচনের আগে পরে পশ্চিমবঙ্গেও এইরূপ নানা হুমিধা ঘোষণার মধ্যে প্রাথমিক মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষা-কর্মীদের জন্তও মার্চ থেকে ২৪ টাকা মাসিক মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি এবং এপ্রিল থেকে ঘরভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা মিলিয়ে মাসিক ১০ টাকা মঞ্জুরির সাড়ম্বর ঘোষণা প্রচারিত হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে রাজ্য বিধানসভায় ঘোষণা সত্ত্বেও মহার্ঘভাতাবৃদ্ধির ঘোষণার সরকারী বিজ্ঞপ্তির মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকার্মীদের বিষয়টি আদৌ উল্লেখিত হয় নি। শোনা গিয়েছিল এটি অনবধানজনিত ত্রুটি এবং সংশোধনের জন্য অর্থদপ্তরে পুনঃ-প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে আরও বিস্তারিত অঙ্গসন্ধানে জানা

ফেললো। জনগণ এ সবই হিসাবের মধ্যে রাখছেন।

জনতা নেতা মধু লিমারে বলেছেন ব্যবসায়ী চক্র চাইছে না যে সি পি এম জনতার মন্ত্রিসভার স্থান পাক। আর এই জন্তই পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম জিতবে। কারণ জনগণের স্বার্থ আর ব্যবসায়ী চক্রের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী দলকে চিনে নিতে জনগণ ভুল করবে না। সাত-ষট্টি নির্বাচনে জনগণ ভুল করেনি। উনসত্তরে জনগণ ভুল করেনি। সাতাত্তরেও জনগণ ভুল করবে না। ‘জনতা হাওয়া’র গ্যাস খেয়ে প্রফুল্ল সেনরা যে ভুল করলেন তার মাশুল তাদেরই দিতে হবে।

নিখিলবজ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বিশেষ পরিষদ সভা শিক্ষক-শিক্ষিকার্মীদের প্রতি বিগত কংগ্রেস সরকারের এইরূপ প্রবন্ধনামূলক ও ধাঙ্গাবাজীর নীতির জন্য তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এবং প্রবন্ধকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকার্মী সমাজকে আহ্বান জানিয়েছে।

গত ১৫ মে নিখিলবজ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বিশেষ পরিষদ সভায় উপরোক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। সভায় কোর্টবিহার দাঙ্গালাং পুন্ডলী প্রভৃতি প্রায় সমস্ত জেলার প্রতিনিধিগণ যোগ-দান করেন। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি জীপকানন মণ্ডল। সভায় সমিতির কার্য বিবরণী ও আর-বায়ের পরীক্ষিত হিসাব গৃহীত হয়।

চারনদলের দশম জন্ম বর্ষে

সংগ্রামী মানুষকে জানাই লাল সেলাম।

১০ই জুন ৬-৩০ মিঃ মুক্ত অঙ্গনে

নাট্যালাচনা ও গণ সংগীতে হোমাজ বিখ্যাস

এবং চারণ দলের নাটক

আদিত্যবণ

নাটক / নির্দেশনা / সংগীত অলক রায়চৌধুরী

হলে টিকিট

১৫ই আগস্টে দৃশ্য ঘোষণা

PEKING OPERA প্রযোজিত RED LANTERN

চারনদলের লাল লণ্ঠন

সম্পাদক—বীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপাঙ্গী প্রেস, ১২৩১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বোড কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৩১ হাট সেন কলিকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত।

দপন

বিশ্ব বর্ষ ৥ ২০শ সংখ্যা ৥ শুক্রবার ১০ই জুন, '৭৭

সিদ্ধার্থ রায়ের রাজত্বে পুলিশ বেপারোয়া খুন গ্রেপ্তার টাকা আদায় ও নারী ধর্ষণ করেছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সিদ্ধার্থ রায় মিথ্যে কথা বলেছেন যে, তাঁর আমলে পশ্চিমবঙ্গে গুলী চলেনি। প্রকৃত ঘটনা ঠিক উল্টো। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে বত গুলী চলেছে, বত মাহুখ পুলিশের গুলীতে খুন হয়েছে, বত মাহুখ পুলিশী অত্যাচারে অর্থ হারিয়েছে তা আর কোনো মন্ত্রিসভার আমলে ঘটেনি। এমন কি সেই ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময়ও নয়। সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক শোভাযাত্রা বা বিক্ষোভের ওপর গুলী চলেনি—একথা ঠিকই। প্রকৃতপক্ষে তিনি বিক্ষোভ বা আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

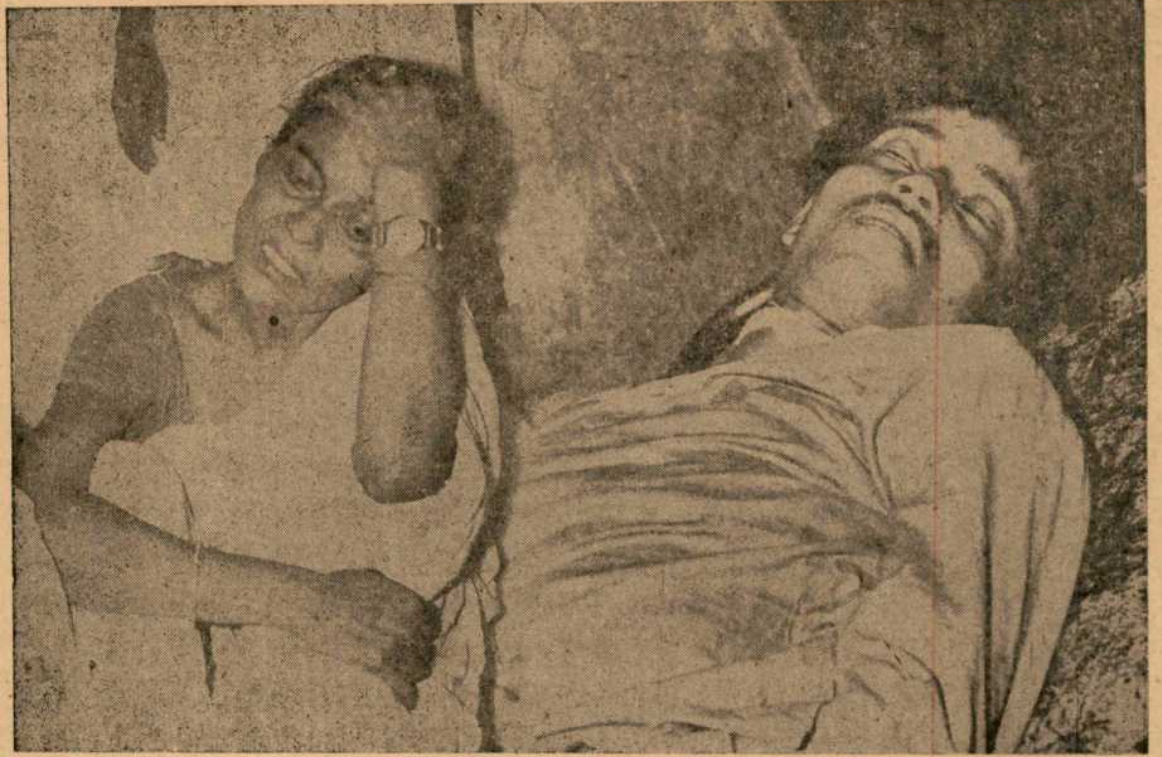
রাজনৈতিক শোভাযাত্রা বা বিক্ষোভের সংগঠক বা কর্মী আসবেন কোথা থেকে? একটি দুটি নয়, শত শত রাজনৈতিক কর্মী সিদ্ধার্থ রায়ের পুলিশের গুলীতে খুন হয়েছেন। মেলে পোরা হয়েছে হাজার হাজার লোককে, আর লাঠি, ডাঙা, ব্যাটন, আলপিন রেড, জলন্ত সিগারেট, চুকটের ছেঁকা দিয়েও অসংখ্য মাহুখকে জীবনের মতো অর্থ কর দেওয়া হয়েছে।

নারী নির্বাচনের ব্যাপারে সিদ্ধার্থ সরকার রেকর্ড করেছে। লাল-বাজায়ে পুলিশ কমিশনারের অফিসর পাশে, লর্ড সিংহ রোডের স্পেশাল (শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেস প্রার্থী পি বি মুখার্জি নারী ঘটিত ব্যাপারেও জড়িত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

চৌধুরী কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি পি বি মুখার্জীর আরও কিছু কাহিনী এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল। বোম্বাইয়ের ব্রিগস পত্রিকা ১৯৭০ সালের ২২শে আগস্ট সংখ্যায় হোটেল বিলের ফটোস্টাট কপি সহ পি, বি, মুখার্জী সম্পর্কে মহিলা ঘটিত চাকল্যকর সংবাদ প্রকাশ করে। যার মর্মার্থ হল বিচারপতি পি, বি, মুখার্জী এবং কুমারী উমা বানার্জী নামে একজন মহিলা অ্যাডভোকেট বেনারসের ক্লাবস হোটেলে পাঁচদিন একটি ভবল কমে একসঙ্গে অতিবাহিত করেন বার বিল শোধ করে মুন্সার কোম্পানী ডানকান স্ট্রাটন। এই সংবাদ প্রকাশিত হলে হরিদাস মুন্সার ছেলে বিজয় মুন্সার কলকাতার চীক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এক মানহানির মামলা দায়ের করে। কিন্তু হুগ্গীম কোর্টে ব্রিগস পত্রিকার আবেদনের ফলে এই মামলা পাটনার স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানে বিচারপতি রায় দেন যে, ব্রিগসে প্রকাশিত সংবাদ সত্য। পি, বি, মুখার্জী সম্পর্কিত এই সংবাদের ফটোস্টাট কপি এই সংখ্যায় দর্পণের ৬ষ্ঠ ও ৭ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হল।



কার্জন পার্কে প্রবীর দত্ত নিহত হন ১৯৭৪-৭৫ ২০শে জুলাই। পাশে তন্দনবত মা।

এবারের নির্বাচনেও কি রিগিং হবে ?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অচ্যুত হবে দুদিন। এগারোই এবং চৌদ্দই জুন। হিমালয় থেকে হুন্দাবন সর্বত্রই অর্থাৎ গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যেন এক নবতর স্পন্দন পরিলক্ষিত হচ্ছে, স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ঘনীভূত হচ্ছে বামস্বাদীদের পক্ষে। কংগ্রেস দিশে-

হার, পারের তলার মাটি সরে যাচ্ছে জনতা দলের রাজ্য নেতৃত্বের। অনেক মনে করেছেন এবারের নির্বাচনের নামে প্রহসনের আশঙ্কা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। এবং এই প্রহসনের রূপ হতে পারে ৭২ সালের চেয়েও ভয়াবহ। এই মহলের ধারণা

নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল ইতি-মধ্যেই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে এবং তা হচ্ছে এইরূপ : জনতা পার্টি ৮১, কংগ্রেস ৭৫, সি পি আই (এম) ১০ এবং বামস্বাদী ফ্রন্ট একত্রে ১৮ এবং বাকী ২০টি আসন পাবে অন্যান্যরা। (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

পাথরবন্দীর ঘটনা

নিয়ে সি পি এমের

বিরুদ্ধে পুলিশ-

আনন্দবাজার

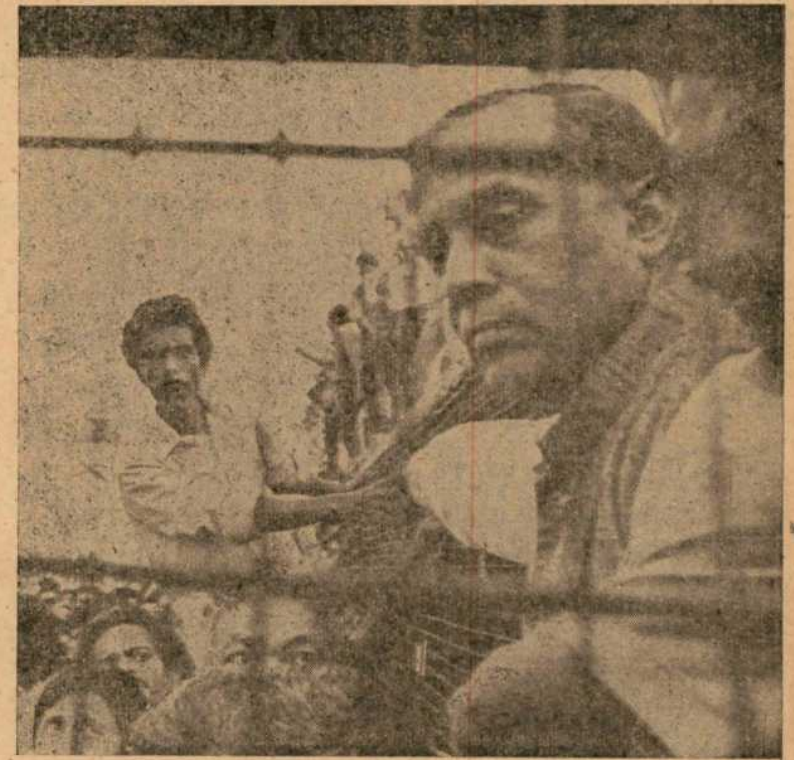
জনতা কংগ্রেস

চক্রান্ত

সাধন গুহ

(পাথরবন্দী প্রত্যাগত)

বাঁকুড়া জেলার রাইপুর থানার অন্তর্গত পাথরবন্দী গ্রামে গত ২২শে মে রাতে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে ১১ জনের জীবনাবসান ঘটেছে সে সম্পর্কে প্রাথমিক তদন্তের পর গোয়েন্দা পুলিশ যে রিপোর্ট পেশ করেছে সরকারের কাছে, তাতে বলা হয়েছে যে উক্ত ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোন সংশ্লিষ্ট নেই। বিশেষ ভাবে স্মর্তব্য যে, পাথরবন্দী গ্রামে এই নারকীয় ঘটনার অব্যবহিত পরেই থেকেই কংগ্রেস এবং জনতা পার্টির পক্ষ থেকে নেতৃস্থানীয় কিছু ব্যক্তি উক্ত ঘটনার



জ্যোতি বসুর কারাবরণ : ৫ই নভেম্বর ১৯৭৩

দুটি ছবিই "রায় মন্ত্রিসভার পাঁচ বছর" বই থেকে নেওয়া

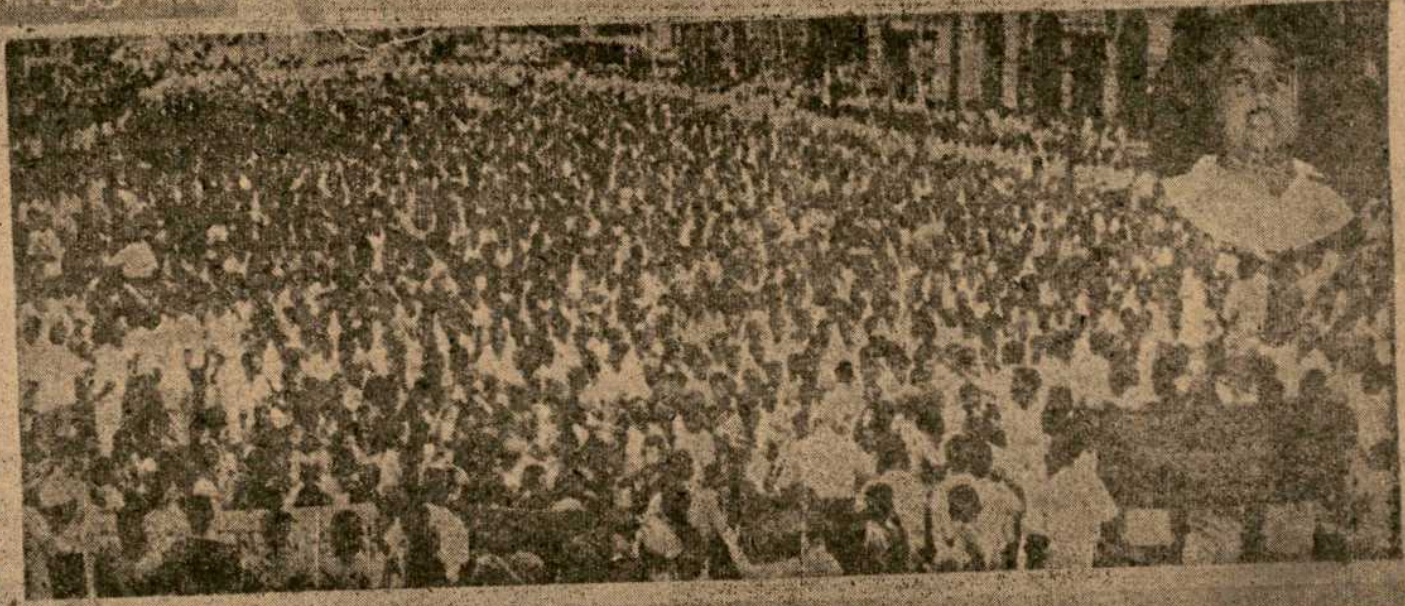
সঙ্গে সি. পি. আই (এম)-কে জড়িয়ে কুৎসা প্রচারে এমনভাবে যেতে গঠন যে, শেষ পর্যন্ত সি. পি. আই (এম) জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অত্যন্ত সম্পাদক শ্রীবিজয় সিংহ নাহার এম পি এবং কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির অত্যন্ত সম্পাদক শ্রীসৌগত দায়ের : বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে বাধ্য হন। ২৪শে মে তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় হুদেব রায় চৌধুরী স্বাক্ষরিত প্রতিবেদনে এমন একটি চিত্র তুলে ধরা হলো যা থেকে যে কোন লোকের পক্ষেই ধারণা করে নেওয়া সম্ভব যে

পাথরবন্দী ঘটনার জন্ত সি. পি. আই (এম)-ই দায়ী। হুদেব রায় তার প্রতিবেদনে প্রদত্ত কিছু কিছু তথ্য পুলিশ স্তরে প্রাপ্ত বলে জানিয়েছেন, অর্থাৎ, বাঁকুড়ার এস. পি বলেছেন য হুদেব রায় বর্ণিত পুলিশ স্তরে প্রাপ্ত বাক্যাংশটি যথার্থ নয়। কে সত্য কথা বলছেন—হুদেব রায় চৌধুরী না বাঁকুড়ার এস. পি শ্রীকালীপদ বানার্জী? পাথরবন্দীর ঘটনার সঙ্গে সি. পি. আই (এম)-কে জড়ানোর পরিকল্পিত বড়যন্ত্র ২২শে উদ্‌ঘাটনের জন্ত এই (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

State at standstill

THE entire administration of Maharashtra State ground to a halt for three days last week when 1,50,000 Government employees took mass casual leave in protest against the authorities' refusal to grant their just demands.

THE three day strike climaxed in a massive demonstration by the Government employees in the city (pic below) which was addressed by the General Secretary of the State's Government Employees Federation, R. G. KARNIK (inset). FOR STORY SEE PAGE 4.



After pocketing the Executive...

By BLITZ Delhi Bureau

NEW DELHI: After having pocketed a big chunk of the Executive branch of the Government, Marwari millionaire Haridas Mundhra has now dared to cast his ugly shadow on the Judiciary.

K. A. Lakshmi Prasad, an enterprising private detective who has specialised in exposing the crime and corruption in the Corporate Sector, has submitted to the President and Prime Minister photographic evidence of the latest in Mundhra's, in which the Chief Justice of the Calcutta High Court figures prominently.

MUNDHRA GON'S BID TO SWALLOW THE JUDICIARY?

THE HEART OF THE COMPLAINT, THE GRAVEST THAT BLITZ HAS EVER COME ACROSS, IS THAT A MUNDHRA CONCERN HAS PAID THE HOTEL BILL OF JUSTICE P. B. MUKHARJI AT A TIME WHEN HE WAS ADJUDICATING A CASE IN WHICH MUNDHRA WAS A PARTY. A FEW MONTHS AGO, MR. MUKHARJI BECAME CHIEF JUSTICE OF WEST BENGAL.

Was judge victim of blackmail?

It should, however, be added straightaway, that the judge seemed to have been a victim of blackmail. The proof of this lies in the fact that the judgment he delivered in the case

under adjudication (Hungerford vs. Turner Morrison) had gone against Mundhra.

In the context of the jungle law obtaining in India's Big Business world, it is also possible that even the hotel bills and other documents (pages 1 & 3) might have been fabricated to bring both the judge and the judiciary into disrepute and make them liable to pressure.

That is one among the many reasons which prompts us to publish this story in the public interest and for the cause of impartial dispensation of justice so that a proper investigation may be instituted and the truth revealed.

Nevertheless, taking the documents at their face value, we are at a loss to understand WHY Justice Mukharji went on a holiday to Varanasi in October 1968 and allegedly stayed in a local hotel with a lady attorney of Mundhra who had been appearing before him in the case along with her seniors.

The story, shocking on the face of it, is worth narrating in the public interest, if only to provide an opportunity to the custodians of our Judiciary to remove the slur, if any, this episode might have cast on their independence and integrity.

Strange entries on hotel bill

On October 11, 1968 Justice P. B. Mukharji and Miss Uma Bannerjee allegedly registered at Clarke's Hotel, Varanasi. They stayed for five days. Miss Bannerjee has been a standing counsel of Haridas Mundhra and his concerns which are perpetually engaged in litigation.

See the photocopy (marked No. 1) of the bill (No. 2784/A) the hotel made on their departure on October 15. Mark some of the entries which are indeed, bewildering.

At the top, are their names. In the column against Room No. 218, the entry reads "1 double room occupied by above couple."

Stratton & Co., Ltd. 18A, London Street, Calcutta-14.

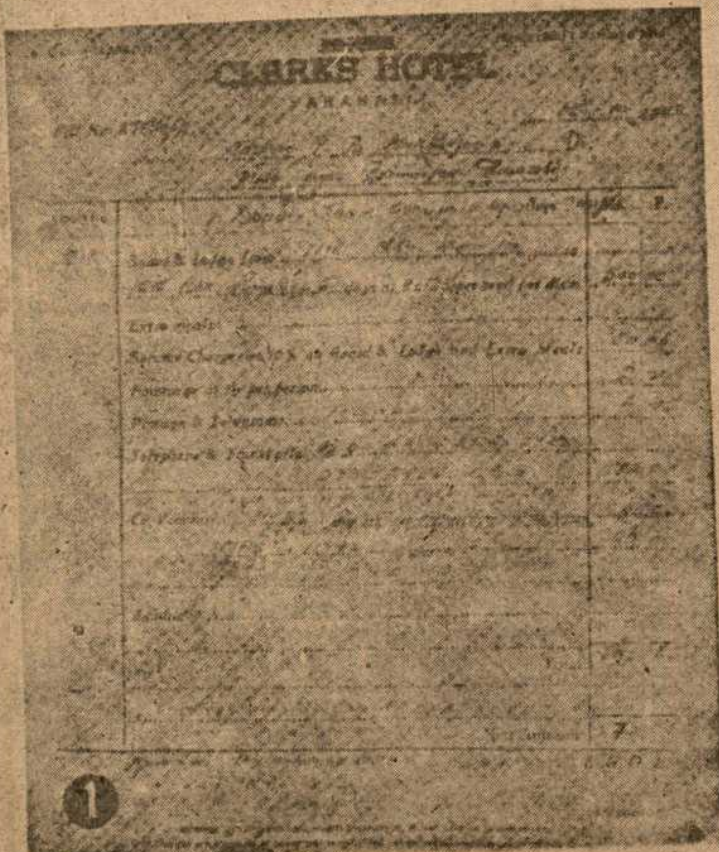
Duncan Stratton, by the way, is a Mundhra concern which operates both from Calcutta and Bombay.

A number of questions arise

from the way this bill was made.

WERE they staying together, as the bill made out? At whose instance did the hotel mark the bill to Duncan Stratton for payment?

PAGE 3



For your transistor... change to

the truly metal-covered batteries. Metal obviously prevents leakage far, far better than just paper.

Every Tudor Battery is tested before it leaves the factory



As per Group

রিগিং প্রসঙ্গে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এরা মন করেন হুস্ত এবং বচ্ছন্দ নির্বাচন হলে ফলাফল বামপন্থী মিত্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতা এনে দেবে। কিন্তু বামপন্থী ফ্রন্ট গণসমর্থন যতই পাননা কেন এই রাজ্যের পুলিশ, কংগ্রেস এবং জনতা নেতৃত্ব বামপন্থীদের ফ্রন্টকে কিছুতেই ক্ষমতায় না আসতে দেওয়ার জন্য একপন্থিক। এর কারণ:

(১) বামপন্থী ফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে জ্যোতি বহুই সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী। বলিষ্ঠ এবং নির্ভীক প্রশাসক হিসেবে তিনি রাজ্য পুলিশের বড় মাঝারি ও ছোট কর্তাদের চোখে ঘঃবপ্ণে আতঙ্ক। বামপন্থী ফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে বিগত কয়েক বছরের পুলিশী নির্বাসন ও বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করা হবে বলে জ্যোতিবাহু বোধবা করেছেন। এর ফলে রাজ্য পুলিশের একশ্রেণীর খুনে ডাকাতরা আতঙ্কগ্রস্ত

হয়ে উঠেছে। বিহুতি চক্রাতী, দেবী রাই প্রমুখ পুলিশের জহলাদরা দিশে-হারা। আতঙ্কগ্রস্ত সিদ্ধার্থশঙ্কর রাই এবং কংগ্রেসের কর্তারাও, কারণ তদন্ত হলে তারাতো রেহাই পাবেননা। এদিকে বড়বাজারের ব্যবসায়ী মহলও চকল বামপন্থী ফ্রন্টের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনার। তাই মরিয়া হয়ে উঠেছে যে কোন মূল্যে বামপন্থীদের ক্ষমতায় শিল্পপতিদের বাহন নিয়ে জনৈক লাঠিভী কুলজিলকতো ইতিমধ্যেই হঠাৎ গজা বাজনীতিজ হয়ে জনতা পার্টির রাজ্য শাখার মোড়ল হয়ে বসেছেন। এবং এই বিভিন্ন বার্থের মিলিত চক্রান্ত আজ ৭৭-এর বিধান সভা নির্বাচনকে হুস্ত ও বচ্ছন্দ হতে দিতে পারেনা।

(২) জনতা পার্টির রাজ্য নেতৃত্বের গোঁরাভূমিতে (অথবা অস্ত্র কিছু!!) বামপন্থী ফ্রন্টের সঙ্গে সমঝোতা না হওয়ার জনতার হাল বুঝে শোচনীয় হতে চলেছে। দলের মধ্যে ইতিমধ্যেই আভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে শুরু

করেছে তীব্র ভাবে। এমতাবস্থায় নির্বাচনে দলের ভাবভূমি হলে প্রকৃত সেন, বিজয় সিংহ নাহারদের গায়ের চামড়া বাচানো দায় হবে। ফলে এই সব পারঘাতে দাঁড়িয়ে থাকা জনতা দলের নেতারা ছলে বলে কৌশলে জনতা পার্টিতে জয়ী করার শেষ চেষ্টা করবেন। বিজয় সিংহ নাহার কান্না ইলেকশন একসপার্ট, পাখরবান্দীর ঘটনা নিয়ে সি, পি, আই (এম) কে জড়ানোর হীন চক্রান্ত করতে গিয়ে বিরাট রাজনৈতিক চপোটাঘাত খেয়ে বিজয় সিংহ নাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা গ্রহণে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। বড়বাজার চিরদিনই তাঁর পৃষ্ঠপোষক এবং পুলিশ ও কংগ্রেস নিজ নিজ বার্থেই তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

কিন্তু আর এক তথ্যাত্মক মহলের বারবা এখারের নির্বাচনে রিগিং অর্থাৎ জুগামী করে বুথ দখল, জোর করে ব্যালট পেপারে ছাপ মেয়ে বাস্তব ভিত্তি করা অথবা অস্ত্র কোন উপায়ে কারচুপি করার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

কেননা ১৯৭২ সালে যে প্রকৃতি ছিল এবং পাড়ায় পাড়ায় মস্তান বাহিনীকে ১৯৭০-৭১ সালে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে তৈরি করা হয়েছিল এবারে সেই প্রকৃতি অদৃশ্যিত। লোকসভার নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর কংগ্রেসী মস্তান বাহিনী ও বুথ নেতারা ছত্রভঙ্গ। এই অবস্থায় পুলিশ প্রশাসন এদের রিগিংয়ে সাহায্য করতে রাজি হবে বলে মনে হয় না। আর জনতা পার্টির পক্ষে এই অল্প সময়ের মধ্যে রিগিং মেশিনাটী তৈরি করা সম্ভব নয়। সব চর্য বড় কথা একই কারদায় দ্বিতীয় বার সাক্ষ্যপাত হুঃসাধা ব্যাপার।

স্পীকার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আছে, কিন্তু এক্সটেনশন দিবার অধিকার পরিচালক সমিতির হাতে। একজন শিক্ষক প্রতিনিধি এই কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন, কিন্তু অস্ত্র সঙ্গী তাহাদের বিধেয়ের বিরুদ্ধে

মড়াপতির কার্যকে অত্যাধিকার করিলেন। বাস্তব গালভরা নীতিবাক্য আড়ান আর ভিতরে ভিতরে স্থানীয় লোক প্রকারের হুমুতিপরায়ণ সমাজ বিবেচীদের নোংরা কাজে যতদূর দেওয়া—এই হইল মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের বক্তা। কংগ্রেসের সমর্থন পাইবার যোগ্য ব্যক্তিই বটে। একজন হুমুতিপরায়ণ অধ্যাক্ষের সমস্ত অবৈধ কাজের সমর্থনের পেছনে নিশ্চয় কোন রহস্য লুকাইয়া আছে। নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করিবার পাত্র নিশ্চয়ই তিনি নন। উদ্দেশ্য বাহাই থাকুক, কল অস্ত্র : কলেজ প্রায় কংসের যুগোযুগি। স্থানীয় উচ্চ শিক্ষা বিশেষত, শ'খানেক লোক চাকুগী হারাইবার ভয়ে শংকিত। অপূর্ববাবুর এইসব অপূর্ব জনসেবা-মূলক কাজের জন্য পুনর্নির্বাচিত হইবার আবদার গ্রহণযোগ্য কিনা তাহা নির্বাচক মণ্ডলীই স্থির করিবেন।

MUNDHRA, JUDGE & LADY LAWYER

Continued from the Front Page

WAS INDISCRETION EXPLOITED?

...

CBI raid exposed dirty business

...

Let Chief Justice order probe

...



Advertisement for Clarks Hotel. The text includes 'Clarks Hotel' and some smaller text about the hotel's location and services. There is a small logo or emblem at the bottom left of the ad.

US-Israeli fraud exposed

US-Israeli fraud exposed

বামপন্থী জোটের জয়যাত্রা

কংগ্রেস ও জনতা পার্টি জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত

দপন

বিংশ বর্ষ ॥ ২১শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১৭ই জুন, '৭৭ ॥ ৪০ পৃষ্ঠা

প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজার দুর্নীতি পেটোয়া পোষণের কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সিদ্ধার্থ রায় বেছে বেছে মাত্র কয়েকজন কংগ্রেসী মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওয়াশ্চু কমিশন বসিয়েছিলেন। কিন্তু যারা সেদিন রাইটাস থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন তাদের প্রায় সকলের বিরুদ্ধেই কমিশন বসানো দরকার চুরি টাকা খাওয়া স্বজন পোষণ সম্পর্কে তদন্তের জন্য। এই মন্ত্রীদের মধ্যে অন্যতম দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা। লিপীজা নানা ব্যাপারে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, চোরদের প্রশ্রয় এবং চুরির সুবিধা করে দিয়েছেন। তিনি সরকারী গাড়ি নিজের ও পরিবারবর্গের জন্য যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। তাঁর জী তন্তু বন্ধুবর্গসহ যাতে গঙ্গাসাগর বেড়াতে যেতে পারেন তার জন্য তাঁদের একটি

সরকারী লঞ্চ দেওয়া হয়েছিল। ১৩, ১, ৭৭ তারিখে ডেপুটি ডাই-রেক্টরের (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত) ভদ্রাবধানে পাঁজাপন্থী গঙ্গাসাগর গিয়েছিলেন। ব্যারিষ্টার পাঁজা সাহেব স্বাস্থ্যদপ্তরের বহু সিনিয়র ও নামী অফিসারের সঙ্গে চর্চাব্যবহার করেছেন বলেও শোনা যায়। এক কথায় পাঁজা সাহেব তাঁর দপ্তরে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন যার ফলে সবচেয়ে ভুগতে হয়েছে সং কর্তব্যপরায়ণ অফিসারদের।

পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যে কোটি কোটি টাকা দিয়েছেন তার যথাযথ-হিসেব নেই। গত বছর নির্বাচকরণ শিবিরের কর্মসূচী চলাকালে

(শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

বর্ধমান জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রহার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার পরও পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের পেটানো হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। গত ১১শে এপ্রিল বর্ধমান জেলে ছ' সাত জন রাজনৈতিক বন্দীকে নির্মমভাবে প্রহার করা হয়। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে যে, জেল কর্তৃপক্ষের স্ট্র এবং তাদের দ্বারা লালিত পালিত কিছু দালাল কয়েদী বন্দীদের খাবার দিতে যায়। খাবার দেবার পর তারা একজন রাজনৈতিক বন্দীকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বলে, “আপনারা

তিন চার ফাইল রুটি চুরি করেছেন। (এক ফাইল মানে তিনটে রুটি)

এই মিথ্যা অপবাদের বিরুদ্ধে রাজবন্দীরা তীব্র প্রতিবাদ করেন। বচসা শুরু হয়। ইতিমধ্যে হেড ওয়ার্ডার শৈলেন মল্লিক বাঁশি বাজিয়ে দেন এবং পাগলা ঘটি বেজে ওঠে। তারপর শুরু হয় ডাঙার তাণ্ডবলীলা। ফলে ছ' সাত জন রাজনৈতিক বন্দী গুরুতর আহত হন।

এতে দালাল বন্দীদের দৌরাড্ডা আরো বেড়ে যায় এবং ক্রমাগত বন্দীদের খাবার চুরি হতে থাকে।

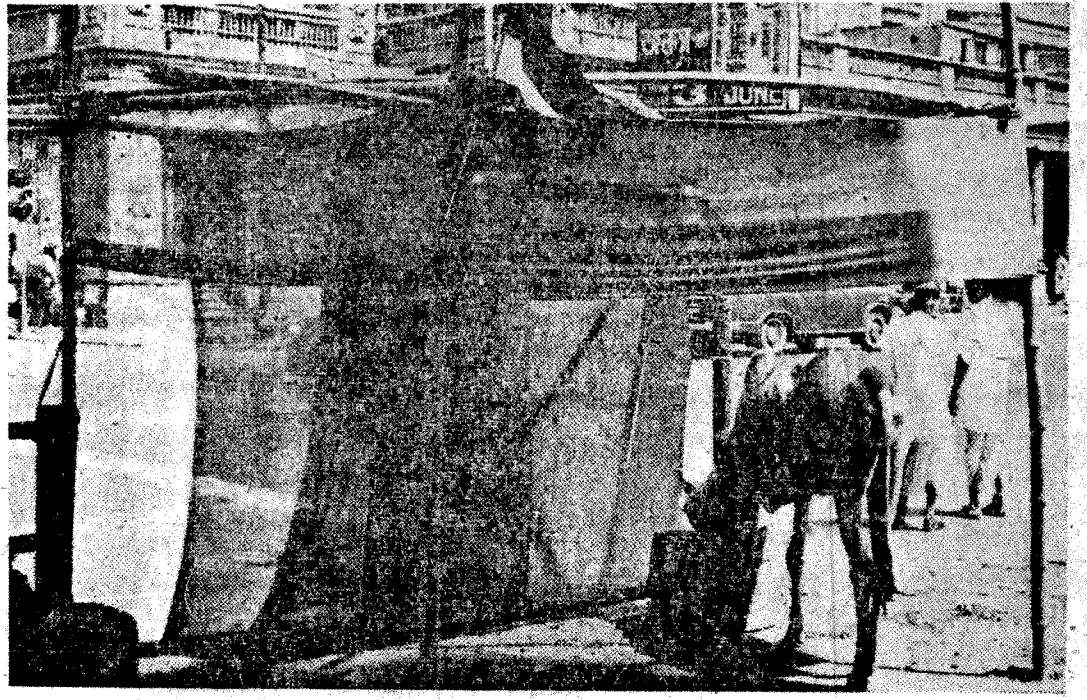
॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও জনতা পার্টির সমস্ত কুংসা ও অপপ্রচার শুরু করে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী ফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে এগিয়ে চলেছে। কংগ্রেস ও জনতা পার্টি উভয় দলই জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত।

১৯৭৭ সালের নির্বাচনী কলাকালে প্রমাণ হয়ে গেল যে, ১৯৭২ সালে কংগ্রেসী গুণ্ডারা পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে যোগসাজসে কি ভয়ঙ্কর রিগিং করেছিল। আজ অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, ১৯৭২ সালে জোচ্চুরি ও গুণ্ডামী করে কংগ্রেস যে পরিমাণ বিধানসভার আসন দখল করেছিল বামপন্থী ফ্রন্ট ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে

সেই আসন সংখ্যাকে অতিক্রম করতে চলেছে।

১৯৭৭ সাল থেকে কংগ্রেস ভারতবর্ষের বুকের ওপর জগদল পাথরের মত চেপে বসেছিল। বিশ বছর বাদে, অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে বালট বাল্লের যাতুতে আমরা প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই পাথরকেও নামানো যায়। কিন্তু তখনও বোঝা যায় নি কেন্দ্রেও তাকে (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)



গত শনিবার কলিকাতায় ভোটের দিন চিত্তরঞ্জন আভেনিউয়ে কংগ্রেসের একটি পোলিং অফিস।

ছবি : লাও অ্যাণ্ড লাইফ

বন্দীদের প্রতিরোধে কর্তৃপক্ষের নতিস্বীকার

দীর্ঘ দিন, প্রায় ছ'বছর ধরে বিভিন্ন জেলে বহু নকশাল বন্দীদের ২৪ ঘণ্টা জেলে লকআপ করে রাখা হত। ছোট ছোট সাতসেঁতে ঘর, আলো বাতাস নেই। তেতরেই মল-মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা। এই হল

সেল। শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর গরমের সময় অগ্নি গরম। তার সঙ্গে আনের স্ব-ব্যবহার হযোগ পেত না বন্দীরা। এই রকম হীন অস্বাস্থ্যকর অপমানজনক অবস্থার মধ্যে প্রেসিডেন্সি জেলের অনেক বন্দীকে মাসের পর মাস কাটাতে হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের কিছুদিন পর থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জনগণ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির আন্দোলন জোরদার করে তুলেছিলেন। জনগণের বন্দীদের প্রতি এই দরদ বন্দীদেরও নাড়া দিল। তারাও ঠিক করলেন এই অপমানজনক অবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন। ২৪ ঘণ্টা লকআপ ব্যবস্থা তুলে দেবার কথা জেল কর্তৃপক্ষকে বার বার বলেও কোন লাভ হল না। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে লাঠিও চলেছে কিন্তু তাতেও বন্দীরা দমেন নি।

অবশেষে সবাই ঠিক করলেন যে তারা আর কোর্টে যাবেন না। কোর্ট বয়কট করার সিদ্ধান্ত তারা নিলেন। সেই মত ২৭ এপ্রিল একটি

“যড়যন্ত্র” মামলায় অভিযুক্ত ১৬-১৭ জন বন্দী কোর্টে যেতে অস্বীকার করেন। দু’তিন জন গিয়েছিলেন এবং তারা সেখানে জনতার সামনে বিচারকে বলেন স্পষ্ট ও জোরাল ভাষায় তাদের কমরেডদের উপর এই নির্ধাতনের কথা। তারা এও জানান যে এই ব্যবস্থার প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত তারা কোর্ট বয়কট করতে থাকবেন।

ম্যাজিকের মত কাজ হয়। দুদিন বাদে জেলের আই. জি প্রেসিডেন্সি জেলের সেলের বন্দীদের সঙ্গে দেখা করেন। তারা তাদের দাবি ও সংকল্পের কথা দৃঢ়ভাবে রাখেন। অবশেষে আই, জি, বাধ্য হয়ে জেল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন ২৪ ঘণ্টা লকআপ ব্যবস্থা তুলে নিতে। বন্দীদের জয় হল। কয়েক দিন পরে স্টেটসম্যানের আই, জির বিরূতি বেকল। তিনি বলেছেন যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির ফলে ২৪ ঘণ্টা আটক রাখার আদেশ প্রত্যাহার

(শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

নির্বাচন শেষ কথা নয়

কালিদাস কুণ্ডু

নির্বাচন বয়কট প্রসঙ্গে

সম্প্রতি তিনজন রাজবন্দী দর্পণের "মতামত" কলমে লিখেছেন, "নির্বাচন বয়কট বা অংশগ্রহণ কোনটাই স্থায়ী ব্যাপার নয়। যদি অংশগ্রহণ জনগণের সংগ্রামের পক্ষে যায় তাহলে আমরা অংশ নেবার পক্ষে। আর যখন তা জনগণের সংগ্রামের বিপক্ষে যায় আমরা বয়কটের পক্ষে।"

"নির্বাচন বয়কট" লাইন স্থায়ী ব্যাপার। ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বের সময় নির্বাচন যে জনগণের সংগ্রামের বিপক্ষে গেছে এ বিষয়ে আজ আর কাকুর বিষম নেই। এখন দেখা থাকে গত লোকসভা নির্বাচন এবং তার ফলাফল জনগণের সংগ্রামের পক্ষে না। বিপক্ষে গেছে এবং এর থেকেই বিধান সভা নির্বাচন ও তার ফলাফল জনগণের সংগ্রামের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা নেবে তা অনুমান করা যেতে পারে। আমাদের দেশের রাষ্ট্র কাঠামো হল আধা-সামন্তরাষ্ট্রিক, আধা-ঐশ্বরিক। যারা শাসন চালায় তারা দেশের বড় জমিদার এবং মুন্সিদি পুঁজিপুতিদের এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের হুকুম মেনে চলে, তাদের দাবী রক্ষা করে, দেশের মানুষকে শোষণ করে। তাই রাজনৈতিক কারণে এরা জনগণের সংগ্রামের বিপক্ষে। যেতে বাধ্য। তাই দেশের এই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর আবুল পরিবর্তন না হলে কোন নির্বাচন তথা এর মাধ্যমে কোন সরকারই জনগণের সংগ্রামের পক্ষে যেতে পারে না। লোকসভা নির্বাচনের আগে এবং পরে এই চিত্র মূলতঃ একই আছে। (এই প্রসঙ্গে দর্পণে একাধিক ভাল-লেখা বেরিয়েছে) এই রাজনৈতিক পটের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা কখনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

এবার সংক্ষেপে দেখা যাক লোকসভা নির্বাচনের কল (জনতা সরকারের কার্যকলাপ) জনগণের সংগ্রামের পক্ষে গেছে কি না। সংগ্রামের পক্ষে যাওয়ার একটা অর্থ হল যারা এতদিন জনগণের জ্ঞান সংগ্রামকে অত্যাচার দ্বারা দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে আসছিল (এবং আজও তাই করছে) তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কিন্তু কুখ্যাত পুলিশ অফিসার এবং তাদের খুনের দল যারা অসংখ্য দেশ-প্রেমিক বিপ্লবী তরুণকে কচুকাটা করেছে, পজ করেছে—এদের কেন এই ক মাসের মধ্যেও গ্রেপ্তার করে বিচারের ব্যবস্থা করা হয় নি? খয়ং ইন্দিরা

গান্ধী যে জনগণের চরম ঘৃণিত শত্রু, তাকে কেন গ্রেপ্তার করা হয় নি, তার বিরুদ্ধে কেন হত্যা, হত্যার ষড়যন্ত্র মায়ালা আনা হবে না? তার সব সম্পত্তি কেন জব্দ করা হবে না? সিদ্ধার্থ রায়ই বা কেন বাদ যাবে? জনগণ যে এই সব অস্তুর দিয়ে চায়, এ তো সবাই জানে।

নির্বাচনের ২ মাসের মধ্যেই সারা দেশব্যাপী জনগণ দাবী দাওয়া নিয়ে ঝগড়া হয়ে উঠেছে। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাও পিছিয়ে নেই। বয়েজে শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষ হয়েছে এবং দু'পক্ষেই হতাহত হয়েছে। নাগা মিজোদের মিলিটারীর সঙ্গে সংঘর্ষ থামে নি। পুলিশ মিলিটারীর সঙ্গে সংঘর্ষ মানেই সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ। সমস্যা সমাধান করতে সময় লাগে ঠিকই কিন্তু সরকার যদি জন-দরদী হয়ে থাকে তাহলে তো সে মজ্জাই এগিয়ে আসবে। জনগণ দেশ জুড়ে উত্তাল আন্দোলনের প্রয়োজন বোধ করেছে কেন? সব নিত্যা প্রয়োজনীয় জীবনের দাম এত বেশি কেন? এ সম্বন্ধে কোন রকম হুঁহুহা নেই কেন? বর্তমানে দেশে বিদেশে

প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য

আপনাদের পত্রিকার আমার সম্বন্ধে প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতি সম্প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। (২০শে মে, ১৯৭৭)। এই সংবাদে কিছু প্রকৃত তথ্য অপ্রকাশিত থাকার অমথ্য আমার উপর কিছু কলঙ্ক লেপন হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি।

বিভাগ্যবশত তহবিল তছরূপের ঘটনা তথ্য অনুসন্ধান কমিটি জানিতে পারিয়াছেন এবং এই বিষয়ে পুলিশ বিভাগের তদন্ত চলিতেছে। তথ্য অনুসন্ধান কমিটির কাজ আরম্ভ হইবার সময় হইতেই বিভাগ্যবশত এক কেরাণী বিভাগে অল্পস্থিত যদিও তিনি তথ্য অনুসন্ধান কমিটিকে তথ্য অনুসন্ধান সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন এবং বিভাগ্যবশত শিক্ষক কর্মচারীদের এক মিলিত সভায় তাহার অপরাধের কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। গ্রীষ্মের ছুটির আগের দিন পর্যন্ত তিনি আর বিভাগ্যবশত উপস্থিত হন নাই।

বিভাগ্যবশত ছাত্রদের রিভিউর কিছু আবেদন পত্রও উক্ত কেরাণীর ড্রয়ারেই তালাবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। রিভিউর আবেদন পত্রের সঠিত বোর্ডের নামে লিখিত পোষ্টাল অর্ডার বহিয়া গিয়াছে। তিনি এই সব

যে প্রশ্ন প্রাধান্য লাভ করেছে—রাজবন্দী মুক্তির প্রশ্ন—তা নিয়ে এত বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা কেন? জনগণের প্রশ্ন, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কেন সরকার সমর্থন করেছে না কার্যক্ষেত্রে? কেউ বলতে পারেন, প্রায় সব ছাঁটাই বেল কর্মীদের তৈরী নতুন সরকার চাকরিতে পুনর্বহাল করেছে। ৭৪-এর বেল ছাঁটাইয়ের ফলে ১৬,৮৯৮ কর্মীকে ডিসমিস করা হয়। ৭৭-এর ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে এ সংখ্যা নেমে আসে ৩২৭ এ। তিন জনকে বাদ দিয়ে সবাইকেই চাকরি ফেরত দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (Statesman, May 12) অর্থাৎ ১৬,২৭১ জন কর্মীকে ক্যাসিট ইন্দিরা সরকারই পুনর্বহাল করে গেছে। তবে কি ইন্দিরা সরকার জনদরদী ছিল? আসল কারণ হল: এই সমস্ত পদ খালি থাকলে রেলের কাজ চলবে কি করে? তাই নতুন কর্মী নেওয়া বা পুনর্বহালের মধ্যে মূলত কোন তফাৎ নেই।

আমার মতে এই সবই চোখে আঁচুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে নির্বাচন জনগণের সংগ্রামের পক্ষে যায় নি এবং যেতে পারে না। নির্বাচন মারফৎ গণ-দরদী সরকার ক্ষমতায় আসে না। অতএব কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা বরাবরই নির্বাচন বয়কট করার ডাক দেবেন এবং এতে অংশ গ্রহণ করবেন না।

গোপাল সেন

আবেদন পত্র বোর্ডে পাঠাইবার নিমিত্ত কখনো আমার নিকট অথবা সহঃ প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র তাহারই অবহেলার প্রকৃত উক্ত আবেদন পত্রসমূহ বোর্ডে জমা পড়িল না। তবু এই ঘটনার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।

আমাদের দুই বিভাগ (মেন ও ব্রাঞ্চ)। মেন স্কুল হায়ার সেকেন্ডারী বিভাগ হইয়াছে। ঐ বিভাগে আমাদের বিভাগ্যবশত কিছু শিক্ষক ক্লাশ গ্রহণ করেন এবং আমিও একটি করিয়া ক্লাশ দৈনিক গ্রহণ করি। পাশাপাশি অবস্থিত দুই বিভাগ। হুত্তরাং বিভাগ্যবশত জরুরী কাজে কোথাও বাহির হইতে না হইলে আমি বিভাগ্যবশত থাকি। অতএব বিভাগ্যবশত চলাকালে আমাকে না পাঠাইবার কোন হেতু নাই।

বর্তমানে হায়ার সেকেন্ডারী আংশিক সময়ের শিক্ষকদের দ্বারাই চালিত হইতেছে। সকালে ও সন্ধ্যায় সম্ভায়ে তিনদিন করিয়া (যাহা স্কুলের সময় নয়) সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে আমি দুইটি কলেজে উক্ত হায়ার সেকেন্ডারী বিভাগেই কাজ করিতেছি। উহাতে বিভাগ্যবশত কাজের কোন ক্ষতি হয় না।

কাজল গুপ্ত
প্রধান শিক্ষক, বেলঘাটা
দেশবন্ধু হাইস্কুল (ব্রাঞ্চ)

১৯৭৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর ঐতিহাসিক দিক থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রের যুগ পরিসমাপ্ত হয়েছে, অচল হয়ে গেছে পুরনো বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যুগজীর্ণ ধারণা। সংসদীয় গণতন্ত্রবাদ মতাদর্শগতভাবে বাসি হয়ে যাওয়ার পরও দেশে দেশে কমিউনিস্টরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছে। কোথাও কোথাও সাময়িকভাবে রাষ্ট্রতন্ত্রও পরিচালনা করেছে। এককথায়, সার্থক অস্ত্রোভার বিপ্লবের পর থেকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বেড়ে উঠেছে সংসদীয় ও সংসদ বহির্ভূত এই বিবিধ সংগ্রাম প্রক্রিয়ায়।

এশিয়া, ভূ-খণ্ডে এই বিমূখী সংগ্রামের ধারাটি লক্ষণীয়। চীন, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, বার্মা, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার দেশে দেশে একদিকে যেমন গড়ে উঠেছে দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের গৌরবজনক ঐতিহ্য, অন্যদিকে তেমনি ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশগুলিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল ধারাটি প্রবাহিত হয়েছে সংসদীয় রীতির অল্পবর্তনে। ইন্দোনেশিয়াতে এই অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে হাজার হাজার কমিউনিস্টের রক্তের বিনিময়ে।

ভারতবর্ষে তেলঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রামের অগ্রিশিখা নিভে যাওয়ার পর থেকে কমিউনিস্টরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে থাকে। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়ায়কে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হ'ল। ১৯৫২ সালের প্রথম লাধারণ নির্বাচনে সশস্ত্র সংগ্রামের পীঠস্থান অন্ধ্র কমিউনিস্টরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অতি দ্রুত তারা পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশগুলিতে জনগণের এক বৃহদাংশের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তৃত করতে সমর্থ হয়। পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি কেরালাতে প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করে। ষাটের দশকের প্রথমভাগে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হোল। অন্য হোল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির। সংগ্রামী জনগণ ও বিপ্লব-প্রেমিক জঙ্গী কর্মীরা সমবেত হোল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা তলে। সংশোধনবাদ ও প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলো মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। সে সশস্ত্র

বীকৃতি জ্ঞানালো আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সংশোধনবাদ-বিরোধী নেতৃত্ব ভূমিকাকে। দেশের আ ভ্যাস্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের বীকৃতি স্বরূপ জনগণ তাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করলো কেরালা ও পশ্চিম বাংলায়। প্রতিক্রিয়ার বড়বন্ধে সেই ক্ষমতা স্থায়িত্ব লাভ করেনি, করতে পারেনা।

আজ আবার সেই প্রশ্ন উঠেছে—নির্বাচনই শেষ কথা কিনা। কমিউনিস্টরা নির্বাচনকে কখনই শেষ কথা মনে করেনা, সংগ্রামের একটি ধাপ হিসেবেই ব্যবহার করে।

বিগত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতায় সশস্ত্র কমিউনিস্ট আন্দোলন আজ ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষেপে দাঁড়িয়ে। বুর্জোয়ারা বিভক্ত। তাদের ক্ষমতার লড়াইয়ে জনগণ নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় থাকতে পারে না। বুর্জোয়ারা কখনও কখনও গণতন্ত্রের কথা বলে, লড়াইয়ে সামিল হয়। ক্ষমতা পেলে জল্লাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় ক্ষমতা রক্ষার জন্যই। ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের অসম্পূর্ণ লড়াইয়ে প্রধান সেনাপতি কমিউনিস্টরা। ইতিহাস তাদের মুখের দিকে চেয়ে আছে। দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা মার্কসবাদকে বর্জন করেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ রণধ্বনি তুলেছে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে। কে তুলবে জনগণতন্ত্রের পতাকা? জনগণ বাদের বর্জন করেনি, শত পাড়ন-অত্যাচারের মুখেও যারা মার্কসবাদকে বর্জন করেনি তারা ই এগিয়ে যাবে পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে।

বুর্জোয়ারা কখনও নির্বাচন করে, কখনও না নির্বাচন করেনা। কমিউনিস্ট পার্টি শ্রেণী সংগ্রামের কথা ভুলে যায়না। নির্বাচনের আগেও নয়, নির্বাচনের পরও নয়। অব্যাহত শ্রেণী সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি বেড়ে ওঠে, বিপ্লবের নারক-শক্তিরূপে গড়ে উঠতে চেষ্টা করে। নির্বাচন যোগ্যমাত্র। স্বযোগ গ্রহণ করতে হয়। জনগণের সমস্ত অংশের কাছে বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ার নির্বাচনী মঞ্চগুলি ব্যবহার না করে এই মুহূর্তে কমিউনিস্টরা কি করতে পারে? হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে। শ্রেণী শত্রু হাত গুটিয়ে বসে থাকেনা। তারা মঞ্চগুলি ব্যবহার করবে। কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাবে। জনগণ বিভ্রান্ত হবে। না, জনগণকে সঠিক নেতৃত্ব দেবে কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টি কে উপদেশ দেবে জনগণ। যদি অল্প ধারণার উপদেশ দেয় কোন দিন, কমিউনিস্ট পার্টি শিরোধার্য করবে সেই উপদেশ। আগ বাড়িয়ে কিছু করার নামই হঠকারিতা।

साधन शुद्ध

১৯২৭ তারিখে বঙ্গবাসী গণগোলকে
কেসে করে নানান ধরনের অসামাজিক
কার্যবলাপে যুগান্তে যুগ ও শ্রীদেব
খুব পেরোনের লোক হিংস্রা ব্যানার্জীর
হঠাৎ পৌরসভার সহ-সভাপতির পদ
থেকে পদত্যাগে সকলেই বিস্মিত
হয়েছে। শ্রীদেবের ভাষায় যুগের সামলার
অভিত থাকার অল্প কংগ্রেসের টিকিট
পান নি উপরন্তু তিনি দল থেকে সাস-
পেওঁড় ভাই টিক এই ধরনের কতিপয়
দ্রুশ্রিত ও দল থেকে বহিষ্কৃত কয়েক-
জন কমিশনার এবং গুণাবাহিনীকে
নিরে শান্তিপুর কেসের কংগ্রেস প্রার্থী
বিকল্পে একজন নির্দল প্রার্থীর ও
জনতা দলের হয়ে কান্ড করছেন। এই
গুণাবাহিনী শ্রীদেব নির্দেশে শান্তি-
পুর বাংলা বন্ধকে কেসে করে সি,
পি, এম-এর স্থানীয় অফিস পুড়িয়েছে,
মহিলা কর্মীদের হাত থেকে পতাকা
কেড়ে নিয়ে তাদের উপর নির্ধাতন
করেছে, উপরন্তু অধ্যাপক, আইনজীবী
শিক্ষক, সামাজিক হিংস্রাচালক, সিনেমার
কর্মচারী, ডাক্তার, সর্বশ্রেণীর সি, পি,
এম সমর্থকদের প্রচণ্ডভাবে মারধোর
করেছে ও হত্যার পর্যন্ত হুমকি
দিয়েছে।

দানিকেন তত্ত্বের আলোকে মহাভারতের সূচী ও দেবতা বীরেন্দ্রনাথ

মহাদেবের সঙ্গে মজ্জযুক্ত

সমরকুশলী মহাদেবকে হিমালয়ে অবতরণ করতে হ'ল বিশেষভাবে সশস্ত্র হয়ে। "তিনি পিনাক, শরাসন ও আশীবিষদূশ শরসমূহ গ্রহণ পূর্বক দেহবান দহনের স্তায় মহাবেগে অর্জুনের ভূপাশে গমন করিলেন।" (বন, কানীপ্রসঙ্গ, ৪০)। তাঁর এই আগমনের পেছনেও আছে একটি চমৎকার সাময়িক পরিবর্তন। আগেই বলেছি, অর্জুনের মৈত্রী, ঐশ্বর্য, সাহস ও তিক্তিকার কঠোর পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন তিনি আপছেন পার্বের শক্তি পরীক্ষা করতে। পাছে তাঁর আসল পরিচয় পেয়ে অর্জুন যুদ্ধ না করে 'আত্মমি' প্রণাম জানিয়ে আত্মসমর্পণ করেন তাই চতুর সাময়িক অধিকর্তা এলেন ভারতীয় আদি উপজাতি এক ক্রিয়াকর্মী ছদ্মবেশে এবং নিজের বিমান-টিকেও বেধে এলেন দুর্বর্তী কোনো স্থানে। প্রত্যাহিত অর্জুন তাই ভাঙিলেন, সত্যেই বৈদ্য যুদ্ধ নেমেছিলেন। দু'পক্ষে যুদ্ধ বেশ জমে উঠল। কিন্তু কারু করা গেল না ক্রিয়াকর্মে। ক্রিয়াকর্মী মহাদেবের উন্নত ধরনের বর্গ ভেদ করতে পারল না পুত্রপুত্র অর্জুনের বাহা বাছা এবং শক্তিশালী শরসমূহও। পারবে কী করে, বিজ্ঞানী দেবদানিকের উন্নতমানের বচ বাস্তবতায় বয়ঃ ইল।

পরন্তু অর্জুন তখন মনে মনে ভাবলেন, "গুনিয়াজি, গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে দেবগণের সমাগম আছে।" অর্থাৎ দেবতারা হিমালয়ে আনা বাওয়া করেন। স্বাভাবিক বসবাস করেন না। আরও ভাবলেন, কিন্তু ব্যাপারটা কি? "পিনাকপানি ব্যতীত আমার সহস্র শরনিকর সঙ্ক করিতে আর কাহার কমতা নাই। যদি ইনি মহাদেব ব্যতীত অন্য কোনো দেবতা কিবা বস্তু হইলেন, আমি অস্ত্র ইহাকে তীক্ষ্ণ শরপ্রহারে শমন সদনে প্রেরণ করিব।" (ঐ, পৃ: ৪৪)। কী সাংঘাতিক কথা। মহাভারত যে দেবতাদের দৈবের মর্যাদা দেন, সাধারণ অর্জুনের অজ্ঞাধাতে তাঁরাও প্রেরিত হ'তে পারেন শমন সদনে, যুদ্ধলোকে।

গ্রন্থ, দৈব এক সামান্য উত্তর প্রদেশী রাজপুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছেন সর্বোৎসাহে এঁটে ও সর্বোৎসাহে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। যিনি উক্ত, তিনি কি তাঁর মহেশ্বরকে এতটা ক্ষুদ্ররূপে কল্পনা করতে ও মনে নিতে রাজি হবেন? কিন্তু মহাভারতকার স্বয়ং তাঁকে অস্ত্র কোনো রূপে হাঙ্গির করতে পারেন নি। এমন কি মহাদেব ব্যবহৃত অস্ত্রের মধ্যেও কোনোও অলৌকিকতা নেই। বলা হয় নি, মহাদেব এলেন 'আশীবিষ' সজ্জিত হয়ে, বলা হ'ল, তাঁর অস্ত্র ছিল 'আশীবিষদূশ'। সুতরাং আমাদের পরিচিত নাগভূষণে সজ্জিত মহাদেবের সঙ্গেও মহাভারতের এই পিনাকপানির সাদৃশ্য কল্পনা করা গেল না। আমরা সংবাদ পেলাম সমরকুশলী বুদ্ধিমান এই দেহধারী মহাদেব এসেছেন 'আশীবিষ-সদৃশ' অর্থাৎ সাপের মত আকৃতির বিশেষ অস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে। এমন সর্পসদৃশ অস্ত্রের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। পৌরাণিক উপাখ্যানে নাগপাশে বেধে বেধে বাওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। নাগেরা বন্দীকে ছোঁবল মাঝে না। তাঁরা

কি কোনো বৈজ্ঞানিক পাশ? দেবতাদের মহাকাশযানেও (ইজ্রায়েল) অর্জুন দেখেছিলেন, "মহাকায় জলিতানন অতি ভীষণাকার নাগগণকে"। একটি মহাকাশযানে বৈজ্ঞানিক তারের কুণ্ডলী ও উজ্জ্বল বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামকে উপযুক্ত উপহার অভাবে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল, দানিকেন তত্ত্বের আলোকে এখন আমরা এমন ব্যাখ্যা করতে পারি (?) কেন না দেবদানি যদি একটি বাস্তবিক বস্তু হয়, তবে 'জলিতানন ভীষণাকার নাগগণকে' অস্ত্রকিছু ভাবা যায় না। তা ছাড়া 'নাগ' শব্দটি শুধুই যে সর্পাদিকে বোঝায় এমনও নয়, 'নাগ' একটি প্রাচীন জাতি। 'নাগ' একটি উপজাতীয় 'টোটেম'। স্তার হার্বার্ট রিসলি-পরিচালিত Ethnographic Survey ভারতের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে জাতীয় প্রতীক হিসেবে পুজিত বিভিন্ন 'টোটেমের' তালিকা রেখে গেছে। শুভিয়ার সম্প্রতি আলোকপ্রাপ্ত বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে চলে আসছে 'নাগ' ও 'শৃগালের' টোটেম। বৈদিক ও রামায়ণ মহাভারতীয় আমলেও টোটেমের অস্তিত্বের কথা জানিয়েছেন ঐলি, ভি, চ্যাটার্জি তাঁর (১৯৭৩) বিজ্ঞান-কংগ্রেসে পঠিত বক্তৃতামালায়। তিনি লিখেছেন, "It now appears to be a certainty that same influence of totemism, can be traced in the Rigveda... The influence becomes all the more marked in the later Vedic works as well as in the epics Rāmāyana and Mahābhārata though none of them has preserved the name of a single totemic clan." (Races and Cultures of India—D. N. Majumdar ed: ১৯৬১)। সুতরাং জলিতানন ভীষণাকার নাগগণকে আর কি ভাবে ভাবা যেতে পারে?

অর্জুনের গ্রন্থ, গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে দেবগণের সমাগম আছে। কিন্তু এই ক্রিয়াকর্মে? ইনি শরীর ব্যতীত অন্য কোনো দেবতা হ'লে কি অর্জুনের শরপ্রহারে নিশ্চয় নিহত হতেন না?—আমাদের চমৎকৃত করল। এক, হিমালয়ে দেবগণের সমাগম আছে। অর্থাৎ হিমালয় দেবগণের একটি দেবদানি অবতরণ ক্ষেত্র; তাকে দেবদানিরূপে আবহমানকাল পুণরায় প্রদেশ করে রাখা হলেও, বস্তুত অর্জুনের বক্তব্য বিপরীত তথ্যেরই সন্ধান দেয়। আনন্দ, হিমালয়ে দেবতারা আসা বাওয়া করতেন। অর্থাৎ আবার সেই দানিকেন।

দানিকেন বলেছেন ও চিত্রাবলী সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন যে, গ্রহীতরবাসী বুদ্ধিমানরা সমস্তমণীষ্য পার্বত্যক্ষেত্রে তাঁদের মহাকাশযান অবতরণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। নেমেছিলেন তীরা-নির্জন দ্বীপ ও নির্জন স্থানে। বুদ্ধিগ্রাহী বুদ্ধি। গ্রহীতরবাসীরা আসতেন বাস্তবিক বানে কয়েক আলোক বছর দূরস্থিত নক্ষত্রলোক থেকে। স্বভাবতই তাঁদের লোকবল ও অস্ত্রবল অসুগত থাকার কথা নয়। তা ছাড়া নেমেছেন তাঁরা ভূ-পৃষ্ঠের গ্রাষ সর্বত্রই। এ অস্ত্র অল্প বসন্ত ও লোকবল নিয়ে এরা লোকালয়ে অবতীর্ণ হতে সাহসী হতেন না হয়ত। চন্দ্রপৃষ্ঠে আমরা হ'লেন নভক্ষরকে

পাঠিয়েছিলাম। তাঁরা কি পারতেন, চান্দ্রীয় জীব বর্তমান থাকলে তাদের মধ্যে নিয়ে সরাসরি অবতরণ করতে পারতেন না। চান্দ্রীয় জীবরা আদ্যমতম অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাণী হলেও সেই বুদ্ধি তাঁদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব ছিল না। বাইবেলে, যে মহাপ্রভুর পর্বতশীর্ষে অবস্থানের কাহিনী আছে, তিনি পরগণ্যকে নিবেদন করে দিয়েছিলেন যেন সাধারণে তাঁর সেই পার্বত্য অবস্থানের কাছাকাছি না হয়। হ'লে, হয়কি দেওয়া হয়েছিল, ফলস্বরূপ হবে তাদের। দেবতারা উন্নত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পন্ন হলেও পৃথিবীর মানুষকে একেবারে অবহেলা করতে পারতেন না। কারণ প্রাচীনগণও খুবই দুর্বল ছিলেন, পুরাণ কথায় এমন ইদিত নেই। মিশরের 'কারোণ'ক' নিজের আদেশ দ্বারা করতে 'সদাপ্রভুকে' কম বেগ পেতে হয় নি। 'মোশির' (মোজেশ) মাধ্যমে 'সদাপ্রভু' কয়েকটি ভীতিপ্রদ ভেদ দেখিয়েছিলেন 'কারোণ' বা কারাগণকে। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়ে যায়। কেন না প্রাচীন মিশরীয় মন্দিরভাড়াও নিজেদের শক্তিতে একই রকম ভেদ দেখায়ে সদাপ্রভুকে বারবার নতন পদ্ধতি গ্রহণ করে মিশরীদের জয় করতে হয়েছিল। প্রয়োজন হয়েছিল পাকা দশটি আঘাত হানার। দৈবর দেখানে, কেবলমাত্র ইস্রায়েলীদের দৈব, সর্ববর নন। তিনি নিজে ইস্রায়েলীদের উর্ধ্বতম সাময়িক অধিকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন (এলোভাম, বা যাজ্ঞাপুস্তক)। মহাভারতে মহাদেব এসেছেন অর্জুনের ও পাণ্ডবদের দেবতা এবং রক্ষক হিসেবে দেবশিবিরের সাহায্য দান করতে। মিশরীরা, ইস্রায়েলীদের তিনশ বছর দাসত্বের কারাপারে নিগৃহীত করেছিল। 'সদাপ্রভু' তাঁদের উদ্ধার করেন। পাণ্ডবরা রাজ্যচ্যুত হয়েছিলেন, কতিপয় দেবগণ তাঁদের রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে সাময়িক সহায়তা দান করেন।

অর্জুনের অপরাধ গ্রন্থ, শরীর ব্যতীত অন্য কোনো দেবতা কি তাঁর শরপ্রহার সহ করতে পারতেন? না, তা হলে অর্জুন অবশ্যই সে দেবতাকে শমন সদনে প্রেরণ করতেন। এ প্রশ্নটি আমাদের বস্তুত অবাক করে দেয়। যে দেবতারা সর্বশক্তিমান হিসেবে আমাদের পূজা দানি করে এগেছেন, তাঁরা শুধু মানুষের কাছে পরাজিত হ'ন না, তাঁরাও বংশীল, অর্জুনের হাতে তাঁদের মৃত্যুও হতে পারে। দেবতারাও যে রক্তমাংসের জীব, অর্জুনের এই চিন্তা তাঁর আর একটি অবিসম্বাদী দাক্ষ্য। আগেই (পূর্ববর্তী আলোচনা) ঐতরের উপনিষদের কথা বলেছি। সেখানে দেবতারা ক্ষুধাতৃষ্ণার অধীন সংসার-সমুদ্রে নিষ্কিপ্ত লোকপাল মাত্র। সর্বশক্তিমান দৈবর মানুষ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের রক্ষকরূপে এই লোকপালদেরও সৃষ্টি করেছিলেন, ঐতরের একথাই জানিয়েছেন আমাদের। আগের আলোচনায় আমার ওর্ক ছিল, ইচ্ছাকৃত ভাবে অথবা বিজ্ঞানবিশ্ববৃত্ত: কল্পিত বৈদিক দেবতাদের নাম পর্বত গায়েব করে পরবর্তী ঋষিরাই সম্ভবতঃ এই দেহধারী বুদ্ধিমানদের দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বর্তমান আলোচনার আলোকে আমার ঐ যুক্তি কি আরও বেশি আলোকিত হয় না? বেদ অপেক্ষা উপনিষদ বহু পরবর্তী; প্রায় ভারতযুদ্ধের সমসাময়িক। এই সময় দেবদানিট 'সমাসরি' আধাবর্তে প্রত্যক্ষ কমতা প্রদর্শন শুরু করেছে। তাঁদের ক্রিয়াকলাপে যুদ্ধ তাঁদের অসুগত স্বমিরা যদি এসব 'সদাপ্রভুদের' কল্পিত দেবতার আসনেই প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন, তবে তৎকালীন অবস্থায় তা অস্বাভাবিক কিছু হয় নি।

দেবদানিওঁরা তৎকালীন দেবগণকে অলৌকিক দৈবর বানিয়েছিলেন নিজেদেরই গোপীবার্ণে। রক্ষককে দেবতা বানালে সেই দেবতার শিষ্ট সামন্ত, অসুগত রাজস্বর্গ ও চামচাঙ্গল চমৎকৃত মানুষের মধ্যে সহজেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন। আজও বৈজ্ঞানিক রাজনীতি এইভাবে (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

আমরা তাহলে কী করব

অরুণাশঙ্কর রায়



বিশ বছর বয়সে পৃথিবীতে আমার একটামাত্র শত্রু ছিল। নাম তার মুসোলিনি। ত্রিশ বছর বয়সে আরো একটি বাড়ল। নাম তার হিটলার। ব্যক্তিগতভাবে এঁদের কারো সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। দেশগতভাবেও আমার স্বদেশের সঙ্গে নয়। কিন্তু যে স্বত্ববাদের এঁরা প্রবক্তা সে স্বত্ববাদ ছিল আমার নিজের স্বত্ববাদের বিপরীত বেলু। আর আমার নিজের স্বত্ববাদ ছিল ইংলণ্ডের লোকের জীবনবোধ, পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসী বা 'স্বত্বভার' প্রাণ দিতে পারে।

দিয়েছেও বিগত মহাযুদ্ধে। সেই মহাযুদ্ধে আমিও ছিলুম কাইজার, দ্বিতীয় উইলিয়ামের বিপক্ষে। একজন রাজতন্ত্র ভারতীর বলে নয়, একজন গণতন্ত্রের পক্ষপাতী নাগরিক বলে। তখনকার দিনের 'বারা' কংগ্রেসনারক তাঁরাও ছিলেন তাই। আমাদের বাড়ীতে হয়েছিল বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বেদলী' নেওরা হতো।

৯ দশ বছর বয়স থেকেই আমি তার নিয়মিত পাঠক। 'ইংরেজরা সাম্রাজ্যবাদী বা বুয়োক্রাট, অতএব তাদের সঙ্গে আমাদের শত্রু সম্পর্ক, কখনো একথা আমাকে কেউ বলেননি। বরঞ্চ এই কথাই যে, কংগ্রেস যেটা চাইছে সেটাই ভাগো আর সেটার অস্বীকার তো ইংরেজরাই দিচ্ছে।

মটেও চেমসফোর্ড রিকর্ডস চেহারা দেখে অনেকেরই মোহভঙ্গ হয়। তাদের মধ্যে আমিও একজন। কিন্তু যে স্বত্বভারের দাবীতে অসহযোগ আন্দোলন সেটাও ইংরেজদের দেশের পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসীর ভারতীয় পরিণতি আর কিছু নয়। নেতারা স্বরাজ পেলে সেগল বা মারাঠা রাজ্য কিরিয়ে আনতেন না। দেশীয় রাজ্যের শাসন পদ্ধতিও ছিল না তাঁদের লক্ষ্য। গান্ধীজী অবশ্য রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখতেন, কিন্তু তাঁর রামরাজ্য ছিল টলস্টয়ের কিংডম অর্থাৎ গডের স্বাবাস্যবাদ। যেমন স্বরাজ ছিল ইংরেজদের সেলক'গার্ডনেস্টের স্বাবাস্যবাদ। তবে তাঁর একটা নিজস্ব স্বত্ববাদ ছিল। সেটা কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের স্বত্ববাদ নয়। সেটা হলো পঞ্চায়তী গণতন্ত্র। গ্রামগুলো হবে স্বাধীন ও স্বয়ংশাসিত। সেই পঞ্চায়ত উপর গড়ে উঠবে এক বিশাল পরিষদ। বার চুড়া হবে কুজায়তন কেন্দ্রীয় সরকার। তার পেছনে সামরিক শক্তি থাকবে না। থাকবে নৈতিক শক্তি। এটা ভারতের

অভিনব এক আদর্শ। সম্রাট অশোকের পেছনেও ছিল মহাপরাক্রান্ত বৌদ্ধ সেনা। রামায়ণকে যদি ইতিহাস বলে গণ্য। কবি তবে রামের পেছনেও কি সামরিক শক্তি ছিল না? কংগ্রেস নেতারা সামরিক শক্তিও চেয়েছিলেন, শুধু রাজনৈতিক শক্তি নয়। সিভিল ও মিলিটারি উভয়বিধ পাওয়ার না পেলে স্বরাজ কখনো পূর্ণ হতো না। আর সে স্বরাজ হতো একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তেমন একটি সংবিধানের খসড়া মোজিলাল নেহরু কমিটি প্রণয়ন করেন।

এখন মুসোলিনি ও হিটলার প্রসঙ্গে কিরে আসি। সে বয়সে আমার ধারণা ছিল স্বত্ব নষ্টের গোড়া ওই দুই ব্যক্তি বিশেষ। যেন ওদের জন্মেই ইটালীর ও জার্মানীর গণতন্ত্র নষ্ট হলো। হ্যাঁ, কাইজারের পলায়নের পরে জার্মানীতেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে বিদ্রোহের পরে দেখলুম যে ইটালীর মতো পঞ্চাংগদ দেশ যদি স্বরিতপথে শিল্পবিপ্লব চায় তো ছায়ার মতো অন্ধসরণ করে সমাজতন্ত্রবাদ। ইংলণ্ডে যেটা বিলম্বিত ইটালীতে সেটা দ্রুত। তখন ধনিকে অমিকে বিরোধ বেধে যায়। সে বিরোধ মেটানো যদি গণতন্ত্রের অসাধ্য হয়, মেটাতে গিয়ে দেশ যদি দেউলে হয়, মুদ্রাস্ফীতি যদি মাতা ছাড়িয়ে যায়, বেকারসংখ্যা যদি লাক দিয়ে বাড়ি তাহলে হঠাৎ একজন বা একদল লোক এসে ক্ষমতা আত্মসাৎ করে ও এমন এক সরকার গঠন করে যে সরকার নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের কাছে দায়ী নয়, সে সরকারের বারী সভাসদ তাঁরাও জনসাধারণের কাছে দায়ী নন। নিজের দলটি ছাড়া আর কোনো দলকে এরা টিকতে দেয় না। মুসোলিনির দলের নাম কাসিস্ট দল। মুসোলিনি নিজে ছিলেন সোশিয়ালিস্ট। পরে হন কাসিস্ট। সমাজতন্ত্রকে তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। জোরটা তিনি দেন ইটালীর জাতীয়তার উপরে। তেমনি হিটলারও দেন জার্মান জাতীয়তার উপরে। তিনিও ছিলেন সোশিয়ালিস্ট। পরে হন জাশনাল সোশিয়ালিস্ট। সংক্ষেপে নাংসী। সমাজতন্ত্রকে তিনিও পুরোপুরি বিসর্জন দেননি, ধনতন্ত্রকেও পুরোপুরি গ্রহণ করেননি।

কলকৃতি হলো এই যে ধনতন্ত্রেরও আধাধা বইল, সমাজতন্ত্রেরও আধাধা না এল, 'বিনষ্ট হলো শুধু গণতন্ত্র। বড়লোকদের

ছর্ছাবনা গেল, আর ধর্মঘট ইত্যাদি ঘটেছে না। গরিবদের ছর্ছাবনা গেল একেবারে নিরুর্ধা ও নিরস্ত্র থাকতে হচ্ছে না। মধ্যবিত্তদের ছর্ছাবনা গেল, মুদ্রাস্ফীতির দরুন তাদের জীবনযাত্রা দুর্বহ হচ্ছে না। তা হলে কেন কেউ গণতন্ত্রের অন্তে প্রাণ দেবে? যেমন দিয়েছিল ইংরেজরা যুদ্ধকালে। পরেও দিত, যদি তাদের দেশে গণতন্ত্র খতম হতো। সচকালে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে ইটালীর গণতন্ত্র ব্রাহ্মিক শিল্পবিপ্লবের টাল সামলাতে পারল না, নইলে ইটালীর জনসাধারণ যে গণতন্ত্র-বিরোধী বা নাগরিক অধিকারে উদাসীন তা নয়। জার্মানীর জনসাধারণ শিল্পবিপ্লব কাইজারের আমলেই স্বরাজিত হয়েছিল, সমাজতন্ত্রও এগিয়ে হয়েছিল। যুদ্ধোত্তরকালে ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে নিদারুণ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় বেকারসংখ্যা অতিক্রমিত হয়, তাই জার্মানীর গণতন্ত্র চলন করতে থাকে। নইলে জার্মানীর যে গণতন্ত্রবিরোধী বা নাগরিক অধিকারে উদাসীন তাও নয়। উভয় ক্ষেত্রেই স্ট্রাবিলিটির প্রয়োজন মেটার ডিক্টেটরশিপ। অধিকাংশ লোক কী চায়? স্ট্রাবিলিটি। যে যা চায় সে তা পায়।

ইংরেজ রাজতন্ত্রে এককাল স্বামী হলো তার মূলত সেই স্ট্রাবিলিটির প্রয়োজন। সেটা মেটাতে পারত সাম্রাজ্যবাদী বুয়োক্রাসী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কা সইতে না পেরেতাকেও বিদায় নিতে হলো। দেশ হলো জাতি-বিবাদে ছ'ভাগ। এখন যে অংশের নাম ভারত সেখানেই স্ট্রাবিলিটি বেশী পার্জিতানে ও বাংলাদেশে কম। এর অন্তে আমরা কৃতজ্ঞ। গণতান্ত্রিক শাসনেও যে স্ট্রাবিলিটি রক্ষিত হতে পারে সেটা সম্ভব হয়েছে স্বদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যাঁরা এক-শিবিরে থেকে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে শিখেছিলেন সেই শিফানবিশীর অন্তেই। এঁরা সবাই সবাইকে চেনেন। সকলেই সকলের সহকর্মী। হাইকমান্ডকে যেনে চলাও এঁদের অভ্যাস। কিন্তু স্বরাজিত শিল্পবিপ্লব, ধনিকদের পৌষ্যাস, শ্রমিকদেরও পিঠে পার্বণ, টেনিসকদেরও সংব্যাবৃত্তি, দেশকে এই ত্রিশ বছরে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছে শ্রেণী-বিরোধের অভিমুখে। কংগ্রেসকেও জার্মানীর সোশিয়াল ডেমোক্রাটদের (অস্বত্বভন করছে হচ্ছে) সোশিয়াল ডেমোক্রাটরা একদিকে ছিলেন

ডেমোক্রাট, আরেকদিকে সোশিয়ালিস্ট। দুই দিক সামাল দেওয়া যে কী কঠিন তা জার্মানদের দেশে গিয়ে আমি বুঝতে পারি বলেই পরবর্তীকালে কংগ্রেসের একজন উদীয়মান নেতাকে লিখি, দেশ একদিন স্বাধীন হবে, তখন কংগ্রেসই হবে এ দেশের সোশিয়াল ডেমোক্রাট পার্টি। হয়তো তারই মতো একদিন ব্যর্থ হবে, যদি আগে থেকে সাবধান না হয়।

সোশিয়ালিজম নামক তত্ত্বটির এমন কোনো কথা নেই যে এটি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ব্যর্থতার উপরেই নির্ভর। ইংলণ্ডের লেবার পার্টিও একটি সোশিয়াল ডেমোক্রাটিক পার্টি। একাধারে সোশিয়ালিস্ট ও ডেমোক্রাটিক। লেবার পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বার বার সে দেশ শাসন করেছে ও এখন করছে। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় তা হলে অপো-জিশনে বসবে। ছায়া মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করবে। পরে আবার কায় ধারণ করবে। তবে ইংলণ্ডের সুবিধা হলো সে দুই শতাব্দী ধরে শিল্পবিপ্লব চালিয়ে এসেছে। তাই সে বিপ্লবের লম্বটা বিলম্বিত নয়। তেমন বিপ্লবকে বিবর্তন বলাই সম্ভব। ইংলণ্ডের জনগণ বিবর্তনমর্মী। রেভোলিউশন নয়, এভোলিউশন ওঁদের রস্টে। সেটা প্রতিকলিত হচ্ছে তাদের পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসীতেও। সেখানকার কনসারভেটিভরাও বিবর্তনশীল। লিবারলরাও তাই। লেবার পার্টির সদস্যরাও তাই। মুষ্টিমেয় একদল কমিউনিস্ট এখনো দিন গুণছে সমাজ বিপ্লবের। তাদের সাকল্যের সম্ভারনা সেই পরিমাণে আছে যে পরিমাণে তারা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতালান্ডের যোগ্য। পার্লামেন্টের সদস্যদের অধিকাংশ যেদিন কমিউনিস্ট হবে ইংলণ্ডও সেদিন কমিউনিস্ট শাসন যেনে নেবে।

সংবিধানে কোনো বাধা নেই। সমাজতন্ত্রবাদ নামক তত্ত্বটিতেও কোনো বাধা নেই। বাধা যদি থাকে সেটা আছে কমিউনিস্টদের নিজেদের ভগ্নময়। তাদের ভগ্নমী অস্বপ্নেরে বিবর্তন নয়, বিপ্লবই অবশ্য-স্তাবী। পার্লামেন্টারি প্রোসেসের ভিতর দিয়ে নয়, বিপ্লবের প্রণববল্লগার ভিতর দিয়েই পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক-রাষ্ট্র ভূমিষ্ট হয়েছে। হুত্তরাং একে একে প্রত্যেকটি শ্রমিকরাষ্ট্রই অমনি করে ভূমিষ্ট হবে। বিবাতাত লিখনের মতো ইতিহাসের লিখন।

রুশদেশে ইংলণ্ডের মতো দুর্বের কথা ইটালীর মতো পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসী ছিল না। যা ছিল না তার ব্যর্থতার প্রস্ত উঠতে পারে না। একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে যে রুশদেশে পরীক্ষা করে দেখা গেল

পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসী ব্যর্থ হয়েছে। যেটা সে দেশে ব্যর্থ হলো সেটা গণতন্ত্র নয়, আরতন্ত্র। সে জিনিস কি ইংলণ্ডে আছে, না ফ্রান্সে আছে, না আমেরিকায় আছে, না ভারতে আছে যে তার ব্যর্থতার প্রশ্ন উঠবে? এদব দেশের পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসী যদি ব্যর্থ হয় তবে যেটা হোঁ মেরে ক্ষমতা কেড়ে নেবে সেটা মুসোলিনি মার্ক। কাসিনজ বা হিটলারমার্ক। ভ্রাশনাল সোশিয়ালিজম বা ফ্রাঙ্কোমার্ক। মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ। তার সঙ্গে মোকাবিলার জিততে হবে কমিউনিস্টদের, যদি জনগণের সমস্ত শক্তি পেছনে থাকে। সে পরিস্থিতিতে সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা ভুলবেই বা কে? ভুললে ভুলবেই বা কে?

এখন পর্যন্ত যে সব দেশে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয় নি সে সব দেশে ইংলণ্ডের লেবার পার্টির মতো গণতান্ত্রিক সমাজ-তন্ত্রী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরেই সরকার গঠন করেছে। তবে লক্ষ্য দেখে যেন হচ্ছে ইটালীতে অচিরেই কমিউনিস্ট পার্টিও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করবে। কিন্তু এই শর্তে যে, পরে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় তা হলে সরকার পক্ষের আসন থেকে সরে গিয়ে বিরোধীপক্ষের আসনে বসবে। অর্থাৎ তাকে ইংলণ্ডের লেবার পার্টির পন্থা অস্বত্বভন করতে হবে। ওরা বিবর্তনমর্মী, বিপ্লবমর্মী নয়। বিপ্লব যাদের ধর্ম তাদের হটাচার অন্তে অপেক্ষা করে প্রতিবিপ্লব। বিবর্তন যাদের ধর্ম তাদের হটাচার অন্তে অপেক্ষা করে কনসারভেটিভ বা লিবারল দল। ইটালীর কমিউনিস্টরা নিশ্চয়ই এটা বোঝেন যে একবার পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে ক্ষমতাসীন হয়ে তারপর সেটাকে ভূমধ্যাগরের জলে ডাসিয়ে দেওয়া যাবে না।

এটাও যেন রাখতে হবে যে রাজনীতিকক্ষে্রে পরাজিত হলেও অর্থনীতি-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রেণী তার বিভিন্ন বাঁটির উপর দখল কারেম রাখে। সে সব বাঁটি থেকে তাকে হটানো তেরল-মাত্র আইন পাশ করলেই হয় না। হুত্থানমা জারী করলেও হয় না। সে আদালতে যায়, সেখানে তার পক্ষে লড়ে উকীল ব্যারিস্টার। সেখানকার প্রোসিডিওর চীর্থহুতী। তাকে সংক্ষেপ করাও সম্ভব নয়। সর্বত্রই দেখা যায় আদালত সম্পত্তির প্রতি সদয়। নয় কেবল কমিউনিস্ট রষ্ট্র-গুলিতেই। সে সব রাষ্ট্র রক্তপাতের ভিতর দিয়ে না গেলে আদালতের প্রাচীর অতিক্রম করা তাদেরও দুঃসাধ্য হতো। কমিউনিস্ট নয়, অথচ সোশিয়ালিস্ট এমন রাষ্ট্র যদি কোথাও থাকে (শেবাংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়)

আমরা তাহলে কী করব

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

তবে সে সব দেশ বড়ো জোর করে কলকারখানা বা কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করে। রাষ্ট্রের জমি, মূল্যের দোকান, ভেজারভরী ব্যবসা যেমনকে তেমন রয়েছে। বাড়ীওয়ালার বাড়ীভাড়াও আদায় করছে। এদের গারে হাত পড়লে এরাই হবে কাসিস্ট বা নাংসী। কিন্তু ভেদ ধারণ করবে সোশিয়ালিজমে। পার্টির নামকরণ দেখে যে-আইনী বলতে পারা যাবে না। তথাকথিত সোশিয়ালিস্ট, নাসাবলীর আড়ালে থাকবে স্বদ্রোহ, মুনাফাখোর ভাড়াভাষী।

ত্রিশ বছর আগে আমি উপলব্ধি করি যে কাইজারের বিদ্যার পর আর্মীনার যে অবস্থা হয় কাইজার-ই-হিন্দের অর্থাৎ ভারতসম্রাটের বিদ্যার পর ভারতেরও সেই অবস্থা হবে। এর পরের অব্যাহতি হবে ভাইমার রিপাবলিকের ও ভাইমার কমিউনিষ্টপার্টের অধিকার। তবে দেশভাঙ্গার ক্ষেত্রে আমি প্রস্তুত ছিলাম না, সেটা তখন আর্মীনে ঘটেছিল, তার কারণ সেটা আরো আগে ঘটে গিয়েছিল, যখন ক্যাথলিকদের ভাগে পড়ে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও প্রোটেষ্টান্টদের ভাগে পড়ে আর্মীন সাম্রাজ্য বা সংক্ষেপে জার্মানী। এই পর্বটা তখন মনে হয়েছিল অর্ধজীন, এখন বুঝতে পারছি অপ্রতিরোধ্য। এটা যখন সারা হয়ে গেল তখন সংবিধান রচনাও অপেক্ষাকৃত দ্রুত হলো, নইলে তিন বছর কেন তেইশ বছরও হতো না। কতকাল লাগল পাকিস্তানে। তাও বাংলাদেশ বেরিয়ে যাওয়ার পর। ইসরায়েল এখনো তার সংবিধান রচনা করতে পারে নি। লেবানন যেটা করেছিল সেটা একটা কাঁচারকম আপস, তাই এখন গৃহযুদ্ধে জর্জর। সর্বস্বীকৃত সংবিধান এখনো বহুদূরে। তার অভাবে লেবানন দু'ভাগ হয়ে যেতে পারে।

সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধান সংরচিত হলো। স্থাপিত হলো ভাইমার রিপাবলিকের অধিকার একটি সেতুলার ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্র। যে-সকলের উপর শাসনভার জ্ঞাত হলো সেটিও একটি সোশিয়াল ডেমোক্রেটিক পার্টি। যদিও সোশিয়ালিস্ট শব্দটি সে সময় ব্যবহার করতে বাধ্য ছিল। কারণ আবাহরলাল ও আদাম সোশিয়ালিস্ট হলেও বলত-ভাই ও রাহেমত প্রসাদ তা ছিলেন না। আপস হিসাবে সংবিধানে সোশিয়াল জাসটিস কথাটি ব্যবহার করা হয়। পরে কংগ্রেসের অধিবেশনে ব্যবহার করা হয় সোশিয়ালিস্ট প্যাঠান পদটি। কংগ্রেস দু'ভাগ হয়ে বাবার পর সোভিয়েত সোশিয়ালিস্ট শব্দটি ব্যবহার করতে আর বাধ্য হইল না।

কংগ্রেসের বৃহত্তর ভাগটি এখন অর্থাৎ সোশিয়ালিস্ট ডেমোক্রেটিক বা সোশিয়াল ডেমোক্রেটিক হয়েছে। এমন যে হবে এটা আমি অনুমান করেছিলাম। এতে আমি বিশ্বস্ত হইনি। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়েছে সংশোধিত সংবিধানে ভারতবর্ষের নামকরণে 'সোশিয়ালিস্ট' বিশেষণটির ব্যবহার। একটা পার্টি নিজেকে সোশিয়ালিস্ট, কমিউনিস্ট, কাসিস্ট, কনসারভেটিভ, লিবারল, র্যাডিকাল ইত্যাদি যে-কোনো মতবাদের দ্বারা বিশেষিত করতে পারে। সে অধিকার তার আছে। কিন্তু রাষ্ট্রকে সোশিয়ালিস্ট বলে বিশেষিত করা কি তার অধিকার অধিকৃত না অধিকার বহির্ভূত? পার্লামেন্টে দুই তৃতীয়াংশ ভোট পেলেই কি রাষ্ট্রের চরিত্র বরাবরের অন্তে নির্দিষ্ট করবার অধিকার বর্তার? তা হলে পাকিস্তানকে ইসলামিক স্টেট বলে বিশেষিত করে মুসলিম লীগ কী অপরাধ করল? কে জানে জনসংঘও তো একদিন পার্লামেন্টে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে। তখন সে যদি ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বলে অভিহিত করে সংবিধান শোষণার তখন সেটা কি তার অধিকার বহির্ভূত হবে না অধিকার অধিকৃত হবে?

এতে শুধু ক্যাপিটালিস্ট বা দক্ষিণ-পশ্চিমের আঘাত করা হলো না। হলো গান্ধীপন্থী কর্মীদেরও। তাঁরাও এক জাতের সোশিয়ালিস্ট। কিন্তু তাঁদের ওটা ইউটোপিয়ান সোশিয়ালিজম গোজের। তাঁরা চান রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীভূত করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে। ধরে ধরে ছড়িয়ে দিতে। তাঁরাও চান সামাজিক শ্রায়। কিন্তু রাষ্ট্রকে তাঁরা সর্বশক্তিমান করতে নারাজ। রাষ্ট্রের আত্মা যদি থাকে তবে সে দেশরক্ষা প্রভৃতি করে কী কী কর্তব্য সম্পাদনের জন্য ন্যূনতম ক্ষমতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুক। অমিয় মালিকানা সম্পত্তির মালিকানা প্রভৃতি বিতর্কিত বিষয়ে রাষ্ট্রের মনোপলি অহিংসভাবে হতে পারে না। আর হিংসার প্রয়োগ অধিকাংশের ভোটে হলেও সেটা গান্ধীপন্থীদের মূলনীতিবিরুদ্ধ। প্রতিরোধ করা না করা আপাততঃ জরুরি হয়ে ওঠে নি। শুধু জানিয়ে রাখলেই চলবে যে রাজকীয় হিংসার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য যাদের কাছে আপত্তিকর ছিল রাষ্ট্রীয় হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রও তাঁদের কাছে আপত্তিকর। আর এ তো জানা কথা যে সোশিয়ালিস্ট স্টেট বলে যে সব রাষ্ট্র আত্মপরিচয় দেয় সে সব রাষ্ট্র ক্ষমতার

হস্তান্তরে বিশ্বাস করে না। পার্লামেন্টে ডেমোক্রেটিক বৈশিষ্ট্য এইখানে যে ক্ষমতাসীন নির্বাচিত পার্টিকে সে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার পর ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকতে দেয় না। নতুন করে নির্বাচনে নামতে ও অধিকাংশের আস্থা অর্জন করতে বাধ্য করে। সে বার বার নির্বাচিত হয়ে হুইডেনের সোশিয়ালিস্টদের মতো একটানা চূরান্নাশ বছর ধরে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে, কিন্তু ক্ষমতার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সব সময় প্রস্তুত থাকে। ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটে তখন, যখন নির্বাচকদের দ্বারা তার বিরুদ্ধে যায়। হুইডেনের সোশিয়ালিস্টরা চূরান্নাশ বছর ধরে আত্মভোজন হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রকে সোশিয়ালিস্ট স্টেট বলে বিশেষিত করেন নি। তুমি নিজে সোশিয়ালিস্ট হতে পারো, কিন্তু রাষ্ট্রকেও যদি সোশিয়ালিস্ট বলে ঘোষণা কর তা হলে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটবে কেমন করে? তা হলে পার্লামেন্টে ডেমোক্রেটিক বৈশিষ্ট্য রটল কোথায়? এটাই হলো আমকের দিনের প্রশ্ন।

গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে আমার মিল যেমন আছে, অমিলও তেমন আছে। এখন আমি যে ভূমিকা অবতীর্ণ হয়েছি সে ভূমিকা একজন গান্ধীপন্থীর নয়। সে ভূমিকা একজন লেখকের, শিল্পীর, বুদ্ধিজীবীর। আমার কাজ হচ্ছে বিতর্কিত বিষয়কে জলের মতো পরিষ্কার করা, যাতে পাঠকরা বা শ্রোতারা নিজেরাই চিন্তা করে বুঝতে পারেন কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ। এখনো নির্বাচন প্রধা বদ হয় নি, বদল হয় নি। এখনো আমরা সবাই নাগরিক, সবাই নির্বাচক। আমাদের মতামতের দাম এখনো কিছু আছে। যদিও সংবিধান সংশোধনের আগে আমাদের মতামত কেউ জানতে চান নি। নানা কারণে আমি সোশিয়াল ডেমোক্রেটিকদের পছন্দ

করি। কিন্তু পক্ষভুক্ত নই। চিরকাল আমি অপক্ষপাত, সরকারের সামিল থেকেও স্বকীয়তা রক্ষা করেছি। পক্ষভুক্ত নই বলেই আমি স্বাধীনভাবে আমার বক্তব্য দেশবাসীকে শোনাতে বা জানাতে ইচ্ছা করি। এটা একজন ইনটেলেকচুয়াল হিসাবে আমার কর্তব্য।

পার্লামেন্টে ডেমোক্রেটিক যদি ভারতের অতঃপন্থক হয়ে থাকে তবে তার সংশোধনের কী প্রয়োজন? তাকে শেষ করে দাও। কী দরকার ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের মতো সোভারেন হওয়ার, যদি তার স্পিরিট না হয় ইংরেজের মতো, বা পার্লামেন্টের মতো? এই সংশোধনের পাঠ পড়ে ইংলণ্ডে এমন কোনো ইংরেজ নেই বা সেখানকার পার্লামেন্টে এমন কোনো মেম্বর নেই যিনি চিন্তে পারবেন যে এটা তাঁদের ঐতিহ্যের অঙ্গস্বরূপ। সোশিয়ালিজম প্রতিষ্ঠাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে কংগ্রেসকে সোশিয়ালিস্ট বিশেষণে বিশেষিত করাই যথেষ্ট। সবে সবে বলতে হয় কংগ্রেস প্রাইভেট প্রপার্টি রাখতে দেবে কি দেবে না, রাখতে না দিলে ক্ষতিপূরণ দেবে কি দেবে না, রাখতে দিলে কী কী শর্ত আরোপ করবে। সোশিয়ালিজমের আদর্শ কথাটাই তো হলো সম্পত্তির মালিকানা খণ্ডিত। সেটাকে কোম্পানি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। যে ছবিটা ফুটে বেরোচ্ছে সেটা সোশিয়ালিজমের অভিমুখে পদক্ষেপ, না ডেমোক্রেটিক উল্টোদিকে পদক্ষেপ, আমিই তো ঠাঠা করতে পারছি। ইংরেজদের কেমন করে বোকাব? তবে এর দ্বারা একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, যদি সেটাই হয়ে থাকে উদ্দেশ্য। আর্মীনার মতো কমিউনিস্টরা বলতে পারবে না যে, 'সোশিয়াল ডেমোক্রেটিক' হচ্ছে আসলে সোশিয়াল কাসিস্ট। তাদের চেয়ে নাংসীরা কম খারাপ।

আর্মীনার নাংসীদের সঙ্গে হাত মেলানো, কমরেড। সোশিয়াল কাসিস্ট বিদ্রোহ করো। আর্মীনার নাংসীরাও বলতে পারবে না যে 'সোশিয়াল ডেমোক্রেটিক' হচ্ছে প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট। তাদের চেয়ে কমিউনিস্টরা কম খারাপ। অতএব কমিউনিস্টদের সঙ্গে হাত মেলানো, আদাত। সোশিয়াল ডেমোক্রেটিকদের বিদায় করো।' বলা বাহুল্য সোশিয়াল ডেমোক্রেটিকদের পরাজয়ের পর নাংসীরাই প্রবল হয়ে কমিউনিস্টদেরও বিদায় করত।

আমরা ত্য হলে কী করব? আমরা যারা সোশিয়াল ডেমোক্রেটিক নই, কাসিস্টও নই, কমিউনিস্টও নই। আমরা যারা লিবারল বা র্যাডিকাল, গান্ধীপন্থী বা কেরিয়ান। কিংবা আমরা মতো স্বভাবে নন-কমফর্মিস্ট তথা চরিত্রে ডেমোক্রেট।

স্বরক্ষার চিত্রাঙ্গদা

কলকাতার হামেশা যে ধরনের নৃত্যনাট্য অভিনীত হয় স্বরক্ষা অভিনীত চিত্রাঙ্গদা (রবীন্দ্রসমন, ১৭ এপ্রিল) তা থেকে অনেক বিষয়েই জালাদা। শূন্য মঞ্চে 'আমার পরাণ লয়ে' গানটি অনেকেরই গাওরানোর সাহস রাখেন না। অঙ্গসজ্জা, সঙ্গীত এবং নৃত্যপরিচালনারও রবীন্দ্র প্রবর্তিত দ্বারাই অক্ষুণ্ণ হয়েছে। তথাকথিত নাটকে, দলের উপস্থাপনা থেকে এর খাত্তর সহজেই অস্বস্তিবোধ। নৃত্যে স্বরক্ষা-দল বাবরই শক্তিশালী, গীতাংশেও এবার তারা উন্নত মানের পরিচয় দিয়েছেন। একক গানে আশিশ ভট্টাচার্য, নীলমণি দত্ত, উমিলা ঘোষ, শ্রীমতী দাশগুপ্ত এবং নৃত্যে পুণিমা ঘোষ এবং গোবিন্দন কুজি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যুদ্ধ-সুযোগিতা সমান স্তরের হলে সর্বাঙ্গ-সুন্দর হত।

মহাভারতের স্বর্গ ও দেবতা

(৬ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যক্তিগত আবহাওয়া সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ক্ষমতা করা যত করার চাতুরী গ্রহণ করে। সেদিনও একই খেলা হয়নি এমন কথা জোর করে বলা যায় কি? অসম্ভব নয়, সেদিন দু'বাসা প্রযুক্তি বাস্তব ঘটনাবলীর ওপর আলোকিত করে একটি ভক্তির ও আলোর রাজত্ব কার্যে করছিলেন। দেবাত্মক কুটনীতিকরা মাহুষের ধর্মগুরু সেজে মন্ত্রমুগ্ধতার সাহায্যে প্রাপ্ত কিছু বৈজ্ঞানিক শক্তিকে মাহুষের কাছে আলৌকিক ভেদিক রূপে প্রদর্শন করতেন। দেবতাদের তাঁরা সাধারণের সামনে আনতেন না, পাছে সাধারণের প্রশ্ন আসে। অতঃপেই অন্ধকার ও অশিক্ষার যুগ প্রত্যেক দেহধারী ক্ষমতাবানকেও জঁবর বলে মানতে নিশ্চয় গররাজি ছিল না। আজও কি আমরা গুরুসম্প্রদায়কে জঁবর জান করিনি? কিছু ভেদিক প্রভাবে প্রভাবিত হই না? সেদিন মুনিরা ছুটতে-পড়তে (যেন দেবতা মাহুষের অন্তরে বাস করেন না)। তারপর কিছু শক্তি সঞ্চয় করে সমস্ত এ

করতেন ইতিভাক। বলতেন, জঁবর-দর্শন হয়েছে, ঐশ্বরিক ক্ষমতা লাভ হয়েছে। যেহেতু সাধারণ এই কুটনীতির কিছুই সম্যক অবগত ছিলেন না, বিবেচনের ক্ষমতাও ছিল কম, তাই তাঁরা ভয় ও ভক্তির প্রাবল্যে বুদ্ধিমানদের তৈরী অহুশাসনকে জঁবরাদিষ্ট বলে মাথা পেতে মেনে নিতেন। আজ এ বিষয়ে নতুন করে চিন্তার হযোগ এসেছে।

অতঃপেই মহাত্মাকে পরাজিত করা অসম্ভব হ'লে অবশেষে অজুন তাঁর সঙ্গে মিলে অস্বস্তি হয়েছিলেন, এবং মহাত্মার দীপ্তিমান দেহ স্পর্শও করেছিলেন। এজন্য অজুনের আত্ম-আমোদ ও পরিতৃষ্টি কথা নেটি করে রাখতেও ভুল হয়নি ইতিবৃত্তকারের। এ প্রসঙ্গে কোনো দিব্যদেহ স্পর্শেরও উল্লেখ নেই। দেহধারী সাধারণ রক্তমাংসের মহাত্মা এই সংঘর্ষকালে সম্পূর্ণ ভাবেই ধরা পড়ে গেছেন। (চলবে)

প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দুর্নীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রী অসুস্থতা ছাড়াই ছয় লক্ষ টাকা মূল্যের পরিবার পরিকল্পনা অফিসারের নামে ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয়, যার ঠিকমত হিসেব নেই।

কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন জেলায় পরিবার পরিকল্পনার কাজের জন্য ১৬টি গাড়ি (বেশির ভাগ অ্যাম-বাসার্ডার) দিয়েছিলেন। কিন্তু এই গাড়ি বেআইনী ভাবে কলকাতায় ফেরে রাখা হয় এবং মন্ত্রী ও তাঁর পেটোয়া অফিসাররা তার অপব্যবহার করেন। কেন্দ্রীয় সরকার গাড়ির অপব্যবহার সম্পর্কে তদন্ত করলে স্বাস্থ্যদপ্তর মিথ্যা কথা বলে যে গাড়ি যথোপযুক্ত কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

১) পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী কার্যে পরিণত করার ব্যাপারে বহু টাকার গুণগোল করা হয়েছে যার জন্য ভিজিলেন্স কমিশন তদন্ত করছে। পরিবার পরিকল্পনার গারপ্রাপ্ত ডাইরেক্টর ডাঃ বি কে চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। তাঁকে আবার অজিত পাঞ্জা মডিকেল কলেজের অধ্যাপকপদে দিয়েছেন। এখনও ইনি সেই পদেই আছেন।

পাঁজা সাহেবের আর একজন প্রিয়পাত্র হলেন ডঃ ইউ এন সাহা। নি প্রাক্তন ডেপুটি ডাইরেক্টর এবং চক্রে রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা অফিসারের পদে উন্নীত করা হয়। তাঁকে ই এস আই (এম-বি) প্রকল্পে এম ও পদে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে। সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করে তিনি এখনও এই পদেই রয়েছেন।

পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের দীর্ঘ ও নাটক অফিসার দিলীপ দ্র প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আর একজন প্রিয়পাত্র। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বারবার আপত্তি সত্ত্বেও তিনি এই পদে রয়েছেন।

অজিত পাঞ্জার আমলে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ মডিকেল কলেজে শিক্ষকতা করার গ্যাতা বিবেচিত হত এবং কোন স্বয়ং না মেনে প্রমোশনও দেওয়া হত। এমার্জেন্সীর সময়ে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী কপারিত করতে য়ে পুলিশের সাহায্য নেওয়া য়েছে। শ্রীপাঞ্জা এই সম্পর্কে আই কে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার টাস্টাণ্ট কপি কিছুদিন আগে দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে প্রকাশিত য়েছে।

ডিকেল কলেজে ভর্তির নিয়ম উলঙ্ঘন করে ১৯৭৪ থেকে বিশেষ শ্রেণী নিয়ন্ত্রণের ছাত্রদেব কানো হয়েছে মেধাবীদের মত করে। এই ধরনের ঘটনার ৬টি চরম উদাহরণ হল ১৯৭৬-৭৭-

সালে অনেক ছাত্রকে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে বাবার অনেক পরে ভর্তি করা হয় সরকারী আদেশ বলে।

ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর কে, কে, রায়কে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ডেপুটি ডাইরেক্টরের পদে উন্নীত করা হয় এবং অজিত পাঞ্জার কৃপায় তার বেতন ৪৫০ টাকা থেকে প্রায় ২ হাজারে পৌঁছে যায়। সিদ্ধার্থ সরকারের পতন ঘটান পর দুর্নীতির অভিযোগে তিনি সাসপেন্ডেড হয়েছেন।

প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এইসব দুর্কার্যে যে সব অফিসার সাহায্য করতেন তাদের প্রমোশন, পুনর্নিয়োগ ও এম্পটেনশান প্রভৃতি হবিষা দেওয়া হয়েছে। যেমন, (১) এন কে সাহা, ডেপুটি সেক্রেটারী আড়াই বছরের জন্য পুনর্নিযুক্ত, (২) এন এম রায়-চৌধুরী, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী—ডেপুটি সেক্রেটারী পদে উন্নীত করা ও এম্পটেনশান দেওয়া হয়েছে; (৩) ডাঃ এল, কে শুকলকে অল্প সময়ের মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর থেকে জয়েন্ট ডাইরেক্টরের পদে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে অনেক অফিসারকে সুপারসিড করে; (৪) অনেক অফিসারকে সুপারসিড করে এল কে চক্রবর্তীকে স্পেশাল অফিসারের পদে বসানো হয়েছে; (৫) ডেপুটি ডাইরেক্টর ডাঃ বিজয় চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ভিজিলেন্স কমিশনের রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও, তাঁকে মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক করা হয় এবং প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁকে হেলথ সার্ভিসের ডাইরেক্টর করারও চেষ্টা করেন, (৬) ডাঃ অজিতকুমার কর ড্রাগ কন্ট্রোলার ডাইরেক্টর এবং তাঁর বিরুদ্ধে কয়েক লক্ষ টাকার গুণগোল কেনার ব্যাপারে টেওয়ার গ্রহণ নিয়ে ভিজিলেন্স কমিশনের রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও স্বপদে বহাল আছেন বহাল তব্বিতে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের ট্রান্সপোর্ট বিভাগে প্রচুর অর্থের অপচয় হয়েছে। ১০০টি পদ সৃষ্টি করা হয় অর্থদপ্তরের অসুস্থ মতি ছাড়া এবং যাদের উপযুক্ত যোগ্যতা নেই তাদের এসব পদে বসানো হয়। ৮৬০ টাকা গ্রেডের একজন ফোরম্যানের পদে নন-টেকনিক্যাল উপযুক্ত যোগ্যতাহীন লোককে বসানো হয়। এ ব্যাপারে ভিজিলেন্স কমিশন তদন্ত করছে এবং সংশ্লিষ্ট অফিসার (ডেপুটি ডাইরেক্টর) মন্ত্রিসভার পতনের পর সাসপেন্ডেড। অজিত পাঞ্জার আর একজন পেটোরা অফিসার রথীন ভট্টাচার্যের দুর্নীতি সম্পর্কেও তদন্ত চলছে। একে পাঞ্জা সাহেব বিচার বিভাগ থেকে এনে

প্রথমে ব্রাদ 'ব্যাঙ্কে' বসিয়েছিলেন এবং তারপর স্বাস্থ্য বিভাগে উচ্চতর পদে বসিয়েছিলেন যিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রাক্তরে সিনিয়র অফিসারদের প্রতি অসম্মান দেখাতেন। মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে যাবার পর একে স্বস্থানে ফেরত যেতে হয়েছে।

এম এল এদের কয়েক লক্ষ টাকা টিউবওয়েলের পাইপ দেওয়া হয় কাঁচা রসিদেব বিনিময়ে এবং এর কোন হিসেব নেই। এই ব্যাপারটা ঘটেছে এন কে সাহা তার তত্ত্বাবধানে, যিনি অজিত পাঞ্জার পেটোয়া ডেপুটি ডাইরেক্টর। এবং পাঞ্জা সাহেব তাঁর কয়েকজন পেটোয়া অফিসার এন কে সাহা (পুনর্নিযুক্ত ডেপুটি ডাইরেক্টর) এল কে চক্রবর্তী (স্পেশাল অফিসার) কে কে রায় (ডেপুটি ডাইরেক্টর) শ্রীআচার্যকে (প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য করেছিলেন যেমন (১) টেওয়ার সিলেকশন কমিটি যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিভাগের কোটি কোটি টাকার গুণগোল কেনা হত; (২) বিভিন্ন হাসপাতালে ডায়েট কন্ট্রোল নিযুক্তি কমিটি।

প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর পেটোয়া এন কে সাহাকে হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট করে দেন এবং তাঁর আমলে অর্থের অপব্যবহার হয়। যেখানে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলেরও কোন গাড়ি নেই সেখানে প্রয়োজন ছাড়াই এন কে সাহা একটি গাড়ি কেনেন। অজিত পাঞ্জার আমলে হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিলের কোন নির্বাচন হয়নি এবং তাঁর পেটোয়া লোকদের সেখানে মনোনীত করা হয়েছে।

ডাঃ এস বি চক্রবর্তী এফ আর সি এস, ডাঃ অরুণ নিত্র এক আর সি ও জি এবং অজিত কয়েকজনকে রাজনৈতিক কারণে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অবসর গ্রহণ করানো হয়েছে। ডাঃ চন্দন রায়চৌধুরী পি এইচ ডি (মেডিসিন) ডাঃ পি মজুমদার এফ আর সি এস ও অজিতদের রাজনৈতিক কারণে চাকরী ছাড়তে হয়েছে। ডাঃ রায়চৌধুরী বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কলেজ অফ মেডিসিন) পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের লেকচারার এবং ডাঃ মজুমদার ত্রিপুরায় হেলথ সার্ভিসের ডাইরেক্টর। ডাঃ স্বজিত দাস এম ডি, ডাঃ এস সি বসু এম, আর সি পি ও অজিতদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। অজিত পাঞ্জার যথেষ্টাচারের বিরুদ্ধে ডাঃ চন্দন রায়চৌধুরী, তার স্ত্রী ডাঃ প্রতিমা রায়চৌধুরী তাঁর শিক্ষক ডাঃ এস সি বসু, ডাঃ হুশান্ত ভট্টাচার্য, ডাঃ স্বজিত দাস, ডাঃ হুতাষ চক্রবর্তী ডাঃ সি এস দাঁ, পূর্ণিমা গুপ্ত ও অজিত অফিসারদের কলকাতা হাইকোর্টের শরণ নিতে হয়।

জয়যাত্রা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কমতাত্যাক্ত করা সম্ভব। জরুরী অবস্থার ফাঁস গলায় নিয়ে আমরা যখন মৃত্যুর প্রহর গুণহিলাম তখন আমরা ধারণাই করতে পারিনি যে, ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসেই সেই অসম্ভব সম্ভব হবে আকস্মিকতার। এবং সেই ঘটনার স্মৃতি ধরেই সারা ভারতবর্ষে আজ কংগ্রেসের শ্মশান-শয্যা রচিত হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী নিজে সপরিবারে ডুবলেন, কংগ্রেস-কেও প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ছাড়লেন।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের উৎখাত হয়ে যাওয়া বিস্ময়কর ঘটনা নয়। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল থেকেই সেটা বোঝা গিয়েছিল। ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ফলাফল থেকে প্রমাণ হয়েছিল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির তথা বামপন্থী ফ্রন্টের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে কোন ফায়দা উঠবে না। কেননা ১৯৭০-৭১ সালে সি পি এমের বিরুদ্ধে খুনোখুনির অপপ্রচার, এমন কি হেমন্ত বসুকে হত্যার দায়ও তাদের ওপর চাপানো সত্ত্বেও এই দলের আসন সংখ্যা ৬৯ সালের চেয়ে ৭১ সালে ৩০টি বেড়ে গিয়েছিল। এই ফলাফলকে উল্টে দিতেই পাড়ায় পাড়ায় মন্তান-বাহিনীকে কংগ্রেসের ছত্রতলে সমবেত করা হয়েছিল। সহযোগিতায় ছিল পুলিশ ও প্রশাসন। এবং ব্যাঙের ছাতার মত অতঃপর গজিয়ে উঠলেন কংগ্রেসী যুব নেতার দল।

৭২ সালের নির্বাচনের পরই কংগ্রেস নেতাদের বীভৎস বা-দগদগে চেহারা বেরিয়ে পড়ল। যেমন এদের মহান নেত্রী ধান্নাবাজ, তেমনই এরাও। অধিকাংশ চোর ছোচোরের দল। এমন আটপেঠে দুর্নীতিপরায়ণ, ঠগ, লম্পট, পিশাচ-সদৃশ রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা খুব কমই দেখা যায়। এরা গত পাঁচ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে যে তাণ্ডব চালিয়েছে তাতে মনে হয় এমন কোন কুক্রম নেই যা এরা করতে পারে না। উচ্চপদে আসীন যুব বা ছাত্র নেতা অথবা মন্ত্রীদের অনেকেই তো ফুলে ফেঁপে ঢোল, কিন্তু এম এল এংলো পর্যন্ত চুরি রাহাজানি করে বেশ কামিয়ে নিয়েছে। রোগা লিকলিকে ছেলেগুলোর চেহারা হয়েছে বডবাজারের মারোয়াড়ীদের মত। এদের সদাঁর সিদ্ধার্থ রায় পাঁচ বছর ধরে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে খিস্তি করেছেন আর "সোনার বাংলা" গড়ে তুলবেন বলে বুলি কপটুছেন। আসলে সোনার বাংলা হয়েছে কেবল সরকারী টাউন বিজ্ঞাপনে। রামপন্থী

ফ্রন্টের অন্য তিনি রেখে গেছেন শ্মশান বাংলা।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে কাগজে লিখে জানাতে হবে না কংগ্রেসীদের কীর্তি-কাহিনী। তারা দু'বছরের রাষ্ট্রপতি শাসন সহ সাত বছর হাড়ে হাড়ে বুঝেছে এরা কি চিন্তা। কিন্তু এদের অজ্ঞানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে নি স্বভাবতই ভীতি থেকে। তারা এই অজ্ঞানের বিরোধী সেক্ষা জানিয়ে দিয়েছে ভোটের বাঞ্ছা। তাই কংগ্রেসের এই শোচনীয় অবস্থা, বদমায়েশগুলো একে একে ধরাশায়ী হচ্ছে।

জনগণ জনতা পার্টির রাজ্য নেতাদের বদমায়েশির বিরুদ্ধেও রায় দিয়েছে। প্রফুল্ল সেন তিরিশ বছর ধরে স্বার্থ মন্ত্রিতে আসার পর থেকেই জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীন। তিনি জনতার স্পন্দন বুঝবেন কি করে? আর ডি এন লাহিড়ী তো হুইফোড, হঠাৎ গজিয়ে উঠেছেন। নির্বাচনী ফলাফলে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, তিনি কত বড় গাডোল। সোমবারও তিনি বলেছেন, জনতা পার্টি ২২০টা আসন পাবে আর সি, পি, এম, পাবে ৪৫টা। ফলাফল বেরোতে শুরু করলে দেখা যাচ্ছে জনতা পার্টি ৪৫টাও পাবে কিনা সন্দেহ। জনতা পার্টির রাজ্য নেতাদের এখন উচিত রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করা। এরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, বেইমানদের জনগণ ক্ষমা করেনা। ১৯৬৭ সালে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে যারা বেইমানী করেছিলেন ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে তাঁরা সকলেই উৎখাত হয়েছিলেন এবং যুক্তফ্রন্টকে জনগণ বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা দিয়ে বিধানসভায় পাঠিয়েছিলেন। বেইমান অজয় মুখার্জী আজ ইতিহাসের আঙা-কুড়ে আর জনগণের প্রকৃত বন্ধু জ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন, যে জ্যোতি বসুর কুশ-পুত্রলিকা দ্বাং করেছিল কংগ্রেসীরা ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধের সময়। মাহুশ তার আদর্শ ও সত্যতার জুড়ই জনগণের শ্রদ্ধা পায়, হাজার অপপ্রচারেও তাকে কালিমালিষ্ট করা যায় না, একদিন না একদিন তার প্রকৃত চেহারা কাকনবর্ণের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠবেই।

একথা যেমন ব্যক্তি সম্পর্কে বাটে তে ম নি দ ল সম্পর্কেও। সেই জন্ম গত দশ বছর ধরে প্রতিদিন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কুংসা প্রচার করেও জনগণের মধ্যে তার প্রভাব ধর্ম করা যায় নি। এই দলের কর্মীদের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে

(শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

কেন্দ্রে জনতা সরকার আসার পর

রমা প্রসাদ মল্লিক

জনতা পার্টি সরকার গঠন করার বছর পূর্বে বলে রেখেছিল যে, এমার্জেন্সীকালে শাসনের বাড়াবাড়ি যে যে অফিসার বা রাজ-কর্মচারী করেছে, তাদের ওপর কোনো শাস্তি-মূলক দমনব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। [পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীহরেন্দ্র মোহনের বিবৃতি : মার্চ ৩, ১৯৭৭]। কারণ বাহ্য : প্রশাসন স্বতন্ত্র মনোবলী অটুট রাখা। কেবল তাই নয়, আমলাতন্ত্রী ঐতিহ্যের স্থায়ী চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং প্রশাসনের ক্ষমতাকেন্দ্র আগেকার মতই বজায় রাখা। প্রশস্তে, জনগণের মধ্যে যারা পুলিশের হাতে চরম নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা পেয়েছে, কেউ কেউ প্রাণও হারিয়েছে, তাদের বা তাদের আত্মীয় কিংবা প্রতিনিধিস্থানীয়দেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে? উদাহরণতঃ কেরালার রাজন নামে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রকে পুলিশের গুলি মার মার করে দেওয়া। অন্ধপ্রদেশের প্রসিদ্ধ বুদ্ধি-জীবীরা, যথা পঞ্চাজি কৃষ্ণমূর্তি, (ডাঃ) মালিকাজুন, ভাস্কর রাও, ভেক্টরটাতাপু সত্যম, নীলম রামচন্দন এবং জে. সি. এস. প্রসাদ (আর. একজন ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র) এভাবে রাষ্ট্র-চালিকাশক্তির পাশবিকতার কাছে বলি হয়েছেন। আজ দেশের নানা দিক থেকে জনশক্তির দুর্বীর অভিযান যেমন, অভিযোগেরও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কেবল পশ্চিমবঙ্গের নয়—মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার থেকেও বহু ঘটনা উদ্ঘাটিত হয়ে জনচক্ষে এসেছে।

সরকার বদলে গেলেও এই বিশাল দেশের বিরাটকায় রাজসভা-ধারী প্রশাসনিক যন্ত্র (যে যন্ত্রসমূহের জটিল ব্যবস্থা) আগেকার মতই ভয়ঙ্কর ক্ষমতালী হয়ে গেছে। জন-প্রশাসনের পরম্পরা এবং আমলা কুলের পুরোনো প্রশিক্ষালব্ধ দৃষ্টিভঙ্গী ও অভ্যাস-তো বদলায়নি। জনতার

রাজনৈতিক আবেগের বহিঃপ্রকাশ দেখে সাময়িকভাবে দ্বিধাদোহল্যমান হয়েছেন মাত্র; মৌলিক প্রশাসনিক চরিত্র শোধরায়নি। খোদ দিল্লীর নাকের নিচে তিহার জেলবন্দীদের মুক্তি পাবার অব্যবহিত পরে অত্যাচার করা এবং ছলে বলে ঘুষ আদায় করার অবিচল প্রবণপ্রকাশ পেয়েছে (উৎস : টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার বিশেষ সংবাদদাতা কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ : ২১ এপ্রিল, ৭৭)।

তাহলে কি রাজশক্তি এবং লোকশক্তির মধ্যে সম্মতি হওয়া দূরে থাক, সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে? বাডছে টানা পোড়নের অস্থিরতা? সারা রাজনৈতিক পদ্ধতিই হয়ে পড়ছে সঙ্কট-কবলিত পুনর্বীর? প্রসঙ্গতঃ, দিল্লীস্থ "সমাজবাদী ক্রিয়াকেন্দ্র" নামক সংস্থার দ্বারা আহত বিচারসভায় গত ৩০শে মার্চ যে অভি-মত ব্যক্ত করা হয়, তা উল্লেখ্য— "সরকারের উচিত এমার্জেন্সী শাসন-কালে যে সমস্ত যে-আইনী বাড়াবাড়ি করা হয়েছিল, গুপ্ত তথ্য গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগদের (উদাহরণতঃ R.A.W.) দ্বারা ব্যক্তি বিশেষদের ওপর গোপন খবরদারি, হায়রানি এবং শ্রেন নজরের সন্দেহাত্মক চাপানো হয়েছিল, তার সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে জনগণকে অবহিত করা।" (শ্রীতারাপদ গুপ্ত কেন্দ্রের আহ্বায়ক)। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিশাস্ত্র বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীশান্তিস্বরূপ বলেন : "যদি জনতা পার্টি-নেতৃত্ব দলের সংগঠনে সংস্থা-গত পরিবর্তন এবং সরকারের শাসন ও ক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন না আনতে পারে, যদি জনসাধারণকে সমগ্র জাতির রাজনৈতিক তথা সামাজিক রূপান্তর দেখাতে না পারে তাহলে গত ২০ মাস ধরে যে বিভী-ষিকাময় পরিস্থিতি চলেছিল, তার পুনরাবির্ভাব ঘটবে।"

নির্বাচনের জের বজায় রাখা কোন প্রয়োজনে? কাদের প্রয়ো-জনে? জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ মূলতঃ, জমিদারতন্ত্র এবং মুন্সী বেনিয়া-আমলা-পুঞ্জিপুতীদের সম্মিলিত শোষণ তথা নিপীড়নের বিরুদ্ধে, একনায়কী ও বেপরোয়া স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ছিল উদ্ভূত ও উত্তত। এই আবেগের বিপ্লবী সম্ভা-বনা সম্পর্কে সজাগ এবং ভীত ভার-তের শাসকশ্রেণী দেখছিল কংগ্রেসকে দিয়ে জনরোষ সামলানো যাবে না। কেননা কংগ্রেস-নেতৃত্ব এমার্জেন্সী আইনের বলে রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষের চরম প্রয়োগ অর্থাৎ ক্ষমতার শেষ তুরপের তাস খেলবার পর রাজনৈতিক নম-নীয়তা হারিয়ে ফেলেছে। এক কথায়, শাসিতদের সামনে আপাতঃ লোভনীয় রাজনৈতিক বখরা দারির কোনো বিকল্প সম্ভাবনা দেখাতে পারছে না। স্বতরাং 'জনতা' পার্টিকে রক্ষ বা কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করা দরকার হয়ে পড়ল শাসক শ্রেণীর আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী অংশের পক্ষে, যে অংশ চাইছিল (বহুদিন ধরে) যে, শাসিত ও মাহিনাবাদী শ্রমিক ক্রীতদাসদেরকে উদার মনো-ভাব দেখিয়ে বুদ্ধিবাদীধারাস বানাতে। জনগণের সতর্ক সজাগ দৃষ্টিকে নির্বা-চনী অত্যাচারের ঝোড়ো হাওয়ায় ঝাপসা করে দেওয়া দরকার একান্তই। তাই শুরু হয়েছে শোষিত সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা। কখনও দেখান হচ্ছে লোক-শক্তির "রাষ্ট্রসত্তার উর্দ্ধে" এক কল্পিত ভূমিকা, কখনও জানান হচ্ছে যে পুণ্য ভারতে "OMBUDSMAN" নামক সরকারী যন্ত্রের ওপর জন-হিতার্থে খবরদারি চালানোব রাজ-নৈতিক হাতিয়ার অপেক্ষা আরও শক্তিশালী ও কার্যকরী অস্ত্র জনতা পার্টি জনগণকে দেবে। উদ্দেশ্য, প্রজ্ঞাকে রাজসত্তার ক্ষমতা প্রয়োগে সায় দেওয়ানো এবং সমর্থক করা।

শ্রীজয়প্রকাশনারায়ণের লোকসভা সম্মুখে বেতার-ভাষণ এবং বারম্বার জনতা সরকারকে অবহিত করান যে, জনগণ তাদের আপন সমিতি-সংগঠন মাধ্যমে প্রশাসনের ওপর সংশোধনী দৃষ্টি রাখবে। এ সমস্ত বর্তমানে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর নৈতিক ও আদর্শগত প্রয়াস। প্রসঙ্গতঃ স্বরণ রাখা দরকার, ভার-নের শিল্পপতি ও বৃহৎ ব্যবসার

মালিকবর্গ, তাদের এমার্জেন্সীকালীন বিশ্বস্ততা বোধ কংগ্রেস সরকারের তরফ থেকে জনতা সরকারের দিকে ঘুরিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দেরী করেনি। ফেডারেশন অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাণ্ড কমার্শিয়াল চেম্বারস অব ইণ্ডিয়া (F.I.C.C.I.) নামক সংস্থা এই শাসকশ্রেণীগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য, আশঙ্কা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখিয়েছে, ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার (৩%-এর সামান্য বেশী) শিল্প-বিকাশ এবং কৃষিজাত বস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধির হার (যথাক্রমে ৪% ও ২%) সম্পর্কে কুস্তীরাশি বিসর্জন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী পুঞ্জিব টালাও নিবেশ এদেশের অর্থনীতিতে বাতে তেজী-য়ানভাবে হতে থাকে তার সুপারিশ করে। কয়েক শ কোটি টাকার 'সাহায্য' ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে সহজ স্বদেব হারে বাতে পাওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে জনতা সরকারের বিস্তমন্ত্রী শ্রীপ্যাটেল ওয়া-শিংটন যান, এদেশে এবং আবে-রিকায় ভারত সরকারের অল্পকুলে পুঞ্জিবদ্ধতারর আবহাওয়া সৃষ্টি হবার পর।

কেবল তাই নয়। শিল্পসংস্থা-গুলিতে "শান্তি" বজায় রাখা, অর্থাৎ শ্রমিকদের মাঝে বাস্তব বিক্ষোভ, আন্দোলন, ঘেরাও প্রদর্শন ইত্যাদির প্রতি ঝোঁক না দেখা দেয়, সেই উদ্দেশ্যেও প্রয়াস শুরু হয়ে গেছে। একদিকে টাটা মহাশয় বলছেন, হস্তমাল্য করার অধিকার মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে আসে না। অপর দিকে বিড়লা মহাশয়রা বল-ছেন, উদারতার ভাণ করে যে, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে সহযোগ করা তাদের কাম্য, ট্রেড ইউনিয়নী "যুযুধান" মনোভাব যদি থাকেও তবু। উদ্দেশ্য, তথাকথিত সমাজবাদী শ্রমিক সংগঠনগুলিকে পোষ মানিয়ে নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে খাপিয়ে নেওয়া। শ্রম-মন্ত্রী ভর্মা মহাশয়ও চান যে ঘেরাও ইত্যাদির অবসান হক। শ্রীমতী গান্ধী এমার্জেন্সী যুগের শেষপর্বে শ্রমিক বিদ্রোহের "তোড়জোড়"কারী ভূত-দেহেতে আরম্ভ করেছিলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

নতিদ্বীকার

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

করা হয়েছে এবং লাঠি চালনা করা হয়েছে। বন্দীদের মুক্ত সংগ্রামের গৌরব তিনি আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলেন। বর্তমানে কিন্তু দমদম ও বর্ধমান জেলে ২৪ ঘণ্টা লক-আপ ব্যবস্থা চালু আছে।

এ জেলে সেল দিনের বেলায় তিন ঘণ্টা মাত্র বন্ধ রাখা হত। কিন্তু এই অপমানও বন্দীরা মানতে রাজি হলেন না। কেন মানবেন? তারা মনে করেন না তারা কোন অপরাধ করেছেন। তাছাড়া তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই প্রমাণিত হয় নি। তারা রাজনৈতিক কর্মী। তাই সরকারের আইন অলুয়ায়ী তাদের বাজবন্দীদের মত মর্মান্বী পাওয়া উচিত। জেলের আইন অলুয়ায়ীও তাদের সেলে আটকে রাখার কোন অধিকারই জেল কর্তৃপক্ষের নেই। আই, জি, মাস দেডেক আগে বলে-ছিলেন নকশাল বন্দীদের সেল থেকে ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন (যেখানে অধিকাংশ বন্দীরা থাকেন)। কর্তৃপক্ষকে বার বার বলেও ফল পাওয়া যায় নি। গত বৃহস্পতিবার বন্দীরা প্রতিবাদ স্বরূপ সন্ধ্যা ৮টার আগে সেলে ঢুকতে অস্বীকার করেন (রোজ ৬টা নাগাদ সেল লক আপ হয়ে যায়)। একটা থমথমে তাবের সৃষ্টি হয়। সেপের সুপারিন্টেনডেন্ট বন্দীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে শাসন। কিন্তু তাকে হাত মানতে হয়। অবশেষে ১২।৬।৭৭-এ সেলের বন্দীদের ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও নতুন লোহার বেড়া দিয়ে বাঁধা করা হয়েছে যাতে বন্দীরা অন্য বন্দীদের মত চলাফেরা না করতে পারেন কিন্তু এ বাঁধাও তারা মানতে নন। এই বাঁধাও তারা দূর-বন্দপরিষ্কার।

জয়যাত্রা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উৎসাহ করেও তাদের মনোবল ভাঙা যায় নি। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বছর যাদের বাঁধাবরের মত ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, যাদের নিকট-আত্মীয়দের থেকে দূরে থাকতে হয়েছে, আজ মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি তথা বামপন্থী ফ্রন্টের জয়যাত্রার দিনেও তাদের মধ্যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মনোভাব অল্পপস্থিত। এটা রাজনৈতিক পরিপক্বতারই লক্ষণ।

বামপন্থী ফ্রন্ট ক্ষমতার আসনে তাদের অভিনন্দন জানাই।

প্রকাশিত হলো

বেতুইনের চাকলাকর রাজনৈতিক গ্রন্থ

জেল ও জহাদ

১২.০০

ওরা হারিয়ে গেল। কেউ মায়ের কোল খালি করে কেউ শ্রীর বুক শূন্য করে। ওরা কোথায় গেল? হাজার হাজার যুবক যুবতীর হিসাব দিতে পারেনি কংগ্রেসী সরকার। দলিল দস্তাবেজসহ ওদেরই বেদনাময় কাহিনী।

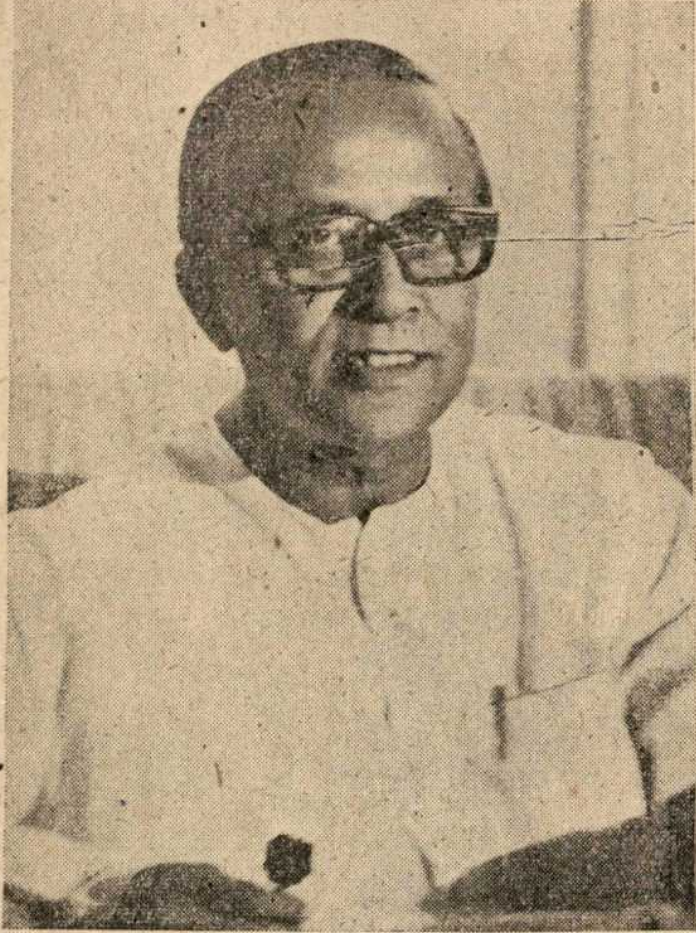
পৃথাল, ৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলি-১

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩।১ আচার্য প্রহ্লাদজি বোড কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং মূল্য কার্যকর ৩১ মই মের কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

বামপন্থী সরকার রাইটাস বিলডিং থেকে দেশ শাসন করবে না জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে

সম্পাদক দর্পণ



মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর একটি প্রোফাইল

(দর্পণের প্রতিনিধি)

সাল ১৯৬৯, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভবন। হঠাৎ মারমুখি পুলিশের দল চুকে পড়ল, কিছু কংগ্রেসী সদস্যকে দেখা গেল তাদের অভ্যর্থনা করতে এবং মুহূর্তের মধ্যে তাওব শুরু হয়ে গেল। পুলিশী আক্রমণের লক্ষ্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীরা, বিশেষ করে যারা মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট দলের। পুলিশের সামনে অনেককেই দখল গেল ছুটে পালাতে।

এত হৈ চৈর মধ্যেও একজন লোক অবিচলিত ভাবে তাঁর ঘরে বসেছিলেন সেদিন। তিনি জানতেন এই কংগ্রেস-পুলিশ যড়যন্ত্রের আসল উদ্দেশ্য তাঁর ক্ষতি করা, শরীরের না হলেও ভাবমূর্তির। তিনি তৎকালীন পুলিশ মন্ত্রী জ্যোতি বসু।

মারমুখি পুলিশের দল কিন্তু জ্যোতিবাবুর ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। চেয়ারে বসা খাটো মানুষটির প্রবল ব্যক্তিত্বের সামনে তারা কী রকম মিইয়ে গেল। তারপর শুরু হল ধমক—“কী ভেবেছেন কী? হাতে লাঠি আছে বলে ভেবেছেন যা খুশি করতে পারেন? ওই লাঠি কেড়ে নিয়ে মানুষের সামনে বের করে দিলে দাঁড়াতে পারবেন?” মারমুখি

পুলিশের দল খানিক পরে চোরের মতন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেদিন জ্যোতিবাবুর রক্ষী বলতে ছিল একমাত্র তাঁর বেয়ারা ভোলা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী। সাহসের পরীক্ষায় তিনি সে দিন অনেকেই ব্লান করে দিয়েছিলেন।

আট বছর পরের আরেকটি ঘটনা। এই বছরের মার্চ মাসে ডায়মণ্ডহারবার কেন্দ্রে লোকসভা নির্বাচন। প্রার্থী সি, পি, আই (এম)-এর শ্রীজ্যোতির্ময় বসু ও কংগ্রেসের শ্রীবীরেন মোহান্তি। বজ্রবজ্র মহেশতলা অঞ্চলে চলছে ব্যাপক গুণ্ডামী, শ্রেষ্ঠাংশে কংগ্রেসী গুণ্ডার দল। একটি বুথের সামনে জ্যোতিবাবু ভোটারদের অভিযোগ শুনছেন, সঙ্গে জ্যোতির্ময়বাবু, আইন-জীবী অমল দত্ত ও তিনজন সাংবাদিক।

হঠাৎ দু'গাড়ী বোঝাই কংগ্রেসী মস্তান এসে হাজির। শুরু হল অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও লাঠি সড়কী প্রদর্শন। কংগ্রেসীদের নেতৃত্বে বীরেন মোহান্তি নিজে, পুলিশ নিছক দর্শক মাত্র। জ্যোতিবাবু তাকে ডাকলেন—“আপনি ত

(শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম কমিউনিষ্ট মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেছেন যে, বামপন্থী সরকার রাইটাস বিলডিং থেকে দেশ শাসন করবে না। জনগণের সমস্ত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য সরকার তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবে। বামপন্থী ফ্রন্ট ঠিক করেছে যে তারা বিভিন্ন রাজ-নৈতিক দল ও সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করবে, যে কমিটি জনগণ ও সরকারের মধ্যে যোগাযোগের কাজ করবে।

মুখ্যমন্ত্রী একথা বলেছেন গত মঙ্গলবার প্রেস ক্লাবে “মীট দ্য প্রেস” অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে। সাংবাদিকরা কাকে কাকে প্রশ্ন ছুঁতে চান তাঁর দিকে আর তিনি স্বভাবসিদ্ধ অবিচলিত ভঙ্গিতে চটপট তার জবাব দিয়েছেন। রাজীববনে শপথ গ্রহণের সময়ও যেমন, তেমনি রাইটাস বিলডিংয়েও একই অবিচলিত ভাব দেখা গেছে। আর তারই যেন প্রতিফলন ঘটেছে রাজ-ভবন ও রাইটাসের সামনে উপস্থিত দর্শকদের আচরণে। দর্শকরা ছিলেন অত্যন্ত সংযত। যেন পাঁচ বছরের কংগ্রেসী শাসনের চরম উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁদের শিক্ষা দিয়ে গেছে। তাই তাঁরা এতবড় একটা পরিবর্তন—ভারতবর্ষে এই প্রথম একটি কমিউনিষ্ট দলের বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভেও উচ্ছ্বাসে কেটে পড়েন নি।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু প্রেস ক্লাবে বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের অনেক সমস্যা। এর মধ্যে কোনটা জরুরী আর কোনটা জরুরী নয় সে বাছবিচার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার ক্ষণস্থায়ী ও স্বল্পকালীন উভয় ব্যবস্থাই গ্রহণ করবে।

(এরপর ৮ম পৃষ্ঠায়)

দুজন নকশাল কর্মীর মৃত্যুদণ্ড

(দর্পণের সংবাদদাতা)

একদিকে সারা পশ্চিমবঙ্গ যখন বামফ্রন্টের অভাবনীয় সাফল্যে উদ্বেল ঠিক সেই উল্লসিত মুহূর্তে আর একদিকে ১৮ই জুন বর্ধমান দায়রা আদালতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন শ্রীমতী মলিনা ধক এবং শ্রীশান্তিময় আকুড়ে নামক দুইজন নকশাল কর্মী। দুর্গাপুরে ৭৬ সালে একটি খনের অভিযোগে এরা গ্রেপ্তার

হয়েছিলেন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবার পর শ্রীমতী ধক এবং শ্রীআকুড়ে বর্ধমান জেল থেকে প্রেসডেস্কী জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

জানা গেছে যে, শ্রীমতী ধক এবং শ্রীআকুড়ে কোন রকম ডিফেন্স নেন নি। তাঁরা দু'জনার সঙ্গে “বুজোয়া বিচার ব্যবস্থার” প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছেন।

দর্পণ

৥ বিংশ বর্ষ ৥ ২২শ সংখ্যা ৥ শুক্রবার ২৪শে জুন, '৭৭ ৥ ৪০ পরস

আর জি করে মদ জুয়া

রোগিনী ধর্ষণের আসর

প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পেটোয়া দুই যুব কংগ্রেসী ডাক্তারের কীর্তি : অনেকের প্রতি অন্যায় অবিচার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

১৯৭২ সালে কংগ্রেস সরকার আনার পর প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাণ্ডা খোঁজ করতে থাকেন কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত ছাত্র, যুবক, ডাক্তার ও কর্মচারীর বার। তার তাবোদারী করবেন ও যাদের সাহায্যে সমগ্র চিকিৎসা জগতে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা যায়। আর, জি, কর মেডিকেল কলেজের দুই হাউস মার্জন ডাঃ তরুণ অধিকারী ও ডাঃ হৃদীপ্ত রায়কে যুগ্ম আহ্বায়ক করে মন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ যুবকংগ্রেসের চিকিৎসক শাখা এবং ঐ দুই কুখ্যাত হাউস মার্জন আর, জি, কর, তথা পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসা জগতে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার জন্য চুর, গুণ্ডামি, অসং দিকাদারদের তাদের প্রিয় “অজি দাকে” দিয়ে কনট্রাক্ট

পাইয়ে দেওয়া, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের ওপর জুলুম করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও বদলীর ভয় দে খয়ে টাকা আদায় পর্যন্ত করতে থাকেন।

ঐ দুইজন কুখ্যাৎ যুবনেতা ছাত্র জীবনে জোর করে পাশ করিয়ে দেবার জন্য চিকিৎসা জগতের এক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডাঃ পদ্মপাত বসুকেও অপমান ও দৈহিক সম্মানহান করতে ছাড়েন না। এছাড়া পরীক্ষা পেছোনের আন্দোলন ও নানা বধ দুকর্মের জন্য আর, জি, করের ছাত্র সংসদ কর্তৃক শ্রীতরুণ অধিকারী দু বছরের জন্য সাসপেন্ড হয়েছিলেন। এরা আর, জি, করের হাউসস্টাফ কোয়ার্টারে মদ, জুয়ার আড্ডা এমন ক সেখানে অসময়ে রোগিনীকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেবার ও ঔষধ দেবার প্রলোভন দে খয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে সকলের গোচরে ও প্রাক্তন মন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় পাশবিক অত্যাচার পর্যন্ত করতে ছাড়তেন না। যার একটি হল এক বিবাহিত মহিলার (যিনি অমৃতবাজার পত্রিকার এক কর্মীর আত্মীয়) তার উপর পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগের চৎপুর থানা কর্তৃক ওদন্ত মন্ত্রীর প্রভাবে চাপা দেওয়া হয়েছে (ঘটনাটি কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল)। অধিকাংশ ডাক্তার, নার্স, কর্মচারী এই কার্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে পরিণামে

(শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

স্বাস্থ্য দপ্তরে দুর্নীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লাঞ্ছনা, অপমান, শাস্তিমূলক বদলী, চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত ও বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ ইত্যাদির কবলে পড়েন। ওদের এই কার্যকলাপের প্রতিবাদে যিনি প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন তিনি আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রাক্তন ছাত্র নেতা ডাঃ চন্দন রায়চৌধুরী। যিনি সে সময় কলকাতা আশাশুনি মেডিকেল কলেজে শিক্ষকতা করতেন ও আর, জি, কর মেডিকেল কলেজের ফুসফুস রোগ সংক্রান্ত গবেষণা কেন্দ্রে পি, এইচ, ডি, (মেডিসিন) ডিগ্রীর জন্ম বিগত ১৯৭০ সাল থেকেই গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। তার উপর নানা উৎপীড়ন, মিথ্যা অভিযোগে তদন্ত কমিটি গঠন এমন কি তাঁর শিক্ষক ও এই গবেষণাগারের প্রধান ডাঃ এস, সি, বসু ও আর, জি, কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ ভোলানাথ মিত্রের ওপর ভীতি প্রদর্শন ও চাপ সৃষ্টি করা হয় যাতে তারা ডাঃ রায়চৌধুরীকে গবেষণার জগৎ আর, জি, কর প্রবেশ করতে না দেন। এই মিথ্যা অভিযোগও করা হয় যে ডাঃ রায়চৌধুরীর গবেষণার কিছুই অগ্রগতি হয় নি। কিন্তু শিক্ষকদের বলিষ্ঠতায় কোন শাস্তিমূলক প্রতিশোধে বার্থ হয়ে ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে ডাঃ রায়চৌধুরীকে কলকাতার বাইরে বদলী করা হয় এবং আশাশুনি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ভোলানাথ মুখার্জীকে প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী টেলিকোনে তৎক্ষণাৎ রিলিজ করে দেবার জন্ম নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি তাতে রাজী না হওয়ায় তার উপর ক্রুদ্ধ হন এবং তার ওপর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। তারপর প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সেন্টেম্বর মাসে একটা কাজের অজুহাতে ও বিনা অপরাধে অত্যাচারে ডাঃ মুখার্জীকে অপসারিত করেন। ডাঃ রায়চৌধুরী

অত্যাচার বদলীর প্রতিবাদে কলকাতা হাইকোর্টের সুরক্ষাপত্র হন এবং সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ২২৬ অর্জছেদের আশ্রয় নেন। ডাঃ রায়চৌধুরী একাদিকারী শিক্ষকতা, গবেষণা ও মামলা চালিয়ে গত '৭৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুসফুসের শিরা সংক্রান্ত গবেষণায় একমাত্র পি, এইচ, ডি, মেডিসিন ডিগ্রী লাভ করেন।

ডাঃ রায়চৌধুরীকে বদলী করে তারা ক্ষান্ত হন না। তখন তারা এই গবেষণাগারটি নষ্ট করতে উদ্যোগী হন। যে গবেষণা কেন্দ্রটি ডাঃ এস, সি, বসুর অমূল্যবিক পরিশ্রমে সরকারী অহুদান ছাড়া ব্যক্তিগত দানে ১৯৬২ সালে স্থাপিত হয়, দীর্ঘ দশ বৎসর চিকিৎসা তথা গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির জন্ম ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে এবং এই গবেষণাগারের উন্নতির প্রয়োজন বোধ করে প্রায় দুইলাখ টাকার যন্ত্রপাতি ও কিছু পদ সৃষ্টি হয় রাজ্যপালের আদেশে। কিন্তু শ্রীপাণ্ডা ডাঃ রায়চৌধুরীর উপর ক্রোধে ও পেটোয়াদের সন্তুষ্ট করার জন্ম মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবার পর আর সব অহুদান বন্ধ করে দেন এবং এই দুই পেটোয়া যুবনেতা ও এক প্রিয়-ভাজন ডাঃ ডি, এম, চক্রবর্তী যিনি আর, জি, কর, মেডিকেল কলেজের প্রধান (যিনি মন্ত্রীর আত্মকল্যাণে গরীব ও অবসরপ্রাপ্তদের জন্ম গঠিত মেডিকেল রিলিফ সোসাইটি থেকে আড়াই হাজার টাকা সাহায্য পেয়েছেন) তাকে দিয়ে ডাঃ এস, সি, বসুকে প্রথমে বদলী ও পরে সাময়িক বরখাস্ত করেন। তিনিও শেষ পর্যন্ত কলকাতা, হাইকোর্টে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ২২৬ অর্জছেদের আশ্রয় নিয়ে দু' বছর সাময়িক বরখাস্ত হয়ে আছেন। এর ফলে এই কেন্দ্রে ডাঃ বসুর অধীনে গবেষণারত দুজন চিকিৎসক হাতাশায় দেশত্যাগ করে বিলেত চলে গেছেন ও আরও তিনজন চিকিৎসক পি, এইচ, ডি, মেডিসিনের থিসিসের কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। এই কেন্দ্রের ফুসফুস রোগে আক্রান্ত অনেক মৌলিক গবেষণার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। ফুসফুস রোগের ওটিই পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র গবেষণাগার। আর, জি, করের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডাঃ ভোলানাথ মিত্রকেও তার পদ খোয়াতে হয় এই অপরাধে যে ইনিও ডাঃ বসুর মতন

ডাঃ রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিতে অস্বীকার করেছিলেন। ডাঃ রায়চৌধুরীর স্বী ডাঃ প্রতিমা রায়চৌধুরী যিনি এন. আর. এস, মেডিকেল কলেজের শিক্ষিকা ও পি, এইচ, ডি, (মেডিসিন) ডিগ্রী গবেষণারত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একান্ত প্রিয়-ভাজন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ বিজয়কুমার চক্রবর্তীকে দিয়ে নানা কৌশলে তাকে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ থেকে বদলী করিয়ে মেডিকেল কলেজে আনিয়ে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা রিপোর্ট করে শিক্ষকতা থেকে বিনা অপরাধে তাড়িয়ে পরিবার পরিকল্পনার কাজে পশ্চিম দিনাজপুরের তৃকানগঞ্জে বদলী করেন। তিনিও কলকাতা হাইকোর্টে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সংবিধানের ২২৬ অর্জছেদের আশ্রয়ে রয়েছেন। ডাঃ রায়চৌধুরীর পিতা (যিনি প্রশাসনিক কাজে ইংল্যান্ডের ট্রেনিংপ্রাপ্ত) স্বাস্থ্য দপ্তরের একজন নির্ভাবান ও সং পদস্থ অফিসার। তাকেও ডাঃ রায়চৌধুরীর পিতা এই অপরাধে নানাভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। কিন্তু এই দুই যুবনেতার কার্যকলাপে যে সব চিকিৎসক ও কর্মচারী পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তারা বে-আইনী ভাবে প্রমোশন ও নানা সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ডাঃ মণিময় গাঙ্গুলী যিনি চিরকাল কলকাতায় থেকে বহু জুনিয়র হয়েও অনেককে টপকে আর, জি, করের উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন। ডাঃ বিনোদ রায় অর্থপেডিক মার্জন হয়েও আর, জি, করের জেনারেল সার্জারীর প্রধান হয়েছেন ও তার পুত্রকে বিনা পরীক্ষায় সরকারী আদেশে ডাক্তারীতে ভর্তি করা হয়েছে। ডাঃ অমিয় মুখার্জীর বিরুদ্ধে অবহেলায় রোগীর মৃত্যুর তদন্তও চাপা পড়েছে এই দুইজন পেটোয়াকে সন্তুষ্ট করায়। কিন্তু মেডিকেল কাউন্সিলের তদন্ত চলছে। আশা করি তারা প্রভাবিত না হয়ে, ত্যাবিচার করবেন। এই দুই পেটোয়া ও তাঁর পরিবারবর্গ নানা ভাবে পুরস্কৃত হয়েছেন। যেমন ডাঃ সুদীপ্ত রায়ের আর, জি, করের আনাসথিসিয়াতে অত্যাচারে চাকরী বজায় রাখা এবং বিভিন্ন মার্জনকে দিয়ে ডাঃ সুদীপ্ত রায়কে আনাসথিসিষ্ট হিসাবে ডাকিয়ে প্রচুর টাকা পাইয়ে দেওয়া, লুইসী পার্ক হাসপাতালের তত্ত্বাবধান করার জন্ম গাড়ী ও কিছু রাহা-খরচের ব্যবস্থা করা এবং অল্প দিনের মধ্যেই গাড়ী, বাড়ী ও প্রচুর টাকার মালিক হতে সাহায্য করা। তার ভাই ডাঃ হরত রায়কে বে-আইনী

ভাবে আশাশুনি মেডিকেল কলেজে নিয়োগ করা হয়েছিল রাজনীতি করার জন্ম। অপর এক পেটোয়া ডাঃ তরুণ অধিকারীকেও লুইসী পার্ক হাসপাতালের তত্ত্বাবধান করে বেশ কিছু সুবিধা দেওয়া, সরকারের সকল আইন অমান্য করে আর, জি, কর হাসপাতালের পলিক্লিনিকে চক্ষু বশারদ 'হসাবে' নযুক্ত করা ও তার পিতার সকল দুর্নীতি চাপা দিয়ে বনগাঁ হাসপাতালে রেডিওলজিস্ট হিসাবে রাখা ইত্যাদি। এবং 'তিনিও

অল্পদিনেই মধ্যে অসং উপায়ে বহু টাকার মালিক হয়েছেন। দর্পণের গত সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে প্রাক্তন মন্ত্রীর সবচেয়ে পেটোয়া অফিসার শ্রীএন, কে, সাহা আই, এ, এস, গত শনিবার দুপুরে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। অত্যাচার হরত শ্রীসাহার পদত্যাগ অগ্রহণ করে অব্যাহতি পেতে চাইবেন। কিন্তু জনপ্রিয় সরকারের কাছে আমাদের আবেদন যে তারা পালিয়ে যেন নিষ্কৃতি না পান।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তুনেছি যুব নেতা, ত এইসব কী হচ্ছে?" যে বীরেন মোহান্তি খানিক আগেও আফালন করছিলেন, তিনি এই কথা শুনে কী রকম ঘাবড়ে গিয়ে খানিক এদিক ওদিক তাকিয়ে গাড়ীতে উঠে পালালেন। জ্যোতিবাবুও রওনা দিলেন মহেশ-তলা পার্টি অফিসের দিকে এবং মিনিট দশেক পরে যখন তাঁকে ওখানে দেখা গেল তখন কে বলবে যে একেই খানিক আগে ওঁদের মোকাবিলা করতে হয়েছে। সন্দের দুই সাংবাদিকের দিকে থালা ভর্তি রুটি ভিন্ন এগিয়ে বললেন, "খান ভিন্ন খান। ভিন্ন ভালো।" পরম নিশ্চিন্ত ভাব।

সাহস, অবিচলিত থাকার ক্ষমতা এবং প্রচণ্ড উপস্থিত বুদ্ধি এই তিন নিয়ে জ্যোতি বসু। অনেকে মনে করেন অহংকারী, কিন্তু ভোলা অল্প কথা বলে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় জ্যোতিবাবু একমাত্র ভোলার শাসন মানতেন, অনেক দিন ফাইলের পাহাড় সরিয়ে ভোলা জ্যোতিবাবুকে বাধ্য করেছে দুপুরের খাওয়া সময় মতন খেয়ে নিতে। ভোলার ভাষায়, "আমি বহু মন্ত্রী দেখেছি, কিন্তু এত ভাল ব্যবহার আগে কখনো পাই নি। এর আগে কেউ কখনো আমাকে আপনি বলে বলে নি। জ্যোতিবাবু বলতেন।" সিদ্ধার্থ সরকার এই ভোলার চরম চূর্ণিত করে, ছেড়েছিল। এখন ভোলা আবার খুশ।

রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই জ্যোতিবাবুর নাম সংবাদপত্রের প্রথম পাতায়। এতে বহুলোক ঈর্ষান্বিতও বটে। যেমন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়। গত পাঁচ বছরে তিনি বোধ হয় কোনদিন জ্যোতিবাবুকে খোঁচা না দিয়ে কথা বলেন নি। বোঝা যেত এর পেছনে কাজ করছে হীনমত্ততা। অবশ্য এক সময়ে এই

জ্যোতি বসুরই পেছনে পেছনে ঘুরতেন সিদ্ধার্থবাবু।

মুখ্যমন্ত্রী হসাবে জ্যোতি বসু কেন হবেন? এর আগে যখন তিনি মন্ত্রী ছিলেন তখন প্রচণ্ড বাম-বিরোধী অফিসারেরাও সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, "না মশাই, প্রশাসক হসাবে উনি অতুলনীয়।"

মার্কসবাদী রাজনীতিতে বরাবরের মধ্যপন্থায় বামসী জ্যোতি বসুর কাছে, শিশুশ্রম ও আত্মদাতী বিপ্লবীরা বা মূল আদর্শ বিসর্জন দিয়ে তাত্ক্ষণিকই সুবিধা খোঁজা, দুইই অপরিগ্রাহ্য। আজ এত বর্ষব্যয় মধ্যও যে মার্কসবাদী কমান্ড পার্টি শক্তিশালী হয়ে বেড়ে উঠেছে তাতে জ্যোতি বসুর অবদান কিছু কম না। দলীয় শৃঙ্খলায় পরম বিশ্বাসী জ্যোতিবাবু হয়ত সময় সময় দলের কর্মীদের হতাশ করেছেন, কিন্তু সেই মনোভাব বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। দল থেকে বিভ্রম কারণে বিভাভিত অনেক কর্মীকেও দেখা গেছে এই লোকটি সম্পর্কে তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বজায় রেখেছেন। এবং আড়ালে তাঁর সম্পর্কে কেউ কেউ বললেও জ্যোতিবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে মুখ খুলেছে এটা বড় একটা দেখা যায় না।

প্রসঙ্গত আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যেখানে সকলেই কারুর না কারুর "দাদা" সেখানে জ্যোতি বসুকে কেউ দাদা ভাবে না, সকলেরই তিনি জ্যোতিবাবু। তাঁর স্বাভাবিক গাভার্ব তাঁকে খানিকটা দূরে সরিয়ে রাখে, অনেকের মাঝে থেকেও তিনি যেন কিছুটা নিঃসঙ্গ। তাঁর চরিত্রের এই দিক নিঃসন্দেহে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর কাজে সাহায্য করবে।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

১১ টাকার হার।

বার্ষিক ২২ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠাবার ঠিকানা:

মানোজ্য, দর্পণ

৬১, মট লেন। কলিকাতা ১০

গুণশক্তি ও অনৈক্যের শক্তির বিরুদ্ধে জনতার জয়

শঙ্খশিল্প বিশ্বাস

মায়ের চোখের জলে ভেজা আর ভায়ের রক্তে রাঙানো সত্তর থেকে সাতাত্তর, সত্তাসের এই সাতটি বছরের অবসান হয়েছে। পরাস্ত হয়েছে গুণশক্তি, পরাস্ত হয়েছে অনৈক্যের শক্তি। পরাস্ত হয়েছে ছেয়টির 'আনন্দ-হরি-গুরুলের' হত্যাকারীরা, পরাস্ত হয়েছে একাত্তরের বরানগরের গণহত্যার নায়কেরা। পরাস্ত হয়েছে প্রফুল্ল সেনের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন, পরাস্ত হয়েছে আনন্দ-বাজারের সি, পি, এম বিরোধী চক্রান্ত। পরাস্ত হয়েছে প্রিয় দাস-মুন্সীর দাদাভায়েরা, পরাস্ত হয়েছে ডি, এন, লাহিড়ীর জুইশ বারোটা আসন পাওয়ার স্বপ্ন।

এই নির্বাচনে প্রমাণ হয়ে গেল গত লোকসভার নির্বাচনে জনতা-হাওয়ায় সি, পি, এম জেতেনি, সি, পি, এমের ঘাড় চেপেই জনতাপনেরটা কেন্দ্রে জিতেছে। এই নির্বাচনে প্রমাণ হয়ে গেল সি, পি, এম শেষ হয়ে যায় নি, কবরু চলে যায় নি, সি, পি, এম, জনগণের মধ্যেই বেঁচে আছে প্রভাব বাড়িয়েছে। এই নির্বাচনে প্রমাণ হয়ে গেল সি, পি, এমের বিরুদ্ধে আনা তথাকথিত 'খুনোখুনি' আমদানীর অভিযোগ ভুয়া, যা জনগণ গ্রহণ করেনি। ডি, এন, লাহিড়ী ঠিকই বলেছেন নির্বাচনে এই পরাজয়টা 'পলিটিক্যাল কনস্পিরেসী'—রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। তবে সে ষড়যন্ত্রটা তাদের বিরুদ্ধে করেছে কাপক জনগণ। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া এই সব আধাব্যবসায়ী আধা-রাজনীতিবিদরা জনগণের মনের খবর রাখবেন কি করে? তাই তারা জনগণের মনের কথা আগে থেকে বুঝতে পারেন নি।

নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ আগে ময়দানের এক শ্রোতাহীন মিটিংয়ে জনতা পার্টির এক উঠতি নেতা হুজুনিয়াম স্বামী বলেছিলেন এদেশে কমিউনিস্টদের স্থান নেই। কিন্তু এই নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করেছে হুজুনিয়াম স্বামীদেরই স্থান নেই এই রাজ্য। তাকে রাজ্যের কোন মুখ জনতা নেতা বুঝিয়ে দিয়েছে এ দেশে কমিউনিস্টদের স্থান নেই আর তিনি তাই আউডে গেছেন। হার্ডার্ডের পণ্ডিত এই উঠতি মুসোলিনীটি অর্থনীতির পণ্ডিত হলেও রাজনীতির কিছু বোঝেন না। ছাব্বিশ তারিখে ব্রিগেডে দশ থেকে পনের লাখ কমিউনিস্টের সমাবেশ হবে। স্বতন্ত্র-নিয়াম স্বামী এসে দেখে যেতে পারেন।

এই নির্বাচনী ফলাফলের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে জনতা চট্টরাজ ছাড়া একজনও 'যুব নেতা' জিতে পারেনি, সব কাং হয়ে গিয়েছে। পেছনে পুলিশ আর সামনে গুণা নিয়ে এদের ঝুঁকতা এত বেড়ে গিয়েছিল যে এরা ভাবত এ রাজ্যটা তাদের জমিদারী হয়ে গিয়েছে। এরাই সব থেকে ডুবিয়েছে কংগ্রেসকে। বঙ্গবন্ধু পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস হয়ে গিয়েছিল যুব কংগ্রেস। 'যুব নেতারা' হয়ে উঠেছিল কংগ্রেসের আসন পাণ্ডা। পুরোনো কংগ্রেসীদের থেকে তারাই বেশী অত্যাচার করেছে সাধারণ মানুষের উপর। ত্রিশ বছরে গোটা কংগ্রেস ধ্বংস করে দিয়েছে মানুষের উপর তার থেকে পাঁচ বছরে যুব কংগ্রেস বেশী অপরাধ করেছে। তাই কিছু বয়স্ক কংগ্রেসী জিতলেও যুব কংগ্রেসীরা একদম জিতে পাবে নি। তাই এদের নেতা প্রিয় দাস-মুন্সী অভিযোগ করেছেন কয়েক জায়গায় নাকি কংগ্রেস কমীরা আক্রান্ত হয়েছে এবং পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে তারা নাকি প্রতিরোধ করবেন। এ সব কথায় জনগণ আতঙ্কিত হন। কারণ তাবা যখন প্রতিরোধের কথা বলেন তখন জনগণ বুঝতে পারেন যে আসলে তা প্রতি-আক্রমণ। গত পাঁচ বছরে তাদের কথাবার্তা এবং কার্যকলাপ দেখে জনগণ সেই রকমই ধারণা করেন। না মরা পর্যন্ত এদের স্বভাব কিছু পাল্টাবে না।

সারা দেশে পঁচাত্তরের জুন মাসে জরুরী অবস্থা জারী করা হলেও পশ্চিমবাংলায় 'জরুরী অবস্থা' কার্যত গত পাঁচ বছর ধরেই চলেছে। গত পাঁচ বছরে কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন দলের নাম নেওয়া যেত না। এই সময়ে কপালে লাল সিঁহুর লাগিয়ে অস্ত্র হাতে গুণ্ডারা হেই হেই করতে করতে সারা রাজ্য দাপিয়ে বেঁচেছে। সারা রাজ্য জুড়ে চলেছে নরমুণ্ড শিকারের অভিযান। মাথা নেড়া করে মাথায় খোদাই করে দেওয়া হয়েছে তিনটি অক্ষর সি, পি, এম। সত্তর বিধবা নারীকে ধর্ষণ করে উল্লাস করতে করতে পাড়া দাপিয়ে বেঁচেছে সমাজ বিরোধীরা। আইনের রক্ষকরা নারকেলডাংগা থানা লক আপে ধর্ষণ করছে অসীমা পোদ্দারকে।

তিরিশজন বাঙালীকে বেওয়ারিশ কুহুরের মতো লাটিপেটা কবে মেবে ফেলা হয়েছে। চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা নেই যে কংগ্রেসের তারা হাজার হাজার বামপন্থী সমর্থককে চাকরি থেকে উচ্ছেদ করেছে, পাড়া থেকে উচ্ছেদ করেছে। গত পাঁচ বছরে পশ্চিম বাংলার কোন যুবক নি। তবু এমনি একাধিক গণহত্যা হয়েছে, যা যুদ্ধকালীন সময়েও বে-আইনী। বরানগর গণহত্যার পর তাকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রিয় দাস মুন্সী বলেছিলেন 'জনতার অভ্যুদয়'। প্রিয় দাস মুন্সীর 'জনতার অভ্যুদয়' দেখেন নি। তা যেদিন হবে প্রিয় দাস মুন্সীর সেদিন আঁকে উঠবেন। এদের মন্ত্রী কংগ্রেসের প্যাডে রিয়ার চেয়ে পাঠান। খবরের কাগজে সে সব বেরোলেও মন্ত্রী পদভাগ্য করেন না। এমনই নির্ভজ বেহায়া এই কংগ্রেসীরা। এদের চিনে নিতে মাংষ এবার ভুল করে নি। তাদের অন্তরেব ঘৃণাবিক্ষোষণ ঘটেছে এবার ব্যালট বাক্সে। তাই একজন যুব কংগ্রেসী কোন রকমে জিতলেও আর সব যুব কংগ্রেসীরা চিং হয়ে পড়েছে। লাইন দিয়ে গুটি সমেত যে যেখানে ছিল হেরেছে। স্বদূর হরিচন্দ্রপুরের গৌতম চক্রবর্তী থেকে রাসবিহারীর লক্ষ্মী বোস কেউ বাদ যায় নি। মাংষ এবার কংগ্রেসকে হারাবার জন্য যেন ক্ষেপে গিয়েছিল। অন্তরের সমস্ত ঘৃণা আর ক্রোধ নিয়ে হাজির ছিল এবার ভোট কেন্দ্রে। গত পাঁচ বছরের সত্তাসের 'কুচুটা বদলা' তারা নিতে পেরেছে এবার। সেই সঙ্গে জবাব দিয়েছে সি, পি, এম বিরোধী অপপ্রচারের। আর জ্যোত বহুকে সব থেকে বেশী ভোটে জিতবে তাকে তার উপযুক্ত সম্মান দিয়েছে। বাহান্তরে জ্যোতিবাবুকে চম্পা হাজার ভোটে 'হা রয়ে' হল' যে 'শব্দ' ভট্টাচার্য সে এবার বরানগরে দেহহাজির না কত যেন ভোট পেয়েছে। হায় 'শব্দ' ভট্টাচার্য! হায় সি, পি, আই!

অশোকক্লক দস্ত জনতা দলের এ রকম পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মধু লিমায়ের বিবৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। ঐ বিবৃতিতে মধু লিমায় বলেছিলেন যে ব্যবসায়ী চক্র চায় না যে জনতার সঙ্গে সি, পি, এম-এর কোয়ালিশন হোক। মধু লিমায় একথা বলে কি থায়াপ করেছেন। সাহস করে তিনি সত্যি কথাই বলেছেন। এই সত্যি কথা

বলার জন্য তাকে ধন্যবাদ। অশোক দস্তরা সি, পি, এম-এর সঙ্গে সীট ভাগাভাগির সময় শুধু বলতেন কংগ্রেস শেষ হয়ে গেছে এবং তাদের সব ভোট জনতা পাবে। কাজেই জনতাকে বেশী আসন দেওয়া হোক। কিন্তু এই নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ জায়গায় কংগ্রেস হেরে গেলেও তারাই দ্বিতীয় স্থানে আছে। আর জনতার স্থান তৃতীয়। জনতার শৌচনীয় হুঁশ থেকে বোঝা উচিত

শহীদেৱা কথা বলে নিমাই মান্না

এখন উৎসব এবং কেবলই উৎসব।
রাস্তার রাস্তার এখন লাল আলোর যোশনাই,
ঘরে ঘরে রক্ত পতাকার আন্দোলন
বাতাসের চাদর জুড়ে লাল আবির্ভাব
মিছিলে মিছিলে আজ সব দিক ছয়লাপ।

এখন তো উৎসব এবং কেবলই উৎসব।
চোখের সামনে আবার এখন হাজারো শহীদেৱ মুখ,
তাদের চোখে চোখে এখন জলন্ত নির্দেশ,
মুড়াহীন প্রাণ তাদের কথা বলেছে,
তারা আমাদের কাছে দাবী রাখছে ২৫ বছর কিছু:
স্বাধীনতা এবং ভয়ঙ্কর নির্যাতন বন্ধন জীবন।
তারা নাড়া দিচ্ছে আমাদের চেতনায় গভীরে,
বলছে: সামনে গভীর খাদ কমরেড সাবধান,
জয় কোথাও আছে পাশেই বাড়-ঝাপে।
সাময়িক গোপনে ফেরে—রক্তের আখাদ তাদের লকলকে জিতে।

এখন তো উৎসব এবং কেবলই উৎসব।
সমুখে অনেক পথ, সামনেই গভীর খাদ-অগাধ-পাহাড়,
উপবাসী খাদ দিব আশেপাশেই জয়-আনোয়ার।
রক্তের পতাকা হাতে কমরেড তাই তুমি পা রাখ হিসাব বেখার।
শহীদেৱা কথা বলে: জমা আছে বহু রক্ত ঋণ,
সামনেই গভীর খাদ, মজবুত চেতনায় কমরেড তুমি সাবধান ॥

রায় মন্ডিসভার চার বছর

স্বাধীন রায় সম্পাদিত 'রায় মন্ডিসভার জন্ম মন্ডিসভার পাঁচ বছর' একটি বিশ্বস্ত রাস্তানৈতিক দলিল। গত পাঁচ বছরে জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান এই পুস্তিকায় বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গত ৫ বছরে এই রাজ্যে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন লেখকরা। মোট ৮জন লেখকের নিবন্ধ সম্মিলিত হয়েছে এই সংকলনে। লেখকরা সর্বলেই ইপরিত্তিত ও স্বাভাৱ।

প্রাচীন সাংবাদিক স্বাধীন চক্রবর্তী

বিহার উত্তর প্রদেশে জনতা-হাওয়া থাকলেও পশ্চিম বাংলায় তারা কংগ্রেসের নীচে। এখানে তাদের হাওয়াও নেই, সংগঠনও নেই, আঁড়ে শুধু ক্ষমতালোভী কিছু নেতা। আর এদের লালসা এতই বেশী যে এদের সং' হ'ল না সি, পি, এমকে কটা বেশী আসন দেওয়ার কথা। তারা ভেবেছিলেন সারা দেশে যখন জনতা হাওয়া এখানেও তারা মেরে দেবেন। এমন তারা নিশ্চয়ই কপাল খাবড়াচ্ছেন। এবং আরো পাঁচ বছরের জন্য তারা কপাল খাবড়াবেন। আমরা খুশি।

শহীদেৱা কথা বলে নিমাই মান্না

এখন উৎসব এবং কেবলই উৎসব।
রাস্তার রাস্তার এখন লাল আলোর যোশনাই,
ঘরে ঘরে রক্ত পতাকার আন্দোলন
বাতাসের চাদর জুড়ে লাল আবির্ভাব
মিছিলে মিছিলে আজ সব দিক ছয়লাপ।

এখন তো উৎসব এবং কেবলই উৎসব।
চোখের সামনে আবার এখন হাজারো শহীদেৱ মুখ,
তাদের চোখে চোখে এখন জলন্ত নির্দেশ,
মুড়াহীন প্রাণ তাদের কথা বলেছে,
তারা আমাদের কাছে দাবী রাখছে ২৫ বছর কিছু:
স্বাধীনতা এবং ভয়ঙ্কর নির্যাতন বন্ধন জীবন।
তারা নাড়া দিচ্ছে আমাদের চেতনায় গভীরে,
বলছে: সামনে গভীর খাদ কমরেড সাবধান,
জয় কোথাও আছে পাশেই বাড়-ঝাপে।
সাময়িক গোপনে ফেরে—রক্তের আখাদ তাদের লকলকে জিতে।

এখন তো উৎসব এবং কেবলই উৎসব।
সমুখে অনেক পথ, সামনেই গভীর খাদ-অগাধ-পাহাড়,
উপবাসী খাদ দিব আশেপাশেই জয়-আনোয়ার।
রক্তের পতাকা হাতে কমরেড তাই তুমি পা রাখ হিসাব বেখার।
শহীদেৱা কথা বলে: জমা আছে বহু রক্ত ঋণ,
সামনেই গভীর খাদ, মজবুত চেতনায় কমরেড তুমি সাবধান ॥

রায় মন্ডিসভার চার বছর

স্বাধীন রায় সম্পাদিত 'রায় মন্ডিসভার জন্ম মন্ডিসভার পাঁচ বছর' একটি বিশ্বস্ত রাস্তানৈতিক দলিল। গত পাঁচ বছরে জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান এই পুস্তিকায় বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গত ৫ বছরে এই রাজ্যে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন লেখকরা। মোট ৮জন লেখকের নিবন্ধ সম্মিলিত হয়েছে এই সংকলনে। লেখকরা সর্বলেই ইপরিত্তিত ও স্বাভাৱ।

প্রাচীন সাংবাদিক স্বাধীন চক্রবর্তী

দানিকেন তত্ত্বের আলোকে মহাভারতের সূচনা ও দেবতা বীরেন্দ্র মিশ্র

তিন প্রধান

শুধু কাব্যেই নয়, কাকতালীয় ঘটনা ঘটে ইতিহাসেও। ইন্দ্রকীল পর্বতে এমনিই এক পবিত্র স্থাতি হয়েছিল সেদিন। সেদিন মানে, পূনেরশ; চোদ্দশ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। তিন শিবিরের, তিন প্রধানের মেতে উঠেছিলেন সমুদ্র সমরে। মানব (অজুন), দানব (বরাহমুক) এবং দেবতা (মহাদেব)। তাঁদের সম্মিলিত হুক্মে সচকিত হয়েছে প্রাচীন গিরবরাহগণ্য হিমালয়। দেবকার্ণাভূতের নিযুক্তির প্রাক্কালে ঘটিত এই যুদ্ধ পরিবেশটি বাস্তবিকই চমৎকার।

মহাভারত, শুধু ভারত যুদ্ধের ইতিবৃত্ত নয়, আর্য অনার্য সংঘর্ষ এবং সংমিশ্রণের বহু বার্তা আছে এই মহাকাব্যে। তাই বললাম, চমৎকার সূচনা। মানব-দেবতার উপস্থিতিতে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশটি স্পষ্ট হয়ে উঠল। দেখা গেল দেবতার আর্যদের পক্ষ নিয়ে অসুখ দানব হত্যা করায় কত নির্বিচারী ছিলেন। মিত্রপক্ষীয় অজুন যুদ্ধদানব কর্তৃক আক্রান্ত, এটুকু বোঝা মাত্রই কিরাতকপী মহাদেব শবপ্রহার করলেন যুদ্ধ দানবের ওপর। অজুনের অহংকার, তাতে আহত হয়েছিল ঠিকই, কারণ অজুন চেয়েছিলেন একাই যুদ্ধ দানবের মহড়া নিতে। মহাদেব কিন্তু এক নজরেই বুঝেছিলেন, এক পার্থের সাধ্য নেই দানব দমন। ছদ্মবেশী দেবপ্রধান তাই অজুনের সোচাচর আপত্তি সঙ্কেত প্রয়োগ করেন তাঁর বৈজ্ঞানিক অস্ত্র পিনাক বা ত্রিশূল। বরাহ আর বাঁচেনি। তার পক্ষে লেসার রশ্মির ধাক্কা সহ করা সম্ভব ছিল না। সে ভারতের এক আদিম জাতির দলপতি দৈহিক শক্তিতে প্রবল প্রতাপাশ্রিত, অস্ত্র শাস্ত্রেও কিছু কম গরিমান নয়, কিন্তু লেসারের অগ্নিতুল্য প্রতাপ সহ করার ক্ষমতা তারও ছিল না। লেসারের কথায় ভক্তিমান পাঠক উত্তেজিত বোধ করছেন বোধ হয়। মাক করবেন। এ ছাড়া মহাভারত অল্পব্যাখ্যার উপায় রাখেন নি। কিন্তু সে ব্যাখ্যায় কলম ছোঁয়ানোর আগে, যুদ্ধ বরাহ সম্পর্কে দু'চার কথা আলোচনা সেরে রাখি।

আর্য আগমনের আগে থেকেই পূর্বভারতে অর, দক্ষিণ ভারতে দানব এবং পশ্চিম ভারতে নাগজাতি বাস করতেন। এ ছাড়াও অগাধ অনার্য জাতির বসবাস ছিল। বিজয়ী আনব এই অনার্য আদি বাসিন্দাদের ভালো চোখে দেখেন নি কোনদিন। এমন কি তাঁদের স্নান-হিসেবে স্বীকৃতি দিতেও আপত্তি ছিল বোধহয় আর্যদের। অনার্যদের তাই আমরা দৈত্য দানব রাক্ষস অসুর হিসেবেই জেনে এসেছি। আর্যদের দ্বারা এরা সব সময়ই বিকটাকার ভয়ঙ্কর জীব হিসেবে চিত্রিত। ভাষা-ভাষিক ও ঐতিহাসিকরা এ নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামিয়েছেন ও যুক্তিযুক্ত রায় দিয়েছেন এদেরকে স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে গণ্য করে। মহাভারত মনন করে এ দেব কিন্তু কখনো মনুষ্যরূপী কখনও বা অতিমানব ভয়ঙ্কর প্রাণী কপেই আমরা পেতে পারি। তাতে

ধোঁয়াধার আবরণ পাতলা না হয়ে পর্বতে পর্বতে ক্ষীতিলাভই করে। পণ্ডিতদের আলোচনায় 'দেবা' ধায়, সেদিন যাবাই আর্য আধিপত্য ও তথাকথিত দেবতাদের পূজা প্রণামে বাধ্য স্থাতি করেছিল, বৈদিক ব্রাহ্মণ্য তাদেরই দানব-রাক্ষস বলে মনুষ্যজগত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। ডঃ এ. ডি. গুপ্তাকারের ক্ষুদ্র নিবন্ধ, 'এবিয়ান সেটেলমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া' থেকে এমন কয়েকটি ভারতীয় আদি উপজাতির কথা আমরা জেনে নিতে পারি। রীতিমত সম্পদশালী পানিরা ছিলেন আর্যদেব শত্রু। পুরুত বামন ও তাঁদের পূজ্য দেবতাদের কিছুমাত্র পাতা দিতেন না পানিরা। তাই ইন্দ্রকে পানি গোষ্ঠীপিতা- 'বল'কে ছ' টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে হয়েছিল। কিরাত, কিরুত, চণ্ডাল, পর্জক, সিম্বারা বিজয়ী আর্যদেব দ্বারা শূলভিত হয়ে দাসে পরিণত হন। এরা আর্যসম্প্রদায়ের সব সময় বাধার স্থাতি কবেছেন। 'অসুর' জাতির পরিচয় নিয়ে প্রচুর মতভেদ। ভাণ্ডারকাব ও ব্যানার্জি শাস্ত্রী মনে করেন, আসিরিয়া থেকে এদেব আগমন ঘটে। আবার কেউবা বলেছেন, অসুর ছিল অতি-মানব (Steen konow)। বেদ পরবর্তী যুগে পিশাচরাণ্ড উপজাতি হিসেবে উল্লেখিত। 'রাক্ষস' শব্দটি আর্যদের শত্রুর প্রতি প্রযুক্ত হ'ত। এ দেব মনুষ্যত্ব বা অতিমানব বলে ধারণা করার তাই কোনো কারণ নেই। বরাহরূপী যুদ্ধ দানবকেও মানুষ ভাবতে আপত্তি কোথায়? মহাভারত, তাকে 'বরাহরূপী' বলেছে, স্বয়ং 'বরাহ' বলে উল্লেখ করেনি।

'অজুতদর্শন' যুদ্ধ দানবের 'বরাহরূপ' ধারণ করা খুব স্বাভাবিকভাবেই আদিমজাতির ভয়ঙ্কর রূপসজ্জার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। এনসাইক্লোপিডিয়ায় পাতা ওন্টালে অথবা আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ার আদিমজাতি-সম্পর্কিত চলচ্চিত্র দেখলে বিচিত্রিত অজুতদর্শন মানুষের দেখা পাওয়া যায়। অবশ্যই, তাঁরা বিকটাকার, ভীতিপ্রদ। অপর একটি সম্ভাবনার কথাও মনে রাখতে হয়, তা হ'ল, আদিম জাতির 'টোটেম' প্ৰীতি। আদিম জাতির মধ্যে বিভিন্ন জীবজন্তুর 'টোটেম' প্রচলিত ছিল ও আছে। জাতীয় 'টোটেম' অমুসারে বিশেষ জীবের মুখোশ ও আকৃতিবোধক রূপসজ্জা করে যুদ্ধ দানব অজুনকে একা পেয়ে আক্রমণ করে থাকতে পারে। মহাভারতীয় যুগে টোটেমী জাতির অস্তিত্বের কথা জানিয়েছেন সি. ডি. চ্যাটার্জি ২৬তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস পঠিত বক্তৃতা-মালায়।

তবু এতো কথাই পরেও কথা আছে। যে যুগটা নিয়ে আলোচনা সে যুগে আমাদের গবেষকদের কেউই উপস্থিত ছিলেন না। জাতিগত গবেষণার সূত্র অসুস্থ মান নিভর। কিন্তু বিশেষ 'শব্দ' ভাষাতাত্ত্বিকদের অসুস্থ মান সহায়তা করেছে। আনানিক সূত্র আছে বিভিন্ন। আজ যদি নোতুনতর অসুস্থ মানের ধারণা পুরোনো অসুস্থ মানকে হুহাতে সরিয়ে জায়গা করে নিতে পারে, তাহলে কিছু অসুস্থ ও হয়ত স্বীকৃতি পাবে। আমাদের মনে

নিতে হবে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে অসুস্থ মানব এবং তাদের উন্নতমানের সভ্যতা থাকার বিচিত্র নয়। ইজিপ্টের আকাশ থেকে নেমে আসা দেবতাদের বিচিত্র জন্তু-মানব-সংকর আকৃতি, যুরোপীয় পুরাণে ঘোটকমানব পক্ষীমানব নুসিংহ প্রভৃতি আজকের চিন্তাবিদদের নতুন করে ভাবাচ্ছে। মহাভারতের পথে পথে ঘুরে বেড়াকার সময় এদের দেখা আবার পাব। আলোচনাও আরার হবে। আপাতত বরাহকে আমরা অনার্য দলপতি হিসেবেই গ্রহণ করলাম। বুঝতে পারলাম, শক্তিশালী এই অনার্যদের উৎখাত করার ব্যাপারে যে দেব-আর্যের একটা সমঝোতা হয়েছিল, চলছিল বহু-যুগ ধাবং লড়াই, ইন্দ্রকীলে কাকতালীয়ভাবে সে লড়াইয়েরই একটি খণ্ডচিত্র দেখা গেল। অজুনের মনোনিয়নের প্রাক্কালে সূচনা হিসেবে চিত্রটি যেন ভূমিকার কাজ করল।

আন্তর্জাতিক শক্তিশিবিরের মেজর জেনারেল মহা-দেব নিজের বিমানটি দূরে রেখে ছদ্মবেশে অজুনের সমীপবর্তী হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, পরিচয় গোপন করে পার্থের সঙ্গে একহাত নকল লড়াই লড়ে তার শক্তি পরীক্ষা করে নেওয়া। চতুর সামরিক অধিকর্তা আপন পরিচয় জানাতে চাননি। পরিচয় পেলে অজুন লড়তেন না। তার বিক্রম পরীক্ষার সুযোগ হত না দেবাধিনায়কের। কিন্তু অসুস্থলে উপস্থিত হয়ে তাঁকে একটা খাতি লড়াই লড়তে হ'ল যুদ্ধ দানবের সঙ্গে। এই লড়াইয়ে আমরা তাঁকে অসুস্থ অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে দেখলাম। মহাদেবের দেহে জড়ানো ছিল 'আশীবিষ সদৃশ' অস্ত্র। অর্থাৎ আশীবিষ মানে সাপ হলেও বলা হয়েছে সেসব আসল সাপ নয়, সাপের মতই সর্পিলা অস্ত্র। মজা এই, অজুনেরও ছিল 'আশীবিষ সদৃশ' অস্ত্র। তবু মহাদেবের মূর্তি ও ছবিতে দেখি সাপ জড়ানো চেহারা। একি উপমা বিভ্রাট? মহাভারতের উপমা বস্তুতঃ গোলমালে। মহাভারতে যুদ্ধ দানবের বিশাল বপুটি বর্ণনার প্রয়োজন। কবির উপমা দরকার। অমনি তিনি মূঠোর মধ্যে গোটা ইন্দ্রকীল পর্বতটিকে নিয়ে বরাহমুকুর ওপর আরোপ করলেন। যুদ্ধ দানব হয়ে গেলেন 'ইন্দ্রকীল পর্বতসদৃশ'। হুক্মর বোঝাতে বজ্রনিপাত করতে হবে। কবির আদরণীয় রাজপুরুষের শৌর্য বর্ণনায় সর্বত্র একটাই মাত্র তুলনা; ইন্দ্র। ফলত বিবদমান দুই রাজপুরুষই হয়ে যান ইন্দ্রতুল্য বীর। আমাদের বোঝার উপায় থাকে না কাকে রেখে কার দিকে তাকাব।

এইসব বিভ্রান্তি সঙ্কেত মহাদেবের অস্ত্রগুলিকে স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে মহাকবি আমাদের অশেষ উপকার করে গেছেন। মহাদেবের পিনাক বা ত্রিশূল একটি ত্রিমুখী শলাকা মাত্র নয়, তা থেকে আগুন ছোটে। বজ্র ও অগ্নি বর্ষিত হয় দেবাধিনায়কের শরসমুদয় থেকেও। মহাভারতে আছে, 'কিরাত (মহাদেব) সেই বরাহের উপর তৎক্ষণাৎ বজ্রব ছায় ও অগ্নিশিখাতুল্য এক বান নিক্ষেপ করিলেন।'

যে মহানায়ক মহাকাশযানে আসেন, খুবই স্বাভাবিক, তাঁর কাছে লেসার রশ্মিক্ষেপক অস্ত্রও থাকবে। এই গোলকের বিজ্ঞানীরা যাঁদের দশকে লেসার তত্ত্বকে আয়ত্ত করলেও অসম্ভব কি সেদিনের বুদ্ধিমানরা সে যুগেই লেসারের ব্যবহার জেনে ফেলেছিলেন। জানাই তো স্বাভাবিক। মহাকাশযাত্রীর লেসারের সাহায্য যাত্রাকে সহজ সাধ্য করে। মহাকাশে মহাকাশযানকে পথনির্দেশ করা ও তাকে নিয়ন্ত্রিত করা; মহাকাশের বিস্তৃতি পরিমাপ ও পৃথিবী-পরিভ্রমণের কৃত্রিম উপগ্রহের কাছে কম শক্তিসম্পন্ন সত্ত্বতক প্রবর্তিত আকারে প্রেরণ লেসার রশ্মির দ্বারাই সম্ভব। লেসার রশ্মিই পারে চোখের পলকে নাশকতামূলক কাজ করতে।

(শেষাংশ চম পৃষ্ঠায়)

জনতা পার্টির বিপর্যয় প্রসঙ্গে

ভূবার বিশ্বাস

অভাবনীয় বা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। বরং বা প্রত্যাশিত তাই ঘটেছে। আমি পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার নির্বাচনে বামজোটের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জয়লাভের কথাটাই বলছি।

বিধানসভার নির্বাচনে স্বভাবতই যা কামা ও আকাঙ্ক্ষিত ছিল তা হলো লোকসভার নির্বাচনের মত সহজ সরল সমঝোতা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল জনতা পার্টির রাজ্য নেতৃত্বের অনমনীয় ও তাক্ষিল্য মনোভাবের জন্য বামজোটের সঙ্গে তাঁদের কোন সমঝোতা হল না। কারণ মাননীয় প্রফুল্ল সেন, অশোক দত্ত প্রমুখ রাজ্য নেতারা আত্মসম্মতি-ভায়ে এতই ডুব গেলেন যে “হেলায় করিব জয়” এমন একটা মনোভাব নিয়ে বিধানসভা আসনের নিজেদের জন্য একটা সিংহভাগ রেখে বাকীটা বামজোটের ছুঁড়ে দিতে চাইলেন। অথচ এরাই লোকসভার নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বামজোটকে ক্ষমতাসালী মনে করে নির্বাচনী সমঝোতা করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবে যেটা হওয়া উচিত ছিল তা হলো ক্ষমতাসালী দলই সিংহভাগ পাবে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাসালী দলেব চেয়ে। কিন্তু তা হলো না। জনতা পার্টি বামজোটের প্রধান প্রতিদ্বন্দীদল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো এবং তাদেরকে মূল শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে আরম্ভ করলো।

বিত্তীয়ত, লোকসভার নির্বাচনেই সাধারণ মানুষ জানিয়ে দিয়েছে যে তারা কংগ্রেসীদের উপর কতখান নষ্ট ও অসন্তুষ্ট। কিন্তু লোকসভার নির্বাচনের পরেই রাজ্য কংগ্রেসেব একটা গোষ্ঠীকে দেখা গেল জনতা দলের দিকে ঝুঁকে পড়তে, যদিও জনতা দলের রাজ্যনেতারা শুধুই লোকদেখানো গা ঝাড়া দিচ্ছেন আর গুঁরাফমেই তাঁদের ‘দাদা দাদা’ করে যাচ্ছেন। সে থেকে এটা অস্বাভাবিক মনে হয়। মোটেই অসংগত-ই হবে না যে রাজ্য কংগ্রেসের একটা গোষ্ঠীকে তখন থেকেই তাঁরা বেশ প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করেছেন এবং ঠিক তখন থেকেই জনতা দলের রাজ্য নেতৃত্বের উপর সাধারণ মানুষের বিরূপ প্রতিক্রিয়াও আবিস্কৃত হয়েছে।

তৃতীয়ত, জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্য নেতাদের বরাবরই বলে আসছিলেন আঞ্চলিক পার্টিগুলোর অস্তিত্ব ও ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিয়ে ‘বামানসভার’ নির্বাচনেও উপ-

যুক্ত ও সম্মানজনক সন্নিবেশিতার জন্য এবং এ ব্যাপারে তাঁরা কয়েকজন নেতাকেও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যনেতাদের উন্নীত মনোভাবের জন্য সে সমঝোতা তো হলই না। উপরন্তু এর কালে সাধারণ মানুষের মধ্যে জনতা পার্টির নেতাদের মনোভাবের দৃষ্টান্তই প্রকট হোল এবং পার্টির ভাবমূর্ত্তিও বেশ কিছুটা নষ্ট হল।

চতুর্থত, সাংগঠনিক দিক। লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী হাওয়ারে জনতা পার্টি ও বিত্তম কংগ্রেস বিরোধী শক্তিগুলো একটা প্ল্যাটফর্মে থেকে একই সঙ্গে এবং অত্যন্ত আন্তরিকতা নিয়েই কাজ করেছে এবং তাঁদের সেই যৌথ উদ্যোগ সফলও হয়েছে। সাংগঠনিক দিক থেকে এই প্ল্যাটফর্মের গুরুত্বটাকে স্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে যাদের শ্রমিক ও কৃষক ফ্রন্টে রয়েছে দীর্ঘ দনের আমোলনের ক্রটি এবং যে-প্ল্যাটফর্মটার তাদেরই আধিক্য। জনতা পার্টির শরিক দলগুলোর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে শুধু সংগঠন কংগ্রেসের শিখাটাই টিমটিম করে জ্বলছিল। সেটাকে নিষ্ফলই রাতারাতি হাজারবাতির ঝাউলগানে পরিত্যক্ত করে জনতা পার্টির আসন্ন নির্বাচনী বৈ-বণী সকলার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে, বাওয়ার আশা করাটা নিশ্চয়ই মূর্খের স্বর্গবাসের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

পঞ্চমত, নির্বাচনী প্রচারণার দিকটা। জনতা পার্টির রাজ্য নেতারা ওখাঞ্চিত সমঝোতা আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকেই বামজোট সম্পর্কে একটা সেই পুরোনো শব্দকে বেশ ভাল করে তালিম দিয়ে হঠাৎ উচ্চগ্রামে তুলে ধরলেন যে ‘সুপি এম নেতৃত্বে যে বামজোট তা আসলে খুনী, কারণ তারা ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের ত্যাগ করেছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে এই বক্তাবাই লোকসভার নির্বাচনে ঐ খুনী জোটের সঙ্গেই একসঙ্গে উঠেছেন রসেছেন হেসেছেন। আবার তাবাই বামানসভার নির্বাচনের সঙ্গেই বিপরীত গাওনা গাইতে আরম্ভ করার সাধারণ মানুষ বেশ হকচাকিয়ে গেল এবং সমঝোতা না হওয়ার লেনপথে জনতা পার্টির নেতাদের মনে যে মনোভাবটা সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে তা ধরা পড়লো। কিন্তু জনতা পার্টির রাজ্য নেতারা সাধারণ মানুষকে বোকা ঠাণ্ডে শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাই-

লেন এবং বামজোটকে সমঝোতা-ভঙ্গকারী বলে চিহ্নিত করতে আরম্ভ করলেন।

নির্বাচনী প্রচারণার আরও যে কয়েকটা দিক তাঁরা তুলে ধরলেন তাও খুব যুক্তগ্রাহ্য নয়। যেমন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ৪২তম সংশোধন ইত্যাদি। তাঁরা মানুষকে বোঝাতে চাইলেন এই বলে যে এসব কাজগুলো ঐভাবে করতে গেলে রাজ্যেও কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলের উপস্থিতি অপরাধ এবং তা না হলে ভরাডুবি হবে এবং জনগণ-জনতা দলকে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন করে যে আধারনা। বস্তুতঃ, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া কয়েকটা রাজ্যে ‘বামানসভার’ নির্বাচনে আঞ্চলিক দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতার ক্ষেত্রে জনতা দলের বিসদৃশ আচরণও পুরোনো একটা পার্টির কৌশলী নীতিকেই স্বরণ করিয়ে দিয়েছে। যেমন ধরুন পান্ডাবের কথা। সেখানে যে যুক্তিতে আকালী দলকে ‘বামানসভা আসনের’ সহভাগ ছাড়া হল এক্ষেত্রে তা হল না কেন? এক শুধু পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি কে ঠেকানোর জন্য। যে কমিউনিস্টরা সংসদীয় রাজনীতির এখন পর্যন্ত সব কিছু মেরে চলে

যদি ঐ কাজগুলো না করে বা ঐ কাজে সহযোগিতা না দেখায় তবে তারা নিজেরাই মাংসের মন থেকে মুছে যাবে। কারণ সাধারণ মাংস খুঁই বিচক্ষণ এবং তাঁরা কোন দল কাউকে কমা করেন না বা কোন দল করবেনও না। তাঁরা দেখেছেন যে গত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী সমর্থিত ভি, ভি, গিরিকে পশ্চিমবঙ্গের বামজোটই ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন এবং প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। অতএব জনতা পার্টির নেতাদের ঐ অসার উজ্জ্বল সাধারণ মাংসের বিবেককে যে শুধু আহতই করেছে তা নয় চরম অবজ্ঞাও করেছে।

ষষ্ঠতঃ, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া কয়েকটা রাজ্যে ‘বামানসভার’ নির্বাচনে আঞ্চলিক দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতার ক্ষেত্রে জনতা দলের বিসদৃশ আচরণও পুরোনো একটা পার্টির কৌশলী নীতিকেই স্বরণ করিয়ে দিয়েছে। যেমন ধরুন পান্ডাবের কথা। সেখানে যে যুক্তিতে আকালী দলকে ‘বামানসভা আসনের’ সহভাগ ছাড়া হল এক্ষেত্রে তা হল না কেন? এক শুধু পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি কে ঠেকানোর জন্য। যে কমিউনিস্টরা সংসদীয় রাজনীতির এখন পর্যন্ত সব কিছু মেরে চলে

তাদের সম্মুখে অকারণ এত তীব্র কীই বা থাকতে পারে সাধারণ মাংস তাও বুঝতে পারেন না।

জনতা পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতারা বাবা একদা অবিভক্ত কংগ্রেসেও শীর্ষপদে আসীন থেকে সমগ্র দেশকে পরিচালনা করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের পক্ষে “কংগ্রেসের ৩০ বছরের কুশাসনের” কথা বলাটা বড়ই বেমানান ও শিষ্টাচার বিরোধী। অবশ্য রণে, প্রণয়ে ওসবের নাক কোন স্থান নেই।

সাধারণ মাংস রাশারিতি কিন্তু তাঁদের ভুলে যেতে পারেন না, এবং শুধুমাত্র। মজা কথায় ভেজেন না। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক দিকে জনতা দলের প্রফুল্ল সেন ও অশোক দত্তকে বামজোটের জ্যোতিষ বহু নেতা হিসাবে মঞ্চে আবিষ্কৃত। দুজনেই বর্ষায়ান ও সংসদীয় রাজনীতি-বিশারদ। এদের মধ্যে একজনের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের মাংস পশ্চিমবঙ্গের ভরানক উন্নতির মান চক্রটা কেমন তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন, অগ্নজনের নেতৃত্বে তা পান নি। সেজন্তে সব মিলিয়ে এবারে পশ্চিমবঙ্গের মাংস বামজোটকে ভোটে জিতিয়ে যা করেছেন তা খুঁই প্রজ্ঞা শত এবং স্বাভাবিক।

কেজ্জে জনতা সরকার আসার পর (২)

রমাপ্রসাদ মল্লিক

জনতা সরকারের শ্রমনীতি অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে ব্যক্ত। এর স্বরূপাত শ্রমধু দণ্ডবতের সাহসী পদক্ষেপে কর্ম থেকে অত্যাধিক বরখাস্ত করা, দমননীতির শিকার রেল-কর্মচারীদের পুনর্বহালের আদেশ এবং রেল-বিভাগে উদ্ভট অফিসারদের বৈরাচার সংযত করায়। পরে শ্রীজর্জ ফার্নান্ডেজ অহুসুপভাবে ডাক তার বিভাগে “সমাজবাদ” সম্রত শ্রম-সম্বন্ধ স্থাপ্তি করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দিল্লীতে যে দিবস উপলক্ষে শ্রমিক সংগঠনগুলির সম্মিলিত র্যালিতে যে মডও বোর্ড প্রকাশ পেয়েছে তাতে বোঝা যায়, ভারতের শ্রমিকশ্রেণী আজ তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা ও পথ সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন হবার দিকে দৃঢ় পা বাড়িয়েছে। তারা হাড় হাড় বুঝেছে, এমার্জেন্সী শাসন প্রয়োগ একটা আলটপকা ব্যাপার ছিল না। যদি তেমন সঙ্কট ফের ঘনীভূত হয় বর্তমানে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী তাদের গণতন্ত্রের প্রতি আদর্শানুগত মনঃবোধ সঙ্গেও অহুসুপ প্রশাসনিক চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম করবেন।

ভারতের শাসকশ্রেণীর দুই গোষ্ঠী জোট তাদের শাসকদলীয় রাজনৈতিক দর্শন অহুসুপী আপনাপন শিবিরকে সংহত করতে লেগে গিয়েছে। একরকম তোলা পটভূমিতে রয়েছে রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্রের দিকে ঝোঁক। স্বতরাং ক্রমে ক্রমে এই ঝোঁক মেহনতী শ্রেণীকেও প্রভাবিত করবে, প্রায়শ্চলে তৌ বটেই শহরালৈও। অবিদ্বান্স ঠেকলেও, ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের ভেতর শ্রেণী-সংগ্রামী চেতনা শহরে ও তথাকথিত সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিক অপেক্ষা দ্রুত ও স্পষ্ট লক্ষ্য অতিমুখী গতি লাভ করবে এতে সন্দেহ নেই। সেকারণে বর্তমান শক্তিস্থায়ী শাসকদল নকশাবাদী বলে অভিহিত রাজনৈতিক কর্মী ও ক্যাডারদের প্রতি পূর্বতন কংগ্রেসী সরকারের নীতিই চালিয়ে যাচ্ছে।

তৃতীয় দুনিয়ার সর্বাধিক জনসম্পন্ন এবং গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র ভারত। এদেশকে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পর গতি, পুঞ্জী-সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা এবং সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী সোভি-

য়েত রুশিয়া সাম্যবাদী বিপ্লবের পথে যেতে দিতে নারাজ। দুই মহাশক্তির রাজনৈতিক লবী এদেশের শাসকশ্রেণীর মাঝেবিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর ভেতর বহুকাল যাবৎ সক্রিয় রয়েছে। এদের রাজনৈতিক তৎপরতা নির্বাচনোত্তর কালে বাড়বে বৈ কমবে না। শ্রীপ্রমোদকো, ভাগ্যমন উপলক্ষে রুশী “বদাঘতার” পরিচয় মিলেছে, দেখা দিয়েছে অর্থনৈতিক চুক্তি ও তার বুনিয়ে ভারত-রুশ সন্ধির চলমানতা সম্বন্ধে, হুতরকে, স্বীকার এবার আমেরিকার পাল্লা, এবং সেই সঙ্গে ভারত-আমেরিকা-প্রেমী লবীর কার্যোন্ময় আরম্ভ হল।

সংবিধানসম্মত পদ্ধতিতে সংসদীয়-গণতন্ত্রের বাজনীতিধারায় বিশ্বাস রাখে যে বামপন্থী দলগুলি, তাদের সামনে ঐতিহাসিক সত্যোপলব্ধির ক্ষণ সুপস্থিত। প্রতি রাজ্যে সম্পূর্ণ সঞ্চালন ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রসারী হাত বাড়িয়েছে জনতা দল, যার সঙ্গে গণতন্ত্রবাদী কংগ্রেস (সি.এফ.ডি) মিলিত হয়েছে।

(সেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

রেল প্রশাসনে অন্যায্য অবিচার

গত ৩রা জুনের দর্পণ পত্রিকায় উপরিউক্ত শিরোনামের প্রতিবেদনটির জন্য সাংবাদিক শ্রীমান গুহকে পূর্বরেলের টিকিটচেকিংস্টাফের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু এই সঙ্গে তাঁর প্রতি আমাদের অত্যাচার যে আর্নিং-এর প্রসঙ্গে তাঁর এই লেখাটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তাই জনসাধারণ এবং ভারতীয় রেলওয়ের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ তথা রেলমন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আরও কিছু তথ্য জানানোর আছে।

টিকিট চেকিং স্টাফের আর্নিং-এর প্রশ্ন নিয়ে বিগত কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা তথা রেলমন্ত্রক এত বেশী মাতামাতি করেছিলেন যে তৎকালীন রেল উপ-মন্ত্রী থেকে শুরু করে সর্বনিম্নস্তরের রেলওয়ে অফিসাররা পর্যন্ত তাঁদের সমস্ত কর্মক্ষমতা ও ধ্যানধারণী প্রয়োগ করেছিলেন টিকিট চেকিং-এর ওপর যেন একমাত্র এই রাস্তাতেই রেলের নষ্ট আয়কে উদ্ধার করে রেলকে লোকসান থেকে লাভের দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে। অবশ্য এটা সকলের কাছেই পরিষ্কার যে, এত হৈ চৈ-য়ের আসল উদ্দেশ্য ছিল যেখানে রেলের প্রাপ্য আয় ইচ্ছা করেই আদায় করা হত না, তার থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখা এবং এই অনাদায়ী আয়ের অংশে রেলওয়ে ব্যবহারকারী বড় বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং বিভাগীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে রেলমন্ত্রক পর্যন্ত বখরা হত। যে সমস্ত সং-কর্মচারী বা অফিসার এই অত্যাচারের বিরোধিতা করেছেন তাঁদের অবস্থা হয়েছে রেলবোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, হৃদয় ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বি. সি. গাঙ্গুলীর মত।

কিন্তু টিকিটচেকিংস্টাফের আর্নিং-এর বাস্তব অবস্থাটা কি ছিল? ইমার্জেন্সীর সুযোগ নিয়ে টিকিট চেকিং স্টাফের ওপর যে অত্যাচার করা হয়েছে, তার ফল ভোগ করেছেন জনসাধারণ। তাঁদের পকেট থেকে অত্যাচারে টাকা বলতে গেলে একপ্রকার ছিনতাই করে চেকিংস্টাফকে অফিসারদের খেয়াল খুশিমত আর্নিং দেখাতে বাধ্য করা হয়েছে। এমন কি এই আর্নিং-এর জন্য স্বাক্ষর ওপর সন্মতভাবে গুলী পর্যন্ত চালানো হয়েছে, অথচ তার দায়ভাগী হতে হয়েছে উৎপীড়িত, অত্যাচারিত চেকিং স্টাফকে। এ ছাড়াও আর্নিং-এ ক্রেডিট কেস বা দেখান হয়েছে, অসুস্থতাকে তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগই মিথ্যা। এখানে হয়ত প্রশ্ন করা যেতে পারে 'তাতে জনসাধারণের কি এসে গেল? উত্তরে

বলব—এই মিথ্যা পরিসংখ্যান দিয়ে দেশের মাঠ থেকে অসং প্রতিপন্ন করার, তাঁদের চুরিছানি করা একটা স্বাভাবিক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে—যার দায়ভাগী এই টিকিট চেকিং স্টাফের। কারণ এইভাবে মিথ্যা আর্নিং না দেখালে ইমার্জেন্সীর শাস্তি তাঁদের কপালে জুটত। যারা তা পারেন নি, মিথ্যাচারকে, অত্যাচারকে, মতলববাজ অফিসারের মজিকে বিবেকের ওপর স্থান দিতে পারেন নি, তাঁদের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। এবং ক্ষোভের কথা, আজও কেন্দ্রে সং বিবেকবান জনতা সরকার গঠিত হবার পরও সেই একই টাউশন (খেলা) চলেছে টিকিট চেকিং এবং টিকিট চেকিং স্টাফদের নিয়ে। যে এস-সি, ও, জি-র নাম সাধনবাবু উল্লেখ করেছেন, শুনে পাই, পূর্ব রেলের তিনিই নাকি এই অপকর্মজ্ঞের হোতা। বর্তমান সি, সি এস শ্রীযুক্ত কে, কে, দাসের রেলকর্মীদের কাছে সং ও বিবেচক অফিসার বলে জনপ্রিয়তা আছে। তাই তাঁর কাছে আমাদের সনির্বন্ধ আবেদন তিনি কি এই জাতীয় অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিবিধানে অগ্রসর হবেন?

আমরা স্বার্থহীনভাষায় বলতে পারি, মুষ্টিমেয় কয়েকজন অসং-কর্মচারী ছাড়া সাধারণ টিকিট চেকিং স্টাফ নোংরামির মধ্যে ঝুঁতে চায় না। পূর্ব রেলের বিভিন্ন ডিভিশনে এবং হেড কোয়ার্টারে যে কয়েকজন অসং টিকিট চেকিং স্টাফ আছে, তারাও বিভাগীয় ও আঞ্চলিক অফিসারদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের অত্যাচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই সুযোগ তারা পাচ্ছে কর্তৃপক্ষ থেকে অত্যাচারে চেকিংস্টাফের ওপর অত্যাচার করে আর্নিং চাওয়ার জন্য। আজও তাই কর্মীদের মধ্যে আর্নিং নিয়ে অশান্ত প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে এবং তাদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে, যাতে প্রলোভিত স্টাফ একতাবদ্ধ হয়ে এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে না পারে এবং অফিসাররা যাতে তাঁদের মজিমাকি আইন কাহনের তোয়াক না করে কর্মীদের যথেষ্ট ব্যবহার করতে পারেন। অথচ আমরা বুঝি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে এই আর্নিং-এর মাপকাঠি কিভাবে নিরূপিত হতে পারে। আর আর্নিং দেওয়া যদি টিকিট চেকিং স্টাফের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, তবে বেতন ছাড়াও আলাদাভাবে পুরস্কার বিতরণ কিসের জন্য?

সাধনবাবু শিয়ালদহ বিভাগের

যে মধুচক্রের উল্লেখ করেছেন, অত্যাচার লঙ্কার সঙ্গে বলতে বাধ্য—হচ্ছি যে সেই জাতীয় মধুচক্র আমাদের হাওড়া স্টেশনেও আছে, যার কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন ইমার্জেন্সীর সময়ের দুই মহা-রথী যারা দুজনে ইনস্পেকটরের পদে প্রমোশন পাওয়া সত্ত্বেও লাইনে কাজ না করে হাওড়া স্টেশনেই কাজ করে যাচ্ছেন বিভাগীয় ডি, সি, এস-দের নির্দেশে এবং আগের মতই এখনও লুইসের রাজস্ব চার্জিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের পুরানো চেলা-চামুণ্ডের নিয়ে। এর বিরুদ্ধে ইষ্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন থেকে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে এই দাবী রাখা হয় যে এই দুই মহাশয় ব্যক্তিকে হাওড়া স্টেশন থেকে সরিয়ে নিয়মিতকারী লাইনে ডিউটি দেওয়া হোক। কিন্তু সে দাবী আজও উপেক্ষিত। তবে কি এই ধারণা করা অসুচিত হবে যে হাওড়ার মধুচক্রের সঙ্গে বিভাগীয় অফিসাররাও জড়িত? হাওড়ার বিভাগীয় প্রধান ও সদাশয় সি, সি, এস মহোদয়ের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি। সবশেষে এই দুই উচ্চপদাধিকারীর কাছে আমাদের বিনীত আবেদন—বিগত ইমার্জেন্সীর সময় আর্নিং-এর কারণে টিকিট চেকিং স্টাফদের যে অত্যাচার ও অর্থনৈতিক শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং ক্ষোভের বিষয় এখনও হচ্ছে অবিলম্বে তা বন্ধ করে সমস্ত শাস্তির প্রতিবিধান করে কর্মীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। এ বিষয়ে এককালীন শ্রমিক নেতা ও বর্তমান রেলমন্ত্রী শ্রীযুক্ত মধু দত্তবতের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বি কে শর্মা
টি টি ই, হাওড়া

অজিত পাঞ্জার দুর্নীতি

১৭ই জুন তারিখের দর্পণে 'প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঞ্জার দুর্নীতি পেটোয়া পোষণেব কাহিনী' শীর্ষক নিবন্ধে শ্রীযুক্ত পাঞ্জার দুর্নীতি সম্বন্ধে যেসব ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ নয়।

জরুরী অবস্থার সময়ে আর-জি-কর মেডিকাল কলেজের প্যাথলজী বিভাগেব প্রফেসর ডাঃ কালীময় ভট্টাচার্যকে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর গ্রহণ করানো হয়। তিনি এর কারণ জানতে চাইলে আজ পর্যন্ত তাকে তা জানানো হয়নি। নদীয়ার তেহট্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাঃ শৈলেন হালদারকে বরখাস্ত করা হয়। ডাঃ হালদার হাইকোর্টের আশ্রয় নিয়েছেন। 'হেলথ সার্ভিসেস এ্যাসোসিয়েশন' এর সেক্রেটারি ডাঃ স্বভাষ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে চার্জশীট দেওয়া হয়েছে একটি ইস্তাহার, ছাপানোর অপরাধে।



'এ্যাসোসিয়েশন' এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডাঃ রবি গুপ্ত বদাবনতি ঘটানো হয়েছে।

সরকারি গেজেটেড অফিসারদের প্রমোশনের বিষয়টি চিরকাল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এজিয়ারভুক্ত ছিল। শুধুমাত্র স্বাস্থ্যদপ্তরে ডাক্তারদের প্রমোশনের ব্যাপারটি শ্রীযুক্ত পাঞ্জা কমিশনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং এইভাবে নিজের হাতে 'অবৈধভাবে ক্ষমতা' নিয়ে পেটোয়ারদের প্রমোশন দিয়েছেন ও গং ডাক্তারদের বঞ্চিত করেছেন। এছাড়া আর একটি কুকীর্তি আছে। অনারারি ডাক্তার নিয়োগ বহুদিন আগেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল কারণ এতে সরকারি হাসপাতালে দুর্নীতির প্রসার হয়। শ্রীযুক্ত পাঞ্জা পুনরায় অনারারি প্র্যাকটিসিং ডাক্তার নিয়োগ করেছেন নিজের একটি পেটোয়া চক্র গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে। এদের নিয়োগ করেছেন শুধুমাত্র কলকাতার হাসপাতালে অথচ শ্রীপাঞ্জা বহুবার মায়াকান্না কেঁদেছেন গ্রামে ডাক্তারের অভাবের জন্য। স্বাস্থ্য বিভাগে নিয়ম আছে যে চাকরির শুরুতে ডাক্তারদের মফস্বলের হাসপাতালে নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু শ্রীপাঞ্জার এক ভাই স্বরূপেই পি জি হাসপাতালে নিযুক্ত হলেন এবং অল্প আর এক ভাই চাকরির শুরু থেকেই কলকাতায় আছেন এবং একই হাসপাতালে আছেন। 'মেডিকাল রিলিফ সোসাইটি' নামে একটি সংস্থা গঠন করে শ্রীপাঞ্জা মন্ত্রী পদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে ডাক্তারদের কাছ থেকে টাকা আদায় কবেছেন।

অন্যদিকে আর এক চিত্র। মুর্শিদাবাদে ডাঃ সত্যনাথায় সিংহ, নদীয়ার ডাঃ মদন মণ্ডল, পি জি হাসপাতালে ডাঃ শিখির দেব, কল্যাণী হাসপাতালে ডাঃ এম, এল দত্তরায় ইত্যাদি পেটোয়া ডাক্তারদের অত্যাচারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করে তাঁদের দ্বারা একটি ভয়ের রাজস্ব সৃষ্টি করেছিলেন।

এতেও কিন্তু তালিকা সম্পূর্ণ হল না। শ্রীযুক্ত পাঞ্জার অত্যাচার কাজের আরো বহু কাহিনী আছে যা প্রকাশ করতে গেলে একটি ক্ষুদ্র পত্রের দ্বারা সম্ভব নয়।

ডাঃ হজিতকুমার দাস
জয়েন্ট সেক্রেটারি, হেলথ সার্ভিসেস
এ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল

সাজানো মামলা

ইন্দিরা গান্ধীর আমলে বাক স্বাধীনতার অধিকার খর্ব করা হয়েছে '৭৫ সালের জুন মাস থেকেই নয়, তার শুরু '৭০ সালের শেষ থেকেই। আমি যখন 'আমার এলাকায় ৭০ সালের গোড়ায় মার্কসবাদী লেনিনবাদী মতাদর্শ প্রচার করতাম তখন থেকেই পুলিশ আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তখন থেকেই আমার বাড়ী গিয়ে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে ও বাড়ীর লোকদের শাসায় 'ধরলে খানায় নিয়ে গিয়ে গুলী করে মারবে।' এই অবস্থায় আমার মতো অনেকেই আত্মগোপন করে।

ঐ সময় থেকেই পুলিশ একের পর এক কেস চাপিয়ে দেয়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রকল্প নেতা হেমন্ত বসুকে খুন করার সঙ্গে আমার নাম জড়ানো হয়। হেমন্ত বসু খুন হয়েছেন ৭১ সালের নির্বাচনের পূর্বে। পুলিশ নাকি বিরাতাকার তদন্ত করে ৭০ সালের শেষে আমার নামে এই চার্জ দেয়। যদিও পুলিশের সাক্ষ্যে এই কেস কোর্ট দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা ভাল 'আমার সঙ্গে আরও কিছু জনকে এই কেস দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা কোর্ট থেকে বেকসুর মুক্তি পাবার পর স্বৈরতন্ত্রী ইন্দিরা সরকারের পুলিশ বাহিনী তাঁদের নামে ডি, আই, আর চাপিয়ে দেয় ও আটক করে রাখে। ইন্দিরা আমলে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধতা করার জন্য সহস্রাধিক মানুষকে জেলে নিক্ষেপ করা হয়েছিল আর যাদের গ্রেপ্তার করতে জ্ঞানদাবাহিনী পারে নি তাদের প'বারবর্গের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে।

জনতা পার্টি কেন্দ্রে ক্ষমতার আসার পর আর, এস, এস ও অন্যান্য অ-বাম সংগঠনের কর্মীদের ওপর থেকে বিনাশর্তে সমস্ত চাপানো মামলা প্রত্যাহার করেছে ও এসব সংগঠনের রক্ষীদের বিনাশর্তে মুক্তি দিয়েছে। অথচ বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের ওপর থেকে সাজানো মামলা প্রত্যাহার করছে না। এই কারণেই কি যেহেতু আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী ও রাষ্ট্রকাঠামোর আবুল পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব চাই?

সঞ্জীব গঙ্গোপাধ্যায় (চন্দন)

কয়লাখনি পরিচালনায় দুর্নীতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কয়লাখনি জাতীয়করণের পঞ্চ-বর্ষ পূর্তি হয় গত ১লা মে তারিখে। এই পাঁচ বৎসরে কয়লাখনিগুলির জাতীয়করণ করার পর কি উন্নতি হয়েছে, কি লাভ লোকসান হয়েছে তা খতিয়ে দেখার সময় এসেছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে জাতীয়করণ করা হয়েছিল তার কতখানি সফল হয়েছে তা জানবার জন্য জনসাধারণ নিশ্চয়ই উৎসুক।

কোল ইণ্ডিয়ার হিসাব অনুযায়ী খনি যায় গত আর্থিক বৎসরে ঐ বছর কতি হয়েছে ৩০ কোটি টাকার মতন। সোজা হিসেবে বলতে গেলে মাথাপিছু প্রত্যেক ভারতবাসীকে ছেলে বুড়ো নির্বিশেষে দুগুণ দিতে হয়েছে গত এক বৎসরে ৫০ পয়সা করে। অথচ জাতীয়করণ হওয়ার পর কয়লার দাম দ্বিগুণ বেড়েছে। এর ভিতরে পূর্বাঞ্চল খনি সংস্থারই ক্ষতি সবচেয়ে বেশী হয়েছে। অথচ জাতীয়করণের আগে যখন কয়লার দাম বর্তমান দামের অর্ধেক ছিল তখনো কিন্তু খনি মালিকরা খনিগুলি থেকে বেশী ছপয়সা কামি-য়েছে। এইভাবে ক্ষতি চলতে 'কালে গৌরী সেনের ট্যাক কতদিন নাহাল দিতে পারবে সে উপর-গুলারাই জানেন। পূর্বাঞ্চলের এক শ্রেণীর অফিসাররা কতাবে লুটে পুটে খাচ্ছেন তা আজ সর্জনবিদিত। শোনা যায় পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা জাতীয়করণের এক বছরের ভিতরেই যে ছুটে বাড়ি বিহারে রানিয়ে-ছেন তার বর্তমান মূল্য দশ থেকে বারো লক্ষ টাকার উপর। এই এক বছরের ভিতর অত টাকা কোথা থেকে কামালেন সেটা আর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে হবে না। শোনা যায় এ বাড়ীগুলোর নকশা করতে পূর্বাঞ্চলের প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টের চারজন অফিসারকে সাতাশ দিন ধরে হিমসিম খেতে হয়েছে। গত সাতাশে এপ্রিল সি বি আই তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে এক-

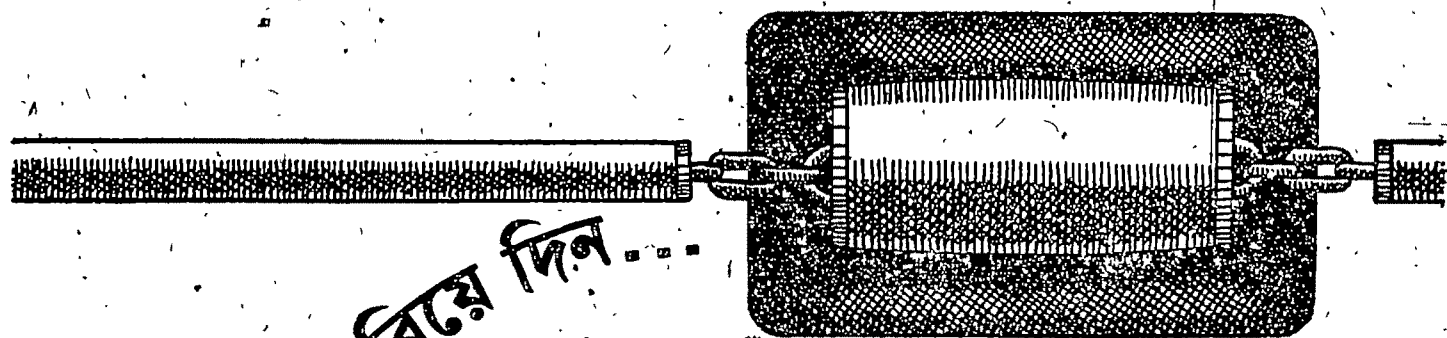
জন প্রাক্তন কোলিয়াক্সি ম্যানেজারের বিরুদ্ধে আসানসোল কোর্টে এক মামলা দায়ের করা হয়। ঐ তদন্তে প্রকাশিত হয় যে উক্ত ম্যানেজার তিয়ান্তর সাল থেকে পঁচাত্তর-সাল মানে দুই বছরের ভিতর কামিয়েছেন এক লক্ষ দশ হাজার টাকা, অথচ ঐ ম্যানেজারের মাসিক বেতন তখন ছিল এগারোশো টাকার মত। কোলিয়াক্সি ম্যানেজাররা সাধারণতঃ মধ্যম শ্রেণীর অফিসার। সেই তুলনায় এক শ্রেণীর রাঘব বোয়ালরা পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তার স্বেহমুগ্ধ হয়ে, কি

লুটে নিচ্ছে তা কল্পনাও করা যায় না। সবচেয়ে দুঃখের হল একশ্রেণীর অনভিজ্ঞ অফিসারের হাতে পড়ে আজ রাণীগঞ্জের অধিকাংশ কয়লার খনি-গুলি বন্ধের মুখে। রাণীগঞ্জের কয়লা এত উৎকৃষ্ট মানের যে পৃথিবীর মাত্র কয়েকটি জায়গাতেই এই উন্নতমানের কয়লা পাওয়া যায়। আজও এই কয়লা পৃথিবীর বহু জায়গায় রপ্তানী হয় এবং লক্ষ লক্ষ লোক এই খনি-গুলিতে কাজ করে জীবনধারণ করে। অথচ এই খনিগুলি আজ ধ্বংসের

মুখে। পশ্চিমবঙ্গের এক বিরাট অংশের আর্থিক কাঠামো এই খনি-গুলোর উপর নির্ভরশীল। অথচ একশ্রেণীর অনভিজ্ঞ অফিসার যাদের খনি পরিচালনার কোনো অভিজ্ঞতা নেই কিংবা অল্প স্বল্প অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত তাদের উপর খনি পরিচালনার ভার দিয়ে জাতীয়করণের কয়েক বছরের ভেতরেই খনিগুলো মৃত্যুমুখী। যদিও রাণীগঞ্জ খনি পরিচালনায় অভিজ্ঞ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারের অভাব নেই। তারা সাহেবরা তাদের একে একে খনি পরিচালনা থেকে সরিয়ে নিয়ে কাউকে ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের ম্যানেজার কিংবা ঠাক অফিসার ইত্যাদি করছেন। তার বদলে

উনি মূলুকা আদমীদের একে একে বসিয়েছেন। এই সমস্ত অনভিজ্ঞ অফিসাররা কি পরিমাণ দুর্নীতিপরায়ণ এবং কি পরিমাণ অবৈধ টাকা লুটে খাচ্ছেন তা ছেনেও ওদের ভাষা সাহেবরা খনি পরিচালনা থেকে অপসারিত করছেন না। শোনা যায় তারা সাহেবের যে টেকনিকাল সেক্রেটারী উনি খুব বাঙ্গালী বিদ্রোহী। উনি এবং আর একজন চীফ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার যিনি কিছুদিন আগে বদলি হয়ে এখানে এসেছেন, যার রাণীগঞ্জ কয়লা খনির কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তার এবং টেকনিকাল সেক্রেটারীর যোগসাজসে আর অভিজ্ঞ মাইনিং (শেষাংশ চম পৃষ্ঠায়)

বিপদ-শৃঙ্খলের অপব্যবহার বন্ধ করতে সাহায্য করুন



অপরাধীকে ধরিয়ে দিন...

ভাল কাজের পুরস্কার দিন

জনতা সরকার

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

এই ক্ষীত-কলেবর দলের নেতারা সকলেই কংগ্রেসী, শ্রেণীচরিত্রের লোক ও রাজনৈতিক স্বার্থসংগ্ৰহের শিষ্টো কংগ্রেস (ইং) হতে অভিন্ন। সমগ্র দলগুলি যদি প্রকৃত অর্থে সমাজবাদী বিপ্লবের দিশারী হয়ে থাকে, তবে লেনিন এবং মাও-সে-তুং প্রদর্শিত পথে আসন্ন শ্রেণী-সংগ্রামের পূর্ণ সদ্যব্যবহার করতে পারবে।

ট্রেন 'লেট' করলে আপনারা স্বভাবতই আমাদের উপর বিরক্ত হন।

অথচ আপনি একথা কি জানেন—অযথা বিপদ-শৃঙ্খল টানার জন্যেই বেশির ভাগ সময় ট্রেন 'লেট' হয়। কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন যাত্রী আছেন যারা কারণে-অকারণে বিপদ-শৃঙ্খল টানেন। ফলে ট্রেন যায় থেমে, সবকিছু স্থিকঠাক করে আরার ট্রেন চালু করতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। এছাড়া, একটি ট্রেন 'লেট' করলেই পরপর ট্রেন 'লেট' করতে থাকে। ফল! আপনার মতো আরও হাজার হাজার যাত্রীর অযথা দুর্ভোগ। আমাদের সাহায্য করুন, এইসব দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকদের ধরিয়ে দিন। যদি অপরাধী সাজা পায় তাহলে আপনি ১০০ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার পাবেন।



পূর্ব রেলওয়ে

বাম সরকার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন রাজ্যের যে সমীচীন ক্ষমতা তার মধ্যে এই রাষ্ট্র আয়তন পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও বহু কাজ করা যায়। তিনি বলেন, ৩নং বামপন্থী ফ্রন্টকে বিপুল সংখ্যাধিক্যে তিতিয়েছে। কিন্তু এই ভোট শুধু কংগ্রেস বিরোধী নয়, ৩নং বামপন্থীদের ক্ষমতায় আনার জন্যই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে।

শ্রীমত এই কথায় দ্বিমত পোষণ করার কোন কারণ নেই। কেননা, এবারের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের ৩নং সাধারণ গণতন্ত্র দল দশ বছরের অনিশ্চয়তার অবসানের মতোই যেন ৩নং বামপন্থীদের বিপুল সংখ্যাধিক্যে বিশ্বাসভাষ্য পাঠিয়েছে। এমন কি বামপন্থী ফ্রন্টের এবারের আসন সংখ্যা ১১৬২ সালের সংখ্যার চেয়েও ছাড়িয়ে গেছে। ১১৬১ সালে কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র ও কিছু পদলোভী এম এল এর দলভাগে যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে রাজ্যপাল ধর্মবীর অত্যাচারে রাতের অন্ধকারে বরখাস্ত করেছিলেন। সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের ৩নং সাধারণ প্রতিশোধ নিয়েছিলেন যুক্ত ফ্রন্টকে ১১৬১ সালের নির্বাচনে ২১৫টি আসনে জয়ী করে। ১১৭০ সালে অজয় মুখার্জী তথা বাংলা কংগ্রেস ও সি পি আইয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে। পরবর্তী সাত বছর প্রথমে রাষ্ট্রপতি শাসনের বকলমে কংগ্রেসী শাসনে এবং তারপর সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে সারা পশ্চিমবঙ্গে যুব কংগ্রেসীদের যে তাণ্ডব চলেছে তার প্রতিবাদেই যেন ৩নং অপ্রত্যাশিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে বামপন্থী ফ্রন্টকে জয়ী করেছে। একথা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। সংবাদপত্রের যে সব রিপোর্টার জেলায় নির্বাচনী সমীক্ষার জন্য ঘুরেছেন তারাও এই হাওয়া বুঝতে পারেন নি। একমাত্র প্রমোদ দাশগুপ্ত ১১ই জুন নির্বাচনের প্রথম

দিন ছপুরবেলা দুই ঘণ্টা রিপোর্টারকে বলেছিলেন বামপন্থী ফ্রন্ট ২২০টার ওপর আসন পাচ্ছে আর সি পি এম পাবে ১৭০-এর ওপর।

আরও একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। সেটি হল এই যে, ১১৬৭ সাল থেকে ১১৭৭—এই দশ বছর ধরে সি পি এমের বিরুদ্ধে কংসা ও অপ্রচার সত্ত্বেও এই দলকে ৩নং এবারের নির্বাচনে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েছে যাতে সেরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সি পি এমকে সরকার পরিচালনায় কেউ বাধা দিতে না পারে। আপাততঃ কেন্দ্র থেকে কোন বাধা আসবে বলে মনে হয় না। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার ও নেতাদের মনোভাব এখন বামপন্থী ফ্রন্টের অফুর। তাছাড়া এই সরকারকে কেন্দ্র ভাঙতে চাইলে তাকে ইন্দিরা গান্ধীর চেয়েও ভয়ঙ্কর ক্যাসিবাঙ্গী চেহারায় আত্মপ্রকাশ করতে হবে। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সে সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

১১৬৭ ও ১১৬১ এই দুই নির্বাচনের পর সর্বসম্মত মাত্র ২১ মাস যুক্ত ফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু এই সরকার কার্য করার বিশেষ সুযোগ পায়নি বলেই চলে। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসন, কংগ্রেস দল, শিল্পপতি এবং সর্বোপরি যুক্ত ফ্রন্টের কয়েকটি শরকের চক্রান্তে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার কখনও স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারে নি। তবু ২১ মাসে ৩নং সাধারণ বুঝতে পেরেছে এই সরকার এবং তার প্রধান শরক মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি মেহনতী মানুষের একান্ত বন্ধু। ৩০ বছরের মধ্যে ২১ মাস প্রায় সাগরের কাছে গোপদের সমতুল্য। ৩০ বছর থেকে ২১ মাস বাদ দিলে বাকি সময়টার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার ছিল কংগ্রেস দল—সে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বেই হোক অথবা প্রফুল্লচন্দ্র সেন কি সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বেই হোক। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পৈতৃক কমিটারীর মত পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রকে চালিয়েছেন, অতুল্য-প্রফুল্ল চন্দ্রের আমলেও হুঁসিতির বজা বয়ে গেছে

মহাভরতের স্বর্ণ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

তাই মহাদেবের পক্ষে চোখের পলকে শত্রুনিধন এবং দেবদেবগণপুত্র, মূনিবরের পক্ষে কথায় কথায় ভয় করা (ত্রাসহৃষ্টিকারী মূনি তুর্বাসারক্রিয়াকলাপ স্বরগীয়) সম্ভব। লেসারই পারে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সৃষ্টি করতে: most exciting possible use for the laser is as a means of communicating over long distances perhaps one day even with intelligent beings on the planets of other stars, if indeed life does exist beyond the Earth. (children's Britannica, vol 10). সেদিন যদি ঝাকে ঝাকে আন্তর্জাতিক বুদ্ধিমানেরা পৃথিবীতে এসে থাকেন তবে নিশ্চয়ই তারা জানতেন লেসার রশ্মির

ব্যবহার। লেসারের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের (দ্বি-ক্রিয়াকাণ্ড?) কথা মনে রেখে মহাভারত পাঠ করলে কত দ্বি-ব্যাপারেরই ব্যাখ্যা মিলে যায়। এমন কি বিশ্বরূপ দর্শনেরও বুদ্ধি আভাস পাই। আমরা লেসার কল্যাণেই। একটা উদাহরণ দিচ্ছি: "শিকাগো শহরে ১১৬৭ সালে এক বিজ্ঞান গুরু-নীতে দর্শকবৃন্দ দেখল, গৃহছাদ ও মেঝের কার্পেটের মধ্যে হাওয়ার একটি সাজোয়া ট্যাক্সি বুলছে। দর্শকেরা ওটা ছুঁতে গিয়ে বিফল হ'ল, কারণ এ ট্যাক্সি ছিল একটি (আলোক) চিত্রমাত্র।" (শ্রীশৈলেন দত্ত অনুদিত ক্রীড়িধ লোরেঞ্জের 'রহস্যময় রশ্মিালোক' থেকে। বইটি ছেপেছেন, শ্রীপ্রকাশ ভবন)। শূন্যে একটি বিশাল ট্যাক্সির দ্বি-দর্শন ঘটানোও লেসার রশ্মির পক্ষে সম্ভব। মহাদেবের পক্ষেও তাই অসম্ভব ছিল না লেসার রশ্মিকেপকের সাহায্যে মুক বরাহকে চোখের পলকে প্রথম করে ফেলা। (চলবে)

সি আর পির একটি হত্যাকাণ্ড

(দর্পণের সংবাদদাতা)

প্রতি বছরই জোতদারদের সঙ্গে আগলদারদের জায়া পাওনা নিয়ে গণ্ডগোল হয়। আগলদার ধানের মরশুমে ধান পাহারা দেয়। ধান ওঠার সময় তারা তাদের পাওনা দাবী করে। প্রতি বছরই জোতদার বলে এই বছর কম নে, আসছে বছর পুষিয়ে দেব। কিন্তু প্রতি বছরই এক কথা।

তখন ১১৭৬ সাল। দেশে চলছে জরুরী অবস্থা। তাই সেবার ষখন চারিদিকে চলছে অত্যাচার জোতদারই বা ছাড়বেন কেন। তিনি বলেন আগলদারদের জায়া পাওনা না দিয়েই ধান ঘরে তুলবো। কারণ

একবার বেটাদের জায়া পাওনা দিলে সেটাই নিয়ম হয়ে যাবে। তাই তিনি মনে করলেন আগলদারদের এমন ভয় করতে হবে যাতে তারা ভবিষ্যতে জায়া পাওনা দাবী না করে। তিনি বোধহয় মনে করেছিলেন ধুনি কংগ্রেসীদের জরুরী অবস্থা সব সময়ই জোতদারদের সন্ধান করবে। তিনি গিয়ে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। আগলদারদের মনোবল ভেঙে দিতে হবে যাতে তারা অবাধ্য না হয়। এত বা প্রণামী দিতে হবে তিনি মনেবন।

ঘটনাস্থল স্থিতি থানার গাঙ্গিন গ্রাম। ঘটনার দিন ২০শে আগষ্ট (১১৭৬)। ঘটনাস্থল থেকে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প ৩ মাইল দূরে হুগুরে। কিন্তু তারা এসে গ্রামের আশেপাশে লুকিয়ে থাকলো। আগলদাররা নির্দিষ্ট দিনে তাদের জায়া পাওনা কাটা ধানের পাঁজা দাবী করলে জোতদারের লোকজনদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু হতেই হঠাৎ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর লোকেরা ওখানে হাজির হয়েই গুলী চালালো।

ফলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আগলদার মানিক মণ্ডল (১৬) গুলীবদ্ধ হয়ে মারা গেল ও আর একজন আহত হল। যত্নের দেহটা নিয়ে গিয়ে জঙ্গীপুর হাসপাতালে পোষ্টমর্টম করা হল। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর লোকেরা সহজ সরল ভাবে বললেন, আমরা গণ্ডগোলের সংবাদ পেয়ে ক্যাম্পের ৩ মাইল দূর থেকে ছুটে এলে একদল লোক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের ওপর চড়াও হলে আত্মরক্ষার তাগিদে গুলী চালাই আমরা।

এরপর স্থিতি পুলিশ আর একটি মামলাদায়ের করে গ্রামবাসীদের উপর চালাতো নানারকম অত্যাচার

কয়লা খনি

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

ইন্ডিয়ানদের অপসারিত করে খনি পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকে আর নাই থাকে "মল্লিকা আদমী"দের ওপর খনি পরিচালনার তার ক্রান্ত করে উপযুক্ত লুটবার রাস্তা তৈরী করেছেন। এছাড়া জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে ভারী সাহেবরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে হৃদয় অকিসার জায়া প্রমোশন থেকে বঞ্চিত পেয়ারের লোকদের প্রমোশন দিয়েছেন।

প্রকাশিত হলো

বেটাইনের চাকলাকর রাজনৈতিক গ্রন্থ

জেল ও জন্মাদ

১২০০

ওরা হারিয়ে গেল। কেউ মায়ের কোল খালি করে কেউ জীর বুক খুলে করে। ওরা কোথায় গেল? হাজার হাজার যুবক যুবতীর হিলাব দিতে পারেনি কংগ্রেসী সরকার। দলিল দস্তাবেজসহ ওদেরই বেদনাময় কাহিনী।

পূর্বচল, ৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলি-২

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সচেতন মাগু, বামফ্রন্টের কর্মীবৃন্দ ও বামপন্থী সরকারকে জানাই

বৈপ্লবিক অভিনন্দন

নবজাতক প্রকাশন, এ-১৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-৬

সম্পাদক—হীরেন বসু

দশম বর্ষ কলিকাতা প্রেস, ১২০১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত এবং ৩০শে মার্চ ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত।

ব্রিগেড ময়দানের সভায় বামপন্থী সরকারের নীতি ঘোষণা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

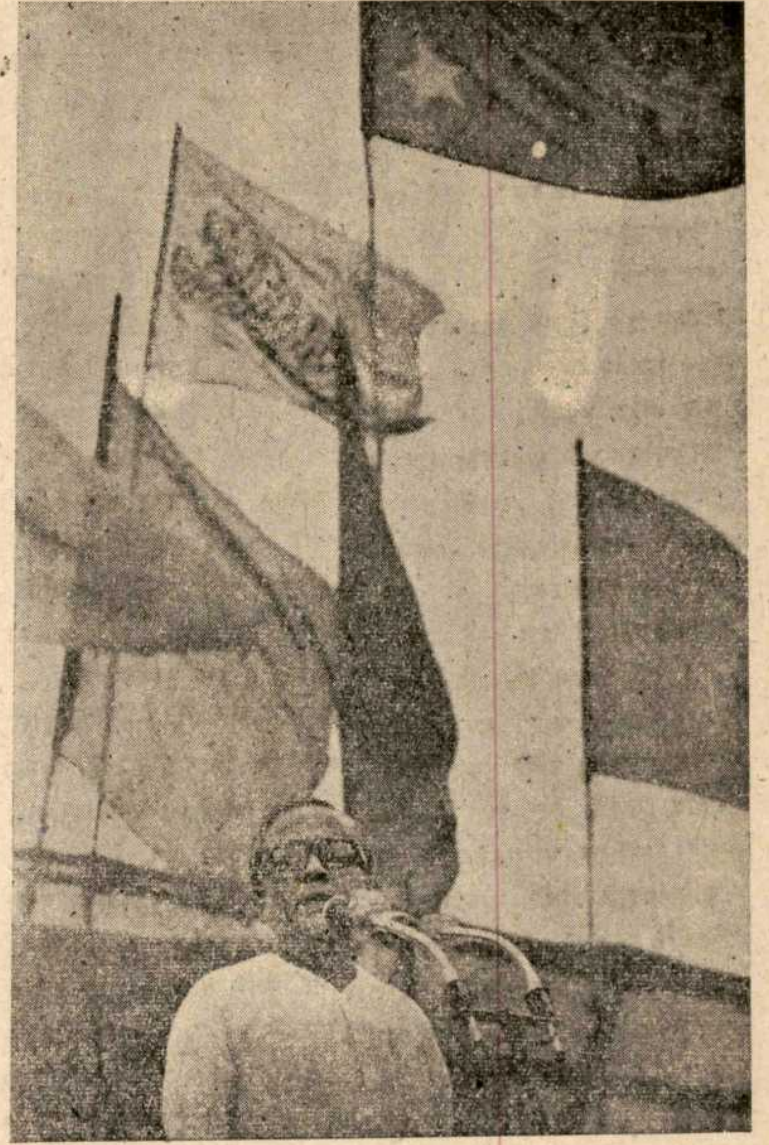
“আমরা পুলিশ এবং আমলাদের ওপর নির্ভর করে সরকার চালাবো না, আমরা বামপন্থী দলগুলো এবং বিরোধী দলের বিভিন্ন গণ-সংগঠনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে জন-সাধারণের সমস্ত অসুবিধা, সমস্ত সমস্যা, সমস্ত যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ শরিক হয়েই সরকার চালাবো যাতে নিপীড়িত মানুষের দুঃখ দুর্দশা যত বেশী সম্ভব লাঘব করতে পারি। কংগ্রেস সরকারের মত আমাদের বাগাড়ম্বর থাকবে না, আশা দিয়ে রাজ্যের মানুষকে আমরা আশাহত করবো না—সীমিত ক্ষমতা নিয়ে যত বেশী কাজ করা যায় আমরা করবো এবং যা করতে পারবো না তা আমরা জন-সাধারণের কাছে এসে বলবো, কারণ এই সরকারকে আপনারাই ক্ষমতায় এসেছেন।”

২৬শে জুন কলকাতা ব্রিগেড ময়দানে বামপন্থী ফ্রন্টের বিজয়োৎসবের ঐতিহাসিক জন-সমাবেশে উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়ে এই কথাগুলো বলেছেন সি, পি, আই, (এম)-এর পলিটবুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সভায় পৌরোহিত্য করেছেন বামপন্থী ফ্রন্ট কমিটির সভাপতি ও সি, পি, আই (এম)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক প্রমোদ দাসগুপ্ত। জ্যোতি বসু এদিন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে কথা বলেছেন কোমলে কঠোরে। জ্যোতি বসুর এদিনের ভাষণে তাঁর মন্ত্রিসভার নীতিটি মোটামুটি প্রতিফলিত হয়েছে। মালিক-শ্রমিক, কৃষক, ছাত্রাব্দ ও সমাজবিরোধীদের প্রসঙ্গ নিয়েও তিনি সরকারী নীতি স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছেন।

দর্পণ

বিংশ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা ২৩শ জুলাই, '৭৭ ৪০ পৃষ্ঠা

কারখানার মালিক শ্রমিক প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিল্প-পতিরা আমাদের কাছে এসেছেন এবং শিল্পে যাতে শান্তি বজায় থাকে সে ব্যবস্থা করার দাবী জানিয়েছেন। আমরা বলেছি নিশ্চয়ই আপনাদের দিকটা আমরা দেখবো কিন্তু শ্রমিকদের কাছে আপনারা শুধু উৎপাদন বৃদ্ধির দাবী জানাবেন, কিছু শ্রমিক তাদের গায পাওনা দাবী করলেই সেটা অশান্তি হয়ে যাবে এটা আমরা মেনে নেব না। তিনি আরও বলেন, (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)



বামফ্রন্টের পতাকাশোভিত মঞ্চে জ্যোতি বসু বক্তৃতা করছেন
ছবি: ল্যাণ্ড অ্যান্ড লাইফ

মেডিকেল পরীক্ষায় গণগোলের নেপথ্যে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত ২১শে জুন এম, বি, বি, এস, পরীক্ষায় ডাক্তারী ছাত্রদের নকল করার সংবাদে পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণ উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়েছেন। কিন্তু কেন এই ঘটনা ঘটেছে? এর প্রথম এবং প্রধান কারণ বিগত পাঁচ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে দুর্নীতি-পরায়ণ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মেডিকেল শিক্ষা-জগতে এক নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল। বিগত পাঁচ বছরে প্রত্যেক বছরে জয়েন্টস এন্ট পেরীক্ষায় অসুতীর্ণ বেশ কিছু নিয়মানের ছাত্রদের ভর্তি করা হয়েছিল। প্রত্যেক কলেজে কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত ছাত্র ও মুষ্টিমেয় স্বার্থাঘেযী শিক্ষকদের নিয়ে একটা চক্র গড়ে উঠেছিল।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই সব পেটোয়া দুর্নীতিগ্রস্ত ছাত্র পরিষদের নামধারী



২৬শে জুনের সমাবেশে এঁরাও এসেছিলেন দূর দূর গ্রাম থেকে। ছবি: ল্যাণ্ড অ্যান্ড লাইফ

ছাত্রনেতারা কথায় কথায় মেডিকেল কলেজের শিক্ষকদের ও অধ্যক্ষদের হুমকি দিত। সে সব অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ অত্যা জুলুমের প্রতিবাদ জানাতেন তাদের ভাগ্যে জুটত শাস্তি পদাবনতি, বদলী প্রভৃতি। এরা জুলুম করত এই বলে ক্লাশ না করলেও পরীক্ষায় বসার অসুতীর্ণ দিতে হবে এবং পরীক্ষায় টুকতে দিতে হবে। তাদের মর্জিমত পরীক্ষার তারিখ

করতে হবে এবং পরীক্ষা পেছাতে হবে—যার পরিণতিতে দু'বৎসর এম, বি, বি, এস, পরীক্ষা পেছিয়ে গেছে। অধিকাংশ মেডিকেল ছাত্র বারো সত্যি-কারের পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিতে যান এবং পরীক্ষা পেছানোর বিরোধিতা করতেন, তাদের হুমকি দেওয়া হত। নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের প্যাথলজির অধ্যাপক ডাঃ সুশান্ত সরকার জনৈক

ছাত্রকে (যিনি ছাত্রপরিষদের একজন কথ্যাত নেতা এবং প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিতকুমার পাজার একজন পেটোয়া বলে পরিচিত) ক্লাশে পারসেনটেজ না থাকার জন্য পরীক্ষায় বসার অসুতীর্ণ দেন নি। এর জন্য ডাঃ সরকারকে অপরিণীম নির্ধাতন সহ করতে হয়েছিল। প্রথমে মুষ্টিমেয় গুণাদের দিয়ে অকথ্য গালিগালাজ, (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

পুরসভার ৮০ হাজার টাকা জলে যাচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আমরা বামপন্থী সরকারের পুরসভা ত্রিপ্রশান্ত শুরুরে অসুতীর্ণ করছি কলকাতা পুরসভায় দুর্নীতির ওদণ্ড সর্বোচ্চ পদ থেকেই শুরু করুন। আমরা পুর প্রশাসক ত্রিপ্রশাস্ত সামান্যের কথা বলছি। উনি পুর-সভার পরসায় নিজের লেখার একটি সংকলন বার করতে চলেছেন। বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে “ক্যালকাটা ইজ”। দাম কুড়ি টাকা। পাঁচ হাজার ছাপা হবে। এর জন্য পুরসভার খরচ হবে আশি হাজার টাকা। এই বই ছাপার ব্যবস্থা করা হয়েছে শিবসাদেওই এক পেয়ারের লোক সজীব বসুর অভিপ্রকাশনীর ছাপাখানা থেকে। এই সজীব বসুর একটি কাগজ আছে, নাম সাহিত্য সংস্কৃতি, যে কাগজে শিবসাদ ৭৬ সালে বেশ কয়েক হাজার টাকার বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। নতুন পুরসভা কলকাতা পুরসভার আশি হাজার টাকাও অশচর্য বন্ধ করুন এবং গত পাঁচ বছরের কলকাতা পুরসভার বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত ফাইল আটক করুন। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত দুর্নীতির আরও খবর আগামী সংখ্যায়।

জনতার কুকুর বনাম জনতার নেতা

(দর্পণের পূর্ববক্ষক)

ওহো, তিনি বড় সজ্জন ছিলেন। ওহো, তিনি বড় সদাশয়। সর্বোপরি তিনি ছিলেন মস্ত বড় “দেশপ্রেমিক” (অবশ্য দুইজনের মতে দেশপ্রেমিক) এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই তিনি ছিলেন অত বি. দী, নিশ্চেকে তিনি মনে করতেন জনগণের কুকুর। নাথ তার অজয় মুখার্জী। ৬৭ ও ৬৯ সালের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী (অথবা মুখ্যমন্ত্রী!) এবং ইতিহাসের স্মরণীয় কক্ষমতালোভী এই রাজনৈতিক ভাঁড়টি এবং সেই সঙ্গে সি, পি, আই ও এস, ইউ, সি, নামক দলের রাজনৈতিক খোজাদের মিলিত চক্রান্তে পরপর দুইটি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় জ্যোতি বহু এবং সি, পি, আই (এম)-কে নাস্তাহুবাদ করার কোন পন্থাই বাকী থাকে নি। ফলশ্রুতি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতন। ঝাঁকের কই ঝাঁকে ফিরে যাওয়ার মত জনতার কুকুর অজয় মুখ্যজ্যো এবং সি, পি, আই ফিরে গেল কংগ্রেসের পক্ষপুটে। ১৯৭১ সাল। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে অজয় মুখ্যজ্যো দাঁড়ালেন জ্যোতি বহুর বিরুদ্ধে বরানগর কেন্দ্রে। ১১০৫৩ ভোটের ব্যবধানে অজয়বাবু পরাজিত হলেন। কংগ্রেসের পক্ষপুটে আশ্রিত সি, পি, আই দল পেলো মাত্র ১৩টি আসন। ৬৯ সালে ওরা পেয়েছিল ৩০টি আসন। অজয় মুখ্যজ্যো ৭১ সালে নির্বাচিত হয়েছিলেন তমলুক কেন্দ্রে থেকে এবং তার দল বাংলা কংগ্রেস পেয়েছিল ৫টি আসন যদিও ৬৯ সালে ওরা পেয়েছিল ৩৬টি।

জ্যোতি বহু বলেন, “জনগণ আমাদের শিক্ষক, জনগণই আমাদের আসল নির্দেশক।” কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মেহনতী মানুষ, সংগ্রামী জনগণ জ্যোতি বহুকে মনে করেন তাদের প্রিয় নায়ক। জননায়ক জ্যোতি বহু। তাঁর দল সি, পি, আই (এম) ৭১ সালে পেলো ১১১টি আসন, ৬৯ সালের তুলনায় ৩১টি বেশী। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলো ৭১ সালের নির্বাচনে সি, পি, আই (এম) পরিণত হলো বিধান সভার বৃহত্তম দল। কংগ্রেস পেয়েছিল ১০৫টি। নিয়মতান্ত্রিকভাবে সি, পি, আই (এম) পরিষদীয় দলপতি জ্যোতি বহুকেই রাজ্যপালের ভাণ্ডা উচিত ছিল মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য কিন্তু ডাকা হলো ৫ জনের দলপতি অজয় মুখার্জীকে। মন্ত্রিসভাও হলো। কিন্তু উষ্টে গেল কয়েক দিনের মধ্যেই। এলো ৭২ সাল।

জাতিয়ানি করে রিগিংয়ের মাধ্যমে কংগ্রেস জবর দখল করলো বহান-সভার প্রায় সব আসন। ৭২ সালে অজয়বাবু হলেন কংগ্রেস প্রার্থী। হায়রে, যে কুকুর প্রতিক্রিয়ার স্বার্থকে এমন ভাবে পাহারা দিলো তাঁকে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রী করা তো দূরের কথা একটি উপমন্ত্রিত্বও জুটলো না তার কপালে।

৭২ থেকে ৭৭ সাল। ক্ষমতায় কংগ্রেস এবং তার দোসর সি, পি, আই, অর্থাৎ কোর্শাল পার্টি অব ইণ্ডিয়া অথবা কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্দিরা কংগ্রেসী খুনীদের হাতে নিহত হলেন সহস্রাধিক সি, পি, আই (এম) কর্মী। প্রতিটি কংগ্রেসী দুষ্কৃতিকে নিঃশর্ত সমর্থন জানালো সি, পি, আই। আগমার্কী সমাজ-তন্ত্রীর আখড়া এস, ইউ, সি, অবশ্য সি, পি, আই, দলের মত সরাসরি কংগ্রেস ভজনা করলো না কিন্তু সি, পি, আই (এম) দলের ওপর অমাহুষিক আক্রমণের ন্যূনতম নিন্দা না করে তাদের শিবদাসী বিপ্লবের শাপিত শর বারবার নিক্ষেপ করলো মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের ওপর।

দৃষ্টান্তর। ১৯৭৭ সাল। লোক-সভা নির্বাচনে সারা ভারতে পয়দস্ত হলো কংগ্রেস। এই রাজ্যে প্রায় নিশ্চিহ্ন হলো। নিশ্চিহ্ন হলো সি, পি, আই। এস, ইউ, সি, লোকসভা নির্বাচনে আলাদাভাবে জনতা পার্টির সঙ্গে আসন রফা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে জনতা সি, পি, আই (এম)-এর “প্রতিক্রিয়াশীল” আতাতের শিবদাসী বিপ্লবের মহা মূল্যবান তত্ত্বকথা শুনিয়া পেলো না একটি আসনও।

আবার দৃষ্টান্তর। ৭৭-এর বিধান সভা নির্বাচন। জনগণের কুকুর (অজয়-তত্ত্ব=আধাসামন্ত-পুঁজিবাদী স্বার্থ+বামপন্থী তত্ত্ববিধাবাদ=জনগণ) অজয়কুমার এবার আর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাহসী হলেন না। সি, পি, আই, দল নানাপন্থা হয়ে বামপন্থীদের সঙ্গে জাড়া বাঁধবার চেষ্টা করলো কিন্তু বেয়াদব বামপন্থীরা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলো তাদের। শিবদাসী রূপান্তর আগমার্কী নীহারিকাও এই নির্বাচনে বাম-পন্থীদের সঙ্গে ধর বাঁধতে গিয়ে গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছে।

৭৭ সাল। নাটকের স্ববনিকা। সি, পি, আই (এম) ৭৭-এর বিধান-সভা নির্বাচনে পেলো ১৭৮টি আসন। বামপন্থী ফ্রন্ট সাকুলো ২৩০। ইন্দিরা-সিদ্ধার্থ পদক্ষেপে শিরোধার্য-কারী গোপাল বাঁজুরের দল সি,

পি, আই, পেলো ২টি। গোপালদার দর্শন-১ কংগ্রেস ০টি। আগমার্কী নীহারিকা এস, ইউ, সি, ৪টি।

২১শে জুন রাজভবনে অহুষ্ঠিত হলো রাজ্যের প্রথম বামপন্থী মন্ত্রিসভার অভিষেক। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহু। অভিনন্দন, অভিনন্দন আর অভিনন্দন। রাজভবনের বাইরে লক্ষ মানুষের বিজয়োল্লাস। মুখ্য-মন্ত্রীরূপে শপথ নিলেন জনগণের প্রিয় নেতা জ্যোতি বহু।

হায়রে, মুখ্যমন্ত্রীরূপে যখন জ্যোতিবাবু শপথ নিচ্ছিলেন—করণ চোখে অসহায়ের মত তখন তাকিয়ে দেখছিলেন “জনগণের কুকুর”,

বাংলার ইতিহাসের সাম্প্রতিকতম মীরজাকর শ্রীঅজয়কুমার মুখো-পাধ্যায়। উপস্থিত সকলের চোখে এক পরিহাসের পাত্র। অবহেলিত, অনাদৃত, নেহাং সৌজন্নের খাতিরেও কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলেনি। এসে-ছিলেন সি, পি, আই দলের বিশ্বনাথ মুখার্জী। এক সময় একটি বিশেষ কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময় একজন পুলিশ অফিসার এসে বাধা দিলেন। বিশ্বনাথবাবু একটু মৃদু প্রতিবাদ করলেন কিন্তু আর কেউ তাকালেন না তাঁর দিকে। অর্থাৎ সেদিনের অহাঠানে মধ্যমণি জ্যোতি বহু। কেন্দ্রভূমি বামপন্থী

ফ্রন্ট। সবাই জ্যোতি বহুকে নিয়ে ব্যস্ত। ব্যস্ত ফ্রন্টের অন্য সব ম... নিয়ে। এসেছিলেন রাজ... ট্যাপিজ খেলোয়াড় সিদ্ধার্থকর রায় এগিয়ে গিয়ে জ্যোতিবাবুকে আলিঙ্গ করে দুটি কেড়েছেন সকলের তাঁকেও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। পরে একটি চেয়ার মিলেছে। উপহাসের পাত্র ছিলেন তিনিও।

রাজভবনের এই অভিষেক অহুষ্ঠানে আসেন নি কে? “পশ্চিম বঙ্গের পিরতিটি মানুষ যার সঙ্গে বেইমানি করে” তাঁর বড় সাধের “মুখ্যমন্ত্রীর গদী কেড়ে নিলে” সেই স্বনামধন্য পেরুমুদা অ... জনতা দলের রাজ্য-সভাপতি প্রফুল্ল চন্দ্র সেন।

ডাক্তারের অবহেলায় রোগিণীর মৃত্যু

প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সমস্ত ঘটনা ধামাচাপা দিয়েছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের প্রাক্তন স্পেশাল অফিসার ও ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রীএন, কে, সাহা এবং ঐ দপ্তরের এস্টাবলিশমেন্ট শাখার সেক-শান অফিসার শ্রীযোগেশচন্দ্র বিশ্বা-সের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। আর জি কর মেডিকেল কলেজের গায়নোকলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ অমিয়কুমার মুখার্জীর বিরুদ্ধে একজন রোগিণীর চিকিৎসার ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব-হীনতা ও অবহেলার অভিযোগে যে তদন্ত চলছিল ঐ তিনজনের যোগ-সাজসে তা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে এবং সরকারী নথিপত্র গায়েব ও বদল করা হয়েছে।

জানা গেছে, আর জি কর মেডি-কেল কলেজের গায়নোকলজি বিভা-গের প্রধান ডাঃ সি এস দাঁ প্রথমে রিপোর্ট দেন যে, ডাঃ মুখার্জীর সম্পূর্ণ অবহেলার জন্য ঐ রোগিণী শ্রীমতী নমিতা ভট্টাচার্যের মৃত্যু ঘটেছে। আরও জানা গেছে তাঁর স্বামী শ্রীনির্মলেন্দু ভট্টাচার্যের অহুমতি ছাড়াই শ্রীমতী ভট্টাচার্যকে ১৪০ বিধান সরণিতে অবস্থিত ক্যালকাটা মেটরনিটি ও নার্সিং হোম থেকে আর জি কর হাসপাতালে ডাঃ মুখার্জীর প্রাইভেট গাড়ীতে স্থানান্ত-রিত করা হয়।

শ্রীমতী নমিতা ভট্টাচার্য ভর্তি হয়েছিলেন ক্যালকাটা মেটরনিটি ও নার্সিং হোমে। ১৯৭১ সালের ২১শে মে তাঁর সিজারিয়ান অপারে-শন হয়। অভিযোগ যে, অপারে-

শনের পর তাকে যে রক্ত দেওয়া হয় তা অল্প গ্রুপের। ২৪শে মে তাঁকে আর জি কর স্থানান্তরিত করা হয়। শ্রীমতী ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় অপারেশন হয় ২০শে জুন এবং তিনি মারা যান ৮ই জুলাই। এই মৃত্যু সম্পর্কে তদ-ন্তের পর ডাঃ মুখার্জীকে সাসপেন্ড করা হয় এবং সেই আদেশে বলা হয় ডাঃ মুখার্জী নমিতা ভট্টাচার্যের চিকিৎসা ব্যাপারে “showed utter carelessness almost amounting to criminal negligence of duty,” অর্থাৎ বিভাগীয় তদন্তে ডাঃ মুখার্জীকে শ্রীমতী ভট্টাচার্যের মৃত্যুর জন্তে প্রাথমিকভাবে দায়ী করা হয়। এবং তিনি যাতে তদন্তের ব্যাপারে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার না করতে পারেন তার জন্তই তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়।

কিন্তু অভিযোগ এই যে ডাঃ মুখার্জী আর জি কর মেডিকেল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নকে প্ররো-চিত করেন যাতে পূর্বোক্ত তদন্তের ভারপ্রাপ্ত এবং আর জি কর মেডিকেল কলেজের গায়নোকলজির প্রধান ডাঃ সি এস দাঁর কাছে থেকে জোরপূর্বক ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদকের নামে এই মর্মে রিপোর্ট আদায় করা হয় যে, হাসপাতালে রোগীকে নিরাময়ের জন্য ডাঃ মুখার্জী সমস্ত রকমের প্রয়ো-জনীয় চিকিৎসা করেছেন। ডাঃ দাঁর এই রিপোর্ট ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদক প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজার কাছে পাঠান ডাঃ মুখার্জীর বিরুদ্ধে সাসপেন্সনের আদেশ প্রত্যা-হারের জন্য। শ্রীপাঁজা এই আদেশ প্রত্যাহার করে নিরপেক্ষ তদন্তের

পথ বন্ধ করেন। এর আগে ডাঃ সি এস দাঁর তদন্তের ভিত্তিতেই স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রাক্তন সেক্রেটারী শ্রীএ কে মজুমদার ডাঃ মুখার্জীকে সাসপেন্ড করেছিলেন। তদন্তের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সরানো হতে পারে বলে শ্রীপাঁজার কাছে অভিযোগ করা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এবং শেষ পর্যন্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নথি, যেমন এক্সরে প্লেট, রোগের বিবরণ সম্পর্কিত কাগজপত্র প্রভৃতি ডাঃ মুখার্জী আর জি কর হাসপাতাল থেকে সরিয়ে ফেলেছেন। আর বাকি যেগুলি ছিল পরবর্তী কালে তদন্তের ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীএন কে সাহার হেফাজতে তাকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ডাঃ মুখার্জী যোগেশচন্দ্র বিশ্বাসের সঙ্গে যে সাজসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল শ্রীএন কে সাহার হেফাজত থেকে সরিয়ে তাঁর স্ববিধামত নথি সেখানে রেখে দিয়েছেন। শ্রীসাহাও নথিপত্র সরাবার স্বযোগ দিয়েছেন এবং যাতে ডাঃ মুখার্জী অভিযোগ থেকে অব্যা-পান তার জন্য তাঁকে সবরকমের স্ববিধা করে দিয়েছেন। এমন কি তিনি ডাঃ মুখার্জী সম্পর্কে মেডিকেল কাউন্সিলের কাছে কোন অভিযোগও করেন নি। অর্থাৎ শ্রীএ কে সাহা ডাঃ মুখার্জীকে অভিযোগ থেকে মুক্ত করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরে নানারকম বেআইনী কার্যকলাপ চালিয়েছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন ঘোষণার ঠিক আগেই কোন কারণ না দেখিয়ে ডাঃ মুখার্জীকে সমস্ত অভি-যোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

তামিলনাড়ুতে পুলিশ কতক খুনের ঘটনা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কেরালার পাশবর্তী রাজ্য তামিলনাড়ুতেও রাষ্ট্র-হত্যার মত ঘটনা ঘটিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী তামিলনাড়ুর পুলিশ বাহিনী। জরুরী অবস্থার স্বযোগে কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে ইন্দিরা সরকার চালাও অত্যাচার দিয়েছিলেন সেখানকার প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের যা হচ্ছে তাই করার। পশ্চিম বাংলার যা শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের পর ভারতের অন্য রাজ্যগুলির সঙ্গে তামিলনাড়ুও তা অনুসরণ করেছে। রাষ্ট্রনৈতিক কর্মীকে গ্রেপ্তার করার পর ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে পুলিশ, যেমন করেছে অন্ধ্রপ্রদেশে, তারকুণ্ডে কমিটির রিপোর্টের মাধ্যমে যা আমরা জেনেছি।

তামিলনাড়ু ব্যক্তি স্বাধীনতা সমিতি ঠাণ্ডা মাথায় পুলিশ কতক খুনের ঘটনা তদন্ত করার জন্য কয়েক জন বিশিষ্ট সাংবাদিককে নিয়ে একটি অনুসন্ধানকারী কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি অনুসন্ধান করে জেনেছে যে, উত্তর আরকোট জেলার পুনেরী গ্রামের উনিশ বছর বয়স্ক সীরালাল নামক এক যুবককে গত এগারোই জুলাইর দুপুরে অখির গ্রামে নিয়ে গিয়ে পুলিশ পিটিয়ে খুন করেছে।

এই উনিশ বছর বয়সী সীরালাল ট্রেড ইউনিয়নের একজন কর্মী ছিলেন। ক্ষেত মজুর এবং বিড়ি শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন বৃদ্ধির আন্দোলনে এবং চূয়াস্তর সালের সেই ঐতিহাসিক রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটে সীরালাল সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে ছিলেন। তাঁর পিতা শ্রীম, ডুরাই-স্বামী তামিলনাড়ু বিদ্যুৎ পর্ষদের একজন পরিদর্শক। ঐ গ্রামের এক গরীব চাষী দম্পতি শ্রীভেলু ও শ্রীমতী জয়া ভেলু প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে অনুসন্ধানকারী কমিটির কাছে জানিয়েছেন যে, শ্রীধুরাইস্বামী ও শ্রীপি স্বকামণির নেতৃত্বে একটি বাহিনী তড়া করে ফাঁদ পেতে সীরালালকে একটা বেগুন ক্ষেতে গ্রেপ্তার করে এবং একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে নিদ্রা ভাবে অত্যাচার করতে থাকে। এর পর গলায় একটা দড়ি বেঁধে তাঁকে টানা হেঁচড়া করতে করতে নিয়ে যাওয়া হয়। একটা পাটাতন তাঁর মাথার চাপিয়ে দুজন পুলিশ তার দু'দিকে দাঁড়িয়ে চেটে কুচকুচ খেলতে থাকে। এরফলে গত এগারোই জুলাইরী সন্ধ্যাবেলা তিনি বারি যান। পুলিশ তখন সীরালালের মৃতদেহ সেই বেগুন ক্ষেতের মধ্যেই ফেলে দিয়ে যায়।

অনুসন্ধান কমিটি ও পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী গলা-খাসনালীর উপর চাপ দেবার কলেই সীরালালের মৃত্যু ঘটেছে। এই ঘটনা নিয়ে তরুণান্তর সাবকালেক্টর শ্রীএস, রায় প্রার্থ মক তদন্ত কালে ঘটনার দুই সাক্ষী সেই ভেলু ও জয়া ভেলু দম্পতির খোঁজ করেন। পুলিশ জানায় যে এরা আত্মগোপন করেছেন। কিন্তু অনুসন্ধান কমিটির মতে ভেলু দম্পতিকে এগারোই জুলাইরী থেকে নয়ই মার্চ পর্যন্ত বেআইনী ভাবে পুলিশ হাড্ডিতে আটকে রাখা হয় এবং ছয়ই মার্চ তাঁদের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। ঐ সময়ে তাঁদের পুলিশ লকআপে উল্লঙ্ঘন করে অত্যাচার করা হয় এবং তাঁদের দু'বছরের সস্তানের দেহে পেট্রল ছিটিয়ে দেবার ভয় দেখান হয়। ভেলু

দম্পতির ক্ষেতের শস্ত পুড়িয়ে দেয় পুলিশ।

তামিলনাড়ু ব্যক্তি স্বাধীনতা সমিতির এক প্রতিনিধি দল রাজ্য-পাল শ্রীপ্রভুদাস পাটোয়ারীর সঙ্গে গত ১৩ই জুন সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর হাতে সীরালাল খুনের প্রমাণ নথিপত্র সহ এক আরকলিপি দিয়ে শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। তাঁরা সীরালাল এবং ভেলু পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দানেরও দাবী জানান।

তামিলনাড়ু সরকার চোদ্দই জুন এক আদেশে সীরালালের মৃত্যুব কারণ অনুসন্ধানের জন্য রাজ্য পর্ষদের সদস্য শ্রীএস, পি, শ্রীনিবাসনের নেতৃত্বে একসদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিশন গঠন করেন।

সীরালালকে খুন করার প্রয়ো-

জনীয়তা সম্পর্কে তামিলনাড়ু পুলিশ বাহিনীও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বাহিনীর শিক্ষা নিয়েছে, সীরালাল-ভেলুদেব আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার আঘাতে গল্প ফেঁদেছে। পুলিশের প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, হেডকন্সটেবল কাশীনাথন দুজন কন্সটেবল রামাস্বামী ও শিবলিঙ্গমকে নিয়ে গত এগারোই জুলাইরী নহনা অসিধুর গ্রাম পরিদর্শনে যায়। সেখানে তারা যখন ভেলু দম্পতিকে কোন এক বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, তখন দুজন কুঁড়ের থেকে বেরিয়ে এসে কন্সটেবলদের লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে। ভেলু দম্পতির নাকি কন্সটেবল শিবলিঙ্গমকে ধাক্কা দিয়ে একটা কুয়ের অধো ফেলে দিতে চেয়েছিল। পুলিশের সাহায্যার্থে জনতা আসে এবং এর

মধ্যে ভেলু দম্পতি পালিয়ে যায়। জনতার ছোট্ট ছুটে একজনের আঘাত লাগে এবং পরে তিনি মারা যান। মৃত ব্যক্তির ব্যাগে নাকি দুটো দেশী বোমা, নকশালপহীলের প্রচার পুস্তিকা, 'কছু পুরোনো কপোর গয়না, একটা ছুরি ও দুটো চাব পাওয়া গেছে। পুলিশের মতে ঐ কপোর গয়না ও চাবি দুটোর প্রকৃত মালিককে গত বছরের এগারোই ডিসেম্বর আপিগামে নকশালপহীরা খতম করেছিল। সাব কালেক্টর প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের বক্তব্যের কোন প্রমাণ পান না, তাই তিনি পুলিশের বক্তব্য গ্রহণ করেন না। এ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের দু'তারিখে কালেক্টরের কাছে পেশ করা রিপোর্টে সাব কালেক্টর বলেছেন যে পুলিশ অনাবশ্যক ভাবে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে ছল এবং তিনি দাবী কন্সটেবলদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তর সুপারিশ করেছেন।

ঔষধ শিল্পের একচেটিয়া মালিকদের যথেষ্টাচার

তপন বসু

সারা দেশের তামাম মেহনতী জনগণ ও সংগ্রামী সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেশন অফ মেডিক্যাল রিপ্রেসেন্টেটিভস এসোসিয়েশনের সংগ্রামী কর্মীরাও কংগ্রেসী সরকারের অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাননি।

জরুরী অবস্থার স্বযোগে ঔষধ শিল্পের দেশী ও বিদেশী একচেটিয়া মালিকেরা ফেডারেশনের ৬৩ জন সংগ্রামী কর্মীকে বিনা কারণে বরখাস্ত করেছে। এই বরখাস্ত কর্মীদের মধ্যে এই সংগঠনের সর্বভারতীয় নেতারা এবং বিভিন্ন রাজ্যের নেতা ও কর্মীরা আছেন বারি স্বদীর্ঘ কাল ধরে ট্রেড ইউনিয়ন করবার অধিকারের দাবিতে আন্দোলন করে চলেছেন। মেডিক্যাল রিপ্রেসেন্টেটিভ কর্মীদের আন্দোলনকে দমন করার জন্য রুশ বিপ্লবের আগে জ্বা-টড সংগঠনের মত অরগানাইজেশন অফ ফারমা স্টুডেন্টস প্রোডুসারস অফ ইণ্ডিয়া সংক্ষেপে ও পি পি আই নামে একটি কুখ্যাত সংগঠন তৈরি হয়েছে যার কাজ কর্ম সংগঠনের কর্মী ও নেতাদের ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া।

সমগ্র ক্ষেত্রেই ইটাই হরছে বিনা কারণে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনরূপ স্বযোগ না দিয়েই এবং জরুরী অবস্থার স্বযোগে ঐ সমস্ত

মালিকেরা মেডিক্যাল ও সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভদের ওপর অকথ্য অত্যাচার ও নানারকম দমনপীড়ন নিরন্তরভাবে চালিয়েছে, যা জরুরী অবস্থার পরেও অব্যাহত রয়েছে। এই ধরনের অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ফেডারেশন বহু আন্দোলন করেছে কিন্তু মালিক পক্ষ তার আক্রমণ থেকে কোন সময়ের জন্য বিরত থাকেনি। অত্যন্ত শ্রমিক কর্মচারীরা যে, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস অ্যাক্টের স্বযোগ সুবিধা পায় মেডিক্যাল ও সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভেরা তার বাইরে পড়ে। অর্থাৎ এই আইনের স্বযোগ সুবিধা আদায় করার জন্য দীর্ঘ বারো বছর ধরে আন্দোলন করার পরেও তারা সরকারের ঔদাসীন্য ছাড়া কিছুই পাননি। এই স্বযোগে মালিক শ্রেণী তাদের আক্রমণকে আরও তীব্র করেছে। শ্রমিক কর্মচারীদের কেবল মাত্র প্রতারণা করার জন্যই গত বছর কেন্দ্রীয় সরকার সেলস প্রমোশন এমপ্লয়ীজ (কনডিশন অফ সার্ভিস) অ্যাক্ট নামে এক আইন প্রণয়ন করেন, যে আইনের আওতার মধ্যে কেবলমাত্র সেই সব সেলস ও মেডিক্যাল রিপ্রেসেন্টেটিভরাই পড়ে যাদের মাস মাহিনা সর্বমোট ৭৫০ টাকার মধ্যে। অর্থাৎ কোন এক অদৃষ্ট হস্তের ইঙ্গিতে অধিকাংশ স্বদেশী ও বিদেশী একচেটিয়া কোম্পানীর কর্মী-

দেরই উক্ত আইনের আওতার বাইরে রাখা হলো।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মালিকবর্গ দ্বারা পরিচালিত কুখ্যাত সংগঠন ও পি পি আই এই সমস্ত ক্ষেত্রে একচেটিয়া কোম্পানীগুলির নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে থাকে। এই সংস্থাটির দালালেরা বিভিন্ন সংস্থায় ও স্থানীয় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য ছড়িয়ে পড়েছে। এইসব দালালেরা দেশের দরিদ্র জনসাধারণের কোটি কোটি টাকা রাজস্বীয় বিলাসে ব্যয় করে। এদের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সামান্যতম বিরোধিতা চূর্ণ করার জন্য রাজনৈতিক অস্ত্রগ্রহ কিনে রেখেছে। এগুলো সবই চলছে আড়ালে—জনসাধারণ খুব কমই এসব জানতে পারেন। বিভিন্ন দেশে অত্যধিক দামে ও নিরমানে ঔষধ বিক্রি করার অপরাধে এরা বারে বারে কার্ঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এরা এতই শক্তিশালী যে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নির্দেশ সহজে অমান্য করতে পারে।

বিদেশী একচেটিয়া ঔষধ কোম্পানীগুলোতে এখন দেশী ম্যানেজার নিয়োজিত হয়েছে যাদের কাজ হলো মুখ্যত বিদেশী প্রভুদের ও দেশের রাজনৈতিক হোমরা চোমরা-দের নানাভাবে বুশি করা। এইসব দেশী সাহেবরা স্বদেশের ভাবমূর্তি রান

করে ভারতবর্ষকে সর্বাধিক "বিশ্বজ্ঞ জাতি" হিসেবে অভিহিত করেছে। এইসব কোম্পানীগুলো জরুরী অবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছে এবং পূর্বতন রাজনৈতিক তারকাদের লগুন আমেরিকায় অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বিদেশ থেকে কম্পউটার আমদানী করে অ্যাসেমব্লী লাইন বসানো ও অন্যান্য বাস্তবীকরণ ব্যবস্থা করে চাকরীর স্বযোগ কমিয়ে দিয়েছে। তার ফলে হাজার হাজার কর্মী কর্মচ্যুত হয়েছে এবং বেকারীর পাহাড় আরো উঁচু হয়ে উঠেছে। এখন স্বদেশী জরুরী অবস্থা ও স্বৈরতন্ত্রের অবসান হয়েছে তবুও এইসব বিদেশী ঔষধ কোম্পানীগুলো নিজেদের সাম্রাজ্য একনাগাড়ে স্বৈরতন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে নিজেদের ছল চাতুরী ও বেআইনী কাজকর্ম গোপন রাখতে ও জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এরাই আবার কর্মচারীদের একাংশের মগজ ধোলাই চালাচ্ছে। সারা ভারতে ২০,০০০ মেডিকেল ও সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ কাজ করছেন। ঔষধ কোম্পানীগুলো তাদের দুর্নীতিপূর্ণ কাজগুলো ছোর করে করানোর জন্য এদের পুরোপুরি ব্যবহার করেছে। এইসব কর্মীদের চাকরীর কোন নিরাপত্তা নেই। স্বভাবতই চাকরী হারাবার আশংকায় (শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

দানিকেন তত্ত্বের আলোকে মহাভারতের সূচী ও দেবতা বীরেন্দ্র মিশ্র

মহাজাগতিক পথে

গতবার কথা হচ্ছিল লেসার রশ্মি সম্পর্কে। বলেছি, লেসার রশ্মির সাহায্যে শূন্যে দৃশ্যমান যে কোনো রকম দিব্য দর্শন ঘটানো যায়। কোটোগ্রাফী, চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশনে লেসার বাস্তবিক অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলতে পারে। মহাকাশ যাত্রায় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগে লেসার যোগ্যতম বিশ্বাসী বন্ধুর কাজ করে। লেসার পারে যে কোনো আকাশযানকে অজ্ঞাতাবে অবতরণে সাহায্য করতে। 'মুনি স্কেপলে' লেসারের সাহায্যে ভ্রম করতে পারেন। আবার নিউক্লিয়ার স্কেপশ্যাট এক পক্ষ ব্যবহার করলে আর পক্ষ সেই অল্পকে তার লক্ষ্যে পৌঁছাবার আগেই মারপথে খতম করে দিতে পারে লেসারেরই সাহায্যে। এই ব্যাপারটির পরিপ্রেক্ষিতে মহাভারতের কিছু ব্যাখ্যাতীত অস্ত্রেরও ব্যাখ্যা বোধহয় সম্ভব। নিশ্চয় করে বলতে পারিনা, তবে লেসার ব্যবহারের ক্ষমোত্তি কি একদিন নির্বাচিত কোনো গর্ভিণীর গর্ভকেও নষ্ট করে দেওয়ার মতো মহাভারতীয় অস্ত্রতুল্য শক্তি অর্জন করে বসবে? সেদিন কি পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্দিন?

নন্দানুষ্ঠি পর্বতবিজয়ী দলের অচ্যুতম সদস্য বন্ধুবব নিমাই বসু একটা প্রশ্ন রেখেছিল আমার কাছে। বলেছিল, জতুগৃহের হুডঙ্গটার কথা ভেবেছ? দুর্বোধনদেব চরবাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে 'অমন' একটা হুডঙ্গ অত তাড়াতাড়ি কেটে ফেলার মধ্যে কী বৈজ্ঞানিক যাত্রা ছিল না? বলেছিলাম খুঁজলে উত্তর নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

সেই উত্তরও দিতে পারে লেসার রশ্মি। ডিলিং করার অদ্ভুত ক্ষমতা রাখে বিজ্ঞানের অধুনাতম আবিষ্কার, এই লাইট গ্র্যামপ্লিকেশন বাই স্ট্রিমুলেটেড এমিশন অফ রেডিয়েশন। পারে তা ইঞ্চিখানেক মোটা মার্বেলকে মাত্র তিরিশ সেকেন্ডে মধ্য বালি করে ফেলতে। হুডঙ্গ, ঝাল, গুহা বানানোর ব্যাপারেও লেসারের অবিস্মৃত ক্ষমতা আজ প্রমাণিত। জতুগৃহে হুডঙ্গ বানাতে কারিগর পাঠিয়েছিলেন বিদুর। যিনি ধৃতরাষ্ট্র শিবিরে বসে সর্বদাই দেবতাদের গুপ্তচরের কাজ করে গেছেন একান্ত নিষ্ঠাভরে। ভারতযুদ্ধে বিদুরের তাই মস্ত কূটনৈতিক ভূমিকা। কিন্তু সেসব কথা উপযুক্ত সময় আলোচিত হবে। আমরা আরও দেখব, বুদ্ধিতে যার ব্যাধা নেই, লেসার রশ্মি অবলীলাক্রমে সে সর্বেরই ব্যাধা আমাদের জানিয়ে দেবে। আন্তর্জাতিক বুদ্ধিমানদের হাতে এই অস্ত্রটি থেকে থাকলে তাঁদের পক্ষে বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ মানুষের সামনে হরেক দৈর ঘটনা ঘটিয়ে তোলাই সম্ভব ছিল।

মহর্ষি ভরদ্বাজের 'বৈমানিক শাস্ত্র' পুঁথিটির সর্বাধুনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন মহীশূরের সংস্কৃত গবেষণার আন্তর্জাতিক আকাদেমী। দানিকেন আমাদের কাছে সেই ব্যাখ্যাকে প্রথম অর্থবহ করে তুললেন পুঁথিটিকে তাঁর বক্তব্যের (দেবতার গ্রহাস্ত্রবাসী) প্রাসঙ্গিক প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরে। ভরদ্বাজের পুঁথি থেকে তৎকালীন

ও তৎসংক্রান্ত যে তথ্যাদি পাওয়া যায়, সেগুলির কথা চিন্তা করেও বোঝা যায়, বিজ্ঞান তখন উন্নতির চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

ভরদ্বাজ পুঁথি বলে সেকালের বৈমানিকেরা জানতেন:

পরবিমানস্থ জনসঙ্ঘাষণাদি সর্বশঙ্কাকর্ষণ রহস্তম্ ॥ অর্থাৎ, শত্রুপক্ষীয় বিমানের শঙ্ক আকর্ষণ করার ও সেই বিমানের কণোপকণন শোনার পদ্ধতি....।

পরবিমানস্থ বস্তুর কণাকর্ষণ রহস্তম্।

মানে, শত্রুপক্ষীয় বিমানের অভ্যন্তরস্থ চিত্রগ্রহণ বিষয়ক রহস্ত....।

পরবানাগমন দিক প্রদর্শন ক্রিয়া রহস্তম্।

শত্রুপক্ষীয় বিমানের গতিপথ নির্ণয়ের গোপন পদ্ধতি....।

এইভাবেই তাঁদের জ্ঞান ছিল শত্রুবিমান নাশক্রিয়া রহস্তম্। জানা ছিল, পরবিমানস্থ যাত্রীদের শুদ্ধিকরণের গোপন উপায়। [দানিকেন গ্রন্থ "নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন" থেকে গৃহীত। অম্ববাদিক অজিত দত্ত, লোকায়ত প্রকাশন]

লেসার রশ্মির সহায়তায় এসব প্রক্রিয়াই সম্ভব। লেসারের উন্নততর প্রয়োগ ঘটলে আজকের বৈমানিকও হয়ত এইভাবেই সবকিছু পদ্ধতি কাণ্ডে পরিণত করতে পারতেন। নাশক ক্রিয়ায়, চিত্রগ্রহণে, কথাবার্তা বলায় লেসার আজ মস্ত হাতিয়ার, সে আরও কত ক্ষমতার অধিকারী করবে পৃথিবীর জীবন্ত দেবতাদের (বিজ্ঞানীদের) কে বলতে পারে। পুরায়ুগের চতুর সেই দেবতাদের সঙ্গে আমরা হয়ত অদূর ভবিষ্যতে অগ্ৰহে গিয়ে হাত সেক করে আসতে পারব অথবা বিজ্ঞানে অনগ্রসর কোনো গোপালকে নেমে আমরাই হব নয়া শতকের নতুন দেবতা।

ঠিক মানতে পারছেন না? কিন্তু বিজ্ঞানীরা সেই সুপার স্পেশ বা হাইজার স্পেশ আবিষ্কারের জোর চেষ্টা করেছেন। বিষয়টি বাস্তব বৈজ্ঞানিক কল্পনা। কিন্তু কাল্পনিক অহুমানই বহুবার বাস্তব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সার্থকভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। সুপার স্পেশ আবিষ্কৃত হলে সেই বিশেষ মহাজাগতিক পথে একটি মহাকাশ যান গ্রহাস্ত্রে পৌঁছে যেতে পারবে অত্যন্ত সময়ে। বৈজ্ঞানিক অহুমান, সুপার স্পেশে স্থানকাল বলতে কিছুই নেই। ('মানুষের পূর্বপুরুষ অগ্ৰহের মানুষ, —পরমেশ চৌধুরী, মোব লাইব্রেরী)। এ প্রসঙ্গে In Search of Ancient Mystries এর লেখক বলেন, "By our thirtieth or fortieth Century, unimaginable gateways to hyper space may have been flung open by geniuses yet unborn". —Alan and Oally Landsburg অর্থাৎ অগ্ৰহে পৌঁছানোর অগ্ৰহে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন বলে ধারণা। সেই প্রচুর সময় দরকার না-ও হতে পারে। আর এই ধরনের চিন্তা থেকেই মনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে,

অগ্ৰহের বুদ্ধিমানরা অল্প সময় কালে এককালে পৃথিবীতে আনাগোনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়, অবিশ্বাস করছে না, কিছুদিন আগে বহুল প্রচারিত সেই অবিশ্বাস সংবাদটি যে, একাধিক গ্রহাস্ত্রের মহাকাশ যান পৃথিবীতে আনাগোনা করেছে। সাম্প্রতিককালে আমরা লাইট সমারের কথা শুনেছি। গবেষণা এই তৃতীয় unknown flying object বা অজানা উড্ডয় বস্তু (অউন) নিয়ে আজ চিন্তা করছেন রাশিয়া আমেরিকায় বসে। সময়মত অউন প্রসঙ্গে আমাদেরও আসতে হবে। তবে সেকথা পরে। বর্তমানে পুনরায় মহাদেবের দিকেই চোখ ফেরানো যাক।

সামরিক কর্তাটি ব্রাহ্মকে খতম করে অজ্ঞানের সঙ্গে নকল যুদ্ধ করেছেন। অজ্ঞান সর্বস্বয়ে দেখেছেন তাঁর অহঙ্কার কেমনভাবে হস্তান্তর হয়েছে মহাদেবের ক্ষমতার কাছে। তিনি ভেবেছেন, শঙ্কর ব্যতীত অগ্ৰহে যে কোনো দেবতা হ'লে তাঁর শরপ্রহার অবশ্যই সে দেবতাকে 'শমন সদনে' (যমালয়ে) প্রেরণ করতে পারত। অজ্ঞানের এমন চিন্তা আমাদের অবাক করেছে। তবে কি দেবতারাও মরণশীল? সামান্য মানুষ তাঁদের ঘরের বাড়ি পাঠাতে পারে? এ কেমন দেবতা!

দেখলাম মহাদেবকে জাপটে ধরে অজ্ঞান তাঁর সঙ্গে মল্লযুদ্ধও করেছেন। কিন্তু অদ্ভুত মানুষের বিশ্বাস। এতোতেও মহাভারতকার বোঝাতে পারেননি যে, মহাদেব উন্নতমানের দেহধারী মনুষ্যমাত্র। তাই শিল্পী তাঁর ছবি এঁকেছেন সর্বাত্মক সাপে ওড়িয়ে দিয়ে। বাড়লা সচিত্র মহাভারতে আছে মহাদেব হাঁ করে অজ্ঞানের বান গিলে ফেলছেন। অথচ ব্যাপারটা ছিল অল্পরকম। মহাদেবের উচ্চমানের বর্ম অজ্ঞানের বান বিদ্ধ করতে পারেনি। অমন দরোর বর্ম সূঁদেব কর্ণকেও দিয়েছিলেন। বর্মটি তাই চুরি করে নিয়ে যেতে হয় স্বয়ং ইন্দ্রকে। পৌরাণিক চিত্র ও বিশেষ শব্দাবলীও বহুক্ষেত্রে অলৌকিকতা সৃষ্টিতে নয়া রসদ যোগান দিয়েছে। হুংখের বিষয় অতি সাম্প্রতিককালে ছাপা ও গুণীজন দ্বারা সম্পাদিত মহাত্মা কালীপ্রসন্নের মহাভারতেও (সাক্ষরতা প্রকাশন) কিরাতাজুন যুদ্ধের দৃশ্যটির সঙ্গে একটা ছবির ব্লক জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে যুদ্ধ বরাহকে একটা হুডঙ্গায় মেথরপট্টর শূকর বানিয়ে অজ্ঞানের পায়ের তলায় ফেলে রাখা হয়েছে। বিজ্ঞ সম্পাদকগণ এ বিষয়ে যথার্থ আপত্তি রাখতে পারতেন। (বনপর্ব, পৃ: ৪১ দ্র:)।

যদি কোথাও বলা হয়, মহাদেব অজ্ঞানের বাণগুলি অবলীলায় 'ভক্ষণ' করিলেন, তবে কি বুঝতে হবে অজ্ঞানের বাণ গিলে ফেললেন মহাদেব? যখন বল, শিশুটি উদ্ভাবনভাবে ঠাকুরদার গল্প গিলে খাচ্ছে, তখন কি আমরা বোঝাতে চাই; শিশু গল্প খায়? বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে পাওয়া যায়, সদাপ্রভু পয়গম্বরকে পুস্তক ভক্ষণ করতে দিলেন। ধরে নিতে হবে পয়গম্বর পুস্তকটি চিবিয়ে খেয়ে নিলেন? মাস্টার মশায় ছাত্রকে অল্প গুলে রাইয়েছেন বলা মানে তো আর অস্ত্রের সরবত পান করানো নয়। অসত্য পুঙ্খবহু হৃদয়ী দেহ লাভ্যা প্রায়ই গিলে খান। ট্রামে বাসে হৃদয়ীদের আশ্রয় বোধ করতে হয় প্রচুর। কিন্তু কোনো শিল্পী কি কোনোও হৃদয়ী খাদকের চিত্র এঁকে দেখাবেন হৃদয়ীকে কেমনভাবে গলধঃকরণ করা হয়? তাই প্রমাণকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করায় এসব বিপদেরই সম্ভাবনা। অস্ত্রের গোপাল হালদার যে কালীপ্রসন্ন-মহাভারতের প্রধান সম্পাদক মেথরপাট্টর শূকরটিকে ব্রাহ্মক দানব হিসেবে সেখানে কেমনভাবে চিত্রিত করা হয়? একই

(শেফালী ওষ্ঠা পৃষ্ঠায়)

জাতীয় আত্মনির্ভরতা প্রসঙ্গে

শ্রীকান্ত বসুরায়

ভারতে অর্থনীতির পরিভর্তন, উৎপাদন ব্যবস্থার উপর সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ, ভারতীয় কৃষি পুঁজির পরিভর্তন, সাম্রাজ্যবাদ—ভারতের বর্তমান অর্থনীতির রাজনৈতিক সঙ্কটের প্রধান কারণগুলোকে পরিষ্কার রূপে চিহ্নিত করতে না পারলে ভারতীয় সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের লাইন খুঁড়ে পাওয়া যাবে না, মুক্ত করা যাবে না। ভারতের জাতীয় অর্থনীতিকে, গড়ে উঠবে না ভারতীয় বিপ্লবের চালিকাশক্তিগুলি।

এ উৎপাদন ব্যবস্থায় বিদেশী নিয়ন্ত্রণের আকার প্রকার কি? ভারতে বিদেশী পুঁজির বিপুল বিনিয়োগ (২০০০ কোটি টাকা), নিরুপায় ক্ষণস্থায়ী রপ্তানিনিতি, প্রায় বাধ্যতামূলক (অর্থনৈতিক-অর্থ) রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন, ভারতে নিযুক্ত বিদেশী পুঁজির তৃতীয় বিশ্বের বাজারে জালবিত্তারের ঘাঁটি নির্মাণ, ভারতের সীমাহীন কৃষিসঙ্কট, জলজ-জলজ-উদ্ভিদ-বনজ ব্যবজীয় পণ্যের ও কাঁচামালের সঙ্কট বিদেশ-বাজা, আন্তর্জাতিক বাজারের সন্তাপণ্য সরবরাহের কারখানারূপে ভারতের পরিণতি লাভ—এ সমস্তই ভারতের অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার সাম্রাজ্যবাদী কিনারা ক্যাপিটালের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার এক একটি দিক; যথাস্থক আমদানী, রপ্তান্য রপ্তানী ও হস্ত রপ্তানী (distress sale এর মত distress export) নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করার পথ।

আর ভারতীয় শাসক বুর্জোয়ার অর্থনীতির পরিভর্তন? এর নিদর্শন—ভুলো ভারতে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগের পক্ষে শাসকশ্রেণীর আত্মসত্য, ভিত্তি, গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক মহাজনী ঋণের (১৫,০০০ কোটি টাকা) গাঁটছটা, যথাস্থক আমদানীনিতিতে, রপ্তানী-মুখী শিল্পায়নে ও বৈদেশিক সাহায্যের প্রত্যাশামুখী পরিকল্পনাগুলিতে নয়রূপে পরিণতি।

আর এতেন অর্থনীতির সাম্রাজ্যবাদবাদ যুক্তিসঙ্গত কারণেই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল হয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে বিনিয়োগ বিস্তার করতে আগ্রহী, এবং নয়া আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার (New World Order) মারফৎ বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পুনর্বিভাগের মধ্যে নিতুন জীবনলাভে (New lease of life) অভিজাতী।

রাজশক্তি ও রাজরক্ত

“দেশের উন্নতিকল্পে” ধনতান্ত্রিক শাসকের “আত্মক সমাজ” অর্থাৎ শাসক-

দলগুলো একটি অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার আশ্রমে দীক্ষিত একটা অসংকেতই বোঝেন; আবার সঙ্কটকালে বুদ্ধিমানেরা ঠাইল বোল-চাল পালটায়, একথাও হবিদিত। একই দেহের ভান ও বাহ্যিক একই জীবননীতির প্রহরা ও প্রহারকার্বে (Defence and Offence) নিযুক্ত থাকে। তাইতো, স্বপ্নস্তির পথে স্বপ্নস্তির পাননা, ‘পরিভর্তন’ পথে ‘নির্ভরতা’র আদর্শ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের ‘এটো হুঁকায় দম মেরে সমাজবাদের খুঁয়ো ফুঁকার’—এর একই ‘মাইট্রাবে’ কংগ্রেস ও জনতা দল উভয়েই একই মন্ত্রপাঠ করে চলেতে হয়।

কিন্তু শ্রেণীগণতন্ত্রের আত্মবে জন্মসাধারণ সঠিক বিচার ও কাজ করতে পারে না, তাই অপরাধকে, দাঁতবান হয়ে থাকে। এ একরকম বাহ্যিক হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে টাণের পাঁজর গিয়ে পড়া কিংবা বাস্কটের হাত থেকে ঘোঁস সব হাতে।

বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনীতিতে মালিকেরাষ্ট্র প্রভু থাকে, জনগণকে শুধু জগদীশ পালটানোর কাজটা করতে দেয়া হয়ে থাকে অর্থাৎ বাস থেকে টায়, বাস্কট থেকে শোকাঙ্গ, আবার খোকাঙ্গ থেকে বাস্কট—পেন্ডুলামের (pendulum) গণতন্ত্র।

“ভাতে সুগ্রীব দৌসর”

অর্থনীতির মারফৎ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও, রাজনীতির মারফৎ অর্থনৈতিক প্রভাববৃদ্ধির এ সমস্ত উৎপাদন-ভুলোকে ও অজ্ঞান নর্য বাস্তবকে আড়াল করে যে সমস্ত অন্ধকারী পানি-বুর্জোয়া দলগুলি অর্থনীতিবাদকে মার্কসবাদ ও রাষ্ট্রীয় পুঁজির সন্ত্র-

সারণকে ‘সমাজতন্ত্রের সকারপথ’ হিসেবে জেনে বসে আছে তারা বলে না যে, এ ত পৃথিবীর কোথাও নেই; তারা বলে না যে, এক-বেশী সংখ্যক দেশের কাছে এত বেশী নির্ভরশীল দেশ ভারতের বাইরে পৃথিবীর কোথাও নেই; তারা মানে না যে, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি (ইঙ্গ-মার্কিন-রুশ সহ) কায়মী স্বার্থ এ দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে অঁড়িত হয়ে একদিকে ভারতীয় উৎপাদন শক্তিগুলোকে পঙ্গু করে রেখে দিয়েছে এবং অপরদিকে ভারতের অর্থনীতি রাজনীতিতে রাজনৈতিক উপাদানের অস্থপ্রবেশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করে চলেছে ও সাম্রাজ্যবাদী প্রাণভাগগুলোকে উৎসাহিত করে চলেছে। আরও জানি ভারতের অর্থনীতির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বন্ধ নিত্যস্থায়ী বাহ্যিক

ময়; আরও জানি, ভারতীয় উৎপাদন শক্তিগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বন্ধ ভারতের অর্থনীতিতেও ছড়িয়ে আছে। তাই, একটু ভিন্ন ভঙ্গীতে হলও ভারতীয় জনগণের ঐতিহাসিক বিকাশের পথে শোষণ-বাদীরাও এক জটিল বিপত্তির সৃষ্টি করে চলেছে। এ অর্থনীতি ও এ উৎপাদন ব্যবস্থার মিহিত ঐতিহাসিক বন্ধগুলোকে, এ সর্বের রাজনৈতিক উপাদান ও দিক ও লোকে এরা তথ্যমাত্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের ব্যাখ্যায় উপস্থাপিত করে; বর্তমান বুঁদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির শক্তিগুলির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বৈত ভূমিকাকে এরা বেয়াল বুঁদী মাকিস পুথ পুথ করে দেখতে ও দেখতে অভ্যস্ত। তাই ঐতিহাসিক বন্ধগুলো সমাজতন্ত্রের দায়িত্ববোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে এরা শাসকশ্রেণী ও শাসকদলগুলোর কাছে মানা বজা ও বিভ্রান্তিকর আত্মপোশ করে ‘নির্ভর জাতীয় অর্থনীতি’র স্বপ্ন দেখে ও দেখায়। বিপদ এই যে, আমাদের পানিবুর্জোয়া শোষণবাদী ঋণাভুলো নানা বিপ্লবী রাজনীতির ছদ্মবেশে যে অর্থনীতিবাদ ও রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদকে মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের পোষকে বাজারে বিক্রী করতে প্রাণান্ত হচ্ছে, চেটরের পর চেটে তুলে তারা কিন্তু জনসমাজে বিভ্রান্তি ও বিকৃতির সংক্রমণ ছড়াতে এখনও বানিকটা সক্ষম।

রাজনৈতিক হোম-রুল!

১৯৪৭ সালে ‘হোম-রুল’ (Home Rule) অধিকার প্রাপ্ত ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী নতুন রাজনৈতিক পরিবেশে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির উপর নির্ভরশীল হয়ে পর পর কয়েকটি পুঁজিবাদী পরিকল্পনা মারফত এক নয়া এ-চেটিয়া পুঁজির জন্ম দেয়। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের এ সঙ্কটযুগে আত এ শক্তি বস্তাবতই আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের জটিল ও কুটিল পথে সামিল হয়ে ভারতের জনশক্তি ও জাতীয় সম্পদসমূহের শোষণ-নিষ্পেষণ-অগচরের এক নরকরাজ্য সৃষ্টি করে বিশ্বের বিশালতম বেকার-বাহিনীর এক বৃহত্তম কারাগার গড়ে তুলেছে। অভাবতই ‘মুক্ত হুনিয়া’র প্রায়-উল্লুৎ এ যুগযুগান্তে যাবতীয় আন্তর্জাতিক মুনাফাশিকারী শক্তিগুলি পারস্পরিক সহযোগিতা-প্রতিযোগিতার ঘন্থে সঞ্চার হয়ে ভারতের অর্থনৈতিক

১৯৪৭ সালে ‘হোম-রুল’ (Home Rule) অধিকার প্রাপ্ত ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী নতুন রাজনৈতিক পরিবেশে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির উপর নির্ভরশীল হয়ে পর পর কয়েকটি পুঁজিবাদী পরিকল্পনা মারফত এক নয়া এ-চেটিয়া পুঁজির জন্ম দেয়। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের এ সঙ্কটযুগে আত এ শক্তি বস্তাবতই আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের জটিল ও কুটিল পথে সামিল হয়ে ভারতের জনশক্তি ও জাতীয় সম্পদসমূহের শোষণ-নিষ্পেষণ-অগচরের এক নরকরাজ্য সৃষ্টি করে বিশ্বের বিশালতম বেকার-বাহিনীর এক বৃহত্তম কারাগার গড়ে তুলেছে। অভাবতই ‘মুক্ত হুনিয়া’র প্রায়-উল্লুৎ এ যুগযুগান্তে যাবতীয় আন্তর্জাতিক মুনাফাশিকারী শক্তিগুলি পারস্পরিক সহযোগিতা-প্রতিযোগিতার ঘন্থে সঞ্চার হয়ে ভারতের অর্থনৈতিক

এতো হলো হোম-রুলের অবদান— অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক মহাসঙ্কটের সমস্ত। কিন্তু মুক্তির উপায়? শোষণবাদী চালাকী বা অর্থনীতিবাদের অঙ্কুর গলিপথে? কিংবা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের (State Capitalism)

ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বের জটিলতম সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে।

তাই ভারতে বিদেশী পুঁজির বারে গর্তে গিয়ে শেষ হয়েছে। মুক্তি পে ১৯৪৭-পূর্ব বিনিয়োগ (২২৫ কোটি টাকা) ও পরবর্তী বিনিয়োগ (রুশ রাষ্ট্রীয় পুঁজি সহ অনুমান ১০০০ কোটি টাকা), চলতি আমদানী ও রপ্তানী নীতিগুলি, বৈদেশিক মহাজনী ঋণের প্রত্যাশামুখী ‘পরিকল্পনাগুলি’, আরও নতুন নতুন বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ কামনা ও ভারতীয় নয়া-এ-চেটিয়া পুঁজির বিদেশ-অভিযানের সাধ— ভারতে পুঁজিবাদী নিষ্পেষণের ইতিহাসে এ ‘স্বস্ত শোষণ-ভেৎকারের’ দিকগুলি ও জটিল যোগাযোগগুলি একে অপরকে থেকে উদ্ধৃত, অতএব পরস্পর অবিচ্ছেদ্য এবং এক জটিলতম অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সঙ্কটে এগুলি পরস্পরের পরিপূরক।

ভারতে উৎপাদন ব্যবস্থার একাধিক সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক (অতএব রাজনৈতিক) উপাদান রয়েছে, তা অনবীক্ষ্য। ভারতীয় জনগণের জনস্বার্থের বিরোধী এ পুঁজিবাদী যথার্থ বিপ্লব না করে জনগণের কোমল-অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, কোনও কর্মসূচী, কোনও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে হতে পারে না। এ সমস্ত কতখনি? প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় পুঁজিবাদের বিকাশের () ঐতিহাসিকে পর্যালোচনা করলে এ সিদ্ধান্তে আপত্তি হয় যে, এরূপ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ভারতে পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার চালিকাশক্তির ভূমিকায় রয়েছে, অতএব ভারতীয় সমাজবিপ্লবের বিপক্ষে ভারতের শাসকশ্রেণী ও এর চালিকাশক্তিগুলির এরূপ জটিল মোচা বিভ্রাস এত যৌথ ষ্ট্রাটেজী রচনা করে ভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক বিপ্লবকে এক কঠিনতম চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। অবশ্যই এ জটিল মোচা বিভ্রাসের মধ্যেও ইঙ্গ-মার্কিন, পশ্চিমী-রুশ ইত্যাদি দলগুলো যেমন রয়েছে তেমনি ভারতীয় ও অজ্ঞাত পুঁজির মধ্যকার অপরিণত ঘন্টিও রয়েছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যের শেষ লড়াইয়ের এ যুগে যখন গোটা তৃতীয় বিশ্ব অস্থির পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে, তখন কোন বুর্জোয়া-রাজনীতি এ ষ্ট্রাটেজীর ছক থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না; বরং এখন সমস্ত বুর্জোয়াশক্তিই নানা ভঙ্গীতে এক অভূতপূর্ব একো জোট বেঁধে আছে।

এতো হলো হোম-রুলের অবদান— অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক মহাসঙ্কটের সমস্ত। কিন্তু মুক্তির উপায়? শোষণবাদী চালাকী বা অর্থনীতিবাদের অঙ্কুর গলিপথে? কিংবা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের (State Capitalism)

আমলাভিত্তিক বুর্জোয়াশাহীর পথে? না; এ শরভানের চলার পথ, একে-তো দূরের কথা, এতটুকু ‘রিলিফ’ও কোনও আশা নেই। তাহলে? মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পথ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিভর্তন-পথ।

“দি লাইন”

“The line is the key-link, once it is grasped, everything will fall into place—”

(Mao Tse Tung).

এ সম্পর্কে এখানে দুইেকটা কথাই উল্লেখ প্রয়োজন।

সমসাময়িক ইতিহাসে পণ্ডিত প্রকৃতিকে অলঙ্ঘ্য রেখে দিয়ে কোনও কাণ্ডজানসম্পন্ন দিকনির্দেশ করা যায় না। অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতার প্রসঙ্গে যে সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্তা রয়েছে, ঐতিহাসিক ঘন্টের ও বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতির বিশ্লেষণে তাদের চিনে নিতে হয়। মুম্বু পুঁজিবাদ ‘সব ঠিক-ছার’ ভাব সব সময়েই দেখায়। তাই বিদ্রোহ পুঁজিবাদের সর্বশেষ স্রোতানগুলো—‘বিশ্ব-অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা (World Economic order) এবং ‘অর্থনৈতিক যুক্তকমিশন’ (Joint Economic Council বা Joint Commission) ইত্যাদি ব্যাপারগুলোকে বিশ্বপরিষদের পটভূমিকায় দেখতে হয়। তারই পাশাপাশি তৃতীয় বিশ্বের কোন কোন রাষ্ট্রে যৌথ-নির্ভরতার ধ্যানটি; এ ‘Collective self reliance’ ধ্যানের লক্ষ্য কতটা যৌথ, কেমনভাবে যৌথ, কাদের কাছে যৌথ হতে পারে তাও তলিয়ে দেখতে হয়। পূর্ব-পশ্চিমের কিনারা ক্যাপিটালের রাজপ্রাসাদগুলিতে আজ জোট বাঁধার এত ছোটাছুটি লেগে গেলই বা কেন?

অবশি, দেহের মেদে কান্ড বিস্তার না থাকলেও পুঁজিবাদী সমাজে ‘মাংসভ্রায়’ একটি আভাবিক নিয়ম, বড়রা ছোটদের গিলে খেতে চায়—এ সত্যটিও ভুলে যাবার নয়।

আবার ঘোড়ার পিঠে ‘সওয়া’ হয়ে Joint Commission এর বড় বড় তরফগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে পোপন অভিসার চালাতে গিয়ে আর দড়ি কাঁটা ঘোঁরাতে গিয়ে ইতিহাসের এক অপরিণত নিয়মকেই আরও জটিল, আরও কঠিন করে তুলবেন তাও অবগতির সত্য।

অতএব, সংগ্রামের লাইন চার-দিকে ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে পড়ছে—আমরা একা নই। (তবে বুর্জোয়া (শোষণ ও ষ্ট্রাটায়)



ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

হুগলী জেলার খানাকুল স্বাস্থ্য কেন্দ্রের, মমতাজবাবুর অহরোধে আমি স্বামীর অসুস্থতা নিয়ে প্রসব হবার পব টিউবেকটিমি অপারেশনের জন্তে ভর্তি হই। কিন্তু ২৫/৮/৭৫ তারিখে অপারেশনের দিন হাসপাতালের ডাক্তার প্রফুল্লকুমার বসুত আমাকে অজ্ঞান না করে পেটে ইনজেকশন দিয়ে তলপেট কাটেন। আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করে বাধা দিতে শুরু করলে অল্প সরকাবী কর্মীরা (ভানীনায়ক, কুশিয়া, কানাই-লাল দাস, বিধুভূষণ মাঝি, হুসে-খামাস) আমাকে জোরপূর্বক চেপে ধরেন। এই ধস্তাধস্তির পর একজন স্বাস্থ্যকর্মী (মাঝিবাবু) আমার নাকে ওষুধ দিয়ে চেপে ধরলে আমি জ্ঞান হারাই।

এই ঘটনার ১৪ মাস পরে আমি অনুভব করি যে, আমি অসুস্থ। আমি ঐ ডাক্তারের কাছে গেলে বহু

অবহেলার পর উনি আমায় পরীক্ষা করে বলেন “ও কিছু না।” ডাক্তার-বাবুর কাছে বারবার গিয়ে মাহিত ও হয়রাণ হয়েছি, প্রতিকার পাইনি। এরপর অনেক দুঃখে আমি নিয়মিত কলকাতা মেডিকেল কলেজে যাতায়াত ও যোগাযোগে প্রায় এক হাজার টাকা খরচ করে জানতে পারি যে, আমি অসুস্থ। প্রকাশ্য তদন্ত করলে আমার মত শত শত অহেলিত রোগী পাওয়া বাবে, যারা টিউবেকটিমি অপারেশন করে ভুগছেন। আমি ক্ষতিগ্রস্ত চাই।

মীরা ঘোষ

গ্রাম : সোনাহাট, পো : রাজহাট
জেলা : হুগলী

রাজ্য বীমা তুলে দিন

বাধ্যতামূলক সঙ্কল্প প্রকল্পের মত কর্মচারী রাজ্যবীমা প্রকল্প তুলে দেওয়া হোক। কারণ এ প্রকল্পে

ওষুধ শিল্পের মালিকরা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মালিকদের জুলুম এদের মোনতে হচ্ছে।

যথাযথ নথিপত্র সহ ফেডারেশন প্রমাণ করতে পারে যে, সারা ভারতে ওষুধ শিল্পের উৎপাদন ও বিক্রি ব্যবস্থার ৮০ শতাংশ বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে রয়েছে। এইসব বহুজাতিক ও দেশীয় একচেটিয়া ওষুধ প্রতিষ্ঠানগুলি, অবাধে ডাক্তার, কে মট ও জনসাধারণের কাছে বহুল পরিমাণে নিম্নমানের ওষুধ বিক্রি করছে। এরা “সকলেই সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা বন্দোবস্তের আওতায় রয়েছে তাই, অবাধে মজুতদারী ও কালোবাজারী চালাচ্ছে এবং ‘নম্ন-মানের ও অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয়

ও অধিক লাভজনক ওষুধগুলো নানা উপায়ে বিক্রি করছে। ১৯৭০ সালে ওষুধের-মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী করে ওষুধের দাম কমানোর অনেক লক্ষ্য চণ্ডা কথা বলেও, এইসব ওষুধ কোম্পানীগুলোকে বিপুল পরিমাণে ওষুধের দাম বাড়াতো দেওয়া হয়েছে। এটা প্রমাণিত : যে, গত দু বছরের মধ্যে মোট ৬০% ওষুধের দাম ৫০% থেকে ২০০% বাড়ান হয়েছে। বিভিন্ন কায়দায় এইসব ওষুধ কোম্পানীগুলো শুধু জনসাধারণকেই প্রতারণা করেনি, সঙ্গে সঙ্গে সরকারকেও প্রতারণা ও বঞ্চিত করে এদের বে-আইনী লাভের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়ে গেছে।

মহাভারতের স্বর্গ ও দেবতা

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

ট্রাভিশন কি চিরকালই চলবে? মহাদেবের উদলা গায়ের চিজটিও ‘ক যথাযথ হয়েছে? যিনি বিমানে এসেছেন ও তাতেই প্রত্যাবর্তন করবেন তাঁর উদ্ধার নিরাবরণ থাকে কি করে? মহাদেব অজুনকেও স্বর্গে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন! ইন্ডের অহাকাশরথ অজুনকে নিতে এসেছিল। পাইলট মাতলি তখন অজুনকে সজ্জিত হয়ে তৈরী হতে বলেন। মহাকাশ গমনে বিশেষ সজ্জার তো দরকারই। কিন্তু আমরা অনারতদেহী দেবতারই ছবি মূর্তির সঙ্গে পরিচিত।

হতে পারে এই পৃথিবীতে নেমে গরমের চোটে তাঁরা তাঁদের দেহাবরণ খুলে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাই বলে উলঙ্গ হয়ে ঘুরতেন না নন্দর। গ্রীসীয় শিল্পী তাঁদের একেবারেই নিরাবরণ করেছে। এর কারণ কি এই, শিল্পী তাঁর আপন শিল্পরীতির প্রয়োগ করেছেন এবং তৎকালীন পরিবেশে যে যেমন পোষাক দেখেছেন, একেওছেন তেমনটি?

(চলবে)

কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীর জ্ঞান গত ১৬ই মে থেকে হুগলী, চুচুড়া ও ব্যাঙল অঞ্চলের হাজার হাজার বীমাকারী শ্রমিক কর্মচারীর হয়রানি চরমে উঠেছে। গত ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৭৬ সালের চার পৃষ্ঠা ব্যাপী সাকুল্যাব যা ১৬ই মে ১৯৭৭ সালে কৈলাসনগর, ব্যাঙল, জেলা হুগলীর কর্মচারী রাজ্যবীমা ঔষধালয়ে পাঠানো হয়েছে, তাতে জানানো হয়েছে যে এনং জ্ঞান অর্থাৎ বাশ-বেড়িয়া অঞ্চল ছাড়া অন্য কোন জ্ঞানের বীমাকারীদের ওষুধ দেওয়া চলবে না। এমন কি ব্যাঙল, হুগলী চুচুড়া প্রভৃতি এলাকা যেখানে কর্মচারী রাজ্যবীমা অফিস রয়েছে সেই এলাকার রোগীদেরও নয়। তাদের চন্দননগর শ্রীরামপুর, কলকাতা থেকে ওষুধ নিতে হবে।

শ্রীধর দেবসরকার

একই দোষে দোষী

গত ৩রা জুন সংখ্যার “দর্পণ” পত্রিকায় শ্রমশক্তির বিশ্বাসের “সারা রাজ্যে নির্বাচনী হাওয়া, এবার সি, পি, এমের পক্ষে” লেখাটা পড়ে আনন্দবাজার পত্রিকার একটা কুৎসিত রূপ আমাদের চোখে সামনে ফুটে উঠলো। লেখক আনন্দবাজার পত্রিকাকে “বেশারূপে” চিহ্নিত করেছেন। একজন রাজনৈতিক লেখকের লেখায় এ রকম অরাজনৈতিক বা কুৎসিত কথার প্রয়োগ একজন রাজনীতি সচেতন মানুষ হিসেবে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। এই লেখাতে আবার দেখতে পাচ্ছি যে লেখক কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর অহু-গামীদের দ্বারা খবরের কাগজ জালানোর সমালোচনা করেছেন। কি কারণে করেছেন, না রাজনৈতিক নেতা বলে পরিচিত ব্যক্তির অহু-গামীরা চরম অরাজনৈতিক ভাবে সংবাদপত্রের ওপর আক্রমণ করেছে বলে। এর কোন প্রতিবাদ না করার জ্ঞাতও প্রিয় দাসমুন্সী যে কতবড় রাজনৈতিক নেতা তার প্রমাণ পাওয়া

গেল। কানেই যে দোষে আমরা প্রিয় দাসমুন্সী, অজিত পাণ্ডা প্রমুখের সমালোচনা করছি শ্রীশ্রমশক্তির বিশ্বাসকেও সেই দোষে দোষী করতে পারি।

স্বরত-মুখোপাধ্যায়

গুণীদের অত্যাচার

৩রা জুন সংখ্যার দর্পণে “আর্জব ঘটনা” পড়ে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা সাধারণ নাগরিক হিসাবে বলছি শব্দ বলে (কংগ্রেসী

জাতীয় আত্মনির্ভরতা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

মস্তিষ্ক প্রস্তুত “Collective self reliance” এর লাইন অবজই আড়ম্বরভেদে লব পেতে বসেছে।

ডাঃ মজুমদার “আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন” নীতি (Doctrine of International Division of Labour) ও “নব্যশিল্পীত্বের নব্য-আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা (New Economic order)”-র আদর্শ-ভাষ্যনা জালাদা হলেও হাল-চাল যদি একটু চর, আর “বৌদ্ধ আত্মনির্ভরতা” যদি “ধনতান্ত্রিক কো-অপারেটিভ” চর, তাহলে এ দুইদিকের পৃথিবীময়নের যে ব্যবস্থা থাকছে, সমগ্র মানবজাতির বিরুদ্ধে সে মৃত্যু পরোয়ানার জবাব কি এবং কাহা দেবে?

এর উত্তর অর্থনীতির বিনিময় (Economic Base) ও উৎপাদন শক্তিশক্তির মধ্যে ঘুঁষতে হবে।

দেশের সমস্ত সম্পদ ও উৎপাদন শক্তিশক্তির সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবহারিক সংযোগে জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থার যে কাঠামো সৃষ্টি হয়, তাকে অভিজ্ঞতার পথে সংগঠিত ও ক্রমাগত উন্নত করেই আত্মনির্ভর জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলা যায়।

ইতিহাস অবশ্যই এ দাবি চরিত করেছে, তৃতীয় বিশ্বের আগ্রস্ত জনগণের উপর, উপায় একমাত্র স্বনির্ভর জাতীয় অর্থনীতি। স্বনির্ভর জাতীয় অর্থনীতি কোনও জাতীয়তাবাদী বা “বিচ্ছিন্নতাবাদী” অর্থনীতি নয়, যেমন জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ কোনও জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ নয়।

অর্থনীতি বা উৎপাদন ব্যবস্থা আত্মনির্ভর না হলে যাদের সর্বনাশ হয়, তারা হলো জনগণ; আর এ অবস্থায় যা কিছু কায়দা হতে পারে তা-সে যতই সীমাবদ্ধ হোক—তা উঠান একমাত্র দেশী একচেটিয়া (নব্য-একচেটিয়া সমাজ), বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা, বড় বড় সন্তোষগেরা আর একশ্রেণীর ভাগ্যাবধারী যাদের জাতীয় চরিত্র লোপ পেয়েছে। বিপণীত অবস্থায়, অর্থনীতি আত্মনির্ভর হলে জনগণের ও উৎপাদনের বিকাশ হয়

গুণী বলে পরিচিত) ছেলেটা ছেলেদের এবং মেয়েদের উপর যে রকুম অত্যাচার, অত্যাচার, ছিনতাই দিনের পর দিন চালিয়ে যাচ্ছে তা বলবার নয়। শব্দর জ্ঞান কোন মেয়ে সন্ধ্যার পর রাত্তার বেরতে পারে না। পুলিশের কাছে বহু রিপোর্ট করা সত্ত্বেও কোন প্রতিকার হয় নি, বহু কেস পুলিশের খাতায় আছে।

রমেন ঘোষ

নিতাই চাটাজী

বিজয় লাভ ঘটে—সংসদবাদী সম্প্র-সারণবাদী ও অস্বাস্থ্য গণবিবোধী শক্তি-গুলির ভরাডুবি পথে। বস্তুতঃ এ কাজের রূপাংগ জনগণের এক হুঁচকায় ও হুমহান ভাবন সংগ্রাম, এ প্রেরণায় উৎসাহ তই একমাত্র জনগণ, আর কেউ নয়। অতএব, মুম্বাফাজ ও ধড়িবাঙ্কদের ধ্বংস থেকে উৎপাদন ব্যবস্থাকে মুক্ত করে জনগণের অর্থনীতি গড়ে তোলা জাতীয় জনগণের—এবং একমাত্র জনগণেরই—এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব—এ ভূমিকা আর কারো নয়।

প্রিয়বর, সে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক হোক, আর অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক হোক—উৎস একমাত্র জনগণ; গণসংগঠন তার শক্তি। নিজেদের উৎপাদন ও সম্পদগুলিই তার মূল স্বয়ং। এ উৎস এ শক্তি ও এ স্বয়ংকে বজা করেই মালিকপ্রাণ ও তাদের কড়েরা বাধ্য-তাগত শ্রম-মজুর ও বাধ্যতামূলক-বৈতার সমাজ সৃষ্টি করে। তাই মালিকপ্রাণীরা এ কারাগারগুলোকে জনগণের দুর্গে রূপান্তর করা জনগণের এক ঐতিহাসিক প্রত্যঙ্গ কাজ ও দায়িত্ব।

নব্য-উপনিবেশবাদী ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশক্তির শোষণের চানে রক্তহীন তৃতীয় বিশ্বের জাতিগুলির বিপ্লব জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব; এ বিপ্লবের তাৎপর্য ‘সর্বভাষা নেতৃত্বে স্বনির্ভরতার পথে দেশ গঠন’ যথোপায় উপরোক্ত ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে হবে।

বিপ্লবের পরিস্থিতি আত্ম চমৎকার, বিপ্লব আরও বিপ্লবের সৃষ্টি করবে। ঐতিহাসিক চন্দ্রবাদের বিচারে মৃত্যু-মণ্ডে দণ্ডিত নয়-উপনিবেশবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও দেশে দেশে তাদের কুহুরেরা নিজেদের মর্কামারা চোঁচাটগুলোকে ঢাকবার মত অস্বস্তিকার ঝুঁকি পাচ্ছে না। তাদের টলার-মান ইমারতগুলো আর আত্মনাগুলো মত পলস্তারা সত্ত্বেও আর টিকে থাকছে না; বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ ও বনতন্ত্র আপনা থেকেই ভেঙে পড়বে। এরূপ যারা ভাবেন তাদের জানা উচিত, স্বাধীনতা মারলে তারা আত্ম-বলটাও ভেঙে পড়ে না। সমস্তরকমের সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের কুহুরদের শেষ শয্যা একই পথে, একই ঘাটে।

এভাবে স্বনির্ভরতার পথে দেশ গঠনের আদর্শ অবস্থায় “জাতীয়” দেখালেও নির্বাসে আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক প্রগতিই রাজনৈতিক—আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিপ্লবের অন্তর্ভুক্ত দুর্গ ও প্রগতি-আক্রমণের শিবির। (চলবে)

ব্রিগেড ময়দানের সমাবেশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মালিক শ্রমিক বিরোধ যেখানেই দেখা দেবে সেখানেই আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হবে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার, কিন্তু শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে মালিকপক্ষকে। মুখ্যমন্ত্রী প্রবাস্ত্রক কঠে বলেন, কাগজে লেখা হয় যে এই রাজ্যে শ্রমিকরা নাকি রোজই ধর্মঘট করছেন। জ্যোতিবাবু দৃঢ়ভাবে এর জবাব দিয়ে বলেন যে, শ্রমিক সমাজ ইচ্ছে করে ধর্মঘটের পথে পা বাড়ান না। সমস্ত আলাপ আলোচনা যখন ব্যর্থ হয়ে যায়, নিষ্পত্তির সমস্ত পথ যখন রুদ্ধ হয় একমাত্র তখনই শ্রমিকরা বাধ্য হন ধর্মঘট করতে এবং এটা তাদের পবিত্র অধিকার। আমরা বলবো শ্রমিকরা যেন জীবনে দিয়েও সেই অধিকার রক্ষা করেন। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, শ্রমিক কৃষকের আন্দোলন কিংবা গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের জন্য আমরা পুলিশ পাঠাবো না। কৃষকদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, খেতমজুর ভাগচাষী এবং গরীব কৃষকদের হৃদয় বর্ণনা করা যায় না। বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার এই অবস্থার অবসান ঘটানোর সর্বকম চেষ্টা করবে। তিনি বলেন, গ্রামে সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরী পর্যন্ত কৃষিশ্রমিকদের দেওয়া হয় না। আমরা চেষ্টা করবো এই অরাজকতা বন্ধ করতে।

ছাত্র যুব প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা সরকার গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে নানাদিকে নানা কামেলা সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে। ছাত্রদের পরীক্ষা দিতে দেওয়া হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনেক ছাত্র রোজই আমাকে ফোন করে বলছেন যে তারা পরীক্ষা দিতে চান এবং তার বেন বধ্যবধ ব্যবস্থা আমরা করি। এই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে হবে। কোন ছাত্র যদি পরীক্ষা না দেওয়াটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার বলে মনে করে তবে তাকে বাড়ীতে বসে থাকতে হবে, কিন্তু সে যদি পরীক্ষা দানে ইচ্ছুক ছাত্রদের বাধা দেয় তবে কঠোরভাবে আমরা তার নোকাবিলা করবো। বিভ্রান্ত যুব সমাজের কথা তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছাত্র যুবসমাজকে দোষ দিয়েছি হবে সিলেবাসের ঠিক নেই, পরীক্ষার কল বছর ঘুরে গেলেও প্রকাশিত হয় না—ছাত্রদের ভবিষ্যতো, কংগ্রেস সরকার অন্ধকারের অতলে ডুবিয়ে দিয়ে গেছে। যুবসমাজের মধ্যে ওরা সর্বকর্মের উচ্ছৃঙ্খলতার অঙ্গপ্রবেশ ঘটিয়েছে এবং গোটা যুবসমাজকে

বিপথে টেনে নিয়ে এদের সর্বনাশ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সব যুবকদের সংপথে পরিচালনার চেষ্টা আমাদের অবশ্যই করতে হবে। এরা সমাজবিরোধী হলেও এদের আমরা বলি নিজেরাই যেন সংশোধিত হয়। কিন্তু, ওরা যদি আবার কংগ্রেসী নেতা এবং প্রতিক্রিয়ামূলক চক্রের জীভনক হয়ে হাকিমা সৃষ্টির চেষ্টা করে তবে বামপন্থী সরকার এদের রেহাই দেবে না। জ্যোতিবাবু রাজ্যে প্রকট বেকার সমস্যা উল্লেখ করে বলেন যে, কংগ্রেস সরকার বছরের পর বছর বেকার সংখ্যা বাড়িয়ে গেছে। সিদ্ধার্থ রায় আমাদের দিয়ে গেছে শূন্য কোষাগার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিরাট সমস্যা, চতুর্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়েও আমরা সরকার গঠনে ভরসা পেয়েছি যেহেতু জনগণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, ভালবাসা ও আস্থা আমরা পেয়েছি।

কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সম্পর্ক কি হবে—এই প্রশ্নের জবাব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, আমরা তৌবারবার বলেছি যে কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত জনতা পার্টির সরকারের প্রতি বামপন্থী ফ্রন্ট বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব পোষণ করে। কেন্দ্রে আমাদের পার্টি জনতা পার্টির সঙ্গে মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণ না করলেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি দলের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা আছে। এখানেও আমরা তাই করবো, কিন্তু প্রয়োজন বোধে সমালোচনা করার অধিকারও আমাদের থাকবে। কেন্দ্র যদি জনস্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করে আমরা অবশ্যই তার প্রতিবাদ করবো—সেটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। জ্যোতিবাবুর শেষ কথা, আমরা এমন কথা বলবো না যে, বর্তমান সামাজিক কাঠামো আমরা পার্টে দিতে পারবো। এই দেশের ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কাঠামোর আমূল পরিবর্তন রাতারাতি সম্ভব নয়। তবু সীমিত ক্ষমতা নিয়েও যত বেশী সম্ভব ভাল কাজ আমরা করতে পারবো যদি জনগণ আমাদের সঙ্গে থাকেন। ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা অণোক ঘোষ বলেন, গণতন্ত্রের শত্রুরা নিশ্চিৎ হয়ে যায় নি। ওরা সচেষ্ট থাকবে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারকে নায়েবাল করতে, কিন্তু জনগণ যদি সম্মাগ থাকেন তবে সব চক্রান্ত ব্যর্থ হচ্ছে বাধ্য। অশোকবাবু বলেন, ৭৭ সালের বামপন্থী ফ্রন্টের সঙ্গে ৬৭ এবং ৬৯ সালের যুক্তফ্রন্টের তফাৎ এইখানে যে, এবারের বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারে অঙ্গমুখ্যমন্ত্রীর মত লোক অঙ্গুপস্থিত এবং এবারের বামপন্থী

ত্রিকো ফাটল ধরানো যাবে না।

আর, এস, পি, নেতা নিখিল হাস আবেগমণ্ডিত কণ্ঠে বলেন, আজ থেকে ছুবছর আগে ২৫শে জুন রাতের অন্ধকারে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার দ্বিতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন এবং ছুবছর আগে এই ২৬শে জুন থেকেই শুরু হয়েছিল নির্বিচারে গ্রেপ্তার, সংবাদপত্রের কঠোর ইত্যাদি। কিন্তু ছুবছর পর এই ২৬শে জুন তারিখেই পশ্চিম বাংলার সংগ্রামী মানুষ ইন্দিরা গান্ধীকে সম্পূর্ণ নির্বাসনে পাঠিয়ে, তার কংগ্রেসকে সমূলে উৎপাটিত করে আজ সমবেত হয়েছেন, রাষ্ট্রমন্ত্রির আনন্দোৎসবে। কিন্তু, নিখিলবাবু বলেন, এই আনন্দ আনুতুষ্টিতে যেন পরিণত না হয়, কারণ এই বামফ্রন্ট সরকারকে ব্যর্থ করার সমস্ত ষড়যন্ত্র ক্রমে মাথা তুলবে। কয়েকদিন পর থেকেই কাগজওয়ালারা লিখতে শুরু করবে বামফ্রন্ট সরকার এটা করলো না, সেটা করলো না ইত্যাদি। তিনি বলেন, এই ফ্রন্ট সরকার গঠনের মধ্য দিয়েই শুরু হলো আসল লড়াই।

আর, সি, পি, আইর বিমলানন্দ মুখার্জী, মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের রাম চ্যাটার্জী এবং বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের আশীষ ভট্টাচার্যও ভাষণ দেন। সভাপতি প্রমোদ দাশগুপ্ত বক্তৃতা করেন নি।

শহীদ বেদীতে মাল্যদান

সভার প্রারম্ভেই ফ্রন্টের ছয়টি শরিকদলের পক্ষ থেকে প্রমোদ দাশগুপ্ত, নলিনী গুহ, মাখন পাল, হৃদয় মল্লিক চৌধুরী, সুধীন কুমার ও আশীষ ভট্টাচার্য শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে মাল্যদান করেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সভা সূরুর আগে গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় শাখা শহীদ রঞ্জন গোস্বামী অরণে একটি হৃদয়স্পর্শী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সভার শুরুতে ১ মিনিট দাঁড়িয়ে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

মন্ত্রী পরিচিতি

বামপন্থী ফ্রন্ট যে শুধু অর্জিত শক্তিতে অনন্তসাধারণ তা নয়, ফ্রন্টের মন্ত্রীরা যে প্রথমে দলীয় কর্মী এবং পরে মন্ত্রী এবং মন্ত্রী হিসেবে তাদের আচার ও আচরণ তথা মর্যাদা যে দল ও ফ্রন্টের শৃংখলার উদ্ভে নয় সে কথাটি প্রমাণ করে বামপন্থী ফ্রন্ট নিজেদের সংহতিরও এক অসাধারণ নজির স্থাপন করলেন। সভাপতি প্রমোদ দাশগুপ্ত একে একে মন্ত্রীদের সমবেত শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট ডাকলেন, কিন্তু বলে দিলেন মন্ত্রীরা বেন যথেষ্ট জায়গা না থাকলে নীচে নেমে যান।

দেখা গেল অনেক মন্ত্রী নির্দেশমত নীচে নেমে এসেছেন। এমন দৃশ্য গত ৩০ বছরে অন্ততঃ অভাবনীয় ছিল। আরও যেটা লক্ষণীয় ছিল তা হচ্ছে এই যে, গোটা রাজ্য মন্ত্রিসভা ময়দানের সভায় এলেও ধারে কাছে ছিল না কোন পুলিশ বা উর্দী-পরা আদালতীর শোভা। ছিল না মন্ত্রীদের সরকারী গাড়ীর ভীড়। কোন দলীয় মন্ত্রীই ভি, আই, পি সঙ্গে আসেন নি। সবাই সাধারণভাবে ঘুরেছেন, কথা বলেছেন, হেসেছেন, বন্ধুদের হাত থেকে বাদাম কেড়ে খেয়েছেন।

মেডিকেল পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরে হুর্নীতিবাজ ছাত্রদের গুরুত্বপূর্ণ প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাকে বদলি এবং তার পদাবনতির নির্দেশ দেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই সব পেটোয়া মন্তানদের নির্দেশমত কলেজে কলেজে অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষদের বিনা অপরাধে পদাবনতি এবং বদলী, সাময়িক বরখাস্ত বা বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করান হয়েছে। এই সব মন্তানদের নির্দেশে অধ্যক্ষ ডাঃ অমল পাল, অধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ ব্যানার্জীকে অধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার এই সব মন্তানরা অধিকাংশ মেডিকেল ছাত্র, যারা সত্যিকারের পড়াশোনা করে পরীক্ষা দেয়, তাদের থেকে পরীক্ষায় ভাল কল করত। এ সমস্ত ব্যাপারে প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পেটোয়া কিছু অধ্যাপক (মুষ্টিমেয়) এই মন্তানদের মতত জোগাত।

এই সমস্ত মন্তানীর বিরুদ্ধে সাধারণ সং ছাত্ররা প্রতিবাদ করতে গেলে তাদের পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হতো। থিয়োরিটিক্যাল পরীক্ষার হলে অফিসার-ইন-চার্জকে কথায় কথায় অকথ্য গালাগাল এবং প্রাণনাশের হুমকী দেয়া হতো। পরীক্ষার হলে যারা পরীক্ষার্থী নয় তারা এবং এই সমস্ত গুণ্ডাদের সমর্থন করা অবাস্তব অঙ্গপ্রবেশ করত এবং পরীক্ষায় টোকাটুকিতে সাহায্য করত। পরীক্ষার হলগুলিতে চীৎকার চেঁচামেচির মধ্যে পরীক্ষা অহুষ্ঠিত হতো। অধিকাংশ ছাত্র যারা পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিত তাদের পক্ষে এই চীৎকার চেঁচামেচি এবং চোখের সামনে টোকাটুকির পরিবেশের মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা করে এম, বি, বি, এস, পরীক্ষার মত কঠিন পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ত। এই সমস্ত ব্যাপার সমগ্র মেডিকেল ছাত্র সমাজের মনে

হতাশার সৃষ্টি করেছে। তাদের ধারণা হয়েছে সংভাবে পরীক্ষা দিলে পরীক্ষায় পাশ করা কঠিন।

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ বামফ্রন্টকে বিধান সভায় বিপুল সংখ্যাগঠনতায় নির্বাচিত করেছেন। কিন্তু প্রতিক্রিয়ামূলক হাত গুটিয়ে বসে নেই। বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় করার প্রথম চক্রান্ত অহুষ্ঠিত হয়েছে ২১শে জুন এম, বি, বি, এস, পরীক্ষার প্রথম দিন। যারা প্রতদিন ছাত্র পরিষদ নেতা হিসাবে মন্তানী করত তারা রাতারাতি “স্টুডেন্টস ফেডারেশন জিম্মাবাদ”, “পরীক্ষাকেই পুলিশ রাখা চলবে না” প্রভৃতি জোগান দিতে থাকে। পুলিশ অ্যাডমিট কার্ড দেখিয়ে পরীক্ষা হলে ঢুকতে বলে। এই সব মন্তানরা তার প্রতিবাদ করতে থাকে। এক কলকাতা জ্ঞানানাল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ শিবেন লাহিড়ী (প্রাক্তন মন্ত্রীর অন্ততম পেটোয়া) এ ব্যাপারে এই সব গুণ্ডাশ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা হল থেকে পুলিশ সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে প্ররোচনা দেন এবং অফিসার-ইন-চার্জকে পুলিশ সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে বাধ্য করেন। এই সব মন্তানরা এই অধ্যাপকের নামে “গুরু গুরু” জোগান দেয়। এই গুণ্ডারা হলের সীট নম্বর ছিঁড়ে ফেলে যে যেখানে খুসি বসে পড়ে এবং অফিসার-ইন-চার্জ ও ইনভিজিলেটরদের অকথ্য গালাগাল দিতে থাকে। হে হট্টগোলের মধ্যে পরীক্ষা শুরু হয়। সাধারণ ছাত্ররা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে অধ্যাপক ছাত্রদের এ ব্যাপারে প্ররোচনা দেন এই সমস্ত মন্তানদের “গুরু” হয়ে তিনি জ্ঞানানাল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের যে পদটি খালি হয়েছে তাতে বসার দুঃস্বপ্ন দেখছেন। পরীক্ষা চলাকালীন লোড শেডিং হয়। এই সব ছাত্ররা বাতি কিনে পরীক্ষায় নকল চালিয়ে যেতে থাকে। আশ্চর্য্য ভোলে “যুক্তফ্রন্ট ফিরে এসেছে”। এটা পরিকল্পনা মালিক বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় করার চক্রান্ত। আমাদের পরিকার বন্ধব্য অধিকাংশ মেডিকেল ছাত্র পরীক্ষায় অসং উপায় অবলম্বন করতে চান না। এই মুষ্টিমেয় গুণ্ডা ছাত্র এবং স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয় অধ্যাপকের জন্ত অধিকাংশ মেডিকেল ছাত্রদের পরীক্ষা বাতিলের মাগুল দিতে হচ্ছে। প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর চেলারা সমগ্র মেডিকেল ছাত্রদের মুখে চূপকালি লাগিয়ে দিয়েছে।

এবারের বিধানসভার প্রথম দিন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

২৪শে জুন যথারীতি তেজগড় বিলিতি চণ্ড সসজ্জিত হয়ে ওঠে বিধানসভা। কক্ষ। আগামী পাঁচ বছরের জন্য এতবড় রাজ্যের কোটি কোটি মানুষের দণ্ডমুগ্ধের বর্তা হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে সি, পি, এম. নেতা। জ্যোতি বস্ত্র নেতৃত্বে বামপন্থী ফ্রন্ট। স্বতন্ত্র বিধানসভার প্রবেশদ্বারে উৎসাহী এবং একই সঙ্গে চিত্তিত জনতার সমাগম। সভাকক্ষের অভ্যন্তরেও দর্শক আসন জনসমাগমে পরিপূর্ণ। স্পীকার নির্বাচন ও সভা শুরু করার নির্ধারিত সময় ছিল ১২টা ৩০ মি। কিন্তু সদস্যদের অনেকেই লম্বা নিতে বাকী থাকায় বেলা ১টা ২০মি পর্যন্ত অধিবেশনের কাল মূলতুণী রাখা হলো। বিরতির পর স্বাধীন পদ্ধতিতে শুরু হলো। অষ্টম বিধানসভার প্রথম অধিবেশনের কাল। স্পীকার প্রটম বিনয় চৌধুরী মঞ্চে উঠে এসে ঘোষণা করলেন যে, তিনি স্পীকার পদের জন্য তিনটি মনোনয়ন পেয়েছেন। তিনটি মনোনয়নই একই সমস্তর নামে অর্থাৎ শাহনুজাত থেকে নির্বাচিত সি, পি, এম, প্রার্থী সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ। অতএব হবিবুল্লাহ সাহেবকেই তিনি স্পীকার পদে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করলেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও বিরোধী দলের নেতা কালীকান্ত মৈত্র উঠে চলে গেলেন অষ্টম বিধান সভার সব নির্বাচিত স্পীকার সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ কাছে এবং তাঁকে আসন গ্রহণ অবধি সজ্জা হলেন।

প্রথম সংসদীয় জ্ঞানালেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান স্পীকারের গুরুত্ব ও ভূমিকার পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন ইন্দিরাশাহার রাজত্বকালে ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপরই শুধু আঘাত আসেনি সংসদের ভেতরেও সদস্যরা কোনরূপ গণতান্ত্রিক অধিকার পান নি। গণতন্ত্র নামে শুধু হয় প্রতারণা ও ছেড়াচার। অতএব সেই গণতন্ত্র শুধু প্রতিষ্ঠা করা নয়, সেই গণতন্ত্র যাতে সংক্ষিপ্ত থাকে এবং সম্প্রসারিত হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমরা চাই স্পীকার যাতে শুধু সরকার নয় সেই সঙ্গে স্বতন্ত্র সরকারও অধিকার রক্ষা করেন। বিরোধী দলের নেতা কালীকান্ত মৈত্র তাঁর নাতিনীর্ঘ ভাষণে এই ভাবে অর্ধাৎ মহাশয়ের কাছে

আবেদন রাখেন যে, সরকারের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলের সদস্যদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি যাতে তিনি দৃষ্টি রাখেন। কালীকান্তবাবুও উনিশ মাসের ভারতীয় অবস্থার বৈশাচারের তীব্র নিন্দা করেন।

অতঃপর শুরু হয় অধিবেশনের দ্বিতীয় অংক। অর্থাৎ কালীকান্ত মৈত্রের ভাষণের পর মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন ডাঃ ভয়নাল আগেনিন। কাপালিক নৃত্যের ডাঙা হাতে নিয়ে ভারতীয় অবস্থার ভিৎসাকে যথার্থ প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার। অত্যন্ত সঠিক ভাবেই চাঞ্চলিক থেকে শুরু হয়ে গেল বিভিন্ন কায়দায় বিজ্ঞপ। নির্লজ্জ জয়নাল ডাঃবাব পাঁচ মন, প্রাইজ পারার আসায় তিনিও শুরু করে দিলেন বীর বিক্রমে প্রতিরোধ। সঙ্গে সহযোগিতার ভূমিকায় সুনীতি চট্টোপাধ্যায় সচল জাতীয় কংগ্রেসী এম, এল, এম। এরপর আবার বামপন্থী সহ অজ্ঞাত বংগ্রেস বিরোধী সদস্যদের পাণ্টা আক্রমণ। গোরা লীগ সদস্য দেব-প্রকাশ রাই তাঁর বেশ শানিকরণের ভাষণে ইমারজেন্সী অবস্থার বংগ্রেসী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমালোচনার সময় রীতিমত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন—“দে কনসার্টেট দি হোল, কান্ট্রি ইনটু এ প্রিজন্স।” একে একে শুরু হয় অজ্ঞাত দলের সদস্যদেরও বক্তৃতা। আর, সি, পি, আই, নেতা বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় ধীরে ধীরে অধচ সংগ্রামী মেজাজের সঙ্গে ভারতীয় অবস্থার অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুগ্ম প্রদর্শন করেন এবং হৃদয় মানসিকতার সঙ্গে অত্যাচারীদের শাস্তের কল্যাণ প্রতিশ্রুতি দেন। এম, ইউ, সি, আই, দলের দেবপ্রসাদ সরকার এবং মুসলীম লীগের এ, কে, এম, হাসানুজ্জামান সরকারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এবং ভবিষ্যতে সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে রেখে চলার প্রতিশ্রুতি জানান যে তাঁদের বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর কিছুক্ষণ বিরতি এবং আবার অধিবেশন শুরু হয়। বিরতির পর আর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দেখা পাওয়া গেল না। আবেদন সাংবে অবস্থা বশবর্তন ভূত্বের জ্ঞান প্রতিরোধের বুলেটপ্রক ভ্যাকুই পরে যথারীতি সভাকক্ষে ফিরে আসেন। কিছুক্ষণ সভা চলার পর সভা আবার মূলতুণী থাকে। এই দফায় বিরতির পর শুরু হয় রাজ্যপালের ভাষণ। কাঁটার কাঁটার বেলা তিনটার রাজ্যপাল

স্পীকার সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ সঙ্গে শোভাযাত্রা সরকারে সভাকক্ষে প্রবেশ করেন। প্রবেশ ও প্রস্থান দুইটি মুহূর্তেই পুলিশ ব্যাণ্ডে জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। ২০ মিনিট বক্তৃতার মধ্য দিয়ে দুটে ঠাঠ, সরকার পক্ষের জনগণের প্রতি বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির মনোভাব। জনগণকে শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং জনজীবনে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনতে সরকার বদ্ধপরিকর। কালোবাজরা মুনাকাখোর, মফুতদার এবং ভেজাল-কাঠীদের শক্ত হাতে দমন করতেও

অবহেলিত ও বঞ্চিত দমকলের কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আপনারা রাস্তায় যেতে যেতে যখন দেবেন দমকলের গাড়ী চং চং ঘন্টা বাজিয়ে উল্লসে দৌড়ছে তখন আপনারা বুঝতে পারেন কোথাও আগুন লেগেছে আর কর্তব্য-পরায়ণ দমকল কর্মীরা সেই আগুন জ্বালেন না। এই দমকলের বর্তমান অবস্থা, আপনারা জানেন না। দমকল কর্মীরা কি অবস্থার মধ্যে কত ঘন্টা কাজ করেন, আপনারা এটাও জানেন না যে দমকল সরকারের সবচেয়ে অবহেলিত বিভাগ এবং সিন্ধার সরকারের আমলে এই বিভাগের যিনি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন সেই হুজুর মুখার্জী তাঁর অধীনস্থ তথ্য ও জনসংযোগ ইন্সপেক্টর ও কলকাতা পুরসভার মত এখানেও নিজের পেটোয়া লোকদেরই চাকরীতে ঢুকিয়েছেন। কিন্তু এই অবহেলিত দমকল বাহিনীর প্রতি তাঁর কোন নজর ছিল না।

এখানকার কর্মীদের খুবই মজার কথা। মতো সংখ্যা যা খানস উচিত্ততা নেই বলে তাঁদের একটানা বাণী ঘন্টা কাজ করতে হয়। এতে বাড়তি টাকা মিললেও কর্মক্ষমতা বজাবতই হ্রাস পায়। বর্তমানে দুই শিফটে কাজ হয়। তিন শিফট চালু করতে গেলে আরও দেড় হাজার কর্মী দরকার। তার মধ্যে বড় বড় বাড়তি এক কোটি টাকা খরচ। ওয়ার্কশপেও কর্মীর অভাব এবং মাস্কটি আমলের মেসিনপত্র, যার ফলে বড় সমস্যা কাগর ইঞ্জিন সারানো বা নতুন বডি তৈরির কাজ বাইরে দিতে হয়। কর্মীদের অনেক অভাব অভিযোগ। পূর্ব-ন

তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিক্ষা ব্যবস্থা সহ সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে শুল্ক ফিসিয়ে আনার ব্যাপারে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত আশাপ্রসন্ন। মন্ত্রিসভার আরও বক্তব্য নিবন্ধনতা দূর করার জন্য জনগণের সহযোগিতা সাপেক্ষ একটি বাস্তব ও ফলপ্রসূ কর্মসূচীকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পুস্তক ও ল্যাপটপ সরবরাহ করার এবং প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা খরচায় টিকিন দেওয়ার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

রাজ্যপালের বক্তব্যে আরও উল্লেখযোগ্য ঘোষণা হল যে, রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার সংবিধানের ৩৮ থেকে ৪২ অবধি সংশোধনগুলি বাতিল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে

সুপারিশ করবেন। ১৫শ শতকের এই ভাষণে প্রমিকদের বোনাস অধিকার পুত্রোপুত্রি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং ১৯৭৫ সালে সংশোধিত বোনাস আইন বাতিল করার জন্য অমরোব করার প্রস্তাব স্পষ্ট করে রাখা হয়। বাধ্যতামূলক জমা প্রকল্প বাতিল করা ও বকেয়া পাওনা ফেরত দেওয়া এবং জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা ও রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন ক্ষমতার অপব্যবহার নিরোধের জন্য সংবিধানের ৩৫২ থেকে ৩৫৬ ধারা সংশোধনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করবেন। শিল্পক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার সকল বৈধ কলকারখানা খোলার চেষ্টা করবেন এবং খেরালখুমিত লক-আউট, লে-অক, হাটাই বন্ধ করবেন।

মন্ত্রী ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে দেখা করার দিমক্ষণ ব্যবহার স্থির করেও শেষ মুহূর্তে অক্ষমতা জানিয়েছেন। কর্মীরা বলেছেন, আমাদের ডাইরেক্টর গত বছরে পাঁচবারের বেশি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি।

দমকলের উন্নতি বা কর্মীদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে হুজুর মুখার্জী মজর না দিলেও যেখানে নিজের দায় সেখানে ছিল শ্রেনদৃষ্টি। পেটোয়া ছেলেদের চাকরী দিয়ে তিনি ও তাঁর পি এ বালিদাস ভট্টাচার্য কত টাকা করেছেন তার হিসেব পাওয়া মুশ্কিল। তবে কলকাতা পুরসভা থেকে সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে, কারাগারজার বেড়েক ছেলেদের সেখানে চাকরী দেওয়া হয়েছে। দমকল বিভাগে তিনি তিনশো ছেলেদের ঢুকিয়েছেন। এইজন্য তিনি ফায়ার সার্ভিসের ডাইরেক্টর স্বহাস চ্যাটার্জী, কালিদাস ভট্টাচার্য ও অনন্ত ভারতীকে নিয়ে একটি কমিটি করে দিয়েছিলেন, যদিও ফায়ার সার্ভিসের যে আইন আছে তাতে ডাইরেক্টরই কর্মীচারা নিয়োগের সর্বময় কর্তা। পাছে কর্মচারী নিয়োগের সমস্ত নিয়ম কার্যন মনসে হুজুর লোকেরা চাকরী না পায় সেইজন্য এই কমিটি তৈরি করা হয়।

কলকাতা শহরের পরিধি বেড়েছে। নতুন নতুন বৃহৎ অট্টালিকা শহরকে ছেয়ে ফেলছে। কিন্তু আগুন থেকে কলকাতাকে বাঁচাবার পক্ষে যথোপযুক্ত সরঞ্জাম ও কর্মী নেই দমকল বিভাগে। সবমুঠে ২৫০টি পাম্প। তার মধ্যে ১২৫টা প্রায় সব সময়ই অকেজো। অর্থাৎ পুরনো মডেলের এই সব পাম্প জোড়াতালি দিয়ে আর চালানো যাচ্ছে না। তাই এগুলোকে বদল করে সব-

মুঠ ৪০০টি পাম্প মজুত করলে অগ্নি নির্বাপনের কাজ তৃপ্তভাবে চলতে পারে। গত পাঁচ বছরে এই ব্যাপারে মন্ত্রীকে ডাইরেক্টর অনেকবার বলেছেন, কিন্তু কোন কাজ হয় নি।

সারা পশ্চিমবঙ্গে মোট ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা ৭২। এর মধ্যে মাত্র ১২টি দমকল বিভাগের নিয়ন্ত্রণ। বাকি ৬০টি বাড়ির জন্য শুধা গুলতে হয় বছরে প্রায় এক কোটি টাকা। অথচ এই ৬০টি বাড়ি তৈরি করলে বরচ হবে ৪ কোটি টাকা।

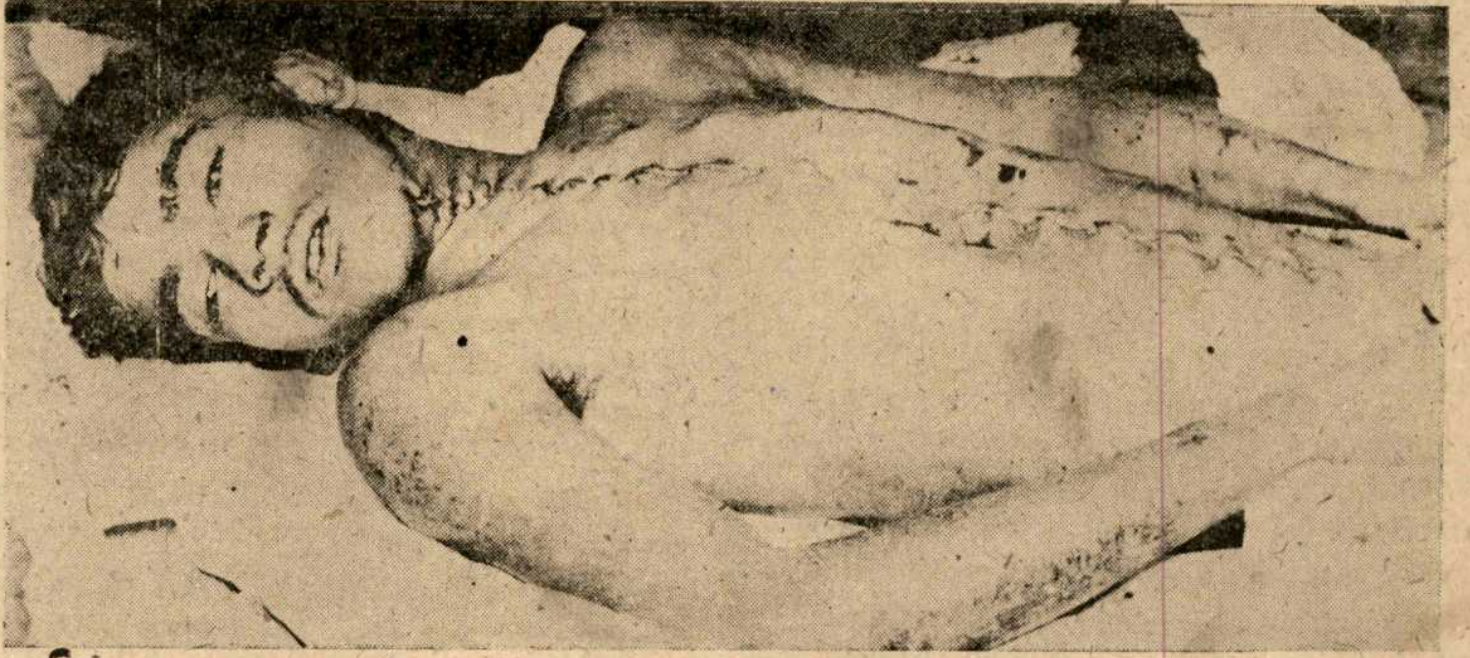
শহরে অগ্নি নির্বাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অলংকরণ অভাব। বৃহত্তর কলকাতার জলের যে পাম্প (ট্যাক) ছিল সেগুলো নতুন ভাবে তৈরি করে চালু করা দরকার এবং হাইড্রেন্টের সংস্কার করে তাতে জলের চাপ বাড়ানো দরকার, যাতে সেগুলো দমকল বাহিনীর কাজে লাগে। তাছাড়া কলকারখানার সঙ্গে বড় বড় ট্যাক থাকে চরকার। এর জন্য বংগ্রেসী সরকারের কাছে ডাইরেক্টর সুপারিশ করা সংবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি।

শহরে গত বেশ কয়েক বছর থেকে যে সব বড় বড় বাড়ি হচ্ছে সেখানে যে বিশেষ অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা দরকার সেদিকেও সরকার কোন দৃষ্টি দেন নি। ফলে এসব বাড়িতে আগুন লাগলে দমকল কর্মীদের মিসিম খেতে হচ্ছে। এসব বাড়িতে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব ফায়ার সার্ভিসের ডাইরেক্টর সরকারকে দিয়েছিলেন কিন্তু তা কার্যকর হয় নি।

রঞ্জিত গুপ্ত দেবী রায় বিভূতি চক্রবর্তী রুণ নিয়োগীকে এখনি গ্রেপ্তার করা দরকার

—জ্যোতিষ্ময় বসু

(দর্পণের সংবাদদাতা)



“জ্যোতিষ্ময় বসু, আমার কাছে নির্মিত
পদ্ধতির লক্ষ্য ফিটান্ড আছে।
“টেরি” নামক পুস্তকটি আরও
পুঙ্খবুদ্ধি দীর্ঘ বিবরণ আছে। আপনি
এ সব পড়লে আপনাকে নিতাইচীন
রাত্রি কাটাতে হবে। ‘হাঃপ্রবাদ
গোলি’ যাকে বলে তাও আছে।
তার মানে একটা লোহার রড লম্বা
ওড়ো মাথিতে কোন লোকের গুহ্মারে
চুকিয়ে দেওয়া

“জ্যোতিষ্ময় বসু নকশালদের উল্লেখ
করার দারুণ উদ্দেশ্যেই ঘটনাও
(শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা

(দর্পণের সংবাদদাতা)



সম্বন্ধী অল্পস্থানে ভারতী তরফদার

ছবি : ল্যাও অ্যান্ড লাইফ

ভারতী তরফদারের কাহিনী

(বিশেষ প্রতিনিধি)

আজ থেকে সাত বছর আগে একটি
সাজানো খুনের মামলায় ক্রিমতী
ভারতী তরফদারের যাবজ্জীবন
কায়দা হয়। দীর্ঘ ৭ বছর পর
ভারতী গত ৩-শে জুন পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা
সমিতি গত রবিবার ৩রা জুলাই শহীদ
মিনার ময়দানে ভারতীকে সম্বন্ধী
জানালেন। এই সম্বন্ধী জানাতে
উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী
শ্রীজ্যোতিষ্ময় বসু, অর্থমন্ত্রী শ্রীশশোক মিত্র
ভূমি রাজস্বমন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী, সি,
পি, এম, নেতা এবং বামফ্রন্টের
সভাপতি শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত প্রমুখ

নেতৃবৃন্দ। সভানেত্রীরূপে উপস্থিত
ছিলেন শ্রীজ্যোতি চক্রবর্তী।

১৯৬৯ সালের ৫ই জুলাই বর্জমান
জেলায় শ্রীমতী দানার অন্তর্গত
এখোরা গ্রামে কংগ্রেসী গুণ্ডা ভবানী
শর্মার নেতৃত্বে একদল মস্তান ভারতীদের
বাড়ী আক্রমণ করে। উদ্দেশ্য ছিল
ভারতীসহ তাদের পরিবারের সকলকে
হত্যা করা। ভারতী সে সময় বাড়ীতে
ছিল না। মস্তান বাহিনীকে বাড়ীতে
প্রবেশ করতে বাধা দিলেন ভারতীয়
বাবা শ্রীগজেন্দ্রনাথ তরফদার। তিনি
এখোরা স্থলের প্রধান শিক্ষক।

(শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

দ্বিতীয় • যুক্তফ্রন্ট সরকারের
পতনের পর পশ্চিমবঙ্গ লার বৃকে
নেমে আসে বিভীষিকার রাজত্ব।
এখানে কার্ণাট: তখন থেকেই আধা
আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা চলতে
থাকে। কেরালায় রাজন ও বিজয়ন
তামিলনাড়ুতে সীরালাম ই.াদি
নামগুলো বহুল প্রচারিত হচ্ছে,
দক্ষিণভারত চঞ্চল হয়ে উঠেছে।
পশ্চিমবঙ্গ লার জনসাধারণ এ সব
খবর পড়ে বিমূঢ় হন নি, বিচলিত
হন নি, কারণ এখানে পুলিশ লক
আপে ও জেলে অসহায় বন্দীদের খুন
করা, গ্রেপ্তারের পর পাড়ায় নিয়ে
গিয়ে খুন করা, সন্ট লোক, ডায়মণ্ড-
হারসার খুন করে কবর দেওয়া—

এ সব ব্যাপার প্রতিদিন ঘটেছে।
আদালতে হাজির করানোর দিনে
কিছু রান্না করা খাবার নিয়ে মা
গেছেন আদালতে ছেলেকে দেখতে,
ওদিকে পুলিশ তখন ছেলেকে গুলী
করে কাঁটাপুকুরে নিয়ে গেছে ময়না
তদন্তের প্রহসনে।— ছেলে আত্ম-
গোপন করেছে অতএব বাবাকে ধরে
অত্যাচার করে ছেলের আশ্রয়স্থল
জেনেছে এবং গ্রেপ্তার করে এনে
বাবা মার সামনে দাঁড় করিয়ে শেষ
খাওয়া খাইয়ে দিতে বলে পরে খুন
করেছে, নিজেরাই কোমা ফাটিয়ে
লালবাজার মার্কেট সংবাদপত্রে
রিপোর্ট দিয়েছে, “উগ্রপন্থীদের
বোমার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য
পুলিশ গুলী ছুঁড়তে বাধ্য হয়েছে।”

উপরের ছবিটি ভাঙ্গ বস্তুর।
বাবা শ্রীচণ্ডীদাস বহু সরকারী

(শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



বিংশ বর্ষ ২৪শ সংখ্যা ২২ জুলাই, '৭৭ ৪০ পৃষ্ঠা

রাজ্য জনতা পার্টিতে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্য জনতা পার্টিতে দ্বন্দ্ব এখন
প্রচণ্ড আকার নিয়েছে। সত্যিকথা
বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গে জনতা পার্টির
শরিকরা আনুষ্ঠানিক ভাবে মিলে
গেলেও প্রকৃত অর্থে মিলন এখনও
হয়নি।

প্রথমে রাজ্য জনতা পার্টির সভা-
পতি মনোনিয়নের প্রশ্নে কি কেন্দ্রে কি
রাজ্যে কোথাও কোন বিরোধ ছিল
না। প্রফুল্ল সেন সর্বসম্মত ভাবেই
সভাপতি হন। কিন্তু কিছুদিন বাদে
প্রফুল্লবাবুর কার্যকলাপ বিতর্কিত হয়ে
উঠতে থাকে এই অভিযোগের
ভিত্তিতে যে, অশোককৃষ্ণ দত্তের পরামর্শ
ছাড়া প্রফুল্লবাবু কোন সিদ্ধান্ত
নেেন না। অর্থাৎ প্রফুল্লবাবুর বকলমে
অশোকবাবুই দলকে কন্ডায় রেখে-
ছেন।

গত বিধানসভা নির্বাচনে জনতা
পার্টির শরিক দলের কয়েকজন যেমন
বিমান মিত্র, স্বরাজবল্লভ চৌধুরী প্রমুখ

রাজ্য নেতা চেয়েছিলেন জনতা পার্টি
বামফ্রন্ট নির্বাচনী ট্রকা। ওদের
যুক্তি ছিল, জনতা পার্টির সাংগঠনিক
শক্তি প্রায় নেই বললেই চলে, তাই
লোকসভার মত বিধানসভা নির্বা-
চনেও বামফ্রন্টের কাঁধে ভর করে
নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া যাবে।
তারপর ক্ষমতায় এসে সংগঠন তৈরী
করে নেওয়া যাবে।

রাজ্যের একাংশের এই মনো-
ভাবের সঙ্গে চন্দ্রশেখর, মধু লিমায়ে
প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দও একমত
হন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক
শেষ পর্যন্ত সমঝোতা হয়নি।
ভোটের ফলাফলে জনতা পার্টিতে
দেখা দিয়েছে প্রচণ্ড নৈরাশ্র এবং
সমস্ত আক্রোশ এবং আক্রমণের মূল
লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনজন
প্রফুল্ল সেন, অশোককৃষ্ণ দত্ত এবং ডি
এন লাহিড়ী।

(শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

কলকাতা পৌরসভার বিজ্ঞাপনের লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় পৌর প্রশাসক শিবপ্রসাদের সাহিত্যিক হওয়ার নেপথ্য কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা পৌরসভার বিজ্ঞাপন বিভাগের লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে যে গৌরীসেনী কারবার চলেছে তার এক চাক্ষু্যকর তথ্য এখন আমাদের হস্তগত হয়েছে। রায় মন্ডলভার আমলে পৌরসভায় বসে অর্থীকষ্ট পৌরসভার লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে নজীরবিহীন খেলা খেলেছেন পৌর প্রশাসক শিবপ্রসাদ সমাদ্দার স্বয়ং। তাঁর 'সাহিত্যিক' হবার উদ্দেশ্য বাসনায় সংস্থার টাকা ব্যয় হয়েছে বেপরোয়া। প্রশাসন গিয়ে উঠেছে লাটে। শিবপ্রসাদ নান্য কর্মকাণ্ডের দোসর হিসেবে বেছে নেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জীব বসু, আশনাল অ্যাডভারটাইজিং-এর সত্য সেন, সংস্থার সচীব অরুণেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, প্রেস এণ্ড পাবলিক রিলেশন অফিসার স্বর্নধর বারিক ও তাঁর দুই আত্মীয় মাতঙ্গর আমল ও সুনীল গাঙ্গুলীকে। কর্পোরেশনের পয়সায় শিবপ্রসাদের সাহিত্যিক হবার ধান্য এর ক'জন বেশ ভাল রেখেই চলেছেন। পরিবর্তে এরা ও ম্যানেজ করেছেন প্রচুর। সংস্থার টাকা ছুহাতে উজাড় করে শিবপ্রসাদ অবিরাম তার 'সাহিত্য চর্চা' করে গেছেন।

ইনি কর্পোরেশনে প্রবেশ করেন কমিশনার হয়ে। তখন প্রশাসক ছিলেন বি, সি, গাঙ্গুলী। দৈনিক পত্রিকার যারা সাংবাদিক তাঁরা জানেন, কমিশনার থাকাকালীন শিবপ্রসাদ কিতাবে ও কোন পদ্ধতিতে বি, সি, গাঙ্গুলীকে ল্যাং মারার চেষ্টা করেন। অতঃপর ক্রীগাঙ্গুলী সরেজ্বার পর শিবপ্রসাদ প্রশাসক হয়ে বসেন। শিবপ্রসাদ বলাবাহুল্য ঝাঙ্ক ব্যক্তি। আত্মপ্রচারে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। সময় মতো ভাল পান্টাতে তিনি তুখোড়। স্বত্ববাবু পৌরসভায় হওয়ার পরেই শিবপ্রসাদ তার সঙ্গে লাইন করা শুরু করেন। মস্তুর গাড়ীর দরজা খুলে দেওয়া থেকে শুরু করে কারণে-অকারণে তার বাড়িতে পড়ে থাকা এ সবই তখন তাঁর নিত্যকর্ম।

শিবপ্রসাদের মাথায় এসময়েই ছুঁত চাপে তিনি সাহিত্যিক হবেন। প্রেস এণ্ড পাবলিক রিলেশনস দপ্তর থাকা সত্ত্বেও শিবপ্রসাদ নিজে বিজ্ঞাপন ও প্রচার সংক্রান্ত কাজকর্মে বেশী করে ঝুঁকে পড়েন। ৭৪ সনে কর্পোরেশনের কর্মীধর্মঘটে হাজার হাজার

টাকা খরচ করে শ্রমিক বিরোধী যে বিজ্ঞাপন ছাড়া হয় তা এই ঝাঙ্ক আমলারই নিজের সৃষ্টি। এ সময়ের সামান্য আগে পরে সংস্থায় এসে চেপে বসেন আশনাল অ্যাডভারটাইজিং-এর সত্য সেন। সত্যাবাবু শিবপ্রসাদের নান্য দুর্বলতার খোঁজ ধর ভালই রাখেন। তাই সুযোগ বুঝে সত্যাবাবু কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপন প্রচারের এজেন্ট হওয়ার আবদার রাখেন শিবপ্রসাদের কাছে। এক কথায় শিবপ্রসাদ লাখ লাখ টাকার বিজ্ঞাপন প্রচারের দায়িত্ব সত্যাবাবুর হাতে তুলে দেন। ৭৪ সনে এই বিজ্ঞাপন প্রচারের সুযোগ নেওয়ার অল্প দাবিদারও ছিলেন। কিন্তু তারা শিবপ্রসাদের পছন্দ নয়, তাই তাদের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি।

সত্যাবাবুর হাতে প্রায় বারো লাখ টাকার বিজ্ঞাপন প্রচারের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে সত্যাবাবু এই অর্ডারটি সংগ্রহ করতে গিয়ে কত কমিশন কাকে কতটা দিয়েছেন? একথা কোন মুখও বিশ্বাস করবে না। যে সত্যাবাবু বিনা কড়িতে কলকাতা পৌরসভার বিজ্ঞাপন প্রচারের অর্ডারটা খুব সহজেই পেয়ে গেলেন। তাও আবার একলাখ চুলাখ নয়, বারো লাখ টাকার অর্ডার। শিবপ্রসাদ এতেও থেমে থাকেন নি, এরপরেও ছোটখাটো অর্ডার যার সঙ্গে হাজার হাজার টাকা জড়িত সেই কাজ সত্য সেনের হাতে তুলে দিয়েছেন।

শিবপ্রসাদের ইন্দিরা ভক্তি জরুরী অবস্থায় চরমে গিয়ে পৌছায়। বিশদফা কর্মসূচীর প্রচারে কর্পোরেশনের মত সমস্তা সমস্ত সংস্থার অল্পতম কর্তা একেবারে মেতে উঠলেন। 'বিশটি দফা নিয়ে তিনি বিচিত্র এক হেডিং করলেন "বিশদফা অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ইন্দিরা।" আবার এর প্রত্যেকটা শব্দ নিয়ে রচনা করলেন জ্ঞানগর্ভ বাণী। তা প্রচার করলেন কাগজে কাগজে। কর্পোরেশনের টাকার প্রায় বেশ ভালোই জবে উঠলো। তবে এখানেই শেষ নয়। তিনি আরেকটা বই লিখলেন কর্পোরেশন এণ্ড টুয়েন্টী পরেন্ট প্রোগ্রাম। প্রশাসনের কাজকর্ম ছেড়ে ইন্দিরা ভক্তি দেখাতে শিবপ্রসাদ ইংরেজীতে এই বইটি লিখে সংস্থার কোষাগার থেকে খরচ করলেন ১৬ হাজার ৯০০ টাকা। তারই নির্দেশে শহরময়

বিশদফা কর্মসূচীর সঙ্গে সংগতি রেখে পৌর সংস্থার কয়েকটি বাণী ছড়ালেন সারা শহরময়। এখানেও পোস্টার ও অ্যান্ডার্স খাতে খরচ হল হাজার হাজার টাকা।

শিবপ্রসাদ সংস্থার ক্যাঙ্কুয়াল অর্থাৎ মাঝেমধ্যে স্বভেদ নর ও বশেষ কারণে প্রকাশিত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া নিয়েও শুরু করলেন নানান খেলা। তার লেখা না ছাপা হলে বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে না এমন হাব ভাব দেখে অনেক বিজ্ঞাপন প্রার্থী শিবপ্রসাদের কাছে নিরুপায় হয়ে লেখা চাইতে বাধ্য হলেন। অভিযোগ বিজ্ঞাপন সংগ্রহকারী-বক্তিকে লেখার দক্ষিণাবাদ শিবপ্রসাদের হাতে কিছু গুজুও দিতে হত। শিবপ্রসাদের হাবভাবটা এমনি—কেন দক্ষিণা নেব না, বলা, আমি তো আর কম বড় লেখক নই। রীয় জামানায় পৌরসভার বিজ্ঞাপনের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে শিবপ্রসাদের লেখাও রয়েছে। বলা বাহুল্য বিজ্ঞাপনের খাতিরেই বিজ্ঞাপন সংগ্রহকারীরা শিবপ্রসাদের লেখা ছাপানোর ব্যবস্থা করে দেন। অর্থাৎ ঘটনা হলো গণতা দ্বক আন্দোলনে বিশ্বাসী বামপন্থী ও প্রগতিশীল পত্রিকাগুলি পৌরসভার বিজ্ঞাপন ভাণ্ডারের কোন ভাগ না পেলেও অখ্যাত অনামী কিছু পত্রিকা ও শিবপ্রসাদের আত্মীয় সুনীল গাঙ্গুলীর 'কুন্তিবাস', 'পেয়ারের সঞ্জীব বসুর 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'সোনার কাঠি' 'ছন্দিতা', 'রূপলেখা', 'ডরোসী', 'ছাপতে ছাপতে', 'উডকি ধানের মুড়কী' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি একনাগাড়ে শত শত কোন কোন ক্ষেত্রে সহস্রাধিক টাকারও বিজ্ঞাপন পেয়েছে। প্রায় হত্যেকটিতেই শিবপ্রসাদের লেখা নিরমিত ছাপা হত। তাঁর এই ধরণের কারবারে শিক্ষিত হয়ে তাঁরই দোসর পৌরসভার সচীব অরুণেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীও কবি হবার চেষ্টা করলেন। তার কাছে 'দেয়া' পত্রিকার লোকজন বিজ্ঞাপন চাওয়া মাত্র তিনি বললেন "আমার কবিতা ছাপো, বিজ্ঞাপন পাবে।" অসহায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষ অরুণেন্দ্রের কবিতা নিলেন। অসহ্য বিরক্তিকর এই কবিতাটির নাম "কথা"। তাও এখনকার নয়। "মহাকবির" এই কবিতাটির রচনাকাল ১৯৪৪ সন। অরুণেন্দ্র নিজের কবিতার সঙ্গে শিব-

প্রসাদের আত্মীয় সুনীল গাঙ্গুলীর এক কবিতাও বিজ্ঞাপন হিসেবে ছাপতে দিয়ে দিলেন। অর্থাৎ নিজের কবিতাও ছাপা হল, কর্তা শিবপ্রসাদও সন্তুষ্ট হলেন।

ছোটখাটো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যাপারটি স্বর্নধর বারিকের হাতে ছিল। কর্তার হালচাল দেখে ধান্দাবাজ স্বর্নধরবাবু শিবপ্রসাদকে দিয়ে নিজের প্রমোশনটি করিয়ে নিলেন। বিনিময়ে তাঁর মজুমত বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া ও লেখা ছাপানোর কাজ যথারীতি চলতে লাগলো।

এরপর শিবপ্রসাদের মাথায় আসে আর এক নতুন প্র্যান। বিজ্ঞাপন দিয়ে বিভিন্ন স্থানে তার ছাপানো লেখার এক সংকলন বের করার কাজে তিনি স্বত্ব মুখার্জীকে ধরে বসেন। এই বইয়ের নাম "ক্যালকাটা ইজ", যার ইতিবৃত্ত গতবারের দর্পণে বেরিয়েছে।

ইতিমধ্যে সঞ্জীববাবুর "সাহিত্য সংস্কৃতির" মার্চ মাসের সংখ্যায় পৌর প্রশাসক শিবপ্রসাদ জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও গর্ভ নিরোধকের উপর এক রচনা ফেঁদে বসেছেন। নাম দিয়েছেন "পুত্রকন্ডা ডাল ভাজিবারে"। হঠাৎ তার জুড়ি বছরের মেয়েই নাকি ক্রত জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিভীষিকা তাঁকে মনে করিয়ে দেয়। প্রবন্ধে সে কথার

উল্লেখ করে শিবপ্রসাদ বীরপাত, পুরুষাঙ্গে রবারের টপি, মেয়েদের জেলী, গর্ভমুখে আঁচা পড়ানো, মৈথুন সহ কোন প্রসঙ্গই আর বাদ দিলেন না। তবে পৌরসভার একটি বিজ্ঞাপন দিতে 'কল্ল ভুললেন না। সবচেয়ে বড় কথা শিবপ্রসাদ এই প্রবন্ধে একটি পুরো পাতায় ভারতবর্ষের মানচিত্র দিয়েছেন। সেটির ব্লক কলকাতা পৌরসভার পয়সাতেই তৈরী। বাইরের একটি পত্রিকায় সংস্থার পয়সা দিয়ে ব্লক করে দেওয়াতে অসহিষ্ণু বুঝে শিবপ্রসাদ এই ব্লকটিকে কলকাতা পৌরসভার মিউনিসিপ্যাল গেজেটে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করলেন। যাতে গেজেটের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে দেখিয়ে পৌরসভা থেকে পয়সাটা ম্যানেজ করা যায়। মার্চ মাসে শিবপ্রসাদের দোসর সঞ্জীব বসুর পত্রিকায় ব্লকটি ছাপা হবার পর একই ব্লক ১১ই জুনের গেজেটে ব্যবহার করা হয়। সঙ্গে বাঙ্গলা রচনাটির একটি ইংরাজী অঙ্কবাদও ছাপা হয়ে যায়। এমন জানা যাচ্ছে এই মাতঙ্গর সাহিত্যিকটির নির্বিয়ে কাজ করার জন্য পার্সাদার্স মার্কেটের উপরে একটি ঘরে একটি এয়ারকন্ডিশন বসানোর ব্যবস্থা চলেছে। সমস্ত ব্যাপারটি নিয়ে কি পৌরমন্ত্রী ব্যাপক তদন্ত শুরু করবেন?

মেদিনীপুরে সন্ত্রাস ও হত্যা

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অষ্টম নির্বাচনে ১৯৬৭নং চন্দ্রকোণা কেন্দ্রের ৩৪নং নেকড়বাগ বুথে নির্বাচনের দিন যে ঘটনা ঘটলো তা নিদারুণ আতঙ্কবহ। গত ১১ই জুন উক্ত গ্রামে কুখ্যাত জোতদার মণি কাজীর নেতৃত্বে কিছু সমাজবিরোধী গুণ্ডা (আমানউল্লা, সেখ লালু, সেখ বুলু প্রভৃতি) বোরখা পরিয়ে কোন এক পুরুষমহুষকে দিয়ে জাল ভোট দিয়ে গেলে সি, পি, এমের নিযুক্ত এজেন্ট চৌধুরী সামসুল আলম বাধা দেন। ফলে গুণ্ডারা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য উক্ত গুণ্ডারা দীর্ঘ ৫৬ বৎসর বাবৎ নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর নানান অত্যাচার চালিয়ে গ্রামটিকে সন্ত্রাস করে রেখেছে।

ভোটের দিন বিকেল সাড়ে চারটার পর গুণ্ডারা সামসুলকে জোর করে প্রহার আরম্ভ করে। অসহায় প্রিন্সাইডিং অফিসার থামাঙে গেলে তাঁর হাতঘড়িটি চেন ছিঁড়ে

মাটিতে পড়ে যায়। স্থানীয় সি, পি, এম, নেতা পাঁচকড়ি ঘোষ উক্ত ঘটনার শাস্তিপূর্ণ মীমাংসার চেষ্টা করলে 'আমানউল্লা তাঁকে বধে প্রহার করে এবং তাঁর সাইড ব্যাগটি (ভোটারলিস্ট, শীল ও ১৬নং ফরম সহ) কেড়ে নেয়। ঘটনার কথা শুনে সামসুলের ৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পিতা সোলেমান চৌধুরী একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করতে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং নিদারুণভাবে প্ররক্ত হন। পরে গুণ্ডারা সামসুলের একশত টাকা জরিমানা করে এবং শাসিয়ে দেয় যে থানাতে জানালে বাড়ীতে আগুন জালিয়ে পুড়িয়ে মারবে। মারধোরের পর সোলেমান সাহেব গত ১১/৬/৭৭ তারিখে রাজি ১১টায় মারা যান। নেকড়বাগ সন্ত্রাসমুক্ত হোক ও সোলেমান সাহেবের হত্যাকারীদের শাস্তি হোক এটা আজ সমস্ত শান্তিপ্ৰিয় মানুষের কামনা।

দানিকেন তব্ধের আলোকে মহাভারতের সূচনা ও দেবতা বীরেন্দ্র মিশ্র

নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন

লুকিয়ে রেখে আসা বিমানটির উদ্দেশ্যে পাহাড় ভেঙে চলেছেন সর্বাধিনায়ক। আত্মতৃপ্ত খুশি খুশি চেহারা। তাঁর দীর্ঘ উন্নত উজ্জল কান্তি খেতুতল হিমালয়ের পাদদেশে এক অপার্থিব মহিমার সৃষ্টি করেছে। অপার্থিব তো বটেই। মহাদেব বিদ্রোহী, তিন-গোলকের এক ক্ষমতাশালী সামরিক অধিনায়ক। সঙ্গে আছেন পত্নী উমা দেবী। ইজ্ঞাকীলের চূড়ো থেকে কোথায় উড়ে যাবেন তাঁরা? কৈলাসে? মন্ত শিবলিঙ্গের মতো বীর চেহারা? যে বরফ-ঢাকা চূড়োটি মানসের উচ্ছলিত পরিভ্রমণে পাদ প্রকালন করে? জানি না। মহাভারতকার এই-মুহুর্তে সে সম্পর্কে কোনই আভাস ইঙ্গিত রাখেন নি। শুধু একটি প্রাণবন্ত ছবি। প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্ব মহাদেবকে অল্পসরণ করছেন পৃথাপুত্র ধনঞ্জয়। বড় মান আর ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে সেই বন্দপ্ত তরুণকে। হরষে রোমাঞ্চে কৃতজ্ঞতায় সে যেন এমন একটি কাদার পুতুল। বিনয়ানত দাসাহুদাসহেন কৃতজ্ঞলিপটে (হাত-কচলাতে কচলাতে) চলেছেন সেই নায়ক মহাভারতকারকে আকাশরথে তুলে দিতে। আর মনে মনে ভাবছেন। 'অহো, কী সৌভাগ্য! মঙ্গলকালে আমি আজ মহাদেবের গাত্র স্পর্শ করলাম। তিনি খুশি। অতএব আমি নির্ভয়। তাঁর প্রমাদে, দেব শিবিরের সাহায্যে আমি এখন অজয়। দিব্যায়ের তোপের মুখে হুধোধনরা আর টিকবে না। নির্বংশ করব আমি ওদের, অবশ্যই।'

যুদ্ধ আসন্ন হ'লে বড় শক্তির ছত্রছায়ায় আশ্রিত ছোটো শিবিরের অধিনায়ক এই ভাবেই পুলকিত হ'ন। যুধিষ্ঠির প্রেরিত অর্জুনের 'মিশন' সফল। সামরিক চুক্তি স্বয়ং মহাদেব দই করে গেলেন। অতঃপর অর্জুন যাবেন নক্ষত্রলোকে, শিববেন উন্নতমানের যুদ্ধ কৌশল ও অস্ত্রাদি ব্যবহার। যখন ফিরে আসবেন, নয়া অস্ত্রের অধিকারী অর্জুনের পরাক্রমে সসাগরা পৃথিবী তখন ধর ধর প্রকম্পিত হবে।

সম্রাট মহাদেব বিমানে উঠে বসলে সগর্জনে বিমানটি উড়ে গেল আকাশমার্গে। উড়ে মুখে তাকিয়ে রইলেন অর্জুন। দেখতে দেখতে বিমানটি তাঁর চোখের নাগাল ছাড়িয়ে অদৃশ হ'ল। আবার মহাশূভতায় স্বল্প পার্বত্য পরিবেশ লক্ষ লক্ষ ঝিঝিঁর ডাকে ঝিমিয়ে পড়ল। একাকী পার্থ সেই বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে অপেক্ষায় রইলেন। আসবে স্বর্গের রথ। নিয়ে যাবে তাঁকে মহাকাশে। যুদ্ধ চিন্তায় ডুবে গেলেন যুদ্ধবাজ অর্জুন।

মহাদেবের বিমানটি নিয়ে অর্জুনের মাথাব্যথা নেই তখন। এই পৌরাণিক • সমরপ্রেমিক রাজতনয়ের চরিত্রটি যে অদ্ভুত। অতি শৈশবকাল থেকে তিনি বড় একনিষ্ঠ। পাখীর চোখ বাণবিন্দু করতে হ'লে চোখ ছাড়া আর কিছুই তাঁর নজরে আসে না। শ্রেষ্ঠ বীর হিসেবে ইতিহাসে সোনার জলে নাম লিখতে চান। এ অল্প কোনো কর্মই তাঁর কাছে অপকর্ম নয়। রাতের অন্ধকারে অস্ত্রশূল দ্রোণকে ক্ষেপিয়ে তোরের পবিত্র

মাহেত্রক্ষণে হৃদয় বনাকলে গিয়ে চোরের মত চুপিসারে একলব্যের আশ্রমটি ঘিরে ফেলেন। সরল নিবাদ রাজপুত্রকে প্রবঞ্চনা করে গুরু দ্রোণ কেটে নিয়ে আসেন তার বৃদ্ধাপুত্র। তা না হলে অর্জুনের চেয়ে বীর আর একজন গোকুলে বেড়ে উঠবে। ব্রাহ্মণ প্রধান আর্ষ-আধিপত্যের বিপদ বনিয়ে আসবে আর্ষাবর্তে। তার চেয়ে, বয়সে তরুণ, বুদ্ধিতে আধপাকা একলব্যকে সময় থাকতেই হীনবল করা দরকার। যদি ভালয় ভালয় সে রাজ না হত, তাহলে দ্রোণাজুনে অবশ্যই ছেলেটাকে পুজা-পাননায় রত নিরস্ত্র অবস্থায় চুপিসারে সেদিন ধতম করেই আসতেন। রণে প্রেমে লক্ষ্য নেই পৃথাপুত্রের। তাঁর ওপর জননী কুন্তী দেবীর অসম্ভব প্রভাব। জননী কুন্তী আপন আর্ষ বড় ভালো করেই বুঝতেন। যেমনি অপরূপ হৃদয়ী, তেমনিই অসম্ভব বুদ্ধিমতী ছিলেন কুন্তী। আর গোপন প্রণয়ে তাঁর ছিল অনন্ত দক্ষতা। তাবড় তাবড় ষোদ্ধাদের মধ্যে ভারত যুদ্ধে মাতা কুন্তীর অবদানও কম ছিল না। বলতে গেলে নেপথ্যচারিণী কুন্তীই ছিলেন পাণ্ডব পক্ষের 'ব্রেন'। বিদূর তাঁর বংশবাহ 'ক্ষত' দেবর। তিনি আপন স্ত্রীপুত্র ফেলে কুন্তীর রক্ষণাবেক্ষণে সত্য ব্যস্ত থাকতেন। এমন একটি দেবরকে কেমন ভাবে হাতের মুঠোয় রাখতে হয় গান্ধারী তা জানতেন না, জানতেন কুন্তী। কুন্তীর নারীদেহে পুরুষ খেলানো অমন একটি 'ব্রেনের' ধর রাখতেন বুদ্ধিমান দেবগণও। সম্ভবত ধরটা পেয়েছিলেন তাঁরা প্রথম শ্রেণীর অন্ততম দেবাহুচর মহর্ষি ত্রীশাসার 'মারকং'। তাই দেবতার কুন্তী গর্ভেই দেবপুত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা পাকা করে ছিলেন কুন্তীর কুমারী অবস্থা কালেই। সে আর এক খেলা। এমন অপরূপ রাজনীতির খেলা পুরা যুগের পর আর কখনো হয় নি কোথাও। কিন্তু ভিন্ গ্রহের দেবতার এখেলা শুধু ভারতবর্ষেই নয়, অন্তর্য ও খেলেছিলেন। আজও তাঁদের কাছ থেকে রাজনীতি যুদ্ধনীতি কৌশল অপকৌশল শিক্ষা করার মতো ঢের শিক্ষণীয় বিষয় আছে। পৃথিবীর বুকে ভিন্ গ্রহের ঝাঙা প্রোথিত করে গেছেন তাঁরা অভাবনীয় সব উপায়ে।

আমরা মহাভারতের বিশাল পুঁথির মধ্যে যে বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডার আছে তার দিকে ফিরেও তাকাই না পণ্ডিত মূর্খের অলীক অভিমান নিয়ে। ভাবি, মহাভারত বুদ্ধি বুদ্ধের বারাগসী। বিশ্ববার শ্রোতব্য। কিন্তু পশ্চিমীরা এ বিষয়ে আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান। তাই তাঁরা মহাভারত নিয়ে দিনের পর দিন কত না কত গবেষণা করে চলেছেন। বুদ্ধিমান তাঁরা নিশ্চয়ই, না হলে সংস্কৃত শিখে মহাভারত বুকে ঘান সাগর পারের অত্যাধুনিক প্রভুরা? বেশ কিছুকাল তাঁদের বিজ্ঞানীরাও চোখ ফেলেছেন এই দিকে। পৃথিবীর মধ্যে ভারত এক রত্নভাণ্ডার, "মহাভারত" সেই রত্ন-প্রসবিনী ভারতের 'ইন্টেলেকট'। বস্তুত বুদ্ধির কারবারী ছাড়া এই মহাসম্পদের কদর আর কেইবা করতে পারেন। কিন্তু যা বলছিলাম:

বলছিলাম, অর্জুন মহাদেবের বিমানটি লক্ষ্যও করেন

নি। শুধু দেখেছেন, ধীরে ধীরে সেটি তাঁর চোখের ওপর অদৃশ হয়ে গেছে। বিমান সম্পর্কে অর্জুনের এই নির্লিপ্তি আমাদের একটু ভাবিয়ে তোলে। প্রশ্ন জাগে, অর্জুনের চোখে আকাশ যান কি তবে সেই মাত্র প্রথম-দৃষ্ট নয়? তিনি কি আগেও অনেক বিমান দেখেছেন? যদি না দেখে থাকেন, তবে যতই যুদ্ধোন্মাদ হন না কেন, বিমানটি তাঁকে নিশ্চয় চমৎকৃত করত। ইজ্ঞাকীলের মত তিনিও ভাবতেন, তাঁর চোখের সামনে 'স্বর্গ খুলিয়া গেল'। তাই মনে হয়, ইতিপূর্বে বিমান অর্জুন দেখেছিলেন, কোতুহল সেজ্ঞাই তাঁর ক্ষেত্রে তেমন দানা বাঁধে নি। তা হলে একবার দেখতে হয় অর্জুন কবে কোথায় বিমান দেখলেন, অথবা বিমান সম্পর্কে তাঁর ধারণা গড়ে উঠল কোথায়। অতি শৈশবকাল থেকেই কি অর্জুন বিমানের অস্তিত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ?

পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম হয়েছিল হিমালয়ের কোলে। শতশত পর্বতে যখন মাত্রী ও কুন্তীকে নিয়ে বনবাসী রাজা পাণ্ডু স্বেচ্ছা বানপ্রস্থ গ্রহণ করে বসবাস করছেন তখন সেইখানে দেব-ঔরসে কুন্তীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন পঞ্চ-পাণ্ডব। সে জন্মকথা পরে বলব। এখানে হিমালয় নিয়ে কথা। ভাবনা বিমান সম্পর্কে।

এই সময় হিমালয়ের ওপর একাধিক বিমানের গত্যাত ছিল। দেবতার পার্বত্য উপত্যকায় বিমানে চড়ে গুঠানামা করতেন। তাই শিশুকালেই অর্জুনের পক্ষে উড়ন্ত বিমান দর্শন অথবা বিমান সম্পর্কে পর্বতচারী মূনিদের কাছে গল্প শোনা সম্ভব। বিমানে চেপে দেবতার এমেছিলেন কুন্তী মাত্রীর সঙ্গে সঙ্গমে রত হতে। হুতরাং মায়ের মুখ থেকেও বিমানের কথা ছেলেরা জেনে থাকতে পারে। পিতা পাণ্ডুদেব বিমানের কথা শুনেছিলেন পর্বতচারী মূনিদের কাছে। ঘটনাটি এই রকম:

শতশত পর্বতে তখন রাজ্যত্যাগী পাণ্ডু (পাণ্ডব পিতা) তপস্শা করতেন। একদিন তিনি বিচলিত হলেন কতিপয় মূনির শোভাযাত্রা দেখে। পাণ্ডু সেই তীর্থ-যাত্রীদের প্রশ্ন করলেন, 'মহাশয়গণ, কোথায় গমন করিতেছেন?' উত্তরে তাঁরা জানালেন, 'সেইদিন ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সভায় মহাত্মা দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের একটি বৈরাট সম্মেলন হইবে।' তাঁরা সেখানেই যাবেন। (আদিপর্ব)।

সমবায়ো মহানত ব্রহ্মলোকে মহাত্মনাম্।

দেবনাঞ্চ ঋষিনাঞ্চ পিতৃনাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥

(সিদ্ধান্তবাগীশ)

জানা গেল, ব্রহ্মার সভাও বসে হিমালয়ে! কী কাণ্ড! সকল প্রকার সৃষ্টিকর্তা সভা বসান একটি সীমিত ভৌগোলিক অঞ্চলে। আর্ঘ্য কি ভেবেছিলেন, পৃথিবীর মাহুঘের বুদ্ধি কোনোদিন পরিপক্ব হবে না? 'কখনো তাঁরা বিচার করে দেখবে না সম্ভব অসম্ভবকে'? ব্রহ্মা বলে কথা। তা তাঁর সভা হিমালয়ে, যার সর্বোচ্চ চূড়া এভারেষ্ট এবং সম্ভ্রতি কান্ধনজঙ্ঘাও সামান্য মাহুঘ চষে ফেলল। না, ঈশ্বরকে এমন হাস্যকর আর ক্ষুদ্র ভাবা আমার সাধ্য নয়। কিন্তু মহাবল পাণ্ডু সে কথায় প্রতিবাদ তো করলেনই না, বরং প্রস্তাব করে বসলেন, তিনিও সে সভায় যেতে উৎসুক। এই তাক্সব ব্যাপারটিও কিন্তু আমাদের আর একটি তথ্য জ্ঞাপন করল। বোঝা গেল, পাণ্ডু যে ঈশ্বরের তপস্শা করেছেন, সেই ঈশ্বর আর সেই ব্রহ্মার মধ্যে অনেক তফাৎ। তা না হলে মূনিদের পরামর্শে তিনি ব্রহ্মলোক দর্শনের এ স্বযোগ কিছুতেই ছাড়তেন না। যার জন্য তপস্শা, তাঁকে যদি কয়েকটা চড়াই ভেঙে চট করে একবার চাক্ষুষ করে আসা যায় তবে সেই স্বযোগ কেই বা ছেড়ে দেয়। বিশেষ, পাণ্ডু তো রাজ্যটাই ত্যাগ করেছেন ভগবানকে পাণ্ডুর অন্ম।

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

এবারের বিধানসভা : একটি পর্যালোচনা

(দর্পণের প্রতিনিধি)

এবারের বিধানসভায় সরকার পক্ষে যেমন অসংখ্য হুজুত এসেছেন তেমনি বিরোধী পক্ষেও আছেন বিরোধী দলপতি শ্রীকালীকান্ত মৈত্র, শ্রীহরিপদ ভারতী, শ্রীবিষ্ণুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ বক্তারা। কংগ্রেসের নামজাদা লোক এসেছেন কেউ কেউ কিন্তু প্রতিষ্ঠিত বক্তা হিসেবে খ্যাতি কারও নেই। শ্রীভোলা সেন আইনবিদকিছু যেহেতু তিনি কোনদিনই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে ছিলেন না সেইহেতু তিনি বলতে গিয়ে রাজনৈতিক ভারসাম্য হারিয়েছেন বেশ কয়েক বার।

৭২ সালে নির্বাচনী কারচুপির মাধ্যমে কংগ্রেস তথাকথিত নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার, দোহাই দিয়ে এই রাজ্যে স্ব-সরকার কায়ম করেছিল এবং রাজনৈতিক ক্লাউন সিদ্ধার্থস্বরূপ হয়েছিলেন যার মুখ্যমন্ত্রী সেই সরকারের বিরুদ্ধে খুন, রাহাজানি, নারীধর্ষণ, স্বজনপোষণ, চুরি লাম্পাট ইত্যাদি সমস্ত দুর্নীতির অভিযোগ আজ নৈতিক ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। বামফ্রন্ট সরকারও এতদসম্পর্কিত তদন্ত কমিশনগঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে গোটা রাজ্যের মানুষের প্রত্যাশাকে কার্যকরী করেছেন। ফলে, এখন সরকারপক্ষীয় সদস্যদের ভাষণে ও আচরণে ততখানি ঐর্ষ্য ও স্বৈর্য প্রতিকলিত হওয়া সরকার যা থেকে প্রতিবিশিত হবে তাঁদের অতুলনীয় ও অনমনীয় ব্যক্তিত্ব। বেদনার সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এবারের বিধানসভা অধিবেশনে সরকারপক্ষের কিছু কিছু সদস্য মাত্রাধিক গণ্ডগোল করেছেন কংগ্রেস সদস্যদের ভাষণের সময়। বাজারী কাগজগুলো এই মুহূর্তে হয়তো এইসব সদস্যদের বেশ খুশী রাখছেন প্রচারের শিরোনামায় এত কিছু ভুলে গেলে চলবে না যে প্রতি-ক্রিয়ামূল স্বার্থের ক্রীতদাস এই বিরুদ্ধ ও বিজয়ীবিবেক সাংবাদিকরাই আবার একদিন এগুলোকে ব্যবহার করবে বামপন্থী ফ্রন্টের বিরুদ্ধে কুৎসার রসদ হিসেবে। ৬৭ ও ৬৯ সালের অভিজ্ঞতা বিস্মৃত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর অনন্ত-সাধারণ ব্যক্তিত্ব বিদিত। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ডঃ অশোক মিত্রও। আকর্ষণীয় এক দৃঢ় ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তি স্পীকার সৈয়দ আবুল মনসুর হাবিবুল্লাহ। এক মধুর স্বভাব ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলেন বামপন্থী ফ্রন্টের চীফ হুইপ শ্রীদীনেশ মজুমদার। এঁরা যেখানে বামপন্থী ফ্রন্ট বিধানমণ্ডলীর মুখপাত্র সেখানে

বিধানসভার কোন বামপন্থী সদস্যকেই এই রাজ্যের নির্ধারিত মানুস চপলচিত্ত অথবা অস্থিরমতি দেখতে চান না। বিধানসভার বিরোধী দলপতি শ্রীমৈত্রও যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তাই, বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশনগুলোতে এইসব সদস্যরা একটু পরিমিত আবেগ প্রয়োগ করবেন—এটাই আমরা আশা করবো। কিছু কিছু ইতিমধ্যে বিক্ষিপ্ত রসালো মন্তব্য তো হবেই এবং রাজনৈতিক মন্তব্যও। যেমন বিনয় কোন্ডার ভোলা সেনের উদ্দেশ্যে বলেছেন, “হাতের রক্ত ধুয়ে আনুন।” মন্তব্যটি যেমন ধারালো তেমনি ব্যঙ্গাত্মক। অথবা “ভোলে বাবা পার করোগা।” যেমনি রসালো তেমনি ইঙ্গিতবহ। মাঝে মাঝে একটু ব্যাণ্টারিং, একটু হুইপ তো চলবেই।

পূর্ব রেল স্বেচ্ছাচারিতার রাজত্ব

সাধন গুহ

ইতিপূর্বে দর্পণে পূর্বরেলের শিয়ালদা ও হাওড়া বিভাগের কিছু কিছু প্রশাসনিক দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হওয়ায় মৌচাকে চিল পড়েছে। এই দুইটি বিভাগ, বিশেষ করে শিয়ালদার প্রশাসনিক গোষ্ঠী-চক্রান্ত একটা কিম্বদন্তীর পর্যায়ে এসে গেছে। শিয়ালদা বিভাগের ইতিহাস মানেই দুর্নীতির বীভৎস অধ্যায়। এখানে প্রশাসনিক কর্তাদের আলীবাদপুত্র কর্মচারীদের খেচাচারী আচরণ সমস্ত শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। প্রশাসনিক দুর্নীতি ছাড়াও মদ মেয়েছেলে জুয়া ইত্যাদি নানা অপকর্মেরও বর্তমান ঘাঁটি শিয়ালদা।

ইতিপূর্বে দর্পণে শিয়ালদা বিভাগীয় টি, টি, ইদের সিলেকশন গ্রেড এবং এতদসম্পর্কিত প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতার সবিস্তার আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে যার প্রতিক্রিয়া হুহু হয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে যে, শিয়ালদা-টি, সি, এবং টি, টি, ইদের ওপর এই খবর প্রকাশের পর থেকে আবার নতুন করে জুলুম হুহু হয়ে গেছে। এই জুলুমের অগতম স্থপতি হচ্ছেন শিয়ালদার এডিশনাল সি, আই, টি শ্রীএস, এন, চ্যাটার্জী। চাটুজে মশায়ের প্রসঙ্গটি আলোচনার আগে টি, টি, ইদের স্পেশাল গ্রেড সিলেকশন সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত করতে চাই।

শিয়ালদার ‘সিলেক্টেড’ বলে বর্ণিত একাংশ টি, টি, ই’র প্রার্থনা

কিন্তু বিরোধী পক্ষের বক্তৃতার সময় ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে যুথবন্ধ হুমোড় সৃষ্টি কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। স্পীকার বারবার সদস্যদের সতর্ক করেছেন, চীফ হুইপ বার বার শাস্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তবু কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে। ২৯শে জুন যখন কংগ্রেস সদস্য শ্রীভোলা সেন বলছিলেন তখন সি, পি, আই এম-এর কয়েকজন তরুণ সদস্য ভীষণ বাধা দিচ্ছিলেন কিন্তু অগ্নিতে স্বাহুতি দেন আর এস পি-র প্রবীণ সদস্য অমল রায়। তিনি ভোলা সেনকে বলেন, “বসে পড়”। এই আচরণ কচিবিগর্হিত এবং এ ধরনের রকইয়ারি ব্যবহার কংগ্রেসীদেরই অঙ্গের ভূষণ—বামপন্থীদের নয়। অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্রকে লক্ষ্য করে ভোলাবাবু অনেক অরাজ-

নৈতিক এবং অপোতন উক্তি করেছেন। ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদের উত্তেজিত করার মতোই সেসব মন্তব্য-গুলো কিন্তু যে কথা ভোলাবাবুর মতো আদর্শহীন, কারণ ক্রিম্যার বশ-বর্তী এক স্বার্থবাজ ঘুঘুর মুখে শোভা পায়, আদর্শনিষ্ঠ সি পি আই (এম) অথবা অন্য কোন বামপন্থী সদস্যের মুখে তা শোভা পায় না, কারণ, বামপন্থীদের আদর্শ আছে নিষ্ঠা আছে, সততা আছে এবং সর্বোপরি আছে জনগণের প্রতি আনুগত্য। জনগণই বামপন্থী মানসিকতার নির্দেশক ও সচেতক কিন্তু জনগণ ছিলেন ভোলা সেন নামক হঠাৎগজা কংগ্রেসী তথা তস্য মুখ্য সিদ্ধার্থস্বরূপ এবং তাঁদের দলীয় জগদ্ধাত্রীর ক্ষমতা লোলুপতার যুগকাঠে নিয়মিত বলি। কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের মধ্যে এটাইতো মৌল পার্থক্য।

বামপন্থী সদস্যরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, ভোলাবাবুর প্রথম

ইদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে না যাচ্ছে, সি, আই, টি যতক্ষণ না তার অকিস বোর্ডেলিট টানিয়ে দিচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এর কার্যকরী বৈধতা কোথায়? এতদসঙ্গে এই লিষ্ট মহামান্য বিচারপতির কাছে পেশ করা হয়েছে কারণ একটা গোষ্ঠীচক্রান্তের ফলেই পেছন দরজা দিয়ে লিষ্ট পাচার করে সমস্ত সম্ভাব্য বিক্ষোভের মুখে কুলুপ এটে দেওয়া হয়েছে আদালতের আদেশনামা জারী করে। কেন এই জঘন্য চক্রান্ত? টি, টি, ইদের মধ্যে এই পারস্পরিক বৈরিভাব রচনার রহস্যটাই বা কি? এর কারণ, স্বস্থ ও সাবলীল প্রশাসনিক ভিত্তি রচিত হলে শিয়ালদার বর্তমান ডি, এস, শ্রীকে, এ, টিকুর তুঘলকী রাজত্বের অবসান ঘটবে অবিনশে। স্বস্থ ও সাবলীল প্রশাসনিক ভিত্তি রচিত হলে এস, সি, ও, জি শ্রীসরোজ মুখার্জীর মদতপুত্র শ্রীএস, এস, চ্যাটার্জী এডিশনাল সি, আই, টির পদ থেকে প্রতি ছয় মাস পর একটি করে এক-সটেশন পেয়ে টি, টি, ইদের ওপর জুলুম করে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের মনো-রঞ্জন করতে পারবেন না। স্টেট-বিলিটির নাম করে কর্তাদের গোষ্ঠী-ভুক্ত বিশেষ বিশেষ টি, টি, ইদের আনিং বাড়াবার স্বযোগ দেওয়া হয় কিন্তু সাধারণ ভাবে টি, টি, ইদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই, তাদের জন্ম উপযুক্ত রেট কম নেই, এদের প্রতি অফিসারদের ব্যবহার

দিনের বক্তৃতায় অশোকবাবুকে অহেতুক ব্যক্তিগত আক্রমণ করা সম্বোধ: মিত্র মুখ খোলেননি, কিন্তু তাঁর জবাবী ভাষণে যুক্তির স্বতীক্ৰ শাসকে সেন মশায়কে তিনি ধরাশায়ী করেছেন। অবশ্য ভোলাবাবুদের লজ্জার বালাই নেই বলেই তিনি অশোকবাবুর বক্তৃতার মাঝেই নানা ভাবে বাধা দিয়েছেন। ডঃ মিত্র “ভোট অন এ্যাকাউন্টস” চেয়ে যে ভাষণ দিয়েছেন কংগ্রেস পক্ষ ছাড়া অন্যান্য বিরোধী দলগুলো তার সাব-বক্তা স্বীকার করে নিয়েছেন। অশোকবাবুর বাজেটের দর্পণে ভোলা সেন, আবেদিন, আবদুস সাত্তার প্রমুখ কংগ্রেসী বাস্তবঘুরা নিষেদের দম্ব বদন দর্শন করে আতঙ্কিত। তাঁরা অনেক উত্তেজনা সৃষ্টি করে বিধানসভার মধ্যে একটা অস্বাভাবীয় পরিবর্তি ঘটাবার পরিকল্পিত চক্রান্ত করছেন। নিশ্চয়ই আশা করবো যে বামপন্থী ফ্রন্টের সদস্যরা সেই চক্রান্তের ফাঁদে পা দেবেন না।

দেখলে মনে হয় এঁরা যেন চাটুজ্যে মুখোজ্যেদের খাস মহলের বান্দা।

রেলমন্ত্রী শ্রীদত্তবতে বারবার ব্যয় সংকোচনের কথা বলেছেন। প্রশ্ন উঠবে, হাওড়ার মত বড় ডিভিসনেও যেখানে এডিশনাল সি, আই, টির পদ নেই সেখানে অপেক্ষাকৃত ছোট ডিভিসন হওয়া সত্ত্বেও শিয়ালদা, ডিভিসনে এই পদ স্থাপিত করা হয়েছে কেন? বার বার শ্রীএস, এস, চ্যাটার্জীকে এই পদে এসেটেনশন দেওয়া হচ্ছে। অথচ, এই ডিভিশনের জন্য কোচ এ্যাটেনডেন্ট এবং কণ্ডাক্টর টি, টি, ইদের কয়েকটি পদ রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক বরাদ্দ থাকলেও অতাবধি তা কার্যকরী না করে যাত্রী-দেব স্বার্থ অবহেলা করা হচ্ছে এবং একান্তই অপ্রয়োজনীয় সি, আই, টি পদ স্থাপিত করে রেলের টাকার অপচয় ঘটানো হচ্ছে। যখন তখন টি, টি, ইদের লেস আনিংয়ের অজুহাতে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে কিন্তু কর্তৃত্বজ্ঞা একাংশের সাতখুন মাপ। টিকু সাহেব নাক্ষি ঘোষণা করেছেন যে তিনি বর্তমান রেলমন্ত্রীর কোন পরোয়া করেন না কিন্তু সাহেব যেন মনে রাখেন এবং একই সঙ্গে মুখোজ্যে চাটুজ্যেরাও যেন ভুলে না যান যে জমান পালটাচ্ছে।

বিনা দোষে

বিনা দোষে সরকারী ডাক্তারের শাস্তি

শ্রীঅজিত পাণ্ডার শাসনকালে স্বাস্থ্য দপ্তরের এক শ্রেণীর পেটোয়া অফিসার যেমন চুরি করে গাড়ী বাড়ী করেছেন, অত্যাধিক তেমন অনেক সং ও কর্তব্যপারায়ণ অফিসারকে বিনা দোষে শাস্তি পেতেও হয়েছে। প্রসঙ্গত এই ধরনের একটা ঘটনার কথা জানাচ্ছি।

আমার স্বামী ডাঃ পরেশনাথ চ্যাটার্জী মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মেডিক্যাল অফিসার ইনচার্জ পদে প্রায় দু বছর প্রচণ্ড স্বনামের সঙ্গে কাজ করছিলেন। ১৯৭৫ সালের 'জাহ্নবীরী' মাস নাগাদ মালদা জেলার আদ কংগ্রেস নেতা শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মৈত্রকে আহত অবস্থায় হরিশ্চন্দ্রপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসেন-স্থানীয় থানার ও, সি,। শ্রীমৈত্র তখন বুকে প্রচণ্ড ব্যথার কথা বলেন। আমার স্বামী ডাঃ চ্যাটার্জী আহত শ্রীমৈত্রকে পরীক্ষা করে সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করে নেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের মালদা সফর কালে এই প্রহারের ঘটনা ঘটে। ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ হল মুখ্যমন্ত্রীর সফর সূচীর জ্ঞাতালুকা ডাক বাংলোয় আসবার কেনা ও সংস্কারের কাজে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করা হয়। হরিশ্চন্দ্রপুরের অসংখ্য দরিদ্র মানুষ তখন অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের জ্ঞাত শ্রীমৈত্র ডাক বাংলোর সামনে অনশন শুরু করেন। এই অনশন স্থানীয় জনসমাজে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। মুখ্যমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে এ ধরনের এক অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে সম্ভবতঃ মালদা কংগ্রেস চায় নি। তাই কিছু সংখ্যক গুণ্ডা প্রকৃতির লোক অতর্কিতে শ্রীমৈত্রের ওপর আক্রমণ করে। সৌভাগ্যবশতঃ স্থানীয় থানার ও, সি, সময় মত ঘটনাস্থলে এসে শ্রীমৈত্রকে উদ্ধার করেন।

শ্রীমৈত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর ডাঃ চ্যাটার্জীকে পুরোক্ষ ভাবে চাপ দেওয়া হয় তাকে ছেড়ে দেবার জ্ঞাত। কিন্তু মানবিকতার কারণে ডাঃ চ্যাটার্জী অস্থূল রোগীকে ছুটি দিতে রাজী হন নি। দিন পনেরো হাসপাতালে থেকে শ্রীমৈত্র কিছুটা স্বাভাবিক হলে তাকে ছুটি দেওয়া হয়। স্বচিকিৎসার জ্ঞাত এরপর তিনি কলকাতায় চলে যান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে শ্রীমৈত্র এরারের নির্বাচনে জনতার প্রার্থী

হয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেছেন।

এই ঘটনার পুরই সেই ও, সি-কে অত্যাধিক বদলি করে দেওয়া হয় এবং গুজব রটে যে আমার স্বামীকেও বদলি করা হচ্ছে। কিছু দিনের মধ্যেই হরিশ্চন্দ্রপুর জেলার উচ্চ-পর্যায়ের অফিসারদের এক সভা ডাকা হয়। সভায় জেলার মন্ত্রী বরকত গনিখান সহ কংগ্রেস নেতা ও এম, এল, এরা উপস্থিত ছিলেন। সভা চলাকালীন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা গুরুদাস সাহেব অভিযোগ করেন যে হাসপাতালের ডাঃ চ্যাটার্জী এক রোগীকে অপারেশনের জ্ঞাত অনেক টাকা নিয়েছেন এবং সেই রোগী এখনও ভর্তি আছে। ডাঃ চ্যাটার্জী সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদ করেন। উপস্থিত মন্ত্রী বরকত সাহেবের নির্দেশে জেলা শাসক সি, এম, ও, এইচকে তদন্ত করতে বলেন। সি, এম, ও, এইচ ডাঃ অপূর্বকুমার সাহা তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং জানান যে অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

কিন্তু স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা অকারণে আমার স্বামীকে অপমান করতে লাগলেন। এমন কি, টেলিফোনেও শাসানি চলে। ৭৫ সালের জুলাই মাস নাগাদ আমার স্বামীর বদলির আদেশ এল। আদেশের বয়ান ছিল স্থানীয় জনসাধারণের স্বার্থে আমার স্বামীকে যেন সঙ্গে সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে অত্যাধিক বদলি করা হয়। আদেশাভ্যাসী আমার স্বামীকে চাঁচল হাসপাতালে বদলি করা হল।

ঘটনার সমাপ্তি এখানেই ঘটে নি। হরিশ্চন্দ্রপুরে বহু পরিস্থিতি পরিদর্শনের জ্ঞাত মুখ্যমন্ত্রী এলে এক জনসমাবেশ হয়। সভায় মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে স্থানীয় কংগ্রেস মহলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে এখানকার প্রাক্তন মেডিক্যাল অফিসার ইনচার্জ হাসপাতালের গুপ্ত বাইরে বিক্রী করে প্রচুর পয়সা করেছেন এবং এর তদন্ত করা হোক। মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তারবাবুর নিম্নায়ম করে বলেন যে প্রয়োজনীয় তদন্ত করা হবে। কিন্তু তদন্ত তো ঘরের কথা এ বিষয়ে পরে আর কোন আলোচনাও করা হয় নি। আসলে এই অভিযোগের কোন সত্যতা ছিল না। কেবলমাত্র জনসমক্ষে আমার স্বামীকে হেয় করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

বিনা দোষে বছরের মাঝামাঝি সময়ে আমার স্বামীকে বদলি করা হলেও, ছেলেদের পড়াশুনার স্বার্থে আমাকে একা হরিশ্চন্দ্রপুরে আরো কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। কলকাতা থেকে অনেক দূরে, আত্মীয়-স্বজন ছাড়া অসহায় আমাকে একা দেখেও স্থানীয় কংগ্রেসীদের রাগ কমে নি। বরং কোন কোন উদ্ধত কংগ্রেসী যেমন বুলবুল রায় আমাকে একলা দেখে পথে ঘাটে টিটকারি দিয়েছে। সেদিনের সেই প্রচণ্ড বিপদের সময়ে আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্তা ছিলেন মালদার তৎকালীন সি, এম, ও, এইচ ডাঃ অপূর্বকুমার সাহা। সময়ে সময়ে তিনি আমাদের খোজ খবর করেছেন। এর জ্ঞাত তার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

পাপের বেতন কংগ্রেস পেয়েছে। অত্যাচারীর পতন ঘটেছে। বামপন্থী সরকারের নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন এই যে আমার স্বামীর মত বিনা দোষে কেউ যেন শাস্তি না

পায়। অপরাধীর শাস্তি হোক এটা সবাই চান। কিন্তু বিনা দোষে কেউ যেন শাস্তি না পায় এটাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

ইলা চ্যাটার্জী

বালিচকে ছাত্র খুন

রবিবার ২৬শে জুন তারিখে বালিচক ভবন বিদ্যালয়ের ছাত্র সত্যব্রত বসুকে পিটিয়ে মেরে ফেলার প্রতিবাদে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক শোক মিছিল বালিচক পথ পরিভ্রমণ করে। ২০শে জুন বালিচক ব্যবসায়ী সমিতির ডাকে এখানে দোকান বাজার বন্ধ থাকে। পুলিশ এ ব্যাপারে বালিচকের একই পরিবারের তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। জানা গিয়েছে নিহত ছাত্রটি তার বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান ছিল।

সাক্ষী প্রস্তুত

শান্তিপুর শহরের প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি হরপ্রসাদ জিবেদ হত্যাকাণ্ডের মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়েছে গত ১৫ই জুন থেকে। কৃষ্ণনগর সেশন জজকোর্টে শ্রীএস, এন, ব্যানার্জীর এজলাসে। এই মামলার অত্যন্ত সাক্ষী পঙ্কজ শর্মা নামক জনৈক যুবক নুসিংহপুর এলাকায় গত ২২শে জুন সকালে এই মামলার আসামী পক্ষের কয়েকজন দুষ্কৃতকারীর দ্বারা পথিমধ্যে ভীষণ ভাবে প্রহত হন। প্রকাশ, এদিন শ্রীশর্মা সাইকেল যোগে এ এলাকার কতিপয় সাক্ষী সহ শান্তিপুরে আসার পথে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার পরে শ্রীশর্মাকে প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় শান্তিপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠান হয়। এছাড়া শ্রীশর্মা সমস্ত ঘটনার বিবরণসহ স্থানীয় থানায় দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে এক এজাহার দাখিল করেন। এ ব্যাপারে পুলিশ অহুসস্থান চলছে।

নাই বা কিনলেন দেখতে আপত্তি কি!

দেখলেই কিনতে হবে এমন
কোনও মাথার দিব্যি দিচ্ছি না।
তবে দেখতে দেখতেও তো আপনার
কেনার ইচ্ছা হতে পারে। তাই
চলে আসুন। হ্যাঁ, আজই। তবে
একা নয়। ছেলে বড়ো-বাচ্চা-
জোয়ান, সবাই, সবাই.....

আমাদের শোরুমঃ
১৪/১০, গড়িয়াহাট রোড,
কলকাতা ৭০০০১৯
বি. ডি. মার্কেট, সফট লেক
বনগাঁ বাজার, বনগাঁ থানা, বহরমপুর



ব্যাশনাল টেক্সটাইল
কর্পোরেশন

৭১, জহরলাল নেহরু রোড,
কলিকাতা-৭০০০১৩

IPB

সুব্রত সমাচার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

অবশেষে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর স্বতন্ত্র মুখ্যমন্ত্রী কার্যকলাপে হস্ত দিয়েছে। তারা অভিযোগ পেয়েছে যে, মন্তান-মন্ত্রী স্বতন্ত্র মুখ্যমন্ত্রী নৃতি চাকরির বিনিময়ে লোকের কাছ থেকে আত্মপিত্ত এক থেকে পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ না নিয়েছেন। এটা এমন কি নতুন ধরনের বোকা গেল না। এতদিন নামে গোয়েন্দা দপ্তর যদি ভেবে থাকে যে, স্বতন্ত্র মুখ্যমন্ত্রী তাদের তদন্তের ইবিধার ভুক্ত এই টাকার ভুক্ত/বিনিময় বা এই জাতীয় কোন প্রমাণ বেধে পেয়েছেন তাকলে তার বুদ্ধি সম্পর্কে অবিচার করবেন।

যদিও এর চেয়ে বেশী প্রমাণ পাওয়া যাবে কনট্রোল এবং নীতের ব্যাপারে যে ভাবে বিনা মীলামে এবং বিপদে ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা করে বন্দোবস্তের কোম্পানীগুলিকে কনট্রোল পাটরে দেওয়া হয়েছে তা থেকেই প্রমাণ হবে মন্ত্রীর সঙ্গে এই সমস্ত কোম্পানীর তুলার তুলার লেনদেনের ব্যাপার। একটি দৃষ্টান্ত হল স্বর্গীর ঘোষণা জি, বি ইনডাস্ট্রি। প্রকাশ নিলাম না করে যে ভাবে এদের কী পাকিং জোন পাটরে দিয়ে বছরের পর বছর তার বর্ধকাল বৃদ্ধি করা হয়েছে, ডান হাত

বা হাতের বাগার হাজা এটা হতে পার না। পৌর বাজারের ইল বিতরি ব্যাপারে জো লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়েছে। স্বতন্ত্র মুখ্যমন্ত্রী আত্মীয় পরিজনদের নামে কলকাতার সম্পত্তি এবং বসন্ত অ্যাকাউন্ট এবং লকাবেব অফিস খোলার ক্ষমতা পাওয়া যাবে।

এই ব্যাপারে যে দুই ব্যক্তি প্রথম দিকে স্বতন্ত্রবাবুকে সর্বাধিক সাক্ষি দিয়েছেন তাদের একজন হলেন তৎকালীন ডি. সি. পাসোমেল অচিন্ত্য সরকার এবং ডি. পি. ও. এবং পদাধিকার বলে সিলেকশন কমিটির সচিব অরুণ ব্যামার্জী। শেষোক্ত ব্যক্তি সাদা নিয়োগপত্র সই করে মন্ত্রীর সি-এ বাবলু মুখার্জীকে রাইটাসে পাঠাওন এবং বাবলু মুখার্জী লেনদেনের পরে সেই সাদা নিয়োগপত্রে বদায়োগ্য নাম বদিয়ে দিতেন। এর ফলে অচিন্ত্য সরকারের মত অপদার্থ ইঞ্জিনিয়ার এবং অরুণ ব্যামার্জীর মত আকাউন্ট ডি. সি. এবং সেক্রেটারির পদে পাকা হয়েছেন। স্বতন্ত্র মুখ্যমন্ত্রী পক্ষে এটা এমন বেশী কিছু নয়। যিনি বীরেন মহাশয়ের মত মন্তানকে ডেপুটি এডুকেশন অফিসার করতে পারেন তিনি যে মধু চ্যাটার্জীকে হেলথ অফিসার, শাস্তি সেনকে চীফ ইঞ্জিনিয়ার এবং স্বর্গী ভট্টাচার্যকে অ্যাসেসর করতেন নিতাই তো বেশী। কিছু কিছু অফিসার এখন ইমার্জেন্সি কাহিনি গেয়ে নিজেরা ঘোরা তুলসীপাত হতে চাইছেন। তাদের চক্রমের আসল প্রেরণা হল নিজেদের আয়ের গুণাগোণ এবং এ দিয়েই তাদের কাছের বিচার করতে হবে।

অপরাধের প্রমাণ

অপরাধী যাওয়ার আগে অপরাধের প্রমাণ লোপ করার চেষ্টা করে লভ্য। কিন্তু একেবারে লোপ করতে পারে না। পৌরসভার কর্তাদের বেলারত দে. কথা লভ্য প্রমাণ কিছু না। কিছু পাওয়া যাবেই। যেমন টাকা নিয়ে চাকরী দেওয়ার অন্ততম প্রমাণ হল বিনা দরখাস্তে নিয়োগপত্র দিয়ে কাজে যোগদান করা। ১৯৭৪-৭৫ সালের এমন বহু নথির খুঁজলে এখনও পাওয়া যাবে।

বেটার লেট

জুনিয়র কঁদের খাতা শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা করােনো হল। পৌরসভার বড় বর্তাদের এখন আর কর্তৃত্বভাষির দোষ দেওয়া যাবে না। অস্ত্রের খাতার পরীক্ষাখীনা নাকি আখতার ১০০০র মধ্যে ১৮, ১৯ নম্বর পেয়েছে। এর দ্বারা পরীক্ষা হলেন অবস্থাই শুধু হাচত হয় না, আরও মালুম হয় যে, আজকালকার বেকারেরা এক একজন সন্তান বা সোমেশ বাস। ষ্টাও ডি গ্রেড কঁদের খাতা পুড়িয়ে না কেললে আবার রোমহর্ষক রহস্যের সন্ধান পাওয়া যেত। পৌরসভার কোন কোন কড়া নাকি এখনো স্বতন্ত্র মুখার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এখনো তার আদেশ প্রতিপালন করেন।

একটি আবেদন

আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, বাংলা মাসিক 'অনীক' আবার প্রকাশিত হতে চলেছে। ১৯৭৫ সালের জুলাই সংখ্যা বের হবার পর পত্রিকার সম্পাদক এবং সম্পাদকমণ্ডলীর আর একজন সদস্য গ্রেপ্তার হবার ফলে 'অনীক' এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাস থেকে আবার আগের মতোই নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হবে।

কিন্তু দীর্ঘ দু'বছর 'অনীক' এর প্রকাশ বন্ধ থাকার স্বতাবতই প্রচণ্ড কিছু সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। অকস্মাৎ প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবার ফলে বিপুল পরিমাণ টাকা আদায়ই হয় নি। বর্তমানে অনীক এর নিয়মিত প্রকাশের ইতিহাস বজায় রাখতে হলে আমাদের অন্ততঃ ৩০০০ টাকার একটি প্রাথমিক তহবিল দরকার। ইতিমধ্যেই অনেক বন্ধু ও শুভাশুভায়া 'অনীক'-এর পুনঃপ্রকাশের জন্য আমাদের অহরোধ করেছেন। যাঁরাই 'অনীক'কে একটি নিয়মিত প্রগতিশীল বাংলা মাসিক পত্রিকা

হিসেবে বাঁচিয়ে রাখতে এবং বিকশিত করে তুলতে চান, তাদের সবার কাছে আমাদের আবেদন— অনীক-তহবিলে মূলতঃ অর্থসাহায্য পাঠিয়ে অনীককে তার যথোপযুক্ত স্থমিকা পালন করতে সাহায্য করুন। তাছাড়া, গত দু'বছরে অনীক-এর অনেক বন্ধু, শুভাশুভায়া, লেখক গ্রাহক ও বিক্রেতাদের সংগে আমাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। 'অনীক'-এর সমস্ত বন্ধু ও শুভাশুভায়ায়ীদের কাছে আমাদের আবেদন— আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন।

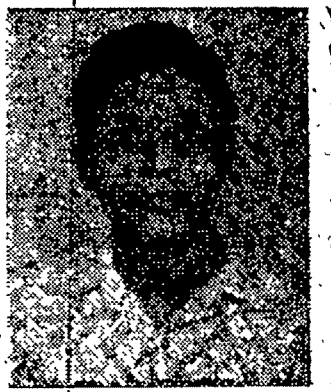
গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ পাঠান, গঠন-মূলক মতামত জানান, গ্রাহক সংগ্রহ করুন (বার্ষিক টাকার—১৮ টাকা) এবং অনীক-তহবিল গঠনের অভিযানকে সাক্ষাৎমুখিত করে তুলুন।

দীপংকর চক্রবর্তী
সম্পাদক, 'অনীক'

১, কুলদা রায় লেন

পো: বাগড়া-৭৪২১০৩

মুর্শিদাবাদ জেলা (পঃ বঃ)



সন্ধান চাই

গত ১৫ই জুন সন্ধ্যা ৭টা থেকে ছোট্ট নামে ৩ বৎসর বয়স্ক এক মুসলিম বালকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তার গায়ের রং 'মারামাসি'। পরনে ছিল গেঞ্জি ও হাফপ্যান্ট। ডানপায়ে কাটা দাগ আছে। হিন্দী-ভাষী, কিন্তু ভাল বলতে পারে না। কেউ সন্ধান পেলে দয়া করে তার পিতা, সিদ্দিক হুসেন C/o আরিফ হুসেন, এ. এইচ। ১৬, বিবিবাগান লেন, কলকাতা-১৫—এই ঠিকানায় খবর দেবেন।

জনতা পাটি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাজ্যের বেশ কিছু জনতা নেতা বর্তমান কমিটি ভেঙে দিয়ে অ্যাডহক কমিটি করার দাবী জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দও সম্মতি পাওয়া গেছে। তবে প্রফুল্লবাবুকে সরানোর ব্যাপারে এখনও ঘিমত আছে। একপক্ষ বলছেন প্রফুল্লবাবুকে রেখেই নতুন করে কমিটি কর হোক। তাদের বক্তব্য পশ্চিমবঙ্গে জনতা দলে প্রফুল্লবাবুর বিকল্প নেতৃত্বের অভাব। অতাপক্ষ বলছেন, না প্রফুল্লবাবুকে সরিয়ে দেওয়া হোক। নির্বাচিত করা হোক নতুন সভাপতি। এ ব্যাপারে তিনটি নাম নিয়ে আলোচনা চলছে। হুশীল ধাড়া, আভা মাইতি এবং হরিপদ ভারতী। হুশীলবাবু কেন্দ্রের মন্ত্রী হতে পারেন। সে ক্ষেত্রে আভা মাইতি অথবা হরিপদ ভারতীর মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে। বেশীর ভাগ নেতারই ও ত্রীমতী মাইতির পক্ষে। অবশ্য টাকা সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। চন্দ্রশেখর হুহু হয়ে মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবেন। এই অবস্থায় প্রফুল্লবাবু পদত্যাগ করেছেন। এখন দেখা যাক দিল্লী কি করে?

এই সময়ে সহরের সম্পদ মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদের গৃহে 'বাবু' নামে এক প্রেমীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগ-সুখেই দিন কাটাইত।

রামতনু লাহিড়ীর কলকাতা

এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ-আখড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাঙে বারানাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত।

শিবনাথ শাস্ত্রী-র 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসামাজ্য' হইতে।



এ কাহিনী যখনকার রামতনু লাহিড়ী তখন বালক। আর কলকাতা তখন শিশু। তখনো ফুটপাথ তৈরী হয়নি কলকাতায়। রাস্তার দুধারে নর্দমা। পুকুরে পুকুরে পচা জল। ঘরে ঘরে বিয়াক্ত অসুখ, যার নাম 'লোনা-লাগা'। আজকের চোখে সেকালের কলকাতা যেন অনেকটা দুঃস্বপ্নের মতো। কিন্তু আজকের চোখে আজকের কলকাতাও কি কখন দুঃস্বপ্ন? কলকাতা বড় হয়েছে। দশদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তার কর্মকাণ্ডের রহৎ জগত। অথচ তার অগ্রগতি ব্যাহত। ব্যাহত, কারণ জীবন যাত্রার প্রতিবেশ মন্থর। মন্থর, কারণ মোকসংখ্যায় তুলনায় মানবাহন অল্প, যান-বাহনের তুলনায় পথ সংকীর্ণ। আজকের এই কলকাতাকে নতুন গতিবেগে উদ্ভীষিত করতে পারে ভূগর্ভ রেল। ভূগর্ভ রেল মানেই দ্রুতগতি অথচ নিবিঘ্ন ভ্রমণ।



কলকাতার নতুন মানচিত্র)
রচনায় ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট
প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

কর্তৃপক্ষের দমন পীড়নের বিরুদ্ধে পিয়ারলেসের কর্মচারীরা আন্দোলনে নেমেছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত সত্তর সালের পর থেকেই পিয়ারলেস কোম্পানীর ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। সত্তর সালে পিয়ারলেস কোম্পানীতে ছত্রিশ জন মতো কাজ করতেন। এই সময়ে একজন কর্মীকে বেআইনীভাবে হঠাৎ ছাটাই করা হয়। এই ছাটাইকে কেন্দ্র করেই এখানকার কর্মচারীরা প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে এবং সংঘবদ্ধ প্রতিবাদে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে ছাটাই আদেশ ফিরিয়ে নেন। পিয়ারলেস এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন কর্মচারীদের মধ্যে দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৭১ সালের শেষ দিকে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া ও বোনাসকে কেন্দ্র করে কর্মচারীরা সংগ্রাম শুরু করেন। কর্তৃপক্ষ মাত্র ষোল হাজার টাকা কর্মীদের দেবার পরিবর্তে রাতেব ক্ষমকারে এবং আলোচনা চলাকালীন অবস্থায় হঠাৎ ১৯৭১ সালের তিরিশে অক্টোবর লক-আউট ঘোষণা করেন। অতীতকালে ভীতি ও প্রলোভন দেখিয়ে কর্মীদের অধিকাংশকে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব দমদমের বাড়িতে কাজে যোগ দিতে বাধ্য করেন।

এর পর থেকেই কর্তৃপক্ষ কর্মচারী ঐক্য ও ইউনিয়ন ভাঙ্গার জ্ঞাত উঠে পড়ে লাগেন। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে তারা সক্ষম হয়েছিলেন ইউনিয়নকে ভেঙ্গে দিতে। আশ্রয় নেমে আসে, তৎকালীন ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের উপর। তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক গংকর কাজিলাল সহ পাঁচজনকে শিলিগুলিতে বদলী করা হল। এর পরে ইউনিয়নের সভাপতি সহ কার্যকরী সমিতির অধিকাংশ সদস্যকে ব্যাপকহারে বদলী করা হল। কাটিহার, রায়গঞ্জ ও আসানসোল শাখায় কলে সাময়িকভাবে হলেও ইউনিয়নের কাজকর্ম কিছুটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হল। কর্তৃপক্ষ এই সময়ে নানা প্ররোচনা ও সন্মতি সৃষ্টি করে কর্মচারীদের মনে এক ব্যাপক ভ্রাসের সৃষ্টি করে।

নিরাপত্তার আশ্বাস না পাওয়ায় যারা চাকরিতে যোগ দিতে পারলেন না তাদের মধ্যে বরখাস্ত করা হল শঙ্কর কাজিলাল, যতীন্দ্র দত্ত ইত্যাদিকে, ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে।

অবশেষে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আবার পিয়ারলেস এম-

এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের সদস্যরা যখন নতুনভাবে ইউনিয়ন চালাবার চেষ্টা সচেষ্ট হন, ঠিক তখনই কর্তৃপক্ষ তাদের কিছু পেটোয়া কর্মচারী ও বহিরাগত কিছু দালালের সহযোগিতায় ঐ মাসেই কর্তৃপক্ষের দমদমের বাড়িতে বসে এন, এল, সি, সি-ব ব্যানারে 'কর্মচারী সমিতি' নামে একটা দালাল ইউনিয়ন গঠন করেন এবং আলোচনা আলোচনা এই সংগঠনের সঙ্গেই চালানো হয়। অতীতকালে এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের কাজকর্ম বলপূর্বক বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করা হয়। শিলিগুলি শাখায় কর্মরত ইউনিয়নের চারজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কংগ্রেসী গুণ্ডাদের লেলিয়ে দেওয়া হয়।

গুরুত্বপূর্ণ এই বুদ্ধি মাকে কলকাতায় ফেলে বায়গঞ্জ বদলী নিতে অস্বীকার করায় বরখাস্ত করা হল ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির একজন সদস্যকে। নানা অজুহাতে এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের সভাপতি ছাটাই করা হতে লাগল। বায়গঞ্জ শাখার একজন কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হল কারণ তিনি গুরুতর অসুস্থ সারাবাব জগদীশচন্দ্র চিকিৎসার জন্য কলকাতায় চলে আসেন।

এরপর এল ১৯৭৫ সাল। পশ্চিমে জুন ঘোষিত হল আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা। জরুরী অবস্থার সুযোগে ১৯৭৫ সালের সাতাশে আগস্ট ছাটাই করা হল এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের অতীত সংগঠক শ্রীহরিত ঘটককে। 'অনুশাসন পর্ব' চলছে, তাই এতেই ওরা ক্ষান্ত থাকেন নি। পূর্বের বছরের এপ্রিল মাসে ঐ বিলম্বে উপস্থিতির মতো সামান্য কারণে চাকরী গেল এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅশোক চক্রবর্তী। এক অদ্ভুত অভিযোগে চাকরী গেল রতন দেবের। তাদের কাছে তাঁর চিকিৎসার জন্য জীত ওষুধের রসিদ চাওয়া হয়েছিল এবং তিনি ঋণায়ুক্ত ভাবেই তা দিতে অস্বীকার করেন এই কারণেই যে, পিয়ারলেস কোম্পানী কর্মচারীদের কোন চিকিৎসা ভাতা দেয় না বা বিন্দুমাত্র সাহায্যও করে না। তাই রসিদ দেবার প্রস্তাব গুলে না।

এরপর এল ১৯৭৭ সাল। লোক সভার নির্বাচনের পবিত্রক্ষেত্রে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পাল্টে গেল। পিয়ারলেস এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মীরাও অস্বাভাবিক অবস্থা বুঝে এই ইউনিয়নকে পুনরুজ্জীবিত

করা প্রয়োজন বোধ করলেন। কর্তৃপক্ষও খজা তুলে ধরতে দেয়ী করলেন না। ছাটাই করা হল জনৈক কর্মী দেবদাস ভট্টাচার্যকে। ইউনিয়ন ভাঙ্গার চেষ্টা চরিতার্থ করার জন্য বদলী করা হল ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির সদস্য পার্শ্ব শারথিসেনকে। বদলীর খজা নেমে এল কার্যকরী সমিতির সদস্য বিপ্লব সেন, শ্রীমল দত্তগুপ্ত এবং শুকদেব বসুর উপর। এছাড়া সাসপেন্ড করা হল অতীতকালে উৎসাহী সদস্য কল্যাণ চ্যাটার্জীকে।

ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নিল যে নির্বিবাদে এই অত্যাচার আর চলতে দেওয়া হবে না। প্রতিবাদের পথ হিসেবে নিয়মিত বিক্ষোভ প্রদর্শন হতে থাকল হেড অফিসের সামনে। এতেও কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করলেন না। অবশেষে ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত মত গত চন্দ্রিশে জুন বেলা সাড়ে তিনটে (১)

উপবোক্ত বদলী ও সাসপেনশন আদেশ প্রত্যাহার ও (২) এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের স্বীকৃতি দাবীতে এক স্বাবলম্বি নিয়ে হেড অফিসে সেক্রেটারীর কাছে গণ-ডেপুটেশন দেওয়া হয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। কিন্তু সেক্রেটারী শ্রীহৃদেব রায় ডেপুটেশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ তো করলেনই না, উপবাস কিছু পেটোয়া ও ভাড়াটে দালাল দিয়ে হেড অফিসের সমস্ত প্রবেশ পথগুলো তালাবদ্ধ করে দিলেন। নব্বুতিষ্ঠিত বামপন্থী সরকারকে অপদস্থ করার জন্য হেয়ার স্ট্রিট থানায় ও বুর্জোয়া কাগজগুলোর কাছে কর্তৃপক্ষ মিথ্যা নালিশ জানালেন যে, এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের সদস্যরা তাঁদেরকে 'ঘেরাও' করেছেন। বরং পেয়ে হেয়ার স্ট্রিট থানার ও, সি এবং এ, সি ঘটনাস্থলে প্রচুর পুলিশ নিয়ে উপস্থিত হন। তাঁরা তদন্ত করে ঘেরাও অভিযোগ মিথ্যা বুঝতে পারেন এবং কর্তৃপক্ষকে তিরস্কার করে শীঘ্র কোম্পানীর সমস্ত প্রবেশ পথ খুলে দেবার নির্দেশ দেন। এদিকে গত পয়লা জুলাই কর্মচারীরা অফিসে গিয়ে দেখেন যে,

তাঁদের দাবী সম্বলিত সমস্ত পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। পরিবর্তে দেয়ালে কোম্পানীর ষ্টো নোটিশ সর্বত্র দেওয়া হয়েছে।

লা জুলাই ১৭ এর মেমো নং ১৪/৭৭ ও ১৫/৭৭ সম্বলিত এই নোটিশ ছটিতে সেক্রেটারী ঐ চন্দ্রিশে জুনের ঘটনাকে সম্পূর্ণ মিথ্যাভাবে বহিরাগত দুষ্কৃতকারীদের সাহায্যে ইউনিয়ন কর্তৃক পাঁচখটা ঘেরাওয়ের কথা বা নয়েছেন এবং পুলিশ নাকি এসে কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও থেকে মুক্ত কবে। এই নোটিশ ছটিতে সেক্রেটারী আন্দোলনরত কর্মচারীদের প্রতি হুমকী ও সাবধান বাণী দিয়েছেন।

পিয়ারলেসের হাজার হাজার কর্মচারী মা লকের শোষণ ও মূল্যবোধ বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। লড়াই করছেন তাঁদের এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের স্বীকৃতির জন্য। সকলেই আশা করেন যে তাঁদের এই শাখা সংগ্রামের পাশে সর্বস্তরের পেশার মানুষ এসে সংহতি জানাবেন এবং বামফ্রন্ট সরকারের শ্রমমন্ত্রী স্বয়ং এগিয়ে এসে তাঁদের আশ্রয় দাবী মেটাবার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করবেন।

চলচ্চিত্রের গুরুতর সংকট

ভানুসিংহ

নতুন কেন্দ্রীয় বাজেটে চলচ্চিত্রের ওপর মূল্যায়নে শতকরা দশভাগ হারে যে আন্তঃস্বত্ব ধার্য করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বিশেষ করে আঞ্চলিক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে গুরুতর সংকট সৃষ্টি করবে। এ শব্দত প্রতিটি ছবির কারোখানি প্রিন্ট শুধু মুক্ত ছিল। এখন থেকে ছবির কোন প্রিন্টই শুধু মুক্ত রইল না। বর্তমানে সাদা-কালো ছবি-একটি প্রিন্ট কবাত পাঁচ হাজার টাকা লাগে। সেখানে শুধুখাতে দিতে হবে অতিবিক্ত পাঁচশো টাকা প্রিন্ট পিছু। একটা ছবির টিট হয় অনেকগুলি। এ ওপর রয়েছে চলচ্চিত্র নির্মাণের ওপর ট্যাক্স। হুতরাং বাংলা ছবি মাব খাবে প্রচণ্ডভাবে। হিন্দি ছবি সাধারণতঃ রঙীন হয়। ছবির কালার প্রিন্ট করতে খরচ লাগে ১২ হাজার টাকার মত। শুধু দিতে হবে ১২শ' টাকা প্রতি প্রিন্ট ব্যবদ। খরচ সেখানে আরও বেশী। প্রস্তাবিত লেভির যে হার নির্দিষ্ট হয়েছে, তা থেকে দেখা যাচ্ছে, একটি বাংলা ছবি অন্ততঃ বারোটি প্রিন্ট সহ তৈরী করতে এখন অতিরিক্ত ৬০ হাজার টাকা লাগবে। একেই তো চলচ্চিত্র শিল্প কবজ্জরিত—এই কর উৎপীড়ন অতিরিক্ত মনে রাখতে হবে।

বোম্বের ফিল্ম প্রোডিউসার

অ্যাসোসিয়েশন-এব সভাপতি জি, পি, সিঞ্জি বর্তমান লেভি প্রথা বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি আন্দোলনের ডাকও দিয়েছেন। বেঙ্গল মোশন পিকচার এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও লেভি ধার্যব ফলে চলচ্চিত্র শিল্পে উদ্ভূত সংকট সম্পর্কে প্রচণ্ড উদ্বেগ

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বক্তব্য

নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীগৌলা-নন্দ রায় এক বিবৃতি মারফত জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বিগত কংগ্রেস সরকার তাব অস্থির অবস্থায় এ-বাজোর জনগণকে যে সকল ধোকা ধাপ্পা দিয়ে দিয়েছেন তার অতীত প্রধান হলো প্রাথমিক শিক্ষকদের ২৪ টাকা মহার্বভাতা এবং ১০ টাকা চিকিৎসা ভাতা ও বাডীভাড়া মঞ্জুরী ঘোষণা। সেই ঘোষিত ভাতা কোন শিক্ষকের অদৃষ্টে আজও জোটে নি। অথচ, অত্যন্ত মিলজ্ঞভাবে তাঁরা বিধান সভায় এই ঘোষণা করেছিলেন আর খবরের কাগজ ও আকাশ-বাণীতে তা ফলাও করে প্রচারিত হয়েছিল। এই পরিস্থিতির ঘটনায় প্রাথমিক শিক্ষক সমাজ প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ ও আশাহত। আমরা সিদ্ধান্ত সরকারের এই জঘন্য ধাপ্পাবাজীর

প্রকাশ করা হয়েছে এবং লেভি বদ করা জ্ঞাত সমস্ত কল্যাণলী, প্রযোজক, পরিবেশক, প্রদর্শক গোষ্ঠীকে একযোগে আন্দোলন সামল হওয়াব জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। ইস্টার্ন ইন্ডিয়ান মোশন পিকচার অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধিগণও এই গুরুতর সংকটের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সংবাদের প্রতিবাদ

গত ২৪শে জুন সংখ্যার দর্পণে "কয়লাখন পরিচালনায় দুর্নীতি" শীর্ষক সংবাদের এক জায়গায় লেখা হয়েছে, "ভাড়া সাহেবের যে টেকনিকাল সেক্রেটারী তিনি খুব বাঙ্গালী বিদ্যেবী।" এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে উক্ত টেকনিকাল সেক্রেটারী কয়েকজন সহকর্মী আমাদের জানিয়েছেন যে, "উনি মোটেই বাঙ্গালী বিদ্যেবী নন। আমরা তাঁর সঙ্গে কাজ করে বুঝেছি যে, তাঁর মনে বিন্দুমাত্র প্রাদেশিকতা নেই।"

সংবাদক—হীরেন বসু

মায়াপুর মঠের 'কৃষ্ণপ্রেমী' বর্তার সন্দেহজনক চরিত্রের বোক : গুলী চালনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়

দুপল

বিশ্ব বর্ষ ২৫শ সংখ্যা ২৫ই জুলাই, '৭৭ ৪০ পৃষ্ঠা

কৃষ্ণপ্রেমী রাজত্বে বেপরোয়া নারী নিষা্তন ও নারী ধর্মণের ঘটনা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কংগ্রেসের পাঁচ বছরের রাজত্বে শুধু গণহত্যাই সংঘটিত হয়নি গণ নারী ধর্মণের মত অপরাধও সংগঠিত হয়েছে। অনেক অপরাধে অপরাধী কংগ্রেসের একটি বিশেষ দান নারী নিষা্তন। বারাসতে এগারো জন তরুণের লাস নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল আর মেদিনীপুরের গোধূলয়া গ্রামে এগারো জন নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। গোধূলিয়ায় নারী ধর্ষণ নিয়ে তিয়াস্তর সালের আঠাশে আগষ্ট বিধানসভায় গীতা মুখার্জী পুলিশের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনেন তা বিশেষভাবে মনে পড়েছে। পরদিন উনত্রিশে আগষ্টের যুগান্তরের রিপোর্ট থেকে জানা যায় "গত চক্কিশে দুই খজাপুর থেকে এগার মাইল দূরে গোধূলিয়া গ্রামে এগার জন হরিজন মহিলার উপর পুলিশ ও গুণ্ডা বাহিনীর এক বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীমতী গীতা মুখার্জী আজ রাজ্য বিধানসভায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। সজল চোখে শ্রীমতী মুখার্জী যখন এই অত্যাচারিত অরহেলিত লালিত মহিলাদের লেখা বিবৃতি পড়ছিলেন, তখন তামাম বিধানসভা নিশুপ নিশুপ, আবেগে নিধর। শ্রীমতী মুখার্জী বলে চলেন, তারপর আর, পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী গোধূলি লয়ে গোধূলিয়া গ্রামে প্রবেশ করলো। উদ্দেশ্য : চোরাই মাল উদ্ধার করা।

তিনি বলেন, পুলিশ এবং গুণ্ডা বাহিনী এ গ্রামে ঢুকে এগার জন মহিলার উপর যে অত্যাচার করেছে তা সভ্য সমাজের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। ওরা মুক, মূঢ়, মূর্খ। তাই প্রতিকারের সোচ্চার দাবী জানাতে পারে নি।"

গীতা মুখার্জী নারীদের এত অবমাননা সহ্য করতে পারেন নি। তাই তিনি বিধান সভায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি ভুল জায়গায় কান্নাকাটি করেছিলেন। নারী ধর্ষণে যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, নারী ধর্ষণের যারা মদদদাতা তাদের কাছে কান্নাকাটি করা অর্থহীন। তিয়াস্তরের সাতাশে জুলাই বাংলা কনগ্রেস দিন তাকে যারা অপমান করেছিল তারা কারা? তাদের কি তিনি চিনতেন না? বাহাউর সালে কংগ্রেস ভবনের সামনে অনশন করার সময় জাভা মাইতির কাপড় ধরে টান মেরেছিল যারা তারা যুব কংগ্রেসী। গীতা মুখার্জী, জাভা মাইতির মতো নারী দায়ী মহিলাদেরই যদি এরকম হাল হয়ে থাকে তাহলে সাধারণ মেয়েদের কি রকম অবস্থা ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

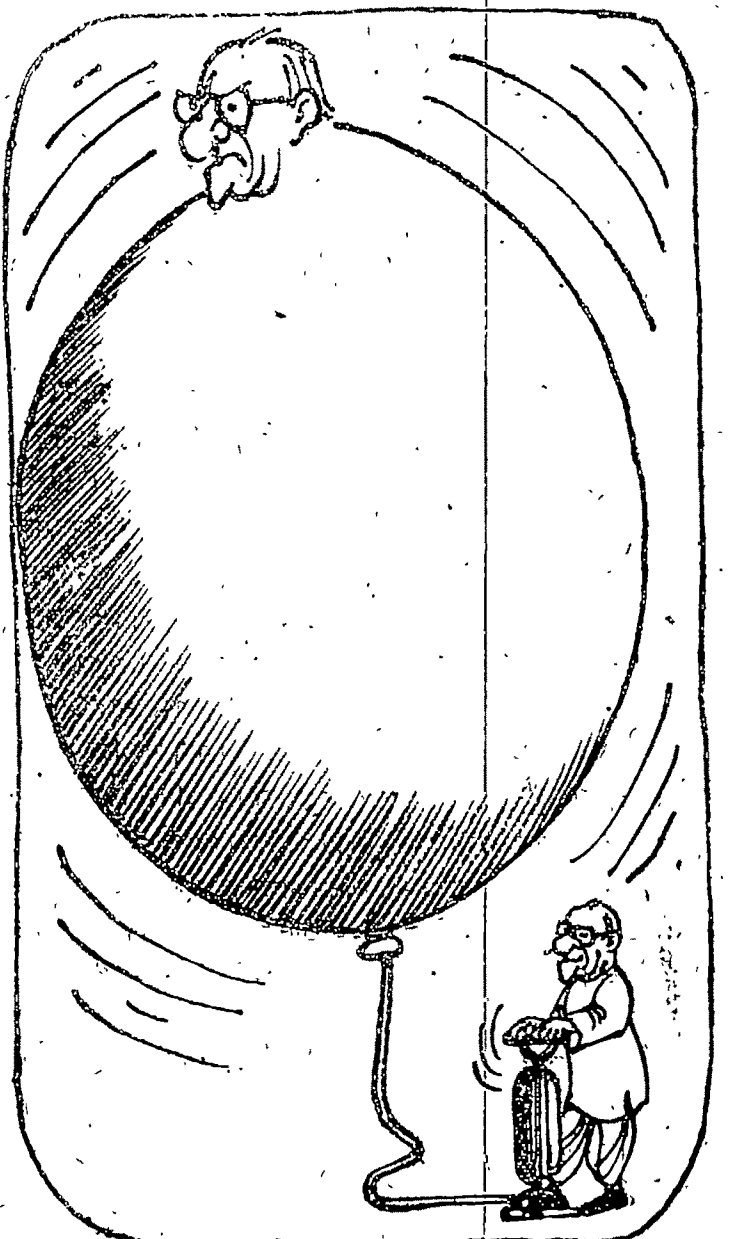
এই সময়ে পশ্চিমবাংলায় এমন একটা দিন যায়নি যেদিন কোথাও না কোথাও একটা না একটা নারী লালনা ঘটছে। এই সময়ে পশ্চিম (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

সাধন গুহ

ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব কৃষ্ণ কনশাসনেন্স (ইকন) অর্থাৎ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ চৈতন্য সংস্থা পরিচালিত মায়াপুর (নদীয়া) চন্দ্রোদয় মঠে সাম্প্রতিক গুলী চালনার ঘটনাটি একটি পবিত্র যজ্ঞেরই অবাঞ্ছিত পরিণতি এবং এটি আদৌ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—মায়াপুর ঘুরে এসে আমার সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। মঠের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো থেকে প্রাপ্ত অভিযোগের মধ্যে সবচেয়ে সোচ্চার হচ্ছে মঠের অস্থায়ী অধ্যক্ষ ভবানন্দ স্বামী, উগ্র ও উদ্ধত ব্যবহার এবং মঠের স্কেনারেল ম্যানেজার নিতাই চাঁদ দাসের অসামাজিক আচরণ। শিক্ষিত অনিাক্ষিত নির্বিশেষে এই অঞ্চলের মানুষ কয়েকজন বিদেশী সম্মানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, তারা রিক্সা এবং পালকীওয়ালাদের প্রতিশ্রুত ভাড়া প্রায়ই দেন না এবং তর্ক হলেই ছুরি এবং চেয়ার বের করেন। অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, যারা সন্ন্যাসী মঠে থাকতে এসেছিলেন তাদের মধ্যে অনেককে শেষ পর্যন্ত মঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাদের জীৱের রেখে দেওয়া হয়েছে মঠে এবং মঠের ধরচেই বিবাহ বিচ্ছেদ মামলা রুজু করে কয়েকটি দাম্পত্য জীবন নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। মঠের বিদেশী সম্মানীদের অধিকাংশই স্থানীয় অধিবাসীদের বেশ স্বপার চোখে দেখেন। ফলে, এতদঞ্চলের মানুষ নানা কারণেই মঠের কার্যকলাপ খুব ভাল চোখে দেখেন না।

ভবানন্দ স্বামী

কে এই ভবানন্দ স্বামী ওরকে চালান এডওয়ার্ড বেনিন? নানা স্বত্রে শোনা গেছে যে এই লোকটি মার্কিন সামরিক বাহিনীতে ছিলেন এবং জিয়েতনামেও গিয়েছিলেন। অবশ্য মঠের ভিরেকটর জয়পতাকা স্বামী এটা অস্বীকার করে বলেছেন যে, ভবানন্দ স্বামী মঠপূর্বজীবনে চিত্রাভিনেতা ছিলেন। সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে ভবানন্দ স্বামী ইতিপূর্বে একবার চোরাই মাল রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং ১০ হাজার টাকার জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন। মঠের কর্মকর্তাদের একজন মুখপাত্র শ্রীরাধা (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



ভবানীপুর থানার প্রাক্তন ও সি অনিল ব্যানার্জী এম এল দলের ফটিককে গুলী করে ঘেরেছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

একাত্তর সালের পরলা মতেষর। ভবানীপুর থানার একজন পুলিশ কালিঘাটের একজন সি,পি,আই (এম-এল) কর্মী ফটিক মুখার্জীর বাড়িতে হানা দিল। তাঁকে বাড়িতে না পাওয়ায় তাঁর দাড়া-বৌদিকে, পুলিশ শাসিয়ে গেল, "ভাইকে থানার হাজির না করালে যেখানেই আমরা পাবো সেখানেই গুলী করবো।" এর একদিন পরেই পুলিশ এক গোপনস্থানে হানা দিয়ে ফটিক মুখার্জীকে পেলো এবং অসহায় নিরস্ত্র অবস্থায় তাঁকে

রাত ৪পূর্বে ঘুম থেকে জুলে গুলী করলো। সত্যি, এ ব্যাপারে সর্বত্র পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাদের কথা রেখেছে দক্ষ হাতে।

গোপনস্থানের কথা পুলিশই বা জানলো কি করে?

এখানেও এক কাহিনী। ফটিক মুখার্জীর বয়স বত্রিশ। পোষ্ট গ্র্যাডু টেলিগ্রাফের আর, এম, এল, বিভাগে কাজ করতেন। সত্তর সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে তাঁর নামে গ্রেপ্তারী (শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠায়)

মায়াপুর মঠের ঘটনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমন্তদাস দাস নিজেই এই তথ্য দিয়েছেন। জৈনিক অতুলকৃষ্ণ ঘোষের স্ত্রীকে বলপূর্বক মঠে আটকে রাখার অভিযোগেও একবার ভবানন্দ স্বামী গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বলে জানা গেছে। অবশ্য মঠের কর্তৃত্ব বা এটা অস্বীকার করেছেন কিন্তু উক্ত অতুলকৃষ্ণের স্ত্রী এখনও মঠে আছেন এবং তার সঙ্গে আমার দেখাও হয়েছে। বর্তমানে তিনি বিধবার বেশ পরেন, কিন্তু অতুলবাবু এখনও বেঁচে আছেন। এই মহিলাটির দত্ত ভবানন্দ স্বামীর বিশেষ আত্মকূল্য এতদঞ্চলে বিশেষ সন্দেহের উদ্ভব করেছে এবং ভবানন্দ স্বামীর উদ্ভোগেই এর দাম্পত্যজীবনে বিচ্ছেদ ঘটান মঠের আত্মসত্ত্বীয় নৈতিক পরিবেশ সম্পর্কেও স্থানীয় সাহস সন্দেহমুক্ত নন। ভবানন্দ স্বামীর দক্ষিণস্থ নিতাইচাঁদও এতদঞ্চলেও কুখ্যাত।

নিতাইচাঁদ

নিতাইচাঁদ দাস চরস্বরূপগঞ্জের মাহুষ। মঠপূর্ব জীবনে সে ছিল নিতাইচাঁদ পরামণিক। নিতাইচাঁদের বিরুদ্ধে একটি অতি সাম্প্রতিক অভিযোগ হলো এই যে, মঠের অধিবাসিনী জনৈক মহিলার প্রতি তার অশালীন ব্যবহার। মহিলা যুবতী এবং তাঁর স্বামী বৃদ্ধ। এই নিতাইচাঁদ নানাভাবে চেষ্টা করে মহিলাকে স্বকীয় লালসার শিকার করতে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মহিলার স্বামী স্থানীয় এম, এল, এ দেবী বহুকে সমস্ত ঘটনা জানান। মঠ কর্তৃপক্ষ এই খবর পেয়েই রাত ১২টার সময় উক্ত দম্পতিকে মঠ থেকে বের করে দেন। ঐ মহিলা বর্তমানে জলদী ঘাটে একটা আশ্রমে দাসীবৃত্তি করে গ্রাসাচ্ছাদন করছেন। নিতাইচাঁদ কুখ্যাত দাঙ্গাবাজ বলেও এতদঞ্চলে পরিচিত। গুলী চালানার দিন এই নিতাইচাঁদই কটা শেখকে অমারুখিক ভাবে মেরেছে। পূর্বোক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস দাসও স্বীকার করেছেন যে, নিতাইচাঁদ একটা বাড়াবাড়ি করে কলেছে।

যা ঘটেছে

মঠের ভিতরকার জরগতাক।

স্বামী এবং রাধাকৃষ্ণদাস উভয়েই আমাকে বলেছেন যে, কটা শেখ গোশালার ফড়ার ক্রপ চুরি করতে এসে ধরা পড়ে এবং তাকে যখন ধরে আনা হচ্ছিল তখন গ্রামবাসীরা নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মঠ আক্রমণ করে, আশ্রমবাসী এমনকি মহিলাদের ওপরেও যখন আক্রমণ করে তখনই গুলী চালানো হয়। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়ে আমার প্রাপ্ত তথ্য থেকে যে ঘটনাটা বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে, এই যে, কটা শেখকে প্রথম অমারুখিক প্রহার করা হয় এবং এই খবর পেয়েই গ্রামবাসীরা উদ্বেজিতভাবে আশ্রম বেরাও করে। রাধাকৃষ্ণদাস নিজেই আমার কাছে স্বীকার করেছেন যে, গোশালার ভারপ্রাপ্ত আমেরিকান সন্ন্যাসী চৈতন্যজীবন প্রথম কটা শেখকে ধরে এনে প্রহার করে এবং পরে নিতাইচাঁদ গিয়ে অমারুখিকভাবে তাকে আহত করে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ যে, কটা শেখের মাথা কামিয়ে এসিড ঢালা হয়, কিন্তু রাধাকৃষ্ণদাস দাস এসিড ঢালার কথা অস্বীকার করে বলেন যে তার মাথায় রঙ লাগানো হয়, এসিড নয়। কটা শেখের হসপিটাল বেড টিকেটে মাল-টিপল ইনজুরিসের উল্লেখ আছে। মঠ কর্তৃপক্ষ গুলী চালানার ঘটনাকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনা করলে মনে হয়, ফড়ার ক্রপ চুরির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ সাজানো। কয়েকজন বিদেশী সন্ন্যাসীর আক্রমণাত্মক ব্যবহারের কথা আগেই বলেছি। চরস্বরূপগঞ্জের ডাঃ জে, সি, পাল, রঞ্জন পাল, ছাত্রপরিষদ নেতা সতীশ দেবনাথ, জলদী ঘাটের বি, কমপার্টওয়ান পাশ করা রিক্সাওয়ালা আনন্দ বিশ্বাস, আজীবর শেখ, নাজির শেখ, কাসেম শেখ প্রমুখ অনেকেই অভিযোগ করেছেন। নিতাইচাঁদের নিষ্ঠুরতা একটা কিংবদন্তীর পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। দুটি শিশু ভিখারীকে পাশবিক প্রহার করে এই কুখ্যাত নিতাইচাঁদ একজনের মাথা কাটিয়ে দিয়েছে এবং একজনের

হাত ভেঙে দিয়েছে। সব ব্যাপারেই নিতাইচাঁদ ভবানন্দের সাহায্য পেয়েছে।

ব্যাপক তদন্ত হোক

ভবানন্দের পাশপোর্ট রহস্য স্ববিদিত। এখান থেকে শিকারপুর সীমান্তের দূরত্ব ১৪০ কি, মি, করিমপুর ১৬ কি, মি, এবং গৌদের দূরত্ব ৮০ কিলোমিটার। এই গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত-নিকটবর্তী মায়াপুরে ইন্ডনের এই মন্দিরে ভবানন্দের মত রহস্যজনক বিদেশী সন্ন্যাসীরা ধর্মের আড়ালে অগ্নি কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করছে কিনা ব্যাপকভাবে তার তদন্ত প্রয়োজন।

দুষ্টি প্রচার

মায়াপুর মঠ কর্তৃপক্ষ বর্তমানে ঘটনটিকে সাম্প্রদায়িক ঝাড়ে পরিচালিত করার চেষ্টা করছে। তাদের মতে এই রাজ্যে বর্তমানে সি, পি, আই (এম) সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই সরকার ধর্মবিরোধী বলেই পুলিশ মঠের বিরোধীদের মদত দিচ্ছে। আমার মনে হয়েছে, মঠ কর্তৃপক্ষের এই দুষ্টি প্রচার সমূলে উৎপাটিত করা দরকার।

নারী নির্যাতন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাংলায় এমন একটা শহর ছিল না, এমন একটা তল্লাট ছিল না যেখানে একটা না একটা নারী লালনার ঘটনা না ঘটেছে। এই সময়ের সারা রাজ্যে সহস্রাধিক নারী লালনার ঘটনা ঘটেছে। বুর্জোয়া পত্রিকা আনন্দবাজার যুগান্তরে প্রকাশিত খবরেই দেখা যায় বেশ কয়েকশ নারী ধর্ষিতা হয়েছেন। কয়েক জায়গায় আবার ধর্ষণের পরে হত্যা করা হয়েছে। এই নারীমেধযজ্ঞে যে কত নারীর সর্বনাশ হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। অবস্থা এমনই গুরুতর হয়ে উঠেছিল যে তিস্তার সালে বিধান সভায় বেলঘরিয়ার প্রদীপ পালিত বেলঘরিয়াতে ব্যাপক নারী লালনার প্রসঙ্গে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যখন আইন শৃংখলার উন্নতির কথা বলছেন তখন বেলঘরিয়ায় এক নতুন উৎপাত দেখা দিয়েছে। আর সেটা হচ্ছে যে ব্যাপকভাবে মেয়েদের লালনা। এ ব্যাপারে তিনি বেলঘরিয়ার এক কুখ্যাত গুণ্ডার কথাও বলেন। কংগ্রেসী আমলে নারী-লালনার ব্যাপারে অবস্থা এমনই ভয়াবহ হয়ে গিয়েছিল প্রদীপ পালিতের মতো যুব কংগ্রেসীও প্রকাশ্যে বিধান সভায় এ নিয়ে অভিযোগ তোলেন। সে সময় বেলঘরিয়া, হুদদম, বরানগর প্রভৃতি এলাকায় মেয়েদের কোন নিরাপত্তা ছিল না। দস্যুর পরে

মেয়েরা রাস্তায় বেরোতে পারতো না। সে সময় প্রায় রোজই খবরের কাগজে খবর থাকতো “কিশোরী অপহৃত”, তরুণীর উপর দলবদ্ধভাবে বলাৎকার”, “বিবাহিত তরুণী ধর্ষিতা”, “ধর্ষিতা যুবতী নিহত” ইত্যাদি। আনন্দবাজার যুগান্তর পাঁচের পাতায় ছয়ের পাতায় খুঁদে খুঁদে অক্ষরে এসব ছাপাতো। কিন্তু এসব নিয়ে কোন হৈ চৈ করতো না বা আইন-শৃংখলার কোন অবনতি দেখতো না।

বাহাঙ্গর মালে পুজোর পরে আনন্দবাজার যুগান্তরের এক খবরে জানা যায় পুজোর চার দিনে বহু নারী রেডের আঘাতে আহত হয়ে হাসপাতালে গেছে। আমি নিজে অষ্টমী পুজোর দিন শিয়ালদহ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি মেয়েকে পেটে রেড মারতে দেখেছি। রক্তাক্ত আহত মেয়েদের ধরাধরি করে নিয়ে যেতে দেখেছি। এইভাবে কংগ্রেসী আমলে মেয়েদের ধর্ষণ, রেডমারা, হত্যা করা সব কিছু মিলিয়ে এই রাজ্য একেবারে নরক হয়ে উঠেছিল।

৪ স্বরূপী অবস্থার সময়ে কৃষ্ণনগরে এক ব্যাপক নারী ধর্ষণের কথা বলছি। কৃষ্ণনগরের এক কুখ্যাত যুব কংগ্রেসী গুণ্ডার নাকি বউ মারা যায়। সেই গুণ্ডা একরাতের মধ্যে এক বাড়ী থেকে পর পর তিন বোনকে একে একে তুলে আনে এবং একটি হোটলে তুলে পরপর তিন বোনকে ধর্ষণ করে এবং আধমরা করে ফেলে রাখে। তারপরে এ নিয়ে শহরে খুব চাঞ্চল্য হয়। কিন্তু তখন স্বরূপী অবস্থা তাই এসব খবরের কাগজেও বের হয়নি। এরাই সব এক একজন যুব কংগ্রেসের রক্ত। এ সবের তদন্ত হবে না? বিচার হবে না? জ্যোতিবাবুরা নিশ্চয়ই এসবের একটা ব্যবস্থা করবেন এই আশাই করি।

যুব কংগ্রেসের আক্রমণের হাত থেকে নাটকের দলের মেয়েরাও রেহাই পায়নি। স্টার থিয়েটারে “হুঃখপ্তের নগরী”র অভিনয় বন্ধ করলে গিয়ে যুব কংগ্রেসীরা পি, এল টির একজন অভিনেত্রীকে চুল ধরে হিচড়ে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে যায়। এসবের বিচার হবে না?

এম, এল, এ হোস্টেলের সেই মেয়ে দিয়ে কল্যাণ কারবারের তদন্ত হবে না? বিচার হবে না? এম, এল, এ বলে তারা কি সব সাধু? এম, এল, এ হোস্টেলে অনাচার এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে রাজ্য সরকারকে সাক্ষীর জারী করতে হয়েছিল যে বাইরের মেয়ে নিয়ে ওখানে কেউ থাকতে পারবে না। মেয়েদের নিয়ে গিয়ে ওখানে যে বেইজ্ঞ্য করা

হত তার তদন্ত চাই, বিচার চাই। এইসব জনপ্রতিনিধিদের মুখোশ খুলে দেওয়া হোক। চাকরী দেওয়ার নাম করে বহু মেয়ের এরা সর্বনাশ করেছে। এবার এদের সর্বনাশ করুক পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকার।

এ বছরের সাতশে এপ্রিল আনন্দবাজার এক নারী নির্যাতনের মামলার কথা লিখতে গিয়ে ঐ নির্যাতিতা তরুণীটি লালবাজার লক আপে নির্যাতনের যে অভিযোগ করে সে সম্বন্ধে লেখে “লালবাজার লক আপে ২১-৪-৭৬ রাত সাড়ে নটা থেকে সারারাত তাকে রাখা হল। তার অভিযোগ, লালবাজার লক আপে পুলিশ তাকে ব্যাটন দিয়ে পেটায়। তার হাত ধরে টানে, বেস্তা বলে গাল দেয়। অপমানের স্বস্তি থাকে না। ২১ তারিখ সারারাত লালবাজারে কাটিয়ে ৩০ এপ্রিল বেলা সপ্তরা এগারোটায় আবার তাকে হাজির করা হয় শিয়ালদহ কোর্ট লক আপে। তরুণীটির বাবা তাঁর সাক্ষ্য অভিযোগ করেন। তিনি দেখেন তার মেয়ে শিয়ালদহ কোর্ট হাউজে একটি চেয়ারে বসে আছে। সে উঠতে পারছে না। বাবাকে দেখে মেয়ে কান্নাকাতি করে কেঁদে ফেলে এবং বলে গতরাতে লালবাজারে তার উপর অকথ্য নির্যাতন হয়েছে। সে দাঁড়াতে পারছে না।” অসী পোন্ধরকে দিয়ে যে জিনিষের হয়েছিল তা এই কয় বছরে ব্যাপ বিস্তার লাভ করে। গ্রেপ্তার হবার পর বহু নকশাল তরুণীই এই অবস্থা হয়। জ্যোতিবাবুদের কাছে অস্থরোধ তাঁরা এইসব নারী নির্যাতনের একটা ব্যাপক তদন্ত করুন। দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দিন।

বিদ্যুৎ কর্মীদের সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ টেকনিক্যাল সুপারভাইজিং ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের ত্রয়োদশ বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন আচার প্রকল্পে রায় পলিটেকনিক যাদবপুরে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অয়োজিত এবং এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

(১) এ্যাসোসিয়েশনের স্ত্রী ও বিলম্বিত দাবীগুলির আশ্রয় কনসালো না হওয়ায় কমিটি বিদ্যুৎ ও দাবীগুলি অনতিবিলম্বে কনসালো দাবী জানাচ্ছে।

(২) রাজ্যের নবগঠিত সরকারকে এ্যাসোসিয়েশন আগত জনাচ্ছে এবং অবহেলিত দাবী কনসালো হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ জানাচ্ছে।

(৩) রাজ্যের জনস্বার্থে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের স্বত্ব ব্যবস্থা করতে এবং বিদ্যুৎ পর্যদে দুর্নীতি ও অপচয় রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রকাশিত হল।

ইন্দিরার কারাগারে

(সিরিজ-১)

দাম—এক টাকা।

দেশকথা প্রকাশনী

৩১, মট লেন, কলিকাতা-১৩

ক্যাবারে নাচের বিরুদ্ধে

শঙ্খশুভ্র বিশ্বাস

মিস শেফালী বাংলা থিয়েটারের মঞ্চগুলো দখল করে বসে আছেন। কান্না বিনা যেমন গীত হত না, তেমনি ক্যাবারে বিনা আঙ্গকাল থিয়েটার হয় না। মিস শেফালী, মিস বৈশালী, মিস চৈতালী মিস জে—হরেক “মিস”—এর ছড়াছড়ি। আগে যা ছিল কেবলমাত্র নিষিদ্ধ অঞ্চল এবং কিছু হোটেলের সীমাবদ্ধ, এখন তা মধ্যবিত্ত পাড়াগুলোতে ছাঁকিয়ে বসেছে। মূল্যবোধের যে ব্যাপক অবক্ষয় শুরু হয়েছে তা এ থেকে বোঝা যায়। ধবরের কাগজ-গুলোতে এই সব নাচিয়েদের নগ্ন-দেহের অঙ্গীল বিজ্ঞাপন দেখা যায়, যা আমাদের চোখের পাতায় চাবুক মারে। সমস্ত রকমের মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ ঘোষণা করে এই রকম অঙ্গীলতার অভিযান চলছে। আর আমরা সবাই অসহায় ভাবে তা দেখছি। এ সবের উদ্দেশ্য কি? এ সবের উদ্দেশ্য শতাব্দী টাকা রোজগার এবং যুব সমাজের নৈতিকতাকে ভুমে মূচড়ে দেওয়া। এবং এই যড়যন্ত্র বিনা প্রতিরোধেই হয়ে চলেছে।

প্রধানত দুটি কারণে এই ধরনের নাচের বিরোধিতা ও প্রতিরোধ করা উচিত। একটি কারণ হচ্ছে এতে উঠতি কিশোরদের নৈতিকতা নষ্ট হয়ে যাবে। মূল্যবোধের আর মূল্য থাকবে না। নারী বলতে তারা বুঝবে শুধু নারী দেহ। নারীর প্রতি প্রেম ভালোবাসা শ্রদ্ধা সব নষ্ট হয়ে যাবে। যে বিষ একবার তাদের মধ্যে ঢুকবে তা সারা জীবন তাদের বয়ে চলতে হবে। এ সব নাচ দেখে তারা রাড়ীতে ক্রিয়ে মাকে মা বলতে পারবে না, দিদির দিদি বলতে পারবে না, বোনকে বোন বলতে পারবে না। স্বাভাবিক মূল্যবোধ যে সব ভ্রমণের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায় তাদের মধ্যে ক্যান্সিস্ট রাজনীতি চোকান হুঁশধা। তাই এই সব কিশোররাই একদিন ক্যান্সিস্টদের খাতায় নাম লেখাবে। পঁচ পঁচ বছরে এই সব নৈতিকতা-বর্জিত ছেলেদের নিয়েই যুব কংগ্রেসের অভ্যুদয় হয়েছিল। তাই গত পাঁচ বছরে একই সঙ্গে যুব কংগ্রেসের অভ্যুদয় এবং অঙ্গীলতার অভিযান চলেছিল। বিপ্লবী নাটক সব যখন হার করে ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছিল, তখন ক্যাবারে নৃত্য এবং অঙ্গীল থিয়েটারগুলো জোর কদমে চলছিল। নারী ধর্ষণে পশ্চিমবঙ্গ তখন রেকর্ড করতছিল।

এ ধরনের নাচের বিরোধিতার আরেকটি কারণ হচ্ছে যে এতে নারীর অমর্যাদা হয়। মানুষ যখন চাঁদে যাচ্ছে পৃথিবীতে সভ্যতার যখন এত বিকাশ হচ্ছে তখন আমাদের দেশে নারীকে বন্ধ ঘরে তীব্র আলোর নীচে, একগাদা লোতাতুর দৃষ্টির সামনে তার শরীরের একান্ত গোপন জায়গাগুলো প্রকাশ করে প্রাণপণে নাচতে হচ্ছে। এটা অঙ্গীল, এটা আদিম ব্যাপার। একটা দেশ কতটা সভ্য কতটা এগিয়ে আছে তার বিচার হয় সে দেশে নারীর মর্যাদা কতটা স্বীকৃত। এই হিসাবে আমাদের দেশ যে অনেক পিছিয়ে, এবং প্রচণ্ড রকমের অসভ্যতা বেশ বোঝা যায়।

এদেশে সাধারণ মানুষ প্রচণ্ড দরিদ্র আর সাধারণ মানুষ তার পেটের কাছে পরাস্ত, পরাস্ত তার মূল্যবোধ। তাই এখানে “মিস শেফালীদেব” অভাব হয় না। কাজেই এ সব সমস্ত সমাজ ব্যবস্থা পান্টানোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সমাজ ব্যবস্থার পুরোপুরি পরিবর্তন না হলে এ সব সমস্তার সমাধান হবে না। কিন্তু তাই বলে যখন হুপজিকলিতভাবে, অসং মতলব নিয়ে এ সব জিনিষকে প্রকাশ্যভাবে বাড়তে দেওয়া হয় তখন এ সব অঙ্গীলতাকে প্রতিরোধ করার কথা ভাবতে হয়। আমি এস, ইউ, সির খুব বিরোধী, কিন্তু জরুরী অবস্থার সময় এস, ইউ, সির ডি, এস, ওই

কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার দুর্বস্থা

শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছেন না : মালিকরা লুটছে

স্বপ্নের অধিষ্ঠিত কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিকরা নিরবিত্ত বেতন পান না। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে অসম্মান কিস্তিতে কোম্পানী বেতন দেওয়া শুরু করেছে এবং ক্রমে তা পাঁচ দশ টাকার কিস্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে চার পাঁচ মাসের বেতন বাকি পড়ে গেছে। এখানকার চারশো শ্রমিক কর্মচারীকে লগ্নাহে জিনদিন অনাহারে কাটাতে হচ্ছে। অষ্ট মাসিক ও তাঁর স্বাক্ষর স্বরন যে বেতন পাবে পাচ্ছে লুটপুটে যাচ্ছে।

শ্রমিক কর্মচারীদের ওভারটাইমের টাকাও ১৯৭৫ সাল থেকে বাকি। উৎপাদন বোনাসের টাকাও কয়েক বছর দেওয়া হয়নি। ই এস আইয়ের টাকা সময়মত জমা না দেওয়ার শ্রমিকদের কার্ড বাতিল হয়ে গেছে।

একমাত্র সংগঠন যারা মিছিল করে গিয়ে ত্যাগরাজ হলে ক্যাবারে নৃত্য বন্ধ করেছিল। আমি সেদিন মনে মনে ডি, এস, ওকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম।

কিন্তু এ ব্যাপারে আর সব যুব-ছাত্র সংগঠনগুলো চুপচাপ কেন? তাদের কি এ সব ব্যাপারে কিছুই করার নেই? এ ধরনের অঙ্গীলতার অভিযানের বিরুদ্ধে বিপ্লবী অভিযান শুরু হোক। এ ধরনের নৃত্য বন্ধ করার ব্যাপারে আমি সমস্ত প্রগতি-শীল যুব সংগঠনগুলোর কাছে একটা প্রস্তাব রাখছি। সেটা হচ্ছে যে সব সংস্থা এই সব নাচ সংগঠিত করে তাদের এবং যে সব হলে এ সব নাচ প্রদর্শন করা হয়, সেই সব হল কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট সময়ের নোটিশে বলা হোক যে এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তারা যদি এই ধরনের অহুতান বন্ধ না করে তাহলে বিপ্লবী যুবছাত্ররা মিছিল করে গিয়ে তা বন্ধ করতে বাধ্য করবে। এটা কোন বে-আইনী ব্যাপার নয়। জনগণ না চাইলে জনগণের বিক্ষোভে অনেক সময় অনেক অহুতান বাতিল হয়ে যায়। এটা কোন হিংসাত্মক ব্যাপার নয়। কাজেই সরকারের তরফ থেকে এ ধরনের বিক্ষোভে বাধা দেওয়ারও কোন আইনগত যুক্তি থাকতে পারে না। সব থেকে বড় কথা জনমত। জনমতের বিরুদ্ধে কোন সরকারের যাওয়া উচিত নয়। আমি চাই প্রগতিশীল যুবছাত্র সংগঠনগুলো এই ধরনের জনমত সংগঠিত করতে এগিয়ে আহুক।



প্রাইভেট ডিটেকটিভ লক্ষণপ্রভুর বিভ্রমনা সরকারী অফিসাররা বিরূপ : ২৮ লক্ষ টাকা কমিশন বাকি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

প্রাইভেট ডিটেকটিভ ত্রীকে এ লক্ষণপ্রভু অভিযোগ করেছেন যে, ইন্দিরা সরকার কমিশন বাবদ তাঁর প্রাপ্য ২৮ লক্ষ টাকে মেননি। সেক্টাল বোর্ড অফ ডাইবেস্ট ট্যাক্সের নিয়ম হল, কেউ যদি আয়কর ফাঁকির খবর দেয় তাকে যে পরিমাণ টাকা আদায় হবে তার ৭৫ শতাংশ কমিশন বাবদ দেওয়া হবে। কমিশনের পরিমাণ ১০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে সংবাদদাতার সাহায্যের পরিমাণও তুঁকি অহুতায়ী। লীলক্ষণপ্রভু ৭২টি কোম্পানীর কোটি কোটি টাকা আয়কর ফাঁকির খবর দিয়েছেন যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিভলা সাহালিয়া ধৈতাম হরিদাস মুদ্রাদেব নাম। লীলক্ষণপ্রভুর চাকলা-কর উল্কাটন হল লণ্ডনের সেক্টাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে সামি প্যাটেলের ২ কোটি টাকা প্রতারণা, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শি বি মুখার্জীর দুর্নীতি, ১৯৬৯ সালে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে জোচ্চুরি যাতে কংগ্রেসীরা উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্বতের দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদের দিয়ে ৫ কোটি টাকা ভুলে-ছিল।

লীলক্ষণপ্রভু ১৯৭৭ সাল থেকে কাউন্সিল, এক্সাইজ, বৈদেশিক মুদ্রা-লক্ষ্য গোয়েন্দা দপ্তর, আয়কর, সি বি আই প্রভৃতি সরকারের বিভিন্ন বিভাগে খবরাখবর, রিপোর্ট, দলিলপত্র দিয়ে আসছেন। তিনি পেশাদার ডিটেকটিভ।

আয়কর বিভাগ লীলক্ষণপ্রভুর সংবাদের ভিত্তিতে ৩ কোটি টাকা আদায় করেছে। কিন্তু তাঁকে এ পর্যন্ত পুঙ্-কার দেওয়া হয়েছে মাত্র ৪০ হাজার টাকা। লীলক্ষণপ্রভুর সহায়তার কেন্দ্রীয়

সরকার যে টাকা আদায় করেছেন তাতে বোর্ড অব ডাইবেস্ট ট্যাক্সের নিয়ম অনুযায়ী তাঁর পুঙ্কার প্রাপ্য হয় ২৮ লক্ষ টাকা। তিনি পুঙ্কারের অস্ত্র যতবার লিখেছেন অফিসাররা চিঠিতে কেবল স্তোত্রবাক্য দিয়েছেন। ১৯৭০ ও ১৯৭২ সালে লোকসভার বিশিষ্ট সদস্যগণ স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি প্রধান-মন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েও কোন ফল হয়নি।

শ্রীচরণ, শ্রীহরশ্রমণিয়ম, শ্রীগণেশ এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গেও লীলক্ষণপ্রভু দেখা করেছেন কয়েক-বার। শ্রীমতী গান্ধীর নির্দেশে পি এন হাকসার প্রধান মন্ত্রীর তহবিল থেকে লীলক্ষণপ্রভুকে পাঁচ অঙ্কের ভাল টাকা দিয়েছিলেন। এক তাঁকে শ্রীমতী গান্ধী কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কিছু দিন অপেক্ষা করতে বলেছিলেন।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্সের ডাইবেস্টের জেনারেল শ্রীপ্রভুকে ৩০ হাজার টাকা দেন এবং তাঁকে বাকি টাকা এপ্রিল মাসে সংগ্রহ করতে বলেন। এরপর শ্রীপ্রভু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আর কোন টাকা পাননি এবং তাঁর চিঠির উত্তরে অফিসাররা জামাতে চেষ্টা করেন যে, তিনি রেশব অপরাধ উদ্ঘাটন করেছেন বলে বলছেন সেগুলো তাঁর নয়।

শ্রীপ্রভু আশঙ্কা করেছেন যে, তাঁর প্রাপ্য টাকা হয়ত কোন কোন অফিসার মেরে দিয়েছেন। কোন একটি ঘটনার সি বি আই তদন্ত করে দেখেছে যে, তখন উচ্চপদস্থ অফিসার একজন সংবাদদাতার প্রাপ্য ১৬০ লক্ষ টাকা মেরে দিয়েছেন।

বর্তমানে শ্রীপ্রভু প্রায় তপস্বী। তিনি আত্মপেক্ষ করে দর্পণকে বলেছেন, “২২ বছর আগে স্বর্ণকিত্তিরোজ গান্ধীর কথার আয়কর ফাঁকিবাঁজদের বিরুদ্ধে তদন্তের কাজে আত্মনিয়োগ করি। ভালই চলছিল, কিন্তু যখন আমি এখন সব খবর দিই যাতে দিনিয়র রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স অফিসার এবং ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার ও অফিসাররা ও তাদের আত্মীয়রা জড়িত তখনই দেখ-লাম আমার সুখের ওপর দয়াদায়ক হয়ে গেল। যেসব ফাইল ও দলিল আমি দিয়েছি তা অস্তিত্বের কাছে ফেরত চলে গেছে কিংবা তারা খবর পেয়ে গেছে। আমার টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে আমি আমার সংবাদদাতাকে টাকা না দিতে পারি এবং আমার সুনাম নষ্ট হয়।”

শ্রীপ্রভু পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ ব্যবসায়ী দের ৮০ লক্ষ টাকা বিক্রয়কর ফাঁকি খরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ বারের সরকার তাঁর প্রাপ্য পুঙ্কারের একটি পরিসংখ্যান দেন নি।

জনগণের অর্থনীতির ইস্তাহার

শ্রীকান্ত বসুরায়

প্রশ্ন হচ্ছে, দেশটা কার? সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারদের, সাম্রাজ্যবাদীদের, নাকি ভারতীয় জনগণের? স্বাধীনতা কার? সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির কণ্ট্রোলারদের, অথবা দেশে নিষ্ঠুরতম রাজস্ব-আদায়ের সাহায্যে মুঁখু বিশ্বপুঁজিবাদের মুনাফার ও ভর্তুকীর যোগানদারদের?

প্রশ্ন হচ্ছে, অর্থনীতিতে আত্মনির্ভরতা কার? তাঁবেদারী অর্থনীতির, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির, কিংবা জনগণের অর্থনীতির?

আর প্রশ্ন হচ্ছে, জাতীয় উৎপাদ-শক্তিগুলি ও সম্পদগুলিই যদি উচ্চতর গেল ভবে রইল কি? দেশের কৃষি, শিল্প ও কারিগরী যদি জনগণের উচ্চ ও প্রতিভা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে, তবে এ অর্থনীতির ভিত্তি কি?

আর প্রশ্ন হচ্ছে, নিয়ন্ত্রিত ও অবরুদ্ধ কোনও অর্থনৈতিক ভিত্তি যে রাজনৈতিক উপরিকঠামো গড়ে তোলে, তার সংজ্ঞা কি?

আর সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে ভারতের নয়া-একচেটিয়া পুঁজির যে দ্বন্দ্ব তার রাজনৈতিক দিকগুলি ও বৈশিষ্ট্যগুলিই বা কি?

সর্বশেষে, তথাকথিত বিশ্বব্যাঙ্ক কিংবা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এগুলি কোন অচল পুঁজির জিন্দাদার, কাদের অচল পুঁজিকে সচল করতে দায়বদ্ধ?

এ সমস্ত মৌলিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নের উত্তর ও মীমাংসার সম্মুখীন আমরা।

আন্তর্জাতিক যুগযাভুনি

বিত্তীয় মহাযুদ্ধ-পুঁজি মহাজনী যুদ্ধের প্রধান নেতৃত্বে বর্তমান

শাসকশ্রেণী ভারতে কৃষি-অর্থনীতির পুনর্গঠনকে গণ-রোধ করে, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি, যন্ত্র ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান সহায়তায় এক তাঁবেদারী পুঁজিবাদ গড়ে তুলেছে। অতএব, এ বুর্জোয়া সে বুর্জোয়া নয়, অর্থাৎ বহু আলোচিত ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণী নয়। সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের এ যুগে গড়ে-ওঠা ভারতের পুঁজিবাদ জন্মলয়েই এভাবে অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব জড়িত হয়ে পড়ে। এ সমস্ত যে কোনও দ্বন্দ্বেরই মীমাংসা করতে সে সক্ষম নয় অর্থাৎ জন্মাবস্থার এ কাঠামো থেকে বা সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারীর ছক থেকে বেরিয়ে আসতে সে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। অতএব, এ কাঠামোকে অবলম্বন করে পর পর কয়েকটি তথাকথিত পাঁচসালা পরিকল্পনার জোরে এ দেশে যে একচেটিয়া পুঁজি-শক্তিগুলো গড়ে উঠলো, তারা ভারতের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিগুলির তাঁবেদারী ও ঠিকাদারী পুঁজিবাদ এবং বিদেশে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সাব-কণ্ট্রোলারী ব্যবস্থাকে আপন জীবনের ধোরাকী খুঁজে পেয়েছে। এই স্বাভাবিক পরিণতি।

শয়তান কুটিল পথ ধরেই চলতে জানে; অতএব, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের বিশেষ বিশেষ চাহিদা-গুলোর সঙ্গে লড়াই রেখে গড়ে ওঠা এ তাঁবেদারী পুঁজিবাদ ভারতের উৎপাদনশক্তিগুলোকে যতই পঙ্কু আর ছাঁচে ঢালা করে তুললো সঙ্কট ততই ব্যাপক, গভীর ও জটিল হয়ে চললো। অতএব, বরজাম ই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিগুলো এবং আন্তর্জাতিক মহাজনী যুদ্ধগুলো এদেশী শাসকশ্রেণীর সহায়তায় সঙ্কটাপন্ন সাম্রাজ্যবাদের সর্বগ্রাসী চাহিদা মেটাতে ভারতীয় কাঁচামাল ও কৃষিপণ্যকে শাস্প করে বেপরোয়াভাবে সমুদ্রপারে সরবরাহ করার চেষ্টা করে। এভাবে যে নজীরবিহীন অর্থনীতি গড়ে উঠলো, তারই ব্যবস্থাপনায় একদিকে জাতীয় সম্পদ-গুলোর যেমন অপূরণীয় অপচয় ঘটে চলেছে অতদিকে তেমনি—যেমন কৃষিতে তেমন শিল্পে—ভারতীয় জনশক্তি, জনগণের সমস্ত উদ্যোগ, উচ্চ ও প্রতিভার অর্থনৈতিক ক্ষমিকাকে এ শাসকশ্রেণীগুলি চরম অবজ্ঞায় ও নিপেষণী অবরোধে নিষ্ক্রিয় ও বিভ্রান্ত করে চলেছে।

অতএব, দেশে অসংখ্য ক্ষুধাশিল্পের ভরাডুবি করে, বাজার-সঙ্কোচ ও ভোগ-সঙ্কোচ করে আরও বিদেশী মহাজনী ঋণ ও পুঁজি আমদানি করে, ঋণের দায় মেটাতে আরও ঋণগ্রহণ আরও করবুদ্ধি করে, “আরও ঋণের অতি-প্রত্যয়ে (Export bias) শিল্প-বিস্তার” ও মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে জন্ম: “আরও রপ্তানীর জন্তে আরও আমদানী এবং আরও আমদানীর জন্তে আরও রপ্তানী”র এক ভৌতিক চক্রে ও প্রক্রিয়ায় মহাজনী পুঁজির অর্থনৈতিক, এবং রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা যথেষ্ট পূরণ হলো।

রতনে রতন চেনে; সাম্রাজ্যবাদও এহেন ব্যবস্থায় বিশেষ আগ্রহী। কেননা, তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন ছোটগুলিতে ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের বিশেষ সুযোগগুলিকে কাজে লাগাতে হলে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ভারতের পুঁজি বিনিয়োগ এক চমৎকার উপায়। সাধ ছিল, ইউরো ডলার পেট্রোল-ডলারের আদর্শে তৃতীয় বিশ্বের বাজারে তথাকথিত ‘মেড-ইন-ইন্ডিয়া’ মার্কী মাল বেচে কোনও ইণ্ডো-ডলারের (Indo-dollar) বা ইণ্ডো রুবলের আ বর্তব্য সাম্রাজ্যবাদকে নতুন ষোঁন এনে দেবে! কিন্তু হায়! জরাগ্রস্তের জীবনে আর ষোঁন কিরে আসে না—ইণ্ডো-ডলারের নিবিড় চাব আর কবে হবে? গল্প-বর্ণিত বৃদ্ধ জরদগরের (শকুন্ম-বিশেষ) তো প্রাণটাই গেল।

তবে, এদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তার কোনও সমাধান করতে এরা সবাই অক্ষম; একথাটা বুঝতে হবে, নয়া-উপনিবেশবাদের এ যুগে সাম্রাজ্যবাদী কিনাঙ্ক ক্যাপিটালের ছত্রছায়ায় আর তথাকথিত রাজনৈতিক “হোম-রুলের” (Home Rule) ভাবাবলম্বনে যে নয়া-একচেটিয়া পুঁজিবাদ সৃষ্টি হলো, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার দ্বন্দ্বগুলো স্বাভাবিক কারণেই নানান মৌলিক বৈশিষ্ট্যে অভিন্ন—এ বিষয়ে আমরা আগেকার সংখ্যায় বিশেষভাবে আলোচনা করেছি। লক্ষ্যের দৃষ্টি, মুদ্রাবাজারের পরস্পর নির্ভরতার বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং অত্যন্ত প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক ও বাহ্যিক ক্ষমতার সাধারণ পরিস্থিতির অধির অবস্থায় বর্তমানে এ দ্বন্দ্বগুলো অত্যন্ত বিশৃঙ্খল।

বিশ্বের সর্বহারা এ সমস্ত নির্মম বাস্তবকে বুঝে, নজরে রেখে যোকা-বেলা করতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ। এর একমাত্র কারণ তারা দ্বন্দ্বযুদ্ধক বস্তববাদকে, মানে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদকে জানে—অতএব, শ্রেণীর জন্ম, শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রেণীর মৃত্যুর নিয়মগুলোকে অগ্রসরণ করে চলে। বুর্জোয়ারা মুঁখু, কারণ নিজেদের জন্ম মৃত্যুর নিয়ম-গুলোকেও তারা বুঝতে অক্ষম। যম-চুরারের ঘটাধনি যদিও তারা প্রতি-নিয়ন্ত্রণতে পায়, তবু মুঁখুদের জন্তে সংরক্ষিত স্বর্গে আপন যোঁকাবাজীর সার্বকতার স্বপ্নে তারা বিভোর।

“বিপ্লবের পরিস্থিতি চমৎকার”

বিশ্বপুঁজিবাদের নিজ শিবিরে আন্তর্জাতিক অবস্থাটা আচ্ছ কি? বিভিন্ন পুঁজিবাদী স্বার্থগুলি পরস্পর সংঘর্ষে হাজারোভাবে কত বিচ্ছিন্ন। একদিকে দুই মহাশক্তি যেমন মধ্য এশিয়ার তেল, ভূমধ্যসাগরের জল আর ছুনিয়ার জলভাগ নিয়ে ভাগা-ভাগি সংঘর্ষে লিপ্ত এবং পরোক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে আছে, অতদিকে পশ্চিম ইউরোপ এমন কি পূর্ব ইউরোপেও অর্থনৈতিক বিরোধগুলি মার্কিন বিরোধী সোভিয়েত বিরোধী রাজনৈতিক উত্তেজনার বিকাশলাভ করছে। এশিয়ার সমগ্র পূর্বাঞ্চল ও আগ্রত আক্রমণ পুঁজিবাদ ও শোষণবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট-গুলোকে অসংখ্য গাড্ডায় আটকে দিয়েছে। তাই রোডেশিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় পশ্চিমী ‘মুক্ত পুরুষরা’ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন, আকোলায় সোভিয়েত কিউবান ‘মুক্তদাতা’রাও তার চাইতে কিছু বেশী সোয়াস্তিতে নেই। আর উত্তর ও অল্পমত পুঁজিবাদগুলোর মধ্যকার সম্পর্কটাই বা কি? একই নয়া অর্থনৈতিক শৃঙ্খলার কাঁচুনী গেয়েও গোলাধর্ষের দক্ষিণী অল্পমত পুঁজিপতিগুলো (তথাকথিত উন্নয়নশীল দেশগুলো) আর উত্তরের শিল্পোন্নত ধনী পুঁজিপতি-গুলোর মধ্যে বিপত ১৯ মাসের ‘উত্তর-দক্ষিণী আলোচনা’ (North South Dialogue) অফুলে খাবি থাকে, আর সঙ্কট নিমজ্জিত তাঁবেদারী পুঁজিহীনগুলো খনারদত্ত গোষ্ঠীর (Group of 19) মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শিল্পপুঁজি ও মহাজনী যুদ্ধগুলির দরজার দরজার ঋণ-মকুবের ও পুঁজি-ঋণের আবেদন এবং পুঁজি-আমদান ও সত্তা প্রশ্ন, পণ্যের নিবেদন রেখে চলেছে। এক অপূর্ব দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্টি একদিকে যেমন দুই মুঁখু পক্ষের তীব্র দর-কষাকষির বিশৃঙ্খলার অভিনব, অপর দিকে তেমনি যেন খুঁড় খুঁড়কে স্বভাবরূপে পাথর অভিনাবের মতই

দিলবাহারী উত্তেজনার অধির। দিকে দিকে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, তাঁবেদারবাদ বিরোধী দেশ-প্রেমিকেরা এবং সামন্তবাদ-ধনতন্ত্র-বিরোধী ও সমাজতান্ত্রিক শক্তিশালী অসংখ্য বিক্ষিপ্ত সংগ্রামে যতই পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে, ধনতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া ততই আত্মকলহে লিপ্ত হচ্ছে। বিপ্লবের শক্তি যেখানে যত বেশী সংহত হচ্ছে, প্রতিবিপ্লবের শক্তিশালী ততই বিশৃঙ্খল ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে। তাই বলে অবশ্য ওদের চালাকীতে কমতি নেই, যড়যন্ত্রে বিশ্রাম নেই। ফলে ‘বিশ্ব অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা, আন্তর্জাতিক প্রশ্ন বিভাজন, উত্তর-দক্ষিণী-আলাপ, জয়েন্ট কমিশন প্রভৃতি ও বৌদ্ধ আত্মনির্ভরতার বুজুককীতে জরাশিষ্ট-মকো-লগুন-প্যা রি স-টো-কিও-ন-রা-দিল্লীর শাসকদলগুলো শশব্যস্ত—নিষ্ফল ব্যস্ততায় ঘর সামলানোর কাজে অধির। আচ্ছ এ মুহুর্তে কি করলে পুঁজির কিছুটা হরহা হতে পারে, এটুকুও যাদের জ্ঞানসমুদ্রের বাইরে তাবড় তাবড় পরিকল্পনার যোঁকাবাজীতে তারাই তত সোচ্চার।

ছুটি মুঁখু শক্তির কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে না, তবু সাম্রাজ্যবাদ ও তাঁবেদারী পুঁজিবাদ উভয়ে পরস্পরকে অবলম্বন করে ছুনিয়ার রক্তপান করে বাঁচতে চায়। আত্ম-টিক একই কারণে উভয়ের মৃত্যুও তেমনি বিশ্বের জনগণের সঙ্গে সংঘর্ষের একই পথ ধরে। ওরা শোষণের চালাকী, অহুপ্রবেশের, মাজা, আক্রমণ ও অত্যাচারের অভিযান যতই বাড়িয়ে চলছে, যতই প্রসারিত করার চেষ্টা করছে, ছুনিয়ার দেশে দেশে সেই জনগণের দ্বারা ততই বেশী বেশী রকমে ঘেরাও হয়ে পড়ছে, আর ততই মারে মারে অস্তর হতে বাধ্য অতএব, বিশ্বের কোন পুঁজিরই বাঁচবার কোনও পথ নেই। নিজেদের কোনও চালাকীতে, কোনও কেরামজীতেও না। এক কথায় ইতিহাসের বিচারে যে ধনতন্ত্র মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, কোনও শক্তিই তাকে বাঁচাতে পারবে না—এমন কি বিশ্বাসঘাতক শোষণবাদীরা অর্থনীতি ও বাহ্যিক ও না।

ক্ষিত্র মনে রাখতে হবে, যে কোমল ও প্রকারের স্ববিধাবাদ ও অর্থনীতিবাদের দিক থেকে বুধ ফেরাতে না পারলে ভারতীয় বিপ্লবের বস্তুগত অবস্থাটা কত চমৎকার রূপে বাস্তব সত্যিকভাবে ধারণা করা সম্ভবপর নয়। আত্মমত্ত দিকের প্রশ্নের দুর্বলতাগুলি থেকে মুক্ত হতে পারলে (শেষাংশ ও পৃষ্ঠার)

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

১১ টাদার হার

বার্ষিক ২২ টাকা

বাৎসরিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠাবার ঠিকানা:

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, মট লেন ১, কলিকাতা ১৩

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং পরীক্ষায় টোকাটুকি

মদনমোহন চন্দ্র

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, কম, এবং এম, বি, বি, এস, পরীক্ষা উপলক্ষে দেশের শিক্ষাসমস্যাটি আর একবার প্রতিফলিত হল। পরীক্ষা দ্বারা দিলেন তাঁরা স্কুলের বালক নন। সে, পরিচয় তাঁরা ফেলে এসেছেন অন্ততঃ দু বছর আগে। বয়সে বুদ্ধিতে ও বিজ্ঞাতে তাঁরা নিঃসন্দেহে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছেন। 'পরীক্ষা' কথাটার অর্থ তাঁরা জানেন না ধরে নিলে তাঁদেরকে অসম্মানই করা হবে। অথচ একথাটাও তো সত্য যে তাঁদের একাংশ নকল করে পরীক্ষা দেওয়ার স্বযোগ 'দাবী' কলহেজ্জম এবং অধিকাংশ পরীক্ষা-কেন্দ্রে ভারী জ্ঞানভারিক পরিবেশে যথাযথভাবে পরীক্ষা হতে পারে নি।

পরীক্ষার নকল অতীতেও হত। তখন যারা নকল করত, তারা জানতো কাজটা অপরাধ। সেই কারণে তারা অতি গোপনে করত ব্যতীত শিক্ষক মহাশয়ের অগোচরে নকল করে উত্তর লিখত। এই হেতু আগের দিনে নকল করে পরীক্ষা দেওয়ার বলা হত চুরি করে পরীক্ষা দেওয়া। অবশ্য কোনো 'চোর' পরীক্ষার্থীই সকল প্রশ্নের উত্তর করে লিখত না। দু একটি প্রশ্নের উত্তর হয়ত তারা নকল করত। অধিকাংশ উত্তরই নিজে লিখত।

আজকের নকল করার ধরনটা অন্য রকম হয়েছে। কিছু না শিখে 'শিখেছি' প্রমাণ করার জন্য পরীক্ষার্থীরা সকল প্রশ্নের উত্তরগুলিই নকল করে লিখতে চায়। বেশ কয়েকবারই যায়, তাদের মুখ উদ্বেগে ফাটল। পাশ করে একটি সার্টিকিটে হস্তগত করা, দেখা নয়। এর ফলে তাদের কী নিদারুণ কষ্ট হয়ছে, তা তাঁরা বোঝে কিনা বলা শক্ত। সমাধের চোখে তারা তো হের হয়েছিল, এমন কি, পরীক্ষকগণের নিকট তারা হেরে পড়েছে সন্দেহ-ভাজন। উত্তরপত্র পরীক্ষার সময় পরীক্ষকের সন্মুখে হয়, উত্তরটা হস্ত নকল করে লেখা। কারণ গন্ত কয়েক বছর ধরে পরীক্ষাগৃহে অস্বাভাবিক বৈপরীত্য কাণ্ডকারখানা দেখে দেখে তাঁরা এই ধারণা বদ্ধবুল হয়েছেন যে, নকল না করে পরীক্ষা আজ কেউ দিবে না। হাজারে একজন হলেও, বেচারী সত্যতার সঙ্গে পরীক্ষা দিচ্ছে, সে কেমন করে পরীক্ষকের কাছে প্রমাণ দাবি করবে? তাঁর অবস্থাটাই আজকের দিনে সবচেয়ে

শোচনীয়। একদিকে, স্বাভাবিক ও শাস্ত পরিবেশের অভাবে সে সঠিকভাবে পরীক্ষা দিতে পারছে না, অপর দিকে, তার উত্তরপত্রখানিও সঠিকভাবে বিচার হচ্ছে না।

এইভাবে আমাদের দেশের শিক্ষাটা এক মর্মান্বিক প্রহসনে পর্যবসিত হয়েছে। যেহেতু এই প্রহসন-মঞ্চের পাদপ্রদীপের সম্মুখে শিক্ষার্থীগণকে আমরা দেখতে পাই, সেইহেতু প্রধানতঃ তাদেরকেই দায়ী করি। তারপর দায়ী করি শিক্ষকগণকে। কারণ কাম টামলে মাথা আসার মতো শিক্ষা ও শিক্ষার্থী এসেছে শিক্ষকের কথাটাও এসে পড়ে। এটা স্বাভাবিক। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক নিয়েই তো শিক্ষা ব্যবস্থা।

বলা বাহুল্য, এটা সমস্তার আপাতরূপ, আসলরূপ নয়। আসল-রূপ যেটা, সেটার আভাস সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর মন্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

ছাত্রদের কথায় প্রথমে ধরা যাক। ছয় বছর বয়সে শিশু অবস্থায় সে শিক্ষা আরম্ভ করে। চার বছর ধরে সে প্রাথমিক শিক্ষা পায়। দশ বছর বয়সে প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা পাস করে সে যখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়, তখন সাধারণতঃ দেখা যায় "রিডিং, রাইটিং এন্ড এরিথমেটিক", সংক্ষেপে "থ্রি আরস" ভাল করে শেখে নি। অর্থাৎ মাতৃভাষায় সহজ করে লেখা একটি রচনা সে ভালভাবে পড়তে পারে না, পাঁচ ছয়টি নিছুল বাক্যে ও বানানে একটি সহজ ভাবকে প্রকাশ করতে পারে না—হাতের লেখা তো অতিশয় দুর্পাঠ্য, এবং গণিতের গোড়ার জ্ঞানটুকু ঠিকমতো হয় না। ইংরেজি বা শেখে, বিশেষতঃ অক্ষরগুলি বেভাবে লেখে, দেখে মনে হয় একেবারে কিছু না শিখলেই ভাল হত। এই দুর্বলতা নিয়ে বেচারী মাধ্যমিক শিক্ষা শুরু করে। অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নীচের দিকের ক্লাসগুলি হয় যেমন এক একটি জনসভা। বাট-সত্তরটি ছাত্র ঠাসা-ঠাসি করে বসে থাকে। শিশু-হলভ চঞ্চলতা ও চিংকার তো থাকেই। শিক্ষক কী করবেন এই জনসভাকে নিয়ে? হাতে তাঁর চল্লিশ মিনিট সময়। শুধু কি শেখানো? তার মধ্যে আছে নানা অভিযোগের তামানি ও বিচার। দিনের পর দিন চলে এইভাবে শেখানোর প্রহসন। পরীক্ষায় অধিকাংশই ফেল করে।

তবু প্রধান শিক্ষক তাদেরকে পাস করতে বাধ্য হন। কারণ ছাত্রদ্বারা বয়ে চলেছে। নববর্ষে নবাগতদের জ্ঞান স্থান খালি রাখা চাই। বছরের পর বছর ঐ একই প্রক্রিয়ায় ছাত্রগণ ফেল করতে করতে উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে থাকে। যত উচুতে ওঠে তত বিষয়গুলি তার কাছে শক্ত মনে হয়। সে কোনো কলকিনারা পায় না। এই অবস্থায় পড়ে সে পরীক্ষায় নকল করার চেষ্টা করে। কারণ পাস তাকে করতেই হবে যে। সে জানে, একই শ্রেণীতে দু বছর ধরে পড়ার খরচ চালানোর সাধ্য তার গরীব পিতার নাই। এমনি করেই হাবুডুপ খেতে খেতে বেচারী মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করে। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যদ সমাপন। তাই কমপার্ট-মেন্টাল, সানিয়েমেন্টারী ইত্যাদি নানা পরীক্ষার ব্যবস্থা রেখেছেন পাস করার জন্য।

এতো পেল সেইসব স্কুলের কথা, যেখানে পর্যদেই কাইনাল পরীক্ষা-স্থান না হওয়ার জন্য মোটামুটি বারো মাস ক্লাস হয়। কাইনাল পরীক্ষার কেন্দ্র হয় স্কুলগুলি, সেখানে পড়া-স্তনা হওয়ার স্বযোগই মেলে না। জাহ্নসারী ও কেক্সারী মাস যায় স্কুল স্পোর্টস, ব্লক-স্পোর্টস, মহকুমা-স্পোর্টস, জেলা স্পোর্টস ও সরস্বতী পুণো নিয়ে। মার্চ মাসে পুরো ক্লাস আরম্ভ হয়। এপ্রিল মে দু মাস ক্লাস বন্ধ। ঐ সময় চলে মাধ্যমিক, পুরনো হায়ার সেকেন্ডারী ও পুরনো স্কুল-কাইনাল পরীক্ষা। শিক্ষক-শিক্ষিকা-গণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন একদিকে ইন-ভিজিলেন্সনের কাজে, অপর দিকে কেউ ছুটে বেড়ান মৌখিক পরীক্ষা নেওয়ার কাজে; কেউ শারীর শিক্ষা পরীক্ষা নেওয়ার কাজে। কেউ বা কর্ম-শিক্ষার পরীক্ষা নেওয়ার কাজে। তারপরই শুরু হয় প্রধান পরীক্ষকের ডাকে কলকাতা যাওয়া আসা। এই সময় পর্যদ কর্তৃক নিযুক্ত পরীক্ষক হিসাবে তিনি খাতা দেখার কাজে বেজায় ব্যস্ত থাকেন। তারপর-জুন মাসে গ্রীষ্মের ছুটি। জুলাই মাসে হার-ইয়ার্লি পরীক্ষা। কী পড়া হল যে পরীক্ষা! পড়া না হলেও পরীক্ষা করতেই হয়। ওটা বছরকালের নিয়ম যে! আগস্ট ও সেপ্টেম্বর দু মাস ক্লাস হয়। অক্টোবরে পুজোর বন্ধ। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে চলে বার্ষিক টেস্ট পরীক্ষা। তাছাড়া, প্রাথমিক শেষ পরীক্ষাটাও চালাতে হয় শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে। এইভাবে একটি শিক্ষাবর্ষ শেষ হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রের অব্যবস্থার শেষ এখানেই নয়। আরও আছে। একজন প্রাথমিক শিক্ষক বা শিক্ষিকা মাসে আড়াই শ' টাকা বেতন পান। বেকার থাকার চেয়ে ভালো। অর্থাৎ মন্দের ভালো, এই ভেবে একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। এটাই ধানের একমাত্র জীবিকা, তাঁরা আড়াই শ' টাকায় পরিবার প্রতিপালন করতে না পেয়ে হতাশায় ও উত্তমহীনতায় ভোগেন। কংগ্রেসী শাসনকালে মন্ত্রী ও এম, এল, এ-দের সাহায্যে রাজনৈতিক সহযোগিতার পুরস্কার হিসাবে যে সকল যুবক যুবতী এই কাজ নিয়ে-ছেন, তাঁদের অধিকাংশই এই কাজকে পছন্দ করেন না। গাঁয়ের অবস্থাপন্ন জোতদার মালিকের ঘরের ঘে-সব ছেলে এই কাজ করেন, তাঁরা তাঁদের বেতনটাকে 'বাড়তি উপার্জন' হিসাবে গণ্য করেন। কাজেই শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর প্রতি ধানের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই, তাঁদের দ্বারা একাজ কেমন করে হবে? এঁদের উপর ধবরদারি করেন দ্বারা সেই সাব ইন্সপেক্টরগণ একদিকে শিক্ষাদপ্তরে বড় অফিসার হতে না পারার জন্য হতাশায় ভোগেন, অপর দিকে স্কুলে গিয়ে দারোগাগিরি করেন।

মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকের বেতন প্রাথমিক শিক্ষকদের চেয়ে কিছু বেশী। কিন্তু তাঁরা বেতনটা সময় মতো পান না। যে মাসে, পুজোর আগে ও মার্চ মাসে তিন কিস্তিতে পান। অর্থাৎ সরকারী অহুদান এলে পান। অতএব প্রাই-ভেট টিউশন না করে উপায় থাকে না। সময় মতো বেতন না পাওয়ার জন্য তাঁদের উত্তম নষ্ট হয়ে যায়। প্রধান শিক্ষকের প্রধান চিন্তা কেমন করে শিক্ষক ও কর্মীদেরকে বেতন দেওয়া যায়। তাঁর আরও একটি চিন্তা আছে—কেমন করে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভ্য মহাশয়গণকে সন্তুষ্ট রাখা যায়। একবার যদি তাঁরা কোনো কারণে বৈকে বসেন বা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরোধে লিপ্ত হন, তাহলেই স্কুলের দফা সারা। স্কুল চালানোর নামে স্কুল অচল করার ঘটনা বহু স্কুলে ঘটছে। মামলা-মকদ্দমা-ইনজাংগন বহু স্কুলে লেগেই আছে। তাছাড়া, স্কুলের আরও যে গুরুতর সমস্যা আছে, তা দেখার কেউ নাই। যেমন, স্কুলবাড়ি মেসারস, স্থামাতা দূর করার জন্য নুতন ঘর তৈরী করা, পুরনো আস-

বাব মেসারস, জীর্ণ ব্যবহার-অযোগ্য আসবাব বাতিল করে নতুন আস-বাব ক্রয় করা ইত্যাদি। এগুলো কে করবে? সরকার শুধু বেতনের জন্য অহুদান দিয়ে থাকেন। কমিটির সভ্যগণ যে টাকাপয়সা পকেটে নিয়ে মিটিং করতে আসেন না, তা বলাই বাহুল্য। অথচ আইন অহুদারী এসব ব্যবস্থা কমিটির করার কথা!

পৃথিবীর কোনো সভ্যদেশে এইভাবে শিক্ষা চলে কিনা জানি না। আমাদের সর্গোরবে চলছে। শীর্ষে দ্বারা বসে আছেন, তাঁরা নিত্য নুতন পাঠক্রম রচনা করছেন, সেই নবরচিত পাঠক্রমকে 'দ্বীখনমুখী' 'কর্মমুখী' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করছেন, পরীক্ষার নব নব কথাকৌশল আবিষ্কার করছেন এবং স্কুলে আদেশ-নির্দেশ পাঠাচ্ছেন কার্ধ্যকরী করার জন্য। স্কুলে ঠিক-মতো কাজ চালাতে কী অহুদা হচ্ছে, এ তথ্য সংগ্রহ করার কোনো ব্যবস্থা নাই।

দুর্ভাগা এদেশের ছেলেমেয়েরা। শিক্ষার প্রহসনের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনের দশটা মূল্যবান বছর অশচয় হয়ে যায়। তারপর? কী করবে তাঁরা? কাজ নাই। কাজ পেলে কাজে যেত। অগত্যা কলেজে ভর্তি হয়। স্কুলে ভালভাবে শেখার স্বযোগ পায় নি বেচারীরা, কলেজের শিক্ষা কঠিন মনে হয়। দরকারী বইগুলি সব কিনে দেওয়ার সাধ্যও অভিভাবকের নাই। সব শিক্ষকের অধ্যাপনাক্ষেত্রে খুব ভাল হয় তা নয়। প্রাজ্ঞ অধ্যাপনায় তারা আকৃষ্ট হয় বৈকি। কিন্তু সে-রকম আকর্ষণীয় অধ্যাপনা ক'জনের দ্বারাই বা সম্ভব। যেটাবোঝা গেল না, সেটা কে বুঝিয়ে দেবেন? আগের দিনের কম কলেজ-শিক্ষকই প্রাইভেট টিউশন করতেন। আজকাল অনেকেই করেন। যার বাবা বড় ব্যবসায়ী বা বড় চাকুরী, সে পড়তে যায়। অতএব বিনা-দক্ষিণায় কেমন করে যাওয়া যায়! যায় না। তখন ছাত্র কী করবে? কলেজের পড়ায় ইতফা দিয়ে এসে বাড়িতে বসে থাকবে?

এই যখন তার অবস্থা, কেমন করে পাস করবে ভেবে যখন সে কলকিনারা পায় না, তখন সে নকল করার স্বযোগ গ্রহণের 'আস্থানে' সাড়া দেয়।

শিক্ষাক্ষেত্রের সুক্ষসিরা মাঝে মাঝে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁদের উদ্বেগের বিষয়—উচ্চ শিক্ষার সর্ব-স্বতীকে কেমন করে ক্রমবর্ধমান ছাত্র জনতার অব্যাহিত স্পর্শ থেকে রক্ষা করা যায়। স্কুলের স্তর পর্যন্ত যাচ্ছে জোক, যা চলেছে চলুক, তাতে (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

আপত্তিকর ভাষা

গত ১লা জুলাইয়ের দর্পণে “জনতার
সুখ বনাম জনতার নেতা” শীর্ষক
নিবন্ধে অজয় মুখার্জী, সি পি আই
নেতৃবৃন্দ ও এস ইউ সির শিবদাস
শোষ ও নীহার মুখার্জীর সমালোচনা
করতে গিয়ে যে ভাষা ব্যবহার করা
হয়েছে তা আপত্তিকর। রাজনৈতিক
সমালোচনা রাজনীতির ভাষাতেই
হওয়া উচিত। তা না করলে বামপন্থী
রাজনীতিই সাবিকভাবে কতিপয়
হবে।

ବିଦେଶ ଆଞ୍ଚ

মিথ্যা প্রচার

আগুনাদেবের পঞ্জিকায় গত তরা
জুন "আশ্বর্ষ ঘটনা" শিরোনামে যে
সংবাদ এবং এলা জুলাই মৃত্যুভ
কলমে "গুণাদেবের অভ্যুত্থান" নামে
যে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে সে দুটির
বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাজি,

কারণ এ ঘটনা মিথ্যা। পারিবারিক
 ও ব্যক্তিগত ক্রোধে শত্রু চই বন্ধুর
 নাম দিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে।
 এ ব্যাপারে পার্শ্ববর্তী পাড়া ইন্ডন
 -যোগাচ্ছে।
 ডি. বানার্জী

আপত্তিকর শিরোনাম

গত ২৭শে জুনের দর্পণে “আর
জি করে যদ, কুয়া ও রোগিনী-ধ্বংসের
আসর”—এই শিরোনামে এক সংবাদ
প্রকাশিত হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে
তদন্তের অবিকার সরকারের। কিন্তু
এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তম ছাত্র এবং
সম্ব্যাপক, হুগবিনস্টোনডেক্ট ও অধ্যক্ষ
হিসাবে আমি আপনাদের কাগজে
প্রকাশিত এই সংবাদের শিরোনামের
তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি মনে
করি ঐ শিরোনাম আমাদের এই
স্বহাম ও ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের তথা
চিকিৎসা-অগতের পক্ষে অত্যন্ত অপ-
মানজনক।

কমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ও স্পারিনিটেন্ডেন্ট
আর জি. কব্জি মেডিকেল কলেজ
ও হাসপাতাল

জাতীয় আত্মনির্ভরতা

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

সংগ্রাম ও মুক্তির প্রসঙ্গে সঠিক লাইন
সঠিক কর্মসূচী সম্পর্কে স্বচ্ছ চিন্তা ও
সিদ্ধান্ত নেওয়াও যেমন অসম্ভব,
তেমনি প্রকৃত শ্রেণী সংগ্রামে নিজেদের
কিংবা জনগণকে সমবেত করাও
সম্ভবপর নয়। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি
কথাও মনে রাখা উচিত যে, অতি
সম্প্রতিকালে ইন্দিরা সরকার ও
কংগ্রেসদলের ভরাডুবির মধ্যে, জনতা
পার্টির মধ্যকার অস্থিরতাও লর
মধ্যে এবং ইন্দিরা কর্তৃক ভারতীয়
সেনাবাহিনীকে ওলব করতে ব্যর্থতার
মধ্যে যে সাধারণ সামাজিক-রাজ-
নৈতিক অস্থিরতার পটভূমি ফুটে
উঠেছে, প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিন-
বাদীদের দৃষ্টিতে তার গুরুত্ব অপরিসীম
(A great disorder is an
excellent situation—Mao
Tse Tung)।

অতএব, সময় ও সুযোগের সন্ধান
করেই সাক্ষাৎসাক্ষ্য, সামাজিক

সাম্রাজ্যবাদ, তাঁবেদারবাদ সামন্তবাদ—এক কথায় কাবাগার, অত্যাচার, অনাহার ও মৃত্যুর শক্তিগুলিকে—আঘাতে আঘাতে স্তব্ধ করে দিতে হবে, উৎপাদনের বিপ্লব আর রাজনৈতিক বিপ্লবের রাস্তা একই। দুনিয়াব প্রায় সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ও তাগেব ডাবতীয় তাঁবেদারদের কায়েমী স্বার্থের ইমারত ও শোষণ প্রকল্পগুলো সারণ ভারতবর্ষ জুড়ে যে অসংখ্য সাকসন পাস্পের শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে আমাদের জবাব দিতে হবে, দেশটা কার। আর এ কাজ হবে জনগণের উত্তোগোজনগণের শক্তিতে, জনগণের স্বনির্ভর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার পথে ‘হাভী-বুর্জোয়া (Big bourgeoisie) পাতিবুর্জোয়া’ যড়যন্ত্রগুলিকে চুরমার করে। শ্রেণী সংগ্রামের এ রাস্তায় দেশের বিপ্লবী শক্তিগুলিকে ক্রম সচেতন করতে না পারলে ফ্যাসিবাদের সামাজিক ভিত্তি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে পারে।

এই সংখ্যা ও পূর্ববর্তী সংখ্যায়
উপস্থাপিত আলোচনার আলোকে
ভারতীয় বিশেষ পটভূমিকায় জাতীয়
অর্থনীতির স্বনির্ভরতার নিয়ম-
গুলোকে বিচার করে দেখলে নীচের
সিদ্ধান্তগুলিতে আসতে হয় :—

১। সাম্রাজ্যবাদের 'সহায়তার' ওপর নির্ভরতা ও জাতীয় আত্ম-নির্ভরতা পরস্পর বিপরীতধর্মী, আমেরিকা-বৃটেনের বিকল্প রাশিয়া পূর্বইউরোপ হস্তে পারে না, কারণ সাম্রাজ্যবাদের বিকল্প সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ নয়।

২। ঋণাত্মক আমদানী ও
ঋণাত্মক রপ্তানীর প্রতিষ্ঠিত নীতি
স্বার্থের সমূহ সম্পদের সর্বনাশ।
অপচয়ই শুধু ঘটায় না, উপাদান
শক্তিগুলোকেও সাধারণভাবে পক্ষ,
বহির্বাঙ্গার-আশ্রয়ী ও অনিশ্চিত-
ভবিষ্যৎ করে তোলে, আভ্যন্তরীণ
বাজার সঙ্কটকে তীব্রতর করে ও
সম্প্রসারণবাদের উপাদানগুলোকে
প্রেরণা যোগায়।

৩। অভাব; কৃষিক, খনিজ ও
অগ্রাণ জাতীয় সম্পদগুলির বেপ-
রোয়া রপ্তানী-নীতি জাতীয় জনগণের
অর্থনীতির পরিপন্থী; বিশ্ব পুষ্টিবাদের
নানা স্বার্থের এক স্বর্ণাভয় বড়বয়।

৪। বিবেচনা-পুঁজি, প্রকল্প, বস
 ও ক্ষমীর নেতৃত্বে গড়ে-ওঠা বর্তমান
 ভারতের পুঁজি-স্বার্থগুলি “অন্নও
 রপ্তানীর জন্য আরও আমদানী,
 আরও আমদানীর জন্য আরও
 রপ্তানীর” এক অগাধ পাপচক্রে
 নিবদ্ধ, এভাবে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি
 বিনিয়োগ ব্যবস্থাকুলি ও শুল্কটুলি

ভারতের জাতীয় উৎপাদন শক্তিগুলি
নিম্নতম ও অবরোধ কবে রেখেছে।

৫। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী
তাবেকারী পুঁজি ও প্রকল্প
মালিকানা ও উদ্দেশ্যগুলির যৌনিক
রূপান্তর এক জরুরী কাজ এবং তা
এমন ভাবে হওয়া চাই যাতে উৎ-
পাদনশক্তিগুলোর গণতান্ত্রিক কেন্দ্রী-
কতার কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন হয়।

৬। উৎপাদন শক্তিগুলি এক-
মাত্র স্বার্থ শ্রেণী সংগ্রামের পথেই
উন্নত হয়, মুক্ত হয় ; এ পথে সাম্রাজ্য-
বাদী ও তাঁবেদারী পুঁজিস্বার্থগুলির
ও শাসকশ্রেণীগুলির প্রধান প্রশাসনিক
আমলাবাহিনী বিশ্বাসঘাতক শাসক-
দলগুলোকে প্রতিনিয়ত ভগ্নগণ থেকে
আরও বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে
যাতে ফ্যাসীবাদের সামাজিক ভিত্তি
গুলো চূড়ান্তরূপে দুর্বল হয়ে পড়ে ।

৭। সাম্যবাদী কাম্বোজী স্বার্থ-
গুলিকে চূরনার করতে সর্বশক্তি
নিয়োগ করতে হবে, ভারতের শ্রমিক
শ্রেণীকে শোধানবাদ ও অর্থনীতিবাদের
প্রভাবমুক্ত করার প্রধান চাবিকাঠি
এখানেই।

৮। ভারতীয় অর্থনৈতিক
রাজনৈতিক-বিপ্লবের ভিত্তি কৃষির
উৎপাদন শক্তিতে নিহিত, যার
অগ্রগামী উপাদান-শিল্প উৎপাদন-
শক্তির সচেতন নেতৃত্ব (সর্বহারা
নেতৃত্বে কৃষি-বিপ্লব)।

১। ভারতীয় পরকল্পনার
নেতৃত্ব অবশ্যই উৎপাদন শক্তিগুলি
থেকে আসবে—বুর্জোয়া,
বুর্জোয়া, ব্যুরোক্রাসি, টেকনোক্রেট
থেকে নয়। কারণ, উৎপাদন শক্তি-
গুলির প্রেরণা, উত্থম ও প্রতিভাই
উৎপাদন-বিস্তারের চালিকাশক্তি,
আর এ কারণে তাদের সমর্থন হলো
জাতীয় সম্পদ ভাণ্ডারগুলি।

১৬। এভাবে দেশের সমগ্র জন-
শক্তিকে দেশের সম্পদসমূহের সঙ্গে
নিযুক্ত করে, সংগঠিত করে ও
আঞ্চলিক বিশেষ বিশেষ উৎপাদ
শক্তি ও সম্পদ সম্ভারের সমন্বয়ে
প্রতি লক্ষ্য রেখে অর্থনৈতিক
কার্যমোহন নয়। বিজ্ঞান ছাড়া সব
পথই বিপথ।

মনে রাখতে হবে বুজোয়ারা
বাঁচে তাদের রাষ্ট্রশক্তির জোরে,
সংগঠনের চালাকীতে, প্রচারধর্মের
মাধ্যমে আর শোখনবাদের সহায়তায়
অপরদিকে জনগণ বাঁচে নিকেমের
শ্রেণী সচেতন সংগঠনের শক্তিতে,
সঠিক লাইন ও কর্মসূচীকে অঙ্গীভূত
করে। এ সব কিছুই থাকে গড়ে
তুলতে হয় অতি দ্রুত, অতি অস্থগুণে
ও অসাধারণ দক্ষতার সহিত।

কোনও বিকল্প নেই, যে কো
বিকল্পের চেষ্টাই আত্মহত্যার সার্মক
[এ প্রসঙ্গে মহাশয়নের মহান
দষ্টান্ত আগামী বারে]

হীরা মেলে হরিলাল মেলে না...



নিজের প্রাণ দিয়ে শিশুদের বাঁচিয়ে
 দিয়েছিলেন হরিনাথ। একটি দুর্লভ
 অহিংস চিন্তা রেখে গেলেন লোহা মাটি
 পাথরের ফাঁদে।

তার নাম ঘিরে থাকবে আনাদের পর্ব শ্রদ্ধা কুতজ্ঞতা।

অযথা প্রাণের খুঁকি নিতে গিয়ে যদি তাঁর কথা স্মরণ করেন, যদি ধৈর্যে যান, সেই হবে তাঁর স্মৃতির প্রতি সত্য প্রদর্শনা। নিজের জীবন বা হরিলোকের মতো আর কোন অর্থ জীবন বিপন্ন করে তুলবেন না।

পূর্ব রেলওয়ে



10711 7/10/18

গুলী করে মেরেছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রোয়ানা জারী হয়। অভিযোগ, তিনি সি, পি, আই, (এম-এল)-এর কালিঘাট অঞ্চলের নেতা। ফটিকও আত্মগোপন করতে থাকেন ওদের চোখে ধুলো দিয়ে। প্রায়ই রাতে পুলিশ এসে বাড়ির লোকজনকে শাসাচ্ছে যে, “খানায় হাজির না করলে ফটিকের কপালে মৃত্যু আছে।”

দোশরা নভেম্বর ফটিক অফিস করেছে, মাইনে তুলেছে। সন্ধ্যাবেলা এলাকায় অনেকের সঙ্গেই গল্প গুজব করে রাতে আশ্রয়স্থলে গুতে গেছে। আরগাটা হলো, রাসবিহারী মোড়ে মুক্ত অঙ্গন নাট্যালয়ের পাশেই একটা টিনের ঘর। আত্ম আত্মে আরও পাঁচজন সহকর্মী ওখানে আসে এবং ওরা একটা চারদর বিছিয়ে মেঝের ওপরে পড়ে। রাত আরোটা পর্যন্ত গল্প করে ওরা ঘুমিয়ে পড়ে।

বিস্তৃত কটাকাবানেক বাবেই শোনা যায় টিনের দরজার ভারী বুটের আওয়াজ। চোখ মেলতেই ওদের চোখে আসে বড় বড় টর্চের চোখ ধাঁধানো আলো। ঘরের চারদিকে বসে ফুটো আছে তার মধ্য দিয়ে সি, আর, পিরা তাদের বাইকেলের মল ঢুকিয়ে দিয়েছে।

ঐ বুটের যা কতকণ আর সহ টিনের দরজা। দরজা ভেঙ্গে

। ভবানীপুর খানার ভদ্রাশীতন অফিসার-ইন-চার্জ বর্তমানে উত্তর কলকাতার এ, সি, অনিল ব্যানার্জীর নেতৃত্বে একদল পুলিশ ও সি, আর, পি, হুড়মুড় করে ঐ ঘরে ঢুকে পড়ে।

এবং বেশরোয়া লাগি চালায়। এরপর তারা “ফটিক-মুখার্জী কে” বলে খোঁজ করতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে ফটিক নিজেই নিজের পরিচয় দেন।

তখন তাঁকে সনাক্ত করার জন্য তার নামের ছোট ভাইরা মার খাচ্ছে, এটা তাঁর সহ হয়নি। সেই না বলা যে, “আমিই ফটিক স্তার”—ব্যস আর রক্ষে আছে। ও, সি, অনিল ব্যানার্জী এক লাগি মারগেন, ফটিক পড়ে গেল। তারপর ফটিককে ভবানীপুর খানার প্রবন্ধ বিশালাকার জমাদার কালু ও গণেশ টেনে তুলে দাঁড় করায়। এবং সেই ও, সি, অনিল ব্যানার্জী কোমর থেকে রিভল-বের করে জলজ্যাক্স, অসহায়, নিঃস্ব ফটিককে গুলী করলেন, গুলী এসে

ফটিকের গায়ের পিছনে লাগলো। গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ফটিক ঘরে পড়লো মেঝের। এতেও ক্ষান্ত মন অনিল ব্যানার্জী। উনি ওর সাজপাঙ্গদের ফটিকের নাক টিপে ঘরতে বললেন যাতে বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে না পারে।

অস্ত্রের উপর চলেছে তখন প্রা-রেশ ধনঞ্জয়। কিন্তু ফটিকদের একজন সহকর্মীকে ওরা কিছুই বলছে না। তার নাম মধু। ফটিকদেরই পাড়ার ছেলে। সকলকে বাইরে নিয়ে এল। বাইরে তখন তেরপল্লের ছাউনি দেওয়া সি, আর, পিরা লীগলো লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা জিপ পাড়িতে অস্ত্রের সকলকে তুললো। ফটিককে টানাইচড়া করতে করতে বাইরে নিয়ে এলো।

ওরা খুন করার জন্য তৈরী হয়েই এসেছিলো। তাই সঙ্গে করে লাল জামা চিহ্ন দেওয়া পুলিশের এ্যাম্বুলেন্স গাড়ি আনতেও ভোলেনি। সেই গাড়িতে ওরা ফটিককে তুললো। নিয়ে গেল ভবানীপুরে রামরিক হাসপাতালে। ভোরবেলা পুলিশ এসে ফটিকের হাদাকে আনিরে গেল যে, “আপনার ভাইকে আমরা গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিলাম। সে পালাতে গিয়ে পড়ে গেছে এবং এখন হাসপাতালে আছে। দেখতে যেতে পারেন।” আত্মসংগে দাদা ট্যান্ডি করে ছুটলেন হাসপাতালে। দেখলেম ডাইয়ের গুলীবিদ্ধ মৃতদেহ।

চৌঠা নভেম্বর সব খবর কাপজে বখারীতি প্রচারিত হল, “শ্রীমপ্রসাদ মুখার্জী রোডে নকশালপন্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয় এবং এতে ফটিক মুখার্জী (৩২) মারা যান।”

এরপর কংগ্রেসী রাজত্বের সময় ফটিকের দাদা অসিত মুখার্জী সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে ভদ্রাশীতন বরাট দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কে, সি, পন্থকে চিঠি দিয়েছিলেন। উত্তর সকলেরই জানা আছে। কিন্তু এখন কেন্দ্রে ও এই রাজ্যে মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটছে। জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন জনপ্রিয় বায়স্কট সরকার এ ধরনের সমস্ত খবরের তদন্ত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

হাজার রাজনের একজন ফটিক মুখার্জীর খবরের তদন্ত হোক। কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হোক অনিল ব্যানার্জীকে (বর্তমানে এ, সি,)। যে রাতে গুলী করেছেন সেই হাতকে পঙ্ক করে দিতে হবে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে।

হ্যাঁ, ফটিক কি করে ধরা পড়লো এবার বলি। পুলিশ তার এক ইন-কর্মারকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো ওদের দলে। ওরই নাম মধু। মধুও ওখানে ওদের সঙ্গে গিয়েছিল। পুলিশের সঙ্গে ওর সর্বদা যোগাযোগ ছিল। পুলিশ ওকে ওখান থেকে লোক দেখানো গ্রেপ্তার করলো। মেলেও দুদিন রাখলো। তারপর...ফটিকদের মেকী কমরেড মধু পুলিশের আশ্রয়স্থলে এল।

কংগ্রেসী রাজত্বে বরখাস্ত শিক্ষকদের পুনর্বহাল দাবী

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

হুগলী নগর বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষক সহ পাঁচজন ইন্টার্ন শিক্ষক শিক্ষিকাকে পুনর্বহালের আবেদন জানানো হয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রীর কাছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, কংগ্রেসী সন্ত্রাসের কলে উপরোক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালক কমিটির সদস্যবৃন্দ পাড়ার বাইরে থাকতে বাধ্য হন। সেই জািসের মধ্যেও শিক্ষক শিক্ষিকারা তাঁদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ১৯৭২ সালের ১৫ই আগস্ট কংগ্রেসী

মস্তানরা সুপরিকল্পিতভাবে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় স্কুলের সামনে প্রধান শিক্ষককে মারধোর করে। সমস্ত শিক্ষককে জোর করে তাড়িয়ে দেয়। শিক্ষকদের “অপবাদ” তাঁরা খুনের রাজনীতির সমর্থক ছিলেন না, সন্ত্রাসের রাজনীতিকে পছন্দ করতেন না। এরই জন্ত তাঁদের উপর নেমে আসে অত্যাচার, চলে নিপীড়ন। পরবর্তীকালে বে-আইনীভাবে কমিটি গঠন করে নিজেদের পছন্দ মতো লোককে শিক্ষক হিসাবে নেওয়া হয়।

মেডিকেল প্রতিনিধিদের সম্মেলন

(দর্পণের প্রতিনিধি)

ফেডারেশন অব মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভস এসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ায় উদ্যোগে ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে অস্থিত এক কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবে ঐযথ শিল্পের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয় যাতে এই শিল্পে শান্ত বজায় থাকে এবং কর্মচারীদের ডিকটিমাইজ করা বন্ধ হয়।

এই কনভেনশনে পশ্চিমবঙ্গ বিহার অসাম ওড়িশার মেডিকেল ও সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভদের রাজ্য ইউনিয়নের ৬০০র বেশি প্রতিনিধি যোগদান করেন। ঐযথ শিল্পে নিযুক্ত কর্মচারীদের অত্যাচার সংগঠন, ব্যাঙ্ক, এল, আই, সি, মার্কেটাইল ফেডা-

রেশন, ডাক ও তার ইউনিয়নের প্রতিনিধিরাও এই কনভেনশনে তাঁদের বক্তব্য রাখেন।

জরুরী অবস্থায় ১০০ জনেরও বেশি মেডিকেল ও সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভকে বরখাস্ত করা হয়। এ ব্যাপারে আলোচনার জন্তই এই কনভেনশনের ববস্থা করা হয়।

ফেডারেশন সারা ভারতে সমস্ত বরখাস্ত মেডিকেল ও সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভদের পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছে। ঐযথ শিল্পে হুণীতি সম্পর্কে তদন্ত কমিশন গঠনের জন্তও ফেডারেশন কেন্দ্রীয় তৈল ও রসায়ন মন্ত্রী এইচ.এন, বহগুণা ও শ্রমমন্ত্রী রবীন্দ্র ভার্মার কাছে আবেদন জানিয়েছে।

শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট চারের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের আন্দোলন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

উত্তর কলকাতার শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃপক্ষের ছাত্র ও শিক্ষক স্বার্থ বিরোধী মনগড়া আইনের বিরুদ্ধে তাদের নানান দাবী দাওয়ায় পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। কর্তৃপক্ষের প্ররোচনায় স্কুলের ভিতরে সমাজ বিরোধীদের অজ্ঞপ্রবেশ ঘটিয়ে আক্রমণের চেষ্টা করা হয়। এর প্রতিবাদে গত ২রা জুলাই শিক্ষকরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতীক ধর্মঘট করেন।

শিক্ষকদের অনেক দাবীর মধ্যে আছে এইসব অন্যান্যের অবসান— (১) স্কুলের মিরীহ শিক্ষকদের গড়ে ৩২টা করে ক্লাসে পাঠান হয়। অথচ বোর্ডের নিয়ম অনুসারে গড়ে

সপ্তাহে সর্বাধিক ২৫টা করে ক্লাস করা যায় (বাড়তি সহ)। (২) বহুদিন ধরে কর্তৃপক্ষ বাইরের গুণ্ডাদের নিয়ে ভয় দেখিয়ে আসছেন। এর অবসান দরকার। (৩) ৭৫ সাল থেকে সরকার অহুমোদিত হারে বকেয়া বেতন এখনও পাওয়া যায় নি। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নিয়মিত জমা পড়ে না।

“পকেট ম্যানেকিং কমিটি”র পরিবর্তে অভিভাবক ও শিক্ষক প্রতিনিধি নিয়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে ঐ কমিটির নির্বাচনের সমস্ত দাবী নস্ত্রাং করে স্বার্থাঘেযী ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতন্ত্র স্কুলকে বক্তাগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছে। ক্ষান্ত ভা বক রা এর পরিবর্তন চাইছেন।

পরীক্ষায় টোকাটুকি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

ওদের মাথাব্যথা নাই। এই প্রসঙ্গে ইন্দিরা সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষা-নীতি স্মরণীয়। “এতকাল পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ছাত্র-ছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য তৈরী করা। এখন থেকে লক্ষ্য হবে ছাত্রছাত্রীকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা।” কেমন করে? সেটা খুলে বলার দরকার হয় নি। ষাঁদের বোঝা দরকার তাঁরা ঠিকই বুঝে নিয়েছেন। তদনুযায়ী পাঠ্যক্রম তৈরী করেছেন তাঁরা। তারপর খাড়া করা হয়েছে হু বছরের হায়ার সেকেন্ডারীর বেড়া। এই বেড়াটি যে অতিক্রম করতে পারবে, সে যাবে কলেজে পড়তে। এই বছরের হায়ার সেকেন্ডারী শিক্ষা কেমন চলছে, কী তার পাঠ্য, কারা পড়াচ্ছেন, কদিন সেখানে ক্লাস হচ্ছে— এইগুলি বিশ্লেষণ করলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, ঐ বেড়াটি টপকে যাওয়া কম ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষেই সম্ভব হবে।

ছাত্ররা শিখতে চায় না, একথা ঠিক নয়। যে-শিক্ষক ভালবাসেন এবং ভালভাবে সেখান, তার প্রতি তারা আজও প্রস্ফাশীল। ছাত্রদের দী ও শিক্ষানুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকা নাই, তা নয়। আছেন। শুধু প্রয়োজন তাঁদের কাজের অন্তরায়গুলি দূর করা। স্কুল-পরিচালনার ব্যবস্থার পরিমার্জন অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ, আশু প্রয়োজন। আমলাতন্ত্রের কবল থেকে শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষালয়কে মুক্ত করতে হবে। প্রত্যেক স্কুল থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। কার কী আছে বা নাই। স্কুলের নিয়ন্ত্রণ আত্মকগুলি মেটাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। আমলাতন্ত্রের হাত দিয়ে এই কাজ হবে না। ঐ যন্ত্রটি তদবির, খোঁশামোদ ও পুজো পছন্দ করে। তাছাড়া, টাকাপয়-সার গন্ধ পেলে ঐ যন্ত্রের সঙ্গে নানা মহল জুটে যায়। প্রাথমিক স্তর থেকে পাঠ্যক্রমের পর্যালোচনা ও পরিবর্তন প্রয়োজন। এই সম্পর্কে যুলমীতি স্থির হোক—অল্প শিখুক, ভাল করে শিখুক। পবীক্ষা-পদ্ধতি সরল করা দরকার। দীর্ঘকাল ধরে পরীক্ষা চলার রেওয়াজ বন্ধ হোক। পরীক্ষা মুখ্য নয়, শিক্ষাই মুখ্য—এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন দরকার। মধ্য-শিক্ষা পর্যায়কে পরিমুদ্র করা খুব প্রয়োজন। গত কয়েক বৎসরে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়ে স্বীয় মর্যাদা হার করেছে এবং আমলা-তান্ত্রিক চরিত্রের গুণাবলী ওর্জন করেছে। তদন্ত করলে প্রশ্নের অভাব হবে না।



বাংলা চলচ্চিত্রের গঙ্গাযাত্রা

ভানুসিংহ

প্রতিটি ছবির মোট ব্যয়ের ওপর অতিরিক্ত দশ শতাংশ হারে যে লেভি ধার্য হয়েছে, তাকে কেন্দ্র করে গোটা ভারতের চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে।

‘রঙীন হিন্দি ছবির’ জ্বলন্ত দোহে কেন্দ্রীয় সরকার হয়তো বুঝেছেন, এই জগত থেকে আরও কর আদায় করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁদের সার্বিক উত্তর নীতি কম বাজেটের পরিচ্ছন্ন শিল্প-সুন্দর ছবি, পরীক্ষা নিরীক্ষা ধর্মী ছবি এবং আঞ্চলিক ছবির ক্ষেত্রে যে-মুদ্রাবাণ হানি—এটা নিশ্চয়ই তাঁদের মনে হয় নি। অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারকে সব দিক বিশেষভাবে চিন্তা করে সঠিক কর-নীতি প্রয়োগে পুনরায় বিবেচনা করতে হবে। অন্ততঃ একটা সিলিং ব্যবস্থার প্রয়োগ করতে হবে। দশ লক্ষ টাকার মধ্যে যে ছবি নিষিদ্ধ হবে, সে ছবিকে লেভিমুক্ত করলেও আঞ্চলিক ছবি ও পরীক্ষামূলক ছবিগুলির প্রাণরক্ষা হবে। অবিলম্বে এই ঘোষণা করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

অসমীয়া ছবির ক্ষতিয় পর-চালক ডঃ ভূপেন হাজরিকার মতে সরকারের উক্ত নীতির ফলে পূর্বাঞ্চলের ছবি তৈরী একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি এ বছর জাতীয় পুরস্কার কমিটির সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। কিন্তু এই করনীতির প্রতিবাদে তিনি দিল্লীর অস্থানে উপস্থিত হন ন। তিনি চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, যেখানে ছবি করাই বন্ধ হয়ে যাবে, সেখানে পুরস্কারের সার্থকতা কোথায়? চিত্র পরিচালক কৈসরোজ দে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যে লেভি ধার্য করেছে, তাতে বিগ বাজেটের ছবির মুষ্টিমেয় নিষাভা

এই শিল্পে মনোপলিট হয়ে উঠবেন। এক্ষেত্রে চলচ্চিত্র শিল্পের কি হাল হবে বোঝাই যাচ্ছে। অপসংস্কৃতির বাহক হিন্দি ছবি আরও উৎসাহিত হয়ে উঠবে। বাংলা ছবির এমনি-তেই মুম্বু অবস্থা, তার ওপর সরকারী করের ধাক্কায় তার মৃত্যু অবধারিত উঠেছে। জাতীয় সংস্কৃতির অগ্রতম ধারক এই চলচ্চিত্র—প্রমাণ ছড়িয়ে আছে নানা আঞ্চলিক ছবির ক্ষেত্রে। সেখানে এই শিল্প স্রাব্যমের ওপর সরকারের দিক থেকে আঘাত আলা মোটেই বাস্তবীয় নয়। কিন্তু একটি ক্রিয়েটিভ আর্ট এবং অত্যন্ত শক্তিশালী আর্ট-মিডিয়াম—এই বিবেচনায় এ মাধ্যমটিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা হয়ে থাকে পৃথিবীর সর্বত্র। স্বতরাং ভারতবর্ষে তার সুরক্ষা হবে কেন? পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি-বসু মহোদয়ের ই, আই, এম, পি, এর সভাপতি এস, কে, জালাল স্থানীয় স্টুডিও ও সিনেমার দরজা-গুলি আরও কিছুকাল খুলে রাখার কথা বলেছেন। এখনও আশা করা হচ্ছে, কেন্দ্র থেকে খুব শীঘ্রই একটি উক্ত-বার্তা এসে পৌছবে।

যাত্রার খবর

চিৎপুরের যাত্রা পাড়ায় ১৩৮৪ সালের প্রস্তুতি প্রায় সমাপ্তির পথে। নাটক নির্বাচন, কুশলী, ইরকার, নাট্য পরিচালক ও যন্ত্রশিল্পী মনোনয়নের কাজ প্রায় শেষ। কোন কোন দলের মহড়াও ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এক কথায় যাত্রা পাড়া এখন নতুন উদ্দীপনায় চক্কল, সরগরম।

সত্যস্বর অপেরা

এ বছর সত্যস্বর অপেরা শৈলেশ ওহ নিয়োগী রচিত ও পরিচালিত “সত্যস্বর” অভিনয় করছে। এই নাট্য-

কারের প্রথম নাটক সত্যস্বর অপেরার আত্মকল্যাণে অভিনীত “একদিন রাজ্যে” ৮২তে প্রথম পুরস্কার পায়। এ বছরে আরো দুটি পালা—এইদল জগৎগণকে উপহার দেবে—হাক রায় রচিত পৌরাণিক পালা “নাগমনি” এবং চিত্ত দে রচিত “সোনার ঘোড়া”। এ দলের ঐতিহ্য মত নবাগত শিল্পীদের স্থান দেওয়া হয়েছে এ বছরেও। শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যুগল কান্তি দাস, রাজা ভট্টাচার্য দেবেশ দে, মাখন সমাদার ও অনিল ভাট্টা। মহিলা শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন শিবানী ভট্টাচার্য (নবাগতা), গীতা মিত্র, অনন্যা নাগ, তরুণী ঘোষ, জয়ন্তী ঘোষ এবং চিত্রা দাসগুপ্ত।

রাজধানী যাত্রা ইউনিট

রাজধানী যাত্রা ইউনিটের ৮৪ সালের নাটক পরিবেশনার মহড়া প্রায় সমাপ্তির পথে। দলে নবাগত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সমন্বয় ঘটেছে। এই দল আগামীতে আপন সেনগুপ্ত রচিত ও নির্দেশিত “প্রতিবাদ” অভিনয় করবে। এরই সঙ্গে থাকবে “স্বর্ষহারী” নাটকটি। প্রখ্যাত ইরকার জগন্নাথ ধরের হুরারোপে আসর মাতিয়ে তুলবে পালার গানগুলি। বললেন দলের নায়ক অরুণ মুখার্জী এবং সহায়কারী বিম্বন মুখার্জী ও আপন সিনহা।

ইন্দ্রলোক অপেরা

এ বছরে যাত্রা জগতে নতুন নাম “ইন্দ্রলোক অপেরা”। এ দল যাত্রায় আনছে ‘বারবধু’ ব্যাভা কেতকী দত্তকে। দল নাটক নির্বাচন করেছে হুম্মাল শর্মা রচিত “মীরাবাই”। শ্রীমা ইতিপূর্বেই বিপ্লবী জীকক, স্বর্ষ আলো দাও এবং জিনয়নী মা প্রকৃতি নাটকে ব্যাভিলাত করেছেন। বর্তমান নাটক “মীরাবাই”কে ইনি ভক্তিরসে ভরপুর নাচগানে সমৃদ্ধ এবং ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধশালী করেছেন। কেতকী দত্তই মীরার ভূমিকায় অভিনয় করবেন। এই দলে যাত্রাঙ্গদের দিলীপ চৌধুরী, মলয়কুমার, স্বপ্নকুমার, চক্কলকুমার, কৌশিককুমার ও নীলাঞ্জন চৌধুরীও যোগ দিয়েছেন।

নিউ রয়্যাল বীণাপাণি অপেরা

নিউ রয়্যাল বীণাপাণি অপেরা এ বছরের জয় নির্বাচন করেছে পানী-সম্রাটের সারা জুড় নাটক “গৃহজয়ী” বাতে স্বর দিয়েছেন প্রখ্যাত ভট্টাচার্য এবং যৌরীকরোহন চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক নাটক “পরাক্রান্ত সম্রাট”। নির্দেশনা ও সঙ্গীতকার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রভাত গৌতম।

প্রধান ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করছেন প্রভাত গৌতম, শান্তি হাজরা, রাজকুমার, তপন ভট্টাচার্য, ননী চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ দত্ত, মঞ্জু মুখার্জী, শিবানী মৈত্র, দীপাশিতা সেন ও রীতা সেন।

নবরঞ্জন অপেরা

৮৩ সালের প্রথম পুরস্কার বিজয়ী দল নবরঞ্জন অপেরা (পালা : লায়লা মজহু) এই মরসুমে লোকগাথা ময়মন-সিংহ গীতিকা অবলম্বনে সমরেশ বসুর “মজহু” পালা উপস্থিত করছেন, যার নির্দেশনা, নৃত্য পরিচালনা ও স্বর সংযোজনায় আছেন যথাক্রমে মহেন্দ্র গুপ্ত, প্রভাত ঘোষ ও ভূপেন হাজরিকা। বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করছেন ছন্দা চাটার্জী ও ইন্দ্র লাহিড়ী।

গণনাট্য কর্মীর জীবনরসান

হঠাৎ সন্ধ্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রখ্যাত গণনাট্য কর্মী মঞ্জীন্দ্র মজুমদার গত ২২শে জুন রাত ৩টের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। তিনি জী ও দুই পুত্র রেখে গেছেন।

১৯৪৮ সালে মঞ্জীন্দ্র মজুমদার ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উত্তর কলকাতা শাখার তাঁর রচিত ও পরিচালিত “মৃত্যু নাই” নাটক নিয়ে যোগদান করেন। ভাষ্কর চট্টোপাধ্যায় রচিত “আজকাল” নাটক মঞ্জীন্দ্র

মজুমদারের পরিচালনায় গণনাট্য সংঘ কর্তৃক অভিনীত হয়ে অসাধারণ প্রিয়তা অর্জন করে।

১৯৩০ সালে গণনাট্য সংঘ পরিচালনা করে মঞ্জীন্দ্র মজুমদার “রঙ-বেরঙ” নামে তাঁর নিজস্ব নাট্য দল গড়ে তোলেন। যে সব নাটক তিনি পরিচালনা করেছেন সেগুলি হল ‘অনন্যা’, ‘সমুদ্র থামে না’, ‘ফাদ’, ‘সুপারল’, ‘ম্যাকবেথ’, ‘জীবিত ও মৃত’, ‘সম্পত্তি সমর্পণ’, ‘ভুল স্বর্গ’ ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রথম চারখানি নাটক মঞ্জীন্দ্র মজুমদারের নিজস্ব মৌলিক রচনা।

প্রবীর দত্তের স্মরণসভা

১৯৭৪-এর ২০শে জুলাই কার্জন পার্কে পুলিশ সন্ত্রাসের বলি নাট্যকর্মী প্রবীর দত্তের স্মৃতিস্মারকী যথাযোগ্য রীতিমালায় পালনের উদ্দেশ্যে ‘অভিনয়’ শিল্পীরা আত্মানে আরো-জিত সাংস্কৃতিক কর্মীদের একটি সভার আয়োজন করে একটি শক্তিশালী প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

অ.গামী মঙ্গলবার ২০শে জুলাই দক্ষিণ কলকাতার হাজরা পার্কে বিকেল ৫টার নাটক, স্মৃতি ও গণ-সঙ্গীতের মাধ্যমে শহীদ প্রবীর দত্তের স্মৃতির প্রতি প্রার্থনা নিবেদন ও একটি কর্মসূচীকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ‘প্রবীর দত্ত স্মরণ সভা প্রস্তুতি কমিটি’ সর্বস্তরের সাংস্কৃতিক কর্মীদের আহ্বান জানিয়েছে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থরাজি

পূর্বভারতীয় সংস্কৃতির রূপরেখা	পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি
১৫.০০	৫.০০
স্বকাক্ষ মূল্যায়ন	৥ পুরাকীর্তি গ্রন্থমালা ৥
৫.০০	বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি
গঙ্গাসাগর মেলা	৪.৫০
২.০০	নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি
ভারতের প্রত্নতত্ত্ব	৪.৫০
২.০০	বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি
	২.১০
	হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি
	৪.৫০

- (১) প্রকাশন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ প্রাপ্তিস্থান : ৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭
(২) প্রকাশন বিপণী, নিউ সেক্রেটারিয়েট, ১, কিরণশংকর রায় রোড, কলিকাতা-১

প, ব, (তথ্য ও জনসংযোগ) ১৯২১/৭৭

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১ আচার্য প্রমুদচন্দ্র রোড কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ ফট লেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

কেরলের রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার রাজন গভ কয়েক বছরে কোথায় উধাও হয়ে গেল জানতে হলে পড়ুন বেটুইন-এর চাকলাকর স্বাক্ষরিত দলিল।

জেল ও জন্মদ

১২.০০

পূর্বচল, ৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলি-২

হরিদাস মুদ্রা ও তার বিভিন্ন কোম্পানীর দেন কোটি কোটি টাকা আয়কর বাকি

ক) ১৯৫১ সাল থেকে হরিদাস মুদ্রার
ব্যক্তিগত আয়কর বাকি ৩,২৬,৫৫২৭৬ টাকা।
খ) মুদ্রার বিভিন্ন কোম্পানীর আয়কর বাকি

বঙ্গপুত্র টি কোং লি:	৪৮৩১৫৫৮
গোয়ালদাস মুদ্রা	২১১১০০০
তুলসীদাস মুদ্রা	৬৪৭০০০
বঙ্গপুত্র টি কোং লি: (লিহুইভেশনে)	৪১১০০০
এস বি এক্সপোর্টস অ্যান্ড ইমপোর্টস লি:	৭৬৭২৩৭
এস বি ইণ্ডাস্ট্রিজ লি:	৭১০৮২৩৭
মনমোহন কর্পোরেশন লি:	১৮০১০০০
এস বি জি ওভালদাস মুদ্রা	২৬০৬০০০
এফ বি অসলার ল্যাম্প ম্যাং লি:	২০১৮০০০
এস বি অসলার ই: লি:	৩৫৩০০০০
এস বি ইণ্ডা: ডে: কোং লি:	৭১০৮২৩৭
রাজেন্দ্র লি:	১৫৫০০০
রিচার্ডসন অ্যান্ড ক্রুজার্স প্র: লি:	৪৪৫০০০
বর্ধমান কোলিয়ারিজ লি:	১৭৭৫০০
এস ভি ইণ্ডা: প্রা: লি:	৩৭৫৫১৩৮
এস বি হাউস অ্যান্ড ল্যান্ড প্রা: লি:	১২৭৮৬৫
এস বি ট্রেডিং কোং লি:	৫৮৪১০০০
রাজী কীটরা প্রা: লি:	১৮৮১৩০২

হরিদাস মুদ্রার বিরুদ্ধে বারো ডিক্রি পেয়েছে

[১৯৬৫ সাল পর্যন্ত]

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন

চম্পারন ইউনিট

কানপুর ইউনিট

এলগিন ইউনিট

ইণ্ডিয়ান কেবলস

জেন্স অ্যান্ড কোং লি:

ইষ্টার্ন ব্যাঙ্ক লি:

চার্জড ব্যাঙ্ক লি:

লেদারল্যান্ডস প্রাইভেট সোসাইটি

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

অস্বাস্থ্য যারা মুদ্রার বিরুদ্ধে ডিক্রি পেয়েছে

[১৯৬৫ সালের পরে]

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

শাহাবুদ্দীন ব্যাঙ্ক লি:

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লি:

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লি:

মার্কেটাইল ব্যাঙ্ক লি:

হরিয়ানা ইণ্ডা: ডে: অ্যান্ড কর্পো:

ব্যাঙ্ক লি: হরিয়ানা

হরিদাস মুদ্রা বর্তমানে তার পুত্র বিজয়কুমার মুদ্রার
মাধ্যমে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রে নিম্নলিখিত কোম্পানীগুলি
পরিচালনা করেন—

ভারতে— মনমোহন কর্পোরেশন লি:

ডানকান স্টাটন অ্যান্ড কোং লি:

কমিশিয়াল কন্সাইন লি:

এস বি ইণ্ডাস্ট্রিজ লি:

গ্রোভ মোটরস লি: দিল্লী

মোর মোটরস অ্যান্ড রপ লি: দিল্লী

ট্রাব ট্রলি লি: দিল্লী

টাকার পরিমাণ
এরনও জানা যায়নি

রাজ্য জনতা পার্টিতে প্রচুর টাকার গুপ্তগোল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গের জনতা পার্টির নির্বা-

চনী তহবিলের হিসেব কোথায়? এই নির্বাচনী তহবিল সম্পর্কে জনতা পার্টির মধ্যে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। হাটে হাড়ি ভেঙেছেন রাজ্যের জনতা পার্টির নির্বাচনী কমিটির সম্পাদক ডি, এন, লাহিড়ী। তিনি বলেছেন প্রকৃত সেনের মারফত নির্বাচনী তহবিলের অর্ন্তে পাওয়া ১৬ লাক ৪১ হাজার ৩৬০ টাকা উনি ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছিলেন। এই টাকা থেকে ২২৪ জন প্রার্থীর প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা অর্থাৎ পনেরো লাখ টাকার বেশী দেওয়া হয়েছে। বাকী টাকার হিসেব কোথায়?

অস্বাস্থ্য করা হচ্ছে, প্রকৃত সেন ও তাঁর স্বেচ্ছা, দলের অন্তর্ভুক্ত সম্পাদক অশোককৃষ্ণ দত্ত আরো অন্তর্ভুক্ত আশী লক্ষ টাকা তুলেছিলেন। এই টাকার হিসেব কোথায়। নির্বাচনের সময় নির্বাচনী কমিটিকে না জানিয়ে অশোক দত্তের বাড়ী থেকে কিছু কিছু প্রার্থীকে সর্বনিম্ন চার হাজার ও সর্বোচ্চ হুড়ি হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। এতে প্রমাণিত হচ্ছে, প্রকৃত সেন-দত্ত টাকা তুলেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে জনতা দলের নির্বাচনী টাকা তুলতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নেতা সি, বি, গুপ্ত কলকাতায় এসেছিলেন। সি, বি, গুপ্ত রাজ্যের শিল্পপতিদের সঙ্গে একভোক্তা সভায় মিলিত হয়ে টাকা দেবার অস্বাস্থ্য করেছিলেন। তারপরে বিউলভাড়ীর কে, কে, বিভলা, জৈনদের পক্ষ থেকে শান্তি মোহন জৈন ও বৈতান (ডানকান) রাজীর রমা গোয়েকা টাকা ভোটার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কে, কে বিভলা ও রমা গোয়েকা ছিলেন সঙ্ঘগোষ্ঠীর একনিষ্ঠ চামচ। তাই ওঁরা নির্বাচনী তহবিলে ঢালাও টাকা তুলে জনতা (এরপর ৮য় পৃষ্ঠায়)

ইণ্ডিয়ান মেটালার্জিক্যাল ইণ্ডা: লি: দিল্লী

বোম্বাই ও কলকাতায় একটি প্রাইভেট ফ্যাক্টরি

যুক্তরাষ্ট্রে— বঙ্গপুত্র টি কোং লি:

ডানকান স্টাটন অ্যান্ড কোং লি:

হোর মিলার অ্যান্ড কোং লি:

এস বি ইণ্ডা: ডে: কোং লি:

হোর মিলার লি:

দঙ্গল

বিংশ বর্ষ ২৬শ সংখ্যা ২২শে জুলাই, '৭৭ ৮০ পরমা

মায়াপুর মঠের বিদেশী সন্ন্যাসীদের সাম্প্রদায়িক জিঞ্জির ও সরকার বিরোধী কুৎসা

সাধন গুহ

এই রাজ্যে এবারের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গীয় বায়পহীলী ফ্রন্ট এক অভাবনীয় সাফল্যের জয়লাভ পান। পরে সরকারে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং বঙ্গীয় ফ্রন্টের বৃহত্তম শরিক সি, পি, আই (এম) এককভাবেই নির-সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছেন। তবু রাজ্যের স্বাধীনতা চক্রাঙ্ক জনগণের সেই ঐতিহাসিক স্মৃতিতে আদৌ

কোন ফলাফল নিয়ে আবার কোয়ার্টার বাধে জ্যোতি বঙ্গ মন্ত্রিসভাকে বেকায়দায় ফেলে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে। দেশী ও বিদেশী চক্রীদের সংঘবদ্ধ ষড়যন্ত্র নানানভাবে জাল বিস্তারে সচেষ্ট ও সক্রিয়। পার্শ্ববর্তী বৈল লাইন অবরোধ থেকে মায়াপুর মঠের সন্ন্যাসীদের (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

বহুসংখ্যক দপ্তর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ কাজ নেই (বিশেষ সংবাদদাতা)

মোচাকের মত অসংখ্য খোপ খোপ বিবর, কিসকিস কথাবার্তা, স্বন্দরী তরুণী ও বুদ্ধিবী পুরুষের প্রমত্ত সংলাপ এখানে শ্রবণে আসায়। কয়েক শো খোপের এ টেবিল থেকে ও টেবিলে, এ খোপ থেকে ও খোপে চলিচলি করে। আশো অজকারে বসে থাকি মত বহুসংখ্যক জার্সি আছে আর আছে একপাশে টেবিল, টেনিস অথবা কারায় খেলার সামান্য ব্যয়সা। উচ্চল যৌবন ভ্রমণ-ভ্রমণের

কটার পর কটা এখানে হাত ধরাধরি করে হস্ত করে... যৌবন জলন্ত রোষে কে, হরে মুরারে। নাটক হয়, রত্ন হয়, গান হয়। দপ্তর তরুণী নিয়ম সাড়ে দশটা সকাল, ক্রিষ্ট সাড়ে এগারোর আগে বিবর-জুটো সব ফাকা থাকে। টেলিফোন বেজে চলে একটিনী। ধরার কেউ নেই। একদা এখানে এসেছিল বহুসংখ্যক তিন ভ্রমণ আমেরিকান। চার বছর ধরে সেই সব আমেরিকান ছত্রিশজন এখানে চুষক-চুষ দিয়ে চুলচেরা খিচুর করে যেথেকে সারা কলকাতা আর শহরতলীর শিল্প-কলের কটোপ্রাফি—সে সব কটো প্রাফি হয়েছে। হাজার মিটার উপে ধাবমান আকাশ-বানে। কোট উই-লিয়াম তখন একবার বৃষ্টি আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু কল হয় নি। সেটা (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

মায়াপুর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বেপরোয়া গুলীচালনা পর্যন্ত এই চক্রান্তের ছবি খুবই স্পষ্ট।

জ্যোতি বহুর নেতৃত্বে এই রাজ্যে বামপন্থী ফ্রন্ট মজিদা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এক অভাবনীয় সম্মেলনের মুখে এবং এখনও এর বয়স এক মাস হয়নি। একদিকে শক্ত কোথাগার। পূর্ববর্তী কংগ্রেসী মজিদা বাবু সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নামক রাজনৈতিক ক্রাউনের নেতৃত্বে লুটেপুটে ধোয়েছেন যার দায়-ভাগ এখন বইতে হচ্ছে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারকে। এবং সর্বক্ষেত্রে সফট।

এতদসত্ত্বেও, স্বার্থাধীন মহল ইতিমধ্যেই এই সরকারের বিরুদ্ধে কড়কড়িৎ হুক করেছে। পরীক্ষায় পণ্টোকাটুকির ব্যাপারে সরকারের কঠোর মনোভাব দেশবাসীর কাছে নিশ্চয় অস্বাভাবিক পেরিয়েছে, কিন্তু স্বার্থাধীনদের মনোভাব অস্বাভাবিক করে একটি বামদারী দৈনিক তো আর্ডনাধের জুরে বলেই ফেলেছে যে, পরীক্ষায় গণ-টোকাটুকির মত ছোট খাটো ব্যাপারেও মূল্যমঞ্জী হস্তক্ষেপ করেছেন। পাশকুড়ায় হঠাৎ রেল লাইন অবরোধ করা হল। মুখ্যমন্ত্রী কঠোরভাবে তার মোকাবিলা করলেন। গুল্লরপ হুক হলো গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপের। কিন্তু জ্যোতিবাহুর হস্তক্ষেপেই ২০০ ছাঁটাই প্রমিককে অস্বাভাবিকভাবে বহাল করা হল। হলদিয়া রেললিঙ্ক স্থাপনের এক্সিম্বার রাজ্য সরকারের নেই। এটা কেন্দ্রের অধিকার এবং রেল মন্ত্রকের অন্তর্ভুক্ত। কেন্দ্র জনতা পার্টির সরকার এবং পাশকুড়ার সংসদ সদস্যও জনতা পার্টির আভা মাইতি, অথচ মজার

কথা এই যে, পাশকুড়ার রেললাইন অবরোধও হয়েছিল জনতা পার্টিরই নেতৃত্বে। এর উদ্দেশ্যও কি কোন-ভাবে অস্পষ্ট? অবরোধের নেতৃত্ব ছিল রাজ্য জনতা পার্টির সেই অংশের হাতে যাদের বিরোধিতায় গত বিধানসভা নির্বাচনে জনতা-বামপন্থী ঐক্য সম্ভব হয়নি। এই অংশের রাজনৈতিক বড়দলী রূপ তাই কারো কাছেই অস্বচ্ছ নয়। এতো গেল দেশী চক্রান্তকারীদের কথা। এবার একটু বিদেশী প্রয়াসের দিকে নজর করানো যাক।

ইন্ডন পরিচালিত নদীয়া জেলার মায়াপুর চক্রোদয় মঠে সাম্প্রতিক গুলী চালনার ঘটনাটি নজির হিসেবে টানা যেতে পারে। এটাকে জমি সংক্রান্ত বিরোধের পরিণতি বলে চালাবার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তা যোগে টেকেনি এবং পরে বলা হলো যে কটা শেখ নামক জনৈক গ্রামবাসী মঠের পোশালার ফড়ার রূপ চুরি করতে এসে ধরা পড়ে এবং তাকে ছিনিয়ে নেবার জন্যই সমস্ত গ্রামবাসীরা মঠ আক্রমণ করলে গুলী ছোঁড়া হয় নিতান্তই আত্মরক্ষার জন্য। চক্রোদয় মঠের ডিরেক্টর জয়পতাকা স্বামী (আমেরিকান) আমাকে এই কথাই বলেছেন। জয়পতাকা স্বামী কিন্তু কটা শেখের ওপর অমানুষিক প্রহারের ঘটনাটি বেমালুম চেপে গেছেন। অথচ, মঠের কর্মকর্তাদেরই একজন মুখপাত্র শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর দাস আমাকে বলেছেন যে, কটা শেখকে বেশ প্রহার করা হয়েছিল এবং তার মাথা মুড়িয়ে সেখানে রঙ ও বার্ণিশ লাগানো হয়। দাস মহাশয় নিতাইচাঁদ ব্রহ্মচারীর নিষ্ঠুরতার আতিশয্যের কথাও স্বীকার করেছেন কিন্তু জয়পতাকা স্বামী তার ধার দিয়েও যাননি।

কটা শেখকে যে বর্বরোচিত প্রহার করা হয়েছিল তার প্রমাণ হাসপাতালের বেড টিকিট যেখানে কটা শেখের সারা দেহে অসংখ্য ক্ষতচিহ্নের (Multiple injuries) কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, একটা বিস্ময় আমার আছে। যেখানে মঠেরই একজন বলছেন যে কটা শেখের মাথা মুড়িয়ে রঙ ও বার্ণিশ লাগানো হয়েছে সেখানে রক্ষনগর হাসপাতালের ডাক্তার বলেছেন যে, কটা শেখের মাথায় চন্দন লাগানো হয়েছে। এই রহস্যও উন্মোচিত হওয়া দরকার কারণ এটা একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচারও হতে পারে। চন্দন লাগানোটা মুন্সিম সেন্ট্রালকে আঘাত করে। হাসপাতালের ডাক্তারদের সঙ্গে মঠ কর্তৃপক্ষের নেপথ্য আতাতের অভিযোগ এতদফলে সোচ্চার। এমন কি রাজ্য মজিদার সমস্ত অমৃতেন্দু মুখার্জীও পরোক্ষভাবে সেই কথাই বলেছেন। তাহলে বিশেষভাবে বিচার্য, কেন ডাক্তাররা এমন মন্তব্য করলেন।

জয়পতাকা স্বামী আমার কাছে তার বিশ্বাসমত সমস্ত কাহিনী বর্ণনার পর মন্তব্য করেছেন যে এটা একটা সাম্প্রদায়িক আক্রমণ এবং শুধু মুসলমান ছাড়া পার্শ্ববর্তী গ্রামের কোন হিন্দু এতে অংশগ্রহণ করেনি। রাধাশ্যামসুন্দর দাস আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলেছেন যে, ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের হিন্দু বলা হয়েছে সেটা পুলিশের সামান্য ব্যাপার কারণ পুলিশ মঠের বিরুদ্ধাচরণই করেছে। অথচ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ আমার কাছে মঠ কর্তৃপক্ষের গুলী চালনার নিন্দা করেছেন। এই অঞ্চলে অসংখ্য মঠ আছে, কোনদিনই এখানে কোন সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি হয়নি। জমি সংক্রান্ত গুলুগোলও কোনদিন দেখা যায়নি। বর্তমান ঘটনা থেকে দাধারপের দৃষ্টি অপসারণের জন্য মঠ থেকে বর্তমানে ঘটনার সাম্প্রদায়িক রূপ জেগে ওঠাচ্ছে এবং তা করা হচ্ছে মার্কিন কম্বাল জেনারেল ওনিলের মঠ থেকে ঘুরে যাবার পর। ভবানন্দ স্বামীর (আমেরিকান) অসামাজিক ব্যবহারের কথা আমার গত সংখ্যার প্রতিবেদনেই উল্লেখ করেছি। ভবানন্দের সঙ্গে জয়পতাকার যে একটা বিরোধ আছে তার প্রমাণ আমাকে মঠ থেকে যে পাড়ী করে রক্ষনগর পৌঁছে দেওয়া হয় তারই আরোহী মঠের দুই ব্রহ্মচারী পৌঁড় নিভ্যানন্দ দাস এবং পূর্ণচন্দ্র দাসের মন্তব্য। আমার গাড়ীতে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের দুই অফিসারও

ছিলেন। পূর্বোক্ত দুই ব্রহ্মচারী স্পষ্ট ভবানন্দের পক্ষ সমর্থন করে জয়পতাকার বিরোধিতা করেছেন, মনে হয় ভবানন্দের এবারের কার্যকলাপে মার্কিন কম্বালও বিব্রত। তাই তিনি মঠের মধ্যেও যাননি, এবং গোট খেকেই মঠ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একান্তে আলাপ করে ফিরে এসেছেন।

লক্ষণীয় যে, এরপর থেকেই সাম্প্রদায়িক প্রচার শুরু হয়েছে। শুধু তাই নয়, জয়পতাকা স্বামী আমার কাছে এমন কথাও বলেছেন যে, যেহেতু রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহু সি, পি, আই (এম)-এর নেতা এবং যেহেতু বর্তমান মন্ত্রিসভায় সি, পি, আই (এম)-এর প্রাধান্য রয়েছে, যেহেতু এই দল ধর্ম মানেমা সেইহেতু ইন্ডন পরিচালিত এই ধর্মসংঘাতকে ধর্মসংক্রান্ত জাতীয় জ্যোতি বহুর নির্দেশে পুলিশ উঠে পড়ে লেগেছে। আমি কিন্তু এতদফলে ঘুরে যে তথ্য সংগ্রহ করেছি তাতে পুলিশের কোন পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হয়নি। রাধাশ্যামসুন্দর দাসতো অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সম্পর্কে রীতিমত অপমানকর মন্তব্য

করেছেন। জয়পতাকা স্বামীর সঙ্গে আমার দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয়েছে। আমাকে সরাসরিদের জন্য সংরক্ষিত আবাসগৃহেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে বিশ্বলক্ষ্মীর সঙ্গে আমার দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয়েছে। তিনি আমাকে বাইরের কোন ক্ষত দেহাতে পারেননি। ইনি একজন নার্স। মঠ কর্তৃপক্ষ বলেছেন, She was brutally beaten - যদি তাই হয় তবে বহিরে ক্ষতচিহ্ন থাকাই স্বাভাবিক। তিনি মুখে যে সব ভাষণীয় আঘাতের কথা বললেন তা কতটা গ্রহণযোগ্য তা তর্কসাপেক্ষ। উপস্থিত অল্পকোম মহিলা কিন্তু তাদের ওপর আক্রমণের অভিযোগ করেননি। অভিযোগকারী দুইজন আমেরিকান মহিলা বিশ্বলক্ষ্মী এবং প্রমুখিত দাসী। আসল ঘটনা কি ভা রিচারানয়েই উন্মোচিত হবে কিন্তু নীমাত্ম নিকটবর্তী এই মায়াপুর গ্রামে ধর্মের আড়ালে বিদেশী সন্ন্যাসীদের সাম্প্রদায়িক জিগির এবং সরকার বিরোধী কুংসা সমূলে এই মুহূর্তেই উৎপাটিত না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় বিপদ আসতে পারে।

ব্রহ্মজানক দপ্তর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ। মানচিত্র থেকে অবস্থান জেনে নিয়ে উত্তর, ভিয়েতনামের শিল্পাঞ্চলে তখন উদ্ধার মত ছুঁড়ে মারা হচ্ছে মার্কিন রকেট, যার অগ্রভাগে 'ফিট' করা থাকছে বিষাক্ত গ্যাসবোমা।

আমেরিকানরা চলে যাবার পর এই দপ্তরের দর্শনবী্য প্রকাণ্ড দুইটি ক্রোরে (যার ভাড়া মাসিক ৬৪ হাজার টাকা) অন্ততঃ এগারোবার মৌচাক পার্টিশন অদল বদল করার কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে। এবং শুধুমাত্র এই এগারোবার কন্ট্রাক্ট ধরার জন্যই তৈরী হয়েছে দুটি কোম্পানী। প্রয়োজন কি ছিল, তা অজ্ঞাত। 'এক্সিকিউশন' নেই অথচ ডজন ডজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ডজন ডজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। প্র্যানিং দপ্তর, অথচ প্র্যানিং ইঞ্জিনিয়ার বলে কিছু নেই। প্র্যানার যে ক'জন আছে তার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা দু'জনের বেশি নয়।

দপ্তরটি কারিগরী, কিন্তু কারিগরী কর্মীর তুলনায় অ-কারিগরী কর্মীর সংখ্যা চারগুণ বেশী। পৃথিবীর বৃহত্তম নিউইয়র্ক, টোকিও অথবা মস্কো প্র্যানিংয়ের জন্তুও এ রকম উৎকর্ষ পরিমাণে অ-কারিগরী কর্মী কদাচ দরকার হয় নি। ১৯৬৭ বর্ষীয় দরনী ১৯৭ গারটিন প্লেন, ২৭৬ নেতা

হতাশ রোড এবং যাদবপুরে একখানা এই চারখানা বৃহৎ বাড়ী জুড়ে তার প্রায় ১ লাখ টাকা ভাড়া মাসিক খরচে কারবার অথচ ১৪ বছরেও নিষ্পন্ন হচ্ছে একটাও বাড়ী তৈরী নি—এমনই তার প্র্যানিং।

অত্মদিকে সি, এম, ডি-এ কর্তৃক তৈরী রাখাঘাট রক্ষা করার জন্য "মেন্টেনান্স দপ্তর" নেই, কর্মী নেই। ফলে কোটি কোটি টাকার জিনিষ তৈরী হয়েও নষ্ট হচ্ছে, যা দেশের বিপুল ক্ষতি। অথচ প্র্যানিং দপ্তরকে ছোট্ট ছোট্ট করে, উদ্ধৃত লোক টেনে নিয়ে একটা পৃথক মেন্টেনান্স দপ্তর স্বামীভাবে করার চেষ্টা করার কেউ নেই। আদ্যকের কলকাতার শিল্পটিও জানে যে শুধুমাত্র জঞ্জাল সাকাই আর জল সরবরাহ করতেই কর্পোরেশন হিমসিম খাচ্ছে, তবু সব কিছু জেনেও মার্কিনবাহী মুখ্যমন্ত্রী সেই পঙ্ক পৌরসভার ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন সি, এম, ডি-এ যারা তৈরী কাজের রক্ষাবেক্ষণের বিরাট দায়িত্ব। সি, এম, পি ও এবং সি, এম, ডি-এ—হুদিকেই অপচয়ের জ্যোতি বজায় রাখা হল, তবু যেটা কমলে দেশ বাঁচবে সেই ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য সি, এম, পি ও জে পুরক মেন্টেনান্স দপ্তর স্থাপন করা হ'ল না। অথচ দক্ষ কারিগরী কর্মীরা সেখানে উদ্ধৃত বদে থেকে প্রকৃত কাজের আশা ছেড়ে দিয়েছে। আমার মতে রাহু একটাই—"বঙ্গ সংকোচ এবং জ্ঞত কাজ"।

ভারতী অপেরায়

(ফোন : ৫৫-২৫৫১)

সম্রাট
আলাউদ্দিন
কবী

পৌরসভায় একটি অভূতপূর্ব ঘটনার প্রতি পৌরমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি

হীরেন বসু

গত পঁচ বছরে, বিশেষত অল্পসী
অবস্থায়, এই রাজ্যে সংঘটিত জুলুম
এবং অবরুদ্ধতার তদন্ত সম্পর্কে নবগঠিত
বায়ফ্রন্ট সরকার অবহিত আছেন। ঐ
সময়ে কলকাতা পৌরসভায় যে সব
অনাচার ঘটেছে তার সম্পর্কে নতুন
পৌরমন্ত্রী তথ্যসংগ্রহ শুরু করে দিয়ে-
ছেন। কংগ্রেস রাজত্বের অনাচার-
অবিচার ছাড়াও এমন কিছু কিছু
ঘটনা আছে যা শাসক সংস্থার অত্যাচার-
হার সাধারণে পরিচিত নয়। এমনি
একটি অত্যন্ত স্পষ্টিত অবরুদ্ধতা এবং
তার সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক সহযোগি-
তার প্রতি আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য
মন্ত্রীর বিশেষত পূর্বমন্ত্রী প্রশান্ত শ্রীর
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আমি তাদের
নজরে আনতে চাই পৌর কমিশনারের
১৯শে নভেম্বর ১৯৭৬ তারিখে ২৫ নং
সাকুলার। এই আপাত নিরীহ পরি-
পত্রটির অন্তরালে কত বড় গুরুতর
অবিচার এবং অবরুদ্ধতাকে আড়াল
করা হয়েছে তা ভাবা যায় না। আমার
পাঠকদের সুবিধার্থে পরিপত্রটির প্রথ-
মাংশের বাংলা অনুবাদ করে দিচ্ছি।

“এমন ঘটনা আমাদের নজরে
এসেছে যেখানে অফিসের কার্যকালে
বাহ্যিক কিছু বাইরের লোক এবং অপর
কিছু পৌর কর্মচারী বর্তৃক কয়েকজন
পৌর কর্মচারী তাদের দৈনন্দিন কাজে
কর্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং যে ঘট-
নার একজন পৌর কর্মচারী একজন
অফিসারের কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন এবং
এর চেয়েও শোচনীয় এই যে, এই
ঘটনা ঘটেছিল স্বয়ং ঐ অফিসারের
পরিদর্শনস্থিতিতে যিনি নিজে একজন বন্-
ট্রোলিং অফিসার। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
এই সংজ্ঞানক পরিদর্শন সম্পর্কে গুরু-
তর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন এবং
আদেশ দিয়েছেন যে যে-সব ঘটনা
অফিসের শৃঙ্খলা এবং সৌষ্ঠবকে ভঙ্গ
করে তার পুনরাবৃত্তি ভবিষ্যতে অফিস
প্রাঙ্গণে হতে দেওয়া উচিত হবে না,
একজন অফিসারের ঘরের কথা বলাই
বাহ্যিক, এবং এই স্বকম বোন ঘটনার
কাউকে যদি লিপ্ত হতে দেখা যায়
তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা
নেওয়া হবে। সবল পৌর কর্মচারী
নয় হ'লিয়ার হয়ে এটা খেয়াল
করুন।”

কুল অফ সাউন্ড অ্যান্ড...
কমিশনারের পরিপত্র থেকে যে
বটি প্রায় অপরিহার্য হয়ে ওঠে তা হল
(১) যে পৌর কর্মীটি বহিরাগত মস্তান-

দের দ্বারা প্রভুত হয়েছিলেন তার নাম
কি এবং কোন তারিখে এই ঘটনা ঘটে-
ছিল? (২) কোন অফিসারের কক্ষে
এই প্রহারের ঘটনা ঘটেছিল যিনি স্বয়ং
একজন কন্ট্রোলিং অফিসার? (৩)
বহিরাগতেরা কি এই অফিসারের এবং
কমিশনারের অপরিচিত? তাদের
নামোল্লেখ নেই কেন? (৪) যে ‘অপর
কিছু পৌর কর্মচারী’ এই পুরকর্মীটির
প্রহারকার্যে বহিরাগতদের সঙ্গে সহ-
যোগিতা করে ছিল তারা কি এই অফি-
সার এবং কমিশনারের অপরিচিত? যদি
অপরিচিত না হয় তাহলে তাদের
বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা কমিশনার নিরে-
ছিলেন? বোধ হয়, বোধ হয় কেন—
এখন নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে,
কোন ব্যবস্থাই এদের বিরুদ্ধে গ্রহণ
করা হয়নি এবং গ্রহণ করতে যাতে না
হয় তার জন্য এবং সচিব বিভাগের যে
বিরুদ্ধ কর্মীরা ১৭ নং সাকুলার এই জুলুমের
প্রতিবাদে পৌর প্রশাসকের কাছে
প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিকার দাবি করে-
ছিলেন তাদের স্তোক দেওয়ার জন্যই
যে এই বাগবিড়তিপূর্ণ ধাওয়া-পত্রটি
রচিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।
নতুবা ১৬ নভেম্বর ১৯৭৭ তারিখে
পৌর সচিব অরুণ ব্যানার্জির ঘরে
প্রহারের ঘটনা সম্পর্কে সাকুলার
বেরোতে ১০ তারিখ লেগে বাবে
কেন? ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় পৌর ভব-
নের কর্মীদের উত্তেজনা প্রশমনের জন্য
একটা স্তোকবাক্য এবং সংশ্লিষ্ট অপ-
রাধীদের আড়াল করতে ট্র্যাটেজি
উদ্ভাবনাথে বীরেন মহাস্ত-বাবসু
মুখালি প্রমুখের সঙ্গে পরামর্শের জন্য
সময় প্রয়োজন ছিল। পরামর্শে ঘির
হয়েছিল যে, (অস্বাস্থ্য) সচিব অরুণ
ব্যানার্জি (যিনি প্রভুত পৌর করণিক
ইউইফ আলিকে সচিবের ঘরে বহিরা-
গত এবং কর্পোরেশনের কংগ্রেস নাম-
ধারী জগদীশের সন্মুখী হওয়ার জন্য
১৬ ১১ ৭৬ তারিখে বেলা ৪। থেকে
৫টা মধ্যে তার ঘরে-ভেঁকে পাঠিয়ে-
ছিলেন) ঘটনা সম্পর্কে এমন একটি
রিপোর্ট দেবেন যাতে সাপেও মরবে
অবশ্য লাঠিও ডাকবে না- ঘটনার
স্বীকৃতি থাকবে কিন্তু কারো নাম
থাকবে না। তারই ভিত্তিতে কমি-
শনার নির্মাল্য মুখালি তার পরিপত্র
প্রচার করবেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ
১৬ নভেম্বর ১৯৭৬ তারিখে পৌর
সচিবের পদে তৎকালীন উমেদার অরুণ
ব্যানার্জির ঘরে বেলা ৪।টা থেকে ৫-

টার মধ্যে যে ঘটনা ঘটান হয়েছিল
তার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের হস্তগত
হয়েছে এবং তা আমরা রাষ্ট্র সুর-
কারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের অবগতিতে
আনছি। উল্লিখিত দিনে এবং সময়ে
অরুণ ব্যানার্জির ঘরে যাদের সমাবেশ
ঘটে তাদের মধ্যে ছিলেন যুব কংগ্রেস
নেতা প্রদীপ ঘোষ (রেল ধর্মঘট ভাঙার
কাজে নারকেলডাঙ্গা এবং বেলেঘাটা
রেলকলোনিতে হামলা চালিয়ে রেলের
চাকরি ইনাম পান; শিয়ালদার যুব
কংগ্রেস নেতা বলে পরিচিত) নির্মল
ব্যানার্জি (অল্পকাল আগে রেলের
চাকরি পান। অল্পকাল সিনেমার
উদ্যোগিক রেল কোয়ার্টার বাগিয়ে
বাস করেন; দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার
যুব কংগ্রেস মস্তান), শক্তি ঘোষ,
স্বতন্ত্র মুখার্জির চামচে এবং কমিশনা-
রের পিএ), শংকর ভট্টাচার্য (স্বতন্ত্র-
চামচে এবং অনির্বাচিত ট্রেড ইউনিয়ন
নেতা, বেলিক থেকে অ্যাসেমি ইনস-
পেক্টরে ট্রিপল প্রমোশন পেয়েছেন,
যেয় প্রশান্ত শ্রীর আমলে তহবিল
তহরুপের প্রমাণে চাকরি গিয়েছিল),
সলিল দে (স্বতন্ত্র-চামচা এবং লাই-
সেন্স ইনসপেক্টর) এবং মিডা
ব্যানার্জি (নির্মল ব্যানার্জির স্ত্রী এবং
স্বনামধন্য কুমদ ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠপুত্রী;
বর্তমান কর্পোরেশনের চ্যাম্পিয়ন টাই-
পিষ্ট কারণ মিনিটে তিনি নাকি দলটি
শব্দ টাইপ করতে পাবেন যেখানে সর্ব-
নিম্ন যোগ্যতা মিনিটে ত্রিশটি শব্দের
জায়গায় অল্প পরীক্ষার্থীরা ৫০০টি
অবধি শব্দ টাইপ করতে পেরেছিল
কিন্তু তাদের চাকরি হয়নি। তিনি
কনফার্মেশন পরীক্ষার ফেল করার পরে
অরুণ ব্যানার্জি অল্প পরীক্ষক নিযুক্ত
করে তাকে পাশ করিয়ে আনেন।
কারণ মিডা ব্যানার্জি হলেন মস্তার
কাছের লোক এবং সচিবের পদে স্থায়ী
হতে গেলে মস্তার সাহায্য প্রয়োজন
এবং সেজন্য তার চমচাদের খুশি করা
এবং হাতে বাখা সরকার)।

দক্ষমতের মূল হেতু
মিডা ব্যানার্জির কাজকর্ম যেখানে
দন্দেদ্বন্দ্ব বাস্তবিক যে তার বিদ্যুৎ
ক্লাশ এইটের বেশী কিনা। এ নিয়ে
সেখানে হাসি ঠাট্টা অন্তর নয়।
কিন্তু মিডা ব্যানার্জি মস্তান গৃহিনী
এবং স্বতন্ত্র চামচেনী, কাজেই হৃদয়ধিক
করেই তিনি অচিরে অনেককে ভিন্নসি
খাইয়ে দিলেন। স্বরাষ্ট্রায় অফিসে
এলে অফিসকে এবং অরুণ ব্যানার্জিকে
ধস্ত করতে থাকলেন অরুণবাবু তাকে

চ-পানে আপ্যায়িত করতেন; সকলের
বেলায় পৌনে এগারোটায় লাভদাগ
পড়লে মিডা ব্যানার্জি সাত দিনে
এক দিন এদে সেই করতে পারতেন।

মোদী জামিল কিবা...
ইউইফ আলি ঘরে ঢুকতেই এরা
দলবদ্ধ হয়ে অভিযোগ রল, তুমি মস্তার
স্বতন্ত্র মুখার্জিকে গালাগালি করেছে।
ইউইফ আলি অস্বীকার করা মাত্র
সলিল দে (লাইসেন্স বিভাগ) বলল,
‘এখানে চাবরি করতে হলে স্বতন্ত্র
মুখার্জিকে বাবা ডেকে থাকতে হবে,
নইলে লাল বাড়ীর দরজা তাদের
সামনে বন্ধ হয়ে যাবে।’ বলেই তিনি
আলিকে প্রহার করেন এবং তাতে
মদত দেয় শক্তি ঘোষ (তৎকালীন কমি-
শনারের পিএ) এবং শঙ্কর ভট্টাচার্য।
এখানেই শেষ নয়—এর পরের
শাসানি আলিকে বাড়ী ফেরার পথে
মায়ের ভোগে লাগিয়ে তার নৌকে
বিধবা এবং মেয়েকে অমাধা করা
হবে। অরুণ ব্যানার্জি চট করে প্রত্যা-
করলেন আলি হামলাকারীদের কাছে
কমা চাক নতুবা তিনি তাকে সাপেণ্ড
করবেন। আলিকে তাই করতে হল।
অরুণ ব্যানার্জি তার দালালির পুংকার
পেয়ে স্বতন্ত্র মুখার্জির সুপারিশে পৌর
সচিবের পদে স্থায়ী হয়েছেন।

আমাদের প্রশ্ন হল অরুণ ব্যানার্জি
এবং নির্মাল্য মুখার্জি স্বতন্ত্র মুখার্জির
যে সব পেয়ারের মস্তানদের ২৪ ঘণ্টা
পদসেবা করতেন, রিপোর্ট লেখার সময়
তাদের চিনতে পারতেন না কেন?
ইমার্জেন্সীতে যে কমতা তারা পেয়ে-
ছিলেন তাতে তারা শংকর ভট্টাচার্য,
শক্তি ঘোষ, সলিল দে এবং মিডা
ব্যানার্জিক সাপেণ্ড করলেন না
কেন?

মাদ্রাসা শিক্ষকদের দুরবস্থা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বাগীনতার পর গত ৩০ বছরে
দেশে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু
মাদ্রাসা শিক্ষকরা যে ভিত্তিতে ছিলেন
সেই ভিত্তিতেই রয়ে গেছেন। এই
হতভাগ্য শিক্ষকদের জন্য আজ পর্যন্ত
কোন বৈতনিক নির্ধারিত হয়নি।
সরকারের কাছে এই ব্যাপারে বহু
দরবার করা হয়েছে, কিন্তু কোন ফল
হয়নি।

বিভিন্ন বেলার এই সব অবহেলিত
শিক্ষক কংগ্রেসী সরকারের আমলে
তাদের কয়েকটি দাবি দাওয়া আদায়ের
জন্য পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা এডুকেশন
বোর্ডের সামনে বেশ কিছুদিন ধরে
প্রথমে অবস্থান ও পরে অনশন ধর্মঘট
করেন। ছয়দিন অতিবাহিত হবার
পর তৎকালীন মন্ত্রী এ বি এ গণি খান
চৌধুরী বরেকজন এম এল একে নিয়ে

পৌর সচিবের বিরুদ্ধে আমার
প্রথম অভিযোগ তিনি এ স্বকম একটা
গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকার সম্পূর্ণ অল্পবয়স্ক-
তার পিচ দিয়েছেন। তার বিভা-
গীয় কোন কর্মীর বিরুদ্ধে অফিসের
জিতরের বা বাইরের কোন লোককে
তিনি লিখিত অভিযোগ দিতে বলতে
পারতেন এবং তদন্তে সত্য বিচার
প্রমাণ অনুসারে তিনি নিজে ব্যবস্থা
নিতে পারতেন। তা না করে তিনি
বিনা প্রমাণে এবং বিনা তদন্তে কেবল
মিডা ব্যানার্জির মত একজন বংগেনী
চামচেনীর অভিযোগের ভিত্তিতে
সিদ্ধ ইউইফ আলিকে অফিস ভাঙার
মুখে গুলোর হাতে মার খাওয়ার জন্য
তার ঘরে ভেঁকে পাঠালেন কেন?
উপরন্তু তিনি অধীনস্থ একজন কর্মীর
রক্ষাব্যবস্থান করে হামলাকারীদের
কাছে তাকে কমা চাওয়ার জন্য চাপ
দিলেন কেন? নতুবা তাকে সাপেণ্ড
করতে ভয় দেখালেন কেন?

অফিসের বিচারের তার তিনি যদি
মস্তানদের হাতেই ছেড়ে দিয়ে থাকেন
তাহলে কি একথাই প্রমাণ হয় না যে,
ঐ পদে তিনি একান্ত অবাস্তব?

যে টাওয়ার্ড গ্রেড ক্রাকের পরীক্ষার
খতা কোন দিন দেখা হয়নি, তার
নম্বর জুটনি করার নামে ৫০০ টাকা
কী নিয়ে তিনি খাতা পরীক্ষা হয়েছে
বলে ভুয়া সার্টিফিকেট দিয়ে পৌর
তহবিল থেকে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন
এই অভিযোগও আমি তার বিরুদ্ধে
রাখছি। আমি দাবি করছি—পৌরমন্ত্রী
অচিরে পৌরসচিবকে সাপেণ্ড করে
এই দুই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করুন
এবং স্বকম গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে
অরুণ ব্যানার্জির মত দালালকে অধি-
লম্বে অপসারিত করুন।

অনশনরত শিক্ষকদের সামনে উপস্থিত
হন এবং তাঁদের দাবি পূরণের আশ্বাস
দেন। কলে শিক্ষকরা অনশন ভঙ্গ
করেন। কিন্তু তারপর অনেক ঘোরা-
ঘুর ও আলোচনা করেও
শিক্ষকরা তাঁদের দাবি আদায় করতে
পারেন নি।

তাই, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী
সরকারের কাছে তাঁরা আবেদন
জানিয়েছেন যে, সিমির মাদ্রাসা
শিক্ষকদের প্রকৃত মর্যাদাদানে
আর কালবিক্রম না করে তাঁদের জন্য
(১) বৈতনিক নির্ধারণ (২) স্বাভাবিক
ভিত্তিক অন্নদান অনুমোদন এবং
(৩) মাধ্যমিক শিক্ষকদের তায়
মাদ্রাসা শিক্ষকদের সবকম অনুদান
ও সুবিধা মঞ্জুর করা হোক।

অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

আপনার দপ্তরের বাণিজ্যিক বিভাগের আমি একজন অতি সাধারণ কর্মী। বিগত প্রায় বিশ বছর ধরে আমি এই দপ্তরে কাজ করে আসছি এবং আরও কয়েক বছর আমাকে এখানে কাজ করতে হবে। অনেক বাণিজ্যিক কমিশনার আমার চোখের ওপর দিয়ে এলেন, গেলেন। তাঁদের বিচিত্র কর্মপদ্ধতি এবং রাইটস বিল্ডিংয়ের বিচিত্রতর আদেশ ও চোখ রাঙানি এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটির অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। ঠিক এই মুহূর্তে এই বাণিজ্যিক অফিসটি কি অবস্থায় রয়েছে সে সম্পর্কে দু' একটি কথা আপনাকে বলতে চাই।

(১) অর্থদপ্তরের বডোকর্তারা, মানে এস, আব, দাশ, এ, কে, মুখার্জী এবং এম, জি, কুট্টির প্রভৃতি ব্যক্তিরা এর মধ্যেই আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যিকই হচ্ছে রাজ্য সরকারের রাজস্বের সবচেয়ে বড়ো উৎস। তাঁরা একথাও নিশ্চয়ই বলেছেন যে গত আর্থিক বছরে প্রায় দুশো কোটি টাকা বাণিজ্যিক খাতে আদায় হয়েছে। কিন্তু একটা কথা তাঁরা কেউই বোধ হয় বলেন নি—বাণিজ্যিক আরও কতো আদায় হতে পারতো! আপনি দয়া করে এঁদের কাছ থেকে জানতে চাইবেন কি বিগত আর্থিক বছরে কতো কোটি টাকা ফাঁকি দেয়া হয়েছে এবং কেন ব্যবসায়ীরা এভাবে ফাঁকি দিতে পারে?

(২) বাণিজ্যিক বিভাগের কাজ-কর্মগত বিশ বছরে যে হারে বেড়েছে, অফিসার, ইন্সপেক্টর, করানী ও পিওনের সংখ্যা সে অনুপাতে বেড়েছে অতি সামান্যই। ফলে কাজ জমে গেছে পাহাড় প্রমাণ। এই অফিসের প্রধান কাজ হচ্ছে এ্যাসেসমেন্ট ও কর আদায়। সেই কাজ যদি জমে যায় তাহলে তো ব্যবসায়ীদেরই পোয়া-বারো! হয়েছেও তাই। রিটার্ন বাকি পড়েছে, এ্যাসেসমেন্ট হয়ে যাওয়ার পর টাকা আদায় হয় নি এবং সেই অনাদায়ী টাকার অংশ বিশেষ যখন সার্টিফিকেট করা হয়েছে সেখানে গিয়েও বছরের পর বছর পড়ে থেকেছে। দু' তিন বছর বাদে-বাদে রাইটস বিল্ডিংস থেকে একজন করে নতুন কমিশনার পাঠানো হয়েছে। তিনি এসে শুধু সতর্ক নজর রেখেছেন যাতে ওর নিজের চাকুরী ঠিক থাকে। রেকর্ড না ধারণ হয়। তিনি সদৃশ লাঠি খুরিয়েছেন এবং প্রতিবছর

কয়েক কোটি টাকা কর আদায়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে প্রমোশন পেয়ে চলে গেছেন। এই আদায়ের পরিমাণটা বেড়ে যাওয়া খুব সহজ খেলা। প্রথমতঃ জিনিসের দামের ক্রমাগত উর্দ্ধগতি ও প্রতিবছর করের হার বাড়ানো বা নতুন কর বসানো। গত দশ বছরের ইতিহাস ঘাঁটলে আপনি এই একটা চিত্রই পাবেন।

(৩) অসহস্কান করলে জানতে পারবেন যে এখানে প্রতিটি কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসারের ঘাড়ে গড়ে প্রায় পাঁচশো ফাইল চাপানো হয়েছে এবং তার সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে মাত্র একজন করানী। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দু'জন অফিসারের জন্ত একজন পিওন। তাছাড়া রাজস্ব বিভাগে যখন ইন্সপেক্টরদের কাজের গুরুত্ব অনেক বেশি, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় দশজন অফিসারের ভাগে পড়েছে মাত্র দুজন ইন্সপেক্টর। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। কাজের চেয়ে অকাজের পাল্লা ভারি। ওপরওয়ালা এবং রাইটারের কতোয় মানতে গিয়ে কাজে হয়েছে ফাঁকিবাজীর চূড়ান্ত এবং রাজস্বের ক্ষতি। একজনকে দিয়ে পাঁচজনের কাজ করালে এর চেয়ে ভালো কিছু হয় না।

(৪) দৈনন্দিন কাজে ফাইল ও নথিপত্র যদি ঠিকমতো না থাকে এবং সময় মতো না পাওয়া যায় তবে কাজে ব্যাঘাত ঘটে। বাণিজ্যিক বিভাগ এমন একটি অফিস যেখানে প্রতি মুহূর্তেই কাজ। দৈনিক হাজার হাজার লোক আসে, হুতরাং হাজার হাজার ফাইল নড়াচড়া করে। অথচ এই অফিসের ফাইল কাগজপত্র ও রেকর্ডরুমের অবস্থা কলকাতা পৌর-সভার ময়লা ভর্তি ট্রাকের চেয়েও খারাপ। যে ফাইল থেকে বছরে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কর আসে তার দিকে তাকালে আপনার বিবমিষা ছাড়া অল্প কিছুই হবে না। এর এক মাত্র কারণ কর্তারা এই বিভাগের ভালোর জন্ত টাকা খরচ করার কথা মনে আনাও পাপ বলে ভাবেন। ওনাদের জিক্সেস করলে জানতে পারবেন যে এই বিভাগে বাৎসরিক ব্যয় আয়ের শতকরা একভাগ বা তারও কম এবং একথা ডাম পিটিয়ে বলে ওয়ারা গর্ববোধ করেন।

শুনলে অবাক হবেন যে এই অফিসে কাগজ, কালি, আলপিন, ট্যাগ ও জেমসক্লিপ পাওয়া যায় না বলে অনেক ক্ষেত্রেই ডীলররা সরকারী কাজের জন্ত সেগুলো দিয়ে থাকেন, কারণ দায়টা ওঁদেরই, কাজটা

করিয়ে নিতে হবে। এর চেয়ে লজ্জার কথা আর ক হতে পারে!

(৫) অফিসের কাজকর্মের অবস্থা দিন দিন যখনক্রমঃ খারাপের দিকে চলছিলো তখন আরেকটা বিরাট সর্বনাশ হলো বিগত কংগ্রেস সরকারের ঐ কুখ্যাত 'সতের হাজার'-এর আবির্ভাব। এদের দুই বৃহৎ অংশ এসেছে বাণিজ্যিক বিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যায় পর্যদে। শুরু থেকেই এদের কথাবাতা, হাবভাব ও কাজকর্মে একটা জিনিসই প্রকট হয়েছেঃ ক্যাবিনেট সাবকমিটির যে দাদারা এদের চাকরী দিয়েছিলেন তাঁরা যেন সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলে দিয়েছিলেন যে এখানে পয়সা ছড়ান রয়েছে, শুধু লুটে নিতে হবে। সরকারী সাহায্যপুষ্ট কর্মচারী ফেডারেশনের মন্তানরা এদের পোষ্টিং, ট্রান্সফার প্রভৃতি সব নিয়ন্ত্রণ করতে থাকলো আর এম, জি, কুট্টির মতো তথাকথিত দু'দে আমলাও মাথা নীচু করে সব সয়ে গেলেন। এরা কাজ করতো না কিন্তু খবরদারি করতো। ইংরাজিতে একলাইন নোট লিখতে গেলে কাগজ ও কলম দুটোরই অশেষ দুর্গতি হয়। আমরা শুনেছি এদের অনেকের নামে পুলিশে ক্রিমিনাল কেসও আছে। অথচ এরা চাকরী পেয়েছে এবং এখনও মাইনে নিচ্ছে।

(৬) এই পরিপ্রেক্ষিতে কুট্টিসাহেব ডেকে আনলেন আই, বি, এম-কে। কেন আনলেন এটা আপনি অসহস্কান করে জাহ্নন দয়া করে। তবে কেউ কেউ বলেছেন এটা একটা ছোটোখাটো লকহীড। সেটা আমাদের ভাববাব বিষয় নয়। শুনেছি এম, জি, কুট্টি অর্থনীতির ছাত্র। যে রাজ্যে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার রয়েছে, এবং যে অফিসে গত পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর ধরে কাগজপত্র, রেকর্ডস ও পরিসংখ্যান রাখার কোনো ব্যবস্থাই করা হয়নি, সেখানে কম্পিউটার ভাড়া করা হলো কোন্ উদ্দেশ্যে? যে অফিসে কোনো হিসেব নেই পশ্চিম বাংলায় কতো 'রেজিস্টার্ড ডীলার' রয়েছে সেখানে কম্পিউটার কিসের খতিয়ান তৈরি করবে? আপনি অসহস্কান করলে জানতে পারবেন বিভিন্ন 'চার্জঅফিস' ডীলারদের নাম ধাম ও অন্যান্য বিশদ বর্ণনা ধরে রাখবার যে 'হ্যামারিক্যাল বেজিস্টার' রাখা হয় তার বেশির ভাগই একটু পুরোনো হলে আর পাওয়া যাচ্ছে না, কিংবা পাওয়া গেলেও তার অর্ধেক পাতা নেই। সত্যিকথা বলতে কি, এই বিভাগের সমস্ত ব্যাপারেই যে সব

'ফিগার' রাইটাসে রয়েছে এবং এ অফিসেও রয়েছে তাদের শতকরা পঁচানব্বই ভাগই ঠিক নয়। যেমন ধরুন, ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি (মানে জরুরী অবস্থা চালু হবার কিছু দিন পরেই) তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের প্ররোচনায় এবং এস, আব দাশ ও এম, জি কুট্টির প্রচণ্ড উৎসাহে কলকাতা, আসানসোল ও শিলিগুড়িতে কিছু ডীলারের ঘরে তল্লাসি হয় ও খাতাপত্র ধরা হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, খাতাপত্র ধরার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই খবরকাগজ ও রেডিওর মারফৎ জানিয়ে দেওয়া হলো কত লক্ষ টাকার ফাঁকি ধরা পড়েছে, কিন্তু ধরাপড়া খাতার একটা পাতাও উন্টে দেখা হয় নি তখনও। আপনি দয়া করে জানতে চান ঐ ঘোষিত লক্ষ লক্ষ টাকার মধ্যে কত কি আদায় হয়েছে। আসলে ঐ হল্লা হচ্ছে শঙ্কর ঘোষের নিজের স্বার্থে এবং জেনেভনেই অর্থদপ্তরের কর্তারা তাতে সাহায্য দিয়েছেন।

রেকর্ডস ও হিসেবপত্রের হাল যখন এরকম তখন মঞ্চে আই, বি, এম-এর প্রবেশ নিশ্চয়ই খুব রোমাঞ্চকর! কুট্টি সাহেবের তরফ থেকে ওর একটা যুক্তি দেখানো হবে মনে হয়।

(৭) এক দিকে যখন লোকজন ও অফিসেশনারির এরকম করুণ অবস্থা তখন অন্যদিকে দেখা যাবে প্রায় বিনা কাজেই সরকার মাসে হাজার-পনেরো টাকা খরচ করছেন জনা ছয়েক এ্যাডিশনাল কমিশনারকে পুষতে। আসলে ঐ পদ রয়েছে সাতটা, একটি খালি রয়েছে এখনও। এবং ঐ খালি চেয়ারটায় বসবার জন্ত বেশ কয়েকজন এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার কিছুদিন ধরেই আঁকুপাকু করছেন। কারণ, ঐ পদে উন্নীত হলে কাজ না করেই প্রতি মাসে মোটা মাইনে নিয়ে বাড়ি ফেরা যায়।

ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাক। উনিশশো চুয়াত্তরের আগে এ্যাডিশনাল কমিশনারদের অনেক কাজ ছিলো। এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের আদেশের বিরুদ্ধে সমস্ত আপীলই ওঁদের সুনতে হতো। তা ছাড়া প্রশাসনিক দায়িত্বও কিছু কিছু ছিলো। কিন্তু ১৯১৪ সালে বাণিজ্যিক ট্রাইবুনাল হবার পর ওঁদের আপীল শোনার কাজটা একেবারেই চলে গেলো, হাতে রইলো পেন্সিল। কুট্টিসাহেব দেখলেন এঁদের চাকরীই প্রায় থাকে না। তাই তিনি কত-গুলো হস্তাকর কাজ চাপালেন এঁদের ঘাড়ে, যেমন ট্রান্সফার ও পোষ্টিং (যা বছরে একবার বা দুবারই হয়) বিভিন্ন অফিসের মাসিক প্রোগ্রেস রিপোর্ট, ফরম, কাগজ, ফাইল কন্ডার, পেন-

সিল, আলপিন, এমন কি বাথরুম, ল্যাভেটরির দায়িত্ব! যদি দেখা যেতো এই কাজগুলোও হুইভাবে হচ্ছে কিছুটা সন্তোষ পাওয়া যেতো অথচ এঁরা ছিলেন এবং আছেন। হয়তো আরও অনেকদিন থাকবেন। প্রশ্ন হচ্ছে জনসাধারণের কাছ থেকে যে কর আদায় হয় ও কি এ ধরনের শাদা হাতি পোষার জন্তে।

(৮) আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনি এবং বর্তমান সরকারের মন্ত্রী সভা এ সম্পর্কে দয়া করে অসহস্কান করুন এবং যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। যদি প্রয়োজন বোধ করেন তবে একটি উচ্চকমতাসম্পন্ন অসহস্কান কমিটি নিয়োগ করা যেতে পারে। এই বিভাগে গত ছত্রিশ বছর ধরে কিতাবে কাজ হয়েছে, বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের নিয়োগ, কনফারমেশন, প্রমোশন ও বদলি নিয়ে কতো সর্বনাশা কাণ্ড হয়েছে এ সমস্ত নোংরা মীমাংসা বর্তমান সরকারের যেমন জানা প্রয়োজন তেমনি তার প্রতিকারও সরকার। এই বিভাগের রক্তে রক্তে দুর্নীতি ছুরারোগ্য ক্যান্সারের মতো বাসা বেঁধেছে—তার আশু চিকিৎসা প্রয়োজন। আমি এবং আমরা আশা করবো সে চিকিৎসা হবে। ইতি—

বশব্দ
বাণিজ্যিক বিভাগের জরুরী কর্মচারী
**মুর্শিদাবাদ জেলার
কংগ্রেস নেতাদের
সম্পর্কে তদন্ত হোক**

(দর্পণের সংবাদদাতা)
মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন কংগ্রেস নেতা ও ভেকদারীদের সম্বন্ধে অবিলম্বে সমস্ত বিষয়ে তদন্ত করা হোক। তারা গত গত পাঁচ বছরে যা দুর্নীতি করেছেন অ-তার উপযুক্ত তদন্ত করা হোক। এই জেলার বিভিন্ন নেতা নানা রকম কুকর্মের মাধ্যমে প্রচুর পয়সা লুটেছেন কেউ কেউ ডাকাত চোর পুঁজে কেউবা পুলিশের দোলালি করে, কেউবা পারমিট ও বেকার যুবকদের চাকুরী দেওয়ার ভাঁওতা দিয়ে। কেউ কেউ বেনামে শিখণ্ডী খাড়া করে বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কন্ট্রোলী নিয়ে। তাছাড়া অনেক কংগ্রেসী বিভিন্ন কেসে জড়িয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরই উপর মহলের দয়ালু রেহাই পেয়েছিলেন। অবিলম্বে সেই সমস্ত কেসের আবার তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক আর কংগ্রেসীদের কাছে বেআইনী ভাবে থাকা অস্ত্রগুলিও দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে উদ্ধার করা হোক।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মার্কসবাদ

কুমুদন গঙ্গোপাধ্যায়

ওটাও ঠাকুর? আমার তিন বছরের নাতি “রাধা” হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করলো। তাকিয়ে দেখি তার হাতে একটা পাঁচ পয়সা। তিন বছরের শিশুর মুখে এ প্রশ্ন কেন? সে কি এই বয়সেই অনেক ঠাকুর চিনে গেছে? ভেবে দেখলাম—হ্যাঁ কথটা তাই। তার পিসির পড়ার বইতে পাঁচ ঠাকুরের নাম আছে, ঠাকুর, নমো করো; তুলসীগাছ দেখিয়ে বলা হয়েছে, এ ঠাকুর নমো করতে হয়, ক্যালেন্ডারের ছবিকে নমো করতে সেখান হয়েছে। বাড়ীতে লক্ষ্মী পূজা, সত্যনারায়ণ পূজার মা, ঠাকুরমার কাছে চুপ করে বসে থেকে ঠাকুর প্রণাম সেখান হয়েছে। পয়সা কড়িও পাঁচ ঠাকুরে, রান্না ভাতে পাঁচ ঠাকুরে বলা হয়েছে, মা লক্ষ্মী, ঠাকুর, নমো করো। শিশুমন ইতিমধ্যেই ঠাকুরের ভাৱে ভাবাক্রান্ত। তাই এ তিন বছরের অবোধ বালক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে “ওটাও ঠাকুর”? এটাই ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার বহু শতাব্দীর সংস্কার।

বহু দিনের অমীমাংসিত একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলাম এই সহজ প্রশ্নের মধ্য দিয়ে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মার্কসবাদ কি অচল? দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের সৃষ্টিত কর্মসূচী, সংগঠিত কর্মপদ্ধতি সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মাত্র তিন চারটি রাজ্য ছাড়া আর কোথাও কমিউনিজম জনতা-গ্রাহ্য হল না কেন?

অতীতের ইতিহাস, বর্তমানের সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী, অর্থ-নীতির অল্পস্বত পথের বিচারে বিপ্লবের সম্ভাবনা এবং প্রয়োজনে পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক যুক্তি মার্কসবাদী চিন্তাধারার ভিত্তিমূল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ যে তিনটি শ্রেষ্ঠ জিনিষ তৈরী করেছিল জ্ঞান, দর্শন, ইংরাজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থ-নীতি এবং ফরাসী সমাজতত্ত্ববাদ, তাদেরই স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী মার্কসবাদ এবং বহু মনীষীর মতে এই মতবাদ অস্বস্ত্য সত্য। তাই যদি হয়, মার্কসের সমাজতত্ত্ববাদ অর্ধ-শতাব্দীর পরিব্যাপ্তিতে কেন আজও ভারতে বিক্ষিপ্তভাবে কেবলমাত্র কয়েকটি অঞ্চলেই সীমিত? বিলম্বিত লয়ে অগ্রগতির কারণ কি? পাত্রভেদে প্রচার ও প্রয়োগের ক্রটি? ভারতে সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষার পাশাপাশি অন্ধ ধর্মবিশ্বাস আর কু-সংস্কার যেমন অতীতেও ছিল, আজও

আছে। সময় এবং পাত্রভেদে কখনও ব্যক্তিগত, কখনও বা সামাজিক, সামন্ততান্ত্রিক অথবা রাষ্ট্রীয় স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে ঠাকুরের দোহাই, ধর্মের দোহাই আর অধর্মের ভয় দেখিয়ে স্বযোগ স্ববিধা পূর্বেও নেওয়া হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে। এই প্রচলিত অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরক্ষর ভারতীয়ের সংস্কার আর সহজাত ধ্যানধারণার অবলম্বিত ঘটিয়ে নতুন চিন্তাধারাকে সহজভাবে গ্রহণ করার মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা একটি বৈশ্ববিক ক্রান্তি। কিন্তু কোনও বিপ্লব-ধর্মী কর্মসূচী সাধারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং সমর্থিত না হলে সফল হয় না। “No revolutionary can afford to go against the common sense of the masses”. (Gramski)

ভারতে সাম্যবাদের প্রসার ও প্রচারে এইখানেই ক্রটি থেকে গেছে। বাস্তববাদী মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সঙ্গে ভারতীয় মনস্তত্ত্বের সমন্বয় করা হয় নি বা এখনও করা যায় নি। সাধারণ মানুষের আবেগ আর উচ্ছ্বাসের স্বযোগ নিয়ে সেই ভাবপ্রবণতার গতিমুখ উপযুক্ত সময়ে ঠিক পথে চালিত করা সহজসাধ্য। সাম্যবাদী বন্ধুরা সে স্বযোগকে অবহেলা করেছেন। ফলে দেখা যায়, ১৯৭৪ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণের বিহার আন্দোলনে এবং ৭৬-এর ২রা এপ্রিল জরুরী অবস্থার প্রতিবাদে দিল্লীতে দুই লক্ষ লোকের জমায়েতে যখন দলমত নির্বিশেষে সবাই উপস্থিত, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট দল সেখানে দূরত্ব রেখে চললেন। সাধারণ মানুষ কিন্তু তাদের সঙ্গীরূপে দেখতে চেয়েছিল। জনগণের সঙ্গে একসঙ্গে মিশে তাদের প্রত্যাশার যথোপযুক্ত মূল্য দিলে আসমুদ্র হিমালয় ভারতবাসীর আরও কাছে আসত। এ স্বযোগ তারা কাজে লাগালেন না।

জাগ্রত চীনের মহানায়ক মাও-সে-তুঙ কিন্তু প্রথম থেকেই এই কথটা বুঝেছিলেন। চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির জয়লাভ থেকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়লাভ পর্যন্ত ত্রিশ বছরের ইতিহাস। এই আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ দিকে ১৯৩৪ সালে ঐতিহাসিক “লঙ মার্চ”-এর পর ১৯৩৫ সালে চীনের পার্টিতে মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে মার্কসবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে (১৯৩৭-৪৫) প্রতিরোধ সংগ্রামে মাও-

সে তুঙ যখন ১৯৩৮ সালে জাতীয় প্রতিরোধ বাহিনী তৈরী করেছেন, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ বর্ধিত সভায়, “The Role of the Chinese Communist Party in the National war” শিরোনামায় তাঁর যে বক্তব্য রাখলেন, তাতে দার্শনিক ভাবে বোঝালেন—চীনে কমিউনিষ্ট মতবাদ প্রচারে চৈনিক ঐতিহ্য আর মনস্তত্ত্বকে যথাযথ সম্মান দিয়ে অগ্রসর না হলে সফল পাওয়া যাবে না। “Communists are internationalists, but we can put Marxism into practice only when it is integrated with the specific characteristics of our country and acquires a definite national form…… For the Chinese communists who are part of the great Chinese nation, flesh of its flesh and blood of its blood, any talk about Marxism in isolation from Chinese characteristics is merely Marxism in the abstract, Marxism in the vacuum…… Foreign stereotypes must be abolished, there must be less singing of empty, abstract tunes and dogmatism must be laid to rest, they must be replaced by the fresh, lively Chinese style and spirit which the common people of China love”. (Page 23—Selected Writings—Mao-Tse Tung December 1967 Edition. Publisher National Book Agency, cal).

মার্কসবাদের প্রবক্তরা আমাদের দেশে কিন্তু এ পরামর্শকে সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করেন না, যার ফলে অগাচ্চ রাজ্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে কিছুটা বেশী রাজনৈতিক সচেতন এবং শিক্ষিত পশ্চিমবাংলা আর কেরালায় মার্কসবাদ জনচিন্তা জন্মে আংশিক ভাবে সফল হলেও, অন্য রাজ্যে প্রায় অস্তিত্বহীন। অথচ প্রয়োজনীয় সব কিছুই ভারতবর্ষে ছিল।

মার্কসবাদ বস্তুবাদী, ভারতীয় জনমানসে অধ্যাত্মবাদী এবং এই দুই মৌলিক পার্থক্যের সমন্বয় সাধনে অল্পবিধা নিশ্চয় আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন যখন স্বজন নিধনে অস্ব-

ধারণ করতে অস্বীকার করলেন, পার্শ্বসারথী শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বোঝালেন ধর্ম রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ধর্মের বিনাশই ধর্ম। যদি বলা যায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শোষণক কুরুকুলের বিরুদ্ধে শোষিত আর বঞ্চিত পাণ্ডবদের সংগ্রাম, গীতার ধর্মযুদ্ধের ধ্যানধারণাই বর্তমানে ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত বাস্তব জগতে বাঁচার লড়াই যদি বলা হয় সেটা কি খুব অস্বাভাবিক বক্তব্য হবে? মার্কসবাদের ধ্বনি ভারতের রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্রের বাণীর মধ্য দিয়ে প্রতিধ্বনিত হলে ভারতবাসীর কাছে সেটাই বেশী সহজ গ্রাহ্য হবে। বিখ্যাত কবি “আজ শুধু বন্দে মাতরম নয় বন্দে বন্দে ভ্রাতারম” বলার দিন এসেছে, স্বামিজীর “মুখ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই……” এই সব উক্তির মধ্যে কি কোন ইঙ্গিত নেই? “পথের দাবী”র স্বাভাবিক মূখে যখন শুনি “কবি তুমি প্রাণ খুলে শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু করে দাও। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন, ধর্ম, সমাজ, সংস্কার, সমস্ত ভেঙেচুরে ধ্বংস হয়ে যাক। আর কিছু না পার শশী, কেবল এই মহাসত্যই মুক্ত কর্তে প্রচার করে যাও, এর চেয়ে ভারতের বড় শত্রু আর নেই”, তখন মনে হয় ভারতের কোটি কোটি জনতার কাছে মার্কসবাদ তবু ভারতীয় আরকে উঁচিয়ে মুখ

সংখ্যালঘু পরিষদের বক্তব্য

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি বর্ধমান জেলা পরিষদ ভবনের সভা কক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির এক বর্ধিত সভা হয়। বর্ধমান রাজ্য কলেজের উপাধ্যক্ষ শ্রীধাংগুশেখর দত্ত পৌরোহিত্য করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব মহম্মদ সিরাজুল হক সভায় নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও অল্পস্বত শ্রেণীর নিজস্ব সমস্যাগুলির উল্লেখ করে তিনি বলেন “রাজ্যের তথ্য সমগ্র দেশের সত্যকার প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তি যত শক্তিশালী হবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং অল্পস্বত শ্রেণীর সঙ্গে সমগ্র অবহেলিত, উপেক্ষিত ও বঞ্চিত মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ তত সুসংরক্ষিত হবে। এছাড়া এই সব মানুষের যে সব প্রকৃত সমস্যা রয়েছে তার সমাধানের ব্যাপারেও একটা ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা সহজ হবে।” সভাপতি শ্রীধাংগুশেখর দত্ত পরিষদের এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্ম-

ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসীর সহজপাচ্য হত।

আর একটি কথা এই সঙ্গে বলা দরকার। কংগ্রেস সভ্যদের পতনের পর ভারতবর্ষে শুধুমাত্র ছুটি রাজনৈতিক দল, এই প্রথা থাকলে গণতন্ত্র রক্ষার পথ আরও সহজ এবং স্বগম হবে, এটাই বহু ব্যাতিমানের বক্তব্য। কংগ্রেসের বিকল্প জনতা দল এবং জনতার বিকল্প কংগ্রেস। আরও বলা হয়েছে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি জনতা-দলের কাছে আত্ম-সমর্পণ না করলে জনমতের শ্রোতে ভেসে যাবে।

কংগ্রেস এবং জনতা-দলের অস্বীকার, তাঁরা সর্বস্তরের সকল মানুষের স্বার্থ রক্ষা আর কল্যাণ সাধনে সঙ্গী সচেষ্ট থাকবেন। কংগ্রেস তাঁদের ঘোষিত নীতি আর শপথ বাক্য ভুলে গিয়ে শোষণের সহায়রূপে গত ৩০ বছরে পরিচিত হয়েছেন। জনতা মাত্র তিন মাসের শিশু। ইতিমধ্যেই বহু অবদানের সাক্ষ্য প্রমাণ নিশ্চয় আছে। তবু শঙ্কা জাগে, দুই বিরোধী স্বার্থের সামঞ্জস্য রক্ষায় পক্ষপাতশূন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা বড়ই দুর্বল। তাই সাম্যবাদের পরিব্যাপ্তির প্রয়োজন আছে, না হলে, ফিরে যাই কথামিল্লীর কথায়, “সংসারে যারা শুধু দলে, পেলনা কিছুই, তাদের নালিশ” কে শুনবে?

উদ্যোগকে সঠিক ও সমন্বয়পূর্ণগী বলে অভিহিত করেন। তিনি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং অল্পস্বত শ্রেণীর বিশেষ সমস্যাগুলির প্রতিকারে জাতি ধর্ম ও দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে আহ্বান জানান।

ত্রিভোজ্যিতি বহুর নেতৃত্বে গঠিত রাজ্যের বামপন্থী সরকারকে স্বাগত জানিয়ে সভায় এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

৫ টা দার হার

বর্ষিক ২২ টাকা

বার্ষিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫.৫০ টকা

টাকা কড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠাবার ঠিকানা:

মানেজার, দর্পণ

৩১, মটলেন, কলিকাতা ১৩



পরীক্ষায় টোকাটুকির প্রসঙ্গে

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পুলিশের সাহায্যে ছাত্রদের গণ টোকাটুকি বন্ধ করবার প্রয়াসী। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে বিরাট সমস্যা গত কয়েক বছর যাবত পশ্চিমবঙ্গের অষ্টোপাশের মত জড়িয়ে ধরেছে তার কিছু সুরাহা হলো কি? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত যে দুর্নীতি, আমলা-তান্ত্রিক রাজত্ব, কর্তৃপক্ষের অবহেলা, অনিয়ম ও অরাজকতা প্রতিমূহূর্তে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করছে ছাত্রদের গণ টোকাটুকি এই সবেরই বাই-প্রোডাক্ট।

কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকেরা কতটা সময় পড়ান? প্রত্যেক ক্লাশের জন্য ৪০ মিনিট সময় নির্দিষ্ট আছে। ১৫।২০ মিনিটের বেশী তারা পড়ান না। নিয়মিত উপস্থিতিও তাদের নেই। কোর্স শেষ হয় না। এরজন্য কি ছাত্ররা দায়ী?

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দুর্বলতার স্বরূপে কিছু কর্মচারী প্রতি বছর নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু প্রশ্রপত্র ফাঁস করে দিয়ে থাকেন। তার ফল ভোগ করে ছাত্র সম্প্রদায়। কেননা এরজন্য পরীক্ষা অনির্দিষ্ট কালের জন্য পেছিয়ে যায়।

পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষকের কাছ থেকে হারিয়ে যায় প্রায় প্রতিবছর নিয়মিতভাবে। এই সব উত্তর পত্রের অধিকারী পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ দায়িত্বজ্ঞানহীন পরীক্ষকের অবিমূর্ত্ত কারিতার জন্য

একটি প্রশ্ন

রাজনৈতিক বন্দীদের জেলমুক্তির ব্যাপারে সরকার গঠনের পরেই মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস এবং প্রয়োজন হলে অন্ত্যস্ত রাজ্যে কোতুলী প্রেরণের ঘোষণা সমস্ত মাঠকেই আশাবিভ করেছিল। তবে আমার মত আরও অনেকেরই প্রশ্ন, পূর্বতন মন্ত্রিসভার যে সমস্ত সদস্য পুলিশের যোগসাজসে ব্যাপক হত্যা ও সন্ত্রাস চালিয়েছেন গত কয়েকবছরে তাঁদের কি জেলের বাইরেই রাখা হবে এখনও? প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেসাই লোকসভায় বলেছেন শ্রীমতী গান্ধীকে তাঁর সরকার লোকের কথায় জেলে পুণবেন না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সারা ভারতের তুলনা চলে না। এখানে ৩১৭০ সালের থেকেই জনগণের উপর গি, আর পি-নামক কুস্তাঘাতিনীকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী।

তপন বসু

অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি শাস্তি দিয়ে থাকেন সেই সব পরীক্ষকের? শাস্তি দিলেও কি পরীক্ষার্থীদের কোনো লাভ হয়?

নির্দিষ্ট সময়ের পরীক্ষা গত কয়েকবছর যাবত অনিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরীক্ষার ফল বেরোতেও অহেতুক বিলম্ব ঘটছে। যাচের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পরীক্ষার ফল তিনমাসের ভেতর প্রকাশিত হতো। এখন ছমাস একবছরেও ফল প্রকাশিত হয় কিনা সন্দেহ।

২রা জুলাই মেডিকেল ছাত্রদের কয়েকজন আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখেছেন, যে পুস্তক বাজারে অমিল প্রশ্রপত্র নিয়ামক সেই পুস্তক থেকে একটি আবৃত্তিক প্রশ্র দিয়েছেন। এমনকি যা অনেক শিক্ষকের কাছেও পুস্তক নয়। আর একজন আইনের ছাত্র লিখেছেন, সিলেবাসে যদিও মহানেডান ল আছে ক্লাসে তা পড়ানো হয় না। তদুপর কিছুদিন আগে অধিক কর্মচারীগণ তাদের দাবীর ভিত্তিতে ধর্মঘট করেছিলেন। কর্তৃপক্ষ এদের দাবী মেনে নিলেন ধর্মঘটের ৩৫তম দিনে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীর ধেমারত দিতে হলো ছাত্রদের। তাদের নির্দিষ্ট পরীক্ষা পেছিয়ে গেল এবং সেই সঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ ক্রমশ অনিশ্চয়তার অন্ধকারে। কিন্তু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীঅমান দত্ত অধিক ধর্মঘট চলা-কালীন অবস্থায় ছাত্রদের নির্দিষ্ট পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে সমর্থ হয়ে ছিলো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থা ও অবহেলার রাজহাণ্ড থেকে নিজ পুত্রকন্ডাদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করবার জন্য কিছু বিস্ত-বান অভিভাবক গত কয়েক বছর যাবত ভিন্ন প্রদেয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে পুত্র কন্ডাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী তথা অভিভাবকগণ কল-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্বদু-প্রসারী কালো হাতের শিকার হয়ে চলেছেন প্রতিদিন প্রতিবছর। এর কলে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা দেবার সুযোগ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীগণ বঞ্চিত হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার তথা পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সম্প্রদায়ের একান্ত

অনুরোধ, আপনার অত্বকরণীয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং দৃঢ় শাসন ক্ষমতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কলংকমুক্ত করবার জন্য এগিয়ে আসুক। স্বপ্ন পরিবেশে স্বপ্নভাবেই ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা করতে এবং পরীক্ষা দিনে আগ্রহী। পুলিশের লাঠির আঘাত হেনে আর যা কিছু করা যাক না কেন সত্যি-কারের বিদ্যাশিক্ষা তাদের মস্তিষ্কের কোষগুলিতে প্রবেশ করানো যায় না।

দিলীপ বসু

আর জি করে যটনা

আপনার পত্রিকার ২৪শে জুন তারিখে প্রকাশিত “আর, জি, করে মদ জুয়া, রোগিনী ধর্ষণের আসর” শীর্ষক সংবাদে যে সব তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে সেগুলির সত্যতা সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। আমাদের কলেজে গত কয়েক বছর যাবত এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধের অবৈধ সম্মাননা বেল্লাপনার যে সকল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা যদি ধারাবাহিকভাবে কেউ প্রকাশের দায়িত্ব নেয় তবে প্রাক্তন “ভারতমাতা” পর্যন্ত লক্ষ্যায় অধোবদন হবেন। আপনার পত্রিকায় তার একটি সামান্য অংশমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। আর এসবের চেয়েও দুঃখের বিষয় (যদিও তাতে বিশ্বাসের কারণ নেই) যে এইসব বেল্লাপনার যেসব ছাত্র ডাক্তার জড়িত ছিলতাদের গৃহপোষকতার দায়িত্ব নিয়েছিলেন আমাদেরই কলেজের কতিপয় ‘শ্রদ্ধেয়’ শিক্ষক। শুধু মদ জুয়া বা নারীধর্ষণই নয়, সং নিরপেক্ষ শিক্ষকদের যত্নতর বদলী করা, সামান্যতম প্রতিবাদের স্বাবে পুলিশের প্রত্যক্ষ সহায়তায় আঁগেগানের দস্ত প্রদর্শন করা ইত্যাদি নিলক্ষ কার্যবলী-প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মুদ্রহামির সামনেই ঘটেছে। সরকারী ‘ভদ্র কামিধন’ ইত্যাদির প্রতি আমাদের আস্থা কম, কিন্তু যদি সে ধরনের কিছু হয় আমরা তাকে সাহায্য করব। কারণ, আশ্চর্যের ঘটনা এই যে এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধটি আজ অপসৃত, অথচ তার উল্লঙ্ঘনটা আজও আমাদের কলেজে প্রতিকলিত হয়ে চলেছে।

এ সংবাদে চন্দন রায়চৌধুরী নামক আমাদেরই কলেজের প্রাক্তন ডাক্তার সম্পর্কে যে সব প্রশংসা উল্লেখিত হয়েছে তাতে আমরা সন্তুষ্ট। কেননা চন্দন রায়চৌধুরী হল সেই সব লোকদেরই পাণ্ডা যারা আমাদের কলেজকে সমস্তরকম দুর্নীতির দুর্গ পরিপাক করার ভিত্তি স্থাপন করে-ছিল। কংগ্রেসী দলাদলির জমানায় সে হালে পানি পায়নি, আর তাঁর ওজাই তার গান্ধীদাহ। সুতরাং এই ব্যক্তি সম্পর্কে অন্ততঃ আমাদের বিন্দু-

মাত্র মোহ নেই।

পরিশেষে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য এই যে, সংবাদটির তথ্য সম্পর্কে এক-মত হওয়া সত্ত্বেও যে শিরোনামায় সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করি। আমা-দের প্রতিবাদ এই কারণে যে এ শিরোনামায় আর, জি, করের শুধু কতিপয় দুষ্কৃতকারী নয়, পরন্তু সমস্ত সাধারণ ছাত্রছাত্রী ডাক্তার শিক্ষককে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

আর, জি, করে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কতিপয় সাধারণ ছাত্র-ডাক্তার আয়ুর্বেদ চিকিৎসা।

সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বে গঠিত বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে আমাদের স্টেট আয়ুর্বেদ কলেজ হাসপাতাল অধ্যাপক ও চিকিৎসক সমিতির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা আশা করি সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর উপযুক্ত নেতৃত্বে আগামী দিনে এক স্বাধীন ও সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ গড়ে উঠবে।

চিকিৎসা জগতে আয়ুর্বেদ এক বিশেষ স্থান পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। দরিদ্র জনসাধারণের হৃদয়ে চিকিৎসার জন্য আয়ুর্বেদ চিকিৎসা অত্যন্ত উপযোগী একটা অনস্বীকার্য। আমরা বর্তমান সরকারের সহিত সর্ব প্রকার সহযোগিতা করিতে বদ্ধ-পরিকর। বামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়ে জনকল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করুন।

বিশ্বনাথ অধিকারী
সম্পাদক, আমদাস স্টেট
আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল

গঙ্গার ভাঙ্গনরোধ প্রকল্প

নিয়ে দুর্নীতি

গঙ্গার সর্বনাশাত্মক নৈসর্গিক দাবাদ জেলার ধুলিয়ানের অধিবাসীরা আজ অনেকেই নিরাশ্রয়। কত লোক যে সর্বস্বাৎ হয়েছেন, কত সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে তার সঠিক মূল্য এখনও নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বহু কাঠখড় পোড়ানোর পর বিগত কংগ্রেস সরকার ভাঙ্গন প্রত্যাহারের যখন সামান্য ব্যবস্থা করলেন তখন স্থানীয় ও বহি-রাগত কিছু ঠিকাদারের চক্রান্তে এবং কংগ্রেসের কতিপয় মন্ত্রী নেতা ও সরকারী কর্মচারীর সহযোগিতার ভাঙ্গন রোধ প্রকল্প ব্যর্থ হল। সেই সময় প্রকল্পের লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ছিনি-মিনি খেলা হয়েছে বলে সরকারের ঘরে বহু অভিযোগ জমা হয়েছে। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এই সমস্ত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের ভার সেন সি বি আইয়ের ওপর। কিন্তু জনসাধারণ তদন্তের ফলাফল এখনও জানতে পারেননি। তাই জনসাধারণ আবার সোচ্চার হচ্ছেন।

রথযাত্রার শুভলগ্নে জানাই
আপনাদের অভিনন্দন
৮-৪'র চমক
শৈলেশ গুহনিয়োগী রচিত
পরিচালিত

আবদালা মজিনা

গীত—সমরেন্দ্র ঘোষ
সুর—রঘুনাথ দাস
কুনাল মুখার্জী রচিত। পরিচালিত

ছোট বো

গীত—অজাতশত্রু
সুর—পশুপতি ভট্টাচার্য

শ্রেঃ অজাতশত্রু, শ্যাম
সুন্দর, তপনকুমার,
প্রশান্তকুমার, নমিতা
বিশ্বাস, কানন মুখার্জী,
সুতপা সেনগুপ্ত,
কনকলতা

নিউ

প্রভাস অপেরা

৩৩৩এ, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬
ফোন ৫৫-৫৭৮

ভেঃ ম্যানেজার—রমেন বসুমন্ত্রিক

নবরঞ্জন অপেরা

৮৪'র বলিষ্ঠ প্রযোজনা
সমরেশ বসু রচিত

মহুয়া

নির্দেশনায়—মহেন্দ্র গুপ্ত
সুর—ভূপেন হাজারিকা
৮৩'র বিজয় গৌরব
যাত্রায় ভারতীয় রেকর্ড

লায়লা মজনু

শ্রেষ্ঠাংশ—মনোরঞ্জন চক্রবর্তী,
বীণা ঘোষ, ইন্দ্র লাহিড়ী ও
ছন্দা চ্যাটার্জী
১১৭, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬

রথযাত্রার অভিনন্দন
রয়েল বীণাপাণির
মৌরীণবাবুর ঐতিহাসিক
পরাজিত সম্রাট

৩৩৩এর সামাজিক

গৃহলক্ষ্মী

বুকিং চলছে (৫৫-৭৫৫২)

চলচ্চিত্র নটক চর্চা

যাত্রা সংবাদ

কীৰ্ত্তিপাণি নাট্য কোম্পানী

১৩৮৪ সালে পরিচালক মুহুল বঃর তত্ত্বাবধানে কীৰ্ত্তিপাণি নাট্য কোম্পানী এবং নাট্যলোক এই দুটি দলেরই সংগঠন প্রায় শেষ, কিছু দিনের মধ্যেই মহড়া আরম্ভ হচ্ছে। এ বছর কীৰ্ত্তিপাণি চারখানা নাটক নিয়ে দর্শকদের সামনে আসছে। মুহুলবাবুর ঔসাহসিক প্রচেষ্টায় অভিনীত হচ্ছে রবীন্দ্র ব্যানার্জীর ‘রক্তাক্ত গিরিশ’ দেবেন নাথের ‘বিশ্ববী হৃৎসেন’, কমলেশ ব্যানার্জীর ‘অভিশপ্তা জননী’ এবং যাত্রা জগতে প্রথম মহিলা পালাকার মলি ব্যানার্জীর একখানি নাটক বার নাম এখনো স্থির হয়নি। নাটকগুলিকে হরের জালে উপভোগ্য করছেন যথাক্রমে পঞ্চানন মিত্র, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, অমৃত মিত্র ও লক্ষণ দাস (কিন্ম)। অভিনয়ে নাটকগুলিকে প্রাণবন্ত করবেন নিতাই দাস, সুভাষ ভৌমিক, অরুণ সেন, নবাগত স্বকেশরঞ্জন দে সুনীল বিশ্বাস, বীরেন

সাহা, মহাদেব দে ও আরও অনেকে। নারী চরিত্রে রয়েছেন পাপিয়া রাণা, যুথিকা দাস, সারথী রায় ও বেলা চক্রবর্তী। নাট্যলোকে চারখানি পালা নিয়ে মুহুল বঃর আসরে নাম ছেন তরুণ নাট্যকার স্বশ্রামল শর্মা ‘নেতাজী সুভাষ’ দেবেন নাথের ‘জয় সন্তোষী মা’ নন্দগোপাল রায়-চৌধুরীর ‘মাতৃহত্যা পরশুরাম ওর’-বাবুর ‘কেউটের ছোবল’। স্বরদিয়েছেন যথাক্রমে প্রশান্ত ভট্টাচার্য নীলিমা মিত্র, পঞ্চানন মিত্র ও লক্ষণ দাস (কিন্ম)। চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত করছেন ভবানী সরকার, হরিপদ ভট্টাচার্য বামচন্দ্র দে মধন হাইতি, গম্মা ভট্টাচার্য সুনীল ভট্টাচার্য আশীষ চক্রবর্তী। স্ত্রী চরিত্রে রয়েছেন মাধবী দত্ত, সংগীতা বঃ ও কল্পনা সরকার।

বাসন্তী অপেরা

বাসন্তী অপেরা এই বছর অভিনয় করছে দুটি পালা। একটি স্বর্গভ ভঞ্জনকুমার দে রচিত পৌরাণিক স্বকেশরঞ্জন দে সুনীল বিশ্বাস, বীরেন

স্বশ্রামল শর্মা রচিত ঐতিহাসিক পালা ‘শাহজাদী রোশেনারা’। শৌর্যজ পালাটি গড়ে উঠেছে মুহুল হারেমের এক বিশ্বকর ট্রাজেডী নিয়ে যা ইতি-হাসের এক অলিখিত দলিল। পালা দুটি পরিচালনা করছেন কাজী সব্যাসাচী ও ঠাকুরদাস মিত্র। সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন বারীন চট্টো-পাধ্যায়। শ্রীতিকর্ণা চৌধুরী ও গোবিন্দ মিত্রের এই প্রচেষ্টায় অভিনয় শিল্পীরূপে যুক্ত হয়েছেন নারায়ণ রায় গোপালী বীরেন সাহা স্বকুমার চট্টো-পাধ্যায় সাধন চক্রবর্তী ত্রিপুরারী চট্টোপাধ্যায় গোবিন্দ মিত্র শ্রীতিকর্ণা চৌধুরী ও কেকা চৌধুরী।

সাহানা যাত্রা ইউনিট

চিৎপুনের যাত্রাপাড়ার এবার বিশ্বয় সৃষ্টির দাবি করছে যে দল তার নাম সাহানা যাত্রা ইউনিট। এটি অভিনেতা শক্তি ভট্টাচার্য ও গায়িকা সাহানা বঃর যুগ্ম প্রচেষ্টা। এরা তিনটি পালা নিয়ে এ বছর যাত্রার আসরে নামছেন। প্রথমটি হল মহেন্দ্র গুপ্তর ‘সমুদ্র গুপ্ত’। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন শক্তি ভট্টাচার্য স্বয়ং এবং স্বর দিয়েছেন অমিয় ভট্টাচার্য। এই দলের আর দুটি পালা হল ‘হরে রাম হরে কৃষ্ণ’ এবং ‘সমুদ্র মন্থন’। নবকুমার চন্দ্র রচিত প্রথম পালাটি করুণ সামাজিক আলোচ্য এবং দ্বিতীয়টি বিশ্বজিৎ পুরোকারস্বর লেখা পৌরাণিক নাটক। পালা দুটি পরিচালনা করছেন যথাক্রমে জহর রায় ও শক্তি ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য।

চন্দ্রলোক অপেরা

এই দলের গত বছরের পালা ‘হাসির আড়ালে’ জনপ্রিয় হয়েছিল। এই বছর চন্দ্রলোক অপেরায় অভিনয়ে যারা অংশ নেবেন তাদের মধ্যে রয়েছেন নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণী ঘোষ। এবার এরা আসরে নামছেন শেখপীরের ‘হামলেট’ নিয়ে যার বাংলা রূপান্তর ও পরিচালনা করছেন অমর ঘোষ। স্বরারোপ করছেন জি বালসারা। ভাষা এই দল যাত্রাস্রাঙ্গীদের সামনে হাজির করছে শ্রামল ঘোষের পরিচালনায় নীহাররঞ্জন গুপ্তর ‘বহি-নিধা’ যার পালারূপ দিয়েছেন সত্য-প্রকাশ দত্ত। স্বর দিয়েছেন আনন্দ-শঙ্কর। এই দলে নতুন নতুন অনেক শিল্পীর সমাবেশ আছে।

নব অম্বিকা নাট্য কোম্পানী

এই দল বর্তমানে যে পালা প্রযোজনা করছে তার সব কটিই ভিন্ন খাদের। স্বর্গভ ভঞ্জনকুমার দে রচিত পৌরাণিক পালা ‘সম্রাট শম্ভুচন্দ্র’ আধুনিক ও প্রগতিশীল। পালা লন্ডা-টের আরেকটি রচনা ‘বিরোধী

নজরুল’। ‘শীশমহল’ একটি ঐতি-হাসিক পালা। এদের অন্ততম পালা ‘নারী ও নাগিনীতে’ নামের মত ঘটনাতেও চমক আছে। এই দলের পরবর্তী আকর্ষণ ‘বিশে ডাকাত’।

একটি খবর

শেখপীরের ‘এটনী ও ক্রিও-পেট্রা’ অবলম্বনে শ্রীতি রায় রচিত ‘ক্রিওপেট্রা’ অভিনীত হতে যাচ্ছে যাতে স্বরারোপ করেছেন স্বধীর বঃ। লক্ষ্য রাখুন কোন দল অভিনয় করছে আর কে পরিচালনা করছেন?

একটি সভা

রাজনৈতিক বন্দীদের কবিতা সংকলন প্রকাশ সংক্রান্ত একটি আলোচনা সভা আগামী ২৬শে জুলাই বিকেল পাঁচটার কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে (১৪নং স্টেশন রোড, কলিকাতা-৩১) অনুষ্ঠিত হবে। সমস্ত প্রগতিশীল পত্রিকা ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির সহস্রদেয় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করছি।

সুলভে চিবিৎসা

১০ নং গুয়াটালু স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১—এই ঠিকানায় অবস্থিত সেন্ট্রাল নার্সিং হোম অ্যান্ড ক্লিনিকের কর্তৃপক্ষ দৃশ্যপক্ষে জানিয়েছেন যে, কংগ্রেস সরকারের নির্ধাতনে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ক্লিনিক অল্প খরচে তাঁদের চিকিৎসা করবে।

রেজিঃ—২৬৭২

ফোন :—৫৫-১৭৭১

সাহানা যাত্রা ইউনিট

প্রোঃ—শ্রীমতী মীরা ভট্টাচার্য

৫৪এ, নিমতলা ঘাট স্ট্রিট, কলিঃ ৬

সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত

রচনা : মহেন্দ্র গুপ্ত

স্বর : অমিয় ভট্টাচার্য

নির্দেশনায় : শক্তি ভট্টাচার্য

হরে রাম হরে কৃষ্ণ

রচনা : নবকুমার চন্দ্র

স্বর : অরুণ ঘোষ

নির্দেশনায় : জহর রায় (বিল্ম)

সমুদ্র মন্থন

রচনা : বিশ্বজিৎ পুরোকারস্বর

স্বর : প্রশান্ত ভট্টাচার্য (বড়)

নির্দেশনায় : শক্তি ভট্টাচার্য

রূপায়ণে : বাণীবিনোদ শক্তি ভট্টাচার্য ও সাহানা বোস আরও বিশিষ্ট যাত্রা শিল্পীসমষ্টি

তরুণ অপেরার

৮৪-র বিশেষ আকর্ষণ

শান্তিগোপাল

নির্দেশিত ও অভিনীত

কাল মার্কস

রচনা—শম্ভু বাগ

স্বর—প্রশান্ত ভট্টাচার্য

নতুন প্রযোজনা

শম্ভু বাগ রচিত

রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা

স্বর—প্রশান্ত ভট্টাচার্য

মধু সোমসামী রচিত

সিপাই মিউটিনি

স্বর—পশুপতি ভট্টাচার্য

৮৪তে আলোড়ন আনছে

৮৫বছরের ঐতিহ্যবাহী জনপ্রিয়

সত্যস্বর অপেরার

বু-মু-বু

সোনার ঘোড়া

নাগমণি

বুকিং চলছে। ৫৫-৮১১০

শুভবর্ষ যাত্রায় সব্বারে জানাই আনন্দজনক

নিউ

ইন্দ্রজ্যোতি

কেতকী দত্ত

অভিনীত নির্দেশিত

গেরীর
মা

পালারূপ কেতকী দত্ত

জ্যোতি
স্বরাধিকার

রচনা : স্বশ্রামল শর্মা

স্বর : দুর্গা সেন

পরিচালক : জয় মাইতি

৯৭/১১এ, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

সদা সত্য কথা বলিবে

হঠাৎ কথাটা উঠলো কেন জানেন? কারণ সত্যি যে কোনটা, সেটা সব সময় বোঝা যায় না।

যেমন ধরুন কলকাতার কিছুই হয় নি, সেটাই কি সত্যি কথা নাকি কলকাতা একেবারে বর্গ হয়ে গেছে সেটাই সত্যি?

অর্থাৎ কিনা সত্যি মিথ্যার মধ্যে অনেকগুলি অজানা, না জানা, তুল-লাগি তথ্য থেকে যায়।

এই কলকাতার কথাটাই ধরুন মা কেন? হংকংর রাষ্ট্রদ্বানী সরিয়ে একে মারতে পারে নি, যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ একে শেষ করতে পারে নি। কলকাতা চার বছরে। সেই ক্ষত কর্মপ্রয়াস, সেই জটিল, এম, ডি, এ।

প্রবাসী বাঙালী এখনও দুটে আসেন কলকাতায় যেকোনো জটিল ঠিক করতে। সোঁকাল জেনে লক্ষ লক্ষ লোক আসছেন শীর্ষ সর্বজি নাছ নিয়ে, কেউ বা কটা হাসের ডিম বা ডাঁড়ি নিয়ে, আবার কেউ সদাগরী অফিসে কলম পিষতে। সবাই কুঁদাই ভাবতে হবে।

এখন প্রশ্ন হল, কলকাতার উন্নতি কি কিছু হয়েছে? উন্নতিটা কি ঠিক দিকে হচ্ছে, নাকি সর্ব কিছুই খরচের খাতায়?

সি, এম, ডি, এ, অর্থাৎ জানতে চেয়েছে এখনও জানতে চায়। আর নতুন যারা জন প্রতিনিধি এলেন, তারাও সেটা ভাব করে বুঝতে চান। তারা জানতে চান কলকাতার মানুষ কি বলে। সত্যিটা কি?

ধরুন কেউ কেউ বলছেন যে সি, এম, ডি, এ-র জাল-নর্মা বসাবার পর তাদের প্রজাতির বেশী জল জমছে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং হিসাবটা কখন, তারপর সত্যি যদি আপনার মনে হয় এ রকম অস্বস্তি ঘটেছে, তাহলে নিঃসংকোচে লিখুন। আর যদি মনে করেন যে, জল কম জমছে আর তাঁড়াগা ড় সেরে যাচ্ছে, তাহলে সেটাও বলুন।

অনেকে বলছেন যে, যে সব বস্তিতে সি, এম, ডি, এ কাঁচ করেছে সেগুলিতে ঢোকা যায় না। তাই যদি হয় তাহলে সে কথা আপনারা নিঃসংকোচে জানান। আর যদি মনে করেন যে, কিছুটা কাঁচ হয়েছে, তাহলে সে কথা বলবেন না কেন?

সি, এম, ডি, এ দাবী করছে যে, জলের সরবরাহ বেড়েছে। আপনারা নিঃসংকোচে জানান, যে আগের

তুলনায় আপনারা বেশী জল পাচ্ছেন না কম জল পাচ্ছেন, জলকষ্ট বেড়েছে না কমেছে।

এক কথা সব কিছু জানান। কলকাতার উন্নতি যদি আপনার কাম্য হয় তাহলে কি ভাবে সে উন্নতিটা হচ্ছে, ঠিক পথে হচ্ছে কিনা, সেটা জানা প্রথমেই দরকার। না হলে সি, এম, ডি, এ-র টাকা খরচ ব্যর্থ হবে।

আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি কেন জানেন? ধবরের কাগজগুলো পড়ে কোথাও দেখে পেলাম না যে এবার বর্ষার জমা জল ভাড়াভাড়া সেরে গেছে। কেউ কেউ তো লিখেই দিলেন সি, এম, ডি, এ-র মুখোঁস পরা দরকার। আবার কেউ কেউ বলেন যে সাংবাদিক ধরে 'কলকাতা-ভাস্কর' একটা প্রদর্শনী চলছে। এটাই কি সত্যি কথাই নয়? কারো কারো মুখোঁস খোলা দরকার। বাই হোক, জানতে হবে যে কাছটা কতখানি সফল হয়েছে, ঠিক পথে হচ্ছে কিনা, অত কিছু করা যায় কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ সব কথাই মহানগরীর প্রত্যেকটি কোনা এবং সর্বস্তরের মানুষের কাছ থেকে আমরা জানতে চাই। জন প্রতিনিধি হিসাবে এবং সি, এম, ডি, এ-র চেয়ারম্যান হিসাবে প্রিজোন্টি বহুকে জানাতে পারেন অথবা সি, এম, ডি, এ-র জন সংযোগ বিভাগে চিঠি লিখতে পারেন। আপনারাও অন্তিমতা, আপনারাও সংযোগিতা, এক আপনারাও সাহায্যে গড়ে উঠুক সত্যিকারের ভাল কলকাতা।

কলকাতা সৌন্দর্য হতে পারে সামান্য সামান্য কাজে। যদি প্রত্যেকটি চা-মিষ্টি পানের দোকানের সামনে শালপাতা, মাটির ভাঁড় ইত্যাদি ফেলবার জন্ত বুদ্ধি থাকে, যদি প্রত্যেকটি নাগরিক সকালে অথবা রাতে নির্দিষ্ট সময়ে এবং স্থানে আবর্জনা ফেলেন এবং যতখানি সম্ভব জলের অপচয় বন্ধ করেন, ভিড়ের মধ্যে অক্ষমদের সাহায্য করেন, বিদেশী এবং ভিনদেশীদের সাহায্য করেন, জামে বাসে সঠিক ভাড়া দেন.....

লক্ষ্য ফিরিস্তি? কিন্তু খরচা নেই।

* সম্প্রতি প্রচণ্ড বর্ষায় বেশপ্রিয় পার্ক এলাকায় ছেলেরা নিজেরাই ম্যানহোলের ঢাকনী খুলে জল

জনতা পার্টি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পার্টির বিশ্বাসভাজন হতে চেয়েছিলেন। কিছুটা মাফল্যও অর্জন করেছেন। আর একজন শিল্পপতি বিউলাবাড়ীর আত্মীয় তিনিও অনেক টাকা তুলতে সাহায্য করেছেন। ইনি হচ্ছেম জি. ডি কোঠারি।

কিন্তু টাকা তোলার পর সেই টাকা গেল কোথায়? জনতার অত্যাচার প্রাণীদের তুলনায় আমদাংগা কেন্দ্রে অশোক দত্তের জী মীরা দত্ত, বড়তলাকেন্দ্রে কমলা সরকার, কান্দিপুরে পদ্মরাজ রায়, বুলবুল চ্যাটার্জিরা অনেক বেশী টাকা পেয়েছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। কিন্তু হিসেব কোথায়?

খরচ সম্পর্কে বা সামান্য হিসেব পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে, কলকাতার পেট্রোল সহ প্রতিদিন বাট টাকার যেখানে মোটর গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় সেখানে জনতা পার্টি ভাড়া দিয়েছে বিনা পেট্রোলে দৈনিক একশো দশ টাকা। কোনো টেওয়ার না নিয়ে প্রায় চার লাখ টাকার পেট্রোল খরচও দেওয়া হয়েছিল একটি কোম্পানীকে। টাকা সংগ্রহের ক্ষেত্রে কুপন ছাপানো হয়েছিল। এখন সেই কুপনের হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না।

কলেজ ষ্ট্রিটের এক খাদি কোম্পানীর কাঁচ থেকে অনেক বেশী হারে ক্যাগ কেনা হয়েছিল। আর একটি স্বল্পতর অভিযোগ হচ্ছে, জনতা পার্টির মুখপাত্র পরিচয় দিয়ে একজন মাস্তান একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্যে জোর করে টাকা আদায় করেছে। এই মাস্তানরা অধৌকৃতক হস্তের লেইবন।

বোটিকা, রাজ্য জনতা পার্টি নিবীচনী সভাবিলের হিসেব দিয়ে বিক্ষোভ এখন জুড়ে।

সরিয়ে দিলেন। এটাই সত্য, ধন-টোকাটুকি নয়।

* বিনি পয়সার শিল্পসাহি লাগাতে চান? উভ মানবীর "উইমকো", আলমবাজারে (কলকাতা ৩৫) যোগাযোগ করুন। এ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগের উদ্যান শাখায়, রথের সেনায় কত বাঁচ পাওয়া যায়, এমন কি আমের আঁটি থেকেও গাছ করা যায়।

* "সুতাহুট সেক্রেট" (বাংলা) "ক্যালকাটা পার্টি, প্রেসেট, কিস্টার" (ইংরাজ) দাম এক টাকা নয়দে বা মানি অর্ডার সি, এম, ডি, এ (৩-এ অকল্যাণ্ড প্রেস কলকাতা-৭০০০১৭) পাওয়া যাচ্ছে।

প্রকাশিত হল।

ইন্দিরার কারাগারে

(সিরিজ-১)

দাম—এক টাকা

দেশকথা প্রকাশনী

৩১, মট লেন, কলিকাতা-১৩

২৪ঘণ্টার পুণ্যদিনে স্মৃতি ও স্মৃতিচিহ্ন গ্রহণ করুন

৮৪'র প্রযোজনা

তিনটি স্বাদের তিনটি পাল

ভৈরব গজোপাধ্যায় রচিত

সামাজিক পাল

অচল পয়সা

সত্যপ্রকাশ দত্ত রচিত

সামাজিক পাল

পাপ পুণ্য ভগবান

শ্রীমদ ভগবদ্গীতা রচিত

ঐতিহাসিক নাটক

সাঁই ফকির রূপচাঁদ

মাট্য মিত্র রচিত : অরুণ দাশগুপ্ত

নির্মায়িত প্রতি শনি ও রবিবার

মহাজাতি সদনে

অভিনীত হচ্ছে

পালসম্রাট অজেন্দ্রকুমার দেব

নটী বিনোদিনী

স্বর : দুর্গা সেন

নির্দেশনা—অরুণ দাশগুপ্ত

পালসম্রাট অজেন্দ্রকুমার দেব

বিজ্ঞাসাগর

স্বর : অনিল বাকলী

নির্দেশনা : অরুণ দাশগুপ্ত

এক

ভৈরব গজোপাধ্যায় রচিত

মা মাটি মানুষ

স্বর : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নির্দেশক : অরুণ দাশগুপ্ত

পরিবেশনায়

সব যুগের একটি নাম

নট কোম্পানী

১৭, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৫

ফোন : ৫৫০৭৭২ ও ৫৪৩৬২৮

সম্পাদক—সীতেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩১ আচার্য প্রহ্লাদ রোড কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দপ্তর কার্যালয়, ৩১, মট লেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

১৯৭৫ সালে ওরা যে হাওড়া জেলে ভ্রমর প্রবীর শ্যামল মদন প্রতীপকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়

দাপন

বিংশ বর্ষ ২৭শ সংখ্যা ২৯শে জুলাই, '৭৭ ৪০ পৃষ্ঠা

রাজ্য জনতা পার্টিতে তুমুল বিক্ষোভ নির্বাচনী তহবিলের হিসেবে বহু লক্ষ টাকার গরমিল

পশ্চিমবঙ্গের জনতা পার্টির আভ্যন্তরীণ কৌদল এখন তুঙ্গে। প্রায় সমস্ত কর্মকর্তাই নির্বাচনী তহবিলের হিসেব বা তদন্ত চাইছেন। এই অবস্থার মধ্যে দলের অগ্রতম সম্পাদক অশোক দত্ত এখন প্রফুল্ল সেনকে নিয়ে খেলছেন। এর কারণ সম্পর্কে জনতার ওয়াকিবহাল মূল বলছেন, প্রফুল্ল সেন রাজ্য জনতার চেয়ারম্যান না থাকলে অশোক দত্ত

কিভাবে নির্বাচনী তহবিল ব্যবহার করেছেন তার তদন্ত হবে। অশোক দত্ত এখন বলছেন, প্রফুল্ল সেন রাজ্য জনতার চেয়ারম্যান থাকতে রাজী হয়েছেন। প্রফুল্ল সেন কিন্তু কিছু বলছেন না। উনি সন্ধান কলকাতা থেকে অনেক দূরে আরামবাগে আছেন। অশোক দত্ত বলছেন, সারা ভারত জনতা পার্টির (এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়)

হায় ! সুরত ও তার স্যাঁড়াংদের ধাক্কাবাজী ব্যর্থ হল

হীরেন বসু

কলেজ স্ট্রীটস্থ 'মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম এবং ঐ বাজারের কিশ রেঞ্জ ভেদে বহুতল বাড়ী করে দু'পয়সা কামানোর মতলব যার মস্তিষ্কে প্রথম উদয় হয়েছিল তার উর্বরতা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। ঐ অঞ্চলের কালোয়ারদের দোকান এবং কালো টাকা খাটানোর জায়গার প্রয়োজন বহু দিনের। কর্পোরেশনকে অর্থাৎ ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং তার চামচেদের বোঝান হল যে, কালোয়ারদের টাকায় এই বাড়ী উঠবে, কর্পোরেশনকে কোন অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে না, উপরন্তু ভাড়া বাবদ তার আয়বৃদ্ধি হবে; এবং সংশ্লিষ্ট সবার পকেটেই মোটা অঙ্ক উঠে আসবে।

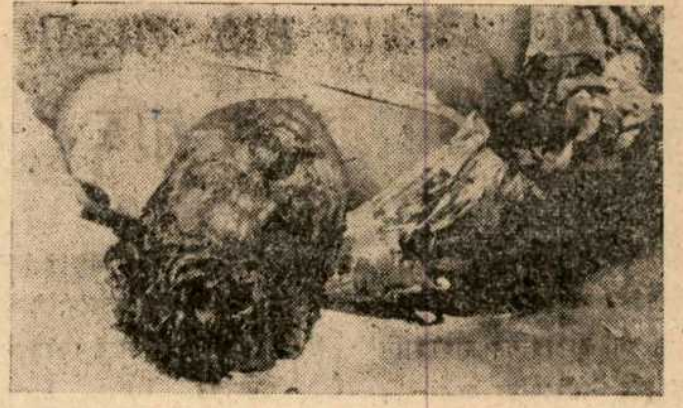
এই পরিকল্পনায় দোকান বাবদ সেলামি নেবেন পৌরসভা নয়— বিনিয়োগকারীরা। ওর সঙ্গে জড়িত প্রধান দুই জন—স্বনামধন্য ফাটা কেটে এবং সোমেন মিত্র। এদের আড়কাঠি পৌরসভার পি পি আর ও স্বদর্শন বারিক এই শুভকর্মে সূচনা করেন তার প্রস্তাবের মাধ্যমে। মন্ত্রী সুরত মুখার্জি দুই পার্শ্ব মধু চ্যাটার্জি এবং শান্তি সেন এই কাজটি ত্বরান্বিত করার জন্ত মোটা অঙ্ক উপকৌশল পান। তার জন্ত অন্য-তর চামচে শংকর ভট্টাচার্য এবং স্বদর্শন বারিকের গৌসান হয়— তাদের ভাগে নাকি মাত্র দু'হাজার টাকা করে জুটেছিল। মামলার সালিশী করতে এগিয়ে এলেন

পালের গোদা সুরত মুখার্জি। তার পকেটে নাকি ৩০ হাজার উঠেছিল; মধু শান্তির দশ করে। বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সব ব্যবস্থাই পাকা, মন্ত্রীর অর্ডারও হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কমিশনার নির্মালা মুখার্জি শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেলেন। ফাইলটি এখনো তার অফিসেই আছে বলে খবর আছে। মন্ত্রিমশায় এটির মধ্যে অনেক মজাদার তথ্য পাবেন।

নেতাজী ভবনের অধিষ্ঠাত্রী পৌরসভার একটি কর্মচারী সমিতি নেতাজীভবন নির্মাণকল্পে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা তুলে পৌরসভার কাছে এই উদ্দেশ্যে একটি জমি চাইলে প্রজ্ঞানানন্দ ভবনের পাশের জমিটি তাদের দেওয়া হয়।

ফাইলটি সুরত মুখার্জির অহুমোদনের জন্য যাওয়া মাত্র তার (এবং চামচে স্বায়ত্ত শাসন কমিশনার বিশ্বনাথ মজুমদারের) মাধ্যমে একটা ব্রেণ্ড ওয়েভ হল মোলালির মোড়ে এরকম একটি জমি কর্মচারী সমিতির মত অপ্রাপ্যে না দিয়ে যুব ফোরামকে দিলে হয়না? যেমন ভাবনা তেমনি কর্ম। কর্মচারী সমিতিতে প্রদত্ত জমিটি

মন্ত্রীর ইচ্ছানুসারে পূর্ব স্যাংসান বাতিল না করেই যুব কংগ্রেসকে দেওয়া হল। বলা বাহুল্য এটা আইনত অসিদ্ধ। প্রাক্তন প্রশাসক এস দত্ত মজুমদার বাইরের পার্টিকে আর জম দেওয়া হবে না বলে যে অর্ডার দিয়েছিলেন এই সব লীজ-তার পরিপন্থী এবং সেই কারণে প্রত্যাহারযোগ্য। (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)



উপর থেকে পর পর শায়িত : ভ্রমর মা লক প্রবীর রায়চৌধুরী
শ্যামল চক্রবর্তী মদন দাস প্রতীপ ঘোষ।

মুর্শিদাবাদ জেলায় চুরি ডাকাতি রাহাজানির ব্যাপক বৃদ্ধি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বহরমপুর শহরে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন থানায় গত কয়েকমাসে ডাকাতি, খুন, হুসাহসিক রাহাজানি ব্যাপক চুরি উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পুলিশ ব্যবস্থা প্রায় অচল। বিভিন্ন জুরে জনমনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। মানুষ চায় প্রতিকার।

মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট ব্রজেন চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি (২৭/৭) তাঁর অফিসে জেলার সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে কিছু তথ্য পেশ করেছেন এবং প্রায় আড়াই ঘণ্টার দীর্ঘ আলোচনায় অনেক বিষয় প্রকাশ পায়। পুলিশ সুপার স্বীকার করেন যে, জেলায় ডাকাতি, খুন, চুরি রাহাজানি বৃদ্ধি পেয়েছে। বহরমপুর শহরেও বেড়েছে।

জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন—প্রতিকারে পুলিশের দায়িত্ব তো প্রচণ্ড। পুলিশ কি কর্তব্যচ্যুত হয়েছে? অথবা দায়িত্ব পালনে অক্ষম?

এইরূপ কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে এস পি বলেন—পুরনো প্রচলিত আইনের বহুবিধ-নিগড়ে হাত পা পুলিশের বাঁধা। পুরনো আইনের যুগোপযোগী কিছু পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন।

পুলিশ সুপার বলেন, জেলায় সম্প্রতি দশটি ডাকাত দলকে পুলিশ ধরতে পেরেছে। তার একটি বিশ্লেষণে দেখা যায়, নতুন নতুন উঠতি যুবকরা এইসব ডাকাত দলের সংগে যুক্ত আছে। এর কারণ নানাবিধ হতে পারে। সামাজিক, আর্থিক এবং অন্যান্য। এস পি বলেন, সব বিষয় ব্যাখ্যা করতে তিনি অক্ষম। তবে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকার কারণ হিসাবে এস পি বলেন: নানাবিধ ঘটনার এবং পরস্পর আলোচনায় জোড়ের মতো খারাপ প্রতিক্রিয়া না হয় সেই জন্য সাংবাদিকরা বহু-জ্ঞান্য তথ্য জানলে তা প্রচার দ্বারা আতঙ্ক সৃষ্টিতে সহায়তা করছে পারেন।

অবশ্য চুরি, রাহাজানি এমন কি ডাকাতিরও বহু ঘটনা থানায় রেকর্ড হচ্ছে না। লোকসাধারণ থানা সন্দেহে বাস্তবত: বীতভ্রম। জানিয়ে কিছু প্রতিকার হয় না, হবে না এই মনোভাবটা এখন অনেকটা স্বাভাবিক রূপ গ্রহণ করেছে।

এস-পিও মতে চোর-ডাকাত-খুনের এখন পুলিশ-ভীতি কমে গেছে। তিনি তার কারণ হিসাবে বলছেন—(১) পুলিশের বক্তব্য রিপোর্ট আদালত প্রায় সবই অগ্রাহ্য করছেন; (২) জামিন খুবই সহজলভ্য হয়েছে এবং (৩) মামলা এত দীর্ঘদিন ঝুলে থাকে যে, অপরাধ-প্রবণ মন এই সুযোগের আশ্রয় নিচ্ছে।

পুলিশ অধিকর্তার বক্তব্যে প্রকাশ, মুর্শিদাবাদ জেলায় এখন দশ হাজারের বেশী কোজদারী মামলা ঝুলে আছে। আরও প্রকাশ, খুন ডাকাত দলের কাছে (১-এম-এম) কাতুজ পাওয়া গেছে, যা স্টেনগানে ব্যবহৃত হয়।

ডাকাতিগুলির চরিত্রে দেখা যায় যাদের বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে তারা অনেকেই ধনী তো নয়ই এমনকি মাঝারি অবস্থাপন্নও নয়। দেখা যাচ্ছে এখনকার ডাকাতিতে ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ইত্যাদি বাদবিচার নেই। কিছু পেলেই হল। এস-পিও ভাষায়—“হুতরি সোনা বা ছুখানা থালা পেলেও ভাবে, যা হয় হল”। কিন্তু রূপটা চুরি নয়, রূপটা ডাকাতি।

ডাকাতরা বন্দুক ব্যবহার করছে। বেশীক্ষেত্রেই বোমা বা পটকা ফাটাচ্ছে এবং পাথরকুচি ও ধুলো ছিটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে।

বহরমপুর, স্বতী, ডোমকল, লালবাগ, লালগোলা, হাতীনগর, সাগরদীঘি, নবগ্রাম, বেলডাঙ্গা, কান্দী, রাণীনগর ও ফরাকান্ন এই বৎসর এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে থানায় ডায়েরী করা হয়েছে এমন ডাকাতির সংখ্যা ত্রিশটি।

গত দুই মাসে একমাত্র বহরমপুর শহর শহরেই খুন, ডাকাতি, চুরি ও চুরির সংখ্যা আতঙ্কজনক ভাবেই বেড়ে গেছে। একটি ঘটনার ওকিয়ারা হয়নি। শহরে একজন তোকোরেরটার (সাথী) জীম জত দাস তার বাড়ীতে আক্রান্ত হলেন এবং পরদিন মারা গেলেন।

পত ১৫ই আগস্ট বহরমপুর শহরের বিশ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনারের বাড়ীতে বড় হরের চুরি হয়ে গেল, জোহার মোটা মোটা সিক অপসারণ করে করে চুরি। থানা-পুলিশ নির্বিকার।

হাওড়া জেলে হত্যা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছবি তোলা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন জেলে “গুগোলের” ঘটনায় নিহত বন্দীদের কোন ছবি তোলা হয়নি একমাত্র হাওড়া জেলের এই ছবি ছাড়া। এই ছবি কমিশনে একজিবিটি ছিল।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, প্রতীপ, প্রবীর ও তরুণ নামে তিনজন নকশালকে ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সী জেল থেকে হাওড়া জেলে ট্রান্সফার করা হয় যদিও হাওড়া কোর্টে এদের কোন মামলা ছিল না। এরা নাকি ১৯৭৩ সালের ১লা অক্টোবর আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে পালানোর ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল। এদের বিশেষ গ্রহণ রাখা হয় এবং এদের জন্য সতর্ক থাকেন জেলার, হেড ওয়ার্ডার গৌরাঙ্গ দত্ত ও কুঞ্জবিহারী এবং ওয়ার্ডার বাদুল, কামাখ্যা ও অত্যাচার। কিন্তু তবু এদের অত্যাচার বন্দীদের থেকে আলাদা করে সেলের মধ্যে রাখা হয় না এবং ডাঙাবেড়ী পরানো হয় না। এই “ভয়ঙ্কর” বন্দীদের কেন প্রেসিডেন্সী জেলের মত অধিক নিরাপদ জায়গা থেকে হাওড়া জেলে ট্রান্সফার করা হল তারও কোন সন্তুর্ন কর্তৃপক্ষ দিতে পারেন নি। তাদের কড়া প্রহরায় রাখা এবং খাদ্যবোয় প্রতি যেভাবে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে তাতে বিশ্বাস করা শক্ত যে পূর্বোক্ত তিনজন নকশাল তরুণ মদন, ভ্রমর ও তপনের সঙ্গে যড়যন্ত্র করে লঙ্কার গুড়ো, ইটপাটকেল ও বোমা সংগ্রহ করতে পারে।

জেল-কর্তৃপক্ষ কথিত জেল ভাঙ্গার ঘটনার শুরু সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে আর শেষ ৬টা ৩০ মিনিটে। ৬টা

৫ মিনিটে বন্দীদের দ্বিতীয়বার গণনা শেষ হবার পরই নাকি ইটপাটকেল জড়ো করা হয় এবং প্রস্রাবখানা থেকে লঙ্কার গুড়ো সংগ্রহ করা হয় বলে অভিযোগ এবং তারপর জেলের ভেতরে প্রহরার চার পাঁচজন ওয়ার্ডার ও বহুসংখ্যক বন্দীর নজর এড়িয়ে নাকি মদন দাস, প্রতীপ ঘোষ, ভ্রমর মানিক, শ্যামল চক্রবর্তী, প্রবীর রায়চৌধুরী ও তপন—এই ছয়জন বন্দী জেলগেটের দিকে দৌড়ে যায়।

এটা জেল-কর্তৃপক্ষের অভিযোগ। কিন্তু বন্দী মুক্তি পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক আইনজীবী সংঘ একে জেলভাঙ্গার ঘটনা বলে স্বীকার করেন না। তারা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এবং সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্যে অনেক গরমিল লক্ষ্য করেছে।

শর্মা সরকার কমিশন বলেছেন ছয়জন নিরস্ত্র বন্দী লঙ্কার গুড়ো আর কয়েকটি ছোট ইটের টুকরোর মত “অস্ত্র” নিয়ে প্রহরীদের বোকা বানিয়ে জেল থেকে পালানো চেষ্টা করত। ওয়ার্ডারদের অথবা জেলারের আঘাত লেগেছে খুব সামান্য এবং অজয় ও কামাখ্যার আঘাত বন্দীদের দ্বারা নিষ্কিপ্ত কোন বোমার নয়।

মৃতদেহের ময়না তদন্ত থেকে দেখা গেছে যে, তরুণ ও প্রতীপের আঘাত সাতটি ধরনের আর ভ্রমরের পাঁচটি ধরনের। এই আঘাত এসেছে চারদিক থেকে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে। এই যৌথ আঘাতের ফলেই মৃত্যু ঘটেছে। প্রবীর, তরুণ ও ভ্রমরের ওপর যথাক্রমে ২, ২৫ ও ৩০ এর বেশিবার আঘাত করা হয়েছে। কয়েকটি আঘাত করা হয়েছে বড় ও ভারী লাঠি দিয়ে। তপনের আঘাত চারধরনের যার সঙ্গে আছে আটটি বিভিন্ন জায়গায়

একাধিক আঘাত। মারের চোটে তার বাদিকের হৃদপিণ্ড বন্ধ হয়ে যায়।

প্রথম পৃষ্ঠার ছবিগুলো দেখলেই পাঠকরা বুঝতে পারবেন যে, কি নির্দয়ভাবে ছেলেগুলোকে পেটানো হয়েছে। কমিশন বলেছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের অলৌকিক উপায়ে তপন মৃত্যুর গহ্বর থেকে ক্লির এসেছে। সাক্ষী রামপ্রসাদ সিং এক বা দেড় ফুট দূর থেকে প্রবীরের বুকে গুলী করেছে এবং চার ফুট দূর থেকে মদনকে পেছন দিক থেকে গুলী করেছে। গুলী করার আগে কোন সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়নি। জেল কোড অমান্য করে, জেলারের আদেশ না নিয়ে গুলী ছোঁড়া হয়েছে। পলায়নপর বন্দীকে যেভাবে গুলী করা হয় সেভাবে না করে একেবারে সামনে থেকে গুলী করা হয়েছে। যদিও জেলখানার বাইরের কম্পাউন্ডে যাবার পথ ১৫০ ফুট দূরে। তেমনি মদন যদি বাইরে এসেও থাকে সেটা জেল থেকে পালানোর চেষ্টা প্রচণ্ড প্রহারে মৃত্যুর হাত এড়াবার জন্য।

শর্মা সরকার কমিশন বলেছেন, প্রবীর ও মদনকে যেভাবে এবং যে অবস্থায় গুলী করা হয়েছে তা জেলখানার বিধি, দণ্ডবিধি ও মানবিক বিধি সমস্তই ভঙ্গ করেছে। বন্দীদের পক্ষে পালানোর কোন সুযোগ ছিল না যেভাবে বহুসংখ্যক ওয়ার্ডার ঘটনাস্থলে প্রবেশ করতেন এবং বাইরের গেটের বাইরেও অপেক্ষায় ছিল। পরবর্তী সময়ে প্রহার করা হয়েছে বন্দীদের পলায়ন বন্ধ করার জন্য, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য। বলপ্রয়োগ ও গুলীচালনাকে কমিশন শুধু বাড়াবাড়িই বলেন নি, উপরন্তু যেআইনী ও অন্যায়ও বলেছেন।

জেল ভাঙ্গার ঘটনা ও আহত নিহতের সংখ্যা

(১৯৭০-৭৫)

তারিখ	জেলের নাম	মৃতের সংখ্যা		আহতের সংখ্যা		কতজন বন্দী পালিয়েছে
		বন্দী	কর্মচারী	বন্দী	কর্মচারী	
১৬/১২/৭০	মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল	১০	—	৮	৬	—
৩/১২/৭১	মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল	২	—	৩৭	১৫	—
৪/১২/৭১	প্রেসিডেন্সী জেল	—	—	—	—	৮
২১/১২/৭১	শিলিগুড়ি সেন্ট্রাল জেল	—	—	—	—	১৬
২৩/১২/৭১	বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল	১	—	৪	১৪	—
১৪/১/৭১	দমদম সেন্ট্রাল জেল	১৬	—	৫০	২৫	৪৫
১১/১/৭১	আলিপুর সেন্ট্রাল জেল	৬	—	২	৫	—
৫/১/৭১	আসানসোল সেন্ট্রাল জেল	১	—	২	—	—
১২/১/৭১	পুলিয়া ডিষ্ট্রিক্ট জেল	—	—	—	—	৭
২৬/১১/৭১	আলিপুর সেন্ট্রাল জেল	৮	—	২০২	৬৫	—
২৪/১/৭২	জলপাইগুড়ি ডিষ্ট্রিক্ট জেল	—	—	৪	—	—
২৮/১/৭২	বর্ধমান ডিষ্ট্রিক্ট জেল	২	—	—	—	২৬
১১/১১/৭৩	আলিপুর সেন্ট্রাল জেল	—	—	—	১	—
৬/১/৭৪	কুমিল্লা ডিষ্ট্রিক্ট জেল	১	—	—	১	—
৩/১/৭৫	হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট জেল	৫	—	১	৪	—
মোট		৬৮	—	৩১০	১০৬	১০২

বরানগর গণহত্যার সমর্থক প্রিয় দাসমুন্সীর বিচার চাই

শঙ্খশুভ্র বিশ্বাস

সারা দেশে যখন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আওয়াজ উঠেছে “ইন্দিরা গান্ধীর বিচার চাই”, “সঞ্জয় গান্ধীর শাস্তি চাই”, সারাদেশে যখন ঐ দুজনকে নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে, কাগজে কাগজে হৈ চৈ হচ্ছে, যখন মারুতি নিয়ে তদন্ত কমিশন বসছে, যখন সঞ্জয় গান্ধী কোথায়ও বাইরে গেলে যুবকরা সব হৈ হৈ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, তখন এই ডামাডোলের বাজারে একজন দাগী আসামী কিন্তু গল্পের সেই চোরের মতন জনতার ভিড়ে মিশে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। সবাই যখন ইন্দিরা-সঞ্জয়ের বিচার নিয়ে ব্যস্ত তখন সেই ফাঁকতালে আড়াল থেকে ঐ দাগী আসামীটি আবার নিজেকে বিপ্লবী সাজানোর চেষ্টা করছেন। তিনি হচ্ছেন শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী।

সঞ্জয় গান্ধী বঙ্গীলালের যদি বিচার হতে পারে, ইন্দিরা-দেবকাস্ত বঙ্গবাদের বিচার যদি দাবী করা হতে পারে, তাহলে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী বেকসুর খালাস পাবে কেন? গত সাল থেকে পঁচাত্তরের মাঝামাঝি পর্যন্ত রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে কোন সঞ্জয় গান্ধী উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু তখন এই পশ্চিমবাংলায় সারা রাজ্য দাপিয়ে বেড়িয়েছেন একা প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী। একাত্তর সালের আগস্ট মাসে রক্তাক্ত গণহত্যার মধ্য দিয়ে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর নেতৃত্বে যুব কংগ্রেসের অভ্যুদয় হল। কানীপুর-বরানগর গণহত্যার কথা মনে পড়ে। ১২ই আগস্ট সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয় এই নরমেধ যজ্ঞ। চলে দুদিন ধরে। পুলিশের সহায়তায় হাজারখানেক পেশাদার খুনী যন্ত্রপাতি নিয়ে নেমে পড়ে ঐ অঞ্চলে। হত্যা, লুণ্ঠ, আগুন, আর পৈশাচিক উল্লাস চলতে থাকে। সঠিক কত নকশাল যে খুন হয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। নকশালের গন্ধ থাকলেই তাকে খুন করা হতে থাকে। বাবলা বিশ্বাসকে পাওয়া গেল না তার বোনের হাত কেটে নেওয়া হল। আরেক নকশালক্ষণ পাওয়া গেল না তার বাবাকে বাড়ীর ভিতর থেকে লাথি মেরে কলে পাঠানো হল। হত্যার পর মুখে আলকাতরা মাখিয়ে লাইন দিয়ে নর্দমায় শুইয়ে দেওয়া হল। বহু মৃতদেহ ঠেলাগাড়ী করে গদায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। ঐ এক বীভৎস

ব্যাপার। এই ঘটনার পরই মোটা-মুটিভাবে “নকশাল যুগ” শেষ হয়ে শুরু হ’ল “যুব কংগ্রেসের যুগ।” আর এত বড় গণহত্যার পর এসম্পর্কে সিদ্ধার্থ রায়ের “দ্বিতীয় নেতাজী” প্রিয় দাসমুন্সী বললেন, এটা জনতার অভ্যুদয়। নেতাজী দেশের শত্রু বিদেশীদের হত্যা করেছিলেন আর প্রিয়দাসমুন্সী দেশের ছেলেদের হত্যা করলেন—এই বা পার্থক্য।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রিয়দাসমুন্সীর চাম্চা আরেক যুব নেতা কুমুদ ভট্টাচার্য যুগান্তরের সাংবাদিককে বরানগর গণহত্যার প্রসঙ্গে বলেন, “ওটা পীপল্‌স রেসিস্ট্যান্স। ওতে কেউ মারা গেলে কিছু করার নেই।” এতবড় একটা গণহত্যাকে যারা বলে ‘জনতার অভ্যুদয়’ এবং ‘পীপল্‌স রেসিস্ট্যান্স’ এবং হত্যাকারী গুণাবাহিনীর নিন্দা না করে তার গায়ে “জনতা” এবং “পীপল্‌স” এর ছাপলা গয়ে দেয় তারা এই গণহত্যার দায়িত্ব কোন মতেই এড়াতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের সরকার খুঁবেখুনি নিয়ে তদন্ত করছেন। সেখানে এই দুই যুব নেতার এই ভূমিকা এবং এই সব বিবৃতি ওঠা দরকার। একটা গণহত্যার স্বপক্ষে কথা বলার মতন বরং তা কংগ্রেসের আর কোন নেতা দেখান নি। তবুও নাকি প্রিয় দাসমুন্সী কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ।

সঞ্জয় গান্ধীদের বিরুদ্ধে তো প্রশাসনে হস্তক্ষেপের ব্যাপার নিয়ে খুব হৈ চৈ হচ্ছে কিন্তু এই প্রিয় দাসমুন্সীরা কি সরকারী ব্যাপারে কম হস্তক্ষেপ করেছে? প্রিয় দাসমুন্সীর এক কালের শত্রু লক্ষ্মী বহুর বাহান্তর সালের চব্বিশে ডিসেম্বর যুগান্তরে প্রকাশিত ‘প্রিয় দাসমুন্সীর বিরুদ্ধে আনা একটি অভিযোগের কথা বলছি। ঐদিন অর্থাৎ চব্বিশে ডিসেম্বর লক্ষ্মী বহুর আক্রান্ত হন এবং সে খবর দিয়ে তিনি যুগান্তরকে বলেন “স্থানীয় পুলিশ তাকে জানিয়েছে যে ওরা সব প্রিয়বাবু লোক, আমরা গ্রেফতার করতে পারবো না।”

লক্ষ্মী বহুর মতন প্রথম সারির কংগ্রেস নেতাদেরই যখন আক্রান্ত হলে এরকম হাল হস্ত, তখন সি পি এম এবং সাধারণ মানুষের সে সময় কি অবস্থা হয়েছিল তা সহজেই অস্বমেয়। প্রিয় দাসমুন্সীরা পুলিশ প্রশাসনের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল

পুলিশকে নিজস্ব রেখে আবার কোথাও কোথাও সঙ্গে নিয়ে এরা সারা রাজ্যে সন্ধান চালিয়ে গেছে। বাহান্তরে বাকুইপুরে এরা জ্যোতি বহুর মিটিং ভেঙেছে। নাগেরবাজারে ত্রিদিব চৌধুরীর মিটিং ভেঙেছে। ৭৫ এর ২রা এপ্রিল কলেজস্ট্রীটে জয়প্রকাশ নারায়ণের মিটিং ভেঙেছে। কলেজস্ট্রীটে জয়প্রকাশের মিটিং ভাঙার ব্যাপার নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের শ্রাম-হন্দর গুপ্ত এক তদন্তের দাবী করে বলেছেন যে, এক যুব নেতার নেতৃত্বে সে দিনের ঐ হাঙ্গামাটি পরিচালিত হয়। ঐ যুব নেতাটি আর কেউ নন, তিনি শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী। ঐ হাঙ্গামার আগে তিনি তার পার্টির ছেলেদের জয়প্রকাশের বিরুদ্ধে কেপিয়ে এক বক্তৃতা দিলেন ইউনিভারসিটি লনে। তারপর জয়প্রকাশ কলেজস্ট্রীটে এলেই শুরু হয়ে গেল দক্ষযজ্ঞ এবং এটা যে প্রিয় দাসমুন্সীর নেতৃত্বেই ঘটেছে তার বড় প্রমাণ হচ্ছে দক্ষযজ্ঞ শেষ হয়ে যাবার পর বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট যেখানে এসে মহাত্মা গান্ধী রোডে মিশেছে ঐ

সংযোগস্থলে স্মরণীয় মুখার্জী এক বক্তৃতা দিয়ে বললেন “এবার প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর নেতৃত্বে মিছিল হবে” অর্থাৎ প্রিয় দাসমুন্সীর নেতৃত্বে এতক্ষণ মিটিং বানচাল সফল হল এবং তার নেতৃত্বে বিজয় মিছিল হবে। জয়প্রকাশের উপর হামলার তদন্ত চাই এবং দোষীদের বিচার চাই। প্রিয় দাসমুন্সী হচ্ছেন কংগ্রেসের সব থেকে কুখ্যাত ব্যক্তি। গত লোকসভার নির্বাচনে মোট পঁচশ বাহান্তরটা কেন্দ্রে নির্বাচন হয়েছে। সারা ভারতে এই মোট পঁচশ বাহান্তরটা কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র একটা কেন্দ্রে একজন জনতা পার্টির প্রার্থী লাঠির ঘায়ে রক্তাক্ত হয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। আর সেই কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থীর নাম প্রিয় দাসমুন্সী। আক্রমণের ঘটনার পব প্রিয় দাসমুন্সী বললেন, “এটা এলাকার যুবকদের সঙ্গে পালিয়ে থাকা সি, পি, এম, সমাজ বিরোধীদের সংঘর্ষ।” আবার পরে বললেন, “ওটা নাকি কংগ্রেসের মধ্যে তার বিরোধী গ্রুপ করিয়েছে তাকে হারাবার জ্ঞাত।” এই পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা থেকেই বোঝা যায় ঐ আক্রমণের ব্যাপারে প্রিয় দাসমুন্সীরাই জড়িত। যারা আক্রমণকারী একমাত্র তারাই উন্টোপান্টা বিবৃতি দেয়।

সাম্প্রতিক বন্দী মুক্তির ব্যাপারে

একজনই। মাত্র কংগ্রেসী এর বিরোধিতা করতে এগিরে এসেছেন আর তিনি শ্রীপ্রিয় দাসমুন্সী। তার মতে এরকম চালাও মুক্তি দিলে নাকি ক্ষতি হবে। সারাদেশে যেখানে চাইছে বন্দীদের মুক্তি সেখানে প্রিয়দাস মুন্সীর মতন একজন কষ্টের প্রতিক্রিয়াশীলের পক্ষেই এই বন্দী-মুক্তির বিরোধিতা সম্ভব।

জরুরী অবস্থার সময় এদেশে সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশিপ চালু হয়। কিন্তু প্রিয়দাস মুন্সী একাত্তর সাল থেকেই বামপন্থী পত্রিকাকে হুমকী দিতে থাকেন।

রাজ্যসরকার নাকি বর্ধমান নিয়ে আলাদা তদন্ত কমিশন বসাবেন। এখানে একটা কথা বলি। একাত্তর সালে বিধান সভা নির্বাচনে সি, পি, এম চমকিটা সীট পাওয়ার পর প্রিয়দাস মুন্সী বললেন, “আমার এবারের ভাবনা বর্ধমান।” আর তারপরেই শুরু হয়ে গেল বর্ধমানে সি, পি, এম খতম অভিযান। প্রিয়দাস মুন্সীর বিবৃতি এবং পরবর্তী পর্যায়ে বর্ধমানে সি, পি, এম, খতম অভিযানকে আলাদা করে দেখা যায় না। এসব কিছুই তদন্ত হওয়া দরকার। তাহলে দেখা যাবে শুধু সঞ্জয়, বঙ্গীলাল নয় অনেক তথাকথিত প্রগতিশীল কংগ্রেসীও অনেক অপরাধে অপরাধী।

ডাগসম্রাট কালাঘানের কাহিনী

তপন বসু

না না আমি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কালাঘানের কথা বলছি না। এ হলো ভারতবর্ষের মার্কিনীকায়িত্বপ্রাপ্ত শিল্পের “ডাগ সম্রাট” উইলফ্রেড লেগোঁর্গ কালাঘান এবং রোচি কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। নিজের অপরাধকে আড়াল করার জন্য লোঁর্গ যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করে তা সত্যি সত্যিই দৃষ্টান্ত স্থাপন করার মত। প্রথমতঃ বেসামান্য হয়ে গাড়ী অ্যাক্সিডেন্ট বা অন্ত কোন ধরনের কুতূহলিত করে ধরা পড়ে গেলে পকেট থেকে একটা ফটা বাব করে কমফোর্টে বা ছোটখাট পুলিশ অফিসারকে ধাক্কা দিয়ে লোকটি জাল চিড়ে পালায়। কটোটি হলো পাণ্ডিত্যমণ্ডিত মৃত্যুশয্যা চাবশাশে নিঃশিষ্ট ভি আই পি গ্যালারিতে কালাঘানের গম্ভীরভাবে বসে থাকার দৃশ্য।

সিদ্ধার্থশব্বের প্রায় ৭০ হাজার টাকা দিয়ে বাধকর্ম নির্মাণের কাহিনী শুনে সারা দেশজুড়ে চাকল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু সেটাতো পুরো বখ-ক্রম নির্মাণ বা পুননির্মাণের জন্য।

আর কালাঘান বাধকর্মের একটা দৃষ্টান্ত সারাবার জন্য খরচা করেছে ১-হাজার টাকা।

ইনি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী না হলেও নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর ভাই বলে ঘোষণা করতে ভালবাসেন। শুধু তাই নয় সম্প্রতি তিনি একটি কনফারেন্স ডেকে নিজেকে আয়ারল্যান্ডের কনসাল জেনারেল বলে ঘোষণা করেছেন। এই সমস্ত ধপ্পা দিয়ে লোণটি ডাগ ইণ্ডাস্ট্রী কর্মসূচী জনগণের শোষণ খাচ্ছে।

রোচি কোম্পানীতে হঠাৎই উচ্চ-মুদ্রা নিয়ন্ত্রিত হয়ে মিসেস লাল নামী এক মহিলা আবির্ভূত হছেন। হাজার হাজার টাকা মহিলা পাওয়া ছাড়াও বাসস্থান ভাড়া, কুকুরের খরচা ভাড়া, এমনকি ভ্রমরহিলার গৃহকর্মের জন্য যে মহিলাটি মিস্ত্রীজিত হয়েছেন তিনিও ব্যবহারের জন্য গাড়ি পান।

যথার্থীতি চলতে থাকল কালাঘান ও মিসেস লালের নৈশ বিহার। আবার এই কালাঘানের ধর্মায়িত্বই এই মিসেস লাল কিছুকাল আগে

সংকটী সংস্থা এয়ার ইণ্ডিয়াতে এয়ার হোস্টেস পদে নিযুক্ত হয়েছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে কালাঘান সাহেব নিজের স্বার্থেই উক্ত মহিলাটিকে এই সরকারী সংস্থায় নিযুক্ত করার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। অর্থাৎ বিভিন্ন ভি আই পিদের মনোরঞ্জন করে মানা ধরণের স্বার্থ আদায় করা ভ্রমরহিলার কাজ। এদিকে বর্ধমাতীতি রোচি কোম্পানীর কর্মী হিসাবেও মহিলাটি কাহিনী সহ আর সমস্ত বকম সুযোগ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

ভারত সরকারের হাড়ী কর্মটি সিদ্ধান্ত নেবে এবং স্থপাতিশ করে বে বিভিন্ন ধর্মের ত্রাণ তুলে দিয়ে শুধু মাত্র ওষুধ নামে বাজারে ছাড়ার। যেমন, কোন মার্কিনীকায়িত্বপ্রাপ্ত কোম্পানী ‘টেট্রাস ইক্সোন’ এট ওষুধটির নামের আগে অস্ত্রি কণ টি যোগ করে অর্থাৎ ‘অস্ত্রি-টেট্রাস ইক্সোন’ এই নামে বাজারে বিক্রী শুরু করে দেয়। এতে ওষুধের দাম দ্বিগুণ বেড়ে যায়। কারণ হিসাবে হাতো ব্যাখ্যা দিল, নিদিষ্ট (পেবাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

‘দানিকেনতত্ত্বের আলোকে মহাভারতের স্বর্গ ও দেবতা’ প্রসঙ্গে দুচার কথা

বীরেন্দ্র মিত্র

উপরোক্ত শিরোনামে দর্পণে প্রকাশিত আমার ধারাবাহিক রচনাটি সম্পর্কে নানা মহলে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়ায় প্রসঙ্গত কয়েকটি কথা বলে রাখার তাগিদ দেখা দিয়েছে।

একদিকে যেমন প্রচুর উৎসাহী পাঠক আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ও কেউ কেউ প্রয়োজনীয় বই পত্র ও পত্র পত্রিকা দিয়ে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছেন, অন্যদিকে তেমনি কিছু সংশয়ী পাঠক সন্দেহের চোখে দেখছেন এই রচনাটিকে। অবশ্য শেষোক্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে মৌখিক আলাপে ও তাঁদের পত্রালাপে পাঠে এইটুকু বুঝেছি যে, তাঁরা মূলত বিজ্ঞান এই রচনাটির শিরোনামের সঙ্গে দানিকেনের নাম যুক্ত থাকায়। তাঁদের প্রথমই একটি কথা জানানো প্রয়োজন যে, দানিকেনের কোনো যুক্তিতর্ক-প্রতিপাদ্য সমর্থন করার জন্য আমি পরিশ্রম করছি না। আমার উদ্দেশ্য, মহাভারতীয় তথ্য প্রমাণের সাহায্যে মহাভারতের অর্থাৎ মহাভারত সমসাময়িক কালের ঘটনাবলীর পুনর্বিচার করা। প্রধানত যাকে বলে গদ্যাকালে গদ্যপুঞ্জ, বর্তমানে আমি তাই করছি। পাঠক মনোযোগ দিয়ে যদি রচনাটি পাঠ করেন তবে নিজেই সন্তুষ্টির পাবেন। মনে হয়, প্রকাশিত আটটি কিস্তির মধ্যেই আমি আমার প্রতিপাদ্যকে মোটামুটি জানিয়ে দিতে পেরেছি।

মুখিল হয়েছে তাঁদের নিয়ে, ধারা

কালান্বিতের কাহিনী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ড্রাগট। অ্যান্ডি ফাফাস। স্বভাবতই এতে আত্মসমীক্ষণ বাজার মাটি ট্রান্সনাল কোম্পানীগুলির দ্বারা দখলিভুক্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ দেশী ও ছোট ক্যাব-সারীরা হটে যায়। কিন্তু মজার কথা কালান্বিতের এর পরোয়া করে না। বসের ব্যাপ্তসামা ডাক্তারদের বিরাট বিরূতি অঙ্কের টাকা খাইয়ে তাদের দিয়ে লিখিত বিবৃতি তৈরী করার ক্ষে, হাতী কথিত্ব পরিবর্তনকে স্বাভাবিক করা বলে রোগীরা ভাল ওষুধের পরীক্ষা যোগানের অভাবে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এবং এইভাবে হাতী কথিত্বের স্থাপনিকের বুদ্ধিজীবী দেখিয়ে কালান্বিতের তাদের জালিয়াতি ব্যবসাকে দ্বিবি বজায় রেখেছে।

এ রচনা পাঠ না করেই, রচনাটির সঙ্গে দানিকেনের নাম যুক্ত থাকায়, দানিকেনের বিরুদ্ধে সহযোগী কয়েকটি পত্র পত্রিকায় উত্থাপিত অভিযোগের দ্বারা আমার রচনাবলীকেও অভিযুক্ত করেছেন। তাঁদের সবিনয় অহরোধ করি এই বলে যে কোনো সংস্কৃতি-সচেতন পাঠকই শিরোনাম পাঠের দ্বারা কোনো রচনার মূল্যায়ন করেন না, ‘বিপ্লবীমনা’ আমার অপার্থক-সমালোচক যেন দয়াকরে এই কথাটি মনে রেখে তাঁর মন্তব্য পাঠান। না হলে সেই মন্তব্যের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। চিঠিতে স্পষ্ট বক্তব্য থাকাও একান্ত প্রয়োজন।

যাই হোক, শিরোনামে ‘দানিকেন’ কেন, এ প্রশ্নের একটি ছোট জবাব এখানে রাখা দরকার, না হলে বিভ্রান্তি থেকেই যাবে। সব জবাবই ক্রমাগত আমার রচনার মাধ্যমে জানাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তা হবার নয়, কেননা কিছু বন্ধু পাঠের পরিশ্রম স্বীকার করতে নারাজ অথচ উত্তেজিত সমালোচক।

এটা অনেকেই হয়ত জানেন এবং দানিকেনে পাঠকরাও জানেন যে, পৃথিবীতে অস্ত্র গ্রহের মানুষ একদিন এসে থাকতে পারেন, এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তব্যের জনক দানিকেন নন, এ প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে বহুদিন যাবৎ চিন্তা অঙ্গসন্ধিসংসা ও আলোড়ন চলছে। কিন্তু বিজ্ঞানী মহল পরীক্ষিত সত্য ছাড়া অহুমানের ওপর কোনও সিদ্ধান্ত খাড়া করেন না। তাই গ্রহান্তরের মানুষের সম্ভাব্য মর্ত্যাবতরণ সম্পর্কে কিছু অহুমান নিয়ে আলোচনা ও সেই অহুমানের ভিত্তিতে গবেষণা কোন পথে অগ্রসর হতে পারে সে সম্পর্কে কয়েকটি সূত্র প্রকাশের পরই বিজ্ঞানী মহল সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে বিজ্ঞান রাজ্যের টপ সিক্রেট করে ফেলেছেন। এ বিষয়ে তাঁরা কি ভাবে অগ্রসর হচ্ছেন সাধারণের তা জানার উপায় নেই। তাই বিজ্ঞানীদের বক্তব্য সাধারণের প্রচার লাভের স্বযোগ হয় নি।

এই অবস্থায় দানিকেন প্রসঙ্গটিকে লুকে নিজেছেন ও সোচ্চারিত পদার্থ-বিদ ম্যাটের্স্ট আগেরেটের সূত্র ধরে অগ্রসর হয়ে পৃথিবীর একটা হৈ চৈ বলে দিয়েছেন। দানিকেন বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি উদ্ধার করে তাঁর বক্তব্যকে উদ্ভৃতিভাবে শাখা

প্রশাখায় পল্লবিত করে চলেছেন সেই সময় যখন বিজ্ঞানী মহল উত্থাপিত প্রশ্নটি সম্পর্কে একেবারেই নীরব। এদিকে সাধারণের ধারণা গ্রহান্তরের মানুষ সম্পর্কে তত্ত্বটি দানিকেনের, কেননা বিষয়টি বিজ্ঞানী মহল উত্থাপন করে পরীক্ষা স্তরে রাখলেও দানিকেনই তার ছনিয়াছোড়া প্রচারে নেমে পড়েছেন ও নিজেই ম্যাটের্স্ট আগেরেট নির্দেশিত সূত্র ধরে, দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন। বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি প্রচুর উল্লেখ আছে দানিকেন গ্রন্থে। সেই বৈজ্ঞানিক সূত্রাদি ধরে দানিকেন

নিবেদন

“মহাভারতের স্বর্গ ও দেবতা” শিরোনামের রচনাটি পুনরায় ধারাবাহিক ভাবে নিয়মিত আগামী সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হবে।

তাঁর বক্তব্যকে পল্লবিত করে চলেছেন এবং নিজেই স্বীকার করেছেন, এই অতিপ্রিয় তত্ত্বটি সম্পর্কে আলোচনার বসলে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তাঁর এই উত্তেজনাই সম্ভবত তাঁকে মাঝে মাঝে চমকপ্রদ বক্তব্যের দিকে টেনে নিয়েছে। ফলত কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর বক্তব্য স্ববিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছে যা জয় দিচ্ছে বিভ্রান্তির। উদাহরণ, হোমো স্যাপিয়েন্স সম্পর্কিত দানিকেনের বক্তব্য।

অনেকের ধারণা, দানিকেন ভার-উইনের বিবর্তনবাদকে অস্বীকার বা আক্রমণ করছেন তাঁর বুদ্ধিমান মানব সৃষ্টি তত্ত্বের দ্বারা। আমি কিন্তু তেমন সংশয়ের কারণ দেখি না। যদি ধরেও নেওয়া যায়, দানিকেনের অভিপ্রায় বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করতে উদ্ভূত, তাহলেও বলতে পারি তেমন ক্ষেত্রে দানিকেনের নির্ভর্য বক্তব্যই তাঁর সে চিন্তাকে বাতিল করে দেয়। ইজেকিয়েলের মহাকাশযান দর্শনের সম্ভাব্যতার ওপরই যদি মূলতঃ দানিকেন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠাভিলাষী হয়ে থাকে তবে তা বলাই যায়, অস্ত্র গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণী যখন এই গোলকে নেবেছেন তখনই পৃথিবীতে বুদ্ধিমান বিচক্ষণ মানুষ বর্তমান। সেই মানুষের লিখিত প্রতিবেদনই গ্রহান্তরের প্রাণী আগমনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে। যদি

ধরা হয় তাঁদের আগমন মহাপ্রাবনেরও পূর্ববর্তী সময়ে, তাহলেও প্রমাণিত হয় না সে সময় পৃথিবী কেবলমাত্র গুহাবাসী আরণ্যক মানুষের বসতি স্থল ছিল। মহাপ্রাবনের সমকালে যে প্রাচীনগণ ছিলেন, পুরাণ কথার মাধ্যমে তাঁদের যতটুকু পরিচয় আমরা পাই, সেগুলিই যথেষ্ট প্রমাণ যে অস্ত্র গ্রহের মানুষ একটি তৈরী মানব সমাজের মধ্যে এসে অবতরণ করেন। তাঁদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হ’ল আবার মৈত্রীবন্ধনেও আবদ্ধ হন। এটাই যদি প্রাগৈতিহাসিক ঘটনা হ’লে থাকে, তাহলে বিবর্তনবাদের গায়ে আঁচড় ফেলা তো দানিকেনের সাধ্য কর্ম নয়। স্মরণ্য আমাদের এতবিস্ময়ে কোনো উদ্বেগ ও উত্তেজনা নেই।

আমি যতদূর বুঝি, দানিকেন হয়ত বলতে চাইছেন, অস্ত্র গ্রহের আগন্তুকরা এই গোলকে নেমে পার্থিব নরনারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেন ও সম্ভান সন্ততি রেখে যান, যেমন রেখে গেছেন অনেক অব্যাহাত কীর্তি, যা ম্যাটের্স্ট আগেরেটকে অস্ত্র গ্রহের বুদ্ধিমান জীবের সম্ভাব্য মর্ত্যাবতরণ সম্পর্কে ভাবিত করেছে। এবং ধারা এসেছিলেন ও দীর্ঘকাল এই গোলকের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন তাঁদের পক্ষে যৌন ব্যাপারটি পরিহার করে দীর্ঘকাল বসবাস নিশ্চয় সম্ভব ছিল না। তাছাড়া প্রাচীন পুথিতেও দেবমানব যৌন মিলনের কথা আছে, আছে মহাভারতেও। তবে বিষয়টির দানিকেনী ব্যাখ্যা কিছুটা বিভ্রান্তির অবস্থায় সৃষ্টি করেছে। ধারা মনোযোগী পাঠক তাঁরা অবশ্য বুঝবেন, বিবর্তনবাদ এ পর্যন্ত প্রকাশিত দানিকেন বক্তব্যের দ্বারা কোনো মতেই আক্রান্ত হতে পারে না, কারণ দানিকেন তাঁর বক্তব্যের চারপাশে তেমন-কোনও দুর্গ বা পরিধা নির্মাণ বা খনন করতে পারেন নি। এই সব প্রশ্ন বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হওয়ার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু আমাদের ধৈর্য কম। আমার কিস্তিবন্দী লেখায় একে একে সব প্রশ্নই উত্থাপন করার ইচ্ছে আছে, যদি সুযোগ পাওয়া যায়। আমার নিজের বিভ্রান্তি অধ্যয়ন ও ক্ষমতার দীক্ষা সম্পর্কেও আমি যথেষ্ট সচেতন। আমি তাই নতুন ভব প্রচারে নামি নি।

যে পাঠক ‘বীরেন্দ্র দর্শনের’ সন্ধান পেয়েছেন, তিনি আমার রচনা বোঝেন নি। আগেরেট নির্দেশিত পথে অস্ত্র গ্রহের মানুষকে পুরাণ-পুথির দেবতাদের সঙ্গে মিলিয়ে পড়বার যে উদ্ভোগ দানিকেন শুরু করেছেন, আমি শুধু সেইটুকু গ্রহণ করে আমাদের পুরা ইতিবৃত্ত মহাভারত

মহন শুরু করেছি। মহাভারত আদিত আট থেকে দশ হাজার শ্লোকের একটি ইতিবৃত্ত মাত্র ছিল। কালে কালে ভাববাদী দার্শনিকরা অলৌকিক ধর্মীয় জ্ঞানের ও ভক্তিময় দেবোৎসাহিত অল্পশাসনের বোঝায় সেই মহাভারতকে পল্লবিত করে লক্ষ শ্লোকে শুল্কানী করে তুলেছেন। তার মধ্যে হারিয়ে গেছে অনেক বাস্তব সত্য। বস্তবাদী ভাবভাবনা অধর্মীয় অনাচার হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। চার্বাকের স্থান হয়েছে দুর্ধোখনের বন্ধু হিসাবে কেননা চার্বাক বস্তবাদী দার্শনিক ছিলেন। যুগ যুগ এই ভাবে সত্য মিথ্যা লক্ষ শ্লোকের হিমালয়ে চাপা পড়ে আছে। আমার সামান্য সামর্থ্যে সেই হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের সন্ধান করতে নেমেছি। তাই আমার রচনা পাঠ না করেই সে রচনাকে কোনো ও ব্যক্তি যদি ‘ভাববাদী দর্শন’ হিসাবে ভাবতে শুরু করেন শিরোনামে দেবতা, স্বর্গ, মহাভারত এবং হয়ত দানিকেনের উল্লেখ দেখে, তবে বলব, ভাববাদী ও বস্তবাদী দর্শন নিয়ে ধারা চিন্তা করেন, তাঁরা ‘ভাবের’ হাওয়ায় ভেসে যাননা, সব কিছু চুলচেরা বিচার করেন। তাঁরা কোনো বক্তব্যকে গলা টিপে হত্যা করেন না। সে বক্তব্য প্রগতি-বিরোধী হলে তাঁরা খণ্ডন করেন। তার জন্য পরিশ্রম দরকার।

গ্রহান্তরের মানুষ সম্পর্কে বিজ্ঞানী মহল প্রশ্ন তুলেছেন, গবেষণার মোটামুটি পছাও নির্দেশ করেছেন, কিন্তু এটিকে একটি তত্ত্ব হিসেবে দাবি ওঠেনি। দাবি করেছেন দানিকেন। তিনি পথের সন্ধানটুকু মেনে নিজে দ্রুত হাঁটা শুরু করে দিলেম। কেউ তাঁকে পথের সন্ধান দিল, একথা জানাবার দায়িত্ব তাঁর। সত্যতা তাঁর। এ বিষয়ে কার কপিরাইট তাঁ-ও বিচার করবোম সংশ্লিষ্ট গবেষক মহল। কিন্তু বিষয়টি আজ দানিকেন মার্ক। তাই শিরোনামে তাঁর উল্লেখ সাধারণের পক্ষে আলোচিত বিষয় সম্পর্কে সহজ ধারণা সৃষ্টির প্রয়োজ্যে। আমি কপিরাইটের বিচারক নই। তবে আমার আলোচনায় আমার জ্ঞান কোনো বিষয়ই অহুলেখিত থাকবে না। সব কথাই এসে পড়বে উপযুক্ত সময়ে। লেটুক সময় নিশ্চয় পাঠকের কাছে দাবি করা যত্ন।

পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত শূর সমীপেষু

আপনি প্রাক্তন কাউন্সিলার ও মেয়র হিসাবে কলকাতা পৌরসভার সব ধরনের ইতিহাসে। এর রক্তে রক্তে যে চুনীতি ও অপদার্থতা বাসা বেঁধে আছে তাও আপনার অজানা নয়। আমরা জানি শক্ত হাতে আপনি এই প্রতিষ্ঠানকে কর্মমুগ্ধ করে নাগরিক করদাতাদের সেবা করবার উপযুক্ত করে একে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। আপনার এই মহান উদ্দেশ্যের সাহায্যার্থে কয়েকজন ব্যক্তি, যারা গত পাঁচ বছর ধরে (কেউ বা তারও আগে থেকে) এই সংস্থাটির মেয়দমজ্জা গুণে একে রক্তশূন্য করে ফেলেছে, তাদের কীর্তিকলাপের দিকে আপনার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এদের অনেককেই আপনি হাড়ে হাড়ে চেনেন। এই আগাছাগুলিকে যদি এই লালবাড়ি থেকে 'উপড়ে না ফেলা যায় তবে এরা লালবাড়ি জালিয়ে ছাড়বে।

প্রথমত: আপনি অত সংগত ভাবেই সকল নাটকের গুরু ও চ্যাংড়া মন্ত্রী হতে মুখার্জীর ব্যবসায়ী দুর্ভিক্ষের প্রধান মোৎসাহী 'হাতের পাঁচ' নির্মাল্য মুখার্জীকে হটিয়েছেন। এরই দয়ায় অফিসারদের নাটকে অভিনয় করে কর্পোরেশনের একজন সাধারণ স্কুলের শিক্ষিকা একেবারে সহকারী পাসেঁনেল অফিসারের পদে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু এছাড়া নির্মাল্য মুখার্জী আরো যেসব কীর্তি করে গেছেন, তার তদন্ত যেন বাদ না যায় এবং উনি এ অফিস থেকে চলে গিয়ে যেন পার না পেয়ে যান। যে দশ হাজার ছেলে ১০ টাকা করে জমা দিয়ে পরীক্ষা দিলো তাদের খাতা লোপাট হয়ে গেল কার হাতের কৌশলে? কেন তারা কেউ চাকরী পেল না? স্বতন্ত্র মধু শান্তি ও এই নির্মাল্য মুখার্জীর লোক-রাই উপযুক্ত উপচৌকন দিয়ে কেন চাকরী পেল কোনো পরীক্ষা না দিয়ে? এইরকম আরো প্রায় ৫০০ অভিযোগ রুলছে এই নির্মাল্যের বিরুদ্ধে। দেখবেন যেন তিনি পার পেয়ে না যান।

এবং নির্মাল্য এইসব নানা দুর্নীতির প্রধান সহযোগী তেজুটি কমিশনার অনিল রায় ও টালীগঞ্জ পাইলট স্কুলের ডিরেক্টর চ্যাটার্জীর কেস-গুলি জেন খতিয়ে দেখা হয়। স্বতন্ত্র দালালীতেও এরা কিছু কম ব্যস। ঐ দশহাজার ছেলের খাতা সরানোর ব্যাপার এদের হাত কিছু কম কলঙ্কিত নয়। এদের দিকে একটু নজর দেবেন।

অপরপর ধর্মঘট ভাঙার ক্ষেত্রে

শান্তি সেনের কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই। মেট্রোয় ঘুষ দিয়ে ওয়ার্কাস ইউনিয়নের পান্টা দালাল ইউনিয়নের সংগঠক হিসাবে এর পরিচয় আপনার অজানা নয়। নরেশ মুখার্জীর আমল থেকে এর এক্যবিরোধী ব্র্যাক শীপ স্বরূপ কারো জানতে বাকী নেই। এই রেন্ড-আপ-টু-ম্যাট্রিক 'ট্রেডইউনিয়ন' নেতাকটিকে আর কোথাও প্রোভাইড করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত স্বধীর রায়-চৌধুরী-জগন্নাথ কোলে কোম্পানী একে লাইটিং ইন্সপেক্টরের চাকরী দিয়ে যান। এই ২৫০ টাকার পদে থেকেই ইনি ইটালি মার্কেটে ছুখানি দোকান দেন এবং ১৫০০ লোককে নিমন্ত্রণ খাইয়ে প্রায় ১ লাখ টাকা খবচ করে মেয়ের বিয়ে দেন।

এবারের নবকংগ্রেসী যুগে শান্তি সেনকে প্রথমে শত ঘোষের চামচে হিসেবে দেখা গেল ঐবোষের পৌর-মন্ত্রীর আমলে, পরে স্বতন্ত্র হাতে পৌরসভা আসার পর কিকরে দু'জনের 'শক্ততা' মিটে গেল ও শান্তি সেন মুখ্যজ্যের সব দুর্ভিক্ষের সাথী হয়ে উঠলেন এ রহস্য একমাত্র শিরদাঁড়াহীন কংগ্রেসীরাই বুঝতে পারে। বাই-হোক স্বতন্ত্র মুখ্যজ্যকে শান্তি সেন তার কাজে এমনই সঙ্কট করলেন যে প্রথমে কনজারভেটর ডেপুটি ডাইরেক্টর ও পরে স্পেশাল ডেপুটি কমিশনার করে দিলেন তাকে স্বতন্ত্র। মন্ত্রী মশাই, একটু তদন্ত করে দেখবেন লোককে চাকরী দিয়ে, লরী কেনাকাটা ও ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের টাকার 'সহায়তার' করে শ্রীসেনের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আত্ম কত? ইনি আমেরিকান এম্বাসীর খুব 'বিশ্বস্ত' সেবক—মাই ওয়াল্ড ব্যাঙ্কে দিয়ে এর যোগ্যতার সার্টিফিকেট দেওয়া নে হয়েছে। শ্রীশান্তি সেন নাকি এখন 'জনতার' যোগ দিয়েছেন। পশ্চিম-বঙ্গে জমতীদলটি কী একটি ডাউবিনে পরণত হয়েছে যে যেখানকার যত অব্যবহার্য মাল এখানে ঢেলে দেওয়া যায়? আশা করি তদন্তে ফাস হবে।

এরপর মধু চ্যাটার্জীর কথা আসা যাক। ছু ডি ফুলিয়ে কুংসিত অদভুত করে ও ততোধিক মোংরা বিস্তি করে যিনি অফিসারদের সঙ্গে সর্বদা কথা বলতেন স্বতন্ত্র-খুটির জোরে এবার সেই মেড়ার কেলটি ভাল করে খোঁজ করা উচিত। ইনিও ট্রেডইউনিয়ন নেতা সেজে ঘুরছেন। কিন্তু সত্যিকথা বলতে কী, একে সাধারণ কর্মীরা ভয় করতো, কেননা এর প্রধান কাজ ছিল কমিশনারের

হাটায়ের তালিকায় লোকের নাম তুলে দেওয়া। হায়, ট্রেড ইউনিয়নের কাজই বটে। স্বতন্ত্র অনেক সেবা পেয়ে শেষে একে চাকরী-দেবার কমিটিতে স্থান দিয়েছিলেন। ফলে অল্প কয়েকদিনে এর বাকি বালেন্স-টিও ফেঁপে ঢোল হয়ে গেছে। ইনি ছিলেন বেলিক, স্বতন্ত্র সহকারী ইন্সপেক্টর করে দিয়ে যান। কিন্তু কোন স্বতন্ত্র ল্যান্ডাউন মার্কেটের কোয়ার্টারটি এর দখলে? কেন ৪টি টেলিফোন কর্পোরেশনের টাকায় এর 'ইউনিয়নে'?

আর এর চালা শংকর ভট্টাচার্য-কেও তো আপনি চিনতেন। কালেকশান বিভাগের বেলিক হিসাবে

শোধানবাদের ঘর ভাঙছে

কালিদাস কুণ্ডু

ষ্ট্যানিনোভের সোভিয়েত নেতৃত্ব বিংশতি পাটি কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই শোধানবাদী টিটোর দিকে সম্প্রীতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মহান নেতা ষ্ট্যালিনের নিদায় পঞ্চম ক্রশেভচকসেদিন দুনিয়ার কমিউনিষ্ট আন্দোলনে যে সর্বনাশ বিভেদের বীজ বুনছিল আজ তা বিষয়ক্ষে পরিণত হয়েছে। শোধানবাদী ভোগোলিন্স্কির লাষ্ট টেষ্টামেন্ট পশ্চিম ইউরোপের কমিউনিষ্ট পাটিগুলির জপমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্পেন, ফ্রান্স ও ইটালীর কমিউনিষ্ট পাটির নেতৃত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞোহের পতাকা উড়িয়েছে অতিকায় সোভিয়েত নেতৃত্বের বরুদে। "স্বাধীন সড়কের" প্রবক্তা থোরোজের কঠোর আজ "স্বাধীন, ইউরোপের" রণধ্বনিকে ডেকে এনেছে। গলিসেটিজম বা বহুকেত্রিকতা দিকে দিকে আজ পর্ষিত আশ্রয় জানাচ্ছে ব্রেকনেভ নেতৃত্বকে।

ইতিহাসের এটাই অমোঘ বধাম। ক্যাসীষাদের বিরুদ্ধে একদিন বরাগড়ে জুসেফিস হুর্জয়, দশজ্ঞ প্রিরোধ আজ তারা সমাজতান্ত্রীদের সঙ্গে ও ক্রিস্টিয়ান ডেমোক্রেটিকের সঙ্গে আতাক করে থোরাব দেখছে শান্তিপূর্ণ। বঙ্গবের। এই থোরাবে ইন্দন জুগিয়েছিল বিশ্বাসঘাতক সোভিয়েত নেতৃত্ব। "পুঁজুবাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার" বক্তা পচা তথ্য ভারাই হাউর করেছিল এবং তার পরিপায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন।

দুনিয়ার কমিউনিষ্টরা সর্গর্বে

কাজ করতে গিয়ে ইনি যখন কয়েক হাজার টাকা আয়সাং করেন তখন আপনি একে সাসপেন্ড করেছিলেন। আর আজ শুনে আতকে উঠবেন যে এহেন 'কীর্তিমান' ঐ মধু চ্যাটার্জীর সমর্থনে এখন একজন এ্যাসেসিং ইন্সপেক্টর, তাও বিভাগীয় বহু সিনিয়রকে টপকে। খোঁজ নেবেন কি করে এর ঐরকম ভয়ানক অপরাধ মাপ হোলো ও কেমন করে ঐরকম অপরাধ করেও এতবড় প্রোমোশনের পুরস্কার? চোরের মার গলা বড়। তাই স্বতন্ত্র ঘরে যখন ক্লার্ক ইউনিয়নের সেক্রেটারীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারা হোলো এবং তার প্রতিবাদে পরের দিন অফিসে ধর্মঘট ধালন করা হোলো তখন এই বীর-পুঙ্খ শাসিয়েছিলেন "যে অফিসে না আসবে তাকে মাতৃগর্ভে চালান করে

দেওয়া হবে" বলে।

এইরকম আরো কয়েকজন কংগ্রেসী মস্তানের নাম আপনার কাছে তদন্তর জ্ঞাত রাখি। একটু খোঁজ নেবেন যে প্রতিমাসে যুঠোঁয়ুঠো টাকা মাইনে হিসাবে নিয়ে গেলেও এদের কোনো চোরার আছে কি? কোনোদিন অফিসের কাজে কাগজে কলম হোঁয়ান কি? শংকর ভৌমিক, ভবানী রায় (ঠাণ্ডা, এর নামে কটি খুনের মামলা রুলছে?) জনৈক মুখার্জী, শোভনদেব চ্যাটার্জী, কালীনাথ দে (কালীঘাটের কুখ্যাত 'টুপী-কাশী') বা ললিত ভড়—এরা কোনো কাজ না করে, বহাল তবিয়তে সকলের উপর মাতব্বরী করে ঘুরে বেড়ান কি করে?

ইতি
জনৈক পৌরকর্মী

আ ধপত্য ভাগ করে নেওয়ার নীতি বা দুর্ভিসন্ধি প্রত্যাহত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংশোধনবাদ আজ স্বাধীন সলিলে। যুদ্ধবিরুদ্ধ ইউরোপের শান্তিকামী, মাহুঘের যুদ্ধ বিরোধী মনোভাবের স্বযোগ গ্রহণ করে শোধানবাদী সোভিয়েত চক্র চেয়েছিল আপন প্রভুত্ব বিস্তারের "শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা।" এবার অশান্তি দেখা দিয়েছে। এখন তার অবস্থা দাঁড়িয়েছে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লের মতো।

বহুভাবাবিদ হরিনাথ দে'র জন্ম শতবার্ষিকী

হরিনাথ দে রোডের অধিবাসী-বুনের উত্তোগে আগামী ১২ই আগষ্ট বহুভাবাবিদ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন পণ্ডিত হরিনাথ দে'র জন্মশত-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হতে চলেছে। এই উদ্দেশ্যে "হরিনাথ দে জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি" নামে একটি কমিটিও গঠিত হয়েছে। বহুগুণ ও কৃতিত্বের অধিকারী প্রথম ভারতীয় আই-ই-এস, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর প্রথম ভারতীয় লাইব্রেরিয়ান হরিনাথ দে মাত্র চৌত্রিশ বছর আয়ুস্কালা ইউরোপের কুড়িটি এবং ভারতবর্ষের চৌদ্দটি ভাষার গুণ্ডিত ছিলেন। সংক্ষিপ্তাকারে তার এই বিশ্বকর জীবনী প্রকাশ, হরিনাথ দে রোডের ওপর তার একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপন এবং চৌত্রিশটি কক্ষবিশিষ্ট বহুতল এক ভাষা শিক্ষায়তন নির্মাণের প্রকল্পও প্রস্তাবে নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের ও রাজ্যের পঞ্চম জননেতাদের এই উত্তোগে বধ্যাঘাগ্য কৃমিকা নেত্র আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

গণনাট্য সংঘ ও একটি প্রাসঙ্গিক বিতর্ক

সধন গুহ

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অতীত দিনের অন্যতম সংগঠক শিল্পী হোমাজ বিশ্বাস তাঁর সাম্প্রতিক কয়েকটি রচনায় বর্তমান গণনাট্য সংঘকে কঠোর ভাবে সমালোচনা করেছেন। শুধু গণনাট্য সংঘ নয় সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধেও তিনি বিবোধকার করেছেন এবং ক্রোধান্বিত হয়ে এমন অনেক মন্তব্য করেছেন যা তাঁর মত প্রবীণ ও অভিজ্ঞ শিল্পীর পক্ষে শোভন ও শালীন বলে বিবেচিত হবেনা। গণনাট্য সংঘের বর্তমান নেতৃত্বের সঙ্গে আমারও বহু ক্ষেত্রে মতান্তর আছে কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই অহেতুক কুংসা প্রচারের পর্দায়ে পর্যবসিত হতে পারে না। হোমাজবাবুর ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে। তিনি একটা ইনফিরমিটি কমপ্লেক্স অর্থাৎ হীনমুগ্ধতার রোগে ভুগে ভুগে ভাবতে শুরু করেছেন যে, সবাই তাঁকে পরিহার করে চলছে, সবাই তাঁকে অবহেলা করছে এবং এরই ফলশ্রুতি তাঁর স্বভাবতঃ উন্নত চীৎকার। তিনি নিজেকে জানেন দীর্ঘকাল বিরাট মাসিক আয়ের কোলিজে তিনি নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন গণ সংস্কৃতি আন্দোলনের ময়দান থেকে। বর্তমানে সেই আয়ের পথ তাঁর রুদ্ধ। ফলে, আবার নিজেকে সামনের সারিতে টেনে আনার জন্য অনেক বড় বড় কথা তিনি বলে ফেলেছেন। বিশ্বাস মহাশয়ের আকোশ এত তীব্র যে তিনি বর্তমান গণনাট্য নেতৃত্বকে সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গুচর বলতে পর্যন্ত কল্পনাকরেন নি। 'প্রস্তুতিপর্বের' এপ্রিল ৭৭ সংখ্যায় তিনি 'গণনাট্য সংঘ বনাম গণনাট্য আন্দোলন' শীর্ষক রচনার এক জায়গায় লিখেছেন "দুই অতি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে যেটি অধিকতর শক্তিশালী ও দুরন্ধর লেনিনের পতাকাধারী সেই সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে চিহ্নিত করবো না—আজকের আন্তর্জাতিক

পরিস্থিতিতে এটা আর সম্ভব নয়। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা বলবো অথচ 'স্টালিনের লৌহকপাট' মুক্ত করে ক্রুশান্ত সোভিয়েট জীবনে পশ্চিমী অপসংস্কৃতির যে অবাধ ও ব্যাপক সংক্রমণ ঘটয়েছে তার উল্লেখ পর্যন্ত করবোনা, এটা আর চলে না। সেই বিচারে গণনাট্য নেতৃত্ব আজ সচেতন অথবা অচেতনভাবে সাম্রাজ্যবাদের সপক্ষে দাঁড়িয়ে আছেন। (পৃ ৫)

হোমাজবাবুকে আমি অগ্রজের মতই শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁর এই চপল এবং দায়িত্বহীন মন্তব্যে আমি শুধু বেদনাহত নই, ক্ষুব্ধও। তিনি খুব ভালভাবেই জানেন যে, বর্তমান গণনাট্য নেতৃত্বের সঙ্গে আমারও মতবিরোধ আছে কিন্তু সে মতবিরোধ সহযোগিতার সঙ্গে সহযোগিতার।

আমার এই মতবিরোধ আমি বহুবার লিখেও প্রকাশ করেছি। কিন্তু হোমাজবাবুর মত শক্তপক্ষের স্বচতুর দালাল সেজে কখনও গণনাট্য সংঘকে প্রতিক্রিয়ার দালাল বলার স্পর্ধা প্রকাশ করিনি কারণ যে সংঘের কাছে আমার ঋণ মাতৃ কিংবা পিতৃঋণের চেয়ে কোন অংশে লঘু নয় তার গৌরবময় ঐতিহ্যকে স্বকীয় স্বার্থসিক্তির জন্য এক নিমেষে ধুলায় লুটিয়ে দেবার মত বিকৃত কিংবা বিকৃত মনের অধিকারী আমি নই। অথচ হোমাজবাবু প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কাছে নতজাহু হয়ে গণনাট্য সংঘ এবং সি পি আই (এম) এর বিরুদ্ধে অহেতুক কুংসা রটনায় এতটুকু কুণ্ঠিত নন। সোভিয়েতকে 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী' হিসেবে চিহ্নিত না করার ফলে বর্তমান গণনাট্য নেতৃত্ব যদি সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ অঙ্গুচর হয় তবে এই 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী' রাষ্ট্রের ভারতীয় দূতাবাস পরিচালিত একটি কাগজে বছরের পর বছর চার অঙ্কের মাসিক বরাদ্দ নিয়ে তাদের বক্তব্য ও তত্ত্ব প্রচার করে হোমাজবাবু কি সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ অঙ্গুচরের দায়িত্ব বহন করেননি?

বয়সে প্রবীণ হলেও বিশ্বাস মহাশয়ের রাজনৈতিক তত্ত্বগত অজ্ঞতা এতই প্রকট যে সাম্রাজ্যবাদ এবং সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের মৌল পার্থক্যটুকুও তাঁর বোধগম্য নয়। সি পি আই (এম) কোন দিনই দলগতভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার স্টালিনোস্তর যুগের রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীকে অন্ধ সমর্থন জ্ঞাপন করেনি অথবা চৈনিক পার্টির ঢালাও নিন্দা করেনি যেটা সি পি আই করেছে। বিশ্ব

কমিউনিস্ট আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ সঙ্কটে ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের দায়িত্বশীল কমিউনিস্ট পার্টিকে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত বিরোধে রাতারাতি মতামত দেওয়ার দাবী জ্ঞাপন করা নামাস্তরে বাতুলতা মাত্র। সি পি আই (এম) সোভিয়েত কার্যকলাপের সমালোচনা প্রয়োজনমত নিশ্চয়ই করেছে এবং প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোরভাবে করবে। চৈনিক পার্টির সাম্প্রতিক বিপ্লবকালীন অনেক আতিশয্যের সমালোচনা নিশ্চয়ই হয়েছে এবং তা যে ভুল নয় বর্তমানে 'গ্যাং অব কোর' তার জলন্ত প্রমাণ। হোমাজবাবু তাঁর বইতে যে চিয়াং চিন এবং ওয়াং প্রমুখের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন বর্তমানে বিভিন্ন বক্তব্যে তিনি কি তাদেরই নিন্দা করছেন না? হোমাজবাবু নাযুজিপাদের 'সোশ্যাল সাম্প্রিটিস্ট' কাগজে মাও-সে-তুং সম্পর্কে ও রচনাকে শোষণবাদের পুনরুচ্চারণ বলেছেন। মনে হয় বিশ্বাস মহাশয় লেখাটি ভাল করে পড়েননি অথবা ইংরেজীর অর্থ সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। আমি সাপ্তাহিক বাংলাদেশ কাগজের ৭৬ এর নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যায় প্রবন্ধটির পূর্ণাঙ্গ অব্যবহৃত করেছি বলেই বলতে পারি যে, নাযুজিপাদ কোন ভাবেই মাওকে ছোট করে দেখাননি। তিনি বিশ্ববিপ্লবের মহান নেতা হিসেবে লেনিনকে চিহ্নিত করেও চৈনিক বিপ্লবে মাওয়ের ঐতিহাসিক অবদানের প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করে বিশ্ববিপ্লবে তাঁর স্থান নির্দেশ করেছেন। নাযুজিপাদ এই প্রবন্ধে স্টালিন সম্পর্কেও একই কথা বলেছেন। সি পি আই (এম) যেহেতু নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছে এবং করছে এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারে যেহেতু পার্টি অংশগ্রহণ করেছিল সেইহেতু হোমাজবাবুর মতে এই দল তার বিপ্লবী চরিত্র হারিয়ে শোষণবাদী হয়ে গেছে। একই সঙ্গে তিনি নকশালপন্থী আন্দোলনের প্রতি আহুগত্য প্রকাশের শিবাচাতুর্ঘের মাধ্যমে আসন্ন নরম করার কায়দাটি প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু এবারের নির্বাচনে তো নকশালপন্থী বিপ্লবী বন্ধুরাও অংশগ্রহণ করেছেন। শুধু ভাই নয়, জেল থেকে অশীষ চ্যাটার্জী, কাহ্ন সাম্যাল, জব্বল সাঁওতাল, সৌরেন বসু প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নকশাল নেতারাও সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বাধীন বামপন্থী ফ্রন্টকে ভোট দেবার আবেদনও জানিয়েছেন। সন্তোষ রাণা নির্বাচনে অংশ

গ্রহণ করে জয়ী হয়েছেন। তবে কি হোমাজবাবুর মতে এঁরাও শোষণবাদী হয়ে গেলেন?

হোমাজবাবুকে সবিনয়ে প্রশ্ন করি তিনি আবার নকশালপন্থী হলেন কবে? ৬২ সালে চীন ভারত সীমানা সংঘর্ষের সময় আজকের সি পি আই (এম) নেতৃত্ব এবং কর্মীদের ওপর যে সরকারী আক্রমণ নেমে এসেছিল এবং গণনাট্য সংঘের শিল্পীরাও যখন সেই আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি আগমার্কা মানব দরদী হোমাজবাবুর ভূমিকা তখন 'সোভিয়েত দেশ' কাগজে মোটা টাকার কর্মচারী হিসেবে বহাল তবিয়তে থেকে নিজের আবেগ ছিয়েছেন। চাকরীর মায়াময় একটি কথাও বলেননি। তিনি নকশালপন্থী হলেন কবে এবং কেন? "সোভিয়েত দেশ" কাগজ নামাস্তরে সি পি আই দলের ঘাটি। ৬৪ সালে সি.পি.আই (এম) গঠিত হবার পর থেকে তিনি এই দলের বিরুদ্ধে খেউর গাইতে শুরু করলেন পরোক্ষে সি পি আই নেতাদের খুশি রাখার জন্য কারণ চাকরিটা তাহলে বহাল থাকবে। নকশালপন্থী হলেন কেন? কারণ, সি পি আই দল সি পি আই (এম)-কে প্রতিরোধের মানসেই নকশালপন্থীদের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একাংশ বলে ঘোষণা করেছিলেন। সেক্ষেত্রেও হোমাজবাবু

চাতুর্যের সঙ্গে কোণালটি প্রয়োগ করলেন কারণ চাকরী যাবার ভয় নেই। ৬৭ সালের পর থেকে নকশালপন্থী আন্দোলনের রাজনৈতিক সমালোচনা করলেও ৬৯ সালে জ্যোতি বসু যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েই নকশাল বন্দীদের মুক্তি দেন। বস্তুতঃ নকশালপন্থী আন্দোলনকে বিকৃত ও বিভ্রান্ত করার জন্য যখন কংগ্রেস দল এবং কংগ্রেসী সরকার ৬৩ ও ৬৪ সালের অগ্রপ্রবেশ ঘটালো এই দলের মধ্যে তখনই শুরু হলো আসল সঙ্কট। এভাবেই যুগোশেলে সি পি আই (এম) ও নকশালপন্থীদের মধ্যে একটা বৈরিতা সৃষ্টি করা হলো। বর্তমানে সেই রহস্য যখন উদ্ঘাটিত হতে চলেছে প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত শক্ত করার জন্যই কি তখন হোমাজবাবু "সোভিয়েত দেশ"-এর চাকরীটি খুঁয়ে নতুন করে নকশালপন্থী সেজেছেন? সি পি আই (এম) এর অসংখ্য কর্মীকে হত্যার কথা না হয় বাদই দিলাম, প্রকাশ্য রাজপথে এবং জেলখানায় এত যে নকশাল কর্মীকে কুহুর বেডালের মত হত্যা করা হয়েছে হোমাজবাবু কি কোনদিন প্রকাশ্যে তার নিন্দায় এগিয়ে এসেছেন? নকশাল বন্দীরা যখন জেলে অনশন করেছেন তখন এসপ্লানডে ইস্টে অনশনরত তাদের আত্মীয়বর্গের সঙ্গে আমিও শরিক (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

শান্তিপুর পৌরসভা ও স্থানীয় কলেজের

সভাপতির পদ জবরদখল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শান্তিপুর পৌরসভা ও স্থানীয় কলেজের সভাপতি পদে জবরদখল করে বসে আছেন শহরের সমস্ত কৃষকের নায়ক অসমঞ্জ দে। শান্তিপুর পৌরসভায় গত ৬ই এপ্রিল পৌর প্রধান নির্বাচিত হওয়ার পর শ্রীদে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকারী অর্থের অপব্যবহার এবং পূর্বকার পৌর প্রধানের দেওয়া ৬ জন কর্মচারীকে ছাটাই করে তাঁর কৈডে ধরা অপকর্মের সহযোগী কতিপয় কমিশনারের মনোনীত ৬ জনকে সম্প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপত্র দিয়েছেন। তার মধ্যে একজন মিসায় অভিযুক্ত আসামী।

অনুরূপভাবে শান্তিপুর কলেজে শ্রীদে কলেজ কর্মচারী হিসাবে ঋণের নিয়োগ পত্র দিয়েছেন সরকারী নিয়ম লঙ্ঘন করে তাঁরা এই শহরের বৃহৎ কাকর বাগান কেটে রাণারতি সাফ করেছে, কারও বাতীর কড়ি, বর্গা, জানালা দরজা বিক্রয় করেছে। এছাড়া দস্তপাড়া এলাকার এবং হাটখোলা পাড়া এলাকার বহু গৃহস্থ

বাড়ীতে রাজির অধিকারে বৃহৎ পাইপগান ধরে সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে চম্পট দেয় এবং যারা মিসার আসামী। ক্ষমতা দখল রাখার জন্য শ্রীদে এই সব গুণ্ডা বাহিনীকে নিয়োগ পত্র দেন। ঐ দের অহুগ্রহ ও সমর্থনপুষ্ট উক্ত কলেজের জৈনিক ইতিহাসের অধ্যাপক শান্তিপুর শহরের ৭০ জন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর পবীক্ষার কিছ দাখিলের টাকা আত্মসাৎ করেন। যলস্বরূপ আজ ঐ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত। এছাড়া উক্ত অধ্যাপকটি বহু জায়গায় এ ধরনের অর্থ আত্মসাৎ করে শহরের বৃহৎ নিলঙ্ঘ ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শ্রীদে গুণ্ডাবাহিনীর অন্যতম নায়ক এক সঙ্গে ছুটি কাজ করছে। একটি হল রাজ্য-সরকারের পি, এইচ, ই, দপ্তরের অধীনস্থ স্থানীয় পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প আর একটি শান্তিপুর হন্দরশ্রী সি.নমা হলের গোট-কিপারের।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

১১ টাকার হার।

বার্ষিক ২২ টাকা

বার্ষিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠাবার ঠিকানা:

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, মট লেন। কলিকাতা ১০

জনতা পার্টি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সুপ্রসিদ্ধ চক্রবর্তী নাকি শুধু
একজন রাজ্য জনতার চেয়ারম্যান
একজনকে অধিবেশন করেছেন।
অধিবেশন কিছু কিছু বলেন নি। উনি
তা বোঝা নন। বরং বরং বেরিয়েছে
ফুল সেনের পদত্যাগপত্র চক্রবর্তী
একজনকে সে খবরের কোনো
অভিযাচন করেন নি। অশোক দত্ত
সেই প্রসঙ্গে প্রকাশ করেছেন।
এই প্রসঙ্গে চিঠি দিয়েছেন এবং সেই
চিঠি নিয়ে তিনি আরামবাগে গিয়ে-
ছেন। উল্লেখযোগ্য, প্রধানমন্ত্রী
এই কিছুই বলেন নি। আশোক দত্ত
প্রধানমন্ত্রীর চিঠি বলে কোনো বক্তৃ-
তা করেননি। দেখা যাচ্ছে সব
সবাই ভাঙতা। অশোক দত্ত এখন
শুধু সেনকে নিয়ে ভাঙতাবাজি
করছেন।

অন্যদিকে জনতা পার্টির নির্বাচনী
কমিটির সম্পাদক ডি, এন, লাহিড়ী
একজন অশোক দত্তের বিরুদ্ধে
আলোচনা করে বলেছেন, জনতা দলের
সাধারণ সম্পাদক রামকৃষ্ণ হেগডের
কাছ থেকে গত ২২শে জুলাই তিনি
শ্রীলাহিড়ী একখানা চিঠি পেয়ে-
ছেন। চিঠিতে হেগড়ে বলেছেন,
জনতা দলের জাতীয় পরিষদের
অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সহ সমস্ত
রাজ্য জনতা দলের কার্যকরী
কমিটিগুলো পুনর্গঠিত হবে। ডি, এন
লাহিড়ী পরিষ্কার ভাষায় এই চিঠির
কথা বলেছেন। অন্যদিকে অশোক
দত্ত "চিঠি চিঠি" করছেন, অধিবেশনের
কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তব ঘটনায়
দেখা যাচ্ছে, কোনটিরই ভিত্তি নেই।
অধিবেশনের খবর হচ্ছে, যে অশোক
দত্ত একদিন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী
এই খোঁজা দেখেছিলেন তিনি
কোনমতে আশ্রয় করতে
চাইছেন। রাজ্য জনতার সংখ্যা-
গণনা দলভর ভাবে বিচ্ছিন্ন। যুব-জনতা
দলভর ভাবে হয়ে গিয়েছে। এদের
সংখ্যাগরিষ্ঠ হল অশোক দত্তের বিরুদ্ধে
প্রচারণা হয়ে উঠেছে। মোস্তাফিজ-
উর-রহমান থেকে বিমান-বিশ্ব, বরাক্ষর
ভট্টাচার্য্য ভো, প্রকাশিত অশোক
দত্তের বিরোধিতা করছেন। বি-এল-
জি হুসৈন খাতা আর জরুরি
গোপীনাথ অশোক দত্তের ভীম
বিরোধী। শ্রীমতী-আতা হাইতির
দল প্রকাশিত এফসি সেন-অশোক দত্ত
এই খবর জানি দিয়ে মিটিং করেছেন।
অশোক দত্তের মুখ্যমন্ত্রী হবার ঘোষণা
এই দিয়েছে। কেন্দ্রের খরচি দল-
দলের রাষ্ট্রপতি এখন মন্ত্রীত্ব
লাভিয়েছে। এখন অশোক দত্ত আশ-
্রয় করতে চাইছেন অফিস সেনকে

খিয়ে। কেননা রাজ্য জনতার সবাই
এখন নির্বাচনী তহবিলের হিসেব
চাইছেন। সামান্য টাকা নয়। অফিস-
মান করা হচ্ছে অন্তত ১০।৭৫ লক্ষ
টাকা হবে।

পৌরসভা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কত ধন ধায়

পৌরসভার জরুরী অবস্থাকালীন
কর্তৃত্বপূর্ণতা এত বড় বিজ্ঞাপিত যে
পুনর্নির্বাচন অনাবশ্যিক। এই সংস্কার
তালবের কর্তারা হঠাৎ ঘোষণা
করলেন যে, তাঁরা প্রত্যেক
কর্তৃত্বকে ব্যাঙ্কের মত পাশ বই
দিয়ে জল, জ্বালান ইত্যাদি সমস্ত
কতিপূর্ণ করে দেবেন। পাশ বই
ছাপার ধুম পড়ে গেল। পৌর
ছাপাখানাতেই ছাপান হল দশ
হাজার টাকার পাশ বই। আই-
বি-এম নাকি বোম্ব থেকে এক
লাখ টাকার বই ছাপিয়েছে। এখন
আবার ঠিক হয়েছে এই সব পাশ বই
দেওয়ার দরকার নেই। তাহলে এই
সব লাখ টাকা তহনছ করার
জবাবদিহিকরবেন কে—ডি সি রেন্ডি-
নিউ? প্রস্তাবটি নাকি কোন কর্তার
ইজ্জতে তিনিই চালু করেছিলেন।
আমরা পৌর কর্তৃপক্ষকে একটা ছোট
প্রশ্ন করতে চাই।

কলকাতা কার ?

কলকাতা শহরটা কার তা আমরা
জানি : দেশী বিদেশী ব্যবসায়ী এবং
কালোবাজারীদের। কিন্তু কল-
কাতা পৌরসভাটা কার ? এটা যদি
কলকাতাবাসী এবং ওখানকার কর-
দাতাদের হত তাহলে কতিপয়
লোকের ঢাক পেটানোর জন্য
লাখের জায়গায় ১০ লাখ টাকা বছরে
বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ হত না। আই-
বি এমের এক্সপেরিমেন্টের জন্য বছরে
১০ হাজারের জায়গায় দু লক্ষাধিক
টাকা ; তারপরেও ভুলেভরা ট্যাক্সের
বিল আবার কেন্দ্র যায়, তাও সময়
মত্ত বেরোয় না।

ক্যালকাটা ইজ

এরপর আবার নাকি কলকাতার

পৌর ইতিবৃত্ত সম্পর্কে কেতাব লিখে-
ছেন 'দেশ' পত্রিকায় তামল গাঙ্গুলীর
কব্জি-অবতার। প্রকাশ করতে খরচ
হবে ৮০ হাজার টাকা। কিন্তু প্রশ্ন :
ক্যালকাটা ইজ এবং ক্যালকাটা
ওয়াশ-হটোর কোনটা সত্য ?
আমার বক্তব্য এই যে, প্রাক্তন পৌর-
স্বামী এবং তার পৌর চামচেরা কল-
কাতাকে এমন জাহাজে পাঠিয়ে
মেছেন যেখান থেকে তাকে টেনে
তুলতে হলে ক্যালকাটা ইজ-এর মত
প্রতিষ্ঠান যোগ্যতার কেতাবের মুদ্রা এবং
প্রকাশন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।
নাগরিকদের টাকায় এই তুলকী
রাজত্ব আর চলতে দেওয়া যায় না।

পুনর্বহাল সরকারী

কর্মচারীদের সম্বন্ধে

গত শনিবার দমকলের সদর
কার্যালয়ে ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স
ইউনিয়নের শ্রীমতী বানার্জী ও
শ্রীনারায়ণচন্দ্র সাহা সহ সমস্ত পুন-
র্বহাল রাজ্য সরকারী কর্মচারী নেতৃ-
বৃন্দকে সম্বন্ধে জ্ঞাপন করা হয়।
সভার প্রারম্ভে গণসঙ্গীত পরিবেশন
করে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মধ্য
কলকাতা শাখা শহীদ বেরীতে
মাল্যদান করেন সংগঠনের সাধারণ
সম্পাদক শ্রীশ্রীমতী মণিগ্রাম।

সহস্রাধিক কর্মচারীর উপস্থিতিতে
ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের
কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এবং
বিভিন্ন দমকল কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিপুল
হর্ষধ্বনির মধ্যে নেতৃবৃন্দকে মাল্য-
ভূষিত করে সম্বন্ধে জানানো হয়।

পুনর্বহাল কর্মচারীদের পক্ষ থেকে
বক্তব্য রাখেন শ্রীঅরবিন্দ বোষ,
শ্রীঅজয় মুখার্জী, শ্রীরামেশ্বর বানার্জী।
অপর এক অস্থানে ফায়ার
সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পরি-
চালনায় বেলা ১২টা থেকে ২টা
পর্যন্ত প্রায় ৩২ জন দমকল কর্মচারী
রক্তদান করেন। দমকলের সদর
কার্যালয়ে সেন্ট্রাল রাস্তা ব্যাঙ্কের
ডাইরেক্টর স্বয়ং উপস্থিত থেকে রক্ত
ব্যাঙ্ক মোবাইল টিমের সাহায্যে রক্ত
সংগ্রহ করেন।

মিহির আচার্যের

বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজজ্ঞান

দাম ৮.০০

এমআরজি সমর এই রচনাসমূহে দর্পণ-এ প্রকাশিত কল্পে নিখুঁত
আলোচন ভূমি ছিল। এগুলি একটি কপি সংগ্রহ করে সংগ্রহী সংগ্রহিত
লাহিল হোম।

: অজ্ঞাত গ্রন্থ :

চিহ্ন বোমাঙ্গ ॥ বোড়সওয়ার ৬.০০ সাধন চট্টোপাধ্যায় ॥ মনোভঙ্গ
৮.০০ সমরেশ দাশগুপ্ত ॥ নির্বাচিত গল্প ৮.০০

লেখক সমাবেশ ॥ এ-১৮-এ কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট। কলকাতা-৭৭

আজও কংগ্রেসী প্রভাব

নদীয়া জেলার রাণাঘাট গ্রুপ
ইলেকট্রিক সানাইয়ের এডহক কর্মী
মনোজ বোষ ও শান্তিপুত্রের প্রাক্তন
কংগ্রেসী এস, এল, এ, অসম্ম দেব
ভাই অজয় দে বদলী হন দার্জিলিং
জেলার রাণাঘাট রিচিটন হাইডেল
প্রোজেক্টে। বদলী হন জরুরী
অবস্থায় গত ৭, ১২, ৭৭ তারিখে।
বিধান সভার নির্বাচনের মূখে
বিভাগীয় আদেশে বখুন ট্রান্সকার ও
নিয়োগ বন্ধ ছিল সেই সময়ে নদীয়া
জেলার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার রেজি-
স্টার্ড ডাকবোম্বে মনোজ বোষের
রাণাঘাট বাড়ীর ঠিকানায় রিলিজ
অর্ডার পাঠান গত ১৬, ৭৭ তারিখে।
শুধুমাত্র শ্রীবোম্বেকে বদলী করা হল।
কিন্তু কেন হল না অসম্ম দেব
ভাইকে? যেহেতু সে কংগ্রেসের
প্রাক্তন এম, এল, এর ভাতা? আর
যে অজয় দে শান্তিপুত্র বসে "দাদা"
অসম্ম দে একজন মহান নেতা "এই

সকল প্রকার প্রগতিশীল বই

ও

চীনা বইয়ের জগৎ

যোগাযোগ করুন :

নিউ অল্পপূর্ণ বুক হাউস

২বি মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৭০০০০৯

(শিয়ালদহ)

চীন থেকে সস্তা প্রকাশিত মাও-এর পঞ্চম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ।
১৯৪৯ সালের পঞ্চম সম্মেলনের লেখার সংকলন।

মাও রচনাবলী ৫ম খণ্ড

গ্রাহক করা হচ্ছে। গ্রাহক টাকা ১০.০০ (দশ) টাকা। যারা গ্রাহক
হবেন কেবল তাঁরাই নির্ধারিত মূল্যের ২৫% টাকা হারে কমিশন
পাবেন। গ্রাহক টাকা ১০.০০ (দশ) টাকা বই দরবরাহ করার সময়
বাদ দেয়া হবে।

বিঃ দ্রঃ প্রস্তুত উল্লেখ করা যাচ্ছে যে মাও রচনাবলী ৫ খণ্ড ইতিমধ্যেই
প্রকাশিত হয়েছে। ৫.০০ (পাঁচ) টাকা জমা দিয়ে নতুন গ্রাহক করা
হচ্ছে এবং খণ্ডগুলি ২৫% টাকা হারে কমিশনে দরবরাহ করা হচ্ছে।

শালীন রচনাবলী

১৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ রচনাবলী ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। শোভন
সংস্করণ ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা, ছোট সংস্করণ ১৬.০০ (ষোল) টাকা
প্রতি খণ্ড। ১০.০০ (দশ) টাকা জমা দিয়ে যারা গ্রাহক হবেন কেবল
তাঁরাই প্রতি খণ্ড শোভন সংস্করণ ১৮.৭৫ ও ছোট সংস্করণ ১২.০০ টাকা
করে পাবেন।

পূর্বাভাস গ্রাহকরা যারা এখনও বই সংগ্রহ করেননি, তাঁরা অবিলম্বে
খণ্ডগুলি সংগ্রহ করুন ও মাও-এর ৫ম খণ্ডের জন্য গ্রাহক টাকা জমা দিন।

দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত

সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসংগ্রহ

১ম খণ্ড ১৫.০০ ; ২য় খণ্ড ২৫.০০

নবজাতক প্রকাশন, এ-৬৪ কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, কলি-৭০০০০৭

অনীক

প্রগতিশীল বাংলা মানিক পত্রিকা
১লা আগষ্ট থেকে আবার নিয়মিত
প্রকাশিত হচ্ছে। এ সংখ্যায়
থাকছে : ভারতের সাম্প্রতিক
রাজনীতি ও দুই বৃহৎ শক্তি।
পশ্চিম বাংলার বিধানসভা নির্বাচন।
'জনতার' বাজেট কি জনতার
বাজেট? লোকসভা নির্বাচন :
বিদেশী সংবাদপত্রের দৃষ্টিতে। বন্দী-
মুক্তি, আন্দোলন। এ ছাড়া গল্প
কবিতা গ্রন্থ সমালোচনা ইত্যাদি
দাম দেড় টাকা। গ্রাহক টাকা
বার্ষিক ১৮ টাকা। বার্ষিক ২
টাকা।

অনীক ॥ পোঃ খাগড়া ৭৪২১০৩।
মুর্শিদাবাদ জেলা। কলিকাতা
কার্যালয় : ২বি মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০৯ (শিয়ালদহে
মহাত্মা গান্ধী রোডে প্রবেশ করেই
বাঁ দিকে)

চলচ্চিত্র নটক সংস্থা

লেভির পীড়ন থেকে মুক্তি

ভাষাসংহ

অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার লেভির পীড়ন থেকে চলচ্চিত্রকে মুক্তি দিচ্ছেন। বহু বিক্ষোভ প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত কল হল। কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, প্রতিটি ছবির প্রথম বারটি প্রিন্ট বাবদ কোন লেভি দিতে হবে না। পরবর্তী প্রতি বার-খানিক করে প্রিন্টের জন্য পর্যায়ক্রমে শুদ্ধ দিতে বেতে হবে। তবে লেভি শুদ্ধের হারও পূর্বের তুলনায় কম হবে। ছবির সমগ্র নির্মাণ, রায়স্বত্ব ওপর যে অতিরিক্ত দশ-শতাংশ লেভি ধার্য হয়েছিল, তা আদায়ের কোন উদ্দেশ্য না থাকায়, এটাই স্পষ্ট হয় যে, পূর্বোক্ত নির্দেশনামা পরবর্তী ঘোষণায় বাতিল হয়ে গেল। চলচ্চিত্রের সংগে সংশ্লিষ্ট সকলেই এর ফলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন। অল্প বাজেটে নির্মিত সুশ্রুতিসম্পন্ন ছবি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা-মূলক ছবি কেন্দ্রীয় সরকারের

কাছ থেকে আরও কিছু সহযোগিতা পাবার আশাও লাভ করেছে। এটিও শুভ সংবাদ নিঃসন্দেহে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ঘোষণায় অল্প বাজেটের আঞ্চলিক ছবিগুলি বিশেষভাবে উৎসাহিত হবে মনেই নেই। সাধারণতঃ আঞ্চলিক ছবিগুলির বারখানির বেশি প্রিন্ট হয় না। এই প্রথম বারটি প্রিন্টের জন্য কোন শুদ্ধ লাগবে না। বহু বাজেটের হিন্দি ছবিগুলির অল্প অনেক প্রিন্ট করতে হয়। কারণ সে সব কমার্শিয়াল ছবির বাজার সারা ভারতব্যাপী। এক একটি হিন্দি ছবির সাধারণতঃ একশোটি প্রিন্ট করতে হয়। রঙীন হিন্দি ছবির নির্মাণের ব্যয় করার সামর্থ্যও অনেক বেশী। সুতরাং তাঁদের পক্ষে এই লেভির ভার বহন করা মোটেই চূঃসাধ্য নয়। তবে এখন লক্ষ্য করতে হবে অল্প বাজেটের পরীক্ষামূল্য ছবি ঘোষণা অনুসারে কি ধরনের কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করে।

লিগ্যাল এড কমিটি

১৯৭০-৭১ এই কম বছরে পশ্চিম-বঙ্গে নির্ধাতন ও হত্যা সম্পর্কে তদন্তের জন্য রাজ্য সরকার যে কমিশন গঠন করেছেন সেখানে বিভিন্ন তথ্য ও সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লিগ্যাল এড কমিটি। তাই কমিটি জনসাধারণকে আহ্বান করছে বাদে আত্মীয় স্বজন নির্ধাতন অথবা নিহত হয়েছে এবং যারা এর বিচার চান তারা যেন লিগ্যাল এড কমিটির অফিসে (১, শুভ পোষ্ট অফিস স্ট্রিট, দেওতলা, কলকাতা ১) ৪টা থেকে ৬টার মধ্যে যাবতীয় তথ্য ও দলিল-পত্র পেশ করেন। কমিটি জনসাধারণের কাছে অর্থ সাহায্যও প্রার্থনা করেছে। চেক অথবা ড্রাফট লিগ্যাল এড কমিটির নামে পাঠানো যেতে পারে। কমিটি আইনজীবীদেরও সাহায্য চেয়েছে।

উৎপল দত্ত বলছেন

বালক ব্রজচরী সাম্প্রতিক কাউন্সেল (মুখচর ২৪ পরগণা) নামে কোনো এক সংস্থা তাদের ছাপা পুস্তকায় পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আমার নাম ব্যবহার করছেন, এটা আমার দুঃখগোচর হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জানতে চাই, উক্ত সংস্থার সঙ্গে আমার কোনো প্রকার সংগ্রহ নেই এবং এ ভাবে আমার নাম ব্যবহার করাটা অপালীন, আইন বিরুদ্ধ এবং অযৌক্তিক।

যাত্রা সংবাদ

প্রতি বছরই নতুন নতুন যাত্রার দল আসতে নামছে। এবারও তার ব্যতিক্রম নেই। এ ক্ষেত্রে “শিল্পী মহল”, “নিউ ইন্ডেলেক্স অপেরা” ও “যুগযাত্রার” নাম উল্লেখযোগ্য। নতুন হলেও শিল্পীমহল দলটির বেশ সম্ভাবনা রয়েছে। শিল্পীদের অভিনয় শুধে রাজ্যবাসীদের মনের মধ্যে দলটি ছাঁদ করে নিতে পারবে বলে মনে করেন দলের জেনারেল ম্যানেজার অভয়পদ সাহা। পুরোদমে প্রযুক্তি চলেছে। শিল্পী ভাসিকায় আছেন ভোলা পাল, তরু মল্লিক, অমর বন্দোপাধ্যায়, তারামানী পাল, ধোকা মল্লিক, কাঞ্চিক অধিকারী, নির্মল নাগ, কুমারেশ বন্দোপাধ্যায়, নন্দিতা দাশগুপ্তা, ফিরোজাবালা ইত্যাদি। নির্বাচিত পালা তিনটির নাম রবীন ব্যানার্জীর পৌরাণিক নাটক “দহা রত্নাকর”, কানাই নাথের ঐতিহাসিক নাটক “লাল নিশান,” ও দেবেন নাথের সামাজিক নাটক “এ যুগের লাক্ষ্মী” নাট্য নির্দেশনায় আছেন ভোলা পাল।

আগামী ৫ই আগস্ট

সৌখীন নাট্যপোষ্ঠীর নিবেদন

এল্যাসির ওরবারি
নির্দেশনা : সুদেব চন্দ্রবর্তী

যাত্রা নামের সার্থকতায়

‘রাজধানী’ অঙ্গীকারবদ্ধ
যাত্রা লোকশিল্পের হাতিয়ার
এই যাত্রাশিল্পকে সামাজিক
অগ্রগতির মঞ্চ হিসাবে
ব্যবহার করতে সক্ষম
যাত্রা প্রনিয়ন্ত্রণ শিল্পী
দরদী ও শুভানুধ্যায়ী
সহযোগিতা কামনা করি।
যাত্রা সবার জয়যাত্রার
হাতিয়ার হোক।

রাজধানী যাত্রা ইউনিটের

১৩৮৪ সালের সাড়স্বর অভিষেক অনুষ্ঠান

১লা আগস্ট প্রতিবাদ

(দ্বিমাত্রিক মঞ্চে অভিনয়)

রচনা নির্দেশনা সুর :

স্বপন সেনগুপ্ত

২রা আগস্ট সূর্যহারা

৩রা আগস্ট আশ্রয়

রচনা : রবীন বন্দোপাধ্যায়

সুর : জগন্নাথ ধর

সম্পাদনা নির্দেশনা :

গোবিন্দ দে

বীণাপাণি নাট্য কোম্পানী

১৩৮৪-র দৃষ্ট ঘোষণা

রবীন ব্যানার্জীর

দেবেন নাথের

রত্নাকর গিরিশ বিপ্লবী সূর্য সেন

সুর : পঞ্চানন মিত্র

সুর : প্রশান্ত ভট্টাচার্য

কমলেশ ব্যানার্জীর

মলি ব্যানার্জীর

অভিশপ্তা জননী ? ? ?

সুর : জয়ন্ত মিত্র

সুর : লক্ষ্মণ দাস (ফিল্ম)

প্রোডাকশন : নিতাই দাস

সুকেশরঞ্জন দে, অরুণ সেন, সুনীল বিশ্বাস

ধীরেন সাহা, কিশোরী চৌধুরী, মহাদেব দে

স্ত্রী : পাপিয়া, মৃধিকা, বেলা ও স্বর্ণ

ও

সুভাষ ভৌমিক

পরিচালক : মুকুল বসু

৩৭৩ রবীন্দ্র সরণী

কলিকাতা-৫

১৩৮৪ চ্যালেঞ্জ

নাট্যলোক-এর

সুশামল শর্মা

দেবেন নাথের

নেতাজী সুভাষ জয় সন্তোষী মা

সুর : প্রশান্ত ভট্টাচার্য

সুর : নীলিমা মিত্র

নন্দাবাবুর

র'বাবুর

মাতৃহত্যা পরশুরাম কেউটের ছোবল

সুর : পঞ্চানন মিত্র

সুর : লক্ষ্মণ দাস (ফিল্ম)

প্রোডাকশন : ভবানী সরকার

হরিপদ ভট্টাচার্য, পদ্মা ভট্টাচার্য, সুনীল ভট্টাচার্য, নলিনী বাগ,

মদন মাইতি ও আশিস কুমার

স্ত্রী : মাধবী দত্ত, সংগীতা বোস ও

কমলা সরকার

পরিচালক : সু-কুল ব-সু

৩৭৩ রবীন্দ্র সরণী

কলিকাতা-৫

সম্পাদক—ধীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২০১ আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র রোড কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কাৰ্যালয় ৬১, ৬২ নং লেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

রেলওয়ে পুলিশের লাম্পাট ও দুর্নীতির কাহিনী



পুলিশ—বিশেষ করে, রেল পুলিশের মধ্যে লাম্পাট কি ভয়াবহ-ভাবে দৃঢ়মূল হয়েছে তার সাম্প্রতিক নজির হচ্ছে গত জুন মাসের শেষ সপ্তাহে শেয়ালদা সাউথ স্টেশনের জিনৈক গ্রামীণ ভদ্রমহিলা কংকর্তব্য জি, আর, পি লক আপে নাহা

শদবীধন্ত মেজবাবু কর্তৃক অবৈধভাবে আটক করা এক ভদ্রমহিলার নারীত্ব লুণ্ঠনের পাণবিক কাহিনী। শেষ ক্যানিং লোকাল ধরতে না পেরে জিনৈক গ্রামীণ ভদ্রমহিলা কংকর্তব্য (শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

দর্পন

বিশ্ব বর্ষ ২৮শ সংখ্যা ২২ শ্রুবার ৫ই আগস্ট, '৭৭ ৥ ৪০ পৃষ্ঠা

সন্তোষ রাণা মূল রাজনৈতিক প্রাণগুলিকে এড়িয়ে যাচ্ছেন

একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ
(বিশেষ প্রতিনিধি)

সংবাদ শিরোনামায় সাম্প্রতিক স্বীকৃত নাম সন্তোষ রাণা। একদা নৃকশালপন্থী আন্দোলনে ডেবরা গোপীবল্লভপুরের স্মৃততম নায়ক হিসেবে প্রথম আবির্ভাব তাঁর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে। সময় ১৯৬৯ সাল। তারপর গ্রেপ্তার হয়ে কারাস্তরালে ছিলেন দীর্ঘ ছ' বছর। শিক্ষিত, মার্জিতরুচি এবং মিষ্টভাষী। ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সি পি আই (এম-এল) দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন গোপীবল্লভপুর কেন্দ্র থেকে। বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে সরকার গঠনের পর প্রথম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানের। এই সিদ্ধান্ত অমূল্যস্বত্বই সন্তোষবাবু সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিহারেও মামলা ছিল। বিহার সরকারও সেসব মামলা প্রত্যাহার করে নেবার ফলেই সন্তোষবাবুর মুক্তি ঘরাগিত হয়েছে।

বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছি — এটাই তো বাস্তব। এর মধ্যেই সব জবাব পাবেন। প্রশ্ন: জ্যোতিবাবু তো নানা আইনের নিয়মতান্ত্রিক জট খুলে আপনার মুক্তি পেতে দেবী হবে মনে (শেখাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

লোকনাট্য

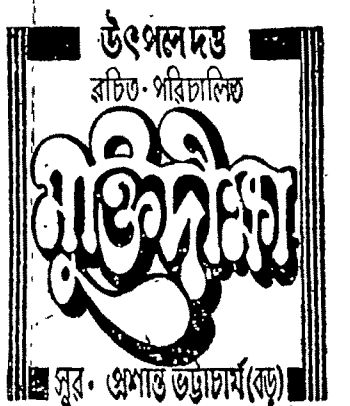
৩৩৩ বি, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬

ফোন : ৫৫৭২৫২

শুভ মুক্তিলাভ

ষ্টারে

১২ই আগস্ট সন্ধ্যা ৩ টায়



হলে টিকিট

কেন, কেন আমার ছেলে সুদীপকে ইন্দিয়ার পুলিশ হত্যা করেছে ?

দর্পণ সম্পাদক সমীপেয়,

আমার তৃতীয় পুত্র স্বর্গত সুদীপ-কুমার চক্রবর্তী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তাল ছাত্রদের একজন ছিল। স্কুল ফাইনালে অংকে ১০০-র মধ্যে ৯৯ পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে প্রাস্তিক বিজ্ঞানে কৃতিত্ব অর্জন করে ১৯৭১ সালে সিলি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৪র্থ বর্ষে পড়বার সময় গরীব উদ্বাস্ত বলে 'মেরিট স্কলারশিপ' পাচ্ছিল। আমার বৃহৎ এবং দরিদ্র সংসারে ওর বাপ ছাড়া তখন আর কেউ রোজগারে ছিল না। সুদীপ স্বভাবতই ছিল আমার ভবিষ্যতের আশা। কিন্তু অল্প অনেক গরীব মধ্যবিত্ত আদর্শবাদী যুবকের মত সেও কখন রাজনৈতিক মতাদর্শে আকৃষ্ট হয়েছিল জানি না।

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ সকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল থেকে ছাড়ার সঙ্গে সুদীপকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে যাদবপুর থানায় আনে।

দর্পণের আগামী সংখ্যা
দর্পণের আগামী সংখ্যা বিশেষ কয়েকটি লেখা নিয়ে বর্ধিতকলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে। দাম : ৬০ পৃষ্ঠা

আমরা তখন কাছেই ১২।৭।১ সেলিমপুর রোড কলকাতা ৩১-নং থাকতাম। হস্টেলে গ্রেপ্তার করার সময় এদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচারের বিবরণ লোকমুখে আমার কানে আসছিল। যাদবপুর থানায় লক আপে চোকানর আগেও এদের বেদম প্রহার করা হয়। সুদীন পরে আলীপুর কোর্টে হাজির করে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের কাঠডিতে রাখা হয়। কিছুদিন বাদে হঠাৎ আমার ছেলেকে এবং আরো কয়েকজনকে দূরে দমদম সেন্ট্রাল জেলে পাঠানর উদ্দেশ্যে তখন আমাদের বোধগম্য না হলেও আজ দিনের আলোর মত স্পষ্ট। আলিপুরের লোকালয় বেষ্টিত জেল থেকে দূরে এদের প্ররোচিত করে হত্যা করার পূর্ব পরিকল্পনা নিয়েই পুলিশ এবং তখনকার ক্ষমতামীন ব্যক্তিরা সুদীপ ও তার সহবন্ধী-দেব দমদম সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়েছিল। বিচারপতিরা এবং বিচারব্যবস্থা এই রকম পরিকল্পিত বন্দী-হত্যায় পুলিশের চোখের ইচ্ছিতে নীরব ও নির্বোধ সহযোগিতা করেছিল এ অভিযোগ অস্বীকার করা যায় না।

আমি আজো জানতে পারি 'ন আমার ছেলের বিরুদ্ধে সরকার বা পুলিশের কী অভিযোগ বা প্রমাণ ছিল। সংস্কার করার জন্য সুদীপের মৃতদেহ আমাদের দেওয়া হয়নি, তা গম্বায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল না। শেয়াল কুকুরে খেয়েছিল তাও আমি জানি না। পশ্চিমবঙ্গের অপরাপর ঘটনার নজিরে এ আশঙ্কাও অমূলক নয়।

১৪মে ১৯৭১ সুদীপকে দমদম সেন্ট্রাল জেলে হত্যা করা হয়। ব্যারাকপুরে লাশখানার মাঠে ১৬টি সারবাধা মৃতদেহ দেখে আমার ছোট ভাই, জামাই এবং সুদীপের ছোট ভাইয়ের দৃঢ় প্রত্যয় যে, এদের নির্মম ভাবে লাঠি ও বন্দুকের কুঁদা দিয়ে প্রহার করে এবং পায়ে দলে পিষে হত্যা করা হয়েছিল। অনেকের বৃকের বাঁদিকে অনেকটা জুড়ে কালো দাগ পদাঘাত বা পদমলনের সাক্ষ্য দিচ্ছিল। পলায়মান বন্দীকে গুলী করে হত্যার লালবাজারী কাহিনী বানানো এবং নির্জলা মিথ্যা। কারণ আমার লোকেরা সুদীপের গায়ে কোন গুলীর চিহ্ন (শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

প্রাথমিক শিক্ষকদের স্মারকলিপি

নিখিলবন্দ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে সম্প্রতি এক প্রতিনিধি দল মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দের নিকট এক ডেপুটিশন মাফকং ৩৪ দফা দাবীর এক স্মারক লিপি পেশ করেন। মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের দুই ঘণ্টার উপর আলোচনা হয় এবং স্মারকলিপির দাবীগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কার্যকর করার জন্য কতগুলি সুনির্দিষ্ট সূক্ষ্ম গৃহীত হয়েছে বলে প্রতিনিধিগণ জানিয়েছেন।

বিগত কংগ্রেস সরকার ২৪ টাকা মহার্ঘভাতা ঘোষণা করে প্রাথমিক শিক্ষকদের যে স্বল্প ভাবে প্রতারণা করেছিল বাফ্রস্ট সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষকগণও ২৪ টাকা মহার্ঘভাতা পাবেন বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন। এ বছর থেকেই প্রাইমারী কাইন্স পরীক্ষা স্বগিত এবং বৃত্তি পরীক্ষা চালু করা হবে। কনট্রোল্ডী ধরত সম্পর্কে নতুন নির্দেশ শীঘ্রই দেওয়া হবে। এ

ছাড়া নিয়মিত বেতন দানের বিষয়ে ডাক বিভাগের সংগে কথাবার্তা চলেছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন। শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিগণ কংগ্রেস আমলে স্কুল অহুমোদন, শিক্ষক নিয়োগ, স্বজন পোষণ ভূতি বহুবিধ দুর্নীতির উল্লেখ করে সমস্ত একটি তদন্তের ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে অহুমোদন জানিয়েছেন। এ ছাড়া পেনসন পাওয়ার সহজ ব্যবস্থা, ছুটির আইন সংশোধন, জেলা অ্যাড মিনিস্ট্রেটিভ কমিটি গঠন, নতুন স্কুল অহুমোদন, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক কল্যাণ তহবিল থেকে সাহায্য দান এবং ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে অবিলম্বে ৫ম শ্রেণীকে অবৈতনিক ঘোষণা প্রভৃতি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক গ্রহণের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি শ্রীপঙ্কজন মণ্ডল সহ সভাপতি শ্রীঅমিয় মৈত্র, সম্পাদক স্বয়ং শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রশান্ত বসু।

কেম পুলিশ হত্যা করেছে ?

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেখনি। বরং মৃতের মূখ পর্যন্ত এমন খোঁজলো ও বিকৃত ছিল যে, সনাক্ত করা গিয়েছিল হৃদীপের কোঁকড়ানো চুল এবং হাতে বাঁধা নাম ঠিকানার তাগা থেকে।

শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায় সংসদে এই হত্যাকাণ্ডকে সংগত ভাবেই 'বাছাই-করা গণহত্যা' বলেছিলেন। বাংলাদেশের বুদ্ধজীবী মহল এই হত্যার লালবাজারী গল্প আদর্শেই বিশ্বাস করেন। তাই বোধহয় উদ্যমীকৃত মুখ্যমন্ত্রী 'সত্যসন্ধ' শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এই ঘটনার বিভাগীয় এবং প্রয়োজন বোধে বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সে ব্যাপারে কতদূর কী হয়েছিল অজয়বাবু জানান প্রয়োজন বোধ করেননি।

আমার মধ্যম পুত্র যদিও সি পি এম ইউনিয়নের সদস্য তবু তাকে এবং আমার চতুর্থ পুত্রকেও হৃদীপের ব্যাপারে জড়ানোর চেষ্টা করে যাদবপুর থানা এদের প্রচুর হয়রানি করেছিল। সে জন্য এবং দেশের এতাব্যস্ত শ্রমজীবী প্রশাসনের ভয়ে এতদিন পুত্রহত্যার ক্ষোভও প্রকাশ করতে দ্বিধা করেছি।

আজ পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র ফিরে আসায় এবং বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এ বিষয়ে তদন্ত কমিশন ঘোষণা করায় এই দাবি জানানো পারছি এবং এজন্য আমার

অন্তরের ধন্যবাদ দিচ্ছি। আশা করি দমদম সেন্ট্রাল জেলে ১৯৭১ সালের ২৪ই মে আমার পুত্র হৃদীপ ও তার সঙ্গীরা কী অবস্থায়, কী কারণে এবং কাদের দ্বারা বিনা দোষে পুলিশী ঘড়বস্ত্রের শিকার হয়ে নিহত হয়েছিল তার সত্য ঘটনা প্রকাশিত হয়ে এর জন্য দোষী এবং দায়ী ব্যক্তিদের কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হবে।

তবেই এই নৃশংস বন্দিহত্যার যোগ্য প্রতিশোধ হবে, তবেই এই বুদ্ধ বয়সে আমার এবং আমার স্বামীর শোকার্ত মনের কথঞ্চিৎ শান্তি হবে। শুধু তাই নয়, জেলখানার অন্তরালে অসহায় বন্দীদের জীবন ও প্রাণের নিরাপত্তা ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিত হবে যাতে কতিপয় স্বার্থপর, দুর্নীতি-পরায়ণ এবং নৃশংস পুলিশ অফিসার ও হত্যাকারীর স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য আলিপুর, দমদম, হাওড়া ইত্যাদি জেলে বন্দিহত্যার ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর কখনো কেউ ঘটাতে সাহস না পায়। তবেই আমার হৃদীপের প্রাণদানকে সার্থক মনে করে এমন শোকেও সাধনা লাভ করব।

ইতি—

ভবদীয়া

প্রতিমা চক্রবর্তী

রেলওয়ে পুলিশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিষয় হয়ে যখন সাউথ ট্রেনে অপেক্ষা করছিলেন তখন জি, আব, পুলিশ এসে তাকে জোর করে থানায় নিয়ে যায়। তিনি তাঁর টিকিট দেখান, স্বগ্রামের ঠিকানা বলেন, কিন্তু পুলিশ অসহায় মহিলার কথায় কর্ণপাত না করে তাঁকে লক আপে পাঠায়। গভীর রাতে মেজবাবু মস্তপান করে লক আপে ঢুকে সেই মহিলাকে বর্ষণ করে। সেই ধর্মিতা ভক্তমহিলা এর প্রতিকার প্রার্থনা করেন উচ্চ-পদস্থ অফিসারদের কাছে। রেল পুলিশের তৎকালীন সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে বিচারপ্রার্থী হলে হয়তো এই ঘটনা চাপা পড়তো এবং হয়তো ঐ ভক্তমহিলা রাতারাতি নিখোঁজও হয়ে যেতে পারতেন (খুন হওয়াও অসম্ভাবিক ছিলোনা) কিন্তু ঘটনাটা যেহেতু আরও ওপরতলার কাছে গেছে সেইহেতু শেষ পর্যন্ত লম্পট মেজবাবুকেই লক আপে যেতে হয়েছে এবং এই লম্পটিকে সাময়িকভাবে বরখাস্তও করা হয়েছে।

এটা নতুন ঘটনা নয়। রেল পুলিশের লম্পট এবং দুর্নীতি অত্যন্ত সুবিদিত। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং বামপন্থী ফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্ত তথা ফ্রন্ট কমিটির মাননীয় সদস্যবৃন্দ সি, পি, আই (এম) এর সরোজ মুখোপাধ্যায়, ফরোয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষ, অমরপ্রসাদ চক্রবর্তী, আর, এস, পির নিখিল দাস, সৌরীন ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যদি কোনদিন রাত ১২টার পর শেয়ালদার ট্রেনে যান তাহলে দেখতে পাবেন সেখানে পুলিশী ছত্রছায়ায় আসর জমিয়েছে কুখ্যাত সমাজবিরোধীরা—চলছে মস্তপান, চলছে রতিলালা। এটা দৈনন্দিন চিত্র। আকস্মিকভাবে তারা যদি হানা দেন মালগুদামের গলিতে দেখতে পাবেন আদিম উল্লাসের বিভীষিকা। পুলিশ সেখানে নীরব দর্শক, কারণ তারা অর্থকরীভাবে লাভবান হয় আর একাংশ সেই সঙ্গে নরম নারীদেহের উত্তাপও ভোগ করে। হাওড়া, বর্ধমান, নৈহাটি, ব্যাঙেল ইত্যাদি ট্রেনেও একই চেহারা কিন্তু শেয়ালদার মত এত ভরাবহ নয়।

এই নৈরাজ্যের যুলোৎপাটন পুলিশ অনায়াসেই করতে পারে কিন্তু করবেনা কারণ এর সঙ্গে জড়িত আছে দৈহিক ও আর্থিক কামনা। শেয়ালদার এই নরক রচনার স্থপতি প্রধানতঃ রেল পুলিশ এবং আর, পি, এক হলেও এর সঙ্গে নাড়ীর যোগ আছে শেয়ালদার বিভাগীয় রেল প্রশাসনের বড়কর্তাদের। পুলিশ

এবং সমাজবিরোধীদের এই দুষ্কৃতির কাছে নতনির হয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করছেন পূর্ব রেলের এস, সি, ও, জি, সরোজ মুখার্জীর মতপুত্র এডিশনাল সি, আই, টি এস, সি, চ্যাটার্জীর নেতৃত্বাধীন একদল টি, টি, ই। শেয়ালদার ডি, এস, টিকুরও অজানা নয় যে, কয়েকটি রেল কোয়ার্টারের আসল মালিকরা সেগুলো ভাড়া দিয়েছেন এবং সেখানে চলে নিয়মিত রতিলালা। মুখ্যমন্ত্রী এবং বামপন্থী ফ্রন্ট কমিটির মাননীয় সদস্যরা তদন্ত চালালেই দেখবেন আমাদের অভিযোগ সত্য কিনা। আমরা সরবরাহ করবো এইসব বাড়ীর ঠিকানা, রেল পুলিশের এবং একাংশ টি, টি, ইর দুর্নীতির পাহাড় প্রমাণ রসদ। দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কারশেডের একদল কংগ্রেসী আমলের মন্তান। এই জাল চারদিকে ছড়ানো আছে।

ব্যাপক ডাকাতি

ট্রেনে ডাকাতি হচ্ছে। ঠিক কথা। কিন্তু এই ডাকাতিতে বামপন্থী ফ্রন্ট পরিচালিত সরকারের আমলেই শুরু হলোনা। দক্ষিণেশ্বর থেকে শক্তিগড় পর্যন্ত এলাকা যে ডাকাতে বহুমানুষের স্বর্গরাজ্য এতো রেলপুলিশের অজানা নয়। বছর বানেক আগে সমাজবিরোধীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন টি, টি, ই অজিতপ্রসাদ ঘোষ। অত্যাধি সেই দোবীরা ধরা পড়লো না। এটা কে না জানে যে পুলিশ একটু চেষ্টা করলেই দুর্বৃত্তদের ধরতে পারতো। ধরেনি। কারণ, এদের সঙ্গে পুলিশের মাসোহারার বন্দোবস্ত রয়েছে। পুলিশ, বিশেষ করে রেল পুলিশ মানেই ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, নারীধর্ষণের পাহারাদার—এটা আজ প্রচলিত সত্য। ডেলী প্যাসেঞ্জারদের মুখে শোনা যাবে আর, পি, এক অর্থ রবার প্রোটেকশন ফোর্স এবং জি, আর, পি অর্থ গ্রাণ্ড রবার পার্টি। সিদ্ধার্থবাবু তা জানতেন না তাতো নয়, কিন্তু এই পুলিশ, এই সমাজবিরোধীরাই তো ছিল কংগ্রেস সরকারের প্রাণভোমরা।

১৭ই জুলাই ৪৩ আপ দার্জিলিং মেলে ডাকাতি হল দক্ষিণেশ্বর এবং শক্তিগড়ের মধ্যে। সিগন্যাল না পেয়ে গাড়ী যখন শক্তিগড় প্রাটফর্মে দাঁড়িয়ে যায় তখন ৪৩০০ নং বগী থেকে ১৪ জনের ছর্ব্বস্ত্রদল নেমে পালিয়ে যায়। রেল পুলিশ ছিলো না? নিশ্চয়ই ছিল। সশস্ত্র ৫ জন ৫১১ নং টু টায়ার বগীর ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮ এবং ৭৯ নং সংরক্ষিত আসনে বিশ্রামরত। শক্তিগড়ে আক্রান্ত যাত্রীদের চীৎকারে এদের হাবিলদার নাকি প্রাটফর্মে নেমেওঠিল কিন্তু তাদের টপ ছিলোনা। আবার

এদেরই একজন বললো যে তারা গুলী করেনি কারণ "ওরা ডাকবো না পাল্লিক কেমন করে বুঝবো?"

গাড়ী যখন বর্ধমান ট্রেনে যায় তখন আক্রান্ত যাত্রীদের একাংশ উত্তেজিত ভাবে এসে গার্ডকে নাবিয়ে নিয়ে যায়। এটা ঘটে রেল পুলিশের নাকের ভগায়। কারণ ব্রেকডাউন ছিল জি, আর, পি অফিসের সামনে। উত্তেজিত যাত্রীরা যেভাবে গার্ডকে নাবিয়ে নিয়েছিলেন তাতে গার্ডের দৈহিকভাবে লালিত হবার আশঙ্কা অমূলক ছিলনা, যদিও তা হয়নি। কিন্তু একজন কর্তব্যরত রেলকর্মীর এই বিপদের সময় রেলপুলিশ ছিল নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার। অবশ্য, বর্ধমানের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ট্রেনে এসে আক্রান্ত যাত্রীদের বিবৃতি নেন এবং ৪৩০০ নং বগীটি দেখেও আসেন। বর্ধমান জি, আর, পি কিন্তু আক্রান্ত বগীটি দেখারও প্রয়োজন অহুভব করেনি।

এখানে একটি প্রশ্ন রাখছি। শেয়ালদার থেকে যে সশস্ত্র জি, আর, পি, ফোর্স গাড়ীতে নিয়েছিল তাদের ভারপ্রাপ্ত কোন অফিসার ছিলেন কি সেই গাড়ীতে? আমি অনেক খুঁজেও তাদের পাইনি। লাম্যাম টি, টি, ইরাও কোন খবর দিতে পারেননি। শাস্ত্রীরাও বলতে পারেনি। অবশ্য, শুনেছি এদের ভারপ্রাপ্ত অফিসার নাকি বর্ধমান সদর থানায় ঘটনা সম্পর্কে বিবৃতি দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তদন্ত করা হোক। অফিসার যদি গাড়ীতেই থাকতেন তবে ৬টি টায়ার স্পিয়ার, প্রথম শ্রেণী এবং মালদা কোচের যে কোন একটাতে নিশ্চয়ই থাকা পাইনি। রেল পুলিশ কেন এতে নিষ্ক্রিয় একথা আজ আর নতুন করে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা। রাজ্যে যে ডাকাতি ছিনতাই রাহাজানি হচ্ছে সে সম্পর্কে রাজ্য পুলিশ কতখানি তৎপর? একেবারেই নয় সে কথা অবশ্যই বলা যায়না। পুলিশের একাংশ চাইছে এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটতে, কিন্তু পুলিশ কর্তাদের একাংশ তা চাইছেন। এই সমস্যার সমাধানে রাজ্যের ছাত্রস্বয়ং সমাজ যদি ঐক্যবদ্ধভাবে পুলিশের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে না পারেন তবে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারকে বেকায়দায় ফেলার পুলিশী চক্রান্ত ক্রমশই শক্তিশালী হবে।

হাওড়া হাসপাতালে ভয়াবহ অবস্থা

তপন বসু

গত ১৪ই জুলাই তারাপদ মিত্র ও ফণিভূষণ মৌলিকের নেতৃত্বে হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের শোষণ ও স্বৈচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বৌগিরা একদিনের অনশন ধর্মঘট পালন করেন। অবর্ণনীয় খারাপ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কনট্রাক্টর সহ ওয়ার্ড মাস্টারের পুত্র চুরির ফলে রোগীরা নির্ধারিত বরাদ্দের অর্ধাংশই পায় না। পচা মাছের দুর্গন্ধের কথা জ্বলন্ত সিগারেটেরই মুখে গুলনাম। এ ছাড়া বেশ কয়েকজন সিগারেটের সঙ্গে কপোতপুত্রে ফলে মনে হলো চাকি চিল পড়েছে। রোগীদের জ্ঞান সুরকারী বরাদ্দ দৈনিক মাত্র আড়াই টাকা। অতএব এই আড়াই টাকা থেকেও যদি চুরি যায় তাহলে স্বভাবতই অবশিষ্ট প্রায় কিছুই থাকে না। খাওয়ার সময়েরও কোন নিয়মালবর্তিতা নেই। খাবার পরিবেশন নির্ভর করে ওয়ার্ড মাস্টারের মজির ওপর। অথচ এ সব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ নীরব।

কোন রোগীকে অপারেশন করার একদিন পরেই তিনতলার সায়তি-ক্যাল ওয়ার্ডে হাটুয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অতগুলো বিজ্ঞ-র কোথাও লিফটের বন্দোবস্ত নেই। স্টেটারে করে বহন করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব যে সমস্ত কর্মীদের তারা প্রায় সব সময়েই অফিসারদের কোয়ার্টারে কর্মে নিয়োজিত থাকে। এক্ষেত্রে কিংবা অপারেশনের জ্ঞান যুগ্ম রোগীদের এক বাড়ী থেকে একশ গজ দূরে আর এক বাড়ীতে পায়ে হেঁটে যেতে হয়। শুধু তাই নয় বর্ষার সময় বৃষ্টিপাতের জ্ঞান অধিকাংশ সময়ই রোগীরা ও টিতে না যেতে পারার ফলে অপারেশন বাতিল হয়ে যায়। এর ফলে অজ্ঞানি বা মৃত্যুর কারণ ঘটে। রোগীর তুলনায় বেডপ্যান ইত্যাদি খুবই কম। এর ফলে পয়সার বিনিময়ে এ সব জোগাড় করতে হয়। এবং রাত বাড়তেই অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করা জিনিসপত্রও উধাও হয়ে যায়। রাতে কোন সাহায্যকারী থাকে না। সাহায্যকারী হিসাবে নিযুক্ত কর্মী এমন জায়গায় স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ থাকে যে ডেকে ডেকে কান্ড হয়ে পড়লেও তার সাড়া পাওয়া যায় না। গৈটে যে দারোয়ান থাকে সে একমাত্র বিকাল ৪টা ছাড়া অজ্ঞান সময় পয়সা ছাড়া কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেয় না। এমন কি হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ী বেলা

১১টার সময় খাবার দেওয়া, অজ্ঞান জরুরী জিনিসপত্র দেওয়া এবং জরুরী কথাবার্তার আদান প্রদান করার যে ব্যবস্থা আছে সে তথ্যোগও পয়সার বিনিময়ে ছাড়া পাওয়া যায় না, আর এই সমস্ত অপকর্মে আনন্দের জিহ্বা কর্মী ওয়ার্ড মাস্টার অনিল দাস হলো সিদ্ধান্ত, যার মুখে ডিউটি করার সময় পর্যন্ত মদের গন্ধ পাওয়া যায়।

ট্যাক্সের পোকামাকড় ভর্তি নোংরা জল খাওয়া সম্পর্কে 'কছু সংখ্যক সিগারেটের অভিযোগ যে "অত্যন্ত কট মুখে ঐ জলই খাবার জ্ঞান রোগীদের ছুঁতে কবতে আমরা বাধ্য হই। যদিও আমরা নিজেই জানি যে ওই নোংরা জল অত্যন্ত কোন মাত্রার পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয়।" তারা আরও বললেন চিকিৎসার উপযুক্ত আধুনিক অ্যাপারেটাস ত নেই পরস্তু বেডের সংখ্যার

তুলনায় ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা নিতান্তই কম, তাই হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে মৃত্যুর সংখ্যা এত বেশী।

এ ছাড়া দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের বেড শোর হয়ে যাবার পরও তুলো এবং প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র পাওয়া যায় না এবং চাইতে গেলে রোগীর আত্মীয়জনকে অনেক কষ্ট আচরণের সম্মুখীন হতে হয়।

কয়েকদিন আগে ফণিভূষণ মৌলিকের নেতৃত্বে কতিপয় রোগী ড এম ও অগদীশ রায়ের কাছে এই মর্মে দাবী করেন যে, অবিলম্বে এই সমস্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করলে, তারা বাধ্য হবেন সংবাদপত্র মারফৎ সমস্ত কিছু জনগণের মধ্যে প্রচার করে দিতে এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে সুবিকল্প ব্যক্ত করতে। যদিও আবেদনপত্রটি হস্তান্তরিত হবার আশ

ঘটার মধ্যে ডি. এম. ও রোগীদের সঙ্গে আলোচনার জ্ঞান ওয়ার্ডে এসে উপস্থিত হন; কিন্তু তৎপরি আলোচনার মধ্য দিয়ে সমস্ত সমস্যা কবার কোন সিদ্ধান্ত না পাকায় তিনি নানান অজ্ঞান আলোচনা ছেড়ে দেন।

আলোচনা ভেঙ্গে যাবার পর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। অপূর্ণাঙ্গ আলোচনার মধ্যে যে কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা গিয়েছিল তাব মধ্যে একটি হল নানা কুকীর্তির অভিযোগ অভিযুক্ত ওয়ার্ড মাস্টার অনিল দাসের সাময়িক বরখাস্ত। 'কছু হাসপাতালের মেট্রন রায় সেন, অনিল দাস যে ধরনের অজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত তাতে তার সাময়িক নয়, স্থায়ী বরখাস্তই হওয়া উচিত। কিন্তু অনিল দাস আজও পশু বহাল তরিতে তার স্বৈচ্ছাচার চালিয়ে যাচ্ছে।

কর্মীদের ওপরও কর্তৃপক্ষের নিধাতনের যথেষ্ট নজর আছে। সিগারেট অগ্নি ভট্টাচার অভিযোগ করেন যে, ১৪ বছর চাকরী করার

পরও তিন পান্সমেন্ট স্ট্যান্ডে স্বীকৃতি পান 'নং দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে অবিরাম আবেদন করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কোন কর্তৃপাত করেন নি। সিগারেট বীথিকা দাসের অভিযোগ, এয়াকবগিহান না থাকার ফলে অপারেশনের আগে ও টির আবহাওয়া শীতল করার জ্ঞান বরফের দরকার হয়। দায়িত্বশীল কর্মী কোন সিগারেট উল্লিখিত বিশেষ প্রয়োজনে বরফ চাইতে গেলে, কর্তৃপক্ষ এমন ধরনের আচরণ করে যেন সিগারেট একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে চৌর্য রুত্তি করেন।

এরামরাজ, হিরাম রাম, হিরাম দোতি, হিরাম বিরজ এই চারজন সাহায্যকারী কর্মী যথাক্রমে ১৯১০। ৫৩, ২৯।৮।৫৫, ১৮।৩৭ এবং ৩।১০।৪২ থেকে নির্দাৰ সঙ্গে ড্রেনারের কাজ কবে যাচ্ছেন কিন্তু ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তাদের কোন সরকারী চাকরির অঙ্ক-মোদন দেওয়া হয় নি এবং ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তাদের কোন সারভিস ব্রেকড ছিল না।

কলকাতা পৌরসভার বিজ্ঞাপন কেলেঙ্কারীর আরও কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা পৌরসভার প্রশাসক শিবপ্রসাদ সমাদ্রারের এখন দারুণ গোঁসা হয়েছে। তাঁর "সাহিত্যিক" হবার নেপথ্য কাহিনী দর্পণে প্রকাশিত হওয়ায় উনি চটে লাল। কর্মচারীদের প্রায়ই তার কাছে ধমক সহ করতে হচ্ছে। শিবপ্রসাদের এখন একটাই কথা : বিজ্ঞাপন নিয়ে এমন কেলেঙ্কারীর কথা কে ফাঁস করেছে? তাঁর গোঁসা হওয়ার কারণ দর্পণের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর পৌরমন্ত্রী জীপ্রশান্ত স্বরের নির্দেশে ব্যাপক তদন্ত শুরু হয়েছে। এবং তাতে ফাঁস হয়েছে আরও নতুন তথ্য।

প্রথমেই দেখুন শিবপ্রসাদের বিজ্ঞাপন দেওয়ার বিচিত্র কাণ্ডকারখানার এক ছোট নজর। শিবপ্রসাদের এক আত্মীয় "কুস্তিবাস" নামক এক মাসিক পত্রিকার সঙ্গে জড়িত। এই পত্রিকাকে শিবপ্রসাদ দিয়েছেন বেদার বিজ্ঞাপন। ৭৩-৭৪ সনে এই পত্রিকাটি প্রায় ১২৫ টাকার বিজ্ঞাপন। ৭৪-৭৫ সনে তিন দশক মোট বিজ্ঞাপন পায় আগের বছরের তুলনায় তিনগুণ। অর্থাৎ ৪,৩০০ টাকার বিজ্ঞাপন। মজার কথা হল এই তিন বারে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে তার কোনটিই হাজার টাকার কমে নয়। তাও আবার একবারেই দেওয়া হয়েছে ১৮০০ টাকা। এমন ঘটনাও রয়েছে। বলা বাহুল্য এর পরের বছর ৭৫-৭৬ সনে এই বিজ্ঞাপনের

মাত্রা আরও বেড়ে যায়। কলকাতা পৌরসভা এই একটিমাত্র মাসিক পত্রিকাতেই বিজ্ঞাপন দেয় ৫৩০০ টাকার। পরের বছর ৭৬-৭৭ সনে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫২৫০ টাকায়। বিজ্ঞাপন এক এক বারে, দেওয়া হয়েছে ৮৫০ টাকা, ১১০০ টাকা। এমন কি এক এক বারে বিজ্ঞাপনের জন্য শিবপ্রসাদের কল্যাণে তাঁর আত্মীয়ের এই পত্রিকাটি ১৫০০ টাকা ১৬০০ টাকা ও ১৮০০ টাকা গেয়েছে। তবে পৌরসভার টাকার বিনিময়ে শিবপ্রসাদের লেখা কিন্তু ঠিক ছাপা হয়েছে। বিচিত্র ব্যাপার। একদিকে কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপন, অপরদিকে কলকাতা পৌরসভার "কথা সাহিত্যিক" শিবপ্রসাদের লেখা।

"সাহিত্য সংস্কৃতিতে"ও তার করুণার অভাব ছিল না। ৭৫-৭৬ সনে এই পত্রিকাটি ৪১৫০ টাকার বিজ্ঞাপন পায়। পরের বছর এই মাত্রা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৪৫০০ টাকায়। ৭৭-৭৮ সনেও ১৬ বছরের সবমাত্রা শুরু এই পত্রিকাটি অর্থজিষ্ট পৌরসভা থেকে নিয়েছে সাড়ে চার হাজার টাকা। কেন এমন হয়? এত পত্রিকা থাকতে শুধু "সাহিত্য সংস্কৃতি" এত বিজ্ঞাপন পায় কি করে? পাঠক এর উত্তর আগের সংবাদেই জেনেছেন যে এই পত্রিকার মাতব্বর সম্পাদক সঞ্জীব বসু হলেন শিবপ্রসাদের একজন পেয়ারের লোক। এই পত্রিকায় হাজার হাজার টাকার বিজ্ঞাপন গেছে প্রচার সর্বশ্ব শিবপ্রসাদের কলমের খোঁচায়। এখানেও সেই কুস্তিবাসের ঘটনা। বিজ্ঞাপনের পাণে "সাহিত্যিক" হিসাবে দাবিদার শিবপ্রসাদের লেখা। শুধু এই ছুটি পত্রিকাই নয়, রয়েছে আরও অনেক। "রূপলেশা" "ছাপতে ছাপতে" "ছন্দিতা" প্রচুর টাকার বিজ্ঞাপন পেয়েছেন। এ ব্যাপারে গত কয়েক বছরে বিজ্ঞাপনের খাতাপত্রে ধরা পড়েছে কিভাবে কলকাতা পৌরসভার বিজ্ঞাপনের টাকা নিয়ে গৌরী সেনী কারবার চলেছে। দর্পণ অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলতে পারে বিজ্ঞাপন নিয়ে যে গুস্তারজনক ঘটনা ঘটেছে তার দায়িত্ব শিবপ্রসাদ অস্বীকার করতে পারেন না। কি করেই বা করবেন? তিন বলুন কিসের জ্ঞান, কলকাতা পৌরসভার কোন কল্যাণে অল্পখ্যাত পত্রিকা-গুলোকে ঢালাও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। "রূপলেশা" কিসের ভিত্তিতে এক বছরেই ৫,৭০০ টাকার বিজ্ঞাপন পায়? "সাহিত্য সংস্কৃতি"ও কিসের ভিত্তিতে প্রায় ১০,০০০ টাকা, কুস্তিবাস প্রায় তিন বছরে ১৫,০০০ টাকার বিজ্ঞাপন পায়? তা লকা বড় হবে বলে অন্য নামগুলো এখানে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিজ্ঞাপন নিয়ে এত কেলেঙ্কারী করেও শিবপ্রসাদের সাধ মেটে নি। তাই ক্ষেদেছেন "ক্যালকাটা ইন্ড" এর

নতুন ফাঁদ যার কল্যাণ পৌরসভার প্রায় ৮০ হাজার টাকা জলে যেতে বসেছে এবং এই স্বাদে ওই পেয়ারের লোক সঞ্জীব বসুও টুপাইস কামাবার ধান্দায় ঘুরছেন।

পৌরমন্ত্রী বিজ্ঞাপনের কাগজপত্র দেখা শুরু করেছেন। দর্পণ একথা বলতে পারে প্রশাসকের অপদার্থতা তিনি এর মধ্যেই খুঁজে পাবেন। তবুও দর্পণ পরিষ্কার প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য শিবপ্রসাদের ভিজিলেন্স ফাইলটি তলব করে দেখতে অনুরোধ জানায়। এই ফাইল চেপে রাখার জন্য শিবপ্রসাদ প্রাক্তন পৌরমন্ত্রী স্বতন্ত্র মুখার্জী পায়ে প্রচুর তেলে ঢেলেছেন। কাজ যে হয় নি তা নয়। স্বতন্ত্রবাবু যে কোন কারণেই হোক না কেন এই ফাইল চেপে রেখেছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক শিবপ্রসাদের এই ভিজিলেন্স ফাইলটি উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। এই সম্পর্কে ফাইলটি তলব হলেই পৌরমন্ত্রী সব জানতে পারবেন।

এরই সঙ্গে নিউ মার্কেটের দোকানদার বাড়ানো ও মজুর করার ফাইলগুলি তলব করলে আরও বিচিত্র রহস্য উদ্ঘাটিত হবে বলে অনেকের ধারণা। শিবপ্রসাদের মেয়ের বিয়ের সময় অনায়াস ও অবৈধ স্বযোগ লাভ করেছে এমন দোকান (এরপর ৫ম পৃষ্ঠায়)

দানিকেন তত্ত্বের আলোকে মহাভারতের সৃষ্টি ও দেবতা বীরেন্দ্রনাথ

বিভিন্ন বিমানে দেবগণ

দেববিমান সম্পর্কে তথ্য পরিবেশনে কোথাও এ টুকু ঘরের ক্রটি রেখে যান নি মহাভারতকার। তাঁর বর্ণনা উত্তর পুরুষকে বলতে চেয়েছে, আমি যা বলছি, সব সত্যি, সবটুকুই বাস্তব, অবিশ্বাস কোরো না। নক্ষত্র-লোকে মহাদেবের প্রত্যাবর্তনকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য কবি লিখেছিলেন, আকাশ মার্গে প্রত্যাবর্তন করলেন তিনি 'অর্জুনের সমক্ষেই'; অর্থাৎ এই প্রত্যাবর্তনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন অর্জুন। অর্জুন আর্ষাবর্তের এক রাজকুমার, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং অকুতোভয়। তিনি যা দেখেছিলেন তার সত্যতায় সন্দেহের অবকাশ নেই। মহাদেবকে তিনি অলৌকিক উপায়ে উবে যেতে দেখেন নি, দেখেছিলেন, "অস্তাচল গমনোন্মুখ ভাস্করের জায় (মহাদেব) দেখিতে দেখিতেই অর্জুনের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন।" (বন, কালী)

কবির আয়ত্তে উপমার সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, ভুবু বর্ণনাটিকে বাস্তব করার জন্যই তিনি বিমানের বা (রকেটের?) আলোটিকে অস্তাচল-গামী স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করে বোঝাতে চেয়েছেন সেই আলোকের দীপ্তি স্বর্গের মত প্রথর তীব্র ও আলাময়ী ছিল না, সেই আলোক-দীপ্তি ছিল অস্তগামী স্বর্গের মত লালভ, নিরুদ্ভাপ এবং দর্শক সেই দীপ্ত আলোকের দিকে তাকিয়ে থাকতে পেরেছিলেন। সে আলোক যদি স্বর্গের সমান হ'ত, অর্জুন চোখ তুলে মহাদেবের প্রস্থানপর্ব লক্ষ্য করতে পারতেন না। অকারণে কবি নিশ্চয় এতো পরিশ্রম করেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ঘটনাটি শ্রোতার মনে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা।

ঠিক একই রকম প্রসঙ্গ নিয়েছিলেন তিনি অস্তাচল দেববিমান বর্ণনার ক্ষেত্রেও। মহাদেবের নক্ষত্র-লোক যাত্রার কিছুক্ষণ পরেই ইন্দ্র-কীলের পার্বত্য উপত্যকায় এসে নামতে শুরু করলেন অস্তাচল দেবতার। তাঁদের বিমানগুলির সঙ্গেও সূর্য-সংকাশ রহস্যময় রশ্মির

কথা আছে। আকাশ থেকে সেগুলি নিয়ে এসেছিল চতুর্দিক আলোকো-দ্ভাসিত করে। লক্ষ্যীয়, এই এতোগুলি কিমানাবতরণের প্রসঙ্গে কিন্তু কোথাও শব্দ বা গর্জনের উল্লেখ নেই। গর্জনের উল্লেখ না থাকায় মনে হওয়া স্বাভাবিক, এই দেববিমান-গুলি ছিল নিঃশব্দ। নিঃশব্দ বিমানের অস্তিত্ব তখন এমন কিছু অভাবনীয় ব্যাপারও নয়। ভরদ্বাজ পুঁথি তৎ-কালীন বিমানের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তাতে কোনো অত্যাধুনিক বিমান অপেক্ষা উন্নততর ছিল। বলা হয়েছে:

"পৃথিব্যপ্ৰস্তুরীক্ষেয়ু

ধগবধেগতস্বয়ম্

যদসমর্থো ভবেদ্বজ্ঞঃ স বিমান

ইতি স্মৃতঃ ॥"

যে যন্ত্র আপন শক্তির সাহায্যে পক্ষীর মত জলে, স্থলে এবং অস্তরীক্ষে বিচরণ করিতে পারে তাহাকেই বিমান বলা হয়।" (নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন দানিকেন। অহুবাদ : অজিত দত্ত, লোকায়ত প্রকাশন)।

একটি অত্যাধুনিক বিমান স্থলে ও অস্তরীক্ষে বিচরণ করে, সী প্লেন জলেও ভাসে, কিন্তু এ পর্যন্ত মহা-কাশয়ান এই তিন জায়গায় সমান বিচরণে সমর্থ হয় নি। কিন্তু পুরাকালে তেমন মহাকাশযানও ছিল। ভরদ্বাজ পুঁথি-তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানায়: "দেশাদেশান্তরং তদ্বক্ষীপাক্ষীপান্তরং তথা। লোকা-ল্লোকান্তরং চাপি যোৎসব্রে গন্তমইতি। স বিমান ইতি প্রাক্তো খেটশাক্তবিজ্ঞঃ বটৈঃ ॥ যাহা এক স্থান হইতে অস্ত স্থানে এক দেশ হইতে অস্ত দেশে এবং এক পৃথিবী হইতে অস্ত পৃথিবীতে গমন করিতে পারে, 'বিমান বিজ্ঞা-বিশারদ' পণ্ডিতগণ তাহাকে বিমান বলেন।" এবং সে বিমান অজন্তর, সদাহ, তাকে না যায় বিভক্ত করা, না পারা যায় ধ্বংস করতে। (এ) সূত্রায় এমন উন্নত মানের রকেটের যুগে বিমান বা রকেট (হুইক একই নামে পরিচিত ছিল?) নিঃশব্দে গমনাগমন করতে পারত এতে আর সন্দেহ কি।

খৃষ্টীয় শতকেও নিঃশব্দ 'অউব' বা 'অজানা উড্ডয় বস্তুর' ধর পাওয়া গেছে যুরোপ, আমেরিকা থেকে। এ ধরনের বেশ কিছু 'অউব' ছিল শব্দহীন। 'অউব' সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা প্রচুর গবেষণা করেছেন ও পশ্চিমী দেশগুলি গ্রহাস্তর থেকে আগত (সন্দেহ করা হচ্ছে) সেই সব অজানা উড্ডয় বস্তু বা 'অউব' সম্পর্কে বিভিন্ন সময় তদন্ত কমিশন বসাতেও বাধ্য হয়েছেন। ফলাফল অবশ্য বিশ্ব-বাসীকে জানানো হয় নি। আমেরিকা ও রাশিয়া মহাকাশ গবেষণা স্তরে এ সব প্রশ্নকে একান্তে 'টপ সিক্রেট' করে ফেলছে। এ ক্ষেত্রে বিদেশী পত্র-পত্রিকায় আলোচনা ও স্কোভ প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ 'অউব' ব্যাপারটা, যাকে আমরা উড্ডয় চাকি বলে জানি, এমন এক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তথ্যসম্ভারের পর্দায়ে আচ্ছন্ন রয়েছে যার থেকে এ ধারণাই বহুমূল্য হয় যে, উড্ডয় অজানা বস্তু কোনো লোকেরটন নয়, তার কিছু না কিছু বাস্তব অস্তিত্বকে বিজ্ঞানীরা অবশ্যই স্বীকৃতি দিয়েছেন। এবং সে ক্ষেত্রে আজ গ্রহাস্তর সম্পর্কে সহস্র প্রশ্ন ও শতাধিক পুস্তক চারদিক ছেয়ে ফেলছে। তাই বলছিলাম, আজও যদি, মানে ষাট সত্তর দশকেও যদি নিঃশব্দ 'অউব' পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধে একাধিকবার আনাগোনা করে থাকে আর তাদের বেশ কিছুই যদি শব্দহীন হয় তবে সে যুগে শব্দহীন রকেটের সম্ভাব্যতায় অবিশ্বাস রাখার আর কোনো সুযোগ থাকে না। কেননা আমরা বুঝতে পারছি, সেদিন যারা এসেছিলেন তাঁদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবিজ্ঞা অত্যাধুনিক আমাদের চেয়ে বেশি বই কম ছিল না। এ সব কারণে আমার মনে দেবগণের বিমানগুলি সম্পর্কে রশ্মির কথা উল্লেখ করলেও মহাভারতকার যে শব্দের প্রসঙ্গে উচ্চরাজ্য করেন নি তার কারণ সেগুলি সম্ভবত নিঃশব্দ ছিল। নাহলে গর্জনের কথাও থাকত। মহাকাবি পরিশ্রমী। ডিটেল বর্ণনায় তাঁর আলস্ত থাকার কথা নয়।

দেবতার। ইন্দ্রকীলে অবতরণ

করে নিজেদের পরিচয় জ্ঞাপন করে বললেন, "হে পার্থ! দেখ, আমরা সমস্ত লোকপাল এখানে আসিয়াছি।" লোকপাল সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী আলোচনা পাঠকে আবার স্বরণ করতে বলি। ঐতরেয় উপনিষদ জানিয়েছেন, লোকপালগণ ঈশ্বরের আব এক সৃষ্টি। বেদে লোকপাল প্রসঙ্গ নেই। ইন্দ্রাদি দেবগণ সেখানে মহাবিশ্বশক্তিরই বিভিন্ন প্রকাশ। উপনিষদের যুগে সেই ঐশ্বরিক শক্তির বিভিন্ন নাম চুরি করে দেহধারী গ্রহাস্তরের মাহুয়রাই ঈশ্বর সেজে বসেছেন। মহাভারতের ইন্দ্রাদি দেবতা তাই হয়েছেন 'লোকপাল'।

লোকপালদের মধ্যে প্রথম যিনি বিমান থেকে অবতরণ করলেন, মহাকাবি তাঁর পরিচয় দিয়েছেন বরুণদেব হিসেবে। তাঁর পরে এসেছিলেন ঋতুতর্দশন কুবের। তিনি এলেন, "আকাশমার্গ সমুদ্যোতিত করিয়া উজ্জল বিমানে আরোহণ-পূর্বক।" এলেন অতঃপর ধর্মরাজ যম, "বিমানলোকে... সমুদয় লোক আলোকময় করিয়া।" সবশেষে নামলেন দেবরাজ ইন্দ্র, সঙ্গে তাঁর মহেশ্রাণী। ইন্দ্রের মধ্যে আরও একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর মাথায় ছিল 'পাণ্ডুর্ণ ছত্র'। ছত্রটি কিন্তু ছাতা অথবা মহারাজের মুকুট নয়। ছত্রটি যেন "তারকারাজ চক্রমা ধেতবর্ষ মেঘে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন"। [বন, কালীপ্রসন্ন সিংহ]

এমন বর্ণনায় একটু খামত হয়। ভাবতে হয়, বস্তুটি কেমন? কোথাও কি এ জিনিস দেখেছি আমরা? তখন চোখের সামনে কিছু মিশরীয় দেবতা ও ক্যারাওয়েব মূর্তি ভেসে ওঠে। মাথায় তাঁদের ট্রানজিস্টার রেডিওর এরিয়ালের মতো তিন বা ততোধিক ধাতুনির্মিত বস্তু। এমন জিনিস সাদা বরফ চূড়োওয়ালা পর্বতের প্রেক্ষাপটে নিশ্চয় স্বকমক করবে। আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হবে তার থেকে। আর দানিকেনকে প্রসন্ন করলে আমরা কি জবাব পাব, ইন্দ্রের মাথায় ঐ অপারিঁব ছত্রট বহির্বিষয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী আন্টেনা? মহাকাশচারীর মাথায় এমন আন্টেনা থাকতেই পারে। পুরায়ুগের ছবিতে, পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ উড্ডয় মাহুয়ের মাথায় ও পৌরাণিক দেবতাদের মাথায় সর্বত্রই দানিকেন এই রকম আন্টেনা আবিষ্কার করেছেন।

মহাভারতের এক নম্বর ইন্দ্রের সঙ্গে অর্জুনের দেখা হয়েছিল ইন্দ্রকীল পর্বতে আসা মাত্রই। ব্রহ্মজীসম্পন্ন সে ইন্দ্রের চেহারা কৃশকায়। তাঁকে যথেষ্ট ক্ষমতাবান পুরুষ বলে মনে হয়

নি। সে ক্ষমতা আমার তর্ক ছিল, চকিতে দেখা সেই ইন্দ্র দেব-সেনার অধ্যক্ষ হতে পারেন। কিন্তু তিনি দেবরাজ নন। ইন্দ্র দেবসেনা-ধিনায়কের পদবি মাত্র। রাজা নহণও ইন্দ্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কার্তিকেয় ইন্দ্রপদ প্রত্যাখ্যান করেন। তাই ইন্দ্র এক নন, বহু। যিনি বিমানে চেপে ইন্দ্রকীলে নামলেন ও অর্জুনকে স্বর্গে বাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন, দেবরাজ হিসেবে তিনি মান্য। তাঁর আন্টেনাযুক্ত শিরশ্রাণ ও মর্দাদা এবং আকাশ থেকে মহেশ্রাণীসহ অবতরণ ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। এক নম্বর ইন্দ্র হলে তাঁকে আকাশ থেকে নামতে হ'ত না। জটাজুটবারী সেই এক নম্বরকে পর্বতবাসী মনুষ্য হিসেবে আমরা দেখেছিলাম। দেবরাজ ইন্দ্রের চরিত্রে কিন্তু ব্রহ্মজী অথবা জটাজুটবারী সাধুর বোঝ করলে হতাশই হতে হয়। যুদ্ধরাজ এই দেবতাটি লম্পট, চোর, হিংস্র, আবার দাতা ও শক্তিমান যদিও পরাজিত হলেই তাঁকে সর্বাধিনায়কদের কাছে আশ্রয় নীতে দেখা যায়। এর প্রধান কাজ ছিল অম্বর নিধন। তাই বেদের যে ইন্দ্র ছিলেন বজ্র ও বিদ্যুতের দেবতা যার কাজ ছিল অন্ধকার ও বরা দূরীকরণ, মহা ভারতীয় যুগে সেই ইন্দ্রের নাম গ্রহণ করে মহাকাশচারীদের সেনাধ্যক্ষ ইন্দ্র হলেন অম্বর নিধনকারী যুদ্ধের দেবতা। ডঃ আর্থার এ অ্যাকডোনেল তাঁর A History of Sanskrit Literature গ্রন্থে ইন্দ্র সম্পর্কে বলেন ইন্দ্র "...became the god of battle and is more frequently invoked than any other deity as a helper in conflicts with earthly enemies. In the words of one poet, he protects the Aryan colour (Varna) and subjects the black skin, while another extols him for having dispersed 50,000 of the black race...."

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত রক্তবোয় পরিপ্রেক্ষিতে এক নম্বর ইন্দ্রের সঙ্গে হু'নম্বরকে মেলানো যায় না। আর আমরা বিশ্বাস করতে পারিনা; ঈশ্বর ইন্দ্র কালো আদমি নিধন করার জন্যই একদিন হিমগিরি শীর্ষে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

(চলবে)

গণনাট্য সংঘ ও একটি প্রাসঙ্গিক বিতর্ক

সাধন গুহ

নকশাল কর্মী ও তাদের আত্মীয়-
দের অনশনের সময় কোথায় ছিলেন
হেমান্ববাবু অথবা আত্মকের হঠাৎ
ক্ষুণ্ট নকশাল দরদীরা? সি পি আই
(এম)-এর তৎকালীন সংসদ সদস্য
ইসমাইল সাহেব না হয় তখন দিল্লীর
দরবারের এক দীততাপ নিয়ন্ত্রিত
কোনাম পরিষদীয় আফিওর
মৌতাত্ত্বিকমুচ্ছিনেন কিন্তু মহাবিপ্লবী
হেমান্ববাবু বিশ্বাস মহাশয় এই দেশের
কোন সীমানায় কবে এবং কখন
বিপ্লবের সঙ্গীতবী হওয়া পান করে
অমিত বিক্রমে রোদ ঝুটি ঝড় মাথায়
নিষে অস্ত্র প্রহরীর মত বিপ্লব সংগ-
ঠিত করেছেন? অতীতের গণনাট্য
আন্দোলনে হেমান্ববাবুর অবদান
প্রকৃতিতে স্বীকার করি। কিন্তু, কবে
তিনি বি খেয়েছেন তার সৌরভ
ছটিয়ে এখনও তিনি সর্বজনস্বাক্ষে
শিল্পীর মর্যাদা আঁকড়ে থাকতে চাই-
লেও পারবেন না। কিছু গান তিনি
অবশ্যই রচনা করেছেন। যেমন
“শংখচিল”। হেমান্ববাবুর এই গানের
প্রসঙ্গ আলোচনা করে “গণনাট্য”
কাগজে আমাদের পুরোনো দিনের
এবং বর্তমানেরও সাংস্কৃতিক সহযোগী
স্বধীন সেন মন্তব্য করেছিলেন যে,
শংখচিলের রঙের বাহারে স্বরের
কারিগরি আর উপমা প্রতীকের
ধাঁধা নিয়ে হেমান্ববাবু “সুদূর সমুদ্রে
কেনই বা হারিয়ে গেলেন”—(গণ
নাট্য অক্টোবর ১৯৭৩)। গানটি
স্টাইলাইজড অর্থাৎ ভঙ্গীপ্রধান।
কিন্তু হেমান্ববাবু যদি সঠিক অর্থে
এটিকে গণসঙ্গীত বলে দাবী করেন
তবে স্বধীন সেনের মত এই অভিযোগ
আমারও।

হেমান্ববাবু ‘ঐক্যতীর্থ’ অক্টোবর
১৯৭৩ সংখ্যায় তাঁর লেখা ‘গণনাট্য
আন্দোলনে আমার গান’ শীর্ষক নিব-
ন্ধের এক জায়গায় বলেছেন, ‘শংখ-
চিলের স্বরারোপে যে আত্মকের ব্যব-
হার করেছি তা নিয়ে কোন বিতর্ক
উঠলে তা প্রকার সন্দেহজনক। এ-
কথাতো ঠিক, একদিন সংগ্রামী জন-
তার যে সান্নিধ্য পেয়েছিলাম, আজ
আর তা আমার নেই। তাই জন-
তার সত্যিকারের কোন প্রতিনিধির
সমালোচনা আমার শিরোধার্য’—
(পৃ: ৫২)। স্বধীন সেন যেহেতু
সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ অঙ্গুর’ সেই
হেতু তিনি ও আর জনতার প্রতি-
নিধি নন। তাই শুদ্ধ চিত্ত বিপ্লবী
পুরুষ বিশ্বাস মহাশয়ের ক্রোধের
উদ্রেক হতেই পারে। কিন্তু এই
গানের স্বর সম্পর্কে ভি ন নিজে তাঁর

সমর্থনে মাওকে উদ্ধৃত করে বোধ হয়
নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছেন।
হেমান্ববাবু লেখেছেন, “তবে স্বরের
কারিকুর ‘ময়ে আমার একটা বক্তব্য
আছে। জনগণের জন্ত সরল সহজ-
বোধ্য রচনার কথা বলে মাও-সে-তুং
ক্যাডারদের জন্ত—যারা জনগণের
অগ্রণী অঙ্গ অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের
সংস্কৃতির অপরাধতার কথাও বলে
ছেন। শুধু বলেছেন নয়, এই
হারিষকে অবহেলা করাটা ভুল বলে
মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। সংস্কৃতকে
জনপ্রিয় করা এবং মান উন্নয়ন করা,
এই দুটো কাজ পরস্পরসম্পর্কিত বলে
তিনি মন্তব্য করেছেন। সে দিক
থেকে ‘শংখচিল’ের কোন গুণ আছে
কিনা ভেবে দেখতে বলি”—(পৃ: ৫২)।

হেমান্ববাবু বিচ্ছিন্নভাবে মাওকে
উদ্ধৃত করে ভুল করেছেন। আমা-
দের জনগণতান্ত্রিকসাহিত্য ব্যাপকতম
জনতার সাহিত্য। এই ব্যাপকতম
জনতা কারা? চীনের এই ব্যাপক-
তম জনতার কথা বলতে গিয়ে ইয়ে-
নান বক্তৃতায় মাও-সে-তুং বলেছেন,
“The broad basis of the
masses, constituting more
than 90% of our population
is made up of workers,
peasants, soldiers and petti-
bourgeoisie. Therefore, our
literature serves first the
workers—the class which
guides the revolution; second the
peasants—a
strong and resolute ally
of revolution, third the
armed workers and peasants
—the 8th route and new Ath
armies and other popular
units, comprising the main
forces of our revolution, who
can co-operate with us in
the long range terms. These
four types of people consti-
tute the majority of
Chinese. They are the
broad masses of the people.”

ভারতবর্ষেও এই চতুর্ভুজই ব্যাপক-
তম জনতা। প্রায় দুই শ’ বছরের
সাম্রাজ্যবাদী শোষণে এবং বিগত ৩০
বছরের কংগ্রেসী দুঃশাসনে এদের
অধিকাংশই আজও শিক্ষা সংস্কৃতির
মৌল অধিকার থেকে বঞ্চিত। উন্নত
মান জাতীয় সংস্কৃতি রচনার লক্ষ্য
আমাদের আছে এবং থাকবেও।
এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্তই

ব্যাপক জনগণের বর্তমান চেতনার
পক্ষে গ্রহণযোগ্য সাহিত্য ও শিল্প রচ-
নার প্রয়োজনকেই স্থান দিতে হবে
সর্বোত্তম এবং মাওর ভাষায় সংস্কৃত
হলো, ‘Any given culture (as
a form of ideas) is the reflec-
tion of a given political and
economic system of society,
though the former in term
exerts immense influence
upon the latter and politics
is the concentrated ex-
pression of economy.’ (New
Democracy. 3rd PPH ed. P 2)

আমাদের দেশে যেখানে শতকরা
৭৫ ভাগ মানুষ এখনও নিরক্ষর,
এখনও যেখানে মোড়ল আর সর্দাররা
গরিষ্ঠ গ্রামীণ মানুষের ‘স্বাধীন
‘নয়ন্ত্রণ করে সেখানে উচ্চাঙ্গ সংস্কৃতির
প্রচার ও প্রসার যদি জনগণতান্ত্রিক
সংস্কৃতির পরিচায়ক বলে হেমান্ববাবু
মনে করে থাকেন তবে তাঁকে মাও-
সে-তুংয়েরই একটি উক্তি মনে রাখতে
বলি, “Cultural workers or
cultural thought that are is-
olated from the masses and
the people are merely, troop-
less commanders or
“Commandments of castle in
the air” and their fires can
never reach the enemies.”
(New Democracy. 3rd PPHed)
হেমান্ববাবুর স্বীকৃতি অঙ্গারেরই বলি
জনগণের সান্নিধ্য বঞ্চিত বলেই
“শংখচিল” বতটা শহুরে শিক্ষিত বুদ্ধি-
জীবী মানুষের মনোরঞ্জন হয়েছে
তার এক সহস্রাংশও সাধারণ মেহনতী
মানুষের গ্রহণযোগ্য হয়নি। সাহিত্য
ও শিল্পের মান উন্নত করার নামে
জনতার বর্তমান কৃতি ও চাহিদাকে
লঘু বিবেচনার কার্যদাটা আসলে
ট্রাইবিবাদেরই নামান্তর এবং এই
কৌকেই ইয়েনান বক্তৃতায় মাও
Sectarianism বলেছেন। এইসব
সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নকারী
তথাকথিত শিল্পীদের জনগণ কভাবে
অভ্যর্থনা জানাবেন সে প্রশ্নে-মাও
বলেছেন, “The more you
demonstrate your qualifi-
cation as an accomplished
writer, the more you parade
as a hero, the more you sell
your ideas to the people, the
more emphatically will they
reject your work.” অতএব
স্বধীন সেন যদি মাউটব্যটন মজল

কাব্যের গীতিকার স্বরকারকে ‘শংখ-
চিল’ এর সুদূর সমুদ্রে হারিয়ে
যাওয়ার জন্ত দুঃখ প্রকাশ করে
থাকেন তবে, তিনি যথার্থ কাজই
করেছেন। অথচ এই গানটির সমা-
লোচনার জন্তই আসলে হেমান্ববাবু
গণনাট্য সংঘকে সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গু-
চর বলতেও কুণ্ঠিত হননি। ‘শংখচিল’
নাগরিক বুদ্ধিজীবী মানসের গ্রহণ-
যোগ্য সার্থক চিত্রবর্মা গান সন্দেহ
নেই কিন্তু এই গান সঠিক অর্থে গণ-
সঙ্গীত নয়। যেমন, সলিল চৌধুরীর
‘গায়ের বধু’ অর্থবা ‘সেই মেয়েটি’ গণ
সঙ্গীত ছিলো না। গণসঙ্গীতের
অঙ্গুগত ভিত্তি সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি
দীর্ঘ আলোচনা করেছি এবং হেমান্ব-
বাবু সেই লেখা পড়ে আমাকে অভি-
নন্দনও জানিয়েছিলেন। সেই
প্রবন্ধে আরোপিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই
আমি বলতে চাই, ‘শংখচিল’ যানে
কাব্যিক আমেজ আছে, সংগ্রামী
একটা আবেদনও আছে কিন্তু ভাষা-
গত এবং স্বরগত সমন্বয়ে বক্তব্যের
সংশ্লেষণ (synthesis) তুলনামূলক
ভাবে কিছুটা আকস্মিক। আর
একটা কথা, ‘সাগরিকা’ উপমাটি
রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই কালজয়ী করে
রেখেছেন এবং ‘শংখচিল’ও চেকভের
‘সিগলেরই’ নামান্তর। অতএব
গণনাট্যসংঘের কর্মীরা গানের কল-
রূপটি অমুদ্রাবন করতে পারেন নি
বলে হেমান্ববাবুর যে মন্তব্য তা লেখ-
কের আত্মসম্মতি বলেই বিবেচিত
হবে।

মাও আরও বলেছেন, “বোঝার
অভাব বলতে কি বোঝায়? একথার
অর্থ হচ্ছে ভাষাকেনা বোঝা। অর্থাৎ
জনগণের সমৃদ্ধিশালী ও প্রাণবন্ত
ভাষা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব।
যেহেতু অনেক লেখক ও শিল্পী জন-
সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অস্তঃসার-
শূন্য জীবন যাপন করেন সেজন্ত
স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা জনগণের
ভাষার সঙ্গে অপরিচিত। ফলে
তাঁদের রচনা যে কেবল ভাষার দিক
থেকেই নীরস তাই নয়, উপরন্তু
তাঁদের ভাষায় এমন অনেক মনগড়া
অমুদ্রবৃত্ত শব্দ থাকে যা অর্থহীন এবং
যা জনপ্রিয় প্রকাশভঙ্গীর পরিপন্থী।
অনেক কমরেড ‘গণরীতির’ কথা
বলতে পছন্দ করেন কিন্তু এই গণ-
রীতি বলতে কি বোঝায়? এর অর্থ
হচ্ছে যে, আমাদের শিল্পী ও সাহি-
ত্যিকদের চিন্তাভাবনা ও আবেগ
অমুদ্রভিত্তিকভাবে প্রমিত কৃত্রিম ও
সৈনিকদের চিন্তা ভাবনা ও আবেগ
অনুদ্রুতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে
দিতে হবে। তা করতে হলে
তাঁদেরকে মনোযোগের সঙ্গে জন-
গণের ভাষা শিখতে হবে। জনগণের

ভাষাকেই বুঝতে না পারলে জনগণের
জন্ত শিল্পসাহিত্য রচনার কথা বলা
যায় কোন মুখে? ‘বুদ্ধিগোষ্ঠীবিহীন
যোদ্ধা’ বলতে আমরা এটাই বোঝাতে
চেয়েছি যে আপনাদের শিল্পসাহিত্যে
প্রকাশিত ‘মহান’ সত্যগুলো জন-
সাধারণের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়
নি” (ঐ পৃ: ৭১-৮০)।

মাও বিবৃত বিশ্লেষণের দর্পণে মুখ
দেখলেই হেমান্ববাবু উপলব্ধি করতে
পারবেন যে, ‘গণনাট্য’ কাগজে
প্রকাশিত নিবন্ধে আমাদের (হেমান্ব-
বাবুরও) দীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক সহ-
যোগী স্বধীন সেন বিপ্লবী সহমর্মিতা
নিয়েই বলতে চেয়েছিলেন যে মাউট-
ব্যটন মজলকাব্যের মত ‘শংখচিল’
গানে প্রকাশিত ‘মহান’ সত্যটা জন-
সাধারণের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়
নি। “সাগরের জলে সিনানের শেষে
প্রবালের সিঁড়ি বেয়ে। মন্তগন্ধা
মেয়ে। কিছক ছপুয়ে ঝুঁ ঝুঁ ঝুঁ।
যেতো সে সাগরিকা। রিলিক
রিলিক নাচিয়ে গলায় মুক্তা
মালিকা। পূর্বাচলের প্রাণগণে। সাগ-
রিকার অংগনে দিক্‌বুড়া খেলয়ে।
সমুদ্র হিলোলে তার দোলে জদর
দোলে। শংখচিলের সঙ্গীতে তার
কলন ছুয়ার খোলে। দাড়চিনি বনের
পাখায় মোহাগ চামর দোলে।
দোলেছদয়দোলে”—শংখচিল গানে
বর্ণিত এই নায়িকার রূপ কি প্রেমা-
ভিনাশিনী লাস্করময়ী নারীর রূপ নয়?
এই চিত্রকল্পের বর্ণে গন্ধে রূপে রসে
কোথাও কি মাটির সৌন্দর্য গন্ধ পাওয়া
যায়? একই সঙ্গে সিকোয়েন্স থেকে
কনসিকোয়েন্স অর্থাৎ প্রতিবেশ থেকে
পরিপতিতে উদ্ভববর্ণের নাটকীয় স্বাধী-
রস নিদ্রিষ্ট হয়েছে কোথায়? “প্রশান্ত
হৃদিতা মরমিয়া মিতা। কোথা সাগ-
রিকা গো। বাতাসে কুরিছে কিরি
কিরি কিরি। আকাশে কুরিছে তারা
। দিক্‌বুড়া গুমরি গুমরি কাদিছে
সঙ্গীহার।” এ যেন নায়কের উদ্দেশে
নায়িকার শোকার্ত চীৎকার। এখানে
কি খুঁজে পাওয়া যায় হিরোশিমা
নাগাসাকির উৎপাদনে কর্মরত পুরুষ
নারীকে? এখানে কি উৎসারিত
হয়েছে বিরম্ব মাটির বুকে বিসম্ব
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

বিজ্ঞাপন কেলেঙ্কারী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

থেকেই শিবপ্রসাদ বাজার হাট
শেরেছেন এই কথাবার্তাও কেলে
দেবার জিনিস নয়।

এই সঙ্গে পৌরমন্ত্রী পি পি আর
ও সুদর্শন বারিকের পদোন্নতির
ফাইল ও তার তথ্যবাহানে পরিচালিত
কলেজ স্ট্রাটের মিউজিয়ামটির
শাচনীয় হাল দেখে নিন।



একটি মৃত্যুর কাহিনী

ভদ্রলোকের নাম শ্রী এস. ভাসু।
বাড়ী কোয়েম্বাটুর। বোটানিকেল
সার্ভে অফ ইণ্ডিয়াতে চাকরী
করতেন। প্রায় ১৫/১৬ বছর চাকরী
হয়েছে। তাঁর রিটায়ারমেন্টের
মাত্র আর কয়েক মাস বাকি ছিল।
শ্রীভাসু ছয় সন্তানের পিতা। ভদ্র-
লোক খুব অভাবী ছিলেন। এমনই
ছড়াগ্য যে দেশে তাঁর প্রমোশন
হল না। প্রমোশন হল তাঁর
বেটানিক গার্ডেনে। অভাবের যদি
খানিকটা লাঘব হয় সেই আশায়
বেচারি এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে
গত ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে
এখানে এসে পৌঁছলেন। চাকরী
করছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর মনে সব
সময়ই একটি হতাশার চিহ্ন পরিলক্ষিত
হচ্ছিল।

মাসখানেকের মধ্যেই তাঁর বাড়ী
যাবার কথা ছিল, কারণ তাঁর মেয়ের
বিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছে। গত
২৪শে জুন অফিসের মধ্যেই তাঁর
বুকের যত্না শুরু হয়। সহকর্মীরা
ডাক্তারকে ডাকার কথা বললে তিনি
তাতে অসম্মতি জানান। ক্রমশঃ
শরীর ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকে, পরে
ডাক্তারকে ডাকা হল। ডাক্তারবাবু
একটু ইনজেকশন দিলেন। কিছু-
ক্ষণ পরে হাসপাতালে দেওয়ার
ব্যবস্থা করা হল। হাসপাতালে
যাবার আগেই সব শেষ।

অফিসে অফিসকে তখন অফি-
সারকে বিদায় সন্মর্শন দেওয়ার জন্য
সকলে ব্যস্ত। শ্রীভাসুর অবস্থার কথা
শুনে সন্মর্শন দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল।
পরে তাঁকে হাওড়া হাসপাতালে

নিয়ে যাওয়া হল, যদি হাসপাতালের
ঠাণ্ডা ঘরে লাশকে রাখা যায়। কিন্তু
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাইরের লাশ
রাখার জন্য অসম্মতি দিলেন না।
অনেক রিকোয়েস্ট করার পর রাজী
হয়েছিলেন, কিন্তু অফিসের লোকেরা
ঠাণ্ডা ঘরে প্রবেশ করে যে দৃশ্য
দেখলো তাতে বোঝা গেল এখানে
লাশ রেখে গেলে রাজিতে লাশ
থেকে ফেলবে। ঠাণ্ডা ঘরে কোন
স্বন্দোবস্ত নেই। তার পরে
মেডিকেল কুলেজ, পি, জি, হাস-
পাতালে ফোন করে খোঁজ নেওয়া
হল, কর্তৃপক্ষ জানালেন বাইরের লাশ
রাখার কোন স্বন্দোবস্ত নেই।
হায়রে আমার দেশ। পরে খোঁজ
নিয়ে জানা গেল ইলিয়াট বোডে ক
খৃষ্টান মিশনারী কোল্ড স্টোরেজ লাশ
রাখার স্বন্দোবস্ত আছে এবং লাশ
প্যাکیং করে এরোপেনে পাঠানোর জন্য
সমস্ত ব্যবস্থা এই সংস্থা করে থাকেন।
লাশ রাখার জন্য ২০০ টাকা ও
প্যাکیং চার্জের জন্য ২০০ টাকা
নেওয়া হয়।

বিদেশী সংস্থাকে ধন্যবাদ যে তাঁরা
সর্বসাধারণের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী।
আমাদের দেশের হাসপাতাল কর্তৃ-
পক্ষকে এবং মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে
অনুরোধ জানাই তাঁরা। যেন এই
বিদেশী মিশনারীদের মত কোল্ড
স্টোরেজ তৈরী করেন, যাতে দেশের
লোকের উপকারে আসে।

পরের দিন বিকালে দমদম
বিমান ঘাটি থেকে কোয়েম্বাটুরে
শ্রী এস. ভাসুর লাশ পাঠান হয়। প্লেন
ভাড়া লাগল ৫০০ টাকা। অফিসের
অনেকেই বিমান ঘাটিতে গিয়েছিলেন
এবং অফিসের সকলেই এই শোকে
মুহম্মান। এই পরিবারকে কি দিয়ে
সামান্য দেবে তাঁর ভাষা খুঁজে পাওয়া
গেল না।

মনে হয় এই প্রমোশনই তাঁর
অপমৃত্যুর কারণ, যদি কোয়েম্বাটুর
অফিসে শ্রীভাসুর প্রমোশন হত
তাহলে হয়ত এই অপমৃত্যু ঘটত
না।

আমরা অফিসের পক্ষ থেকে সমস্ত
কর্মচারিবৃন্দ ভাসু পরিবারকে সম-
বেদনা জানাই এবং শ্রীভাসুর আত্মার
মঙ্গল কামনা করি।

শেখ এমাম রশিদ
বোটানিকেল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া
বোটানিক গার্ডেন, হাওড়া

অংশ ৫ আসত্য

আপনার পত্রিকার ২২শে জুলাই
তারিখে প্রকাশিত 'রহস্যজনক দপ্তর'
দীর্ঘকাল সংবাদে যে সব তথ্য সরবরাহ
করা হয়েছে সেই তথ্যগুলির আংশিক
সম্পর্কে আমি এই দপ্তরের একজন
কর্মী হিসাবে তার তীব্র প্রতিবাদ
করি। সি, এম, ডি, এর কল্যাণে
প্রকৃতই আমাদের কাজের চাপ বেশ
কিছুদিন যাবৎ কম, তাঁর অর্থ এই
নয় যে সাড়ে এগারোর আগে
কর্মীরা দপ্তরে আসেন না। কাজের
চাপ না থাকায় স্বভাবতই অনেকেই
তাদের নিজেদের মধ্যে দপ্তর চলা-
কালীন কথা বলে, তাই সঙ্গে
শিহরণ জাগাবার মত সংলাপ কখনই
হয় না। বিশেষ সংবাদদাতার
ভাষায় "কয়েকশো বোতল এ টেবিল
থেকে ও টেবিলে, এ খোপ থেকে ও
খোপে চলাচল করে," বুলতে
পারলাম না তিনি কি অর্থে এই তথ্য
সরবরাহ করলেন। তবে এখানে
কর্মীরা অনেকেই হরিপুষ্টিচার, ছুধের
বোতল তাদের টেবিলের পাশে
রেখে দেয় জন পানের উদ্দেশ্যে,
যাতে বার বার কলঘরে না যেতে
হয়। আমি আমার কয়েক বছরের
কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় কখনও
দেখিনি মহিলা বা পুরুষ কর্মীরা
ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দপ্তরে হাত

ধরাধরি করে হুলা করে বা গল্প
করে। দপ্তর ছুটির পর অনেকেই
টেবিল টেনিস, ক্যারাম, দাঁবা অথবা
তাস খেলে থাকেন, কিন্তু সেটা কি
কিছু অন্যায্য? দপ্তরে সাংস্কৃতিক
সংস্থা আছে, যার মাধ্যমে বাৎসরিক
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে যেমন
নাটক, নৃত্য ও গান। এর মধ্যেও
কি কিছু অন্যায্য আছে? আমরা
কাজ চাই, কারণ কাজ করতেই
আমরা এসেছি, কিন্তু কাজের শেষে
যদি একটু খেলাধুলা বা সাংস্কৃতিক
অনুষ্ঠান করে থাকি সেটা কি অন্যায্য
কিছু?

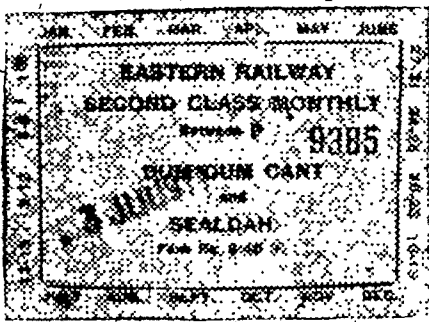
বিকাশমাথ মৈত্র

ভ্রম সংশোধন

মায়াপুর চন্দ্রোদয় মঠ সম্পর্কিত
দর্পণের ২২শে জুলাই সংখ্যার প্রতি-
বেদনে আমি মায়াপুর থেকে কৃষ্ণ-
নগর পর্যন্ত আমার গাড়ীর আরোহী
হিসেবে দুইজন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা
অফিসারের উল্লেখ করেছিলাম। পরে
জেনেছি, এই দুই আরোহী কেন্দ্রীয়
গোয়েন্দা দপ্তরের নয়। এই দুই
ভদ্রলোক সম্পর্কে ধারা আমাকে
বলেছিলেন তাঁদের প্রদত্ত তথ্য
ভুল।

সাধন গুহ

টিকিট কাটলে
সাতাই সমা পড়ে



সারা মাসের টিকিটের দাম কয়েকদিনের ভাড়ার সমান

বিনা টিকিটে
চড়ার খোঁসারও আনন্দ



কারণ শুধু অর্থদণ্ডেই লেগে যায় কয়েক মাসের ভাড়া

বিনা টিকিটের যাত্রীকে দিতে হয় ভাড়া ছাড়াও কমপক্ষে ১০ টাকা জরিমানা।
আছড়া বিচারে জেল এবং ৫০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হতে পারে।

পূর্ব রেলওয়ে



EN 446/77

দিনলিপি

অভ্যাস, অবিচার এবং অত্যাচারের
বিরুদ্ধে সংগ্রামের বলিষ্ঠ হাতিয়ার
সাপ্তাহিক দিনলিপি। দিনলিপি
পড়ুন এবং দিনলিপিতে সংবাদ
প্রেরণ করুন।

সম্পাদক :

প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীমলিনী পাল
১১, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড
(পুরানো ক্যানিং স্ট্রীট) বাগড়ি
মার্কেট (সর্বোচ্চ তলা)।

ফোন : ৩৪-৫৬০৮

সম্পাদকের বাসস্থান : ৫৭-৩৮৯৮

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

১ টাকার হার।

বার্ষিক ২২ টাকা

বাৎসরিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠাখার ঠিকানা :

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, মট লেন। কলিকাতা ১০

গণনাট্য সংঘ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

মাহুকের বুকের হৃদয় নিংড়ানো শ্রেণী-
যুগ্ম? প্রেমিকা সাগরিকাকেও
আমার গ্রহণ করতে আপত্তি হতো
না যদি তার শ্রেণীপট চিহ্নিত
হতো। মাও-সে-তুঙ-এর ভাষায়,
“শ্রেণী সমাজে প্রেম হতে পারে এক
মাত্র শ্রেণীগত প্রেম” (এ পৃ ৮২)।
হাফচিনি বনের পাখায় সোহাগ
চামুকের হাওয়া খেতে খেতে প্রবালের
সিঁড়ি বেয়ে মুক্তার মালা গলায় পরে
কীড়ারতা মস্তগন্ধা কি হিরোশিমা
নাগাসাকীর মেহনতী নারীস্বের
প্রতীক? হোমাবাবুর গানে চিত্রিত
নারিকা কি বুর্জোয়াদের বিমূর্ত
প্রেমের প্রতিনিধিত্ব করে না? মাও
হোমাবাবুর মত বিভ্রান্ত শিল্পী
সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গেই বলেছেন,
“এই কমনডেরা শ্রেণী-উর্দ্ধ প্রেমের
অন্বেষণ করছেন, বিমূর্ত প্রেম এবং
বিমূর্ত স্বাধীনতা, বিমূর্ত সত্য ও মানব
প্রকৃতি ইত্যাদির অন্বেষণ করছেন”—
(এ পৃ ৮২)। স’জল চৌধুরী গায়ের
বধূর সোহাগী হৃদয়ের যে শ্রেণীপট
তুলে ধরেছিলেন হোমাবাবু তা
পারেন নি। সলিল চৌধুরী রবীন্দ্র-
নাথের কৃষ্ণকলির গ্রামীণ সমাজে
বিবর্তিত যে শ্রেণীপট তুলে ধরতে
পেরেছিলেন হোমাবাবু তা পারেন
নি। সলিলের উদ্ধৃত ছুটি গান গণ-
সঙ্গীত নয় ‘কল্ল সেই গানের বর্ণনায়
ও ব্যঙ্গনায় লোকসংস্কৃতির প্রভাব
ছিল স্পষ্ট। হোমাবাবুর আলোচ্য
গানটিতে সেই ঐতিহ্য অল্প-স্বত।
শংখচিলের বিপ্লবী ঘোষণা স্পষ্টতঃ
আকস্মিক ও বিক্ষিপ্ত। রাসায়নিক
স্বত্রে বিশ্লেষণ করলে হোমাবাবুর
বিপ্লবী মানসিকতার আসল রূপ =
জনসংযোগহীনতা + নকল বিপ্লবী
ছদ্মজীবী দল ÷ ২ = বামপন্থী সুবিধা-
বাদ।

কোথাক হোমাবাবু ‘বিশ্বাস ‘গণনাট্য’
কাগজে এল, টি, জ’র ‘কল্লোল’ নাট-
কের সমালোচনার সমালোচনা করে
বলেছেন যে ‘কল্লোল’ ‘বখন এক-
দিকে ‘নবিত্ব করে দেবার জন্য
প্রকাশে ধর্ম উঠছে, অতীতকে
সংগ্রামী জনতার মুখে ধনি উঠছে :
কল্লোল চলছে চলবে তখন সেটা
ছিল এক তথাক থত নিরপেক্ষ সমা-
লোচনা। প্রলেতারীয় পক্ষভুক্তির
নাম-গন্ধও ছিল না’—(প্রস্তুতিপর্ব
এপ্রিল ৭৭ পৃ ১২)। অবশ্য ‘নিরপেক্ষ’
শব্দটির বিশেষণাত্মক অভিধা হিসেবে
‘ভথাকথিত’ শব্দটি ব্যবহার করে
হোমাবাবু নিজের অজান্তেই স্বীকার
করে ফেলেছেন যে ‘গণনাট্য’র
‘কল্লোল’ সম্পর্কিত সমালোচনা
আদৌ নিরপেক্ষ ছিল না। হোমাবাবু

বাবু মিথ্যে কথা বলে পাঠকদের
প্রতারিত করেছেন। ‘গণনাট্য’
অক্টোবর ৬৫ সংখ্যায় ‘কল্লোল’
শিরোনামায় প্রকাশিত সমালোচনাটি
করেছিলেন বর্তমান গণনাট্য নেতৃত্বের
অন্ততম শাস্তিময় গুহ। ১৬৫ থেকে
১৬৮ পৃষ্ঠা জুড়ে যে সমালোচনা করে-
ছিলেন শাস্তিবাবু তা ছিল ‘কল্লোল’
নাটকের এক উচ্ছৃঙ্খলিত প্রশংসা।
প্রারম্ভেই ছিল, ‘কল্লোল’ ১৯৪৬ এর
বিফোরক দিবসের ইতিহাস।
‘কল্লোল’ নৌবিদ্রোহের প্রতিচ্ছবি।
বিদ্রোহ স্পন্দিত ১৯৪৬ এই প্রথম
শিল্পে ছাড়পত্র পেলো। আর সে
পত্র হাকির করলো লিটল থিয়েটার
গ্রুপ। তাই আজ লিটল থিয়েটার
গ্রুপের প্রতি আমাদের বঙ্গবী অভিনন্দন।
আর অভিনন্দন দেউয়ের
মালা গাঁথানাম ‘কল্লোল’ এর প্রতি।
এই সমালোচনা নিবন্ধের শেষ স্তবকে
শাস্তিবাবু লিখেছিলেন, ‘কল্লোল
এ’গয়ে চলছে, চলবে। আমরাও
ধীরে ধীরে বিফোরক দিনের দিকে
এ’গয়ে চলব।’ হোমাবাবু এর মধ্যে
নাকি নিরপেক্ষতার গন্ধ পেয়েছেন।
শাস্তিময় গুহ হোমাবাবুর মত রঙীন
পোষাক পরা বিপ্লবী নন বলেই বোধ-
হয় উৎপল দত্তের সঙ্গে তৎকালে
প্রচণ্ড মতাদর্শগত বিরোধিতা থাকা
সত্ত্বেও সত্য কথা অসংকোচেই বলে-
ছেন। শাস্তিবাবুর মতে, ‘মঞ্চস্থাপত্য
ও যান্ত্রিক কুশলতায় কল্লোল এক
অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।’ শাস্তিবাবু লিখে-
ছেন, ‘এক উচ্চ পর্দায় লিটল থিয়ে-
টার গ্রুপের সদস্যরা অভিনয় করে
যান।’ এর মধ্যে কোথায় নির-
পেক্ষতা? অবশ্য শাস্তিবাবু ‘কল্লোল’-
এর স্বরকার হোমাবাবু বিশ্বাসের প্রশংসা
করেন নি। বুঝতে অসুবিধা হয় না
যে বিশ্বাস মহাশয়ের আসল রাগটা
সেইখানেই। একথা ঠিক যে, শাস্তি-
ময় গুহ বিপ্লবী সহযোগকারী আন্ত-
রিকতা ও সত্যতা নিয়ে উৎপল দত্তের
মত সমালোচনা করে একটা স্তবকে
লিখেছেন, ‘কল্লোল নাটককে হাট-
খোলা মাঠে উপস্থিত করার কোন
সুযোগ উৎপলবাবু রাখেন নি।’
এটা কি বিরোধিতা? ‘কল্লোল’
নাটককে দেশের সাধারণ মানুষের
কাছে নিয়ে যাবার জন্য এতো সহ-
যোগকারী আবেদন। মিনার্ভার
‘কল্লোল’ নাটক আক্রান্ত হবার
আশংকায় অতন্ত্র প্রহরীর মত ধারা
পাহারা দিয়েছেন হোমাবাবু বোধ-
হয় স্বীকার করতে লজ্জা পান যে,
তাঁদের গরিষ্ঠাংশই সি পি আই (এম)
এবং গণনাট্য সংঘের কর্মী। কিন্তু
সেই বিপদের সময় কোথায় ছিলেন
হোমাবাবু? তিনি আসেন নি।
অথচ আমরা ছিলাম ধারা সি পি
আই (এম) বা গণনাট্য সংঘের কর্মী

নয়। এরপর বিশ্বাস মহাশয় কোনমুখে
‘কল্লোল’-এর প্রতি প্রলেতারীয় পক্ষ-
ভুক্তির বড়াই করেন?

পরিশেষে হোমাবাবুর মত অগ্রজ
শিল্পীদের কাছে সবিনয় নিবেদন
করি অহেতুক কুৎসার পথ পরিহার
করে একাবন্ধ ও দুর্ভেদ্য সাংস্কৃতিক
ফ্রন্ট গড়ে তোলার। আর্থ সামাজিক
রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন মেরুকরণ
(Polarisation) স্রব হরয়েছে
সাংস্কৃতিকগতও তার প্রতিফলন
অনিবার্য। এই সঙ্কট মুহূর্তে একা-
বন্ধ ফ্রন্ট গড়ে তোলার পরিবর্তে
হোমাবাবুরা যদি নিছক মাংসর্ষ
দোষে ভাঙিত হয়ে সি পি আই (এম)-
এর বিরুদ্ধে অহেতুক কুৎসা গেয়ে
পরিজ্ঞাপের ব্যর্থ আশায় সংঘমিত শঠ-
তার শিবরে ভীড়বান তবে আগামী
দিনের ইতিহাস সম্ভবত তাঁদের কমা
করবে না। (সমাপ্ত)

সন্তোষ রাণা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করে আপনার বন্দী অবস্থায়ই বিধান
সভার সমস্ত হিসেবে আপনাকে শপথ
গ্রহণ করানোর ব্যবস্থা করতে চেয়ে-
ছিলেন কিন্তু আপনি রাজী হননি।
এখন আপনি মুক্তি পেয়েছেন। এম,
এল, এ হিসেবে শপথ নিচ্ছেন কবে?
জবাব: কিছুই ঠিক করিনি।
অনেক দিন পরে বাইরে এলাম।
আগে নিজেকে একটু গুছিয়ে নিই।
এত তাড়া কিসের?

প্রশ্ন: বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বাম-
পন্থী ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
এই সরকারের প্রধান পরিক. সি পি
আই (এম)। এই সরকারের সঙ্গে
সহযোগিতা করবেন অথবা এই সর-
কারের শ্রেণী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিচারে
পূর্বতন কংগ্রেস সরকারগুলোর সম
পর্যায়ভূক্ত মনে করেন কিংবা এই
সরকারের কোন প্রগতিশীল চরিত্র
আছে বলে মনে করেন?

জবাব: এই সরকারের হাতে
জনস্বার্থ বিস্তৃত না হলেই বর্তমান
সরকারের প্রগতিশীলতা প্রমাণিত
হবে। আমরা জনগণের স্বার্থরক্ষা
করার জন্য লড়াই করে যাব।

প্রশ্ন: আপনার সহযোগকারী
অর্থাৎ সি পি আই (এম-এল) দলের
শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বসমূহ যথা অসীম
চ্যাটার্জী কাহ্ন সাম্যাল প্রমুখ অনে-
কেই এখনও জেলে আছেন। আপ-
নাদের যদি কোন রাজনৈতিক পুন-
র্নির্দাষ্ট হয় তা কি এঁদের মুক্তির
পর হবে?

জবাব: অসীম চ্যাটার্জী কাহ্ন
সাম্যালরা আমাদের দলে নেই।
আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক
সত্যনারায়ণ সিন্হা। এটাই সি পি
আই (এম-এল) এবং আমাদের দলে

কোন কাটল নেই। আমাদের বক্তব্য
পরিষ্কার।

সন্তোষবাবু আমার আরো অনেক
প্রশ্নের জবাব হয়তো দিতেন কিন্তু
ধবর এলো তাঁরই সহকর্মী খুরপা
মাণ্ডী গোপীবল্লভপুর ধানার শাল-
গড়িয়া গ্রামে জোতদারদের তীরে
আহত হয়েছেন। এটা ২৪ জুলাই-
য়ের ঘটনা। অবশ্য আহত হয়ে-
ছিলেন খুরপা মাণ্ডির মা। খুরপা
মাণ্ডিও সম্প্রতি জেল থেকে ছাড়া
পেয়েছেন। তাঁকে প্রদত্ত যে জমি
নিম্নে সেদিনের সংঘর্ষ তা ছিল ৬৯
সালে মুক্তফ্রন্ট সরকারেরই খাস করা
জোতদারদের উত্তৃত জমি। খুরপা
মাণ্ডী সরকারী পাট্টা নিয়েই জমি
চাষ করতে গিয়েছিলেন কিন্তু জোত-
দারের লোকজন তাঁদের আক্রমণ
করে। সন্তোষ রাণা এই ঘটনা
পুলিশকে জানান এবং পুলিশও তৎ-
পরতার সঙ্গে জোতদাররা মর্টনারক
সহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

সন্তোষ রাণার বর্তমান কার্য
কলাপ দেখে মনে হচ্ছে যে, ডেবরা
গোপীবল্লভপুরে অতীতে কৃষি বিপ্লবের
নামে রাজ্যের অন্তান্ত স্থানের মত যে
ধরণের ব্যক্তিহত্যার প্রবণতা দেখা
দিয়েছিল এখন আর নতুন করে তার
পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। হিংসা এবং
অহিংসার প্রমুখ সন্তোষ রাণার সাক্ষ্য
জবাব—বিপ্লব কখনও শান্তিপূর্ণ হয়
না। একপক্ষ মারবে আর অন্যপক্ষ
শুধু মার খাবে এটা হতে পারে না।
এটার নাম হিংসা হলে এতিরোধ
আন্দোলনে হিংসার আশ্রয় নিতেও
হতে পারে। সন্তোষ রাণার প্রমো-
ত্তর খুব সংঘত ও সংক্ষিপ্ত। মনে
হয়েছে নকশালপন্থী আন্দোলনে
দলের আন্তর্গোষ্ঠী লড়াইয়ে তিনি
বিরত কিন্তু প্রকাশে সেটা স্বীকার
করতে রাজী নন এবং সাংবাদিকদের
প্রশ্নও তিনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। তাঁর
দলের নেতা সত্যনারায়ণ সিন্হা এবং
এটাই আসল সি পি আই (এম এল)
— সন্তোষবাবু আপাততঃ একথা
বলেই ক্ষান্ত থাকছেন কিন্তু অসীম

চ্যাটার্জী কাহ্ন সাম্যালদের রাজ-
নৈতিক মতামতের কোন বিশ্লেষণে
যাচ্ছেন না। অথচ ডেবরা গোপী-
বল্লভপুরের সংগ্রামে অসীম চ্যাটার্জী-
দের অবদান অনস্বীকার্য। এটাও
মনে রাখা দরকার যে অসীমবাবুরা
ব্যক্তিহত্যার খুব সমর্থক ছিলেন না
এবং কিছুদিন আগে তাঁরা জেল থেকে
বে বিবৃতি দিয়েছেন তার মাধ্যমে
ব্যাপক বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দো-
লনে তাঁরা সমর্থনও জানিয়েছেন।
কিন্তু সন্তোষবাবুরা মা বলছেন তার
স্বস্পষ্ট অর্থ অসীমবাবুদের বক্তব্যের
সমার্থক নয়। রাজ্যে বামপন্থী ফ্রন্ট
সরকার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আসীন

হননি। ভারতীয় সংবিধানের নিয়ম-
তান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই
তাঁদের কাছ চালাতে হবে। এই
সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়েই জ্যোতি
বহু মন্ত্রিসভাকে কাজ করতে হবে।
এটা কিন্তু বিশেষভাবে মনে রাখতে
হবে যে, কেন্দ্রে বামপন্থী ফ্রন্টের সম-
মতাদর্শী সরকার নেই। ফলে ফ্রন্ট
সরকার ইচ্ছা করলেই সব ইচ্ছা রূপা-
য়িত করতে পারবেন না। স্বভাবতই
সরকারী স্তরে শ্রেণীবিরোধ দেখা
দিতে পারে এবং দেখেও। এক্ষেত্রে
সন্তোষ রাণা প্রমুখ নেতারা যদি
দাবী করেন যে, রাজ্য সরকার এই
মুহূর্তেই সব সমস্যার সমাধান করে
দেবেন তবে সেটা হবে অযৌক্তিক
দাবী। আবার সমস্যার সমাধান না
হলে সন্তোষবাবুরা যদি সরকারের
বিরোধিতায় নামেন তবে কি হবে
তার রূপ সেটাও অবশ্যই বিবেচ্য।
সমস্যার কথা তো বামপন্থী ফ্রন্ট মন্ত্রি-
সভা বারবার স্বীকার করছেন কিন্তু
সব সমস্যার মূলোৎপাটন করতে হলে
কেন্দ্রের যে ভূমিকা থাকা দরকার তা
বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কতটুকু
পালন করবেন সেটা সত্যকভাবেই
লক্ষ্য করা দরকার। উপরন্তু, বাম-
পন্থী ফ্রন্ট সরকারকে বেকারদার
ফেলার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও
বাজারী কাগজগুলোর উদ্বেগ প্রমো-
দিত প্ররোচনা তো আছেই। প্রশ্ন
উঠবে, সন্তোষ রাণা প্রমুখ নকশাল
নেতারা এক্ষেত্রে কি পন্থা অবলম্বন
করবেন?

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সন্তোষবাবু
সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি মেনে নির্বা-
চনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হলেন
কিন্তু তিনি এম, এল, এ হিসেবে কবে
শপথ নেবেন এবং আদৌ নেবেন কি
না। সত্যনারায়ণ সিন্হার সঙ্গে
ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিংয়ের মধুর
সম্পর্ক আজ আর বিতর্কিত নয়।
এই পরিপ্রেক্ষিতে থেকে বিচার করলে
কিন্তু বর্তমান রাজনীতিতে সন্তোষ
রাণার স্থান প্রশ্নবোধকই থেকে
যাচ্ছে।

১০ই আগষ্ট সন্ধ্যা ৬টায়

সারকারিনায়

শঙ্কু বাগ রচিত

রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা

স্বর—প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য

নির্দেশনা ও অভিনয়ে

শান্তিগোপাল

পরিবেশনায়

তরুণ অপেরা

৫৫-৭১২১

আজ থেকে হলে টিকিট

চন্দ্রিকা নবোদয়

যাত্রা সংবাদ

ভোলানাথ অপেরা

ভোলানাথ অপেরা এরূপ পরিবেশন করেছে নির্মল মুখার্জী রচিত ও পরিচালিত “সন্তান গেল না ফিরে” এবং অধ্যাপক নরেশ চক্রবর্তী রচিত ও অমর ঘোষ নির্দেশিত ঐতিহাসিক নাটক “ওয়ারেন হেস্টিংস”। এ দলের শিল্পী শম্ভু সিনহাকে এবার সম্পূর্ণ এক নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে। গত বছর আমরা তাঁকে দেখেছি “স্বামীর কোলে মৃত্যু” পালায় এক চাষীর ভূমিকায় সফল অভিনয় করতে। দলের প্রধান সচিব শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য : ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমিকায় অভিনয় করে শম্ভু সিনহা এবার সকলের প্রশংসা অর্জন করবেন। বর্তমানে এই পালার প্রস্তুতি চলছে। দীনেশ সরকারকে

এবার জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে পেয়েছে এই দল। দলের প্রধান আকর্ষণ শম্ভু সিনহা ও কবিতা চক্রবর্তী ছাড়াও আছেন বলাই হালদার গৌষ্ঠ পাল, ফণী ভট্টাচার্য, দুর্গাদাস ব্যানার্জী, বলাই রায়, প্রদীপ চন্দ্র, দিলীপ, বেবি, কল্যাণী চক্রবর্তী, রমা বীথি কর ও হান্তরসিক তারা ভট্টাচার্যের মত শিল্পীরা।

নব অম্বিকা নাট্য কোম্পানী

চাঁপুপুরের একটি পবিচিত দল নব অম্বিকা নাট্য কোম্পানী। ৮৪তে এই দল আসরে নামছে এই পালাগুলি নিয়ে—পৌরাণিক পালা “সম্রাট শঙ্খচূড়”, ঐতিহাসিক পালা “শীশ মহল”, “নারী ও নাগিনী”, “বিশে ডাকাত” এবং “বিরোধী নজরুল”। “বিরোধী নজরুল” গত বছরও অভিনীত হয়ে সর্বজনীন প্রশংসা লাভ করে। দলের প্রধান অভিনেতা ও নির্দেশক হচ্ছেন যথাক্রমে অমিয় বসু ও বিমল লাহিড়ী। অগাধ শিল্পীদের মধ্যে আছেন ছবি রায়, গোপাল ব্যানার্জী, প্রমথেশ ব্যানার্জী, বেলা ঘোষ, মল্লিকা চ্যাটার্জী, স্বধাক্ষ জয়ন্তকুমার, রঘু রায়, কুমার শক্তি দত্ত (চিত্র ও মঞ্চ খ্যাত) মধু ব্যানার্জী এবং আরো অনেকে।

বীণাপাণি নাট্য কোম্পানী

এই দলের নতুন নাটক “রত্নাকর গিরিশ”। ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ জানিয়েছেন মুকুল বসু। এই নাটকের সাফল্য সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত। অভিনয়শ্রেণি আছেন নাম ভূমিকায় নিতাই দাস, স্বভাব ভৌমিক (নরেন) এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভূমিকায় নবাগত স্বকেশরঞ্জন দে। তাছাড়া বিনোদিনীর ভূমিকায় আছেন পাপিয়া রাণা।

চন্দ্রলোক অপেরা

এদের এবারকার পালার মধ্যে শৈলেশ গুহ নিয়োগী রচিত “নগর বধ” অন্ততম। ইতিহাসের আঙ্গিপালীর ঘটনা অবলম্বনে এই নাটক রচিত। তৎকালীন সমাজের শিকার এই বারবধুর রঘুনাথ দাস লিখিত কাহিনী এবং কেনেথকুমারের পরিচালিত নৃত্য উন্মুক্ত মঞ্চে অপেরার আমেজ এনেছে। এদের অন্য নাটক দেবেন্দ্র নাথের “প্রেমপুঞ্জারী” ভক্তিরসের। ঘোষপাড়াব আউলচাঁদ এবং

৮সতীমা একসময় বাঙ্গালীকে ধর্মসম্বন্ধে টেনে এনেছিলেন। সেই আবেদন এবং সতী মায়ের গান আজও অম্লান। প্রশান্ত ভট্টাচার্যের স্বর তাতে নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে। এই দুটি পালাতেই প্রধান চরিত্রাভিনয়ে আছেন নবকুমার ও ও কল্যাণী ঘোষ। দল পরিচালনায় কমলকৃষ্ণ ধা। এদের আগেরকার নাটক “হাসির আড়ালে” জনসমাদৃত।

সুশীলা অপেরা

নতুন দল সুশীলা অপেরা। দলের পরিচালক গোপাল মুখার্জী জানালেন “স্বর্ঘ আলো দাও”—এর পরবর্তী তিনটি নাটক “জীবনটাই নাটক” (রচনা : কানাই মণ্ডল) “সাহাজাদী আহানারা” (রচনা : শান্তি চক্রবর্তী) এবং “ঠাকুর জার্নাল সিং” শহর ও গ্রামের সর্বশ্রেণীর যাত্রামোদীকে খুশি করবে। এইসব পালায় অমর দত্ত ও বাসন্তী দেবী সহ বহু প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছে।

নিউ গণেশ অপেরা

এই দল ৮৪তে উপস্থিত করছে সুশীল চক্রবর্তী রচিত “তদন্ত চলছে”। স্বরারোপ করছেন অজিত বসু। যুগযুগান্তর ধরে একদল সমাজবিরোধী মুখোশ পরে সমাজের বৃক্ জঘন্য অপরাধ করছে, সত্যকে মেয়ে ফেলে তারা সমাজকে দূষিত করে তুলছে। তাদের কঠোর শাস্তি না দিলে সমাজ সুন্দর হতে পারে না, মানব জীবনে মুক্তি আসতে পারে না। এরই ভিত্তি, এরই মনস্তত্ত্ব মূলক বিশ্লেষণ রয়েছে এই নাটকে। এই দলের অন্য নাটক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এবং তরুণ মুখোপাধ্যায় স্বরারোপিত “কপসী গঙ্গা”। এই দুটি পালাইই সম্পাদনা, নির্দেশনা ও প্রধান ভূমিকায় আছেন তপনকুমার।

মঞ্জুরী অপেরা

“অভিশপ্ত ফুলশয্যা”, “এক যে ছিল কন্ডা”, “স্বর্ঘমুখীর সংসার” প্রভৃতি সফল পালার প্রযোজক মঞ্জুরী অপেরা এবার তৈরী হচ্ছে কমলেশ ব্যানার্জী রচিত ও নির্দেশিত “সংসার সীমাস্তে” অভিনয়ের জন্ত। এদের অন্য দুটি পালা চণ্ডী ব্যানার্জীর “তটিনীর বিচার” এবং এম নন্দরের “সিতারা বাজি”। প্রথমটি একটি সামাজিক আলোচনা যা সহজেই দর্শক আবেগকে মগ্নিত করবে এবং দ্বিতীয়টি ইতিহাস থেকে সংগৃহীত যা কোন কোন স্থানে রোমাঞ্চকর। দুটি

নাটকেই শান্তি চক্রবর্তী নির্দেশিত এবং স্বরারোপে আছেন যথাক্রমে অহীন ঘোষ ও প্রশান্ত ভট্টাচার্য।

কলিকাতা যাত্রা সমাজ

এবার এরা আসরে নামছে সেক্সপীয়রের “হামলেট” নিয়ে যার বাংলা রূপান্তর ও পরিচালনা করছেন অমর ঘোষ। ভি বালসারা এতে স্বরারোপের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাছাড়া এই দল শ্রামল ঘোষের পরিচালনায় নীহাররঞ্জন গুপ্তের “বহির্বিধা”কেও হাজির করছে যাত্রা-স্বরাসীদেব সামনে যার পালারূপ দিয়েছেন সত্যপ্রকাশ দত্ত। স্বর দিয়েছেন আনন্দশঙ্কর। এই দলে নতুন নতুন অনেক শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছে।

সুবিনয় রায়েক

গানের অন্তর্গত

(সদীত সমালোচক)

অধুনা ববীন্দ্রসংগীতের পূর্ণ শিল্পীদের মধ্যে সুবিনয় রায়েক অগ্রণী ভূমিকার প্রমাণ নতুন কবে পাওয়া গেল সেদিন সন্ধ্যায় অবন মহাল (২৪ জুলাই)। সুবিনয়বাবুর

গানের আসর উদ্বোধন করলেন (কেন জানি না) ভাব ছাত্রী শ্রীমতী সংঘ-মিত্রা গুপ্ত যার চারটি গান মোটামুটি উত্তরে গেলেও আধারে একেলা ঘরে গাওয়ার বয়স বা অভিজ্ঞতা না থাকায় যাত্রিক। কিন্তু গায়িকার ভবিষ্যৎ অস্বচ্ছল নয়।

মাঝে সামান্য বিরতি ব্যতিরেকে শ্রীমতীর একাদিক্রমিত পনেরোটি গান স্বরশুদ্ধতা এবং তন্ত্রিত গায়িকার দ্বারা (বিশেষত ভারী রাগতালের ব্রহ্মসংগীতগুলি) অভিজ্ঞত হলেও অস্বচ্ছতা এবং আবেগহীনতার জন্য কেমন যেন একরঙা। অবশ্য শিল্পী সেদিন খোশ মেজাজে ছিলেন বলে বোধ হল না। তবু স্বনির্বাচিত বর্ষার গানগুলির নিপুণ স্বরকৃতি তার কণ্ঠে আবার ভাল লাগল। কিন্তু ভিন্নির অবগুণে গানটিকে এত জ্বল জ্বালে দৌড়া না করিয়ে মুক্ত ছন্দে বা মধ্যম গাইলে গানের ভাব গাঙ্গীর্থ বেশী প্রকটিত হত না? হুটো তানপুরা, এস্রাজ এবং সেতারের পবেও হারমোনিয়াম? জিনিটস? কি খুব রাবীন্দ্রিক? প্রশংসিত শ্রীমতী আশা করি ভেবে দেখবেন।

ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে উৎসাহ দান পরিকল্পনা বিশেষ অনুদান

- * W. B. S. I. C. কর্তৃক নির্মিত কারখানার শেডের জন্ত অনুদান।
(প্রথম বছর শতকরা ২৫% এবং পরবর্তীকালে ১৫% অনুদান)
- * বিদ্যুতের জন্ত শতকরা ২৫% অনুদান (কর বাদে)
- * ব্যাংকের স্থানের উপর শতকরা ৩% অনুদান
- * জমি, বাড়ী ইত্যাদি স্থায়ী মূলধনের উপর শতকরা ১৫% অনুদান।

। যোগাযোগ ।

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পাধিকার বিভাগ

নিউ সেক্রেটারীয়েট বিল্ডিংস

(দশম তল)

১, কিরণশংকর রায় রোড

কলিকাতা-১০

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্ট্রল ইণ্ডাস্ট্রিস

করপোরেশন লিঃ এর সৌজন্যে প্রচারিত

সম্পাদক—শ্রীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্শন কার্যালয় ৬১মিট লেন কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

৮৪তে
নব অম্বিকা
নাট্য কোম্পানীর
দীপ্ত ঘোষণা
অজেন্দ্রকুমার দে রচিত
পৌরাণিক পালা
সম্রাট শঙ্খচূড়
প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য রচিত
ঐতিহাসিক পালা
শীশ মহল
বিতর্কিত পালাকার ধুমকেতুর
নারী ও নাগিনী
ডাঃ অরুণ দে রচিত
বিশে ডাকাত
নির্দেশনা ও অভিনয়ে
অমিয় বসু ও
বিমল লাহিড়ী
এবং
অজেন্দ্রকুমার দে রচিত
বিরোধী নজরুল
পরিচালক
অশ্বিনীকুমার দাস
১১৭১, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬
ফোন : ৫৫-২৮৫২

১৯৭০ সাল। বারাসাতের রাজপথে আটটি মৃতদেহ। কিছু ঘটনা ও প্রশ্ন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের এক সকালে সারা দেশের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চমকে উঠেছিল একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ পড়ে: বারাসাতের রাজপথে আটজন তরুণের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। সকলের মনে প্রশ্ন: কারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে? শাসন-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগসাজস ছাড়া কি এই হত্যাকাণ্ড এবং মৃতদেহগুলি রাজপথে চুপিচুপি ফেলে রাখা সম্ভব? প্রশ্নের জবাব এখনও মেলেনি এবং জানা যায়নি কারা অপরাধী। কিন্তু এর পূর্ববর্তী কতগুলো ঘটনার কথা আমাদের জানিয়েছেন আড়িয়াদহের জনৈক বাসিন্দা। বামপন্থী সরকার কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিশনের তদন্তের সুবিধার জন্য আমরা নাম ধাম সহ ঘটনাগুলি প্রকাশ করছি।

বারাসাতে বাদ্যের মৃতদেহ পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় টুকটুক দত্ত, স্বপন পাল, গণেশ ঘটক সমীর, মিত্র, বাপী দাস, কানাই ভট্টাচার্য, যতীন দাস আড়িয়াদহ দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দা। শঙ্কর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র ছিল। তখন তার বয়স ২০ বছর ৪ মাস। টুকটুক, স্বপন, সমীর ও গণেশ বি এস সির ছাত্র, বাপী (১৪) বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং যতীন দাস ও কানাই ভট্টাচার্য টেক্সটাইল কোর্সের ছাত্র।

১৯৭০ সালের ১৯শে নভেম্বর বুধবারের বেলা দুটো পূর্বস্থ শঙ্কর বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে প্র্যাকটিক্যাল করেছে এবং বেলা ৩টা ১৫ মিনিটের সময় সুরেন্দ্রনাথ কলেজে প্রাণীতত্ত্ব বিভাগের লেবোরেটরী অ্যাসিস্ট্যান্ট মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞানার গেষ্টিকিনে দিতে গিয়েছিল। এরপর বেলা চারটে সাড়ে চারটের সময় শঙ্কর ধর্মতলায় পৌছয়। সেখানে যখন সে তার ছাত্র বাপীর সঙ্গে কথা বলছিল সেই সময় বেলঘরিয়া থানার ও সি কালিপদ দত্ত, সেকেন্ড অফিসার নন্দী, আম্রপুত্র থানার পরিমল এবং ভূট্টা, দেবু, সিরি, গোবিন্দ, পিটু, নিমাই প্রভৃতি প্রায় ১৬ জন লোক গুলির ঘিরে ফেলে এবং একটা কাগজ দেখিয়ে বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে গাড়িতে তোলে। সেই সময় তখন ভট্টাচার্য (যে সিগারেট কিনতে গিয়েছিল) ফিরে আসে এবং পুলিশদের দেখে ভয়ে পালিয়ে যায়।

(শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

১৯৭৫ সালে নিখোঁজ শ্যামল জীবিত না মৃত?

পুলিশ পিতাকে কেবল ধান্না দিচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জোড়াসাঁকো এলাকা থেকে ১৯৭৫ সালের ১১ই জুলাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাসের মধ্যম পুত্র শ্রীশ্যামলকুমার দাস নিখোঁজ হয়ে যায়। শ্রীদাসের বাসস্থানের ঠিকানা হল ১৪-এ রামচন্দ্র চ্যাটার্জী লেন, কলকাতা ৭।

তার পুত্র শ্যামল ঐ দিন ৫-৩০। ৬টা নাগাদ অফিস থেকে বাড়ি ফিরে চা খেয়ে বেরিয়ে যায়। তারপর থেকে তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। তার পিতা ও মাতা তার খোঁজ পাওয়ার জন্য বহু চেষ্টা করেছেন, পুলিশের দ্বারা হুয়ারে হুয়ারে এবং থানায় লালবাজারে বিভিন্ন জেলে ঘুরেছেন, জনৈক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে পুলিশ অফিসার শ্রীচীন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়ি গিয়ে পুত্রের খবর দিয়েছেন, রাইটার্স বিল্ডিংয়ে তৎকালীন পুলিশ মন্ত্রী কাছে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। শ্যামলের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

পুলিশ অফিসার শচীনবাবু শ্যামলের মায়ের কাছ থেকে নামধাম সব লিখে নিয়ে বলেছিলেন কোন চিন্তা করবেন না, সব ঠিক আছে। যদি কোন থানায় ধরা পড়ে থাকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করব। আগে খোঁজ খবর নিই।

এরপর গত নভেম্বর মাসে একদিন ২১২-৩৬ নাগাদ শ্যামলের পিতা শ্রীদাস যখন অফিসে কাজ করছিলেন তখন দুই ভদ্রলোক তাঁর টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর নাম ধাম জানতে চাইলেন এবং জ্ঞানার পর বললেন, আপনি একটু বাইরে আসবেন, আমরা পুলিশের লোক। 'হু' একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব। ঠিক-ঠিক জবাব দেবেন। তারপর তারা জ্ঞানতে চাইল, শ্রীদাসের কটি সন্তান, তাদের বয়স, তারা কতদূর পড়েছে বা পড়ছে, কে কি চাকরী

(শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

জনতা পার্টির শেষখবর

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মন্ত্রী করো যদি সম্পাদক না থাকতে দাও বলে অশোক দত্ত তদ্বির করছেন। - অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের জনতা পার্টির আভ্যন্তরীণ কৌদল আরো জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে। এখন বিগত লোকসভার নির্বাচনে সংগৃহীত টাকার হিসেবও চাওয়া হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য, গত বিধান সভা নির্বাচনে অশোক দত্ত আর প্রফুল্ল সেন যে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলেছিলেন তার হিসেব নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ রয়েছে। অশোক দত্ত এই বিক্ষোভ থেকে নিজেই বাঁচানোর জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তিনি এতদিন প্রফুল্ল সেনকে ধরে ছিলেন। এখন আর দুজন সাধারণ সম্পাদক হুকুমার বানার্জী ও অশোক মুখার্জীকেও খোসামোদ শুরু করেছেন। এই দুজন দ্বিতীয় গিয়েছিলেন। লোকে বলছে অশোক দত্তই নিয়ে গিয়েছিলেন।

অশোক দত্তের প্রতিটি বিবৃতি এখন অসত্য প্রমাণিত হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে নয়াদিল্লী থেকে দুজন পর্যবেক্ষক মন্ত্রী সেকেন্দার বখ্ত ও লোকসভা সদস্য বজ্রদত্ত শর্মা আগামী

১৬ই আগষ্ট কলকাতায় আসছেন। তারপর এটাও নিশ্চিত যে, এখানে জনতার এ্যাড-হক কমিটি হচ্ছে। যতদূর খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে জানা যায়, অশোক দত্তকে আর সাধারণ সম্পাদক রাখা হবে না। প্রফুল্ল সেন অবশ্য এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন

(শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেস-সি পি আই অবৈধ আঁতাতের এক কুৎসিত কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্টরা নানা মিটি মিটি বুলি আউড়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আবার 'বামপন্থী' সেজে ফিরে আসতে চাইছে। তার জন্য সি, পি, এম ও বামফ্রন্টকে শোশামুদী ও সুরু করেছে। কিন্তু জনসাধারণ কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত এই সাপের মত সর্বনাশা দলটি যদি আবার বাম মোর্চার অঙ্গপ্রবেশ করতে পারে তাহলে যে পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের সমূহ ক্ষতি—একথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বোধহয় বিহীনভাবে বোঝাতে হবে না, বিশেষ করে গত পাঁচ বছরের তিরু অভিজ্ঞতার পর।

মস্তান-গুণ-পাইপগান-পরিপুষ্ট কংগ্রেসীদের সঙ্গে এদেব কুৎসিত ও অবৈধ মিলনের বহু ভয়ঙ্করজনক ঘটনার মধ্যে মাত্র একটি এখানে তুলে ধরতে চাই - যা থেকে স্পষ্ট হবে এদের "রাজনীতির" স্বরূপ। কলকাতা পৌরসভার করণিকদের মধ্যে এই দক্ষিণী কমিউনিষ্টদের ছোট্ট একটি গোষ্ঠী "প্রগতিশীল" কংগ্রেসী স্বরূপ মুখার্জীর মদতে বেশ গুছিয়ে বসেছিল। তবে সি পি আই-দের বিষয়বুদ্ধি প্রবল। তারা যখন বুঝতে সুরু করলো যে কংগ্রেসীদের দিন ঘনিয়ে আসছে তখন নিজেদের আখের গুছিয়ে নেবার

(শেখাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়)

দুর্নীতির দায়ে হাওড়া জেলা কংগ্রেস সম্পাদক গোয়েন্দার কবলে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত রবিবার (৭ই আগষ্ট) বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছে যে কলকাতা পৌরসভার অন্যতম এ্যাসেসিং ইন্সপেক্টর অজয় ঘোষ জাল লোক মারফৎ নকল করে কাইনাল আইন পরীক্ষা দিতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়েছেন সোজা-সুজি গোয়েন্দা দপ্তরের পুলিশের হাতে। পুলিশ অবশ্যই তার নিজের পথে যা ব্যবস্থা নেবার নেবে। কিন্তু পৌরকর্তৃপক্ষ কী করবেন?

এই ভদ্রলোক হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সম্প্রতি প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে পৌরসভার চাকরী পান—সেখানেও

বয়েস ভাঁড়ানো ও অন্যান্য অপকর্মের খবর আছে। তার উপর চাকরী পেয়েই এখানে কর্মচারীদের নেতা বনে বসেন ও কংগ্রেসী ক্যান্ডিডেট কায়দায় ইউনিয়নের কাজ চালাতে থাকেন। অফিসের ফাইল কদাচিৎ ছুঁয়ে দেখেন - দল বেঁধে সি পি আই কর্মীদের নিয়ে আড্ডা মারাই এর কাজ। এ হেন চরম দুর্নীতির দায়ে পুলিশের হাতে ধর-পড়া ব্যক্তিটি কি সি পি আই বেঁধা কংগ্রেসের নেতা বলে বহাল তবিয়তে পৌরসভায় চাকরী করে যাবেন?

শারদীয় সংখ্যা

দর্পণ

দর্পণের শারদীয় সংখ্যা এ বছর পুস্তকাকারে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে অথবা অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হবে।

এই সংখ্যায় থাকবে প্রধানত: রাজনৈতিক বিষয়ে লেখা। প্রতিটি আলোচনাই পাঠকের পক্ষে কৌতূহলোদ্দীপক হবে।

এই সংখ্যায় দাম তিন টাকা
মফঃস্বলের এজেন্টরা
যতশীঘ্র সম্ভব
তাদের চাহিদা জানান

শ্রামল নিখোঁজ

(১ম পৃষ্ঠার প)

বাক্য করে। এরপর তারা বলেন, সব ঠিক আছে। আপনার এখানে এসেছি কাউকে বলবেন না। আপনার দ্বিতীয় ছেলের খোঁজ খবর নেব। কিছু ভাববেন না। তারা পরদিন সকাল ১০টা নাগাদ শ্রামলকে ১০নং লর্ড সিনহা রোডে যেতে বলেন। এই দুজন পুলিশ ইন্সপেক্টরের নাম পবিত্র ভট্টাচার্য ও রঞ্জিত কুমার বহ।

পরদিন শ্রামল ও তাঁর স্ত্রী লর্ড সিনহা রোডে উপস্থিত হলে তাঁদের নিয়ে পবিত্রবাবু একটা জীপে করে ইন্সপেক্টর দুজনের আগে ড্রামকে একটি বাগান বাড়ির দোতলায় নিয়ে যান এবং বেড়িতে বসতে বলেন।

পরে তাঁদের একজন অফিসারের কাছে হাজির করা হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, শ্রামল পাঠি করত কিনা, কোন পুলিশ হত্যার সঙ্গে জড়িত কিনা। সব নিয়ে নিয়ে তিনি শ্রামলকে ভবানী ভবনের জুপারি-টেণ্ডেন্টের নামে একটি আবেদনপত্র দিতে বলেন সমস্ত তথ্য দিয়ে। সেখানে বসে শ্রামলের পত্র লিখতে ৬টা বেজে যায়। তখন পবিত্রবাবু বলেন, আপনি তো চোখে ভাল দেখতে পান না। ওটা আমাদের কাছে দিয়ে যান। আমরা কাল দশটার পর পাঠিয়ে দেব।

তারপর এক ভয়ঙ্কর শ্রামল ও তাঁর স্ত্রীকে টালিগঞ্জ ট্রান্সিটের দ্বায়ে ভুলে দিয়ে বলেন, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে বলবেন কাহিনীটা গল্পনা করতে দিয়েছিলাম। এসব বিষয় কাউকে বলবেন না। আপনার

ছেলের খোঁজ করব। কোন চিন্তা করবেন না।

শ্রামল আশ্বস্ত হয়েছিলেন। ২৩ মাস আগে কোন এল তাঁর অফিসে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল ছেলের কোন খোঁজ পেয়েছেন কি। সেই ব্যক্তি বলেন, টালিগঞ্জ থেকে বলছি। দেখুন, ওর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গিয়ে ওকে মেরে ফেলেছে। তারপর বললেন পুলিশ মেরে ফেলতে পারে। শ্রামল বলেন, আমার ছেলে কোন দোষ করল না, মেরে ফেললেন। আমি যেমন তো? আর কোন জবাব নেই। দুই মাস পর আমার কোন করেছিলেন। শ্রামল তখন ছুটিতে ছিলেন। পরে পুলিশের সেই লোক তাঁকে বলেন ইন্সপেক্টর আন্তোভ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে। ২৩ দিন পর তাঁর সঙ্গে শ্রামল দেখা করলে তিনি ভবানী ভবনের সেই

চিঠির ফাইল বার করে শ্রামলের বয়স, উচ্চতা, পরিধান ইত্যাদি লিখে নেন। শ্রামল বলেন যে, শ্রামলকে পাড়ার তাপস বলে একটা ছেলে ধরিয়ে দিয়েছে। সবাই বলে সে ডি ডির চর। ইন্সপেক্টরবাবু একথা বিশ্বাস করেন না। ঘটনা ঘেড়েক পরে শ্রামল ছাড়া পান। তাঁকে বলা হয় পরে জানানো হবে।

তারপর শ্রামল ২৭/৮/৭৬ তারিখে ভিজিলেন্স কমিশন (১৮নং রডন স্ট্রিট) থেকে ডেপুটি আই জি পুলিশ এ সি সেনের চিঠি পান। তিনি ৩১/৮/৭৬ তারিখে সেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যান। সেখানেও জোর জবাবদা করে তাঁকে দিয়ে আরও একখানি আবেদনপত্র লেখানো হয়। সব জেদার পর তিনি বলেন, আপনি কেন পুলিশের কাছে বর্তেছেন যে, আপনাকে ছেলেকে কোম নদীতে বা হুদারী লোকে করে দিয়ে দিয়ে জল দিয়ে দেওয়া হয়েছে? শ্রামল বলেন, আমি একটা বজিনি। তবে তারপরে একটি ছেলে জল দিয়ে দিয়েছে। সেন সাহেব এ ধরনের কথা বর্তে নিয়ে করে শ্রামলকে দিয়ে জোর করে লিখিয়ে বেন যে, পুলিশের ওপর তাঁর কোম সন্দেহ নেই।

এরপর আর কোন খবর নেই। পুলিশ নির্বিকার। বুদ্ধিমত্তা এখনও পর্যন্ত জামতে পেরেন নি তাঁর ছেলের কোম খবর। তিনি চাকরী থেকে অবসর নিয়েছেন। উপাধীনকর প্রবন্ধে অল্পপস্থিতিতে তাঁর সংসার আর অচল।

বারাসাত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানা গেছে যে, মধ্যপ্রদেশে এই ছেলেদের ধর্ষণের অভিযোগ হয়। আড়িয়ার হর গোবিন্দ ভট্টাচার্যের ছেলে বেটে নামে পরিচিত, যে আসানসোলে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এখন জেল খাটছে। এই ছোকরাই অজয় ঘোষালের শিক্ষা মত এই ছেলেদের এক জায়গায় জড়ো করে। একথা সে পরে নিয়েই স্বীকার করে তার কাটার সময় ধরা পড়ে পাড়ার লোকের হাতে মার খাবার সময়। ২০শে নভেম্বর যুগান্তরে টুকটুক করে ছ'ব'বেশে সে অজয় ঘোষালের পা ধরে কেঁদেছিল আর বলেছিল, করবেন, এখন আমার কি হবে? অজয় ঘোষাল তার বন্ধু কালিপদ দত্তর সাহায্যে বেটেকে কয়েকদিন দমদম জেলে রেখে দেয়।

ছেলেগুলোকে গাড়িতে তোলার পর লালবাজারে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড পেটানো হয়। রাত ১০:১১টার সময় পুলিশের কালো গাড়ি, অজয়ের

আমবাসাভার ও ফুলের ৬০০নং গাড়িতে প্র পুলিশ ও গুটার দল হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ছেলেদের আড়িয়ার হর হাসপাতালে নিয়ে আসে। অজয় ঘোষাল এদের সনাক্ত করে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় হাসপাতালের ভেতর এদের ওপর অসহনিক নির্ধাতি চলল। ডাঃ তাঁপসরজন দাস মহাপাত্র ও তাঁর স্ত্রী ডাঃ মদিকা দাস মহাপাত্র দেবা-শোনা করেন। রাত ১২টা ১১টার সময় ছেলেদের খেলারিরা বাঁমার নিয়ে বাঁগুরা এবং রাত ৩টার বার করে আঁমা হয়। বাঁমার চোকাতে ও বার করতে এবং বাঁমারিরা বতীম ও সতীরকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পুলিশ বধম বারজিত তখন ইন্সপেক্টর হাউজে থাকা ছাড়া ছেলে জা দেবেছে।

জমতা পাটি

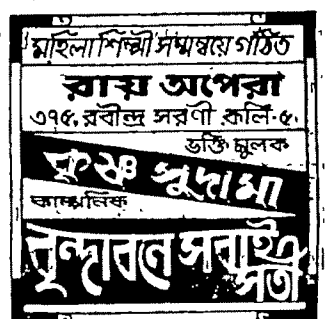
(১ম পৃষ্ঠার পর)

অশোক দত্তের জন্ম। অশোক দত্ত এখন আর একটি কাহিনী করছেন। তিনি প্রায়ই আমদান্যকার পত্রিকার হ' একজন রিপোর্টারকে দিল্লী থেকে কোম করে এটা ওটা বাঘে ধরার দিচ্ছেন। আর ধরনের কার্গিওরা-লারা কোম করেছিল বলে দিল্লীতে হার বাড়িয়েছেন। কিন্তু আসল ঘটনা হচ্ছে অশোক দত্তকে দলের অধিকাংশই চাইছে না।

পুলিশ সুপার এখনও

কংগ্রেসীদের প্রায় দিচ্ছেন

মুর্খদাবাদ জেলার পুলিশ সুপার ইতিপূর্বে ২৪ পরগণা জেলার ডি, আই, বি বিভাগের অতিরিক্ত এস, সি ছিলেন। হুগো বুরে তিনি জমৈক প্রাক্তন কংগ্রেসী বস্তীর কাছে কংগ্রেসের হয়ে কাজ করার শপথ নিয়ে এসেছিলেন এই জেলার এস, সি হয়ে। তাই জেলা বিস্তারিত থানার থামার কংগ্রেসী মোড়লাই এখনো ছড়ি ঘোরায়। যে সব পুলিশ অফিসার কংগ্রেসকে সমর্থন করে নানা রকম দুর্নীতি করতো তারা আজও তা চালিয়ে যাচ্ছে। আর ধারা কংগ্রেসের হয়ে অত্যাচার করেন নি তারা আজও নানাভাবে কতিগ্রস্ত হচ্ছেন। উক্ত পুলিশ সুপার, নিম্নতম পুলিশ কর্মচারীদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার চালান।



ইন্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে

সেফা: ই সি এল। এইচ কিউ। এম ডি। ই এন জি (সি)। টেওয়ার নোটিশ। ডবলু এস/

১। ৭৭-৭৮, তার ২২-৭-৭৭

ইন্টার্ন কোলফিল্ডস লিঃ-এর কোলিয়ারীসমূহে ওয়াটার সোপাই স্বীকৃত নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে।

আর. সি. সি. ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ:

(১) ১,৩৬,২০০ লিটার ক্যাপাসিটি, ১১-২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত (২টি)। ব্যয়বরাদ্: ১৫,১৪৬ টাকা। ব্যয়নার টাকা ১৫২ টাকা। টেওয়ার দলিলের নং: ১। সি এইচ ই। ৭৭-৭৮। (২) ১০৮০০ লিটার ক্যাপাসিটি, ১২-২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত (৩টি); ৭৭,৫০৮ টাকা, ৭৭৫ টাকা, নং: ২। সি এইচ ই। ৭৭-৭৮। কাজটি ১ মাসে সম্পূর্ণ করতে হবে।

নিম্নোক্ত স্থানে পাল্পহাউস ও অন্যান্য বিভিন্ন কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে:

(১) চোরা ৭ ও ১, পিটস, ব্যয়বরাদ্: ১,২২,২১৭ টাকা। ব্যয়নার টাকা: ১,২২৩ টাকা। টেওয়ার দলিল নং: ৩। সি এইচ ই। ৭৭-৭৮। (২) রীয়েল কাজোড়া কোলিয়ারী ২২,৭২৭ টাকা, ২২৭ টাকা। নং: ৪। সি এইচ ই। ৭৭-৭৮। কাজটি ৬ মাসে সম্পূর্ণ করিতে হবে।

নিম্নোক্ত স্থানে পাইপ লাইন স্থাপন:

(১) রাণীপুর কোলিয়ারী, ব্যয়বরাদ্: ২,৬৫,৬৩১.৫২ টাকা। ব্যয়নার টাকা: ২,৬৫৬ টাকা। টেওয়ার দলিল নং: ৫। সি এইচ ই। ৭৭-৭৮। (২) বাহজা, আমবাধ ও লোরার কেণ্ডা কোলিয়ারী, ১,০২,৩৫৮-৪২ টাকা, ১,০২৪ টাকা। নং: ৬। সি এইচ ই। ৭৭-৭৮। (৩) কুমারদিহি কোলিয়ারী, ১,৪৫০৪০.৮৩ টাকা। ১,৪৫০ টাকা। নং: ৭। সি এইচ ই। ৭৭-৭৮। (৪) ৪ এরিয়ার জি এম'র অফিস ও হাউসিং কমপ্লেক্স ১,৪৪,৩৮৮.৩৪ টাকা, ১,৪৪৪ টাকা। নং: ৮। সি এইচ ই। ৭৭-৭৮। কাজটি ৪ মাসে সম্পূর্ণ করতে হবে।

আর সি সি ওভারহেড ট্যাঙ্কের জন্য টেওয়ারদাতাদের ডিপার্টমেন্টের এননীয় নিজস্ব নকসার উপর খোক ভিত্তিতে দর উল্লেখ করতে হবে। টেওয়ারদাতাদের স্বীয় টেওয়ার দলিলে অন্তর্ভুক্ত সম্পূর্ণ কাজের জন্য দর উল্লেখ করতে হবে। টেওয়ারপত্র আডি: চীফ ইঞ্জিনিয়ারের (সিভিল) অফিস থেকে ২২-৮-৭৭ থেকে ৭-২-১৯৭৭ যে কোন কাজের দিনে পাওয়া যাবে। ব্যক্তিগতভাবে এসে-সংগ্রহ করলে প্রতিটির জন্য ৫০ টাকা (পঞ্চাশ টাকা) এবং ডাকযোগে চাইলে ৬০ টাকা (ষাট টাকা) জমা দিতে হবে (ফেরতযোগ্য নয়)।

সমস্ত কাজের জন্য টেওয়ার ৮-২-৭৭ তারিখে বেলা ১টা পর্যন্ত শাকতোড়িয়ার অ্যাডি: চীফ ইঞ্জিনিয়ারের (সি) অফিসে গ্রহণ করা হবে এবং ঐ দিনই বেলা ২-৩০টার উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেওয়ারদাতা অথবা তাঁদের অধ্যক্ষপ্রতি প্রতিনিধিবর্গের উপস্থিতিতে খোলা হবে।

শনিবার ব্যতীত অন্যান্য সব কাজের দিনে বেলা ১২টা পর্যন্ত এবং শনিবার বেলা ১১টা পর্যন্ত শাকতোড়িয়ায় এম ডি'র অফিসে ক্যাশিয়ার কর্তৃক নগদ অর্থ গ্রহণ করা হবে।

কয়লা-দামে সম্মতা, জ্বলে বেশী

কলকাতার একটি ভাবী সমস্যা ও সি এম পি এ

(সংবাদদাতা প্রেতিত)

দর্পণে প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি সরকারী দপ্তর সম্পর্কে সরকার যথোচিত পদক্ষেপ করেছেন বলেই মনে হয়। সি এম পি ও দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার শ্রীমতী শ্রীমতী অশোক মিত্র তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর চলে সাজাবার জন্য প্রচণ্ড রকম সক্রিয় হয়েছেন।

কিন্তু মন্ত্রীমশায় সম্ভবতঃ এখনও জনসাধারণের এই জরুরী দপ্তরটির ভিতরের অগ্ৰহণাত্মক শক্তির সন্ধান পান নি। এ বিষয়ে সংক্ষেপে মাত্র একটি উদাহরণ দিই। কলকাতার হতভাগ্য মানুষ এখনও জানে না যে, পাতাল রেলের মত অতিপ্রয়োজনীয় মাস্ট্রানজিট্ লাইন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি অবর্ণনীয় লড়াই বেলগাছিয়া থেকে টালীগঞ্জ পর্যন্ত শুরু হবে। সতেরোটি টিউব-স্টেশন মারফৎ যে লক্ষ লক্ষ যাত্রী এবং মালপত্র পাতাল থেকে ভূপৃষ্ঠে অথবা পাতালে চলাচল করবার কথা তার দক্ষণ প্রত্যেকটি টিউব স্টেশন সংলগ্ন (বিশেষতঃ মধ্য কলকাতা) এলাকায় কি বর্ণনাতেই ইম্প্যাক্ট সৃষ্টি হবে সেটা সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে। লগুন, মস্কো অথবা ফ্রান্স-প্রতিটি ক্ষেত্রে ভূগর্ভ থেকে উদ্ধৃত এই ভয়ংকর সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য অনেক আগেই প্রতিটি টিউব-স্টেশনের ভূপৃষ্ঠ সন্নিহিত এলাকার ট্রাফিক-চলাচল তথা মানুষের বাজীর অদল বদল করার প্রকল্প রচিত হয়েছে। পাওয়ার স্টেশন অকেজো হলে সারা দেশে প্যাহুৎ-সংকটের বিপর্যয় কবে ঘটবে সে কথা অন্তর্দেখে আগেই ভাবা হয়, টিউব-রেলের দরুন উদ্ধৃত সমস্যা কি দাঁড়াবে সেকথাও আগে থেকেই সে সব দেশে ভাবা হয়।

সি এম পি ও দপ্তরে ১৮নং রবীন্দ্র সরণিতে টিউব-রেলের ভয়ংকর সমস্যা মোকাবিলার জন্য যে প্রকল্প রচিত হচ্ছিল, সত্যি কথা বলতে গেলে সমগ্র পরিকল্পনা দপ্তরে সেটাই ছিল একমাত্র কাজ, সেটাই ছিল বিপুল দায়িত্ব। এই কাজের টেকনোলজি ন সারা পূর্ব গোলাপে সম্পূর্ণ হুন। সেই অতি প্রয়োজনীয় প্র্যানিংএ নিযুক্ত দক্ষ কারিগরী কর্মীরা আকস্মিক আঘাতে লগুগু হয়ে গেছেন নতুন ক্ষমতা বসবার অল্প কিছুকাল আগে। সমগ্র পূর্বভারতের

স্বার্থে অগ্রসরমান অতি গুরুত্বপূর্ণ সেই প্র্যানিং সেলেক্ট করবার পর তার গলা টিপে খতম করে দেওয়া হয়েছে। সেইসব দক্ষ কারিগরী কর্মীদের অনেকেই দীর্ঘ ১০ বছরের পাওনা একটা তুচ্ছ প্রমোশন বা সিলেকশন গ্রেড তাদের কপালে ছোটে নি। অথচ লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয়ের স্রোত অব্যাহত। কেবলমাত্র সেইরকম দক্ষ কর্মী ছাড়া বাকী অনেকেই সিলেকশন গ্রেড বা একাধিক প্রমোশন পেয়েছেন।

অতীতের কোনও মূর্খপরিকল্পনার ফলে কারখানার চাকা বন্ধ হয়েছে অথবা ঘরাক্ত দেহে পাখার হাওয়া লাগছে না—এই সব দেখে যে দেশে

বার্ণ স্ট্যাণ্ড কোম্পানীর বার্নপুর কারখানায় লুণ্ঠের রাজত্ব

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বার্ন স্ট্যাণ্ড কোম্পানীর বার্নপুরস্থ ওয়াগন কারখানায় এখন লুণ্ঠের রাজত্ব চলছে। প্রমিক কর্মচারীদের আশা ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণের পর এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক উন্নতি হবে এবং সেই সঙ্গে তাদেরও অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। কর্তৃপক্ষ প্রমিক কর্মচারীদের সমস্তাগুলি সহায়ত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন। কিন্তু কার্যত তার বিপরীত চিত্রই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণের পর পরই এই কারখানায় একটি দুর্নীতি চক্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রমিক-

দের ধারণা কারখানার জেনারেল ম্যানেজার ও কয়েকজন পদস্থ কর্মচারীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও প্ররোচনায় এই ধরণের দুর্নীতি চলতে পারে না।

এই কারখানায় জ্বৈনক ঠিকাদারের আধিপত্যও লক্ষ্যীয়। সম্প্রতি এই ঠিকাদারকে টালি বিক্রয় নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ যে বদান্ততা দেখিয়েছেন তা দুর্নীতিরই নামান্তর বলা চলে। বাছারে যে টালি প্রতি শ'র মূল্য ন্যূনপক্ষে ২৫০ টাকা হয় (শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়)

রেলওয়ে অফিসারের খামখেয়ালিতে যাত্রীদের দুর্ভোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রেলওয়ে অফিসারদের খামখেয়ালীপনায় যাত্রী দুর্ভোগের একটি ঘটনা আমাদের নজরে এসেছে। রেলওয়ে আইন অনুসারে কোন ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের কোন অংশের কোন পরিবর্তন করতে হলে রেলওয়ে ডিভাইন সংস্থার অগ্রিম অনুমোদন নেওয়ার পরই তা লাইনে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু অতি সম্প্রতি আসানসোলার মিঃ শর্মা নামে একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নিজের খুশিমত এল ৩০১ ইলেকট্রিক ইঞ্জিনটির একটি অংশের (কাউ কাচার) কিছু পরিবর্তন করেন এবং গত ১ই জুলাই ইঞ্জিনটি যখন

২২নং ডাউন ও ১নং আপ-এ যাত্রী পরিবহনের জন্য লাইনে ব্যবহার করা হয় তখন এই বিশেষ অংশটির পরিবর্তনের জন্তই লাইনে পাথর ছিটকাতে থাকে। এর ফলে ২২নং যাত্রী আহত হয় এবং ইঞ্জিনটিও অগ্নালে বিকল হয়ে পড়ে। ট্রেনের ড্রাইভারও এ ব্যাপারে নিষিদ্ধ অভিযোগ পেশ করেন। পরে ইঞ্জিনটি আসানসোল শেডে ফিরিয়ে এনে যথারীতি পূর্বের অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। শোনা যাচ্ছে পাছে এ ব্যাপারে কোন তদন্ত হয় তাই প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজ পত্র সরিয়ে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে।

কলকাতা পৌরসভার আরও কাহিনী

হীরেন বসু

তিন বছর নয় মাসের কার্যকালে স্বতন্ত্র মুখাঙ্গিরা এবং তার লেফটেন্যান্ট অফিসারেরা এই শহর এবং পৌরসংস্থাটিতে কোন রসাতলে পাঠিয়ে গেছে বর্তমান বানভাসিতে পুরবাসী তা হাড়ে হাড়ে মালুম পাচ্ছে। ১৯৭২ সাল থেকেই স্বর্গতঃ পয়ঃপ্রণালী থেকে পাক তোলার কাজ শিথিল হয়ে আসছিল; স্বতন্ত্র মুখাঙ্গির আমলে তা একেবারে বন্ধ। স্বতন্ত্রবাবু কাজের ছেলে। তিনি জানতেন যৈবন থাকতেই গাঁটে কড়ি বাঁধা ভাল, যৈবন গেলে কেউ পুছবে না। তা তিনি ভালই বেঁধেছেন।

কেবল স্বতন্ত্রবাবু কেন তার কর্পোরেশনী অফিসার-চম্ যারা ৭৪ সালে ধর্মঘট ভাঙার কাজে দালালি করে সমাদ্রার সাহেব তথা স্বতন্ত্র মুখাঙ্গির গুড বুক এসেছিলেন সেই সব 'ডি সিরি, কনট্রোলিং অফিসার এবং বিভাগীয় মাথারা অনিল মৈত্রের পোষপুত্র শ্রাম পালের মত ভাঁড়, অচিন্ত্য সরকার এবং সাতকড়ি চক্রবর্তীর মত ফন্সীবাজ দালাল, অনিল রায় এ কে সেনের মত ধূর্ত আড়কাঠি এবং জিতেন চ্যাটার্জি গৌর দাসের মত নির্লজ্জ চাটুকার মন্ত্রী ইচ্ছাপূরণ এবং পৌরসভার ক্ষতি করে প্রমোশন আদি স্ববিধা বাগিয়ে নিয়েছেন। আর একটি উজ্জল রত্ন হলেন স্বনীল সেনগুপ্ত। এই তারের ব্যক্তিটি হলেন কলকাতা পৌরসভাকে গোবিন্দের দান, এর জন্য একটা আলাদা পর্বই লিখতে হবে।

রথি মহাবুধি কথা

একটালি ওয়ার্কশপের নানাবিধ চুরি জোচ্চুরি ও গুণামিকে প্ররোচন দিয়ে কংগ্রেসের, বিশেষত স্বতন্ত্র নেকনজরে এসে সাতকড়ি চক্রবর্তী এখন একেবারে আতুল ফুলে কলাগাছ—ডেপুটি ডিরেক্টর কনসারভ্যাটিভ অফিসারদের গাড়ি বটনের ব্যাপারটাও নাকি এর হাতে। জানতে পারি কি বেলিক মধু চ্যাটার্জি, সি-এ বাবলু মুখাঙ্গিকে তিনি গাড়ি পাঠাতেন কর্পোরেশনের কোন আইনে? বাবলু মুখাঙ্গির ভাইয়ের শালা মিঃ ব্যানার্জিকে না হয় স্বতন্ত্র দৌলতে সেক্ট্রাল গ্যারাজের কোরম্যান করা

হয়েছে অ্যাড হক অর্থাৎ অস্থায়ী ভাবে। কিন্তু তার যাতায়াতের জন্যও গাড়ি? কর্পোরেশনের কোন কোন অফিসার গাড়ি পাওয়ার লায়েক? সেক্রেটারিরা আগে পি-এস-সির চেয়ারম্যানকেও কর্পোরেশনের গাড়ি পাঠিয়ে নিজেদের প্রমোশনের সজ্জাবনা পাকা করতেন। তা কি এখনো প্রশান্ত-বাবুর আমলেও চালিয়ে যাচ্ছেন সাতকড়িবাবু? রোজ রোজ-রাই-টাসে। তার কী দরকার? তৈলদান? কিন্তু ওতে কি এবারে কাজ হবে?

চকচকে নতুন পাম্প অকেজো থবরে দেখলাম ঘটনাটা। দিল্লীর কোন কোম্পানী থেকে লক্ষাধিক টাকায় কেনা নতুন পাম্প জল টানে না। মৌখিক-টেণ্ডারের ব্যবস্থা কেবল ইলেকট্রিসিটি বোর্ডেই চলত না—পৌরসভায়ও বিলক্ষণ চালু ছিল তার প্রমাণ মন্থঃকীড অকেজো যন্ত্র। ট্রেন্স, সেক্ট্রাল গ্যারাজ এবং টালাপলতায় এমন জিনিস অনেক পাওয়া যাবে। স্বতন্ত্রবাবুর ইচ্ছিতে প্রমোশন লোলুপ অফিসারেরা চোখবুজে নোট লিখেছেন এবং অ্যাপ্রভাল শ্রাংশন ইত্যাদি দিয়েছেন। আজকে ন্যাকা সাজলে চলবে কেন?

গাড়ি কেনার ব্যাপারে আর একটি চক্র ছিল। টাটা মার্ভিডিজ ৮০টি কেনার পরে চালু গাড়ির সংখ্যা যখন ১২০ তখনও শহরে জঞ্জাল জমে থাকে কী করে?

পথ হল বৈরী

ধাপা এবং বানভাসায় যাওয়ার রাস্তা খারাপ হয়েছিল ছয় বছর আগে। এতকাল এই সব চামচে ইঞ্জিনিয়ারেরা কার পায়ের তৈল-নিষেক করছিলেন সে কৈফিয়ৎ মন্ত্রীমশায় চাইবেন কি? প্রশাসক মশায় তার বিজ্ঞাপনের একটা অংশ এই বাবলু খরচ করলেন না কেন? শাস্তি সেনই বা এতকাল পায়ের তৈল দিয়ে এখন হঠাৎ জেগে উঠলেন কেন? এতদিন এ কাজ না করে স্বতন্ত্র সংগে কোন হিস্তার সলা করছিলেম?

জন-বিরোধী শিক্ষা পরিকল্পনা

মদনমোহন চন্দ্র

ধরুন, সরকার একটি নতুন প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাবটি শুনে বিচলিত হবেন না কেউ যেন, কারণ একটা পরিণতি বর্ণনা করার সুবিধার জন্য ধরে নিতে বলছি। প্রস্তাবটি হল: কয়েকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হবে। এম, এ, পাশ শিক্ষকগণকে প্রস্তাবিত ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা যেতে পারে। প্রধান শিক্ষকগণকে অরর উপাচার্য আখ্যা দেওয়া হবে। দরখাস্তকারী বিভাগ-লয়ের উপযুক্ত ঘরবাড়ি থাকা চাই। আপাতত কোনো টাকা পয়সা দেওয়া হবে না।

আমার বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ স্কুল উঠে-পড়ে লাগবে ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার জন্য। তদ্বির-তদারক, গণদরখাস্ত ইত্যাদি করার হিড়িক পড়ে যাবে। আমার বিশ্বাসকে যদি কেউ অবিশ্বাস করেন, তাহলে তাঁকে অহরোধ করব—দয়া করে একবার স্বরণ করুন মাত্র এক বছর আগে আপনার এলাকার স্কুলে কী উপায়ে বারো ক্লাসের হায়ার সেকেন্ডারী খোলা হয়েছে। এগারো ক্লাসের হায়ার সেকেন্ডারীর সময় শুধু ডি, পি, আই, অফিসে বা ক্ষেত্রবিধে মজুরি কাছে ধর্ণা দিতে হয়েছিল। বারো ক্লাসের বেলায় ধর্ণা দিতে হয়েছিল কংগ্রেসী নেতাদের বাড়িতে।

কী কারণে এত তদবির-তদারক, নেতা-ভজনা? এলাকাটি যাতে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য? ছাত্র ছাত্রী গণকে শিক্ষাদানের আন্তরিক বাসনার জন্য?

না হয় তাই ধরে নেওয়া গেল। জুলাই মাস থেকে হায়ার সেকেন্ডারীর শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে। অবশ্য কাগজে কলমে। ছাত্র ছাত্রী র ফী আদায়ের রসিদ নামক কাগজে কলম দিয়ে যা লেখা হয়েছে, তাতে দেখা যায় জুলাই মাস থেকে বেতন ও বহুবিধ ফী আদায় করা হয়েছে, যার মোট পরিমাণ শতাধিক টাকা। পুজোর বন্ধ সমেত চার মাস পর নভেম্বর থেকে “অধ্যাপনা” শুরু হয়েছে। মে মাসে পরীক্ষা! এই সাত মাসের মধ্যে কতদিন ক্লাস হয়েছে? ২৫শে ডিসেম্বর থেকে পয়লা জাহ্নস্মারী পর্যন্ত বড়দিন। মাধ্যমিকের শিক্ষাবর্ষ-সমাপ্তি ও নববর্ষ উপলক্ষে মাধ্যমিকের সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিকও বন্ধ ছিল। জাহ্নস্মারীতে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর শিপি-

লতা থেকে একাদশ শ্রেণী মুক্ত ছিল কি? ফেব্রুয়ারীতে যতগুলি স্পোর্টসের আয়োজন হয়েছিল, তাতে সেকেন্ডারীর টানে হায়ার সেকেন্ডারীকেও জড়িয়ে পড়তে হয় নি কি? নভেম্বরে যখন প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা চলছিল এবং এপ্রিল মে মাসে যখন মাধ্যমিক ও পুরনো হায়ার সেকেন্ডারী ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল, তখন একাদশ শ্রেণীর ক্লাস চলছিল কি? এইবার হিসাব করে দেখুন তো একাদশ শ্রেণীর ক্লাস সাত মাসে কতদিন হয়েছে।

যে-শিক্ষক মহাশয়গণ পড়াচ্ছেন তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করছি—বলুন তো পাঠ্যবস্তুর বহরটা কেমন? বইগুলির ওজন ও দাম কেমন? কতটা শেখাতে পেরেছেন? তাঁরা হয়তো বলবেন—কোর্স কমপ্লিট করে দিয়েছি। আমার জিজ্ঞাস্তা কিন্তু তানয়। আমি জানতে চাই—ছাত্র-ছাত্রীরা শিখেছে কি?

না, তাঁরা শিখতে পারে নি। বেচারীরা অধৈর্যে জলে পড়েছে। ঐ সামান্য কয়েকটা দিনে ঐসব ভারী ভারী বিষয় শেখানো ও শেখা যায় না। শিক্ষক মহাশয়গণও যে-উৎসাহ নিয়ে গোড়ায় আরম্ভ করেছিলেন, তা আর নাই। এখন তাঁদের আপশোস—কি ফল লভিষ্ক হয়! তাঁরা এখন ঈদের চাঁদ দেখার আশায় আকাশের দিকে চেয়ে থাকার মতো নতুন পে-ক্সেলের অপেক্ষায় রয়েছেন।

বিগত কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা-নীতির উদ্দেশ্য কী? অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষা নেবে। তাদের ঘারা চলবে রাজ্যে ও কেন্দ্রে প্রশাসনকার্য, শিল্পপতিদের কলকারখানা-পরিচালনার কাজ, ইত্যাদি। তাদের ঘারা তৈরী হবে একটা নতুন শ্রেণী, যারা নিজেদেরকে কোনো মতেই সাধারণ মানুষের আত্মীয় ভাববে না। ইংরেজ শাসকরা যেমন তৈরী করেছিল। এই উচ্চশিক্ষার জন্য ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন যথেষ্ট অর্থ মঞ্জুর করবে। অতএব দুই বৎসরের হায়ার সেকেন্ডারীটা হচ্ছে একটা চেক-ভালভ।

আমাদের দেশের সমগ্র শিক্ষা-কাঠামোটা ঠিক এই রকম: চার বছরের অবৈতনিক শিক্ষাটা হচ্ছে কান্দালী ভোজনের ব্যবস্থা, ছয় বছরের মাধ্যমিক শিক্ষাটা হ'ল সস্তা হোটেলের আহাৰ্য পরিবেশন, দুই বৎসরের হায়ার সেকেন্ডারীটা দুশাচা আহাৰ্য গ্রহণের জন্য অপেক্ষাকৃত

ব্যয়সাধ্য হে টেল এবং উচ্চ শিক্ষাটা হবে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্য খানা পরিবেশনের অভিজাত হোটেল।

১৯২৩ সালের মার্চ মাসে বডলাট লর্ড লিটন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর সার আন্তোয়াকে লিখত এক পত্রে অভিযোগ করেছিলেন যে, তিনি সরকারী শিক্ষা পরিকল্পনা কার্যকরী করার কাজে সহযোগিতা করছেন না। এব উত্তরে সার আন্তোয়া লিখেছিলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত সরকারী শিক্ষা বিলের বিরোধিতা তিনি করবেনই। উক্ত ঘটনার অর্ধ শতাব্দী কাল পরে আজ আমরা একট জনবিরোধী শিক্ষা-পরিকল্প-

সরকারপুৰ মানসিক হাসপাতাল সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ

(সংবাদদাতা গ্রেবিত)

সরকারপুৰ মানসিক হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ ডাঃ বিজয় আইচ সরকারের জলুম ও অত্যাচারে কয়েক বছর যাবত শুধু হাসপাতালের শ্রমিক কর্মচারীরাই নয়, এলাকার মানুষও নষ্ট হয়ে গেছে। হাসপাতালের আশেপাশের লোকের ঘরবাড়ী জমি জায়গা জোর করে দখল করে বাস্তহারা করেছেন বাসিন্দাদের। এলাকার মানুষ বহুবার ডাঃ সরকারের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, ওপরওয়ালাকে জানিয়েছেন, কিন্তু প্রতিকারের আশ্বাস এলাকার মানুষ ওপরওয়ালার কাছ থেকে পাননি। বরঞ্চ দিন দিন আরো স্বৈরাচারী হয়ে উঠছেন ডাঃ সরকার, বিশেষ করে জরুরী অবস্থায়।

হাসপাতালের কর্মচারীরা ডাঃ সরকারের দাপটে এতদিন সাহস পাননি একাবন্ধ হবার। গত লোক-সভা নির্বাচনের পর দেশে যে নতুন রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তাতে কর্মচারীরা একাবন্ধ হবার চেষ্টা করেন এবং এই এলাকার সংগ্রামী শ্রমিক নেতা প্রশান্ত মজুমদার ও স্বভাষ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একটি একাবন্ধ সংগঠন গড়ে তোলেন। ইউনিয়নটি গড়ে ওঠায় কর্মচারীদের মধ্যে যেমন উৎসাহ দেখা দেয় তেমনি লক্ষণীয় ভাবে এলাকার মানুষও উৎসাহিত হয়ে ওঠে। দলমত নির্বিশেষে এলাকার সাধারণ মানুষ সংগ্রামী শ্রমিকদের সমর্থনে এগিয়ে

নাকে কার্যকরী করার কাজে প্রতিযোগিতা শুরু করেছি। অভিজাত হোটেলের মধ্যে যাতে অবাস্থিতগণ প্রবেশ করতে না পারে, তারজন্য প্রতিরোধের যে ব্যবস্থা, তাতে আমরা মহা উৎসাহে অংশ নিয়েছি।

অনেকে সরল চিন্তে প্রশ্ন করেন: আগে ছিল দুই বছরের ইন্টারমিডিয়েট। এখন চালু হল দুই বছরের হায়ার সেকেন্ডারী, অতএব ব্যাপার তো একই। তাহলে আগের মতো ওটাকে কলেজে পড়ানোর ব্যবস্থা করলে ক্ষতি কি?

এর উত্তরে সিংহাসনচ্যুত রাজার বেতনভোগী পণ্ডিতগণ তেড়ে আসেন: খবরদার, গুলিয়ে ফেলো না। এটা হল সেকেন্ডারী শিক্ষার অঙ্গ। অতএব সেকেন্ডারী এলাকার মধ্যেই শেখানোর ব্যবস্থা চাই।

আসেন। এই অবস্থায় ওরা জুলাই কর্তৃপক্ষ হঠাৎ সংস্থার দুজন কর্মচারী ভক্ত গিরি ও কৃষ্ণবাহাদুরকে কোন কারণ না দেখিয়ে ছাঁটাই এবং অপর দুজনকে কোন কারণ না দেখিয়ে ১০ টাকা করে/জরিমানা করার সংগঠিত শ্রমিকেরা তীব্র প্রতিবাদ করেন। প্রায় ১২ ঘণ্টা পর ছাঁটাই নোটিশও জরিমানা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

গত ৯ই জুলাই কর্তৃপক্ষ আকস্মিক ভাবে অধিকাংশ কর্মচারীকে কর্মস্থলে তালোচাবি দিয়ে আটকে রেখে দেয়। এবং একজন কর্মচারীকে বাধ্যতামূলক ছুটি নিতে বলে। সেই কর্মচারী এতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে গলাধাক্কা দিয়ে হাসপাতালের সীমানার বাইরে বের করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার ফলে এলাকার সাধারণ জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ডাঃ সরকার বিক্ষোভকারীদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে থাকেন। স্থানীয় সি, পি, এম-সংগঠক অসীম মৌলিককে ‘লাশ গুম করে দেব’ বলে ডাক্তার হুমকি দেন। এই ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশের তৎপরতায় ঘটনা আয়ত্তে আসে। কর্তৃপক্ষ পুলিশের কাছে প্রতিশ্রুতি দেয় যে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর ভবিষ্যতে ঘটবে না।

কিন্তু কয়েকদিন পর গত ১৬ই জুলাই ডাঃ সরকার আবার দুজন কর্মচারীকে গুম করে ফেলার জন্য

আসল কথাটা কী? পূর্বে ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল স্কুলের শিক্ষা শেষ করে যারা উচ্চশিক্ষার জন্য আসবে, তাদেরকে দুই বছর ধরে উপযুক্ত করে তোলা। এ উদ্দেশ্য ইতিবাচক। কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারীর উদ্দেশ্য নেতিবাচক। উচ্চশিক্ষার দরজায় যাতে শিক্ষার্থী হাজির হতেই না পারে, তার ব্যবস্থা এখানে।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য যেমন পরিবার পরিকল্পনা, তেমনি শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা। একট সরকারের তো দুই রকম নীতি, দুই রকম লক্ষ্য থাকতে পারে না। একটিই থাকে। সেটিকে বুঝতে পারলেই তার সকল কাজকর্মকে বোঝা যায়।

রিভলবার দেখিয়ে জোর করে গাড়ীতে তুলে নিয়ে যাবার জন্য চক্রান্তে মেতে ওঠেন। সকল কর্মচারী এতে বাধ্য দিতে এলে গুলী করে মেরে ফেলার হুমকী দেয়া হয় এবং দুইজন কর্মচারী স্বপন চন্দ ও হুমভাষ চন্দকে মারতে মারতে গাড়ীতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়নের সভাপতি প্রশান্ত মজুমদার মহেশতলা থানায় ও, সি-র কাছে আরো কিছু কর্মচারীকে নিয়ে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেন। থানায় ও, সি, নিজে এসে প্রত্যক্ষ ভাবে ঘটনার তদন্ত করেন। ঘটনার প্রায় ৫ ঘণ্টা পর স্বভাষ চন্দ ও স্বপন পুলিশের কাছে এসে তাদের জবানবন্দী দেন।

কর্তৃপক্ষের দাবী

সরকারপুৰ মানসিক হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে এই সংস্থার নতুন সভাপতি হয়েছেন স্পীকার মনম্বর হরিবুজা। তিনি সম্প্রতি হাসপাতালের কার্যভার গ্রহণ করেছেন। ঠিক দশ বছর আগে যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য এই হাসপাতালের উদ্বোধন করেছিলেন। তখন হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ছিল ১৭টি, এখন ১৭০। কর্মচারী ছিলেন ৬জন, এখন ৬০ জন। জমি ছিল এক বিঘা, এখন দশ বিঘা।

হাসপাতালের মূল প্রতিষ্ঠাতা হলেন ডাঃ বিজয় আইচ সরকার ও শ্রীমতী প্রভা সরকার। তাঁরা হাসপাতালের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বলেন যে, প্রতিষ্ঠানটি ক্রমেই উন্নতির দিকে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ আরও জানান যে, মনোরোগীদের বৃত্তিশিক্ষণ ও রোগ নিরাময়ের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কালিম্পাংয়ে একটি ২৫-শয্যা বিশিষ্ট আবাস প্রতিষ্ঠান প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় নাট্যশালা প্রসঙ্গে

রাখাল ভট্টাচার্য

সম্প্রতি প্রেস ক্লাবে তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী শ্রীমান বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 'মীট দ্য প্রেস' অস্থানের অববহিত পরেই কলকাতার এক প্রধান সাংবাদিক আমাকে জানান যে মন্ত্রী মহোদয় জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ আগ্রহী। ওই ঘটনার দুদিন আগে প্রকাশিত ৩০শে এপ্রিল তারিখের দেশ পত্রিকায় রুজুপ্রসাদ সেনগুপ্ত "জাতীয় নাট্যশালা" প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, যদিও তাতে কোনও কংক্রিট প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয়নি।

জাতীয় নাট্যশালা সম্পর্কিত চেতনা প্রথম অঙ্কুরিত হয় রাজা সুবোধ মল্লিক কর্তৃক জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (যাদবপুর) প্রতিষ্ঠার সময়। ব্রিট্রিশ শাসনের অধীনে জাশজালাল নবগোপাল থেকে এই সেদিন পর্যন্ত জাতীয়তার চেতনা সমাজনেতাদের মনের প্রবল আবেগ ছিল।

এরপর ১৯২৩ এ যখন সীতা নাটক দেখতে এসেছিলেন কলকাতার প্রথম মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং তাঁর কাছে শিশিরকুমার জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার কথা বললে দেশবন্ধু জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা হবে বলে শিশিরকুমারকে আশ্বাসও দিয়েছিলেন। পরের বছরই দেশবন্ধুর তিরোধান ঘটে এবং পরিকল্পনাটি আর অঙ্কুরিত হতে পারেনি। ওই সময় জাতীয় নাট্যশালা হলে স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্ব শিশিরকুমারেই হত।

কিন্তু এরপর সম্পূর্ণ পরিবর্তিত পরিবেশে ভক্তির বিধানচন্দ্র রায় যখন ৫০ এর যুগে শিশিরকুমারকে তাঁর ওয়েলিংটন ষ্ট্রিটের বাড়িতে ডেকে পাঠান জাতীয় নাট্যশালা বিষয়ে আলোচনার জন্য শিশিরকুমার সেখানে পৌঁছেই দেখেন বাংলা পেশাদার মঞ্চের দুই রাঘব বোয়াল মালিক সেখানে আগেরভাগে এসে জুড়ে বসে আছেন। অবস্থা দেখেই শিশিরকুমার উঠে পড়লেন, অজুহাত দিলেন, আমার শ্রীরঙ্গ নিয়ে মাথলা চলছে, অতএব আমার পক্ষে বসা সম্ভব নয়। কেউ কিন্তু তাঁকে বললেন না যে শ্রীরঙ্গকেই জাতীয় নাট্যশালা করা যায় কিনা সে বিষয়টি আলোচনার উপযুক্ত।

সেদিনের পরিবেশও আজ আর নেই। ১৯৬০-এ যখন ক্যাথোডাল রোডে 'রবীন্দ্র সরণী'র (পরে সরণী বদলে 'সদন' করা হয়) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়, তখন ঐ প্রেক্ষাগৃহটি জাতীয় নাট্যশালা হলে বলেই ঘোষণা

করা হয়েছিল। উদ্বোধন দিবসে ২৬ বৈশাখ (১৯৬৬) শিল্পীসাহিত্যিক ও নাট্যরসিকদের এক সমাবেশে আমি প্রদ্যেয় মন্মথ রায় ও স্নেহভাষন সবিতাব্রতকে বলেছিলাম, সরকার জাতীয় নাট্যশালা তৈরী করলে তার কট্টোল রাজনৈতিক পালা বদল অস্থায়ী রাজনৈতিক দলের হাতে থাকবে, সেটা আর বাই হোক, 'জাতীয়' হবে না। আমি আরো প্রস্তাব করেছিলাম যে ১০০টি নাট্য দল হাজার টাকা করে দিয়ে একটি লক্ষ টাকার ফাণ্ড করে কর্পোরেশনের কাছে জমি এবং সরকারের কাছে অর্থ সাহায্য নিয়ে নাট্যসংস্থার গঠন কর্তব্য। যিনি ও ব্যবস্থাপনায় জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা হতে পারে। এইখানে প্রথম হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিটি আমি দিয়েছিলাম কিন্তু কারো কোনও গা দেখতে পাইনি।

এরও কিছু পরে প্রশান্ত শূর (বর্তমান পৌরমন্ত্রী) যখন কলকাতার মেয়র তাঁরই আত্মতত্ত্ব প্রসঙ্গ আলোচনামূলক সম্মেলনে তাঁর ঘরে মিলিত নাট্যমোদীদের মধ্যে বিজ্ঞান ভট্টাচার্য প্রস্তাব করেছিলেন, পৌরসংস্থা যেন প্রতিটি পার্কে ছটি করে মুক্ত মঞ্চ গড়ে দেয়। বিজ্ঞানবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন জোছন দস্তিদার। বিরোধিতা করে আমি বলেছিলাম, ম্যান ক্যান নট লিভ অন স্টেজ অ্যালোন; পার্কগুলির আরো অল্প সামাজিক প্রয়োজন আছে, ওগুলিকে নাট্যমঞ্চ দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া উচিত হবে না। শূর মহাশয় হেসে বলেছিলেন, যে পৌরসংস্থা রাস্তার জুড়াল মাফ করার ন্যূনতম কর্তব্য পালনে অক্ষম তার পক্ষে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ঘোষণা করলে লোকে খুঁধেবে।

এরপর একাধারে তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী ও পৌরমন্ত্রীস্বরূপ মুখোপাধ্যায় ময়দানে মিউজিয়ামের সামনে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন, কিন্তু গোপাল ঠাকুর শালুক চিনেছিলেন, তাই তাঁর প্রস্তাব ছিল তরুণ রায়ের হাতে ভার দেওয়ার। রবীন্দ্র সরোবর সংলগ্ন জমিতে সাঁতারের পুল-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অস্থানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সেদিনের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে শঙ্কু মিত্র-ভূমি মিত্র আছেন, উৎপল দত্ত-শোভা সেন আছেন, তরুণ রায়-দীপাধিতা রায় আছেন (সবিতাব্রত-গীতা দত্তর নাম তিনি উল্লেখ করেনি) অতএব আমাদের পক্ষে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা

কঠিন কাজ নয়।

কিন্তু ওই অতগুলি আছেনটাই বড় বাবা। কারণ জাতীয় নাট্যশালা সোনার পাথর বাটি কি অমুদ্রিত, তা ঠিক করে কেউ বলেন না। শঙ্কুবাবু বলবেন আমি, কতী না, হলে তা জাতীয় নাট্যশালা নয়, উৎপলবাবুও পিছিয়ে থাকবেন না অমুদ্রিত মনোভাব প্রকাশে। শঙ্কুবাবু অবশ্য অজিতেশবাবুর ও সবিতাব্রতের দলের সহযোগিতায় কয়েক লক্ষ টাকা তুলেছেন জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ঘোষণা করে, তারপর গ্যাট হয়ে বসে আছেন এবং একটি আধা জাতীয় প্রতিষ্ঠান অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস এর মঞ্চটি প্রতি শনিবার ও রবিবার মৌরসীপাটায় দখল করে আছেন। মহাজাতি সদনও জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষিত, কিন্তু সেখানেও নট কোম্পানী ১৯৮০ পর্যন্ত শনিবার ও রবিবার ভাড়া নিয়ে

বসে আছে এবং দেওয়া হয়েছে বলেই পেয়েছে।

শিশিরকুমারের প্রথম যুগে তিনিই হতে পারতেন জাতীয় নাট্যশালা, পরবর্তীকালে তাঁকে অমুদ্রিত মর্ষাদা দান স্বীকৃতি সবার নাও পেতে পারত। আর আজ তো নাট্যজগতে অজস্র সিংহের মদমস্ত বিক্রমণ, তাদের সবাইকে একই খাঁচায় পোরার অনিবার্য পরিণতি ভাবতে গা শিউরে ওঠে।

শ্রীমান বুদ্ধদেবকে জানাচ্ছি জাতীয় নাট্যশালা নামটা যত গালভরা হোক না কেন বস্তুটি সম্পর্কে গঠনধারণা কারোরই নেই। বিদেশে কোনও মডেল মলবে না, কারণ ওটি পৃথিবীর কোনও দেশেই নেই। ইংল্যান্ডের শেক্সপীয়র থিয়েটার জাতীয় নাট্যশালা নয়। কমিউনিস্ট দেশগুলিতে যা আছে, তা জাতীয় নাট্যশালা নয়, রাষ্ট্রীয় নাট্যশালা।

সরার আগে জাতীয় নাট্যশালায় সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ করা না গেলে কোনো পরিকল্পনা নেওয়া আদর্শেই সম্ভব নয়। মরীচিকার পিছনে ছোট্ট অর্থহীন পণ্ডিত। পশ্চিমবঙ্গে

আজ বুদ্ধবর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টর হিসাব অস্থায়ী ৫০,০০০ নাটকে দল আছে। দেখে শুনে মনে হয় আগামী ১০১২৫ বছরে দেশে সমগ্র যুগসমাজ নট-নটী হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু তাদের তালিম ও মদত দেবার জন্য যতগুলি সম্ভার নাট্যশালা প্রয়োজন, তর হিসেব ভয়াবহ।

আর কমিউনিস্ট দেশের অস্থভাবে রাষ্ট্রীয় নাট্যশালা রবীন্দ্রসদন ও মহাজাতি সদন অ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে পুরোপুরি ব্যবসায়ী প্রেক্ষাগৃহে পরিণত। মোটা টাকা ও ধরপাকড়ের জোরেই তার ব্যবহার খাওয়া যেতে পারে।

সত্যি কথা বলতে কি, জাতীয় নাট্যশালা বলে কিছু হতে পারে না এবং তার প্রয়োজনও নেই। সরকারী ব্যয়ে সম্ভার প্রেক্ষাগৃহ তৈরী হলে, তার ব্যবহারও হবিধাভোগী দলগুলিই শুধু পাবে। বরং শৌভনিক করিংকর্ম। প্রমোদ লাহিড়ীর খাটারটি দখল করে সেখানে চালা বেঁধে তারা বহু ছোট ছোট দলকে অভিনয়ের সুযোগ দিয়েছে এবং নিজেদের বৃহৎ মঞ্চ নির্মাণের প্রস্তুতি চালাচ্ছে।

এই সময়ে সহরের সম্পদ
মধ্যস্থিত ভ্রম গৃহস্থদিগের পুহে
'বাবু' নামে এক প্রেপীর
মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা
পারসী ও স্বল্প ইংরেজী
শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে
আস্থাবিহীন হইয়া ভোগ-সুখেই
দিন কাটাইত।

রামতনু লাহিড়ীর কলকাতা

এই বাবুরা দিনে মুম্বাইয়া, ফুড়ি
উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই
দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীন
প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি,
হাপ-জমখড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি
শুনিয়া, রাতে বারান্দাদিগের
আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও
আমোদ করিয়া কাল কাটাইত।

শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী
ও তৎকালীন
বঙ্গসমাজ' হইতে।



এ কাহিনী যখনকার রামতনু
লাহিড়ী তখন বালক। আর
কলকাতা তখন শিশু। তখনো
ফুটপাথ তৈরী হয়নি
কলকাতায়। রাস্তার দুধারে
নর্দমা। পুকুরে পুকুরে পচা জল।
ঘরে ঘরে বিষাক্ত অসুখ, যার
নাম 'লোনা-লাগা'।
আজকের চোখে সেকালের
কলকাতা যেন অনেকটা দুঃস্বপ্নের
মতো। কিন্তু আজকের চোখে
আজকের কলকাতাও কি কম
দুঃস্বপ্ন? কলকাতা বড় হয়েছে।
দশদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তার
কর্মকাণ্ডের রহৎ জগত। অথচ
তার অগ্রগতি ব্যাহত। বনহত,
কারণ জীবন যাত্রার গতিবেগ
মুহুর। মুহুর, কারণ লোকসংখ্যার
তুলনায় যানবাহন অল্প, যান-
বাহনের তুলনায় পথ সংকীর্ণ।
আজকের এই কলকাতাকে নতুন
গতিবেগে উজ্জীবিত করতে পারে
ডুগর্ড রেল। ডুগর্ড রেল মানেই
দ্রুতগতি অথচ নিবিঘ্ন ভ্রমণ।

MP

কলকাতার নতুন মানচিত্র
রচনায় ডুগর্ড-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট
প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

সমবায় কৃষিক্ষণ ব্যবস্থার ভয়াবহ অবস্থা

কারচুপি করে অগ্রগতির ঢাক পেটানো হয়েছে

কেদার চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে জনসাধারণ অনেক কিছু শুনে এসেছেন বিগত পাঁচ বৎসর ধরে। যেমন প্রচার করা হত পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কৃষিক্ষণ আদ্যে সমগ্র ভারত বর্ষে প্রথম ও সমবায়ের প্রসার সবচেয়ে বেশী হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। আমরা যারা সমবায় আন্দোলন, বিশেষ করে সমবায় কৃষিক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত তারা জানি কিভাবে কাগজপত্রে সমবায়ের এই জয়যাত্রা সম্ভব করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিগত কংগ্রেস সরকারের সব মন্ত্রীই ছিলেন প্রচারপ্রিয়। প্রত্যেক বিভাগের প্রচারের জয়ঢাক দেওয়া হয়েছিল মন্ত্রীর পেটোয়া সব অফিসারকে। সমবায়ের প্রচারের দায়িত্ব পেয়েছিলেন সমবায় সচিব ত্রিপিতি, সেনয়। তিনি যুগ্ম সচিব থেকে প্রমোশন পেয়েছেন সচিব পদে। কোন কাজ না করে কেবল কাগজপত্রে সমবায়ের জয়ঢাক পিটিয়ে এবং বাস্তবে সমবায়ের গঙ্গা-প্রাপ্তি ঘটিয়ে।

কেমন করে সমগ্র গ্রামীণ কৃষিক্ষণ ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, দরিদ্র কৃষকের শেষ সম্বল মহাজনের কবলে গিয়েছে, জোতদার সব ক্ষীতকায় হয়েছে নীচের উদাহরণ থেকে তা বোঝা যাবে। কোন কৃষক গ্রামীণ সমবায় সমিতি থেকে ধরুন ৫০০ টাকা কৃষিক্ষণ নিয়েছে। সে সময় মত শোধ করতে পারছেননা, কিন্তু তাকে নতুন করে ১০০০ টাকা কৃষিক্ষণ মঞ্জুর করা হল। এর থেকে ৫০০ টাকা আদায় করে ৫০০ ওকে দেওয়া হল। পরের বৎসর পুনরায় ১৫০০ টাকা বিনিয়োগ দেখিয়ে হাজার টাকা আদায় করা হল। এভাবে ৩।৪ বৎসবে তার কৃষিক্ষণ কাগজপত্রে ২৫০০ টাক হবে। হয়ত সমবায় ব্যাঙ্কের কাছে গচ্ছিত তার জমির দাম ২৫০০ টাকা কাজেই আর কাগজপত্রে নতুন করে ৩০০০ টাকা মঞ্জুর করা যাবেনা। সেক্ষেত্রে তার জমি নীলামে উঠবে। যে কৃষক প্রথম বৎসর ৫০০ টাকা দিতে পারেনি তার পক্ষে ২৫০০ টাকা স্বদসহ শোধ করবার প্রসঙ্গই নেই। কাজেই অনিবার্যভাবে তার জমি গ্রামীণ মহাজন ও জোতদারদের হাতে চলে যাবে। কিন্তু পরি-সংখ্যানে এইভাবে পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনের উন্নতি দেখানো হয়েছে।

কৃষিক্ষণ বিনিয়োগ	৮৫%	১৪.৫০	২৩.৪৯	৩৩.০২	৬১.০০
কৃষিক্ষণ আদায়	৪১%	৬৫%	৭৩%	৮৩%	৮৫%

সমবায়ের এই গুণকীর্তন করতে সরকারের খরচে ডাঃ জয়নাল আবে-দিন অন্ততঃ তিনবার বিদেশ ভ্রমণ করেন।

এখন সরকার পরিবর্তন হওয়ায় সমবায় দপ্তরের অফিসাররা বেশ বেকায়দায় পড়েছেন। তারা বলতে শুরু করেছেন “বাম ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছেন এখন আর কৃষিক্ষণ আদায় হবে না”। এটা বাম ফ্রন্ট সরকারকে হেয় করবার একটি সূচিস্থিত পরিকল্পনা। কেননা অনেককেই আর কাগজপত্রে কৃষিক্ষণ বিনিয়োগ দেখাতে সাহস পাবেননা এবং এবার কৈফিয়ত দিতে হতে পারে সব অপকর্মের। পশ্চিমবঙ্গে কৃষিক্ষণ ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়বে ২।১ বৎসরের মধ্যে যদি না বর্তমান সরকার এর প্রতি বঞ্চিত মনোযোগ দেন এবং কাগজপত্রে কৃষিক্ষণ আদায় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে অবিলম্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে তদন্ত করতে বলেন এবং দোষী অফিসারদের শাস্তি দেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির এই সমস্ত অপকর্মের খবর রাখে। তাদের পরিদর্শন রিপোর্টে এগুলো লিপিবদ্ধও করে কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা এসব পরোয়া করেন না। যেখানে স্বয়ং মন্ত্রী সহায় সেখানে তাঁরা ভয় পাবে কাকে? সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এই একইভাবে কাগজপত্রে সব কিছু উন্নতি দেখানো হচ্ছে। আমি বিশেষ কোন সমবায় ব্যাঙ্কের নাম না করে ও সমিতির নাম গোপন রেখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে দিচ্ছি।

Transaction Suggestive of book adjustment of Loans. A. The Bank disbursed loans to the societies and on the same day earlier loan was realised from out of the fresh loan. These transactions are suggestive of book adjustment

Name of the	Fresh loan i	
	Date	A
'A'	14.12.76	1
'B'	26 2,76	6
'C'	12.2.76	50

B. The Bank follows the practice of crediting the

undisbursed loan to the loan collection a/c thereby the recovery performances were shown higher than the usual.

C. A—Society repaid a loan of Rs 10000/- on 10.1.77 but the cash balance of the society on 9.1.77 was only Rs. 50.50 paise which does not permit repayment of Rs 10000/-. On 10.1.77, a temporary deposit of Rs 10,000/ was shown in the cash book and repayment was shown to have been made from out of it. The transaction was of suspicious nature and it is nothing but paper transaction.

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে গত ১৬ই এপ্রিল থেকে ১৮ই এপ্রিল কলকাতায় রাজ্য-ভিত্তিক সমবায় আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এখানে সরকারী, বেসরকারী ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার দুলাইন উদ্ধৃতি দিচ্ছি “Collection of loan money through paper transaction should be stopped immediately and honest efforts be made for collection of cooperative loan in cash”.

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে কাগজপত্রে সমবায় আন্দোলনের এই অগ্রগতির কথা সবাই জানেন কিন্তু বলেননা মন্ত্রী তোষণের জন্য। সেনয় সাহেবের পরিকল্পিত ট্রাজেডী এই ভাবে সফল করেছেন। প্রত্যেক সমবায় ব্যাঙ্ক পরিচালনার জন্য সমবায় দপ্তর থেকে একজন অফিসার পাঠানো হয় যিনি ব্যাঙ্কের সর্বোচ্চ পদে থাকেন। কিন্তু ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই। অনেক

সময় রক পর্দায়ের সমবায় পরিদর্শক-দের কাছে বসাবো হয়। সমবায়

দপ্তর থেকে সমবায় ব্যাঙ্কে আসবার জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসারদের প্রচুর তোষা-মোদ করতে হয় ওপরওয়ালাদের।

কেননা ২০% ভাগ বেতনবৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ঢালাও ব্যবস্থা আছে এদের জন্য। ব্যাঙ্কের উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে এদের কোন যোগ নেই কেননা ২।৩ বৎসর পর বদলী হয়ে এরা যে কোন জায়গায় যাবেন। এদের একমাত্র কাজ ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখা ও কাগজপত্রে কৃষিক্ষণ আদায় ও বিনিয়োগ দেখানো। কেননা এর ওপরে প্রমোশন নির্ভর করছে।

অনেক সমবায় ব্যাঙ্কের নিজস্ব অফিসাররা একাজ করতে চাননি। কেননা এতে সমবায় ব্যাঙ্কের গঙ্গা-প্রাপ্তি হবে। সেজন্য সমবায় দপ্তর থেকে প্রতি ব্যাঙ্কে ডেপুটি ম্যানেজার, ফিল্ড এক্সিকিউটিভ অফিসার ইত্যাদি পদ তৈরী করে সরকারী কর্মচারী পাঠানো হয়েছে এবং তাদের হাতে কৃষিক্ষণের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হয়েছে। এরাও ঢালাও সুখ সুবিধার অঙ্গী-দার। এছাড়া ২০% বেতন বৃদ্ধি থাকছেই। ব্যাঙ্কের সঙ্গে এদের কোন আশ্রিক যোগাযোগ থাকেনা। এরা ২।১ বৎসর হলিডে মুড়ে বসে থাকেন, আবহু কাছ কাগজপত্রে সব করেন এবং প্রমোশন নিয়ে চলে যান।

সমবায় ব্যাঙ্কের সুপারভাইজাররা একাজ করেন কেন? কারণ এক্ষেত্রে সমবায় দপ্তর থেকে এদের লোভনীয় সব ব্যবস্থা করবার প্রতিশ্রুতি থাকে। যেমন সুপারভাইজার থেকে ইন্সপেক্টর প্রমোশন। তাছাড়া থাকছে ব্যাঙ্ক থেকে ঢালাওভাবে আর্থিক অহুদান যা ১০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। অধিকাংশ সুপারভাইজার নিজেদের এইসব লোভনীয় ব্যাপার থেকে সরিয়ে রাখতে পারেননা। কিন্তু এইভাবে কতদিন চলবে?

আমাদের অভিজ্ঞতা আর ২।১ বৎসরের মধ্যে সব থেমে যাবে। কেননা কাগজপত্রে আর দান ও আদায় দেখানো যাবেনা। এটা প্রায় শেষ পর্দায় এসে পৌঁছেছে। সমবায় কৃষিক্ষণ ব্যবস্থাকে পুনরায় কৃষকের স্বার্থে সংগঠিত করতে হলে দুটো জিনিষ করতে হবে।

(এক) সমবায় ব্যাঙ্কগুলো থেকে সমবায় বিভাগের সমস্ত কর্মচারীদের সরিয়ে নিয়ে ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে সর্বোচ্চপদে বসাতে হবে। বিগত ২০ বৎসর ধরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একথা বলে আসছে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্পাত করছেন না। কারণ তাহলে কোন অপকর্ম করা যাবে না। কাজেই সমবায় দপ্তর

থেকে বারবার বোঝানো হয় সরকারী কর্মচারী তুলে নিলে ব্যাঙ্ক রসাতলে যাবে।

সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত কো-অপারেটিভ সেমিনারে এধরনেরই একটা প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে যে “Superseded boards of management should be replaced by elected directors and Govt officials attached to the Banks should be withdrawn.”

(দুই) পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় কৃষিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায়ের জন্য ৭% হার বৃদ্ধি টাকা দিলেও কৃষকের হাতে যখন টাকা পৌঁছয় তখন স্বদ হয় ১৩.৫%। এটা একটা অসম্ভব অবস্থা। রাষ্ট্র-খানের বিভিন্ন টেক্সটলো তুলে দিতে হবে। হয় কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলোকে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের শাখা করা হোক অথবা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক তুলে দিয়ে সোজা-সুজি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে টাকা দেওয়া হোক। ভাবতে অবাক লাগে আমাদের মত। দরিদ্র দেশে কি করে এ ব্যবস্থা চলে আসছে। কৃষিক্ষণের স্বদের হার অবশ্যই ১০% এর বেশী হওয়া উচিত নয়।

সমবায়মন্ত্রী শ্রীভক্তিনৃষণ মণ্ডলকে বলবো দয়া করে কৃষকের স্বার্থে আপনি এ ঘুর বাসা তানুন। এবার আপনাদের দীর্ঘদিন সরকার পরিচালনা করতে হবে। এবার ১৯৬৭ বা ১৯৬৯ সাল নয়। কাজেই প্রথমেই তদন্ত কর্মিটি বসিয়ে কৃষিক্ষণে এ অরাজকতার জন্য দোষী অফিসার-দের শাস্তি দিন। তারপর সমবায় ব্যাঙ্কগুলোর পুনর্গঠন করে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের দ্বারা ব্যাঙ্ক পরিচালনার ব্যবস্থা করুন। সরকারী অফিসার-দের সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে উঠিয়ে দিন। অথবা গতানুগতিক স্রোতে গা ভাসিয়ে ১০০% (?) কৃষিক্ষণের উন্নতি করুন।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

। চাঁদাব হার ।

বার্ষিক ২২ টাকা

সাপ্তাহিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৬.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠাবার ঠিকানা :

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, মট লেন। কলিকাতা ১৩

মহাচীনের শিক্ষা ব্যবস্থা

ইন্দিরা বসু

বহুদিন চীন বাইরের জগতের কাছে অজ্ঞ ছিল, তাই অজ্ঞাতও ছিল। হাল আমলে দেশবিদেশ থেকে অনেকেই, চীনে গিয়েছেন, কিছু দেখেছেন কিছু শুনেছেন। যারা গিয়েছেন তাদের মধ্যে রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতি ক্ষেত্রে খ্যাতনামা ব্যক্তি, বহু সাংবাদিক, কিছু ব্যবসায়ী এবং কিছু সংখ্যক সাধারণ লোক আছেন। তারা দেশটাকে নিজের চোখে দেখেছেন এবং ফিরে গিয়ে নিজের মত করে কিছু বলেছেন বা লিখেছেন।

কিছুদিন আগেও আমাদের পত্র-পত্রিকায় চীন সম্বন্ধে যে সব খবর দেওয়া হতো তাকে নিন্দা ছাড়া অন্য কোন আখ্যা দেওয়া চলে না। কিন্তু বর্তমানে অত্যন্ত দেশের সংবাদ প্রতিষ্ঠানে সংবাদ উদ্ধৃত করায়, চীন যে কিছু উন্নতি করেছে বা করছে তার একটু আধটু আভাস পাওয়া যায়।

এবারে (১৯৭৬-৭৭) গিয়ে দেখি নানা দিক দিয়ে চীনের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। এর আগে আরও দু'বার আমার ওদেশে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল—১৯৭৭ ও ১৯৭৩ সালে। ১৯৭৭ সালে কি পরিবর্তন হয়েছে এবং কতটুকু উন্নতি হয়েছে তা বিশেষ কিছুই বুঝিনি। কেবল আগে কি ছিল এবং তা থেকে যে অবস্থায় এসেছে তা জেনেছি। কিন্তু তুলনা করার মত বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার ছিল না, কারণ সেটাই প্রথম দেখা। তিনবার সালে গিয়ে প্রায় তিন মাস ছিলাম। তাতে অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, অনেক আলাপ আলোচনা করেছি এবং অনেকখানি উপলব্ধি করতে পেরেছি, কারণ ওদেশের ইতিহাস একটু জানা হয়েছিল। কোন দেশকে জানতে হলে তার নতুন রূপকে যেমন বুঝতে হয় তেমনি তার প্রাচীন ইতিহাসকেও জানতে হয়।

এখানে একটু বলে নিতে হচ্ছে কমিউনিস্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে চীনের অবস্থা সম্বন্ধে। বহু বছর আগে থেকেই বিভিন্ন ইউরোপীয় তি সেখানকার সমুদ্র তীরবর্তী বড় ড শহর বন্দরগুলি দখল করে অত্যাচার ব্যবসা বাণিজ্য চালাচ্ছিল এবং সম্ভব হলে উপনিবেশ স্থাপন করার মতলবও এঁটেছিল। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা চীনের চিয়াং কাইশেক সরকারকে নানাভাবে সাহায্য করছিল কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে

লড়তে। তখন চীন সরকারের ব্যবসা বাণিজ্যের ছিল অচল অবস্থা, তাই চারিদিকে কি শহরে কি গ্রামে ছিল অনাহার, মহামারী, অপরাধ ও অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা। শহরগুলি ছিল নানা রকম অসংবৃদ্ধি ও অনাচারের আড্ডা আর গ্রামগুলি ছিল লক্ষ লক্ষ বুদ্ধ জন্মসাধারণের আবাস স্থল, যত্ন ছিল তাদের নিত্যকার সাথী। এ সবের উপরে ছিল স্বৈরাচারী শাসন। ব্যবস্থা গ্রামে ছিল সামন্ততান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা যার ফলে অত্যাচার, অবিচারের সীমা ছিল না। চারি দিকে থেকে এই অত্যাচার অব্যবস্থার-সঙ্গে এসে ছুটেছিল ধরা, বন্ডা, নানারকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর ছিল যুদ্ধের অভিযাপ। উৎপাদন ছিল সীমিত কারণ চাষের যন্ত্রপাতি প্রাচীন ধরণের, মাটির উর্বরতা বাড়ানোর অত্যাচার, গরুভেড়া, অত্যাচার কৃষকদের ভয়াবহ দারিদ্র্য ও ভয়স্বাস্থ্য। এ সবের ফলে দেশের অনেক স্থানেই দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিত। দেশে অল্প পরিমাণ জমিরও চাষ হতো। কোন কোন এলাকায়, বিশেষ করে সিনকিয়াংয়ে জমির শতকরা এক অংশের চাষ হতো। গ্রাম ছিল জমিদার, অবস্থাপন্ন ঋণ-হাতাদের হাতে, তাই ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছিল। চাষীদের উপরে নানা জোর জুলুম অত্যাচার অবিচার ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এর উপরে আবার চেপে বসল মূল্যফীতি।

এই তো গেল নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার আগেকার অবস্থা। বহুদিন আগে থেকেই মাও সে তুঙ্গ বুঝেছিলেন যে সব কিছু দুঃখ দুর্দশার মূলে আছে আর্থিক অবস্থা আর এই অবস্থার উন্নতি করতে হলে গ্রামের অর্থনীতির উন্নতি করতে হবে। দেশের বেশীর ভাগ লোকই গ্রামে বাস করে এবং ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাই বেশী। তারা জমিদারের কাজ করে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় না। এ অবস্থা থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে ভূমি সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। তাই ক্ষমতায় আসার পরে বহু আকাশচুম্বিত কাজ হাতে নিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি ভূমি সংস্কার করার কথা প্রচার করলেন এবং সে বছরই জমিদারী প্রথা রহিত করেন। ১৯৫২ সালে জমির পুনর্বিন্যাস ঘোষণা করেন। ধনী ও মধ্য

কৃষকদের জমির উপর হস্তক্ষেপ তখনও করা হলো না। ভূমিহীন কৃষক জমি পেলো, কিন্তু শিক্ষার অভাবে সংস্কার এত বন্ধমূল যে তারা ভাবতে পারলো না সে তারা জমির মালিক হতে পারে। কতকটা ভয় ভীতি আর কতকটা প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রচারে তারা মালিককে জমি ফেরত দিতে চাইলো। মাও সে তুঙ্গ দেখলেন শিক্ষার মাধ্যমে এই কোটি কোটি অশিক্ষিত জনগণের মনকে সংস্কারমুক্ত করতে হবে তাই ভূমি সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দিকে নজর দিলেন।

শিক্ষা মাওসেবের জন্মগত অধিকার আর চীনের অগণিত জনগণ এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। শিক্ষা ছিল ধনী শ্রেণীর জন্ত, দরিদ্রের জন্ত নয়। নতুন সরকার প্রথমেই নিরক্ষরতা দূর করার কাজে মন দিলেন। শহরে, গ্রামে, গল্লি, মাঠে, ময়দানে, নানা জায়গায় নিরক্ষরদের অক্ষর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হলো। তার মানে এই নয় যে বড় বড় অনেক স্কুল স্থাপিত হলো আর বিদ্যান লোকেরা শিক্ষার কাজে লেগে গেলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যারা কিছুটা শিখেছে তাদের কাজে লাগান হলো। অক্ষর পরিচয় করিয়ে দিয়েই কর্তব্য শেষ হতো না। তাদের এই নবলব্ধ জ্ঞানকেই দিন দিন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা রইল। শিক্ষার উন্নতিকল্পে বহু স্কুল, কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলো। কিন্তু দেখা গেল এগুলি সবই শহর ভিত্তিক।

জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের কোন উপকারে আসবে না। চেয়ারম্যান মাও তখন জানালেন যে শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে হবে—সর্বশ্রেণীর জ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজা খুলে দিতে হবে। শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ পর্যন্ত ধনী ও উচ্চ সরকারী কর্মচারীরাই শিক্ষার সুবিধা ভোগ করেছে কিন্তু গরীব শ্রমিক কৃষকদের শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না। কৃষক, শ্রমিক ও সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধানই সমাজে উন্নতির পথে অস্বাভাবিক। এই ব্যবধান ঘুটিয়ে শিক্ষা একটি প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ মানুষ গড়ে তুলবে। পূর্ণাঙ্গ মানুষ বলতে তিনি বোঝালেন যে কোন ব্যক্তি বিশেষ একাধারে কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী হবে এবং প্রয়োজনে বন্দুকও ধরতে পারবে। তাকে বিশেষ কোন গুণীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা চলবে না অর্থাৎ যে বুদ্ধিজীবী সে শুধু লেখাপড়াই করবে, অন্য বিষয়ে অজ্ঞ থাকবে তা নয়—তার পুণ্ড্রিগত বিজ্ঞাকে সে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিমাণে সামরিক শিক্ষাও নেবে। বিচার বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ না হলে ব্যক্তির পূর্ণবিকাশ ঘটবে না। শিক্ষা যেন বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের দাসত্ব না করে, বাস্তবকে যেন বড় করে দেখে এবং এই বাস্তবক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অভাবে পুণ্ড্রিগত বিজ্ঞা অনেক সময় কাজে লাগান কঠিন হয়।

নানাদিক দিয়ে বিচার করেই চীনের নতুন শিক্ষা প্রণালী রচিত হলো। প্রথমেই ঠিক করা হল শিক্ষার উদ্দেশ্য কি এবং সে উদ্দেশ্য সাধনে কি কি পদা নেওয়া হবে। সেই সঙ্গে নজর দেওয়া

হলো শিক্ষা ক্ষেত্রে সময়ের সদ্ব্যবহার, পাঠ্যসূচী সংস্কার ও সংক্ষিপ্তকরণ, বাস্তব অভিজ্ঞতার মূল্যদান, শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি অহুসঙ্কিত, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং নিজস্ব স্বজনী শক্তি, প্রকাশের অবকাশ প্রভৃতির দিকে। সর্বশেষ আরও এক ব্যবস্থা নেওয়া হলো। যাতে 'পরীক্ষা' নামক শব্দ, শিক্ষার্থীকে গেরিলা বাহিনীর মত আড়াল থেকে আক্রমণ না করে। পরীক্ষা একেবারেই নেই বললে ভুল হবে, সেটা খাতা পেন্সিলের মাধ্যমে না করে তার নিজস্ব প্রয়োগের ক্ষমতার মধ্য দিয়েই দেখাতে সুযোগ দেওয়া হয়। প্রশ্নের বিষয়বস্তু আগেই বলা হয় এবং কোন কোন পুস্তকে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে বলে দেওয়া হয়, এমন কি পরীক্ষার সময়ে কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার করতে দেওয়া হয়।

চীনের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে মানসিক, শারীরিক ও বুদ্ধিবিচার দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলা। আমাদের দেশে একটা কথা খুব চালু আছে "শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজনীতি নয়", কিন্তু ওদেশে ঠিক তার বিপরীত। ওখানে ওরা গর্বের সঙ্গে বলে ছেলেমেয়েদের রাজনীতি শেখান হয় দেশের ও দেশের স্বার্থে। সে দেশে শিক্ষার নীতিই হলো শিশুকে ছোটবেলা থেকেই রাজনীতিতে সচেতন করে তোলা। যা কিছু আছে, যা কিছু করা হচ্ছে তা কেবল একার জন্ত নয় সবাইকার জন্তই। মনের এই উদারতাই শিক্ষা দেওয়া হয়।

শিক্ষা মাওসেবের মনোবৃত্তির বিকাশ ঘটায় আর অশিক্ষা বললে ভুল হবে কৃষিকা মন সঙ্কুচিত করে। এ প্রসঙ্গে আমাদের একটি পাঠ্য (এরপর ১০ম পৃষ্ঠায়)



আসুন বিশ্বগুরে

মন্দিরময় বিশ্বপুর বাংলা স্বাধীনতার জন্য অত্যাধিকারী মন্দিরময় ও নিপুণ শিল্পীদের তৈরি পোড়ামাটির সূক্ষ্ম কারুকার্য আপনাকে মুগ্ধ করবে। বিশ্বপুরের কাছেই কামারপুত্র ও জয়রামবাড়ী—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেব ও শ্রীশ্রীমা সারদামণির পূণ্য জন্মস্থান।
রেজ কিংবা সড়ক পথে বিশ্বপুরে যাওয়া যাত্রী-কলকাতা থেকে বিশ্বপুরে যাবার এখন সরাসরি বাসের ব্যবস্থা হয়েছে এবং দুয়ত মাত্র ১৪৬ কিলোমিটার। জয়রামবাড়ী এবং কামারপুত্র থেকে বিশ্বপুরের দূরত্ব যথাক্রমে ৪৩ ও ৪৮ কিলোমিটার।
সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসেবার জন্য মনোরম বিশ্বপুর ট্যুরিস্ট লজে উঠুন। হুগলি-এর জন্য যোগাযোগ করুন।
রিজার্ভেশন কাউন্টার, ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম-ডেভেলপ-মেন্ট কর্পোরেশন, ৩/২, বিনয়-বাসল-দীনেশ বাস (মিষ্ট), কলিকাতা-৭০০ ০০১ অথবা ম্যানুজরি, ট্যুরিস্ট লজ।

বিশ্বপুর বিকল্পের জন্য যোগাযোগ করুন।
ট্রাভেলিস্ট স্যুসাইড
৩/২ বিনয়-বাসল-দীনেশ বাস (মিষ্ট),
কলিকাতা-৭০০ ০০১, ফোন : ২৩৮-৮২৭৬
গ্রাম : TRAVELTIPS
পরিদর্শন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দানিকেন তহের আলোকে মহাভারতের সূচী ও দেবতা বীরেন্দ্র মিশ্র

সফল মিশন

লোকপাল যম “মেঘ গম্ভীর স্বরে অর্জুনকে কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ!...কেবল ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে মর্ত্যকলেবর পরিগ্রহ করিয়াছ (ভূমি)। তুমি বহুসমুদ্র মহাবীৰ্য-সম্পন্ন পরমধর্মাত্মা পিতামহ ভীষ্মকে লংগ্রামে পরাজয় করিবে, দ্রোণরক্ষিত ক্রিয়গণ তোমার শরানলে দগ্ধ হইবে। যে সমস্ত মহাবীৰ্যসম্পন্ন দানবদল মন্থস্থলোকে জয় পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহারা ও নিবাত-কবচ প্রভৃতি অস্ত্রাশ্রয় দানবগণ তোমার হস্তেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে।...মহাবল পরাক্রান্ত কর্তব্য তোমারই বধ্য।”

যমের উক্তি তাঁকে তাঁর শমন সদনের অধিকর্তার পদ থেকে কোথায় টেনে না মনেছে ভেবে দেখুন। আমরা তো জানি, যম-মহাপ্রভু যুগ আশ্রয় মহান বিচারক। চিত্রগুপ্ত তাঁরই সভায় মন্ত খেরো খাতা খুলে বসে থাকেন অশান ঘাটের ছাড়পত্রদানকারী বৃদ্ধ কেরানীটির মত! কিন্তু হায়, এ যম সে যম নয়। মহাভারতের যম ধোঁয়া খবর রাখেন, আধাবর্তে কোন দুই ক্ষত্রিয় শিবিরের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন। তিনি চিত্তস্তব্ধ অর্জুন তথা পাণ্ডবদের জয় সম্পর্কে। তিনি জানেন, দেবপক্ষ অর্জুনকে নিয়োগ করেছেন। অর্জুনের মতো দেবতাদেরও প্রয়োজন কর্তব্যে ভীষ্মদ্রোণাদির নিধন। কেননা তাঁরা দুর্ধোদন শিবিরের রক্ষক। আর দুর্বিনীত দুর্ধোদন ভারতে কোনো বহিঃশক্তির স্বেচ্ছাপ্রবেশ বরদাশ করেন না। আন্তর্জাতিক প্রভুদের পরোয়া করেন না কুরু যুবরাজ। এ ছেলে তার এই দুর্বিনয়কে উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছে পিতা যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে। অন্ধ হলেও তাঁর শক্তি ছিলেন সে মানুষ! দেবাসুর বিতুর শব্দ উপদেশেও বুদ্ধের মন টলাতে পারেন নি। ভীতি প্রদর্শনেও না। ইঞ্জিষ্টের কারোনের মতো মহাকাশচারী ভিক্ষুশৈলীর শক্তিমন্তর খবর পেয়েছেন যুধিষ্ঠির। সে সব সংবাদ তাঁকে শঙ্কাতুর

ও বিমূঢ় করেছে। তবু বস্তুতঃ স্বীকার করতে রাজি হননি তিনি। দেবতারা তাই জোট বেঁধেছেন যুধিষ্ঠির তথা দুর্ধোদনকে সিংহাসনচ্যুত করে মনোমত একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র কয়েম করার জন্ত।

পরিকল্পনাটি যে অর্জুন জন্মের আগেই হয়েছিল, যমরাজ সে কথাও জানিয়ে দিলেন। বললেন, স্বয়ং ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে দেবপুত্র অর্জুনের জন্ম। পাণ্ডবরা - দেবতার সৃষ্টি। তাই দেবপক্ষের নেপথ্য শাসনের হাল ধরবেন দেব-ঐরসজাত পাণ্ডবরাই। এজন্য সমস্ত দেবশক্তি অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শক্তি প্রস্তুতি চালিয়ে আসছেন বহুদিন। বাছাই করেছেন তাঁরা অধিবর্তের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজবংশ কুরুকুলকে। একমাত্র কুরুকুলই পারত সেদিন খণ্ডিষ্টি বিক্ষিপ্ত ভরতকে একসূত্রে বাঁধতে তার বলবীৰ্য জ্ঞানমেধা ও বাহুবল দিয়ে। বুদ্ধিমান মহাকাশচারীরা এসব খবর রাখতেন। চতুর গণ্যকারীর মত আগেভাগে সংগৃহীত খবরগুলি এমনভাবে সময়মত প্রকাশ করতেন যা তাঁদের অপরের চোখে আলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিত।

যমরাজ যা বললেন তার মধ্যে ঈশ্বরীয় আলৌকিকতা ছিলনা। ছিল আস্থা ও বিশ্বাস। অর্জুনকে নানা আন্তর্জাতিকীয় অস্ত্রদান করার সময় তথাকথিত দেবতারা তাঁকে বিভিন্নভাবে আশস্ত করার চেষ্টা করলেন। যমবানী তারই একটি নিদর্শন। অর্জুনকে বলা হল, জন্মের আগেই তিনি দেবপক্ষভুক্ত হিসেবে মনোনীত হয়ে আছেন; মনোনীত করেছেন স্বয়ং ব্রহ্মা। ব্রহ্মা দেবগণের বুদ্ধিদাতা। ইনি লড়াই করেন না; সভা করেন। সভা বসে হিমালয় পর্বতেরই কোনো এক রমণীয় উপত্যকায়। মনে আছে হয়ত, আগের আলোচনায় ব্রহ্মলোকের হৃদিশ আমরা পেয়ে গেছি। ব্রহ্মার বিবেচনায় কুন্তীর গর্ভে ইন্দ্রের ঔরসে অর্জুনের জন্ম। তাছাড়া

যম আরও বলেছেন দেবতারা-তুই অর্জুনের ওপর। কারণ অর্জুন ‘সাক্ষাৎ মহাদেবকে প্রসন্ন’ করেছেন।

অতএব যমের কাছ থেকে অর্জুন লাভ করলেন ‘অপ্রতিবারনীয় দণ্ড’। শিখে নিলেন সে অস্ত্রের প্রয়োগ ও প্রতিসংহারের কৌশল।

বরণ দিলেন বাক্ষ্য পাশ। সে অস্ত্র ত্যাগ ও প্রতিসংহার করার উপায়ও তখনই শিখিয়ে দেওয়া হ’ল পার্থকে। বরণ বললেন, “আমি ভারতবর্ষের সংগ্রামে এই পাশাধারা সহস্র সহস্র মহাবলপরাক্রান্ত দানবকে বধ করিয়াছিলাম।” বিধে আশ্রয়াদা নয়; বরণদেবও ছিলেন এককালে ইন্দ্র অপেক্ষা পরাক্রান্ত পুরুষ। ভাগ্য বিপর্যয়ের ফলে তাঁর সে মর্যাদা ক্রমশঃ হ্রাস হয়ে এসেছে। এ বিষয়ে তৎপর ধোঁয়াখবর করে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা ডঃ আর্চার এ ম্যাকডোনেল সাহেব লিখেছেন যে, ইন্দো-ইরানীয়ান যুগে বকবের মর্যাদা ছিল ইন্দ্রেরও ওপরে। পরবর্তী বৈদিকযুগে মর্যাদা হানি ঘটেছে তাঁর। আর ইন্দ্র-বে কীভাবে ভারতীয় আদিবাসিন্দা ‘অসুর’দের অপদারিত ও নিধন করতেন সে কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

এইসব একদেহদর্শী আন্তর্জাতিক সেনাপতিদের আর যাই বলা যাক, ঈশ্বর বা তাঁরই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ হিসেবে যেনে নিয়ে এঁদের পায়ে পুজো নিবেদনের চিন্তা কখনই করা যায় না। জানিনা, এজন্মই আমাদের পুজ্য দেবতার তালিকা থেকে এঁরা বাদ পড়ে গেছেন কিনা। অবশ্য সম্পূর্ণ বাদ পড়েননি। এখনও পুজোপাটে এঁদের নামেও পুজো চড়ানো হয়, শ্রদ্ধা স্তব পাঠ করা হয়। তবে জনপ্রিয় দেবতার আসর থেকে উৎখাত হয়েছেন।

কুবের দ্বিজেন্দ্র, প্রস্থাপন অস্ত্র; অস্ত্রটি ভার লক্ষ্যবস্তুর দক্ষ করে! কুবের বললেন, “এই অস্ত্রের দ্বারা মৃত্যু ভিন্ন অস্ত্রাশ্রয় হুজুর বোদ্ধাকেও পরাজয় করিতে পারিবে এবং যুদ্ধ-

রাষ্ট্রের সমুদয় সৈন্যগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিবে।” বললেন, “আমি এই অস্ত্র নিষ্ক্ষেপ করিয়া মহাভারতগণকে দগ্ধ করিয়াছিলাম।”

একমাত্র দেবরাজ ইন্দ্রই পর্বত-ঈর্ষে অর্জুনকে কোনো অস্ত্রদেননি। আদেশ দিয়েছিলেন উন্নত শক্তি-শিবিরের অন্যতম প্রধান হিসেবে।

বলেছেন, অতঃপর অর্জুনের নিয়োগ সম্পূর্ণ। অর্জুন দেবশিবিরের মিত্রপক্ষ, তাই তিনি সিদ্ধিলাভ পূর্বক ‘দেব প্রাপ্ত’ হয়েছেন। তার পর নির্দেশ: “তোমাকে দেবকার্য সাধনের নিমিত্ত স্বর্গে গমন করিতে হইবে; অতঃপর সম্বীভূত হও। মাতলি তোমার নিমিত্ত রথ লইয়া স্তুতলে আগমন করিবে। তুমি সেই রথে আরোহণপূর্বক স্বর্গে গমন করিলে তথায় আমি তোমাকে দিব্যাস্ত্র সমুদয় প্রদান করিব।”

লক্ষণীয়, মহাকাশযাত্রার জন্য অর্জুনকে বিশেষ প্রস্তুতি (সাজ পোশাক) গ্রহণ করারও উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মহাকাশে জো এমনি যাওয়া যায় না।

ভারতের বিশেষ, আধাবর্তের ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য স্বপ্ন প্রাগৈতিহাসিক অতীতে হিমালয়ের গোপন প্রদেশে এইভাবেই একটি যুদ্ধ প্রস্তুতির চক্রান্ত দানা বেঁধে উঠছিল। তাই সফল হল, পাণ্ডব প্রতিনিধি অর্জুনের হিমালয় মিশন। কুরুক্ষেত্রে বহির্জাতিক দেবতাদের ‘অসুরাগী’ পক্ষ বা আশ্রিতদের সঙ্গে দেববিরোধী পক্ষের যুদ্ধ হয়ে উঠল অনিবার্য। দেব-পাণ্ডব শিবিরের মধ্যে স্বাক্ষরিত হল চূড়ান্ত সামরিক চুক্তি। অর্জুনকে দেবপক্ষ সামরিক সহায়তা দান করবেন, বিনিময়ে ক্ষমতা পেলে আধাবর্তে করবেন দেবশাসনের প্রতিষ্ঠা, সেটাই হয়ে তাঁদের দ্বারা ‘দেবকার্য-সাধন’! দেব-বিরোধী দুর্ধোদন শিবিরকে যেমন পযুদস্ত করতে হবে তেমনিই নিশ্চিহ্ন অথবা সম্পূর্ণ নিঃশক্তি করতে হবে আদিম অধিবাসী অনাথ অস্ত্র দানব রাক্ষসদের কারণ তারা চায়না তাদের ভারতভূমি বহির্জাতিক প্রভুদের উপনিবেশে পরিণত হোক। তাই তো স্বযোগ পেলেই দেবতা ও দেবাসুগৃহীত মুনিদের আখড়া অক্রমণ করে ওরা। সেজন্যই তো দেবপক্ষ তাঁদের বলেন, -দুরাস্তা, কদাচারী, রাক্ষস! (একেবারে বুজোয়া সাংবাদিকদের চতুর প্রচার ও স্বণ্য ভাষা।)

দেবতারা সর্বজ্ঞ। মুনিরা ধ্যানে জ্ঞানেন ও বিচরণ করত পৃথিবীরী: বোধহয়, মহাভারত চোখ মেলে পড়লে, সভাগ সপ্নায় মনঃ বুরবাস কুণ্ডল দেবতা ও মুনিদের এই

আলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আমাদের আবহমানের ধারণার ভিত্তি নড়ে ওঠে। যাকে ভবিষ্যদ্বাণী মনে করে এতোকাল বিস্মিত হয়েছি সবাই ঘটনা বিশ্লেষণে ধরা পড়ে যায়, তা নিছক ভবিষ্যদ-ব্যাপারে কারও ধ্যান-লব্ধ ভক্তি নয়। তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধির অধিকারী, রাষ্ট্রনীতির বিশেষজ্ঞা রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী আঙ্কণ করতে পারেন, বিশ্লেষণ ছাড়াও অনেকে শুধুমাত্র সহজাত রাজনৈতিক ইনটুইশন থেকেও যা ঘটবে বা ঘটতে পারে আগেই সে সম্পর্কে মন্তব্য রাখতে পারেন। যুদ্ধমান শিবিরের পারস্পরিক শক্তি গণনা করে বলে দেওয়া যায়। কার অস্ত্রকুলে আশীর্বাদী মালা নিয়ে অপেক্ষা করছেন বিজয়লক্ষী! দেবতারাও সেইভাবেই বিচার করেছেন পাণ্ডবদের জয় অনিবার্য; যুধিষ্ঠিরের রাজনৈতিক দূরদর্শিতাও আগেই জ্ঞানতে পেরেছিল, কৌরব-দের জয়ের আশা কম। এ সবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

অনন্ত স্বাভাবিক হল, জন্মের আগে ও জন্ম মুহূর্তে গর্ভস্থ শিশু অথবা নবজাতকের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা। জ্যোতিষ যেকুল পারে তা জেনেরালাইজেশন। কিন্তু গ্রহা-স্তরবাসী দেবতারা পারতেন সঠিক ও বিশেষ গণনা করতে। কেমন করে তা সম্ভব যদি তাঁরা সামান্য মানুষ? ধর্ম ধর্ম, দানিকেন সে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। সে কথাও বলব। (চলবে)

পুরুলিয়া গ্রাম সেবক সমিতির গণভেদপুটেশন

গত ৩০শে জুলাই বেলা ১টার সময় পশ্চিমবঙ্গ গ্রাম সেবক সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার পক্ষে জেলাসার ২০টি ব্লকের প্রায় শতাধিক গ্রাম-সেবক গ্রামসেবিকাদের এক গণভেদপুটেশন জেলা সমাহর্তার দপ্তরে মিলিত হন। সকাল ১১টার সময় পুরুলিয়া জুবলী ময়দানে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে প্রায় শতাধিক সদস্য সমবেত হয়ে, বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে ওয়ান-লাইন অ্যাডমিনি-স্ট্রেশন (রক প্রশাসন থেকে কৃষি বিভাগকে বিচ্ছিন্ন করার প্রতিবাদে)-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। পরে এক হুসংগঠিত মিছিল ও প্লোগান সহকারে পথ পরিক্রমা করে জেলা সমাহর্তার দপ্তরের সম্মুখে উপস্থিত হলে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে ও অগাস্ট প্রাচী-প্রতিম সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে তাঁদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানান। পশ্চিমবঙ্গ গ্রাম সেবক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক এক জ্যোতালো বক্তব্য রাখেন। পরি-শেষে ছয়জনের এক ভেদপুটেশন জেলা সমাহর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি স্মারকপত্র স্মরণার্থে জেলা সমাহ-র্তার হস্ত অর্পণ করে।

পাটচাষী ও পাটের বাজার দল

নোশাদ মল্লিক

পাট ভারতের এক অর্থকরী ফসল। ভারতের অর্থনীতিতে পাটের এক বিশেষ অবদান আছে। বিদেশী মুদ্রা অর্জনে পাটের সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতে মোট ৮২টি পাটকল আছে। তারমধ্যে পশ্চিমবঙ্গলাতেই রয়েছে ৭০টি মিল। ২'৪০ লক্ষ পাটকল শ্রমিকের মধ্যে ২'২ লক্ষ পাটকল শ্রমিক রয়েছে পশ্চিমবঙ্গলায়। তাছাড়াও এই পাট শিল্পের মধ্যদিয়ে মোট প্রায় ১২ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে উপরুত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গলার জুট-মিলগুলিতে মোট ৬৮ লক্ষ বেল পাটের প্রয়োজন হয়—তারমধ্যে শতকরা ৪৫ থেকে ৫৫ ভাগ আসে এই পশ্চিমবঙ্গলা থেকেই। বাকীটা অন্যান্য কাছাকাছি রাজ্য থেকে সরবরাহ করা হয়। দেশ-বিভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ২'৫ লক্ষ বেল পাট উৎপাদন হতো। উপরিউক্ত পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় বর্তমানে তা বহুগুণে বৃদ্ধিলাভ করেছে।

গত ১৯৭৩-৭৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে রেকর্ডসংখ্যক পাট উৎপন্ন হয়। মোট ১০'৩৪ লক্ষ একক জমিতে ৩৬'৩৭ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হয়। তাছাড়াও ঐ বছর ১'৭০ লক্ষ একর জমিতে ৩'৬৪ লক্ষ বেল মেস্তা পাট উৎপন্ন হয়।

কিন্তু পাটের সর্বনিম্ন যে বাজার দর সরকার বেঁধে দিয়েছেন তাতে বর্তমানে বহু চাষীই হতাশ হয়েছে। তাদের মতে এতে উৎপাদন খরচই উঠবে না। ফলে এখন বহু চাষীই পাটের জমিতে আউস ধান উৎপাদন করেছেন। চলতি বছরে পাটের

বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ অস্থায়ী সরকার কুইন্টাল প্রতি পাটের বাজার দর ১৩১'৫০ থেকে ১৬০ টাকার মধ্যে বেঁধে দিয়েছেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই বাজারদরেও চাষী পাট বিকোতে পারছে না। জুট কর্পোরেশন পর্যাপ্ত পরিমাণে বিপণি কেন্দ্র স্থাপন না করায় এবং তাদের পাট কেনায় বিশেষ গরজ না থাকায় চাষীকে সেই ফড়িয়া এবং মুনাকাখোর পাট কবলায়ীর কবলেই পড়তে হচ্ছে এবং যে কোন মূল্যে গ্রামের পাট বিক্রয় করতে হচ্ছে। বৌশীরাঙা ক্ষেত্রেই আজ নগদ কাল ধারকে বুড়ো আসুল দেখিয়ে। আজ ধার কাল নগদে চাষীকে পাট বিক্রয় করে হয়রাণির শেষ হতে হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে পাটের বিশ্ববাজারের এক সমীক্ষা এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

আন্তর্জাতিক বাজার ও কৃষি সংস্থার (ফাও) এক পণ্য সমীক্ষায় বলা হয়েছে বিশ্ববাজারে পাটজাত দ্রব্যের প্রতিযোগিতামূলক দর স্থানান্তিত করার দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে একমাত্র উপায় হলো কাঁচা পাটের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা এবং চটকলগুলির উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা। এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে পাট ও অন্যান্য তন্তুর ভবিষ্যৎ খুব অনিশ্চিত। ১৯৭৬ সালে চাহিদা বৃদ্ধির খুব সীমিত লক্ষণ দেখা যায় এবং সিনথেটিক বিকল্পের তুলনায় পাটের প্রতিযোগিতা মূলক অবস্থা ছিল মূলতঃ কমজোরী।

'ফাও' বলেছে যে, ১৯৭৬-৭৭ সালে বাংলাদেশ ও ভারতে পাট রোয়ার সময় পাট ও ধানের মূল্যের অল্পপাত পাটের অধিক ছিল। সেজন্য পাটফসল বেশী হওয়া উচিত। আবহাওয়া অধিকুলে থাকবে এটা ধরে নিয়ে বলা যায় ভারত ও বাংলাদেশের মোট কাঁচাপাট উৎপাদন ১৯৭৬-৭৭ সালে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বেশি হবে।

'ফাও' সমীক্ষায় বলা হয়েছে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করবে মূল উৎপাদক দেশগুলিতে ধানের দরের ভবিষ্যত প্রবণতা এবং পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বিশ্বচাহিদার ওপর। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, পাটচাষের জমির পরিমাণ রদ-বদলের অনিশ্চিতকারী প্রভাবগুলির বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ বাজার সংরক্ষণের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ খুব জরুরী বলে মনে হয়।

উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে ভারত ও বাংলাদেশে নিবিড় চাষ প্রকল্প গ্রহণ হলো ধানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা মূলক স্তরে পাট ফসলকে তোলার একমাত্র উপায়। ভারতে নানা ধরনের উচ্চ ফলনশীল পাটের উদ্ভাবন হয়েছে। যদি পাটচাষকে লাভজনক রাখতে হয় তবে—এই প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে বলে সমীক্ষায় বলা হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে পাটচাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য নয়, বরং উচ্চতর ফলনের দরুন। ভারত ও থাইল্যান্ডে চাষের জমি হ্রাস করায় এই দশকের সর্বাপেক্ষা কম ফলন হয়েছে। ফাও বলেছে সেজন্য পাট উৎপাদনের অস্থিতিশীলতার পেছনে এক প্রধান কারণ হলো পাট ও ধানের অভ্যন্তরীণ দরের অল্পপাতের প্রচুর হেরফের। ১৯৭৫-৭৬ এর মরসুমে ভারতে পাট

আমদানি করতে হয় কারণ মিল-গুলিকে চালু রাখার পক্ষে অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ছিল কম। আর রপ্তানির দিক থেকে কেবলমাত্র বাংলাদেশই পারে বিদেশে পাট চালান বাড়াতে।

পাটজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্যের বাজার উৎপাদনের চাইতে ক্ষত পড়ে যায়। এটা হলো বিশেষতঃ জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ শিল্পোন্নত দেশগুলিতে চাহিদা অত্যন্ত পড়ে যাওয়ার পরিণাম। এক দশক আগে তাদের মোট আমদানি ছিল ৬০ শতাংশ। কিন্তু এখন তার পরিমাণ বিশ্ব আমদানির অর্ধেকের কম। আমদানিগত চাহিদা পড়ে যাওয়ার সমস্ত রপ্তানিকারী দেশের অত্যন্ত ক্ষতি হয় এবং বাণিজ্যের পরিমাণ ও মূল্য অত্যন্ত নেমে যায়। সমীক্ষার অভিমতে উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে ভারতের রপ্তানি কমে যায় সব চাইতে বেশি পরিমাণে। রপ্তানি হ্রাস পাবার কারণগুলির মধ্যে শুধু-মন্দা ও বিকল্প সিনথেটিক দ্রব্যের অবিরাম চাপ নয় বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক

দরও আছে। বাংলাদেশ ভারতের তুলনায় ১০-১৫ শতাংশ কম দামে মাল রপ্তানি করেছে।

এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলি বাজার তোলার চেষ্টা করলেও সার্বিক পরিস্থিতি হলো এক ক্রমহ্রাসমান চাহিদার। এতে পাট ও পাটজাত দ্রব্য থেকে উৎপাদক দেশগুলি আর আয় বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা দেখেছে না।

১৯৭৪ সালে ভারতের পাটজাত দ্রব্যের দর পড়ে যায় চাহিদা অত্যন্ত কমে যাবার ফলে। এতে ভারতীয় চটকলগুলিতে আর্থিক ক্ষয়তার ওপর গুরুতর চাপ পড়ে। পাটজাত দ্রব্যের ওপর থেকে রপ্তানি শুধু পুরোপুরি তুলে নেয়া হয়। বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্য ও কার্পেট ব্যাকিং-এর রপ্তানির জন্য দশ শতাংশ নগদ ভরতুকি দেয়া হয়। হোসিয়ারের জন্যও অল্পরূপ ভরতুকির কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। এ সমস্ত কিছুই করা হয়েছে বিশ্ববাজারের বর্তমান মূল্যস্তরে পাটশিল্পটিকে বেঁচে থাকায় সাহায্য করার জন্য।

এক জাতি

এক প্রাণ

একতা



এঁরা মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছেন



শিল্পের বিকাশে...

রমনলাল মহেতা প্রায় বিশ বছর আগে ব্যাঙ্গালোরে একটি ছোট বোতামের কারখানা খুলেছিলেন... সেই কারখানা আজ এতো বড় হয়েছে... আরও অনেক নতুন পুরুষ কাজ পেয়েছেন। আর তা সম্ভব হয়েছে সকলে মিলেমিশে কাজ করেন বলে। রমনলাল হলেন গুজরাতের লোক কিন্তু তিনি কান্নাড়া ভাষা শিখেছেন। তাঁর ম্যানেজার, ফোরগান, সুপারভাইজার কিংবা কর্মচারীরা এসেছেন দেশের নানা প্রান্ত থেকে... তাঁদের ভাষা আলাদা, পোষাক আলাদা, খাওয়াদাওয়া আলাদা আর রীতিনীতিও আলাদা কিন্তু কারখানায় তাঁরা একটি ভাষাতেই কথা বলেন আর তা হল কাজের ভাষা। শিল্পের বিকাশে অন্তরায় কোথায়?

অলস মনই বাধার প্রাচীর। আমরা তা ভাঙতে পারি।

চলচ্চিত্র নিয়ে কথা

নাট্যকার অভিনীত 'ফুটবল'

গুরুদাস ভট্টাচার্য

আদিম মা ঘের কাছে নাচ গান
আঁকা অভিনয় ইত্যাদির মতো
খেলাধুলাও ছিল বাঁচার লড়াইয়ের
অঙ্গ, অস্তিত্বের অন্ততম হাতিয়ার।
অঃপর, নানা ধারাবাহিক কার্য-
কারণে ক্রিকেট টেনিস বেসবল ফুট-
বল আজ এক একটা বিনোদন, এমন
এক ধরনের নেশা তথা উদ্ভাসনা যা
ক্যান ও ক্যানাটিকদের ব্যক্তিত্বকে তৃপ্ত
করে, শূন্যতাকে ভরিয়ে দেয়, নিয়ে
যায় লড়াইছুট অবাধ এক স্বপ্নের
জগতে। বিশেষত সেই সমাজে
যেখানে ধনিক বণিক শাসন করে
শোষণের উদ্দেশ্যে, যেখানে আশাহত
বিক্ষুব্ধ উঠতি জেনারেশন মুক্তি খোঁজে
মস্তানীতে এবং কে না জানে, পশ্চিম-
বঙ্গে খেলার মধ্যে খেলার রাজা—
ফুটবল।

এই উদ্ভাস নেশার মজার দিকটা
নিয়ে লেখা পিটার টাস্কার নাটক।
যার অকুশল ইংলও, আমল ষ্ট্যানলী
ম্যাথিউজের। মূল নাটকের ধীম
ও ঠোঁকচার অব্যাহত রেখে বাংলা

রূপান্তর করেছেন কল্পপ্রসাদ সেনগুপ্ত,
বিদেশী সমাজচিত্র মুছে একেছেন
স্বদেশী সমাজের ছবি, বদলেছেন
চরিত্র ও অহুদত্তের তাৎপর্য, সংলাপ,
গানের কলিও। ফলে, বোর্সটাল
ফুলের 'জ্যাক' হেডমাষ্টার হয়ে
গেছেন কলকাতার দিল্লী মিশনারী;
মুলের-বোন ত্যাগিতা মাসী বাংলা
নাটকে পরিবেশের অসহায় শিকার।
মাসীর-কাছে-মাসুদ হরি সকালে
কাগজের হকার, বিকেলে গডের
মার্শের উদ্ভাস ফ্যান। স্ব-অধীন,
বধন-বা-খুশি জীবনের খোঁজ দেয় ফুট-
বল পাগল ব্যোমকালী; ছকে বাঁধা
খির জীবিকার খবর দেয় মেকানিক
জামাইবাবু বিনয়। ইতিমধ্যে মস্তানী
পুলিশ আদালত-জেল, চাকরীর
উমেদারী, শ্রমিক সমস্যা, প্রেমের
আসা যাওয়া, মাসীর রহস্য উন্মোচন
—উন্টোপাটা ধাক্কা খেতে খেতে শেষ
পর্ব হরি মিলিয়ে যায় কারখানার
ফটকের পেছনে; শ্রবণ-সংগীত হুদে
ট্রানজিস্টার। ইতি-উতি বিদেশী

গন্ধ রয়ে গেছে, তবু 'ফুটবল'-এ
বান্ধালিয়ানার ঝাঁপ উগ্র, পাশ্চাত্যের
বেজোড় লাপরোয়া ইয়ংম্যান সাজ
বদলে বাংলার নগজোয়ান-উদ্ভাস
বিস্তৃত ক্ষতবিক্ষত। তার মাতন ফুট
বলে, বারোয়ারী, রবীন্দ্র কাংশান,
হিন্দী সিনেমা, রাজনীতি, সর্বত্র।
তারও ইঙ্গিত আছে এখানে।

বলা বাহুল্য, কলকাতার বুকের
মধ্যে থেকে যদি এ নাটক উঠে
আসত, তাহলে আমাদের অস্তিত্বের
আরও অনেক কথা, গৃহ গভীর কথা
সহজেই বলা যেত, কোন বিদেশী
নাটকের ছকের অহুসরণে তা সম্ভব
নয়। কিন্তু তা যখন হচ্ছে না, ফুটবল-
নেপাথোর বান্ধালীর কাছে 'ফুটবল'
একটি দার্শনিক অভিজ্ঞতা বলেই
বিবেচিত ও সমাদৃত হবে।

প্রায় চলচ্চিত্রের মতোই গোটা
চল্লিশ দৃষ্টাণু, তীব্র গতি—এ শুধু মূল
নাটকেরই, বাংলা নাটকে যা
অব্যাহত। তার সঙ্গে আরও একটু
আছে—একটা মজাদার নাটকের
টেকসূচারে বুন দেওয়া সিরীয়াস
বক্তব্যের সূতো; ব্রেস্টীয় মোহ-
ভঙ্গের টানাপোড়েনে বারলেস্কে এর
লঘু মায়া। ফলত এক মিশ্র রীতির
ও রঙ্গের দ্বন্দ্বিক সম্বন্ধ। এইখানেই
নাট্যকার নির্দেশকের মৌলিকতা,
পরিপ্রসঙ্গ ও তিনি প্রয়োগ প্রসঙ্গে।
মেজের রাখার মতো মুহূর্ত-প্রতিমুহূর্ত

তিনি সৃষ্টি করেছেন; অনেকগুলি
মঞ্চে ফুটে উঠেছে। কোথাও
কোথাও ধামতি-যেমন, বিতীয়
আবির্ভাবে ফীর অ্যাকসনের পুনঃ
পুনরাবৃত্তি। হরির ভূমিকায় নবাগত-
শিল্পীর অভিনয়ে আরও প্রাসটসিটির
প্রয়োজন, বিশেষত এই দৌড়
নাটকে। অনেক, কম্পোজিশন,
যথা অঙ্গন-সীতা, ক্লিশে; কিছু ষ্টাই-
লাইজেশন, যথা বেশিন চালানো,
ক্ল্যাট। মঞ্চে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা
পনায় গতি আছে; শুধু টি ভি সেটের
ক্লিনটাই অস্বার্থ; ভালো হত
রিজুটি সেটের এবং অঙ্গন-সীতার
দৃষ্ট দৃষ্টিকে স্বপ্নিল রূপ দিলে। মেক
আপে বৈচিত্র্য আছে; তবু মারো-
য়াডী গৃহিনীকে কেমন যেন ওড়িশা
নন্দিনী মনে হয়। জনতা যখন
'কোয়াম' নামে অভিহিত। তাহলে
ঘরোয়া পোশাকেই ষ্টাইলাইজেশন
কেন যে নেই! উর্দু সাইনবোর্ডে
ছোটো বানান ভুল। একটা তো
মারাত্মক! শব্দ প্রয়োগে ডাইমেন-
শন তৈরীর চেষ্টা প্রশংসনীয়; তবে
ট্রানজিস্টারের গান মঞ্চে
ভিতর থেকে এলেই ভালো হয় এবং
যে রীতিতে স্থান কালকে ভেঙ্গে
'কাইনেটিক' আবহের জন্ম হয় তার
পরিচয় নেই শব্দ গ্রহণে। আলোর
ব্যবস্থা প্রচুর ও ক্ষিপ্ত; স্পটের আচরণ
সর্বত্র সূঁচ নয়; অসৌষ্ঠব রংয়ের ব্যব
হার—টকটকে লাল শাড়ির ওপর
বেকার বেগুনী ছড়িয়ে দিয়ে কার কী
লাভ হল, জানি না। অবশ্য নাচটাও
নাচ হয়নি। বস্তুত নাট্যকারের
এই নাটকের দুর্বলতম অঙ্গ তথা
আলিঙ্গ: প্যাটোমাইম।

কম্পিউটার, ফিলহারমোনিক
অর্কেস্ট্রা, কোলাজ, ক্রিকেট, ফুটবল,
সর্বত্র—"পারফেকশন" যদি কাম্য,
চাই 'প্রিসিন'। আজকাল নাট্য-
কলায় যতোই বিভিন্ন উপাদানের
স্তিদ্ধ বাড়ছে, নির্দেশনা-প্রয়োগ-
প্রকাশ ততোই হচ্ছে বিজ্ঞান সম্মত
হিসেবী। বিদেশে ষ্টাইলাইজড
অ্যাকটিংয়ের মতো প্যাটোমাইমও
উন্নত ব্যালের পর্যায়ে। স্বদেশেও
হেথেন্সি: পশ্চিম ও উত্তর ভারতে
প্যাটোমাইম জ্বরদন্ত আর্ট ছেলে,
মেয়েদের মধ্যেও বড় বড় গ্রুপে।
অর্থাৎ বঙ্গরঙ্গমঞ্চে 'থিয়েটার অফ
মিক্সড মীন্স' কে যদি আনতেই
হয়, বিবিধ আর্ট ও বিজ্ঞান মাধ্যমের
নাটকীয় প্রয়োগ, আলো রং ও
সাউন্ডট্রাকে নিরীক্ষা, বোম্বব্যাসাম,
নাচ, প্যাটোমাইম, এসব গ্রুপ
থিয়েটারকে রঙ্গ করতাই হবে,
কোরিওগ্রাফী ও ডেনস্ট্রেশন, উভ-
য়তই। তবু, অস্তাব সম্বন্ধে ক্রীমেন-
গুপ্ত একটা সং ও বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা
করেছেন, তার জন্তে নিরন্তর শক্ত-
বাদ তাঁর প্রাপ্য অবতাই।

বাবা তারকনাথ

ভানুসংহ

বাবা তারকনাথের মহিমা কিনা
বলতে পারব না, রঙীন ছবিটি বহু
ক্রটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে সাধারণ দর্শকের
মনে একটি সহজ আবেদন সঞ্চার
করে। ভক্তিরসাত্মক কাহিনীর
মধ্যে পৌরাণিক ভঙ্গের কোন প্রসঙ্গ
নেই—বাবার মহিমা ফুটিয়ে তোলার
জন্ত কিছু কিছু আবেগ সর্বত্র ঘটনা
সাজিয়ে কাহিনীর একটি কাঠামো
দাঁড় করানো হয়েছে যেখানে ভক্তি-
বাদের কাছে যুক্তিবাদ পুরোপুরি
নস্তাং। অবশ্য এ জাতীয় ছবিতে
ভক্তিরসই হল মূল কথা—কিন্তু
চিত্রনাট্যকার বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকেও
টেনে এনেছেন ভক্তিবাদকে বড়
করার জন্ত। কিন্তু প্রশ্ন, এই উভয়
তত্ত্বকে Contrast Form-এ যথাযথ
তুলে ধরা হল কোথায়? তা যদি
না হল, তবে এই সংসারের ব্যাপারটি
ছবিতে নিয়ে আসা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে
পড়ল না কি? দুর্বল চিত্রনাট্য,
শিথিল দৃষ্টবিজ্ঞান, নির্বোধ ঘটনা
সমীক্ষণ ও অহেতুক দৈর্ঘ্য ছবিটির
রসাস্বাদনে বাধা সৃষ্টি করে নিশ্চয়ই,
কিন্তু গোটা ছবিতে সমস্ত সমাধানের
সরলীকরণ সম্বন্ধে সহজ ভক্তিভাবের
এমন একটি পরিমণ্ডল রচনা করা
হয়েছে যেখানে সাধারণ ভক্ত দর্শকের
চিত্ত কিছুটা আবিষ্ট হবেই।
পরিচালক অর্ধেন্দু চ্যাটার্জীর এখানেই
কৃতিত্ব। ভাবি, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
যদি আরও একটু ভক্তিনিষ্ঠ হয়ে
গানগুলি রচনা করতেন এবং নীতা
সেন যদি আরও কিছুটা তন্ময় স্বর
আরোপ করতেন, তাহলে হিন্দি
'সন্তোষী মা'-র মত আমাদের বাবার
ছবিও সাধারণের কাছে আরও কত
না আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। তবে
শিল্পীদের গরিষ্ঠাংশের অভিনয়
নিষ্ঠাশীল। সন্ধ্যা রায় এবং হলোচনা
চ্যাটার্জীর অভিনয় তো বিশেষ
উল্লেখ্যেরই দারী রাখে। কিন্তু স্বাভা-
বিকভাবে অভিনেত্রীকে কোন কারণে
এ ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ দেওয়া
হল বুদ্ধিমান না। তিনি ছবির
অভিনয়ে পুরোপুরি অচল। আর
অল্পপুরুষের আবেগপূর্ণ অভিনয়
দর্শকমনে রেখাপাত অবশ্যই করবে।
ছবির আঙ্গিক খুবই সরল। মোটা
দাগের এই ছবিতে কিছু ট্রিকশট
ব্যবহৃত হয়েছে অলৌকিকতার
বাড়িরে। নাচের দৃষ্টটি স্বকল্পিত।

মহাচীনের শিক্ষা

(৪ম পৃষ্ঠার পর)

পুস্তকের কথা উল্লেখ করছি। আমা-
দের পশ্চিমবঙ্গেই কোন এক পাঠ্য
পুস্তকে (বোর্ড কর্তৃক অহুমোদিত)
লেখা আছে—"বিশ্বভ্রমণে বিশ্বাসী
ভারত বিশ্বশান্তির পুজারী। আফ্রিকা
লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশ-
গুলির মত উন্নত দেশগুলির সঙ্গে
ভারতের বন্ধুত্ব বিচল। সোভিয়েট
সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য,
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ফ্রান্স
হলান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান
প্রভৃতি উন্নত দেশগুলির সঙ্গে বহুদিন
থেকেই ভারতের বাণিজ্যিক ও সাং-
স্কৃতিক যোগাযোগ রয়েছে। তবে যে
সমস্ত রাষ্ট্র বর্ণবৈষম্যে বিশ্বাসী (দক্ষিণ
আফ্রিকা) ভারত তাহদের সঙ্গে বন্ধুত্ব
আগ্রহী নয়। আগ্রাসী মনোভাবও
ভারতের পছন্দ নয়। তাই ভারত-
চীন সন্ধুত্বের পর থেকে ভারতের
সঙ্গে চীনের সম্পর্কে ছেদ পড়েছে।"

এ কথার মূল্য এখন আছে কি?
এখন তাহলে লেখককে ভারত মত
বদলাতে হচ্ছে—মত না হলেও
লেখার বয়ান বদলাতে হচ্ছে, কারণ
সরকারী পর্যায়ে এখন চীনের সঙ্গে
সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। আশা করি

ভবিষ্যতে এর আরও অনেক উন্নতি
হবে। তিনি হয়তো তার ব্যক্তিগত
কিছু সুবিধার কথা ভেবে লিখে-
ছিলেন যদিও লেখার প্রয়োজন ছিল
না কারণ ওটা বিষয় বহিস্কৃত।
বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে ওটা কি সুশিক্ষা
বা ভুল শিক্ষা: দেওয়া হলো না? শিক্ষার্থীর মনের উদারতা বাড়ানই
তাঁর কাজ, মন ছোট করা নয়। এ
দায়িত্ববোধ আমাদের থাকার দরকার।
চীনের সাধারণ মানুষের মনোবৃত্তি
কমিউনিষ্ট সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গেই
আপনা থেকেই বদল হয়নি। "আমি
ও আমার" এ কথা তোলা খুব সহজ
নয় কারণ এটা শত সহস্র বছরের
মজাগত ধারণা। বর্তমান চীনের
জনগণ যে মনোভাব নিয়ে চলেছে
তা কেবল এই শিক্ষানীতির ফলেই।
এ কথা বলছি না যে চীনে একটিও
ভিন্ন মতের লোক নেই। আগেই বলেছি
হাজার বছরের সংস্কারে মন আচ্ছন্ন
হয়ে আছে। সেই সংস্কার থেকে
মুক্ত করা কঠিন, ঘুরে ফিরে তা একটু
আধটু আসবেই এবং ক্রমাগত শিক্ষার
ফলে শেষে হয়তো দূর হবে। পুরা-
তন এই ভাবধারার পরিবর্তনের জন্তই
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছিল।
তবুও এই ধরণের বিপ্লব আরও হবে।
শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজ-
তান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার ঘটান।

সেই জন্ত চীনের শিক্ষা হবে সর্বহারার
রাজনীতির সহায়ক এবং তা থাকবে
উৎপাদনমূলক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত।
এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে চাই সেই
শিক্ষার্থীর নৈতিক, শারীরিক ও সাং-
স্কৃতিক উন্নতি। এই জন্তই কৃষক
শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের মিলন ও
আদান প্রদানের মধ্য দিয়েই
সর্বজনীন সূঁচ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে
তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থী
একজন সমাজ সচেতন কর্মী হয়ে
উঠবে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে
উৎপাদনমূলক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত
করা হয়েছে যাতে বিদ্যার্থী কেবলমাত্র
পুঁথিগত বিচার অধিকারী না হয়।
কায়িক শ্রমের উপর বিশেষ জোর
দেওয়া হয়েছে কারণ রাষ্ট্রনায়কদের
বিশ্বাস যে কায়িক শ্রম নতুন করে
শিক্ষার সুযোগ দেয় যাতে জ্ঞানের
গভীরতা বাড়ে। এ বিশ্বাস তারা
অর্জন করেছেন নিজেদের অভিজ্ঞতা
থেকে। স্কুল কলেজের সঙ্গে ছোট
ছোট কারখানা থাকবে যাতে ছেলে-
মেয়েরা যন্ত্র বিষয়ে কিছু জ্ঞানতে পারে
এবং ছোটখাট কিছু তৈরী করে
নিজেদের পাঠ্য বিষয়ের প্রয়োগ
করতে পারে। শ্রমিক ও কৃষক
সম্প্রদায়ের শিক্ষার অগ্রাধিকার
দেওয়া হচ্ছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

যাত্রা সংবাদ

তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যাত্রা
প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ
পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের প্রতি-
নিধিরা সম্মতি, তথ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত দেব
ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করেন।
আলোচনার বিষয় ছিল আগামী
যাত্রা সম্মেলন। স্থির হয়েছে সেপ্টেম্বর
মাসে পনেরো বিংশ দিম ব্যাপী এই
যাত্রা উৎসব চলবে। পরিবেশিত
হবে শিক্ষামূলক পালা।

ভাড়াট্টা সরকার আবেদন
করেছেন গ্রামের যেকোনো বাড়ি
যাত্রা দেখতে গাঁও সেইজন্য যাত্রার
ব্যয় করা সম্পর্কে। হজরতের
পক্ষ থেকে বলা হয় যে, এতে তাদের
কিছু করার নেই, কারণ যাত্রা ব্যয়
করে তারাই চিকিটের দর বাড়ায়।
প্রতিনিধিদের বক্তব্য, তাঁরাও ব্যয়
বৃদ্ধির জন্য বেশি টাকা চাইতে বাধ্য
হন। অনেক টাকা অন্যায়ভাবে

থাকে। সরকার বলেছেন এ ব্যাপারে
সহযোগিতা করবেন। সরকারের
বক্তব্য, এবার যাত্রা উৎসবে পুরস্কার
দেওয়া হবে না। কারণ পুরস্কার
নিয়ে প্রতি বছর নানা অভিযোগ
শোনা যায়।

সত্যস্বর অপেরা

যাত্রা জগতের সুপ্রাচীন সংস্থা
সত্যস্বর অপেরা এ বছরে ৮৫ বর্ষে
পূর্ত্যাপন্ন করল। এদের এবারের
পালা ৮২তম সরকারী পুরস্কার প্রাপ্ত
পালাকার শৈলেন্দ্র ভূঁইয়া নিয়োজিত
রচিত ও নির্দেশিত “সত্যস্বর” নাট্য গান
ও অভিনয়ে সমৃদ্ধ। গত ১লা আগস্ট
শ্রীমতি কল্যাণ প্রেক্ষাগৃহে
পালাটির উদ্বোধন হয়। দিল্লীস্থ
আবিস্তার অভিনয়ে পালাটি দর্শকদের
প্রশংসাময় হয়ে সার্বজনীন স্বাক্ষর
পেয়েছে। হজরত অভিনয়ে সত্যস্বর
অপেরার ঐতিহ্য বর্তমান পালায়ও
উপস্থিত। এবারের শিল্পী জালিকার
আছেন মৃণালকান্তি দাস, রাজা
ভট্টাচার্য, অজিত দত্ত, অমল ভাট্টাচার্য
চিত্ত বোধি, রঞ্জন চক্রবর্তী, রাধন
সমাদার, দেবেশ দে, দেবব্রত
সংকার, বাবু দেবনাথ, রাধেশ
ভট্টাচার্য, চৈতন্য মোহান্ত, মিলন
আচার্য, শ্রীধর মুখার্জী, বিজয়
চৌধুরী এবং বিমলেন্দু ভট্টাচার্য।
শ্রী চরিত্রে আছেন নবীগতা শিবানী
ভট্টাচার্য, তরুণী বোধি, অনন্যা নাগ,
জয়ন্তী বসু, স্বপ্না বিশ্বাস ও চিত্রা
দাস। এ ছাড়া সত্যস্বর অপেরা
প্রযোজনা করছে আরও দুটি বলিষ্ঠ
পালা। একটি হারু রায় রচিত
পৌরাণিক পালা “নাগমনি”
(চিত্রাঙ্গদা) এবং অন্যটি যুগপোষোণী
বাস্তবধর্মী সামাজিক পালা চিত্ত দে
রচিত ও পরিচালিত “সোনার
ঘোড়া”। সংস্থার সংযোজক বিমান
বোধি পালা দুটির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে
নিঃসন্দেহ।

রাজধানী যাত্রা ইউনিট

গত সপ্তাহে রাজধানী যাত্রা
ইউনিট মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়
করে স্বপন সেনগুপ্ত রচিত, নির্দেশিত
ও হরারোপিত “প্রতিবাদ” নাটক।
সমাজ জীবনের শোষণ, অত্যাচার,
অবিচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে
প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে এই
নাটকে। চন্দনপাড়ার কৃষক আন্দোলনের
পটভূমিকায় রচিত কাহিনী
নিয়ে এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ যাত্রা-
মোদীদের প্রশংসা পাবে। গ্রামের
ছেলে শহরের কারখানায় ঢোকে
শ্রমিক হয়ে। মালিক-শ্রমিকের
ঘর্ষে মালিকের দালালের ছুরির
আঘাত খেয়ে শ্রমিক প্রতিবাদ জানায়।
গ্রামের ছেলে গ্রামে কিংবা যায়।
যে কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠছে
তার সঙ্গে সামিল হয়ে জানায়

শহরের সংগ্রাম শ্রমিকও তাদের
সঙ্গে আছে। মেহনতী মানুষ এগিয়ে
চল। দিন বদলাচ্ছে। জোরালো
বক্তব্যকে সার্বজনীন রূপ দিয়েছেন
শিল্পীরা।

রায় অপেরা

যাত্রা জগতে প্রথম মহিলা যাত্রা
ইউনিট আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের
একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চিংপুরে
হৈ চৈ পড়েছিল। সত্যমিকারিনী
সাধনা রায় সিদ্ধান্তে অটল। এবারে
ওদের পালা নট ও নাট্যকার শান্তি
চক্রবর্তী রচিত ও পরিচালিত
“বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবারই স্ত্রী”। কাহিনীর
মধ্যে অভিনয় আছে। সুর মনো-
জনার দায়িত্ব নিয়েছেন সুবীর বসু।
মুঠ রচনা করেছেন সুরার বিবরণ।
এদের দ্বিতীয় পালা বিমল মুখো-
পাধ্যায়ের ভক্তি রঞ্জিত নাটক
“কলকাত্তা”। এটিরও নির্দেশনা
আছেন শান্তি চক্রবর্তী। বিভিন্ন
চরিত্রে রূপদান করছেন হলেবা
ব্যানার্জী, অমিতা চক্রবর্তী, বীণা
দত্ত, কৃষ্ণা সরকার, জীলা রায়,
পুষ্পিতা মুখার্জী, প্রভৃতি। দল
পরিচালনার দায়িত্বে আছেন
গোপাল মুখার্জী।

ভারতী অপেরা

এই দলের নতুন পালা আনন্দময়
বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “কংস”, যে
পালা কংসের জন্ম, দেবকীর কারাবাস
কংসের জন্ম, বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যস্বর
যুগে যুগের শাবিত বাণী প্রচার
করবে। এদের দ্বিতীয় পালা সত্য-
প্রকাশ দত্ত রচিত “সম্রাট আলাউদ্দিন”।
ইতিহাসের এক জীবন্ত
চরিত্র সম্রাট আলাউদ্দিন, বিনি
দেবারের রাণী পদ্মিনীর রূপে আকৃষ্ট
হয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার
চরিত্রের অন্যতম ছিল। তাই
তাকে বিবৃত হওয়া যায় না। তার
চরিত্রের এই আলো-আঁধার “সম্রাট
আলাউদ্দিন” পালায় ফুটে উঠেছে।
দুটি পালায়ই নির্দেশক শেখর চট্টো-
পাধ্যায়। অভিনয়শ্রেণি আছেন
রাখাল সিংহ, দিব্যেন্দু মুখার্জী, রীতা
দত্ত, দেবকুমার ও অন্যান্যরা।

মোহন অপেরা

আগামী ১৫ই আগস্ট রাত ৯টার
বসিরহাট মেঘনানী হলে “সাত নম্বর
কয়েদী” ও ১৭ই আগস্ট সন্ধ্যা ৬-৩০-
টার ঠারে “কালকেতু ফুল্লরা”র
শুভমুখি হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য
“সাতনম্বর কয়েদী” পালায় দৈত-
ভূমিকায় মোহন চ্যাটার্জী ও “কাল-
কেতু ফুল্লরা” পালায় কালকেতুর
ভূমিকায় মোহন চ্যাটার্জী, ফুল্লরার
ভূমিকায় অদিমা - কর ও চণ্ডীর
ভূমিকায় বিণা চ্যাটার্জী অভিনয়
করবেন।

স্বপ্ন সংশোধন

গত ২২শে জুলাই সন্ধ্যার দর্পণে
নিউ প্রভাস অপেরার বিজ্ঞাপনে অন-
বধানভাবশতঃ প্রেষ্ঠাংশে অজ্ঞাতশব্দ
নামের উল্লেখ ছিল। সেখানে
অজ্ঞাতশব্দর বদলে প্রেষ্ঠাংশে সমীর
লাহিড়ীর নাম পড়তে হবে।

সমকাল

শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক
সাময়িকী
বিধুশেখর শাস্ত্রী, এস আর সি
সি এম ও এস ভি প্রভৃতির
অনবস্ত রচনা সমৃদ্ধ।

প্রাক্তিধান :

যৌর চক্রবর্তী
৩১, আশুতোষ শীল লেন
কলি-৭০০০৬

১৫ই আগস্ট

মোহন অপেরার

শুভেচ্ছা

৮৪তে নিবেদন করছে

আনন্দময়ের

কালকেতু ফুল্লরা

ও

সাতনম্বর কয়েদী

এবং

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মী এলো ঘরে

নির্দেশনা ও প্রেষ্ঠা ভূমিকায়

মোহন চ্যাটার্জী

৩০৯, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬

ফোন-৫৫ ৫৪১০

স্বাধীনতা দিবসের

পুণ্যলগ্নে সকলকে

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

৮৪-তে

মাধবী

নাট্য কোং'র

সুপারহিট নাটক

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জিঘাংসা

সঞ্জয় সেনের

কচ ও দেবযানী

৩০৫ বি, বিধান সরণী

কলিকাতা-৬

১৫ই আগস্টের ডাকে

রয়েল বীণাপাণির

সর্ব বোধনা

ব্রজেন ফের

গৃহলক্ষ্মী

সৌরেনবাবুর

পরাজিত সম্রাট

চলছে চলবে

৮৩'র হিট পালা

বধু বিনোদিনী

বুকিং চলছে (৫৫-৭৫৫২)

তরুণ অপেরার

শুভ স্বাধীনতা দিবসের

অভিনন্দন

১২শে আগস্ট

সারকারিনায়

সন্ধ্যা ৩-৩৩ টায়

শঙ্কু বাগ

বিরচিত

রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা

স্বর-প্রশান্ত ভট্টাচার্য

মুক্তি প্রতীকার

মধু সোমস্বামী রচিত

সিপাই মিউচিনি

স্বর-পশুপতি ভট্টাচার্য

নির্দেশনা ও অভিনয়ে

শান্তিগোপাল

ভারতী অপেরায় চলবে

সম্রাট আলাউদ্দিন

ও

কংস

১১০, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬

৮৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী জনপ্রিয়

সত্যস্বর অপেরা

নিবেদিত

কল্লোলিত কলকাতায়

মুখরিত ‘ঝুমুর’

তৎসহ

জমজমাট পৌরাণিক পালা

নাগমনি (চিত্রাঙ্গদা)

ও

যুগপোষোণী সামাজিক পালা

সোনার ঘোড়া

ফোন-৫৫-৮১১০

৮৪তে প্রেষ্ঠার দাবী রাখে

শ্রেষ্ঠ শিল্পী নিয়ে গঠিত

শিল্পীমহল

তিনটি অনবস্ত নাট্য: উপহার

রবীন্দ্র ব্যাঙ্গাজীর পৌরাণিক

দম্য রত্নাকর

কানাই নাথের ঐতিহাসিক

লাল বিশাল

দেবেশ্র নাথের সামাজিক

এ যুগের আয়না

নির্দেশক • সর্বাধিনায়ক

—প্রেষ্ঠাংশে—

নটরাজ ভোলা পাল

সুবিমল আদক, নির্মল নাগ,

কার্তিক অধিকারী

সত্যেন মুখোঃ, কুমারেশ বন্দ্যোঃ,

বলাই দে, ঋষি মণ্ডল,

দাশরথি শেঠ, প্রদীপকুমার

গায়ক—ভক্ত মল্লিক ও

অমর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষ্ণুপ্রিয়া ও রাইকমলখাতা

তারারানী পাল

ফিরোজাবালা, স্বর্নালী মিত্র

এবং

নন্দিতা দাশগুপ্তা

আবহসঙ্গীত—খোকা মল্লিক

ম্যানেজার—ক্ষেত্রমোহন পাল

জেনারেল ম্যানেজার

অভয় সাহা

৩০২ডি, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬

৫৫-২০২৬

কুৎসিত কাহিনী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মতলবে গোপনে কংগ্রেসীদের সাহায্যে এক 'হাউসিং কো-অপারেটিভ' বানিয়ে ফেললো। আর প্রত্ন যখন সদয় তখন দক্ষিণ কলকাতায় রিচি রোডে ও বালীগঞ্জ সাকুলার রোডে পৌরসভার দুখণ্ড জমি (প্রায় ১৫।১৬ বিঘা) সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় কজাও করে ফেললো। সি পি আই নেতা মনি সাম্রাজ্যের যোগ-সাজসে ২৫ লাখ টাকার সরকারী ঋণও পাশ হয়ে গেলো। কিন্তু কো-অপারেটিভের রেজিস্ট্রারের নির্দেশে যখন সকলের অল্প সমস্ত পদ খুলে দিতে হলো তখনই কেবল সাধারণ কর্মচারীরা জানতে পারলো সমস্ত ব্যাপারটা। সাধারণ কর্মচারীরা তখনই ২০৫ টাকা করে জমা দিয়ে প্রায় ৪০০ জন সদস্যশ্রেণীভুক্ত হলেন যে অল্প কয়েকদিন সময় দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যেই। যে ২৫।৩০ জন এই চক্রান্তটি শুরু করেছিলো ৩০টি ফ্ল্যাট তৈরী করে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেবে বলে, তারা প্রমাদ গুলো। গোপনে তৈরী কর্মপরিকল্পনার অগ্রতম সদস্য কংগ্রেসী মস্তান 'ঠাণ্ডা' ওরফে ভবানী রায় ধমকাতে লাগলো অব্যাহত লোকের সমস্ত পদ খারিজ করে দেওয়া হবে বলে। কিন্তু আইনের কোনো স্বত্বই "অব্যাহত"দের তাড়ানো গেল না। এবং তাদের নিয়েই হয় সাধারণ

বার্ষিক সভার ব্যবস্থা করতে হলো। সাধারণ সদস্যদের নিরন্তর অসুস্থতাদের অবাবে বলা হলো, যা কিছু জানবার ঐ সাধারণ সভায় জানানো হবে। তার আগে পর্যন্ত সবই গোপন, চুপি চুপি—কেন তা ওরাই জানে।

মধ্যবিত্ত গরীব কর্মচারীরা "একটুকু বাসা" পাওয়ার ক্ষীণ আশায় সাধারণ সভায় হাজির হলো। কিন্তু সেখানে যে নাটক অভিনীত হলো তার তুলনা নেই। সভামঞ্চ কণ্টোল—করছেন কর্পোরেশনের সি পি আই নেতা মতা ভট্টাচার্য, সামনে চাল হিসাবে রেখে দিয়েছেন সেই নির্দিত কংগ্রেসী মস্তান মধু চ্যাটার্জীকে। আর "অব্যাহত" লোকেরা যাতে কোনো প্রশ্ন তুলে বা কমিটিতে ঢুকে পড়ে অবস্থিতে না ফেলে তার অল্প সি পি আই কর্মী স্বধেনু সেনের নেতৃত্বে ছুরি ও চেয়ারধারী মস্তানরা সভা ঘিরে রাখলো। এরপর মধু চ্যাটার্জীর হুমকীতে অতি স্বর্ণা ক্যানিস্ত কায়দায় মাত্র সাড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ১৩টি

আইটেমের ১৩টি প্রস্তাব "সর্বসম্মতিক্রমে" পাশ হয়ে গেল এবং মধু চ্যাটার্জীর পদলেহী ডেপুটি কমিশনার বিমল রায় কোনো আলোচনা করতে না দিয়ে সভার গিলোটিন করে দিলেন। কেউ জানতে পারলো না ক'টি ফ্ল্যাটে তৈরী হবে, সকলে পাবে কিনা। কী পদ্ধতিতেই বা বন্টন করা হবে কোনো খবরই পাওয়া গেল না। অপূর্ব সভ্য ভট্টাচার্য রবি চক্রবর্তী কোম্পানী। এরা আবার সি পি আইদের মধ্যে "তবুও সং" বলে বিজ্ঞাপিত।

এরপর ক্রাফট নির্বাহক সমিতির প্রথম সভায় সি পি আই-রা এত দালালী করেও একটু ধাক্কা খেলো কংগ্রেসের মধু-শান্তি মিলিত শক্তির হাতে। "সং" সি পি আই রবি চক্রবর্তীকে সরিয়ে-কংগ্রেসী প্রমিক নেতা শান্তি সেনের এক ল্যাংবোটকে সম্পাদক করা হলো। তারপর প্রায় নয় বছর হয়ে গেলেও এই সোসাইটির আর কোনো খবর সাধারণ সদস্যরা পাচ্ছেন না। শোনা যাচ্ছে পূর্বপরিকল্পনা অসুস্থায়ী গোটা

সরোজ দত্ত সম্পর্কে তদন্ত হক

"প্রথম টাইমুনালের মামলা প্রত্যাহারের সরকারী আবেদন পত্র বলা হয় যে, আসামী সরোজ দত্ত পলাতক। সরোজ দত্তের অন্তর্ধানকে ঘিরে ধেরহস্ত জড়িয়ে আছে তার এমনও মীমাংসা হয়নি। অনেকের ধারণা যে তাকে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারপর থেকে তার

সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কিছু জানা যায় নি। কিন্তু -টা মনে হয়েছিল যে তাকে পুলিশী হেফাজতে মেরে ফেলা হয়। রাজনৈতিক নেতাদের সরকার কর্তৃক নিমূল করার অভিযানের অনেক ঘটনাই প্রকাশ্যে এসেছে। সরোজ দত্তের ব্যাপারটা এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য হিসাবে হাজির হচ্ছে। পুলিশ এবং শুণ্ডা বাহিনী কর্তৃক রাজনৈতিক নেতাদের হত্যার ব্যাপারে তদন্ত কমিশন নিয়োগকে স্বাগত জানিয়েই বলছি, যে কবি সরোজ দত্তের ব্যাপারটা বিশেষভাবে আলাদা করে তদন্ত করা হোক।

"বাংলায় রাষ্ট্রতন্ত্রের ২তম ঘটনাগুলির মধ্যে কবি সরোজ দত্তের ব্যাপারটা অনেক জলজ্যাস্ত এবং এটা জনগণের স্বত্বিতে দাগ কেটে আছে। অপরাধীদের শাস্তিহীন সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করেছেন, তাই তাদের বলতে চাই সরোজ দত্তের ব্যাপারে একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হোক এবং অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হোক।"

এই-বিবৃতি দিয়েছেন সৌরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, দিলীপ চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অরুণা চৌধুরী, সভ্যত্ব দাশগুপ্ত, জ্ঞানেশ পত্রনদীশ, অরবিন্দ পোদ্দার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, পরেশ ধর ও হীরেন বসু।

৪০ ফ্ল্যাট বানিয়ে ওরা নিজেদের দিয়ে হটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মধ্যে ভাগ করে নিচ্ছে। যারা এ অবস্থায় তদন্ত ও অনুসন্ধান হতাশ হয়ে তাদের ২০৫ টাকা ফেরৎ মের জন্ম নুতম পৌরসভা চাইছেন তাদেরও টাকা ফেরৎ না সমবায় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি

স্বাধীনতা দিবসে আমাদের শ্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

প্রস্তুতির পথে

৮৪'র প্রযোজনা

তিনটি স্বাদের তিনটি পালা

ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত সামাজিক পালা

অচল পয়সা

সত্যপ্রকাশ দত্ত রচিত সামাজিক পালা

পাপ পুণ্য ভগবান

স্বর: মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সুনীল চৌধুরী রচিত ঐতিহাসিক নাটক

সাঁই ফকির রূপচাঁদ

নাট্য নির্দেশনায়

অরুণ দাশগুপ্ত

নিয়মিত প্রতি শনি ও রবিবার

মহাজাতি সদনে

অভিনীত হচ্ছে

পালাসত্রীট ব্রজেন্দ্রকুমার ঘের

নটী বিনোদিনী

স্বর: দুর্গা সেন

নির্দেশনা:

অরুণ দাশগুপ্ত

পালাসত্রীট ব্রজেন্দ্রকুমার ঘের

বিদ্যাসাগর

স্বর: অনিল বাগচী

নির্দেশনা:

অরুণ দাশগুপ্ত

ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত

মা মাটি মানুষ

স্বর: মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নির্দেশনা:

অরুণ দাশগুপ্ত

পরিবেশনায়

সর্বযুগের একটি নাম

নট কোম্পানী

১৭, হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, কলিকাতা-৫

ফোন: ৫৫-০৭৭২ ও ৫৪-৩৬৬৮

প্রকাশিত হলো

সিরিজ-২

ইন্দিরার কারাগারে

ইন্দিরা রাজত্বের শুরুতেই ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০-৭১ এর পুলিশী

অত্যাচারের বীভৎস কাহিনীর সংকলন

দাম—দেড় টাকা

দেশকথা প্রকাশিনী

৬১, মট সেন, কলিকাতা-১৩

মিহির আচার্যের

বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজভাবনা

এমারজেন্সির সময় এই রচনাগুলি দর্পণ-এ প্রকাশিত হলে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল। এখন একটি কপি সংগ্রহ করে সংগ্রামী সংস্কৃতির সামিল হোন।

: অত্যন্ত গ্রহ:

চিত্ত ষোমাল ৥ ঘোড়সওয়ার ৬.০০ সাধন চট্টোপাধ্যায় ৥ মনোনয়ন

৮.০০ সমরেশ দাশগুপ্ত ৥ নির্বাচিত গল্প ৮.০০

লেখক সমাবেশ ৥ এ-১৮-এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা-৭

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট সেন কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

দর্পণ

বিশ্ব ৪৪। ৩০শ সংখ্যা। শুক্রবার ১২শে আগস্ট, '৭৭। ৪০ পয়সা

বাজপেয়ী ও মেনকার কলকাতা সফরের নেপথ্য রহস্য

(দর্পণের সংবাদভাষ্য)

ভারতের বিদেশমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী রেলুন যাবার পথে হঠাৎ দমদমে খাজা বিরতি করে বিমান বন্দরে থেকে সরাসরি পাসপোর্ট অফিসে হাজির হয়েছিলেন কি নিছক কর্মচারীদের চমক দেবার জন্ত? আদর্শেই তা নয়। সঙ্ঘ গান্ধীর সাক্ষরিত ও সত্যীর্থ ই, এম, সির কমল নাথ কলকাতায় কিসে এসেছেন স্বল্পকালের জন্ত। তার অবস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট গোপনীয়তা অবলম্বিত হচ্ছে। ইন্দিরাজী এবং সঙ্ঘ গান্ধী থেকে শুরু করে ইন্দিরাপন্থীদের অনেকেই তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। অটলবিহারী বাজপেয়ীর হঠাৎ কলকাতায় আসা এবং পাসপোর্ট অফিস পরিদর্শন করার নেপথ্য রহস্য হচ্ছে কমল নাথের পাসপোর্ট আটকে দেওয়া। সম্ভবত কমল নাথের পাসপোর্ট বাতিল করা হবে। এদিকে

সঙ্ঘ-জায়া মেনকা গান্ধীও কলকাতায় এসেছেন ১৭ই আগস্ট। বাহ্যিক সাংবাদিক হিসেবে তিনি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ইন্টারভিউ নেবেন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে মেনকা গান্ধী কমল নাথের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই আসছেন।

কলকাতার রাজনৈতিক জগতে আর একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনাও যে কোন সময়ই ঘটতে পারে। প্রাক্তন ইন্দিরা সরকারের দুই মন্ত্রী দেবী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রণব মুখোপাধ্যায় যে কোন মুহূর্তে গ্রেপ্তার হতে পারেন বলেও পরিস্থিতি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। মেনকা গান্ধী হয়তো দেবীবাবু এবং প্রণববাবুর সঙ্গেও দেখা করতে পারেন। তবে যা কিছু ঘটছে কিংবা ঘটবে তা নিঃসন্দেহেই চাঞ্চল্যকর ভবিষ্যতের ইংগিতবহী।

বীরেন মহান্তী কলকাতা পৌরসভার মহিলা কর্মীদের ভয় দেখিয়েছিলেন

কলকাতা পৌরসভায় জনৈক মহিলা কর্মী দর্পণের কাছে অভিযোগ করেছেন যে, ১৭৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে পৌরসভার একজন যুবনেতা বীরেন মহান্তী পৌর প্রতিষ্ঠানের মহিলা কর্মীদের এক সভা ডাকেন কাউন্সিলারদের বিশ্রামাগারে। এবং এই সভায় যাতো সকল মহিলা কর্মী যোগ দেন, তার জন্ত যথু চ্যাটার্জী, শংকর ভট্টাচার্য, শংকর ভৌমিক, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ছড়ি হাতে ঘুরে বেড়ায় ও গোক তাড়ানে করে সবাইকে নিয়ে আসে। সেখানে মহান্তী সাহেব বলেন যে মহিলাদের সমস্মানে এখানে চাকরি করতে হলে অস্ত্র সব

ইউনিয়ন ছেড়ে আমাদের কংগ্রেসের ইউনিয়নে যোগ দিতে হবে, আর যোগ দেনা হিলে শুভা লাগিয়ে মেয়েদের ইচ্ছা হানি করানো হবে। যেমেরা অবশ্য যুগান্তরে এ সভা ত্যাগ করে চলে আসেন ও বলে আসেন যে তারা চাকরি করতে এসেছেন, রাজনীতি করতে নয়। পরে কার্কে ইউনিয়নের নেতা সত্য ভট্টাচার্যকে সব বলা হয়। কিন্তু এই দঃ কমিউ-নিষ্ট নেতাটি কংগ্রেসী যুবনেতাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে রাজী হয় না। এখন নতুন পৌরমঞ্জীর কাছে বিচার চাই।

প্রেসিডেন্সী জেল নরককুণ্ডের সামিল

(দর্পণের সংবাদভাষ্য)

ইন্দিরা গান্ধীর জন্মের রাজস্বের বছর হুদে হিটলার মাথাচাড়া দিয়েছিল। প্রেসিডেন্সী জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অমিতাভ গাঙ্গুলী এদের অন্যতম। ১৯৭৬ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্সী জেলে রাজবন্দীদের একটি অংশের জেল পালানোর ঘটনা ঘটে যার কোন বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। সেসময় বলবৎ থাকার জন্ম। এই ঘটনার পর, এই জেল-সহ গোটা জেল প্রশাসনেরই পুনর্বিন্যাস ঘটে আর এই মণ্ডকাতেই হুদে হিটলার অমিতাভ গাঙ্গুলীর বরাত খুলে যায়। ইনি আগে ছিলেন এই জেলেরই সহকারী সুপার। জেল প্রশাসনে জেল-সুপারের দাপটের পরিসীমা খতটা বিস্তৃত ডেপুটির ততটা নয়।

তাই লটারীতে প্রথম পুরস্কার পাওয়ার মত হঠাৎ সুপার হয়ে

জয়প্রকাশ মেনকাগান্ধীর কাছে প্রফুল্ল সেনের সমালোচনা করলেন

(দর্পণের সংবাদভাষ্য)

জনতা দলের দার্শনিক গুরু জয়প্রকাশ নারায়ণ মেনকা গান্ধীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন: আমি দুঃখিত যে প্রফুল্ল সেন সি পি এমের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে পারেন নি। তিনি আরো বলেন: “প্রফুল্লবাবু এটা একটা ভুল করেন। তিনি তার নিজের শক্তিকে বেশী করে দেখেছিলেন এবং সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন যে এখানেও জনতা হাওয়ায় তিনি বেরিয়ে যাবেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এরকম হাওয়া ছিল না।” প্রফুল্ল সেনরা কি জয়প্রকাশের এই বক্তব্যও নস্টাং করতে পারবেন?

জয়প্রকাশ অবশ্য সি পি এম সম্বন্ধে আরো কিছু কথা বলেন। তিনি বলেন সি পি আই-এর মতন সি পি এমকে বিশেষের কোন রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল বলা যায় না। চীন, রাশিয়া ছাড়া দেশ থেকেই সি পি এম স্বাধীন। যারা সি পি এমকে বিদেশের হালাল বলে তারা জয়প্রকাশের এই বক্তব্যের পরে কি বলবেন?

দুঃখিত

দর্পণের গত সংখ্যায় চারপৃষ্ঠা বাড়িয়ে দাম করা হয়েছিল ৬০ পয়সা। কিন্তু ভ্রমরশত প্রথম পৃষ্ঠায় ৪০ পয়সা ছাপা হয়েছিল যদিও শেষ পৃষ্ঠায় ৬০ পয়সা লেখা ছিল। এর কলে দর্পণের পাঠক ও এজেন্টরা কোন কোন ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়েন। এই ক্ষতির জন্ত আমরা দুঃখিত।

গাঙ্গুলী একটু হতভম্ব হয়ে রইলেন। আর তারপরেই শুরু হল তার তাগুব। ইন্দিরা তথা কংগ্রেস বিরোধীদের জেলে পোরা ও তাদের পেটানো ছিল অন্যান্য রাজ্যের মত সিদ্ধার্থ রায় সরকারেরও পলিসি। এই পলিসিকে ঘসে মেজে তার ধার আরও তীক্ষ্ণ করে প্রেসিডেন্সী জেলের রাজবন্দী সহ সমস্ত বন্দীদের ওপর প্রয়োগ করতে শুরু করলেন অমিতাভ গাঙ্গুলী।

১৯৭৬ সালের এপ্রিলে পি মবন্ধ কারা বিভাগের ভদ্রানীতন আই জির আদেশ এল যে, এই রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ, যেমন ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী, বিমান মিত্র, স্বরাজবল্লভ ভট্টাচার্য, মশীল ধাড়া প্রমুখদের এই জেল থেকে অন্য জেলে স্থানান্তরিত করতে হবে। গাঙ্গুলী ও জেলার আমল মুখার্জী

তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে এই কাষটি সমাধা করলেন। একদল লাঠিধারী সেপাই সাত্তী নিয়ে এই বিশিষ্ট ও বয়োবৃদ্ধ কেউকেউ অসুস্থ নেতাদের কাউকে ধাক্কা মেরে, কাউকে চ্যাং-দোলা করে, কারো ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাউকে লাঠিপেটা করার হুমকী দিয়ে প্রিজন্স ভাণ্ডানে পুরে দিলেন।

তার পর কিছুদিন পরে এই কই পছায় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নম্বজন সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ইন্ড্রি-শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

শ্রাব্য সংখ্যা দর্পণ

দর্পণের শ্রাব্য সংখ্যা এ বছর পুস্তকাকারে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে অথবা অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হবে।

এই সংখ্যায় থাকবে প্রধানত: রাজনৈতিক বিষয়ে লেখা। প্রতিটি আলোচনাই পাঠকদের পক্ষে কৌতূহলোদ্দীপক হবে।

এই সংখ্যার দাম তিন টাকা।
মক:হলের এজেন্টরা
যতশীঘ্র সম্ভব
তঁদের চাহিদা জানান

আমরা শুধু যাত্রার জন্য যাত্রা গান গাইনা। আমরা যাত্রার মাধ্যমে প্রতিদিন হাজির হই তাদের সামনে “যারা আকাশে পাখির মত, সাগরে মাছের মত, যারা মাটিতে পিপড়ের মত অর্পণত।”

যারা কারখানার কলের দানবের সাথে লড়ছে, যারা ক্ষেত্রে খামারে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করছে, যারা ভাঙতে পারে যারা গড়তে পারে।

আজ আমাদের গড়ে তুলতে হবে নতুন এক সমাজ ব্যবস্থা যে সমাজে নারী আর বেথুা হবেনা, কুবকরা জমি হারাবেনা, শ্রমিকরা পুরো মেহনতের দাম পাবে, সেই সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি মানুষ, মানুষ হয়ে জন্মাবার অধিকারে ন্যায্য অধিকার পাবে। যাত্রা সবার শুভ জয়যাত্রার সাধী হোক।



প্রেসিডেন্সী জেল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নীয়ারিং শিল্প মজুর ইউনিয়নের সম্পাদক স্বাক্ষরগোষ্ঠী কণী বাগ-চীকেও জেল বদলি করা হল। অবশ্য এদের অপরাধের গুরুত্ব ছিল আরও বেশি। জেল পালানোর ঘটনার পর রাজবন্দীদের অধিক্ত অধিকারগোষ্ঠী একের পর এক হরণ করা হতে থাকে। অন্যান্য রাজবন্দীরাও ধোঁকাতোলাও তার বিরুদ্ধে কয়েক দাঁড়ান এবং ১৯৭৬ সালের মে মাসে সংগঠিত গণ-আন্দোলনে এরা হস্তমরাসরি অংশগ্রহণ করেন। অথবা আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন। তাই এই প্রতিশোধ।

অধিক্ত অধিকারসমূহ হরণের বিরোধিতায় দলমত নির্বিশেষে রাজবন্দীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সত্তর দিনেরও বেশি লাগাতার অনশন ধর্মঘট গাঙ্গুলী শাহেবের মুখোশটি পুরোপুরি উন্মোচন করে দেয়। অধিক্ত অধিকারগুলি কি ছিল? বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের স্বতন্ত্র ওয়ার্ডে একসঙ্গে থাকার অধিকার, আলাদা রান্নার ব্যবস্থা, উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা, আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে সপ্তাহে একবার টেলিফোন-কল, সপ্তাহে একবার চিঠি দিতে পারার ব্যবস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি। '৭৬ এর মে মাসের মাঝামাঝি পৃথক রান্নার ব্যবস্থা রদের হুকুম নিয়ে সরকারের এক সাকুলার এল আর তার পরদিন ভোরেই গাঙ্গুলী সায়েব তার সেপাই সাদী নিয়ে বেরোলেন রাজবন্দীদের বিভিন্ন ওয়ার্ডে হানা দিয়ে তাদের চাল-ডাল তেল-হুন থেকে গুরু করে নিত্যব্যবহার্য প্রায় প্রতিটি জিনিস লুণ্ঠ করতে। সেই চুয়াত্তর সাতের মাঝামাঝি থেকেই এক লাগাতার অনশন সংগ্রামের কলকলতি হিসাবে অন্যান্য অধিকারসমূহ পৃথক রান্নার সুবিধাও রাজবন্দীরা ভোগ করে আসছিলেন। আর তাদের দৈনিক রান্নাও থাকত তাদেরই হেপাজতে। এই যাত্রার বেশ কয়েক মণ চাল-ডাল তেল-হুনলা, —কম কথা নয়। তত্পরি, রাজবন্দীদের একহাত দেখে নেওয়ার এমন একটা সুযোগ!

এই হল গুরু। এরপর, বিনা কারণে একের পর এক রাজবন্দীকে সেলে পোরা শুরু হল। আর সেলগুলি বন্ধ রাখা হল চক্কি ঘটা — মাঝে মিনিট পাঁচ দশ খোলা হত, তাও সবুদিন নয়। অভ্যাসের কেসবিন্দু হয়ে দাঁড়াল এই সেলগুলি। যখন খুশি সার্জের নাম করে বন্দীদের ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র লুণ্ঠপাট, কারণে-অকারণে ডাঙাবাদী ইত্যাদি

ইত্যাদি। বা খুশি করার সুবিধা সেলে আরও বেশি এই কারণে যে, সেলে কি ঘটছে, এমন কি জেলের অন্যান্য বন্দীরাও তা জানতে পারতেন না। তবে, এ থেকে এ সিদ্ধান্তে যেন কেউ না আসেন যে, অভ্যাসের পরিধির সীমাই নীতিবদ্ধ ছিল। বস্তুত, সারা জেলেই ডাঙাবাদীর ফোঁসারা ছুটিয়ে এক আতঙ্কের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন শ্রীমান অমিতাভ।

সাধারণ সিপাই জমাদারদাররাও এই অভ্যাসের পরিধির বাইরে ছিলেন না। (যবঙ্গ পেরারের সিপাই জমাদাররা বাহে)। সিপাইদের ওপরেও নেমে আসছিল কারণে অকারণে সাময়িক বরখাস্তের থুকা। চিকিৎসার ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন তারাও। এমন কি সিপাই কোয়ার্টারে উঠুন জালালো নিবন্ধ এমন এক কিছুতকিমাকার নির্দেশও গাঙ্গুলী সায়েব জারি করেছিলেন। এককথায় আতঙ্ক তার রাজত্ব বিস্তার করেছিল শুধু বন্দী নয়, সিপাই জমাদার ডাঙা স্বতন্ত্র কর্মচারীদের মনেও।

রাজবন্দীদের সত্তরদিন লাগাতার অনশন ধর্মঘট একদিকে জেল সংগ্রামের ইতিহাসে যেমন এক সৌরবোজ্জ্বল স্মরণীয় ঘটনা হিসাবে পরিগণিত হবে, তেমনই ঐ সংগ্রামকে বানচাল করার জন্য সরকার ডাঙা 'গাঙ্গুলী বাহিনীর'র দমননীতি ও অপকর্মগুলিও মনে থাকবে চিরকাল।

অনশনব্রতীদের দেবশোনার দায়-দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে যার উপর বর্তায় সেই অমিতাভবাবুর প্রথম ক'দিন কোন পাতাই পাওয়া গেল না। অনশন সংগ্রামীদের শারীরিক অবস্থা চেক-আপ করার জন্য ডাক্তাররা প্রথম যেদিন এলেন, সেটি হল অনশনের ষষ্ঠ দিন। ইতিমধ্যেই অনশনকারীদের অনেকে ভালরকম অস্থির। অথচ এ সময়েও ডাক্তাররা আর্টিকি'সিয়াল ফিজি (নাক দিয়ে 'টিউব' চুকিয়ে তরল খাদ্য প্রদান) এর রাস্তায় গেলেন না। বরং বলা ভাল, তাদের সে রাস্তায় যেতে দেওয়া হল না। আর এই না যেতে দেওয়ার মূলে গাঙ্গুলী সায়েব তো ছিলেনই, উপরন্তু ছিলেন কলকাতা জেলসমূহের চীফ মেডিকেল অফিসার এস, এম, চক্রবর্তী ও 'সনিয়র অফিসার (প্রেসিডেন্সী জেলের প্রধান চিকিৎসক) চ্যাটার্জী সায়েব। প্রায় বাইশ তেইশ দিন এইভাবে কেটে গেল এবং গাঙ্গুলী-চক্রবর্তী-চ্যাটার্জীর আশায় ছাই দিলে রাজবন্দীরা অনশন চালায়ে গেলেন। সংগ্রাম ডাঙার প্রথম চালটি ব্যর্থ হল।

এরপর শুরু হল 'কোর্পস ফিজি' (ডাক্তারী ভাষায় 'আর্টিকি'সিয়াল ফিজি')। অনশন সংগ্রামীদের এক একটি দলকে চালান করা শুরু হল প্রেসিডেন্সী জেলের সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিউ ওয়ার্ডে। একতলা, টিনের চাল, মশাযাছি; বিছের স্বাধীন প্রথম বিচরণ ক্ষেত্র। ওদিকে জুন মাসের জ্বালাপালা গরম। শুরু হল 'কোর্পস ফিজি'। এক এক জন অনশনব্রতীকে জোর করে চাইয়ে হাত-পা চেপে ধরে, মুখে ক্লিপ এঁটে (যাতে খুঁচ না লাগতে পারে) আর এক ইঞ্চি বাসবস্ত্র রবারের টিউব গলা দিয়ে পাকস্থলী পর্যন্ত চালিয়ে, ঢালা হতে লাগল বার্জি গোলা জল। ফল: বমি, গলা চিরে রক্তপাত, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। সর্বশেষ ব্যাচটিকে এই আহরিক প্রবাস ফিজি দেওয়া হয় অনশনের ছাশিশ-তম দিনে।

এই অপূর্ব নাট্যরঞ্জে উপস্থিত ছিলেন এস, এস, কে এম হাসপাতালের কয়েকজন সরকারী ডাক্তার—বাদের অনেকেই ঐ দৃশ্য চোখের জল রোধ করতে পারেন নি এবং অসহায়ের মত অনশনব্রতীদের অহরোধ করেছেন সংগ্রাম প্রত্যাহার করে নিতে। অনশনব্রতীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং তাদের সমবেত প্রতিবাদে কদিন পর থেকে আয়োজন করা হল নাক দিয়ে নল চুকিয়ে ধোঁওয়ানো, যে পদ্ধতি ছিল তখনা-মূলকভাবে কম বেদনাদায়ক।

এখানে ডাঃ চ্যাটার্জীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া দরকার। এই ব্যক্তিটি ডাক্তারী কতটা জানেন সে বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ থাকলেও "দক্ষ" প্রশাসক হবার সব "গুণই" যে এর আছে সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। দুর্নীতি এবং দারিদ্রহীনতা শব্দ দুটি যদি রক্তমাংসের চেহারা নিত তাহলে তার নাম হত সম্ভবত ডাঃ চ্যাটার্জী। ৭৬ সালের ৩০শে জাঙ্গুলী প্রেসিডেন্সী জেল হাসপাতালে তার গাফিলতীতে নকশালপাশী যুবক রাজকুমার সিংয়ের মৃত্যু ঘটে। এই দিন তৎকালীন কারামতী জ্ঞানসিং সোহনপাল প্রেসিডেন্সী জেলে গাঙ্গুলী মৃত্যুতে মাল্যদান করতে আসেন। সে সময়ে এ জেলে আটক স্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কারামতীর কাছে এই মৃত্যুর জন্ত যারা দায়ী তাদের শাস্তির দাবী জানান। কারামতী তদন্তের আশাস দিয়ে যান এবং পরে দেখা যায় ঐ জেলের এক বিবেকবান ও নিরপরাধ চিকিৎসক ডাঃ আর কে দাসকে কেসগোট করা হয়। তাকে বদলি করারও চেষ্টা হয়। অবশ্য সমস্ত বন্দীর প্রতিবাদে সে চেষ্টা উত্তমকার মত

ব্যর্থ হয়। আর একটি উদাহরণ, মৃত্যুপথযাত্রী নকশাল যুবক তপন ভট্টাচার্যের বিন্দুমাত্র চিকিৎসা করা হচ্ছে না, তাকে নামেই হাসপাতালে রাখা হয়েছে।

অনশন সংগ্রাম চলাকালেও অনশনব্রতীদের প্রতি মনোভাব ছিল একই রকম। আর্টিকি'সিয়াল ফিজি-য়ের সময় অনেকেই অচেতন হয়ে পড়তেন। সে সময় ডাঃ চ্যাটার্জীকে ডেকে পাঠালে তার পাতা পাওয়া যেত না। জর্দমক অনশনব্রতী এক-ধিম ফিজি'য়ের ঠিক পরেই অজ্ঞান হয়ে যান। ডাঃ চ্যাটার্জী তখন জেল হাসপাতালে যার দূরত্ব নিউ ওয়ার্ড থেকে এক মিনিট বাহা। স্ববাদ পেয়ে তিনি বলে পাঠান যে, এখন তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। ষ্ট্রেচারে করে হাসপাতালে পাঠালে তিনি দেখবেন। আর একদিন অপর এক অনশনব্রতী হারাধন রায়েব অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে পড়লে ডাঃ চ্যাটার্জীকে খবর পাঠানো হয়। স্ববাবে তিনি বলেন, "রয়েব রক্তগত ওদের হাজার ট্রাইক কে করতে বলেছিল?" অবশেষে এল এস কে এম হাসপাতালের এক লম্বা চিকিৎসক হারাধনকে বিশদমুক্ত করেন।

অনশন সংগ্রামীদের মধ্যে পঞ্চম টাইবুনালে অভিযুক্তরাও ছিলেন। অনশন চলাকালে তারা কোর্টে তাদের স্ত্রী অধিকার ফিরে পাবার দাবী জানান। শুনানী হয় এবং বিচারপতির রায় অভিযুক্তদের পক্ষে যায়। এমন কি অভিযুক্তদের ওপর দমনমূলক কার্যকলাপ চালাবার অভিযোগে অমিতাভ গাঙ্গুলীকে আদালতে প্রকাশ্যে ক্ষমা পর্বস্ত প্রার্থনা করতে হয়। বেহায়া নির্লজ্জ অমিতাভ তার নিজ "সাম্রাজ্য" প্রেসিডেন্সী জেলে ফিরে এসেই পঞ্চম টাইবুনালে-অন্ততম অভিযুক্ত নিমাই ঘোষকে হুকী দেন, "এখন যদি আমি আপনাকে পাচিলের ধারে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দিই এবং প্রচার করে দিই যে আপনি পালাতে গিয়েছিলেন আপনি কিছু করতে পারবেন? জীবোঁধ সংক্ষিপ্ত জবাব দেন, "চেষ্টা করে দেখতে পারেন।"

এই সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সিপি আই (এম) দলের কর্মীদের ওপরেও অকথ্য অভ্যাসের চালানো হয়েছিল। অনশনব্রতী কর্মীদের একে একে অমিতাভ চালান করেন কুখ্যাত পয়লা বাইশ সেলে যাকে অক্ষুপ বলাই জেয়। সেখানে কেউ যদি মারাও যেতেন সে খবর জানা যেত কবচী পরে। সামান্য জল দেবার ব্যবস্থা পঞ্চ সেখানে ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা অদ্যান্য সং-

গ্রামীদের মতই কঠোর মনোবল দেখিয়েছিলেন।

মাত্র মাস চার পাঁচ আগে গাঙ্গুলী কোম্পানী রাজনৈতিক বন্দীসহ সাধারণ বন্দীদের "একটু শাস্তি" করার জন্য এক চরৎকার চক্রান্ত কাঁদলেন। মাঝে মাঝে জেল একটু "গরম" না করলে কয়েদীরা বড বাড বেড়ে যায় কি না। চক্রান্তটি হল: জেল কতৃপক্ষ নাকি একটি বেআইনী চিঠি (রাজনৈতিক) উদ্ধার করেছেন। কোথা থেকে কেমন করে এসব প্রশ্ন আস্তর। কেন না উদ্ভেদ তো চিঠি উদ্ধার (?) নয়, উদ্ভেদ একটু "হাতের খণ" করে মেবার সুযোগ তৈরী করে নেওয়া। এই উদ্ধো চিঠি চক্রান্তের জালে জড়ানো হতে লাগল একের পর এক রাজবন্দী ও স্বরাজনৈতিক বন্দীকে। আর অস্বাভাবিক প্রহারে জর্জরিত করে তাদের পাঠানো হতে লাগল কুখ্যাত পয়লা-বাইশ সেলে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যে সব স্বরাজনৈতিক বন্দী নানাকারণে কতৃপক্ষের বিরোধভাজন ছিলেন, এই উদ্ধো চিঠি চক্রান্তের শিকার হলেন বিশেষভাবে তারা।

উদ্ভেদ সফল। বেশ জমিটি "সম্মান" কায়েম করা গেল। রাজবন্দীদের অশ্রু আর হরহামি করার প্রক্রিয়া হল আরো জোরদার। এটালী বড়বড় মামলার অভিযুক্ত প্রব মৃদাঙ্গী, পঞ্চম টাইবুনালে অভিযুক্ত বরোবুদ্ধ টি বি রোশাকান্ত ধীরেন চক্রবর্তী এবং আরও অনেককে কোন কারণ না দেখিয়ে পানিশমেন্ট-সেলে চালান করা হল। চতুর্থ টাইবুনালে অভিযুক্ত স্বশাস্ত হাজদারকে শ' পাঁচেক সাধারণ বন্দীর সামনে প্রায় উলঙ্গ করে হঠাৎ "তল্লাশি" করা হল।

পাঠকবৃন্দ চিন্তা করতে পারেন কোন জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিজে ডাঙা হাতে ঘুরছে ও স্বতন্ত্র সেই ডাঙা বন্দীদের ওপর চালাচ্ছে? চিন্তা করতে পারেন, জেল-সুপার বন্দীদের প্রতি অহরহ প্রয়োগ করছে সেই সব অস্বাভাবিক ভাষা বা বেড়াপদ্ধিতে শোনা যায় এবং মানায়?

অমিতাভ গাঙ্গুলী একা নন, তার মত মহন্ত দেহবাহী শরতানরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে রয়েছেন। তাই জেলখানাগুলোতে এত হত্যা, এত রক্তপাত, এত অভ্যাসের কাহিনী জমা হয়েছে। নির্বাচনের পর এই সব শরতানরা ভোল পাঁটাতে গুরু করেছে। অভ্যাসের ষ্ট্রোরোলার আপাতত: রক্তগতি। জেলার ওপর হঠাৎ সমাজ সচেতন নাগরিক হতে চাইছেন। রাজবন্দীদের সঙ্গে হেসে কথা বলতেও তাদের "সম্মানে" রাখছেন না।

নকশাল আন্দোলনের মূল্যায়ন

কালিদাস কুণ্ডু

ভেলেছানা-কার্খীপের, সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনের, মতো নকশাল-বাড়ীর কৃষক অভ্যুত্থানও ভারত-বর্ষের কমুনিষ্ট আন্দোলনের ঐতিহাসিক অধ্যায় রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও নেতৃত্ব সম্পর্কে জনসাধারণের ব্যাপক অংশের মধ্যে গভীর সংশয় থাকার সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে ভারত-বর্ষের রাজনীতিতে ইতিপূর্বে অন্য কোন ঘটনা নকশালবাড়ীর মতো চাক্ষুষ সৃষ্টি করতে পারেনি।

কেন চাক্ষুষ

প্রথমতঃ, পশ্চিমবঙ্গে কম্যুতাসীন তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধান শরিক মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টিরই একটি ক্ষুদ্র অংশ নকশালবাড়ী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, এই আন্দোলনের বর্ষাগ্র উদ্ভূত হয়েছিল প্রধানতঃ মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে। তৃতীয়তঃ, দেশের বৃহৎ বৃক্ষোয়া পরিচালিত পত্রিকাগুলি নকশালবাড়ীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে, সি, পি, এম-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার সুযোগ লাভ করেছিল। ফলে নকশাল আন্দোলন ব্যাপক ও অতৃতপূর্ব প্রচারের সুযোগ লাভ করে। চতুর্থতঃ, নকশালবাড়ীর অভ্যুত্থানকে চীনের কমুনিষ্ট পার্টি নৈতিক সমর্থন জানালে ভারতবর্ষের বিপ্লব-প্রেমী হাজার হাজার তরুণের মনে বিপ্লবের উদ্যাদনা জাগ্রত হয়েছিল।

রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লড়াই ?
নকশালবাড়ীর আন্দোলনের মূল চরিত্র কি ছিল? প্রথম দিকে এই আন্দোলন ছিল কৃষকদের ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠার অর্থনৈতিক আন্দোলন। ৪০ হাজার কৃষকের সংগঠিত শক্তি স্পর্ধিত আহ্বান জানিয়েছিল অভ্যুত্থারী জমিদার জোতদারদের। নকশালবাড়ী খড়িবাড়ী ও ফাঁসিদেশিয়া শিলিগুড়ি মহকুমার এই তিনটি থানার অন্তর্গত কৃষকদের মধ্যে আশ্রয় প্রতিরোধ চেতনা নিঃসন্দেহে একটি সংগ্রামের ফুল্লিঙ্গ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এটা কোন ক্রমেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ছিল না। পশ্চিম-বঙ্গের নকশালবাড়ী কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটি তখন যে ধারায় প্রচারকার্য চালিয়েছিল তাতেও এইরূপ ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়নি।

যেদিন পিকিং রেডিও নকশাল-বাড়ীর কৃষক অভ্যুত্থানকে “বসন্তের

বসন্ত নির্দোষ” রূপে অভিনন্দন জানালো সেই দিন থেকেই নকশাল-বাড়ীর আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠল।

চীনের কমুনিষ্ট পার্টির ভূমি ?
স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, চীনের কমুনিষ্ট পার্টি কি নকশাল-বাড়ীর আন্দোলনের ভাস্কর্য মূল্যায়ন করেছিল? ইতিহাসে দশ বৎসর বিচারের পক্ষে যথোপযুক্ত সময় নয়। তবে একথা বলা যেতে পারে যে, তদানীন্তন চীনের কমুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব সংসদীয় পন্থাকে অস্বীকার করেছিল। তাই তারা কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট সরকার দুটি সম্পর্কে নিষ্কণ্টক হয়েছিলেন।

তারা কম্যুতাসীন যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ‘প্রতিক্রিয়াশীল’ রূপে চরিত্রায়িত করেছিলেন।

ফুল্লিঙ্গ দাবানল হল না কেন ?

নকশালবাড়ীর ফুল্লিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিক্ষিপ্ত ভাবে অস্ত্রের স্ফীকুলাম ও পশ্চিমবঙ্গের গোপীবল্লভপুর ও রীরতুমের দু'একটি অঞ্চল ছাড়া নকশালবাড়ীর আন্দোলন কোথাও সাড়া বা তরঙ্গ জাগাতে পারেনি। কেন ?

প্রথমতঃ যে পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকলে দেশব্যাপী বিপ্লবের দাবানল জ্বলে ওঠে দেশের অভ্যন্তরে সেই সময়ে সেইরূপ একটি পরিস্থিতি পরিপক্ব ছিল না। অর্থনৈতিক সংকট রাজনৈতিক সংকটে পরিণত হয়েছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু যে গভীর রাজনৈতিক সংকট শাসকশ্রেণীকে সাময়িক সংকট ও সংঘর্ষে বিভক্ত করে সেই সংকটের বিন্যাস চিহ্ন বিদ্যমান ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, দেশের বিপুল সংখ্যক মাল্হের উপর তখনও শাসক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক প্রভাব অক্ষর ছিল। তৃতীয়তঃ, তন্নিমিত্ত সি পি আই (এম এল) নামে যে পার্টি গঠিত হয়েছিল, জন্ম-সাধারণের মনে তার বৈপ্লবিক ভাব-মূর্তি ছিল অস্বচ্ছল এবং এই পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বে আসীন ব্যক্তিগণ অনেকেই সংগ্রামে পরীক্ষিত জন-নেতাক্রমে সমাদৃত ছিল না। ফলে অচিরেই শাসকশ্রেণীর হিংস্র আক্রমণের মুখে এই আন্দোলন ব্যর্থ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

বিচ্ছিন্ন হল কেন ?

একথা অনস্বীকার্য যে, প্রথম দিকে নকশালবাড়ীর মতাদর্শ বহু মাল্হের নিঃশব্দ, নৈতিক সমর্থন লাভ

করেছিল। কেননা, সংসদীয় পন্থা জনগণের মৌলিক সমস্তা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছিল। একটানা অর্থনৈতিক আন্দোলনে ক্রান্ত, হতাশাজ্বর মাল্হ নকশালবাড়ীর অভ্যুত্থানের মধ্যে দেখেছিল বিকল্প পথের সম্ভাবনা। কিন্তু, সত্তরের দশকের গোড়োতেই মাল্হের মোহমুক্তি ঘটতে শুরু করল। সি পি এম-এর কর্মীদের সঙ্গে অনবরত ভ্রাতৃত্বাভী, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, সাধারণ, দরিদ্র পুলিশ, শিক্ষক ও কেরাণীকে নির্বিচারে হত্যা, নিজেদের বিরুদ্ধ উপদুলের সঙ্গে বুনোখুনি, স্থল কলেজে অগ্নি সংযোগ—এই সমস্ত ঘটনা ক্রমশঃ নকশাল আন্দোলনকে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল।

অথ কলকাতা পৌরসভা কথা

হোরেন বসু

সংবাদে প্রকাশ হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি অজয়শংকর ঘোষ (যিনি কলকাতা পৌরসভার একজন অ্যাসেসমেন্ট ইন্সপেক্টর) সম্মতি প্রতিনিধির সাহায্যে আইন পরীক্ষা দিতে গিয়ে ধরা পড়েছেন। এটা এমন কি একটা আশ্চর্য খবর!

১৯৭০ সাল থেকে গণটোকাটুকির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিধির সাহায্যে পরীক্ষা দেওয়া তো কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় ও লিভিং সরকারী অফিস মোদন পেয়েছিল। এই সময়কার গ্রাজুয়েট, এম-এ এবং এল-এল-বি সকলের বেলায়ই তো একথা থাকে। উপাচার্য এবং তার সহকারীরা একদা এইসব মস্তান নেতার জঘন্য নজরদার বিহীন আলাদা ঘর, নকলনবীশ ইত্যাদির পাকা ব্যবস্থা করে দিতেন। এইভাবে প্রিয় দাস-মুন্সী, স্বতন্ত্র মুখার্জী, সোমেন মিত্র, কুমুদ ভট্টাচার্য, শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়ের মত রত্ন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শোভাবর্ধন করেছে। শেখোক্ত ব্যক্তি নাকি আইন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। আশু মুখোপাধ্যায় বৈচে থাকলে হয়তো আইনের উপাধিটাই গন্ধাক্ত বিসর্জন দিয়ে আসতেন।

মস্তানের হয়ে নকল পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দিয়ে পাশ করানোও এমন কোন নতুন ঘটনা নয়। আমাদের শিক্ষাবিদেব্রা কাকের মত চোখ বুজে থেকে ভেবেছেন দুর্নীতি এবং অপকর্মে তাদের সহযোগিতা কেউ বুঝি দেখতে পেল না। গত আট বছর

সশস্ত্র সংগ্রাম কি একমাত্র সংগ্রাম ?
চারু মজুমদারের নেতৃত্বাধীন সি পি আই (এম এল) সশস্ত্র সংগ্রামকেই একমাত্র সংগ্রামের রূপ বলে বিবেচনা করলো। তারা গণ-সংগঠন, গণ-সংগ্রাম তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করলো। তারা ঘোষণা করলো—“গ্রাম জাগলে শহর ঘুমিয়ে থাকে না।” অর্থাৎ গ্রামের সশস্ত্র সংগ্রামের সপক্ষে শহর-রাজলেও সশস্ত্র সংগ্রাম চলবে। কিন্তু শহরের এই তথাকথিত সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালিত হল সি পি এম-এর বিরুদ্ধে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উল্লসিত হল। কেননা, সংসদীয় রাজনীতিতে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সি পি এম আক্রান্ত।
অস্ত্রের নাগি রেড্ডী-পোলা রেড্ডীরা কিন্তু গণতান্ত্রিক সংগ্রামের

প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করলেন না। তারা চারু মজুমদারের চিন্তা-ধারার বিরোধিতা করলেন। পশ্চিম-বঙ্গে অসিত সেন, স্বপ্নাতল রায়চৌধুরী পরিমল দাসগুপ্ত, প্রমোদ সেন ও চারু মজুমদারের অস্বস্ত নীতির বিরোধিতার সোচ্চার হয়েছেন। কিন্তু, তাদের প্রভাব ছিল খুবই সীমিত।

নকশাল আন্দোলনের প্রভাব

সি পি আই (এম এল) দল আজ বহু উপদলে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, তারা একটি রাজনৈতিক শক্তি। ভারতবর্ষের কমুনিষ্ট আন্দোলনে তারা মতাদর্শগতভাবে যে গুরুত্বপূর্ণ উত্থাপন করেছে নকশালবাড়ীর আন্দোলন ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও সেই গুরুত্বপূর্ণ আছে ও থাকবে।

স্থানান্তরের অজুহাতে প্রথম বিভাগে পাশ করা ছাত্র ভর্তি হতে পারেনি কিন্তু সোমেন-ফাটা কেটের সুপারিশ-ধারী তৃতীয় বিভাগে পাশ করা ছাত্রও প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হতে পারত। মস্তানদের রোজগারের এটা ছিল অন্ততর পথ এবং আমাদের সরকারী মহাবিদ্যালয়গুলির পরম সারস্বত অধ্যক্ষরা এইসব মস্তানদের দেওয়া ভর্তির তালিকা সাগ্রহে শিরোধার্য করতেন। কংগ্রেসী শিক্ষক সংগঠনের দেওয়া তালিকায়-যায়ী হাকিমস্তানদের মাধ্যমিক পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত করে ঐ পরীক্ষার খাতা দেখার বারোটা বাজানো হয়েছে। কাউকে কোনো আপত্তি বা প্রতিবাদ করতে শোনা যায়নি।

কাজেই অজয়শংকর ঘোষের এই কাজে মৌলিক কুখ্যাতি ? স্টাওয়ার্ড গ্রেড ক্লাক এবং স্টেনোদের পরীক্ষায় এই পদ্ধতি আগেই প্রয়োগ হয়েছে। বরং যে কালে কলকাতা পৌরসভার অ্যাসেসমেন্ট ইন্সপেক্টর নিয়োগের সর্বনিম্ন বয়স ২৫ সে কালে ত্রিশোর্ধ অজয়বাবুকে সরাসরি সেই পদে বসানো অজয়বাবু এবং স্বতন্ত্র বাবু উভয়ের কৃতিত্ব। অবশ্য ভি সি রেভিনিউ অনিল রায়, ভি সি পার্পোনেল অচিন্ত্য সরকার, সচিব এবং কমিশনার কোনো উচ্চবাচ্যবিহীন সহযোগিতার দ্বারা অজয়বাবুর লাল বাড়ী আগমনের পথ মন্থন করে দিয়েছিলেন। বিনিময়ে তারাও নিশ্চয়ই কিছু পেয়েছিলেন, নতুবা এমন নিরমবিরুদ্ধ কাজেব অস্বীকার

হতে যাবেন কেন ?

রতনে রতন চেনে

কমিশনার নির্মালা মুখার্জি যাওয়ার আগে পৌরসভার স্বনির্বাচিত এবং স্বনামধন্য প্রমিক নেতা শংকর ভট্টাচার্যকে একটি চিঠি কেসের ব্যাপারে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার আদেশ দেন। কিন্তু যেহেতু অপরাধী একজন তথাকথিত প্রমিক নেতা এবং এর সঙ্গে পৌরসভার পলিমি-ম্যাটার জড়িত থাকতে পারে সেজন্য তিনি এই আদেশ অস্বীকার করার জন্য প্রশাসকের কাছে পাঠান।

এইখানেই আসল মজা। চোর হোক আর বাই হোক মধু-শংকর প্রশাসকের অনেক খেলার সঙ্গী, অনেক কাম্বারের অঙ্গীকার। অতএব তিনি আদেশটি অস্বীকার না করে বতদিন পারা যায় চেপে রেখে এতদিনে নাকি পুলিশের এনফোর্সমেন্ট বিভাগে পাঠিয়েছেন। দু'জনের হাতে দস্তানা সম্পর্কের বিচাবে অসম্ভব নয় যে, এই রাষ্ট্রাটী মধুবাবুই শিব সমাধার মহাশয়কে বাতলে দিয়েছিল।

প্রাইমা ফেন্সি কেস না থাকলে একজন কংগ্রেসী মস্তানকে সাসপেন্ড করার চিন্তাও নির্মালা মুখার্জির পক্ষে সম্ভব হত না। তাহলে সমাদার সাহেব সাময়িক বরখাস্ত অস্বীকার করলেন না কেন ? তিনি বোধ হয় আশায় আছেন ৭০ সালের মত আবার কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় আসবে তখন এই নজির স্বপক্ষে দেখিয়ে উপযুক্ত পুরস্কার বাগাবে।
(শেখাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

দানিবেন তৎস্বের আলোকে মহাভারতের স্বর্গ ও দেবতা বীরেন্দ্র মিত্র

কোথায় স্বর্গ!

অর্জুনের নিয়োগ সম্পূর্ণ। দেব সমরান্বিতায়ক, মহা দেব ফিরে গেছেন তাঁর বিমানে। অন্যান্য দেব বিমান ও উখাও হ'য়ে গেল পার্বত্য বিমানক্ষেত্র থেকে। আবার প্রতীকার পালা। আসবে ইন্দ্র। দেবতাদের সমরশিক্ষা শিবিরে নিয়ে যাওয়া হবে পৃথাপুত্র অর্জুনকে; মাহুষ হ'লেও যিনি দেব-সন্তান। পাণ্ডুর ক্ষেত্রে মহাকাশ-চারী ইন্ডের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে তাঁর জন্ম। জন্মের আগেই দেবপ্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত হয়ে আছেন তিনি। দেবতা অর্থাৎ গ্রহাস্তর-বাসী মহাকাশচারীরা তাঁদের পার্থিব অস্থচরবর্গের সাহায্যে জয়া-বধি অর্জুন তথা পঞ্চপাণ্ডবকে কুন্তীসহ রক্ষা করে আসছেন। উদ্দেশ্য, ঋগ্বেদে আধারবর্তে একটি দেবাত্মরক্ত সাম্রাজ্য স্থাপনা ও দেবাত্মশাসন প্রতিষ্ঠা ভিলাধী সনাতন ধর্ম সংস্থাপন করা। তাই অর্জুনকে নিয়ে যাওয়া হবে মহাকাশচারীদেব গুপ্ত বাঁটিতে ভাববাদী প্রাচীনরা যার নাম দিয়েছিলেন, স্বর্গ।

বড় গোলমালে ব্যাপার এই মহাভারতের স্বর্গ। এ স্বর্গে যাওয়া যায় কখনো। পর্বতের-ধাপ ভেঙে, কখনো 'যান্ত্রিক' বিমানে চেপে সশরীরে। আবার ফিরেও আসা যায়। যেমন ফিরে আসতেন গুহ্যত-স্বের কারবারী মুনরা; যেমন প্রত্যাবর্তন করেছিলেন অর্জুন। হিমালয়েব মাধ্যম ছিল, সেই পার্থিব স্বর্গভূমি, ব্রহ্মলোক, ইন্দ্রলোক অমরাবতী। মহাকাশচারীদের আড্ডাখানার নামই ভক্তিব প্রাবল্যে স্বর্গেব মর্যাদা লাভ করেছিল। আবার ঐ হিমগিরিঋগ্বেদ থেকেই মহাকাশচারীরা চিরদিনের জন্যই তুলে নিয়ে গেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে তাঁদের মহাকাশযানে চাপিয়ে। পৃথিবীর ছেলে আবার ফিরে আসেনি পৃথিবীমায়ের বৃকে। সে-ও আবার এক স্বর্গ-যাত্রা!

কিন্তু কোনোটাই সেই স্বর্গ নয় ভাববাদী দার্শনিকরা যে স্বর্গের

কল্পিত ছবি এঁকেছেন মহাভার-তের শেষ পর্বে, স্বর্গারোহণ পর্বে। মহাভারতে কল্পনার তুলিতে স্বর্গ ও নরক আঁকা হয়েছে, যদিও সেই কল্পিত স্বর্গে স্বয়ং-যুধিষ্ঠিরও যাননি। তাঁকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধজয়ের পর, মহা-কাশ্যানে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অজ্ঞাত-কোনো গ্রহে। হয়ত তিনি এখনো যাচ্ছেন। এখনো ভাসছেন মহাকাশে। মহাকাশ-চারী দেবগণ হয়ত আজও তাঁদের আপন গ্রহে পৌছতে পারেননি। এমনি ভাবেই হিব্রু পুথির জগদ্বাতা এনক-ও হয়ত আজও মহাকাশ-চারণায় রত। যাচ্ছেন হয়ত পৃথি-বীর বাছাই করা আরো অনেক অনেক মাহুষ। পার্থিব বুদ্ধিমান প্রাণীর নমুনা হিসেবে ঋগ্বেদের কারো কারোকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আজ থেকে তিন হাজার বছরেরও আগে। অন্তত বৈজ্ঞানিকরা আজ এভাবেই ভাবছেন।

এ সম্পর্কে প্রখ্যাত রুশীয় পদার্থ-বিদ ম্যাটেক্স্ট আগারেস্ট পৃথিবীতে গ্রহাস্তরবাসীর সম্ভাব্য আগমন সম্পর্কিত তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী রচনা Astronauts of Yore-এ একটি হিসেব প্রাধিকার করে বলেছেন, মোটা হিসেব থেকে মনে হয়, যদি তারা এসে থাকে, তাহলে প্রথম আগমন থেকে দ্বিতীয় আগমনের ব্যবধান হবে আত্মমানিক দশ হাজার বছর। যদি ধরে নেওয়া হয়, এই গোলকে তাদের আগমন ঘটেছিল পাঁচ থেকে ছয় হাজার বছর আগে, তবে আমরা আশা করতে পারি, এখন থেকে বেশ কয়েক হাজার বছর পবে তাঁরা আবার ফিরে আসতে পারেন, কেননা পৃথিবীর বয়স হাজার হাজার বছর বেড়ে গেলেও মহাকাশ চারণারত যুগ্মচারীর বয়স দে তুলনায় কিছুই বাড়বে না। আগবেস্ট লিখেছেন, "Another possibility is that the celestial visitors came from some very distant world and are still on their way home Remember that in a moving

spaceship time passes much slower than on our "stationary" earth and the astronauts and the "son of man" they took with them may not be much older than they were when they departed. Depending on their speed, only a few decades or even years may have passed according to their clock. On earth thousands of terrestrial years will have to pass before the astronauts or their countrymen come back for a second time."

জিজ্ঞাসুরা প্রশ্ন করবেন, যুধিষ্ঠির যদি এখনো গ্রহাস্তর পথে মহাশূন্যেই উড়ে চলেছেন। তাহলে স্বর্গে গিয়ে তিনি যে একরাশ নিহত রাজা-রাজড়া এবং তাঁর যুত ভাই ও প্রৌপদীকে দেখলেন, সেইসব পবিত্র কথা কি মিথ্যে? কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে সে অজসন্ধান আগামী দু'এক সংখ্যার লেখায় করা যাবে, এখানে শুধু ঘুরিয়ে একটা ছোট প্রশ্ন করি ভক্তিমান বিশ্বাসীদের। আচ্ছা, বলুন তো ভাই, যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়ে কেবলমাত্র কতকগুলো রাজা উজিরকেই দেখলেন কেন? তাঁরা তো জমির লড়াই লড়ে উলুখাগড়াদের শ্রমশান বানিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্রে। রহেছিল রক্তের নদী। সাধারণ হাজার হাজার সৈনিকের দেহ পচে হাড়মাস মাট হ'য়ে গেছিল সেই প্রান্তরে। তা সাধারণের মধ্যে কি এমন কোনো পুণ্যাত্মা ছিলেন না যিনি রাজাদের মৃত একই সঙ্গে স্বর্গলাভ করেন? নাকি আর্ঘ্যদের স্বর্গটাও তৈরী হয়েছিল শুধু আর্ঘ্য-বর্ডেব রাজপরিবার ভূক্ত রাজস্ববর্গের জন্যই? এই মিথ্যা স্বর্গ কি রাজ্য-জাতের কলমে বানানো নয়? স্বর্গে একজনও সাধারণ মাহুষ নেই-কেন? সেই বানানো স্বর্গে ভূর্ধোদন গোষ্ঠী-কেও আনিয়ে বুদ্ধ পরবর্তী একটা সমঝোতাই কি করা হয়নি? আর ইতিহাস নানাভাবেই প্রমাণ রেখেছে

চমৎকার স্বচতুর রাজনৈতিক সম-ঝোতার চালাক আর্ঘ্য ছিলেন পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কটকৌশলী। তাই তাঁরা মহাভারতে চমৎকার সব রাজনৈতিক উপদেশ দিয়ে গেছেন। সমঝোতার বাজনীতি এমন ভয়ানক ভালোভাবে আর কোথাও কেউ সাজিয়ে দিতে পেয়েছেন বলে আমার জানা নেই। তাই তো কথা, যা নেই মহাভারতে, তা নেই ভাষ্যতে। মানে, যা নেই মহাভারতে তা নেই গোটা ভূ-ভারতে।

রাজা ও ব্রাহ্মণদের জন্ত তৎ-কালের বুদ্ধিমান পুরোহিতত্বই স্বর্গ বানিয়েছেন রসিয়ে রসিয়ে। যুধিষ্ঠির মহাকাশযানে হাওয়া হয়ে গেলে সেই মনগড়া স্বর্গের একটি কাহিনী চূপচাপ মহাভারত গ্রন্থের 'ভিউ পাট' হিসাবে একেবারে লেজের দিকে জুড়ে দেওয়া হ'ল: এই কাজটি স্বচাচরভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরই চতুর মহাপ্রভুদের হয়ত খেয়াল হয়েছিল যে, গোড়ায় গলদ রয়ে গেছে।

'গলদ' কি? অবশ্যই সেটা ঘটে গেছে আদি ও বনপর্বে। আদিপর্বে অমৃতমহুনের মন্ত্রণায় দেবগণ এক জুত হয়েছেন হমেক নাশক পরম রমণীয় মহীধরে। সেখানে, মনে হয় দেব-বান (জ্যাস্ত দেবতার) হমেকই স্বর্গ। বনপর্বে, ব্রহ্মলোকটা নির্দিষ্ট হয়েছে হিমগিরি শীর্ষে। মনে হতে পারে, ব্রহ্মলোকই স্বর্গ। তারপর বলা হ'য়েছে, মহাদেব ও ইন্ডের আমন্ত্রণে মাতলির রথ এসে অর্জুনকে নিয়ে গেল স্বর্গে। বৃকতে হ'ল অর্জুনের প্রথম সশরীরে স্বর্গযাত্রী হলেন। কিন্তু বিপদ হ'য়ে আছে ঐখানেই। মহাভারতকার বলে গেছেন অর্জুনের পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে প্রথম সশরীরে স্বর্গে গেলেন। আর সেই স্বর্গের বেশ বিবাসযোগ্য বর্ণনাও আছে। পড়লেই বোঝা যায়, যে স্বর্গ অলৌকিক অবিদ্যস্ত কোনো দিব্যালোক নয়। তা বেশ একটা প্রশস্ত পার্থিব এলাকা। কিন্তু যেহেতু সেখানেই অধিকতর বুদ্ধিমান বিজ্ঞানী মহাকাশচারীরা (দেবগণ) বসবাস করেন, তাই মহাভারতকার তাকে স্বর্গলোক বলেছেন। স্বর্গের আভিধানিক (চলন্তিকা) অর্থ: দেবলোক। জিহিব। পরবর্তী অর্থ পুণ্যবান যেখানে মৃত্যুর পর স্থলভোগ করে। প্রথম অর্থে যে দেবলোক, অর্জুন বসন্ত সেখানেই গেছিলেন। হুতবাং বনপর্বে মতোর অপলাপ নেই।

কিন্তু চতুর মুনবা পবে ভেবে দেখেছিলেন হয়ত যে, যে বিবাসী বনে বহু প্রাণবলি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তাব উদ্দেশ্য সকল, তাঁদের ইচ্ছাই জয়ী হয়েছে। পুরোহিতত্ব

ও দেবদেবক পাণ্ডবরাই হয়েছেন বিজয়ী। কিন্তু এই বিজয়ীদের সাধারণের চোখে শুধু শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেয়ে পুণ্যবান দেবশিশুপুত্র বংশধারারূপে প্রতিষ্ঠার চেয়ে প্রজ্ঞাদুর মনে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব। তাই তাঁরা অর্জুনের স্বর্গযাত্রাকে ধামাচাপা দিয়ে বড করে তুললেন যুধিষ্ঠিরের কাল্পনিক স্বর্গগমনের গালগল্পটি। আমাদের ভুলিয়ে দেওয়া হ'ল যুধিষ্ঠিরের আগে-কারও স্বর্গগমনের কথা। সেজন্তাই অর্জুনই যে সশরীরে প্রকৃত দেব-লোকে (বা বসন্ত অর্থে স্বর্গ) প্রথম যাত্রা করেন, একথা তুলে গেলাম আমরা। অনেকে এ কাহিনী জানিও না। আমাদের বোঝানো হল স্বর্গে গেছেন একমাত্র যুধিষ্ঠির। তিনিই পুণ্যাত্মা। কিন্তু বসন্ত ঘটনা অন্য রকম। ওটা ভাববাদী দার্শনিকের কল্পনার সৃষ্টি এক কপকথার স্বর্গ, যেখানে যুধিষ্ঠির আদৌ যাননি।

(চলবে)

কলকাতা পৌরসভা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শংকর ভট্টাচার্যের চুরির নজির যদি সমাজের সাহেবের অজানা থাকে, তবু মেয়র প্রশান্ত শ্রুরের আমলে বেলিফ শংকর ভট্টাচার্যের তহবিল তছরূপ এবং সেই প্রমাণে উক্ত ব্যক্তির বরখাস্তের মামলাটি তার অজানা থাকার কথা নয়। এর পরও এমন তদন্তকে বেলিফ থেকে অ্যাসেস-মেন্ট ইমপেট্রের পদে ট্রিপল প্রমো-শনের পুরস্কার দিয়ে পৌরসভার নৈতিক পরিমণ্ডলকে কলুষিত করার দায়িত্ব শ্রীমন্মন্ডার অধীকার করতে পারেন কি?

এই ব্যক্তির সাম্প্রতিক আর একটি কীর্তি (যেখানে চাকুরির জন্ত আগন্ত এক বৃদ্ধ এবং তার কন্যাকে প্রতারিত করে এই স্বনামধন্য পৌর-কংগ্রেসী কালক্রমে সেই মেয়েটির উন্নতিসাধন করবে) আশা করি তার অজানা নেই। এই ব্যাপারে নাছোড়বান্দা রাপের হাত থেকে দলের মুখ বাঁচাতে এবং মেয়েটির 'অবনতিসাধন' করতে মন্ত্রী মশায়ের পকেট থেকে কড়কড়ে কয়েক হাজার টাকা বেরিয়ে গেল এবং পবে মেয়েটিকে একটি চাকরির যোগাড় করে দিতে হল। একপ একটা রক্তকে শান্তি থেকে আড়াল করার এমন কি দায় সমাদার সাহেবের?

মহাচীনের শিক্ষা ব্যবস্থা

ইন্দ্রিা বসু

প্রথমেই শিশু শিক্ষা দিয়ে আরম্ভ করি। শিক্ষার দিকটাই আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। শিশু শিক্ষার ক্ষুদ্র বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে কারণ 'রাই তো হবে' ভবিষ্যৎ নাগরিক। সাধারণ শিশু বিভাগ (kindergarten) যেখানে ছেলে মেয়েরা প্রতিদিন সকালবেলা আসে আর সন্ধ্যাবেলা বাড়ী চলে যায়। দ্বিতীয় ধরনের ১৯শ বিভাগে শিশুরা সারা সপ্তাহ থাকে কেবল শনি রবিবারে বাড়ী যায়। এই সব স্কুলে শিশুদের তিনবার খাবার দেওয়া হয়। এছাড়া কারখানা ও কমিউনিস্টিতে যে ছেলে আছে তার সঙ্গেও স্কুল থাকে। সর্বত্র ছাত্রদের দেয় এক নম্বর। এটা নির্ভর করে ব্যবস্থাদির উপর। মোটামুটি সাত থেকে কুড়ি ইউরানের মধ্যে (এক ইউরান বর্তমানে আবার সাড়ে চার টাকার মত)। এথেকে থাকা, খাওয়া, শিক্ষা মোটামুটি সব বরচই, চলে। এই স্তরে ছোটদের নৈতিক, উন্নতির দিকটাই বিশেষ নজর দেওয়া হয় কারণ সমাজ ও রাষ্ট্র দাঁড়াবে এই স্তরনীতির উপর। এই সঙ্গে সঙ্গে কিছু কারিক্রম জমজমাট করান হয় যাতে জীবন মূল্যবোধ জাগে। মানবিকতা শিক্ষার দিকটাইও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সব শিশু তো আর মহামানব হ'য়ে জন্মায় না, তাদের ছোট মনে অন্তের কোন জিনিষ আকর্ষণীয় মনে হয় এবং তা পাওয়ার ইচ্ছাও হয় এবং সময়ে সময়ে কোন কোন শিশু তার শিশু-স্বভাব বুদ্ধিতে তা নিয়েও নেয়। শিক্ষকের সেখানেই যত কাজ। তাকে বুদ্ধিয়ে সুস্থিয়ে দেওয়া এবং সত্যটা স্বীকার কয়ান। এ রকম অনেক ক্ষেত্রে অনেক কাজই হতে পারে কিন্তু এই যে সত্যটা স্বীকার করা এটাই শিক্ষা, এর মধ্য দিয়ে আসে নৈতিক উন্নতি। - দেশ বিদেশের ছোট ছেলে মেয়েদের সম্বন্ধে গল্প করা, ছবি ইত্যাদি দেখান হয় আর সঙ্গে সঙ্গে তারাও যে এই সব ছেলে মেয়েদের বন্ধু ও দরদী তা বুদ্ধিয়ে বলা হয়। এর ঝগড়া দিয়েই জেগে ওঠে শিশু ভাবের ভাব। জ্ঞান-বস্তু ক'রে একটা ক্লাস হয় আর তার স্কেলে কাকে খেলাধুলা, নাচগান, হাতের কাজ (কাগজ ভাঁজ করা, কাগজ কাটা, মাটির জিনিস তৈরী করা) করান হয়। তিন বছর থেকে সাত বছরের ছেলেমেয়েরা এখানে পড়াশুনা করে। এর পরে তারা বাস

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। একেবারে ছোটদের দিয়ে জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখতে কেবল নিজের জিনিষ নয় অন্তেরটাও এবং তাদের চেয়ে বড়দের খাবার টেবিলে ডিশ, বাটি ও চপটিক মাঝিয়ে রাখতে এক আরও একটু বড়দের দিয়ে বাগানে গাছ-পালার যত্ন করতে ও জল দিতে শেখান হয়। এই স্তরে নিজের মাতৃভাষা ও কিছুটা গণিত শেখান হয়। শিশু বিভাগের পরে আসে প্রাথমিক (Primary) বিভাগ। এখানে পাঠ্যক্রম পাঁচ বছরের অর্থাৎ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। এই স্তরে মনের পরিপূর্ণ বিকাশ ও আত্মনির্ভরশীলতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। নানা রকম পাঠ ও তার বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ছাত্র ছাত্রী তার মনোমত বিশেষ বিষয়টির উপর আকৃষ্ট হয় এবং তা শেখার ও জানার ক্ষুদ্র আগ্রহ দেখায়। তখন শিক্ষক তাকে উৎসাহ দিয়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রটাও দেখেন। নিজের পড়া-শুনা, যত্নপাতি, অন্যান্য জিনিষপত্র বিষয়ে এবং প্রয়োগ ক্ষেত্রে বিচারী যাতে অনির্ভর হয় তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। স্কুল আরম্ভ হয় সকাল সাড়ে সাতটার এবং শেষ হয় সাড়ে চারটার। মাঝখানে সাড়ে এগারটা থেকে তিন ঘটীর বিরতি থাকে। খাওয়া, বিশ্রাম, আলাপ আলোচনা ইত্যাদির জন্য। সাধারণতঃ স্থানীয় ছেলে মেয়েরাই স্কুলে যায় তাই, তাদের সঙ্গে এসময়টা যথেষ্ট বলা চলে। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি হচ্ছে ভাষা, গণিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান, রাজনীতি, সঙ্গীত-শারীরিক ব্যায়াম ও একটি বিদেশী ভাষা। এগুলির মধ্যে ইংরাজী স্পেনীয়, ফরাসী ও রাশিয়ান ভাষাই প্রধান অবশ্য সব বিদ্যালয়ে সব ভাষা শেখবার ব্যবস্থা এখনও হয়ে ওঠে। কারণ দেশও বড় বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেশী। রাজনীতি বলতে খুব কিছু দাঁতভাঙ্গা বিষয় নয় ও সমাজে শ্রেণী বিভেদ কি ও তার ফল কি সাধারণত গল্পের ছলে বলা হয়। বছরে দুটি পরীক্ষা হয় এবং তাতে শতকরা বাট পেলে পাশ ধরা হয়। আগেই বলেছি পরীক্ষা নেওয়া হয় ছাত্র ঠাকার। জন্য নয় তার জ্ঞানের গভীরতা বোঝার জন্য। পরীক্ষার বিষয়বস্তুগুলি আগে থেকেই রাখা হয় এবং তা নিয়ে নানা আলাপ আলোচনা

করা হয়। পরে তারই থেকে প্রশ্ন তৈরী করা হয়, বিস্তারিত স্বল্পনী শক্তির মূল্যায়ন করা হয়। স্কুলে দুটি ছোট জমিতে একই জিনিস লাগান হ'লো, একই রকম সেচ করা হ'লো, আবহাওয়া তো এক হবেই তবে উৎপাদনের পার্থক্য কেন হ'লো ছাত্র ভ্রমণ তার বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে ঠিক করবে যে জমি এক রকম নয়-এটাই তো তার পরীক্ষা। কোন ছাত্রছাত্রীকেই তার অকৃতকার্যতার জন্য নিন্দাসাহ করা হয় না-ফল বলে কোন শ্রমের ব্যবহার নেই। একবারে না পারলে ছাত্রকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় যার জন্য শিক্ষক, সহপাঠী ও অভিভাবকরা মিলিত চেষ্টা চালায়। এখানে স্কুল শিক্ষা হলো যা কিছু করা হয়, যা কিছু শোনা হয় তার প্রয়োগ জনগণের স্বার্থে-নিজের স্বার্থ স্বার্থের জন্য নয়। এখানকার পাঠ শেষ করে ছাত্র যায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (Middle school)। মাধ্যমিক শিক্ষার আবার দুটি ভাগ-জুনিয়র ও সিনিয়র (উচ্চ মাধ্যমিক) শিক্ষা। পাঠ্য তালিকায় আছে ভাষা, সাহিত্য, গণিত রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল রাজনীতি, বিদেশী ভাষা, স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি ও কৃষি বিজ্ঞান, শরীর গঠন, ছবি আঁকা, বিমবী শিল্পকলা ও সঙ্গীত। এতগুলি বিষয় এই শ্রেণীতে করান হয় না-এর থেকে কিছু কিছু বিষয় নির্বাচন করে এক একটি ক্লাসে পড়ান হয়। লেনিন, স্ট্যালিন ও মাওয়ের উদ্ধৃতির আলোচনা করা হয় এবং আগেকার দিনে চীনের জনগণের দুঃখদুর্দশা ও বীরত্বের কাহিনীর সঙ্গে ছাত্র ছাত্রীদের পরিচয় করান হয় যাতে শিক্ষার্থী জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য ভুলে না যায়। কারণ বর্তমান চীনের ছেলে মেয়েরা আগেকার দুঃখের পীড়ন অনুভব করে না তাই তাদের সচেতন ক'রে দেওয়া হয় সর্বস্বারা রাজনীতিই তাদের বর্তমান ৩৬৫ দিনগুলি এনে দিয়েছে। শিক্ষায় বাস্তব প্রয়োগকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। স্কুল সংলগ্ন কারখানা অথবা বাইরের কোন কারখানায় ছেলে মেয়েদের বাস্তব অনুশীলনের সুযোগ দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্রকেই কারখানার এবং কৃষিক্ষেত্রে শিক্ষা নিতে হয়-এর মূল উদ্দেশ্য হলো পাঠ ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে

ব্যবধান ঘুচান। এতে তাদের শ্রমিক কৃষকের কাজের মূল্য দিতে শিক্ষা দেয় এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটায়। কিছু কিছু ছাত্র জুনিয়রপাঠ শেষেই নিজের দক্ষতা ও কৃতি মত ক্ষেত্রে খামারে বা কারখানার কাজে চলে যায়। স্কুলে কারখানা বা কারখানা কিভাবে হয় তাও কিছুটা দেখেছি ৭০ মাল্। একটা স্কুলে দেখলাম, ছোট ছোট অনেক প্যাকিং বাস্ক তৈরী হচ্ছে, তা ছাত্ররাই তৈরী করছে কিন্তু বাইরের কারখানা থেকে দক্ষ কার্গের মিশ্রিত এসেছে কাঠ কাটা, কাঠ জোড়া দেওয়া ইত্যাদি-শে পাতে। এই বাস্কগুলি কারখানার কাজেই লাগবে। স্কুলের ব্যয় কিছু হ'লো না কিন্তু ছেলে মেয়েরা শেখার সুযোগ পেল। এ বকম বই বাধান, কালি তৈরী করা ইত্যাদি শেখার ব্যবস্থা আছে; যা উৎপাদন হবে তা স্কুলের প্রয়োজন মিটিয়ে সরকারের কাছে বিক্রি করে দিতে পারবে। কৃষি ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েদের দলে দলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ক্ষেত চাষ, বীজ বপন, সেচ, কীটনাশা ও শস্ত তোলা শেখার জন্য-কেবল বই পড়িয়েই শেষ করা হয় না। উচ্চ মাধ্যমিক শেষ ক'রে সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারেনা। সেখানে কিছু নিয়ম কাছন আছে। সে বিষয়ে পরে বলছি। প্রাইমারি বিভাগে প্রতি ছাত্র-ছাত্রী মাস অন্তর স্কুলের বেতন হিসাবে দেয় ২৫০ ইউরান (এগারো টাকার কিছু উপরে) আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দেয় পাঁচ ইউরান। যে পরিবারে আয় কম ও পোস্ত সংখ্যা বেশী তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যয় পিতামাতার কর্তব্য প্রতিষ্ঠান বহন করে এবং সেক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা থেকে থাকলে (নতুন বা ছোট প্রতিষ্ঠান হলে) বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা আছে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ সব ছেলেমেয়েরই আছে কিন্তু আগেই বলেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার সবার নেই। যেখা বলায় সহজ হওয়ার জন্য রেলের কর্মসকলের এক রকম হয় না আর তা

ছাড়া জীবনে কার্য ক্ষেত্রে নামতে গিয়ে বাড়তি ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অতিরিক্ত সুযোগ কিছু এনে দেয় না। তার ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রয়োজনও নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের কতকগুলি শর্ত আছে। প্রথমতঃ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করতে হবে, দ্বিতীয়তঃ সুস্থ সবল হবে, তৃতীয়তঃ কুড়ি বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে এবং সবার চেয়ে বড় হলো যে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে অন্ততঃ দু'বছর কোন কৃষি বা শিল্পক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অবশ্য শ্রমিক কৃষকের বেলায় বয়সের ও শিক্ষামানের হেরফের কিছুটা করা হয় অতিরিক্ত কৃতিত্ব দেখাবার জন্য। এখন শর্ত পূরণ হলেও তার রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ে তার কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী পরিচালক এবং স্থানীয় বিমবী কমিটির (Revolutionary Committee) অনুমোদন প্রয়োজন হয়। রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করার জন্য এই স্তরে ছাত্রছাত্রীকে শ্রমিক কৃষক ও সৈনিকদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে হয়, শিখতে হয়, পড়তে হয়। এমন কি কোন কোন অভিজ্ঞ শ্রমিক বা কৃষক তার নিজ নিজ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে আসেন। বইয়ে পড়া আর কাজে করার মধ্যে তফাৎ অনেক-তাদের অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মাঠে মরদানে শিক্ষা'র নীতি চালু হয়েছে যাকে ইংরাজীতে বলে Open door Schooling, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা নিজের শিক্ষার বিষয়বস্তুর উপর জ্ঞান লাভ ও গবেষণার জন্য ইচ্ছামত জায়গায় ঘুরে ফিরে শিক্ষা নিতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসও করতে পারে। ডাঃ সানিয়েং সেন বিদ্যালয়ের এ রকম কয়েকটি ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে আমাদের দেখা হয় এবারে দেশে ফেরার পথে ক্যাটন থেকে সামচুন, রেলগাড়ীর কামরায়। তারা ইংরাজী ভাষা শিক্ষার ছাত্র-ইংরাজীতে কথাবার্তা বলায় সহজ হওয়ার জন্য রেলের কর্মসকলের এক রকম হয় না আর তা (শেষাংশ ৩ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

মিহির আচার্যের

বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজভাবনা

এমারজেন্সি সময় এই রচনাগুলি দর্পণ-এ প্রকাশিত হলে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল। এখন একটি কপি সংগ্রহ করে সংগ্রামী সংস্কৃতির সামিল হোন।

: অন্তান্ত গ্রন্থ :

চিন্তা ঘোষণা ॥ বোড়স ওয়ারে ৬.০০ সাপ্তাহ চট্টোপাধ্যায় ॥ মনোময়ন ৮.০০ সমরেশ দাশগুপ্ত ॥ নির্বাচিত গল্প ৮.০০

লেখক সমাবেশ ॥ এ-১৮-এ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট। কলিকাতা-৭

জরুরী অবস্থায় মেটাল বক্সে কর্মচারী হাটাই

(দর্পণের সংবাদদাতা)

অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের মত জরুরী অবস্থায় স্বযোগে মেটাল বক্সের মালিক পক্ষও অন্যান্যভাবে দমন পীড়ন চালান কর্মচারীদের উপর। আটজন কর্মীকে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ভাবে হাটাই করেন। ১৯৭৫ সালের ২রা এপ্রিল মালিকপক্ষ স্বীকৃত ইউনিয়নের সঙ্গে কোন আলোচনা না করেই ভলেনটারি সেপারেশন ক্রিম চালু করেন, যেটা প্রকৃত অর্থে শ্রমিক হাটাইয়ের রাস্তা বিশেষ। এই স্বীম পুরোপুরি জনস্বার্থ বিরোধী।

এর ফলে শুরু হল শ্রমিক হাটাই। অসহায় শ্রমিক কর্মচারীরা কংগ্রেসী প্রমুখদের কাছে দরবার করলে একমিকে তিনি মালিকপক্ষকে হাটাই বন্ধ করার উপদেশ দেন, অন্যদিকে কিন্তু ঐ সেপারেশন ক্রিমকে বাস্তব জ্ঞান।

১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন জরুরী করা হল জরুরী অবস্থা। পুলিশের সক্রিয় সহযোগিতায় ৬ই জুলাই মেটাল বক্সের কলকাতার হুটো কারখানাতেই লক-আউট ঘোষিত হল। শ্রমিক কর্মচারীরা সংগ্রামে একবদ্ধ হলেন। ইউনিয়ন নেতা সহ ১৬ জন কর্মীকে চার্জশীট দেওয়া হল এবং সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কাছে বহু আবেদন নিবেদন করা হোল কিন্তু তারা চিঠিগুলির প্রাপ্তি পর্যন্ত স্বীকার করেননি।

শ্রমদফতরের প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে কয়েকটি বৈঠক হয়। কর্মচারীদের প্রকৃত প্রতিনিধিদের কিন্তু এই আলোচনায় ডাকা হয় না। শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্য একসময় নিজেই মালিক পক্ষের ঔদ্ধত্যের মুখে অসহায় হয়ে স্বীকার করেন যে, কর্তৃপক্ষের হাটাইয়ের অধিকার আছে এবং শ্রমিকদের স্বার্থ দেখার জন্য সরকারের হাতে কোন আইন নেই।

এরপর শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্য সমস্তার সমাধানে নিজেই একটা কমিউলি বের করেন। হাটাই হওয়া ঐ আটজন শ্রমিককে বাইরে রেখে কারখানা খোলা হবে। এই শর্ত না মানার অর্থ মিসা বরণ করে ছেলে যেতে হবে। খবরের কাগজে তখন এই কমিউলি কথা ঘোষণা করে 'জরুরী অবস্থায় স্থূল' বলে ঘোষণা করা হল, কিন্তু ভ্রষ্টাচার্য ঐ আটজনকে পরবর্তীকালে পুনঃনিয়োগের আশাস দিতে তোলেন নি।

অন্যথেষ্ট ১৯৭৫ সালের ২৫শে নোভেম্বর একটা চুক্তি হল। এরফলে

স্বীকৃত ইউনিয়নের কমতা খর্ব হল, এবং কর্মচারীদেরকে কিছুটা দমন করা গেল। ৩৫শে নোভেম্বর কারখানা স্থূল। এই ছিয়াশি দিন কর্মচারীরা অনাহারের মধ্যে ঘটি বাটি বিক্রি করে কাটিয়েছেন। ভীতি-সন্ত্রাস প্রদর্শন, তুচ্ছ অপরাধে গুরু শাস্তি এবং সর্বদাই জরুরী অবস্থার মিসার জুজু দেখানো হলো। এবং কারখানা খোলার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আরও তিনজনকে চার্জশীট দেওয়া হল। লক-আউটের এই ৮৬ দিনের জন্য কর্মচারীদেরকে এক পয়সাও দেওয়া হয় না। সংশোধিত বোনাস আইনের জন্য পুজোর মুখে এক পয়সা বোনাসও তারা পেলেন না। এবং স্বযোগ বুকে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ খুঁজা উচিয়ে পাঁচশো জন কর্মচারীকে বাধ্য করলেন ভলেনটারি সেপারেশন স্বীম গ্রহণ করতে।

যাদেরকে চার্জশীট দেওয়া হলো, তারা কি অগ্রায় করেছিলেন একটু বিচার করে দেখা যাক। কর্মচারী শ্রীবীন তালুকদার পঁচাত্তর সালের ৪ঠা জুলাই অসহ্যতার জন্য ছুটি নিয়েছিলেন। কিন্তু তাকে চার্জশীট দিয়ে অভিযোগ করা হয় যে, ঐদিন তিনি সকাল সাড়ে ছটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা পর্যন্ত অফিসারদের ঘেরাও করে রাখেন। আবার তদন্তে প্রমাণিত হয় যে, বেলা আড়াইটের পর ঐ ঘেরাও হয়েছিল। কিন্তু রবীন তালুকদার তো তখন বিছানায় শুয়ে, তিনি ঘেরাও করেন কি করে?

৩১শে জাছুয়ারী কারখানা গেটে আটজন হাটাই হওয়া কর্মচারীর নামের তালিকা টাঙ্গানো হয়। কর্মচারীদের ভয় দেখানো হতে থাকে এবং ঐ রাজ্বে সাভজন কর্মচারীকে সাঙ্গানো অভিযোগে 'মিসায়' গ্রেপ্তার করা হয়। এবং গত লোকসভার নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৮ই ফেব্রুয়ারী এদেরকে শর্তাধীনে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু ঐদিন কোম্পানী কর্তৃপক্ষ ঐ আটজনের বাড়ী থেকে ঘোর করে ধরে নিয়ে আসেন এবং প্রত্যেককে পৃথকভাবে পদ্মতাগ পত্রে মই করতে বাধ্য করেন।

আজ কেন্দ্রে ও রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার জরুরী অবস্থার সময়ে যা তার পূর্বে হাটাই হওয়া কর্মচারীদের কাজ ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন। এখন আশা করা যায় যে, মেটাল বক্সের এই আটজন কর্মচারী সম্মানের সঙ্গে কাজে যোগ দিতে পারবেন।

চীনের শিক্ষা ব্যবস্থা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

চারী হিসাবে কাজ করে এবং হবিধা মত-বিদেশীদের সঙ্গে ইংরাজীতে কথা বলে। ক্যান্টনের কাছে ডাঃ সানিয়েং সেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পদ্ধতিতে শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ছাত্র ছাত্রীরা তাদের তিন বছর পাঠ্য সময়ের এক তৃতীয়াংশ কাটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের বাইরে এবং অন্ততঃ তিন মাস কোন খামার বা কারখানায় কাজ করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশীরা ভাগ ছাত্রই শ্রমিক কৃষক ও সৈনিক, যাদের নিজ নিজ কর্ম ক্ষেত্রে কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে। এই ছাত্রদের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক চেতনা বাড়ান ও ব্যক্তিগত-উৎকর্ষ সাধন বা বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে এবং দেশ গড়ার কাজে সাহায্য করবে। ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, বিদেশী ভাষা প্রভৃতি শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ সমাজকে কক হিসাবে ব্যবহার করতে পারে—বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়বস্তুও তাই সর্বত্র ছড়িয়ে আছে যাতে নিজেদের মধ্যে উপলব্ধি করে তার প্রয়োগ করতে পারে। জীব বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী একবার এক কমিউনে গিয়ে মাঠে যাতে যে সব কীটপতঙ্গ শত্রু নষ্ট করে তাদের প্রকৃতি ও গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন। বহু কীটনাশক ওষুধও ব্যবহার করা হলো তাতে বিশেষ কিছু কল হলো না উপরন্তু সে সব কীট কৃতিকারক নয় সেগুলিও মরে গেল এমন কি বড় ইঁদুরস্বী ও সব শত্রুর দানা পেয়েছিল-তারাও মরে গেল। তখন এক স্বভিজ বুদ্ধ কৃষক পরামর্শ দিলেন ওষুধ ব্যবহার না করে যা চিরন্তন ব্যবস্থা তা নিতে—সে ব্যবস্থায় বহু ইঁদুর ক্ষেতে ছেড়ে দেওয়া হলো, এই ইঁদুরই সব কীটপতঙ্গ থেকে শত্রু বাঁচালো—এটাই তো হলো বিচার বাস্তব প্রয়োগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটোরিতে বসে দু'চারটি পতঙ্গ পরীক্ষার মাধ্যমে এটা সম্ভব হতো না। অল্পদিন হল সানিয়েং সেন বিশ্ববিদ্যালয় এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে এবং তাতে বেশ স্বকলও দেখা যাচ্ছে।

শিক্ষাকালে শিক্ষার্থী কৃষক শ্রমিকদের সঙ্গে একযোগে কাজ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে গ্রামে চলে যায় যাতে তারা শ্রমিক, কৃষকদের সঙ্গে থেকে দেশ গঠনে সাহায্য করতে পারে ও তার নিজের মন থেকে জাত্যাতিমান দূর হয় আর কৃষক শ্রমিককে অবহেলার চোখে দেখার সংস্কার মুছে ফেলতে পারে। এতেই ক্রমে শ্রমিক, কৃষক; শহর ও

গ্রাম এবং পুণিগত বিজ্ঞা ও কার্যিক জন্মের মধ্যে ব্যবধান দূর হবে।

এবার আমি এই উচ্চ শিক্ষার খরচের কথায় আসছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকালে ছাত্রছাত্রীদের থাকা খাওয়া শিক্ষা কোন বিষয়ে কোন খরচ নেই তবে এখনও কিছু সংখ্যক ধনবান ব্যক্তি আছেন যাদের ছেলেমেয়েদের কিছু খরচ দিতে হয়। এই ধনবান ব্যক্তি কারা সে বিষয়ে প্রশ্ন জাগতে পারে। এখনও দারাদেশে পুরোপুরিভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়নি। ধনের কিছুটা অসম বন্টন এখনও আছে, তা একদিনে এক বছরে বদল করা যায় না। এ ব্যবধান ঘুচাতে বহু দশকের প্রয়োজন হবে। যে সব শ্রমিক কৃষক পড়তে আসে তারা তাদের পূর্ব বেতন পায় এবং তার থেকে কিছু শিক্ষা বাবদ দেয়।

পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যতালিকা প্রভৃতি নির্ধারণের জন্য কমিটি আছে। তাতে ছাত্র, শিক্ষক ও বিপ্লবী কমিটির প্রতিনিধি থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে তো পাঠ্যসূচী নির্ণয় করতে শিক্ষার্থীদের মতামতকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক সব দিক দিয়ে উন্নত করে তুলতে হবে যাতে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সহায়ক হয়। খেলাধুলা, গান বাজনা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য দেশময় জিমিনাসিয়াম শিশুপ্রাসাদ (Childrens palace) গড়ে তোলা হয়েছে। স্কুলের পরে বিকালে অবসর সময়ে ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা (ফুটবল, বাস্কেটবল, ব্যাটমিন্টন অন্যান্য নানা প্রকার খেলা) সঁতার কাটা, শরীর গঠনের জন্য ব্যায়াম ইত্যাদি করার সুযোগ পায়। কিন্তু প্রাসাদে নিজস্ব কুচি, অস্থায়ী নানা কাজ শেখানর ব্যবস্থা আছে। সাংহাইয়ে এরকম এক শিশু প্রাসাদে দেখছি কোথাও গান, বাজনা নাচ হচ্ছে, কোথাও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে, কোথাও শিল্পকলার চর্চা হচ্ছে আবার কোথাও বা কারিগরি বিচার চর্চা হচ্ছে। স্কুল ছুটির পর ছেলেমেয়েরা এসব জায়গায় গিয়ে নিজের খেলায় মগ্নী এবং কচিমন্ড কাজ করতে পারছে। তাতে তাদের স্বজনীশক্তির বিকাশ ঘটছে। এ সবের জন্য কোন ছাত্রছাত্রীকে কিছু খরচ করতে হয় না—সরকার সব ব্যয় বহন করে।

মোটকথা চীনে শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বস্তরেই বিপ্লব এসেছে—এ বিপ্লব দেশকে, জাতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে চলবে। পরিবর্তনশীল সমাজের

সঙ্গে থাপ থাপগাতে শিক্ষা ব্যবস্থারও নিরন্তর পরিবর্তন দরকার হবে—এ স্থিতিশীল থাকতে পারে না।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'মধ্যাহ্ন'

দশ বছর ধরে একটি নিউল ম্যাগাজিন তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে এটা কম প্রশংসনীয় ব্যাপার নয়। ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'মধ্যাহ্ন'-র দশম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যাটি আমাদের হাতে এসেছে। বন নিরীক্ষার শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনায় শৈলেন্দ্রনাথ বসু নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। বর্তমান সংখ্যাটির উল্লেখযোগ্য তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধটি হল 'সুদেষ্ণা চক্রবর্তীর 'ক্রান্তির রাজনৈতিক থিয়েটার'। আঞ্চলিক বাংলা প্রবাদ প্রসঙ্গে স্ববীর মুখোপাধ্যায় সাধারণের উৎসাহ সৃষ্টি করেছেন। 'চীনের সাম্প্রতিক শিল্প সাহিত্য' নিবন্ধটিতে স্ববল চক্রবর্তী আরও গুরুত্ব আরোপ করতে পারতেন। সংখ্যাটিতে সমাজ সচেতন মূলক গল্প লিখেছেন দিলীপ মিত্র, বাদল সেন ও স্বপন বিশ্বাস। কবিতাগুলি মননশীল। চীনের সাংস্কৃতিক বসবসর ওপর কবিতাগুলির স্বচ্ছন্দ ও বুদ্ধিদীপ্ত অঙ্কন ইন্দ্র সেন মুন্সিয়না দেগিয়েছেন কম নয়। গোবিন্দ পালকড় স্বেচ্ছাচি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পোষ্টম্যানের কীর্তি

মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি থানার রমনা সেখদীঘি শাখা ডাকঘরের পোষ্টম্যান নাজেম আলি চিঠিপত্র বিলি না করে নিজের চায়ের দোকানে জালানী হিসেবে ব্যবহার করেন জঙ্গীপুর মহকুমা ডাকঘর-সমূহের পরিদর্শক কিছুদিন থেকে এই ধরনের অভিযোগ পেয়ে ২৬ই জুলাই সেখদীঘিতে ঐ পোষ্টম্যানের চায়ের দোকানে হানা দিয়ে ২২টি চিঠিপত্র আটক ও তাকে মাসপেও করেন।

নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে তদন্ত

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকার চর জোত বিশ্বনাথপুর গ্রামের মেশের সেখ নামে জনৈক ব্যক্তির কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা গুজব রটতে শুরু করেছে। মেশেরের স্ত্রী সূমেরা বিবি জঙ্গীপুর আদালতের এম, ডি, জে, এম, মহাশয়ের কাছে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় নিখোঁজ মেশের সেখকে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ স্বগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে এবং তার পর থেকেই তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

হিন্দু স্কুল কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে নানা অভিযোগ

গৌতম সাহিত্তী

হিন্দু স্কুলে অনির্দিষ্টকাল ধর্মঘট চলছে। পঠন-পাঠম ও তৎসংক্রান্ত বাস্তবিক কাণ্ডকর্মই বন্ধ হয়ে রয়েছে। ধর্মঘট থেকেছেন এই স্কুলের ছাত্ররা। কারণ সম্পর্কে ধর্মঘট নিয়ে গিয়ে জানলাম ১৯৭৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই স্কুলের মোট ১১৫ জন পরীক্ষার্থী ছিলেন। যারা প্রকাশিত কলাকল্লের তালিকায় আনা যায় যে মাত্র ৫০ জন প্রথম বিভাগে, ৫৫ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ১ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। বাকী ২৬ জন ফেল ও একজন পরীক্ষা দেয় নি। হিন্দু স্কুলের ক্ষেত্রে এই কলাকল্ল অত্যন্ত বিষয়কর এবং অভাবনীয়। এমন কি যে সমস্ত ছাত্র পাশ করেছেন তাদের অভিভাবকরাও হতবাক হয়ে গিয়েছেন। অবশ্য মাধ্যমিকের সাধারণ রেজাল্টের তুলনায় এ কিছুই নয় বলেই চলে। কিন্তু এরটা অত আশঙ্ক্য।

আমরা জানি সাধারণত: অত্যন্ত কঠোর পরীক্ষার কথা দিয়েই হিন্দু স্কুলে ছাত্র ভর্তি করা হয় এবং যেসব ছাত্র ব্যতীত অল্প কারোয় পক্ষেই হিন্দু স্কুলে ভর্তি হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে সার্বিক মেধার এইরকম ধস কেন? কিন্তু পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে এরপরে। ইতিমধ্যে ১১-১২ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার কথা ওঠে। কর্তৃপক্ষ ভর্তি হওয়ার জন্য একটি যোগ্যতামান নির্ধারণ করেন। এই মানটি হল বাংলা, ইংরাজী ও বিজ্ঞান বিভাগ সহ ছাত্রদের ৩১০ নম্বর পেতে হবে। আরো বলা হল বিজ্ঞান বিভাগের মোট ৫০টি সিলেটের জন্য স্কুলের ছাত্রদের ৪০টি সিলেট পেওয়া যেতে পারে ও বাকীগুলি বাইরের স্কুলের জন্য। এসময়: উল্লেখ্য যে হিন্দু স্কুলের প্রতিকা ৪০জন ছাত্রই এই যোগ্যতা মানে পৌছতে পারে নি। স্বভাবত:ই প্রশ্ন উঠেছে এই ছাত্ররা কোথায় যাবে? কর্তৃপক্ষ তার স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করার জন্য বলেছেন যে স্কুলে মাত্র ১৩০টি সিলেট রয়েছে। এমনভাবেই এই স্কুল থেকে পাশ করা সমস্ত ছাত্রকে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠেছে গত বছর তাহলে কেন ৭৫ জনকে ভর্তি করে নেওয়া হল যার মধ্যে ৫০ জনকে বিজ্ঞান বিভাগে, ১৪ জনকে কলা বিভাগে ও ১১ জনকে বাণিজ্য বিভাগে?

আজ ছাত্ররা দাবী করেছেন তাদের সবাইকেই ভর্তি করতে হবে। কেননা আশ্রয় প্রতিটি স্কুলেই এই সমস্ত রয়েছে। মাধ্যমিক পাশ

করেছেন ৮৪,০০০, অথচ দেখা গেছে মোট সিলেট আছে ৬৪,০০০। তাহলে এই বাকী কুড়ি ছাত্রের কি করবে? এদের জন্য লেবাপড়ার দরজা কি একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া হবে?

অথচ বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী যে কোন বিভাগে সর্বনিম্ন ২৬টি সিলেট রাখতে হবে এবং সার্বিক মোট সিলেট বিদ্যালয়গুলি রাখতে পারে ২২৫ ও কলেজগুলো ৩০০। কিন্তু হিন্দু স্কুল গত বছর এই নিয়ম লঙ্ঘন করে ছাত্র নেয়নি তথাকথিত "স্বাধীন" কুড়ির জন্য। আইভেট কলেজগুলি নিজেদের সমস্তা নিয়ে এতই বিরত যে তারা নতুন কোন দায়িত্ব নিতে রাজী হচ্ছেন না। কিন্তু হিন্দু স্কুলের মত একটি সরকারী স্কুলে ছাত্র আনন বাড়াতে অস্ববিধে কোথায়? হিন্দু স্কুল কর্তৃপক্ষ উচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে তথাকথিত "ভাল ছেলেদের" নিতে চান, কিন্তু এই স্কুলেরই অমান্য ছাত্রদের নিচ্ছেন না নম্বরের বোঝাই দিয়ে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে পরীক্ষার কলাকল্ল সার্বিকভাবে বাতিল হল কেন? কর্তৃপক্ষ ঘরান ছাত্ররা পড়াশোনা করেনি। তাহলে আশ্রয়ের ভাগ নম্বরের ভিত্তিতে গৃহীত ছাত্র ১১-১২ শ্রেণীতে পরীক্ষায় যদি বারাপ কলাকল্ল দেখায় তাহলেও কি কর্তৃপক্ষ বলবেন ছাত্ররা পড়াশোনা করেনি? এখন স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে হিন্দু স্কুলের ভাল ছাত্ররা কেন পড়াশোনার মন দিচ্ছে না! নাকি কর্তৃপক্ষ সমস্ত দায়ভাগ ছাত্রদের বাড়ি চাপিয়ে দিচ্ছেন। কেননা ভাল ছেলেদের দায়িত্ব তারা পালন করছেন অথচ তথাকথিত "বারাপদের" নয়। ঘটনা চক্রে দেখা যাচ্ছে ভাল ছাত্রদের ক্ষেত্রেও তারা দায়িত্ব পালন করছেন না।

তাই ছাত্ররা দাবী করেছে কাজ এত বারাপ হল কেন তার তদন্ত করতে হবে। এখানেই কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছে এক দুর্নীতিচক্র—শিক্ষা অগতে আসলে যারা নৈরাজ্য ছাড়া অন্য কিছুই চান না। দেখা যাচ্ছে, ছাত্রদের পড়াশোনার অবনতির জন্য কর্তৃপক্ষই অনেকাংশে দায়ী। ছাত্রদের হাজিরা বাতা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে শতকরা ১০ জন ছাত্র ১০ দিন উপস্থিত হয়েছে। অথচ যে সমস্ত দিন স্কুল হওয়ার কথা ছিল সেইদিনগুলিতে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন প্রধান শিক্ষক প্রমুখ সরকারের বেতের বিয়ের জন্য স্কুল

ব্যবহার করার জন্য ছুটি দিয়ে দিয়েছিল। এই রকম অকারণে স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আবার স্কুল খোলা স্বকল্পেও শিক্ষকরা আসেন নি। এর প্রধান কারণ শিক্ষকদের মধ্যে ঘোড়ী বার্থ প্রাধান্য পেয়েছে। প্রধান শিক্ষকের সর্বমুখ্য একজন শিক্ষক তাদের যোগ্য হবিবানত স্কুলে আনেন ও প্রাস করেন। এরা প্রধান নত: স্কুলের সিফিনের পুরই আনেন। সেই কারণে সেই বৃত্ত কটম সেট আপ করেন। ফলে বিরোধী গোষ্ঠীর শিক্ষকরা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য হয় প্রাসে বান না মতবা পড়ান না। এর ফলশ্রুতি অধিকাংশ দিনই প্রাস হয় না।

এই গোষ্ঠী কোম্পানির কারণ অসু-সহান করে জানলাম শিক্ষকদের মধ্যে আইভেট টিউশনি সংক্রান্ত রেবা-রেবি। হিন্দু স্কুলের কোন শিক্ষকই ৩০০ টাকার নীচে বেতন পান না,

অথচ আইভেট টিউশনিতে এরা ১০০০-২০০০ টাকা পর্যন্ত রোজগার করেন। হিন্দু স্কুলে সাধারণত: ধনী, উচ্চমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঘরের ছেলেদের সংখ্যাই বেশী। সেই কারণে এদের ব্যক্তিগতভাবে গৃহ-শিক্ষক রাখতে অস্ববিধে হয় না। জানা গেছে এক গোষ্ঠীর শিক্ষক প্রাসে এসে অল্প গোষ্ঠীর শিক্ষকদের নিন্দা করেন, এবং নিজের সংগে সংগে তার গোষ্ঠীর শিক্ষকদের হয়ে "অ্যাডভান্স টাইজ" করেন আইভেট টিউশনির ব্যত। এই রেবারেবির ফলশ্রুতি অসু হয় ছাত্ররা। শিক্ষকদের মধ্যে কৌতুকের আর একটি কারণ হল যে এই স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিকের সমস্ত টেকনিক্যাল নামে একটি আলাদা বিভাগ ছিল যার প্রধান ছিলেন জনৈক "ইন্ডিয়ান"। ইনি একজন গেজেটেড শ্রেণীর কর্মচারী। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক উঠে যাওয়ার পর এমার কাজ হয় ওয়ার্ক-এডুকেশন করানো অর্থাৎ মধ্যাহ্নে একটি বা দুটি প্রাস। অথচ এনার বেতন প্রায় ১৫০০ টাকার কাছাকাছি।

এই সমস্ত ঘটনার পরিণতিতে স্কুলের পড়াশোনার মান-নিয়ন্ত্রণী হয়ে চলেছে এবং পরীক্ষার কলাকল্লও অত্যন্ত হতাশাবাধক। অবশ্য প্রধান শিক্ষক কেবলমাত্র ছাত্রদের ঘোষা-রোপ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তিনি কুড়িখেরও দাবী করেছেন যে স্কুলে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনছেন। শ্রুত যোগ্যতালো অনুশীলনের শান্তি বিরাজ করিয়ে আন কি? হিন্দু স্কুলে এমন একটা সময় ছিল যখন কোন প্রধান শিক্ষকও ছিলেন না এবং ৭-৭-৭১ সালে যে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময়গুলোতেও হিন্দু স্কুলের গৌরবোজ্জ্বল কলাকল্ল দেখা গেছে। অথচ এই নিরবচ্ছিন্ন শৃঙ্খলার মধ্যে হিন্দু স্কুলের এই দশা কেন? দেখা গেছে সার্বিক শিক্ষার নৈরাজ্য দূর করার চেষ্টা না করে কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগত কারোই স্বার্থে বেশি করে নৈরাজ্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন।

কেবলমাত্র এই ঘটনাই নয় অর্থ-নৈতিক দুর্নীতিতেও এই কর্তৃপক্ষ নিজেদের হাত-কলাকল্ল করে তুলে- (শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য
লটারী
প্রতি সপ্তাহে শুধু
৬০০০ টির ওপর
পুরস্কারই দেয় না
হাজার হাজার পরিবারের
রুটি-রুজিরও ব্যবস্থা
করে।

প্রতি সপ্তাহে মাত্র এক টাকায় দেড় লাখ টাকার সুযোগ তো আপনার থাকছেই—তাহলে ইচ্ছা করলে দক্ষ জনপ্রিয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর টিকিট বিক্রি করেও আপনি প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত মোটা টাকা আয় করতে পারেন। এ ভাবে হাজার হাজার পরিবারের অমের সংস্থান হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী থেকে—বহু দুর্ভাবনায় শ্রমণ মুখে নিশ্চিন্ততার হাসি ফুটে উঠছে। আপনিও আসুন না, আমাদের এজেন্ট হোন। আপনার জন্য সুনির্দিষ্ট আয়ের সুযোগ করে আপনার মুখেও আমরা হাসি ফুটিয়ে তুলি।

আর এ কাজে শুধু আপনি টিকিট বিক্রি করছেন না—আপনি জনসেবায় অংশ গ্রহণ করছেন। কারণ পুরস্কার দেবার পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর উদ্ভূত প্রতিটি পয়সা পশ্চিমবঙ্গের নানা জনকল্যাণ প্রকল্পে ব্যয় করা হয়।



প্রতি সপ্তাহে
আপনার পুরস্কার
প্রথম পুরস্কার (একটি)
১,৫০,০০০ টাকা নগদে অথবা
জিনিসপত্র
সাত্বনা পুরস্কার (২টি) : প্রতিটি ১,০০০ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার (৩টি) : প্রতিটি ১০,০০০ টাকা
নগদে অথবা জিনিসপত্র
তৃতীয় পুরস্কার (প্রতি ১০,০০০ টিকিটে একটি) :
প্রতিটি ১,০০০ টাকা
চতুর্থ পুরস্কার (প্রতি ১,০০০ টিকিটে একটি) :
প্রতিটি ১০০ টাকা
পঞ্চম পুরস্কার (প্রতি ১,০০০ টিকিটে একটি) :
প্রতিটি ৫০ টাকা
বিক্রেতাদের জন্য লাকি ড্রপ (প্রতি ১০,০০০ টিকিটে একটি) :
প্রতিটি ৫০ টাকা
এবং বিশেষ খেলায় যে-যে বিশেষ
পুরস্কার থাকবে।

প্রতি সপ্তাহে আপনার
জন্ম আয়ের ব্যবস্থা
টিকিট বিক্রীর উপর ২০% থেকে
২৫% কমিশন।
প্রথম পুরস্কার এজেন্টদের জন্য ৭,০০০ টাকা
এবং বিক্রেতাদের জন্য ৩,০০০ টাকা।
বোনাস : এজেন্টদের ৭% ও বিক্রেতাদের ৩%
প্রথম, দ্বিতীয় ও সাত্বনা পুরস্কার বিজয়ী টিকিটে।
স্থানাদিকারী পুরস্কার : প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়
স্থানাদিকারী টিকিটের বিজয়ীরা যথাক্রমে ১,০০০
টাকা—৫,০০০ টাকা, ৭৫০ টাকা—২,৫০০
টাকা ও ৫০০ টাকা—১,০০০ টাকা (খেলার মোট
টিকিট বিক্রীর পরিমাণ অনুযায়ী) পুরস্কার
পাবেন।
বিক্রেতাদের পুরস্কার : ৫০ টাকা, প্রতি তৃতীয়
পুরস্কার বিজয়ী টিকিটে।
লাকি ড্রপ : প্রতিটি ৫০ টাকা হিসাবে ৩০০টি
পর্যন্ত (প্রতি ১০,০০০ টিকিটে একটি)।
এজেন্ট হবার নিয়মাবলী ও আবেদনপত্রের জন্য
আপনার জেলার জেলাশাসকের দপ্তরে অথবা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর দপ্তরে—৬৯ গণেশচন্দ্র
আড্ডেনু, কলিকাতা-৭০০০১৩ টিকানায় যোগাযোগ
করুন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী

এই সপ্তাহে প্রতি সপ্তাহে
সুদাননি

পিয়ালসের মালিকরা ইউনিয়ন নেতাদের বিরুদ্ধে গুণ্ডা লাগিয়েছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পিয়ালস মালিকদের শোষণ ও কুসুরের প্রতিবাদে গত ২৬শে জুলাই পিয়ালসের সমস্ত শাখার কর্মচারীরা গণ-ছুটিতে অংশ নেন। জনসাধারণ কর্মচারীদের কাছে পিয়ালসের মালিকদের খোঁকা-বাঁজী বতই উদ্ঘাটিত হচ্ছে ততই বি, কে, রায় কোম্পানী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। ২৬শে জুলাই মালিকপক্ষ হাজার টি ও বোম্বার্ডার থানার সঙ্গে যৌথসভা করে কর্মচারী নেতৃত্বকে গ্রেপ্তারের কন্দি আটেন। কয়েক-

জন কর্মচারীকে বি কে রায়ের তাড়াটে গুণ্ডা ও দালাল কর্মচারীরা জোর করে কাজে যোগ দিতে বাধ্য করার চেষ্টা করে। ঐ গুণ্ডাদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে ইউনিয়নের দুজন নেতৃস্থানীয় কর্মী হারুণভাবে নিগৃহীত হন। কাটিহার শাখার কর্মী ইউনিয়ন নেতা কৃষ্ণদাস রায়কে বি কে রায়ের গুণ্ডারা প্রচণ্ডভাবে মারধোর করে এবং অবশেষে সাজানো অভিযোগে গ্রেপ্তার করানো হয়। পরের দিন আদালত তাঁকে জামিনে

হিন্দু স্কুলে নানা গুণ্ডাগোল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পারব না ইত্যাদি। এই টাকা কোথায় গেল? এই সময়ে প্রধান শিক্ষক ছিলেন শক্তিবাবু। শোনা যায় একদল ছনীতিগুস্ত শিক্ষকের চাপে পড়ে শক্তিবাবু বদলী হতে বাধ্য হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, যে সমস্ত শিক্ষক এই গোষ্ঠী রাজনীতির বাইরে থাকতে চান তারা দুর্গতির সম্মুখীন বা বাধ্য হন অন্যত্র বদলী হতে।

ইতিমধ্যে কেলেকারীর আর একটি রহস্য উন্মোচিত হয়। ৭০-৭১ সালে নকশাল হামলার দরুণ স্কুলে যে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি হয় তার জন্য দুই কোটি মোট ৫০ হাজার টাকা সরকারী অর্থমোদন আসে। প্রথমবার আসে শক্তিবাবু থাকাকালীন দশ হাজার টাকা ও বর্তমান প্রধান শিক্ষক প্রমুদবাবু থাকাকালীন আরো চল্লিশ হাজার টাকা। অথচ এর মধ্যে এই টাকার সম্যবহার করার কোন দক্ষণ চোখে পড়বে না। ছোটখাট কাজ হয়েছে সত্যি, কিন্তু তা ৫০ হাজার টাকার কাজ কোন অর্থেই নয়। তাও আবার বাইরের কন্ট্রোলর ডাকা হয়েছে। অথচ স্কুলে বৈদ্য নামে জনৈক ছুতোর রয়েছে যার মাঝে বেতন ৩০০ টাকা।

বর্তমান প্রবীণ শিক্ষক দাবী করেছেন স্কুলে যথেষ্ট শৃঙ্খলা রয়েছে, কিন্তু গত তিনবছর ধাবৎ স্কুলে কোন ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়নি। এ কোন শৃঙ্খলার নিদর্শন? অথচ ছাত্ররা যথারীতি ম্যাগাজিন চালা দিয়ে গেছে। তাহলে ম্যাগাজিন লাগুর টাকা কোথায় গেল?

ছাত্ররা এই সমস্ত প্রশ্ন করাতে প্রমুদবাবু জবাব দেন, “এর উত্তর

মুক্তি দেন।

এদিকে পিয়ালসের মালিকপক্ষ চেষ্টা করছেন কোম্পানীতে লক্ষ আউট ঘোষণা করতে। এর ফলে একদিকে কর্মচারীদের যেমন বিপদে ফেলা যাবে তেমনি বিপদে ফেলা যাবে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে। আর বি, কে, রায়ের বুক বদল আছে যে, জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের দু একজন প্রত্যাশালী এম, পি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার জনৈক ডাকসাইটে সমস্ত পিয়ালসের ইন্সপেক্টরের তুমিকায় লক্ষ লক্ষ টাকা কামান। তাই শাসক পার্টি মালিকদের পক্ষ নিশ্চয়ই অবলম্বন করবেন।

এক হি রাস্তা

ভানুসিংহ

হিন্দি ছবির নির্মাতার হাতে পড়ে বাংলা গল্প (পূর্বে স্টার স্ক্রিনে অভিনীত নাট্যরূপ ‘শ্রেয়সী’) সচরাচর একটি রাস্তার নিশানাই পাওয়া এবং সে রাস্তাটা হল প্রচলিত আদর্শ-বোধকে সামনে রেখে ভাবাবেগের জোরে দর্শক মনকে ধরে রাখা। আলোচ্য ছবির ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটি ঘটেছে এবং সেই বিচারে, ছবির নাম ‘এক হি রাস্তা’ যথাযথ হয়েছে বলতেই হবে। এই বাঁধা ছকের কল্পনা থেকে এ দেশের ছবি কবে মুক্তি পাবে কে জানে। সেই স্বামী লাহিতা স্ত্রীর অবিচল পতিভক্তি, স্বামী দেবতার পর-নারীতে আসক্তি ও বিবাহ, অতঃপর মোহতঙ্গ ও পূর্ব স্ত্রীর নিকট অমৃততপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন—এরই মধ্যে শিশু-সন্তানের সিনেমা-হুলত ক্রিয়াকলাপ, যা সত্যতই দর্শক চিত্তকে ভাবাবেগের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই শিশু সন্তানকেই স্বামী-স্ত্রীর মিলনে তুরূপের তাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেই আদি সনাতন পদ্ধতিতে। অবশ্য হুবোহ খোষের কাহিনীর মধ্যেও তেমন নতুন কিছু নেই—যেটা আছে সেটা হল, মানবিকতার জয় ঘোষণা ও পাতিব্রতের মহিমা প্রচারের সহজ আবেদনময়তা। চিত্র পরিচালক মোহন সেগল সে দিকে যে দৃষ্টি রাখেন নি, এমন কথা বলি না। তিনি যদি পরিমিতবোধের পরিচয়টুকু দিতেন, ছবিটি আবেদন সৃষ্টি করতে পারত।

অনেক দৃষ্ট বিখ্যাত হয়ে ওঠেনি। স্রীতিমত কষ্ট হয় যখন দেখি সোসাইটি

ভরুণ অপেরা'র

(৫৫-৭১১১)

প্রযোজনা

১৯শে আগষ্ট

সাবকারিনায়

সন্ধ্যা ৬-৩ টায়

শান্ত বাগ রচিত

রক্তাক্ত তেলেশানা

স্রঃ প্রশান্ত ভট্টাচার্য

গীত রচনা : মধু গোহাঙ্গী

নির্দেশনা ও অভিনয়ে

শান্তিগোপাল

হলে টিকিট

গাল বীণার অকারণ আত্মহত্যা এক তারই প্রজ্জ্বলিত চিত্র। উপর নৃত্যরতা প্রতীকী দৃশ্য। এই প্রতীকের কোন প্রয়োজন ছিল না—প্রয়োজন ছিল না কমল নৈম সিংয়ের অমন নাটকীয়ভাবে পুত্রের ব্যবহৃত ত্রিনিয়টজির কল্যাণকর করার। তবে কেতকীর নববয়স বেগে কয়েকটি ক্রোড়-আপ, ছর্বোপ-পূর্ণ রাত্রে অতীত ও কেতকীর আকস্মিক দৈহিক মিলন, দুঃখ নিঃসন্দেহে রস-ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। ছবিতে গানের প্রবেশ কিন্তু বিরক্তিকর। ক্যামেরার মানও সর্বত্র অসুস্থ থাকে নি। ‘কেতকী’ চরিত্রে শাবানা আজমি এবং কমল নৈম সিংয়ের তুমিকায় উৎপল দত্ত চরমকার অভিনয় করেছেন। সংবেদনশীল অভিনয়ে বিনোদ মেহরা নির্মল চরিত্রটি দর্শনীয় করে তুলেছেন। বীণা রূপে আশা সচিব চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন কোন কুঠী না রেখেই।

ভুলেছেন কি?

‘বাসন্তী অপেরা’

তাদের দুইখানা পালা নিয়ে এবছরে আপনাদের কাছে এগিয়ে আসছে।

৬২জেন দে'র

রাজলক্ষ্মী

নির্দেশনা : ঠাকুরদাস মিত্র

সহঃ নির্দেশনা : মীরেন সাহা

সুশ্রীমল শর্মার

সাহাজাদী

রোশেনারা

স্রঃ : বারান চ্যাটার্জী

অভিনয়ে : নারায়ণ রায় গোস্বামী, মীরেন সাহা, রবীন্দ্র মিত্র, সাধন চক্র, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি বসুমদাস, আশীষ মজুমদার, অচ্যুৎ বসু, গংকর দত্ত, শক্তি মিত্র, জিপুরারী চট্টো, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, কলীন্দ বসু, বৈষ্ণব চট্টো, হনীল সিংহ, গোবিন্দ মিত্র এবং কৈকা চৌধুরী, আতা বকুল, মীরা রায়, সন্ধ্যা দে, শান্তি দোষ, সায়ী রায়, পুষ্প ঘোষ, উমা দাস, পাদিনা, কাবেরী বসিতা ও স্রীতিকণা দেবী।

কর্মসচিব : গোবিন্দ মিত্র

ফোন : ৪৪-৯৪৪৮

যোগাযোগ করুন : রঞ্জিত বসু

৩২, রবীন্দ্র সমীপ

কলিকাতা-৬

যাত্রামোদীদের

শুভেচ্ছা নিয়ে

১৯শে আগষ্ট

(২রা ভাজ) শুক্রবার

শুভ উদ্বোধন

স্থান—মিনার্ভা

সময়—সন্ধ্যা ৬টা

এম নক্ষর রচিত

ঐতিহাসিক পালা

সিতারা বাঈ

স্রঃ প্রশান্ত ভট্টাচার্য (২৬)

মৃত্যু : সত্যশঙ্কর

সম্পাদনা ও নির্দেশনা

বিশ্বনাথ সামন্ত

টিকিট ৫, ৩, ২, ১, টাকা

হলে ৯টা—৭টা

পরিবেশনায়

মঞ্জুরী অপেরা

৩৩, রবীন্দ্র সমীপ, কলি-৬

পরিচালক—সত্য রায়

সম্পাদক—মীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক হীপালী প্রেস, ১২৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং কর্তৃক কার্যালয় ৩১, মট লেন কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

কিছু পদস্থ অফিসার রাজ্য সরকারকে বিব্রত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন

কংগ্রেসীরা জোতদার ও মালিকরাও ষড়যন্ত্র পাকিয়েছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)



বিংশ বর্ষ ১১ সংখ্যা ১১ শুক্রবার ২৬শে আগস্ট, '৭৭ ১১ ৪০ পরমা

সমাজবিরোধীদের সঙ্গে

পুলিশের একাংশও জড়িত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বামপন্থী ফ্রন্ট কমিটির সভাপতি প্রমোদ দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, রাজ্যে ক্রমবর্ধমান সমাজ বিরোধী দৌরাচারের সঙ্গে পুলিশের একাংশের যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিটি সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের খবরের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন

এবং সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ দমনে বৃদ্ধপরিচর হয়ে তিনি পুলিশকে প্রতিটি ক্ষেত্রে তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ কথা ঠিক যে, রাজ্যে সমাজ বিরোধী উৎপাত আগের মতোই অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

(শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

রাজ্যের বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে কতিপয় পদস্থ অফিসার এখন নতুন কায়দায় বিব্রত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এদের মধ্যে আই এ এস ও আই পি এস পর্ষায়ের কিছু অফিসার দারুণ রকম সক্রিয়। জানা গেছে শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা হলেই এঁরা নানানভাবে বাধা দিচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণকে কোন সময় আইনের দোহাই নয়ত অন্য কোন অজুহাত দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্ত নিতে বিধাগ্রস্ত করে তুলছেন।

এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের আইন উপদেষ্টা সহ অন্যান্য সরকারী বিশিষ্ট কৌশলীরাও হতবাক। প্রায় প্রতিদিনই গাদা গাদা ফাইল আসছে। যে ফাইল অনায়াসে মহাকরণ থেকে সহজেই ফয়সালা হয়ে যেতে পারে। আর সরকারী পদস্থ অফিসারদের "কেতাবী নোটের" ফলে আইনজ্ঞদের কাছে তা পাঠাতে হচ্ছে। এর নীট ফল দাঁড়িয়েছে প্রতিটি কাঞ্চেই অহেতুক বিলম্ব ঘটছে। এর সুযোগ নিচ্ছে কিছু স্বার্থাষেবী মানুষ।

(শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

বিভূতির নিদে'শে ও রুণু-অরুণের নেতৃত্বে একটি হোটেল লুণ্ঠন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হোটেল জেনিথ (৭৮নং মহাত্মা গান্ধী রোড) মধ্য কলকাতার একটি প্রাচীন হোটেল। গোয়েন্দা দপ্তরের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার কুখ্যাত বিতৃষ্টি, চক্রবর্তী, উত্তর কলকাতার ডি সি সুখরঞ্জন ব্যানার্জী এবং লালবাজার স্পেশাল পুলিশ সেলের কয়েকজন বদম্যাস অফিসার ও গুণ্ডাদের মিলিত ষড়যন্ত্রের ফলে এই হোটেলের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়েছে যার মূল্য প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এই সম্পত্তির অনেক মূল্যবান অংশই উপরিউক্ত অনেক পুলিশ অফিসারের বাড়ি চালান হয়ে গেছে।

১৯৭৬ সালের ১৮ই আগস্ট অর্থাৎ জরুরী অবস্থার সময় ইন্সপেক্টর রুণু গুহ নিয়োগী, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর অরুণ ব্যানার্জী, সাব-ইন্সপেক্টর উমাশঙ্কর লাহিড়ী বেশ কিছু কম্পটেবল নিয়ে হোটেল জেনিথ আক্রমণ করে। তারা নারী শিশু নির্বিশেষে সমস্ত বোর্ডারকে রাস্তায় বার করে দেয় এবং তাদের জোর করে লালবাজারে ধরে নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্ত। হোটলে চলে পুলিশ বাহিনীর দক্ষস্বজ্ঞ বাড়ির মালিক দুই মারোয়ারীড়ীর এবং কংগ্রেসী গুণ্ডাদের উপস্থিতিতে। পাঁচতলা হোটেল বাড়টিকে সম্পূর্ণ খালি করে দেওয়া হয়। তারপর কুখ্যাত অত্যাচারী রুণু অ্যাণ্ড কোম্পানী ঘোষণা করে যে হোটেল জেনিথ প্রাইভেট লিঃ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল। বাড়ির মালিকরা আদালতে আবেদন করে হোটেল বন্ধ করতে পারেন নি, তাই পুলিশ তাদের সাহায্যার্থে এসে হোটেল খালি করে দেয়।

তারপর শুরু হয় লুণ্ঠন। কাপড়িস, বাসনপত্র, বিদ্যুতের সরঞ্জাম, দামী বিছানার চাদর থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিসপত্র, মিষ্টান্ন, বড় বড় মাছ সব চালান যায় পুলিশ অফিসারদের বাড়ি। ড্রেসিং টেবিল, আলমারি ইত্যাদি সমস্ত আসবাবপত্র লরীতে চাপিয়ে চালান দেওয়া হয়।

দর্পণের কাছে এই অভিযোগ করেছেন হোটেল জেনিথ প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীমতী গোপা গুহঠাকুরতা। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন, ১৯৭৫ সাল থেকেই হোটেল জেনিথ গুণ্ডা

ও পুলিশের আক্রমণের শিকার। ঐ বছরের ২৫ই জুন ১৯৭২ জন যুব কংগ্রেসী গুণ্ডা হোটেলটি সম্পূর্ণরূপে দখল করে নেয়, বোর্ডার যে কজন ছিল তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে এবং হোটেলটিকে কুখ্যাত কেস করে তোলে। তারা হোটেলের মালিকের কাছে এক-

(শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

রুণুকে গ্রেপ্তার করা হোক

চার মজুমদার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সত্তরের দশক মুক্তির দশকে পরিণত হবে, আর রুণু গুহ নিয়োগীরা সত্তরের দশকে সন্ত্রাসের দশকে পরিণত করে ছেড়েছে। জ্যোতির্ময় বসু লোকসভায় রুণু গুহ নিয়োগীর গ্রেফতারের কথা বলেছিলেন। যশপাল কাপুর, আর কে ধাওয়ান-দের গ্রেফতারের পর প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছিলেন, এই গ্রেফতারে প্রমাণ হল কমিশনের রায়ের জন্ত দীর্ঘ দিন অপেক্ষা না করে স্থনির্দিষ্ট অভিযোগে অনেকে গ্রেফতার করা যায়। পশ্চিমবঙ্গেও হরতোষ চক্রবর্তী কমিশনের রায়ের জন্ত অপেক্ষা না করে স্থনির্দিষ্ট অভিযোগেই রুণু গুহদের গ্রেফতার করা হক। তা হ'লে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছ থেকে নতুন করে অভিনন্দন পাবে। দমদমের অর্চনা গুহ তার উপর অত্যাচারের জন্ত আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। শুধু অর্চনা গুহই নয় গত সাত বছরে হাজার হাজার নকশাল বন্দীর উপর রুণু গুহ নিয়োগী নৃশংস অত্যাচার করেছে। তার বিরুদ্ধে নারী ধর্ষণের মামলাও চলছে। লালবাজারের টর্চার চেম্বারের অত্যাচারী পুলিশ অফিসার রুণু গুহ ছিল বন্দীদের কাছে এক ভয়ঙ্কর জানোয়ার বিশেষ। গ্রেফতার হবার পর লালবাজারে গিয়ে রুণু চুর্কটের হেঁকা খায় নি এমন নকশাল কমই আছে। রুণু গুহকে সম্প্রতি বদলী করা হয়েছে। কিন্তু বদলী-টদলী পর পক্ষে কিছুই শাস্তি নয়। ওর নিজস্ব কায়দায় ওকে টর্চার করাই উপযুক্ত শাস্তি।

সি আই টি ইউর সমাবেশে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের আহ্বান

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রবিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে সি আই টি ইউর প্রকাশ্য সমাবেশে নেতৃবৃন্দ সারাদেশে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন যে, গণতন্ত্রের জন্ত এবং শ্রমিকশ্রেণীর জরুরী দাবী-দাওয়ার সংগ্রামের জন্ত এই ঐক্য অপরিহার্য। কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী ও নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের পুরোভাগে থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে এগিয়ে যেতে হবে।

এই বিরাট সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সি আই টি ইউর সভাপতি বি টি রণদিত্তে এবং বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক পি রামমূর্তি ও সহ সভাপতি জ্যোতি বসু। শুধু শ্রমিক-রাই নয়, কৃষক, ক্ষেতমজুর ও মধ্যবিত্ত কর্মচারীরাও সমাবেশে যোগদান করেন।

বি টি রণদিত্তে আভ্যন্তরীণ জরুরী

অবস্থার সময় ইন্দিরা সরকারের দমন পীড়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, দেশে এখন রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। স্বৈরাচারী কংগ্রেস জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী শক্তির বিরাট জয় সারা দেশের নিপীড়িত মানুষের মনে আশা ও উদ্দীপনা এনেছে। কিন্তু আপাততঃ জয় হলেও গণতন্ত্রের বিপদ এখনও কাটেনি। মিসা এখনও বাতিল হয়নি। সংবিধানের ৩৫২ ধারা রয়েছে, জরুরী অবস্থা জারী করার সুযোগ এখনও রয়ে গেছে। ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইনও রয়েছে। এসব বাতিলের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সক্রিয় হয়ে সমবেত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

রণদিত্তে বলেন, কংগ্রেসের নীতি গত ৩০ বছরে দেশকে যে অরাজকতা

ও সংকটের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে তার থেকে উদ্ধার পাওয়া বাবে না জনতা সরকার সেই নীতি যদি না পাল্টায়। আবার গণতন্ত্রের ওপর আঘাত আসতে পারে। জনগণের হাতে ৭তম দিন না রাষ্ট্রক্ষমতা আসছে ততদিন গণতন্ত্রের সংগ্রাম চলতে থাকবে। শ্রমিক শ্রেণীকেও তাই অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এই সংগ্রামে সামিল করতে হবে গ্রামের কৃষক এবং জনগণের অন্যান্য অংশকেও।

দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও মানুষের একই অবস্থার উল্লেখ করে রণদিত্তে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির একত্রিত ওপর জোর দেন এবং বলেন সমাজবাদের লক্ষ্য সামনে রেখে মৌলিক সমাধানের সচেতন ধারণা নিয়ে এই ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

(শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

কয়লা খনির কয়েকজন কুখ্যাত অফিসার বাম্পন্থী সরকার বিরোধী চক্রান্তে মেতেছে

সাধন গুহ

৭৩ সালে কয়লাখনি জাতীয়-করণের পর থেকেই কয়লাখনি অঞ্চলের একদল অফিসার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন আমলের খেজাচারী ক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছেন। স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকদের কাছে তাদের প্রচণ্ড বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং হচ্ছে, এতদসত্ত্বেও কংগ্রেসী রাজত্বে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জমানায় বিশেষ করে জরুরী অবস্থার উনিশ মাসে এইসব কুখ্যাত অফিসারের দল আবার ক্ষুধার্ত শাহুলের মত রক্তের তুষায় মেতে উঠেছিল এবং সেই পিপাসা তারা মিটিয়েছে অনাহতভাবেই। এলো ৭৭এর সংসদ নির্বাচন। গোটা দেশের নিশ্চিত নিষ্পেষিত মানুষ ভোটের অধিকার নির্ভীক চিত্তে প্রয়োগ করে কবর রচনা করলো কংগ্রেসী অপশাসনের। কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হলো অকংগ্রেসী সরকার জনতা পার্টির সরকার।

আবার পটবদল। এলো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন। রাজ্য শাসনের ক্ষমতায় পশ্চিমবঙ্গে অধিষ্ঠিত হলো সি. পি. আই (এম)-এর নেতৃত্বাধীন বাম্পন্থী ফ্রন্ট সরকার। প্রতিক্রিয়ার শিবিরে স্বরূপ হলো হুমস্পন্দন। রক্ত পিপাসী হায়নার দল বিবরে মুখ লুকিয়ে উজত থাকলো শিকারের সন্ধানে। সেই হায়নার মতোই কয়লাখনির মুষ্টিমেয় এবং অতি কুখ্যাত এই অফিসাররাও এখন নেপথ্যবাসী আই, এন, টি, ইউ, সি এবং এ, আই, টি, ইউ, সি অর্থাৎ কংগ্রেস এবং সি, পি, আই দলের মদতপুষ্ট হয়ে কয়লাখনি অঞ্চলে আইন ও শৃংখলার অবনতি ঘটেছে বলে তারদের চীৎকার শুরু করেছে এবং এদের ঔদ্ধত্য এমন সীমায় পৌঁছে গেছে যে, এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন অফিসার অফিসার এসোসিয়েশনের সভায় কর্মকর্তাদের হুমিগ নিয়ে একদিনের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন এবং ২২শে জুলাই আসানসোল কয়লাখনি অঞ্চলে একদিনের অফিসার ধর্মঘট হয়। এরা শিল্প বিরোধ আইনের বিধি অমুখ্যায়ী কোন নোটিশ জারী না করেই এই ধর্মঘট করেছেন যার ফলে ইষ্টার্ন কোলফিল্ড কর্তৃপক্ষ কঠোর মনোভাব নিয়েছেন এদের সম্পর্কে এবং এদের একদিনের বেতন কাটা হচ্ছে। স্বভাবতই ব্যাপক প্রতি-

ক্রিয়া শুরু হয়েছে অফিসারদের মধ্যে। একদিনের ক্যাঙ্ক্যাল লীভার দরখাস্ত নাকি পেশ করা হয়েছে এবং এটাকে এখন ধর্মঘট অথবা কর্মবিরতিও নাকি বলা হচ্ছে না।

আমরা সবিনয়ে বলি অফিসার এসোসিয়েশনের তৎকালীন সভাপতি (২১শে আগস্ট অফিসার এসোসিয়েশনের নির্বাচনে এই কুখ্যাত অফিসারদের ভরাডুবি হয়েছে) এডিশনাল-চীফ পার্সোনেল অফিসার ব্রীজে, সরগ স্বস্ত লিখিত বয়ানে নিজেই ২২শে জুলাই কর্মবিরতির কথা স্বীকার করেছেন। সাধারণভাবে সব অফিসারের এক দিনের বেতন কাটার সিদ্ধান্ত সমীচীন নিশ্চয় কারণ শতকরা ৯৫ জন অফিসারই ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে একমত হননি কিন্তু সাংগঠনিক এক্য বজায় রাখার জন্মই তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক দিনের জন্ম ধর্মঘট করতে হয়েছে। অতএব তাদের লঘু শাস্তিই যথেষ্ট। কিন্তু এসোসিয়েশনের তৎকালীন সভাপতি জে, সরগ, সহসভাপতি কে, কে, পূজারী (এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার-পিওর নীতলপুর কোলিয়ারী),-ময়রা সাব এরিয়া ম্যানেজার কাশেম, মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার রণজিৎ ভট্টাচার্য প্রমুখ পালের গোদাদের বিরুদ্ধে ই, সি, এল কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই কঠোর শাস্তি বিধান করতে হবে কারণ সরগ আমার সঙ্গে কথা বলার সময় স্পষ্টতই বলেছেন যে, এই ধর্মঘট রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। এই ধর্মঘট বে-আইনী এবং আপনি এর জন্য অহুতপ্ত কিনা-আমার এই প্রশ্নের জবাবে সরগ নেতিবাচক জবাব দেন এবং ততোধিক উদ্ধত জবাব দিয়েছেন পূজারী। এই মহাশয়ের মতে অহুতপ্ত যদি হতে হয় তবে তা নাকি হতে হবে রাজ্য সরকারকে। কারণ? কারণ, কয়লাখনি অঞ্চলে নাকি খনি শ্রমিকদের হাতে অফিসাররা অহোরহই নিগৃহীত হচ্ছেন এবং খনি-শ্রমিক নামক "বেইমান-ছোটলোক-বজ্রাতঙ্কের" হাতে নাকি পূজারী প্রমুখ "পুতচরিত্র" অফিসারদের জীবন-মান-সম্মান বিপন্ন।

প্রশ্ন করেছিলাম মি: সরগ এবং মি: পূজারীকে-কার বিরুদ্ধে আপনারা ধর্মঘট করেছিলেন-কোলফিল্ড অধিরিতি অথবা রাজ্য সরকার? সরগ নির্ধিক কঠোর জবাব দিলেন-রাজ্য সরকার।

১০ই জুলাই আসানসোল ডুরাও হল অফিসার এসোসিয়েশনের এক সভায় যথেষ্ট প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দিয়েছেন কয়েকজন অফিসার। অনেক অফিসার অবশ্য "ল'এ্যাণ্ড অর্ডার" প্রসঙ্গটি উত্থাপনের বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু তাদের কাপুরুষ ভীতু ইত্যাদি নানা বিশেষণে আপ্যায়িত করা হয়। এই প্ররোচনামূলক সভা করার কয়েকদিন পরই ২১শে জুলাই এস, এস, ইনস্ট্রাক্টাইনড গুগোল হয় এবং ঐ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করেই অফিসাররা বিনা নোটিশে ২২শে জুলাই ধর্মঘট করেন। অফিসারদের পূর্বোক্ত মুষ্টিমেয় একাংশের মতে ২১শে জুলাই সকালে এস, এস, ইনস্ট্রাক্টাইনড থাদে রাম আশীষ সিং নামক জটনক মাইনিং সর্দার ম্যানেজার মি: শাহজোয়ানীকে গুরুতরভাবে প্রহার করেছেন। আমি যখন নিগা কোলিয়ারীতে ঘটনার তদন্ত করতে যাই তখন সাব এরিয়া ম্যানেজার মি: শর্মা আমাকে বলেন যে, ঘটনার দিন সেন্ট্রাল মাইনিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ৪১৫ জন প্রতিনিধির সঙ্গে মি: শাহজোয়ানী খাদে নামেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন মি: শাহজোয়ানী আসেন তখন আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, তিনি একাই খাদে নেমেছিলেন। একই দিনে মাইনিং সর্দারদের সংগঠন ইনমোসার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার অর্গানাইজিং সেক্রেটারী রামজি গিরির সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি বলেন যে ম্যানেজার শাহজোয়ানীর সঙ্গে খাদে নেমেছিলেন সার্ভেয়ার শচীবাঈ একজন পীক মাইনার, একজন রাজমিস্ত্রী এবং যোগীন্দ্র সিং। শাহজোয়ানীর সঙ্গে পূর্বদিন মাইনিং সর্দার রামআশীষ সিং-এর কথা কাটাকাটি হয়। রামআশীষ ইনমোসার স্থানীয় শাখার সম্পাদক। স্বভাবতই তার প্রতি কর্তৃপক্ষের হুমজুর থাকার কথা নয়। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে শাহজোয়ানী মিথ্যা কথা বলেছেন। খাদে যে রামআশীষকেই প্রথম আক্রমণ করা হয়েছিল সপারিশদ শাহজোয়ানীর পক্ষ থেকে সেই সভা চাখা দেবার জন্মই স্বচতুর সাব এরিয়া ম্যানেজার শর্মা শাহজোয়ানীর খাদে সহ-বাজীদের সেন্ট্রাল মাইনিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধি হিসেবে বর্ণনা করে অসত্য ভাষণ করেছেন।

বলা হয়েছে, শাহজোয়ানী গুরুতর-রূপে আহত হয়েছেন। মিথ্যা কথা, প্রেক্ষ সত্যের অপলাপ। আমি গিয়েছিলাম সীকতোড়িয়া হাসপাতালে এবং সেখানে চীফ মেডিকেল অফিসার ডাঃ কে,পি,রায় আমাকে ২২শে আগস্ট দুপুরে বলেছেন যে, শাহজোয়ানীর ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলে খুব মাইনর ক্র্যাকচার হয়েছে এবং হাঁটুর এক জায়গায় অল্প কেটে গেছে। পক্ষান্তরে রামআশীষ সিং-এর হাসপাতাল রিপোর্টে দেখা গেছে তার আঘাত অনেক বেশী গুরুতর। কলে সরগ, পূজারী, কাশেম, রণজিৎ ভট্টাচার্য প্রমুখ অফিসারদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চক্রান্তের ছবিটি খুবই স্পষ্ট। চেয়ার-

ম্যান ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মি: ভার্মা নিজেই অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, বাম্পন্থী সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবার পর কয়লাখনি অঞ্চলে আইন শৃংখলার কোন অবনতি ঘটে নি। একই কথা বলেছেন এরিয়া ফোরের জেনারেল ম্যানেজার মি: নির্মল শর, এম, ডি'র টেকনিক্যাল সেক্রেটারী মি: এস, সি গুপ্তা এবং আরও অনেকে। তাহলে কেন এই ধর্মঘট? এবং কোম্পানীর নিয়ম শৃংখলা ভঙ্গ করে যারা এই ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিলেন তাদের বিরুদ্ধে কেন কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হবে না চেয়ারম্যান এম, ডি'র কাছে সেটাই আমাদের সবিনয় প্রশ্ন।

আসানসোলের সরকারী হাসপাতাল থেকে নার্স অপহরণের চেষ্টা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আসানসোলের সরকারী হাসপাতাল থেকে একজন কর্মরত তরুণী নার্সকে কয়েকজন মস্তান জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে একটি সংবাদে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটে গত ৪ঠা আগস্ট মধ্যরাত্রে। সংবাদ, এই মস্তান দলটি এইদিনই একজন রুগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে। রুগীটিকে দেখাশুনার নামে মস্তানরা সন্ধ্যা থেকেই হাসপাতালের ভিতরে ঢুকে নার্সদের উত্যক্ত করতে থাকে। এই ঘটনায় বিরক্ত ও ভীত হয়ে কয়েকজন নার্স ও রুগী বর্তমানে এ্যাকটিং এস ডি এম ও ডাঃ রাহার কাছে প্রতিকারের জন্য আবেদন জানান। কিন্তু তিনি প্রতিকারের বদলে কার্যত মস্তানদেরই পক্ষ নিতে থাকেন। অবশ্য বেশ কিছু লোকজন জড় হয়ে যাওয়ায় মস্তানদের এইদিনের উদ্দেশ্য সকল হয়নি। সমস্ত ঘটনাটি স্থানীয় এম এল একে জানানো হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে উক্ত মস্তানদলের

পিয়ারলেসের হাওড়া শাখায় লকআউট

আন্দোলনের তীব্রতায় শংকিত পিয়ারলেস কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় গত ১২ই আগস্ট ইউনিয়নের হাওড়া শাখা ইউনিটের অন্ততম নেতা কল্যাণ চ্যাটার্জীর ওপরে হাওড়া শাখার ম্যানেজার নিজে এবং তার নিযুক্ত লোকেরা দৈহিক উৎপীড়ন চালান। এর প্রতিবাদে কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুখর হয়ে ওঠেন এবং ম্যানেজারের আচরণের তীব্র নিন্দা করেন। তারা ম্যানেজারকে এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হবে বলে দাবী জানান। কিন্তু পরের দিন শনিবার, ১৩ই জুলাই ম্যানেজার দুঃখ প্রকাশে

অসম্মতি জানালে বিক্ষোভ চরমে ওঠে। আর, ঐদিনই গভীর রাতে কোন নোটিশ ব্যতিরেকেই কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ একতরফা ও বে-আইনীভাবে কোম্পানীর হাওড়া শাখায় লকআউট ঘোষণা করেন।

উক্ত ঘটনায় সর্বস্তরের কর্মীরাই প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ। কর্তৃপক্ষ ঘোষিত এই একতরফা ও বে-আইনী লকআউটের বিরুদ্ধে ইউনিয়ন তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

গত সপ্তাহে পিয়ারলেসের নির্মল চন্দ্র দে স্ট্রীট শাখার মেশিন কর্মী শ্রীশংকর বহুকে সম্পূর্ণ সাজানো, (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

আসানসোল মাইনস বোর্ড অব হেলথের ভাইস চেয়ারম্যানের পদে পুরনো পাপী স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তে স্থানীয় জনসংস্কার বিক্ষুব্ধ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দুর্নীতির অভিযোগে এক সময় যিনি আসানসোল মাইনস বোর্ড অব হেলথের 'ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ' ছেড়ে দিতে বাধ্য হন সেই ডাঃ স্থানীয়রঞ্জন বিশ্বাসকে বামপন্থী সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী ভট্টাচার্য বর্তমান বোর্ড পুনর্বিন্যস্ত করে ঐ একই পদে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেল। ডাঃ বিশ্বাস নিজেকে আসানসোল কাছ থেকে একথা বলেছেন। তাঁর পুনর্নিয়োগের সংবাদে আসানসোলের বিভিন্ন স্তরে মাইনসের মধ্যে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

আসানসোলের আর এস পি নেতা ডাঃ স্থানীয়রঞ্জন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হচ্ছে (১) জীপ ক্রয় সংক্রান্ত কলঙ্কারী (২) এ ডি, এম এর বাংলা সংস্কারের নামে বোর্ডের অহুমোদন ছাড়াই হাজার হাজার টাকা খরচ (৩) প্রকাশ্যভাবে মত্তপান।

প্রথম অভিযোগ সম্পর্কে স্মৃতিস্তম্ভ কাহিনী হচ্ছে এই যে, ২০।১২।৬৯ তারিখে আসানসোলের হরজিৎ সিং নামক জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে ১৩৫০০ টাকায় একটি সেকেন্ডহ্যান্ড জীপগাড়ি কেনা হয় (ডব্লু, ডি, জে ৬৬৪৩)। ৮।৩।৭০ তারিখে গাড়িটি চুরি যায় এবং সেই তারিখেই গাড়ীটি দুর্ঘটনার কলে বিলম্ব হয়ে যায় এবং দুর্ঘটনা নিহত হয়। অডিট রিপোর্টে দেখা যায় যে, বিলম্ব জীপটি ৩।৩।৭৩ তারিখে ১২৫০০ টাকায় বিক্রী করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটির মধ্যে কোন দুর্নীতি কিংবা অবহেলার ছবি স্পষ্ট নাহলেও এর নেপথ্য কাহিনীটি নিঃসন্দেহেই রহস্যজনক। বোর্ড কর্তৃক নিষ্পত্তি তৎকালীন এ, ডি, এম মণীশ গুপ্তের সভাপতিত্বে গঠিত তিন জনের তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, "Vice Chairman, Asansol Mines Board of Health and the Secretary, AMBH are jointly responsible for the entire episode of the Jeep Scandal." এই তদন্ত রিপোর্টে "Nature and extent of irregularities শিরোনামায় বলা হয়েছে, "No attempt was made by the Vice Chairman and the Secretary for change

of ownership just after purchase of the jeep though full payment was made in cash. বলা হয়েছে, "No record is available to show that any attempt was made by the V. C and the Secretary to insure the Jeep (WGJ 643) against accident and theft."

জীপসংক্রান্ত সমস্ত রেকর্ডপরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে জীপ দুর্ঘটনা হয় ৮।৩।৭০ তারিখে কিন্তু মালিকানা বদলের দরখাস্ত করা হয় ২০।৩।৭০ তারিখে ব্যাংকডেট দিয়ে। জীপটি বোর্ডের সম্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও সেটা বোর্ডের গ্যারেজে না রেখে রাখা হল হেলথ অফিসারের বাগানোয়। সেখানে রাতে কোন পাহারাও থাকতো না। উপরন্তু, হেলথ অফিসারের ড্রাইভারের কোন ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও সে বহাল তব্বিতেই কাজ করেছে এবং এটাও প্রমাণ হয়েছে যে গাড়িটি সেই ড্রাইভারই চুরি করেছিল কারণ জীপ দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে ড্রাইভারও ছিল। অতএব, ২০।১২।৬৯ তারিখে গাড়ী কেনা হলো অথচ ৮।৩।৭০ পর্যন্ত সেই গাড়ীর প্রয়োজনীয় সব দলিল বিক্রতার কাছ থেকে উদ্ধার করে মোটর ভেহিকলস থেকে মালিকানা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা গেল না—এটা নিঃসন্দেহেই রহস্যজনক এবং নিন্দনীয়ও।

আর একটি দিকও বিচার্য। গাড়ী চুরি এবং দুর্ঘটনার পর হেলথ অফিসার থানায় ডায়েরী করার জন্ত যখন সেক্রেটারীর কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চান তখন সেক্রেটারী মিঃ বার্গেল জানান যে, ঐসব কাগজপত্র অফিসের ক্লার্ক দেবময় চ্যাটার্জীর কাছে আছে এবং উক্ত দেবময়বাবু দু দিনের ক্যান্ডুয়াল লীডে আছেন। দেবময় নিশ্চয়ই ফাইলটি বাজী নিয়ে যাননি। আবার বোর্ডের সদস্য ডাঃ হরিনারায়ণ মুখার্জী এবং ডাঃ লোকেশ ঘোষ যখন সেক্রেটারীর কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তলব করেন এবং গাড়ীর 'চেসিস ও ইঞ্জিনের নম্বর' জানতে চান তখন তাঁদের বলা হয় যে, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র 'ভাইস চেয়ারম্যানের কাছে আছে এবং তিনি তখন কলকাতায় ছিলেন তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্ত। সেক্রেটারীর

এই পরস্পর বিবোধী মন্তব্য খুবই সন্দেহের উদ্রেক করে। কাগজপত্র গোপন করার কোন কারণই থাকতে পারে না কিন্তু তবুও তা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে ভাইস চেয়ারম্যান তাঁর নোটে বিশ্বাস প্রকাশ করে বলেছেন, যেখানে জীপটাই পাওয়া গেছে সেখানে চেসিস এবং ইঞ্জিনের নম্বর জানার জন্ত মাননীয় সদস্যদের আগ্রহ কেন তা তিনি বুঝতে পারেননি। আসলে জীপের মালিকানা হস্তান্তরের দলিলে চেসিস এবং ইঞ্জিনের নম্বর উল্লেখ করতাই হয়। এক্ষেত্রে তা হয়নি। এমন কি সেল ইন্টিমেশন যে মোটর ভেহিকলস অ্যাক্টের ৩১ নং ধারা অনুযায়ী ১৪ দিনের মধ্যে দেওয়া হয়নি তা হরজিৎ সিং এবং ভাইস চেয়ারম্যানের পরস্পর বিবোধী বক্তব্যের মধ্যেই পাওয়া যাবে। জীপ বিক্রতা হরজিৎ সিং বলেছে যে, ২০।১২।৬৯ তারিখেই সে সেল ইন্টিমেশন দিয়েছে কিন্তু ভাইস চেয়ারম্যান বলছেন (যা নথিভুক্ত আছে) যে তার অফিসের ১৩।৩।৭০ তারিখের ১৪৮৯বি নং চিঠিতে হরজিৎ সিং সেল ইন্টিমেশন দিয়েছে। আবার ১৭।৮।৭০ তারিখে এ, ডি, এম-কে লেখা এ, আর, টি, ও'র চিঠিতে দেখা যায় যে উক্ত তারিখ পর্যন্ত মোটর ভেহিকলস অফিসে কোন সেল ইন্টিমেশন যায়নি। ফলে জীপ কেনা থেকে চুরি যাওয়া পর্যন্ত সব ঘটনাই রহস্যজনক যার দায়িত্ব ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ বিশ্বাস এড়াতে পারেন না।

দ্বিতীয় অভিযোগের সংক্ষিপ্ত কাহিনী হচ্ছে, মাইনস বোর্ড অব হেলথের যে বাড়ীতে এ, ডি, এম-এর কোয়ার্টার তার সংস্কার সাধনের অঙ্ক-হাতে ভাইস চেয়ারম্যান বোর্ডের অহুমোদন ছাড়াই ৩০ হাজার টাকা খরচ করেছেন বিনা টেঙারে তাঁর মনোনীত কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে এবং এই টাকা খরচ করার পরও যখন ডাঃ বিশ্বাস বোর্ডের মিটিংয়ে আরও টাকা খরচের অহুমোদন দাবী করেন তখন বোর্ডের একজন মাননীয় সদস্য ডাঃ হরিনারায়ণ মুখার্জী এই অর্থ বরাদ্দের দাবী বিরোধিতা করেন। ডাঃ মুখার্জী বলেন যে, এ কাজে ইতিমধ্যেই অস্বাভাবিক পরিমাণ অর্থব্যয় করা হয়েছে। উপরন্তু ৩০।৩।৭২ তারিখের এই সভায় বোর্ডের চেয়ার-

ম্যানও উপস্থিত ছিলেন না। এই বিরোধিতার ফলে ভি, সি এদিনের সভায় অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের দাবী পাশ করাতে পারেন না। মজার কথা এই যে, তার ঠিক পরদিন অর্থাৎ ১।৭।৭২ তারিখে এ, ডি এম অশোক কাপুর বেলা সাড়ে চারটায় ডাঃ মুখার্জীর বাড়ীতে ফোন করে তাঁকে গতদিনের সভায় অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের দাবীর বিরোধিতার জন্ত অশোভন ভাষায় আক্রমণ করেন এবং ডাঃ মুখার্জীকে মিসায় গ্রেপ্তারের ভয় দেখান। ডাঃ মুখার্জী আসানসোলের বিখ্যাত চিকিৎসক ও অতি বিশিষ্ট নাগরিক এবং ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সহ সভাপতি। ডাঃ মুখার্জী অশোক কাপুরের এই অশোভন আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (বোর্ডের এক্স-অফিসিও চেয়ারম্যান) বিভাগীয় কমিশনার এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া চিঠি দেন। এর ফলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং উক্ত এ, ডি, এম অশোক কাপুরকে কয়েকদিন পরেই ৩৬ ঘণ্টার নোটিশে আসানসোল ত্যাগ করতে হয় এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ, কে, চ্যাটার্জী এর পরই আকস্মিকভাবে মাইনস বোর্ড সব হেলথের অফিস পরিদর্শন করে উক্ত বাংলা সংস্কার সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র হস্তগত করে সেগুলো সীল করে দেন। ডি, এম, এর এই পরিদর্শন ঘটে ১৫।৭।৭২ তারিখে। ডাঃ স্থানীয়রঞ্জন বিশ্বাসকে ২১।৭।৭২ তারিখে পদত্যাগে বাধ্য করা হয় এবং সেদিনই বোর্ডের মিটিংয়ে সর্বসম্মতিক্রমে পদত্যাগ গ্রহণ করা হয়।

এ ডি এম-এর বাংলা সংস্কারের নামে যে টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে তা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ, কে,

চ্যাটার্জীর ভি সি কে লেখা মেমোতেই প্রমাণিত। এই মেমোতে বলা হয়েছে, "It has been ascertained by me that work order has been issued in a most irregular and objectionable manner and selection of the contractor in question has been highly arbitrary"

নিজের ইচ্ছামত অর্থখরচের এমন আরো অনেক নজির আছে। যেমন মেসার্স এ, এন, ব্যানার্জী এ্যাণ্ড কোংকে বোর্ডের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে ৫৮১৫ টাকা দেওয়া। কেন এভাবে টাকা দেওয়া হয়েছে তা ভাবতে হবে বৈকি।

তৃতীয় অভিযোগ ডাঃ বিশ্বাস নিজেই স্বীকার করেছেন। অতএব এ সম্পর্কে কিছু বলা নিম্নরোজন।

তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে ডাঃ বিশ্বাস স্বীকার করেন যে, কিছু কিছু ক্রটি ঘটেছে এবং মত্তপানের কথাও তিনি স্বীকার করেন। দুর্নীতির তদন্ত থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে তদানীন্তন হেলথ অফিসার পঞ্চানন চ্যাটার্জীর (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) ভূমিকা জীপ কলঙ্কারীর ক্ষেত্রে বেশ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ডাঃ বিশ্বাস তাঁর হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন। বোর্ডের সেক্রেটারী জীবার্গেলও স্থানীয়বাবুর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সব মিলিয়ে বলা যায়, ডাঃ স্থানীয়রঞ্জন বিশ্বাস যদি নিজে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নাও হয়ে থাকেন (তাঁর কথামত) তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে তাঁর জ্ঞাতসারেই সব ঘটেছে এবং উপযুক্ত প্রশাসনিক অক্ষমতার জন্ত তিনি তা রূপতে পারেন নি।

আসানসোলে রেলের আউট হাউসগুলো

সমাজ বিরোধীদের আড্ডাখানা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ইষ্টার্ন রেলওয়ের আসানসোল ডিভিশনে বিভিন্ন অফিসার বাংলা ও কোয়ার্টারের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকশত আউট হাউস ইদানিং সমাজ বিরোধীদের আড্ডাখালে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে এই সব আউট হাউস রেলওয়ে অফিসার-দেব সেবায় নিয়োজিত ধোপা, জমাদার মাল বাবুর্চি খানসামা প্রভৃতির বসবাসের জন্ত কোয়ার্টার রূপে নির্মিত হয়। সংবাদে জানা যায় আসানসোল ডিভিশনে এইরকম আউট হাউসের সংখ্যা কয়েকশত হবে। সমগ্র রেলের সংখ্যা কয়েক হাজার হবে বলে অনুমিত হয়। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ অবশ্য আউট হাউসের সংখ্যা কত তার কোন সঠিক হিসাব দিতে পারেন নি। বর্তমানে এই সব

আউট হাউসে কোন রেল কর্মচারী বাস করে না। রেলওয়ের সংগে সম্পর্কহীন লোকেরা এই কোয়ার্টারগুলি দখল করে বাস করছে। সংবাদ নিয়ে জানা গেছে আউট হাউসে বসবাসকারীরা প্রতিমাসে কোয়ার্টার ভাড়া দেয়। তবে এই ভাড়ার টাকা রেলওয়ের ঘরে জমা পড়ে না। একদল রেল কর্মচারী এই ভাড়ার টাকা ভোগ করে। অথচ এই সব আউট হাউসগুলি ভালোমত সংস্কার করলে রেলকর্মীদের বাদোপযোগী কবে তোলা যায় এবং এতে কয়েক-হাজার রেলকর্মী কোয়ার্টার পাবার সুযোগ পাবে। বর্তমানে রেলকর্মীদের মাত্র ৪০ ভাগ কোয়ার্টারের সুযোগ পেয়েছে। সেক্ষেত্রে আউট হাউসগুলির এই দুরবস্থা নিঃসন্দেহে লঙ্কাজনক।

দানিবেগ তব্বের আলোকে মহাভারতের সূচ্য ও দেবতা বীরেন্দ্র মিশ্র

অর্জুনের স্বর্গযাত্রা

মহাভারত বললেন, ইন্দ্রপ্রেরিত মাতলির রথে চেপে অর্জুন যাবেন স্বর্গে উন্নতমানের যুদ্ধকৌশল শিখতে ও কিছু ভিন গ্রহের অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে আনতে। বোঝা গেল সে স্বর্গ শাস্তির তপোবন, নয়, হিংসার পীঠ-স্থান।

স্বর্গে যাওয়ার জন্য কত রকমই না কুচ্ছ সাধনার ফিরিস্তি আছে। বিশেষ হিন্দু বিধবার জন্য আছে শত রকম বিধি নিষেধ, যেমন, মাথা কামাবে, মাছ মাংস উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ করবে না, জগতের অসংখ্য জীবের সম্বন্ধে প্রকৃতি তোমার মধ্যে স্তায়িত যে কাম, আকাঙ্ক্ষা ও আশা নামক প্রাকৃতিক গুণরাজি দিয়েছে, স্বর্গে যাওয়ার জন্য সে সব ত্যাগ করে ইহজীবনটাকে ব্যর্থ করে দেবে। বিলম্বে স্বধর্মমতি। তবেই তো হবে স্বর্গ লাভ। অর্জুনের জন্য কিন্তু স্বর্গে অপেক্ষা করে ছিল উর্বরী উষ্ণ আশ্রয়, মজা মাংস-নৃত্যগীত, এবং যুদ্ধ! তাহলে কোনটা সত্যি? বিধবার স্বর্গ, “অভাগীর স্বর্গ”, মুনি-ঋষির স্বর্গ, “যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ”, না “অর্জুনের স্বর্গ”? একই স্বর্গে এতো রূপ? রাজার স্বর্গ, প্রজার স্বর্গ; ভূ-স্বামীর স্বর্গ, ভূমিহীন চাষীর স্বর্গ, ইন্দ্রির স্বর্গ, ইন্দ্রির ঠাককণের স্বর্গ—এ সবই কি আলাদা আলাদা? স্বর্গের শ্রেণী বিভেদ!

মহাভারতের মহান কাণ্ডে কাণ্ডে তো সেরকমই কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। উপায় নেই, ধর্মরাজপুত্র স্বয়ং যুধিষ্ঠির বলেছেন, “ধর্মের অর্থ আছে তিমিরাক্ষর গৃহায় নিহিত। কে পারে তার পাঠোদ্ধার করতে? পারে হয়ত অহিংসেন সেবকরা। তাই গরীব জনগণের ঋষি (ঋষি মানে, স্রষ্টা ও লেখক) ধর্মের অপর নাম দিয়েছেন, ‘আফিং’। মহাভারত পাঠকের পক্ষে কথাটা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার উপায় আছে কি?

ধারা এ সব কথায় আমার ওপর রাগ করবেন ভাবছেন, সত্যি বেগে ওঠার আগে, তাঁদের বলি, আহন,

মহাভারতে বর্ণিত কয়েকটা স্বর্গে উকি মেরে আসা যাক, সেখানে বস্তুতই কীসব কাণ্ড কীরখানা ঘটে। ঐ ইন্দ্র প্রেরিত প্রকাণ্ড উড়োজাহাজটা নামছে। আহন, ওটাকেই নন্দর করি। ঐ দেখুন:

“অর্জুন দেবরাজ রথের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, ইত্যবসরে মাতলি (ইন্দ্র বিমানের চালক) রথ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।” (বনপর্ব, স্থালী, পৃ: ৪৭) মনে রাখবেন, সেকালে অশ্ব-চালিত রথও রথ, আবার বিমান ও মহাকাশযানের মতো উড্ডীন বস্তুও রথ। মাতলির রথ প্রচণ্ড বেগে গুড়ে। আর “বায়ু বেগগতি দশসহস্র তুরঙ্গম (দশ হাজার অশ্বশক্তিসম্পন্ন এগ্নিন?) সেই দৃষ্টি বিলোভন মায়াময় রথ বহন করিতেছে।” কৃতজ্ঞ এবং ভক্তিমান অর্জুনের চোখে-এ সময় সব কিছু মায়াময় বলেই তো মনে হবে। আমাদেরও হয়। কোনো ব্যাপারে কৃতকার্য হলে ভারি, সকলি ‘তাহার ইচ্ছা’। গুরু কৃপয়া কেবলম্। অর্জুনও সব কিছুকেই মায়াময় করবেন আনন্দ-প্রাবল্যে, এতে আর সন্দেহ কী। ভালোভাবে স্বার্থ সন্ধি হলে মাইয়ের অন্তর মাঝে মাঝে মহান হয়। এই মহান হওয়াটাই তো মস্ত মায়াময়।

ইতিপূর্বে বিমানে চেপে দেবতার নেমেছিলেন, কিন্তু তার গর্জন ও প্রচণ্ডতা এমন ছিল না। ইন্দ্ররথ নামছে, “বেগে জলদমালা (মেঘ) ছিন্নভিন্ন হওয়াতে নভোমণ্ডল নির্মল হইল এবং ঘনঘটাণ গভীর গর্জন সদৃশ নির্ঘোষে দিক সকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।” (ঐ, প্রায় একই রকম বেগবান ও গর্জনে আকাশ রথের কথা আছে রামায়ণেও। রথটির মালিক ছিলেন অপার্বিব-দর্শন পরশুরাম। সে রথ প্রায় ঘটিয়ে কেমনভাবে-নায়ত সে কথা এই রচনার একেবারে গোড়ার দিকে বলেছি। পরশুরামের রথ বহু গাছ-পালা নষ্ট করেছিল, তার প্রচণ্ড শব্দে যুঁহিত হয়ে পড়েছিল রাজা দশরথের সৈন্য সামন্ত। মনে রাখতে হবে, পরশুরাম মাহুয়াটাও ছিলেন অদ্ভুত-

দর্শন, অসাধারণ ক্ষমতাপালী এবং তাঁরও নিবাস ছিল মন্দার বা মহেন্দ্র পর্বতে। পুরাকালে পর্বত এক সাংঘাতিক ভায়াগা। পার্বত্য উপত্যকাতেই তথাকথিত দেবগণ তাঁদের বিশেষ বিমানে ওঠা নামা করতেন। হিন্দুদেবভূমি ছিল হিমালয়, চৈনিকদের কুঙলুং, রেড ইণ্ডিয়দের সান্তা পর্বত এবং হিব্রুদের সদাপ্রভুও থাকতেন পর্বতেই। এমন পার্বত্য উপত্যকায় যে পরশুরামের দুর্গ, নিশ্চয় তাও ছিল অসাধারণ।

মহাভারতের যুদ্ধ ১৪শ ঋ: পূর্বদিকে ঘটেছে। কিন্তু মহাভারত লিখত আকার গ্রহণ করে পাঁচশত ঋ: পূর্ব সময়ে। পাঁচশ বিরেনন্দই ঋ: পূর্বদিকে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে আর একটি মহাকাশ রথ অবতরণের কথা আছে বাইবেলে। বাইবেলীয় পয়গম্বর ইজেকিয়েল দেখেছিলেন সেই মহাকাশ যানটিকে। একবার নয়, একাধিকবার। বাইবেলে তার চমৎকার বাস্তব প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ আছে। ইজেকিয়েল দেখা সেই মহাপ্রভুর মহাকাশযানটির সঙ্গে এবার মাতলির রথটিকে একটু মিলিয়ে নেওয়া যাক। ইজেকিয়েল দৃষ্ট মহাকাশযানটি বস্তুতই একটি প্রয়োগ সম্ভব মহাকাশযান ছিল অনেক বিচার বিবেচনা করে প্রখ্যাত রকেট বিজ্ঞানী ডা. আমাদের জানিয়েছেন। তাঁর পরীক্ষার ফলক্রটি হিসেবে রুমরিশ সাহেব বলেছেন, “পৃথিবী প্রদক্ষিণরত একটি যুল যানের সঙ্গে (ইজেকিয়েল দৃষ্ট মহাকাশযানটি) একযোগে ক্রিয়ামূল ছিল।” [‘তখন স্বর্গ খুলিয়া গেল’—রুমরিশ। অল্প: অজিত দত্ত।] অর্থাৎ মহাপ্রভুর মহাকাশযানটি যুল রকেট নয়। চাঁদে যেমন আজকের বিজ্ঞানীরা চন্দ্রভেলা নামিয়েছেন, সে যানটিও ছিল তেমনি এক পৃথি-ভেলা। তা নিশ্চয় তাহলে যুল যানে প্রত্যাবর্তন করতে পারত। ইন্দ্ররথও কি এ জাতীয় কোনো ভেলা? তা কি অর্জুনকে যুলযানে নিয়ে গেছিল। অথবা কোনো ভাসমান উপগ্রহে? এ প্রশ্নের মীমাংসা কোনো রকেট

বিজ্ঞানীই করতে পারেন, তবে তারও সম্ভাবনা কম। কারণ বাইবেল যে ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনার প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, মহাভারতে তেমনটি নেই। মহাভারতের বর্ণনা কবর কাব্য এবং সে কাব্যেও খোঁসার ওপর খোঁসকারী আছে। আসল জিনিসের চেহারা তাই আর স্বাধাধ নেই। কিন্তু সেকথার আগে ছুটি রথকে মিলিয়ে পড়া দরকার। আগে দুই রথের সাদৃশ্যটুকু বাছাই করে দেখা যাক।

মাতলির রথ নামে সগর্জনে মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্ন করে। কোবর নদী-তটে ইজেকিয়েল সদাপ্রভুর ‘প্রপাত’ (মহাকাশযান) অবতরণ করতে দেখেন এইভাবে: “উত্তর দিক (আকাশ) হইতে ঘূর্ণবায়ু, বৃহৎ মেঘ (রকেট নিঃসৃত ধোঁওয়ার কুণ্ডলী?) ও জ্বালান্যমান অগ্নি আসিল...” অগ্নি কেমন অগ্নি? যিহিঙ্কেল পুঁথির বর্ণনা: “সেই অগ্নি তেজোময় এবং সেই অগ্নি হইতে বিদ্যুৎ নির্গত হইত।” মাতলিও ইন্দ্ররথকে ‘ওড়াবার সময়’ “রশ্মিধারা অশ্বসকল সংযত” (বিদ্যুৎ সহযোগে?) করে ছিলেন। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যুতের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। বিদ্যুৎ গ্রহাণে অশ্ব নয়, ইঞ্জিনই চালু করা হয়। অগ্নি এবং ধোঁয়া অশ্ব-বাহিত রথে ‘নর্গত হয় না। মাতলি রথের অভ্যন্তরে বর্ণনায়ও বিদ্যুৎ এবং বৈদ্যুতিক কয়েল লক্ষ্য করেছেন অর্জুন। উভয় ক্ষেত্রেই মেঘমালা ছিন্ন করে রথের সগর্জন অবতরণের কথা উল্লেখিত আছে। যিহিঙ্কেল পুঁথি আরও বেশি বাস্তব বর্ণনায় সমৃদ্ধ। সেখানে মহাকাশযানের গর্জনে সর্বিশেষ বর্ণনার চেষ্টা আছে। যেমন সে গর্জনধ্বনি ছিল, “মহাশলরাশির কল্লোলের তায়, সর্বশক্তিমানের রবের তায়, সৈন্য সামন্তের ধ্বনির তায় তুমুল ধ্বনি।” যানটির উড্ডয়ন কালে

ইজেকিয়েল শুনেছিলেন ভূমিকম্পের আওয়াজ (যিহিঙ্কেল, ভাববাদীর পুস্তক; ধর্মপুস্তক, বাইবেল োসাইটি অব ইণ্ডিয়া)। সেই প্রচণ্ড ধ্বনি ও অদ্ভুত ধান এবং তাতে আকৃষ্ট অপরিস্রুত নভোচরেরা ইজেকিয়েলের মনে জ্বাল সঞ্চার করে ছিল। অর্জুনের কিন্তু তেমন কোনো জুড়াবনা হয় নি। তিনি বিমান দেখেছেন জন্মাবধি এবং ইন্দ্ররথের আগমন প্রতীক্ষা করছেন। তাঁর একটা মানসিক প্রস্তুতি ছিল যার অভাব ছিল ইজেকিয়েলের মধ্যে। ইজেকিয়েল ভাবাপ্রসূত হওয়ার সুযোগ পান নি। তিনি ছিলেন খুবই অল্প-সঙ্কীর্ণ এবং উত্তম রিপোর্টার। তাই তাঁর বর্ণনা পরীক্ষা করে প্রখ্যাত রকেট যন্ত্রবিদ রুমরিশের পক্ষে একটা সিদ্ধান্তে আশা সম্ভব হয়েছে। অর্জুন, যোদ্ধা, ভাবানু, প্রেমিক এবং ভক্তি-মান। তিনি শুধু মুগ্ধ হয়েছিলেন মাতলির রথের ঐশ্বর্য, বিশালতা ও অনন্তসাধারণ আকৃতি দর্শনে। তাঁর দেখা এই রথ অন্তান্ত সাধারণ বিমান থেকে যে অনেক উচ্চমানের ছিল, মহাভারত পাঠে শুধুমাত্র সেকথাই জানা যায়। ইজেকিয়েল সদাপ্রভুর প্রতাপের কিছু যান্ত্রিক বর্ণনা দিয়েছেন, যেমন ভেলাটির সঙ্গে সংযুক্ত চাকা, হেলিকপ্টারের পাখা, একটি যান্ত্রিক লৌহ হস্ত এবং বিভিন্ন অবস্থায় যন্ত্র ভেলাটির চেহারা কেমন হয়েছে যথাসাধ্য তার প্রতিবেদন উপহার দিয়েছেন আমাদের। (এই রথের ক্ষেচসহ প্রায়ুক্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার জন্য পাঠক রুমরিশের গ্রন্থটি দেখতে পারেন।)

অর্জুন লক্ষ্য করেছেন ইন্দ্ররথের অভ্যন্তরস্থ কলকজা ও জলন্ত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলি, ইচ্ছা আদি পিতা এনকের দেয়া মহাকাশযানের সঙ্গে যার সাদৃশ্য সমধিক।

[চলবে]

মুর্শিদাবাদ জেলায় পুলিশী অত্যাচার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিশী অত্যাচারের খবর পাওয়া যাচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জ ফাঁড়ির কনেষ্টবল ভবেশ পোদ্দারের বিরুদ্ধে কুর্কীতির অভিযোগ আনা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। ২৯শে জুলাই রাত্রে তিনজন পুলিশ কনেষ্টবল মিকাপুরে পুরনো চামড়া গুদামের কাছ থেকে তিনজন উদ্ভাস্ত মেয়েকে রিকসায় করে নিয়ে এসে গোপালন গরের কাছে জোড়াসাঁকোয় উল্লঙ্ঘন করে। পরে ওই রিকসাতে করেই তাদেরকে জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতালের কাছে দিয়ে আসে এবং তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা

বা ছিল কেড়ে নেয় ও তাদের তাড়িয়ে দেয়। মেয়েরা ওই রাত্রেই কয়েকজন লোককে সঙ্গে করে রঘুনাথগঞ্জ থানায় আসে অভিযোগ জানাতে। তারা কনেষ্টবল ভবেশ পোদ্দারকে সনাক্ত করে। কিন্তু থানার তাদের এজাহার নেওয়া হয় না, ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

অপর এক সংবাদে প্রকাশ, গ্রেপ্তারের পর চর জোত বিশ্বনাথপুর গ্রামের মেশের সেখের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। রঘুনাথগঞ্জ পুলিশের জনৈক দারোগা সহ কয়েকজন (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

পশ্চিমবঙ্গে গণ মুক্তিফৌজ গড়া হক

রমা প্রসাদ মল্লিক

জুনের দ্বিতীয়-তৃতীয় সপ্তাহ থেকে সারা ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকবর্গ এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের তল্লাহাঙ্ক স্বদেশী ধনকুবের-গোষ্ঠীদের শ্রোণদৃষ্টি পশ্চিমবঙ্গের ওপর নিবদ্ধ রয়েছে। এর কারণ, এই রাজ্য-বাসীদের “ধুঁটতা”; তারা পুনর্বীর বামপন্থী ফ্রন্টকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছে। কেবল তাই নয়। এখানকার নাগরিকরা অতীতপূর্ব বিপ্লবী পরিপক্বতার পরিচয় দিয়েছে ভারতের শাসক-তথা-শোষক শ্রেণীর দ্বিতীয় হাতিয়ার জনতা পার্টিকে প্রথম হাতিয়ার কংগ্রেস পার্টির মত পরিপূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে। সারা দেশে এই ঘটনার সমতুল্য নজীর কেবল কাশ্মীরেই দেখা গেল। যেখানকার জনতা তাদের জন্মার্জিত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে ভারতীয় সংবিধানের সীমার মধ্যে নিবদ্ধ অবস্থাতেও সফলভাবে প্রয়োগ করার জন্য তাশনল কনফারেন্স দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে। সেখানকার জনগণ যেমন জানে, পশ্চিমবঙ্গেরও তেমনি পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে যে, রাজনৈতিক “সভ্যতা সৌজন্য”মূলক বাণী বিনিময় সত্ত্বেও নতুন দিল্লী কলকাতাকে চ্যালেঞ্জ, অর্থাৎ প্রগতিশীল রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীত্বপূর্ণ দেখছে। অবশ্য সবকথা বলা সমীচিন নয়, কিন্তু এও ঠিক যে, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারের এখন প্রয়োজন, এ প্রদেশে তাদের সমর্থকদের পক্ষে শুধু নয়, সমগ্র নিপীড়িত-দুঃস্থ-গরীব শ্রেণীদের সঙ্গে সংযোগ ও সহকর্মিতার ধারা বজায় রাখা, এবং নিবিড় থেকে নিবিড়তর করা।

কতগুলি ইসারা ইতিমধ্যেই মিলেছে। কেন্দ্র-প্রান্তের সম্পর্ক এবং সম্বন্ধ মূলতঃ রাষ্ট্রতন্ত্রের ক্ষমতা প্রয়োগ এবং রাজস্ববান্ধ অর্জিত বিস্তারিত বটনের ওপর নির্ভর করে। ১৯৬২-৭০ সালের সেই অবিদ্বারীয় সঙ্কটময় দিনগুলিতে দিল্লী বনাম পশ্চিমবঙ্গের ঘর্ষণ (Major contradiction) তুঙ্গে উঠেছিল। তৎকালীন কেন্দ্রীয় বুরোক্রসী বা বৃহৎ আমলাতুল প্রত্যক্ষ এবং অ-প্রত্যক্ষভাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনিক কাঠামোর ধারক ও সেবকদের ওপর প্রচণ্ড চাপ দেয়, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ সংস্থার ওপর। উদ্বেগ ছিল, এ রাজ্যের প্রশাসনিক এবং পুলিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে দিল্লীর বশব্দ বানিয়ে তোলা, যাতে এখান-

কার নাগরিকদের সকল প্রকার গণ-দাবীভিত্তিক আন্দোলন, এমন কি সামান্য জন-অসন্তোষের আলোড়ন-কেও স্তব্ধ করে দেওয়া যায়। সেটা নকশালী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের তীব্র অধ্যায়। দিল্লীর প্রশাসনিক “মাথা” যারা সে যুগে ছিলেন (সর্বশ্রী গোবিন্দ সহায়, এল, পি, সিং এবং গভর্নর ধর্ম-বীরার নাম আরো অনেকের মধ্যে সহজেই মনে আসে) পশ্চিমবঙ্গকে “বাণী-প্রান্ত” অর্থাৎ বিদ্রোহী প্রদেশ রূপে গণ্য করতেন; স্বতরাং নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে সমস্ত রকম রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক রাডাবাড়ি সূক্ষ্ম বাকচাতুরিতে ঢেকে শুক করেছিলেন। সে “মহৎ” কাজ যে কি নির্মম কঠোরতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়েছিল, তা এ রাজ্যের হাজার হাজার নিহত, তরুণ শহীদদের আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিত ও প্রতিবেশীরা আজও মনে রেখেছে।

পশ্চিমবঙ্গের পুলিশবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে সি, আর, পি, দিয়ে হাটিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। সে কারণে দিল্লীর পক্ষে করণীয় হয়ে পড়েছিল, সি, আর, পির আধিপত্যকে পশ্চিমবঙ্গে অপ্রতিহত করে তোলা। ১৯৭২ সালে দিল্লীর বশব্দ সিদ্ধার্থ রায় মল্লিকগুণী ক্ষমতায় আসার পরও কংগ্রেসের তথাকথিত “সম্মুখ শিবির”-সংগঠনের এক তরুণ সদস্য কোনো সি, আর, পি, জওয়ানের গুলিতে কাটোয়ায় খুন হয়। অথচ, সে সময় গোড়াতে সিদ্ধার্থবাবু ঐ সি, আর, পি, খুন্সী জওয়ানের বিচার হবে। এমনি লক্ষ্যক্ষমূলক উক্তি করলেও শেষ পর্যন্ত ভিজে বেড়াল বনে গিচ্ছলেন। উক্ত জওয়ানের নাম, ধাম, ঘুনিটের বৃত্তান্ত তৎকালীন রাজ্য সরকার এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃস্ব জনতেন না। এমন নয়, তবু খুনের বিচার মেলেনি।

খুব সম্ভ্রতি নতুন দিল্লীতে সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের তলব করা হয়েছিল। সম্মেলনে অনেক আপাতঃ মধুর কথা শোনা গেল। প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ের বাণী সুললিত সন্দেহ নেই, “শক্ত রাজ্য সরকার দেখা দিলেই কেন্দ্র শক্তিশালী হতে পারে”, “কেন্দ্রের শক্তিতেই রাজ্যের সামর্থ্য বাড়ে” ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বেই-কর-অর্জিত টাকার রাজ্য অহুযায়ী বিলি ব্যবস্থার কথা উঠলো, অমনি “কেন্দ্রীয় অর্থ-ক্ষমতা তথা রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও অবনমনের” গালভরা আদর্শের নীতি বিলকুল গায়েব। এদিকে নতুন বিভ্রান্তি

নাকি রাজ্য কেন্দ্র সম-সংগ্রহণের ভিত্তিতে, অর্থাৎ Federal principle-এর ওপর Financial policy রচিত হতে যাচ্ছে। অর্থাৎ, অপর দিকে, জুট এবং আয়কর অর্জিত সম্পদের ভায়সম্বত ভাগ পাওয়া তো দূরের কথা, উপরন্তু সেলস ট্যাক্স (বিক্রয় কর) লক্ষ অর্থগম থেকেও বৃদ্ধি রাজ্য সরকার বঞ্চিত হতে চললো। বহুমুখী বিক্রয় কর বা পণ্য ভিত্তিক কর (Excise tax) ধার্য করা কেন্দ্রের দ্বারা একবার চালু হলে রাজ্যের পক্ষে হাহাশাশ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বিবৃদ্ধি ও বিকাশের দরুণ টাকা দরকার। টাকা দরকার ভূমি সংস্কার আইন কঠিন ভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রেও। কেন্দ্র জানে, যা রাজ্য সরকার বহুবার বলেছে, যে ভূমি-আইনগুলিকে এক মানের করে তুলতে হলে প্রয়োজন সকল রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কেন্দ্রের আইনমন্ত্রীর এক সঙ্গে

সলাপরামর্শ করে এক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো—যার ফলে সারা দেশে এককপী ভূমি-আইন প্রবর্তিত হয়। কিন্তু তা তো হল না, উনৈ কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক নীতির পক্ষে ওকালতী করনেওয়াল। মুখপত্র টাইমস অফ ইন্ডিয়া তো পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা জনগণের উদ্দেশ্যে অবাচিত উপদেশামৃত বর্ষাতে লেগে গিয়েছে। উদাহরণতঃ নেওয়া যাক এই কাগজের এই আগষ্ট তারিখের সম্পাদকীয় “পশ্চিমবঙ্গ সরকার নীতিগত ব্যাপারে উদাসীন তো নয়, জমিদারী স্বার্থ এদের কাছে ঠাই পাবে না; কি করে প্রকৃত বাধাবিপত্তি জয় করা যায় এবং আমলাতন্ত্রের ঢিলেমীর যেখানে প্রস্র সেখানে সম্প্রদায় কর্মচারীরূপকে কি করে হ্যাঁকা দিয়ে কাজে প্রবৃত্ত করতে হয়, তা এরা জানে, তার ওপর রয়েছে সি, পি, আই (এম) দলের কাডার-বন্দ, যারা সজাগ তৎপরতার সঙ্গে ঢিলেমী কোথায় ফের শুরু হয়েছে তা দেখিয়ে দিতে পারে। (অবশ্য অতি সজাগ সন্ধানীবৃত্তিতে তা যদি নেমে না যায়!)...সুসম বিকাশ-

বিবৃদ্ধি তখনই সম্ভব, যখন রাজ্যে রাজ্যে দাবীমূলক সংস্কার পরি-প্রেক্ষিতে কঠিনতম সম্পদের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। আর, এই কাজে সর্বাধিক যোগ্য হল কেন্দ্র। চূড়ান্ত homily দেওয়া হ’ল, তবে সহযোগিতার ক্ষেত্রে চুঁচু। এখনটা কেন?

শাসকবর্গের এমন দুমুখো নীতি এবং চাল পশ্চিমবঙ্গের অভিমুখেই বা কেন, সে কথা তলিয়ে ভাববার সময় এসেছে। চারিদিক দেখে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ নিবাসীদের পক্ষে এগিয়ে চলা ক্ষুদ্র ধারের ওপর ইটটার মতই কঠিন কাজ সন্দেহ নেই। তবু সর্বস্বার্থবর্গের পক্ষে এ ছাড়া অন্য কোন রাস্তাই বা আছে? পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ সংস্থার মধ্যে বহু বছর ধরে জন-বিরোধী উপরকণ চোকানো হয়েছে। রাত-রাতি এই সংস্থা তার চরিত্র বদলাবে না। পশ্চিমবঙ্গের গণমুক্তি ফৌজ গড়া হক, প্রতিরোধশক্তি সৃষ্টি-ভাবে ট্রেনিং দিয়ে তৈরী করা হক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে, চুরি-ডাকাতির বিরুদ্ধে, শোষণ ও ঘড়য়ন্ত্রের বিরুদ্ধে।

ইউকোব্যাক্সে টাকা জমানো মানে চড়া হারে সুদের সুযোগ আর সেই সঙ্গে অপরকে দাবলদ্বী হতে সাহায্য করা

সুবীর মুখার্জীর জমা টাকা আটজন অসহায় নারীর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল।

যদিও তিনি তাঁদের চোখেই দেখেন নি।

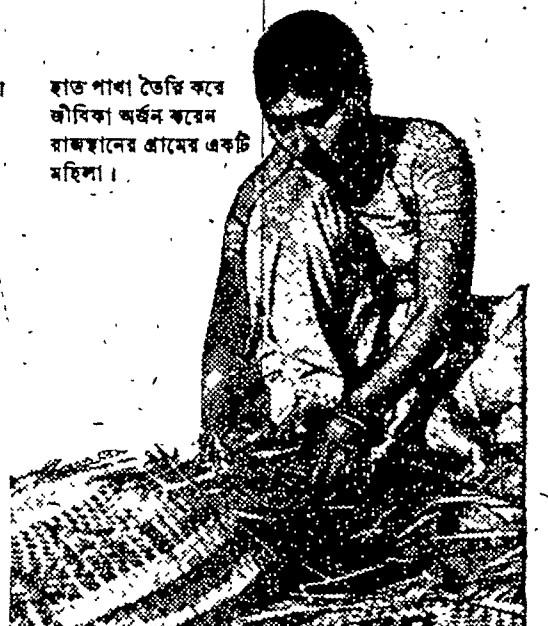
সুবীর মুখার্জী শুধু চেয়েছিলেন পৈতৃক সূত্রে তিনি সামান্য যা পেয়েছিলেন তাই দিয়ে নিজের অবস্থা কিছু ফিরিয়ে নিতে। তাই সম্পত্তি বিক্রির ৬০০০ টাকা তিনি আমাদের দ্বিকারি ডিপজিটের সঙ্গে মুক্ত ফিস্কাড ডিপজিট পরিকল্পনায় জমা রাখেন। তিনি মোটেই জানতেন না তাঁর জমা টাকায় আটজন নিঃসম্মল মহিলার জীবিকারও সংস্থান হবে।

ইউকোব্যাক্সের অন্যান্য আমানতকারীদের টাকার মত সুবীর মুখার্জীরও জমা টাকা আমাদের নানা প্রকার সামাজিক প্রয়াসে বাবদ্যার করা হয়।

এই যেমন অসহায় নারীদের সেলাইকর কিনে দিয়ে আবজদী হতে সাহায্য করা, পল্ল ও অপারগদের জীবিকার সংস্থান করা, যাদের স্বপ্ন দরকার সময়মত তাঁদের স্বপ্ন দেওয়া, বা নিঃস্ব চামড়াদের দরকারমত রাসদ জোপানো। এক কথায় আপনার স্বপ্ন সঞ্চয়ই সমাজে হারা অসহায় ও নিঃসম্মল তাঁদের বড় রকমের সহায়সম্মল হয়ে দাঁড়ায়।

তাই যখনই আপনি ইউকোব্যাক্সের যে কোনো সঞ্চয় পরিকল্পনায় টাকা জমা রাখছেন, আপনি অপরকে দাবলদ্বী হতে সাহায্য করছেন। এবং সেই সঙ্গে নিঃস্ব ও লাভজনক উপায়ে নিজেরও সংস্থান করছেন, কারণ আপনার জমা টাকায় আপনার আয় নিয়মিত বেড়েই চলেবে।

হাত পাখা তৈরি করে জীবিকা অর্জন করেন রাজস্থানের গ্রামের একটি মহিলা।



ইউকোব্যাক্সের লাভজনক পরিকল্পনা কী কী?

সেভিংস বঁাধ আকাউন্ট ফিস্কাড ও টাইম ডিপজিট রিকারিং ডিপজিট রিকারিং ডিপজিটের সঙ্গে মুক্ত ফিস্কাড ডিপজিট	ডিপজিট সার্ভিসেসেট পরিকল্পনা সুদের বৈজ্ঞানিক ফিস্কাড ডিপজিটের সঙ্গে মুক্ত জনতা পার্সোনাল অ্যাকসিডেন্ট ইন্সিওরেন্স পরিসর
---	---



ইউনাইটেড কমানিয়ার্স ব্যাংক

জনগণকে দাবলদ্বী করে তুলতে সাহায্য করছে



দানিকেন তত্ত্ব প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকার ১৯শে জুলাই সংখ্যায় বীরেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের লেখা “দানিকেন তত্ত্বের আলোকে মহাভারতের স্বর্গ ও দেবতা প্রসঙ্গে তুচার কথা” পড়লুম। মূল প্রবন্ধটি প্রতি সপ্তাহেই পড়ছি, আগ্রহ সহকারেই পড়ছি।

প্রথমেই বলি, শ্রীমিত্রের এ সব প্রবেশ সমালোচনায় কান না দেওয়াই ভালো। ভারতের পুঁথিপত্র থেকে মণিরত্ন খুঁজে বের করছেন, সেই কাজই করুন। দানিকেন আজ এমনই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন যে তাঁকে নশ্তাং করতে গেলেও অমূল্য রত্ন বেরিয়ে পড়ে। আমি বোসের রুমরিশের “তখন স্বর্গ খুলিয়া গেল” গ্রন্থটির কথা বলছি।

দানিকেনের সপক্ষে এবং বিপক্ষে অনেকদিন থেকেই কিছু কিছু লেখা বেরুচ্ছে। সমালোচনা খুব ভালো জিনিস। কিন্তু না পড়ে বা না বুঝে সমালোচনা বোধহয় না করা হই ভালো। কাউকে ভালো বলতে গেলে ভালো করে জেনে বলতে হয়, কিন্তু মন্দ বলতে গেলে বলতে হয় আরো ভালো করে জেনে।

শ্রীমিত্র লিখেছেন “কে তাঁকে (দানিকেনকে) পথের সন্ধান দিল, সে কথা জানাবার দায়িত্ব তাঁর। সত্যতা তাঁর। ঐ ঠিক কথা। কথাটা উঠেছে রুশী অধ্যাপক, পদার্থবিদ মাতেভ আগ্রেস্তক নিয়ে। কিছু ‘অপার্টক সমালোচক’ (শ্রীমিত্রের কথা, —কথাটা আশ্মো বলি) বলেন, দানিকেন চোর! আগ্রেস্তের তত্ত্ব তিনি চুরি করে নিজের বলে চালাচ্ছেন! বলেন পারেন, বেথয়ালেই কথাটাকে যাচাই করা হয়ে ওঠেনি।

যাচাই না করার প্রথম কারণ, দেখতে পাচ্ছি, দানিকেনতত্ত্ব আজ সাবা পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। কেউ সমর্থন করছেন, কেউ করছেন না, কিন্তু ‘চোর’ অ্যাখ্যা তাঁকে কেউ দিয়েছেন বলে আজ পর্যন্ত কানে আসেনি। খোদ রাশিয়ার লোকও বলেনি। দানিকেনতত্ত্বের ওপর তোলা ফিল্মের কপিও রুশ সরকার কিনেছিলেন এবং তাঁর প্রদর্শনী সেখানে বেশ হৈচৈও তুলেছিল। তাঁদের ধরে যে সিঁদ কেটেছে, সেই সিঁদেলকে নিয়েই তাঁদের অমন মাতামাতি নিশ্চয় শোভা পায় না। আগ্রেস্ত অথবা তাঁর হয়ে কাউকেও তো

কিছু বলতে শুনি।

দ্বিতীয় কারণ, এই ধরনের সমালোচকরা দানিকেনের বই না পড়ে শুধু পাতা উন্টে, অথবা পুরের মুখে কাল খেয়ে, অথবা পড়লেও না বুঝেই সমালোচনা করেন। স্বভাবতই তাই মাথা ঘামাতে ইচ্ছে হয়নি।

কিন্তু দানিকেন তো আগ্রেস্তের নাম তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন। প্রথমেই করেছেন। আমি ‘অপার্টক সমালোচকের’ তো বটেই, শ্রীমিত্রকেও অত্যাচার করছি, “দেবতা কি গ্রহাস্তরের মানুষ?” গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদের প্রথম অঙ্কেই দিয়া করে একটু স্বল্প সহকারে পড়ুন, তাহলেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাবে। যদি বলেন তো মূল জার্মান গ্রন্থ থেকেও উদ্ধৃতি দেবো।

আগ্রেস্তের তত্ত্ব দানিকেন চুরি করেছেন কি না, সে সম্পর্কে ইউরোপ আমেরিকার গ্যাকিবহাল মহলের কাছে খোজ-খবর করছি। খোজ পেলে আপনারই পত্রিকা মারফত জানাবার ইচ্ছে রইলো।

সব শেষে বলি, শ্রীমিত্রের প্রবন্ধের শিরোনামে যার যত আপত্তিই থাক, একথা আজ সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষকে নির্দিষ্টায় স্বীকার মানতেই হবে যে দানিকেনই শিখিয়েছেন, প্রাচীন পুঁথিপত্রের ব্যাখ্যা কী ভাবে করতে হবে, কী ভাবে প্রত্নবস্তুকে দেখতে হবে, কী ভাবে হাঁটতে হবে ঐগৈতিহাসের দুর্গম পথে।

অজিত দত্ত

বজর উচ্ছেদ

স্থানীয় একটি বৈকালিক বাজার উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে শহরে চরম বিক্ষোভ এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশের এই জোর জরদস্তির প্রতিবাদে আলিপুর-ছয়ারবানী সোচ্চার।

বিগত তিন বছর ধরে আলিপুর-ছয়ার সাব-জেলের পার্শ্ববর্তী পি, ডব্লিউ, ডি-র পরিত্যক্ত জায়গায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই ছোট্ট একটি বাজার গড়ে ওঠে। ব্যবসায়ীদের পুঁজি পাঁচ থেকে পঞ্চাশের বেশী নয়। পাঁচটি মিউনিসিপাল ওয়ার্ড এবং পার্শ্ববর্তী তিন চারটি গ্রামের অধিবাসীরা এই বাজারের ক্রেতা। দিনান্তে পসরা-সেরে লভ্যাংশ থেকে

ব্যবসায়ীরা পোস্তদের মুখে তুলে দেয় সামান্য শুধুধার অন্ন। কিন্তু গত ১লা আগষ্ট পুলিশ তথা পুলিশের মহকুমা পাণ্ডা এস, ডি, পি, ও হাট ওভারসিয়ারের প্ররোচনায় সাধ-পাঙ্গদের দাঁড় করিয়ে নিজে বাজার তছনছ করে দেন। পসারীর পসরা ধুলিসাং হয় তার বুটের লাধিতে। প্রতিবাদের উত্তর মেলে হাতের ব্যাটনের ঘায়ে। সাত থেকে সত্তর বছরের নারী পুরুষ ক্রেতা বিক্রেতা কেউই রেহাই পাননি।

ক্রেতাদেরই একজন মাকবয়সী মহিলা অস্থূল শরীরে বাজার কর-ছিলেন। পুলিশের পাণ্ডার উদ্ধত লাঠি এসে পড়লো তাঁর মুখে। পুলিশ ভ্যানে তোলা হল নয়-জনকে। বাকীদের পসরা এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ ফেলে দেওয়া হল নর্দমায়। সাধারণ কনস্টেবলরা কিন্তু বডকর্তার মস্ততায় লজ্জিত অশোবদন। দর্শক সহস্রাধিক পথিক ক্রেতা। ১৪৪ ধারা জারী করা হল। প্রতিবাদে থিকার মিছিল বের হল। ডায়েরী করা হল এস, ডি, পি, ও-র বিরুদ্ধে কিন্তু পুলিশ সে ডায়েরী গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বের হল যারা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে।

বাজার উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি পরে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন। নেতৃবর্গ বিষয় প্রকাশ করে বলেন স্বকীয় অবস্থায় যে বাজার নির্বিঘ্নে চলেছে, আজ মেহনতী মানুষের দরদী সরকারের আমলে মেহনতী মানুষের রুটি রোজগারে বাধা সৃষ্টি হয় কি ভাবে? সামান্য জমিতে ছোট-বাজার উচ্ছেদের জন্য প্রশাসন এত উৎসাহী কেন?

প্রদীপকুমার নিয়োম্বী

ঋণ দেওয়া হয়নি

আপনাদের পত্রিকার গত ১২ আগষ্ট তারিখে ‘কংগ্রেস সি, পি, আই অর্বেদ’ জাতাতের এক কুংসিত কাহিনী’ শীর্ষক সংবাদের একাংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে কলিকাতা পৌরসভার করণিকদের একাংশের উত্তোকে একটি হাউসিং কো-অপারেটিভ সংগঠিত হয়েছে এবং সেই সমিতি শ্রীমণি সান্তালার ষোগসাজসে ২৫ লাখ টাকার সরকারী ঋণ মঞ্জুরীলাভে সমর্থ হয়েছে।

এই রাজ্য সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি মূলতঃ রাজ্য সরকারের অংশীদারিত্বে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গৃহনির্মাণ অর্থসংস্থান সমিতি লিঃ এর থেকেই দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সংগ্রহ

করে থাকে। আপনাদের পত্রিকায় যে গৃহনির্মাণ সমিতি ও তার জমি প্রাপ্ত বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা কোন প্রশ্ন তুলছি না কারণ তার সত্যতা বিষয়ে আমরা কিছুই অবগত নই। কিন্তু ২৫ লাখ টাকার সরকারী ঋণ মঞ্জুরীর বিষয়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে চাই এজন্য যে, যেহেতু এই শীর্ষ আবাসন সমবায় সমিতির বর্তমান সভাপতি শ্রীমণি সান্তাল, যেকোন সাধারণের এবং আমাদের স্বভাবতই ধারণা হয় যে এই শীর্ষ আবাসন সমবায় সমিতি থেকেই সংবাদে আলোচিত সমিতিকে ২৫ লাখ টাকার ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

সর্বসাধারণের অবগতির জন্তে জানাই যে, পৌরসভার কর্মীদের দ্বারা সংগঠিত কোন গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতির কাছ থেকে এ পর্যন্ত ঋণের কোন আবেদন পড়ই এই শীর্ষ সমিতির নিকট পেশ করা হয়নি। ২৫ লাখ টাকার ঋণ মঞ্জুরীর সম্বন্ধে যদি এই সংস্থার কোন ভূমিকা আলোচিত হয়ে থাকে তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই শীর্ষ সমবায় সমিতি উক্ত প্রাথমিক গৃহনির্মাণ সমিতিকে কোন ঋণ মঞ্জুর করেনি।

অমিয় মজুমদার
এক্সিকিউটিভ অফিসার

অপসংস্কৃতির সম্বন্ধ না

আজকাল প্রগতিবাদী সংস্কৃতি-কর্মীদের অনেকেই মাঝে মাঝে এমন এক একটা কাণ্ড করে বসছেন যার মধ্যে প্রগতির লেপমাত্র চিহ্ন থাকছে না। কিছু সংস্কৃতি-কর্মী বর্তমানে কলকাতায় সলিল চৌধুরীর সর্ধনার আয়োজন করেছেন। যে সলিল চৌধুরী ১৯৫২ সাল থেকে জনগণের শিবির পরিত্যাগ করে আজ ২৫ বছর ধরে একাগ্র চিন্তে অপসংস্কৃতির গোলামী করে আসছেন, সেই সলিল চৌধুরীকে সম্বন্ধনা দেবার কি হল? এটা কি অপসংস্কৃতির সম্বন্ধনা নয়?

এই ব্যাপারে একজন প্রধান উত্তোক্তা হলেন তথাকথিত প্রগতি-শীল ও জনপ্রিয় একধানি নাট্য পত্রিকার সম্পাদক। ইনি কিছুদিন আগে শহীদ প্রবীর দত্তর স্মৃতিসভা করেছিলেন। আজ আবার সলিল চৌধুরীর সম্বন্ধনা ব্যাপারে মদত দিচ্ছেন। প্রবীর দত্ত থেকে সলিল চৌধুরীর সেতুবন্ধনটা ভালই।

“হেই সামালো ধান হো / কাস্তেটা দাও শান হো”-র সলিল চৌধুরীকে আমরা প্রজ্ঞা করি। তখন তার বিপ্লবী চরিত্র ছিল। কিন্তু

১৯৫২ সালে তার অবাস্তব “গায়ের বধু” গানের অসামান্য সাফল্যের পর তিনি বুজোয়া সংস্কৃতির পুতিগন্ধময় খোয়াড়ে ঢুকে গেছেন। তার মৃত্যু হয়েছে। তাই সলিল চৌধুরীর সর্ধনার বিরুদ্ধে আজ দিকে দিকে প্রতিবাদ তুলে প্রকৃত প্রগতিপন্থী সংস্কৃতি কর্মীরা নিজেদের স্বস্থ চেতনার স্বাক্ষর রাখবেন—এই আশা করি।

কল্যাণী সাহা

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

৮পণের ২৭শ ও ২৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত সাধন গুপ্তের লেখা “গণনাট্য ও একটি প্রাসঙ্গিক বিতর্ক” শীর্ষক লেখার অসম্মান না করেও কয়েকটি কথা নিবেদন করছি। হেমাঙ্গবাবু দীর্ঘকাল বিরাট মাসিক আয়ের কোলীয়ে নিজেই গণ-সংস্কৃতির আন্দোলনের ময়দান থেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন এ তথ্য সাধন-বাবু কি করে পেলেন? গণনাট্য সংঘ তার কাজের জন্য দারী জনগণের কাছে। যদি হেমাঙ্গবাবু অহেতুক সংঘকে আক্রমণ করে থাকেন, তবে জনগণই তার জবাব দেবে তাকে গণ-সংস্কৃতির আঙিনা থেকে বিদায় করে। সাধনবাবু ভাবাবেগে অনেক কথাই বলেছেন। যেমন, হেমাঙ্গবাবুকে “শত্রুপক্ষের হুচতুর দালাল” বলে পরক্ষণেই বলেছেন উনি নকশাল-পন্থী। আরো লিখেছেন, “সি, পি, আই দল সি, পি, আই (এম)-কে প্রতিরোধের মানসেই নকশাল-পন্থীদের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের একাংশ বলে ঘোষণা করেছিল” অর্থাৎ নকশালপন্থীরা কমিউনিষ্ট নয়। কিন্তু তাহলে নকশাল বন্দীরা জেলে অনশন করাকালীন বন্দীদের আত্মীয়-বর্গের সঙ্গে সাধনবাবুও কেন এস-প্লানেড ইস্টে বিক্ষোভ দেখিয়ে-ছিলেন? উনিও কি নকশাল-পন্থী?

৬৭ থেকে ৭১ পর্যন্ত অনেক ঘটনা সম্পর্কেই আমরা অজ্ঞ। স্বতরাং সম্পূর্ণ ঘটনার বিশ্লেষণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়। পরিশেষে একটা কথা সাধনবাবুর জাতার্থে জানিয়ে রাখি। হেমাঙ্গ বিশ্বাস যখন মাসিক মোটা আয়ের অঙ্কে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন তখন থেকে আজো উনি তার বাড়ীতে নিয়মিত গণসঙ্গীতের ক্লাস করছেন। এবং তাঁর মোটা আয়ের অনেকটাই তার চিকিৎসার জন্য ব্যয় হতো।

দেবু বণিক

সমাজ বিরোধী

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

যদিও বাজারী কাগজগুলোতে এই সব খবরগুলোকে সংবাদ শিরোনামায় এনে প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে যে, বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের আমলেই সমাজ বিরোধী উৎপাত মাথাচাড়া দিচ্ছে এবং প্রচলিতভাবে এ কথা বলার চেষ্টাও হচ্ছে যে, জরুরী ব্যবস্থার আমলে এই সব দুষ্কৃতকারীরা দমিত হয়েছিল, সিদ্ধার্থ শাসনেও রাজ্যে কোন সামাজ্য বিরোধী কাজ হয় নি। এটা স্বাভাবিক এবং এটা খুবই স্ববিদিত যে, বৃহৎ পুঁজি নিয়ন্ত্রিত বাজারী কাগজগুলোর সঙ্গে রাজ্যের খুনি এবং লম্পট একশ্রেণীর উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের নিয়মিত যোগ-সাহস ছিল এবং আজও যে তা নেই এমন কথা হলপ করে বলা সম্ভব নয়। রক্তিত গুপ্ত, দেবী রায়, বিদ্যুতি চক্রবর্তী এবং রুণ্ড গুহ নিয়োগী প্রমুখ অতি কুখ্যাত জ্বলাদতুল্য পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে মাহুঘের হৃদয় নিঃড়ানো ঘৃণা আজ উপচে পড়ছে। হয়তো আইন মোতাবেক আসামীর কার্গডায় আজও সকলকে হাজির করা হয় নি। কিন্তু বহু মন্ত্রিসভার বক্তব্য থেকে এ কথা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার ক্লাউকে ছেড়ে কথা বলবেন না। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, বামপন্থী ফ্রন্ট বিপ্লব করে রাজ্য শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করে নি। সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি অস্থায়ী নির্বাচনে জয়ী হয়েই বামফ্রন্ট রাজ্য শাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এটা ক্ষমতা দ্বল নয়, স্বভাবতই সাংবিধানিক নিয়ম-কানুন সরকারকে মেনে চলতেই হবে এবং এটাও অনস্বীকার্য যে বর্তমান ভারতীয় সংবিধানে সাধারণ মাহুঘের অর্থ সামাজিক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সার্বিক অধিকারের ন্যূনতম স্বীকৃতিও নেই। অথচ সংবিধান সংশোধনের অধিকার রাজ্য বিধান সভার নেই। সে অধিকার আছে সংসদের এবং

ভার উত্তোপ নিতে পারেন কেন্দ্রীয় সরকার। বলাই বাহুল্য, এই রাজ্যের বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রে সমাসীন জনতা পার্টি পরিচালিত সরকারের সম্পর্ক হাল্কা হলেও মশ-দর্শের ওয়ে উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। এমতাবস্থায় রাজ্য সরকারকেও নিয়মতান্ত্রিক পথেই অগ্রসর হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের দুর্নীতিপরায়ণ একাংশ এই সুযোগটা ভালভাবেই গ্রহণ করেছে পেছন থেকে সমাজ বিরোধীদের মদত দিয়ে এবং বাজারী কাগজগুলো সেই চক্রান্তের রসদ জোগাচ্ছে।

বিগত ত্রিশ বছরের কংগ্রেসী অপশাসনে পুলিশী কর্তাদের একাংশ নিজেদের প্রায় সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন সামন্তসম্রাট্যে তাবতেই অত্যন্ত হয়ে উঠেছিল। ৬৭ এবং ৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে খুবই সাময়িকভাবে রাজ্য পুলিশের এই চেতনা কণকিৎ আঘাতপ্রাপ্ত হলেও ৭০ থেকে ৭৭ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি এবং সিদ্ধার্থ-শাসনের আমলে রাজ্য-পুলিশ আবার দুর্নীতির মনোবল ফিরে পায় এবং নববলে বলীয়ান হয়ে শুরু করে তাদের ভৈরব ক্রিয়া যার অতীতম প্রধান অঙ্গ পঞ্চম-এর কারবার। সুযোগও ছিল সুপ্রচুর। সিদ্ধার্থ রায়, গণিধান চৌধুরী প্রমুখ লম্পট মন্ত্রীদেই তারা পদাঙ্ক অহসরণ করেছে। শুধু মতপানই নয়, গণি ধানের বিরুদ্ধে সাঁওতাল-ডিহির ডাকবাংলোয় মেয়েছেলে নিয়ে ফুটি করার সংবাদ বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। কংগ্রেসী এম, এল, এ (৭২-এর জালিয়াতি নির্বাচনে) স্থনীতি চট্টরাজ মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্রামকক্ষে সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধেও নারী ঘটিত লাম্পটোর অভিযোগ এনেছিলেন এবং কলকাতার একটি সুপরিচিত সংবাদ সাপ্তাহিকে সেই খবর প্রকাশিত হয় এবং কংগ্রেসী ভৈরব বাহিনী সেই কাগজের প্রেসও আক্রমণ করেছিল কিন্তু আইনজীবী হয়েও স্বকীয় অপরাধী সচেতনতা প্রসূত দুর্বলতার ফলে সিদ্ধার্থ রায় সেই কাগজের বিরুদ্ধে মামলা কবে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করার সংসাহস দেখাতে পারেন নি। রাজনীতিতে পুঁটি মাছের সমতুল্য আধিকলো মন্ত্রী স্বরত মুখোজোতা কারণ ক্রিয়ায় আজ্ঞর হয়ে কোন একটি বিশিষ্ট ইংরেজী দৈনিকের অফিসেও হামলা করেছিলেন। এহেন মন্ত্রীদের ছত্র-ছায়ায় রাজ্য পুলিশের একাংশ মদ-মেয়েছেলে নিয়ে ঢালাও ফুটির যে স্বাদ পেয়েছে তা কি সহজে ভুলতে পারে?

পিয়ালসে লক আউট

(২য় পৃষ্ঠার পর)

মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়। এত করেও বি কে রায় থেমে থাকলেন না। মেশিন বিভাগের সঙ্গে বুল প্রায় সকল কর্মীকেই (বিভিন্ন শাখা অফিসেও) 'কাজের পরিমাণ' কম দেওয়ার অজুহাতে তাঁর একান্ত বিধ্বস্ত অজুগ্রহ ভাজন অফিসারদের মাধ্যমে গভ সপ্তাহে সর্বশেষ ওয়ার্নিং লেটার ধরান যাদের মধ্যে শ্রীজহর মুখার্জী শ্রীগৌতম চ্যাটার্জী প্রভৃতি রয়েছেন।

কিছু অফিসার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইতিমধ্যে কংগ্রেসী, জ্যোতদার ও মালিকদের নয়া সিদ্ধান্ত হল আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বোনাস, ঘেরাও, জমি দখল ইত্যাদি হরেক জিনিষ নিয়ে রাজ্য সরকারকে বিব্রত করার জন্য এরা মামলা মোকদ্দমায় মগ্নিসভাকে একেবারে জেরবার করে তুলবেন। জেলা প্রশাসন কোন পর্যায়ে সরকারকে কতটুকু সাহায্য করবেন, তাও চিন্তার বিষয়। কেননা রাঘব বোয়াল অফিসারদের অনেকেই কাছের মাহুঘ জেলা প্রশাসনের কিছু অফিসার। এই অবস্থায়

মুর্শিদাবাদ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

পুলিশের বিরুদ্ধে সম্প্রতি জঙ্গীপুর আদালতে এক আবেদন করেছেন মেশেরের স্ত্রী। জঙ্গীপুর আদালতের এস, ডি, জে, এম, ঘটনাটি সম্পর্কে তদন্ত করে এস, ডি, পি, ওকে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছেন। সামসেরগঞ্জ পুলিশ সম্প্রতি ঐ থানা এলাকার শেরপুর গ্রামের শিক্ষক মর্জেন সেখের বিরুদ্ধে জোর করে ধর্ষণের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেছে। প্রকাশ উক্ত মর্জেন সেখ নিমতিতা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। সে জর্নৈক ছাত্রী রীতা রায় (১২)-কে ওই স্কুলের মধ্যেই স্কুল ছুটির পর (ফাঁকা স্কুলে) জোর করে ধর্ষণ করে। এরপর উক্ত ছাত্রীর অভিভাবক ঘটনাটি পুলিশকে জানান। বর্তমানে শিক্ষকটি পলাতক।

ব্রিগেড সমাবেশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সি আই টি ইউ-র সাধারণ সম্পাদক পি রামমুর্তি জনগণের সমস্ত সমাধানের ব্যর্থতার জন্য জনতা সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি এ আই টি ইউ সি নেতাদের কার্য-কলাপেরও সমালোচনা করে বলেন যে, এরা এখনও কংগ্রেসের লেজুড হয়ে থাকতে চাইছে। এতো যে পরিবর্তন ঘটে গেল এ থেকে এরা কোন শিক্ষাই নিচ্ছে না। একেক জায়গায় এদের একেকরকম নীতি। জ্যোতি বহু ১৯৭০ সাল থেকে এই বাজ্যে সংঘটিত সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, অন্যান্য রাজ্যের লোকেরা জরুরী অবস্থার পর এর স্বরূপ বুঝতে পেরেছে। তিনি বলেন, ধনবাদী সমাজকাঠামোব মধ্যে আমরা যেটুকু সম্ভব জনগণকে রিলিফ দেবার চেষ্টা করছি।

জেলাগুলির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য সরকারের বিশিষ্ট কৌশলীরা যখন ব্যস্ত, তখন রাজ্যের ইন্সপেক্টর জেনারেল হুদীল চৌধুরী তাতেও ঝগড়া দিয়েছেন। জানা যায় হাইকোর্ট থেকে একতরফা ভাবে কোনও মালিক কিংবা জ্যোতদার যাতে কোনও ব্যাপারে ইনজাংশন না নিয়ে যেতে পারেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে সরকারের তরফে কৌশলীরা যাতে সশ্লিষ্ট জেলা থেকে প্রকৃত তথ্য জেনে নিতে পারেন সেদৃষ্টি সরকারের একটি বিশেষ বিভাগের আইন উপদেষ্টা বিশিষ্ট আইনজীবী নরনরায়ণ গুপ্ত আই, জি, বোর্ড মারফৎ তার সংগে টেলিফোনে লাইন চান। কিন্তু আই, জি, শ্রীচৌধুরী তা দিতে গররাজী হন। জানা গেছে তা নিয়ে বিস্তার জল ঘোলা হবার পরও শ্রীচৌধুরী নরনরায়ণবাবুর আই, জি, বোর্ড মারফৎ আইনের ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের সংগে যোগস্বজ রক্ষার বিষয়টিতে গুরুত্ব দেননি। কোনও জেলা থেকে কোনও ব্যাপারে ইনজাংশন চাওয়ার ব্যাপার হলে সরকারী তরফে বক্তব্য পেশ করার জায়গা এটি প্রয়োজন। কলকাতা হাইকোর্টে সরকারের সিনিয়র কৌশলী বিষয়টি শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহুর গোচরে এনেছেন বলেও জানা গেছে। কারও কারও ধারণা জেলা প্রশাসনের সংগে সি, পি, আই (এম) সমর্থক এই নেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকেরই স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে উঠতে পারে বলে তার আবেদন নাকচ হয়ে যায়।

সরকারী মহলেরই অভিযোগ, আইন শৃঙ্খলার গুরুত্বপূর্ণ সময়েও আই, জি, সাহেবকে পাওয়া ভার। ১৩ই আগষ্ট রাতে আইন শৃঙ্খলা জনিত একটি প্রস্নে খোঁজ করতে গিয়ে সরকারের জর্নৈক বিশেষ ব্যক্তি হতবাক। কারণ আই, জি, বোর্ড থেকে জর্নৈক এস, সি, মুখার্জী জানান রাতে আই, জিকে বিরক্ত করা বারণ। ঐ ব্যক্তির পবিচয় পাবার পরেও শ্রীমুখার্জী আই, জি, সাহেবকে ডেকে দেন নি।

পুলিশী অত্যাচার সম্পর্কে কমিশন গঠন, বর্তমান পর্যায়ে পুলিশ মহলে রদবদল, সর্বোপরি এক কায়মী চক্রের স্বার্থের ওপর ইন্তক্ষেপে এখন তাই চলেছে সরকারকে বিব্রত করার নানা অপচেষ্টা। এ ধবনের ঘটনাগুলি তারই অন্ততম নজীর বলে অনেকের ধারণা।

যাত্রা সংবাদ

“আবদান্না মর্জিনার” উদ্বোধন

২৬শে আগস্ট শুক্রবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ রঙমহল রঙ্গমঞ্চে নিউ প্রভাস অপেরার নতুন পালা শৈলেন্দ্র গুহনিয়োগী রচিত ও পরিচালিত “আবদান্না মর্জিনার” শুভ উদ্বোধন হবে। শ্রেষ্ঠাংশে আছেন সমীর লাহিড়ী, শ্রামহন্দর, তপনকুমার, নমিতা বিশ্বাস, সুতপা সেনগুপ্ত, কানন মুখার্জী ও কুনকলতা।

হোটেল লুঠন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কালীন দশ হাজার টাকা অথবা মাসে মাসে এক হাজার টাকা দাবি করেছিল এবং এই টাকা দিতে অস্বীকার করার ফলেই হোটেল দখল করা হয়। এই অবস্থায় পুলিশের এক টাউট হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলে যে দশ হাজার টাকা দিলে পুলিশ যুবকংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। হোটেল কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবে রাজী হন না। ৭৫ সালের ডিসেম্বরে পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিবর্তন ঘটান প্র চীফ সেক্রেটারীর নির্দেশে স্পেশাল সেলের পুলিশবাহিনী রুণ্ড গুহনিয়োগীর নেতৃত্বে হোটলে অভিযান চালিয়ে বারোজন গুণাকে গ্রেপ্তার করে, বাইরের মেয়েদের তাড়িয়ে দেয়, মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করে। হোটেলের মালিক পূনর্বহাল হয়ে আবার হোটেলের কাজকর্ম শুরু করেন।

এরপর এই কেসের এস আই ও আই ও অশোকমালাকার হোটেলের মালিকের বাড়ি গিয়ে বলে তার এক বন্ধু আন্তোয সরকারকে হোটলে চাকরী দিতে হবে এবং হোটেল থেকে যুব কংগ্রেসী গুণাদের তাড়িয়ে দেওয়ায় পুরস্কার হিসেবে রুণ্ড গুহনিয়োগীকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে। হোটেল কর্তৃপক্ষ এক হাজার টাকা দিতে চান, কিন্তু এত কম টাকা নিতে তারা রাজী হয় না। অবশ্য পুরো টাকা জোগাড় করার জন্য সময় দেওয়া হয় আর দুশো টাকা বেতনে পূর্বোক্ত আন্তোয সরকারকে হোটেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। হোটেল কর্তৃপক্ষ রুণ্ডকে পাঁচ-হাজার টাকা দিতে পারেন না ব্যবসা খারাপ বলে। আন্তোয সরকারের প্রত্যহ লালবাজারে যাতায়াত ছিল। হোটেল কর্তৃপক্ষকে বারবার বলা হয় যে, ধার করে হলেও কুর চাওয়া টাকাটা দিয়ে দেওয়ার জন্ত। এরপর টাকা না পাওয়ার ফলে অসন্তুষ্ট পুলিশ হোটেলের বিরুদ্ধে বড়দস্ত শুরু করে।

ইস্কা কারখানায় একটি অপমৃত্যু

অবহেলার আভ্যোগ ও তদন্তের দাবী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বার্ণপুরের ইস্কা কারখানার কর্মী শ্রীময় হালদার গত ১৫ আগস্ট 'বি' কারনেসে বার্ষিক সেট করার সময় দুর্ঘটনায় পড়েন এবং স্থানীয় হাসপাতালের অবহেলায় ১৪ তারিখে মারা যান।

এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে তদন্তের দাবি উঠেছে। জানা গেছে, তাঁকে যে কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল তা সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূত। শ্রীহালদার প্রায় ৫০ ফুট ওপর থেকে কারনেসের চেয়ারের ভেতর পড়ে যান। তাঁর সহকর্মীরা অনতিবিলম্বে কারনেসের চেয়ার থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন।

শ্রীহালদারকে বার্ষিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর ডান পায়ে অস্ত্রোপচার করেন শল্য চিকিৎসক ডাঃ অশোক বসু। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বারবার আশ্বাস দেন, আঘাত গুরুতর নয়। অথচ বিবর্তনশীল জানা গেছে যে, বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডাঃ গোপালচন্দ্র সেনের মতে আঘাত অত্যন্ত গুরুতর। তাঁরই উপদেশ অনুযায়ী এক-রে করে শ্রীহালদারের শিরদাঁড়া ভাঙার চিকিৎসা করা হয়।

তা সত্ত্বেও কোন প্রখ্যাত শল্যবিদ বা মেডিকেল বোর্ডের দ্বারা শ্রীহালদারকে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়নি। অভিযোগ যে অস্ত্রোপচারের পরেও যে যত্ন ও পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল ডাঃ অশোক বসু, তাঁরও কোন ব্যবস্থাই করেন নি।

১৩ই আগস্ট সন্ধ্যা থেকে শ্রীহালদারের বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। সারারাত ধরে তিনি প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট পান। অথচ তাঁর বৃদ্ধা মায়ের বারম্বার অহরোধ সত্ত্বেও অস্ত্রিকেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হয়নি। সেই সময় হাসপাতালে ডিউটিতে ছিলেন ডাঃ এন সি মুখার্জী। বিধবা মায়ের ও সন্তান বিবাহিতা তরুণী বধূর কাতর আবেদনও তাঁর কাছে নিষ্ফল হয়েছিল। শ্রীহালদার বাঁচার জন্য সারারাত ধরে একা সংগ্রাম করেছেন। সাক্ষী তাঁর মা ও স্ত্রী। সারারাত পাওয়া গেল না ডাঃ অশোক বসু অথবা অন্য কোন সিনিয়র ডাক্তারের দর্শন।

সকালবেলা শ্রীহালদারের মৃত্যু

সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বার্ষিক হাসপাতালের সামনে ইম্পাত কারখানার অসংখ্য কর্মী অগ্নি-চিকিৎসা ও হৃদযন্ত্রহীনতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করেন। শীল মেনিষ্ট শপের কর্মীরা কাজ বন্ধ করে এই অপমৃত্যুর তদন্ত দাবি করতে থাকেন। জনতার দাবিতে প্রখ্যাত শল্যবিদ ডাঃ গোপালচন্দ্র সেনকে পোষ্টমর্টেমের পর মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য আনা হয়। কিন্তু আগেই কেন কর্তৃপক্ষ শ্রীহালদারের অচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন নি সেটাই প্রশ্ন।

বার্ষিক হাসপাতাল সম্পর্কে বহু অভিযোগ। ডাক্তারদের বেআইনী প্রাইভেট প্র্যাকটিসের চেষ্টায় কর্মীদের প্রাণান্ত। তার ওপর এখানে, চলে গুণ্ডার কালোবাজারী। আসানসোল বার্ষিক এলাকায়

ব্যাঙ্কের ছাতার মত গভিয়ে উঠেছে নার্সিং হোম। বার্ষিকের ডাক্তাররাই বেশির ভাগ নার্সিং হোমে ইম্পাত কর্মচারীদের অচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, অথচ এঁদেরই হাসপাতালে অস্ত্ররূপ।

কারখানা কর্তৃপক্ষও কম হৃদয়হীন নয়। শ্রীহালদারের শেষকৃত্যের সময় তাঁর সহকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে একমাত্র চীফ ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া আর কেউ স্থান নেই বান্ধি। এমনকি ১৫ই আগস্টের উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁর মৃত্যুর কোন উল্লেখ করা হয়নি।

পরলোকগত শ্রীময় হালদার ছিলেন একজন বিশিষ্ট ইম্পাতবিদ। বার্ষিকের সমাজে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রীহালদার ছিলেন প্রাণবিন্দু স্বরূপ।

সরকারী গার্মেন্টস জন্ম ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কর্মীরা মৃতপ্রায়

(বিশেষ সংবাদদাতা)

অন্যদিক চিকিৎসক ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট বন্ধ করে দেওয়া হয় ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে। কর্মচারীরা পূর্বতন সরকারের কাছে বারবার ধর্না দিয়েও বন্ধ কারখানা গবেষণা-কেন্দ্রটি খুলতে না পেরে ১৯৭৫ সালে নিজেদের প্রতিভেও ফাণ্ডের টাকা দিয়ে কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠন করেন। বিধান সূত্রীতে অবস্থিত পূর্বের কারখানা লিকুইডেটরের অধীনে বন্ধ থাকে আর আলমবাজারের একটি বড় পুরানো বাড়ি মাসিক ৬০০ টাকা ভাড়া নেওয়া হয়। এই বসতি বাড়ি কারখানায় রূপান্তর করতে অনেক টাকা খরচ হয়।

স্বীমও তৈরি। এখন শুধু পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার এগিয়ে এলেই কাজ শুরু হতে পারে। দুর্ভাগ্যব্যাধি কালজ্বর আবার ভারতবর্ষে দেখা দিয়েছে। ঐ ভেদে কারখানাটি চালু করে ঐ গুণ্ডা (ইউরিয়) ষ্ট্রিমাইল, সোডিয়াম অ্যাক্টিভমি প্রকোনেট, সিলিনিস গুণ্ডা ও অন্যান্য কৃত্তিক প্রান্তের গুণ্ডাদি প্রস্তুত করে) সরবরাহ করা বাবে এই চিন্তা করে পূর্বতন সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে কোটেশন দেওয়া হয়। রাজ্যবীমা প্রকল্পের অর্ডারও পাওয়া যায়। কিন্তু অর্থ দপ্তরের বাধার প্রাচীর সব ভেঙে দেয়।

কর্মচারীরা দিল্লী থেকে আরম্ভ করে প্রদেশের নানান্তরে ছুঁয়ারে ছুঁয়ারে আবেদন জানিয়ে এসেছেন ১৯৭১ সাল থেকে। এই কয় বছরের মধ্যে বহু পরিবার বিলুপ্ত হয়েছে। যারা জীবিত তারাও এখন গভীর হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত এবং মৃতপ্রায়।

অথচ এতদিন কারখানা চালু হওয়ার কথা। দুই ছইবার এদের স্বীম শ্বল ইন্ডাস্ট্রিজ সার্ভিসেস ইনস্টিটিউট, কুটির শিল্প দপ্তর ও তার বাসতস্থিত প্রোজেক্ট অফিস, ড্রাগস কন্ট্রোল প্রভৃতি বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সরকারের অহুমোদন সাপেক্ষ ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর করে। শিল্পসংস্থার সরকারী দপ্তর ১০৫ জন কর্মচারীর কর্ম সংস্থানের কথা বিবেচনা করে ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর করে এবং কর্মচারী সমিতিও বণ্ড প্রদান করে। শিল্প দপ্তর অহুদান হিসেবেও ২০ হাজার টাকা আবৃত্তিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য মঞ্জুর করে। ঐ চেক বাসন্তে রয়েছে। ম্যানেজারিয়েল অহুদান হিসেবেও কর্মচারীদের জন্য কোয়ার্টারি ছয় হাজার টাকা মঞ্জুর হয়।

এতদসত্ত্বেও কারখানা চালু হয় নি। কারণ মঞ্জুরীকৃত অর্থ সবুজ সেক্টরের অপেক্ষায় রয়েছে। কর্মচারীরা এখন তাকিয়ে আছেন নতুন সরকারের দিকে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল জাতীয়করণের দাবি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানী জাতীয়করণের দাবিতে এই সংস্থার সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীরা আজ সোচ্চার। তারা গত ৪ঠা আগষ্ট মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর কাছে এক স্প-ডেপুটেশন দেন। বিকেল চারটেয় এক বিরাট মিছিল মিশন রোর মুখে পুলিশের বাধা পেলে শ্রমিক কর্মচারীরা রাস্তায় বসে পড়েন। ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীজ্ঞান সেন কর্মীদের সামনে বক্তব্য রাখার পর সুরেন্দ্রনাথ সাউ, ছুপেন লাহিড়ী, বিজুতি মজুমদার, কানাইলাল ব্যানার্জী ও রতন ব্যানার্জী এই পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এক স্মারকলিপি নিয়ে যান যার অহুলিপি শিল্পমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রীকেও দেওয়া হয়। বিচারমন্ত্রী হাসিম আবহুল হালিম সমবেত কর্মীদের সামনে বক্তব্য রাখেন এবং মন্ত্রিসভা শ্রমিক কর্মচারীদের দাবী বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

উল্লেখযোগ্য যে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্মৃতি বিজড়িত বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানটি তাঁর উত্তর-সূরীদের হাতে মুনাকা শিকারের যন্ত্রে পরিণত হয়। ১৯৭২ সাল থেকে আই আর সি আই এর দাবি গ্রহণ করার পরও কোন উন্নতি হয়নি। তিন কোটি টাকার বেশি খরচ করা হয়েছে। কিন্তু পরিচালকবর্গের দুর্নীতি ও অযোগ্যতায় প্রতিষ্ঠানটি জাহান্নামের পথে। অতদিকে কর্মচারীরা ছাঁটাই ও ক্ষাণ্ড পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণের দাবি নিয়ে ইউনিয়নের প্রতিনিধি কানাইলাল ব্যানার্জী সুরেন্দ্রনাথ সাউ এবং সংসদ সদস্য সমর মুখার্জী দিল্লীতে কেন্দ্রীয় রসায়ন মন্ত্রী শ্রীএইচ এন বহুগুণার সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

না-মঞ্জুর দরখাস্ত

অনুদাশঙ্কর রায়

হায় রে আমার পুতলিকা!

হায় রে আমার গডলিকা!

সওয়া বছর আগেই তোরা

হঠাৎ হলি বরখাস্ত!

পুতলিদের টিকিট দাও!

গডলিদের ভোট জোগাও!

দেশকে আবার মেঘ বানানো!

ইতি আমার দরখাস্ত।

জনগণ ও সরকার

পশ্চিমবঙ্গের জনগণের রায়ে এই রাজ্যে যে বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে জনগণেরই সরকার। এই সরকারকে জনগণই প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও পরামর্শ দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেছেন: "বামফ্রন্ট সরকার শোষিত মানুষের সংগ্রামে সর্বদাই তাঁদের পাশে পাশে থাকবে।"

- * বেনামী ও উদ্ধৃত্ত জমি বিলি করার কাজে সরকার জনগণের সাহায্য চান
- * ফিরে-পাওয়া গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করুন, প্রসারিত করুন
- * পাড়ায় পাড়ায়, কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে, স্কুলে-কলেজে শৃঙ্খলা বজায় রাখুন
- * পরীক্ষায় টোকাটুকি শুধু বর্তমান সমাজকেই নয়, ভবিষ্যৎ সমাজকেও পঙ্গু করবে—পরীক্ষার্থীরা তাই নিজেরাই এই টোকাটুকি বন্ধ করুন
- * জনগণের সঙ্গে সরকারও বলতে চান—জাতীয় ভিত্তিতে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অবিলম্বে বেঁধে দেওয়া হোক

সুখী ও সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তুলতে
জনগণের সহযোগিতাই সরকারের কাম্য

বাঙলা দেশের কাদের সিদ্দিকি প্রিয় মুন্সীর ঘনিষ্ঠ এক প্রতারকের পাল্লায়

দপ্পন

বিংশ বর্ষ ১১ ৩২শ সংখ্যা ১১ শুক্রবার ২২। সেপ্টেম্বর, '৭৭ ৥ ৪০ পয়সা

যতীন চক্রবর্তীর গতিবিধি নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্যের বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য যতীন চক্রবর্তী কি, কংগ্রেসীদের সংযোগ হুত্র হয়ে মন্ত্রিসভার কাজ করছেন? অত্যন্ত সংগোপনে খবর নিয়ে আমরা যে তথ্য পাচ্ছি তাতে দেখা যাচ্ছে বিদ্যায়ী কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন সদস্য যতীন চক্রবর্তীর মাধ্যমে নিজেদের গোপ্তা স্বার্থ মেটানোর চেষ্টা করছেন। আমরা খবর পাচ্ছি, ভূতপূর্ব প্রমমন্ত্রী গোপালদাস নাগ, বামমন্ত্রী প্রফুল্ল কান্তি ঘোষের সঙ্গে যতীন চক্রবর্তী গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। ওদের কাছ থেকে তাঁর কাছে চিঠি আসছে অল্পরোধ আসছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বিদ্যায়ী

কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার একজন সদস্য আমাদের বলেছেন, যতীন চক্রবর্তী কংগ্রেসী মন্ত্রীদেব কাছ থেকে নানা সুযোগ সুবিধে নিয়েছেন। প্রতিদানে তাঁরাও যতীন চক্রবর্তীর কাছে আশা করছেন। যতীন চক্রবর্তী মন্ত্রী হয়ে আত্মপ্রচারের ব্যাপারে সবাইকে টেকা দিচ্ছেন। এই আত্মপ্রচারের তাগিদে তিনি পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থহানিও করছেন। ইয়া, এই অভিযোগ করার সময় এখন এসেছে। হলদিয়ায় পেট্রো-কেমিক্যাল কমপ্লেক্স হবার সম্ভাবনা নিয়ে যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহু, শিল্পমন্ত্রী ডঃ কানাই (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

রুণু গুহ রাজনৈতিক আশ্রয় খুঁজছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বহু অত্যাচারের নায়ক কলকাতা পুলিশের অফিসার রুণু গুহনিয়োগী এখন বাচার জ্ঞাত রাজনৈতিক আশ্রয় খুঁজছেন। নকশাল দমনের নামে রুণুগুহ তাঁর টরচার চেম্বারে পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলের ওপর যে পৈশাচিক অত্যাচার চালিয়েছেন, তার কিছু কিছু অংশ সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতার বিভিন্ন আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলাও দায়ের হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিভিন্ন হুত্রে কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে বোঝাতে চাইছেন যে তিনি তো কোন সি, পি, এম কর্মীকে মারেন নি। আর, এস, এস, বা জনসংঘ কর্মীদেরও হত্যা করেন নি। তিনি শুধু নকশালপন্থীদের মেরেছেন। হুতরাং তাঁকে রেহাই দেওয়া হক। এদিকে রুণু গুহ নিয়োগীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল সোচ্চার হয়ে উঠেছে। রুণুগুহ হাতে অমাহুষিকভাবে অত্যাচারিত অনেকেই মামলা

দায়ের করতে প্রস্তুত হচ্ছেন। এ ছাড়া, বিচারপতি হরতোষ চক্রবর্তীর অধীনে বামফ্রন্ট সরকার পুলিশ অত্যাচার সম্পর্কে তদন্তের জ্ঞাত যে কমিশন করছে তার সামনেও কয়েক হাজার মানুষ রুণু গুহের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন। প্রাথমিক ভাবে এ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে যে সমস্ত মারাত্মক অভিযোগ এসেছে তার ভিত্তিতে রুণুগুহকে গ্রেপ্তার করা না হলে আদালতের মামলা অবশ্যই কমিশনের সাক্ষ্য প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা। কেউ কেউ আরও আশংকা করছেন যে, বিচার চলাকালীন অবস্থায় রুণুগুহ বহাল তবিয়তে স্বপদে বহাল থেকে মামলাকারীদের ভয় দেখাবেন। গুয়াকিবহাল মহলের খবর লালবাজারে তিনি বলে বেড়াচ্ছেন, যারা মামলা করবে বা সাক্ষ্য দেবে তাদের কারো রেহাই মিলবে না। কারণ, তাঁর কাছে সোজা খবর, ৬ মাসের মধ্যেই তাঁর পুরোনো প্রভু অর্থাৎ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সদলবলে ক্ষমতায় আসীন হবেন।

জুট ব্যাচিং অয়েল নিয়ে বেপারোয়া চোরাকারবার : পুলিশ জেনেও চুপ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পুলিশের নাকের ডগাতেই রাজ্য ব্যাপী জুট ব্যাচিং অয়েল নিয়ে এখন এক বেপারোয়া চোরাকারবার চলছে। এই তেল সাধারণতঃ চটকলগুলির যন্ত্রাংশের কাজে লাগে। তেল নিয়ে দুঃসাহসিক চোরাকারবারের সঙ্গে পুলিশের একাংশ সরাসরি জড়িত বলেও অভিযোগ উঠেছে। প্রকাশ এই তেলের কারবারে কিছু ব্যক্তি-লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করছে। প্রশাসন ও পুলিশের একাংশ সব জেনেও নীরব, নিষ্ক্রিয়। কয়েকটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর হল, এই কারবারের গুটিকয় পাণ্ডার মধ্যে খড়দার বি, কে, বিশ্বাস রোডের শিবনাথ সাউ, বি টি রোডের রাজপথ সাউ, চেতলা রোডের নরসিং গুপ্তা, দিল্লী রোডের বেবীচাঁদ চৌরাসিয়া, রাজেন্দ্র চৌরাসিয়া অন্যতম। চোরাকারবারের পদ্ধতিগুলি প্রায় একই রকম। ব্যাচিং অয়েল হলদিয়া ও বঙ্গবন্ধু থেকে বেসরকারী ট্যাংকারে করে বিভিন্ন চটকলে নিয়ে যাওয়া হয়। মাঝপথে খড়দহে মধুসূদন রোড

৬নং স্ট্যান্ডাল হাইওয়ের কাছে নিবিড়া গ্রামের ডোমজুড় থানা এলাকা, চেতলা রোড সহ কয়েকটি স্থানে ট্যাংকার থেকে জুট ব্যাচিং অয়েল অর্থাৎ জি বি ও বার করে নেওয়া হয়। পরিবর্তে ডিজেল ভরে দেওয়া হয়। এই জি বি ও পরে কালোবাজারে ফুয়া নাম দিয়ে দিল্লী বোম্বাই ও পাঞ্জাবে পাঠানো হয়। এক একটি ট্যাংকারে ১০-১২ হাজার লিটার জি বি ও ধরে। এই তেলের সরকারী দর ১০ পয়সা। কালোবাজারে তাবিক্ত হয় একটাকা চল্লিশ পয়সা দরে। একটি ট্যাংকারের প্রচুর পরিমাণ জি বি ও বার করে তার বাকীটাকে ডিজেল ভেজাল দিলেই ট্যাংকার পিছুপ্রায় ২৫ হাজার টাকা মুনাফা হয়। চটকলগুলির মেরিনপত্রে খাটি জি বি ও না পাড়ার ফলে সেগুলিরও ক্ষতি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকার। খবর হল, এই কারবার করেই রাজপথ সাউ এখন লাখ লাখ টাকার মালিক। ইউনিয়ন কারবাইডে এক

জন শ্রমিকের কাজ করতেন এই রাজপথ। এখন তিনি বি টি রোডের কাছে মধুসূদন মুখার্জী রোডে ৩০ কাঠা জমির মালিক। ডবলু বি কে ৩৮২, ডবলু এম কে ৪০৭, ডবলু এম কে ৩৮৮ নম্বরের তিনটি ট্যাংকারের মালিক বলেও অনেকে রাজপথকে চেনেন। ট্যাংকার ছাড়াও রয়েছে প্রাইভেট কার। এর মধুসূদন মুখার্জী রোডে রয়েছে প্রাসাদোপম বাড়ী। ৬নং জাতীয় সড়কের কাছে নিবিড়া মোজাতেও এর জমি রয়েছে ১০ (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

আমি সুভাষ বলছি-র

সাংখ্যিক স্রষ্টা শৈলেশ দে'র আর একটি বিন্ময়কর গ্রন্থ

গান্ধীজী ও নেতাজী

ইতিহাস যুগে যুগে পাল্টায়। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস থেকে গান্ধীজী ও নেতাজী—এ দুটি নাম হাজার চেষ্টা করলেও কোনদিন মুছে ফেলা যাবে না ৥ এ দুটি নাম পরস্পর এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, একজনকে বাদ দিয়ে আর একজনকে কল্পনা করাও যায় না। স্বাধীনতা-সংগ্রামের জাতির পিতা ও জাতির নেতার মিল-স্মিল, স্বন্দ-সংঘাত, আপস-বিরোধের পূর্ণাঙ্গ দলিল। স্বাধীন দেশের প্রতিটি মানুষের অবশ্য-পাঠ্য এক ঐতিহাসিক গ্রন্থ। মূল্য : কুড়ি টাকা। ডাক-মাঙ্গল স্বতন্ত্র।

স্বাধীনতা সংগ্রামের আর একখানা মূল্যবান গ্রন্থ

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-স্বায়ের

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব ২৫

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫/২, আমাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

ফোন : ৩৪-৮৩৫৬



কয়লাখনি পরিক্রমা (২)

কিছু অফিসারের ইচ্ছাপূরণ হচ্ছে না
তাই বলছেন আইন শৃঙ্খলার অবনতি

সাধন গুহ

ইষ্টার্ন কোলফিল্ডের অফিসার এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের অভিযোগগুলো প্রধানতঃ এই—(১) শ্রমিকরা যখন তখন অফিসারদের দৈহিকভাবে আক্রমণ করছে (২) এই সব ঘটনা পুলিশকে জানালেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেনা (৩) এই সব কারণে অফিসাররা নিজেদের জীবন ও মান সম্মান নিরাপদ বলে মনে করতে পারছেন না।

অভিযোগগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব এগুলো অবশ্যই বিচার্য। এটা প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় কোন কোন রাষ্ট্রে প্রধান শিল্প বহিরে জাতীয়কৃত হলেও সরকার যেহেতু লোকায়ত নয় সেইহেতু জাতীয়করণের অভ্যন্তরীণ নীতি কোন ভাবেই শোষণ মুক্তির লক্ষ্যে নির্দেশিত হতে পারে না। এই দৃষ্টির দর্পণেই কয়লাখনি জাতীয়করণের মূল দিকটি বিচার করতে হবে। প্রশ্ন উঠবে, জাতীয়করণের পর এই শিল্পে খনি শ্রমিকদের বেতন লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গেছে, তাঁদের চাকরীর নিরাপত্তা এখন আইনতঃ স্বীকৃতি লাভ করেছে, তাদের স্ব-স্ববিধার জ্ঞান নানাবিধ পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে যা ক্রমশঃ কপায়িত হচ্ছে ও হবে। সব কথা ঠিক। কিন্তু, একই সঙ্গে এই কথাটাও মনে রাখতে হবে যে, খনি শ্রমিকদের বেতন বাড়লেও এবং তাঁদের চাকরীর নিরাপত্তা স্বীকৃত হলেও অফিসারদের কাছে তাঁরা কি মাননিক স্বীকৃতি পেয়েছেন? সবিনয় বলবো, পান নি। মিঃ সরণ এবং মিঃ পূজারী এস, এস, ইনক্লাইন এবং কুহস্তুরিয়া কোলিয়ারীর ম্যানেজার নিগ্রহের কথা (যেটা সম্পূর্ণ বানানো গল্প) বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মিঃ সরণ এবং মিঃ পূজারী কি অস্বীকার করতে পারবেন যে ২২শে জুলাই তারিখেই নিংগা কোলিয়ারীর ম্যানেজার মিঃ পুরেকারের বাড়ীতে বেশ কিছু অফিসার সমবেত হয়ে একটি পবিত্র চক্রান্তের দলিল তৈরী করেছিলেন এবং উত্তেজনার রসে হিসেবে শাহজোয়ানীকে মেরে হাত পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে শ্রেষ্ঠ মিথ্যা রটনার মাধ্যমে কোম্পানীর গাড়ীতে কোম্পানীর তেল খরচ করে সারি-রাত ধরে গোটা কয়লাখনি অঞ্চলে

ঘোরাঘুরি করে অফিসারদের উত্তেজিত করে ২২শে জুলাই তারিখে ধর্মঘট করিয়েছিলেন? মেডিকেল রিপোর্টেই প্রমাণিত হয়েছে যে, শাহজোয়ানীর আঘাত নিছক মাইনর ইনজুরি মাত্র। তাহলে দোষী কে? শাহজোয়ানী না মাইনিং সর্দার রামআশীষ সিং?

কুহস্তুরিয়ার ম্যানেজার নিগ্রহের কথা বলা হয়েছে। আমি ১৯শে আগষ্ট কুহস্তুরিয়ার গিয়েছিলাম এরিয়া ফোর-এর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ নির্মল শরের সঙ্গে দেখা করতে বেলবেইদ কোলিয়ারীর দুজন শ্রমিক হত্যার প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের জন্য। আমি সেদিনই ফিরে আসার মুখে কুহস্তুরিয়ার ম্যানেজার নিগ্রহের যে তথ্য সংগ্রহ করেছি তাতে দেখা যায় যে ঐ ম্যানেজারের অসহিষ্ণুতা, অমানবিক আচরণ এবং দৃষ্টিকটু উদ্ধৃত ব্যবহারই সমস্ত ঘটনার জন্ম দায়ী। এই, ম্যানেজারটি নিজেই এক সার্বভৌম সম্রাট বলে মনে করেন। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে কেন যে বর্তমানে কোলিয়ারী শ্রমিককে বেলোয়ারী কাঁচের মত চুনকো বলে ভাবাটা নামাস্তরে, বাতুলতা মাত্র?

১৭৭৪ থেকে ১৯৭৭। মধ্যবর্তী ব্যবধানের কালসীমা ২০৩ বছর। ১৭৭৪ সালে সামার এবং হিটলীর মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে কয়লা উত্তোলনের ভিত্তি স্থাপন হয়। ১৮১৮ সালে উইলিয়াম জোনস, ১৮২৪ সালে আলেকজেন্ডার এ্যাণ্ড কোং প্রভৃতি ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের কাজে নামে। ১৮৩২ সালে এই ব্যবসায়ের বাবু স্বার্কানাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় প্রথম আমদানী হয় ভারতীয় পুঁজি এবং গঠিত হয় ফার এ্যাণ্ড টেগোর কোম্পানী। ১৮৪৪ সালে গঠিত হয় বেঙ্গল কোল কোম্পানী। এভাবেই ১৮৫০ সালে গোটা ভারতীয় অর্থনীতিতে কয়লা শিল্পের একটি প্রত্যক্ষ ভূমিকা সূচিত হয়। ১৭৭৪ থেকে ১৯৭৩ অর্থাৎ জাতীয়করণের প্রাকমুহূর্ত পর্যন্ত কয়লাখনিতে খনি শ্রমিক এবং খনি মালিকের সম্পর্ক ছিল ক্রীতদাস এবং দাসপ্রভুদের মত। তৎকালীন খনি মালিকের মুনাকা মুগয়ার প্রধান হাতিয়ার ছিল অফিসার মহল যারা ছিল নেকড়ের মত হিংস্র, কেউটার মত বিষধর এবং শৃগালের মত ধূর্ত।

জাতীয়করণের উত্তরযুগে সে কালের অফিসাররাই পরিণত হয়েছে এ কালের আমলায়। আশা করা যায় কি যে সেই লোকগুলো রাতারাতি হয়ে যাবে ফুলের মত পবিত্র, শিশুর মত নিষ্পাপ এবং বিহঙ্গের মত স্বর-হুম? অবশ্য একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তিগত মালিকানার যুগেও বহু অফিসার ছিলেন যারা নিঃশর্ত ভাবে স্বতঃকৃত আত্মগত্যে মালিকের কাছে নতজাহু হয়ে অসহায় শ্রমিককে বাধ্য করেননি নির্মম মৃত্যুর পায়ে তার ছিমশির উপহার দিতে, মালিকের পোষা শুণ্ডায় সহায়তায় খনি শ্রমিকের ঘরের বোবনবতী কন্যাকে টেনে এনে নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে আহতি দেন নি মালিকের অনিবার্য রুতি-যজ্ঞের দাবানলে। যে যুগের ইতিহাসেও এ ধরণের অবিক্রীতবিবেক অফিসারের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও নিতান্ত কমও ছিল।

সেদিন যারা ছিলেন শুদ্ধবাক এ যুগে তাঁরা পুরোপুরি মূবর না হলেও একেবারে নীরব নন। অফিসার এসোসিয়েশনে ২২শে জুলাই তারিখের ধর্মঘটের, সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতবৈধতার মূলমন্ত্র এই মध्ये নিহিত। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কয়লা শিল্পের বিদেশী অর্থাৎ ইংরেজ মালিকরা নিজেদের ইংরেজ শাসকদেরই সমগোত্রীয় মনে করত বলেই শিল্পের আইন শৃঙ্খলা এবং দেশের আইন শৃঙ্খলার মধ্যে কোন ভেদবৈধতা টেনে দিতে অভ্যস্ত ছিলো না। সে আমলের কয়লাখনি অফিসাররাও তাই ডিসিপ্লিন ইন ড্রেড এবং দেশের ল এ্যাণ্ড অর্ডারের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পেতো না। এই ধারারই উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন সরণ-পূজারী-কাশেম-রচিত ভট্টাচার্যের দল যারা শিল্পবিরোধ এবং দেশের আইন শৃঙ্খলাকে এক ও অভিন্ন বলে ভাবেন। এইসব হস্তী-যুগের দল হয়তো ট্রেড এবং স্ট্রেকের মৌল পার্থক্যটুকুও জানেন না এবং জানেন না বলেই পাগলা মেহেরালীর মত যত্রতত্র আইন শৃঙ্খলার অবনতি কল্পনা করে তারপরে চীৎকার করে চলেছেন। খনি শ্রমিক নামক সেকালের ক্রীতদাসরা যদি একালে স্পার্টাকাস হয়ে অস্তিত্ব স্বধিকার রক্ষায় আগ্রহী হন তবে অফিসারদেরও অস্বাভাবিক টেমের সমবেদনা ও

সহায়ত্ব নিজেই তার মোকাবিলা করতে হবে। একেবারে মিথ্যা নয় যে, কিছু কিছু উদ্ধৃত শ্রমিকও আছেন। কিন্তু তারা কারা? কিছু বাস্তবযুগ ট্রেড ইউনিয়ন নেতার পোষা ব্যক্তি তারা এবং বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেসী অপশাসনে তারা ছিল হোঁদগপ্রতাপ। পূর্বোক্ত ট্রেড ইউনিয়ন নেতারাও ছিলেন হয় তৎকালীন শাসকদল কংগ্রেসের পক্ষভূত নয়তো তাদেরই রাজনৈতিক দোসর কোন দলের লোক। এদের সঙ্গে ছিল দুইবার্ধ সম্পন্ন অফিসার এবং পুলিশের মোগসাজস। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই ঘৃণ্য আঁতাতের শিবিরে লেগেছে প্রচণ্ড আঘাত। তাই শুরু হয়েছে সরকার বিরোধী চক্রান্ত।

আদৌ অস্বীকার করি না যে, একাংশ পুলিশও এখন বামপন্থী সরকারকে বিব্রত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে এবং সরণ ও পূজারীরা যে অভিযোগ করেছেন যে পুলিশকে জানানো সঙ্গেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয় নি তা একেবারে অসত্য আমি বলতে চাই না। হতে পারে। কিন্তু তাঁরা কি এমন কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ করেছেন কোন থানা অফিসারের বিরুদ্ধে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে এবং তাঁরা কি বলতে পারেন যে সে ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি? পুলিশ তো কাশেম-পূজারী-রঞ্জিত ভট্টাচার্যদের জানে। এতদিন তো পূজারীদের কথায় পুলিশ এসেছে এবং শ্রমিকদের ধরে নিয়ে গিয়ে নানাভাবে নির্যাতন করেছে। এখন হয়তো পুলিশ সেই কাণ্ডদায় চলতে ভয় পায় কারণ তারা জানে যে সে ক্ষেত্রে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার তাদের রেহাই দেবে না কারণ দুর্নীতি পরায়ণ ও অত্যাচারী যে সব পুলিশ অসংখ্য দুষ্কৃতিকর্মকার তাদের কাছে তো জ্যোতি বস্তুর নাম এক চরম আতঙ্ক ও দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা। ফলে এখন তাদের ইচ্ছামত সরণ-পূজারী-কাশেম ভট্টাচার্য নির্দেশিত ব্যক্তিকে ধরে এনে নিগৃহীত করার ক্ষমতা নেই। অতএব, এইসব তথ্য-কথিত অফিসারদের ইচ্ছাপূরণ না করার আব এক নাম আইন শৃঙ্খলার অবনতি নয়। কারণ ই, সি, এল-এর চেয়ারম্যান মানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ রামাইজি ভার্মার মতে, "We get best co-operation of police since the left government came in power. People celebrated the life of emergency and there might have been some excess but that should not be generalised and

it can't be said that there any deterioration of law and order.

মিঃ ভার্মার সঙ্গে আমার প্রায় ৭০ মিনিট আলোচনা হয়েছে। নানা প্রশ্ন উঠেছে। খনি পরিচালনার মূলনীতি, জনসংযোগ ব্যবস্থা, খনি শ্রমিকদের মানসিকতা এবং স্টাফ অফিসারদের দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি সব প্রশ্নই উঠেছে এবং মিঃ ভার্মা অত্যন্ত সংযতভাবে মুক্ত মনে কথা বলেছেন। তিনি নিজেই আমার প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, কোন আনরেই ইন্ ট্রেডকে ল এ্যাণ্ড অর্ডারের আওতায় টেনে আনা ঠিক নয়। এম, ডির টেকনিকাল সেক্রেটারী মিঃ এস, সি, গুপ্তাও আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন পি, আর, ও মিঃ জয়ন্ত বসুও। তবে কি ধরে নেব যে, মিঃ ভার্মা ভুল এবং মিঃ সরণ ও মিঃ পূজারী প্রমুখ শিল্পে শৃঙ্খলাভঙ্গকারী মুষ্টিমেয় কয়েকজন অফিসারই ঠিক কথা বলেছেন? কয়লাখনির ষড়যন্ত্রকারী দুষ্কৃতক যেন মনে রাখেন যে দাঁতের গোড়ায় বিষফোঁড়া হলে কোন যন্ত্র দিয়ে দাঁত তুলতে হয়, শল্য চিকিৎসার সেই জ্ঞান-সম্পন্ন সাংবাদিকের সংখ্যা আজকের পশ্চিমবঙ্গে নেহাৎ কম নয়। তাই, সাধু সাবধান।

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী
ও কলাকুশলী সম্মিলনের
কলকাতা জেলা সম্মেলন

২৭শে আগষ্ট কলকাতা ইন্ডেন্টস হলে অস্থিত হলো গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী ও কলাকুশলী সম্মিলনের কলকাতা জেলা সম্মেলন।

সম্মেলনের উদ্বোধন করে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে বলেন যে, জাতীয় জীবন গঠনে সংস্কৃতি কর্মীদের দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লেখক শিল্পীদের বিশেষণ করে তিনি বলেন যে, তথাকথিত বিদ্যাত ও রাষ্ট্রীয় শিরোপাপ্রাপ্ত লেখক শিল্পীদের সঙ্গে মাটির তথা সাধারণ মানুষের আদৌ পরিচয় নেই বলেই তাদের শিল্পে জনজীবন প্রতিফলিত হয় না এবং নোংরা ও অশালীন মানসিকতাই তাদের শিল্পচিন্তার মূল ভিত্তি। অধ্যাপক দে আরও বলেন, জনজীবনের সাদে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থেকো এবং মেহনতী মানুষের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে প্রত্যক্ষ শ্রমিকানার মধ্য দিয়েই অর্জন করতে হবে জীবন শিল্পের উপাদান ও উপকরণ এবং এ যুগের শিল্পচিন্তায় সেটাই হবে প্রধান শর্ত। শিক্ষামন্ত্রী গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী ও কলাকুশলী সম্মিলনের সংগ্রামী অভিযানকে অভিনন্দন জানান।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রীডার নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত আট-ন বছর ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপক রীডার এবং অফিসার পদে প্রার্থীদের নিয়োগ সর্বক্ষেত্রে নীতি সম্মত ভাবে না হওয়ায় শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্রসমাজ নানাভাবে তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ করে এসেছেন। অধুনা সেই অসন্তোষ বিক্ষোভে পরিণত হতে চলেছে। সেই সমস্ত নিয়োগের পেছনে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর হাত আছে। এই গোষ্ঠীর নেতা ও তাঁর বন্ধুবর্গ সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিপর্যস্ত একটি তথাকথিত বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সংগে সম্পর্কিত বলে খবরে প্রকাশ। রাজনৈতিক দলটি বৃহত্তর রাজনীতিতে পৃষ্ঠপোষক হলেও এই গোষ্ঠী কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিতে এখনও সক্রিয়। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন পদে প্রার্থী নিয়োগে তারই প্রমাণ মেলে।

তালিকা দীর্ঘতর না করে গত কয়েক বছরের ও সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। কয়েক বছর আগে জিওগ্রাফী বিভাগের প্রোফেসরের পদে থাকে নিযুক্ত করা হয়েছিলো সেই ক্রীকাননগোপাল বাগচী জিওগ্রাফীর নন, জিওলজীর এম এস সি। ডক্টরেট ডিগ্রীধারী অল্প-অনেক প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল তা আজও রহস্যবৃত। কর্মার বিভাগে প্রোফেসর পদে বাইরে থেকে আহ্বান করে আনা হল ডঃ ক্ষিতিমোহন মুখোপাধ্যায়কে। এই বিভাগে ডি, লিট ডিগ্রীধারী কৃতি ও জনপ্রিয় অধ্যাপক ডঃ অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়ের দাবী অগ্রাহ্য হয়েছিল। এই বিভাগের আরেকজন স্বাতিমান অধ্যাপক জীমণি সান্যালের দাবীও টেকে নি। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে বিখ্যাত কারমাইকেল প্রোফেসর পদে থাকে আনা হল সেই ডঃ ব্রজেননাথ মুখোপাধ্যায় লক্ষীর বরপুত্র হলেও কোন দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন নি, যদিও এই অভিজ্ঞতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর নিয়োগের অন্যতম শর্ত। দীর্ঘদিনের শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ ডক্টরেট ডিগ্রীধারী একাধিক যোগ্য প্রার্থীর দাবী অগ্রাহ্য করে ব্রতীনবাবুকে পুরস্কৃত করার পেছনে কতটা চক্রান্ত কাজ করেছে তা সহজেই অনুমেয়। প্রকৃত বিভাগের লেকচারার ডঃ অনিলচন্দ্র পাল লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বিশ্ববিদ্যে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী, বিশ্ববিদ্যা-

লয়ে অধ্যাপনার অভিজ্ঞতাও তাঁর দীর্ঘদিনের, অথচ তাঁকে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে রীডারের পদ দেওয়া হল জীমতী অমিতা রায়কে। জীমতী রায় এই বিভাগের লেকচারার হলেও শিক্ষাগত যোগ্যতার বিচারে ডঃ পালের সমকক্ষ নন।

অফিসার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি দেখি। রেজিষ্টার পদে ডঃ শংকরীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়োগেও কারচুপি ঘটছে। আটস ও কমান্ডার পোষ্ট প্রাজেক্টের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন ডঃ অনিরুদ্ধ রায়। এই নিয়োগ সংক্রান্ত সিলেকশন কমিটি দু'হবার যাকে মনোনীত করেছিলেন শেষ পর্যন্ত এই পদ তাঁর ভাগ্যে জোটে নি, কোন-চোরা পথে সেই নিয়োগপত্র অনিরুদ্ধবাবুর কাছে পৌঁছছিল তা এখনও তদন্ত সাপেক্ষ। আরও কয়েকজন অফিসার নিয়োগের ব্যাপার হাইকোর্টের বিচার্যবীন বলে খবরে প্রকাশ। কয়েকটি ক্ষেত্রে চ্যান্সেলারের কাছে প্রতিবাদ পত্র পাঠানোও হয়েছে।

এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে পদে পদে এই কুচক্রী দলের অহুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করেছেন। ফলে শিক্ষক, সমাজ, জনসাধারণ শিক্ষার্থী ও কর্মচারীগণ বিভ্রান্ত ও নৈরাশ্রপীড়িত। সম্প্রতি নিযুক্ত উপাচার্য ডঃ স্বপীলকুমার মুখোপাধ্যায় সজ্ঞান ও নির্দলীয় ব্যক্তি হিসেবে খ্যাত এবং তাঁর আগমনে শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারী মহলে আশার সঞ্চার হয়েছিল। সবাই ভেবেছিলেন এবার সুবিচার পাওয়া যাবে। কিন্তু যে কুখ্যাত গোষ্ঠী এতাবৎ কাল নিয়োগের ক্ষেত্রে কলকাতা নেড়ে এসেছে বর্তমান উপাচার্যের আমলেও তাঁর অজান্তে সেই গোষ্ঠীটিই আগের মত সমান সক্রিয়।

বর্তমান উপাচার্যের কর্মভার গ্রহণের আগে থেকেই অনেকগুলি সিলেকশন কমিটি গঠিত হয়ে আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলিতে এমন ভাবে বিশেষজ্ঞ নির্বাচন করা হয়েছিল যাতে এই রাজনৈতিক দলটির অহুগ্রহ সমর্থকরা জয়মাল্যে সজ্জিত হতে পারেন। এই অবস্থায় পূর্ব নির্ধারিত প্ল্যান অনুযায়ী সংস্কৃত বিভাগে নিয়োগ করা হল ডঃ শিবেন্দ্রনাথ বোমালকে। সুবিচার পেলেন না অধ্যাপক জীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য দেশে ও বিদেশে ধার পাণ্ডিত্যের

খ্যাতি। এডুকেশন বিভাগের বিশেষ কৃতি শিক্ষক ডঃ গৌরবরণ কপাটের ভাগ্যেও প্রোফেসর হওয়া ঘটলো না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কটি পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের সংগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং শিক্ষকতার দক্ষতাও তাঁর দীর্ঘদিনের। এই গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক শিকার ভাবাত্তা বিভাগের রীডার ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়। ভাষা বিজ্ঞানে সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ডঃ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিভাগের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শিক্ষক। তিনি যোগ্যতম প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও থরথরা অধ্যাপক পদে দ্বিতীয় মনোনয়ন পেলেন, প্রথম মনোনয়ন দেওয়া হল ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুকে। ডঃ বসু আধুনিক ভাষা বিজ্ঞান সম্বন্ধে পারদর্শী নন এবং ইতিপূর্বে এই পদে তাঁর প্রার্থীপদ চার চারবার খারিজ হয়েছিল। ডঃ চট্টোপাধ্যায় চতুর্থ বারে প্রার্থী হিসেবে আবেদন পত্র পেশ করেছিলেন এবং সেইবারে নির্বাচক মণ্ডলীর বিশেষজ্ঞ সদস্যরা তাঁকেই একমাত্র মনোনয়ন দিলেও পূর্বোক্ত গোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত তাঁকে এই পদে নিযুক্ত হতে দেয় নি। এই গোষ্ঠীর চক্রান্তে শেষ পর্যন্ত দ্বিজেনবাবু থরথরা অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হতে চলেছেন।

ইংরেজী বিভাগের লেকচারার ডঃ শিশির দাস কি দোষ করেছেন? ডঃ দাস স্বাতিমান ও পণ্ডিত ব্যক্তি এবং উক্ত বিভাগের সর্বোত্তম শিক্ষক। তাঁর রীডার না হবার পেছনেও এরূপ পূর্ণগঠিত সিলেকশন কমিটির কারসাজি ছিল—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। যে যে ক্ষেত্রে পূর্ব বর্ণিত দলটি সিলেকশন কমিটি গঠনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, সেই সেই ক্ষেত্রে তারা নানা উপায় অবলম্বন করে চলেছে। উদাহরণ স্বরূপ কর্মার বিভাগে নিজেদের সমর্থক ব্যক্তি রীডার পদে নির্বাচিত না হওয়ায় তারা স্বাধ্যত মনোনীত প্রার্থী যাতে সিঙিকেট কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন সেই ব্যবস্থা নিয়েছে। দর্শন বিভাগে দ্বিতীয় মনোনয়ন পেয়েছেন এই গোষ্ঠীর অহুগ্রহ ও সাহায্যপুষ্ট প্রার্থী ডঃ শচীন গাঙ্গুলী। প্রথম মনোনয়ন পেয়েছেন উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শিবজীবন ভট্টাচার্য। শিবজীবনবাবু যাতে শোগদান না করেন তাঁর জন্য তাঁকে ভয় দেখানো থেকে শুরু করে নানা চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। নৈরাশ্রপীড়িত শিক্ষকমণ্ডলী কি উপাচার্যের কাছে সুবিচার পাবেন না? তথাকথিত বামপন্থী দলটিই কি এখনও তাঁদের একছত্র রাজত্ব চালিয়ে যাবে?

কলকাতা পৌরসভায় কংগ্রেসীদের আরও কেলেঙ্কারীর কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলিকাতা কর্পোরেশনের কংগ্রেসী মন্ত্রণা মধু চ্যাটার্জী প্রাক্তন মন্ত্রী স্বতন্ত্র মুখার্জীর বশব্দ চার্টে-গিরি করে তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেছিলেন। হয় নোভ দেখিয়ে আর তাতে কাজ না হলে গুণ্ডা লেলিয়ে বেশ কয়েকটি ইউনিয়ন তার কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে ভিড়িয়েছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পৌরসভায় প্রায় ৬২টি রেজিষ্টার্ড ইউনিয়ন আছে। তার মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ শ্রমিক কর্মচারী “জয়েন্ট কমিটি অফ এমপ্লয়িস ও ওয়াকাস”-এর মধ্য সংগঠিত এবং এ-নেতৃত্বে আছে সি, পি, এম, সি, পি, আই, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি। আর বাকী ২৫ ভাগ কর্মচারী কংগ্রেসের এই কো-অর্ডিনেশনে। হুঁত্যা এই যে কো-অর্ডিনেশনের নেতৃত্বে এই বহুনির্মিত মধু চ্যাটার্জীর সঙ্গে রয়েছেন জনতা পার্টির বেলেঘাটা কেন্দ্রের পরাজিত প্রার্থী প্রমোদনা বসু। মধু প্রেমনারায়ণ শেষ শিকার হইয়া এসে-মেট ইন্সপেক্টরদের ইউনিয়নটি। বাবুদের এই ইউনিয়নটি ছোট্ট হলেও কর্পোরেশনের সামগ্রিক আয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ এই ইউনিয়নের সদস্যরাই আয় করেন। স্বতরাং এই ইউনিয়নটি কুক্ষিগত করায় মধুবাবুর ডেপুটি কমিশনার (রেভিনিউ)-এর কাছে এ্যাসেসমেন্ট কেস গুনানী করে টু পাইস রোজগারের সুবিধা হয়।

কুমুদশঙ্কর রায় বসু হাসপাতালে

রোগীদের অনশন চলছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

যাদবপুর কুমুদশঙ্কর রায় টি বি হাসপাতালের স্বতন্ত্র রোগীরা তাদের স্বয়ম খাদ্য, স্বচিকিৎসা, ওষুধ পাওয়ার সুযোগ এবং সর্বোপরি হাসপাতালের বর্তমান ট্রাষ্টি বোর্ড ভেঙ্গে দিয়ে জাতীয়করণের দাবীতে আজ প্রায় মাস তিনেক ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান হাসপাতালের দুর্নীতিপরায়ণ ট্রাষ্টি বোর্ড রোগীদের দৈনিক খাদ্য ৩৫০০ ক্যালোরী থেকে আজ ১৮০০ ক্যালোরীতে নামিয়ে এনেছেন। জমাদার ওয়ার্ডবয়দের সাপ্তাহিক বেতন ৪৪ টাকা থেকে ২৭ টাকায় নামিয়েছেন। এই অবস্থায় স্থায়ী প্রতিকারের জন্য

আর এ্যাসেসমেন্টের এই ইউনিয়নটি মিথ্যা আশাস দিয়ে কো-অর্ডিনেশনের খোঁজাড়ে পুরে দিতে পারায় সম্পাদক অমিত ব্যানার্জীর ববাত খোলে। মধু-সাকরেদদের ভোলেন না। অমিত ব্যানার্জীকে প্রথমে “কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির” অন্যতম ডাইরেক্টর ও পরে অপকর্ম পরিহার করার জন্য চেয়ারম্যান করে দিয়েছেন। কিন্তু মধু-অমিতের এই তথের রাজস্ব বাদ সেধেছেন সোসাইটির সাধারণ সদস্যরা। মধু-অমিতরা গুণ্ডা নিয়ে দাঙ্গা করে ৭৬ সালের এমার্জেন্সীর সুযোগে যে কুৎসিতভাবে সোসাইটি দখল করেছিলেন তা সকলের মনে দগ্ধ করছিল। এরপর যখন তারা দেখলেন দীঘার বিশ্রামগৃহ সারানো, অনামী প্রতিষ্ঠানে টাকা লগ্নী, দলীয় লোকদের বহু টাকার ঋণ ব্যাড ডেট বলে মাপ করে দেওয়া প্রভৃতি অত্যাচার পথে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যবহার হচ্ছে তখন তারা আর চুপ থাকতে পারলেন না। তারা কো-অপারেটিভ-সমূহের রেজিষ্ট্রারের কাছে সব ঘটনা জানিয়ে অবিলম্বে হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন করেছেন। সদস্যরা চান সোসাইটির আগামী নির্বাচনের আগেই আয়ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা কবে দাগী আসামীদের নির্বাচনে দাঁড়াবার অযোগ্য বলে নির্ধারিত করা হোক।

রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী ভট্টাচার্য ট্রাষ্টি বোর্ড ভেঙ্গে না দিয়ে একজন সরকারী প্রশাসক নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু হাসপাতালের বর্তমান ৭৫ জন রোগী সহ কর্মচারীরা সকলেই মনে করেন যে এরকলে সমস্ত স্বরাহা হবে না, তাই রোগীরা তাঁদের মূল শ্লোগান ট্রাষ্টি বোর্ড ভেঙ্গে দিয়ে জাতীয়করণের দাবীতে ২৫শে আগষ্ট থেকে লাগাতার আন্দোলন অনশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রথম দিন প্রায় বিশজন অপেক্ষাকৃত স্বস্থ রোগী এই অনশন শুরু করেন এবং পরে প্রত্যেক দিনই কয়েকজন করে অনশনে যোগ দিয়েছেন।

দানিকেন তত্ত্বের আলোকে মহাভাবতের স্বর্গ ও দেবতা বীরেন্দ্র নিখ

স্বর্গীয় রকেট

"And Enoch walked with God; and he was not; for God took him." (Gen. ch 5-24).

ইজেকিয়েল সুদাপ্রভু মহাকাশ-যানটিকে অবতরণ করতে দেখেন পাঁচশ-ছয়শ ঋ: পূর্বাব্দে। এনক কিন্তু ঢের পূর্ববর্তী। মহাপ্রাচীন যুগীয় নোয়ার তিনি পূর্বপুরুষ, ঠাকুরদার বাবা, স্বয়ং আদমের ষষ্ঠ উত্তরপুরুষ, যেরদের পুত্র। এই এনক তিনশ বছর ধরে 'ঈশ্বরের সহিত গমনা-গমন' করেছেন। তিনশ পয়ষটি বছর বয়সে ঈশ্বর তাঁকে নিয়ে স্বর্গে চলে গেছেন। সুতরাং 'পরে তিনি আর রহিলেন না, কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।' (আদি-পুস্তক, ৫ অ, ২৪। ভারতের বাইবেল সোসাইটি মুদ্রিত: 'ধর্মপুস্তক' বা বাইবেল)।

ঘটনাটি রুশ পদার্থবিদ আগরে-ষ্টকে চিত্তাধিত করে। তিনি এই ঘটনাটিকেও মহাকাশযানের সম্ভাব্য অবতরণ সম্পর্কিত তাঁর অস্বাভাবিক নির্ভর রচনাটির অঙ্গীভূত করে নিয়ে লেখেন: In many ancient documents we find myths, legends and references to beings descending from the sky, and people taken up to heaven. প্রসঙ্গত: আরও বলেন, পুরাকীর্তি ও পুরানো কথায় কালক্রমে বৈজ্ঞানিক সত্যের মর্দাদা লাভ করে। এমনিই একটি প্রাচীন তথ্য আজ পরীক্ষিত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তথ্যটি মঙ্গল গ্রহের উপগ্রহ সম্পর্কিত।

আমরা চিরকাল শুনে আসছি মঙ্গলের মায়া এই পৃথিবীতে একদিন পদার্পণ করেছিলেন। মঙ্গল থেকে এসেছিলেন নাকি যুরোপীয় দেবতা। আজ সেকথা গালগল্প। কিন্তু পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ প্রকাণ্ড একটি মহাকাশচারীর (এরকম পোষাক পরিহিত) ছবি দেখে তাকে পুণ্যবৃক্ষের মহাকাশচারী বলে বৈজ্ঞানিকরা সন্দেহ করতেই পারেন। তাই

আগরেষ্ট বলেন, "...who knows but that the ancient rock drawings studied by professor Henri Lhote of France present a record of a visit from the blue yonder? ...In fact, it (the old rock portrait) looks rather like a man dressed in a kind of space suit; a member of an extra-terrestrial landing party on our planet? ...Henri Lhote might not have been so far off the mark when he named the huge drawing 'the great Martian God'." এই অস্বাভাবিক অবস্থা এখনো কোনো প্রমাণ নয়। কিন্তু প্রাচীন উপকথা এবং জ্যোতির্বিদরা একদিন যে বলেছিলেন, মঙ্গলের উপগ্রহ আছে, সে কথা আজ আবিস্কৃত সত্য। আরও মঙ্গল ব্যাপার, উপগ্রহ ছটির রকম স্কম অপ্রাকৃতিক। তাব মানে আমরা যেমন উপগ্রহ স্থাপন কবছি মহাকাশে ওহুটিও কি তেমনি আদি মহাকাশ-যুগে মঙ্গলের কক্ষপথে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান দ্বারা স্থাপিত উপগ্রহ ছিল?

এইসব প্রশ্ন উঠছে। এসব প্রশ্ন উদ্ধার করলাম এনকেব স্বর্গযাত্রার ভাববাদী ব্যাখ্যার প্রতিপক্ষে। আমবা বলতে চেয়েছি; এনক, এজরা, অর্জুন, এতানা আর এলিজুরা স্বর্গে গেছিলেন বলে যে পুরাকীর্তি প্রচলিত, আজ তার ভিন্ন অর্থও অস্বাভাবিক করার কারণ দেখা দিয়েছে। আজ বোঝা যাচ্ছে, উল্লিখিত পিতামহবন্দ প্রকৃতপক্ষে দূর নক্ষত্রলোক থেকে সমাগত কতিপয় মহাকাশচারীর দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত হয়েছিলেন এবং তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মহাকাশ-স্বর্গে। আর এই বক্তব্যের সমর্থনে তাই আমাদের পরীক্ষা করতে হয় সেইসব স্বর্গীয় বানগুলিকে যেগুলি যুধিষ্ঠির প্রমুখকে তুলে নিয়ে যায় তথাকথিত স্বর্গধামে।

ইজেকিয়েল দৃষ্ট মহাকাশযানটির দুরন্ত গতি ও ওজ্জ্বল্যের সঙ্গে অর্জুনের

দেখা ইঙ্গ প্রেরিত মাতলিব মহাকাশ রথটির সাদৃশ্য খোজার চেষ্টা কবেছি আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায়। এবার এনক অবলোকিত দেবযানটির খবর নিয়ে জানবার চেষ্টা কবব, তিনটি দেবযানের মধ্যে এমন কিছু আছে কিনা যা রথগুলিকে দেবযানের মর্দাদা থেকে নামিয়ে মহাকাশযানের মর্ত্যমহিমা প্রদান করতে পারে। স্বর্গেব সন্ধানের বার হয়েছি, স্বর্গীয় যানগুলির তথ্যতন্ময় না নিয়ে সেখানে পৌঁছাই কী করে? তাই স্বর্গ কোথায়, এ প্রশ্নে আসার জগুই স্বর্গীয় যানগুলি কী বস্তু তা জানা দরকার।

মাতলির রথের অভ্যন্তরে অর্জুন দেখেছিলেন, "অসি, শক্তি, গদা, প্রাস, বজ্র ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি অস্ত্র সকল এবং মহাকায় জলিতানন অতি ভীষণ-কায় নাগগণকে"। দেখেছিলেন সেখানে, "ধবলোপলসমূহ (শেত-প্রস্তর) দেদীপ্যমান রহিয়াছে।"

এনকের বর্ণনাব সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে তাঁর দেখা মহাকাশযানেও একই জাতের বিস্ময়কর জিনিস তিনিও লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি দেখেন, "অগ্নিজিহ্বা বেষ্টিত ফটিক নির্মিত প্রাচীর।" 'অগ্নিজিহ্বার' সঙ্গে 'জলিতানন ভীষণকায় নাগগণের' কি সাদৃশ্য ধরা পড়ে না? আর যেত প্রস্তরের সঙ্গে ফটিক নির্মিত প্রাচীরের তফাৎ কতটুকু?

ইজেকিয়েল দৃষ্ট মহাকাশযানের 'মন্তকের উপরে এক বিতানের আকৃতি ছিল, তাহা ফটিকের আভার ন্যায় তাহাদের (নভশরদের) মন্তকের উপরে বিস্তারিত ছিল।" অর্থাৎ ফটিকসদৃশ বস্তু তাঁরা তিন জগুই লক্ষ্য করেছিলেন বিভিন্ন কালের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে। দানিকেন ঐ ফটিক নির্মিত বস্তুটিকে মহাকাশযানের স্বচ্ছ আবরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রাচীন প্রত্যক্ষদর্শীদের সকলেই দেবযানে অগ্নি বিদ্যুৎ ও প্রজ্জ্বলন্ত বস্তু দেখেছেন। সেই অগ্নিময় উত্তপ্ত শিখা, প্রজ্জ্বলন্ত 'অঙ্গার সদৃশ' বস্তু

এবং 'জলিতানন নাগগণ'হেন বৈজ্ঞানিক তার (?) গুলির ব্যাখ্যা প্রথ্যাত বকেট বিজ্ঞানী রুম্বিশের বক্তব্যের মধ্যে খোজ করা যেতে পারে। ইজেকিয়েল দৃষ্ট 'প্রাণীগণের মধ্যস্থানে প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার সদৃশ কী এক বস্তুকে' ব্যাখ্যা কবে রুম্বিশ লিখেছেন: "শক্তি উৎপাদক যন্ত্রের গনগনে বিকিরক এবং নিয়ন্ত্রক রকেটের ফ্লিক দেখেছেন তিনি। বিকিরকের উচ্চ তাপের কথা বিচার করলে, 'প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারের' সঙ্গে তুলনা নিতুল এবং 'স্বাধা'। (তখন স্বর্গ খুলিয়া গেল, রুম্বিশ। অল্পবাদী অজিত দত্ত। (লোকায়ত প্রকাশন)। 'নাগগণ' বলতে অর্জুন, কি সর্পিল 'বৈজ্ঞানিক কয়েলকেই বুঝিয়েছিলেন? মহাভারতে নাগ শব্দ সর্পাকার বস্তুকে নির্দেশ করে। যেমন, আগেই বলেছি, আশীবিষ সদৃশ অস্ত্র বলতে সর্পাস্ত্র বোঝায় না। 'নাগপাশ'ও বৈজ্ঞানিক পাশ কিনা একথা আজ আমাদের ভাবতে পারে। 'নাগপাশাবন্ধ বন্দী সর্পাহত হই না, কেবল আটক থাকেন। নাগ 'শব্দ' অনার্থ টোটম হিসেবেও ব্যবহৃত। তাই নাগজাতি বলতে এক অনার্থ জাতিকে বোঝায়, যাদের আবাস ছিল নর্মদা নদীর দক্ষিণ প্রান্তে। মান্ধাতাপুত্র পুরুকুৎসের সঙ্গে এরী নাগকন্যা নর্মদার বিবাহ দেন।

ইঙ্গরথের বাস্তবতা সম্পর্কে কিছুটা বৈজ্ঞানিক ধারণা গ্রহণের জগুই এঁতো কথা। নচেৎ এসব কাজ বৈজ্ঞানিকের, আমার কর্তব্য তথ্যাসংগ্ৰহ। প্রসঙ্গত আমরা বুঝতে পারি মাতলির রথ সাধারণ বিমান ছিল না। তাহলে অর্জুন এই রথ দেখে চমৎকৃত বোধ করতেন না। তিনি আশ্চর্যের ঢের বিমান দেখেছেন। কিন্তু মাতলিব রথ দেখে তাঁর মনে হয়েছে, "এই অস্বস্তমরথ শত শত অশ্বমেধ ও রাজহৃদয় যজ্ঞেও দুর্লভ।" (বন, কালী)। সুতরাং অর্জুনের কাছ থেকেই আমরা জানতে পারি, ইঙ্গ প্রেরিত মাতলির রথ অসাধারণ উন্নতমানের মহাকাশযান। এ রথ অর্জুনকে যে উচ্চতম নক্ষত্রলোকে নিয়ে যায় তা সাধারণ বিমানের পক্ষে অনতিক্রমীয়।

"ইঙ্গ সারথি মাতলি... রথাবোহন পূর্বক রশ্মিধাবা অশ্বসকল সংযত" করেন। ঘোড়ার পিঠে বিদ্যুতের চাবুক? না, নতুন পাঠ হবৈ, রশ্মিধারা তিনি তাঁর যান্ত্রিক যানটির ইঞ্জিনগুলি চালু করলেন। ইঞ্জিনকেই যে অশ্ব বলা হয়েছে তা নিয়ে আর বিবাদ করা যায় না। তাই তো অগ্নি উদগীরণ হয় রথ

থেকে। তাই সে বস্তু 'স্বর্ষ সংকাশ দিব্যরথ'।" সে যুগে যান মাত্রই রথ, সুতরাং ইঞ্জিনের পক্ষে 'অশ্ব' অভিধা লাভ করা এমন কিছু অসম্ভব নয়।

মহাকাশে নিয়ে গিয়ে মাতলি কুরুনন্দনকে কী দেখালেন? মহাভারতের প্রতিবেদন: "কুরুনন্দন সেই স্বর্ষসংকাশ দিব্যরথে নীত হইয়া আকাশপথে গমন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে মর্ত্যালোকদিগের দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইয়া অদ্রুতকণ সহস্র সহস্র (অনেকানেক) বিমান সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।" সেই নক্ষত্রলোকে "স্বর্ষ চন্দ্র বা পাবকের আলোক নাই; -লোকসকল কেবল স্ব-প্রভার দ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন"

মহাকাশ বিজ্ঞানীরাই বলতে পাবেন অর্জুন মহাকাশে কী জাতের উজ্জল বস্তু লক্ষ্য করেছিলেন। সেগুলি কি বিমান, না কি আব কিছ? উজ্জীন কিছু মহাকাশভেলা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ কবলেও করে থাকতে পারে। বিমান ও মহাকাশ ভেলার গমনাগমন তখন স্বচ্ছন্দ নিত্য ঘটনা বলেই পুরা পৃথিবী থেকে জানা যায়। ইঙ্গলোকে গিয়ে অর্জুন একটি কর্মব্যস্ত বিমানক্ষেত্র দেখেছিলেন। দেখেছিলেন, কিছু বিমান উডছে, কিছু নামছে, কিছু বা অবস্থানরত। হিমালয়ের পার্বত্যভূমিতে অবস্থিত ব্রহ্মলোকে গিয়ে মুনরাও দেখে এসেছেন, সে প্রদেশ শত শত বিমানে পূর্ণ:

"বিমান শত সংবাধাঃ গীতশ্বন নিনাদিতাম্" (সিদ্ধান্তবাগীশ)। (চলবে)

হাসপাতালে অব্যবস্থা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দর্পণের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে যে, শ্রীমতী সত্যবান পাইন তাঁর বাড়িতে (১০১২ এ-প্যারীমোইন হ্রর লেন) একটি ছুফটিনায় আহত হয়ে গত ১৭ই আগস্ট মধ্যাহ্ন ছটার যেডি-কেল কলেজের এমার্জেন্সীতে গেলে তাঁর ক্ষতস্থান সেলাই করে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাঁকে কোন টিকিট বা কোনরকম কাগজপত্র দেওয়া হয় না। এই অবস্থায় বাড়িতে অন্য ডাক্তারের কাছে দেখাতে গিয়ে শ্রীমতী পাইনকে যু'স্থলে পড়তে হয়, কারণ সকলেই হাসপাতালেব কাগজ দেখতে চান। আরও অভিযোগ যে, তাঁকে কোন ইলেকশান না দিয়ে শুধু ছটো ট্যাবলেট দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, হাসপাতালে আব আসবার দরকার নাই, বাইরে সেলাই কাটিয়ে নেবেন। হাসপাতালের রেকর্ড বুকও শ্রীমতী পাইনের নাম ঠিকানা লেখা হয় না বলে অভিযোগ।

দশ+দুই স্তরের শিক্ষা : কয়েকটি প্রশ্ন ও প্রস্তাব

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

মাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রমের বোকা, উচ্চ মাধ্যমিকের পরিচালনা ও রূপায়ণ ব্যবস্থায় প্রায় অচলাবস্থার সংকট এড়ানোর সদিচ্ছা নিয়ে সম্প্রতি পুন-মূল্যায়নের উদ্যোগ দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ১০+২+৩ স্তরের সমগ্র ধারার দুর্বলতা, অসঙ্গতি ও কার্যকর বাধাগুলি খতিয়ে দেখার জন্য প্রথমে সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির সঙ্গে আলোচনা করেন ও পরে স্থপারিশের জন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিটি নিয়োগ করেন। এ ব্যাপারে রাজ্যস্তরেও নতুন করে চিন্তাভাবনা চলছে বলে জানা গেছে।

মাধ্যমিক স্তরে প্যাকেজ ডিল বা মোড়ক প্রথা গেছে ভালই হয়েছে। ওতে এক-একটি দিকে বিশেষ যত্ন দিয়ে কিছু সংখ্যক ভাল ছাত্রছাত্রী বানানো হয়। আমরা চাই সকলের জন্য সমান ধরনের পূর্ণ মাধ্যমিক বা সাধারণ শিক্ষা স্থানান্তরিত করতে। তাই পুরোনো একাদশী মোড়ক গেছে ভালই হয়েছে। প্রবর্তনের সময় থেকেই নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি সহ বহু গণতান্ত্রিক মানুষ মাধ্যমিক স্তরেই এই ধরনের বিশেষীকরণের বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন।

১৯৪৭ সালে কমতা হস্তান্তরের পর কংগ্রেস সরকারের অল্পগত শিক্ষাবিদদের মাধ্যম মাধ্যমিক স্তরেই বিশেষীকরণের ঝোঁক এমনই পেয়ে বসেছিল যে, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থায় বুদ্ধি পরীক্ষা ও বিশেষীকরণ না থাকার ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শিক্ষাবিসয়ক রিপোর্টে সেটাকে দুর্বলতা বলে মন্তব্য করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে ১৯৫৬ সালে হুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বে ভারত সরকারের টিম সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা দেখতে গিয়েছিলেন এবং কবীর সাহেব পরের বছর 'ট্রেণ্ডস অব সোভিয়েত এডুকেশন' নামে ভারত সরকারের পক্ষে 'যে বই লেখেন তাতেই ঐ রকম অগণতান্ত্রিক ও অজ্ঞানিক মন্তব্য করেন।

আমরা জানি, পূর্ণ বিকশিত বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের সমাজে প্রভাবশালী সরকারী পদগুলিতে কিছু সংখ্যক বাছাই লোকের দরকার এবং ইংলও প্রভৃতি দেশে ঐ ধরনের বিশেষীকরণ ও বুদ্ধির মাপ অস্থায়ী বিভিন্ন থাক তৈরীর ব্যবস্থা থাকে। ব্রিটিশ আমলের কথা ছেড়েই দিলাম, এমন কি স্বাধীনতার পরেও আমাদের মত

পশ্চাৎপদ উন্নয়নশীল অর্থনীতির সমাজে ঐ ধরনের ব্যবস্থা আমদানীর চেষ্টা হয়েছে।

অথচ যে সময়ে সে-শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি ভারত সরকার আকৃষ্ট হয়েছিলেন, সেই সময়েই সেই থাক-ভাগের বিরুদ্ধে সারা ইউরোপের গণতান্ত্রিক শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণ তীব্র বিক্ষোভ আন্দোলন করছেন; এবং যে সোভিয়েত রাশিয়ার সকলের জন্য সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষাকে হুমায়ুন কবীর প্রমুখ ভারতীয় শিক্ষাবিদরা 'দুর্বলতা' বলেছেন, সেই সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৫৭ সালের অক্টোবরে মহাকাশে প্রথম উপগ্রহ ছেড়ে সারা দুনিয়াকে বিশ্বয়ে হতবাক করেছে। সেই সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েকটি পত্র-পত্রিকা এমন মন্তব্যও করেছিল যে, উচ্চ ক্ষমতার পদার্থ বিজ্ঞানে সোভিয়েত রাশিয়া এত এগিয়ে গেছে আমেরিকার সেখানে পৌছতে আরও ১০ বছর লাগবে। অতঃপর এই ঘটনায় সচকিত হয়ে উন্নত ধন-তন্ত্রের দেশগুলিও তাদের শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তা দেখেই ভারত সরকারও প্রেম রূপালের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দলকে আবার সোভিয়েত রাশিয়ায় পাঠায়। তারা এসে রিপোর্ট দেন—মাহুকের জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা অসীম, এই তত্ত্ব সোভিয়েত শিক্ষার বনিয়াদ রূপে কাজ করেছে। উল্লেখ-যোগ্য, ১৯৬৪-৬৬ সালের কোঠারী বা জাতীয় শিক্ষা কমিশনে এই অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে। তাতে মেনে নেওয়া হয়েছে: এত দিনের চালু ধারণা—প্রাথমিক শিক্ষা সাধারণ, আর মাধ্যমিক স্তর প্রবণতা ও বুদ্ধির ছাপ অস্থায়ী বিশেষ ধরনের, এটা ভুল এবং প্রথম স্তরের শিক্ষা জনগণের এবং দ্বিতীয় স্তর থেকেই উচ্চ বিশেষ মহলের, এই পার্থক্য ও ভাঙা দরকার।

আমরা মনে করি দেশ, কাঠামো ও ব্যবহারিক স্তরের ভেদ মেনেই প্রগতিশীল শিক্ষা হবে, অগ্রগামী সমাজ বিকাশের স্তর অস্থায়ী গণ-তান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব প্রতিফলন। কোঠারী কমিশনের (১৯৬৪-৬৬) স্থপারিশে সাধারণভাবে এটা থাকলেও এতে যে সীমিত আসনের শিক্ষা সংকোচনকে অন্তরঙ্গ প্রতিভার মাপে বিবেচনা করতে বলা হয়েছে সেখানেই এর সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা। আমাদের লক্ষ্য, ১৮৩৫ সালের মেকলের মিনিট-

এর (উপর থেকে চুইয়ে পড়া) ঔরবে জাত ঔপনিবেশিক শিক্ষার অবশেষ-গুলির উচ্ছেদ করে জাতীয়, গণ-তান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। এ শিক্ষা হবে জীবন-সমাজ ও উৎপাদনের গতিশীলতার সঙ্গে তাল রেখে চলা—ক্রমবিবর্তিত প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের উপযুক্ত জ্ঞান, দক্ষতা ও চেতনা আগানোর উপযোগী সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা। একথা সম্মিলিত জাতিসত্ত্বের মানবাধিকার সনদের ২৬নং ধারায় ঘোষিত হলেও দুঃখের কথা আমাদের পক্ষম। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৪-৭৯) শিক্ষা সংস্কৃতির প্রক্ষেপে ৭১ শতাংশ নিরক্ষরের দেশে 'শিক্ষার মনোময়নের' নামে শিক্ষার স্বযোগকে সীমিত ও সংকুচিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। শিক্ষার বাজেটে অর্থবরাদ্দের প্রক্ষেপে এই দৃষ্টি-ভঙ্গী প্রকট। ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি ৩৩২০ কোটি টাকা ব্যয়ের স্থপারিশ করলেও জাতীয় উন্নয়ন বোর্ড তা নাকচ করে ২২০০ কোটি বরাদ্দ করে। ১৯৭৩ সালে উপদেষ্টা কমিটির সভায় এই টাকাও পাওয়া যাবে কিনা সংশয় প্রকাশ করে। অতঃপর ১০+২+৩ কাঠামোর কেন্দ্রীয় শিক্ষাবোর্ড 'সবচেয়ে দুর্বলতম গ্রন্থী' মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ৬০০ কোটি টাকা চেয়ে বরাদ্দ হিসাবে পেয়েছে মাত্র ৬০০ কোটি। অবশ্য যে দেশে ১৯৭২-৭৩ সালে মাত্র ২৭টি বৃহৎ পুঞ্জিপতি পরিবারেরই সম্পত্তির পরিমাণ থাকে ৩৫১৬ কোটি টাকা এবং দু'তিন বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৯৬৬ কোটি, সেই দেশে জাতীয় আয়ের মাত্র ৩ শতাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে এবং সাম্প্রতিক সংসদীয় কমিটির ১০ শতাংশের দাবী নাকচ হয়ে যাবে এতে বিশ্বাসের কিছু নেই। কিন্তু মাত্র ৫ শতাংশ বৃহৎ ভূস্বামী ও পুঞ্জিপতি পরিবারের দেশে শাসকশ্রেণীর পা-চাটা গান্ধীবাদী শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণ এক কোটি বেকারের, চল্লিশ কোটি দারিদ্র্যসীমার নীচে ও নিরক্ষরতার অন্ধকারে বস-বাসকারী দুর্দশাগ্রস্ত মাহুকের বুকের উপর দাঁড়িয়ে যখন বলেন: "Where there is will, there is a way. Money is never a bar to real progress a farmer's son who passes B. A, becomes unfit for unsophisticated farmings; the housewife's daughter who passes

M. A. looks down on housewifery. It is anti-national" (G. L., Bakshi, chairman, CBSED) এবং এরাই যখন পঞ্চতন্ত্রের নীতিবাক্য উদ্ধৃত করেন: "নিচের মহলের মানুষ বাধাবিহীন ভয়ে কাজ নিতে ভয় পায়; মাঝারি মানুষ শুরু করে কিন্তু মাঝপথে ছেড়ে দেয়; কিন্তু উচ্চ মহলের জ্ঞানী-গুণীরা বাধা বিপর্যয়ে নির্ভয়ে কাজকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়"—তখন স্বথেষ্ট প্রশ্ন জাগে, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থারই উত্তরসাম্যক এইসব উচ্চ মহলের জ্ঞানী-গুণীরাই কি বর্তমান কালের বিজ্ঞান ও টেকনলজির শিক্ষায় 'বিপ্লব' আনার ভগীরথ?

বুর্জোয়া সমাজের ভিতরকার টানাপোড়েন থেকে কিছু দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী এগিয়েও আসেন। ১৯৬৪-৬৬ সালে কোঠারী কমিশনের আগেই ডঃ সম্পূর্ণানন্দের সভাপতিত্বে গঠিত 'ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন কমিটি' বলেছিল: "from the point of view of national integration 10+2+3 system should be adopted for schools and Colleges in all parts of our country."

আমরা মনে করি, ১০ ক্লাশের ব্যবস্থায় সকলের জন্য পূর্ণ সাধারণ শিক্ষা স্থানান্তরিত উন্নত করতে ১১-১২ ক্লাশের দুই খাতে (সাধারণ ও বুদ্ধিমূলক) ছেদহীনভাবে, তাকে জন্ম-বিকশিত করার লক্ষ্যে গোটা মাধ্যমিক স্তরের পরিকল্পনাই স্বচ্ছ, গণ-তান্ত্রিক ও বিজ্ঞানসম্মত কাঠামো। তা না করে ৮-ক্লাশের পর একবার পাবলিক পরীক্ষা করে (এ প্রস্তাবও উঠেছে) ১০-ক্লাশের পর আর একবার এবং ১২-ক্লাশের পর বৃত্তিমূলক খাতের অংশকে থামিয়ে ও থসিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের নামে শিক্ষা-সংকোচনের জাতিভ্রোহিতা গণ-তান্ত্রিক বিবেকী জনগণ আদৌ বরদাশ্ত করতে পারেন কি? মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বজনীনতা ও সমদৃষ্টিভঙ্গীর যে নমুনা সাম্প্রতিক সার্ভে রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায় তা ভয়াবহ। তারা বলেছেন, যেখানে প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যায় ১টি করে হাইস্কুল, ২টি করে জুনিয়র হাইস্কুল করা দরকার সেখানে অহুমোদনকে সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে; পশ্চাৎপদ এলাকায় শিক্ষাকে না ছড়িয়ে কায়মী স্বার্থের বা স্থবিধাভোগী শক্তির চাপে এলোমেলোভাবে যেখানে-সেখানে কিছু স্কুলের অহ-

মোদন দেখা হয়েছে এবং চলছেও; এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা বোর্ড হয় ঠুটো জগন্নাথ, নয়ত ওড় বুক-এ থাকার জন্য মদত দিয়ে যাচ্ছে, এরই সঙ্গে রয়েছে 'বিশেষ' গঠনতন্ত্রের স্বৈরাচারী ঘাটি, যেগুলো ব্রেন ড্রেন, সি আই এ ও দুর্নীতিবাজদের ব্যবসায় ছাড়া কিছু নয়। এইসব 'উচ্চ মহলের জ্ঞানীগুণীরাই' কি জাতীয় সংহতির শঙ্করাচার্য?

পশ্চিমবাংলায় মাতৃভাষা বাংলাকে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন হিসাবে আব-শ্রিক না করার যুক্তি হিসাবে বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেস সরকারের অল্প-গত শিক্ষাবিদ জ্ঞানীগুণীরা বলে-ছেন: ওতে ইংরাজী মাধ্যম বিভা-লয়ের ছাত্রছাত্রীদের (২.৫%) উপর অবিচার হবে। ওদের উপর বাংলায় পড়ার ও পরীক্ষার চাপ দিলে উন্নত বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কারণ এইসব ভাল ভাল ছেলে-রাই দেশের বিজ্ঞান ও টেকনলজিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। আসলে এইসব সরকারী নীতি নির্ধারক ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েদের টিকিট আমেরিকা, ব্রুটম, পশ্চিম জার্মানি, কানাডা প্রভৃতি দেশের জন্য কাটা হয়ে থাকে, এই তথ্য ও সত্যকে চাপা দেওয়ার জন্যই এইসব উপর মহলের এত কর্মোদ্যোগ।

সকলের জন্য সমান মাধ্যমিক বা সাধারণ শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের প্রাথমিক স্তর থেকেই প্রতিবেদন দেখতে হয়। বাইরে যে ৭০ শতাংশ রইল সে বাদে যারা এল তারাও দারিদ্র্যের কারণে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পর বিভাগলের বাইরে চলে যাচ্ছে; পরীক্ষা ও বহনের অল্পপয়সার পাঠক্রমের কার্টার মেনসিনে মাধ্যমিক কাঠামোর মধ্যেই প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে বিভাগলের বাইরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। ক্রলকাতার মত স্থানেও প্রশাসনিক নৈরাজ্যে, অনিয়মিত বেতন ব্যবস্থায় এবং নিয়মান্বয়ের পঠন পাঠনে দুর্দশাগ্রস্ত কয়েকটি স্কুলের (শেবাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

১ টাদার হার

বার্ষিক ২২ টাকা

বার্ষিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠাবার ঠিকানা:

মানোজ্য, দর্পণ

৩১, মট লেন। কলিকাতা ১০

দশ + দুই স্তরের শিক্ষা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে মোটামুটি ভাল ধরনের স্থলে প্রায় দেড়হাজার ছাত্র ভর্তি চাহিদা থাকে। সেখানে ১৫০ জন ছাত্রের বেশী নেওয়া যায় না। ফলে, হয় বাকী ছাত্ররা পড়ালেখা ছাড়ছে নয়ত কিছু ভগ্নদশা বিদ্যালয়ে ঢুকে দিনগত পাপক্ষয় করছে। এরই নাম কি সকলের জন্য সমান সুযোগ?

সারা দেশে একই ধরনের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে ও প্রশ্ন : আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৯৭৬ সালের জুলাই থেকে ১১-১২ ক্লাশের উচ্চ-মাধ্যমিক চালু হবার পর কেন দেখা গেল—কেরালার ডিগ্রি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যুক্ত +২ স্তরের/জুনিয়ার কলেজ অঙ্কে ও পশ্চিমবঙ্গে স্বতন্ত্র বোর্ডের আওতায় জুল ও কলেজ দুই জায়গাতে, কর্ণাটকে প্রি-ইউনিভার্সিটি, উত্তরপ্রদেশে কোথাও জুনিয়ার কলেজ, কোথাও বা +২ এর প্রি-ইউনিভার্সিটি। বহু বিচিত্রের মধ্যে এইভাবেই কি এক বা জাতীয় সংহতি হবে?

গ্রাম বাংলার কয়েকটি হাই স্কুলে দেখা যায়, জ্যোতদার-মহাজন পরিবারের ছেলেরা কর্মশিক্ষার (Work Experience) ক্লাশে সংলগ্ন মাঠে জমি চাষের কাজ শিখছে, আর গ্রামের শত শত ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষী সেই অস্থান বিরে ক্রোড়কের চোখে দেখছে আর ভাবছে—বাবুদের ছেলেরা কি জমিচাষের কাজ কোন দিনও করবে?

সেদিন এক ডাক্তারের চেয়ারে বসে আছি। কল থেকে ফিরে ডাক্তার বন্ধু বললেন : 'স্কুলগুলোর PT বন্ধ করা দরকার। এ মাসে সাতটা স্কুলে একই কেস। পুষ্টির অভাব। পারবে কেন!'

জিজ্ঞেস করলাম : সমাধান?

বন্ধু নির্দিষ্ট বললেন : 'স্কুলে স্কুলে বিনা পয়সার দুধ-রুটির ব্যবস্থা! ভাবলাম, শহরেই যদি এই গ্রামে না জানি কি অবস্থা!

বর্তমান অবস্থায় আমরা কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের শিক্ষামন্ত্রকের কাছে প্রস্তাব রেখে বলতে পারি : আপনারা ভাষা বিভাগে প্রথম ভাষাক্রমে মাতৃভাষাকে আবশ্যিক করুন এবং দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে উপযোগিতার মাপ অনুযায়ী ইংরাজীকেও অবশ্য পাঠ রাখুন; তৃতীয় ভাষা না রাখলেই ভাল, কারণ বর্তমানে কোন সভ্যদেশে মাধ্যমিক স্তরে তৃতীয় ভাষা নেই। যদি নেহাতই রাখতে হয় তবে অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া বন্ধ করুন। এর সঙ্গে ভারতের উপর গুরুত্ব রেখে পৃথিবীর ইতিহাস ও

ভূগোল, ধনতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্বব্যবস্থার যথাযথ গুরুত্বের স্বীকৃতিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানসহ অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞান, গণিত, প্রকৃতি ও জীবন বিজ্ঞান, শারীর ও কর্মশিক্ষা (আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরির মৌলিক জ্ঞান) এবং নান্দনিক (ছবি গান ও নাটক) শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। আর এই মাধ্যমিক পাঠক্রমেরই উন্নত ও পরিণত স্তরকে সাধারণ ও বৃত্তিমূলক প্রবাহকে উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব হিসাবেই নির্দেশ করুন; এমনটা যেন না হয়, যারা সাধারণ কোর্সে থাকবে তারা কেবল উচ্চ-শিক্ষার সুযোগ পাবে আর যারা বৃত্তিমূলক কোর্সের শেষ পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কাজকর্ম না পেয়ে অচরিতার্থ যৌবনের অভিশাপ বহে বেড়াবে। অর্থাৎ 'বারংবার' কসরৎ সঙ্গেও দুর্ভাগ্যক্রমে এটাই ব্যাপক ভাবে অনুভূত হচ্ছে যে, বিদ্যালয় স্তরের বৃত্তিশিক্ষা নিতান্তই খেলো পর্যায়ে রয়েছে যা কেবলই সাধারণ শিক্ষায় অকৃতার্থ ছাত্রদের লাগিয়ে রাখা গোছের অথবা অভিভাবক ও ছাত্রদের যেন একটা শ্রেণি চেষ্টার ব্যাপার'। (ভারতীয় শিক্ষা কমিশন) এই রকম যেন না হয় এবং তাঁদেরই সুপারিশমত উপযুক্ত মর্মান্বসম্পন্ন দক্ষ শ্রমিক ও কারিগর তৈরীর জন্য যথাযথ পরিচালনা ও জাতীয় মজুরী নীতির (National Wage-policy) ভিত্তিতে এবং সরকার ও শিল্প-কারখানার সমন্বয় সাধন করে সমগ্র মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাকে উৎপাদনশীল ও বৃত্তিমুখী করা হয়। পরিশেষে, সকলের জন্য সমান ও সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে একথাই বলব : বর্তমান আর্থ-সামাজিক স্তরে এ শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করুন, অল্পমত গ্রামীণ এলাকায় বেশ কিছু বিদ্যালয় স্থাপন করুন এবং সাধারণভাবে সকল বিদ্যালয়েই বিনা মূল্যে টিফিন ও বইখাতা সরবরাহের ব্যবস্থা করুন।

নজরুল-সুকাঙ্ক জরতী

গত ২০শে ও ২১শে আগষ্ট দক্ষিণ কলকাতা নজরুল-সুকাঙ্ক জন্মোৎসব কমিটির পরিচালনায় নজরুল-সুকাঙ্ক জন্মোৎসব পালন করা হয়। প্রথম দিন উদ্বোধন অস্থানের সভানেত্রী ছিলেন ডঃ রমা চৌধুরী। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সুকাঙ্ক ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' কবিতাটির আবৃত্তি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। এরপর বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয়। বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল, 'নজরুলের কাব্য ও চিন্তায় বিদ্রোহী

এক যে ছিল দেশ

ভানুসিংহ

এক বৈজ্ঞানিক ঘটনাচক্রে ভুল ফর্মুলার রসায়ন প্রবোয় সংগে ভেজাল সরবের তেলের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এমন একটি আজব বস্তু তৈরী করলেন, যা সবাইকেই তাক্তব করে দেয়। সেই বিচিত্র রাসায়নিক বস্তুটির কণামাত্রিও যদি কারও শরীরের মধ্যে ঢোকে, তবে তার মনের কালো সর ঘুচে গিয়ে সাদা হয়ে যাবে—অর্থাৎ অতীতের সব পাপাচরণ সে অনর্গল স্বীকার করে আত্মতত্ত্বের জন্য প্রায়-চিস্ত করবে। এমন কাণ্ডটি আবার যদি ঘটত তাহলে এই বিশ্বচরাচরে কলোক বলে কথাটাই উপে যেত। সবাই সাধু সচ্চিদানন্দ হয়ে সংভাবে জীবন যাপন করত। কিন্তু এমনটা

সবাই প্রধান'। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম হন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ইংরাজী বিষয়ের ছাত্র শ্রীপ্রশান্ত রায়। এরপর নজরুল ও সুকাঙ্ককে নিয়ে আলোচনা করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্র সেন ও শ্রীনেপাল মজুমদার। অস্থানে বাটানগর থিয়েটার ওয়ার্কশপ 'বোধন' মাটকটি মঞ্চস্থ করে।

দ্বিতীয় দিনে অস্থানের সভাপতি ছিলেন স্থানীয় ওরিয়েন্টাল একাডেমী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ রায়। এদিন আবৃত্তি প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল 'লিচুচোর'। দশ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। এরপর বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয়। বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল 'যুগের বিচারে সুকাঙ্ক একজন সার্থক কবি'। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হন শ্রীকানীনাথ দত্ত। দ্বিতীয় দিনের 'কিশোরদের প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক প্রতিযোগীকেই আবৃত্তিতে উৎসাহিত করার জন্য সুকাঙ্ক ভট্টাচার্যের 'হরতাল' বইটি পুরস্কার দেওয়া হয়।

এবপর আলোচনা স্তম্ভানে অংশ গ্রহণ করেন কবি শ্রীদিনেশ দাস, শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী প্রমুখেরা। পিপলস শাপেট থিয়েটারের একটি মোরগের কাহিনী' নাটকটি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম দিন শ্রীপদ্মেশ্বর ধর ও দ্বিতীয় দিন 'ইক্ষা' (ভারতীয় গণনাট্য সম্বন্ধ) শাখা সহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর গণসঙ্গীত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। এ ছাড়া দুদিন এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল শ্রীসঙ্কর সেনগুপ্তের সুকাঙ্কের কবিতাবলীর ভিত্তিতে 'আজকের পৃথিবী' শীর্ষক লিনোকোট ও শ্রীগৌতম বসুর ভাষা প্রদর্শনী।

বাস্তবে সম্ভব নয়—এও যেমন সবাই বোঝে, আবার মনে মনে এটাও তো সবাই চায় যে দেশ থেকে অনাচার দূর হোক, শয়তানের শয়তানী বন্ধ হোক। এই দুই অভিজ্ঞতার মধ্যে নিজেকে স্থাপন করে, স্বস্তি ও অস্বস্তির মধ্যে উদ্ভূত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে তখনই রস উপভোগ করা সম্ভব যখন সেই ঘটনারাজি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে দৃশ্যময় ব্যাঙ্গনায় নৈতিক তাৎপর্যটুকু লীভ করে। কিন্তু তখন সিংহের 'এক যে ছিল দেশ' ছবিটিতে তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। আর তাই হয়ে ওঠেনি বলেই ছবিটি শুধু সাধারণ স্তরের একটি প্রহসন বলেই গণ্য হবে।

তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতীয় ছবির পর্দায় এমন বিচিত্র বিষয়বস্তুর অবতারণা এই প্রথম। এমন অভিনব কাহিনী অবলম্বন করেও চলচ্চিত্রকার তপন সিংহ তার ছবিকে অনন্ত বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করা তো দূরের কথা, একটি সাধারণ মাপের রঙ্গ ব্যঙ্গের আধার করে তুললেন যেখানে আবার ব্যঙ্গের চেয়ে ভীড়ামিটাই বেশী। নিষাদ সত্য স্বীকারোক্তি ও পূর্ণ সদাচরণ প্রবহমান চলনা, প্রতারণা ও লোভের সংসারে যে বিপর্যয় ডেকে আনে, তার উপস্থাপনায় তপনবাবু কিছু ন্যাপটিক প্রয়োগ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। সুখোশের আডালে স্বার্থাঘেযী মানুষের যে ভয়ংকর মুখ রয়েছে তার উল্লেখ করেন নি। ফলে ছবিটি সামাজিক তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছে এবং প্রেক্ষাগৃহে একটা রঙে ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তপনবাবু ছবির বিষয়বস্তুর সংগে ছবির আঙ্গিককে মেলাতে পারেন নি। সংগীত পরিচালনাতে তপনবাবু নিজেকে জাহির করতেই ব্যস্ত, ছবিকে পর্যন্ত খাতির করেন নি। এ জাতীয় ক্যান্টাসী ছবির মুড় ফুটিয়ে তুলতে ক্যামেরাও তেমন সহযোগিতা করেনি।

অভিনয় প্রসঙ্গে প্রথমেই নাম করতে হয় অনিল চ্যাটার্জী। তিনি একটি চমৎকার টাইপ চরিত্র উপহার দিয়েছেন। কালী ব্যানার্জীর অভিনয়ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৈজ্ঞানিক হলেই ক্যালামার্কি হতে হবে—এ কেমন কথা? দীপঙ্কর দে এই ধারণারই শিক্ষার হয়েছেন। সমিতি মুখার্জীর চরিত্রটিই প্রতিষ্ঠিত নয়, হুতরাং তার অভিনয়ও মনে কোন দাগ কাটে না। রবি ঘোষের এবার অভিনয় ভংগী পালটানো দরকার, নজড একঘেয়ে হয়ে পড়ছে।

রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা

(দর্পণের সমালোচক)

গত ১০ই আগষ্ট উত্তর কলকাতার সারকারিনা মঞ্চে তরুণ অপেরার এ বছরের প্রযোজনা শঙ্কু বাগ রচিত 'রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা' যাত্রাটির উদ্বোধন হয়।

লোকে বলে রে, বলে রে

বীর তেলেঙ্গানা

লক্ষ কমরেডের কথা ভুলবো না,

ভুলবো না।

এই রকম একটা স্বন্দর চারণ গান দিয়ে যাত্রা শুরু হয়। ১৯৪৫ সালে তেলেঙ্গানার রুষক আন্দোলনের পটভূমিকায় এটি রচিত। জ্যোতদার-মহাজন-জায়গীরদার এবং সবার উপরে নিজে কড়ক শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত রুষকদের জোটবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে নামার কাহিনী স্বন্দরভাবে যাত্রায় তুলে ধরা হয়েছে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়, ধামান, ওয়ারাঙ্গল, নলকুণ্ডা জেলায় চেউয়ের মত লড়াই ছড়িয়ে, পড়ার কাহিনীও তুলে ধরা হয়েছে। অবশেষে, নেহেরু-নিজাম চুক্তি ও জেনারেল জে এন চৌধুরীর পৈশাচিক বর্বরতা কিভাবে তেলেঙ্গানার গ্রামের পর গ্রাম অশ্রান করে দিয়েছে বুঝতে পারা যায়। গ্রামের ধ্বংস করে খুন করেছে তুলে ধরা হয়েছে। আবার একদিকে লড়াইয়ে ভীষণ মধ্যবিত্ত পার্টি নেতার দোহলায়মানতা, দ্বিধা, সংশয়ের বিরুদ্ধে হাতে কলমে লড়াইয়ের শিক্ষা পাওয়া সাধারণ রুষকদের স্বপ্ন ও ক্রোধ সঠিক ভাবেই দেখা হয়েছে।

তরুণ অপেরার রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা, অবশ্যই একটা দেখার মত যাত্রা হয়েছে। ঐতিহাসিক তেলেঙ্গানার সংগ্রামের স্বতি কান্নার মন থেকে মুছে যায়নি মুছে যাবেও না। তাকে আরও উজ্জ্বল তুলে ধরে তরুণ অপেরা একটা কর্তব্য পালন করেছেন। এ প্রসঙ্গে শিব ভট্টাচার্য ও তরুণ অপেরার কাছে একটা আবেদন ও অনুরোধ জানাতে চাই যে, গ্রামে গড়ে, শহরতলীতে এই যাত্রাটি দেখানোর জন্য সাহায্য যেন সচেষ্ট হন। অতি অল্প খরচায় বাতে করা যায় তার জন্য একটু চিন্তা করবেন।

প্রতারকের পাল্লায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কলকাতা পৌরসভার পাওনা প্রায় তিন লক্ষ টাকা শ্রীযোষ হুম্ম করে বসেছেন। পৌর কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত তার “কার পার্কিং” লাইসেন্স বাতিল করে দিতে বাধ্য হন। শ্রীযোষ সম্পর্কে ইতিমধ্যে আরও নানা তথ্য এখন প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। কংগ্রেসী জমানায় প্রিয়বাবুর দৌলতে নাকি স্ববীরবাবু এক ব্যবসা ফেঁদে বসেন। নাম দেন জি. বি. আই গ্রুপ অব ইনডাস্ট্রিজ। তাই ব্যবসার প্রথম দিকে তার তাইয়েরাও ছিলেন কিন্তু পরে শ্রীযোষের ছোটভাই বাচ্চু বোর্ড অব ডিরেক্টরস থেকে সরে আসেন। শ্রীযোষ বেহালার যে কারখানাটি খুলে বসেন তা দেখতে তৎকালীন মন্ত্রী টি. এ. পাই কলকাতায় আসেন। প্রিয়বাবুর আরেক সাক্ষরিত সোণতবাবু মহান শ্রীযোষের “শিল্পোৎসোগ” সরেজমিনে পরিদর্শন করে যান। শোনা যায় প্রতিরক্ষা দপ্তরের আবু বদিক যন্ত্রপাতি তৈরী করার জন্তই এই কারখানা তৈরী করা হয়। কারখানা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কীড ট্রাটে একটি অফিসও খোলা হয়। শ্রীযোষের কারখানা ও অফিস খোলার ব্যাপারে প্রিয়বাবুর উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে সেদিন অনেকেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। আজ সেই কারখানা ও অফিসের মালিক লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার দায়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ও কলকাতা পৌরসভার কাছে আসামী হয়ে আদালতের কার্ঠগড়ায়। ঘটনার এখানেই শেষ নয়, ২৯ আগস্ট কীড ট্রাটের জি. বি. আই অফিসের জরনৈক কর্মচারী আমায় জানান অফিস থেকে অফিসের ম্যানেজার তপন মুখার্জি সংস্কার এক মহিলা টাইপিষ্ট কর্মীকে নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। বারবার সময় সেও নাকি প্রচুর টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেছে।

“বিশাখা”

ধূপ বিক্রয়ের জন্ত স্মার্ট সেলসম্যান/ গার্ল প্রয়োজন। গোবিন্দবাবু ৬১, সীতানাথ রোড, কলি-৬ (সিমলা ব্যায়াম সমিতির নিকট)।

প্রকাশিত হলো

রেডুইন-এর নতুন রাজনৈতিক দলিল

জেল ও জহাদ ২য় খণ্ড ১২ টাকা

ইন্দিরা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত বেডুইন-এর অপর গ্রন্থ

স্বাগলিং চক্র ১০.০০ টাকা

পূর্বাচল ৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৯

সব মিলিয়ে বেহালার কারখানা ও কীড ট্রাটের অফিস পুরো বন্ধ। কর্মীরা অনাহারে, এক ছবিবর্হ অবস্থার মধ্যে পড়েছেন।

সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো, এ ধরনের একটি প্রতারকের পাল্লাতেই পড়েছেন, ওপার বাংলার তেজী ও সংগ্রামী নেতা বলে পরিচিত বাবা সিদ্দিকি। বাংলাদেশ শরণার্থীদের তাঁর কন্যার নিয়ে যে কারবার ঘটেছিল বাবা সিদ্দিকিকে সাহায্য করার নামে সংগৃহীত টাকা পরমা নিয়েও সে ধরনের একটি ঘটনা ঘটতে চলেছে বলে অনেকের ধারণা।

তাছাড়া শ্রীযোষ সম্পর্কে আরো নানা কথা বাজারে চালু রয়েছে। শ্রীযোষ হাজারো রোডে তার পৈতৃক বাড়ীতে থাকেন। তার স্ত্রী ও এক পুত্র আমেরিকাতে। “নিঃসঙ্গ” শ্রীযোষ দিনরাত কাটান এলগিন বোডের নীলকমলদের স্ট্যাটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা, নীলকমলের স্ট্যাটে নীল আলোকের নীচে অনেক মাতঙ্গর কংগ্রেসীকেও দেখা যায়। বলা বাহুল্য শ্রীযোষের আতিথেয়তার সেখানে শাড়ী ও জলের অবাধ আনাগোনাও রয়েছে।

প্রশ্ন, বাবা সিদ্দিকি কি শ্রীযোষের এ হেন ঘাঁটি থেকেই মুক্তি সংগ্রামের রসদ যোগাবেন।

চেরা কারবার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাঠা। এরও দাম অস্বাভাবিক ৫০ হাজার টাকা। ডায়মণ্ডহারবার রোডে এক অফিস খুলে বসেছেন রাজপথ। যার খরচ ইতিমধ্যে লক্ষ টাকা পরিয়ে গেছে। রাজপথের বেআইনীপথে টাকা রাজস্বগারের অপর ছই সাক্ষরিত হল মটাবিকু সাউ ও সন্ত সাউ।

শিবনাথ সাউও সামান্য ফল বিক্রেতা থেকে এখন নামে বেনামে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। খড়দহ পুনরো বাজারের কাছে বি কে বিশ্বাস রোডের কাছে একটি বাড়ী, মুহম্মদ মুখার্জী রোডে ১৫ কাঠা জমি ও টিটাগড় মিউনিসিপ্যালিটির সন্নিহিত এলাকায় আরও কিছু জমির মালিক এখন শিবনাথ। শোনা যায় প্রাই-

ভেট কার ডবলু এম এ ৫২৭৭, ট্যাংকার ডবলু এম কে ১২৫৩, ডবলু আর ও ১৮৮৯ নম্বরের গাড়ীগুলিও নামে বেনামে শিবনাথেরই হেপাজতে রয়েছে।

জি বি ও নিয়ে চোরাকারবারের আরেক নামক ইলেন চেতলা রোডের নরসিংহ গুপ্তা। রাজনৈতিক মহলে এর অবাধ যাতায়াত রয়েছে। রাজ্য-ব্যাপী তথা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বেআইনী পথে তেল পাচার করে নরসিংহ সহ অন্যান্যরা পরিবর্তিত অবস্থাতেও তাদের কারবার বেশ ভালোই চালিয়ে যাচ্ছেন। অভিযোগ, রাজ্য পুলিশ দপ্তরের একাংশের সঙ্গে নিয়মিত লেনদেনও নাকি এদের রয়েছে।

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ সুনীল চৌধুরী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সেন্ট্রাল এনফোর্সমেন্ট দপ্তর এ ব্যাপারে মাঝে মাঝে চোরাকারবারের ঘাঁটিতে হানা দিলেও আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো কারবারের মহারথীরা এখনও কেউ ধরা পড়েনি। এমন কি হানা দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ঘাঁটিতে খবর পৌছে যাচ্ছে এমন অভিযোগও রয়েছে।

যতীন চক্রবর্তী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বহুগুণার সঙ্গে হলদিয়া গেলেন তখন দেখা গেল সঙ্গে পূর্ত ও গৃহ নির্মাণ মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীও হলদিয়ায় যাচ্ছেন। কোন প্রয়োজন ছিল না ওর, যাবার কোনো এজিয়ারও ছিল না। শুধু গেলেনই না, সেখানে সকলের সামনে কেন্দ্রীয় সরকারের বড় বড় অফিসারদের অসম্মানজনক কথাবার্তা বললেন। কাগজে বেরিয়েছে, যতীন চক্রবর্তী বলেছেন “আমাদের এতো ক্ষমতা কেঁ দিল?” এই আমলারা কারা? ভারতে পেট্রো-কেমিক্যাল করপোরেশনের প্রবীণ কর্তা বরদারাজলুও এঁদের মধ্যে ছিলেন। বরদারাজলুর অভিমতের উপরেই কেন্দ্রীয় অভিমত গঠিত হয়। কেননা উনিই বিশেষজ্ঞ।

সেই বরদারাজলুও মতো অফিসারকে অসম্মান করা কি পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে স্বার্থসাহায্যকর নয়। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু স্বয়ং যখন হলদিয়ায় গিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই বেডাতে যাননি। তিনি গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে যে এই পেট্রো-কেমিক্যাল কমপ্লেক্স রাজ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এখানে দরকার ছিল, তথ্য যুক্তি আর নিশ্চয়ই খানিকটা ধরাধরি। ধরাধরিতে কোন অসম্মান নেই, কারণ সেটা রাজ্যের প্রয়োজনে। সেখানে যতীন চক্রবর্তী মেজাজ দেখিয়ে এলেন। কার স্বার্থে উনি এই কাঙ্ক্ষা করলেন?

দর্পণ

শারদীয় সংখ্যার তিনটি দীর্ঘ লেখা
ইন্দিরা : গণতন্ত্রে এক ডিক্টেটর
বংশীলাল : গণতন্ত্রে এক ক্ষুদ্রে ডিক্টেটর
গণতন্ত্র বনাম কারাতন্ত্র

এছাড়া ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক গতিপথ, কমিউনিস্ট রাজনীতি, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন, সংবিধানের নব কলেবর প্রভৃতি বিষয়ে অনেকগুলি আলোচনা।

দাম : চার টাকা

মফঃস্বলের এজেন্টদের যত কপি শারদীয় সংখ্যা নিতে চান কমিশন বাদ দিয়ে তার পুরো দাম ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দর্পণ অফিসে পাঠাতে হবে। টাকা ঐ সময়ের মধ্যে না পৌছলে কাগজ পাঠানো সম্ভব হবে না।

চিত্রপট

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির চলচ্চিত্র পত্রিকা “চিত্রপটের” একটি নতুন সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে প্রয়াত চলচ্চিত্রকার ঋতিককুমার, ঘটকের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর ছবি, শিল্পদৃষ্টি, মানসিকতা, সঙ্গীতচিন্তা নিয়ে আলোচনা করেছেন বিভিন্ন লেখক। ঋতিককুমার ঘটকের নিজের কয়েকটি লেখাও এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে যেগুলি ব্যক্তিমাছুষ ও শিল্পী ঋতিকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। এই

প্রতিবাদ

গত ১.ই আগস্ট ১৯৭৭ শুক্রবার “দর্পণ” পত্রিকার ২৯শ সংখ্যায় “১৯৭০ সাল। বারাসাতের রাজপথে আটটি যুতদেহ। কিছু ঘটনা ও প্রশ্ন” শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ করেছেন অজয় ঘোষাল। তিনি লিখেছেন, “আমার এবং আডিয়াদহ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বা ডাক্তার মহোদয়গণের সহিত উক্ত হত্যাকাণ্ডের কোন যোগাযোগ আদৌ ছিল না বা নাই। ১৯৭০ সালের ১৯শে নভেম্বর আমার কোন গাড়ী ঐ ঘটনার ব্যাপারে যুক্ত ছিল না। ২০শে নভেম্বর ১৯৭০ বা ঐ তারিখের পরে বেটে নামীয় কেউ আমাব নিকট আসেনি বা আমি কাকেও দমদম জেলে রাখবার অভি- সন্ধি আটিনি বা কারো নিকট স্থপারিশও করিনি। কালিপদ দত্তও আমার বন্ধু নন। ১২শে নভেম্বর ১৯৭০ বা ২০শে নভেম্বর ১৯৭০ পুলিশ কাকেও আডিয়াদহ হাসপাতালে আনেনি। স্বতরাং আমার সনাক্তকরণ বা হাত পা বাধা অবস্থায় ব্যক্তিদের উপর অত্যাচারের কাহিনীটি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা।”

সংখ্যায় লিখেছেন মৃণাল সেন অসীম সোম কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিতোষ সেন শিবপ্রসাদ সমাদার শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশেতা দেবী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র দিলীপ মুখোপাধ্যায় রিমল ভৌরিক বিষ্ণু দে বিভাস চক্রবর্তী মৃগাংশেশ্বর রায়। ঋতিকে শেষ ছটি ছবি - বাংলাদেশে তোলা “তিতাস একটি নদীর নাম” ও “যুক্তি তাকে আর গল্পো” সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যথাক্রমে অজয় বসু ও অমলেন্দু বসু। এ ছাড়া আরও দুটি লেখা আছে—মৃণাল সেনের হিন্দী ছবি “মৃগয়া” সম্পর্কে লিখেছেন প্রব গুপ্ত এবং চার্লি চ্যাপলিনের প্রথম জীবনের স্বপ্ন দৈর্ঘের ছবি সম্পর্কে মধু বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋতিকে বিভিন্ন ছবির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থিরচিত্রও “চিত্রপটের” বর্তমান সংখ্যায় ছাপা হয়েছে।

রঙমহলে

২রা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ

আনন্দময়ের

কালকেতু ফুল্লরা

শ্রেষ্ঠাংশে

মোহন চ্যাটার্জী

পরিবেশনায়

মোহন অপেরা

হলে টিকিট

ফোন : ৫৫-৫৪১৩

আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর

সন্ধ্যা ৬-৩০ টায়

ধারে

তরুণ অপেরার

রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা

হলে টিকিট

পিয়ারলেস লক-আউট ঘোষণা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

অবশেষে গত ২৭শে আগস্ট পিয়ারলেস কোম্পানীর কলকাতার অফিসগুলিতে কর্তৃপক্ষ লক-আউট ঘোষণা করেছেন।

পিয়ারলেসের সর্বস্তরের কর্মীরা পিয়ারলেস এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের নেতৃত্বে তাদের ছয় দফা দাবীর ভিত্তিতে দীর্ঘদিন যাবত দুর্বীর আন্দোলন চালাচ্ছেন। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে ওয়ানিং ও শো-কজ নোটিশ, চার্জশীট, সাসপেনশন ও বদলীর ভয় দেখিয়ে কর্মী আন্দোলন তাদার চেষ্টা করেন কিন্তু তাদের এই অপচেষ্টা হুদু কর্মী একেবারে কাছে ব্যর্থ হয়।

অভিযোগ, এরপর কর্তৃপক্ষ নেতা ও কর্মীদের ওপরে বহিরাগত ভাড়াটে গুণ্ডাদের লেলিয়ে দেন যার ফলে কলকাতা, কাটিহার, আসানসোল ও জামশেদপুরের শাখা অফিসগুলিতে স্থানীয় কুখ্যাত গুণ্ডাদের তাওব চলে এবং ইউনিয়নের নেতাদের অন্তত:

পাঁচজন বিভিন্ন ঘটনায় কম বেশী আহত হন। এতে যখন আন্দোলন দমন করা যায় না তখন কর্তৃপক্ষ গত ২৬শে আগস্ট মধ্যরাতে হেড অফিস সহ কলকাতার সব অফিসগুলিতে লক-আউট ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এর আগেই ১৩ই আগস্ট হাওড়া শাখাতেও লক-আউট ঘোষণা করা হয়েছিল।

কলকাতার অফিসগুলিতে লক-আউটের খবরে কর্মীরা দারুণ ক্ষুব্ধ। তারা এর প্রতিবাদে এক বিরাট মিছিল বের করেন। মিছিল কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমার পর দমদমে কোম্পানীর সেক্রেটারীর বাড়ীর সামনে উপস্থিত হয়। এখানে দীর্ঘ সময় বিক্ষোভ প্রদর্শন চলে এবং একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই হঠাৎ ঘোষিত "বে-আইনী" লক-আউটে এই কোম্পানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাজার হাজার ফিল্ড স্টাফ ও সার্টিফিকেট ক্রেতা তাদের বিনিয়োগ

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগ্রাম

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের দাবী সনদ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ অনতি-বিলম্বে আলোচনায় বসতে অস্বীকার করায় সারা ভারত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন যে প্রতীক সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তার মধ্যে আছে ২১/৮/৭৭ তারিখে আধ ঘণ্টার জন্ত গণ ডেপুটেশন, ১০/৯/৭৭ তারিখে এক ঘণ্টা দেয়ীতে উপস্থিতি এবং ২৭/৯/৭৭ তারিখে একদিনের জন্ত পূর্ণ ধর্মঘট।

২৬শে আগস্ট প্রেস ক্লাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশনের কলকাতা শাখার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয় যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতনহার সংশোধনের সর্বশেষ চুক্তি হয়েছিল ১৯৭০ সালে এবং এর মেয়াদ গত ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়ে গেছে। এর মধ্যে জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে বিস্তর। এই বাড়তি দামের খেসারত গুণতে ১৯৭৩ সালে সামান্য যে বাড়তি টাকা কর্মচারীরা আদায় করতে পেরেছিলেন তাতে গেছেই বরং আগের মাইনেতেও টান পড়েছে। এসোসিয়েশনের মুখপাত্র সাংবাদিকদের আরও বলেন যে, প্রথমতঃ ক্রমবর্ধমান পণ্যমূল্যের পরি-

প্রেক্ষিতে তারা যে ভতুর্কী পান তা আংশিক, দ্বিতীয়তঃ মূলস্ফটকের যে পরিসংখ্যান তৈরী হয় তা প্রকৃত পক্ষে বাজারের চলতি দাম মেনে হয় না এবং তৃতীয়তঃ টাকার ক্রয় ক্ষমতা ক্রমশঃ কমতির দিকে। মুখপাত্র বলেন যে, এই পরিপ্রেক্ষিতেই একটি নতুন দাবী সনদ রচিত হয় এবং ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হয়। এই দাবী সনদে ১৯৬০ সালের মূল্যমানের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের জাহুয়ারীতে ১৮০ পয়েন্ট পুরো ভতুর্কীর হিসেবে প্রাপ্য মাগগীভাতার সঙ্গে মূল বেতন যোগ করে পুরনো বেতন কাঠামোকে পুনর্বিভাগের দাবী জানানো হয়েছে।

জরুরী অবস্থার কালে কলকাতায় ৩, বালুালোরে ২ এবং কানপুরে ৩ জন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্মীকে ছাঁটাই করা হয় এবং পাটনায় ২ ও কলকাতায় ১ জনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। জরুরী অবস্থার সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্মীদের ওপর কর্তৃপক্ষের জুলুমের আরও বিবরণ দিয়ে উক্ত মুখপাত্র বলেন যে, ডেপুটেশন নিয়ে যাবার অপরাধে এসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ কমিটির ১৮ জন কর্মকর্তাকে চার্জশীট দেওয়া হয়েছে।

জিত কোটি কোটি টাকার আমানত সম্পর্কে আশংকিত।

ইউনিয়ন এই "বে-আইনী" লক-আউটের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় বামপন্থী সরকারের মুখ্যমন্ত্রী, প্রমমন্ত্রী এবং সর্বস্তরের গণতান্ত্রিক মানুষের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন।

স্বাধীন প্রাণী স্ট্রীট জাতীয়করণের দাবী

গত ২৪শে আগস্ট স্বাধীন প্রাণী স্ট্রীট ওয়ার্কস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কলকাতার মহাকরণে কেন্দ্রীয় বসায়ন ও সার মন্ত্রী এইচ এম বহুগনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কোম্পানীটির জাতীয়করণের দাবী জানানো হয়। ইউনিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দ আই ডি পি এল অথবা হিন্দুস্থান অ্যান্ডিবায়ে-

টিজ লিমিটেডের সঙ্গে সংযুক্ত না করে কোম্পানীটির নিজস্ব স্বাধীন সত্তা অক্ষুণ্ণ রেখে জাতীয়করণের আবেদন জানান।

শ্রীবহুগনা এই আশাস দেন যে স্বাধীন প্রাণী স্ট্রীট সম্পর্কে অচিরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কোম্পানীটিকে কখনোই বেসরকারী/মালিকানার হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না।

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফিনান্স

অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

স্থাপিত—১৯৩২

রেজিঃ অফিস : "পিয়ারলেস ভবন", ৩ এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৬৯

কর্মী-বিক্ষোভ ও লক-আউট সম্পর্কে

আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

আমাদের অগণিত সার্টিফিকেট-হোল্ডার, এজেন্ট ও ফিল্ড অফিসারের অবগতির জ্ঞত আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, প্রায় দুই মাস যাবৎ কলকাতার সব অফিসগুলিতে, হাওড়া ব্রাঞ্চ ও অন্যান্য অবস্থিত বিভিন্ন অফিসে কর্মচারীদের এক বৃহৎ অংশ কর্তৃক নিরবচ্ছিন্নভাবে গো-স্লো, অফিসার ও অল্পগত কর্মচারীদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন, ধর্মঘট ও অন্যান্য উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এবং অফিসের উপর বাহিরের লোকদের ক্রমাগত হামলা চলিয়া আসিতেছে। পরিচালকমণ্ডলী বিভিন্ন সময়ে কর্মচারীদের প্রতিনিধিদের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু কোন মীমাংসায় পৌঁছিতে তাদের সম্মত করা যায় নাই। এমনকি ফিল্ড অফিসারদের পৌনঃপুনিক অহুরোধেও সংশ্লিষ্ট বিক্ষোভকারীগণ কোন সাড়া দেন নাই। এইকপ অবিরাম শৃঙ্খলাবিহীন কার্য-কলাপের ফলে আমরা দুঃখের সহিত ২৭ আগস্ট, ১৯৭৭ তারিখ সকাল ৬টা হইতে রেজিস্টার্ড ও হেড অফিসসহ কলিকাতার সমস্ত অফিসে "লক-আউট" ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

ইহার ফলে আমাদের পৃষ্ঠপোষকবৃন্দের যে অসুবিধা হইবে, তজ্জন্য আমরা গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। আমাদের সার্টিফিকেট-হোল্ডারগণকে স্থিতিশীলভাবে জানানো যাইতেছে যে, এই লক-আউট-এর ফলে কোম্পানির সহিত তাঁহাদের স্ব স্ব কন্ট্রাক্ট বা চুক্তির কোনভাবে হেরফের হইবে না এবং তাঁহাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সার্টিফিকেট-হোল্ডারগণকে আরও জানানো যাইতেছে যে, কোম্পানির অধিকাংশ লগ্নীই করা হইয়াছে সরকারী সিকিউরিটিতে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক-এর স্থায়ী আমানতে। এখানে, ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উপরোক্ত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্কীম ফাণ্ড (অর্থাৎ সার্টিফিকেট-হোল্ডারদের নিকট দায়)-এর ১০০%-এর বেশী পরিমাণ অর্থ সরকারী হেফাজতে লগ্নী করিয়া রাখা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত।

অফিস কর্মীদের জন্য বোনাস— ১৯৭৫ এর জন্য ২০% ১৯৭৬ এর জন্য ২০%
লক-আউট চলা-কালে সার্টিফিকেট-হোল্ডারগণ নিম্নোক্ত অফিসগুলিতে টাকাকড়ি জমা দিতে পারেন :—

- (১) কলিকাতা ও হাওড়া-র বাহিরে অবস্থিত কোম্পানির সমস্ত ব্রাঞ্চ অফিসে,
 - (২) সমস্ত অর্গানাইজেশন অফিস,
 - (৩) নতুন কেস বাদে সিটি ব্রাঞ্চ নং ১ সম্পর্কিত টাকাকড়ি ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, লেনিন সরণি ব্রাঞ্চ, কলিকাতায় জমা দেওয়া যাইতে পারে।
 - (৪) নতুন কেস বাদে হাওড়া ব্রাঞ্চ এরিয়া সম্পর্কিত যাবতীয় টাকাকড়ি ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের হাওড়া ব্রাঞ্চে জমা দেওয়া যাইতে পারে।
 - (৫) অধিকন্তু, আমাদের অন্যান্য আদায়কারী ব্যাঙ্কারও প্রচলিত মত টাকা গ্রহণ করিবেন।
- বিলম্বে টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে লক-আউটের সময়ের জন্য কোন হুদ দিতে হইবে না।
- আশা করা যাইতেছে যে, শ্রীশ্রী সংশ্লিষ্ট কর্মীদের শুভবুদ্ধির উদয় হইবে এবং তাহার ফলে কোম্পানির পক্ষে আমাদের অসংখ্য সার্টিফিকেট-হোল্ডার ও এজেন্টকে পুনরায় প্রচলিত সার্ভিস দেওয়া সম্ভব হইবে। ইতিমধ্যে এই অন্তর্বর্তী সময়ে আমাদের সার্টিফিকেট-হোল্ডার, এজেন্ট ও ফিল্ড অফিসারদের যে অসুবিধা হইবে তাহার জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

উপরোক্ত লক-আউটের সময়ে সমস্ত জরুরী চিঠিপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় কোম্পানির অডিটরদের নিকট কেবলমাত্র রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠাইতে হইবে।

মেসার্স এ সি শ্রীশঙ্কর অ্যাণ্ড কোং

১২/১, গুড পোস্ট অফিস স্ট্রীট কলিকাতা ১

তারিখ, ২৯ আগস্ট, ৭৭

স্বাঃ বি কে রায়, সেক্রেটারি

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

নকশাল নিধনের রু-প্রিণ্ট তৈরি হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নকশালপন্থীদের নিধনের রু-প্রিণ্ট তৈরি হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনন্দপল্লি বিভাগে। সম্প্রতি এক বিশ্বস্তসূত্রে এই চাকল্যকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রাক্তন আই-জি এবং ১৯৭৫ সালের কলকাতা পুলিশের কমিশনার শ্রীরঞ্জিত গুপ্ত ছিলেন এর হাত।

ঠাণ্ডা মাথায় পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার তরুণ ও যুবক খুনের ফন্দির স্বরূপাত হয়েছিল খোদ দিল্লিতে। জীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বস্ত উপদেষ্টা জীপি-এন হাকদারই নাকি সর্বপ্রথম প্রতিবিপ্লবী তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

এ কাণ্ডে তাঁর সর্বক্ষণের সহযোগী ছিলেন রঞ্জিতবাবু। সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯৭০ সালের মে মাসে দিল্লিতে এক গোপন বৈঠক থেকে কলকাতায় ফিরে রঞ্জিতবাবু তাঁর কুখ্যাত 'কাউন্টার ইনসারজেন্সী' পিওরি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। সংবাদে প্রকাশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ও সত্যেন্দ্রনাথ সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আনন্দপল্লি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিকের সাহায্যে রঞ্জিতবাবু বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে বসেই গবেষণা চালিয়েছিলেন।

নকশাল আন্দোলনে যুক্ত মেধাবী ছাত্রদের কি ভাবে খুন করা হবে, এর প্রচারই বা কেমন ধাঁচের হবে এবং সর্বোপরি নকশালপন্থীদের ওপর

দর্পন

বিংশ বর্ষ ৥ ৩৩শ সংখ্যা ৥ শুক্রবার ৯ই সেপ্টেম্বর, '৭৭ ৥ ৪০ পৃষ্ঠা

রাজবন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে মন্ত্রী ভক্তি মণ্ডল ও দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জল ফোলা করছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করে বন্দীমুক্তি ও গণদাবী কমিটির পক্ষ থেকে নানা সভা ও সমাবেশ করা হচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই দেশবাসীর অনভিপ্রেত নয় যে, দলমত নির্বিশেষে রাজবন্দীরা নিঃশর্তে মুক্তিলাভ করুন। বার্মপন্থী সরকার রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে নিঃশর্তে মুক্তি দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। তবু, চালাও-ভাবে এখন পর্যন্ত কেন রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি পাচ্ছেন না তার বিশদ বিবরণ দিয়ে আইনমন্ত্রী হাসিম আব্দুল হালিম ইতিপূর্বে বিবৃতিও দিয়েছেন।

অসীম চ্যার্টার্ড, কাছ সাম্রাজ্য সৌরেন বসু প্রমুখ বন্দীদের মুক্তি এই মুহূর্তেই সম্ভব হবেনা, কারণ অন্যান্য রাজ্যেও এদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। অন্য রাজ্যগুলো যদি মামলা প্রত্যাহার না করে নেয় তবে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে তার জন্য দায়ী করা অথবা দোষী সাব্যস্ত করা উচিত হবেনা নিশ্চয়ই। অথচ এই প্রব্লে রাজনৈতিক জল ফোলা করা হচ্ছে। ময়দানে নেমেছেন নেপথ্যবাসী রাজ্য জনতা নেতৃবৃন্দের এক অংশ, নেমেছেন নকশালপন্থী একটি উপদলের অন্যতম নেতা সুস্বোষ রাণা এম, এল; এ এবং বন্দীমুক্তির সভা ও সমাবেশে ভাষণ

দিচ্ছেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী করোয়ার্ড রকের ভক্তিমুখ মণ্ডল ও আর, এস, পি'র দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

একথা সবাই জানেন যে, যে, ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চরণ সিং মুচালেকা না দিলে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানে রাজী নন। তবু, (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

প্রিয় মুন্সীর দক্ষিণী বাটার অফিস এখন সি বি আইয়ের কবলে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

"প্রগতিশীল" যুব কংগ্রেসী নেতা প্রিয় দাসমুন্সী সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক "দক্ষিণী বাটার" এখন সি বি আইয়ের কবলে।

কেন্দ্রীয় ভদ্রত ব্যুরোর এবং রাজ্য পুলিশের বিশেষ শাখার পদস্থ অফিসাররা একযোগে দক্ষিণী বাটার কীড ষ্ট্রিটের কোর্ট প্যালেস অফিসে হানা দিয়ে অনেক কাগজপত্র আটক করেছেন এবং অফিসটি সীল করে দিয়ে গেছেন।

সি বি আই-এর ভদ্রত কেঁচো খুঁড়তে মাপ বেরিয়ে পড়ে। ২৩ লক্ষ টাকা প্রভাষণের অভিযোগে অভিযুক্ত প্রিয়বাবুর পৃষ্ঠপোষক এবং অন্যতম উপদেষ্টা স্ববীর ঘোষের জাল-জুয়াচুরি তদন্ত করতে গিয়েই প্রিয় মুন্সীর

"দক্ষিণী বাটার" জড়িয়ে পড়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

যুবনেতা প্রিয়বাবুর সাহিত্যিক হওয়ার বাসনা চরিতার্থ করা এবং ছুয়া প্রগতির তত্ত্ব ফিরি করার উদ্দেশ্যে "দক্ষিণী বাটার" জন্ম হয়।

স্ববীর ঘোষের দৌলতে প্রিয়বাবুর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধিও ঘটেছে। প্রিয়বাবুর বড় ভাই হাজরা রোডের যে বাড়ীতে থাকেন সেটি কীর্তিমান স্ববীর ঘোষের। তিনি প্রিয়বাবুর বড় ভাইকে নিজের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে প্রচুর টাকা দিয়ে এলগিন রোডে একটি ফ্ল্যাট কেনেন নিজের থাকার জন্য।

এখন সব ব্যাপারটাই সি বি আই-এর তদন্তাধীন। ব্যাপারটা কোনও ভাবে কিছু করা যায় কিনা তা দেখার জন্য প্রিয়বাবু সম্প্রতি দিল্লী গিয়েছিলেন।

গোটা পুলিশ বাহিনীকে স্বেপিয়ে তোলার জন্য ভাড়াটে বাহিনীকে দিয়ে কিভাবে পুলিশ হত্যা করানো হবে তা এখানেই স্থির হয়। এই পরিকল্পনাই ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৬ সালের শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ

সরকারের বিনা অনুমতিতে রঞ্জিত গুপ্ত তিন জায়গায় চাকরী করছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্রাক্তন আই-জি রঞ্জিত গুপ্ত কি সমস্ত নিয়ম কাহ্নের বাইরে? দর্পণ জানতে পেরেছে রঞ্জিত গুপ্ত এখন সরকারের বিনা অনুমতিতে অন্ততঃ তিনটি বেসরকারী কোম্পানীতে কাজ করছেন। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী অবসর নেবার ছু বছরের মধ্যে কোন চাকরী নিতে হলে সরকারের অনুমতি নিতে হয়। দর্পণ আরো জানতে পেরেছে, রঞ্জিত গুপ্ত চাকরী করার অনুমতি চেয়েছিলেন। সেই অনুমতি এখনও

আসেনি। শুধু তাই নয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার রঞ্জিত গুপ্তকে বিনা সরকারী অনুমতিতে কোনো চাকরী না নিতে বলেছিলেন। কিন্তু রঞ্জিত গুপ্ত কোন কথা শোনেননি। তিনি এখন তিনটি কোম্পানী, হিওক, উইলিয়ামসন ম্যাগর ও বেঙ্গল ল্যাম্পে কাজ করছেন। হাওড়ার হিওক কোম্পানী মোটরবোট ইত্যাদি নির্মাণ করে। এই কোম্পানীর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর হচ্ছেন রঞ্জিত (শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

'আমাদের পথ চীনের পথ, চে গুয়েভারার পথ সশস্ত্র বিপ্লবের পথ'

—কারামন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

(দর্পণের সংবাদদাতা)

"নির্বাচনের মাধ্যমে মন্ত্রী বদল হয়, সিদ্ধার্থ রায়ের জায়গায় জ্যোতি বোস আসতে পারে, তরুণকান্তির বদলে দেবব্রত ব্যানার্জী আসতে পারে, কিন্তু তাতে আসল সমস্যার কিছু সমাধান হয় না। তাই আমি বলতে চাই আমাদের পথ চীনের পথ, চে গুয়েভারার পথ, সশস্ত্র বিপ্লবের পথ।" এই কথাগুলি বলেন পশ্চিমবঙ্গের কারা মন্ত্রী দেবব্রত ব্যানার্জী গত ৩১শে আগস্ট খড়দহে বন্দীমুক্তির সমাবেশে।

তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অজ্ঞানের বিরুদ্ধে ভগবানের কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা কোন ভগবান বা আল্লাহর কাছে নালিশ জানাবো না। ওসব জানিয়ে কিছু হয় না তাই সব সমস্যার সমাধান করতে হলে চাই সংগ্রাম, চাই সশস্ত্র বিপ্লব। সশস্ত্র বিপ্লবের পথে আমাদের পা বাড়াতে হবে। তিনি বলেন সমস্ত সালে নকশালপন্থীরা যদি ইন্দিরা সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করতো, তাহলে সেটা হত কাপুরুষতা এবং সেটা না করে তারা

সঠিক কাজই করেছে। তিনি বলেন, আমরা মন্ত্রীর গদীতে আছি, আপনারা আন্দোলন করুন। ছবীর সংগ্রাম গড়ে তুলুন। আমরা পুলিশের লাগাম টেনে রাখবো, আর তা যদি না করতে পারি তাহলে ঐ মন্ত্রি ছেড়ে চলে আসবো। কারণ মন্ত্রি করার জন্যই আমি মন্ত্রী হইনি, সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই আমরা চাই।

দেশের ভয়াবহ বেকারীর কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার। হাজার হাজার চাকরীর দরখাস্তের স্তুপ জমে আছে।

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



চিত্তরঞ্জন লেবার ইউনিয়নের বিপুল জয়

গত ২৬শে আগষ্ট চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের এরিয়া ষ্টাক কাউন্সিলের নির্বাচনে লেবার ইউনিয়নের সভ্যরা ২২টি আসনের মধ্যে ১১টি আসনে বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করেছেন। এই নির্বাচনে চিত্তরঞ্জনের সংগ্রামী লেবার ইউনিয়নকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে কংগ্রেসের দুই অংশ, জনতার দুই অংশ, কর্মচারী সংগ, এ, আই, আর, এফ ও এ আই আর টি এস-এর সম্মিলিত জোটের বিপক্ষে। এই জয় চিত্তরঞ্জন শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সজ্জার করে এবং নির্বাচনের পরে প্রায় ১০০০ লোকের এক মিছিল শহর পরিভ্রমণের পর ইউনিয়ন অফিসে জমায়তে হয়। এই সভায় ভাষণ দেন ইউনিয়নের সভাপতি নির্মল মুখার্জী। চিত্তরঞ্জন লেবার ইউনিয়ন আর একবার প্রমাণ করল যে তারাই একমাত্র প্রতি-নির্ধ্ব শ্রমিক সংগঠন।

গত ২৫শে আগষ্ট কংগ্রেসী অপ-

দেজ মেডিকেল আন্দোলন চলছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত ২রা সেপ্টেম্বর থেকে দে'জ মেডিকেল স্টোপের ১৭০ জন মেডিকেল ও সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ মালিক পক্ষের অনমনীয় মনোভাবের জ্ঞাত পুনরায় ধর্মঘটে নেমেছেন। গত ২৯শে আগষ্ট শ্রমজীবী কক্ষে এক জিলাপক্ষিক বৈঠকে আলোচনায় বসতে অস্বীকার করে মালিকপক্ষ।

গত ৬ই সেপ্টেম্বর প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সাবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানিয়ে ফেডারেশন অব মেডিকেল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক জীমিতাভ গুহ বলেন, ফেডারেশন ১৯৭৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর দে'জ মেডিকেলের মেডিকেল ও সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভদের পক্ষ থেকে দে'জ কোম্পানীর মালিকের নিকট দাবী সনদ পেশ করেন।

ইতিপূর্বে বহু অবদান ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মালিকপক্ষ আপোষ মীমাংসার জ্ঞাত কোন আলোচনায় বসতে বাজী হননি। বাধ্য হয়ে গত ৪ঠা জুলাই কলকাতার হেড অফিস সহ সারা ভারতে দে'জ মেডিকেলের অফিসের সামনে উক্ত কোম্পানীর মেডিকেল ও সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভরা একদিনের অবস্থান ধর্মঘট করেন। এরপর মালিকের অনমনীয় মনোভাবের জ্ঞাত ঐ কর্মীরা ৯ই আগষ্ট একদিনের ধর্মঘট পালন করেন। এর

শাসনের কালী আইন মিসা মুক্ত লেবার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এস আর দাস, ভাইস প্রেসিডেন্ট দিলীপকুমার বহু সহ ১২ জন তাদের নিজ নিজ কাজে যোগদান করেছেন। ইউনিয়ন নেতাদের কর্মীরা মিছিল করে তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যায়।

গত ২৩শে আগষ্ট চিত্তরঞ্জনের রেল কর্মচারীরা বোনাস সহ ছয় দফা দাবীতে জি, এম, অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই বিক্ষোভ মিছিলে দশ থেকে বার হাজার শ্রমিক যোগদান করেন। তারা জি, এম, অফিসে জমায়তে হয়। এই বিক্ষোভ মিছিলে বোনাস সহ অন্যান্য দাবীর সমর্থনে বক্তব্য রাখেন লেবার ইউনিয়নের সভাপতি নির্মল মুখার্জী ও সাধারণ সম্পাদক এস, আর, দাস। পরে বোনাস সহ দাবীপত্র জেনারেল ম্যানেজারের কাছে লেবার ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ দেন রেলমন্ত্রীকে পাঠানোর জ্ঞাত।

পরেও বিভিন্নভাবে মালিকদের কাছে অস্বীকার ও আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব পাঠানো হয়। কিন্তু মালিক পক্ষ জিলাপক্ষিক বৈঠকে বসতে রাজী হন না। ফলে গত ১৯শে আগষ্ট থেকে সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দে'জ মেডিকেল ও সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ কর্মীরা কলকাতায় এসে জড়ো হতে থাকেন এবং অনি-দিষ্ট কালের জন্ত ধর্না শুরু করেন।

২০শে আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গের শ্রম-মন্ত্রী অস্বীকারে শিল্পে শান্তি বজায় রাখার জন্ত ধর্না তুলে নেওয়া হয় এবং দে'জ কর্মীরা পুনরায় কাজে যোগদান করেন। কিন্তু মালিকরা বৈঠকে বসতে অস্বীকার করার ফলে ২রা সেপ্টেম্বর থেকে দে'জ কর্মীরা পুনরায় ধর্মঘটের পথ ধরেন।

কারামজীবী বক্তৃতা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রী হবার পর হাজার হাজার ছেলে রাইটটার্স এসে আমার পা জড়িয়ে ধরছে 'একটা চাকরি দিন।' এ ভয়াবহ অবস্থা চলতে পারে না। এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

বন্দীমুক্তি আন্দোলনের ব্যাপারে তিনি বলেন, কেউ কেউ বলছে বন্দী মুক্তি আন্দোলনের প্রয়োজন নেই। বন্দী মুক্তি কমিটিভে দেওয়া হোক, কারণ সরকার তো সব বন্দীদের

বন্দী মুক্তির ব্যাপার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সত্যনারায়ণ সিনহা গ্রুপের সবাই মুক্তি পেয়েছেন, মুক্তি পেয়েছেন সন্তোষ রাণাও। তাঁরা মচালেকা দিয়েছেন কিংবা দেননি সেই রহস্যের চাবিকাঠি একান্তভাবেই তারা জানেন। কিন্তু, গোটা দেশের কাছে এটা এক চিরস্তব রহস্য হয়েই থাকবে। সন্তোষবাবুরা নিজেদের সাক্ষাৎ বিপ্লবী বলে দাবী করেন এবং অসীম চ্যাটার্জী, কাহ্ন সার্যাল প্রমুখ নকশাল কর্মীদের তারা স্বদলীয় বলে স্বীকার করেননা বরং তাঁদের সঙ্গে সন্তোষবাবুদের কোন সম্পর্ক নেই বলেই বলছেন। ভাল কথা। রাজনৈতিক মতাস্তর থাকতেই পারে। কিন্তু অসীম চ্যাটার্জীরা যদি চরণ সিং-এর কাছে একটুখানি নতশির হতেন তবে তারাও খুবই স্বল্পত মূল্যে নিজেদের মুক্তি কিনে নিতে পারতেন। তা তাঁরা স্থগাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

পক্ষান্তরে সন্তোষবাবুর বর্তমান রাজ-নৈতিক গুরু সত্যনারায়ণ সিন্হা নিজের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও যখন তখন চরণ সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত গ্রেপ্তারী পরোয়ানাও প্রত্যাহার করা হয়েছে। অসীম চ্যাটার্জীর সত্যনারায়ণ গোষ্ঠীর চিহ্নিত দুশমন। অতএব, সিন্হা গোষ্ঠীর প্রতি চরণ সিং তথা কেন্দ্রের জনতা পার্টির সরকারের দুর্বলতা নিশ্চয়ই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ বলে বিবেচিত হবেন।

এমতাবস্থায় বন্দীমুক্তির দাবী জানিয়ে সভা ও সমাবেশে জনতা পার্টির নেতৃবাহীন কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় সোচ্চার হওয়া উচিত কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, যাকে রাজ্যের দুই মন্ত্রীর উপস্থিতি সত্ত্বেও সন্তোষ রাণা এবং তাঁর সহযোগীরা যে সব কথা বলছেন তা প্রকারান্তরে বর্তমান রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, অনেক ঘরোয়া আলোচনায় ভক্তিাবাবু এবং

ছেড়েই দিচ্ছে। অতএব আর বন্দী মুক্তি আন্দোলনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু বন্দী মুক্তি আন্দোলন কোন মতেই বন্ধ হতে পারে না বরং একে আরো জোরদার করা উচিত। এটাই তার মত। স্পষ্টতই এটা সি পি এমকে লক্ষ্য করে বলা।

সবশেষে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে সেপ্টেম্বর মাসেই বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে। এবং সঠিক কত বন্দী ছাড়া পেয়েছে এবং কত বন্দী এখনও জেলে আছে তার বিবরণ তিনি সংবাদপত্রে দেবেন বলে জানান।

দেবব্রতবাবু সি, পি, আই (এম)-এর বিরুদ্ধে তীব্র বিমোহন করছেন। বিশেষ করে ভক্তিাবাবুর পুরনো সি, পি, আই (এম) বিষয়ে অতীতে তো এক কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। ভক্তিাবাবু কি আবার সেই পুরনো রোগে আক্রান্ত? দেবব্রত বন্দোপাধ্যায় তাঁর বিভিন্ন সমাবেশের ভাষণে সশস্ত্র বিপ্লবের অনিবার্যতার উল্লেখ করছেন। দেবব্রতবাবুর রাজনৈতিক বিশ্বাসমতে বাকস্বাধীনতার অধিকার আছে বৈকি! কিন্তু যেহেতু তিনি মজি-সভার সদস্য সেইহেতু তাঁকে সংযত-বাক হতে হবে। অতীতে রাজবন্দী মুক্তির দাবীতে খুবই সোচ্চার ছিলেন যিনি তিনি হচ্ছেন অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র। কিন্তু, এখন তাঁকে মজি-সভার সদস্য হিসেবে নির্দিষ্ট আচরণ বিধি মেনে চলতে হয় এবং আশা করবো ভক্তিাবাবুও দেবব্রত-বাবুও সেই রীতি অনুসরণ করবেন।

এল আই সির ক্লাস ওয়ান অফিসারদের দাবী দিবস

জীবন বীমা কর্পোরেশনের ক্লাস ওয়ান অফিসাররা সারা ভারতব্যাপী "দাবী সপ্তাহ" পালন করেন গত ২৯শে আগষ্ট থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর। তাঁদের কর্মস্থলীর মধ্যে ছিল কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ টেলিগ্রাম বা পত্র প্রেরণ, স্মারকলিপি প্রদান, বিক্ষোভ প্রদর্শন, গেট মিটিং, অবসর গ্রহণের বয়স কমানোর সাহু-লারে অগ্নি সংযোগ, জোনাল অফিসের সামনে অবস্থান ও গণ-অনশন। সারা ভারতের ক্লাস ওয়ান অফিসারদের সঙ্গে কলকাতার অফিসাররাও এই কর্মসূচী পালন করেন।

এল আই সির ক্লাস ওয়ান অফিসার্স এসোসিয়েশনের অভিযোগ যে, একমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রেই বেতন ও চাকরীর শর্তের পুনর্বিভাগ করা হয়নি যার ফলে ক্লাস ওয়ান অফিসাররা তাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের থেকে মোট বেতন কম পাচ্ছেন। এরা অবশ্য বেতন বৃদ্ধির দাবী করছেন না, এরা চাইছেন অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারীদের সঙ্গে বেতন কাঠামোর সামঞ্জস্য বিধান। অফিসাররা কর্তৃপক্ষের দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধেও সোচ্চার। এর অন্ততম উদাহরণ হল, নতুন নিয়ম করা হয়েছে যে, ৫০ বছর হলেই সরাসরি এল আই সি কর্তৃক নিযুক্ত অফিসারকে অবসর গ্রহণ করানো যাবে, আগে যেটা ছিল ৫৮ বছর।

মতামত

প্রতিবাদ

গত ১২ই আগষ্ট ১৯৭৭ দর্পণ পত্রিকার ২৯শ সংখ্যায় '১৯৭০ সাল। বরাসাতের রাজপথে আটটি মৃতদেহ। কিছু ঘটনা ও প্রশ্ন।' শীর্ষক কাহিনীটি আমরা রামকৃষ্ণ মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের (আড়িয়াদহ হাসপাতাল) কর্মীবৃন্দ পাঠ করে আশ্চর্যবোধিত হয়েছি।

১৯৭০ সালের ১৯শে নভেম্বর রাতে কি তারপর কোনদিন পুলিশ কাউকে সঙ্গে করে হাসপাতালে আনে নি, হতরাং অজ্ঞাবাহুর সনাক্ত-করণ অথবা আড়িয়াদহ হাসপাতালের ভেতর অত্যাচারের কাহিনী মিথ্যা ও ছুরতিসম্মিশ্রিত। ডাঃ তাপসরঞ্জন দাসমহাপাত্র বা তাঁর জীবন দেখাশুনোর কাহিনীটিও অলীক। আমরা এই মহান প্রতিষ্ঠান এবং এর সঙ্গে যুক্ত সমগ্র চিকিৎসক-মণ্ডলী এবং কর্মচারীবৃন্দ সমস্ত রকম দলাদলি এবং রাজনীতির উপরে।

কৃষ্ণ গুপ্ত, শীলা গাঙ্গুলী
এবং আরও কয়েকজন

জেলে পুরছেন না কেন?

কংগ্রেসী রাজস্ব বিনা দোষে অনেককে জেলে যেতে হয়েছে। এমন কি জিজ্ঞাস্যপ্রকাশ নারায়ণ ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে দেশের প্রায় সমস্ত বিরোধী নেতৃবৃন্দকেই জেলে যেতে হয়েছিল বিনা অপরাধে। হাজার হাজার নকশাল-পন্থীকেও কারারুদ্ধ থাকতে হয়েছে। অথচ কংগ্রেসী আমলে ভেজালদার ও চোরাকারবারীরা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়িয়েছে। এবং অসং কংগ্রেসী নেতা ও মন্ত্রীরাও।

কিন্তু জনতা সরকার এই সব কংগ্রেসীদের জেলে পুরছেন না কেন? সঙ্গম গান্ধীর মত একটি জুয়াচোর এবং অনেক অপরাধের নায়ককে আগে জেলের ভাত খাইয়ে তবেই তার বিচার করা উচিত ছিল। আমি প্রধান মন্ত্রীকে অস্বীকার করছি সঙ্গম, বংশীলাল ইত্যাদিদের জেলে পুড়ন। অনেক কীর্তির নায়ক পশ্চিমবঙ্গের যুব কংগ্রেসী নেতাদেরই বা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াতে দেওয়া হচ্ছে কেন?

শ্রীমল বিশ্বাস

বাজেট অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমে আগষ্ট বিধান সভায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র ১৯৭৭-৭৮ সালের রাজ্য বাজেট পেশ করার পর এর পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা শোনা গেল। একমাত্র বিরোধী দলের নেতা শ্রীকান্ত মিত্র ছাড়া বিরোধী পক্ষের অন্ত কারো ভাষণে বিরোধিতার জন্তই বিরোধিতার স্বর যত সোচ্চার ছিল, গঠনমূলক সমালোচনার প্রয়াস ততটা ছিল না। অবশ্য, একথাটা কংগ্রেস দলের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। শ্রীভোলা সেন বাজেট বিতর্কে ভাষণ দানের সময় মনে হচ্ছিল যেন একটা গিণ্ট কমপ্লেক্সে ভুগছেন। প্রথম দিকে তো প্রেস বন্ধ থেকেও তার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল না, পরে শোনা গেছে। কিন্তু তা ছিল নিঃশব্দ, নিরুত্থাপ। তাঁর ভাষণের সময় হাতে মাঝেই ট্রেজারী বেক থেকে ক্ষেত্রীয় মন্তব্য শোনা গেছে। কংগ্রেস পক্ষ বাহ্যতঃ খুব বলিষ্ঠতা দেখাতে চাইলেও কার্যতঃ ওদের হাবভাব ছিল আত্মরক্ষার প্রয়াস। ভোলাবাবুর অভিযোগ, অর্থমন্ত্রী একচেটিয়া পুঞ্জিকে এই রাজ্যে নানা স্বযোগ সুবিধা দিতে চাইছেন। তাঁর মতে, বিড়লাদের সঙ্গে যদি জয়েন্ট সেক্টর হয় তবে বিড়লাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করার কোন যুক্তি নেই। তাঁর প্রস্তাব, এ রাজ্য থেকে কেন্দ্রে যে অর্থ পায় তার ৪০ শতাংশ রাজ্যকে দিতে হবে। বিরোধী দলপতি

শ্রীমৈত্র বলেন যে, কেন্দ্র রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক কি হওয়া উচিত এবং কি কি ক্ষমতা রাজ্য সরকারের দরকার। অর্থমন্ত্রী সে কথা স্পষ্ট করে বলেননি। কাশীবাবুর মতে, এখন কেন্দ্রে জনতা সরকার বিরাজমান এবং সে ক্ষেত্রে বিমাতুলত ব্যবহারের আশঙ্কা নেই।

এবারের বিধানসভায় বাজেট উপস্থাপনা এবং জরুরী ভাষণে অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র একাই ছিলেন একশ। একদিকে যেমন তাঁর কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বর অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজন বোধে তীব্র স্নেহ। জবাবী ভাষণে তিনি স্পষ্টতই বলেছেন যে তারই উপস্থাপিত বাজেটে তিনি নিজেও খুসী নন, তবু সীমাবদ্ধতার মধ্যেও একটা বথাসম্ভব জনকল্যাণ মূলক বাজেট তিনি পেশ করেছেন।

রাজ্য বায়ব্যক্তি সরকারের প্রথম বাজেটের রচয়িতা হিসেবে অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র নিঃসন্দেহেই অভিনন্দনযোগ্য। বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেসী বাজেটগুলোর সঙ্গে বামপন্থী সরকারের বাজেটের লক্ষণীয় মৌল পার্থক্য আছে। যেমন, উৎপাদনশীল লব্ধি বৃদ্ধির জন্ত এই সর্বপ্রথম পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দ ৪ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। ১৯৭৭-৭৮ সালের পরিকল্পনাধীন ব্যয় বরাদ্দ ৩১১ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩১৭ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। ডঃ মিত্র বলেছেন, এই রাজ্যে ধারা এর আগে হাল ধরে

ছিলেন তারা সবকিছু ওলট পালট করে দিয়ে লুটেপুটে খেয়ে গেছেন কিন্তু তাই বলে বামপন্থী সরকার বার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ হাটাই করবেনা। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, পরিকল্পনার বাইরে খরচ কমিয়ে বাৎসরিক পরিকল্পনার বাড়তি টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন পুলিশের খাতে খরচ ভোট অন এ্যাকাউন্টে যা দেখানো হয়েছে তা থেকে প্রায় ৪ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। এবারের বাজেটের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, জনসাধারণের ওপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপানো হয় নি। বিক্রয় করের হার সংশোধন হলেও এই বর্ধিত হার জনসাধারণকে আঘাত করবে না এবং এই সংশোধনের ফলে, প্রায় ২৩ কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া যাবে। শহুরে বিস্তারনের ভোগ্য পণ্যের করবৃদ্ধির ফলে ২ কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ব্যক্তিগত মালিকানায় মোটর গাড়ীর ওপর কর বৃদ্ধির ফলে সংগৃহীত হবে ৭৫ লক্ষ টাকা। মাদকজব্বোর ওপর আবগারী ওজের হারবৃদ্ধির ফলে বাড়তি প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকা সংগৃহীত হবে। অর্থমন্ত্রীর বোষণামতে, সরকার ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে ছাড়ের সীমা বাড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পারিবারিক ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে আগে যেখানে ছাড়ের সীমা ছিল ৩০ একর, সেখানে ছাড়ের সীমা এখন থেকে হবে সেচ এলাকায় চার এবং অসেচ এলাকায় ছয় একর। অর্থমন্ত্রীর আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘোষণা হলো, “ভূমিরাজস্ব সম্পূর্ণ তুলে দিয়ে পরিষেবা কৃষিজীবীদের আর অল্পস্বার্থী একটি প্রগতিশীল স্বল্প কৃষি আয়কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই আমাদের লক্ষ্য।”

কংগ্রেস পক্ষ থেকে বারবার আক্রমণ করা হয়েছে ডাঃ মিত্র, বামপন্থী সরকার, বামফ্রন্ট এবং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুরকে। জ্যোতিবাবু এবং ডাঃ মিত্র তাঁদের অনন্তসাধারণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে বলিষ্ঠ যুক্তির জাল বিস্তার করে বিরোধীপক্ষকে ধরাশায়ী করেছেন অনায়াসেই। কংগ্রেস বেঞ্চের দিকে নিন্দাসূচক মন্তব্য বিতরণে জনতা দলের সহস্রাও বামফ্রন্টের সঙ্গে শরিক হয়েছেন।

প্রশাসনিক ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত বয়ঃ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন যে, স্বজন পোষণ অথবা অন্ত কোন দুর্নীতিকে বর্তমান রাজ্য সরকার বরদাস্ত করবেন না। জয়নাল

আজমীনের একটি মন্তব্যের জবাবে জ্যোতিবাবু সিংহবিক্রমে বিগত কংগ্রেস সরকারের নানাবিধ দুর্নীতি ও কলেক্টারীর প্রস্থ তুলে প্রতি-আক্রমণ চালান। কসবায় একজন যুবক হত্যাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস পক্ষ থেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করলে মুখ্যমন্ত্রী বিধাইন কণ্ঠে জবাব দেন যে এর সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই।

এবারের অধিবেশনে নকশালীদের সত্যনারায়ণ সিন্হা গ্রুপের অন্ততম নেতা সন্তোষ রাণা যোগ দিয়েছেন। নির্বাচনের সময় তিনি জেলে আটক ছিলেন। বায়ব্যক্তি সরকার ঘোষিত রাজবন্দী মুক্তির সিদ্ধান্ত অল্পস্বার্থী

তার বিধ্বংস মামলা প্রত্যাহার করা হয়। বিহারেও তাঁর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। অবশ্য ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চরণ সিং সত্যনারায়ণ সিন্হা গ্রুপের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট। এই গ্রুপের শাস্য সকলেই মুক্ত। অত্যাচার নকশালখানী বন্দীদের ক্ষেত্রে টালবাহানা চলছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সন্তোষ-রাণা বসছেন, জনতা বকে। বাজেটকে সরাসরি নেতিবাচক আখ্যা দিয়ে তিনি তার আক্রমণ ঘনীভূত করেন বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে। ধারা আশা করেছিলেন যে, সন্তোষ রাণা নতুন কিছু বলবেন, গঠনমূলক বৈদেশিক সংশোধনীয় তুলবেন তারা সকলেই আশাহত।

প্রধান শিক্ষকের পুনর্বহাল দাবি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এ বি টি এর অধীন বর্ধমান জেলা শিক্ষক সমিতি সম্প্রতি বর্ধমান সি. এস. উচ্চ বিদ্যালয়ের বিতাড়িত প্রধান শিক্ষক শিশিরকুমার চক্রবর্তীকে পুনরায় ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে পুনর্বহালের দাবীতে আন্দোলন স্বরূপ করেছেন। বিতাড়িত প্রধান শিক্ষক রাজনৈতিক কারণে কংগ্রেসের গুণাবাহিনীর অত্যাচারে বর্ধমান ছাড়তে বাধ্য হন। দীর্ঘদিন ঐ পদ শূন্য থাকার ফলে বর্ধমান বাগীপাঠ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বধীরচন্দ্র দাকৈ পরিচালক সমিতি প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করেন। জেলা শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্রীআমোদ রায় বর্ধমান প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন যে, উক্ত

শিক্ষক শ্রীচক্রবর্তী রাজনৈতিক কারণে ও কংগ্রেস বাহিনীর অত্যাচারে বর্ধমান ছেড়ে অন্তর্ভুক্ত চলে যেতে বাধ্য হন। এক্ষত্রে তাঁরা ক্ষেত্রীয় বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ১৫০ জন শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বর্ধমানের মহকুমা শাসকের নিকট একটি ডেপুটেশনও দিয়েছেন। শ্রীবসু বলেন, এই জেলায় প্রায় একশত জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের মার্চ পর্যন্ত কংগ্রেসী শাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় ও কংগ্রেস দলের, গুণাবাহিনীর বলি স্বরূপ নানাবিধ অত্যাচার ভোগ করেছেন। সেই সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করাই হবে তাঁদের প্রধান কাজ।

একটি মৃত্যুর ব্যাপারে অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পূর্ব রেলের চীংপুর ইয়ার্ডের পাণ্ডুর হাউসের বৈজ্ঞাতিক বিভাগের কর্মী বিকাশচন্দ্র দাস গত ১২শে আগষ্ট কর্মরত অবস্থায় বৈজ্ঞাতিক চূর্ণটনায় পড়েন ও পরদিন ভোর ছটায় বি আর সিং হাসপাতালে মারা যান। কর্মচারীদের অভিযোগ, এই মৃত্যুর জন্ত দাসী ফোরম্যান মধুসূদন চক্রবর্তী। তাঁরা এই মৃত্যুর জন্ত পূর্ণ ক্ষতিপূরণ এবং পরিবারের একজনকে অবিলম্বে পাকা চাকরিতে নিয়োগের দাবী করেন। ফোরম্যানের ডিভিসন ট্রান্সফারও দাবী করা হয়।

অভিযোগে প্রকাশ, বিকাশচন্দ্র দাসের কর্মস্থল ১৪নং ট্রাণ্ড রোডে থাকা সত্ত্বেও তাঁকে চীংপুর ইয়ার্ড পাণ্ডুর হাউসে পাঠানো হয় কারণ

তিনি যেহেতু জরুরী অবস্থার সময় নির্বাহকরূপে এবং ফোরম্যানের জীর কাছে পিয়ারলেসের বীমা করতে রাজি হননি।

জানা গেছে উচ্চ বৈজ্ঞাতিক সম্পন্ন হইচ গিয়ার (৬৬০০ ভোল্ট) ১৯৬৭ সালে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয় এবং তার পরিবর্তে নতুন হইচগিয়ার ৮৮৭৪ তারিখে আনা হয়। কিন্তু পুরনো বাতিল হইচ পাটাবার কোন ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত হয়নি। যথাসময়ে পাটাবার ব্যবস্থা হলে এই অকাল মৃত্যু ঘটত না। ঐ হইচের স্কেটের জন্ত একটি অয়েল ট্যাক থাকে যা প্রতি বছর অন্তত একবার পরীক্ষা করা দরকার। চূর্ণটনা ঘটান (শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিরুদ্ধে এ বি টি এর অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির (এ, বি, টি, এ) সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতী অনিলা দেবী গত ২৬শে আগষ্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে মধ্য শিক্ষা পর্ষদের বিরুদ্ধে ‘গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষার অভিযোগ এনে বলেছেন যে, পর্ষদের কাজকর্ম ছাত্র-স্বার্থ বিরোধী এবং বিশেষ একটি গোষ্ঠীর নির্দেশেই তা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তিনি বলেন, পর্ষদ কর্তৃপক্ষের ধামধেমালীর জন্ত যৌথিক পরীক্ষা, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স ও শরীরশিক্ষা ইত্যাদি পরীক্ষা গ্রহণে চরম অব্যবস্থা চলছে। অনিলা দেবী আরও বলেন যে, অযোগ্য টেবুলেটের নিয়োগের জন্ত মার্কসীটে অনেক গলদ দেখা যাচ্ছে

এবং এর ফলে অসম্পূর্ণ ফল প্রকাশ করা হচ্ছে এবং রিভিউ ফি নেওয়া সত্ত্বেও আবেদনকারীদের ফল রিভিউ করা হয়নি বা তার ফলাফল জানানো হয়নি। তাঁর আরও অভিযোগ এই যে, মাধ্যমিক পরীক্ষার সিলেবাস নির্ধারণেও পর্ষদ ছাত্রদের স্বার্থ উপেক্ষা করেছে। তিনি অভিযোগ করেন, সম্পূর্ণ অযোগ্য ও অস্বাস্থ্যকর লোকদের নিয়ে পরিদর্শক দল গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন জুনিয়র হাই স্কুলকে পরীক্ষায় প্রার্থী গ্রহণের অসু-মতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু অসুস্থ পরিদর্শক রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও এই সমস্ত স্কুলকে অস্বাভাবিক দেওয়া হয়নি।

দানিকেন তত্ত্বের আলোকে মহাকাশের সূত্র ও দেবতা বীরেন্দ্রনাথ

মহাকাশ ভ্রমণ :

তথ্য ও মন্তব্য

মহাকাশে আমরা বার বার লক্ষ্য করেছি একই রকম অদ্ভুত ঐশ্বর্য। সঠিক তথ্যসমূহের তার আগ্রহ তেমন নয় এমন অজ্ঞাত পুরাণ-পুথিতে প্রাপ্য। অর্জুনের নক্ষত্র-লোক ভ্রমণের বিবরণেও বিবরণ মহাকাশের কবির কাছে গৌণ। তিনি নক্ষত্রের প্রাকৃতিক অস্তিত্বকে নক্ষত্র-করে দিয়ে বলেন, রাজচক্রবর্তী এবং দানধ্যানবংশীল ব্যক্তিরাই স্বকৃত পুণ্যফলহেতু দিগন্তগুলি উদ্ভাসিত করে নক্ষত্ররূপে অবস্থান করছেন। এ কথা- অর্থ যদি এই হয় যে, সেই প্রাগৈতিহাসিক মহাকাশ-চারণার যুগে কিছু কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি বিভিন্ন রথযোগে নক্ষত্রে চলে গিয়েছিলেন তবে সেই 'যাওয়ার' বাস্তবতা কিছু থেকে থাকলে কবির হৃদয়ব্যবস্থাও অর্থময় হতে পারে। নচেৎ বুঝতে হয়, মানুষের মনে ভক্তি ও বিশ্বাস চিরস্থায়ী করার মানসেই কবি ঐ জাতীয় মনগড়া বক্তব্যকে 'মহাকাশের সূত্র' থেকে প্রাকৃতিক মালার মত গেঁথে রেখে গেছেন।

বিভিন্ন নক্ষত্রে যাত্রায় ও বসবাসের কথা বলা হয়ে থাকলে মাত-লির বক্তব্য, বিভিন্ন নক্ষত্রে পুণ্য-শীলোয়া জ্যোতির্ময় রূপে বসবাস করেন। এমন কথা-কৌতুহলের সঙ্গে কান পাতে হয়। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে 'প্রজ্ঞাদের রাজ্য ছিল শুকতারার। প্রসঙ্গত একটি প্রাচীন মানচিত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মানচিত্রটির রসম আনুমানিক তের হাজার বছর। পাওয়া গেছে হিমালয়ের পাদদেশে এক গুহায়। এই মানচিত্রে তের হাজার বছর আগেকার নক্ষত্রলোকের অবস্থান চিত্রিত আছে। মানচিত্রটি ছাপা হয় সোভিয়েত রাশিয়ার জাতীয় ভৌগোলিক ম্যাগাজিনে। ঐ মানচিত্রে শুকতারার ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান রেখাচিত্র দ্বারা যুক্ত করা আছে। তার অর্থ কী? তখন পৃথিবী ও শুকতারার মধ্যে আন্তর্মহাকাশিক সংযোগ ছিল? মানচিত্রে পথরেখা

তো এভাবেই থাকে। (দ্রঃ 'মানুষের পূর্বপুরুষ অথ গ্রহের মানুষ', পরশুরাম চৌধুরী, প্রোব লাইব্রেরী।) এই তথ্য কি বিষ্ণুপুরাণের প্রজ্ঞাদের গল্পটির উপর কিছু আলোকপাত করেছে? দূর নক্ষত্রলোকে জীবের অস্তিত্ব আছে ও ছিল বলে আজকের বৈজ্ঞানিকদেরও বিশ্বাস। আর সহস্রাব্দিক বছর আগে কোথায় জীবের বসবাস কেমন ছিল আমরা তা জানি না। জানবার প্রয়াস চলেছে, হয়ত একদিন তা জানাও যাবে।

কিন্তু সেইসব অসম্ভব নির্ভরতার ওপর মহাকাশের পুনরুৎপাদন-আমি আগ্রহী নই। আমার বক্তব্যের ক্ষেত্রে প্রসঙ্গটি এসে পড়ছে মাত্র। আমার ক্ষোভ, অর্জুন নক্ষত্রলোকে গেলেন, কিন্তু মহাকাশের সূত্র সেই হৃদয় ভ্রমণের ছিটে ফোটা বিবরণও আমাদের জ্ঞান রেখে গেলেন না, অথচ অজ্ঞাত ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

বাবিলনীয় উপাখ্যানের বর্ণিত কীশোর রাজা এতানা (Near Eastern Mythology—John Gray. Hamlyn Publishing, London) ঈগলে চেপে (গল্প রথ?) মহাকাশ ভ্রমণ করেছেন। এতানা কাব্যে তার বর্ণনা আছে। পুথিটি পাওয়া যায় আশিরীয় রাজা বানিপালের (খৃঃ পূঃ ৬৬২-৬২১) গ্রন্থাগার সংগৃহীত সংস্করণ থেকে। দানিকেন এতানার মহাকাশ চারপাশ বিবরণটি থেকে বহুলাংশ উদ্ধার করে সেই আশ্চর্য ভ্রমণের বৃত্তান্ত জানিয়েছেন আমাদের। অজিত দত্তের অনুবাদ ('আমার পৃথিবী') এই রকম: "কিছুক্ষণ উড়ে ওড়ার পর ঈগল এতানাকে বললেন, 'দেখ, দেখ বন্ধু, মাটি কেমন বদলে গেছে। পৃথিবীর পাহাড়ের গায়ে সমুদ্রকে দেখ।'"

"মাটিকে মনে হচ্ছে, পাহাড়ের মতন আর সমুদ্র যেন স্রোতবহা।"

তারপর আরো উচুতে উঠে ঈগল আবার বলেন, "দেখ, দেখ বন্ধু, মাটি আরো কত বদলে গেছে।"

"মাটি এখন উপবন যেন।"

একসময় পৃথিবীর মাটিকে মনে হয় "একখানি ছোট কুটির আর সমুদ্র তার ক্ষুদ্র অঙ্গন।" তারপর "মাটি যেন একখানা পিঠে আর নাগর যেন পিঠের সরা।" আরো উচুতে পৌঁছলে পৃথিবী অদৃশ্য হয়ে গেল। এতানা অরাক "চেয়ে দেখি সত্যিই পৃথিবী হারিয়ে গেল। বিশাল বারিধিও মুছে গেল চোখের ওপর। সমুদ্রে বললুম, দাঁড়াও বন্ধু, চাই না তোমার স্বর্গে যেতে, আমায় ফিরিয়ে নিয়ে চলে। আমার পৃথিবীতে।"

এতানার এই ভীতিই চিত্রটিকে সজীব ও বাস্তব করেছে। হায় অর্জুন কেন অমন করে দেখলেন না! তার কি কোনই কৌতুহল ছিল না! যুধিষ্ঠির হয়ত দেখতেন। তিনি অনেক বেশি প্রকৃতিপ্রেমিক। অর্জুন যুদ্ধ-বিজ্ঞার মত মোটা জিনিষের প্রতি সন্দেহিত আকৃষ্ট। কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর, "মহাকাশের কথা" গ্রন্থে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন অর্জুনের ওপর। খুঁজে পেয়েছেন তিনি যুধিষ্ঠিরের মধ্যে একজন বিচক্ষণ কবি দার্শনিককে কিন্তু কি আর করা যাবে, যুধিষ্ঠির মহাকাশ রথে চড়ে কী দেখেছিলেন তা আমাদের জ্ঞানার উপায় নেই। তিনি তো ফিরে আসেন নি। তাঁর সহযাত্রীরাও প্রত্যাবর্তন করেন নি কেউ।

এতানার মহাকাশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত উদ্ধার করে "In Search of Ancient Mysteries" গ্রন্থের লেখক Alan and Sally Landsburg লিখেছেন মহাকাশ থেকে এতানা যেমন দেখেছিলেন এ যুগের নভস্কর কার্পেটার স্কটও দেখেন তেমনই একই রকম দৃশ্যাবলী। স্কট বলেন সবকিছু মুছে গিয়ে থাকে শুধু নীল মহাকাশ কেননা stratosphere-এর উপরে উঠে গেলে পৃথিবী হারিয়ে যায় অসীম বাষ্পের পেছনে। তাই চারদিকে বিরাজ করে ধূ ধূ নীল। এতানার চোখে শেষ দিকে শুধুই সমুদ্র ধরা পড়েছে। স্কট কার্পেটারও বলেছেন "One thing that struck one was the preponderance of

ocean and blue." Mr Alan এতানার ঈগলটিকে জিহ্বারীয় রক-টের সঙ্গে তুলনীয় মনে করেছেন, "The eagle infirms Etana that they will ascend to the place where they are going in a series of rises." I looked up 'Sounds like the three stage rocket that puts a space craft into orbit.' (ঐ)।

ওড়ার কথা এভাবেই ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর বিভিন্ন পুরাণপুথিতে। বর্ণনাগুলি অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্যভাবে মিল করিয়ে দিচ্ছে বর্তমান নভস্করের দেখা আকাশ মাটির বর্ণনার সঙ্গে।

জুমেদীয় শহর উরুর অধিপতি গিলগামেশের বন্ধু এন্কিডুও ঈগলে চেপে আকাশ ভ্রমণে গেছিলেন। তিনিও প্রায় একই রকম দৃশ্য দেখেন। ওপর থেকে মাটি সমুদ্রের রূপ দেখে মাটিকে পর্বত, সমুদ্রকে হ্রদ মনে হল। চার ঘণ্টা উচ্চতর পথে ভ্রমণের পর মাটিকে মনে হ'ল উদ্ভান আর সমুদ্র উদ্ভান পরিধা। তারপর আরও চার ঘণ্টা আরও উচুতে উঠে মনে হ'ল, মাটি যেন একবাটি জড়ি আর সমুদ্র জলকুণ্ড। ('দেবতা কি গ্রন্থান্তরের মানুষ?'—দানিকেন, অনুবাদ অজিত দত্ত)

আকার সেই জিহ্বারীয় রকেট নাকি? ধাপে ধাপে ওঠা ও উচ্চতর অবস্থান থেকে পৃথিবীর রূপ পরিবর্তন দেখাও নভস্করের চোখে পৃথিবীর চেহারা অনেকটা এমনই দেখায়। এই বিচিত্র দর্শন কল্পনার দ্বারা অসম্ভব। কার্পেটার স্কট বলেছেন পর্বত চূড়া থেকে সমতল ভূভাগ দেখা আর মহাকাশ থেকে দেখার মধ্যে তের তফাৎ। মহাকাশ থেকে তোলা পৃথিবীর যে সব ছবি আমাদের চোখের সামনে আজ সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলিই তো স্কটের বক্তব্যের চাক্ষুষ সাক্ষ্য।

নভস্কর দেবতাদের সঙ্গে মহাকাশে হারিয়ে যাবার আগে এনক ছেলেকে যে পুথি দিয়ে গেছিলেন তাতে তাঁর আকাশ ভ্রমণের কথা আছে; আছে মহাকাশযানের অধিনায়কের সঙ্গে আলাপের বিবরণ। বিচক্ষণ এনক জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে বেশ কিছু জ্ঞান অর্জন করেছিলেন মহাকাশে নীত হয়ে। গ্রন্থান্তর-বাসীদের উন্নত বিজ্ঞান তাঁকে দিয়েছিল সেই জ্ঞান ভাণ্ডার। এনক পুথিতে আছে, তিনি চন্দ্রস্বর্গের 'পরিক্রমণ পথ' সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি শিখলেন কেমনভাবে নক্ষত্রগুলির নামকরণ ও গুরুত্বের পরিমাপ করা হয় সেই বিদ্যা। জানলেন, "বজ্রের নিনাদের কয়েকটি

শ্রির স্বর আছে। বজ্র এবং বিদ্যুৎ এক ও অভিন্ন। তাহার। কখনো পৃথক হয় না।" ("আমার পৃথিবী") থেকে বজ্র বিদ্যুৎকে মানুষ দেবরোষ হিসেবে ভাবছে, সে সময় এনক কোথায় পেলেন তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা?

এনকের প্রতিবেদনে মহাকাশ-চারীদের নাম ও পদমর্যাদা এবং তাঁদের ওপর আরোপিত কর্তব্যের কথাও বলা হয়েছে। এতো অদ্ভুত সব তথ্য কেবলমাত্র কারও কল্পনা-প্রসূত হতে পারে না। বরং মনে হয়, এই তথ্য সমৃদ্ধি ঘটছে বস্তু বাস্তব ঘটনার সম্মুখীন হয়েই।

মহাকাশের তত্ত্ব এহেন তথ্যপূর্ণ প্রতিবেদন আজকের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু মনে বিশেষ প্রার্থিত ছিল। কিন্তু যেন ইচ্ছাকৃত ভাবেই একটি বিশেষ ভাবমণ্ডলের মেঘে বাস্তবত্ব-গুলিকে কুয়াশাচ্ছন্ন করা হয়েছে। অবশ্যই এ কাজ সম্ভব তখনই যখন কথক বা লেখকের জ্ঞান সম্পূর্ণ, যখন তিনি তাঁর সেই প্রজ্ঞার আসন থেকে জ্ঞানময় বস্তুগুলির ইচ্ছামত বিবাক্তন করতে সক্ষম। কলংট এটুকুই যুক্তি, মহাকাশের তত্ত্ব যুগের ভারতবর্ষে জ্ঞানালোকে অনেক বেশি উদ্ভাসিত ছিল, তাই সম্ভব হয়েছে মন্তব্য। তাই কৌতুহল ছিল কম, জ্ঞান হয়েছিল রহস্যময়।

(চলবে)

একটি মৃত্যু

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পর দেখা যায় যে, হুইচ গিয়ায়ে লেখা আছে ২০/৭/৭৪ তারিখে শেষ তেল পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু পরে ৩ তারিখ পাঁচটে ২০/৭/৭৭ তারিখ করা হয়েছে।

আরও জানা গেছে, এই উচ্চ বৈদ্যুতিক হুইচ কোন চার্জম্যান বা সুপারভাইজারের উপস্থিতি ছাড়া কোন কর্মচারীর লাগাবার নিয়ম নেই। অথচ দেখা যায় বারবারই জোর জ্বরদস্তি করে ও শক্তির ভয় দেখিয়ে চার্জম্যান বা সুপারভাইজারের অনুপস্থিতিতে দৃক ও অদৃক কর্মচারীদের এই হুইচ লাগাতে বাধ্য করা হয়। মধুসূদন চক্রবর্তী এ গ্রেড চার্জম্যান হয়ে ফোরম্যানের কাজ করেছেন। অনেকেই প্রশ্ন, তিনি দুবার ফোরম্যান পরীক্ষায় অযোগ্য প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কার নির্দেশে দীর্ঘদিন এই দায়িত্বশীল পদে বহাল রয়েছেন। বকাশচন্দ্র দাসের সঙ্গে যিনি সাহায্যকারী হিসেবে ছিলেন তিনি একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী।

মাও সে তুঙের চিন্তাধারা প্রসঙ্গে

শ্রীকান্ত বসুরায়

এক) নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব;
দুই) জনযুদ্ধ (গণবিপ্লবের রণ-
বিজ্ঞান ও প্রয়োগ);

তিন) দুই সংগ্রাম (ধনতন্ত্রের
পথ ও সমাজতন্ত্রের পথের লড়াই);

চার) জনগণের মধ্যকার বিভিন্ন
বিশ্বের সমাধানের সংগ্রাম;

পাঁচ) উপরিকাঠামোর সঙ্গে
ভিত্তির ধর্ম বিষয়ক সংগ্রাম;

ছয়) মহান সর্বহারা সামাজিক
বিপ্লব;

সাত) পার্টি, গণসংগঠন ও গণ-
ফৌজের একতর সংগ্রাম (সংগ্রাম
সমালোচনা ও রূপান্তর);

আট) পার্টিকে অবিস্তৃত রেখে
পার্টির মধ্যকার ডান ও বাম
বিচ্যুতির বিরুদ্ধে দশ এগারটা গুরুতর
সংগ্রাম;

নয়) সমাজতান্ত্রিক শিবিরের
আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব বা “দুই পথের
লড়াই” (Struggle between two
roads) ক্রমে যখন এক ব্যতিক্রম
বা “দুই ব্যবস্থার লড়াই” (Strug-
gle between two Systems)
রূপান্তরিত হল তখন প্রকৃত সমাজ-
তান্ত্রিক শক্তিগুলির রণনীতি ও রণ-
কৌশল নির্ধারণ করা ও প্রকৃত সমাজ-
তান্ত্রিক শিবিরের আন্তর্জাতিক
সংহতিকে স্থানিকিত করে তোলা।

মাও সে-তুঙের চিন্তাধারাকে
অনুধাবন করতে হলে উপরোক্ত
বিপ্লবগুলিকে ও সংগ্রামগুলিকে অনু-
ধাবন করতে হবে। এদের প্রত্যেকটি
এক একটি অতীতপূর্ব বিপ্লব—জনগণের
সচেতন সংগঠন ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে
অবস্থার গুণগত পরিবর্তন। প্রথম
দুইটি যেমন এশিয়া-আফ্রিকা-
লাতিন আমেরিকার অধিবাসী
হুনিয়ার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মানুষের
মুক্তির দিশারী, বাকীগুলোও তেমনি
হুনিয়ার সমস্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের
কঠিনতর ও উচ্চতর পর্যায়ে শ্রেণী-
সংগ্রামের অঙ্গের স্বাভাবিক।

অন্যভাবে বলা যায়, অসমত
দেশগুলিতে (‘লেনিনের বর্ণনায়
“Uneven Developement”
ঐক্য) বিপ্লবের কাছে নয়া গণতান্ত্রিক
বিপ্লবের বিজ্ঞান যাও সে-তুঙের এক
বিশ্বকর অবদান; এবং সমাজ-
তান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা
ঠেকানোর পদ্ধতি-বিজ্ঞান মাও-
নেতৃত্বের দ্বিতীয় মহান অবদান
(উপরোক্ত তিন থেকে আট ঐক্য);
তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় শোষণ-
বাদের অনুপ্রাণণ ও সামাজিক
সাম্রাজ্যবাদে তার পরিণতি লাভ

পৃথিবীর ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ অচেনা,
সম্পূর্ণ অতীতপূর্ব এক পরিস্থিতি নিয়ে
এসেছে, বিশেষতঃ এই আণবিক
যুগের ‘অতিশক্তি’ দাপটের দিনে
তার পার্টা রণনীতি ও কৌশল গড়ে
তোলা এবং সর্বহারা বিপ্লবকে রক্ষা
করা ও উন্নত করা মাও নেতৃত্বের
তৃতীয় মহান অবদান। এক কথায়,
এ তিনটি অবদানের ঐতিহাসিক
তাৎপর্যের মধ্যেই মাও চিন্তাধারার
নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত।

ইতিহাসের পাতাকা শাতে

লেনিন-মাও

“The power of the prole-
tariat lies, not in its num-
erical strength, but in its
political strength”—Lenin.

সর্বহারা আন্দোলনে রাষ্ট্র ক্ষমতা
দখল করা যেমন আবশ্যিক, তেমনি
আবশ্যিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতি-
বিপ্লবী শক্তির রাষ্ট্র ক্ষমতা পুনর্দখলের
চেষ্টাকে ঠেকানো। এ আবশ্যিকতার
ভিত্তিতে সোভিয়েত বিপ্লবের ও চীন
বিপ্লবের সাদৃশ্য ও পার্থক্যগুলিকে
আমাদের জানতে হবে। আর
সর্বহারা বিপ্লবের অগ্রগতিতে রুশ-
বিপ্লবের পাশাপাশি চীন বিপ্লবের
অবদানগুলিকে বুঝতে হলে মাও-
অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন প্রয়োজন।
সেগুলি প্রধানতঃ কি কি?

১। মহান অক্টোবর বিপ্লব দেশে
দেশে সর্বহারার নেতৃত্ব বিপ্লবগুলিকে
প্রেরণা যুগিয়েছে, পথ দেখিয়েছে;
চীন বিপ্লবও তেমনি হুনিয়ার দেশে
দেশে বিপ্লবের প্রধান শক্তি সাম্রাজ্য-
বাদকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও
সামরিক দিক থেকে দুর্বল করে
তুলছে, বিপ্লবের প্রধান বিপদগুলিকে
উদ্ঘাটিত ও বিচ্ছিন্ন করে চলেছে,
এক অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে
বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক
বিপ্লবের পক্ষের শক্তিগুলিকে বিভিন্ন
ভিত্তিতে সমবেত করছে ও প্রধান
প্রধান সাধারণ শক্তির সম্মুখীন হতে
সাহায্য করে চলেছে, নিজদেশে
সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে উন্নত করার
মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির
সামনে উদাহরণ ও প্রেরণা যুগিয়ে
চলেছে, দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর
পার্টির ও সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজ-
তান্ত্রিক সমাজের সামনে ‘বর্তমান পূর্ব
ইউরোপীয় অধঃপতনকে’ ঠেকানোর
সম্ভাব্য পথ দেখাচ্ছে। অন্যভাবে
বলা যায়, রুশ বিপ্লব যেমন চীন বিপ্লব
সহ অন্যান্য বিপ্লবকে একাধারে সমৃদ্ধ

ও প্রভাবিত করেছিল, চীন বিপ্লবও
নতুন এক তীব্র পরিস্থিতিতে বর্তমান
কালের ও আগামী দিনের বিপ্লব-
গুলিকে (আগামী দিনের ‘দ্বিতীয়
রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব’ সহ) আরো
শুদ্ধ ও প্রভাবিত করার ঐতিহাসিক
গুরুত্ব ও সামর্থ্য অর্জন করেছে।

তাই অক্টোবর বিপ্লব ও চীন
বিপ্লব পরস্পরের পরিপূরক। এক
বিপ্লবের নেতৃত্ব যেমন লেনিন, অপর
বিপ্লবের নেতৃত্ব তেমনি মাও সে-তুঙ।
তাই মহান লেনিন ও মহান মাও
পরস্পরের সাথী ও পরিপূরক।

আজ লেনিনোত্তর দিনে যখন
লেনিন ও লেনিনবাদকে ডুবানোর
চেষ্টা চলছে, সে সময় লেনিনের
সামর্থ্য সাম্রাজ্যতান্ত্রিক উত্তরাধিকারী
মাও এক মহান শিক্ষক ও দিশারী,
বিশেষতঃ আণবিক ও সামাজিক
সাম্রাজ্যবাদের এ যুগে।

২। আরার, লেনিন যে সমস্ত
হুনিয়ারী রেখে গেছেন, সি পি এস
ইউ তার অনেকটাই সম্মুখে নিতে
ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সি পি
এস ইউ-এর ব্যর্থতার মধ্যে ক্ষেত্র-
বাচক শিক্ষা (negative lessons)
ফুটে উঠেছে, সি পি সি তার সঠিক
বিশ্লেষণ করেছে; শুধু তাই নয়,
সর্বহারা বিপ্লবের বর্তমান স্তরের
বিশেষ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
সি পি সি তার নিজ অভিজ্ঞতার
ভিত্তিতে এ সমস্ত সমস্ত সমাধানের
বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি
উদ্ভাবন করে চলেছে ও গড়ে
তুলছে। এক কথায়, সি পি এস
ইউ-এর শোচনীয় ব্যর্থতা বর্তমান
কালের ইতিহাসের কাছে যে প্রশ্ন-
গুলো তুলে ধরেছে, সি পি সি তারই
উত্তর রেখে চলেছে তার বিশ্লেষণে,
তার বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতিতে, নিজ
দেশে অনেকগুলো বিপ্লব সমাধার
মধ্য দিয়ে ও আন্তর্জাতিক বহুমুখী
সংগ্রামের মধ্যে।

বলা বাহুল্য, চীন বিপ্লবের ইতি-
হাস ও মাও-নেতৃত্বের ইতিহাস
অভিন্ন। মাও-নেতৃত্ব-চীনের পার্টি
দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে বিরাট বিরাট
ঐতিহাসিক সাফল্যের এক মালা
গেঁথে চলেছে (সঙ্গে সঙ্গে পার্টির
অত্যন্ত দুই লাইনের লড়াইয়ে
দশ এগারটি বিপজ্জনক মোড়
পেরিয়ে)। তাই লেনিনের-যোগ্য
উত্তরাধিকারী মাও প্রকৃত অর্থে
লেনিনোত্তর দিনের লেনিন।

৩। মার্কসবাদের দ্বন্দ্বিক তত্ত্ব
ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সাম্রাজ্যবাদের যুগের

বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশ্লেষণের ও
রূপায়ণের মধ্যে লেনিনবাদ
প্রতিষ্ঠিত। (Leninism is
Marxism of the era of imper-
ialism. To be more exact,
Leninism is the theory and
practice of the proletarian
revolution, in general, the
theory and tactics of the
dictatorship of the Prole-
tariat in particular)—Stalin :
The Foundation of
Leninism).

লেনিন অনেক কিছু করে যেতে
পারেননি (অবশ্যই অকালমৃত্যুর
জন্যে), অনেক কিছু দেখেও যাননি
(যেমন বর্তমান কালের শোষণ-
বাদের দেশে দেশে শাসক শক্তিতে
প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমশঃ সামাজিক
সাম্রাজ্যবাদে উত্তরণ ইত্যাদি),
আবার একই কারণে লেনিন অনেক
কিছুই বলে যাননি (যেমন
আণবিক অতিশক্তির যুগে শাস্তিপূর্ণ
সহ অবস্থানের নীতির, যুদ্ধ ও শান্তির
এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিপ্লব
সমূহের সমস্ত ইত্যাদি); ‘শোষণ-
বাদের সর্বোচ্চ পর্যায়’ হিসেবে
সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বিচার ও
মূল্যায়নের ফলে যে নতুন সংগ্রামের
লাইন দেখা দিয়েছে তার বাস্তব
নির্দেশগুলিকে রূপায়ণের মধ্যে দেখা
দিয়ে মার্কসবাদের নতুন বিকাশ
(অবশ্যই সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের
যুগের সাধারণ ও বিশেষ বস্তুগুলিকে
অনুধাবনের ভিত্তিতে)।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে
সর্বহারার একনায়কত্বের বর্তমান
অবস্থা। যে সব দেশে সর্বহারার
একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল তার
অনেকগুলিতেই আজ নয়া বুর্জোয়া
শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে
যার আক্রমণ সর্বহারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে
কেজীভূত (সে সব দেশেও শ্রমিক
শ্রেণীর একনায়কত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার
জটিল ও কঠিন সংগ্রামের হাতিয়ার
এই মাও বিজ্ঞান)।

সর্বহারা বিপ্লবের সামনে সমস্তা-
গুলি এর আগে কখনই এত জটিল,
এত কঠিন ছিল না যেমনটি হয়েছে
আজ। পরিস্থিতির ঐতিহাসিক
পটভূমিকাকে আরও খানিকটা
বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। মারমুখি
সাম্রাজ্যবাদের হাতে মহাবিপ্লবসী
আণবিক অস্ত্র নিষ্ফল্যই রাশিয়ায় ও
পূর্ব ইউরোপে শোষণবাদের বিজয়-
যাত্রাকে সহজ করে তুলেছিল।
কিন্তু দেশে দেশে শোষণবাদ কর্তৃক
রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ফলে সর্বহারার
রণনীতি ও রণকৌশল এক নতুন
অচেনা স্তরে প্রবেশ করলো; কেননা,

শোষণবাদীরাষ্ট্র ও তার রাজনীতি
ক্রমশঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে
সর্বহারা আন্দোলনের ভেতরে ও
বাইরে তার অসুপ্রদর্শন ও সংহতি
গড়ে তোলার কাছে এবং প্রভাব
বিস্তারের প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত সক্রিয়
হয়ে উঠলো। এককালের সমাজ-
তান্ত্রিক শিবিরের অংশ রাষ্ট্রগুলি যখন
এমনভাবে প্রতিবিপ্লবী তাওবে মত্ত
(ভারতে সোভিয়েত নীতি লক্ষণীয়)
হুনিয়ার দেশে দেশে বিপ্লবের ধারা-
গুলি ও সঙ্কচিত, সমাজতান্ত্রিক শিবির
তখন কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন তা
সহজেই অসম্ভব। এককালের
শ্রেণীশক্তির এভাবে উৎসাহী শ্রেণী-
মিত্রের হুমিকায় পেয়ে পশ্চিমী
সাম্রাজ্যবাদীরা ও দেশে দেশে
তাদের বুকুরেরা তাদের আক্রমণের
মাত্রা চড়িয়ে দেবে তাতে আশ্চর্যের
কিছু ছিলনা। আণবিক অস্ত্রের
উপর নির্ভরশীল এহেন সাম্রাজ্যবাদ
ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ যখন পর-
স্পরের পরিপূরক শক্তি হিসাবে
হুনিয়ার সমস্ত বিপ্লবী কোণাল, চাপ,
যড়যন্ত্র ও অসুপ্রবেশ বিস্তার করে
চললো (যেমন চীনে, ইন্দোচীনে,
আলবেনিয়ায়), কোথাও বা প্রত্যক্ষ
সশস্ত্র আক্রমণ কেজীভূত করে
চললো (যেমন ইন্দোচীনে মার্কিন
সাম্রাজ্যবাদ), যখন জনগণের
ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল সমাজ-
তান্ত্রিক শক্তিগুলি—তা সে প্রতি-
রক্ষার প্রসঙ্গেই হোক, কিংবা অর্থ-
নৈতিক পুনর্গঠনের প্রসঙ্গেই হোক,
কিংবা মতাদর্শগত ব্যাপারেই হোক
—অস্ত্রবিক্ষার সঙ্কটের মুখোমুখি
হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ ও সামা-
জিক সাম্রাজ্যবাদের এই সমবেত
অভিযানের মোকাবেলা করার উপ-
যোগী তত্ত্বগত, সংগঠনগত কূটনৈতিক
ও রণমৈত্রিক বিজ্ঞান স্বাভাবিক
কারণেই শ্রমিক শ্রেণীর জানা ছিল
না। একে উদ্ভাবন করা, আয়ত্ত
করা, উন্নত করা ও বাস্তবে রূপায়িত
করার ক্ষেত্রে যে নেতৃত্বকে ইতিহাস
চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল মাও নেতৃত্ব
তারই যোগ্য উত্তর। তাইতো
সাম্রাজ্যবাদী আণবিক রাজনীতি
পর্বস্ত তার অক্ষম আক্রোশে আজ
অসাড় (কাণ্ডজে বাঘ)।

তাই আমরা দেখি, লেনিনবাদ-
যেমন সাম্রাজ্যবাদের যুগের মার্কস-
বাদ, সেই একই অর্থে মাও সে-তুঙের
চিন্তা (বাহ্য) সাম্রাজ্যবাদের আণবিক
পর্যায়ে ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের
যুগের মার্কসবাদ লেনিনবাদ।

কয়লাখনি পরিভ্রমণ (৩)

সাধারণভাবে খনিপ্রিয়করা শান্তিপ্রিয় হলেও
কিছু অফিসার শিল্পে অশান্তি সৃষ্টি করছেন

সাধন গুহ

আজুর্বার্থ কেন্দ্রিক মুষ্টিমেয় অফিসারের ইচ্ছা পূরণ না হলেই তাঁরা আইন শৃংখলার অবনতির কথা বলেন। ইতিপূর্বে অর্থাৎ কংগ্রেসী শাসনে এমনটি ঘটনাই ঘটেছে তখনই এদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে থানা এবং কোম্পানীর পোষা ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও তাদের সংগঠিত মস্তান বাহিনী। ফলে, কোন খনি শ্রমিক ব্যক্তিগত অথবা সমবেতভাবে অফিসারদের তুঘলকী কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানালে তার মোকাবিলা করা হতো নির্মমভাবে। খনি জাতীয়-করণের পরও এমন ঘটনা ঘটেছে। এমন কি, ৭৭ সালে কেন্দ্রে জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরও এরিয়া ফোরের বেলবাইদ কোলিয়ারীর অফিসে দুইজন খনি শ্রমিক হুম্মা বাউরী এবং বেহু খইরাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে ২৮শে এপ্রিল রাতে। এই পাশবিক হত্যাকাণ্ডের কথা পরে বলছি। তার আগে অফিসারদের উত্থাপিত অকি-বোগগুলো বিচার করা যাক।

এ কথা অনস্বীকার্য যে অনেক শ্রমিক ব্যবহারে খুবই উদ্ধত এবং কোন কোন সময় তারা অহেতুক ভাবে মারমুখিও হয়ে ওঠেন। এরা সংখ্যায় অত্যন্ত এবং এদের পেছনে মদত দেয় কিছু পেশাদারী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা যারা এই কাজ করেই লাখ লাখ টাকা কামিয়েছে, গাড়ী করেছে, বাড়ী করেছে। সাধারণ শ্রমিক ঠেড়ানোর কাজে এরাই অফিসারদের প্রধান হাতিয়ার হয় আবার আকস্মিকভাবে কখনও হয়তো এদের হাতেই অফিসাররা নিগৃহীত হন। সরণ কাশেম পূজারী ভট্টাচার্য্য শ্রমিকদের হাতে অফিসারদের জীবন ও সম্মান বিপন্ন বলে যে চীৎকার করছেন তার মূল রহস্য এখানেই। সাধারণ খনি শ্রমিক শান্তিপ্রিয়, কর্তব্যপরায়ণ এবং নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। সর্বোপরি তাদের শৃংখলাবোধ অসাধারণ। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ ২২শ জুলাই অফিসার ধর্মঘটের দিন উৎপাদন বৃদ্ধি। অর্থাৎ বাহাদুর খনি শ্রমিকরা বহু অপকর্মের নায়ক কিছু কুখ্যাত অফিসারের চুই চক্রের পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত রাইনৈতিক শয়-তানীর সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করে চোখের মণির মত রক্ষা করেছেন জাতীয় শিল্পের স্বার্থ। উৎপাদন অব্যাহত রেখেছেন তারা। এই

বাহাদুর শ্রমিকরা যখন স্বাধিকার বক্ষার দাবীতে গর্জে ওঠেন তখন তাব প্রতিক্রিয়া হয় স্বদূরপ্রসারী। সেই গর্ভমান বিক্ষোভের বিক্ষোভ মুষ্টিমেয় অফিসারের দৈহিক নির্ধাতনে রূপায়িত হয় না, সেই বিক্ষোভ ঘটলে গোটা শিল্প হয় স্তব্ধগতি। সৃষ্টি অচলাবস্থার। যদি শ্রমিকদের হাতে অফিসারদের জীবন এবং মান বিপন্ন হয় তবে ২৮শে এপ্রিলের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরও কি বেলবাইদ কোলিয়ারীর ম্যানেজার আগরওয়াল এবং জোটজাকী কোলিয়ারীর ম্যানেজার সি, পি, সিং তথা বেলবাইদের এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার চ্যাটার্জী এবং ইনজিনিয়ার তেওয়ারী অজ্ঞ ও অকৃত দেহে ও অবোধে বিচরণ করতে পারতেন? পূজারী নিজেইতো আমার কাছে বেলবাইদ কোলিয়ারীর নৃশংসতা এবং এক্ষেত্রে অফিসারদের স্বর্ণা ভূমিকার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যদিও তার মতে এ রকম ঘটনা “ওয়ান পার মিলিয়ন।”

কে না জানে কয়লা খনির একাংশ অফিসারের নানাবিধ দুর্নীতির কাহিনী। কে না জানে একদল অফিসারের স্বার্থচক্রের ঘূর্ণায়মান পথে প্রতি টন ৮০ টাকার কয়লা বাজারে আসে প্রায় প্রতি টন ২৫০ টাকায়? জালজোচ্চুরির ঘাঁটি হয়ে উঠেছে কতকগুলো তথাকথিত কো-অপারেটিভ। বাস্তবধূর আড্ডা গড়ে তুলেছে কিন্তু কয়লা ব্যবসায়ী। খুব কংগ্রেসী মস্তানরা বিগত কয়েক বছর ধরে যে ডি, ও স্লিপ (ডেলিভারী অর্ডার) পেয়েছে আজও তা অব্যাহত আছে। এই ডি, ওগুলো মস্তানরা চড়াবোমে বিক্রী করে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর কাছে। এ ভাবেই ব্যবসায়ী ও /মিডলম্যানদের কারসাজিতে বাজারে কয়লার অগ্রিমূল্য। অফিসার এসোসিয়েশনের পেছনে এই ব্যবসায়ীদের কালো হাত চিরদিনই বেশ সক্রিয়। দেনজং কো-অপারেটিভের প্রবীর সরকার এবং কয়লা ব্যবসায়ী টি, পি, সিং প্রমুখের নাম নিশ্চয়ই সরণ-পূজারীদের অজানা নয়। আমার কাছে প্রমাণ আছে অফিসারদের বিভিন্ন পার্টিতে হাজার হাজার টাকা খরচ হয় এই ব্যবসায়ীদের তহবিল থেকে। এই একাংশ অফিসারের বিকল্পে লাম্পটের অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে স্থানীয় কোন কোন কাগজে। আমার কাছেও আসানসোলার অনেক বিশিষ্ট

নাগরিক এই অভিযোগ করেছেন।

একথা ঠিক যে, অফিসার মাজেই দুর্নীতিপরায়ণ নন। বিবেক ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন অফিসারও আছেন কিন্তু তাদের মধ্যে যদি কেউ ব্যাপক মানবিকতার সন্ধান করেন তবে খুবই ভুল করবেন। কয়লা খনির অফিসারের চোখে খনি শ্রমিকের জীবন ও মর্যাদা গুরু ভাগলেরই সমতুল্য। তবে চক্রান্তকামী অফিসারদের সঙ্গে সাধারণ অথবা বলা যায় গরিষ্ঠাংশ অফিসারদের তফাৎ এইখানে যে, এঁরা কালের পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং বাহ্যিক আচার ও আচরণে অন্ততঃ সংযত। সরণ-পূজারী কাশেম-ভট্টাচার্য্যেরা তো নিজেরাও জানেন যে তারা আইন কাহনের ধার ধারেন না। বিজনেস ম্যানেজমেন্টে অফিসারদের বলা হয় “এথিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভস অব দ্যা ট্রেড অন হু লাইজ ডা সোল রেস-পনসিবিলিটি অব এক্সিকিউটিং এণ্ড চ্যানেলাইজিং ডা এক্সপেটেড প্রিন্সিপলস অব দ্যা প্রসেস এ্যাণ্ড কাইও অব প্রডাকশন ইন ডা ম্যানার অব গ্রোয়িং এ্যাণ্ড ফান্ডার ডেভেলপিং ডা রিলেশান বিটুইন ডা এমপ্লয়র এ্যাণ্ড ডা এমপ্লয়জ-এ্যাণ্ড দাস ক্রিয়েটিং এ হারমোনিয়াস এনভায়রনমেন্ট টু-আর্ডস এ নন ইন্টারাপটেড মার্চ অব প্রোডাকশন।” অথচ, কয়লাখনির মুষ্টিমেয় অফিসার নিজেরাই আইনকে পদদলিত করে আইন শৃংখলার অবনতির দোহাই দিচ্ছেন।

এবং বর্তমানে সেটা রাস্তানৈতিক চক্রান্তের রূপ দিচ্ছে। ১৯শে আগষ্ট সাকতোড়িয়া অফিসের কোল অপারেশন এ্যাণ্ড ইনফরমেশন রুমে বসে পি, আর, ও জয়ন্ত বসুর উপস্থিতিতে সরণ আমার কাছে যে লিখিত বিরতি দিয়েছেন তাতে কেন তারা কর্ম-বিরতি অর্থাৎ ধর্মঘট পালন করে-ছিলেন (এবলেন্ড ফ্রম ওয়ার্ক) তার উল্লেখ করে কয়েকজন অফিসার নিগ্রহের কাহিনীর উল্লেখ করে বলে-ছিলেন, “অল দীজ ল্যাপেন্ড উইদিন টু মাস।” অর্থাৎ ২১শে জুন রাজ্য জ্যোতি বসুর মধ্যমস্তিষে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ১৯শে আগষ্ট পর্যন্ত কালসীমা ১মাস ২৯ দিন। অর্থাৎ ২ মাস। তাহলে সরণের কথামত কি ধরে নেব যে ইতিপূর্বে অফিসারদের জীবন ও সম্মানের নিরাপত্তা কোনদিন বিঘ্নিত হয় নি? অথবা যদি হয়ে থাকে,

তবে অফিসাররা ইতিপূর্বে এমন চরম সংগ্রামে অবতীর্ণ হন নি কেন?

এর জবাব খুবই পরিষ্কার। বাম-ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলে পুলিশী জুলুম অব্যাহত গতিতে চালানো সম্ভব নয়। পুলিশের একাংশ এখনও যড়যন্ত্র করছে ঠিকই কিন্তু তারাও জানে যে, তারা আশ্রয় নিয়ে থেলা কবছে। ফলে, এখন চতুর্দিকে মিথ্যা রটনার কল্পিত কাহিনী প্রচার করে একটা অরাজকতা সৃষ্টি করাটাই হচ্ছে কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য। সঙ্গে আছে বশরত সি, পি, আই দল। এদের অতি গোপন প্রচারের বয়ান হচ্ছে এই যে, কেন্দ্রে খুব শীগগিরই আবার কংগ্রেস ক্ষমতায় আসছে এবং পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসু মন্ত্রিসভাও স্থায়ী হতে পারবে না। কেন্দ্রে এখন যেহেতু কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা নেই সেই-হেতু আই এন টি ইউ সি এবং এ আই টি ইউ/সি নেতারা এখন খুবই হুঃসময়ের মধ্য দিয়ে চলেছেন। ফলে এখন চক্রান্তের দাবাখেলায় তারা মেতে উঠেছেন এবং সরণ-পূজারীরা পরিণত হয়েছেন তার বোভেতে। অফিসারদের একাংশ সম্বন্ধে যে কিস্তি চলেছিলেম তারা বুঝতেও পারেন নি যে, উল্টো চালে তারাই কিস্তিমাং হয়ে যাবেন। এই সব অফিসাররা একবারও নিজেদের আ আ ন মা লোচনা করেছেন? নিজেদের সংশোধন করতে চেয়েছেন?

ঘটনাদৃষ্টে আজ না ভেবে উপায় নেই যে, ইষ্টার্ব কোলফিল্ড লিমি-টেডের অর্ধভাগর সম্ভবত গৌরী সেনের তহবিল। নইলে কিছু কিছু অফিসার এমনভাবে লুটেপুটে খাচ্ছেন কেমন করে? ধানবাদে ৩টি সেন্ট্রাল ট্রাইবুনাল আছে যারা কয়লা শিল্পের বিরোধ মীমাংসার দায়িত্বে আসীন। পশ্চিমবঙ্গে কয়লা শিল্পে বিরোধ বিচার ও মীমাংসার জন্ত মাত্র একটি সেন্ট্রাল ট্রাইবুনাল আছে এবং বিশ্বয়ের কথা যে সেটি বসে কল-কাতায়। কোলিয়ারী হচ্ছে আসান-সোল-রাণীগঞ্জ অঞ্চলে অথচ ট্রাইবুনালে উপস্থিত হবার জন্ত সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে স্বপ্ন করে হলেও কলকাতায় যেতে হয়। পক্ষান্তরে একদল অফিসারের পোয়াবারো। ট্রাইবুনালে মামলা ধোঁকাতার অজুহাতে ম্যানেজমেন্টের পক্ষের সাক্ষী ছাড়াও ম্যানেজারদের অনেকে পর্যন্ত ৪-৫ দিনের জন্য কল-কাতায় গিয়ে বসে থাকেন। হোটেল ম্যাজেস্টিকে বিরাট অঙ্কের বিল মেটাতে হয় ই সি এল কর্তৃপক্ষকে। শতকরা ৯০টি কেসেই কর্তৃপক্ষ হেরে যায় কারণ কেসের কোন মেরিট অর্থাৎ ভিত্তিই থাকে না। মেরিট যাচাইয়ের জন্ত আইনজ্ঞদের পরামর্শও

নেওয়া হয় না। কারণ প্রায় প্রত্যেকটি সাসপেনশন অথবা অ্যা-ধরণের শাস্তি কিছু অফিসারের প্রতি-হিংসা পরায়ণতারই ফলশ্রুতি মাত্র। ট্রাইবুনালে যাবার নামে একাংশ অফিসারের টি এ এবং ডি এ বিল হচ্ছে ভালোই। অনেকের আবার একই সঙ্গে রথ দেখা আর কলা বেচাও হয়। প্রসঙ্গতঃ হেড কোয়ার্টারের ডেপুটি-চীফ পার্সোনাল অফিসার বি এন লালার নাম উল্লেখ করা যায়। প্রায় প্রতিটি মামলা দেখা-শুনার জন্ত তিনি ধানবাদ ও কল-কাতা যাতায়াত করেন। একথা কি সত্য নয় যে লালার ছেলে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত এবং গৌরী সেনের টাকায় তাব পুত্র-স্নেহও তিনি নিয়মিত ভাবেই কালিয়ে নিতে পারেন? অনেক অফিসার কোম্পানীর গাড়ীতে কোম্পানীর তেল খরচ করে রাঁচী হাজারীবাগ ঘুরে এসে লগবুকে পরিক্রমার মিথ্যা রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন।

এ সব ঘটনা শ্রমিকদের অজানা নয়। শ্রমিকদের রিকর্ডে মিথ্যা চার্জ-সীট এবং মিথ্যা কেস করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং নিয়মিতভাবে কোম্পানী প্রায় সব মামলাতেই হেরে যাচ্ছে। কিছু অফিসারের খেচ্ছা-চারিতা এবং তুঘলকী মনোভাবের জন্তই এগুলো হচ্ছে, যার ফলে উজাড় হচ্ছে গৌরী সেনের তহবিল আর সেই টাকার সিংহভাগ যাচ্ছে ঐ একাংশ অফিসারদের পকেটে এবং সবচেয়ে বড় কথা যে এর ফলে শ্রমিক কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে তিক্ত থেকে তিক্ততর হচ্ছে। এই সত্যগুলো কি সরণ-পূজারীরা অস্বীকার করবার হিম্মত রাখেন? অফিসারদের জীবন-মান বিপন্ন হবার অভিযোগ অসত্য ভাষণ মাত্র। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কর্মীরা (যথা সিটু ইত্যাদি) আগের তুলনায় অনেকটা নিরাপদে কাজ করিতে পারছেন। চেন্নারম্যান-ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ ভার্মা, মিঃ এস সি গুপ্তা, এরিয়া ফোরের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ নির্মল শর প্রমুখ অনেকেই স্বীকার করেছেন যে সিটু ইত্যাদি বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা নিরোভ এবং রিজনেবল। এদের নেতৃত্বে শ্রমিকদের সংঘমিত্র চেতনার স্মৃতি ঘটেছে বলেই সরণ-পূজারীদের “গেল রাজ্য গেল মান”। আগামীবার আমার এবারের কয়লাখনি-পরিক্রমার শেষ প্রতি-বেদনে বেলবাইদ কোলিয়ারীর নৃশংস শ্রমিক হত্যার কাহিনী থেকেই পার্থক্য সমাজ বুঝতে পারবেন যে এর কাছে মধ্যযুগীয় বর্বরতাও তৃণাদপি তৃণ।

নতুন চীনের শিল্প প্রসঙ্গে

ইন্দিরা বসু

গত পঁচিশ বছরে চীনের জনগণ দ্রুত পশ্চিম পুরনো চীনকে নতুন সমাজতান্ত্রিক চীনে পরিবর্তিত করেছে। কোন দেশে কখনই সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যন্ত্রশিল্পের প্রসার ছাড়া। মুক্তির পরেই দেশময় ভারীশিল্প গড়ে তোলার অহরহা ছিল অনেক। বহুদিন ধরে চীন সাম্রাজ্যবাদী সামন্তবাদী শাসনের নিপীড়নে থাকায় তার অর্থনীতি খুব ধারাপ অবস্থায় ছিল। সেই সময়ে কৃষির উন্নতিকল্পে প্রাথমিক না দিয়ে কোন উপায়ই ছিল না যার উপর ভিত্তি করে জাতীয় অর্থনীতি দাঁড়াতে কৃষির উন্নতি করায় কিছু কিছু কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠলো। মাও-সে-তুং হাঙ্গা শিল্পগুলির ক্ষতি করে ভারী শিল্প গড়ে তোলার পক্ষ-পাতী ছিলেন না। হাঙ্গা শিল্প দেশে ভোগ্য পণ্যের প্রাচুর্য আনবে, বিশেষ করে গ্রামে চাষীদের জীবনের মান উন্নত হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আসবে জনগণের সম্ভাব্য ও আস্থা। ভারী শিল্প কিছু সংখ্যক লোকের স্বপ্নস্বিধা বাড়তে পারবে। অধিক উৎপাদন দিয়ে, কিন্তু তা হবে ব্যয়বহুল। ভারী শিল্পের মূলধন যোগাতে জনসাধারণকে কিছুটা বঞ্চিত করতে হবে যাতে আসবে অসন্তোষ এবং ক্রমে কর্মদক্ষতার অবনতি ঘটবে, নৈতিক মান নেমে যাবে। এসব কথা চিন্তা করেই কৃষি ও হালকা শিল্পের প্রসারের দিকে অগ্রসর হওয়া গেল। এই ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষিকে অল্প মূলধন সাহায্য করলে তাদের আয় থেকে কিছু মূল-ধন সঞ্চিত হবে যা থেকে ভারী শিল্প গড়া সহজ হবে। চীনে শিল্প সম্ভাবনা যথেষ্ট—নিজের দেশেই রয়েছে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্র। উন্নত কৃষি ব্যবস্থা ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলি কাঁচামাল ও মূলধন যোগাতে সক্ষম হবে ভারী শিল্পের। মাসের মাস বাড়লে ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে এবং পণ্যের কাটতি হবে। হঠাৎ বৃহৎ শিল্প গড়ে তুললে গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যবধান বাড়বে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সংঘাত দেখা দেবে। ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠায় অর্থ ছাড়াও অল্প অস্ববিধা ছিল—তাতে বেশ কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন পড়তো। এদের জন্ম বহু সময় ও অর্থব্যয় করতে হতো। দেশ, বড়, প্রয়োজনও অধিক। দেশের এমন সঙ্গতি ছিল না যে এই অর্থ ও সময় দিতে পারে। ছোট ছোট কলকারখানায় কাজ করে যে শাস্তব অভিজ্ঞতা, অর্জন হবে তা ভবি-ষ্যৎ শিল্প গড়ে তোলার সাহায্য করবে, কোন ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকবে না

বটে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই শ্রমিক-রাই নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে পারবে। সরকার দেখলেন উন্নত কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিই জনসাধারণের খাতিয়োগে, শিল্পের কাঁচামাল দিয়ে, মূল-ধন দিয়ে ও শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা দিয়ে ভবিষ্যতে দেশকে শিল্পে সমৃদ্ধ করতে পারবে।

মুক্তির আগে চীনের বেশীর ভাগ শিল্পই সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চল পিকিং, তেনজিং, সাংহাই, ক্যান্টন ও নিকটবর্তী স্থানে কেন্দ্রীভূত ছিল। দেশের শতকরা সত্তর ভাগ শিল্পই এই অঞ্চলে ছিল আর অল্প কয়েকটি মাত্র দেশের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে-ছিল। মাও-সে-তুং মত প্রকাশ কর-লেন—ওগুলিকে অবহেলা করা ভুল হবে, ওগুলিকে সাহায্য দিয়ে বাড়িয়ে তুলে দেশ গঠনের কাজে লাগাতে হবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভিতর নানা জায়গায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, শিল্প প্রতিষ্ঠানের এই অমম বস্তু থেকে রেহাই পেতে হবে। এই ভারী শিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে তাদের কলকল বাড়িয়ে আর বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান বাড়িয়ে তার কল ব্যবহার করে অগ্রজ শিল্প প্রতি-ষ্ঠান গড়ে তোলার সুযোগ নিতে হবে। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ গড়ে তুলে আয় আসে তা নয় এর কিছুটা তৈরী হলে তার থেকে যে আয় হয় আস্তে আস্তে তা থেকেই প্রয়োজনীয় মূলধন পাওয়া যায়। এরকম ভাবে একটির থেকে অন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়া যায়। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি দেশ-ময় ছড়িয়ে থাকলে তার কিছুটা সুবিধাও পাওয়া যায়। পরিবহনের ব্যয় ও সমস্যা কমে এবং যুদ্ধের সময় (যদি ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধে) কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের উপরই নির্ভর করে ঠকতে হয় না, বরং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মত বিশ্বাস ও ক্ষমতা জন্মায়। মাও চাইলেন শিল্প প্রতিষ্ঠান সারা দেশময় জালের মত জড়িয়ে থাকবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান নির্ভর করবে স্থানীয় সম্পদ ও স্থানীয় কাঁচামালের উপর। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (অর্থাৎ জেলা বা প্রদেশ) এগুলি গড়ার দায়িত্ব নেবে। কোন প্রতিষ্ঠানকেই, কেন্দ্রের অধীনে রাখতে চান নি—প্রতি অঞ্চলের মতামতের মূল্য এবং চালনার ক্ষমতা দেওয়া হলো। প্রত্যেক কো-অপারে-টিভ, প্রত্যেক জেলা, প্রত্যেক প্রদেশ শিল্প পরিকল্পনা নেবে। তা একত্রে আলোচনার মধ্যে পরি-মার্জিত, পরিবর্তিত হওয়ার পর গ্রহণ করা হবে। সারা দেশে শিল্প ছড়িয়ে

থাকলে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রয়ো-জন মিটবে, পরিবহনের সমস্যা কমবে। স্থানীয় লোকদের চাকুরীর সংস্থান হবে, নিজের সম্পদ ও যন্ত্র-পাতি কাজে লাগাতে পারবে। বস্তুত: জীবনের মান উন্নয়ন হবে। জনগণের নিজস্ব চেষ্টা ও উত্তমের বিকাশ ঘটবে।

“দুপায়ে চলার নীতি” অহুসরণ করে চির প্রচলিত যন্ত্র ও আধুনিক বৈজ্ঞা-নিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়িয়ে তুলবে। উৎপাদন মূল্যক প্রতিষ্ঠানকে তার কৃতিত্বের জন্ম কিছু সুবিধা দেওয়ার কথাও চিন্তা করা হলো। এখানে অবশ্য একটু ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে তাই পরিষ্কার করে বলছি। উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়ও বেড়ে গেল। তাই ১৯৫৬ সালে শ্রমিকের শতকরা দশ বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হলো, কারণ কিছুটা স্বপ্ন স্ববিধা না দিলে উৎপাদন বাড়ার চেষ্টা থাকবে না। এই প্রতিষ্ঠান-গুলির থেকে স্থানীয় জনগণ নানা স্বপ্ন স্ববিধা ভোগ করতে পারায় গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে আসার প্রবণতা রোধ হলো। গ্রামের জনসাধারণ নিজের এলাকাতেই নানা ধরনের কাজ করে তার কলা কৌশল দেখা-বার সুযোগ পেল।

এই স্বনির্ভরতা নতুন কিছু নয়। জাপানী আক্রমণের সময় (১৯৪০-৪২) ই য়া না নে থা কা কা লী ন মাও জনগণকে নিজের চেষ্টায় কৃষি ও বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ডাক দিয়েছিলেন। সেখানে এরই কলে জনসাধারণ ইম্পাতের অভাবে সিরামিক ব্যবহার করে ডায়নামো করে-ছিল (খুব শক্ত না হলেও সহজেই বদল করার সুবিধা ছিল)। বায়ু-

চালিত যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, বিদেশ থেকে আমদানি করা রবারের বেল্টের পরিবর্তে হাতে তৈরী পাটের বেল্ট ইত্যাদি করা হয়েছিল। মাসুকের স্বজনী শক্তির বিকাশ ঘটানই ছিল এই দেশের উদ্দেশ্য। দেশের খেটে খাওয়া জনগণ নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উত্তেজিত হলো। স্থলে শিক্ষার সময় সংক্ষিপ্ত করা হলো। কারিগরি ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির ছাত্র ও শিক্ষকেরা এ বিষয়ে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলো। ছোট, মাঝারি ও বড় শিল্প গড়ে উঠতে লাগলো যা “দুপায়ে চলার নীতি”র সকলতা প্রমাণ করলো। রাসায়নিক সারের কারখানা (১৯৭০-৭৩ এ ১০০০) সিমেন্ট কারখানা (২৪০০) জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র: মুক্তির আগের দ্বিগুণ সংখ্যায় দাঁড়াল। দেশের নানা স্থানে লোহা গলবার ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো। এগুলিই বড় শিল্প কারখানার পরিপূরক হিসাবে কাজ এগিয়ে নিয়ে চললো।

শিল্প গড়তে হলে চাই শিল্প গড়ার মেশিন। চীন গত পঁচিশ বছরে বহু মেশিন ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের কার-খানা স্থাপিত করেছে যাতে ধাতব শিল্প সংক্রান্ত, বনি, সংক্রান্ত, শক্তি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি তৈরী হচ্ছে।

পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক শিল্পে প্রয়োজনীয় যন্ত্র, কাপড় বোনার কল, মোটর গাড়ী, জাহাজ, ট্রাকটর ইত্যাদি তৈরীর কারখানা গড়ে তুলেছে। মুক্তির আগে চীন কল-কলার জন্ম বিদেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। নিজের বলতে তার কিছুই ছিল না। বর্তমানে সব রকম কলকল্লা চীন নিজেই তৈরী করে। গত হুড়ি বছরের মধ্যে চীনের বৃহৎ ইম্পাত শিল্প কেন্দ্র আনসান, উহান, পাওতো প্রচুর পরিমাণ সাজ সরঞ্জাম

যোগাচ্ছে দেশকে। শিল্পের বিভিন্ন শাখায় চীনের উন্নতি অপরিসীম।

পিকিং একটি বহু প্রাচীন ইতি-হাস প্রসিদ্ধ শহর, কিন্তু মুক্তির আগে এখানে শিল্প ছিল মগধ্য। সামান্য প্রয়োজনের জিনিষও বিদেশ থেকে আসতো। এখন পিকিং ও তার আশ-পাশে শিল্পের প্রসার হয়েছে অবিদ্বান্ত রকম। গঠনমূলক শিল্পের (যা দেশের অর্থনীতির উন্নতি করবে) উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষার প্রয়োজন আছে, কিন্তু প্রতিরক্ষা-মূলক শিল্পে অর্থ আসবে না, খরচ হবে। প্রতিরক্ষার ব্যয় কম করে ও শাসন ব্যবস্থার খরচ কম করে মূলধন নেওয়া হচ্ছে প্রতিরক্ষামূলক শিল্প গড়তে। চারিদিকে দেশের শক্তি আশ্রিত হানার জন্ম হাত উচিয়ে আছে তাই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোর-দার করা হয়েছে। অতি আধুনিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাতেও চীন পিছিয়ে নেই। চীনকে দেখেই মনে হয় জনগণই মূল শক্তি, তাদের যদি ঠিক পথে চালিত করা যায় তারাই ইতিহাস সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশ ছিল চীনেরই মত গরীব দেশ। আমাদেরও প্রাকৃতিক সম্পদ ও স্বনশক্তি ছিল, কিন্তু পরি-চালনার অভাবে আমরা খুব একটা এগিয়ে যেতে পারিনি। এখনও দেশে লক্ষ লক্ষ লোক নিরম, যুবশক্তি বেকার। ভারী শিল্প অবশ্য কয়েকটি গড়ে উঠেছে, কিন্তু তা দেশের প্রয়ো-জনের তুলনায় কিছু নয়। সেগুলি-তেও আমরা স্বনির্ভর নই। বিদেশী মূলধন, বিদেশী কলকল্লা ও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভরশীল। ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য দিলে হয়তো আমা-দের জাতীয় আয় বাড়তো, ভোগ্য- (শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

জনগণের প্রতি ক্ৰমবর্ধমান সেবা

আমাদের কল্যাণের জন্য

ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

চলচ্চিত্র নবোদয়

ষ্টারে নতুন নাটক! 'সম্রাট'

তালুসিংহ

অবসরপ্রাপ্ত লক প্রতীক অভিনেতা মঞ্চ-সম্রাট শরদিন্দু রায়ের জীবনের শোচনীয় পরিণতি দেখাতে নাটকটিতে যে সব ছককাঁচা ঘটনার সমিবেশ হয়েছে, তাতে আবেগ ও উচ্ছ্বাসের অতিশয়তা কিছু পরিমাণে, দর্শক-সাধারণকে আবিষ্ট করেছে। কর্মক্ষেত্রে থেকে অবসর গ্রহণের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কতটা ব্যক্তিটি আপন সংসারের কাছেই একটা বোঝাবুঝি হয়ে ওঠেন এই সাধারণ সত্যটি এক করুণ অভিজ্ঞতা হয়ে দেয় অনেকের জীবনেই—এবং তার একটা আবেদন সাধারণের মনে ক্রিয়াশীল থাকে—এও মিথ্যে নয়। কিন্তু সেই করুণ পরিণতিকে আরও সুকরুণ করার অভিপ্রায়ে যে সব ঘটনার

সমাবেশ করা হয়েছে এই নাটকে তার মধ্যে বিশ্বাস ও বাস্তব বলে কিছুই প্রায় থাকেনা। সোনার কঙ্কন হারানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে নাট্য সংঘাত সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে, তা-এতই দুর্বল ও সংগতিহীন যে, পুরো ব্যাপারটা মনে কোন রেখাপাত করেনা। শরদিন্দু রায় কেন সোনার কঙ্কন চুরি করতে যাবেন—এই প্রশ্নের সপক্ষে যে সব যুক্তি দেখানো হয়েছে, তা নেহাতই নাবালক-স্থলভ। খ্যাতিমান নট তাঁর বিপুল উপার্জনের টাকায় গাড়ী বাড়ি ধন সম্পত্তি সবই করেছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি যথাবিহিত উইলও করেছেন পুত্র ও পুত্রবধূর পূর্ণ স্বার্থ রক্ষা করে। প্রচুর অর্থ ফিল্ড

ডিপোজিটেড রেখেছেন। পুত্র বেকার নন, প্রফেসরি করেন। তথাপি পুত্রবধূ জয়ন্তী বলে যাবে—সংসার আর চলেনা; শত্রুর নামে অভিযোগ তুলেও বলে যাবে—অস্বাভাবিক কম খরচ হল, বর্গে বর্গে খেলে আর কত দিন চলে—দুধ বন্ধ করে দাও—ইত্যাদি। ভেবে অবাক হতে হয় এত অসংগতি আজকের নাটকেও থাকে কি করে? অথচ পুত্রবধূ এই বিজ্ঞপকটাক্ষ, কঙ্কনচুরির সন্দেহ, পুত্রের বিশ্বাসকর ব্যক্তিত্বহীনতা শরদিন্দুর জীবনে মর্যাদাসিক ট্রাজেডি বনিয়ে আনল। কিন্তু দর্শক তার সংগে কতখানি একাত্ম হ'ল সেটাই প্রশ্ন। নাটকের নাম 'সম্রাট'। শ্রেষ্ঠাঙ্ক অবশ্য কিন্তু নাট্যরস আরও জোরালো ও ব্যঙ্গনাপূর্ণ হলে, নামটি আরও সংগতিপূর্ণ হতে পারত। প্রধান উপদেষ্টা রূপে আছেন মহেন্দ্র গুপ্ত। তিনি, এদিকটায় কিছু সতর্ক দৃষ্টি দিতে পারতেন। পরি-কল্পনা ও নির্দেশনার দায়িত্ব রঞ্জিত-মল কাকারিয়া বহন করেছেন। নাট্যরূপ দিয়েছেন অসিউ বসু।

নাটকটির দ্রুতগতি বাহনীয় ছিল। দৃষ্টান্তের বাণ্যায় এত কালক্ষেপ হয় কেন? মঞ্চ দৃষ্ট সাধারণ মানের। আলোক সম্পাত পরিমিত। আবহসংগীত পরিচালনার বৈশিষ্ট্যের পরিচয়, রেখেছেন তিমিরবরণ। স্বর রচনায় চণ্ডীদাস বসু হতাশ করেছেন।

শরদিন্দু রায়ের ভূমিকায় মহেন্দ্র গুপ্তর ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় নাটকের দুর্বলতাকে কিছুটা ঢেকে রেখেছে সন্দেহ নেই। সত্যীন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রণব যথাযথ। হরিধন মুখো-পাধ্যায়ের অভিনয় রীতিমত উপভোগ্য। অভিনয়ে নির্বল ঘোষ ও দিলীপ রায়চৌধুরী বিশেষ নজরে পড়েন। বাসবী চরিত্রে স্বপ্না মুখোপাধ্যায় নির্ভর পরিচয় দিয়েছেন। স্বপ্না ঘোষাল, মীরা চক্রবর্তী ও মেনকা দাসের অভিনয় উল্লেখের দাবী রাখে।

ডে ফর নাইট

ফ্রেন্স ইটালীয়ান কোলাবরেশনে তোলা 'ডে ফর নাইট' ছবিটি ফ্রান্সের ছবি তোলার এক ছবি। এর মধ্যে নিটোল কাহিনী বলতে কিছু নেই। একটি ছবির ভিত্তি পর্ব দিয়ে ছবিটি শুরু হয়েছে এবং শেষ হয়েছে প্যাক-আপ করার পর। এবং এরই মধ্যে ছবির দৃষ্ট যেমন আছে আবার পরিচালক, কলাকুশলী, অভিনয় শিল্পী—এদের জীবনের সুখ দুঃখের কথা, প্রেম ও যন্ত্রণার কিছু অহুত্ব, কিছু ঘটনা ভিট—এর ফাঁকে ফাঁকে বিচ্ছিন্নভাবে স্থান পেয়েছে। এটাই বড় কথা নয়—ছবিটিতে স্পষ্ট ব্যঙ্গ বিজ্ঞপ এক অতিরিক্ত মাত্রা এনে দিয়েছে। ছবির এখানেই বৈশিষ্ট্য ও চলচ্চিত্রকার ফ্রান্সের বিশেষ কৃতিত্ব। ছবির নামকরণেই রয়েছে প্লেস এবং চলচ্চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে তা আত্মক ব্যঙ্গনাও পেয়েছে। ফিল্মের জগৎ কৃত্রিম। এর মধ্যে থেকে পাত্র-পাত্রীরাও ক্রান্ত অবসর হয়ে পড়ে। তাদের জীবনের সত্যিকারের সুখাহু-ত্বও যেন কেমন ভোতা হয়ে যায়—ক্রমে বিষন্নতার শিকার হয়ে পড়ে। বেদনার মধ্যে থেকেও তাদের হাসিতে হয় আবার খুশীর আলোকের মধ্যেও বিপদের অন্ধকার ফুটিয়ে তুলতে হয়। ছবিটিতে এ বক্তব্য যেমন চমৎকার ফুটেছে আবার ফিল্মি জগতের ইলিউশনকেও পরিচালক বিশ্বাসকর নৈপুণ্যে ভেঙ্গে দিয়েছেন। ক্যামেরার কাজ ও আবহসংগীত অনবদ্য। অ্যাক্ট্রিন বিসেট-এর জুলি, এক উল্লেখ্য চরিত্র সন্দেহ নেই। পরিচালকের ভূমিকায় ফ্রান্সের অভিনয় দেখবার মত।

রয়েল, বীণাপাণি অপেরা

রয়েল বীণাপাণি অপেরা যাত্রা পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত দলগুলির অন্যতম প্রচার মাধ্যম নয়, পালা নির্বাচন ও অভিনয় দলের জনপ্রিয়তার এক-মাত্র চাবিকাঠি—এই মূলমন্ত্র নিয়ে এবারও এ দলের যাত্রা শুরু। দল পরিচালক স্বপ্না চক্রবর্তীর আশা গত বছর দলের স্রে স্বনাম অর্জন করেছেন এবারও তা বজায় থাকবে। বর্তমান বছরে এ দলের নির্বাচিত পালগুণি হল "পরাজিত সম্রাট" ও পল্লীবধূর আত্মকাহিনী নিয়ে লেখা "গৃহলক্ষ্মী" এবং গত বছরের সাড়া-জাগান পালা "বধু বিনোদিনী"। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রভাত গৌতম। অভিনয়শাশে থাকছেন নির্দেশক স্বপ্না এবং রাজকুমার, শান্তি হাজারা, তপন ভট্টাচার্য, রীতা সেন, শিবানী মৈত্র, মঞ্জু মুখার্জী, ও অমৃত শিল্পীরা।

কবি হুকাঙ্গ জয়ন্তী

গত ১৮ই আগস্ট "সার্বিক ইষ্টার্ন রেলওয়ের ক্রেমস অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ পরিবেশে বিপ্লবী কবি হুকাঙ্গ ভট্টাচার্যের ৫১তম জন্ম জয়ন্তী উৎসব উদযাপিত হয়।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মুখ্য অধীক্ষক শ্রীঅনিতকুমার ভাট্টা এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাহিত্য সেবী, সাংবাদিক, শিল্প সমালোচক শ্রীহৃদী প্রধান। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী নিরঞ্জন চক্রবর্তী দিলীপ রায়চৌধুরী, কবিতা আবৃত্তি করেন রণজিৎ চক্রবর্তী, সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী মঞ্জুলিকা ভাট্টা ও বলাই সরকার। পরিশেষে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের (মধ্য কলিকাতা) সদস্যবৃন্দের সঙ্গীতে অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

নতুন চীনের শিল্প

(৭ম পৃষ্ঠাব পর)

পূণ্য বেশী করে পাওয়া যেত এবং বেকারি ঘুচতো। বড় বড় উন্নত দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দলে ভুল হবে হয়তো, কারণ আমাদের যে গরীব দের, উন্নতিকামী দেশগুলির সঙ্গে মিলে দেওয়ানেওয়ার মাধ্যমে আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারবো বলে মনে হয়।

চীন জগতকে দেখিয়েছে মেহনতী মাণ্ড্য স্বনির্ভর হয়ে অদম্য উৎসাহ উদীপনার সঙ্গে সর্বশক্তি নিয়োগ করে দেশকে, জাতিকে সর্বপ্রকার শোষণ মুক্ত করে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়েচলেছে। তাদের জয়-যাত্রা সকল হোক।

এবার পুজোয় এন, টি, সি-র নয়া নকশা

গুণু সস্তা বলেই নয়, নতুন নতুন নকশাতেও এন, টি, সি-র কাপড়ের জুড়ি নেই। মন ভোলানো, প্রাণ মাতানো বিচিত্র সব নয়া নকশারই আকর্ষণীয় সমাবেশ দেখতে পাবেন এন, টি, সি-র নিম্নলিখ শো-রুম এবং খুচরো বিক্রেতাক্ষেত্রে। চলে আসুন। ইয়া, আজই। তবে একা নয়, ছেলে-বুড়ো-বাচ্চা জোড়ান সবাই, সবাই

রানাঘাটে স্বভাষ অভিনিউতে
আমাদের শো-রুম খোলা হয়েছে

আমাদের শো-রুমঃ
১৪/১০, গড়িয়াহাট রোড,
কলকাতা ৭০০০১৯
বি. ডি. মার্কেট, সল্ট লেক
বনগা বাজার, বনগা থানা, বহরমপুর



ন্যাশনাল টেক্সটাইল
কর্পোরেশন

৭, জহরলাল নেহেরু রোড,
কলকাতা-৭০০০১৩

IPB

আমাদের শ্রদ্ধেয় পৃষ্ঠপোষক, সার্টিফিকেট হোল্ডার এবং এজেন্ট, ফিল্ড অফিসার ও অফিস কর্মীদের প্রতি আমাদের নিবেদন

গত ২৭শে আগস্ট, ১৯৭৭ তারিখ থেকে দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনাল এণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিমিটেডের কলিকাতার সকল অফিসে ও হাওড়া ব্রাঞ্চ অফিসে কোম্পানী “লক-আউট” ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে।

এজন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত সকল সার্টিফিকেট হোল্ডার ও ফিল্ডের এজেন্ট এবং সকল শ্রেণীর কর্মী ও অফিস কর্মীদের যে সাময়িক অস্থবিধার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য সকলের কাছেই আমরা সবিনয়ে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি।

যতাবতই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে কোম্পানী কী পরিস্থিতিতে এই দুঃখজনক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। তাই এর পটভূমিকা ও কারণগুলি অবশ্য আমাদের প্রত্যেক শুভাশীলদের জানানো প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

১। এই “লক-আউট”ের সিদ্ধান্ত কেন অপরিহার্য হয়েছে?

যে মহৎ ও মানবীয় প্রেরণায় উদ্ভূত হয়ে এই কোম্পানী সকল কর্মীদের সঙ্গে একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল, যাকে কোম্পানী সর্বদাই অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে স্থায়ী “পিয়ারলেস পরিবার” বলে অভিহিত করেছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে পিয়ারলেসের এই রিঅরগানাইজেশনের মূলে সেই প্রেরণা ও ত্র্যক্যবোধই সক্রিয় ছিল। নতুবা আমরা স্বল্প সংখ্যক একটা জাতীয় সংস্থা চরিত্র গঠনে এতটা সফলকাম হতে পারতাম না। সকলেই জানেন আমরা ২০ লক্ষেরও অধিক পরিবারের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাই শুধু দিতে পেরেছি তাই নয়, এই স্বল্প সংখ্যক প্রকল্পের সফল রূপায়ণের মাধ্যমে আমরা জাতীয় সরকারের হাতে ২১ কোটি টাকাও বেশী অর্থ লব্ধি রেখে জাতীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অংশীদার হতে পেরেছি।

এই প্রকল্পে আজ ৮০ হাজারেরও বেশী কর্মী নিযুক্ত আছেন এবং তার মধ্যে ৪০ হাজারেরও বেশী লোককে আমরা স্বনির্ভর অর্থ নিশ্চিত কর্মস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছি—যার ফলে তাঁরা কেবলমাত্র পিয়ারলেসের মাধ্যমেই তাঁদের পরিবার প্রতিপালন করে থাকেন।

সীমিত সংগতির মধ্যেই গভর্নমেন্ট নির্ধারিত প্রতিটি আইনকানুন যথাযথ মাত্র করেও আমাদের অফিস কর্মীদের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দিতে কোম্পানী কখনও কার্পণ্য করে নি। তারা পূর্ণাঙ্গ ভাল বোনাস দিয়ে এসেছে। ১৯৭৪, ১৯৭৫ এবং ১৯৭৬ সালে অত্যন্ত সুবিধা ছাড়াও ২০% হারে বাৎসরিক বোনাস ঘোষণা করেছে। তাছাড়া সময়ে সময়ে “এক্সগ্রাসিয়া” হিসাবে অতিরিক্ত একমাসের বেতন প্রায় প্রতি বৎসরেই দিয়েছে।

২। এ কেমন শ্রমিক আন্দোলন? আন্দোলনের শুরুতেই স্বংসের চেষ্টা কেন?

প্রচলিত সমস্ত রীতিনীতি জলাঞ্জলি দিয়ে, কোন প্রকার দাবী দাওয়া পেশ না করেই স্বয়ং নিযুক্ত কোন এক ব্যক্তি, একটি অসমর্থিত কর্মচারী ইউনিয়নের সেক্রেটারী হিসেবে একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর ইস্তাহার ছেপে প্রকাশে বিতরণ শুরু করে ২০শে জুন ১৯৭৭। ইস্তাহারটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাষায় ও বিকৃত তথ্যপূর্ণ। কোম্পানীর পরিচালক, সার্টিফিকেট হোল্ডার, এজেন্ট ও ফিল্ড অফিসারদের জড়িয়ে কুৎসার্পণ সেই ইস্তাহার নির্বিচারে প্রকাশে বিতরণ করার উদ্দেশ্য একটাই। কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট সকলে এতদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা দ্বারা যে ভাবযুক্তি গড়ে তুলেছিল তাকে ধ্বংস করা—যার অর্থ কোম্পানীর মূলেই কুঠারঘাত করা। তাতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের অফিস কর্মীদের কী সুবিধা? সার্টিফিকেট হোল্ডারদের মনে মিথ্যা সন্দেহ ও ভীতি জন্মাবার অপচেষ্টা ছাড়া এটাকে আর কী বলা যায়?

৩। দাবীদাওয়া পেশ না করেই আন্দোলন শুরু হল কেন?

গত ২৪শে জুন ১৯৭৭ তারিখে অফিস চলাকালে কোন পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই বেলা পৌনে তিনটার সময়ে সহসা একযোগে কোম্পানীর সব অফিসগুলিতে প্রচণ্ড চীৎকার ও কুৎসিত স্লোগান দিয়ে অফিসের মধ্যেই হৈ-হুগোল আরম্ভ করা হল। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে ক্যাপিয়ারদেরও ক্যাশ ছেড়ে এই গোলমালে যোগ দিতে বাধ্য করা হল। তারপর থেকে এরই ক্রমবর্ধমান পুনরাবৃত্তি চলতে থাকল। কাজে গাফিলতি (“গো-স্লো”) ও অফিসের নিয়ম শৃঙ্খলা তুচ্ছ করে যথেষ্টাচার কার্যকলাপ প্রতিদিন চলতে থাকল। এর ফলে আমাদের কাজ, যা নিতান্ত “সার্ভিসিং” এর কুশলতার ওপরই নির্ভরশীল তা ক্রমশঃ অবনতির দিকে যেতে থাকল। অর্থাৎ, ২০শে জুন ১৯৭৭ থেকে ১০ই জুলাই ১৯৭৭ পর্যন্ত কেউই জানতে পারল না যে কর্মীদের দাবীদাওয়া কী?

১০ই জুলাই দাবীদাওয়া পেশ হল। দাবীর মধ্যে কোন অর্থনৈতিক দাবী নেই। আছে অযৌক্তিক দাবী যেমন, বদলী করা চলবে না, ডেপুটেশনে পাঠানো চলবে না, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য আইনসম্মতভাবে, অসুস্থস্থানান্তে, বরখাস্ত কতিপয় কর্মীদের পুনর্বহাল করা ইত্যাদি। এই দাবী থেকে একথা সুস্পষ্ট হল যে মাত্র কয়েকজন ব্যক্তির সুযোগ সুবিধা লাভের জন্যই এই আন্দোলন। সকল কর্মীদের কল্যাণের জন্য নয়।

৪। গণছুটির নামে বে-আইনী ধর্মঘট

বিনা নোটিশে ২৬শে জুলাই ৭৭ “গণছুটি ঘোষণা” করে অসুগত কর্মচারীদের ভীতি প্রদর্শন করে ও গেটে দাঁড়িয়ে বাধা সৃষ্টি করে অফিসের কাজ অচল করে দেওয়া হল। পরবর্তী দিনগুলিতে আন্দোলন ক্রমে তুচ্ছ তোলবার চেষ্টা কিন্তু অব্যাহত থাকল। এরপর ২৫শে আগস্ট একঘণ্টা কর্মবিরতির নামে কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করা হল। ‘পেন ডাউন ষ্ট্রাইক’ নাম করে বেশ কিছু কর্মচারীকে অফিসের বাইরে নিয়ে গিয়ে অকথ্য গালিগালাজ, চীৎকার ও হৈ-হুগা শুরু করে অফিসের মধ্যে বিস্ত্রী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হল। অশালীন পোস্টারিং-এ অফিস ছেড়ে ফেলা হয়েছে।

৫। কর্তৃপক্ষের ধৈর্য ও সহনশীলতা

কোম্পানী ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে কর্মচারীদের বুঝিয়ে তাদের গুণবুদ্ধি উদ্বোধন করার প্রথম থেকেই নিরলস চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বহু সাত্বনার ও

অফিস মোহো প্রচার করে কর্মীদের কাছে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে পড়া মত আন্দোলন চালিয়ে তাদের প্রকৃত দাবীদাওয়া নিয়ে আলোচনার আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু কোন কল হয় নি।

কোম্পানীর ফিল্ড অফিসারদের সমিতি এবং বিভিন্ন কমিটি একাধিকবার কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছে। কিন্তু কোনবারই কর্মীদের পক্ষ থেকে আদৌ কোম্পানী দাওয়া বায় নি বরং বিশৃঙ্খলা ক্রমে বেড়েই গিয়েছে।

অফিসের কাজের ক্ষতির জন্য সার্টিফিকেট হোল্ডার, এজেন্ট ও ফিল্ড অফিসারের অস্থবিধা হতে লাগল। পাহাড় প্রমাণ অসুযোগ আসতে লাগল সব দিক থেকে। রসিদ ইত্যাদি বিলম্বিত হল। মূল্যবান কাগজপত্র অগোছালি করে রেখে অফিসের কাজের অস্থবিধা সৃষ্টি করা হল। অফিস কর্মীদের এইসব আচরণে ফিল্ডের কর্মীদের ও সার্টিফিকেট হোল্ডারদের অসন্তোষ ও ক্ষোভ ক্রমে সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগল। যে কোন সময়ে বিস্ত্রী পরিস্থিতি বা সংঘর্ষের আশঙ্কা ক্রমেই চরমে উঠল। এই রকম যখন অবস্থা তখন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ আরো কোন গুরুতর পরিস্থিতি এড়াবার জন্য ও অফিসের কাজ অচল হয়ে পড়ায় কয়েকটি অফিসে “লক-আউট” ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। কারণ, মাত্র কয়েকজনের স্বার্থে ২০ লক্ষ সার্টিফিকেট হোল্ডার ও ৮০ হাজার ফিল্ড কর্মীর এবং ১২ শত অফিসকর্মীর স্বার্থ কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ করা যায় না।

৬। শিক্ষানবীশদের ঠাইপেণ্ড ও কর্মীদের বেতনের হার

কোনও কোনও কর্মীদের পক্ষ থেকে মিথ্যা প্রচার করা হয়েছে যে একজন গ্রাজুয়েট কর্মীকে মাত্র ২০০ টাকা বেতন দেওয়া হয়। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ভর্তি হওয়ার পর নতুন শিক্ষার্থী (Commercial Trainee) এক বছর শিক্ষানবীশ (অর্থাৎ, Apprentice) থাকেন। শিক্ষানবীশ থাকাকালীন তাঁরা মাসিক ২০০ টাকা ঠাইপেণ্ড পান। অর্থাৎ অনেক প্রতিষ্ঠানে বিনা ঠাইপেণ্ডেও শিক্ষার্থী রাখা হয়। বর্তমানে একজন গ্রাজুয়েট কর্মী নতুন ভর্তি হওয়ার সময়ে ন্যূনতম ৩৪০ টাকা বেতন (সর্বসমেত) পেয়ে থাকেন। কর্মীদের সাথে চুক্তি অনুযায়ী একজন গ্রাজুয়েট কর্মীর বার্ষিক বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি ন্যূনতম ৩৫ টাকা হারে গত কয়েক বছর ধরে হয়েছে।

৭। কোম্পানীর একান্ত আশা

এই লক-আউটের জন্য কোম্পানীর সার্টিফিকেট হোল্ডারদের কোনরকম দুর্ভাবনা বা আশংকার কারণ নেই। আমাদের সার্টিফিকেট হোল্ডারদের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে স্বরক্ষিত। তাঁদের কাছে কোম্পানীর যে পরিমাণ দায় তার ১০০%-এর বেশী টাকা গভর্নমেন্ট তহবিলে গচ্ছিত আছে। সুতরাং সার্টিফিকেট হোল্ডাররা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

৮। প্রকৃত আর্থিক বুনয়াদ

কোম্পানীর মোট সম্পত্তির ৮০% এরও অধিক গভর্নমেন্ট ও ট্রাস্ট সিকিউরিটিতে নিয়োজিত আছে—এটা অবশ্যই সন্দেহাতীত নিরাপত্তার নিদর্শন, যার তুলনা এ পর্যন্ত কোন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নেই।

সব শেষে কোম্পানী এখনও আশা পোষণ করে যে এই অস্থায়ী উদ্ভ্রাণ ও বিকৃত আন্দোলনের উত্তাপ, বিবেকের দাবীতে ও শুভ বুদ্ধির আলোকে সমস্তই স্থিরতা লাভ করবে। আমাদের অফিসকর্মী বন্ধুরা তাদের ভুল বুঝতে পারবেন ও পুনরায় সৌহার্দ্যপূর্ণ ও স্বশৃঙ্খলার আবহাওয়ার সৃষ্টি করে তাঁরা পিয়ারলেস পরিবারের যোগ্য অংশীদার হবেন।

৯। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাদ

যতদিন এই দুঃখজনক লক-আউট চানু থাকবে ততদিন যাতে আমাদের সার্টিফিকেট হোল্ডার, এজেন্ট ও ফিল্ড অফিসাররা কোন অস্থবিধায় না পড়েন তার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

কলিকাতার অফিসগুলি ও হাওড়া ব্রাঞ্চ অফিস বাদে অল্প যে কোন ব্রাঞ্চ/অর্গানাইজেশন অফিসে সব অফিসের চাঁদা (subscription) নেবার ব্যবস্থা হয়েছে। ওইসব অফিসে নতুন কাজ নেওয়া হবে—নতুন এজেন্সী জমা করা যাবে যার কোড নম্বর ওইসব অফিস থেকেই দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

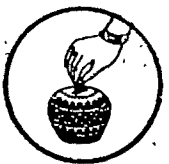
এছাড়া কোম্পানীর অসংখ্য কেন্দ্রে ব্যাকসমূহের অফিসেও সার্টিফিকেটের চাঁদা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

১০। মিথ্যা ও কুৎসা প্রচার ব্যর্থ হোক

সর্বশেষ আমরা আমাদের অফিস ও ফিল্ড কর্মী বন্ধুদের অসুযোগ করছি যে তাঁরা যেন অভিসন্ধিমূলক প্রচারে বিভ্রান্ত না হন। বিশেষত হেড অফিস ও সিটি অফিসের সামনে ২১টি প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা মাঝে মাঝে যে সমস্ত গুজব ও কুৎসা প্রচারের চেষ্টা করেন তাতে যেন কর্পণাত না করেন। বরং প্রকৃত তথ্যাদি ও পরিস্থিতি অবগত হওয়ার জন্য ফিল্ড কর্মীরা যেন নিজ নিজ ইমপেক্টর বা টিম লীডারের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করেন।

আমাদের বিশ্বাস, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে কোম্পানী লক-আউট ঘোষণা করায় আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও কর্মীদের যে সাময়িক অস্থবিধার সৃষ্টি হয়েছে সহনশীলতার সঙ্গে বিচার করে তার যৌক্তিকতা তাঁরা অবশ্যই অস্বীকার করবেন ও সাময়িক এই অস্থবিধার জন্য আমাদের ক্ষমা করবেন।

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনাল এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ-র পক্ষ থেকে
বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্স কর্তৃক প্রচারিত



দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনাল এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ

(স্থাপিত ১৯৩২)

রেজিষ্টার্ড অফিস : পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯

বিভিন্ন ধরনের তেলের বেপরোয়া চোরাকারবার

পুলিশের একাংশ জড়িত : কংগ্রেসীরাও টাকা লুটছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জুট ব্যাগ অয়েল নিয়ে ভরত করতেন কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরি পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। জানা গেছে শুধু জুট ব্যাগেই নয়, জি বি ও নিয়েই চোরা-কারবার চলছে তা নয়, রাজ্যে পেট্রোল সহ প্রায় সব ধরনেরই তৈল জাতীয় জিনিষ নিয়ে বেপরোয়া চোরাকারবার চলছে। রাজ্যের প্রায় ৪০টি ঘাঁটিতে এই তেলের ভেজাল কারবার চলছে। পুলিশের খবর, এইসব কারবারের প্রধান নায়করা হলেন শিউলাখি, রাজপথ, নরসিং গুপ্তা, গৌরীশঙ্কর সাউ, বিধি-চাঁদ। এরা সবাই আসল তেলের সংগ্রাহক। পরে এরাই এতে ভেজাল মিশিয়ে চালান দেয় হরিয়ানা, পাঞ্জাব, নাগপুর, দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ। তেল পাচার করার ব্যাপারে যুক্ত ছুটি পরিবহন সংস্থারও নাম পাওয়া গেছে। এরা হলো কালাকার স্ট্রিটের মোহনলাল সিউ বক্স কোম্পানী, চাঁদনীচকের ওরিয়েন্ট ট্রেডার্স। দর্পণে প্রকাশিত সংবাদের পর এই দুঃসাহ-সিক চোরাকারবারের প্রধান দুই পাণ্ডা শিউনারায়ণ সাউ, রাজপথ সাউ হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছে।

রঞ্জিত গুপ্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গুপ্ত। কলকাতা টার্ক ক্লাবে রঞ্জিত গুপ্ত এই পরিচয়ই দিয়েছেন। উইলিয়ামসন ম্যাগর কোম্পানীর মালিক বিজু খৈতান অনেক বছর ধরেই রঞ্জিত গুপ্তের বন্ধু। রঞ্জিত গুপ্ত এই কোম্পানীর গাড়ী ব্যবহার করেন। এই কোম্পানীতে নিয়মিত বেরোন। আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র - সম্ভবতঃ নেই। সাধারণতঃ মারোয়াড়ী ব্যব-সায়ীরা বিনা স্বার্থে কিছু করেন না। তাই একটা তদন্ত করা যেতে পারে যে, বিজু খৈতান কোন স্বার্থে রঞ্জিত গুপ্তকে পুষছেন। অতীতে আই-জি পুলিশ থাকতে রঞ্জিত গুপ্ত কি কি অগ্রহ উইলিয়ামসন ম্যাগর কোম্পানী কিংবা বিজু খৈতানকে দেখিয়েছেন সে সম্পর্কে তদন্ত হতে পারে।

কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, সরকারের বিনা অগ্রমতিতে রঞ্জিত গুপ্ত কি করে বেসরকারী কোম্পানীতে চাকরী নিয়েছেন?

বিংশতম শতকের ধরন হলো, যশোর রোড, বি টি রোড, দিল্লী রোড ও বোম্বে হাইওয়ের পাশে প্রায় ৪০টি ঘাঁটিতে প্রতিদিন তেল নামিয়ে নেওয়া হয়। পথের পাশে যেসব ঘোড়া জায়গায় ট্যাংকারগুলি দূকে যায়। সেখানে গাড়ীগুলি দূকে যাবার পরই দরজা বন্ধ হয়ে যায়। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে পাম্প করে তেল বের করে নেওয়া হয়। পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম দরের তেল ওতে পুরে দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের চট্ট শিল্পকে সাহায্য করার জন্য কম দরে জি বি ও দিয়ে থাকেন। বাইরে এর প্রচুর দর। কতিপয় সমাজ বিরোধী একেই চোরাকারবারের ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করে। গত রায় জমা-নায় এদের ব্যবসা ফুড়ে কেঁপে ওঠে। স্থানীয় পুলিশ ও এম এল এ-রা এর সব কিছুই জানতেন। কিন্তু কেউ কিছু কলতেন না। কেমনা, প্রয়ো-জনে কংগ্রেসী এম এল এ-রা টাকা পয়সা গাড়ী এদের কাছ থেকেই ম্যানেজ করতেন। পুলিশরা খুশি থাকত মাসোয়ারা পেয়েই। নির্ভর-যোগ্য মহলের খবর হল, স্থানীয় থানা, জেলা এনফোর্সমেন্ট ইন্সপেক্টর সহ পুলিশের বিভিন্ন বিভাগ থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জি বি ও পাচারের ঘাঁটি গড়ে ওঠে। এর মধ্যে সীকারাইলো আলমপুর, ডোমজুড়, বাউরিয়া, দিল্লী বোম্বে রোডে চণ্ডী-তলা, সীরামপুর, উত্তরপাড়া, মগরা, খড়দা, বেলঘরিয়া, চেতলা, রোড, গোবিন্দ আচ্য রোড, ডানলপ ব্রীজ, কোলাঘাট, শালবনী ইত্যাদি স্থান। গুলি শিউনারায়ণ, রাজপথ, নরসিং-দের অন্যতম ব্যবসায়িক জল হয়ে দাঁড়ায় এবং এখনও এইসব ঘাঁটি থেকেই তেলের ভেজাল কারবার চলেছে।

এই কারবারের সঙ্গে শিউনারায়ণ রাজপথের সঙ্গে পুলিশের একাংশও সরাসরি জড়িত। পুলিশের প্রত্যক্ষ মদত না পেলে জেলা ব্যাপী এই কার-বার গত ক'বছর সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে পারে না। আর এর সংগে কিছু কংগ্রেসী তো ছিলই। নরসিং গুপ্তার সংগে প্রাক্তন স্পীকার অর্পূরলাল মজুমদারের মাথামাখি অনেকেরই নজরে পড়েছে।

জি বি ও নিয়ে বেপরোয়া চোরা-কারবারের কাহিনী প্রকাশিত হবার পর রাজ্যের কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্টের কিছু সং. অফিসার বিভিন্ন স্থানে তদন্ত শুরু করেন। ইতিমধ্যে খড়দা থেকে ধরা পড়েছে চোরাই তেল সহ দুটি গাড়ী। গাড়ী দুটির নম্বর হল ৩বলু এম-কে কে ৮৩১ এবং ২৬৪০। ধরা যায় একটি ট্যাংকার সরকারী সংস্থা ভারত রিফাইনারীজ থেকে নির্ধারিত তেলেরও বেশী তেল নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। এর পরিমাণ প্রায় ২০১ লিটার। অর্থাৎ যোগসাজসের পরিধি এমনই বিস্তৃত যে, বজবজ, হলদিয়া থেকে এরা ট্যাংকারে চুরি করে বেশী তেলও নিয়ে আসে। পুলিশ চেতলা রোড, দিল্লী রোড, খড়বার বিভিন্ন স্থানে তদন্ত চালিয়ে

কংগ্রেস খুনের তদন্ত বানচাল করতে চাইছে—সন্তোষ রাণা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

“কেউ কেউ বলছেন আমাদের সঙ্গে কংগ্রেসের দাবীর কিছু মিল আছে। যেমন কংগ্রেসও ঘাটঘটি থেকে খুনের তদন্ত চাইছে আবার আমরা সি, পি, আই (এম, এল)-ও ঘাটঘটি থেকেই তদন্ত চাইছি। অতএব কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের মিল আছে। কিন্তু এটা ঠিক নয়, এটা অপব্যাপ্য। কং-গ্রেসের সঙ্গে আমাদের মিল থাকতে পারে না। কংগ্রেস ঘাটঘটি থেকে সব খুনের তদন্ত চেয়ে আসলে তদন্তের ব্যাপারটাকেই বাতিল করতে চাইছে। ওদের তদন্ত চাইবার কোন অধিকারই নেই। কারণ দীর্ঘদিন ধরে ওরা সারা দেশে প্রচণ্ড অত্যাচার চালিয়েছে। কিন্তু ঘাটঘটি থেকে যে আমরা তদন্ত চাইছি তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা আন্তরিক ভাবেই সমস্ত অত্যাচারের তদন্ত চাই। আমরা কংগ্রেসের মতো অত্যাচার করিনি, কাজেই আমাদের নৈতিক অধিকার আছে এ তদন্ত চাওয়ার।” এই কথাগুলো সন্তোষ রাণা বলেন ৩১শে খড়দহে বন্দীমুক্তি সমাবেশে।

তিনি বলেন, চরণ সিং এক কলমের মৌচাক নাকি রাজ্যের বিধান সভা ভেঙে দিলেন, অথচ অন্ধের অত্যাচারী ভেজাল রাও সর-

প্রচুর চোরাই তেল রয়েছে। ট্যাং-কারও আটক করেছে তিনটি। এর একটি মাদ্রাজের। অপর একটি দিল্লীর। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে পনেরো জনকে।

জানা যায়, তেজাল তেলের ব্যাপারে চট্টশিল্পেও কতিপয় পরিবার প্রচুর। জি বি ও চট্টের থলে জেনিং করার কাজে বিশেষভাবে লাগে। তেজাল তেলে ভা করায় বিদেশে এর মান ক্রমশই মেমে আসছে। এই কারবার অব্যাহত থাকলে এই শিল্পে সমস্ত বনীভূত হবে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। মুখ্যমন্ত্রী ছোয়াড়ি বহুর কাছে বিভিন্ন মহলের দাবী : বিভিন্ন জেলায় পুলিশের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ থাকা সত্ত্বেও সেখানে চোরাই ঘাঁটি-গুলি কিভাবে গড়ে উঠলো সে ব্যাপারে তিনি অবিলম্বে তদন্তের নির্দেশ দিলেন। মাত্র ক'বছরে শিউ-নারায়ণ সাউ, রাজপথ সাউ, নরসিং-গুপ্তা প্রমুখের অচেন সম্পত্তির নেপথ্য উৎস সম্পর্কেও তিনি খোঁজখবর করুন।

কার যে রাজবন্দীদের ছাড়বে না বলে জানিয়েছে, যে প্রচণ্ড অত্যাচার চালিয়েছে, তাকে বরখাস্ত করছেন না কেন? এই খুনি তেজাল রাওকেই তদন্ত কমিশনের ভার দেওয়া হয়েছে। তিনি বিজ্ঞপ্তি করে প্রশ্ন করেন চোর-কে যদি চোর ধরার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে ব্যাপারটা প্রহসন হয়ে দাঁড়ায় না? তিনি তেজাল রাও সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দেন।

তিনি বলেন, বন্দীমুক্তি সহ সমস্ত রকমের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তা না হলে আবার ছবিশে ছল ফিরে আসবে, আবার ইন্দিরা-সঙ্কটক ফিরে আসবে। তিনি বলেন, ছবিশে ছল সারা ভারতে জরুরী অবস্থা জারী হলেও কার্ভত পশ্চিমবঙ্গে আরো আগের থেকেই জরুরী অবস্থা জারী হয়।

বন্দীমুক্তির ব্যাপারে রাজ্য সর-সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমা-লোচনা করে বলেন, বন্দীমুক্তি নিয়ে টালবাহানা হচ্ছে, অনেক দিন হয়ে গেল এখনও কেন বন্দীদের ছাড়া হচ্ছে না।

ঐ সমাবেশে কারামতী দেবব্রত ব্যানার্জীর বক্তৃতার এক অংশ উল্লেখ করে বলেন, দেবব্রত ব্যানার্জী বলে-

টেলিফোনে ভীতি প্রদর্শন ও গালিগালাজ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্য সরকারের ট্যাংকি ডাউ-সেল শ্রীঅরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে বেশ কিছুদিন ধরে টেলি-ফোনে ভীতিপ্রদর্শন ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। লালবাজারের স্পেশাল সেলের কুখ্যাত অফিসার রণু গুহ নিয়োগীর বিরুদ্ধে হাওড়ার একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকাকে আর্চনা গুহ ও গোপেল কলেক্টর লেক-চারার লতিকা গুহ চীফ মেট্রো-পলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিযোগ করার পর থেকেই এই ভীতিপ্রদর্শন ও গালিগালাজ চলছে। উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীচট্টোপাধ্যায় এই মামলায় এঁদের পক্ষের কৌশলী সাধারণতঃ রাজি দশটার পর, এমন কি রাজি বারোটার সময়ও টেলিফোন করা হয়। প্রথম দিন বলা হয়েছিল “আমি রণু গুহ নিয়োগীর বাড়ি থেকে বলছি”। অরুণবাবুর অগ্রপন্থিতিতে তাঁর স্ত্রী টেলিফোন ধরলে তাঁকেও একই ভাষায় গালিগালাজ করে বলা হয়, “তোমার স্বামীকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলব।” গত মঙ্গলবার সকাল দশটার অরুণবাবুর বাড়িতে আবার টেলিফোন আসে। এবার ঐ ব্যক্তির কথা টেপ রেকর্ড করা হয়েছে। অরুণবাবু এই ঘটনা রাজ্য সরকারকে জানিয়েছেন।

জানা গেল, রণু নানাভাবে এবং তার স্ত্রীকে নানা ভাষায় পাঠিয়ে অরুণবাবুর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে যাতে তিনি আর্চনা ও লতিকা গুহ-মামলা না করেন। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে রণুকে বেশ কিছুদিন আগে লালবাজার থেকে বদলী করা হলেও সে এখনও লালবাজারে গ্যাট হয়ে বসে আছে।

ছেন, আন্দোলনে পুলিশী অত্যাচার হলে তারা সরকার থেকে চলে আসবেন। এসব ভালো কথা কিন্তু বাতিল, উনসত্তর সালে যথাক্রমে নকশালবাড়ী ও দেবব্রত-গোপীবল্লভ-পুরে পুলিশী অত্যাচারের সময় তারা সরকার ছেড়ে চলে আসেন নি কেন?

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৩১ বট সেন কলকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত।

৬৯ সালের ষড়যন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা

স্টাটের গুরু আনন্দবাজার : সঙ্গে সত্যনারায়ণপন্থী নকশালরা



বিংশ বর্ষ ১৩৪ শংখ্যা ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৭৭ ১১ ৪০ পরস

প্রাক্তন স্পীকারের বিরুদ্ধে

বহু অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীমজুমদার বাগদা কেন্দ্রে থেকে নির্বা-
চীত হয়েছিলেন এবং হাওড়াতে বস-
বাস করেন। যে সমস্ত অভিযোগ
এসেছে তার মধ্যে আছে ক্ষমতা
অপব্যবহার এবং বিভিন্ন দুর্নীতিমূলক
কার্যকলাপ। (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

নীলরতনে রক্ত নিয়ে ছেলেখেলা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রক্ত নিয়ে ছেলেখেলা করার
প্রতিবাদ করতে গিয়ে নীলরতন
হাসপাতালের ল্যাবরেটরী এ্যাসিস-
টেন্ট হুম্মার ধর কর্তৃপক্ষের কোপে
পড়েছেন। শ্রীধর রক্ত নিয়ে পরীক্ষা
করার ব্যাপারে যে কারচুপি ও
অনাচার চলছিল তাতে বাগড়া
দেন। এর ফলেই মাত্র ২৪ ঘণ্টার
নোটিশে তাঁকে পুন্ডলিয়া বদলী করে
দেওয়া হয়।

এনড্রু ইউলার গেষ্ট হাউসের জন্য অকারণে সরকারী অর্থব্যয়

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সরকারী পরসায় বিলাসবহুল
গেষ্ট হাউস পরিচালনার দৃষ্টান্ত যদি
দেখতে চান তবে দক্ষিণ কলকাতায়
বালীগঞ্জ পার্কে যেতে হবে। এখানে
২৬ নং বালীগঞ্জ পার্কে ভারত সরকার এই
পরিচালিত এনড্রু ইউলার গেষ্ট
হাউস আছে। বিরাট বাড়ী বিরাট
জমি। সাধারণত কেউ থাকেনা।
তবু প্রতি মাসে এই বাড়ীর পেছনে
এনড্রু ইউলার কোম্পানীর অন্ততঃ চার
হাজার টাকা করে খরচ হচ্ছে।
উল্লেখযোগ্য টাকাটা কিন্তু কোম্পানীর
নয়। ভারত সরকারের টাকা।
এনড্রু ইউলার কোম্পানীর অবস্থা শোচ-
নীয় হয়ে পড়ায় ভারত সরকার এই
প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।
আগে যে অপদার্থ অফিসারদের
পরিচালনায় কোম্পানীর শোচনীয়
অবস্থা হয়েছিল তারাই এখন ভারত
সরকারের টাকা উড়িয়ে আরাম
করবার বন্দোবস্ত করে যাচ্ছেন।
(শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

(দর্পণের সংবাদদাতা)

অবশেষে সাতটা বিপ্লবী (!) সন্তোষ
রাণা এবং তাঁর রাজনৈতিক গুরুদেব
সত্যনারায়ণ সিনহা স্বার্থ স্বরূপে
আত্মপ্রকাশ ববেছেন। লোকচন্দ্র
অন্তরালে তাঁরা কোন মূল্য দিয়ে
নিজেদের মুক্তি ক্রয় করেছেন আজ
আর তা জনসাধারণের কাছে রহস্তা-
বৃত্ত রইলো না। ৬৯ সালে আদর্শ-
বাদী নকশালপন্থীদের আন্দোলনকে
বিপথগামী করে এদের মধ্যে কুখ্যাত
কংগ্রেসী মস্তানদের অহুপ্রবেশ ঘটিয়ে
তৎকালীন শাসকদল কংগ্রেস আম-
দানী করেছিল খুনের রাজনীতি এবং
এর মূল লক্ষ্য ছিল সি পি আই (এম)।
এইসব তথ্যকথিত নকশাল কর্মীরা
আখ্যাত হতো কংখাল নামে। এই
গুপ্তচররাই দলেব মধ্যে ঢুকে আদর্শ-
বাদী নকশাল কর্মীদের গোপন
আস্তানার খবর তুলে দিয়েছে পুলি-
শের হাতে এবং এই ঘটনা বিশ্বাস-
ঘাতকদের সক্রিয় সহযোগিতাতেই
পুলিশ হীরের টুকরো ছেলেদের
গোপন আস্তানা থেকে ধরে এনে
প্রকাশ্যে গুলী করে হত্যা করেছে।
অবশ্য এই বেইমানদের অনেককেও
ন্যূনতম প্রমাণ লোপের জ্ঞাত পুলিশ

হত্যা করেছে। এই প্রেমীকৃত
মহিলাদের অনেকে এখন পুলিশ
অফিসারের অঙ্কশায়িনী।

এই ঘটনা বেইমানদের পরিকল্পিত
চক্রান্তের ফলেই প্রথম শুরু হয় সি
পি আই (এম) কর্মী হত্যার বীভৎস
অভিযান এবং একথা অনস্বীকার্য যে
প্রতিরোধ গড়তে গিয়ে বংশেই
পাল্টা হিসেবে অনেক নকশাল কর্মীও
সি পি আই (এম) কর্মীদের হাতে
নিহত হয়েছেন। একথা কে না
জানে যে কংগ্রেস দল এবং কংগ্রেস
সরকারই এই দুঃস্বপ্নরাজনীতির প্রস্তাবক
উদ্ভাবক এবং সংগঠক?

বন্দী মুক্তির প্রশ্নে

নকশালপন্থীদের

একাংশের বক্তব্য

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন
নিয়ে সম্প্রতি দিল্লীতে পিপলস ইউ-
নিয়ন কর সিভিল লিবার্টিজ-এর দিল্লী
শাখার আহ্বানে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত
হয়। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের নকশাল-
পন্থীদের একাংশের প্রতিনিধিকপে
সুভ মুক্তিপ্রাপ্ত অসিত সিনহা গিয়ে-
ছিলেন তাদের বক্তব্য রাখতে। কিন্তু
সেখানে ডামাডোলের মধ্যে সম্মেলন
শেষ হয় এবং শ্রীসিনহা তাঁর লিখিত
বক্তব্য পড়তে পারেন নি। জানা

গেল, এই বক্তব্য জেলে আটক
শ্রীমদীমচট্টোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত সাম্যাল
এবং শ্রীসোমন বসুর অহুমোদিত।
সম্মেলনে অর্পিত এই বক্তব্যে
বলা হয়েছে, "আমাদের মহান মাতৃ-
ভূমির সংগ্রামী জনগণ, যারা নিরলস-
ভাবে ঐশ্বরতান্ত্রিক ইন্দিরা সরকারের
বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ও নাগরিক
অধিকার রক্ষার সংগ্রামে অবিরল
থেকে সূক্ষ্ম রকম ভয় সংশয়কে জয়
(শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

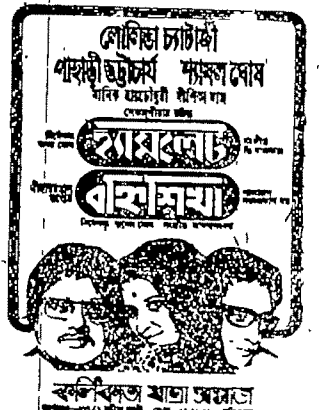
এন এল সি সির এক মাতব্বরের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

এন এল সি সি-র প্রাক্তন কোষা-
ধ্যক্ষের বিরুদ্ধে মারাত্মক এক অভি-
যোগে দক্ষিণ কলকাতার কিছু বাসিন্দা
তদন্তের দাবীতে সোচ্চার। মুখ্যমন্ত্রী
জ্যোতি বসুর কাছে প্রেরিত এক
চিঠিতে এই অভিযোগ সম্পর্কে ইঙ্গিতে
বলা হয়েছে এন এল সি সি-র একদা
অন্ততম পাণ্ডা অতীক ব্যানার্জী একটি
নৃশংস খুনের ঘটনায় রহস্যজনকভাবে
জড়িত। প্রকাশ, অভিযোগকারী-
দের মধ্যে শ্রীব্যানার্জীর এককালের
বনিষ্ঠ সহকর্মীও রয়েছেন।

এ সম্পর্কে খোঁজ করে জানা যায়
ঘটনাটি '৭৫ সনের শেষের দিকে।
এই সময় সঙ্গর গান্ধীর আশীর্বাদ পুষ্ট
হয়ে বারিদবরণ দাস রাজ্য যুবকংগ্রে-
সের সভাপতি হয়েছেন। এ সম্পর্কিত
ঘোষণাটি হবার মাত্র দু'দিন আগে
দক্ষিণ কলকাতার পরিচিত যুবক

তিলক কর হঠাৎ উধাও হয়ে যায়।
পরে জানা যায়, তিলকনাকি কল্যা-
ণীতে গক কিনতে গেছে। তার সঙ্গে
আরও দু'জন বন্ধুও রয়েছে।
কল্যাণীতে তিনবন্ধু মিলে মদও পায়।
এরপর ঐ মদের বিবক্রিয়াতেই নাকি
তিলক মারা যায়। তিলকের এই
হত্যা নিয়েই এখন নানা রহস্য ঘনী-
(শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)



বন্দী মুক্তির প্রশ্নে নকশালপন্থী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছেন এবং প্রাথমিকভাবে স্বৈর-তন্ত্রকে পৃষ্ঠপোষক করে অনেক রাজ-নৈতিক বন্দীর সাথে আমাদেরও দীর্ঘ সাত বছর তিন মাস কারাবাসে পব মুক্ত করেছেন তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

“বন্ধুগণ, আমার কারাবাসীন সমাপ্ত হলেও আমার হৃদয় আজও ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে কারণ এখনও শত শত রাজনৈতিক কর্মী ভারত-বর্ষের বিভিন্ন জেলে আটক রয়েছেন। এই সম্মেলন থেকে জনগণের বন্দী মুক্তির সংগ্রামী স্রোতের সঙ্গে তাই নিজেকে যুক্ত করার কথা ঘোষণা করছি। যতদিন একটি রাজনৈতিক কর্মীও জেলে থাকবেন ততদিন আমাদের এই সংগ্রামের অবসান হতে পারে না।”

“বন্দী মুক্তির প্রশ্ন, গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে যুক্ত। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত না করে জনগণের গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকারের সংগ্রাম সাফল্য-মণ্ডিত হতে পারে না।

“ভারতে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসানের পর যেমন সমস্ত দেশের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন তেমনি জনতা পার্টির ও সরকারের নেতৃবর্গের নাগরিক অধিকার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিতে বিপুলভাবে

উৎসাহিত হয়েছিলেন। যতদিন পর্যন্ত রাজ্যগুলিতে পুরানো কংগ্রেস সরকারের অস্তিত্ব ছিল ততদিন পর্যন্ত সমগ্র দেশে নাগরিক অধিকার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার প্রধান অঙ্গ হিসাবে রাজ-নৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি দানের ব্যাপারে জনগণের ধারণা হচ্ছিল যে জন নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতি পালনের ক্ষেত্রে এই রাজ্য কংগ্রেস সরকারগুলি প্রচণ্ড বাধা স্বরূপ হয়ে আছে বলেই নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা পুরো-পুরি সম্ভব হচ্ছে না।”

“ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যে কংগ্রেস সরকারগুলির পদচ্যুতির পর নির্বাচনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু ও কাশ্মীর ও তামিলনাড়ু ছাড়া আর সব কয়টি রাজ্যেই জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং রাজ্য-গুলির নির্বাচনী প্রচারাে জননেতৃ-বৃন্দের বিশেষতঃ চন্দ্রশেখর জে বি, কপালনী, কৃষ্ণকান্ত, কপূরী ঠাকুর, জর্জ কার্ণাওজ প্রমুখ প্রথম সারির জননেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক বন্দী মুক্তির ঢালাও প্রতিশ্রুতি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। রাজ্যগুলির নির্বা-চনের পর কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য কোন রাজ্যে বিশেষতঃ যেখানে যেখানে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের জেলে এক সময়ে নিপীড়িত জনতা পার্টির নেতারা মন্বিসভা গঠন করলেন সে

সমস্ত রাজ্যে রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি যেন চাপা পড়ে গেল।

“নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা দেশে ব্যাপক গণতন্ত্র প্রচলন রাজ-নৈতিক বন্দীদের সারা দেশব্যাপী নিঃশর্ত মুক্তিদান ছাড়া অর্থহীন। একথা তত্ত্বগত ভাবেও শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ থেকে আরম্ভ করে জনতা পার্টির দলীয় ও সরকারী নেতৃবৃন্দ মেনে নিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তা না হলে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের আশীর্বাদ ধন্য তারকুণ্ডে কমিশন অঙ্গপ্রদেশে, নকশালবন্দী হত্যার প্রশ্নে অজ্ঞের কংগ্রেস সর-কারের বিরুদ্ধে গণমত গড়ে তুলতেন না বা পিপলস ইউনিয়ন কর সিভিল লিবার্টিজ যা মুখ্যত জনতা পার্টির নেতৃবৃন্দ পরিচালিত, এখন রাজবন্দী মুক্তির প্রশ্নে সম্মেলনের আহ্বান করতেন না।

“কিন্তু তত্ত্বগত ভাবে যেটি স্বীকৃত এবং আন্তর্জাতিক ভাবেও সেটি একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি যে নাগরিক অধি-কারের পূর্ণ প্রয়োগ রাজবন্দীদের জেলে রেখে হয়না, তা কার্যকর হতে না দেখে জনগণ বিশেষতঃ পশ্চিম-বঙ্গের সংগ্রামী মানুষ আশঙ্কিত। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার দৃঢ়তার সাথে নকশালপন্থী সহ সমস্ত রাজ-বন্দীদের বিনা সর্তে মুক্তিদানকে যে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং ইতি-মধ্যেই রাজনৈতিক মতামত নির্বি-শেষে যে মুক্তি শুরু হয়েছে সেই

পদ্ধতি কার্যকর করতে অন্যান্য রাজ্যের জনতা সরকারের ব্যাধি-কোথায় তা তো আমাদের পক্ষে বোঝা মুশকিল।

“জনতা পার্টির সভাপতি শ্রীচন্দ্র-শেখর বসু'ন সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে মুত্যা-দগুজা প্রাপ্ত নকশাল বন্দীদের মুক্তির আহ্বান করলেন তখন আমরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম এবং নিশ্চয় হয়েছিলাম যে চন্দ্রশেখরজী এবার উত্তরপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যের নকশালপন্থী সহ সমস্ত রাজ-বন্দীদের মুক্তি দেওয়া'র জন্য নির্দেশ দেবেন।

“কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখছি তা হচ্ছে না। বিভিন্ন রাজ্যগুলির জনতা সরকারের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কোন নীতি রাজবন্দীমুক্তি সম্বন্ধে ঘোষণা করা হয় নি। বিহারে অপরাধের পরিমাপ করে বন্দীমুক্তির প্রশ্ন বিবে-চনার কথা অতীতের কংগ্রেস সরকারী মনোভাবে অভিব্যক্তির মত হয়ে দাঁড়ায়। স্বৈরতন্ত্রী সরকার ও তার পুলিশের চোখে যে রাজনৈতিক বন্দীর অপরাধী জনগণের চোখে তো তাঁরা বীর হিসাবে গণ্য।

“অধিকন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শতাব্দী মুক্তির অসফল পদ্ধতি একদিকে যেমন সকলকে হতাশ করেছে অন্যদিকে অঙ্গপ্রদেশ, কেরালা ও আসামের কংগ্রেসী সরকারগুলিকে অহঙ্কারী মনোভাব দেখতে প্ররোচিত করেছে। তাই অজ্ঞের মুখামুখী বলতে সাহস পান, যে “নকশালদের আমি রাজনৈতিক বন্দী মনে করি না...।”

“প্রদত্তকালে আরও একটি বিষয় উত্থাপন করতে হয়, তা হচ্ছে জয়-প্রকাশজীর আশীর্বাদধন্য তারকুণ্ডে কমিটি অঙ্গপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বন্দী হত্যার অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে তদন্তের দাবী রেখেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ উর্সের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির তদন্তের জন্য সরাসরি তদন্ত কমিশন বসালেন সেখানে অজ্ঞের মুখ্যমন্ত্রী ভেল্ল রাও এর বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা মাথায় রাজনৈতিক বন্দী হত্যা ও অন্যান্য মারাত্মক অভিযোগের তদন্ত করার জন্য সরাসরি কোন তদন্ত কমিশন না বসিয়ে অপরাধী মুখ্যমন্ত্রীর উপরই তদন্তের দায়িত্ব অর্পণ করলেন কেন? অজ্ঞের মুখ্যমন্ত্রীর উপর কেন্দ্রীয় জনতা পার্টির সরকারের এই দুর্বলতা কেন?

“বন্ধুগণ, এই সম্মেলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মতের সবাই উপস্থিত হয়েছি এইজন্য যে নকশাল-পন্থী সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের

মুক্তিকে আমরা গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত বলে মনে করি। আরও আমরা এখানে প্রস্তাব নিই যে, প্রত্যেকটি রাজ্যে বন্দীমুক্তি আন্দোলন গড়ে তুলবো এবং সব রাজ্য সরকার-গুলিকেই বাধ্য করবো আমাদের দাবী মানতে এবং এই সঙ্গেই ভারতের সব কটি রাজ্যেই কংগ্রেস সরকারগুলি কর্তৃক বন্দীদের উপর অত্যাচার ও জেলে বন্দী হত্যার পূর্ণ তদন্ত ও অপরাধীর শাস্তি বিধানের, বিহার জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের জেলে অবিলম্বে সর্বপ্রকার অধিকার দানও আমরা দাবী করবো।”

মাও সে তুঙ স্মরণে

(দুর্পণের প্রতিনিধি)

গতবছরের ১ সেপ্টেম্বর চীন বিপ্লবের নেতা মাও-সে-তুঙ মারা যান। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর বিশ্বের বিভিন্ন ভায়গায় এই কমিউনিষ্ট নেতার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী স্বরূপে সভা সমাবেশ হয়। দক্ষিণ কলি-কাতার রাসবিহারী এভিনিউর উপর শিখ গুরুদ্বারের সামনে ঐদিন সন্ধ্যায় মাও-সে-তুঙের জীবনী আলোচনার এক প্রদর্শনী অ ণ্ঠিত হয়। এর সঙ্গে ছিল চীন বিপ্লব ও মাও-সে-তুঙ সম্পর্কে প্রকাশিত পুস্তকাদির এক প্রদর্শনী। চিত্র-পোষ্টার প্রদর্শনীর শিল্পী ছিলেন স্বজাত ভদ্র, মলয় দাশগুপ্ত ও কলোন দাশগুপ্ত।

পরের দিন এ/স্বানের অদূরে দেশবাসী গার্লস কলেজের হলে কালীঘাটের ‘বাকসভা’ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গে মাও সে-তুঙ শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করেন। কবি সমীর রায়ের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শ্রীঅমিত্রহাঁতি কুমার, ডঃ প্রভাতকুমার গোস্বামী এবং শ্রীহৃজিত ঘোষ। সভায় মাও সে তুঙের কবিতা পাঠ করা হয়।

১১ই সেপ্টেম্বর বিকেলে সাহা-নগর ইন্সটিটিউটে মাও সে তুঙ সম্পর্কে এক আলোচনা সভা অঙ্গ ণ্ঠিত হয়। এই সভায় প্রধান বক্তা ণ্ঠি-হাসিক গবেষক শ্রীগৌতম ভদ্র চীন বিপ্লবে মাও সে তুঙ-এর অবদান নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন।

দুর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

৮ দাব হার

বাসিঃ ২২ টাকা

বঙ্গ বঙ্গ ১১ টাকা

দৈনিক ৫.৫০ টাকা

টাকা-ডি ও চিঠিপত্র

পাঠ-পত্র টাকায়:

মাওসেতুঙ, দুর্পণ

৩১, ৩২ জেনা, নলিন্দা ১৩



ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়া'র একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্তগুলির জন্য প্রস্তাব আহত হইতেছে :

সেক্টি রবার ক্যানভাস বৃটস-বরাহ

টেণ্ডার নিক্স'প্ল ন'ইসি এ' / পা' / কুটমগ্যা' / ৭৭/৫৩

নিম্নোক্তগুলি সরবরাহার্থ নির্মাতা অথবা তাঁহাদের অহুমোদিত এজেন্টগণের নিকট হইতে স্বপ্ৰতিভাবে 'ফুট অয়ার' শব্দটি এবং টেণ্ডার নং ও নির্ধারিত তারিখ শীর্ষাঙ্কিতমতে দুই প্রহ্নে শীলকরা দরপত্র আহত হইতেছে :

সেক্টি রবার ক্যানভাস বৃটস ফর মাইনাস' টাইপ-২, আই এস : ৩২৭৬ (সাম্প্রতিক) অহুমায়ী আই এস মাই চিহ্নিত এবং ডি জি এম এস কর্তৃক যথার্থীতি অহুমোদিত পরিমাপ—পর্যায়বদ্ধ সরবরাহ ১,৯০,০০০ ডোড়া।

দরপত্রের সহিত অবশ্যই নিম্নোক্ত কাগজ থাকি-চাই :—

(ক) ডি জি এম এস-এর অহুমোদনপত্রের ফটোকোপি, (খ) আই এস আই-এর অহুমোদনপত্রের ফটোকোপি, (গ) আয়কর পরিশোধের সর্বাধুনিক প্রমাণপত্র (ঘ) বিক্রয়কর পরিশোধের সর্বাধুনিক প্রমাণপত্র (ঙ) মাসিক সরবরাহ ক্ষমতা।

অহুমোদিত এজেন্টগণকে তাঁহাদের প্রধানদের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্তি পত্রের ফটোকোপি কপি দাখিল করিতে হইবে।

প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজবিহীন দরপত্র বাতিল হইয়া যাইবে।

দরপত্র পূর্বক ভাবে প্রদর্শিত মূল্য দাম, ছাড়, একসাইজ ডিউটি, বিক্রয়-কর, মাসুল, বীমা সহ এফ ও আর গন্তব্যের ভিত্তিতে হইবে।

৬০-দিনের জন্য বৈধ দরপত্রসমূহ জিলা বরমান (পশ্চিমবঙ্গ), পোঃ দিশেরগড়, ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের কটোলার অব পারচেজের নিকট একপত্রাবে দাখিল করিতে হইবে যাহাতে ঐগুলি সর্বশেষ ১৫-৯-৭৭ তাং বেলা ১টার মধ্যে পৌছায়। উক্ত দিবসেই বেলা ৩টার দরপত্র খোলা হইবে।

কয়লাখনি পরিক্রমা (৪)

বেলবাইদ কোলিয়ারী অফিসে বৃশংস শ্রমিক হত্যা

সাধন গুহ

অফিসারদের একাংশের অভিযোগ যে তাদের জীবন এবং মান সম্মান বিপন্ন। ইতিপূর্বে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আমি বলেছি যে, কিছু শ্রমিক রুখনও কখনও উদ্ভর্ত আচরণ করেন ঠিকই এমন কি মার-মুখীও হয় ওঠেন। কিন্তু, সেটা একতরফা নয়। অফিসারদের অমানবিক আচরণই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঝামেলা সৃষ্টি করে। জাতীয়করণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত খনিশ্রমিকদের মাতুষ্য বলেই গণ্য করা হতোনা। এখন সেই চির নিগূহীত শ্রমিকরা যদি মাথা উচু করে কথা বলতে চায় তবে চোখ রাঙিয়ে তার মোকাবিলা করতে গেলে অশান্তি হতেই পারে। কিন্তু আমি চালেও করেই বলছি, শ্রমিকদের ঔদ্ধত্যের নজির হাজারে একটাও খুঁজে পাওয়া ভাব। পক্ষান্তরে, কিছু অফিসারেরও এবিধ আচরণ প্রায় দৈনন্দিন ঘটনার পর্যায়ভুক্ত। এবং এই আচরণ কতটা নির্মম কতটা পাশবিক হতে পারে তার প্রমাণ এরিয়া কোরের অন্তর্গত বেলবাইদ কোলিয়ারীর অফিসে ২০শে এপ্রিল তারিখে অগ্নিস্ফুটন দুইটি বৃশংস শ্রমিক হত্যা।

ঘটনাটি প্রায় চাপা দেওয়া হয়েছিল। ১৭ই জুলাই গ্রেটসমান কাগজে এই পাশবিক হত্যাকাণ্ডের খবর প্রকাশিত হবার পরই, সি, এল এর ম্যানেজিং ডাইরেকটরের পক্ষ থেকে মিনিট্রী অব এনার্জির কোল ডিপার্টমেন্টের ডাইরেকটর সি, ডি, ত্রিপাঠিকে ১৯শে জুলাই ১৯৭৭ তারিখে একটি রিপোর্ট পাঠানো হয়। এই রিপোর্টের মূল্য প্যারা-গ্রাফে বলা হয়েছে, "A preliminary inquiry committee was set up by the G. M, Area IV into the incidence. The enquiry committee concluded that the 2 officers sri chatterjee and sri Tewari did not rise to the occasion and acted with prudence and controlling and guiding the mob to avoid this untoward incidence"

এই চিঠির পক্ষ প্যারাগ্রাফে দেখা যায় যে, পুলিশ এ.চ্যাটার্জী ও তেওয়ারী অর্থাৎ বেলবাইদ কোলিয়ারীর এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার এ, কে, চ্যাটার্জী এবং ইনস্পেক্টর পি, কে, তেওয়ারীকে আরও ৩ জন চাপ-

রাশীর সঙ্গে গ্রেপ্তার করে। বলা হয়েছে যে, চুরি করা কয়লা বিক্রী করতে গিয়ে নিহত ২ জন শ্রমিক গ্রামবাসীর হাতে ধরা পড়ে এবং ঐ নিহত ২ জনের বিরুদ্ধে নাকি আরও চুরির অভিযোগ ছিল এবং বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে প্রচণ্ডভাবে প্রহৃত হয়েই তাদের মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু পূর্বোক্ত রিপোর্টের ৩নং প্যারা-গ্রাফে বলা হয়েছে, "ince the scuffle originally started on catching the coal pilferers and alleged demand of security guards, who were not on duty, to realise some money, which later on developed into the person caught selling the coal alleged to be pilfered." ইত্যাদি। এই মামলা বর্তমানে বিচারাধীন। সত্যিকারের দোষী নির্ধারণ করবেন মহামায়া আদালত। কিন্তু, কিছু তথ্য আমরা তুলে ধরতে চাই যাতে মাননীয় বিচারক সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন এবং প্রয়োজনবোধে আরো কাউকে আসামীর কার্টগডায় তলব করলেও করতে পারেন।

প্রথমেই আমি প্রশ্ন তুলতে চাই, বেলবাইদ কোলিয়ারীর ম্যানেজার এম, আর, আগরওয়ালকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়নি? এরিয়া কোরের জেনারেল ম্যানেজার কর্তৃক নিযুক্ত তদন্তেও তিনি রেহাই পেলেন কি করে? এই তদন্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে ম্যানেজারের নির্দেশেই তাদের অর্থাৎ নিহতদের অফিস ঘরে আটক রাখা হয় (to keep these persons confined in the office room to save them from the mob fury so that they may be handed over to police on the following day.) এই প্যারা-গ্রাফেই বলা হয়েছে, Meanwhile it appears that they had already been manhandled very seriously. তাই যদি হয় তবে ম্যানেজার আগরওয়াল নিজে অফিসে যান নি কেন? তাকে যখন আমি প্রশ্ন করি যে তিনি নিজে অফিসে খবর পেয়ে গিয়েছিলেন কিনা আগরওয়াল জবাব দেন, "I did not take it very seriously and I didn't feel it essential for the manager to go there personally." চ্যাটার্জী এবং তেওয়ারী ঘটনাস্থলে

উপস্থিত ছিলেন কিনা এই প্রশ্নের জবাবে আগরওয়াল বলেন, "I don't know whether Mr, Chatterjee or Mr. Tewari was present there are not." তিনি নিজেই বলেছেন, "I was informed at about six in the evening that the condition of one man is very serious." এরপর আপনি কি অফিসে গিয়েছিলেন—আমার এই প্রশ্নের জবাবে আগরওয়াল বলেন, "No, even after getting the information I didn't visit the spot. I asked the manager to call the doctor. I didn't go to the spot at all" যদি আগরওয়ালের বিরুদ্ধেই সত্য বলে ধরে নিই তাহলেও কতটো অবহেলার দ্বায়ে তাকে গ্রেপ্তার করা উচিত।

কিন্তু আমার তদন্তে দেখা যায় যে আগরওয়াল নিজে দৈহিক নির্ধা-ওনে অংশগ্রহণ না করলেও আগা-গোড়া অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে অফিস ঘরের দূরত্ব খুব বেশী হলে ২০ ফুট। কোন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন লোক কি বিশ্বাস করবেন যে এক্ষেত্রে আগরওয়াল কিছুই জানতেন না, কিছুই দেখেননি?

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, দুজন শ্রমিককে দড়ি বেধে টানিয়ে স্ট্রেক পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে এবং অভিযুক্ত দুই অফিসার চ্যাটার্জী ও তেওয়ারী ম্যানেজারের চোখের সামনেই সেই নির্মম জলাদী ভূমিকা পালন করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সব শ্রমিকের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ কল্পিত কাহিনী মাত্র। মূল কাহিনীর শেকড় আরও অনেক গভীর। গোটা চক্রান্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জোট জাকী কোলিয়ারীর দুই কুখ্যাত গুণ্ডা হরদয়াল সিং এবং শঙ্কর গোপ। এরা আই, এন, টি, ইউ, সি'র জালালের উপদেষ্টা কর্মী। এদের লাম্পট্য এতদূরকালে সুবিদিত। নিহত হুদাম রাউরীর অনেকা আত্মীয়কে রক্ষিতা রেখেছিল হরদয়াল। এই নিয়েই বিরোধ। জোট জাকী গ্রামের খতি মজুরররা হরদয়ালকে মদত দিতে রাজী হয়নি এবং সেই কারণেই এই গুণ্ডারা একটা মিথ্যা কাহিনী দাঁড় করিয়ে নিজেদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে এবং কিছু অফিসার সেই

চক্রান্তে সামিল হয়েছেন। এখনও গুণ্ডারা জোট জাকী গ্রামে নিয়মিত-ভাবে হামলী চালাচ্ছে এবং এর মধ্যে আরও দুইজনকে তুলে আনবার চেষ্টা করেছে। এতবড় পাশবিক একটা ঘটনাকে কি অফিসারদের সম্মতবাহারের নজির করতে হবে। এইসব অতি কুখ্যাত কয়লাখনির অফিসাররা স্বযোগমত এবং থেয়ালখুশি মার্কিক শ্রমিকদের যখন তখন চোর আখ্যা দিয়ে পিটিয়ে মারবেন আর তারস্বরে চীৎকার করবেন তাদের জীবন মান বিপন্ন।

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করছি ২০শে আগষ্ট নিংগা সাব এরিয়া ম্যানেজার মিঃ শর্মা'র ঘরে এরিয়া ট্রব ডেপুটি চীফ পার্সনাল অফিসার মিঃ এস, সি, মল্লিক নির্বিকার চিত্তে বলেন যে, তার ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ডের লোক দুইজন চোরকে খানায় জমা দিতে গেলে পুলিশ নাকি উল্টে ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ডের লোকদেরই গ্রেপ্তার করে। আমি সঙ্গে সঙ্গে খানায় কোন করি এবং জানতে পারি যে সন্দেহ কারণেই ওদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফোন নামিয়ে রেখে মিঃ মল্লিককে বলেছিলাম, "আপনারা-ওতো ধোয়া তুলসী পাতা নন।" মল্লিক মাথা নীচু করে হজম করেছিলেন আমার মন্তব্য। আসল ঘটনা হচ্ছে, জামুরিয়া কোলিয়ারীর টোর থেকে দুজনকে ধরে প্রচণ্ডভাবে মারা হয় এবং সারারাত্রি ওদের বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা

হয়। ম্যানেজার উপাধারী সেনে শুনেও এদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করেননি। পরের দিন ওদের যখন খানায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন পুলিশ আহতদের হাসপাতালে পাঠিয়ে ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ডের লোকদের গ্রেপ্তার করে। দুদিন পর আহতদের একজন মারা যায়। অথচ মিঃ মল্লিক সরাসরি দোষ চাপালেন পুলিশের ওপর। কয়লাখনির টোরে সাগর চুরির কথা কারো অজানা নয়। মাঝে মাঝেই তাই চুরির ঘটনা দাঁড় করতে হয় নিজেদের কেলঙ্কারী চাপা দেবার জন্য। এবং এই সব অপকীর্তি ধরা পড়লেই আইন শৃংখলার অবনতির সজ্জা ওঠে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য, রাজ্যে বৃহত্তম শিল্পে শৃংখলা বজায় রাখার দায়িত্ব অফিসার এবং শ্রমিক উভয়েরই। এতদিন ধরে আই, এন, টি, ইউ, সি এবং তাদের সহযোগী ট্রেড ইউনিয়নের অনেকে ই, সি, এস থেকে মাসিক বরাদ্দ পেয়ে আসছিলেন। বর্তমানে সেটা পাচ্ছেন না। ফলে চক্রান্ত হুক হয়েছে। কিছু অফিসার যদি সেই রাজনৈতিক ধড়িবাজদের অপকর্মের নেপথ্য সহায়ক হয়ে বর্তমান রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে আঘাত-হানতে চান তবে তাঁরা যেন মনে রাখেন যে অসুটা বুঝেই ফিরে যাবে।

(সমাপ্ত)

লেবার কমিশনার অফিসের কর্মচারীরা বঞ্চনার শিকার

(দুর্গার সংবাদদাতা)

শ্রমিক কর্মচারীদের দাবী হয়েছে। হওয়া উচিত ছিল সন্তোষ দাওয়ার ব্যাপারে সালিশী কবে যারা সেই লেবার কমিশনার অফিসের কর্মচারীরাই দীর্ঘকাল ধরে বঞ্চনার শিকার। জানা গেছে, আপার ডিভিসন ক্লার্কের দৃষ্টি পদ হুবহুর ধরে শৃঙ্খলা রাখা হয়েছে, যার ফলে নিম্নতম কর্মচারীরা প্রমোশনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ শৃঙ্খলা পূরণ হলে কিছু বেকারের চাকরী হতে পারে। এখানে অফিসার ও ইউ ডি ক্লার্ক ছাড়া আর কেউ সিলেকশন গ্রেড পান নি।

এখানে কাজের চাপ ক্রমশঃ বাড়ছে। ট্রান্সপোর্ট লাইসেন্স এখন শ্রম দপ্তরের অধীন। তাছাড়া পশ্চিম বঙ্গে ৩৩০টি বি ডি ও অফিস এগ্রি-কালচারাল মিনিমাম ওয়েজ ইন্সপেক্টর সহ দুজন করে কর্মচারী কাজ করেন। তাদের চাকরী জীবনের রেকর্ড এই অফিসকেই রাখতে হয়। এর জন্য মাত্র দুটি পদ সৃষ্টি করা

হয়েছে। হওয়া উচিত ছিল সন্তোষ দাওয়ার ব্যাপারে সালিশী কবে যারা সেই লেবার কমিশনার অফিসের কর্মচারীরাই দীর্ঘকাল ধরে বঞ্চনার শিকার। জানা গেছে, আপার ডিভিসন ক্লার্কের দৃষ্টি পদ হুবহুর ধরে শৃঙ্খলা রাখা হয়েছে, যার ফলে নিম্নতম কর্মচারীরা প্রমোশনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ শৃঙ্খলা পূরণ হলে কিছু বেকারের চাকরী হতে পারে। এখানে অফিসার ও ইউ ডি ক্লার্ক ছাড়া আর কেউ সিলেকশন গ্রেড পান নি।

এখানে কাজের চাপ ক্রমশঃ বাড়ছে। ট্রান্সপোর্ট লাইসেন্স এখন শ্রম দপ্তরের অধীন। তাছাড়া পশ্চিম বঙ্গে ৩৩০টি বি ডি ও অফিস এগ্রি-কালচারাল মিনিমাম ওয়েজ ইন্সপেক্টর সহ দুজন করে কর্মচারী কাজ করেন। তাদের চাকরী জীবনের রেকর্ড এই অফিসকেই রাখতে হয়। এর জন্য মাত্র দুটি পদ সৃষ্টি করা

দানিবেন তত্ত্বের আলোকে মহাভারতের স্বর্গ ও দেবতা বীরেন্দ্র মিশ্র

হিমালয়ে ইন্দ্রপুরী

মহাভারতের বিশাল প্রেক্ষাপটের অসুসঙ্গত চালায়ে গবেষণা, মহাকাব্যের যে বিষয় বিভাজন করেছেন, সেই নিরিখেব দিকে তাকালেই বোঝা যায় কি ভাবে তথ্যের অবলম্বিত ঘটেছে গুটী উদ্দেশ্যের মসিলেপনে। মূল কাহিনী ও তথ্যাবলী নিশ্চিত হয়েছে ভক্তিযুলক পুরাণ কথা ও উপদেশাবলীর চাপে পড়ে। লক্ষ্য শ্লোকের মধ্যে মূল কাহিনীর জ্ঞান বরাদ্দ আছে মাত্র দশ হাজার শ্লোক। যুদ্ধ বর্ণনায় বায় হয়েছে শতকরা বিশ ভাগ। আর সিংহভাগ অর্থাৎ উপদেশাবলীর জ্ঞান শতকরা ত্রিশ এবং ভক্তিযুলক পুরাণ কথার জ্ঞান ছুটেছে শতকরা পঁচিশ ভাগ। (ডঃ পি.এল. বৈদ্য, অধ্যাপক সংস্কৃত ও পালি, বেনাবস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত "Mahabharata: Its History and Character", The Cultrual Heritage of India vol. II গ্রন্থে দ্রঃ)। স্বতঃপূর্ব ভাগ উদ্দেশ্যমূলক রচনাব জায়গা করে দিতে হলে যথার্থ তথ্যসমূহের আর কতটুকুই বা স্বযোগ থাকে? এসব কারণে অর্জুনের মহাকাশ ভ্রমণ-বিবরণ বর্ণনা মন্তব্যপূর্ণ পক্ষপৃষ্ঠে আবৃত হয়ে থাকলে আশ্চর্যের কিছু নেই। আশ্চর্য হই বরং তখন, যখন দেখি পাইলট মাতলি নক্ষত্রলোক সম্পর্কে যে মুহূর্তে মুখ খুলেছেন, সেই মুহূর্তেই তাঁকে ধামিয়ে দেওয়া হয় এ নিপুণ ভাবে সেই ফাঁক পূরণ করা হয় বহু পুনরুক্তিহীন মহাভারতের একমাত্র উদ্দেশ্যমূলক বক্তব্য দিয়ে। বক্তব্যটি হ'ল, যাগযজ্ঞশীল ও ধর্মবান্ধব রাজারা এবং ব্রাহ্মণকে সর্বশ্রম সমর্পণ করেছেন এমন দানশীল ব্যক্তিই একমাত্র পুণ্যকল লাভের অধিকারী। ব্রাহ্মণের জ্ঞান একটি পরমশ্রমভোগী কায়দার বাবস্থা প্রতিষ্ঠার মানসে অত বড় মহাভারত। সেক্ষেত্রেই মাতলি যখন শুক করেন তারকামণ্ডলী সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য তখন নিপুণ বিবাকনের ফলে সে বক্তব্য আর বস্তৃপ্তিও তারকা সম্পর্কে মহাকাশচারী প্রদত্ত জ্ঞানময় বাণী থাকে না, হয়ে

ওঠে তা মহাভারতের বহু ব্যবহৃত সেই ভাঙা বেকডটির কম্পিত স্বর, যে স্বর বিভিন্ন অধ্যায়-বিভিন্ন চরিত্রের মনে বারবার বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা শুনতে শুনতে শ্রদ্ধা অপেক্ষা বাস্তবিক পক্ষে মনে বিতৃষ্ণা ও অশ্রদ্ধাবই উদ্ভূত হয়।

মাতলির রথ মহাকাশের বিশেষ এক উচ্চমার্গে তখন উঠে এসেছে তাই অর্জুনের দৃষ্টপথ থেকে মর্ত্যলোক অদৃশ্য হয়ে গেছে। তিনি দেখছেন "তথায় সূর্য চন্দ্র বা পাবকের আলোক নাই, লোকসকল কেবল স্ব স্ব পুণ্যাজিত প্রভাভারা দীপ্তি পাই-তেছেন। যে-সকল তারকামণ্ডল বাস্তবিক বৃহৎ হইলেও বিপ্রকৃষ্ট প্রযুক্ত (দূরত্ব নিবন্ধন) দীপের তায় অতীব ক্ষুদ্রতর প্রতীয়মান হইয়া থাকে তথায় তাহারা স্ব স্ব কক্ষে বিলক্ষণ উজ্জ্বল ও বৃহদাকার-সম্পন্ন।" এ পর্যন্ত মহাকাশ জগতের একটি বর্ণনা চলছিল বলেই মনে হয়। মহাকাশবিজ্ঞানী কেউ অথবা এই পৃথিবীর নভচর কাব্যে কাছ থেকে হয়ত এই বর্ণনার যথার্থ ব্যাখ্যাও পাওয়া সম্ভব, কিন্তু পরবর্তী শ্লোকে - মহাভারতীয় উদ্দেশ্যের স্পষ্ট অঙ্গপ্রবেশ সমস্ত চিত্রটির বাস্তবতা করেকটি কালিবাঁচড়ে মলিন করে দেয়, আমবা পাঠ করি: "যে সমস্ত মহাবীর সিদ্ধ বাহাদুরগণ রণস্থলে কলবের পবিত্রাঙ্গ করিয়াছিলেন, অর্জুন দেখিলেন যে, তাহারা সকলে নিজ নিজ স্থানে স্বকীয় প্রভাপুঞ্জ প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। স্বর্ঘের তার তেজস্বী সহস্র সহস্র গন্ধর্ব তপোবলে স্বর্গময় করিয়া তথায় উপনীত হইয়াছেন।" এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে মাতলিকে তাব ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করায় মাতলি বললেন, "হে পার্থ? তুমি ভ্রমশ্রম হইতে যে সমস্ত তারকা পূর্ববক্ষণ করিয়াছ, সেই সকল পুণ্যশীলরা (অর্থাৎ তপোবলধররা) স্মৃতি ফলে এই তারকাকপে'স স্থানে অবস্থিতি করিতেছে।"

মহাভারতই বলুন আর স্বয়ং ভগবানই বলুন, মাতলির এই ব্যাখ্যা আজকের মহাকাশবিজ্ঞানের আলোকে

অতিলৌকিক দৈব ঘটনা হিসেবেও আর মান্য নয়। তারকামণ্ডলী কী ও কেমন জিনিস এ সম্পর্কে জুলের কিশোরটিও অনেক জ্ঞানে ফেলেছে। মহাভারতীয় উদ্দেশ্য তাই নোচনী-ভাবে ব্যর্থ। তারকাপুঞ্জ মৃত রাজর্ষি-বর্গের প্রভাভূতি তো নয়ই, বরষিও ছাড়া তার উপর কোনো ব্যাখ্যাও নেই। আপন চতুর্ভালির কাদে মহাভারতের কবি এখানে আপনি ধরা পড়ে গেছেন।

এই পাঠের পর স্বভাবতই মনে হতে পারে, অর্জুন মহাকাশের উচ্চ মার্গে আদৌ উপনীতই হননি, তাঁব মহাকাশদর্শন স্বপ্ন-কল্পিত একটি মনগড়া বর্ণনামাত্র। আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি, এতানা ও একিডুব মহাকাশ থেকে পৃথিবী দর্শনের বর্ণনা কেমনভাবে আজকের সত্যদর্শনের সঙ্গে সামিল হয়েছে। দেখেছি, তাঁদের যান দুটির নির্মিতিও ছিল বিচিত্র। বিগেযজ্ঞের দৃষ্টিতে যান দুটি ত্রিস্তরীয় মহাকাশযান বলেও মনে হতে পারে। মাতলির রথ কিন্তু তেমন কোনো পরিচিতি আমাদের সামনে তুলে ধরে না। শুধু বোঝা যায়, সেই আকাশরথের বৈভব ও বিশালতা ছিল সাধারণ বিমান অপেক্ষা অনেক বেশি। আর সেটাই সম্ভব। কেননা মাতলির রথকে হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গগুলি অতিক্রম করে এক জায়গা থেকে অত্র জায়গায় উড়ে যেতে হয়েছে।

অতএব আমাদের সামনে একটি-মাত্রই প্রশ্ন পড়ে থাকে, তা হ'ল, চতুর নভচররা স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছি বলে অর্জুনকে বস্তৃত কোথায় নিয়ে গেলেন। কোথায় সেই চতুর ইন্দ্রের অমরাবতী?

আগেই বলেছি, স্বর্গ মানে দেবভূমি। দেব আবাসই স্বর্গ এবং এই অর্থেই শব্দটিকে গ্রহণ করা হলে অনেক গোল মিটে যায়। দেখেছি আমরা, সেই পুরাণে ভিন্‌গ্রহের কতিপয় বুদ্ধিমান নভচর এই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দেবতা সঙ্গে নিজের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁদের আবাসগুলিই, স্বতঃপূর্ব স্বর্গ। যখন তাঁরা পৃথিবী-

পৃষ্ঠে উচ্চ পার্বত্য উপত্যকায় ক্যাম্প ফেলেছেন, তখন মহাকাশ বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ মানুষের কাছে সেই অবস্থিতিই স্বর্গ। আবার যখন তাঁরা বুদ্ধিগিরের মতো কাউকে নিয়ে চিরদিনের জন্য মর্ত্যলোক ত্যাগ করেছেন তখন প্রতারিত মানুষ সেই অজ্ঞাত লোককেই প্রকৃত স্বর্গ বলে ধারণা করেছেন। সেদিন প্রকৃত স্বর্গের ধারণা হয়েছে এমন এক লোক যা নীল মহাস্রোতের কোনো অজ্ঞাত অবস্থানে হারিয়ে গেছে। বহু তপো-বলধন্যও আর কখনই তাঁর হৃদয় পায়নি। পার্থিব স্বর্গ মিথ্যা হয়ে তখন থেকেই কি! অসীম অনন্তে বিরাজমান এক কল্পিত স্বর্গের ধারণা স্বপ্নময় আলোড়িত করেছে? তাই কি অর্জুন সর্বপ্রথম স্বর্গে গেলেও সব ব্যাপারটি গোপন হয়ে গেছে আর প্রচারিত হয়েছে একমাত্র বুদ্ধিগিরই সশরীরে স্বর্গলাভ করেছেন বলে? অর্জুনের স্বর্গযাত্রানন্দ্য হয়ে যাওয়ার পেছনে, আমাব তো মনে হয়, এই যুক্তিই বস্তৃত অর্থময়। এছাড়া আর যুক্তি কৈ? এ ছাড়া আর কোন যুক্তিতে অর্জুনের প্রথম স্বর্গযাত্রাকে বাতিল করা যেতে পারে। এটাই যুক্তি নাহলে বুদ্ধিগিরের স্বর্গ দর্শনকে অমূল্য কাচা কলমে কষ্টকল্পিত ভাবে বঙ্গনা করতে হব কেন? কেন কবি ধরা পড়ে যান? কেন আমবা বুঝতে পারি, সে বর্ণনার মধ্যে ছিটেফোটা সত্যও নেই। আছে কবিকল্পনার ব্যর্থ প্রয়াস?

একথা আবোভালে করে বোঝা যাচ্ছে অর্জুনের দেখা স্বর্গলোকটি ধীরে স্বপ্নে ঝুঁটিয়ে বিচার করলে।

পরবর্তী পাঠ: "মহাশয়া: অর্জুন এইরূপে সকল রাজলোক অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে (দেবলোকে) উত্তীর্ণ হইয়া পরম রমণীয় ইন্দ্রপুরী অমরাবতী সন্দর্শন কারিতে লাগিলেন।" এ বর্ণনা অবশ্যই বুদ্ধিগ্রাহ্য। রাজলোক বলতে পার্থিব ভূমি বা নাকি তথাকথিত দেবতাদের দখলীভূত নয়। অর্জুন সেই ভূপৃষ্ঠে (ভূমি মাঝেই তখন রাজার অধিকৃত) অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হলেন স্বর্গলোকে যা দেবতাদের অধিকৃত অঞ্চলে।

এই স্বর্গলোকও যে নেহাংই আর একটি পার্থিব ঞ্চল মহাভারত-কার সে বিষয়ে আমাদের মনে আর কোনো প্রশ্ন বন্ধের অবকাশ রাখেন নি। রাজা বলেছেন, সে রাজ্য পবিত্র তরুজাতি দ্বারা পরিবেষ্টিত। "তথায় স্রগন্ধি কুসুম সংপূর্ণ... গন্ধবহ সর্বদাই মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে" কেননা ইন্দ্রের অমরাবতীর সন্নিকটেই যে পরমপীতিকর নন্দনবন।

হিমালয়ের পথে, পথে এই দেব-

ভূমির বিস্তার। পুরাণ পুথিতে ইন্দ্র-পুরী বা অমরাবতীর অবস্থান উল্লেখ করা হয়েছে স্বমেক পর্বতে। স্বমেক পর্বতেই দেবতার সমুদ্রমন্ডনের মঞ্চা করেন। দেবভূমি স্বমেকের বিস্তৃতি হিমালয়ের কোড়দেশকে ঠিক কতদূর অধিকার করে আছে এ নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন মতামত দেখেছি। তবে ইন্দ্রের আবাস যে বজ্রীনাথ চৌখায়া ও কেদারনাথের পথেই, বিভিন্ন মত একত্রিত করলে তেমনই ধারণা হয়। হিমালয় পথের ভক্তি-স্বক পৃথিবী জীউমাগ্রসারি মুখোপাধ্যায়ের 'পঞ্চকেদার' গ্রন্থে দেখি, হিমালয়ের স্থানীয় অধিবাসীরা বজ্রীনাথ-চৌখায়া-কেই 'স্বমেক' পর্বত বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। চৌখায়া ও স্বমেক দুটি শৃঙ্গ উত্তরকাশী জেলার অন্তর্ভুক্ত। (শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দু দত্তের মানচিত্র, শ্রী মহারাজের 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে' গ্রন্থে দ্রঃ, প্রকাশক, রবীন্দ্র লাইব্রেরী)। স্বমেক পর্বত কেদারনাথের উত্তরপূর্বে এবং গঙ্গোত্রী হিমবাহের দক্ষিণ দিকে চিহ্নিত। কেদারনাথের পূর্বে বজ্রীনাথ ও তারই সামান্য উত্তরপূর্বে নন্দন কানন। ক্লাসিক প্রেস প্রকাশিত দীপকুমাব সরকারের 'কপুতীকপুত-হোমকুণ্ড' গ্রন্থে শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দু দত্তের মানচিত্র দ্রঃ)। সম্প্রতি প্রকাশিত সাক্ষরতা প্রকাশনের 'বিশ্বকোষ' প্রথম খণ্ড জানাচ্ছে 'স্বর্গদীপ্ত অগকানন্দা অমরাবতীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এই অলকানন্দার কোল ঘেঁষেই বজ্রীনাথের পর্ব। এই সব স্বাবস্তীর্ণ পার্বত্য এলাকা গুড্ডাই সেদিন দেবতার (নভচরগণ) বিচরণ করেছেন। অর্জুনও নীত হয়েছেন হিমালয়ের এক স্থান থেকে অত্র। অর্জুনের দেখা স্বর্গ দেবতারা হিমালয় ছাড়া অত্র কোনো লোক নয়। তাই প্রবাদ স্বর্গযাত্রার পথে বুদ্ধিগির কেদারনাথে অবস্থান করেন। তাইতো দেবমানব সম্পর্কিত সকল সংবাদে সংগ্রাহক ব্যাসদেবের গুহাটি ছিল বজ্রীনারায়ণ মন্দিরের অদূরে। কৈলাসে ছিল কুবেরের অলকাপুরী। অর্থাৎ ঐ পার্বত্য প্রদেশ ঘিরে সেদিন ছিল নভচরদের প্রচুর তৎপরতা। সেজন্যই স্বর্গ ও দেবভূমি সেখানেই। অস্তিত মহাকাশে বুদ্ধিগির হারিয়ে যাওয়ার আগে হিমালয়ই ছিল স্বর্গ হিসেবে উল্লেখিত।

(চলবে)

আনন্দবাজার পাঠকদের ঠকাচ্ছে

কালিদাস কাঞ্জিলাল

ইন্দিরা-সম্পর্কিত এই অফুরন্ত সামান্যভোলের মধ্যে আমরা যেন সেই মহান সাংবাদিকের স্বরূপটাও লক্ষ্য করতে অপরাগ না-হই। অক্ষরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ার পূর্বেও নেহরু-কতার বড় বড় বিরোধী কাজ নিয়ে উচ্চবাচ্য হন। এই দুর্ভাগ্য দেশে বেশীর সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের হাড়ে—যখন যেমন! তখন অর্থাৎ এরা যোপ বুকে মারেন। এই দিক দিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রুপের কার্য-কলাপ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এদের অ-ঘোষিত নীতি হচ্ছে—যেমন করে হোক পয়সা রোজগার করা এবং ক্ষমতাসীন দলকে অবৈধভাবে তোয়াজ করা। তবে ধনী সমাজের স্বার্থে এবং নিজেদের কায়মী স্বার্থ-রক্ষার্থে কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র-বাদের এরা ঘোরতর বিরোধী। আর এদের গণতন্ত্র প্রীতিটাও শুধু নিজেদের গোষ্ঠীগত স্বার্থেই। অর্থাৎ এরা চান স্থিতিবস্থা বজায় রাখতে।

মানে, ঐদেব টাকার খলিতে যেন চান না পড়ে। আসল কথা ইন্দিরা সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে খুব বেশী নুঁকে পড়েছিলেন, এইটেই হয়েছিল আনন্দবাজার গ্রুপের কাছে অসহ্য। পয়সা কামানোর মহান উদ্দেশ্য নিয়েই পত্রিকাকে ওরা আজ অব-শেষে রহস্য-পত্রিকায় পরিণত করে ছেড়েছেন। ওটাকে এখন আর সংবাদপত্র বলা চলে না। পত্রিকার বেতনভূক কর্মচারী একদল চটুল সাহিত্যের 'অতি-আধুনিক' লেখক যারা ফুলিয়ে-ফাপিয়ে সামান্য-সামান্য জিনিষকে অসামান্য করে তোলেন, চটকদার করে তোলেন এবং যে লেখা দশটি শব্দে শেষ করা উচিত, সেই লেখা শেষ করেন দুশো শব্দে। তবু পত্রিকাটিকে 'সংবাদপত্র' বলা হয়। সংবাদ থাকে তো ওতে নামমাত্র। রাজনৈতিক অপপ্রচারণা, গবেষণা আর বিকৃত অর্থসত্য সংবাদ। তাছাড়া বেশীর ভাগ আক্ষে-বাজে বিষয় তুচ্ছাতুচ্ছ বিষয় চণ্ড ও রঙ দিয়ে লেখা হয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। তাই, দিয়ে আর বিজ্ঞাপন দিয়েই কাগজ ভরতি। নারীঘটিত বিশেষতঃ তরুণী-ঘটিত বিষয় হলে তো আর কথাই নেই। চটকদারী লেখার ফোয়ারা ছুঁতে থাকে কলমের পর কলম। তরুণীর গন্ধ পেলে আনন্দ-বাজারে কর্মরত লেখকদের এত বেশী পরিমাণে মুড় এসে যায় যে

তার স্থান-কাল-পাত্র ভুলে যান এবং ভুলে যান, তার সাংবাদিকত্বের ক্ষমতা রিপোর্ট লিখছেন, রহস্য উপভাস লিখছেন না।

তরুণী-হরণ, তরুণীর উপর বলাৎ-কার ও তরুণী হত্যার উপর রহস্য-রচনা আনন্দবাজার পত্রিকা-কার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। দেশের এক শ্রেণীর ছেলে-বুড়ো এবং সেরে-পুরুষ বিশেষত তরুণ-তরুণীরা ওরই আকর্ষণে আনন্দ-বাজার পত্রিকা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। ধন্য আনন্দবাজার পত্রিকা। ধন্য তোমাব পরিচালকবৃন্দ।

পত্রিকাটির বর্তমান মাসের সংস্করণের ঘোষ একটা অদ্ভুত জীব মনে হয়। উনি কাগজের অনেকখানি ফুল্যাবান জায়গা জুড়ে যেদিন আবোল-তাবোল লেখেন, সেদিন কাগজের মালিকের প্রতি বিভিন্ন পাঠক মহল থেকে প্রচুর অভিযোগ বর্ণিত হয়। সংস্করণবাবুর লেখায় কি যে প্রতিপাত্ত বিষয়, তা অগোচর পাঠকেরা বুঝতে না পারলেও ওর মাথাগুঁড়িহীন লেখাব ছত্রে ছত্রে বিভা ও পাণ্ডিত্যের অপরূপ প্রদ-র্শনী দেখে এবং কোটেশানের বহর দেখে তাদের কিন্তু তাক লেগে যায়। অনেকে তো ভয়েই 'বিশ্বের জাহাজ' সংস্করণবাবুর হুমসারচারগুলি পড়তে চেষ্টা পর্যন্ত করে না। খাত-অখাত পৃথিবী ভাব লোকের উজ্জ্বল সংস্করণবাবুর লেখায় আগাগোড়া ঢালাওভাবে উদ্ধৃত হয় নানাতাবে এবং নানা ভঙ্গিতে। তরুণী আর তরুণী। চণ্ড আর চণ্ড। অর্থাৎ তরুণী আর চণ্ডের বস্ত্রা বয়ে যায় সংস্করণ-বাবুর লেখায়। অনেকেই অনেক রকম ব্যঙ্গ-বিদ্রোপাদি কবে ওর লেখা নিয়ে। কিন্তু আমরা বলি, উনি কলির বেদব্যাস। লেখাকে ছর্বোধ্য করার ক্ষমতা ভজন ভজন ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন সংস্করণবাবু। চমৎকার। কারো কারো অভিযোগ কাগজের বিক্রি বাড়তে কাগজটাকে হাক করার অপকর্মে উনিই নাকি মূখ্য ভূমিকা নিয়েছেন—মালিকের ব্যাঙ্ক ব্যালাস ফীত করার ক্ষমতা। সত্যিই তো মালিকের ব্যাঙ্ক-ব্যালাস না বাড়লে কি কর্মচারীদের হাজার হাজার টাকা বেতন দেওয়া যায়? —যায় না।

আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষের কাছে, আমাদের জিজ্ঞাস্য, এইভাবে সংবাদ বিরল 'সংবাদপত্র' বিক্রি করে ওরা কি পাঠকদের প্রকরান্তরে প্রভাবিত করছেন না? আনন্দবাজার

দেশ বিদেশের মোটামুটি ববর জানতে হলে তিন চারখানা দৈনিক কাগজ পড়তে হয়। এর মধ্যে ইংরেজি জানা লোকদের পক্ষে স্টেটসম্যান তো অপরিহার্য। এই কাগজের অন্ততঃ পাঁচ ছিট পৃষ্ঠা আগাগোড়া নানা রকমে সংবাদে ঠাসা থাকে। এতটুকু চণ্ড বা বর্ণনার আতিশয্য কোথাও থাকে না। বাজে কথা তো একটিও নেই। কিন্তু আনন্দ-বাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও সাহিত্য-কর্ম বাদ দিলে প্রকৃত সংবাদ থাকে স্টেটসম্যানের একশ ভাগের এক ভাগ। অথচ উভয় কাগজেরই দাম প্রায় সমান। এইভাবে আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দেশবাসীকে ঠকাচ্ছেন।

শেষকালে ওরা ইমার্জেন্সীর সময়ে 'আনন্দলোক' বের করে একেবারে বাজিমাৎ করে দিয়েছেন। 'আনন্দ লোক'-এর মাধ্যমে সাহিত্যের

দেবীকে একেবারে এতলোকে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ জেজাল সাহিত্যের ব্যবসা ছেড়ে এবার বরং জেজাল বাস্তব ব্যবসাই শুরু করুন। তাতে ওদের পয়সা বেশী আসবে; অথচ দেশের ক্ষতি কম হবে।

চরণ সিং দেশবাসীর নৈতিক মান উন্নত করার ক্ষেত্রে রাজনীতি ক্ষেত্রের রাঘব বোয়ালদের শুধু ধরছেন। অন্তান্ত ক্ষেত্রেও নৈতিক অপরাধের বড় বড় কেন্দ্র রয়েছে। সেই সব কেন্দ্রের রাঘব বোয়ালদেরও পাকড়াও করা দরকার। দেশের লক্ষ লক্ষ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্র ছাত্রী সিনেমা তারকারদের নিয়ে লেখা নানা রকম চটুল ও রসালো কাহিনী এক নিঃশাপে গলাধঃকরণ করছে 'আনন্দলোক'-এর রূপায়। এখানেও 'আনন্দলোক'-পরিবেশক আনন্দ-বাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ কি একটা মস্তবড় নৈতিক অপরাধ করছেন না? কিন্তু এঁদের নৈতিক অপরাধ নিয়ে 'আনন্দলোক'-এর মাধ্যমে সাহিত্যের দেশে কোনো সোবগোল নেই। যাবা

চোরাকারবার করে, কর ফাঁকি দিয়ে, বাস্তব জেজাল দিয়ে পয়সা কামাচ্ছে, তাদের চেয়ে 'আনন্দলোক' কর্তৃপক্ষ কম অপরাধী কিসে?

আনন্দবাজার গোষ্ঠীর মনতে যে সব লেখক আজ বেড়ে (পয়সায়) উঠেছেন, তাঁদের প্রায় কারোরই লেখায় বক্তব্য নেই আদর্শ নেই, সমাজ বাস্তবতার কোন অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ দুর্বল সাহিত্যের কারবারি এরা। এই দুর্বল সাহিত্য, আর্ট সর্বধ সাহিত্য, আর যৌনরসাত্মক সাহিত্য দেশে একটা দুর্বল ও মেক হুগুহীন ছেনারেশন তৈরি করছে আনন্দবাজার গোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় যে সব লেখক দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের লেখা যেমন মেকদুগুহীন, সেই সব লেখা পড়ে পড়ে দেশময় তেমনি মেকদুগুহীন বা নীতিহীন একদল মানুষ তৈরি হয়ে গেছে ইতিপূর্বেই। দেশে লম্পট, মস্তান ও নারীমানস-লোভী মানুষ সৃষ্টিতে আনন্দবাজার গোষ্ঠী গত ২০/২৫ বছর যাবত যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমানো মানে চড়া হারে সুদের সুযোগ আর সেই সঙ্গে অপরকে দাবলদ্বী হতে সাহায্য করা

তাই অমর প্যাটেলের জমা টাকায় নতুন একটি ট্রাক্টর কেনা সম্ভব হন।

তার অবশ্য এক বিঘা জমিও নেই।

অমর গ্রন্থ করে অমর প্যাটেল প্রতিভা ও ফাণ্ডের সব টাকা ইউকোব্যাঙ্কের একটি ফিল্ড ডিপজিট পরিকল্পনায় জমা রাখেন। তিনি মোটেই জানতেন না—মাসে মাসে তিনি যখন সুদের টাকা ভুলছেন, তখন তার জমা টাকার সাহায্যে একটি কৃষক সমবায়ের ট্রাক্টর কেনা হচ্ছে।

ইউকোব্যাঙ্কের অন্যান্য আহমানতকারীদের টাকার মত অমর প্যাটেলেরও জমা টাকা সমাজে খ্যাতি দুর্বল ও নিঃসমল তাঁদের দাবলদ্বী করে তুলতে সাহায্য করেছে। এই যেমন—একটা ট্রাক্টর দিয়ে কিছু চাষীর প্রয়োজন মেটানো, কিংবা কোন কৃষকের দরকারমত কাজের রসদ জোগানো, অথবা অসহায় দুঃস্থ মহিলাদের জীবিকার সংস্থান করা বা পল ও অপারগের জন্যে স্থানের ব্যবস্থা করা। আমাদের নানা পুরিকল্পনায় আপনায় সক্ষম, তা যেমনই হোক না কেন, সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের সহায়ক। তাই, ইউকোব্যাঙ্কের যে কোনো সক্ষম পরিকল্পনায় টাকা জমা রাখার মানেই অপরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করা, এবং সেই সঙ্গে নিখর ও আভজনকভাবে নিজের সম্রতিও বাড়িয়ে তোলা। কারণ আপনায় জমা টাকা দিন দিন সুদে আসলে মিলে বেড়েই চলেবে।



সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফিল্ড ও টাইম ডিপজিট রিকারিং ডিপজিট রিকারিং ডিপজিটের সঙ্গে যুক্ত ফিল্ড ডিপজিট

টিপজিট সার্ভিসেসেট পরিকল্পনা কৃষকের আত্মনা ফিল্ড ডিপজিটের সঙ্গে যুক্ত জনতা পার্সোনাল অ্যাকসিডেন্ট ইনসিওরেন্স পলিসি



ইউনাইটেড কমানিশিয়াল ব্যাঙ্ক

জনগণকে দাবলদ্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

চলচ্চিত্র সমীক্ষা

কিউবার চলচ্চিত্র

ভানুসিংহ

ক্যালকাটা সিনে সেন্ট্রাল ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জন-সংযোগ বিভাগের উদ্যোগে কলকাতায় সম্প্রতি কিউবান চলচ্চিত্রের একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই উৎসবে মোট দশটি ছবি দেখান হয়। তার মধ্যে ছয়টি কাহিনী চিত্র এবং চারটি তথ্যচিত্র। কিউবার ছবি এর আগেও কলকাতায় একবার দেখান হয়েছে। কিন্তু এতগুলি ছবি নিয়ে একটি উৎসব এই প্রথম। এর জন্য উদ্যোক্তারা অভিনন্দন অবশ্যই দাবী করতে পারেন।

কিউবার চলচ্চিত্র সমগ্র বিশ্বে সজ্জ্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আধুনিক কিউবান চিত্রের বৈশিষ্ট্য হল নবতর ব্যঙ্গনায় কিউবান-সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরা এবং সাধারণ দর্শক মনে বৈপ্লবিক চেতনার সঞ্চার করা। আজকের কিউবার ছবি সে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করতে সতত সচেষ্ট। এর ফলে ফিচার ফিল্মেও ডকুমেন্টারি ভাবটা এসে পড়ে। কিউবার ছবি শুধুমাত্র প্রমোদ বিতরণের উদ্দেশ্যেই নির্মিত নয়, সাধারণ দর্শক-সমাজকে সমস্তার গভীরে নিয়ে গিয়ে সচেতন করে তুলতেও সে ছবি নিয়ত প্রয়াসী। ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া সমাজের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা কিউবার ছবি যে ভাষায় বলে, তা মনে অমোঘ শক্তিতে গেরণা সঞ্চার করে। এখানেই কিউবান চলচ্চিত্রের সার্থকতা। সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা কল্পে বিপ্লব ও সংগ্রাম ছবির অনেকখানি আয়ত্তা জুড়ে থাকলেও শিল্প ক্ষমতার পরিচয়ও ছবিতে পাই বৈ কি। তবে ছবিগুলি কিছুটা প্রচাব-মুখী।

ফিচার ফিল্মগুলির মধ্যে 'মেমোরি' আর 'আগার ডেভেলপমেন্ট' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। পরিচালক টমাস গুতিয়েরেজ এলিয়া চমৎকারভাবে ফুটিয়েছেন বিপ্লবের ফলে পঙ্গু মধ্যবিত্ত বুজিঙ্গীবি শ্রেণীর অধঃপতন। এই ছবির প্রধান চরিত্র সার্জিয়ে অরাজনৈতিক ব্যক্তি। সে বিপ্লবীরা নয়, প্রতিবিপ্লবীও নয়। সে কিন্তু বিপ্লবকে সমর্থন করে। ব্যক্তিগত কারণেই বুর্জোয়া আদর্শের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা আছে

তার মনে। সে বিচ্ছিন্ন, একাকী, নিঃসঙ্গ। সে তার অট্টালিকার অলিন্দ থেকে তাকিয়ে দেখছে— দেশবাসী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সে নিজে কিন্তু এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে অক্ষম। এই দ্বন্দ্ব মুখর চরিত্রটি ছবিতে চমৎকার ফুটেছে। ছবিটির শৈল্পিক ব্যঙ্গনাও

তারিক করবার মত। কিউবার ছবি শুধু বিদ্রোহের সঙ্গীতাই যে ফোটায় না। এ ছবিটি তারই উজ্জল দৃষ্টান্ত। ছবিটির ক্যামেরার কাজও অসামান্য।

'দি ম্যান অফ দ্য হাইসিনিট' ফিচার ফিল্মটি ডকুমেন্টারি ধাঁচে তোল। কিউবার বৈপ্লবিক ভয়ের পর প্রতি-বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে দেশবাসীর অবিরাম সংগ্রামের ছবিই ফুটেছে সেখানে। যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেছে ছবিটি তা দর্শক-মনকে অপ্রাপ্তিগত না করে পারেনা। 'পুয়েরটোরিকো' ছবিটি দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্তার প্রসঙ্গ যেমন রেখেছে, তেমনি

বুর্জোয়া সমাজের শোষণের কথাও বলেছে। 'গিরণ' ছবিটি কিউবার বিপ্লবকেই পুরোপুরি দর্শকের সামনে হাজির করে। আবার 'সিলোটিপিয়া' ছবিটি ভিন্ন রেজাঙ্কের। এখানে এক দম্পতির মধুর কৌতুককর কাহিনী আশ্চর্য রস ব্যঙ্গনায় চিত্রায়িত হয়েছে। অপারেশন ম্যান্টিপল ছবিটি এক গোয়েন্দা চিত্রের সাদৃশ্য পেলে, ভরা। দেখানেও রয়েছে বিপ্লবের পটভূমি।

কিউবার তথ্যচিত্রগুলি আশ্চর্য হৃন্দর। এত চিত্রাকর্ষক ভঙ্গীতে ছবিগুলি তোলার যে ভাবতে কোন কষ্টই হয়না আজকের কিউবার

চলচ্চিত্র কলাকুশলীরা কি পরিমাণে উন্নত। 'ফোকলোর', 'কিউবা ইন পি টাইমস', 'আবাকুয়া' ও উইক এণ্ড' ছবিগুলি কিউবার লোক-সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরেছে সগৌরবে। ছবিগুলিতে লোকনৃত্য ও লোকসংগীত পরিবেশিত হয়েছে নৈপুণ্যে।

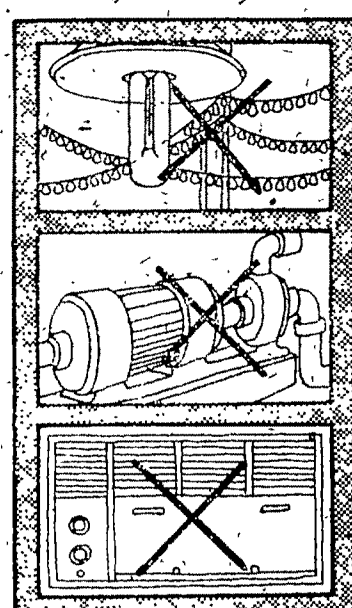
এ বছরের শ্রেষ্ঠ শারদ সন্টার

'কালিয়'

আর কয়েকদিন পরেই প্রকাশ্যে হবে। আজই আপনার কলকাতা নিকটবর্তী হকারকে বলে

যদি বাসস্থানের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন :

কিভাবে বিদ্যুৎ ঘাটতির মোকাবিলা করবেন



খুবই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আগামী বেশ কিছুদিন-এ রাজ্যে, বিদ্যুৎ সংকট থাকবে। অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্যে সব রকম প্রচেষ্টা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিতে কীভাবে মোকাবিলা করা যায়—সেদিকে নজর দেওয়াটাই ভালো।

কীভাবে মোকাবিলা করবেন :

প্রথমত বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন। আলোর বাহার এবং আলোর প্রদর্শনী বন্ধ করুন। যতটা সম্ভব আলো বা পাখা বন্ধ করে দিন। বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করুন এবং নিজের

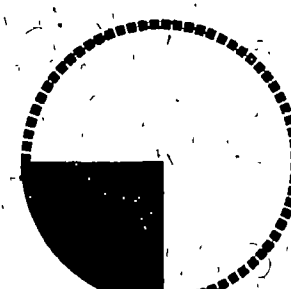
খরচ কমান। এই মূল নীতির ভিত্তিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেই বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছুটা সামাল দেওয়া যাবে।

অনুগ্রহ করে বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত জলের পাম্প, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, ওয়াটার হীটার ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না, কারণ এই সময়ে শিল্প কারখানার জন্যে বিদ্যুৎ সবচেয়ে বেশি দরকার।

আইন মেনে চলুন :

রাজ্য সরকারের বিধিনিষেধগুলি দৃঢ় মনে রাখবেন। সকাল ৯-৩০ থেকে বেলা ১১টা এবং বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এয়ারকন্ডিশনার চালানো নিষেধ, অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ছাড় দিয়েছেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। এছাড়া বিদ্যুৎ বা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষ্যে নিয়ন, মার্কারী ল্যাম্প বা অন্যান্য উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বাতি জ্বালানোও নিষেধ।

'বিদ্যুৎ' ঘাটতি কমিয়ে আনতে আমাদের সাহায্য করুন



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

যডযন্ত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অফিসার কংগ্রেসী মন্ত্রীদেব 'কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেয়েই নির্বাচন হত্যাযজ্ঞে যেতে উঠেছিল এবং কে না জানে যে এই নরপতনের হাতে মেয়েদের ইচ্ছা তুলিসাং হয়েছে বারবার। কে না জানে দ্বিতীয় যুক্ত-ফ্রন্ট সরকারের আমলে সি পি আই (এম)-কে পৃষ্ঠপোষক করার জন্য প্রতি-ক্রিয়াশীল চক্র তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আশুতোষিত জনগণের কুহর অজ্ঞ মুখার্জীর নেতৃত্বে একটা অরাজক পরি-বেশ সৃষ্টি করেছিল এই রাজ্যে এবং তার সঙ্গে সামিল হয়েছিল সি পি আই, এস ইউ সি এবং এমন কি করোয়ার্ড ব্লকও? প্রকৃত জননেতা হেমন্ত বসুকে ভাড়াটিয়া ঘাতক দিয়ে হত্যা করিয়ে দোষ চাপানো হয়েছে সি পি আই (এম)-এর ওপর।

সেই চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। রক্তিত গুপ্ত চক্রান্ত করে পুলিশ বাহিনীর অনেককে ভাড়াটিয়া ঘাতক দিয়ে হত্যা করেছে। প্রিয়রঞ্জন দাসমুখী, স্বরত মুখার্জী, লক্ষ্মীকান্ত বসু ও সোমেন মিত্র প্রমুখ গুপ্তার সঙ্গীরা তো হিংস্র নখদস্ত বিকাশ করতে শুরু করেছিলো ৬৯ সাল থেকেই। বাজারী কাগজগুলো শরিকী সংঘর্ষের উদ্ভট কাহিনী প্রচার করে স্বতাহতি দিয়েছে সেই নাটকীয় হত্যাযজ্ঞে এবং সংবাদ শিরোনামায় হত্যাযজ্ঞের জ্ঞান দায়ী করেছে সি পি আই (এম)-কে। কে না জানে গ্রামাঞ্চলে জোত-দারী চক্রান্তের বলি হয়েছেন সসংখ্য নিরীহ কৃষিজীবী মানুষ এবং দোষ

গোফ্ট হাউস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, এই অফিসাররা মন্ত্রীর আদেশও মানেন না। কংগ্রেসী আমলে শিল্পমন্ত্রী টি. এ. পাই বালীগঞ্জ পার্কেব গোট হাউস তুলে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরেই নির্বাচন ও নির্বাচনে কংগ্রেস হেরে যাওয়ায় এন্ডু ইন্ডুর একটি অফিসার চক্র মন্ত্রীর আদেশ কার্যকরী করেননি। তারপর জনতা সরকারের শিল্পমন্ত্রী ব্রিজলাল ভার্মাও এই গোট হাউস ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে-ছেন। কিন্তু তারপর ভার্মার মন্ত্রিত্বের দপ্তর বদল হয়েছে। তাই তাঁর আদেশও কার্যকরী করা হয়নি। গোট হাউসটি স্থায়ীভাবে আছে। আর চলছে এক শ্রেণীর অফিসার ও তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের ক্ষুতির খান-পিনা। কিন্তু সবটাই জনসাধারণ অর্থাৎ ভারত সরকারের টাকায়।

চাপানো হয়েছে সি পি আই (এম)-এর ওপর?

তাই ৭১-এর নির্বাচনেও রাজ্যের মানুষ সি পি আই (এম)-কেই গরিষ্ঠ সংখ্যায় নির্বাচিত করেছে। ৭২ সালে তাই কংগ্রেস এবং সি পি আইকে জাল জোচ্চুরি করে নির্বা-চনী প্রহসনের মাধ্যমে রাজ্যের ক্ষমতাদশল করতে হয়েছিল এবং ৭২ থেকে ৭৭ পর্যন্ত সেই জালিয়াত সর-কারনির্বিচারহত্যা, নারীধর্ষণ, চুরি, জোচ্চুরি এবং গণতন্ত্রের কঠোরোপ ইত্যাদি সমস্ত নারকীয় কার্যকলাপ চালিয়ে গেছে অব্যাহত ভাবে।

তদন্ত হবে সেইসব অপকর্মের। ৬৯ সালে সি পি আই (এম) খুনের রাজনীতি আয়দানী করেছিল কিনা ৭১-এর নির্বাচনী কলাকলেই রাজ্যের জনমত তার রায় দিয়েছে, রায় দিয়েছে ৭৭ এর ঐতিহাসিক নির্বা-চনেও।

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। রাজ্য কংগ্রেসের সভা-নেত্রী পূর্ববী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নির্লজ্জ কিছু হতবল তথাকথিত রাজ-নীতির কারবারী এখন ঘুরা-তুলে-ছেন ৬৯ সাল থেকে তদন্তের। মুখ্য-মন্ত্রী জ্যোতি বসু স্পষ্টতই বলেছেন যে প্রয়োজন মনে করলে সিদ্ধার্থ রায়ের মন্ত্রিসভাই তো '৬৯ সালের সি পি আই (এম) সন্যাস' সম্পর্কে তদন্ত করতে পারতেন কিন্তু সেই নৈতিক বল ওদের ছিল না। তাই বামফ্রন্ট সরকার নিয়োজিত তদন্ত কমিশনের নামে কংগ্রেস, পুলিশের একাংশ এবং রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরে জাহি জাহির ব উঠেছে এবং এই আতঁনাদের গ্রামোঞ্চোনে পরিণত হয়েছে মধ্যকলকাতার রাজারী জয়-চাকটি।

এই জয়চাকেই মাঝে মাঝে কাঠি মেরে বোল তোল হচ্ছে সন্তোষ রাণার জয়গানের। জয়গানের বোল উঠছে সত্যনারায়ণ সিনহারও। সন্তোষ-সত্যনারায়ণ আও কোম্পানী নেমকহারামী করেনি। কংগ্রেসীদের সঙ্গে তারাও ৬৯ সাল থেকে তদন্ত দাবী করেছেন। যে বিবেক/বিক্রয়ের শর্তাধীনে তাঁরা নিজেদের মুক্তি ক্রয় করেছেন সেই শর্তপালনে 'ধর্মপুত্র যুগিষ্ঠিরের' মত তাঁরা সক্রিয় হয়ে উঠেছেন এবং বামফ্রন্ট সরকারকে বানচাল করার জন্তুজন্মবর্ধমান চক্রা-ন্তের বৃন্দগানে কঠ মেলতে শুরু করেছেন। 'সন্তোষবাবু নিজেও জানেন এবং আমাদেরও এটা অজানা নয় যে, কোন নেপথ্য শক্তির মদত পেয়ে তিনি এবারের নির্বাচনে জয়-লাভ করেছেন। তাঁর দলীয় শক্তিতে যে তিনি জয়লাভ করেন নি এটা

তার চেয়ে ভাল করে আর কে জানে এবং মুক্তিলাভের পর জনতা পার্টির স্থানীয় নেতৃত্ব এবং কংগ্রেসীদের একাংশই যে তাঁকে নিজ অঞ্চলে অভিনন্দন জানিয়েছে এর মধ্যেও গোপনীয়তা কিছু নেই।

স্বভাবতই এইসব ঘটনাবলী খুব নিম্নলিখ রাজনৈতিক পরিণতি বলে বিবেচিত হবে না। সন্তোষবাবুরা ভাল করেই জানেন যে, ৬৯ সালে জ্যোতি বসু যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েই নকশালবন্দীদের বিনা শর্তে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং ৭৭ সালেও জ্যোতি বসু মন্ত্রিসভা প্রথম দায়িত্বপালন করেছেন দলমত নির্বি-শেষে সমস্ত রাজবন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। আইন-গত নানা জটিলতার জন্তই অনেক রাজবন্দীর মুক্তি পেতে দেয়ী হচ্ছে এবং সন্তোষ রাণার সেটিকেই অপ-প্রচারের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার কর-ছেন এবং কেন করছেন সেটাও আমাদের অজানা নয়, কারণ রাজ্য জনতা পার্টি নেতৃত্বের একাংশ প্রচার করতে শুরু করেছেন যে, সি পি আই (এম) রাজবন্দীদের ঢালাও মুক্তির পক্ষে নয় এবং এ নিয়ে প্রমোদ দা-গুপ্ত ও জ্যোতি বসুর রেঘারবির আঘাতে গল্প পুঁজি বাজারে চালু করা হয়েছে।

এবার সি পি আই (এম) একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। অর্থাৎ মন্ত্রিসভার কোন শরিক পার্টিতে দিয়ে এই সরকার বানচাল করা যাবে না। যদিও করোয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি ইডি-মধ্যেই একটু বেহরো গাইতে শুরু করেছে। সন্তোষ রাণা প্রমুখ ব্যক্তিরা এখন আর রেখে চেকে নয়, প্রকাশ্যেই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের রাজনৈতিক মুহুর্তি হিসেবে ময়দানে নেমেছেন। অসীম চ্যাটার্জী, কালু সাহা, সৌরেন বসু প্রমুখ আদর্শ-বাদী নকশাল কর্মীরা মুচলেকা দিতে রাজী হননি বলেই তাদের মুক্তি মেলেনি এবং এদের বন্দীদের সুযোগ গ্রহণের জন্যই সন্তোষ রাণা-দের মুক্তি দেওয়া হয়েছে সি পি আই (এম) বিধেয়ী বড় ভোলাব জন্তু ও রামপণ্ডী একো ফাটল ধরাবার জন্তু।

বাজারী কাগজ এখন সন্তোষ রাণাকে নিয়ে যেতেছে কারণ আর একটা ৬৯ সাল সৃষ্টির যডযন্ত্রটাই ক্রমশই দানা বাধছে। বামফ্রন্ট সরকারের কোন কোন মন্ত্রী ও গণ্ডের মত নেপথ্য মদত দিচ্ছেন।

গুরুতর অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কৃত হয়ে উঠেছে এবং এর সংগে এন-এস সি সি-র এই মাতব্বটির নামও জড়িত হয়ে পড়েছে। অভিযোগকারী মহলের বলবা, তারা শুনেছেন এবং খোঁজ করে শুনেছেন তিলকের মদে বিযক্রিয়া হবার পর তাকে কোনও হাসপাতালে নিয়ে ব'ওয়া হয়নি। পরন্তু তিলকের অচেতন দেহটি কল-কাতাগামী একটি থ্রুওর স্ট্রীতে তুলে দেওয়া হয়। আর্কর্ডের ঘটনা হল, শ্রামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে তিল-কের দেহটি ঠিক ঐ লরীটা থেকেই কে বা কারা নামিয়ে নেয়। সেখানে আর জিকর হাসপাতালে না নিয়ে জিলককে পি জি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এখানে তিলককে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। আরও অদ্ভুত ঘটনা হলো, শ্রামবাজার পাঁচমাথার মোড় থেকে তিলককে পি জি হাস-পাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানে শ্রীব্যানাজীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় এক তিনিই হাসপাতালে তিল-কের অচেতন দেহটি গ্রহণ করেন।

শ্রীব্যানাজীর অত্যন্ত কাছের মানুষ-বেরাই প্রশ্ন তুলেছেন, তিলকের কোন বন্ধুরা তাকে কল্যাণীতে নিয়ে যায়? তাদের পরিচয় কি? অস্থির হবার পর 'তিলককে স্থানীয় কোনও হাস-পাতালে নেওয়া হল না কেন? শ্রাম-বাজার পাঁচমাথার মোড়ে কারা তিলককে লরী থেকে টেনে নামায়? আর কারাই বা তাকে পি জি হাস-পাতালে ভর্তি করে? মৃত তিলককে কে সনাক্ত করে?

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসব প্রশ্ন রেখে স্থানীয় বাসিন্দা বলেছেন, গোয়েন্দা বিভাগের প্রাক্তন কর্মকর্তা দেবী রায় ঘটনাটি জানতেন এবং এই দপ্তরের একজন এ এস আই নীহার চৌধুরীও তিলকের মৃত্যু সংক্রান্ত অনেক খব-রাদি রাখতেন। সুর্বোপরি সংগঠনের চেয়ারম্যান লক্ষীকান্ত বসুও বিয়টি সম্পর্কে গুয়াকিবহাল।

এদের দাবী, পুরো ঘটনাটি নিয়ে ব্যাপক তদন্ত হোক। খোঁজ করা হোক মৃত তিলকের জী 'বাণি'র সঙ্গেই বা শ্রীব্যানাজীর সম্পর্ক কী? তিলককে কল্যাণীতে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে তার দেহ পি জি হাস-পাতালে পৌঁছানো পর্যন্ত শ্রীব্যানাজীর ভূমিকাও এর সংগে খতিয়ে দেখা হোক।

প্রাক্তন স্পীকার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানা গেছে যে, রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রাপ্ত সমস্ত অভিযোগপত্র বিধানসভার বর্তমান অধ্যক্ষ জনাব মনম্বর হবি-বুধার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে অহরোধ করেছেন যে, তিনি যেন এই সব অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করে দেখেন এবং কি কবা যায় সে বিষয়ে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেন।

রাজ্যের বামফ্রন্ট কমিটির সভা-পতি এবং সি পি এম রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের কাছেও অপূর্ববাবু সম্পর্কে তুরি তুরি অভিযোগ জমা পড়েছে।

অভিযোগে বলা হয়েছে যে, শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার দীর্ঘদিন অধ্যাক্ষ পদে থাকাকালীন রাজ্য বিধান-সভা অরৈধভাবে বেশ কিছু ব্যক্তিকে চাকরী দিয়েছেন এবং বেশ কয়েক-জনের পদোন্নতি ঘটেছে অরৈধ উপায়ে। আরও অনেক কারণে তিনি সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগে বলা হয়েছে।

বিষয়সমূহে জনো গেছে যে, রাজ্যের বিভিন্ন মহল থেকে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে অপূর্ব মজুম-দারের ছনীতি বিষয়ক বেশ কিছু প্রমাণপত্রও এসেছে।

আরও জানা গেছে যে, বহু বিধান সভা সদস্য পাহাড় প্রমাণ লিখিত অভিযোগ পেশ করেছেন বিধানসভার বর্তমান অধ্যক্ষ জনাব মনম্বর হবি-বুধার কাছে প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীঅপূর্ব লাল মজুমদারের বিরুদ্ধে। বিধান-সভা সদস্যগণ বর্তমান অধ্যক্ষের কাছে দাবী করেছেন যে, এই সমস্ত অভিযোগের যথোপযুক্ত তদন্ত করা হোক। অধ্যক্ষ জনাব হবিবুলা বিধানসভা সদস্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, সমস্ত অভিযোগেরই তদন্ত হবে।

বিধানসভার জটনক মুখপ্রাক্ষ বলেছেন যে, প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীঅপূর্ব লাল মজুমদারের ছনীতি বিষয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠেছে এবং তা বর্তমান বিধানসভা অধিবেশনে পেশ করা হবে।

প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য যে, দর্পণে বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীঅপূর্ব লাল মজুমদারের ছনীতি সংক্রান্ত বহু চাকলাকর তথ্য ইতিপূর্বে প্রকা-শিত হয়েছে।

হাজার হাজার লিটার চোরাই তেল উদ্ধার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ভেজাল তেলের আরও সংবাদ দর্পণে এসে পৌঁছেছে। জানা যায় এ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর পুলিশ মহলে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। মাসোয়ারার ভিত্তিতে এতদিন বেশ ভালোই চলছিল কারবার। কিন্তু পুলিশ কর্তৃপক্ষ তেল নিয়ে যজ্ঞাতির বিষয় আর ধামাচাপা দিয়ে রাখতে পারে নি। পুলিশ করে একটি স্থানে তন্নাসীচালিয়ে উদ্ধার করেছে তেলের ধনি। চণ্ডীতলা থানা এলাকায় পাব ডানকুনি রোডে পুলিশ বাহিনী উদ্ধার করেছে দশ হাজার চারশো লিটার ডিজেল, সাত হাজার লিটার জে.বি.ও. ছত্রিশ শ' লিটার পেট্রোল ও মবিল, নয় হাজার লিটার ডার্ক অয়েল, যোলো শ' লিটার পেট্রোল, একহাজার

লিটার কার্বেস অয়েল। এ সবই চোরাই মাল। পুলিশ অকস্মাৎ হানা দিয়ে সন্দেহক্রমে ছুটি লরীও আটক করে। এর নথির হল ডবলু জি এইচ ৮৬৪১, বি.আর.ভি ৮৯১৫। পুলিশের হাতে ধরা পড়েন রাজ্যবাপী চোরাই তেলের, নামকরা আসামী বিধিচাঁদ চৌরাসিয়া, হুদর্শন চৌরাসিয়া, রাজেন্দ্র চৌরাসিয়া, শেখ হীরা।

১৭ নং মধুসূদন মুখার্জি রোডে হানা দিয়ে পুলিশ উদ্ধার কবেছে আরও প্রায় সাড়ে পচিশ হাজার লিটার জে.বি.ও. দুই হাজার লিটার মবিল। তেল ভর্তি গাড়ীও আটক হয় এখানে। প্রাক্তন স্পীকার অপূর্ব লাল মজুমদারের পরিচিত কথ্যাত চোরাকারবারী নরসিংহ গুপ্তার গুদামে হানা দিয়ে চোরাই জে.বি.ও. উদ্ধার করে প্রায় একশো ব্যারেল তেল। হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম থেকে ডবলু এম কে ৩০১ নম্বরের একটা গাড়ীও পুলিশ এখান থেকে আবিষ্কার করে। এতে ট্যাংকার ভর্তি ছিল তেল। কলকাতা পুলিশ এটিকে আটক করে নিয়ে যায়। চোরাই তেল ভর্তি একটা লরী মাদ্রাজে বাবার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিল, পুলিশ সেটিও বাজেয়াপ্ত করে।

ভারতীয় স্বামীরা সুশাস্ত্র এখনও স্কুলের চাকরি ফিরে পাননি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

৭২ সালের পরবর্তী দিনগুলোতে কংগ্রেসী সন্ত্রাসের যুগে নানাভাবে বিভাডিত ও চাকুরীচ্যুত স্কুল শিক্ষকদের অবিলম্বে পুনর্বহালের সুস্পষ্ট সরকারী নির্দেশ বর্তমান রাজ্য সরকার কর্তৃক জারী হলেও সন্ধ্যা-মুক্তিপ্রাপ্ত ভারতীয় তরুণদের স্বামী এধারা হাইস্কুলের শিক্ষক সুশাস্ত্র রায় অজাবধি তার পূর্ব পদে বহাল হতে পারেন নি। স্কুলের সম্পাদক কংগ্রেস নেতা ডাঃ জয়গোপাল শর্মা জানিয়েছেন যে, যেহেতু কার্যকরী কমিটি কর্তৃক গৃহীত সুশাস্ত্রবাবুর বরখাস্তের সিদ্ধান্ত মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অমুমোদিত হয়েছে সেইহেতু সুশাস্ত্রবাবুর পুনর্বহালের আদেশ এখন মধ্য

এ পর্ষদ দর্পণে চোরাই তেল সম্পর্কে যেসমস্ত সংবাদ এসে পৌঁছেছে তাতে দেখা যাচ্ছে বিগত কংগ্রেস জমানায় এর বিস্তৃতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। প্রায় প্রতিটি জেলার পুলিশ দপ্তর নিয়মিতভাবে মাসোয়ারা পেয়ে একাঙ্গে চোরাকারবারীদের সাহায্য করেছে। কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট দপ্তর বর্তমানে বিস্তৃত একটি ঘটনা দেখে। খডদা থানার মাত্র কয়েক গজ দূরেই তারা দেখেন চোরাই তেলের বিরাট কারবার। খোঁজ নিয়ে পরে জানা যায়, থানার কতিপয় কর্মীও এ কাজের নেপথ্য মদদদাতা।

কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট দপ্তরের জৈনক মুখপাত্র দর্পণ প্রতিনিধির কাছে সরাসরি স্বীকার করেন সংস্থার জেলা অফিসগুলির প্রচলিত মদতে এ ব্যবসা এখন ব্যাপক হয়ে পড়েছে এ কথা স্বীকার করার কোনও পথ নেই। শিউনাথ, শিবনাথ, নরসিংহ গুপ্তা, রাজপুত্রের যাবতীয় সম্পত্তি খতিয়ে দেখবার জন্ত পুলিশ আয়কর বিভাগ, ও সি, বি আইকেও অহরোধ করবে বলে জানা যায়।

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ দপ্তর স্বত্রে জানা যায়, রাজ্যের ভেজাল তেলের চল্লিশটি ঘাটি সম্পর্কে পুলিশ যাতে সতর্ক থাকে সে ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া মাদ্রাজ, বোম্বাই, নাগপুর, পাণ্ডাব, হরিয়ানা পুলিশকেও খবর দেওয়া হচ্ছে এ রাজ্যের শিবনাথ, রাজপুত্র, নরসিংহ গুপ্তার দলবল এসব রাজ্যের কোথায় কোথায় ঘাটি গেড়েছে তা যেন তারা অবিলম্বে তদন্ত করে বার করেন।

শিক্ষা পর্ষদই দিতে পারেন।

বর্তমান কার্যকরী কমিটি তাদের পূর্ব বরখাস্তের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে তদন্তাবলুকে কাজে যোগ দিতে দিচ্ছেন না কেন—এই প্রশ্নের জবাবেই ডাঃ শর্মা উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, ডাঃ শর্মা আসানসোল অঞ্চলের পরিচিত কংগ্রেস ও আই এন টি ইউ সি নেতা এবং আসানসোল মাইনস বোর্ড অব হেলথের ভাইস চেয়ারম্যান ও আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রুপের আসানসোলস্থ সংবাদদাতা। আসানসোলের বহু বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী নাগরিক এই ঘটনার প্রতি মাধ্যমিক শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে'র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মালিক পক্ষের হয়ে দালালি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পিয়ারলেস কোম্পানীর ইনসপেক্টর জি.বি চৌধুরী ও জে কে থান মালিকপক্ষের হয়ে দালালী করতে নেমেছেন বলে কর্মচারীরা অভিযোগ করেছেন। জানা গেছে জিচৌধুরী (শিলাদিত্য, খেলার আসর, পার্স-পেকটিভ) প্রকাশনী সংস্থা খুলতে অগ্রিম স্বর্ণ বাবদ পাঁচ লক্ষ টাকা সেক্রেটারী বি কে রায়ের কাছে থেকে পেয়েছেন। জিজ্ঞেস কে থানও এই মওকায় গোহাটতে সিনেমা হল খোলার জাগিদে বি কে রায়ের দাক্ষিণ্যে ১০ লক্ষ টাকা অগ্রিম স্বর্ণ বাবদ লাভ করলেন। আজকের এই পরিস্থিতিতে পিয়ারলেসের সংগ্রামী কর্মীদের পাশে হাজার হাজার বামপন্থী মনোভাবাপন্ন এজেন্ট ফিল্ড অফিসার ও ইনসপেক্টর এসে দাঁড়িয়েছেন যেখানে সেখানে এই দুই ব্যক্তির ভূমিকা সকলের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে। মূলতঃ এই দুই ব্যক্তির দালালীতে 'ফিল্ড অফিসার এসোসিয়েশন' নামক একটা পান্টা সংগঠন গড়ে পিয়ারলেস কর্মীদের এই সংগ্রামে চিড ধরানোর বন্দোবস্ত হলো।

পিয়ারলেসে যেখানে লকআউট সেখানে এ বি চৌধুরী সরাসরি তার ইউনিটে পুরস্কার ঘোষণা করলেন (এই মাসে) যাতে অন্ততঃ তার

দলে বেশ কিছু সংখ্যক এজেন্ট, ফিল্ড অফিসার ইত্যাদি ভিড়ে পড়েন।

আরও জানা গেল, জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত অনেক কংগ্রেসী যুব নেতাই এখন পিয়ারলেসের এজেন্ট অথবা ইন্সপেক্টর হয়েছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রিয় দাসমুখী, হরত মুখার্জী, সোমেন মিত্র। পারস্পরিক স্বার্থেই নাকি এই যোগাযোগ।

বিকৃত তথ্যের প্রতিবাদ

গতকাল ২৪শে আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সহ সভাপতি অধ্যাপক জীনংকুয়ার বন্দোপাধ্যায় এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব মহম্মদ সিরাজুল হক রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী জীপার্থ দে'র সঙ্গে কলকাতায় মহাকরণে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা সপ্তম শ্রেণীর জন্ত বিজ্ঞান-পাঠ্য হিসাবে অমুমোদিত "ভারত পরিচয়" এবং "ভারত আমার" নামক দুইটি ইতিহাসের বইয়ে পয়গম্বর হজরত মহম্মদ (সঃ), পবিত্র ঐশীগ্রহ কোরান এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে লেখা কয়েকটি বিকৃত তথ্যের প্রতিবাদ জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এক আরকলিপি দেন। সংখ্যালঘু পরিষদের পক্ষে নেতৃত্ব্য তাঁদের আরকলিপিতে রাজ্য সরকারের কাছে অবিলম্বে বই দুইটির প্রত্যাহার দাবী করেছেন।

দর্পণ

শারদীয় সংখ্যার তিনটি দীর্ঘ লেখা

দণ্ডিতা ইন্দিরা : গণতন্ত্রে এক ডিক্টেটর

বংশীলাল : গণতন্ত্রে এক ক্ষুদ্রে ডিক্টেটর

গণতন্ত্র বনাম কারাতন্ত্র

এছাড়া ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক গতিপথ, কমিউনিস্ট রাজনীতি, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন, সংবিধানের নব কলেবর এবং আরও অনেক রাজনৈতিক বিষয়ে অনেকগুলি আলোচনা।

এই সংখ্যায় লিখছেন : অম্বদাশঙ্কর রায় নারায়ণ চৌধুরী সমর সেন বিনয় ঘোষ, রাখাল ভট্টাচার্য সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় জ্যোতির্ময় বসু হুমন্ত বন্দোপাধ্যায় সাধন গুহ তপন বসু কুমদকুমার ভট্টাচার্য মিহির আচার্য পঙ্কজ চৌধুরী ও আরও অনেকে।

দাম : চার টাকা

মকমলের এজেন্টদের যত কপি শারদীয় সংখ্যা নিতে চান কমিশন বাদ দিয়ে তার পুরো দাম ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দর্পণ অফিসে পাঠাতে হবে। টাকা ঐ সময়ের মধ্যে না পৌঁছেলে কাগজ পাঠানো সম্ভব হবে না।

গ্রাহকরা শারদীয় সংখ্যার জন্য রেজিষ্ট্রী খরচ সহ ৭৫ টাকা পাঠাবেন।

সম্পাদক—শ্রীয়েন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২০১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৩১ মট লেন কলকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত।

সু-স্বাগতম

১৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টার
ফারে

তরুণ অপেরা

নতুন প্রযোজনা

মধু গোস্বামী রচিত

সিগাই মিউটিনি

স্বর—পশুপতি ভট্টাচার্য

নিদেশনা ও অভিনয়ে

শান্তিগোপাল

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত

যাত্রা উৎসব

আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর

বেলা ৩ ঘটিকায়

শিল্পীমহল

নিবেদিত

গাজীরগড়ের হিন্দুমুসলমান

চাষী বিদ্রোহের পটভূমিকায়

রচিত

লাল নিশান

রচনা : কানাই নাথ

স্বর : তরুণ যুগোপাধ্যায়

নিদেশনা : ভোলা পাল

দপন

বিংশ বর্ষ ॥ ৩৫শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ

বিগত পাঁচ বছরে

কংগ্রেসীদের দ্বারা

৮৫০ জন কংগ্রেসকর্মী

নিহত বা নিখোঁজ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আজ ঘের কংগ্রেসী সি পি এম কর্মীরা হামলা করছে বলে চীৎকার করে বেড়াচ্ছে তাদের জবাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর লেছেন কংগ্রেসীদের হাতে প্রায় দুশ জন কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর এই সংখ্যা নেহাতই কম। কেন না প্রায় চারশ কংগ্রেসী খুন হয়েছে কংগ্রেসের তথাকথিত মন্ত্রীদের হাতে। দলের আপন লোকদের নকশাল নাম দিয়ে এভাবে খুন করার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে পুলিশ। বিশেষ করে বর্ধমান বীরভূম ২৪ পরগণার শিল্প এলাকা, জলপাইগুড়ি, কলকাতার ভবানীপুর, বালীগঞ্জ, কাশীপুর, শ্রামপুর, টালীগঞ্জ, মুচিপাড়া, আমহাট্টা, বটতলা প্রভৃতি থানা এলাকাগুলির আশেপাশে এ সমস্ত ঘটনা

ঘটারে জরুরী ক্রি ক্রি ক্রাক করা হয়েছে তা তৎকালীন পুলিশ রেকর্ডই বলে দেবে।

১৯৭২ সালে কংগ্রেস রাজ্যের একচেটিয়া ক্ষমতা পাবার পর গত পাঁচবছরে প্রায় সাড়ে আটশ কংগ্রেস কর্মী নিজের দলের লোকদের দ্বারা খুন না হই নিখোঁজ হয়েছে। বাদের আত্মীয়-স্বজন সেই সমস্ত ছেলেদের জন্য এখনও হয়ত পথ চেয়ে আছেন।

কংগ্রেসের দলীয় কোন্ডলের শিকার হয়ে যে সমস্ত কংগ্রেস কর্মী বা সমর্থক খুন হয়েছে তাদের সংখ্যা বর্ধমান জেলাতেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এখানে প্রাদীপ ভট্টাচার্য এবং মুকুল ইসলামের কোন্ডলের পরিণতিতে অনেক রক্ত ঝরেছে। প্রাদীপ ছিলেন মন্ত্রী আর মুকুল ছিলেন এম-এল-এ (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

আবদুস সাত্তার মন্ত্রী থাকাকালীন

একটি দুর্নীতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

স্বস্তর মন্ত্রী থাকাকালে জামাই কি ভাবে প্রভাব খাটিয়ে পাকিস্তানী শত্রু সম্পত্তি বেনামে কিনেছেন তার এক চাকল্যকর তথ্যসম্প্রতি জানা গেছে।

বিগত কংগ্রেস মন্ত্রিসভার কৃষি মন্ত্রী ও বর্তমানে কংগ্রেস এম-এল-এ শ্রী আবদুস সাত্তারের জামাই শ্রী খালেদুজ্জামান মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাকার হাট কেনার জন্য বেলডাকার জুনিয়র ল্যাণ্ড রিকরম অফিসারকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তাকে

প্রমোশনের আশাস দেওয়া হয়েছে। এর ফটোকপি আমাদের কাছে আছে।

দর্পণের এই সংবাদদাতা জানতে পেরেছেন যে ১৯৭৪ সালে বেলডাকার ঐ হাটটিকে ভারত সরকার শত্রু সম্পত্তি বলে ঘোষণা করেন। শত্রু সম্পত্তি নাকি কোন ব্যক্তিকে বিক্রী বা লীজ দেওয়া যায় না। তাছাড়া ঐ সম্পত্তি থেকে যে আয় হবে স্থানীয় রেভিনিউ (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



ছাঁটাই পার্টকল শ্রমিকদের শিশুদের স্কুল

খড়দহ ছুটমিলের মালিক দীর্ঘদিন হল মিল বন্ধ করে দিয়েছেন। ছাঁটাই শ্রমিকেরা নিজেরদের জন্য একটি ছোট স্কুল করেছেন এরই মধ্যে। কংগ্রেসীদের আক্রমণে ঘরের দেওয়াল ভেঙ্গে যায়। কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার এই মিলটি অধিগ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন। ছবি: দীপক ভট্টাচার্য

আনন্দবাজারও সঞ্জয়কে খোসামোদ করেছিল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

অমৃতবাজার পত্রিকার মত আনন্দবাজার পত্রিকাও জরুরী অবস্থার সময় সঞ্জয় গান্ধীকে খোসামোদ করার জন্যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে এক ক্রোড়পত্র ছেপেছিল এবং এই ক্রোড়পত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে অন্তত তিরিশ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন নিয়েছিল। ১৯৭৬ সালের ২৭শে নভেম্বর আনন্দবাজারের পরিবার পরিকল্পনা ক্রোড়পত্র ছাপা হয়েছিল।

এই কাজ করা সত্ত্বেও আনন্দবাজার এখন দেখাতে চাইছে যে, তারা যেন ইন্দিরা সরকারের বিরোধী ছিল। তাদের একথানা সাপ্তাহিকের একটি প্রকাশন তো প্রায় পুরোপুরি সঞ্জয় প্রশস্তি সংখ্যা হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। শিল্পপতি কমল নাথের সঙ্গে আনন্দবাজারের মাথা-মাথা সর্বজনবিদিত।

অবশ্য, একথা সত্য জরুরী অবস্থার

কয়েকমাস ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়ের নির্দেশে ও সুপারিশে আনন্দবাজার স্বাক্ষরিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকারের বিজ্ঞাপন পায়নি। কিন্তু তারা ভেতরের খবর রাখেন তারা জানেন, এটা সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে আনন্দবাজারের ঘরোয়া স্বগড়ার পরিণতি এবং সিদ্ধার্থ রায় ব্যক্তিগত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আনন্দবাজারের সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্তকে জেলে পুরেছিলেন। কারণ একসময় জ্ঞানদাস বরুণ সিদ্ধার্থ রায়কে যাচ্ছেতাইভাবে আক্রমণ করে অনেক জ্ঞানদান করেছিলেন।

উল্লেখযোগ্য যে, বরুণ সেনগুপ্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর এমন কিছু লেখেননি যাতে তাকে আটক করা যেতে পারে। আরও উল্লেখযোগ্য সিদ্ধার্থের রক্তচক্ষু থেকে বাঁচার জন্য বরুণ দিল্লী পলায়ন করেছিলেন এবং সেখানে সঞ্জয় গান্ধীর আশ্রয় লাভ

করেছিলেন। মনে রাখার দরকার, আনন্দবাজার কোনদিনই কংগ্রেস বিরোধী অথবা এমার্জেন্সী ইন্দিরা বা সঞ্জয় বিরোধী কোন ভূমিকা গ্রহণ করেনি। সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে ওপর-চালাকি করতে গিয়ে তারা এমার্জেন্সীর সময়ে একটু বেকায়দায় পড়েছিল। তাদের গরম গরম খবর, সম্পাদকীয়তে গণতন্ত্রের (শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার পর)



রাগসঙ্গীতের রাণী ও রাজকুমার

হীরেন্দ্র চক্রবর্তী

কেসরবাঈ কেরকর প্রথম যুগের অল বেঙ্গেল গাইতে আসেন তখন এমন কি জ্ঞান গোস্বামী রবিশঙ্কর পরসু 'মৈয়েছেলে আবার কি মাল-কোশ গাইবে' বলে পূর্ববী নিনেয়ার বাইরে চা খেতে খেতে কেসরবাঈ সাঁ লাগানো মাত্র তড়িৎ চা খেতে গিয়ে ঠোট-জিভ পুড়িয়ে হলে ছুটে এসেছিলেন। গানের শেষে অবশ্য দুজনের মুখে কোন কথা নেই। তার পর খোঁজ খোঁজ কার ছাত্রী, কোন ঘরানার গাইয়ে। শোনা গেল জয়-পুরের কাছে অজৌলি নামক জায়-গার আলাদিয়া খাঁর প্রিয় শিষ্যা কেসরবাঈ। মেয়েছেলে মালকোশ গাইবে শুনে জ্ঞান গোস্বামী বা রবিশঙ্কর এর পরে আর কখনো বক্তৃতা করেননি বোধহয়।

কেসরবাঈয়ের গায়নরীতি ঠিক তাঁর চেহারা এবং ব্যক্তিত্বের মত - উজ্জল, গাঙ্গীর্ষপূর্ণ, স্বদৃঢ়, স্থললিত অথচ অপ্রগল্ভ। তাঁর বেশীর ভাগ গান ছিল সামান্য বিলম্বিত ত্রিতালে বাঁধা; আজকালকার মত খানাপুরী বিস্তার তিনি কবতেন না। তাঁর বিস্তার ছিল তানপ্রধান; তার প্রতিটি দর্শনা বেশ আলাদা করে তুলে নেওয়া যায়। আশ্চর্য তার গানের এবং চিত্রের বাঁধনি-গানের মোহড়া ভানের সঙ্গে আঠার মত লেগে

গিয়ে সমে ভিড়ত। কোথাও কোন বনাটো বা এলেবেলে ভাব নেই। রাগের প্রয়োজন অঙ্গগত প্রয়োজন ছাড়া একটিও তান নেই। আধ ঘণ্টায় যখন একটা রাগ শেষ করতেন তখন মনে হত এ সময়ে আর বেশী কিছু করলে পুনরুক্তিদোষ বা অহম্মর হত। দেখতে ছিলেন-রাণীর মত, গানে ছিলেন সম্রাজ্ঞী।

অজৌলি ঘরানার অনেক গায়ক হয়েছেন এবং আছেন কিন্তু কেসর বাঈ একজনই। আমাদের দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে, এমন শিল্পীরাও এল-পি বেরোয় না কারণ আমাদের সংগীত রেকর্ডের ব্যবসা বিদেশী এক-চেটিয়া কোম্পানী এইচ-এম-ভির কুক্ষিগত। ১২ ইঞ্চি রেকর্ডগুলি থেকে একটা এল-পি বেরিয়ে বহুদিন আগে ফুরিয়ে গেছে। সাহেবদের আবার কবে মজি হবে কে জানে।

রাজকুমার

খলিফা বদল খাঁর ১০৫ বছরের জীবনে বহু ছাত্রছাত্রী এসেছিল কিন্তু প্রিয়তম একজনই যাকে তিনি 'কালো' বলে ডাকতেন। ১৯৩০-এ কলকাতা তাবড় গুস্তাদে ভর্তি-গিরিঞ্জাংকর চক্রবর্তী, বীরেন এবং অমর ভট্টাচার্য, নগেন দত্ত। পশ্চিম-মের বাঈজীদের কেউ কেউ তখন কলকাতায় থাকতেন যেমন বেগম

আখতার, মালিকান্ন (আগ্রাওয়ালী)। তাছাড়া সেতারী এনায়েত খাঁ এবং হাফিজ আলীতো রাজা বজেন্দ্র-কিশোরের দৌলতে কলকাতাকে ঘরবাড়ী করে নিয়েছিলেন। এমন সময়ে হুগলীর চাটুজ্যে পরিবারের এক গেকুয়া পরা তরুণের সম্ভাবনাকে গণ্য করা কঠিন ছিল বৈকি। কিন্তু বদল খাঁর শিষ্য ভীষ্মদেব চট্টো-পাধ্যায় যে স্বীকৃতি কেড়ে নিয়ে-ছিলেন। আব্দুল কবির সাহেব তার গান শুনে আশ্চর্য হয়েছিলেন তার ঘরের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে; তখন বদল খাঁ কানে কানে বলে দিয়ে-ছিলেন, হুমায়ূন শাগির্দ। বদল খাঁ আদিত: কিরানা ঘরাণার।

এতো বাইরের কথা। ভীষ্মবাবু যে-কালের লোক সেটা ব্যক্তিগতত্ব এবং কল্পনা প্রবণতার যুগ। এর পরিচয় তাঁর নিজস্ব রচনার এবং গায়নের মধ্যে। তিনি রাখতেন। বালকপ্রতিভা হিসাবে ভীষ্মবাবু আবাল্য সমাদৃত। ১৯২২ সালে ১৩ বছর বয়সে ছুটি নির্বাবুব টপ্পা গানের রেকর্ডের পরে তার প্রথম ক্লাসিকাল রেকর্ড বেরোয় ১৯৩৪-এ কাজী নজরুলের যোগাযোগে মে গা ফোন থেকে। ভীষ্মবাবু গলা জ্ঞান গোস্বামী এবং তারাপদ চক্রবর্তীর চেয়ে নিকট শ্রেণীর ছিল—খাদে ভাল বলত না, একটু চেরা এবং ধাতব আওয়াজ ছিল, যা প্রথম শ্রেণীর গায়কের প্রতিকূল। কিন্তু তাঁর অসাধারণ শিল্পবোধ, স্বষ্টিশীলতা এবং পরিশীলিত কল্পনা দিয়ে এই নীমাবদ্ধতাকে অক্লেশে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন বলেই তার রেকর্ড বাজলে অদীক্ষিত শ্রোতা পর্যন্ত ধমকে দাঁড়ায়, জানতে চায় এই অসাধারণ গায়ক কে?

ভীষ্মবাবুর আয়ুসে অর্ধাং বর্তমান শতকের চতুর্থ দশকে এখনকার বানানো ২৪ মাত্রা বা ৪৮ মাত্রার খানাপুরী খালের চলন ছিল না। ফৈয়াজ প্রথমে সামান্য দিরেনা-বুল রাগালপ করে রাগের চেহারাটা ফুটিয়ে মধ্যলয় ত্রিতালে গান ধরতেন; তারপর দুই গান হত।

কিন্তু ভীষ্মবাবু বৈশিষ্ট্য ছিল যে, বসেই তিনি স্বর লাগিয়ে দিতেন এবং তবলা সঙ্গে ভেড়া মাত্র গান জুমে উঠত। তখনকার দিনে নিজের পুঙ্খ মাফিক তবলচি নেওয়া চলত না।

গ্রামোফোনের এবং চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালনা, বেতারে গান

এবং স্বরারোপ ইত্যাদিতে যুবক ভীষ্মদেবের যখন আনাহারের সময় নেই তখন তিনি সব ছেড়ে পণ্ডি-চেরী চলে গেলেন। আট বছর বাদে যখন ফিরলেন তখন জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় এবং উত্তম অতিবাহিত হয়ে শিল্পী হিসেবে তিনি নিঃশেষ। তবু বাংলা গানে তিনি নতুন, একটা গোত্র যোজনা করেছেন—রাগপ্রধান; চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আর এক জাতের গান এসেছে যাকে বলা যায় কাহিনীগান বা টোরি সঙ। সমস্ত সম্ভাবনা বিকশিত হওয়ার আগে পলাতক গায়ক এবং স্বরকার বাংলা দেশের সংগীতে পূর্ব মহিমায় আর ফিরে আসতে পারলেন না। যে পরিমাণ প্রতিভা ছিল তার সামান্য দিয়েছেন। এর কারণ কি শুধু গলা খারাপ, না অন্য কোন

আবহুস সান্ত্বনের দুর্নীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অফিসার কেয়ার টেকার হিসাবে তা জমা নেবেন। কিন্তু সান্ত্বনার সাহেব মস্তিষ্কের জ্বরে প্রভাব খাটিয়ে রেভিনিউ অফিসার হিসাবে তার নিজের রেয়াই আবহুল বাকী শেখকে নিযুক্ত করেন। শুধু তাই নয় আবহুল বাকী শেখই পরে ঐ শ্রদ্ধসম্পত্তি মাত্র চোদ্দ হাজার টাকায় কিনে নেন।

অভিযোগে প্রকাশ যে, কোন শ্রদ্ধসম্পত্তি কখনও বিক্রী করতে বা ভাড়া বা লীজ দিতে গেলে ঢাক পিটিয়ে লোককে জানিয়ে দিতে হয় এবং তার রেভিনিউর যথার্থ অ্যাসেস-মেন্ট করতে হয়। কিন্তু এই সবেল কাছ দিয়ে না গিয়ে সম্পূর্ণ বেআইনী ভাবে ঐ শ্রদ্ধ সম্পত্তি ক্রয় করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগে আরো প্রকাশ যে এই সম্পত্তি বেআইনীভাবে ক্রয় করার কাজে যে সমস্ত অফিসারের উপর প্রভাব বিস্তার করা হয়েছিল তাদের মধ্যে মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রীকান্ত ঠাকুর চক্রবর্তী এবং জুনিয়র ল্যাও রিফরম অফিসার শ্রীবিংশনাথ চ্যাটার্জীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রক্তিত ঠাকুর চক্রবর্তী এই কাজে সাহায্য করার জন্য সান্ত্বার সাহেব তাকে দেড় বছরের মধ্যে কৃষিবিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী কবে কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী বর্তমানে সিনিয়র ল্যাও রিফরম অফিসার হিসাবে বহরমপুরে ট্রেনিং নিচ্ছেন।

পাকিস্তানী সম্পত্তি বা শ্রদ্ধসম্পত্তি হিসাবে বেলডাকার হাট বেআইনী-ভাবে বিক্রী করার জন্য রাজ্য বিধান সভার আর এস পি সদস্য শ্রীতিমির ভাড়াটী বহরার কংগ্রেস মন্ত্রিসভার

বৈরাগ্য? ধর্মোন্মাদ এবং শিল্পোন্মাদে তো অহিনকুল সম্পর্ক। ভৌত বস্তু, মাজসজ্জা, সিনেমা, খেলাধুল প্রভৃতির প্রতি আকর্ষণ তো বৈরাগ্যের প্রমাণ দেয় না।

ইদানীং যে কয় জায়গায় ভার ভক্ত এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে দিয়ে গান করিয়েছেন সব জায়গায়ই হয় বসন্ত, না হয় মালকোশ এবং অব-ধারিত 'যদি মনে পড়ে সেদিনেরও কথা আমরা ভুলিও প্রিয়'। কোন এক আঙুটায় যেন তাঁর মন আটকে গিয়েছিল সেই তিরিশের যুগে।

তবু ভীষ্মবাবু এই জন্ত বাঙালীর মনে চিরদিন বেঁচে থাকবেন যে, বাংলাদেশে হিন্দুস্থানী গান হিন্দুস্থানী গুস্তাদদের মত শিক্ষা, দক্ষতা এবং শিল্পবোধ নিয়ে পাল্লা দিয়ে যদি কেউ গেয়ে থাকেনতো সে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।

বিকল্পে রিধান সভায় অভিযোগ করে-ছেন এবং বোঝাইয়ে কার্টডিয়ানকে চিঠি লিখেছেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের তদন্ত রিপোর্ট তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীব্রজেন রেড্ডি ও শ্রীওম মেহতার কাছে দেন। তার একটি কপি রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছেও পাঠান হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন কিছুই হয় নি।

প্রাক্তন স্পীকারে একটি জমিদারী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার প্রাক্তন স্পীকার শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার হাওড়ার একটি স্থল নেতাজী বিজা-য়তনের সম্পাদক। তিনি এখানে অনন্ত নজীর স্থাপন করেছেন। উন্নয়ন ফী ব্যবহ হাজার হাজার টাকা আয়-সাং। সরকারী টাকা তছরপ। স্থলের প্রধান শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও প্রধান শিক্ষক। শিক্ষকেরা মাসের পর মাস বেতন পান না। কিন্তু অপূর্ববাবুর বিবস্ত্র অহুচর প্রধান শিক্ষকের নিয়মিত পাওনা ও উপরি আয়ে কোন ঘাটতি নেই। এদিকে শিক্ষকদের প্রতিডেট ফাণ্ডের টাকা জমা পড়ছে না। অন্তর্দিকে অপূর্ববাবু প্রবল দাপটে জমিদারী চালিয়ে যাচ্ছেন ভি, পি, আই, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অমান্য করে।

দর্পণ

শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৪

এই সংখ্যার ১৫৪ পৃষ্ঠা

দ্বিপিতা ইন্দিরা : গণতন্ত্রে এ ডিক্টেটর

বংশীলাল : গণতন্ত্রে এক ক্ষুদ্রে ডিক্টেটর

গণতন্ত্র বনাম কারাতন্ত্র

এছাড়া ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক গতিপথ, কমিউনিস্ট রাজনীতি, ভারতীয় রাজনীতি ও পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার সংবিধানের নব কলেবর, রাশিয়ার রাষ্ট্রচরিত্র ও সংশোধনবাদ, রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ বাংলার বিদ্রোহ সমাজ, নৃশালবাড়ির অন্দোলন ও প্রাসঙ্গিক নট, ফরপাবলিকেশন, মিসা সংশোধন ১৯৭৬ এবং আরও অনেক রাজনৈতিক বিষয় অনেকগুলি আলোচনা।

এই সংখ্যায় লিখছেন: অন্নদাশঙ্কর রায় নারায়ণ চৌধুরী সমর সেন বিনয় বোষ রাখাল ভট্টাচার্য সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় জ্যোতির্ময় বসু হুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সাধন গুহ তপন বসু কুমদকুমার ভট্টাচার্য মিহির আচার্য পঙ্কজ চৌধুরী ভাণ্ডারী, দিলীপ মুখোপাধ্যায় আরও অনেকে।

দাম: চার টাকা

গ্রাহকরা শারদীয় সংখ্যার জন্য রেজিস্ট্রী খরচ সহ ৫০ টাকা পাঠাবেন।

গোসা বা থানায় ব্যাপক দুর্নীতির কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গোসা বা থানার বি ডি ও শ্রীনিখিল চক্রবর্তী কংগ্রেস রাজ্যে প্রাক্তন এম-এল-এ শ্রীপ্রেম বৈষ্ণব সহযোগিতায় বেআইনী রোজগার করে বখরাদারি ব্যবসার একটি মৌরসী পাট্টা করে নিয়েছিলেন। দুর্নীতির সহজ ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে (১) রকে ধানচাল সংগ্রহ (২) স্কন্দরবন উন্নয়নপ্রকল্পে নদী, বাধ, রাস্তা নির্মাণ (৩) জমি বিতরণ ও গৃহ-নির্মাণে সাহায্য (৪) নলকূপ খনন ইত্যাদি। ২৪ পরগণার গাইঘাটায় বি ডি ও থাকাকালে জয়বাংলার শরণার্থীদের ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এই নিখিল চক্রবর্তী। ক্যাম্প বন্ধ হওয়ার পর চূড়ান্ত হিসাবে জিপস, টিন, গুড়া দুধ তহবিলের দায়ে ঐ রকের কয়েকটি কংগ্রেসীর চাকরি চলে যায় কিন্তু মুকবির জোরে বি ডি ও চক্রবর্তীর গায়ে আঁচড়টি লাগেনি। অবশ্য এ ব্যাপারে পরে বিশেষ গোপন তদন্তের ব্যবস্থা হয়েছিল।

শ্রীচক্রবর্তী গোসাবায় ১৯৭৪ সালের আগস্টে বদলি হয়ে এলেও মাসে ৫৭ দিনের বেশী গোসাবায় থাকেননি। তার স্থায়ী বাসস্থান বসিরহাটে তার বাসাবাড়ী। এর বিস্তৃত বিবরণ বসিরহাটের মহকুমা-শাসক এবং ২৪ পরগণার জেলা শাসককে রেজিস্ট্রী ডাকে জানান সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়নি।

শ্রীচক্রবর্তী উপর মহলের যোগাযোগে ক্ষমতাবান বলে তার স্বী বাছড়িয়া রক থেকে গোসাবায় বদলি হওয়ার পরেও সেখানে কাজে যোগ না দিয়ে বসে আছেন। এদের মুকবিরদের অন্ততম প্রাক্তন স্থানীয় এম-এল-এ শ্রীপ্রেম বৈষ্ণব। শ্রীমতী চক্রবর্তী বসিরহাটে থেকেই গোসাবা রক থেকে তার বেতন ড্র করেছেন বলে শোনা যায়।

ধানসংগ্রহ অভিযানে গিয়ে একবার ভারপ্রাপ্ত অফিসার দেখতে পান যে, আমতলীর শ্রীজিতেন গায়েনের নথিভুক্ত জমির পরিমাণ মাত্র ৭ একর ৩৬ শতাংশ অল্পসারে তার লে ভর পরিমাণ কুইন্টাল ৩৬ কেজির বেশী হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তার বাড়ীতে প্রচুর লুকানো ধানের সন্ধান পেলেন। ১১/৩/৭৬ তারিখে খান ইনসপেক্টর শ্রীশিবশংকর সাহা এবং স্থানীয় প্রোক্লিওরমেন্ট

ম্যাজিস্ট্রেট। সে অস্থায়ী শ্রীগায়েনকে যে ২৪ কুইন্টাল ধান জমা দিতে বলা হয়েছিল, বি-ডি-ও নিখিল চক্রবর্তীর যোগসাজ্জে শ্রীগায়েন সেই আদেশ এড়িয়ে যান। জেলা শাসক এই ঘটনা জেনেও কোন ব্যবস্থা নেননি। অপর পক্ষে ছয় বছর আগে মৃত এক ব্যক্তিকে এবং ১২ কুইন্টাল ধান জমা দিতে পারেননি এমন মহিলাকে মিনা করার জন্য গোসা বা থানাকে বি-ডি-ও নিখিল চক্রবর্তী লিখেছিলেন। এখানকার প্রাক্তন এম-এল-এ শ্রীপ্রেম বৈষ্ণব জমি ২ একর। ৬২ শতাংশ অল্পপাতে তার দেয় লেভি ৩ কুইন্টাল ১২ কেজির এবং হেতালবাড়ীর শ্রীতামা-পদ মণ্ডলের ৫৬ কুইন্টালের কতখানি উক্ত বি ডি ও জমা নিয়েছিলেন? এ সব ঘটনা প্রাক্তন খানমন্ত্রী এবং মুখ্য-মন্ত্রীকে জানান সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

নলকূপ খনন বিষয়ে ১৯৭৩ সালে শ্রীহরীবোদ দত্ত নামে স্থানীয় এক ঠিকাদার টেঙার দিয়ে নলকূপের ঠিকাদারি পান এবং পরের বছর আরো কম দরের টেঙার দিয়ে ঠিকা পেলেও তখনকার বি ডি ও শ্রীপ্রদীপ চক্রবর্তী ইঞ্জিনিয়ারের অভিযন্ত না নিয়েই তার কাজ বন্ধ করে দিয়ে বাসন্তী রকের শ্রীবকীচরণ দাস নামে ঠিকাদারকে ডেকে বিনা টেঙারে শতকরা ৪০ টাকা বেশী হারে নলকূপ বসানোর কাজ দেন। এর ব্যর্থ প্রতিবাদে করেন সহকারী ইঞ্জিনিয়ার শ্রীহরত ভট্টাচার্য।

১৯৭৪ সালে শ্রীনিখিল চক্রবর্তী গোসাবায় বদলি হয়ে এসে ঐ বকী-চরণ দাসকেই বিনা টেঙারে ঐ বর্ধিত হারে ঠিকাদারি দেন হরত ভট্টাচার্যের লিখিত নোট অগ্রাহ্য করে। বসিরহাটের এস-ডি-ও, বনামী এবং বেনামী চিঠির দ্বারা এ বিষয়ে অবহিত হয়েও কিছু করেন নি। হরত ভট্টাচার্য ২৪ পরগণার তৎকালীন জেলা শাসক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়কে ২৫/৭/৭৬ তারিখে ঘটনার বিবরণ জানলেও কোন ফল না হওয়া সাধারণ-তাৎপর্যপূর্ণ ছাড়া আর কি?

কিন্তু ১৯৭৬ সালে আর বিনা টেঙারে নলকূপের ঠিকাদারি বকী-চরণকে পাইয়ে দেওয়া গেল না কারণ হরবোধ দত্ত শতকরা ২৪ টাকা বেশী হারে টেঙার দিয়ে ঠিকা পেয়ে

গেলেন। গত দুবছর সরকারের এই যে শতকরা ১৬ টাকা হারে বছরে প্রায় ২৪ হাজার টাকা ক্ষতি হল এর জন্য দায়ী হবে কে এবং কাউকে দায়ী করা হয়েছে কি?

বি ডি ও নিখিল চক্রবর্তীর অপর কীর্তি ছোট মোল্লাখালিতে পরেশ বৈষ্ণব বাড়ীর লাগোয়া জমিতে নলকূপ বসানো। এটা উপর থেকে দেখা যায় না; মাটিব ১ ফুট নীচে দিয়ে বৈষ্ণব মহাশয়ের বাড়ী পর্যন্ত ২০০ ফুট পাইপ লাইন টানা হয়েছে। এর এক কোঁটা জলও সাধারণ মানুষ পায় না।

১৯৭৪-৭৫ লালে বকীচরণ দাস নলকূপ বসানোর জন্য ২০ ফুটের ১৪৫ খানা পাইপ এবং আন্তান্ত সরকারী সরঞ্জাম নিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের তদারকিতে ১৫টি নলকূপ বসান। বাকী ছিল ২০০ খানা অর্থাৎ মোট ৪০০০ ফুট পাইপ। যার দাম কম করেও তখন ২০,০০০ টাকা। অনেক তাগাদার পরেও বকী ফেরত না দিয়ে একটা জাল হিসাব দাখিল করেন। পরের বছর বকীচরণ কাজ চাইলে সাব অ্যাঃ ইঞ্জিনিয়ার ২০০ পাইপ ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত বকীকে কাজ দেওয়া উচিত নয় বলে নোট শীটের মাধ্যমে জানান যার ভিত্তিতে নিখিল চক্রবর্তী বকীচরণকে একটা মামুলি তাগিদ দিয়ে লোক-দেখানো কর্তব্য শেষ করেন। তবু বি ডি ও এই বকীচরণকেই নলকূপের কাজ দিয়ে তাকে আবার মালপত্র দিতে আদেশ দেন। এ সব ব্যাপার এস-ডি-ও এবং ডি-এমের জানা ছিল।

বকীচরণের সঙ্গে বি ডি ও নিখিল চক্রবর্তী এতদূর সংযুক্ত ছিলেন যে, ২০০ পাইপের অনাদায়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার তার যে ১৬০০০ টাকার বিল আটকে দিয়েছিলেন, তা সেই সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের অস্থ-পস্থিতিতে টেঃ রিলিফ ওভার-সীয়ার মনোরঞ্জন ঘোষকে দিয়ে মাপ করিয়ে বকীচরণের আটক বিল মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন।

২৯ জুলাই ১৯৭৫-এর পরে ঠিকাদার দত্ত এবং মণ্ডলকে বাদ দিয়ে নিখিলবাবু বকীকে কাজ দিয়েছেন। কিন্তু দত্তর কাছে ১৯৭৪ সনের হিসাবে যে ৬০টি পাইপ পাওনা ছিল, যার জন্য বি ডি ও তাকে রেজিস্ট্রী চিঠি দিয়েছিলেন, তা কি বুকে নেওয়া হয়েছে?

অপর এক ছলনাবাবু বসিরহাট থেকে নৌকায় পাইপ নিয়ে এসে ভাড়া দিতে না পারায় নৌকার মাঝে মনোরঞ্জন হালদার, পিতা (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

আনন্দবাজার নকশাল ও সি পি এমের মধ্যে গণ্ডগোল বাঁধাতে চায়

শঙ্খশুভ্র বিশ্বাস

১৩ই সেপ্টেম্বর বিধানসভার লবীতে সন্তোষ রাণাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম “খড়গপুরে বক্তৃতায় আপনি বলে-ছিলেন নকশালবাড়ীতে প্রথম যুক্ত-ফ্রন্টের সময় পচিশজনকে খুন করা হয়েছিল, অথচ আনন্দবাজার আপ-নার বক্তৃতার পচিশজনকে পাঁচহাজার বানিয়ে দিল। ব্যাপারটা কি?”

সন্তোষ রাণা বললেন “সেই তো! কেন যে আনন্দবাজারের গুরুত্ব লিখল। আমি ওকথা বলিই নি। ওরা আমার বক্তৃতা একদম বিকৃত করেছে। ভেবেছিলাম তার একটা প্রতিবাদ করব, কিন্তু তারপর দিনই দেখলাম প্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয় আমাদের ‘ঘাতক’ বলেছেন। স্বভাবতই এর একটা জবাব দেওয়ার দায়িত্ব এসে পড়ল আমার ওপর।

এরপর আমি সন্তোষ রাণাকে বললাম “আচ্ছা, ব্যাপারটা এরকম হতে পারে না যে আনন্দবাজার ইচ্ছা করেই নকশালবাড়ীতে পচিশজনের খুনের অভিযোগকে পাঁচ হাজার খুন বানিয়ে দিল যাতে এরকম একটা অস্বাভাবিক সংখ্যা শুনে সি.পি.এম চটে যায় এবং উত্তেজিত হয়ে একটা কড়া বিবৃতি দেয় এবং স্বভাবতই তাব প্রতিবাদে আপনাদেরও একটা কড়া বিবৃতি দিতে হয় এবং এইভাবে দুই পার্টির মধ্যে বিবৃতির যুদ্ধ বেঁধে যায় এবং তা ক্রমে ক্রমে বিবৃতির যুদ্ধ থেকে রাস্তার যুদ্ধে পরিণত হয়।

ইসকো প্রশাসনের গাফিলতীর ফলে

নিম্নমানের উৎপাদন বাড়ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ইসকোর মাথাভারী প্রশাসনের মাত্রাহীন গাফিলতির ফলে নিম্ন-মানের উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়ছে এবং ক্ষতির পরিমাণও স্বাভাবিক ভাবেই বর্ধমান। কোম্পানীর কর্মকর্তাদের জটিল জ্ঞান গত জুন-জুলাই বিশেষ নিম্নমানের গলিত লোহা উৎপাদন হয় মোট বিশ হাজার সাতশো সত্তর টন এবং পনেরো হাজার দুশো সত্তর টন (জুন+জুলাই)। এর ফলে মোট ক্ষতি হয় ষাটকো একত্রিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা এবং বাইশ লক্ষ সত্তর হাজার পাঁচশো টাকা। সঠিক মানের গলিত লোহার দর টন

আনন্দবাজার এরকম চক্রান্ত করতে পারে।” সন্তোষ রাণা এর জবাবে বলেন “তা হতে পারে। তবে আনন্দ-বাজারেরই এরকম সংবাদপরিবেশন করল কেন তা? আনন্দবাজারই ভাল জানে।”

বক্তৃত আনন্দবাজার এমন সব খবর পরিবেশন করেছে যাতে এই দুটি পার্টির মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং দুটো পার্টির মধ্যে গণ্ডগোল বেঁধে যায়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যেমন নীতি ছিল “এশিয়াবাসীকে দিয়ে এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে লড়াও।” আনন্দবাজারও তেমনি নীতি নিয়েছে “একদল জংগী কমিউনিস্টকে আরেক দল জংগী কমিউনিস্টের বিরুদ্ধে লড়াও।” তাই এই কুখ্যাত কমিউ-নিস্ট বিদ্রোহী পত্রিকাটি নকশালদের সি পি এম বিরোধিতায় হুড়হুড়ি দিচ্ছে এবং এই দুটি পার্টির মধ্যে উত্তে-জনা সৃষ্টি করেছে। যাতে আবার সত্তর সালের মতন দুই পার্টির মধ্যে মারামারি লেগে যায় এবং আবার বাহান্তর সাল কিরিয়ে আনা যায়।

আনন্দবাজারের এই চক্রান্ত আরো পরিষ্কার হয় সন্তোষ রাণাকে করা আমার আরেকটি প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে। আমি সন্তোষ রাণাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম “আচ্ছা, আপনি তো সব জায়গায় নকশালবাড়ীর গণ-হত্যার কথা বলছেন, কিন্তু বরানগ- (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

প্রতি ৮২৭ টাকা এবং নিম্নমানের গলিত লোহার দর টন প্রতি ৭২৭ টাকা। এছাড়া কিছু অতি নিম্নমানের লোহা উৎপাদন করা হচ্ছে, যা সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পিগ স্নায়রন তৈরী হবার পর রেলওয়ে ওয়াগনে ভর্তি করেও আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসে ফার্গেসে আবার চার্জ করা হচ্ছে। উপরন্তু পিগ মেশিনে ঢালাই হবার পর যখন ওয়াগন থেকে খালি করার জন্য ওভার হেড ক্রেনে নিচে আনা হয়, তখন সেই নিম্নমানের লোহা ক্রেনের ম্যাগনেটের সাহায্যে খালি করা সম্ভব হয় না।

দানিকেন তব্ধের আলোকে মহাভারতের সূচনা ও দেবতা বীরেন্দ্র মিশ্র

রাজকীয় সম্বন্ধনা

ইন্ডের অমরাবতী যে হিমালয়েই এ বিষয়ে প্রদর্শনের অবকাশ না থাকলেও অর্জুনের মহাকাশচারণ সম্পর্কে কৌতূহলের নিরসন হয় না। মহাভারতের বিশেষ উদ্দেশ্যের ধোঁয়ার আড়ালে সব তথ্য হারিয়ে গেলেও মহাকাশচারী অর্জুনের দুটি রাক্য, “তথ্য স্বর্ষ চন্দ্র বা পাবকের আলোক নাই,” এবং “লোকসকল কেবল স্ব স্ব পুণ্যার্জিত প্রভা দ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন”—আমাদের মনে প্রশ্ন সাজিয়ে রাখে।

আগেই বলেছি, নভচর কার্পে-টার স্কট ট্রাটোফিয়ার-এর (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫০ মাইল) উপরে উঠে পৃথিবীকে স্থলী বরণে আচ্ছাদিত দেখেছিলেন, যে দৃশ্যের সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এতান্দিমহাকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠদর্শনের হব্ব মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু আরও ওপরে উঠলে আকাশের চেহারা যেভাবে বদলে যায় মহাভারতের বর্ণিত অর্জুনের দেখা মহাকাশের রঙ ছিল ঠিক সেই রকম। কালো, চন্দ্রবর্ণের আলোকবিহীন। এ দৃশ্য দেখেছেন মার্কিন নভচর জন মেন। ফ্রেণ্ডশিপ-সাত-এ চড়ে পৃথিবী পরিভ্রমণের সময় জগৎবাসীকে শুনিয়ে তিনি মহাকাশ থেকে যে বার্তা প্রেরণ করেন, তারই স্ববাদে আমরা জানতে পারি, “The sky has been black throughout the day.” আকাশটা সারা দিনমান শুধু আধারে আবৃত ছিল। অর্থাৎ সেই অর্জুনের উক্তি: “তথ্য স্বর্ষ চন্দ্র বা পাবকের আলোক নাই।” মহাশূন্য বস্তুতই রাত্রির মত কালো। [মেনের উক্তি: বিস্তারিত তথ্যের জন্য Natural Geographic, vol 121, No 6 pp. 1]

‘লোকসকল স্ব স্ব প্রভা দ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন’ বলতে অর্জুন কি উচ্চ মহাকাশে ভাসমান জলন্ত বস্তুপিণ্ডের কথাই বলতে চেয়েছিলেন?, উচ্চ মহাকাশে তাঁদেরও তো সাক্ষাৎ মেলে। সে কি আইনোস্ফীয়ারে উঠে মহাকাশ দর্শন?

অর্জুনের এই দুই উক্তিকে তাই বৈজ্ঞানিক বিচারের বিষয় বলে আমি

আগেই উল্লেখ করেছি। এসব ব্যাপার আছে বলেই অর্জুনের মহাকাশচারণার ঘটনাটিকে আমরা কবিকল্পিত বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। এমনও হতে পারে, তাঁকে কোনো মহাকাশ ভেলায় তুলে উচ্চ মহাকাশে বেড়িয়ে আনা হয়েছিল। অর্জুনের মনে অচলাভক্তি প্রোথিত করাই তাঁদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকতে পারে। অতঃপর অর্জুনকে নামানো হয়েছে হিমালয়েরই স্বতন্ত্র এক পার্বত্য এলাকায়, যেখানে ইন্ডের দলদল শিবির স্থাপন করেন।

সেই ইন্ডলোকে যখন অর্জুন এসে নামলেন তখন আধাবর্তের রাজ্যচ্যুত রাজকুমারকে যথোচিত সম্বন্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য সাজ সাজ রব পড়ে গেল। গীতবাহাদুরি সহযোগে আন্তরিক শ্রুতিশিবির গার্ড অব অনার জানালেন পাণ্ডুরাজতনয় অর্জুনকে। প্রথমেই তাঁকে নন্দন কাননের মনোহর শোভা সৌন্দর্য যুগিয়ে দেখানো হল। তারপর নভচররা নিয়ে এলেন তাঁকে বিমানক্ষেত্রে। হিমালয়ের সুউচ্চ বিমানাবতরণ ক্ষেত্রে অর্জুন দেখলেন, “সহস্র সহস্র (অনেকানেক) স্বেচ্ছাচারী, বিমান..., তাহার মধ্যে কতকগুলি অবস্থিত, কতকগুলি কৃতগতি ও কতকগুলি আহত হইতেছে।” (বন, কালী ৪৮)। অর্থাৎ ইন্ডের অমরাবতীতে বৈমানিকরাই সবচেয়ে কর্মব্যস্ত। অমরাবতী অলকানন্দার রূপালী জলের কিতের কটিবন্ধন বেঁধে হিমালয়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় ইন্ডের আধিপত্যকে চিহ্নিত করেছে। কেদারবন্দী ও চোখাঘার অর্ধচন্দ্রাকৃতির শীর্ষে নন্দনকানন। স্পষ্ট হয়ে ওঠে ছবিটা। অর্জুন সেই পার্বত্য কাননে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের মধ্যে রিমোহিত। হিমালয়ের মোহিনী মায়া তাঁর মনে অপার্থিব এক দিব্য আনন্দের সঞ্চার করেছে। এখনও হিমালয় পথের পথিক অত্যাশ্চর্য পার্বত্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। মূর্ন তাঁদের দিব্য অহুত্বিতে বিহ্বল হয়। অর্জুন শুধু সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ নন, দেবতা নামক নভচররা তাঁদের বৈজ্ঞানিক মারাময় ক্রিয়াকাণ্ড

দেখিয়ে তাঁকে ঢের বেশী চমৎকৃত করেছেন। তাই সেই দেব (নভচর)-আবাসভূমি লাভ করেছে স্বর্গীয় মহিমা।

ভিন্দেদী রাষ্ট্রনায়ক অথবা মিত্র শক্তির অধিনায়কের আগমনে আজও যেমন, রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শন করা হয়ে থাকে, সেদিনও তেমনিই হ’ত। শুধু যেখানের যেমন প্রথা। হিমালয়ের দেবশিবিরে গর্দ্ব ও অঙ্গরীগণ অর্জুনের জরগাথা (স্ববস্তুতি) গেয়ে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে। বেজে উঠল “দিব্যবাস্তুধনি ও শঙ্খহুত্বি”। সকল বিশিষ্ট জনসমাধি হয়ে অমরাবতীতে ইন্ডকে দর্শন করলেন পৃথিবী। শুক্র হল বিশিষ্ট অতিথির আপ্যায়ন।

আগেই চমৎকার প্রস্তুতি ছিল। তাই ইন্ডের পাশে উপবেশন করলে অর্জুনকে ঘিরে শুক্র হল হিমালয়ের অবস্থানরত নভচর কতাদের নৃত্য-হুঠান। পার্বত্য শিবিরে যেন মেলা বসে গেল। বিশিষ্ট ক্ষমতাবান পুরুষদের ঘিরে এক এক দল নর্তকী আসর জমিয়ে তুললেন।

“স্বতাচী, মেনকা, রম্ভা, পূর্বচিহ্নি, স্বয়মপ্রভা, উর্বশী, মিশ্রকেশী, দণ্ডগৌরী, বরুণিনী, গাপালী, কুন্তযোনি, প্রজাগরা, চিত্রসেন, চিত্রলেখা ও সহাপ্রভৃতি কমললোচনা কলকল্পী নর্তকীগণ... তাহাদিগের স্থলিত নিতম্বাভিনয় কম্পমান পয়োধর ও মনোহর হাবভাব-বিলাস এবং কটাক্ষ বিক্ষেপে সকলের চিত্ত চঞ্চল ও মন মোহিত হইল।” (বন, ৪৮)। মিত্রপক্ষীয় এক বীরপুরুষকে মুগ্ধ করার জন্য যারা এমন নর্তকী সমাবেশ করতে পারেন ক্ষমা করবেন, তাঁদের ঈশ্বর-প্রেরিত দেব দূত হিসাবেও আর মান্য করতে পারি না। বুঝতে পারি সে যুগেই তাঁরা হিমালয় শীর্ষের ছাঁউনি শিবিরগুলিতে বহন করে এনেছিলেন এক অতি আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির কলা ও কৌশল, রীতি ও নীতি। নচেৎ কে একথা আজ মেনে নেবেন যে, স্বর্গ নামক এক ঈশ্বরীয় রাষ্ট্রে দেবরাজ ইন্ড সাম্রাজ্য এক মানবীপুত্রের মনোভূষ্টিজন্য নর্তকীর নিতম্বাভিনয়

ও কম্পমান পয়োধর’ প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন! কে স্বীকার করে নেবেন, পাণ্ডব-পক্ষকে আপন শিবির-ভুক্ত করার জন্য দেবতানামক ঈশ্বরীয় দূতেরা পাণ্ডব প্রতিনিধি অর্জুনের কাছে গভীর রাত্রে প্রেরণ করবেন উর্বশী নামী এক রূপসীকে?

প্রবাসী অর্জুনকে নারী সহবাসে ভুক্ত করার জন্য তাঁর পার্বত্য ছাঁউনীতে উর্বশীকে পাঠানো হয়েছিল স্বয়ং ইন্ডের আদেশেই। ভক্তজনে বলবেন এ-ও ভগবানেরই পরীক্ষা। নারীমুগ্ধ লম্পটের মনোশাঞ্চল্য ঘটানোই তাঁর উদ্দেশ্য। প্রেমের ভক্তগণের প্রতি আমার নিবেদন, মহাশয়! ঐতিহ্যবানের এমত দুর্মতির কারণ কী? কেনই বা অর্জুনের পরীক্ষা! তিনি তো ভগবৎরূপা লাভের জন্য ইন্দ্রকীল থেকে হুমকিতে সমাগত হননি। তাঁর একটিই মাত্র উদ্দেশ্য, একটিই মাত্র যত্ন। সে কথাও তো স্পষ্টভাবেই মহাভারতে উল্লেখিত আছে। বলা হয়েছে, স্বর্গে গিয়েও “তিনি সর্বদাই কেবল দুঃশাসন ও শকুনির বধ চিন্তা করিয়া ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইতেন।” কাম ক্রোধ মোহে আচ্ছন্ন অর্জুনের একটিই মাত্র লক্ষ্য, দুর্বোধন গোষ্ঠীর উৎসাদন। এর মধ্যে ভগবন্তের কোথাও কোনো ইঙ্গিতমাত্র নেই। সমস্ত ঘটনাই যুদ্ধকেন্দ্রিক এবং যুদ্ধটিও একটি বিশেষ পার্থিব অঞ্চল আধাবর্তে সীমাবদ্ধ। ভগবানের গম্ব এই স্বর্গে পার্থিব কুসুমরাজি এবং স্ববাসিতা হিমালয়বাসিনীর গাত্র সৌগন্ধে বেবাক হারিয়ে গেছে। কুসংস্কার ছাড়া এ-বাসে স্বর্গবাস কে আর খুঁজে নিতে পারেন।

“অর্জুনের মন উর্বশীতে আসক্ত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া দেবরাজ ইন্ড চিত্রসেনকে নির্জনে আহ্বান” করে বলেছিলেন, “উর্বশীর নিকট গমন কর এবং সে এখানে আসিয়া যেন কামানির (অর্জুনের) মনোরথ সফল করে, ইহাও আদেশ করিবে।” (বন, ৪৯) একে ইন্ড অর্জুনের পিতা, তায় দেবরাজ। তিনি প্রবাসী অর্জুনের চিত্তবিনোদনের জন্য নেপথ্যে বসে কামকলানিপুণা এক স্ত্রমরীকে পাণ্ডব-তনয়-শিবির বা ক্যাম্পে প্রেরণ করার আদেশ দিচ্ছেন। এমন প্রথা ভোগ-সর্বস্ব বড়া-আদমিদের ঘরেই প্রচলিত। আমা-হেন সাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ ব্যাপারটিই অকল্পনীয়। কিন্তু মহাভারত পাঠে জানা যাবে তৎকালীন যুগি ঋষি ও ব্রাহ্মণদেরও ভোগাকাজ্জ্বা কী প্রবল ভয়ঙ্কর এবং পাত্রাপাত্র জ্ঞান বিবজিত ছিল। আর সেটাই স্বাভাবিক। কেননা পরশ্রম-ভোগী সমাজের চরিত্রই নির্বোধ ভোগাকাজ্জ্বার দ্বারা

সর্বদা বিকৃত। ভোগভক্ত সমাজের ধারাবাহিকতা (ট্রাডিশন) আজও সমানে চলেছে। তাই ঘটনাটি আদৌ কবি কল্পিত নয়। অত্যাশ্চর্য বাস্তব। এমনটিই সম্ভব। মহাভারতীয় যুগের শীর্ষসমাজে যৌন ব্যাপারে নারীর ভূমিকাও অপ্রধান ছিল না। এসব ক্ষেত্রে তাঁদের উক্তিও ছিল অব্যবহা। কামাবেশ প্রকাশেও তাঁরা লজ্জার বালাই রাখতেন না, আর উর্বশী তো স্বৈরীণী। সুতরাং তিনি স্পষ্টই বলতে পারেন, “আমি লোক-মুখে অর্জুনের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া বিষম কামশবে ব্যথিত হইয়াছি;”

ভিন্ গ্রহ থেকে আগত প্রাণীরা সেকালে পৃথিবীর স্বর্ষীপুরুষের সঙ্গে যথেষ্ট যৌনসংসর্গে লিপ্ত হয়েছেন। কোথাও তা শুধুমাত্র যৌনতার প্রয়োজনে, কোথাও বা বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির মানসে, যেমন কুন্তীর সঙ্গে ইন্ডাদি পুরুষগণের যৌনমিলন। মহাকাশ থেকে নেমে আসা রমণীগণ যেমন পার্থিব পুরুষের আসক্ত লাভে লুপ্ত হয়েছেন, তেমনিই নভচররা স্বযোগ মতো ভোগ করে গেছেন পৃথিবীনারীকে।

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়) কবর স্থানের জাম বেদখলের অভিযোগ

হাওড়া জেলার ডোমছড় থানার কাটালিয়া নামক গ্রামে মুসলিম সংলগ্ন কবরস্থানকে সরকারী খাস জমি হিসাবে দখল করেছিলেন নিবড়া অঞ্চলের শেখ জইয়ুল আরেদিন সাহেব হাওড়ার ডোমছড়ের কংগ্রেস এম এল এ কৃষ্ণপদ রায়ের চেষ্টায়।

কংগ্রেসী জয়হুল আবেদিন মাকডুদহ অঞ্চলের অন্তর্গত কাটালিয়ার কবরস্থানটি (প্লট নং ১৭০০, জে এল নং ৫০) জে, এল, আর ও সাহেবকে অর্থসাহায্য দিয়ে এবং তৎকালীন এম এল এল তয় দেখিয়ে প্রভাব বিস্তার করে দখল করেন এবং কবর স্থানে দোকান তৈরীর চেষ্টা করেন।

কংগ্রেসীদের প্ররোচনায় বর্তমান জে এল আর ও সাহেবও পুরনো দিনের বেআইনী লেনদেনের বিরুদ্ধে কথা বলছেন না বলে নিবড়া গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন। কবর স্থানের জমি দখলের এবং পাট্টা দেওয়ার ব্যাপারে জে এল আর ওর কাছ থেকে দেওয়া চুক্তিপত্র প্রাক্তন এম এল এ কৃষ্ণপদ রায়ের সইও আছে। গ্রামবাসী অবিলম্বে জায়গাটি ফেরত চান এবং সম্ভাব্যজনক মীমাংসা চান।

আসানসোলের বহুমুখী সমস্যার সমাধানে রাজ্য সরকারকে তৎপর হতে হবে

সাধন গুহ

আসানসোল শহর এবং মহকুমার সমস্তা বহুমুখী। সমাধান এক কথায় সম্ভব নয়। কিন্তু সমাধানের উপায় ভৌমের করতেই হবে এবং বর্তমান রাজ্য সরকারের পক্ষেই সম্ভব। এ সম্পর্কে স্থিরচিত্তে চিন্তা করা এবং বহুমুখী সমাধানের পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়া। এ সম্পর্কে আসন-সোল প্রেস ক্লাবের সভাপতি ডাঃ জয়-গোপাল শর্মা (আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রুপ), সম্পাদক শ্রীশিবসনাতন ব্যানার্জী (ধূগান্তর, অমৃতবাজার ও আকাশবাণী), অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অরুণ ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট জনদের সঙ্গে আমার দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে এ, ডি, এম, ভট্টাচার্যের বাংলায় প্রায় ২০ মিনিট আলোচনার সময় তিনি বেশ কয়েকটি সুচিন্তিত পরিকল্পনার কথা আমাকে বলেছেন। সাংবাদিক বন্ধু শিবসনাতন ব্যানার্জীও বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা করেছেন। সাংবাদিক হিসেবে আমি খুব আনন্দিত এইজন্মে যে, আসান-সোল প্রেস ক্লাবের কয়েকজন সহ-যোগী বন্ধু অন্ততঃ বৃহত্তর জনজীবনের কথা ভাবছেন এবং ভালো লাগলো। এ, ডি, এম, ভট্টাচার্যের জনজীবন সম্পর্কিত গঠনমূলক চিন্তাধারা। ইতিপূর্বে কোন জেলা শাসককে বৃহত্তর জনজীবন সম্পর্কে এতটা আগ্রহ হতে দেখিনি।

প্রসঙ্গটি আলোচনার আগে প্রয়োজনীয় কয়েকটি কথা বলা দরকার। আসানসোল প্ল্যানিং

মহাভারতের স্বর্গ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

এহাঙ্গুরের জীবের সঙ্গে যৌনসংসর্গ সম্পর্কে জানিকেন বহু কৌতূহলো-দ্দীপক নজীর উদ্ধার করেছেন। পরবর্তী কোনো আলোচনায় প্রাস-ঙ্গিকতার দাবি মেনে তারই দু'একটি আমরাও উদ্ধার করে দেখাব। এখানে পাঠককে মহাভারতীয় ঘটনা-টিকে পুণিবীপুটে 'অহস্তিত' একটি বাস্তব ঘটনারূপে দেখতে অগ্ররোধ করি। গভীর রাজ্যে অজ্ঞানের ছাউনিতে কামাতুরা মহাকাশচারিনীর আগমন একটি ঘটনা বলেই আমরা যেনে নিতে পারি। এই অভিসারের উদ্যোগ আয়োজনের নিখুঁত বর্ণনাও আমাদের মনোভাবকে সেদিকেই টানে। (কালীপ্রসন্ন, মহাভারতের বনপর্ব পৃঃ ৪২-৪১ প্রঃ)।

(চলবে)

অর্গানাইজেশন নামে একটি মাথা-ভারী সংস্থার অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। বিগত কয়েক বছরে এই সংস্থার জন্ম খরচ হয়েছে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা। এদের কাজ পরিকল্পনা করা। পরিকল্পনা কার্যকরী করার অধিকার এদের নেই। এ পর্যন্ত এই সংস্থা যা করেছে তাকে বলা যায় পর্বতের মুখিক প্রসব। এর ভারপ্রাপ্ত অফিসার দুর্গাপুর ডেভেলপ-মেন্ট অর্গানাইজেশনেরও প্রধান। ডি, ডি, ওর এক্সিকিউটিং অফিসিট আছে—এ, পি, ওর নেই। এই সংস্থার উদ্ভট উদ্ভট পরিকল্পনা আছে। একটি নজির দিচ্ছি। আসানসোল বাস স্ট্যাণ্ড বর্তমানে জি, টি, রোডের একধারে আছে। এদের পরিকল্পনা মাসিক এখন বাসস্ট্যাণ্ড নাকি রাস্তার দু'দিকেই সম্প্রসারিত হবে। এমনটি যদি সত্যি করা হয় তবে এখানে একটি নিশ্চিত মরণ ফাঁদ তৈরী হবে মাত্র। এই সংস্থা জীইয়ে রাখার প্রয়োজন কতটা আশা করি রাজ্য সরকার সেটা একটু বিচার করবেন। দ্বিতীয়তঃ, আসানসোল জেলার মর্যাদা পেতে পারে কিনা সেটা বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার। এই শহরে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজি-স্ট্রেটের স্থায়ী বাস। এখানে সাব-জজ কোর্ট আছে। এই শহর কমলা-খনি এবং বার্ষপুর ও কুলটি ইম্পাত কারখানার কেন্দ্রীয় ঘাঁটি। আসান-সোল মহকুমা থেকে কোলিয়ারীর খাতে বার্ষিক রয়্যালটি'র পরিমাণ ১০ কোটি টাকা, পরিবহন খাতে ১ কোটি এবং টে'এন্ডাইজের খাতে ৩ কোটি টাকা। এই মহকুমায় কৃষিখাতে মাথাপিছু ব্যয় প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ এখানে সরাসরে বড় সমস্তা জলের। টিউবওয়েল করে জলের সমস্তা এখানে যেটানো যাবে নাকারন এখানের ভূগর্ভে সহজে জল পাওয়া যায় না। অতএব এখানে জলের সমস্তার সমাধানের জন্য দায়োদর বরাকর ও অজয় নদী থেকে ট্যাপ করে জল আনার বন্দোবস্ত করা দরকার। একে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১নং অর্থাৎ বরাকর ফেজে পড়বে বারাবনী, সালানপুর, কুলটি ২নং অর্থাৎ দায়োদর ফেজে পড়বে আসানসোল ও হীরাপুরের একাংশ এবং রাণীগঞ্জ ও জামুরিয়া, ৩নং অর্থাৎ অজয় ফেজে পড়বে অতাল এবং জামুরিয়ার একাংশ। এখানে চাহিদা হচ্ছে দৈনিক ৪০ লক্ষ গ্যালন জল কিন্তু

পাওয়া যাচ্ছে ২০ লক্ষ গ্যালন এবং তাও শুধু পৌর এলাকায়। অতিরিক্ত জেলা শাসক অরুণবাবু দাঁট প্রত্যয় নিয়ে আমাকে বলেছেন যে, মাষ্টার প্লান চালু করলে তিনি ২০ লক্ষ গ্যালন জলকে অনায়াসে ৪০ লক্ষ গ্যালনে পরিণত করতে পারেন যদি স্বীকৃত কার্যকরী করার জন্য রাজ্য সরকার ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে রাজী থাকেন। আসানসোল প্রেস ক্লাবও জলের সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। অরুণবাবুর প্রস্তাব রাজ্য সরকার নিশ্চয়ই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন বলে আশা করি। এ, ডি, এম, ভট্টাচার্য বলেছেন, ট্রাকে করে জল পৌছে দেবার জন্য বছরে আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হয়। মাষ্টার প্লান কার্যকরী হলে এ ধরনের অপব্যয় রোধ করা যায়।

প্রেস ক্লাবের সম্পাদক শিব-সনাতন ব্যানার্জী এই মহকুমার ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। অতিরিক্ত জেলা শাসক অরুণ ভট্টাচার্যও একই প্রস্তাব করেছেন। কোলিয়ারীর প্রয়োজনীয় ট্যাব, ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি এবং আরও নানাবিধ ক্ষুদ্র শিল্প এখানে গড়ে তোলা যায় এবং এরই মাধ্যমে স্থানীয় ভয়াবহ বেকার সমস্যার কিছুটা মোকাবিলা হয়তো সম্ভব। বলাই বাহুল্য, এ ধরনের ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুলতে হলে তা সরকারী অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমেই গড়ে তোলা উচিত বলে আমরা মনে করি। আশা করি বিজয় পাল, বামাপদ মুখার্জী, সুনীল বসুরায়, হারাধন রায়, লক্ষণ বাগদী, বিকাশ চৌধুরী প্রমুখ জনপ্রিয় শ্রমিকনেতা ও এই মহকুমার বিধান সভার সদস্যবৃন্দ ও সংসদ সদস্য শ্রমিকনেতা রবীন সেন এই প্রস্তাবগুলো সম্পর্কে একটু ভাববেন। তাঁরা ভাবছেন তো নিশ্চয়ই, কারণ এ'রা কেউ তো আখের গুছাবার জন্য জন প্রতিনিধি হন নি। তবু বলবো, তাঁরা যেন উত্তোষী হয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন। এদের কাছে আমার আর একটা অহরোধ আছে। রাজ্য সরকারকে বলে এ'রা যেন কমলাখনির জন্য নিয়োজিত সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাই-বুতালের দপ্তরটি আসানসোলে স্থানা-স্তরের বন্দোবস্ত করেন। এটা হলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা বিরাট পরিমাণ

খাতায়াতের খরচ থেকে রেহাই পাবেন এবং ই, সি, এল-এর তহবিল থেকে মামলা, তদারকীর অজুহাতে এক শ্রেণীর কমলাখনির অফিসারের টাকা হাতিডাবার কল্পনাতক স্বজাতিও বন্ধ হবে। কমলাখনির জন্য সেন্ট্রাল ট্রাইবুতাল কমলাখনি অঞ্চলেই থাকা দরকার। সরকার নিশ্চয়ই এই বিষয়টি-বিবেচনা করবেন বলে আশা করি।

আসানসোল এবং রানীগঞ্জ অঞ্চল দু'খাত সমাজ বিরোধীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এতদঞ্চলের ধান পুলিশ সম্পর্কেও নানা কাহিনী প্রচলিত। সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে একাংশ পুলিশের নিয়মিত যোগ সাপ্তাসের ঘটনাও অমূলক নয়। এটা এক নির্মম বাস্তব। এই সব অঞ্চল চোরাই কারবারেরও নিরাপদ ঘাঁটি। পুলিশ তাই দু'হাতে এখান থেকে পয়সা কামাবার প্রলোভন সহজে জয় করতে পারেনা। এক একটি ধানার এলাকাও বিরাট। ঘটনাস্থলে পুলিশ বহুক্ষেত্রে ২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টা পরেও পৌছোয়। ফলে এই অঞ্চলে ব্যাপক অরাজকতা চলে। বর্তমান রাজ্য সরকারকে এতদঞ্চলের পুলিশ প্রশাসনের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ধানার সংখ্যা বাড়তে হবে এবং পুলিশের স্বরিত গতিতে চলা ফেরার জন্য গাড়ীর সংখ্যাও বাড়তে হবে। এবং একই সঙ্গে ডিটেকটিভ ডিপার্ট-মেন্টের স্পেশাল সেল বসাতে হবে এতদঞ্চলের জন্য যাতে দু'হুতির যথাযথ তদন্ত করা সম্ভব হয়। ধানার হাতে এই সব তদন্তের ভার থাকলে অধিকাংশ ক্রেতাই সত্য চাপা পড়ার আশঙ্কা এখনও বিদ্যমান। উপরন্তু ভাবতে হবে, প্রত্যেক অঞ্চলের এম, এল, এ-এর নেতৃত্বাধীন একটি ডিজিটেল কমিটি গঠন করে এই সব অঞ্চলের পুলিশী দুর্নীতি রোধের জটিল সমস্যার সমা-ধান করা যায় কিনা। আসান-সোল মহকুমা রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল। এই অঞ্চলে সমাজ বিরোধীদের উৎপাত তাই খুবই তীব্র এবং প্রকট। রাজ্য সরকারকে অগ্রভব করতে হবে যে, গতাংগতিক পুলিশী ব্যবস্থা দিয়ে এতদঞ্চলে গুণ্ডামী, বদমায়েসী, খুন, রাহাজানি নারী ধর্ষণ ইত্যাদি দমন করা যাবেনা। পরিশেষে, রাজ্য সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, আসানসোল মহকুমার প্রতিটি প্রান্তে রাঢ় সংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ ছড়ানো রয়েছে। সেগুলোর পুনরুজ্জীবন ও সংগ্রহের দায়িত্ব

সরকারী তথ্য দপ্তরকেই নিতে হবে। একই সঙ্গে ধনি শ্রমিক এবং ইম্পাত শ্রমিকের শ্রমজীবনের সঙ্গে বৃহত্তর জনজীবনের সম্মানীয় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এই সম্পর্ক রচনার মধ্য দিয়েই গড়া যাবে বলিষ্ঠ ও স্বস্থ এক সাংস্কৃতিক পরিবেশ। বৃহত্তর জনজীবন ধনি শ্রমিকদের জীবন সম্পর্কে কিছুই জানেনা। ই, সি, এল-এর জন সংযোগ দপ্তর কিছু বাগাড়ম্বর ছাড়া এ সম্পর্কে অজ্ঞাবধি কোন গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেনি। সুসংহত জাতীয় জীবন গঠনে এই দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

আনন্দবাজার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

রের গণহত্যার কথা বলেছেন না কেন? সেখানে আমামী, কংগ্রেস বলে?" এর উত্তরে সন্তোষ রাণা আমাকে পাঁচটা প্রশ্ন করে বলেন "আপনি আমার কটা মিটিয়ে দিয়েছেন? আমি সর্বত্র নকশালবাড়ীর সঙ্গে বরানগর গণহত্যার কথাও বলছি।" আমি তারপর বললাম, "তা আনন্দবাজারে দেখিনা তো?" সন্তোষ রাণা বলেন, "আনন্দবাজার না ছাপালে আমি কি করবো? আমি সর্বত্রই বলছি।"

এ থেকেই সন্তোষ রাণাদের বোকা উচিত আনন্দবাজার কেন তার নক-শালবাড়ীর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত বক্তব্য নিয়ে এত মেতে উঠেছে। অথচ বরানগর গণহত্যা সম্বন্ধে তার অভিযোগ কাগজে ছাপছে না। আসলে আনন্দবাজার সন্তোষ রাণার সেই সব বিবৃতিই ছাপাচ্ছে যাতে সন্তোষ রাণাদের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক ধারাপ না হয় এবং উন্টে সি পি এমের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে তিক্ত-তার সৃষ্টি হয় এবং তা বেড়ে চলে। খুব অপরিকল্পিত উপায়ে এটা কর হচ্ছে।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

৪ টাকার হার।

বার্ষিক ২২ টাকা

বার্ষিক ১১ টাকা

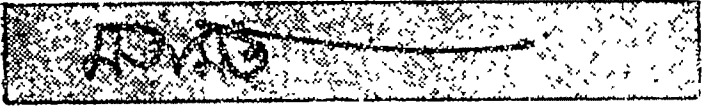
ত্রৈমাসিক ৫.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠাবার ঠিকানা:

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, ৪৮ গেম। কলিকাতা ১০



অভিযোগ এবং উত্তর

গত মে জুলাই সংখ্যা গণনাট্য পত্রিকায় জিহুদী প্রধান এক দীর্ঘ প্রবন্ধে আমাকে আক্রমণ করে যেসব কথা বলেছেন তার অধিকাংশই অসত্য ও অশালীন। যেমন, তাঁর অভিযোগ, আমার নাট্যসংস্থা পিপলস লিটল থিয়েটার নাকি সংগীত নাটক আকাদেমি থেকে “লক্ষাধিক টাকা” অহুদান পেয়েছে। কথাটি সর্বৈব মিথ্যা। এমন সব অলীক কথার উত্তর প্রদানের কোনো স্পৃহা আমার নেই। কিন্তু প্রবন্ধের শেষে এসে চরিত্র হননের যে শর স্বধীবাবু নিক্ষেপ করেছেন, সে সম্পর্কে দু’কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, নাইলে বিভ্রান্তির উদ্ভব হতে পারে।

স্বধীবাবু প্রায় এক বছর আগের দক্ষিণী বার্তা শারদীয়া সংখ্যা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আমি নাকি তাতে “এমার্জেন্সি সমর্থনে বিরূতি” দিয়েছি। দক্ষিণী বার্তা আমার সংগে সাক্ষাৎকারের যে রিপোর্ট ছেপেছিল তা বিস্মৃত। দক্ষিণী বার্তার ভাণ্ড—

“প্রশ্ন ১। চলচ্চিত্রের ওপর জরুরী অবস্থার প্রভাব আছে বলে মনে করেন?”

“উত্তর ১। আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি জরুরী অবস্থায় নাটক বা চলচ্চিত্রে কোনো পরিবর্তন হয় নি।”

অবিকৃত মূল বয়ান আমার কাছেই আছে। তা হবে:

“প্রশ্ন ২। চলচ্চিত্রের ওপর জরুরী অবস্থার প্রভাব আছে বলে মনে করেন?”

“উত্তর ২। না, মনে করি না।

প্রশ্ন ৩। “বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রে যে খুন জখম নগ্ন নৃত্য দেখানো হয়, তা বন্ধ করা উচিত নয়?”

“উত্তর ৩। সেটা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি।...কিন্তু জরুরী অবস্থায় চলচ্চিত্রে কোনো পরিবর্তন হয় নি।”

মূল বয়ানে দেখা যাচ্ছে সমর্থনটা ছিল “খুন জখম নগ্ন নৃত্য” বন্ধ করার প্রতি। স্বধীবাবুও একটু ঠাहर করলেই বুঝতে পারতেন, মাঝখানে কিছু বাদ দেয়া হয়েছে স্ব-পরিকল্পিত ভাবে। নইলে “প্রভাব আছে?” প্রশ্নের উত্তর “সমর্থন করি” হয় কখনো?

এমার্জেন্সি তথা কংগ্রেসী অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য নানা

নাটক, প্রবন্ধ ও কার্যকলাপে সম্যক প্রকাশিত। সে সময়ে স্বধীবাবু কোথায় ছিলেন জানি না। আজ দক্ষিণী বার্তার দ্বারস্থ হয়ে আমাকে কলংকিত করার তাঁর এই প্রয়াস সত্যিই হাস্যকর। এক স্থানে তিনি লিখেছেন আমার সম্পাদিত পত্রিকা এপিক থিয়েটার তিনি সব সংখ্যাই পড়েছেন; তাহলে কি তিনি দেখেন নি সে পত্রিকা সমানে এমার্জেন্সি তথা কংগ্রেসী অত্যাচারের বিরুদ্ধে লিখে গেছে?

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য দক্ষিণী বার্তার দপ্তরে তৎক্ষণাৎ আমি প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলাম যার নকল আমার কাছেই আছে। সে পত্র ছাপা হয়েছিল কিনা, বা ঐ পত্রিকাই আদৌ আর প্রকাশিত হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই।

উৎপল দত্ত

কয়লাখনি পরিক্রমা

গত ৯ই সেপ্টেম্বর ৩৩শ সংখ্যাতে ‘কয়লাখনি পরিক্রমা’ শীর্ষক সংবাদ পরিবেশনে সাংবাদিক শ্রীমান গুহ জানি না কার প্ররোচনায় ডেনজং কো-অপারেটিভ সোসাইটি সম্বন্ধে কটাক্ষ করেছেন। এ সম্বন্ধে সোসাইটির তরফ থেকে আমি কিছু বক্তব্য তুলে ধরতে চাই।

কয়লাখনি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হওয়ার পর কয়লাখনি অঞ্চলের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্ত, কয়লাখনি অঞ্চলের বেকার যুবকদের কয়লা ব্যবসা করার জন্ত কয়লা খনি কর্তৃপক্ষ কো-অপারেটিভ গঠনের নির্দেশ দেন। উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু স্বল্প নীতি না-ধাকার জন্ত বেশ কিছু ‘ছুয়া’ কো-অপারেটিভ গড়িয়ে ওঠে। আর এইসব কো-অপারেটিভ গড়িয়ে ওঠার জন্ত যদি কেউ দোষী হন তাঁবা হলেন কলকাতা অফিসের কতিপয় সেন্স অফিসার, কারণ তাঁরা কোন কিছু পরীক্ষা না করেই এইসব কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলিকে হাজার হাজার টনের পারমিট খোলাবাজারে বিক্রী করার জন্তে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ডেনজং সমবায় সমিতি রেজিস্ট্রীকৃত এবং সরকারী আইনসম্মত ভাবে গঠিত এবং বিনা সরকারী সাহায্যে স্বনির্ভর প্রকল্পনিযুক্ত একটি সমবায় সংস্থা। এই সোসাইটি মারফৎ যেমন বেশ কিছু যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে, তেমনি গ্রামের এবং

স্থানীয় বেশ কিছু স্কুলের উন্নতিকল্পে সাহায্যদানও হয়েছে।

কোল মাইনস অফিসার্স এ্যাসোসিয়েশন কিন্তু এতে কোনও সাহায্য করে নি। অপরদিকে ছুয়া কো-অপারেটিভদের কোনকিছু পরীক্ষা না করেই হাজার হাজার টন কয়লা দেওয়া হয়েছে। অনেক ‘অবাঙালী’ সংস্থা এবং ‘অবাঙালী’ ব্যবসাদার হাজার হাজার টন কয়লার পারমিট ব্যার করে চোরাপথে শুদ্ধ ফাঁকি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কয়লা পাচার করেছে। কই তাদের সম্বন্ধে তো কোন মন্তব্য করা হয়নি। আর আপনাদের সংবাদদাতা কোথা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করলেন যে ৮০ টাকার কয়লা ২৫০ টাকায় বিক্রী হয়েছে?

সম্প্রতি ইষ্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের সাক্তোরিয়ায় সেলস বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জ্ঞানতে পেরেছে যে ই, সি, এল কর্তৃপক্ষ যে ‘একশ’ একচল্লিশটা কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং অ্যাসোসিয়েশনকে কয়লা দিয়েছিল তার মধ্যে মাত্র তিনটি সোসাইটি বা অ্যাসোসিয়েশন রেজিস্ট্রীকৃত এবং সরকার কর্তৃক অহুমোদিত। স্মারক এর মধ্যে ডেনজং কো-অপারেটিভ সোসাইটি আপ-টু-ডেট, অডিট রিপোর্ট জমা দিয়েছে।

গণেশচন্দ্র বন্দী

ডেনজং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের পক্ষ থেকে

অভিযোগ অসত্য

আপনাদের সংবাদপত্রে বিগত ২১/৯/৭৭ তারিখে প্রকাশিত সংবাদে কলকাতা কর্পোরেশন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড সম্পর্কে কয়েকটি অসত্য সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

(১) অনামী প্রতিষ্ঠানে আমরা কখনও টাকা লয়ী করি নি এবং বর্তমান ম্যানেজিং কমিটি কোন টাকা কোথাও লয়ী করেনি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আইন অহুযায়ী সরকারী ব্যাঙ্ক ছাড়া কোথাও টাকা আমানত করার অধিকার আমাদের নেই।

(২) দলীয় সভ্যদের স্বার্থে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাড ডেট বলে ঘোষণা করা হয়েছে এটাও অসত্য সংবাদ। কো-অপারেটিভ আইন অহুযায়ী ম্যানেজিং কমিটির এক টাকাও রাইট-অফ করার অধিকার নেই। এই ক্ষমতা অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিজের ওপর জন্ত। বর্তমান ম্যানেজিং কমিটি একটাকাও রাইট-অফ করার জন্ত তাঁর কাছে প্রেরণ করে নি।

(৩) ‘দীর্ঘা হলিডে হোম’ যেরা-মতি কাজের নামে সোসাইটি বহু টাকা অপব্যয় করেছে এই অভিযোগে

অসত্য। বর্তমান ম্যানেজিং কমিটি এই খাতে কোন ব্যয় অহুমোদন করে নি। যদি কোন ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে ম্যানেজিং কমিটির অহুমোদন ব্যতিরেকে টাকা ব্যয় করে থাকেন তবে তার দায়সেই ব্যক্তিকেই বহন করতে হবে।

অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি
কলকাতা কর্পোরেশন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি ম্যানেজিং কমিটির পক্ষে

আনন্দবাজারের

অপপ্রচার

গত ২২শে আগস্ট সোমবার আনন্দবাজার পত্রিকায় “বার্টি পরিবার বাস্তুচ্যুত” শিরোনামায় অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী এম পির একটি বিবৃতি পড়ে, আশ্চর্য হলো। এটি যদি সত্যি তাঁর হয় তাহলে বলতে হয় যে তাঁর বিবৃতি মুন্সিগঞ্জ রোডের ঘটনা সম্পর্কে সত্যের অপলাপ মাত্র। প্রকৃত ঘটনা হল যে, ১৯৭৬ সালে ১লা নভেম্বর জরুরী অবস্থার সুযোগে জনৈক প্রাক্তন কংগ্রেসী এম এল এ পুলিশের সহায়তায় ৬০টি পরিবারকে বেআইনীভাবে বাস্তুচ্যুত করে, এমন কি তাদের পরিষেব বস্ত্র পর্বস্ত্র নেবার সুযোগ দেওয়া হয় না। বাস্তুচ্যুত কিছু ব্যক্তি এই অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্ত আদালতে কয়েকটি মোকদ্দমা করেছেন। তারম কেশরী সর্কারের নিকট জরুরী অবস্থাকালীন এই জুলুমসংক্রান্ত ঘটনা জানিয়েও আবেদন করেছেন। ২০শে আগষ্ট রাতে প্রায় শ থানেক লোক জনতা পাটির ঝাণ্ডা পুতে বিচারাধীন এই এলাকাটি দখল করার চেষ্টা করে। পুলিশ সাধারণ নিয়মে বাধা দেয়। কিন্তু দিলীপবাবুর বিবৃতিতে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে যেন বর্তমান সরকারের পুলিশের সামনেই ৬০টি পরিবার বাস্তুচ্যুত ও অত্যাচারিত হয়েছে। দিলীপবাবুর এই বিবৃতি কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক এবং হয়ত রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

ডাঃ জহরুল হক

সমর্থন এবং অভিনন্দন

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের তথ্যমন্ত্রী যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ তাকে সমর্থন ও অভিনন্দন জানাচ্ছে। ‘বারবধু’র মত নাটকের প্রদর্শনী দেখতে অস্বীকার করে এই নাটকের অভিনয় বন্ধ রাখার জন্ত তথ্যমন্ত্রী উদ্যোক্তাদের বিবেকের কাছে যে আবেদন জানিয়েছেন তা জনগণের স্বস্থ সাংস্কৃতিক চেতনারই প্রতিকলন। এই ঘটনায়

যারা আতঙ্কিত আমরা কখনই তাদের সমাজের বহুরূপে গণ্য করতে পাবি না। ‘বারবধু’ নাটকের উদ্যোক্তারা ভিয়েতনামের নাম জড়িত করে এবং বর্তমান জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করে যে সব বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশ করে চলেছেন আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

আমরা আশা করব পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক শিল্পী সাহিত্যিক এবং মেহনতী মানুষ এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানাবেন এবং তথ্যমন্ত্রীর অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করবেন।

শান্তিময় গুহ

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ,
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

নিজেই নিজের

সমর্থনার আয়োজন

গত ২৬শে আগস্ট দর্পণে প্রকাশিত চিঠিতে কল্যাণী সাহার সলিল চৌধুরীর সমর্থনকে অপসংস্কৃতি আখ্যা দিয়ে সঠিক প্রগতি চেতনার স্বাক্ষর বেখেছেন। এ সম্পর্কে আমি আরো তথ্য জানি। এই সমর্থনার ব্যাপারে কলকাতার সপ্তর্ষি হোটেল প্রথম মিটিং করার জন্ত সলিল চৌধুরী নিজের ট্যাক থেকে জনৈক নাট্য-পত্রিকা সম্পাদকের হাতে ৫০০ টাকা নগদ দিয়ে গেছেন। তিনি আরো বলে গেছেন কলকাতার ভাল প্রেক্ষাগৃহে তাঁকে সমর্থনা দেবার ব্যাপারে তিনি তিন হাজার টাকা খরচ করবেন। তার মানে সলিল চৌধুরী নিজেই নিজের সমর্থনার আয়োজন করেছেন। জনগণের শিবির ত্যাগ করলে শিল্পীর এই ভাবেই কলঙ্কিত হয়। বোম্বাই শহরে সলিল চৌধুরীর আর কত্বে মিলছে না। তিনি এখন না ঘাটকা, না ঘরকা।

মলয় মুখার্জি

২৩শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা

ফাঁরে

ভারতী অপেরার

কংস

হলে টিকিট

ফুলরা কালকেতু

ভানুসিংহ

রাজাধিপত্যে ভূপোবন নাট্য কোম্পানী এক স্বাগত নতুন সংযোজন। নবাগত হলেও এই নাট্য গোষ্ঠী পালাভিনয়ে যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তা বিবেচনা উল্লেখের দাবী রাখে। টিম-ওয়ার্ল্ড প্রযোজনায়। চণ্ডীমন্ডলের কাহিনী অবলম্বনে ব্রজেনকুমার দে রচিত 'ফুলরা কালকেতু' পালাটিতে রচনার প্রসাদগুণ যেমন পাওয়া যায়, পালাটির শিল্প-সম্মত উপস্থাপনও প্রযোজক ও নির্দেশক হুলাল চট্টোপাধ্যায়ের মুন্সিয়ানার স্বাক্ষরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পৌরাণিক কাহিনীটির মধ্যে ভক্তিমহিমার প্রচারটুকু আছে ঠিকই, কিন্তু অল্পদিকে সমাজের 'অচ্ছন্ন'দের প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষের সীমাহীন অবজ্ঞা, ব্যাধ সম্প্রদায়ের ওপর পীড়ন ও শোষণ, অস্পৃশ্য বলে যারা গণ্য, তাদের হৃদয়ের মমত্ব ও উদারতা, তেজ ও শক্তিমত্তা, অত্যাচারিতের বিদ্রোহ ঘোষণা পালাটিকে আধুনিক মননের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবে। শুধু তাই নয়, বলিষ্ঠ চেতনায় উদ্বুদ্ধও করবে। সম্প্রতি মিনার্ভা থিয়েটারে এই পালাভিনয় অহুষ্টিত হল।

প্রধান ভূমিকা কালকেতু চরিত্রে নাট্য নির্দেশক হুলাল চট্টোপাধ্যায় চমৎকার অভিনয় করেছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ও স্বরক্ষেপন শুনে বারংবার মহেঞ্জু গুপ্তর কথা মনে পড়লেও একথা স্বীকার না করে উদ্যম নেই যে, কালকেতু চরিত্রের তেজ ও ক্ষমা, বীর ও শাস্ত ভংগী এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব উঠেছে তাঁর অভিনয়-শৈলীর মধ্য দিয়ে। দেহের দৈর্ঘ্যে তিনি হুম্বলেও কণ্ঠস্বরের ওজস্বীতায় তার অভাব তিনি বুঝতেই দেন নি। এ কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। রাজা, রানী, যুবরাজ, ফুলরা, দেবী, ভাঁড়ন প্রভৃতি চরিত্রে প্রত্যেক অভিনয়-

শিল্পীই প্রশংসনীয় নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

পালাভিনয়ের প্রথমার্শ্বে বেশ মনোরম গতি। এটি ব্যক্তনীয় নয়। সেই অংশে নৃত্যগীতের বাহ্যিক অনায়াসে বর্জন করা চলত। পালায় তাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হত না। নৃত্যগীত পরিবেশনেও কৃতিত্বের ভাগ কম। আলোর ব্যবহার খুবই সাধারণ। আরও কিছুটা চরিত্রাভিনয় আলোক সম্পাত কেন্দ্রীভূত হলে অভিনয় শিল্পীর নাট্যাভিবেগ ছুটে ওঠার অবকাশ পেত। বুদ্ধবানন যথার্থ ও পালায় তাবস্থিতি রচনায় সার্থক।

যাত্রা সংবাদ

নক্ষত্র মহল

যাত্রার শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে সর্বপ্রথম সমবায় পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছে যাত্রার দল নক্ষত্র মহল। এই দল নতুন তিনখানা নাটক নিয়ে আসবে অবতীর্ণ হচ্ছে। কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিকায় প্রীতি রায় রচিত 'মুক্তি চাই' এবং সত্যেন ভদ্র রচিত 'সমাজ ধর্ষণ' ও 'কবি ভারত-চন্দ্র'। নাটক তিনটিতে হুরাবোপ করেছেন যথাক্রমে স্ববীর বসু, রবীন মালিক ও রঘুনাথ গুহ এবং পরিচালনা করেছেন নির্মল মুখার্জী। দলের পরিচালক গোপাল মুখার্জী এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আমাদের 'মুক্তি চাই' যাত্রাপালাটি জমিদার শ্রেণীর অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার। দেশের কিছু লোক যদিও বলছে বর্তমানে জমিদারী খতা ও সামন্যবাদ নেই, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সবই রয়েছে। শুধুমাত্র শোষণের ধারা পাট্টেছে। তাই তো ভারতের নানা জায়গায় কৃষকরা আন্দোলনের জ্বলন্ত বিদ্রোহে বাধ্য হচ্ছে। এ ছাড়া তাদের মুক্তি কোথায়?

বীণাপাণ নাট্য কোম্পানী

চট্টগ্রাম অস্তাগার লুইনের বীর বিপ্লবী স্বর্ধ সেনের বীরত্ব কাহিনী আঙ্গকের তরুণ বাঙ্গালীকেও রোমাঞ্চিত করে। সেই স্বর্ধ সেনকে নিয়েই বীণাপাণি নাট্য কোম্পানীর নতুন যাত্রাপালা 'বিপ্লবী স্বর্ধ সেন'।

নাট্যকার দেবেন্দ্র নাথ জানালেন নাটকের শুক চট্টগ্রাম অস্তাগার লুইনের কার্যকলাপ থেকে এবং শেষ স্বর্ধ সেনের কাহিনীতে, মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন নাটকীয় পরিবেশ। প্রশান্ত ভট্টাচার্য হুরারোপিত এই পালায় অভিনয় করেছেন স্বভাষ ভৌমিক, পাণ্ডিত্য রাণা, নিতাই দাস অরুণ সেন, অজিত চক্রবর্তী ও আরও অনেকে।

পাঁচ বছরে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এল-এ তথা প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। প্রায় ষেত পুলিশ অফিসারদের। তারা মন্ত্রী কথা শুনবেন, না সাধারণ সম্পাদকের কথা শুনবেন। সেইজন্য পুলিশ অফিসারদের হুকুমাব্যবহর দলের ক্যাপ্টেনকে গ্রেপ্তার করলে অহু-রূপভাবে প্রদীপবাবু দলের ক্যাপ্টেনকেও অপরাধ না থাকলেও গ্রেপ্তার করতে হতো।

১৯৭০-৭৪ সালে বর্তমান শহরে সরকারী মতে প্রায় সতের জন কংগ্রেসী যুবক কংগ্রেসীদের দলীয় কোন্ডলের শিকার হয়। কিন্তু বেসরকারী মতে প্রায় ৮৮ জন কংগ্রেস কর্মী খুন হয় কংগ্রেসীদের হাতে। তাছাড়া দলীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য এসেছে পাশের রাজ্য বিহার থেকে রাইফেল, রিভলবার, বন্দুক, জিপ প্রভৃতি সাজ সরঞ্জাম।

বর্তমান শহরে বিদ্রোহী হাঙ্গামার এই সময়ের খাতাপত্র যদি দেখা যায় তাহলে জানা যাবে যে ছুরি মারা; বোমা মারার ঘটনায় কত লোক আহত অথবা নিহত অবস্থায়। হাঙ্গামার কলবুকের খাতায় রেকর্ড হয়ে আছে এবং যে সমস্ত লোককে এই সমস্ত হাঙ্গামাতে ভতি করা হয়েছে তারা হয় হুকুমদার লোক না হয় প্রদীপদার লোক। তারপর দলের একজন কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা সাজানোর জন্য এক গ্রুপের লোকেরা, অল্প গ্রুপের লোকের মেয়ে, স্ত্রী অথবা অল্প কোন আত্মীয়কে বেপ করতেও ছাড়েনি। তার রেকর্ডও বর্তমানের কয়েকটি থানা এবং বর্তমান শহরের কয়েকজন ডাক্তারের কাছে স্বাক্ষর পাওয়া যাবে।

বর্তমানের পরেই নাম কাশীপুরের। এখানে প্রথমে শতকালি ঘোষ বনাম স্বরত মুখার্জীর দলের লোকের বিরুদ্ধে খুনোখুনি চলে। শেষের দিকে তা অজিত পাণ্ডা বনাম শত ঘোষ দাঁড়ায়। তবে কাশীপুর এলাকায় শতবাবু লোকের তুলনায় স্বরতবাবু এবং অজিতবাবুর সমর্থকদের বেশী মাঝে খেতে হয়েছে।

পুলিশ রেকর্ড বলে, বিশেষ করে শ্রীমধুসূদর, বটল্লা, জোড়াবাগান থানায় এই সময় যে সমস্ত কেস ডায়েরী রেকর্ড করা হয় তাতে দেখা যায় ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের গোড়ার দিকে কার্যত কংগ্রেসীদের ইন্টারনাল অপারেশনে স্বরত মুখার্জী বা অজিত পাণ্ডার সমর্থকরা হয় খুন হয়েছে না হয় আহত হয়েছে। আব জি করহানপাতালে বোমার আঘাতে এই সময় প্রায় শতাধিক লোককে অর্ধ-

মৃত অবস্থায় ভতি করা হয়। শতবাবু এখানে শক্তিমত্তা সব দিক থেকে। কংগ্রেসীদের এই দলীয় কোন্ডল দেখে কলকাতা পুলিশের জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসার চাকরী ছেড়ে দিয়ে অল্প চাকরীর সন্ধান করেছিলেন। কারণ ছদ্মবেশ ক্যাপ্টেন বিগ্রেডিয়ান আর হাবিলদার সামলাতে সামলাতে তাঁর প্রায় প্রাপ্য হয়েছিল।

কলকাতার পতিতালয়গুলির পতিতারাও এই সময় কংগ্রেসীদের দলীয় কোন্ডলের শিকার হয়েছে। যদি কোন পতিতা অমুক গ্রুপের কোন ক্যাপ্টেনকে বেশীপাতা দিতেন তাহলে অপর গ্রুপের ক্যাপ্টেন এসে তার ওপর হামলা করতো।

বালীগঞ্জ, রাসবিহারী, মুচিপাড়া, ট্যাংরা এই সমস্ত জায়গায়ও কংগ্রেসীদের দলীয় কোন্ডলের ফলে বেশ কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী প্রাণ হারায়। একমাত্র একটু ব্যতিক্রম ছিল কসবা ও তিলজলা এলাকায়। এখানে স্বরতবাবু এবং লক্ষ্মীবাবুর গ্রুপের লোকদের মধ্যে লড়াই সীমাবদ্ধ ছিল। লক্ষ্মীবাবুর গ্রুপে আছে বলে যারা এই এলাকায় নিজেদের দাবী করত তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল এই এলাকায় অপরিচিত। তবে মাঝে মাঝে এখানে বোমাবাজি হয়েছে। তিনজলা এবং কসবা থানার ও সিরী এই সময় লক্ষ্মীবাবুর চেয়ে স্বরতবাবুর কথার গুরুত্ব বেশী দিতেন। কারণ স্বরতবাবু ছিলেন মন্ত্রী আর লক্ষ্মীবাবু ছিলেন জীভার।

কংগ্রেসীদের দলীয় কোন্ডলের ফলে মহাকরণ থেকে দুজন মহিলাকে বিদায় নিতে হয়েছিল। কারণ এরা পশ্চিমবঙ্গের জমিদার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমদ্বার্ড রায়ের কুনজরে পড়েছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম জন ছিলেন সিদ্ধার্থবাবুর রাজনৈতিক সচিব শ্রীমতী সুপ্রিয়া সেনগুপ্ত। ইনি ছিলেন প্রিয় স্বরত গ্রুপের আস্থাভাজন। তাকে সিদ্ধার্থবাবু কোপে পড়ে বিদায় নিতে হয়। পরে রাজনৈতিক সচিব না হলেও রাজনৈতিক কাজ দেখা শোনা করতেন যিনি সেই শ্রীমতী মিষ্ট সিকদারও সিদ্ধার্থবাবুর কোপে পড়ে মহাকরণ থেকে বিদায় নেন। ইনিও প্রিয়-স্বরত গ্রুপের আস্থাভাজন ছিলেন। পরে এই দু'জনের জায়গায় যিনি আসেন তিনি স্বনামখ্যাত বিজ্ঞা সিন্ধা। অবশ্য কংগ্রেস দলের লোক ছিলেন না ইনি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে দুজন কংগ্রেসী মহিলা দলীয় কোন্ডলের শিকার হলেন তাদের কংগ্রেসের কোন নেতাই প্রোটেকশন দিলেন না।

গোসাবায় দুর্নীতি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মৃত নগেন্দ্র, সাং নারায়ণতলা লক্ষ্মীচাঁদ ক্যানিং তার প্রাপ্য ভাড়ার পরিবর্তে ১৫টি পাইপ আটকে রেখেছে। কাজেই গোসাবার জম্ব এক বছরের অহুমোদন থেকে মোট (২০০+৩০+১৫) ২৭৫টি পাইপের কোন হিসাবে রহস্যজনক ভাবে বি ডি ও তার ঠিকাদারদের কাছ থেকে নিলেন না।

নিখিলের প্রতিশ্রুতি। এই সব ঘটনায় একটি লোক মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে উলটো কথা এবং অপ্রকাশ্যে মহকুমা শাসক এবং জেলা শাসককে উড়ো চিঠি দিয়ে বি ডি ওর বিরোধভাজন হন। তিনি সাব অ্যানিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীহরত ভট্টাচার্য। বি ডি ও নিখিল চক্রবর্তী এবারে একে-টি করার তালে থাকেন এবং কাজ শুরু করেন প্রথমে গরহাজিরের অভিযোগে তার ১৫ দিনের মাইনে আটকে দিয়ে। অভিযোগটি যে মিথ্যা তার প্রথম প্রমাণ এই যে, স্বরতবাবু উপর মহলে আবেদন করলে মাইনেটা তিনি দিতে পথ পান না। দ্বিতীয়ত তিনি বসিরহাটেই থাকেন কাজেই অফিসে কে উপস্থিত হয় বা না হয় দেখবেন কী করে? এরপরে তিনি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং পেটোয়া লোকদের দিয়ে ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ২৪ পরগণার এম ও পি-ডি মহাশয়ের চেম্বারে বসে কতকগুলি কেস সাজান। মুখ্য বাস্তকার তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই ২০।৭।৭৬ তারিখ থেকে তাকে সাসপেন্ড করেছেন। তাকে যে চার্জশীট দেওয়া হয়েছে তা পড়ে লোকে হাসবে কি কাদবে আমরা জানি না। মামলাটি আমরা বিভাগীয় মন্ত্রিমহাশয়কে উপহার দিচ্ছি।

শিক্ষিত ভদ্র-স্তান মুখ্য বাস্তকার শ্রীহর্গামোহন মুখোপাধ্যায়কে আমার ছোট একটি প্রশ্ন: নিয়োগকর্তা হিসেবে আপনি নিশ্চয়ই ভট্টাচার্যকে সাময়িক বরখাস্ত বা চাকুরিচ্যুত করতে পারেন ষেট কারণ থাকলে। কিন্তু যুনের আসামীও তো আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পায়। তা কি আপনারা ভদ্রনোককে দিয়েছেন? অভিযোগপত্রটি কি আপনি পড়ে দেখেছেন? অফিসের হেড ক্লার্ক এবং গ্রামদেবক যদি সমাজস্বিরোধী হয় তাহলে তারা আজো সেখানে বহাল তবিয়তে আছে কি করে? আর জুলাই ১৯৭৬ এর মামলা আজ সোবা বহরেও ফয়সালা হল না বিচারের এই বিলম্ব কি অবিচারের নাশকত নয়? তার জন্য আপনি নিশ্চয় কি নৈতিক ভাবে দায়ী নন?

২৮শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টা

মহা জাত সন্দেশ

সিগাই মিউজিক

রচনা : মধু গোস্বামী

সুপ : প পতি ভট্টাচার্য

নির্দেশনা ও অভিনয়ে

শান্তি গোপাল

হলে টিকিট

প্রযোজনায়

তরুণ অপর

৫৫-৭১২১

এখনও বেপারোয়া তেল চুরি চোরাকারবার পুলিশের সঙ্গে বন্দোবস্ত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্যের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন মহল ছুট ব্যাচিং জয়েল নিয়ে ব্যাপক চোরাকারবারের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন। এই মহলের রক্তব্য—রাজ্যের এই চোরাকারবার অবিলম্বে বন্ধ না হলে গোটা চটশিল্পই এক বিপর্যয়ের মুখে গিয়ে দাঁড়াবে।

জে, বি, ও নিয়ে বেপারোয়া চোরাকারবারের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেছেন পুলিশ, মিল অফিসার ও সমাজবিরোধীদের যোগসাজ্জে এই কারবার এখনও অব্যাহত। বিভিন্ন ঘাঁটিতে তেল নিয়ে বজ্জাতি যথারীতি চলছে। মুখ্যমন্ত্রী যেন পুলিশ দপ্তরকে দিয়ে চোরাই তেলের গোড়াউল্লুগুলি অবিলম্বে শীল করে দেন। কিংবা সেখানে পুলিশ মোতায়েন করেন।

এদিকে দর্পণের খবর হল বিভিন্ন থানা কর্তৃপক্ষ ও সি, আই, ডি সহ বিভিন্ন দপ্তরের সংগে চোরাকারবারীদের আর্থিক লেনদেন মারফৎ এখনও জে, বি, ও পাচার হচ্ছে। এব্যাপারে নতুন কয়েকটা ঘাঁটির সন্ধানও পাওয়া গেছে। টালীগঞ্জ ইটখোলের তারা, ধর্মতলার জগন্নাথ দাস, কাকিনাড়ার ভিকু সাউ, স্ট্যাণ্ড রোডের শিউনারায়ণ পালোয়ান, রামলাল আগরওয়াল, হাওড়ার বনোয়ারিলাল, ইন্ডিয়া এক্সচেন্জ প্রেসের ওমপ্রকাশ প্রমুখ

এ ব্যরসা যাতে বন্ধ না হয় সেজন্য কতিপয় পুলিশ অফিসারের সংগে বৈঠকও করেছেন বলে প্রকাশ। সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে যে রেলখরিদা স্টেট ট্রান্সপোর্ট গ্যারান্টির কাছে একটি কাচের কারখানার তেতরে হাজার হাজার জে, বি, ও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এই ঘাঁটি থেকে এখনও ব্যরসা চলেছে। এই এলাকায় নন্দলাল সাউ, অধিকা সিং, রায় সিং, উকিল সিং, কালু সিং প্রমুখ এই বিরাট চোরাই ঘাঁটিটি চালাচ্ছে। শুধু তাই নয় জানা গেছে, দিল্লী রোডের রাধেকান্ত, বেণুলাল দুবে, শেখ মুসাক, শালকিয়ার চন্দিকা সিং, মেদিনীপুরের রায়াকুমাণ পুলিশের সংগে রক্ষা করে জয়েল ট্রান্সকার থেকে প্রতিদিন প্রতিরাতে হাজার হাজার লিটার তেল রের করে নিচ্ছে।

আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো গত ১৫ই সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুর থানা এলাকায় ঘুড়াঙ্গার এক চোরাই ঘাঁটিতে এই থানার জনৈক অফিসারকে সমলবলে মৃত্যুপান করতেও দেখা যায়। অফিসারটির সংগে ওয়ারল্যাস ভ্যান ছিল। রাত প্রায় ১২টার সময় ওয়ারল্যাস মারফৎ তাঁকে বারবার ডেকে পাঠান হচ্ছিল। দেখা যায় মৃত্যুপানে বিভোর অফিসারটি তার সহযোগী মারফৎ ওয়ারলেসে অসত্য

খবর দিয়ে যাচ্ছেন। এই ঘাঁটিতে বেশ কয়েকজন নামকরা জে, বি, ও চোরাকারবারীর সংগে শলাপসামর্থ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওয়ারলেসে বার বার তিনি বলে যান আমরা কাজে ব্যস্ত—আচ্ছা এখনি যাচ্ছি। এই যখন অবস্থা তখন অপরাধিকে খবর পাওয়া যায়—সি, ই, ডি দপ্তরের জনৈক কর্মী জে, বি, ও চোরাকারবারীদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করছেন। প্রত্যেক ঘাঁটিতে গিয়েই কর্মীটি ওপরওয়ালা কর্মীদের নামে মোটা টাকার ঘুষ আদায় করছেন। জানা যায় জি, বি ও পাচারের একজন প্রধান পাণ্ডা কাকিনাড়ার ভিকু সাউ, খড়দার রাধুপাথ সাউ, গিরনাথ সাউ ইতিমধ্যেই পুলিশের হাতে প্রচুর টাকা দিয়ে একটা 'বন্দোবস্ত' করে নিয়েছে।

সঞ্জয়কে খোশামোদ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জান বিতরণ বা কোন কোন কলম লেখকের সরকার বিরোধী সমালোচনা—এ সমস্তই ধান্দারাজী। দ্বারে পড়লে ডিগবাজী খেতে এদের জুড়ি ভূ-ভারতে নেই। ইন্দিরাকে গুলি করে আনন্দবাজারের স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসবে আনার জন্ত এরা নিজেদের প্রকাশিত রণজিৎ রায়ের 'দি এ্যাগনি অব ওয়েস্টবেঙ্গল' (প্রথম সংস্করণ) পুস্তকটি বাজার থেকে উধাও করে দিয়েছিল। সঞ্জয় পশ্চিমবঙ্গে এলে আনন্দবাজার কয়েকটি স্মৃতি-মূলক লেখা, বিস্তারিত সংবাদ এবং গোটা দশেক ছবি ছেপেছিল।

পিয়ারলেস কর্তৃপক্ষের জেদ

আলোচনায় বসতেও রাজ নয়

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পিয়ারলেস কর্মীদের আন্দোলন এখনও চলছে। মালিক পক্ষ অপপ্রচার চালিয়েও তাঁদের মনোবল ভাঙতে পারছে না। কিন্তু ওয়ার্কার-রাও এই আন্দোলনে সামিল। ইতিমধ্যে লেবার কমিশনার বিরোধী মীমাংসা সম্পর্কে আলোচনার জন্ত মালিকপক্ষ কয়েকবার ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু তার আলোচনায় বসতে রাজী নয়, তাই প্রম. দপ্তরে হাজির হয়নি। এ থেকেই মালিকদের মনোভাব পরিষ্কার। তারা বেপারোয়া ও বণ্ণেচ্ছাবে কোম্পানীর কাজ কারবার চালাতে অভ্যস্ত। পিয়ারলেস এমগ্রীজ ইউনিয়ন ১৯৭৪ সাল থেকেই কর্মীদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক ইউনিয়ন এবং ১৫ শতাংশ কর্মী এর সদস্য। অথচ পিয়ারলেস কর্তৃপক্ষের মনোভাব এমনই মধ্যযুগীয় যে, ইউনিয়নের স্বীকৃতি দেওয়া দূরের কথা, আজ পর্যন্ত বহু চিঠিপত্র লিখে সৌজন্যের খাতিরেও ইউনিয়ন কোন উত্তর পায়নি। ১৯৭৫ সালে আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার পূর্ণ স্বযোগ নিয়ে কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের নেতা ও সক্রিয় কর্মীদের ওপর চাঁটাই বদলী ও নানা রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়।

ইউনিয়নের বর্তমান আন্দোলন কর্তৃপক্ষের এই অনমনীয়, জেদী মনো-

ভাব এবং কর্মচারী স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের বিকল্পে। তাদের দাবী: চাঁটাই নেতা ও কর্মীদের পুনর্বহাল, বদলী আদেশ প্রত্যাহার, শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অবসান, বর্তমান অসম্পূর্ণ সার্ভিস রুলের পরিবর্তে নতুন ও পূর্ণাঙ্গ সার্ভিস রুল প্রবর্তন, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়ার মীমাংসা এবং ইদানীং যে সব নেতা ও কর্মীকে শুধুমাত্র ইউনিয়ন সংগঠিত করার অপরাধে জন্মভাষে অভিযুক্ত করা হয়েছে সেগুলি প্রত্যাহার।

সি আই টি ইউরপশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীমোহনরায় এক বিবৃতিতে পিয়ারলেস কর্মীদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আশা প্রকাশ করেছেন যে, কর্তৃপক্ষ বর্তমান সম্ভাব আলোচনার মাধ্যমে কর্মচারীদের সঙ্গে বিরোধের মীমাংসা করবেন। সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীহরাম চক্রবর্তী এম এল এ এবং গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি শ্রীদীনেশ মজুমদার এম এল এও এক যুক্ত বিবৃতিতে পিয়ারলেস কর্মীদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার আশা প্রকাশ করেছেন।

রেল পুলিশের অমানুষিক ব্যবহার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান গঙ্গা রেলস্টেশনে কিছুদিন আগে চারজন রেলওয়ে পুলিশ গণপ্রহারে আহত হন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ওই দিন বিকালে ৩৩২নং ডাউন গঙ্গা প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিতে বিনা টিকিটের ব্যাহারওয়া থেকে দুজন বালক আসছিল। বালক দুইটির বাড়ী সামসেরগঞ্জ থানার গাজীনগরে। মাঝপথে সাঁকোপাড়া হলটে স্পেশাল চেকিং শুরু হলে চারজন রেল পুলিশ ওই কামরায় ওঠে। তারা বিনা টিকিটে যাওয়ার জন্ত বালক দুটির কাছে ২৫ টাকা দাবী করে এবং টাকা না দিতে পারলে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেবে বলে শাসায়। তারা তাদের টাকা দিতে অক্ষম হলে রেলওয়ে পুলিশরা দুজন বালকের মধ্যে মনোরুল ইসলাম (তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র) নামে একজন বালককে

সাঁকোপাড়া ও ধুলিয়ান গঙ্গা স্টেশনের মাঝামাঝি বাগমারি সেতুর কাছে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। তাকে ফেলে দিতে দেখে তার সঙ্গে বালক নরুল ইসলাম (চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র) ভয়ে স্বাক্ষরদেব মধ্যে আশ্রয় নিয়ে সমস্ত প্রকাশ করে দেয়। ট্রেনটি ধুলিয়ান গঙ্গা স্টেশনে থামলে ওই ট্রেনের স্বাক্ষর এবং জনতা লাইন অবরোধ করেন। রেলওয়ে পুলিশদের কাছে জনতা কার ছক্কে চলন্ত ট্রেন থেকে বালকটিকে ফেলা হল জানতে চাইলে ওই চারজনের পুলিশ দলটি বলে 'আমাদের ইচ্ছা হয়েছে ফেলেছি। তখন উত্তেজিত জনতার সঙ্গে তাদের হাতাহাতি শুরু হয়। তারপর জনতা ওই পুলিশ দলটিকে গণপ্রহার দেন। খবর পেয়ে সামসেরগঞ্জ পুলিশের হস্তক্ষেপে অবস্থা আয়ত্তে আসে। ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া বালকটিকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার করা হয়।

নিজেকে রঙীন ও প্রাণবন্ত করে তুলতে

এন, টি, সি-র

কাপড়

পুরুন

শুষ্ক সস্তা বা টেকসই বলেই নয়, বাহারেও এন, টি, সি-র কাপড়ের জুড়ি নেই।

আমাদের শো-রুমে ও নিজস্ব দোকানগুলোতে

সুটিং, সাটিং, ধুতি, শাড়ী, মার্কিন, পপলিন সবই পাবেন।

আরও পাবেন মনমাতানো ও বলমলে সব পদার কাপড় ও বিছানার চাদর।

ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন

(পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা লিমিটেড)

৭, জগদলাল নেহেরু রোড

কলিকাতা-৭০০০১৩

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২০১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৩১ মট লেন কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

কসমস ক্লাবের সঙ্গে খেলার টিকিট নিয়ে গণ্ডগোল করেছেন মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শুক্রবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ভাতার প্রবেশ। দু'জনের হাতে হয়েছে এমন সময় সাউথ ক্লাবে গোছা গোছা ১৫৫ ও ৬০ টাকার মোহনবাগান তথা ভারতের এক টিকিট। বিলি শুক হল এবং উপস্থিত বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় ও তাঁর (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

দর্পণ

বিংশ বর্ষ ৥ ৩৬শ সংখ্যা ৥ শুক্রবার ৩০শে সেপ্টেম্বর, ৭৭ ৥ ৪০ পয়সা

বন্ধিত্বের বিরুদ্ধে তদন্তের নেপথ্যে চরণ সিং ও উদ্দেশ্য রাজনৈতিক

(দর্পণের সংবাদদাতা)

“পর্যায়গত লক্ষ টাকা আয়কর ফাঁকি দিয়ে বিজু পট্টনায়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য, শুধু তাই নয়, কেন্দ্রে ওড়িশা রাজনীতির একমাত্র মুখপাত্র। অথচ আমার ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী ওড়িশা ভিজিল্যান্সকে নিয়ে সার্চ করানো হলো শুধু রাজনৈতিক আক্রোশ মেটানোর জন্ত।” কথাগুলো নন্দিনী শতপথী প্রধান-মন্ত্রী মোরারজী দেশাইকে বলেছেন কোভের সঙ্গে।

নন্দিনী প্রধানমন্ত্রীকে আরও বলেন, রাজ্য সরকারের আমার বিরুদ্ধে যদি তদন্ত করার পরিকল্পনা ছিল, তবে আমার বিদেশ সফরের শেষেই তা করা যেতে পারত। প্রধান-মন্ত্রীও এ ব্যাপারে তাঁর অসন্তোষের (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

সত্যনারায়ণপন্থী নকশালরা জনতা পার্টিকে সন্তুষ্ট রাখতে চান

(বিশেষ সংবাদদাতা)

লোকসভা নির্বাচনের পর একটি সংশ্লিষ্ট যারা সি পি আই (এম, এল) সত্যনারায়ণ গোঙ্গী নামে পরিচিত জনতা পার্টিকে সন্তুষ্ট রাখার নীতি গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বন্দীমুক্তি ও স্বাধীনতা প্রসঙ্গটি আয়োজিত বিভিন্ন জনসভায় এদের নেতা বিধানসভা সদস্য সন্তোষ রাণার বক্তব্য থেকে এই মতই পরিস্ফুট হয়েছে। অবশ্য নকশালপন্থী মহলের এদের বিরোধীদের ধারণা যে সত্য-নারায়ণ সিং-এর সঙ্গে চরণ সিং-এর

এক “গোপন বোঝাপড়া”র ফলে এই অবস্থা উদ্ভূত হয়েছে। এখানে মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছেন শ্রীকৃষ্ণকান্ত। বলা বাহুল্য এই কৃষ্ণকান্তের বাড়ীতেই সত্যনারায়ণ সিং-এর আশ্রয়স্থল এবং শোনা যাচ্ছে এখানেই সি পি আই (এম-এল) গোঙ্গীর কেন্দ্রীয় কমিটির অফিসও খোলা হবে। (শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

লক্ষ্মী বম্বর বাড়ি গাড়ি ও কুকুরের হিসেব

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কিভাবে কংগ্রেসী জামানায় কিছু কিছু কংগ্রেস নেতা নিঃস্ব থেকে প্রচুর সম্পদ গড়ে তুলছেন তা ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে।

এন এল সি সি-র কর্ণধার লক্ষ্মী-কান্ত বম্বর আজ প্রচুর সম্পদের মালিক। কিন্তু এমনটা ছিল না। সামান্য বেতনে কাজ করতেন একটা কারখানায়। কোনরকমে দিন কাটত। প্রাচুর্যের কোন স্থান ছিল না জীবনে।

এলো ১৯৭১-৭২-এর রাজনীতির টালমাটাল দিনগুলো। অজ্ঞাত-অব্যাত লক্ষ্মী বম্বর রাতারাতি কংগ্রেস রাজনীতির প্রথম সারিতে চলে এলেন। আর এই সুবাদে আসতে লাগল প্রচুর অর্থ নানা স্বত্ব থেকে।

কালিনায় লক্ষ্মীবাবুদের একটা পৈতৃক বাড়ী ছিল। সেই বাড়ী ডিম

পাড়তে পাড়তে এখন চার পাঁচটায় দাঁড়িয়েছে। শ্রামপ্রসাদ মুখার্জী রোডে ভাইপো পার্থ বোসের নামে একটা ফ্ল্যাট কেনা হয়েছে। ২বি, সাহানগর রোডে লক্ষ্মীবাবুর নিজের নামে। ৭নং হাজী মহসীন রোডে মাসিক ৩২৫ টাকা ভাড়া। চেতলায় সি আই টি ফ্ল্যাট যার মাসিক ভাড়া ৬০০ টাকা। আনুমানিক ৭২০০০ টাকায় ভাইপো পার্থর নামে হিমালয় কো-অপারেটিভের ১১ তল ফ্ল্যাট।

এ তো গেল বাড়ীর হিসেব। এবার গাড়ীর হিসেব। বেনামে লক্ষ্মীবাবুর কাছে মোট ৬টি গাড়ী আছে। কোন-টার আবার ট্যাক্স টোকেন বা রু বুক নেই। ডবলু বি, এস ১৯৭২ প্রলয় বাগচির নামে, ডবলু জিকে ৫৪১ আর্থ বেকারীর মালিকের নামে, ডবলু এম এ ৪০৬৫ প্রদেশ কংগ্রেসের নামে (র বুক নেই), ডবলু বি.এফ

১ অতীক ব্যানার্জীর নামে, ডবলু এম সি ৫১৩৩ ভারতীয় যুব উদ্যোগের নামে, আর ডবলু আর এস ১০৪২ (শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

মহাজাতি সদনে

৩০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা আটা

১লা অক্টোবর সন্ধ্যা আটা



২রা অক্টোবর (রবি) সন্ধ্যা আটা
পঃ বঃ সরকার আয়োজিত
যাত্রা উৎসবে
(রবীন্দ্রসদনের পশ্চিম দিকের
ময়দানে)



হলে ও মণ্ডপে টিকিট

পরিবেশনায়



পঃ বঃ সরকার আয়োজিত
যাত্রা উৎসবে

হ্যামলেট

৫ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ

ভারতীয় নৃত্যের প্রাণপুরুষ

হীরেন চক্রবর্তী

বেশ পরিপাতি বয়সেই চলে গেলেন নটরাজ উদয়শঙ্কর। সেদিক থেকে ফোড়ের কোন কারণ নেই। বরং যে বিশেষ নৃত্য-আন্দোলনের নেতৃত্বে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তত্পর্যন্ত কোন নর্তক গোষ্ঠী বা সেই ধারাবাহিক অংশীদার ও প্রচারকারী কোন শিক্ষায়তন যে তিনি গড়ে যেতে পারলেন না সেটাই বেশী দুঃখের। ১৯৩৯ সনে প্রতিষ্ঠিত আলমোড়ার কৃষ্ণকেন্দ্র ভেঙ্গে গিয়েছিল তাঁর নিজের অনভিজ্ঞতা এবং অদূরদর্শিতার জন্ত। ময়মনসিংহ শহরে ১৯৪১ সনে তাঁর দলের নৃত্য-কলার সঙ্গে যখন চারুধর পরিচয় বর্তমান লেখক তখন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। যে দলে অল্পদৈর্ঘ্যের সঙ্গে সিমকি এবং স্বর্গত আলাউদ্দিন ছিলেন। আর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ৬৪ দশকে কলকাতার নিউ এম্পায়ারে আবার সদলে শঙ্করের দেখা পেয়েছিলাম। কিন্তু তখন না ছিলেন সিমকি বা উজ্জ্বলজোহরা, না ছিলেন আলাউদ্দিন বা বিষ্ণুদাস শিরালি। বৃন্দ-বাহনের পরিচালক তখন কমলেশ মৈত্র।

পরবর্তী ২০ বছরে রামায়ণ ছায়া-নাট্য, সামান্য ক্ষতি, প্রকৃতি ও আনন্দ এবং শঙ্করস্বপ্ন উপহার দেওয়া সত্ত্বেও যে শঙ্করকে পেয়েছিলাম রীতিমত অক্ষ লাইফ, ম্যান অ্যাণ্ড মেশিন, লেবার অ্যাণ্ড মেশিন ইত্যাদি নৃত্য রচনায়—সে মৌলিক স্রষ্টার পুনরাবির্ভাব আর ঘটল না। বস্তুত 'কল্লনা'-র সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কল্লনার এবং স্বজনের স্রোত যেন শুকিয়ে গেল।

উদয়শঙ্কর বিরজু মহারাজ বা বাঁজী সরস্বতীর মত একজন প্রথাসিদ্ধ নৃত্যের প্রতিষ্ঠা ছিলেন না। তাঁর নৃত্যে ভরতনাট্যম, কথক, কাথাকালি, মণিপুরী এবং লোকনৃত্যের মিশ্রণ ছিল বটে কিন্তু একক নর্তক হিসেবে কোনটাতেই তিনি উল্লিখিত-দের সমান পারদর্শিতা দাবি করতে পারতেন না। তিনি ছিলেন এ থেকে আলাদা জাতের এক নৃত্য-শিল্পী, এক সম্পূর্ণ নৃত্য ও স্বতন্ত্র নৃত্য-রীতির রূপবন্ধের স্রষ্টা—ভারতের নৃত্য যা আগে ছিল না, তার নাম নাট্যনৃত্য বা ব্যালে। ভারতীয় নৃত্যের প্রথাগত পারস্পর্য-প্রদর্শনে তাঁর উৎসাহ ছিল না। তিনি আগ্রহী ছিলেন ব্যালের মাধ্যমে ভারতীয় নৃত্য-ঐতিহ্যকে লোকচক্ষুর সম্মুখীন করাতে। এ জন্ত ইন্দুনাথ, কার্তিকেশ্বর, হরপার্বতী প্রভৃতি

পৌরাণিক বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে লেবর অ্যাণ্ড মেশিন-এর মত সমকালীন সামাজিক সমস্যাতেও তিনি নৃত্যের বিষয়ীভূত করেছিলেন। এর কিছুটা 'কল্লনা'-র অন্তর্ভুক্ত।

এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় যন্ত্রের সাহায্যে তিনি পুরোদস্তুর অর্কেস্ট্রা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন আলাউদ্দিন খাঁ এবং তিমিরবরপের সহায়তায়। প্রথাগত নৃত্য বা নৃত্যের সঙ্গে এখানেই তাঁর নাট্য নৃত্যের যুগলত পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ যে হিসাবে ভারতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি, উদয়শঙ্করের নৃত্যও তাই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তার সমাজ ও কালচেতনা। তাঁর নৃত্য রচনা ভূত ভারতের প্রথাগত নৃত্যসম্ভার আত্মগত করেও বর্তমান জীবনের সমালোচনা এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহ। কিন্তু কৃত্রিমি তাঁর কোন রাজনৈতিক স্লোগান কর্তৃ-বিদার ঘটাত না—এমনই নান্দনিক প্রত্যয়ে সংযত।

বলা বাহুল্য, এই উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশের কাছে গমন করেছেন যেমন রবীন্দ্রনাথ করেছেন যুরোপের রোমান্টিক সাহিত্যের কাছে। শঙ্করের উপরে পাশ্চাত্য ব্যালের প্রভাব অনায়াসদৃষ্ট।

ভারতীয় নৃত্য যে কালে নির্বিশেষ বিষয়ের এবং রসের সেকালে শঙ্কর তাঁর নৃত্যে বিশেষ রস এবং বিষয়ের উত্থাপন এবং পরিবেশন করেছেন। দেশাত্মবোধ তো বটেই এমন কি এক ধরনের সমাজবাদী চেতনাও তাঁর নৃত্যে দেখা গিয়েছিল। নৃত্যের মাধ্যমে তিনি ভারতের মর্ম-কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন যা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তাঁর কাব্য, নাটক এবং সংগীতে। নতুবা ভারতনাট্যম, কথক বা কাথাকালি কোনটারই তিনি ওস্তাদ নাচিয়ে ছিলেন বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথও একই সময়ে একই নিরীক্ষা করছিলেন তাঁর নৃত্যনাট্য-গুলির মাধ্যমে। কিন্তু তখন তাঁর বয়স ষাটের উপর; তা ছাড়া ভারতের প্রায়োগিক নৃত্য সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল না। তবু প্রাণী শিল্পবোধ এবং বহিরাগত নৃত্যবিদ ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যে তিনি শাস্তিনিকেতনী নৃত্যের স্বরূপটি করেন। শঙ্কর সে তুলনায় অনেক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে, উভয়ের উপরেই পাশ্চাত্য ব্যালের প্রভাব ক্রিয়ামূল ছিল।

গীতিরচনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আপেক্ষিক পক্ষপাত হেতু তাঁর ব্যালে গীতিনৃত্যের রূপ পেয়েছে। কিন্তু শঙ্করের ব্যালে সত্যিকারের ব্যালে—তার উপরে গানের, গুরুশাই-গিরি নেই।

বহির্বিষে শঙ্কর যে কালে আলোড়ন সৃষ্টি করে ভারতীয় নৃত্যের স্বীকৃতি কেড়ে এনেছিলেন সারা বিশ্বে উপনিবেশবাদ তখন জয়-জয়মাটি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে শঙ্করের ভূমিকা ছিল ভারতের সাংস্কৃতিক দূতের মত। তা আজকের দিনের মত অত সহজসাধ্য ছিল না। নতুন ভারতীয় নৃত্যের উদ্গাতা শঙ্কর।

কিন্তু দুঃখের বিষয় শঙ্করের সঙ্গে সঙ্গেই সে সৃষ্টির পথ কষ্ট হয়ে গেছে মনে হয়। তাঁর ভাই শচীনশঙ্কর ছাড়া আর কেউ এ পথে কোন সত্যিকারের চেষ্টা করেন নি। যদিও প্রতিভা গুণায় গুণায় জন্মায় না, তবু যুরো-আমেরিকার সমকালীন ব্যালে-সম্পর্কিত নিরীক্ষার কাছে আমাদের প্রশ্ন্যসকে গোপদ বললেও বেশী বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ-নজ-কলের পরে যেমন সত্যিকারের গীতিকার হয় নি, শঙ্করের পরে তেমনি হয় নি কোন সত্যিকারের ব্যালে স্রষ্টা। দেশবাসী এই কারণে উদয়শঙ্করকে আরো বেশী করে মনে রাখবেন।

নিষিদ্ধ পত্রপত্রিকা প্রদর্শনী ইত্যাদি

আগামী ৩রা থেকে ৯ই অক্টোবর কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে জরুরী অবস্থা কালে প্রকাশিত প্রচারপত্র, পুস্তিকা, কার্টুন, পত্রিকার এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। এইসব ছাড়াও ঐ সময় নিষিদ্ধ করা রবীন্দ্রসঙ্গীত ও সেনসর কর্তৃক ছাটাই করা সংবাদের প্রকৃষ্ট প্রদর্শন ও প্রসারের ব্যবস্থা করা হবে। ৩রা অক্টোবর প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী জি.জি. ফার্মাগুজ। যাদের কাছে ঐ সময়ে নিষিদ্ধ করা দেশ বিদেশের পত্রিকা, প্রচারপত্র, চিঠিপত্র আছে তাঁরা দয়া করে প্রদর্শনীতে রাখার জন্ত সেগুলি দিলে প্রদর্শনীটি আরও তথ্যসমৃদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক হয়। সব কিছুই প্রদর্শনীর পর তাঁদের ফেরৎ দেওয়া হবে। নীচের ঠিকানায় এগুলি পাঠান বা দিয়ে আসুন।

(১) কমিটি ফর একজিবিসন অফ

সত্যনারায়ণপন্থী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই বক্তব্যের সমর্থনে আরো জোরালো যুক্তি পাওয়া যাবে, গত ২১-২২শে আগস্ট দিল্লীতে আয়োজিত পিপলস ইউনিয়ন অব সিজিল জিবার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলনে এই গোষ্ঠীর বিভিন্ন নেতার বক্তব্য অনুধাবন করলে। এখানে সম্ভাব্য রাণা তীর্থ ভাষায় আক্রমণ করেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকারকে। তিনি বলেন জনতা সরকার বন্দীমুক্তির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে তো কোন বাধা সৃষ্টি করছেন না, তাহলে কেন তারা বন্দীমুক্তির ব্যাপারে দেরী করছেন? এই দেরী হওয়াটা নাকি বামফ্রন্ট সরকারের ইচ্ছাকৃত।

কৃষ্ণকান্ত সত্যনারায়ণ/সিং-এর পিঠ চাপড়াতেই তিনি কৃষ্ণকান্তকে জড়িয়ে ধরলেন সবার সামনেই। মাইকে নাম ঘোষণা হতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে জনতা সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গেই। এখন একে রক্ষা করতে হবে। তাই এমনি এক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যেখানে কেবলমাত্র জনতা পার্টিই তাতে থাকবে না, এমনকি "কংগ্রেসের প্রগতিশীল" অংশকেও সংগে নিতে হবে। সত্যনারায়ণ সিং বোধহয় ভুলে গেছেন একসময়-সি পি আই এই কথা বলত। এবং এই জাতীয় "প্রগতিশীলতা" খোঁজার জন্ত তার অবস্থা আজ কোথায়।

জনতা পার্টির নেতা চন্দ্রশেখর বক্তৃতা দিতে উঠে বলেন, চারজন নকশাল যখন একজায়গায় আসতে পারেনা, সময়তাবলম্বী হতে পারেনা তখন তাদের "লম্বা-চওড়া" কথা বলা উচিত নয়। আসলে চন্দ্রশেখরজী চান সমস্ত নকশালরা তাদের পেটোয়া সত্যনারায়ণ সিংদের সঙ্গে চলে আসুক। কিন্তু জনতা পার্টির লেজুড়বৃত্তি করে সত্যনারায়ণ সিংদের লাভ কি? লাভ আছে। আগামী কয়েকমাসের মধ্যে আসাম, অন্ধ্র, কেরালায় বিধানসভার নির্বাচন হতে চলেছে। এইসময়ে তারা বেশ কয়েকটি রাজ্যে প্রার্থীও দিতে চান। যেমন অন্ধ্র সম্ভবতঃ চন্দ্রপোলা রেড্ডী প্রার্থী হচ্ছেন। তাই এরা চাইছেন জনতাব সঙ্গে সমঝোতা করে যদি আরো একটা দুটো আসন পাওয়া যায়। এদের সঙ্গে ক্যানিং স্ট্রিট (চতুর্থতল) কলি-১, (২) নিরানী রেইরেট, রাসবিহারী এতিহ্য (গডিহায়াটের কাছে), (৩) কলকাতা-১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-২

যোগ দিচ্ছেন নকশালদের আর একটি অংশ। এরা হল ইউনিটি কমিটি সি পি আই (এম-এল)। এখন এরা বলছেন আমরা দুটি ভাই ভাই। সত্যনারায়ণদের মুখপত্র "জনযুদ্ধ" এই দুই সংগঠনের এক যৌথ বিবৃতিও প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে সমস্ত ভুলত্রুটি সম্বোধন করার থেকে একমুখে কাজ করবেন। আসলে এদের নেতা ভাস্কর নন্দী সম্ভবতঃ আদাম থেকে প্রার্থী হতে চান।

এই কারণে জনতাকে সন্তুষ্ট করতে এরা বন্ধপরিকর। এদের মুখপত্রে কেবলমাত্র বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিবোধগার। আর এরা সোচ্চার অজ্ঞের সরকারের বিরুদ্ধে, যেখানে কংগ্রেস ক্ষমতায়। এই সমস্ত কাজ-কর্ম চালানোর এদের টাকাপয়সারও অভাব হচ্ছেনা। সম্ভ্রতি দিল্লীতে মার্কিন মূলক থেকে এক ট্রান্সপিরেই বুদ্ধিজীবী এসেছিলেন। তিনি সত্যনারায়ণ সিংদের বেশ কিছু টাকা দেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

সত্যনারায়ণপন্থীরা তাই বন্দী-মুক্তি কমিটির অভ্যন্তরেও চাপ সৃষ্টি করছেন। তারা চাপ দিচ্ছেন যেন এখন বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়। কমিটির মধ্যে এই নিয়ে তীব্র মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। কমিটির কেউ কেউ মনে করেন লোকসভা নির্বাচনের পর জনতা সরকার নকশালপন্থীদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত "হীন মনোভাব" গ্রহণ করেছেন। তারা সত্যনারায়ণ সিংদের দিয়ে পরোক্ষভাবে মুচলেকা আদায় করতে চাইছেন। তাই আন্দোলন হওয়া উচিত জনতা সরকারের বিরুদ্ধে এবং আয়লাতাত্ত্বিক ডিলেমির বিরুদ্ধে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য সত্যনারায়ণ সিংরা স্বীকার করেছেন তাদের বন্দী মুক্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত তুল ছিল (জনযুদ্ধ, ৫ম বুলেটিন)। অবশ্য এম যথোচিত ব্যাখ্যা তারা দেননি আর সত্যনারায়ণ সিংপন্থী নকশাল ক্যাডাররা তা জানেন না, বোধহয় সত্যনারায়ণজী জানেন।

(দর্পণের প্রতিবিম্ব)

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠার)

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দানিকেন তত্ত্বের আলোকে মহাভারতের সৃষ্টি ও দেবতা বিরোধিতা

“আমরা সামান্য নারী”

স্বর্বেশ্বা হিসেবে যতই কেননা বিজ্ঞাপিত হয়ে থাকুন, উর্বশী নিজেই স্বীকার করেন, তিনিসামান্য নারী। আর বস্তুত তিনি তাই-ই। তাঁর মধ্যে এমন কোনো বিশেষ চমৎকারিত্ব নেই যা তাকে কোনও ভাবে কোনো রকম আলোকসামান্য স্বর্গীয় মহিমা দান করতে পারে।

“মম্বথশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া” “পৃথুনিতস্থিনী” উর্বশী “স্বীয় নিবাস হইতে বহির্গত হইয়া পার্শ্ব-ভবনান্তিমুখে গমন করিতে লাগিল।”

“সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী দিবা চন্দন চর্চিত বিলোল হারাবলিলিত, পীনোন্নত পয়োধরযুগল বিকম্পিত হওয়াতে পদে পদে নমিতাক্ষী হইয়া গমন করিতে লাগিল। তাহার ত্রিবলী দাম মনোহর কটিদেশের কি অনির্বচনীয় শোভা! তাহার গিরিবর-বিস্তীর্ণ রজতরশনারচিত নিতম্ব যেন মম্বথের আবাসস্থান; স্তম্ভ বসনারূত অনিন্দনীয় তদীয় জঁখন নিরীক্ষণে ঋগিগণেরও চিত্তবিকার জন্মে; ...একে তো সেই সুর-সুন্দরী সহ-জেই মদোন্মত্তা, তাহাতে আবার পরি-মিত সুরাপানে প্রৱলচিত্ত...” (রন, ৫০)।

বর্ণনাটি যে কোনো উত্তরদেশীয় সুন্দরী মদালসারই হতে পারে। একমাত্র ‘নিতম্বের’ গুণগানেই মহাভারতীয় চরিত্রটি ধরা পড়ে। মহাভারতে ‘নিতম্বের’ প্রশংসা নারীর প্রতি তৎকালীন ও তৎকালীন কল্পিত-মেন্ট। বলা বাহুল্য, কবি স্বর্বেশ্বার ক্ষেত্রেও সমান প্রশংসাসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। স্বর্গীয় চরিত্র হিসেবে উর্বশীর ক্ষেত্রে অন্তত কোনো বিশেষ-বর্ণ প্রযুক্ত হয়নি।

কিন্তু তাও বড় কথা নয়। লক্ষ্যীয় এই যে, সাধারণ কামার্তা রমণীর মতো মিত-সুরাপানের পর তিনি পৃথাপ্রভু অর্জুনের পার্বত্য শিবিরে চলেছেন আসক্ত স্বপ্ন লালসায় সর্বদা শিহরণ জাগিয়ে। ঘটনাটির মধ্যে অলৌকিকতার স্পর্শমাত্র নেই। সাধারণ রক্তমাংসের নারীরূপেই ধরা দেন উর্বশী। তাকে স্বর্বেশ্বা হিসেবে স্বতন্ত্রভাবে আর দেখা যায় না।

স্বর্গ ও মর্ত একাকারে মিশে যায়। আমরা বুঝি, এক্ষেত্রেও আমাদের সিদ্ধান্ত সঠিক পথেই চলেছে। তিনু গ্রহের বুদ্ধিমান জীবগণ আমাদের মতই মম্বথ শরীরধারী। তাঁদের সঙ্গে আগত নারীরাও পার্শ্ব নারীর সকল গুণসম্পন্ন। তাই, যেমন দেবতা নামক নভঃচরণ পার্শ্ব নারীর সঙ্গে যৌনসঙ্গমেসেকালে তৃপ্ত হয়েছিলেন, তেমনিই মহাকাশচারিণী রমণীও ছিলে এই গোলকের পুরুষ-গণের অঙ্গশায়িনী হওয়ার জন্য উন্মুখ।

প্রাচীন পুঁথিপত্রে দেব (নভঃচর) মানব যৌনমিলনের কথা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। পুরাকালে মানুষের কোনো কোনো বংশ দেব ঔরসে সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবি করা হয় প্রায় সকল প্রাচীন পুঁথিতে বর্ণিত প্রাগৈতিহাসিক কাহিনীগুলির মধ্যে। সর্বত্র প্রাপ্ত একই তথ্যাদি আঙ্গকের চিন্তাবিদগণের বিশেষ প্রশ্রাবনার কারণ। সেই সব বিবরণকে তাঁরা নেহাৎ গাল-গল্প বলে আঙ্গ খুব সহ-জেই উড়িয়ে দিতে পারছেন না, আবার স্বর্গীয় দেবতাদের মর্ত লীলা বলেও এসব গল্পকে মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

ঘটনাক্রমবিচারে আঙ্গকের গবেষক ও ভাবুরা পুরা-পুঁথি-বর্ণিত দেব-মানব মিলনকাহিনীগুলিকে ব্যাখ্যা করছেন খুবই বুদ্ধিগ্রাহ তর্কের দ্বারা। তাঁরা বলছেন, দেবতা সঙ্গে এই গোলকে একদিন ধারা ভয় ও ভক্তির আসনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁরাই মর্তের নরনারীর সঙ্গে দেবার যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেন। তুখাকথিত দেব-ঔরসে এই ভাবেই মানুষের কয়েকটি বংশধারা ও গোত্রাদির সৃষ্টি হয়। মহাকাশ বিজ্ঞানের আলোকে দেবতাদের নয়া ব্যাখ্যা এমনিভাবে ধরা পড়ার আগে কিন্তু আমরা অবাক হয়ে প্রাচীন পুঁথির গল্পগুলিকে হেঁয়ালি ও অবা-স্তব ভেবেছি। মহাভারত খুলে একে অন্যভাবে প্রসঙ্গ করেছি মহাভারতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্মপরিচিতির মধ্যে উদ্ভূত গোলমাল লক্ষ্য করে। পাণ্ডব-দেব-ঔরসে কুন্তীগর্ভে জন্ম রহস্য-

মাত্রই থেকে গেছে। যখন ঐতিহাসিকগণ প্রায় একমত হয়ে বলছেন, কুরুক্ষেত্রে একটি যুদ্ধ বস্তুতই হয়েছিল এবং তা ঐতিহাসিক, তখনও আমরা তা মেনে নিতে পারছি না। পারছি না শুধু এই ভেবেই যে, তা কী কবে সম্ভব? পাণ্ডবরা দেবতার সন্তান একথা কোন বুদ্ধি যুক্তি দিয়ে মেনে নেওয়া যায়?

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা বাস্তবপক্ষে পাণ্ডবদের মাধ্যমে লড়লেন নেপথ্য-চারী দেবতারা এটাই বা সম্ভব কী করে? ওসবই কবি কল্পনা, গাঙ্গা, উদ্ভট চিন্তা।

কিন্তু আগের আলোচনাগুলিতে তথাকথিত ঐ দেবগণের স্বরূপ আমরা নানাভাবে বিচার করে নানান তথ্যাবলীর সাহায্যে দেখাতে পেরেছি যে বস্তুত দেবতা একটি নাম। মানুষের তৎকালীন বিশ্বয় এই নামে গ্রহাস্তর থেকে আগত নভঃচরদের পূজা নিবেদন করে। সেই নভঃচরণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মহাকাশযানে চেপে অবতরণ করেন এবং কোথাও দেবতা কোথাও বা ‘ঈশ্বর পুত্র’ কপে নিজে-দেব প্রতিষ্ঠিত করেন। এই গোলকে তাঁরা এক বা একাধিকবার এসে-ছিলেন আন্তর্নাক্ত্রিক জীবন ও জগৎ সম্পর্কে গবেষণার জন্য। (একথা কশ পদার্থবিদ ম্যাটেরিট আগারেস্টের) কিন্তু পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্কে বিজড়িত হয়ে পড়তে হয় তাঁদের। যুদ্ধ, সন্ধি, মধ্য ও যৌন সম্পর্কের মতো জৈবিক ব্যাপারগুলিও এড়াতে পারেন না তাঁরা। গ্রহাস্তর-বাসী মহাকাশচারী যেমন মানবী গর্ভে জাত মানব পুত্রের পিতৃ লাভ করেন (পাণ্ডব পিতা ইন্দ্রাদি দেবগণ) তেমনিই মহাকাশচারিণী রমণীগণ গর্ভিনী হয়েছেন পৃথিবীপৃষ্ঠের ঔরসে (যেমন শকুন্তলা জননী মেনকা এবং ভীষ্মজননী গঙ্গা, যদিও গঙ্গা স্বর্বেশ্বা ছিলেন না)। এসবই বুদ্ধিগ্রাহ ব্যাপার। এই স্ত্রীর ব্যাখ্যা পুরা-পুঁথির বিবরণগুলিকে আর হেঁয়ালীর পর্যায়ে ফেলে রাখে না, সরাসরি তারা প্রাগৈতিহাসিক যুগের গোপন ইতিহাসটির সন্ধান দেয়। কুরুক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিষয় বলে মনে

নেওয়া যে প্রধান বাধা ও ধোঁকা তাও অপসারিত হয়।
উর্বশী ছিলেন তেমনিই এক মহাকাশচারিণী স্বর্বেশ্বা। আন্তর্নাক্ত্রিক শিবিরের এক প্রভু ইন্দ্র তাকে নিয়োগ করলেন মিত্রপক্ষীয় পাণ্ডব পক্ষের রাজপ্রতিনিধি পার্থকে পরিতুষ্ট করার জন্য। মানবপুত্রের সঙ্গে যৌন মিলনের অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য উর্বশীও হলেন উদগ্রীব।

তৎকালীন মহাকাশচারিণীরা যে মানবপুত্র অপছন্দ করতেন না এ সম্পর্কে তার একটি কাহিনী উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্ববর্তী আলোচনায় উল্লেখিত গিলগামেশ পুঁথিতে লিপিবদ্ধ আছে, স্বমেরীয় উককপতি গিলগামেশের প্রতি যুদ্ধ হয়ে দেবী ইশতার (যুদ্ধ ও প্রেমের দেবী) গিলগামেশকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করেছিলেন। উর্বশীও অর্জুনকে পতিত্ব বরণ করতে চেয়েছেন। গঙ্গা রাজা শাক্তুর/অঙ্কশায়িনী হয়ে বেশ কিছুকাল তাঁর ভোগবাসনা পূর্ণ কবে গেছেন। এখানে বিবাহ বা পতিরূপে আত্মীয় যৌন-মিলনের আকাঙ্ক্ষাকেই ইঙ্গিত করে। এঁরা কেউ সংসার করার মানসে এই পতিত্ব কামনা করেন নি। উর্বশী তাঁর আকর্ষণীয় দেহ বিভ্রম দেখিয়েছিলেন আর দেবী ইশতার গিলগামেশকে প্রলুব্ধ করেছিলেন উপটৌকন প্রদানের লোভ দেখিয়ে। পুঁথির বর্ণনা এই রকম:

Come, Gilgamesh, be thou
my lover!
Do but grant me of thy
fruit,
Thou shall be my husband,
and I will be thy wife.

এই আত্মীয়ের সঙ্গে ইশতার এক লম্বা তালিকা হাজির করেছেন উপটৌকনের, যা তৎকালে বস্তুত লোভনীয় সম্পদ। [উঃ: Near Eastern Mythology, Gray, p. 43]।

বাইবেলের আদি পুস্তকে ঈশ্বরপুত্র বা ‘সম্ম অবাদি গড’ এর সঙ্গে পৃথিবী-নারীদের যৌনসন্ধির কথা বিবৃত আছে সদাপ্রভুর মুখঃনিযত বাণীতে। ইতিপূর্বে ইজেকিয়েল-দেখা মহাকাশযান প্রসঙ্গে সদাপ্রভুকে আমরা মহাকাশচারী অধিনায়কের চেহারায় দেখেছি এবং তাঁর সেই ‘ঈশ্বরপুত্র’কে তাঁরই মহাকাশচারী সঙ্গী ও রক্ষী বলেই বুঝতে চেষ্টা করেছি। বুঝিয়েছেন খ্রীষ্টীয়ক ফন দানিকেন। সদাপ্রভুর রক্ষীরা এই গোলকে যথেষ্ট যৌনজীভা, করে গেছেন।

বাইবেলের বয়ানে ঈশ্বরপুত্রদের এই ক্রিয়াকলাপের কথা বলা হয়েছে এইভাবে, “...যখন ভূমণ্ডলে মম্বথদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও অনেক অনেক কন্তা জন্মিল, তখন ঈশ্বরের পুত্রেরা মম্বথদের কন্তাগণকে সুন্দরী দেখিয়া বাহার বাহাকে ইচ্ছা সে তাহাকে বিবাহ করিতে লাগিল।... তৎকালে পৃথিবীতে মহাবীরগণ ছিল এবং তৎপরেও ঈশ্বরের পুত্রেরা মম্বথদের কন্তাদের কাছে গমন করিলে তাহাদের গর্ভে সন্তান জন্মিল, তাহারাই সেকালের প্রসিদ্ধ-বীর।” (আদি, ৬/১-৫)। এ শুধু বাইবেলীয় বাণীই নয়, মহাভারতীয় কাহিনীও বটে। দেবপুত্র বলেই তৎকালে পাণ্ডবরা বীর, তাঁরা রিজ্ঞানে অগ্রসর গ্রহাস্তরবাসী দেবতাদের কাছে পেয়ে-ছিলেন অপরাজেয় রথ ও অস্ত্র। মহাবীর হিসাবে মাত্র লাভ করে-ছিলেন ভীষ্ম, কর্ণ প্রমুখ।

দানিকেনের ব্যাখ্যা; পুরা পুঁথিগুলির মধ্যে গবেষকের দৃষ্টিতে দৃকপাত ও অতি ‘আধুনিক মহাকাশবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকদের অহুম্যে ও আলোচ্য বিষয়গুলি উর্বশীর সামান্য নারী চেহারাকে নক্ষত্রলোকবাসিনী রক্তমাংসের শরীর বলেই গণ্য করবে এবিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

হিমালয়-স্বর্গে সেই বিলাসিনীর কথাই বলা হয়েছে। তাঁর দেহবস্ত্রীয় বর্ণনাও অত্যন্ত নারীরই সমতুল। স্বতরাং অর্জুনের স্বর্গবাস এক পার্শ্ব স্বর্গে স্বধবাস ছাড়া অন্য কিছু নয়। যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ কাল্পনিক। সে কথা পবে।

(চলবে)

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

৥ চাঁদার হার ৥

বার্ষিক ২২ টাকা

ষাণ্মাসিক ১১ টাকা

জৈমিনিক, ৫.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র

পাঠাবার ঠিকানা:

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, মট স্টেশন। কলিকাতা ১৩

নয়া চীনের নারী সমাজ

ইন্দিরা বসু

‘পুরুষ নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ’ এই যে ২০০০ বছরের পুরনো ধারণা তার অসত্যতা প্রমাণ করেছে নতুন চীনের নারী সমাজ। মুক্তির পরে গত ২৫ বছর ধরে আধা উপনিবেশিক আধা সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা থেকে বর্তমান চীনের সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে চীনের নারী সমাজ পুরুষের সঙ্গে সমান দায়িত্ব বহন করে এসেছেন। মুক্তির আগে অগণিত নারী শিক্ষার কোন সুযোগই পাননি, তাদের অজ্ঞতার জন্ত মন ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সমাজে এবং গৃহে তারা ছিল নির্ধাতী, নিপীড়িত। সমাজে তাদের কোন স্থান ছিল না এবং গৃহেও কোন অধিকার ছিল না—অন্তর আদেশ পালন, গৃহস্থালীর কাজ করা ও শিশুপালন এই ছিল তাদের কাজ। পুরুষদের মত প্রাচীন সমাজে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও দেশের প্রতিজ্ঞাশীলদের হাতে অনেক উৎপীড়ন সহ করতে হয়েছে। পিতামাতা বা স্বামীর আদেশ মত চলতে হতো, তাদের নিজস্ব সত্তা বলে কিছু ছিল না। শিশু জন্মাবার পরেও তার পা বেঁধে ছোট করে রাখা হতো। এ ছিল উদ্বেগজনক রীতি যাতে শত অত্যাচারেও তাড়াতাড়ি পালাতে না পারে। সমাজে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল, তাই বিবাহ ক্ষেত্রে পিতামাতা মেয়েকে প্রয়োজনে দ্রব্য সামগ্রীর মত বেচা কেনা করতো। তারাই পাত্র ঠিক করতো, পাত্রীর মতামতের কোন প্রশ্নই উঠতো না। বাড়ীতে স্বামীই সর্বো-সর্বা তাই গৃহে নারীর স্থান খুব অসম্মানজনক ছিল। যে যুগে বড় বড় জমিদার ও ধনী ব্যক্তিদেরই সমাজে প্রাধান্য ছিল। তারা গরীব গৃহস্থের মেয়েদের ক্রীতদাসী হিসাবে কিনে নিত বা পিতার স্বর্ণশোখে অসমর্থতার জন্ত মেয়েদের জোর করে নিয়ে নিত; কখন কখনও তাদের খেয়ালখুশীমত ভোগের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করতো। রাজনীতির ক্ষেত্রে বা সামাজিক কোন অঙ্কুরে তারা যোগ দিতে পারতো না। নারী সমাজের যখন অসম্মানজনক অবস্থা তখন শে এলো জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং কয়েক বছরের ব্যব-ধানে এল গৃহযুদ্ধ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যুগে চীনের কিছু সংখ্যক শিক্ষিত

নারী ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দেশ ও সমাজের মঙ্গলের কাজে হাত দিলেন, অনেক নারী সংগঠন গড়ে তুললেন। এদের মধ্যে গরীব মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলার সংখ্যা নগণ্য ছিল। জাপানী আক্রমণ যখন দেশে এলো তখন চীনের নারী সমাজের কিছুটা চেতনা জাগলো কারণ প্রাণভয়ে, সম্মান-হানির ভয়ে তাকে অনেক সময় পালাতে হয়েছে গ্রাম ছেড়ে ঘর ছেড়ে—তার আহাৰ বিহার আশ্র-রক্ষা সবই তার নিজের প্রচেষ্টায় হয়েছিল কারণ পুরুষেরা অনেকেই আক্রমণ রোধ করতে নান্না, কাজে নিযুক্ত ছিল। দেশে বা সমাজে কোন নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল না। মেয়েরাও শত্রু আক্রমণ রোধ করার কাজে লেগে গেল। এর পরেই এলো বিপ্লব। বিপ্লব যখন এলো তখন অনেক শ্রমিক কৃষক মহিলা বিপ্লবের কাজে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। এ রকম একদল মহিলার সন্ধান মেলে লং মার্চের (Long march) সময়। “শ্রমিক কৃষক লাল বাহিনী” যেটা ছিল তাতে অনেক মহিলা ছিলেন। কিন্তু অস্ববিধা দাঁড়াল মধ্যবিত্ত পরি-বারের মহিলাদের। মধ্যবিত্তরা চিরকালই একটু রক্ষণশীল। অনেক কিছু বুঝেও মন থেকে সংস্কার কেড়ে ফেলতে পারে না।

এ বিষয়ে একটা ছোট গল্প বলছি। ক্যান্টনের কাছে কোন এক পরিবারের ছেলে যোগ দিয়েছিল গেরিলা বাহিনীতে আর তার স্ত্রী ও পরিবারের অত্যাচারী ছিল বাড়ীতে। ছেলে কাজ করছে—তাল কাজ করছে এ ধারণা মায়ের আছে কিন্তু বাড়ীর বৌ কোন সভা সমিতিতে যোগ দেবে তা মেনে পারছেন না। এ তাদের কল্পনার অতীত। বিপ্লবের কাজে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের নামান বড়ই কষ্টসাধ্য ছিল। সহজে তাদের মন সংস্কার মুক্ত করা যায় না। মহিলা সমিতির কর্মীরা বার বার এই পরি-বারের সাহায্য সহায়তা চেয়েছে, নানা আন্দোলনে প্রতিবারেই শান্তাঙ্গী এদের সঙ্গে অসম্মানবাহার করেছেন, পুত্রবধূকে ছাড়েননি। শেষে তারা অস্ত পশা নিল। প্রতি-দিন একজন কর্মী এই বাড়ীতে এসে শান্তাঙ্গীকে তার কাজে এটা ওটা সাহায্য করতে লাগলো এবং প্রতি-বাদ না করে তার মতামত শুনতে লাগলো। কিছুদিন পরে বৃদ্ধির মন ভিজলো আর এই মেয়েটির

উপর ভাল ধারণা হলো। হযোগ বুঝে কর্মীটি বিপ্লবের পক্ষে একটু আধটু বলতে শুরু করলো এবং বোঝাতে লাগলো যে পরিবারের ছেলে যখন কাজে যোগ দিয়েছে তখন অত্যাচারের তার কাজে সাহায্য করা উচিত। একদিন বৌকে এক সমিতিতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলো আর বৃদ্ধী মত দিয়ে দিল। এটা যে কেবল একটিমাত্র পরিবারের বেলাই সত্য তা নয়, অধিকাংশ পরিবারের এই অবস্থাই ছিল।

নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর নারী সমাজ সমিতির মাধ্যমে একদিকে যেমন তাদের সমাজে অধিকারের জন্ত দাবী জানাতে লাগলেন অপর দিকে সমাজতন্ত্র গঠনে তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে নারীসমাজকে দৃষ্টান্ত করে দিতে লাগলেন। কিছু সংখ্যক মহিলা রাজনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্ভূত হয়ে পার্টিতে যোগ দেন। চীনের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী সমাজ—এদের শক্তি যদি অবহেলা করা হয় তবে এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে না ভেবে সরকার ও পার্টি তাদের সাদরে গ্রহণ করে কাজে লাগালো। মহিলারা সর্ব-ক্ষেত্রে পুরুষের সমান সম্মান কাজ করে চললো, বিতায় বুদ্ধিতে তারা কোন অংশেই পুরুষদের থেকে কম নয়। সমাজতন্ত্র গঠন কাজে তারা সর্বতোভাবে সাহায্য করতে লাগলো। মাও বলেছিলেন যে নারী সমাজের মুক্তি না হলে সমাজ-তন্ত্রের বনিয়াদ শক্ত হবে না। এই মুক্তির জন্ত কিছু কিছু পশা অবলম্বন করা হলো আর সঙ্গে সঙ্গে পুনরো আইন রহিত করে নতুন আইন হ’লো যাতে বিবাহে পাত্রপাত্রীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হলো। ১৯৫০ সালে জীবন বীমা আইনে নারী ও শিশুদের স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হলো। কো-অপারেটিভ যখন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন কৃষিতে ছেলেদের সাহায্যের জন্ত দলে দলে মেয়ে এসে যোগ দিল, বিশেষ করে বীজ বপন ও শস্ত তোলার সময় কারণ এ সময়ই কাজ বেশী থাকে। স্বামী বা পিতার হায়ে বিনা বেতনে তাদের কাজ করতে হলো না। ১৯৫৩ সালে ঘোষণা করা হলো যে সমান কাজে নারী পুরুষ সমান পারিশ্রমিক পাবে।

শহরে ও গ্রামে মেয়েরা ঘর ছেড়ে আপনাকেই উৎপাদনের কাজে এসে যোগ দিল—তাতে তাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা এলো এবং রাজ-নীতির ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে তারা সমান অধিকার পেল। আইন করে মেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়া হলো। দেশ গঠনের কাজে যখন দিকে দিকে সাড়া পড়ে গেল তখন অনেক মহিলা (তাদের মধ্যে গৃহিনীর সংখ্যাই বেশী) ঘর ছেড়ে বাইরে এসে পাড়ার কল কারখানায় কাজ নিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নিজেদের সামান্য সঞ্চয় নিয়ে এবং অত্যাচার কারখানার সাহায্য নিয়ে ছোট ছোট কারখানা গড়ে তুললেন—যেমন পিকিংয়ের ট্রানজিষ্টারের যন্ত্রপাতির ও চশমার কাঁচের কারখানা। এগুলি এমন ক্রমে ক্রমে কলেরবে ও গুণগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চীনের নারী যখন সব বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার পেল তখন পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সব কাজ করে চললো। কিছু কিছু কাজ আছে যা মেয়েদের শারীরিক গঠনের জন্ত করার অস্ববিধা আছে। সেগুলি বাদ দিলে কোন কাজেই তারা পিছিয়ে পড়ে নেই। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সব ক্ষেত্রেরই তাদের অবদান আছে।

আজ চীনে মহিলারা সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান—তাচাই, তাম্বিন প্রভৃতি আদর্শমানীয় প্রতিষ্ঠানেও মহিলাদের সংখ্যা নগণ্য নয়। ১৯৬৩ সালে তাচাইয়ে কো-কেঙ্গ-লিনের নেতৃত্বে একটি টিম গঠন করা হয়—টিমের নাম আয়রণ গার্লস টিম। আজ সেই নেত্রীই ‘রিগেড পার্টির সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব পালন করছেন। লিনসেন কাউন্সিলে যে পাহাড়ে, হুডুং কেটে জল আনা হয়েছে (Red Flag canal) তাতে পাথর কাটা, পুল তৈরী করা, ছোট নালি তৈরী করা সবটাইই মহিলারা পুরুষের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছে। আজকাল মেয়েদের মধ্যে অনেক দক্ষ কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ও শিক্ষকও আছেন। অনেকে তারি ট্রাক ও ক্রেন চালাচ্ছেন, এমন কি বেসামরিক বিমান বিভাগেও মহিলারা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মিলিসিয়া বাহিনীতেও তারা দলে দলে যোগ দিয়েছেন। স্থানীয় বিপ্লবী কমিটির সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক ও রেল বিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত মহিলাদের সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ

ঘটেছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে মহিলা-দের অবদান সবচেয়ে বেশী। গ্রামের কৃষি প্রতিষ্ঠান ও শহরের ফ্যাক্টরিতে শিশু ও মাতৃ মঙ্গল বিভাগে এরাই সংখ্যায় বেশী। বিশেষ করে ‘নাকা পায়ে ডাক্তার’ তো শহরে, গ্রামে, গঞ্জে সর্বত্র ছেয়ে আছে।

ক্রমে, কিংগারগটেন, শিশু ও মহিলা চিকিৎসা বিভাগে এবং ক্যান্টনগুলিতে মেয়েদের এক-চেটিয়া অধিকার বলে মনে হয়। সামাজিক বন্ধন ও পারিবারিক বাতাকলের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি পেয়ে সব ক্ষেত্রেই তারা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। “নারী অর্ধেক আকাশ কাঁধে বয়ে চলে” নতুন চীনের এই প্রচলিত উক্তি যেকোন সত্য তা নারী সমাজ আজ সর্বতোভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন।

অসংস্কৃতি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সংস্কৃতি ব্যাপারটাই জনগণ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাক। সাহ-গন মুক্ত হবার আগে ভিয়েতনাম থেকে একদল প্রতিনিধি এসেছিলেন। আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, সাহগনে কি ধরনের সিনেমা চলে। তারা বলেছিলেন যে সেখানে যে সব রু কিস্ম চলে তার দর্শক শুধু আমে-রিকান সৈনিকেরা এবং কিছু Luna-tic, তাহলেই বুকুন ওখানে অপ-সংস্কৃতি কি রকম জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। আমরাও চাই আমাদের দেশে অপসংস্কৃতিকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে। তাহলে আপনা থেকেই সব বন্ধ হয়ে যাবে। তবে মিছিল বিক্ষোভ করা যেতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা বিতর্কের মাধ্যমে জনমত সংগঠিত করতে চাইছি। জনমত সংগঠিত হলে-অন্ত পন্থার কথা ভাবা যাবে।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, “বার-বধূর অসীম চক্রবর্তীকে আমি বলেছি, আপনি তো রবীন্দ্রনাথ করেছেন আবার বারবধুও করেছেন। আপনি ভালই জানেন কোনটা সাদা কোনটা কালো, তা আপনি এ রকম করছেন কেন?”

গ্রন্থ সমালোচনা

বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য আলোচনা

অরুণা হালদার

ডঃ জীর্ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ' (প্রকাশক : আশা প্রকাশনী, ৪৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। দাম : কুড়ি টাকা।) পড়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছি। আঙ্গকের দিনে বিভ্রান্ত 'মাহুষের মিছিলে' বহু বুদ্ধিজীবীরই কঠিন সঙ্কট দেখা দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে একাংশ অন্ততঃ এই বইয়ের দ্বারা চিন্তনের নতুন বিষয় পাবেন—হয়ত বিভ্রান্তির কিছু আংশিক সমাধানও পাবেন বলে মনে করি।

ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্বনামধন্য চিকিৎসক-মনোবৈজ্ঞানিক। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় ব্রিটিশ স্কুল-ভুক্ত মনোবিজ্ঞানী নন। তিনি এদেশে পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান-চর্চার প্রবর্তক-গবেষক এটিই তাঁর মূল পরিচয়।

মনোবিজ্ঞানী ফ্রেড ও পাভলভ প্রায় একই সময়কার লোক। উভয়েই স্বাধীন বিশেষজ্ঞ হিসাবে, দক্ষ চিকিৎসক হিসাবে জীবনায়ত্ত করেন। ফ্রেড ক্রমশঃ তাঁর প্রবর্তিত মুক্তাঙ্ক-যুক্ত পদ্ধতি দ্বারা মনোব্যাপির উৎস অহুসন্ধান ও চিকিৎসা করতে থাকেন। নিঃসন্দেহ যে তাঁর প্রবর্তিত চিকিৎসাপদ্ধতি তাঁর হাতে কিছু অসুস্থ ও মনোবিকার সম্পন্ন রোগীর সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু অনেকাংশেই পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সে বিজ্ঞা যাচাই করা যায় নি বলে গেটা এক-রূপ ফলিত মনোবিজ্ঞানের অপরিণীত তথ্য বা empirical truthই আমাদের দিতে পারে একথা বলা যায়। অপর পক্ষে পাভলভ ক্রমশঃ Every Psychosis has got a Néurosis এই সত্যকে তথ্যনিষ্ঠ ও পরীক্ষিত প্রতিষ্ঠায় রূপায়িত করে তোলেন। পাভলভীয় তত্ত্ব এখন আর অপরিণীত তত্ত্বকাল নয়, অন্ততঃ যে কোনও বিজ্ঞানের মতই তা পরীক্ষা নির্ভর। আর সেই পরীক্ষার একটা বৃহদংশের মধ্যে পড়ে মাহুষ এবং তার সমাজ, সংসার, তার শিল্প সংস্কৃতি, মনন ও স্বপ্ন সব কিছু। ইহা বিজ্ঞান আবার চিকিৎসা বিজ্ঞানও বটে। তার ফলিত রূপ থাকবেই। সেই ফলিত রূপের মধ্যে রোগনির্ণয় ও রোগমুক্তি (Diagnosis ও Prognosis) দুইই বিচার্য। নির্গলিত অর্থে পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানেরই বিশাল প্রয়োগশালা এই মানব অধুষিত পৃথিবী। এইভাবে পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের অধুধ্যানে আমাদের কাছে ফ্রেডীয় চিকিৎসা

প্রণালীর ব্যর্থতা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যখন তা অচিকিৎসকের হাতে পরিচালিত হয় তখন সেটা অবৈজ্ঞানিক না হওয়ার স্বপক্ষে কোনও যুক্তিই আমরা পাই না। আমাদের দেশে অন্ততঃ এখন পর্যন্ত চিকিৎসক অচিকিৎসক উভয়বিধ ব্যক্তিই মনোব্যাপির চিকিৎসা করে থাকেন। সেই চিকিৎসা চিকিৎসক ও চিকিৎসিত ব্যক্তিদের উপস্থিতিও আমাদের সমাজে সংসারে রোগের মতই থেকে যায়।

পাভলভীয় বিজ্ঞান এখনও আমাদের দেশে নবাগত। তাই বটেই, অপরিচিতও বলা যায়। অথচ এ গ্রন্থের 'পটভূমি' হলো বিজ্ঞান এবং পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান। দ্বিতীয়ত, পাভলভের কর্মকাণ্ড মুখ্যতঃ সোভিয়েত ভূমিতে প্রসারিত হয়েছে। সাধারণ ভাবেই এদেশে এখনও বহু লোকের মনে সোভিয়েত তথ্য কমিউনিজম ও মার্কসিজম সম্বন্ধে একটি ভয় অথবা গোঁড়ামী আছে। বলা প্রয়োজন যে এই দুই প্রকার মনোভাবই অবৈজ্ঞানিক এবং অন্ততঃ সেজন্তই শিক্ষিত লোকের তা সমস্তে পরিশীলন দ্বারা পরিহার করা কর্তব্য। আলোচ্য গ্রন্থে এই চর্চা বা Ethics এর বৈজ্ঞানিক রূপটি কয়েকটি নিবন্ধের মধ্য দিয়ে লেখক পরিষ্কৃত করে তুলেছেন।

লেখকের আরও একটি বিশেষ দান হলো তরুণ মার্কসের দার্শনিক চিন্তাতত্ত্বকে বক্তব্যের মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তরুণ মার্কস ও পরিণত বয়স্ক মার্কসের রচনা দুই পর্যায়ের হলেও সে একই লোকের এবং এমন এক দার্শনিকের রচনা যে দার্শনিক তাঁর এই গভীর মনীষাকে নতুন পথে পরিচালিত না করলে তিনিই পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে হেগেলীয় দর্শনের পরে দর্শনের এক নবীন দিগন্তের দিশারী হয়ে প্রচলিত পথের সমান অর্থ ও প্রতিষ্ঠা সকলই পেতে পারতেন। তা তিনি করেননি স্বীয় বিবেকের সমর্থন পান নি বলে। গতাহুগতিক পথ ছেড়ে তাঁকে তাই নিজস্ব আদর্শের অভিসারে অভিযাত্রী হতে হয়েছে। সেই অভিযানের বিকাশের পথে প্রথম দেখা দিয়েছে, মানব সমাজের নানা বিক্ষেপ বিচ্যুতি এবং ব্যক্তি মানবের সর্বপ্রকার সম্ভাবিত বিকার—যার মোটামুটি নাম আমরা দেখছি বিচ্ছিন্নতা। আর উত্তর জীবনে এই আদর্শের অনন্ত পরিণতি

মার্কসীয় অর্থনীতি শাস্ত্র বা ক্যাপিটাল। আমরা প্রথমটিকে দেখতে পারি সমাজরোগের নির্ণয় বা Diagnosis হিসাবে, দ্বিতীয়টিকে দেখতে পারি Prognosis বা রোগ মুক্তি হিসাবে। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় স্বীয় রচনায় এই উভয়ের হুমসম্বন্ধ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তজ্জনিত বহু আন্তরিক সম্ভাব্য সমাধান দিয়েছেন।

ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় কেবলমাত্র গবেষক হিসাবেই, তথ্যই প্রকাশ করেন নি। তাঁর নেতিক দায়িত্ব-বোধ ও সমাজ সচেতনতা তাঁকে আধুনিকতম সমাজগুণের সম্মুখীন করেছে। মাহুষ পিতৃমাতৃ ক্রোড়ে জন্ম নেয়, স্বাভাবিক ভাবে সে সংসারে সমাজে বেড়ে ওঠে। এইভাবে আবার সে বিশ্বমানব সমাজেরও নাগরিক স্বীকার করে। প্রতি মাহুষের মধ্যেই এইরূপ বিকাশের একটা সংস্কারভূমি ও সম্ভাবনা থাকে। এজন্ত কোনও সমস্তাই শুধু এদেশের বা বিদেশের নয়। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় তাই এদেশের বা বিদেশের সমস্যাকে পৃথকরূপে দেখা-নোর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মূল ঐক্যেরও আলোচনা করেছেন। সমস্যার মূল কারণ যেমন সর্বাহুগত (Universal) তেমনই সর্বাহুগত হবে তার সম্ভবীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা। সেই পথেই সমস্যার সমাধানও পাওয়া যাবে। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, এদেশে ও বিদেশে সাম্প্রতিক 'বিচ্ছিন্নতা' সংক্রান্ত সমস্যাগুলি, চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে দৃশ্য ও শ্রব্য নাট্যকাব্যের মাধ্যমে আজ এই বিচ্ছিন্নতাকে আমরা দেখছি ও গ্রহণ করছি নিরঙ্কুশভাবে। দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি অদ্ভুত রসের সাহিত্যে ও শিল্পে। জন-মানব বিকৃত আনন্দ যুগে পাচ্ছে অস্থির অপরিণত (অথবা অপরিমিত) ঘোঁরাবেগের কবলীভূত ফিল্মে, নাট্যকাব্য অথবা গায়েরী খুন জখম হুল্লোড়ে সমন্বিত এক প্রকার দুর্দৃষ্টি-হীন তথাকথিত আন্দোলনের মধ্যে। এগুলিও ভাবিকার। হয় সে বিকার ব্যক্তি আশ্রিত অথবা তা সমষ্টির মধ্যে অহুসারিত। এরও একটু উপর দিকে উঠলে আমরা বুদ্ধিজীবীদের স্বভূমিতে আসি। সেখানে এই সমস্যার রূপ আরও জটিল আরও কঠিন। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় এই অতি কঠিন সমস্যাকেও আজ আমাদের

সামনে তুলে ধরে আমাদের রক্তজ্ঞতা সাজান হয়েছেন।

দার্শনিক, রিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও ক্রয়েভোত্তর যুগের বিশিষ্টতা লক্ষ্য করার মত। একদিকে প্রথম যুদ্ধোত্তর ইউরোপে ও আমেরিকায় যথাক্রমে সন্তোষদর্শন ও লজিক্যাল পজিটিভিসমের আবির্ভাব লক্ষ্য করার মত। এর আগে থাকতেই মার্কসবাদকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা চলে আসছিল। (দ্রষ্টব্য নিবন্ধ নং ৭—পৃঃ ১১০) পরেও সে ধারা এখনও অপ্রতিহত গতি। সমাজ-তাত্ত্বিক লেখকদের অনেকেই তাঁদের রচনায় ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন, যুদ্ধোত্তর সামাজিক চেতনার অবক্ষয়মান অস্বস্তা দিয়ে। এ প্রসঙ্গে ধারাবাহিক-ইতিহাসসম্মত আলোচনা ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় এত নিপুণভাবে করেছেন যে তাঁকে আমরা ইতিহাসের সুযোগ্য ছাত্রও বলতে পারি। অবশ্যই বুদ্ধিজীবীর বিপদ কাটিয়ে উঠতে হলে বা বুদ্ধির তাৎপর্যকে কাজে লাগাতে গেলে ইতিহাস প্রসঙ্গ মানতেই হবে। সেদিক দিয়ে হেগেল থেকে নিয়ে আজকের দিনের কামু সাজ পর্যন্ত তিনি বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে এগিয়ে এসেছেন। মনো-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কুস ও ম্যাকিন টায়ারের মতবাদেরও যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি এসকল লেখকের প্রভাব আজকের ভারতীয় ও বাঙ্গালী লেখকের মধ্যে লক্ষ্য করে তা নিয়ে আলোচনাও করছেন। এ স্থলে তাঁর বক্তব্য আমাদের পরিষ্কার করে বোকা দরকার। সম্ভবতঃ এই 'বিচ্ছিন্নতা'র অনেকখানিই এখন পর্যন্ত আমাদের দেশের লেখকদের মধ্যে ভিন্ন দেশীয় লেখক-দার্শনিকের প্রভাব জাত আম-দানী বা প্রতিধ্বনি। এখনও ঠিক এ 'বিচ্ছিন্নতা'র জন্ম এদেশের মাটিতে হয়নি। কারণ এদেশের মাটিতে এখনও এত বেশী ধনাত্মক ঘন পীড়া দেখা দেবার মত উত্তোষ ব্যাপার বা Industrialisation দেখা যায় নি। এই কথাটি অহুসাবনয়োগ্য। এবং সেই কারণেই হয়ত ক্ষীণ আশা করা যেতে পারে বিদেশগত ধনাত্মক অসঙ্গতির ফলজ্ঞানিত বিকার আমাদের দেশের মাটিতে নতুন ফসল ফেলাবে না।

কিন্তু এদেশের মাটিতেই কি বিকারের কম বীজ অন্তর্নিহিত হয়ে আছে? বিকারের বিক্ষোভ দেখা দেয়নি ঠিকই, কিন্তু অন্তর্ঘাত কপটতা হিংসা আত্মহুলনা কোনটা বা কম এদেশে? আর, এসবের অনেকখানি কারণ ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন আমাদের দেশের সংরক্ষণ-শীলতা ও ধর্মপরাজী মনোভাব দোষ-

দুষ্ট। অথচ ইদানীং বহু লেখক সমগ্রভাবে এই আত্মাত্মিক আ-সমীক্ষণ অথবা কোনও মার্মিক অহু-ভূতি অথবা আরও প্রত্যক্ষভাবে কোনও না কোনও ধর্মগুরুর পক্ষপৃষ্ঠে আশ্রয় নিয়ে ভূগু মনে সাহিত্যশিল্প সৃষ্টি করে চলেছেন। এ পথের উত্তরণ নিতান্তই যদি সম্ভব হয় তা হবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আরও বিপদের কথা বহলাংশে আমাদের রাজনৈতিক দল-গুলিও একই একটা ধর্মীয় আশ্রয় স্থলের রূপ নিচ্ছে। এদের মধ্যেও দেখা যাবে শুদ্ধ দলপুষ্টির জন্ত আগ্রহ, বুদ্ধি ও যুক্তিহীনতা, আদর্শবাদের অবচ্যুতি এবং পরমর্ভ অসহিষ্ণুতা। একপ মতবাদও প্রচার সাপেক্ষ এবং প্রচারের কলে টিকেও থাকে। কিন্তু তার একমাত্র আপেক্ষিক ফললাভ হয় এক রকমের ব্যর্থপন্থতা যা ক্ষয়িষ্ণু সমাজ জীবনেরই প্রত্যক্ষ ফল এবং সমাজ জীবনকে আরও অধিকতর ক্ষয়শীল করে তোলার জন্ত দায়ী।

ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় এ গ্রন্থে পর পর তিনটি প্রবন্ধে (পৃঃ ১৫৩—রবীন্দ্র-মানস বিশ্লেষণের ভূমিকা) রবীন্দ্র-রচনার কিয়দংশ অবলম্বনে রবীন্দ্র-মানবের একটা পর্যালোচনা করে-ছেন। তাঁর সামগ্রিকভাবে বিচ্ছিন্ন-তাঁর আত্মস্থ ইতিহাসের মধ্যে এ অংশটি একটি মূল্যবান গ্রন্থনা ও নতুন-তর অবলোকন। এদিক দিয়ে রবীন্দ্র-নাথের আলোচনা আর কেউ করে-ছেন বলে শুনি নি। এ মূল্যায়নে তিনি পথিকৃত। এ প্রসঙ্গে হয়ত মত-ভেদের অবকাশ আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে বিচ্ছিন্নতার আলোকে দেখার প্রয়াসের অভিনব আছ মানতেই হবে।

ডঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'ছাত্র-বিক্ষোভের মনস্তত্ত্ব' এবং 'শিক্ষা ও বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গে' ও 'তরুণ বিশ্ববীর পত্র' এই তিনটি নিবন্ধ প্রসঙ্গতঃ সম্পর্কিত। আধুনিক কালে তরুণ মানবের নিরবগুপ্তিত আত্মপ্রকাশকে কেবল মাত্র ভয়াবহ বা শোচনীয় না বলে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তার গতি ও প্রকৃতি নিরাকরণ করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে সমগ্র তরুণ সমাজের দাবী আজ, রথের রশ্মি তারাই তুলে নেবে। এই সত্ত্বজাগ্রত নব যুগশক্তি আর সমস্ত কিছু পহ-দলিত মথিত করে দিলেও এ পৃথিবী তাঁরা স্বজনাশ্বক কোনও সমাধানের সন্ধান দেয়নি। সে পথের সন্ধান তারা পেয়েছে কিনা তা আমরা জানি না। এখন পর্যন্ত যাচোখে পড়ে তা হলো ক্ষোভের বিক্ষোভ ও ধ্বংসের তাণ্ডব। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে দুই একটা সমা-ধনের কথা বলেছেন গ্রামস্কি ও মেসা- (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

খেলার টিকিট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সকলেই একগাথা করে পেলেন।

ওই দিনই সকাল থেকে সন্ধ্যা বিভিন্ন জেলার অফিসাররা কলকাতা চলে বেড়িয়েছেন তাদের প্রাপ্য টিকিটের জন্য। দুই ভুল্লোলকে তারা খুঁজছিলেন, একজন পূর্বমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী ও অপরজন জীড়া দপ্তরের প্রব সেন। শেষ অবধি এরা টিকিট পেয়েছিলেন কি না জানা নেই।

এবারে কসমস ক্লাব বনাম মোহন-বাগানের খেলার টিকিট নিয়ে যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তার সঙ্গে কংগ্রেসী আমলের ঘটনাবলীর খুব একটা তফাৎ নেই। এবং এর জন্ত দায়ী মোহনবাগানের কিছু আমলা ও যতীন চক্রবর্তী মহাশয়। শোনা গেছে রাজ্যের স্পোর্টস কাউন্সিলের প্রধান ও অ্যাডভোকেট জেনারেল জি.স্নেহান্ত আচার্য যতীন বাবুর আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং মুখ্য-মন্ত্রীকে তিনি এই ব্যাপারে তদন্ত করতে অনুরোধ করেছেন।

সব ব্যাপারটাই গোলমালে। আই, এক, একে বলা হল তারা পুরো টিকিট পাবে না যার ফলে লীগ চ্যাম্পিয়ন ইষ্টবেঙ্গলকে ৬৭টি টিকিট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হল। অথচ সাউথ ক্লাবে মোহনবাগানের তরফে টিকিট বিলি হল যার মানে প্রচুর টিকিট বাড়তি ছিল। এর হিসাব কে দেবে?

টিকিট যে বাড়তি ছিল তার আরও প্রমাণ আছে। খেলার আগের দিন সরকারের সব বিভাগীয় সচিবদের জানান হল যে তাঁদের দপ্তরের জন্ত টিকিট রাখা আছে এবং তাঁরা যেন জানান কার কত টিকিট লাগবে। এই ধরনের ঘটনা আগে ঘটে নি এবং অনেকেই ওই টিকিট নিতে অস্বীকার করেন। যেখানে টিকিটের এত হাহাকার সেখানে বদন্ততা কীভাবে সম্ভব হল?

যতীনবাবুর নামে অভিযোগ উঠেছে তিনি ২০০ টিকিট বিলি করেছেন। সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় তিনি বেশ কিছু টিকিট অন্তায় ভাবে বিলি করেছেন। একথা কি ভুল যে আনন্দবাজারের কিছু সাংবাদিক ব কাছে উপকৃত বলে ওই কাগজে বিধান সভার মন্তব্যের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের ওয়াক আউটের ধরন ছাপা হয় নি? কোন কারণে তিনি কলমস দল যে বাসে শহরে আসে তাতে শুধু আনন্দবাজারের একজন সাংবাদিকের জায়গা করে দেন?

বামফ্রন্ট বিরোধী আনন্দবাজারের সঙ্গে যতীনবাবুর এই মাথাপিছু পিছনে কি কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই?

আরও প্রশ্ন আছে। প্রেস কার্ড কথানা ছাপা হয়েছিল এবং কাদের মধ্যে বিলি হয়েছিল? খেলার দিন দেখা গেল এমন সব লোক কোটো-গ্রাফারদের কার্ড নিয়ে ঘুরছে যারা জীবনে কোন কাগজের অফিস দেখে নি। সংখ্যায় এরাই ছিল ভারী। যতীনবাবু কী এখানে তাঁর দায়িত্ব এড়াতে পারেন? এর ফলে কী সরকারের স্থানম বেড়েছে?

তারপর আছে যতীনবাবুর আচরণ। তিনি মন্ত্রী, না মোহন-বাগানের কর্মকর্তা। আকাশবাণীতে ভাষণকালে তিনি বারে বারে ক্লাবের সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেন। কোন মন্ত্রীর কি এটা করা উচিত? পেলের সাংবাদিক সম্মেলনেই বা তিনি মোড়লী করছিলেন কেন, ওটাতো মোহনবাগান ও কসমস ক্লাবের কর্মকর্তাদের ব্যাপার। খেলার দিনেও দেখা গেল অদ্ভুত দৃশ্য।

কলকাতা দূরদর্শন একটি বন্ধ অধিকার করে ছিল। সেখানে একটি বিদেশী টেলিভিশন টিম জায়গা পেল না, যতীন-বাবুকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও। তার বক্তব্য "কলকাতা টি, ভি ছাড়া আমি কিছু জানি না"। তাহলে কার্ড দিলেন কেন? আশ্চর্যের ব্যাপার অপর একটি বিদেশী টিম কিন্তু সেখানে জায়গা পেল যাদের সঙ্গে ছিলেন এক অসমীয়া মহিলা যার 'ব্যবসার' কথা অনেকেই জানেন। ইনি কী করে চুক্তিতে পারলেন মাঠে? এবং এই বিদেশী টিমই বা কী করে এর টিকিট যোগাড় করল? এর উত্তর কে দেবে? জীড়া সাংবাদিকদের কার্ড প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে চারদিন বোরার পর খেলার আগের দিন সন্ধ্যায় তাঁরা কার্ড পান। এটাকে বামফ্রন্ট বিরোধী আমলাদের বড়বন্দ্য বলে কী ভুল বলা হবে?

এবার আস্থান লটারীর কথা। সুবাই জানে বেশ কিছু লোক তাঁদের টিকিট নেন নি নম্বর ওঠা সত্ত্বেও। এ জিনিষ বরাবর হয় এবং প্রব সেন এগুলি পরে বিলি করেন। এই ধরনের কত টিকিট বেশি ছিল এবং কারা এগুলো পেল? এর উত্তর প্রব সেন কোনদিনই দেবেন না। কারণ তিনি ত যতীনবাবুর চক্রতলে আছেন। প্রসঙ্গত আরেকটি প্রশ্ন। কোন সাহসে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে ডিঙিয়ে প্রব সেন মহাশয় স্পোর্টস কাউন্সিল থেকে স্ত্রীমহম্মদের ঘোষের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের অনুরোধ শক্ত হাতে এইসব ব্যক্তির কার্যকলাপ বন্ধ করুন। নাহলে এরা সরকারকে ডুবিয়ে ছাড়বে।

নন্দিনী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কথা বলেছেন। এবং জনতা পার্টির ওয়াকিং কমিটির সভায় এ ব্যাপারে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন।

নন্দিনী কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রায়, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হেমবতীনন্দন বহগুণা, পার্টির সভাপতি চন্দ্রশেখর এবং মোহন দারিয়ার সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছেন।

জগজীবনবাবু এবং চন্দ্রশেখরের মধ্যে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা হয়েছে। উভয় নেতাই একমত যে, সমস্ত ব্যাপারটাই চরণ সিং-এর বি এল ডি ও জনসংস্কার নেতাদের মদত আছে। এবং এটা করা হয়েছে জনতা দলের অন্ততম শরিক দল গনতন্ত্রী কংগ্রেস ও প্রাক্তন কংগ্রেসী-দেবী রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব করার জন্ত। এ ব্যাপারে ঠিক হয়েছে প্রাক্তন কংগ্রেসী যারা বর্তমানে জনতা দলে আছেন তারা খুব তাড়াতাড়ি একটা বৈঠকে বসবেন।

নন্দিনীর বিরুদ্ধে তদন্তের ব্যবস্থা করার জন্ত বিজ্ঞপ্তিনায়ক ও জনতা দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক রবি রায় এখনো সক্রিয়। এ ব্যাপারে সাহায্য করছেন কেন্দ্রীয় সুরক্ষামন্ত্রী চরণ সিং। আসলে চরণ সিং-এর সঙ্গে পরামর্শ করেই নন্দিনীর বিরুদ্ধে

পরিকল্পনা করা হয়েছিল। যেহেতু কেন্দ্রীয় ভদ্র ব্যারোকে দিয়ে তদন্ত করালে ব্যাপারটা প্রধানমন্ত্রীর গোচরে আনতে হবে এবং সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী হয়তো রাজী নাও হতে পারেন, তাই ওড়িশা ভিজিলেন্সকে দিয়েই করানো হয়েছে।

নন্দিনী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন রাজনৈতিক কৌশল হিসেবেই। আসলে জনতা নেতৃত্ব-বৃন্দের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্তই ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এ ব্যাপারে জনতা পার্টির ওয়াকিং কমিটির আগামী বৈঠকে ঝড় উঠবে বলে মনে হচ্ছে। নন্দিনীও প্রস্তুত।

গ্রন্থসমালোচনা

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

জারোসের লেখা দ্রষ্টব্য পৃ: ২৮৪। আশা করাই হয়ত উচিত। তবে উপস্থিত আশা করার মত কিছু চোখে যেন পড়ে না। যদি বা দু'একটি পড়ে তা অবশ্য ব্যতিক্রম বলেই আমরা ধরি।

সর্বশেষ প্রবন্ধে লেখক এ রকম একটা সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতার রূপ ও তার কারণ দেখিয়েছেন। মানব প্রকৃতির এক ইতিহাস অবলম্বনে পূর্বসূরীদের মতবাদ খণ্ডন মণ্ডন করে তিনি তাঁর কথা শেষ করেছেন "মে আগুনে সব ধ্বংস হয় সেই আগুন ছাড়া সভ্য মাহুষের শাস্তির কাজ একদিনও চলে না। - পারমাণবিক

শক্তি ধ্বংস অথবা সৃষ্টি দুইই করতে সক্ষম। মাহুষের সমাজ ব্যবস্থা আগ্রাসী না শান্তিকামী, তার উপর শেষপর্যন্ত সব রকম শক্তির ব্যবহার নির্ভরশীল -" (পৃ ৩২২)। একথা ছাড়া একজন সং ও মনীষী-বুদ্ধি-জীবী আজকের দিনে অল্প কিছুই বলতে পারেন না জেনেও আমাদের মনে করতে হয় এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিপূরক সমাজব্যবস্থা এখন পর্যন্ত আশাশ্রিতভাবে কোথাও গড়ে ওঠে নি। এবং তা যে গড়ে ওঠে নি তার কারণ ও হলো আবার একটা vicious circle এর মত অবস্থা। তার উপস্থিতি আশাশ্রিতকামী আশ্রয়-স্থলী বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই। সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র কেউই সম্পূর্ণভাবে এ পর্যন্ত এই বিশিষ্ট ethics বা চর্চাকে গ্রহণ করেনি। কবে বা কেমন করে তা সম্ভব হবে তার উত্তরের আশা না করেই লেখক সত্যতার সঙ্গে এখানে তাঁর বৈজ্ঞানিক আলোচনা শেষ করেছেন।

পরিশিষ্টটি আরও বিস্তারিত হলে ভাল হত। অন্ততঃ লেখক যে যে নামগুলি উদ্ধৃতির মধ্যে ব্যবহার করেছেন তাঁদের সবার নাম ও পরিচয় দিলে এটি সম্পূর্ণতর তালিকা হতে পারত। একটি গ্রন্থপঞ্জী ও নির্দেশিকা (Index) সংযোজন করার কথা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার সময় ভাবতে লেখককে অনুরোধ করব।

বিজ্ঞেকে রঙীন ও প্রাণবন্ত করে তুলতে

এন, টি, সি-র

কাপড়

পারুন

শুধু সস্তা বা টেকসই বলেই নয়, বাহারেও এন, টি, সি-র কাপড়ের জুড়ি নেই।

আমাদের শো-রুমে ও নিজস্ব দোকানগুলোতে

সুটিং, সার্টিং, ব্রুটি, শাড়ী, মার্কিন, পপলিন সবই পাবেন।

আরও পাবেন মনমাতানো ও কলমলে সব পদার কাপড় ও বিছানার চাদর।

ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন

(পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা লিমিটেড)

৭, জগদাল নেহেরু বোড

কলিকাতা-৭০০০১৩

জুট ব্যাচিং অয়েল নিয়ে আরো চাঞ্চল্যকর খবর

৯৪ ওয়াগন তেল পাচার ভিক্টোরিয়ান পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জুট ব্যাচিং অয়েল নিয়ে আরো চাঞ্চল্যকর সংবাদ দর্পণের কাছে এসে পৌঁছেছে। ৯৪ ওয়াগন পাওয়া গেছে যে, জরুরী অবস্থা চলাকালীন এরা জুট থেকে সড়ক পথ ছাড়াও ট্রেনপথেও লক্ষ লক্ষ লিটার জে, বি, ও অক্স প্রদেশে পাচার হয়ে গেছে। পুলিশ ও রেল দপ্তরের নাকের ডগাতেই এ সব কাণ্ড ঘটে।

জানা যায়, চুয়াত্তর সনের উনিজিশে অক্টোবর থেকে এ বছরের উনিজিশে জুলাইয়ের মধ্যে চোরাকারবারীরা চুরানকুই ওয়াগন ভর্তি জে, বি, ও বোম্ব, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর, জলন্ধর, দিল্লী চালান দেয়। শুধু সোদপুর স্টেশন থেকেই এই সময়ে এই ওয়াগনগুলি চোরাপথে যোগাড় করা জে, বি, ও নিয়ে অক্সপ্রদেশে চলে যায়। হিসাব করে দেখা গেছে কেবল একটি মাত্র স্টেশন

থেকেই এগারো লক্ষ আঠাশ হাজার লিটার জে, বি, ও পশ্চিমবঙ্গের চটশিল্পকে ডুবিয়ে অক্স প্রাধান হয়। অর্থাৎ কাণ্ড হলো, এই তেল সাধারণত যে কোনও স্টেশন থেকেই ওয়াগন ভর্তি করে পাঠান যায় না। এর জন্ত অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে পশ্চিমবঙ্গের কুখ্যাত তেল চোরাকারবারীদের এতখানার কোনও অহুবিধা হয়নি।

পুলিশের কানেও খবরটা এসে পৌঁছেছে। এরা এতখানার একজনকে গ্রেপ্তারও করেছে। কিন্তু প্রকৃত আসামী এখনও ফেরার। পুলিশ মহলের অভিযোগ, এই লক্ষ লক্ষ লিটার জে, বি, ও পরিবহনের সঙ্গে টিটাগড়ের এস সাউ এবং রাজপথ গুপ্তার গুপ্তা ট্রান্সপোর্টও জড়িত। এবং এখনও যে জে, বি, ও পাচার

হচ্ছে তার সঙ্গে এই ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীটি ঘনিষ্ঠভাবে রয়েছে।

অতীত কথা হলো, বর্তমান রাজনৈতিক পরিবর্তিত অবস্থাতেও কংগ্রেসী জমানার কুখ্যাত চোরাকারবারীরা বহাল ভবিষ্যতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং প্রায় প্রতিদিন ভিক্টোরিয়া ময়দানে খোদ সি, আই, ডি দপ্তর সহ বিভিন্ন বিভাগের পুলিশ কর্তাদের কেউ কেউ দাপ্তর চোরাকারবারীদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। বলা বাহুল্য সেখানে চালাও মদও চলেছে। এই সব পুলিশ অফিসাররা নাকি চোরাকারবারীদের আশঙ্ক করেছেন যে শিগ্গেই ডি আই জি বদলী হয়ে যাবেন। এর পর ব্যবসা পুরোদমে চলবে। রহস্যজনক ঘটনা হলো, তেল নিয়ে কিছু 'অপারেশন' হবার পরই এন-কোর্সেট বিভাগের (সি, ই, ডি) ডি, আই, জি এখন সত্য সত্যই বদলী হবার মুখে। এ ব্যাপারে এই কর্মী ও অফিসাররা দারুণ ক্ষুব্ধ। ইতিমধ্যে গুজব উঠেছে, রাজ্যের চটশিল্প শেষ করার চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে যখন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ও রায় জমানায় রাজপথ গুপ্তা, শিবনাথ গুপ্তা, নরসিংহ গুপ্তা, কাকিনাডার ভিকু সাউ, টালিগঞ্জ ইটখোলার ভারী-র যাবতীয় সম্পত্তি ও অর্থের প্রকৃত উৎস নিয়ে তদন্ত শুরু করার কথা তখন কোথায় যেন একটা বোঝাপড়া চলেছে। না হলে রাজ্যের জে, বি, ও-র প্রায় চল্লিশটি গোডাউনের মধ্যে মাত্র তিনটিতে তল্লাসী চালানোর পরই দপ্তরের ডি, আই, জি বদলী হয়ে যান? এছাড়া জাতীয় সড়কের ধারে গোডাউনগুলিই বা এখনও খোলা থাকে কী করে? ভিক্টোরিয়া ময়দানে চোরাকারবারীদের সঙ্গে পুলিশ কর্তাদের এখন বৈঠক করার সাহস-ই বা কোথা থেকে আসে?

বিভিন্ন মহলের দাবী, রাজ্যের চটশিল্পের কাছে ব্যবহৃত হয় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ তেল নিয়ে এমন বেপরোয়া চোরাকারবারের সঙ্গে জড়িত পুলিশ, কিছু মিল অফিসার, কিছু সরকারী আমলার যোগসাজসের বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকার এখন তদন্ত শুরু করুন। নচেৎ এর দায় এড়ানো বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষেও কঠিন হয়ে পড়বে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

লক্ষ্মী বস্তুর সম্পত্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গাড়ীটি সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।

বাড়ী-গাড়ীর পর বড়লোকের আর একটি অল্পবয়স্ক কুহর পোষা। গ্রেড ডেল, ভোভার ম্যান, ছোটো অ্যাল-সেসিয়ান, টিবেটয়ান, স্পেনিয়াল, মোট পাঁচটি কুহর লক্ষ্মীবাবুর আছে। এগুলোর পেছনে ধরনের কথা ভাবলে সাধারণ মানুষ অবাক হয়ে যাবেন। লক্ষ্মীবাবু ট্রেড ইউনিয়ন করতেন। দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার। কিন্তু ঘটনা ঘটেছে উটো। লিপটন, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, প্রবর্তক জুটমিল প্রভৃতি কারখানায় দেখা গেল মালিকের দাবী মেনে নিয়ে তিনি প্রায় ২৫০ জন শ্রমিক ছাটাইয়ের চুক্তিতে সই করে দিলেন। এ ঘটনা শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটা রেকর্ড। বেঙ্গী ইঞ্জিনিয়ারিং, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, পার্ক হোটেল, লিপটন প্রভৃতি কারখানায় মালিকদের সঙ্গে লক্ষ্মীবাবুর দস্তার কথা সকলেরই জানা। আর সেই স্ববাদেই বেঘড়ক শ্রমিক ছাটাই। একজন হাজার হাজার

টাকা কামালেন, আর শ্রমিকের চাকরী গেল।

১৯৭৬ সালের অক্টোবরে অল্পসংখ্য তার জন্ত লক্ষ্মীবাবু বেলভিউ নার্সিং-হোমে ভর্তি হন। শোনা যায় বিভিন্ন কোম্পানী থেকে প্রায় ৮০ হাজার টাকা এসেছিল চিকিৎসার জন্ত। যদিও নার্সিংহোমের টাকা মিটিয়ে দিলেন জটনৈক মন্ত্রী।

গত লোকসভা নির্বাচনের আগে জটনৈক মন্ত্রী ১০ হাজার টাকা লক্ষ্মীবাবুর হাতে :দেন দক্ষিণ কলকাতার নির্বাচনী কর্মীদের কাছে টাকা দিয়ে দেবার জন্ত। কিন্তু জানা যায় ৩০-৪০ হাজার টাকার বেশি খরচ হয়নি। এছাড়া প্রিয় দাসমুখীও ২০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন লক্ষ্মীবাবুর হাতে। লক্ষ্মীবাবু নিজেও বিভিন্ন কোম্পানীর কাছ থেকে প্রচুর টাকা তুলেছিলেন নির্বাচনের জন্ত। টাকাসুলো গেলো কোথায়?

রাজ্য সরকার দুর্নীতির জন্ত তদন্ত কমিশন বসিয়েছেন। রাজ্য সরকারের উচিত সমস্ত ব্যাপারটা তদন্ত করা। তাহলে জানা যাবে কিভাবে এক-শ্রেণীর কংগ্রেসী রাজনীতির নামে ব্যবসা করেছেন।

৩ই অক্টোবর প্রকাশিত হচ্ছে

দর্পণ

শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৪

এই সংখ্যায় থাকছে :

রায়ত প্রসঙ্গে বাংলার বিদ্যাসমাজ : কুমুদকুমার ভট্টাচার্য / দর্পিতা ইন্দিরা : সাধন গুহ / বংশীলাল—গণতন্ত্রে এক ক্ষুদ্রে ডিক্টেটর : মুকুন্দ-মেনন / রাশিয়ার রাষ্ট্রচক্রিৎ এবং সংশোধনবাদ : পঙ্কজ চৌধুরী / গণ-তন্ত্র বনাম কীরাতন্ত্র : ক্রান্তি সেন / সংবিধানের নব কলেবর : রমাপ্রসাদ মল্লিক / আগামী পাঁচ বছর—ভারতীয় রাজনীতি ও পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার : সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় / শত্রুমিত্র : সুরেন্দ্র সেন / সাহিত্যিকের রাজনীতি : মিহির আচার্য / মিসা সংশোধন, ১৯৭৬ : সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় / ইন্দিরার রাজত্বে হরিজন হত্যা : জ্যোতির্ময় বসু / নকুলালবাড়ীর কৃষক সংগ্রাম ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক : তপন বসু / জনতা দল ও সরকারের শ্রেণী চরিত্র : কালিদাস কুণ্ডু / সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে : ফণী চক্রবর্তী / কলকাতার ফুটবল ও পেলে : আরবি / রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের গতিপ্রকৃতি : ভাসুসিংহ

এছাড়া লিখছেন অন্নদাশঙ্কর রায় নারায়ণ চৌধুরী

বিনয় ঘোষ এবং রঞ্জিতকুমার সেন

অনার্থ মিত্রের রাজনৈতিক ছড়া ও অমলের কার্টুন

দাম : চার টাকা

হাঁড়ি ফাটল হাঁড়ি ফাটল

যা দেবী সর্বহরণেশ্বরী শ্রীরূপেণ সংস্থিতা
পতনে পতিতং দেবী জিশূলবিদ্যা পরাজিতা।
জয় জয় দেবী দুর্গতাহারিনী
শাসনং শোষণং অধিকারকাড়িনী।
ছাড়িনি তোমায় দেবী, আজও কেউ ভুলিনি,
ভয়ে ভয়ে হাঁড়িটির ঢাকনাটা খুলিনি।
হাঁড়ির খবর ফাঁস ছড়া দিয়ে গাঁথা সে
চৌদিকে ছড়ালো আকাশে ও বাতাসে।

হাঁড়ি ফাটল হাঁড়ি ফাটল

ছড়া। অনাথ মিত্র * ছবি। অহিভূষণ মালিক
ভূমিকা। অন্নদাশঙ্কর রায়
হাতে হাতে বিক্রী শত শত হাজারে
হাঁড়ি আজ কাটলো শারদীয়া বাজারে।

যে সব ছড়ার তাণ্ডব সিদ্ধার্থ-সরকার সইতে পারেনি, আক্রমণ হেনেছে। ছাপাখানা সীল করেছে। বাহাদুরের নির্বাচনী কারচুপি থেকে ইন্দিরা পতন অবধি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ব্যঙ্গছড়ায় ব্যঙ্গচিত্রে প্রতিবিম্বিত প্রথম এক-মাত্র ঝাঁঝালো শাপিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হচ্ছে মহালয়ার আগেই।

হাঁড়ি ফাটল হাঁড়ি ফাটল

ছড়াগুলি গেঁথেছেন
অনার্থ মিত্র,
অহিভূষণের আঁকা
আঁকিবুকে চিত্রিত।
অন্নদা রায়, যিনি
শিরোমণি ছড়াকার,
ভূমিকাটি লিখেছেন
সাধুবাদে সুরধার

বাজারে পড়লেই
উধাও হবে।
এখনই তলব
করুন। পুছো
বাজারের সেরা
আকর্ষণ; একটি
ছড়ার বই।
দাম ছ'টাকা।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২০১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৩১ মট সেন কলকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত।



ইন্দিরার গ্রেপ্তার এবং মুক্তি

॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥

গত সোমবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর গ্রেপ্তার এবং তাঁর পরবর্তী আচরণ যেমন নাটকীয় তেমনি নাটকীয় দিল্লীর অতিরিক্ত মুখ্য মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তাঁকে বিনা শর্তে মুক্তিদান। এবং কোনকপ জামিন ছাড়াই শ্রীমতী গান্ধীর মুক্তির আশা আমাদের কাছে অন্ততঃ অপ্রত্যাশিত স্বপ্ন একই অপরাধে অত্যন্ত অভিযুক্তরা আটক রইলেন। যদিও আইনের চুলচেরা ব্যাখ্যায় সেটাই হয়ত স্বাভাবিক। তবে আমরা স্বাধীন ভারতে, বিশেষ করে গত কয়েক বছরের অনেক ঘটনার বিবরণ জানি যেখানে পুলিশ মিথ্যা অভিযোগে বহু লোককে বহুরের পর বছর আটকে রেখে দিয়েছে, অথচ আদালতও নির্বিকার থেকেছে; পুলিশী অত্যাচারে অর্ধশত বন্দীকে বিচারকের সামনে হাজির করা হয়েছে, বন্দীর আবেদনে কর্তৃপক্ষ করা দুর্গে থাক, তার দিকে তাকিয়েও দেখেননি বিচারক, পুলিশের প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাকে আটক রাখার আদেশ দিয়েছেন।

ইন্দিরা-গান্ধীর গ্রেপ্তার নিয়ে তাঁর অনুচর ও কংগ্রেসীরা যে সোর-গোল তুলেছে সেটা রাজনৈতিক ফায়দা ওঠার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। ইন্দিরা নিজেও সেই চেষ্টা চালাচ্ছেন। সাধারণ মানুষকে তিনি জানেন না, তাদের সঙ্গে তাঁর কোন হার্দয় সম্পর্কও নেই। পিতার মতই ইন্দিরাও বক্তৃতামঞ্চের উচ্চতা থেকে মুচ মুচ শব্দ মুখগুলো দেখেছেন আর বড় বড় বুলি ঝেড়েছেন। তাই ক্ষমতাত্যাগ হয়েই অধি জলে পড়েছিলেন। এখন সাধারণ মানুষের দোহাই পেড়ে তিনি ভেসে ওঠার চেষ্টা করছেন। জনতা সরকারের পদক্ষেপ বেসামাল হলেই তাঁর পক্ষে স্বর্ণ স্বযোগ।

(শেখাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

সভাপতি ও সম্পাদকের পদ নিয়ে জনতা দলে

খেয়োখেয়ি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ জনতা পার্টিতে সভাপতি ও সম্পাদকের পদ নিয়ে লড়াই এখন বেশ জমে উঠেছে। গত নির্বাচনে জনতার পরাজয়ে কোণঠাসা প্রফুল্ল সেনকে সরিয়ে স্থানীয় রাজ্য কমিটির সভাপতির পদ দখলের জন্য আসরে নেমেছেন। জানা গেছে, স্থানীয় বাবু বিমান মিত্র মধু লিমায়ে, বোহুবাবু, আতা মাইতি প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে চাইছেন।

জনতা পার্টিতে বোহুবাবু ও আতা মাইতিদের গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রফুল্ল সেন ও অশোক দত্তদের লড়াই প্রায় জনতা পার্টি গঠনের সময় থেকেই চলে আসছে। বোহুবাবুরা নিজেদের দল ভারী করতে কয়েক মাস আগে একটি সভাও করেছিলেন। কিন্তু বিমান মিত্র কি করে এদের সঙ্গে ভিড়লেন সেটাই অনেকের প্রশ্ন। প্রফুল্ল-অশোক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বলেই

স্থনীতি চট্টরাজ বিধানসভার অবমাননা করলেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ইন্দিরা গান্ধীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পাঁচই অক্টোবর এসম্মানেড ইস্টে কংগ্রেসীদের এক সমাবেশে কথ্যাত স্থনীতি চট্টরাজ বিধানসভার সদস্যদের “পশু” বলেছেন। তিনি বলেন, “ইন্দিরা গান্ধীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আমরা আজ বিধান সভা থেকে ওরাক-আউট করেছি। আমরা এই ঘৃণ্য কাজের প্রতিবাদ করেছি। আর আমাদের কেউ সমর্থন করেনি। আমি বলছি, জনগণ জাহ্নন বিধান সভার অভ্যন্তরে কিছু পশু বসে আছে।” স্থনীতি চট্টরাজ বিধান সভায় কংগ্রেসের ডেপুটি লীডার। তিনি এই উক্তি ঘরা স্পষ্টতই বিধান সভার অবমাননা করেছেন।

কয়েক দিন আগে বিধান সভায় যতীন চক্রবর্তী এদের উচ্ছৃংখল যুবক বলেছিলেন। স্থনীতি চট্টরাজ বিধান সভাকে এভাবে অবমাননা করে প্রমাণ করলেন যে তিনি সভাই উচ্ছৃংখল যুবক। তার মতন এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক কি কয়েই বা বিধান সভার ডেপুটি লীডার হন?

কি বিমানবাবু বোহু-আতার কাছাকাছি?

মধু লিমায়েস সঙ্গে প্রফুল্ল সেনদের সম্পর্ক খারাপ হয় পশ্চিম-বাংলায় গত নির্বাচনের সময়। আর সেই তিক্ততাকেই উসকে দিচ্ছেন স্বযোগ সন্ধানী স্থনীল ধাড়া। এ ব্যাপারে তিনি আরেকটি উপদানের সাহায্য পাচ্ছেন, সেটি হচ্ছে বি, এল, ডি। কিন্তু অনেক কৌশল করেও তিনি খুব একটা কায়দা করতে পারছেন না। ১২ তারিখে রাজ্য কমিটি ঘোষণা করা হবে। সেদিনই বোঝা যাবে স্থনীল ধাড়ার শক্তি কতটা।

এই ল্যাং মারামারির খেলা চলছে সম্পাদকের পদ নিয়েও এবং সেখানেও খেলছেন বিমান মিত্র, তিনি এ ব্যাপারে ছোট বেঁধেছেন বোহুবাবুর সঙ্গে। তিনি চেষ্টা করছেন যাতে তিনি নিজে এবং বোহুবাবু সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন অশোককৃত্তক দত্তকে ল্যাং মেরে। এ ব্যাপারে তিনি স্থনীল ধাড়াকে পাচ্ছেন, কারণ তিনিও ভেদ স্থনীল ধাড়াকে সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করছেন।

অশোক দত্তকে সাহায্য করছেন প্রফুল্ল সেন। প্রফুল্ল সেনকে ডিবিয় সশোক দত্তকে কাং করা একটু মুশকিল। তবে এটা ঠিক যে তিনজন সাধারণ সম্পাদকের অন্তত একজন পরিবর্তন হবেই। জানা গেছে অশোক মুখার্জী এবং স্বহুমার ব্যানার্জী মোটামুটি প্রফুল্ল সেনকেই সমর্থন করছেন। সব পরিষ্কার হবে বারো তারিখে। কিন্তু যে গোষ্ঠীই জিতুক আর যে গোষ্ঠীই হারুক, একটা জিনিষ পরিষ্কার যে জনতা পার্টিতে আদর্শহীন স্ববিধাবাদীদের খেয়ো-খেয়ি চলছে।

লক্ষ্মী বসুরা কোর্টের আদেশও মানছেন নাঃ অসহায় বিধবার বাড়ি দখল করে রেখেছেন

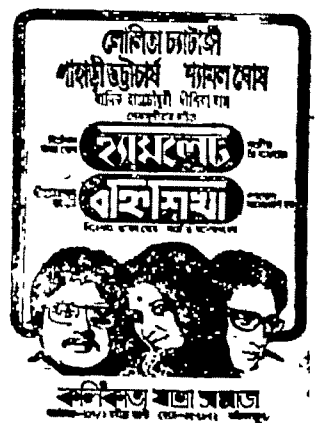
কোর্টের অর্ডার পেয়েও লক্ষীকান্ত বসু ৭নং হাজি মহসীন রোড থেকে এন এল সি সি-র দপ্তর তুলে নিচ্ছেন না। বাড়ীর মালিক এক অসহায় বিধবা মহিলা। এই বাড়িতে লক্ষী-বাবু একতলাও কয়েকটি ঘর নিয়ে অফিস বোলেন। মালিকের সম্মতি নেওয়ার কোন অপেক্ষা রাখা হয়নি। মালিক লীলনগোপাল দাস এই-বে-আইনী ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু করেন। ১৯৭০ সালের ১৬ই নভেম্বর মালিক জীবন-বাবু কোর্টের ডিগ্রী পেলেন। কিন্তু লক্ষীবাবু বাড়ী ছাড়লেন না। সর-

কারী মহলে প্রভাব বিস্তার করা হল। বাড়ীটি সরকার হুকুম দখল করে নিলেন। যেহেতু বাড়ীর দোতলায় জনৈক পুলিশ কর্মচারী থাকেন।

সরকার বাড়ীটি দখল নেওয়ার পর লক্ষী বসুর এনএল সি সি-র দপ্তর এখানেই থেকে গেল। বাড়ীটার পেছন দিকে কয়েক কাঠা খালি জমি ছিল। কর্পোরেশনের আগাম অন্মতি না নিয়েই সেই খালি জায়গায় বেশ কয়েকটি ঘর তোলা হল।

এর মধ্যে বাড়ীর মালিক মারা গেলেন। তাঁর বিধবা স্ত্রী সরকারী হুকুম দখল আদেশের বিরুদ্ধে আবার

আদালতের শরণাপন্ন হন। গত ১০ই মার্চ বিচারক বাড়ীর মালিক জীবনগোপাল দাসের বিধবাস্ত্রীর পক্ষে রায় (শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



বিশ্ব বর্ষ ১১ ৩৭শ সংখ্যা ১১ শুক্রবার ৭ই অক্টোবর, ৭৭ ১১ ৪০ পৃষ্ঠা

প্রিয় মুন্সীর সঙ্গে সত্যনারায়ণপন্থী নকশাল নেতার সাক্ষাৎ ও আলোচনা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি প্রিয়রজন দাসমুন্সীর সঙ্গে সত্যনারায়ণপন্থী একনকশাল নেতার গোপন সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে জানা যায় যে এই সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ছিল ঐ নকশাল নেতার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রয়োজন। কিন্তু পরে এক গোপন সূত্রে থেকে বলা হয় যে ঐ দিনের আলোচনার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রাজনৈতিক।

আলোচনার প্রারম্ভে ব্যক্তিগত কুশল বিনিময়ের পর দুই নেতাই তাদের অতীত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের “মুহূ আত্মসমালোচনা” করেন। কংগ্রেস নেতা প্রিয়বাবু জরুরী অবস্থার বাড়ি বাড়ির জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর পুত্র সন্তান গান্ধী এর জন্য দায়ী। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন, গত লোকসভা নির্বাচনে স্বয়ং সন্তান গান্ধী তার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন যাতে তিনি নির্বাচিত হতে না

পারেন। এই ব্যাপারে সহযোগিতা করেছিলেন এক ব্যবসায়ী, যিনি কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে। নির্বাচনের প্রাক্কালে জনতা পার্টির প্রার্থী দিলীপ চক্রবর্তীকে ‘মারধোর’ করার পেছনে পরিকারভাবে সন্তান গান্ধীর চক্রান্ত কাঙ্ক্ষ করেছিল, যার ফলে প্রিয়বাবুকে জনসমক্ষে হেয় হতে হয়।

প্রিয়রজনবাবু এই দুঃখে ঐ নকশাল নেতা “আন্তরিক সহানুভূতি” জ্ঞাপন করেন। এরপর প্রিয়বাবু যে সমস্ত নকশাল যুবককে পুলিশ গুলি করে বা পিটিয়ে মেরেছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এই বলে যে এরা “বাংলার সোনার টুকরো ছেলে।” এই প্রসঙ্গেই আলোচনাওঠে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থা ও বামফ্রন্ট সরকার (শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

‘ফ্যাসিস্ট’ জয়প্রকাশ সকাশে প্রিয়

(দর্পণের পর্ববন্ধক)

প্রিয় দাসমুখী জয়প্রকাশের সঙ্গে দেখা করে নাকি জানতে চান যুব সমাজ বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন ভূমিকা পালন করবে। এই সংবাদে মনে পড়ছে পঁচাত্তরের মরা এপ্রিল ইউনিভার্সিটি লনে এই প্রিয় দাসমুখী জয়প্রকাশ সঞ্চয় বা বা বলেছিলেন। ঐদিন জয়প্রকাশের ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে মিটিং করার কথা ছিল। কিন্তু প্রিয় দাসমুখী ও স্বতন্ত্র মুখার্জীরা সেদিন ফ্যাসিস্ট কায়দায় তার মিটিং ভেঙে দেন। তার আগে তারা ইউনিভার্সিটি লনে একটা মিটিং করেন। কলকাতায় আসার আগে জয়প্রকাশ নারায়ণকে এক জায়গায় কালো পতাকা দেখানো হয়েছিল। জয়প্রকাশ তার উত্তরে বলেছিলেন “স্বাগত কালো পতাকা” আর প্রিয় দাসমুখী সেই কালো পতাকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ইউনিভার্সিটি লনে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন “জয়প্রকাশ: নারায়ণকে ধর্মবাদের, তিনি কালো পতাকাকে স্বাগত জানিয়েছেন। এই কালো রং ভালবাসতেন আরো একজন। তিনি হচ্ছেন হিটলার। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ামূলক ক্ষমতা ধ্রুপদলের চেষ্টা করছে। এই জোটে আছে বত চোরাকারবারী, প্রতিক্রিয়ামূলক, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো। এরা

ক্ষমতায় আসলে দেখা যাবে গণতন্ত্র শেষ হয়ে যাবে।” এরপর জয়প্রকাশ ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের কাছে এসে শুরু হয়ে যায় দক্ষিণপন্থী জয়প্রকাশের গাড়ীর ওপর উঠে একটি যুব কংগ্রেসী মেয়েটিকে ধাক্কা দেয়। সমর গুহর জামা ছিঁড়ে দেওয়া হয়। কয়েক জনের মাথা ফাটে, রক্ত করে। মিটিং বানচাল হয়ে যায়। জয়প্রকাশ নারায়ণ চলে যান। কিছুক্ষণ আগে প্রিয় দাসমুখী জয়প্রকাশকে হিটলার বানাচ্ছিলেন আর কিছুক্ষণ পরে জয়প্রকাশ মিটিং ভেঙে দিয়ে প্রমাণ করলেন জয়প্রকাশ নন, তারা

সত্যনারায়ণপন্থী নকশালদের সঙ্গে কারামন্ত্রী দেবব্রত মাখামাখি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সত্যনারায়ণপন্থী নকশালদের সঙ্গে বামপন্থী সরকারের কারামন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের (আর এস পি) বনিষ্ঠতা অনেকের মনে প্রশ্ন তুলেছে। সেটা আরও এই কারণে যে, সত্যনারায়ণ গোষ্ঠীর নকশালরা যুক্তফ্রন্টের শরিক বামপন্থী দল-গুলোকে শোষণবাদী বলে মনে করে এবং সম্ভবতঃ সেইজন্মেই তারা নির্বাচনে বামপন্থী ফ্রন্টকে সাহায্য না করে অনেক অঞ্চলে জনতা পার্টির পক্ষে কাজ করেছে।

নিজেরাই সব এক একটা ক্ষুদ্র হিটলার।

আজকে যখন প্রিয় দাসমুখীরা কোথাও কলকে পাচ্ছেন না, যখন জনগণের ক্রোধ তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে তখন জয়প্রকাশকে যুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যাকে একবার হিটলার বানালেন তার কাছে যেতে প্রিয় দাসমুখীরা লজ্জা হওয়া উচিত। আজ কোথায় গেল তার “এশিয়ার মুক্তিসূর্য”? আজকে একজনকে “শালা” বলা আবার কালকেই তাকে “বাবা” বলা চরম সুবিধাবাদের নিদর্শন। দাসমুখী এরকমই একজন সুবিধাবাদী যুবক।

৪র্থ টাইবুনাতে অভিব্যক্তদের বক্তব্য

আলীপুর কোর্টে চতুর্থ টাইবুনাতে অনন্ত সিং ও স্বতন্ত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। এই মামলার অভিযুক্তগণ একটি বিবৃতি এই আদালতে পেশ করেন। আদালত তা নথীভুক্ত করে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর। অভিযুক্তরা এই বিবৃতিতে বলেছেন: “চতুর্থ টাইবুনাতে সামনে বিচারার্থী অনন্ত সিং ও স্বতন্ত্র অভিযুক্তগণ “রাজনৈতিক বন্দী” নয়—মুখামুখী জ্যোতি বহুর সম্পূর্ণ সুস্থিহীন, ঐক্যতাপ্রণ ও অপমানজনক এই উক্তির বিরুদ্ধে কোর্ট ও বিচার আদালত উপযুক্ত ভাষা আমাদের জানা নেই। যে মামলার চার্জ পঠনের ক্ষেত্রে আদালতে হুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে অভিযুক্তদের সমগ্র কার্যকলাপের পিছনে সশস্ত্র বিপ্লব সাধনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার এবং যে মামলার প্রতিটি বিচারার্থী বন্দী নিজ নিজ এলাকার জনসাধারণের নিকট নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে সুপরিচিত—একমাত্র সংকীর্ণ ও অসং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া কেউই তাদের “অ-রাজনৈতিক” আখ্যা দিতে পারে না। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত—শুধুমাত্র এই কারণেই কোন ব্যক্তি বিশেষের বক্তব্য চূড়ান্ত বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণতান্ত্রিক মানুষের অভিমতই চতুর্থ টাইবুনাতে বিচারার্থী বন্দীদের চরিত্র নিরূপণে চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং ব্যক্তি বিশেষের—তা তিনি যতই গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হোন না কেন—সংকীর্ণ

স্বার্থ প্রণোদিত কুংসামূলক অভিপ্রাতিতে প্রভাবিত হবে।”

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন, দীপক বহু, কাজল পাল, অমল রায়, রঞ্জিত দে, গৌরাজ মজুমদার, শঙ্কর ভৌমিক, হারাধন দাস, গৌতম গোস্বামী, প্রলয়েশ মিত্র, অশোক বোষ, সুপ্রসাদ হালদার, দেবব্রত ভট্টাচার্য, মোহন পরামাণিক, তরুণ চক্রবর্তী, কল্যাণ বহু, অজয় গোস্বামী, বনহুদেব বোষাল, কল্যাণ রায়।

ঘুষ দিয়ে পাশ সার্টিফিকেট

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বাতিজ না হওয়ার আগে পর্ষদীয়কাল ধরে ৮০০; ১০০ বা ১০০০ টাকার বিনিময়ে পরীক্ষা না দিয়েই মাধ্যমিক বা স্কুল ফাইনাল সার্টিফিকেট পাওয়া যেত। এই রকম বহু ব্যক্তিই ফাঁদে পড়েছেন। কারণ তাঁরা আগাম টাকা পয়সা দিয়ে রেখেছিলেন সার্টিফিকেট পাবার আশায়। অথচ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বাতিজ হওয়ার ফলে তাঁদের আশায় ছাই। তাঁরা ঘুষখোরদের ধরিয়ে দেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। এখন প্রশ্ন: প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গী-সাথীদের ধরিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হবেন, না এখনো ‘অগণতান্ত্রিক’ ‘অগণতান্ত্রিক’ বলে চোঁচাবেন? অপব দিকে সত্যপ্রিয়বাবু ও বামফ্রন্ট এই ঘটনার মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণ করবাব সুযোগ পাবেন যে, বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থায় হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া গণতন্ত্র বিরোধী নয়।

প্রকাশিত হল

দর্পণ

শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৪

এই সংখ্যায় আছে

রায়ত প্রসঙ্গে বাংলার বিদ্যাসমাজ: কুমুদকুমার ভট্টাচার্য / দর্পিতা ইন্দিরা: দাধন গুহ / বংশীলাল—গণতন্ত্রে এক ক্ষুদ্র ডিক্টেটর: মুকুন্দন মেনন / বাণেশ্বর রায়চৌধুরী এবং সংশোধনবাদ: পঙ্কজ চৌধুরী / গণ-তন্ত্র বনাম কারাতন্ত্র: ক্রান্তি সেন / সংবিধানের নব কলেবর: রমাপ্রসাদ মল্লিক / আগামী পাঁচ বছর—ভারতীয় রাজনীতি ও পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার: সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় / শত্রুমিত্র: সমর সেন / সাহিত্যিকের রাজনীতি: মিহির আচার্য / মিসা সংশোধন, ১৯৭৬: সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় / ইন্দিরার রাজত্ব হরিজন হত্যা: জ্যোতির্ময় বসু / নকশালবাদের কৃষক সংগ্রাম ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক: তপন বসু / জনতা দল ও সরকারের শ্রেণী চরিত্র: কালিদাস কুণ্ডু / সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে: ফণী চক্রবর্তী / অব্যমূল্যের সমস্তা: নারায়ণ চৌধুরী / শেষ কথা কে বলবে: অন্নদাশংকর রায় / সময় সময়: অসীম রায় / এখনও: রণজিৎকুমার সেন / কলকাতার ফুটবল ওপেনে: আরবি।

অনার্য মিত্রের রাজনৈতিক ছড়া ও অমলের কার্টুন

দাম: চার টাকা

কিন্তু অনেকেই জানেন না এই গোষ্ঠীর নকশালরা পশ্চিমবঙ্গের গত সাধারণ নির্বাচনে একটি মাত্র কেন্দ্রে বামপন্থী প্রার্থীর স্বপক্ষে প্রচারে নামে এবং প্রকাশ্যে তাকে ভোট দিতে বলে। ইনি আর কেউ নন বহরমপুর কেন্দ্রের প্রার্থী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্যনারায়ণপন্থী নকশাল পার্টির পত্রিকা “জনযুদ্ধের” প্রথম সংখ্যায় এই সম্পর্কে লেখা হয়, “আর এস পি প্রার্থী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে জয়যুক্ত করুন। ইন্দিরা ক্যাসীবাদের মোকাবিলায় বামপন্থী শক্তির অন্ততম হিসাবে কম: দেবু ব্যানার্জীর ভূমিকাকে আমাদের পার্টি সি পি আই (এম-এল) লালসোলাম জানায়। তার নির্বাচনী সংগ্রামকে আমরা সমর্থন করি এবং জনগণকে আহ্বান জানাই যেন তারা কম: দেবু ব্যানার্জীর পক্ষে রায় দেন।” (জনযুদ্ধ, প্রথম সংখ্যা, ২৫শে মে ১৯৭৭)

প্রশ্ন উঠতে পারে, ইন্দিরা ক্যাসীবাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে অনেকেই তো লড়াই করেছেন, কিন্তু তারা কি ওদের ক্রাচে অন্ত্যজ? এর উত্তর দিতে পারেন দেবব্রতবাবু আর নকশালরা।

লক্ষ্মী বসু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দিয়ে ভাড়াটিয়াদের বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার আদেশ দেন।

কিন্তু এখনও লক্ষ্মী বহু বাড়ী ছাড়ছেন না। অভিযোগ, তিনি বিভিন্ন উপায়ে বাড়ীটি নিজের হাথলে রাখার চেষ্টা করছেন। এদিকে অসহায় নিঃস্বল বিধবা মহিলা পরাশ্রয়ে থেকে দোরে দোবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রতিভার আশায়।

প্রিয় দাসমুখীর সঙ্গে আলোচনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কার.নিরে। উভয় নেতা এই বিষয়ে একমত হন যে ৬৭-৬৯ সালে যে সমস্ত হত্যাকাণ্ড অস্বীকৃত হয়ে তার জন্য ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা দায়ী। এর তদন্তের জন্য সরকার হলে ব্যাপক আন্দোলন করতে হবে। “সবাইকে নিয়ে আন্দোলন করতে হবে।”

এছাড়া এই নকশাল নেতা বিভিন্ন গণসংগঠনের সংগে যুক্ত এবং ইনি সত্যনারায়ণ সিংপন্থীদের “গণফ্রন্টের লোক” হিসেবে পরিচিত।

নকশালপন্থীদের স্বতন্ত্র মহল এই আলোচনা সম্পর্কে ওরাকি-বহাল। তাঁরা মনে করেন সত্যনারায়ণ সিংদের সঙ্গে চরণ সিং-এর সঙ্গে এক গোপন সমঝোতা হয়েছে। কেমনা আকাংক্ষাবোধী এক বুলেটিনে বলা হয়েছিল নকশাল নেতা কাল

সান্তাল, অসীমচ্যাটার্জীর কাছে চরণ সিং মূলতঃ চেয়েছেন, কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেন। এই জনতা সরকার তাঁদের প্রতি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে তাঁদের মুক্তি দিচ্ছেন না। অথচ রহস্যজনকভাবে সত্যনারায়ণপন্থীদের অপর এক নেতা অজয়ের চরণোপাচারে ডিওর ওপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা উঠে গেছে। বলা দরকার, এর প্রেক্ষিতার জন্ত অজয় কংগ্রেস সরকার দু-লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। এরম একটা সময়ে এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে যখন অজয়ের মুখ্যমন্ত্রী-ডেজল রাও প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন “কোন নকশালকে মুক্তি দেওয়া হবে না।”

পুলিশ ও অফিসারদের উপস্থিতিতেই রেলের টি টি ই-রা গুণ্ডাদের হাতে আক্রান্ত হচ্ছেন সাধন গুহ

রেলের যাত্রী বাড়ছে। আরও বাড়ছে। এটা রেল দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই বলছি। এতদসঙ্গেও “আর্নিং”-এর দোহাই দিয়ে টি, সি এবং টি, টি, ইদের নানাতাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, টি, সি এবং টি, টি, ইরা কর্তাদের খামখেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়ে যাত্রীদের হাতে প্রহৃত হচ্ছেন, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের জীবনহানিরও ভয় দেখানো হচ্ছে পুলিশ এবং অফিসারদের সামনেই। বিপদের সময় সবাই কেটে পড়েন। জীবন বিপন্ন হয় টি, টি, ইদের। ১৩, ১৭, তারিখে শিয়ালদা ম্যাসিভ স্কোয়াডের টি, টি, ই অফিসার, কে, বিশ্বাস অমিত চৌধুরী ওরফে ডুরান বলে জর্নিক যুবককে মোবাইল চেকিংয়ের সময় বিনা টিকেটে ভ্রমণের অপরাধে

আটক করেন। বিশ্বাস ছেলেটিকে ধরেন কে ৪৭নং কল্যাণী লোকালে। এই ছেলেটিকে ভাড়া আদায়ের জন্ত আটক করার কয়েক মিনিট পরেই ১০।১৫ জন মস্তান ৩নং প্র্যাটফর্মে এসে সশস্ত্র পুলিশের সামনেই পূর্বোক্ত ডুরানকে ছেড়ে দেবার জন্ত এ, কে, ক বিশ্বাসের কাছে দাবী জানায়। পুলিশকে নিষ্ক্রিয় দেখে বিশ্বাস তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে ছেলেটিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ছেলেটি মুক্ত হবার পরই ৪নং প্র্যাটফর্মে গিয়ে প্রকাশ্যে ইট ছুঁড়তে থাকে এবং পুলিশ তা দেখে পালিয়ে যায়। বিশ্বাসরা এমতাবস্থায় ১নং প্র্যাটফর্মে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

প্রায় দুঘণ্টা পর পূর্বোক্ত ডুরান তার দলবল নিয়ে ১নং প্র্যাটফর্মে হানা দেয় এবং বিশ্বাসকে হত্যা করার হুমকী দিয়ে তাঁকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। এ সব ঘটনা ঘটে প্রায় ১৫জন আর, পি, এফ এবং রেল পুলিশের সামনে। তারা কেউ এর প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধে এগিয়ে আসেনি। এ, সি, এস (টিকেট) পি, সি, ব্যানার্জী ঐ সময় ব্যারাকপুর স্টেশনে ছিলেন। জি, আর, পির এস, আই স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত হাঙ্গামা হয়ে গেল সে সময়-এ, সি, এস (টিকেট), এস, আই-জি, আর, পি অথবা মোবাইল স্কোয়াড-ইন-চার্জ বি, একবর্তী একবারও আক্রান্তদের রক্ষা করার জন্ত এগিয়ে আসেন নি। এই গুণ্ডার দল পুলিশকে ধাক্কা মেয়ে ফেলে দিয়ে বিনা টিকেটের আইট যাত্রীদের ছিনিয়ে নেয়।

ঘটনা মিটে যাবার পর সেদিনের ভারপ্রাপ্ত এ, সি, এস (টিকেট) পি, সি, ব্যানার্জী, এস, আই, জি, আর, পি, এবং বি, চক্রবর্তী ঘটনাস্থলে এসে বলেন যে তারা নাকি ঘটনার কিছুই জানতেন না। এতদ্ব্যতীত মিথ্যা কথাও কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? কেন সেদিনের ঘটনার জন্ত অফিসার পি, সি, ব্যানার্জী, এস, আই, জি, আর, পি এবং স্কোয়াড ইন চার্জ বি, চক্রবর্তীর কৈফিয়ত লব করা হবে না এবং কেন তাদের কর্তব্যে অবহেলার অপরাধে শাস্তি দেওয়া হবে না? এস, সি, ও জি সয়োজ মুখার্জী ৩৩.৫৬০ গ্রেডের টি, টি, ই, এস, এস, চ্যাটার্জীকে স্টপ গ্যাপে ৪২৫-৬৪০ গ্রেডে টেনে আনলেন এবং পরপর একসটেনসন দিয়ে তাকে এডিশনাল সি, আই, টি-

শেয়ালদা করলেন এবং নানা অজুহাতে আর্থিক পুরস্কারও চাটুজ্জ্ব মশালের ভাগ্যে জুটছে। সরোজবাবু নিজস্ব উপদলীয় কার্যকলাপে খুবই সক্রিয় হলেও টি, সি এবং টি, টি ইরা যখন কর্তব্যরত অবস্থায় গুণ্ডাদের হাতে আক্রান্ত হন তখনতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে নিষ্ক্রিয় কেন? শুধু ব্যারাকপুরেই নয়, ১৫ই সেপ্টেম্বর সাহেবগঞ্জের কাহালগা স্টেশনে ভাগলপুরের রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেট চেকিংয়ের সময় টি, টি, গুণ্ডাদের হাতে প্রহৃত হন।

পূর্ব রেলের সি, সি, এস ব্রীকে, কে, দাস দয়াকরে এ সম্পর্কে কিছু বলবে কি? গত ২১শে সেপ্টেম্বর ইষ্টার্ন রেল টিকেট চেকিং ষ্টাফ এসো-সিয়েশনের গোয়েন্দা বিভাগীয় শাখার উত্তোগে প্রায় দুই শতাধিক টি, সি, টি, টি, ই’র (মহিলাসহ) এক মিছিল শেয়ালদা ডি, এস, অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ জানায় এবং ডি, এস এঁদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা

প্রসঙ্গে বিভিন্ন দাবী বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দেন। আমরা আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি, রেল প্রশাসন শুধু আয়ের দিকটাই দেখছেন কিন্তু যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের ন্যূনতম বন্দোবস্তও করছেন না। এর প্রতিক্রিয়া ভোগ করতে হচ্ছে টি, টি, ইদের। তাঁরা যাত্রীদের হাতে প্রহৃত হবেন, অপমানিত হবেন। তার কোন প্রতিকার হবে না। কিন্তু দৈনিক ৪৫টা করে পেনাল্টি কেস না করলেই তাদের শাস্তি পেতে হচ্ছে। এটা কি হুবুজা রাজার দেশের আইন? প্রশাসনের পেটোয়া টি, সি, টি, টি, ইদের ‘সাতধুন মাফ। কিন্তু খারা কর্তাদের কাছে নতজাহ না হয়ে আইনমার্কিত কভ্যাপালনে তৎপর তাঁরাই নানাতাবে নিগৃহীত হচ্ছেন।

রেলযাত্রীদের কাছে আমরা আবেদন করি যে, রেলের টিকেট চেকিং ষ্টাফের দুরূহ সমস্যা তাঁরা যেন দয়া করে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন তাঁরা নানাতাবে নিগৃহীত হচ্ছেন—এ কথা বলাই বাহুল্য। যাত্রী হিসেবে তাঁরা কোন সুবিধাই পাচ্ছেন না কিন্তু এতদসঙ্গেও অনেক সময় টি, সি, টি, টি ইদেরও তাঁদের সঙ্গে কঠোর

ব্যবহার করতে হয় বাধ্য হয়ে। আমরা আবেদন করি, যাত্রীরাও রেল প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করুন যাতে টিকেট চেকিং ষ্টাফকে বাধ্য হয়ে অনেক অপ্রিয় কাজ না করতে হয়। অনেকেই জানেন না যে বাইরে গেলে টি, টি, ইদের বিশ্রাম গ্রহণের উপযুক্ত বন্দোবস্তও রেল করে না, কারণ তাঁরা রানিং ষ্টাফ নয়। শেয়ালদায় টি সিদের জন্ত কোন টিফিন কিংবা ক্রোক কম নেই। অর্থাৎ এঁদের ন্যূনতম পাওনাটুকুও এঁরা প্রশাসনের কাছে পান না। অথচ কথায় কথায় এঁদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের পোষা কিছু লোকেরা হুর্নীতির জন্ত গোটা টিকেট চেকিং ষ্টাফকে যাত্রীদের কাছে হেয় হতে হচ্ছে, তার কোন প্রতিকার নেই। এই হচ্ছে বর্তমানে পূর্ব রেলের প্রশাসনিক চালচল। রেল মন্ত্রী মধু দত্তবতে অনতিবিলম্বে যদি হস্তক্ষেপ না করেন তবে পূর্ব রেল পরিণত হবে স্থায়ী হুর্নীতির ঘাঁটিতে।

প্রাক্তন মন্ত্রীর একটি দুর্নীতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্যের প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী কমল হেমব্রমের বিরুদ্ধে রাজ্যের বন দপ্তর জাল রসিদ দাখিল করে বই কেনার অভিযোগ এনেছে এবং রাজ্য পুলিশকে অস্বরোধ করেছে যে তাকে যেন গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৭১ সালে ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে ক্রীহেমব্রম বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হন। তখন তার একান্ত সচিব ছিলেন শ্রীলাই মণ্ডল।

অভিযোগে প্রকাশ, বিজ্ঞানময় প্রেস থেকে একখানি পাঁচ টাকা দামের বই কিনে তিনি পাঁচশ টাকার ক্যাশমেমো দাখিল করে বনদপ্তর থেকে ঐ টাকাটা তুলে নেন। রাজ্যের বনদপ্তর এরপর তদন্ত শুরু করেন এবং বিদ্যোদয় প্রেসে গিয়ে তাদের ডুপ্লিকেট ক্যাশমেমো পরীক্ষা করে দেখেন যে সেখানে পাঁচটাকা দামের একটি হিন্দী বই কেনা হয়েছে। অথচ ঐ একই ক্যাশমেমোর আসলটি পাঁচশ টাকা দেখিয়ে একটি জাল ক্যাশমেমো দাখিল করা হয়েছে। রাজ্য বন দপ্তরের সহকারী সচিব মন্ত্রী ও তাঁর সি এর বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ এনে রাজ্য পুলিশের এনকোয়ার্সমেন্ট বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার কথা বলে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কংগ্রেসী (শেবাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

একটি রহস্যজনক দুর্ঘটনা ও কিছু ঘটনা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

একটি মোটর দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে রহস্যের জাল বিস্তৃত হয়েছে। দুর্ঘটনা ঘটেছে গত ১৫ই আগস্ট রাত ৩টায় জি টি রোডের ওপর কুলটি থানার অধীন নিয়ামতপুরে আসানসোল থেকে যার দূরত্ব তিন মাইল। গাড়িতে আরোহী ছিল পাঁচজন—অনিল ঘোষ (রামবাবু), অনিল দাস, প্রবীর গুপ্ত, চিত্ত সাহা এবং ডাঃ সূদীপ্ত রায় যিনি গাড়ির মালিক এবং তিনিই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। এই দুর্ঘটনায় প্রথম দুজন ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন এবং তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ প্রবীর গুপ্তকে আহত অবস্থায় আসানসোল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তিনি গত ১৮ই আগস্ট সকাল ১০-৩০ মিনিট নাগাদ মারা যান।

দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে জানা গেছে, জি টি রোডের উপর একটি লরী দাঁড়িয়েছিল এবং গাড়ির চালক ডাঃ সূদীপ্ত রায় ভ্রমক্রমে এতে ধাক্কা মারেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই দুর্ঘটনায় ডাঃ সূদীপ্ত রায় প্রায় অক্ষত ছিলেন। আর একজন আরোহী চিত্ত সাহার গায়েও কোন আচড় লাগেনি। এই চিত্ত সাহা (হৃদয়ম অকলেরহাটকাটিচিস্ত নামে কথ্যাত) দুর্ঘটনার দিন রাজহৈলরীতে

করে কলকাতা ফিরে আসে। জানা গেছে থানার রেকর্ডে তার নাম নাকি লেখা হয়েছে বিমল সরকার বলে। এবং কুলটি থানার বর্তমান ও সি আগে দমদম থানায় ছিলেন বলেও জানা গেছে। দুর্ঘটনার পরবর্তী অনেক ঘটনাই রহস্যজনক এবং তার উত্তর মেলে না। যেমন, তিনজনের মৃত্যুতে বোঝা যায় দুর্ঘটনা বেশ গুরুতর, কিন্তু দুজন আরোহী প্রায় অক্ষত রইলেন কি করে এবং পেছনের সীটে মাঝে বসা সত্বেও প্রবীরের মাথার পেছনে গুরুতর আঘাত লাগে কি করে? প্রবীরের আত্মীয়দেরই বা পুলিশ কোন খবর দেয়নি কেন? পুলিশ সাউথ সিঁথিতে ডাঃ সূদীপ্ত রায়ের পিতা ডাঃ অনিল রায়কে খবর দেয়, কিন্তু তিনি প্রবীর সূদীপ্তর গাড়িতে কলকাতার বাইরে গেছে তা জানা এবং প্রবীরের বাড়ি তাঁর পাড়ায় হওয়া সত্বেও সেখানে কোন খবর দেন নি কেন? অথচ ডাঃ অনিল রায় খবর পাওয়া মাত্রই আসানসোল হাসপাতালে দৌড়েছিলেন এবং সেখান থেকে কুলটি থানায় গিয়েছিলেন। সূদীপ্ত নিজে ডাক্তার হওয়া সত্বেও প্রবীরকে বর্তমান হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন নি কেন সেখানে তার যথোপযুক্ত চিকিৎসা হতে

পারত? পুলিশই বা এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ছিল কেন? ডাঃ সূদীপ্ত রায় দুর্ঘটনায় লিপ্ত গাড়ির মালিক ও চালক হওয়া সত্বেও তাকে আদালতে হাজির না করে কি করেছে দেওয়া হল? পুলিশ হাতকাটা চিত্তকে সেই রাজহৈ বা ছেড়ে দিল কি করে জিজ্ঞাসাবাদ না করে? আরও প্রশ্ন গাড়িটি কি চালানোর উপযুক্ত ছিল এবং তার ঠিকমত ইনসিগুর করা ছিল?

বি এম এস কোর্সের
ছাত্রদের অভিযোগ
(দর্পণের সংবাদদাতা)

১৯৭৬ সালের ১লা ডিসেম্বর বি, এম এস ডিগ্রী কোর্সের ক্লাশ কলকাতা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ শুরু করেছে। কিন্তু ডিগ্রী কোর্সের মান অসুযায়ী শিক্ষালাভ থেকে ছাত্ররা বঞ্চিত। ডিগ্রী কোর্সের উপযুক্ত ব্যবস্থা ছাড়াই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিতাবে এটা চালু করার অসুমোদন দিলেন? এ অভিযোগ বি এম এস কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের। এ ব্যাপারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও প্রতিকার না হওয়ায় ছাত্ররা ক্ষুব্ধ। তাই বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ছাত্রদের ক্লাশ বন্ধকট আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এ ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তরের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

মানবের ভাবের আলোকে মহাত্মার ভাবের স্বরূপ ও দেবতা বীরেন্দ্র নিশ

অমীমাংসিত প্রশংসা

স্বর্গ অথবা ইজলালের খোঁজে
দ্রেপদীসহ চার পাণ্ডবও গেছেন
বন্দীনাথের পথেই। গেছেন তাঁরা
তিমতে কৈলাসে মানস সরোবরের
কোলে। কিন্তু স্বর্গারোহণের পথে
অগ্রসর হওয়ার স্বযোগ পাননি। সে
পথে সমর্থকরা সর্বদা দুর্ভেদ্য প্রতি-
রোধ রচনা করে আছেন। দেবগণ
(নভশর) প্রবৃত্ত 'পাসপোর্ট' 'ভিসা'
পরিচয়পত্র ছাড়া স্বর্গের সেই পার্বত্য
সোপান অতিক্রম করে কেউই দেব-
শিবিরে উপস্থিত হতে পারেন না।
দেবাত্মচর কিছু মুনিঋষির কাছেই
ঐশ্বর্য ছাড়পত্র থাকে। তাঁরা
দেবতা নামক আন্তর্জাতিক প্রত্নদের
সেবা করেন বার্তাবাহকরূপে, প্রচারক
রূপে ও অমূল্যমানী গুপ্তচর হিসেবেও।
প্রতিদানে লাভ করেন কিছু অত্যা-
শ্চর্য বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা। সমতলে ও
মহুসমাজে সেই ক্ষমতাকে দৈবশক্তি
হিসেবে প্রচার করে প্রভু দেবগণসহ
নিজেদের গোষ্ঠীত্বের প্রভাব ও প্রতি-
পত্তি বিস্তার করেন।

ব্যাপারটি সম্পর্কে কঠোর সাম-
রিক গোপনীয়তা বজায় রাখার যথেষ্ট
কারণ ছিল বলেই কি পাছে নভশর
শিবির (স্বর্গরূপে প্রচারিত) স্বমেরু
পর্বতকে পার্থিব এলাকা হিসেবে
বুঝতে পারেন অর্জুন, তাই সেখানে
নামানোর আগে মহাকাশে ঘুরিয়ে
আনা হয়েছিল তাঁকে? তাই কি
তথাকথিত নভশরশিবির বা দেবভূমি
স্বর্গের সবকিছু গোপন গিরিপথ ছিল
সংরক্ষিত? সেই পথমুখে পৌঁছানোর
আগেই দেবাত্মচর মুনরা এসে সাব-
ধান করতেন, ফিরে যেতে বলতেন
পূণ্যার্থীকে? সজ্ঞাই কি রাজা
পাণ্ডু ব্রহ্মার সভায় যেতে চাইলে
নানা অজুহাতে সেই সভার উদ্দেশ্যে
শোভাযাত্রাকারী মুনরা তাঁকে বাধা
দিচ্ছেলেন? ভীমসেনকে রুখে-
ছিলেন মহাকাশ পূরনপুত্র হনুমান? পাছে
পাণ্ডবরা লোমশ মূনির মতই
পার্বত্যপথে বেড়াতে বেড়াতে হিমা-
লয়-স্বর্গে উপস্থিত হ'ন, দেবরাজ ইন্দ্র
তাই কি স্বয়ং লোমশকেই পাঠিয়ে-
ছিলেন তাঁদের আগলে রাখার জন্ত?

লোমশ ইজলাল থেকে অর্জুনের
কুশল বার্তাবাহ হিগেবে বনবাসী
পাণ্ডবদের কাছে প্রেরিত হয়ে বলেন,
“আমি দেবরাজ ইন্দ্র ও অর্জুনের
নিয়োগানুসারে রক্ষকস্বরূপ হইয়া
আপনাদিগের সহিত পর্যটন করিব।”
জিজ্ঞাসার কাছে প্রশ্ন, লোমশের এই
আগমনের পিছনে বস্তুতই কি অন্য
উদ্দেশ্য ছিল না? পথে লোমশ
পাণ্ডবরক্ষকের ভূমিকার কোনও
বিভূতি প্রদর্শন করেন নি। তিনি
ঐশ্বর্যযুক্তিরাদির সর্বক্ষণের সঙ্গী
হিসাবে পথ পরিচালনা করেছেন।
কিন্তু কেন?

সন্দেহ হয় লোমশকে প্রেরণ করার
পেছনে ইন্দ্রের হয়ত ছিল স্বতন্ত্র
উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য হ'ল, লোমশের
মাধ্যমে স্বর্গাতিযুগে যাত্রাকারী পাণ্ডব-
দের খবরাখবর সংগ্রহ করা। পাণ্ডব
সঙ্গী লোমশ হয়ত কোনো বার্তা
প্রেরক যন্ত্র অথবা টেলিফোনের
মাধ্যমে ব্রাহ্ম্যমান পাণ্ডব পরিবারের
ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ইজলালকে
সর্বদা অবহিত রাখছিলেন। তাঁর
নিয়োগের নেপথ্য কারণ সেটাই।
সম্ভবত লোমশের মাধ্যমেই ইজলালকে
বসে পাণ্ডবগণের পরস্পরের কথোপ-
কথন পর্যন্ত ধরতে পারতেন দেবগণ।
তাই দেখি যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে যখন
বলছেন যে অনেক পথ পর্যটন করে
বহু নদী পর্বত অতিক্রম করে তাঁরা
গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন,
এবার তাঁদের গন্তব্য বৈশ্রবণ (কুদেব)
আবাস কৈলাস (বন, ১৫৯), তখন
সঙ্গে সঙ্গেই দৈববাণী বা আকাশবাণী
হয়, ‘হে রাজেন্দ্র! এই বৈশ্রবণের
আশ্রম হইতে সেই দুর্গম দেশে (স্বর্গে)
গমন করিতে সক্ষম হইবে না। অত-
এব যে পথ আশ্রয় করিয়া আগমন
করিয়াছে, সেই পথ অবলম্বন করিয়া
পুনরায় বদরিকাশ্রমে প্রতিগমন
কর।’ এই সতর্কীকরণই প্রমাণ,
তথাকথিত দেবগণ খুবই সাবধানে
কাজ করতেন।

আমরা বাবংবার লক্ষ করেছি
দেবতার বার্তাবাহক মাধ্যমেই সংবাদ
আদান প্রদান করেন, অন্ত কোনো
ঐশ্বর্যীয় পদা তাঁদের নেই। তাহলে

ভীমকে রাজা যুধিষ্ঠির কী বলছেন
সেই মুহুর্তে ইজলালকে ট্রান্সমিট কর-
ছেন কে? পাণ্ডবদের আত্মনা থেকে
একমাত্র লোমশই পারেন সে খবর
পাঠাতে। দেবসভায় তাঁরই গতা-
য়াত আছে। আর সেই সংবাদ প্রাপ্তি
মাত্র দেতারমুখে রেবতারাও পাণ্ডব-
দের উদ্দেশ্যে তাঁদের নির্দেশ প্রেরণ
করতে পারেন উপযুক্ত গ্রাহকের
কাছে। নিকটই সেই গ্রাহক লাউড-
শীকার যোগে বার্তাটি প্রচার করতে
পারেন কোনো গোপন পার্বত্য
সোপান থেকে। শুনে পাণ্ডবদের তা
দৈববাণী বলেই মনে হয়েছে। লক্ষ-
ণীয় এই, যখন দৈববাণী হচ্ছে তখন
কিন্তু যুধিষ্ঠিরাদির সর্বক্ষণের সঙ্গী
লোমশ সেখানে অমূল্যপণ্ডিত। দৈব-
বাণীকে মাত্র করার উপদেশ দান
করেছেন পুরোহিত ধোম্য। এই
লোমশ হঠাৎ কোথায় গেলেন?
অলক্ষ্য থেকে তিনিই কি বিশ্বয়কর
দৈববাণীটি শোনাচ্ছিলেন তখন?
ইজলাল থেকে আসার সময় বৈজ্ঞা-
নিক দেবতার তাঁকে উপযুক্ত স্বরূপাতি
দিয়ে দেন নি তো? এই লোমশ-
মূনির সঙ্গে ব্যাসদেবেরও ছিল ঘনিষ্ঠ
যোগাযোগ। তাই সন্দেহ অমূলক
নয়।

দেবগণের সঙ্গে ব্যাসদেবের
গোপন সংযোগ ছিল বহুকাল।
অম্মাবধি ব্যাসদেব কোথায় থেকে-
ছেন, কী করেছেন স্বয়ং মা সত্য-
বতীও তা জানতেন না। সত্যবতী
তাঁকে স্মরণ করলে তিনি একবার
রাজপুত্রীতে আসেন। সত্যবতীর
নিয়োগানুসারে ভাতৃবৃন্দের গর্ভে
তিনিই উৎপন্ন করেন ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু
ও বিদুরকে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাস-
দেবই এঁদের পিতা। তারপর আবার
উধাও হয়ে যান ব্যাস। পাণ্ডুর
মৃত্যুর পর কুন্তীসহ কিশোর পাণ্ডব-
গণ যখন প্রথম হস্তিনাপুরে আসেন
ও তদবধি কুরুপাণ্ডবে সামসারিক
কলহ শুরু হয়, তখন দ্বিতীয়বার
ব্যাসদেবের সাক্ষাৎ পাণ্ডুর
বায় রাজপ্রাসাদে। তিনি মাতা
সত্যবতীর এক অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী

শোনান। বলেন:
অতিক্রান্তমুখা: কাল: পৃথুপস্থিত
দাক্ষা:।
স্ব: স্ব: পাপিষ্ঠ দিবসা: পৃথিবী গত-
যৌবনা: ॥ (৬)
বহুমাসা সমাকীর্ণো নানাদোষ
সমাহুল:।
লুপ্তধর্মক্রিয়াচারে। ঘোর: কাল:
ভবিষ্যতি ॥ (৭)
কুরুনামনরাচাপি পৃথিবী ন ভবিষ্যতি
(আদি, সিদ্ধান্তবাগীশ)।

পাণ্ডুর আত্মহত্যাভীরে পর এই
ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণী করে। ঐদৃশ্যিন
তাঁর মা রাজমাতা সত্যবতীকে নিয়ে
বানপ্রস্থে চলে গেলেন। লক্ষণীয়
কুরুপাণ্ডব সত্ত্ববর্ষের অকুরও তখন পর্যন্ত
দেখা দেয়নি। সে সময় যুধিষ্ঠিরের
বয়স মাত্র বোল, ভীম ও দুর্ধোধন-
পনের, অর্জুন চোদ্দ। এই জ্ঞাতি
ভায়েরা সবমাত্র একত্রিত হয়েছেন।
ওই সময় ব্যাসদেবের ভবিষ্যদ্বাণী হ'ল
দুর্ধোধনময়ী কাল সমাগত হয়েছে।
কুরুকুল ধ্বংস হয়ে যাবে। স্বতরাং
মা সত্যবতীকে সংসার ত্যাগ করার
উপদেশ দিয়েছিলেন বেদব্যাস।
প্রশ্ন হ'ল, বিদুর বেদব্যাস কি কুরু
পাণ্ডবদের জন্মমুহুর্ত থেকেই জানতেন
যে একটা মহতী বিনষ্টি সমাগত।
দেবগণ নামক আন্তর্জাতিক শিবির
উত্তরাধিকার শাসন ভার গ্রহণ করে
যেতে চান কি দেবাত্মচর কুন্তীপুত্র-
দের হাতে, যারা বস্তুতপক্ষে দেব-
গুরুসমাজ? চক্রান্ত কি পাণ্ডবদের
সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেছে? তারই
প্রথম চেষ্টা কি ছিল ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়ে
দুর্ধোধনকে ত্যাগ করানো ও যুধি-
ষ্ঠিরের সিংহাসন লাভের পথকে
নিরুদ্ধ করা? এ কাজে দেবনিযুক্ত
ব্যক্তি ছিলেন বিদুর। পাণ্ডবদের
সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম নিয়েছিল কি কুরু-
ক্ষেত্রের কুলনাশী চক্রান্তের বীজটি?
আর সেই চক্রান্তের পেছনে প্রধান
ক্রিয়াশীল পরিচালক ছিলেন আন্ত-
র্জাতিক শক্তিশিবির? তারই
চতুর খেলা চলছে তারপর?
অর্জুন গেছেন হিমালয় স্বর্গে
সময় শিক্ষার্থে? লোমশকে পাঠানো
হয়েছে ভাতৃবিরহে কাতর পাণ্ডবদের
পার্শ্বচররূপে থেকে আন্তর্জাতিক
শক্তি শিবিরকে তাঁদের বিষয় প্রতি-
মুহুর্তে ওয়াকিবহাল করিয়ে রাখার
জন্ত?

মহাত্মার তীয় ঘটনাবলীর অদ্ভুত
পারস্পর্য বিচার করলে ওসব কথাই
মনে হয়। বুঝতে পারি, চতুর্দিকে
একটা ভক্তি বিশ্বাস ভয় ও ভ্রাম
যুক্ত করে সেই আন্তর্জাতিক শক্তি-
শিবিরকে অলৌকিক ক্ষমতার অধি-
কারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত
একটা সর্বব্যাপী প্রচার চলেছে।

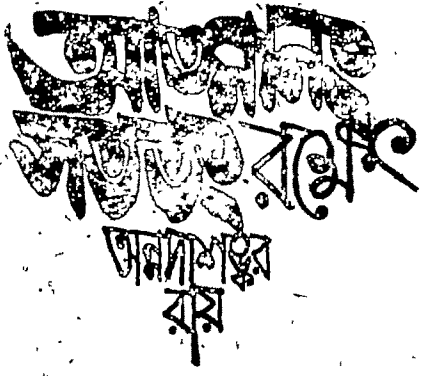
যদিও ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর মিত্রপক্ষ সেই
প্রচার সত্যও শত্রুপক্ষকে কখনো
ঐশ্বর্য শক্তির প্রতিনিধি বলে গণ্য
করেন নি। বিদেহী বলেই গণনা
করেছেন। এমন কি অর্জুন যখন
হিমালয়ে যাত্রা করছেন, দ্রৌপদী
তখন সজল চোখে তাঁর প্রিয়তমাকে
বিদায় জানিয়ে বলেছেন, হে প্রিয়,
তোমার বিরহে আমরা মৃতপ্রায়।
কিন্তু উপায় নেই, “জয়লাভের নিমিত্ত
...তুমি প্রবাসে যাত্রা কর, মঙ্গল
হইবে।” (বন, ৪১) অর্থাৎ স্বয়ং
দ্রৌপদীও জানতেন অর্জুনের স্বর্গযাত্রা
নামান্তরে প্রবাস যাত্রা মাত্র। স্বর্গ
এক মহাশক্তিমান বৈদেশিক বাণী।
তা ভগবানের আলম্বনয়।

লোমশ ছিলেন ইন্দ্র কর্তৃক
প্রেরিত কুশলবার্তাবাহক: ব্যাসদেব
তাঁকে পাণ্ডবদের পার্শ্বচর নিযুক্ত
করেন। এ সমস্তই স্বস্পষ্ট ও চতুর রাজ-
নীতির খেলা। মহাত্মার তের রাজ-
নৈতিক কুটিলাবর্ত আলোচনার সময়
সেই অদ্ভুত রোমহর্ষক ঘটনাবলীকে
আমরা মহাকাশবিজ্ঞানের আলোকে
নোতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে পাব
বিচারে বসলে বোঝা যাবে কুরু-
ক্ষেত্রের যুদ্ধের কারণ পাঁচটি মাত্র
গ্রামের জন্ত জাতিবিবাদ নয়, নয় ভা-
দ্রৌপদী লালনার প্রতিশোধগ্রহণ,
তার পেছনে ছিল আন্তর্জাতিক
বৈদেশিক শক্তির পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠার
আকাঙ্ক্ষা। সেই অনেক কথার জন্ত
আর একখণ্ড গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন।
(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)

গ্যাক্সো ওয়াকার্স ইউনিয়নের অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)
গ্যাক্সো ওয়াকার্স ইউনিয়নের পক্ষ
থেকে প্রতিদ্বন্দী পুরনো এমপ্লয়ীজ
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ওয়াকার্স ইউ-
নিয়নের সভ্য ও সমর্থকদের ওপর
হামলা ও ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ
করা হয়েছে।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে
যে, পুরনো এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের কর্ম-
কর্তারা এতদিন ভুল পথে কর্মচারী-
দের চালনা করেছেন। তাই এই
নতুন এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের জন্ম
হয়েছে। কিন্তু এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের
কর্মকর্তারা নিজেদের অস্তিত্ব বজায়
রাখার জন্ত সব রকম চেষ্টা করে
যাচ্ছেন। পুলিশকে জানিয়েও কোন
লাভ হয়নি। মালিকপক্ষও এই
বিরোধের স্বযোগ নিচ্ছেন বলে অভি-
যোগে বলা হয়েছে।



কতটুকু ভূমি? বিষয়টা যদিও খুব জরুরী তবু বিষয়-
গুণেই লেখা কখনো সাহিত্যের মর্যাদা পায় না। তাই
যদি হতো, আমাদের সাংবাদিকদের মতো ভাগ্যবান
কে? যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়।

‘সবুজপত্র’ আমার সাহিত্যিক জীবনের সুর বেঁধে
দিয়েছে। কিন্তু আমি সেইখানে থেমে থাকিনি। বারো
বছর বয়স থেকে বাহাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত কতরকম
বিষয়েই না মাথা ঘামিয়েছি। আটের চৌহদ্দির ভিতরে
নিয়ে এসেছি কতরকমই না বিষয়। বাল্যকাল থেকেই
আমি শুনে এসেছি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে একটা
সীমিত্তিসি ঘটানো দরকার। সে ভার নিয়েছিলেন
রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী। আমিও সে ভার নিজের
কাঁধে তুলে নিই। আমি হই তাঁদের উত্তরসাধক। সে
সাধনা এখনো অসমাপ্ত। প্রাচ্য প্রতীচ্যের সীমিত্তিসি
এখনো সূদূর। লোকের ধারণা ইংরেজরা দামী জিনিষ
কিছুই দিয়ে যায়নি, সব কিছুই নিয়ে গেছে। কী কী
নিয়ে গেছে ও কী কী দিয়ে গেছে এর একটা সামগ্রিক
হিসাব নিকাশ প্রয়োজন। করতে হবে আমার মতো
যারা দুই দেশের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত, দুই সভা-
তার কোলে জালিত। এটাকে আমি একটা কর্তব্য
বলে স্বীকার করেছি। প্রাচ্য আর প্রতীচ্য দুই মিলেই
বিশ্ব। যে মানুষ বিশ্বপ্রেমিক হবে সে একই কালে
ভারতপ্রেমিক তথা ইউরোপপ্রেমিক হবে। ইউরোপকে
স্বপ্ন করে বা পাটো করে বিশ্বপ্রেমিক বা মানবপ্রেমিক
হওয়া যায় না। ভারতপুথিক রামমোহন ইউরোপ-
পুথিকও ছিলেন। ছিলেন বিশ্বপুথিক। তার সেই
পন্থা আমারও পন্থা।

রামমোহনের মতো আমারও ওপর একটি কর্তব্য
হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মেলবন্ধন। যেখানে আমার জন্ম
সেখানে আমাদের পেছনদিকের প্রতিবেশী একঘর পশ্চিমা
মুসলমান। ব্যক্তিগত জীবনে ওদের সঙ্গে আমাদের
সম্পর্ক চিরকাল মধুর। হিন্দু পুরুষ যে মুসলমান নারীকে
হরণ করে এটা অবিশ্বাস্ত হলেও এরকম ঘটনা আমার
বাল্যকালে বার দুই ঘটে। প্রথম বারের নারীটি আমার
মাস্টারনী। আমাকে আদর করে ধাওয়াতেন মুরগীর
ডিম, যেটা আমাদের বাড়ীতে নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়বারের
পুরুষটি আমাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়। হৃদয়
সাহেবী পোশাকপরা ডাক্তার। দেশীয় রাজ্যে আমার
পিতার বাস। হিন্দুর উপর হিন্দুর অত্যাচারের প্রত্যক্ষ-
দর্শী আমি। খারাপ কেবল মুসলমানরাই, অত্যাচারী
কেবল মুসলমানরাই, এমন কথা আমাদের বাড়ীতে
কখনো শুনিনি। শুনেছি বাইরে, শুনেছি কেবল তাদেরি
মুখে যারা কখনো মুসলমানদের সঙ্গে মেশেনি বা হিন্দু-
দের আশ্রয়গুলো দেখেনি। হিন্দু আর মুসলমান দুই
মিলেই ভারতবর্ষ। ভারতপ্রেমিক যারা হবে তারা
একই কালে হিন্দুপ্রেমিক তথা মুসলমানপ্রেমিকও হবে।
মুসলমানকে স্বপ্ন করে বা পাটো করে ভারতপ্রেমিক বা
বিশ্বপ্রেমিক হওয়া যায় না। এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি
করতে আমার জীবনের আদিপর্বই যথেষ্ট। কিন্তু অস্তিম
পর্বে উপনীত হয়েও আমি অপর দশজনকে উপলব্ধি
করতে পারিনি। গান্ধীজী তো প্রাণটাই হারালেন।
আমি অবশ্য ততদূর ঘাইনি, তবে আমিও কিছুদূর গেছি।
মানচিত্রের দিকে তাকাতে কষ্ট হয়। ওটা তো রাম-
মোহনের, রবীন্দ্রনাথের ও গান্ধীজীর ব্যর্থতার মানচিত্র।
সেই সঙ্গে আমারও।

তৃতীয় যে কর্তব্য নিয়ে আমি গান্ধীজীর প্রভাবে
আসার পর থেকে চিন্তাধিত সেটা হচ্ছে জনগণের সঙ্গে
সাবুজ্য। একই সময়ে আমি টেলিভিশনের প্রভাবেও আসি।
জনগণের সঙ্গে লিখিত তাঁর তেইশটি গল্পের সংগ্রহ আমি

স্কুল থেকে পুরস্কার পাই। তার একটি বাংলায় তর্জমা
করে সেই বয়সেই ‘প্রবাসী’তে পাঠিয়ে দিই। সঙ্গে
সঙ্গে ছাপা হয়ে যায়। টেলিভিশন আর রবীন্দ্রনাথ মিলে
তৈরী করে দিয়েছেন আমার সাহিত্যদর্শন। গান্ধী
আর রবীন্দ্রনাথ মিলে স্থির করে দিয়েছেন আমার জীবন
দর্শন। এঁদের সঙ্গে আমি মনে মনে বাদাশুবাদও
করেছি। বিনা বাক্যে একটা কথাও মেনে নিইনি।
শেষপর্যন্ত আমি এঁদের সন্নিধানে এসে পৌছেছি।
তিনজনেই নগরবিমুখ। তিনজনেই পল্লীপ্রাণ। তিন-
জনেই চেয়েছেন জনগণের মুক্তি ও তাদের সঙ্গে
একাত্মতা। এঁদের আরম্ভ কর্ম এর সমাপ্ত করে যেতে
পারেন নি, পারলে রাশিয়াতে বিপ্লব ও ভারতে নকশাল
বিক্ষোভ ঘটত না। শাস্তিনিকেতনের উত্তরায়ণ এখন
লোহার জাল দিয়ে ঘেরা ‘রক্তকরবী’র রাজনিকেতন।
নইলে নকশালরা রবীন্দ্রনাথের কীর্তি ধ্বংস করত। ক্রমশ
দেশটাও ‘রক্তকরবী’র রাজনিকেতন না হয়ে ওঠে।
আমার কাছে অহিংসা কেবল একটা আধ্যাত্মিক প্রশ্ন
নয়। এটা মানুষের প্রাপরক্ষার তথা কীর্তিরক্ষারও
প্রশ্ন। শুধু ভারতেই নয়, সারা জগতে।



পানু রায়

অনার্য মিত্র

শোন শোন পানু রায়

কতটা জ্বালালে যদি জানতে,
যদি কিছু অপরাধ কিছু কিছু
দোষ গুণ মানতে।

পাচটা বছরে তুমি -

কৌতুক-কেছা ছাড়া কি দিলে,
একে তাকে চাটি দিয়ে

পকেট ভারিয়া তুমি কি নিলে;

এর সাথে গলাগলি ওর সাথে চলাচলি
কালকেই তাকেই দিলে গাট্টা,
পরশু তাকেই ঘুষ, কানাকানি ফুসফুস
অদ্ভুত শাসনের ঠাট্টা।

জরুরী ঘোষণা হোক, মিসা করে। কিছু লোক
দিল্লীখরীকে দিলে বুদ্ধি,
তোমার ধরেনা খুশী, একা মনে ঘোঁটলী
সংবিধানের হ'লো শুদ্ধি।

আরো কত উপহার, কি জানি কি, বাহার,
দিয়েছ কি আলতা ও কুমকুম
দিয়েছ সে মালুবেরে, যারা আছে অনাহারে
লক্ষ টাকার এক বাথরুম।

আহা উহ পানু রায়

চলে গেলে হায় হায়

কি হবে যে পশ্চিমবঙ্গে

সমূলে পতন হল

ধন গেল মান গেল

দয় দয় ভগবতী গদে।

আমার আজকালকার সর্বপ্রধান চিন্তা হলো, আমি
কেমন করে আত্মরক্ষা করব। কেবল কায়িক অর্থে
আত্মরক্ষা নয়, মানসিক অর্থে আত্মরক্ষা, বাচিক অর্থে
আত্মরক্ষা। আমি একজন সারস্বত। একজন কবি,
কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধকার। একজন স্রষ্টা, স্রষ্টা, পথ-
নির্দেশক। দেশের ইনটেলেকচুয়াল লীডারশিপ আমার
মতো কয়েকজনের উপরেও বর্তেছে। প্রাণের ভয়ে বা
দুর্ভোগের ভয়ে আমরা কখনো আমাদের দায়িত্বের প্রতি
বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারিনে। প্রলোভনে পড়েও
লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারিনে। সামনে আমাদের ক্ষুধার পন্থা।
লিকলেও বিপদ, না লিখলেও বক্ষ্যাহ। স্টেরিলাই-
জেশন।

বিশেষ করে আমার সামনে এখন একরাশ অসমাপ্ত
কাজ। বা আমি ছাড়া আর কারো হাত দিয়ে সম্পন্ন
হবার নয়। ত্রিশ বছর ধরে যে উপন্যাসটির জন্তে
আমি প্রস্তুত হচ্ছি তার সমাপ্তির জন্তে আমাকে বেঁচে
থাকতে হবে। শরবৎ ত নয় না হলে সে কাজটি ব্যাহত
হবে। সেইজন্তে আমি দশ জনের দশ রকম করমাস
খাটতে নারাজ। তবু খাটতেই হয়, কারণ আমি একজন
সামাজিক মানুষ। নির্মমভাবে ‘না’ বলতে কুঠা বোধ
করি। এমনতেই যথেষ্ট অসামাজিক। সামাজিকতা
করতে সম্মত পাইমে। কিন্তু এখনো সমাজে বাস করছি।
ক্রীঅরবিন্দ বা পাবলো পিকাসো বনে ঘাইনি। তা
ছাড়া আমি একজন ঔপন্যাসিক। ঔপন্যাসিক যদি
পাঁচজনের সঙ্গে না মেশে, যদি সব সময় দরজা বন্ধ করে
লেখে, তাহলে তার জীবনের অভিজ্ঞতা বাড়ে না। আর
তার জীবনের অভিজ্ঞতাই তো তার পুঁজি।

তার পর এখনো আমার কবিতার কাজ বাকী।
কতক কথা আছে, তা কবিতা আকারেই ব্যক্ত করতে
হয়। আমি আবার এমন একজন কবি যে কবিতা বলতে
বোঝে ছন্দোবদ্ধ মিত্রাক্ষর কবিতা। ক্রী ভার্স আমি
জীবনে একবারমাত্র লিখেছি। সেটা আমার এপিটাক।
নিজের উপর এমন একটা অহুশাসন না চাপালে আমার
কবিতার সংখ্যাও আমার প্রবন্ধ সংখ্যার সমান হতো।
কিন্তু তা হলে আবার এমন অভিযোগও উঠত যে ওগুলিও
বর্ণচোরা প্রবন্ধ। পড়ের মতো করে শাদালাে কী হবে,
কবিতা বলে কথিত বস্তুটি কবির বক্তব্য মাত্র।

ছেলেবেলায় আমার হাতে এক ডান্ডা ‘সবুজপত্র’
পড়ে। তখন থেকেই ‘আর্ট’ বলে একটি শব্দ আমার মনে
গেঁথে রয়েছে। কী যে ওর অর্থ তখন আমি তা বুঝতুম
না। পরে নানা মূনির নানা ব্যাখ্যা শুনেছি। নানা মূনির
অনুসরণ বা অনুসরণও করেছি। শেষে নিজেই একটা
সিদ্ধান্তে পৌছেছি। তার আগে রকমারি এক্সপেরি-
মেন্ট করেছি। ‘আর্ট’ নামক ওই শব্দটি আমার জীবনের
সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে যে আমার নিজের
বিশ্বাস আমি একজন আর্টিস্ট ও আর্টিস্ট ছাড়া আর কিছু
নই। আমি বাই লিখি না কেন, প্রবন্ধ বা ছড়া বা গল্প,
তা যদি আর্ট না হয় তবে তা আমার চোখে-ব্যার্থ। যে
পরিমাণে তা আর্টোত্তীর্ণ সেই পরিমাণে তা কালোত্তীর্ণ।
যা আজ বাদে কাল বাসি হয়ে যাবে তা লিখে আমার



পিতা-পুত্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা

১৯৭০ সালে ২৬শে ডিসেম্বর রাতে আমার ছেলে স্থগির দস্তকে একদল সশস্ত্র পুলিশ বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করে একটা স্কুল পোড়ানোর মিথ্যা মামলায়। আমার ছেলের ওপর পুলিশ অকথ্য অত্যাচার চালায়। আরও নানা মিথ্যা মামলা সাজিয়ে পুলিশ বনগাঁ সাব-ডিভিশন কোর্টে একটা মামলা দায়ের করে। কলেজের অধ্যক্ষ এবং স্থানীয় জন-সাধারণের আবেদনের ভিত্তিতে আমার ছেলেকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ঐ অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ তাকে পি, ডি, অ্যাক্টে গ্রেপ্তার করে দমদম সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেন।

আমার ছেলে রাণাঘাট কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক বিজ্ঞানের ছাত্র। মেধাবী বলে সরকারী বৃত্তি পায়। জেলে থাকাকালীন পাট ওয়ান পরীক্ষা দেওয়ার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি চাইলে দেওয়া হয় না। এরপর একাত্তর সালের ১৪ই মে জেলের অভ্যন্তরে শতাধিক বন্দীর সঙ্গে আমার ছেলের ওপরও প্রচণ্ড ভাবে অত্যাচার করা হয়। ফলে সে প্রায় পঙ্গু হয়ে যায়। ব্যারাকপুর কোর্টে একটা মিথ্যা মামলাও রুজু করে জেল কর্তৃপক্ষ।

এরপর এল আমার পালা। যেহেতু আমি মার্কসবাদে বিশ্বাসী তাই আমার ঘাড়ের চাপানো হলো মিথ্যা একটা হত্যা মামলা। ১৯৭৪ সালের ১৭ই জুলাই কংগ্রেস কর্মী পরিষেবা নাথের নেতৃত্বে একদল সমাজ-বিরোধী আমার বাড়ী পুড়িয়ে দেয়। পাশে আমার একটা ক্ষেত ছিল যা থেকে আমার অন্ন সংস্থান হত তাও নষ্ট করে দেয়। আমার সমস্ত সম্পত্তি আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে পরাশ্রয়ে থাকতে বাধ্য হয়। পরে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হলেও আমাকে আর স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না। পুলিশ আজ পর্যন্ত আমার বাড়ীতে যারা আগুন দিয়েছে তাদের গ্রেপ্তার করে নি।

আমার ছেলের বিরুদ্ধে আবার হত্যার মামলায়, পরোয়ানা জারী করা হয়। ঐ একই মামলার স্থানীয় কৃষক পরিবারের বাবলু, অশোক, অরুণের বিরুদ্ধেও মামলা রুজু করা হয়। এখন এরা আদালতের নির্দেশে বেকসুর খালাস পেয়েছে। কিন্তু আমার ছেলের বিরুদ্ধে এখনও

গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নেওয়া হয় নি।

কংগ্রেসী অত্যাচারে আমি এখন নিঃশ্ব, রিক্ত। আমি ছেলে মেয়ে নিয়ে অনাহারে মিন কাটাচ্ছি। এ ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

ভবানীজীবন দত্ত
পাল্লা, ২৪ পরগণা

৪র্থ টাইবুনালের মামলা প্রসঙ্গে

বন্দীমুক্তি ও গণদাবী কমিটি বর্ণিত প্রতিনিধিদের “৪র্থ টাইবুনাল মামলাটি” সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর উক্তি রাজনৈতিক বন্দী মুক্তির প্রসঙ্গে জটিলতারই সৃষ্টি করবে। কিস্তি নির্ধারিত হবে রাজনৈতিক মামলা চরিত্র? কোন বিশেষ দলের বা ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছাই যদি রাজনৈতিক চরিত্র নিরূপণের মানদণ্ড হয়, তাহলে সেটা হবে বামফ্রণ্টের “রাজনৈতিক বন্দীদের” সাধারণভাবে ক্ষমা” ঘোষণার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বিপরীত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উক্ত ৪র্থ টাইবুনাল মামলাটিতে, “সশস্ত্র উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল,” “বর্তমান সরকারকে উৎখাত করে তার স্থলে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন” ইত্যাদি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। স্বতরাং সরকারী অভিযোগনামা থেকেই মামলাটির রাজনৈতিক চরিত্র নির্ধারিত হয়। তাছাড়া এই মামলার অভিযুক্তদের অনেকের বিরুদ্ধেই আবার বিহারে একটি “নকশালী বড়বল মামলা” রুলছে যার নাম “বহুগোড়া বড়বল মামলা।”

রমা চ্যাটার্জী

উদ্ভট নিয়ম

নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি ল’ কলেজে ভর্তি নিয়ে চরম ধামধেয়ালী-পনা ও পক্ষপাতিত্ব চলছে।

আমি ১৯৭৭-এর জুন সেখানে ভর্তি হওয়ার জন্য যথারীতি আবেদন করি। বেশ কিছুদিন বাওয়ার পর ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে প্রকাশিত তালিকায় দেখলাম আমার নাম নেই। অক্লিষ্ট শোখ নিয়ে এ ব্যাপারে কোন সঠিক উত্তর পেলাম না।

ভারপ্রাপ্ত লেকচারার ইন-চার্জ মিঃ ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা করলে তিনি জানতে চান আমি কোথা

থেকে পাশ করেছি। বললাম করবার অস্বরোধ জানাই। এবং কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে। শুনে তিনি আমাকে সরাসরি জানিয়ে দিলেন একমাত্র নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি ছাড়া অন্য কোন ইউনিভার্সিটির ছাত্রকে ভর্তি করা হবে না। যদিও আমার চেয়ে অনেক কম নম্বরের ছাত্রকে (নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির) ভর্তি করা হয়েছে।

আমি জলপাইগুড়ির অধিবাসী। স্কুল ও কলেজের পড়া ওখানেই করেছি। যেহেতু তখন উত্তরবঙ্গে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, তাই আর্থিক অসুবিধা সত্ত্বেও কলকাতায় পড়তে আসি। সেটাই কি আমার অপরাধ? তাবতও অবাক লাগে আদ্যকের দিনে কি করে আঞ্চলিক ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে।

দিলীপকুমার দত্ত
জলপাইগুড়ি

লক্ষ্মীকান্ত বসুর ষড়যন্ত্র

আপনার ১৬ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

দক্ষিণ কলিকাতার রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সদস্য শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বসুর কিছু কিছু দুর্নীতি-মূলক ও খেচ্ছাচারী অগণতান্ত্রিক ও দলের ওপরে ব্যক্তি-স্বার্থকে কায়ম করা ও অবৈধ উপায়ে সম্পত্তি করার বিরুদ্ধে কংগ্রেস দলের একজন কর্মী ও এন এল সি সির কোষাধ্যক্ষ হিসেবে আমি প্রতিবাদ করি। এন এল সি সি সংগঠনের আমি কোষাধ্যক্ষ থাকার সময় বেশ কিছু টাকা তিনি দপ্তরে জমা না দিয়ে তছরপ করার ঘটনারও প্রতিবাদ করি। এর কলে স্থানীয় পুলিশের বড়কর্তাদের (ক্ষমতায় থাকার সময় যাদের তিনি নানাতাবে “উপকার” করেছেন) সাহায্যে আমার নামে গাড়ী চুরির একটি সাক্ষ্যাদা ঘটনা দিয়ে আমার গ্রেপ্তার করান। অভিযোগ নাকি জনৈক চালকের কাছ থেকে একটি গাড়ী ছিনিয়ে আমি চালিয়ে নিয়ে যাই। আমি নিজে গাড়ী চালাতে জানি না। এবং শুধু তাই নয় খোয়া বাওয়া গাড়ীটি লক্ষ্মীবাবুর ঘরের ১০ গজের মধ্যেই পাওয়া যায় যাতে প্রমাণ হয় এ ঘটনা স্বস্থমস্তিকে সাক্ষ্যাদা একটি জঘন্য ষড়যন্ত্র মাত্র। সেই ঘটনায় অভিযোগকারীরা পুলিশের উপস্থিতিতেও বলে আমি ঐ ঘটনায় ছিলাম না।

আমার বন্ধু পরলোকগত তিলক করের স্মৃতির বিষয়েও অভিযোগ করা হয়েছে। তিলক আমার বনিষ্ঠতম বন্ধু ছিল। দেবী রায়ের হাতে পায়ে ধরে আমিই তাকে তদন্ত

করবার অস্বরোধ জানাই। এবং আমি ও পরলোকগত তিলকের বৃদ্ধ পিতাই এ বিষয়ে সমস্ত প্রকার-চেষ্টা করছি।

অভীক বন্দ্যোপাধ্যায়

সরকারপুর মানসিক হাসপাতাল

সরকারপুর মানসিক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্মচারীরা আন্দোলনে নেমেছেন। কর্মচারীদের দাবী চাকুরীর নিরাপত্তা, বেতন কাঠামো চালু, নিয়ম অনুযায়ী ছুটি প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি ও ৮ ঘণ্টা কাজের সময় প্রভৃতি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ দাবী মানতে মোটেই রাজী নয়। জেলা-শাসক একজন প্রশাসক নিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের দাপটে তিনিও কাজ ছেড়ে চলে যান।

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর বাইরের ভাড়াটে গুণা দিয়ে কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ও হাসপাতাল কর্মীদের ওপর হামলা সংগঠিত করেন। কর্তৃপক্ষ সমস্ত রোগীদের হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার নোটিশ দিয়েছেন। এবং নতুন রোগী ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চক্রান্ত চলছে হাসপাতাল পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার। এ ব্যাপারে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অবিলম্বে হস্তক্ষেপ দাবী করছি।

অমল নন্দ

সাধারণ সম্পাদক, সরকারপুর ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ এম্বলয়ীজ ইউনিয়ন

অপসংস্কৃতি

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর দর্পণে অপসংস্কৃতির অবসানে প্রত্যেকের সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে শ্রীশান্তি-ময় শুভ যে মত ব্যক্ত করেছেন তা সমর্থন করি। কিছুদিন আগে ড্যা-মন্ত্রী ‘বারবধু’ নাটকটির প্রদর্শনী বন্ধ করতে বলায় ফল হয় উল্টো। প্রমোদক সংস্থা তাঁকে অপমান করতে দ্বিধা বোধ করেন না। শুধু তাই নয়, সস্ত্রি একটি বাংলা সাপ্তাহিকে বাংলা থিয়েটারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনায় রক্তপ্রসাদ সেনগুপ্ত ‘বারবধু’ নাটককে অস্বীল বলায় এই নাটকের রূপকার, নির্দেশক এবং নায়ক শ্রীঅসীম চক্রবর্তী তাঁকেও ছেড়ে বেন নি এবং গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর নিজের নাটক অভিন্ন করে বলেন নান্দীকারের ‘নাট্যকারের সম্মানে ছুটি চরিত্র’ নাটকটিও অস্বীল।

অসীমবাবু অবশ্য একটি সহায়ক সমীকরণ সাহায্যে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে তাঁর নাটক সংস্কৃতির বাহক এবং শিল্পগুণ সমন্বিত। সেটি হোল, ঈর্ষা=অপসংস্কৃতি; অতএব ভালো-বাসার রোহট=সংস্কৃতি।

শান্তনু সেনগুপ্ত

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

আমি শতকরা ৭০ ভাগের বেশী নম্বর পেয়ে ছুটি লেটার সমেত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে ‘৬৮ সালে ইউ সি ই টি যাদবপুর থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছি। আজও পর্যন্ত আমি যোগ্যতানুযায়ী কোনো চাকরি পাই নি। অথচ চারদিকে দেশ গঠনের জন্য শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ারদের প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। দেশ এগিয়ে চলেছে, জুড় বেকার সমস্যা সমাধানের কথা যখন উচ্চ-স্তরে প্রচারিত, সেই সময় শিক্ষার অভিশাপ বহন করে যোগ্যতানুযায়ী চাকুরীর জন্য আমি প্রতীক্ষা করে আছি। বাড়িতে ৭৫ বছর বয়সের অসুস্থ বৃদ্ধ পিতা তাঁর কনিষ্ঠতম পুত্রের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। আমি নিজেও সার্টিফিকেটগুলির মূল্য সম্পর্কে ক্রমশ হতাশ ও সন্নিহান হয়ে উঠছি।

প্রাণতোষ গঙ্গোপাধ্যায়

মন্ত্রীদের দুর্নীতি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রী সীতারাম মাহাতোর কাছে রাজ্য বন দপ্তর যখন ফাইলটি পাঠান তখন তিনি পাঁচটি বছর ফাইলটি চেপে রাখেন এবং অফিসাররা বার বার তাকে এ ব্যাপারে অস্বরোধ করলে তিনি এড়িয়ে যান। কারও কমদ হেমব্রম শ্রীমাহাতোর জেলা পুলিশিয়ার কংগ্রেস নেতা। গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহেমব্রমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্য বনদপ্তর এনফোর্সমেন্ট বিভাগের কাছে সুপারিশ করে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার আজ পর্যন্ত বার বার বলা সত্ত্বেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নি।

রাজ্য বনদপ্তরের কয়েকজন অফিসারের প্রশ্ন জামিয়াতির অভিযোগ আনা সত্ত্বেও পুলিশ কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তিনি প্রাক্তন মন্ত্রী বলে কি রেহাই পাচ্ছেন?

ভানুসিংহ

পাঞ্জিরাহ + কলেজ স্ট্রীট এবং কাশনাথ বুক এজেন্সী কলকাতা-১২

এমার্জেন্সীর সময় সঞ্জয়রাই ছিল প্রকৃত শাসক : শাহ কমিশনের তথ্য

দর্পন

বিশ্ব বর্ষ ১৯৮১ সংখ্যা ১১ শুক্রবার ১৪ই অক্টোবর, ৭৭ ৪০ পয়সা

সি পি এম কর্মী স্বজনকে হত্যার কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

১৯৭১ সালের স্বাধীনতার সেই দিনগুলিতে যখন পুলিশ, সি, আর, সি, আর কংগ্রেসী হামলা বাহিনীর বোম্বardmentে যারা দেশটা হয়ে উঠেছে দুঃশাসনের রাজত্ব তখন বেলেঘাটা অঞ্চলের সি, পি, এম, কর্মী রবি দাসের সামনেই উদ্ঘাটিত হলো এক খুনের ঘটনার কাহিনী।

গত ২২, ১১, ৭১ তারিখ সকালে যুব কর্মী রবি দাসকে বিভিন্ন বানানো মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। এবং একই দিনে সি, পি, এম কর্মী স্বজন চক্রবর্তীকে ইন্দিরা-শাহীর পুলিশ নির্মমভাবে হত্যা করে। রবি দাস যখন বেলেঘাটা থানায় বসে রয়েছে, তখন রবি দাসের উপস্থিতিতেই থানার অ্যাটর্নি ও, সি, ছলল দাস আফ্রাদে আটখানা হয়ে নাচতে নাচতে লাল-

বাজারে ফোন করে খবর দিল যে, “একটা শুভ নিউজ আছে, সি, পি, এম-এর স্বজন চক্রবর্তী ফিনিস”। এরপরও যে সমস্ত কথোপকথন হল তাতে এটা পরিষ্কার যে, স্বজন চক্রবর্তীর মৃত্যু একটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড এবং ঐ ছলল দাসই হত্যাকারী। ফোনে কথা শেষ হবার পর থানার জেহুইন ও, সিকে হাসতে হাসতে থানায় ঢুকতে দেখা গেল এবং ছলল দাসকে সে আশ্বাস দিল যে, “এবার তোমার প্রমোশন সিওর।” এদিকে যখন হঠাৎ খেয়াল হলো যে রবি দাসের সামনেই সব কথাবার্তা হয়েছে। তখন ডাইরীতে রবি দাসের গ্রেপ্তারের সময় পাণ্টে বিকেল তিনটে করে দিয়ে বাবুরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শাহ কমিশনে এ পর্যন্ত যে সব তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, এমার্জেন্সীর সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর নামে তার অপদার্থ পুত্র সঞ্জয় ও অপকর্মের তার সহযোগী ধাওয়া নরা প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করেছে। সমস্ত দিক দিয়েই গভর্নমেন্টের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও সঞ্জয় প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যাপারে নাক গলিয়েছে এবং বিভিন্ন উচ্চপদে তার স্বাবস্থিত লোকদের সরিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক-দের বসিয়ে জনসাধারণের অর্থ লুটে-পুটে ধরেছে। তার মাতৃদেবী ৬০ কোটি মানুষের মণ্ডুকের কর্তা তাকে নিরস্ত করা দূরে থাক, এ সব কাজে প্রশংসা দিয়েছেন। এমন কি মার্চের সাধারণ নির্বাচনে সবংশে উৎপাত হওয়ার পরেও ইন্দিরা নিজ পুত্রের, সাফাই গেয়েছেন।

শাহ কমিশনে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে যে, প্রধান মন্ত্রীর সচিবালয়ের একজন সামান্য কর্মচারী হয়েও আর কে ধাওয়ানের ক্ষমতা কত বেড়ে গিয়েছিল। সঞ্জয়ের যে কোন ইচ্ছাকে তিনি প্রধানমন্ত্রীর আদেশ বলে ঘোষণা করতেন এবং কার্কে পরিণত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলে চাপ সৃষ্টি করতেন।

সঞ্জয়রা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলো দখল করে নিয়েছিল নিজদের পেটোয়া লোক মারফৎ, অর্থাৎ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বংশীলাল, রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং আর এন কাণ্ড, (শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



প্রেসিডেন্সী জেলে সত্যনারায়ণ সিংয়ের একটি টেলিগ্রামের কাহিনী

দর্পণের সংবাদদাতা

চলতি বছরের মে মাসের ১৫ তারিখে নকশালপহীদের একটি গোষ্ঠীর নেতা সত্যনারায়ণ সিং প্রেসিডেন্সী জেলে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। উনি টেলিগ্রাম করেছিলেন নিউদিল্লী থেকে। এটি এখানে পান সাধন সরকার। ঐ টেলিগ্রামের বয়ানে বলা হয়েছে ১৪ই মে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসে সত্যনারায়ণ সিং যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটাকে মেনে নিতে এবং জেলের স্বস্ত সব বন্দীদের বলা হচ্ছে তারা যেন জেলকর্তৃপক্ষের কাছে একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে তাদের “কেন্দ্রীয় কমিটির” লাইন সমর্থন করে এবং সংগে সংগে ১৩ই এপ্রিল সত্যনারায়ণ সিং যে বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন তাকেও যেন সমর্থন করেন। সত্যনারায়ণজী টেলিগ্রামে স্পষ্ট ভাষায় লিখে দিয়েছিলেন “এটি মুচলেকা নয়।” এই স্বাক্ষর করলে তারা মুক্তি পাবেন।

সত্যনারায়ণ সিং সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য যে বিবৃতি দেন তাতে কি ছিল? বিবৃতির শুরুতেই তিনি বলেছেন গত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও সি পি আইয়ের পরাজয় হল “জনগণের স্বয়ং”। তিনি আশা প্রকাশ করেন জনতা সরকার “গণ-তন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা” করবেন। তাই তারা জনতা সরকারকে সমালোচনা-মূলক সমর্থন করছেন। তারাই

নাকি একমাত্র পার্টি যারা ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে এবং জনগণের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেছে এবং করবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এই সত্যনারায়ণ গোষ্ঠী গত লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়েছিল যা অন্যান্য নকশালপহীদের মতে “ঐশ্বর্যতন্ত্রের পক্ষে সহায়ক ভূমিকা।” নকশাল আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কাহ্নুসাত্তাল এই মত পোষণ করতেন। এছাড়া ঐ বিবৃতিতে তিনি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য চরণ সিংয়ের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সত্যনারায়ণজী চরণ সিংয়ের সংগে দেখা করে বন্দী-মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করার পরই এই বিবৃতি দেন। চরণ সিং প্রসঙ্গে বলেন আলোচনায় চরণ-সিংয়ের দৃঢ়তা, সমস্তকে আরম্ভধীন করার ক্ষমতা, কমুনিষ্ট বিপ্লবীদের প্রতি বাস্তবমুখী দৃষ্টি মূর্ত হয়ে (শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

যতীন চক্রবর্তী প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রীদের ক্ল্যাট দিচ্ছেন

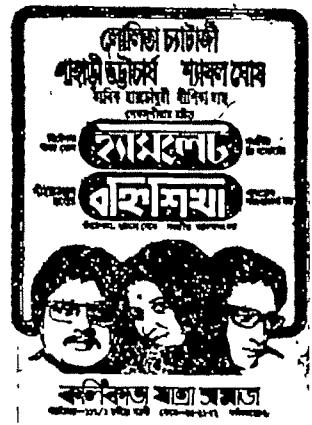
(দর্পণের সংবাদদাতা)

পূর্বে যতীন চক্রবর্তী অফিস-লারদের দুর্নীতিগ্রস্ত বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু তাঁর ঘরে ক্ল্যাট নিয়ে যে কেলেঙ্কারী হচ্ছে তার তদন্ত হলে কি উত্তর তিনি দেবেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের আবেদন ক্ল্যাট বিলির ব্যাপারটা তিনি যেন খতিয়ে দেখেন। যতীনবাবুর উদারতায় কংগ্রেসের দুই প্রাক্তন মন্ত্রী ডাঃ গোপালদাস নাগ ও প্রদীপ ভট্টাচার্য পাম এভিনিউতে দুটি ক্ল্যাট পেয়েছেন। গোপালদাস নাগ ও প্রদীপ ভট্টাচার্য যতীনবাবুকে কংগ্রেসী আমলে অনেক সাহায্য করেছেন তাই তিনি সেই উপকা-

রের বিনিময়ে তাদের দুটি ক্ল্যাট উপহার দিয়েছেন। ডাঃ গোপালদাস নাগের মেয়ের নামে আরো একটি ক্ল্যাট আছে মণিকতলা তি-আই-পি রোডে। কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার সময় সন্ত বিবাহিত মেয়ে জামাইয়ের জন্য ঐ ক্ল্যাটটি বরাদ্দ করা হয়েছে। ডাঃ গোপালদাস নাগের নিজস্ব বাড়ী আছে ঐরামপুরে। তিনি কলকাতাতে থাকেন না বললেই চলে। অথচ যতীনবাবুর কল্যাণে ডাঃ নাগ আরো একটি ক্ল্যাট পেয়েছেন। কেন তাদের এত সখ্য সেটা অনেকেরই প্রশ্ন।

চরণ সিং সি আই এ এজেন্ট

বিগত কংগ্রেসী আমলের এক মন্ত্রী গোবিন্দ নন্দর ৪ঠা অক্টোবর এস-প্রান্ডে ইন্টে গ্রেফতার বরণের আগে তাঁর বক্তৃতায় চরণ সিংকে সি আই এ এজেন্ট আখ্যা দিয়ে বলেন “ঐ সি আই এ এজেন্ট চরণ সিং অত্যন্ত ক্যান্সিষ্ট কায়দায় ইন্দিরা গান্ধীকে গ্রেফতার করেছে। চরণ সিং-এর বোম্বardment আমরা মানবো না। আমরা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো এবং তাকে যে কোন পর্যায়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত।” গোবিন্দ নন্দর কি সত্য সত্যই মনে করেন যে চরণ সিং সি আই এ এজেন্ট? তা যদি তিনি মনে করেন তাহলে তিনি এ সম্পর্কে তদন্তের দাবী করুন।



দুর্গাপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অনিয়মের রাজত্ব (দর্পণের সংবাদদাতা)

দুর্গাপুর রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যাপারে যে কি রকম অবৈধতা ও অত্যাচারে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, তার বিশদ বিবরণ বর্তমানে জানা গেছে।

এই কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীমণ্ডল তাঁর কার্যকালের মেয়াদ ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকা সত্ত্বেও কোমরুপ অহুমোদন ছাড়াই আরও দু'বছর বেআইনী ভাবে চালিয়ে ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে কার্যভার ত্যাগ করেন। নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে সিনিয়রিটি ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করে ডঃ এম এস সিন-হাকে কার্যভার বুঝিয়ে দেওয়া হয়। অথচ ১৯৭০ সালে অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করার আমন্ত্রণ এই ডঃ সিনহাই প্রত্যাখ্যান করেন এবং তখন নিজের সিনিয়রিটির দাবীও নিজ স্বার্থে তুলে নেন।

কলেজের সবচেয়ে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ নারায়ণচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের অধ্যক্ষ পদের দাবীই সবচেয়ে জোরালো হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ডিঙিয়ে অন্য লোককে অধ্যক্ষ হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। শ্রীদাশ-গুপ্ত ১৯৭০ সালে নকশাল আমলে কলেজের সংকটময় মুহুর্তে যখন অত্যাচার এই পদ গ্রহণে ভীত হন তখন অস্থায়ীভাবে কাজ করতে স্বীকৃত হয়ে কলেজের প্রতি তাঁর ভালোবাসার পরিচয় রেখেছেন। অথচ কর্তৃপক্ষ অভিজ্ঞ ও যোগ্যতার লোককে বাদ দিয়ে ১৯৭০ এর সংকটজনক পরি-
স্থিতিতে যারা অধ্যক্ষ দায়িত্ব পালনে পিছিয়ে গিয়েছিলেন, তাদেরই আশ্রয় পুরস্কৃত করলেন।

সম্প্রতি আবার অধ্যক্ষ পদে যাতে মনোমত লোককে বসানো যায় সেজন্য কর্তৃপক্ষ অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের বয়সের উর্দ্ধসীমা অস্তায়ভাবে বাড়িয়ে ৪৫ বৎসর করেছেন। এর ফলে অত্যাচার যোগ্যতার প্রার্থীকে ইচ্ছাকৃতভাবে মনোনয়নের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

সম্প্রতি আবার অধ্যক্ষ পদে যাতে মনোমত লোককে বসানো যায় সেজন্য কর্তৃপক্ষ অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের বয়সের উর্দ্ধসীমা অস্তায়ভাবে বাড়িয়ে ৪৫ বৎসর করেছেন। এর ফলে অত্যাচার যোগ্যতার প্রার্থীকে ইচ্ছাকৃতভাবে মনোনয়নের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

সম্প্রতি আবার অধ্যক্ষ পদে যাতে মনোমত লোককে বসানো যায় সেজন্য কর্তৃপক্ষ অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের বয়সের উর্দ্ধসীমা অস্তায়ভাবে বাড়িয়ে ৪৫ বৎসর করেছেন। এর ফলে অত্যাচার যোগ্যতার প্রার্থীকে ইচ্ছাকৃতভাবে মনোনয়নের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

গার্ডেনরীচে রেল কর্মচারীদের ওপর পুলিশী হামলা (দর্পণের সংবাদদাতা)

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর সমাজ-বিরোধীরা ছদ্মবেশে কলকাতা পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা গার্ডেন-রীচে দক্ষিণপূর্ব রেল কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতির কাঁধালয়ে হামলা করে। রেল কর্মচারী শ্রীধীরাজ ব্যানার্জীর হাত বেয়েনেটের সাহায্যে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা হয়। এছাড়া সর্বশ্রী সমর-ভট্টাচার্য, দিলীপ মুখার্জী, রঞ্জিত ভট্টাচার্য এবং কৃষ্ণ চ্যাটার্জী মারাত্মকভাবে ঐ পুলিশ বাহিনীর হাতে প্রহত হয়ে রেল হাসপাতালে ভর্তি হন। অত্যাচার কর্মচারীরা আক্রমণকারীদের নিম্নোক্ত চারজনকে আটক করে পোর্ট পুলিশের ডি. সি. এস. কে. মুখার্জীর হাতে তুলে দেন। এই চারজন হলেন শ্রীমুখার্জীর সন্তান, কলকাতা

১লা অক্টোবর ১৯৭৩ সাল থেকে কলেজে ইউ সি সি প্রবর্তিত সংশোধিত বেতন হার চালু হবে। ডঃ সিনহা ১৯৭৫ সালে অবসর গ্রহণ করেও পুনর্নিযুক্ত হয়েই উক্ত স্কেলের সুযোগ লাভ করবেন যদি ইউ সি সি উক্ত পুনর্নিয়োগ অহুমোদন করে। অত্যাচার গভর্নিং বডিকে অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের অহুমোদন নিতে হবে যদি তাঁরা ডঃ সিনহাকে কন্ট্রাক্ট সা ভিসে রেজু নিয়োগ করে। কিন্তু গভর্নিং বডি তা করে কিনা সেটাই লক্ষ্য করার বিষয়।

গার্ডেন পুলিশ কনষ্টেবল নং ১৪৩৪২, শ্রীলক্ষ্মণ মুখার্জী ১০৫১৪, শ্রীসদানন্দ মণ্ডল, ১০৫৪৫, শ্রীচন্দ্রাবলী সিং ৫৪২৪।

কর্মচারীদের চাপের ফলে ডি সি পোর্ট লিখিতভাবে এদের গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। কিন্তু গৃহ পুলিশদের স্বীকৃতি অস্বাভাবিক অত্যাচার দোষী পুলিশদের এখনও গ্রেপ্তার করা হয় নি। পুলিশী হামলায় আহতদের কতিপয়নের ব্যবস্থাও এখনও হয় নি। এই ঘটনার পর স্থানীয় এম. পি. শ্রীসোমনাথ চ্যাটার্জী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। রেল কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে শ্রীশ্রী ব্যানার্জী, শ্রীকে, পি ভদ্র ও শ্রীবিমান দাস সমস্ত পুলিশদের শাস্তি ও আহতদের কতিপয় দাবী করে এক বিবৃতি দিয়েছেন।

ফিলে পাওয়া যাচ্ছে দর্পণ

শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৪
এই সংখ্যায় আছে ৥

রায়ত প্রসঙ্গে বাংলার বিদ্যাসমাজ : কুমদকুমার ভট্টাচার্য / দর্পিতা ইন্দিরা : সাধন গুহ / কংশীলাল—গণতন্ত্রে এক ক্ষুদ্রে ডিক্টেটর : মুকুন্দন মেনন / রাশিয়ার রাষ্ট্রচরিত্র এক সংশোধনবাদ : পঙ্কজ চৌধুরী / গণ-তন্ত্র বনাম কীরাতন্ত্র : ক্রান্তি সেন / সংবিধানের নব কলেবর : রমাপ্রসাদ মল্লিক / আগামী পাঁচ বছর—ভারতীয় রাজনীতি ও পশ্চিমবঙ্গের শমপপন্থী সরকার : সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় / শত্রুমিত্র : সমর সেন / সাহিত্যিকের রাজনীতি : মিহির আচার্য / মিসা সংশোধন, ১৯৭৬ : সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় / ইন্দিরার রাজত্ব হরিজন হত্যা : জ্যোতির্ময় বসু / নকশালবাদের কৃষ্ণ সংগ্রাম ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক : তপন বসু / ফবজা দল ও সরকারের শ্রেণী চরিত্র : কালিদাস কুণ্ডু / সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে : জন চক্রবর্তী / জব্বারুলোকর সমগ্র : নারায়ণ চৌধুরী / শেষ কথা কে বলবে : অমলদাশের রায় / সময় সময় : অসীম রায় / এখনও : রণজিৎকুমার সেন / কলকাতার ফুটবল ২৯তমী : আরবি।

অনার্য মিত্রের রাজনৈতিক ছড়া ও অমলের কাউন
দাম : চার টাকা

শাহ কমিশনের তথ্য (১ম পৃষ্ঠার পর)

তথ্য ও বেতার দপ্তর বিভাগের স্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মেহতা, ব্যাংক প্রণব মুখোপাধ্যায়, বাগিচা দেবী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং সি বি আই ডি সেন মারফৎ শাহ কমিশনের প্রথম করেকদিনের শুনানীতেই এই তথ্য উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে। একথাও বোঝা যাচ্ছে যে মাতাপুত্রের দেশ-স্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্র, সরকারী প্রশাসনকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার ও বিধিবিহীন উপায়ে অর্থ রোজগারের বহু লক্ষ্য প্রমাণ আছে।

ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভার সদস্যরা শাহ কমিশনে তাঁদের প্রদত্ত লক্ষ্যে তাঁকে ডুবিয়েছেন। এইচ আর গোখল, টি এ পাই, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, স্বতন্ত্রনিয়ম জানিয়েছেন ইন্দিরা কি ভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন।

এদিকে সি বি আই অফিসাররা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করেন। সি বি আইয়ের প্রাক্তন ডিরেক্টর ডি সেন বিচারকের স্বেচ্ছায় নাস্তানাবুদ হন। কমিশনে প্রমাণিত যে, এমার্জেন্সীর সময় সি বি আই সবচেয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করেছে। প্রথম যে ঘটনা যাতে সি বি আই চারজন অফিসারের পেছনে লাগে সেটা অনেক কম গুরুতর। ডি সেন স্বীকার করেছেন যে, শাওয়ানের "আদেশেই" এই অফিসারদের শিক্ষা

দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে, লোক-সভায় উদ্ঘাপিত প্রশ্নের ক্ষেত্রে এরা মার্কতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কর-ছিলেন। কমিশনে আরও বড় বড় ঘটনার কথা উঠবে এবং তাতে দেখা যাবে ইন্দিরা, সঞ্জয়, অ্যাণ্ড কোং কি ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিকে নাজেহাল করেছে। গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান আর এন মাধুরের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে গোপনে তাঁরই অহুরোধে। বিরোধীদের নাস্তানাবুদ করার কাজে যে এই দপ্তরকে ব্যবহার করা হয়েছে একথা পরিকার হয়ে গেছে।

সামরিক পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীজবাহার তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিগত দপ্তরের একজন সামান্য কর্মচারী আর কে শাওয়ানের নির্দেশ কত অসম্মানজনক লাগত সে কথা বলেছেন। তাঁর মতে এমার্জেন্সীর সময় এটাই ছিল বাস্তব সত্য এবং সেটাই সকলকে মেনে নিতে হয়েছিল। প্রাক্তন মন্ত্রী টি এ পাই কমিশনে বলেছেন, মার্কতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত অফিসারদের কাজে ইন্দিরা কি রকম বিচলিত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। টি এ পাইয়ের উপস্থিতিতেই ইন্দিরা শাওয়ানকে ডেকে সি বি আই ডিরেক্টরকে বলতে বলেন ঐ চারজন অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে এবং তাঁদের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে।



ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

প্রস্তাব আহ্বান করছে

ষ্টোন প্যাকিং

রেফা: নং ৪৫/৪১০০/৭৭/২২২১ তারিখ ২৬-২-৭৭
সাব-এরিয়া ম্যানেজার, অমৃতনগর সাব-এরিয়া, কুহুস্টারিয়া এরিয়া নিম্নলিখিত কাজের জন্য সক্ষম, নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে আইটেম প্রতি দূরের ভিত্তিতে সীল করা টেন্ডার আহ্বান করছেন:
ইনস্টলেশন নিউ অমৃতনগর প্রোজেক্টের এন জে সিমের গ্যালারীতে স্টোন প্যাকিং এবং ৩৬,৫০৭ টাকা অহুমিত ব্যয়ে। বায়নার টাকার পরিমাণ ৪০০ এবং কাজ শেষ করার সময় আড়াই বছর। অমৃতনগর সাব-এরিয়ার সাব-এরিয়া ম্যানেজারের অফিস থেকে ২৭-১০-৭৭ তারিখ পর্যন্ত টেন্ডারপত্র পাওয়া যাবে যে কোন কাজের দিনে অফিসের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অমৃতনগর সাব-এরিয়ার জুনিয়ার অ্যাকাউন্টস অফিসারের কাছে ১০ টাকা (ফেরত-যোগ্য নয়) জমা দিয়ে। ২৮-১০-৭৭ তারিখে বিকেল ৪টা পর্যন্ত টেন্ডার গ্রহণ করা হবে এবং ঐদিন ৪-৩০ টায় টেন্ডার খোলা হবে উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেন্ডারদাতা / অহুমোদিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে। বায়নার ১০ টাকা কোল ইন্ডিয়া লিঃ, ইস্টার্ন ডিভিশন, অমৃতনগর গ্রুপ এই নামে অ্যাকাউন্ট পেয়ী ব্যাঙ্ক ড্রাকটে অথবা নগদে অমৃতনগর সাব-এরিয়ার জুনিয়ার অফিসারের কাছে জমা দিতে হবে এবং এর বসি টেন্ডারপত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে। বায়নার টাকা ছাড়া টেন্ডার নাকচ করা হবে।

সি এম ডি এতে ভোলা সেনের ভূত

বিনা টেঙারে বিশেষ এক কোম্পানী মোটা টাকা কাজ করছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সি এম ডি-এর প্রাক্তন চেয়ার-ম্যান ভোলা সেনের আমলে একটা বিশেষ ঠিকাদারী সংস্থার ওপর যে হাকিমিয়ার স্থচনা হয়েছিল বর্তমানে সেই হাকিমিয়ার পরিমাণ শোভনতার সীমা পার হয়ে গেছে।

সি এম ডি-এর তরফ থেকে কল-কাতা ও শহরতলী এলাকায় প্রতিটি বাড়ীতে পুরনো ব্যবস্থার বদলে আধুনিক প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড ল্যাট্রিন চালু করার এক পরিকল্পনা নেওয়া হয়। প্রথম দিকে এর দায়িত্ব দেওয়া হয় পৌরসংস্থাগুলোর ওপর। যেহেতু পৌরসংস্থাগুলোর অধীনে এই পরিকল্পনার কাজ খুব বেশী এগোচ্ছিল না, তাই সি এম ডি এককর্তৃপক্ষ এর দায়িত্ব নিজেরাই নিয়ে নেন।

১৯৭১ সালে সি এম ডি এককর্তৃপক্ষ প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড ল্যাট্রিন তৈরী করার জন্য রিষড়ায় একটা কারখানা তৈরী করেন। কিন্তু এই কারখানায় যে পরিমাণ প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড ল্যাট্রিন তৈরী হত তাতে চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় কিছু উৎসাহী বাড়ালী ঠিকাদার এগিয়ে এসে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। এই বাড়ালী ঠিকাদারদের বলা হল যে, আপনারা নিজের দায়িত্বে কারখানা করতে পারেন। সি এম ডি-এর কাছ থেকে আপনারা অর্ডার পাবেন।

এর মধ্যে সি এম ডি এককর্তৃপক্ষ রিষড়ার কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই কারখানার দুইজন কর্মী মুকুলেশ মিত্র এবং শঙ্কর শীল কর্তৃপক্ষের কাছে কারখানা পরিচালনার দায়িত্ব তাদের ওপর ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানান। এর মধ্যে ভোলা সেন সি এম ডি-এর চেয়ার-ম্যান হয়েছেন। তিনি মুকুলেশ মিত্র ও শঙ্কর শীলের আবেদন মেনে নিতে রাজী একটি শর্তে এবং তা হাঁসো তাঁর একজন মনোনীত লোককে অংশীদার করতে হবে। ওরা রাজী হন। ভোলাবাবুর নির্বাচনী কেন্দ্রের জনৈক কর্মী অরূপ চৌধুরীকে নিয়ে মুকুলেশ মিত্র এবং তাঁর সহযোগী শঙ্কর শীল একটা অংশীদারী সংস্থা বোলে। আর এই সংস্থাকে সি এম ডি-এর রিষড়ার কারখানা নামমাত্র ভাড়া লীজ দেওয়া হয়। তারপর এই সংস্থাকে এক বছরের মধ্যে দেড় হাজার প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড ল্যাট্রিন তৈরী করে দিতে হবে এই শর্তে বিনা টেঙারে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়।

কিন্তু এই সংস্থাটি চুক্তি অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে দ্বিতীয় বছরে সি এম ডি এককর্তৃপক্ষ এই সংস্থাকে এই কারখানার লীজ দ্বিতীয় বারের জন্য দিতে অসম্মত হন। মুকুলেশ, অরূপরা এসে ভোলা সেনকে ধরলেন। ফলে কর্তব্যপরায়ণ দুই অফিসার একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং ডেপুটি ডাইরেক্টরকে অন্য দপ্তরে বদলী করা হয় এবং ভোলাবাবু এদের জায়গায় "জো-হুজুর" লোক বসিয়ে মুকুলেশ মিত্র অ্যাণ্ড পার্টনার্সকে দ্বিতীয়বারের জন্য তিন বছরের লীজ দেওয়া হয় এবং উপরোক্ত সংস্থাকে এককোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকার অর্ডার দেওয়া হয় কোন টেঙার না ডেকেই।

অদূর ভবিষ্যতে ডিরেক্টর প্রীমজের আর এই কাজের জন্য টেঙার আহ্বান করার ইচ্ছে নেই। যত টাকার কাজই হোক আর তাতে সময় যতই লাগুক (ইউ ব্যাঙ্ক জোনে সাধারণত কোন পায়খানা অর্ডার দেবার পরে ৬ মাসের আগে এই কোম্পানী বসাতে পারে না) পূর্বতন চেয়ারম্যানের প্রিয়ভাজন অরূপ চৌধুরীর কোম্পানীর উপরোক্ত ফর্মটিকে দিয়েই তিনি সব কাজটা করতে চান।

আশ্চর্যের বিষয় যে, এই ফর্মটিকে সেগুন কাঠের দরজার পাঞ্জার বদলে কম্পানীর হার্ড উডের বা লোকাল কাঠের দরজার পাঞ্জা লাগাবার অহুমতি দেওয়া হয়েছে, যা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিভিন্ন জোনে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াররাও রিপোর্ট দিয়েছেন। অথচ এই কোম্পানী ব্যতীত এই কাজে নিযুক্ত অন্য ঠিকাদারকে লাগাতে হয় এক ইঞ্চি মোটা সেগুনের পাঞ্জা। এই ভাবে এই কোম্পানীকে বেশ কিছু অতিরিক্ত টাকা (প্রায় ৬৫) পাইয়ে দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। পাঞ্জার কাঠটি শুধু যে নিয়মানের তাই নয় অন্য ঠিকাদারের দেওয়া দরজার চেয়ে অনেক পলকা বা হালকা। দরজার বিষয়ে জনসাধারণের গোছা গোছা অভিযোগ বিভিন্ন জোনের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের দপ্তরে জমা পড়ছে। কিন্তু জনসাধারণের অভিযোগের কোন স্বরাহা আজও পর্দিত হয়নি।

এছাড়াও সি ডি ও লোকপিট প্রকৃতির মাধ্যমে আরও ৩৫৮০ টাকা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা অন্য ঠিকাদার পায় না। মুকুলেশ মিত্র এও পার্টনার্সের সঙ্গে অবৈধভাবে করা

চুক্তিটি এই কোম্পানীটিকে আর্থিক সুবিধা দিচ্ছে—(১) প্রোডাকশনের পরে এই কোম্পানীটিকে দেওয়া হয় ৮৫০ টাকা। এই কাজে অন্য অন্য ঠিকাদার পায় ৬৪০ টাকা। (২) এই ফর্ম কোম্পানী আনেষ্ট মানি জমা দেয়নি ঠিকাদারের সময় বা এই কোম্পানীর এই কাজের দক্ষতা বিল থেকে কোন টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসাবে কাটা হয় না। এটা সম্পূর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ ও পাবলিক ফিন্যান্স অ্যাক্টের পরিপন্থী। (৩) ২৫ টাকা হিসেবে প্রতি সেট প্রোডাকশনের ভাড়াই সি এম ডিএর সুসজ্জিত কারখানাটি এই কাজের জন্য পাওয়া এক আশ্চর্যের বিষয়। কোটে-

শন আহ্বান করলে সি এম ডি এ অন্ততঃ প্রায় ৫০ টাকা পাবেই।

বেশ কিছুদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে ডিরেক্টর প্রীমজ এই কোম্পানীটিকে সবটুকু কাজ দেবার উঠে পড়ে মেসে-ছেন। অন্য সব ঠিকাদারদের কাজ প্রায় বন্ধ বা অনেকদিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। পুরনো কন্ট্রাক্টর দ্বারা এর পূর্বে স্থানান্তরিত কাজে কয়েক হাজার করে পায়খানা বসিয়েছেন, তারা সবাই এখন বেকার বসে আছেন। তাদের কয়েক শত আর্থিক কর্মচারীও এখন বেকার। পুরনো ঠিকাদারদের কারখানার সব লাঞ্ছনাময় বেকার হয়ে পড়ে আছে।

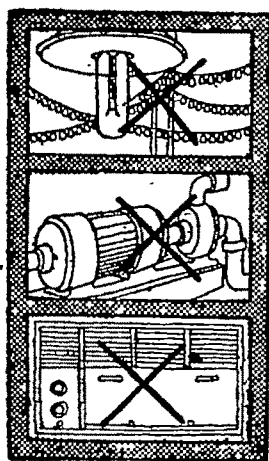
ইউ ব্যাঙ্ক জোন ও সেন্টাল ক্যালকাটা জোনে লক্ষ লক্ষ টাকার কাজে এই কোম্পানীটিকে বিলি করা হচ্ছে ও হবে বলে ডিরেক্টর ঠিক করে ফেলেছেন বলে জানা গেছে।

শিক্ষানবীশদের সম্মেলন

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর কল্যাণী আই, টি, আইতে সারা পশ্চিম বাংলা ট্রেনীজ অ্যান্ড অ্যাক্ট অ্যাগ্রেমেন্টস কো-অর্ডিনেশন কমিটির নদীয়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিমান মিত্রের সভাপতিত্বে সম্মেলনে আই, টি, আই ট্রেনীজ এবং ফ্যাক্টরী অ্যাগ্রেমেন্টসদের বিভিন্ন দাবীর আওয়াজ তোলা হয়। (১) আই, টি, আই ট্রেনিং শেষে অ্যাগ্রেমেন্টসশিপে যোগদানের স্বযোগ (২) চাকরীর নিশ্চয়তাসহ অ্যাগ্রেমেন্টসশিপ ৬১ অ্যাক্টের সংশোধন (৩) বৃদ্ধিতহায়ে টাইপেও দান (৪) অমিকের জায় অত্যন্ত স্বযোগ সুবিধা দাবীগুলি নিয়ে বিভিন্ন প্রতিনিধিরা বিশদ আলোচনা করেন। সম্মেলনে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল থেকে একশ পঞ্চাশ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ১৭জন সদস্য নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি গঠন করা হয় এবং শ্রীহরকান্ত কাক্সিলাল সভাপতি ও শ্রীশিবরতন পাল সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন।

যদি বাসস্থানের জগৎ বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন :

কি ভাবে বিদ্যুৎ ঘাটতির মোকাবিলা করবেন



যুবই যুগের সঙ্গে খোঁকার রুস্তে বাধ্য হচ্ছি যে আগামী বেশ কিছুদিন এ রাজ্যে বিদ্যুৎ সংকট থাকবে। অবস্থা কাটতে ওঠার জন্যে সব রকম প্রচেষ্টা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিতে কী ভাবে মোকাবিলা করা যায়—সেদিকে নজর দেওয়াই ভালো।

কী ভাবে মোকাবিলা করবেন :

প্রথমত বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারের মিতব্যয়ী হোন। আলোর বাহার এবং আলোর প্রদর্শনী বন্ধ করুন। যতটা সম্ভব আলো বা পাখা বন্ধ করে দিন। বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করুন এবং নিজের

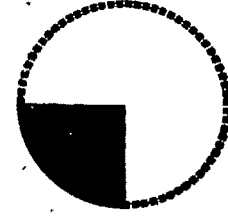
করচা কমুন। এই মূল নীতির ভিত্তিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেই বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছুটা সামান্য দেওয়া যাবে।

অনুগ্রহ করে বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত জেনে, পাম্প, ইলেকট্রিক ইন্সট্রুমেন্টস, হীটার ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না, কারণ এই সময়ে শিল্প কারখানার জন্যে বিদ্যুৎ সবচেয়ে বেশি দরকার।

আইন মেনে চলুন :

রাজ্য সরকারের বিধিনিষেধগুলি দৃঢ় করে মনে রাখবেন। সকাল ৯-৩০ থেকে বেলা ১১টা এবং বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এয়ারকন্ডিশনার চালানো নিষেধ, অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ছাড় দিয়েছেন তাদের কথা রত্ন। এছাড়া বিদ্যুৎ বা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে নিয়ম, মার্কসী ল্যাম্প বা অন্যান্য উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বাতি জালানোও নিষেধ।

‘বিদ্যুৎ’ ঘাটতি কমিয়ে আনতে আমাদের সাহায্য করুন



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

অগণতান্ত্রিক সরকারী নির্দেশ

কিছুক্ষণ আগে একটা কাগজ দিয়ে গেল এক বন্ধু। ইংরেজীতে লেখা। ২৫.৫.৭৭ তারিখে APT/Con/interception/77 নম্বর চিঠি মারফৎ কলকাতার পোস্টমাষ্টার জেনারেলের দপ্তর থেকে একখানি গোপন চিঠির নকল পাঠানো হচ্ছে সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ডাকঘরের কর্তাদের কাছে। গোপন চিঠির (Secret letter) নম্বর 1081 P. S. তারিখ ১৬.৫.৭৭, পাঠাচ্ছেন পঃ বঃ সরকারের অধস্তন সচিব। চিঠিখানির বয়ান হল—“১৮৯৮ সালের ভারতীয় ডাকঘর বিধির ২৬(১) ধারার ক্ষমতাস্বায়ী রাজ্যপাল এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, ডাকঘোগে পাঠানো সমস্ত আন-রেজিস্টার্ড, রেজিস্টার্ড, ইনসিওরড, বা অন্তর্গত কোন ধরনের জিনিসপত্র, যেগুলি ৬০/এ কেশরচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ‘দেশ-ত্রতী’র উদ্দেশ্যে এবং ঐ ঠিকানা থেকে পাঠানো হবে সেগুলি যেন আটক করা হয়।” (“In exercise of the Indian Post office Act, 1898, the Governor is pleased to direct the interception of all postal articles of un-registered, registered, insured and of other class of description which may be discovered in the course of transmission by post address-

ed to and emanating from, ‘Desabrat’ a weekly published from 60A, Keshab chandra Sen Street, Calcutta”) ডাক বিভাগের যে দফতর কর্মী বাছাই (Sorting) করার কাজে নিযুক্ত তাদের প্রতি নির্দেশ : সমস্ত আটক করা (Intercepted) জিনিসপত্র যেন কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চার ডেপুটি কমিশনার অথবা তার মনোনীত কোন অফিসারের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল—এ তো বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগের ঘটনা। তখন তো পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন। কিন্তু চমকে উঠলাম। এই নির্দেশের কার্য-কারিতার সময় দেখে? বলা হয়েছে ২১শে মে ১৯৭৭ থেকে আগামী এক বছর এই নির্দেশ বলবৎ থাকবে।

লেখাটা পড়ার পর থেকে এক-গাধা প্রশ্ন অনবরত মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে :

(১) মুখ্যমন্ত্রী জীজ্ঞ্যোতি বসুর অভ্যন্তরেই কি এই নির্দেশ চালু রয়েছে? এবং তিনি তা জানা মাত্র এই নির্দেশ বাতিল ঘোষণা করবেন?

(২) এই নির্দেশ কি বিশেষ ভাবে ‘দেশত্রতী’ গোষ্ঠীকে দমন করার উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়েছে? না কি যারা সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা ও

তার অবশ্যজাবিতার কথা প্রচার করে তাদের সকলকেই দমন করার এটা একটা কৌশল মাত্র?

(৩) স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও যদি এই নির্দেশের কথা না জানেন, অথবা যদি তিনি জানা সত্ত্বেও এই নির্দেশ বলবৎ থাকে, তবে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ কি ধরনের “গণ-তান্ত্রিক অধিকার” পেয়েছেন?

এই প্রশ্নে বলে রাখি—যে নির্দেশটা আমার হাতে পড়েছে সেটা কোন জেলার এবং কে পাঠাচ্ছেন তার উল্লেখ করতে পারছি না। কারণ ২১শে মে থেকে শুরু করে এই মুহূর্ত পর্যন্ত “গণতন্ত্রের” ছত্রছায়ায় এই নির্দেশ বলবৎ রয়েছে।

মিডিকেল হোটেলে ভয়াবহ অবস্থা

আমরা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। পরীক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে ছাত্রদের থাকবার ব্যবস্থা পর্যন্ত চূড়ান্ত অব্যবস্থা। আমরা শীল ম্যানসন মেডিক্যাল হোটেলেব আবাসিক। এতদিন জানতাম আমাদের হোটেল সরকার অধিগ্রহণ করেছেন বা শুনে আসছি সেই ৭৫ সাল থেকে। আমাদের হোটেল সম্পর্কে বিশেষভাবে জানাবার কারণ : চারতলা বাড়িটির প্রত্যেকটি ঘরে জল পড়ে বর্ষার সময়, বাড়ির প্রতিটি দেওয়াল ফাঁক, দুই তিনবার শৌচাগারের শোচনীয় পতন, চল্লিশজনের জন্য একটি মাত্র শৌচাগার, বাড়ির যে কোন অবস্থায় ভেঙ্গে পড়তে পারে, এবং ইলেকট্রিক ওয়্যারিং অত্যন্ত করুণ; সব সময় শর্টসার্কিট লেগেই আছে।

এই হল বিংশ শতাব্দীর ভাস্করী ছাত্রদের থাকবার বাসস্থান। এরপর ৭৬ সালে তখনকার বাড়ি বেহেতু অধিগৃহীত হয়েছে তাই সারানো হয়নি। এরপর কিছু কাজ শেষ হল এবং কিছুদিন বাদে ভৌতিক কারণে কাজ বন্ধ হল। বাড়ি অর্ধেক ভাঙা অবস্থায় পড়ে রইল এবং বাড়িটি আরও বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছাল। আমরা এখন তখনকার, হাইকোর্ট থেকে ইনজাংসন আরি হয়েছে। কারণ বাড়িওয়ালার সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। বাড়িটির চারিদিকে আবজ্ঞানার ভূপে ভর্তি। সেখানে বশামাছির অবাধ বিচরণ। তনলে অবাক হতে হয়, আমাদের প্রত্যেককে Life-bond দিয়ে থাকতে হচ্ছে অর্থাৎ কারো কোন ছুটিনা বা মৃত্যু হলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন না।

আমরা চাই এ অবস্থার অবসান।

হোক এবং আমাদের হোটেলের কাজ শুরু হোক। স্বপ্ন বাসস্থানের দাবীতে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান ধর্মঘট শুরু হয়েছে ২০-১-৭৭ থেকে। আমরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিতে চাই, এর পরবর্তী সব ধরনের অবস্থার জন্য সম্পূর্ণভাবে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন।

শীল ম্যানসন আবাসিকবৃন্দ নেতাজীর বিবাহ প্রসঙ্গ

নেতাজীর বিবাহ সংঘর্ষে পূর্বে কোন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় এবং বর্তমানে “মাই আকাল নেতাজী” বইতে বহু পরিবারের কোন কোন সদস্য যে-তথ্য পরিবেশন করেছেন তার মধ্যে কোন সত্যতা আছে কিনা সন্দেহ হয়।

স্বর্গত শরণচন্দ্র বহু জীবিত থাকাকালীন নেতাজীর বিয়ের ঘটনার কোন গুরুত্ব দেন নি। নেতাজীর বিবাহ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হবার পর কয়েকদিনের ইউ-পি শাখার সাধারণ সম্পাদক রামগতি গাঙ্গুলী এই সংবাদের সত্যতা জানতে চেয়ে শরণ বহুকে যে চিঠি লেখেন তার উত্তরে শরণবাবু লেখেন “...কি ভাবে আপনি ইহার প্রতিকার করবেন? এই ধরনের বয়র অথবা প্রবন্ধের কোন গুরুত্ব আপনি দেনেন না।” তাছাড়া এই মিথ্যা অপপ্রচার বন্ধ করার জন্য শরণ বহু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুকে অস্থ-রোধ করেছিলেন। নেতাজীর বিয়ের ব্যাপারে প্যাট সার্প-এর আলীন মন্তব্যের বিরুদ্ধে স্বরণচন্দ্র বহু এবং তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র বিজেন বহু একটি মানহানির মামলা দায়ের করে বলেন “নেতাজী বিবাহ করেন নাই।” খোশলা কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময়ও স্বরণচন্দ্র বহু বলেছিলেন—সত্যই চিরকুমার। নেতাজীকে বিয়ে করার জন্য অনৈক্য মিস তবলু ওয়াহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু নেতাজী কোন দিন বিয়ে করবেন না এই কথা বলার ভ্রমহিলা নিরাশ হন।

নেতাজীর বিয়ের ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোন প্রামাণ্য ঠিকির প্রকাশ করা হয় নি। অথচ নেতাজীর কোন ভ্রাতৃপুত্রের উক্তি প্রকাশ পেয়েছে যে নেতাজী বিবাহিত ছিলেন।

সম্প্রতি যুগান্তরের একটি সংবাদে জানা গেল নেতাজীর ভ্রাতৃপুত্র জীর কলকাতায় আসার সভাবনা আছে। আমরা এই সভাবনার উদ্দেশ্যে এই সভাবনাকে খণ্ডিত জানাচ্ছি।

অমর সেন

মুখ্যমন্ত্রীর ভুল ধারণা

গত ২১.০৭.৭৭ তারিখে চীন বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি আয়োজিত জনসভা সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর যে বিবৃতি কলকাতার কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তা আমাদের কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর। মুখ্যমন্ত্রী ঐ সভাকে নকশালীদের সভা এবং ঐ সভায় প্রবীণ জননেতা ত্রিগণেশ বোষের বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকার প্রচারকে “নকশালীদের কারসাজি” হিসাবে অভিহিত করেছেন। আমরা এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। প্রকৃত গণেশ বোষের উক্ত সভায় উপস্থিতির ঘোষণা আমরা তাঁর মতাস্বায়ী করি। হুতরাং এ সম্পর্কিত বিবৃতি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। ১ তারিখের ঐ সভার আয়োজন ‘নকশালীরা’ করেনি, করেছিলো চীন বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি এবং সভায় ওয়ার্ল্ড পার্টি, এস ইউ সি, সি পি আই (এম-এল) প্রভৃতি কয়েকটি বামপন্থী দলের বক্তারা বক্তব্য রাখেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী মহা-শয় কেন এই সভাকে নকশালীদের সভা বলেছেন আমরা বুঝতে পারছি না।

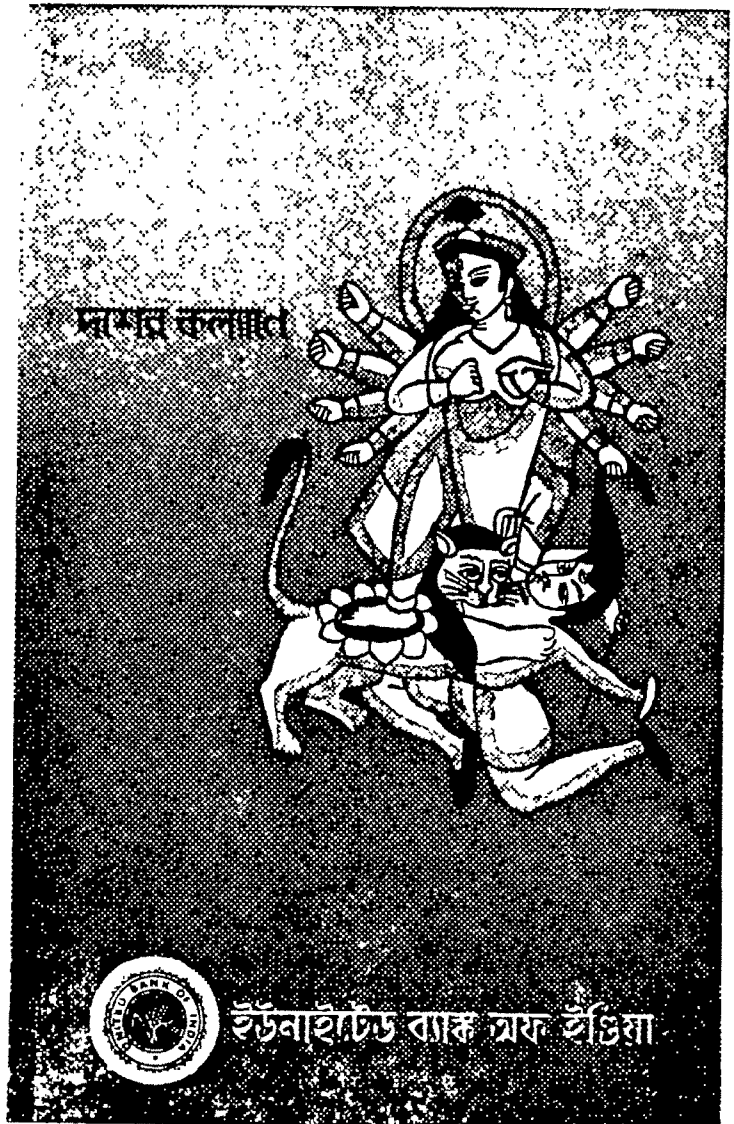
সময় দে

চীন বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির পক্ষে

অপসংস্কৃতি প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের তার-প্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্তদেব ভট্টাচার্যের অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বক্তব্য পড়লাম। বিভিন্ন সভা-সমিতিতেও তাঁর বক্তব্য শুনেছি। তিনি চান অপসংস্কৃতি নিয়ে একটা বিতর্কের ঝড় উঠুক। বলা বাহুল্য এখনও পর্যন্ত বিতর্কের ঝড় না উঠলেও বিতর্কের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। হয়তো ঝড়ও একদিন উঠবে। আমার কথা বড় বেঁচে গেলে কি অবস্থা হবে সেটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার হচ্ছে না।

এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটি উদাহরণ তুলে ধরছি। আজ থেকে ছ’সাত বৎসর আগের কথা। বাংলা সাহিত্যে শীলতা-অশীলতা নিয়ে এ রকমই একটি বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। একদা কমিউনিষ্ট বলে পরিচিত বর্তমানে বামাবী পত্রিকার ভাতাট্টারা লেখক সমরেশ বসু ‘বিবর’ উপন্যাসটি এই বিতর্কের সূত্রপাত করেছিল। আমার পেন্ডা শ্রীনাথচরণ চৌধুরী মহাশয়



বিভিন্ন সভাসমিতিতে সাহিত্যে
স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ
মানান। সেই সময় দৈনিক সাপ্তা-
হিক কাগজগুলিও স্বাধীনতা-অস্বাধীনতা
প্রশ্নটিকে প্রাধান্য দিয়েছিল। সেই
কিছু একদিন থেমে গেছে, সমরেশ
বসুর বইয়ের কাটতি কিন্তু কয়েক
বৎসর তার সহযোগিতায় স্বাধীনতা
জ্যোতিরিক্ত, বিমল, কবিতার
আবির্ভাব ঘটেছে, এবং তাঁরা পুরো-
দমে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িয়ে
যাচ্ছেন।

সেই কারণে শুধুমাত্র বিতর্কের ঝড়
তুলে কোন লাভ হবে না, বরং সংগ-
ঠিত ভাবে সরকারী সহযোগিতায়
অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন
করাই শ্রেয়ঃ। এতে হয়তো বাজারী
পত্রিকাগুলিশিল্প সংস্কৃতি 'গেল গেল'
রব তুলবে। কিন্তু এটা মনে রাখা
দরকার বাক্স সন্তোষ ঘোষের
ভোটের ক্ষমতায় আসে নি, বরং যে
সকল অগণিত সাধারণ মানুষ বাক্স
সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা
হুহাত তুলে সরকারী ব্যবস্থাকে সাধু-
বাদ জানাবেন। স্বতরাং বুদ্ধদেব-
বাবুকে বিনীত অস্বস্তি অপসংস্কৃতির
বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
অপসংস্কৃতির ধারক ও বাহক সকল
প্রকার নাটক, গ্রন্থ, ক্যাবারে নৃত্য
ও সংগীত বন্ধ করুন। জরুরী অবস্থার
সঙ্গে এখনকার অবস্থার আকাশ-
পাতাল ফারাক। তখন ছিল স্বৈরা-
চারী শাসন ব্যবস্থা। বর্তমানে জন-
গণের সরকার প্রতিষ্ঠিত। সরকারের
প্রতিটি কাজের পিছনে জনগণের
অকুণ্ঠ সমর্থন থাকবেই এই আমার দৃঢ়
বিশ্বাস।

জয়ন্তী চৌধুরী

হাসপাতাল ও ওয়ার্ড মাস্টার

গত ১৯ই জুলাই-এর দর্শনে তপন
বসুর প্রধান জেহাদ হাওড়া
হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার
অনিল দাসের বিরুদ্ধে। কিন্তু, তিনি
যে সব বিষয়ে রিপোর্ট করেছেন,
তার অধিকাংশই অনিল দাসের
ক্ষমতার বাইরে। রোগীদের জন্ত
সরকারী বরাদ্দ মাত্র দৈনিক আড়াই
টাকা। আড়াই টাকার দুটো
মিল, সকালের ব্রেকফাস্ট, কল ও
জুহ, এর বেশী কি দেওয়া যায়?

ওয়ার্ড মাস্টার অনিল দাস আন-
রজিস্টার্ড কর্মী নন, সে একজন
সরকারী কর্মী। ১৬/১৭ বৎসর
সে চাকরী করছে। সে কেবল মদ
খায়, এই কথাটা লিখেই শেষ
করলেন। আরও কিছু লিখলেন না
কেন? আর সঙ্গে তো কথা বলেন
নি। আশনি কেবল নাম আর

মেইনের সঙ্গে কথা বলেছেন। মদ
কি কেবল অনিল দাস একা খায়?
আর কেউ খায় না? অনেক নাম-
কেও তো গাড়ী করে হোস্টেলে
পাঠাতে হয় ওতার ডোজের জন্ত।
সেটা কি খুব দামী মদ? হাস-
পাতালে আগে ত্রাণি দেওয়া হত।
এখন দেওয়া হয় না। কারণ
রোগীরা সে সব পেত না। কোথায়
যেত? ওয়ার্ড মাস্টার খেত কি?
মেইন বলেছেন, অনিল দাসকে
বরখাস্ত করা উচিত। আমরাও
বলছি, নিশ্চয়ই। অস্ত্রায়কে বরখাস্ত
করা উচিত নয়? তাঁর মেয়েরা
ঠিকমত কাজ করছেন তো?

সিষ্টার অঞ্জনা ভট্টাচার্যের ১৪
বৎসর চাকরী হলেও পার্মানেন্ট হন
নি। কিন্তু অনিল দাসের কি হয়েছে
সেটাতো লিখলেন না। কেবল
অনিল দাস বা কেন, ৩০০ জন
ওয়ার্ড মাস্টারের মধ্যে ২৫০ জনই
প্রতারিত হয়েছে স্বাস্থ্য অধিকর্তা-
দের দ্বারা। এরা সকলেই স্বনামের
সঙ্গে ক্লারিক্যাল সার্ভিস করেছেন।
কর্মক্ষমতা আর ভাল রিপোর্ট থাকায়
ওদের ওয়ার্ড মাস্টার করা হয়।
গ্রেডেশন আর ভাল পে-স্কেলের
লোভ দেখানো হয়েছিল। কিন্তু
শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বনাশ করা
হয়েছে। এমন কি ক্লারিক্যাল
সার্ভিস ক্যান্টট পর্যন্ত করা হচ্ছে না।
১৮/১৯ বৎসর চাকরী হলেও কন-
কার্শমেন্ট করা হয় নি। কোন
ছুটিই তারা ভোগ করতে পারে না।
কোথাও ১২/১৪ বছর, কোথাও ২৪
বছর ডিউটির সঙ্গে যুক্ত থাকতে
হয়। তার জন্ত কোন স্পেশাল পে-
বা ওতার টাইম ভাতা নেই।

দীর্ঘদিনের এই অস্ত্রায় তারা সহ
করে আসছে। কলে স্বাস্থ্য ভেদে
পড়ে, পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত
হয়। মানসিক ভারসাম্য কেলে
হারিয়ে। এই অবস্থায় যদি মদ খায়
সেটা আর বিচিৎর কি! কোন সভা
বেশে মানুষকে ২৪ বছর কাজ করতে
হয়? অথচ ওয়ার্ড মাস্টাররা যে
কাজ করে, তার জন্ত বাহা বা হুড়ান
অধ্যাক। বিগত মাসিলা অধ্যাক
আর তাদের সচিবদের ১৫০ টাকা
করে স্পেশাল ভাতা দিয়ে গেছেন।
কিন্তু বারা নিজের জীবন বিপর্যস্ত
কাজ করেন, সেই ওয়ার্ড মাস্টাররা
চেয়েছিলেন মাত্র ৫০ টাকা। তা মজ
হয় নি। তপনবাবু, ওয়ার্ড মাস্টাররা
এখনও স্কুলে অনিল দাসের মত
মদ ধরেনি। ওটা কেনার পরমাণ
ভাদের নেই। তাদের অনেকেই
পান-সিগারেটও খায় না। হাস-
পাতালে তারাই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম-
শীল ব্যক্তি। কোন হাসপাতালের
বিষয়ে সবটা যদি এক ব্যক্তির কাজ
থেকেই জানতে চান, তাহলে ওয়ার্ড
মাস্টারের কাছে যান। নিন না
ভাদের একটা ইন্টারভিউ।

নিবেদিতা সরকার
একজন ওয়ার্ডমাস্টারের স্ত্রী

উৎপল দত্তকে বয়কট করুন

আমরা পানিহাটি জেলের
গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন কিছু মানুষ
১লা অক্টোবর চীন বিপ্লব বার্ষিকী
পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঠিক
করি কোন রাজনীতিবিদকে বয়কট
হিসাবে রাখা হবে না। অতএব
আমরা উক্ত অসুস্থানে উৎপল দত্তকে
বয়কট হিসাবে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ
করি। গত ১৪/১১/৭১ তারিখে
আমরা উৎপল দত্তের বাসভবনে তাঁর
সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমাদের আগ-
মনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল
হবার পর তিনি বয়কট হিসাবে অসু-
স্থানে উপস্থিত থাকতে রাজী হয়ে
যান। তবে ১লা অক্টোবর তাঁর
সময় না থাকায় তিনি প্রস্তাব দেন
যে পরদিন অর্থাৎ ১৫/১১/৭১ তারিখে
মহাজাতি সদনে পি এল টিওর সেক্রে-
টারী মুকুলবসুর সঙ্গে আলোচনা
মাপেক্ষে দিনকণ্ঠ ঠিক করবেন।
সিদ্ধান্ত মত বর্ণিত দিবসে এবং নির্দিষ্ট
সময়ে ও স্থানে আমি এবং আমার
আর এক বন্ধু উপস্থিত হই। অনেক-
ক্ষণ অপেক্ষা করার পর মুকুলবাবুর
সাক্ষাৎ পাওয়া গেল এবং মুকুল-

বাবুর মুখে বা শুনলাম তাতে শুধু
হতাশাই নয় অবাকও হলাম।
উনি বললেন, বিশেষ কাজে
উৎপল দত্ত বন্ধে চলে গেছেন।
অবশ্য মুকুলবাবু আমাদের কিছুক্ষণ
অপেক্ষা করার কথাও বললেন এবং
কিছু সময় অপেক্ষা করার পর
মুকুলবাবুর অবিরোধী কথায় এটা
প্রমাণ হয়ে গেল যে, তিনি এর আগে
সত্যি কথা বলেন নি। মুকুলবাবু
বললেন, উৎপলবাবুর শরীরটা খুব
খারাপ হয়েছে। অতএব উনি বন্ধে
নাও যেতে পারেন।

১৬/১১/৭১ তারিখ বিকেলের দিকে
আমরা উৎপল দত্তের বাড়ী গেলাম
এবং স্বাধীনতা তার দেখাও পেলাম।
আমি যখন তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত
হই, তখন আকাশে মেঘ করেছে,
আর সেই মেঘলা আকাশের নীচে,
ছাদের ওপরে হিন্দী ফিল্মের কান্নদায়
এবং স্বাধীন মানানসই পোষাকে
সজ্জিত এক এলোকেলীকে ছাড়া আর
কাউকেই দেখলাম না। অগত্যা
তাঁর কাছেই উৎপলবাবুর সঙ্গে
সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্ত সাহায্য

প্রার্থনা করতে হলো। মহিলাটি যে
ব্যবহার করলেন তা চাকরবাকরদের
জন্ত যথোপযুক্ত। গেটের কাছে
ছাড়া ছিল ভয়ঙ্কর দর্শন ছোটো হিন্দী
জানোয়ার এবং বারংবার অস্বস্তি
করা সবেও কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা
করা হলো না। অবশেষে আক্রমণের
মুখোমুখি হতেই হলো। একেত্রেও
আমাকে যিনি রক্ষা করলেন, তাঁদের
ভাষায় তিনি বাড়ীর চাকর।

অতঃপর গৃহভ্রাতৃত্বের প্রবেশের
স্বভূমতি পেলাম। প্রবেশান্তে উৎপল
দত্তের কণ্ঠস্বরও অস্বাভাবন করলাম।
অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর যিনি
আমার সামনে উপস্থিত হলেন, তিনি
উৎপল নন, তিনি শোভা সেন।
বর্ণিতা মহিলার রুঢ় আচরণের জন্ত
খ্যাতি সম্পর্কে আগেই অবগত হয়ে-
ছিলাম এবং উক্ত দিবসে তা প্রত্যক্ষ
করলাম। আমার সঙ্গে কথোপকথন
চলাকালীন সারাটাক্ষণ যেভাবে
তিনি মিথ্যা কথা বলে গেলেন তাতে
সঠিকভাবেই মনে হলো মিথ্যাচার
সম্পর্কেও তিনি খ্যাতি অর্জন করার
যোগ্য।

শোভা সেন আমাকে পরিষ্কার
(শেবাংশ চন্দ্র পূজার)

সি ই এস সি'র নতুন "ভিজিলেন্স সেল"

নতুন সার্ভিস কনসাল্টন বা ইলেকট্রিক বিজ
থেকে উদ্ভূত অভিযোগ সম্বন্ধে ভাড়াভাড়া
ব্যবস্থা করিয়ে দেবার অহিলায় কিছু অসৎ
লোক আমাদের গ্রাহকদের কাছে টাকা
চাইছে, এই ধরনের খবর পেয়ে আমরা বিশেষ
চিন্তিত। আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
গ্রাহকদের কাছে তাই আমাদের একান্ত
অনুরোধ তাঁরা যেন কখনই কাউকে এই সব
ব্যাপারে কোনো রকম টাকা কাড়ি না দেন,
এমন কি, সে ব্যক্তি আমাদের কোম্পানীর
লোক বলে নিজেকে জাহির করলেও।
যদি কেউ আপনাদের কাছে এই ধরনের
অর্থ দাবী করে তবে আমাদের বিশেষ
অনুরোধ আপনারা যেন পাশের ঠিকানায়
আপনাদের অভিযোগ-সহ সব খবরটি

অনিচ্ছা দেন যাতে এই সব অসৎ লোকের
সম্বন্ধে সব কুপ্রচেষ্টাকে আমরা প্রতিরোধ
করতে সমর্থ হই।

"ভিজিলেন্স সেল"

সি ই এস সি লিমিটেড

পোস্ট বক্স নং ৬৬৫৪, এসপ্লানেড,
কলকাতা-৭০০০৬৯

এই পোস্ট বক্সটি বিশেষ করে এই কাজের
জন্যই নেওয়া হয়েছে এবং এই ঠিকানায়
লিখিত সব চিঠির বক্তব্য গোপন থাকবে এবং
লোকের অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করা
হবে না।

CESC

দি ক্যালকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড

বহুমতীর ব্যাপার কতদিন ঝুলে থাকবে ?

(দুর্গার সংবাদদাতা)

সেই ঐতিহ্যবাহী বাংলা সংবাদ-পত্র দৈনিক বহুমতীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীমহলে আবার নতুন করে উদ্বেগ আশংকা দেখা দিয়েছে। বেনামদার মালিক অশোক সেনের হঠকারিতা ও প্রমিষ্টবিরোধী নীতির ফলে একদিন সংবাদপত্রটির দরজায় তালা ঝুলেছিল। দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক বহুমতী এবং প্রকাশন বিভাগের মোট সাতশে পাঁচশো সাংবাদিক অসংবাদিক কর্মচ্যুত হয়ে অনিশ্চয়তার গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় রণেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আই জে এ ভুক্ত সাংবাদিকদের নিরলস প্রচেষ্টায় বহু দরজা খোলে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহুমতী প্রাইভেট লিমিটেডকে রুগ্ন শিল্প সংস্থা হিসেবে অধিগ্রহণ করেন। কিন্তু যে আশা ও প্রত্যাশা নিয়ে নবকলেবরে বহুমতীর পুনরাবির্ভাব ঘটানো হয়েছিল নবনিযুক্ত মুখ্য প্রশাসক ও প্রধান সম্পাদক কেদার ঘোষ তাঁর পেটোয়া কয়েকজন সাংবাদিকের সাহায্যে ও সহযোগিতায় তা বানচাল করে দেন। কেদারবাবু রাজ্য সরকার প্রদত্ত ৫০ লাখ টাকা হুঁকে দিয়ে পদচ্যুত হয়েছেন, রুগ্ন শিল্প-বহুমতীর আশ্রয়স্থল তো আদৌ হয় নি, বরং তার নাতিশাস উঠেছে। তার মাসিক লোক-

সানের বহর এখন দেখ মাথ টাকার মতো।

রাষ্ট্রের বামফ্রন্ট সরকার বহুমতীর ব্যাপার তদন্ত করার ক্ষমতা এবং একে স্বস্থ স্ববল ও লাভজনক করে তোলা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখার ক্ষমতা একটি তিনসদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। কিন্তু একমাসের মধ্যে তদন্তের রিপোর্ট দাখিল করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আজ দুমাসের মধ্যে সমস্তার কোন কলকিনারা তারা করতে পারেননি। কমিটির কাছে সাংবাদিক, অসংবাদিকদের পক্ষ থেকে সংস্কার ও ব্যক্তিগতভাবে এক ডজনও বেশী স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। স্বভাবতই বহুমতীর হালচাল সম্পর্কে কমিটিকে ওয়াকিবহাল করার জন্তই ঐ স্মারকলিপির অবতারণা করা হয়েছিল। কিন্তু কমিটির নাকি এখনো দুমাস সময় লাগবে তাঁদের সুপারিশ সরকারকে জানাতে। স্বাভাবিক অবস্থায় সে সময় দিতে কারো আপত্তি হতো না কিন্তু ইতিমধ্যে কেদার ঘোষ বরখাস্ত হবার পরেও বহুমতীতে অরাজকতা অব্যাহত রয়েছে। কেদারবাবুকে যদি পুঙ্ন চূরির দ্বায়ে অভিযুক্ত করা হয় তবে এখন সেখানে চলছে সাগর চুরি। কাঁচা মাল কেনা বেচা,

পাড়ির বণেজ ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্ত হলেই এসব তথ্য প্রমাণিত হতে পারে। অবশ্য এদিকে বহুমতীর প্রচার সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পড়ে যাচ্ছে। বাবার কারণ একটাই এবং সেটি হলো এতদিন যারা সিদ্ধার্থ রায় এবং কংগ্রেসের জয়ডাক হিসাবে বহুমতীকে ব্যবহার করে এসেছেন সেই পরিচালকবর্গ এবং সেই কেদার চক্রই বামফ্রন্ট সরকারকে সাবোতাঙ্গ করার মতলবে বহুমতীকে কাজে লাগাতে চাইছে।

কংগ্রেসের এবং সিদ্ধার্থবাবুর প্রশস্তি গাওয়ার এবং বামপন্থী হল-গুলির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাবার জন্তই কেদারবাবু ৮-১০ জন সাংবাদিকের এক ককাস বা চক্র গড়ে তুলেছিলেন। এদের সবাইকে তিনি অফিসের ফাইলপত্রে কারসাজির মাধ্যমে অত্যাচার ও বে-আইনী প্রমোশন দিয়েছেন বোর্ড ও সরকারের অসহমোদনের তোয়াক্কা না করে, সিনিয়রিটি ও যোগ্যতার বাহ-বিচার না করেই। বিবেকানন্দবাবুর আসনে যাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তিনি চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল এবং কঠোর বামপন্থী বিরোধী হিসাবে পরিচিত। বহুমতীতে নতুন আগত হওয়া সত্ত্বেও কেদারবাবু একসঙ্গে পাঁচটি ইনক্রিমেন্ট দিয়ে অফিসে লাঠি

ঝোরাবার সর্বমুখ কনফারেন্স হাতেই তুলে দেন। বহুমতীর নয়টি কিস্তি তাঁর নিয়ন্ত্রণে। অতএব তিনি যে বহুমতীকে প্রতিক্রিয়াশীল কায়েদী পার্শ্বের অহুসুলে চালাবেন এক স্বাভাবিক।

উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কয়েকজন সাংবাদিক তত্ত্ব অবগত্য ও অপরাধই নয়, তারা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কোশলে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফিসের গাড়ী ও টেলিফোনের খরচ বাড়ানো ছাড়া আর কিছু করার পক্ষে অযোগ্য।

অন্যদিকে বহুমতীর সেই অশোক সেনের স্বেচ্ছাপ্রাপ্ত সাংবাদিক সংঘ এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বতন্ত্র মুখার্জীর আশীর্বাদমস্ত ইউনিয়ন এখন রং বদলাবার জন্ত ব্যস্ত। বামপন্থী মন্ত্রী এম, এল, এ, নেতাদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়েও তারা স্ব স্ব পক্ষে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করছেন।

বহুমতী সমস্তার সমাধান আদৌ কঠিন নয়। পুরনো পরিচালক মণ্ডলী ভেঙে দিয়ে নতুন বোর্ড গঠন, সাপ্তাহিক, মাসিক ও প্রকাশনা বিভাগ খোলা, সমস্ত ইচ্ছুক পুরনো সাংবাদিক অসংবাদিক কর্মচারীকে ফিরিয়ে আনা, প্রাক-অধিগ্রহণ স্থিতিবস্থায় প্রত্যাবর্তন, অর্থাৎ কেদারবাবু যেসব প্রমোশন, ট্রান্সফার ইত্যাদি চক্রম্বক করেছেন সেগুলি বাতিল করে দেওয়া ইত্যাদি। একটি ট্রাস্টার হাতে বহুমতীর পরিচালন ভার তুলে দেওয়া যাতে পারে যেখানে সরকার, বহুমতীর সাংবাদিক অসংবাদিক এবং সংবাদপত্র জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিনিধি থাকবেন।

ছিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে যত দেরী হচ্ছে তত জনমনে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে উদ্বেগ ও হুঁসিদ্ধা বাড়ছে। স্বার্থাঘেযী মহল থেকে একধরনের প্রচারও করা হচ্ছে যে সরকার লোক-মানী কারবার বহুমতীকে রাখবেন না। কিন্তু বহুমতীকে সহজেই লাভজনক সংস্থায় উন্নীত করা যায় যদি স্বযোগ্য পরিচালক পিছনের থাকেন, প্রচার সংখ্যা এবং বিজ্ঞাপন হুইই বহুস্তর বাড়ানো সম্ভব। সমস্তের সেই অংশের কাছে প্রস্তুতি অত্যন্ত জরুরী যারা বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি গভীর আস্থাশীল এবং তারা এর কর্তার সমাধানই প্রত্যাশা করেন।

পি আর সির অনুষ্ঠানে অব্যব

(দুর্গার সংবাদদাতা)

পিপলস রিলিক কমিটি সংক্ষেপে পি, আর, সি, গত ২৬শে ও ২৭শে সেপ্টেম্বর নেতাজী ইন ডোর টেডিয়ামে দুদিন ব্যাপী এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল বঙ্গা ও ধরা পীড়িত মানুষদের সাহায্য করার জন্ত। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁদের এ আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন।

কিন্তু উত্তোজার ভাবেননি যে নেতাজী টেডিয়াম কোনভাবেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত জায়গা নয়। সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাধে আর সব কিছুই চলতে পারে। তাই স্বাভাবিক কারণেই ২৬ এবং ২৭ তারিখে টিকিট কেটে গান, আবৃত্তি ও যাত্রা গুনতে যাওয়া দর্শকেরা শারীরিক ও মানসিকভাবে যথেষ্ট অস্বস্তি ভোগ করেছেন এবং অর্থেকেরও বেশী লোক মাঝপথেই বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। মাইকের গোলমাল দুদিনের অনুষ্ঠানকে যথেষ্টভাবে বিঘ্নিত করেছে। সবচেয়ে অসহায় লেগেছে দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান দেরী করে শুরু করার পর (এটাই কি নিয়মে দাঁড়াল ?) ডাঃ শৈলেন দাসকে যখন পূর্ববী দপ্তর পর রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে দেওয়া হল তখন দর্শকের এক অংশ তার প্রথম গানের পরই হাততালি দিয়ে তাঁকে উঠে যেতে বললেন এক ভাঃ দাস সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন ঠিক আছে গাইব না এবং স্বার্থাঘেযী টেডিয়াম ত্যাগ করে চলে গেলেন। দর্শকেরা অসহায় ভাবে বসে রইলেন। কর্তৃপক্ষের কেউ এগিয়ে এলেন না। মাইকে কিছু প্রচার হল না। নাম থাকা সত্ত্বেও স্থিতি সেন এলেন না, প্রদীপ ঘোষ আবৃত্তি করলেন না। হঠাৎ শুরু হয়ে গেল লোকনাট্যের মুক্তিদীক্ষা যাত্রা। অনেকেই রেখটের প্যারী কমিউন নাটকের ওপর লেখা উপন্যাস রচিত ও পরিচালিত এই নাটক দেখবার আগ্রহে মূল্যবান সময় নষ্ট করে সেদিন টেডিয়ামে উপস্থিত হয়েছিলেন। যাত্রার সংলাপ ও বর্ণনা শোনা যায় নি। দর্শকেরা বহুক্ষণ বাধা দিচ্ছিলেন মাইকে অব্যবহার জন্ত, শিল্পীরা বিহ্বল হয়ে পড়ছিলেন এবং কর্তৃপক্ষের স্বার্থাঘেযী নির্দিকার।

পশ্চিমবঙ্গের তাঁতবস্ত্র

আমাদের গর্ব ও আনন্দের জিনিস

পশ্চিমবঙ্গের তাঁতশিল্প তার স্মৃতি ও রেশমের বিরাট বহুস্তর

নির্থে উপস্থিত হয়েছে। বয়নবৈচিত্র্য আর উৎকর্ষতার

পশ্চিমবঙ্গের তাঁতবস্ত্রের তুলনা নাই।

পশ্চিমবঙ্গ তাঁত ও বস্ত্রশিল্প অধিকার কর্তৃক প্রচারিত

এবারের যাত্রা উৎসব

(দর্পণের প্রতিনিধি)

রবীন্দ্রসম্মানের কাছে কলকাতা য়দানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়ো-
জিত যাত্রা উৎসবে অষ্টাবারের থেকে
আত্মপরিচয়িত হয়েছে। এবারের
বর্ণকে উল্লেখযোগ্য সংযোজন (বা
বয়োজন) তথাকথিত পুরস্কারের
ীতি রদ। আপেকার ভারপ্রাপ্ত
রী স্বতন্ত্র মুখ্যমন্ত্রী আমলে এই
তথাকথিত পুরস্কারকে কেন্দ্র করে
নীতি ও পদ্ধতিগত চিন্তাপ্রবণের
মহাকাশ যাত্রাঙ্গুলিকে বিক্ষুব্ধ
করেছিল। সেইজন্য বর্তমান উৎসব
অস্থানে পুরস্কার বন্ধের সিদ্ধান্তকে
আজারসিকরা স্বাগত জানিয়েছেন।

ছোট বড় ছেচলিগটি দল নিয়ে
শত ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ১২ই
অক্টোবর ২২ দিন ব্যাপী এই উৎস-

মহাজাতি সদনে
১৫ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টা
অচল পয়সা
হলু টিকিট সকাল ৯টা-৭টা

পরিবেশনায়
সর্বযুগের একটি নাম
নট কোম্পানী
এক এবং একক
১৭, হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট
৫৫-০৭৭২, ৫৪-০৬৬৮

শিল্পীমহল
নিবেদিত
ছোটো কালজয়ী নাটক
রবীন্দ্র ব্যানার্জীর পৌরাণিক
দস্যু রত্নাকর
কানাই নাথের ঐতিহাসিক
লাল নিশান
নির্দেশক সর্বাধিনায়ক
শ্রেষ্ঠাংশে নটদল

ভোলা পাল
বিষ্ণুপ্রিয়া ও রাইকমলখ্যাত
তারারাণী পাল
গায়ক-ভক্ত মল্লিক
আবহসঙ্গীত-খোকা মল্লিক
জেনারেল ম্যানেজার
অভয় সাহা

বের আসার বসেছিল। উৎসবের
আগে তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
ঘোষণা করেছিলেন বিষয়বস্তুর দিক
থেকে প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও
জাতীয় ঐতিহ্যের বাহক বা দেশের
সাংস্কৃতিকরূপায়ণকেই প্রাধান্য দেবার
চেষ্টা করা হয়েছে।.....আমরা অপ-
সংস্কৃতির হাত থেকে মুক্তি চাই।
এর জন্য দেবা গেছেকোন কোন দল
কিছু অশালীন নাচ ও দৃশ্যের সংস্কার
করে এখানে প্রদর্শন করেছেন। প্রশ্ন
হোল এই সেলফ সেলফ তারা সর্বত্র
বজায় রাখবে তো?

উৎসবে বেশ কয়েকটি গণচেতনা-
মূলক পালার সমাবেশ স্বাভাবিক
কারণেই হয়েছে। পেশাদারী যাত্রায়
এই সব নাটকের আগমন কিছুদিন
আগে থেকে হলেও এখনকার মতো
ব্যাপক ছিল না। এটা এখন
প্রমাণিত সত্য জনগণ। এই ধরনের
পালা সাগ্রহে গ্রহণ করে। কিন্তু
বিষয়বস্তু দুর্বল হলে মঞ্চে শুধু চিত্রকার
দাপাদাপি করলে লাভ হয় না।
আর সরকারের মন রাখার জন্য শুধু-
মাত্র স্লোগান চুকিয়ে 'মিলেই চলবে
না। শিল্পবোধ আর উদ্বেগ সঞ্চে
পরিষ্কার জ্ঞান থাকারকার। দেশী
ও বিদেশী ক্যান্টিন ধর্মী কিছুপালাও
সমাবিষ্ট হয়েছিল। এদের এই

তরুণ অপেরার 'সিপাই মিউটিনি'

(দর্পণের সমালোচক)

পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশো বছর
পর অযোধ্যা, মীরট, ঝাঁসী থেকে
হুদুদ ব্যারাকপুরে সিপাইরা ব্রিটিশ
শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে
পড়েছিলেন। কার্ল মার্কস ভারতে
সিপাইদের এই আগর ও সংগ্রামকে
ভারতের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম
আখ্যা দিয়েছেন। ১৮৫৭ সালের পূর্বে
এদেশে একাধিক কৃষক বিদ্রোহ সংগ-
ঠিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো সবই
ছিল বিক্ষিপ্ত, অঞ্চলভিত্তিক আর
সিপাই বিদ্রোহ ছিল ব্যাপক। ঐ
বিদ্রোহের প্রথম শহীদ ব্যারাকপুরের
সিপাই-স্ববেদার মজল পাড়ে।

'রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা'র পর তরুণ
অপেরার নবতম প্রযোজনা 'সিপাই
মিউটিনি' রচনা করেছেন মধু
গোখামী। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর বিষ্ণু-
রূপায় 'সিপাই মিউটিনি'র প্রথম
প্রদর্শনী অস্থিতি হল। অর্ধশত বিকৃত
জাতীয় ইতিহাস পড়ানো হয় স্কুল-
কলেজে। পড়ানো হয় না নানা
সাহেব-মীরাবাদী-মজল পাড়ের
মহান ভূমিকার কথা। সে ক্ষেত্রে
এ ধরনের যাত্রাঙ্গষ্ঠান অবশ্যই প্রোতা-
গণকে শিক্ষিত করবে।

প্রদর্শন প্রদর্শনার যোগ্য। অবশ্য
এখানেও বেশ কিছু বাজে পালা
জায়গা করে নিয়েছে। আরোজনের
সবচেয়ে বড় ত্রুটি দুপুরে ও সন্ধ্যায়
পালা ও মনের স্থান নির্ণয়ে। কিসের
ভিত্তিতে এটা করা হয়েছে বোঝা
যায় নি। সন্ধ্যাতে দর্শকের সংখ্যা
বেশী হয়। উন্নতমানের পালাকে
নিশ্চয়ই বেশী সংখ্যক দর্শকের কাছে
পরিচিত করা উচিত। কিন্তু বড়
দল রাজাই সন্ধ্যায় আর ছোট দল
দুপুরে থাকবে এটা ঠিক নয়। নাম-
করা দল ও পালায় বেশী দর্শক
যাবেই। অনেক ছোট দল হাজার
হাজার টাকা বিজ্ঞাপনের জন্য গরচ
করতে পারে। এদের কোন কোন
ক্ষেত্রে সন্ধ্যায় না দিয়ে দুপুরে
দেওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। অন্তর্দিকে
ভালো ছোট দলকে সন্ধ্যায় স্থযোগ
দেওয়া উচিত ছিল। এতে সরকার
ও দল দুয়েরই লাভ হোত আর অস্থ-
ঠানের মূল স্পিরিটটাও বজায়
থাকতো। সেইজন্য উত্তোক্তাদের
আরো বেশী মনোযোগের প্রয়োজন
ছিল।

সংস্কৃতি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী এবং তথ্য
মন্ত্রীর ঘোষণার প্রভাব এবারকার
যাত্রা উৎসবে ভালোভাবেই প্রতি-
ফলিত হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে
তাদের এই প্রচেষ্টা প্রশংসার
যোগ্য।

যুক্তি তক্কো গল্পো

ভানুসিংহ

ঋষিক ঘটকের শেষ ছবি 'যুক্তি
তক্কো গল্পো' আমাদের ভাবনার
অগতাকে উন্নত করে, দোলাচল রাজ-
নীতির দৃষ্টি মুখরতায় আমাদের
মনকে সচেতন করে, কয়িছু সমাজের
অবক্ষয়ের স্বাক্ষরানেও আশার আলো
দেখায় আর স্বপ্ন দেখাতে চায়। রূঢ়
বাস্তব বোধানে নির্মম, ভেঙে চূঁরে
জালিয়ে পুড়িয়ে সব শেষ করে দিতে
চায় সেখানেও দেখি নতুন করে বেঁচে
ওঠার কঠিন শপথ গ্রহণ।

আলোচ্য ছবিটিতে ঋষিক
ঘটকের ব্যক্তি-জীবনের ছায়া
অনেকটাই পড়েছে। তথাপি
ছবিটিতে সার্বজনীন আবেদন সঞ্চারে
কিছুমাত্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় নি—
এটাই এ ছবির অমূল্য বৈশিষ্ট্য।
একটি প্রতিভাবান শিল্পী সং প্রচেষ্টা
সঙ্গে সমাজের প্রতিকূল পরিবেশে
দেশের অর্থনৈতিক স্বাভাবিক
নিষ্পত্তি হতে হতে নিঃশেষ হয়ে
গেল যে ভাবে, তার মধ্যে কি বঞ্চিত
দেশবাসীর ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস চাপা পড়তে
পেরেছে? ছবির নীলকণ্ঠ বাগচি
ঋষিক ঘটককে যতই সনাক্ত করুক
না কেন, তার কথা, তার ব্যথা,
ক্রোধ, আক্ষেপ, যন্ত্রণা সাধারণ
মাহুষের অস্থিতিতেও সাড়া জাগায়
বৈকি। তবে একথাও সত্য যে,
ঋষিকের জীবনের যে ফ্রাস্ট্রেশন, তা
অবশ্যই সাধারণ মাহুষের নয়। কিন্তু
সেই ফ্রাস্ট্রটেড চরিত্র স্বীয় জীবনের
অভিজ্ঞতা নিয়ে সমাজের বৈষম্যকে
যখন কণ্ঠস্বরে করে, বন্ধনাকে ব্যাধ
করে, শোষণের বিরুদ্ধে রুখে
দাঁড়াবার ঘোষণা করে, তখন তো
সেগুলি শুধুই জনমানসের কাছেই
আবেদন রাখে।

নীলকণ্ঠ বাগচি শিল্পী জীবনের
ব্যর্থতায় আজ হতাশার শিকার,
রীতিমত মদ্যপ। বিশ্বংল এই
জীবনের সংগে গ্লী দুর্গা খাপ খাওয়াতে
না পেরে মফঃস্বলের এক বিচ্ছালয়ে

মতামত

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

জানিয়ে দিলেন, উৎপলবাবুর দৃঢ়
সিদ্ধান্ত ইন্দো-চায়না শ্রেণীশিপ
এ্যাসোসিয়েশনের অস্তিত্ব ছাড়া
তিনি অত কোন অস্থানে যোগদান
করবেন না।

স্বভাবতই এবার আমি নিশ্চয়ই
দাবী করতে পারি যে, গণতান্ত্রিক
চেতনাসম্পন্ন মুক্তিকামী মাহুষ এই
ভাণ্ডাবাজগুলোকে বয়কট করুন,
যারা টাকা রোজগারের ধান্দায় রাজ-
নীতির মূখোশ মুখে গঁটে নিয়েছেন।
জনৈক পাঠক

শিক্ষিকার চাকরী নিয়ে চলে যায়
পুত্র সত্যকে সংগে করে। নীলকণ্ঠ
গ্লী পরিত্যক্ত হলেও নিঃসঙ্গ নয়, তার
সংগী হিসেবে দেখি এক বেকার তরুণ,
বাংলাদেশের জাহিতা এক তরুণী
বন্ধবালী আর এক স্কুলের প্রৌঢ়
প্রাক্তন সংস্কৃত শিক্ষককে। এদের
মধ্য দিয়েও ছবির বলিষ্ঠ বক্তব্য
ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নানা তির্যক
জগিয়ায়। কাটা কাটা সংলাপ আর
দৃশ্যের মধ্য দিয়ে যুগ যন্ত্রণা ও জীবনের
এই দাবাখেলার ছবি ফুটেছে।
রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সমস্তা তুচ্ছ
ধরার চেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়, যেখানে
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

গ্রামে-গঞ্জে সহরে নগরে
সবার মুখে একই কথা
অপূর্ব
আনন্দময়ের
কালকেতু ফুল্লরা
সাতনম্বর কয়েদী
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের
লক্ষ্মী এলো ঘরে
নির্দেশনায় ও অভিনয়ে
মোহন চ্যাটার্জী
পরিবেশনায়
মোহন অপেরা
৫৫-৫৪১৩

পঃ বঃ সরকারের
যাত্রা উৎসবে
'রেকর্ড দর্শক'
এবং যে সকল অগণিত দর্শক
বু-মু-বু পালার
টিকিট না পেয়ে ফিরে গেছেন
তাদের জন্য আমরা ছুটি
আমাদের আরো ২টি
বলিষ্ঠ নিবেদন
নাগমণি
(পৌরাণিক)

জোনার ঘোড়া
(সামাজিক)
পরিবেশনায়
৮৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী জনপ্রিয়
সত্যনম্বর অপেরা
৥ ৫৫-৮১১০ ॥

সফল ধর্মঘট

পিয়ারলেস এমপ্লয়ী ইউনিয়নের নেতৃত্বে হাটাই কর্মীদের পুনর্বহালসহ ছ বর্ষা দাবীর ভিত্তিতে অবিলম্বে হাওড়া শাখা, কলকাতা, অফিসগুলি এবং রায়গঞ্জ শাখা অফিস থেকে লক-আউট প্রত্যাহারের দাবীতে পিয়ারলেসের কর্মীরা দীর্ঘ চার মাস যাবত আন্দোলন চালাচ্ছেন। ঐক্যবদ্ধ কঠোর ইউনিয়নের সঙ্গে কোন আলাপ আলোচনার পরিবর্তে নানা ধমন-পীড়ন বুলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। এমন কি বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রথম দপ্তর আহত ছ'টি আলোচনা সভার একটিতেও কঠোর উপস্থিতি হননি। এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রতিবাদে ভারতবর্ষব্যাপী পিয়ারলেসের বিভিন্ন শাখা অফিসের কর্মীরা ২২শে, ২৬শে ও ২৭শে সেপ্টেম্বর বর্ধাক্রমে একদিন ও দু-দিনের সফল ধর্মঘট পালন করেন। এই উপলক্ষে উক্ত তিন দিনই বিভিন্ন শাখা ইউনিটের নেতৃত্বে সমাবেশ ও মিছিল অল্পাধিক হয়। ইতিমধ্যে পিয়ারলেসের আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে বিভিন্ন গণ সংগঠন এগিয়ে এসেছেন।

হাতে হাতে বিক্রী শত শত হাজারে
হাঁড়ি আজ কাটিল শারদীয় বাজারে

হাঁড়ি ফাটিল

একটি চাঞ্চল্যকর

রাজনৈতিক ছড়ার বই

প্রকাশিত হল



ছড়া ॥ অনার্য মিত্র ০ কাটুন ॥ অহিভূষণ

ইন্দ্রিরা গ্রেপ্তার ॥ তাঁর সহচর গ্রেপ্তার কেন গ্রেপ্তার? কি রহস্য? কি পাপ? কি কৌতুক? রাজনৈতিক সাহিত্যে এই প্রথম অনার্য মিত্রের কাঁকালো ছড়ায় হেসে লুটিয়ে পড়া, শরীরে জ্বালা ধরানো সর্বত্র উপভোগ্য একটি দলিল। ভূমিকা লিখেছেন অন্নদাশংকর রায়। সতর্ক নজর রাখুন।

দাম—দুটাকা। এজেন্টদের জন্য ২৫% কমিশন।

প্রাপ্তিস্থান—আশনাল বুক এজেন্সী, ১২, বক্সিস চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-১২। নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-১১০২১০। পাতিরাম কল্লেক্স স্ট্রিট মোড়। সাপ্তাহিক 'ধর্ম' ৬১নং বট লেন কলকাতা-১০।

বিকারগ্রস্ত ছড়া

অনার্য মিত্র

হু' ছুটিবার স্বামীম হলেন
তবু কিসের জ্বালা?
এমন জ্বালা অধিক
নেতাবে কোন শালা?

তিরিশ বছর যারা ছিলেন,
তারা তো আর নেই,
তবু তুমি যেমন ছিলেন
তেরি আছেন সেই।

আজ্ঞা মশাই বলুন দেখি
আসলে কি চান?
পুত্র তরা গুরু দেখো
গোয়াল ভরা ধান?

আহা সোনার চান আমার
ওহো সোনার চান,

এস তোমায় আর কয়ে
ম'লে দিই দুই কান।

তিরিশ বছর দার বেড়েছে
হু'মাসে তা বাবে?
আমরা পাইনি কিছু
ভারী সব কি ধাবে?

উনিশটি মাস খেল খাটিল
ভবেই পেছ গরি,
এক ছুটো দিন খেতে নেই কি
আর কি আর দরি?

ভোট দিচ্ছেন বেশ করেছেন,
দেব বলেছি যেবা,
ভোটের আগে নগর দিয়েই
না হয় ভোটটা নেবা।

সত্যনারায়ণ সিংহ
(১ম পৃষ্ঠার পর)

উঠেছিল।" পরিষ্কারভাবে বলেন
হিংসার তারা বিশ্বাস করেন না।

সত্যনারায়ণবাবু এই বিবৃতি
নকশাপত্রীদের অত্যন্ত মহলে তীব্র
ক্ষোভের সঞ্চার করে। এমনকি গত
২ই জুন বন্দীমুক্তি কমিটির পক্ষ থেকে
রাজ্যপালকে দেওয়া এক স্মারক-

লিপিতে এই প্রসঙ্গে বলা হয়
"আমরা দুতভাবে মনে করি এই শর্ত
অগণতান্ত্রিক, অমৌলিক এবং
নোংরা।"

এটা সত্য কথা, সত্যনারায়ণ
সিং প্রত্যাকভাবে বন্দীমুক্তি আন্দোলনে
না জড়িত থেকে একক প্রচেষ্টার
সরকারের সংগে আলোচনা প্রস্তুত
কোন সিদ্ধান্ত বন্দীদের ওপর চাপিয়ে
দিতে পারেন না এবং এটা করার
মানেই বন্দীমুক্তি আন্দোলনে শর্তের
সৃষ্টি করা। তাঁর রাজনৈতিক মতামত
বন্দীরা নাও মানতে পারেন। এটা
বন্দীদের নিজস্ব ব্যাপার। তাঁর
বা তাঁর গোষ্ঠীর মতামত সমস্ত বন্দী-

দর্পণের ছুটি

শারদীয় উৎসব উপলক্ষে দর্পণের
দুপ্তাহ ছুটি। পুনরায় দর্পণ প্রকাশিত
হবে আগামী ৪ঠা নভেম্বর।

যের উপর চাপিয়ে দেওয়া কি
অগণতান্ত্রিক নয়? তাছাড়া যে
বক্তব্য সমর্থন করে একটি সই করলে
মুক্তি পাওয়া যায় তাকে কি মুচ-
লেকা বলে না? মুচলেকা এভাবেই
আদায় করা হয় সাধারণতঃ। হিংসার
কেউ বিশ্বাস করে কি করে না তা
কেন লিখে জানাতে হবে? তাও
আবার সরকারকে।

বলা বাহুল্য সত্যনারায়ণ সিংয়ের
এই "দুপ্তাহ প্রচেষ্টা"কে বন্দীরা ছুড়ে
ফেলে দিয়েছেন কেউ সই না করে।
অবশ্য তিনজন সত্যনারায়ণসহী
সম্ভাষণ রাণা, সাধন সরকার ও প্রদীপ
ব্যানার্জী বাহ দিয়ে।

বুজু তরো গল্পে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অবশ্যই গল্পে, ব্যঙ্গ আর যুক্তি তরোর
ব্যাপারটাই বড় হয়ে ওঠে। যে
দেশে তরুর সমাধির ওপর বেকার-
দের অভিযান, মধ্যবিত্তের কঠোর
মূল্যবোধ, শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর
জীবন বঞ্চনা, নারীর লালনা এবং
রাজনৈতিক দলবাজিতে যুবজতির
অপচয়, সেখানেও আমরা নীলকণ্ঠের
মুখে শুনি—'এই বেকার তরুর আর
লাজিতা বঞ্চনা এক নতুন বাংলা
নাগরিক হবে, যে বাংলা এখনও
জন্মায় নি তবে একদিন জন্মাবে'—
'দুর্গা, এই শালবনে ভোরের আলোয়
আমার সম্মান সভার মুখখানা
একবার দেখে যেতে চাই, কারণ সেই
ছবিটাই তো আমার বুকে থেকে
যাবে।' এ সব কথা এক মস্তপের
মুখ থেকে বার হলেও তার স্বপ্ন আর
আশার ছবিটা স্পষ্ট হয়েই ওঠে আর
এখানেই হচ্ছে শিল্পীর অবদান।
শেষ দৃষ্টে যখন নীলকণ্ঠ বুলেটের
আঘাতে নিহত, তখনও দেখি বেকার
তরুর আর লাজিতা বঞ্চনার শুভ-
মিলন, শুনি মঙ্গলধ্বনি আর
আশাবরী। কাজের কাজ না করে
শুধু যুক্তি তর্ক আর গল্প করে বত
বিশ্বাসী সৃষ্টি করা হোক না কেন,
গলা পচা এই সমাজ ব্যবস্থার
অবসানে নতুন প্রাণশক্তির জন্ম এক
দিন হবেই—ছবির তো এটাই বীজ-
মন্ড। ছবিতে নীলকণ্ঠের আচরণের
অভিযন্তা বিশেষভাবে প্রকট হয়ে
উঠেছে মদের বোতল হাতে।
ছবিতে ধাপছাড়া দৃষ্টের অভাবও
করেছে।

নেই। শব্দ গ্রহণও ত্রুটিপূর্ণ।
এ সব নিয়েই স্বতন্ত্র ভাবন
ভাষার হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র আ
বঞ্চনা চরিত্রটিতো স্বতন্ত্র
চিত্তারই কসল।

অভিযোগ

রাজ্য সরকার পরিচালিত অ
নাশ দপ্তর যেটার নিচি হোমের কয়েক
জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ
পাওয়া গেছে। জানা গেছে প্রাক্ত
স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধিত পাকার রাজস্ব ও
চাকরী পান। কিন্তু মন্ত্রীর লো
বলে 'হোক অথবা' কাজ করা
ইচ্ছা বা সাধ্য নেই বলেই হো
এরা যুগ্মিত ঘোরাফেরা আর বা
ধাকা ছাড়া বিশেষ কিছু আশ্র
করতেন না, এখন জমানা পাটাব
পূরণ করেন না। এই পঞ্চপাট
হলেন অমল রায় (কেরানী) প্রশা
রায় (টোটার কীপার) গুণনিদ্ধ কয়া
(ওয়ার্ড মাস্টার) বক্সিম দা
(কার্মিসিস্ট) এবং সমীর রা
(সোভাল ওয়ার্কার)। শেষো
ব্যক্তি কিছুদিন আগে 'অন্তঃ বদল'
হলেও এবং উপরওয়ার নির্দেশ সঙ্গে
এখনও একটি কোয়ার্টার দখল ক
রেখেছেন।

একটি কনভেনশন

সর্বশ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের
মুক্তি ঘরানিত করার স্বপক্ষে জনম
গড়ে তোলার জন্য বন্দীমুক্তি ও গণ
দাবী প্রস্তুতি কমিটি আগামী শনিবা
১৫ই অক্টোবর মুসলিম ইন্সটিটিউট হা
একটি কনভেনশনের আয়োজ
করেছে।

Shortly to be out

SHELLEY and MARX—their MILLENNIA
A topic never before covered.

In all about a hundred pages with the original sources
generally appended.

The work closes with 'comments by Prof. Jyoti Bhatta-
charjee M. A. (Cal. & Leeds) Reader in the Dept. of
English, University of Calcutta. Price Rs. Five Only.

ON POET R. N. TAGORE.

A political appraisal of the poet in verse. In all a hundred
pages with the original sources generally appended.
Something out of the rut—

no kindred of the hallelujah brood.

Comments by : Prof. Kanak Mukherjee M. A. (Cal.),
Lecturer in English, Women's College, Editor : Monthly
Eksathe. Prof. Jyoti Bhattacharjee, M. A. (Cal. & Leeds),
Price Rs. Five only.

Murati, Murati, oh Murati!

A satire in verse from the politico-philosophical
point of view.

The curtain on the work falls and in comes comments on
it in prose by Prof. Jyoti Bhattacharjee, M. A.

Author :

Sunilkrishna Sen (alias Parthasarathi Sengup
Lecturer in English, Uluberia College (affiliated
Calcutta University) P. O. Uluberia, Dist. Howrah,
West Bengal, India.

সম্পাদক—ইরেন বহু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২০/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ বট লেন কলকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত।

ইন্দিরাপন্থীরা তলবী সভা ডাকবেই : রাজ্য নেতাদের দলে টানার চেষ্টা

(দর্পণের সংবাদদাতা)



বিশ্ব বর্ষ ১৯৭৭ সংখ্যা ১১। শুক্রবার ৪ঠা নভেম্বর, ৭৭। ৪০ পয়সা

বেপরোয়া তেল ডাকাতি পুলিশ এখন চুপচাপ : মন্ত্রীদেব ভুল বোঝাবার চেষ্টা করছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্যের চটকলগুলিতে ব্যবহৃত জুট ব্যাচিং অয়েলের চোরাই ব্যবসা বন্ধ হয়নি। পূজার দিনগুলিতে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অদ্ভুত ঘটনা হলো হলদিয়া বজর থেকে নিয়ে আসার পথে ট্যাংকার থেকে তেল বের করে নেওয়ার ঘটনা এখানে প্রকাশ্যেই ঘটছে। এবং প্রতিটি ঘটনা সংশ্লিষ্ট থানার নাকের ওপরই হচ্ছে।

খবর নিয়ে দেখা গেছে, মধ্য কলকাতার রেহানা ট্রেডিং, ওমপ্রকাশ স্বন্দর সিংহ, চতুরা সিং প্রমুখ সংস্থা ও ব্যক্তিরা প্রকাশ্যেই চোরাই মাল পাচার করছে। এর সঙ্গে জে, বি, ও-র পুরনো পাপী রাজপথ গুপ্তা, শিবনাথ গুপ্তার 'গুপ্তা ট্রান্সপোর্ট', কাকিনাডার ডিক সাউ, হাওড়ার বনোয়ারীলাল, বি, কে, পলি এভিনিউর রমেশ ঠাকুর, চাঁদনীচকের রামলাল, জগন্নাথ দাগাও যথারীতি চোরাই চালান অব্যাহত রেখেছে।

হলদিয়া বজর থেকে নিয়ে আসা তেল উট্টোডাকায় যায়। বড়বাজারের কৃষ্ণ সিনেমার সমীকটস্থ গোড়াউন, ষড়ঙ্গা থানার অদূরে এক পাচিল ঘেরা চোরাই গোড়াউনে জুট ব্যাচিং নামান হচ্ছে। নতুন খবর হল গুপ্তা ট্রান্সপোর্ট তাদের অয়েল ট্যাংকারের উপর থেকে নিজেদের কোম্পানির নাম মুছে ফেলেছে। অনেকের ধারণা সংবাদপত্রে তেল পাচার নিয়ে বহু বিষ সংবাদ প্রকাশিত হয়ে পড়ায় এরা নাম গোপন রেখে কাজ চালাবার চেষ্টা করছে। আরও মারাত্মক

খবর হল আনুল-মোরিগ্রামের ডিপো থেকেও অবৈধভাবে তেল পাচার হচ্ছে। এসব কারবারের সঙ্গে পূর্বোক্ত ব্যক্তিরা নানাভাবে জড়িত বলে অভিযোগ। মোটকথা ট্যাংকার পথে বাহিত কোন তেল-ই এরা বাদ দিচ্ছে না। পুলিশ প্রথম দফায় কিছু "অপারেশন" করলেও এখন চুপচাপ। বিভিন্ন মহলের অভিযোগ পুলিশ, প্রশাসন ও মিল অফিসারদের মধ্যে এক গোপন বোঝাপড়ায় এই কারবার দারুন ভাবে জমে উঠেছে। মহাকরণ এব্যাপারে এখনও পর্যন্ত খুব কড়া সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারেনি। বর্তমান মন্ত্রীদেবও এই বিষয়টিতে যাতে উৎসাহ না দেখা দেয় সেইজন্ম পুলিশ ও কিছু অফিসার ভুল বোঝাচ্ছেন। না বোঝানোরও কারণ নেই। কেননা পশ্চিমবঙ্গের বরাদ্দ জে, বি, ও কেরোসিন, পেট্রোল, সয়াবিন নিয়ে যে ছ নম্বরী কারবার চলছে তাতে এরাও কম উপকৃত নন। মাসিক বরাদ্দ বাঁধা, বোতলের ছড়াছড়ি সর্বোপরি বাঁধাধরা কিছু স্বন্দরী মহিলা দিয়ে রাজ্যের নামকরা কুখ্যাত চোরাচালানিরা এদের আঁঠেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

আমাদের কাছে পরিষ্কার খবর রয়েছে বর্তমানমন্ত্রিসভার ধারে কাছে ঘোরাফেরা করে এমন কিছু দলীয় ব্যক্তিও এখন রীতিমত এদের সঙ্গে ওঠা বসা করছে। মাত্র কিছুদিন আগে রাজপথ গুপ্তার হলবল প্রাক্তন (শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসের তলবীপন্থীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, তাঁরা তলবী সভা ডাকবেনই এবং ইন্দিরা গান্ধীকে কংগ্রেস সভাপতির পদে বসাবেন। তলবীপন্থীদের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে মোট ৬৪৯ জন এ আই সি সি সদস্যের মধ্যে এ পর্যন্ত ৪৫০ জন স্বাক্ষর করেছেন। বলা হয়েছে এই সমর্থন বেড়ে ৫৫০ জন হবে। তলবীপন্থীরা আপাততঃ কোন সভা ডাকছেন না। কারণ বিভিন্ন রাজ্যে তলবী সভা আহ্বানের ব্যাপারে কংগ্রেস কর্মীদের প্রতিক্রিয়া এখন ভালভাবে যাচাই করে নেওয়া হচ্ছে। কেননা ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস ভাঙছেন এই প্রচারের স্বীকার হতে তলবীপন্থীরা রাজী-নন।

তলবীপন্থীদের পুরোধা কমলাপতি ত্রিপাঠী এই স্বযোগে বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস নেতার সঙ্গে কথা বলে তাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছেন। উদ্দেশ্য সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম সারির নেতারা যাতে ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। এ ব্যাপারে ত্রিপাঠীজীর উল্লেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে বোম্বাইয়ের রঞ্জনী প্যাটেলের সমর্থন পাওয়া। এর আগে তিনি ইন্দিরা-বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে ছিলেন।

এ পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গেছে তাতে জানা গেছে, ইন্দিরা গান্ধী (শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

প্রিয় দাসমুন্সী ও কয়েকজন কংগ্রেস ছাড়তে চাইছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

প্রিয় দাসমুন্সী সহ কয়েকজন প্রথম ও দ্বিতীয় সারির কংগ্রেস নেতা এখন কংগ্রেস দল ছাড়ার কথা ভাবছেন। প্রিয়বাবু সম্প্রতি জনতা পার্টির বর্ষিয়ান নেতা প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করেন। প্রিয়বাবুর এই সাক্ষাৎকারের মূল উদ্দেশ্য জনতা দলের সমর্থন নিয়ে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হওয়া।

প্রিয়বাবু বিগত পাঁচ বছরের ভুল রাজনীতির জন্য প্রফুল্ল সেনের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য প্রফুল্ল সেনের কাছে স্বযোগ চান। প্রিয়বাবু বলেন যে তাকে জনতা দল সমর্থন করলে তিনি রাজ্যসভায় নির্বাচিত হতে পারবেন এবং তিনি তার সমর্থকদের নিয়ে জনতা দলে যোগ দেবেন। প্রফুল্ল সেন বেশীর ভাগ সময়ই চুপ করে ছিলেন। শুধু তিনি রাজ্যসভায় জনতা দলের সমর্থনের প্রস্তাব দিলে, "প্রিয়, তুমি কি কংগ্রেসের পুরো ভোট পাবে?"

প্রফুল্ল সেনের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে প্রিয় গিয়েছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণের কাছে। যদিও বলা হয়েছে সর্বাস্বক বিপ্লবের দীক্ষা নিতে তিনি গিয়েছিলেন আসল উদ্দেশ্য ছিল জয়প্রকাশজীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তাঁর আশীর্বাদ পাওয়া। জানি না জয়প্রকাশজী কলকাতায় প্রিয়-র নেতৃত্বে তার ওপর হামলার ঘটনা

ভুলে গেছেন কিনা, তবে তিনিও প্রিয়কে খুব আশার বাণী দিতে পারেন নি। অবশ্য প্রিয়বাবু অধুনা জনতা দলের নেতা তরুণকান্তি ঘোষের সমর্থন পেয়েছেন। আর পার্টী যাওয়াত বাবদ সমস্ত ব্যয় তরুণবাবুই প্রিয়কে যুগিয়েছেন।

তারপরই প্রিয় দাসমুন্সী এ আই সি সি বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লী গিয়েছিলেন গত মাসের মাঝে সপ্তাহে। প্রথমে তিনি ১২নং ওয়েলিংটন ক্রিসেন্ট রোডে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে নিভৃত সাক্ষাৎ করে তার প্রতি নিজেদের পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেন। পরে আবার এ আই সি সি অধিবেশনে ইন্দিরা বিরোধী বক্তৃতা দিয়ে বলেন যে পাঁচবছর তিনি ভুল রাজনীতি করেছেন। প্রিয়বাবুর কাছে তার দলের অনেকেই প্রশ্ন রেখেছেন, তুমি নিজেকে দায়িত্বশীল রাজনীতিবিদ বলে জাহির কর। পাঁচ বছর বাধে এখন তুমি বলছ যা করেছ ভুল করেছ। তাহলে তোমার কি কোনটা ভুল রাজনীতি আর কোনটা সঠিক রাজনীতি তা বিচার করার যোগ্যতা নেই? যদি সে যোগ্যতা না থাকে তবে এখন যে রাজনীতি করছ সেটাই যে সঠিকতার গ্যারান্টি কোথায়?

বিশ্বরূপা থিয়েটারে যাচ্ছেতাই কাণ্ড

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিশ্বরূপা থিয়েটার কর্তৃপক্ষের হাতে সাধারণ দর্শকবৃন্দ এখন রীতিমত নাঞ্জেহাল। থিয়েটারের সর্বময় কর্তা রাসবিহারী সরকার ওরফে ছোট্টা ওরফে "বাবু"র খেলালখুশীতে নাটক চলছে। এই খেলারই বলি হচ্ছেন হাজার হাজার দর্শক।

গত সাতাশে দর্শকদের একাংশ কর্তৃপক্ষের নানা অনাচারের প্রতিবাদও করেছেন। এদের বক্তব্য, কাগজে কলমে তিনঘণ্টার বই রেখে দর্শকদের মাত্র দু ঘণ্টার শো দেখিয়েই নাটক ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। সাধারণত বই শুক্ল কথ্য সাড়ে নটায়। এখন দেখা যাচ্ছে বই শুক্ল হচ্ছে দেবীতে অথচ শেষ হচ্ছে কাটুইট করে মাত্র দেড় দু ঘণ্টার মধ্যেই। হলের ভিতর যে স্থানভেনির বিক্রী হয় তার সংগেও নাটকের দৃশ্য

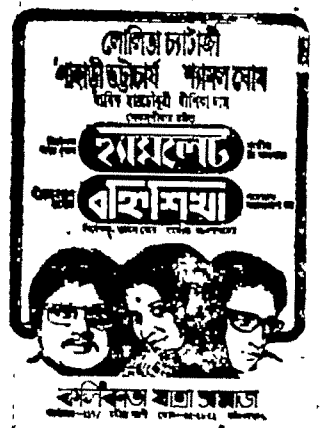
ও অংকের সাদৃশ্যের কোনও বলাই নেই। ফলে প্রতিদিন প্রায় প্রতি শোতেই দর্শকরা বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষের কাছে বোকা বনে ফিরে যাচ্ছেন।

এদিকে থিয়েটারের গ্রীণরুমের খবর হল, দর্শকদের জন্য যে নাটকই বরাদ্দ থাক না কেন বিশ্বরূপার গ্রীণরুমে ও দোতলার "বাবু"র ঘরে যে নাটক চলছে তারই খেসারত দিচ্ছেন সাধারণ দর্শক।

এই অন্তর মহলের নাটকের শিকার হলেন অপেক্ষাকৃত কম দামী ও নামী শিল্পীরা। যারা চট করে "বাবু"র ঘরে হনোররুমে যেতে পারেন না কিংবা তাঁর একাক্ষিক যোচাতে পারেন না। এদের কারও কারও বেতন পনেরো টাকাও রয়েছে। মানে প্রায় কুড়িটি শোতে অভিনয় করার জন্য এই সামান্য

টাকার সংগে উপরি রয়েছে "বাবু"র জমিদার স্বলভ আচরণ। থিয়েটারে প্রায় একশো আঠাশ জন কর্মী কাজ করেন। এদের চাকুরীর কোনও নিরাপত্তা নেই। অত্যাচার থিয়েটারের চেয়ে এদের বেতনও কম। শিল্পী ও টেকনিশিয়ানদের কোনও ইউনিয়ন গড়তেও মহামাফ "বাবু" দেননি।

(শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



বিশ্বরূপা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফলে অনাচার দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে—কমেনি। প্রতিদিনই থিয়েটারগতপ্রাণ “বাবু” রাত দেড়টা ছুটো পর্যন্ত বিশ্বরূপার দ্বিতলকক্ষে কাটান। নিশ্চয়ই একলা নন। অধিকাংশ সময়েই নাটকের প্রয়োজনে থিয়েটারের বেবি, স্থলেখা ঘোষ, মোফিয়া চ্যাটার্জী, রাণী চক্রবর্তী, বকুলরাণী প্রমুখ উপস্থিত থাকেন। থিয়েটারে “বাবুর” কথাবার্তা শোনা ও সেই মত চলার ফলে প্রতিদিন কাগজে এরা বিজ্ঞাপনে প্রচারও পাচ্ছেন। যারা ঠিক তেমনটা নন কাগজের বিজ্ঞাপনে তাদের নাম অল্পপস্থিত। শুধু সোকেরা বলেন থিয়েটারের টেকনিশিয়ানরা পঞ্চাশ/ষাট টাকা বেতন পেলেও রাণী বকুলরাণীরা প্রকাশ্যে ও গোপনে বাবুর কাছ থেকে প্রচুর টাকা পেয়ে থাকেন।

বাবুর অপর দুই সাক্ষরদ্বয় গ্রীণ-রুমের ম্যানেজার নারায়ণ ভট্টাচার্য; অভিজিৎ দে-ও (রামলু) কম নন। শিল্পীদেরই কারো কারো অভিযোগ গ্রীণরুমের অভ্যন্তরেও এখন তরল পানীয়ের ছাড়াছড়ি। এরা বলছেন কর্মী শিল্পীদের বেতন বাড়তে নানা বায়নাধা থাকলেও অল্প খাতে প্রতিদিন রাতে প্রচুর টাকা বেরিয়ে

তেল ডাকাতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খাণ্ডমন্ত্রী প্রজ্ঞাপন দিয়ে ঘোষের সঙ্গে চলাফেরা করতেন এমনকি একে দিয়ে কয়লা বিতরণও করিয়েছে। গুপ্তার দলবল। জামানা পাটেছে। হুযোগ বুকে পশ্চিম বাংলায় হাজী মস্তানের সাক্ষাৎ শিল্পরা এখন বাম-ফ্রন্টের মৃত্যুসংগ্রাম বাগে আনার তালে রয়েছে। অদ্ভুত ঘটনা হল কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমনের হাজারো বিভাগ ও কর্মী থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে কলকাতার প্রধান সড়ক ও জাতীয় সড়কের উপর দিনে দুপুরে তেল ডাকাতি চলছে। নইলে রাজ্যের চল্লিশ-বিশালিশটা চোরাই গোড়াউনের উপর পুলিশ প্রহরা দিতে এত অসুবিধা কোথায়? কেনইবা বিহার উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা রাজ্যকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হচ্ছে না। তবে এটুকু বলা যেতে পারে তেলের চোরাই চালান নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার এখন চূপচাপ থাকলেও হয়তো বেশীদিন তা পারবেন না। কেননা তাদের জবাবদিহি করতেই হবে। আসন্ন বিধানসভা ও সংসদ অধিবেশনে এই প্রসঙ্গ বিস্তারিত ভাবে উঠছে।

যাচ্ছে। এর প্রতিবাদ করতে গেলেই বিপদ। বলাবাহুল্য তাব ঘাড়ে ইটাইয়ের নোটিশ নেমে আসবে। শিল্পী জয়ন্তী সেন, কবি দত্ত থিয়েটার ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণও নাকি স্বনামধন্য “বাবু”।

দর্পণ প্রতিনিধির কাছে শিল্পী কর্মীরাই অভিযোগ করেছেন যে, নাট্যশিল্পকে উৎসাহ দেবার জন্য থিয়েটারে কোন প্রমোদক নেই। অথচ টিকিটের দর ৪ থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত। প্রতিদিনই হাউসফুল যাচ্ছে। এছাড়াও বেআইনীভাবে অতিরিক্ত চেয়ার দিয়ে দর্শকদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে। এর কোনও প্রতিবিধান নেই। করমুক্ত টিকিট বিক্রীর অচেন টাকাতে তাদের কোন লাভ নেই। তাঁরা যে তিমিরে সেই তিমিরে।

বিভিন্ন মহলের অভিযোগ অন্তরমহলের নাটকের ক্ষেত্র এখন নাট্যমঞ্চকেও গ্রাস করেছে। থিয়েটারের “দামী” শিল্পীদের অনেকেই ভেতরের হালচাল বুঝতে পেরে বই যেমন তেমন করে শেষ করে কেটে পড়ছেন। “মহানায়িকা” সুপ্রিয়া দেবীর তো কথাই নেই। কণিকা দেবীও প্রায়ই বে-সামাল হয়ে সরে পড়ছেন। ফলে নাটকের অংক/দৃশ্যকোনটিই আর ঠিক ঠিক থাকছে না। বিকিষ্ট ভাবে নাটক থেকে হচ্ছে। ক্ষুদ্র দর্শক এর প্রতিবাদও করেছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের বটতলা থানারহুমকি দিচ্ছেন।

হলের কা রাসবিহারী সরকার ওরকে “বাবু” বলে বেড়াচ্ছেন, “চৌরঙ্গী” বইয়ে শেফালীর নাচ যেভাবে চালিয়েছি, সেইভাবে এখনও চলবে। প্রসঙ্গমত উল্লেখ্য কংগ্রেসের যুব বাহিনী “অঙ্গীলতা” বন্ধের ব্যাপারে চৌরঙ্গী বইয়ের প্রদর্শন তুলে দিতে চায়। কিছু হৈ-চৈ-ও হয়। এর কর্তা ছিলেন প্রিয়রঞ্জন দাসগুপ্তীর চেলা উত্তর কলকাতার জিনিবাস বসু প্রমুখ। শেফালীর নাচ বন্ধ হয়নি। হয়েছিল উৎপল দত্তের “হুঃখপের নগরী”। “বাবু” চালটা ঠিক ধরেছিলেন। অনেকেই জানেন যুবকংগ্রেসের জৈনক মাতব্বর শেফালীর নাচ অব্যাহত রাখার হুযোগ দিয়ে সাত হাজার টাকা ম্যানেজ করেছিলেন। পরিবর্তিত অবস্থায় বিশ্বরূপার “বাবু” এখন নতুন বাবু ধরার ফিকিরে রয়েছেন। কিন্তু বিশ্বরূপার বেলজাপনা এখনও চলবে? তথ্যমন্ত্রী কি বলেন?

গরীব মানুষের জমি দখল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হগলী জেলার আবামবাগের কাছাকাছি এক ভদ্রলোকের চার বিঘা জমির দু'বিঘা সাড়ে বারো কাঠার কিছু বেশী অংশ কিনলেন তার প্রতিবেশী। ম্যাপে বা পরচায় তা তখনই উঠলো না। পরে দেখা গেল বিক্রোতা তার বিক্রি করা জায়গা সবটা এহীতাকে দিতে চাইছে না। কারণ পরে যখন জরিপ হয়েছিল তখন গোপনে (ঘুষ দিয়ে) ম্যাপ ও স্বত্বের কারচুপি হয়েছে। ক্রেতা একজন বিধবা মহিলা। সম্পত্তিটা বাস্তবজমি। এটা কি সংশোধন করা যায় না? টাকা দিয়ে দলিল করে যতটা বাস্তবজমি কিনেছেন ততটা তার নামে রেকর্ড বা ম্যাপ করা স্তায় নীতি ও আইনগত ভাবেই যুক্তিসঙ্গত। না হলে এক-

ধরনের অনাচারকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

আর একটি ক্ষেত্রে ৮৬৪ শতক জায়গার এক মালিক ২৯ শতক বিক্রি করলেন তার প্রতিবেশীকে। দলিলে পরিমাণ সীমা উল্লেখ করা হোল স্পষ্টভাবে। ক্রেতা তার দলিলে উল্লেখিত সীমা ছাড়িয়ে জোর করে বাড়ী তুললেন। বিক্রোতা গরীব ও দুর্বল। বাধা দিতে পারে নি। তাতে তার ওপর হয়তো আরও জোর জুলুম হতো। এই বাড়ী ভাঙ্গা বা বলশালীকে সংযত করার কি কোন ব্যবস্থা আইনে হতে পারে না?

ভূতীয় উদাহরণ আরও রোম-হর্ষক। এক ভদ্রলোক তার জী ও এক সন্তানকে তার সম্পত্তির দুই

সমান অংশের মালিক উল্লেখ করে দলিল রেজিস্ট্রী করে দিলেন। সন্তান পরে মারা গেলে তার স্ত্রীকে সম্পত্তি ভিটে ছাড়া করে তাড়িয়ে দেওয়া হল। প্রতিবেশীরা প্রতিবাদ করলো না। কে কার জমি মাথা ঘামায়? জরিপ এলো। সেই ভদ্রমহিলাকে বেদখল দেখিয়ে স্বত্বহীন করা হোল। এই ভদ্রমহিলা যখন মারা গেলেন তার দুটি ছেলে ভাসলো।

এ অবস্থা চলছে বহুদিন ধরে। এ সবই জানা যাবে শাবলসিংহপুর গ্রামে গেলে। হগলী জেলার আবামবাগের কাছাকাছি থানাফুল থানার শাবলসিংহপুর, হীরাপুর, কাকিনান সর্বত্র গরীব মানুষের জমি যেন তেন প্রকারে কিনে নেওয়া ও কম যুলো রেজিস্ট্রী করে নেওয়ার হিড়িক চলছে। সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রার ঠিকমত অহুসস্থান না করেই জমি জায়গা কেনা বেচার ব্যাপারে মতামত দিয়ে দিচ্ছেন বলে স্থানীয় জনসাধারণের তীব্র অভিযোগ। স্থানীয় লোকেরা ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীর কাছে এর প্রতিকার চেয়ে চিঠি লিখেছে।



ইস্টার্ন কোলফিল্মস্ লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

প্রস্তাব আহ্বান করছে

ভার্টিকাল ও হরাইজেন্টাল বয়লার মেরামত

সর্বপ্রকার ভার্টিকাল ও হরাইজেন্টাল বয়লারের মেরামতের কাজে অভিজ্ঞ সংস্থাদের নাম ইস্টার্ন কোলফিল্মস্ রেজিস্ট্রিকরণ। রেজিস্ট্রিকরণে ইস্টার্ন কোলফিল্মস্ সংস্থাদের সাধারণ যোগ্যতা নিম্নরূপ:

- (১) সংস্থাদের পেটাই, কালাই ও মেশিনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।
- (২) সংস্থাদের ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং পদ্ধতিতে এবং ফ্রেমের সাহায্যে কাটিং ও ওয়েল্ডিংয়ে প্রতিষ্ঠিত ওয়েল্ডার হওয়া দরকার।
- (৩) সংস্থাদের ১ ইঞ্চি পর্যন্ত মোটা প্লেট স্ট্রু ব্যাসে বেঞ্জিংএর কারিগরী জ্ঞান থাকা দরকার।
- (৪) সংস্থার বয়লার-কোয়ালিটি প্লেট ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হওয়া চাই। এগুলি বয়লার দপ্তর কর্তৃক অহুমোদনের দায়িত্ব তাদের।
- (৫) সংস্থার হাইড্রোলিক টেস্টিং যন্ত্রপাতি থাকা চাই এবং বয়লারের হাইড্রোলিক পরীক্ষা, সেফটি ভালভ ট্রোটিং ও স্টীম রেজ প্রভৃতি ইন্সটলেশনের জন্য আই বি আর সম্পর্কে জ্ঞান থাকা চাই।
- (৬) সংস্থা ২ থেকে ৩ লক্ষ টাকার কাজ করার মত আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন হওয়া চাই।
- (৭) বয়লার ইন্সপেক্টরের দেওয়া মেরামতী অর্ডার অহুমায়ী মেরামতী কাজের খরচ সম্পর্কে বিস্তৃত হিসাব দেওয়ার জন্য সংস্থার অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান থাকা দরকার যাতে কর্তৃপক্ষ কোটেশনের মূল্য সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন।
- (৮) সংস্থার যথেষ্ট টেকনিক্যাল লোক থাকা দরকার যাতে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার দায়িত্ব দিলেও কাজ নিতে পারে।
- (৯) সংস্থার আয়কর ও বিক্রয়কর দপ্তরের প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র থাকা দরকার। আবেদনের সময়ে আবেদনকারীকে আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রয়োজন অহুমায়ী পূর্ব অভিজ্ঞতার দলিলপত্র পেশ করতে হবে।
- (১০) চীফ ইঞ্জিনিয়ার (ই অ্যাণ্ড এম) অহুমায়ী, ইস্টার্ন কোলফিল্মস্ লিমিটেড, সাকতোরিয়া, পো: দিশারগড় (৭১৩৩৩৩) জেলা বর্ধমান এই নামে আবেদন পাঠাতে হবে।

মেরামতী ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

রেফ: নং ই সি এল/এন কে এস/ই এন জি জি (সি)/টেণ্ডার/৬/তাং ১০-১০-৭৭

নিম্নোক্ত কাজের জন্য অভিজ্ঞ / বিশ্বাসযোগ্য / প্রখ্যাত এবং সঙ্গতিসম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে সীল করা টেন্ডার। (১) ২০০০০ টাকা অহুমিত খরচে নিউ কেণ্ডা কোলিয়ারীর ইস্ট কেণ্ডাতে এক ও জি ব্লকের এন এইচ এস কোয়ার্টার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। বায়না ২০০ টাকা এবং সম্পূর্ণ করার সময় ৩ (তিন) মাস। (২) ২০০০০ টাকা অহুমিত খরচে নিউ কেণ্ডা কোলিয়ারীর ইস্ট কেণ্ডাতে ডি ই ব্লকের এন এইচ এস কোয়ার্টার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। বায়না ২০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার সময় ৩ (তিন) মাস। নিউ কেণ্ডা সাব-এরিয়র সাব-এরিয়র ম্যানেজারের অফিস থেকে টেন্ডারপত্র সংগ্রহ করা যাবে ৩১/১০/৭৭ থেকে ৭/১১/৭৭ তারিখ পর্যন্ত যে কোন রাজ্যের দিনে দুপুর ২টা থেকে ৪-৩০ টার মধ্যে ৫ (পাঁচ) টাকা দিয়ে বা অপ্রত্যাখ্যাপযোগ্য। টেন্ডার দলিল, কাজের নাম, বায়নার টাকার বিবরণ সহ প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা টেন্ডার সীল করা যাবে ৮/১১/৭৭ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে এবং বা টেন্ডারদাতা অথবা তাদের অহুমোদিত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ১২৭ ৩টায় এবং ২২৭ ৪টায় খোলা হবে। বায়নার টাকা কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড, ইস্টার্ন ডিভিসন, নিউ কেণ্ডা গ্রুপ এই নামে আসানসোলের যে কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের উপর। নিউকেণ্ডা গ্রুপের গ্রুপ অ্যাকাউন্ট অফিসারের কাছে জমা দিতে হবে। বায়নার টাকা ছাড়া টেন্ডার বাতিল করা হবে।

পেলেকে নিয়ে ওয়ার্ণার ব্রাদার্স ধীরেন দে তথা মোহনবাগান ক্লাবের ব্যবসা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পেলেকে সামনে রেখে কসমস ক্লাব, ধীরেন দে এবং টিকিট বন্টনকারী কমিটির ব্যবসাক্ষেত্র হলে? ভারত-মার্কিন সাংস্কৃতিক চুক্তি কতটা জোরদার হল?

কসমস ক্লাবের অর্থ বিশ্ব। কিন্তু যে কসমস দল কলকাতায় খেলে গেল তার নিগূঢ় অর্থ বিরাট। ধনতন্ত্রের উদ্বলগণে পশ্চিম হুনিয়ার পুঁজিপতিরা নতুন দেশ খোঁজার জন্য জল অতি-ষানে বেরিয়েছিলেন, কলকাতা খুঁজে পেলেন আমেরিকা দেশ, ব্রুটনের শিল্পপতিরা পেল তাদের শিকার। আজ ধনতন্ত্রের সংকটের সময় সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিরা ও তাদের চাটুকার বিজ্ঞানীরা নতুন দেশ খোঁজার চেয়ে খোঁজ করছেন ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা, পুঁজি লগ্নীর ক্ষেত্র। তাই আজ ভারতে গত বছর তিনেক ধরে মার্কিনী পুঁজি নিয়ন্ত্রিত বহুজাতিক কর্পোরেশন ইউনিয়ন কার্বাইড এভারেসডি টর্চ বা ব্যাটারীর সঙ্গে সঙ্গে উন্নত ধরনের ট্রলার আমদানী করে মাত্রাউপকূল গভীর সমুদ্রে মাছ ধরে রপ্তানী ব্যবসা করছে, জি, ই, সি কোম্পানী এ পথ নিয়েছে, ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো, ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল তারাও শুরু করেছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এটাই বৈশিষ্ট্য। জনগণের চাহিদা অছ্যায়ী নয়, মুনাফার দিকে তাকিয়ে পুঁজি লগ্নী করা হয়। মুনাফার দিকে তাকিয়ে ইংল্যান্ডের জি, পি, স্পোর্টস এ্যাণ্ড কোংয়ের মালিক টোরি প্যাকার বিভিন্ন দেশের জাত ক্রিকেটারদের স্টারলিংয়ের বিনিময়ে কিনে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দল গড়ে ব্যবসা করতে চাইছে। আমেরিকার পেপসি কোলা, ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের মতো বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো সত্তর দশকের শুরু থেকেই আমেরিকায় ফুটবল জনপ্রিয় করার অজুহাতে ব্যবসায় নেমেছে, শুরু করেছে উত্তর আমেরিকা ফুটবল লীগ (North America Soccer League)

পাঠক, নিশ্চয়ই ওয়ার্ণার বেরিজ কম্পাউণ্ড ওয়ুথের নামটা শুনেছেন? ওয়ুথটা বোঝাতে ভারতীয় শ্রমিকরা তৈরী করেন, আর কোটি কোটি টাকার মুনাফা কামায় আমেরিকার ঐ ওয়ার্ণার ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানী।

ঐ ওয়ার্ণার ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানীই এই সত্তর দশকে কসমস ফুটবল দল গড়ে ব্যবসা শুরু করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রতিদ্বন্দ্বীরা রয়েছে, তাই বহু লক্ষ ডলার লগ্নী করে তারা বিভিন্ন দেশ থেকে প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়দের কিনতে লাগল।

ব্রেজিলের স্ট্যান্টোস ক্লাবে খেলার সময় ১৯৫৮ সালে সুইডেনে অস্থায়ী বিশ্বকাপ ফুটবল খেলায় পেলের অসাধারণ খেলা দেখে (যার পর পেলের নাম 'কালো মানিক' হয়) ১৯৬০ সালে ইতালির একটি দল দশ লক্ষ ডলার মূল্যে পেলেকে কিনতে চায়। কিন্তু ব্রাজিল সরকার তখন পেলেকে অরপ্তানীযোগ্য জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু, দেশের হয়ে ১৯৭৪ সালের ২রা অক্টোবর যুগোশ্লাভ দলের বিরুদ্ধে শেষ আন্তর্জাতিক খেলার পর বিশাল অর্থ ভাণ্ডার পেলেকে হাতছানি দিতে থাকে। অবশেষে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে পেলে কসমস দলে যোগদান করেন। কসমস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি ক্লাইভ টয়ে ১৯৭৫ সালের তেসরা জুন একটা জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, পেলে কসমস দলের পক্ষে খেলবেন। পরের দিন নিউইয়র্ক টাইমসের প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম জোড়া চাক্ষু্যকর খবর বেরুলো—'সাত লক্ষ ডলারের চুক্তিতে পেলে কসমস দলের পক্ষে খেলতে আসছেন।' আমেরিকাবাসী আনন্দিত হলেন যে বিশ্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়ের খেলা তারা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পাবেন। কিন্তু এটা ভাবা বৈঠক হবে যে, আমেরিকাবাসীর দিকে তাকিয়ে ওয়ার্ণার ব্রাদার্স কোম্পানীর শাখা সংগঠন কসমস ক্লাব পেলেকে কিনেছে। জীবন রক্ষাকারী ওয়ুথগুলোর আবিষ্কার ও প্রস্তুতিতে তো সমগ্র মানবজাতি আনন্দিত উপরুত; কিন্তু ক্লাইভার ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের মতো কোম্পানীগুলো মোটেই জনসাধারণের স্বার্থে তা প্রস্তুত করছে না, তারা প্রস্তুত করছে মুনাফার দিকে তাকিয়ে। পেলে বেকেনবাউয়ার কিনামিয়া অ্যালবার্টোকে আমদানী করার অর্থও এটাই। নামী-দামী খেলোয়াড়দের সমাবেশ ঘটিয়ে আমেরিকার ভেতরে ও বাইরে ব্যবসায় নামা। ওয়ুথ কসমস ক্লাবই যে

অল্প দেশের খেলোয়াড়দের আমদানী করেছে, তা নয় কিন্তু। পেলের আগমনের পরই উত্তর আমেরিকার ফুটবল লীগের অন্যান্য দলগুলো বিশ্বের বহু নামী-দামী খেলোয়াড়কে কিনতে শুরু করে। পর্তুগালের সেই বিখ্যাত ফুটবলার ইউসেবিও (যাঁকে এক সময় পেলের সমতুল্য মনে করতেন কেউ কেউ) নিউ-ইউর্কের লাস ভোগাস দলে জর্জ বেন্ট এবং গোলরক্ষক গর্ডন ব্যাংকনকে কোর্ট ল্যাডেরাল ট্রাইকার্স দল এবং লস এঞ্জেলস-ক্লাব রন দাভুকে ক্রয় করে। কার্ল মার্কস দেখে যেতে পারলেন না ফুটবল দল গড়ার ক্ষেত্রে পুঁজি লগ্নীর এরকম প্রতিযোগিতা। পেলে কসমস ক্লাবের সঙ্গে মাত্র তিন বছর খেলার চুক্তি করেছিলেন। পেলেকে দিয়ে দীর্ঘদিন ব্যবসা চালানো যাবে না, এটা বুঝে কসমস ক্লাব হুনিয়ার আকর্ষণকারী ব্যক্তি হিসেবে গত দু'বছরের ইউরোপীয় ফুটবলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় পশ্চিম জার্মানীর অধিনায়ক তথা 'কালো-মুক্ত'র মতোই ফুটবলের কাইজার বিশেষণে ভূষিত বেকেনবাউয়ারকে ক্রয় করে। বিরাট টাকার অঙ্ক ও নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ণার কমিউনিকেশন-সংস্থায় মোটা চাহুরীর প্রলোভন বেকেনবাউয়ার সামলাতে পারলেন না, চুক্তিপত্রে সই করলেন। বেকেনবাউয়ার স্বদেশ ছেড়ে আমেরিকায় খেলবেন এ খবর ছড়িয়ে পড়া মাত্র পশ্চিম জার্মানীর ফুটবল অঙ্গ-রাগীরা বিক্ষোভ সংঘটিত করেন। কিন্তু বেকেনবাউয়ার দেশপ্রেমিক ছিলেন না, তাই স্বদেশবাসীর বিক্ষোভ আন্দোলন তাঁকে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে পারেনি। ১৯৭৮ সালে আর্জেন্টিনায় যে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে, সেখানে পশ্চিম জার্মানীর অধিনায়ক করার জন্য বেকেনবাউয়ার আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, কিন্তু উনি স্বদেশের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইতালিতেও বিক্ষোভ হয়েছিল, যখন রোমের লাজিও ক্লাবের তথা দেশের সেরা ফরোয়ার্ড কিনামিয়া কসমস ক্লাবে যোগদান করেন। ওয়ার্ণার ব্রাদার্স কসমস মালিকেরা পেলেন আর একজন দক্ষ কারিগর। কিনামিয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা করে দেশ-ত্যাগ করলেন। কিন্তু টাটা-বিড়লা

সহ মালিকশ্রেণীর নীতি ও মানসিক-তাট হলো শ্রমিক কারিগরদের যত-ক্ষণ শ্রমনৈপুণ্য আছে, ততক্ষণই তাঁদের বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম মজুরী দেওয়া, শ্রমিকদের নিরাপদ ভবিষ্যৎ মালিকদের কাম্য নয়। পাঠকরা জেনে রাখুন, কসমস দলের বর্তমান গোলরক্ষক শেপ্ ইয়েসিন ১৯৭৩ সালে কসমস দল ত্যাগ করে বোস্টন ক্লাবে যোগদান করেন। কিন্তু ১৯৭৬ সালে কসমস ক্লাবের তদানীন্তন গোলরক্ষক বব্ রিগবি আহত হবার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহিষ্কৃত হয়েছিলেন এবং বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ইয়েসিনকে আবার ডেকে আনা হয়। বেচারী বব্ রিগবি হয়তো আজ কপাল ঠুকছেন। কিনামিয়া এ তথ্য জেনেও ভুল করলেন।

পেলে, কিনামিয়া কলকাতায় খেলে গেলেন, বেকেনবাউয়ার এলেন না। মোহনবাগানের আমন্ত্রণে কসমস এসেছিল। ১৯৭৫ সাল থেকেই নাকি চেষ্টা চলছিল কসমস ক্লাবকে কলকাতায় আনবার জন্য। বোধহয় গত লোকসভার নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আজ যে পশ্চিমা ষাঁক দেখা যাচ্ছে, তার জন্যই সম্ভব হয়েছে পেলে সহ কসমসকে ডেকে আনা। এই খেলা উপলক্ষে মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃক প্রকাশিত আরক পুস্তিকায় (Mohan Bagan meets Cosmos) ধীরেন দে কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কসমস ক্লাবের ভারত ভ্রমণে সহায়তা করার জন্য। ধর্মতলা ইউ এস আই এস ভবন কয়েকদিন খুবই ব্যস্ত ছিল ২৪শে সেপ্টেম্বর ইডেনে ভারত ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা পাশাপাশি উড়েছে। দিল্লী থেকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট গোহিন ঘটনার গতি-প্রকৃতি নজর রেখেছেন। সত্যিই ভারত-মার্কিন সাংস্কৃতিক চুক্তি বিরাট একধাপ এগিয়ে গেল। বোধহয় দে'জ মেডিকেল কোম্পানী এখন ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের সঙ্গে কারিগরী প্রযুক্তিজ্ঞান, সংক্রান্ত সহযোগিতা (Collaboration for technical know-how) মাধ্যমে নতুন ওয়ুথ শিল্প গড়ার সম্ভাবনা দেখছে। উপরন্তু শ্রীধীরেন দে মোহনবাগান ক্লাবের ক্রমবিস্তারমান সম্মান ফিরিয়ে আনতে কিছুটা সক্ষম হলেন, ক্লাবের আসন্ন সাংগঠনিক নির্বাচনে নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেলেন। মোহনবাগান কোম্পানীর যে সকল শেয়ার হোল্ডার শ্রীধীরেন দে'র প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তাঁদের বেশ কিছু সংখ্যক টিকিট ভেট দিয়ে বন্দোবস্ত করলেন। দশ পনেরো

টাকার কুপন কিনে লটারীতে যে সব ঘুবকেরা টিকিট পেয়েছিলেন তাদের অর্ধেক সংখ্যক প্রথম দিকেই ২০।২৫ গুণ দামে টিকিট ব্ল্যাক করে-ছেন, পুজোয় একটা প্যারালাল-পলিয়েস্টারের সাট কেনার জন্য। শেষ দিকে, মন্দ আবহাওয়া, পেলের খেলায় অনিশ্চয়তা এবং নয়াচীনের কাছে কসমস দলের পরাজয়ে ব্ল্যাক-মার্কেটে টিকিটের দাম পড়ে গিয়েছিল। ব্যবসার ক্ষেত্রে তথা মিডল-ম্যানেরা যাট টাকার টিকিট দেড় হাজার টাকায় কিনে কোম্পানীর পারচেষ্ট ম্যানেজারকে ঘুষ দিয়ে অর্ডার আদায় করেছেন, বিল পাশ করিয়েছেন। অতীতকে মালিকেরা আবার টিকিট কিনে তুলে দিয়েছেন আয়কর-বিক্রয়কর ইনস্পেক্টরদের হাতে। আনন্দে খেলা দেখে এসেছে ইনস্পেক্টরদের পুত্র-শালক-ভাইয়েরা। ওদিন ইডেনের মোট বিক্রীত টিকিটের সরকারী মূল্য যত, প্রকৃত মূল্য তার থেকে কয়েকগুণ বেশি। যাট টাকার টিকিট পনেরো শো টাকায় বিক্রি হলে প্রকৃত মূল্য (অবশ্যই স্ফীত) দ্বিতীয় সংখ্যাটাই ধরতে হবে।

এরপর আছে টিকিট বন্টনকারী কমিটির ব্যবসা। ধীরেন দে এবং সেন বতীন চক্রবর্তীর শারদোৎসব এবার খুব ভালোভাবেই কেটেছে। প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ নিশ্চয়ই কপালে আঘাত কর-ছেন স্বর্ণ সুযোগ কয়েক মাস পূর্বে এলো না কেন এই বলে।

মোহনবাগান-কসমস দলের খেলাকে কেন্দ্র করে এতগুলো আন্তর্জাতিক এবং ভারতীয় বাস্তবযুগ এক-চোট ব্যবসা হয়ে গেল (নিশ্চয়ই লেখকের অজানা আরও আছে) অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে ধরলো মালটিমিডিয়া কর্পোরেশন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম এটা দেখে যে, সি, পি, আই (এম)-এর পলিট ব্যুরো সদস্য তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর এ হেন খেলার (অর্থাৎ ব্যবসার) গুস্ত কামনা করে-ছেন, -কসমস ক্লাবের আগমনকে স্বাগত জানিয়েছেন। একজন প্রকৃত মার্কসবাদীর কাজ হলো সর্বক্ষেত্রের মতো ফুটবলের আঙ্গিনাতেও পুরনো (উৎপাদন) সম্পর্ক পাটানো, ওয়ার্ণার ব্রাদার্স-ধীরেন দে পরি-বারদের পুঁজি কর্তৃক খেলোয়াড়দের শ্রম-নৈপুণ্যের উপর প্রভুত্ব-শোষণ চিরতরে উৎখাত করা। এটা আজ চীন, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনামের মতো দেশগুলোতে সম্ভব হয়েছে বলেই চীন আজ স্বদেশে, এমনকি আমেরিকাতেও ঐ শক্তিশালী কসমস ক্লাবকে একাধিকবার পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছে।



‘নকশা’লবাড়ী আন্দোলনের মূল্যায়ন

দর্পণে কালিদাস কুণ্ড লিখেছেন নকশাল আন্দোলনের “বর্ষাগ্র উদ্ভূত হয়েছিল প্রধানতঃ মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে।” এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। নকশালবাড়ীর আন্দোলন ছিল সামন্তবাদী শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে কৃষকের, শস্য সংগ্রাম। কালিদাস কুণ্ড খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন যে নকশালবাড়ী ঘটনার অনেক আগে থেকেই তখনকার সি পি এম পার্টির ভেতরে মতাদর্শগত লড়াই চলে আসছিল (যদিও তা খুবই কম মাত্রায়) নাহলে নকশালবাড়ীর শস্য সংগ্রাম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশব্যাপী এত ব্যাপক আলোড়ন ওঠে কি করে? আর সেটা ছড়িয়েই বা পড়ল কি করে? মার্কসবাদে যার সামান্ততম জ্ঞান আছে তিনি স্বীকার করবেন যে সংগ্রাম কোন সংগঠন ছাড়া আকাশ থেকে পড়ে না, স্বতঃস্ফূর্ততাকে সংগঠিত করতে হয়। তৃতীয়তঃ বৃহৎ বর্জ্যো পরিচালিত কাগজপত্রগুলি প্রচার করল আর চাকল্য উঠল? চতুর্থতঃ নকশালবাড়ীর আন্দোলনকে চীনের পার্টির নৈতিক সমর্থন দান—এ সবই বাইরের কারণ। কোন বস্তু বিকশিত হয় তার ভেতরকার বিরোধগুলির জন্য এটা কালিদাসবাবুর অজানা নাকি? “চাকল্যের” আসল কারণ হচ্ছে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় বৈষম্য যার ফলে বড়লোক আরও বড়লোক হয় আর গরীব না খেতে পেয়ে মারা যায়। আর সি পি এম-এর বিরুদ্ধে লড়াই, একশবার কেন নয়? যারা তাদের জন্মের পর থেকে মুখে বলেছে বিপ্লব কাঙ্ক্ষা করেছে সংস্কার, যারা মহান ভারতীয় জনতার শস্য সব বিক্রোছে, ছুরি মেরেছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়া কোন বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে না।

ভারতবর্ষে সামন্তবাদী জমিদার জোতদার বর্তমানে রাষ্ট্রক্ষমতার শরিক। আর নকশালবাড়ীতে ছিল ঠিক তাদের বিরুদ্ধেই আঘাত শোষণের নির্দিষ্ট রূপকে কেন্দ্র করে। যদি সামন্তবাদী শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতার শরিক না হত তবে সেদিন নকশালবাড়ীর মাটিতে পুলিশ ইম্পেক্টর সোনাম ওয়াংদির নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী শস্য কৃষক সংগ্রামকে দমন করতে আসত না ও বীর বিপ্লবী কৃষকদের হত্যা করত না কেননা আমরা জানি যে এই পুলিশ মিলিটারী হচ্ছে শাসকশ্রেণীগুলির শোষণ ও শাসনকে

টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার—তাদের সাধের সাম্রাজ্যের দারোয়ান, এক-কথায় রাষ্ট্রশক্তির প্রধান অংগ। আবার নকশালবাড়ীর আন্দোলন যদি খালি অর্থনৈতিক আন্দোলন হয় তবে পুলিশ ইম্পেক্টর সোনাম ওয়াংদি বিপ্লবী কৃষকদের হাতে নিহত হলেন কেন? শস্য বিপ্লবী কৃষকরা যদি পুলিশকে রাষ্ট্রশক্তির একটা অংগ হিসাবে না চেনেন বা জানেন বা বোঝেন তবে তারা তাদের আঘাত করেন কি করে?

লেখক এখানে বস্তুর পরিমাপ নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু কোন বস্তুতে পরিমাপ যখন জমতে জমতে গুণে রূপ নেয় তখন গুণটাই আসল কথা, পরিমাপ নয়। হ্যাঁ বস্তুগত পরিস্থিতি (বিপ্লবের) আগেও ছিল, এখনও আছে, আগামী দিনে ভারতবর্ষে যত দিন যাবে ততদিনই বিপ্লবী পরিস্থিতি ভালর থেকে আরও ভালর দিকে যাবে, কমবে না বরং বাড়বে। সেই তুলনায় ভারতের বিপ্লবী শিবিরের সাংগঠনিক দুর্বলতা আছে অর্থাৎ বিপ্লবী পরিস্থিতি গড়ে তোলার প্রয়াস মূল কথা। লেখক এই অংশের শেষদিকে বলছেন “কলে অচিরেই শাসকশ্রেণীর হিংস্র আক্রমণের মুখে এই আন্দোলন ব্যর্থ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।” নকশালবাড়ীর আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে পড়েছে। তবে আজও পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান জেলার কাকনা থানা অঞ্চলকে ও বিহারের ভোজপুর জেলাকে পুলিশ, সি আর পি, এইচ আর পি ক্যাম্প দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে কেন? তবে কেন বিহারে “জনতার পার্টি” জনতা দলের মজিন্দা গঠিত হওয়ার পরেও জেলের ভেতরে অমাত্যবিক অত্যাচার করে বিহারের জনপ্রিয় কৃষকনেতা কমরেড গম্ভীরকে মেরে ফেলতে হয়? তবে কেন আজও ভেঙ্গল রাওকে অজ্ঞের ক্রীড়াফুলামে পুলিশ মিলিটারী মজুত রাখতে হয়? আসলে ঘটনাটা কী? আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন দেশেই বিপ্লবী আন্দোলন কখনই সমান তালে চলে নি, চলেও না এবং ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। এতে সাগরের মত জোয়ার ভাঁটা আসে এবং তার পেছনে যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ আছে। ভারতবর্ষে এখন ঘটে চলেছে তাপমাত্রার বৃদ্ধি। তা বাড়তে বাড়তে ধ্বন প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা (মহান ভারতীয় বিপ্লবের পক্ষে) পৌঁছে যাবে তখন শস্য শিববস্তার

মহান্ধাবনে সমস্ত শোষণশ্রেণীগুলি তাদের অতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে খড়্গকোটের মত ভেসে যাবে। পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকান, এ ঘটনার প্রমাণ বিস্তার।

এই আন্দোলনের ফলে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ মহান ভারতীয় জনগণের মধ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক সচেতনতার বিস্তার—সমগ্র ব্যবস্থাটা সম্পর্কে ব্যাপক প্রশ্ন—নতুন বোতলে পুরোনো মদ আমদানীর ভাঁওতা-বাজীর স্বরূপ উন্মোচন এবং এটাই আসল প্রশ্ন। দ্বিতীয়তঃ বিপ্লবের অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যে চলে আসা দুই লাইনের সংগ্রামে এক অপূর্ব বেগ সৃষ্টি। তৃতীয়তঃ শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির প্রকৃত রাস্তা দেখানো। চতুর্থতঃ শোষণশ্রেণীগুলির মধ্যে সংকট বৃদ্ধি। শোষণশ্রেণীগুলি—সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, দালাল পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ—ব্যক্তি হিসাবে চারু মজুমদার বা সত্য নারায়ণম বা কৃষ্ণমূর্তিকে মেরে ফেলতে পারে, কিন্তু মহান ভারতীয় জনগণের “পুনরুজ্জীবিত আত্মাকে” কখনই ধ্বংস করতে পারে না, পারবে না। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

স্বশাস্ত সেম

বন্দী মুক্তির প্রশ্নে

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসবার পর কিছু রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিয়েছেন এ সত্যটি স্বীকার করেও বলতে হয় এখনও কিছু রাজনৈতিক কর্মী জেলে আটক রয়েছেন, বিশেষ করে কৃষনগর জেলে যারা আটক আছেন এখনও তাদের মধ্যে একজনও মুক্তি পাননি বা নদীয়া জেলায় যে সব মামলা আছে তা প্রত্যাহত হয়নি।

আজ রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তির প্রশ্নে বর্তমান সরকার আমলাতন্ত্রের প্রতি বদ্ধকতার প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। আমলাদের প্রতিবদ্ধকতার কথা মেনে নিলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে যন্ত্রিখে থেকের আমলাদের পরিচালনা করা যদি বর্তমান সরকারের পক্ষে সম্ভব না হয় তবে যে জনসাধারণের ভোটে তারা নির্বাচিত সেই জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে এবং তাদের নেতৃত্ব দিয়ে তারা ঐ আমলাদের শায়েস্তা করার জন্য এগিয়ে আসছেন না কেন বা আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে নামছেন না কেন? প্রশ্ন ক্রমে গত ৮ই অক্টোবর দুপুরে কৃষ্ণনগর জেলে আমলারা পুলিশ বাহিনী সঙ্গে নিয়ে ২ বটা ধরে বন্দীদের উপর বর্ষা অত্যাচার চালিয়েছেন।

যার ফলে বহু বন্দী গুরুতর রূপে আহত হয়েছেন। এবং নকশালপহী বন্দীদের ইন্দিরা গান্ধীর আমলের কায়দায় আবার ২৪ বটা লক আপে রাখার নিয়ম চালু করেছেন। এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের যারা নায়ক তাদের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তা দেখবার জন্য আজ শুধু কৃষ্ণনগরবাসী নয় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ অপেক্ষা করছেন।

জর্জ কার্ণাওড, ভারতী তরুণদার ইত্যাদির মুক্তির ব্যাপারে যে তৎপরতা ও শুভ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার জনসাধারণের কাছে কয়েক মাস আগেই অভিনন্দিত হয়েছেন আজ বিচার বিভাগও আমলাতন্ত্রের দোষে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি বিলম্বিত হওয়ায় সেই সরকারই ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের কাছে বৈষম্যমূলক আচরণের অপরাধে অপরাধী হয়ে পড়েছেন। বর্তমান সরকারকে এই কথাই আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে

সমবায় সচিবের একটি নির্দেশে গরীব চাষীরা অসুবিধায় পড়বে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, রাজ্যের সমবায় সচিব এই ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব তিনটি ব্যাঙ্ককে বিলুপ্ত করার নির্দেশ দিয়ে গরীব চাষীদের প্রচণ্ড অসুবিধার মুখে ঠেলে দিচ্ছেন।

উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও কুচবিহার সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক তিনটি ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের আওতায় আনা হয়। বর্তমানে উক্ত ব্যাঙ্কগুলো সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে পৃথক করে দেওয়া হলে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হবে। যেমন—

(১) এলাকার চাষীদের দেয় কৃষিক্ষেত্রের সংকোচন ঘটবে। কারণ কৃষিক্ষেত্রের সীমা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশে আমানতের ওপর নির্ভরশীল।

(২) ব্যাঙ্কগুলোর স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বর্তমানে এই ব্যাঙ্ক সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক হওয়ায় পৃথকীকরণের পর নন-সিডিউল্ড ব্যাঙ্কে পরিণত হবে। আমানত কমে যাওয়ার ফলে ব্যাঙ্কগুলোর অস্তিত্ব বিপর্যয় হবে।

(৩) ৮৯ কোটি টাকার বাড়তি কৃষি ঋণ বা ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে তা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে নিতে হবে।

চাই।

সকল রাজনৈতিক দল ও গণ-তান্ত্রিক সংগঠনের কাছে আমরা নিম্নলিখিত দাবির ভিত্তিতে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাই : ৮ই অক্টোবর কৃষ্ণনগর জেলের বন্দীদের উপর অত্যাচারের তদন্ত চাই; নকশালপহী সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই; ৪র্থ ট্রাইব্যুনাল সহ অবশিষ্ট সমস্ত রাজনৈতিক মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে; সমস্ত গণহত্যা ও জেলে বন্দীহত্যার তদন্ত চাই; সমস্ত স্তরের রাজনৈতিক কর্মীদের উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলতে হবে; মলিনা ধক, শাস্তিময় ঝাঁকুড়ে, কালীপদ সর্দার, স্বদেশ বিশ্বাস, নিতাই বিশ্বাসের উপর থেকে মৃত্যুদণ্ড তুলতে হবে ও মুক্তি দিতে হবে।

অমূল্য কুমার পাল, বামনদাস গাঙ্গুলী, সত্যরঞ্জন দাসগুপ্ত, শিবু বানার্জী, লীলাময় মুখার্জী

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

৪ টাকার হার।

বার্ষিক ২২ টাকা

সাপ্তাহিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাঘর ঠিকানা

ম্যানেজার, দর্পণ

৬১, মট লেন। কলিকাতা-১৩

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক প্রসঙ্গে

কালিদাস কুণ্ডু

ঔপনিবেশিক শাসনের যুগে ইংরেজ ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের জোহজাল রচনা করেছিল সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভারতীয় পুঞ্জিপতিদের প্রতিভা শক্তিগুলি কিছু কিছু রাজনৈতিক অধিকার দাবী করার ইংরেজ সরকার যুদ্ধের পূর্বে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অমুখ্যায়ী কিছুটা শাসন সংস্কার করেন। তদানীন্তন ভারত সচিব মন্টেগুর সুপারিশক্রমে ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হোল। মূলতঃ, মন্টেগু-চেমসফোর্ড সুপারিশগুলি একটা বৈশ্ব শাসনের প্রহসন ছাড়া কিছুই ছিল না। এই শাসন ব্যবস্থা অমুখ্যায়ী অর্থ, সামরিক বিভাগ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ বড়লাটের অধীনে স্তম্ভ হ'ল। শিক্ষা ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ছিঁটে-ফোটা অধিকার অর্পিত হোল রাজ্যের কাউন্সিল সদস্যদের উপর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইংরেজ সরকার পুনরায় একটি মন-ভুলানো শাসন ব্যবস্থা জারী করেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। প্রকৃতপক্ষে, এটা ছিল ১৯১৯ সালের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের একটি সম্প্রসারিত রূপ। ১৯৩৫ সালের এ্যাক্টে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন বা আত্মকর্তৃত্বের গালভরা বুলির আড়ালে লুকিয়ে ছিল সাম্রাজ্যবাদের এক গুপ্ত অভিসন্ধি। আসন্ন মহাযুদ্ধে ভারতবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের আশায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা প্রতিরক্ষা, মুদ্রা ও বৈদেশিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি নিজেদের হাতের কজায় রেখে শিক্ষা জনস্বাস্থ্য, প্রভৃতি বিষয়গুলি, লোক্যালবোর্ড জেলাবোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের অন্তর্ভুক্ত করলেন। তবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমেই প্রথম প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব নীতিগত স্বীকৃতি ও অমুখ্যায়ন লাভ করেছে।

ক্রীপস্ মিশন

জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার মিজশক্তির সংকট আরও বনীভূত হোল। বিবুদ্ধে ভারতীয় জনমতকে শাস্ত করার উদ্দেশ্যে স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ এজেন্সি "ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস"-এর মধুর আশ্বাসবানী নিয়ে। তিনি ঘোষণা করলেন যে, যুদ্ধ শেষে ভারত ডোমিনিয়নের মর্যাদা লাভ করবে। প্রদেশগুলি

হবে স্ব স্ব ক্ষেত্রে আত্মকর্তৃত্ব সম্পন্ন। এমনকি তারা নিজেদের জন্য পৃথক পৃথক সংবিধান অধিকারও লাভ করবে। ইতিহাসের পরিহাস, কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ যারা এই অনৈক্য বিধায়ক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তারাই দ্রুত ক্ষমতার মসনদ দখল করার জন্য দেশ বিভাগকে মেনে নিয়েছিলেন পাঁচ বছর যেতে না যেতেই।

ইংরেজ প্রস্তাবিত ১৯৫০ সালের গণ-পরিষদ সাধারণভাবে ১৯৩৫ সালের শাসন আইনের উপর ভিত্তি করেই সংবিধানের কাঠামো তৈরী করলেন। পুরনো চাল ভাতে বাড়ল না। সর্বময় কর্তৃত্ব কেন্দ্রের হাতে, প্রদেশের হাতে ছেলে-ভুলানো খেলনার মতো শোভা বুদ্ধি করলো ছিঁটে ফোটা অধিকার।

কংগ্রেস রাজত্বের ত্রিশ বছর

বিগত ত্রিশ বছরের কংগ্রেস রাজত্ব আমরা দেখেছি ঔপনিবেশিক শাসনের সেই একই অপকোশল। "শক্তিশালী কেন্দ্র" ও "জাতীয় সংহতি"র তব আউড়ে পুরাতন শাসকবর্গ ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের নীতি অমুখ্যায়ন করেছে, রাজ্যগুলিকে বাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলিকে পদ হালিত করে রাজ্য সরকারগুলিকে উচ্ছেদ করেছে, প্রতিপদে প্রাদেশিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপের নীতি অমুখ্যায়ন করে দেশের অভ্যন্তরে ঐক্যভঙ্গ ও কতৃৎবাদ গড়ে তুলেছে, জাতিসত্তাগুলির বিকাশের আয়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ করেছে, অর্থনৈতিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে ক্রমাগত বৈষম্যের নীতি অমুখ্যায়ন করেছে।

মনে রাখা প্রয়োজন, তথাকথিত "শক্তিশালী কেন্দ্রের তব" অবলম্বন করেই ইন্দিরা গান্ধীর খেচ্ছাচারতন্ত্র গড়ে উঠেছিল। অপরাজ্যগুলিকে দুর্বল, প্রতিহত ও ক্ষীণকায় রেখে কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার বস্তাপচা তব জাতীয় স্বাধ্বের পক্ষে স্ব স্ব ও কল্যাণকর নয়। শরীরের সমস্ত অংশকে বঞ্চিত করে তার একাংশ বা অংশ বিশেষ ক্ষীত হলে তাকে আমরা স্বাস্থ্য বলিনা। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ গণতন্ত্রের একটি ন্যূনতম শর্ত।

জনতা সরকারের কর্মশূচী প্রসঙ্গে ইন্দিরা ঐক্যভঙ্গের বিবুদ্ধে ক্ষমতা দল ও অসংগত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম পরিচালনা করে-

ছিল। জনতা দল ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার কর্মশূচীতে। গণতন্ত্রের সংগ্রাম শেষ হয়নি। একাধিক রাজ্যে অ-জনতা সরকার প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় এটা স্বাভাবিক ঘটনা। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অমুখ্যায়ী জনতা সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিভাসের কর্মশূচী নিয়ে। এটা দেশের অভ্যন্তরে স্ব স্ব গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থেই প্রয়োজন।

কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য বা রাজ্যগুলির স্ব স্ব সম্পর্ক নির্ণীত হলে সংসর্গের প্রশ্ন তিরোহিত হবে, গড়ে উঠবে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক। ভারতীয় জাতি সত্তাগুলির আয়সঙ্গত অধিকারগুলির প্রতি সম্মান না দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যদি পূর্বসূরী সরকারের পদাঙ্ক অমুখ্যায়ন করতে থাকেন তাহলে ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে

সংগ্রামের ময়দানে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অসম বিকাশ

ইংরেজের ঔপনিবেশিক, বড়স্বয় মূলক নীতির কলে ভারতীয় অপরাজ্যগুলির স্ব স্ব বিকাশ সম্ভব হয়নি। যেটুকু শিল্প-বিকাশ হয়েছে সেইটুকুও দেহের ছ-একটি জায়গায় মেহ-ক্ষীতির মতো। বিগত ত্রিশ বছরে কংগ্রেস সরকারের নেতৃত্বে শিল্প-বিকাশ হয়েছে বাধাপ্রাপ্ত। রাজ্যগুলির প্রতি বিমাতৃহীন মনোভাব ও আচরণের জন্য যেটুকু হওয়া সম্ভব ছিল সেইটুকুও হয়নি। অথচ প্রত্যেকটি রাজ্যেরই আছে স্ব স্ব প্রাকৃতিক সম্পদ, ধনিজ ও কৃষিজাত ঐশ্ব্যের ভাণ্ডার। পশ্চিমবঙ্গের পাট ও চা-শিল্প, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের কার্পাস বয়ন শিল্প, বিহারের অত্র সম্পদ, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের ম্যানুফ্যাকচারিং ধনিজ শিল্প কেন্দ্রীয় সরকারকে কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দিচ্ছে। বিনিময়ে রাজ্যগুলির আয়সঙ্গত দাবীগুলি উপেক্ষিত থাকলে পুঞ্জীভূত

অসংখ্য একদিন সংসর্গের পথে চালিত হতে বাধ্য।

"ভারতবর্ষ এক রাষ্ট্র, এক প্রাণ" খুব বড় কথা, ভাল কথা। কিন্তু গণতন্ত্র আরো কিছু ভাল কথা, বড় কথা আছে। সেইটি হচ্ছে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা। নাগা, মিজো, হুিকি, কাশ্মীরী প্রভৃতি জাতিসত্তাগুলির আত্মবিকাশের, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্প্রসারিত না হলে সমগ্রভাবে জাতীয় বিকাশ সম্ভব নয়।

ভাষা ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের পর ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ অন্বেষণ করে প্রদেশ ভিত্তিতে ও জাতীয় চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে। আমরা ভারতীয় বলেই বাঙালীকে বিসর্জন দিয়েছি—এইরূপ বৃহৎ চিন্তা এখনও কল্পনা করা দুরূহ। তাই, মহারাষ্ট্রে দাবী ওঠে, "শতকরা ১০% মহারাষ্ট্রবাসীর চাকুরী চাই।" কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাষাগত দিক থেকে গড়ে ওঠা ভাবাত্মকতার প্রতি সহায়ত্বশীল হতে হবে। পূর্বোক্ত স্লোগানটি সঠিক না হতে পারে, (শেবাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)।

ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমানো মানে চড়া হারে সুদের সুযোগ আর সেই সঙ্গে অপরকে দাবলদ্বী হতে সাহায্য করা।

গোবিন্দ রাজনের জমা টাকায় ছয়জন তাঁতী তাঁদের জীবিকা ফিরে পেলেন।

রাজন কিন্তু জীবনে কখনও তাঁত দেখেন নি।

আমাদের রিকারিং ডিপজিট পরিকল্পনায় গোবিন্দ রাজন যখন মাসে মাসে ২০০ টাকা করে জমা রাখতে শুরু করলেন, তাঁর ধারণাই ছিল না তাঁর টাকায় ছয়জন তাঁতী তাঁদের জীবিকা ফিরে পাবেন।

ইউকোব্যাঙ্কের অন্যান্য আমানতকারীদের টাকার মত গোবিন্দ রাজনেরও জমা টাকা সমাজের অসহায় ও নিঃস্বলদের উন্নয়নকল্পে ব্যবহার করা হয়।

যেমন এই তাঁতীরা—আমরা সহায় হলাম বলে তাঁরা আবার পুরোদমে কাজে লাগতে সক্ষম হলেন। এমনিভাবেই পুষ্টি ও অপারগকে উপযুক্ত কাজে লাগানো হচ্ছে অথবা মহিলাদের জীবিকাকল্পে সাহায্য করা হচ্ছে। যাদের দরকার তাঁদের প্রয়োজন মেটাতে নানা উপায়ে আপনার স্বয়ং সঞ্চয়ই বড় রকমের সাহায্য হয়ে দাঁড়াতে পারে।

তাই, যখনই আপনি ইউকোব্যাঙ্কের যে কোন সঞ্চয় পরিকল্পনায় টাকা জমা রাখছেন, আপনি অপরকে দাবলদ্বী হতে সাহায্য করছেন। এবং সেইসঙ্গে নিজে ও লাভজনক উপায়ে নিজেও সংস্থান করছেন, কারণ আপনার জমা টাকায় আপনার আর নিয়মিত বেড়েই চলেবে।

ইউকোব্যাঙ্কের লাভজনক পরিকল্পনা কী কী?



মহারাষ্ট্রের একটি অখ্যাত গ্রামের একজন তাঁতশিল্পী।

সেটিংস বাক্স প্রাকমিউন্ট	ডিপজিট সার্ভিসেসেট পরিকল্পনা
ফিক্সড ও টাইম ডিপজিট	সুদের যোজননা
রিকারিং ডিপজিট	ফিক্সড ডিপজিটের সঙ্গে যুক্ত
রিকারিং ডিপজিটের সঙ্গে যুক্ত	জনতা পার্সোনাল প্রাকসিডেণ্ট
ফিক্সড ডিপজিট	ইনসিওরেন্স পলিসি



ইউকোব্যাঙ্ক কমার্শিয়াল ব্যাংক

ভারতগণতন্ত্রে দাবলদ্বী হতে তুলতে সাহায্য করছে

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে

ভানুসিংহ

‘অপসংস্কৃতি’ কথার মানে সংস্কৃতির বিকৃতি, কিন্তু কখনো তা অ-সংস্কৃতি বা সংস্কৃতি বিরুদ্ধ কিছু ব্যাপার নয়। এটা স্বভাবতই মনে হতে পারে, বিকৃতি সাধন আর বিরুদ্ধাচরণ একই ব্যাপার। যদিও আপাততঃ ধারণায় মনে হয় যে বিকৃতির মধ্য দিয়েই তো বিষয়টির বিরোধিতা করা হয়, কিন্তু মূলতঃ ব্যাপারটি তা নয়। কারণ সংস্কৃতি নির্ভর করে দেশাচার সম্মত নীতিবোধের ওপর। এক দেশের সংস্কৃতির সংগে অন্য দেশের সংস্কৃতির মিল নাও থাকতে পারে। নীতিবোধও ভিন্ন ভিন্ন দেশাচার অঙ্গব্যাপী গড়ে ওঠে। প্রাচ্যের সংস্কৃতি আর পশ্চাত্যের সংস্কৃতি যেমন এক নয়, তেমনি নীতিবোধও ভিন্ন। কিন্তু ‘অপসংস্কৃতি’ যখনই বলা হয় তখন একটি বিশেষ দেশের সংস্কৃতির বিকৃতিই বোঝায়। পশ্চাত্যের ‘ক্যাবারে’ যখন আমাদের সংস্কৃতিতে অল্পপ্রতিষ্ঠ হয়, তখনই ঘটে সংস্কৃতির বিকৃতি। কিন্তু এদেশেই পশ্চাত্য কোন অঙ্গুষ্ঠানে ‘ক্যাবারে’ থাকলে, তা আমাদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধ ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। সূচনায় এত কথা বলার কারণই হল অনেকে সংস্কৃতির আগে ‘শিল্প’ কথাটি বোঝে করে নীতির সীমারেখা মুছে আপন আপন সুবিধার স্বার্থে ব্যাপক উচ্ছৃংখলতার আশ্রয় নেন। কিন্তু একথা তো সত্য, ‘আর্ট’ কখনো ‘এথিক্স’-কে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে পারে না।

কোন বিশেষ দেশের জনমানসে ‘আর্ট’ রসস্থিতি করতে পারে তখনই, যখন সেই ‘আর্ট’ বা শিল্প দেশাচার সম্মত নৈতিক চেতনাকে আঘাত না করে।

অনেকে শিল্পস্থিতিতে বাস্তবতার নাম করে সমাজের কোন কদর চোহারা, নরনারীর ঘোনাবেদন, নারীর নগ্নদেহ ফুটিয়ে তোলেন বিশেষ আতিশয্যে, কিন্তু কোন সুস্থ চিত্ত তাঁদের স্থিতিতে স্থান পায় না। সমাজ সংসারে অন্ধকার ঘেমন আছে, আলোও তেমনি আছে, নর্দমাও আছে, ফুলবাগানও আছে। কিন্তু কেউ যদি বাস্তবতার অঙ্গুষ্ঠাতে অন্ধকার ও নর্দমাতেই বড় করে ফুটিয়ে তোলেন তাঁর স্থিতি, তবে তাঁর একটা বিশেষ ‘মোটিভ’ও ধরা পড়ে বৈকি। সমাজ সচেতন শিল্পী নিশ্চয়ই এহেন ‘মোটিভ’-এর শিকার হবেন না। শিল্প যেন রস-ভোক্তার কাছে পরিপূর্ণ নেতিবাচক হয়ে বিরাট শূন্যতা স্থাপি না করে।

আসলে ‘মোটিভ’-টাই হল বড় কথা। শিল্পীর বিশেষ মোটিভ-এর দরুনই শিল্পে অপসংস্কৃতি প্রশ্রয় পায়। উপস্থাপনের বিশেষ ভঙ্গীতে কোন বিষয় অঙ্গীলও হয়ে ওঠে। কোন উদ্ভাদিনী চরিত্রকে ঘটনা পরিবেশে উলঙ্গ করে দেখানোয় ‘ভাল্গারিটি’ প্রকাশ পায় না, কিন্তু দর্শকচিহ্নকে শুধুমাত্র উত্তেজিত ও কামনাসিক্ত করার উদ্দেশ্যে নগ্ন নারীদেহ প্রদর্শনী অবস্থাই ভাল্গার সন্দেহ নেই।

ধারা বলেন, ‘শিল্প শুধু শিল্পের জন্ত’ অথবা শিল্পে কোন নীতি বা হুর্নীতি বলে কিছু থাকতে পারেনা, তাঁরা কখনো সমাজ সচেতন মানসিকতার পরিচয়ও দেন না, তারা নৈরাশ্রের উপাসক। আর এসব কথাতে সুস্থ ক্রটিসম্পন্ন শিল্পী সমাজে কবেই ‘অচল’ বলে প্রতিপন্ন হয়ে গেছে। শিল্প মানুষেরই জন্ত এবং মানুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধ, নৈতিক চেতনা, জীবনমুখী চিন্তা ও ক্রটিবোধ জাগ্রত করাই সং-শিল্পের কর্ম। শিল্পে অপসংস্কৃতি, নীতি-হীনতা আর অঙ্গীলতা সমাজ-শরীরকে অহিফেন ক্রিয়ায় আচ্ছন্ন ও পঙ্ক করে ফেলে। এবং সে কারণেই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া প্রতিটি সচেতন নাগরিকেরই নৈতিক কর্তব্য।

আজ এখানকার সাধারণ রঙ্গালয়ে ব্যাপকভাবে নগ্ন নারীদেহের নৃত্য প্রদর্শনী, ঘোনাভেদনপূর্ণ দৃশ্যের ছড়াছড়ি, চলচ্চিত্রে বিশেষ করে হিন্দি ছবিতে ‘সেক্স’ আর ‘ভায়ো-লেন্স’-এর প্রাচুর্য, ‘ইয়াকি’ স্থলভ ভাবধারার আতিশয্য—কোন জাতীয় স্থিতির পর্যায়ে পড়ে? এসব অনাস্থি ছাড়া আর তো কিছু নয়। শিল্পের শিল্প এখানে কোথায়? শিল্পস্থিতির লক্ষ্য যদি হয় রসভোক্তার চিত্তে সৌন্দর্য ও আনন্দের অঙ্গুষ্ঠি সঞ্চার করে মহত্ব উত্তরণ করা, তবে তো এসব অপসংস্কৃতিমূলক স্থিতি জনসাধারণকে রসাতলে পাঠাবার সহজ ও অমোঘ পথ ছাড়া আর কিই বা বলা চলে?

চণ্ডীতলা থানার সঙ্গে অশুভ আভাত

চুরি ডাকাতি ছিনতাই রেকর্ড

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হুগলী জেলার চণ্ডীতলা থানা সারা জেলার চুরি ডাকাতি ছিনতাইয়ে রেকর্ড করেছে। থানার ও, সি, ও উর্জতন কর্মচারী ও পুলিশ হোমগার্ডের সাহায্যে ডাকাতি হচ্ছে বলে স্থানীয় বামপন্থী নেতারা বার বার জ্যোতি বন্ধকে ও বামফ্রন্ট কমিটিকে জানিয়ে বিকল হয়েছেন। চণ্ডীতলা বাজারে থানা অফিসারের নির্দেশে ডাকাতির অভিযোগে পুলিশ হোমগার্ড গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন। সব চাপা পড়েছে এখন। ‘থানার চোখের সামনে কুমীরমোড়া, নবাবপুর, ভগবতীপুরে দুদিন অন্তর এক-বার ডাকাতি হচ্ছে। এটা নিয়মিত ব্যাপার। থানা থেকে একদল কর্মী ও ডাকাত নিয়মিত খবর নিয়ে প্রতি রাতে ডাকাতি করছে। ডি, আই, জির নির্দেশে অতি সাম্প্রতিক কালেও একটি তদন্ত হয়েছে।

চণ্ডীতলার বিশিষ্ট গ্রামবাসী থানা থেকে টান্ডি বস্তু ও অস্ত্র ডাকাতদের হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগ জানিয়েছেন। তদন্তকারী

অফিসাররা তা ধামাচাপা দেন। চণ্ডীতলা থানার একশত আটচল্লিশটি আর, জি, প্রতিরক্ষী দল আছে নানা গ্রামে। প্রতি আর, জি বা গ্রামরক্ষী বাহিনীর মধ্যে থানার রড ছোট-বাবুদের দালাল আছে, তারা ডাকাতি করার স্বযোগ নেয়, ভাগ দেয়। কদিন আগে আর, জি, কমিটিগুলোকে কল্যাণ করার জন্ত থানা বাবুরা নির্বাচন করে আর, জি, সমিতির সম্পাদক কাজী মামুনুল হককে বাস দিয়ে জোর করে প্রাক্তন অভিযুক্ত-বেগমপুরবাসী শ্রীশিবনাথ ব্যানার্জিকে সম্পাদক বানানেন। আর, জি, পার্টির প্রকৃত ভোটারদের ও, সি চোখ রাঙিয়ে ভোট দিতে দিলেন না। চুরি ছিনতাইয়ের সঙ্গে অশুভ আভাত হলো। আর, জি পার্টির নামে স্থানীয় গ্রামবাসী এখন আতঙ্কগ্রস্ত। শিবনাথবাবুর অত্যাচার অনাচারের কথা স্মরণ করে নতুন থানা কমিটি সম্পাদক হিসাবে তাকে দেখে মকাই অবাক।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু, রাজ্যভিত্তিতে আর্থবিকাশের গুরুত্ব আছে—একথা স্বীকার করতেই হবে।

পশ্চিমবঙ্গের ফরাক্কার জল বা হলদিয়ার প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মধ্যে অল্পকণ আর্থবিকাশের ভাবাঙ্গুষ্ঠিকে জাগ্রত করেছে। তাই, এই প্রকল্প ছুটিতে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাজনৈতিক দল একই মনো-ভাব শোষণ করে। কেন্দ্রীয় সরকার কি এই মনোভাবের প্রতি উদ্যমীণ থাকতে পারেন?

তাই সঙ্গত কারণেই রাজ্যে রাজ্যে দাবী উঠেছে—“ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের নীতি চালু কর”, “রাজ্যগুলির হাতে অধিকতর ক্ষমতা চাই।” প্রতিরক্ষা, মুদ্রা ও পর-রাষ্ট্রবিষয়ক নীতিগুলি ছাড়া অধিকাংশ বিষয়েই রাজ্যগুলির হাতে ক্ষমতা অর্পিত না হলে জাতীয় উন্নয়নের গণতান্ত্রিক কর্মসূচী অর্থহীন হয়ে পড়ে। স্বতন্ত্রাঙ্গী শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রের সর্বময় কর্তৃত্ব একনায়কত্বের পথই প্রশস্ত করে।

দীর্ঘকাল কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ-নৈতিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির প্রতি চরম বৈষম্যমূলক, পক্ষপাত-চুষ্ট আচরণ করে এসেছে। পশ্চিম-বঙ্গের প্রতি এইরূপ বৈষম্যপূর্ণ

আচরণের একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দেওয়া যাক। ইণ্ডিয়ান ফিনান্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া ১৯৭৬-৭৭ সালে মোট ৬৫৫ কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে। পশ্চিম-বাংলার বরাতে জোটে মাত্র ৫০ কোটি ১২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট মঞ্জুরীকৃত টাকার ৮%। সবচেয়ে বেশী পেয়েছে মহারাষ্ট্র—১২৮ কোটি ৮ লক্ষ টাকা।

কেন্দ্রীয় জনতা সরকার গণতন্ত্রের সংগ্রামে অংশীদার হয়েছিলেন। বৃহত্তর গণতন্ত্রের সংগ্রামের স্বার্থে তারা সাম্রাজ্যবাদী বিভেদনীতির অবশেষ নিষিদ্ধ করতে এগিয়ে আসেন—রাজ্যগুলির গণতান্ত্রিক মাধ্যম এই দাবী উত্থাপন করেছে ব্যাপকতর গণতন্ত্রের স্বার্থে।

প্রশ্ন-পর্ব

ইন্দির গেলো, হুটো গেলো
গেলো বন্দরনায়ক।
মুক্ত দিনের স্বপ্ন নিয়ে
জাগছে নোতুন নায়ক ॥

হনু-যুবরাজ

হনুর নামে-কারখানাটি
গড়লে যুবরাজ,
তখন কি আর জানতে তুমি
হানবে শিরে বাজ?
কোথায় গেলো হা-রাই মোটার
কোথায় ইন্দ্রধনু,
কুসুমী কিস্যায় ফেসে তুমি
নিজেই হোলে হনু ॥

নিমাই মান্না

আঁকুনী হাইস্কুলে ফাইল পোড়ানো হচ্ছে

(দর্পণের ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি)

আঁকুনী হাইস্কুলের হুর্নীতি চলছিল বহুদিন ধরে। দর্পণে দু’বছর আগে এ সম্পর্কে খবর বেরিয়েছিল। আঁকুনী বি জি হাইস্কুলে এখন বারো ক্লাসের কলেজও হয়েছে। হাইস্কুলের মাহিনা দু’বছর ধরে নিয়ে খাতায় নাম তোলা হয়নি এ অভিযোগ এসেছে। যে ছাত্র আদৌ নেই তাদের নামেও বিনামূল্যে বই খাতা দেওয়া হয়েছে। হেড ক্লাক অচিন্ত্য মুখার্জী চার হাজার টাকার হিঁসাব দেখাতে পারছেন না। জোর করে খাতা পুড়িয়ে দিচ্ছেন; তার ভাইও (কমিটির মেম্বর) আছেন সঙ্গে। প্রধান শিক্ষকও জড়িত আছেন বলে অভিযোগ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পদত্যাগ করে সবদোষ এড়াতে চাইছেন। প্রকাশ্যভাবে ফাইলপত্র

সরানো ও পুড়িয়ে দেওয়া কেউই বন্ধ করতে পারছেন না। কমিটিও নড়বড়ে। স্কুলের ভীত শিক্ষকরা শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহম্মদ আব-দুল বারী সাহেবকে অবিলম্বে এ ব্যাপারে তদন্ত করতে অনুরোধ করেছেন।

প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগের পর শিক্ষকদের মধ্যে দুটি দলই প্রধান শিক্ষক পদের জন্ত নিজ নিজ প্রার্থী দিয়েছেন। দু’দলের নেতা জগন্নাথ মাইতি, দুর্গাচরণ পান্না এবং জীবন সরকার। অভিযুক্ত অচিন্ত্য মুখার্জীর দাদা অবনী মুখার্জী ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক গিরিধারী মাইতির ঘনিষ্ঠ শিক্ষক জগন্নাথ মাইতি অচিন্ত্য মুখার্জীকে নির্দেশ বলে প্রচার

করছেন। তার বহলে অচিন্ত্য এবং তাঁর বন্ধু বাবু জগন্নাথবাবুকে প্রধান শিক্ষক করতে চাইছেন। সম্পাদক মামুনুল হককে নিষ্ক্রিয় করে বেসরকারীভাবে জোর করে জগন্নাথকে প্রধান শিক্ষক বসে ঘোষণা করতে চাইলে স্থানীয় আইনাবাদপুর সি পি এম কমিটির তরফ থেকে বিক্ষোভ জানানো হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার এ খবর লেখা পর্বস্ত গোটা স্কুল এবং বারো ক্লাস কলেজের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ফাইল অচিন্ত্য মুখার্জীর হাতেই আছে। তাঁর কাছেই চাবি। পুঞ্জোর ছুটির আগের পড়াশোনা। ছাত্ররাও বিক্ষুব্ধ। মাস্টারমশাইদের দুটো দল পালাক্রমে ছুটি নিয়েছেন এবং ছুটিয়ে রাজনীতি করছেন।

চমকিত নটকাভিনয়

পদ্মানদীর মাঝি নাটকাভিনয়

(দর্পণের সমালোচক)

অন্ধকারে প্রেক্ষাগৃহে মাঝির গান আর দাঁড় খাঁপানোর মিউজিকে দর্শকবৃন্দকে ভাসিয়ে নিয়ে 'লাইম লাইট' গোষ্ঠী শুরু করে তাদের নাটক 'মাঝি' বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'। এ নাটক সঙ্গীত দিয়ে শুরু, মিউজিক দিয়ে শেষ। নির্ধাতিত প্রবন্ধিত মাঝিভাষ্যের বিপন্ন অস্তিত্বের বেদনা এবং তারই জন্ম দিনে-দিনে সঞ্চিত-বিক্ষোভের প্রকাশ চমৎকার ও সার্থকভাবে অর্থ-ময় হয়ে উঠেছে সঙ্গীতে মিউজিকে। শুরু থেকে শেষ ঐ সঙ্গীত ও মিউজিকেরই প্রাধান্য ও সব চরিত্র ছাপিয়ে তাই নিয়েছে মূখ্য ভূমিকা।

পদ্মার বুকে যখন ভেসে পড়ে সারবন্দী জেলে নৌকা, তীরে দাঁড়িয়ে বিদায় জানায় তাদের বুড়ো মাঝি কিশোর ছেলে আর কপিলার মত হৃদয়বতী মাঝিনীরা, মঞ্চের পর্দায় তখন স্বকরকে নীল আকাশ এবং ভাসমান স্তম্ভ মেঘবলাকা, যেন সে সবই সরল প্রকৃতিলালিত মাঝি জীবনেরই মহান প্রতিচ্ছবি। পদ্মার চেউয়ে মাঝি-নৌকার পাল ভাসে, আর মাঝিমনে ভেসে বেড়ায় আশা-আকাঙ্ক্ষা স্ববেদনার সিক্ত গানের চেউ। অর্পূর্ব দৃশ্য! তবে অভিনেতৃ-বৃন্দের পঙ্ক্তিবন্দী পৃষ্ঠদেশে সে দৃশ্য ভালোভাবে দর্শকদের আর দেখা হয় না। মঞ্চের ওপর তৈরী উচ্চ পাটাতনটি এভাবেই অভিনেতৃবৃন্দের দখলে চলে গেছে বারবার; প্রায় ব্যর্থ হয়েছে পদ্মার আকাশের রূপ পরিবর্তনের দৃশ্য।

মাঝি গাঙে ফরসা আকাশ কখনো আবার কুঁজো হয়ে 'কালো ভালুকের মতো' কাঁপিয়ে পড়ে। কালো মেঘের কর্কশ নখরে ফালা ফালা হয়ে যায় পদ্মার উত্তরুক বুক। বিদ্যুৎ বজ্র বৃষ্টির মূল্য বর্ষণ। অসহায় প্রিয়জনের

লড়াই চলে জীবন নদীতে; অসহায় প্রিয়জনের বুক ভাঙে মাঝিপাড়ায়। কেউ ফেরে, কেউ হারিয়ে যায় ক্ষুধার্ত নদীর জঠরে। জীবনভোর এই ভয়ঙ্কর জীবিকা!। ডাক্তার জীবনেও একই রকম ভয়ানক সংকট। সেখানেও জীবন নদীতে সাক্ষাৎ উৎপাত হয়ে দেখা দেয় জমিদারের নায়েব; আসে হোসেন মিঞার লোভের ক্ষুধা। মাঝিভাষ্য গ্রাস করতে। হাঃ মাঝি! হারে মাঝি!! এভাবেই তার জীবন-তরী ডোবে, ডুবছে। বলা বাহুল্য, জীবনের এই নিষ্ঠুর দিকটিও সম্যক ফুটিয়ে তোলে ঐ সঙ্গীত ও মিউজিকের প্রতীকী ব্যঙ্গনা।

কিন্তু বেদনা যতই তীব্র হোক, জীবিকা হোক নির্মম, জীবন এক মহানদী। ধামার উপায় নেই কোথাও। ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গভীর। নীচের তলার শোষিত মানুষ সেই গভীরার রাশি রাশি না গণ্য 'অব্যয়'। তাদের বিপন্ন অস্তিত্বের কাঁধে চেপে নিষেদের অর্থ-ময় করে তোলে শোষক জমিদার আর বজ্রাত হোসেন মিঞার দল। অসহায় মানুষগুলোর পায়ের তলায় ভিটেভূঁই হারিয়ে যায়। নিরুপায় জীবন তখন আশ্রয় খোঁজে ভয়ঙ্কর 'ময়না ধীপে'। তবু একদিন না একদিন পুত্র জমিদার আর অজগর হোসেন-মিঞাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় মানুষ।

'লাইন লাইটের' আলোর মাণিকবাবুর মমতায় গড়া সেই বিপন্ন অস্তিত্বের মাঝিভাষ্য বোধ হয় সবচেয়ে সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করেছে শেষদৃশ্যের অনবদ্য 'ফ্রিজের' মাধ্যমে। বাকি নাটক বুল ধেনুয়েছে বৈচিত্র্যের অভাবে। অবশ্য পরিচালকের উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে মাঝিদের একটি যুগ-বন্ধ জীবন চিত্রণ, তবে তা সফল

হয়েছে। কেননা অভিনয়ে কারকেই অন্ধুর চেয়ে বেশি মনে হয়নি। এক-মাত্র বুড়ো মাঝি টাইপ চরিত্রের সহায়তায় দর্শকদের মন টেনেছেন, একঘেষেই কাটিয়েছেন। মাঝির মেয়ে বড় বেশি ডানা কাপটে লাফিয়েছে। কপিলার মধ্যে শহুরে ছলাকলা বেধাঙ্গা ঠেকেছে।

পদ্মানদীর মাঝি মাণিকবাবুর কলমের যাদুতে জীবন্ত। কিন্তু নাটক পাঠ্য নয়, শ্রাব্য নয় ততখানি, যতখানি তা দৃশ্য। নাটকীয় মুহূর্ত রচনায় তাই পরিচালকের স্বতন্ত্র যাত্র প্রয়োজন। চরিত্রগুলির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দরকার। তাদের আচরণে পৌনঃপুনিকতা বর্জন, পাটাতনের ওপর ভিড় বাড়িয়ে একাধিক দৃশ্যে পদ্মার ওপর ঝুঁকিপড়া, পা চুলকানো

ইত্যাদির ব্যাপারে আরও একটু মিতব্যয়িতা বোধ হয় পরিচালককে আরও কিছু ভাবতে সাহায্য করতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সংসদের সভাপতি শ্রীতিনকড়ি গুহাইত জানাচ্ছেন যে, গত ৬ই অক্টোবর যাত্রা সংসদের প্রচেষ্টায় মেয়ো হাসপাতালে পুরুষ ও মহিলাদের জন্ম একটি করে মোট দুটি আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। এতে দুঃস্থ যাত্রাশিল্পী, কর্মী ও যাত্রা শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত লোকেরা উপকৃত হবেন। সংসদ সভাপতি কথা প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কর্মসূচীর কথা বললেন যাতে যাত্রা শিল্পীদের বিশেষ ভাবে উপকার হবে। যাত্রা

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সংগীত বাধ দিলে এ নাটক দর্শককে কতক্ষণ ধরে রাখবে, সেটাও পরীক্ষা করলে ভালো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সংসদ

শিল্পের বহুবিধ সমস্তা আছে। তাদের পক্ষে সব সমস্তার সমাধান করা সম্ভব নয়। তবু তাদের চেষ্টা হচ্ছে এই সমস্তার যতটা মোকাবিলা করা যায়। যাত্রা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই শিল্পে বহুলোকের জীবিকা নির্বাহ হয়। এরা জীবন সমস্তায় জর্জরিত হয়ে পড়লে যাত্রা শিল্পের উন্নতি সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সংসদ এই গুরু দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর।



ইস্টার্ন কোলফিল্মস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়া একটি সংস্থা বিশেষ)

প্রস্তাব আহ্বান করছে

মাউন্টিং ও ফিটিং সরবরাহ

রেফঃ নং জি এমএ এ ই (ই অ্যাণ্ড এম)। টেওয়ার নোটিশ। ৩৫ এ। ৩৭৭ ৬৪ ৩৫ অফ ৩০, ৯, ৭৭ ১৫০ পি এস আই ওয়ার্কিং প্রেসার, ৪০০ ডিগ্রী থেকে ৫০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রার উপযোগী লাক্সাশায়ার ও ভার্টিকাল বয়লার সরবরাহের জন্য সীলকারী টেওয়ার এবং আই বি আর সার্টিফিকেটের সঙ্গে মাউন্টিং ও ফিটিং সরবরাহ করতে হবে। সরবরাহের সময় তালিকা সহ সরবরাহকারী জিনিষের গুণাগুণ সমেত ড্রয়িং ক্যাটালগের সঙ্গে কাজ সংক্রান্ত বিবরণ দিয়ে টেওয়ার পেশ করতে হবে ৭.১১.৭৭ তারিখ দুপুর ১টার মধ্যে। ঐ দিন বেলা ৩.৩০টায় জেনারেল ম্যানেজার, এরিয়া ২, ত্রিপুর, পোঃ কালিপাহাড়ি, জেলা বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ) এর অফিসে টেওয়ারদাতা অথবা তাঁদের অহুমোদিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেওয়ারপত্র খোলা হবে। টেওয়ারপত্র দেবার আগে ঐ জিনিষ সরবরাহে টেওয়ারদাতার যোগ্যতা সম্পর্কে দলিল ভিত্তিক প্রমাণপত্র দেখাতে হবে, যে ব্যাপারে টেওয়ারপত্র দানকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ক্যাসিয়ার, এরিয়া ২-র অফিস থেকে ২৭.১০.৭৭ তারিখ থেকে যে কোন স্বাভাবিক কাজের দিনে প্রতিটি সেটের জন্য ৫ (পাঁচ) টাকা দিয়ে টেওয়ারপত্র কেনা বাবে এবং ক্যাসিয়ার, এরিয়া-২-র অফিসে নগদ টাকায় দিতে হবে। বায়নার টাকা টেওয়ার মূল্যের ১% এবং তা 'কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড, ইস্টার্ন ডিভিসন, এরিয়া-২' নামে যে কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক ড্রাফটে দিতে হবে যা আসানসোলে ভান্ডানো বাবে এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াই বাঞ্ছনীয়। ক্যাসিয়ার, এরিয়া-২-র অফিসে ব্যাঙ্ক ড্রাফট জমা দিতে হবে এবং তার রসিদ টেওয়ারের সঙ্গে দিতে হবে। নিয়ম মাসিক অর্ডার দেবার ৬০ দিনের মধ্যে বয়লার ফিটিং ও মাউন্টিং সরবরাহ করতে হবে। সকল টেওয়ার দাতাদের সময়ের নিশ্চয়তা এবং জিনিষের মান ও উৎপাদনের ক্ষেত্রের জন্য অর্ডারের অর্থমূল্যের ১০% জমা রাখতে হবে। বায়নার টাকাবিহীন টেওয়ার বাতিল করা হবে।

বাস্তব ও কেবল সরবরাহ

টেওয়ার নং ৪ ই সি এল। পি ইউ আর। সি, এল, বাস। এ, এফ, কেবল। ৭৭৬২

নিম্নোক্ত সরবরাহের জন্য কেবলমাত্র উৎপাদকদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী চুক্তি :

- (১) আই এস আই সার্টিফিকেট নং আই এস: ২৫৯৬-১১৬৪ (সাম্প্রতিক) প্রাপ্ত এবং ডি জি এম এস, ধানবাদ কর্তৃক অহুমোদিত মাইনার্স ক্যাপ ল্যাম্প বাস।
- (২) আই এস আই সার্টিফিকেট প্রাপ্ত নিম্নোক্ত শট ফায়ারিং কেবল (ক) ২ কোর কেবল (সিঙ্গেল শট ফায়ারিংয়ের জন্য প্যারালাল টার্প) (রুজ ৬, ১, ৩) (খ) সিঙ্গেল কোর কেবল (রবার) মালটিশট ফায়ারিংয়ের জন্য (রুজ ৬, ২, ১) (গ) সিঙ্গেল কোর কেবল (পি, ভি, সি) মালটিশট ফায়ারিংয়ের জন্য (রুজ ৬, ২, ২) (গ) ২ কোর কেবল (প্যারালাল টুইন) সিঙ্গেল / মালটিশট ফায়ারিংয়ের জন্য (রুজ ৬, ৩, ১)।

পরিষ্কারভাবে এই কথাগুলি "ক্যাপ ল্যাম্প বাস / শট ফায়ারিং কেবল", টেওয়ার নং এবং নির্দিষ্ট তারিখ লিখে সীল করা টেওয়ার দু কপি কন্ট্রোলার অব পারচেজ, ইস্টার্ন কোলফিল্মস লিমিটেড, সীকতোরিয়া, পোঃ দিশারগড় (পিন ৭১৩৩৩৩) জেলা বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)-এর কাছে জমা দেওয়া যেতে পারে এবং তা ৯.১১.৭৭ তারিখ দুপুর ১টার মধ্যে পৌঁছাতে হবে এবং যা ঐ দিন দুপুর ৩টায় খোলা হবে। প্রামাণিক মূল্য বিক্রয় কর, উৎপাদন শুরু, পরিবহনের খরচ, বীমা ইত্যাদি পৃথকভাবে স্পষ্ট উল্লেখ করে "এফ ও আর ডেইলিশন" ভিত্তিতে প্রস্তাব দিতে হবে। টেওয়ারদাতাদের নিম্নোক্ত দলিলপত্র দাখিল করতে হবে (১) আই এস আই সার্টিফিকেটের কন্ট্রোলার কপি (২) ডি পি এম এস, ধানবাদ-এর অহুমোদনের কন্ট্রোলার কপি (৩) আয়কর পরিশোধের সাম্প্রতিক সার্টিফিকেট (৪) বিক্রয়কর পরিশোধের সাম্প্রতিক সার্টিফিকেট।

গ্রাম বাংলার মানুষের খবর জানতে হলে নিয়মিত পড়ুন

গ্রাম ও গঞ্জ

শুধুই প্রকাশিত হচ্ছে। একেবারে জন্ম লিখুন।

তাছাড়া প্রতিটি মহকুমা শহরে সংবাদদাতা নেওয়া হবে।

যোগাযোগ করার ঠিকানা

সম্পাদক—গ্রাম ও গঞ্জ

১৩৭, কে লি রায় লেন, কলিকাতা-৭০০০৩১

কবরস্থান নিয়ে রাজনীতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মশাট বাজারের কাছাকাছি করে নিতে চায়। এ নিয়ে মামলা খুচীয়া অঞ্চলে একটি কবরস্থানকে মোকদ্দমা হয়ে সব মিটে গিয়েছিল। নিয়ে রাজনীতি করছে কংগ্রেসীরা। আবার আন্দোলন করছে কংগ্রেসীরা। তারা হরিসভা নাচগানের ঐ কবরস্থানটি বহুদিন বেড়াহীন আসর বসিয়েছে কবরস্থানের ছিল। একসময় বেড়া দিতে শুরু পাইয়ে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা মুখ্য করলে কংগ্রেসীরা স-ঘবতভাবে মন্ত্রীর কাছে বিপদের আশঙ্কা করে হামলা করে এবং কবরস্থান দখল চিঠি দিয়েছেন।

দমদম-বজবজ যাত্রীবাহী রেলের প্রস্তাব

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা ও চব্বিশ পরগণার কলকাতা ও চব্বিশ পরগণার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে পশ্চিম-বাংলার প্রথমস্ত্রী রূপক পথ, এবং বিধানসভার সদস্য মহাঃ নিজামুদ্দিন, সুভাষ চক্রবর্তী, শচীন সেন, সুমন্ত, হীরা, সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী, পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত সুর প্রমুখ রেলমন্ত্রী মধু দত্তবত্তের কাছে দমদম থেকে বজবজ পর্যন্ত সরাসরি যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করার জন্য এক প্রস্তাব পেশ করেছেন।

বর্তমানে প্রচণ্ড যানবাহন সমস্যার কথা মনে রেখে এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে উন্টোডাঙ্গা থেকে বজবজ পর্যন্ত যে মালবাহী লাইন বর্তমানে আছে, সেই লাইনে অবিলম্বে যাত্রীবাহী ট্রেন চালানো হোক। বর্তমানে এই উন্টোডাঙ্গা-বজবজ মালবাহী

লাইনটির বৈদ্যুতিকরণের কাজ সম্পূর্ণ।

দমদম থেকে বজবজ পর্যন্ত যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর জন্য বিশেষ অতিরিক্ত খরচেরও দরকার হবে না। কেবল নারকেলডাঙা, বেলোখাটা, এটালী ও টালীগঞ্জে চারটি রেল স্টেশন স্থাপন করতে হবে।

এই লাইন চালু হলে কলকাতা ও শহরতলীর উত্তর ও দক্ষিণ ভাগের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হবে। এই প্রস্তাব কার্যকর হলে শিয়ালদহ স্টেশন এবং কলকাতার যানবাহনের ওপর চাপ অনেক কমে যাবে।

এই লাইন চালু হলে রেলকর্তৃপক্ষের অর্থনৈতিক দিক থেকেও যেমন লাভবান হবেন তদ্ব্যতিক্রমে কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণের অগণিত মানুষের কাছে ধন্যবাদার্থ হবেন।

তলবী সভা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সমস্ত রাজ্যগুলি এখন সফর করে তার সমর্থনে জনমত ও কংগ্রেস কর্মীদের সমর্থন আদায় করবেন। তারপর তলবী সভা ডাকা হবে। এই উদ্দেশ্যে আগামী ২৫, ২৬ ও ২৭শে নভেম্বর ইন্দিরা গান্ধীর পশ্চিমবঙ্গ সফর করার কথা। ২৭শে নভেম্বর ব্রিগেড ময়দানে ইন্দিরা গান্ধীর সভা ডাকা হতে পারে। অবশ্য এই সফর-খুচী এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এই সফরখুচী পিছিয়ে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে হতে পারে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানান যাচ্ছে যে, ত্রৈমাসিক সাহিত্য সংকলন 'আমাদের শিল্পসাহিত্য' (দপ্তর : ২৫/৪, যত্ননাথ উকিল রোড, কোলকাতা-৪১) ছাড়া অন্য কোন পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা বা কোন সংস্থার সঙ্গে আমি শ্রীশ্রীকোমল রায়চৌধুরী কোন ভাবেই কিছুমাত্র যুক্ত নই। যদি অন্য কোন পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা বা কোন সংস্থার তরফ থেকে আমার নাম কোন ভাবে যুক্ত করা হয় তাহলে সেটা সম্পূর্ণ জালিয়াতি। সেক্ষেত্রে কোন কাজের জন্য আমি কিছুমাত্র দায়ী হব না।

ঠিকানা : ২৫/৪, যত্ননাথ উকিল রোড, কোলকাতা-৪১
 স্বাঃ শ্রীকোমল রায়চৌধুরী
 সম্পাদক,
 'আমাদের শিল্প সাহিত্য'

[যদি অন্য কোন ঠিকানা আমার ঠিকানা বলে কোথাও ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও জালিয়াতি বলে ধরে নিতে হবে]

লাগাতার ধর্মঘট : এ আই টি ইউ সির বিশ্বাসঘাতকতা

বিগত ৭/১১/৭৭ তারিখ থেকে এই ইউনিয়নের এক নেতৃস্থানীয় মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ভিলাইয়ের কর্মী এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, রাজহারায় ঠিকাদার ও সোসাইটি ম্যানেজমেন্ট ও ঠিকাদারদের সঙ্গে শ্রমিকেরা ফলবাক মজুরী ও অন্যান্য গাঁটছড়া বেঁধে এ, আই, টি, ইউ, সি, এক নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা অবলম্বন করছে। গত ১২/১০/৭৭ তারিখে এক বিশাল জনসমাবেশে সি এম এস এস ইউনিয়ন নেতা শ্রীশংকর গুহ নিয়োগী ও বংশীলাল সাহ ধর্মঘটের সমর্থনে বক্তব্য রেখে ম্যানেজমেন্ট ও ঠিকাদারদের দোষ এ, আই, টি, ইউ, সি-র মতোশ উন্মোচন করে দেন। আশা দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঠিকাদার ও সোসাইটি শ্রমিকেরা লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে ধাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।



ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

প্রস্তাব আহ্বান করছে

ইট সরবরাহ

রেফাঃ কে এ জে / সি ই / টেগার / ব্রীকস / ৩৩(এ) / ১ / ৭৭-৭৮ তাং ১৭-১০-৭৭

কাজোরা সাব-এরিয়র অধীন খাস কাজোরা / লাচিপুর ও ঘনশ্যাম কোলিয়ারীতে পাঁজায় পোড়ানো ও কিলনে পোড়ানো ইট সরবরাহের জন্য প্রখ্যাত ও সঙ্গতিসম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে সীলকরা টেগার। বিভিন্ন কোলিয়ারীতে মোটামুটি কত ইট প্রয়োজন এবং অন্যান্য জাতব্য নিয়রূপ :

(১) প্রথম শ্রেণীর পাঁজায় পোড়ানো ইট : খাস কাজোরা কোলিয়ারীতে—৩০ লক্ষ, লাচিপুর কোলিয়ারীতে—৭ লক্ষ, ঘনশ্যাম কোলিয়ারী—৮ লক্ষ। বায়না ১১,২৫০ টাকা (২) প্রথম শ্রেণীর কিলনে পোড়ানো ইট : খাস কাজোরা কোলিয়ারীতে—৪০ হাজার, লাচিপুর কোলিয়ারীতে—৬০ হাজার, ঘনশ্যাম কোলিয়ারীতে—১ লক্ষ। বায়নার-টাকা ১ হাজার।

সাব-এরিয়া ম্যানেজার, কাজোরা এরিয়া, কাজোরা সাব-এরিয়া, পোঃ কাজোরা গ্রাম, জেলা বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ) অফিস থেকে টেগারপত্র পাওয়া যাবে ২৬-১০-৭৭ থেকে ১৭-১১-৭৭ তারিখ পর্যন্ত অফিসের সময়ে কাজোরা গ্রুপ, কাজোরা এরিয়র ক্যাসিয়ারের কাছে ৫ টাকা জমাদিলে, যা প্রত্যাগণযোগ্য নয়। ইট তৈরি এবং গাড়িতে বোকাই ও খালারের খরচ এবং যে কোন কোলিয়ারীতে সরবরাহের সমস্ত খরচ সহ দর দেওয়ার জন্য টেগারদাতাদের অনুরোধ করা যাচ্ছে। রাজ্য সরকারকে বয়্যালটি বাবদ দেয় অর্থও এর সঙ্গে যোগ করতে হবে। ১৭-১১-৭৭ তারিখ বিকেল ৩টা পর্যন্ত সীলকরা টেগার নেওয়া হবে এবং সেইদিনই বিকেল ৪টায় এই অফিসে টেগারদাতা অথবা তাঁদের অস্থায়ী প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে তা খোলা হবে।

উপরিউক্ত বায়নার টাকা নগদে কাজোরা গ্রুপের ক্যাসিয়ারের কাছে জমা দিতে হবে অথবা কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড 'ইস্টার্ন ডিভিশন, কাজোরা গ্রুপ'র নামে যে কোন রাষ্ট্রকৃত ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক ড্রাফট আসানসোলে ভান্ডানোর জন্য কাজোরা গ্রুপের ক্যাসিয়ারের কাছে জমা দিতে হবে। টেগারপত্রের সঙ্গে এর রসিদ পাঠাতে হবে।

পাঁজায় পোড়ানো ইট সরবরাহ

রেফাঃ এস এ এম / বি জি / সি ই / টেগার / ৪২ তাং ১২-১০-৭৭

সাব-এরিয়া ম্যানেজার, বাকোলা সাব-এরিয়া, বাকোলা এরিয়া, পোঃ উথরা, জেলা বর্ধমান নির্ভরশীল ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে টেগারপত্র আহ্বান করছেন কিলনে পোড়ানো ইট তৈরি ও সরবরাহ করার জন্য যার বিবরণ দেওয়া হল : (১) বাকোলা কোলিয়ারী, ১০ লক্ষ পরিমাণ, প্রতি এক লক্ষে বায়না ২১০ টাকা এবং ৬ মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। (২) শ্যামসুন্দর কোলিয়ারী, ৬ লক্ষ পরিমাণ, বায়না প্রতি এক লক্ষে ২১০ টাকা এবং ৬ মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

ইট তৈরির জায়গার ব্যবস্থা ঠিকাদারদের করতে হবে। কোলিয়ারী থেকে তার দূরত্ব হবে শূন্য এবং এই বিভাগ কর্তৃক অস্থায়ীভাবে হতে হবে। ইট তৈরির এই টেগারে পরিবহনও অন্তর্ভুক্ত যার জন্য টেগারদাতাকে আলাদা দর দিতে হবে।

সাব এরিয়া ম্যানেজারের অফিসে ১৬-১১-৭৭ তারিখ থেকে যে কোন কাজের দিনে অফিসের সময়ে লিখিত আবেদনের বিনিময়ে অথবা তার / তাদের অভিজ্ঞতা / পরিচয়পত্রের সন্তোষজনক সাক্ষ্যগ্রহণ উপস্থিতি করে টেগারপত্র পাওয়া যাবে। প্রতি সেট টেগার পত্রের দাম ১০ টাকা (অপ্রত্যাগণযোগ্য)। বায়নার টাকা ও টেগারপত্রের দাম নগদে বাকোলা কোলিয়ারীর ক্যাসিয়ারের কাছে জমা দিতে হবে। টেগার জমা দেবার শেষ দিন ও সময় ২-১২-৭৭ তারিখ বেলা ১২-৩০ এবং তা ঐদিন বিকেল ৪টায় ইচ্ছুক টেগারদাতা অথবা তাদের অস্থায়ী প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খোলা হবে।

সম্পাদক—ইরেন বসু

দলপাঠক বর্জ্য দীপালী প্রেস, ১২৩১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ মট সেন কলকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত।

কসমস ক্লাবের সঙ্গে খেলার টিকিট নিয়ে গণ্ডগোল করেছেন মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শুক্রবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা জাতীয় প্রবেশ। ছ জনের হাতে হয়েছে এমন সময় সাউথ ক্লাবে গোছা গোছা ১৫৫ ও ৬০ টাকার মোহনবাগান তথা ভারতের এক টিকিট। বিলি শুরু হল এবং উপস্থিত বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় ও তার (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)



সত্যনারায়ণপন্থী নকশালরা জনতা পাটিকে সন্তুষ্ট রাখতে চান

(বিশেষ সংবাদদাতা)

লোকসভা নির্বাচনের পর একটি বিভিন্ন জনসভায় এদের নেতা অংশ দারা সি পি আই (এম, এল) সভ্যনারায়ণ গোষ্ঠী নামে পরিচিত জনতা পাটিকে সন্তুষ্ট রাখার নীতি গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বন্দীমুক্তি ও গণদাবী প্রস্তুতি কমিটি আয়োজিত বিভিন্ন জনসভায় এদের নেতা অংশ দারা সি পি আই (এম, এল) সভ্যনারায়ণ গোষ্ঠী নামে পরিচিত জনতা পাটিকে সন্তুষ্ট রাখার নীতি গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বন্দীমুক্তি ও গণদাবী প্রস্তুতি কমিটি আয়োজিত

এক "গোপন বোকাপড়া"র ফলে এই অবস্থা উদ্ভূত হয়েছে। এখানে মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছেন ঐক্যকাস্ত। বলা বাহুল্য এই কৃষ্ণকাস্তের বাড়ীতেই সত্যনারায়ণ সিং-এর আশ্রয়স্থল এবং শোনা যাচ্ছে এখানেই সি পি আই (এম-এল) গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় কমিটির অফিসও খোলা হবে।

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

নন্দিনীর বিরুদ্ধে তদন্তের নেপথ্যে চরণ সিং ও উদ্দেশ্য রাজনৈতিক

(দর্পণের সংবাদদাতা)

"পর্যতাল্লিশ লক্ষ টাকা আয়কর মন্ত্রী মোরারজী দেশাইকে বলেছেন ফাঁকি দিয়ে বিজু পট্টনায়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য শুধু তাই নয়, কেন্দ্রে ওড়িশা রাজনীতির একমাত্র মুখপাত্র। অথচ আমার ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী ওড়িশা ভিজিল্যান্সকে নিয়ে সার্চ করানো হলো শুধু রাজনৈতিক আক্রোশ মেটানোর জন্ত।" কথামূলো নন্দিনী শতপথী প্রধান-মন্ত্রী মোরারজী দেশাইকে বলেছেন ফাঁকি দিয়ে বিজু পট্টনায়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য শুধু তাই নয়, কেন্দ্রে ওড়িশা রাজনীতির একমাত্র মুখপাত্র। অথচ আমার ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী ওড়িশা ভিজিল্যান্সকে নিয়ে সার্চ করানো হলো শুধু রাজনৈতিক আক্রোশ মেটানোর জন্ত।" কথামূলো নন্দিনী শতপথী প্রধান-

মন্ত্রী মোরারজী দেশাইকে বলেছেন ফাঁকি দিয়ে বিজু পট্টনায়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য শুধু তাই নয়, কেন্দ্রে ওড়িশা রাজনীতির একমাত্র মুখপাত্র। অথচ আমার ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী ওড়িশা ভিজিল্যান্সকে নিয়ে সার্চ করানো হলো শুধু রাজনৈতিক আক্রোশ মেটানোর জন্ত।" কথামূলো নন্দিনী শতপথী প্রধান-মন্ত্রী মোরারজী দেশাইকে বলেছেন ফাঁকি দিয়ে বিজু পট্টনায়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য শুধু তাই নয়, কেন্দ্রে ওড়িশা রাজনীতির একমাত্র মুখপাত্র। অথচ আমার ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী ওড়িশা ভিজিল্যান্সকে নিয়ে সার্চ করানো হলো শুধু রাজনৈতিক আক্রোশ মেটানোর জন্ত।" কথামূলো নন্দিনী শতপথী প্রধান-

মহাজাতি সদনে

৩০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা আটা

১লা অক্টোবর সন্ধ্যা আটা



২রা অক্টোবর (রবি) সন্ধ্যা আটা
পঃ বঃ সরকার আয়োজিত
যাত্রা উৎসবে
(রবীন্দ্রসদনের পশ্চিম দিকের
অয়দানে)



হলে ও মণ্ডপে টিকিট

পরিবেশনায়



লক্ষ্মী বম্বুর বাড়ি গাড়ি ও কুকুরের হিসেব

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কিভাবে কংগ্রেসী জামানায় কিছু কিছু কংগ্রেস নেতা নিঃস্ব থেকে প্রচুর সম্পদ গড়ে তুললেন তা ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে।

এন এল সি সি-র কর্ণধার লক্ষ্মী-কান্ত বম্বু আশ্র প্রচুর সম্পদের মালিক। কিন্তু এমনটা ছিল না। সামান্ত বেতনে কাজ করতেন একটা কারখানায়। কোনরকমে দিন কাটত। প্রাচুর্যের কোন স্থান ছিল না জীবনে।

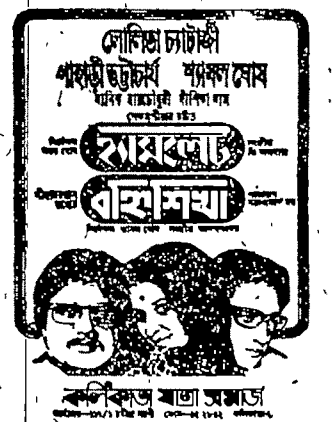
এলো ১৯৭১-৭২-এর রাজনীতির টালমাটাল দিনগুলো। অজ্ঞাত-অব্যাত লক্ষ্মী বম্বু রাতারাতি কংগ্রেস রাজনীতির প্রথম সারিতে চলে এলেন। আর এই সুবাদে আসতে লাগল প্রচুর অর্থ নানা স্বরূপে।

কালনায় লক্ষ্মীবাবুরের একটা শৈতুক বাড়ী ছিল। সেই বাড়ী ডিম

পাড়তে পাড়তে এখন চার পাঁচটায় দাঁড়িয়েছে। শ্রামপ্রসাদ মুখার্জী রোডে ভাইপো পার্থ বোসের নামে একটা ফ্ল্যাট কেনা হয়েছে। ২বি, সাহানগর রোডে লক্ষ্মীবাবুর নিজের নামে। ৭নং হাজী মহসীন রোডে মাসিক ৩১৫ টাকা ভাড়া। চেতলায় সি আই টি ফ্ল্যাট বার মাসিক ভাড়া ৬০০ টাকা। আত্মমানিক ৭২০০০ টাকায় ভাইপো পার্থর নামে হিমালয় কো-অপারেটিভের ১১ তল ফ্ল্যাট।

এ তো গেল বাড়ীর হিসেব। এবার গাড়ীর হিসেব। বেনামে লক্ষ্মীবাবুর কাছে মোট ৬টি গাড়ী আছে। কোনটাও আবার ট্যাক্স টোকেস বা রু বুক নেই। ডবলু বি এস ১৯৭২ প্রায় বাগচির নামে, ডবলু জিকে ৫৪১ আর্থ বেকারীর মালিকের নামে, ডবলু এম এ-৪০৬৫ প্রদেশ কংগ্রেসের নামে (র বুক নেই), ডবলু বি এফ

১ অতীক ব্যানার্জীর নামে, ডবলু এম সি ১১৩৩ ভারতীয় যুব উত্তোগের নামে, আর ডবলু আর এস ১০৪৯ (শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)



পঃ বঃ সরকার আয়োজিত
যাত্রা উৎসবে
হ্যামলেট
৫ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ

ভারতীয় নৃত্যের প্রাণপুরুষ

হীরেন চক্রবর্তী

বেশ পরিণতি বয়সেই চলে গেলেন নটরাজ উদয়শঙ্কর। সৌন্দর্য থেকে ক্ষোভের কোন কারণ নেই। বরং যে বিশেষ নৃত্য-আন্দোলনের নেতৃত্ব পেয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তদুপযুক্ত কোন নর্তক গোষ্ঠী বা সেই ধারার অনুশীলন ও প্রচারকারী কোন শিক্ষায়তন যে তিনি গড়ে যেতে পারলেন না সেটাই বেশী দুঃখের। ১৯৩৯ সনে প্রতিষ্ঠিত আলমোড়ার কৃষ্টিক্ষেত্র ভেঙ্গে গিয়েছিল তাঁর নিজের অনভিজ্ঞতা এবং অদূরদর্শিতার জন্ত। ময়মনসিংহ শহরে ১৯৪১ সনে তাঁর দলের নৃত্য-কলার সঙ্গে যখন চান্দ্র্য পরিচয় বর্তমান লেখক তখন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। যে দলে অল্পদের সঙ্গে সিমু কি এবং স্বর্গত আলাউদ্দিন ছিলেন। আর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ৬৪ দশকে কলকাতার নিউ এম্পায়ারে আবার সদলে শঙ্করের দেখা পেয়েছিলাম। কিন্তু তখন না ছিলেন সিমু কি বা উজ্জ্বলজোহরা, না ছিলেন আলাউদ্দিন বা বিজ্ঞান শিরালি। বন্দ-বাদনের পরিচালক তখন কমলেশ মৈত্র।

পরবর্তী ২০ বছরে রামায়ণ ছায়া-নাট্য, সামান্য ক্ষতি, প্রকৃতি ও আনন্দ এবং শঙ্করকোপ উপহার দেওয়া সত্ত্বেও যে শঙ্করকে পেয়েছিলাম রীদম অফ লাইফ, ম্যান অ্যাণ্ড মেশিন, লেবার অ্যাণ্ড মেশিন ইত্যাদি নৃত্য রচনায়—সে মৌলিক স্রষ্টার পুনরাবির্ভাব আর ঘটল না। বস্তুত 'কল্পনা'র সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কল্পনার এবং স্বপ্নের স্রোত যেন শুকিয়ে গেল।

উদয়শঙ্কর, বিরজু মহারাজ বা বাঁজী সরস্বতীর মত একজন প্রাথমিক নৃত্যের প্রতিষ্ঠা ছিলেন না। তাঁর নৃত্য ভরতনাট্যম, কথক, কাথাকালি, মণিপুরী এবং লোকনৃত্যের মিশ্রণ ছিল বটে কিন্তু একক নর্তক হিসেবে কোনটাতেই তিনি উল্লিখিতদের সমান পারদর্শিতা দাবি করতে পারতেন না। তিনি ছিলেন এ থেকে আলাদা জাতের এক নৃত্য-শিল্পী, এক সম্পূর্ণ নতুন ও স্বতন্ত্র নৃত্য-রীতির রূপবন্ধের স্রষ্টা—ভারতের নৃত্য যা আগে ছিল না, তার নাম নাট্যনৃত্য বা ব্যালে। ভারতীয় নৃত্যের প্রথাগত পারম্পর্য-প্রদর্শনে তাঁর উৎসাহ ছিল না। তিনি আগ্রহী ছিলেন ব্যালের মাধ্যমে ভারতীয় নৃত্য-ঐতিহ্যকে লোকচক্ষুর সম্মুখীন করাতে। এ জন্ত 'ইন্দ্রনৃত্য', 'কার্তিকেশ্বর', 'হরপার্বতী' প্রভৃতি

পৌরাণিক বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে লেবর অ্যাণ্ড মেশিন-এর মত সমকালীন সামাজিক সমস্যাতেও তিনি নৃত্যের বিষয়ীভূত করেছিলেন। এর কিছুটা 'কল্পনা'-র অন্তর্ভুক্ত।

এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় যন্ত্রের সাহায্যে তিনি পুরোদস্তুর অর্কেস্ট্রা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন আলাউদ্দিন, খাঁ এবং তিমিরবরধের সহায়তায়। প্রথাগত নৃত্য বা নৃত্যের সঙ্গে এখানেই তাঁর নাট্য নৃত্যের মূলগত পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ যে হিসাবে ভারতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি, উদয়শঙ্করের নৃত্যও তাই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তার সমাজ ও কালচেতনা। তাঁর নৃত্য রচনা স্রুত ভারতের প্রথাগত নৃত্যসম্ভার আত্মগত করেও বর্তমান জীবনের সমালোচনা এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহ। কিন্তু কৃত্যপি তাব কোন রাজনৈতিক মোগান কর্ণ-বিদ্যার ঘটনা না—এমনই নান্দনিক প্রত্যয়ে সংযত।

বলা বাহুল্য, এই উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশের কাছে গিয়েছিলেন যেমন রবীন্দ্রনাথ করেছেন। যুরোপের রোমান্টিক সাহিত্যের কাছে। শঙ্করের উপরে পাশ্চাত্য ব্যালের প্রভাব অনায়াসদৃষ্ট।

ভারতীয় নৃত্য যে কালে নির্বিশেষ বিষয়ের এবং রসের সেকালে শঙ্কর তাঁর নৃত্যে বিশেষ রস এবং বিষয়ের উত্থাপন এবং পরিবেশন করেছেন। দেশাত্মবোধ তো বটেই এমন কি এক ধরনের সমাজবাদী চেতনাও তাঁর নৃত্যে দেখা গিয়েছিল। নৃত্যের মাধ্যমে তিনি ভারতের মর্য-কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন যা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তাঁর কাব্য, নাটক এবং সংগীতে। নতুবা ভারতনাট্যম, কথক বা কাথাকালি কোনটারই তিনি ওস্তাদ নাচিয়ে ছিলেন বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথও একই সময়ে একই নিরীক্ষা করছিলেন তাঁর নৃত্যনাট্যগুলির মাধ্যমে। কিন্তু তখন তাঁর বয়স ষাটের উপর; তা ছাড়া ভারতের প্রায়োগিক নৃত্য সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল না। তবু প্রবীণ শিল্পবোধ এবং বহিরাগত নৃত্যবিদ ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যে তিনি শান্তিনিকেতনী নৃত্যের স্বরূপ প্রতি করেন। শঙ্কর সে তুলনায় অনেক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে, উভয়ের উপরেই পাশ্চাত্য ব্যালের প্রভাব ক্রিয়ামূল ছিল।

গীতিরচনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আপেক্ষিক পক্ষপাত হেতু তাঁর ব্যালে গীতিনৃত্যের রূপ পেয়েছে। কিন্তু শঙ্করের ব্যালে সত্যিকারের ব্যালে—তার উপরে গানের, গুরুশাই-গিরি নেই।

বহির্বিষে শঙ্কর যে কালে আলোড়ন সৃষ্টি করে ভারতীয় নৃত্যের স্বীকৃতি কেড়ে এনেছিলেন সারা বিশ্বে উপনিবেশবাদ তখন জয়-জমাট। সেই পরিপ্রেক্ষিতে শঙ্করের ভূমিকা ছিল ভারতের সাংস্কৃতিক দূতের মত। তা আজকের দিনের মত অত সহজসাধ্য ছিল না। নতুন ভারতীয় নৃত্যের উদ্যোগী শঙ্কর।

কিন্তু দুঃখের বিষয় শঙ্করের সঙ্গে সঙ্গেই সে সৃষ্টির পথ কঙ্ক হয়ে গেছে মনে হয়। তাঁর তাই শতীনশঙ্কর ছাড়া আর কেউ এ পথে কোন সত্যিকারের চেষ্টা করেন নি। যদিও প্রতিভা গণ্ডায় গণ্ডায় জন্মায় না, তবু যুরো-আমেরিকার সমকালীন ব্যালে-সম্পর্কিত নিরীক্ষার কাছে আমাদের প্রশ্নকে গোপদ বললেও বেশী বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ-নজ-রুলের পরে যেমন সত্যিকারের গীতিকাব হয় নি, শঙ্করের পরে তেমনি হয় নি কোন সত্যিকারের ব্যালে স্রষ্টা। দেশবাসী এই কারণে উদয়শঙ্করকে আরো বেশী করে মনে রাখবেন।

নিবিদ্ধ পত্রপত্রিকা

প্রদর্শনী ইত্যাদি

আগামী ৩রা থেকে ২ই অক্টোবর কলকাতা তথা কেন্দ্রে জরুরী অবস্থা কালে প্রকাশিত প্রচারপত্র, পত্রিকা, কার্টুন, পত্রিকার এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। এইসব ছাড়াও ঐ সময় নিবিদ্ধ করা রবীন্দ্রসঙ্গীত ও সেনসর কর্তৃক ছাটাই করা সংবাদের প্রক্ষ প্রদর্শন ও প্রশারের ব্যবস্থা করা হবে। ৩রা অক্টোবর প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী শ্রীজ্ঞান ফার্মাওজ। বাদের কাছে ঐ সময়ে নিবিদ্ধ করা দেশ বিদেশের পত্রিকা, প্রচারপত্র, চিঠিপত্র আছে তাঁরা দয়া করে প্রদর্শনীতে রাখার জন্ত সেগুলি দিলে প্রদর্শনীটি আরও তথ্যসমৃদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক হয়। সব কিছুই প্রদর্শনীর পর তাঁদের ফেরৎ দেওয়া হবে। নীচের ঠিকানায এগুলি পাঠান বা দিয়ে রাখুন। (১) কমিটি ফর একজিভিসন অফ আওয়ার গ্রাউণ্ড নিউরোর ১৩৭,

সত্যনারায়ণপন্থী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই বক্তব্যের সমর্থনে আরো জোরালো যুক্তি পাওয়া যাবে, গত ২১-২২শে আগস্ট দিল্লীতে আয়োজিত পিপলস ইউনিয়ন অব সিবিল লিবার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলনে এই গোষ্ঠীর বিভিন্ন নেতার বক্তব্য অনুধাবন করলে। এখানে সম্ভাব্য রাণা ভীম ভাষায় আক্রমণ করেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকারকে। তিনি বলেন জনতা সরকার বন্দীমুক্তির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে তো কোন বাধা সৃষ্টি করছেন না, তাহলে কেন তারা বন্দীমুক্তির ব্যাপারে দেরী করছেন? এই দেরী হওয়াটা নাকি বামফ্রন্ট সরকারের ইচ্ছাকৃত।

কৃষ্ণকান্ত সত্যনারায়ণ/সিং-এর পিঠ চাপডাতেই তিনি কৃষ্ণকান্তকে জড়িয়ে ধরলেন সবার সামনেই। মাইকে নাম ঘোষণা হতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে জনতা সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গেই। এখন একে রক্ষা করতে হবে। তাই এ এমন এক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যেখানে কেবলমাত্র জনতা পার্টিই তাতে থাকবে না, এমনকি 'কংগ্রেসের প্রগতিশীল' অংশকেও সংগে নিতে হবে। সত্যনারায়ণ সিং বোধহয় ভুলে গেছেন একসময়-সি পি আই এই কথা বলত। এবং এই জাতীয় 'প্রগতিশীলতা' খোঁজার জন্ত তাঁর অবস্থা আজ কোথায়।

জনতা পার্টির নেতা চন্দ্রশেখর বক্তৃতা দিতে উঠে বলেন, চারজন নকশাল যখন একজায়গায় আসতে পারেনা, সমমতাবলম্বী হতে পারেনা তখন তাদের 'লম্বা-চওড়া' কথা বলা উচিত নয়। আসলে চন্দ্রশেখরজী চান সমস্ত নকশালরা তাদের পেটোয়া সত্যনারায়ণ সিংদের সঙ্গে চলে আসুক। কিন্তু জনতা পার্টির লেজুডবুজি করে সত্যনারায়ণ সিংদের লাভ কি? লাভ আছে। আগামী কয়েকমাসের মধ্যে আসাম, অন্ধ্র, কেরালায় বিধানসভার নির্বাচন হতে চলেছে। এইসময়ে তারা বেশ কয়েকটি রাজ্যে প্রার্থী দিতে চান। যেমন অন্ধ্র সম্ভবতঃ চন্দ্রপোন্না রেড্ডী প্রার্থী হচ্ছেন। তাই এরা চাইছেন জনতার সঙ্গে সমঝোতা করে যদি আবো একটা ছোটো আসন পাওয়া যায়। এদের সঙ্গে ক্যানিং স্ট্রীট (চতুর্থতল) কলি-১, (২) নিরালারোইয়েট, রাসবিহারী এভিনিউ (গডিহায়াটের কাছে), (৩) কলকাতা-১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-২

বোশ দিচ্ছেন নকশালদের আর একটি অংশ। এরা হল ইউনিটি কমিটি সি পি আই (এম-এল)। এখন এরা বলছেন আমরা ছুটি ভাই ভাই। সত্যনারায়ণদের মুখপত্র 'জনযুদ্ধে' এই দুই সংগঠনের এক যৌথ বিবৃতিও প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে সমস্ত তুলনাস্তি সঙ্গেও তারা এবার থেকে একসঙ্গে কাজ করবেন। আসলে এদের নেতা ভাস্কর নন্দী সম্ভবতঃ আসাম থেকে প্রার্থী হতে চান।

এই কারণে জনতার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ করতে এরা বন্ধপরিকর। এদের মুখপত্রে কেবলমাত্র বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিধোদগার। আর এরা সোচ্চার অস্ত্রের সরকারের বিরুদ্ধে, যেখানে কংগ্রেস ক্ষমতায়। এই সমস্ত কাজ-কর্ম চালাতে এদের টাকাপয়সারও অভাব হচ্ছেনা। সম্প্রতি দিল্লীতে মার্কিন মূলক থেকে এক উটপ্লিগহী বুদ্ধিজীবী এসেছিলেন। তিনি সত্যনারায়ণ সিংদের বেশ কিছু টাকা দেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

সত্যনারায়ণপন্থীরা তাই বন্দী-মুক্তি কমিটির অভ্যন্তরেও চাপ সৃষ্টি করেছেন। তারা চাপ দিচ্ছেন যেন এখুনি বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়। কমিটির মধ্যে এই নিয়ে তীব্র মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। কমিটির কেউ কেউ মনে করেন লোকসভা নির্বাচনের পর জনতা সরকার নকশালপন্থীদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত 'হীন মনোভাব' গ্রহণ করেছেন। তারা সত্যনারায়ণ সিংদের দিয়ে পরোক্ষভাবে মুচলেকা আদায় করতে চাইছেন। তাই আন্দোলন হওয়া উচিত জনতা সরকারের বিরুদ্ধে এবং আমলাতান্ত্রিক চিলেমির বিরুদ্ধে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য সত্যনারায়ণ সিংরা স্বীকার করেছেন তাদের বন্দী মুক্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত তুল ছিল (জনযুদ্ধ, ৫ম বুলেটিন)। অবশ্য এর যথোচিত ব্যাখ্যা তারা দেননি আর সত্যনারায়ণ সিংপন্থী নকশাল ক্যাডাররা তা জানেন না, বোধহয় সত্যনারায়ণজী জানেন।

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জনমত সোচ্চার হোক

—ভদ্রাচরণী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
(দর্পণের প্রতিনিধি)

“আমি বুঝতে পারিনি যে অসীম চক্রবর্তীর কান টানলে সন্তোষ ঘোষের মাথা চলে আসবে। আমি বারবধু বন্ধ করার জ্ঞানবোধ সরকারী নির্দেশ পাঠাই নি, শুধু তাদের বিশেষ প্রদর্শনী অস্থানে আমি তাদের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করি এবং অভিমত প্রকাশ করি বারবধুর মতো নাটক বন্ধ হওয়াই উচিত। এতেই চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। অপসংস্কৃতির পাণ্ডুরা প্রচারে নেমে পড়ে। কিন্তু আমি জানি চল্লিশ লক্ষ লোকই বারবধু দেখুক আর বত লক্ষই দেখুক, জনমত এর বিরুদ্ধে। আর প্রমুখ

শুধু বারবধু নয়, প্রমুখ হাচ্ছে অপসংস্কৃতির। সিনেমা, থিয়েটার, অঙ্গুলি পুস্তক ইত্যাদি নানা মাধ্যমে এর প্রচার চলছে। এসব কিছুই বন্ধ হওয়া দরকার। কিন্তু ঘটনাক্রমে বারবধু আজ সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে।”

এই কথাগুলো বলেন ভদ্রাচরণী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আমার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে। আমি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে বলেছিলাম, “প্রচার করে সময় নষ্ট করার দরকার কি। বিভিন্ন প্রগতিশীল যুব সংগঠনগুলো মিছিল করে গিয়ে এইসব অপসংস্কৃতির অস্থ

ধানগুলোর বিরুদ্ধে জাগ্রত বিক্ষোভ দেখাতে পারে তো জনতার বিক্ষোভে অনেক সময়ই তো অনেক অস্থানবাসিত্ব হয়ে যায়, এ ক্ষেত্রেও তো সেই ব্যাপারটা করা যায়। কারণ এ ব্যাপারে বিতর্কে তো কিছু নেই। সবাই তো অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে। বারবধু জাতীয় থিয়েটারগুলো বন্ধ হলে জনগণ খুশী হবে, সমর্থন করবে।”

বুদ্ধদেববাবু জবাবে বললেন, “আপনি একটু বেশী এগিয়ে ভাবছেন। আমরা এই মুহুর্তে ওরকম ভাবতে পারছি না। ওরকমভাবে কিছু করা খুব সোজা। কিন্তু আমরা চাই এই বিষয়টা নিয়ে বিতর্ক উঠুক। ব্যাপারটা জনগণের মধ্যে যাক। বিভিন্ন প্রগতিশীল পত্রিকা নাট্য সংস্থা, এবং সংগঠনগুলো এ ব্যাপারে এগিয়ে আসুক। তারা তাদের রায় দিক। জনমত সোচ্চার হোক। অপ- (শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের লক্ষ লক্ষ টাকা তামাদি হয়েছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতার ইউনাইটেড ইনডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের একটি ছুট চক্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ২৪.৩.৭৬ তারিখের যে রিপোর্ট এ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে প্রায় এক কোটি ছাপান্ন লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কের তামাদি হয়েছে এবং এই তামাদি হওয়ার পিছনে ব্যাঙ্কের বেশ কয়েকজন অফিসার জড়িত আছেন বলে সন্দেহ করা হয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অডিটর যে কয়েকটি মন্তব্য করেছেন তাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখছেন।

জানা গেছে যে, ইউনাইটেড ইনডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের কলকাতা অফিস যে কয়েকটি সংস্থাকে লক্ষ লক্ষ টাকা অগ্রিম দিয়েছে সেগুলি আজো পর্যন্ত আদায় হয় নি এবং সেগুলিকে অগ্রিম দেওয়ার সময় কোন ব্যাঙ্কিং নিয়ম মানা হয় নি। এই সংবাদদাতা জানতে পেরেছেন যে মেসার্স পের্শিয়ালি কোল কোম্পানীকে প্রায় আটত্রিশ লক্ষ টাকা, মেসার্স কুয়ারডিয়াল কোল কোম্পানীকে প্রায় পনের লক্ষ টাকা, মেসার্স সুরিন্দ্র ইন্ডিয়ানিং ওয়ার্কস লিমিটেডকে প্রায় এগার লক্ষ টাকা, মেসার্স ডায়না রোলিং মোটারকে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা, মেসার্স কুসুম উল এ্যাণ্ড উলেনসকে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা, মেসার্স কুসুম হোসিয়ারী মিলস প্রাইভেট লিমিটেডকে পাঁচ লক্ষ টাকা, মেসার্স অরুণা মেটাল ওয়ার্কসকে চার লক্ষ টাকা প্রভৃতি এই ভাবে প্রায় এক কোটি ছাপান্ন লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কলকাতার ভবানীপুর ব্রাঞ্চ থেকে অরবিন্দ এনটারপ্রাইসকে একটা ইটখোলার জুথ এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার টাকা এবং ইনডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন সেন্টারকে কোন রকম সিকিউরিটি না রেখে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা নগদ দেওয়া হয়েছে। আরো যে সব কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে ইনডিয়ানিং কনস্ট্রাকশন কোম্পানী, ব্যানার্জী ইন্সপোর্ট প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সবচেয়ে মজার ব্যাপার ভবানীপুরের যে ম্যানেজারের রিটায়ার করতে মাত্র দু'মাস

বাকী ছিল তাকে ঐ দু'মাসে অতিরিক্ত ক্ষমতা দিয়ে প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা ধন দেওয়ার অধিকার দেওয়া হলো কিসের ভিত্তিতে।

এই সংবাদদাতা ব্যাঙ্কের বেশ কয়েকজন কর্মচারীকে প্রশ্ন করেন এবং অধিকাংশ কর্মচারীই যে চারজন অফিসার সম্বন্ধে অভিযোগ করেন তাদের মধ্যে স্পেশাল অফিসার সুধাংশু মিত্র, সুপারিনটেনডেন্ট সন্তোষ ঠাকুর, সুহাস চ্যাটার্জী ও মুন্সী প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে সন্তোষ ঠাকুরকে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের এ্যাণ্টিব্রিভা বিভাগে কিছুদিন আগে জিজ্ঞাসাবাদের জুথ ডেকে পাঠান হয়েছিল। পুলিশের কাছে তার বিরুদ্ধে জরীদ ব্যক্তি অভিযোগ করলে তাকে ডেকে পাঠান হয়।

স্পেশাল অফিসার সম্বন্ধে অভিযোগ যে, রিটায়ারমেন্টের পরও ঐ অফিসারকে প্রতি বছর এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছে এবং তিনি নাকি এখন ব্যাঙ্কের বকলমে জেনারেল ম্যানেজার। তার হাতে বাবতীয় ইন্সপেকশন, এবং প্রায় দু'লক্ষ টাকা লোন শ্রাংশান করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া তাঁকে ম্যানেজমেন্ট কমিটির অগ্রতম সদস্য করা হয়েছে। তিনি নাকি নিজের ইচ্ছে মত বা খুশী তাই করে চলেছেন। নিজের ক্ষমতা বলে তার দুটি ছেলেকে ব্যাঙ্কে বিশেষ কাজে নিয়োগ করেছেন যাদের গত কয়েক বছরের মধ্যে কলকাতার বাইরে কোন দিন বদলী করা হয় নি। অথচ তাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কর্মচারী কোন কিছু বলেছেন তাদেরই সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার বাইরে বদলী করে দেওয়া হয়েছে। কারণ স্পেশাল অফিসার সি, পি, আই ইউনিয়নের মদত পাচ্ছেন। অভিযোগে প্রকাশ, ঐ স্পেশাল অফিসার যে সব অজ্ঞ ব্রাঞ্চে ছিলেন বিশেষ করে শ্রামবাজার, বড়বাজার প্রভৃতি ব্রাঞ্চে তখন ধার দেওয়া কয়েক লক্ষ টাকা আজও ব্যাঙ্কের অনাদায়ী থেকে গেছে। অথচ বর্তমানে কোন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার যদি কোন ব্যক্তিকে মাত্র পাঁচ হাজার লোন দেন এবং তা অনাদায়ী থাকে তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে শো কন্স নোটিশ দেওয়া হয়।

ভারত-জার্মান সহযোগিতার সাক্ষ্যের চাবিকাঠি কোথায়?

ভারতীয় ও জার্মান জনগণের প্রতিভার মিলন, যা স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমগ্র মানব কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত।

ভারতের প্রবল ক্ষেত্রের প্রজাতন্ত্রী জার্মানীর জনগণ গত ২৫ বছর ধরে এই উদ্দেশ্যে যুক্তি সহযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সফলতার সংপ্নে কাজ করে এসেছে।

এক নজরে ভারত-জার্মান সম্পর্ক :

১। বাণিজ্য

জার্মানিতে ভারতের রপ্তানি

১৯৭৫-এ ১৫% বৃদ্ধি

—৪৮৩ মিলিয়ন ডি.এম.

১৯৭৬-এর প্রথম ছয় মাসে ৬৩% বৃদ্ধি

—৩৯৭.৩ মিলিয়ন ডি.এম.

জার্মান মেলাগুলিতে ভারতের সস্ত্র ও সাক্ষ্য জনক অংশ গ্রহণের জন্য ১৯৭৭-এ বাণিজ্যের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল। ১৯৭৬/৭৭-এ ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের সুনিশ্চিত ফলপ্রসূতি আশা করা যায়।

জার্মানী থেকে ভারতে আমদানী

১৯৭৫-এ ৩.৫% হ্রাস

—৮৬৩ মিলিয়ন ডি.এম.

১৯৭৬-এর প্রথম ছয় মাসে ৩% হ্রাস

—৪৫২.৭ মিলিয়ন ডি.এম.

ভারতীয় নিজের ঘাটতিজনিত

রেকর্ডে উল্লেখনীয় হ্রাস।

১৯৭৫-এ ২০% হ্রাস

—৬৮০ মিলিয়ন ডি.এম.

১৯৭৬-এ জানুয়ারী থেকে জুন ৭৫% হ্রাস

—৫৫.৫ মিলিয়ন ডি.এম.

২। সহায়তা

১৯৭৬-বিপাকিক সরকারী মূলধনী সহায়তা

(আই ডি এ'র শর্তে প্রদত্ত মেয়াদ ৫০ বছর

১০ বছর অবধি ছাড় ০.৭৫% সুদ, অতএব,

অনুদান অংক ৮৪%)

—বহুপাকিক সহায়তা

—বেসরকারী মঞ্জী (১৯৭৬ পর্যন্ত)

১৯৭৭ বন-এ গত ২৪শে জুন, ১৯৭৬ ভারত ও ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানীর মধ্যে ১২৪ কোটি টাকার

(৩৬২ মিলিয়ন ডি.এম.-এর) জার্মান বিপাকিক সরকারী মূলধনী সহায়তা সম্পর্কিত চুক্তি হয়।

৩। শিক্ষা বিনিময়

ভারত ও জার্মানীর মধ্যে বিবিধ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বর্তমান। এর একটি দিক হল শিক্ষা বিনিময় :

(ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের তদারকীতে) কারিগরী শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য জার্মান ছাত্রবৃত্তি

জার্মান শিক্ষা বিনিময় পরিষেবার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ছাত্রবৃত্তি, হুমবোল্ডট ফাউন্ডেশন-এর

গবেষণার জন্য ছাত্রবৃত্তি, ভারতের মাদ্রাজ স্থিত আই আই টি'র মত বিখ্যাত প্রযুক্তি শিক্ষা সংস্থার

জন্য সহায়তা, আলোচনাচক্র ও সম্মেলনের মাধ্যমে জার্মান এবং ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের মধ্যে জ্ঞান

বিনিময়ের জন্য সম্পর্কের উন্নতিকরণ এবং ভারতীয় ও জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের গবেষণা প্রকল্প-

গুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ইত্যাদি হল ফলপ্রসূ বিনিময়ের কয়েকটি উদাহরণ।



ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানী—এক নির্ভরযোগ্য সহযোগী

দানিকেন তত্ত্বের আলোকে মহাকাশচরিত্রের সূচনা ও দেবতা বীরপ্রমি

“আমরা সামান্য নারী”

স্বর্বেশ্বর হিসেবে যতই কেননা বিজ্ঞাপিত হয়ে থাকুন, উর্বশী নিজেই স্বীকার করেন, তিনিসামান্য নারী। আর বস্তুত তিনি তাই-ই। তাঁর মধ্যে এমন কোনো বিশেষ চমৎকারিত্ব নেই যা তাকে কোনও ভাবে কোনো রকম আলোকসামান্য স্বর্গীয় মহিমা দান করতে পারে।

“মন্মথশরে নিত্যন্ত নিপীড়িত হইয়া” “পৃথুনিতমিনী” উর্বশী “স্বীয় নিবাস হইতে বহির্গত হইয়া পার্শ্ব-ভবনান্তিমুখে গমন করিতে লাগিল।”

“সেই সর্গাঙ্গীন্দ্রী দিব্য চন্দন চর্চিত বিলোল হারাভলিলিত, পীনোন্মত্ত পয়োধরয়ুগল বিকম্পিত হওয়াতে পদে পদে নমিতাঙ্গী হইয়া গমন করিতে লাগিল। তাহার ত্রিবলী দাম মনোহর কটিদেশের কি অনির্বচনীয় শোভা! তাহার গিরিবর-বিস্তীর্ণ রক্ততরণনারজিত নিতম্ব যেন মন্মথের আবাসস্থান, স্তম্ভ বসনারূত অনিন্দনীয় তদীয় জঁখন নিরীক্ষণে ঋষিগণেরও চিত্তবিকার জন্মে; ...একে তো সেই সুর-সুন্দরী সহ-জ্যেই মদোন্মত্তা, তাহাতে আবার পরি-মিত সুরাপানে প্রাজ্ঞচিত্ত...” (রন, ৫০)।

বর্ণনাটি যে কোনো উত্তরদেশীয়া সুন্দরী মহাশয়ই হতে পারে। একমাত্র ‘নিতম্বের’ গুণগানেই মহাভারতীয় চরিত্রটি ধরা পড়ে। মহাভারতে ‘নিতম্বের’ প্রশংসা নারীর প্রতি তৎকালীন ও তৎকালীন কল্পিত-মেট্রা বলা বাহুল্য, কবি স্বর্বেশ্বরের ক্ষেত্রেও সমান প্রশংসাসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। স্বর্গীয় চরিত্র হিসেবে উর্বশীর ক্ষেত্রে অততরকোনা বিশেষণ প্রযুক্ত হয়নি।

কিন্তু তাও বড় কথা নয়। লক্ষ্যীয় এই যে, সাধারণ কামার্তা রমণীর মতো মিত-সুরাপানের পর তিনি পৃথাপুত্র অর্জুনের পার্শ্বাশ্রিত্যে চলেছেন আসঙ্গ স্বখ লালসায় সর্বক্ষেত্র শিহরণ জাগিয়ে। ঘটনাটির মধ্যে অলৌকিকতার স্পর্শমাত্র নেই। সাধারণ রক্তমাংসের নারীরূপেই ধরা দেন উর্বশী। তাঁকে স্বর্বেশ্বর হিসেবে স্বতন্ত্রভাবে আর দেখা যায় না।

স্বর্গ ও মর্ত একাকারে মিশে যায়। আমরা বুঝি, এক্ষেত্রেও আমাদের সিদ্ধান্ত সঠিক পথেই চলেছে। ভিন্ গ্রহের বুদ্ধিমান জীবগণ আমাদের মতই মহাশয় শরীরধারী। তাঁদের সঙ্গে আগত নারীরাও পার্শ্বাশ্রিত্য নারীর সকল গুণসম্পন্ন। তাই, যেমন দেবতা নামক নভসঙ্গগণ পার্শ্বাশ্রিত্য নারীর সঙ্গে যৌনসঙ্গমেসকালে তৃপ্ত হয়েছিলেন, তেমনিই মহাকাশচারিণী রমণীও ছিলে এই গোলকের পুরুষ-গণের অধঃশায়িনী হওয়ার জন্য উন্মুখ।

প্রাচীন পুঁথিপত্রে দেব (নভসঙ্গ)-মানব যৌনমিলনের কথা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। পুরাকালে মাহুয়ের কোনো কোনো বংশ দেব-ঔরসে সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবি করা হয় প্রায় সকল প্রাচীন পুঁথিতে বর্ণিত প্রাগৈতিহাসিক কাহিনীগুলির মধ্যে। সর্বত্র প্রাপ্ত একই তথ্যাদি আজকের চিন্তাবিদগণের বিশেষ প্রশ্নভাবনার কারণ। সেই সব বিবরণকে তাঁরা নেহাৎ গাল-গল্প বলে আজ খুব সহজেই উড়িয়ে দিতে পারছেন না; আবার স্বর্গীয় দেবতাদের মর্ত লীলা বলেও এসব গল্পকে মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

ঘটনাক্রমবিচারে আজকের গবেষক ও ভাবুকরা পুরা-পুঁথি-বর্ণিত দেব-মানব মিলনকাহিনীগুলিকে ব্যাখ্যা করছেন খুবই বুদ্ধিগ্রাহ্য তর্কের দ্বারা। তাঁরা বলেন, দেবতা সেজে এই গোলকে একদিন যারা ভয় ও ভক্তির আসনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁরাই মর্তের নরনারীর সঙ্গে দেদার যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেন। তথাকথিত দেব-ঔরসে এই ভাবেই মাহুয়ের কয়েকটি বংশধারা ও গোত্রাদির সৃষ্টি হয়। মহাকাশ বিজ্ঞানের আলোকে দেবতাদের নয়া ব্যাখ্যা এমনিভাবে ধরা পড়ার আগে কিন্তু আমরা অবাক হয়ে প্রাচীন পুঁথির গল্পগুলিকে হেঁয়ালি ও অবাঞ্ছিত ভেবেছি। মহাভারত খুলে একে অতর্কিত প্রশ্ন করেছি মহাভারতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্মপরিচিতির মধ্যে উদ্ভূত গোলমাল লক্ষ্য করে। পাণ্ডব-দেব-ঔরসে কুন্তীগর্ভে জন্ম রহস্ত-

মাত্রই থেকে গেছে। যখন ঐতিহাসিকগণ প্রায় একমত হয়ে বলছেন, কুরুক্ষেত্রে একটি যুদ্ধ বস্তুতই হয়েছিল এবং তা ঐতিহাসিক, তখনও আমরা তা মেনে নিতে পারছি না। পারছি না শুধু এই ভেবেই যে, তা কী করে সম্ভব? পাণ্ডবরা দেবতার সন্তান একথা কোন বুদ্ধি বুদ্ধি দিয়ে মেনে নেওয়া যায়?

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা বাস্তবপক্ষে পাণ্ডবদের মাধ্যমে লড়লেন নেপথ্য-চারী দেবতারা এটাই বা সম্ভব কী করে? ওসবই কবি কল্পনা, গাঙ্গা, উদ্ভট চিন্তা।

কিন্তু আগের আলোচনাগুলিতে তথাকথিত ঐ দেবগণের স্বরূপ আমরা নানাভাবে বিচার করে নানান তথ্য-বলীর সাহায্যে দেখাতে পেরেছি যে বস্তুত দেবতা একটি নাম। মাহুয়ের তৎকালীন বিশ্বয় এই নামে গ্রহাস্তর থেকে আগত নভসঙ্গদের পূজা নিবেদন করে। সেই নভসঙ্গগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মহাকাশখানে চেপে অবতরণ করেন এবং কোথাও দেবতা কোথাও বা ‘ঈশ্বর পুত্র’ রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। এই গোলকে তাঁরা এক বা একাধিকবার এসেছিলেন আন্তর্জাতিক জীবন ও জগৎ সম্পর্কে গবেষণার জন্য। (একথা রুশ পদার্থবিদ ম্যাটেল্ট আগারেস্টের) কিন্তু পৃথিবীর মাহুয়ের সঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্কে বিজড়িত হয়ে পড়তে হয় তাঁদের। যুদ্ধ, সন্ধি, সখ্য ও যৌন সম্পর্কের মতো জৈবিক ব্যাপারগুলিও এড়াতে পারেন না তাঁরা। গ্রহাস্তর-বাসী মহাকাশচারী যেমন মানবী গর্ভে জাত মানব পুত্রের পিতৃস্ব লাভ করেন (পাণ্ডব পিতা ইন্দ্রাদি দেবগণ) তেমনিই ‘মহাকাশচারিণী রমণীগণ গর্ভিনী হয়েছেন পৃথিবীপুত্রের ঔরসে (যেমন শকুন্তলা জননী মেনকা এবং ভীষ্মজননী গঙ্গা, যদিও গঙ্গা স্বর্বেশ্বর ছিলেন না)। এসবই বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপার। এই স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা পুরা-পুঁথির বিবরণগুলিকে আর হেঁয়ালীর পর্যায়ে ফেলে রাখে না, সরাসরি তারা প্রাগৈতিহাসিক যুগের গোপন ইতিহাসটির সন্ধান দেয়। কুরুক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিষয় বলে মেনে

নেওয়ায় যে প্রধান বাধা ও ধোঁকা তাও অপসারিত হয়।
উর্বশী ছিলেন তেমনিই এক মহাকাশচারিণী স্বর্বেশ্বর। আন্তর্জাতিক শিবিরের এক প্রভু ইন্দ্র তাঁকে নিয়োগ করলেন মিত্রপক্ষীয় পাণ্ডব পক্ষের রাজপ্রতিনিধি পার্শ্বকে পরিতুষ্ট করার জন্য। মানবপুত্রের সঙ্গে যৌন মিলনের অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য উর্বশীও হলেন উদগ্রীব।

তৎকালীন মহাকাশচারিণীরা যে মানবপুত্র অপছন্দ করতেন না এ সম্পর্কে তাব একটি কাহিনী উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্ববর্তী আলোচনায় উল্লেখিত গিলগামেশ পুঁথিতে লিপিবদ্ধ আছে, সুমেরীয় উল্লুপতি গিলগামেশের প্রতি গৃহ্য হয়ে দেবী ইশতার (যুদ্ধ ও প্রেমের দেবী) গিলগামেশকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করেছিলেন। উর্বশীও অর্জুনকে পতিত্ব বরণ করতে চেয়েছেন। গঙ্গা রাজা শান্তনুর অঙ্কশায়িনী হয়ে বেশ কিছুকাল তাঁর ভোগবাসনা পূর্ণ করে গেছেন। এখানে বিবাহ বা পতিত্বপে আত্মহীন যৌন-মিলনের আকাঙ্ক্ষাকেই ইঙ্গিত করে। এঁরা কেউ সংসার করার মানসে এই পতিত্ব কামনা করেন নি। উর্বশী, তাঁর আকর্ষণীয় দেহ বিভ্রম দেখিয়েছিলেন আর দেবী ইশতার গিলগামেশকে প্রলুব্ধ করেছিলেন উপচৌকোন শুদানের লোভ দেখিয়ে। পুঁথির বর্ণনা এই রকম:

Come, Gilgamesh, be thou
my lover!
Do but grant me of thy
fruit,
Thou shall be my husband,
and I will be thy wife.
এই আত্মহানের সঙ্গে ইশতার এক লম্বা তালিকা হাজির করেছেন উপচৌকনের, যা তৎকালে বস্তুত লোভনীয় সম্পদ। [উঃ: Near Eastern Mythology, Gray, p. 43]।

বাইবেলের আদি পুস্তকে ঈশ্বরপুত্র বা ‘সঙ্গ অবাদি গড’ এর সঙ্গে পৃথিবীনারীদের যৌনসঙ্গির কথা বিবৃত আছে সদাপ্রভুর মুখনিহত বাণীতে। ইতিপূর্বে ইজেকিয়েল-দেখা মহাকাশযান প্রসঙ্গে সদাপ্রভুকে আমরা মহাকাশচারী অধিনায়কের চেহারা দেখেছি এবং তাঁর সেই ‘ঈশ্বরপুত্র’কে তাঁরই মহাকাশচারী সঙ্গী ও রক্ষী বলেই বুঝতে চেষ্টা করেছি। বুঝিয়েছেন শ্রীএরিক ফন দানিকেন। সদাপ্রভুর রক্ষীরা এই গোলকে যথেষ্ট যৌনজীড়া করে গেছেন।

বাইবেলের ব্যাখ্যা; পুরা পুঁথিগুলির মধ্যে গবেষকের দৃষ্টিতে দৃকপাত ও অতি ‘আধুনিক মহাকাশবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকদের অহুম্মেয় ও আলোচ্য বিষয়গুলি উর্বশীর সামান্য নারী চেহারাকে নক্ষত্রলোকবাসিনী রক্তমাংসের শরীর বলেই গণ্য করবে এবিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।
হিমালয়-স্বর্গে সেই বিলাসিনীর কথাই বলা হয়েছে। তাঁর দেহবল্লরীর বর্ণনাও অন্তান্ত নারীরই সমতুল্য। স্বতরাং অর্জুনের স্বর্গবাস এক পার্শ্বাশ্রিত্য স্বখবাস ছাড়া অন্য কিছু নয়। যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ কাল্পনিক। সে কথা পরে।

(চলবে)

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

১ টাকার হার

বার্ষিক ২২ টাকা

বার্ষিক ১১ টাকা

জৈয়সিক ৫.৫০ টাকা

টাকাভি ও চিঠিপত্র

পাঠাবার ঠিকানা:

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, মট লেন। কলিকাতা ১৩

নয়া চীনের নারী সমাজ

ইন্দিরা বসু

‘পুরুষ নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ’ এই যে ২০০০ বছরের পুরনো ধারণা তার অসত্যতা প্রমাণ করেছে নতুন চীনের নারী সমাজ। মুক্তির পরে গত ২৫ বছর ধরে আধা ঔপনিবেশিক আধা সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা থেকে বর্তমান চীনের সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে চীনের নারী সমাজ পুরুষের সঙ্গে সমান দায়িত্ব বহন করে এসেছেন। মুক্তির আগে অগণিত নারী শিক্ষার কোন সুযোগই পাননি, তাদের অজ্ঞতার জ্ঞান মন ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সমাজে এবং গৃহে তারা ছিল নির্বাসিত, নিপীড়িত। সমাজে তাদের কোন স্থান ছিল না এবং গৃহেও কোন অধিকার ছিল না—অন্তর আদেশ পালন, গৃহস্থালীর কাজ করা ও শিশুপালন এই ছিল তাদের কাজ। পুরুষদের মত প্রাচীন সমাজে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে অনেক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। পিতামাতা বা স্বামীর আদেশ মত চলতে হতো, তাদের নিজস্ব সন্তা বলে কিছু ছিল না। শিশু জন্মাবার পরেও তার পা বেঁধে ছোট করে রাখা হতো। এ ছিল উদ্দেশ্যমূলক রীতি যাতে শত অত্যাচারেও তাড়া-তাড়ি পালাতে না পারে। সমাজে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল তাই বিবাহ ক্ষেত্রে পিতামাতা মেয়েকে প্রয়োজনে জব্দ সামগ্রীর মত বেচা কেনা করতো। তারাই পাত্র ঠিক করতো, পাত্রীর মতামতের কোন প্রশ্নই উঠতো না। বাড়ীতে স্বামীই সর্বো-সর্বা তাই গৃহে নারীর স্থান খুব সম্মানজনক ছিল। যে যুগে বড় বড় জমিদার ও ধনী ব্যক্তিদেরই সমাজে প্রাধান্য ছিল। তারা গরীব গৃহস্থের মেয়েদের ক্রীতদাসী হিসাবে কিনে নিত বা পিতার ঋণ শোধে অসমর্থতার জন্ত মেয়েদের জোর করে নিষে। নিত; কখন কখনও তাদের খেয়ালখুশীমত ভোগের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করতো। রাজনীতির ক্ষেত্রে বা সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে তারা যোগ দিতে পারতো না। নারী সমাজের যখন অসম্মানজনক অবস্থা তখন দেশে এলো জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং কয়েক বছরের ব্যব-ধানে এল গৃহযুদ্ধ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখে চীনের কিছু সংখ্যক শিক্ষিত

নারী ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দেশ ও সমাজের মঙ্গলের কাজে হাত দিলেন, অনেক নারী সংগঠন গড়ে তুললেন। এদের মধ্যে গরীব মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলার সংখ্যা নগণ্য ছিল। জাপানী আক্রমণ যখন দেশে এলো তখন চীনের নারী সমাজের কিছুটা চেতনা জাগলো কারণ প্রাণভয়ে, সম্মান-হানির ভয়ে তাকে অনেক সময় পালাতে হয়েছে গ্রাম ছেড়ে ঘর ছেড়ে—তার আহার বিহার আশ্র-রক্ষা সবই তার নিজের প্রচেষ্টায় হয়েছিল কারণ পুরুষেরা অনেকেই আক্রমণ রোধ করতে নানা কাজে নিযুক্ত ছিল। দেশে বা সমাজে কোন নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল না। মেয়েরাও শত্রু আক্রমণ রোধ করার কাজে লেগে গেল। এর পরেই এলো বিপ্লব। বিপ্লব যখন এলো তখন অনেক শ্রমিক কৃষক মহিলা বিপ্লবের কাজে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। এরকম একদল মহিলার সম্মান মেল লং মার্চের (Long march) সময়। “শ্রমিক কৃষক লাল বাহিনী” যেটা ছিল তাতে অনেক মহিলা ছিলেন। কিন্তু অস্ববিধা দাঁড়াল মধ্যবিত্ত পরি-বারের মহিলাদের। মধ্যবিত্তরা চিরকালই একটু রক্ষণশীল। অনেক কিছু বুঝেও মন থেকে সংস্কার কেড়ে ফেলতে পারে না।

এ বিষয়ে একটা ছোট গল্প বলছি। ক্যান্টনের কাছে কোন এক পরিবারের ছেলে যোগ দিয়ে-ছিল গেরিলা বাহিনীতে আর তার স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্যরা ছিল বাড়ীতে। ছেলে কাজ করছে—ভাল কাজ করছে এ ধারণা মায়ের আছে কিন্তু বাড়ীর বোঁ কোন সভ্য সমিতিতে যোগ দেবে তা মনে পারছেন না। এ তাদের কল্পনার অতীত। বিপ্লবের কাজে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের নামান বড়ই কষ্টসাধ্য ছিল। সহজে তাদের মন সংস্কার মুক্ত করা যায় না। মহিলা সমিতির কর্মীরা বার বার এই পরি-বারের সাহায্য সহায়তা চেয়েছে, নানা আন্দোলনে প্রতিবারেই শাস্তাভী এদের সঙ্গে অসম্মানজনক করেছেন, পুত্রবধূকে ছাড়েননি। শেষে তারা অস্ত্র পছা নিল। প্রতি-দিন একজন কর্মী এই বাড়ীতে এসে শাস্তাভীকে তার কাজে এটা ওটা সাহায্য করতে লাগলো এবং প্রতি-বাদ না করে তার মতামত শুনেতে লাগলো। কিছুদিন পরে বুড়ির মন ভিজলো আর এই মেয়েটির

উপর ভাল ধারণা হলো। সুযোগ বুঝে কর্মীটি বিপ্লবের পক্ষে একটু আধটু বলতে শুরু করলো এবং বোঝাতে লাগলো যে পরিবারের ছেলে যখন কাজে যোগ দিয়েছে তখন অন্যান্যদের তার কাজে সাহায্য করা উচিত। একদিন বোঁকে এক সমিতিতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলো আর বুড়ী মত দিয়ে দিল। এটা যে কেবল একটুমাত্র পরিবারের বেলাই সত্য তা নয়, অধিকাংশ পরিবারের এই অবস্থাই ছিল।

নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর নারী সমাজ সমিতির মাধ্যমে একদিকে যেমন তাদের সমাজে অধিকারের জন্ত দাবী জানাতে লাগলেন অপর দিকে সমাজতন্ত্র গঠনে তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে নারী সমাজকে সচেতন করে দিতে লাগলেন। কিছু সংখ্যক মহিলা রাজনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্ভূত হয়ে পার্টিতে যোগ দেন। চীনের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী সমাজ—এদের শক্তি যদি অবহেলা করা হয় তবে এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে না ভেবে সরকার ও পার্টি তাদের সাদরে গ্রহণ করে কাজে লাগালো। মহিলারা সর্ব-ক্ষেত্রে পুরুষের সমান সমান কাজ কবে চললো, বিজ্ঞান বুদ্ধিতে তারা কোন অংশেই পুরুষদের থেকে কম নয়। সমাজতন্ত্র গঠন কাজে তারা সর্বতোভাবে সাহায্য করতে লাগলো। মাও বলেছিলেন যে নারী সমাজের মুক্তি না হলে সমাজ-তন্ত্রের রনিয়াদ শক্ত হবে না। এই মুক্তির জন্ত কিছু কিছু পছা অবলম্বন করা হলো আর সঙ্গে সঙ্গে পুংনো আইন রহিত করে নতুন আইন হ’লো যাতে বিবাহে পাত্রপাত্রীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হলো। ১৯৫০ সালে জীবন বীমা আইনে নারী ও শিশুদের স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হলো। কো-অপারেটিভ যখন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন কৃষিতে ছেলেদের সাহায্যের জন্ত দলে দলে মেয়ে এসে যোগ দিল, বিশেষ করে বীজ বপন ও শস্ত তোলার সময় কারণ এ সময়েই কাজ বেশী থাকে। স্বামী বা পিতার হ’লে বিনা বেতনে তাদের কাজ করতে হলো না। ১৯৫৩ সালে ঘোষণা করা হলো যে সমান কাজে নারী পুরুষ সমান পারিশ্রমিক পাবে।

শহরে ও গ্রামে মেয়েরা ঘর ছেড়ে আপনা-থেকেই উৎপাদনের কাজে এসে যোগ দিল—তাতে তাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা এলো এবং রাজ-নীতির ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে তারা সমান অধিকার পেল। আইন করে মেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়া হলো। দেশ গঠনের কাজে যখন দিকে দিকে সাদা পড়ে গেল তখন অনেক মহিলা (তাদের মধ্যে গৃহিনীর সংখ্যাই বেশী) ঘর ছেড়ে বাইরে এসে পাড়ার কল কারখানায় কাজ নিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নিজেদের সামান্য সম্বল নিয়ে এবং অন্যান্য কারখানার সাহায্য নিয়ে ছোট ছোট কারখানা গড়ে তুললেন—যেমন পিকিংয়ের ট্রানজিষ্টরের যন্ত্রপাতির ও চশমার কাঁচের কারখানা। এগুলি এমন ক্রমে ক্রমে কলেরবে ও গুণগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চীনের নারী যখন সব বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার পেল তখন পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সব কাজ করে চললো। কিছু কিছু কাজ আছে যা মেয়েদের শারীরিক গঠনের জন্ত করার অস্ববিধা আছে। সেগুলি বাদ দিলে কোন কাজেই তারা পিছিয়ে পড়ে নেই। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সব ক্ষেত্রেরই তাদের অবদান আছে।

আজ চীনে মহিলারা সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান—তাচাই, তাম্রিন প্রভৃতি আদর্শমানীয় প্রতিষ্ঠানেও মহিলাদের সংখ্যা নগণ্য নয়। ১৯৬৩ সালে তাচাইয়ে কো-কেন্স-লিনের নেতৃত্বে একটি টিম গঠন করা হয়—টিমের নাম আয়রণ গার্লস টিম। আজ সেই নেত্রীই ব্রিগেড পার্টির সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব পালন করছেন। লিনসেন কাউন্টিতে যে পাহাড়ে হুডঙ্গ কেটে জল আনা হয়েছে (Red Flag canal) তাতে পাথর কাটা, পুল তৈরী করা, ছোট নালি তৈরী করা সবটাকেই মহিলারা পুরুষের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছে। আজকাল মেয়েদের মধ্যে অনেক দক্ষ কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ও শিক্ষকও আছেন। অনেকে তারি ট্রাক ও ট্রেন চালাচ্ছেন, এমন কি বেসামরিক বিমান বিভাগেও মহিলারা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মিলিসিয়া বাহিনীতেও তারা দলে দলে যোগ দিয়েছেন। স্থানীয় বিপ্লবী কমিটির সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক ও রেল বিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত মহিলাদের সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ

ঘটেছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে মহিলা-দের অবদান সবচেয়ে বেশী। গ্রামের কৃষি প্রতিষ্ঠান ও শহরের ফ্যাক্টরিতে শিশু ও মাতৃ মঙ্গল বিভাগে এরাই সংখ্যায় বেশী। বিশেষ করে ‘নাক্সা পায়ে ডাক্তার’ তো শহরে, গ্রামে, গঞ্জে সর্বত্র ছেয়ে আছে।

ক্রমে, কিংডারগটেন, শিশু ও মহিলা চিকিৎসা বিভাগে এবং ক্যান্টনগুলিতে মেয়েদের এক-চেটিয়া অধিকার বলে মনে হয়। সামাজিক বন্ধন ও পারিবারিক বাতাকলের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি পেয়ে সব ক্ষেত্রেই তারা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। “নারী অর্ধেক আকাশ কাঁধে বয়ে চলে” নতুন চীনের এই প্রচলিত উক্তি যে কত সত্য তা নারী সমাজ আজ সর্বতোভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন।

অসংস্কৃতি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সংস্কৃতি ব্যাপারটাই জনগণ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাক। সাং-গন যুক্ত হবার আগে ভিয়েতনাম থেকে একদল প্রতিনিধি এসেছিলেন। আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, সাংগনে কি ধরনের সিনেমা চলে। তারা বলেছিলেন যে সেখানে যে সব রু ফিল্ম চলে তার দর্শক শুধু আমে-রিকান সৈনিকেরা এবং কিছু Luna-tic, তাহলেই বুকুন ওখানে অপ-সংস্কৃতি কি রকম জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। আমরাও চাই আমাদের দেশে অপসংস্কৃতিকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে। তাহলে আপনা থেকেই সব বন্ধ হয়ে যাবে। তবে মিছিল বিকোভ করা যেতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা বিতর্কের মাধ্যমে জনমত সংগঠিত করতে চাইছি। জনমত সংগঠিত হলে-অস্ত্র পন্থার কথা ভাবা যাবে।”

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, “বার-বধূর অসীম চক্রবর্তীকে আমি বলেছি, আপনি তো রবীন্দ্রনাথ করেছেন আবার বারবধুও করেছেন। আপনি ভালই জানেন কোনটা সাদা কোনটা কালো, তা আপনি এ রকম করছেন কেন?”

বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য আলোচনা

অরুণা হালদার

ডঃ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ' (প্রকাশক: আশা প্রকাশনী, ৬৪ মহাস্থা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। দাম: কুড়ি টাকা।) পড়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছি। আশ্চর্যের দিনে বিভ্রান্ত মানুষের মিছিলে বহু বুদ্ধিজীবীরই কঠিন সঙ্কট দেখা দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে একাংশ অন্ততঃ এই বইয়ের দ্বারা চিন্তনের নতুন বিষয় পাবেন—হয়ত বিভ্রান্তির কিছু আংশিক সমাধানও পাবেন বলে মনে করি।

ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্বনামখ্যাত চিকিৎসক-মনোবৈজ্ঞানিক। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় ব্রিটিশ স্কুল-ভুক্ত মনোবিজ্ঞানী নন। তিনি এদেশে পাতলভীয়া মনোবিজ্ঞান-চর্চার প্রবর্তক-গবেষক এটিই তাঁর মূল্য পরিচয়।

মনোবিজ্ঞানী ফ্রেড ও পাতলভ প্রায় একই সময়কার লোক। উভয়েই স্বায়ু বিশেষজ্ঞ হিসাবে, দক্ষ চিকিৎসক হিসাবে জীবনযাত্রা করেন। ফ্রেড ক্রমশঃ তাঁর প্রবর্তিত মুক্তাঙ্ক-যুক্ত পদ্ধতি দ্বারা মনোব্যাপির উৎস অন্বেষণ ও চিকিৎসা করতে থাকেন। নিঃসন্দেহ যে তাঁর প্রবর্তিত চিকিৎসাপন্থা তাঁর হাতে কিছু অসুস্থ ও মনোবিকার সম্পন্ন রোগীর সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু অনেকাংশেই পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সে বিজ্ঞা-বাচাই করা যায় নি বলে গেটা এক-রূপ কলিত মনোবিজ্ঞানের অপরিণীত তথ্য বা empirical truthই আমাদের দিতে পারে একথা বলা যায়।

অপর পক্ষে পাতলভ ক্রমশঃ Every Psychosis has got a Neurosis এই সত্যকে তথ্যনিষ্ঠ ও পরীক্ষিত প্রতিষ্ঠায় রূপায়িত করে তোলেন। পাতলভীয় তত্ত্ব এখন আর অপরিণীত তত্ত্বজাল নয়, অল্প যে কোনও বিজ্ঞানের মতই তা পরীক্ষা নির্ভর। আর সেই পরীক্ষার একটা বৃহৎক্ষেত্র মধ্যে পড়ে মানুষ এবং তার সমাজ সংসার, তার শিল্প সংস্কৃতি, মনন ও স্বপ্ন সব কিছু। ইএ বিজ্ঞান আবার চিকিৎসা বিজ্ঞানও বটে। তার কলিত রূপ থাকবেই। সেই কলিত রূপের মধ্যে রোগনির্ণয় ও রোগমুক্তি (Diagnosis ও Prognosis) দুইই বিচার্য। নির্গলিত অর্থে পাতলভীয় মনোবিজ্ঞানেরই বিশাল প্রয়োগশালা এই মানব অধ্যুষিত পৃথিবী। এইভাবে পাতলভীয় মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের অস্থ্যাদ্যে আমাদের কাছে ফ্রেডীয় চিকিৎসা

প্রণালীর ব্যর্থতা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যখন তা অচিকিৎসকের হাতে পরিচালিত হয় তখন সেটা অবৈজ্ঞানিক না হওয়ার স্বপক্ষে কোনও যুক্তিই আমরা পাই না। আমাদের দেশে অন্ততঃ এখন পর্যন্ত চিকিৎসক অচিকিৎসক উভয়বিধ ব্যক্তিই মনোব্যাপির চিকিৎসা করে থাকেন। সেই চিকিৎসা চিকিৎসক ও চিকিৎসিত ব্যক্তিদের উপস্থিতি ও আমাদের সমাজে সংসারে রোগের মতই থেকে যায়।

পাতলভীয় বিজ্ঞান এখনও আমাদের দেশে নবাগত। তো বটেই, অপরিচিতও বলা যায়। অথচ এ গ্রন্থের 'পটভূমি' হলো বিজ্ঞান এবং পাতলভীয় মনোবিজ্ঞান। দ্বিতীয়ত, পাতলভের কর্মকাণ্ড মূল্যে সোভিয়েত ভূমিতে প্রসারিত হয়েছে। সাধারণ ভাবেই এদেশে এখনও বহু লোকের মনে সোভিয়েত তথ্য কমিউনিজম ও মার্কসিজম সম্বন্ধে একটি ভয় অথবা গৌড়ামী আছে। বলা প্রয়োজন যে এই দুই প্রকার মনো-ভাবই অবৈজ্ঞানিক এবং অন্ততঃ সেজন্যই শিক্ষিত লোকের তা সম্বন্ধে পরিশীলন দ্বারা পরিহার করা কর্তব্য। আলোচ্য গ্রন্থে এই চর্চা বা Ethics এর বৈজ্ঞানিক রূপটি কয়েকটি নিবন্ধের মধ্য দিয়ে লেখক পরিষ্কৃত করে তুলেছেন।

লেখকের আরও একটি বিশেষ দান হলো তরুণ মার্কসের দার্শনিক চিন্তাভাবনাকে বক্তব্যের মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তরুণ মার্কস ও পরিণত বয়স্ক মার্কসের রচনা দুই পর্যায়ের হলেও সে একই লোকের এবং এমন এক দার্শনিকের রচনা যে দার্শনিক তাঁর এই গভীর মনীষাকে নতুন পথে পরিচালিত না করলে তিনিই পাকাত্য দর্শনের ইতিহাসে হেগেলীয় দর্শনের পরে দর্শনের এক নবীন দিগন্তের দিশারী হয়ে প্রচলিত পথের সম্মান অর্থ ও প্রতিষ্ঠা সকলই পেতে পারতেন। তা তিনি করেননি স্বীয় বিবেকের সমর্থন পান নি বলে। গতানুগতিক পথ ছেড়ে তাঁকে তাই নিজস্ব আদর্শের অভিযানে অভিযাত্রী হতে হয়েছে। সেই অভিযানের বিকাশের পথে প্রথম দেখা দিয়েছে, মানব সমাজের নানা বিকল্প বিচ্যুতি এবং ব্যক্তি মানবের সর্বপ্রকার সম্ভাবিত বিকার—যার মোটামুটি নাম আমরা দেখছি বিচ্ছিন্নতা। আর উত্তর জীবনে এই আদর্শের অনন্ত পরিণতি

মার্কসীয় অর্থনীতি শাস্ত্র বা ক্যাপিটাল। আমরা প্রথমটিকে দেখতে পারি সমাজরোগের নির্ণয় বা Diagnosis হিসাবে, দ্বিতীয়টিকে দেখতে পারি Prognosis বা রোগ মুক্তি হিসাবে। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় স্বীয় রচনায় এই উভয়ের সুসমঞ্জস সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তজ্জনিত বহু ভাস্কর্য সম্ভাব্য সমাধান দিয়েছেন।

ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় কেবলমাত্র গবেষক হিসাবেই, তথ্যই প্রকাশ করেন নি। তাঁর নেতৃত্ব দায়িত্ব-বোধ ও সমাজ সচেতনতা তাঁকে আধুনিকতম সমাজগুলির সম্মুখীন করেছে। মানুষ পিতৃমাতৃ কোড়ে জন্ম নেয়, স্বাভাবিক ভাবে সে সংসারে সমাজে বেড়ে ওঠে। এইভাবে আবার সে বিশ্বমানব সমাজেরও নাগরিক স্বীকার করে। প্রতি মানুষের মধ্যেই এইরূপ বিকাশের একটা সংস্কারভূমি ও সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া কোনও সমস্তাই শুধু এদেশের বা বিদেশের নয়। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় তাই এদেশের বা বিদেশের সমস্যাকে পৃথকরূপে দেখা-নোর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মূল ত্র্যকোরও আলোচনা করেছেন। সমস্যার মূল কারণ যেমন সর্বাত্মগত (Universal) তেমনই সর্বাত্মগত হবে তার সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা। সেই পথেই সমস্যার সমাধানও পাওয়া যাবে। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এদেশে ও বিদেশে সাম্প্রতিক 'বিচ্ছিন্নতা' সংক্রান্ত সমস্যাগুলি চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে দৃষ্ট ও শ্রব্য নাট্যকাব্যের মাধ্যমে আচ্ছন্ন এই বিচ্ছিন্নতাকে আমরা দেখছি ও গ্রহণ করছি নিরন্তরভাবে। দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি অদ্ভুত রসের সাহিত্যে ও শিল্পে। জন-মানব বিকৃত আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে অস্থির অপরিণত (অথবা অপরিমিত) যৌনাবেগের কবলীভূত ফিল্মে, নাট্যকাব্য অথবা গায়েরী খুন জখম হলোড়ে সমন্বিত এক প্রকার দূরদৃষ্টি-হীন তথ্যকথিত আন্দোলনের মধ্যে। এগুলিও তো বিকার। হয় সে বিকার ব্যক্তি আশ্রিত অথবা তা সমষ্টির মধ্যে অস্থায়িত। এরও একটু উপর দিকে উঠলে আমরা বুদ্ধিজীবীদের স্বভূমিতে আসি। সেখানে এই সমস্যার রূপ আরও জটিল আরও কঠিন। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় এই অতি কঠিন সমস্যাকেও আচ্ছন্ন আমাদের

সামনে তুলে ধরে আমাদের রক্তজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

দার্শনিক, রিস্তানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও ক্রয়েডোত্তর যুগের বিশিষ্টতা লক্ষ্য করার মত। একদিকে প্রথম যুদ্ধোত্তর ইউরোপে ও আমেরিকায় যথাক্রমে স্তম্ভবাদ দর্শন ও লজিক্যাল পজিটিভিসমের আবির্ভাব লক্ষ্য করার মত। এর আগে থাকতেই মার্কসবাদকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা চলে আসছিল। (দ্রষ্টব্য নিবন্ধ নং ৭—পৃঃ ১১০) পরেও সে ধারা এখনও অপ্রতিহত গতি। সমাজ-তাত্ত্বিক লেখকদের অনেকেই তাঁদের রচনায় ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন, যুদ্ধোত্তর সামাজিক চেতনার অবক্ষয়মান অস্থিত্য দিয়ে। এ প্রসঙ্গে ধারাবাহিক-ইতিহাসসম্মত আলোচনা ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় এত নিপুণভাবে করেছেন যে তাঁকে আমরা ইতিহাসের সুযোগ্য ছাত্রও বলতে পারি। অবশ্যই বুদ্ধিজীবীর বিপদ কাটিয়ে উঠতে হলে বা বুদ্ধির তাৎপর্যকে কাজে লাগাতে গেলে ইতিহাস প্রসঙ্গ মানতেই হবে। সেদিক দিয়ে হেগেল থেকে নিয়ে আজকের দিনের কামু সাত্র পর্যন্ত তিনি বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে এগিয়ে এসেছেন। মনো-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কস ও ম্যাকিন টায়ারের মতবাদেরও যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি এসকল লেখকের প্রভাব আজকের ভারতীয় ও বাঙ্গালী লেখকের মধ্যে লক্ষ্য করে তা নিয়ে আলোচনাও করছেন। এ স্থলে তাঁর বক্তব্য আমাদের পরিষ্কার করে বোঝা দরকার। সম্ভবতঃ এই 'বিচ্ছিন্নতা'র অনেকখানিই এখন পর্যন্ত আমাদের দেশের লেখকদের মধ্যে ভিন্ন দেশীয় লেখক-দার্শনিকের প্রভাব জাত আমদানী বা প্রতিধ্বনি। এখনও ঠিক এ 'বিচ্ছিন্নতা'র জন্ম-এদেশের মাটিতে হয়নি। কারণ এদেশের মাটিতে এখনও এত বেশী ধনাত্মক দৃষ্টি পীড়া দেবার মত উদ্যোগ ব্যাপার বা Industrialisation দেখা যায় নি। এই কথাটি অস্বাভাবিক। এবং সেই কারণেই হয়ত ক্ষীণ আশা করা যেতে পারে বিদেশগত ধনাত্মক অসঙ্গতির ফলজ্বলিত বিকার আমাদের দেশের মাটিতে নতুন ফসল ফেলাবে না।

কিন্তু এদেশের মাটিতেই কি বিকারের কম বীজ অন্তর্নিহিত হয়ে আছে? বিকারের বিক্ষোভ দেখা দেয়নি ঠিকই, কিন্তু অন্তর্ঘাত কপটতা হিংসা আত্মহত্যা কোনটা বা কম এদেশে? আর, এসবের অনেকখানি কারণ ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন আমাদের দেশের সংরক্ষণ-শীলতা ও ধর্মধর্মী মনোভাব দোষ-

হুট। অথচ ইদানীং বহু লেখক সমগ্রভাবে এই আত্মত্যাগিক আত্ম-সমীক্ষণ অথবা কোনও মার্মিক অস্থিত্য অথবা আরও প্রত্যক্ষভাবে কোনও না কোনও ধর্মধর্মের পক্ষপৃষ্ঠে আশ্রয় নিয়ে তৃপ্ত মনে সাহিত্যশিল্প-সৃষ্টি করে চলেছেন। এ পথের উত্তরণ নিতান্তই যদি সম্ভব হয় তা হলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আরও রিপদের কথা বহুলাংশে আমাদের রাজনৈতিক দল-গুলিও একপ এক একটি ধর্মীয় আশ্রয় স্থলের রূপ নিচ্ছে। এদের মধ্যেও দেখা যাবে শুদ্ধ দলপুষ্টির জ্ঞাত আগ্রহ, বুদ্ধি ও যুক্তিহীনতা, আদর্শবাদের অবচ্যুতি এবং পরমত অসহিষ্ণুতা। এরূপ মতবাদও প্রচার সাপেক্ষ এবং প্রচারের ফলে টিকেও থাকে। কিন্তু তার একমাত্র আপেক্ষিক ফললাভ হয় এক রকমের ব্যর্থপন্থতা বা ক্ষয়িক্স সমাজ জীবনেরই প্রত্যক্ষ ফল এবং সমাজ জীবনকে আরও অধিকতর ক্ষয়শীল করে তোলার জ্ঞাত দায়ী।

ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় এ গ্রন্থে পর পর তিনটি প্রবন্ধে (পৃঃ ১০৩—রবীন্দ্র-মানস বিশ্লেষণের সূক্ষ্মিকা) রবীন্দ্র-রচনার কিয়দংশ অবলম্বনে রবীন্দ্র-মানসের একটা পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর সামগ্রিকভাবে বিচ্ছিন্নতা-র আগন্ত ইতিহাসের মধ্যে এ অংশটি একটি মূল্যবান গ্রন্থনা ও নতুন-তর অবলোকন। এদিক দিয়ে রবীন্দ্র-নাথের আলোচনা আর কেউ করেছেন বলে শুনি নি। এ মূল্যায়নে তিনি পথিকৃত। এ প্রসঙ্গে হয়ত মতভেদের অবকাশ আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে বিচ্ছিন্নতার আলোকে দেখার প্রয়াসের অভিনবত্ব আছে মানতেই হবে।

ডঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'ছাত্র-বিক্ষোভের মনস্তত্ত্ব' এবং 'শিক্ষা ও বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গে' ও 'তরুণ বিপ্লবীর পত্র' এই তিনটি নিবন্ধ প্রসঙ্গতঃ সম্পর্কিত। আধুনিক কালে তরুণ মানসে নিরবগুষ্ঠিত আত্মপ্রকাশকে কেবল মাত্র ভয়াবহ বা শোচনীয় না বলে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তার গতি ও প্রকৃতি নিরাকরণ করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে সমগ্র তরুণ সমাজের দাবী আজ, রথের রশ্মি তারাই তুলে নেবে। এই সত্যজাগ্রত নব যুগশক্তি আর সমস্ত কিছু পদ-দলিত মথিত করে দিলেও এ পৃথিবী তারা স্বজনাঙ্ক কোনও সমাধানের সন্ধান দেয়নি। সে পথের সন্ধান তারা পেয়েছে কিনা তা আমরা জানি না। এখন পর্যন্ত যাচোখে পড়ে তা হলো ক্ষোভের বিক্ষোভ ও ধ্বংসের তাণ্ডব। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে দুই একটা সমাধানের কথা বলেছেন গ্রামশিক্ষা ও মেসো- (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

খেলার টিকিট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সকলেই একগাছা করে পেলেন।

ওই দিনই সকাল থেকে সকলো বিভিন্ন জেলার অফিসাররা কলকাতা চলে বেড়িয়েছেন তাদের প্রাপ্য টিকিটের জন্য। ছুই ভত্রলোককে তারা বুঝছিলেন, একজন পূর্বমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী ও অপরজন জীড়া দপ্তরের প্রব সেন। শেষ অবধি এরা টিকিট পেয়েছিলেন কি না জানা নেই।

এবারে কসমস ক্লাব বনাম মোহন-বাগানের খেলার টিকিট নিয়ে যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তার সঙ্গে কংগ্রেসী আমলের ঘটনাবলীর খুব একটা তফাৎ নেই। এবং এর অন্তর্গত দায়ী মোহনবাগানের কিছু আমলা ও যতীন চক্রবর্তী মহাশয়। শোনা গেছে রাজ্যের স্পোর্টস কাউন্সিলের প্রধান ও অ্যাডভোকেট জেনারেল জিন্নেহাউ আচার্য যতীন বাবুর আচরণে অভ্যস্ত ক্ষুব্ধ এবং মূর্খা-মন্ত্রীকে তিনি এই ব্যাপারে তদন্ত করতে অহরোধ করেছেন।

সব ব্যাপারটাই গোলমালে। আই, এফ, একে বলা হল তারা পুরো টিকিট পাবে না যার ফলে লীগ চ্যাম্পিয়ন ইষ্টবেঙ্গলকে ৬৭টি টিকিট নিয়ে সমুদ্র থাকতে হল। অপর সাউথ ক্লাবে মোহনবাগানের তরফে টিকিট বিলি হল যার মানে প্রচুর টিকিট বাতিল/ছিল। এর হিসাব কে দেবে?

টিকিট যে বাড়তি ছিল তার আরও প্রমাণ আছে। খেলার আগের দিন সরকারের সব বিভাগীয় সচিবদের জানান হল যে তাঁদের দপ্তরের অন্তর্গত টিকিট রাখা আছে এবং তাঁরা যেন জানান কার কত টিকিট লাগবে। ধরনের ঘটনা আগে ঘটে নি এবং নব্বই ওই টিকিট নিতে অস্বীকার করেন। যেখানে টিকিটের এত হাহাকার সেখানে বদন্যতা কীভাবে সম্ভব হল?

যতীনবাবুর নামে অভিযোগ উঠেছে তিনি ২০০ টিকিট বিলি করেছেন। সংখ্যা সংক্ষেপে সন্দেহ থাকলেও একথা নিঃসন্দেহে বল। যার তিনি বেশ কিছু টিকিট অন্তায় ভাবে বিলি করেছেন। একথা কি ভুল যে আনন্দবাজারের কিছু সাংবাদিক যাকে উপরূত বলে ওই কাগজে বিধান সভায় মস্তব্যের বিরুদ্ধে বাঙ্গালিকদের ওয়াক আউটের খবর ছাপা হয় নি? কোন কারণে তিনি কসমস দল যে বাসে শহরে আসে তাতে শুধু আনন্দবাজারের একজন সাংবাদিকের জায়গা করে দেন?

বামফ্রন্ট বিরোধী আনন্দবাজারের সঙ্গে যতীনবাবুর এই মাঝামাঝির পিছনে কি কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই?

আরও প্রশ্ন আছে। প্রেস কার্ড কখনো ছাপা হয়েছিল এবং কাদের মধ্যে বিলি হয়েছিল? খেলার দিন দেখা গেল এমন সব লোক কোটো-একাদশের কার্ড নিয়ে ঘুরছে যারা জীবনে কোন কাগজের অফিস দেখে নি। সংখ্যায় এরাই ছিল ভারী। যতীনবাবু কী এখানে তাঁর দায়িত্ব এড়াতে পারেন? এর ফলে কী সরকারের হুঁশ বেড়েছে?

তারপর আছে যতীনবাবুর আচরণ। তিনি মন্ত্রী, না মোহন-বাগানের কর্মকর্তা। আকাশবাণীতে ভাষণকালে তিনি বারে বারে ক্লাবের সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেন। কোন মন্ত্রীর কি এটা করা উচিত? পেলের সাংবাদিক সম্মেলনেই বা তিনি মোড়লী করছিলেন কেন, ওটাতো মোহনবাগান ও কসমস ক্লাবের কর্মকর্তাদের ব্যাপার। খেলার দিনেও দেখা গেল অত্যন্ত দুষ্ট।

কলকাতা দূরদর্শন একটি বন্ধ অধিকার করে ছিল। সেখানে একটি বিদেশী টেলিভিশন টিম জায়গা পেল না, যতীনবাবুকে অহরোধ করা সম্ভব। তার বক্তব্য "কলকাতা টি, ভি ছাড়া আমি কিছু জানি না"। তাহলে কার্ড দিলেন কেন? আশ্চর্যের ব্যাপার অপর একটি বিদেশী টিম কিন্তু সেখানে জায়গা পেল যাদের সঙ্গে ছিলেন এক অসমীয়া মহিলা যার 'ব্যবসার' কথা অনেকেই জানেন। ইনি কী করে ঢুকতে পারলেন মাঠে? এবং এই বিদেশী টিমই বা কী করে এর টিকিট যোগাড় করল? এর উত্তর কে দেবে? জীড়া সাংবাদিকদের কার্ড প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে চারদিন ঘোরার পর খেলার আগের দিন সকলের তাঁরা কার্ড পান। এটাকে বামফ্রন্ট বিরোধী আমলাদের যত্নবশত বললে কী ভুল বুল হবে?

এবার আহ্নন লটারীর কথা। সবাই জানে বেশ কিছু লোক তাঁদের টিকিট নেন নি নম্বর ওঠা সত্ত্বেও। এ জিনিষ বরাবর হয় এবং প্রব সেন এগুলি পরে বিলি করেন। এই ধরনের কত টিকিট বেশি ছিল এবং কারা এগুলো পেল? এর উত্তর প্রব সেন কোনদিনই দেবেন না। কারণ তিনি ত যতীনবাবুর চক্রতলে আছেন। প্রসঙ্গত আরেকটি প্রশ্ন। কোন সাহসে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে ডিঙিয়ে প্রব সেন মহাশয় স্পোর্টস কাউন্সিল থেকে স্ত্রীমন্ত্রীর ঘোষের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের অহরোধ শব্দ হাতে এইসব ব্যক্তির কার্যকলাপ বন্ধ করুন। নাহলে এরা সরকারকে ডুবিয়ে ছাড়বে।

নন্দিনী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কথা বলেছেন। এবং জনতা পার্টির ওয়াকিং কমিটির সভায় এ ব্যাপারে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন।

নন্দিনী কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রাম, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হেমবতীনন্দন বহুগুপা, পার্টির সভাপতি চন্দ্রশেখর এবং মোহন-বারিয়ার সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছেন।

জগজীবনবাবু এবং চন্দ্রশেখরের মধ্যে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা হয়েছে। উভয় নেতাই একমত যে, সমস্ত ব্যাপারটায়ই চরণ সিং-এর বিএল ডি ও জনসংস্থের নেতাদের মত আছে। এবং এটা করা হয়েছে জনতা দলের অন্ততম শরিক হল গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও প্রাক্তন কংগ্রেসী-দেবী রাজনৈতিক প্রভাব ধ্বংস করার জন্য। এ ব্যাপারে ঠিক হয়েছে প্রাক্তন কংগ্রেসী যারা বর্তমানে জনতা দলে আছেন তারা খুব তাড়াতাড়ি একটা বৈঠকে বসবেন।

নন্দিনীর বিরুদ্ধে তদন্তের ব্যবস্থা করার জন্য বিজ্ঞ পট্টনায়ক ও জনতা দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক রবি রায় এখনো সক্রিয়। এ ব্যাপারে সাহায্য করছেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী চরণ সিং। আসলে চরণ সিং-এর সঙ্গে পরামর্শ করেই নন্দিনীর বিরুদ্ধে

পরিকল্পনা করা হয়েছিল। বেহেতু কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোকে দিয়ে তদন্ত করালে ব্যাপারটা প্রধানমন্ত্রীর গোচরে আনতে হবে এবং সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী হয়তো রাজী নাও হতে পারেন, তাই ওড়িশা ভিজিলেন্সকে দিয়েই করানো হয়েছে।

নন্দিনী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন রাজনৈতিক কৌশল হিসেবেই। আসলে জনতা নেতৃবৃন্দের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্যই ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এ ব্যাপারে জনতা পার্টির ওয়াকিং কমিটির আগামী বৈঠকে কড় উঠবে বলে মনে হচ্ছে। নন্দিনীও প্রস্তুত।

গ্রন্থসমালোচনা

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

জারোসের লেখা গ্রন্থ পৃ: ২৮৪। আশা করাই হয়ত উচিত। তবে উপস্থিত আশা করার মত কিছু চোখে যেন পড়ে না। যদি বা ছ একটি পড়ে তা অবশ্য ব্যতিক্রম বলেই আমরা ধরি।

সর্বশেষ প্রবন্ধে লেখক এ রকম একটা সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতার রূপ ও তার কারণ দেখিয়েছেন। মানব প্রকৃতির এক ইতিহাস অবলম্বনে পূর্বসূরীদের মতবাদ খণ্ডন খণ্ডন করে তিনি তাঁর কথা শেষ করেছেন "যে আশুনে সব ধ্বংস হয় সেই আশুনে ছাড়া সভ্য মানবের শাস্তির কাজ একদিনও চলে না। পারমাণবিক

শক্তি ধ্বংস অথবা সৃষ্টি দুইই করতে সক্ষম। মানুষের সমাজ ব্যবস্থা আগ্রাসী না শান্তিকামী, তার উপর শেষপর্যন্ত সব রকম শক্তির ব্যবহার নির্ভরশীল—" (পৃ ৩২২)। একথা ছাড়া একজন সং ও মনীষী-বুদ্ধি-জীবী আশুকের দিনে অস্ত কিছুই বলতে পারেন না যেনেও আমাদের মনে করতে হয় এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপূরক সমাজব্যবস্থা এখন পর্যন্ত আশাশ্রিতভাবে কোথাও গড়ে ওঠে নি। এবং তা যে গড়ে ওঠে নি তার কারণ ও হলো আবার একটা vicious circle এর মত অবস্থা। তার উৎপত্তি আশুপ্রসাদকামী আশু-স্থপী বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই। সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র কেউই সম্পূর্ণভাবে এ পর্যন্ত এই বিশিষ্ট ethics বা চর্চাকে গ্রহণ করেনি। কবে বা কেমন করে তা সম্ভব হবে তার উত্তরের আশা না করেই লেখক সত্যতার সঙ্গে এখানে তাঁর বৈজ্ঞানিক আলোচনা শেষ করেছেন।

পরিশিষ্টটি আরও বিস্তারিত হলে ভাল হত। অন্ততঃ লেখক যে যে নামগুলি উদ্ধৃতির মধ্যে ব্যবহার করেছেন তাঁদের সবার নাম ও পরিচয় দিলে এটি সম্পূর্ণতর তালিকা হতে পারত। একটি গ্রন্থপঞ্জী ও নির্দেশিকা (Index) সংযোজন করার কথা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার সময় ভাবতে লেখককে অহরোধ করব।

বিজ্ঞেকে রঙীন ও প্রাণবন্ত করে তুলতে

এন, টি, সি-র

কাপড়

পুরুন

শুধু সস্তা বা টেকসই বলেই নয়, বাহারেও এন, টি, সি-র কাপড়ের জুড়ি নেই।

আমাদের শো-রুমে ও নিজস্ব দোকানগুলোতে

সুটিং, সার্টিং, ব্রুটি, শাড়ী, মার্কিন, পপলিন সবই পাবেন।

আরও পাবেন মনমাতানো ও সলমলে সব পদার কাপড় ও বিছানার চাদর।

ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন

(পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা লিমিটেড)

৭, জগদাল নেহেরু রোড

কলিকাতা-৭০০০১৩

জুট ব্যাচিং অয়েল নিয়ে আরো চাঞ্চল্যকর খবর

৯৪ ওয়াগন তেল পাচার

ভিক্টোরিয়ায় পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক

(দর্পণের সংবাদদাতা)

জুট ব্যাচিং অয়েল নিয়ে আরো চাঞ্চল্যকর সংবাদ দর্পণের কাছে এসে পৌঁছেছে। ১০ খবর পাওয়া গেছে যে, জরুরী অবস্থা চলাকালীন এয়াড্যা থেকে সড়ক পথ ছাড়াও ট্রেনপথেও লক্ষ লক্ষ লিটার জে, বি, ও অম্ল প্রদেশে পাচার হয়ে গেছে। পুলিশ ও রেল দপ্তরের নাকের ডগাতেই এ সব কাণ্ড ঘটে।

জানা যায়, চূয়াস্তর সনের উনত্রিশে অক্টোবর থেকে এ বছরের উনিশে জুলাইয়ের মধ্যে চোরাকারবারীরা চূয়ানবুই ওয়াগন ভর্তি জে, বি, ও বোম্ব, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্কালোর, জলন্ধর, দিল্লী চালান দেয়। শুধু সোদপুর স্টেশন থেকেই এই সময়ে এই ওয়াগনগুলি চোরাপথে যোগাড় করা জে, বি, ও নিয়ে অম্লপ্রদেশে চলে যায়। হিসাব করে দেখা গেছে কেবল একটি মাত্র স্টেশন

থেকেই এগারো লক্ষ আঠাশ হাজার লিটার জে, বি, ও পশ্চিমবঙ্গের চট্টশিল্পকে ডুবিয়ে অম্ল পাঠান হয়। অর্থাৎ কাণ্ড হলো, এই তেল সাধারণত বে কোনও স্টেশন থেকেই ওয়াগন ভর্তি করে পাঠান যায় না। এর জন্য অনেক কাঠখড় শোড়াতে হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে পশ্চিম বঙ্গের কুখ্যাত তেল চোরাকারবারীদের এব্যাপারে কোনও অসুবিধা হয়নি।

পুলিশের কানেও খবরটা এসে পৌঁছেছে। এরা এব্যাপারে একজনকে গ্রেপ্তারও করেছে। কিন্তু প্রকৃত আসামী এখনও ফেরার। পুলিশ মহলের অভিযোগ, এই লক্ষ লক্ষ লিটার জে, বি, ও পরিবহনের সঙ্গে চিটাগড়ের এস সাউ এবং রাজপথ গুপ্তার গুপ্তা ট্রান্সপোর্টও জড়িত। এবং এখনও জে, বি, ও পাচার

হচ্ছে তার সঙ্গে এই ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীটি ঘনিষ্ঠভাবে রয়েছে।

অজুত কথা হলো, বর্তমান রাজনৈতিক পরিবর্তিত অবস্থাতেও কংগ্রেসী জমানার কুখ্যাত চোরাকারবারীরা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং প্রায় প্রতিদিন ভিক্টোরিয়া মহদানে খোদ সি, আই, ডি দপ্তর সহ বিভিন্ন বিভাগের পুলিশ কর্তাদের কেউ কেউ-দাঙ্গী চোরাকারবারীদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। বলা বাহুল্য সেখানে চালাও মদও চলছে। এই সব পুলিশ অফিসাররা নাকি চোরাকারবারীদের আশ্রয় করেছেন যে শিখই ডি আই জি বদলী হয়ে যাচ্ছেন। এর পর ব্যবসা পুরোদমে চলবে। রহস্যজনক ঘটনা হলো, তেল নিয়ে কিছু 'অপারেশন' হবার পরই এন-ফোর্সেট বিভাগের (সি, ই, ডি) ডি, আই, জি এখন সত্য সত্যই বদলী হবার মুখে। এ ব্যাপারে এই কর্মী ও অফিসাররা দারুণ ক্ষুব্ধ। ইতিমধ্যে গুপ্তার উঠেছে, রাজ্যের চট্টশিল্প শেষ করার চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে যখন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ও 'রায় জমানায়' রাজপথ গুপ্তা, শিবনাথ গুপ্তা, নরসিং গুপ্তা, কাকিনাডার ভিকু সাউ, টালিগঞ্জ ইটখোলার ভারী-র যাবতীয় সম্পত্তি ও অর্থের প্রকৃত উৎস নিয়ে তদন্ত শুরু করার কথা তখন কোথায় যেন একটা বোঝাপড়া চলছে। না হলে রাজ্যের জে, বি, ও-র প্রায় চল্লিশটি গোড়াউনের মধ্যে মাত্র তিনটিতে তল্লাশী চালানোর পরই দপ্তরের ডি, আই, জি বদলী হয়ে যান? এছাড়া জাতীয় সড়কের ধারে পোড়া-উমগুলিই বা এখনও খোলা থাকে কী করে? ভিক্টোরিয়া মহদানে চোরাকারবারীদের সঙ্গে পুলিশ কর্তাদের এখন বৈঠক করার সাহস-ই বা কোথা থেকে আসে?

বিভিন্ন মহলের দাবী, রাজ্যের চট্টশিল্পের কাছে ব্যবহৃত হয় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ তেল নিয়ে এমন বেপরোয়া চোরাকারবারের সঙ্গে জড়িত পুলিশ, কিছু মিল অফিসার, কিছু সরকারী আমলার যোগসাজসের বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকার এখন তদন্ত শুরু করুন। নচেৎ এর দায় এড়ানো বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষেও বাটন হয়ে পড়বে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

লক্ষ্মী বস্তুর সম্পত্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গাড়ীটি সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।

বাড়ী-গাড়ীর পর বড়লোকের আর একটি অস্থবছ কুহুর পোষা। গ্রেড ডেল, ডোভার ম্যান, হুটো অ্যালিসেসিয়ান, টিবেটিয়ান, স্পেনিয়াল, মোট পাঁচটি কুহুর লক্ষ্মীবাবুর আছে। এগুলোর পেছনে ধরনের কথা ভাবলে সাধারণ মানুষ অবাক হয়ে যাবেন।

লক্ষ্মীবাবু ট্রেড ইউনিয়ন করতেন। দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার। কিন্তু ঘটনা ঘটেছে উল্টো। লিপটন, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, প্রবর্তক জুটমিল প্রভৃতি কারখানায় দেখা গেল মালিকের দাবী মেনে নিয়ে তিনি প্রায় ২৫০ জন প্রমিক হাটাইয়ের চুক্তিতে সই করেছিলেন। এ ঘটনা প্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটা রেকর্ড। বেঙ্গী ইঞ্জিনিয়ারিং, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, পার্ক হোটেল, লিপটন প্রভৃতি কারখানার মালিকদের সঙ্গে লক্ষ্মীবাবুর স্বস্তার কথা সকলেরই জানা। আর সেই সুবাদেই বেধড়ক প্রমিক হাটাই। একজন হাজার হাজার

টাকা কামালেন আর প্রমিকের চাকরী গেল।

১৯৭৬ সালের অক্টোবরে অস্থবছ তার জন্ম লক্ষ্মীবাবু বেলভিউ নার্সিং-হোমে ভর্তি হন। শোনা যায় বিভিন্ন কোম্পানী থেকে প্রায় ৮০ হাজার টাকা এসেছিল চিকিৎসার জন্য। যদিও নার্সিংহোমের টাকা মিটিয়ে দিলেন জনৈক মন্ত্রী।

গত লোকসভা নির্বাচনের আগে জনৈক মন্ত্রী ১০ হাজার টাকা লক্ষ্মীবাবুর হাতে : যেন দক্ষিণ কলকাতার নির্বাচনী কর্মীদের কাছে টাকা দিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু জানা যায় ৩০-৪০ হাজার টাকার বেশী খরচ হয়নি। এছাড়া প্রিয় দামমুখীও ২০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন লক্ষ্মীবাবুর হাতে। লক্ষ্মীবাবু নিজেও বিভিন্ন কোম্পানীর কাছ থেকে প্রচুর টাকা তুলেছিলেন নির্বাচনের জন্য। টাকাগুলো গেলো কোথায়?

রাজ্য সরকার দুর্নীতির জন্য তদন্ত কমিশন বসিয়েছেন। রাজ্য সরকারের উচিত সমস্ত ব্যাপারটা তদন্ত করা। তাহলে জানা যাবে কিভাবে এক-শ্রেণীর কংগ্রেসী রাজনীতির নামে ব্যবসা করেছেন।

৬ই অক্টোবর প্রকাশিত হচ্ছে

দর্পণ

শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৪

। এই সংখ্যায় থাকছে :

রায়ত প্রসঙ্গে বাংলার বিদ্যাসমাজ : কুমদকুমার ভট্টাচার্য / দপিতা ইন্দিরা : সাধন গুহ / বংশীলাল—গণতন্ত্রে এক ক্ষুদ্রে ডিক্টেটর : মুকুন্দন মেনন / রাশিয়ার রাষ্ট্রচরিত্র এবং সংশোধনবাদ : পঙ্কজ চৌধুরী / গণতন্ত্র বনাম কৌরাতন্ত্র : ক্রান্তি সেন / সংবিধানের নব কলেবর : রমাশ্রীনাথ মল্লিক / আগামী পাঁচ বছর—ভারতীয় রাজনীতি ও পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার : সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় / শত্রুমিত্র : সমর সেন / সাহিত্যিকের রাজনীতি : মিহির আচার্য / মিসা সংশোধন, ১৯৭৬ : সোমিনাথ চট্টোপাধ্যায় / ইন্দিরার রাজত্বের হরিজন হত্যা : জ্যোতির্ময় বসু / নকশালবাড়ীর কৃষক সংগ্রাম ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক : তপন বসু / জনতা দল ও সরকারের শ্রেণী চরিত্র : কালিদাস কুণ্ডু / সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে : ফণী চক্রবর্তী / কলকাতার ফুটবল ও পেলে : আরবি / রাজনৈতিক চলাচলের গতিপ্রকৃতি : ভাসুসিংহ

এছাড়া লিখছেন অমলদাশকর রায় নারায়ণ চৌধুরী

বিনয় ঘোষ এবং রণজিৎকুমার সেন

অনার্থ মিত্রের রাজনৈতিক ছড়া ও অমলের কাচুন

দ্রাম : চার টাকা

হাঁড় ফাটল হাঁড় ফাটল

বা দেবী সর্বহরণে শ্রীরামগণ সংস্থিত।
পতনে পতিত দেবী ত্রিশূলবিদ্ধা পরাজিত।
জয় জয় দেবী দুর্গতিহারিনী
শাসনং শোষণং অধিকারকাড়িনী।
ছাড়িনি তোমায় দেবী, আজও কেউ তুলিনি,
ভয়ে ভয়ে হাড়িটির চাকনাটা খুলিনি।
হাড়ির খবর ফাঁস ছড়া দিয়ে গাঁথা সে
চৌদিকে ছড়ালো আকাশে ও বাতাসে।

হাঁড়ি ফাটল হাঁড়ি ফাটল

ছড়া। - অনার্থ মিত্র, * ছবি। অহিভুষণ মালিক
ভূমিকা। অমলদাশকর রায়
হাতে হাতে বিক্রী শত শত হাজারে
হাড়ি আঁচ কাটলো শারদীয় বাজারে।

যে সব ছড়ার তাণ্ডব সিদ্ধার্থ-সরকার সইতে পারেনি, আক্রমণ হেনেছে। ছাপাখানা সীল করেছে। বাহান্তরের নির্বাচনী কারচুপি থেকে ইন্দিরা পতন অবধি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ব্যাংছড়ার ব্যাংচিজে প্রতিবিম্বিত প্রথম এক-মাত্র কাঁকালো শাণিত এছটি প্রকাশিত হচ্ছে মহালয়ার আগেই।

হাঁড়ি ফাটল হাঁড়ি ফাটল

ছড়াগুলি পেঁখেছেন
অনার্থ মিত্রের,
অহিভুষণের আঁকা
আঁকিবুঁকি চিত্রিত।
অমলদা রায়, যিনি
শিরোমণি ছড়াকার,
ভূমিকাটি লিখেছেন
সাধুবাদে সুরধার

বাজারে পড়লেই
উধাও হবে।
এখনই তলব
করুন। পুজো
বাজারের সেরা
আকর্ষণ; একটি
ছড়ার বই।
দ্রাম দু'টাকা।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৩১ মট সেন কলকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত।



ইন্দিরার গ্রেপ্তার এবং মুক্তি

॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥

গত সোমবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর গ্রেপ্তার এবং তাঁর পরবর্তী আচরণ যেমন নাটকীয় তেমন নাটকীয় দিল্লীর অতিরিক্ত মুখ্য মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তাঁকে বিনা শর্তে মুক্তিদান। এবং কোনরূপ জামিন ছাড়াই শ্রীমতী গান্ধীর মুক্তিলাভ আমাদের কাছে অসম্ভব: অপ্রত্যাশিত যখন একই অপরাধে অন্যান্য অভিযুক্তরা আটক রইলেন। যদিও আইনের চুলচেরা ব্যাখ্যায় সেটাই হয়ত স্বাভাবিক। তবে আমরা স্বাধীন ভারতে, বিশেষ করে গত কয়েক বছরের অনেক ঘটনার বিবরণ জানি যেখানে পুলিশ মিথ্যা অভিযোগে বহু লোককে বছরের পর বছর আটকে রেখে দিয়েছে, অথচ আদালতও নির্বিকার থেকেছে; পুলিশী অত্যাচারে অর্থহীন বন্দীকে বিচারকের সামনে হাজির করা হয়েছে, বন্দীর আবেদনে কর্পাত করা দূরে থাক, তার দিকে তাকিয়েও দেখেননি বিচারক, পুলিশের প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাকে আটক রাখার আদেশ দিয়েছেন।

ইন্দিরা-গান্ধীর গ্রেপ্তার নিয়ে তাঁর অস্থির ও কংগ্রেসীরা যে সোর-গোল তুলেছে সেটা রাজনৈতিক ফায়দা ওঠাবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। ইন্দিরা নিজেও সেই চেষ্টা চালাচ্ছেন। সাধারণ মানুষকে তিনি জানেন না, তাদের সঙ্গে তাঁর কোন হার্দয় সম্পর্কও নেই। পিতার মতই ইন্দিরাও বক্তৃতামঞ্চের উচ্চতা থেকে মুচ মুচ শব্দ মুখগুলো দেখেছেন আর বড় বড় বুলি ঝেড়েছেন। তাই ক্ষমতাচ্যুত হয়েই অধৈর্য জলে পড়েছিলেন। এখন সাধারণ মানুষের দোহাই পেড়ে তিনি ভেসে ওঠবার চেষ্টা করছেন। জনতা সরকারের পদক্ষেপ বেসামান্য হলেই তাঁর পক্ষে স্বর্ণ স্বযোগ।

(শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

সভাপতি ও সম্পাদকের খেয়োখেয়ি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ জনতা পার্টিতে সভাপতি ও সম্পাদকের পদ নিয়ে লড়াই এখন বেশ জমে উঠেছে। গত নির্বাচনে জনতার পরাজয়ে কোণঠাসা প্রফুল্ল সেনকে সরিয়ে স্থানীয় খাড়া রাজ্য কমিটির সভাপতির পদ দখলের জন্য আসরে নেমেছেন। জানা গেছে, স্থানীয়বাসী বিমান মিত্র মধু লিমায়ের, বোহুবাবু, আভা মাইতি প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে চাইছেন।

জনতা পার্টিতে বোহুবাবু ও আভা মাইতিদের গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রফুল্ল সেন ও অশোক দত্তদের লড়াই প্রায় জনতা পার্টি গঠনের সময় থেকেই চলে আসছে। বোহুবাবুরা নিজেদের দল ভারী করতে কয়েক মাস আগে একটা সভাও করেছিলেন। কিন্তু বিমান মিত্র কি করে এদের সঙ্গে ভিড়লেন সেটাই অনেকের প্রশ্ন। প্রফুল্ল-অশোক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বলেই

স্থনীতি চট্টরাজ বিধানসভার অবমাননা করলেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ইন্দিরা গান্ধীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পাঁচই অক্টোবর এসমানেড ইস্টে কংগ্রেসীদের এক সমাবেশে কুখ্যাত স্থনীতি চট্টরাজ বিধানসভার সদস্যদের “পশু” বলেছেন। তিনি বলেন, “ইন্দিরা গান্ধীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আমরা আজ বিধান সভা থেকে ওয়াক-আউট করেছি। আমরা এই স্বপ্ন কামের প্রতিবাদ করেছি। আর আমাদের কেউ সমর্থন করেনি। আমি বলছি, জনগণ জাহ্নন বিধান সভার অভ্যন্তরে কিছু পশু বসে আছে।” স্থনীতি চট্টরাজ বিধান সভায় কংগ্রেসের ডেপুটি লীডার। তিনি এই উক্তির দ্বারা স্পষ্টতই বিধান সভার অবমাননা করেছেন।

কয়েক দিন আগে বিধান সভায় যতীন চক্রবর্তী এদের উচ্ছৃঙ্খল যুবক বলেছিলেন। স্থনীতি চট্টরাজ বিধান সভাকে এভাবে অবমাননা কবে প্রমাণ করলেন যে তিনি সভাই উচ্ছৃঙ্খল যুবক। তার মতন এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক কি করেই বা বিধান সভার ডেপুটি লীডার হন?

কি বিমানবাবু বোহু-আভার কাছাকাছি?

মধু লিমায়ের সঙ্গে প্রফুল্ল সেনদের সম্পর্ক বারাপ হয় পশ্চিম-বাংলায় গত নির্বাচনের সময়। আর সেই তত্ত্বতাকেই উসকে দিচ্ছেন স্বযোগ সন্ধানী স্থনীল খাড়া। এ ব্যাপারে তিনি আরেকটি উপদলের সাহায্য পাচ্ছেন, সেটি হচ্ছে বি, এল, ডি। কিন্তু অনেক কৌশল করেও তিনি খুব একটা কায়দা করতে পারছেন না। ১২ তারিখে রাজ্য কমিটি ঘোষণা করা হবে। সেদিনই বোকা বাবে স্থনীল খাড়ার শক্তি কতটা।

এই ল্যাং মারামারির খেলা চলছে সম্পাদকের পদ নিয়েও এবং সেখানেও খেলছেন বিমান মিত্র, তিনি এ ব্যাপারে ছোট বেঁধেছেন বোহুবাবুর সঙ্গে। তিনি চেষ্টা করছেন যাতে তিনি নিজে এবং বোহুবাবু সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন অশোকদত্তকে দত্তকে ল্যাং মেরে। এ ব্যাপারে তিনি স্থনীল খাড়াকে পাচ্ছেন, কারণ তিনিও ডে, স্থনীল খাড়াকে সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করছেন।

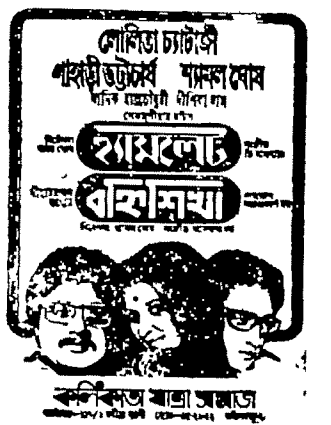
অশোক দত্তকে সাহায্য করছেন প্রফুল্ল সেন। প্রফুল্ল সেনকে ডিঙ্গিয়ে অশোক দত্তকে কাং করা একটু মুশকিল। তবে এটা ঠিক যে তিনজন সাধারণ সম্পাদকের অন্তত একজন পরিবর্তন হবেই। জানা গেছে অশোক মুখার্জী এবং স্বকুমার ব্যানার্জী মোটামুটি প্রফুল্ল সেনকেই সমর্থন করছেন। সব পরিষ্কার হবে বারো তারিখে। কিন্তু যে গোষ্ঠীই জিতুক আব যে গোষ্ঠীই হারুক, একটা জিনিষ পরিষ্কার যে জনতা পার্টিতে আদর্শহীন স্ববিধাবাদীদের খেয়োখেয়ি চলছে।

লক্ষ্মী বহুরা কোর্টের আদেশও মানছেন নাঃ অসহায় বিধবার বাড়ি দখল করে রেখেছেন

কোর্টের অর্ডার পেয়েও লক্ষ্মীকান্ত বহু ৭নং হাজি মহলীন রোড থেকে এন এল সি সি-র দপ্তর তুলে নিচ্ছেন না। বাড়ীর মালিক এক অসহায় বিধবা মহিলা। এই বাড়ীতে লক্ষ্মী-বাবু একতলাও কয়েকটি ঘর নিয়ে অফিস খোলেন। মালিকের সম্মতি নেওয়ার কোন অপেক্ষা রাখা হয়নি। মালিক জীবনগোপাল দাস এই বে-আইনী ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু করেন। ১৯৭০ সালের ১৬ই নভেম্বর মালিক জীবন-বাবু কোর্টের ডিগ্রী পেলেন। কিন্তু লক্ষ্মীবাবু বাড়ী ছাড়লেন না। সর-

কারী মহলে প্রভাব বিস্তার করা হল। বাড়ীটি সরকার হুকুম দখল করে নিলেন। যেহেতু বাড়ীর দোতলায় জনৈক পুলিশ কর্মচারী থাকেন। সরকার বাড়ীটি দখল নেওয়ার পর লক্ষ্মী বহুরা এন এল সি সি-র দপ্তর এখানেই থেকে গেল। বাড়ীটার পেছন দিকে কয়েক কাঠা খালি জমি ছিল। কর্পোরেশনের আগাম অস্থ-মতি না নিয়েই দেই খালি জায়গায় বেশ কয়েকটা ঘর তোলা হল। এর মধ্যে বাড়ীর মালিক মারা গেলেন। তার বিধবা স্ত্রী সরকারী হুকুম দখল আদেশের বিরুদ্ধে আবার

আদালতের শরণাপন্ন হন। গত ১০ই মার্চ বিচারক বাড়ীর মালিক জীবন-গোপাল দাসের বিধবা স্ত্রীর পক্ষে রায় (শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



দর্পণ

বিশ্ব বর্ষ-১১ ৩৭শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৭ই অক্টোবর, ৭৭ ॥ ৪০ পয়সা

প্রিয় মুন্সীর সঙ্গে সত্যনারায়ণপন্থী নকশাল নেতার সাক্ষাৎ ও আলোচনা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সম্প্রতি প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর সঙ্গে সত্যনারায়ণপন্থী এক নকশাল নেতার গোপন সাক্ষাৎকার অল্পশ্রুত হয়। প্রথমে জানা যায় যে এই সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ছিল ঐ নকশাল নেতার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রয়োজন। কিন্তু পরে এক গোপন সূত্রে থেকে বলা হয় যে ঐ দিনের আলোচনার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রাজনৈতিক।

আলোচনার প্রারম্ভে ব্যক্তিগত কুশল বিনিময়ের পর দুই নেতাই তাদের অতীত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের “মুহূর্ত” আত্মসমালোচনা করেন। কংগ্রেস নেতা প্রিয়বাবু জরুরী অবস্থার বাড়াবাড়ির জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তার পুত্র সন্তান গান্ধী এর জন্য দায়ী। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন, গত লোকসভা নির্বাচনে স্বয়ং সন্তান গান্ধী তার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন যাতে তিনি নির্বাচিত হতে না

পারেন। এই ব্যাপারে সহযোগিতা করেছিলেন এক ব্যবসায়ী, যিনি কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে। নির্বাচনের প্রাক্কালে জনতা পার্টির প্রার্থী দিলীপ চক্রবর্তীকে “মারধোর” করার পেছনে পরিকারভাবে সন্তান গান্ধীর চক্রান্ত কাঙ্ক্ষ করেছিল, যার ফলে প্রিয়বাবুকে জনসমক্ষে হেয় হতে হয়।

প্রিয়রঞ্জনবাবু এই দুঃখে ঐ নকশাল নেতা “আন্তরিক সহানুভূতি” জ্ঞাপন করেন। এরপর প্রিয়বাবু যে সমস্ত নকশাল যুবককে পুলিশ গুলি করে বা পিটিয়ে মেরেছে, তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এই বলে যে এরা “বাংলার সোনার টুকরো ছেলে।” এই প্রশংসাই আলোচনা গুঁঠে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থা ও বামফ্রন্ট সর-

(শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

‘ফ্যাসিস্ট’ জয়প্রকাশ সকাশে প্রিয়

(দর্পণের পর্ববন্ধক)

প্রিয় দাসমুন্সী জয়প্রকাশের সঙ্গে দেখা করে নাকি জানতে চান যুব সমাজ বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন ভূমিকা পালন করবে। এই সংবাদে মনে পড়ছে পঁচাত্তরের মরা এপ্রিল ইউনিভার্সিটি লনে এই প্রিয় দাসমুন্সী জয়প্রকাশ সম্বন্ধে যা যা বলেছিলেন। ঐদিন জয়প্রকাশের ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি মিটিং করার কথা ছিল। কিন্তু প্রিয় দাসমুন্সী ও হুত্রত মুখার্জী সেদিন ফ্যাসিস্ট কায়দায় তার মিটিং ভেঙে দেন। তার আগে তারা ইউনিভার্সিটি লনে একটা মিটিং করেন। কলকাতায় আসার আগে জয়প্রকাশ নারায়ণকে এক ছায়গায় কালো পতাকা দেখানো হয়েছিল। জয়প্রকাশ তার উত্তরে বলেছিলেন “স্বাগত কালো পতাকা” আর প্রিয় দাসমুন্সী সেই কালো পতাকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ইউনিভার্সিটি লনে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন “জয়প্রকাশ: নারায়ণকে ধন্যবাদ, তিনি কালো পতাকাকে স্বাগত জানিয়েছেন। এই কালো রং ভালবাসতেন আরো একজন। তিনি হচ্ছেন হিটলার। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল বা ক্ষমতা হীনদের চেষ্টা করছে। এই জোটে আছে যত চোরাকারবারী, প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো। এরা

ক্ষমতায় আসলে দেখা-যাবে গণতন্ত্র শেষ হয়ে যাবে।” এরপর জয়প্রকাশ ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটির কাছে এলে শুরু হয়ে যায় দক্ষিণপন্থী জয়প্রকাশের গাড়ীর ওপর উঠে একটি যুব কংগ্রেসী মেয়েলিচতে থাকে। সময় ওহর জামা ছিঁড়ে দেওয়া হয়। কয়েক জনের মাথা ফাটে, রক্ত ঝরে। মিটিং বানচাল হয়ে যায়। জয়প্রকাশ নারায়ণ চলে যান। কিছুক্ষণ আগে প্রিয় দাসমুন্সী জয়প্রকাশকে হিটলার বানাচ্ছিলেন আর কিছুক্ষণ পরে জয়প্রকাশ মিটিং ভেঙে দিয়ে প্রমাণ করলেন জয়প্রকাশ নন, তারা

সত্যনারায়ণপন্থী নকশালদের সঙ্গে কারামন্ডী দেবব্রতর মাখামাখি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সত্যনারায়ণপন্থী নকশালদের সঙ্গে বামপন্থী সরকারের কারামন্ডী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের (আর এস পি) ঘনিষ্ঠতা অনেকের মনে প্রশ্ন তুলেছে। মেটা আরও এই কারণে যে, সত্যনারায়ণ গোষ্ঠীর নকশালরা যুক্তফ্রন্টের শরিক বামপন্থী দল-গুলোকে শোধানবাদী বলে মনে করে এবং সম্ভবতঃ সেইজন্তেই তারা নির্বাচনে বামপন্থী ফ্রন্টকে সাহায্য না করে অনেক অঞ্চলে জনতা পার্টির পক্ষে কাজ করেছে।

নিজেরাই সব এক একটা ক্ষেত্রে হিটলার।

আজকে যখন প্রিয় দাসমুন্সীরা কোথাও কলকে পাচ্ছেন না, যখন জনগণের ক্রোধ তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে তখন জয়প্রকাশকে যুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যাকে একবার হিটলার বানালেন তার কাছে যেতে প্রিয় দাসমুন্সীর লজ্জা হওয়া উচিত। আজ কোথায় গেল তার “এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধ”? আজকে একজনকে “শালা” বলা আবার কালকেই তাকে “বাবা” বলা চরম সুবিধাবাদের নিদর্শন। দাসমুন্সী এরকমই একজন সুবিধাবাদী যুবক।

৪র্থ টাইবুনাতে অভিযুক্তদের বক্তব্য

আলীপুর কোর্টে চতুর্থ টাইবুনাতে অনন্ত সিং ও অজ্ঞানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। এই মামলার অভিযুক্তগণ একটি বিবৃতি এই আদালতে পেশ করেন। আদালত তা নথীভুক্ত করে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর। অভিযুক্তরা এই বিবৃতিতে বলেছেন: “চতুর্থ টাইবুনাতে নামনে বিচারাধীন অনন্ত সিং ও অজ্ঞান অভিযুক্তগণ “রাজনৈতিক বন্দী” নয়—মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহুর সম্পূর্ণ মুক্তিহীন, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অপমানজনক এই উক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিতার জানাবার উপযুক্ত ভাষা আমাদের জানা নেই। যে মামলার চার্জ গঠনের ক্ষেত্রে আদালতে হস্তক্ষেপেই বলা হয়েছে যে অভিযুক্তদের সমগ্র কার্যকলাপের পিছনে মন্ত্রণা পরিবর্তনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার এবং যে মামলায় প্রতিটি বিচারাধীন বন্দী নিজ নিজ এলাকার জনসাধারণের নিকট নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে সুপরিচিত—একমাত্র সংকীর্ণ ও অসং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া কেউই তাদের “অ-রাজনৈতিক” আখ্যা দিতে পারে না। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত—শুধুমাত্র এই কারণেই কোন ব্যক্তি বিশেষের বক্তব্য চূড়ান্ত বলে গ্রহণ হতে পারে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণতান্ত্রিক মন্ত্রণের অভিমতই চতুর্থ টাইবুনাতে বিচারাধীন বন্দীদের চরিত্র নিরূপণে চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং ব্যক্তি বিশেষের—তা তিনি যতই গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হোন না কেন—সংকীর্ণ

স্বার্থ প্রণোদিত কুসংস্কৃত অভিপ্রত্যাখ্যাত হবেই।”

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন, দীপক বহু, কাজল পাল, অমল রায়, রঞ্জিত দে, গৌরাঙ্গ মহম্মদার, শঙ্কর ভৌমিক, হারাধন দাস, গৌতম গোস্বামী, প্রলয়েশ মিত্র, অশোক বোষ, হুপ্রশান্ত হালদার, দেবব্রত ভট্টাচার্য, মোহন পরামাণিক, তরুণ চক্রবর্তী, কল্যাণ বহু, অরুণ গোস্বামী, কনুদেব বোষাল, কল্যাণ রায়।

ঘুষ দিয়ে পাশ সার্টিফিকেট

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বাতিল না হওয়ার আগে পর্বস্বত্বদীর্ঘকাল ধরে ৮০০, ১০০ বা ১০০০ টাকার বিনিময়ে পরীক্ষা না দিয়েই মাধ্যমিক বা স্কুল ফাইনাল ১ সার্টিফিকেট পাওয়া যেত। এই রকম বহু ব্যক্তিই ফাঁদে পড়েছেন। কারণ তারা আগাম টাকা পরমা দিয়ে রেখেছিলেন সার্টিফিকেট পাবার আশায়। অথচ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বাতিল হওয়ার ফলে তাঁদের আশায় ছাই। তাঁরা ঘুষখোরদের ধরিয়ে দেবার জন্ত মরিয়া হয়ে উঠেছেন। এখন প্রশ্ন: প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গী-সাথীদের ধরিয়ে দেবার জন্ত প্রস্তুত হবেন, না এখনো ‘অগণতান্ত্রিক’ ‘অগণতান্ত্রিক’ বলে চোঁচাবেন? অপব দিকে সত্যপ্রিয়বাবু ও বামফ্রন্ট এই ঘটনার মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণ করবার সুযোগ পাবেন যে, বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থায় হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া গণতন্ত্র বিবোধী নয়।

প্রিয় দাসমুন্সীর সঙ্গে আলোচনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কার.নিরে। উত্তর মেতা এই বিষয়ে একমত হন যে ৬৭-৬৯ সালে যে সমস্ত হত্যাকাণ্ড অস্বীকৃত হয়ে তার জন্ত ফ্রন্ট মন্বিসভা দায়ী। এর তদন্তের জন্ত সরকার হলে ব্যাপক আন্দোলন করতে হবে। “সবাইকে নিয়ে আলোচনা করতে হবে।”

এছাড়া এই নকশাল নেতা বিভিন্ন গণসংগঠনের-সঙ্গে যুক্ত এবং ইনি সত্যনারায়ণ সিংপন্থীদের “গণফ্রন্টের লোক” হিসেবে পরিচিত।

নকশালপন্থীদের অজ্ঞান মহল এই আলোচনা সম্পর্কে ওরাকি-বহাল। তাঁরা মনে করেন সত্যনারায়ণ সিং-দের সঙ্গে চরণ সিং-এর সঙ্গে এক গোপন সমঝোতা হয়েছে। কেমনা আকাশবানীর এক বুজোটেই বলা হয়েছিল নকশাল নেতা কাল

সাম্রাজ্য, অসীম চ্যাটার্জীর কাছে চরণ সিং যুদ্ধলোকা চেয়েছেন, কিন্তু তা বা প্রত্যাখ্যান করেন। এই জনতা ১৭-কার তাঁদের প্রতিরাজনৈতিক প্রতি-হিংসা চরিতার্থ করতে তাঁদের মুক্তি দিচ্ছেন না। অথচ রহস্যজনকভাবে সত্যনারায়ণপন্থীদের অপর এক নেতা অজ্ঞান চরণপাল্লাবেড়ির ওপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা উঠে গেছে। বলা দরকার, এর ধ্বংসাত্মক জন্ত অজ্ঞান কংগ্রেস সরকার হু-লাথ টাকা প্রস্তুত বোষণা করে-ছিলেন। এমন একটা সময়ে এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে যখন অজ্ঞান মুখ্য-মন্ত্রী ডেভেন্দ্র রাও একান্তে বোষণা করেছেন “কোন নকশালকে মুক্তি দেওয়া হবে না।”

প্রকাশিত হল

দর্পণ

শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৪

এই সংখ্যায় আছে

রায়ত প্রসঙ্গে বাংলার বিদ্যাসমাজ: কুমুদকুমার ভট্টাচার্য / দণ্ডিতা ইন্দিরা: দাশন গুহ / বংশীলাল—গণতন্ত্রে এক ক্ষুদ্রে ডিক্টেটর: মুকুন্দন মেনন / বাশিয়ার রাষ্ট্রচরিত্র এবং সংশোধনবাদ: পঙ্কজ চৌধুরী / গণ-তন্ত্র বনাম কারাতন্ত্র: ক্রান্তি সেন / সংবিধানের নব কলেবর: রমাপ্রসাদ মল্লিক / আগামী পাঁচ বছর—ভারতীয় রাজনীতি ও পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার: সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় / শত্রুমিত্র: সমর সেন / সাহিত্যিকের রাজনীতি: মিহির আচার্য / মিসা সংশোধন, ১৯৭৬: সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় / ইন্দিরার রাজত্বে হরিজন-হত্যা: জ্যোতির্ময় বসু / নকশালবাদের কৃষক সংগ্রাম ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক: তপন বসু / জনতা দল ও সরকারের শ্রেণী চরিত্র: কালিদাস কুণ্ডু / সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে: ফণী চক্রবর্তী / অব্যমূল্যের সমস্তা: নারায়ণ চৌধুরী / শেষ কথা কে বলবে: অমলশংকর রায় / সময় সময়: অসীম রায় / এখনও: রণজিৎকুমার সেন / কলকাতার ফুটবল ওপেলে: আরবি।

অনার্য মিত্রের রাজনৈতিক ছড়া ও অমলের কার্টুন

দাম: চার টাকা

লক্ষ্মী বসু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দিয়ে ভাড়াটিয়াদের বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার আদেশ দেন।

কিন্তু এখনও লক্ষ্মী বসু বাড়ী ছাড়ছেন না। অভিযোগ, তিনি বিভিন্ন উপায়ে বাড়ীটি নিজের দখলে রাখার চেষ্টা করছেন। এদিকে অসহায় নিঃস্বল বিষবাহিলা পরা-জ্বরে থেকে দোরে দোবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অভিকারের আশায়।

পুলিশ ও অফিসারদের উপস্থিতিতেই রেলের টি টি ই-রা গুণ্ডাদের হাতে আক্রান্ত হচ্ছেন

সাধন শুহ

রেলের যাত্রী বাড়ছে। আরও বাড়ছে। এটা রেল দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই বলছি। এতদসঙ্গেও “আর্নিং”-এর দোহাই দিয়ে টি, সি এবং টি, টি, ইদের নানাভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, টি, সি এবং টি, টি, ইরা কর্তাদের খামখেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়ে যাত্রীদের হাতে প্রহৃত হচ্ছেন, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের জীবনহানিরও ভয় দেখানো হচ্ছে পুলিশ এবং অফিসারদের সামনেই। বিপদের সময় সবাই কেটে পড়েন। জীবন বিপন্ন হয় টি, টি, ইদের। ১৩, ১৭, তারিখে শিয়ালদা ম্যাসিভ স্কোয়াডের টি, টি, ই জিএ, কে, বিশ্বাস অমিত চৌধুরী ওরফে ডুরান-বলে জর্নৈক যুবককে মোবাইল চেকিংয়ের সময় বিনা টিকেটে ভ্রমণের অপরাধে

আটক করেন। বিশ্বাস ছেলেটিকে ধরেন কে ৪৭নং কল্যাণী লোকালে। এই ছেলেটিকে ভাড়া আদায়ের জন্য আটক করার কয়েক মিনিট পরেই ১০।১৫ জন মস্তান ৩নং প্র্যাটফর্মে এসে সশস্ত্র পুলিশের সামনেই পূর্বোক্ত ডুরানকে ছেড়ে দেবার জন্য এ, কে, ক বিশ্বাসের কাছে দাবী জানান। পুলিশকে নিষ্ক্রিয় দেখে বিশ্বাস তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে ছেলেটিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ছেলেটি মুক্ত হবার পরই ৪নং প্র্যাটফর্মে গিয়ে প্রকাণ্ডে ইট ছুঁড়তে থাকে এবং পুলিশ তা দেখে পালিয়ে যায়। বিশ্বাসরা এমতাবস্থায় ১নং প্র্যাটফর্মে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

প্রায় দুই ঘণ্টা পর পূর্বোক্ত ডুরান তার দলবল নিয়ে ১মং প্র্যাটফর্মে হানা দেয় এবং বিশ্বাসকে হত্যা করার হুমকী দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। এ সব ঘটনা ঘটে প্রায় ১৫জন আর, পি, এক এবং রেল পুলিশের সামনে। তারা কেউ এর প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধে এগিয়ে আসেনি। এ, সি, এস (টিকেট), পি, সি, ব্যানার্জী ঐ সময় ব্যারাকপুর স্টেশনে ছিলেন। জি, আর, পি, এস, আই স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। এতবড় যে হাঙ্গামা হয়ে গেল সে সময় এ, সি, এস (টিকেট), এস, আই-জি, আর, পি অথবা মোবাইল স্কোয়াড-ইন-চার্জ বি, একুবর্তী একবারও আক্রান্তদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেন নি। এই গুণ্ডার দল পুলিশকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে বিনা টিকেটের আইট যাত্রীদের ছিনিয়ে নেয়।

ঘটনা মিটে যাবার পর সেদিনের ভোরপ্রাণে এ, সি, এস (টিকেট) পি, সি, ব্যানার্জী, এস, আই, জি, আর পি, এবং বি, চক্রবর্তী ঘটনাস্থলে এসে বলেন যে তারা নাকি ঘটনার কিছুই জানতেন না। এতবড় মিথ্যা কথাও কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? কেন সেদিনের ঘটনার জন্য অফিসার পি, সি, ব্যানার্জী, এস, আই, জি, আর, পি এবং স্কোয়াড ইন চার্জ বি, চক্রবর্তী কৈফিয়ৎ তলব করা হবে না এবং কেন তাদের কর্তব্যে অবহেলার অপরাধে শাস্তি দেওয়া হবে না? এস, সি, ও জি সরোজ মুখার্জী ৩৩.১৫.৬০ গ্রেডের টি, টি, ই, এস, এস, চ্যাটার্জীকে স্টপ গ্যাপে ৪২৫-৬৪০ গ্রেডে টেনে আনলেন এবং পরপর একসটেনসন দিয়ে তাকে এডিশনাল সি, আই, টি-

শেয়ালদা করলেন এবং নানা অজুহাতে আর্থিক পুরস্কারও চাটুষ্ক্ মশালের ভাগ্যে জুটছে। সরোজবাবু নিজস্ব উপদলীয় কার্যকলাপে খুবই সক্রিয় হলেও টি, সি, এবং টি, টি ইরা যখন কর্তব্যরত অবস্থায় গুণ্ডাদের হাতে আক্রান্ত হন তখনতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে নিষ্ক্রিয় কেন? শুধু ব্যারাকপুরেই নয়, ১৫ই সেপ্টেম্বর সাহেবগঞ্জের কাঁহালগা স্টেশনে ভাগলপুরের রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেট চেকিংয়ের সময় টি, টি, গুণ্ডাদের হাতে প্রহৃত হন।

পূর্ব রেলের সি, সি, এস ব্রীকে, কে, দাস দয়াকরে এ সম্পর্কে কিছু বলবে কি? গত ২১শে সেপ্টেম্বর ইষ্টার্ন রেল টিকেট চেকিং ঠাক এসো-সিয়েশনের গোয়েন্দা বিভাগীয় শাখার উদ্যোগে প্রায় দুই শতাধিক টি, সি, টি, টি, ই'র (মহিলাসহ) এক মিছিল শেয়ালদা ডি, এস, অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ জানায় এবং ডি, এস এঁদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা

প্রসঙ্গে বিভিন্ন দাবী বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দেন। আমরা আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি, রেল প্রশাসন শুধু আয়ের দিকটাই দেখছেন কিন্তু যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের ন্যূনতম বন্দোবস্তও করছেন না। এর প্রতিফলিত ভোগ করতে হচ্ছে টি, টি, ইদের। তাঁরা যাত্রীদের হাতে প্রহৃত হবেন, অপমানিত হবেন। তার কোন প্রতিকার হবে না। কিন্তু দৈনিক ৪৫টা করে পেনাল্টি কেস না করলেই তাদের শাস্তি পেতে হচ্ছে। এটা কি হুবুজা রাজার দেশের আইন? প্রশাসনের পেটোয়া টি, সি, টি, টি, ইদের ‘সাতখুন মার’। কিন্তু যারা কর্তাদের কাছে নতজাহ্ন না হয়ে আইনমার্কিত কতব্যপালনে তৎপর তাঁরাই নানাভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন।

রেলযাত্রীদের কাছে আমরা আবেদন করি যে, রেলের টিকিট চেকিং ঠাকের দুরূহ সমস্যা তাঁরা যেন দয়া করে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন তাঁরা নানাভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন—এ কথা বলাই বাহুল্য। যাত্রী হিসেবে তাঁরা কোন সুবিধাই পাচ্ছেন না কিন্তু এতদসঙ্গেও অনেক সময় টি, সি, টি টি ইদেরও তাঁদের সঙ্গে কঠোর

ব্যবহার করতে হয় বাধ্য হয়ে। আমরা আবেদন করি, যাত্রীরাও রেল প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করুন যাতে টিকেট চেকিং ঠাককে বাধ্য হয়ে অনেক অপ্রিয় কাজ না করতে হয়। অনেকেই জানান না যে বাইরে গেলে টি, টি, ইদের বিশ্বাস গ্রহণের উপযুক্ত বন্দোবস্তও রেল করে না, কারণ তাঁরা রানিং ঠাক নয়। শেয়ালদায় টি সিদের জন্য কোন টিফিন কিংবা ক্লোক রুম নেই। অর্থাৎ এঁদের ন্যূনতম পাওনাটুকুও এঁরা প্রশাসনের কাছে পান না। অথচ কথায় কথায় এঁদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের পোষা কিছু লোকেরা দুর্নীতির জন্য গোটা টিকেট চেকিং ঠাককে যাত্রীদের কাছে হেয় হতে হচ্ছে, তার কোন প্রতিকার নেই। এই হচ্ছে বর্তমানে পূর্ব রেলের প্রশাসনিক চালচিত্র। রেল মন্ত্রী মধু দত্তবতে অনতিবিলম্বে যদি হস্তক্ষেপ না করেন তবে পূর্ব রেল পরিণত হবে স্থায়ী দুর্নীতির ঘাঁটিতে।

প্রাক্তন মন্ত্রীর একটি দুর্নীতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্যের প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী কমল হেমব্রমের বিরুদ্ধে রাজ্যের বন দপ্তর জাল রসিদ দাখিল করে বই কেনার অভিযোগ এনেছে এবং রাজ্য পুলিশকে অল্পরোধ করেছে যে তাকে যেন গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৭১ সালে ডেমোক্রাটিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে লীহেমব্রম বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হন। তখন তার একান্ত সচিব ছিলেন শ্রীমলাই মণ্ডল।

অভিযোগে প্রকাশ, বিদ্যোদয় প্রেস থেকে একখানি পাঁচ টাকা দামের বই কিনে তিনি পাঁচশ টাকার ক্যাশমেমো দাখিল করে বনদপ্তর থেকে ঐ টাকাটা তুলে নেন। রাজ্যের বনদপ্তর এরপর তদন্ত শুরু করেন এবং বিদ্যোদয় প্রেসে গিয়ে তাদের ডুপ্লিকেট ক্যাশমেমো পরীক্ষা করে দেখেন যে সেখানে পাঁচটাকা দামের একটি হিন্দী বই কেনা হয়েছে। অথচ ঐ একই ক্যাশমেমোর আসলটি পাঁচশ টাকা দেখিয়ে একটি জাল ক্যাশমেমো দাখিল করা হয়েছে। রাজ্য বন দপ্তরের সহকারী সচিব মন্ত্রী ও তাঁর সি এর বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ এনে রাজ্য পুলিশের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার কথা বলে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কংগ্রেসী (শেবাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

একটি রহস্যজনক দুর্ঘটনা ও কিছু ঘটনা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

একটি মোটর দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে রহস্যের জাল বিস্তৃত হয়েছে। দুর্ঘটনা ঘটেছে গত ১৫ই আগস্ট রাত ৩টায় জি টি রোডের ওপর কুলটি থানার অধীন নিয়ামতপুরে আসানসোল থেকে যার দূরত্ব তিন মাইল। গাড়িতে আরোহী ছিল পাঁচজন—অনিল ঘোষ (রামবাবু), অনিল দাস, প্রবীর গুপ্ত, চিত্ত সাহা এবং ডাঃ হৃদীপ্ত রায় বিনি গাড়ির মালিক এবং তিনিই গাড়ি চালাছিলেন। এই দুর্ঘটনায় প্রথম দুজন ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন এবং তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ প্রবীর গুপ্তকে আহত অবস্থায় আসানসোল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তিনি গত ১৮ই আগস্ট সকাল ১০-৩০ মিনিট নাগাদ মারা যান।

দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে জানা গেছে, জি টি রোডের উপর একটি লরী দাঁড়িয়েছিল এবং গাড়ির চালক ডাঃ হৃদীপ্ত রায় ভ্রমক্রমে এতে ধাক্কা মারেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই দুর্ঘটনায় ডাঃ হৃদীপ্ত রায় প্রায় অক্ষত ছিলেন। আর একজন আরোহী চিত্ত সাহা গায়েও কোন আচড় লাগেনি। এই চিত্ত সাহা (হুমহম অকলের হাতকাটা চিত্ত নামে কথ্যাত) দুর্ঘটনার দিন রাতেই লরীতে

করে কলকাতা ফিরে আসে। জানা গেছে থানার রেকর্ডে তার নাম নাকি লেখা হয়েছে বিমল সরকার বলে। এবং কুলটি থানার বর্তমান ও সি আগে দমদম থানায় ছিলেন বলেও জানা গেছে। দুর্ঘটনার পরবর্তী অনেক ঘটনাই রহস্যজনক এবং তার উত্তর মেলে না। যেমন, তিনজনের মৃত্যুতে বোঝা যায় দুর্ঘটনা বেশ গুরুতর, কিন্তু দুজন আরোহী প্রায় অক্ষত রইলেন কি করে এবং পেছনের সীটে মাঝে বসা সত্বেও প্রবীরের মাথার পেছনে গুরুতর আঘাত লাগে কি করে? প্রবীরের আত্মীয়দেরই বা পুলিশ কোন খবর দেয়নি কেন? পুলিশ সাউথ সি'থিতে ডাঃ হৃদীপ্ত রায়ের পিতা ডাঃ অনিল রায়কে খবর দেয়, কিন্তু তিনি প্রবীর হৃদীপ্তর গাড়িতে কলকাতার বাইরে গেছে তা জানা এবং প্রবীরের বাড়ি তাঁর পাড়ায় হওয়া সত্বেও সেখানে কোন খবর দেন নি কেন? অথচ ডাঃ অনিল রায় খবর পাওয়া মাত্রই আসানসোল হাসপাতালে দৌড়েছিলেন এবং সেখান থেকে কুলটি থানায় গিয়েছিলেন। হৃদীপ্ত নিজে ডাক্তার হওয়া সত্বেও প্রবীরকে বর্ধমান হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন নি কেন সেখানে তার যথোপযুক্ত চিকিৎসা হতে

পারত? পুলিশই বা এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ছিল কেন? ডাঃ হৃদীপ্ত রায় দুর্ঘটনায় লিপ্ত গাড়ির মালিক ও চালক হওয়া সত্বেও তাকে আদালতে হাজির না করে কি করেছে দেওয়া হল? পুলিশ হাতকাটা চিত্তকে সেই রাতেই বা ছেড়ে দিল কি করে জিজ্ঞাসাবাদ না করে? আরও প্রশ্ন গাড়িটি কি চালানোর উপযুক্ত ছিল এবং তার ঠিকমত ইনসিগুর করা ছিল?

বি এম এস কোর্সের
ছাত্রদের অভিযোগ
(দর্পণের সংবাদদাতা)

১৯৭৬ সালের ১লা ডিসেম্বর বি, এম এস ডিগ্রী কোর্সের ক্লাস কলকাতা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ শুরু করেছে। কিন্তু ডিগ্রী কোর্সের মান অস্বাভাবিক শিক্ষালভ থেকে ছাত্রাব্যক্তি। ডিগ্রী কোর্সের উপযুক্ত ব্যবস্থা ছাড়াই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে এটা চালু করার অল্পমোদন দিলেন? এ অভিযোগ বি এম এস কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের। এ ব্যাপারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে প্রতিকার না হওয়ায় ছাত্ররা ক্ষুব্ধ। তাই বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ছাত্রদের ক্লাস বন্ধকট আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এ ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তরের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

মহাশক্তিমানের আলোকে মহাশক্তিমানের হৃদয় ও দেবতা বীরেন্দ্রনাথ

অমীমাংসিত প্রশ্নগুলি

স্বর্গ অথবা ইজ্রায়েলের খোঁজে
দ্রোণদীপ চার পাণ্ডবও গেছেন
বজ্রীনাথের পথেই। গেছেন তাঁরা
ভিক্ষাতে কৈলাসে মানস সর্বোত্তরের
কোলে। কিন্তু স্বর্গারোহণের পথে
অগ্রসর হওয়ার স্বযোগ পাননি। সে
পথে সমর্থকরা সর্বদা দুর্ভেদ্য প্রতি-
রোধ রচনা করে আছেন। দেবগণ
(নৃত্যর) প্রদত্ত 'পাসপোর্ট' 'ভিসা'
পরিচয়পত্র ছাড়া স্বর্গের সেই পার্বত্য
সোপান অতিক্রম করে কেউই দেব-
শিবিরে উপস্থিত হতে পারেন না।
দেবদূতের কিছু মূর্খবির কাছেই
শুধু স্বামী ছাড়পত্র থাকে। তাঁরা
দেবতা নামক আন্তর্জাতিক প্রভুদের
সেবা করেন বার্তাবাহকরূপে, প্রচাবক
রূপে ও অনুসন্ধানীগুণের হিসেবেও।
প্রতিদানে লাভ করেন কিছু অত্যা-
শ্চর্য বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা। সমতলে ও
মহাসাগরে সেই ক্ষমতাকে দৈবশক্তি
হিসেবে প্রচার করে প্রভু দেবগণসহ
নিজেদের গোষ্ঠীতন্ত্রের প্রভাব ও প্রতি-
পত্তি বিস্তার করেন।

ব্যাপারটি সম্পর্কে কঠোর সাম-
রিক গোপনীয়তা বজায় রাখার যথেষ্ট
কারণ ছিল বলেই কি পাছে নৃত্যর
শিবির (স্বর্গরূপে প্রচারিত) স্বমেরু
পর্বতকে পার্থিব এলাকা হিসেবে
বুঝতে পারেন অর্জুন, তাই সেখানে
নামানোর আগে মহাকাশে ঘুরিয়ে
আনা হয়েছিল তাঁকে? তাই কি
তথাকথিত নৃত্যরশিবির বা দেবভূমি
স্বর্গের সবকিছু গোপন গিরিপথ ছিল
সংরক্ষিত? সেই পথমুখে পৌছানোব
আগেই দেবদূতের মূর্খরা এসে সাব-
ধান করতেন, ফিরে যেতে বলতেন
পূণ্যার্থীকে? সম্ভবত কি রাজা
পাণ্ডুর ব্রাহ্মণ সভায় যেতে চাইলে
নানা অজুহাতে সেই সভার উদ্দেশ্যে
শোভাযাত্রাকারী মূর্খরা তাঁকে বাধা
দিয়েছিলেন? ভীমসেনকে রূপে-
ছিলেন মহাকায় পবনপুত্র হুম্যান? পাছে
পাণ্ডবরা লোমশ মূর্খের মতই
পার্বত্যপথে বেড়াতে বেড়াতে হিমা-
লয়-স্বর্গে উপস্থিত হ'ন, দেবরাজ ইন্দ্র
তাঁকে কি স্বয়ং লোমশকেই পাঠিয়ে-
ছিলেন তাঁদের আগলে রাখার জন্য?

লোমশ ইজ্রায়েল থেকে অর্জুনের
কুশল বার্তাবাহ হিসেবে বনবাসী
পাণ্ডবদের কাছে প্রেরিত হয়ে বলেন,
“আমি দেবরাজ ইন্দ্র ও অর্জুনের
নিয়োগানুসারে রক্ষকস্বরূপ হইয়া
আপনাদিগের সহিত পর্যটন করিব।”
জিজ্ঞাসার কাছে প্রশ্ন, লোমশের এই
আগমনের পিছনে বস্তুতই কি অল্প
উদ্দেশ্য ছিল না? পথে লোমশ
পাণ্ডবরক্ষকের ভূমিকার কোনও
বিস্তৃতি প্রদর্শন করেন নি। তিনি
শুধু যুধিষ্ঠিরাদির সর্বক্ষণের সঙ্গী
হিসাবে পথ পরিক্রমা করেছেন।
কিন্তু কেন?

সন্দেহ হয় লোমশকে প্রেরণ করার
পেছনে ইন্দ্রের হয়ত 'ছিল' স্বতন্ত্র
উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য হ'ল, লোমশের
মাধ্যমে স্বর্গাতিযুগ্মযাত্রাকারী পাণ্ডব-
দের স্ববরাখবর সংগ্রহ করা। পাণ্ডব
সঙ্গী লোমশ হয়ত কোনো বার্তা
প্রেরক যন্ত্র অথবা টেলিপ্যাথির
মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ পাণ্ডব পরিবারের
ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ইন্দ্রলোককে
সর্বদা অবহিত রাখছিলেন। তাঁর
নিয়োগের নেশা ক্রুর সেটাই।
সম্ভবত লোমশের মাধ্যমেই ইন্দ্রলোকে
বসে পাণ্ডবগণের পর্বতপরের কথোপ-
কথন পর্বত ধরতে পারতেন দেবগণ।
তাই দেখি যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে যখন
বলছেন যে অনেক পথ পর্যটন করে
বহু নদী পর্বত অতিক্রম করে তাঁরা
গজমাদন পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন,
এবার তাঁদের গন্তব্য বৈশ্রবণ (স্বর্গে)
আবাস ঠিকানা (বন, ১৫৯), তখন
সঙ্গে সঙ্গেই দৈববাণী বা আকাশবাণী
হয়, 'হে রাজেন্দ্র! এই বৈশ্রবণের
আশ্রম হইতে সেই দুর্গম দেশে (স্বর্গে)
গমন করিতে সক্ষম হইবে না। অত-
এব যে পথ আশ্রয় করিয়া আগমন
করিয়াছে, সেই পথ অবলম্বন করিয়া
পুনরায় বদরিকাশ্রমে প্রতিগমন
কর।' এই সতর্কীকরণই প্রমাণ,
তথাকথিত দেবগণ খুবই সাবধানে
কাজ করতেন।

আমরা বাবংবার লক্ষ করেছি
দেবতার বার্তাবাহক মাধ্যমেই সংবাদ
আদান প্রদান করেন, অল্পকোনো
ঈশ্বরীয় পন্থা তাঁদের নেই। তাহলে

ভীমকে রাজা যুধিষ্ঠির কী বলছেন
সেই মুহূর্তে ইন্দ্রলোকে ট্রান্সমিট কর-
ছেন কে? পাণ্ডবদের আস্তানা থেকে
একমাত্র লোমশই পারেন সে খবর
পাঠাতে। দেবসভায় তাঁরই গতা-
য়াত আছে। আর সেই সংবাদ প্রাপ্তি
মাত্র দেতারযোগে রেবতারাও পাণ্ডব-
দের উদ্দেশ্যে তাঁদের নির্দেশ প্রেরণ
করতে পারেন উপযুক্ত গ্রাহকের
কাছে। নিকটস্থ সেই গ্রাহক লাউড
স্পীকার যোগে বার্তাটি প্রচার করতে
পারেন কোনো গোপন পার্বত্য
সোপান থেকে। শুনে পাণ্ডবদের তা
দৈববাণী বলেই মনে হয়েছে। লক্ষ-
ণীয় এটি, যখন দৈববাণী হচ্ছে তখন
কিন্তু যুধিষ্ঠিরাদির সর্বক্ষণের সঙ্গী
লোমশ সেখানে অস্থগত। দৈব-
বাণীকে মাত্র করার উপদেশ দান
করেছেন পুরোহিত ধৌম্য। এই
লোমশ হঠাৎ কোথায় গেলেন?
অলক্ষ্য থেকে তিনিই কি বিশ্বয়কর
দৈববাণীটি শোনাছিলেন তখন?
ইন্দ্রলোক থেকে আসার সময় বৈজ্ঞা-
নিক দেবতার তাঁকে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি
দিয়ে দেন নি তো? এই লোমশ-
মূর্খের সঙ্গে ব্যাসদেবেরও ছিল ঘনিষ্ঠ
যোগাযোগ। তাই সন্দেহ অমূলক
নয়।

দেবগণের সঙ্গে ব্যাসদেবের
গোপন সংযোগ ছিল বহুকাল।
ভ্রাম্যবধি ব্যাসদেব কোথায় থেকে-
ছেন, কী করেছেন স্বয়ং মা সভা-
বতীও তা জানতেন না। সভ্যবতী
তাঁকে স্মরণ করলে তিনি একবার
রাজপুরীতে আসেন। সভ্যবতীর
নিয়োগানুসারে ভ্রাতৃবৃন্দের গর্ভে
তিনিই উৎপন্ন করেন ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু
ও বিদুরকে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাস-
দেবই এঁদের পিতা। তারপর আবার
উধাও হয়ে যান ব্যাস। পাণ্ডুর
মৃত্যুর পর কুন্তীসহ কিশোর পাণ্ডব-
গণ যখন প্রথম হস্তিনাপুরে আসেন
ও তদবধি কুরুপাণ্ডবে সামসারিক
কলহ শুরু হয়, তখন দ্বিতীয়বার
ব্যাসদেবের সাক্ষাৎ পাণ্ডুর
যায় রাজপ্রাসাদে। তিনি মাতা
সভ্যবতীর এক অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী

শোনান। বলেন:
অতিক্রান্তমুখা: কাল: পশু্যপস্থিত
দারুণা:।
খঃখঃ পাপিষ্ঠ দিবসা: পৃথিবী গত-
যৌবনা:। (৬)
বহুমায়ী সমাকীর্ণা নানাদোষ
সমাকুল:।
লুপ্তধর্মক্রিয়াচারো ঘোর: কাল:
ভবিষ্যতি। (৭)
কুরুনামনবাচ্চাপি পৃথিবী ন ভবিষ্যতি
(আদি, সিদ্ধান্তবাগীশ)।

পাণ্ডুর আত্মহত্যাভীর পর এই
ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণী করে ঐষপায়ন
তাঁর মা রাজমাতা সভ্যবতীকে নিয়ে
বানপ্রস্থে চলে গেলেন। লক্ষণীয়
কুরুপাণ্ডব সম্রাটের অস্থব ও তখন পর্যন্ত
দেখা দেয়নি। সে সময় যুধিষ্ঠিরের
বয়স মাত্র ষোল, ভীম ও দুর্ধোধন
পনের, অর্জুন চোদ্দ। এই জ্ঞাতি
ভায়েরা সবেমাত্র একত্রিত হয়েছেন।
ওই সময় ব্যাসদেবের ভবিষ্যদ্বাণী হ'ল
দুর্ধোধনময়ী কাল সমাগত হয়েছে।
কুরুকুল ধ্বংস হয়ে যাবে! স্বতরাং
মা সভ্যবতীকে সংসার ত্যাগ করার
উপদেশ দিয়েছিলেন বেদব্যাস।
প্রশ্ন হ'ল, বিদুর বেদব্যাস কি কুরু
পাণ্ডবদের জন্মমূর্ত থেকেই জানতেন
যে একটা মহতী বিনষ্টী সমাগত।
দেবগণ নামক আন্তর্জাতিক শিবির
উত্তরাধিকার শাসন ভার ন্যস্ত করে
যেতে চান কি দেবদূতের কুন্তীপুত্র-
দের হাতে, যারা বস্তুতপক্ষে দেব-
ঔরসজাত? চক্রান্ত কি পাণ্ডবজন্মের
সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেছে? তারই
প্রথম চেষ্টা কি ছিল ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়ে
দুর্ধোধনকে ত্যাগ করানো ও যুধি-
ষ্ঠিরের সিংহাসন লাভের পথকে
নিষ্ফল্ট করা? এ কাজে দেবনিযুক্ত
ব্যক্তি ছিলেন বিদুর। পাণ্ডবজন্মের
সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম নিয়েছিল কি কুরু-
ক্ষেত্রের কুলনাশী চক্রান্তের বীজটি?
আর সেই চক্রান্তের পেছনে প্রধান
ক্রিয়ালীল পবিচালক ছিলেন আন্ত-
র্জাতিক শক্তিশিবির? তারই
চতুর্ন খেলা চলেছে তারপর?
অর্জুন গেছেন হিমালয় স্বর্গে
সমর শিক্ষার্থে? লোমশকে পাঠানো
হয়েছে ভ্রাতৃবিরহে কাতর পাণ্ডবদের
পার্শ্বচররূপে থেকে আন্তর্জাতিক
শক্তি শিবিরকে তাঁদের বিষয় প্রতি
মুহূর্তে ওয়াকিবহাল করিয়ে রাখার
জন্য?

মহাভারতীয় ঘটনাবলীর অদ্ভুত
পারস্পর্য বিচার করলে ওসব কথাই
মনে হয়। বুঝতে পারি, চতুর্দিকে
একটা ভক্তি বিশ্বাস ভয় ও ভ্রাস
শ্রুতি করে সেই আন্তর্জাতিক শক্তি-
শিবিরকে অলৌকিক ক্ষমতার অধি-
কারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য
একটা সর্বব্যাপী প্রচার চলেছে।

যদিও ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর মিত্রপক্ষ সেই
প্রচার সত্যও গুরুপক্ষকে কখনো
ঈশ্বরী শক্তির প্রতিনিধি বলে গণ্য
করেন নি। বিদেশী বলেই গণনা
করেছেন। এমন কি অর্জুন যখন
হিমালয়ে যাত্রা করছেন, দ্রোণদী
তখন সম্রাট চোখে তাঁর প্রিয়তমাকে
খিদায় জানিয়ে বলেছেন, হে প্রিয়,
তোমার বিরহে আমরা যতপ্রায়।
কিন্তু উপায় নেই, 'জয়লাভেব নিমিত্ত'
...তুমি প্রবাসে যাত্রা কর, মন্দল
হইবে।' (বন, ৪১) অর্থাৎ স্বয়ং
দ্রোণদীও জানতেন অর্জুনের স্বর্গযাত্রা
নামান্তরে প্রবাস যাত্রা মাত্র। স্বর্গ
এক মহাশক্তিমান বৈদেশিক ঘাটি।
তা ভগবানের আলয় নয়।

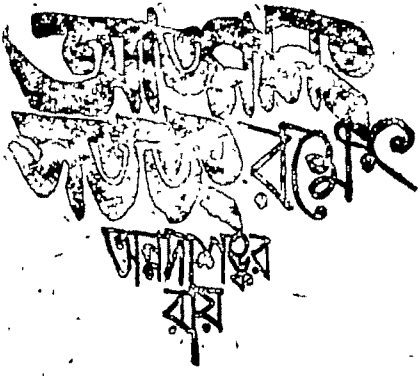
লোমশ ছিলেন ইন্দ্র কর্তৃক
প্রেরিত কুশলবার্তাবাহক: ব্যাসদেব
তাঁকে পাণ্ডবদের পার্শ্বচর নিযুক্ত
করেন। এ সমস্তই স্পষ্ট ও চতুর রাজ-
নীতির খেলা। মহাভারতের রাজ-
নৈতিক কুটিলাবর্ত আলোচনার সময়
সেই অদ্ভুত রোমহর্ষক ঘটনাবলীকে
আমরা মহাকাশবিজ্ঞানের আলোকে
নোতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে পাব

বিচারে বসলে বোঝা যাবে কুরু-
ক্ষেত্রের যুদ্ধের কারণ পাঁচটি মাত্র
গ্রামের জ্ঞাত প্রতিবিরোধ নয়, নয় তা
দ্রোণদী লাজনার প্রতিশোধগ্রহণ,
তার পেছনে ছিল আন্তর্জাতিক
বৈদেশিক শক্তির পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠার
আকাঙ্ক্ষা। সেই অনেক কথার জন্য
আর একখণ্ড গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন।
(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)

গ্যাক্সো ওয়াকার্স ইউনিয়নের অভিযোগ (দর্পণের সংবাদদাতা)

গ্যাক্সো ওয়াকার্স ইউনিয়নের পক্ষ
থেকে প্রতিদ্বন্দী পুরনো এমপ্লয়ীজ
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ওয়াকার্স ইউ-
নিয়নের সভ্য ও সমর্থকদের ওপর
হামলা ও ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ
করা হয়েছে।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে
যে, পুরনো এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের কর্ম-
কর্তারা এতদিন ভুল পথে কর্মচারী-
দের চালনা করেছেন। তাই এই
নতুন এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের জন্ম
হয়েছে। কিন্তু এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের
কর্মকর্তারা নিজেদের অস্তিত্ব বজায়
রাখার জন্য সব বকম চেষ্টা করে
যাচ্ছেন। পুলিশকে জানিয়েও কোন
লাভ হয়নি। মালিকপক্ষও এই
বিরোধের স্বযোগ নিচ্ছেন বলে অভি-
যোগে বলা হয়েছে।



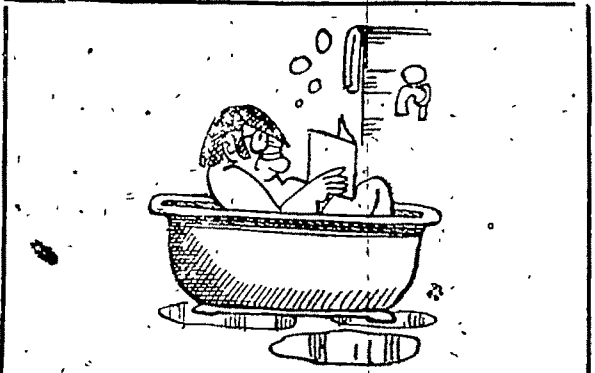
কতটুকু তৃপ্তি? বিষয়টা যদিও খুব জরুরী তবু বিষয়-
গুণেই লেখা কখনো সাহিত্যের মর্যাদা পায় না। তাই
যদি হতো, আমাদের সাংবাদিকদের মতো ভাগ্যবান
কে? যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়।

‘সবুজপত্র’ আমার সাহিত্যিক জীবনের সুর বেঁধে
দিয়েছে। কিন্তু আমি সেইখানে থেমে থাকিনি। বারো
বছর বয়স থেকে বাহাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত কতরকম
বিষয়েই না মাথা ঘামিয়েছি। ‘আটের চৌহদ্দির ভিতরে
নিজে এসেছি কতরকমই না বিষয়।’ বাল্যকাল থেকেই
আমি শুনে এসেছি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে একটা
সীমথেনিস ঘটানো দরকার। সে ভার নিয়েছিলেন
রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী। আমিও সে ভার নিজের
কাঁধে তুলে নিই। আমি হই তাঁদের উত্তরসাধক। সে
সাধনা এখনো অসমাপ্ত। প্রাচ্য প্রতীচ্যের সীমথেনিস
এখনো সূদূর। লোকের ধারণা ইংরেজরা দামী জিনিষ
কিছুই দিয়ে যায়নি, সব কিছুই নিয়ে গেছে। কী কী
নিয়ে গেছে ও কী কী দিয়ে গেছে এর একটা সামগ্রিক
হিসাব নিকাশ প্রয়োজন। করতে হবে আমার মতো
যারা দুই দেশের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত, দুই সভ্য-
তার কোলে লালিত। এটাকে আমি একটা কর্তব্য
বলে স্বীকার করেছি। প্রাচ্য আর প্রতীচ্য দুই মিলেই
বিশ্ব। যে মানুষ বিশ্বপ্রেমিক হবে সে একই কালে
ভারতপ্রেমিক তথা ইউরোপপ্রেমিক হবে। ইউরোপকে
স্বপ্ন করে বা পাটো করে বিশ্বপ্রেমিক বা মানবপ্রেমিক
হওয়া যায় না। ভারতপৃথিবী রামমোহন ইউরোপ-
পৃথিবীও ছিলেন। ছিলেন বিশ্বপৃথিবী। তার সেই
পন্থা আমারও পন্থা।

রামমোহনের মতো আমারও ওপর একটি কর্তব্য
হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মেলবন্ধন। যেখানে আমার জন্ম
সেখানে আমাদের পেছনদিকের প্রতিবেশী একঘর পশ্চিমা
মুসলমান। ব্যক্তিগত জীবনে ওদের সঙ্গে আমাদের
সম্পর্ক চিরকাল মধুর। হিন্দু পুরুষ যে মুসলমান নারীকে
হরণ করে এটা অবিশ্রাস্ত হলেও এরকম ঘটনা আমার
বাল্যকালে বার দুই ঘটে। প্রথম বারের নারীটি আমার
সাক্ষীরনী। আমাকে আদর করে খাওয়াতেন মুরগীর
ডিম, যেটা আমাদের বাড়ীতে নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়বারের
পুরুষটি আমাদেরই এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়। সূদর্শন
সাহেবী পোশাকপরা ডাক্তার। দেশীয় রাজ্যে আমার
পিতার বাস। হিন্দুর উপর হিন্দুর অত্যাচারের প্রত্যক্ষ-
দর্শী আমি। খারাপ কেবল মুসলমানরাই, অত্যাচারী
কেবল মুসলমানরাই, এমন কথা আমাদের বাড়ীতে
কখনো শুনিনি। শুনেছি বাইরে, শুনেছি কেবল তাদেরি
মুখে যারা কখনো মুসলমানদের সঙ্গে মেশেনি বা হিন্দু-
দের আত্মীয়গুলো দেখেনি। হিন্দু আর মুসলমান দুই
মিলেই ভারতবর্ষ। ভারতপ্রেমিক যারা হবে তারা
একই কালে হিন্দুপ্রেমিক তথা মুসলমানপ্রেমিকও হবে।
মুসলমানকে স্বপ্ন করে বা পাটো করে ভারতপ্রেমিক বা
বিশ্বপ্রেমিক হওয়া যায় না। এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি
করতে আমার জীবনের আদিপর্বই যথেষ্ট। কিন্তু অস্তিম
পর্বে উপনীত হয়েও আমি অপর দশজনকে উপলব্ধি
করতে পারিনি। গান্ধীজী তো প্রাণটাই হারালেন।
আমি অবশ্য ততদূর যাইনি, তবে আমিও কিছুদূর গেছি।
মানচিত্রের দিকে তাকাতে কষ্ট হয়। ওটা তো রাম-
মোহনের, রবীন্দ্রনাথের ও গান্ধীজীর ব্যর্থতার মানচিত্র।
সেই সঙ্গে আমারও।

তৃতীয় যে কর্তব্য নিয়ে আমি গান্ধীজীর প্রভাবে
আসার পর থেকে চিন্তাধিত সেটা হচ্ছে জনগণের সঙ্গে
সাদৃশ্য। একই সময়ে আমি টলস্টয়ের প্রভাবেও আসি।
জনগণের ক্ষেত্রে লিখিত তাঁর সেইশটি গল্পের সংগ্রহ আমি

স্কুল থেকে পুরস্কার পাই। তার একটি বাংলায় তর্জমা
করে সেই বয়সেই ‘প্রবাসী’তে পাঠিয়ে দিই। সঙ্গে
সঙ্গে ছাপা হয়ে যায়। টলস্টয় আর রবীন্দ্রনাথ মিলে
তৈরী করে দিয়েছেন আমার সাহিত্যদর্শন। গান্ধী
আর রবীন্দ্রনাথ মিলে স্থির করে দিয়েছেন আমার জীবন
দর্শন। এঁদের সঙ্গে আমি মনে মনে বাদানুবাদও
করেছি। বিনা বাক্যে একটা কথাও মেনে নিইনি।
শেষপর্যন্ত আমি এঁদেরি সম্মুখানে এসে পৌঁছেছি।
তিনজনেই নগরবিমুখ। তিনজনেই পল্লীপ্রাণ। তিন-
জনেই চেয়েছেন জনগণের মুক্তি ও তাদের সঙ্গে
একাত্মতা। এঁদের আরও কর্ম এঁরা সমাপ্ত করে যেতে
পারেন নি, পারলে রাশিয়াতে বিপ্লব ও ভারতে নকশাল
বিক্ষোভ ঘটত না। শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণ এখন
লোহার জাল দিয়ে ঘেরা ‘রক্তকরবী’র রাজনিকেতন।
নইলে নকশালরা রবীন্দ্রনাথের কীর্তি ধ্বংস করত। ক্রমশ
দেশটাও ‘রক্তকরবী’র রাজনিকেতন না হয়ে ওঠে।
আমার কাছে অহিংসা কেবল একটা আধ্যাত্মিক প্রশ্ন
নয়। এটা মানুষের প্রাণরক্ষার তথা কীর্তিরক্ষারও
প্রশ্ন। শুধু ভারতেই নয়, সারা জগতে।



পানু রায়

অন্যায়ের বিরুদ্ধে

শোন শোন পানু রায়
কতটা জালালে যদি জানতে,
যদি কিছু অপরাধ কিছু কিছু
দোষ গুণ মানতে।

পাচটা বছরে তুমি
কৌদল-কেছা ছাড়া কি দিলে,
একে তাকে চাটি দিয়ে
পকেট ভারিয়া তুমি কি নিলে।

এর সাথে গলাগলি ওর সাথে চলাচলি
কালকেই তাকেই দিলে গাটা,
পরন্তু তাকেই ঘুষ, কানাকানি ফুসফুস
অদ্ভুত শাসনের ঠাটা।

জরুরী ঘোষণা হোক, মিসা করো কিছু লোক
দিল্লীসরীকে দিলে বুদ্ধি,
তোমার ধরেনা খুশী, একা মনে ঘোটুণী
সংবিধানের হ'লো শুদ্ধি।

আরো কত উপহার, কি জানি কি বাহার,
দিয়েছ কি আলতা ও কুমকুম
দিয়েছ সে মাহুঘেরে, যার আছে অনাহাবে
লক্ষ টাকার এক বাথরুম।

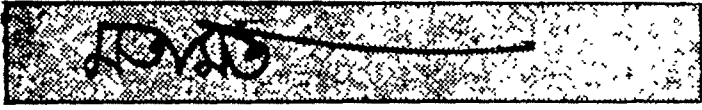
আহা উহ পানু রায়
চলে গেলে হার হার
কি হবে যে পশ্চিমবঙ্গে
সমূলে পতন হল
ধন গেল মান গেল
জয় জয় ভগবতী গঙ্গে।

আমার আজকালকার সর্বপ্রধান চিন্তা হলো, আমি
কেনন করে আত্মরক্ষা করব। কেবল কায়িক অর্থে
আত্মরক্ষা নয়, মানসিক অর্থে আত্মরক্ষা, বাচিক অর্থে
আত্মরক্ষা। আমি একজন সারস্বত। একজন কবি,
কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধকার। একজন শ্রুতি, শ্রুতি, পথ-
নির্দেশক। দেশের ইনটেলেকচুয়াল লীডারশিপ আমার
মতো কয়েকজনের উপরেও বর্তেছে। প্রাণের ভয়ে বা
হুতোরগের ভয়ে আমরা কখনো আমাদের দায়িত্বের প্রতি
বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারিনি। প্রলোভনে পড়েও
লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারিনি। সামনে আমাদের ক্ষুরধার পন্থা।
লিঙ্কলেও বিপদ, না লিঙ্কলেও বধ্যাঙ্ক। স্টেরিলাই-
জেশন।

বিশেষ করে আমার সামনে এখন একরাশ অসমাপ্ত
কাজ। যা আমি ছাড়া আর কারো হাত দিয়ে সম্পন্ন
হবার নয়। ত্রিশ বছর ধরে যে উপন্যাসটির জন্তে
আমি প্রস্তুত হচ্ছি তার সমাপ্তির জন্তে আমাকে বেঁচে
থাকতে হবে। পরবর্ত্ত নয় না হলে সে কাজটি ব্যাহত
হবে। সেইজন্তে আমি দশ জনের দশ রকম ফরমাস
খাটিতে নারাজ। তবু খাটিতেই হয়, কারণ আমি একজন
সামাজিক মানুষ। নির্মমভাবে ‘না’ বলতে কুঠা বোধ
করি। এমনতেই যথেষ্ট অসামাজিক। সামাজিকতা
করতে সম্মত পাইমে। কিন্তু এখনো সমাজে বাস করছি।
ঐশ্বরবিন্দ বা পাবলো পিকাসো বনে যাইনি। তা
ছাড়া আমি একজন ঔপন্যাসিক। ঔপন্যাসিক যদি
পাঁচজনের সঙ্গে না মেশে, যদি সব সময় দরজা বন্ধ করে
লেখে, তাহলে তার জীবনের অভিজ্ঞতা বাড়ে না। আর
তার জীবনের অভিজ্ঞতাই তো তার পুঁজি।

তার পর এখনো আমার কবিতার কাজ বাকী।
কতক কথা আছে, তা কবিতা আকারেই ব্যক্ত করতে
হয়। আমি আবার এমন একজন কবি যে কবিতা বলতে
বোঝে ছন্দোবদ্ধ মিত্রাক্ষর কবিতা। ক্রী ভার্স আমি
জীবনে একবারমাত্র লিখেছি। সেটা আমার এপিট্যাফ।
নিজের উপর এমন একটা অহুশাসন না চাপালে আমার
কবিতার সংখ্যাও আমার প্রবন্ধ সংখ্যার সমান হতো।
কিন্তু তা হলে আবার এমন অভিযোগও উঠত যে ওগুলিও
বর্ণচোরা প্রবন্ধ। পত্রের মতো করে পাজালে কী হবে,
কবিতা বলে কথিত বস্তুটি কবির বক্তব্য মাত্র।

ছেলেবেলায় আমার হাতে এক তাড়া ‘সবুজপত্র’
পড়ে। তখন থেকেই ‘আট’ বলে একটি শব্দ আমার মনে
গেঁথে রয়েছে। কী যে ওর অর্থ তখন আমি তা বুঝতুম
না। পরে নানা মুনির নানা ব্যাখ্যা শুনেছি। নানা মুনির
অনুবরণ বা অনুসরণও করেছি। শেষে নিজেই একটা
সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। তার আগে রকমারি এক্সপেরি-
মেন্ট করেছি। ‘আট’ নামক ওই শব্দটি আমার জীবনের
সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে যে আমার নিজের
বিশ্বাস আমি একজন আর্টিস্ট ও আর্টিস্ট ছাড়া আর কিছু
নই। আমি বাই লিখি না কেন, প্রবন্ধ বা ছড়া বা গল্প,
তা যদি আট না হয় তবে তা আমার চোখে-ব্যার্থ। যে
পরিমাণে তা আটোস্তীর্ণ সেই পরিমাণে তা কালোস্তীর্ণ।
যা আজ বাদে কাল বাসি হয়ে যাবে তা লিখে আমার



পিতা-পুত্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা

১৯৭০ সালে ২৬শে ডিসেম্বর রাতে আমার ছেলে স্থির হৃৎকে একদল সশস্ত্র পুলিশ বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করে একটা স্থল পোড়ানোর মিথ্যা মামলায়। আমার ছেলের ওপর পুলিশ অকথ্য অত্যাচার চালায়। আরও নানা মিথ্যা মামলা সাজিয়ে পুলিশ বনগাঁ সাব-ডিভিশন কোর্টে একটা মামলা দায়ের করে। কলেজের অধ্যক্ষ এবং স্থানীয় জনসাধারণের আবেদনের ভিত্তিতে আমার ছেলেকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ঐ অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ তাকে পি, ডি, অ্যাক্টে গ্রেপ্তার করে দমদম সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেন।

আমার ছেলে রাণাঘাট কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক বিজ্ঞানের ছাত্র। মেধাবী বলে সরকারী বৃত্তি পায়। জেলে থাকাকালীন পাঠ ওয়ান পরীক্ষা দেওয়ার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি চাইলে দেওয়া হয় না। এরপর একাত্তর সালের ১৪ই মে জেলের অভ্যন্তরে শতাধিক বন্দীর সঙ্গে আমার ছেলের ওপরও প্রচণ্ড ভাবে অত্যাচার করা হয়। ফলে সে প্রায় পন্থ হয়ে যায়। ব্যারাকপুর কোর্টে একটা মিথ্যা মামলাও রুজু করে জেল কর্তৃপক্ষ।

এরপর এল আমার পালনা। যেহেতু আমি মার্কসবাদে বিশ্বাসী তাই আমার ঘাড়ের চাপানো হলো মিথ্যা একটা হত্যামামলা। ১৯৭৪ সালের ১৭ই জুলাই কংগ্রেস কর্মী পরিতোষ নাথের নেতৃত্বে একদল সমাজ-বিরোধী আমার বাড়ী পুড়িয়ে দেয়। পাশে আমার একটা ক্ষেত ছিল যা থেকে আমার অন্ন সংস্থান হত তাও নষ্ট করে দেয়। আমার সমস্ত সম্পত্তি আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে পরাজয়ে থাকতে বাধ্য হয়। পরে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হলেও আমাকে আর স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না। পুলিশ আজ পর্যন্ত আমার বাড়ীতে যারা আগুন দিয়েছে তাদের গ্রেপ্তার করে নি।

আমার ছেলের বিরুদ্ধে আবার হত্যার মামলায়, পরোয়ানা জারী করা হয়। ঐ একই মামলার স্থানীয় কৃষক পরিবারের বাবুল, অশোক, অরুণের বিরুদ্ধেও মামলা রুজু করা হয়। এখন এরা আদালতের নির্দেশে বেকসুর খালাস পেয়েছে। কিন্তু আমার ছেলের বিরুদ্ধে এখনও

গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নেওয়া হয় নি।

কংগ্রেসী অত্যাচারে আমি এখন নিঃশ্ব, রিক্ত। আমি ছেলে মেয়ে নিয়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছি। এ ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

ভবানীজীবন দত্ত
পাল্লা, ২৪ পরগণা

৪র্থ টাইবুনের মামলা প্রসঙ্গে

বন্দীমুক্তি ও গণদাবী কমিটি বর্ণিত প্রতিনিধিদের “৪র্থ টাইবুনাল মামলাটি” সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর উক্তি রাজনৈতিক বন্দী মুক্তির প্রসঙ্গে জটিলতারই সৃষ্টি করবে। কিভাবে নির্ধারিত হবে রাজনৈতিক মামলা চরিত্র? কোন বিশেষ দলের বা ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছাই যদি রাজনৈতিক চরিত্র নিরূপণের মানদণ্ড হয়, তাহলে সেটা হবে বায়ুক্ষেপের “রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণভাবে ক্ষমা” ঘোষণার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বিপরীত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উক্ত ৪র্থ টাইবুনাল মামলাটিতে, “সশস্ত্র উপায়ে রাষ্ট্রকর্মতা দখল,” “বর্তমান সরকারকে উৎখাত করে তার স্থলে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন” ইত্যাদি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সুতরাং সরকারী অভিযোগনামা থেকেই মামলাটির রাজনৈতিক চরিত্র নির্ধারিত হয়। তাছাড়া এই মামলার অভিযুক্তদের অনেকের বিরুদ্ধেই আবার বিহারে একটি “নকশালী বড়বহু মামলা” রুজু করে যার নাম “বহুগোড়া বড়বহু মামলা।”

রমা চ্যাটার্জী

উদ্ভট নিয়ম

নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি ল' কলেজে ভর্তি নিয়ে চরম খামখেয়ালীপনা ও পক্ষপাতিত্ব চলছে।

আমি ১৯৭৭-এর জুন সেখানে ভর্তি হওয়ার জন্য স্বাক্ষরীতি আবেদন করি। বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে প্রকাশিত তালিকায় দেখলাম আমার নাম নেই। অক্সিলে বোঝা নিয়ে এ ব্যাপারে কোন লিখিত উত্তর পেলাম না।

ভারপর লেকচারার ইন-চার্জ মিঃ ব্যামার্জীকে শব্দে ঘেঁষা করলে তিনি জানতে চান আমি কোথা

থেকে পাশ করেছি। বললাম করবার অনুরোধ জানাই। এবং কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে। শুনে তিনি আমাকে সরাসরি জানিয়ে দিলেন একমাত্র নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি ছাড়া অন্য কোন ইউনিভার্সিটির ছাত্রকে ভর্তি করা হবে না। যদিও আমার চেয়ে অনেক কম নম্বরের ছাত্রকে (নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির) ভর্তি করা হয়েছে।

আমি জলপাইগুড়ির অধিবাসী। স্থল ও কলেজের পড়া ওখানেই করেছি। যেহেতু তখন উত্তরবঙ্গে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, তাই আর্থিক অসঙ্গতি সত্ত্বেও কলকাতায় পড়তে আসি। সেটাই কি আমার অপরাধ? ভাবতেও অবাক লাগে আজকের দিনে কি করে আঞ্চলিক ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে।

দিলীপকুমার দত্ত
জলপাইগুড়ি

লক্ষ্মীকান্ত বসুর বড়বহু

আপনাদের ১৬ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

দক্ষিণ কলিকাতার রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সদস্য শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বসুর কিছু কিছু দুর্নীতি-মূলক ও খেচ্ছাচারী অগণতান্ত্রিক ও দলের ওপরে ব্যক্তি-স্বার্থকে কামেম করা ও অবৈধ উপায়ে সম্পত্তি কুরার বিরুদ্ধে কংগ্রেস দলের একজন কর্মী ও এন এল সি সির কোষাধ্যক্ষ হিসেবে আমি প্রতিবাদ করি। এন এল সি সি সংগঠনের আমি কোষাধ্যক্ষ থাকার সময় বেশ কিছু টাকা তিনি দপ্তরে জমা না দিয়ে তহরুপ করার ঘটনারও প্রতিবাদ করি। এর ফলে স্থানীয় পুলিশের বড়কর্তাদের (কর্মতায় থাকার সময় যাদের তিনি নানাতাবে “উপকার” করেছেন) সাহায্যে আমার নামে গাড়ী চুরির একটি সাজানো ঘটনা দিয়ে আমার গ্রেপ্তার করান। অভিযোগ নাকি জনৈক চালকের কাছ থেকে একটি গাড়ী ছিনিয়ে আমি চালিয়ে নিয়ে যাই। আমি নিজে গাড়ী চালাতে জানি না। এবং শুধু তাই নয় খোয়া যাওয়া গাড়ীটি লক্ষ্মীবাবুর ঘরের ১০ গজের মধ্যেই পাওয়া যায় যাতে প্রমাণ হয় এ ঘটনা স্বস্থমস্তিকে সাজানো একটি জঘন্য বড়বহু মামলা। সেই ঘটনায় অভিযোগকারীরা পুলিশের উপস্থিতিতেও বলে আমি ঐ ঘটনায় ছিলাম না।

আমার বহু পরলোকগত তিলক করের মৃত্যুর বিষয়েও অভিযোগ করা হয়েছে। তিলক আমার বনিষ্ঠতম বন্ধু ছিল। দেবী রায়ের হাতে পায়ে ধরে আমিই তাকে তদন্ত

আমি ও পরলোকগত তিলকের বৃদ্ধ পিতাই এ বিষয়ে সমস্ত প্রকার-চেষ্টা করছি।

অতীক বন্দ্যোপাধ্যায়

সরকারপুল মানসিক হাসপাতাল

সরকারপুল মানসিক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্মচারীরা আন্দোলনে নেমেছেন। কর্মচারীদের দাবী চাকুরীর নিরাপত্তা, বেতন কাঠামো চালু, নিয়ম অনুযায়ী ছুটি প্রভিডেণ্ড ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ও ৮ ঘণ্টা কাজের সময় প্রভৃতি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ দাবী মানতে মোটেই রাজী নয়। জেলা-শাসক একজন প্রশাসক নিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের দাপটে তিনিও কাজ ছেড়ে চলে যান।

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর বাইরের ভাড়াটে গুণা দিয়ে কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ও হাসপাতাল কর্মীদের ওপর হামলা সংগঠিত করেন। কর্তৃপক্ষ সমস্ত রোগীদের হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার নোটিশ দিয়েছেন। এবং নতুন রোগী ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চক্রান্ত চলছে হাসপাতাল পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার। এ ব্যাপারে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অবিলম্বে হস্তক্ষেপ দাবী করছি।

অমল নন্দ

সাধারণ সম্পাদক, সরকারপুল ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল হেল্থ এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন

অপসংস্কৃতি

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর দর্পণে অপসংস্কৃতির অবসানে প্রত্যেকের সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে শ্রীশান্তি-ময় শুভ যে মত ব্যক্ত করেছেন তা সমর্থন করি। কিছুদিন আগে তথ্য-মন্ত্রী ‘বারবধু’ নাটকটির প্রদর্শনী বন্ধ করতে বলায় ফল হয় উল্টো। প্রযোজক সংস্থা তাঁকে অপমান করতে বিদ্রোহ বোধ করছেন না। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি একটি বাংলা সাপ্তাহিকে বাংলা থিয়েটারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনায় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ‘বারবধু’ নাটককে অসীল বলায় এই নাটকের রূপকার, নির্দেশক এবং নায়ক শ্রীঅসীম চক্রবর্তী তাঁকেও ছেড়ে দেন নি এবং গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর নিজের নাটক অভিন্ন করে বলেন নান্দীকারের ‘নাট্যকারের সম্মানে ছটি চরিত্র’ নাটকটিও অসীল।

অসীমবাবু অবশ্য একটি সহস্র সমীকরণ সাহায্যে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে তাঁর নাটক সংস্কৃতির বাহক এবং শিল্পগুণ সমন্বিত। সেটি হোল, ঈর্ষা = অপসংস্কৃতি; অতএব ভালো-বাসার রোহট = সংস্কৃতি।

শান্তনু সেনগুপ্ত

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

আমি শতকরা ৭০ ভাগের বেশী নম্বর পেয়ে দুটি লেটার সমেত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে ৭৬ সালে ইউ সি ই টি বাদবপুর থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেছি। আজও পর্যন্ত আমি যোগ্যতানুযায়ী কোনো চাকরি পাই নি। অথচ চারদিকে দেশ গঠনের জন্য শিক্ষিত ইঞ্জিনীয়ারদের প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। দেশ এগিয়ে চলেছে, জুত বেকার সমস্তা সমাধানের কথা যখন উচ্চ-স্তরে প্রচারিত, সেই সময় শিক্ষার অভিশাপ বহন করে যোগ্যতানুযায়ী চাকুরীর জন্য আমি প্রতীক্ষা করে আছি। বাড়িতে ৭৫ বছর বয়সের অসুস্থ বৃদ্ধ পিতা তাঁর কনিষ্ঠতম পুত্রের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুঃস্বাদ নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। আমি নিজেও সার্ভিকিটেকটগুলির মূল্য সম্পর্কে ক্রমশ হতাশ ও সন্দেহান হয়ে উঠছি।

প্রাণতোষ গঙ্গোপাধ্যায়

মন্ত্রীদের দুর্নীতি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রী সীতারাম মাহাতোর কাছে রাজ্য বন দপ্তর যখন ফাইলটি পাঠান তখন তিনি পাঁচটি বছর ফাইলটি চেপে রাখেন এবং অফিসাররা বার বার তাকে এ ব্যাপারে অনুরোধ করলে তিনি এড়িয়ে যান। কারণ কমল হেমব্রম শ্রীমাহাতোর জেলা পুলিশয়ার কংগ্রেস নেতা। গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহেমব্রমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্য বনদপ্তর এনফোর্সমেন্ট বিভাগের কাছে সুপারিশ করে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার আজ পর্যন্ত বার বার বলা সত্ত্বেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নি।

রাজ্য বনদপ্তরের কয়েকজন অফিসারের প্রশ্ন জালিয়াতির অভিযোগ আনা সত্ত্বেও পুলিশ কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তিনি প্রাক্তন মন্ত্রী বলে কি রেহাই পাবেন?

ঋত্বিক ঘটকের প্রথম ছবি

ভানুসিংহ

ঋত্বিক ঘটকের প্রথম ছবি 'নাগরিক' এবং শেষ ছবি 'যুক্তি তত্ত্ব' গল্পে কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাপটকে একই সংগে মুক্তিলাভ করে বর্তমান সপ্তাহটিকে চলচ্চিত্রের সুখী ও রসিক দর্শক সমাজের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ঋত্বিক ঘটক মারা যান গত বছর ফেব্রুয়ারী মাসে। তারপর থেকেই তাঁর প্রথম তোলা ছবি 'নাগরিক'-এর সম্বন্ধে চলে জোর কন্ঠে। কিন্তু ছবিটির নেগেটিভ প্রিন্টের হ্রদিশ কিছুতেই পাওয়া যায় না। অবশেষে একটি পজিটিভ-প্রিন্টের খোঁজ মেলে জরাজীর্ণ দশায়। তা থেকেই প্রিন্ট করিয়ে ছবি দেখাবার ব্যবস্থা হয়। ছবির একেই তার ফলে তো ভাল হতে পারে না—স্বাপ্না আবছা দেখাবেই। পশ্চিম বছর আগে ১৮৫২ সালের তোলা ছবি 'নাগরিক' বর্তমান সপ্তাহে শেষ পর্যন্ত মুক্তিলাভ করল। এটাই আজ একটা বিশেষ দিগদর্শনকাব্যী ঘটনা হিসেবেও দেখা দিল।

ঋত্বিক ঘটক তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি 'নাগরিক'-এর মধ্যেই তাঁর বলিষ্ঠ শিল্পীমানসিকতার স্পষ্ট স্বাক্ষর রেখেছিলেন প্রশংসনীয়ভাবে, আজ আমরা সেটা দেখতে পাই। আর এটাও আজ বুঝতে পারি যে, সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাচালী' নির্মাণের তিনবছর আগেই ঋত্বিক ঘটক এই 'নাগরিক' ছবি তৈরীর মধ্যেই এদেশের চলচ্চিত্রে যুগান্তর সৃষ্টির সম্ভাবনা-বীজকে রেখে দিয়েছিলেন সঠিক শিল্প চেতনায়। এই ১৯৫২ সালেই প্রথম এখানে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের উৎসব হয়। ঋত্বিকের 'নাগরিক' কিন্তু তার

আগেই তোলা হয়েছে এবং সে কারণেই সে-ছবিতে যখন 'নিও-রিয়ালিস্টিক' ভাবধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তখন বিশ্বের অবধি থাকে না। আরও আশ্চর্য লাগে যখন দেখি, সে ছবিতে এমন ইংগিতও রয়েছে, যে, ভারতের অপর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ঠিকমত ব্যবহার না করে শাসকদল বিশেষ উদ্দেশ্যে অত্যাচার জিইয়ে রাখছে।

বড়িও আগের বছর ১৯৫১ সালে নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' ছবিতে বাস্তবতার দৃঢ় পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়, তবুও আজ কিন্তু নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে, 'নাগরিক' চলচ্চিত্র হিসেবে যে-শিল্প-মহিমা ও আশার ব্যাখ্যায় বক্তব্য-গরিমা ফুটিয়ে তোলে তার পরিচয় আগে এখানে পাওয়া যায়নি। সে সময় এখানে ছবির পর্দায় 'চিত্তা বহিমান', 'কুহেলিকা', 'অভিশপ্ত', 'মিনতি', ইত্যাদি ড্রামা যখন দেখানো হচ্ছে, তখনই 'নাগরিক' নির্মিত হয়, লক্ষ্য রাখতে হবে। কোন বৈপ্লবিক চেতনা নিয়ে ঋত্বিক ছবির জগতে এসেছিলেন, তৎকালীন পরিস্থিতি পর্যালোচনায় তা স্পষ্ট ধরা দেয় বৈকি। 'নাগরিক' বর্ধাসময়ে সেই ১৯৫২ সালেই যদি মুক্তিলাভ করত, তবে সেটাই হত যুগান্তকারী চলচ্চিত্র সৃষ্টির দিগনির্দেশক নিদর্শন।

একটি ছোট নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙনের ছবি অসামান্য শৈল্পিক তাৎপর্ষ্যে ফুটে উঠেছে 'নাগরিক' চিত্রটির মধ্যে। হতাশা এখানে এসেছে সাময়িকভাবে বাস্তব-সম্মত পথ ধরে, কিন্তু কখনও আশার স্বপ্ন দেখাটা এখানে বন্ধ হয়নি, এটাই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। নৈরাশ্রের

নিঃসীম অন্ধকারে ছুবে হতা-গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া নয়—আশা নিরাশার বেশ রৌদ্রের লুকাচুরির মধ্যেই জীবনের হাতছানিটুকু সদাই সক্রিয় এখানে দেখি। শিল্পীমনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় তো এটাই। আর এখানেই তো আমরা ঋত্বিক ঘটককে পরিপূর্ণরূপে সম্বিহমান দেখতে পাই। ছবির নায়ক যখন চরম হতাশার মধ্যেও উত্তরণের স্বপ্ন দেখে, বাঁচবার আশুতিতে হয়ে ওঠে চঞ্চল, হাসি-মুখে সব যন্ত্রণাকে অস্বীকার করে এগিয়ে যেতে চায় তখনই সেটা আর শুধু ছবি হয়ে থাকে না—হয়ে ওঠে জীবনমুখী চেতনায় বস্ত্র একটি মহান ছবি। তবুও এ ছবি ঋত্বিক-মুক্ত নয়। আশা ও হতাশার ছবি ফোটানোর কিছু আতিশয্যের ভাব দেখা যায়।

অবসরপ্রাপ্ত প্রোট পিতার রোগ-জরুর মেহে দারিদ্র্যের কশাঘাত সংসারের নিত্যকার দিনব্যাপনের মানি মনিত মাতার দুঃসহ ক্লান্তি, বোনের কুমারী জীবনের অস্বহীন জালা, নাবালক ছোটভায়ের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নায়ক বামুর বেকার জীবনে চরম দিক্কার ডেকে নিয়ে আসে ঠিকই, কিন্তু ছবির পর্দায় এও তো দেখি, বামু পিতাকে আশ্বস্ত করছে, বোনের জালা দূর করতে সচেষ্ট হচ্ছে, পুরনো ক্যালেন্ডারের এক ছবি দেখে মাঠের ধারে শান্তি-কুটারের স্বপ্ন দেখছে, এই দুঃখ দারিদ্র্যের অবসান একদিন হবেই—আশা করছে, নিজে বিয়ে করে উমার জীবনের অভিশাপকেও মুছে ফেলতে চাইছে। এসবই অসামান্য শিল্প-ব্যবনায় যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি উমার বোনের ধীরে ধীরে ভ্রষ্টা হয়ে যাওয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে আশ্চর্য মরমী দৃষ্টিভঙ্গিতে। এখানে সেই নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের নির্মম শিকার হয়েছে। তথাপি নাগরিক সভ্যতার অভিশাপকে এক নাগরিক হিসেবেই বামু চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে—এটাই তো ছবির শেষ কথা।

রামানন্দ সেনগুপ্তের আশ্চর্য ফটোগ্রাফী এই জরাজীর্ণ ছবিকে আজও দৃষ্টমান করে রেখেছে সগৌরবে। হরিপ্রসন্ন দাশের সংগীত পরিচালনা ছবিটিতে একটি বিশেষ মাত্রা যুক্ত করেছে প্রশংসনীয়ভাবে। এছবিতে প্রভা দেবীর অভিনয় একটি সম্পদ। রাণী ব্যানার্জী, শোভা সেন, সতীজ আচার্য, অজিত ব্যানার্জী, কেতকী দত্ত সপ্রাণ অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। শুধু দুঃখ, এমন একটি মূল্যবান ছবির একটি ভাল প্রিন্ট পর্বস্ত করা করা গেল না। এল আমাদের গভীর লক্ষ্য।

অনিল দেবের মৃত্যুরহস্য সম্পর্কে রহস্যজনক নীরবতা

(দর্পণের পর্যবেক্ষক)

কলকাতার মোহনবাগান-প্রেমিক বিরাট জনতা যখন জিন্দাবাদ ধ্বনি—“পেলেকে আনলে কে? মোহনবাগান আবার কে?” দিয়ে শহর সরগরম করছে, সেই ডামাডোলের মধ্যেই মোহনবাগান ক্লাবের ভূতপূর্ব ফুটবল অধিনায়ক অনিল দে তাঁর বাড়িতে একঘল উত্তাপে কঠক প্রহৃত হয়ে পরদিন হাসপাতালে মারা গেলেন।

কিন্তু আশ্চর্য। পেলে, কসমস ও মোহনবাগানের আই এক এ শীতল বিষয়ের রেশ কেটে যাওয়ার পরও এই মৃত্যুরহস্য উন্মোচন প্রয়াসে পুলিশের সক্রিয়তার কোনও খবর কোথাও পাওয়া গেল না।

এমনকি, মোহনবাগান ক্লাব অস্থি-স্থিত অনিল দে'র শোকসভায়ও ওই অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে তদন্তের দাবি তোলা হয়েছে বলে জানা যায় নি।

অনিল দে নিজে ভেটোরানস ফুটবল ক্লাবের সদস্য ছিলেন কিনা জানি না, যদি নাও বা হয়ে থাকেন, তিনি যে সত্যি কলকাতা ফুটবলের একজন ভেটোরান ছিলেন তাতে তো আর সন্দেহ নেই। এমন একজন এক-

কালের প্রবল জনপ্রিয় ও প্রতিভাশালী ফুটবল খেলোয়াড় আততায়ীর আক্রমণে নিহত হলেন, আর সে সম্পর্কে যথাযথ তদন্ত হওয়ার কোনো খবর এযাবৎ কোথাও প্রকাশিত না হওয়া সত্ত্বেও কোনও দিক থেকেই সেই সম্পর্কে তদন্তের দাবি উঠলো না। ভেটোরানস ক্লাব পর্যন্ত নীরব।

দেখতেওনা আশঙ্কা হয় এই হত্যার রহস্য যারপরনাই গভীর এবং সেই রহস্যের গভীরতা থেকেও সেই রহস্য উন্মোচনের জন্য যথাযথ তদন্তের ও অহুসঙ্কানের কোনও পক্ষ থেকে দাবি না ওঠার বহস্য বোধহয় আরও গভীর।

একজন নামকরা মাহুকে বাড়িতে ঢুকে কে বা কারা পিটিয়ে এমন অধম করলো যে তার ফলে পরদিন হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু ঘটলো—এমন একটি ঘটনা নিঃশব্দে ধামাচাপা পড়ার নজির বোধ হয় আর নেই। এ বিষয়ে অন্তত পুলিশ কি করেছে ও করছে তা জানবার জন্য জনসাধারণের বিশেষ করে কলকাতার ফুটবল প্রেমিকদের পক্ষে আমরা দাবি জানাচ্ছি।

টাকা জমা রেখে পূজা ঈলের জন্য চালানে বই দেয়া হচ্ছে

নবজাতক প্রকাশন

এ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলি-৭০০০০৭



হাঁড়ি ফাটিল
হাঁড়ি ফাটিল

একটি চাকল্যকর

রাষ্ট্র নৈতিক ছড়ার বই

মহাশয়ার আগেই বেরুচ্ছে

ছড়া ॥ অনার্য মিত্র • কার্টুন ॥ অহিভুষণ

ইন্দিরা প্রেপ্তার ॥ তাঁর সহচর প্রেপ্তার। কেন প্রেপ্তার? কি রহস্য? কি পাপ? কি কৌতুক? রাজনৈতিক সাহিত্যে এই প্রথম অনার্য মিত্রের ঝাঁঝালো ছড়ায় হেসে লুটিয়ে পড়া, শরীরে জালা ধরানো সর্বত্র উপভোগ্য একটি দৃশ্য। ভূমিকা লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। সতর্ক নজর রাখুন। দাম দুটাকা।

খোঁজ করুন দর্পণ কার্যালয় ৬১নং হাট লেন কলকাতা-১০।
পাতিবার * কলেজ ষ্ট্রীট এবং ক্রাশনাল বুক এজেন্সী কলকাতা-১২

জানেন কি আসছে

চন্দ্রলোক অপেরা

পরিবেশিত

বহুবিকিত মনোহারিণী

শোভেন গুহনিয়োগী রচিত-পরিচালিত



পঃ বঃ সরকার আরোজিত বাত্রা উৎসবে

(রবীন্দ্র মন্ডনের পাশে)

১০ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬.০ টায়

লন্ডন কলকাতা প্রেস, ১২৩১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং বর্ধা কাঁচালয় ৬১ মট লেন কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

এমার্জেন্সীর সময় সঞ্জয়রাই ছিল প্রকৃত শাসক : শাহ কমিশনের তথ্য

(দর্পণের সংবাদদাতা)

শাহ কমিশনে এ পর্যন্ত যে সব তথ্য উন্মোচিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে এমার্জেন্সীর সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর নামে তার অপদার্থ পুত্র সঞ্জয় ও অপকর্মের তার সহযোগী ধাওয়াবানরা প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করেছে। সমস্ত দিক দিয়েই গভর্নমেন্টের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও সঞ্জয় প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যাপারে নাক গলিয়েছে এবং বিভিন্ন উচ্চপদে তার অব্যাহত লোকদের সরিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধির সহায়কদের বসিয়ে জনসাধারণের অর্থ লুটপুটে খেয়েছে। তার মাছুষেবী ৬০ কোটি মানুষের দুঃখগুণের কর্তী তাকে নিরস্ত করা হয়ে থাক, এ সব কাজে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এমন কি মার্চের সাধারণ নির্বাচনে সবংশে উৎসাহ হওয়ার পরেও ইন্দিরা নিজ পুত্রের সাফাই গেয়েছেন।

শাহ কমিশনে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে যে প্রধান মন্ত্রীর সচিবালয়ের একজন সামান্য কর্মচারী হয়েও আর কে ধাওয়ানের ক্ষমতা কত বেড়ে গিয়েছিল। সঞ্জয়ের যে কোন ইচ্ছাকে তিনি প্রধানমন্ত্রীর আদেশ বলে ঘোষণা করতেন এবং কার্কে পরিণত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলে চাপ সৃষ্টি করতেন।

সঞ্জয়রা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলো দখল করে নিয়েছিল নিজেদের পেটোয়া লোক মারফৎ, অর্থাৎ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বংশীলাল, রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং আর এন কাও, (শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



প্রেসিডেন্সী জেলে সত্যনারায়ণ সিংয়ের একটি টেলিগ্রামের কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

চলতি বছরের মে মাসের ১৫ তারিখে নকশালপন্থীদের একটি গোষ্ঠীর নেতা সত্যনারায়ণ সিং প্রেসিডেন্সী জেলে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। উনি টেলিগ্রাম করেছিলেন নিউদিল্লী থেকে। এটি এখানে পান সাধন সরকার। ঐ টেলিগ্রামের ব্যানে বলা হয়েছে ১৪ই মে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে সত্যনারায়ণ সিং যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটাকে মেনে নিতে এবং জেলের অন্ত সব বন্দীদের বলা হচ্ছে তারা যেন জেলকর্তৃপক্ষের কাছে একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে তাদের “কেন্দ্রীয় কমিটির” লাইন সমর্থন করে এবং সংগে সংগে ১৩ই এপ্রিল সত্যনারায়ণ সিং যে বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন তাকেও যেন সমর্থন করেন। সত্যনারায়ণজী টেলিগ্রামে স্পষ্ট ভাষায় লিখে দিয়েছিলেন “এটি মুচলেকা নয়।” এই স্বাক্ষর করলে তারা মুক্তি পাবেন।

সত্যনারায়ণ সিং সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য যে বিবৃতি দেন তাতে কি ছিল? বিবৃতির শুরুতেই তিনি বলেছেন গত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও সি পি আইয়ের পরাজয় হল “জনগণের জয়”। তিনি আশা প্রকাশ করেন জনতা সরকার “গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা” করবেন। তাই তারা জনতা সরকারকে সমালোচনা-মূলক সমর্থন করছেন। তারাই

নাকি একমাত্র পার্টি যারা ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে এবং জনগণের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেছে এবং করবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এই সত্যনারায়ণ গোষ্ঠী গত লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচন ব্যয়কটের ডাক দিয়েছিল যা অন্যান্য নকশালপন্থীদের মতে “ঐশ্বর্যতন্ত্রের পক্ষে সহায়ক ভূমিকা।” নকশাল আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কাহ্নু সাত্তাল এই মত পোষণ করতেন। এছাড়া ঐ বিবৃতিতে তিনি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য চরণ সিংয়ের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সত্যনারায়ণজী চরণ সিংয়ের সংগে দেখা করে বন্দী-মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করার পরই এই বিবৃতি দেন। চরণ সিং প্রসঙ্গে বলেন আলোচনায় চরণ সিংয়ের দৃঢ়তা, সমতাকে আরম্ভধীন করার ক্ষমতা, কমান্ডিং বিপ্লবীদের প্রতি বাস্তবমুখী দৃষ্টি মূর্ত হয়ে (শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)



বিশ্ব বর্ষ ১৯৮৮ সংখ্যা ১১ শুক্রবার ১৪ই অক্টোবর, ৭৭ ৥ ৪০ পয়সা

সি পি এম কর্মী স্বজনকে হত্যার কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

১৯৭১ সালের অক্টোবরের সেই দিনগুলিতে যখন পুলিশ, সি, আর, পি, আর কংগ্রেসী হামলা বাহিনীর বোধ নেতৃত্বে যারা দেশটা হয়ে উঠেছে দুঃশাসনের রাজত্ব তখন বেলেঘাটা অঞ্চলের সি, পি, এম, কর্মী রবি দাসের সামনেই উদ্ঘাটিত হলো এক খুনের ঘটনার কাহিনী।

গত ২২, ১১, ৭১ তারিখ সকালে যুব কর্মী রবি দাসকে বিভিন্ন বানানো মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। এবং একই দিনে সি, পি, এম কর্মী স্বজন চক্রবর্তীকে ইন্দিরা-শাহীর পুলিশ নির্মমভাবে হত্যা করে। রবি দাস যখন বেলেঘাটা থানায় বসে রয়েছে, তখন রবি দাসের উপস্থিতিতেই থানার অ্যাক্টিঙ, সি, ডুলাল দাস আফ্রাদে আটখানা হয়ে নাচতে নাচতে লাল-

বাজারে ফোন করে খবর দিল যে, “একটা শুভ নিউজ আছে, সি, পি, এম-এর স্বজন চক্রবর্তী ফিনিস”। এরপরও যে সমস্ত কথোপকথন হল তাতে এটা পরিষ্কার যে, স্বজন চক্রবর্তীর স্বত্বা একটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড এবং ঐ ডুলাল দাসই হত্যাকারী। কোনো কথা শেষ হবার পর থানার জেহুইন ও, সিকে হাসতে হাসতে থানায় ঢুকতে দেখা গেল এবং ডুলাল দাসকে সে আশ্বাস দিল যে, “এবার তোমার প্রমোশন সিওর।” এদিকে যখন হঠাৎ খেয়াল হলো যে রবি দাসের সামনেই সব কথাবার্তা হয়েছে। তখন ডাইরীতে রবি দাসের গ্রেপ্তারের সময়পাণ্টে বিকেল তিনটে করে দিয়ে বাবুরা স্থতির নিঃশ্বাস ফেলল।

যতীন চক্রবর্তী প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রীদের ফ্ল্যাট দিচ্ছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পূর্বমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী অফিসারদের দুর্নীতিগ্রস্ত বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু তাঁর ঘরে ফ্ল্যাট নিয়ে যে কেলেঙ্কারী হচ্ছে তার তদন্ত হলে কি উত্তর তিনি দেবেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের আবেদন ফ্ল্যাট বিলির ব্যাপারটা তিনি যেন খতিয়ে দেখেন। যতীনবাবুর উদারতায় কংগ্রেসের দুই প্রাক্তন মন্ত্রী ডাঃ গোপালদাস নাগ ও প্রদীপ ভট্টাচার্য পাম এভিনিউতে দুটি ফ্ল্যাট পেয়েছেন। গোপালদাস নাগ ও প্রদীপ ভট্টাচার্য যতীনবাবুকে কংগ্রেসী আমলে অনেক সাহায্য করেছেন তাই তিনি সেই উপকা-

রের বিনিময়ে তাদের দুটি ফ্ল্যাট উপহার দিয়েছেন।

ডাঃ গোপালদাস নাগের মেয়ের নামে আরো একটি ফ্ল্যাট আছে মানিকতলা ভি-আই-পি রোডে। কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার সময় সন্ত বিবাহিত মেয়ে জামাইয়ের জন্য ঐ ফ্ল্যাটটি বরাদ্দ করা হয়েছে। ডাঃ গোপালদাস নাগের নিজস্ব বাড়ী আছে স্ট্রামপুরে। তিনি কলকাতাতে থাকেন না বললেই চলে। অথচ যতীনবাবুর কল্যাণে ডাঃ নাগ আরো একটি ফ্ল্যাট পেয়েছেন। কেন তাদের এত সখ্য সেটা অনেকেই জ্ঞান।

চরণ সিং সি আই এ এজেন্ট

বিগত কংগ্রেসী আমলের এক মন্ত্রী গোবিন্দ নম্বর ৪ঠা অক্টোবর এস-প্রানেন্ড ইষ্ট গ্রেফতার বরণের আগে তাঁর বক্তৃতায় চরণ সিংকে সি আই এ এজেন্ট আখ্যা দিয়ে বলেন “ঐ সি আই এ এজেন্ট চরণ সিং অত্যন্ত ক্যান্সিট কায়দায় ইন্দিরা গান্ধীকে গ্রেফতার করেছে। চরণ সিং-এর বৈদ্যপী আমরা মানবো না। আমরা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো এবং তাকে যে কোন পর্যায়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত।” গোবিন্দ নম্বর কি সত্য সত্যই মনে করেন যে চরণ সিং সি আই এ এজেন্ট? তা যদি তিনি মনে করেন তাহলে তিনি এ সম্পর্কে তদন্তের দাবী করুন।



দুর্গাপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অনিয়মের রাজত্ব (দুর্গাপুর সংবাদদাতা)

দুর্গাপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যাপারে যে কি রকম অবৈধতা ও অন্যায়ে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, তার বিবরণ বিবরণ বর্তমানে জানা গেছে।

এই কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীমণ্ডল তাঁর কার্যকালের মেয়াদ ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকার সঙ্গেও কৌশলপূর্ণ অল্পমোহন ছাড়াই আরও ছবছর বেআইনী ভাবে চালিয়ে ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে কার্যভার ত্যাগ করেন। নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে সিনিয়রিটি ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করে ডঃ এম এম সিনহাকে কার্যভার বুঝিয়ে দেওয়া হয়। অথচ ১৯৭০ সালে অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করার আমন্ত্রণ এই ডঃ সিনহাই প্রত্যাখ্যান করেন এবং তখন নিজের সিনিয়রিটির দাবীও নিজ স্বার্থে তুলে নেন।

কলেজের সবচেয়ে প্রাণী ও অভিজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ নারায়ণচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের অধ্যক্ষ পদের দাবীই সবচেয়ে জোরালো হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ডিঙিয়ে অন্য লোককে অধ্যক্ষ হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। শ্রীদাশগুপ্ত ১৯৭০ সালে নকশাল আমলে কলেজের সংকটময় মুহুর্তে যখন অত্যাচার এই পদ গ্রহণে ভীত হন তখন অস্বাভাবিকভাবে কাজ করতে স্বীকৃত হয়ে কলেজের প্রতি তাঁর ভালোবাসার পরিচয় রেখেছেন। অথচ কর্তৃপক্ষ অভিজ্ঞ ও যোগ্যতর লোককে বাদ দিয়ে ১৯৭০ এর সংকটজনক পরি-

স্থিতিতে বার অধ্যক্ষের দায়িত্বপালনে পিছিয়ে দিয়েছিলেন, তাদেরই আজ পূরস্কৃত করলেন।

সম্প্রতি আবার অধ্যক্ষ পদে যাতে মনোমত লোককে বসানো যায় সেজন্য কর্তৃপক্ষ অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের বয়সের উর্দ্ধলীমা অত্যাচারে বাড়িয়ে ৪৫ বৎসর করেছেন। এর ফলে অত্যাচার যোগ্যতর প্রার্থীকে ইচ্ছাকৃতভাবে মনোনয়নের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

গার্ডেনরীচে রেল কর্মচারীদের ওপর পুলিশী হামলা (দুর্গাপুর সংবাদদাতা)

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর সমাজ-বিরোধী ছদ্মবেশে কলকাতা পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা গার্ডেনরীচে দক্ষিণপূর্ব রেল কর্মচারী সমন্বয় স্থপনান সমিতির কার্যালয়ে হামলা করে। রেল কর্মচারী শ্রীধীরাজ ব্যানার্জীর হাত বেয়েনেটের সাহায্যে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা হয়। এছাড়া সর্বশ্রী সমর-ভট্টাচার্য, দিলীপ মুখার্জী, রঞ্জিত ভট্টাচার্য এবং কৃষ্ণ চ্যাটার্জী মারাত্মকভাবে ঐ পুলিশ বাহিনীর হাতে প্রহৃত হয়ে রেল হাসপাতালে ভর্তি হন। অত্যাচার কর্মচারীরা আক্রমণকারীদের নিম্নোক্ত চারজনকে আটক করে পোর্ট পুলিশের ডি. সি., এস. কে. মুখার্জীর হাতে তুলে দেন। এই চারজন হলেন শ্রীমুপতিরঞ্জন সরকার, কলকাতা

১৯৭৩ সাল থেকে কলেজে ইউ জি সি প্রতিষ্ঠিত সংশোধিত বেতন হার চালু হবে। ডঃ সিনহা ১৯৭৫ সালে অবসর গ্রহণ করেও পুনর্নিযুক্ত হয়েই উক্ত স্কেলের স্বযোগ লাভ করবেন যদি ইউ জি সি উক্ত পুনর্নিয়োগ অল্পমোহন করে। অত্যাচার গভর্ণিং বডিকে অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের জল্পমোহন নিতে হবে যদি তাঁরা ডঃ সিনহাকে কট্টাঙ্গ না ভীসের জল্প নিয়োগ করে। কিন্তু গভর্ণিং বডি তা করে কিনা সেটাই লক্ষ্য করার বিষয়।

আর্মড পুলিশ কন্ট্রোল নং ১৪৩৪২, শ্রীলক্ষ্মণ মুখার্জী ১০৫১৪, শ্রীসদানন্দ মণ্ডল, ১০৫৪৫, শ্রীচন্দ্রাবলী সিং ৫৪২৪।

কর্মচারীদের চাপের ফলে ডি সি পোর্ট লিখিতভাবে এদের গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। কিন্তু গুড পুলিশদের স্বীকৃতি অস্বাভাবিক অত্যাচার দোষী পুলিশদের এখনও গ্রেপ্তার করা হয় নি। পুলিশী হামলায় আহতদের কতিপয়ের ব্যবস্থাও এখনও হয় নি। এই ঘটনার পর স্থানীয় এম. পি. শ্রীসোমনাথ চ্যাটার্জী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। রেল কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে শ্রীচী ব্যানার্জী, শ্রীকে, পি ভদ্র ও শ্রীবিমান দাস সমস্ত পুলিশদের শাস্তি ও আহতদের ক্ষতিপূরণ দাবী করে এক বিবৃতি দিয়েছেন।

ফিলে পাওয়া যাচ্ছে দুর্গাপুর

শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৪

এই সংখ্যায় আছে।

রায়ত প্রসঙ্গে বাংলার বিদ্যাসমাজ : কুমুদকুমার ভট্টাচার্য / দর্পিতা ইন্দির : সাধন শুভ / কালীলাল—গণতন্ত্রে এক ক্ষুদ্র ডিক্টেটর : মুকুন্দন মেনন / রাশিয়ার রাষ্ট্রচরিত্র এক সংশোধনবাদ : পঙ্কজ চৌধুরী / গণতন্ত্র বনাম কীরাতন্ত্র : ক্রান্তি সেন / সংবিধানের নব কলেবর : রম্যপ্রসাদ মল্লিক / আগামী পাঁচ বছর—ভারতীয় রাজনীতি ও পশ্চিমবঙ্গের শামপপন্থী সরকার : সুনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় / শত্রুমিত্র : সমর সেন / সাহিত্যিকের রাজনীতি : মিহির আচার্য / মিসা সংশোধন, ১৯৭৬ : সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় / ইন্দিরার রাজত্বে হরিজন হত্যা : জ্যোতির্ময় বসু / নকশালবাদের কৃষক সংগ্রাম ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক : তপন বসু / কবজা দল ও সরকারের শ্রেণী চরিত্র : কালিদাস কুণ্ডু / সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে : জন চক্রবর্তী / জবায়ুল্যের সমস্যা : নারায়ণ চৌধুরী / শেষ কথা কে বলবে : অন্নদাশংকর রায় / সময় সময় : অসীম রায় / এখনও : রঞ্জিতকুমার সেন / কলকাতার ফুটবল ২০তমী : আরবি।

অনার্য মিত্রের রাজনৈতিক ছড়া ও অমলের কাটুন
দাম : চার টাকা

শাহ কমিশনের তথ্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তথ্য ও বেতার দপ্তর বিভাগের স্ক্রল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মেহতা, ব্যাংকিং প্রণব মুখোপাধ্যায়, বাণিজ্য দেবী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং সি. বি. আই ডি সেন মারফৎ। শাহ কমিশনের প্রথম কয়েকদিনের শুনানীতেই এই তথ্য উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে। একথাও বোকা যাচ্ছে যে মাতাপুত্রের দেশ-স্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্র, সরকারী প্রশাসনকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার ও বিধিবিহীন উপায়ে অর্থ রোজগারের বহু সাক্ষ্য প্রমাণ আছে।

ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভার সদস্যরা শাহ কমিশনে তাঁদের প্রদত্ত সাক্ষ্য তাঁকে ভুিয়েছেন। এইচ আর গোখেল, টি এ পাই, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রহ্মনিয়ম জানিয়েছেন ইন্দিরা কি ভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন।

এমিকে সি বি আই অফিসাররা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করেন। সি বি আইয়ের প্রাক্তন ডিরেক্টর ডি সেন বিচারকের জেরায় নাস্তানাবুদ হন। কমিশনে প্রমাণিত যে, এমার্জেন্সীর সময় সি বি আই সবচেয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করেছে। প্রথম যে ঘটনা যাতে সি বি আই চারজন অফিসারের পেছনে লাগে সেটা অনেক কম গুরুতর। ডি সেন স্বীকার করেছেন যে, ধাওয়াবের "আদেশেই" এই অফিসারদের শিকার

দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে, লোক-সভায় উপস্থিত প্রবন্ধে তাঁরা মার্কটি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কর-ছিলেন। কমিশনে আরও বড় বড় ঘটনার কথা উঠবে এবং তাতে দেখা যাবে ইন্দির, সঞ্জয় অ্যাণ্ড কোং কি ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিকে নাজেহাল করেছে। গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান আর এন মাথুরের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে গোপনে তাঁরই অহরোধে। বিরোধীদের নাস্তানাবুদ করার কাজে যে এই দপ্তরকে ব্যবহার করা হয়েছে একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

অসাময়িক পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীজাহাঙ্গীর তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিগত দপ্তরের একজন সামান্য কর্মচারী আর কে ধাওয়ানের নির্দেশ কত অসম্মানজনক লাগত সে কথা বলেছেন। তাঁর মতে এমার্জেন্সীর সময় এটাই ছিল বাস্তব সত্য এবং সেটাই সকলকে মেনে নিতে হয়েছিল। প্রাক্তন মন্ত্রী টি এ পাই কমিশনে বলেছেন, মার্কটি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত অফিসারদের কাজে ইন্দির কি রকম বিচলিত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। টি এ পাইয়ের উপস্থিতিতেই ইন্দির ধাওয়ানকে ডেকে সি বি আই ডিরেক্টরকে বলতে বলেন ঐ চারজন অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে এবং তাঁদের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে।



ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

প্রস্তাব আহ্বান করছে

ষ্টোন প্যাকিং

রেফা: নং ৪৫/৪১০০/৭৭/২২২১ তারিখ ২৬-২-৭৭

সাব-এরিয়া ম্যানেজার, অমৃতনগর সাব-এরিয়া, কুর্নুলেরিয়া এরিয়া নিয়মিতভাবে কাজের জন্য সক্ষম, নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে আইটেম প্রতি দুই মাসের ভিত্তিতে সীল করা টেন্ডার আহ্বান করছেন:

ইনস্ট্রাক্টন নিউ অমৃতনগর প্রোজেক্টের এন জে সিমের গ্যালারীতে ষ্টোন প্যাকিং এবং ৩৬,৫০৭ টাকা অঙ্কনিত ব্যয়ে। বায়নার টাকার পরিমাণ ৪০০ এবং কাজ শেষ করার সময় আড়াই বছর। অমৃতনগর সাব-এরিয়ার সাব-এরিয়া ম্যানেজারের অফিস থেকে ২৭-১০-৭৭ তারিখ পর্যন্ত টেন্ডারপত্র পাওয়া যাবে যে কোন কাজের দিনে অফিসের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অমৃতনগর সাব-এরিয়ার জুনিয়ার অ্যাকাউন্টস অফিসারের কাছে ১০ টাকা (ফেরত-যোগ্য নয়) জমা দিয়ে। ২৮-১০-৭৭ তারিখে বিকেল ৪টা পর্যন্ত টেন্ডার গ্রহণ করা হবে এবং ঐদিন ৪-৩০টা টেন্ডার খোলা হবে উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেন্ডারদাতা / অল্পমোদিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে। বায়নার টাকা 'কোল ইন্ডিয়া লিঃ, ইস্টার্ন ডিভিসন, অমৃতনগর গ্রুপ' এই নামে অ্যাকাউন্ট পেয়ী ব্যাঙ্ক ড্রাকটে অথবা নগদে অমৃতনগর সাব-এরিয়ার জুনিয়ার অফিসারের কাছে জমা দিতে হবে এবং এর রসিদ টেন্ডারপত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে। বায়নার টাকা ছাড়া টেন্ডার নাকচ করা হবে।

সি এম ডি এতে ভোলা সেনের ভূত

বিনা টেঙারে বিশেষ এক কোম্পানী মোটা টাকা কার কাজ করছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সি এম ডি-এর প্রাক্তন চেয়ার-
ম্যান ভোলা সেনের আমলে একটা
বিশেষ ঠিকাদারী সংস্থার ওপর যে
হাক্ষিপের তখন। হয়েছিল বর্তমানে
সেই হাক্ষিপের পরিমাণ শোভনতার
সীমা পার হয়ে গেছে।

সি এম ডি-এর তরফ থেকে কল-
কাতা ও শহরতলী এলাকায় প্রতিটি
বাড়ীতে পুরনো ব্যবস্থারবদলে আধু-
নিক প্রি-ক্যাব্রিকেটেড ল্যাট্রিন চালু
করার এক পরিকল্পনা নেওয়া হয়।
প্রথম দিকে এর দায়িত্ব দেওয়া হয়
পৌরসংস্থগুলোর ওপর। যেহেতু
পৌরসংস্থগুলোর অধীনে এই পরি-
কল্পনার কাজ খুব বেশী এগোচ্ছিল না,
তাই সি এম ডি এককর্তৃপক্ষ এর দায়িত্ব
নিজেরাই নিয়ে নেন।

১৯৭১ সালে সি এম ডি এ কর্তৃ-
পক্ষ প্রি-ক্যাব্রিকেটেড ল্যাট্রিন তৈরী
করার জন্য রিয়ডায় একটা কারখানা
তৈরী করেন। কিন্তু এই কারখানায়
যে পরিমাণ প্রি-ক্যাব্রিকেটেড ল্যাট্রিন
তৈরী হত তাতে চাহিদা মেটানো
সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় কিছু
উৎসাহী বাড়ালী ঠিকাদার এগিয়ে
এসে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ কর-
লেন। এই বাড়ালী ঠিকাদারদের
বলা হল যে, আপনারা নিজের
দায়িত্বে কারখানা করতে পারেন।
সি এম ডি-এর কাছ থেকে আপনারা
অর্ডার পাবেন।

এর মধ্যে সি এম ডি এ কর্তৃপক্ষ
রিয়ডায় কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার
সিদ্ধান্ত নেন। এই কারখানার তখন
কর্মী মুকুলেশ মিত্র এবং শঙ্কর শীল
কর্তৃপক্ষের কাছে কারখানা পরিচাল-
নার দায়িত্ব তাদের ওপর ছেড়ে দেও-
য়ার অনুরোধ জানান। এর মধ্যে
ভোলা সেন সি এম ডি-এর চেয়ার-
ম্যান হয়েছেন। তিনি মুকুলেশ মিত্র
ও শঙ্কর শীলের আবেদন মেনে নিতে
রাজী একটি শর্তে এবং তা হলো তাঁর
একজন মনোনীত লোককে অংশীদার
করতে হবে। ওরা রাজী হন।
ভোলাবাবুর নির্বাচনী ক্ষেত্রে অনেক
কর্মী অল্প চৌধুরীকে নিয়ে মুকুলেশ
মিত্র এবং তাঁর সহযোগী শঙ্কর শীল
একটা অংশীদারী সংস্থা বোজেন।
আর এই সংস্থাকে সি এম ডি-এর
রিয়ডায় কারখানা নামমাত্র ভাড়া
লীজ দেওয়া হয়। তারপর এই
সংস্থাকে এক বছরের মধ্যে দেড়
হাজার প্রি-ক্যাব্রিকেটেড ল্যাট্রিন
তৈরী করে দিতে হবে এই শর্তে
কিন্তু টেঙারে কটা ই দেওয়া হয়।

কিন্তু এই সংস্থাটি চুক্তি অনুযায়ী কাজ
করতে ব্যর্থ হয়। কলে দ্বিতীয় বছরে
সি এম ডি এ কর্তৃপক্ষ এই সংস্থাকে
এ কারখানার লীজ দ্বিতীয় বারের
জন্য দিতে অসম্মত হন। মুকুলেশ,
অল্পরা এসে ভোলা সেনকে ধর-
লেন। কলে কর্তব্যপালয় দুই অফি-
সার একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং
ডেপুটি ডাইরেক্টরকে অল্প দপ্তরে
বদলী করা হয় এবং ভোলাবাবু এদের
জায়গায় "মো-হুজুর" লোক বসিয়ে
মুকুলেশ মিত্র অ্যাণ্ড পার্টনার্সকে
দ্বিতীয়বারের জন্য তিন বছরের লীজ
দেওয়া হয় এবং উপরোক্ত সংস্থাকে
এককোটি চুয়াশ্লিশ লক্ষ টাকার অর্ডার
দেওয়া হয় কোন টেঙার না ডেকেই।

অদূর ভবিষ্যতে ডিরেক্টর জিইমজের
আর এই কাজের জন্য টেঙার আহ্বান
করার ইচ্ছে নেই। বত টাকার
কাজই হোক আর তাতে সময় বতই
লাগুক (ইষ্ট ব্যাঙ্ক জোনে সাধারণত
৬ মাসের আগে এই কোম্পানী বসাতে
পারে না) পূর্বতন চেয়ারম্যানের
প্রিয়ভাঙ্গন অল্প চৌধুরীর কোম্পানীর
উপরোক্ত কার্যটিকে দিয়েই তিনি সব
কাজটা করতে চান।

আশ্চর্যের বিষয় যে, এই কার্যটিকে
সেগুন কাঠের দরজার পাল্লা বদলে
কম্পানীর হার্ড উডের বা লোকাল
কাঠের দরজার পাল্লা লাগাবার
অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যা একে-
বারেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিভিন্ন
জোনে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াররাও
রিপোর্ট দিয়েছেন। অথচ এই
কোম্পানী ব্যতীত এই কাজে নিযুক্ত
অল্প ঠিকাদারকে লাগাতে হয় এক
ইঞ্চি মোটা সেগুনের পাল্লা। এই
ভাবে এই কোম্পানীকে বেশ কিছু
অতিরিক্ত টাকা (প্রায় ৬০) পাইয়ে
দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।
পাল্লার কাঠটি শুধু যে নিয়মানের
তাই নয় অল্প ঠিকাদারের দেওয়া
দরজার চেয়ে অনেক পলকা বা
হালকা। দরজার বিষয়ে জনসাধারণের
গোছা গোছা অভিযোগ বিভিন্ন
জোনের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের
দপ্তরে জমা পড়ছে। কিন্তু জন-
সাধারণের অভিযোগের কোন স্বরাহা
আজও পূর্ণ হয়নি।

এছাড়াও সি ডি ও সোকাপিট
প্রকৃতির মাধ্যমে আরও ৩৫৮০ টাকা
পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা অল্প ঠিকা-
দার পায় না। মুকুলেশ মিত্র এও
পার্টনার্সের সঙ্গে অর্ধেকভাবে করা

চুক্তি এই কোম্পানীটিকে আর্থিক
সুবিধা দিচ্ছে—(১) প্রোডাকশনের পরে
এ কোম্পানীটিকে দেওয়া হয় ৮০০
টাকা। এই কাজে অল্প অল্প ঠিকাদার
পায় ৬৪০ টাকা। (২) এই ফর্ম কোম
আনেষ্ট মানি জমা দেয়নি ঠিকাদার
সময় বা এই কোম্পানীর এই কাজের
দরদর বিল থেকে কোন টাকা সিকিউ-
রিটি ডিপোজিট হিসাবে কাটা হয়
না। এটা সম্পূর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ ও
পাবলিক ফিন্যান্স অ্যাক্টের পরিপন্থী।
(৩) ২০ টাকা হিসেবে প্রতি সেট
প্রোডাকশনের ভাডায় সি এম ডি-এর
সুসজ্জিত কারখানাটি এই কাজের জন্য
পাওয়া এক আশ্চর্যের বিষয়। কোটে-

শন আহ্বান করলে সি এম ডি এ
অন্ততঃ পক্ষে ১০ টাকা পাবেই।

বেশ কিছুদিন ধরেই যেথা যাচ্ছে
ডিরেক্টর জিইমজ এই কোম্পানীটিকে
দবদব কাজ দেবার উঠে পড়ে মেগে-
ছেন। অল্প সব ঠিকাদারদের কাজ
প্রায় বন্ধ বা অনেকদিন আগেই বন্ধ
হয়ে গেছে। পুরনো কন্ট্রাক্টর দ্বারা
এর পূর্বে স্থানান্তর সবে কয়েক
হাজার করে পারখানা বসিয়েছেন,
তারা সবাই এখন বেকার বসে
আছেন। তাদের কয়েক শত শ্রমিক
কর্মচারীও এখন বেকার। পুরনো
ঠিকাদারদের কারখানার সব মাছ-
সরঞ্জামই বেকার হয়ে পড়ে আছে।

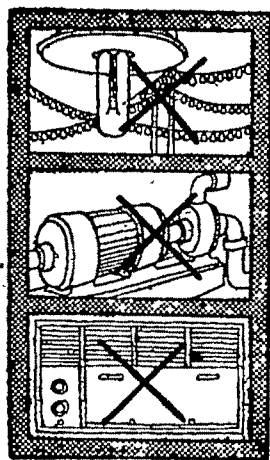
ইষ্ট ব্যাঙ্ক জোন ও সেন্টাল
ক্যালকাটা জোনে লক্ষ লক্ষ টাকার
কাজে এই কোম্পানীটিকে বিলি করা
হচ্ছে ও হবে বলে ডিরেক্টর ঠিক
করে ফেলেছেন বলে জানা গেছে।

শিক্ষানবীশদের সম্মেলন

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর কল্যাণী
আই, টি, আইতে সারা পশ্চিম বাংলা
ট্রেনীং অ্যাণ্ড অ্যান্ডি অ্যাপ্রেনটিস
কো-অর্ডিনেশন কমিটির নদীয়া জেলা
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কমিটির
সাধারণ সম্পাদক বিমান মিত্রের
সভাপতিত্বে সম্মেলনে আই, টি, আই
ট্রেনীং এবং ক্যাঙ্করী অ্যাপ্রেনটিসদের
বিভিন্ন দাবীর আওদাজ তোলা হয়।
(১) আই, টি, আই ট্রেনিং শেষে
অ্যাপ্রেনটিসশিপে যোগদানের সুযোগ
(২) চাকুরীর নিশ্চয়তানয় অ্যাপ্রেন-
টিসশিপ ৩১ অক্টোবর সংশোধন (৩)
বর্ত্তিত্বারে টাইপেও দান (৪)
শ্রমিকের ভ্রাতৃ অত্যাচার সুযোগ সুবিধার
দাবীগুলি নিয়ে বিভিন্ন প্রতিনিধিরা
বিশদ আলোচনা করেন। সম্মেলনে
বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল থেকে একশ পঞ্চাশ
জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।
১৭জন সদস্য নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ
জেলা কমিটি গঠন করা হয় এবং
শ্রীহরকান্ত কাক্সিলাল সভাপতি ও
শ্রীনিবরতন পাল সম্পাদক পদে
নির্বাচিত হন।

যদি বাসস্থানের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন :

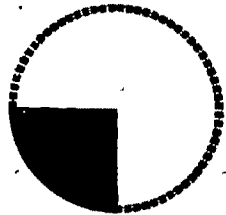
কিভাবে বিদ্যুৎ ঘাটতির মোকাবেলা করবেন



শুধুই দুইঘণ্টার সঙ্গে বীকার করতে
বাস্য হচ্ছি যে আগামী বেশ কিছুদিন এ রাজ্যে
বিদ্যুৎ সংকট থাকবে। অবস্থা কাটলে
ওঠার জন্য সব রকম প্রচেষ্টা চালানোর
সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিতে কীভাবে
মোকাবেলা করা যায়—সেদিকে নজর
দেওয়াটাই ভালো।
কীভাবে মোকাবেলা করবেন :
প্রথমত বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন
এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে সিতব্যয়ী হোন। আলোর
বাহার এবং অলোর প্রদর্শনী বন্ধ করুন।
যতটা সম্ভব আয়তন বা পাখা বন্ধ করে দিন।
বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করুন এবং নিজের

করচ কমান। এই মূল নীতির ভিত্তিতে
বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেই বর্তমান পরিস্থিতিতে
কিছুটা সামাল দেওয়া যাবে।
অনুগ্রহ করে বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা
পর্যন্ত জেনে পাম্প, ইলেকট্রিক ইন্ড্রি,
ওয়াটার হীটার ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না,
কারণ এই সময়ে শিল্প কারখানার জন্য
বিদ্যুৎ সবচেয়ে বেশি দরকার।
আইন মেনে চান :
রাজ্য সরকারের বিধিনিষেধগুলি দৃঢ় করে
মেনে রাখবেন। সকাল ৯-৩০ থেকে
বেলা ১১টা এবং বিকাল ৫টা থেকে রাত
১০টা পর্যন্ত এয়ারকন্ডিশনার চালানো
নিষেধ, অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার
ছাড় দিয়েছেন তাদের কথা মতন।
এছাড়া বিদ্যে বা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে
মিলন, মার্কারী ল্যান্স বা অন্যান্য উচ্চ
শক্তিসম্পন্ন বাতি জালানোও নিষেধ।

‘বিদ্যুৎ’ ঘাটতি কমিয়ে আনতে
আমাদের সাহায্য করুন



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

অগণতান্ত্রিক সরকারী নির্দেশ

কিছুক্ষণ আগে একটি কাসেট দিয়ে গেল এক বন্ধু। ইংরেজীতে লেখা। ২৫.৫.৭৭ তারিখে APT/Con/interception/77 নম্বর চিঠি মারকং কলকাতার পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের দপ্তর থেকে একখানি গোপন চিঠির নকল পাঠানো হচ্ছে সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ডাকঘরের কর্তাদের কাছে। গোপন চিঠির (Secret letter) নম্বর 1081 P. S. তারিখ ১৬.৫.৭৭, পাঠাচ্ছেন পঃ বঃ সরকারের অধস্তন সচিব। চিঠিখানির বয়ান হল—“১৮৯৮ সালের ভারতীয় ডাকঘর বিধির ২৬(১) ধারার ক্ষমতামুযায়ী রাজ্যপাল এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, ডাকঘোপে পাঠানো সমস্ত আন-রেজিস্টার্ড, রেজিস্টার্ড, ইনসিওরড, বা অন্ত যে কোন ধরনের জিনিসপত্র, যেগুলি ৬০/এ কেশরচন্দ্র সেন ষ্ট্রিট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ‘দেশ-ব্রতী’র উদ্দেশ্যে এবং ঐ ঠিকানা থেকে পাঠানো হবে সেগুলি যেন আটক করা হয়।” (In exercise of the Indian Post office Act, 1898, the Governor is pleased to direct the interception of all postal articles of un-registered, registered, insured and of other class of description which may be discovered in the course of transmission by post address-

ed to and emanating from, ‘Desabratī’ a weekly published from 60A, Keshab chandra Sen Street, Calcutta.”) ডাক বিভাগের যে সকল কর্মী বাছাই (Sorting) করার কাজে নিযুক্ত তাদের প্রতি নির্দেশ : সমস্ত আটক করা (Intercepted) জিনিসগুলি যেন কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার অথবা তার মনোনীত কোন অফিসারের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল—এ তো বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগের ঘটনা। তখন তো পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন। কিন্তু চমকে উঠলাম। এই নির্দেশের কার্য-কারিতার সময় দেখে? বলা হয়েছে ২১শে মে ১৯৭৭ থেকে আগামী এক বছর এই নির্দেশ বলবৎ থাকবে।

লেখাটা পড়ার পর থেকে এক-গাধা প্রশ্ন অনবরত মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে :

(১) মুখ্যমন্ত্রী ত্রিভোজি বহুর অভ্যন্তরেই কি এই নির্দেশ চালু রয়েছে? এবং তিনি তা জানা মাত্র এই নির্দেশ বাতিল ঘোষণা করবেন?

(২) এই নির্দেশ কি বিশেষ ভাবে ‘দেশব্রতী’ গোষ্ঠীকে দমন করার উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়েছে? না কি যারা সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা ও

তার অবশ্যজাবিতার কথা প্রচার করে তাদের সকলকেই দমন করার এটা একটা কৌশল মাত্র?

(৩) স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও যদি এই নির্দেশের কথা না জানেন, অথবা যদি তিনি জানা সত্ত্বেও এই নির্দেশ বলবৎ থাকে, তবে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ কি ধরনের “গণ-তান্ত্রিক অধিকার” পেয়েছেন?

এই প্রশ্নে বলে রাখি—যে নির্দেশটা আমার হাতে পড়েছে সেটা কোন জেলার এবং কে পাঠাচ্ছেন তার উল্লেখ করতে পারছি না। কারণ ২১শে মে থেকে শুরু করে এই মুহূর্ত পর্যন্ত “গণতন্ত্রের” ছত্রছায়ায় এই নির্দেশ বলবৎ রয়েছে।

অনিমা দাশগুপ্তা

মেডিকেল হোটেলে ভয়াবহ অবস্থা

আমরা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। পরীক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে ছাত্রদের থাকবার ব্যবস্থা পর্যন্ত চূড়ান্ত অব্যবস্থা। আমরা শীল ম্যানসন মেডিক্যাল হোস্টেলের আবাসিক। এতদিন জানতাম আমাদের হোস্টেল সরকার অধিগ্রহণ করেছেন যা শুনে আসছি সেই ৭৫ সাল থেকে। আমাদের হোস্টেল সম্পর্কে বিশেষভাবে জানাবার কারণ : চারতলা বাড়িটির প্রত্যেকটি ঘরে জল পড়ে বর্ষার সময়, বাড়ির প্রতিটি দেওয়াল ফাঁক, দুই তিনবার শৌচাগারের শৌচনীয় পতন, চল্লিশজনের জন্য একটি মাত্র শৌচাগার, বাড়ির যে কোন অবস্থায় ভেঙ্গে পড়তে পারে, এবং ইলেকট্রিক ওয়্যারিং অত্যন্ত করুণ; সব সময় শর্টসার্কিট লেগেই আছে।

এই হল বিংশ শতাব্দীর ডাক্তারী ছাত্রদের থাকবার বাসস্থান। এরপর ৭৬ সালে সুনলাম বাড়ি যেহেতু অধিগ্রহীত হয়েছে তাই সারানো হয়নি। এরপর কিছু কাজ শেষ হল এবং কিছুদিন বাদে ভৌতিক কারণে কাজ বন্ধ হল। বাড়ি অর্ধেক ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে রইল এবং বাড়িটি আরও বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছাল। আমরা এখন সুনলাম, হাইকোর্ট থেকে ইনজাংসন জারি হয়েছে। কারণ বাড়িওয়ালা সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। বাড়িটির চারিদিকে আবর্জনার স্তুপে ভর্তি। সেখানে বশাবাহির অব্যবহিত বিচরণ। সুনলে অবাক হতে হয়, আমাদের প্রত্যেককে Life-bond দিয়ে থাকতে হচ্ছে অর্থাৎ কারো কোন ছুটিনা বা মৃত্যু হলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন না।

আমরা চাই এ অবস্থার অবসান

হোক এবং আমাদের হোস্টেলের কাজ শুরু হোক। স্বাস্থ্যবাসস্থানের দাবীতে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান ধর্মঘট শুরু হয়েছে ২০-২-৭৭ থেকে। আমরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিতে চাই, এর পরবর্তী সব ধরনের অবস্থার জন্য সম্পূর্ণভাবে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন।

শীল ম্যানসন আবাসিকবৃন্দ

নেতাজীর বিবাহ প্রসঙ্গ

নেতাজীর বিবাহ সম্বন্ধে পূর্বে কোন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় এবং বর্তমানে “মাই আকাল নেতাজী” বইতে বহু পরিবারের কোন কোন সমস্ত যে-তথ্য পরিবেশন করেছেন তার মধ্যে কোন সত্যতা আছে কিনা সম্বন্ধে হয়।

স্বর্গত শরণচন্দ্র বহু জীবিত থাকাকালীন নেতাজীর বিয়ের ঘটনার কোন স্মরণ দেন নি। নেতাজীর বিবাহ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হবার পর ফরোয়ার্ড রকের ইউ-পি শাখার সাধারণ সম্পাদক রামগতি গাঙ্গুলী এই সংবাদের সত্যতা জানতে চেয়ে শরণ বহুকে যে চিঠি লেখেন তার উত্তরে শরণবাহু লেখেন “...কি ভাবে আপনি ইহার প্রতিকার করবেন? এই ধরনের ববর অথবা প্রবন্ধের কোন স্মরণ আপনি দেখেন না।” তাছাড়া এই মিথ্যা অপপ্রচার বন্ধ করার জন্য শরণ বহু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুকে অগ্র-রোধ করেছিলেন। নেতাজীর বিয়ের ব্যাপারে প্যাট সার্প-এর আলীন মন্তব্যের বিরুদ্ধে স্বরেশচন্দ্র বহু এবং তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র বিজেন বহু একটি মানহানির মামলা দায়ের করে বলেন “নেতাজী বিবাহ করেন নাই।” খোশলা কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময়ও স্বরেশচন্দ্র বহু বলেছিলেন—স্বভাষ চিরহুমার। নেতাজীকে বিয়ে করার জন্য অইনকা রিস ভবলু ওয়াদার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু নেতাজী কোন দিন বিয়ে করবেন না এই কথা বলায় তদ্রহিলা নিরাশ হন।

নেতাজীর বিয়ের ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোন প্রামাণ্য দলিল প্রকাশ করা হয় নি। অথচ নেতাজীর কোন ভ্রাতৃপুত্রের উক্তিও প্রকাশ পেয়েছে যে নেতাজী বিবাহিত ছিলেন।

সম্প্রতি যুগান্তরের একটি সংবাদে জানা গেল নেতাজীর ভাষ্যবিত্ত জ্বর কলকাতায় আসার লড়াবনা আছে। আমরা এই লড়া উল্লেখটানের জন্য এই লড়াবনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

অবস সেন

মুখ্যমন্ত্রীর ভুল ধারণা

গত ২১.১০.৭৭ তারিখে চীন বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি আয়োজিত জনসভা সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিভোজি বহুর যে বিবৃতি কলকাতার কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তা আমাদের কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর। মুখ্যমন্ত্রী ঐ সভাকে নকশালীদের সভা এবং ঐ সভায় প্রবীণ জননেতা ত্রিগণেশ ঘোষের বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকার প্রচারকে “নকশালীদের কারসাজি” হিসাবে অভিহিত করেছেন। আমরা এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। প্রকৃত গণেশ ঘোষের উক্ত সভায় উপস্থিতির ঘোষণা আমরা তাঁর সভামুযায়ী করি। স্বতরাং এ সম্পর্কিত বিবৃতি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। ১ তারিখের ঐ সভার আয়োজন ‘নকশালীরা’ করেনি, করেছিলো চীন বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি এবং সভায় ওয়ার্কার্স পার্টি, এস ইউ সি, সি পি আই (এম-এল) প্রভৃতি কয়েকটি বামপন্থী দলের বক্তারা বক্তব্য রাখেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কেন এই সভাকে নকশালীদের সভা বলেছেন আমরা বুঝতে পারছি না।

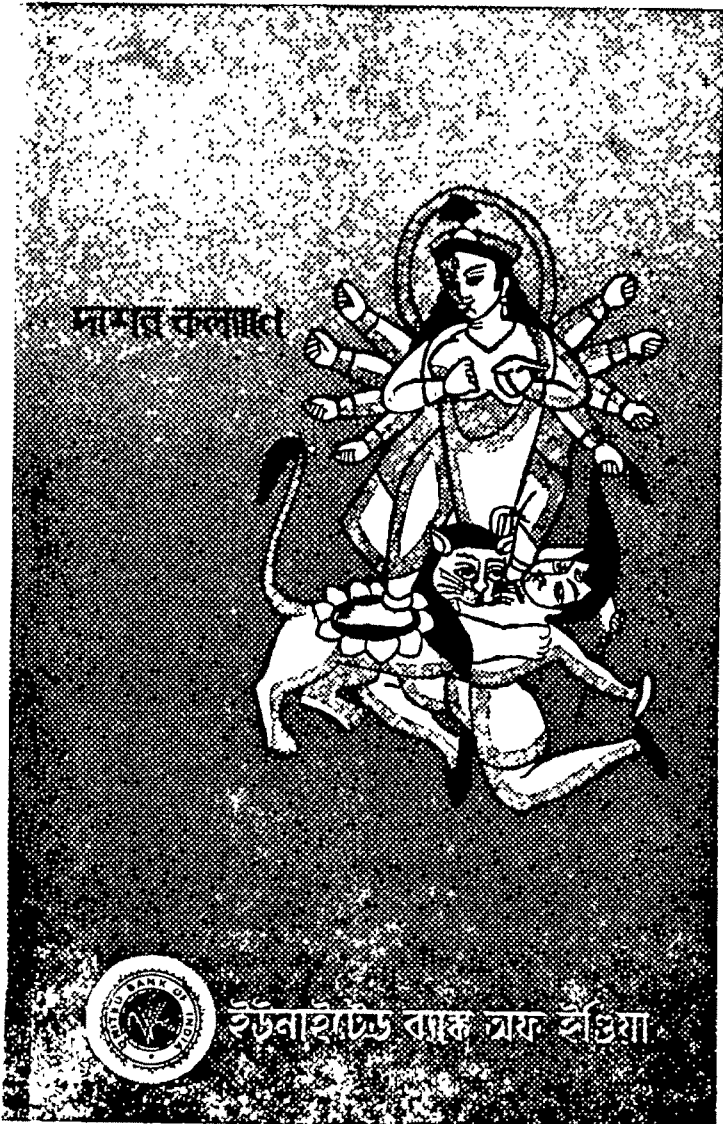
সমস্ত

চীন বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির পক্ষে

অপসংস্কৃতি প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের তার-প্রাপ্ত মন্ত্রী ত্রিভুজবহু তট্টাচার্যের অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বক্তব্য পড়লাম। বিভিন্ন সভা-সমিতিতেও তাঁর বক্তব্য শুনেছি। তিনি চান অপসংস্কৃতি নিয়ে একটা বিতর্কের ঝড় উঠুক। বলা বাহুল্য এখনও পর্যন্ত বিতর্কের ঝড় না উঠলেও বিতর্কের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। হয়তো ঝড়ও একদিন উঠবে। আমার কথা ঝড় খেনে গেলে কি অবস্থা হবে সেটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার হচ্ছে না।

এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটি উদাহরণ তুলে ধরছি। আজ থেকে ছ’সাত বৎসর আগের কথা। বাংলা সাহিত্যে রীলতা-অরীলতা নিয়ে এ রকমই একটি বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। একদা কমিউনিষ্ট বলে পরিচিত বর্তমানে বামাবী পত্রিকার ভাড়াটিয়া লেখক সমরেশ বহু ‘বিপ্লব’ উপন্যাসটি এই বিতর্কের সূত্রপাত করেছিলেন। আমার পড়া শ্রীলংকার চৌধুরী মহাশয়



বিভিন্ন সভাসমিতিতে সাহিত্যে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। সেই সময় দৈনিক সাপ্তাহিক কাগজগুলিও স্বাধীনতা-অস্বাধীনতা প্রশ্নটিকে প্রাধান্য দিয়েছিল। সেই ঋতু একদিন থেমে গেছে, সমরেশ বসুর বইয়ের কাঁচিতি কিন্তু কমে নি বরং তার সহযোগিতায় স্বাধীনতা জ্যোতিরিন্দ্র, বিমল, কবিতার আবির্ভাব ঘটেছে, এবং তাঁরা পুরো-দমে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িয়ে যাচ্ছেন।

সেই কারণে শুধুমাত্র বিতর্কের ঝড় তুলে কোন লাভ হবে না, বরং সংগঠিত ভাবে সরকারী সহযোগিতার অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করাই শ্রেয়ঃ। এতে হয়তো বাজারী পত্রিকাগুলিশিল্প সংস্কৃতি 'গেল গেল' রব তুলবে। কিন্তু এটা মনে রাখা সরকার বাম ফ্রন্ট সন্তোষ ঘোষের ভোটের ক্ষমতার আসে নি, বরং যে সকল অগণিতসাধারণ মানুষবামফ্রন্ট সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা হুহাত তুলে সরকারী ব্যবস্থাকে সাধুবাদ জানাবেন। স্বতরাং বুদ্ধদেব-বাবুকে বিনীত অস্বরোধ অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। অপসংস্কৃতির ধারক ও বাহক সকল প্রকার নাটক, গ্রন্থ, ক্যাবারে নৃত্য সংগীত বন্ধ করুন। জরুরী অবস্থার সঙ্গে এখনকার অবস্থার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তখন ছিল স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা। বর্তমানে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত। সরকারের প্রতিটি কাজের পিছনে জনগণের অস্বস্তি সমর্থন থাকবেই এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

অরুণ চৌধুরী

হাসপাতাল ও ওয়ার্ড মাস্টার

গত ১৪ই জুলাই-এর দর্পণে তপন বসুর প্রথম জেহাদ হাওয়া হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার অনিল দাসের বিরুদ্ধেই। কিন্তু, তিনি যে সব বিষয়ে রিপোর্ট করেছেন, তার অধিকাংশই অনিল দাসের ক্ষমতার বাইরে। রোগীদের জন্ত সরকারী বরাদ্দ মাত্র দৈনিক আড়াই টাকা। আড়াই টাকার দুটো মিল, সকালের ব্রেকফাস্ট, কল ও জুথ, এর বেশী কি দেওয়া যায়?

ওয়ার্ড মাস্টার অনিল দাস আন-প্রতীকিত কর্মী নন, সে একজন সরকারী কর্মী। ১৬।১৭ বৎসর সে চাকরী করছে। সে কেবল মদ খায়, এই কথাটা লিখেই শেষ করলেন। আরও কিছু লিখলেন না কেন? তার সঙ্গে তো কথা বলেন মি। আপনি কেবল নাস আর

মেট্রনের সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু কি কেবল অনিল দাস একা খায়? আর কেউ খায় না? অনেক নাস-কেও তো গাড়ী করে হোস্টেলে পাঠাতে হয় ওতার ডোজের জন্ত। সেটা কি খুব দামী মদ? হাসপাতালে আগে ত্রাণ দেওয়া হত। এখন দেওয়া হয় না। কারণ রোগীরা সে সব পেত না। কোথায় যেত? ওয়ার্ড মাস্টার খেত কি? মেট্রন বলেছেন, অনিল দাসকে বরখাস্ত করা উচিত। আমরাও বলছি, নিশ্চয়ই। অত্যাচারকে বরখাস্ত করা উচিত নয়? তাঁর মেয়েরা ঠিকমত কাজ করছেন তো?

সিস্টার অঞ্জনা ভট্টাচার্যের ১৪ বৎসর চাকরী হলেও পার্মানেন্ট হন নি। কিন্তু অনিল দাসের কি হয়েছে সেটাতো লিখলেন না। কেবল অনিল দাস বা কেন, ৩০০ জন ওয়ার্ড মাস্টারের মধ্যে ২৫০ জনই প্রতারণিত হয়েছে স্বাস্থ্য অধিকর্তাদের দ্বারা। এরা সকলেই স্বাস্থ্যের সঙ্গে ক্লারিক্যাল সার্ভিস করেছেন। কর্মদক্ষতা আর ভাল রিপোর্ট থাকায় ওদের ওয়ার্ড মাস্টার করা হয়। গ্রেডেশন আর ভাল পে-স্কেলের লোভ দেখানো হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বনাশ করা হয়েছে। এমন কি ক্লারিক্যাল সার্ভিস ক্যান্টউ পর্যন্ত করা হচ্ছে না। ১৮।১৯ বৎসর চাকরী হলেও কন-কার্পোরেশন করা হয় নি। কোন ছুটিই তারা ভোগ করতে পারে না। কোথাও ১২।১৪ বর্ষ, কোথাও ২৪ বর্ষাই ডিউটির সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। তার জন্ত কোন স্পেশাল পে বা ওতার টাইম ভাতা নেই।

দীর্ঘদিনের এই অস্তায় তারা সহ করে আসছে। কলে স্বাস্থ্য ভেদে পড়ে, পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। মানসিক ভারসাম্য কেলে হারিয়ে। এই অবস্থায় যদি মদ খায় সেটা আর বিচিৎ কি! কোন্ সভ্য দেশে মানুষকে ২৪ বর্ষা কাজ করতে হয়? অথচ ওয়ার্ড মাস্টাররা যে কাজ করে, তার জন্ত বাহাবা সুধান অধ্যাক। বিগত মন্ত্রিসভা অধ্যাক আর তাদের সচিবদের ১৫০ টাকা করে স্পেশাল ভাতা দিয়ে গেছেন। কিন্তু বারা নিজের জীবন বিপর করে কাজ করেন, সেই ওয়ার্ড মাস্টাররা চেয়েছিলেন মাত্র ৫০ টাকা। তা মঞ্জুর হয় নি। তপনবাবু, ওয়ার্ড মাস্টাররা এখনও সকলে অনিল দাসের মত মদ খরেনি। ওটা কেনার পরমাণু ভাঙের নেই। তাদের অনেকেই পান-লিগারেটও খায় না। হাসপাতালে তারাই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম-মূল ব্যক্তি। কোন হাসপাতালের বিষয়ে সবটা যদি এক ব্যক্তির কাজ থেকেই জানতে চান, তাহলে ওয়ার্ড মাস্টারের কাছে যান। নিন না তাদের একটা ইন্টারভিউ।

নিবেদিতা সরকার
একজন ওয়ার্ডমাস্টারের স্ত্রী

উৎপল দত্তকে বয়কট করুন

আমরা পানিহাটি সঞ্চলের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন কিছু মানুষ ১লা অক্টোবর চীন বিপ্লব বার্ষিকী পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঠিক করি কোন রাজনীতিবিদকে বক্তা হিসাবে রাখা হবে না। অতএব আমরা উক্ত অস্থানে উৎপল দত্তকে বক্তা হিসাবে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। গত ১৪।১৭ তারিখে আমরা উৎপল দত্তের বাসভবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিবখাল হবার পর তিনি বক্তা হিসাবে অস্থানে উপস্থিত থাকতে রাজী হয়ে যান। তবে ১লা অক্টোবর তাঁর সময় না থাকায় তিনি প্রস্তাব দেন যে পরদিন অর্থাৎ ১৫।১৭ তারিখে মহাজাতি সম্মেলনে পি এল টির সেক্রেটারী মুকুল-বসুর সঙ্গে আলোচনা মাপেক্ষে দিনক্ষণ ঠিক করবেন। সিদ্ধান্ত মত বর্ণিত দিবসে এবং নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে আমি এবং আমার আর এক বন্ধু উপস্থিত হই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর মুকুলবাবুর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল এবং মুকুল-

বাবুর মুখে বা শুনলাম তাতে শুধু হতাশাই নয় অবাকও হলাম। উনি বলেন, বিশেষ কাজে উৎপল দত্ত বধে চলে গেছেন। অবশ্য মুকুলবাবু আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার কথাও বললেন এবং কিছু সময় অপেক্ষা করার পর মুকুলবাবুর স্ববিরোধী কথায় এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে, তিনি এর আগে সত্যি কথা বলেন নি। মুকুলবাবু বললেন, উৎপলবাবুর শরীরটা খুব খারাপ হয়েছে। অতএব উনি বধে নাও যেতে পারেন।

১৬।১৭ তারিখ বিকেলের দিকে আরার উৎপল দত্তের বাড়ী গেলাম এবং স্বথারীতি তার দেখাও পেলাম। আমি যখন তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হই, তখন আকাশে মেঘ করেছে, আর সেই মেঘলা আকাশের নীচে, ছাদের ওপরে হিন্দী কিংয়ের কায়দায় এবং স্বথায় মানানসই পোষাকে সজ্জিত এক এলোকেমীকে ছাড়া আর কাউকেই দেখলাম না। অগত্যা তাঁর কাছেই উৎপলবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্ত সাহায্য

প্রার্থনা করতে হলো। মহিলাটি যে ব্যবহার করলেন তা চাকরবাকরদের জন্য যথোপযুক্ত। গেটের কাছে ছাড়া ছিল তরুণ দর্শন দুটো হিংস্র জানোয়ার এবং বারংবার অস্বরোধ করা সঙ্গেও কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হলো না। অবশেষে আক্রমণের মুখোমুখি হতেই হলো। একেত্রেও আমাকে যিনি রক্ষা করলেন, তাঁদের ভাষায় তিনি বাড়ীর চাকর।

অতঃপর গৃহান্তরে প্রবেশের সন্মতি পেলাম। প্রবেশান্তে উৎপল দত্তের কণ্ঠস্বরও অস্বাভাবন করলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর যিনি আমার সামনে উপস্থিত হলেন, তিনি উৎপল নন, তিনি শোভা সেন। বর্ণিতা মহিলার রূচ আচরণের জন্ত খ্যাতি সম্পর্কে আগেই অবগত হয়েছিলাম এবং উক্ত দিবসে তা প্রত্যক্ষ করলাম। আমার সঙ্গে কথোপকথন চলাকালীন সারাটাক্ষণ যেভাবে তিনি মিথ্যে কথা বলেছিলেন তাতে সঠিকভাবেই মনে হলো মিথ্যাচার সম্পর্কেও তিনি খ্যাতি অর্জন করার যোগ্য।

শোভা সেন আমাকে পরিষ্কার (সেবাংশ চম পূর্ণায়)

সি ই এস সির নতুন "ভিজিলেন্স সেল"

নতুন সার্ভিস কন্সল্টেশন বা ইলেকট্রিক বিল থেকে উদ্ধৃত অভিযোগ সম্বন্ধে ভাড়াভাড়া ব্যবস্থা করিয়ে দেবার অছিলায় কিছু অসৎ লোক আমাদের গ্রাহকদের কাছে টাকা চাইছে, এই ধরনের খবর পেয়ে আমরা বিশেষ চিন্তিত। আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গ্রাহকদের কাছে তাই আমাদের একান্ত অনুরোধ তাঁরা যেন কখনই কাউকে এই সব ব্যাপারে কোনো রকম টাকাকড়ি না দেন, এমন কি, সে ব্যক্তি আমাদের কোম্পানীর লোক বলে নিজেকে জাহির করলেও। যদি কেউ আপনাদের কাছে এই ধরনের অর্থ দাবী করে তবে আমাদের বিশেষ অনুরোধ আপনারা যেন পাশের তিকানায় আপনাদের অভিযোগ-সহ সব খবরটি

জানিয়ে দেন যাতে এই সব অসৎ লোকের সম্ভাব্য সমস্ত কুপ্রচেষ্টাকে আমরা প্রতিরোধ করতে সমর্থ হই।

"ভিজিলেন্স সেল"

সি ই এস সি লিমিটেড

পোস্ট বক্স নং ৬৬৫৪, এসপ্লানেড, কলকাতা-৭০০০৬৯

এই পোস্ট বক্সটি বিশেষ করে এই কাজের জন্যই নেওয়া হয়েছে এবং এই তিকানায় লিখিত সব চিঠির বক্তব্য গোপন থাকবে এবং লেখকের অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করা হবে না।

CECSC

দি ক্যালকুলা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন লিমিটেড

বহুমতীর ব্যাপার কতদিন ঝুলে থাকবে ?

(দুর্গার সবাদদাতা)

সেই ঐতিহাসিক বাংলা সংবাদ-পত্র দৈনিক বহুমতীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীমহলে আবার নতুন করে উদ্বেগ আশংকা দেখা দিয়েছে। বেনামদার মালিক অশোক সেনের হঠকারিতা ও প্রমিতবিরোধী নীতির ফলে একদিন সংবাদপত্রটির দরজায় ছালা ঝুলেছিল। দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক বহুমতী এবং প্রকাশন বিভাগের মোট সাতশে পাঁচশো সাংবাদিক অসংবাদিক কর্মচ্যুত হয়ে অনিশ্চয়তার গর্ভে নিষ্কিন্ত হয়েছিলেন। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় রথেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আই জে এ ডক্টর সাংবাদিকদের নিরলস প্রচেষ্টায় বহু দুরূহা খোলে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহুমতী প্রাইভেট লিমিটেডকে রুগ্ম শিল্প সংস্থা হিসেবে অধিগ্রহণ করেন। কিন্তু যে আশা ও প্রত্যাশা নিয়ে নবকলেবরে বহুমতীর পুনরাবির্ভাব ঘটানো হয়েছিল নবনিযুক্ত মুখ্য প্রশাসক ও প্রধান সম্পাদক কেদার ঘোষ তাঁর পেটোয়া কয়েকজন সাংবাদিকের সাহায্যে ও সহযোগিতায় তা বানচাল করে দেন। কেদারবাবু রাজ্য সরকার প্রদত্ত ৫০ লাখ টাকা ঋণ দিয়ে পূর্য্যুত হয়েছেন, রুগ্ম শিল্প-বহুমতীর স্বাস্থ্যোদ্ধার তো আশো হয় নি, বরং তার নাতিশাস উঠেছে। তার মাসিক লোক-

সানের বহর এখন খেঁচ মাখ টাকার মতো।

মাসের বামফ্রন্ট সরকার বহুমতীর ব্যাপার তদন্ত করার জন্য এবং একে স্বস্থ সবল ও লাভজনক করে তোলা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য একটি তিনসদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। কিন্তু একমাসের মধ্যে তদন্তের রিপোর্ট দাখিল করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আজ দুমাসের মধ্যে সমস্তার কোন কলকিনারা তারা করতে পারেননি। কমিটির কাছে সাংবাদিক, অসংবাদিকদের পক্ষ থেকে সংস্থাগত ও ব্যক্তিগতভাবে এক ভয়নেরও বেশী আরকলিপি পেশ করা হয়েছে। স্বভাবতই বহুমতীর হালচাল সম্পর্কে কমিটিকে ওয়াকিবহাল করার জন্যই ঐ আরকলিপির অবতারণা করা হয়েছিল। কিন্তু কমিটির নাকি এখনো দুমাস সময় লাগবে তাঁদের সুপারিশ সরকারকে জানাতে। স্বাভাবিক অবস্থায় সে সময় দিতে কারো আপত্তি হতো না কিন্তু ইতিমধ্যে কেদার ঘোষ বরখাস্ত হবার পরেও বহুমতীতে অরাজকতা অব্যাহত রয়েছে। কেদারবাবুকে যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ চূরির দ্বায়ে অভিযুক্ত করা হয় তবে এখন সেখানে চলছে সাপের চুরি। কাঁচা মাল কেনা বেচা,

গাড়ির বগেজ ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্ত হলেই এসব তথ্য প্রমাণিত হতে পারে। অথচ এদিকে বহুমতীর প্রচার সংখ্যা ক্রমশঃ পড়ে যাচ্ছে। বাবার কারণ একটিই এবং সেটি হলো এতদিন যায়। সিদ্ধার্থ রায় এবং কংগ্রেসের জয়ডাক হিসাবে বহুমতীকে ব্যবহার করে এসেছেন সেই পরিচালকবর্গ এবং সেই কেদার চক্রই বামফ্রন্ট সরকারকে লাবোতাঙ্ক করার মতলবে বহুমতীকে কাজে লাগাতে চাইছে।

কংগ্রেসের এবং সিদ্ধার্থবাবুর প্রশস্তি গাওয়ার এবং বামপন্থী দলগুলির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাবার জন্যই কেদারবাবু ৮-১০ জন সাংবাদিকের এক ককাস বা চক্র গড়ে তুলেছিলেন। এদের সবাইকে তিনি অফিসের কাইলপত্রে কারসাদির মাধ্যমে অন্তায় ও বে-আইনী প্রমোশন দিয়েছেন বোর্ড ও সরকারের অনুমোদনের তোয়াক্কা না করে, সিনিয়রিটি ও যোগ্যতার বাহ-বিচার না করেই। বিবেকানন্দবাবুর আসনে যাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তিনি চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল এবং কট্টর বামপন্থী বিরোধী হিসাবে পরিচিত। বহুমতীতে সত্তা আগত হওয়া সত্ত্বেও কেদারবাবু একসঙ্গে পাঁচটি ইনক্রিমেন্ট দিয়ে অফিসে লাঠি

খোঁচাবার সর্বস্ব কবিতা তাঁর হাতেই ভুলে যেন। বহুমতীর নয়টি ফিচার তাঁর নিয়ন্ত্রণে। অতএব তিনি যে বহুমতীকে প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী খাণের অঙ্গকূলে ঢালানোর এক স্বাভাবিক।

উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কয়েকজন সাংবাদিক শুধু অযোগ্য ও অপরাধীই নয়, তারা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কোশলে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফিসের গাড়ী ও টেলিফোনের খরচ বাড়ানো ছাড়া আর কিছু করার পক্ষে অযোগ্য।

অন্যদিকে বহুমতীর সেই অশোক সেনের স্নেহপ্রাপ্ত সাংবাদিক লুৎফ এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বরত মুখার্জীর আশীর্বাদমস্ত ইউনিয়ন এখন রং বদলাবার জন্য ব্যস্ত। বামপন্থী মন্ত্রী এম,এল,এ, নেতাদের ছুয়ারে ছুয়ারে গিয়েও তারা স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকার উচ্চ প্রাণপাত পরিশ্রম করছেন।

বহুমতী সমস্তার সমাধান খুঁড়ো কঠিন নয়। পুরনো পরিচালক মণ্ডলী ভেঙে দিয়ে নতুন বোর্ড গঠন, সাপ্তাহিক, মাসিক ও প্রকাশনা বিভাগ খোলা, সমস্ত ইচ্ছুক পুরনো সাংবাদিক অসংবাদিক কর্মচারীকে ফিরিয়ে আনা, প্রাক-অধিগ্রহণ স্থিতিবস্থায় প্রত্যাবর্তন, অর্থাৎ কেদারবাবু যেসব প্রমোশন, ট্রান্সফার ইত্যাদি দুর্ভিক্ষ করেছেন সেগুলি বাতিল করে দেওয়া ইত্যাদি। একটি ট্রান্সফার হাতে বহুমতীর পরিচালন ভার ভুলে দেওয়া যাতে পারে যেখানে সরকার, বহুমতীর সাংবাদিক অসংবাদিক এবং সংবাদপত্র জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিনিধি থাকবেন।

যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণে যত দেরী হচ্ছে তত জনমনে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে উদ্বেগ ও হুঁসিধা বাড়ছে। স্বার্থান্বেষী মহল থেকে একধরনের প্রচারও করা হচ্ছে যে সরকার লোকসানী কারবার বহুমতীকে রাখবেন না। কিন্তু বহুমতীকে সহজেই লাভজনক সংস্থায় উন্নীত করা যায় যদি স্বযোগ্য পরিচালক পিছনের থাকেন, প্রচার সংখ্যা এবং বিজ্ঞাপন দুইই বহুগুণ বাড়ানো সম্ভব। সমাজের সেই অংশের কাছে প্রস্তুতি অত্যন্ত জরুরী যারা বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি গভীর আস্থাশীল এবং তারা এর জরুরী সমাধানই প্রত্যাশা করেন।

পি আর সির অনুষ্ঠানে অব্যব

(দুর্গার সবাদদাতা)

পিপলস্ রিলিক কমিটি সংক্ষেপে পি, আর, সি, গত ২৬শে ও ২৭শে সেপ্টেম্বর নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে ছদ্ম ব্যাপী এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল বঙ্গা ও ধরা পীড়িত মানুষদের সাহায্য করার জন্য। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ অকুণ্ঠ চিন্তে তাঁদের এ আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন।

কিন্তু উদ্যোক্তারা ভাবেননি নেতাজী স্টেডিয়াম কোনভাবেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত জায়গা নয়। সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাদে আর সব কিছুই চলতে পারে। তাই স্বাভাবিক কারণেই ২৬ এবং ২৭ তারিখে টিকিট কেটে গান, আবৃত্তি ও যাত্রা শুনতে যাওয়া দর্শকেরা শারীরিক ও মানসিকভাবে যথেষ্ট অস্বস্তি ভোগ করেছেন এবং অর্ধেকেরও বেশী লোক মাঝপথেই বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। মাইকের গোলমাল দুদিনের অনুষ্ঠানকে যথেষ্টভাবে বিঘ্নিত করেছে। সবচেয়ে অসহায় লেগেছে দুই দিনের অনুষ্ঠান দেরী করে শুরু করার পর (এটাই কি নিয়মে দাঁড়াল ?) ডাঃ শৈলেন দাসকে যখন পূর্ববী দত্তের পর রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে দেওয়া হল তখন দর্শকের এক অংশ তার প্রথম গানের পরই হাততালি দিয়ে তাঁকে উঠে যেতে বললেন এক ভাঃ দাস সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন ঠিক আছে গাইব না এবং যথারীতি ট্রেডিয়ায় ত্যাগ করে চলে গেলেন। দর্শকেরা অসহায় ভাবে বেরইলেন। কর্তৃপক্ষের কেউ এগিয়ে এলেন না। মাইকে কিছু প্রচার হল না। নাম থাকা সত্ত্বেও সুমিঞ্জা সেন এলেন না, প্রদীপ ঘোষ আবৃত্তি করলেন না। হঠাৎ শুরু হয়ে গেল লোকনাট্যের মুক্তিদীক্ষা যাত্রা। অনেকেই রেবটের প্যারী কমিউন নাটকের ওপর লেবা উৎপন্ন হচ্ছিল। পরিচালিত এই নাটক দেববার আগ্রহে মূল্যবান সময় নষ্ট করে দেখির ট্রেডিয়ায় উপস্থিত হয়েছিলেন। যাত্রার সংলাপ ও বর্ণনা শোনা যায় নি। দর্শকেরা মুহূর্ত্ত বাধা দিচ্ছিলেন মাইকে অব্যবস্থার জন্য, শিল্পীরা বিব্রল হয়ে পড়ছিলেন এবং কর্তৃপক্ষের যথারীতি নির্দিকার।

পশ্চিমবঙ্গের তাঁতবস্ত্র

আমাদের গর্ব ও আনন্দের জিনিস

পশ্চিমবঙ্গের তাঁতশিল্প তার স্মৃতি ও রেশমের বিরাট বহুসম্ভার

নির্থে উপস্থিত হয়েছে। বয়নবিচিত্র্য আর উৎকর্ষতার

পশ্চিমবঙ্গের তাঁতবস্ত্রের তুলনা নাই।

পশ্চিমবঙ্গ তাঁত ও বস্ত্রশিল্প অধিকার কর্তৃক প্রচারিত

এবারের যাত্রা উৎসব

(দর্পণের প্রতিনিধি)

রবীন্দ্রসদনের কাছে কলকাতা
রদানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়ো-
জিত যাত্রা উৎসবে অত্রবারের থেকে
অতিথ্য পরিচালিত হয়েছে। এবারের
এর থেকে উল্লেখযোগ্য সংযোজন (বা
বয়োজন) তথাকথিত পুরস্কারের
নীতি রদ। আগেকার ভারপ্রাপ্ত
শ্রী স্বরূপ মুখার্জীর আমলে এই
তথাকথিত পুরস্কারকে কেন্দ্র করে
নীতি ও পদ্ধতিগত চিংড়ির
বিকাশ যাত্রাদলগুলিকে বিক্ষুব্ধ
করেছিল। সেইজন্য বর্তমান উৎসব
মহত্বপূর্ণ পুরস্কার বন্ধের সিদ্ধান্তকে
আজারসিকরা স্বাগত জানিয়েছেন।

ছোট বড় ছেচলিগলি দল নিয়ে
শত ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ১২ই
অক্টোবর ২২ দিন ব্যাপী এই উৎস-

মহাজাতি সদনে

১৫ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টা

অচল পয়সা

হলু টিকিট সকাল ৯টা-৭টা

পরিবেশনায়

সর্বযুগের একটি নাম

নট কোম্পানী

এক এবং একক

১৭, হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট

৫৫-০৭৭২, ৫৪-৩৬৬৮

শিল্পীমহল

নিবেদিত

ছোট কালজয়ী নাটক

বীন ব্যানার্জীর পৌরাণিক

দস্যু রত্নাকর

কানাই নাথের ঐতিহাসিক

লাল নিশান

নির্দেশক সর্বাধিনায়ক

শ্রেষ্ঠাংশে নটদল

ভোলা পাল

বিষ্ণুপ্রিয়া ও রাইকমলখ্যাত

তারারানী পাল

গায়ক-ভক্ত মল্লিক

আবহসঙ্গীত-খোকা মল্লিক

জেনারেল ম্যানেজার

অভয় সাহা

বের আসর বসেছিল। উৎসবের
আগে তথ্যময়ী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
ঘোষণা করেছিলেন বিষয়বস্তুর দিক
থেকে প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও
জাতীয় ঐতিহ্যের বাহক বা দেশের
সাংস্কৃতিক রূপায়ণকেই প্রাধান্য দেবার
চেষ্টা করা হয়েছে।..... আমরা অপ-
সংস্কৃতির হাত থেকে মুক্তি চাইই।
এর জন্য দেখা গেছেকোন কোন দল
কিছু অশালীন নাচ ও দৃষ্টের সংস্কার
করে এখানে প্রদর্শন করেছেন। প্রশ্ন
হোল এই সেলফ সেন্সর তারা সর্বত্র
বজায় রাখবে তো?

উৎসবে বেশ কয়েকটি গণচেতনা-
মূলক পালার সমাবেশ স্বাভাবিক
কারণেই হয়েছে। পেশাদারী যাত্রায়
এই সব নাটকের আগমন কিছুদিন
আগে থেকে হলেও এখনকার মতো
ব্যাপক ছিল না। এটা এখন
প্রমাণিত সত্য জনগণ। এই ধরনের
পালা সাংগ্রহে গ্রহণ করে। কিন্তু
বিষয়বস্তু দুর্বল হলে মঞ্চে শুধু চিংকার
দাপাদাপি করলে লাভ হয় না।
আর সরকারের মন রাখার জন্য শুধু-
মাজ রোগান ঢুকিয়ে 'দিলেই চলবে
না। শিল্পবোধ আর উদ্বেগ সম্বন্ধে
পরিষ্কার জ্ঞান থাকার দরকার। দেশী
ও বিদেশী ক্যান্টিন ধর্মী কিছু পালাও
সমাবিষ্ট হয়েছিল। এদের এই

তরুণ অপেরার 'সিপাই মিউটিনি'

(দর্পণের সমালোচক)

পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশো বছর
পর অযোধ্যা, মীরাট, কানৌজ থেকে
হুদূর ব্যারাকপুরে সিপাইরা ব্রিটিশ
শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, কাঁপিয়ে
পড়েছিলেন। কার্ল মার্কস ভারতে
সিপাইদের এই আগ্রহ ও সংগ্রামকে
ভারতের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম
আখ্যা দিয়েছেন। ১৮৫৭ সালের পূর্বে
এদেশে একাধিক কৃষক বিদ্রোহ সংগ-
ঠিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো সবই
ছিল বিক্ষিপ্ত, অঞ্চলভিত্তিক আর
সিপাই বিদ্রোহ ছিল ব্যাপক। ঐ
বিদ্রোহের প্রথম শহীদ ব্যারাকপুরের
সিপাই-স্ববেদার মঙ্গল পাড়ে।

'রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা'র পর তরুণ
অপেরার নবতম প্রযোজনা 'সিপাই
মিউটিনি' রচনা করেছেন মধু
গোখরাই। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর বিষ্ণু-
রূপায় 'সিপাই মিউটিনি'র প্রথম
প্রদর্শনী অহুতীত হল। অর্ধগত বিকৃত
জাতীয় ইতিহাস পড়ানো হয় স্কুল-
কলেজে। পড়ানো হয় না নানা
সাহেব-মীরাবাই-মঙ্গল পাড়ের
মহান কৃষিকার কথা। সে ক্ষেত্রে
এ ধরনের যাত্রাহুতান অবশ্যই প্রোতা-
গণকে শিক্ষিত করবে।

প্রয়াসও প্রশংসার যোগ্য। অবশ্য
এখানেও বেশ কিছু বাজে পালা
জায়গা করে নিয়েছে। আরোজনের
সবচেয়ে বড় ভ্রুটি দুপুরে ও সন্ধ্যায়
পালা ও দলের স্থান নির্ণয়ে। কিসের
ভিত্তিতে এটা করা হয়েছে বোকা
বায় নি। সন্ধ্যাতে দর্শকের সংখ্যা
বেশী হয়। উন্নতমানের পালাকে
নিশ্চয়ই বেশী সংখ্যক দর্শকের কাছে
পরিচিত করা উচিত। কিন্তু বড়
দল মাজই সন্ধ্যায় আর ছোট দল
দুপুরে থাকবে এটা ঠিক নয়। নাম-
করা দল ও পালার বেশী দর্শক
যাবেই। অনেক বড় দল হাজার
হাজার টাকা বিজ্ঞাপনের জন্য খরচ
করতে পারে। এদের কোন কোন
ক্ষেত্রে সন্ধ্যায় না দিয়ে দুপুরে
দেওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। অত্রদিকে
ভালো ছোট দলকে সন্ধ্যায় স্থান
দেওয়া উচিত ছিল। এতে সরকার
ও দল দুয়েরই লাভ হতো আর অহু-
ঠানের মূল স্পিরিটটাও বজায়
থাকতো। সেইজন্য উদ্যোক্তাদের
আরো বেশী মনোযোগের প্রয়োজন
ছিল।

সংস্কৃতি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী এবং তথ্য
মন্ত্রীর ঘোষণার প্রভাব এবারকার
যাত্রা উৎসবে ভালোভাবেই প্রতি-
ফলিত হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে
তাদের এই প্রচেষ্টা প্রশংসার
যোগ্য।

যুক্তি তক্কো গল্পো

ভানুসিংহ

ঋষিক ঘটকের শেষ ছবি 'যুক্তি
তক্কো গল্পো' আমাদের ভাষনার
জগতকে উন্নত করে, দোলাচল রাজ-
নীতির দৃষ্টি মুগ্ধতার আমাদের
মনকে সচেতন করে, কৃষিক সমাজের
অবক্ষণের মাধ্যমেও আশার আলো
দেখায় আর স্বপ্ন দেখাতে চায়। রুচ
বাস্তব যেখানে নির্মম, ভেঙে চূরে
জালিয়ে পুড়িয়ে সব শেষ করে দিতে
চায় সেখানেও দেখি নতুন করে বেঁচে
ওঠার কঠিন শপথ গ্রহণ।

আলোচ্য ছবিটিতে ঋষিক
ঘটকের ব্যক্তি-জীবনের ছায়া
অনেকটাই পড়েছে। তথাপি
ছবিটিতে সার্বজনীন আবেদন সঞ্চারে
কিছুমাত্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় নি—
এটাই এ ছবির অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য।
একটি প্রতিভাবান শিল্পী সং প্রচেষ্টা
সম্বোধ সমাজের প্রতিকূল পরিবেশে
দেশের অর্থনৈতিক ধাতাকলে
নিম্পেষিত হতে হতে নিঃশেষ হয়ে
গেল যে ভাবে, তার মধ্যে কি বঞ্চিত
দেহবাসীর ক্ষুদ্র দীর্ঘবাস চাপা পড়তে
পেয়েছে? ছবির নীলকণ্ঠ বাগচি
ঋষিক ঘটককে বতই সনাক্ত করুক
না কেন, তার কথা, তার বাধা,
ক্রোধ, আক্ষেপ, যন্ত্রণা সাধারণ
মাহুষের অহুতীতেও সাড়া জাগায়
বৈকি। তবে একথাও সত্য যে,
ঋষিকের জীবনের যে ফ্রাস্ট্রেশন, তা
অবশ্যই সাধারণ মাহুষের নয়। কিন্তু
সেই ফ্রাস্ট্রটেড চরিত্র স্বীয় জীবনের
অভিজ্ঞতা নিয়ে সমাজের বৈষম্যকে
যখন কণ্ঠস্বরে করে, বক্ষনাকে ব্যঙ্গ
করে, শোষণের বিরুদ্ধে রূপে
দাঁড়াবার ঘোষণা করে, তখন তো
সেগুলি শুধুই জনমানসের কাছেই
আবেদন রাখে।

নীলকণ্ঠ বাগচি শিল্পী জীবনের
ব্যর্থতায় আজ হতাশার শিকার,
রীতিমত মস্তপ। বিশৃঙ্খল এই
জীবনের সংগে জী দুর্গা খাপ খাওয়ানো
না-পেরে মফঃস্বলের এক বিচ্ছলে

মতামত

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

জানিয়ে দিলেন, উৎপলবাবুর দৃঢ়
সিদ্ধান্ত ইন্দো-চায়না ফ্রেণ্ডশিপ
এ্যাসোসিয়েশনের অগঠন ছাড়া
তিনি অন্য কোন অহুতানে যোগদান
করবেন না।

স্বভাবতই এবার আমি নিশ্চয়ই
দাবী করতে পারি যে, গণতান্ত্রিক
চেতনাসম্পন্ন মুক্তিকামী মাহুষ এই
ভাওতাবাস্তুলোকে বয়স্কট করুন,
যাক টাকা রোজগারের ধান্দায় রাজ-
নীতির মূষণ মুখে পেঁটে নিয়েছেন।
জনৈক পাঠক

শিক্ষিকার চাকুরী নিয়ে চলে যায়
পুত্র-সত্যকে সংগে করে। নীলকণ্ঠ
জী পরিত্যক্ত হলেও নিঃসঙ্গ নয়, তার
সংগী হিসেবে দেখি এক বেকার তরুণ,
বাংলাদেশের লাক্ষিত্য এক তরুণ
বন্ধুত্ব আর এক স্কুলের প্রৌচ
প্রাক্তন সংস্কৃত শিক্ষককে। এদের
মধ্য দিয়েও ছবির বলিষ্ঠ বক্তব্য
ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নানা তির্যক
জগিমায়। কাটা কাটা সংলাপ আর
দৃষ্টের মধ্য দিয়ে যুগ যন্ত্রণা ও জীবনের
এই দাবাখেলার ছবি ফুটেছে।
রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্তা তুর্বে
ধরার চেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়, যেখানে
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

গ্রামে-গঞ্জে সহরে নগরে

সবার মুখে একই কথা

অপূর্ব

আনন্দময়ের

কালকেতু ফুল্লরা

ও

সাতনম্বর কয়েদী

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের

লক্ষ্মী এলো ঘরে

নির্দেশনায় ও অভিনয়ে

মোহন চ্যাটার্জী

পরিবেশনায়

মোহন অপেরা

৫৫-৫৪১৩

পঃ বঃ সরকারের

যাত্রা উৎসবে

'রেকর্ড দর্শক'

এবং যে সকল অগণিত দর্শক

বু-মু-র পালার

টিকিট না পেয়ে ফিরে গেছেন

তাদের জন্য আমরা জুখিত

আমাদের আরো ২টি

বলিষ্ঠ নিবেদন

নাগমনি

(পৌরাণিক)

সোনার ঘোড়া

(সামাজিক)

পরিবেশনায়

৮৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী জনপ্রিয়

সত্যস্বর অপেরা

৫৫-৮১১০

সফল ধর্মঘট

পিয়ালসেস এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের নেতৃত্বে হাটাই কর্মীদের পুনর্বাসনসহ ছ বর্ষ ধর্মঘট ভিত্তিতে অবিনশে হাওড়া শাখা, কলকাতা, অফিসগুলি এবং রায়গঞ্জ শাখা অফিস থেকে লক-আউট প্রত্যাহারের দাবীতে পিয়ালসেসের কর্মীরা দীর্ঘ চার মাস যাবত আন্দোলন চালাচ্ছেন। শৈল্পাত্মক কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের সঙ্গে কোন আলোচনা আলোচনার পরিবর্তে নানা ধমন-পীড়ন মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। এমন কি বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রথম দপ্তর আহত ছ'টি আলোচনা সভার একটিতেও কর্তৃপক্ষ উপস্থিত হননি। এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রতিবাদে ভারতবর্ষব্যাপী পিয়ালসেসের বিভিন্ন শাখা অফিসের কর্মীরা ২২শে, ২৬শে ও ২৭শে সেপ্টেম্বর যথাক্রমে একদিন ও দু-দিনের সফল ধর্মঘট পালন করেন। এই উপলক্ষে উক্ত তিন দিনই বিভিন্ন শাখা ইউনিটের নেতৃত্বে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে পিয়ালসেসের আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে বিভিন্ন গণ সংগঠন এগিয়ে এসেছেন।

বিকারগ্রস্ত ছড়া

অনার্য মিত্র

হু' ছুটিবার দাবীম হলেন
তবু কিসের জালা?
এমন জালায় অগ্নিকুণ্ড
নেতাবে কোন শালা?

তিরিশ বছর যারা ছিলেম,
তারা তো আর নেই,
তবু তনি যেমন ছিলেন
তেরি আছেন নেই।

আচ্ছা মশাই বলুন দেখি
আলো কি চান?
পুত্র ভরা গৃহ দেখো
গোয়াল ভরা ধান?

আহা সোনার চান আমার
ওহো সোনার চান,

এস তোমায় আদর করে
ম'লে দিই ছই কান।

তিরিশ বছর হাম বেছেছে
ছ'মাসে তা ধাবে?
আমরা পাইনি কিছু
তারো সব কি ধাবে?

উনিশটি মাস জেল খাটিল
তবেই পেছ গছি,
এক ছুটো দিন খেতে নেই কি
আমি ঘি আর দধি?

ভোট দিয়েছেন বেশ করেছেন,
দেব বলেছি দেবো,
ভোটের আগে নগর দিয়েই
না হয় ভোটটা নেবো।

সত্যনারায়ণ সিংহ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উঠেছিল।" পরিকারভাবে বলেন হিংসায় তারা বিশ্বাস করেন না। সত্যনারায়ণবাবুর এই বিবৃতি নকশাপত্রীদের অত্যাচার মহলে তীব্র কোভের সঞ্চার করে। এমনকি গত ২ই জুন বন্দীমুক্তি কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যপালকে দেওয়া এক স্মারক-

লিপিতে এই প্রসঙ্গে বলা হয় "আমরা দুতভাবে মর্মে করি এই শর্ত অগণতান্ত্রিক, অধৈমিক, এবং নোংরা।"

এটা সত্য কথা, সত্যনারায়ণ সিং প্রত্যক্ষভাবে বন্দীমুক্তি আন্দোলনে না জড়িত থেকে একক প্রচেষ্টায় সরকারের সংগে আলোচনা প্রস্তুত কোন সিদ্ধান্ত বন্দীদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারেন না এবং এটা করার মানেই বন্দীমুক্তি আন্দোলনে শর্তের সৃষ্টি করা। তাঁর রাজনৈতিক মতামত বন্দীরা নাও মানতে পারেন। এটা বন্দীদের নিজস্ব ব্যাপার। তাঁর বা তাঁর গোষ্ঠীর মতামত সমস্ত বন্দী-

দর্পণের ছুটি

শারদীয় উৎসব উপলক্ষে দর্পণের দুসপ্তাহ ছুটি। পুনরায় দর্পণ প্রকাশিত হবে আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর।

দের উপর চাপিয়ে দেওয়া কি অগণতান্ত্রিক নয়? তাছাড়া যে বক্তব্য সমর্থন করে একটা সই করলে মুক্তি পাওয়া যায় তাকে কি মুচলেকা বলে না? মুচলেকা এভাবেই আদায় করা হয় সাধারণতঃ। হিংসায় কেউ বিশ্বাস করে কি করে না তা কেন লিখে জানাতে হবে? তাও আবার সরকারকে।

বলা বাহুল্য সত্যনারায়ণ সিংয়ের এই "স্বর্ণ প্রচেষ্টা"কে বন্দীরা ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন কেউ সই না করে। অবশ্য তিনজন সত্যনারায়ণপন্থী সম্ভোষ রাণা, সাধন সরকার ও প্রদীপ ব্যানার্জী বাঁধ দিয়ে।

যুক্ত তরুণ পল্লী

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

অবশ্যই শ্রেয়, ব্যক্তি আর বৃদ্ধি তরুণ ব্যাপারটাই বড় হয়ে ওঠে। যে দেশে তরুণ সমাজের ওপর বেকার-দের অভিযান, মধ্যবিত্তের ক্ষয়িক্ষয়, শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর জীবন বঞ্চনা, নারীর লালনা এবং রাজনৈতিক দলবাজিতে যুগান্তের অপচয়, সেখানেও আমরা নীলকণ্ঠের মুখে শুনি—'এই বেকার তরুণ আর লালিতা বঞ্চনালো এক নতুন বাংলার ন্যায়গতিক হবে, যে বাংলা এখনও জন্মায় নি তবে একদিন জন্মাবে'—'দুর্গা, এই শালবনে ভোরের আলোর আমার সম্মান সত্যের মুখখানা একবার দেখে যেতে চাই, কারণ সেই ছবিটাই তো আমার বুক থেকে থেকে ধাবে।' এ সব কথা এক মস্তপের মুখ থেকে বার হলেও তার স্বপ্ন আর আশার ছবিটা স্পষ্ট হয়েই ওঠে আর এখানেই হচ্ছে শিল্পীর অবদান। শেষ দৃষ্টে যখন নীলকণ্ঠ বুলেটের আঘাতে নিহত, তখনও দেখি বেকার তরুণ আর লালিতা বঞ্চনালার গুত-মিলন, শুনি মঙ্গলধ্বনি আর আশাবরী। কাজের কাজ না করে শুধু বৃদ্ধি তরুণ আর গল্প করে যত বিশ্বাসলা সৃষ্টি করা হোক না কেন, গলা পচা এই সমাজ ব্যবস্থার অবলম্বনে নতুন প্রাণশক্তির জন্য এক দিন-হবেই—ছবির তো এটাই বীজ-ময়। ছবিতে নীলকণ্ঠের আচরণের অতিশয়তা বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে মদের বোতল হাতে। ছবিতে ধাপছাড়া দৃষ্টের অভাবও

নেই। শব্দ গ্রহণও ত্রুটিপূর্ণ। এ সব নিয়েই স্বস্তিক ভাবন। ভাবের হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র আঁখ বঞ্চনালো চরিত্রটিতো স্বস্তিকের চিত্তারই ফসল।

অভিযোগ

রাজ্য সরকার পরিচালিত আ-নাশ দপ্তর মোটরনিটি হোমের কয়েকজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা গেছে প্রাক্ত-স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধিত পাড়ার রাজস্ব এ-চাকরী পান। কল্ল ময়ীর লো-বলে হোক অথবা কাজ করা-ইচ্ছা বা নাথ্য নেই বলেই হো-এরা যুগ্মিত ঘোরাফেরা আর-ধাকা ছাড়া বিশেষ কিছু আ-করতেন না, এখন জন্মানা পাটাবা-পরও করেন না। এই প্রকৃপাণ্ড-হলেন অমল রায় (কেরানী) প্রশা-রায় (স্টোর কীপার) গুণসিদ্ধ কয়া (ওয়ার্ড মাষ্টার) বক্রিম দা (কারাসিস্ট) এবং সমীর রা (সোসাল ওয়ার্কার)। শেষো-ব্যক্তি কিছুদিন আগে অত্যাচার বদল-হলেও এবং উপরগুলার নির্দেশ সঙ্গে-এখনও একটি কোয়ার্টার দখল ক-রেখেছেন।

একটি কনভেনশন

সর্বশ্রেণীর রাজনৈতিক ব-মুক্তি স্বরাধিত করার স্বপক্ষে জনম-গড়ে তোলার জন্য বন্দীমুক্তি ও গণ-দাবী প্রস্তুতি কমিটি আগামী শনিবা-১৫ই অক্টোবর মুসলিম ইন্সটিটিউ হতে একটি কনভেনশনের আয়োজ-করেছে।

হাতে হাতে বিক্রী শত শত হাজারে
হাঁড়ি আড়ি ফাটল শারদীয় বাজারে



হাঁড়ি ফাটল

একটি চাঞ্চল্যকর

রাজনৈতিক ছড়ার বই

প্রকাশিত হল

ছড়া ॥ অনার্য মিত্র ০ কার্টুন ॥ অহিভূষণ

ইন্দ্রিরা গ্রেপ্তার ॥ তাঁর সহচর গ্রেপ্তার কেন গ্রেপ্তার? কি রহস্য? কি পাপ? কি কৌতুক? রাজনৈতিক সাহিত্যে এই প্রথম অনার্য মিত্রের ঝাঁকালো ছড়ায় হেসে লুটিয়ে পড়া, শরীরে জ্বালা ধরানো সর্বত্র উপভোগ্য একটি দর্শন। ভূমিকা লিখেছেন অনাদ্যশংকর রায়। সতর্ক নজর রাখুন।

দাম—ছ'টাকা। এজেন্টদের জন্য ২৫% কমিশন।

প্রাপ্তিস্থান—আশুনাথ বুক এজেন্সী, ১২, বক্রিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-১২। নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১০২১০। পাতিরাম কলেক্স স্ট্রিট মোড়। সাপ্তাহিক 'দর্পণ' ৬১নং মট লেন কলকাতা-১০।

Shortly to be out
SHELLEY and MARX—their MILLENNIA
A topic never before covered.

In all about a hundred pages with the original sources generally appended.

The work closes with comments by Prof. Jyoti Bhat charjee M. A. (Cal. & Leeds) Reader in the Dept English, University of Calcutta. Price Rs. Five Only.

ON POET R. N. TAGORE.

A political appraisal of the poet in verse. In all a hundred pages with the original sources generally appended.

Something out of the rut—
no kindred of the hallelujah brood.

Comments by : Prof. Kanak Mukherjee M. A. (Cal.), Lecturer in English, Women's College, Editor : Monthly Eksathe. Prof. Jyoti Bhattacharjee, M. A. (Cal. & Leeds) Price Rs. Five only.

Murati, Murati, oh Murati !
A satire in verse from the politico-philosophical point of view.
The curtain on the work falls and in comes comments on it in prose by Prof. Jyoti Bhattacharjee, M. A.
Author :
Sunilkrishna Sen (alias Parthasarathi Sengup Lecturer in English, Uluberia College (affiliated Calcutta University) P. O. Uluberia, Dist. Howrah, West Bengal, India.

সম্পাদক—ইব্রেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২০/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৩১ মট লেন কলকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত।

আলিপুর জেলে 'কংগ্রেসী' গুণ্ডাদের

আধিপত্য : বন্দীদের মধ্যে সংঘর্ষের নেপথ্য কাহিনী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দর্পণ

কিশক ৮৮ ৪০শ সংখ্যা ১১ই নভেম্বর, ৭৭ ৪০ পরস

গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সকলেই নাস্তানাবুদ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

গত শনিবার হাওড়া স্টেশনে হাওড়া-বোম্বাইগামী 'গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস' উদ্বোধন উপলক্ষে দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে এক রাজস্ব সংগ্রহের আয়োজন করেছিলেন। দেশভূঁড়ে রেল-পরিবহনে দুর্ঘটনার সংগে পাল্লা দিয়ে অর্থ-অপচয়ের নজর এই প্রথম নাহলেও ঐ দিনের পৌনে একঘণ্টার উদ্বোধন অনুষ্ঠান রাজস্বসাধারণ, সাংবাদিক এবং মন্ত্রী মহোদয়দের নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে।

সেদিন ভোর থেকেই হাওড়া স্টেশনে জোর তৎপরতা। ট্রেনের প্রাটকর্মে সামিয়ানা দিয়ে এক বিশাল ভাড়া গিয়ে ফেলা হয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র। বিকেল ৪-৪৫ মিনিটে হাওড়া থেকে গীতাঞ্জলি/যাত্রা শুরু করল, কিন্তু নয় নম্বর প্রাটকর্মে বেলা ১২টা থেকেই রাজস্বসাধারণের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়ে যায়। ট্রাফিক পুলিশ, রেল পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশে ছয়লাপ। হাওড়া স্টেশনের প্রাটকর্মে প্রতি মিনিটে কম করে দশ হাজার মানুষ গিজ গিজ করে। তার মধ্যে এক বিরাট অংশ দখল করা হয় 'গীতাঞ্জলি'র উদ্বোধন পর্বের জন্য।

বেলা ষখন সোয়া-তিনটে তখনও গীতাঞ্জলি'র যাত্রার উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এসে পৌঁছান নি। পুলিশ যেখানে সেখানে/এমনভাবে রাজস্বের গতিরোধ করে দেয় সেদিন অনেকেই ছুটোছুটি করে তাদের অফিসফেরং লোকাল ট্রেন ধরতে

পারেন নি। অবশেষে চারটে বাজতে দশ এমন সময়ে মুখ্যমন্ত্রী এলেন, তাঁকে নয় নম্বর প্রাটকর্মে নিয়ে গিয়ে 'গীতাঞ্জলি'র চালকদের সঙ্গে পরিচয় করানো হল, তিনি দক্ষিণপূর্ব রেলের নবতম অবদান এই ট্রেনের কামরাগুলি একে একে পরিদর্শন করলেন আর তাকে পথ করে দিতে প্রাটকর্মের কাড়দার এবং মালবাহী কুলি ও রাজস্বের পুলিশের গুতো সামলাতে হল।

গীতাঞ্জলি পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রী এলেন শামিয়ানার নীচে সভামঞ্চে। এই সভামঞ্চের পেছনেই ছিল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যাতায়াতের পথ। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বসু সভামঞ্চে প্রবেশের পরে পুলিশ সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যানের দাড়া দিয়ে সরিয়ে দিতে থাকে। আমার সামনে টেলিভিশনের জনৈক সাংবাদিককে পুলিশের গলাধাকায় মুখ খুঁড়ে পড়ে যেতে দেখলাম। ট্রেনের কামরাগুলিতে মুখ্যমন্ত্রীর পরিদর্শন শেষে অনেক সংবাদপত্রের ক্যামেরাম্যানকেই সভামঞ্চে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের কোন ছবি তোলায় সুযোগ তারা পান নি। অনেক সরকারী সংস্থার পি আর ও এবং উচ্চপদস্থ অফিসারকে সেদিন পুলিশের গলাধাকায় সহিতে হয়েছে।

ঘটনার এখানেই শেষ নয় সেদিন পশ্চিমবঙ্গের নবনিযুক্ত রাজ্য-শেখাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

গত ৩০শে অক্টোবর আলিপুর জেলে বন্দীদের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। ঐই সংক্রান্ত যা খবর দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ নয় এবং বিশেষত 'আনন্দ-বাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়েছে তা হল "সর্বের মিথ্যা"—বন্দীমুক্তি কমিটির আত্মীয়ক পীযুষ ঘোষ একথা জানিয়েছেন।

প্রকৃত ঘটনা হল, ঐদিনে আলিপুর "সেন্ট্রাল জেলে" ৩নং সেলের প্রথম শ্রেণীর দুজন/যাবজ্জীবন দণ্ডিত অরাজনৈতিক বন্দী রাইট লেফটেন্যান্ট ভাড়াড়ী ও সত্যেন চক্রবর্তীর মধ্যে ব্যক্তিগত কারণে বাদানুবাদ থেকে হাতাহাতি চলতে থাকে। ৪নং সেলের প্রথম শ্রেণীর অরাজনৈতিক বন্দী রবি কোলে ৩নং সেলে ঢুকে ভাড়াড়ীকে মারতে থাকে। ৩ নম্বরের পাশে ১নং সেলে থাকেন অসীম চ্যাটার্জী, কাছ সাঙ্গালরা। মারামারি ও কুংসিত গালাগাল এমন চরমে ওঠে যে অসীম চ্যাটার্জী এসে থামাতে চেষ্টা করেন এবং বলেন যে মারামারি না করে তাদের অভিযোগগুলি চীফ হেড ওয়ার্ডারকে জানান উচিত। এতে রবি কোলে অসীম চ্যাটার্জীকে মারতে আসে। আরো উল্লেখযোগ্য, চীফ হেড ওয়ার্ডার বখন ভাড়াড়ীকে বার করে নিয়ে যান সেল থেকে, তখনও রবি কোলে তাঁকে মারতে থাকে। উত্তেজিত রবি কোলেকে থামাবার জন্য কাছ সাঙ্গাল তাকে ধমক দেন। কিন্তু রবি কোলে প্রত্যন্তরে কাছবাবুকে ঘুষি মেরে বসে। এতে পরিস্থিতি ক্রমশঃ আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, এবং ঐ সেলের সামনে হাতাহাতি মারামারি চলতে থাকে।

এই ঘটনা সম্পর্কে আই, ডি, প্রিজন্স মদস্ত করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছেন। বন্দীমুক্তি কমিটির আত্মীয়ক পীযুষ ঘোষ প্রশ্ন "আনন্দ-বাজার কেন বিকৃত রিপোর্ট ছাপা হল? কংগ্রেসের ক্ষেপে পড়া ভাবমূর্তিতে বৃত্তিকালপনের জন্ত কি?" এরপর কংগ্রেস সভানেত্রী পূর্বী মুখার্জী জেলে নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন রবি কোলে ও সত্যেন চক্রবর্তী (আর একজন বন্দী) কংগ্রেস সদস্য।

কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল রবি কোলে এবং সত্যেন চক্রবর্তী (যে কংগ্রেস সদস্য এ প্রমাণ কোথাও নেই। জেল (শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

আপনারা আমাদের \$১০০ কর্মীকে খুন করেছেন, আমরা আপনাদের কেশাগ্র স্পর্শ করব না—জ্যোতি বসু

(দর্পণের প্রতিনিধি)

গত ৭ই নভেম্বর হাওড়া ডাল-মিয়া পার্কে নভেম্বর বিপ্লব দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কংগ্রেসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা আমাদের ১১০০ কর্মী খুন করেছেন, আমরা আপনাদের কেশাগ্র স্পর্শ করব না এবং বেঁচে থাকার অধিকার সহ সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক অধিকার দেব।

জ্যোতি বসু বলেন যে, ১৯৭০ সাল থেকে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কংগ্রেসীরা বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড শুরু করে। তিনি বলেন নারা ভারতবর্ষের মানুষের দ্বারা এরা এমনভাবে পরিত্যক্ত হয় যে, শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর সব ধরনের অপরাধ, সব ধরনের অন্যায় করে কোন ক্রমে টিকে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অতএব তারা শুরু করে দেয় বেপরোয়া খুন-প্রারপি, কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন, সংবাদপত্রের কঠরোধ, গণতন্ত্রকে ধ্বংস এবং এমনকি ব্যাপক হারে আমাদের মা-বোনদের পর্যন্ত মৃত্যু ঘটায়। ৬৭, ৬৯, ৭১ পর পর তিন তিনটি নির্বাচনে আমরা

ওদের পরাজিত করি। স্বভাবতই এই অবস্থায় শংকিত হয়ে ৭২-এর নির্বাচনে ওরা বোমা পাইপপানের মত মারাত্মক বেসাইনী আগ্নেয়াস্ত্র এবং দিহীতে তৈরী মরণ কাঁদের রুপ্তি হাতে নিয়ে আমাদের ৬০ কোটি মানুষের বুকের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয় অত্যাচারের ঠাস রেলোর।

জনগণের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সমস্ত অত্যাচারের কথা আপনারা সবই জানেন, কারণ আপনারা আমার থেকেও বেশী ভুক্ত-ভোগী। আমাদের প্রদেশে বিদ্রোহের যে ভয়াবহ সংকট তার সমাধান কল্পে আমরা মন্ত্রিসভা গঠন করার আশ্রয়ে ১০০ কোটি টাকার এক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। কিন্তু অপদার্থ কংগ্রেসী মন্ত্রীর দল চুরি ছোচুরি ছাড়া কিছুই করেনি। ফলে, পরিকল্পিত কর্মসূচী প্রায় ১৫ মাস পিছিয়ে যায়। সি, এম, ডি, এর সঙ্গে জনগণ বা সরকার কারোরই কোন সম্পর্ক নেই। বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করার পর শক্ত হাতে সি, এম, ডি, এর হাল ধরেছে।

ফাটা কেপ্ট সোমেন মিত্রের দুঃসাহস

সাধারণ মানুষ সন্ত্রস্ত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সোমেন মিত্র, ফাটা কেপ্ট এবং আরো বেশ কিছু ঐ ধরনের কংগ্রেসী সমর্থক ও মদস্ত এক গোপন সভায় মিলিত হয়ে কালীপুজোর ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের ভাড়া ও জনসংযোগ মন্ত্রী শ্রী বসুকে ভট্টাচার্যের সরকারী নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আর গোপন সভার মৌপন খবর অবরোধের বেড়া পেরিয়ে শহরবাসীর কাছে ফাঁস হয়ে গেছে। এতে বিশেষ করে উত্তর কলকাতার জনগণ আতঙ্কিত। কারণ উত্তর কলকাতার স্থখ্যাত ঐ ছোটো পুজোর জন্য যে লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হয় তার তার শহরবাসীকেই বহন করতে হয় এবং ব্যয়ভারের জন্ত সাধারণ মানুষকে প্রচণ্ড অত্যাচারও সহ করতে হয়।

এই ছুটি পুজো যুগপৎকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের অসামাজিক কার্য-কলাপও সংগঠিত হয় যার শিকার হয় সাধারণ মানুষ। যানবাহনের

অবস্থাও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। স্বতরাং কলকাতাবাসী সহ আশেপাশের জেলার নাগরিকরা দ্বারা দৈনন্দিন কাজে কলকাতা যাতায়াত করেন এবং ছোট, ব্যবসায়ীরা এই ধরনে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। অবশ্য সাধারণ মানুষ বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আশা করছেন যে, তারা শক্ত হাতে জুলুম দমন করবেন।



সমাজবিরোধীদের হাতে বনকর্মী প্রফুল্লকুমার পালের মৃত্যু প্রসঙ্গে

সমাজবিরোধীদের হাতে বনকর্মী প্রফুল্লকুমার পালের মৃত্যু প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সাবডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট সার্ভিস অ্যান্ড এনালিসিসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমন্তকান্তি সেনগুপ্ত এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, বনভাঙ্গার বনকর্মী-চারীদের অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণের ঘটনায় সন্তোষিত বনকর্মী প্রফুল্লকুমার পালের নাম সংযোজিত হল। বিগত ১লা অক্টোবর বিকেলে মরাঘাট রেঞ্জ অফিসে সরকারী কাজ সমাপনান্তে বীট অফিসে প্রত্যাবর্তনের সময় পথিমধ্যে তাঁকে অত্যাচারের হত্যাকাণ্ডে করা হয়। দশমাসেরও কম সময়ের মধ্যে চারজন বনকর্মী-চারী, কর্তব্যরত অবস্থায় নৃশংস হত্যার শিকারে পরিণত হয়েছেন। অথচ বন-প্রশাসনের পক্ষ থেকে সরকারী কার্যকালীন সময়ে নিহত কর্মচারীদের মৃত্যুর মূল কারণ খুঁজে বার করা, অপরাধীদের শাস্তিবিধানের ক্ষিপ্ত ব্যবস্থা করার কোন চেষ্টা করা হয়নি। মৃত্যুর ঘটনাগুলিতে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ একটা, কটন ব্যাপার ভিন্ন কোন প্রকার গুরুত্ব আরোপ করেননি। মেঘে সর্বস্তরের বন কর্মচারীরা চূড়ান্তভাবে মর্মান্বিত ও বিস্মিত। ভ্রান্ত অরণ্যনীতি অহুসরণের ফলশ্রুতি হিসাবে মৃত্যুবরণকারী এই কর্মচারীদের পারিবারিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পর্যন্ত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন রকমের টালবাহানায় কালক্ষেপ করে যাচ্ছেন। একটি

ক্ষেত্রে ১৫,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া ছাড়া ছয় পরিবারগুলিকে কোন সাহায্য দেওয়া হয়নি। এমনই মর্মান্তিক অবস্থান। দেশে কর্মচারীরা বিশ্বস্ত হত্যাকার এবং কর্তব্যসম্পাদনে বিশ্বাসিত হয়ে পড়ছেন। কর্মজীবনে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে অক্ষম কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত ভাবভাবের জ্ঞানেন যে এর পরিণাম কত ভয়াবহ এবং পশ্চিম-বাংলার ক্ষয়িষ্ণু বনসম্পদ রক্ষার স্বার্থে বন কর্মচারীদের মনোবল রক্ষা করা কত বেশী প্রয়োজন। সবকিছু জেনে শুনেও বন বিভাগের দায়িত্ব-জ্ঞানহীন আমলাবর্গ বনকর্মচারীদের মৃত্যুর মূল কারণ অহুসদ্ধান ও তার প্রতিকারে কোন প্রকার উত্তোগ গ্রহণ করছেন না।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতির উল্লেখ করে বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বন বিভাগের কমিশনার ও রাজ্যের মুখ্য বনপালের কাছে প্রফুল্লকুমার পালের হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে শাস্তিবিধানের দাবী জানান হয়েছে এবং মৃতের পরিবারবর্গকে ১৫,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়ার ক্ষিপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করারও অহু-রোধ জানান হয়েছে।

বনসম্পদ লুণ্ঠনকারী সমাজ-বিরোধীদের হাতে বনকর্মচারীদের এই অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণের ঘটনা অবিলম্বে বন্ধ করার ব্যবস্থা ও মৃত্যু-জনিত পারিবারিক ক্ষতিপূরণের স্বয়ং-ক্রিয় ব্যবস্থা প্রবর্তন না করলে কর্ম-

আলিপুর জেলের ঘটনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দপ্তর বা স্বরাষ্ট্র দপ্তরে নেই। গত জুলাই মাসে সত্যেনবাবুরা তাঁদের নামের লিষ্ট কংগ্রেসের রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে পাঠাবার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। আইনমন্ত্রী যখন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে সত্যেন চক্রবর্তী, রবি কোলে প্রমুখদের কংগ্রেস সদস্য হওয়ার দাবীর স্বার্থতা জানতে চান তখন কংগ্রেস দপ্তর কিন্তু এদের কংগ্রেসের লোক হিসেবে স্বীকার করে নি। এছাড়াও, এরা যদি রাজনৈতিক বন্দী হতেন তাহলে এতদিনে ছাড়া পেয়ে যেতেন। কেন না এরা প্রায় ১০ বছর জেলে আছেন এবং বামফ্রন্ট সরকার সেই রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়েছে। উক্ত ঘটনার স্বার্থা তদন্ত করে বন্দীমুক্তি কমিটির আহ্বায়ক পীযুষ দে এক বিবৃতিতে কতকগুলি প্রশ্ন তুলেছেন:

- (১) ৪নং সেলের রবি কোলে ৩নং সেলে এসে ভাবুড়ীর সঙ্গে সত্যেন চক্রবর্তীর মারপিটে অংশ নিল কি করে?
- (২) অসীম চ্যাটার্জী, কাছ সাহায়েলের ওপর কডাকড়ি করা হল, অথচ রবি কোলে একে মারবো তাকে ধরব বলে সারা জেলে ঘুরে বেড়ায় কি করে?
- (৩) সত্যেন চক্রবর্তী, রবি কোলে রাজনৈতিক বন্দী না হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে তাদের লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে পাঠানো হল কার আদেশে?
- (৪) অত্যন্ত সমস্ত রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক বন্দীদের কোন জেল গেটে যাওয়া নিষিদ্ধ কিন্তু কংগ্রেসী নামধেয় কিছু বন্দী নিয়মিত জেল গেটে যাওয়া আসা করে, খেয়াল-খুশীমত ইন্টারভিউ করে কার আদেশে?

চারীরা নিজ উত্তোগে এর প্রতিকারে অগ্রণী হবেন এবং কলে বন প্রশাসন তত্ত্ব হয়ে যাবে এই বক্তব্যও স্বার্থহীন ভাবায় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করি অনেক দেরীতে, হলেও প্রশাসনিক দায়িত্বে আসীন কর্তৃপক্ষ তাদের অপরিণামদর্শী অব-হেলা পরিত্যাগ করে স্বাধীন হত্যাকারীদের শাস্তিবিধানে তৎপরতা অবলম্বন করবেন এবং লাল কিতার বাধনে আবদ্ধ পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করে ক্রমশঃ বনকর্মচারীদের বনসম্পদ রক্ষার তৎপর হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

বন্দী মুক্তির দাবীতে সভা
বিগত ২১।১০।৭৭ তারিখ বেলা চার ঘটিকায় স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্দী মুক্তি সংঘের পরিচালনার মোহা-বোধি সোসাইটি হলে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে এক সভা অহুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ফরোয়াজ রক নেতা শ্রীনলিনী গুহ। বক্তৃতা করেন অধ্যাপক শান্তিময় রায়, শ্রীবরেন দা, শ্রীক্ষিতীশ রায়চৌধুরী, ডক্টর শান্তি দাশগুপ্ত, অধ্যাপক হরি-পদ ভারতী প্রমুখ বক্তারা। প্রত্যেকের বক্তৃতার মধ্যে যে একটি মূল আওয়াজ সাধারণভাবে প্রতি-ফলিত হয়েছিল, তা হলো বুকভরা

আশা নিয়ে সমস্ত দেশবাসীর সঙ্গে তাঁরাও বামফ্রন্ট সরকারের বন্দী-মুক্তির প্রতিশ্রুতিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু গভীর বেদ-নার সঙ্গে সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও লক্ষ্য করছেন যে, প্রতিশ্রুতি পালনে বামফ্রন্ট যথেষ্ট তৎপরতা দেখাচ্ছেন না। অধ্যাপক হরিপদ ভারতী বলেন যে, সাইবাড়ী হত্যামামলার অভিযুক্তদের রাজনৈতিক মর্মান্বী সহ নিঃশর্তে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত যদি বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করতে পারেন, তবে কিংবদন্তীর বিপ্লবী নায়ক অনন্তলাল সিংহ মহা-শয় পরিপূর্ণ রাজনৈতিক মর্মান্বী সহ কেন মুক্তি পাবেন না।



ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

প্রস্তাব আহ্বান করছে

মেরামতী কাজ
রেফা: ৪৫।৪১০০।৭৭।৩১৭৩ অফ ১৫. ১০. ৭৭

সাব-এরিয়া ম্যানেজার, অমৃতনগর সাব-এরিয়া, কুহুটরিয়া-এরিয়া নির্ভরযোগ্য, সঙ্গতি সম্পন্ন ও অভিজ্ঞ অসামরিক কনট্রাক্টরদের কাছ থেকে ১৯৭৫ সালের ই সি এল নির্দিষ্ট দরের শর্তকরা হারের ভিত্তিতে (উচ্চ/সমান/নিম্ন) নিম্নোক্ত কাজের জন্য সীলকরা টেণ্ডার। কাজের বিবরণ, ইউনিটের নাম, অহুমিত খরচ, বায়নার টাকা, সম্পূর্ণ করার সময় এইরূপ:—

- (১) অমৃতনগর (আর) কোলিয়ারী (৪৮ ইউনিট) অমৃতনগর সিলেক্টেড ইউনিটের বিভিন্ন কলোনীর এল সি এইচ কোয়ার্টারের মেরামতী কাজ, অমৃতনগর সিলেক্টেড, ২৩,০০৬.২০ টাকা, ৪৬০.১২ টাকা এবং ১২ মাস।
- (২) অমৃতনগর (আর) কোলিয়ারী (২৮৪ ইউনিট) অমৃতনগর সিলেক্টেড ইউনিটের বিভিন্ন কলোনীর এল সি এইচ এস কোয়ার্টারের মেরামতী কাজ, অমৃতনগর সিলেক্টেড, ৪৮,৮৪৩.৬০ টাকা, ১৭৬.৮৭ টাকা এবং ২ মাস।
- (৩) অমৃতনগর (আর) কোলিয়ারী, কারনানির নামচা ইউনিটের-বিভিন্ন কলোনীর এল সি এইচ কোয়ার্টার (১১৮ ইউনিট) মেরামতী কাজ, নামচা ইউনিট, ১৮, ২০০.১৫ টাকা, ৩৬৪.০২ টাকা এবং ১২ মাস।
- (৪) অমৃতনগর (আর) কোলিয়ারী (১৮ ইউনিট), কারনানির নামচা ইউনিটের বিভিন্ন কলোনীর এল সি এইচ এস কোয়ার্টার ও বাংলো মেরামতী কাজ, নামচা ইউনিট ১, ৩০৮.৩০ টাকা, ১৮৬.১৭ টাকা এবং ১ মাস।
- (৫) অমৃতনগর (আর) কোলিয়ারী, কারনানির নামচা ইউনিটের বিভিন্ন কলোনীতে কোলিয়ারী টাইপের ধাওয়া (৬৭ ইউনিট) মেরামতী কাজ, নামচা ইউনিট, ৩৪,০৫৫ টাকা, ৬৮১.১০ টাকা এবং ১ মাস।
- (৬) দামোদা (এন) কোলিয়ারীর সিলেক্টেড পিয়ারসোল ইউনিট কোলিয়ারী টাইপের ধাওয়া এবং বিভিন্ন কলোনী ও মাইনার্স কোয়ার্টারের মেরামতী কাজ, সিলেক্টেড পিয়ারসোল, ১,১৫,৬১১.৬৯ টাকা, ২,৩১২.২৩ টাকা এবং ৩ মাস।
- (৭) দামোদা (এন) কোলিয়ারীর (২২ ইউনিট) দামোদা ইউনিটের বিভিন্ন কলোনীর এল সি এইচ এস কোয়ার্টার মেরামতী, দামোদা, ২৩, ৬৮০.৮০ টাকা, ৪৭৩.৬২ টাকা এবং ১২ মাস।
- (৮) দামোদা (এন) কোলিয়ারীর (৫০ ইউনিট) দামোদা ইউনিটের বিভিন্ন কলোনীর কোলিয়ারী টাইপের ধাওয়া মেরামতী, দামোদা, ২৪, ১৮২.৪৫ টাকা, ৪৮৩.৭৯ টাকা এবং ১২ মাস।

কাজের বিশদ বিবরণ, নিয়ম কাছন, ড্রয়িং প্রভৃতি সাব-এরিয়া ম্যানেজার, অমৃতনগর সাব-এরিয়া, কুহুটরিয়া-এরিয়া-র অফিসে যে কোন কাজের দিনে অফিসের সময়ে (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা) দেখা যেতে পারে। ৪ নং কাজের জন্য টেণ্ডারপত্রের দাম ৫ টাকা, ১, ৩, ৫, ৭, ৮ নং কাজের জন্য ১০ টাকা, ২ নং কাজের জন্য ১৫ টাকা, ৬ নং কাজের জন্য ২০ টাকা (এবং বা প্রত্যাশিতব্য নয়) এবং বা গ্রুপ অ্যাকাউন্টস অফিসার, অমৃতনগর সাব-এরিয়ার কাছ থেকে নগদ টাকায় কিনতে পাওয়া যাবে ১৪.১১.৭৭ তারিখে অফিসের সময়ে বিকেল ৩.৩০টা পর্যন্ত। সাব-এরিয়া ম্যানেজার, অমৃতনগর সাব-এরিয়া কর্তৃক উক্ত অফিসে ১৫.১১.৭৭ তারিখ বিকেল ৪টা পর্যন্ত উক্ত কাজের টেণ্ডার গ্রহণ করা হবে এবং ঐদিন বিকেল ৪টায় উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতা বা তাঁদের অহুমোদিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেণ্ডার খোলা হবে। উক্ত বায়নার টাকা টেণ্ডারের সঙ্গে “কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড” ইস্টার্ন ডিভিশন, অমৃতনগর গ্রুপ এই নামে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আসানসোল ব্রাঞ্চে দেয় ডিম্যাণ্ড ড্রাকটের আকারে অথবা গ্রুপ অ্যাকাউন্টস অফিসার, অমৃতনগর সাব-এরিয়া, কুহুটরিয়ার কাছে নগদে দিতে হবে। কর্মক্ষেত্রের পরিস্থিতি অহুখ্যায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর কাজের পরিমাণে হেরফের হতে পারে। বায়নার টাকা ছাড়া টেণ্ডার বাতিল করা হবে।

জনতা পার্টির জনৈক নেতার বিরুদ্ধে সারান্যক অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কুষ্টিয়া হাউসিং এজেন্সি গভীর রাত্রে জনতা পার্টির জনৈক নেতা গুপ্তা দিয়ে জনৈক মহিলাকে রেপ করার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে শ্রীমঙ্গল সরস্বতী নামে জনতা পার্টির জনৈক নেতা দক্ষিণ কলকাতার তিলজলার কুষ্টিয়া হাউসিং এজেন্সি বিমলারানী জৈন নামে জনৈক মহিলাকে ধর্ষণ করার জন্ত কয়েকজন গুপ্তকে শ্রীমতী জৈনের বেডরুমে জোর করে ঢুকিয়ে দেন। শ্রীমতী জৈনের স্বামী তখন বাড়ী করেন নি। পরে স্থানীয় হাউসিং এজেন্সির লোকের চেষ্টায় ঐ গুপ্তদের ঘর থেকে মারতে মারতে বের করা হয় এবং তাদের পুলিশে দেবার আগেই তারা পালিয়ে যায়।

জানা গেছে শ্রীমঙ্গল সরস্বতী কুষ্টিয়া হাউসিং এজেন্সির আই/এল এইট ফ্ল্যাটে থাকেন। তিনি জনতা পার্টির একজন বড় ধরনের নেতা এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের প্রাইভেট সেক্রেটারী বলে প্রচার করেন। অভিযোগে প্রকাশ তার আসল নাম নাকি ইন্দ্রকুমার সিনহা। স্থানীয় লোকদের কাছে কখনও কখনও তিনি বিহার জনতা পার্টির ডেপুটি

বলে জানান। বিগত কংগ্রেস মন্ত্রিসভা বাতিল হবার কয়েকদিন আগে তিনি ঐ ফ্ল্যাটটির এ্যালটমেন্ট তদনীন্তন মন্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণ সারোগীর সুপারিশে পান। ফ্ল্যাট পাওয়ার কয়েকদিন পর তিনি অমর সিং জৈন নামে জনৈক ব্যক্তিকে ঐ ফ্ল্যাটের একটি ঘর সাবলেট করেন। শ্রীজৈন একজন প্রাক্তন প্রেস ফটোগ্রাফার এবং কলকাতার অনেক ফটোগ্রাফার তাকে চেনেন। মুজার ব্যাপার শ্রীমঙ্গল সরস্বতী ও শ্রীজৈন ও তার পরিবার-বর্গ একই সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করেন। অভিযোগে আরো প্রকাশ শ্রীজৈন যখন বাড়ী থাকেন না তখন প্রায় প্রতিদিন শ্রীমঙ্গল সরস্বতী শ্রীমতী জৈনকে কতকগুলি অসৎ কাজে সহায়তা করার জন্ত বলেন। কিন্তু শ্রীমতী জৈন তার এই কাজে সাহায্য করতে রাজী হন না।

ফলে গত ১১শে অক্টোবর রাজি দেড়টা নাগাদ কিছু গুপ্তা শ্রীমতী জৈনের শয়ন কক্ষে ঢুক সপ্পুর উলঙ্গ হয়ে নাচতে শুরু করে। স্থানীয় জনগণের অভিযোগে ঐ গুপ্তারা মদ খেয়ে এসেছিল। গুপ্তাদের ঐভাবে ঘরে ঢুকতে দেখে শ্রীমতী জৈন চীৎকার করে ওঠেন। তার চীৎকার

শব্দে পাশের ফ্ল্যাট ও অগ্নি ফ্ল্যাট থেকে লোকজন ছুটে আসে এক গুপ্তাদের মারধর করতে থাকে। আশ্চর্যের ব্যাপার শ্রীমঙ্গল সরস্বতী ঐ সময়ে ফ্ল্যাটে উপস্থিত না থাকলেও তার মা পাশের ঘরে দরজা বন্ধ করে গুপ্তাদের কাজে সাহায্য করছিলেন।

আরো জানা গেছে যে শ্রীমঙ্গল সরস্বতী যখন কোন কোন জায়গায় মিটিং করতে যান তখন কিছু বেকার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং স্থানীয় জনগণের কাছে ঠাককে বি ডি ও, কারুকে এস ডি ও বলে পরিচয় দেন।

কুষ্টিয়া টেনান্ট এসোসিয়েশন এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এবং জনতা পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীপ্রফুল্ল সেনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। সকলের প্রশ্ন জনতা পার্টির নেতা সেজে এই মঙ্গল সরস্বতী এই সমস্ত বোকাইনী কাজ করে চলেছেন-অথচ জনতা নেতারা তার প্রতিবাদও করছে না কেন? শ্রীমঙ্গল সরস্বতী যে জনতা পার্টির নেতা তা প্রমাণ করার জন্ত তিনি বড়বাজারের এম-এল-এ শ্রীবিশ্বকর পাণ্ডেকে নিয়ে গত ২০শে অক্টোবর স্থানীয় এলাকায় ঘোরাঘুরি করেন। এই ঘটনার আগে শ্রীমতী জৈন তিলজলা থানায় ডায়েরী করেন। স্থানীয় জনগণের আরো বক্তব্য যদি শ্রীমঙ্গল সরস্বতীর বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে পরিস্থিতি আরো ভয়ানক হবে।

বিদেশী চক্রান্ত, না অন্তর্ঘাত?

(দর্পণের সংবাদদাতা)

১৮ নং রবীন্দ্র সরণীতে সি এম পি ও দপ্তরের পদচ্যুত চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখার্জী হাইকোর্টে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেন এবং হাইকোর্টের রায় অগ্রহণ্য সরকার হেরে গিয়েছেন বলেই মনে হচ্ছে। সি এম পি ও তুলে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু হাইকোর্টের রায় মেনে নিলে, দপ্তরটি থাকবে বলেই মনে হচ্ছে। বোধ হয় সেটাই ভাল, কারণ পৃথিবীর সমস্ত সমাজ-তান্ত্রিক বা কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে শহর উন্নয়ন পরিকল্পনার পুরো কাজটাই খাস সরকারী দপ্তরের হা ত থাকে। বেসরকারী ইন্ডাস্ট্রি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করাই কমিউনিষ্ট আদর্শ। কিন্তু কলকাতা প্রকল্পের ক্ষেত্রে এদেশে কেন যে সরকারী দপ্তর সি এম পি ও ভেঙ্গে দিয়ে বেসরকারী দপ্তর সি এম ডি এ-কে প্রকল্প রচনার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে সে এক রহস্য। এরকম উল্টো ব্যাপার তো কমিউনিষ্ট শাসনে হওয়া উচিত নয়। সি এম ডি এ বৃহৎ কন্ট্রাক্টরদের এলিকিউশন সংস্থা, তাকে দিয়ে এলিকিউশন করানো হচ্ছে কংগ্রেসী আমল থেকে, তা বেশ কথা। কিন্তু প্রকল্প রচনার দায়িত্বটা তাকে কেন? জ্যোতিবাসু মন্ত্রী হয়েই বলেছিলেন সি এম ডি এ-র কাজকর্ম বেকার যুবকদের হাতে তুলে দিলে বেশী কর্ম সংস্থান হবে, বেসরকারী কর্তৃক কমবে। কিন্তু এখন সব যেন গোল-মেলে হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

প্রকল্প দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীঅশোক মিত্র তাঁর সি এম পি ও দপ্তরের ক্ষমতাহানি না ঘটিয়ে তাকে আরও বেশী করে কর্মচঞ্চল করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এই দপ্তরের কতিপয় দুর্নীতিপরায়ণ এবং আমেরিকা-ফ্রেন্ড অফিসারের পরামর্শেই সম্ভবতঃ এই বিপত্তি। হাইকোর্টের রায়ে সরকারের প্রশাসনিক অপদার্বিতা প্রমাণ হওয়াতে এই সব বদপ্রকৃতির অফিসারের অভ্যর্থনা হয়তো পূরণ হয়েছে। দপ্তর নিয়ে এই রকম ছেলেখেলা বাম সরকারের ইমেজ নষ্ট করছে।

এদিকে এই দপ্তরের দক্ষ এবং কর্ম-চঞ্চল কারিগরী কর্মীরা এক বড়বজ্রের মধ্যে পড়েছেন, তাঁদের বিপুল ক্ষতি হয়েছে। কংগ্রেস সরকারের পতনের অনেক আগেই সারা রাজ্যের সরকারী কর্মীরা নিলেকশন গ্রেড পেয়েছেন। কিন্তু এ দপ্তরের সাব-অ্যানিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং ড্রাকটম্যান ইত্যাদি কর্মীদের নিলেকশন গ্রেড চাপা দিয়ে রেখে একদল প্রশাসন-

কর্মী বড়বজ্র চালিয়ে যাচ্ছেন। কারিগরী কর্মীদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ছে। এই অত্যাচার শুধু দক্ষ কারিগরী কর্মীদের উপরেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। বামপন্থী শাসনেও এই রকম ভয়ংকর অন্তর্ঘাত চলছে। বেছে বেছে সরকারের প্রকল্প দপ্তরেই সমস্ত বড়বজ্র এবং অন্তর্ঘাত দাট্টা বাঁধছে কেন? এর কি প্রতিকার নেই?

জাহাজী শ্রমিকদের ওপর দালাল ইউনিয়নের হামলা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

একচেটিয়া জাহাজ মালিকদের প্রশ্রয় ও সমর্থন পুষ্ট আই, এন, টি, ইউ, টি, পরিচালিত জাহাজী ইউনিয়ন অব সীমেনস অব ইণ্ডিয়া (এন, ইউ, এস, আই) একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে গত ২৭ বছর ধরেই সাধারণ জাহাজী শ্রমিকদের প্রতি-নিধি করওয়ার্ড সীমেনস ইউনিয়নের কর্মী ও নেতৃত্বের উপর শারীরিক আক্রমণ ও হামলা চালিয়ে এসেছে। দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও এই দালাল ইউনিয়ন অবাধে হামলা ও সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে এবং একচেটিয়া জাহাজ মালিক ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি যাতে শ্রমিকদের আর্থ মজুরি, বকেয়া বেতন ও গণতান্ত্রিক অধিকার-সমূহ হরণ করতে পারে তার জন্ত বারে বারে শ্রমিকদের উপর আক্রমণ করেছে।

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর ডেপুটি শিপিং মাস্টার, অ্যানিস্ট্যান্ট শিপিং মাস্টার, ও মার্ফেটাইল মেরিন ডিপার্টমেন্টের প্রিন্সিপাল অফিসারের সামনেই উক্ত আই, এন, টি, ইউ, সি, ইউনিয়ন পরিচালিত হামলাকারীরা "বিশ্ব বিক্রম" জাহাজের জাহাজী শ্রমিক ও করওয়ার্ড সীমেনস ইউনিয়নের সদস্যদের উপর আক্রমণ করে এবং উক্ত ঘটনা থানায় (এম, পি, পি, এস,) ডায়েরী করা হয়।

কিন্তু এর পরেও ২৯ সেপ্টেম্বর আই, এন, টি, ইউ, সি, ইউনিয়নের সশস্ত্র লোকজন দুই ঘণ্টা ধরে গভর্ণ-মেন্ট শিপিং অফিসের ভিতরে ও বাইরে "ইণ্ডিয়ান রিসোর্সের" জাহাজীরা চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের সময় তাদের উপর হামলা করে। এই আক্রমণের ফলে প্রচুর নিরীহ জাহাজী

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

সমবায়িকায় চুরির জন্য কেবল লোকসান

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কলকাতা হোলসেল কনজিয়ার্স অর্থাৎ এক কথায় সমবায়িকা নামে পরিচিত যে সংস্থার জন্ত পক্ষিমবদ সরকারকে হাজার হাজার টাকা ভর্তুকি দিতে হয়, সেই সংস্থার প্রকৃত অবস্থার অংশবিশেষ জানা গেছে। বেশ কয়েক বছর ধরেই এই সংস্থাটি কিন্তু চোরের আড্ডাখানা ছিল এবং যার ফলস্বরূপ লাখ লাখ টাকার পণ্য সামগ্রী বিক্রী হওয়া সত্ত্বেও লোকসানে পরিচালিত হচ্ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গত ১৯৭৬-৭৭ শ্রীমঙ্গল সরস্বতী থেকে হুলস্থল টাকার উলের কথল, সোয়েটার এবং অন্যান্য উলজাত ব্র্যা আশানাল কনজিউয়ার্স কো-অপারেটিভ ফেডারেশন ও স্টেট ফেডারেশন নামক দুটি সংস্থার কাছ থেকে চড়া মূল্যে কেনা হয়। প্রশ্ন হল কেন ঐ সব পণ্য চড়া মূল্যে কেনা হল। জবাবটা জলের মত পরিষ্কার। পুরনো পরিচালক মণ্ডলী চাঁদীর জুতো পরতে খুব ভালবাসতেন, অর্থাৎ

কোম্পানী দুটির কাছ থেকে প্রচুর টাকা উৎকোচ গ্রহণ করে সেই মাল-গুলি চড়া মূল্যে ক্রয় করার সবুজ সংকেত স্থান করতেন। খোলা বাজারে যে সোয়েটারের মূল্য ৪০ থেকে ৪৫ টাকা ঠিক সেই কোয়ালিটির সোয়েটার সমবায়িকাতে ৬০ থেকে ৬৫ টাকা ধার্য করা হয়। ক্রেতা সাধারণ খুব স্বাভাবিক নিয়মেই সেই উলজাত ব্র্যা ক্রয় করতে রাজি হননি। যার চরম পরিণতি হল, সমস্ত উলজাত ব্র্যার মালিক পরিবর্তন অর্থাৎ তা লিগুসে স্ট্রীট কাপড়ের গোড়াউনে ইহরের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, বেশ কয়েক মাস পূর্বে ২৯ নং সি আর এ্যাভিনিউতে সমবায়িকা শাখায় কয়েক হাজার-টাকার ঘড়ি চুরি হয় এবং চুরির দায়ে স্থানীয় মুখার্জী নামক জনৈক কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে পুলিশী কেস দেওয়া হয়। বিচার-

কের রায়ে শ্রীমুখার্জী নির্দোষ প্রমাণিত হন। বর্তমানে তাকে স্বপদে সমস্থানে পুনর্বহাল করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য। কিন্তু প্রশ্ন হল, ঘড়ি চুরির প্রকৃত নায়ক কে? আরো লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, বর্তমানে ক্রেতার চাহিদামুসারে পণ্য সামগ্রী আমদানী না করে ভিন্ন কোম্পানীর বা ব্রাণ্ডের জিনিসপত্র আমদানী করা হয়, যেমন পূজার মরসুমে ডালডা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের খুবই দরকার অথচ কুস্তম প্রোডাক্টসের ৪ কেজি ২ কেজি টিনের পাহাড় সাঝানো হয়েছে। নিম্নকোমর বলাহে এখানেও চাঁদীর খেলা।

বর্তমানে নতুন সরকার ও নতুন পরিচালক মণ্ডলী গঠিত হয়েছে, তাদের পুরোনো সমস্ত অপকর্মের এবং বর্তমানে চাঁদীর জুতোর যে খেলা গোপনে চলছে তার পূর্ণ তদন্ত এবং প্রকৃত দোষীদের প্রকাশ দিবালোকে টেনে এনে শাস্তি দেওয়া দরকার।

॥ পাকিস্তান ॥

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের নতুন শিকার

রমাপ্রসাদ মল্লিক

সাম্রাজ্যবাদ যে আসলে বিশ্ব-ব্যাপী এবং তার কবাল অক্টোপাসী দাঁড়া দিয়ে তা শিকার ধরে, বিশেষতঃ স্বল্প-বিকশিত, গরীব ও সম্ভ্রান্ত-রাষ্ট্র দেশগুলিকে এ সত্য সম্বন্ধে আমাদের দেশে এক ধরণের সজ্ঞান ওদাসীত্ব রয়েছে। এমন কি তথাকথিত বামপন্থী বাজনীতিজ্ঞদের মহলেও। সম্ভবতঃ কেউ কেউ মনে করেন, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ একটা তত্ত্ব-কল্পনা মাত্র। আসলে এমনি দৃষ্টি-ভঙ্গী অলস চিন্তকের দায়িত্বহীন ভাবনার পরিচয় দেয়। আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্রুর কার্যকলাপ তারা দেখেও দেখে না।

উদাহরণতঃ পাকিস্তান সম্বন্ধে আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও গাফিলতি-ভরা, এমন কি সহায়কত্ব প্রদান করে মনো-বৃত্তি দেখা যায়। নিকটতম প্রতিবেশী হল পাকিস্তানীরা, যেমন নেপালী, বর্মী এবং সিংহলীরাও। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বিদ্যান এবং মননশীলদের লেখা (যথা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সেমিনার বা আলোচনাচক্রে) বিরাট ও বিপুলাকায় গবেষণা, খিসিস বা নিবন্ধে বড় একটা চর্চা হয় না, কেন পাকিস্তানী জনগণ বাববার বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের দেশীয় দালাল-বর্গ-গোষ্ঠী দ্বারা পৃথক হচ্চে; কেনই বা সেখানে জাতীয়গণতান্ত্রিক রাজনীতি-গত বিকাশের ধারা শুরু করে দেওয়া হচ্ছে; কোন শক্তিবলে রাজনৈতিক পদ্ধতি ও সংস্থাগুলিকে সৃষ্টি করে সেখানে জনগণের মূল-স্বাধীনতা অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় এবং কি ভাবে।

পাকিস্তানে শাসকশ্রেণীর সংকট

১৯৭১ সালে পাকিস্তানে শাসক-শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ সংকট তুঙ্গে ওঠে। এর কারণ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে ভৌগোলিক তথা জাতি ও সংস্কৃতিগত অসংহতির জন্মে সংঘর্ষই কেবল ছিল না। কারণ ছিল মূলতঃ অর্থনৈতিক। অর্থ-নীতির কাঠামো সম্পূর্ণভাবে সামন্ত-তন্ত্রী বর্গ-সম্বন্ধের হাতে রচিত হওয়া সত্ত্বেও "স্বাধীনতা" প্রাপ্তির পর থেকে উদীয়মান বৃহৎ ব্যবসায়ী এবং মাঝারি আকারের বহু শিল্পপতিদের সঙ্গে সামন্তী ভূস্বামীদের তীব্র গুরু

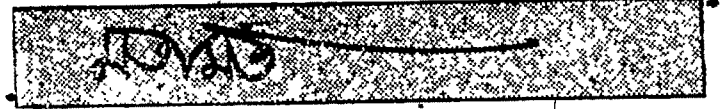
হয়। কিন্তু এই বর্গ-সংঘর্ষ হাতের বাইরে যেতে দেওয়াও সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং একচেটে বিত্ত-পুঞ্জিবাদের চরম শক্তি-প্রতিনিধি, বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের শীর্ষ রাষ্ট্র আমেরিকা পাকিস্তানী প্রভু-শ্রেণীর এই দুই বর্গগোষ্ঠীর মাঝে যাতে মোটাটুটি সম্বলন বজায় থাকে স্বার্থ সংঘর্ষের টানা-পোড়েন সত্ত্বেও তার ব্যবস্থা করে, এদের মধ্যে সংযোজক বর্গ হিসেবে প্রশাসনিক ও সামরিক বৃহৎ আমলা, অফিসারদের শক্তিশালী জোট দাঁড় করিয়ে। এমনি জটিল, শাসকশ্রেণী ঘোঁটকে সাধারণতঃ সামন্তী তথা মুসলমানী বেনিয়া-শিল্পপতি তথা প্রশাসনিক-সামরিক আমলা জোট বলা হয়। [feudal cum comprador capitalist cum military-administrative-bureaucracy complex]

উদাহরণতঃ স্বতন্ত্র, পাঞ্জাবের সর্বাধিক উর্বর জেলা 'মটোগেরী', যেখানে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদী রাজত্ব উৎকৃষ্ট সেচ ব্যবস্থা কার্যকরী করা হয়—এবং তার আশে পাশে আজও আছে ভূস্বামী এবং প্রাক্তন নবাব-কুলের রবররা। এদের সঙ্গে উদীয়মান ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের সংঘর্ষ ছিল (এবং আছে); রয়েছে প্রতি-স্বার্থমূলক মিতালী ও রাজনৈতিক পদার পেছনে সদা সর্বদা সক্রিয়, আন্তর্জাতিক বিত্ত-শিল্প কর্পোরেশন-গুলি এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা। [Multinational Corporations and imperialist super-power U. S. A.]

১৯৭১-এর সংকট ছিল পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী চক্রের বর্গ-আভ্যন্তরীণ সংকট। শক্তহাত-সামরিক-অধিকর্তাদের একনায়কী হঠকাবিতা, পূর্বাংশে পশ্চিমী ধনপতিদের অর্থ-নৈতিক শোষণ, এবং উদীয়মান দুই বুদ্ধিজীবীর পারস্পরিক বেঘারেণি ও সংঘর্ষের ফলে উৎপন্ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ক্ষমতা-সম্বলনের বিলয়—এই সমস্ত কারণে ঘটেছিল, অনিবার্যরূপে, রাষ্ট্রীয় বিঘটন। পাকিস্তানী প্রশাসনিক তথা সামরিক চক্র সে সময় পশ্চাদপসরণ করতে, এবং স্বল্প কানাডায় সফররত ভূট্টোকে খোশামোদ করে ডেকে এনে পাকি-

স্তানের অবশিষ্ট অংশের শাসনভার নীপে দিতে বাধ্য হয়। ভেঙে পড়া পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক সংহতি ও রাষ্ট্র-নৈতিক স্বায়িত্ব পুনর্বার প্রতিষ্ঠা করতে তিনি সফল হন। এ ছাড়াও ভূট্টোর আব একটি কৃতিত্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিকে ফের সুস্থ করে তোলা; মোট জাতীয় উৎপাদনের ধনরাশি পূর্বের তুলনায় বাড়িয়ে শিল্প-বিরুদ্ধির হার তেজী করা, কৃষির উন্নতি, ভূমি-সংস্কার, শ্রমজীবীদের উপার্জন-সংক্রান্ত দাবী জাতীয় আয় মূল্য ও মূল্যস্তরের পরিপ্রেক্ষিতে খাপিয়ে নেওয়া। বিশ্ব বাস্তবপক্ষে পাকিস্তানের শক্তি ও সম্মানবুদ্ধি হয় দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক পদ্ধতির তথা অর্থনীতির সংস্কারগত ক্রিয়-শীলতা ও স্বায়িত্বের প্রতিকলনরূপে। একথা মারা পৃথিবীর তথ্যভিজ্ঞ রাজনৈতিক মহলে স্বীকৃত যে, প্রথম রাজনীতিজ্ঞান, কূটনৈতিকতার চাতুর্ষ এবং জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে আন্তর্জাতিক-রাজনৈতিক সম্বন্ধের নীতি-গত সঙ্গতি বিধানের ভূট্টোর জুড়ি রাজনীতিবেত্তা তথা প্রয়োগকারী পাকিস্তানের ইতিহাসে দেখা যায় নি। কিন্তু এ হেন স্টেটসম্যানকে তাঁর দলের সম্পূর্ণ বিজয় (নির্বাচনী) সত্ত্বেও সামরিক ক্ষমতার জবরদস্তির জোবে যে সরানো হল, তা কেবল শাসকশ্রেণীর মধ্যে স্বার্থ-সংঘাতের কারণে নয় (যদিও এও অনেক কারণের অন্যতম) এর পেছনে কাজ করেছে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার গোপন ষ্টাটেজি যাকে ক্ষমতা রাজনীতির বিশ্বব্যাপী কূটকৌশল পদ্ধতি বলা যায়।

সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার উদ্দেশ্য হঠাৎ হয়নি। ১৯৫৮ সালের অনেক আগে থেকেই আইয়ুব খান সামরিক অধিনায়কত্ব পাকিস্তানী রাজনীতির শিখরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা ছিল মারা জগতে নিদ্রিত 'সি আই এ' রক্ততঃ, সিকন্দর মির্জাকে সরিয়ে আইয়ুবের প্রতিষ্ঠা অবক্ষীয়মান ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদী শক্তির-বিপক্ষে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ওপর চড়াও টেকা দেবার প্রমাণ। কিন্তু আয়ুবশাহী পাকিস্তানে স্বার্থনৈতিক সূত্রটিকে ঘনীভূত করেছিল, সমাধান করা দূরে থাক। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ নির্ণয় এবং মৈত্রীসন্ধান তথা স্থাপনের ব্যাপারে মিলিটারী শাসকের মাথা খুলত না, খুলত কেবল সেটো চুক্তি এবং বোগদাদ-প্যাক্টের তল্লাবাহকতা কবা এবং পেশোয়ারের অনতিদূরের আমেরিকান যুদ্ধবাজদের জন্ত 'বাদ-বেরা' উড্ডোজাহাজ-খাটি ধরাত করা। শুধু তাই নয় ১৯৬৫-এর (শেখাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)



কিসের পরীক্ষা নিরীক্ষা?

ভারত-সোভিয়েত 'যৌথ আন্তর্জাতিক' চুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইষ্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড-এর পরিচালনাধীন 'নাকডাকোন্দা পরীক্ষামূলক খনি প্রকল্পে' প্রায় ৩০০ জন শ্রমিক কাজ করেন। এর মধ্যে ঠিকাদারী প্রণয় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৩০০ জন। এই শ্রমিকেরা হাডডাকোন্দা খনির পর দৈনিক মজুরী পায় মাত্র দেড় টাকা থেকে দুটাকা পচিশ পর্য্যন্ত মতো।

ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির চাপে শ্রমিকদের নাতিশ্রাস উঠতে শুরু করেছে। বর্তমান বাজারে ঐ যৌথ আন্তর্জাতিকের ফসল দুটাকা পচিশ পর্য্যন্ত কোনমতেই সম্ভব নয় টিকে থাকা। তাই শ্রমিকেরা ঠিক করেছেন ন্যূনতম মজুরীর জন্ত সংগ্রাম করবেন। কর্তৃপক্ষ এ খবর জানতে পেরে গা বাঁচানোর জন্ত ঠিকাদারের সঙ্গে যোগসাজস করে গত ২রা আগষ্ট খনি প্রকল্পের শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করে দেয়। কর্তৃপক্ষ ও ঠিকাদার আশা করেছিল

যে, কাজ বন্ধ কবে দিলে ঐ গরীব শ্রমিকরা সংগঠন ভেঙ্গে দিয়ে মূল্যলোপ লিপে দিয়ে দুটাকা মজুরীতেই কাজ করতে রাজী হয়ে যাবে এবং তাই সংগ্রামের জন্ত সংগঠিত হবেন। কিন্তু নাকডাকোন্দার শ্রমিকরা গত ২রা আগষ্ট থেকে আজ পর্য্যন্ত অমীলাতনিক কর্তৃপক্ষের কাছে মাথা নোয়ায়নি, আত্মসমর্পণ করেনি। তারা জনমত সংগ্রহ করছেন বিজয়ী হওয়াব জন্ত।

কর্তৃপক্ষ ও সরকারের কাছে আমাদের প্রশ্ন, নাকডাকোন্দায় কিসের পরীক্ষা চালানো হচ্ছে? খনি শিল্পকে উন্নত করার পরীক্ষা নিরীক্ষা, না যৌথ আন্তর্জাতিকের নাম করে এদেশের সম্ভা 'শ্রম' শোষণের পরীক্ষা নিরীক্ষা? আমাদের বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। উত্তর চাই।

স্বভাষ মুখার্জী
সাধারণ সম্পাদক
ইষ্টার্ন কোলফিল্ড ওয়াকার্স ইউনিয়ন
পাণ্ডবখণ্ড। বর্ধমান

সরকারপুল মানসিক হাসপাতাল সম্পর্কে

গত ৩রা জুলাই থেকে সরকারপুল মানসিক হাসপাতালের কর্মচারীরা সাধারণ দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ও কর্তৃপক্ষের অত্যাচার, জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ মরিয়া হয়ে কর্মচারীদের এই সংগ্রামী ঐক্যকে ভেঙে দেবার জন্ত বিভিন্ন ধরণের হীন চক্রান্ত করে এসেছে। হাসপাতাল বন্ধ করে দেবার যত্নসম্মে কর্তৃপক্ষ গত দেড়মাস যাবত রোগীদের আরোগ্য-লাভ না হওয়া সত্ত্বেও জোর করে অতিভাবকদের ডেকে এনে রোগী নিয়ে যেতে বাধ্য করেছে এবং নতুন কোন রোগীকে ভর্তি করছে না। কর্মচারীদের নামে মিথ্যা অভিযোগে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। প্রায় সকল কর্মচারীর ও এলাকার সিপিএম সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সহ একশত সংগ্রামী মানুষের নামে মিথ্যা ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে। এমন কি প্রায় সকল কর্মচারীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি ও কর্মচারীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং পরিচালকের একগুয়েমি-মনোভাব ও প্রতিহিংসাধারিতার জন্ত হাসপাতালের পরিচালকমণ্ডলীর সভা-

পতি, বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীমহেশ্বর হবিবুল্লা ও সহ সভাপতি শ্রী ২৪ পরগণার জেলা শাসক শ্রীমশোক চ্যাটার্জী এবং স্থানীয় এমএলএ শ্রীনিরঞ্জন মুখার্জী বাধ্য হয়ে সরকারকে হাসপাতাল অধিগ্রহণ করবার জন্ত অস্বরোধ জানিয়েছেন এবং ১৭ই অক্টোবরের সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ৩০শে নভেম্বরের ভিতর সরকার যদি অধিগ্রহণ না করেন তাহলে হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালকে বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এলাকার সংগ্রামী মেহনতী মানুষেরা, কারখানার শ্রমিক কর্মচারীরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে হাসপাতালকে দুর্নীতি মুক্ত করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অধিগ্রহণ করবার জন্ত কর্মচারীদের সঙ্গে এক হয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। হাসপাতালের কর্মচারীরা ও এলাকার মেহনতী মানুষেরা অবিলম্বে হাসপাতালকে অধিগ্রহণ করিবার জন্ত সরকার বাহাদুরের হস্তক্ষেপ কামনা করছে।

স্বভাষ চন্দ
সহ-সভাপতি
সরকারপুল মানসিক হাসপাতাল
এমদয়ীজ ইউনিয়ন

নয়া চীনের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

ইন্দ্রিা বসু

প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তখনকার পৃথিবীর চারটি বড় নদীকে কেন্দ্র করে—নীলনদ তীরে মিশরীয় সভ্যতা, ইউফ্রেটিস টাইগ্রিস তীরে—সুমের সভ্যতা, সিন্ধুতীরে ভারতীয় আর্য সভ্যতা ও ইরানসিকিয়া তীরে চীন সভ্যতা। কোন দেশের পূর্ণাঙ্গ লিখিত ইতিহাস না পাওয়া গেলেও এটা স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে সে যুগের মানব সমাজ নানা শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। তার মধ্যে চিকিৎসা শাস্ত্র একটি। ভারতেও এ বিষয়ে কিছু পুঁথি পাওয়া গিয়েছে আর চীনে আড়াই হাজার বছর বা তারও আগে পীত সম্রাটদের আমলে লেখা একটি বিবরণ পাওয়া গিয়েছে—তার নাম “লুয়াংদি পেহচিং”। এই রচনায় আছে অস্থি-বিজ্ঞা, ব্যাধির কারণ-নির্ণয়, রোগ-নিরূপণ, রোগের লক্ষণ, নানা ভেষজ ঔষধের ব্যবহার ও সে যুগে প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতির বিবরণ, আর আছে আকুপাংচার ও মল্লিবাচন চিকিৎসা পদ্ধতির উল্লেখ। সে যুগে আকুপাংচারের জ্ঞান পাথরে তৈরী ছুঁচের ব্যবহার ছিল। মানব দেহে অনেক মস্তিষ্ক আছে যেখানে এই ছুঁচের ও মস্তিষ্ক ব্যবহার করা হতো। মস্তিষ্ক এক রকম উদ্ভিদ যার পাতা ওকিয়ে ওড়ো করে সিগারেটের মত পাকান হয় এবং তা দিয়ে ঐ বিশেষ বিন্দুতে স্টিক দেওয়া হয়। এ জাতীয় উদ্ভিদ আমাদের দেশে হিমালয়ের পাদদেশে এবং আসামে প্রচুর জন্মায়। এই ছুঁই প্রাচীন পদ্ধতির চিকিৎসার বিস্তারিত বিবরণ এই পুঁথিতে আছে। কালে কালে ছুঁচের জ্ঞান নানা ধাতুর ব্যবহার হয়েছে যেমন ব্রোঞ্জ, তামা, রূপা, সোনা ইত্যাদি। তবে বর্তমান টিনলেস স্টিলের ব্যবহার চলছে। বর্তমানে অস্ত্রোপচারেও এই পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এই পুস্তক সে যুগের চিকিৎসকদের বিভিন্ন ব্যাধির ক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োগের অভিজ্ঞতার বিবরণ বলে মনে হয়। বিভিন্ন যুগে এই পুস্তকের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এই শাস্ত্রকে আরও সমৃদ্ধিশালী করে তোলেন এবং পরবর্তী কালে কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেন। উনিশ শতকেও এই পদ্ধতি চালু ছিল এবং চীনের ইরে প্রতিবেশী দেশগুলিতেও বিস্তার লাভ করেছিল।

এই সময় থেকেই কিছু কিছু ইয়োরোপীয় ধর্মাবলম্বক এ দেশে আসতে শুরু করেন। তারা এদেশের সর্বক্ষেত্রে পশ্চিমী ভাবধারার

বিস্তার করেন, বিশেষ করে এই চিকিৎসা বিজ্ঞান ক্ষেত্রে কো-ওমিনটাং শাসন কালে কিছু কিছু ধনী সন্তান পশ্চিমী কায়দায় শিক্ষিত হয়ে শহরের ধনী সন্ত্রাসীদের সেবার আত্মনিয়োগ করেন এবং নিজেদের আর্থিক অবস্থার খুব উন্নতি করেন। তারাই এই স্বল্প ব্যয়নাপেক্ষ প্রাচীন পদ্ধতি অকেজো, অবৈজ্ঞানিক বলে বর্জন করেন। ক্রমে ক্রমে এই পদ্ধতি লোপ পেলে। পরিবর্তে পশ্চিমী পদ্ধতি চালু করা হলো। এই সময় থেকেই দেশের অগণিত জনসাধারণ ডাক্তার, ঔষধ সব কিছু থেকেই দূরে থাকতে বাধ্য হলো। দেশে চলছিল অরাজকতা-বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি। জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতি এত বেড়ে চলেছিল যে এই ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষমতা তাদের ছিল না। জনস্বাস্থ্য বলতে গেলে কিছুই ছিল না। বছরে বছরে বসন্ত, কলেরা, মহামারীতে বহু লোকের জীবনহানি হতে লাগলো কিন্তু তার প্রতিরোধ বা প্রতিকার করার কোন প্রচেষ্টাই ছিল না।

১৯৪৯ সালে মুক্তির পরে নতুন চীন সরকার জনকল্যাণের কাজ হাতে নিয়েই এই প্রাচীন পদ্ধতি চালু করেন। চোরারমান মাও ও কমিউনিস্ট পার্টি চীনের জনস্বাস্থ্য রক্ষার কাজে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগের প্রয়োজন বোধ করলেন। ঠিক মুক্তির পরই দেশের অর্থনীতি এমন উন্নত হয়ে ওঠে নি যে জনসাধারণ পশ্চিমী চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যয়ভার বহন করতে পারবে। তাঁর মতে নতুন ও পুরাতন পদ্ধতির মিলন ঘটিয়ে দেশের প্রয়োজন মেটানই প্রথম কাজ হওয়া উচিত। তিনি বলেছিলেন যে প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের নথি বহু হাজার বছরের অভিজ্ঞতার মূল্যবান বিবরণ। এই বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে কিছু আহরণ করে পশ্চিমী ভাবধারায় শিক্ষিত ডাক্তাররা যদি বিদেশী বিজ্ঞান সঙ্গ্রে সমন্বয় ঘটিয়ে চলে তবে দেশের জনসাধারণ উপকৃত হবে আর এই শাস্ত্রেরও পূর্ণ বিকাশ ঘটবে। অনেক নতুন নতুন মেডিক্যাল কলেজ ও স্কুল খোলা হলো কিন্তু দেখা গেল এগুলি শহরকে কেন্দ্র করে রয়েছে, শহরের লোক-জনের সুবিধা হয়েছে। এ সব শিক্ষিত ডাক্তাররা গ্রামে যেতে অনিচ্ছুক, কারণ সেখানে শহরের মত সুখ সুবিধা নেই আর অর্থগণও হবে না। নিজের সুবিধা ছাড়া তারা অস্ত্রের কথা, বিশেষ করে দাবিদেব কথাভাবে শেখেনি। দেশের জন-

সংখ্যার বিরাট এক অংশ গ্রামে বাস করে, অতএব দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি করতে হলে গ্রামের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে প্রতিই নজর দেওয়ার প্রয়োজন। মূল শিক্ষানীতি অস্থায়ী মেডিকেল কলেজগুলিতে শ্রমিক, কৃষক ও গণমুক্তি ফৌজ থেকে ছাত্র নেওয়া শুরু হলো।

‘জনগণের সেবা’ এই নীতি অনুসরণ করেই পাঠ্যশুচী পরিবর্তিত হলো। রোগ প্রতিরোধ করা ও রোগীকে রোগমুক্ত করাই আসল উদ্দেশ্য। তার জন্ত যে কোন পদ্ধতি কার্যকরী হবে তা গ্রহণ করতে হবে। পাঠ্যকাল সংক্ষোচ করা হলো, তিন বছরের পাঠ্যশুচী নেওয়া হলো। অনেক অপ্রয়োজনীয় পাঠ বাদ দিয়ে দেওয়া হলো যার জন্ত সময় নষ্ট হয় কিন্তু প্রকৃত কাজে আসে না। পাঠ্যশুচীতে রইল পদার্থ বিজ্ঞা, রসায়ন বিজ্ঞান বিশেষ, অংশ, মানব দেহ সম্বন্ধে তত্ত্ব, রোগের কারণ, প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি ও ভেষজবিজ্ঞা। বিশেষ জোর দেওয়া হলো রোগ প্রতিরোধ, রোগ নিরাময়, ধাতুবিজ্ঞা, প্লীরোগ, শিশুরোগ ও শল্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপরে। ঠিক হলো, প্রত্যেক ছাত্রকে চিকিৎসা বিষয়ে পড়াশুনার সঙ্গে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাও-সে-তুং চিন্তাধারা পড়াশুনা করতে হবে, উৎপাদনমূলক শ্রম করতে হবে এবং সামরিক শিক্ষা নিতে হবে। মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের মত কতকগুলি শর্ত আছে—(১) প্রাণীকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করা চাই (২) মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাও-সে-তুং চিন্তাধারা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগে প্রয়াসী হতে হবে (৩) খাদ্য, কারখানা বা সৈন্যবিভাগে কাজে অন্তত দু’বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে এবং স্বাস্থ্য সম্পন্ন হতে হবে। ডিগ্রিদারী ডাক্তার হ্যাঁতীত হাসপাতালগুলিতে শত শত ধাতু, নার্স, নগ্নপদ ডাক্তার এবং ঔষধ প্রস্তুতকারক কর্মীকে ট্রেনিং দেওয়া শুরু হলো। চিকিৎসা ও ঔষধ-আজ চীনের শ্রমিক কৃষকদের ঘরের দরজায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। দেশের আরও জনসংখ্যা অস্থায়ী শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তারের সংখ্যা যথেষ্ট নয় বলে প্রায়সাত লক্ষের মত নগ্নপদ ডাক্তার ট্রেনিং দিয়ে গ্রামে, গঞ্জে পাহাড়ে, পর্বতে, মক অঞ্চলে বা তৃণ-স্থলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাগ্যমান চিকিৎসকদল বিভিন্নস্থানে

গিয়ে প্রয়োজন মত চিকিৎসার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

‘নগ্নপদ’ ডাক্তার কারা বা তাদের চিকিৎসা বিষয়ে কি অভিজ্ঞতা আছে এ বিষয়ে প্রশ্ন মনে আসতে পারে। এরা আসলে কমিউনের সাধারণ সদস্য, ক্ষেত্রে খাদ্য, গ্রাম্য কারখানা বা স্কুলে কাজ করে। তাদের মধ্যে যাদের সেবার প্রবৃত্তি প্রকাশ পায় বা চিকিৎসা বিষয়ে ঔৎসুক্য দেখা যায় তাদের কোন হাসপাতালে পাঠিয়ে তিন থেকে ছয় মাস ট্রেনিং দেওয়া হয়। এদের মোটামুটি স্বাস্থ্যবিজ্ঞা, শরীর বিজ্ঞা, জীববৈজ্ঞানিক, জনস্বাস্থ্য, রোগ প্রতিরোধ, সাধারণ ব্যাধির চিকিৎসা, ছোট ছোট অস্ত্রোপচার শেখান হয়। বিশেষ করে প্রসূতি ও শিশুর চিকিৎসা এবং আকুপাংচার বিষয়ে শিক্ষা নিতে হয়। কমিউনের কোন সদস্য অস্থায়ী হলে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া, প্রয়োজনে স্বাস্থ্য-ক্ষেত্রে পাঠান এবং রোগ কঠিন হলে হাসপাতালে পাঠান ইত্যাদি সবই এই নগ্নপদ ডাক্তারদের দায়িত্ব। ১৯৬৮ সালে প্রথম, দল নগ্নপদ ডাক্তারদের ট্রেনিং দেয় সাংহাইয়ের নিকটবর্তী এক কমিউন। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে এদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। বর্তমানে এদের সংখ্যা ১৫০০০০০-র মতন। এদের সংযত করা হলো এবং যোগ্যতা ও স্বজনীশক্তি বৃদ্ধির নানা সুবিধা দেওয়া হলো। বহুসংখ্যক চিকিৎসা কর্মীর (paramedical staff) ট্রেনিং দেওয়া হলো। এই নগ্নপদ ডাক্তার চিকিৎসা কর্মী ও উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তার মিলিত ভাবে গ্রামের গরীব ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের স্বাস্থ্যরক্ষার কাজে লেগে গেল। মাও-সে-তুংয়ের পরামর্শ মত রোগ প্রতিরোধ (preventive measure) বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হলো। চিরাচরিত পদ্ধতি ও পশ্চিমী পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়ে কাজ শুরু হলো। এতে আকুপাংচার ভেষজ ঔষধ ও মালিশ ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার চললো। মেডিকেল কাজেও কো-অপারেটিভ গড়ে উঠলো। বর্তমানে প্রত্যেক ব্রিগেডে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে সাধারণ ব্যাধির চিকিৎসার জন্ত। চিকিৎসাক্ষেত্রে এই কো-অপারেটিভ দিন দিন উন্নত হচ্ছে এবং শ্রমিক কৃষকরাও নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিরাপদ বোধ করছে। ধনী লোকের তো কোন সমস্যা নেই কিন্তু এই অগণিত জনসাধারণ যারা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল তারাই হলো উপকৃত।

কমিউনের সদস্য বছরে এক ইউয়ান (সাড়ে চার টাকা) চাঁদ দেয়

চিকিৎসা কেন্দ্রে। তা থেকে তাকে সারাবছর বিনা মূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউন হাসপাতালগুলির সকল ব্যয়ই জনকল্যাণ তহবিল থেকে দেওয়া হয়। কমিউনের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল না হলে (নতুন প্রতিষ্ঠিত অথবা অনগ্রসর এলাকায় অবস্থিত কমিউনে) সরকার সাহায্য দেয়। এই কেন্দ্রে দেশীয় গাছ-গাছড়া থেকে কিছু কিছু ঔষধও তৈরী হয়। বিশেষ বিশেষ ঔষধ সরকার দেয়। নগ্নপদ ডাক্তাররা গ্রাম্য পরিবেশ থেকে কাজ করায় বিশেষ বিশেষ কিছু স্থানীয় রোগের সম্মুখীন হয়। তার চিকিৎসায় যে অভিজ্ঞতা অর্জন হয় তার সুযোগ নেওয়ার জন্ত তাকে হাসপাতাল বা মেডিকেল কলেজে পাঠান হয় যেখানে বিভিন্ন ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞানের আদানপ্রদানে চিকিৎসা শাস্ত্র আরও সমৃদ্ধ হয়। নগ্নপদ ডাক্তাররা পাহাড়ে জন্মে গিয়ে স্থানীয় লোকদের কাছে শিক্ষা নেয় বিভিন্ন উদ্ভিদে ব্যবহার সম্বন্ধে এবং নানা ভেষজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করে চিকিৎসার উন্নতি ঘটানো তারা।

নগ্নপদ ডাক্তারদের মধ্যে একটি বিরাট অংশই হলো মহিলা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে, পাহাড়ে জন্মে গিয়ে গৃহস্থ মহিলাদের স্বাস্থ্য বিষয়ে শিশু ও প্রসূতির স্বত্ব নেওয়া সম্বন্ধে নানা পরামর্শ তারা দেয়। তাদের মধ্যে বহু যোগ্য মহিলা আছেন যারা কমিউনের পার্টির উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বা কমিউনের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয় পরিচালনা করেন।

আজকাল এই নগ্নপদ ডাক্তারদের শিক্ষা আরও উচ্চস্তরে উন্নীত করার জন্ত এক পদা নেওয়া হয়েছে। বিশেষ আগ্রহী ও প্রতিভা সম্পন্ন নগ্নপদ ডাক্তারকে পালাক্রমে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠান হয় যাতে তারা বিভিন্ন প্রকার রোগের চিকিৎসা করার সুযোগ পায় এবং সময়ে সময়ে তাদের ছোটখাট অস্ত্রোপচারেও অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়। এতে তাদের অভিজ্ঞতা বাড়ে আর এই চিকিৎসার দায়িত্ব পালনে সর্বতোভাবে সক্ষম হয় তারা।

মার্গারেট স্টেনলে (Margaret Stanley) ১৯৪৭ সালে যুক্ত বিবস্ত্র চীনে ডাক্তারী সাহায্য দেওয়ার জন্ত যান এবং পরে ১৯৭২ সালে দ্বিতীয়বার চীন পরিদর্শন করেন। তিনি নগ্নপদ ডাক্তারদের সম্বন্ধে যা বলেছেন তার মোটামুটি অর্থবাদ “আমার চীনা সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে পারলাম আমা- (শেয়াং ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের শিকার

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের অপ্রত্যাশিত ফলাফলে আইয়ুবের ঘটেছিল চরম রাজনৈতিক বিপর্যয় এবং সম্মানহানি, যেজন্য তিনি সোভিয়েত রুশিয়ার খবদারি মূলক মধ্যস্থতা মেনে নিতে ও তাসখন্দ চুক্তিতে সই করতে বাধ্য হন। কাস্মীরে “মুক্তিযোদ্ধা”দের পুনঃ অস্থপ্রবেশ ঘটিয়ে সে দেশকে “মুক্ত” অর্থাৎ পাকিস্তানের কবলিত করা তো হলই না, উপরন্তু শেখ আবদুল্লাহকে কাস্মীরী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ-অধিকারের সংগ্রামে কোনো প্রকৃত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে না চাওয়ায় কাস্মীর-সমস্যা সমাধান হাতের বাইরে থেকে গেছিল। আইয়ুব ভূট্টোকে বৈদেশিক নীতি মন্ত্রক থেকে সরান, কিন্তু নিজেও পরে জনমতের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হওয়ায় ডিক্টেটরী মনন থেকে সরে যান। আইয়ুবের পর “নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র”র অবস্থান শুরু হয়, এবং গণতন্ত্রের আগরণের ১৯৭৭ সালে পাকিস্তানী গণতন্ত্রের ইতি-

হাসে মোড়বদলের বছর বলা চলে। ইয়াহিয়া খাঁ তারপর ধাপে ধাপে নৈর্ঘ্যে যান রাজনৈতিক অবিমুখ্যকারিতার কলে; তাছাড়া, মিলিটারী ব্যারোক্রসির রাজনৈতিক পদ্ধতিতে কার্যকরী অবস্থান দেবার যত কিছু ছিলও না।

সাম্রাজ্যবাদী দালাল ডিক্টেটরের গলায় শিঙিমাছ

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ সম্মত বিশ্ব-রাজনীতির আসল উদ্দেশ্য-পুর্তিতে ভূট্টো বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন। প্রথমত: তিনি সেটো নিয়টে ইত্যাদি বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের শক্তিজোটগুলিকে একের পর এক কার্যত: অকেজো করে তুলছিলেন এবং ভবিষ্যতে যে আমেরিকার “এশিয়াকাসীদের দ্বিগুণ এশিয়াকে করায়ত্ত” করার নীতি ভূট্টোর অস্থ-অস্থ হতে বৈদেশিক কূটরাজনীতির চালে পর্যুদন্ত হতে পারে, এমন সম্ভাবনা স্পষ্টত: দেখা দিচ্ছিল। দ্বিতীয়ত: পাকিস্তান ক্রান্তির সঙ্গে

চুক্তি করে এমন এক আণবিক শক্তি-সম্প্রসারণের ব্যবস্থা পাকা করে তুলছিল, যার ফলে পাকিস্তানের আণবিক অস্ত্র তৈরী করার ক্ষমতা স্বতই জন্মাত। সাম্রাজ্যবাদী দুই বৃহৎ শক্তি সারা জগতে আপন একচেটিয়া আণবিক শক্তির আধিপত্য বজায় রাখতে চায়। ভূট্টোকে এই চুক্তি কার্যকরী করা থেকে নিরস্ত করতে স্বয়ং কিসদ্বারও পারেন নি তাঁর বিখ্যাত কায়দা। “ভেলভেটের দস্তানায় লুকোনো লোহার ঘুঁষি” প্রয়োগ করেও। তৃতীয়ত: ভূট্টোর আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ও দিশা দুই তৃতীয় বিশ্বের, অর্থাৎ আফ্রেশিয়া-লাতিন আমেরিকার গরীব ও অল্প বিকশিত দেশগুলির স্বপক্ষে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে যাচ্ছিল। চতুর্থত: আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা চালু ধার্মামারি “ডিটেটে”, অর্থাৎ শক্তি-প্রতিকূলতা জনিত বৈরিতার আবহাওয়াকে নরম করা নীতির আসল স্বরূপ উদ্ঘাটন করার যে পথ দেখিয়ে চীন তৃতীয় বিশ্বের সর্বহারা রাষ্ট্রগুলির জনগণকে মোহমুক্ত করে তুলছিল,

সে পথের সমপন্থী ভূট্টো হয়ে উঠেছিলেন। পঞ্চম, পাকিস্তান পিপুলস পার্টি ক্রমশই বে-সামরিক জনগণের বৈধ ক্ষমতার কেন্দ্র এবং সংগ্রহন-শক্তির উৎস হয়ে উঠছিল—যে সম্ভাবনা পাকিস্তানে ধর্মীয় মতাদ্ধ ও পশ্চাদগামী দলগুলি, সামন্তী তথা মুংহুদী-বেনিয়া-ধনপতিবর্গ এবং সর্বোপরি সামরিক আমলা-অফিসার-শাহীর ধ্বংসাত্মক ভয়ের চোখে দেখছিল।

ফলে প্রয়োজন দেখা দিল সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে পিপুলস পার্টির মন্ত্রিমণ্ডলী এবং ভূট্টোকে সরান। ভিয়েতনামে এবং কম্বোডিয়ায় দালাল-ডিক্টেটরদের দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধির যে হস্তক্ষেপকারী পরিকল্পনা আমেরিকার পক্ষেই-কাল হয়েছিল আমেরিকান রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক পদ্ধতিকে সঙ্কটগ্রস্ত করে, কিন্তু চিলি দেশে বা কার্যকরী করা গুপ্ত-সংস্থা সি আই এ-র পক্ষে সম্ভব হয়, অস্থরূপ প্রাণ আজ পাকিস্তানে বাটান হচ্ছে। তবে, ভিয়েতনামী যুদ্ধে নাদির শা দিয়েম অথবা কম্বোডিয়ায় প্রাক্তন সৈরাচারী ক্ষমতা-অপহারক লন-নলের দশায় পৌছতে সম্ভবত: জেনারেল জিয়া-উল-হকের একটু দেয়ী হবে। কারণ, তিনি ভারতের কংগ্রেসীমার্কী এমার-জেন্দী যুগের কেরামতী—অবৈধকে আইনের বলাংকার মাধ্যমে বৈধ করা খুব ভালভাবেই শিক্ষা করেছেন এবং সেখানে সূপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক-বদলের গ্যাড়াকল ঘটিয়ে জুডিশারি অর্থাৎ বিচারপদ্ধতিরই অস্তিম দশা আনতে উদ্ভত।

কিন্তু বিরাট সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আবার হিমালয়ী প্রমাদ ঘটেছে, তার জুম-তীব্রতার জিয়ার গলায় ভূট্টো শিঙিমাছ হয়ে বিধে গেছেন। ভূট্টোকে বিচারের প্রহসনে যত্নশূন্য দ্বিগুণ সরান চলতে পারে, কিন্তু তাঁর তাত্ক্ষণিক শহীদী অমরত্বলাভ পাকিস্তানকে বিপ্লবের জোয়ারে ভাসিয়ে দেবে, আইয়ুব-জিয়ার গ্যাড়াকল আটকাতে পারবে না।

দালাল ইউনিয়নের হামলা
(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শ্রমিক আহত হন। পরে জাহাজী শ্রমিকরা সংগঠিত ভাবে হামলার মোকাবিলা করতে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। কিন্তু পুলিশ অপরাধীদের না ধরে কয়েকজন নিরীহ জাহাজী শ্রমিক ও ফরওয়ার্ড সীমেন্স ইউনিয়নের আক্রান্ত কর্মীদেরই গ্রেপ্তার করে। এই সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় জাহাজ ও পরিবহন মন্ত্রীর নিকট এক জরুরী তারবার্তা পাঠিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিকারের প্রার্থনা করা হয়েছে। ফরওয়ার্ড সীমেন্স

নয়া চীনের স্বাস্থ্য

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

দের হাসপাতালে শিক্ষানবীশ হোক কাজ দেখা দেশের চাহিদা মেটাতে স্বাস্থ্যকর্মীদের পক্ষে নিত্যান্ত প্রয়োজন এবং সেটা সমগ্র স্বাস্থ্য বিষয়ে তাদের সাধারণ দায়িত্ববোধের পরিচয়। ১৯৭২ সালে চীনে কেরার আগে পর্যন্ত আগিতা উপলব্ধি করতে পারিনি। ১৯৪৭ সাল থেকেই যে পন্থা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নততর করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকেই নগ্নপদ পদ্ধতি বলা হয়। এই পন্থাই স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে ব্যাপকতর উন্নততর করে নিয়ে চলেছে। এতাবৎকাল কোন মানব সমাজ (any human society) এ বিষয়ে এতটা সফল হতে পারেনি।

বর্তমানে এই ‘নগ্নপদ’ ডাক্তাররা মহাচীনের গ্রামের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের কাজ অনেক এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। মনেহ নেই যে তারা ক্রমে ক্রমে আরও শক্তিশালী হবে। বর্তমান জগতে এই ‘নগ্নপদ’ ডাক্তাররা পৃথিবীময় লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

আমাদের দেশে শহরে অনেক হাসপাতাল আছে সেখানে চিকিৎসার সুযোগ গরীবদের বড় একটা মেলে না। বাদে রাস্তায় ঘরবাড়ি তারা অস্থস্থ হলে সেখানেই ভোগে, সেখানেই মরে, হাসপাতালে তার প্রবেশাধিকার নেই, সেগুলি বড় লোকদের জন্ত। গ্রামে গ্রামে নাকি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। ধবরের কাগজে বেশি কোন কোন কেন্দ্রে গুরুত্ব আছে কিন্তু ডাক্তার নেই, আবার কোথাও বা ডাক্তার আছে ওষুধপত্র বা ডাক্তারী কোন যন্ত্রপাতি নেই। এর থেকেই বোঝা যায় গ্রামের লোক তাতে উপকৃত হয় না। সরকার অভিযোগ করেন শিক্ষিত ডাক্তাররা গ্রামে যেতে চায় না আর প্রতিপদ বলে তাদের কোন সুবিধা দেওয়া হয় না আর ডাক্তারী করার মত ওষুধ বা সাঙ্গ সরঞ্জামও দেওয়া হয় না। দোষ বারই হোক গ্রামের লোক যে তিমিরে সেই তিমিরেই।

চীনের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে তার অর্থ এই নয় যে কেউ মরে না। কেউ অচিকিৎসায় মরে না, ওষুধ, ডাক্তার সবই তাঁর হাতের কাছে। ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আরও উন্নততর হবে সেই আশাই রাখবো।

ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জীবান্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিবৃতিতে এই ঘটনার কথা জানিয়েছেন।

গোপন কথাস্থ?

আপনিও জানতে পারেন।

আমার নির্বৃত্ত পরিকল্পনা থেকে দু'ভাবে লাভ সুনিশ্চিত!
আয়কর আইনে প্রভিডেন্ট ফান্ড, সি টি ডি, জীবন বীমার পলিসি ইত্যাদিতে টাকা লগ্নী করলে আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা আছে।
এই সবের মধ্যে, জীবন বীমা শুধু যে আপনার করের টাকা বাঁচাতে সাহায্য করে তা নয়, আপনার জীবনের কুঁকি নেওয়ার মাধ্যমে, যে দিন থেকে আপনি জীবন বীমা করেন, সেইদিন থেকেই আপনার জন্য এক সম্পত্তি গড়ে তোলার গ্যারান্টি দেয়।
জীবন বীমার প্রিমিয়ামের মাধ্যমে কর সংক্রান্ত সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য আপনার বীমার এজেন্টের সঙ্গে আজই দেখা করুন না কেন?

জীবন বীমার কোন বিকল্প নেই



লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে অশান্তি

ভানুসিংহ

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে এবার যে অশান্তি দেখা দিয়েছে, তেমনটি ইতিপূর্বে আর দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। ইন্টার্ন ইন্ডিয়া ঘোষণা পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সঙ্গে এবার বিরোধ লেগেছে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের। বিরোধের কারণ হল, সরকার কর্তৃক রঙীন ছবির প্রদর্শনীর উপর টিকিট প্রতি অতিরিক্ত করধার্যকরণ। ই, আই, এম, পি, এ এই অতিরিক্ত কর ধার্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে সিনেমা হলগুলিতে একদিনের প্রতীকী ধর্মঘটপালিত হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ই, আই, এম, পি-এ আদালতে নালিশও জুড়ে দিয়েছিলেন। এতে বিরোধ হয়েছে তীব্রতর।

পরস্পরের বিরোধী বক্তব্য পরিস্থিতিকে করে তুলেছে জটিল। সরকার পক্ষ বলছেন, তাঁদের সঙ্গে কোনরকম আলাপ আলোচনা না করেই অ্যাসোসিয়েশন একতরফা ভাবে সিনেমা হলগুলির দরজা একদিন বন্ধ করে দিলেন। আদালতে নালিশও করলেন। আবার বিষয়টি ধ্বনবিচার্য্যীন, তখন আবার তাঁরা

হুমকি দিচ্ছেন, সমগ্র চলচ্চিত্র শিল্পে এবার অচল হয়ে যাবে। অ্যাসোসিয়েশন এদিকে অস্ত্র কথা বলেন। তাঁরা সরকার পক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলাপ আলোচনা চালাতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু সরকারপক্ষই সাক্ষাতে সম্মত হন নি; ফলে তাঁদেরকে অস্ত্রপথে যেতে হয়েছে।

এই অস্ত্রত পরিস্থিতির ফলে সিনেমা শিল্পই যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাতে সন্দেহ নেই। সরকার পক্ষ চেয়েছিলেন, রঙীন ছবির প্রদর্শনীর ওপর কর ধার্যের ফলে যে অতিরিক্ত আয় হবে, তার বেশমোট অংশই সিনেমা শিল্পের উন্নতি সাধনে ব্যয় করা হবে। আর এই অতিরিক্ত ট্যাক্স চাপানোয় হিন্দী ছবির ওপরই যা কিছু প্রতিক্রিয়া হবে, বাংলা ছবির ওপর নয়। কারণ হিন্দী ছবি সাধারণতঃ রঙীন হয় আর বাংলা ছবি আজও বেশী সাংখ্যিক সাদা-কালো। সুতরাং অতিরিক্ত ট্যাক্স নির্ধারণ বাংলা ছবির ক্ষেত্রে কোন দিক থেকেই ক্ষতিকারক নয়—এই হল সরকারী ধারণা।

কিন্তু এই ধারণা কি সঠিক? যখন বাংলা ছবির উন্নতিকল্পে নানা পরি-

সবচেঁহে উন্নত নাবুদ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাল টি এন সিং রাজধানী এসেগ্রেসে হাওড়া এসে পৌঁছোন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবর্দর পরবর্তী কর্মসূচী ছিল নবতম রাজ্যপালকে স্বাগত জানানো। অত্যাগত মন্ত্রীরাও একে একে তাঁকে স্বাগত জানাতে আসতে থাকেন। শ্রীবর্দর তখনও গীতাঞ্জলি ছাড়ার সবুজ সংকেত দেননি, এমন সময়ে এসে পৌঁছোন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র। দেখা গেল, জনৈক পুলিশ তাকে ঘাড় নীচু করিয়ে দড়ি ধরা ট্রাফিকের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন, তারপর তার দিকে জলপান করবার কেউ নেই। দেখলাম মন্ত্রী চিত্তবৃত্ত মজুমদার ছ'একবার ভীড়ে পুলিশের ধাক্কা সহিতে না পেয়ে দূরে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

রাজ্যপালকে স্বাগত জানাতে মন্ত্রীরা ঠিক সময়ে এসেছিলেন, কিন্তু রাজধানী এসেগ্রেস আধঘণ্টা লেট ছিল। তাই এই সময়টুকু তাঁদের দিকশূন্য অবস্থায় এদিক ওদিক ঘুরতে হয়েছে। একমাত্র মন্ত্রী সতীন চক্রবর্তী আগাম এসেছিলেন বলে সঙ্গে বসবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

গীতাঞ্জলির যাত্রা উপলক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের আরও একটি কর্মসূচী হল কলকাতার সাংবাদিকদের এই

ট্রেনে পাঁচদিনের প্রমোদভ্রমণ। এক্ষেত্রে বাছাইকরা প্রতিকার সাংবাদিকদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের কর্মীদের মধ্যেও মনোমালিন্যের ঘটনা ঘটেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। দৈনিক পত্রিকার মধ্যে অনেক ছোট কাগজও তাদের হিসেবের বাইরে ছিল। ট্রেনে ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রিত নয়, এমন একটি সংস্থা হল কলকাতা দূরদর্শন।

আদলে ঘটনাটা অন্তরকম জানা গেছে, সব প্রতিকার সাংবাদিক ফ্রিল্যান্সার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকেই নামের টিকিটে এই সংস্থার জনসংযোগ দপ্তরের বেগ কিছু প্রিয়তম প্রিয়তমারা ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছেন।

ভারতীয় রেলওয়ে ঘেঁষানে এত দুর্ঘটনা, দুর্ঘটনায় পতিতদের ক্ষতিপূরণ দানের এত কারচুপি, সেখানে দক্ষিণপূর্ব রেলের এই রাজকীয় কাণ্ড সেদিন অনেককেই হতবাক করেছে। হতবাক হয়েছেন তারাও; দক্ষিণপূর্ব রেলের যেসব সাহিত্যরস বক্তিতকর্মী সেদিন তাদের দরিদ্র নগ্ন হাতে একটি করে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' কাব্য উপহার পেয়েছেন।

কলনার সঙ্গে ছবিকে আবৃত্তিকভাবে রঙীন করার কথা উঠছে এবং এখানে কালার-লেবরেটরী প্রতিষ্ঠা করার যৌক্তিকতা স্বীকার করা হচ্ছে, তখনই রঙীন ছবির ওপর এমন আঘাত কোন মদল সাধন করতে বোকা মুখিল। একেই তো সিনেমা টিকিটের ওপর সরকারের প্রমোদকর অত্যধিক হারে চেপে বসে আছে, তার ওপর আবার এই কর বৃদ্ধিতে দর্শক সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনার কথা স্বীকার করা যায় না।

সৌখিন গোষ্ঠী প্রযোজিত 'অঙ্গার'

(দর্পণের সমালোচক)

গত ৩০শে অক্টোবর বিড়লা একাডেমী হল সৌখিন গোষ্ঠী কর্তৃক উৎপল দত্ত রচিত 'অঙ্গার' নাটকটি মঞ্চস্থ হলো।

নাটকটির সাংস্কৃতিক গুণাগুণ বিচার করতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে নিঃসন্দেহে তা অবক্ষয়ী সংস্কৃতি ও শ্রেণী-শোষণের ইঙ্গিতাত্মক রূপকে নিরক্ষরভাবে উন্মোচন করে দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ নয় অপসংস্কৃতির পাশাপাশি আপাতী দিনের স্বজনশীল সমাজের সর্বহারা সংস্কৃতির এক জলন্ত উদাহরণ সৃষ্টি করার পক্ষে এই নাটকটি এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তবে ইউনিয়নের বিপ্লবী নেতার ভূমিকা আরো বেশী করে দেখালে নাটকটি মেহনতি মাত্রার কাছে অনেক বেশী উৎসাহদীপক হতো। এবং বিপ্লবী নেতার বক্তৃতাটি আর একটু দীর্ঘ হওয়া উচিত ছিল। তবে নাটকটির একটা বিরট-ত্রুটি হলো এই যে, পুঞ্জিবাদী জোয়ারে বিধ্বস্ত সনাতনের যে চরিত্র, তাঁর মুখে কিছু কিছু সংলাপ বড়ই যেমান।

অভিনয় দক্ষতা ও শিল্পগুণের কথা বলতে গেলে বলব সনাতনের ভূমিকায় রতন চৌধুরীর অভিনয় স্বার্থ অর্থে প্রশংসনীয়। ইউনিয়ন

নাট্যপ্রয়াসীর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

গত ২৪শে অক্টোবর বিজয়া উপলক্ষে 'নাট্যপ্রয়াসী' সংস্থা বি, ই কলেজ প্রেক্ষাগৃহে এক মনোজ্ঞ অস্থানীয় আয়োজন করেন। সংস্থার প্রবীণ শিল্পী শ্রীহলধর কর ও শ্রীউমাপদ চট্টোপাধ্যায়কে মানপত্র দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়। পরে সংস্থার সভাপতি শ্রীবিলাস মুখোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত প্রহসনমূলক নাটক 'ভগবান মারা গেছে' মঞ্চস্থ করেন। দলগত অভিনয়ের জন্মই নাটকটির গতি শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। অভিনয়শাশে বাসনা ও চপলায় ভূমিকায় শ্রীনিমিতা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরীতা দাশগুপ্তার অভিনয় প্রশংসার দাবী রাখে। সেই তুলনায় মিনতি দেবনাথ যথেষ্ট আড়ষ্ট।

২৭দিন ব্যাপী যাত্রা সম্মেলন

(দর্পণের সমালোচক)

প্রতি বছরের মত এবারও রবীন্দ্র কাননে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন অহুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই অস্থানটি চলবে ২৫শে নভেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। মণ্ডপে দর্শকের স্থান হবে ৬০০০। এতে প্রায় পঁয়ত্রিশটি ছোট বড় যাত্রা দল অংশ গ্রহণ করবে এবং অভিনীত হবে দলগুলির ১৩৮৪'র নির্বাচিত ও বহল অভিনীত নাটকগুলি। অস্থানটির

একজন বিশিষ্ট উদ্যোক্তা ও সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীশৈলেন মহান্ত এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে জানান যে, তারা আন্তরিকভাবে চাচ্ছেন অস্থানটির উদ্বোধনের দিন প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রতাপ চন্দ্র চন্দকে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথিরূপে সম্মেলনে উপস্থিত করতে। প্রতিবারের মত এবারও যাত্রা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এমন পাঁচজন স্থানীয় ব্যক্তিকে সম্মেলনের শেষের দিন দিন বিশেষভাবে গুণীজন সম্বর্ধনা জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রীমহান্ত আশা করেন প্রতিবারের মত এবারও যাত্রা সম্মেলন জনসাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগাবে।

বিশেষ পুরস্কার

গত বছরের মত এবারও 'তুলি' পত্রিকার তরফ থেকে যাত্রা/মঞ্চ সাংবাদিক এবং সাহিত্যিকদের বিশেষ পারদর্শিতার উপর বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। এ ব্যাপারে সমস্ত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে পত্রিকা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান সম্পাদক তপনকুমার দে। আগামী ডিসেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

৮১ দ্বার হার

বার্ষিক ২২ টাকা

সাপ্তাহিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাণ্ডার ঠিকানা

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, মটলেন। কলিকাতা-১৩

প্রকাশিত হয়েছে

ইন্দিরার কারাগারে

(নিরীক্ষ-৩)

দাম-৮০ পয়সা

দেশকথা প্রকাশনী

৬১, মটলেন, কলিকাতা-১৩

নয়াচীনের চিত্রকলা

শাওন সেন

পত মাসে ভারত-চীন মৈত্রী সম্মেলন উপলক্ষে কলকাতা তথা কেন্দ্রে সমকালীন চীনা চিত্রকলার প্রদর্শনী হয়ে গেল। বহুশ্রম আপে শোনা বিজ্ঞানী কবি নজরুলের সেই শ্লোক "চীন ও ভারতে মিলেছি আবার শতকোটি লোক। / চীন ভারতের জয় হোক! / একের জয় হোক! / সাম্যের জয় হোক।" মনে পড়ে গেল। আজ থেকে ৩৭ বছর আগে ১৯৪০-এ চীনা চিত্রশিল্পী জু-পিংয়ের (জি পাই হোং) চিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল গুরিয়েটাল সোসাইটির হলে চীনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের অর্থ সাহায্যার্থে।

সেই সংগ্রামে আজ সে জয়ী; আরো নতুন নতুন সংগ্রামের ঢেউ উঠেছে সেখানে। এই দীর্ঘ ৩৭ বছরে রূপান্তর ঘটেছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে সেই রূপান্তরকে জানবার আগ্রহে আমরা এতোদিন উন্মুখ হয়ে ছিলাম। আজ তার সুযোগ হয়ে গেল। অবশ্য ১৯৫০ সালে কলকাতায় চীনা চিত্রকলা ও চিত্রকলার এক বিশাল প্রদর্শনী হয়েছিল। কিন্তু সেই ৫০ সালের পর থেকে পত কয়েক বছরের স্বল্প সময়ে চীনের সমাজ জীবনে ক্রান্ত গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে।

সেদিন (১৯৪০) চীনের একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীরই চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল এবং পরবর্তী প্রদর্শনীতেও পেশাদারী শিল্পীদের শিল্পই উপস্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু আজ যে বিপুল চিত্রের সমারোহ তার স্রষ্টা হলেন সেখানকার প্রমিত-কৃষক মাসুয়েরা, জীবন-বিমুখ শিল্প-সর্বশ শিল্পীরা নন। আজকের চীনে শিল্পচর্চা আর সুবিধাভোগী বহুল শ্রেণীর অবসর বিনোদনে সীমাবদ্ধ নয়, শিল্পচর্চায় সুযোগ আজ যেহেতু মাসুয়েরা মধ্যও প্রসারিত। সাম্প্রতিক কালে হুসিয়েনের (Huhsien) কৃষকদের আঁকা চিত্রপ্রদর্শনী রিদেপ্ট সমালোচকদেরও সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমালোচনায় বলা হয় "ছবিগুলির দিকে তাকালেই তাদের প্রাণময়তা ও আশাবাদ আমাদের উপলব্ধি করায় যে শিল্পীরা শুধু শ্রমের আনন্দই প্রকাশ করেন না বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে তারা ভালো বলেই বিশ্বাস করেন এবং তা' তাদের উজ্জল ভবিষ্যতের

আবেদন রাখে।"

প্রদর্শিত ছবিগুলি থেকে চীনের চলমান জনজীবনের এক কালক আভাস পাওয়া গেল। ছবিগুলিতে নেতাদের স্তবগান বা ব্যক্তিবিশেষের অলৌকিক অবস্থানের গুণগত নৈই, আছে সমষ্টিচেতনার প্রকাশ যেখানে পাহাড়কে হুইয়ে, নদীকে বশ করে দুর্জয় প্রকৃতিকে করা হয়েছে জনগণের সেবক। শুধু শ্রম আর স্বষ্টির বিশাল কর্মক্ষেত্র বাহ্যিক রূপই প্রকাশ পায় নি শিল্পীর তুলিতে মৃত হয়েছে অন্তরঙ্গ ছবি। মাসুয়ের সত্যতাবোধ চীনের স্বাধীন মরোয়া জীবনের প্রতীক হয়েছে "who lost it" (কার হারিয়েছে?) এর দ্বিধা-নাশনীর ছবিটি। "A new scene in the Taihang mountain area" (তাইহাং পাহাড়ের নতুন দৃশ্য) ছবিতে পাহাড়ের গায়ে সোষিত হয়েছে—চীনা জনগণের মনোবল সব কিছুকেই জয় করবে। "Source of Strength" (শক্তির উৎস) ছবিতে তাচিং শিল্প-কেন্দ্রের জনৈক প্রমিতকে বলিষ্ঠতা ও একাগ্রতার নিদর্শন হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে যেখানে তার অধ্যবসায় ও কর্মপরায়ণতার উৎস হল মাও সে তুংয়ের চিন্তাধারা।

কিন্তু ছবি কি শুধু বক্তব্যের ভারে ভারাক্রান্ত? "A Holiday in a rural people's commune" (গ্রামীর গণকমিউনে এক ছুটির দিন) ছবিটির দৃষ্টগত (visual) সৌন্দর্য এক কাব্যিক আবেদন রাখে, এ যেন কম্যুনের দলবঁধা আনন্দের উজ্জলিত প্রতীক। চঞ্চলিত হয়েছে মাছের খেলা (Jumping carp fish in a new lake) রঙ আর রেখার ছন্দে। কিন্তু এ ছবি—"এখন তাহার হৃদে জলে ক্রীড়া করে"র ছবি নয়, গণকম্যুনের মস্ত চাষের সার্থকতাকে মনে করিয়ে দেয়। Lotus ছবিতে পদ্মের সবুজ বাগ্গব প্রতিচ্ছবি না করে শিল্পী তুলির খেলা খেলেছেন, রেখায়, ব্যঙ্গনায় সৃষ্টি করেছেন চিত্রগত আবেদন, কিন্তু এখানেও "ছুটিল কমলদল ছুটিল" নয়; গণকম্যুনে পদ্মের চাষ হয় খাড়ের জন্ত।

এই সব ছবিতে আদিকের দিক থেকে প্রচলিত রীতিকেই অঙ্গসরণ করা হয়েছে। আধুনিক চীনা

ভাস্করের যে সামান্য কিছু নিদর্শন পেয়েছি তাতে পার্শ্চাত্য রীতির অনুসরণ দেখতে পাই কিন্তু প্রদর্শিত চিত্রকলার পার্শ্চাত্য রীতির কোন অনুসরণ নেই তবে ঐতিহ্যগত চিত্রের অলংকরণ বাহ্যিক আধুনিক ছবিতে হাস পেয়েছে। প্রতিটি চিত্রেই স্নিগ্ধ রঙের ব্যবহার অথচ তা উজ্জল। Fragrance of flowers & fruits sweeps old Yellow River (ফুল-ফলে ভরপুর পীত নদীর উপত্যকা) ছবিতে রকমারী ফল আর মাসুয়ের সমারোহ যেন রকমারী রঙেরই সমাবেশ, রঙের স্বসমঞ্জস উপস্থাপনা দেখে মনে হয় না যে চিত্রকর অপেশাদার-শিল্পী। "on their back from the night School" (নৈশ বিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে), Reporting about the new found mines (নতুন খনির সম্ভান জানানো) প্রভৃতি ছবির নৈসর্গিক সৌন্দর্য মুগ্ধকর, কিন্তু ছবির তাৎপর্য শিল্পের মোহিনী রূপচর্চায় সীমাবদ্ধ নয়, আধুনিক জীবনধারা প্রকাশে প্রয়াসী। আজ চীনের গায়ে গায়ে নৈশ বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, ছবির মাসুয়ের হাতে টেরে আলো থাকায় সহজেই অনুমেয় যে গ্রাম্যপথ বিদ্যুৎ-আলোকিত হয়ে ওঠেনি।

উড-কাট সিরিজের ছবিগুলিতে পার্শ্চাত্য রীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। বর্তমান চীনে এই জাতীয় কর্মধারা বিশেষ জনপ্রিয়। কারখানার প্রমিতরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সাহায্যেই এই শিল্পের চর্চা করে থাকেন। তবে এই সিরিজের অধিকাংশ ছবি পোষ্টার-ধর্মী হয়ে পড়েছে। Building a bridge (সেতুবন্ধন) এবং With each passing day, something new emerges (প্রতিটি দিনে নতুন কিছুই আবির্ভাব) ছবিতে ব্রীজ এবং জাহাজ ইত্যাদির কম্পোজিশন ভালো হলো রঙের tonal variation সার্থক না হওয়ায় চিত্র নিম্পন্দ হয়ে পড়েছে সেই তুলনায় 'Collecting medical herbs' (বনৌষধি সংগ্রহ) চিত্রটি পোষ্টারধর্মীতা মুক্ত। এই ছবিতে, চীনের আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি দিককে চিত্রিত করা হয়েছে। আজ চীনে দেশের লতা-পাতার গুণাগুণ নতুন ভাবে পরীক্ষিত ও প্রয়োগ হচ্ছে আর এই বনৌষধি সংগ্রহ করেন সেখানকার বেয়ারফুটেড (নগ্নপদ) চিকিৎসক বাহিনী। যারা পেশাগত দিক থেকে প্রমিত বা কৃষক। আরেকটি উজ্জল ছবি হল A site of Canton

Peasant Movement Institute run by Chairman Mao (চেয়ারম্যান মাও পরিচালিত ক্যান্টনের কৃষক আন্দোলন শিক্ষণ কেন্দ্র)। কর্তমানে এই চীনের একটি দৃষ্টব্য মিউজিয়াম। চল্লিশ দশকে এই বাড়ীতে মাও কৃষকদের আন্দোলনের রাজনৈতিক শিক্ষা দিতেন। লাল রঙের ব্যবহার চিত্রটিকে শুধু স্মরণ করে তোলে নি তাৎপর্য মণ্ডিতও করেছে। আরেকটি প্রাণবন্ত ছবি Petrol against the enemy (শত্রুর বিরুদ্ধে প্রহরা)। ছবিতে মুক্তি সেনানীর দৃঢ়তা স্মরণ পরিফুট হয়েছে। শত্রুর বিরুদ্ধে তার সজাগ দৃষ্টি এখনও প্রথম। স্বাধীন চীনের শত্রু কে?—সাম্রাজ্যবাদ আর ঘরোয়া প্রতিক্রিয়াশীলরা। এই-সজাগ প্রহরা শুধুই কি প্রহরীরা নাকি শিল্পীর নিজেরও। আমাদের দেশের শিল্পীরা

কি এই দুই শত্রু সম্পর্কে সজাগ হবেন না?

কোন কোন সময় আমাদের দেশে কিছু কিছু গণচিত্রের নিদর্শন পাই। সে ছবি দেখে পশ্চিৎ সময়ে এরকম ধারণাই আসে যে শুধু অঙ্ককার, গোঙানি আর হঠাৎ জালের বলকানি। সব মিলিয়ে ছবিতে আড়ষ্টতা নয় তো কাটুন-ধর্মিতা। তাই বুঝি "খাটি শিল্পীরা" সত্যে গুণধর্মিতার পথ পরিহার করে ছবিকে উত্তরোত্তর বিমূর্তবাদ আর প্রতীকবাদের মগডালে তুলে দিচ্ছেন। কিন্তু এই কলা-নৈপুণ্য কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় নিবেদিত না হলে শিল্পীদের শুধু আক্ষেপ করে বলতে হবে—"হায় ওরা বুঝল না কি মহৎ স্বষ্টিই না করেছি! এদেশে শিল্পীর মূল্য পেলো না।"

একটি অবিচারের কাহিনী

(দর্পণের সবাদদাতা)

মেহিনীপুরের তমলুক খানায় নাইকুড়ির বিজুবাড় অঞ্চলে একটি প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন বেকার স্থানীয় ছেলেরা। এদের মূলে ছিলেন শেখ শরিয়ত আলী সরকার নামে বি, এ (অনার্স) ক্লাসের ছাত্র। চন্দনপুরে তার বাড়ী। তিনি দীর্ঘকাল স্কুলে বিনামূল্যে পরিশ্রম করেন, শিক্ষকতা করেন। অল্পটুকু শিক্ষক নিয়োগের সময় কৌশলে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করে

শাস্তি-মুখলা রকার প্রর তুলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সি পি আই-এর পাশকড়া শাখা জনাবকে শরিয়তকে পাশকড়াতে ঢুকতে দিচ্ছে না। শরিয়ত নিজে রাজমিট্রী এবং সিটু প্রভাবিত রাজমিট্রী ইউনিয়নের নেতা, এবং সি পি এম কর্মী। স্থানীয় এম, এল, এ, ডাঃ ওমর আলি নানাভাবে শরিয়তকে গ্রামে ঢুকতে বাধা দিচ্ছেন।

Space
Donated
By A
Well-Wisher

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কৃষ্ণ দীপালী প্রেস, ১২০। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং বর্ষাপ কাৰ্যালয় ৩১ মট লেন কলকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত।

বেশ গুরুত্ব উঠেছে। এর মধ্যে কারো কারো অভিযোগ শ্রীমজ্ঞ রাজ্যের বামদপ্ট সরকারের সংশ্লিষ্ট তেমন সহযোগিতা করছেন না। সি, পি, আই, এমের আইনজীবীরা অনেকেই মনে করেন শ্রীমজ্ঞর কাছ থেকে তারা তেমন লাভা পাচ্ছেন না। কথটা মধ্যমস্ত্রী জ্যোতি বহুর কানেও উঠেছে। প্রাক্তন রাজ্য-পাল শ্রী এ, এল, ভায়ালের বিদায়

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান
বিচারপতি "শংকরপ্রসাদ" মিত্রকে
কেন্দ্র করে রাজ্যের বাম রাজনীতিতে

বিশ্ব বর্ষ ॥ ৪১শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১৮ই নভেম্বর, ৭৭ ॥ ৪০ পৃষ্ঠা

('দর্পণের সন্বাদদাতা')

বিশোধী উত্তর পোষ্টাই তাদের নিজ
নিজ দাবী থেকে সরে আসতে চাই
ছেন না।

তলবীবিরোধী গোষ্ঠির দাবী
বর্কানন্দ রেড্ডীকেই সভাপতি পদে
রাখিতে হবে এবং তলবী সভার
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দারেরই স্বার্থরক্ষা করছে। ফসল কাটা নিয়ে বাস
সরকার পরিষ্কার ঘোষণা কবেছেন যে, "চাষ করছে যে
ফসল কাটবে সে"। তা সত্ত্বেও জমি-বিরোধ এড়াবার
জল্প ব্রহ্ম পর্ষায়ে কতিপি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রফুল্লবাবু যদি প্রকৃতই দরিদ্র চাষীদের প্রার্থ নিয়ে
মাথা ঘামাতেন, তাহলে রুক কমিটির ভূমিকা লক্ষ্য
করার জন্য তার অপেক্ষা করা উচিত ছিল। কেননা
ব্যাংক হারে ফসল কাটার কাজ এখনও শুরু হয় নি।

রক কমিটি গঠন সম্পর্কেও পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে এই কমিটিতে স্থানীয় এম. এল. এরাও থাকবেন। স্বতন্ত্র জনতা দলের সদস্যরাও কোথাও না কোথাও এই কমিটিতে থাকার সুযোগ পাচ্ছেন। তা সত্ত্বেও প্রকৃত বাবর এত উৎসে কেন।

আসলে বঙ্গের রাজ্যান্তরে শীর্ষস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত
থেকেও তিনি সকলের নেতা নন। তিনি শুধুমাত্র তার
ছায়ায় লালিত কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নেতা। তাদের
(শেখারশ ৭৫-পৃষ্ঠায়)

(বর্ষপের সন্বাদসংকলন)

ব্যক্তিকে হান্ড করে তাদের “বেওয়া” হত্কেপকারী তি, আই, জিকে বহনী করার চেষ্টা করছে । তাতে সম্ভবত তারা সার্থক হয়েছে । কেমনা, তি, আই, জি এখন স্থানান্তরিত । পরবর্তী পর্যায়ে নতুন তি, আই, জি,

আমার পর একটিও “অপারেশন”
হয়নি। এরই সুযোগ নিয়েছে
রাহ্মের কুখ্যাত চোরাকাবারীরা।
ইতিমধ্যে ঠাঠা নভেম্বর সি আই, ডি
হস্তরের কিছু অফিসার বোম্বে রোডে
হানা দিয়ে কিছু চোরাই তেল

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বহাধাতি লদনে অনশনরত ছাত্র
পরিবার কর্মীদের সামনে বক্তৃতা দিতে
গিয়ে লক্ষী বোস চ্যালেঞ্জ জানিয়ে
বলেন, “আমি অনশনে বিশ্বাস করি
না। কর্মজা থাকে হরদানে লড়াই
ভালো। ‘আয়রা দেখে নেব।’”

জঙ্গী বোসকে ধন্যবাদ, তিনি স্বীকার করলেন যে, তিনি অনশন-টনশনে বিশ্বাস করেন না; তিনি হার্পিটের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন। জঙ্গী বোস বিদ্যা হরণী দেন নি, তাঁর এই হসকারেই এক

দিনের মধ্যেই কসবার একজন সি,
 শি, এম, কর্মীর গুপ্ত আক্রমণ
 হয়েছে। সারা রাতে আবার নতুন
 করে সম্ভ্রাস স্থিতির প্ররোচনা চলছে।

সাতাশের সালের লোকসভা নির্বা-
চনের পর পশ্চিমবঙ্গের বোটার্‌মুটিয়া
মুক্ত হয়। এলাকাচ্যুত কর্মীরা নিজ
নিজ পাড়ায় ফিরে আসে এবং
প্রত্যেকেই নিজ নিজ পছন্দ অস্থায়ী
রাজনীতি করতে পারছিল। কিন্তু
লক্ষ্মী বোসদের তোঁতা পছন্দ হবার
নয় বোম-পাইগগান কম্পিত

আটক করেন। কিন্তু প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ঘৃণা নিয়ে হাজার লিটার তেল সরিয়ে ফেলতে চোরাকারবারীদের সাহায্য করেন।

রাজ্যের এই তেলের চোরাই
চালান নিয়ে সর্বত্রই উত্তেজনা দেখা
দিয়েছে। শুধু এর কোন ছাপ
পড়েনি পুলিশ প্রশাসনে। কোনও
এক মহল পুলিশের কাছে একটি
তালিকা পেশ করে চোরাই গোড়াউন
ও এর ব্যাপারীদের নামধাম
(শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠার)

(-দর্পণের পৰ্যবেক্ষক)

পশ্চিমবঙ্গের আই জির সংবাদ-
পত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতি থেকে
জানা যায় গত বছর পশ্চিমবঙ্গের
যত ভাঙাতি লুট খুন অর্ধশতের ঘটনা
ঘটেছিল তার থেকে এবারের সংখ্যা
অনেক কম। রাজনৈতিক পার্টি-
গুলোর মধ্যে রেবারেবি উদ্ভেজনাও
আর আগের মতন নেই। বেশী
রাতেও ট্রেনে বাসে ট্রায়ে প্রচুর ভীড়
দেখা যায়। মাহবের মধ্যে আর
দাংগা হাংগামা নিয়ে ছুঁকিছু দেখা
যাচ্ছে না। নারী লাহনার ঘটনাও
প্রায় এক রকম বন্ধ হয়ে গেছে। এই
সরকার আসার পর বোট দুটি নারী
ধর্ষণের খবর সংবাদপত্রে পাওয়া
গিয়েছে। অর্ধচ গত কংগ্রেস
শাসনের সময় এ রাজ্যে সহস্রাধিক
নারী ধর্ষণের খবর কাগজে দেখেছি।
এক সঙ্গে এগারো জন যুবতীকে
ধর্ষণের মত ঘটনাও ঘটেছে মেদিনী-
পুরের গোবুলিয়া নামক গ্রামে।
বামফ্রন্ট সরকার ক্রমতায় আসার পর
এক জৈবীর পুলিশের সহায়তায় কিছু
(শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠার)

জেলা শাসকের দপ্তরে ঘূষের রাজত্ব

(দপ্তরের সংবাদদাতা)

হুগলী জেলা শাসকের দপ্তরে ঘূষ ছাড়া কোন কাজই হচ্ছে না। প্রতিদিন একদল লোক বাস মালিকের তরফ থেকে টাকা দিয়ে যাচ্ছেন। এক দল বাস্তার কন-ট্রাক্টরের হয়ে। অল্প দু' একজন চাকুরীর ঘূষ। আমাদের সংবাদদাতা এসব লক্ষ্য করেছেন। চু'চুতা অফিসে দূর দূরান্ত থেকে সাধারণ মানুষ এসে বার বার ফিরে যান কর্তা ব্যক্তিদের দেখা না পেয়ে। গচ্ছ বছরে জেলা শাসক জে, ভি, আর প্রমাদ রাওয়ের আমলে টাইপিট, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ও অল্প কর্ম-প্রার্থীদের চাকুরীর ইন্টারভিউ নেওয়া এবং প্যানেল তৈরী করা হয়েছিল। সে প্যানেল মাসিক চাকুরী খাবার জন্তে বড়বাঁকু, ভিন কে, জি, ওজনের কুই মাছ দিতে হয় বলে অনেকে দপ্তরের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। হুগলীর চণ্ডীতলা এক নম্বর রকের আইয়া অফিসে বাদ-পুরের মোল্লা কল্ল আমদ, ইন্টারভিউ দিয়ে নাম তালিকাভুক্ত করে আজও চাকুরী পায় নি। স্বল্প পিতার সন্তান কল্ল অনাহারে আছে। প্রতিদিন ডি, এম, অফিসে যাচ্ছে।

বহুমতী সম্পর্কে অভিযোগ

(দপ্তরের সংবাদদাতা)

বহুমতী কর্পোরেশন লিমিটেডের মত সরকার পরিচালিত সংস্থায় টাকার ছিনিমিনি চলছে। প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক কেদার ঘোষের সাক্ষরিত পত্র এখনও বহাল তব্বিতে কাজ করে যাচ্ছে। এদের পেটোয়া লোকেরা স্বনামে বেনামে বহুমতীতে লিখে টাকা নিয়ে যাচ্ছেন। সম্পাদকীয় বিভাগ ছাড়া অন্য বিভাগে প্রকাশিত লেখার জন্য পারি-শ্রমিকের বিল তৈরী হয় কিন্তু টাকা দেওয়া হয় না। সম্পাদক গোপাল ভৌমিক বলেন টাকার জন্ত সহ-

সম্পাদক সময় চাটুজের কাছে যেতে, সময়বাবু বলেন গোপালবাবুর কাছে যেতে। প্রকাশিত ছড়ার জন্তও টাকা দেওয়া হয় পেরারের লোকেরের। এ দিকে বড় রচনার জন্ত অনেকে টাকা পান না। প্রায় পনের জন লেখকের হাজার টাকার মত পাওনা আছে বলে দপ্তরে খবর এসেছে। মাননীয় তথ্যমন্ত্রীর কাছে এ ব্যাপারে বাকি পাওনা মেটাবার জন্ত চিঠি দিয়েছেন বলে একজন দাবী করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ হাক্কামামুস্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সমাজবিরোধী গুণগোল পাকিয়ে সরকার বিরোধী চক্রান্তে মদদ যোগাতে চেষ্টা করেছিল। সেটাও এখন অনেকটা দমন করা গেছে। চক্রান্তকারীরা বুঝতে পেরেছে এই সরকার শক্ত হাতে সমস্ত রকমের গুণামী বন্ধ করতে প্রস্তুত। প্রত্যেক বার পুছোর সময়ই দেখেছি সমাজ-বিরোধীদের উৎপাত। গুণামি, অসভ্যতা, জোর-জুলুম। এই সব ব্যাপারগুলো প্রত্যেকটি পুছোর হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক রকম স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এবার? উগ্র, সি, পি, এম বিরোধীরাও এবার স্বীকার করেছেন যে এ রকম শাস্তি শৃংখলা কোন পুছোর সময় এর আগে দেখা যায় নি। এবার পুছোর শাস্তিতে সবাই উৎসব উপভোগ করেছেন। পাড়ায় পাড়ায় যে 'যুব বাহিনীর' অত্যাচার দেখা দিত এবার নতুন সরকার হবার পর তা অনেক কমে গেছে। এরকম কোন মিসার সরকার হয় নি। পুলিশ কমিশনার বলে-ছিলেন প্রচলিত সাধারণ আইনেই গুণীদের মোকাবিলা করা যায়; তার জন্ত কোন অস্বাভাবিক আইনের প্রয়োজন নেই। আসল কথা হল সহিষ্ণু। কংগ্রেস এতদিন সমাজ-বিরোধীদের নিয়ে রাজনীতি করেছে যতাবতই তারা সমাজবিরোধীদের দমন করতে চায় নি। তাই পাড়ায় পাড়ায় হাতকাটা দেবা, কাটা শব্দ আর কানা অজিতরাই রাজত্ব চালিয়েছে।

গত বিধান সভার নির্বাচনে বাম ফ্রন্ট জয়লাভের পর যুব কংগ্রেস নেতা প্রিয় হাসমুদী বলেছিলেন 'সি, পি, এম, কর্মীর 'স্বন্দর আচরণের' কথা। এই স্বন্দর আচরণই সি, পি, এম, কর্মীরা সর্বত্র করে চলেছে। তাই এই বামফ্রন্টের রাজত্বও কংগ্রেসীরা পাড়ায় পাড়ায় নিজেদের বশি মতন রাজনীতি করে চলেছে। ইন্দিরা গান্ধী গ্রেফতার হয়ে ছাড়া পাবার পরও দিনের পর দিন এরা রাস্তা অবরোধ করেছে। রাজনীতি করার অভিযোগে এদের কাউকেই পাড়া ছাড়তে হয় নি। এদের একটা অফিসও জবরদখল হয় নি। এই সরকার কমতার আসার কলে কুড়ি হাজার বামপন্থী কর্মী। আবার নিজেদের পাড়ায় ফিরে যেতে পেরেছে। কংগ্রেসীদের নিজেদের মধ্যে যে মারামারি চলছিল সেটাও এখন বন্ধ হয়েছে। কংগ্রেসীদের হাতে পুলিশ এবং প্রচুর অস্ত্র থাকায় তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে মারামারি করতো। সবাই জানেন

যে কংগ্রেসীদের নিজেদের মধ্যে মারামারির কলে কংগ্রেস এম, এল, এ চণ্ডীপন মিত্র খুন হন। এবার নির্বাচনের আগে কংগ্রেসীরা প্রচার করতে থাকে যে সি, পি, এম, জিতলে একজন যুব কংগ্রেসীও বাতী থাকতে পারবে না। এই বলে তারা বিপণ্যগামী যুবকদের ঘায়েল বাহাদুর সাল থেকে নানা অপরাধ কার্যে লাগানো হয়েছিল তাদের আবার নির্বাচনে রিগিং করতে প্ররোচিত করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এই সব অপপ্রচার এতদিনে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সি, পি, এম, কোন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার যায় নি। তাই কংগ্রেসীরাও আজ যে যার নিজ নিজ পাড়ায় অবস্থান করছেন শান্তিতে।

তেল ডাকাতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশকে দিয়েছে। এর এক তালিকা দপ্তরে, কাছে এসেছে। এই তালিকার উল্লিখিত ব্যক্তিদের নাম ও বহুদীর মধ্যে তাদের কর্ম-ক্ষেত্রের ঠিকানা দেওয়া হলো।

- ১। ভগবান সাউ (মোমিনপুর)
- ২। আচ্ছালাম
- ৩। বিজা সিং
- ৪। উকিল সিং (বেঙ্গলুরিয়া)
- ৫। রোজানা ট্রেডিং (আমড়াতলা)
- ৬। মায়ীরা (উত্তরপাড়া)
- ৭। বনোয়ারীলাল (সালকিয়া)
- ৮। অমরকাশ (বড়কাচার কুড়ু দিনেমার কাছে)
- ৯। দৌতলরাম (চেতলা)
- ১০। সুবর্জি (বোম্বে রোড)
- ১১। নন্দলাল (কাশীপুর)
- ১২। এস, কে, ট্রেডিং (শালিমার)
- ১৩। লালু শর্মা (উন্টাডালা)
- ১৪। জগদীশ দাস (ধর্মতলা)
- ১৫। ভিকু সাউ (কাকিনাড়া)
- ১৬। তারা (টালীগঞ্জ ইটখোলা)
- ১৭। শিউনারায়ণ পালোয়ান (শ্রীহর-রোড)
- ১৮। বিবিটাল (বোম্বে রোড)
- ১৯। মোহনলাল সিউবকস কোম্পানী (কালাকার ষ্ট্রীট)
- ২০। ওরিয়েন্ট ট্রেডস (চান্দনীচক)
- ২১। শিউনারায়ণ সাউ (বড়দা)

উল্লিখিত তালিকা পেশ করে সংশ্লিষ্ট মহল বলেছেন, বলা বাহুল্য এসব কাজকর্মের অন্ততম দলপতি হলেন রাজপথ গুপ্তা শিউনাথ গুপ্তা। এরাই আবার সরকারী খাতাপত্রে 'সরকারী কন্ট্রাক্টর'। কংগ্রেস আমলে এরা গভর্নমেন্ট কন্ট্রাক্টর হন। বামফ্রন্ট আমলেও এরা সেই কার-বারের সংগে সরকারী ঠিকদার হিসাবে কাজ চালাচ্ছেন। এসব বেপরোয়া চোরাকারবারীদের দমন করার মত শক্ত হাত কি একেবারেই নেই? এই প্রশ্নও প্রশ্নবহুল।

কংগ্রেসী বিবোধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নোটিশ প্রত্যাহার করে নিতে হবে অন্তর্দিকে তলবী পন্থীদের বস্তব্য ভলবী সভার নোটিশ প্রত্যাহার করা যেতে পারে একটি শর্তে, তা হচ্ছে কংগ্রেস সভাপতিকে ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হবে।

উভয় পক্ষই তাদের দাবী থেকে সরে আসতে চাইছেন না। যদিও চাবন, রজনী প্যাটেল প্রমুখ উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলে একটা সম-ঝোতার আসতে চাইছেন। এই আলোচনার ফলশ্রুতি হিসাবে উভয় পক্ষই আপাততঃ 'ধমকে' দাঁড়িয়েছেন।

এদিকে 'বার্গডে' ক্লাবের কিছু সদস্য এবং কয়েকজন প্রাক্তন এম পি ও এম এল এ মিলে একাধিক নামে একটি তৃতীয় গোষ্ঠী তৈরী করেছেন। এদের বক্তব্য সংগঠনের স্বার্থে এখনও ইন্দিরা গান্ধীর যথেষ্ট প্রয়োজন আছে তবে তারা ইন্দিরাগান্ধীকে একক নেতৃত্ব দিতে রাজী নন। রাজ্যসভার সদস্য আমজাদ আলী, ভি, এ, সর্দার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এখন দিল্লীতে উভয় গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলছেন।

আগামী বছর অক্টো, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও আসামে রাজ্য বিধান সভার নির্বাচন। এই নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে দ্বন্দ্বীর বিরোধ আবার যে কোন মুহুর্তে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। সম্ভ্রতি দাক্ষিণাত্য সফরে বিপর্যস্ত ইন্দিরা গান্ধী নতুন করে কৌশল রচনা করছেন পরবর্তী অভিযানের জন্ত।

ইন্দিরা গান্ধী যে কোন প্রকারে দলকে কজার রক্তে পুরোপুরি তার ইচ্ছামত পরিচালনা করতে চান। বর্তমানে দলপরিচালনার ব্যাপারে কংগ্রেস সভাপতি রেড্ডী ও লোক-সভার বিরোধী নেতা ওয়াই বি চাবন কেউই ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে পরামর্শ করছেন না। বিশেষতঃ ইন্দিরা গান্ধী যখন জনতা সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক জেহাদ ঘোষণা করার কথা বলছেন, তখন রেড্ডী ও চাবন 'ধীরে চলো' নীতি নিয়েছেন। এতে, ইন্দিরা গান্ধী খুব অসন্তুষ্ট।

বর্তমানে ইন্দিরাগান্ধীর সমর্থকরা কংগ্রেসের সামন্তরাল ভাবে কাজ চালিয়ে যাবার সিকান্ত নিয়েছেন। রাজ্যে রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছে নতুন নতুন সংগঠনের নামে। তার মধ্যে অন্ততম কংগ্রেস যুব কোরাস।



ইন্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

প্রস্তাব আহ্বান করছে

ইন্সট্রাক্টর ড্রাইভেজ

রেফা: এসআর ই ই (সি) ছয়/২০/৭৭/৭২ তারিখ ২৪, ১০, ৭৭

প্রথ্যন্ত, নির্ভরযোগ্য এবং অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে সীল করা টেণ্ডার লুহোয়ার কাছে নাকরাকোণ্ডা খনিতে সারকেন্স থেকে বনবোহাল সীম পর্যন্ত ইন্সট্রাক্টর ড্রাইভেজ প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী সম্পূর্ণ করার জন্ত। বিবরণ, অাপ. সম্পূর্ণ করার পর আয়তন, অস্থায়িত দৈর্ঘ্য, এবং বায়নার টাকা নিম্নরূপ :-

(১) মেন ইন্সট্রাইন, ১ ইন ৪,৪'৫" x ২'৫" এম, ১৩০ এম এবং ৩,৫০০ টাকা (২) অঞ্জিলিয়াসী ইন্সট্রাইন, ১ ইন ৭'২,৪'৫" x ২'৫", এম, ১৮০ এম এবং ৫০০০ টাকা। অঞ্জিলিয়াসী ইন্সট্রাইনে আরও থাকবে-একটি ক্যান-ড্রাকট/ভেটিলেসনের জন্ত পিট। স্ট্রীট পাশ করতে হবে কোল সীম পর্যন্ত যা প্রধানত মাটি, বালি, মোরাম, ওয়েস্টার্ড ও আন-ওয়েস্টার্ড বালি পাথর, গ্রে-শেল প্রভৃতি দিয়ে তৈরি।

টেণ্ডারপত্র ও নিয়ম কাছন সহ অস্ত্রান্ত বিবরণ জেনারেল ম্যানেজার, বাকোলা এগ্রিয়া, পো: বাকোলা, জেলা বর্ধমান-এর অফিস থেকে প্রতি সেটের জন্ত ২৬.২৫ টাকা নগদে দিয়ে (অপ্রত্যাশ্রয়যোগ্য) যে কোন কাজের দিনে অফিসের সময়ে পাওয়া যাবে। টেণ্ডারের হলিলপত্র ১.১২.৭৭ থেকে ১৪.১২.৭৭ তারিখ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। ১৫.১২.৭৭ তারিখে বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ করা হবে এবং ৩ দিন বিকেল ৪টার জেনারেল ম্যানেজারের অফিসে উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতা অথবা তাদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেণ্ডার খোলা হবে। কাজ সম্পূর্ণ করার সময় ৬ মাস। বায়নার টাকা ছাড়া টেণ্ডার বাতিল করা হবে।

বিশ্বরূপার অন্দর-মহল নাটকের

আরও কাহিনী : বাবু এখন প্রগতিশীল হতে চাইছেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিশ্বরূপার অন্দরমহলের নাটক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ফাঁস হয়ে পড়ায় হলের কর্তা রাসবিহারী সরকার ওরফে ছোটদা ওরফে 'বাবু' এখন বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠেছেন। তাঁর অপকর্ম দর্পণ বের করে দেওয়ায় তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়েছে বিশ্বরূপার সাধারণ কর্মীদের ওপর। কয়েকজনকে ভেঙে বাবু খুব ধমকও দিয়েছেন। এখন খোঁজ চলেছে কে এই খবর ধর্পণকে দিয়েছে।

এদিকে সাধারণ কর্মী ও শিল্পীরা পুরো ব্যাপারটাতেই তথ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবী করেছেন। এরা বলেছেন নাট্য ও সংস্কৃতির প্রতি বর্তমান সরকার যে উদ্বলনীয় নয় তা দেখাবার জন্যও অন্তত তথ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। সাধারণ কর্মী ও শিল্পীদের প্রতি বাবুর অকথ্য অবিচার হজম করার মানেই

হল তার অপকর্মকে মেনে নেওয়া। মহিলা শিল্পীদের প্রতি বাবুর ক্ষত-জনক ব্যবহার নিয়েও তব্বন্তের দাবী আছে। কর্মীদের মোটামুটি বক্তব্য, বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষ এই হলটিকে ব্যবসার কেন্দ্রস্থান করে নানা অনাচার চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে কারও কোন প্রতিবাদ করার খোঁজ পর্বত নেই। কর্মীদের মধ্যে নিজের কিছু সাক্ষরও ছড়িয়ে রেখেছেন বাবুর মধ্যে নারায়ণবাবু, বুকিংয়ের সাতকড়িবাবু বাবুর নানা অপকর্মের স্মরিক। কর্মীদের অভিযোগ, কিছুদিন আগেও 'বাবু' কংগ্রেস মাতব্বরদের হাজার হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে বিশ্বরূপার মঞ্চে অলীকতার চড়াই করে ছেড়েছেন। শেকালী, ভেরোনিকার হলবল ঘিনের পর ঘিন নাটকের বিনা প্রয়োজনে নরনারী প্রদর্শন করে গেছেন। এখনও সেই অবস্থা। কতকগুলি তথাকথিত ইনোশনাল দৃষ্টে কতিপয় মহিলা শিল্পী যেভাবে গা থেকে কাপড় ছেড়ে রুমময় হাপাহাপি করে বেড়াচ্ছেন তা আর মাই হোক নাটকের প্রয়োজনে নয়। এর ওপর রয়েছে একটি অপ্রয়োজনীয় দৃষ্টে দেবিকার উল্লেখ নৃত্য। এই ধরনের আগেকার বইতে ছিলেন শেকালী। পার্কার্কারদের বাড়ীতে বাবুর আনাগোনা তো ছিলই। উপরন্তু মধ্য-রাজিতে বাবু শেকালীর বাড়ী থেকে, বেরোচ্ছেন এমন দৃষ্ট আকছার দেখা গেছে। এখন দেবিকার সংগেও বাবুর ঘনিষ্ঠ মেলামেশা। বইয়ের প্রয়োজন থাকুক আর নাই থাকুক তাই দেবিকা প্রতিটি শো-তেই তার উল্লেখ নৃত্য প্রদর্শন করতে পারছেন। কলকাতার একটি বিশেষ হোটেলের জ্যাকলীন নামে জনৈক ক্যাবারে শিল্পীর জন্তও নাকি প্রচুর টাকা এই বিশ্বরূপা থেকে যাচ্ছে।

কর্মীরা বলতে চান, নাটকের নামে এখানে বা চলছে তা এককথায় নোংরামো। হলের ভিতলকক্ষে মিঠু নামে জনৈক মহিলাকে নিয়েও নানা গুণ্ডাম। বুড়ীটি একটি মঠে থাকেন। বাবু এখন তাকে নিয়ে পড়েছেন। মাঝে মধ্যে জনৈক ভারী সাধুবাবা আসেন। তখন অবস্থা আরও মারাত্মক হয়ে ওঠে। ভারী সাধুবাবা কিছুপর্বে ভিন 'ম' রের খুবই প্রয়োজন। এর তিনটিই সরকারের দায়িত্ব নিয়েছেন ছোটদা

ওরফে বাবু।

কর্মী ও শিল্পীমহলের অভিযোগ বাবুর বখেছাচারে তাঁরা অতিষ্ঠ। বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় নিজের হাজারো অপকর্ম ঢাকার অপচেষ্টায় বাবু এখন "প্রগতিশীল" হতে চাইছেন। দর্পণের সংবাদ প্রকাশিত হয়ে পড়ার পরেই বাবু তার সাক্ষরদের বলেছেন আর নয়, এবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই করবো। কিন্তু সবাই জানেন দুঃস্বাদ ছলের অভাব হয়না। বাবুর বাতাকলে দুর্দশাগ্রস্ত কর্মীদের বাচানোর কোনও পথই কি সরকারের নেই?

ঘাটাল শ্রীম নেভিগেশন কোম্পানীতে প্রচুর গণ্ডগোল : কর্মীরা নিয়মিত মাহিনা পান না

(দর্পণের সংবাদদাতা)

[ঘাটাল শ্রীম নেভিগেশন কোম্পানী একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, প্রায় ১২১৬ জন শেয়ার হোল্ডার— বেশীর ভাগই ঘাটাল বা তৎসংলগ্ন এলাকার অধিবাসী। অথচ কলকাতার বর্তমান ডিরেক্টর শ্রীকেশ শর্মাচার্য ও গুরু দুই ভাই এমনভাবে কোম্পানীটি পরিচালনা করে যাচ্ছেন তাতে মনে হয় এটি গুপের গৈরিক সম্পত্তি। প্রতিটি শেয়ার হোল্ডারকে পুরোপুরি তাল্লি ও অবজ্ঞার চোখে দেখা হয় এবং ১৯৭৩ সালের পর কোনরকম মিটিং হচ্ছে না। কোম্পানী নিয়মে কিছু আছে (১৬৬ ধারা) প্রতি ১৮ মাস ছাড়া অবশ্যই মিটিং ডাকতে হবে।

সেই মাহাতার আমল থেকে দুটি লক্ষ। সোনায় বাংলা ও ভিক্টরী/কল্যাণী বোট সহ প্রথমোক্ত ডিজেল চালিত লঞ্চটির প্রায় বছরে সারা-কশই মেরামতী চলে ও বছবার বাধাঘাট-আহিরীটোলা পারাপারের সময় মাজীসহ বিপজ্জনক অবস্থায় ভাসে। অথচ এই লঞ্চটির ড্রাইভার ডিরেক্টরদের নানা কুকীর্তির সহচর বলে কোনো শাস্তিই হয় না, বরং কোম্পানী থেকে তার থাকার ঘর-ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। সেখানে সে কালের সময়ও জ্যোতিষচর্চা ও নানারূপ রত-ভারমার লিঙ্গ থাকে।

রাজনীতিও করে। বর্তমান ডিরেক্টররা যখন তখন বেআইনীভাবে টাকা নিয়ে নেন যার ফলে কর্মীরা ঠিকমত মাইনে পাচ্ছেনা। বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে দেনা প্রায় ২০,০০০ টাকা ও অন্তান্ত সরবরাহকারীরা প্রায় ১৮,০০০ টাকা পাবেন। এ ছাড়াও টেলিফোন, লাইট, ইত্যাদি বিল ঠিক সময়ে দেওয়া হয় না। কর্মীদের ২ বছর বেতন বাড়েনি, তারা দেবার কমিশনারের অফিসে দরবার করেছেন— ধর্মঘটের নোটাশ দিয়েছেন। তাই সরকারী কর্তৃপক্ষও ক্ষুব্ধ।

ডিরেক্টররা অথবা মামলা মোকদ্দমার পথে গিয়ে কোম্পানীর বহু টাকার ক্ষতি করে চলেছেন। ঘাটালের শ্রীময়ারাম সিংহরায় ৩০ বছর যাবৎ কোম্পানীর ম্যানেজার হিসাবে কাজ করার পরও কোমোস্তপ গ্র্যাচুইটি না নিয়েই রিটায়ার করতে বাধ্য হয়েছেন। বর্তমান ম্যানেজারও ঘাটালের। কোম্পানীর ভাইরেক্টরদের কুকীর্তি লম্বন না করার তাকেও সরানোর চেষ্টা হচ্ছে।

এই কোম্পানী একটি লাভজনক ব্যবসা হওয়া সত্ত্বেও শেয়ার হোল্ডাররা কোনও ডিভিডেণ্ড পাচ্ছেন না। অধিকাংশ শেয়ার হোল্ডার ডিরেক্টরের কর্মতা কেড়ে নিয়ে অশাসক

নিয়োগের দাবী আনিয়েছেন। এই কোম্পানীর দুর্নীতি সম্পর্কে আরও নানা অভিযোগ জানিয়ে কেন্দ্রীয় আইন ও কোম্পানী বিষয়ক মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে প্রতিকারের আশায়।

দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের দাবী

রোডেশিয়ান জাতীয় দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের সশস্ত্র বাহিনী 'জিপা' (জিহাবী পিপলস আর্মি) দাবী করেছে যে, গত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাদের গেরিলারা ৫৯ জন রোডেশিয়ার সরকারী সৈন্য ও পুলিশকে হত্যা এবং অন্তান্ত ১০ হাজার ৪৮ জনকে আহত করেছে।

জিপা আরও জানিয়েছে, এ সময়ে রোডেশিয়ার যুক্তি বাহিনীরা পাঁচটি হেলিকপটার গুলী করে ক্ষুণ্ণিত করেছে এবং পাঁচটি প্রধান সেতু উড়িয়ে দিয়েছে। চারটে টেলিফোন বোটও এর মধ্যে ভুবিয়েছে। এ সময়ে তাদের অন্তান্ত কার্যকলাপের মধ্যে ৭৭ মিটার রেলপথ এবং ৭২টি ট্রাক সংস্কার কৃত্রিমও রয়েছে।

হাওড়া শিবপুর থানা এলাকায় দোকান লক আউট

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হাওড়া শিবপুর থানা এলাকায় এখন পরপর সাতটি হোটেল দোকান রেইরেট বন্ধ। পুজার আগে থেকেই সংশ্লিষ্ট দোকানদের মালিকবৃন্দ এগুলি বন্ধ করে দেন। ফলে প্রায় একশোজন কর্মী বেকার। ওয়েষ্ট বেঙ্গল সপ এণ্ড এসটার্লিসমেন্ট এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশনের বোকাল কমিটির সেক্রেটারী জিয়ারী ভট্টাচার্য জানান, কর্মীদের অনাহারের মুখে ঠেলে দিয়ে যুল দাবী এড়ানোর জন্যই মালিকগোষ্ঠী দোকানগুলিতে লকআউট ঘোষণা করেছে। ভ্রষ্টাচারের দাবী প্রদর্শনের অবিলম্বে এ ব্যাপারে ফরাল্লা করে মালিকপক্ষকে লকআউট প্রত্যাহার করতে বাধ্য করুন। সাধারণ কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের অর্থ সঠিকভাবে উপার্জিত হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে ব্যাপক তদন্ত হওয়া প্রয়োজন কেননা সংশ্লিষ্ট দোকান রেইরেট মালিকদের উপার্জিত অর্থ নিয়ে নানা মহলে নানা কথা শোনা যাচ্ছে। কর্মীরা চান বামফ্রন্ট সরকার তাদের এই আবেদন শুধু সহকারে বিবেচনা করবেন।

হিন্দুস্থান লিভারের কার্যকলাপ জাতীয় স্বার্থের বিরোধী : কর্মচারীদের প্রতিও বঞ্চনা

(বিশেষ সংবাদদাতা)

সংবাদপত্র ও অন্যান্য জন-সংযোগের মাধ্যমে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ ভারতীয় নাগরিকবৃন্দকে ১০ টাকা মূল্যের ৩২৬০১৪৭টি নতুন ইকুয়িটি শেয়ার, শেয়ার পিছু ৬ টাকা প্রিমিয়মে বন্টন করার আহ্বান জানিয়েছে। শুধুমাত্র এই বিষয় নিয়েই কোম্পানী একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে নতুন শেয়ার গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই কোম্পানীর প্রকৃত চরিত্র কি এবং কি ভাবে এরা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে সে কথা জনসাধারণের জানা দরকার।

কোম্পানীর চরিত্র

১৯৫৬ সনে ২৪ কোটি টাকার পেইড-আপ মূলধন নিয়ে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের পত্তন হয়। এই আন্তর্জাতিক দৈত্য, যা ইউনিলিভার নামে পরিচিত বর্তমানে শতকরা ৮৫ শতাংশ শেয়ারের অংশীদার। নাম-মাত্র ১৫ শতাংশ শেয়ার ভারতীয়দের হাতে ছাড়া হয়েছে। কোম্পানীর

বর্তমান মূলধন ১৬৮৫ কোটি টাকা—গত ২০ বৎসরে লভ্যাংশ মূলধনী-কৃত করে সাতগুণ করা হয়েছে ১৩৬ কোটি টাকার বোনাস শেয়ার বাজারে ছেড়ে। উল্লেখ্য গত ২০ বৎসরে এর উপরে লগুনস্থ মালিকদের ২৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে যা ১৯৫৬ সনের থেকে দশগুণ বেশী। অন্য কোন সংস্থা ভারতের মাটিতে বসে ভারতীয় অর্থ এমনভাবে লুট করতে পারে নি। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—আমরা, ভারতবাসীরা এতটা কি বহন করতে সক্ষম?

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ—ছিল কোম্পানী যেন ১৯৭১ সনের ১লা জুলাইয়ের ভেতর বর্তমান ৮৫ শতাংশ ইকুয়িটি মূলধনকে ৪০ শতাংশে কমিয়ে আনে। কিন্তু কোম্পানী রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আবেদন করে এটা ৫১ শতাংশ ধার্য করতে অস্বমতি চেয়েছে। আমরা এটা মোটেই যেনে নিতে পারি না, কারণ এটা সর্বতোভাবে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

কোম্পানীর মিথ্যা দাবী

কোম্পানীর প্রচার পুস্তিকার দাবী করা হয় (১) কর্মচারীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের খুব ভাল সম্পর্ক; (২) বেতন ও অন্যান্য সুবিধা সমপরিমাণের অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে তুলনীয়; (৩) বেতন, বৃদ্ধির দাবী প্রমিকদের স্বার্থে আদালতে স্থানান্তরিত হুতরাং এর সর্বশেষ দায় যদি কিছু কোম্পানীর উপর বর্তায় তাতে কোম্পানীর বিশেষ কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। পশ্চিমবঙ্গে কোম্পানীর প্রমিকদের সংগঠন ইষ্টার্ন জোন অফ দি কেডারে-শন অফ হিন্দুস্থান এণ্ড/অর ইস এসোসিয়েটেড/এলায়েড কোম্পানী এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কোম্পানীর এই সব দাবীর প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। তারা আরো বলেছেন বাজারে শেয়ার ছাড়বার পূর্ব মুহূর্তে জন-সাধারণের চোখে ধুলো দেবার জন্যই এই প্রচেষ্টা এবং যা সত্যের অপলাপ-মাত্র। কার্যতঃ কোম্পানীতে বর্তমানে প্রমিকদের সঙ্গে যে সম্পর্ক তাতে

বর্তমান ম্যানেজমেন্ট লক্ষ্য ও দিকারের পাছ বলে বিবেচিত হচ্ছেন। আর্থিক অনটনের দরুন আমরা কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকার প্রমিক-বিরোধী ও জাতীয়তা বিরোধী কার্যকলাপের পূর্ণ বিবরণ প্রচারে সক্ষম নই, তবুও সোচ্চার হবো যে কোম্পানীর উপরোক্ত সু-সম্পর্কের দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

(১)—বিগত পাঁচ বৎসর ধাবৎ ইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ নানা ভাবে হরষাণ হচ্ছেন—তদন্তাধীন অরস্বায় বরখাস্ত, মিথ্যা অভিযোগ, উদ্বেষ্টমূলক স্থানান্তরণ, (মিথ্যা অভিযোগ যা আদালত পর্যন্ত প্রমাণিত করা হয় নি) বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ ইত্যাদি এর অন্ততম প্রক্রিয়া। শোকজ নোটিশ, চার্জ-শীট, নানা ভাবে ভীতি প্রদর্শন প্রমিক কর্মচারীদের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটবে। বিভিন্ন আদালতে, হাইকোর্টে, লেবার কোর্টে বা প্রমিক আদালতে বর্তমানেও আমাদের অনেক মামলা চলছে। ১৯৭৭-এর এপ্রিল মাসে শেষ অল্প হিসাবে বোম্বে ফ্যাক্টরীর ৩,০০০ হাজার প্রমিক কর্মচারী ৩০ দিনের ধর্মঘট করতে বাধ্য হলেন, তবেই তাদের দীর্ঘদিনের দাবী দাওয়ার একটা কয়লা হোল। কাজেই কোম্পানীর এই সু-সম্পর্কের কথা যে

কৃত বড় মিথ্যা এবং উদ্বেষ্ট প্রণোদিত ভাণ্ডা তা সহজেই অস্বপ্নের।

(২) কর্মচারী ও প্রমিকদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি আই-সি-আই, টাটা, ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক, ম্যাক্সো, ম্যাকনেল মেগর ইত্যাদির সঙ্গে মোটেই তুলনীয় নয়। তদুপরি গার্ডেনরীচ ও শ্রামনগর কারখানা ও কলকাতা শাখা অফিসের কর্মচারীরা দেশের অন্যান্য অংশের কর্মচারী বা অফিসের চেয়ে মাসে ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা কম মাইনে পান। অথচ কোম্পানী স্বীকার করে মাদ্রাজ, বোম্বাই বা দিল্লীর চেয়ে পশ্চিম-বাংলার কর্মচারীদের দক্ষতা অধিক।

(৩) পশ্চিমবঙ্গ দিল্লী ও মাদ্রাজের কর্মচারীরা সেলস শাখার বহু কর্মচারী সমেত দাবী সনদ নিয়ে ১৯৭৪ সালের গোড়া থেকে আন্দোলন করছেন। এমারজেন্সীর সুযোগে কোম্পানী প্রমিকদের এক-তরফাভাবে ভাষা যজুরী ও বেতন ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করেছে অথচ এই কোম্পানী নির্লজ্জভাবে বলাচ্ছে তারা কর্মচারীদের ভাষা-দাবী নির্ধারণের ভার আদালতকে ছেড়ে দিয়েছে।

কোম্পানীর ব্যবসা ও মুনাকার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সত্ত্বেও নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান প্রাণধানযোগ্য—কি ভাবে ঠিকাদারী প্রথা ও স্থায়ী কর্ম-চারীদের হ্রাস করা হয়েছে—

সর্বভারতীয় প্রমিক সংখ্যা

স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট
১৯৬৪	৭৮০০	১৫০০
১৯৭৪	৬৪১০	১২০০

শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান, হওয়া সত্ত্বেও (বেকারের সংখ্যা বেধানে পাঁচ লক্ষাধিক) ১৯৭৪ এবং ১৯৭৭-এর মধ্যে ২৩ জন উদ্ভূত ঘোষিত সমেত ১৫০ জন স্থায়ী প্রমিককে (১৫ শতাংশ মোট) স্থায়ী ভাবে কমান হয়েছে।

তামিলনাড়ুর অন্তর্গত তিরুচিরা-পল্লীর কারখানা বন্ধ করা কোম্পানীর নির্জলা মিথ্যা ভাষণের এক প্রকট উদাহরণ। ১৯৭৪ সালে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে ৩০০ প্রমিককে কর্ম-চ্যুতি করা হয়। কোম্পানীর প্রচার পুস্তিকার এই বক্তব্য কোম. সঠিক কারণ দর্শান হয় নি। অত্যাধিক কর্ম-চারীদের সমস্ত আবেদন নিবেদন কর্তৃপক্ষের দ্বারা টলিতে পাঠে নি।

বনমল্পীর সঙ্কল্প রূপায়ণে পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি

বনভূমি ও বনজ সম্পদের বহুখণী উপযোগিতা ও বনভূমি ও সম্পদ-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাপক কোন প্রচারের ব্যবস্থা আমাদের দেশে আজও অসুপস্থিত। আয়-তনের অসুপায়ে দেশে বনভূমি ধাকা আবশ্যিক বনবিভাগের অজিহাশতাব্দী পার হয়ে যাওয়ার পরও তার দুই-তৃতীয়াংশ ঘাটতি রয়ে গেছে। হুত্যাগের কথা এই ঘাটতি পূরণের জন্য আজও কোন সার্বিক উদ্যোগ দেয়া যাচ্ছে না। প্রশাসনিক পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ বলে ধারা দাবী করেন তারা নিজেদের ধোঁয়াশা সতো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অজস্র অর্থব্যয় করেও দেশের মানুষের বনসম্পদের চাহিদা ও বন-ভূমির ঘাটতি পূরণ করতে পারছেন না এটাই বাস্তব সত্য। এর কলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য তার স্থিতি-শীলতা হারিয়েছে, পরিবেশ হয়েছে দূষিত, অবাধ ভূমিকম্পের কলে নদী নালী জলবহনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, দেশ ধরা ও বস্তার শিকারে পরিণত হচ্ছে, নরোপরিভূমিকমলে ঘটছে নিদারুণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া। প্রশাসকবর্গের পারস্পরিক ক্রন্দ, আত্ম-

স্তম্বিতা, অপরিণামদর্শিতা ও দুর্নীতি-পরায়ণতা বনপ্রশাসনকে সম্পূর্ণ বিলম্বিত করে গেছে। প্রান্ত-স্বত্বাধীনতা পরিবর্তনে ক্রমাগত অস্বীকৃতি পরিস্থিতিতে জটিলতর করে তুলেছে। এই সবকিছু সত্ত্বেও বনবিভাগের আর্থিক ব্যবস্থার কোন প্রকার আলোচনা ব্যতিরেকে সিলোটিং প্রয়োগেই পাশ হয়ে আসছিল।

বর্তমান মন্ত্রিসভার আমলেই সর্বপ্রথম বনবিভাগের ব্যবস্থার মজুরীর ক্ষমতা পেশ করতে গিয়ে বনমন্ত্রী বনভূমির কার্যকারিতা, সেই সম্পর্কে গবেষণা, সমীক্ষা ও প্রচার প্রকল্প রূপায়ণের অপরিণীম গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। বঙ্গপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপরও তিনি বধ্যাধ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বনভাষ্যের নির্বাসিত বনকর্মচারীরা যে বিপদসঙ্কলিত ও বিরাট ঝুঁকি নিয়ে দেশের বনসম্পদ রক্ষায় ব্যাপৃত রয়েছেন তাদের কর্ম-জীবনের দুর্দশামোচনের প্রতিক্রিয়া দেওয়ার পাশাপাশি বনপ্রশাসনে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ বন্ধ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তা সত্যিই

অভিনন্দনযোগ্য। বনসম্বলিত অঞ্চলের অধিবাসীদের আর্থিক দৈন্য দূরীকরণের জন্য বনজ-সম্পদ নির্ভর শিল্প গড়ে তোলার ঘোষণা নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই শিল্প গড়ে তোলার ঘোষণাকে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়িত করলে বনসম্বলিত অঞ্চলের অন্ত্যস্ত দরিদ্র ও তপশীল জাতিভুক্ত মানুষের কটিকঠির সংস্থান হবে, সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যের তাড়নায় বনসম্পদ অপহরণের যে প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে তাও অনেক পরিমাণে হ্রাস পাবে। বনভাষ্যের নিয়োজিত কর্মচারীদের সমস্তাবলী সম্পর্কে বনমন্ত্রী সচেতন এবং অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন—তার এই সহায়ত্বভূমিতল অভিব্যক্তি কর্মজীবনে হতাশাগ্রস্ত কর্মচারীদের নিঃসন্দেহে আশাবিত্ত করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সাবডিনেট করেট সার্ভিস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বর্তমান বনমন্ত্রী তাঁর খুব কাছের জটিকরেক. মানুষের প্রকাবসুজ হয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বাজেট ভাষণে

ঘোষিত লক্ষ্য পরিপূরণের জন্য অগ্রসর হয়ে সাধারণ মানুষের বন-সম্পদের উপর চাহিদা পরিপূরণ, বনসম্বলিত অঞ্চলের অধিবাসীদের কর্মসংস্থান, কর্মচারীদের আন্ত ও জরুরী দাবীদাওয়া পূরণ এবং সরো-পরি আবহাওয়ার ভারসাম্য পুনঃ প্রতিষ্ঠাসহ ভূমি অবক্ষয়রোধ ও পরি-বেশকে কলুষমুক্ত করার বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করবেন। বনমন্ত্রী বাজেট ভাষণে সাধারণ বনকর্মচারীদের প্রতি যে সম্বোধন প্রকাশ করেছেন (যা অধিকাংশ কাগজেই প্রকাশিত হয় নি) তার জন্য আমরা তাকে আন্ত-রিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দুর্নীতি-মুক্ত বনপ্রশাসন গড়ে তোলার যে সঙ্কল্প তিনি ব্যক্ত করেছেন তাকে সফল করে তোলার জন্য আমরা পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। এই প্রসঙ্গে আমরা পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী বননীতি প্রবর্তনের স্বার্থে বিশিষ্ট নাগরিক, সংবাদপত্র ও বিভিন্ন গণসংগঠনের আন্তরিক সহযোগিতা কাঙ্ক্ষা করছি।

এক সরদারের চাঞ্চল্যকর কাহিনী

(বিশেষ প্রতিনিধি)

হুমায়ুন এলাকার গোসা বা এখান একটি সুপরিচিত নাম। এই গোসা-বার একমাত্র সিনেমা হলটির মালিকের নাম বীরেন সরদার। গোসা-বার আরামপুরে তাঁর বাড়ী। ১৯৭৪ সাল থেকে তিনি তাঁর আধুনিক ছোটলা বৃহৎ বাসভবনটি তৈরী করছেন কলকাতার কন্সট্রাক্টর দিয়ে। এখানকার লোকে যে বলে তাঁর মত ধনী এখানে খুব কমই আছে তা এ ব্যাপার থেকেই কিছুটা আঁচ করা যায়। তবে তাঁর বাবার মতই তিনিও ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে খুব একটা বিশ্বাস করেন না। তাই তাঁর নগদ টাকার হিসেব করা খুবই শক্ত। কিন্তু এলাকার সবচেয়ে ধনী মাহবুবুলোর মধ্যেই যে তিনি পড়েন একথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করে।

কেমন করে বিরাট সম্পত্তির তিনিমালিক হলেন সেটা জানা খুবই কঠিন ব্যাপার। এখানকার লোকে বলে ১৯৬৫ থেকে ৬৭ সাল—এ দু' বছর চালের ব্যবসা করা ছাড়া বীরেনবাবুকে আর কোনও রকম কাজকর্ম করতে কেউ দেখেনি। শুধু কি করে এমন বিপুল ব্যয়ে এতবড় বাড়ী করান, কেমন করে সিনেমা হলের মালিক হলেন, প্রকৃত সম্পত্তি তাঁর কত এসব কিছু রহস্যবৃত।

রহস্যের স্বরূপাত তাঁর বাবা প্রবোধ সরদার থেকে। ১৯৭৬ এর ২১ ডিসেম্বর ১২৪ বছরে তিনি মারা গেছেন।

প্রবোধ সরদার ছিলেন একজন এ দেশীয় ষ্টান। বাড়ী ছিল ক্যাণ্ডাপুরের ফুলবাড়ি এলাকায়। খুব অল্প বয়সে কি কারণে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েন। তারপর বাহা এলাকায় আসেন। বাসভূমি এলাকার সম্মুখভাগে মিলেদের বাড়ীতে রাখাল হয়ে তিনি তার কর্মজীবন শুরু করেন। সে সময় গোসাবাতে বন কেটে আবাদ শুরু হয়েছে। নতুন বাঁধ বাঁধা হচ্ছে। ভাগ্যান্বেষী প্রবোধ সরদার সেই বাঁধ বাঁধার কাজে যোগ দিলেন। সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন আর তাতেই পছন্দটি ঘটে গেল। হিসেব রাখার তার পছন্দ তাঁর উপর। এই হিসেবের কাজকর্ম থেকে উপরি আর হত কিনা বলা শক্ত। তবে হলেও তার পরিচালনা অতি নগণ্য।

হ্যাঁমিলটন সাহেব তাঁর গোসা-বার প্রত্যেক পরিবার গিল্ল ২৫ বিঘা করে জমি দেবার ব্যবস্থা করেন।

প্রবোধ সরদারও পেয়েছিলেন ২৫ বিঘা জমি। কলকাতা হবার অল্প-হাতে তার খাজনা মাপ করিয়ে নেবার কথা শোনা যায়। ২৭ বিঘার মত জমি সাহেবকে লুকিয়ে তিনি কিনে ফেললেন। অবশ্য গোসা বা এন্টেটের ম্যানেজার স্বধাও মজুমদার কিছু একথা সেনেও চূপ করে ছিলেন। মেয়েদের পড়ানোর মাম করে সাহেবের কাছ থেকে আরও জমি তিনি আদায় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আসল খেল শুরু হল সব-বায় ব্যাংক চালু হবার পর।

কাছাকাছি এলাকা থেকে মহা-জনেরা এসে গোসাবার তাহের কার-বার চালাত। ব্যাপারটা হাবিজ-টনের নজরে আসতেই তিনি তাদের গোসাবার আসা নিষিদ্ধ করে দিলেন। প্রজাদের সুবিধার জন্য সববার ব্যাংক চালু করা হল যাতে প্রয়োজনে তারা এই ব্যাঙ্কের কাছে ধার পায়। এক এক এলাকায় এক একজন মোড়ল ঠিক করে দেওয়া হল। কার কত ঋণ প্রয়োজন, কাকে কত ঋণ মঞ্জুর করা যেতে পারে, তা সুপারিশ করবেন এই মোড়লরা। প্রবোধ সরদার তাঁর এলাকা আরাম-পুরে (খুটানপাড়া বলে বার পরিচয়) এমনি মোড়ল হলেন। আর তারপরই তাঁর কপাল বলে গেল। সামান্য কিছুদিনের মধ্যে তাঁর আত্ম লুপ্ত হল কলমাসা।

এন্টেটের ম্যানেজার স্বধাও মজুমদারের কিছু তোষামুদে দাবাজ ছিল। মজুমদার মশাই এদের মুখেই ঝলি খেতেন। নরক কয়াল শব্দে, প্রবোধ সরদার প্রকৃতিরা ছিলেন এই ধরে। এঁরা বার নায়ে বা রিপোর্ট দিতেন, সেটাই সত্য বলে গৃহীত হত আর ম্যানেজারও তেমন তেমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। তার ফলে প্রামের মাহিমরাও এই সব 'কোটনা নাপিত'দের দস্তরবস্ত ভয় পেত। এমন একটা অবস্থায় উঠে এসে প্রবোধ সরদার তাঁর পূর্ণ স্বযোগ গ্রহণ করলেন।

হয়ত কোনও ব্যক্তির নামে ব্যাংক থেকে ঋণের টাকাটা তুলে নিতেন সরদার মশাই। টাকাটা কিন্তু উক্ত ব্যক্তির হাতে এল না। ঐ টাকাটাই উক্ত ব্যক্তির কাছে জমা হলে (মতকরা ২৫) বার ছিলেন সরদার মশাই। দাবাজান থেকে হুদের টাকাটা হল তাঁর নিবেশ। আর। পদ্ধতিটা কয়েকই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠতে

লাগল। চাবীর বে টাকা হরকার তার চেয়ে অনেক কম টাকা সুপারিশ করতে লাগলেন সরদার মশাই। বাকী টাকাটা ঐ সরদার মশাইয়ের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হল চাবী।

প্রত্যাহার চূড়ান্ত হল তাঁর আমাই গিরীশ সিংহের ব্যাপারের মত ব্যাপারগুলোয়। গিরীশ সিংহ একবার তাঁর মতের কাছ থেকে তিনশ টাকার মত ঋণ গ্রহণ করে-ছিলেন। সেই ঋণ শোধ করার জন্যে চাবীর কলম তোলায় পর খামার থেকে কাঁটা আর কুলো নিয়ে তাঁকে ঘরে কিয়েতে হল। তারপর দেখা গেল ব্যাংক থেকেও তাঁর কাছে নোটিশ এসেছে, তিনশ টাকা ঋণ শোধ করার জন্যে। এই গিরীশ সিংহের ঘর একবার আগুন লেগে পুড়ে যায়। তাঁর সহকর্মীরা রাতে রাতে বেগার দিয়ে ঘর তুলে দিয়ে-ছিলেন। কিন্তু তাঁর মতের প্রবোধ সরদার তাঁকে একটি পরমা দিয়েও সাহায্য করেন নি। সে স্তম্ভ কাহিনী।

এমনি করে আরামপুরের প্রায় সকলের কাছ থেকে প্রবোধ সরদার জমিজমা হুকিগত করে নিলেন। শোনা যায় নগদ টাকা তাঁর নিজের লিফ্টে থাকত। প্রয়োনে খাতা তিনি রাখতেন না। সেয়ানা মাহবুবি বছরের গোড়াতেই নতুন খাতা করে পুরোনো খাতা পুড়িয়ে দিতেন। শেষ বয়সে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পর্যাগত ছিলেন তিনি। তাঁর লিফ্টকটিতে একমাত্র বীরেন সরদারের ঐ হাত দিতে পারতেন বলে শোনা যায়। সে লিফ্টের অবস্থা কি হয়েছিল তা আর জানা যায় না। আর তাঁর জমির হিসাব তাঁর জীবিত কালেই স্বযোগ্য পুঞ্জেরা যে ভাবে তৈরী করেছে তাও উদ্ধার করা শক্ত। শোনা কথা থেকে কিছু কিছু উদ্ধেয় করা যেতে পারে।

প্রবোধ সরদারের ৮টি সন্তান— ৩টি পুত্র এবং ৫টি কন্যা। এর মধ্যে দুই কন্যা সহাসিনী এবং শিবর-কাসিনী এবং এক পুত্র সুপাল মারা গেছে। জীবিত দুই পুত্র, বতীন এবং বীরেন। এর মধ্যে বীরেনই কর্তৃত্ব করত। গিতামাতার সম্পত্তি পুত্র-কন্যার সমানভাবে ভাগ পাবে। ১৯৬২/৭০ সালে গোসাবার সিনেমা হলটি প্রবোধ সরদারের টাকায় তৈরী হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সাল থেকে সেই হলটির মালিকানা বীরেন

সরদার কি ভাবে পেয়ে গেলেন কে জানে।

বেশ করে বড়র আগে থেকেই নাকি প্রবোধ সরদার এবং তাঁর ছেলেমেয়েরা সবাই আলাদা আলাদা এবং সকলের সম্পত্তি পৃথক হয়ে যায়। তাই সব জমির হিসেব পত্র পাওয়া কঠিন। কিন্তু শোনা যায় ১৯৫১ সালে প্রবোধ সরদারের জমি ছিল ৩৭০ বিঘা। এই জমির যতটুকু হিসেব পাওয়া যায় তা হল: পাখীরালাতে ছিল ৬৭ বিঘা, বাণীত-লাতে ৪৫ বিঘা, আরামপুরে ২৭ বিঘা, কাটাখালিতে ৩৫ বিঘা, গোল-বাড়ীতে ৫ বিঘা, বিরাজমুনিতে ৫২ বিঘা, বাতীর লাপোয়া ২৫ বিঘা, এ ছাড়া সতীশ সরদারের কাছ থেকে নেওয়া ৭ বিঘা, বাবব সরদারের কাছ থেকে নেওয়া ৫ বিঘা, পূর্ণ সিংহের কাছ থেকে নেওয়া ৫ বিঘা, শঙ্কর সিংহের কাছ থেকে নেওয়া ১১ বিঘা, গোবিন্দ সিংহের কাছ থেকে নেওয়া ১ বিঘা, বসন্ত নন্দরের কাছ থেকে নেওয়া ২১ বিঘা, বিলাস প্রামাণিকের কাছ থেকে নেওয়া ১৮ বিঘা, ক্ষুদ্রা মালীর কাছ থেকে নেওয়া ১ বিঘা। এই সমস্ত জমির মালিকানা ছিল প্রবোধ সরদারের।

এই সব জমির মালিকানা লাভের পিছনে অনেক কারণ ছবি লুকিয়ে আছে। যে সমস্ত অসাধু উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল তার সাক্ষ্য লোকমুখে ছাড়া পাবার উপায় নেই। জমিজমা কেনার ব্যাপারে লোকে প্রবোধ সরদারের কনিষ্ঠ নন্দন বীরেন সরদারের নামই বেশি বলে। এদের কেউ কেউ বলে বীরেন সরদার নাকি একবার ৭ টাকার ন বিবে জমি কিনেছিলেন। কথাটা কতখানি সত্যি তা বিচার করা অসম্ভব। আরও শোনা যায়, অল্প পাগলার ৪ বিঘে জমি কিনে নাকি বেচারীকে তার মূল্য একটি টাকাও দেওয়া হয় নি। শোনা যায় প্রবোধ সরদারের তাইপো সতীশ সরদারের পুরো সম্পত্তিটা ঠকিয়ে নেওয়া হয়েছে। পুত্রদের আমলে ১৯৭০ সালে হাবীর দাসের ২৫ বিঘে জমি মাত্র ৪০০ টাকায় কিনে পরে ৭৫ সালে তা বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে।

কি ভাবে আত্মীয় স্বজনকে প্রত্যাখ্য করা হয়েছে এবং সরকারের চোখকে কাকি দেবার চেষ্টা করা হয়েছে তারও কিছু বিবরণ শোনা গেল। প্রবোধ সরদারের বড় পুত্র সুপালের নামে বাণীতলায় যে জমি ছিল, বি, ডি, ও, অফিসের কার্তিক চৌধুরীকে তা বিক্রী করা হয়েছে। কিন্তু যে পদ্ধতিতে তা করা হয়েছে সেটি অবৈধ বলে দু'

একজন সম্ভেদ প্রকাশ করেছেন। আরামপুরে, এল, নং ৮৩তে প্রবোধ সরদারের ঐ অল্পপূর্ণ নামে ২৭ বিঘে জমি ছিল। অল্পপূর্ণ অনেকদিন আগে মারা গিয়ে-ছিলেন। হুতরাং তাঁর সম্পত্তিতে পুত্রকন্যা সকলেরই অধিকার থাকার কথা। ১৯৭৪ সালে বোনদের বৃদ্ধাশ্রম দেখিয়ে দুতাই বতীন এবং বীরেন সেই জমি বিক্রী করেছেন দুলাল মণ্ডলের কাছে। সরদার পরিবারের জমি থেকে ৭৪-৭৫ সালে বিক্রীত জমির পরিমাণ না হোক ৮০ বিঘার মত। এই বিক্রীত জমির মধ্যেই ২০ থেকে ২৫ বিঘার মত খাসজমি বলে দেখানো হয়েছে। বোনদারা বাক, বসন্ত সরদারের যে ২১ বিঘা জমি প্রবোধ সরদার নিয়ে-ছিলেন তার ১২ বিঘা জমি বিক্রী করা হয়েছে তারমিস সরদারের কাছে। এই বিক্রীত জমির কিছু অংশ খাসজমি হিসাবে ঘোষণা করা হল তা বোঝার উপায় নেই। আবার এক চিলে দুই পাখী মারার চেষ্টা করা হয়েছে বিরাজ নগরের ৫২ বিঘা জমি দিয়ে। ১৯৫৩ সালের সেটল-মেটে নাকি দেখানো হয় উক্ত জমি প্রবোধ সরদার তাঁর মেয়েদের নামে দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে সেটাকে খাসজমি হিসেবে দেখিয়ে জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

৭৪ সালের অনেক আগেই প্রবোধ সরদার পুত্র হয়ে পড়ে-ছিলেন। হুতরাং সেই সময়ের লেনদেন বা অস্ত বা কিছু প্রকৃতপক্ষে তাঁর দুই পুত্র বতীন এবং বীরেনই করেছেন। বোনদের অস্ত বা সম্পত্তি তাও হাতিয়ে নেবার চেষ্টা এঁরা করছেন বলে শোনা গেল।

কংগ্রেসী আমলে বীরেনবাবুর সঙ্গে স্থানীয় থানার বোগাবোগ খুব নিবিড় ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। খুব দীর্ঘ সব রকম অহুসদান নাকচ করে দেবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। বর্তমানের বামপন্থী সরকার দুর্নীতি দূর করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই আশা করব বতীন এবং বীরেন সরদারের সমস্ত সম্পত্তির হিসাব নিকাশ করতে বর্তমান সরকার এগিয়ে আসবেন। কি ভাবে সাধারণ মানুষ, সরদারদের আত্মীয় স্বজন এবং সরকারকে প্রত্যাখ্য করা হয়েছে তা প্রকাশ করার জন্য এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বর্তমানের জনপ্রিয় সরকার অবিলম্বে এগিয়ে আসবেন এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

পরিশেষে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য। কলকাতার বেহালা অঞ্চলের পি-৩১ ইউনিক পার্কের মত বড় বাড়িটির মালিক ছিলেন জর্জ বিহার সাহেব। ঐ বাড়িটি কিভাবে এই সরদার পরিবারের হাথলে এসেছে বা কারা সেই বাড়িটির দখল উপভোগ করছেন এই সঙ্গে এটিরও তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

ভানুসিংহ

সেই তাক্তার ছবির রিমেক
তুলনেন বোধের শক্তি সামন্ত 'আনন্দ
আশ্রম' নাম দিয়ে। যেহেতু শক্তি
সামন্ত বোধের বহু হিম্মি ছবির সফল

‘এই পৃথিবী গ্রাহনবাস’ ছবিটির নামে যে ব্যঙ্গনা আছে, ছবিটিতে তা অন্তর্ভুক্ত হয় নি, কল্লে ছবিটি তাৎপর্যশূন্য হয়ে পড়েছে। রমাপর চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে এ ছবিটির পরিচালনাতেও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন অরবিন্দ মুখার্জী। রস সঞ্চার আর কল্পনা ও মননের প্রকাশ না ঘটলে ছবি যে রসোত্তীর্ণ হয় না—ছবির পর ছবি করে যাচ্ছেন তিনি। ছবির এই গালভরা দার্শনিক নামের বদলে যদি প্রেমের দৌড় নামটা রাখা হত, তবে বোধকরি ছবির বিষয়বস্তুর সংগে নামকরণের একটা সামঞ্জস্য থাকত। কারণ ছবিতে যদিও একটা হোটেল আছে কিন্তু প্রেমিকের প্রেমিকার পেছনে দৌড় দেওয়াটাই এখানে বড় হয়ে উঠেছে। পরিচালক হয়তো শুধু এই প্রসঙ্গটাই হুটিয়ে, ভুলতে পট। সত্য্য রায়, রবিন্দ্র বসিক, হিমিতা মুখার্জী, ছায়া দেবী, অংশুমান, সন্তোষ দত্ত, বনামী চৌধুরী এবং কাজী বামাদ্দীর অভিনয়ে আন্তরিকতার অভাব না থাকলেও প্রেক্ষাপট পরিচালনার দোষে ভীরা অংশটুকু থেকে গেছেন।

(०१व प्रश्नोत्तर)

অতঃপক্ষে কসবা ভিলজনে স্বাক্ষরের প্রতিটি মানুষ
জামে সেখানকার জনতা দলের নেতা হরিহর ব্যানার্জী

বাস্তবপূরের জরুরী বৈঠকে আইন শৃংখলার অবনতির বিরুদ্ধে সভাপ্রণেতা বো-সিদ্ধান্ত হয়েছে, তার কেন্দ্রীয় অহুবেদনের অন্ত প্রদূরবাবু আজ কালের মধ্যেই দিল্লী যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যেই স্পষ্ট হবে, রাজ্য সরকারের এবং এ রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে তারা কি-সম্পর্ক বজায় রাখতে চান।

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পূর্ব)

‘এই সংগ্রামী কাহিনীর প্রথম অধ্যায়টি লিপিবদ্ধ হয়েছে ‘চক্রবাক’-এর লেখায় ‘সংগ্রামী নগরের ইতি-

সামগ্রিকভাবে 'সংগ্রামী নগরের
ইতিহাস' সমাজসেবীদের মনে
প্রচার ভাবে জাগাবে এবং সমষ্টিগত
ভাবে এই জাতীয় কর্মক্ষেত্রে, গঠন
মূলক কাজে উৎসাহিত করবে।
প্রশস্তি সকল শ্রেণীর মানুষের কাছেই
সমাদৃত হবে। এই পুস্তকটির বিক্রয়-
জনক অর্থ সংগ্রামীনগর বিভাগীঠের
হৃদয় ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের
কন্যাগণের জন্য ব্যয়িত হবে।

(কোল ইন্ডিয়ান একটি অংশ বিশেষ)

প্রস্তাব আহ্বান করছে

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কর্তৃক আর্কাইভসের কাছে প্রতি কয়েক সপ্তাহ
নির্ধারিত ফী নগদ জমা দেওয়ার রশিদ দেখিয়ে চীফ ইঞ্জিনিয়ার (ই অ্যাও
এম), ইষ্টার্ন কোল ফিল্ডস লি., স্নাকভোরিয়া, পো: ডিশেরগড়, জেলা বর্ধ-
মান (প: ব:)-এর অফিস থেকে যে কোন কয়েক দিনে টেওয়ারের দলিলপত্র,
স্পেসিফিকেশনের তফসীল এবং শর্তাবলী পাওয়া যাবে। ১১. একই ঠিকানায়
নির্ধারিত টেওয়ার ফী যদি অর্ডার যোগে পাঠালে তখনই নেওয়া হবে যখন
ডাকযোগে টেওয়ার দলিলাদি পাঠারার ব্যয়সংকুলানের জন্য টেওয়ার শিডিউল
অনুযায়ী হুই বা ততোধিক টাকা হবে। এই জাতীয় যদি অর্ডারের কূপনে
টেওয়ারদাতার পুরো ঠিকানা, টেওয়ার নং এবং টেওয়ারের নির্ধারিত তারিখ
লিখিত থাকতে হবে। টেওয়ারের নির্দিষ্ট তারিখের ১৫ দিন আগে পাওয়া
যদি অর্ডারই কেবল গৃহীত হবে। ১০,০০০ হাজার টাকার ব্যয়না
অথবা উল্লিখিত দরের শতকরা ১ ভাগ যেটাই কম হয় নগদে অথবা কোল
ইন্ডিয়া লিমিটেড (ইষ্টার্ন ডিস্ট্রিশন) ডিশেরগড়-এর নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফটের
সহ দরপত্র না পাঠালে তা গ্রাহ আইনসম্মত বলে গণ্য হবে না। ১৫ চেকে
বা ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির মাধ্যমে বাব্বনার টাকা গ্রাহ হবে না। টেওয়ার জমা
দেওয়ার শেষ দিনের তিন দিন আগে টেওয়ার পত্র বিক্রয় বন্ধ হবে। ডাকের
বিলম্বের জন্য ইষ্টার্ন কোল ফিল্ডস লিমিটেড দায়ী হবে না। পোস্টাল
অর্ডার, ব্যাঙ্ক ড্রাকট বা চেকে টেওয়ার ফী পাঠালে গৃহীত হবে না।

রবীন্দ্র কাননে উৎসবের রোশনাই

আগামী ২৫শে নভেম্বর শুক্রবার থেকে সারা শহর ভেঙে পড়বে উত্তর কলকাতার রবীন্দ্রকানন প্রাঙ্গণে। সব শুভযাত্রার পথ এসে থমকে দাঁড়াবে বিডনষ্ট্রি আর চীংপুরের সংযোগস্থলে। একটি নয় দুটি নয়, যাত্রাপাড়ার ৩২টি দল একে একে তাহের, নব অবদান চিত্রিত করবেন রবীন্দ্রকাননের আলো কলমলে অবয়বহীন যাত্রা-মঞ্চে। ছ'র দিনগুলোতে বাড়তি প্রদর্শনী থাকবে একটা করে। জনস্বার্থে রাতভোর পালা পরিবেশনও বিচিত্র নয়। তার জন্তে প্রয়োজনে বাড়তি টিকিটেরও ব্যবস্থা থাকবে। কে কে আসবেন এই যাত্রাহুন্দের মোহকে মধু নিতে। স্বধী শাদাসিধে, ভক্ত-অভক্ত, পোবাকী, গেরম্ব, সাংবাদিক সমালোচক, শিল্পী সকলেই। আর আসবেন শহর আর গ্রামগঞ্জ থেকে "নায়ক" বাহিনী। যারা বহু যাত্রা দলেরই ভাগ্য-দুর্ভাগ্যের অগ্রহৃত। তারা আসবেন, পালা বিচার করবেন, মাহুকের চাহিদা বাচাই করে নতুন পালার জন্ত নিত্য নতুন বাবনা এনে দেবেন।

সঞ্জয় চ্যাটার্জির দাপটে অতিষ্ঠ (দর্পণের সংবাদদাতা)

সঞ্জয় গাছীর চ্যাটার্জি কলকাতা যাত্রাসার ক্লাব শেখ আইহুদ্দিনের অত্যাচারে তাঁর গ্রামবাসী হাওড়ার বাগনান থানার অন্তর্গত নবরপুর গ্রামের বাসিন্দারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সিদ্ধার্থ স্নেহসূত সত্য বি. এ. পাশ এই ক্লাব আবার ক'মাস আগে কলকাতা যাত্রাসার ইমপেক্টর পদে উন্নীত হলেন। প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী যত্নের ব্যানার্জীর সুপারিশে তিনি বছরের মধ্যেই কয়েকটি প্রমোশন পেয়েছেন। তাঁর অত্যাচারের শিকার নবরপুর গ্রামের শেখ মুর্শিদ আলী (নাজির)।

প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে গুণ্ডন (১ম পৃষ্ঠার পর)

করে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই মহল রাজ্য জনতা দল মারকং দিল্লীতেও বোগাযোগ করেছেন। রাজ্যের সি, পি, আই এম থেকে যাতে বাগড়া না পড়ে সেজন্তে এরা বেশ সক্রিয়। এ ব্যাপারে তারা সংসদ সদস্য জ্যোতির্ময় বসুর পরামর্শ নিয়েছেন। জ্যোতির্ময় বসুকে বোকানোর চেষ্টা চলেছে লক্ষ্মী অবস্থায় তিনি যখন বন্দী তাকে প্যারোলে ছাড়ার ব্যাপারে ও অত্যন্ত ব্যাপারে স্খিভ বহু সাহায্য করেছেন। এর একটা প্রতিদান দেওয়া উচিত। জ্যোতির্ময়বাবু বিষয়টি সত্য।

বলাবাহুল্য এই যাত্রা উৎসবের লভ্যাংশ ব্যয় হবে যাত্রার কল্যাণেই। যাঁহে হুঃহু যাত্রা শিল্পীদের কল্যাণ আর যাত্রা স্টেডিয়ামের রঙীন স্বপ্ন।

এই স্বপ্নে ইতিমধ্যেই ৩০ বরঙে তুফ করেছে। রবীন্দ্র কাননে যাত্রা মণ্ডপ তৈরীর কাজ এখন শেষ পর্যায়ে।

এবারেও উৎসবের শেখবিনে প্রধান যাত্রাশিল্পীদের নিয়ে স্তম্ভীকন লক্ষ্যনায় আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধন অহুঠানে কে কে আসবেন? অনেকেরই নাম শোনা যাচ্ছে। ডঃ প্রতাপচন্দ্র চক্র, সুখ্যমতী জ্যোতি বসু, অশোক সরকার প্রমুখ অনেকের নামই কার্ণে তেমে আসছে। এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

দর্পণের যাত্রা ক্রোড়পত্র

যাত্রা উৎসব উপলক্ষে আগামী মণ্ডাহের দর্পণে যাত্রা সম্পর্কে একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র মুদ্রিত করা হবে। এতে প্রকাশিত হবে কয়েকটি বিশেষ রচনা।

পাইওনীরার নিটিং মিলসের ৪০ বর্ষ পুতি

সম্রাতি পাইওনীরার নিটিং মিলস লিমিটেডের ৪০তম বর্ষ পুতি উৎসব এক মনোজ্ঞ পরিবেশে সম্পন্ন হয়। ১৯৩৭ সালে পাইওনীরার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কলকাতা মহানগরীর জীবনে যখন হুঃগুগু ঘনিষে আসে তখন এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটিও বিপদে পড়ে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা-ডিরেক্টর শ্রীনিবাস মুখোপাধ্যায়ের বোগ্য পরিচালনার প্রতিষ্ঠানটি লম্বা বাঁচিয়ে অতিক্রম করে এসোতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায়শ্চৈ এই ক্ষুদ্র মিলের মূলধন ছিল মাত্র ৩২ হাজার টাকা। কোম নাম করা হুতার মিল এদের লদে চুক্তি করতে চাইত না। শ্রীনিবাস মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে মিলের নামে চুক্তি করে তার লম্বা উপবৃত্ত কোম্পানীকে দান করেছিলেন। অবচ ঐ হুতা তখন বাঁচারে দশমুখ দামে বিকী হুছিল। উল্লেখ্য পাইওনীরার কোম্পানী যুদ্ধের সময় প্রায় এক লক টাকা লাভ করে।

এই প্রতিষ্ঠানটি প্রথম থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত কর্মীদের ৩,২০,০০০ টাকা কোমাস হিসেবে এবং ৪,৯৮,০০০ টাকা ইনসেকিউর্যান্স হিসেবে দিয়েছে। কর্মীদের আরও নানারকম সুবিধা দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত অশ্রীদারদের মোট ২৬% লভ্যাংশ দেওয়া হয়েছে।

জনমহল

সংবাদ ও সাহিত্য সাপ্তাহিক

বিক্রি

অনিবার্য কতগুলি অসুবিধার হরণ শারদীয় অধকাশের পর গত ৪ঠা নভেম্বর থেকে সাপ্তাহিক 'জনমহল' প্রকাশন বহু আছে। আগামী ২৫শে নভেম্বর থেকে 'জনমহল' নিরন্তর প্রকাশিত হবে।

এজেন্ট ও হকার বহুরা অবিলম্বে 'জনমহল'-এর সিটি অফিস মিলীপ চক্রবর্তী, ২২ গড়কা, মেন রোড, কলকাতা-৩১ এই ঠিকানায় বোগাযোগ করুন।

সম্পাদক—দীপেন বসু

লভ্যাংশ কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩১ আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র রোড কলকাতা-৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৩১ বট লেন কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

২৫ নভেম্বর থেকে ২১ ডিসেম্বর

রবীন্দ্র কানন

২৭ দিনব্যাপী বিশাল ও বর্ণাঢ্য
কলোচিত্র দিনরাত্রি
পঞ্চম বার্ষিক

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন



২৫ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা নট কোম্পানী	১৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা রক্তধারী যাত্রা ইউনিট
অচল পদ্মসা	প্রতিবাদ
২৬ নভেম্বর দুপুর ২টা মাধবী মাটা কোম্পানী	২৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা চরম অপেরা
জিঘাংসা	সিপাই মিউটিনি
২৬ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা রয়েল বীথপার্নি অপেরা	১০ ডিসেম্বর দুপুর ২টা পলকাটা
গৃহলক্ষী	অ - জা - ক - খ
২৭ নভেম্বর দুপুর ২টা সাহানা যাত্রা ইউনিট	১০ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা অনাথিকা যাত্রা ইউনিট
সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত	বেনারসী
২৭ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা নাগ কোম্পানী	১১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ভোমানাথ অপেরা
বেইমান বিধাতা	সন্তান পেজনা ফিরে
২৮ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা প্রাণ অপেরা	১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা দ্বিপী মহল
আনারকলি	লাল নিশান
২৯ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা নিউ প্রচল অপেরা	১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা
আবদুল্লা মজিনা	অরুণ অপেরা
৩০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা জাহান অপেরা	বিশে ডাকাত
কালকেতু ফুল্লরা	১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা শিল্পীতীর্থ
১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা জয়দীর্ঘ	বাদী লালবাই
প্রেমসী আনারকলি	১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা কলিকাতা যাত্রা সমাজ
২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা বজ্রবী অপেরা	বহুশিখা
সংসার সীমাস্তে	১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা তপোদাস নাট্য কোম্পানী
৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা অগ্রগামী	ফুল্লরা কালকেতু
কুতুব মিনার	১৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ভারতী অপেরা
৪ ডিসেম্বর দুপুর ২টা বগবাতা	কংস
মীনাবাজার	১৮ ডিসেম্বর দুপুর ২টা নব ইন্দ্রলোক
৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা নিউ গণেশ অপেরা	মীরাবাই
রূপসী গজা	১৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা নবরতন অপেরা
৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা সুশীল নাট্য কোম্পানী	মহুয়া
লালুভুলু	১৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা চন্দ্রলোক অপেরা
৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা আনন্দলোক	নগরবধু
নরনারায়ণ	২০ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা মহানন্দ
৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা লোকনাট্য	ভৈরবমন্ত্র
গুরমিতা	২১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা সংসার অপেরা
	রুমুর

টিকিট : ৫, ৩, ২ ও ১ টাকা

কসবায় মাক'সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে চক্রান্তের নেপথ্যে

(দর্পণের সংবাদদাতা)



বিশ্ব বর্ষ ১১ ৪২শ সংখ্যা ১১ শুক্রবার ২৫শে নভেম্বর, ৭৭ ১১ ৪০ পৃষ্ঠা

প্রতি জেলাতেই তেলের চোরাই গোড়াউন

ফাইলে মুখ্যমন্ত্রী সামান্য তথ্য পাবেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তেল-ডাকাতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আই, জির কাছে জানতে চেয়েছেন। পদস্থ পুলিশ অফিসারদের মারফৎ এই সংক্রান্ত কাইল তৈরীর কাজও শেষ। কিন্তু দর্পণ বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছে সড়ক পথে তেল সরানোর বিস্তৃত তথ্য গোপন করার চেষ্টা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীকে প্রকৃত সত্যের অভ্যন্তরে রেখে তেলের চোরাকারবারীদের সংগে যুক্ত কিছু পুলিশ অফিসার তাঁকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছেন।

দর্পণ একথা আগে ভাগেই পরিষ্কার করে লিখেছে যে, কেন্দ্রের কাছ থেকে কম পয়সায় পাওয়া জে, বি, ও সহ অন্যান্য তেল অল্প রাজ্যে পাচার হয়ে যাচ্ছে এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে পশ্চিমবঙ্গ। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লী, গোয়া যেখানে এই জে, বি, ও, যাচ্ছে সেখানকার পুলিশ এ ব্যাপারে কতটা কি করবে তা বলা দুঃস্বপ্ন, কিন্তু এ রাজ্যের পুলিশ দপ্তর অনান্যসেই এই বেপরোয়া তেলের চোরাই কারবার বন্ধ করতে পারে।

প্রায় প্রতিটি জেলাতেই রয়েছে

যাত্রা ক্রোড়পত্র

২৫শে নভেম্বর থেকে রবীন্দ্র কাননে ২৭দিন ব্যাপী পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন আরম্ভ হচ্ছে। এই উপলক্ষে দর্পণের এই সংখ্যা প্রকাশিত হল চার পৃষ্ঠার যাত্রা ক্রোড়পত্র সহ। এই ক্রোড়পত্রে আছে কয়েকটি বিশেষ রচনা।

চোরাই গোড়াউন। দেওয়াল ঘেরা, ভেতরে তেল সরানোর পাম্প। রয়েছে ড্রাম, মজুত তেল ইত্যাদি। আশ্চর্য ঘটনা হলো, এর বেশ কয়েকটি রয়েছে ধানার কাছে। খড়দা, শালকিয়া, বড়বাজার, গোলাবাড়ী সহ বেশ কয়েকটি ধানার নাকের ডগাতেই একাঙ্গ চলছে। হাত পা বাঁধা কিছু সং পুলিশকর্মী আশ্রয় বলেছেন বেলঘরিয়া নার্সিং হোমের পেছনে, শালকিয়ায় রাধা সার্ভিস পার্শ্বিং স্টেশনে আইনকে বুজাছু দেখিয়ে কাজ যথারীতি চলেছে। রাধা সার্ভিসের মালিক বলে পরিচিত জামদেও নারায়ণ সিং ওরফে জাম- (শেবাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়)

গত ১১ই নভেম্বর কসবা তিল-জলার সি, পি, এম, লোক্যাল কমিটির সদস্য স্বপন চক্রবর্তীর ওপর হিংস্র আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসী ও প্রফুল্ল সেন প্রভাবিত জনতা গোষ্ঠী যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে তা পূর্ব পরিকল্পিত চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয়। কসবা অঞ্চলে শান্তিপ্রিয় মানুষের এককালের বিভীষিকা দেবা দত্ত, কল্যাণ গুহ, রাণা চৌধুরী, তারা ঘোষ প্রমুখদের সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারের অন্যতম একটি রূপ ছিল স্থানীয় রিক্সা-ওয়ালাদের উপার্জনের সিংহভাগ গায়ের জোরে পকেটস্থ করা। এবং এককালীন কংগ্রেসী নেতা বর্তমানে জনতা নেতা প্রফুল্ল সেনের পক্ষপৃষ্ঠ ডাঃ হরিহর ব্যানার্জীও এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের এই দৌরাত্ম্য কমে যায়। স্থানীয় সি, পি, এম, কর্মীরা মেহনতী রিক্সাওয়ালাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। স্বভাবতই প্রাক্তন কংগ্রেসী এবং বর্তমান জনতা গুণ্ডারা ক্রোধে মরিয়া হয়ে ওঠে এবং তারই বিফোরণ ঘটে স্বপন চক্রবর্তীর ওপর আক্রমণের বিফোরণের মধ্য দিয়ে।

এ দিকে চক্রান্তের আর এক নজীর হলো স্বপন চক্রবর্তীর ওপর আক্রমণ সংগঠিত হবার কিছুকাল আগে হঠাৎ ঐ অঞ্চলের জনৈক শিবাজী নামক গুণ্ডাটি বিনা প্ররোচনায় বাড়ীঘর ত্যাগ করে ডঃ হরিহর (শেবাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

বিশ্বরূপার বাবুর কাণ্ডকারখানা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিশ্বরূপার মালিক নাট্যকার রাসবিহারী সরকার ওরফে বাবুর ঘরে মহাকরণের সরকারী আমলা অর্থদপ্তরের নিখিলেশ্বর মুখার্জির এত যাতায়াত কেন? কেনই বা প্রতি-ডেন্ট ফাণ্ড দপ্তরের এস মজুমদার বাবুর কাছে নিয়মিত হাজিরা দিয়ে থাকেন? দর্পণ প্রতিনিধির কাছে ঘিয়েটার হলের কর্মীরা জানান এ সবই কর্মীদের শোষণ করে সরকারী রোষ থেকে বাঁচার কায়দা। নিখিলেশ্বর চুঁচুড়ায় থাকেন। মহাকরণের এক ঝালু আমলা বলে তার নামও রয়েছে। অবসর গ্রহণের আর মাত্র

কয়েকমাস বাকী। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি পে-কমিশন নয়ত ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের সদস্য হওয়ার তাগিদে যথাস্থানে ঘোরাকেরা শুরু করে দিয়েছেন বলে তার সহকর্মীদেরই অভিযোগ। যাক, অর্থদপ্তরের ব্যাপার কিংবা তাঁর 'ম্যানেজ' করার কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে কিনা তা সরকারই বুঝবেন। কিন্তু বিশ্বরূপার শোষিত কর্মীরা মহাকরণের এই নিখিলেশ্বর, প্রতিডেও ফাণ্ড দপ্তরের এস মজুমদারের বাবুর ঘরে নিত্য যাতায়াত ভালো চোখে দেখতে রাজী নন। কর্মীদের ধারণা,

বাবুর নানা অনাচার অপকর্মের জন্ত তাঁর ওপর যাতে সরকারী আইনী ব্যবস্থা নেমে না আসে এরা দুজন তারই তত্ত্বির তদারকি করে থাকেন। মহিলা কর্মীরা আমাকে বলেছেন, বাবুর ঘরটি নানা ঠাকুর দেবতার ছবিতে ঠাসা, গুটি কয় চেনার। আর রয়েছে পদা যেরা সোফা কাম বেড। এই পদার আড়ালেই মহাকরণের অনেককেই বেসামাল অবস্থায় দেখা যায়। বাবুর প্রত্যক্ষ সহযোগিতাতেই এসব কাণ্ড কারখানা চলে। একথা অস্বীকার

নির্বাচন বানচাল করার জন্য সঙ্গয়ের মারাত্মক অপচেষ্টা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মার্চের সাধারণ নির্বাচনের কয়েকদিন আগে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে দিয়ে পর পর কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়ে ইন্দিরা-মন্দন সঙ্গয় নির্বাচন স্থগিত রাখার অজুহাত সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন বলে জানা গেছে। নির্বাচনী প্রচারে হালে পানি না পেয়ে সঙ্গয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওম মেহতাকে দিয়ে আমেধিতে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স আনিয়ে ছিলেন। প্রায় ৪০০ লোকের কোর্স। এসেছিল মোগলসরাই থেকে এবং আন্তানা গেড়েছিল গৌরীগঞ্জে একটি স্থলে।

সঙ্গয় ভেবেছিল বি এস এফ তাঁর মনোবাহা পূর্ণ করবে। ১৪ই ও ১৫ই মার্চ তিনি বি এস এফ অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেন। সঙ্গয় প্রায় আদেশের স্বরে তাঁদের বলেন, ভোটারদের সঙ্গয় করার জন্ত এই বাহিনীর স্ফাগ মার্চ করা দরকার। তিনি অস্বপ্ন বলেন, স্থানীয় পুলিশ বাহিনীকে সরিয়ে বি এস এফ পোলিং বুথের দায়িত্ব নিক।

বি এস এফ অফিসাররা বলেন, এটা তাঁদের কাজ নয়। অসামরিক কর্তৃপক্ষ লিখিত আদেশ না দিলে তাঁরা গুলী করতেও পারেন না। উল্লেখযোগ্য যে, বি এস এফ ভারী অস্ত্রে সজ্জিত থাকে। তাই সঙ্গয়কে বলা হয় যে, বি এস এফ যদি পুলিশের স্থান গ্রহণ করে তবে জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত হবে যার ফলে

ভোটপত্র বানচাল হয়ে যাবে। সঙ্গয়ের মনোবাহা ছিল এই ঘটনা ঘটুক। তাই বি এস এফের অস্বীকৃতিতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

কিন্তু তারা অস্বীকার করলে কি হবে সঙ্গয় ও তার সঙ্গোপাঙ্গোরা যত্নবশত বেশ পাকিয়ে তুলেছিলেন। গ্রেনেড পেট্রোল বোমা, বন্দুক প্রচুর জমা করা হয়েছিল। তাঁর মানে সঙ্গয়ের হল যে নির্বাচনের দিন বন্দুকবাহী করে আমেধি এবং সেই সঙ্গে সারা দেশে নির্বাচন পণ্ড করতে চাইছে একথা বি এস এফের কর্তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। এর পরই সঙ্গয়ের উদ্দেশ্যে গুলী চালানার ঘটনা সম্পর্কে প্রচার শুরু হয় যেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

অবস্থা দেখে বি এস এফ রায়-বেরিলিতে ওম মেহতাকে এবং দিল্লীতে বি এস এফের ডিরেক্টর জেনারেলকে সমস্ত ঘটনা জানায়। ওম মেহতা দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধীকে সব জানালে শ্রীমতী গান্ধী তাড়াতাড়ি ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীকে পাঠান সঙ্গয়কে সামলাবার জন্ত। ১৫ই মার্চ ব্রহ্মচারী গৌরীগঞ্জে এসে সঙ্গয়কে ঠাণ্ডা করেন। বি এস এফ তাঁকে সেখানে থাকতে অহরোধ করে। ব্রহ্মচারী তাদের অহরোধ রক্ষা করে নির্বাচনের পরের দিন অর্থাৎ ১৬ তারিখে আমেধি কেন্দ্র ত্যাগ করেন।

করার কোনও পথ কারো নেই। লবঙ্গ আর এলাচ মুখে নিয়ে ছোটদা ওরফে বাবু হন কোনও সময় নিজেই নায়ক, কখনও বা অবতীর্ণ হন পাহারাদারের সূক্ষ্মিকায়।

অনেকেরই অভিযোগ, কংগ্রেসী জমানায় যুব কংগ্রেসীদের হাতে মাত হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে বাবু যেমন শেফালীর নয়নুতা চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন, ঠিক সেই একই কায়দায় রায় জমানার শেষ দিকে প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা সরকার থেকে পাকাপাকিভাবে নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করে ফেলেছিলেন। বিশ্বরূপার লেনে সিনেমা হল তৈরীর ব্যাপারে বাবু তৎকালীন অর্থদপ্তর ও (শেবাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়)

বাকসার দেশপ্রেমিক গঙ্গাধর বড়ি

শব্দ বসু

বাকসার গঙ্গাধর বড়ি বিরাট পণ্ডিত লোক, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা চিকিৎসা শাস্ত্রে জ্ঞান তেমনি পসার। শুধু কি তাই, বেদ বেদান্ত, কোরাণ বাইবেল সব ধর্মীয় শাস্ত্রেই তাঁর অসাধ পাণ্ডিত্য। এখন তাঁর বয়স হুগে ৬০।৬২ তবুও রাইফেল ছোঁড়ায় তাঁর জুড়ি কম আছে। তাঁর দেশপ্রেমের কথা রাজ্যের সবাই জানেন। তিনি গান্ধীজীর খাটি শিষ্য। কোনো ভেজাল পাবেন না। গান্ধীজীর যত আন্দোলন হয়েছে তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে যোগ দিয়েছেন।

দেশ থেকে ইংরেজ চলে যাবার পর বাকসার গঙ্গাধর বড়ির যৎসামান্য কার্যকলাপের হিসেব দিলে তাঁর গুণের আরও পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজ যাবার পর তিনি বাকসা এলাকার কংগ্রেস দলের যোগ্য হোমরা চোমরা নেতা হিসেবে দল থেকে সার্টিফিকেট পেলেন। স্বদেশের পোশাকে আপাদমস্তক মুড়ে তিনি বুক ফুলিয়ে বাকসার জনসাধারণের সেবায় মেতে উঠলেন। এলাকার শান্তি রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হল গঙ্গাধর বড়িকে। সবাই জানে বড়ি মশাই বাঘা লোক, স্ত্রায় বিষয়ে (?) একেবারে কাজির বিচার? কোনো নড়চড় হবার উপায় নেই। তাই এলাকার মাহুষ বড়ি মশায়কে ভীষণ ভয় করেন। তারা জানেন অশান্তি করলে বড়ি চেপে ধরবেন। না বাবা, বাকসা রাজ্যে কোনো অশান্তি করা চলবে না। বড়িমশাই সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে আছেন, যেমন—ইস্কুল কমিটি, ক্লাব কমিটি, পূজা কমিটি ইত্যাদি, তাছাড়া হোমগার্ডের কমান্ডার আরও কত কি। এ না লে দেশ সেবা করা যায়? এছাড়া প্রতিটি ভোটের সময় নিজের দলকে জয়যাত্রার জন্তে ভোটবাক্স ভরিয়ে

তোলায় সব রকম ব্যবস্থা করতে তিনি খুব পটু। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধলে তিনি নিজে ছুটে যেতেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের প্রাণ রক্ষা করার জন্তে, তাদের এলাকার বাইরে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করেছেন। অবশ্য তারা আর কিরে এসে বসবাস করতে পারেনি। কারণ ঐ সময় কি সব তাদের কাছ লিখিয়ে নিয়ে সমস্ত জমিগুলি বেনামীতে তাঁর এজিয়ারে রেখেছেন। অবশ্য প্রথমে ছ'একজন প্রাণ হারালেও বাকিদের তো প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

এছাড়া তিনি স্বল্প থেকেই অলিখিত ভাবে কটা গোপন ও স্পেশাল কমিটির প্রধান নেতা। এই সমস্ত গোপন সংগঠনগুলো দিয়ে তিনি প্রকৃত শান্তি রক্ষারই কাজ করতেন। অবশ্য এগুলি তাঁর গোপন ব্যাপার তাই প্রকাশে বলে দিলে বড়ি মশাই চটে যাবেন। সত্যিই তো চটে যাবারই কথা, গোপন ব্যাপার ফাঁস করে দিলে কে না চটে বলুন? কিন্তু মজাটা কি জানেন? ধরুন নিয়ে দেখুন বাকসার ঘরে ঘরে আবাস, বুদ্ধ, বণিতা সকলেই জানেন তাঁর গোপন স্পেশাল কমিটির ধর ও কর্মকাণ্ড। কিন্তু কেউ তাঁর সামনে কিছু বলতে চান না। কারণ তাঁর সম্পর্কে কোনো আলোচনা করলেই শান্তি নষ্ট হবে। কেউ যদি শান্তি ভঙ্গ করেন তবে বড়িমশাইয়ের স্পেশাল কমিটির লোক এসে অতর্কিতে দিনে ছুপুরে পেটে ছুরি ঢুকিয়ে অশান্তির বীজ একেবারে সার্ব করে দেবে। মামলা, মকদ্দমা, গ্রেপ্তার? ওসবে কিছু হবে না মশাই, থানার দারোগাবাবু যে শান্তি রক্ষার স্পেশাল কমিটির ইনকামের পার্টনার। না মশাই, অশান্তি করার কি দরকার, বড়িমশাই যেমন চালাতে চাইছেন

তেমনি চলুক, প্রতিবাদ করে প্রাণ থাক আর কি?

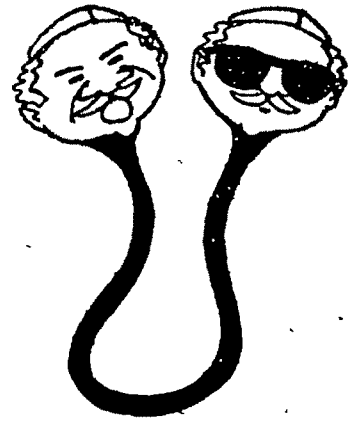
ঠিক আছে, আপনি প্রতিবাদ না করতে পারেন কিন্তু আমার কোনো ভয় নেই, আমি এখনও নাগালের বাইরে। তাই ঠিক করেছি বড়ি মশায়ের গোপন খবর ফাঁস করে দেব। তবে একটা কথা, ভুল করেও যেন আমার নামটা বলে ফেলবেন না। কারণ একবার যদি উনি জানতে পারেন তাহলে কিন্তু তাঁর নাগালের মধ্যে পড়ে প্রাণটা হারাব।

গোপন খবর

বাকসার সংলগ্ন কাকরগঞ্জ রেল স্টেশনের ওয়াগনশেড আছে। বড়ি মশাইয়ের স্পেশাল কমিটির সদস্যরা এই রম্যরচনাটির সঙ্গে বেহালা কসবা বা অন্ত যে কোন স্থানের ঘটনার মিল অবশ্যই থাকতে পারে। কেননা অনেক জায়গাতেই তো আকছারই এমন ঘটনা ঘটেছে ও ঘটছে।

নিপুণ ওয়াগন ব্রেকার। ওয়াগনে বা কিছু সম্পদ থাকে তার প্রকৃত মালিকানা নাকি তাঁর। তাই কমিটির সদস্যরা ওয়াগন ভেঙে সমস্ত মাল বার করে বড়ি মশায়ের কাছে পৌঁছে দেন। তারপর বড়ি মশাই যোগ্যতামুযায়ী সদস্যদের বার বা প্রাপ্য তা ভাগ করে দেন। বড়ি মশাই অবশ্য একটা মোটা ভাগ সরিয়ে রাখেন তাঁর নিজের দক্ষিণা হিসাবে। অবশ্য তিনি এই সমস্ত দক্ষিণা নিজের কাজে লাগান না, মা লক্ষ্মীর কাঁপিতে জমা করেন। ও, আপনারা ভাবছেন কাজটা খুব সহজ তাই না? না মশাই এ কাজে অনেক ঝামেলা আছে। তাছাড়া সবাই পক্ষে করাও সম্ভব নয়। সর্বপ্রথম আপনাকে ঐ ধরনের একটা রাজনৈতিক দলের নেতা হতে হবে, তার ওপর অসাধ পাণ্ডিত্য থাকতে হবে, এছাড়া এলাকার মস্তানদের হাতের মুঠোয় রাখতে হবে, পুলিশ, দারোগা, রেল পুলিশ ইত্যাদিদের ঠিক ঠিক বধড়া দিতে হবে।

এছাড়া আরও কাজ করেন, যেমন—রেল লাইনের ধারে চোলাই মদের কারবার চলে পুরো দমে। কারবারীদের ট্রেড লাইসেন্স আছে। সেই ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু হয় স্পেশাল কমিটির মহান নেতা গঙ্গাধর বড়ি মশাইয়ের হস্ততর থেকে। অবশ্য কারবারীদের লাইসেন্স কি হিসাবে একটা মোটা টাকা দিতে হয়।



ব্যবসা করতে গেলে দিতে তো হবেই। তবুও বলব বড়ি মশাই গরীবের বন্ধু, কারণ যারা চোলাই মদের পরস্যা যোগাতে পারে তারা-তো আর পার্ক স্ট্রিটের বারে বসে অত ধরচ করতে পারেনা। এটা নিঃসন্দেহে গরীব দরদী কাজ। তারপর সাইকেল রিক্সাওয়ালাদের মাসিক ছুটাকা করে মাথা পিছু নজরানা দিতে হয় (কোনো রসিদ নেই)। বাজারের ব্যাপারীরা তোলা দিয়ে তবে সবাই অহুমতি পায়। দোকানদারদের মাসিক একটা মোটা টাকা চাঁদা দিতে হয়, না হলে 'আইনের' কামেলায় জড়িয়ে পাবে। এই সমস্ত ছাড়া বাকসা এলাকায় যত খুন হয়েছে তার ১০ ভাগ বড়ি মশাইয়ের পরামর্শে শান্তি রক্ষার জন্তে। এতোগুলি মহান কাজ কারন এই স্পেশাল কমিটির মারফৎ। বুকে দেখুন এই কমিটির কত গুরুত্ব। আপনি যদি চান এই কমিটির সভ্য হতে পারেন। তবে আপনার অবশ্যই মস্তান ডিগ্রি নিতে হবে। বড়ি মশাইয়ের হুকুম হলেই থাকে তাকে, যে কোনো স্থানে অতি সহজেই চাকু বসিয়ে দিতে হবে। ভয় নেই, তার জন্তে ফাঁসির হুকুম হবে না কারণ দারোগাবাবুতো আছেন। কোনো আঁচড়ও পড়বে না। তাছাড়া তিনি যে দলের রাজনীতিতে বিশ্বাসী সেই দলের সঙ্গে থেকে দেশসেবার কাজ করতে হবে। অবশ্য অন্ত কোনো গান্ধীবাদী দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন, তবে আসল কথা বড়ি মশাইয়ের আত্মগত্যা স্বীকার করতে হবে।

বড়ি মশাইয়ের ঘরে সেই যে একবার মালম্মী এসে আসন পেড়ে বসেছেন তিনি আর নড়তে চাননা। ইনকামতো আর কম নয়, একেবারে ছাপ্পড় কোড়কে বাকে বলে। তবে একথা না বললে মিথ্যে বলা হবে, স্পেশাল কমিটির সদস্যদেরও ঘরে ঘরে বাজে একটা করে মিনি না লক্ষ্মীর পুজোর যোগান দেওয়া সম্ভব হয় সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখেন।

আপনাদেরতো আগেই বলেছি বড়ি মশাই খাটি গান্ধীবাদী, তবে এখন বিশ্বাসবাগের মহান গান্ধীবাদী নেতাকে অহুসরণ করে চলেন।

এখন তিনি বিশ্বাসবাগের মহান নেতার দলের সদস্য। কিন্তু এলাকার মস্তানরা দলমত নির্বিশেষে তাঁর স্পেশাল কমিটির সদস্য। এই ব্যাপারে কারোর কোনো বিরোধ নেই, খালি ঠিকমত হিন্দা পেলেই হল।

কমাল আগে বড়ি মশাইয়ের স্পেশাল কমিটির একটা অংশ গুরু-মারা বিচ্ছিন্ন পথ ধরে। অর্থাৎ এই অংশটি গোপনে ওয়াগন ভেঙে মাল পাচার করে। বড়ি মশাই ঠিক জানতে পারেন। এ যে শৃংখলা ভেঙের অপরাধ। তাঁর হুকুম হল শৃংখলা ভঙ্গকারীদের পাণ্ডাকে সাক্ষ্য কর। কিন্তু স্পেশাল কমিটি তাকে সাক্ষ্য করতে গিয়ে ঠিক কারদা করতে পারল না শেষে গুরুতর ভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে বিছানা নিল। বড়ি মশাই মুন্সিবে পড়লেন, একেবারে সাক্ষ্য না হলে রাগের মাধ্যমে হাসপাতালে বিছানায় শুয়ে যদি সব ফাঁস করে দেয়? এদিকে আবার গদীতে বসে ফ্রন্ট সরকার। আবার আর একটা ঝামেলা অজিতকে নিয়ে, যদিও অজিত স্পেশাল কমিটির সভ্য নয় তবে একজন সভ্যের (যে হাসপাতালে) কাছ থেকে সে নানা প্রকারে উপকৃত। তাই সে হরি-তথি করছিল। বড়ি মশাইয়ের চেলারা ছ'একবার বারণ করেছে কিন্তু অজিত দিয়েছে কটা চড় চাপড়। তারপর আর ঘায় কোথায় দিন ছুপুরে অজিতের বুকে বিঁধল ছুরি। রাস্তাটা তাজা রক্তে লাল হল। পুলিশ আনাগোনা করল কিন্তু খুনী আসামীর তখন বড়ি মশাইয়ের বাড়ীতে বসে বেদ-বেদান্ত শুনছে। অজিতের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের মনে বিক্ষোভ দেখা দিল কারণ অজিত এমন কোনো বিশেষ ধারাপ ছেলে নয়।

এ দিকে বড়ি মশাই এক টিলে ছ'পাখি মারার মতলব আটলেন। তিনি প্রচার করলেন তাঁর দলের রাজনৈতিক কর্মী অজিতকে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীরা খুন করেছে। দেখুন, বড়ি মশায়ের বুদ্ধির বহর, তারিক না করে পারবেন না। কোথাকার জল কোথায় দাঁড় করালেন। আসল মতলবটা কি জানেন? এদিকে আর একটা ঝামেলা ছিল অর্থাৎ নকুল চক্রবর্তী বলে একজন স্থানীয় বুঁক, ইমার-কেশীর সময় মস্তানের হাতে তার মাও নির্বাচিত হয়েছেন, ফলেন এলাকা ছেড়ে বাড়িভাড়া সবাই বাইরে চলে গিয়েছিলেন। সেই নকুল আবার কিরে এসেছে ফ্রন্ট সরকার (শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়)

ইন্টারন্যাশনাল ফিল্মস্ লিমিটেড
(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

সংশোধনী

ইনক্রাইনের ড্রাইভেজ

রেফা: নং এন কে আর / ইনক্রাইন ড্রাইভেজ / এন-১৬ / ৭৭-৭৮ / ৬১৫ ভাগ ১.১১.৭৭

বীকোলা এরিয়ায় অধীনস্থ নাকরাকোণা পরীক্ষামূলক পন্থিতে ইনক্রাইন ড্রাইভেজ সম্পূর্ণ করার টেন্ডার নোটিশ নং এস আর ই ই (সি) ছয়/২০/৭৭/ ৬২ ভাগ ২৪.১০.৭৭ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য যে, সিরিয়াল নং ১৩২য়ে উল্লিখিত কাজ একটি কম্পোজিট কাজ যার বায়নার টাকা ৮,৫০০ (আট হাজার পাঁচশো মাত্র)।

জেনারেল ম্যানেজার, বীকোলা এরিয়া, পো: উথরা, জেলা বর্ধমান।

স্বর্গত ঋত্বিক ঘটকের সরকারী ফ্ল্যাটে রয়েছেন এক ভেড়িওয়াল।

(দর্পণের সংবাদদাতা)

চিত্রপরিচালক ঋত্বিক ঘটক মারা গেছেন অথচ তাঁর নামে একটি ফ্ল্যাটে ভেড়িওয়াল। রাস করেন। দক্ষিণ কলকাতার তিল-জলার সি এন রায় বোডের জি-তিন নম্বর ফ্ল্যাটটি বিগত কংগ্রেস সরকার স্বর্গত চিত্রপরিচালক ঋত্বিক ঘটককে অ্যালট করেন। কিন্তু ঋত্বিক ঘটক পেয়েও ওখানে যেতে অস্বীকার করেন। তখন ঋত্বিক ঘটককে তদানীন্তন মন্ত্রী রামকৃষ্ণ সারোগী সি-এ নিমাই চক্রবর্তী এবং সি এন রায় বোডের তদানীন্তন রেন্ট কালেক্টর তথা কেয়ার টেকার অমৃত চ্যাটার্জী জোর করে তপন গাঙ্গুলী নামে জনৈক ভেড়িওয়ালকে ঢুকিয়ে দেন। অভিযোগে প্রকাশ ঋত্বিক ঘটক তপন গাঙ্গুলীকে দেওয়ার সময় বেশ কয়েক হাজার টাকার লেনদেন হয়। তপন গাঙ্গুলীকে ঋত্বিক ঘটক দেওয়ার অর্থ হু-হুবার নোটিশ দেওয়া হয় তথাপি ঋত্বিক ঘটক বিশেষ ব্যক্তির প্রভাবে তাকে উচ্ছেদ করা থেকে বিরত থাকতে হয়।

এস্টেট ম্যানেজারের অফিস থেকে তপন গাঙ্গুলীকে তার আয়ের বিবরণ জানাতে বলা হয় এবং ইনকাম ট্যাক্স সার্টিফিকেট দাখিল করতে বলা হয়। কিন্তু হাজার হাজার টাকা আয় করেও শ্রীগাঙ্গুলী ঋত্বিক ঘটককে দাখিল করতে পারেন নি। শ্রীগাঙ্গুলীর মাসিক আয় নাকি কয়েক হাজার টাকা, তাহলে তিনি জোর জবরদস্তি করে ঋত্বিক ঘটককে দাখিল করে। আরো জানা গেছে যে হাউসিং ডিপার্টমেন্টের কল্যাণে ওপন গাঙ্গুলীর ফাইলটি নষ্ট করে ফেলা হয় এবং নতুন করে একটি ফাইল খোলা হয় যাতে তপন গাঙ্গুলীকে ক্যানিংয়ের একটি প্রেসের ৬০০ টাকা মাইনের কর্মী বলে দেখানো হয়েছে। দর্পণের কাছে খবর তপন গাঙ্গুলী ঋত্বিক ঘটককে দাখিল করেন না। ওটা সম্পূর্ণ জাল। শুধু তাই নয় ঋত্বিক ঘটক সার্টিফিকেট দেওয়ার পেছনে তদানীন্তন কেয়ার টেকার অমৃত চ্যাটার্জীর হাত আছে। আরো যজ্ঞার ব্যাপার তপন গাঙ্গুলী ঋত্বিক ঘটকের কোন আত্মীয়ই নন। অথচ ঋত্বিক ঘটক মারা যাওয়ার পর তার নামে তপন গাঙ্গুলী টাকা জমা দিয়ে চলেছেন। সোনারপুরের হরিনাভিতে তপন গাঙ্গুলীর অত্যাচারে বহু সি পি এম কর্মীকে ধর ছাড়া হতে হয়েছে। আর সেখানে বাড়ী ধর সব রয়েছে। হাজার হাজার মাহুষ সেখানে ফ্ল্যাট পাওয়ার জন্য আবেদন করছেন সেখানে টাকার জোরে প্রাক্তন মন্ত্রী গোবিন্দ নন্দুরের সাক্ষরিত কি করে ঋত্বিক ঘটক বে-আইনীভাবে আছেন সেটাও ভাবার কথা।

প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী সম্পর্কে আলোচনা

গত ১১ই নভেম্বর নয়াধিকার 'শান্তি ভবন' কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের নিকট নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে এক ডেপুটেশন স্মারক ১১ দফা দাবী-দাওয়ার একটি আবেদন উপস্থাপন করা হয়। দাবীগুলি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী নিরঞ্জন দাসী করণ ও ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি স্বীকার করেন যে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন অনেক কম এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চেয়ে প্রায়শ্চিত্ত ১০০ টাকা কম। কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি বৃদ্ধির দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করে তিনি এ বিষয়ে সাধ্যমত প্রচেষ্টা নেবেন বলে আশ্বাস দেন। শিক্ষাকে রাজ্য তালিকাভুক্ত করার দাবীর প্রতি তিনি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য

কোন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা বাতিল করার দাবীর প্রতি তিনি সমর্থন জানান। দ্বিতীয় ভাষা জোর করে চাপানো হবে না বলে তিনি আশ্বাস দেন। পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনের গৃহীত নীতি অনুসারে ন্যূনতম প্রয়োজন ভিত্তিক বেতনহার চালু হওয়া বৃদ্ধি রোধের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপদগুলির ব্যবসা রাজস্বায়ীকরণ, কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃত বোনাস শিক্ষকদের প্রধান সম্পর্কিত দাবীগুলির ব্যাপারে তিনি কোন আশ্বাস দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপের কথা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন। সমিতির প্রতিনিধিদের ছিলেন সাধারণ সম্পাদক গৌরুলাল রায় এবং সম্পাদক অরুণ তট্টাচার্য ও প্রশান্ত বসু। প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সংসদ সদস্য সুর মৃধাও উপস্থিত ছিলেন।

দখল করা বাড়িতে কংগ্রেসীরা অসামাজিক কাজকর্ম চালাচ্ছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মধ্য কলকাতার টিপু হুসেন মসজিদের উত্তোদিকের রাস্তায় দুতলা বাড়ীর ছাদ ও ঘর দখল করে যুব নেতা ও তৎকালীন মন্ত্রী স্বতন্ত্র মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস অফিস করে দিয়ে গেলেন ঠিক বিধানসভা নির্বাচনের আগে। চাঁদনী চক স্ট্রীটের কংগ্রেসীরা এখনও দখল করা বাড়ীতে অসামাজিক কাজ চালাচ্ছে। এদের একটি দল নিয়মিত বাড়ীর ছাদ দখল করেছে এবং ফাঁকা ছাদে হোগলা আর বাঁশ দিয়ে ঝোপড়া বানিয়ে মদ আর মেয়ের আড্ডা পড়ছে। কতিপয় ভাড়াটিয়া পুরসভায় বার বার ধরবার চেষ্টা করছে।

৩৬ নং চাঁদনীচক স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩ এ সি, পি, এম, নির্বাচনী

অফিসের পাশের বাড়ীর ছাদে বে-আইনী দখলদার কংগ্রেসী গুপ্তা নিয়মিত ঠোকাঠুকি করছে, হৈ হুলা আর জুয়ার আসর বসিয়ে দাপাদাপি চালাচ্ছে। এই বাড়ীটির ওপর তলায় এক বে-আইনী দখলদার এই সব কংগ্রেসী দখলদারের সহায়তায় অ্যান্ডার নিকেল পালিশ কাজ করছে, প্রায় কারখানা বসিয়ে ফেলেছে। ফলে বাড়ীটির বরগায় ক্ষয় ধরছে। ছাদ দিয়ে জল পড়ছে। কতিপয় ভাড়াটিয়া পুরসভায় বার বার ধরবার চেষ্টা করছে। দিন দিন জলুম বেড়েই চলেছে।

টাকা আদায়ের অভিযোগ (দর্পণের সংবাদদাতা)

মুগ্ধাবাদের সৈয়দ আহমদ নামে এক ব্যক্তি নানাভাবে নানা জনের কাছে সমাজ সেবার নামে অর্থ আদায় করছেন বলে অভিযোগ এসেছে। রাজা হজ কমিটির সদস্য সৈয়দ আহমদ কয়েকবার সরকারের টাকায় আরব ভ্রমণ করেছেন বিনা পয়সায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খরচে এ বছরও তিনি হজ কমিটির দপ্তরে মহাকরণের এক তলায় নিয়মিত হাজিরা দিয়ে আরব যাত্রার লিস্টে নাম লেখানো, টাকা দান, ইত্যাদির ব্যাপারে হজ যাত্রীদের কাছ থেকে বে-আইনী ভাবে টাকা আদায় করছেন। ইনি কংগ্রেসের আবদুস সত্তারের সহায়তায় ওয়াকফ কমিশন অফিসে নানা রকম দালালী করেছেন এবং নিরানব্বই বছরের লীজ পাইয়ে দিচ্ছেন ওয়াকফ সম্পত্তি। (শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়)

গোপন কথাসুখ?

আপনিও জানতে পারেন।

আমার নিখুঁত পরিকল্পনা থেকে হুঁভাবে লাভ সুনিশ্চিত! আয়কর আইনে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, সি টি ডি, জীবন বীমার পলিসি ইত্যাদিতে টাকা লগ্নী করলে আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই সবের মধ্যে, জীবন বীমা শুধু যে আপনার করের টাকা বাঁচাতে সাহায্য করে তা নয়, আপনার জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার মাধ্যমে, যে দিন থেকে আপনি জীবন বীমা করেন, সেইদিন থেকেই আপনার জন্ম এক সম্পত্তি গড়ে তোলার গ্যারান্টি দেয়। জীবন বীমার প্রিমিয়ামের মাধ্যমে কর সংক্রান্ত সুবাদিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সম্পর্কে বিধান বিবরণের জন্য আপনার বীমার এজেন্টের সঙ্গে আজই দেখা করুন, না কেন?

জীবন বীমার কোন বিকল্প নেই



লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া

অপসংস্কৃতি এবং কালীপূজা

সমীরণ মজুমদার

কথাটা খট করে স্থানে বাজতে পারে যে পূজার সঙ্গে অপসংস্কৃতির আবার যোগ-কোথায়। কিন্তু 'অপ' উপসর্গ যখন একবার সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত হয়ে যায় তখন তাকে, আর কেবল বিশেষে বাদ রাখা যায় না। পূজার প্রাঙ্গণেও তার উপস্থিতি ঘটে। কেবল আবার খুলে তাকে আবিষ্কার করা দরকার।

অপসংস্কৃতি কথাটা বহুল প্রচলিত হলেও তার অর্থটা সকলের কাছে খুব পরিষ্কার কিনা তাতে সন্দেহ আছে। প্রথমতঃ সাধারণ মানুষ সংস্কৃতি বলতে গান বাজনা বড় ছোর নাটক উপভাসকে বুঝে থাকেন। অর্থাৎ সংস্কৃতির পূর্ণ রূপটি সম্পর্কে তারা অবহিত নন। দ্বিতীয়তঃ কিছু অসীলতার মধ্যেই অপসংস্কৃতির স্বরূপটিকে ধরে রাখেন। ফলে পূজাতে অপসংস্কৃতি কথা শুনেলে চমকে উঠবেন। আবার 'বারবধূর' বলে 'দেশ' পত্রিকাকে অপসংস্কৃতির ধারক বললে তারা তেমনি আশ্চর্য হবেন।

আসলে মানসিক জগতের যা কিছু সম্পদ তার সামগ্রিক প্রকাশকেই বলা যায় সংস্কৃতি। মানসিক ও দৈহিক শ্রমের মিলনেই মানবসমাজের যা কিছু সৃষ্টি। উৎপাদনের বিষয় ও উৎপাদনের সম্পর্কের কথা যখন বলা হয়, তখন সেই শাস্ত্রকে আমরা বলি অর্থনীতি, 'হুনিফিক্টভাবে' বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা ও প্রমাণের পথ হল বিজ্ঞানের, সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি সামগ্রিক ফলকে। চিন্তা, কল্পনা, দর্শন, ধ্যান-ধারণা, আচার-অহুতান, রীতি নীতি, এক কথায় ঘটনাবলী ও মানসিক কৃতির সম্মিলিত

কলস্রুতি হল 'সংস্কৃতি'। সুতরাং মূল কাঠামোর উপরে দাঁড়িয়ে উপরিকাঠামোর ভিতর দিয়ে একটি সমাজের যে স্বরূপ প্রকাশিত হয় তাই হ'ল সেই সমাজের সংস্কৃতি। জীবন-ধারণের বাস্তব উপকরণ ও সামাজিক সম্পর্কের কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে একটি সমাজের মানসিক গঠনের পরিচয় মেলে সেই সমাজের সংস্কৃতিতে।

ধর্ম সুতরাং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বহন করবার একটি দিক। এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ দেখা গেছে যাতে বর্তমানের সার্বজনীন পূজার জাঁকজমককে এক রুচিশীল মানসিকতার অভিব্যক্তি বলে অভিনির্নিত করা হয়েছে। সেকালে জমিদার, রাজারা পূজার নামে জলসা বসাত, রাত-ভোর ছুটি করত। তার থেকে এই জাঁকজমক অনেক ভাল বলে অভিমত প্রকাশ করা হচ্ছে। কালী-পূজার আলোর ঘটা সার্বজনীন পূজার তথাকথিত শিল্পমনের সঙ্গে আরো এক সংযোজন। বাজী-পোড়ান ও কোঁটান এরও উপর। বিগত সরকার সার্বজনীন দুর্গাপূজার সজ্জার প্রেক্ষিতের জন্ত পুরস্কার দিতেন। হযুত ক্রমশঃ এই পুরস্কার কালী-পূজার আলোকসজ্জার বাহারের জন্তও প্রদত্ত হতো।

প্রথম কথা, এই প্রবণতাকে স্বাভাবিক বলা যায় কিনা। আর দ্বিতীয় কথা উৎসবের এই বাইল্য-গনার ভিতর বর্তমান সমাজ জীবনের অবক্ষয়িত চিন্তার প্রতিকলন আছে কিনা।

সার্বজনীন পূজার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যাক। চাঁদা তোলা। সাধারণ স্বল্প আয়ের

লোকেদের উপর জুলুম এবং হুনিফিক্ট-পরায়ণ শোষণ ব্যবসাদারের উপর নির্ভরতা হল চাঁদার দুটি উৎস। যে কোন স্থানে রাস্তায়, ফুটপাথে বা মাঠে রিনা অহুমতিতে সাধারণের সুবিধা অহুবিধার কথা বিবেচনা না করে পূজামণ্ডপ তৈরি, দীর্ঘদিন তা সংরক্ষণ। বে-আইনীভাবে লাইট পোস্ট থেকে বা জুলুম করে গৃহ চষর থেকে আলোকসজ্জার জন্ত লাইট নেয়া। মাইকে শাস্তির কথা চিন্তা না করে অপ্রিয় গান বাজান। ইত্যাদি এমন কতকগুলি ব্যাপারও সার্বজনীন পূজার সঙ্গে জড়িত যে পূজার কল্যাণী রূপকে এই আব-হাওয়ার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে জমিদার রাজা মহারাজার পূজা উপলক্ষে জলসা বসাতেন আর আজ পূজার পর জলসার আয়োজন হয়। তারা উৎসবের জাঁকজমক ইত্যাদিকে ব্যক্তিগত ভোগলিপ্সার অঙ্গ হিসাবে দেখতেন। আজ তা হয়েছে অনেকের বিশেষ করে কিছু যুবক শ্রেণীর আয়োজনের ব্যাপার। অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ের পরিবর্তিত সংস্করণ হিসাবে পূজা উৎসব টিকিয়েছে।

আমাদের বর্তমান সমাজের কাঠামোটা স্যুমন্ত সমাজের মতো আজ নেই। সংস্কৃতির ভিত্তি আজ পাট্টেছে। সমস্ত সমাজ ভেঙে গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতি হয়ে পড়েছে আধা সামন্ততান্ত্রিক। সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ, নিয়ন্ত্রণ ও লুণ্ঠন সমাজ জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রভাব ফাটিয়ে চলেছে। এই দুইয়ের একত্র অবস্থানের ফলে আমাদের সাংস্কৃতিক

জীবনের বৈশিষ্ট্য দেশীয় চিহ্ন যেমন বোলআনা খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী দেশের বুজোয়া সমাজের বিধিব্যবহার কোন পূর্ণ প্রতিকলন তাতে ফুটে ওঠে না। আর যেহেতু সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরতাই এখানকার বুজোয়াশ্রেণীর বৈশিষ্ট্য সেই হেতু পূর্ণ পুজিবাদী সংস্কৃতির দেখা আমাদের সমাজে মিলতে পারে না। একদিকে দেশীয় সংস্কৃতির অপহৃতি অন্যদিকে পুজিবাদী সমাজের অপ্রাপ্তি—একই মাঝখানে যা গড়ে উঠছে তাই হল অপসংস্কৃতির মূল ভিত্তি।

এই অপসংস্কৃতি গড়ে উঠছে দুটি কারণে। একটি হল নিজস্ব দেশীয় সংস্কৃতি ভেঙে পড়ার তার সবলতা অবলুপ্ত। অন্যটি হল আধা সামন্তবাদী অ-পুজিবাদী এই সমাজে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিনিয়ত রপ্তানী করছে তাদের অবক্ষয়িত পচা গলা চিন্তার অবশেষ।

পূজাতে তাই একদিকে সামন্তবাদী জাঁকজমকের আমদানী আর তার পাশাপাশি টুইস্ট নাচ, অহরহ মাইকের আওয়াজ। একদিকে নিশ্চাপ পুতুলের পায়ের আওয়াজমর্পণ, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী প্রদর্শনীর ঘটা। এই যে এক পা ভগবানের দিকে আর এক পা মানবশক্তির উপর বিশ্বাসের দিকে তার পরিণাম, কোন পথকেই অবলম্বন না করা। কয়েক দিন ধরে পুরোহিতত্বের সাধনা, তারপর সেই প্যাণ্ডেলেই সামাজিক নাটকের ঘটা, যার কঙ্গ কোন বিশ্বাসেরই জন্ম দিতে পারে না। তাই পূজাকে কেন্দ্র করে যুবশক্তি প্রকৃতপক্ষে কোন আদর্শেরই ধারক হতে পারে না।

উৎসবের একটি সংঘবের দিক থাকে। যা ছাড়িয়ে গেলে তাকে উচ্ছ্বলতা নাম দেয়াতে কোন বাধা নেই। কালীপূজার আলোকসজ্জার বাধনহারা প্রতিযোগিতা আর বাজীর নাচ বিক্ষোভের কান ফাটান উপলব্ধ উৎসবের কোনো শাস্ত্রীয় পরিচয়বহন করে না। আমেরিকার ক্রিস্টমাস উৎসবের বীভৎসতার কথাই মনে পড়িয়ে দেয়।

এবার পশ্চিমবঙ্গে দুই কোটির উপর টাকার বাজী পোড়ান হয়েছে। আলোকসজ্জা পূজামণ্ডপের ধরনের হিসাব পাওয়া যায় নি। অধিকাংশ পূজার জন্ত কোন অহুমতি নেয়া হয় না। সরকারী ভবনে আলোকসজ্জাকে সার্বজনীন কমিটির নিজস্ব ব্যাপার করে নেয়া হয়েছে। বর্তমান বাঙ্গালী জীবনের অবস্থার দিকে তাকিয়ে একে মানসিক স্বস্থতা বলে মনে করা অত্যন্ত কঠিন।

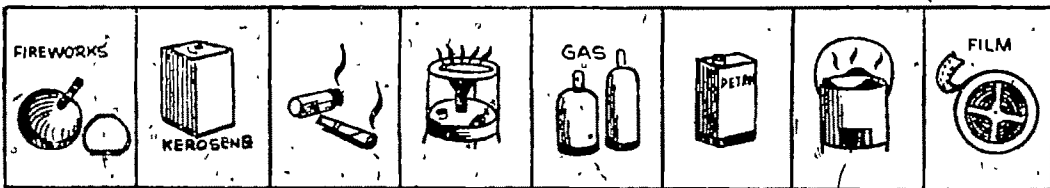
এতদিন বাজীর প্যাণ্ডেটে নানা

রকম কল্লী ছবি দেখা যেত। যদিও বাজী পোড়ান হয় অধিকাংশ স্বল্প-বয়সী ছেলেদের হাতে তবুও সেই সমস্ত ছবি যে কিভাবে ব্যবহৃত হত তা মাথায় ঢুকত না। এবার চকলেট বোম তৈরীতে লক্ষ্য করা গেল রাঙতা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে ব্যাপক ভাবে নিরোধের হলুদ কভার, সাদা-লালের ডোরা কভার ও ডুরা-প্যাকের কভার। কিভাবে বাজীর গায়ে এই কভার এসেছে তা জানা সম্ভব হয় নি। কিন্তু ঘটনাটি যে স্বাভাবিক ব্যাপার নহি তা অনায়াসে বলা যেতে পারে।

'বারবধূর' অসীলতা বা 'জগন্নাথ' বিপ্লবী কাহিনীর বিকৃতি কিংবা পোষাকে ইয়াক্সী বৈশিষ্ট্যের অহু-প্রবেশ অথবা সিনেমা, সাহিত্যে, যৌন জীবন ও খুন দাঙ্গার প্রাধান্য যেমন একদিকে ব্যাপকভাবে আমাদের মানসিক চরিত্রকে হনন করেছে, অপরদিকে পূজার নামে উচ্ছ্বলতা যুব চরিত্রকে স্বস্থভাবে আদর্শ বিমূর্ণ করে তুলছে। একদিকে প্রতিটি পূজার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে নানা পূজার নতুন প্রচলন হচ্ছে আর অন্যদিকে পূজার জাঁকজমক অতৃত-পূর্বভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের হাজার হাজার সমান্তর সমায়ানের চিন্তায় আত্মনিয়োগ না করে যুবসমাজ নিয়োজিত রয়েছে সার্বজনীন পূজার ছল্লাড়ে। একটা সমাজের আত্মশক্তির কাঠামো হল তার যুবসমাজ। কাজেই অপসংস্কৃতির বিষাক্ত আব-হাওয়ায় সেই কাঠামোতে যুব ধরান হল আমাদের শাসকশ্রেণী আর সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য। তাই কালী-পূজা প্রাঙ্গণে রাতভোর বাজী পোড়ানোর পর যদি পরদিন সকালে পূজামণ্ডপের সামনে পড়ে থাকতে দেখা যায় নিরোধ আর ডুরাপ্যাকের খোলগুলি তবেই তো শোষণশ্রেণী আর সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনা মতো সামাজিক উৎসব সার্থক।

তাই প্রশ্ন হল, শোষিত শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত মত আমাদের সাংস্কৃতিক কার্যধারা আর কতদিন পরিচালিত হবে?

ট্রেনে ভ্রমণের সময় বাজি, পটকা, পেট্রোল
কেরোসিন, ফিল্ম, গ্যাস, সিলিণ্ডার,
এ্যাসিড স্টোভ প্রভৃতি বহন করবেন না।



ট্রেনের বগিতে বিস্ফোরক, দাহ্য পদার্থ, স্টোভ প্রভৃতি বহন করার ফলে এবং জ্বলন্ত দেশলাই-এর কাগি কিংবা সিগারেটের শেষাংশ অসাবধানতার সঙ্গে যেখানে সেখানে নিক্ষেপের ফলে বগিতে আগুন লাগতে পারে এবং আপনার জীবন বিপন্ন হতে পারে।

এ ধরনের কাজ ভারতীয় বিস্ফোরক আইনের ৫ম ধারা এবং ভারতীয় রেল আইনের ৫৯ ও ১০৭ ধারা অনুযায়ী নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়।



সতত সেবায় নিয়ত
দক্ষিণ পূর্ব
রেলওয়ে

PRESSMAN

দপণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

৮ টাকার হার

বার্ষিক ২২ টাকা

সাপ্তাহিক ১১ টাকা

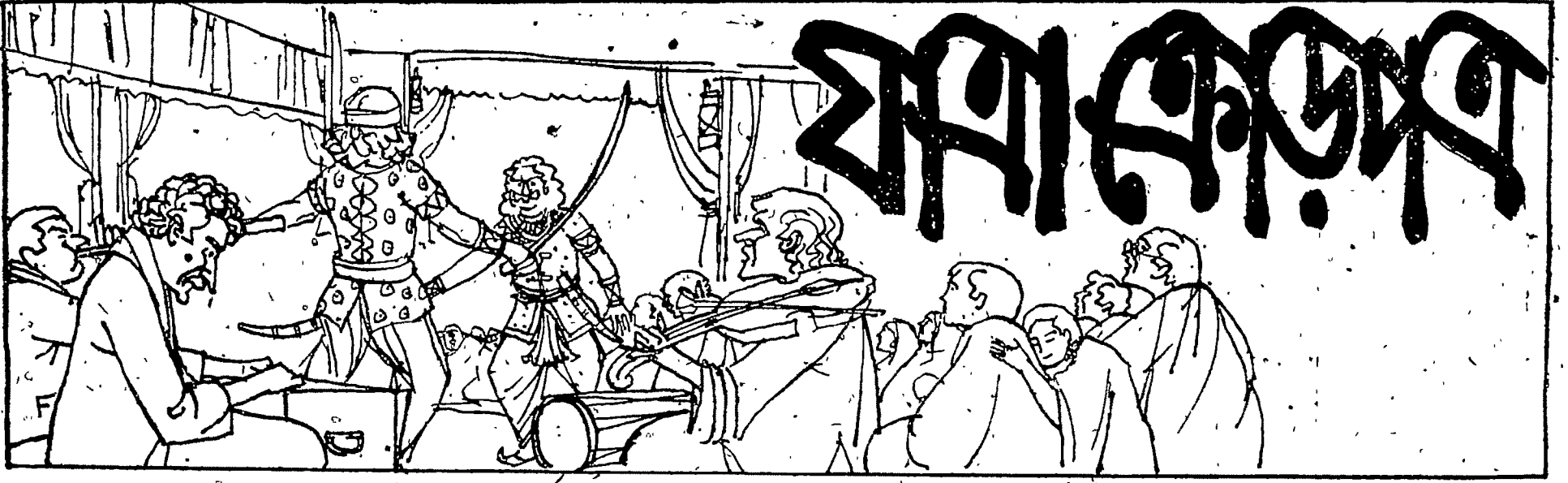
ত্রৈমাসিক ৫.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দপণ

৬১, মট লেন। কলিকাতা-১৩



যাত্রা শিল্প

যাত্রাশিল্পের প্রগতি ও সমস্যা

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

এ দেশের যাত্রাগান অতি প্রাচীন। সেই হৃদয় অতীতকাল থেকে যাত্রাভিনয় গ্রামে গঞ্জে জনপদে লোকশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। গ্রামের নিরক্ষর মানুষ যাত্রাপালার মধ্য দিয়েই নীতিজ্ঞান ও মানবিক মূল্যবোধ আপন হৃদয় সম্ভার যেভাবে মিশিয়ে দিতে পেরেছে, এমনটি আর কোন মাধ্যমেই সম্ভব হয়নি। এবং যেহেতু দেশের অধিকাংশ মানুষেরই বাস পল্লীগ্রামে, সেইহেতু যাত্রার আসর দেশবাসীর পরিচাংশেরই হৃদয়ঙ্গমে ঠাঁই পেয়েছিল অসামান্য মমতায়, একথা কি কখনো বিস্মৃত হবার? ধর্মীয় পালার ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়, সামাজিক নাট্যে পাপের পতন ও পুণ্যের উত্তরণ দেখানোর মধ্য দিয়েই যাত্রা তার লোকসংস্কৃতির অনন্ত ভূমিকাটি পালন করে এসেছে সুগৌরবে। একথা কি অস্বীকার করা চলে যে, একমাত্র যাত্রাই গ্রামবাসীর সংস্কার ও বিশ্বাস, ভাবনা ও বাসনা, দেশাচার ও নীতিবোধকে মরমী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে তাদের সাংস্কৃতিক মনের উত্তরণ ঘটাতে চেয়েছিল? আর সেকারণেই গ্রামীণ মানুষ যাত্রা সংস্কৃতিকে এতটা আপন করে নিতে পেরেছিল। শহরে মানুষ সেখানে কিছু ছিল কিছুটা বিধাগ্রস্ত। মূল্যবোধের বত রূপান্তর ঘটুক যাত্রা সংস্কৃতি কিন্তু শহরবাসীর মনেও প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রাখে যুগের দাবীকে মেনে ও দেশাচার সম্মত নীতিবোধকে জাগিয়ে রেখে।

একথা স্বীকার করতেই হবে, মধ্যপর্বে যাত্রাশিল্প তার আপন দুর্বলতায়, অনতিমব পরিবেশনায়, ক্রান্তিকর পৌনঃপুনিকতায়, এক-ঘেয়েমি পালারচনার বিরক্তিকর দীনতায় সেই গৌরব দীপ্তি হারিয়ে বসেছিল। যাত্রার জনপ্রিয়তাও কিছু অপদার্থ অধিকারী ও অক্ষম পালাকারের জন্ত বঞ্চিত হতে-ছিল। ক্রমে ক্রমে শহরে মানুষও উন্নাসিক হয়ে বলতে লাগলেন 'যাত্রা'

মানের চীৎকার আর বিবেকের গান—ওটা আবার শিল্প মাকি।

ষাট দশকের প্রথমভাগে শোভা-যাত্রার রাজবাটিতে বিপুল সমারোহে যে বিরাট যাত্রা সম্মেলন হয়, তারপর থেকেই যাত্রার আবার জয়যাত্রা শুরু হয়। সেই যাত্রা সম্মেলনের পর আরও একরকমি সম্মেলন হয়, দিকে দিকে সাড়া পড়ে যায়, বিভিন্ন স্থানে আসর বসতে থাকে, জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষ করে আকৃষ্ট হয়। ধর্মীয় পৌরাণিক পালার ছাড়াও আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার ওপর ও রাষ্ট্রনীতিকে কেন্দ্র করেও পালার তৈরী হতে লাগল। ক্রমে দেশের ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে যাত্রা-নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে উঠল আন্তর্জাতিক। জনসাধারণের ওপর শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে যাত্রাপালার এসে গেল আধুনিক বননের কাছাকাছি। বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক পুরুষ হলেন যাত্রা-পালার নায়ক। যাত্রার অভিনয় ও আংগিকেও এল রীতিমত পরিবর্তন। থিয়েটার ও সিনেমার কিছু টেকনিক নেওয়ায় কিছু গোড়া সনাতনপন্থীরা অবশ্য বলে উঠলেন, 'যাত্রার জাত এতে মারা গেল'—কিন্তু একথাতো মিথ্যে নয়, যাত্রা এই নবকলেবরেই তার নতুন অভ্যুদয় সত্ত্ব করে তুলেছে অগণিত জনসাধারণের চিত্তলোকে। গ্রামে গ্রামে যাত্রার সেই অপ্রতিহত গতি দেখা গেল নতুন উজ্জ্বলনায়।

অনুনা কলকাতায় সক্রিয় যাত্রাদলের সংখ্যা প্রায় ষাট আর পশ্চিমবঙ্গে হাজার শতাধিক। কলকাতায় এক একটি যাত্রাদল গঠন করতে লাগে প্রায় দেড় থেকে দু'লক্ষ টাকা। হুতরাং এটা বুঝতে অস্বীকারে হবার কথা নয় যে, এই শিল্পটির ব্যবসাগত দিক থেকেই শুরু কতখানি।

সিনেমা থিয়েটারের মত যাত্রাতেও 'তারকা প্রথা' অল্পপ্রবেশ করেছে। এখানে এক একটি দলজো তারকা শিল্পী মাসিক পারিশ্রমিক পান প্রায় চার হাজার থেকে আট হাজার টাকা। বিশেষ দলে বড় তারকা পান মাসে দশ হাজার কি তার বেশী। সেক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বেতন-ছুক শিল্পী কলাকুশলী পান মাসে মাত্র একশো টাকা থেকে তিনশো টাকা পর্যন্ত। এই দুস্তর ব্যবধানটা লক্ষণীয় এবং চিন্তানীয়ও বটে। পালাকার, নির্দেশক ও সুরকারগণ এককালীন পারিশ্রমিক পান। রয়্যালটি প্রথা চালু নেই এখানে। যাত্রার প্রদর্শনকাল বছরে ছমাস। যাত্রার মত দুর্গাবস্তি থেকে।

বর্তমানে পল্লীগ্রামেও রাজনৈতিক পালার প্রভুত্ব সমাদর দেখা যায়। পরিবেশনা ও অভিনয়ের গুণে সাধারণ দর্শক সমাজও আকৃষ্ট হন। এরকম গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে কার্ল মার্কস, লেনিন, মাওসে-তুং, হো চি মিন প্রভৃতি বরেন্দ্র দেশনেতা পরিচিতি পান রাজনৈতিক তাৎপর্ষ্যে মণ্ডিত হয়ে। এও কি কম লাভ? ধর্মীয় নাটকের আবেদন আজও অক্ষুণ্ণ আছে। তবে সে সব নাটকে নতুন তাৎপর্ষ্য ও ব্যঙ্গনা স্থষ্টি করে পরিবেশন করলে বঞ্চিত হুকল পাওয়া যায়। সেখানে কিছু লক্ষ্য রাখতে হবে, সাধারণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কার যেন আঘাত না পায়। এ সম্পর্কে কোন বাড়াবাড়ি বা ক্রটি ঘটলে ফল বিপরীত হতে বাধ্য। সিনেমা থিয়েটারে যেখানে 'ক্যাবারে' ইত্যাদি অপসংস্কৃতির অল্পপ্রবেশ ঘটে গেছে, সেখানে যাত্রা আজও অপসংস্কৃতির শিকার হয়নি—এটা খুবই ভরসার কথা, আশ্রয়ের কথা। এ ধরনের নিম্নমানের চেষ্টা অবশ্যই যাত্রাতেও চালানো হয়েছিল, কিন্তু

যাত্রার সচেতন দর্শক সমাজ সেই ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন।

১৯৭৬ সাল থেকে যাত্রাশিল্পের প্রমোদকর মুক্ত হয়। অনেকের মনেই প্রশ্ন আজ প্রমোদকর থেকে রেহাই পেয়েও যাত্রার টিকিটের হার ক্রম উর্ধ্বমুখী কেন? যাত্রা সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটা উত্তর অবশ্য পাওয়া গেছে। তাঁদের বক্তব্য, যে সব সংস্থা যাত্রা দলকে আহ্বান করে, অহুষ্ঠান করে, তারাই টিকিটের হার নির্ধারণ করে। যাত্রাদল শুধু ভাড়া খাটে। সেখানে টিকিটের হার বৃদ্ধির দায়িত্ব তাদের ওপর তো আসেনা। তবে একথা ঠিক, যাত্রার প্রোডাকসন খরচ খুবই বেড়ে গেছে বর্তমান অবস্থা-মূল্যবৃদ্ধি ও আরও নানাকারণে। এই ব্যয়বৃদ্ধির উর্ধ্বগতিতে এখনো পর্যন্ত সংযত করা যায়নি। আবার

এ ব্যাপারে সিলিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেও সমস্যা দূর হবেনা, তখন চাহিদা অহুসারী কালোটিয়ার লেন-দেন শুরু হয়ে গিয়ে আবহাওয়া আরও বিবময় হয়ে উঠবে। যোগ্য পালাকার তেমন না থাকায় প্রগতিশীল ও উন্নত শ্রেণীর নাট্য রচনাও সম্ভব হচ্ছে না। যাত্রাদলের সামনে পরিবহন একটি বিরাট সমস্যা। কত গ্রামে গঞ্জে, নানাস্থানে যাত্রাদলকে যেতে হয় নির্দিষ্ট বাসে। আগাম রুট পারমিট সংগ্রহ করার বিধি-চালু থাকায়, একই ট্রিপে রুট পরিবর্তন দরকার হলেও তখন আইনের কায়েল এসে পড়ে। এক্ষেত্রে যাত্রাদলকে অল্প বেতন পারমিট দিলে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। যাত্রা থেকে স্টার সিস্টেম দূর হলে প্রোডাকসন খরচ বেশ কমে যাবে।

১৯৭৩ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যাত্রা উৎসব করে আসছেন। গত চার বছর ধরে রবীন্দ্র কাননে যাত্রা সম্মেলনও অহুষ্ঠিত হয়ে আসছে (শেবাংশ ওষ্ঠ পৃষ্ঠায়)।

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের উদ্দেশ্য

(দর্পণের প্রতিনিধি)

গত ১৯শে নভেম্বর রবীন্দ্র কাননে এক সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের পক্ষ থেকে যুগ্ম সম্পাদক জীশৈলেন মোহান্ত জানাজেন যে, পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের উদ্দেশ্য হল, সংগৃহীত টাকায় যাত্রা-হুষ্ঠানের জন্য একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ ও আরও একটি বহুতল বিশিষ্ট বাটি নির্মাণ যেখানে বিভিন্ন যাত্রাদলের অভিনয় করা থাকবে, যাত্রাশিল্পী ও কলাকুশলীদের জন্য রেস্ট হাউস থাকবে, পরিচালনা ও অভিনয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে অর্থাৎ একটা 'আকাদেমী' গড়ে উঠবে। প্রতি বছরের মত এবছরও দুঃস্থ যাত্রাশিল্পী ও কলাকুশলীকে আর্থিক সাহায্য

দেবার কর্তৃপক্ষী থাকবে। রবীন্দ্র কাননের বিরাট হুমজিত মণ্ডপও আসরে যাত্রা উৎসব চলবে ২৫শে নভেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। যাত্রামণ্ডপে মোট আসন সংখ্যা পাঁচ হাজারের মত এবং সব আসন পূর্ণ হলে সংগ্রহের পরিমাণ হবে ৮/৯ হাজার টাকা। প্রতিটি দলই বিনা পারিশ্রমিকে সম্মেলনের উৎসবে যোগ দিচ্ছেন মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। যাত্রাঙ্গণের স্বরণীয় পুরুষ মুকুন্দ দাসের জয়গত-বার্ষিকীর বছর বলে এবারের উৎসবের উদ্বোধন হবে মুকুন্দ দাসেরই একটি গান পরিবেশন করে।



যাত্রাশিল্প

১)

যাত্রা : ভিন্নমত

উৎসব ও প্রতিযোগিতা

শান্তিগোপাল

অভিনয় উৎসব মঞ্চে প্রতিযোগিতার অয়োজন ইতিহাসে আদিপর্ব থেকে অল্পকিছু হয়ে আসছে। প্রাচীন গ্রীসে এমনি এক ঐতিহাসিক উৎসবেই নাট্যশিল্প ইসকাইলাসকে তার মানতে হয়েছিল সমসাময়িক অন্য এক নাট্য প্রতিভার কাছে। তার নাম সাক্সোস। প্রতিযোগিতার লক্ষ্য ছিল সেদিন অভিনয়ের মান উন্নয়ন করা। উন্নত নাট্যরীতি, নাট্যরসের সন্ধান করা। তাই সেদিন প্রতিযোগিতা উৎসব মঞ্চের বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশকে নষ্ট করত না।

আজ পৃথিবীতে শুরু হয়েছে বাণিজ্যের যুগ। সংস্কৃতিও আজ বাণিজ্যিক পণ্য। যেহেতু তা পণ্য, সেহেতু বাণিজ্য জগতের নিয়মে সেই পণ্য বিকোবার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে বিজ্ঞাপনের।

আজকের উৎসবের মঞ্চে প্রতিযোগিতার ফলাফল তাই জরী দলের পক্ষে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা পালন করে। আমি বলি তা করুক—সার্থক দল বাজার পাক। কিন্তু প্রমুখা অজ্ঞ—অর্থাত্ স্ব-বিচারের প্রমুখ।

এখন এই স্ব-বিচারের প্রশ্নের সংগে স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন, বিভিন্ন রুচির প্রশ্ন। শ্রুতিই আজকের শ্রেণী বিভক্ত সমাজে নৈর্ব্যক্তিক বিচার বলে কিছু নেই।

যাত্রাশিল্পের প্রগতি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

সগৌরবে। এবারও যাত্রা সম্মেলন যথারীতি অল্পকিছু হচ্ছে সাড়ম্বরে। কিন্তু কথা হচ্ছে, নিয়বেতনভুক্ত শোষিত যাত্রা শিল্পী কলাকুশলীর অবস্থার উন্নতি না হলে সমগ্র যাত্রাশিল্পটিই সপ্রাণ সতেজ হয়ে উঠতে যে পারেনা, সে সম্পর্কে কে কতজন ক্রিয়ভাবে চিন্তা করছেন? উন্নতি ও প্রগতির যত আলোর বজ্রাই বয়ে যাক না কেন, প্রদীপের স্তীচে অন্ধকারের মত তা অন্ধকারেই থাকবে।

[এই প্রবন্ধ রচনায় কিছু তথ্য সরবরাহ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীশ্রীশ্রী মোহান্ত]

প্রযোজনায় সাক্ষ্য, না নাট্যবস্তুর সার্থকতা কোনটি বিচার হবে সে প্রশ্নও এসে যায়।

তাই বর্তমানে সাংস্কৃতিক উৎসব-গুলিতে প্রতিযোগিতা নিয়ে উঠেছে নানা প্রশ্ন, নানা বিরোধ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, সন্ত সমাপ্ত সরকারী যাত্রা উৎসবের প্রশ্নটা এসে যায়।

বিগত বৎসরগুলিতে সরকারি যাত্রা উৎসবে প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। বড় ও প্রতিষ্ঠিত দল হিসাবে এই ব্যবস্থায় আমরা লাভবানই হয়েছিলাম। শিল্পী হিসাবে ব্যক্তিগত ভাবে আমিও পেয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার। তবু সরকারী 'উন্নয়ন কমিটির' একজন সদস্য হিসাবে এবারের উৎসব প্রতিযোগিতা বিহীন করার সরকারী প্রস্তাবকে আমি স্বাগত জানিয়েছিলাম। কেন জানিয়েছিলাম সে কথাটাই উপরে আলোচনা করলাম।

অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, প্রতিযোগিতা না থাকায় উৎসবের আকর্ষণ কমে গেছে। আমি এর সংগে মোটেই একমত নই। আমার সামনে দৃষ্টান্ত রয়েছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন আয়োজিত রবীন্দ্র কাননের যাত্রা উৎসবের। প্রতি বছর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র কাননে যে দর্শক সমাগম হয়, সেটা অস্বাভাবিক। দর্শনারী হারও এই উৎসবে কম নয়। এখানে তো প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা নেই, তবুও কিসের আকর্ষণ?

কাজেই, আমার মনে হয়, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উৎসবের বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের স্বার্থে, প্রতিযোগিতার—পুরস্কারের ব্যবস্থা না রাখাই ভালো। না হলে একাবন্ধ কর্মপ্রচেষ্টা, সংক্রান্ত মানসিকতা, সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

কিছুদিন আগেও একটা কথা চালু ছিল। "যাত্রা শোনে কাজী লোকে, কবি শোনে ভক্তলোকে।" আজ তার বদল ঘটেছে, কারণ যাত্রা তার সেই প্রাচীন ব্যাধি থেকে মুক্ত। বৈদেশী বৈদেশী খ্যাতিমান লেখক নাট্যকারেরা এসে যাত্রা শিল্পকে অলংকৃত করেছেন। আজ যাত্রাশিল্প অর্থ বিনিয়োগের দাপটে, খ্যাতিনামা চিত্র মঞ্চ কলাকুশলীদের আবির্ভাবে রঞ্জিত। যাত্রার বিজ্ঞাপনী দৌরাণ্ড্য সংবাদপত্রে সংবাদকে নির্জীব করেছে, অনেক সংবাদ নিহত হচ্ছে। বছর কয়েক আগেও চিৎপুরের সংগে কেতা-হরত স্বধী সম্মেলনের কোন সংযোগ ছিল না, যাত্রা সেই অন্ধকার নিঃসঙ্গতা থেকে এখন মুক্ত।

এই যাত্রাশিল্পের নব অধ্যায় সূচিত হওয়ার পর যাত্রা জগতের সর্বাধিনায়কদের (মালিক) ভাবের জগতে কিছু বিবর্তন ঘটছে। প্রমুখ চৈতন্য, জয়দেব, রামকৃষ্ণ কৃপাস্বরিত হয়েছে 'হো-চি-মিন', 'হিটলার', 'লেনিন', 'মাও-সে-তুং', 'জুলিয়াস সীজার', 'হামলেট', 'ওথেলো', 'অ্যালেক্সে ও প্যারি কমিউনে'। তবে পুরাণ-ইতিহাস যাত্রা থেকে মুছে যায় নি। তবে এই পুরাণ-ইতিহাসকে যে অর্থে ব্যবহার করলে সমাজের দ্রুত বিবর্তন সাধিত হবে, তা অস্বাচারিত।

এই জগতটার ভেতর মহলে দৃষ্টি দিলে বোঝা যাবে যাত্রার দলের অধিনায়ক মহলে এখনও বাজারে মানুষিকতা পুরোপুরিই রয়েছে। সাম্প্রতিক কালে যাত্রার 'বিক্রমী' উল্লাস দেখে মনে হয় তার আত্মঘাতী ছুটি ডানা বড় বেশী ছটকট করছে। কেননা যাত্রার অন্তর মহলটা কয়েকশো বছরের অন্ধকারময় ঐতিহ্যই বহন করে।

দলের নায়ক-নায়িকা এবং গুটিকয় দ্বিতীয় সারির অভিনেতা-অভিনেত্রী ছাড়া বিভিন্ন দলে হাজার হাজার কর্মী শোষিত নির্ধারিত।

কোন দলের একজন খ্যাতিমান নায়ক ছ'মাস চাকরী করে তিন বছর পাওয়ার ওপর পা তুলে বাবুয়ানী করবেন, আর একজন বেয়োরা বা কনসার্ট বাদক নয়মাস দলে কাজ করে বাকী তিনমাস মোট বইবেন এ কেমন শিল্প? পাতাজুড়ে বিজ্ঞাপনের জন্য একদিকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ আর সাধারণ কর্মীদের বেলায় বত হাতটান। নতুন কোন দল বিবর্তনের ভাবনা নিয়ে এগিয়ে এলে তাকে

সম্মিলিত যত্নসহে হত্যা করা কেন? —এই জ্ঞানের প্রতিযোগিতা এবং মালিকের অতিমুনাফার হাত থেকে যাত্রা কবে রক্ষা পাবে? ছুঃখ লাগে, মঞ্চচিত্র জগৎ থেকে আগত প্রগতিবাদী (?) শিল্পীরাও কেন মালিকদের কাছে আত্মসমর্পিত?

প্রীতি রায়

২)

যাত্রাশিল্পে আজও শতকরা ৯৫ জন শিল্পীর মূল্যায়ন হয় ২০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে। আবার কোন দলে পালার বায়না না থাকলে ছয় মাসের চাকরীতে তিনমাস ছুটি। আর ছুটি মানেই (হু একটি দল বাদ দিলে) মাইনে কাটা। এক একটা যাত্রা দল মানে কম করে ২০০ কর্মীর সংগঠন। কিন্তু এ সংগঠন সংবিধানহীন। তার ওপর বিপন্ন মালিকের হাত থেকে সম্পন্ন মালিকের কাছে দলের সম্বল হস্তান্তরিত হলে পুরোনো কর্মীরা বেকার।

যাত্রা দলে কর্মরত থাকা মানেই এক বন্দী জীবন। ছয় থেকে নয়মাস স্বামী অথবা স্ত্রী-স্বজনসংসার ত্যাগ করতে হবে। পালা গাইতে যেতে হবে দূর-দূরান্তরে। মাইনে যা মিলবে তাতে একার পেট চালানোই দায়। সংসারের দিকে অক্ষিপের কোন সুযোগ নেই।

মালিক বায়না পেলেই বায়না ধরবেন; এমন কি এক রাস্তিরে তিনটে বায়না ধরতেও তিনি কহুর করেন না—আর কর্মীরা পাঁচ টাকা বেশী মাইনের বায়না ধরলেই তাকে উল্টো দিকের পথ দেখিয়ে দেওয়া হবে।

মালিক মহল গড় হিসেব করতেই ভালবাসেন। তিনপালা গাইলেও যে খাটুনি, একপালা গাইলেও তাই। পালা ধরে পরসার হিসেব করতে গেলে পালার হিসেব রাখতে হয়। হিসেব হয়তো একটা থাকে ছনঘরী খাতায়। কিন্তু এক নঘরী খাতায় হিসেব থাকলে আইনের মুখ বন্ধ করা শক্ত, কর্মীদের মুখতো বটেই।

যাত্রা জগত শিল্পী কেনাবেচার হাট। বছর বছর নায়ক-নায়িকা পালার মুকলেই নীলামে ওঠেন। দরে পোষালে সেই দিকে হাটেন। কিন্তু বাঁদের নীলাম নেই, দর ওঠে না, থাকলেও চলে আবার না

থাকলেও তেমন লোক ছোটোতে অল্পবিধা নেই—তাদের টাভিশন সমানে চলেছে। এদের কথা ভাববে কে?

সরকার কি পারবেন, সাময়িক করে এই সব নিপীড়িত সাড়ে চার হাজার মানুষের জীবন যাত্রাকে নির্বাহ করে দিতে। কাজটা কঠিন। কিন্তু পারলে এই সব প্রকৃত যাত্রাপাণ্ডা মানুষ তাদের প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করবেন।

সুধীর বসু

ভাতুহত্যার রক্তরাজা হাত নিয়ে শাহাজাদা ঔরঙ্গজেব দিল্লীর মসনদে বসে হলেন বাদশা আলম-গীর, জিজিয়া কর রূপী সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ছুরিকা নিক্ষেপ করলেন তিনি হিন্দুস্থানের সমগ্র হিন্দু জাতির উপর; প্রতিবাদে গর্জে উঠল জাঠ সম্প্রদায়, শুরু হলো রক্তাক্ত অধ্যায় যার বাস্তব রূপায়ণ ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের

কল্প

সুদখোর মহাজন বিনোদ-বিহারীর পোষা গুণ্ডা বিন্দু অভয় মাস্টারকে খতম করার মতলবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু গোটা গ্রাম যাকে ভালবাসে, তাকে খতম করা কি এতই সহজ? কে এই অভয় মাস্টার? আর কেনই বা গ্রামবাসির তিনি এত প্রিয় এরই উত্তর দেবে—

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ভাতা কথ

নির্দেশনা ও প্রেক্ষাপট

নটসূর্য

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

১০ই ডিসেম্বর বেলা ২:৩০ মিঃ

রবীন্দ্র কাননে পশ্চিমবঙ্গ

যাত্রা সম্মেলনে

অ-অ্য-ক-খ

পরিবেশনায়

গণনাটা

৩২৭এ, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬

যাত্রা অর্থনীতির অন্তর্দৃষ্টি

নীলাঞ্জন দাশ

রবীন্দ্রকাননের এই প্রান্ত থেকে শোভাবাজারের ঐ প্রান্ত পর্যন্ত জোড়া ট্রামলাইন ধরে যে পথটি চলে গেছে—তা অট্টালিকাবাসী থেকে শুরু করে দীন ভিহারী পর্যন্ত আজ আর কারো অচেনা নয়। এই পথের দু'ধারে একটা উত্তাপ আছে। এই উত্তাপের আঁচ গায়ে লাগে নি এমন লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এর উত্তাপ গ্রামে গঞ্জে কলে কারখানার কয়লাখনি চা-বাগিচায় সর্বত্র ছড়িয়েছে।

এর নাম যাত্রাপাড়া। স্থায়ী জনের ভাষায় শিল্পের জগত। যাত্রা শিল্পের সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে অনেক বিতর্কিত প্রশ্ন উঠেছে কিন্তু এর অর্থনীতির মধ্যে

দিকে দিকে "প্রতিবাদ" করতালি আর শুনি রাজধানী দিকে দিকে স্থায়ী জনের প্রশংসা, মানপত্র, রৌপ্যপদক তুলে তুলে ছুটে চলে গ্রামাঞ্চলে চাবী ও মেহনতী মাহুষের কণ্ঠে কণ্ঠে প্রতিফলিত হয় "প্রতিবাদ"। চাবী বলছে—এ নাটক আমার জীবন দর্পণ। কলের শ্রমিক বলেছে—এ নাটক আমার মালিকের নিপেষণ, জুলুমের ও অত্যাচারের স্বার্থ প্রতিচ্ছবি। মধ্যবিত্ত বুদ্ধি-জীবীরা বলেছে—একটি শোষণহীন সমাজ গড়ার ইঙ্গিত বহন করে এ নাটক।

স্বপন সেনগুপ্ত রচিত নির্দেশিত ও সুরারোপিত

প্রতিবাদ

(রবীন্দ্র কাননে যাত্রা সম্মেলনে ৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৩।)

রীন বানার্জী রচিত আর একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক—

সুর্ষহারী

ও

আগুন

নির্দেশনা—গোবিন্দ দে

সুর—জগন্নাথ ধর

শ্রেয়: যাত্রার তরুণ তুর্কী নায়ক অরুণ মুখার্জী

ফ্রাইট কম্পোজার: বিপ্লব মুখার্জী

রাজধানী যাত্রা ইউনিট

৩৩৭, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা

সব বিতর্কের বীজ নিহিত।

সেই দিন ফুরিয়ে গেছে, যখন যাত্রা শিল্পীরা পালা গাইবার আস্থানে লাফিয়ে উঠত, নিজেকে বস্ত্র মনে করত। পয়সা নয়, শুধু চা বিস্কুটেই তারা শিল্পের কদর আদায় করে নিত।

দিন বদলেছে, সমাজের অর্থনীতি বদলের সংগে সংগে যাত্রার অর্থনীতিটাও দেশের অর্থনীতির সংগে পালা দিয়ে চাকা হয়ে উঠেছে।

প্রদীপের আধো আলো দিয়ে যার সৃষ্টিচারণ করতে হয়, আজ বিম্বলী রোশনাই দিয়ে তাকে বরণ না করে উপায় নেই।

যাত্রা শিল্পের কোলিক্তের আকস্মিক প্রশ্নার ঘটেছে আজ এক দশক। প্রথম দিকটার একটু মন্থর, কিন্তু পরে আরো আকস্মিক। এই আকস্মিক অগ্রগতির ফল হিসেবে আজ চিংপুরে যাত্রা দলের সংখ্যা সত্তরেরও বেশী। এদের মধ্যে কেউ রয়সম করে চলছে, কেউ খুঁড়িয়ে চলছে, কেউ অচল, কেউ নিশ্চল। নিশ্চলদের অস্তিত্ব শুধু সাইন বোর্ডে, কোন গদিধরও নেই। এমন অচল চলিষ্ণু দলের সংখ্যা প্রায় ৪০টি। তাহলে হাতে রইল আর তিরিশটির মতো। এরা শুধু মচল নয়, কেউ কেউ দমকলের মতো জ্বতগামী। তার প্রমাণ এই রবীন্দ্র কাননের যাত্রা সম্মেলন। এবার ৩২টি দল সম্মেলনে অংশ নিয়েছে। এরা যোটাযুটি প্রথম সারির দল। এর মধ্যে গুণগত মানের ফারাক নিশ্চয়ই রয়েছে।

দলপ্রতি যদি মোট ৬০ জন কর্মী ধরা হয়, তাহলে এই পেশার সংগে যুক্ত কর্মীর সংখ্যা সাড়ে চার হাজার।

এই মুহুর্তে যাত্রার অর্থনীতি বুঝতে গেলে আপনাকে একটি দল তৈরী করে হাতে নাতে তার প্রমাণ নিতে হবে।

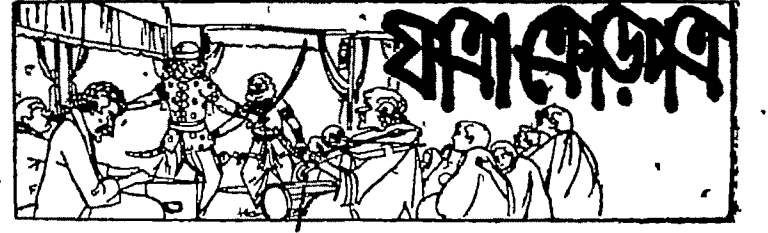
দল গড়তে গেলেই চাই টাকা। কত টাকা? কী করে কয়েক লক্ষ। কেন? কেননা টাকা ছাড়া আপনার কিছুই নেই। আপনার তেজারতি ব্যবসা আছে। অথবা ছোটো বাস, চারটে মিনি আছে, অথবা শহরের পাঁচটা আকাশ ছোঁয়া বাড়ী আছে, অথবা আপনার সম্পত্তি বাগানো কিংবা পিতৃদেবের গচ্ছিত ভাণ্ডার আছে। আপনি সেই ভাণ্ডার থেকে অর্থই ব্যয় করতে পারেন যাত্রা। আট বাট প্যাচ-পয়সার জানলে কিছু কমে পারবেন, নয়তো

জলবৎ তরলং টাকা লাগবে। কেন এত টাকা লাগবে।

প্রথমেই যাত্রার চলতি পালা-কারকে দিয়ে নিজের পালাটি বাছাই করে লিখিয়ে নিতে হবে। কি পালা নেবেন, তাতেও আপনার বুদ্ধির দৌড়। আপনাকে দেখতে হবে যাত্রার বাছাই কি? যেমন নাচ গানের পালা গত দু'বছর খুব বাছাই। চলতি পালা লিখে পালাকার নিশ্চয়ই সেটি নীলামে 'ভুলবেন'। যার টাকা বেশী সেই কিনে নেবে। কমতা থাকলে আপনি কিছুনা অভিনেতা চাই, অভিনেত্রী চাই। তার আগে হিরো-হিরোইন। তারা নীলামে চড়ে বসে আছেন।

যেন কখন মন্থরকুমার পাঁচজন বড় স্টারের মধ্যে একজন। অতএব তিনি আগেই নীলামে চড়ে বসে আছেন। গত বছরে তিনি যে দলে অভিনয় করেছেন, সে দল থেকে তিনি মাইনে ছাড়াও আগাম ৬০ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। দু' নম্বরী খাতায় হিসেব থাকলেও তার মাইনে ছিল মাসে ২০ হাজার টাকা। তিনি আগাম টাকার কিছু কিছু মাসে মাসে শোধ দিয়েছেন। দলের সংগে চুক্তির সময় শেষ হয়ে গেলেও তার কাছে পাওনা রয়েছে ২০ হাজার টাকা। এই অভিনেতাকে যদি আপনার দলে টানতে হয়, তাহলে ঐ ২০ হাজার টাকার দায় সমেত সেই অভিনেতাকে ৮০ হাজার টাকা আগাম দিতে হবে এবং মাস মাইনে বাড়িয়ে ২৫ হাজার টাকা করতে হবে। এ ছাড়া চুক্তির আরো শর্ত আছে, সেই নায়ক বা নায়িকার স্ত্রী-স্বামী যদি হন অভিনেতা বা অভিনেত্রী তবে স্বার্থ মূল্য দিয়ে তাকেও সেই দলে নিতে হবে। অথবা স্ত্রীও নয়, স্বামীও নয়, ভা নৃষেও প্রয়োজনে তার মনপসন্দ অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে নিতে হবে। এ ছাড়া সেই নায়ক-নায়িকার জন্ম গার্জী, আচ্ছা খানা, এবং সেই সংগে যেখানেই অভিনয় করতে যান না কেন আলাদা মেকআপম্যান, আলাদা গ্রীনরুম, আলাদা বেয়ারা। এ ব্যাপারে খরচের বহরটা ভেবে দেখুন।

তা ছাড়া তাঁর মজির মূল্যটাও আপনাকে দিতে হবে। হয়তো স্মরণবনের কোন গায়ে দু বছর আগে পালা গাইবার সময় কোন দর্শক সেই অভিনেতাকে 'কুম-ডোপটাশ' বলে সম্বোধন কবেছিল তাহলে আপনি সেখানে বায়না নিতে পারবেন না। অথবা তার মন-পসন্দ পেয়ারকে টিটকিরি দিয়েছিল, সেখানেও বায়না নেবেন কি না



আপনাকে ভেবে দেখতে হবে।

আপনি কি পালা নিচ্ছেন, তিনি জম্মাতে পারবেন কিনা, তাও নায়ককে ভাববার সুযোগ দিতে হবে।

একজন পালাকারকে আপনি কত দেবেন। একটি পালায় জন্ম ৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত রেট আছে। এবার আপনি পালাকার খুঁজে নিন। যে সে অভিনেতা তার নাটক করুক তিনি তা চাইবেন না। আপনার খাতায় বতাই গোলমেলে হিসেব রাখুন এ সব আপনাকে ভাবতেই হবে। এ ছাড়া হরকারের জন্ম ধরে রাখতে হবে ১০ হাজার টাকা।

দল শুরু করতে গেলে আপনি আর কি করবেন? গদিধর উচ্চমূল্যে ভাড়া ও সেলামী দিয়ে যাত্রা পাড়াতেই যোগাড় করতে হবে। কেননা চৌরঙ্গীতে আপনার পালা কেউ বায়না করতে যাবে না। টেলিফোন লাগবে। মরত্তম শুরু আগের কম করে যানে তিন হাজার টাকায় ভাড়া করতে হবে। এই হিসেবে শোভাবাজারের এক বাড়ী মালিকের মাসে প্রায় লক্ষাধিক টাকা আয়।

অত্যাধি অভিনেতা কম করে হবে পঁচিশ জন। তাদের মাইনে আড়াই হাজার থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত বেঁধে দিতে হবে।

দূর দূরান্তে পালা গাইবার জন্ম নিজস্ব বাস দরকার। ড্রাইভার স্ত্রীনার ধরে সে বাসের জন্ম অন্তত: তিন লাখ টাকা ধরে রাখুন।

৫ম বার্ষিক
পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনে
রবীন্দ্র কাননে
৯ই ডিসেম্বর শুক্রবার

তরুণ অপেরার
জিগাইমিউটিনি

রচনা—মধু গোস্বামী

সুর—পশুপতি ভট্টাচার্য

নির্দেশনা ও অভিনয়ে

শান্তিগোপাল

সাজসজ্জার জন্ম বড় বড় কয়েক-

খানা ট্রাক, বাস, মেকআপ বাস। মহিলাদের আলাদা গ্রীনরুমের পর্দা এবং কনসার্টের যন্ত্রপাতি। এ সবের জন্ম কম করে ৩০ হাজার টাকা। দলের সংগে ঘুরে ঘুরে রান্না করে দেবে সেজন্ত রাধুনি ব্রাহ্মী, যাত্রার হাট দরকার। সেজন্তে ব্যয় মাসে ৫ হাজার টাকা।

এই অর্থ ব্যয়ের যোগাড়া থাকলে আপনি একটি যাত্রার দল খুলতে (শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

৫ম বার্ষিক
পঃ বঃ যাত্রা সম্মেলনে
আগামী ৭ই ডিসেম্বর
সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে
রবীন্দ্র কানন
প্রান্তে

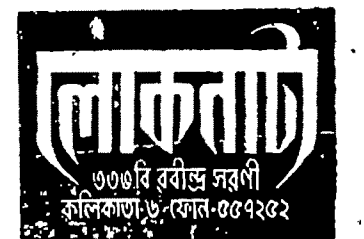


তৎসহ ৮৪-র আর এক
বলিষ্ঠ পদক্ষেপ



চলছে—চলবে

পরিবেশনায়





যাত্রা দলের অর্থনীতি

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

পারেন। তার দল রাখতে পারা না কোম সন্দেহ নেই। আরেকটি দিকে পারা আপনার যোগ্যতা। যাত্রাদলগুলির মধ্যে মোটামুটি সামগ্রিক রয়েছে। তা হল পালার রেট। যে দলগুলি মোটামুটি প্রথম সারিতেই অনেক কম। সুতরাং মুনাকার ঘরে পরিচিত তাদের রেট হল ১২ হাজার জমা পড়ছে বেশী। যে দলের থেকে নীচে ৬ হাজার। এর নীচে যারা মালিক নিজেই নায়ক, নিজেই নির্দেশক সেখানে লাখ দুই টাকা খরচ করে গেল। অর্থাৎ তা একই দিনে দুটো পালার গাওয়া মালিকের গর্তেই গেল। হুজু, এ হিসেব যদি বাদ দি, তাহলে যদিও এই তথ্য দিয়ে যাত্রা দল- ৬ হাজারের হিসেবে একটি চরিত্র গুলির সাধারণ চরিত্র নির্ণয় করা যায় দলের মাসে আয় হচ্ছে ১ লক্ষ ৮০ না। দল বিশেষে চরিত্রের কারাক। হাজার টাকা। তবে এই প্রবণতা বৈশিষ্ট্যগতের এখানে ২৫ হাজারের নায়ক অর্থ নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে এ বিষয়ে থেকে শুরু করে ১০০ টাকার বেয়ারা

পার্থক্য এই টাকা ভাগ করে দিন, দেখুন মালিকের লভ্যাংশে এক লক্ষ টাকার হিসেব মেলে কিনা। সুতরাং আগামীকাল বড়বাজারের তেজারতী ব্যবসায়ীরা যদি যাত্রার ব্যবসায় চলে আসেন, তাহলে কতি কি। ব্যব- সাও হল বড় সংস্কৃতির বাণিজ্যও হল। অবশ্য যাত্রা জগতের কোন মালিকের অল্প কোন তেজারতি ব্যবসা আছে কিনা, বা কোন চিত্র- মঞ্চব্যত পালার ৩০ হাজারের কমে পালার লেখেন না কিনা সে হাড়ির খবরে সরকার কি। সে সব আইনের সংগে তাদের বোঝাপড়া বা কার- চুপির ব্যাপার।

তবে যাত্রাজগতে উদার চেজা মালিক কি নেই। আছেন বৈকি। তারা বারোমাসই কর্মীদের মাইনে দেন। নিম্নতম বেতন দুশো টাকা। অল্প হল অভিনেতা কর্মীর চিকিৎসা করে দেন। প্রবীণ অভিনেতার বিবাহযোগ্য কন্ঠার ভারমুক্তি ঘটান। কিন্তু যার ছাপ যাত্রাজগতের সামগ্রিক চরিত্রে নেই, সেখানে একটি দুটি শুভ লক্ষণই কি যথেষ্ট। যাত্রাদলের অনৈক মালিক আমায় বললেন, “প্রতিভার পবিত্রাংগে আমরা শিল্পী বৃত্তি মিই বটে কিন্তু দলে থাকার সময় মুড়ি মিছরি এক- দর। কেননা মাছঘের যোগ্যতার ফারাক হতে পারে, কিন্তু পেট সকলের এক।”

এই বোধটুকুও সব দলে নেই। সাধারণ শিল্পীদের কাছে যাত্রাজগত অনেক সময়ে অভিযানের মতো মনে হয়। নায়িকার আদীর সংগে দলের কোন যোগ নেই, তবু পুরের বছরে নায়িকা যাতে দলছাড়া না হয়ে যায়, সেজন্য রোজই তার গলায় মাল পেটে মশলা ফেলার জন্ত পকাশ ঘটি টাকা করে ব্যয় হচ্ছে। সাধারণ

অভিনেতা কর্মীদের দিকে চোখ করেছেন, গায়ে জায়গা-জমি কিনেছেন। মাসে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা আয়কর দেয়। অর্থাৎ এই ব্যবসায় কোন পুঁজি নেই। কোন যাত্রাদলেই কোন বিধি নেই। যেটুকু আছে তা ব্যব- নায়িক স্বার্থের সংগে সম্পর্কিত। তারা সাধারণ শিল্পীদের মাইনে বাড়াবেন নাকেন? তাদের কাছে জবাব আছে, প্রতি বছর একই আয় যদি না হয়, পালার যদি না জমে? আয়ের কি স্থিরতা আছে?—কিন্তু মালিকের নিজস্ব মুনাকার স্থিরতা আছে, নায়ক নায়িকার নীলাম আছে।

কিন্তু যাত্রা যে অনিশ্চিত শিল্প- মাধ্যম, তার যে প্রসার ঘটছে, তা অস্বীকার না করেও বলতে দোষ নেই, যাত্রা-রাজার মুখোশে রং চড়লেও ডেতের কাঠ ষড়ে জীর্ণতার ছাপ পড়েই আসছে।

সাধারণভাবে দালালদের এখন কমিশনের হার শতকরা ৬ ভাগ। তার মানে ৭ হাজার টাকার বায়নার ৭০০ টাকা তার। জেলায় জেলায় দালালরা কাজ করছে। এক এলা- কার দালাল অপর এলাকায় হাত বাড়তে পারবে না। এজন্যও বিরোধ লেগেই আছে।

এরকমভাবে অনৈক দালালের মালিক আয় ১ লক্ষ টাকারও বেশী। তিনি দুটি প্রেস করেছেন, গাড়ী

নাট্যমোদী
জনগণের অভিমত
৮৪-র বলিষ্ঠ নাটক



নিবেদিত
পৌরাণিক পালার

দয়্যব্রাহ্মকর

এবং
ঐতিহাসিক পালার



(গাজীগড়)

আমুন—দেখুন

আপনিও বিচার করুন

আগামী

১২ই ডিসেম্বর * সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ
পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনে

লাল নিশান

৫ম বার্ষিক
পঃ বঃ যাত্রা সম্মেলনে
সমাপ্তি রজনীতে
৮৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী
চির নবীন

সত্যস্বর অপেরা
নিবেদিত
এ বছরের সাদা জাগানো
শৈলেশ গুহ নিয়োগীর
একশো মজার এক পালার

বু-মু-র

সুর—শিবকুমার শর্মা

গীত—সমরেন্দ্র ঘোষ

নৃত্য—কেনেধকুমার

[বিঃ দ্রঃ—পঃ বঃ সরকারের স্বাধীন উৎসবে অভ্যবসায়ী দর্শক সমাগমের কলে বহু দর্শক অনেক অসুবিধার মধ্যেও কষ্ট স্বীকার করে দেখেছেন এবং যারা স্থানান্তরে ফিরে গেছেন তাদের জন্য আমাদের অহরোধ অগ্রিম আসন সংগ্রহ করুন।]

৮-৪-র আর এক আকর্ষণ
সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের

পৌরাণিক পালার

নাগমণি

নির্দেশনা

যাত্রাজগতের দিকপাল

মা-থ-ন স-মা-দার

সুর—শচীন বোস ও কিতীশ মণ্ডল

ফোন—৫৫-৮১১০

বেদের দলে এক সুন্দরী মেয়ে ছিল। নাম তার মল্লিকা। দলের সর্দার হুমড়োর মেয়ে সে। কিন্তু অনেকে বলে মল্লিকা ব্রাহ্মণ কন্যা। এক বছর বয়সে মল্লিকাকে চুরি করে নিয়ে আসে হুমড়ো সর্দার। এই সুন্দরীর প্রেম হয় বামুন তালুকদার নদেরচাঁদের সঙ্গে। বেদের মেয়ের সঙ্গে নদেরচাঁদের মিলন কি সম্ভব? আর মল্লিকার জন্মবৃত্তান্তই বা কি? এসবের জবাব দেবে—

সমরেশ বসুর লেখা

মল্লিকা

নির্দেশনা

মহেন্দ্র গুপ্ত

সুর

ডঃ ভূপেন হাজরিকা

আগামী ১৮ই ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যা ৬-৩০ টায়

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনে

মল্লিকা

স্থান—রবীন্দ্র কানন

লায়লা আর মজনু, মজনু আর লায়লা। একজনকে ছাড়া অত- জনকে ভাবা যায় না। লায়লা মজনুর প্রেম আঙ্গ কিংবদন্তী। এদের মিলনকে ব্যর্থ করে দিতে চায় শয়তান জিয়াদের দল। তবুও লায়লা মজনুর মৃত্যু নেই। কারণ প্রেম অমর। সেই অমর কথা নিয়ে লেখা—

লায়লা মজনু

রচনা / নির্দেশনা

শৈলেশ গুহনিয়োগী

সুর

রঘুনাথ দাস

অভিনয়ে

মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, ছন্দা চ্যাটার্জী, ইন্দ্র

লাহিড়ী, বীণা ঘোষ এবং আরও অনেকে

পরিবেশনায়

নব রঞ্জন অপেরা

১১৭, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬

৫ম বার্ষিক
পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন

রবীন্দ্র কাননে

দেখুন

১৭ই ডিসেম্বর শনিবার

সন্ধ্যা ৬ টায়

ভারতী অপেরা

নিবেদিত

রাখাল সিংহ

অভিনীত

বৃন্দাবন লীলা সমৃদ্ধি পালার

কংস

নয়া চীনের কৃষি ব্যবস্থা

ইন্দিরা বসু

বর্তমান চীনের গ্রামগুলি দেখে এমন ধারণাই করা যায় না মুক্তির আগে সেগুলি কি পরিমাণ দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। বর্তমান গ্রামগুলি দিগন্ত প্রসারিত, চোখ ছুঁড়ান শস্যে ভরা মাঠ, ধরে ধরে গাছের লম্বা সারি, ক্ষেতের পাশ ও মধ্য দিয়ে প্রশস্ত সেচের খাল, যান বাহন, চলচিলের দৃশ্য বোধান রাস্তা, কৃষকদের নতুন নতুন ছোট ছোট ঘর বাড়ী, বিজলী বাতি, অসংখ্য ছোট ছোট কারখানা দেখে মনে হয়না কোন অভাব আছে। নতুন সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন এই গ্রামের রূপ ছিল অন্ধ রকম। গ্রাম ছিল জমিদার ও মুষ্টিমেয় অবস্থাপন্ন ঋণদাতাদের হাতে আর অগণিত ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক ছিল এদের অন্য় অত্যাচারের শিকার। গ্রামগুলিতে উৎপাদন দিন দিন কমে আসছিল কৃষকদের দারিদ্র্য, অনাহার, রোগ, মৃত্যু প্রভৃতি কারণে আর তার সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগও সহায় হয়েছিল। গরীব ভূমিহীন চাষী জমিদারের ক্ষেতে চাষ করে যে ফসল কলাতো তার অর্ধেক জমিদারকে দিতে হতো। এখানে ধরা, বন্ধা, অতিরুষ্টি, অনাবৃষ্টি কোন কিছুই বিচার হতো না। সরকারী খাজনাও এই চাষীকেই দিতে হতো, জমিদারকে নয়। চাষী জমিদারের কাছ থেকে জমির উন্নতি করার খরচ বা বীজ-কিছুই পেতো না, কিন্তু বছরে ১২০ দিন তাকে জমিদারের কাজ করতে হবে এই ছিল নিয়ম। সমস্ত ব্যয় বহন করে তার অংশে পারিশ্রমিক হিসাবে বা পড়তো তাতে বছরে দু-তিন মাসের বেশী তার অন্ন সংস্থান হতো না। ঋণ নিয়ে অভাব পূরণের চেষ্টা করতো। এই ভূস্বামী বা ঋণদাতার ঋণ শোধ ব্যবস্থা কৃষকের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সবাইকে বিক্রি করার অধিকার ছিল, আইনের সাহায্যে এর কোন প্রতিকার ছিল না। ১৯৪৯ সালে মুক্তির আগে চীনের এই ভূমিহীন, দরিদ্র কৃষক নানা শোষণ ও অত্যাচারে দুঃখ দুর্দশায় দিন কাটাত, তাদের নিজের বলতে কিছুই ছিল না। ফলে বছরে বছরে অনেকেই অনাহারে রোগে পঙ্গু হয়ে প্রাণ হারাতো। এদের কেউ কেউ রোজ-গারের আশায় গ্রাম ছেড়ে লাঠির মাথায় তার সামান্য সঞ্চয় বেঁধে নিয়ে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে শহরের দিকে চলে যেত। শহরের অবস্থাও ভাল ছিল না। তাই এদের আশা পূরণ হতো না, অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তি

নিত আর ভিলে ভিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেত। বছরের পর বছর চীনের বৃক্ষে এই অনাহার, রোগ, মৃত্যুর তাণ্ডব চলছিল। মুক্তির পরে নতুন সরকার ক্ষুধিতের মধ্যে অন্ন যোগাবার ভার গ্রহণ করলেন। সরকার বুঝলেন এই অন্ন যোগাতে, পারে কৃষি, তাই কৃষির উন্নতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলো। দেশ থেকে সব রকম অসাম্য দূর করে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলবেন এই ছিল মাও সে তুংয়ের জীবনের স্বপ্ন। এও বুঝেছিলেন যন্ত্রশিল্পের প্রসার ছাড়া সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। দেশের অবস্থা ছিল শতছিন্ন কাপড়ের মত। সবদিকেই সংস্কার প্রয়োজন কিন্তু তিনি তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রথমেই কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার হাতে নিলেন। কৃষি যোগাবে মুখের অন্ন আর শিল্পের কাঁচা মাল। ১৯৫০ সালে তিনি জমিদারী প্রথা রহিত করে ঘোষণাপত্র দিলেন এবং ১৯৫২ সালে ভূমিহীন ও গরীব চাষীদের মধ্যে ভূমি বন্টন করলেন। এখন পর্যন্ত কিন্তু ধনী ও মধ্যাচাষীদের ভূমিতে হাত দেওয়া হলো না, কারণ সরকার মনে করলেন যে গ্রাম্য অর্থনীতির উন্নতি করতে হলে এদের প্রয়োজন আছে। এই মধ্য চাষীদের রেখেই জমিদারকে কোণঠাসা করা যাবে। চাষীদের জমিদারের অত্যাচার অবিচার সম্বন্ধেও সজাগ করে দেওয়া হলো এবং সমাজতন্ত্র বিষয়ে আস্তে আস্তে তাদের ওয়াকিবহাল করা হলো। পরে তারাই কৃষে দাঁড়াতে শিখলো এই অবিচারের বিরুদ্ধে। এ সময়ে এও ঠিক হলো দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে হলে মিলিত চাষবাস প্রথা (co operative) গ্রহণ করা দরকার। খণ্ড খণ্ড জমি চাষ করে কোন পরিবারেই আয় কিছু বাড়লে না, অভাব লেগেই রইল। আয় বাড়ানোর বিষয়ে চাষীদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করায় উৎসাহ দেওয়া হলো। এর পরই এই মিলিত চাষের পরিকল্পনা নেওয়া হলো। এতে চাষীরা কিছুটা উপকৃত হলো এবং তা থেকেই ধাপে ধাপে সমস্যার অত্যাচার ঘটলো। কৃষির উন্নতি করতে গিয়ে মাও সে তুংকে দেশের ও পার্টির প্রতি-ক্রিয়াপনীদের কাছ থেকে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তিনি দূরদৃষ্টি দিয়ে সঠিক পথ অনুসরণ করে কৃষি ব্যবস্থাকে বর্তমান উন্নত অবস্থায়

আনতে পেরেছেন। কৃষকের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কৃষির উন্নতি ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ায় হঠাৎ পরিবর্তনের কুফল থেকে অনেকটা অব্যাহতি পাওয়া গিয়েছে। এই সময় কিছু পরস্পর সাহায্যের টিম (Mutual Aid Team) গড়ে তোলা হয়। এই টিম শস্ত রোপণ ও তোলার সময় চাষীদের সাহায্য করতে লাগলো কিন্তু এই সময়টাতেই সকলের কাজের চাপ বেশী হয় এবং টিমের সদস্যদের ও নিজেদের চাষের কাজ তখনই থাকে, ফলে সাধারণ তদারকি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা জমি সংক্রান্ত উন্নতি এবং সেচের নতুন নতুন ব্যবস্থা কোন দিকেই বিশেষ নজর বা সময় দেওয়া সম্ভব হতো না। আর ধনী কৃষকদের এদের কাজ একচেটিয়া করে নেওয়ার প্রবণতাও দেখা গেল। কৃষি বিষয়ে নানা পরামর্শ ও নির্দেশ দেওয়া বাক্য একদল কন্নী নিযুক্ত করা হয়। তারা সবাই কলেক্টর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ধনী সম্প্রদায়ের সম্ভ্রামসম্পত্তি, স্বতরাং স্বভাবতঃ তাদের আত্মীয়স্বজনের স্বার্থের দিকে নজর ছিল। এরাই প্রকৃত উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। যৌথ চাষের ছিল চারটি স্তর (১) পরস্পর সাহায্য ভিত্তিক টিম, যাতে ব্যক্তিগত মালিকানা আছে কিন্তু এই যে একে অগ্রের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া তাতেই সৃষ্টি হয় সমাজতন্ত্রের অঙ্কুর; (২) প্রাথমিক সমবায়; এই স্তরেও ব্যক্তিগত মালিকানা আছে কিন্তু এই মিলিত শ্রমের ফল বন্টনের মধ্য দিয়েই আসে সমাজতন্ত্রের প্রথম ধাপ; (৩) উন্নত ধরনের বৃহৎ সমবায় যা একেবারে সম্মিলিত ব্যবস্থা; জমি চাষের যন্ত্রপাতি, বলদ গরু, সার, বীজ সবই সমবায়ের সম্পত্তি—ব্যক্তিগত মালিকানার অবকাশ রইল না; (৪) গণ কমিউন, যা পূর্ণ সমবায় ভিত্তিক। এ স্তরে কৃষিতে কিছু পরিমাণে ধর্মের ব্যবহার হয়। কো-অপারেটিভের প্রথম স্তরে অবস্থাপন্ন কৃষকেরা অত্যধিক ব্যয়ে উৎসাহ দিয়ে, যন্ত্রপাতি বিশেষ প্রয়োজনের সময় অর্থাতঃ বীজ বপন, চারা রোপণ, ও শস্ত তোলার সময় আটকে রেখে নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে। এত অসুবিধা সত্ত্বেও কো-অপারেটিভ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং সংখ্যাও বছরে বছরে বেড়ে চলেছিল, কারণ ক্রমেই উৎপাদন বেড়ে যেতে লাগলো। কৃষকেরা নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে, সরকারের

খাজনা দিয়ে বাড়তি উৎপাদন সরকারের কাছে বিক্রি করে দিয়ে কিছু সঞ্চয় করতে লাগলো। এই স্বচ্ছতার মুখ দেখে কৃষি উন্নয়নের কাজে তাদের উৎসাহ উত্তম দিন দিন বেড়ে যেতে লাগলো। এখানে একটু অসুবিধা দেখা দিল। মিলিত শ্রম ও ব্যক্তি বিশেষের পরিচালনার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল। এই অসুবিধা এড়াবার জন্য প্রাথমিক সমবায় গড়ে তোলা হলো (১৯৫৩-৫৫) যাতে মালিকানা আগেকার মতই রইল কিন্তু পরিচালনা সম্মিলিত, দায়িত্ব রইলো (unified management)। উৎপাদন থেকে সবকারী কর দেওয়ার পর মূল আয় (net income) সমান ভাগ করে একভাগ থেকে কৃষকের জমির আত্মপাতিক হিসাবে মূল্য দিয়ে অবশিষ্ট অংশ কৃষকের পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া হতে লাগলো। এতে অবশ্য কৃষকের কাজের পরিমাণ ও গুণগত উৎকর্ষের দিকেও লক্ষ্য রাখা হলো। উৎপাদন বাড়লো কিন্তু সৃষ্টি হলো আর এক সমস্যা। কোন কৃষক হয়তো জমি দিল কিন্তু শ্রম দিল না, বিভেদ বাড়লো সম্মিলিত পরিচালনা ও বহু জনের মালিকানার মধ্যে। এই সমস্যারও সমাধান হলো ১৯৫৬ সালে উন্নততর বৃহৎ সমবায় গড়ে তুলে। জমির ব্যবস্থা দেয় বন্ধ হলো। জমি, যন্ত্রপাতি, সার, বলদ, বীজ সবই মিলিত মালিকানায় এলো। এর থেকে সরকারকে আয়কর দিয়ে (বর্তমানে দাঁড়িয়েছে শতকরা পাঁচ, আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনাবৃষ্টি, অতিরুষ্টি প্রভৃতি সময়ে স্থান বিশেষে কর মকুব করা হয়) নিজেদের প্রয়োজন অসুখারী রেখে বাকি অংশ সরকারের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হতে লাগলো। এই বিক্রয় লব্ধ অর্থ থেকে পরিচালনা, উৎপাদনের খরচ কুলিয়ে একটা জংশ সম্মিলিত তহবিলে এবং কিছুটা জনকল্যাণ তহবিলে জমা করে বাকি অংশ বেতন হিসাবে ভাগ হতে লাগলো। মিলিত তহবিল কৃষির উন্নতি, হৃদিনের সঞ্চয় হিসাবে রাখা হতো। জনকল্যাণ তহবিল থেকে বৃত্ত, অসমর্থ ও বড় পরিবার যার আয় কম কিন্তু পোষ্য সংখ্যা বেশী তাদের সাহায্য ব্যয় হতে লাগলো। কিছুদিনের মধ্যেই ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের ক্ষমতার সঙ্গে সমবায় তাল রেখে চলতে অসমর্থ হলো। তখন শিল্পের সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়লো। এই প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতে ১৯৫৮ সালে সারা দেশে গণ কমিউন গড়ে ওঠে। এই গণ কমিউন বলতে আমাদের

দেশের এবং পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ নানা বিচিত্র ধারণা করে বসে আছেন, কারণ বর্তমান কাল পর্যন্ত স্বার্থান্বেষী কৃষি উন্নয়ন নানা প্রকার কুৎসা প্রচার করছিল। ১৯৭৩ সালে যখন চীন থেকে ফিরে আসি তখন পশ্চিমবঙ্গেরই একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন “ওরা নাকি একই জায়গায় একই খাত খেয়ে গাদাগাদি করে পাশাপাশি শুয়ে থাকে, একি সত্যি?” আমাদের বুদ্ধিজীবীদেরই যখন এ বকম ধারণা তখন সাধারণ লোক নানা রকম কল্পনা করবে তাতে আর আশ্চর্য কি? গণ কমিউন বন্ধা নিয়ন্ত্রণ সেচের জল সরবরাহ, বন সংরক্ষণ, মৎস্যচাষ, পরিবহন ও স্থানীয় মিলিশিয়া গঠন ইত্যাদি বিষয় চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিল। কোন কোন কমিউন নিজের প্রয়োজনে ছোট ছোট কারখানা প্রতিষ্ঠা করে ট্রাক্টর ও চাষের নানা যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক সার উৎপাদন করতে লাগলো। এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলিই স্থানীয় চাহিদা মেটাতে ও অনেক অংশে বেকারি ঘুচাতে সাহায্য করলো। চীনের কিছুটা অংশ শীতের কয়লা সরবরাহ ঢাকা থাকে তখন চাষ বাসের কাজও বন্ধ থাকে। এই সময়টাতে চাষীরা কারখানায় কাজ করতে লেগে গেল আর যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হওয়ায় কিছু লোক উদ্বৃত্তও হলো। তারা এই শিল্পগুলি চালাতে লাগলো এবং ছোট ছোট আরও কারখানা গড়ে তুললো। এই কারখানাগুলিই গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার কাজে হাত দেওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ কমতে শুরু করল, এই ভাবেই এলো কারিগরি বিদ্যালয় বিপ্লব আর বাড়লো কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার। স্থানীয় ভাবে নানা দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠার শাসন ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণও এলো। প্রতি কমিউন তাদের উৎপাদন থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করতে সক্ষম হলো। কৃষিকর শতকরা পনের থেকে দশে আনা হলো। উৎপাদন আশাতীত ভাবে বাড়ায় গ্রামের জনসাধারণের আত্মপ্রত্যয় জন্মাল। এই সময় শহর থেকে কিছু বিশেষজ্ঞ পাঠান হলো, গ্রামের কমিউনগুলিতে যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও সংরক্ষণ বিষয়ে শিক্ষা দিতে। মাও সে তুং বলেছিলেন যে উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকলে আত্মা বেড়ে উঠবে। ছোট ছোট কারখানাগুলি যে দেশকে কেবল



আয়কর অফিসের অভিজ্ঞতা

আয়কর অফিস সম্পর্কে আমার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছি। একটি নাভিশাস ওঠা কো-অপারেটিভ সোসাইটির সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার ফলে কয়েকদিন আগে উক্ত সোসাইটির তরফ থেকে, আমাকে ৭টি দফা দেওয়া হয় যে, রিটার্ন সাবমিট, অডিট অ্যাও অ্যাকাউন্টস সাবমিট, সিকিউরিটি মানি ফেরৎ ইত্যাদি মারফৎ বাৎসরিক কেস কন্ট্রোল কাজ সম্পূর্ণ করার। স্বভাবতই অনেকগুলো কাজকে কেন্দ্র করে আমি বিগত কয়েকদিন প্রায় রোজই উক্ত সরকারী দপ্তরে যাতায়াত করেছি। তাতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তার একটা বিশেষ দিনের বর্ণনা দি।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, বর্ণিত সরকারী দপ্তরের চারতলায় আছে পাইলট সেকশান এবং কিছুদিন আগে আমরা ঐ পাইলট সেকশানে অত্যন্ত জরুরী কিছু কাগজপত্র জমা দি। কিন্তু পাইলট সেকশানের দায়িত্বপ্রায়ণ কর্মীরা ঐ সমস্ত কাগজপত্র হারিয়ে ফেলেন ও পুরো-পুরি অস্বীকার করেন। অবশেষে আমরা যে ভাবেই হোক ঐ সমস্ত কাগজপত্র সহ ইনকাম ট্যাক্স অফিসে হাজির হই। পাইলট সেকশানে ঢুকতেই সামনের টেবিলে যে অল্প-বয়স্ক কর্মী বসেন, তাঁর কাছে কাগজপত্র জমা দেওয়া মাত্র ভুলোক কাটা কেইটর কায়দায় বলে উঠলেন, "আগে চাঁদা দিন" এবং হাতে একটা কালী-পুঞ্জের বিল ধরিয়ে দিলেন। সেই বিল আমার কাছে এখনও আছে। রাগে ঘেমায় "সারা গা" রি করছিল। যাই হোক অগত্যা দ্বায়ে পড়ে চাঁদাটা দিয়ে দিলুম এবং অহরোধ করলুম যে, আমাদের কাগজপত্রগুলো হারিয়ে যাওয়ায় কাজের অনেক কঠি হয়েছে, অতএব ওগুলো ওপরে আটতলায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। যেহেতু চাঁদাটা পেয়ে গিয়েছিলেন তাই সন্তুষ্ট চিত্তে বণিকবাবু নামে এক প্রবীণ কর্মীকে দেখিয়ে দিলেন। আবার ঐ বণিকবাবুই আমাদের কাগজপত্র হারিয়ে যাবার ব্যাপারে প্রথমতঃ দায়ী। এবার বণিকবাবু আদর করে আমাদের নিজের পাশে বসালেন। কিন্তু অর্থ-করী ব্যাপারে ওরা কখনো প্রতিপক্ষের প্রতি দুর্বলতা দেখান না। অস্ততঃ তিরিশ চল্লিশটা টাকা না হলে কোন কিছু হবার উপায় নেই।

অর্থী একদিনের ভেতরে কাগজ

ওপরে যাবে না। নিরুপায় হয়ে আমিও যথারীতি প্রতিশ্রুতি দিলাম। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে প্রস্তুত না থাকায় অনেক অহনয় বিনয়ের পর বণিকবাবুকে বিকেল অবধি অপেক্ষা করতে রাজী করালুম। বণিকবাবু স্বয়ং কাগজপত্র সহ আমাকে নিয়ে আটতলায় ইন্সপেক্টর সাহা সকাশে যাত্রা শুরু করলেন। কিন্তু ইত্যাক করে দিলে আবার লিফটের কাছে এসে বলতে শুরু করলেন, অস্ততঃ দশটা টাকা না হলে তিনি নড়াচড়া করবেন না। স্বতরাং আবার অহনয় বিনয়ের পালা শুরু হলো। কোনক্রমে ইন্সপেক্টর সাহা হাতে উপস্থিত হলুম।

সাহাবাবু কাগজপত্র দেখেই প্রায় ছুড়ে ফেলে দিলেন। কারণটা মোটেই গুরুতর নয়। কিছু কিছু লেখা বাদ পড়ে গিয়েছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গেই বাদ পড়া অংশগুলো লিখে দিলাম। কিন্তু কিছুতেই তিনি কাগজপত্রগুলো গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। ইতিমধ্যে ভোলা নামে ঐ অফিসের জনৈক পিয়নের সঙ্গে সাহাবাবুর চোখে চোখে কি কথা হয়ে গেল। ভোলা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, টাকা পয়সার ব্যাপারটা বোকাপড়া হয়ে গেলে কামেলা সহজেই স্মিটে যাবে। তখন ইন্সপেক্টর সাহা কাগজপত্র সহই করতে রাজী হলেন। কিন্তু মুজার কথা এই যে, সেই করবেন কিনা এই অহমতি তিনি গ্রহণ করলেন বর্ণিত ভোলার কাছ থেকে। কাজ আমাদের অসম্পূর্ণ রয়ে গেল কারণ "টাকা-পয়সা" সেদিন আর মেটাতে পারি নি। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসার সময় ভোলা আমাকে কানে কানে বলে দিলেন যে, বণিকবাবুকে যা দেবেন তার অর্ধেক আমার, এবং সাহাবাবুকে যা দেবেন তারও অর্ধেক আমার। অতএব ওদের অর্ধেক করে দিয়ে বাকী অর্ধেক আমাকে দিয়ে যাবেন।

অপপ্রচার

১৪ই অক্টোবরের দুর্গা পত্রিকা প্রকাশিত হাওড়া জেনারেল হাসপাতালের একটি চিঠির প্রতি আপনাত দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল দীর্ঘদিন যাবৎ কয়েকটি স্বার্থাধেবীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে এই ব্যাপারে সরকারের

দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, কিন্তু কাজে কিছুই করা হয়নি। একই বিষয়ে আপনাত পত্রিকায় গত ৫ই আগস্ট একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। জানিনা এইকণ সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরই প্রতিহিংসা-মূলকভাবে উক্ত হাসপাতালের নার্সদের সম্পর্কে জঘন্য কুৎসামূলক চিঠি পাঠানো হয়েছিল কিনা। নার্সরা শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যেভাবে তাদের কাজ করেন, সে সম্পর্কে স্বার্থাধেবী মহল জানা সত্ত্বেও তারা কিছু নীরব রইল। রোগীর সংখ্যা অসুখ্যায়ী নার্সের সংখ্যা অত্যন্ত কম, ভাস্কারের সংখ্যা কম, ঔষধপত্র সরবরাহ প্রায় নেই বললেই চলে। খাদ্যও অত্যন্ত নিম্ন মানের এবং প্রয়োজনের তুলনায় কম। নার্সদের কাজের সময়ের কোন নিয়ম নেই, তাছাড়া তাদের চাকুরী জীবনের অল্প সুযোগ সুবিধাগুলি থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যে থেকেও তাদের কাজ করতে হচ্ছে। অথচ এই ব্যাপারগুলি সম্পূর্ণরূপে চেপে গিয়ে অত্যন্ত উদ্বেগমূলকভাবে সেবাধারায়ণ নার্সদের সম্পর্কে কুৎসামূলক মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে। কয়েকটি স্বার্থাধেবীদের সম্পর্কে আসল ঘটনার কিছুটা প্রচার হওয়াতেই ঐ মহল ক্ষিপ্ত হয়ে এইরূপ সংবাদ প্রচার করছে।

সম্পাদিকা

পশ্চিমবঙ্গ নার্সেস এসোসিয়েশন,
হাওড়া জেলা

উৎপল দত্ত

শোনা গেল, বামফ্রন্ট সরকারের কাছে উৎপল দত্ত ৬ লক্ষ টাকার জন্ত আবেদন জানিয়েছেন। ঐ টাকা দিয়ে উনি অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে একখানি ছায়াছবি তুলবেন। উৎপল দত্ত কত চতুর তা লক্ষ্য করুন। আশ-কাল বামফ্রন্ট সরকার অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে মাকে মাকে বিব্রতি দিচ্ছেন। অমনি উৎপল দত্ত সেই সুযোগটি নেবার চেষ্টা করছেন। অথচ মজা দেখুন, এই উৎপল দত্ত অর্থ ও ব্যাতির লোভে হিন্দী বাংলা অসংখ্য কুৎসিত ছায়াছবিতে পর পর অভিনয় করে মনে প্রাণে অপসংস্কৃতির সেবাদাস করে চলেছেন। মাসের ১৫ দিন তিনি বোম্বাই শহরে থাকেন। তাই দেড় লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি সেখানে একটি ফ্ল্যাট কিনেছেন। আবার কলকাতার সভা সমিতিতে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তিনি প্রবল বিরুদ্ধে গলাবাকি করেন। গাছেরও খাব তলারও কুড়োবো, হু নৌকোয় পা রেখে সাগর পাড়ি দেব—এই সুবিধাবাদী নীতির ওপর দাঁড়িয়ে বিপ্লবী শিল্পী হাওয়া যায় না—এটা বেন উৎপল দত্ত মনে রাখেন।

বিমল পাল

কারণস্বধার কাহিনী

(দুর্গার সংবাদদাতা)

পাঠকরা ক্রমা করবেন। 'কারণ স্বধা' নামে পরিচিত হুগলী জেলার জে, এল, আর, ও, (পাণ্ডা) শিবেন চট্টোপাধ্যায়ের হাতে সমস্ত জেলার ছোট বড় অফিসারদের, বদলী, প্রমোশন সব কিছুই আছে। এর প্ররোচনায় হুগলী জেলার বাইগ জন জে, এল, আর, ও নানা সময়ে অত্যাচারিত হয়েছেন হুগলী এবং অস্তায় আবদার সহ করছেন। এখন হুগলী জেলার তিনজন জে, এল, আর, ও সাসপেন্ড হয়েছেন। এখনও কয়েকজন সাসপেন্ড হয়ে আছেন। ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসে হুগলী জেলার পোলবার এম, এল, এ তবানী সিংহ রায়ের প্ররোচনায় এবং অস্তায় অভিযোগের ভিত্তিতে হুগলীর এ, ডি, এম বি, আর, বাজাজ সাহেব পোলবার জে, এল, আর, ওকে সাসপেন্ড করে রেখেছেন। পোলবার জে, এল, আর, ও প্রাক্তন কংগ্রেসী এম, এল, এ এবং এ, ডি, এম বাজাজ সাহেবের বিরোধিতা করার জন্তেই সাসপেন্ড হন। শিবেনবাবুর শিবিরে নতি স্বীকার না করার জন্ত একজন মাত্র জে, এল, আর, ও এখনও সাসপেন্ড আছেন। পোলবার স্থানীয় সি, পি, এমের সর্বসময়ের কর্মী রামধন টুডুর ভাগচাষী রেকর্ড সমর্থন করতে গিয়েই এই বিপত্তি।

আশ্চর্যের কথা শিবেনবাবুই এই সব বরখাস্ত করার সঙ্গে যুক্ত। শিবেন চট্টোপাধ্যায় জে, এল, আর, ও হয়েও কিন্তু ডি, এম অফিসের হর্তাকর্তা। মদ এবং নারী সরবরাহে অফিসার ছুটির ঘণ্টা চক্রান্তের জন্ত বার বার অভিযুক্ত হয়েও খালি। শিবেনবাবুর বন্ধু আর এক জে, এল, আর, ও বিমল গুহ জে, এল, আর, ও চক্রান্তে আর এক হোতা। লক্ষ্য করার বিষয় যে শিবেনবাবু পাণ্ডুয়াতে জে, এল, আর, ও হিসাবে আসতেই তাঁর আগের জায়গা পোলবারে বদলী হলেন বিমল গুহ। তিনি শিবেনবাবুর কুকীর্তি চাপা দেবেন। এ ব্যাপারে তাঁর জুড়ি নেই।

আবার শিবেন চট্টোপাধ্যায় ধনে-খালিতে বদলী হতেই ধনেখালি থেকে বিমলবাবু গেলেন তাঁর পূর্বজন অফিসে। চন্দননগরে শিবেনবাবু বদলী হতেই ধনেখালিতে বিমলবাবু বদলী হয়ে এলেন।

জে, এল, আর, ওদের এবং অস্ত অফিসারদের জোর করে ঘুরে নেওয়ার ব্যাপারে বাধ্য করতে কাজ চালাচ্ছেন হুগলীর এ ডি, এম (এল, আর) পি, কে ব্রজী, তড়িৎ সাহা এবং আরও অনেকে। এই অভিযোগ উঠেছে।

পোলবার জে, এল, আর, ও সাহেব এই চক্রান্তের শেষ শিকার। নির্দাৰ্ণ অর্থভাবে ভুগছেন। একে কোন শো-কজ নোটিশ দেওয়া হয়নি। দেড় বছরের মধ্যে বিচার করাও হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার এ বিষয়ে বিবেচনা করুন।

অর্থ আদায়ের অভিযোগ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেসের ভরাডুবিতে এখন ইনি জনতা নেতা এ. কে. এম. হান্নান এম. পি এবং জ্যোতির্ময় বসু এম. পির. কাছে পরলোকগত সৈয়দ বদরুদ্দোজা এম. পির. ভাই বলে পরিচয় দিয়ে কাজ গোছাচ্ছেন। জ্যোতির্ময় বসু বদরুদ্দোজার বন্ধু ও ভ্রাতৃস্বায়ী, তাই দু'বেলা তাঁর বাসায় ধনী দিচ্ছেন সৈয়দ সাহেব। সৈয়দ সাহেব মুসলমান সমাজের লীডার পরিচয় দিয়ে ইতিমধ্যে অনেক কুকীর্তি করেছেন বলেও অভিযোগ এসেছে।

নয়া চীনের কৃষি

(২য় পৃষ্ঠার পর)

শিল্পে সমৃদ্ধ করলো তা নয়, সমস্ত গ্রামের জনসাধারণকে ভোগ্যপণ্য বৃগিয়ে তাদের অত্যাচার ঘটিয়ে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে শ্রমিক কৃষকদের স্বজনী শক্তি বিকাশে সাহায্য করলো। দেশের মূলধন বাড়তে থাকল। এই ছোট কারখানাগুলি স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরিচালনার ব্যয় হ্রাস করে, স্থানীয় বেকার সমস্তার সমাধান করে গ্রামের চাহিদা মেটাতে ও গ্রাম থেকে শহরে আসার প্রবণতা রোধ করে। এতে কৃষক তার নিজস্ব কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ পায় আর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দূর থেকে বয়ে আনার খরচও হ্রাস করে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে

চাকপোড়ার (হাওড়া) 'সংস্কৃতি' সংস্থা গত ১১-১২ই নভেম্বর সংস্থা-প্রাক্তন অপসংস্কৃতি বিরোধী একটি চিত্র পোষ্টার প্রদর্শনী ও সেমিনারে আয়োজন করে। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন ভারতীয় গণনাট্য সংগের আমতা শাখার সভাপতি নিমাই মারা। তিনি তাঁর বিশ্লেষণাত্মক ভাষণে অপসংস্কৃতির সংজ্ঞা, কারণ ইত্যাদি ব্যাখ্যা, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে দূর্বীর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্ত আহ্বান জানান এবং সঙ্গে সঙ্গে জনগণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশের জন্ত ডাক দেন। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অরুণ মামা এবং অস্তান্তরাও বক্তব্য রাখেন। এই চিত্র পোষ্টার প্রদর্শনী ও সেমিনারে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন এবং প্রদর্শনীটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পরিশেষে বিনয় কোডারের সুদীর্ঘ ভাষণে টেপ-রেকর্ড যোগে প্রচার করা হয়।

বত্তিমশাই

(২য় পৃষ্ঠার পর)

পর্ষীতে বসার পর। এসেই সে আবার আমোলা বাঁধিয়েছে। যেমন চোরাই মদের ব্যবসা তুলে দেওয়া, রিকসাওয়াদের কাছ থেকে টাকা আদায় বন্ধ করা, ওয়াগন ভাঙ্গার কাজ বন্ধ করার জন্তে প্রচার করা ইত্যাদি। কি আশা বনুন তো? বত্তিমশাই শান্তির প্রতীক, মনে হয় আমেরিকা থেকে খেত কপোতের পিঠে চড়ে উড়ে এসেছেন। আর তাঁরই শান্তির কাজে ব্যাঘাত? তা ছাড়া বত্তিমশাইয়ের ঘরে লক্ষী রাগ করে চলে যাবেন যে। ডাক এবার আমার হারোগাবাবুকে। হারোগাবাবুও মুখ ঝড় করে এসে কিস কিস করে কি সব আলোচনা করলেন। পরের দিন নকুল চক্রবর্তী পুলিশের খাতায় খনের আসামী। অর্থাৎ অজিতকে খুন করেছে নকুল। নকুলকে হারোগাবাবু তলব করলেন, তারপর নকুল পুলিশ লক-আপে বন্দী।

বত্তিমশাই এবার অজিতকে শহীদ করে দিলেন। এলাকায় হল প্রচার। শহীদ সত্য, দৈনিক পত্রিকা-গুলি কলাও করে লিখতে লাগল বত্তিমশাইয়ের বক্তৃতার রিপোর্ট। এলাকার সাধারণ মানুষ ব্যাপারটা বুঝে হতভম্ব। কারণ তাঁরা অজিতকে ভাল করে চিনতেন, কখনই কোনো রাজনীতিক কাজে অজিতকে দেখেন নি। যাই হোক বত্তিমশাই যখন বলছেন তখন কে অস্বীকার করবে। বত্তিমশাই ত শহীদ সত্য বক্তৃতা দিতে কামায় তেড়ে পড়লেন আর বিকার দিতে থাকলেন বিরোধী ফ্রন্ট সরকার ও তার শরিক রাজ-নৈতিক দলকে। তাতেও খুব একটা সুবিধা হল না বা জনসাধারণ তাঁর আঘাতে গুলে তুলতে চাইলেন না। ব্যাপারটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্তে এবার ডাক পড়ল বিশ্রামবাগের মহান নেতা ও ভূতপূর্ব মন্ত্রী মশাইয়ের। ঠিক হল বিশ্রাম-বাগের মহান নেতা পদযাত্রা করার মধ্যে দিয়ে শহীদ অজিতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবেন। ঠিক তাই হল, ঢাক ঢোল পিটিয়ে বিশ্রাম-বাগের নেতার গলায় মালা পরিয়ে পথযাত্রা শুরু হল। এলাকার রাস্তার সারীতে অগণিত জনতার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে বিশ্রামবাগের গান্ধীবাদী মহান নেতা ও বত্তিমশাই শহীদ মিছিল নিয়ে এগিয়ে চললেন। যারা অজিতকে খুন করেছে তারাও তাঁদের সঙ্গে চলেছে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। বিশ্রামবাগের নেতা এক-বার নিজের হাতটা তুলে পাশ ফিরে

তাঁদের দিকে দেখলেন এবং মনে মনে আত্মবোধ করলেন বত্তিমশাইয়ের স্পেশাল কমিটির সদস্যদের।

ক'মাস পরে নকুল জামিন পেয়ে জেল থেকে ছাড়া পেল। জেল থেকে বেরিয়ে আবার চাকরি আরম্ভ করে দিল। কিছুতেই দমতে চায় না, কম শয়তান না তো? নকুল নাকি পণ করেছে এলাকা থেকে চুক্তি উচ্ছেদ করবেই। বত্তিমশাইও ঠিক করেছেন তাঁর মহান কর্মকাণ্ডগুলি চালিয়ে থাকেন। এবার তিনি তাঁর গান্ধীবাদী স্পেশাল কমিটির সভ্যদের ডেকে পাড়ি ঘেঁটে শুভদিন স্থির করে হুকুম দিলেন অমাবস্তার পরের রাতে নকুলকে সাক্ষ করে শুভকাজ সম্পন্ন করতে। যেমন হুকুম তেমন কাজ। কাকরগঞ্জ রেল স্টেশনের অপর পারে বাস চারবিনাসের কাছে ভরা সন্ধ্যার সময় গান্ধীমতালম্বী ছুঁদলের মিলিত স্পেশাল কমিটির সদস্যরা ছোরা, ছুরি ও রিভলবার নিয়ে জনসাধারণের চোখের সামনে রাঁপিয়ে পড়ল নকুলের উপর। নকুলকে ওরা ইচ্ছে মত কোপাল এবং কটা গুলী বিদ্ধ করে চম্পট দিল, কিন্তু নকুলকে ওরা পুরোপুরি শেষ করতে পারল না। নকুল এখনও হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করছে, বাকসার ঘরে ঘরে মেয়েরা ভাই কোটার দিন নকুলের উদ্দেশ্যে দেয়ালে কোটা দিয়ে কাঁটা দিয়ে ঘরের পথ অবরোধ করেছেন। নকুল এখনও মনকে বাঁধছে সে চুক্তিকারীদের সম্মুখে উৎখাত করবেই।

কসবায় চক্রান্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যানার্জীর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। আবার হরিহরবাবু সম্পর্কে একথা কসবা অঞ্চলের প্রায় সকলেরই জানা যে, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেসী শয়তানেরা সাধারণ মানুষের ভয়ে যখন এলাকা ত্যাগ করার উত্তোগ গ্রহণ করে এখন সি, পি, এম, কর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে হরিহর-বাবুও ঐ সমস্ত গুণ্ডাদের আস্তানা ত্যাগ না করার ও নিরাপদে বসবাস করার আশাস দেন। কিন্তু হরিহর বাবুর বক্তব্য ছিল একটু অল্প রকম। তিনি বলতেন, “এখন এলাকা ছাড়ার দরকার নেই, যখন দরকার হবে আমি নিজেই বলব।”

বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া গেল যে এই সমস্ত ধরনের গুণ্ডাগোল পাকিয়ে অনাবস্তক এলাকা ছেড়ে দিয়ে তারা দল বেঁধে দিল্লী চলে যাবার পরিকল্পনা করছে। দিল্লীতে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে অভিযোগ করবে যে, সি, পি, এম, কর্মীদের অভিযানে তাদের জীবন বিপন্ন।

জনতা পার্টির প্রফুল্ল সেন বিরোধী গোষ্ঠীর দুই দায়িত্বশীল নেতা ত্রিবিমল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ত্রিদিলাপ চট্টো-পাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে তীব্র ভাষায় এ সব কার্যকলাপের নিন্দা করে বলেন যে, এ সমস্তই সংগঠিত হচ্ছে প্রফুল্ল সেন ও কংগ্রেসী নেতাদের বোধ পরিচালনায়। কারণ তারা যে কোন পদ্ধতিতেই হোক না কেন, পশ্চিমবঙ্গে সম্রাসের দিন ফিরে আসছে এ কথা প্রমাণ করতে বদ্ধ-পরিকর।

কংগ্রেসীরা তাদের যে সমস্ত কর্মী সম্পর্কে বাড়ীঘর ছেড়ে পালাবার তালিকা দাখিল করছে, উল্লিখিত অঞ্চলের ব্যাপক মানুষের সে সম্পর্কে অভিযত এই যে বর্ণিত ব্যক্তিদের অধিকাংশেরই প্রকৃত অর্থে ঘরবাড়ী বলতে যা বোঝায় তার অস্তিত্ব নেই। তাদের বাসস্থান হচ্ছে বে-আইনী মদের আড্ডাখানা, রিক্সা স্ট্যাণ্ড, এবং কিছু গরু মোষের খাটাল। আর ঐ সমস্ত খাটালগুলোতে তারা শুধু থেকেই ক্ষান্ত হয় না, সেখানকার গরীব গোয়ালাদের অত্যাচার করে রীতিমত টাকা পয়সা আদায় করে। প্রসঙ্গত হরিহরবাবুর সঙ্গে দেবা দত্তের সম্পর্কটা খুবই উল্লেখযোগ্য। বিগত বিধান সভা নির্বাচনের সময় হরিহর-বাবু নিজেকে প্রগতিশীল সাজারার জন্ত দেবা দত্তকে কংগ্রেসীদের পক্ষে মস্তানী করার শাস্তি হিসাবে পোলিং বুথ থেকে টেনে নিয়ে এসে রীতিমত দৈহিক নির্যাতন করেন। কিন্তু এখন বামফ্রন্ট সরকারকে হয় প্রতিপন্ন করার স্বার্থে দেবা দত্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিতালী পাতিয়েছেন।

তেলের গোডাউন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাবু প্রকট্টেই বলছেন পুলিশ তাদের চাকর, কারো সাধি নেই তাদের কিছু করে। এর পাশ্বে জে. বি, ও সরানো তো হচ্ছেই আর চলছে কেরোসিন ডিজেলের পাইকারী তেলার কারবার। রাজপথ গুল্লাও এই টাকার তোড়া দেখিয়েই কিছু পুলিশ অফিসারকে হাত করে রেখেছেন। এর মধ্যে ২৪ পরগণার জনৈক শুকলা নামে পুলিশ অফিসারও রয়েছেন। চোরাই কারবার চালাবার নানা ফন্দি ফিকির তাদের কাছ থেকে রাজপথরা জেনে নিচ্ছেন।

কথা হল, দেয়াল ঘেরা গো-ডাউনগুলি সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশের কি কিছুই করণীয় নেই? জেলা এন-ফোর্সমেন্ট দপ্তরের হাজারো ঠাট-বাটেরই বা দায় কি? সড়ক পথে সর্বদা ওয়ারলেস ভ্যান ঘোরাফেরা করে। অথচ সড়কের ধারেই চলেছে ট্যাংকার থেকে তেল বের করে

নেওয়ার ব্যবসা। রাজ্য এনফোর্স-মেন্ট ও কলকাতা এনফোর্সমেন্ট দপ্তরের মধ্যেও এই চোরাই কারবার বন্ধের ব্যাপারে কাজকর্মের সামঞ্জস্য নেই।

জুট মিল কর্তৃপক্ষ জে, বি, ওর সবচেয়ে বড় খরিদার। তেল তেল চটে ব্যবহার হওয়ার ফলে চট জাত ব্যবহার ক্ষতি সাধন হচ্ছে। এ ব্যাপারে মিল অফিসারদের সংগেও সরকারের বৈঠক করা প্রয়োজন বলে অনেকের ধারণা। সবচেয়ে বড় কথা হলদিয়া, বজবজ, পাহাড়পুর, আনুল, মোরি অয়েল ডিপো থেকে বেশী তেল বেরিয়ে আসার নেপথ্য কারণ-গুলিও প্রতিবেদন দেখা আবশ্যক। মিল অফিসার, তেল ডিপো কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় থানা, জেলা এনফোর্সমেন্ট, কলকাতা এনফোর্সমেন্ট সক্রিয় হলেই এ ব্যবসা বন্ধ করা যেতে পারে। সর্বোপরি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের কর্মীরা যদি তাদের নিজ নিজ এলাকায় দেয়াল ঘেরা গো-ডাউনের ওপর নজর রাখেন তাহলেও কিছুটা বে-আইনী কারবার বন্ধ করা যায়।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু তাঁর তলব করা ফাইলে যা দেখবেন তা সামান্যই। এ কথা জোর করে বলা যায় এ ব্যাপারে বিস্তৃত তদন্ত হলে তেল ডাকাতির এক বিরাট ইতিহাস উদ্ঘাটিত হবেই। কংগ্রেসীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এই রাজপথ শিউনাখ গুল্লা আত্ম বহু ট্যাংকার প্রাইভেট গাড়ী বাড়ীর মালিক। মাত্র পাঁচ বছর আগেও খড়খা বাজারে শিউনাখ আম বিক্রী করতেন, রাজপথ কুলীর কাজ করতেন একটি ব্যাটারীর কারখানায়। এরাই মাত্র ক'বছরে লাখ লাখ টাকার মালিক।

প্রকাশিত হল
রক্তে ভাসে স্বদেশ সময়
সত্তর দশকের প্রতিনিধিত্বকারী
কবিতা সংকলন
মূল্য—পাঁচ টাকা
সম্পাদনা—পুলক চন্দ
কথামিশ্র
১৯, শ্রীমাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড
(কোল ইন্ডাস্ট্রির একটি সংস্থা বিশেষ)

প্রস্তাব আহ্বান করছে

ইনফ্রাইন নির্মাণ
রেকা: নং ইসি এল/এ-৭/ইজ (সি)/টেওয়ার/৭৭-৭৮/১১/১৯২৭ তার ১. ১১.৭৭.
জেনারেল ম্যানেজার, পাণ্ডবেশ্বর এরিয়া, পো: পাণ্ডবেশ্বর, জেলা বর্ধমান
ই সি এল, রেলওয়ে, পি ডব্লু ডি, ইরিসেশন ইত্যাদির অধিষ্টি, ও সজ্জি-
সম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে আইটেম দ্বয়ের ভিত্তিতে মূল করা টেওয়ার
উল্লিখিত কাজের জন্ত—বার টেওয়ার দলিল, নং কাজের বিবরণ, ই সি এস
'৭৫ ও রেলওয়ে সিডিউল অস্থায়ী অস্থায়িত খরচ, বায়নার টাকা এবং কাজ
সম্পূর্ণ করার সময় নিয়ন্ত্রণ:
(১) পি/সি ডব্লু/প্রোজেক্ট/১১ খোটাডি কোলিয়ারীতে খোটাডি
পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের জন্ত মেন ইনফ্রাইন নির্মাণ (আর্থওয়ার্ক ও আর. সি.
আর্টিফিসিয়াল টানেলকাট ও কভার), ১৪'২৬ লক্ষ টাকা, ১৪'২৬০ টাকা
এবং ১ মাস (২) পি/সি ডব্লু/প্রোজেক্ট/১২, খোটাডি কোলিয়ারীতে
খোটাডি পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের জন্ত অল্লিসিয়ারী ইনফ্রাইন নির্মাণ (আর্থ-
ওয়ার্ক ও আর. সি. আর্টিফিসিয়াল টানেল-কাট ও কভার), ১১'৩১ লক্ষ
টাকা, ১১'৩১০ টাকা এবং ৬ মাস। টেওয়ার খেলার তারিখ থেকে ১২০
দিন পর্বন্ত টেওয়ার উন্মুক্ত থাকবে।
দলিলপত্রের সাক্ষ্য প্রমাণ, টেওয়ারদাতার এই ধরনের পূর্বতন কাজের
টার্গেটতার, সম্পূর্ণকরণের দলিল এই অফিসে পরীক্ষা করার পর ইচ্ছুক টেওয়ার-
দাতাদের কাছে টেওয়ারপত্র বিক্রীত হবে। জেনারেল ম্যানেজার, পাণ্ডবেশ্বর
এরিয়া-র অফিস থেকে ৫.১২.৭৭ থেকে ২০.১২.৭৭ তারিখের মধ্যে যে কোন
কাজের দিনে প্রতি সেটের জন্ত ৫০ টাকা নগদে দিয়ে টেওয়ার দলিলপত্র
পাওয়া যাবে। কেসিয়ার, জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, পাণ্ডবেশ্বর এরিয়া
শনিবার ছাড়া সমস্ত কাজের দিনে ৩টা পর্বন্ত এবং শনিবার বেলা ১২টা পর্বন্ত
নগদ টাকা গ্রহণ করবেন। টেওয়ারপত্রে উল্লিখিত যে কোন গ্রহণযোগ্য উপায়ে
নির্দিষ্ট বায়নার টাকা সহ টেওয়ার গ্রহণ করা হবে ২১.১২.৭৭ তারিখে ৩টা
পর্বন্ত এবং ঐদিন ৩'৩০টার ইচ্ছুক টেওয়ারদাতা অথবা তাঁদের অস্থায়ী
প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খোলা হবে। টেওয়ার জমা দেবার আগে
টেওয়ারদাতারা কর্মস্থলে গিয়ে সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবখাল
হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। বায়নার টাকা ছাড়া টেওয়ার বাতিল করা
হবে।

বিশ্বরূপার বাবুর কাণ্ড

(১ম পৃষ্ঠার পূর্ব)

অর্থহীনতার কতিপয় অফিসার ও মন্ত্রীকে ম্যানেজ করেন। কিন্তু রায় জমানা শেষ হয়ে যাওয়ার কালে বাবুর সে খবর আর সফল হয়নি। কিন্তু নিখিলেশ্বর প্রমুখেরা জানেন সেদিন কি করে কি ভাবে সরকারী ঋণ বাবদ বাবু লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। সেদিনের অতিবৃদ্ধ কংগ্রেসী সমর্থক এখন তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছেও হাজির হয়েছেন। সেখানে নিশ্চয়ই তিনি বলেননি। বিশ্বরূপার শতাব্দিক দীর্ঘদিনের কর্মী, শিল্পী, টেকনিসিয়ানের এখনও চাকুরীর কোনও নিরাপত্তা নেই, নেই কোনও এপয়েন্টমেন্ট লেটার অর্থাৎ নিয়োগ পত্র। এই দুইয়ের বাজারে কর্মীদের অনেকেই বেতন মাত্র চল্লিশ-টাকা। প্রতিডেও ফাণ্ড নিয়েও রয়েছে হাজারো অভিযোগ। বাবু কি একবারও বলেছেন কিছুদিনের

মধ্যেই তিনি বিশ্বরূপার কর্মী বতীন দে, বুড়ো, শিবু ঘোষকে নানা অজু-হাতে হাটাই করেছেন।

কর্মীদের প্রাণ যখন জেরবার তখন তার ছুটি ও অচেল সম্পত্তি-র রসদই বা কোথা থেকে আসে? কর্মীরা জানেন এসব কথা বাবু নিশ্চয়ই তথ্যমন্ত্রীর কাছে বলেননি। বলতে পারেন না।

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-কারী তরুণ মন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুর কাছে বিশ্বরূপার দরিদ্র কর্মী, টেকনিসিয়ান, শিল্পীদের অহরোধ, তিনি বেন অবিলম্বে বিশ্বরূপার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। রাজ্যবাস্তব রায় রোডের বাড়ী, বিশ্বরূপার মহিলা কর্মী মীরা দেবীর জিন্সা কারখানা ক্রয় করা সহ বিশ্বরূপার আয় ব্যয়ের বাবতীয় তথ্য সম্পর্কেও ব্যাপক তদন্ত হওয়া আবশ্যিক।

কৃষ্ণি রোজগারের জন্ত কাজ করতে

বাধ্য এমন মহিলা কর্মীদের প্রতি-দিন, প্রতিমুহুর্তে কি অবস্থায় কাজ করতে হচ্ছে তারও গোপন তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এইসব তদন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে হওয়া নিতান্তই বাঞ্ছনীয় এই কারণে যে, “অপসংস্কৃতি” নামক এক অটল সমস্তার সংগে রাসবিহারী সরকার ওরফে ছোট্টা ওরফে বাবুর মত বাবুরাও জড়িত।

পঃ বঃ যাত্রা সম্মেলনে

স্থান—রবীন্দ্র কানন

২৬শে নভেম্বর শনিবার

সন্ধ্যা ৬-৩০ টায়

রয়েল বীণাপাণির
গৃহলক্ষ্মী৥ দিক দিপ্তে শুনি শুধু
“চন্দ্রলোকের” নগরবধু ॥যাত্রায় সর্বপ্রথম জাছু ও
পুতুলনাচ সম্বন্ধিত পালা

নগর বধু

রচনা ও পরিচালনা—

শৈলেশ গুহনিয়োগী

শ্রেঃ—নবকুমার ও কল্যাণী ঘোষ

(রবীন্দ্র কানন যাত্রা সম্মেলনে

১৯শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬।০)

পরিবেশনায়—

চন্দ্রলোক অপেরা

৩৭৩নং রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬

ফোন—৫৪-৩৬৩৩

পাহাড়ী ভট্টাচার্য, ললিতা

চ্যাটার্জি, শ্যামল ঘোষ

অভিনীত

হায়েলেট

দেখতে ভুলবেন না

১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬।০

আম্রুন

রবীন্দ্র কাননে

বহিঃশিখা

দেখতে

কলিকাতা

যাত্রা সমাজ

৮-৪-র মনমাতানো পালা

আনন্দময়ের ভক্তিমূলক

সত্য বন্দোপাধ্যায়ের সামাজিক

কালকেতু ফুল্লরা লক্ষ্মী এলো ঘরে

আনন্দময়ের লোমহর্ষক

সাতনন্দর কয়েদী

যাঁদের অভিনয়ে পালাগুলো মূর্ত হয়ে উঠেছে

মোহন চ্যাটার্জী, প্রবীরকুমার, শ্যামপ্রসাদ বন্দ্যোঃ, প্রফুল্ল গোস্বামী, সব্যসাচী মুখার্জী, গৌর ভড়, বিমান মৈত্র, সমীরণ চৌধুরী, জয়ন্ত চ্যাটার্জী, কল্যাণ ঘোষ, রাজকুমার ও নন্দহুলাল চ্যাটার্জী এবং মিতা চ্যাটার্জী, মহুয়া বন্দ্যোঃ, অনিমা কর, গীতভী পাল, মিলু এরিণা, মিস্ মোনালিসা ও সোনালী গোস্বামী।

জেনারেল ম্যানেজার

শংকর কোলে

পঞ্চম বার্ষিক যাত্রা সম্মেলনে তিরিশে নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়

“কালকেতু ফুল্লরা” দেখুন। স্থান—রবীন্দ্র কানন।

৮-৫-র নতুন খবর

পৌরাণিক নাটক

ঐতিহাসিক নাটক

আদ্যাশক্তি মহামায়া দুর্গেশ্বরিন্দ্রী

সামাজিক নাটক

শরৎচন্দ্রের দত্তা

পরিবেশনায়

মোহন অপেরা

তিনশ নয়, রবীন্দ্র সরণী, কলি-ছয়

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩।১ আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র রোড কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং বর্ষাপ কার্যালয় ৬১ মট লেন কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

২৫ নবেম্বর থেকে ২১ ডিসেম্বর

রবীন্দ্র কানন

২৭ দিনব্যাপী বিশাল ও বর্ণাঢ্য

কল্লোলিত দিনরাত্রি

পঞ্চম বার্ষিক

পশ্চিমবঙ্গ
যাত্রা সম্মেলন২৫ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
নট কোম্পানী৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
রাজধানী যাত্রা ইউনিট

অচল পয়সা

প্রতিবাদ

২৬ নভেম্বর দুপুর ২টায়

৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়

জিঘাংসা

তরুণ অপেরা

২৬ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
রয়েল বীণাপাণি অপেরা১০ ডিসেম্বর দুপুর ২টায়
গণনাট্য

গৃহলক্ষ্মী

অ - আ - ক - খ

২৭ নভেম্বর দুপুর ২টায়
সাহানা যাত্রা ইউনিট১০ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
অনামিকা যাত্রা ইউনিট

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত

বেনারসী

২৭ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
নাগ কোম্পানী১১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
ভোলানাথ অপেরা

বেইমান বিধাতা

সন্তান পেলনা ফিরে

২৮ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
প্রদীপ অপেরা১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
শিল্পী মহল

আনারকলি

লাল নিশান

২৯ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
নিউ প্রডাস অপেরা

১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়

আবদালা মর্জিনা

অরুণ অপেরা

৩০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
মোহন অপেরা১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
শিল্পীতীর্থ

কালকেতু ফুল্লরা

বাদী লালবাজ

১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
জনতীর্থ১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
কলিকাতা যাত্রা সমাজ

প্রেমসী আনারকলি

বহিঃশিখা

২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
মঞ্জুরী অপেরা১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
তপোবন নাট্য কোম্পানী

সংসার সীমান্তে

কুল্লরা কালকেতু

৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
অগ্রগামী১৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
ভারতী অপেরা

কুতুব মিনার

?

কংস

১৮ ডিসেম্বর দুপুর ২টায়
নব ইন্দ্রলোক৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
নিউ গণেশ অপেরা১৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
সবরজন অপেরা

রূপসী গঙ্গা

মহুয়া

৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
সুশীল নাট্য কোম্পানী২০ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
চন্দ্রলোক অপেরা

লালুভুলু

নগরবধু

৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
আনন্দলোক২১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
সত্যম্বর অপেরা

নরনারায়ণ

ভৈরবমন্ড

৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
লোকনাট্য২২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়
সত্যম্বর অপেরা

গরমিল

রুমুর

টিকিট : ৫, ৩, ২ ও ১ টাকা

সি আই এর পৃষ্ঠপোষিত কুখ্যাত আই পি আই-এর ভারতে পুনরাবির্ভাব

দর্পন

বিশ্ব বর্ষ ২২ ৪৩শ সংখ্যা ২২ ডিসেম্বর, ৭৭ ২৪০ পৃষ্ঠা

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্র পরিষদের গুণ্ডামি বোম্বাজী ও থিস্তিখেউড

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মঙ্গলবার পৌনে বারোটা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিরাট জুলফি-ওয়াল। এক ছাত্র পরিষদ নেতা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। উপলক্ষ ছাত্র ধর্মঘট। তারপরেই শুরু হ'ল শ্লোগান। শ্লোগান নয়ত থিস্তি। "হুস্তার বাচ্চা জ্যোতি বোস নিপাত যাও।" স্বভাবতই ছাত্র ফেডারেশনের ছেলেরা এর প্রতিবাদ করে। এতে আরো উচ্চস্বরে থিস্তি শুরু হয়ে যায়। প্ররোচনা বাড়তে থাকে। তাছাড়া জোর করে ব্যারিকেড করে রাখা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট।

ছাত্র ফেডারেশন এবং জনগণের ভরফ থেকে যখন এর প্রতিবাদ চলছিল তখন হঠাৎ ছাত্র পরিষদের গুণ্ডারা একটি বোমা ফাটায়। সঙ্গে সঙ্গে দোড়োদোড়ি এবং মারপিট শুরু হয়ে যায়। পুলিশ ছাত্র পরিষদকে কিছু না বলে জনগণকে তাড়া করে। এরপর ক্রমাগত বোমা পড়তে থাকে। মধ্য কলকাতা যুব কংগ্রেসের অশোক দেব এই বোমাবাজীতে নেতৃত্ব দেন। পুলিশকে বারবার বলা হতে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটটা মুক্ত করে দেওয়া হোক। কিন্তু পুলিশ চূপ-চাপ থাকে। এরপর যখন চার-পাশের সমবেত জনগণ ছাত্র পরিষদের গুণ্ডামি প্রতিরোধ করতে এগিয়ে যায় তখন পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। তাদের প্রত্যেকের হাতে বোমা ছিল।

ছাত্র পরিষদের একজন নিজের হাতে বোমা কেটে আহত হয়। তাকে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরাই হাসপাতালে নিয়ে যায়। জনতার পাণ্ডা প্রতিরোধে ছাত্র পরিষদের গুণ্ডারা কুস্তুরের মত লেজ গুটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আশ্রয় নেয়। সেখানে তাদের সঙ্গী থাকে কিছু বোমা। তাদের গ্রেফতারের দাবী

(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়)

মোরারজী দেশাই রাজ্য জনতা কমিটির পুনর্গঠন চান

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্য জনতা পার্টির সত্ত্ব ঘোষিত কার্যকরী সমিতি আবার পুনর্গঠিত হতে পারে বলে বিশ্বস্ত হুজু খবর পাওয়া গেছে। জনতা পার্টির বর্ধমান নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন দিল্লীতে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কাছে কেন

তিনি পদত্যাগ করেছেন তা ব্যাখ্যা করেছেন।

জনতা পার্টির সত্ত্ব ঘোষিত কমিটিতে প্রফুল্ল সেন বিরোধী গোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য। আসলে দিল্লীতে

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

যতীনবাবু সম্পর্কে লক্ষ্মী বোসের

(দর্পণের প্রতিনিধি)

"ওই বেঁটেকে (যতীন চক্রবর্তী) শায়েস্তা করতে আমাদের পার্টির মেয়েরাই যথেষ্ট। তার জন্ত আমরা ছেলেরা না গেলেও চলবে। তবে আমরা তো পেছনে আছি। ওই যতীনকে এবার ভালোমত শিক্ষা দিতে হবে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় এক ভাঁড় ছিল, তার নাম গোপাল ভাঁড় আর জ্যোতিবাবু

মজিনসভায় আরেক ভাঁড় আছে তার নাম যতীন চক্রবর্তী।"

এই কথাগুলো লক্ষ্মী বোস বলেন ২৪শে নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় লনের সমাবেশে। রাজনীতি করতে গেলে যে ন্যূনতম শালীনতাবোধ দরকার তাও লক্ষ্মী বোসের নেই। তাই তিনি একজন মন্ত্রী সম্বন্ধে এভাবে অশালীন উক্তি করতে পারেন। এসব

লক্ষ্মী বোস এখনও মারপিটের হুমকি দিয়ে চলেছেন

(বিশেষ প্রতিনিধি)

"এখানে যদি দর্পণের রিপোর্টার থেকে থাকেন তিনি নোট করতে পারেন, যে গতদিন মহাজাতি সদনে আমার এক লড়াইয়ের বক্তৃতার পরে যদি কসবায় সি পি এম কর্মীর ওপর আক্রমণ হয়ে থাকে তাহলে এরপর যখন বলে কয়ে আমরা রাস্তায় নামবো তখন ওরকম শত সহস্র ঘটনা ঘটবে।" এই কথাগুলো বলেন লক্ষ্মী বোস ২৪শে নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় লনে। কিছুদিন আগে মহাজাতি সদনে এক বক্তৃতায় লক্ষ্মী

বোস ময়দানে মারপিট করে শক্তি পরীক্ষার জন্ত চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এবং তারপর কয়েকদিনের মধ্যেই কসবায় একজন সি পি এম কর্মীর ওপর আক্রমণ হয়। এই ঘটনা দুটি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয় একথাই দর্পণ লিখেছিল আর তাই লক্ষ্মী বোস দর্পণকে কটাক্ষ করলেন। লক্ষ্মী বোস আরো বলেন, "আমি হোমিওপ্যাথির গুলিতে বিশ্বাস করি না। আমি সার্জারিতে বিশ্বাস (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

অভিযোগ বিশ্বরূপার মালিকের বিরুদ্ধে

ভয় দেখিয়ে শিল্পী কর্মীদের সই জোগাড় না করে প্রতিবাদ করুন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মৌচাকে টিল পড়েছে। দর্পণে বিশ্বরূপার রাসবিহারী সরকার ওরফে ছোটদা ওরফে বাবুর অনাচার, স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষুধার্ত যাবতীয় তথ্য প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় বাবুর 'মানে' লেগেছে। বিশ্বরূপার দ্বিতলকক্ষে যে মৌতাত দীর্ঘদিন চলে আসছিল তাতে দর্পণ কিছুটা বাদ সেধেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এতেই বাবুর রাগ। উত্তেজিত বাবু এখন তাই দর্পণকে রক্তচক্ষু দেখাতে চান। এরই ফলে সম্ভবত বহু ভ্রষ্টাচারের নায়ক রাসবিহারী দর্পণ অফিসে জনা চারেক যুবককে শনিবার (২৬/১১/৭৭) পাঠান। হাতে তাদের বানান ভুল সম্বলিত এবং শিল্পী ও কর্মচারীদের স্বাক্ষরিত এক অতি সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ লিপি। হাবভাবে অব্যব আচরণ। দর্পণ সম্পাদককে এরা বাবুর জঘন্ডা কীর্তিকলাপ যাতে প্রকাশ না হয় তার জন্ত প্রকারান্তরে ভীতি প্রদর্শনও করে।

বলে রাখা ভালো দর্পণ বিশ্বরূপার কোনও সাধারণ কর্মী শিল্পী টেক-নিশিয়ানের বিরুদ্ধে নয় এবং তাঁদের কাউকে ছোট করাও দর্পণের উদ্দেশ্য নয়। গত কয়েক সংখ্যার দর্পণে যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে তাঁদের স্বপক্ষেই বলা হয়েছে যে বাবুর অনাচারে নোংরামোতে এরা কতিপয় বাবুর লালসার শিকার হতে হচ্ছে অনেককে। বিশ্বরূপার সাধারণ কর্মী, শিল্পীরা তো বটেই নাট্য জগতের অনেকেই এসব কথা জানেন। বিশ্বরূপার কর্মী সহ গোটা শিল্পীমহল জানেন কেন বিশ্বরূপা থেকে কতিপয় মহিলা শিল্পী এই থিয়েটার ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। কেনই বা নৃত্যশিল্পীর জন্ত রাসবিহারীবাবুর কঙ্কস হাত থেকে মুঠো মুঠো টাকা বেরিয়ে যায়। কেনই বা দমদমের জনৈক মহিলা অধিউদ্ভাদ হয়ে যান। প্রায় প্রত্যেকেই জানেন গ্রীষ্মকম ছেড়ে কেনই বা কতিপয় মহিলা শিল্পীকে নিত্যদিন বাবুর ঘরে হাজির হতে হয়। একদিকে বাবুর টাকা নিয়ে খোলামকুচি খেলা অপর দিকে দরিদ্র কর্মীদের অনাহারী পেটে লাথি মারা—এর কোনটাই আজ কারো অজানা নয়। তাই বলছি বিশ্বরূপার কর্মী, শিল্পীদের নিয়ে রাসবিহারীবাবু যে জুয়ো খেলছেন দর্পণের প্রতিবাদ সেখানেই। কারো ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনও ঘটনা প্রকাশ করার মত কোন ইচ্ছা দর্পণের (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

অশালীন উক্তি

মনে হয় একমাত্র কংগ্রেসী রাজনীতিতেই চলে। এই ধরণের এলো-মেলা কথাবার্তা থেকেই লক্ষ্মী বোসের রাজনৈতিক চরিত্র বোঝা যায়। নির্বাচনে হেরে গিয়ে এবং লুপ্তপাঠের রাজস্ব চলে গিয়ে লক্ষ্মী বোসদের এখন মাথার ঠিক নেই। তাই তিনি যা খুশি তাই বলে চলেছেন।

বিশ্বরূপা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নেই। সেটা, কোন সংবাদপত্রের ধর্মও নয়। কিন্তু কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন যদি অপরের স্বস্থ স্বন্দর জীবন অতিবাহিত করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, কিংবা তাকে কলুষিত করার চেষ্টা করে, তবে তার চরিত্র বিচারের জন্য সমস্ত ঘটনা জন-সমক্ষে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। এতে দর্পণের কোনও বিধা নেই।

আমাদের কাছে শিল্পী কর্মীরা জানিয়েছেন দর্পণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পত্র পাঠানোর তোড়জোড় করেন রাসবিহারী স্বয়ং। তাঁরই কতিপয়

আই পি আই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এজেন্সি বাছাই করা সাংবাদিকদের বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা, নগদ টাকা দেওয়া, বক্তৃতা সেমিনারের মারফৎ স্লোটা টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য আই-পি-আই সংবাদপত্র মালিক কিংবা মালিক-সম্পাদকদেরই প্রথম গুরুত্ব দেয়। তারপর এদের পেটোয়া সাংবাদিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করে।

উল্লেখযোগ্য, আই-পি-আই-এর সঙ্গে সি-আই-এর ঘনিষ্ঠতা কয়েক বছর আগে এত বেশি প্রচারিত হয়েছিল যে, এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম-কর্তারা এতদিন এক রকম চুপ করে ছিলেন। এদেরই একটি দল প্রেস কাউন্সিল অব এশিয়া নামে একটি নতুন সংস্থা গড়ে সেই একই কাজকর্ম চালাচ্ছে, সি-আই-এর সঙ্গে যোগাযোগও রেখে চলেছে। ভারতের প্রেস ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া তো কয়েক বছর আগে সরকারীভাবে স্বীকারই করেছিল যে, তারা এশিয়া কাউন্সিল থেকে মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিত। তবে এশিয়া কাউন্সিল যে সি-আই-এর টাকায় চলে তা নাকি তারা জানতেন না। অবশ্য ওয়াকিবহাল মহল এই যুক্তি মোটেই গ্রহণ করেন নি। কেননা, খোদা আমেরিকার কাগজই সব কথা ফাঁস করে দিয়েছিল। এইসব ঘটনার পর প্রেস ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া আই-পি-আইকে ছেড়ে প্রেস কাউন্সিল অব এশিয়ার অন্তর্গত হয়। কিন্তু এখন অকস্মাৎ দেখা যাচ্ছে, সেই আই-পি-আই আবার বাজারে নেমেছে। প্রেস ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া আবার আই-পি-আইতে ভিড়েছে। আবার ওরা কলকাতায় সাংবাদিক চক্র ধাড়া করছে। তাই ওয়াকিবহাল মহল বলছেন, বাম সরকার সাবধান।

বশব্দ কর্মী প্রতিবাদ-পত্রটিতে সই যোগাড় করেন। তিনকপি সই তোলা হয়। আমরা পরিষ্কার বলছি দর্পণ কোনও প্রতিবাদপত্র ছাপতে রাজী নয়। কেননা যা প্রকাশিত হয়েছে তাকে আমরা সত্য বলেই জানি। বরং আমরা বলছি রাস-বিহারী চাহুরীর ভয় দেখিয়ে শিল্পী কর্মীদের কাছ থেকে সই যোগাড় করছেন কেন? কেনই বা দালাল পাঠিয়ে দর্পণকে চোখ রাত্জাতে চাইছেন? আপনার সম্বন্ধেই আমাদের অভিযোগ। প্রতিবাদ আপনার অনাচার আর ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে। কিন্তু আপনি নিজে প্রতিবাদ পত্র পাঠালেন না কেন? তবে কি আপনার স্বল্প চাহুরীর ভয় দেখিয়ে শিল্পী ও কর্মীদের যোগাড় করা সই আর গোটা চারেক দালাল?

একথা আপনি স্বীকার করতে পারেন মাত্র 'কিছুদিনের মধ্যে আপনিই বিরুদ্ধপন্থী শিল্পী ও কর্মীদের মধ্যে ইজুজি চ্যাটার্জী, গৌর দাস, স্বপ্ন রক্ষিত, অসীম ভট্টাচার্য, কালী মুখার্জি, প্রহ্লাদ ভট্টাচার্য, চঞ্চল মুখার্জি, দিলীপ সরকার, জহর ব্যানার্জি, মুরারী পাণ্ডার, মিহির ব্যানার্জি, নির্মল ঘোষ, হেমন্ত দাস, মটু দত্ত, বাদল দাস, সূর্য বাগ, গোপাল দাসকে ছাড়াই করেছেন?

মাসে ২০টি নিয়মিত শো উপরন্ত ছুটির দিনের প্রদর্শনী, এ ছাড়া প্রায় প্রত্যেকদিনই হল ভাড়া দেওয়া থাকে। কিন্তু একটি প্রেক্ষাগৃহ চালানোর ব্যাপারে দর্পণের জন্ত যে সব ব্যবস্থা থাকার কথা তা আদৌ নেই। বাথরুম শহরের রাস্তার পৌচাগারকেও লজ্জা দেয়। হলে অগ্নি প্রতিরোধক ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত নয়। গত পাঁচ/ছয় বছরে হল মেরামতও করা হয়নি। সর্বত্রই এলোমেলো অবস্থা। অথচ এই হলেই রয়েছে একসট্রা চেয়ার-দেয়ার ব্যবস্থা। চারটাকার টিকিট নাম-মাত্র রেখে রয়েছে পাঁচ, সাত, নয়, এগারো, তেরো-পনেরো টাকার অধিক সংখ্যক টিকিট। ফ্রি পাশ থেকে রাসবিহারীবাবু আগে চার আনা নিতেন। এই পয়সা গিরিশ গ্রন্থাগারের (যা অনেকই দেখেন নি) নামে নেওয়া হত। এখন প্রতি পাশ থেকে রাসবিহারীবাবু তিনটাকা করে আদায় করছেন। প্রতিদিন পাশ থেকে গ্রন্থাগার গাঁড়াকলের টাকা পয়সা উঠছে। এর হিসাব একমাত্র রাসবিহারীবাবুই জানেন। শুধু তাই নয়, হলে শুধু একসট্রা চেয়ার দিয়ে ব্যবসা নয়, বাবু আবার হলের চৌহদ্দিতেই খুলেছেন চীনে রেস্টোর। নাম শ্যাম্পেন।

প্রদর্শনীর মাঝে বিরতির সময় রাস-বিহারীবাবু তার এই দোকানের গুণপনা বর্ণনা করেন; অথচ এই শ্যাম্পেনের খাবার সরকারী দপ্তরের লোকজনেরা এসে একবার নষ্ট করে দিয়ে যান। কেননা তাদের মতে ঐ খাবার খেলে মরণ অনিবার্য।

এ ছাড়া বিশ্বরূপার আয় ব্যয়, কর্মীদের প্রতিভেদে ফাও, এ্যাপয়েন্ট-মেন্ট লেটার, অগ্নিপ্রতিরোধক ব্যবস্থা, ইলেকট্রিক ওয়্যারিং, প্রেক্ষাগৃহের দর্পণের প্রয়োজনীয় টয়লেট ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারী মহলে তদন্তের দাবী কর্মীরাই তুলেছেন। একথা স্বীকার করা ভুল, কোন কোন কর্মীকে বিশেষ একটু সুবিধা দিয়ে তাদের কিছুদিনের জন্ত হাতে রাখা যায় কিন্তু তাতে বেশিদিন চালায়ো সম্ভব নয়। অনাচার

লক্ষ্মী বোসের হুমকী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করি।" স্পষ্টতই লক্ষ্মী বোস আরারও মারপিটের হুমকী দিচ্ছেন। কংগ্রেস দল কি লক্ষ্মী বোসের প্রকাশ্যে বার-বার এইসব হিংসাত্মক কথাবার্তার দায়িত্ব নেবেন? কোন রাজনৈতিক দলের কোন দায়িত্বশীল সদস্য এভাবে প্রকাশ্যে মারপিটের হুমকী দিতে পারে না। আসলে নির্বাচনে হেরে গিয়ে এবং লুপ্তপাটের রাজস্ব চলে গিয়ে লক্ষ্মী বোসের এখন মাথার ঠিক নেই। ক্রাসের রাজ্য ছেলেরা যেমন একদম পেছনের বেঞ্চে বসে হৈ হুয়া করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় তেমনি রাজনৈতিকভাবে খতম হয়ে যাওয়া লক্ষ্মী বোসরা এলো-মেলো কথা বলে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বেঁচে উঠতে চাইছেন।

কসবায় স্বপন চক্রবর্তীর ওপর আক্রমণ নিয়ে তদন্ত চলছে। কস-বার ঘটনা সম্পর্কে লক্ষ্মী বোসের বিবৃতি কাজে লাগতে পারে।

গুণাগুণিতে বলবান লক্ষ্মী বোসরা জনশক্তি সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। লক্ষ্মী বোস-বারবার দ্বাংগা-বাজীর হুমকী দিচ্ছেন। কিন্তু জন-শক্তি যদি একবার এই সব গুণাগুণী প্রতিরোধ করতে রাস্তায় নামে তাহলে ওরকম অনেক লক্ষ্মী বোসের হৃদকম্প শুরু হয়ে যাবে। লক্ষ্মী বোসরা হয়ত চাইছেন যে তাদের পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করা হক যাতে আবার নেতা হওয়া যায়। কিন্তু কোন পুলিশের দরকার নেই। জনগণই একহাতে মোকা-বিলা করবে এই গুণাগুণের, আরেক হাতে মোকাবিলা করবে এদের প্রতিক্রিয়াশীল মনস্তাত্ত্বিকদের।

অভিজ্ঞতা নোংরামো আর ভ্রষ্টাচারে বিরক্ত সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে এরাও একদিন হাত মেলান।

রাসবিহারীবাবু, আপনার প্রতি সাধারণ কর্মীরা কত বিরক্ত আপনিও তা জানেন। ৫ নভেম্বর রাস-পূর্ণিমার দিন ছিল আপনার জন্মদিন। হরিবোল বাবু এখনও আপনার হৃৎ হব না?

সারে শাঁখ বাজিয়ে আপনাকে কেউ কেউ সোহাগ জানাচ্ছিল তখন আপনিই শাঁখ বাজাতে বারণ করেন। কারণ আপনি শুনেছিলেন বিশ্বরূপার প্রাঙ্গণে আপনাকে ব্যঙ্গ করে ধ্বনি দেওয়া হচ্ছিল, "হরিবোল হরিবোল"। আচ্ছা, রাসবিহারী-বাবু এখনও আপনার হৃৎ হব না?



ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ)

প্রস্তাব আহ্বান করছে

১। প্ল্যান্ট ও সেমিনারী পরিবহন

রেফা: নং এস এ এম / জি এস এ / জি ই এন (সেমিনারী ট্রান্সপোর্ট) / ৭৪-৭২ / ৭৭ / ৭৩৪৭ তার ১২.১১.৭৭

সাব-এরিয়া ম্যানেজার, যুসিক সাব-এরিয়া, পোঃ কালিপাহাড়ি, জেলা: বর্ধমান কর্তৃক ১৯৭৮-৭৯ সালে নিয়োজিত কাজের জন্য সীল করা টেণ্ডার: বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান্ট ও সেমিনারী ও টেণ্ডারের জিনিসপত্র পোনিয়াটি ওয়ার্কশপ / শ্রীপুর এরিয়া টোর্প / মিনগা সার-এরিয়া / ভেনেরা সাব-এরিয়া / আসানসোল / দিশেরগড় / রাণীগঞ্জ / দুর্গাপুর / সোদপুর টোর্প / নিয়ামতপুর টোর্প / রাণীবাটি ওয়ার্কশপ / ধানবায় / যুসিক ওয়ার্কশপ থেকে যুসিক সাব-এরিয়ার বিভিন্ন কোলিয়ারীতে পরিবহন এবং টেণ্ডারের জিনিসপত্র, গৃহে ব্যবহারের কয়লা, বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান্ট ও সেমিনারী এক ধনি / ইউনিট থেকে অন্ত জায়গায় পরিবহন। বায়নার টাকা ১,০০০ এবং কাজ সম্পূর্ণ করার সময় এক বছর।

ইজুক ব্যক্তিদের দীর্ঘ ও হৃৎ দূরত্বের প্রতি কিলোমিটারের ভাড়া জানাতে অহরোধ করা হচ্ছে। তৈল সহ চব্বিশ ঘন্টার অর্থাৎ রোজের ভিত্তিতে ট্রাকের ভাড়াও উল্লেখ করিতে হবে। সাব-এরিয়া ম্যানেজার, যুসিক সাব-এরিয়ার অফিস থেকে ১৫ টাকা নগদে দিয়ে (অপ্রত্যাশযোগ্য) উল্লিখিত কাজের জন্ত অহুমোদিত কর্ম শর্তাবলী সহ পাওয়া যাবে ৭.১২.৭৭ তারিখ থেকে। বায়নার টাকাও নগদে দিতে হবে যুসিক সাব-এরিয়ার কেসিয়ারের কাছে এবং বায়নার টাকার রসিদ নং টেণ্ডারে উল্লেখ করতে হবে। সকল টেণ্ডারদাতাদের চুক্তির সময়ে বায়নার টাকা জমা সহ সিকিউরিটি হিসেবে ১৫০০ টাকা জমা দিতে হবে। ১৪.১২.৭৭ তারিখ বিকেল ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ করা হবে এবং ঐ দিন বিকেল ৪টায় টেণ্ডারদাতা অথবা তাঁদের অহুমোদিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেণ্ডার খোলা হবে।

বায়নার টাকা ছাড়া টেণ্ডার বাতিল করা হবে।

২। ওভার বার্ডের পরিবহন।

রেফা: নং ১৭০০ / এস এ এম / ১৪৪ / ৭৭ / ৫৩৭৮ তার ১৮.১১.৭৭ যথেষ্ট সংখ্যক ট্রাক আছে এমন সুপরিচিত ও বিশ্বাসযোগ্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে সীল করা টেণ্ডার ডাবর কোলিয়ারীর ডাবর কোয়ার্টারী থেকে ওভারবার্ডে এক কিলোমিটারের মধ্যে বিভিন্ন ওভার বার্ডে ডাম্পিং ইয়ার্ডে পরিবহনের জন্ত। ডাম্পিং ইয়ার্ডে গাছা করা জঙ্গাল লেভেল করার জন্ত যদি কায়িক শ্রম দরকার হয় সেটা ঠিকাদারদের নিজেদের খরচে করতে হবে।

১৬.১২.৭৭ তারিখ বিকেল ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ করা হবে এবং ঐ দিন বিকেল ৪টায় টেণ্ডারদাতা অথবা তাঁদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সাব-এরিয়া ম্যানেজার, সালানপুর সাব-এরিয়া, পোঃ সামডি (বর্ধমান)-এর অফিসে টেণ্ডার খোলা হবে। প্রতিদিন ৪২০ কিউবিক মিটারের মত ওভার বার্ডে পরিবহন করতে হবে। ১৬.১২.৭৭ তারিখের আগে সালানপুর সাব-এরিয়ার গ্রুপ অ্যাকাউন্টস অফিসে বায়নার ৫,০০০ টাকা নগদে জমা দিতে হবে এবং টাকার রসিদ টেণ্ডারের সঙ্গে দিতে হবে। সালানপুর সাব-এরিয়ার গ্রুপ অ্যাকাউন্টস অফিসারের অফিস থেকে যে কোন কাজের দিনে কিন্তু ১৬.১২.৭৭ তারিখের আগে ১০ (দশ) টাকা দিয়ে (অপ্রত্যা-পণযোগ্য) কাজের বিস্তৃত বিবরণ ও সম্পূর্ণ বিবরণ সহ টেণ্ডারপত্র পাওয়া যাবে।

পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর আরেক কীর্তি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর আরেক কীর্তির সংবাদ দর্পণ দপ্তরে এসে পৌঁছেছে। এক্ষেত্রে যতীনবাবু যা করেছেন তা এককথায় স্তম্ভকর। কোনও দায়িত্বশীল মন্ত্রী এমন কাজ করতে পারেন তা ভাবাও যায় না।

গত সাতই নভেম্বর বিপ্লববার্ষিকী দিবস উপলক্ষে মেট্রো সিনেমার বিপরীত দিকের পার্কে লেনিন মূর্তিতে মাল্যদান উপলক্ষে একটি অস্থায়ী স্ট্রাটের আয়োজন করা হয়। ছয়ই নভেম্বর অর্থাৎ অস্থায়ী আয়ের দিন যতীনবাবু টেলিভিশন সেন্টারের নিউজরুমে ফোন করে বলেন “লেনিনের গলায় মালা দেব, আপনারা আসবেন কিন্তু”। টি, ভি, রিপোর্টারদের জানান হয় সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যেই তাঁরা যেন চলে আসেন।

প্রচার কাণ্ডাল যতীনবাবু সংবাদপত্র দপ্তর, টি, ভি, সেন্টারে প্রায়ই নিজেই ফোন করে জানান কবে তিনি পার্ক স্ট্রাটের গান্ধীমূর্তি তুলতে যাবেন, কবে রামমোহনের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে যাবেন, কবে তিনি হাউসিং বোর্ডের মিটিংয়ে যোগ দিচ্ছেন বিপ্লব দেশকে বাঁচাবেন। হরদম তিনি প্রচারের ধাক্কা লক্ষ্য সরমের মাথা খেয়ে একজন মন্ত্রী হয়ে বিভিন্ন জায়গায় হবনব করে বেড়ান।

আরামবাগের

ছাত্রাবাস বন্ধ কেন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হুগলীর আরামবাগে দ্বারকেশ্বর নদীর পাশে জে. এল. আর. ও অফিসের কাছাকাছি চার কাঠা জমির ওপর একটি ছাত্রাবাস আছে। ওয়াকফ দপ্তরের পরিচালনায় এতদিন এই ছাত্রাবাসটি চলছিল। বেশীর ভাগ মুসলিম ছাত্র থাকতো। মোলানা আবদুর রহিম নামে এক ব্যক্তি ছাত্রাবাসটি তৈরী করেন।

নেতাজী কলেজ, বিধেকানন্দ মহাবিদ্যালয় এবং স্কুলের প্রায় ত্রিশজন ছাত্র এখানে থাকতো। যুব কংগ্রেসী হামলা এবং নানা রকম রাজনৈতিক কারণে ছাত্রাবাসটি বন্ধ আছে। ওয়াকফ কমিশনার সাহেবও কোন মতে ছাত্রাবাসটি পুনরায় খেলার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে ছাত্রাবাস সংরক্ষণ কমিটির সম্পাদক শ্রীসাদেজুল হক চৌধুরী জানিয়েছেন।

সাতই নভেম্বর যা করেন তা অদ্ভুত। টি, ভি, ক্যামেরাম্যানদের দিয়ে লেনিনের গলায় যে তিনি মালা দিলেন তা তোলালেন। ‘এরপরেও অস্থরোধ, যাবেন না বক্তৃতা দেব। সেটাও তুলে নিন। এত কথা বললেন কিন্তু একবারও বললেন না রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রধান মুখ্যমন্ত্রীর অত্যাচার ও কিছুক্ষণের মধ্যে লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আসছেন। বরং টি, ভি, রিপোর্টারের এই প্রশ্নের জবাব স্বকৌশলে যতীনবাবু এড়িয়ে যান। কলে যা হয় তাই হল টি, ভি, নিউজে “বিপ্লবী যতীনবাবুর” মহান কীর্তিই শুধু প্রকাশ পেল। বলা বাহুল্য রাজ্যমন্ত্রিসভার সংগে টি, ভি, সেন্টারের তুল বোঝাবুঝির সূত্রপাতও এইখানেই।

ইন্দিরা সঙ্ঘের আমলের টি, ভি এখন বহুলাংশে পরিবর্তিত একথা অস্বীকার করার কোন পথ নেই। কলকাতা সেন্টারে টি, ভি, রিপোর্টার কম থাকলেও দক্ষতার সংগে যে এরা কাজ করছেন এর মধ্যে কোন অতিশয়োক্তি নেই। টি, ভি কর্তৃপক্ষের সংগে রাজ্যমন্ত্রিসভার একটা বিরোধ বাধুক বা তুল বোঝাবুঝি হোক সম্ভবত তা অনেকেই চাইছেন। নয়ত জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের শোকদিবস উপলক্ষে রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত অস্থায়ী জন্ম কোনও চিঠি কেন টি, ভি সেন্টারে পাঠান হয়নি? অথচ প্রয়াত নেতার খবর সংগ্রহের জন্য এরাই মুক্ত অঙ্গনের অস্থায়ী কভার করেন। সত্যজিৎ রায়, হেমাক্ষ বিশ্বাস প্রমুখের সাক্ষাৎকার নেন। রবীন্দ্র সদনের অস্থায়ী জন্ম প্রয়োজনীয় ক্যামেরা বরাদ্দের ব্যাপারে যে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠান দরকার কতিপয় সরকারী আমলা তাও উপেক্ষা করেছেন। প্রসঙ্গত রল্য দরকার টেলিভিশন সেন্টার সম্বন্ধে অনেকেই অনেক প্রশ্ন তুলতে পারেন এবং তা তুলুন কিন্তু ইন্দিরা আমলের টি, ভি-র বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা মনে রেখে কতিপয় মন্ত্রী এদের সংগে যে ধরনের ব্যবহার করছেন তাও তেমন ভালো নয়। এর ওপর যতীনবাবু প্রমুখের আত্মপ্রচারে টেকা দেওয়ার ব্যাপারে নানা বদ কায়দা ভো আছেই। সময় থাকতে মুখ্যমন্ত্রী পুরো বিষয়টি কি একটু খোঁজ করে দেখবেন?

উপেন্দ্র বিদ্যামন্দিরে কংগ্রেসী মধুচক্র

(দর্পণের সংবাদদাতা)

উত্তর কলকাতার উপেন্দ্র বিদ্যামন্দিরের কংগ্রেসী মধুচক্র ঘিরে অনেক মোমাছি ভিড় জমাচ্ছে। এই শিশু পাঠশালাটি পল্লীর প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকার জরনৈক মাতব্বর কংগ্রেস নেতার (যিনি নাকি ইদানীং সাংবাদিক বলে তকমা এঁটে বেড়াচ্ছেন) পৃষ্ঠপোষকতায় এবং এই স্কুলের একজন বোনামদার শিক্ষকের আত্মকল্যে শিক্ষিকাদের মান-ইজ্জত বাঁচিয়ে শিক্ষকতা করা দায় হয়ে উঠেছে।

এই দুই পল্লীসেবী কোন সরকারকেই পরোয়া করেন না। স্কুলের সম্পাদক এঁদের ভয়ে স্কুলে প্রবেশ করতে পারেন না। অভিভাবকদের কোন মত প্রকাশের অধিকার নেই। এঁদের মনোরঞ্জন করতে পারলে যে কোন মহিলার চাকরী অবধারিত। অত্যাচারী গালাধাক্কা, লাজনার সীমা

থাকে না। সবচেয়ে মজার বিষয় হল, এই মধুচক্র টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁরা স্কুলটির সরকারী অহুমোদন লাভে অস্তরায় হচ্ছেন। খোদ কংগ্রেসী আমলেও এই দুই জন-নেতার বিরুদ্ধে ‘তদন্তের দাবি’ উঠেছিল। কিন্তু কংগ্রেসী আমলের এক যুবক মন্ত্রীর রূপায় সে যাত্রায় তাঁরা মার খেয়েছেন। পল্লীবাসীর জিজ্ঞাসা এই ধুটতা কী এখনও চলবে?

দুই কুখ্যাত গুণ্ডার

মৃত্যুতে মানুষ খাঁশ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বংশী পাল এবং বীরবল পাল নামে দুই কুখ্যাত সমাজ বিরোধী সম্প্রতি কৃষ্ণনগর শহরে চকের পাড়ায় নিহত হয়। ব্যক্তিগত জীবনে এরা দুই ভাই ছিল। এদের দুই ভাইকে চেনে না এমন লোক শহরে নেই। এরা ছিল কৃষ্ণনগরবাসীর আতঙ্ক। বাহাত্তর সাল থেকে এরা সারা শহরেই শুধু নয় নদীয়া জেলার সর্বত্র

এবং ধুবুলিয়া ক্যাম্পে গিয়েও আক্রমণ সংগঠিত করত। বংশী কাঁচরাপাড়া নৈহাটির গুয়াগন-ব্রেকারদেরও নেতা ছিল। ছিনতাই, গুণ্ডামী, ডাকাতি, খুন, দাংগা, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি কার্যকলাপে এরা সকলকে জালিয়ে মারছিল। জরুরী অবস্থার সময় বীরবল একই রাত্রে বাড়ি থেকে পরপর তিন বোনকে তুলে নিয়ে এসে ধর্ষণ করে। সম্প্রতি সে মিসা থেকে ছাড়া পায়। এরা এত অত্যাচার করার স্বযোগ পায় কংগ্রেস দলভুক্ত ছিল বলে। বাহাত্তর সালে নির্বাচনে রিগিং করার সময় এই সমাজ বিরোধীদের কংগ্রেস কাজে লাগায়। থানা পুলিশ এদের হাতে ছিল। এরা মারা যাওয়ায় কৃষ্ণনগরবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস কেলে বেঁচেছে। হত্যা মাত্রই নিন্দনীয় কিন্তু কৃষ্ণনগরবাসীর মনের কথা যারাই এদের মার্কক, এরা মরতে কৃষ্ণনগরে শান্তি ফিরে আসবে। সবাই এতে খুশি।

ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমানো মানে চড়া হারে সুদের সুযোগ আর সেই সঙ্গে অপরকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা

এখন থেকে দশ বছরে অনিভা কাপুরের জমা টাকা নয়টি শিশু স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে ঝেরিয়ে আসছে। তাঁরা কেউই তাঁর সন্তান নয়।

সত্যি কথা বলতে কি, অনিভা কাপুর জানেনই না, তিনি বস্তির নয়টি শিশুর ভরসা।

তিনি শুধু ইউকোব্যাঙ্কের ডিপজিট সার্টিফিকেট পরিকল্পনায় একটি অ্যাকাউন্ট খোলেন। তাঁর পক্ষে এইভাবে টাকা রাখাই ছিল সবদিক থেকে নিরাপদ ও লাভজনক। পনেরো বছরে তাঁর জমা টাকা চারগুণেরও বেশি বেড়ে যাবে।

ইউকোব্যাঙ্কের অন্যান্য আমানতকারীর টাকার মত অনিভা কাপুরের জমা টাকা আমাদের নানা প্রকার সমাজকল্যাণ প্রয়াসে ব্যবহার করা হয়! যেমন, বস্তির স্কুলকে সাহায্য দেওয়া, বা, বেকার যুবকদের কাজের সংস্থান করা, অথবা অসহায় মহিলাদের নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা করা, কিংবা, চাষীদের সময়মত ঋণ দিয়ে সহায়তা করা। এইরকম নানা উপায়ে আপনার স্বল্পসংখ্যকই সমাজে যারা অসহায় ও নিঃসহায় তাঁদের বড় রকমের সহায় সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

তাই, যখনই আপনি ইউকোব্যাঙ্কের যে কোন সঞ্চয় পরিকল্পনায় টাকা জমা রাখছেন, আপনি অপরকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করছেন। এবং সেইসঙ্গে নিবিঘ্নে ও লাভজনক উপায়ে নিজেরও সংস্থান করছেন, কারণ আপনার জমা টাকায় আপনার আয় নিয়মিত বেড়েই চলেবে।

পাঠ্য পুস্তক কিনতে সাহায্য পেয়েছে তামিলনাড়ুর এই ছটি ছেলে মেয়ে



ইউকোব্যাঙ্কের লাভজনক পরিকল্পনা কী কী?

সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট
ফিক্সড ও টাইম ডিপজিট
রিকারিং ডিপজিট
রিকারিং ডিপজিটের সঙ্গে যুক্ত
ফিক্সড ডিপজিট

ডিপজিট সার্টিফিকেট পরিকল্পনা
কুয়ের যোজনা
ফিক্সড ডিপজিটের সঙ্গে যুক্ত
জনতা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট
ইন্সিওরেন্স পলিসি



ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

জনগণকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

জয়পুরের চিঠি

সামন্তশাহী আমেজে মশগুল রাজস্থান !

রমা প্রসাদ মল্লিক

কে বলে ইতিহাসের লাজ ধরে অতীতের পুনরাবর্তন হয় না? যদিও বা কেউ তাই মনে করে থাকেন জয়পুরে এসে আঠারশো বছরের নগর জয়ন্তী দেখে গেলে তাঁর ভুল ভেঙে যেত। “গোলাপী” জয়পুর ১৮ই নভেম্বর সামন্তী সৌগন্ধে মম করে উঠলো, অবশ্য এর পেছনে নেতাদের এবং শাসক শ্রেণীর মাথা ও পকেট ছুইই কাজ করেছিল প্রচুর।

এই উৎসব বা সন্মারোহ ঘাই বলুন অকারণে “ব্যবস্থাপিত” হয় নি। রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল। বর্তমান শাসকদল জনতা বহুদিন থেকে আত্মবিভক্ত, মুখ্যমন্ত্রী ভৈরো সিং সেখাওয়া তাঁর বিধায়ক মণ্ডলীর ভেতরেই জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেল-ছিলেন। কারণ, মুখ্যতঃ তাঁর অতীতে জনসমাজ দলের অন্তর্গত হয়ে কাজ করা ও নেতৃস্থানীয় হবার চেষ্টায় রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীল কায়েরী স্বার্থবাদীদের সঙ্গে মাথা-মাথির পটভূমিকা। পরে অবশ্য তিনি জনসমাজ থেকে সরতে সরতে

ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেস এবং আদি কংগ্রেসের মাঝামাঝি এক সন্তলন বিন্দুতে এসে পৌঁছে গেছিলেন—বলা বাহুল্য, পরোক্ষ সংগঠনের প্রতি বেশী ঝুঁকে বা tilt করে। কিন্তু জুন নির্বাচনের পর থেকে রাজস্থানের রাজনীতি এক আবর্তমান জঙ্গম অবস্থায়। জনতা দলের বিভিন্ন শরিকদের উপশ্রেণী কেন্দ্রিক বিশ্বস্ততা সঙ্গোপনে কাজ করতে থাকায় মুখ্যমন্ত্রী সেখাওয়া সাহেবকে ল্যাং মারবার তালে জনতার এম, এল, এদের এক মতান্তরী গোষ্ঠী বা ডিসিডেন্ট গ্রুপ তৈরী হতে দেয়ী হল না। এই গোষ্ঠীর প্রধান ধারা তাঁরা সাধারণভাবে, রাজনীতিতে জাতিবাদ বা casteism আমদানী করেছেন জাতিদের রাজনৈতিক রবরবা বাড়াবার উদ্দেশ্যে। মুখ্যমন্ত্রী রাজপুত “জাতির”, স্ততরাং স্থানীয় দেশপ্রেমের আধিমি। এই ক্যাক্টর তাঁর পক্ষে কাজ করেছে। দ্বিতীয় শক্তি-উপকরণ তাঁর দিকে যোগাচ্ছে তথাকথিত “আদিবাসী” বা tribal

মীনা সম্প্রদায়। মীনাদের ঐতি-হাসিক পটভূমিকা আছে রাজস্থানের রাজস্ববর্গের ঠিক নিচের সারিতে এক উপ-রাজস্ববর্গ রূপে। তারা রাজ-স্থানের রাজা রাজড়াদের দক্ষিণ হস্ত তথা অস্থচর হিসাবে লড়াই করেছে, প্রশাসনিক সংগঠন ও কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে, ফলে সামন্তী প্রসাদ পেয়েছে অপরাধ ও মধ্যযুগের শোষণে তারা রীতিমত ক্ষমতাধর শ্রেণী হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক শক্তির অবক্ষয় শুরু হয়। গত ১০০ বছর ধরে অনেক ক্ষেত্রে তারা অমগ্রসর সম্প্রদায় বিশেষ বনে যায়। অথচ জনতা দলের অভ্যুদয়ের আগে থেকে কংগ্রেস দল “মীনা”-দেরকে রাজনৈতিক আত্মকল্যাণ দেখান শুরু করে, যদিও তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাদপরতা দূর করবার উপযুক্ত কোনো অর্থনৈতিক উন্নতির যোজনা রূপায়িত করতে চেষ্টা হয় নি। বাঁশওয়াড়া জেলা এবং অন্তর্ভুক্ত (দক্ষিণ ও মধ্য রাজস্থান) প্রকৃত ট্রাইবল (ভিল ইত্যাদি) উপজাতিদের উন্নতি এবং রাজনৈতিক সংহতি শক্তি বাড়াবার উদ্দেশ্যে সোশালিস্ট পার্টি কিছু কাজ করেছে; এই অল্পবলে মীনাদের হয়েছে। সোশালিস্টরা এখন জনতা শাসকদের অঙ্গ এবং তাদের নেতা প্রোঃ কেদার রাজস্থান মন্ত্রিমণ্ডলীতে রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি কোটা জেলার “ছবড়া” নির্বা-চনকেন্দ্রে থেকে ভাগ্য পদীক্ষা করতে যাচ্ছেন, পদাঙ্গীন হবার ছ’মাসের মধ্যে তাঁর পক্ষে অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল এম. এল. এ. হওয়ার। ছবড়া কেন্দ্রে প্রচুর মীনা ভোটার, স্ততরাং ভৈরো সিং সাহেব এখন ওখানে মীনা উপজাতির গ্রামবাসী মুখপাত্র ‘প্যাটেল’দের কাছে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া শুরু করেছেন, যেমন তাঁর পূর্ববর্তী কংগ্রেসীরা করত। ভোটের গরজ বড় বালি।

অথচ, ইতিমধ্যে জনতা সর-কারের ইমেজ এ প্রদেশে খারাপ হতে আরম্ভ করেছে। প্রথমতঃ, সর্ব-ভারতীয় স্তরে মূল্যমানবৃদ্ধির পরিণাম এখানে গরীব রাজস্থানীদের জীবন হুবহু করে তুলেছে (জয়পুরে ছোট দোকানদার থেকে নিচু-মাঝারী সমভোক্তা শ্রেণীভুক্তদের অবস্থা দ্বিতীয় তুলনায় কোনো অংশে কম ক্রেশকর নয়। জিনিষপত্রের দাম এবং ঘর ভাড়া রেট আকাশচুম্বী); দ্বিতীয়তঃ,

চুরি-ডাকাতির সংখ্যা এত বেড়েছে যে, খোদ প্রান্তীয় রাজধানীতে “জান ও মালের” নিরাপত্তা নেই। এ প্রসঙ্গে জন অসন্তোষ তো রয়েছেই; এমন কি শাসক শ্রেণীভুক্ত “রাজস্থান পত্রিকা” ও “দৈনিক রাষ্ট্রদূত” গত জুন মাস থেকে জয়পুরে ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে বারবার সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ পত্রকারদের প্রেরিত খবর ছেপে চলেছে। তবু ডাঙাধারী পুলিশ পুঙ্খবদের ঘূমের ব্যাঘাত হয় না। কারণ বাহ, চুরিডাকাতি মহা-বিভায়া বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে তাদের গোপন মিতালি তো রয়েছেই, হাতের তালু ঘূষে গরম হতে দেয়ী হয় না। এক সাম্প্রতিক বিধায়ক দলের বৈঠকে স্থানীয় এম. এল. এ. বজরওয়াল পুলিশী নিষ্ক্রিয়তা ও দ্রষ্টা-চারিতা সম্পর্কে অনেক উদ্‌াহরণ দেন। একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য তো স্পষ্ট বলে বসলেন পুলিশী সংস্থা ও বিভাগকে তুলে দিতে যদি সরকার অবস্থা শুধরোতে অক্ষম হয়।

মুখ্যমন্ত্রী তথা শাসক শ্রেণীগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ তাই অত্যন্ত আগ্রহী ছিল জনগণের হুঃখাভিযোগ ও অন্বিতা এবং দলের অভ্যন্তরে গোষ্ঠী স্বন্দর বাস্তবকে ধামাচাপা দিতে। উৎসবের প্রাবন ডাকা হল তাই। ১৭২৭ সালে সওয়াই জয়সিংহ দ্বারা জয়পুর নগরীর শিলাভাস মনে পড়ল ইতিহাসবিদদের। তাঁরা পুঁথিপত্রের পাতা খুঁড়ে বের করলেন ভুলে যাওয়া অনেক তথ্য। রাজা জয়-সিংহের অনেক গুণ ছিল, প্রশাসন-কলা, ভূগোলবিদ্যা, কুটনীতিশাস্ত্র এবং সর্বাধিক—বিভাগ্যরাগ। তিনি সে যুগের জয়পুর নিবাসী (রাণা প্রতাপা-দিত্যের বংশোদ্ভূত থেকে রাজা মান-সিংহের আমন্ত্রণে আসা দশটি বৈদিক বাঙ্গালী পরিবারের অন্ততম বংশজ) বিভাধর চক্রবর্তীর স্থাপত্যশিল্পে প্রতিভার চিহ্ন দেখে তাঁকে জয়পুর নগর স্থাপনার পরিকল্পনায় সংযুক্ত করেন স্থপতিপ্রধান হিসেবে। ১৭২৯ সালে বিভাধর চক্রবর্তী “দেশ দেওয়ান” পদে নিযুক্ত হন। এই কৃতি বাঙ্গালীর নাম আজও বহন করে জয়পুর ‘ত্রিপোলিয়া বাজারের’ রাস্তা ও সেখানকার প্রাচীনতম ঘাট

“বিভাধর-কা-বাগ”। [এ প্রসঙ্গে কোতুলী পার্ঠক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের কেতাব ‘বঙ্গের বাহিরে বাঙালীতে’ লেখা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ছেলে শ্রীমেষনাদ ভট্টাচার্যের বিবরণীয় উল্লেখ দেখতে পারেন।] জয়পুর নগর যোজনাবদ্ধ ভাবে পরিকল্পিত হয় প্রজাসাধারণের স্বত্ব। কতেহপুর সিক্রিশহর অল্পরূপ যোজনাবদ্ধ হলেও তা হয়েছিল মুঘল-শাহান-শাহের দরবার-কেন্দ্রিক প্রাসাদ-শোভিত শাহী শহর রূপে সীমিত উদ্দেশ্যে। সে ঘাই হক, জয়পুর স্থাপনার কয়েক বছরের মধ্যে ইতিহাসঘাত নাদির শার দিল্লী আক্রমণ হয়; এবং তীত মুঘল দিল্লীধরের সঙ্গে মারাঠা-পেশাওয়া বালাজীর সন্ধিচুক্তি হয়; মধ্যস্থ-দোতা করেন জয়পুর রাজ সওয়াই জয়সিংহ (১৭৪২)। তার এক বছর পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু এ যুগের রাজা রাজওয়াড়া-গম্ভী শাসকশ্রেণীর সামন্ততন্ত্র প্রেমের স্বস্ত ঘটেনি। নাহলে এমত্ব অস্বৃত উৎসাহের সঙ্গে অতীতচারণ করবেন কেন তাঁরা। বর্তমান শাসকদলে নেতাদের অন্ততম রাও লক্ষণ সিংহ (ডুঙ্গারপুর) অমেক সাধ্যসাধনা করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইকে মাত্র তিন ঘণ্টার জ্ঞাত্ব হলেও এই জয়ন্তী মহোৎসব উদ্‌ঘাটন করবার মহাযজ্ঞে ডেকে আনতে সক্ষম হয়েছেন। সফল হয়েছেন বর্তমান জয়পুর রাজ শ্রীভবানী সিংহ এই উৎসব উপলক্ষে এক বিশালাকার ইতিহাস ধর্মী যিছিল সংগঠিত করতে। কি ছিল না তাতে? হাতী; প্রোনো দিনের রাজসিক দস্তের প্রতীক, নিশানা, অথারোহী যুধ, রথ ও রথারোহী, পুলিশ ব্যাণ্ড, মেপাই শাস্ত্রী এবং সেকালের বিশেষ সামরিক শ্রেণী “নাগা” সৈনিকদের সেকালের সাজে কুচকাওয়াজ। এ-ছাড়া রাতে বিমূঢ় জয়পুরবাসীদেরকে দেখান হল নি-ধরচায় আতশবাজীর শোভা। অবশ্য এ সমস্তর মূল কাজ করেছে, তাবড় নাগরিক নেতাদের এক সমিতি, যারা সংগ্রহ করেছে লক্ষ লক্ষ টাকার চাঁদা, ব্যয় করেছে অযাচিত উপদেশ সাধারণ নাগরিক-দের উদ্দেশ্যে নগরের সম্মার্জিত রূপ ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে। হায়, দরিদ্র পুরবাসী প্রেরণায় মেতে উঠলো কৈ? কেবল বিক্ষাণিত নেত্রে দেখে গেল বড় বড় বড়লোকদের ‘কালচার’ ও কীর্তি।



প্রফুল্ল সেনের অন্যায় আচরণ

আরামবাগ মায়াপুরে শ্রীপ্রফুল্ল সেনের যে কল্যাণকেন্দ্র আছে তার সংলগ্ন একটি সরকারী বাঁধ আছে। উক্ত বাঁধ ও কল্যাণ কেন্দ্র সংলগ্ন ৬২৩ দাগে আমাদের একটি দখলী জমি আছে। উক্ত জমির কিয়দংশ সরকারী বাঁধের জন্ত আমরা দিয়েছি। বাকি অংশ যা বর্তমানে ঠিক পূর্বদিকে অবস্থিত তা শ্রীপ্রফুল্ল সেন নিজ নির্দেশে অজ্ঞয় দে এম এল এ (ননী বো)-র তত্তাবধানে জোর পূর্বক দখল করে প্রাচীর তোলার আদেশ দিয়েছেন। অত্যাচার্য্যে প্রাচীর তোলার জন্ত আমি প্রতি-বাদের জন্ত শ্রীপ্রফুল্ল সেনের নিকট যাওয়ায় উনি এবং শ্রীঅজ্ঞয় দে আমাকে বলেন “প্রাচীরের কাজ বন্ধ রাখা হবে না।” তাঁদের এই আচ-রণে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশেষ উদ্দেশ্যে উদ্ধানি-মূলক কাজের দ্বারা দেশে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে বলে মনে করতে বাধ্য হচ্ছি। আমি

একটি রাজনৈতিক পার্টির সক্রিয় কর্মী জেনেও শ্রীসেন যে কিতাবে এই অত্যাচার্য্যে মদত দিলেন তা বোধ-গম্য হচ্ছে না। জনতা দলের একজন বর্ষীয়ান নেতার এই ধরনের অত্যাচার্য্যে প্রতীবাদের ভাষা নেই। ঠিক এই ভাবেই আরামবাগের বৃহৎ গরীব ও মধ্যবিত্ত লোকের জমি দখল সহ ফসল লুণ্ঠের অভিযানও সংগঠিত হচ্ছে। যথাসময়ে প্রাচীরটি ভেঙ্গে ফেলা না হলে আইনানুযায়ীই ব্যবস্থা নেওয়া হবে, অবশ্য পূর্বেই আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি তবে প্রয়োজনবোধে আমরা দেশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ঐ ধরনের উদ্ধানিমূলক কাজের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাব। আশা করি শাস্তি শৃঙ্খলার স্বার্থে সরকারী কর্তৃ-পক্ষ সবার হস্তক্ষেপ করবেন।

মদন সাহা

আভারাগী সাহা

মায়াপুর, হুগলী

নয়া চীনের কৃষি ব্যবস্থা (২)

ইন্দ্রি বসু

নানা স্থখ সুবিধা পাওয়ায় কমিউন খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলো এবং ১৯৬১ সালের মধ্যেই কমিউনের সংখ্যা দাঁড়াল ৭২ হাজারের মত। কমিউন সংলগ্ন কারখানা-গুলিই প্রমাণ করে দিল যে উচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ছাড়াও শিল্প গড়া যায়। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিজ্ঞা একটা রহস্যজনক গুপ্ত বিজ্ঞা নয়। এতকাল বিশেষজ্ঞরা সাধারণ শ্রমিকদের অবহেলার চোখে দেখতে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু এখন থেকে তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী কিছু বদলাতে আরম্ভ করলো। গ্রাম্য কারখানার প্রতিষ্ঠা পরিচালনা দেখিয়ে দিল জনশক্তির প্রাধান্য। কমিউনগুলিতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামরিক শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমন্বয় ঘটিয়েছে। সেখানে আছে স্কুল, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পশু-চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, স্থানীয় দেশরক্ষার কাজে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি। বিভিন্ন কমিউনগুলির সহযোগিতার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ তৈরী করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাস, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পরিচালনা, ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, সার তৈরী এবং ময়দা ও আটার কল প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। জনসাধারণের অদম্য উৎসাহে শুরু হলো খাল কাটা, জলাধার তৈরী করা, রাস্তা-ঘাট তৈরী করা, পাহাড়ের গ্রামে গ্রামে বনভূমি সৃষ্টি করা, নীচু জায়গা ভরাট করা ও উঁচু জায়গা কেটে সমান করা, পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে জমি তৈরী করা। এই জন-শ্রুই আগে কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি সে এ সব কাজ করতে সক্ষম হবে। ১৯৭৩ সালে সাঙ-ই (মহাপ্রাচীরের ঠিক দক্ষিণে) বলে একটা ব্রিগেড দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানকার লোকেরাই নিজের চেষ্টায় সেই পাথরময় অনাবাদী অঞ্চলটাকে উৎপাদনকারী অঞ্চলে পরিবর্তিত করেছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে শস্তভারে নত অনেক ক্ষেত রয়েছে।

এই পাথুরে অঞ্চলে মুষ্টিমেয় লোক বাস করতো। তারা বলতে গেলেন নিরক্ষর। চারিদিকে বন সাড়া দেবে গেল “নিজের পায়ে দাঁড়াও” তখন গুটিকয়েক লোক মিলে এই অসাধ্য সাধনের কাজে লেগে গেল। পাথরের উপরে মাটির স্তর খুব হালকা ছিল। তাতে চাষ করা সম্ভব ছিল না। কয়েক মাইল দূরে এক ছোট নদীর ধার থেকে খুঁড়ি খুঁড়ি মাটি

কেটে এনে দিনের পর দিন জমি ভরাট করে চললো, এমনকি ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও ছোট পাত্রে বা কৌচরে করে মৃত্তিকানেক মাটি বয়ে নিয়ে আসতো। জলকষ্ট ছিল মারাত্মক রকম তাই পাথর কেটে বৃষ্টির জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করলো আর দূরে পাহাড়ী নদী থেকে খাল কেটে কিছুটা জলের ব্যবস্থা করলো। পাহাড়ের গায়ে এক মিটার লম্বা, এক মিটার চওড়া ও এক মিটার গভীর করে গর্ত করে তাতে মাটি ফেলে নানা রকম ফলের গাছ লাগালো। গিয়ে দেখলাম পাহাড়ের ধাপে ধাপে শস্ত, গাছ ভরা আপেল, ত্রাসপাতি ইত্যাদি ফল, মাঝে মাঝে চাষীদের ছোট ছোট ঘর বাড়ী সবই হয়েছে। একটা বড় মত চাতালে শস্ত মাড়াই বাছাইও করতে দেখলাম। ওরা বললো গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ তো বটেই, কিছুটা সরকারের কাছে বেচে দিতেও পারছে। এবারে হোপে প্রদেশে একটা কমিউন দেখেছি, সেটাও একটা বিরাট নোনা জলে ভরা অঞ্চল ছিল ও মাঝে মাঝে পাথুরে জমি ছিল। সেই নোনা জল পরিষ্কার করে, পাথর কেটে কাকড় বেছে চাষের জমি তৈরী করা হয়েছে। ফসল ফলাচ্ছে, ফলের চাষ করছে, হাঁস মুরগী শূয়ার পালন করছে, শস্তের চাষ করছে, ছোট ছোট কারখানায় কিছু কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সার ও বাড়ীঘর তৈরী মালমশলা তৈরী করছে। ২৩ হাজার লোকের বাস, তাতে গৃহ আছে ৫ হাজার আর চাষ হচ্ছে ২১০০ হেক্টর জমি। নিজের চেষ্টায় খাল কেটেছে, ভৌমজল তোলার ব্যবস্থা করেছে, স্কুল ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে, খেলাধুলা, আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাও করেছে (অল্পদূর অঞ্চল-গুলিকে সরকার কিছু অর্থ সাহায্য করে)।

এখন তো সানশি প্রদেশের তাচাই ব্রিগেড দেশের কাছে আদর্শ। এই অঞ্চলটা নাকি উচ্চ থাইহান পাহাড়ে অবস্থিত। তার অধিকাংশই পার্বত্য, কিছুটা গহ্বর আর খুব সামান্যই ছিল সমতল। তাতে আবার মাটির স্তর খুব হালকা ছিল যার জন্য কিছু জন্মাত না। এই অঞ্চলে খুব কম লোকের বাস ছিল, জাপানী আক্রমণে এখানেই বহু লোক নিহত হয়। এরাও নাকি

অসাধ্য সাধন করেছে। প্রথম অবস্থায় এরাও প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়েছে। পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে চাষের জমি করেছে। নীচু জমি ভরাট, বর্ষার ঢল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পাথর সাজিয়ে দেওয়াল তৈরী, জলাধার তৈরী, উঁচু পর্বতে জলাধার থেকে খাল কাটা এসব নিজেরাই করেছে। এখন নাকি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক উন্নতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাচাই নাকি এখন স্বর্গরাজ্য। দুঃখের বিষয় শীতের ভয়ে উত্তর চীনে না যেতে পারায় এই বহু আকাজক্ষিত স্থানটি দেখা হয়নি।

কমিউন দেশকে নানাভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণ কি না করেছে—মাটি কাটা, পাথর কাটা, খাল কাটা, পাহাড়ের অপর পার থেকে স্বল্প কেটে (রেড ক্ল্যাগ ক্যানেল) নদীর জলধারা অপর পাশে আনা, হ্রস্ব নদী বা বছরে বছরে ভয়াবহ বন্যায় লোকের ধন সম্পত্তির ক্ষতি করে চলেছিল তাকে বাঁধ দিয়ে পোষ মানান, কৃষির উন্নতি করে উৎপাদন বাড়ান এবং কলকারখানা প্রতিষ্ঠা এই সব কিছুই দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

গোটা দেশে ৭০ হাজারের উপর কমিউন আছে। কমিউনের আকার, প্রাকৃতিক অবস্থান, স্বাভাবিক অবস্থা বা আর্থিক সঙ্গতি সর্বত্রই এক নয়, কিন্তু গঠন গভীর এক। ঘন বসতি অঞ্চলে কমিউনের জন সংখ্যা ৫০/৬০ হাজারের মত, কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে ও মরু অঞ্চলে বসতি কম থাকায় জনবল কম। কমিউনেরও আবার কয়েকটি স্তর আছে। একে-বারে নীচুকার স্তর হলো উৎপাদন টিম (Production Team)। এই টিম ১০০/১৫০ জন লোক নিয়ে গঠিত হয়। ১০/১২টি টিম নিয়ে একটি ব্রিগেড (Production Brigade) এবং ১০/১৫টি ব্রিগেড নিয়ে হয় একটি গণ কমিউন। কাজের সুবিধার জন্য এই ভাগগুলি করা হয়েছে। কমিউন এদের নেতা ঠিক করে, অবশ্য সদস্যদের মতামত নিয়ে। নিজেরাই আয় ব্যয়ের হিসাব রাখে, বন্টন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা করে, ব্যাকের কাজ কর্ম চালায়। বস্তুতঃ কমিউনের কর্তব্য হলো কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা। একে শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ এবং

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠা বলা চলে।

কমিউনগুলির গঠন ও কাজ সম্বন্ধে যা বলেছি তার সঙ্গে গৃহ শিক্ষা স্বাস্থ্য অর্থাৎ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একটু বলছি। কমিউনে প্রত্যেকের থাকার বাড়ী আছে। তার সঙ্গে একটু জমিও আছে যেখানে গৃহস্থালীর জন্য শাকসব্জি ফল ফলাতে পারে, হাঁস-মুরগী, শূয়ার পালন করতে পারে। আগে তো গ্রামের গরীব চাষীর বাড়ী লতাপাতা দিয়ে খুপড়ি মত ছিল, এখন কিন্তু টালির ছাদ, ইটের দেওয়াল বা মাটির দেওয়াল ঘেরা ঘর দেখা যায়। বাড়ীর সব ছেলে মেয়েই কাজ করে কৃষিতে, শিল্পে অথবা সৈন্য বিভাগে। কাজে বাদ পড়ে শিশু, বৃদ্ধ ও অসমর্থরা। যাদের বাড়ীতে থাকার লোক থাকে তারা দুপুববেলা বাড়ী এসে খেয়ে যায় যদি কাজের জায়গা বাড়ী থেকে খুব দূরে না হয় আর যাদের সে সুবিধা নেই তারা ভোজনালয়ে খেয়ে নেয়। কাজের শেষে বাড়ী ফিরে নিজদের ইচ্ছামত রান্নাবান্না করা, খেলাধুলা করা, নানা আমোদ প্রমোদ করার যথেষ্ট সময় পায়। পরিবারে মিলিত আয়ের দৌলতে আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হওয়ায় অভাব জনিত নানা অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে রেহাই পায়। এতে পারিবারিক সম্পর্ক ভালই থাকে। গ্রামেই থাকতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যোগ্যতা অহুয্যী অন্ত্র কাজ করতে পারে। শীতের সময় যখন চাষাবাসের কাজ কম থাকে পরিবারের লোকেরা কিছু কিছু কুটির শিল্পও করে যাতে নিজ পরিবারের চাহিদা মেটে ও সামান্য অর্থও আসে। কাজগুলি হচ্ছে কাপড় বোনা, জাল বোনা, বাঁশ বাঁবেতের খুড়ি বোনা, এছাড়া কিছু কিছু শৌখিন দ্রব্য তৈরী করা। অবস্থা ভাল হওয়ায় নিজদের সঞ্চয় কিছু থাকে। তা দিয়ে তারা নিজের পছন্দ মত রেডিও, সেলাইর কল, সাইকেল ইত্যাদি কিনতে পারে আর ইচ্ছা করলে ব্যাঙ্কেও জমাতে পারে।

কমিউনে জনস্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সেখানে যেমন হাসপাতাল আছে তেমনই অনেক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে আর আছে বহু সংখ্যক “নার্স পা ডাক্তার” (Barrefoot doctor)। তারা কমিউনের কর্মী। তারা নিজদের নির্দিষ্ট কাজ করে এবং প্রয়োজনে প্রাথমিক চিকিৎসা করে এবং বিশেষ অবস্থায় রোগীকে স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা হাসপাতালে পাঠায়। রোগ যদি কঠিন ও চিকিৎসা ব্যয় সাপেক্ষ হয়

তবে সে ক্ষেত্রে পরিবার অর্থক ব্যয় বহন করে এবং বাকি অর্থক স্বাস্থ্য তহবিল থেকে দেওয়া হয়। অনেক কমিউন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভেষজ উদ্ভিদ থেকে ওষুধ তৈরী করা হয় এবং বিশেষ বিশেষ ওষুধ সরকার যোগান দেয়। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রতি পরিবারকে এক ইউয়ান চান্দা দিতে হয় এবং সেখান থেকে তাকে সারা বছর বিনা মূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ-পত্র দেওয়া হয়। শহর থেকে দূরে হলেও কেউ বিনা চিকিৎসায় মারা যায় না।

কমিউনে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আছে কেন্দ্র। যাদের বাড়ীতে দিদিমা ঠাকুরমা থাকে তাদের শিশুরা সাধারণতঃ বাড়ীতে থাকে। বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের জন্য আছে আবাস। যাদের দেখাশুনার লোক থাকেনা তাদের এখানে রাখা হয় বেশ যত্নের সঙ্গেই। পশ্চিমী দেশগুলির মত এগুলি এখনও অত উন্নত ধরনের নয়। এ সবের খরচ বহন করে জন-কল্যাণ তহবিল। কমিউনে শিশু বিভাগ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগ এবং কারিগরি বিদ্যালয় আছে। কোন কর্মী বিশেষ যোগ্যতা দেখালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা আছে। কার্যিক শ্রম এখানে সবাই-কেই করতে হবে, যাতে কারও মধ্যে আমলাতান্ত্রিক ভাব না জন্মায়।

স্থখ সুবিধার আকর্ষণেই লোক গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে স্থখ সুবিধার পার্থক্য ক্রমেই কমিয়ে আনা হচ্ছে। কমিউনের প্রয়োজনেই গ্রামে বাঁধান রাস্তা, বিদ্যলী বাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এসব দেখে শুনে স্বভাবতই মনে হবে আমাদের কেন এ উন্নতি হলো না? আমরাও ওদের মত ঔপনিবেশিক দেশ ছিলাম, আমাদেরও জনসংখ্যা কম নয়, আমাদেরও প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। ওরা বহিঃযুদ্ধ অস্ত্রযুদ্ধের পরে বিদেশী সাহায্য ছাড়া কেমন করে স্বনির্ভর হয়ে খাদ্য সমস্যা, বেকার সমস্যার সমাধান করেছে। শিল্প, কৃষি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা কোন ক্ষেত্রেই অস্ত্র জাতের কাছে পিছিয়ে পড়ে নেই। চীনদেশ গোড়ার দিকে কিছু সোভিয়েট সাহায্য পেয়েছিল কিন্তু পরে রাজনীতিতে আদর্শগত মতপার্থক্য দেখা দেওয়ায় রাশিয়া সব সাহায্য হঠাৎ বন্ধ করে দেয় এবং যে ঋণ তারা দিয়েছিল তা তখনই সম্পূর্ণ আদায় করে নেয়। নদীতে মাঝি যেমন করে নৌকোর হাল ধরে নদী পার করে নেয়, এই হৃদিনে চেয়ারম্যান (শেয়াং ৭ম পৃষ্ঠায়)

ঋত্বিক ঘটকের শেষ ছবি

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ঋত্বিক ঘটকের যুক্তি-তর্কো-গল্পের যে সমস্ত সমালোচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, কিম্বা ছবিটি সম্বন্ধে এটা কথা হয়নি এদিক ওদিক থেকে ছুঁড়ে দেওয়া এ জাতীয় মন্তব্য কয়েক বছর আগেকার যন্ত্রণা-দায়ক তিক্ত অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়ে দিল। কলকাতার ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ আয়োজিত মিষ্টি-গুটির উৎসব মনোগাতারির প্রদর্শনীর সময় ক্রফো-গদ্য আন্তোনিয়ন-রসিক, এই শিল্প মাধ্যমের সব কিছু গুলে খাওয়া বেশ কিছু সংখ্যক বোকা দর্শক নানা ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যে কটুক্তিতে ছবিটিকে সারাক্ষণ ধিকার দিয়ে যাচ্ছিলেন। মিষ্টিগুটির মধ্যযুগের রূপকধর্মী কাহিনী ব্যবহার, রূপকের বিস্তারিত, জাপানী নাটকের ঐতিহাসিক দৃশ্যরচনা ও অভিনয়-প্রকরণ—এক কথায় জাপানী চলচ্চিত্রের বিশেষ দেশজ ভাষা তাঁদের অত্যন্ত অপরিচিত লাগছিল। কিন্তু নিজেদের ধ্যানধারণা অভ্যাসের শ্রেষ্ঠবোধে ছবিটিকে ন্যাং করার প্রয়াস ও দৃষ্টি প্রকাশ না করলেও চলত। মধ্যযুগী কাহিনীভিত্তিক আর একটি জাপানী ছবি 'বিক্রোহ'

দেখতে গিয়েও একই অভিজ্ঞতা হয়। জাপানী চলচ্চিত্রশিল্পীরা নিজস্ব দেশজ-ভাষায়, রূপকধর্মী বিস্তারিত মধ্যযুগী জীবন ও সামরিকতন্ত্রের ঐতিহ্য প্রভাব আধুনিক যুগেও প্রবল তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদে সমালোচনায় মানবিক সত্যের সন্ধানকে রূপ দিতে চেয়েছেন। এই ছবিগুলোর পেছনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী কালের জাপানের যন্ত্রণাবিদ্ধ আত্মাকে অনুভব করা যায়। ঋত্বিকের যুক্তিতর্কো আর গল্পো ও সত্তর দশকের ভয়ংকর কঠিন সময়ের অভিজ্ঞতা-মহন প্রবল প্রতিবাদ সমালোচনার তাৎপর্যপূর্ণ রূপায়ণ। ছবিটির নায়ক নীলকণ্ঠ বাগচির মধ্যে ঋত্বিক এক প্রবল দুঃসাহসে নিজের মাত্রাতিরিক্ত মস্তাশক্তি, জীবনের অপচয়, জীবন সঙ্কে সম্পর্কচ্ছেদ—ব্যক্তিজীবনের এই সমস্ত দিক একেবারে অনাবৃত করে দিয়েছেন। ব্যক্তিজীবনের অনেক ঘটনা, অনেক কথা হুবহু ছবি-টিতে গেঁথে দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেননি। আর সেই নিজের সৃষ্ট চরিত্রে, নিজেরই পরিচালনায় নিজেই অভিনয় করেছেন, কিন্তু কিসের তাগিদে? বোধহয়, নিছক

আত্মপ্রদর্শনীর অহরোধের ভাঙনাম নয়। নিজের জীবন সঙ্কেও মিথ্যাচার করে নীলকণ্ঠের মদ খাবার পয়সা সংগ্রহ, শেষদৃশ্যে তিনি কখনও পরের পয়সায় মদ খান না নীলকণ্ঠের এই কথার জবাবে নকশাল তরুণ কিশোর যখন বলে, এই সব কথা বলেই তিনি মদ খাবার পয়সা জোগাড় করেন তখন সারা মুখে শিশুর মত সরল, করুণ এক আশ্চর্য হাসি নিয়ে তাঁর এই উক্তি সে ত তাকে ঠিক চিনেছে আমাদের অজান্তে ভাবেই বুঝিয়ে দেয়, নিজের দুর্বলতাকে তিনি ক্ষমা করেননি, নিজেকে নিয়েও ব্যঙ্গ কৌতুক করেছেন।

সর্বনাশা নেশার ব্যাধিতে ব্যক্তিগত জীবন বিধ্বস্ত হলেও নিজের শিল্পকর্মে, এমনকি এই শেষ ছবিতেও যখন আসন্ন মৃত্যুর বীজ তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, ব্যাধিজর্জরিত শরীরমন পঙ্কতার শেষ সীমায় উপনীত ঋত্বিক কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের নৈরাজ্যকে প্রশ্রয় দেননি, আত্মরতির বিলাসে মাতেননি, বাপ ও গভীর ইতিহাস চেতনায় দেশকালের পটভূমিতে আমাদের অস্তিত্বের সংকটকেই চিত্রিত করতে চেয়েছেন। মনে হয়, শিল্পী যেন বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি শেষ হয়ে যাচ্ছেন, তাই পুরোপুরি ভাবে পঙ্ক হয়ে যাওয়ার আগেই মরীয়া হয়ে শিল্পের স্তরে বৃহত্তর জীবনবোধে বাচার দুঃস্বপ্ন গরজেই আমাদের কালের ব্যাধির বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, প্রশ্ন তুলেছেন, টুকরো টুকরো নকশায় লক্ষ্যপ্রাণ, চরিত্রহীন সমাজের রূপ দেখিয়েছেন। এই ভাবেই শিল্পী তিনি যে একেবারে ফুরিয়ে যাননি, ব্যাধিতে পযুঁজ হননি, এক কঠিন সময়ের মোকাবেলা করার বিবেক ও ক্ষমতা যে তাঁর অটুট, শিল্পে তার প্রমাণ খুঁজতে, নিজের ব্যাধির মানি থেকে উত্তরণ পাবার মর্যাদাসিক চেঁচাই করেছেন। যুক্তি তর্কো আর গল্পোতে ঋত্বিক একটি বাউল গান ব্যবহার করেছেন, আমার মনে হয় সেটাই এই ছবির স্ট্রাকচারাল, সাংগঠনিক ছক : বাউলের গান অন্তের যেমন তেমনি গায়কেরও আত্মচৈতন্য উদ্বোধনের মন্ত্র, বেলা যে শেষ হতে চলল একথা অতর্কিত শোনানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকেও শোনান, ঠিক সেই ভাবেই এ ছবিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্বর প্রবল বেদনাময় হাহাকারে ধ্বনিত হয়েছে, সমস্ত দৃষ্টিকে একটা তাৎপর্যের সংলগ্নতা দিয়েছে।

শিল্পী হয়ত দর্শকদের কাছ থেকে বেশিই দাবি করেছেন, একটি স্তরে যুক্তি তর্কো-গল্পো সত্যি ব্যক্তিগত, নিজের ব্যক্তিগত জীবন ও শিল্পের ব্যবধানের বেড়া এমনভাবে

ভেঙে দিয়ে একাকার করে তোলার নজির সহজে চোখে পড়ে না। ছবিতে নীলকণ্ঠের মাতলামির, জীবনের অপচয়-ক্ষয়ের কোনও চরিত্রগত পশ্চাদপটভূমি তৈরি করার কোনও দায়দায়িত্ব ঋত্বিক অনুভব করেননি, দর্শক তার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অবহিত না হলে ভুল বোঝার অবকাশ থেকে যায়। এটাও হয়ত ঋত্বিকের সেই একরোখা, অবুঝ, মহাশ্বেতা দেবী কথিত শিশুস্বভাবেরই পরিচায়ক। কিন্তু শুধু এই দুর্বলতার এবং অজ্ঞান্য ক্রটি বিচ্যুতি শিথিলতার জন্যই ছবিটি একেবারে ন্যাং হয়ে যায়? যুক্তি তর্কো গল্পের ব্যক্তিগত স্তর সম্বন্ধে অবহিত হতে না পারলেও অজ্ঞ স্তরেও ছবিটির দাঁড়বার মত একটা জমি আছে অনুভব করি। ঋত্বিক হয়ত বুঝিয়েলের নাজারিন থেকে পথপরিষ্কার বিস্তারিত নিয়েছেন, কিন্তু যুক্তি তর্কো গল্পের রূপকের ধাঁচটি একান্তভাবেই দেশজ। নীলকণ্ঠ, তাঁর স্ত্রী দুর্গা, বঙ্গবালী, নচিকেতা এই নামগুলোও ছবিটির বিশেষ মেজাজ ও বিস্তারিত পরিচায়ক। আমাদের দেশে সাধারণ, অশিক্ষিত লোকের মুখেও সহজ সরলভাবে জীবনের গভীরতম প্রজ্ঞার বাণী উচ্চারিত হয়। শিল্পী আধুনিক সচেতনতায়ই সেই দেশজ ভঙ্গিটি ব্যবহার করেছেন, নীলকণ্ঠের বিভিন্ন উক্তি, গানের ধূয়ার মত একই কথার পুনরাবৃত্তিতে আমাদের জীবনের সত্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে। এ ছয়ছাড়া, বোহেমিয়ান, নেশাখোর মাদ্যুষ্টির সত্য উচ্চারণ শহুরে পরগাছা বিলাসী পণ্ডিতমন্ডল রুচিকে প্রশ্রয় না দিলে আমাদের দেশেও একেবারে অস্বাভাবিক মনে হওয়ার কথা নয়। কিংবা যদি সাহিত্যিক ঐতিহ্যের কথাই ধরি, বঙ্গমচন্দ্রের কমলাকান্ত কি আমাদের সংস্কৃতি থেকে একেবারেই মুছে গেছে? নীলকণ্ঠ ব্যক্তিগত জীবনের দায়ভাগে গৃহ-চ্যুত, তাঁর সঙ্গী নচিকেতা ইঞ্জিনিয়ার হয়েও বেকার, আশ্রয়হীন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্ত বঙ্গবালী, আশপাশের বুনাখুনির কলে আশ্রয়-চ্যুত এক প্রবীণ শিক্ষক এরাও ছিন্নমূল নীলকণ্ঠের পদযাত্রার সঙ্গী। শিল্পী আমাদের জীবনের ছিন্নমূলতার যন্ত্রণাকেই এই চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে রূপায়িত করেন। অন্তরিক্তে তারা একেবারে নিঃপ্রাণ, ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যবর্জিত, নিছক রূপকের ছকের অংশ হয়ে দাঁড়ানি। বুদ্ধ শিক্ষক নীলকণ্ঠের জ্ঞানান, তাঁর বাড়িতে মুগ্ধহীন লাশ, কবচ পড়েছিল, সমস্ত বিচারবোধ খুঁয়ে যে আত্মহননের নেশায় আমাদের সমাজ মেতেছিল, তার ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর ট্রাজেডি তাঁর মধ্য দিয়ে আভাসিত হয়।

নীলকণ্ঠ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে শহর ছেড়ে গ্রামে আসেন। সেই যাত্রা তাঁর নিজের যেমন তেমনি আত্মঅন্বেষণ এবং জীবনের সত্য উদ্ঘাটনের রূপক হয়ে দাঁড়ায়। নচিকেতা ইঞ্জিনিয়ার হয়েও বেকার, এই সমাজে তার আশ্রয় মেলেনি। অন্তরিক্তে আমরা দেখি, লক আউট কারখানার পাশে, ধনীর লালিত, চাঁকররত, চেনবাধা জক্সটা পঞ্জি-শনে তরুণ নেতার সাম্রাজ্যিক অগ্র-গতির বক্তৃতার আফালন,—যে সময় সবকিছুকে নির্বিবাদে মেনে নেওয়ার ক্লীবতায় আমরা বিবরগামী, প্রশ্ন-প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর প্রায় অশ্রুত, বুদ্ধিজীবীরা স্ববিধাবাদী তখন ঐ তীক্ষ্ণ নকশার সমালোচনা-প্রতিবাদ যে কি সাহস, সত্যতা ও সত্যসন্ধানী দৃষ্টির চারিত্র্য থাকলে সম্ভব আমাদের বার বার-বুঝতে হয়। ঋত্বিক যুক্তি তর্কো গল্পোতে আমাদের সত্তার শেকড় সন্ধান করেছেন শক্তি দেবীর আর্কি-টাইপাল ইমেজে, বঙ্গবালীর দুর্গা-প্রতিমাকপে, ছোঁ-নাচে, দেশজজীবন ও সংস্কৃতির জীবন্ত ধারায়। প্রশ্ন-প্রতিবাদহীন এক কঠিন সময়ের চাপে আড়ষ্ট, জড়তাগ্রস্ত মধ্যবিত্ত-মানসের পটভূমিতে ঐ সন্ধানকে কি অর্থপূর্ণ মনে হয়না? ছোঁনাচে জননীর পরাক্রান্ত শক্তির সামনে শংকাতুর মস্তানকে বীর্ঘে সংগ্রামে উদ্দীপিত করার রূপকদৃশ্য শিল্পী কেন তুলে ধরলেন সে একথা একবারও ভেবে দেখার প্রয়োজন নেই! এই মাতৃমৃতিঘটিত সন্ধান হয়ত খুব ব্যক্তিগত মনে হতে পারে, কিন্তু চারদিকের সর্বগ্রাসী শূন্যতার মাঝখানে শিল্পী যে আমাদের দেশের প্রতি গভীর বেদনাময় ভালোবাসা নিয়ে শক্তিদেবীর রূপকে সংকট-উত্তরণের শক্তি-আত্মাসের চিত্র গড়ে তুলতে করেছেন, তার কি কোনও মূল্যই নেই?

নীলকণ্ঠ তাঁর পথপরিষ্কার শেষ স্থানটিতে, শালবনে নকশাল তরুণ-দের মাঝখানে এসে উপস্থিত হন, এটাও কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই তরুণেরা যতই বিভ্রান্ত হোক, চারদিকে ভ্রষ্টতার মাঝখানে তাদের আদর্শনিষ্ঠা ছিল সংশয়াতীত আদর্শের জন্য নিজের প্রাণ বিলিয়ে দেবার সত্যতা নীলকণ্ঠকে টানে, তিনি তাদের জানতে চান, তাদের সঙ্গে তর্ক করে ঐতিহাসিক উত্তরণের সত্য বোঝার ও বোঝানোর চেষ্টা করেন। পুলিশের সঙ্গে অসম খণ্ড-যুদ্ধে এই তরুণদের মৃত্যু ঘটে। একটি পুলিশের বন্দকের স্থির নিশানায় গুলিতে নীলকণ্ঠের বুক বিদ্ধ হয়, ক্যামেরার ওপর তিনি বোতল থেকে যে মদ ঢেলে দেন সেটা তাঁর বুক (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)



ইস্টার্ন কোলমিডিয়াস লিমিটেড
(কোল ইন্ডিয়াস একটি সংস্থা বিশেষ)

প্রস্তাব আহ্বান করছে

এক্সপ্লোজিভ ক্যানিষ্টার

রেফা: নং ০২ / ই সি এল / পি ইউ আর / এক্সপ্লোজিভ ক্যানিষ্টার / ৭৭/৬৩
যথাযোগ্যভাবে টেণ্ডার নং দিয়ে সীল করা টেণ্ডার দু'কপি নিম্নোক্ত সরবরাহের জন্য : ২৫ গেল্স গ্যাসভানাইজড সীটে তৈরী সিলেনড্রিক্যাল আয়তনের এক্সপ্লোজিভ ক্যানিষ্টার যার টপ কভার গোলাকৃতি ইনজ্ করা এবং যাতে শক্ত সেলফ লকিং ব্যবস্থা আছে। ক্যানিষ্টারের ভেতরের অংশ হবে কাঠের লাইনিং করা যা টু ইঞ্চির বেশী পুরু হবে না। ভিতর ও বাহির মোটা করে রেড অক্সাইড প্রিমিয়ার দেওয়া থাকবে। ক্যানিষ্টারের ভিতরের ব্যাস ৬ ইঞ্চি এবং আন্তঃস্থ গভীরতা (ঢাকনা বাদে) ১৮ ইঞ্চি — ১২৫টি দরকার।

ক্যানিষ্টারের নমুনা যে কোন কাজের দিনে চীফ কন্ট্রোলার অফ স্টোর অ্যান্ড পারচেজ, সাকতোরিয়া, পো: দিশেরগড়, জেলা বরমান-এর অফিসে দেখা যেতে পারে। নমুনা এবং সাম্প্রতিক ইনকাম ট্যাক্স ও সেলস ট্যাক্স সার্টিফিকেট সহ কোটেশন জমা দিতে হবে। বায়নার ১০০০ টাকা নগদে অথবা কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের (ইস্টার্ন ডিভিসন) অফিসে ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের (ইস্টার্ন ডিভিসন) দেওয়া যে কোন অফিসে ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি / জাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট / গভর্ণমেন্ট ট্রেজারী সার্টিফিকেট কোটেশনের সঙ্গে জমা দিতে হবে। ২০/১২/৭৭ তারিখ বেলা ১টার মধ্যে কন্ট্রোলার অফ পারচেজ-এর কাছে কোটেশন পৌঁছানো চাই এবং যা ঐদিন ৩টার সময় উপস্থিত টেণ্ডার-দাতাদের সামনে খোলা হবে।

গ্রন্থ সমালোচনা

রাজনৈতিক

ছড়ার সংকলন

হাঁড়ি ফাটিল : অনার্য মিত্র।
প্রাপ্তিস্থান : শ্রাশানাল বুক
এজেন্সি। দাম : দু'টাকা।

বিগত কয়েক বছরে আমাদের দেশে রাজনৈতিক দিক থেকে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বহু চাপ্পল্যকর ঘটনা ঘটে গেল যার প্রতিক্রিয়া সর্বব্যাপী। অনেক ক্ষেত্রে বৃহৎ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এই সব ঘটনা প্রতিকলিত এবং বিভিন্ন মহলে আলোচিত ও সমালোচিত। এই সব ঘটনার কিছু কিছু বিভিন্ন সময়ে ছড়ায় গেঁথেছেন শ্রীঅনার্য মিত্র যার নির্বাচিত সংকলন সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে “হাঁড়ি ফাটিল” নামে গ্রন্থাকারে। শ্রীমিত্রের ছড়ার হাত খুবই পাকা, মিল অনায়াস ও অটুটীহীন এবং সহজ শব্দ ব্যবহারে স্বতঃস্ফূর্ত। ছড়ার যেটা বৈশিষ্ট্য সেই কৌতুক এখানে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং ব্যঙ্গ নয়, মজাটাই এখানে বিশেষ প্রত্যা। তাই শ্রীমিত্রের ছড়া পড়তে পড়তে

চীনের কৃষি ব্যাঙ্গ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

মাও দেশের নৌকোর হাল ধরে
তেমনি করে বিপদ সাগর পার করে
আনলেন। তিনি ঘোষণা করলেন
যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখ।
সোভিয়েট সাহায্য তুলে নেওয়া
চীনের পক্ষে শাপে বর হলো।
জনগণ স্বনির্ভর হয়ে দেশকে সর্বক্ষেত্রে
এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

আমরা তো এখনও বিদেশী ঋণ,
বিদেশী মূলধন, বিদেশী কলকজা,
বিদেশী কারিগর ও বিশেষজ্ঞদের
মুখ চেয়ে আছি। তাতে আমাদের
সব উত্তমের পথ বন্ধ হয়ে আছে আর
আমরা পিছিয়ে পড়ে আছি।

চীন এ সব উন্নতিতে বিনা
বাধ্য স্বত্বভাবে এগিয়ে গিয়েছে
বা যাচ্ছে তা ভাবার কোন কারণ
নেই। জমিদার ও ধনী সম্প্রদায়
যা কিছু হারালো, যারা অস্ত্রের
প্রমে অজিত পয়সায় বিলাসিতায় গা
ভাসিয়ে চলতো তারা সবকিছু
শাস্ত ভাবে মেনে নেয়নি। তাই
কোন প্রকৃতিক দুর্ভোগের অঙ্কুহাতে
চলার পথে তুল আস্তির
যোগ নিয়ে এই ধনী সম্প্রদায় বার
বার মাথা তুলতে চেষ্টা করেছে এবং
করে যাচ্ছে। এ সব সত্ত্বেও চীন
সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে
এবং আশা রাখি ভবিষ্যতে সফল-
কাম হবে। (সমাপ্ত)



যেমন মজা লাগে, দৃষ্টি হাতের শব্দ
সাজানোয় যেমন আয়ত্তা সাহিত্যরস
উপভোগ করি তেমনি চিত্রিত ঘটনার
অস্বাভাবিকতায় আমরা চমকে উঠে
সচেতন হই।

শ্রীঅনার্য মিত্রের কৌতুকগাথা
গুরু “বাহাত্তরের রক্ত” দিয়ে। “ভোট
কেন্দ্র খোলার আগেই / ভোগপর্ব
শেষ” এবং “ভোটের রইল পররক্ষী /
তোমরা পেলে গুদী”। সত্যই এত বড়
রক্ত এর আগে কেউ প্রত্যক্ষ করে নি।
এর মিনি নায়ক তাঁর উদ্দেশ্যে লেখা
দিয়ে বইটির সমাপ্তি—

“পাঁচটা বছর তুমি
কৌতুক-কেছা ছাড়া কি দিলে ?
একে তাকে চাটি দিয়ে
পকেট ভরিয়ে তুমি কি নিলে ?

এর সাথে গলাগলি
ওর সাথে চলাচলি
কালকে তাকেই দিলে গাটা,
পরও তাকেই ঘুষ, কানাকানি ফুসফুস
অদ্ভুত শাসনের ঠাট্টা।”

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২-৭৬-এর শাসন
পূর্ব নিশ্চয় এখনও বিস্মরণ হয় নি ?

সাধারণভাবে কংগ্রেসের
স্বৈরাচারী শাসনের স্বরূপ উদঘাটন
ছাড়াও বিশেষ কোন ঘটনা নিয়ে
কয়েকটি ছড়াও এই সংকলনে স্থান
পেয়েছে। যেমন ১৯৭৪ সালের ২৬শে
আগষ্ট স্টার থিয়েটারে উৎপল দত্তের
“হুঃস্বপ্নের নগরী” কংগ্রেসী মন্তানদের
বন্ধ করা সম্পর্কে—“ঠাণ্ডা দেশের গান
নাটকে / গরম কথা বন্ধ / গরম কথায়
পাণ্ডুরা পান/কমুনিষ্টের গন্ধ।” অথবা
রায়বেরিলির নির্বাচনী ফলাফল
প্রকাশের পর—“কাইনোনা মা মুক্তি-
মাতা / আছে নাতিপুত্রি / ভাগো
লইয়া স্থখে থাকো / আর আছে
মাক্তি। তবে একটি ছড়ায় (সবই
হচ্ছে) শ্রীমিত্র ইন্দিরা রাজস্বের চরিত্র
চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যেটি
রচনা-কৃতিত্বেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
অহিভূষণের ব্যঙ্গচিত্র ছড়াগুলিকে
মূর্ত করে তুলেছে যথাযোগ্যভাবে।

হীরেন বসু

শরৎচন্দ্র

পুনর্মূল্যায়নে শরৎচন্দ্র : সুখ-
রঞ্জন মুখোপাধ্যায় সুবর্ণরেখা
প্রকাশনী। পরিবেশক : দে বুক
ষ্টোর। দাম : বারো টাকা।

অসাধারণ জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর জীবদ্দশা-
তেই অত্যন্ত বিতর্কিত সাহিত্যিক
ছিলেন। ১৯৩৮ সালে তাঁর জীবনা-
বমান হয় এবং তারপর প্রায় চল্লিশ
বছর কেটে যাবার পরও তাঁর সাহি-
ত্যের বিপুল জনসমাদর যেমন বিশেষ
ভাবে লক্ষ্যণীয়, তেমনি তাঁর সাহি-
ত্যের প্রতি কিছু বিতর্ক স্বাধীনতার
তীব্র কটাক্ষ ও বিরূপতাও উল্লেখ
করার মত। সম্প্রতি শরৎচন্দ্রের জন্ম-
শতবার্ষিকী উদ্ঘাপিত হয়ে গেল।
এই উপলক্ষে তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্ব ও
সাহিত্যসৃষ্টি নিয়ে বাদ্যম্বাদেদের ঝড়ও
বইল কম নয়। নতুন ক’রে মূল্যায়-
নের নামে কেউ জানালেন স্বীকৃতি
কেউবা আবার অস্বীকৃতি।

শ্রীমুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় রচিত
‘পুনর্মূল্যায়নে শরৎচন্দ্র’ গ্রন্থখানি ঠিক
এ সময়েই প্রকাশিত হয়ে যথেষ্ট
গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করেছে সন্দেহ
রেই। যখন আজও শরৎসাহিত্যের
প্রতি তীব্র অনীহা ও অপ্রীতি প্রকাশ
পাচ্ছে তথাকথিত জাতীয়তাবাদের
সমালোচনায়, তখন শ্রীমুখোপাধ্যায়
অত্যন্ত নির্ভর সংগে গবেষকের মন
নিয়ে ঐ সব বিরূপ সমালোচনার
বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করেছেন,
তাঁদের কোথের কারণ বর্ণনা করে-
ছেন, রাজনৈতিক ও সামাজিক পট-
ভূমিতে শরৎচন্দ্র ও তাঁর সাহিত্য-
কীর্তিকে রেখে নির্ধারিতিনি বলতে
চেয়েছেন, শহুরে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী
সম্প্রদায়ের আজও কেন আক্রমণের
লক্ষ্যস্থল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সংযত ভাষার
লালিত্য পাঠকের নজর এড়ায়
নয়। তাঁর মননশীল আলোচনাও
যথেষ্ট প্রশংসা দাবী করে। তিনি
যখন যুক্তি দিয়ে শরৎ সাহিত্যের
পর্যালোচনা করেন, তখন তিনি তার-
সাম্য হারিয়েছেন—এমন কথা কিন্তু
বর্তমান সমালোচক কখনই স্বীকার
করেন না, বরং তিনি স্পষ্ট করেই
বলতে চান, শ্রীমুখোপাধ্যায় যথেষ্ট
নৈপুণ্যের সংগে শরৎ বিরোধিতাকে
যুক্তির সাহায্যে ধ্বংস করে শরৎ
সাহিত্যের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও
মহিমাকেই তুলে ধরেছেন। শরৎ-
চন্দ্রের দুর্বলতার কথাও রচনাটিতে
স্থান পাওয়ায় নিরপেক্ষ বিচারের
সাধুবাদটিও লেখকের প্রাপ্য। তবে
‘রবীন্দ্র-শরৎ-দ্বন্দ্ব’ গ্রন্থটিতে যে গুরুত্ব
পেয়েছে, বঙ্কিম-শরৎ দ্বন্দ্ব সে তুলনায়

তেমন পায়নি—অথচ পাওয়া উচিত
ছিল। শরৎচন্দ্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে
সাহিত্যিকগুরু হিসেবে মানতেন।
শ্রীমুখোপাধ্যায় কিন্তু তাঁর গ্রন্থে
লিখেছেন—‘শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মনীষায়
একমাত্র তুলনীয় হলেন বঙ্কিমচন্দ্র।’
আরও লিখেছেন—(প্রবন্ধ) ‘এ ক্ষেত্রে
(শরৎচন্দ্রের) তাঁর সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের
মিল এবং ‘রবীন্দ্রনাথের ‘অমিল।’
বঙ্কিমের সংগে শরৎের নানা প্রসঙ্গে
মিলের কথা লেখক লিখলেও বঙ্কিম
শরৎের দ্বন্দ্ব আলোচনায় শুধুই
‘শৈবলিনী’ আর ‘রোহিনী’ প্রসঙ্গ
রাখলেন! বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনায়
স্পষ্ট করেই ফিউডাল ভাবধারার
পরিচয় দিয়ে গেছেন, যেমনটি রবীন্দ্র
রচনায় পাওয়া যায়। শ্রীমুখোপাধ্যায়
ফিউডাল বঙ্কিমচন্দ্রের সংগে শরৎ-দ্বন্দ্ব
ফুটিয়ে তুললে প্রসঙ্গটি উজ্জলতর হত।
গ্রন্থের শুরুতেই ‘শরৎ বিদ্যুৎ’ থেকে
শুরু করে বিভিন্ন পরিচ্ছেদ ভাগ ও
নামকরণে লেখকের মুক্তিমানের পরি-
চয় পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের পুন-
র্মূল্যায়নে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থখানি
এক মূল্যবান সংযোজন সন্দেহ
নেই।

বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ

নরক : স্বরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। পরি-
বেশক : পাণ্ডু লিপি, শিবপুর,
হাওড়া। দাম : চার টাকা।

স্বরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ‘নরক’
উপন্যাসখানি প্রাক্তন কংগ্রেসী সর-
কার জরুরী অবস্থায় বাজেয়াপ্ত করে-
ছিলেন। বইটির প্রথম প্রকাশকাল
১৯৭৪ সাল। ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্ব-
কালে দেশে বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক
নেতা ও কর্মীদের ওপর যে নিপীড়ন
ও অত্যাচার চলছিল, যে নির্মম
শোষণ জনসাধারণের ওপর, তারই
ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন লেখক
কতকগুলি চরিত্র ও ঘটনা সৃষ্টি করে।

উপন্যাস রচনার শৈলীটা এখানে বড়
কথা নয়। যে দুঃসহ পরিস্থিতির
মধ্য দিয়ে আমাদের চলতে হয়েছে
ইন্দিরাশাহীতে তারই কিছু তথ্য ও
ঘটনা লেখক কাহিনীর আগিকে
দিতে চেয়েছেন অত্যন্ত দুঃসাহসিক-
তার সংগে। প্রচেষ্টাকে বৈপ্লবিক
বলা চলে বৈকি!

রেকর্ড সমালোচনা

‘ব্রান্ডস এন্টারপ্রাইস’-এর
‘দিলীপস রেকর্ড’—এই লেবেলে
বাংলা গানের একটি নতুন ই.পি.
রেকর্ড বাজারে বেরিয়েছে। গানের
বাণী ও সুর রচনায় অভিনব স্বাদবী
করতে পারেন অভিজ্ঞতা সেনগুপ্ত।
মেলডির ধামতি ণ্ডাকলেও তাল ও
ছন্দের বৈশিষ্ট্য আছে। চারখানি
গান গেয়েছেন অভিজ্ঞতা সেনগুপ্ত,
অনিমিতা মুখার্জী, প্রজ্ঞামিতা
র্যানার্জী ও মনমীতা ব্যানার্জী।

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

ঋত্বিক ঘটকের শেষ ছবি

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

থেকেই যেরে পড়ে বলে মনে হয়।
জীর কোলে মাথা রেখে নীলকণ্ঠ
বলেন, একটা কিছু করতে হবে,
মানিকবাবুর গল্পের সেই তাত্ত্বিক
মত শ্রুতীতে তিনি মাক্ চালিয়ে
দিলেন—তখন তাঁর ছবির বক্তব্য
স্পষ্ট থাকেনা, নিজের জীবনের
নেতি থেকে শিল্পী সত্যে পৌছতে
চান। ঐ স্বত্ব-আকীর্ণ পরিবেশে
নতুন সৃষ্টি প্রক্রিয়া হিসেবে বঙ্গবালা
ও নচিকেতার মিলনের পটভূমিতে
শংখদণ্ডারনির মধ্যে ভোর বেলায়
নীলকণ্ঠের দেহ বহন করে নিয়ে
যাওয়ার দৃশ্যটি নবজন্মের ইঙ্গিতে
অর্থময় হয়ে ওঠে। ঋত্বিক ঘটক
তাঁর শেষ ছবির ঐতিহাসিক উত্তরণের
বেদনাময় স্বপ্ন অতীপায় আমাদের
গতীরভাবে স্পর্শ করেন।

অনার্য মিত্রের ছড়া

রাজনৈতিক ছড়ায় ইন্দিরার

স্বৈরাচারী শাসনের দলিল

হাঁড়ি
ফাটিল

ব্যঙ্গ চিত্র। অহিভূষণ মালিক। দাম দু'টাকা

এন বি এ পারিজা ব্রাদার্স

দর্পণ কার্যালয়

প্রফুল্ল সেনের কার্যকলাপের বিবৃতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু মজুর সভার সভার সাধারণ সম্পাদক ও জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার দায়িত্বশীল নেতা শ্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যুব জনতার একটি অংশের নেতা শ্রীদিলীপ চট্টোপাধ্যায় নিম্নোক্তক ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেন যে, খান কাটার মরশুমে প্রফুল্ল সেন বাম-ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা সরাসরি ভাবে জোঁতদারদের হাতই শক্ত করেছে। তাঁরা আরও অভিযোগ করেন যে, প্রফুল্লবাবু এ ধরনের কাজে অবতীর্ণ হয়েছেন কংগ্রেসী গুণ্ডাদের সঙ্গে নিয়ে। বিমলবাবু পূর্ব ইউরোপ সফরে গিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য "বিদেশ থেকে ফিরে প্রফুল্ল সেনের কাণ্ডকারখানা দেখে আমি-অবাক হয়ে যাচ্ছি।"

কসবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রফুল্লবাবুর ক্রিয়াকলাপকেও তাঁরা তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। তাঁদের অভিমত, কসবায় যা কিছু হচ্ছে সবই প্রফুল্ল সেন ও কংগ্রেসীদের ঘোষণা পরিচালনায়। কারণ তারা যে কোন পদ্ধতিতেই হোক না কেন, পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাসের দিন ফিরে

হাজরা পার্কে ৭৭ মঞ্জু

আগামী ডিসেম্বর থেকে 'অভিনয়' পত্রিকার উদ্যোগে প্রতি শনিবার বেলা ৫টায় দক্ষিণ কলকাতার হাজরা পার্কের 'গণ-মঞ্চ' মঞ্চস্থল বাংলা ও কলকাতার অপেশাদার নাট্য দলগুলির মঞ্চসফল একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছে। অপসংস্কৃতি বিরোধী শক্তিশালী একটি স্বেচ্ছাসেবক দল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ব স্ব সংস্কৃতিকে ব্যাপক জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া এই সমাবেশের উদ্দেশ্য। ৩রা ডিসেম্বর ৩টায় 'গণ-মঞ্চ' উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জন সংযোগ মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ঐদিন অভিনয় (তারকেশ্বর), নটতীর্থ (ব্যারাকপুর) ও কিংগুক (নবগ্রাম) পরিবেশন করবেন যথাক্রমে লাস-বিপনী, গেরীয়েল পেরী ও গণ সঙ্গীত।

প্রতি শনিবার বেলা ৫টায়
দক্ষিণ কলকাতার হাজরা পার্কের

গণ-মঞ্চ

প্রগতিবাদী নাটক দেখুন

: ৩রা ডিসেম্বর :

(অস্থগান শুরু বেলা ৩টায়)

লাস বিপনী / অভিনয়। তারকেশ্বর
গেরীয়েল পেরী/নটতীর্থ। ব্যারাকপুর
গণ-সঙ্গীত / কিংগুক। নবগ্রাম
একটি 'অভিনয়' প্রয়াস

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন

২৭ দিন ব্যাপী বিশাল ও বর্ণাঢ্য পঞ্চম বার্ষিকী

সবারে করি আহ্বান

২৫শে নভেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর

রবীন্দ্র কাননে যাত্রা উৎসবে

শুভেচ্ছা জানাই

পশ্চিমবঙ্গের যাত্রামোদী

দর্শকগণকে

বিনীত

'পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন'

টিকিটের হার—১, ২, ৩, ৫ টাকা মাত্র

আসছে একথা প্রমাণ করতে বদ্ধ-পরিকর। প্রফুল্ল সেনের অনাবশ্যক সত্যাগ্রহকে সমর্থন করে যুব জনতার সর্বভারতীয় নেতা মায়াকৃষ্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে যে বক্তব্য রেখেছেন সে সম্পর্কে যুব নেতা দিলীপবাবুর অভিযোগ, সর্বভারতীয় নেতার ভূমিকা ভ্রমশী। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে যে কথা বলেছেন তা যুব জনতার সর্বসম্মতিক্রমে কোন গৃহীত সিদ্ধান্ত নয়। সর্বভারতীয় কার্যকরী সমিতির আর এক নেতা শ্রীবিনয় কুমারকেও তিনি একই অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। বিনয় কুমার সম্পর্কে তিনি একথাও বলেন যে, তাঁর একটাই কাজ, তিনি এরোপ্লেনে সারা ভারতবর্ষ সফর করে ঘুরে বেড়ান। সেন মহাশয় সম্পর্কে উক্ত চম্পক প্রকাশনার জনতা দলের আর এক বিশিষ্ট নেতা কোভের সঙ্গে বলেন যে, "The activity of Prafulla Sen is hatching conspiracy against the total revolution." তিনি আরও বলেন যে, এই ধরনের কার্যকলাপ সার্বিক ভাবে কংগ্রেসী তথা ক্যাসীবাদের হাতকেই জোরদার করেছে।

জনতা পার্টির রাজ্য কমিটি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বসে এই কমিটির চূড়ান্ত রূপ দিয়ে-ছেন হুশীল ধাড়া, আভা মাইতি ও বিজয় সিং নাহার। জনতা দলের অন্যতম সম্পাদক মধু লিমায়ে ও রবি রায় রাষ্ট্রের এই তিন নেতার প্রচেষ্টাকে পুরোপুরি মদত দেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রতাপ চন্দ্রের সমর্থনও বিজয়বাবুরা পান।

মোটামুটি কমিটির নাম পাকা করে ওরা পার্টির সভাপতি চন্দ্রশেখর কাছে যান অমুমোদনের জন্য। চন্দ্রশেখর প্রথমে প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে আগে কথা বলে নিতে চান। কিন্তু বিজয় নাহার ও হুশীল ধাড়া চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন যাতে তাড়াতাড়ি কমিটি ঘোষণা করা হয়। এর পর চন্দ্রশেখর কমিটি অমুমোদন করে দেন।

প্রফুল্লবাবুর পদত্যাগের সিদ্ধান্তে রাজ্য জনতা পার্টি পুরোপুরি ছুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে বিমান মিত্র, আভা মাইতি, নির্মলেন্দু দে, হুশীল ধাড়া প্রমুখ। অন্য প্রফুল্লবাবুকে বাদ দিয়েই রাজ্য কমিটির কাজ চালিয়ে যেতে চান। অন্যদিকে সমর/গুহ অশোক মুখার্জী প্রমুখ মহাস্তি, ফজলুর রহমান প্রমুখ প্রফুল্লবাবুর নেতৃত্ব অপরিহার্য বলে

কলিন লেনে গুণ্ডার রাজত্ব

মধ্যকলকাতার কলিন স্ট্রীট ও কলিন লেন এলাকা একদল অসামাজিক ব্যক্তি ও গুণ্ডার রাজত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলিন লেনের বাসিন্দা প্রাক্তন, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সাহেবের ব্যক্তিগত ছদ্মনাম সচিব ইন-সান আলী নামক বেহারী যুবকের দাপট ও দৌরাভ্য কমেও জনতা দলের সমর্থক বলে পরিচিত একদল লাঠিয়াল, সাট্টা খেলোয়াড় এবং চোলাই মদ সরবরাহকারী যুবক বে-আইনী কাজকর্মে লিপ্ত থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছে।

ছাত্র পরিষদের গুণ্ডামী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানাতে বিশ্ববিদ্যালয়, তল্লাট জুড়ে বিক্ষোভ চলতে থাকে।

গুণ্ডারা আশ্রয় নেয় হার্ডিঙ্গ হোটেলে। ছাত্র ফেডারেশনের ছেলেরা হোটেলে ঘিরে রাখে এবং গুণ্ডাদের গ্রেপ্তারের দাবী জানাতে থাকে। পরে ছাত্র ফেডারেশন নেতা স্বভাব চক্রবর্তীর অহুরোধে হোটেলে ঘেরাও মুক্ত হয় এবং অবশেষে পুলিশ গুণ্ডাদের গ্রেপ্তার করে।

দাবি করেছেন। এর চেউ দিল্লীতেও পৌঁছেছে।

অন্য প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই প্রফুল্লবাবুর সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। তিনি চন্দ্রশেখরকে অহুরোধ জানিয়ে-ছেন প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে কথা বলে কমিটি পুনর্গঠিত করতে।

কতকগুলি নাম কমিটি থেকে বাদ দেওয়ার জন্য প্রফুল্লবাবু নেতৃত্বকে বলেছেন। যেমন, অনিল মামা ("শঙ্কর" ডেকরেটরের মালিক) কিংকর ব্যানার্জী (রেশন দোকানের মালিক), তরুণকান্তি ঘোষ প্রভৃতি।

মধু লিমায়ে, বিজয় নাহার ও রবি রায় এই তিন সর্বভারতীয় সম্পাদক কমিটি পুনর্গঠনের ঘোরতর বিরোধী। পার্টির সভাপতি চন্দ্রশেখরও চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে খুব একটা ইচ্ছুক নন। তবে মোরারজী দেশাইয়ের অনমনীয় মনোভাব তাকে নমনীয় করতে পারে বলে মনে হচ্ছে।

এখানকার চিকন শিল্পের মহিলা কর্মীরা কলিন লেনে দুবার লাহি-হয়েছেন আবহুল হক নামে সর্দারের কাছে। সাট্টা আর জুয়ার আড্ডায় মদত দিচ্ছে কলিন লেনের পাশেই পুলিশ থানার কর্তারা। সমাজ বিরোধীরা কলিক নাগরিক ইউনিয়ন নামের সমিতিরগড়ে কংগ্রেসী নেতাদের মদত পেয়েছিলেন, এখন জনতা দপ্তরে এদের আড্ডা।

অরণ থাকতে পারে এই এলাকায় গত বছরে হাঙ্গামায় গুণ্ডাবাদীতে হুজুন খুন হয়েছিল।

৫ম বার্ষিক

পঃ বঃ যাত্রা সম্মেলনে

আগামী ৭ই ডিসেম্বর

সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট

রবীন্দ্র কানন

প্রান্তণে



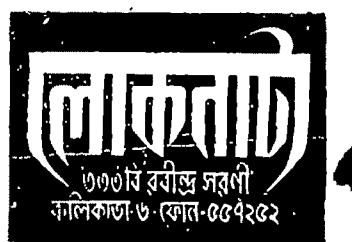
তৎসহ ৮৪-র আর এক

বলিষ্ঠ পদক্ষেপ



চলছে — চলবে

পরিবেশনায়



সম্পাদক—বীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক হীপালী প্রেস, ১২৩১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয়

৬১ মট লেন কলকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত।

দর্পন

বিশ্ব বর্ষ ১১ ৪৪শ সংখ্যা ১১ শুক্রবার ২২ই ডিসেম্বর, ৭৭ ১১ ৪০ পৃষ্ঠা

পোস্তাবাজারের বেনেদের মধ্যযুগীয় অমানুষিকতা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

প্রায় সাড়ে চার মাস হয়ে গেল কলকাতা তথা পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তম পাইকারী বাণিজ্য কেন্দ্র পোস্তাবাজার বন্ধ রয়েছে। গত তিনচার বছর ধরে ব্যবসায়ীরা পণ্যবাহকদের যে বোনাস দিয়ে আসছিলেন এবারে তা দিতেও তারা অস্বীকৃত। সর্বশেষ পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, তাতে কিন্তু কিছু ছোট ছোট পাইকারী ব্যবসায়ী বোনাস দিয়েছেন এবং তাদের ধরে প্রমিকরা কাজও করছেন, কিন্তু এক-তয়েমি মনোভাব প্রদর্শন করছেন বড় ব্যবসায়ীরা।

স্বাধীনতার আগে থেকেই গত ৫০ বছর ধরে পণ্যবাহক বা পোর্টাররা পুরুষাভুতক্রমিকভাবে কাজ করে আসছেন। মাল বোকাই এবং খালসের কাজে এই সমস্ত পোর্টার-দের সাহায্য ছাড়া এক পা চলবে না। তা সত্ত্বেও প্রমিক হিসেবে তাদের কোন স্বীকৃতি নেই। পোস্তাবাজার ব্যবসায়ী সমিতি বলেছে, সরকার পোর্টারদের প্রমিক হিসেবে স্বীকৃতির ব্যাপারটা আইনী করুন, আমাদের কোন আপত্তি নেই। এই-টুকু মন্তব্যেই তারা তাদের দায়িত্ব শেষ করেছেন। কিন্তু ব্যবসায়ীদের স্বার্থে যা লেগেছে অস্ত্র জায়গায়। তারা বিগত ৪৫ বছর ধরে যে বোনাস দিয়ে আসছেন, সে ব্যবস্থা আর তারা চালাতে চান না, তার কারণ ক্রমাগত বোনাস দিতে থাকলে এই সমস্ত প্রমিকদের একটা অধিকার জন্মে যাবে।

যে সব ব্যবসায়ীর দিনে হাজার হাজার টাকা আয়, তাদের ৫ মাস কেন এক বছর হাত শুটিয়ে বসে থাকলে কোন অস্ববিধে নেই। অস্ববিধে এই সব নির্ধারিত প্রমিক-দের এবং জনসাধারণের। কেননা পূর্বাঞ্চলে অত্যাবশ্যকীয় জিনিস-
(শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

রাজ্য জনতা কমিটি পুনর্গঠিত হবে না

প্রফুল্ল সেন ও তাঁর সান্নিপাতদ্বারা যতই চীৎকার করুক না কেন পশ্চিম বঙ্গে জনতা পার্টির অ্যাড হক কমিটি পুনর্গঠিত হবে না। একথা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন সর্বভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি শ্রীচন্দ্রশেখর। এদিকে প্রফুল্ল সেন এই কমিটি সম্পর্কে সর্বশেষ বা বিবৃতি দিয়েছেন তাতে তাঁর আসল উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। তিনি চাইছেন রাজ্য জনতা পার্টির কমিটি তাঁর পেটোয়া লোক ঢুকিয়ে পুনর্গঠিত করতে, অর্থাৎ তিনি হবেন রাজ্য জনতা পার্টির একমোবাধিতীয় নেতা এক কথায় ডিক্টেটর। স্বভাবতই

যাদের প্রফুল্লবাবু সম্পর্কে খুব একটা আস্থা নেই এবং তাঁর রাজনৈতিক গতিবিধি সম্পর্কে যারা সন্দেহান তাঁরা প্রফুল্লবাবুর বিরোধিতায় দৃঢ়-সংকল্প ও এককাত্তা।

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, রাজ্য কমিটি সম্পর্কে চন্দ্রশেখর তথা কেন্দ্রীয় নেতাদের মনোভাব জানতে পেরেই প্রফুল্লবাবুর স্বর, নরম হয়েছে এবং তথাকথিত কর্মী সম্মেলনের কথা তিনি আর উচ্চবাচ্য করছেন না। তবে এত চীৎকার-চোঁচামেচির পর প্রফুল্লবাবু যদি স্থিতিাবস্থাকে মেনে নেন সেটা তাঁর একটা রাজনৈতিক পরাজয় তাঁর গোষ্ঠীভুক্তদের অনেকে

এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

নয়াদিল্লী থেকে খবর পাওয়া গেছে, রাজ্য কমিটি নিয়ে প্রফুল্লবাবুর বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেকে পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপ বলে মনে করছেন। তাছাড়া তিনি প্রতিদিন সি, পি, এম তথা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছেন তাতেও তাঁরা ক্ষুব্ধ। তাঁরা মনে করেন এটা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। তাঁরা আরও মনে করেন যে, পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি চমৎকার এবং বহু বছরের মধ্যে এমন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এই রাজ্যে দেখা যায় নি।



দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কৃষিমেলার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মণ্ডপ থেকে বের হবার মুখে এই মূর্তিটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আলোচনা শেষ পৃষ্ঠায়

মহাজাতি সদন থেকে যক্ষ্মার কীট অপসারণ করতে চাই অপারেশন —শুভাষ চক্রবর্তী

(দর্পণের সংবাদদাতা)

“কুম্ভ ভট্টাচার্য বলেছেন মহাজাতি সদন নিয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবেন। তা রক্তগঙ্গা কথটা প্রথম কে ব্যবহার করেছিলেন? বিনি এই কথটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তিনি আজ রক্তগঙ্গার নদীর তলায় তলিয়ে গেছেন। কাজেই রক্তগঙ্গা টকা বলবেন না। রক্ত আপনাদেরও আছে, আমাদেরও আছে। আর আমরা চোরের মতন ষড়যন্ত্র করে মহাজাতি সদনে অভিযান করবো না, আমরা যেদিন মহাজাতি সদন অভিযান করবো সেদিন কুম্ভবাবুদের চিঠি দিয়ে জানিয়েই করবো। কুম্ভবাবুরা সেদিন তাদের পাইক-বরকন্দাজ প্রস্তুত রাখবেন। মহাজাতি সদন থেকে যক্ষ্মার কীট অপসারণ করতে চাই অপারেশন।”

এই কথাগুলো বলেন এস, এফ, আই-এর সম্পাদক শ্রীশুভাষ চক্রবর্তী গত ১লা ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় লনে এক ছাত্র সমাবেশে। ওই দিন তিনি

বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এস, এফ, আই, পি, এস, ইউ, এবং ছাত্র ব্লক এই সমাবেশের ডাক দেয়। ঐ সমাবেশে প্রচুর যুব ছাত্র উপস্থিত হন। এর দুদিন আগেই ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র পরিষদের সঙ্গে বামপন্থী যুবছাত্রদের এক সংঘর্ষ হয়। কাজেই সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই সমাবেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমাবেশে ছাত্র নেতা শ্রীমল চক্রবর্তী বলেন, “লক্ষী বোস বলেছেন যে তারা শুধু মহাজাতি সদনের একটা ঘরই নয় পুরো মহাজাতি সদনটাই নাকি দখল নেবেন। আমি বলি লক্ষীবাবু মিছিলের মুখ এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে, যেদিন এই মিছিল ঘুরে যাবে সেদিন শুধু ঐ মহাজাতি সদনই নয় লক্ষীবাবুদের নিজেদের বাড়ী সামাল দেওয়াও মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।” তিনি আরো বলেন, “এখন কোথাও একটা খুন হলেই সঙ্গে সঙ্গে, কংগ্রেস আর জনতা টেচিয়ে উঠছে, “এ

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন প্রচারে আকাশবাণী কলকাতার আপত্তি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পশ্চিমবঙ্গে ফ্ল্যাপ ডে উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর যে আবেদন আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র রেকর্ড করেছিল সেটা প্রচারে স্টেশন ডিরেক্টর আপত্তি করেছিলেন বলে জানা গেছে। আকাশবাণীর ডিরেক্টর জেনারেল একথা এখন অস্বীকার করলেও ঘটনাটি সত্য। মুখ্যমন্ত্রীর এই আবেদন প্রচারের ব্যাপার নিয়ে রাজ্য সরকার ও কলকাতার স্টেশন ডিরেক্টরের মধ্যে কথাবার্তাও হয়েছে। স্টেশন ডিরেক্টরের বক্তব্য হয়েছে, “ডোনেশান” শব্দটি আছে, অতএব

এই আবেদন প্রচার করা যাবে না। রাজ্য সরকার জানতে চান এ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশ আছে কিনা। আকাশবাণী স্পষ্ট কিছু বলতে পারে না। তখন রাজ্য সরকার দিল্লীতে লেখেন এ বিষয়ে জানার জন্ত। ব্যাপারটা এতদূর গড়াতে কলকাতা স্টেশন ডিরেক্টর বোধ হয় শঙ্কিত হন। তাই গত ৬ই ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন হঠাৎ প্রচার করে দেওয়া হয়। অবশ্যই যে উপলক্ষে রেকর্ড করা হয়েছিল সেই উপলক্ষে চলে যাওয়ার পর। ধন্য আকাশবাণী!

আমাদের লোক” বলে। আমি কংগ্রেস আর জনতা পার্টিতে অহরোধ করছি আপনারা আপনাদের পার্টি অফিসগুলো শ্রাশানঘাটে নিয়ে যান কারণ কখন কোন স্বতদেহ

শ্রাশানে আসে। আপনাদের তো দাবী করতে হবে।” সভায় পি, এস, ইউ, নেতা ক্ষিতি গোস্বামী এবং ছাত্র ব্লকের কেশব ভট্টাচার্যও বক্তৃতা করেন।

পোস্তাবাজার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পত্রের মূল্যবৃদ্ধির অন্ততম একটি কারণ পোস্তাবাজারে এই অচলা-বস্থা।

শ্রমিকদের দাবী মানবিক এবং অত্যন্ত সামান্য। প্রথমতঃ পণ্যে যে ভারী বস্তা তারা বহন করেন তা ৭৫ কেজির বেশী হতে পারবে না। বকেয়া বোনাস শোধ করতে হবে এবং ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহাল করতে হবে।

কোন শ্রমিককে দিয়ে ৭৫ কেজির বেশী বস্তা বহন করানো ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন সভ্য দেশে নেই। গত কয়েক বছরে এক কুইন্টাল পরিমাণ ভারী চিনির বস্তা বহন করতে গিয়ে ১৮ জন শ্রমিক কর্মরত

অবস্থার মারা গিয়েছেন বলে অভিযোগ। গত বছরে স্ট্রাও ব্যাংক রোডে কর্মরত অবস্থায় মারা গেছেন রুদ্রমল, বসন্তিলাল ও ইন্দ্রমণি জেনা। এ বছর এপ্রিল মাসে স্থিতিক স্টোর্সের কর্মী সীতারাম মণ্ডল এবং নাগেশ্বর সিং নামে দুজন কর্মী মারা যান।

পোস্তাবাজার মানেই বিজি অপরিচ্ছন্ন সংকীর্ণ জায়গা। প্রতিদিন শত শত লরী, টেম্পো এবং ঠেলা-গাড়ী পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকে। বর্ষার দিনে এই রাস্তাঘাটের অবস্থা আরও অবর্ণনীয়। ফলে শ্রমিকদের এক কুইন্টাল বস্তা কাঁধে নিয়ে ১৫ হাত দূরত্ব যাওয়া মানে ৩০ হাত ইটার সামিল।

যেহেতু এই সব কর্মী শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃত নন, সেহেতু যে কোন সময়েই যে কোন অজুহাতে এরা ছাঁটাই হতে পারেন। ফলে এই হাড়ভাঙা খাটুনি এবং অমানবিক পরিশ্রমের বোঝা বয়েও কর্মীদের কোন নির্দিষ্ট জীবনধারণের মান তৈরী হল না। আর “শ্রমিক” হিসেবে পণ্য বাহকরা স্বীকৃত নন বলেই তারা শিল্পবিরোধ আইনের আওতায়ও পড়েন না এবং জেবার ট্রাইবুনালেও বোনাসের মীমাংসা সম্ভব নয়। অন্তিমিকে বোনাস আইনের আওতার ক মী রা পড়েন না।

ব্যবসায়ী সমিতির জনৈক মুখ-পাত্র আমাকে সরাসরি জানানেন, “পণ্য বাহকদের সংগে আমাদের শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক নয়। তারা আজ এ ঘরে কাজ করছেন, কাল সে

ঘরে। সোজা বাংলায় তারা রেল-স্টেশনের কুলির মতো। তাদের আবার বোনাস কি?” মুখপাত্রটি কোথের সংগে বলেন, ছোটবেলা থেকে একজন ড্রাইভার গাড়ী করে আমার ঘর থেকে স্কুলে-কলেজে পৌঁছে দিয়েছে, তাই বলে কি মেয়ে বড় স্বলে ড্রাইভারের আবদারে তার সংগে তার বিয়ে দিতে হবে? এতো অদ্ভুত কথা?

কিন্তু একজন স্থায়ী ড্রাইভার কোন অফিসের গাড়ী চালিয়ে যে সুযোগ সুবিধে পেতেন তার কথাও গৃহকর্তার ভাবা উচিত। ধরুন পোস্তা মজদুর সংজ্ঞার কোষাধ্যক্ষ বিশ্বম্ভর রাউতরায় পোস্তাবাজারে মাল বহনের কাজ করতে আসেন ৮ বছর বয়সে। আজ ৫৭ বছর কাজ করেও শ্রমিক হিসেবে তার স্বীকৃতি মেলেনি। কাল তাকে ছাঁটাই করলে পরন্তু তিনি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন। রামস্বরূপ সর্দার, গোপাল প্রদান, চিংনি সিং, নিত্যানন্দ পোহি গিরিধারী সর্দার, বিকসান বিশ্ব-ওয়াল বিভিন্ন গদিতে ৪০ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত কাজ করছেন, তবু তারা শ্রমিক নন।

পোস্তাবাজারে ৫ হাজার অ-শ্রমিক পণ্য-বাহক আঁধার অনিশ্চয়তার মধ্যে।

ভারী চিনির বস্তার ব্যাপারে এই পোস্তাবাজারের বেনেরা সরকারী প্যাকেজিং আইনের অজুহাত দিচ্ছেন। কিন্তু ১৯৭০ সালের আগে যখন এ আইন তৈরী হয় নি, তখন ব্যবসায়ীরা এক কুইন্টাল বস্তা শ্রমিকদের দিয়ে বহন করাতেন

কবি করুণানিধান

কবি করুণানিধানের জন্মস্থান শান্তিপুরে কবির জন্মশতবর্ষ উৎসব পালিত হয় ২০ ও ২১শে নভেম্বর। এই উৎসবের সূচনা করেন জন্মশত-বার্ষিকী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীজীবো চক্রবর্তী কবির মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করেন। প্রভাতফেরির মনোজ্ঞ অছটানের পর বেলা তিনটায় মূল অছটান উদ্বোধন করেন শ্রীজীবো চক্রবর্তী। তিনি কবিকে দেশপ্রেমিক কবি বলে বর্ণনা করেন। পরাধীন-তার জালা বঙ্গমঙ্গল কাব্যগ্রন্থের ভেতর দিয়ে তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়ে পরবর্তী গ্রন্থেও ভিন্নরূপে দেখা দেয়। তাঁর মতে ‘জাতীয়তার সঙ্গে প্রকৃতিপ্রেমের যোগ অভিন্ন। সভায় সভাপতি ছিলেন ডঃ হুশীল রায়। দ্বিতীয় দিন আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, কবি সম্মেলন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল বিজ্ঞা-লয়ের ভিক্টোরিয়া হলের নাম পরি-

বর্তন করে করুণানিধান হল নাম-করণ করার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভার শেষের দিকে ‘কাব্য-লেখ’ সাংস্কৃতিক অস্থানটি পরিবেশিত হয়।

ফাইল পোড়ানো হল

২৪ পরগণায় হাড়োয়া থানার অন্তর্গত পীর গোরাটাদ হাই স্কুল একটি ঐতিহ্যময় প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রকাশ দিবালোকে দুদিন ধরে সমস্ত ফাইল পোড়ালেন। সম্পাদক সাহেব তিন দিনের মাথায় স্কুলের অফিসে তালি ফুলিয়ে দিলেন।

স্কুলের শিক্ষকদের লক্ষাধিক টাকা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড জমা না দিয়ে গায়েব করা হয়েছে বলে হাড়োয়া তরুণ সমিতির মনজুর রহমান জানিয়েছেন। প্রধান শিক্ষক দু’একদিনের মধ্যেই স্কুল থেকে রিটার্ন করবেন। দুর্নীতি ধরা পড়ার আশঙ্কায় তিনি জঞ্জাল পরিষ্কার করলেন। ডি, আই সাহেব দেখে শুনে বললেন সব ঠিক হয়ে।

কেন? তাছাড়া একশো কেজির বস্তা দু’জন বহন করে থাকে বলে অজুহাত, তাও জলজ্যান্ত মিথ্যে। অন্তিমিকে এখনকার অচলাবস্থার সুযোগটাও ব্যবহারীরা পুরোপুরি নিতে চাইছেন। অন্ত শ্রমিক লাগিয়ে ওয়াগন ও গুদাম থেকে মাল খালাসের কাজ চলছে। শ্রমিকরা এ ব্যাপারে সক্রিয় বিরোধিতাও করেছেন।

পোস্তা বাজারের এই সামন্ততান্ত্রিক বেনেদের এবারে বড় দুঃখ যে তারা দেওয়ালীতে তাদের হালখাতা আর স্মৃতিস্মার্ত করতে পারেন নি। আর দরিদ্র অ-শ্রমিকদের দুঃখ তারা কাঙ্ক্ষিত করতে পারছেন না, রোজ-গারও বন্ধ। কারও বাড়ীতে ইাড়িও চড়েছে না।



ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে

১। নলকূপ খনন

রেফা: নং এস এ এম / এস এস এ / ইজ (সি) টি এন / ৭৭ / ১৪৮১ তাং ১৬. ১১. ৭৭

রেফা: নম্বর ৩ তারিখ ১৫ই মার্চ ১৯৭৭ তারিখ সীল করা টেণ্ডার / কোটেশন দুই কপি সাব-এরিয়া ম্যানেজার, জীপুর সাব-এরিয়া, এরিয়া নং ২, জীপুর, পো: কালিপাহাড়ি, জেলা বর্ধমান-এর অফিসে ২৬. ১২. ৭৭ তারিখ বিকেল ৫টার মধ্যে পাঠাতে হবে এবং যা ঐদিন বিকেল ৪টার কন্ট্রাকটর অথবা তাঁদের অহুমোদিত এজেন্টদের উপস্থিতিতে খোলা হবে নিম্নোক্ত কাজের জন্য: সেন্টাল জামুয়ারী কোলিয়ারীর ড্রয়িং নং সি ই ডি / ডবলু ডবলু / ৭-অস্থায়ী ২টি (দুই) ৮ ফুট ডাই কিনিসড ৬০ ফুট গভীর নলকূপ। বায়নার টাকা ৫০০ এবং কাজ সম্পূর্ণ করার সময় ৩ (তিন) মাস।

জীপুর ক্যাস অফিসে যে কোন কাজের দিন কাজের নির্দিষ্ট সময়ে বায়নার টাকা জমা দেওয়া যেতে পারে এবং যা অসফল টেণ্ডার দাতাদের ক্ষেত্রে দেওয়া হবে। সাব-এরিয়া ম্যানেজার, জীপুর সাব-এরিয়া-র অফিস থেকে প্রতি আই-টেমের জন্য ২ (দুই) টাকা (অপ্রত্যাশিতব্যয়) দিয়ে টেণ্ডারপত্র পাওয়া যাবে স্বাক্ষরযোগ্য রসিদ দেখিয়ে। যদি পাওয়া যায় তাহলে জিনিসপত্র বিভাগীয়ভাবে সরবরাহ করা হবে এবং বিভাগীয় ইন্সপেক্ট অস্থায়ী সেই সব আদায় করা হবে। বায়নার টাকা ছাড়া টেণ্ডার বাতিল করা হবে।

২। কয়লা পরিবহন

রেফা: এস এ টি / জি এম / কোল ট্রাম / ৭৭/৭৮-৭৯ তাং ২১. ১১. ৭৭

আমকোলা ৭ ও ৮ পিট থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে ইষ্ট নিমচা কোলিয়ারীতে মূর্গাখল রেলওয়ে সাইডিংয়ে কয়লা পরিবহনের জন্য জেনারেল ম্যানেজার সাতগ্রাম এরিয়া, পো: দেবচন্দ্রনগর, জেলা বর্ধমান সীল করা টেণ্ডার আহ্বান করছেন বিশ্বাসযোগ্য ও অভিজ্ঞ কন্ট্রাকটরদের কাছ থেকে যাদের অন্ততঃ ৮টি (আট) ডাম্পার আছে নিজেদের অথবা নিজেদের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে এবং তাদের নিয়ে অন্ততঃ এক বছর কাজ করেছেন। আনুমানিক ২০,০০০ টন কয়লা প্রতি মাসে পরিবহন করতে হবে। প্রয়োজন অস্থায়ী পরিমাণের হেরফের হবে। টেণ্ডারপত্র পাবার জন্য ডাম্পারের মালিকানা / তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হবে।

স্টোয়িং অফিসার, সাতগ্রাম এরিয়া-র কাছ থেকে ১১. ১২. ৭৭ তারিখ থেকে ১৬. ১২. ৭৭ তারিখ পর্যন্ত সকাল ১০টা ও দুপুর ১২টার মধ্যে নির্দিষ্ট টেণ্ডারপত্র পাওয়া যাবে যার জন্য আবেদন করতে হবে এবং ১৫ টাকা (পনেরো টাকা) নগদে দিতে হবে (অপ্রত্যাশিতব্যয়)। সীল করা খামে টেণ্ডারের সঙ্গে পাঠাতে হবে বায়নার ৮০০০ টাকা যে কোন তপসিল-ভুক্ত ব্যাঙ্কের আসানসোল ব্রাঞ্চের ওপর “কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড, ইস্টার্ন ডিভিসন, এ/সি এরিয়া ৩”-এর অফিসে ডিমাণ্ড ড্রাফটের আকারে এবং “কয়লা পরিবহন, নিমচা কোলিয়ারী” এই কথা লিখে ২১. ১২. ৭৭ তারিখ বেলা ৩টার মধ্যে জেনারেল ম্যানেজার, সাতগ্রাম এরিয়া-র কাছে জমা দিতে হবে। ঐদিন ৩.৩০ টায় জেনারেল ম্যানেজার, সাতগ্রাম এরিয়া-র অফিসে ইজুক টেণ্ডারদাতা অথবা তাঁদের অহুমোদিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেণ্ডার খোলা হবে। টেণ্ডার খোলার পর গ্রহণের জন্য ৬০ দিন পর্যন্ত সময় থাকবে এবং চুক্তি হলে ওয়ার্ক অর্ডারের তারিখ থেকে এক বছর পর্যন্ত তার মেয়াদ থাকবে। বায়নার টাকা ছাড়া টেণ্ডার বাতিল করা হবে।

৫ম বার্ষিক

পং বঃ যাত্রা সম্মেলন

রবীন্দ্র কাননে

১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার

তরুণ অপেরার

মিণাই মিউটিনি

রচনা: মধু গোস্বামী

সুর: পশুপতি ভট্টাচার্য

নির্দেশনা ও অভিনয়ে

শান্তিগোপাল

ভারতের গৌরব

নবরঞ্জন অপেরা

৮৪-র

শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা

ম-ত-য়া

“বাবুজী আপনার এ বাত আমি মানি না। আদমী যদি সবাই সমান—তবে কেন জিন্দগী ভর আমরা রাস্তার মানুষ আর কেউ বড় ইমারতে থাকে? কেন কারো দুদিন গুণা রোটি মেলে না আর আর কারো ফেলে দেওয়া খাবার রাস্তার কুত্তারা পেট ভরে খায়? এ সবই নসীব বাবু—সবই নসীব”

মহুয়া—ছন্দা চ্যাটার্জী

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন

রবীন্দ্র কাননে

১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬-৩০ টায়

ম-ত-য়া

প্রাক্তন বিচারমন্ত্রী ও তাঁর বন্ধু রামবাবুর বেআইনী কার্যকলাপ (দুর্গার সংবাদদাতা)

একটার পর একটা প্রমোশনের বহর দেখে এবং রামবাবুকে এমন স্থানে বদলী করা হচ্ছে যাতে রামবাবু কলকাতা থেকে যাতায়াত করতে পারেন।

এ ভি বি ব্যবকক কোম্পানীতে শ্রমিকদের ওপর নানা আক্রমণ (দুর্গার সংবাদদাতা)

সিদ্ধার্থ রায়ের মন্ত্রিসভায় এই রাজ্যের আইন মন্ত্রী ছিলেন মুর্শিদাবাদের আবদুস সাত্তার। সাত্তার সাহেব যখন থেকে আইনমন্ত্রী হিসেবে কাজ করছিলেন, তখন দেখা যায় এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জেলায় আদালত মহলে এক ধরনের মনশেফ ও জজ রাখা আরম্ভ হল যাদের কাছ থেকে সুবিচার পাওয়া দূরে থাকুক, তাদের আমলে উল্টো পাল্টা বে-আইনী কাজ আরম্ভ হল। সাত্তার সাহেব তাঁর অনেক বন্ধু-স্থানীয় লোককে মনশেফ থেকে প্রমোশন দিয়ে জজ করে দিলেন। সাত্তার সাহেবের নির্দেশমত বদলী করা হোত জজদের, মনশেফদের। যারা নিরপেক্ষ নির্ভীক বিচারক, তাদেরকে সাত্তার সাহেবের নির্দেশ মত টুটো জগন্নাথ বানিয়ে রাখা হত। মূল উদ্দেশ্য ছিল সাত্তার সাহেবের দলীয় রাজনৈতিক এবং নিজস্ব কায়দা স্বার্থ সিদ্ধি। আর এতে এক ধরনের সমাজ বিরোধীরা বে-আইনী কাজগুলো সূন্দরভাবে করে যেতে লাগল।

রাম কুমার সাত্তার সাহেবের মুর্শিদাবাদের বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি। রামবাবু ডব্লু, বি, সি, এস. (জুডিশিয়াল) মনোনীত প্রার্থী হিসাবে সাগরদীঘি অঞ্চল থেকে এসেছেন। রামবাবু সাত্তার সাহেবের মন্ত্রিপাবার আগে জেলায় জেলায় জুডিশিয়াল অফিসার মনশেফ হিসেবে কাজ করে আসছিলেন। কিন্তু সাত্তার সাহেব যখন মন্ত্রী পেলেন, তখন রামবাবুর ভাগ্যের পরিবর্তন দেখা দিল। আর জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াতে হল না। সরাসরি কলকাতার শিয়ালদহ কোর্টে বদলী। এদিকে তখন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীকুমারজ্যোতি সেন কাজ করে যাচ্ছেন। শ্রীসেনও মুর্শিদাবাদের লোক। গড়ে উঠল তাই শ্রীসেন, সাত্তার ও রামবাবুর এক অন্তত টায়ামভিরেট। রাতারাতি রামবাবুর হাতে এল টাকা। আর সন্তুষ্টও অনেক বেড়ে গেল রামবাবুর। সাত্তার সাহেবের হয়তো ইচ্ছে রামবাবুকে কলকাতার এক কোর্ট থেকে আরেক কোর্টে বদলী করে কলকাতায় স্থায়ী ভাবে রাখার। রামবাবুরও আর চিন্তে নেই ঠিক ছাত্তাবাবুর মতন। সাত্তার সাহেবের সঙ্গে খানাপিনা ভালভাবেই চালালেন। ঠিক যেন গুজেষ্টা লাখনৌ। অথবা

পুরনো আমলের মুর্শিদাবাদের নবাবী দরবার। মোরগা পোলাউ, বিবিয়ানী, যতরকমের খাবার দাবার চলত এই টায়ামভিরেটে। আলীপুর কোর্ট, শিয়ালদহ কোর্ট, হাইকোর্ট, ইত্যাদি সবই রামবাবুর ভয়ে তটস্থ। রামবাবু, “বাবা সাত্তার সাহেবের লোক”।

রামবাবু পার্ক সার্কাসের যে বাড়ীটিতে এখন থাকেন সেই বাড়ীটি শোনা যায় ১৫,০০০ টাকায় কেনেন। ঐ বাড়ীটি একটি অবিভক্ত সম্পত্তি। তাই অবশেষে ঐ বাড়ীটি রামবাবু অবৈধভাবে দখল করার জন্য এক মামলা উপস্থিত হয় আলীপুর কোর্টে। মামলাটির নম্বর টি. এস. ৭৫/৭৫। এই মামলাটি যখন আলীপুর কোর্টে চলছিল, তখন রামবাবু ঐ কোর্টে সাব জজ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রামবাবুর কালো হাত সাত্তার সাহেবের সাহায্যে কোর্টের সর্বস্তরে সম্প্রসারিত। তাই সেই জাল থেকে আরম্ভ করে সব কিছুতে জড়িয়েও, রামবাবু রেহাই পেয়ে গেলেন। কিন্তু মামলার নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। শুধু তাই নয়, মামলাটির একটি অংশ এখনও কলকাতা হাইকোর্টে রয়ে গিয়েছে। সেটার নিষ্পত্তিও এখন পর্যন্ত হয়নি।

আলীপুর কোর্টে ঐ মামলাটি চলাকালে শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্রর কাছে একটি আবেদন করে রামবাবুকে আলীপুর কোর্ট থেকে বদলী করা হয়। কিন্তু সাত্তার সাহেবের নির্দেশে তাকে হাওড়া কোর্টে রাখা হয় বলে শোনা যায়। তাই রামবাবু তাঁর ঐ বে-আইনী দখলকারী পার্ক সার্কাসের অবিভক্ত সম্পত্তি ছাড়লেন না। কলকাতা থেকে হাওড়ায় যাতায়াত করতে আরম্ভ করলেন।

পার্ক সার্কাসের নির্মলচন্দ্র দত্ত ওরফে মধু ডাক্তার তাঁর বোনদের পৈত্রিক বাড়ী থেকে বঞ্চিত করবার জন্য রামবাবুর সাহায্যপুষ্ট হয়ে আলীপুর কোর্টে এক বে-আইনী রায় বের করেছিলেন। সেই মামলাটিরও এখন পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়নি। সেটাও এখন হাইকোর্টে রুলছে।

বামপন্থী সরকার পশ্চিমবঙ্গে আসার বেশ কিছুদিন আগে এই রামবাবুকে প্রমোশন দিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেনস জজ হিসেবে চুঁচুড়াতে বদলী করা হয়। আশ্চর্য হতে হয় সাধারণ একটা মনশেফ পদ থেকে এত অল্প সময়ের মধ্যে রামবাবুর

পার্ক সার্কাস বেনিয়াপুকুর থানার পুলিশ অফিসাররা রামবাবুকে এক সময়ে বেণ তোয়াজ করে চলেছেন যে বাড়ীটি রামবাবু এখনও বে-আইনী ভাবে দখল করে থাকছেন সেই বাড়ীর শাস্তি বিয় করবার জন্য। রামবাবু একসময়ে যথেষ্ট পুলিশী তাণ্ডব করেছেন। থানার পুলিশ অফিসারদের ভিজ্ঞাসা করলে একটি কথাই বলতেন “উপর থেকে নির্দেশ আছে।” ইন্দিরা গান্ধী যখন সারা ভারতে ইয়ারজেলি ঘোষণা করলেন তারপর থেকে রামবাবুর মৌখিক ভয়ঙ্কর বহর বেড়ে গেল, যথা ‘মিসা করে আটকে দেব। ডি. আই. আর করে জেলে পুরে দেব।’

রামবাবু এখন কলকাতার পার্ক সার্কাসের সেই বাড়ীটিতেই বসবাস করছেন। চুঁচুড়া থেকে আবার কলকাতায় বদলী হয়ে আসা যায় কিভাবে তার জন্য রামবাবু এখন চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সাত্তার সাহেব শোনা যাচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টে আবার প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছেন। রামবাবু যদি কলকাতায় আবার ফিরে আসতে পারেন তবে জমবে ভাল। হাইকোর্ট এবং লোয়ার কোর্টে কলকাতায় অনেক চেলা আছেন রামবাবু ও সাত্তার সাহেবের। ওয়াকক সম্পত্তি লিঙ্গ দিয়ে এবং অত্যাচারে সম্পত্তি দখলে এই ধরনের সামাজিক অপরাধীদের সংখ্যা কম নয়। এদের হাতে আবার রয়েছে বিচার বিভাগের বিষয়। তাই সাধারণ মানুষ এই রাজ্যে কি ধরনের সুবিচার পাবে, তা আজ বিশেষভাবে ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সম্মত এ সি সি কোম্পানী আর এই কোম্পানীর নেতৃস্থানীয় এ ভি বি এবং ব্যবকক অ্যাণ্ড উইলকক্স কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কাজে নানান ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তাদের ওপর একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। যেখানে কাজের অগ্রগতি নিয়ে ডেপুটি লেবার কমিশনারের কাছে ইউনিয়ন ও কর্তৃপক্ষের আলোচনা চলছে সেখানে ব্যবকক কর্তৃপক্ষ বে-আইনীভাবে শ্রমিকদের হাজিরা কাটতে শুরু করেছে এবং সাঁওতালডিহি সাইটে ইউনিয়নের সাঁওতালডিহি সাইট কমিটির সভাপতি স্থলীল সেনকে অত্যাচারে হোস্টেলার নির্দেশ দিয়েছে। এই অবস্থায় ব্যবকক শ্রমিকরা যে কোনদিন লাগাতার ধর্মঘটে নামতে পারেন।

১৯৭২ সালের থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাইটে ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় শ্রমিক সহ যে ৩৭ জন শ্রমিককে বে-আইনী ও অত্যাচারে বরখাস্ত করা হয়েছে তাঁদের পুনর্বহাল ও পারমানেন্সী কেস সমেত সমস্ত কেসের স্তূহ মীমাংসা, শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি ও অত্যাচার দাবী নিয়ে ইউনিয়নের নেতৃত্বে শাস্তিপূর্ণ আন্দোলন চলছে। ১৯৭৭ সালের ২২শে থেকে ২৭শে আগষ্ট দাবী ব্যাজ পরিধান করে দাবী দিবস পালন করা হয়েছে এবং ২২শে আগষ্ট থেকে ওভারটাইম বয়কট করা হয়েছে। ১৯৭৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করা হয়েছে।

বিদ্যায় সমস্ত সমাধানের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে সেই উদ্যোগকে বানচাল করার জন্য এবং বিদ্যায় শিল্পে সংকট সৃষ্টি করার জন্য ব্যবকক ও এ. ভি. বি. কোম্পানী সাঁওতালডিহি ব্যাণ্ডেল কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ-গুলি অথবা চিলে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাঁওতালডিহি ১নং ও ২নং ইউনিটের কাজ ব্যবকক শ্রমিকরা যথাসময়ে শেষ করেছে। তা ১৭শে ও ৩নং এব কাজ ব্যবকক কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ে না দেওয়ার কৌশল করেছে। ১৯৭৪ সালে ৪৪/ (শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়)

প্রণবের মস্তানিতে পাড়ার লোক অতিষ্ঠ (দুর্গার সংবাদদাতা)

তবানীপুর থানা এলাকার চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী বোডের প্রণব চক্রবর্তী নামে জনৈক মজুরের যন্ত্রণায় স্থানীয় বাসিন্দারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন বলে অভিযোগ। প্রকাশ, প্রণব ইতিমধ্যে জেল হাজত ঘুরে এসেছে। কয়েক জন ওয়া নিয়ে প্রণব জোর করে চাঁদা আদায়, মারপিট, সাধারণ নাগরিককে ভীতিপ্রদর্শন, সহ নানা ধরনের অপকর্ম করেই চলেছে। প্রণব নাকি একটি সরকারী চাকুরীও করে। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা লাল-বাজার সহ পুলিশের কর্তৃত্বকে জানিয়েছেন যে, প্রণব ওরফে পরাণের অত্যাচারে তাদের প্রাণ ভেরবার হয়ে উঠেছে। কোনও আইনেই কি পরাণ ক সামলানো যায় না? পুলিশের কাছে শুল্ক নাগরিকদের একটাই প্রশ্ন।

অ্যালুমিনিয়াম কেবল এণ্ড কণ্ডাক্টর্সে আচমকা লক আউট

(দুর্গার সংবাদদাতা)

গত ১৫ই নভেম্বর গভীর রাতে অ্যালুমিনিয়াম কেবল এণ্ড কনডাক্টার্স (ইউ, পি) প্রাঃ লিঃ-এর মালিক গোপী আচমকা ৪৭নং হাইড রোডে অবস্থিত ১নং কারখানা, ৪নং মাশ্রু আমেদ রোডে অবস্থিত ২নং কারখানা এবং ২-এ সেক্সপীর সরণিতে অবস্থিত হেড অফিসে লক-আউট ঘোষণা করে নোটিশ জারি করেছে। গত অক্টোবর মাসের বেতন না দিয়েই এই লক-আউট করা হয়। এর ফলে প্রায় ছয়শোর মতো শ্রমিক কর্মচারী এখন কর্মচ্যুত হয়ে পড়লেন।

বিশেষভাবে বঙ্গা দরকার যে কর্তৃপক্ষ গত জুলাই মাস থেকে ১০৪ জন শ্রমিক কর্মচারীকে বে-আইনী ছাঁটাই করে। এবং জুন মাসের বেতন নিয়ে মালিক পক্ষ টালবাহানা শুরু করে। এক সঙ্গে বেতনের বহলে মাসে দুইফা, তিন দফায় বেতন দিতে শুরু কবে। বোনাসের আজ পর্যন্ত কোন মীমাংসা মালিকরা করেনি, এমন কি বোনাসের নোটিশ পর্যন্ত দেয়নি, যেখানে শ্রমিক কর্মচারীরা ২০ শতাংশ বোনাস প্রতিবৎসর পেয়ে আসছেন। এমন কি শ্রমমন্ত্রীর ঘরে

আলোচনাতেও মালিক পক্ষ গর-হাজির থাকে। এই ব্যাপারে সরকারী প্রস্তাবও মালিকরা মেনে নেয়নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত ১৯৭৬ সালে সংস্কার রেকর্ড মুনফা হয়েছে। উৎপাদনের হার দেখে কেন্দ্রীয় সরকার প্রশংসাও করেছে। এই অবস্থায় হঠাৎ কোন হাশিয়ায় না দিয়েই এই বে-আইনী লক-আউট ঘোষিত হয়। শ্রমিক কর্মচারীদের দাবী অবিলম্বে বে-আইনী লক-আউট তুলে নিয়ে কারখানা খুলতে হবে এবং ক্ষয় ক্ষয় দাবীর মীমাংসা করতে হবে।



টরন্টোতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

বিগত ২৪শে জুলাই শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায় টরন্টোর একটি বাঙালী সমাবেশে সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। রঙ্গমঞ্চে একটি দুঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবার পরিপ্রেক্ষিতে এই লেখার প্রয়োজন পড়েছে। তবে এই লেখার প্রয়োজন না পড়লেই স্বপ্নের কারণ ঘটত।

ঘটনাটি সংক্ষেপে এই রকম: হেমন্তবাবু মঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন তার পুত্র জয়স্ববাবুকে সঙ্গে করে তবলচী হিসেবে। স্বাভাবিকভাবেই শ্রোতারা মনোরঞ্জন অহুষ্ঠান আশা করছিলেন, যা চরিতার্থ হয়নি, বলা চলে জয়স্ববাবুর অপটু তবলা সঙ্গতের জন্ত। তাই প্রশ্ন উঠেছিল, “টরন্টোতে কি এর চেয়ে ভালো তবলচি ছিল না?” ঋষ্ট হেমন্তবাবু বচসার স্বত্রপাত করেছিলেন, “আপনার পছন্দ না হলে চলে যান” বলে। বচসা যখন তীব্রতর হচ্ছিল তখন হেমন্তবাবু চড়া গলা শোনা গেল “এর চেয়ে ভালো তবলচি টরন্টোতে পাওয়া যায়নি, এর চেয়ে ভালো তবলচি টরন্টোতে নেই।” প্রশ্নোত্তর এসেছিল জর্নৈক শ্রোতার কাছ থেকে; “এর চেয়ে ভালো তবলচি টরন্টোতে আছে।” এরপর হেমন্তবাবু তার পুত্রকে নিয়ে মঞ্চ ত্যাগ করেন। পরে অবশ্য তিনি ফিরে এসে যথারীতি সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন, সম্ভবত উজ্জ্বলতার অহুরোধে। বলা বাহুল্য যে, হেমন্তবাবুর পক্ষ থেকে বচসার স্বত্রপাত করার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না, যখন উজ্জ্বলতার কোন উচ্চ শ্রোতার প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম এবং নিশ্চিতরূপে সক্ষম ছিলেন। তবলচির প্রশ্নে উজ্জ্বলতার উত্তরই যথাযথ হত, কারণ তাঁরাই তবলচি সংগ্রহের সুবিধে অসুবিধে যথাযথ ব্যাখ্যা করতে পারতেন। হেমন্তবাবুর পক্ষে যথাযথ প্রশ্নোত্তর করা সম্ভব ছিল না স্বাভাবিক কারণেই। তাছাড়া জয়স্ববাবুও ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগতভাবে কোন শ্রোতৃবৃন্দেরই আক্রমণের পাত্র ছিলেন না, একথা স্থির নিশ্চিত। স্থির নিশ্চিত যেমন টরন্টোতে বহু কৃতি তবলচির বসতি। টরন্টোর শ্রোতৃমণ্ডলী বহু ভারত বিখ্যাত শিল্পী ও গুণী মাহুষের জলসাতে অভ্যস্ত এবং বহুক্ষেত্রে তবলাতে সঙ্গত করেছিলেন স্থানীয় শিল্পীরা—পুনরুল্লেখযোগ্য—একাধিক তবলচি। এই

অহুষ্ঠানগুলি সার্থক হয়েছিল। কিন্তু হেমন্তবাবুর অভিজ্ঞতা কতটুকু টরন্টোর স্থানীয় তবলচীদের সম্বন্ধে, সে কোন প্রতিপাত্ত বস্তু নয়; কারণ তিনি ঋষ্ট প্রত্যুত্তরে ব্যাপৃত না হলে জানা যেত না যে তিনি সে বিষয়ে অজ্ঞ থেকেও বচসা করছিলেন।

প্রথমত: এই ঘটনাতে আহত হয়েছেন অহুষ্ঠানের উজ্জ্বলতার। হেমন্তবাবুর অহুষ্ঠান সার্থক করে তবলবার জন্ত বহু আয়াস স্বীকার করেছেন স্থানীয় বাঙালী প্রতিনিধিবৃন্দ। রেডিও অহুষ্ঠানে হেমন্তবাবুর টরন্টোতে অভ্যাগমন এবং সঙ্গীত পরিবেশনে স্বীকৃতিসম্বন্ধে প্রচার করা হয়েছে সুবিস্তারে, মূল্যবান বিজ্ঞাপনের নির্ধারিত সময়ে (এখানে উল্লেখযোগ্য, টরন্টোর বঙ্গীয় সংস্কৃতি পরিষদের নেতৃত্বে প্রতি রবিবার বাংলা অহুষ্ঠান প্রচার করা হয় টরন্টোর একটি স্থানীয় বেতার কেন্দ্র থেকে। ব্যয়ভার স্তম্ভ হয় বঙ্গীয় সংস্কৃতি পরিষদ ও বিজ্ঞপ্তি লব্ধ অর্থের উপর)। এমন কি প্রাক অহুষ্ঠান বেতার সূচীতে (রবিবার, ২৪শে) জুলাই শুধুমাত্র হেমন্তবাবুর কণ্ঠে পরিবেশিত গান প্রচার করা হয়েছিল। যাদের নিরলস প্রচেষ্টা হেমন্তবাবুর কীর্তিকেই উদ্ভূত করতে উন্মুখ ছিল, তারা নিরাশ হয়েছেন সবচেয়ে বেশী। যারা হেমন্তবাবুকে তোরণ সংগৃহীত অর্থের শতকরা আশিভাগ দিতে প্রস্তুত ছিলেন তারা বসে রইলেন অধোবদনে। উল্লেখযোগ্য যে অহুষ্ঠান শেষে শুধু ঘরে ফিরে পুরো ঘটনা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া এদের উপায় ছিল না। তাই তারা পূর্ব নির্ধারিত প্রবেশমূল্যসমষ্টির আশিভাগেরও বেশী হেমন্তবাবুর হাতে ভুলে দিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন। এই উজ্জ্বলতার অনেকই অকপটে স্বীকার করেছেন যে হেমন্তবাবুর অহুষ্ঠানের আয়োজন আর তারা কখনও করবেন না। হেমন্তবাবু বিনামূল্যে রাজী হলেও এবং তাদের প্রচেষ্টার পারিশ্রমিক দেওয়া হলেও।

বলা বাহুল্য, বহু চড়া দামে হেমন্তবাবুর সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল। কারণ সংগৃহীত অর্থের শতকরা কুড়ি ভাগ দিয়ে প্রেক্ষাগৃহ ভাড়া করা, বেতার অহুষ্ঠানের জন্ত অর্থ সাহুল্য বজায় রাখা প্রভৃতি কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। অথচ প্রবাসের বাঙালী সংস্কৃতি

সংগঠন অর্থকষ্টের জন্তই জীবী শীর্ণ হয়ে বেঁচে আছে। এই সমল নিয়েই আবার একাধিক দুর্গাপূজা করতে হয়; করতে হয় একাধিক সরস্বতী পূজা, নাটক, জলসা। এখানে সংস্কৃতির পূজারী প্রত্যেকটি মাহুষ খেচ্ছাসেবক। আর হেমন্তবাবুর মত মাহুষ এখানে আসেন টাকা দুটতে।

প্রবাসের সমস্তসমাকুল ইতিবৃত্ত এই মুহূর্তের প্রতিপাত্ত বস্তু নয়। যা ছিল নিত্যদিনের তুচ্ছতার বিশীর্ণ, পৃথিবীর প্রত্যন্ত কোণে বসে তাতেই আরোপিত হয়েছে মহত্ব—প্রবাসী জন্মে তার আবেদন প্রবল। ছিন্ন-মূল জীবনছন্দের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বেদনা, হতাশার পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারে প্রবাসী মানস খুঁজে বেড়ায় কোনও একটি স্নিগ্ধতাম স্তম্ভের দ্যুতি—তারই অঙ্গীভূত সংস্কৃতির স্নেহস্পর্শ। ওই জলসা, নাটক, পুজো, সাময়িকী তারই ফলশ্রুতি। তাই যখনই দেশের কৃতি মাহুষের সাক্ষাৎ মেলে, প্রবাস চেতনা হয়ে ওঠে উজ্জ্বল, তাকে আমরা গ্রহণ করি গরম সমাদরে। হেমন্তবাবু টরন্টোতে আগমনও (মুখ্যত: কোনও হিন্দী চলচ্চিত্র উপলক্ষে) এর কোন ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু তিনি আমাদের নিরাশ করেছেন। তিনি তার মহত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন প্রস্তুতিহীন পরিবেশনার জন্ত, তার অর্থগত দুর্বলতার জন্ত, তার চিন্তাহীন কার্যকারণের জন্ত। অথচ হেমন্তবাবুর প্রতি সৌজন্য প্রকাশে কোনও ক্রটি রাখেন নি এখানকার উজ্জ্বল পুরুষেরা ও বিবেকবান মাহুষেরা।

প্রগতিশীল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এখানকার বাঙালী সমাজ চরিতার্থতা লাভ করেছে, এখানে গড়ে উঠেছে একটি সংস্কৃতির একাধিক প্রতিভূ গোষ্ঠী—বলা চলে বিবিধ শিখায় জলে উঠেছে এখানে সংস্কৃতির আলো একই বর্ণে একই সমৃদ্ধ আলোয়। ওই পুজো, নাটক, বহু জলসার পীঠস্থান তাই হয়ে উঠেছে টরন্টো। এখানে বাঙালী সমাজ বিভক্ত নয়, এখানে গালাগালি অনাদৃত, পরস্পরিকাতরতা পরিত্যক্ত এবং প্রতিহিংসাত্মক কার্যকলাপ স্থগিত। এখানের দুটি সংঘ ‘বঙ্গীয় সংস্কৃতি পরিষদ’ ও ‘প্রবাসী’ একে অপরের প্রায়শে সাহায্য করে থাকেন; বিবিধ মতবাদ এখানে আদৃত; বিতর্ক এখানে উত্তরণের প্রসূতি। হেমন্তবাবুকে একই সহযোগী প্রতিযোগিতার নিদর্শন স্বরূপ এই দুটি সংস্কৃতি সংঘ জলসার জন্ত অহুরোধ করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, হেমন্তবাবু মঞ্চে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করে এই ধারণা প্রচার করতে চেয়েছিলেন যে বিভক্ত বাঙালী

গোষ্ঠিকে একত্রিত করার জন্তই তিনি এই জলসাতে রাজী হয়েছিলেন। প্রথমত: কলিত বিতর্ক-বোধের কোন ভিত্তি ছিল না টরন্টোর বাঙালী সমাজে। দ্বিতীয় তিনি প্রবাসী বঙ্গীয় সংস্কৃতি পরিষদের মিলিত মঞ্চের উপলক্ষ ছিলেন কিন্তু হোতা ছিলেন না। তৃতীয়ত: এখানকার বুদ্ধিজীবী ও বিবেকবান মাহুষদের বিচারশক্তিকে অনবধানে হেয় করেছেন তিনি। চতুর্থত: তার কোন কোন সমর্থকদের (যাদের কেউ কেউ গত বছর রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রোজেক্ট সন্থা সেনগুপ্তকে টরন্টোর অদূরবর্তী হামিলটনে অপমানিত করেছিলেন) বিতর্ক বুদ্ধিকেই তিনি উত্তেজিত করেছেন এই ঘটনার জের টেনে।

হেমন্তবাবু মধুকষ্ট এবং অনায়াস সাধিত সঙ্গীতের পূজারী, তিনি কোন জন-নায়ক নন। তিনি তাঁর গায়ক স্বলভ খ্যাতির কিংবদন্তিকে বহিষ্কার করে জন-নায়কের খ্যাতি মনে করে থাকেন তবে তার শোচনীয় পরিণতির নিমিত্ত হবেন তিনিই। তার জন্ম-নন্দিনী কঠিন শক্তিকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই অকুণ্ঠিত চিন্তে, যেমন জানাই অনাদৃত তার অশাচিত অর্থ কামনা, অনাহৃত ক্ষুদ্র অথবা অনবধানজনিত চিন্তাহীন কার্যকলাপকে।

সম্প্রসাদ মজুমদার, পার্শ্ব সেন
কবি বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহন শীল
টরন্টো, কানাডা

প্রতিবাদ ও উত্তর

২৫শে নভেম্বরের দর্পণ পত্রিকায় জর্নৈক ঠিকানাহীন বিমল পাল লিখেছেন: আমি নাকি একটি চলচ্চিত্র তৈরী করার জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে ছ’ লক্ষ টাকা চেয়েছি। কথাটি ডাঙা এবং নির্ভল মিথ্যে। উক্ত বিমল পালের পত্রের অন্ত্যন্ত অপ্রাসংগিক ও ব্যক্তিগত কুৎসার উত্তর দেবার প্রয়োজন দেখি না।

উৎপল দত্ত

[উৎপল দত্ত কথাটা মিথ্যা বলে অস্বীকার করলেও আমরা জানি পত্রলেখক বিমল পাল সত্য কথাই লিখেছেন। তবে আমরা স্বতন্ত্র জানি উৎপলবাবু তিন লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন “ক্ষমা করব না” ছবি করবেন বলে যার ক্রিপ্ট নিয়ে তাঁর পত্নী শোভা সেন অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্রের বাড়ি কয়েকবার যাতায়াত করেছেন। পত্রলেখকের অন্ত্যন্ত বক্তব্যকে বুদ্ধিমান বিপ্লবী উৎপল দত্তের পক্ষে ব্যক্তিগত কুৎসা বলে উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় কি,

কারণ সত্য কথা বড়ই অস্বস্তিকর। বিশেষ করে উৎপলবাবুর স্বত লোকেদের পক্ষে ধারা টাকার জন্ত যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ করে যাবেন, কিন্তু আবার জোর গলায় চীৎকার করবেন সব “নির্ভল মিথ্যে” বলে।

—সম্পাদক, দর্পণ]

কসবার ঘটনা

দর্পণ পত্রিকার ২৫শে নভেম্বরের সংখ্যায় কসবার ঘটনাবলী সংক্রান্ত সংবাদটি পড়ে বিস্মিত হইনি। আমি একজন জনতা দলের সমর্থক কর্মী এবং ১৯৭০ সাল থেকে আদি কংগ্রেসে আছি। এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে।

কসবার সমাজবিরোধীদের উপ-দ্রবে জনজীবন ব্যাহত হয়েছে এটা ঘটনা। এই অশান্তির উৎস নিয়ে জল্পনা কল্পনা, বিবৃতি পাণ্ডা বিবৃতি সত্য মিছিল শ্লোগান পাণ্ডা শ্লোগান সবই পুরোদমে চলেছে। অগাধে তাপস ঘোষালের হত্যাকাণ্ড দিয়ে সূচনা, পরিণতি স্বপন চক্রবর্তীর উপর নৃশংস আক্রমণ। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমরা জনতা কর্মীরা আয়-নয় নিজেদের মুখ দেখি না, পর-নিন্দা এবং পরচর্চা আমাদের অন্ধ করে দিয়েছে। একথা বলছি না যে, খুনোখুনির পিছনে সি, পি, এম নেই বা সি পি এম-এর স্থানীয় নেতারা ঘোয়া তুলসীপাতা। কিন্তু জনতা পার্টির নাম নিয়ে যারা আজ কসবার অস্তিত্ব জাহির করছেন, তাঁরা সবাই কি নিরীহ? শান্তিপ্রিয়? শুধু তাই নয় তারা কি আর্দ্র জনতা পার্টির কর্মী? বেশীদিনের কথা নয়, এই বিধানসভা নির্বাচনেও কি তাঁদের অনেকের হাতে তেরঙা ঝাণ্ডা শোভা পায়নি? তাঁদের অরণীয় একজন নেতা, যিনি কি শান্তির সময়ে কি অশান্তির দিনে সর্বদা গুলিভরা রিসলবার হাতে চলাফেরা করেন তিনি কি একদা স্থানীয় প্রাক্তন কংগ্রেসী এম এল এ ও মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত বিশ্বাসভাজন লোক ছিলেন না? এই ভক্তলোকটি কি এখনো কসবার কিছু কুখ্যাত সমাজবিরোধীকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে চেষ্টা করছেন না? স্বপন চক্রবর্তীর উপর হামলাকারীরা কংগ্রেস কি সি পি এম আমার জানা নেই; কিন্তু সমাজবিরোধীদের জাতীয়তাবাদী আখ্যা দিয়ে জনতা পার্টির এক স্থানীয় নেতা এবং চৌরঙ্গী রোডের যুবজনতার সভাপতি যে প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছেন যে, “প্রয়োজনে একদা কংগ্রেসীদের জনতায় সাহায্য গ্রহণ করা হবে”—এ তথ্য সর্বজনবিদিত। একদিন যাদের উজ্জত পাইপগানের মুখে দাঁড়িয়ে আমরা প্রাক্তন সংগঠন কংগ্রেস,

কমিউনিষ্ট একের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাক্তন জনসংঘ, প্রাক্তন সোশালিস্ট কর্মীরা জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, যাদের দোষও প্রতাপে কসবার সাধারণ মানুষ নির্ধাতিত, অত্যাচারিত হয়েছিলেন, আজ তারা 'জাতীয়তাবাদের' তকমা পরে জনতা পার্টির ছায়ায় সমরেত হয়, তবে সাধারণ মানুষের কাছে আমরা মুখ দেখাব কি করে? সর্বজন-শ্রদ্ধেয় দেশবরেণ্য নেতা প্রফুল্ল সেন মহাশয়কে কসবার শাস্তিকামী যুব ছাত্রের তরফ থেকে আমার একান্ত অহরোধ, আপনার মত অবিসংবাদী নেতাও যদি একজন সমাজবিরোধী-প্রেমী যুবনেতা ও একজন সমাজ-বিরোধীদের আশ্রয়দাতার কথায় পরিচালিত হন, তবে আমাদের লজ্জা ও পরিতাপের সীমা থাকবে না। জাতীয়তাবাদের অর্থ যদি হয় দেবা দত্তের সঙ্গে সৌহার্দ্য তবে জনতা পার্টির তথাকথিত যুবনেতা-দের মিনতি করছি, দয়া করে আর গান্ধীজীর নাম উচ্চারণ করবেন না, কারণ তাতে শুধু গান্ধীজীর অবমাননা হবে না, ভগ্নমীর চূড়ান্ত হবে।

মদনকুমার সরকার

মেদিনাপুর জেলার তিনটি স্কুল প্রসঙ্গে

মেদিনাপুর জেলার তিনটি স্কুল সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকারকে অবহিত করতে চাই। এরা এখনও কেন সরকারী অহুমোদন পেল না?

(১) মেদিনাপুর জেলার কেশপুর থানার একটি গ্রাম। তার নাম ধলহারা। গ্রামটি ১৩নং অঞ্চলে। এই গ্রামের স্থানীয় অধিবাসীদের উত্তোকে তপসিলী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্ত ১৯৭৬ সাল থেকে একটি নৈশ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। স্কুলটির ছাত্র সংখ্যা ১০০র ওপর। স্কুলটির নাম ধলহারা নৈশ প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষে এই ধরনের একটি স্কুলের দায়দায়িত্ব আর বহন করা সম্ভবপর হচ্ছে না। কিন্তু আশ্বর্ষের বিষয় ইন্দিরাগান্ধীর আমলে বি, ডি, ও এবং স্কুল পরিদর্শক সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে যাওয়ার পর এখনও কোনো সরকারী সাহায্য ও অহুমোদন পাওয়া যায় নি।

(২) এই স্কুলটি মেদিনাপুর জেলার ডেবরা থানার অন্তর্গত ৪নং অঞ্চলে এবং গ্রামের নাম লাউ-ঘেরিয়া। এটিও একটি তপসিলী স্কুল। এবং স্কুলটির নাম লাউঘেরিয়া প্রাইমারী স্কুল। স্থানীয় জনসাধারণের উত্তোকে ১৯৭৪ সালে এটি চালু করা হয়। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ১২৫ এবং তিনজন শিক্ষক আছেন। গত ৪

বছরে কয়েকবার পরিদর্শক এসেছেন। আজ থেকে তিন বাস পূর্বেও আরও একবার পরিদর্শক এসেছিলেন। কিন্তু স্থানীয় মানুষের দুর্ভাগ্য তারা এখনও জানতে পারলেন না যে সরকার এই স্কুলের জন্ত কি করেছেন?

(৩) এই স্কুলটি ডেবরা থানার অন্তর্গত ৮নং অঞ্চলে এবং গ্রামটির নাম করাগা। এটি একটি জুনিয়র হাই স্কুল এবং তপসিলী ছাত্রদের জন্ত। ছাত্রসংখ্যা ২০০। শিক্ষক ৫ জন। স্কুলের নাম আদিবাসী উন্নয়ন জুনিয়র হাই স্কুল। স্কুলের সাধারণ সম্পাদক হলেন লোপসা হেমব্রম। এই স্কুলটি স্থানীয় মানুষের উত্তোকে ১৯৭৩ সালে শুরু হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন সরকারী অহুমোদন পাওয়া যায় নি। যখন জনতা সরকার আদিবাসী উন্নয়ন দিবস, শিক্ষা দিবস ইত্যাদি উৎসাহের সঙ্গে পালন করছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের বাম ও গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র ও নৈরাজ্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত করবেন এই সদিচ্ছা ঘোষণা করছেন তখন এই তপসিলী স্কুলগুলির এই অবস্থা আর কতদিন চলবে? আমরা স্থানীয় জনসাধারণ আশা করি শিক্ষামন্ত্রী ও তার দপ্তর সমস্ত বাধা অতিক্রম করে এই স্কুলগুলিকে যথাযোগ্য সাহায্যদান ও স্বীকৃতি দেবেন।

কেশপুর অঞ্চল নং ১৩, ডেবরা অঞ্চল নং ৪ এবং ৮এর স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ

ব্যাবকক

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

৪৬ টাকা মাহিনা বাড়িয়ে ব্যাবকক এণ্ড উইলকক্স প্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে একটি চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তির মেয়াদ ১৯৭৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হওয়ার পর ১৫.২.৭৭ তারিখে ব্যাবকক এণ্ড উইলকক্স প্রমিক ইউনিয়ন মাহিনা বাড়ানো সম্বন্ধে একটি দাবীপত্র ব্যাবকক কর্তৃপক্ষকে দেয়। কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে কোন-রূপ আলাপ আলোচনা করেনা। অপরদিকে প্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্ত তারা সাঁওতালডিহি ব্যাংক, চন্দ্রপুরা সাইটগুলিতে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে মাহিনা বাড়ানোর ব্যাপারে আগেই চুক্তি করেছিল।

মার্চের লোকসভা নির্বাচনের পর কথা উঠেছে জনতা পার্টি অথবা কংগ্রেস দলের বিকল্প হিসাবে বাম-পন্থী শক্তিকে দাঁড়াতে হলে কমিউনিষ্টদের একাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কমিউনিষ্টদের এক্য বলতে সি, পি, আই, সি, পি, আই, এম এবং সি, পি, আই, এম, এল, এই তিনটি দলের একাবদ্ধ আন্দোলনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। যদিও কমিউনিষ্ট একের প্রমতি সেই সমস্ত বুদ্ধিজীবী মহল থেকে জোরের সহিত উচ্চারণ হচ্ছে যারা সি, পি, আই দলভুক্ত এবং যারা আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাহলেও ভারতের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একের প্রমটিকে বিচার করে দেখা যেতে পারে।

প্রথমে দেখা যাক আন্তর্জাতিক প্রশ্নে উক্ত তিনটি দলের রাজনৈতিক অবস্থান কি? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ও চীন এই দুটি বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে যে অনমনীয় মতবিরোধ রয়েছে সে প্রশ্নে সি, পি, আই সোভিয়েতের পক্ষে এবং তারা সোভিয়েত গোষ্ঠীর দ্বারা ভারতের কমিউনিষ্ট দল হিসাবে স্বীকৃত। অপরপক্ষে সি, পি, আই, এম, এল দলটি চীনের গোঁড়া সমর্থক বলে নিজেদের দাবী করে যদিও উক্ত দলটি বর্তমানে নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। অপর দল সি, পি, আই, এম, সোভিয়েত ও চীন এ দুটি দেশের সঙ্গে সম দূরত্ব রেখে চলছে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ও চীন এক হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হোক এ দাবী উপস্থিত করেছে। পৃথিবীর কয়েকটি সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক এ দলটিকে বন্ধু দল হিসাবে যথাযথ মূল্য দিতে দেখা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রশ্নে উক্ত তিনটি দলের পক্ষে এক্যমতে পৌছানো খুবই কষ্টসাধ্য।

জাতীয় রাজনীতিতে সি, পি, আই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মশূচী গ্রহণ করেছে। সি, পি, আই দলের মতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস দল জাতীয় বুদ্ধোন্মাদের প্রতিনিধি। সুতরাং কংগ্রেস দলকে শর্তহীন সমর্থন করা প্রয়োজন। এই নীতি অহুযায়ী সি, পি, আই কংগ্রেস দলকে নির্বাচনে বিপর্যয়ের আগে পর্যন্ত বিবেকহীন সমর্থন জুগিয়েছে। আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থাকে স্বাগত জানানো এবং জরুরী অবস্থাকালে কংগ্রেস দলের সমস্ত

দমনমূলক কার্যকলাপকে প্রতি-ক্রিয়ালীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বলে প্রচার চালানো উক্ত দলের প্রধান নীতি ছিল। সি, পি, আই, এম দলের উপর কংগ্রেস দলের প্রচণ্ড সম্ভাস সি, পি, আই নেতাদের কাছে সি, পি, আই, এম-এর হঠকারী নীতির বিরুদ্ধে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ বলে বিবেচিত হয়েছিল। তাই আমরা দেখেছি কংগ্রেসী গুণ্ডাদের দ্বারা সি, পি, এম, কর্মীদের হত্যায় সি, পি, আই নেতাদের কাছে আশ্চর্য-সন্তোষের কারণ ঘটেছিল।

অপরপক্ষে সি, পি, এম দল জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মশূচী ঘোষণা করেছে। প্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে অস্ত্রাস্ত্র সমস্ত শ্রেণীকে একাবদ্ধ করে বিপ্লবী অভ্যুত্থান জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল নীতি। সি, পি, এম, কংগ্রেস দলকে সামন্ত ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দল বলে মনে করে। সুতরাং জাতীয় নীতিতে সি, পি, আই, দলের সহিত সি, পি, এম-এর মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

সি, পি, আই, এম, এল দলের কাছে নির্বাচন বয়কট ও সশস্ত্র বিপ্লবের প্রোগান সঠিক কর্মপন্থা বলে বিবেচিত হয়েছিল। উক্ত দলের এ নীতি সি, পি, আই ও সি, পি, এম-এর কাছে অবিবেচনাপ্রসূত ও হঠকারী নীতিরূপে নির্দিষ্ট। বর্তমানে উক্ত দলের বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের পুরাতন নীতির ব্যর্থতা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করেছে। সুতরাং উক্ত দলের ভবিষ্যত কর্ম-প্রণালী সম্পর্কে এখনই কোন মত প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যদিও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সত্য-নারায়ণ সিংহের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি গোষ্ঠীর নেতারা বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করেছে।

জাতীয় রাজনীতিতে সি, পি, আই ও সি, পি, এম-এর মতপার্থক্য এত তীব্র যে উক্ত দুটি দলের পক্ষে যৌথ কোন কর্মশূচী গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সি, পি, আই যেখানে কংগ্রেস দলের সঙ্গে আতাত রক্ষা করতে আগ্রহী সি, পি, এম, সেখানে কংগ্রেস দলকে একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরাচারের ধারক ও বাহকরূপে গণ্য করেছে। সি, পি, আই এবং সি, পি, এম দলের মধ্যে সমঝোতা অথবা কোন যৌথ আন্দোলনের কর্ম-

শূচী গ্রহণ করতে হলে সি, পি, আই দলকে কংগ্রেস দল সম্পর্কে নতুন মূল্যায়ন করতে হবে।

কংগ্রেস দল সম্পর্কে সি, পি, আই, দলের মূল্যায়ন ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত। কেননা জাতীয় বুদ্ধোন্মাদের নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার কর্তৃক জনগণের সমস্ত গণ-তান্ত্রিক অধিকার হরণ ও ফ্যাসিষ্ট স্বল্প আচরণের কোন নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। তাছাড়া ইন্দিরা গান্ধীর শাসনে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অবাধ মূনাফা লুণ্ঠনের সুযোগ দান ও গত লোকসভা নির্বাচনে ব্যাপক হারে রাজা মহারাজাদের কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়ন সি, পি, আই দলের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে। সুতরাং বর্তমানে সি, পি, আই, দলের মধ্যে জরুরী অবস্থাকে সমর্থন করা উচিত ছিল কি ছিল না এ প্রশ্ন নিয়ে যে বিতর্ক চলছে তা মূল্যহীন।

ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সোভিয়েত নেতাদের হস্তক্ষেপ সি, পি, আই-সি, পি, এম সমঝোতার প্রশ্নটিকে জটিল করে তুলেছিল। জরুরী অবস্থাকালীন ব্যক্তি স্বাধীনতা লোপ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, মিসার যদৃচ্ছ ব্যবহার, বোনাস আইন সংশোধন, হাটাই, লে-অক, লক-আউট প্রভৃতি জনগণের জলন্ত সমস্ভাবলী সম্পর্কে সি, পি, আই দলের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ থাকলেও সি, পি, আই নেতাদের পক্ষে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব ছিল না। যার ফলে সি, পি, আই ক্রমশঃ বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল শ্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং জন-গণের চোখে কংগ্রেসের একটি উপদল রূপে পরিগণিত হয়। জরুরী অবস্থাকালে সি, পি, আই-এর জাতীয় নীতি কার্যতঃ সোভিয়েতের বৈদেশিক নীতিতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে বিকল্প শক্তিরূপে দাঁড়াতে হলে সি, পি, আই এবং সি, পি, এম-এর মধ্যে আশু সমঝোতা প্রয়োজন। কিন্তু সি, পি, আই যতদিন কংগ্রেস দলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ না করছে ততদিন ঐক্য সমঝোতার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

গ্রন্থ সমালোচনা

নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে কিছু চিন্তা-ভাবনা

সাতশটি সালের যে মাসে সংগঠিত তরাই-এর কৃষক আন্দোলন এবং উত্তরকালীন নকশালপন্থী আন্দোলন নিয়ে অনেকগুলো বই বেরিয়েছে। সেই তালিকায় সংযোজিত হলো “নকশালপন্থী বিপ্লবের প্রথম দশক” নিয়ে লেখা এ বইটি।

লেখক পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের বিমাতাহুল আচরণের কথা তথ্য দিয়ে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত পাঠকদেরকে জানাতে চেয়েছেন যে, এ কারণেই নকশালপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব ও তীব্রতা এ রাজ্যেই ঘটেছিল। তাহলে পূর্বাঞ্চলের আসাম বিহার ও উড়িষ্যা একই কারণে আন্দোলনের মাত্রা-তীব্রতা বেশি হওয়া উচিত ছিল এবং ভারতের বর্তমান বাইশটি রাজ্যের মধ্যে যেখানে মাথা পিছু আয় সব থেকে বেশি বলে জানা যায়, সেই পাঞ্জাবে

অথবা কেরালায় এ আন্দোলনের প্রসার ঘটতো কেন?

ঐগনোপাধ্যায় ১২০ পাতার মধ্যে এক দশকের নকশালপন্থী আন্দোলনের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে চেষ্টা করেছেন, যা সম্ভব নয়। এর কলে যা তিনি লিখেছেন, তার গভীরতা অনেক কম, ভাষাভাষা এবং সাধারণ রাজনীতি-আগ্রহী পাঠকদের অজানা নয়। অবশ্য এ বই পড়ে জানা যাবে, যে ঐচ্ছিক মজুমদারের বাবা বেনারসের উকিল ছিলেন অথবা কাছ সাথালের বাবার নাম ছিল আনন্দ সাত্তাল।

লেখকের মতে, মেদিনীপুরে নকশালপন্থী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার কারণ এই যে, “১৯৬৮ সালে কোলা-ঘাটে রূপনারায়ণ নদের উপর সেতু হয়ে গেছে।” এ যুক্তি হাস্যকর। সি, পি, আই (এম-এল) সহ সমস্ত

বর্ণের নকশালপন্থীরা “গ্রাম দ্বিবে শহর ঘেরার” লাইন নিয়েছিল। কিন্তু ১৯৭০ সালের ২৮শে মার্চ প্রথম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সি,পি,আই (এম-এল) সমর্থক ছাত্ররা গান্ধীভবন আক্রমণ করে। প্রতিবাদে দক্ষিণ কলকাতার একদল কংগ্রেসী এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি নাগাদ হাজরা মোড়ে ‘মাও-সে-তুঙের কুশপুতলিকা’ পোড়ায়। সেদিন রাতেই ঐ কুশপুতলিকা বহনকারী একজন নেতাকে নকশালপন্থীরা খুন করার চেষ্টা করে। পুরের দিন সিদ্ধার্থস্বরায়ের বাড়িসহ কয়েকটি রক কংগ্রেস অফিস আক্রান্ত হয়। সংক্রামক রোগের মতো কুলে-কলেজে ছড়িয়ে পড়ে গান্ধী মূর্তি ভাঙা অভিযান। নকশালপন্থীদের তখন বক্তব্য ছিল যে, “এটা ’৬২ বা ’৬৫ সাল নয়, এটা সত্তরের দশক—যুক্তির দশক। এখন

চীন বা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কথা বললে পিঠের চামড়া তুলে নেবো।” এরপর ২২শে এপ্রিল (৭০) ভিক্টোরিয়ার সামনে থেকে সি, পি, আই (এম-এল)-এর দীর্ঘতম মিছিল বেরোয়। সাতাশে এপ্রিল সি, পি, আই এলাকায় প্রথম পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ক্রিসেন নিয়োগী খুন হন।

এবং এ সবই ঘটেছে পার্টি কংগ্রেসের পূর্বে। অথচ ঐগনোপাধ্যায় লিখেছেন যে, পার্টি কংগ্রেসে “সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় শহরেও অভিযান চালান হবে।” এ বক্তব্য সঠিক নয়। এরকম আর একটি তথ্য তুল আছে। ঐগনোপাধ্যায়ের মতে অসীম চ্যাটার্জী নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের পর ১৯৭৬ সালের তেসরা নভেম্বর দেওঘরে গ্রেপ্তার হন। ক্রিস্তানারায়ণ সিংহ কের্ণক পুনরুজ্জীবিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভা হয় সাতই নভেম্বর। এর চারদিন পূর্বেই ঐচ্ছাটাজী গ্রেপ্তার হন, কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের পর নয়। ১১৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, “দক্ষিণ দেশের মতাবলম্বীরা কোন-দিনই চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান বা খতমের অভিযানে আগ্রহ দেখান নি।” ঐচ্ছিক মজুমদার “চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান”—এই স্লোগান রাখার পরই মাওবাদী কম্যুনিষ্ট কেন্দ্র “চেয়ারম্যানের চিন্তা, আমাদের চিন্তা” বলে স্লোগান তোলেন।

ঐচ্ছিক গনোপাধ্যায় সি,পি,আই (এম-এল) গড়ে ওঠা নিয়ে আলোচনা শেষে বলেছেন যে, “এ ব্যাখ্যা একান্ত আমার-এর কোন মার্কসীয় ভিত্তিহীন নেই।” অথচ তিনিই আবার প্রথমেই মত পোষণ করেছেন যে, “সি, পি, আই এবং সি, পি, এম নেতৃত্ব শ্রেণীসংগ্রাম ও সর্বহারার এক-নায়কবিশিষ্ট দিয়েছেন। ছোটো পার্টিই পর্যায়ক্রমে সোশ্যাল ডেমোক্রাট সংস্কার রূপ নিয়েছে।” এসব কথা কি ভিত্তিহীনভাবে তিনি বুঝেন?

তরুণাবু লিখেছেন, “কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে দ্বিতীয় ধাক্কা এল সোলি-য়েট রাশিয়ার বিশতম কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের স্ট্যালিনের মুখোশ খুলে দেওয়ার উপলক্ষে।” এখানেই লেখকের চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিহীন আংশিক ফুটে উঠেছে। ৩৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, “চীন ভারত যুদ্ধের পর ছুটি বিদেশী রাষ্ট্রের প্রয়োজন কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের বিভাগের প্রধান কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে।” লাল-চীনের প্রয়োজনে এদেশে কম্যুনিষ্ট পার্টি ছটুকরো হয়েছে, এ যুক্তি হাস্যকর।

জাতীয় নেতাদের মূর্তি ভাঙা

নিরে চাক মজুমদার ও হুমীতল রায়-চৌধুরীর মতবিরোধের কারণ লেখক বুঝতে পারেন নি। ঐচ্ছিক মজুমদার-চৌধুরী বলেছিলেন যে, রামমোহন বিদ্যাসাগর প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী, এদের মূর্তি ভাঙা সঠিক নয়। পশ্চান্তরে, চাকবাবু পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতবর্ষে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির অস্তিত্ব অস্বীকার করে গান্ধী, রামমোহন, বিদ্যাসাগর সবাইকেই মূর্খান্দি আখ্যা দিয়েছেন।

অবশ্য নকশালপন্থী আন্দোলনের কারণ হিসেবে ঐগনোপাধ্যায় ৩২ পৃষ্ঠায় যা বলেছেন তা সত্য। তাঁর মতে, “আসলে হয়ত কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ব্যর্থতাই নকশাল আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ।”

এ কথাটা মনে হয় সত্য। নতুবা ১৯০৫-০৮ সাল, জিশের দশক ও বি, টি, রণদিভের আমলের সম্মানবাদী নৈরাজ্যবাদী অমার্কসীয় লাইন আবার ১৯৭০-এ মণ্যবিস্তৃত যুব-ছাত্রকে আকর্ষণ করলো কেন। অথচ লেনিনের মতে, ১৯০০ সালের পর থেকে রাশিয়ায় আর সম্মানবাদী রাজনীতি মাথাচাড়া দেয়নি। জনগণকে সেখানে লেনিনের নেতৃত্বাধীন কম্যুনিষ্টরা সঠিক পথ দেখাতে পেরেছিলেন, নারোদনিকরা যে জনসাধারণের প্রকৃত বন্ধু নয় তা বোঝাতে পেরেছিলেন, নিরলস সংগ্রাম চালিয়েছেন সম্মানবাদের বিরুদ্ধে আবার নিছক অর্থনীতিবাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম কবে পথ দেখিয়েছেন জনসাধারণকে। তাই সেখানে পার্টি প্রতিষ্ঠা (১৯১৮) উনিশ বছরের মধ্যে বিপ্লব দেখা গেল আর এখানে? দেবশিশু ভট্ট চার্য

হোট্টেলে পুলিশের হানা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, গত ২৭শে নভেম্বর রাত বারোটার সময় কারাবালা ট্যাক্স লেনে অবস্থিত হুটিশ চার্চ কলেজের অন্ততম হোট্টেলে (ওয়ান হোট্টেল হিসাবে পরিচিত) বটতলা ধানার একদল পুলিশ হানা দেয়। হোট্টেলের আবাসিকরা বিনা ওয়ারেন্টে তল্লাশী চালানোর প্রতিবাদ জানায় ও পরে ধানায় লিখিত ভাবে প্রতিবাদ করে। গণ-তান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির সভাপতি ক্রীকপিল ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে এই ঘটনার কথা জানিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন “জনসাধারণের মাঝে বামফ্রন্ট সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যই পুলিশ আমলাদের একাংশ যে চক্রান্ত শুরু করেছেন, এ ঘটনা কি তার সাক্ষ্য বহন করে? আমরা অবিলম্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এ ঘটনাটি তদন্ত করার দাবী জানাচ্ছি।”



ছুটিতে বাইরে কোথাও যেতে হলে আপনি নিশ্চয়ই স্বাচ্ছন্দ্য চাইবেন! আপনার সহযাত্রীর চাহিদাও কিন্তু একই। কিন্তু আপনার লটবহরের বোঝা যদি পাহাড় প্রমাণ হয়, তাহলে শুধু আপনার নিজের চলাফেরার জায়গাই কমে যাবে না, আপনার সহযাত্রীর অসুবিধাও হবে বিস্তার। আপনার ঐ বোঝার উৎপাত তাঁদের মনমেজাজ তো বিগড়ে দেবেই, সঙ্গে সঙ্গে আপনার নিজের ছুটির মেজাজটিও বরবাদ হয়ে যাবে।

ভারতী জিনিষপত্র প্রেক্ষাগৃহে স্ক্রিনে সিনেমা।
হালকা হাতে পাল্লে চলুন—দেখবেন মেজাজ কাকে বলে।



পূর্ব রেলওয়ে

তবলার শিল্পী চলে গেলেন

ত্রীসামাজিক

মনে হয় এই তো সেদিন স্বর্গত গিরীনদার সংগে রাত দশটার মত লেনের বোর্ডিংয়ে ঢুকতে গিয়ে কানে এল জ্যোতি সিনেমা থেকে ভেসে আসা ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গলা। গিরীনদার পিছু পিছু হলে ঢুকে গেলাম। ফৈয়াজ তখন কেদার রাগের আলাপ প্রায় শেষ করে এনেছেন। তাঁর পাশে তবলা নিয়ে বসেছিলেন ১২/২০ বছর বয়সের এক যুবক। গিরীনদা বললেন মসিহ খাঁর ছেলে কেরামৎ-উল্লা খাঁ।

নেত্রকোণা ময়মনসিংহে থাকতেই কলকাতা ফেরতদের মুখে কেরামৎ সাহেবের নাম শুনতাম। ভীষ্মবাবুর মত কেরামৎ সাহেবও শিল্পপ্রতিভা। উপরে যে ঘটনার কথা লিখলাম তা ১৯৪৪ সনের ঘটনা। তাঁর আসল বয়স ২৬/২৭। দেখতে অনেক কম। তখনই কেরামৎ সাহেব রেডিও এবং জলসার প্রতিষ্ঠিত তবলিয়া।

বাক্সাতে শুরু করেছিলেন ১২/১৩ বছর বয়সে। ফৈয়াজ কেদারের জিতালের গান 'কাহা রে নৌন্দে নন্দন' ধরা মাত্র কেরামৎ সাহেব সাধসংগীতী ঠেকা ধরলেন। ফৈয়াজ মাকে মাকে গান ছেড়ে দিয়ে সমের ছ'এক মাত্রা আগে গানের মুখ ধরে বাজের মত হোঁ মেরে সমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, কিন্তু কেরামৎ সাহেবের লয় একটুও টলল না দেখে হাসলেন। তারিকের স্বিত হাসি। এর পরে খাঁ সাহেব গিয়েছিলেন জিতালের কাফি হোরী 'বন্দে নন্দকুমার'।

পরবর্তী কালে শতাব্দী গায়ক-বাদকের সংগে কেরামৎ সাহেবের বাজনা কত যে শুনেছি তার হিসেব করা মুশকিল। গানের সংগে, যন্ত্রের সংগে, নাচের সংগে; এছাড়া একক লহরা। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এর মধ্যে গানের সং-গতিতেই কেরামৎ ছিলেন অধিতীয়।

স্বর্গত আনোখেলাল ছাড়া এমন স্বরেলা হাত এবং সঙ্গের সংগত আর কারো কাছে আমরা পাইনি। অবশ্য আনোখেলাল পারদর্শী ছিলেন যন্ত্রের এবং নাচের সংগতিতে। তাঁর নাথিখিনা ছিল যেমন চড়া এবং স্বরেলা, কেরামৎ সাহেবেরটি তেমনি মিহি এবং মোলায়েম। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে খাঁ সাহেবকে বোধ হয় রবীন্দ্রসংগীতের সংগে বসিয়ে দিলেও হয়।

এমন নিরতিমান শিল্পী আর দুটি দেখিনি। কোন সংগতে কখনও কেউ তাঁকে যুল গাইয়ে, বাজিয়ে বা নর্তকীর উপরে সওয়াধ হতে দেখিনি। এটা কোন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য নয়—তাঁর বিশেষ শিল্পবোধই তাঁর বাজনার মধ্যে এই প্রবণতা সঞ্চার করেছিল। পরমাওয়ালা বাপ মাদের উপরোধ রক্ষার্থে কম ধোকাখুহুদের সংগে তাঁকে আসরে বসতে হয়নি; কিন্তু আসরে তাঁর মুখ দেখলে মনে হত যেন তিনি রোশেনারা বেগম বা দস্তায়েয় পলুড়ের সংগে বাজাচ্ছেন। এমনই ছিল তাঁর বাজনার সংবেদনা।

সংগীত যে স্বর এবং তালের সংমিলন এই বিশ্বাস যেন তাঁর-হাসি-হাসি মুখের প্রতিটি তারিকে ছুটে উঠত। নামী না অনামী গায়কের সংগে সং-গত করছেন এ চিন্তা তাঁকে কোনদিন রিষ্ট করত না। অথচ এ নিয়ে সাধারণ গাইয়ে-বাজিয়ে পর্যন্ত কত না ঝামেলা বাঁধান। বীক মিশ্রের, মোলবীরামের বা নসু খাঁর সংগতের কিংবদন্তী শুনেছি; হবিবুদ্দিন, সামসুদ্দিন কঠে মহারাজ, আনোখেলাল বা খেরেকোয়া সাহেবের বাজনা আমরা শুনেছি, কিন্তু গান বা বাজনার সংগে মিশে গিয়ে (তার উপর চড়াও হয়ে নয়) বড়, মাকারী, ছোট সকল শিল্পীকে অহু-প্রেরিত করতে পারতেন কেবল একজন তবলিয়া—তাঁর নাম কেরামৎ-উল্লা খাঁ।

কয়েক বছর আগে ক্যালকাটা মিউজিক মার্কেল আয়োজিত উপরাগ-সঙ্গীত সম্মেলনে উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রসদনে গজল-দাদরা গাইছিলেন বেগম আখতার। সংগে ছিলেন কেরামৎ খাঁ সাহেব। সামান্য দাদরা-কাহারবার রেলা এবং লগুপি বাজাচ্ছিলেন খাঁ সাহেব। তাই শুনে শুনে গান গাইতে ভুলে গেলেন বেগম আখতার। তালেরও যে তাঁর হয় এবং তারও যে একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে এবং তা যে সংগীতকে আরো চিত্তাকর্ষক করতে পারে, তা যে বোঝে সে ই তো সত্যিকারের সম্বন্ধ-দার; এবং তা যে হাতের টোকার ফোটাতে পারে সেই তো সত্যিকারের তালবাজের শিল্পী।

তবলার পণ্ডিত ভারতবর্ষে কখনও কম ছিল না। এখনও নেই, ভবিষ্যতেও হয়তো থাকবে না। কিন্তু কেরামৎ সাহেবের শিল্প আসন। কখনো পূর্ণ হবে কিনা সন্দেহ। ৩১ বছরের যত্নকে আজকালকার দিনে অকাল যত্নই বলতে হয়। তবে শিল্পপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে তবলা বাজনার যে নতুন রীতি তিনি প্রবর্তন করে গেছেন তার মধ্যেই তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

পুলিশ কমিশনারকে আগে জানানো সত্ত্বেও নাবিকদের ওপর গুণাদের হামলা

(দুর্গাপুর সংবাদদাতা)

পুলিশ কমিশনারকে আগে জানানো সত্ত্বেও ১৭ই নভেম্বর আবার এম-ডি "স্টেট অব উত্তর প্রদেশ" জাহাজের নাবিকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের আলোচনার সময় মালিক পক্ষ ও ভারত সরকারের প্রতিনিধি শিপিং-মাস্টার'ও প্রিন্সিপাল অফিসারের সামনে করওয়ার্ড সীয়েন্স ইউনিয়নের আলোচনার তিনজন প্রতিনিধির উপর আচমকা ছোরা মারামারি ও খুন-খবরের প্রচেষ্টা চালানো হয় নিম্নলিখিত নামী গুণা সমাজ-বিরোধীদের দ্বারা তালতলার "জাহির", অজিত চক্রবর্তী, বিজয় মুখার্জী, কালীলাল সাউ, কালিপদ রায়, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (ছলু), তালতলার ব্রাক হারি, সমীর চক্রবর্তী, সুনীল দাস, এস, গুহ,

কেরামত সাহেবের এই স্টাইল ফরাকাবাদের হয়েও একটু আলাদা, এমন কি তাঁর পিতা মসিহ খাঁ থেকেও তা স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য শিল্পীর নিজস্বতা। ঘরানার সাধারণ গুণের অধিকারী হয়েও কোন কোন বিষয়ে তা আলাদা। এইখানে পিতা এবং পুত্র, ঘরানা এবং ষ্টাইলের পার্থক্য।

তালতলার খনা, নির্মল রায়, আর, কে, নাথ, পি, কে, দে, ওয়াটগঞ্জ স্ট্রিটের মুস্তাফা, ওয়াটগঞ্জ স্ট্রিটের বাচ্চু সহ ২০০ সমাজ বিরোধী এবং যাদের নেতৃত্বে ছিলেন কংগ্রেসী জাশনাল ইউনিয়ন অব সিয়েন্স অব ইণ্ডিয়ার দুই কুখ্যাত নেতা।

নাবিকদের উপর এবং এই ইউনিয়নের ও কর্মীদের উপর এই ব্যাপক ও মারাত্মক আক্রমণের সহযোগী শক্তি হিসাবে ইচ্ছন যুগিয়েছিলেন উপশিপিং মাস্টার জিভি, পি. চ্যাটার্জী, প্রিন্সিপাল অফিসার জিজে, কে, বোস, মেরিন হাউসের পুলিশ অফিসারেরা যথাক্রমে জিএস, ঠাকুর, জিজি, তরফদার জিবি, সাহা, জিজে, সাহা। করোয়ার্ড সীয়েন্স ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়ার পক্ষ থেকে এই অভিযোগ করা হয়েছে।

ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে,

বসন্তবাড়ি নির্মাণ

রেফা: নং জি এম / কেণ্ডা / ই ই (সি) / টেণ্ডার / ১৩৬১ তাং ২৬.১১.৭৭
আনিতারী ও বৈজ্ঞানিক, জল সরবরাহ ব্যবস্থা সহ বসন্তবাড়ি নির্মাণের জন্য প্রখ্যাত ও অভিজ্ঞ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কন্স্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে শতকরা ভিত্তিতে সীল করা টেণ্ডার। কাজের নাম ও স্থান, ইউনিটের সংখ্যা, অঙ্কমিত খরচ, বায়নার টাকা ও সম্পূর্ণ করার সময় নিম্নরূপ: (১) বহলা কোলিয়ারী, ৩২নং, এন এইচ এস, ৩,২৫,৫৩৪ টাকা, ৩২৫৬ টাকা ও ২ মাস; (২) বহলা কোলিয়ারী, ৮নং, বি টাইপ, ১,৭২,০৪৭ টাকা, ১,৭১১ টাকা ও ২ মাস; (৩) নিউ কেণ্ডা কোলিয়ারী, ৪নং এ টাইপ ও ৪নং বি টাইপ ও ২নং বি টাইপ, ২,২৪,০২২ টাকা, ২,২৪১ টাকা ও ২ মাস; (৪) কৃষ্ণনগর, ৪৮ নং এন এইচ এস, ৫,২৩,০০০ টাকা, ৫২৩৩ টাকা ও ১২ মাস, (৫) সি এল জাহাদ, ৪৮নং এন এইচ এস, ৫,২৩,০০০ টাকা, ৫২৩৩ টাকা ও ১২ মাস; (৬) লোয়ার কেণ্ডা, ৩২ নং, এন এইচ এস, ৩,২৫,৫৩৪ টাকা, ৩২৫৪ টাকা ও ২ মাস, (৭) এরিয়া হেড কোয়ার্টার্স, ৮নং বি টাইপ ও ৪নং সি টাইপ, ৩,১১,০৬৫ টাকা, ৩১১১ টাকা ও ১২ মাস।

জেনারেল ম্যানেজার, কেণ্ডা এরিয়া পো: বহলা (বর্ধমান)-এর অফিস থেকে ২১.১২.৭৭ তারিখ থেকে ৩.১.৭৮ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে (শনিবার ছাড়া) বিকেল ৪টা পর্যন্ত টেণ্ডারপত্র পাওয়া যাবে কেণ্ডা এরিয়ার ক্যান্স অফিসে প্রতি সেটের জন্য ২৬-২৫ টাকা (বিক্রয় কর সমেত) নগদে দিয়ে (অপ্রত্যাশযোগ্য)। ধারা ভাঙে টেণ্ডারপত্র পেতে চান তাঁদের মনিঅর্ডারে ৫ টাকা অতিরিক্ত পাঠাতে হবে। ভাঙে টেণ্ডার দলিল পৌছতে দেরী হলে তার দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে না। টেণ্ডার দলিল নং, কাজের নাম, বায়নার টাকা জমা দেবার বিবরণ, টেণ্ডার খোলার তারিখ ও সময় উল্লেখ সহ সীল করা খামে টেণ্ডার গ্রহণ করা হবে ৪. ১. ৭৮ তারিখ বেলা ২-৩০ পর্যন্ত এবং ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতা অথবা তাঁদের অহুমোদিত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ৫ দিন বেলা ৩টায় টেণ্ডার খোলা হবে। টেণ্ডারপত্রে উল্লিখিত যে কোন অহুমোদিত উপায়ে বায়নার টাকা জমা দিতে হবে। টেণ্ডার খোলার তারিখ থেকে চারমাস টেণ্ডারের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এরিয়া সিভিল ইঞ্জিনিয়ারে অতীত অভিজ্ঞতা ও সংগতি সম্পর্কে ধারা সন্তোষজনক প্রমাণপত্র দেখাতে পারিবেন সেই রকম ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাদেরই কেবল টেণ্ডারপত্র দেওয়া হবে। বায়নার টাকা জমা দেওয়ার প্রমাণহীন টেণ্ডার বাতিল করা হবে।

ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে

তৈল ও লুব্রিক্যান্ট সরবরাহ

টেণ্ডার নং ও আই / ই সি এল / পি ইউ আর / পি ও এল / ৭৭ / ৬৫
বিভিন্ন গ্রেডের তৈল ও লুব্রিক্যান্ট সরবরাহের জন্য কেবলমাত্র সাম্রায়ারদের কাছ থেকে টেণ্ডার নম্বর ও নির্দিষ্ট তারিখ দিয়ে দু কপি সীল করা টেণ্ডার, পরিমাণ স্পেসিফিকেশন অহুমায়ী, টেণ্ডার ফি ৫০ টাকা, টেণ্ডার জমা দেবার শেষ দিন ৫. ১. ৭৮ তারিখ বেলা ১টা এবং যা ৫ দিন বেলা ৩টায় খোলা হবে।

নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন ও সরবরাহের শর্তাবলী সহ টেণ্ডার দলিলপত্র কন্ট্রোলার অফ পারচেজ, ইষ্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড, সাকতোরিয়া, পো: দিশেরগড়, জেলা বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)-এর অফিস থেকে যে কোন কাজের দিনে একই অফিসে অ্যাডিশনাল কন্ট্রোলার অফ অ্যাকাউন্টসের কাছে নগদ টাকায় নির্দিষ্ট ফি জমা দেওয়ার রসিদ দেখিয়ে পাওয়া যাবে। মনিঅর্ডারে একই ঠিকানায় অ্যাডিশনাল কন্ট্রোলার অফ অ্যাকাউন্টসের কাছে পাঠানো নির্দিষ্ট ফি গ্রহণ করা হবে যদি তার সঙ্গে টেণ্ডার দলিলপত্র পাঠাবার জন্য ডাক খরচ হিসেবে অতিরিক্ত ২ টাকা (দুই টাকা) অথবা টেণ্ডার অহুমায়ী আরও বেশী পাঠানো হয়। এই মনি অর্ডারে যেন টেণ্ডার নং ও নির্দিষ্ট তারিখ সহ টেণ্ডারদাতার সম্পূর্ণ ঠিকানা দেওয়া হয়। টেণ্ডার জমা দেবার নির্দিষ্ট দিনের ১৫ দিন আগে প্রাপ্ত মনিঅর্ডারই কেবলমাত্র গ্রাহ্য হবে। টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখের তিন দিন আগে টেণ্ডারপত্র ভাঙে পাঠানো হবে। ভাঙে পৌছতে বিলম্বের জন্য ইষ্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড দায়ী হবে না। পোস্টাল অর্ডার / ব্যাঙ্ক ড্রাক্ট / চেকে পাঠানো টেণ্ডার ফি গ্রহণ করা হবে না।

একটি উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্র

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্দীমুক্তি এবং অত্যাচার ও শোষণ থেকে মুক্তির আন্দোলন আজ নয়, সেই পরাধীন ভারতের দুঃস্বপ্ন থেকেই সোচ্চার হয়ে বেজেছে দেশ-বাসীর মর্মস্থলে। সেই মুক্তির আকৃতি, মুক্তির সেই দাবী অর্ধশত বছরের ওপর কেটে গেলেও অতৃপ্ত অপূর্ণতায় এবং শাসকের সীমাহীন উপেক্ষায় আজও তা সংগ্রামী চেতনায় উচ্চকিত হয়ে ওঠে নগরে ও বন্দরে। এমনই এক উদ্দীপ্ত প্রসঙ্গ নিয়ে উৎপলেন্দু চক্রবর্তী নির্মাণ করেছেন এক উল্লেখ্য তথ্যচিত্র 'মুক্তি চাই'। এ ছবিতে তাঁর একাধিক কৃমিকা। প্রযোজনা, চিত্রনাট্যরচনা ও সংগীত পরিচালনাও তাঁর। সম্পাদনা করেছেন গঙ্গাধর নন্দর ও পরেশ ঘোষ। চিত্রগ্রহণে আছেন সঞ্জয় ব্রহ্ম ও শেখর তরফদার। কণ্ঠ-সংগীতে স্বর দিয়েছেন মলিল চৌধুরী। গ্রহণার আছেন রুজ্জুসাদ সেনগুপ্ত। সম্প্রতি রব্বি মিনিয়া-চারে ছবিটির এক বিশেষ প্রদর্শনী হয়।

ছবির প্রথমই আলীপুরের স্থান। সেখানের জাতীয় গ্রন্থাগার, চিড়িয়া-খানা ও সেন্ট্রাল জেল পর পর

দেখানো হয় বিশেষ অর্ধবহু দৃষ্টি-ভঙ্গীতে। এই তিনের সহাবস্থান ছবিটির সূচনাতেই যে তাঁৎপর্ষ ও ব্যঙ্গনা সৃষ্টি করে তা রীতিমত চমক-প্রদ। সেই ব্রিটিশ শাসনকালে ইংল্যান্ড 'রাউলার্ট আইন'কে কেন্দ্র করে যে তীব্র উত্তেজনা ও আন্দোলন উদ্ভাবিত করে তুলেছিল ভারত-বাসীকে, বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তির জন্য যে প্রচণ্ড ক্ষোভ জন-মানসকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল, তারই কিছুটা আভাস দিয়ে 'মুক্তি চাই' প্রসঙ্গের শুরু। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ, শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'-র রাজরোষে নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি বিষয়ও ছবিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে। পরবর্তী কালের নির্ধাতন ও বিক্ষোভের নমুনাও কিছুটা পাওয়া যায়। কংগ্রেসী আমলের অনাচার ও দুঃশাসনের পরিচয় ছবিতে তেমন জোরালো হয়ে ফোটেনি, যেমন ফোটেনি সে সবার বিরুদ্ধে তীব্র জনমত। তবে প্রধান-মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশ্যে স্ববস্তুটি উচ্চারণের পাশে পাশে নব অত্যাচার আর শোষণের ছবি তুলে ধরায় যে

তীব্র ব্যঙ্গ আর 'কটাক্ষ' প্রকাশ পেয়েছে, তা বিশেষভাবেই উল্লেখের দাবী রাখে। ছবিতে যুক্তকণ্ঠ আমল ও তারপর এখানে কংগ্রেসী অপশাসন ও শেষে কংগ্রেসের পতন পর্যন্ত ঘটনার ছায়া চিত্রটিতে থাকলেও তেমন দানা বাঁধেনি। ছবীর লেখা ছোট তথ্যচিত্রে সে ব্যাপ্তি ও গভীরতা নিশ্চয়ই আশা করা যায় না। তবুও বলব, প্রসঙ্গের পশ্চাদপটে অত সুদূর ঘটনাকে তেমন প্রাধান্য না দিলেও চলত। তবে যুগে যুগে বিদেশী ও স্বদেশী শাসকের আমলে কারাবন্দীর মুক্তির জন্য, পীড়ন ও শোষণ থেকে পরিজ্ঞানের জন্য দেশ-বাসীর স্বতীর্ষ আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনার আন্তরিক চিত্রায়ন আলোচ্য চলিত চিত্রটিকে মূল্যবান করেছে সম্বন্ধে নেই। আবহ ও কণ্ঠসংগীত ছবিতে এক অতিরিক্ত মাত্রা যুক্ত করেছে। কটোপ্রাকীর মান আরও উন্নত হওয়ার অপেক্ষা রাখে। ক্রটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও জনগণের দাবীর মর্মস্পর্শাতক এ জাতীয় তথ্যচিত্র নির্মাণের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

যাত্রা সম্মেলন

কল্যাণ সমিতির পরিচালনায় আগামী ১১শে ডিসেম্বর শনিবার কাকুরগাছি সি, আই, টি, পার্কে (বড়) পূর্ব কলিকাতা যাত্রা সম্মেলনে শুরু হচ্ছে। গত ৪, ১২, ১৭ তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্বোধনাদেয় পক্ষ থেকে সভাপতি শ্রীঅনিল রায় ও যুগ্মসম্পাদক শ্রীঅমলেশ মিত্র জানান গত 'হু' বৎসর যাবত 'হু' ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যার্থে এই যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত বছর তারা স্থানীয় সাতটি বিদ্যালয়ের 'হু' ছাত্র-ছাত্রীকে আর্থিক সাহায্য দিতে পেরেছেন। এ বছরও তারা আরো অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীকে সাহায্য করার আশা রাখেন। শ্রীমিত্র জানান যে সমিতি অজ্ঞের বঙ্গ-পীড়িত আর্থ জনগণকে সাহায্য করার জন্যও এক প্রয়াস গ্রহণ করেছে। তাদের ইচ্ছা উক্ত সংগৃহীত অর্থ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর হাতে অর্পণ করার। এই যাত্রা সম্মেলনের উদ্বোধন অহুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে পশ্চিমবঙ্গের পৌরমন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত শ্রী, সভাপতি রূপে শ্রীহরম মল্লিক চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীবলাইচাঁদ মুখার্জী (বনফুল) এবং শ্রীকুমারেশ ঘোষ। এই যাত্রা উৎসব চলবে সাত দিন। দর্শক আসন চার হাজারের মত।

কৃষিমেলার রাজনৈতিক বক্তব্য

(দর্পণের প্রতিনিধি)

দিল্লীতে এখন যে কৃষিমেলা চলেছে (এপ্রি-এক্সপো ৭৭) তাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও অংশ নিয়েছেন। সারা মেলা প্রাক্ষেপে চোখ ধাঁধানো আলোর বলকানি। নানান রাজ্যের প্যাভিলিয়ন বা মণ্ডপ হাজির করেছে তাদের কৃষি অগ্রগতির নানান প্রদর্শনী। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে গড়ে উঠেছে এক একটা মণ্ডপ। আলো, মডেল, যন্ত্রপাতির কায়দায় সবার মধ্যে পড়ে গেছে একটা প্রতিযোগিতা—কোন রাজ্যের প্রাচুর্য কত, কোন রাজ্যের কৃষক কতটা ধনী। কিন্তু এত করেও কোন রাজ্যই দরিদ্র কৃষকের বা কৃষি অর্থনীতির গভীরে যেতে পারেন নি। তাই পশ্চিমবঙ্গের মণ্ডপ এক সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদ এনে দিয়েছে দর্শকদের কাছে। এই মণ্ডপে চুকেই ধমকে দাঁড়াতে হবে। মণ্ডপ ছেড়ে যখন বেরিয়ে যাবেন তখনও আবার দাঁড়াতে হবে—কোথায় যেন চিন্তার গোড়ায় একটু নাড়া লাগে। পশ্চিম-বঙ্গের বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার তাঁদের নিজস্ব রাজনৈতিক বক্তব্যই তুলে বেরিয়েছেন এই প্রদর্শনীতে। দর্শককে নিয়ে গেছেন গভীরে—বাংলার বিশাল কৃষক সমাজের হোরগড়ায়। বাংলার কৃষকের দারিদ্র্য গত ত্রিশ বছরে যেচে নি তো বটেই বরং তাঁরা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছেন। আর মুষ্টিমেয় ধনী জমিদার-জোতদার মহাজন আরও ধনী হয়েছেন। এই শোষণ নতুন নয় দীর্ঘদিনের। আর এই শোষণের বিরুদ্ধে তিতুমির-সাঁও-তাল বিদ্রোহ-নীল বিদ্রোহ-তেভাপা ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে কৃষকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। কৃষকের এই লড়াই এখনও চলেছে বতই তার ওপর আক্রমণ আহুক না কেন।

১৯৭১ সালে কৃষক মিছিলের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের বিরাট ছবি তারই সাক্ষ্য দেয়। এই ছবিতে আহত একজন কৃষকের লুটিয়ে পড়া দেহের কাছে একটা পোষ্টারে লেখা আছে "গণতান্ত্রিক প্রণায় ভূমিসংস্কার চাই"। ধারা এই মণ্ডপটির পরি-কল্পনা করেছেন তাঁরা চমৎকারভাবে বার বার এই পোষ্টারটি বিভিন্ন সাইকে এবং বিভিন্ন প্যানেলে ব্যবহার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন বর্তমান সরকারের মূল বক্তব্য—ভূমি সংস্কার ছাড়া কৃষকের মুক্তি নেই। ইতিহাসের বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহকেও এঁরা হাজির করেছেন এক অভিনব

উপায়ে। এঁরা তুলে বেরিয়েছেন কি ভাবে বাংলার শিল্পীসমাজ কৃষক সং-গ্রামকে রূপায়িত করেছেন। "বিশেষ কেলা", "নীলদর্পণ", "মুখর অভিযান" এবং "অহল্যা" প্রভৃতি চলচ্চিত্র, নাটক ও ব্যালের স্বিরচিত্র এঁরা ব্যবহার করেছেন একটা হিষ্টি-ক্কে ট্রান্সলাইটের মাধ্যমে। মণ্ডপের একটি দিকে ট্রান্সলাইটের সাহায্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অতৃতপূর্ব গম-বিপ্লব ঘট-য়েছেন বাংলার কৃষক। গমবিপ্লবের শেষ চিত্রে দেখানো হয়েছে এই বিপ্লবীদেরই শিবুরা লক্ষরখানায় কুটি খাচ্ছে। সাতটি প্যানেলে পশ্চিম-বঙ্গের কয়েকটি প্রধান উপাদানের অগ্রগতিও দেখানো হয়েছে। এতে অবশ্য বলা হয়েছে চা এবং তামাকের আয় কিভাবে কেন্দ্রের কোষাগার পূর্ণ করেছে রাজ্যের ভাণ্ডার শূন্য করে। বামপন্থী সরকারের ৩৬ দফা কর্ম-সূচীর মধ্যে ভূমি-সংস্কার ও কৃষকের জন্য যে কর্মসূচী এবং এখনও পর্যন্ত এই সরকার কি কি করেছেন তার একটি ভিউয়াল (বক্স-পিরামিড) এক উচ্চ শিল্পবোধের পরিচয় দেয়। যড়ভূজ-চৌকোণ এবং ত্রিকোণের তিনটি মোবাইলে কৃষি অর্থনীতি এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপ্রকল্পকেও তুলে ধরা হয়েছে। শেষের দিকে বাংলা কি ছিল, কি হয়েছে এবং কি হতে পারে তা দেউস্কর, রমেশ দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, মুহুম্মদাস, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, শরৎচন্দ্র ও বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষীদের উদ্ধৃতি দিয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপে উপস্থিত করা হয়েছে। মণ্ডপের মাঝ বরাবর সং-গ্রামী কৃষকের আবক্ষ মূর্তিটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সংগ্রামী কৃষকের মুরালের পটভূমিকায় রাখা নোটেশন টেবিলের চওে স্বাধীনতাউত্তর যুগের কৃষক আন্দোলন বা, শোষণ যন্ত্রের যুগ যুগ ধরে হাত বদলের বাস-রিলিফের কাজ অপূর্ণ। মণ্ডপ থেকে বের হবার মুখে পেটের ওপরে যে বলিষ্ঠ মুরালটি আছে তাতে আবার মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন সংগঠিত কৃষকসমাজের নেতৃত্বে ভূমি সংস্কারই হচ্ছে একমাত্র মুক্তির উপায়। পশ্চিমবঙ্গের সরকার সাহ-সিকতার সঙ্গে পশ্চিম বাংলার কৃষি অর্থনীতিকে যে নির্মল সত্যের সঙ্গে হাজির করেছেন, এতো আশু শুধু এই রাজ্যের নয়—সারা দেশের। স্বভাবতই এবারের পশ্চিমবঙ্গ মণ্ডপটি রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এমন কি এর বিষয়বস্তুতে অনেকেই অবশিষ্টবোধ করেছেন।

শর্মা সরকার তদন্ত কমিশনের কাছে

১৬ ডিসেম্বর (১৯৭৭)-এর মধ্যে আপনাদের অভিযোগ পেশ করুন

১৯৭০ সালের ২০ মার্চ থেকে ১৯৭৫ সালের ৩১ মে পর্যন্ত, এই সময়ের মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচার অপব্যবহার বিষয়ে তদন্তের জন্য পশ্চিম-বঙ্গ সরকার কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীজি, শর্মা সরকারকে নিয়ে যে তদন্ত কমিশন গঠন করেছেন, তার বিবেচ্য বিষয় ইতিপূর্বেই বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সংবাদপত্র ও অন্যান্য জনসংযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে।

অভিযোগ দাখিল করবার জন্য কোনো ছাপানো ফর্ম নেই। ইতিপূর্বে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে যে ভাবে অভিযোগ দাখিল করবার কথা বলা হয়েছে, তদনুসারে অভিযোগকারীরা নানা কাগজে তাঁদের অভিযোগ লিখে পাঠাতে পারেন। সেই অভিযোগ নিয়ন্ত্রিত ঠিকানায় রেজিস্ট্রী ডাকে এমনভাবে পাঠাতে হবে যাতে তা ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭৭)-এর মধ্যে পৌছয়; তাছাড়া ঐ তারিখের মধ্যেই যে কোনো কাজের দিন বেলা ১১টা থেকে বিকেল চারটের মধ্যে হাতে হাতে জমা দেওয়াও চলবে:—

"সচিব, শর্মা সরকার তদন্ত কমিশন,

বিধানসভা ভবন, পরিষদ কক্ষ, কলিকাতা-১"

বর্তমানে কোনো শপথপত্রের প্রয়োজন নেই; তবে কমিশন প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সত্যপ্রমাণের প্রয়োজন হবে।

নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন * সত্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করুন * ভবিষ্যতে যাতে আর কোনো ক্ষমতাসীন দল এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি না করতে পারে তা সুনিশ্চিত করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচারিত

সম্পাদক—স্বর্নেন বসু

প্রকাশক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১ আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র রোড কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৩১ মট সেন কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

জনতা পার্টিতে উগ্র কমিউনিষ্ট বিরোধীরা জোট বাঁধছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

সর্বভারতীয় জনতা পার্টিতে উগ্র কমিউনিষ্ট বিরোধীরা জোট বাঁধছে যাদের মধ্যে অধিকাংশই জন-সংঘ ও আর এস এসের লোক। এই উদ্দেশ্য নিয়েই উগ্র জনসংঘী হার্ডাড ফেরত ডঃ স্বরঞ্জনিয়ম স্বামী কল-কাতায় এসেছেন। দর্পণের পাঠক-দের হস্ত মনে আছে এই স্বামীজীই লোকসভা নির্বাচনের পর কলকাতায় এসে ছফার ছেড়েছিলেন যে, ভারত-বর্ষে কমিউনিজমের স্থান নেই।

কমিউনিষ্ট বিধেয়ী প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে স্বরঞ্জনিয়ম স্বামীর সাক্ষাৎ এবং শ্রীসেনকে সার্টফিকেট দান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের সঙ্গে জনতা পার্টির সম-ঝোতা প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রফুল্ল সেনের রাজনীতি একটি মাত্র বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। সেটি হল যে কোন উপায়ে সি পি এম বিরোধিতা। তার জন্ত জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা বলা, কুখ্যাত ব্যক্তিদের গণ্যমান্ত্রণে ঘোষণা করা, নিজের দলের লোকদের হেয় করা ইত্যাদি কোনকিছতেই প্রফুল্ল সেনের কুঠা নেই। এর ফলে রাজ্য জনতা পার্টি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত, কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বিরূপ। কিন্তু প্রফুল্লবাবুর কোনদিকে ছাঁশ নেই, তিনি লাজ-লজ্জার মাথা খেয়েছেন আর বোধ হয় ঠিক করেছেন এই রাজ্য থেকে জনতা পার্টিকে উঠিয়ে ছাড়বেন। তিনি সি পি এম বিরোধিতায় এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন যে, সেদিন বলেই ফেললেন লোকসভার নির্বাচনেও

নাকি তিনি সি পি এমের সঙ্গে সম-ঝোতার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু মজার কথা, সি পি এমের দ্বায় পাওয়া আরামবাগ লোকসভার আসনটি তিনি ছাড়তে নারাজ। তাছাড়া তিনি ঐ কেন্দ্রের ভোট-দাতাদের প্রতিও তাঁর কর্তব্য পালন করছেন না। কারণ তিনি লোক-সভার অধিবেশনে যোগদান করেন না।

এই অবস্থায় প্রফুল্ল সেনের কার্যকলাপ সম্পর্কে স্বরঞ্জনিয়ম স্বামীর প্রশংসা-বাক্য বোধশক্তিহীন জানোয়ারেরও হাসির উদ্ভেক করবে। কিন্তু ব্যাপারটা হাসির নয়, বিপজ্জনক রাজনৈতিক তাৎপর্ষের ইঙ্গিতবহ। কারণ স্বরঞ্জনিয়ম স্বামীর গতিবিধি জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতারা তালা চোখে দেখছেন না। কিন্তু জনতা পার্টির মধ্যেই তাঁর বহু সমর্থক রয়েছে যারা উগ্র কমিউনিষ্ট বিধেয়ী, সাম্প্র-দায়িক ও মার্কিন প্রেমী। স্বামীজীর জনতা পার্লামেন্টারী এল্লিকিউন্ডে নির্বাচনই একধার প্রমাণ। এবং এটা পরিষ্কার, কেন্দ্রীয় জনতা নেতৃবৃ-যখন প্রফুল্ল সেনের কার্যকলাপকে ষিকার জানাচ্ছেন তখন স্বরঞ্জনিয়ম স্বামীর কলকাতায় ছুটে এসে প্রফুল্ল সেন ও সাক্ষোপাঙ্গদের সঙ্গে জোট বাঁধার একমাত্র উদ্দেশ্য ঐ গোষ্ঠীকে জোরদার করা।

কিন্তু তাঁর গতিবিধি ও কার্য-কলাপের দীর্ঘকালব্যাপী পর্যবেক্ষক (শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

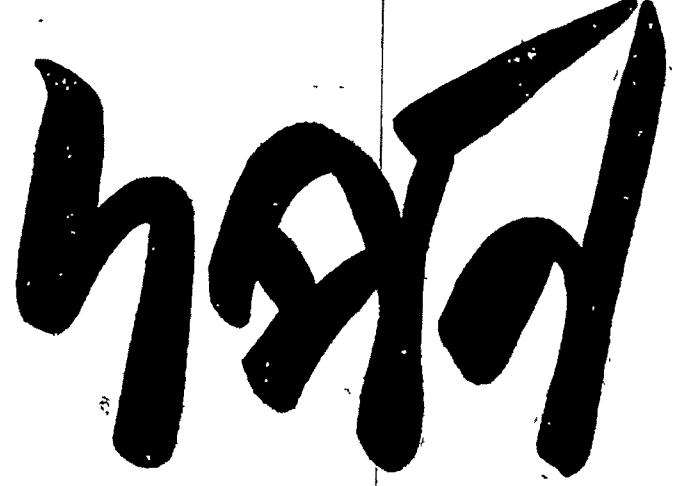
'আমূল পরিবর্তন আনতে গেলে কোটি কোটি মানুষকে জড়ো করতে হবে'

গোপালনের স্মৃতিসভায়

জ্যোতি বসু

(দর্পণের প্রতিনিধি)

শুক্রবার রবীন্দ্র সরোবর হলে অল্পশ্রুতি গোপালন স্মৃতিসভা কমিটির সভায় মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির পলিটবুরো সদস্য, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী জ্যোতি বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "মানুষ আমাদের ক্ষমতায় বসিয়েছেন এ কারণে যে, তাঁরা সমাজতন্ত্র চান। ক্ষমতায় বসার (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)



বিশ্ব বর্ষ ৪৫শ সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠা ১৬ই ডিসেম্বর, ৭৭ ৪০ পৃষ্ঠা

ইন্দিরা কংগ্রেসকে আবার ভাঙছেন

(বিশেষ প্রতিনিধি)

কংগ্রেস আবার ছুঁকরো হচ্ছে। আত্মগোপন ঘোষণা শুধু বাকি। বিশ্বস্তহুত্রে জানা পেল কংগ্রেস সপ্তা-হের মধ্যেই ইন্দিরা গান্ধী এ আই সি সি সদস্যদের জরুরী বৈঠক ডাকছেন এবং সেখানেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। বেশ কিছুদিন কংগ্রেস রাজ-নীতি জোড়াতালি দিয়ে চলার পর এখন একেবারেই অচল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। যারা এতদিন বগড়া মিটিয়ে ফেলার জন্য উভয় পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন তাঁরাও ক্লাস্ত। এখন শুধু কংগ্রেসের উভয় গোষ্ঠী তাদের নিজস্বের দিকে বেশী সংখ্যায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের কংগ্রেস নেতা-দের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করছেন।

সবচেয়ে ব্যস্ত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তার বারো নম্বর ওয়েলিং-ডন ক্রিসেন্ট রোডের বাড়ীতে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত শলাপরামর্শ

চলছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে তার সমর্থক নেতৃবৃন্দ ঘনঘন এসে পরবর্তী কার্যক্রমের নির্দেশ নিয়ে যাচ্ছেন। আর এই আলোচনা চলার সময় শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে থাকছেন কমলা-পতি জি পাঠী, এ আর আনতুলে, এ পি শর্মা, তারকেশ্বরী সিনহা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

শ্রীমতী গান্ধী দলকে নিজের কন্ডায় রাখার জন্য সব চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার তিক্ত অভিজ্ঞতা অথও অব-স্থায় তা সম্ভব নয়। এদিকে চট করে দল ভাঙার মধ্যে গেলে দলীয় কর্মী-দের মধ্যে এ ধারণা জন্মাতে পারে যে শ্রীমতী গান্ধীই দল ভেঙে দিলেন যা তার পক্ষে স্বপ্নের কথা হবে না। তাই তলবী সভা প্রত্যাখার করে, ওয়ার্কিং কমিটির আবার বৈঠক দাবী করে তিনি কর্মীদের মধ্যে এ ধারণা জন্মাতে চাইছেন যে, কংগ্রেসের সভাপতির অনমনীয় মনোভাবের জন্তই দল ভেঙে যাচ্ছে।

গত সপ্তাহে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দশজন সদস্য শ্রীমতী গান্ধীর বাড়ীতে আলোচনার বসেছিলেন পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করার জন্য। বৈঠকে উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যই এ আই সি সি সদস্যদের তলবী সভা ডাকতে বলেছেন। আর সেই সভা-তেই নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করা হবে বলেও ঠিক হয়েছে।

এখন চেষ্টা চলছে লোকসভার বিরোধী নেতা ওয়াই বি চাবনকে দলে টানার। এই জন্তই কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ উরস একবার প্রত্যাখ্যান করেও আবার নিজেই চাবনের সঙ্গে আলোচনা করছেন।

এদিকে কংগ্রেস সভাপতি ব্রহ্মা-নন্দ রেড্ডী ও তার সঙ্গী সিদ্ধার্থ রায়, দেবকান্ত বরুয়া, রজনী প্যাটেল প্রমুখ ঘনঘন বৈঠক করছেন কিস্তাবে ইন্দিরার গোষ্ঠী থেকে লোক ভাঙিয়ে আনা যায়।

বরাচক হত্যাকাণ্ড নিয়ে রাজনৈতিক ফাটকাবাজী চলছে

সাধন গুহ

গত ২৩শে নভেম্বর আসানসোল শহরের অদূরবর্তী বরাচক গ্রামসংলগ্ন দূর বিস্তৃত উচুনীচু মাঠের নির্জন প্রান্তে অবস্থিত একটি পরিত্যক্ত কয়লাখাদ থেকে দুইটি মুণ্ডহীন দেহসহ চারটি মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করেছে। নিহতদের বিধবারা দেহ গুলো সনাক্তকরণের পর সেগুলো পোষ্ট মর্টেম করে আত্মীয়দের হাতে কিসিয়ে দেওয়া হয় এবং যথা-রীতি তাদের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এ সম্পর্কে প্রাথমিক তদন্ত শেষে পুলিশ

সমাজবিরোধী বলে বর্ণিত ৪ জনকে এবং বরাচক গ্রামের ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ডি, এস, পি (হেড কোয়ার্টার) শ্রীমানকৃষ্ণ বায়, ডি, এস, পি (ক্রাইম) শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ, ডি, আই, ও (টু) শ্রীঅনিল মুখার্জী, আসানসোলের ইন্সপেক্টর ইনচার্জ শ্রীদেবী দত্ত প্রমুখ সব পুলিশ অফিসারই বলেছেন যে, এই হত্যা-কাণ্ডের নেপথ্য রহস্য ও উদ্দেশ্য নির্ধা-রণের প্রাথমিক ভিত্তিটা তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন এবং মূল স্ত্রুটি তাঁরা খুঁজে বের করতে বদ্ধপরিকর।

এটা পুলিশের বক্তব্য। পক্ষা-

স্তরে আসানসোলের কোন কোন রাজনৈতিক মহল অভিযোগ করেছেন যে, এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তে পুলিশ পক্ষপাতিত্বের দোষে ছুট এবং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত করে আসান-সোল পুলিশ নির্দোষদের নিগূহীত করেছে এবং নিহতদের বিধবাদের ধানায় ধরে এনে দৈহিক নির্ধাতন করা হয়েছে। স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা "লিপি" ১৫ ডিসেম্বর ৭৭ সংখ্যায় এটিকেই সংবাদ শিরোনাম করে লেখা হয়েছে, "এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীদেবরঞ্জন সেন এম, এল, এ

আসানসোল এসেছিলেন এবং তিনি বিধবাদের ওপর ধানায় অত্যাচারের অভিযোগ করেছেন বলে ডেপুটি স্পার জানান।" এই কাগজে নিহত ৪ জনকে হরিজন বলে আখ্যাত করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ ঘটনার বয়ান হিসেবে নিহতদের ৩ জনের জীব বক্তব্যকে হুবহু তুলে ধরা হয়েছে।

বিস্ময়ের কথা এই যে, কলকাতার দুই বাজারী কাগজের স্থানীয় সংবাদ-দাতারাও একই কায়দায় নিজ নিজ কাগজে বার্তা প্রেরণ করেছেন এবং তা ফলাও করে প্রচারিতও হয়েছে। বলা দরকার এই ডিসেম্বর আনন্দ-

বাজারের স্থানীয় সংবাদদাতা ডঃ জয়গোপাল শর্মা, অমৃতবাজার-বৃগান্তরের স্থানীয় প্রতিনিধি শ্রীশিব-সনাতন বন্দ্যোপাধ্যায়, (ইনি আকাশবাণীরও প্রতিবেদক) সত্যযুগের স্থানীয় প্রতিনিধি এবং স্থানীয় সংবাদ সাপ্তাহিক "পর্ববেক্ষক"-এর সম্পাদক শ্রীশীল মালগুণী, "আসানসোল বাণী" নামক স্থানীয়-সংবাদ সাপ্তাহিকের সম্পাদক শ্রীসুধা-কৃষ্ণ গুপ্ত এবং আমাকে নিয়ে গঠিত ৫ জনের একটি সাংবাদিক দল এই ৬ই ডিসেম্বর এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

বরাচক হত্যাকাণ্ড

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যাপক তদন্ত চালান এবং ৬ তারিখ, আমাদের সঙ্গে ডি, এম, পি (হেড কোয়ার্টার) ও আসানসোলের ইনস্পেক্টর ইনচার্জ ছিলেন। এদিনই মাঠে একটি বিচ্ছিন্ন মাথার খুলি পাওয়া যায় যেটি ঐ পূর্বোক্ত দুই মুণ্ডার দেহের একটির বলেই ধরে নেওয়া যায়। “সিপি” সম্পাদক আমাদের সঙ্গে ছিলেন না এবং তিনি ঘটনা সম্পর্কেও অবহিত নন। তাঁর কাগজে প্রকাশিত ও প্রচারিত সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটি আনন্দবাজারের স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক বিবৃতি বয়ানের অহুসিত মাত্র। আসানসোল টেলিগ্রাফ অফিসের প্রেসরুম বসেই এই চক্রান্তের দলিল রচিত হয় এবং মতান্তর ঘটায় আমি সেখান থেকে চলে আসি। সন্দেহ নেই যে, আনন্দবাজার এবং অমৃতবাজারের স্থানীয় দুই সংবাদদাতা ডাঃ শর্মা এবং শ্রীব্যাসজী স্থানীয় কংগ্রেস, শিল্পপতিগোষ্ঠী এবং অন্যান্য স্বার্থাশ্রয়ী চক্রের সঙ্গে যোগসাজসে বরাচক হত্যাকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য থেকে দেশবাসীর দৃষ্টি অত্যাশ্রিত নিবন্ধ করার কাজে লক্ষ্যই উদ্ভোগ গ্রহণে সফল হয়েছেন। স্পষ্টতই এটা বামফ্রন্ট সরকার এবং বিশেষ করে সি, পি, আই (এম)-কে হেয় করার এক কুট চক্রান্ত মাত্র। এবং একই সঙ্গে আসানসোল পুলিশের একাংশও এই চক্রান্তের সহযোগী স্থপতি।

হরিজন নিগ্রহের রহস্য

কেন এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে যাওয়ার এক পক্ষকাল পর বাজারী কাগজের স্থানীয় প্রতিনিধিরা হঠাৎ হরিজন নিগ্রহ বলে চীৎকার শুরু করেছেন সে রহস্যটা জানা দরকার। নিহতদের নাম, কানী দুইপা, ককিরা দাদব, রাম নরেশ ভাষী এবং রাম গণেশ টকরী। বিহারের সামাজিক বর্ণবিদ্ভাস সম্পর্কে যাদের ন্যূনতম ধারণাও আছে তারাই

বলতে পারবেন যে পদবী বিচারে নিহতদের একজনও হরিজন অর্থাৎ অচ্ছাৎ নন। পুলিশের কথা বাদই দিলাম, আমি আসানসোলের হিন্দীভাষী সাংবাদিক শ্রীমূল্য কায় কাছের শুনেছি যে, নিহতরা কেউ তথাকথিত হরিজন নন। তবে কেন এই “হরিজন নিগ্রহের” শিবাচার্য-পূর্ণ শর্তা? এর কারণ, ধৃত ৫ জন সমাজবিরোধী বলে বর্ণিত ব্যক্তি যার নেপথ্য জালনে পুষ্টি ও নেপথ্য নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত বলে পুলিশ এবং এতদঞ্চলের সাধারণ মানুষের নিশ্চিত বিশ্বাস সেই মহাপ্রতাপশালী ‘ভি, আই, পি’র নাম মহাবীর রবিদাস ওরফে শেঠ। এই “শেঠ” এর নিয়ন্ত্রণে শুধু পূর্বোক্ত ৫ জনই নয়—এর নিয়ন্ত্রণে আসানসোল অঞ্চলে ওয়াগন ভাঙ্গা সহ সমস্ত জঘন্য সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের দুর্ভেদ্য জাল বিস্তৃত রয়েছে বলে প্রকাশ। এর বৈবাহিক নাকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগজীবন রাম। হয়তো এই কারণেই পুলিশ এর গায়ে হাত দিতে ভরসা পায়নি। শুনেছি, একবার নাকি একে মিসায় আটক করা হয়েছিল। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ হাতে থাকলেও পুলিশ একে কোন মামলায় অভিযুক্ত করেনি। কিন্তু, এবার বরাচকের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে পুলিশ মহাবীরের মূল ঘটনাকে আঘাত হেনেছে।

এই মহাবীর হরিজন, সম্প্রদায়ভুক্ত। এবং এই মহাবীরের কাছেই আর্থিক আত্মকল্যাণ বন্ধ হয়েছেন এতদঞ্চলের অনেক কংগ্রেসী নেতা ও কর্মী। এখন বামফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত কোন কোন বামপন্থীদের (সি, পি, আই-এম নয়) ছু একজন নেতার বিরুদ্ধেও এই অভিযোগটি করা চলে। পুলিশের একাংশতো আছেই। আনন্দবাজারের সংবাদদাতার সঙ্গেতো মহাবীরের গোষ্ঠীর

গভীর প্রেম নিজেদের চোখেই দেখে এলাম। ঘটনার এক পক্ষকাল পর “হরিজন নিগ্রহ” এবং পুলিশী তদন্ত ত্রুটিপূর্ণ বলে বৃনকর্ষ চীৎকারের আসল কারণ এটাই। আসানসোল পুলিশ এবার এই মহাবীরকে ধরে টান দিয়েছে। এটা তাদের অপরাধ বৈকি। বাজারী কাগজের দুই স্থানীয় সংবাদদাতাও তাই বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছেন।

এই দুই সংবাদদাতার সি, পি, আই (এম) এবং বামফ্রন্ট বিরোধিতার দুটি নজির রাখছি। আনন্দবাজারের সংবাদদাতা ডাঃ শর্মা কিছুদিন আগে রাণীগঞ্জ যাবার পথে গাড়ীতে আসানসোল বার্পুরের সি, পি, আই (এম) নেতা শ্রীব্যাসপদ মুখার্জীকে বললেন যে, আসানসোলের অন্ততম শিল্পপতি শ্রীমালেক সিংয়ের টা কায় আসানসোলের জনৈক সিটু নেতা বিমানে দিল্লী গিয়েছিলেন। বাম্যাপদবাবু তাঁর সম্ভাবনিক সৌজন্যবশতঃ এ সম্পর্কে খবর নেবার প্রতিক্রিয়া দিলেন। আমরা সেদিন একই গাড়ীতে, রাণীগঞ্জে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমনী উত্তাচার্যের সত্য যোগ দিতে বাচ্ছিলাম। কয়েকদিন পর কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীচিত্তরত্ন মজুমদার বেদিন আসানসোল এলেন সেদিন মন্ত্রীর সঙ্গে কাজ করে ডাঃ শর্মা এবং শিববাবুর সঙ্গে মালেক সিংয়ের অফিসে বসে চা খেতে খেতে আমি প্রসঙ্গতঃ মালেক সিংকে তাঁর টাকায় জনৈক সিটু নেতার বিমানে দিল্লী যাওয়ার ঘটনা ঠিক কিনা জানতে চাইলে তিনি দুই বাজারী সাংবাদিকের উপস্থিতিতেই এটাকে মিথ্যা ঘটনা বলে মন্তব্য করেন।

অমৃতবাজারের প্রতিনিধি শিবসনাতনবাবুতো যখন তখন যেখানে সেখানে বর্তমান রাজ্য সরকারের মন্ত্রীদের সম্পর্কে অশালীন ভাষা প্রয়োগ করে যাচ্ছেন। ৬ই ডিসেম্বর আসানসোল এসেছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডাঃ অশোক মিত্র। ডাঃ মিত্র কোন সাংবাদিক সম্মেলন করতে রাজী ছিলেন না। স্থানীয় প্রেস ক্লাবের অহরোধে আমিই কোনে ডাঃ মিত্রকে রাজী করাই। দুই বাজারী সাংবাদিক তাঁকে একটু বাক্যভাবে প্রশ্ন করলেন যে তিনিতো ইন্দিরা গান্ধীরও প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন; ডাঃ মিত্র সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন যে, ইন্দিরা গান্ধী নয়, তিনি ভারত সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন এবং কোন সাংবাদিক প্রধান মন্ত্রী এবং ভারত সরকার যে এক নয় সে সম্পর্কে অজ্ঞ হতে পারেন ভেবে বিশ্বয় প্রকাশ করেন। মন্ত্রী চলে যাবার পর শিব-

বাবু আসানসোল প্র্যানিং অফিসের কর্মীদের কাছে অত্যন্ত অশোভন ভাষায় যখন খিঁচি করছিলেন তখন “পূর্ববেক্ষক” সম্পাদক শ্রীমূল্য মালখণ্ডী এবং আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং তখনই দেখা যায় যে, ডাঃ মিত্রের সঙ্গে ভারত সরকারের মতান্তরের আসল ঘটনাটাও তিনি জানেননা। এ হেন দুই “পণ্ডিত” সাংবাদিক এখন বরাচক হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে আসানসোলে রাজনৈতিক ফাটকা-বাজী শুরু করেছেন। অবশ্য দুইজনে

বলে যে, এর মাধ্যমে মহাবীরের কাছে এরা কুপাধস্ত হবেন। বরাচক হত্যাকাণ্ডে নিহত ৪ জনই ছিল কুখ্যাত সমাজবিরোধী। পুলিশই শুধু একথা বলেনি, বরাচক বস্তীর প্রত্যেকেই সে কথা বলেছে। এখন স্বার্থাশ্রয়ী মহল দোষ চাপাতে চাইছে গ্রামবাসীর ওপর। আমরা যে তদন্ত করেছি তা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে উক্ত ৪ জন সমাজবিরোধী-দের অন্তর্দলীয় সংঘর্ষেই নিহত হয়েছে।

জ্যোতি বসুর বক্তব্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দুর্ভাগ্যবশত এই ঘটনা ঘটে যায় না। আমরা ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গে কি প্রশাসন বদলেছে? সেনিনের রাষ্ট্র বিপ্লব যদি পড়ে থাকি তবে এটা আমরা বুঝতে পারব যে, বিপ্লব মানে হচ্ছে আমূল পরিবর্তন। আমূল পরিবর্তন আমাদের লক্ষ্য। সমাজতন্ত্রে পৌছবার সংগ্রাম কঠিন ও দীর্ঘ। তিনি আরও বলেন যে, “সীমিত ক্ষমতার মধ্য থেকে সমাজতন্ত্র গড়ার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আমরা এখন কিছু সংস্কার, জনগণের কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করে যেতে পারি মাত্র। তবে, সমস্ত কাঠামোর পরিবর্তন ঘটাতে হলে চাই আমূল পরিবর্তন। তাই কেন্দ্রে ক্ষমতা পেলে জনগণের উপকারে যা করতে পারি তা রাজ্যের সীমিত ক্ষমতায় করা সম্ভব নয়।”

প্রসঙ্গত শ্রীবসু বলেন যে, যদি আমরা নির্ভর সঙ্গে জনগণের সেবা করতে পারি পাঁচ বছর তবে গণতন্ত্র-প্রিয় মানুষ সমাজতন্ত্রের জন্ম আমূল পরিবর্তনের সংগ্রাম করতে আগ্রহী হবেন ও অগ্রসর হবেন। এখনও দেশের দেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে আমরা যেতে পারিনি, এখনও তাদের বোঝাতে পারিনি সমাজতন্ত্রের জন্ম আরও কতবড় সংগ্রামের প্রয়োজন। আমূল পরিবর্তন যদি আনতে হয় তবে শুধুমাত্র পার্টির কিছু লোক নিয়ে হবে না, ব্যাপক সহস্র কোটি মানুষকে জড়ো করতে হবে। যে লড়াই এখনও দূরের ব্যাপার, সেই লড়াই যদি এখনই শুরু করে দিই তবে তা হবে নেতিবাচক কাজ। আমাদের এটা বুঝতে হবে যে, এখনও ব্যাপক মানুষ প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারের প্রভাবে আচ্ছন্ন; সেই ব্যাপক মানুষকে মোহমুক্ত করা আমাদের প্রাথমিক কাজ।

শ্রীবসু প্রসঙ্গত বলেন যে জনতার সঙ্গে তাঁর দল গণতন্ত্রের সংগ্রামে এক-সঙ্গে লড়েছে। কিন্তু অর্থনীতির মূলগত প্রশ্নে জনতার সঙ্গে তাঁদের

মৌলিক তফাৎ। জনতার অর্থনৈতিক নীতি জনকল্যাণ করতে পারে না। প্রসঙ্গত তিনি আরও বলেন যে, কৃষকের স্বার্থে জমি সংস্কার করতে না পারলে কোন পরিবর্তনের আশা নেই। তিনি হুঁশিয়ারী দিয়ে আরও বলেন যে, প্রতিক্রিয়া চক্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। তথাকথিত সমাজবাদের নাম করে একদল সামন্তবাদকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে। এদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।

এ কে গোপালনের প্রতি প্রজ্ঞা জানিয়ে তিনি বলেন যে, গোপালন তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যে আদর্শের জন্ত সংগ্রাম করে গেছেন, সেই আদর্শের বাস্তব রূপ দিতে হবে। মার্কসবাদ লেনিনবাদ একটা বিজ্ঞান। শুধু বই পড়লেই হবে না তাকে কাজে লাগাতে হবে। সোভিয়েত, চীন, ভিয়েতনামের বিপ্লব থেকে শিক্ষা আমাদের নিতে হবে। অনেক ব্যাপারে হয়ত মিল হল না। তার মানে শিক্ষা ভুল হয়ে গেল না। প্রয়োগে কখনও আমরা সফল হব, কখনও আবার নয়। এখনও অনেক বিষয় অস্পষ্ট আছে, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা সফল হব এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ই এস এস নাথুজিপাদ জানান যে কেরালায় কমিউনিষ্ট নেতা গোপালনের নামে একটা মার্কসবাদী গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়েছে, তাঁদের পরিকল্পনা আছে যে, বিভিন্ন প্রদেশে এমন গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার। সভাপতিত্ব করেন পলিট ব্যুরো সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত। গোপালন স্মৃতিরক্ষা কমিটির পশ্চিমবঙ্গ শাখা নাথুজিপাদের হাতে তেরো হাজার তিনশ এক টাকার একটি চেক দেন।



ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

সংশোধনী

বসতবাড়ি নির্মাণ

রেফা: নং জি এম / কেণ্ডা / ই ই (সি) টেণ্ডার / ১৪৬১ তাং ৩০-১১-৭৭
বসতবাড়ি নির্মাণের জন্য টেণ্ডার নোটিস নং জি এম / কেণ্ডা / ই ই (সি) টেণ্ডার / ১০৬১ তাং ২৬-১১-৭৭ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, জমা দেওয়া টেণ্ডার মূল টেণ্ডারে লিখিত শর্তকরা ভিত্তিতে নয়, আইটেম দরের ভিত্তিতে। টেণ্ডারদাতাদের তদন্তস্বায়ী দর দিতে অহরোধ করা হচ্ছে।

অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত।

জেনারেল ম্যানেজার, কেণ্ডা এরিয়া

হাওড়া পৌরসভায় দুর্নীতির জঞ্জাল

অফিসার ও ইউনিয়ন নেতাদের অশুভ আঁতাত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হাওড়া পৌরসভায় কতিপয় ইউনিয়ন নেতার রামরাজ্য চলছে। বৃহত্তম এই পৌরসভাটিতে অফিসার ইউনিয়ন নেতাদের অশুভ আঁতাতে হাওড়া শহরের বাসিন্দাদের এখন দম বের হওয়ার মুখে। সবচেয়ে মজার কথা, কংগ্রেসী রাজ্যে যারা লুটেপুটে খেয়েছে এখন তারাই কড়া বামপন্থী। কমবেশী সবারই গায়ে বামপন্থী লেবেল।

হাওড়া পৌরসভা এলাকায় প্রায় দশ লক্ষ লোকের বসবাস। পৌর-কর্মীর সংজ্ঞা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার। ১০টি ওয়ার্ডে পৌরসভাটি বিভক্ত। বকুলতলা, ঘুহুড়ী, দাশনগর বেনারস রোড ঘিরে পৌরসভার সীমানা। রাজ্য সরকার পৌরসভার কাজকর্ম ঠিকভাবে চালানো ও নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্ত প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা ভরতুকি দিচ্ছেন। কিন্তু শহরের বাসিন্দাদের তেমন কোন লাভ হচ্ছে না। এসেস-মেন্ট, স্বাস্থ্য কনজারভেনশী, বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রায় প্রতিটি দপ্তর জুড়েই রয়েছে বেপরোয়া দুর্নীতি। এতে রয়েছেন কিছু বোড়েল অফিসার এবং আশ্চর্যের কথা রয়েছে কিছু 'জনদরদী' ইউনিয়ন নেতাও। হাওড়া পৌরসভায় এখন ৮টি ইউনিয়ন। এগুলির "মালিকানা" রয়েছেন অর্ধেক বহু, নির্মল সরকার,

অশোক ঘোষ প্রমুখ। অর্ধেকবাবু এসেসমেন্টের একজন সাধারণ ক্রাফ্ট। কিন্তু তাকে দেখে বোকার উপায় নেই তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হাওড়া পৌরসভার একজন কর্মী। জঞ্জাল দপ্তরের কর্মীদের নিয়েই তার ইউনিয়ন। এই দপ্তরে রয়েছেন প্রায় সাড়ে তিন হাজার কর্মী। অনেক রংয়ের জামা পাণ্টে অর্ধেকবাবু এখন নাকি জনতার সমর্থক। কর্মীরা বছরে ইউনিয়নকে তিন টাকা করে চাঁদা দেন। পূজা একসময়সিয়ার সময় দেন পাঁচ টাকা। অনেকেরই অভিযোগ এ সবের নাকি রসিদ খুব কম ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়ে থাকে।

জঞ্জাল অপসারণের লরী নিয়েও নানা অভিযোগ। মহেন্দ্র রায়, পরমেশ্বর সিং, সীতারাম সাউ, লক্ষ্মণ সিং এরাই পৌরসভাকে আবর্জনা সরানোর লরী দিয়ে থাকেন। এরমধ্যে একজন জাল নোট ছাপানোর দায়েও ধরা পড়েছেন। হাওড়ার জঞ্জাল তোলার জন্ত পৌরসভার লক্ষ লক্ষ টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে সত্য তাতে কোনও লাভ হচ্ছে না। হাওড়া সেই 'গন্ধা' শহর হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে থাকছে। ভূয়া ট্রিপ দেখিয়ে এদের অনেকেই প্রচুর টাকা লুটেছে। অস্ত্র কায়দায় এখনও এই কারবার চলছে। কনজারভেনশি দপ্তরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে 'এলাকা

সাকের' সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে। অথচ জঞ্জাল অপসারণের কোনও লক্ষ্য নেই। অনেকেরই অভিযোগ এই জঞ্জাল নিয়েই চলেছে নানা গ্যাডা-কল। যার মুনাফা লুটেছে একদল অফিসার ও ইউনিয়ন নেতা।

নির্মল সরকার হলেন আরও একজন ছুঁড়ে নেতা। কৌচানো ধুতি, হাতে দামী সিগারেট, ইউনিয়নের পয়সায় নানা খরচ চালানো ছাড়া নির্মলবাবুর পক্ষে একদিন চলাও অসম্ভব। এর জী অল্প যোগ্যতাসম্পন্ন হয়েও পৌর স্কুলের প্রধান শিক্ষক। এদের পালিতা কন্যা পৌরস্কুলের শিক্ষিকা। এদের কন্ডার দেবর সমীর মুখার্জিও নির্মলবাবুর কল্যাণে পৌরদপ্তরে বহাল হয়েছেন। এহেন নির্মলবাবু বীমা কোম্পানীর একজন এজেন্টও বটে, আবার পৌর ইউনিয়নের স্নাতকস্বরও বটে। শোনা যায় সময় বুঝে নির্মলবাবু এখন বামপন্থী লেগেছেন। মহাকরণে ঘন ঘন যাতায়াত করে চাকুরীর একসটেশন বাড়ানোর তালে রয়েছেন। বারাস্তরে এইধরণের ইউনিয়নের নেতাদের সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য দর্পণ প্রকাশ করবে। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলো প্রশাসন জুড়ে এদের রামরাজ্য চালানো এখনি বন্ধ করা।

(শেবাংশ গম পুঠায়)

বিধানসভার ডেপুটি স্পীকারের অবৈধ কাজ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার শ্রীকলিমুদ্দিন সামসের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের কোটা থেকে স্কুটার নিয়ে এক অবৈধ কার্যকলাপের অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে যে, রাজ্য সরকারের কাছে শ্রীসামস একটি প্রিয়া স্কুটারের জন্ত আবেদন করেন। তাঁর আবেদনপত্রে তিনি জানান যে তিনি যে স্কুটারটির জন্ত আবেদন করেছেন সেটা অন্তর ব্যবহারের জন্ত, যেটা সরকারী নিয়মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। শ্রীসামসের আবেদন অল্পসারে রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের (পরিবহন) এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী তাঁকে একটি প্রিয়া স্কুটার এ্যালট করেন (আর ও নং ১০৬০/আই এস টি / ৫৫ পি — ৪/৭ ডেটেড ৩১-১০-৭৭)

জানা গেছে যে রাজ্য সরকারের প্রিয়া স্কুটারের যে কোটা আছে

তাতে পাবার যোগ্য কেবলমাত্র রাজ্য সরকারের কর্মচারী এম,এল,এ, এম,পি এবং সরকারী প্রেস কার্ডধারী সাংবাদিকগণ। শুধু তাই নয় যদি তারা নিজেদের ব্যবহারের জন্ত এই স্কুটার চান তবেই পেতে পারেন। আবার কেউ তার স্কুটার অস্ত্র ব্যবহার করছে বলেন তাঁকে স্কুটার দেওয়া হয় না।

কিন্তু শ্রীসামস স্কুটারের যে আবেদন তাতে তিনি লিখেছেন তার স্কুটারটি অপরের ব্যবহারের জন্ত চাওয়া হচ্ছে। রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী নাকি তাকে স্কুটার দেওয়ার ব্যাপারে স্থপারিশ করেছেন। সরকারী অফিসারদের বক্তব্য মত বড় ভি-আই-পিই হোন না পারসোন্সাল ব্যবহারের জন্ত ছাড়া অপরের ব্যবহারের জন্ত স্কুটার বরাদ্দ করা কোন আইনেই সম্ভব নয়।

জানা গেছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীঅক্ষয় মুখার্জী বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে একটি বাজাজ স্কুটার নিয়েছেন। তিনি এখন রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তরের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর কাছে আবেদন করেছেন যে তিনি তাঁর নাতীকে স্কুটারটি দান করতে চান এবং বিক্রী-কবলা লিখে দিতে চান। সে ব্যাপারে রাজ্য সরকার যেন অহুমতি দেন। তিনি স্কুটারটি ছুঁছর হলো পেয়েছেন এবং এতদিন স্কুটারটিকে ব্যবহার করেছে? যারা প্রকৃত পাবার যোগ্য তাদের ব্যাপারে কোন নজর না দিয়ে ক্ষমতাবান লোকদের কেন এভাবে স্কুটার দেওয়া হচ্ছে তার তদন্ত হলে ভাল হয়। এ বিষয় পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

'ঐ হাত দুটো কেটে নেব, শোলে দেখেছ' ?

ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীর ওপর থানার বড়বাবুর নৃশংস বর্বরতা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মনবেড ৭ই ডিসেম্বর : হুগলী জেলায় চণ্ডীতলা থানা এখন পশ্চিম-বঙ্গের কুখ্যাত থানা। এখানকার বড়বাবু ছোটবাবুদের কাহিনী, থানায় মজপান এবং ডাকাতদের হাতে থানার বন্দুক, কাঁড়জ তুলে দেওয়া তথা লুটের মাল ভাগ বন্টন নিয়ে মতভেদে থানার মধ্যেই গুলি করে পুলিশ হত্যা সবই রোমাঞ্চকর। গত সপ্তাহে ডানকুনির অস্ত্র ষ্টীল কারখানার শ্রমিক নেতা ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মী দিলীপকুমার ঘোষকে চণ্ডীতলা থানার অফিসার বড়বাবু অশোক ভৌমিক ডেকে পাঠান। থানায় এলে ওর চুল ধরে অশোকবাবু কিল চড় কষাতে শুরু করেন। মেজবাবু নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। বড়বাবু তখন ক্ষেপে উঠেছেন।

চোলাই কারবারের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীর আড্ডাথানায় তখন জমে গেছে। বড়বাবু সাতালের মত পিটিয়ে যেতে শুরু করলেন। ব্যাটাকে আঙ্গ শেষ করবোই করবো। কে আমাদের রোখে দেখি।

থানা লক আপে পুরে রড দিয়ে মার শুরু করলেন। দিলীপ ঘোষের মাথা কেটে রক্ত বের হচ্ছে। তাতেও রাগ কমনো। ব্যাটা ডানকুনি ওয়াগন ব্রেকারদের সঙ্গে লাগবে। ওরা আমাদের ঝুটি জোগায়। তুমি কে হে। সমাজসেবী! তোমার ঐ হাত দুটো কেটে দেবো। শোলে দেখেছো? শোলেতে যেমন নায়কের হাত কেটেছে তেমন। ছুরি খুঁজে না পেয়ে রডের আঘাতে শ্রীঘোষের দুটো হাত ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিলেন, শেষে তার নামে ছিনতাইয়ের কেস। শ্রীঘোষ প্রায় পাগলের মত হয়ে উঠেছেন। প্রায় নির্ব্যাক। মাথায় আঘাত বেশী। তাঁর বাঁড়ীতে গেলেই দেখতে পাবেন রক্ত মাথা জামা আর ভাঙ্গা হাত দুটো। কি নৃশংস বর্বরতা। এ নিয়ে নিদারুণ চাক্কলোর সৃষ্টি হয়েছে। চণ্ডীতলা ফরওয়ার্ড ব্লকের জৈনক নেতা এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। থবরে প্রকাশ, বড়বাবু অশোক ভৌমিক সাত বছর আগে চণ্ডীতলায় নকশাল দমনের নাম করে নিরীহ ছেলেদের ঠেঙিয়ে দারুণ মার করেছিলেন।

চণ্ডীতলা বাজারের ডেকরেটারের মালিকের জৈনক গর্তবতী আত্মীয়ের পেটে লাথি মেরে বাচ্চা

খসিয়েছেন থানার স্বযোগ্য অফিসার। ব্যাপারটা চণ্ডীতলার এম,এল,এ মলিন ঘোষ মিটিয়েছিলেন। গর্তবতী যুবতীর গর্তপাতের কি কোন ক্ষতিপূরণ চণ্ডীতলা থানা দেবে? ইতিমধ্যে চণ্ডীতলায় কো-অপারেটিভ এবং অন্যান্য জায়গায় দারোগার সাহায্যে ডাকাতি হলো। এক সপ্তাহে বনমালীপুর, কুমীর-মোড়া, নবাবপুর পশ্চিম পাড়ায় ডাকাতি হয়েছে গণ্ডাকয়েক। চণ্ডীতলা ডানকুনি কুমীরমোড়ায় সন্ধ্যার সময় ছিনতাই খুন ভখম বাড়ছে। বর্মানের মেমারীর আনোয়ার আলী নামক জৈনক যুবককে ডানকুনি নামিয়ে চণ্ডীতলা থানার কাছাকাছি মনবেডে ছিনতাই করে এবং ছুরি মেরে প্রায় মৃত অবস্থায় ফেলে রাখে হয়েছে। চণ্ডীতলা থানা চুপচাপ। কালীপুর মোড়ে পুলিশ বসাতেও চণ্ডীতলা থানা রাজী নয়। এদিকে নতুন থানা কমিটি সম্পাদক রূপে জৈনক দাগী গুণ্ডা ও চোরকে নিয়ে ডাকাতির জাল ফেলছে। চণ্ডীতলা থানা কি দুর্নীতি মুক্ত করতে পারবেন না মুখ্যমন্ত্রী?

ডেবরা থানাতে শান্তিপূর্ণ ধানকাটা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

বালিচক, ৮ই ডিসেম্বর : ডেবরা থানাতে বেশ শান্তিপূর্ণ ভাবেই ধান কাটা শেষ হতে চলেছে। এবংসর ধান কাটা নিয়ে সংঘর্ষের আশংকা অনেকেই করেছিলেন। কিন্তু এলাকার মানুষ অনেক ঠকে বুঝতে পেরেছেন যে সংঘর্ষে নিজেদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই পাওয়ার থাকে না।

শিক্ষার অভিমান তুলে গিয়ে ডঃ স্বধীর পণ্ডিত, ইঞ্জিনিয়ার নারায়ণ পাণ্ডুই নিজেদের জমির ধান নিজে-রাই গোলায় তুলেছেন। এঁরা "উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ ভালো" — এই নীতি নিয়ে মাঠে নেমে পড়ে অস্ত্র চাষীদের পথ দেখিয়েছেন। ডেবরা ছাড়া পিংলা, ময়না, পাশকুড়া প্রভৃতি জায়গাগুলিতেও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।



ব্যাবককের গাফিলতীতে বিদ্রোহ সঙ্কট

একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অত্যাচার এ, সি, সি কোম্পানী এবং এই সংস্থার অধীনস্থ এ, ভি, বি ও ব্যাবকক এণ্ড উইলকক্স কোম্পানী। এই এ, ভি, বি ও ব্যাবকক এণ্ড উইলকক্স কোম্পানী ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে বয়লার নির্মাণের কাজ করে থাকে। এই কোম্পানীর গাফিলতির ফলে বিদ্রোহ সঙ্কট দেখা দিচ্ছে।

প্রথমতঃ দুর্গাপুরের এ, ভি, বি যে সমস্ত বয়লারের যন্ত্রাংশ দীর্ঘদিন থেকে তৈরী করে আসছিল সেই সমস্ত যন্ত্রাংশ ব্যাবকক এণ্ড উইলকক্স প্রমিক কর্মচারীরা ইরেকশান করে বিদ্রোহ প্রকল্পগুলি প্রস্তুত করে আসছিল। হঠাৎ এ, ভি, বি কোম্পানী এ, ভি, বি প্রমিকদের ত্রাণ দাবী থেকে বঞ্চিত করে অধিক মূল্য লোটার জন্য ১৯৭০ সালের পর বয়লারের যন্ত্রাংশ তৈরী করার জন্য ছোট ছোট কোম্পানীকে সাব কন্ট্রাক্ট দেয়। ঐ সমস্ত ছোট ছোট কোম্পানী বয়লারের যন্ত্রাংশ তৈরী করতে অনভিজ্ঞ। তারা যে সমস্ত যন্ত্রাংশ তৈরী করে সাইটে পাঠায় তা ইরেকশান করতে ব্যাবকক এণ্ড উইলকক্স প্রমিকদের মডিফিকেশান করতে হয় যার জন্য প্রচুর সময় লেগে যায় এবং প্রায়শঃই কাজ দেয়ী হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ ফারনিস ওয়ালের টিউব বা ৩টা অথবা ৪টা জয়েন্ট থাকার কথা সেখানে ৭।৮টা জয়েন্ট হওয়ার জন্য ঘন ঘন বয়লারের জয়েন্ট লিক করছে, বয়লার বন্ধ করতে হচ্ছে এবং এতেই লোড শেডিং হচ্ছে। এই অধিক জয়েন্ট করা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের বয়লার ইন্সপেক্টর (পরিদর্শক) ইন্সপেকশান করে বয়লার পাশ করে দিচ্ছেন ডি, ভি, সি চন্দ্রপুরায় পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালভিতে। শোনা যাচ্ছে ঐ সমস্ত বয়লার ইন্সপেক্টরের আত্মীয়স্বজনকে এ, ভি, বি এবং ব্যাবকক এণ্ড উইলকক্স কর্তৃপক্ষ চন্দ্রপুরায় চাকুরী দিয়েছে। ব্যাবকক কর্তৃপক্ষের কিছু কিছু খারাপ কাজ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্রোহ পর্ষদ ও ডি, ভি, সি চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ১৬।১।৭৫ এবং ১০।২।৭৫ তারিখে আমরা দুটি চিঠি দিয়েছিলাম। ঐ দুটি চিঠিতে আমরা উল্লেখ করেছিলাম ব্যাবকক কোম্পানী ওয়েল্ডিং জয়েন্ট কিভাবে বরোচ্ছে। যেখানে বি, ও, সি রড লাগে সেখানে যোদি রড দিয়ে কাজ করিয়েছে।

কিন্তু রাজ্য বিদ্রোহ পর্ষদ আজ পর্ষদ ঐ চিঠির কোন উত্তর দেয় নি। মনে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্রোহ পর্ষদের অফিসারদের সঙ্গে ওদের দহরম মহরম আছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্রোহ পর্ষদের কিছু কিছু অফিসারের ভাই অথবা আত্মীয়কে এ, ভি, বি, ও ব্যাবকক কর্তৃপক্ষ চাকুরী দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী যখন অক্টোবর মাসে সাঁওতালডি গিয়েছিলেন তাঁকে প্রমিকরা ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন যে মূল্যবান যন্ত্রাংশ কিভাবে যেখানে সেখানে কেলে রাখায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এই সমস্ত অভিযোগ করার জন্য ব্যাবকক কর্তৃপক্ষ ব্যাবকক প্রমিক ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় প্রমিক সহ ৩৭জন প্রমিককে বেআইনী ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভাবে ছাঁটাই করেছে। ১৯৭৫ সালে ইমারজেন্সির সুযোগ নিয়ে আমাদের ৫জন প্রমিককে কর্তৃপক্ষ চার্জশীট দেয়, পরে মিসা করে নাগপুর থেকে ১২ ঘণ্টার রাস্তা আকোলা জেলে পাঠায়। দীর্ঘ ২মাস পরে আমাদের ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট এবং অল ইণ্ডিয়া সি, আই, টি, ইউর ভাইস প্রেসিডেন্ট মহঃ ইস-মাইলের প্রচেষ্টায় তারা মুক্তি পায়। পরে এদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। এই সমস্ত বরখাস্ত লোকদের ফিরিয়ে নেওয়া এবং অন্যান্য কিছু দাবী নিয়ে প্রমিকেরা যখন আন্দোলন করছেন তখন আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য নতুন করে চার্জশীট দেওয়া ও সাদপেগু করা শুরু হয়েছে। আমাদের দাবী (১) ডি, ভি, সি চন্দ্রপুরায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্রোহ পর্ষদের সমস্ত বয়লার ইন্সপেক্টর দিয়ে ইন্সপেকশান করানো হোক এবং বয়লারের সমস্ত কাজ অল্পসময় করার জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অহরোধ করছি। (২) জনসাধারণের চাহিদা পূরণের জন্য প্রকল্পের কাজকে ত্বরান্বিত করতে হবে। এ, ভি, বি, কর্তৃপক্ষ যাতে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ করতে বাধ্য হয় তার জন্য ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হোক। (৩) বর্তমান সরকারের নীতি 'অস্থায়ী প্রমিক মালিকের সম্পর্কের উন্নতি করা হোক।

জাবেদ আলী
ব্যাবকক এণ্ড উইলকক্স প্রমিক
ইউনিয়নের পক্ষে

সি এম ডি এ এবং সি এম পি ও

কংগ্রেসী আমলে সি এম ডি এ থেকে কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন হয়েছে। বর্ষায় কলকাতা জবজ্বল ভাবে ডুবেছে, সমস্ত রাজপথ খাবলা খাবলা গর্ত সমাকীর্ণ হয়ে মধ্যযুগীয় সভ্যতা ডেকে এনেছে। দোকানের আলো না থাকলে কলকাতার রাস্তায় বিভীষিকাময় অন্ধকার। পানীয় জল সরবরাহ শেষ দশায় পৌঁছেছে এবং মাস দেড়েক আগে হুদিন জল বন্ধ হয়েছিল। বস্তীর উন্নয়ন আদৌ হয়নি, শুধু অস্থায়ী সংস্কারকার্য কিছু কিছু হয়েছিল। এই হল সি এম ডি এ-র কৃতকর্মের ইতিহাস।

এইসব কাণ্ড অবোধে চালানোর উদ্দেশ্যে এবং অর্থের বিপুল অপচয় ঘটানোর মতলবে কংগ্রেস আমলে সি এম ডি এ-কে মাথায় তোলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী প্রকল্প দপ্তর সি এম পি ও-কে পংক্ত করার সব ব্যবস্থা হয়। সি এম পি ও কী কাজ করবে? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাক্তন কংগ্রেসী সরকার জানান যে ঐ দপ্তর রাজ্যের জেলাগুলির জন্য উন্নয়ন-প্রকল্প রচনা করবে। যেখানে কলকাতার রাজপথগুলির গর্ত ভরাট করার টাকা নেই, কলকাতা উন্নয়নের জন্য ঐক্সিমেন্ট করা টাকার অর্ধেকটাও কপালে জুটবে কিনা নন্দেহ সেখানে মেট্রোপলিটান এলাকার বাইরের উন্নয়ন প্রকল্প রচনার কথা উদ্ভাষ ছাড়া আর কে বলতে পারে? দুঃখের বিষয় সেই অবাস্তবতা প্রচারের ড্র্যাডিশন বামপন্থী সরকারের আমলেও সমানে চলছে। উপরন্তু ছুম করে সি এম পি ও দপ্তর তুলে দেওয়া হল। এত তাড়াতাড়ি যে, দেশের প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দকে একবিন্দু ভাববার সময় দেওয়া হল না।

সি এম ডি এ-তে বোনাসের জন্য টাকার অভাব হয়নি, অথচ সরকারী প্র্যানিং দপ্তরে (১৮ রবীন্দ্র সরণী) কারিগরী পরিকল্পনার মাস্টার প্লানের নক্সা রচনাকারী ড্রাকটস-ম্যানদের সঠিক বেতন (সিলেকশন গ্রেড) আটকে বেখে দশ বারো বছরের বিশেষজ্ঞ এইসব কারিগরী কর্মীকে বিপদে ফেলা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারিগরী কর্মীদের কর্মক্ষমতাকে নষ্ট করলে কার হাত শক্ত হবে? রাজ্য সরকারের অন্যান্য কর্মীরা তো বহুকাল পূর্বেই 'সিলেকশন' গ্রেড বেতন পেয়েছেন। কিন্তু এইসব টেকনিক্যাল কর্মী বরাবর কংগ্রেসী খাঁচের ফেডারেশনের সদস্য হতে

অস্বীকার করেছেন বলেই কি তাঁদের এই দুর্দশা?

এঁদের ফাইল মাননীয় মন্ত্রী অশোক মিত্রের কাছেও তো গিয়েছিল। তথাপি সুরাহা হলনা কেন? আমলাতন্ত্র কি এতই শক্তিশালী? ওদিকে আগামী বর্ষায় কলকাতা সম্পূর্ণ ডুবে যাবে কারণ বৃষ্টি আমলের পুরানো ডিজাইনের স্রুসক ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী এখন সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বিদ্রোহ সংকটের ফলে পাম্প চলে না। ফলে ডুবন্ত কলকাতার জল কিছুটা টেনে বার করাও সম্ভব হবে না। জলে শহরের মোটর যানসমূহের চাকা এবং ইঞ্জিনের সর্বনাশ হবে। শহর-

যাত্রার একটি বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে

২৫শে নভেম্বর 'দর্পণে' প্রকাশিত যাত্রা ক্রোড়পত্রে আলমগীর পালা নাটকের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এতে লেখা হয়েছে—“...জিজিয়া কর রূপী সাম্প্রদায়িকতার বিবাস্ত ছুরিকা নিক্ষেপ করলেন তিনি হিন্দুধর্মের সমগ্র হিন্দু জাতির উপর, প্রতিবাদে গর্জে উঠল জাঠ সম্প্রদায়, শুক হলো রক্তাক্ত অধ্যায় বার বাস্তব কপায়ণ—” ইত্যাদি। পশ্চিমে গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই মার্কস ইতিহাসকে নতুন করে সাজানোর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের রূপরেখা দিয়ে গিয়েছেন। আর এই ভারতে এক শতাব্দী পরে তার একটি ক্ষুদ্রমাত্র প্রচেষ্টা চলছে অথচ কবে রবীন্দ্রনাথ এই সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন। উৎপল দত্ত এপিকেও এদিকে বারবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে পালা নাটকে সাম্প্রদায়িকতা যেন নতুনকে আচ্ছন্ন না করে।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে জিজিয়া কর ঔরঙ্গজেব কতখানি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বসিয়েছেন তার হৃদিস মেলে না। মুসলমানদের অতি প্রাচীন অবস্থা পালনীয় ধর্মীয় কর 'জাকৎ'; আর এই অর্থনৈতিক দৃষ্টান্ত অল্পসরণ করে হিন্দুদের উপর বসান হয়েছিল 'জিজিয়া'। বিশেষ বিশেষ সময়ের ঐতিহাসিকগণের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই অর্থনৈতিক ব্যাপারটি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে কপাস্তরিত হয়েছে এবং ত্রিংশের দশক থেকে এর উল্লেখ এবং তীব্রতাও বৃদ্ধি পেতে চলেছে; যেমন ইরানিং বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কিছু ঐতিহাসিকের [ক্রীমলেশ জিপাঠী ইত্যাদি] এ

ময় পয়ঃপ্রণালীর পচাজল এপিডেমিক রোগ, মহামারী ঘটাবে। সে বিপদ কম্যুনিষ্ট-অ-কম্যুনিষ্ট কাউকে রেয়াৎ করবে না। এসবের পাশাপাশি প্রাক্তন সি এম পি ও দপ্তরের পয়ঃপ্রণালী বিশেষজ্ঞ কারিগরী বিভাগটিকে অকর্মণ্য থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। পরিকল্পনাহীন জীবন, দক্ষ কারিগরী কর্মীদের অবমাননা ও লাঞ্ছনা, উদ্ভাষ-ঘোড়ার মত রাজনৈতিক অস্থিরতাময় সমাজ—এ সবের অনিবার্য ফল হিসাবে এক সর্বাঙ্গিক ধ্বংস এই প্রাচীন শহরকে গ্রাস করবে। এই শহরের সর্বনাশ মানেই সমগ্র পূর্বভারতের সর্বনাশ। সি এম পি ও দপ্তরকে সেই দুঃসময়ে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

জৈনক তথ্যাভিজ্ঞ

বিষয়ে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব চলছে। গোটা কয়েক ইতিহাসের বই সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার কথা উঠেছে এবং তার কারণও একমাত্র এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। অবশ্য 'জাকৎ' সামাজিক অহুদান এবং জিজিয়ার চরিত্র সামাজিক, না রাষ্ট্রের অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল তা একমাত্র বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের পরই সাম্প্রদায়িক না সাম্প্রদায়িক তা বেরিয়ে আসবে। এটা ঠিক যে জাকৎ-এর ধর্মীয় অহু-করণেই এটা করা হয়েছিল যাতে মুসলমানরা তো দিচ্ছেই এবার হিন্দুরা দিক। ঈদের পুণ্য প্রভাতে মোট বাৎসরিক রাজস্বের ১/৫ মুসলমানদের দান করা অবশ্য কর্তব্য, না করলে সামাজিক খড়গ ওদের উপর নেমে আসে। বর্তমানে অন্যান্য করের ধাক্কা আর ঠুট নেই। সব দিয়ে মোটামুটি দাঁড়ায় যা তাই দিতে হয়। এই পালা নাটক গ্রামেগঞ্জে যাবে এবং সরলমতি জনগণের উপর প্রভাব পড়বে, বিজ্ঞাপনও প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোকের গোচরে আসবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তার উপর লক্ষ রেখেই এই বিনীত নিবেদন। যা সঠিক বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা তাই বেরিয়ে আসুক এবং তার থেকেই যেন পালা নাট্যকার তার বক্তব্য উপস্থাপিত করার সুযোগ পান, বিজ্ঞাপনও যেন সাম্প্রদায়িকতার সহায় না হয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের আলমগীরে শিশির ভাঙুড়ীর প্রয়োজননা অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীতে কত স্বচ্ছ ছিলো—এটাও বিচার্য।

নরেশ চৌধুরী

মানবাধিকার প্রসঙ্গে

দেবাশিস ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধের পরি-
তে শান্তির সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে-
রাষ্ট্রসংঘ গড়ে ওঠে। আবার প্রতিটি
দেশের মধ্যে প্রতিটি মানুষের কতক-
গুলি জন্মগত অধিকার স্বীকৃত করার
উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘের অধীনেই মানবা-
ধিকার সম্পর্কিত কমিটি (The
Committee on Human Rights)
গড়ে ওঠে। প্রতিটি মানুষের মর্যাদা
ও অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রসংঘের
এই পদক্ষেপ বিশ্বপরিস্থিতিতে একটা
পরিবর্তন ইঙ্গিত করল। কারণ
পূর্বে লীগ অফ নেশনস-এর অধীনে
এ কথা ভাবাই যেত না। ব্যক্তি
স্বাধীনতা, মানবাধিকার যদিও
প্রতিটি রাষ্ট্রের ব্যাপার, তবুও এটা
আন্তর্জাতিক কমিটিতে স্থান পেলে।
১৯৪৫ সালে রাষ্ট্রসংঘের সান-
ফ্রান্সিসকো সম্মেলনে যদিও এটা
প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে স্বীকৃত হল,
তথাপি রাষ্ট্রসংঘে মানবাধিকার ও
মৌলিক অধিকারের কোন সংজ্ঞা
ঠিক হল না। ১৯৪৬ সালের ফেব্রু-
য়ারী মাসে এই সংজ্ঞা ও এ সম্পর্কে
একটা সনদ তৈরী করার জন্য মান-
বাধিকার সম্পর্কিত কমিটি গঠিত
হল।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে
কমিটির প্রথম সম্মেলনের
আলোচনায় একটা বিতর্ক দেখা দেয়।
আমেরিকার প্রতিনিধি কোনও
রকম আইন-মার্কিন বাধাধরা
স্বীকৃতির চেয়ে লক্ষ্যপৌছানোর জন্য
একটা ঘোষণা তৈরী করার পরামর্শ
দেন, কিন্তু ব্রুটেনের প্রতিনিধি
বলেন যে, অংশ গ্রহণকারী রাষ্ট্র-
গুলির কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থায়
আইনসম্মত এবং বাধ্যতামূলক একটা
চুক্তি করা উচিত।

দু বছর ধরে আলোচনা
চলল। ১৯৪৮ সালের দশই ডিসেম্বর
প্যারিসে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ
অধিবেশনে ঐতিহাসিক 'মানবাধি-
কারের বিশ্বজনীন ঘোষণা' সংক্রান্ত
বিল স্বাক্ষরিত হল। আটচল্লিশটি
দেশের প্রতিনিধি বিলের স্বপক্ষে
ভোট দিলেন, বিরুদ্ধে কেউ নয়।
কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদি আরব,
এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পূর্ব
ইউরোপের কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক
দেশ ভোটদানে বিরত থাকে।

সামাজতান্ত্রিক দেশগুলো ভোট
দানে বিরত থাকলো কেন? এ
প্রশ্নের উত্তরে আমাদেরকে প্রাথমিক
ভাবে, ব্যক্তি স্বাধীনতা, নাগরিক
অধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলো সম্পর্কে
কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একটু
আলোচনা করতে হবে। গণতান্ত্রিক
অধিকার এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের
ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়ে একটু চিন্তা
করতে হবে।

সামাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিক
স্বাধীনতা বলতে প্রায় কিছুই থাকে
না, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন থেকে আরম্ভ করে
সর্বক্ষেত্রে রাজ্যের সিদ্ধান্তই হয়
চূড়ান্ত। আর, সামন্ততন্ত্রের গর্ভ
থেকে যে ধনতান্ত্রিক সমাজ জন্ম নিল
সেখানে মানুষ পেল কিছুটা
স্বাধীনতা। এখন এই স্বাধীনতার
অর্থ শাস্তিপূর্ণ মিছিল, মিটিং করার
স্বাধীনতা, মতামত পোষণ ও প্রচা-
রের স্বাধীনতা, চলাফেরা-পেশার
স্বাধীনতা, শ্রমিকদের ষ্ট্রেই ইউনিয়ন
করার স্বাধীনতা, আবার সঙ্গে সঙ্গে
অবাধ শোষণের স্বাধীনতাও স্বীকৃত
হল। ধরা যাক, আমাদের দেশ
ভারতের কথা। এখানে ১৯৫০
সালের ছাব্বিশে, জানুয়ারী থেকে
সংবিধান চালু হয়েছে, তার ১৯ (ক)
ধারায় পূর্বে উল্লিখিত সপ্ত স্বাধীনতা-
গুলো স্বীকৃত হয়েছে, আবার সঙ্গে
সঙ্গে সম্পত্তির মালিকানাও স্বীকৃত
হয়েছে। এই সংবিধান অস্থায়ী
টার্ম-বিড়লার সম্পদ-পুঞ্জী পাহাড়-
তুল্য হয়েছে, আবার টেলকো-টেল-
ম্যাকোর শ্রমিক কর্মচারীরা পেয়েছে
ইউনিয়ন গড়ার স্বাধীনতা। সংবিধান
সমাজের দেশের শত্রুরাই তৈরী
করেছে নিজেদেরই স্বার্থে। ব্যবস্থার
আয়ু পরিবর্তন হলে এ সংবিধান
অবশ্যই পান্টাতে হবে। সম্পত্তির
মালিকানা (প্রথম জনগণতান্ত্রিক
পর্যায়ে সীমিত মালিকানা স্বীকার
করে) বিলোপ পাবে, কিন্তু থাকবে
বেকার সমস্যার সমাধান তথা চাক-
রির গ্যারান্টি, জাতিসমূহ (নাগা,
মিজো, কুকী, কাশ্মিরী, ত্রাভিড়)
পাবে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার তথা
বিচ্ছিন্ন হবার স্বাধীনতা (Right to
Secede) ইত্যাদি। কিন্তু যতক্ষণ
তানা হচ্ছে সেই আয়ু পরিবর্তন
সাপেক্ষে সংবিধান সংস্কারের দাবী
করা হয়, সংবিধান অস্থায়ী সরকার
চালানোর দাবী করা হয়।

১৯৭২ সাল থেকে, এদেশের
কোন কোন রাজ্যে বিক্ষিপ্তভাবে,
আংশিকভাবে সংবিধানগত নাগরিক
অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।
যেমন, পশ্চিমবঙ্গে ভোটদান, ছাত্র-
ইউনিয়ন, ষ্ট্রেই ইউনিয়নগড়া, শাস্তি-
পূর্ণ মিছিল-মিটিং সবই শাসকদলের
মর্জির উপর নির্ভর করছিল। আর
১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন অভ্যন্তরীণ
জরুরী অবস্থা জারী করে সারা দেশে
সংবিধান প্রদত্ত মানবাধিকার, নাগ-
রিক অধিকারগুলো লিখিতভাবে
ঘোষণা করেই কেড়ে নেওয়া হল।
দেশাই, বাজপেয়ী, আকালী, চরণ

সিং-এর সঙ্গে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক
অধিকার পুনঃপ্রবর্তনের জন্য কমিউ-
নিষ্টরাও গলা মেলালো। কারণ
কমিউনিস্টদের মতে এগিয়ে থাকা
মুষ্টিময় ব্যক্তি নয়, রাজনৈতিকভাবে
অসচেতন, পেছিয়ে থাকা কোটি
কোটি দেশবাসীকে সংগ্রামে পোড়
খাওয়ানোর জন্য, বিবর্তনমূলক পথ
ধরে এগুবার জন্য সাম্যবাদের প্রাথ-
মিক বিদ্যালয় হিসেবে প্রকাশ্য
আইনী গণ-সংগঠনে অংশগ্রহণ
করতেই হবে। কমিউনিস্টদের মতে
বুর্জোয়া গণতন্ত্রের তুলনায় সমাজতন্ত্র
অবশ্যই ভালো, আবার সামন্ততন্ত্র
এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নেতাকরণ
তথা লম্বী পুঞ্জির উগ্র একনায়কত্বের
শাসন তথা ফ্যাসিবাদ অথবা
ভারতের মতো পেছিয়ে পড়া দেশে
শ্রমতন্ত্রের চেয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্র
অনেক অনেক ভালো। জরুরী
অবস্থার দিনগুলোর চেয়ে জনতা
পার্টির রাজত্বের আজকের দিনগুলো
নিশ্চয়ই অনেক ভালো। ভালো
বলেই এত কথা প্রকাশ্য আইনী
পত্রিকায় লেখা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু
ইন্দিরা শাসনে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
ছিল আজও তারই গেছে। শোষণ,
ঘুষ সবই আছে।

অবশ্য, কতিপয় বিপ্লবের ব্যাধি-
গ্রস্ত, গণ আন্দোলনে শিশুহুলভ
বিশংখলা স্বষ্টিকারী নকশালপন্থী
বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনে নাক
সেঁটকান। তাদের মতে, সংসদীয়
গণতন্ত্রের ঘোমটার চেয়ে জরুরী অব-
স্থার মত নয় আক্রমণ, ফ্যাসিবাদ
ভালো, কারণ তাতে নাকি লোকের
চোখ খোলে। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, ধৈর্য
সহকারে এগুনোর কথা ওরা ভাবেন
না। তাছাড়া বুর্জোয়া গণতন্ত্রের
পুনঃপ্রবর্তন ওরা ভাবতেই পারেন না,
অথচ ইতালিতে ফ্যাসিবাদের অভ্যু-
থানে ১৯২৮ সালে স্থালিন বলে
ছিলেন যে, 'বুর্জোয়া গণতন্ত্রের
পতাকা আজ ধূলায় লুপ্ত।
কমিউনিস্টদেরকে সেই পতাকা তুলে
নিতে হবে।'

সমাজ বিজ্ঞান সম্মত এই দৃষ্টিভঙ্গী
নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন
মানবাধিকার রক্ষা সম্পর্কিত রাষ্ট্র-
সংঘের এই প্রস্তাবকে বিচার করে-
ছিল। সমর্থনে ভোটদান করেনি
এই কারণে যে, ঐ ঘোষণার ১৭নং
ধারায় ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠীগত
সম্পত্তির মালিকানা স্বীকৃত হয়েছে,
(Everyone has the right to
own property alone as well
as in association with
others)

অথচ ১৯৩৬ সালে সোভিয়েত
ইউনিয়নের সংবিধানে সরকার ১১৮
নং ধারায় চাকরির গ্যারান্টি, ১১৯
নং এ বিশ্রামের অধিকার, ১২১ নং
ধারায় শিক্ষার অধিকার, ১২৪ নং
ধারায় নাগরিকদের বিবেকের
স্বাধীনতা হিসেবে (গির্জাকে রাষ্ট্র
থেকে বিচ্ছিন্ন করে) ধর্মের স্বাধীনতা
এবং ১২৫ নং ধারায় বাক, প্রেস,
সমাবেশ, মিছিল এবং বিক্ষোভের
স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। অসমাজ-
তান্ত্রিক দেশের সংবিধানেও এগুলো
সাধারণত থাকে। কিন্তু সম্পত্তির
অবাধ মালিকানা সোভিয়েত সংবি-
ধান সংগত নয়। যেখানে সবই রাষ্ট্র
অথবা কো-অপারেটিভের মালিকানায়
চলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের
সংবিধানের ৭ এবং ৮ নং ধারা মতে
বসতবাটির জন্য একটা ছোট প্লট,
পোলট্রি, চাষের কিছু যন্ত্রপাতি পরি-
বারের মালিকানায় রাখা চলে।

তাই, ঐ ঘোষণার পক্ষে স্বাক্ষর
করে ভোট দিলে নিজের দেশের
সংবিধানকেও পান্টাতে হবে, সম্পত্তির
মালিকানা স্বীকৃত হবে। আবার
বিরুদ্ধে ভোট দেওয়াটাও সম্ভব হবে
হবে না, কারণ ঐ ঘোষণার কয়েকটি
ধারায় আবার ভালো ভালো কথা
বলা আছে। বিশ্ব মানবাধিকারের
বিশ্বজনীন ঘোষণায় মোট তিরিশটি
ধারা আছে। এর মধ্যে ১নং ধারায়
বলা আছে, প্রতিটি মানুষই সম

প্রয়োচনামূলক কার্য প্রচারণার নিন্দা

মৌলানা আজাদ কলেজের ছাত্র-
জনতা ইউনিটের উদ্বোধন উপলক্ষে
৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোডে ছাত্রজনতার
প্রাদেশিক কার্যালয়ে আয়োজিত
মধ্য কলকাতা ছাত্রজনতার এক কর্মী
সম্মেলনের পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রজনতার
সাধারণ সম্পাদক সুপ্রতীক বাগচী
ছাত্র পরিষদ নেতৃত্বের প্রয়োচনামূলক
কার্যকলাপ সম্পর্কে ছাত্রজনতার
সদস্যদের সতর্ক থাকতে আহ্বান
জানিয়েছেন। সম্মেলনে প্রধান
অতিথির ভাষণে ছাত্রনেতা সুপ্রতীক
বাগচী বলেন, ছাত্র পরিষদ গত পাঁচ
বছর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষায়তনগুলিতে
বোমা আর পাইপগানের সামনে
সাধারণ ছাত্রদের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করে
রেখে অবাধে স্বৈরাচারী রাজত্ব
কায়ম করেছিল, ছাত্র সংসদে নির্বা-
চন প্রহসনে পরিণত করেছিল।
সাধারণ ছাত্ররা তাদের স্বরূপ চিনে
ফেলেছে তাই আজ বিরোধী দলের
পর্যায়ে এসে ছাত্র পরিষদ নেতারা
অসহায় বোধ করছেন, তাঁরা এত-
দিনে উপলব্ধি করছেন তাঁদের পায়ের
তলায় মাটি নেই, সেক্ষেত্রে তাঁরা
কমুনিষ্ট বিরোধিতার জিগির তুলে
ছাত্রজনতাকে সঙ্গে পেতে চাইছেন,
যদিও তাঁরাই একদিন কমুনিষ্ট পার্টি

মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে শৃংখলাহীন
অবস্থায় জন্মলাভ করে। ৪নং ধারা
মতে সবপ্রকার দাস ব্যবস্থা এবং
দাস ব্যবস্থা নিষিদ্ধ। ১৯ নং ধারায়
স্বাধীন মতামত পোষণের অধিকার,
২০নং-এ শাস্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সমিতি
গড়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই
রকম ধারাগুলোর দিকে তাকিয়েই
সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ রাষ্ট্রসংঘের
সমাজতান্ত্রিক সদস্য রাষ্ট্রসকল বিরুদ্ধে
না গিয়ে ভোটদানে বিরত থাকে।

আমাদের সকলকে মানবাধিকার
সম্পর্কিত কমিটির ঐ তিরিশটি ধারা
জানতে হবে। কারণ ভারত সরকার
ঐ ঘোষণার স্বপক্ষে রায় দিয়ে স্বাক্ষর
করেছিলেন। কিন্তু ঐ পঞ্চাশ সাল
থেকে এ যাবত অভিজ্ঞতায় আমরা
দেখেছি মানবাধিকার লঙ্ঘনের
হাজার হাজার ঘটনা। গত বছরের
১০ই ডিসেম্বর মানবাধিকার রক্ষা
দিবস অতি গুরুত্ব সহকারে পালিত
হয়েছে। এ বছরও এর গুরুত্ব আছে,
কারণ বর্ষ হিন্দু জ্যোতিষারদের বন্দুক
হরিজনদের বুক কাঁকরা করে দিচ্ছে,
পুলিশ অফিসার ফুটপাতে শুয়ে থাকা
মহিলাকে বলাৎকার করার প্রয়ো-
জনে ইচ্ছেমতো গ্রেপ্তার করছে,
পুলিশ লক-আপে রাজনৈতিক কর্মীর
মৃত্যু আজও দেখছি। এবারের দশই
ডিসেম্বরের তাৎপর্য চিন্তা করে মান-
বাধিকারের সীমা সম্প্রসারিত করতে
হবে।

(পরবর্তী সংখ্যায় দেশ ও বিদেশে
মানবাধিকার)

অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে-
ছিলেন।

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে শ্রীবাগচী
বলেন, আমরা রাজ্য জনতা দলে
প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্ব অপরিস্রব বলে
মনে করি, কিন্তু জনতা পার্টি ভুল
করলে তার সমালোচনা করার অধি-
কার আমাদের আছে, কারণ ছাত্র-
জনতা স্বয়ংশাসিত সংস্থা। ছাত্র পরি-
ষদের প্রয়োচনায় আমরা কখনোই
কোনও দুর্নামী কুখ্যাত সমাজবিরো-
ধীর সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী নই।
তীব্র শ্লেষের সঙ্গে তিনি বলেন, বাড়ির
সামনে একদিন দুজন পুলিশ দেখে
স্বতন্ত্র মুবার্জী আজ হঠাৎ আঁতকে
উঠে গণতন্ত্রের বুলি আওড়াচ্ছেন।
কিন্তু জরুরী অবস্থায় স্বতন্ত্রবাবু যখন
মমী তখন বিরোধী দলের
হাজার হাজার নেতা ও কর্মীকে বিনা
বিচারে আটক রাখা হত, শ্রীবাগচীর
মত সাধারণ সংগঠন কংগ্রেস কর্মীর
বাড়ির সামনে দিবারাজ পুলিশ
প্রহরা থাকত! তাঁকে পাঁচবার
গ্রেপ্তার করে হয়রাণি করা হয়েছিল,
তখন ত' স্বতন্ত্রবাবু গণতন্ত্রের অভাব
বোধ করেননি?

হায়দ্রাবাদের চিঠি

অন্ধ্রে রাজনৈতিক ঘূর্ণিবায়ু

রমাপ্রসাদ মল্লিক

১৯১০ থেকে ১৯৭৭—প্রায় চারশো বছর। চার শতাব্দী ধরে চার মিনার বহাল তবিয়তে দাঁড়িয়ে থেকে প্রমাণ করছে আমাদের দেশের “নৈতিকতা” চারদিকে সমান কাটে। সততা এবং তার নামে ভাড়া মো; পরোপকারবৃত্তি কিন্তু তারই ফাঁকে নিজের উপকার বাগিয়ে নেওয়া; দেশপ্রেম ও সেই নামাবলী গায়ে পরাক্রমশালী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তল্লিবাহকতা, সর্বোপরি ঈশ্বর প্রেম ও প্রবঞ্চনা।

অন্ধ্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মূর্খ নন, রীতিমত ধূরন্ধর। তবে ইদানিং বড় বেকাদায় পড়ে গেছেন। প্রায় ঐতিহাসিক যে বিপর্যয় তুফান ও প্রাবনের রাজঘোটকী রূপে এ প্রদেশের দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্য ভেঙে দিয়ে গেল তা ঈশ্বরের “দান” রূপে তিনি দেখছেন কিনা বলা কঠিন, তবে অতি সম্প্রতি (৪ ডিসেম্বর) ঐশ্বরিকতা এবং মানবিক রাজনীতির অপূর্ব সংমিশ্রণ রাজধানী হায়দ্রাবাদের বিদ্রোহজনের আড্ডায় পরিবেশনের ব্যবস্থা করেছেন। অবশ্য এ ছাড়া এ সময়ে তাঁর উপায়ও ছিল না। দিল্লী থেকে তলব তাবড় তাবড় ক্ষমতা-রাজনীতিজ্ঞদের ও বুক কাঁপিয়ে দেয়।

বিশ্বয়কর মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, যখন অন্ধ্রের জনগণ সারা প্রদেশ-ব্যাপী ক্ষোভ ও খেদ নিয়ে ব্যস্ত—কেন এত বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে যাবার পর সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রশাসনিক যন্ত্রটাকে, আর্মি সহ পীড়িত ভুক্তভোগীদের সেবায় লাগানো হলনা—তখন কে একজন বিলি গ্রাহম খৃষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ এবং যীশুর বাণী-প্রবক্তা এবং তাঁর কিছু চেলাদের অনাবশ্যক স্বযোগ স্ববিধা দেওয়া হচ্ছে প্রচারণার জন্ত। স্বয়ং পর্যটন বিভাগীয় মন্ত্রী গ্রাহম-সাহেবের মিটিঙে সভাপতিত্ব করতে হাজির হলেন নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণাবশে। অথচ, প্রাদেশিক রাজনৈতিক (কংগ্রেসী) মহলে আজ এক “গেল গেল, ধর ধর” গোচর অবস্থা; ক্যাবিনেট থেকে এই সেদিন পাঁচজন মন্ত্রী ইস্তফা দিয়েছে, স্থানীয় জনতা পার্টির নেতা হাফ-নেতারা গুলি পাকছে কংগ্রেসী-ক্ষমতা রথ উল্টে দেবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ইন্দিরাপন্থী ভেদল রাও রাজনীতিতে না জানি কতই না স্থিতপ্রজ্ঞ এবং দৃঢ়তা দেখানর জন্ত এই সমস্ত “স্বাভাবিক”

জন-অহুষ্ঠান—যেন কিছুই হয় নি।

বস্তুতঃ, আজ কণাটকে যেমন, অজ্ঞতেও তেমনি ক্যাবিনেট ভাঙার কাজ আরম্ভ করায় মাত্র কিছুদিন আগেকার কংগ্রেসী ক্ষমতাস্বার্থীদের অহুষ্ঠান খেলা। ১৯৫৯ সালে কমিউনিষ্ট মন্ত্রিমণ্ডলীকে ছলে বলে হটানো, শেষ বেশ ডিসমিস করার মতন বলাংকার থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশে “সংযুক্ত বিধায়ক হল” ক্যাবিনেটের বহিষ্করণে বিশেষ কংগ্রেসী ক্যারাদানী শ্রীচরণ সিংয়েরও নিশ্চয়ই মনে আছে। থাকার কথাই কারণ তিনি স্বয়ং ও তাঁর সম-গোত্রীয়রা ভুক্তভোগী হয়েছিলেন (১৯৬৮-৬৯) এই নির্ভর গ্যাড়াকজে! [তাঁর টিমের একজন অনামধষ্ঠ “নিপীড়িত” তো আজ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালরূপে অধিষ্ঠিত]

কিন্তু ভেদল রাওকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ঘূর্ণিবায়ুর সৃষ্টি কেবল বিধাতার বিধান রূপে দেখলে ঠিক দেখা হবে না। বর্তমান শাসকবলের সাধারণ সম্পাদক নানাজী দেশমুখ এবং দাক্ষিণাত্যে জনতা পার্টি সংগঠনের প্রধান উত্তোজনা সুরেন্দ্র-মোহন যে সুরে প্রেস-বয়ান দিয়েছেন তাতে তো পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সরকারী ক্ষমতা এখন যাদের হাতে সেই এলিট নেতৃবর্গ স্পষ্টভাবে দলীয় মনোবৃত্তি আমদানী করেছেন অন্ধ্রের রাজনৈতিক পদ্ধতিটা হস্তক্ষেপ মারফৎ বদলে দিতে। “অন্ধ্রের জনগণ স্বৈরাচারী মন্ত্রিমণ্ডলীর কবল থেকে মুক্তি পাবার দাবীদার” ইত্যাদি, ইত্যাদি। মুখ্যমন্ত্রী এর জবাব দিয়েছেন হুতাবে: প্রথমতঃ তিনি রাজ্য কংগ্রেসের প্রাদেশিক কার্যকারিণীর বৈঠক ডেকে ৫ জন মন্ত্রীর হঠাৎ ইস্তফাদান পর্বের পর যে উদ্ভূত ক্যাবিনেট রয়ে গেছে, তার সমর্থনে প্রস্তাব পাস করিয়ে নিয়েছেন (৭২ জন সদস্যের মধ্যে ৫৬ জন উপস্থিত ছিল); দ্বিতীয়তঃ রাজ্য-প্রশাসনের আমলাচক্রের শক্তিকেন্দ্র মুখ্য সচিবের পদে একজন ডাটো ও বিশ্বাসভাজন আই, এ, এস, অফিসারকে বসিয়েছেন পুরোনো পদাধিকারীর স্থানে। এর ফলে, রাজ্য প্রশাসনিক যন্ত্রের ওপর কেন্দ্রের পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারের রাস্তা মোটা মুঠি বন্ধ হল।

এমনি প্রভাব খাটানর কাজ অনেক পূর্বেই শুরু হয়ে গেছে। সূক্ষ্ম-ভাবে, যখন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী

দেশাইর অন্ধ্র রক্ষণকে পীড়িত পরিদর্শনার্থে আবির্ভাব ঘটে। ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে জনমত তৈরি করা হয়েছে ভেদল রাও মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে। কোতুকের বিষয়, পরোক্ষ গোষ্ঠী কল্পন করে নি কেন্দ্রে শাসক-বর্গের দ্বারা আরম্ভ করা, তাদের মতই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের রাজনৈতিক স্বযোগ সন্ধান। স্থানীয় প্রেস বিমূঢ়, সাংবাদিকদের অনেকেই জানে ভেদল রাও বেকসুর নন, কেন্দ্রও কিছু ধোয়া তুলসী নয়। প্রসঙ্গতঃ, প্রায় দুই দশক আগে রয়ালসীমায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তা নিয়ে বামপন্থী রাজনৈতিক কেন্দ্রে সমালোচনা গুঞ্জন হওয়া মাত্র বিরোধী দল ও বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের মুখ বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার বজ্র নিধৌবে হুমকি দিতেন, জনগণের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে রাজনৈতিক খেলা খেলনা। বর্তমানে পারস্পরিক অবস্থান বদলে গেছে এবং শাসক জনতা পার্টি একমুখে বিরোধী স্বর রপিত করছে রাজনৈতিক “সততা” বাড়াবার অভিসন্ধি নিয়ে; অন্য মুখে ক্ষমতাস্বার্থমূলক ধর্মক দেওয়ার রেওয়াজ বজায় রেখে চেষ্টা করছে, ফেব্রুয়ারি ’৭৮ নির্বাচনে জনতা-পার্টির পক্ষে রাজনৈতিক আবহাওয়া অহুকুল করে তোলার। সম্ভবতঃ নির্বাচন পর্বন্ত ভেদল রাও ক্যাবিনেটের আয়ু বজায় রইল, যদি না ইতিমধ্যে কোনো অনিশ্চিত ও অভাবনীয় রাজনৈতিক ঘটনা পরিস্থিতিকে হঠাৎ বদলে দেয়।

অন্ধ্রের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে ভেদল রাওয়ের তিক্ত বচসা এবং পদত্যাগকারী অন্ধ্র মন্ত্রীদের প্রতি জনতা পার্টি নেতৃত্বের তরফে উল্লসিত অভিনন্দন জ্ঞাপন আশ্রয়ের রাজনৈতিক বায়ুচাপ কেমন তা দেখাচ্ছে। সাময়িকভাবে ব্যালেন্স হারানর ফলে ক্ষমতার দাঁড়িপাল্লা কোনদিকে ঝুঁকে পড়বে আপাততঃ তা বলা কঠিন। তবে এটা বুঝতে অস্বিধে হবার কথা নয় যে, অন্ধ্রে কংগ্রেসী প্রশাসন তার স্থায়ীত্বের গ্যারান্টি হারিয়েছে। একুশি পরিবর্তন আনার তাগিদ জনতা সরকারের (কেন্দ্রে) নেই; গৃহমন্ত্রীর বিরূতি এবং পার্টি কার্যকারিণীর মনোভাব ও প্রকাশ-ভঙ্গীতে তা ভাস্বর। তবু মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না এবং অন্তরিতার কারণে এমন কতক-

গুলি পক্ষপেপ নিয়ে ফেলছেন, বা তাঁকে রাজনৈতিক স্বযোগ সন্ধানীর পর্যায়ে ফেলে।

উদাহরণতঃ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক সফরের সময় তাঁর সঙ্গে দেখা অবধি না করা। এটা নিছক কাকতালীর গাফিলতি নয় তা বোকা গেল, রাও মহাশয়ের আপন কাজের সাক্ষী দেওয়ায়; তিনি বলেছেন ইন্দিরাজী নাকি তাঁকে খবর দেন নি। অথচ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য, তিনি নাকি ২৩শে নভেম্বর থেকে তাঁর প্রোগ্রাম সূচনা দিয়ে রেখেছেন। তবে রাও মহাশয় স্থানীয় রাজনীতির জট পরিবর্তনশীল হেরফের সম্বন্ধে অতি সচেতন, অতি সাবধানীও। গাওনা গেয়ে রেখেছেন, ইন্দিরাজী নাকি তাঁকে অহুমতি দিয়েছিলেন—শ্রীমদানন্দ রেড্ডীর কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হবার সময়—রেড্ডীর সমর্থনেই কাজ করতে। মানেটা যেন এই, আমি তো রামভক্ত হনুমানের মত, ইন্দিরাজী, তোমার প্রতি আজও রফাদার (বিশ্বস্ত); তুমিই তো আমাকে অন্ধ্র যাত্রা দর্শিয়েছ। কালের হাওয়া পালে লাগিয়ে তরী বাইতে ওস্তাদ ভেদল রাও প্রমাণ করে ছাড়লেন যে, প্রয়োজন হলে তিনি জনতা পার্টি মিছিলের সঙ্গে সমান্তরাল দূরত্বে হলেও সমান তাগে পা ফেলতে রাজী আছেন। এখন শ্রীচরণছোড়জী মোরারজীর পদ ভরসা।

নন্দ ঘোষের বাগড়ায় কাজ বন্ধ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

হুগলী জেলা পোলবা রকের চন্দনপুর অঞ্চলের সমাজসেবী অঞ্চল প্রধান নন্দকুমার ঘোষের বাগড়ায় সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে দর্পণের কাছে খবর এসেছে এখানে আবহুল গণি সরকারের নামে পাকা রাস্তাটি মেরামতের সময় এবং মাটি ফেলার সময় তিনি তাঁর বাড়ীর কাছাকাছি মাটি ফেলছেন। ওলিপুর থেকে ময়নাপোতা পর্বন্ত অর্ধেক পথে মাত্র মাটি পড়েছে। তাঁর জুলুমে কেউ কাজ করতে পারেন না বলে আহমদ মুবারক জানানেন।

শ্রীনন্দকুমার ঘোষ কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষের ভাগনে। জেজুর গায়ে ইনি থাকেন। এর ধর্পাতেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাণ্ডা ভাঁকাচোরা গণি সরকার হাসপাতালে টাকা মঞ্জুর এবং মেরামত বন্ধ রাখলেন। আজও হাসপাতালটি প্রায় অচল হয়ে আছে।

তার জুলুমে তদন্ত সব বন্ধ। কলাহড়া, হেতমপুর, নালিতপুর, ঘটাপুর কাঁকড়ে প্রভৃতি গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়নি। দরখাস্ত

যদিও কংগ্রেস এবং জনতা পার্টির মহারথী গোলন্দাজরা তে দেগেই চলেছে (চাবন, চন্দ্রশেখর, সিংহ, এম, পি,-র পরিদর্শন দল ইত্যাদি, ইত্যাদি), কিন্তু নিচের তলায় বাস্তবায়ন আমলারা আখের গুলিয়ে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত নয়—শোনা যাচ্ছে, জলসর্বস্ব দুর্গতদের জন্ত প্রতি পরিবারের কুঁড়ে তৈরির খরচ বাবদ মঞ্জুরীকৃত ১৫০ টাকা থেকে ৫০ টাকা সাক হয়ে যাচ্ছে। সম্ভবতঃ, পরে বৃহৎ আমলা অফিসারদের ঘুম ভাঙবে এবং ভ্রষ্টাচার নিরোধার্থে নেওয়া অফিশিয়াল কার্য পদক্ষেপের ফলে কিছু খুদেদের জ্ঞান যাবে। তবে প্রশাসনের চিমে-তোতলা লয় পূর্বের মতই ময়র। সেই ভয়ঙ্কর শনিবার (১৯ নভেম্বর) পার হয়ে পুরো এক পক্ষকাল কেটে যাবার পর ৩ ডিসেম্বর তারিখে অন্ধ্র সরকার বাঁশ তালপাতা এবং আহুযজ্ঞিক ঘর ছাওয়া বস্ত্র সরবরাহের জন্ত ঠিকাদারদের নিকট থেকে টেণ্ডার আহ্বান করেছে। ঈশ্বর জানেন, ঘর তৈরি করে দেওয়ার মহান ব্রত কবে সমাপ্ত হবে, অর্থাৎ দুর্গতরা তাদের পুরোনো দুর্গতির দিনে বস্ত্রী জীবনের ক্রেদে ও কষ্টে ফিরে যাবে। স্বাভাবিক কারণেই হায়দ্রাবাদের দৈনিক “ডেকান ক্রনিকল” পবিত্র রোষায়িতে প্রদীপ্ত হয়ে লম্বা সম্পাদকীয় লিখে ফেলল।

করুণেও দেবেন না এবং আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের কাজ করতে দেবেন না। এটা এর জিহা।

এখন জনতা এম, এল, এর সমর্থক হয়ে সংখ্যালঘু এলাকায় উন্নয়নে বাধা দিচ্ছেন। হরিপাল থেকে চন্দননগরের একটি রাস্তা তিনি তার বাড়ীর দিকে জোর করে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। অথচ ম্যাপ ও সরকারী নির্দেশে রাস্তা চলার কথা অন্ধ পথে।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

৪ টাকার হার।

বার্ষিক ২২ টাকা

ষাণ্মাসিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাণর ঠিকানা

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, মট লেন। কলিকাতা-১৩



ইন্টার্ন কোলোফিন্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়া একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে

১। ষ্ট্রাকচারাল স্টীল ওয়ার্ক

রেফা: নং ৪৫/৪১০০/৭৭/৩৫৩২ তাং ২৮.১১.৭৭

সাব-এরিয়া ম্যানেজার, অমৃতনগর সাব-এরিয়া, কুর্নুলেরিয়া এরিয়া, পো: রাণীগঞ্জ, জেলা বর্ধমান বিখাসযোগ্য, সঙ্কতিসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ সিভিল কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে শতকরা (নিম্ন / সমান / উচ্চ) আইটেম দরের ভিত্তিতে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করছেন নিম্নোক্ত কাজের জন্য: (১) অমৃতনগর কোলিয়ারীতে (প্রোজেক্ট) ষ্ট্রাকচারাল স্টীল ওয়ার্ক (ইন-ক্রাইন) ৪৩,৩৮২ টাকা অঙ্কিত খরচে (ই সি এল নির্দিষ্ট দরের ভিত্তিতে)।

বায়নার টাকা ৪৪০ এবং সম্পূর্ণ করার সময় ২০ দিন।
গ্রুপ অ্যাকাউন্টস অফিসার, কুর্নুলেরিয়া সাব-এরিয়া-র কাছে নগদ ১০ টাকা (অগ্রত্যাগযোগ্য) দিয়ে ২১.১২.৭৭ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন অফিসের সময়ে সাব-এরিয়া ম্যানেজার, অমৃতনগর সাব-এরিয়া, কুর্নুলেরিয়া এরিয়া-র অফিস থেকে শর্তাবলী সহ টেন্ডার দলিল পাওয়া যাবে। ৩০.১২.৭৭ তারিখ বেলা ১১টা পর্যন্ত টেন্ডার গ্রহণ করা হবে এবং ঐ দিন বেলা ১১-৩০টায় টেন্ডারদাতা/উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রোজেক্ট ম্যানেজার, নিউ অমৃতনগর প্রোজেক্ট-এর অফিসে টেন্ডার খোলা হবে। বায়নার টাকা "কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড, ইন্টার্ন ডিভিশন, অমৃতনগর গ্রুপ"-এর অফিসে এ/সি পেম্বী ব্যাঙ্ক ড্রাক্টের আকারে অথবা গ্রুপ অ্যাকাউন্টস অফিসার, অমৃতনগর সাব-এরিয়া-র কাছে নগদে দিতে হবে এবং তার রসিদ টেন্ডারপত্রের সঙ্গে দিতে হবে।
বায়নার টাকা ছাড়া টেন্ডার বাতিল করা হবে।

২। নির্মাণ কার্য

রেফা: নং ই সি এল / জি এম / সি ই / ৮২০ তাং ২৪.১১.৭৭

মুগমা এরিয়ায় গোপালপুর টাউনশিপে প্রদত্ত অ-সম্পূর্ণ কাজের জন্য বিখাসযোগ্য কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে শতকরা ভিত্তিতে সীল করা টেন্ডার। কাজের নাম, কতদূর সম্পূর্ণ, ই সি এল '৭৫ সিডিউল অস্থায়ী অঙ্কিত খরচ এবং বায়নার টাকা নিম্নরূপ:

(১) 'এ' টাইপ ৪৪ ইউনিট, লিটেল লেভেল, ৭,১২,১১৭ টাকা এবং ৭,২০০ টাকা (২) 'এ' টাইপ ৪ ইউনিট, সিল লেভেল, ৬৬,১২৬ টাকা এবং ৬৭০ টাকা (৩) টাইপ 'বি' ১৬ ইউনিট, লিটেল লেভেল, ৩,৬৮,১৬৮ টাকা এবং ৩,৬৮০ টাকা (৪) টাইপ 'বি' ৪ ইউনিট, প্লিন্থ লেভেল, ২৬,২২২ টাকা এবং ২৬২ টাকা (৫) টাইপ সি ৮ ইউনিট, রুফ লেভেল, ২,৩২,৫৫৬ টাকা এবং ২,৩২৫ টাকা (৬) টাইপ 'সি' ৪ ইউনিট, লিটেল লেভেল, ১,২০,৬২৭ টাকা এবং ১,২০৬ টাকা (৭) টাইপ 'ডি' সিঙ্গেল ইউনিট, রুফ লেভেল, ৬১,৭৫৪ টাকা এবং ৬১৮ টাকা (৮) টাইপ 'ডি' ২ ইউনিট টিউ-ওয়েলের কাছে, লিটেল লেভেল, ১,০৬,৭৫৮ এবং ১,০৬৮ টাকা (৯) টাইপ 'ডি' ২ ইউনিট ট্রোর বিল্ডিংয়ের কাছে, লিটেল লেভেল, ১,০৮,৭৮১ টাকা এবং ১,০৮৮ টাকা (১০) 'ডি' টাইপ ২ ইউনিট, সিল লেভেল, ১,১৪,৪২২ টাকা এবং ১,১৪৫ টাকা (১১) এন এইচ এস কোয়ার্টার ১৬ ইউনিট (মোটলা) প্লিন্থ লেভেল, ১,০৮,৩২২ টাকা এবং ১,০৮৪ টাকা (১২) এন এইচ এস কোয়ার্টার ১৬ ইউনিট (মোটলা) প্লিন্থ লেভেলের নীচে, ১৮৪,৩০৩ টাকা এবং ১,৮৪৪ টাকা। প্রত্যেকটি কাজ সম্পূর্ণ করার সময় ৬ মাস।

টেন্ডারদাতারা প্রত্যেকটি টেন্ডার দলিলে সমস্ত ইউনিট অথবা মোট ইউনিটের অংশ বিশেষের জন্য দর দিতে পারেন আনুপাতিক বায়নার টাকা জমা দিয়ে। ২৩.১২.৭৭ তারিখ বেলা ৩-৩০টা পর্যন্ত জেনারেল ম্যানেজার, মুগমা এরিয়া, পো: মুগমা, জেলা ধানবাদ-এর অফিসে টেন্ডার গ্রহণ করা হবে এবং ঐ দিন বেলা ৪টায় উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেন্ডারদাতা অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। জেনারেল ম্যানেজার, মুগমা এরিয়া-র অফিস থেকে টেন্ডার দলিল পাওয়া যাবে। কেসিয়ার, এরিয়া অফিস, মুগমা এরিয়া-র কাছে ২৬.২৫ টাকা (অগ্রত্যাগযোগ্য) নগদ জমা দিয়ে ১৪.১২.৭৭ তারিখ থেকে ২২.১২.৭৭ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে অফিসের সময়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। বায়নার টাকা নগদে / কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড, ইন্টার্ন ডিভিশন, এরিয়া-৮-এর অফিসে ডিমাণ্ড ড্রাক্ট ডিপোজিটের আকারে জমা দিতে হবে।

গ্রন্থ সমালোচনা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

এস্টারিসমেন্ট নামক মাসির খাতার নাম না লিখিয়েও যে একজন সংকল্পিত অগণন সচেতন পাঠকের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছেন এটা তাঁর পক্ষে কম অহংকারের বিষয় নয়। পাঠকের কাছে যদি ভোট নেওয়া হয় সাম্প্রতিক কালে সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি কে? নির্বিধায় একটি নামই উচ্চারিত হবে; বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অথচ তাঁর অসামান্য জনপ্রিয়তার পিছনে এস্টারিসমেন্ট-নামক জয়চাকটি নেই।

তাহলে তাঁর জনপ্রিয়তার আসল উৎসটি কোথায়? সেটি এই ১৯৭২-র ষাটোপথ থেকে সত্তরের এই দশক পর্যন্ত তিনিই একমাত্র জীবন্ত কবি, যার কবিতার প্রথম শর্ত রাজনীতি মনস্তত্ত্ব। এই রাজনীতি অত্যাচারিত নিগৃহীত মানুষের সঠিক আন্দোলনের স্তরগুলিকে বিদ্ধ করে, মানুষকে উত্তরণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। মূলত যেখানেই অত্যাচার সেখানেই কবি তাঁর

কাজের সম্পূর্ণ ড্রয়িং যে কোন কাজের দিনে অফিসের সময়ে গিয়ে দেখা যেতে পারে। টেন্ডার প্রস্তাব ছয় মাস পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। কর্মস্থল ইত্যাদি সমস্ত কিছু পর্যালোচনার পর কন্ট্রাক্টররা দর দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। টেন্ডারদাতারা সীল করা খামে যে কোন আইটেমের সমস্ত অথবা অংশ বিশেষের জন্য দর দিতে পারেন টেন্ডার দলিল নং, কাজের নাম ও বায়নার টাকার বিবরণ সীল করা খামের ওপর উল্লেখ করে। টেন্ডারপত্র দেবার আগে টেন্ডারদাতার যোগ্যতা সম্পর্কে দলিল ভিত্তিক প্রমাণপত্র দেখাতে হবে, যে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। বায়নার টাকা ছাড়া টেন্ডার বাতিল করা হবে।

ভাটিতে পোড়ানো / বাঙ্গলা ইঁট তৈরি ও সরবরাহ

রেফা: নং এস এ এম / কে এইচ / এ ই (সি) / টেন্ডার ব্রিকস / ৭৭-৭৮ / ৩৬১১ তাং ১১.১১.৭৭

কোটাভিহি সাব-এরিয়ায় ভাটিতে পোড়ানো / বাঙ্গলা ভাট্টা ইঁট তৈরি ও সরবরাহের জন্য বিখাসযোগ্য ও অভিজ্ঞ কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে সীল করা টেন্ডার। কোলিয়ারীর নাম, প্রতি কোলিয়ারীতে তৈরির পরিমাণ এবং বায়নার টাকা নিম্নরূপ: কোটাভিহি কোলিয়ারী-১৫ লক্ষ প্রথম শ্রেণীর ভাটিতে পোড়ানো এবং ৮ লক্ষ বাঙ্গলা ভাট্টা এবং ৩২২৫ টাকা। সামলা কোলিয়ারী-১০ লক্ষ প্রথম শ্রেণীর ভাটিতে পোড়ানো এবং ৫ লক্ষ বাঙ্গলা ভাট্টা এবং ২১২৫ টাকা। প্রত্যেকটি কাজ সম্পূর্ণ করার সময় ৬ মাস। পিট দপ থেকে চার থেকে ছয় কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে উপযুক্ত স্থান ও জমির ব্যবস্থা করার দায়িত্ব কন্ট্রাক্টরদের গ্রহণ করতে হবে। উৎপাদন খরচের মধ্যে ইঁট তৈরির জায়গা থেকে বিভিন্ন কোলিয়ারীতে পিটের কাছে লোডিং, আন-পোডিং ও যথাযথভাবে ষ্ট্যাকিং সহ পরিবহনকেও ধরতে হবে। ইঁট তৈরির জায়গা থেকে কোলিয়ারীর পিট টপে ইঁট পরিবহন ছাড়াও কন্ট্রাক্টরগণকে প্রদত্ত দরের মধ্যে জমি ব্যবহারের জন্য ক্ষতিপূরণ, রাজ্য সরকারকে দেয় রওয়ালটি, জল, কয়লা ও শ্রমিক ইত্যাদির খরচও ধরতে হবে। ইঁট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জল ও জমির ব্যবস্থা কন্ট্রাক্টরদের নিজেদের করতে হবে। যদি জমি ও জলের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে প্রতি ১০০০ ইঁটের জন্য যথাক্রমে ১ টাকা ও ২ টাকা কন্ট্রাক্টরদের বিল থেকে নেওয়া হবে। কর্তৃপক্ষ প্রতি লক্ষ ভাটিতে পোড়ানো / বাঙ্গলা ভাট্টা ইঁট তৈরির জন্য ২১ টন করলা সরবরাহ ক্যাবেন বর্তমান দবে। সাব-এরিয়া ম্যানেজার, কোটাভিহি সাব-এরিয়া, পো: পাণ্ডবেশ্বর-এর অফিস থেকে টেন্ডার পত্র ও শর্তাবলী সহ অন্যান্য বিবরণ পাওয়া যাবে কেসিয়ার, কোটাভিহি সাব-এরিয়া-র কাছে প্রতি সেটের জন্য ১৫ টাকা (অগ্রত্যাগযোগ্য) নগদ দিয়ে ১৫.১২.৭৭ থেকে ২১.১২.৭৭ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে কাজের নির্দিষ্ট সময়ে। কেসিয়ার, কোটাভিহি সাব-এরিয়া র কাছে টেন্ডার খোলার দিন ছাড়া যে কোন কাজের দিনে কাজের নির্দিষ্ট সময়ে বায়নার টাকা জমা দেওয়া যেতে পারে যা অসফল টেন্ডারদাতাদের ক্ষেত্রে দেওয়া হবে। কোটাভিহি সাব-এরিয়ায় অফিসে সাব-এরিয়া ম্যানেজার কর্তৃক ২১.১২.৭৭ তারিখে বিকেল ৩-৩০টা পর্যন্ত টেন্ডার গৃহীত হবে এবং ঐ দিন বিকেল ৪টায় টেন্ডারদাতা অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। বায়নার টাকা ছাড়া টেন্ডার বাতিল করা হবে। বাঙ্গলা ভাট্টার দরও প্রয়োজন একই শর্তাবলীতে।

দেখে তিনি পলায়ন করেন না, জনগণের সঙ্গে সেই অত্যাচারের শরিক হন। কলে, তাঁর কাব্য স্বাভাবিকভাবেই মানুষের আত্মীয়তা অর্জন করে। এটা একজন কবির পক্ষে কম পুরস্কারের কথা নয়। বিশেষত এই সত্তরের দশকে পশ্চিম বাঙালি রাজনৈতিক বাতাবরণে যে আন্দোলনগুলি ছুঁবার হয়ে উঠেছে সেইসব ক্ষেত্রে কবির লেখনী সুরধার হয়ে উঠেছে। কখনো ব্যঙ্গ, কখনো ক্রোধ, কখনো মানিতে, কখনো প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞায় ভাস্বর। তাঁর 'পষ্ট' উচ্চারণে আত্মদানের পবিত্র সংকল্প ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। ষৈরাচারী শক্তির হুমকিও তাঁকে পথভ্রষ্ট করেনি।

সেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমগ্র কবিতা খণ্ডে খণ্ডে বের হবার প্রতিশ্রুতি সহ সমগ্র প্রকাশিত হয়েছে প্রথম খণ্ডটি গ্রন্থবিতান ৭৩ বি মুখার্জি রোড, কলকাতা ২৬ থেকে। দাম দশটাকা।

তাঁর আদি থেকে যে কাব্যগ্রন্থগুলি ক্রমাগত প্রকাশিত হয়েছে যেমন গৃহচ্যুত, তিন পাহাড়ের স্বপ্ন, রাগুর জন্ম, উলুখড়ের কবিতা, মৃত্যু-তীর্থ, লখিম্বর, জাতক-কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিই প্রথম খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে। ১২৮ পৃষ্ঠার গ্রন্থ, মূল্যবান ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা, হৃদয় প্রচ্ছদপট্ট এঁকেছেন মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত। কবিতাহরাগী সচেতন পাঠকের কাছে গ্রন্থটি অবশ্যই সানন্দে গৃহীত হবে। ইতিমধ্যে আমরা নাগ্রহে অন্যান্য খণ্ডগুলির জন্য অপেক্ষা করে থাকব।

মিহির আচার্য

হাওড়া পৌরসভা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পৌরসভার নিজস্ব জরী বসিয়ে ভাড়া জরী খাটানো, শহরের বাড়ী-ঘরের এসেসমেন্ট ও প্রান পাশ করানো সহ ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের হাজারো কারচুপি বন্ধ করা না হলে এই পৌরসভায় সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ভরতুকি দিলেও কোনও লাভ নেই।

রাজ্য সরকার আলোকদূত দাসকে চেয়ারম্যান করে একটি উপ-দেষ্টা কমিটি বসিয়েছেন। তার-পরেই কমিটির বিভিন্ন সদস্যকে বিভ্রান্ত করার জন্য কতিপয় ইউনিয়ন নেতা বেশ সচেষ্ট। শহরের বাসিন্দাদের বক্তব্য, কমিটি কি হাওড়া পৌরসভার ইউনিয়ন নেতা ও কিছু অফিসারের ঘুরুর বাসা ভাদতে দৃঢ় পদক্ষেপ নেবেন।

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মেলনী কলকাতা জেলা সম্মেলন

(দর্পণের প্রতিনিধি)

গত তেসরা ডিসেম্বর প্রেসিডেন্সী কলেজের বেকার হলে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মেলনীর কলকাতা জেলা কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শুরুতে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং কানাই দত্তের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব নেওয়া হয়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের সংগ্রাম অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে আছে। গণতান্ত্রিক সাহিত্যিক কলাকুশলী ও শিল্পীরা এ

ব্যাপারে এগিয়ে এসেছেন সেটা স্বত্বের ব্যাপার। আমি এই উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।

সভাপতির ভাষণে নারায়ণ চৌধুরী অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, এই সমস্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে সমাগত শিল্পীরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন এবং সমাজকে অপসংস্কৃতির হাত থেকে মুক্ত করবেন।

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র বলেন অপসংস্কৃতির সঠিক সংজ্ঞা নেই। এটা একটা উপলব্ধির ব্যাপার

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা এই অপসংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। একে নিমূল করার দায়িত্ব শিল্পীদেরই নিতে হবে।

এই সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন, তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, ডঃ কুদ্রিয়াম দাস, সাধন গুপ্ত, বিজয় চৌধুরী প্রমুখ।

সম্মেলনে নজরুল রচনাবলী প্রকাশের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়েছে, এছাড়াও টেলিভিশন, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা, বন্দীমুক্তি, নাট্যদলগুলির সমস্তা ও অপসংস্কৃতি সম্পর্কে প্রস্তাব নেওয়া হয়।

জোট বাঁধছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ও সমালোচক হিসেবে প্রফুল্ল সেনকে শুধু প্রশংসা করি, যে গান্ধীবাদী সভ্য-গ্রন্থী ও সভ্যাবলী, ১৯৭২-৭৬ সালে যখন সিদ্ধার্থ রায়ের রাজত্ব বেপরোয়া খুন-খারাপি, চুরি, রাহাজানি, নারীধর্ষণ চলেছে, শত শত লিপি এম কর্মী খুন হয়েছে, কংগ্রেসীরাই কংগ্রেসীদের হাতে রক্তিত করেছে, ভাগচাষীরা উৎখাত হয়েছে, জোতদাররা ডাঙাবাজী করে ধানকেটে নিজেদের গোলায় তুলেছে তখন আপনাদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নি কেন এবং গত ৩০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে আপনি আইন-শৃঙ্খলার ধূলা তুলে চীৎকার করছেন কার স্বার্থে? আপনি জবাব না দিলেও সাধারণ লোক আপনাকে চেনে, আপনাদের মন্ত্রী থাকাকালীন কার্ণকলাপ এখনও কেউ ভোলেনি। এবং আপনিও নিশ্চয় ভোলেন নি যে, একসময় আপনি পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন সবচেয়ে ধিকৃত ব্যক্তি।

আনন্দ মুখরিত রবীন্দ্র কানন

রবীন্দ্র কানন এখন আলোকমালায় সজ্জিত হয়ে আনন্দ মুখরিত। অপরূপ শোভামণ্ডিত প্যাণ্ডেলে প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রামোদী দর্শক সানন্দে যাত্রা পালার আনন্দ উপভোগ করছেন। এই উৎসবের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন। আগামী ২১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই উৎসব চলবে। এই সম্মেলন শুরু হয়েছিল চার বছর

বধু নির্যাতনের একঘেয়ে ছবি

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই সনাতন বিষয় বধু নির্ধাতনকে কেন্দ্র করে সাবেকী চয়ে আজও বাংলা ছবি তৈরী হয়। চিত্র কাহিনীর সময়কাল স্পষ্ট বলা হয় নি—তবে যে সময় জমিদারী প্রথা ছিল, আট বছরের মেয়ের সংগে চোদ্দ বছরের ছেলের বিয়ে যে কালে হত, শাস্ত্রীয় নির্মম অত্যাচার ও গল্পনার শিকার হয়ে যে যুগে পুত্রবধু আত্ম-হত্যা করত, সেই কালের বিষয়বস্তু নিয়ে নতুন বাংলা ছবি 'প্রতিমা' মুক্তি পেয়েছে। তারারশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কাহিনী অবলম্বন করে ছবিটি পরিচালনা করেছেন নবীন পরিচালক পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছুঃখের বিষয়, পরিচালনায় নবীনতার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। বিষয়গত দিক থেকে যেমন কোন আধুনিক তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় নি তেমনি পরিচালনায় কোন আধুনিক শিল্প ব্যক্তিত্বও প্রকাশ পায় নি। আবেদন সঞ্চারেও ব্যর্থ ছবি।

যে যুগে জমিদারের প্রতাপ ছিল দোহাও সেই যুগে জমিদার কর্তা তাঁর গিন্নীর কাছে এতখানি মেক-দণ্ডহীন যে, পুত্রবধু ওপর নিপীড়ন চোখে দেখেও নীরব থাকেন। অথচ তিনিই পছন্দ করে একদা বালিকা বধুকে ঘরে এনেছিলেন। দরিদ্র ঘরের মেয়েকে পুত্রবধু করার গল্পনাও সুনতে হয়েছে তাঁকে গিন্নীর কাছ থেকে। বধুর পিতা পুণের টাকা দিতে না পারায় অপরাধে জমিদার গিন্নী সেই বালিকা অবস্থা থেকেই বধুর প্রতি পুত্রের মন বিষিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনা এমন কতই না ঘট—এ নিয়ে বাংলা ছবিও কম হয় নি। কিন্তু আজ এই সত্তর দশকের শেষ লগ্নে এমন ধারার ছবি কেমন যেন বিশ্বাস লাগে। তবে জমিদার বাড়ির বেতনভুক মুংশিল্পী দুর্গা-প্রতিমা গড়তে গড়তে জমিদার

পরিবারের গৃহবধু এই নির্ধাতনের সাক্ষী হয়ে যে নিরুদ্ভার সমবেদনা প্রকাশ করে এবং অলক্ষ্যে বধুর মুখের আঁধারেই প্রতিমার মুখ গড়ে তোলে, তা ছবিটির মধ্যে এক নাটকীয় বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। এই মুহূর্তগুলি রচনার পরিচালক কৃতকার্য হয়েছেন যদিও নান্দনিক তাৎপর্য সৃষ্টির অবকাশ যথেষ্টই ছিল।

হেমন্ত মুখার্জীর সংগীত পরিচালনা সাধারণ মানের। ধীনবন্ধু মিত্র ও তারারশংকর রচিত গান দুটি উল্লেখযোগ্য। সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় অভিনয়ে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মনে কোন ছাপ ফেলেন না। অল্পপুন্নারের অভিনয় উপভোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনে
রবীন্দ্র কাননে
১৭ই ডিসেম্বর শনিবার
সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট

কংস

পরিবেশনায়

ভারতী অপেরা

৫৫-২৩৫১

ভারতের গৌরব

নবরঞ্জন অপেরা

৮-৪-র

শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা

ম-ভ-য়া

“বাবুজী আপনার এ বাত আমি মানি না। আদমী যদি সবাই সমান—তবে কেন জিন্দেগী ভর আমরা রাস্তার মানুষ আর কেউ বড় ইমারতে থাকে? কেন কারো হুদিন শুখা রোটি মেলে না আর আর কারো ফেলে দেওয়া খাবার রাস্তার কুত্তারা পেট ভরে খায়? এ সবই নসীব বাবু—সবই নসীব”

মহুয়া—ছন্দা চ্যাটার্জী

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন

রবীন্দ্র কাননে

১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬-৩০ টায়

ম-ভ-য়া

সম্পাদক—দীপেন বসু

প্রকাশক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২০১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং বর্ণন কার্যক্রম ৬১ মট জেন কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

প্রাক্তন ব্যাকিং মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী কর্তৃক তহবিল তছরূপ :

সমস্ত ঘটনা ধামাচাপা পড়ে আছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কংগ্রেসী আমলে ভারত সরকারের ব্যাকিং ও রেভিনিউ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণবকুমার মুখার্জীর বিরুদ্ধে একটি কলেজের প্রায় আঠারো হাজার টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ ধারের থাকা সত্ত্বেও প্রণব মুখার্জী বহাল তবিয়তে দায়িত্ব করে গিয়েছেন। এই চাকলাকার ঘটনার সমস্ত কাগজ-পত্র ফাইলের কাগজ দর্পণের কাছে আছে।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে, ১৯৬১ সালের ২২শে আগস্ট ২৪ পর-গাঁও বিষ্ণুপুর থানায় রাজ্য সরকারের লেকেকারী এডুকেশন শাখার তদা-নীন্তন চীফ ইনসপেক্টর এস. সি. রায় সরকারের তরফ থেকে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে বিজ্ঞানগণ শিক্কা সংসদ ও তাঁর অন্তর্গত বিজ্ঞানগণ কলেজের তদনকার ভাইস প্রিন্সিপাল প্রণব-কুমার মুখার্জী ও কলেজের এ্যাকা-উন্টেন্ট জি. পালের বিরুদ্ধে তদন্ত করার জরুরী অনুরোধ করেন। লিখিত অভিযোগে প্রণব মুখার্জী ও জি. পালের বিরুদ্ধে কলেজের তহবিল তছরূপ করার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করা হয়। এছাড়া বিজ্ঞানগণ শি-
 ক্কা সংসদের অধীনস্থ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতি-
 ঠানের জন্তে ভূয়া রসিদে মালপত্র
 কেনার নানা অভিযোগ লিপিবদ্ধ
 করানো হয়। [এটি হচ্ছে বিষ্ণুপুর
 থানার পুলিশ কেস নম্বর ২২। তারিখ
 ২২-৮-৬১। ভারতীয় দণ্ডবিধির
 ৪০৬ (বিশ্বাস ভংগ) নং ধারার অভি-
 যোগ।] অভিযোগ পাবার পর

পুলিশ বিজ্ঞানগণ কলেজ ও বিজ্ঞা-
 নগণ শিক্কা সংসদের সংশ্লিষ্ট কাগজ-
 পত্র বাজিয়াপ্ত করে।
 অভিযোগ লিপিবদ্ধ হবার পর
 প্রায় আট বছর অতিক্রান্ত হয়েছে।
 প্রণব মুখার্জী বিজ্ঞানগণ কলেজের
 ভাইস প্রিন্সিপালের পদ থেকে
 (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

শিয়ালদহ অঞ্চলে কংগ্রেসীদের গুপ্তায়া : পুলিশ নির্দিকার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দিন পাণ্টে নতুন সরকার পশ্চিম-
 বঙ্গে শাসনের ভার নেবার পরও যুব
 কংগ্রেসীদের হীন গুপ্তায়া চলছে।

গত শুক্রবার (১৬ই ডিসেম্বর)
 রাজি চা। টার সময় মহাত্মা গান্ধী
 রোড শিয়ালদহ জংশনের কাছে
 বীভৎস গুপ্তায়া স্বচক্ষে দেখলাম।
 শিয়ালদহ মহাত্মা গান্ধী রোডের
 মোড়ে বাসের জন্ত দাঁড়িয়েছিলাম।
 দেখলাম এক গরীব শাকওয়ালাকে
 ট্রাউজার-পাঞ্জাবী-লেডীজ স্কাফ-
 শোভিত তোলা সংগ্রহকারীদের
 দাবী পূরণ করতে না পারায়
 বেধড়ক মার খেতে। জনৈক
 নিরীহ পথচারী যিনি ঘটনার খব
 কাছেরে ছিলেন এই অত্যাচার ব্যবহারের
 প্রতিবাদ জানান ও বে-আইনী

বললেন, "এরা সব সোয়েন মিত্রের
 চেলা। উনি এখানকার প্রাক্তন এম,
 এল, এ। আজ নির্বাচনে পরাজিত
 হলেও তার এই ব্যবসা অব্যাহত
 আছে। দেখছেন না প্রায় আট বছর
 হয়ে গেলে তবু পুলিশের দেখা নেই,
 অথচ এ মোড়েই তো কাড়ি। উদ্দেশ্য
 চেলাচামুগার জায়গাটা ঘিরে আছে
 —কিছু করা যাবে না।"

শেষে কয়েকজন ভক্তলোকের
 চেষ্টায় রক্তাক্ত প্রায় জ্ঞানহীন ভক্ত-
 লোকটিকে ছবিঘর সিনেমার বিপ-
 রীতে এক দোকানে ঢুকিয়ে দেওয়া
 গেলো। এই অপরাধে দোকানটি
 যখন প্রায় আক্রান্ত হবার জোগাড়,
 তখন কয়েকজন লাঠিধারী পুলিশ
 ঐ মস্তানদেরই সঙ্গে কথা বলতে
 বলতে এসে ভীড় হাটিয়ে দিলো এবং
 তখন লোকটিকে হাসপাতালে
 পাঠানো গেলো।

দোকানদারটিকে প্রশ্ন করে জান-
 লাম যে প্রতিদিন না'ক রাত ৮।-৯
 টার সময় এই একই ঘটনার কমবেশী
 পুনরাবৃত্তি হয়। লোকে আজও
 ভয়ে ঐ প্রাক্তন এম. এল, এর
 পোষিত কুস্তাদের পাওনা দিয়ে
 খেতে বাধ্য হচ্ছে।

তেল-ডাকাতির ব্যবসার সঙ্গে পুলিশ অফিসার ও জেলার প্রশাসন জড়িত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

তেল ডাকাতি মাত্র কিছুদিন
 আগেও বা হতো রাতের অন্ধকারে
 এখন তা প্রকাশ্যদিবালোকে অস্বস্তিত
 হচ্ছে। কলকাতা মহানগরের বিভিন্ন
 জেলায় তেলের গোডাউনগুলিতে
 এখন আগের চেয়েও বেগরোয়া কার-
 বার চলছে। কলকাতার বুকে এই
 সব ব্যাপারে লেনদেন বজায় রাখার
 জন্ত হুদর বোধে থেকে নামকরা
 চোরাকারবারীরাও শহরে এসে ভীড়
 জমিয়েছে। এক্ষেত্রে পুলিশ অফি-
 সার প্রতিদিন রাতে কুখ্যাত চোরাকার-
 বারীদের সঙ্গে খানাপিনা
 চালাচ্ছেন।

দর্পণের কাছে সুস্পষ্ট তথ্য রয়েছে
 যে জেলার ডি আই বি শাখার পদস্থ
 অফিসার, থানার কর্মচারী, জেলা

প্রশাসনগুলি সরাসরি এই কারবারের
 সংগে জড়িয়ে পড়েছে। জাতীয়
 সড়কের ধারে দেওয়ালঘেরা গোডাউন-
 (শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

বিশ্বরূপায় ছাঁটাইয়ের তোড়জোড়

(দর্পণের সংবাদদাতা)

দর্পণে সংবাদ সরবরাহ করার
 মিথ্যা সন্দেহে বিশ্বরূপায় 'বাবু'
 রাসবিহারী সরকার কতিপয় কর্মীকে
 ছাঁটাই করার মতলবে রয়েছেন বলে
 খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে শিল্পী
 সহ কয়েকজন সাধারণ কর্মীও
 রয়েছেন।

'বাবু' কুর্কমের স্বাভাবিক তথ্য
 দর্পণ কয়েক সপ্তাহে বিস্তারিত ভাবে

প্রকাশ করেছে। এর পর থেকেই
 'বাবু' তাঁর "কাজকর্মের" ব্যাপারে
 বাধানাকারী কতিপয় কর্মীর ওপর
 দারুণ রকম খাপ্পা। দালাল জেলীর
 কয়েকজন কর্মীকে দিয়ে কিছু কর্মীকে
 মাসপেণ্ড করা হচ্ছে। আগামী জাহ্ন-
 যারীমাস থেকে নতুন নাটকের প্রদর্শন
 শুরু হচ্ছে। এই সুযোগে রাসবিহারী
 (শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)

সত্যনারায়ণ সিংরা প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের নতুন স্থপতি

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

আরোপ করতে রাজী নন। কোন
 এক গোড় কবির কয়েকটি লাইন
 উদ্ধৃত করে বলছি, "আরে কারে
 করি ভয়, ব্যাধ সর্পে তত নয়, মাহুয
 জন্তরে বত ভরি।" তাই; প্রমোদ-
 বাবুর মত এইসব চক্রীদের কার্য-
 কলাপ আমরা খুব লক্ষ্য করে দেখছি
 না। অতীতের অভিজ্ঞতা বশেষে
 তিত্ত বলেই হয়তো।

একদা এ সব বাধা বিম্বীরা
 নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে রূপদী
 বিস্তি সহযোগে নির্মা করে অবশেষে
 নিজেদের খালী নির্গত পুষ্টি

নিজেরাই লেহন করে নির্বাচনে
 অংশগ্রহণ করেছেন। অসীম
 চ্যাটার্জী কাছ সাম্রাজ্য প্রমুখ নক-
 শাল নেতাদের মত নিজেদের
 অতীতে অস্বস্তিত নীতির পর্যালোচনা
 ও আত্মসমালোচনা করে এর নির্বা-
 চনে অংশগ্রহণ করেননি। অসীম-
 চন্দ্রের সঙ্গে এদের সম্পর্ক প্রায় "শ্রেষ্ঠ
 শত্রু" পর্যায়ভূক্ত। অসীমরা চোয়ে-
 ছিলেন রাজ্যের বামপন্থী জট্টের
 কর্মস্থলীর সঙ্গে সীমিত রকম করে
 নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে কিন্তু
 সত্যনারায়ণ সিং এবং তম্য বশবর্ষ

সন্তোষ রাণারা তা না করে নিজে-
 রাই নির্বাচন জেতেন এবং গোপী-
 বল্লভপুর কেন্দ্রে থেকে সন্তোষ রাণা
 জয়ীও হয়েছেন। সন্তোষবাবুর
 জয়ের পেছনে জনতা পার্টি এবং
 কংগ্রেসের একাংশের অর্থ ও সাহায্য
 যে কাজ করেছে এটা আজ আর
 কারো কাছে গোপন নেই। এবং, এই
 রাজ্যে জনতা পার্টির নেতী জত পৌরব
 প্রক্টর সেন যখন বামপন্থী সরকারের
 বিরুদ্ধে চক্রান্তের পর চক্রান্ত করে
 চলেছেন, যখন কংগ্রেস, প্রতিক্রিয়া-
 (শেবাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়)

সম্প্রতি নকশালপন্থীদের দুই
 গোষ্ঠী এক হয়ে একটি শক্তিশালী দল-
 ভারতীয় সি, পি, আই (এম, এল)
 দল গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন। সত্য-
 নারায়ণ সিং গোষ্ঠীর সঙ্গে রাধি
 বেয়েছেন ইউনিটি কমিটির নেতারা।
 নতুন দল গঠন করেই এই "মহা
 বিপ্লবীরা" সি, পি, আই (এম)-এর
 বিরুদ্ধে হিংস্রাচার ভয়েদের ব্যবসায়ী
 প্রতীকটির মত তুফান বিধোদ্যায়
 করতে শুরু কবেছেন। একান্তে
 আমরা বিস্মিত হইনি। বরং এটাই
 ওদের পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ, যে

সত্যনারায়ণ সিংয়ের বিরুদ্ধে প্রোপার্টী
 পরোয়ানা জারী থাকা সত্ত্বেও এই
 ব্যক্তিটি বরাহী মন্ত্রী চরণ সিংয়ের সঙ্গে
 হৃদয়ময় মনোমুগ্ধ চালায়ে নিজের মুক্তি
 কিনে নিতে কষ্ট করছেননি তাঁর
 রাজনৈতিক অসামান্য সম্পর্কে কিছু
 বিক্রান্ত বিবেক অপলক ছাড়া আর
 কারও সঙ্গেই থাকতে পারে বলে
 আমরা মনে করিনা। সন্তোষ এই
 কারণেই সি, পি, আই (এম)-এর
 পলিটবুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য
 কমিটির সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত
 এই লোকটি কে কোন জট

দেশে বিদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা

দেবানীস ভট্টাচার্য

১৯৭৭ সালের ১৮ই জানুয়ারী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভার নির্বাচনের সুপারিশ করলেন কেন? এ প্রশ্নে বহু আলোচনা চলছে। কারণ ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের ফলে আইনগত ভাবেই তিনি আরও চোদ্দ মাস ক্ষমতায় থাকতে পারতেন। দ্বিতীয়তঃ, নির্বাচনের দাবীতে কোথাও কোন আন্দোলন হয় নি। তাহলে কেন নির্বাচনের সিদ্ধান্ত? একাধিক কারণ থাকতে পারে, তবে মনে হয় যে, রাষ্ট্রসভ্যের এই মানবাধিকার সংক্রান্ত কমিটিতে মার্কিন প্রতিনিধির ভাষণ ও মার্কিন সিনেটে মানবাধিকার লঙ্ঘনে দায়ী দেশ-গুলোকে সাহায্য বন্ধ করার দাবী ইন্দিরা গান্ধীকে নির্বাচন অস্থগীতে বাধ্য করেছে। মণ্ডল ওলিম্পিকে বহু বিষয়ে ভারতের স্থান যখন পেছন দিক থেকে প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়, তখন নির্বাচকরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনেই ভারত সম্ভবতঃ প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

দেড় বছরের মধ্যে কোথাও এত লোককে কখনও বোধহয় জেলে যেতে হয় নি। শুধু রাজনৈতিক কর্মীরাই নয়, সঙ্গরক্ষী শাস্তি ঠাকুরের 'ইন্দিরা ইন্টারন্যাশনালের' কাপড় রপ্তানীর বে-আইনী ব্যবসায় সাহায্য করতে না পারায় বাণিজ্য মন্ত্রকের বাধা বাধা অফিসারদের 'মিসায়' গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কারণ তাঁরা (বড়য়ার কথামতো ভারতের) ইন্দিরার পরিবারের শাস্তি-নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারেন নি। পাঁচ মাসের অস্বাস্থ্যাত্মক জীবন স্বামীকে বিনা কারণে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। পরিচর্যা অভাবে সে শিশু আর পৃথিবীর আলো দেখে নি। যে

আইন প্রথমে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হল, পরে তা পৌড়া মার্কসবাদ-বিরোধী, মার্কিন প্রেসী অথবা সূক্ষ্ম কটাক্ষে রেহাই দিল না। অবশেষে সচিবালয়ের অফিসাররাও। দোষ প্রমাণের কোন দায় নেই। বিনা বিচারে মাসের পর মাস ফেলে রাখা হল। অবশ্য বিনা বিচারে আটক, মিসা; ডি, আই, আর আটক এর পূর্বেও করা হয়েছে। কারণ প্রয়োজনে সরকারকে এ ক্ষমতা সংবিধানে দেওয়া হয়েছে। আজ জনতা সরকার মিসার ভয়াবহ পরিচিতির জন্ত এই নারটার পরিবর্তে, অত নামে বিনা বিচারে আটকের বিল আনার চেষ্টা করছেন। ইন্দিরা গান্ধীর মতো চরণ সিং ও আশাস দিচ্ছেন যে, চোরাকারবারী, কালোবাজারীদের বিরুদ্ধেই এই আইন প্রয়োগ করা হবে, রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে নয়। অর্গেন্টিনার বর্তমানে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতি লিমেনী ইসাবেল পেরন বিনা বিচারে আটকের জন্ত যে আইন জারী করেছিলেন, সামরিক অভ্যুত্থানের পর তার বিরুদ্ধেই তা প্রয়োগ করা হয়। বিচারালয়ের স্বাধীনতা এবং বিনা বিচারে আটকের ক্ষমতা পরস্পর বিরোধী। এ কারণে আইন এমনভাবে সংশোধন করতে হবে, যাতে বিনা বিচারে আটকের ক্ষমতা চিরতরে বিলুপ্ত হয়। না হলে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার হাতিয়ার সরকারের হাতে সব সময় থেকে যাবে। মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণার ৯, ১০ এবং ১১ নং ধারায় যেচ্ছামূলক গ্রেপ্তার ও নির্বাসনের বিরুদ্ধে এবং নিরপেক্ষ বিচারালয়ের সামনে আটক ব্যক্তিকে হাজির করে

বিচারের কথা বলা হয়েছে। এ ধারাগুলোর প্রতি বৃদ্ধাধুর্ন দেখিয়েছে ভারত সরকার।
এ ঘোষণার ৭নং ধারায় বলা হয়েছে যে, "কাউকে নিষ্কর্তৃত্ব অমানবিক শাস্তি দেওয়া অথবা অত্যাচার করা চলবে না।" অর্থাৎ এখানে গ্রেপ্তারের পর পুলিশ কি রকম অত্যাচার করে, তা ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন নেই। গত ৬ই অক্টোবর স্ট্রাসবার্গে আম্মেনেট্টি ইন্টারন্যাশনাল আহত এক সেবিনারে নরুইট দেশ অংশ গ্রহণ করে পুলিশ লক আপে অত্যাচারকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে স্বীকার করেন। ১৯৭৫ সালে মানবাধিকার সংক্রান্ত কমিটি বিভিন্ন দেশে আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাদের ওপর পুলিশী উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। এ কমিটির সকল সদস্য রাষ্ট্রের কাছে এ ধরনের পুলিশী উৎপীড়ন বন্ধের ব্যবস্থা করতে বলা হয়। ভারত সরকারের কাছেও সে চিঠি আসে। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজ্ঞানন্দ রেড্ডী তদুহ্যায়ী সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের পুলিশ লক আপে উৎপীড়ন বন্ধের জন্ত লোক দেখানো আদেশ পাঠান। কিন্তু পুলিশ লক আপে টর্চার বন্ধ হয় নি। কংগ্রেসের পর জনতা পার্টির শাসনেও তা চলছে। উত্তর বিহারের চম্পারণে ক্ষেত মজুরদের প্রিয় নেতা গম্ভীরাকে পুলিশ লক আপে পিটিয়ে মারা হয়েছে। ১৯৭৭ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর পূর্ব চম্পারণের পিপরা গ্রামে 'পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের' পুরনো গল্পে আবার তিনজন উগ্রপন্থী মারা গেছেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পরে সাংবাদিকদের বলেছেন যে, "সংঘর্ষের পর আরও তিনজন গ্রেপ্তার হন ও তাঁদের কাছে পাওয়া মাওবাদী পুস্তিকা আটক করা হয়েছে।" এ ব্যাপারে কংগ্রেসী রাজ্যের সঙ্গে জনতা পার্টির রাজ্যের পুরো মিল দেখা যাচ্ছে। মাওবাদী পুস্তিকা পড়া ও রাখার জন্তই তাঁদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হল।
অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধান অহুযায়ী মাও-সে-তুঙের মতবাদ পাঠ, পোষণ ও প্রচার করা বে-আইনী নয়। ১৯৭১ সালে দার্জিলিং আদালত শ্রীকান্ত সান্মালের বিরুদ্ধে এক মামলার রায়ে বলেছিলেন যে, রেড বুক সঙ্গে রাখাটা মোটেই বে-আইনী নয়। পরের বছর সি, পি, এম, দলের গুজরাট রাজ্য কমিটির সম্পাদক বনাম গুজরাট সরকারের মামলার এক রায়ে

আবেদনাবাদ হাইকোর্টও একই কথা বলেন। অর্থাৎ এখানে পুলিশ মাও-সে-তুঙের অহুযায়ী সনদে সব সময় ধোঁয়া ধরতে পারে। মাও-সে-তুঙের বই পড়তে দেখলেই গ্রেপ্তারযোগ্য মনে করে। মানবাধিকারের এই বিশ্বজনীন ঘোষণাতেও ১১ নং ধারায় স্বাধীন মতামত পোষণের অবাধ অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।
এ ঘোষণার ২৩ (২) ধারায়, 'একই কাজের জন্য সমান বেতন পাবার অধিকার' দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখানে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন সমান নয়। পুরুষ নারীর একই কাজের জন্য একই বেতনের আইন হলেও তার প্রয়োগ দেখা যায় না। অবশ্য এরকম মানবাধিকারের চরম প্রয়োগ সমাজতান্ত্রিক দেশেই সম্ভব। দলীকান্ত গুহর সাউথ পয়েন্ট স্কুলের শিক্ষক হাজার টাকা মাইনে পেলে সাধারণ স্কুলের শিক্ষকেরা চারশো / পাঁচশো টাকা বেতন পান। স্কুল নিয়ে প্রাইভেট ব্যবসা তথা সামগ্রিক ভাবে ব্যক্তি মালিকানার বিলোপ ছাড়া মানবাধিকার অতি সীমিতই হয়ে দাঁড়াবে।
এখানে বাংলা বনঘের পূর্ব দিন যে মুষ্টিমেয় অহুযাত কর্মচারী মহাকরণে রাত কাটান, বনঘের দিন সকালে আনন্দবাজার-যুগান্তরে ঝাড়ের তাল খেলার ছবি ছাপানো হয় তাঁদেরকে ধর্মঘট ভাঙা তথা দালালীর পুরস্কার স্বরূপ কংগ্রেস সরকার ছুটো মিল বাবদ পাঁচ টাকা ও ছুটো টিকিন বাবদ দু টাকা মোট লাভ টাকা দিয়েছেন। ইয়া, বর্তমান বাজার দর অহুযায়ী বেঁচে থাকতে হলে শুধু খাবার জন্ত মাথা পিছু দৈনিক লাভ টাকা প্রয়োজন। পরিবার পরিকল্পনার সাড়ে তিন ইউনিটের জন্ত দরকার সাড়ে বাইশ টাকা। এ ছাড়া বেতনের ২০% বাড়িভাড়া, বস্ত্র, চিকিৎসা, ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার বিরাট খরচ আছে। অর্থাৎ এ বাজারে সাড়ে তিন ইউনিটের পরিবার চালাতে ন্যূনতম পক্ষে হাজার টাকা প্রয়োজন। অর্থোত্তিক দাবী নয়, সরকারের দালাল পোষার হিসেব দিয়েই শুরু করেছে। অর্থাৎ এখানে সরকারী কর্মচারীদের গড় বেতন প্রয়োজনের সিকি ভাগও নয়। তাই ভারত সরকারের উচিত এর ব্যবস্থা করা। কারণ ভারত মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণার স্বাক্ষর করেছিল। ঘোষণার ২৩ (৩) ধারায় মাতৃদের মত

মর্যাদা নিয়ে, পরিবার সহ বেঁচে থাকার জন্য ভাষ্য প্রয়োজনীয় পারি-
প্রমিক প্রদানের, কথা বলা হয়েছে।
কটির নিশ্চয়তা না দিয়ে শুধু কথা বলায় স্বাধীনতা দিয়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না।
২৬নং ধারায় 'বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা' চালু করার কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ৪৫নং ধারায় বলা হয়েছে, 'দশ বছরের মধ্যে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা হবে।' আজ আঠাশ বছরেও তা সম্ভব হল না।
৭নং ধারায় 'আইনের চক্ষে সকলেই সমান' স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ এদেশে গরীব হরিজনদের কুয়োর জল গরমে শুকিয়ে গেলে তাঁরা যখন বর্ষা হিন্দু জমিদারদের কুয়ো থেকে জল তোলেন, -তখন নেমে আসে চরম অত্যাচার। হরি জনদের বস্তিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। আইনের চক্ষে তো উভয়েই সমান, তাহলে আজ পর্যন্ত ক'জন বর্ষা হিন্দু জোতদার হরিজন নিপীড়নের দ্বারা শাস্তি ভোগ করেছেন? ভারতীয় সংবিধানের ১৭নং ধারায় অস্পৃশ্যতা বিলোপের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অবস্থা একই আছে। শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ নারায়ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সিটিজেনস কন ডেমোক্রাসী' নামক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিচারপতি জি.এম. তারকুণ্ডে গত ২৫শে সেপ্টেম্বর বোহরা সম্প্রদায়ের কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন, যাতে উচ্চ শ্রেণীর পুরোহিতগণ কর্তৃক এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তি অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তদন্ত করা হয়।
এদেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তিরিশ বছরই মানবাধিকার বিপর্যাস হয়েছে, আজও হচ্ছে। গত ২১শে অক্টোবর ভ্যাটিকান সিটিতে অহুযাত রোমান ক্যাথলিক নেতৃবৃন্দের এক সভায় ধর্মীয় ও মানবিক স্বাধীনতার ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। পোপ পল মানবিক অধিকার রক্ষার জন্ত সমস্ত দেশের সরকারগুলোর কাছে আবেদন জানিয়েছেন।
আজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কারটার 'বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার বিপর্যাস' বলে হৈ চৈ শুরু করেছেন। বিশেষ করে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে মানবাধিকার বিপর্যাস দেখেছেন। অর্থাৎ খোদ আমেরিকা (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)



ইন্টার কোলফিন্ডস লিমিটেড

(কোম ইন্ডিয়া একটা সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে

সিপ্রিং ইগুাক শাস্ত্র মোটর

রেকা: নং ই সি এল/ডি এ/সি এ পি/৭৭-৭৮/১৮২ তার ২৯/১১/৭৭

জেনারেল ম্যানেজার, ইন্টার কোলফিন্ডস লিমিটেড, দিশেরগড় এরিয়া, বোরাচক হাউস, পোঃ সীতারামপুর, জেলা বর্ধমান উৎপাদনকারী/ডিলার/অহুমোদিত ষ্ট্রোরদের কাছ থেকে নিম্নোক্ত কাজের জন্ত সীল করা টেন্ডার আহ্বান করছেন :

- (১) ৩৫০ সিপ্রিং ইগুাকশান মোটর ৩০ কে ভি, ৩৬৫ আর, পি, এম কন্টিনিউয়াস রেটিং।
- (২) ১২৫ এইচ, পি সিপ্রিং ইগুাকশান মোটর ৩০ কে ভি, ৩৬৫ আর, পি, এম কন্টিনিউয়াস রেটিং।

জেনারেল ম্যানেজারের অফিসে সীল করা টেন্ডার গ্রহণের শেষদিন ২৯/১২/৭৭ তারিখে বিকেল ৩টা এবং এ দিন বিকেল ৩:৩০টায় টেন্ডার খোলা হবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকতে পারেন।

পাম এভিনিউয়ের সরকারী ফ্ল্যাট মিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ

(দর্পণের সংবাদদাতা)

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের রাজনৈতিক সচিবের সরকারী ফ্ল্যাটে মেয়ে নিয়ে নানারকম দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে ফ্ল্যাটটি তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে।

দর্পণের কাছে খবর এসেছে ১৯৭২ সালে কংগ্রেস-যখন ক্ষমতায় তখন সিদ্ধার্থবাবু রাজনৈতিক সচিব নিযুক্ত হন শ্রীমতী সুপ্রিয়া সেনগুপ্ত নামে জর্নৈক মহিলা। তারই স্ববাদে ও প্রভাব ঘটিয়ে তিনি দক্ষিণ কলকাতার পাম এভিনিউর এল/আই/জি সেভেন ফ্ল্যাটটি নিজের নামে অ্যালট করেন। যদিও সুপ্রিয়া সেনগুপ্তারা বঙেল রোডের একটি বাড়ীতে দীর্ঘদিন ধরে ভাড়া আছেন। কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় ছিল তখন এই ফ্ল্যাট সম্পর্কে বহু অভিযোগ স্থানীয় লোকেরা তৎকালীন সরকারের কাছে করেছিলেন কিন্তু কোন ফল হয়নি। শ্রীমতী সেনগুপ্তা এই ফ্ল্যাটে নিয়মিত থাকতেন না, মাঝে মাঝে থাকতেন; পরে যুব কংগ্রেস নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের

সঙ্গে শ্রীমতী সেনগুপ্তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর অবশ্য কিছুদিন তারা এই ফ্ল্যাটে বসবাস করেন। তারপর শ্রীমতী সেনগুপ্তা দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি বাড়ীতে উঠে যান। কারণ তখন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় নিজে যে বাড়ী (পুরনো বাড়ী) সারিয়ে ঘরের সংখ্যা বাড়ান হয়েছে তৈরী করেছেন তা সম্পূর্ণ হয়নি।

এদিকে শ্রীমতী সেনগুপ্তা নিজের নামে এই ফ্ল্যাটটি রেখে ঠার থিয়েটারের জর্নৈক নর্তকীকে সেটি ভাড়া দেন। এই নর্তকীর জ্বালায় আশেপাশের বহু লোক অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এবং সরকারের কাছে অভিযোগ করেন যে এই ফ্ল্যাটে প্রকাশ্যে মেয়ে নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকায় জনসাধারণের অভিযোগে কান দেওয়া হয়না। যদিও শ্রীমতী সেনগুপ্তা লোকের কাছে জানান এই নর্তকী নাকি তার দূর সম্পর্কের বোন, কিন্তু দর্পণের কাছে খবর আছে এই

নর্তকী শ্রীমতী সেনগুপ্তার বোন তো নয়ই এবং সুপ্রিয়া সেনগুপ্তার সঙ্গে এই নর্তকীর পরিচয় কোন এক বন্ধুর মাধ্যমে। পরে অবশ্য এই নর্তকী উঠে যান।

বর্তমানে শ্রীমতী সেনগুপ্তা শ্রীমতী সরমা সেন নামে জর্নৈক মহিলাকে এই ফ্ল্যাটে বোন বলে পরিচয় দিয়ে চোকাবার ব্যবস্থা করছেন বলে জানা গেছে। কিন্তু জানা গেছে সরমা সেন সুপ্রিয়া সেনগুপ্তার বোন নয়, বোনের বন্ধু। তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের প্রধান কর্মকর্তা কেরানীর চাকরী করেন এবং এই চাকরীও ১৯৭২ সালে গৌতম চক্রবর্তীর আহুকূলে এবং শ্রীমতী সেনগুপ্তার সুপারিশে পান। বর্তমানে শ্রীমতী সেনগুপ্তা এই ফ্ল্যাটে থাকেন না, তিনি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতেই থাকেন। প্রশ্ন, সুপ্রিয়া সেনগুপ্তা এই ফ্ল্যাট তাহলে কিসের উদ্দেশ্যে রেখেছেন?

দর্পণের কাছে আরো খবর আছে পাম এভিনিউর এল/আই/জি এইট ফ্ল্যাটটিও বার বার হাত ফেরত হয়ে যাচ্ছে। এই ফ্ল্যাটটি যুব নেতা প্রিয়রঞ্জন হাসমুখীর এ, এন, রায় নামে জর্নৈক আত্মীয় নামে কংগ্রেস রাজস্ব অ্যালট করা হয়। এই ফ্ল্যাটের বর্তমানে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ভাড়া বাকী। এ, এন, রায়ের নামে ফ্ল্যাট হলেও সেখানে তরুণী মেয়েদের প্রেমের রিহার্সাল হতো। বর্তমানে সেখানে বিশ্বরঞ্জন সরকার নামে জর্নৈক যুব কংগ্রেসী থাকেন। ভাড়া বাকীর নোটিশ পাবার পর বিশ্বরঞ্জনবাবু এই ফ্ল্যাট জর্নৈক ব্যক্তিকে দিয়ে দিয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

আরো খবর এই যে রাজ্যের আবাসন-মন্ত্রী শ্রীমতী চক্রবর্তীর দলের লোককে পাম এভিনিউতে দুখানি সরকারী ফ্ল্যাট যে কোন উপায়ে দিতে হবে। তাই এইট ম্যানেজারের অফিস থেকে সাহ-জনের উপর ভাড়া বাকীর নোটিশ জারী করা হয়। যাদের ওপর নোটিশ জারী করা হয় তাদের মধ্যে আছেন প্রাক্তন এম, এল, এ শ্রীনাথ-রুদ্দিন খান যেখানে বর্তমানে কাকক নামে জর্নৈক ব্যক্তি থাকেন (এল/আই-জি টু), শ্রীমতী সুপ্রিয়া সেনগুপ্তার যে ঘরটি এখন তালাবদ্ধ (এল/আই/জি-সেভেন), শ্রী এ, এন রায় যিনি প্রিয়রঞ্জন হাসমুখীর আত্মীয় (এল/আই/জি এইট) প্রভৃতি। কেবলমাত্র নাসিরুদ্দিন খান ও এ, এন রায়ের ফ্ল্যাটের ভাড়া বাকী ছিল পাঁচহাজার টাকা।

ব্যাক কন্ট্রোল পক্ষের সঙ্গে সি পি আই ইউনিয়ন কর্মকর্তার আঁতাত

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের সি পি আই ইউনিয়নের কর্মকর্তা সদানন্দ ঘোষের সঙ্গে ম্যানেজমেন্টেব আঁতাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ব্যাঙ্কের বেশ কিছু কর্মীকে অবশ্য হররানি হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সদানন্দ ঘোষ যদি মনে করেন যে কোন কর্মীকে প্রমোশন দেওয়া উচিত নয় তাহলে ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান তার কথা শুনে থাকেন বলে দর্পণের কাছে অভিযোগ এসেছে।

একই ইউনিয়নের সদস্য হয়ে সদানন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ যারা তারা কেন ব্যাপক হারে বদলি হচ্ছেন সে সম্পর্কে প্রতিবাদ জানিয়ে প্রায় ৮১ জন সদস্য সদানন্দ ঘোষকে একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন। তাতে তারা বলেছেন, “ব্যাঙ্কের বহু নতুন শাখা খোলা হয়েছে এবং ব্যাঙ্কের উন্নতি হয়েছে। তাতে আমরা আনন্দিত হয়েছি এবং একথা উপলব্ধি করছি যে ব্যাঙ্কে বদলির প্রয়োজন আছে। কিন্তু এটা আমরা মেনে নিতে পারি না যে কর্মীরা কে কোথায় এবং কখন বদলি হবেন তা আগে থেকে জানতে পারবেন না এবং সর্বদাই একটা আশঙ্কার মধ্যে থাকবেন। এমন ঘটনাও অবিদিত হয়।

নয় যে এক বছরের মধ্যে ৩/৪ বার কর্মচারীরা বদলি হয়েছে, দূরবর্তী শাখাগুলিতে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এমন কি কোন ক্ষেত্রে সেই নির্দেশ যেদিন দেওয়া হয়েছে তারপর দিনই কার্যকর করতে বলা হয়েছে। কখন কখন এই ধরনের বদলিগুলি নিপীড়ন ও প্রতিশোধমূলক বদলির পর্যায়ে পড়েছে বলে বলা যায়। যদিও সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মীর বিপক্ষে গাফিলতী বা কাঙ্ক্ষিত অবহেলার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।”

জানা গেছে যে সদানন্দ ঘোষ তার পেটোয়া লোকদের নিজের কাছে রেখে ম্যানেজমেন্টের ওপর লাঠি ঘুরিয়ে যাচ্ছেন।

সদানন্দ ঘোষের ইউনিয়নের জর্নৈক কর্মকর্তা এই ব্যাঙ্কের একটি ব্রাঞ্চের সদস্যকে পূর্ন মারফৎ জানিয়েছেন যারা সদস্য চাঁদা দেবেন না তাঁদের প্রমোশন সাসপেন্ড করা হবে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ কি সি পি আই ইউনিয়নের নির্দেশ মত কর্মচারীদের প্রমোশন দেন? না হলে এই ধরনের চিঠি লেখা কি করে সম্ভব হয়?

জেলেদের ওপর কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর অমানুষিকতা

(দর্পণের সংবাদদাতা)

মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা থানা এলাকার ইসলামপুর জলকরে মাছ ধরতে গিয়ে পরেশ হালদার নামে জর্নৈক জেলে নিখোঁজ হয়ে যান ও কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর লোকদের হাতে মার পেয়ে দু'জন জেলে হাসপাতালে ভর্তি হন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে যে গত ৮ই ডিসেম্বর একদল জেলে একটি নৌকো নিয়ে ইসলামপুর জলকরে মাছ ধরতে গেলে হঠাৎ কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা একটি লঞ্চ নিয়ে এসে ওই জেলেদের উপর চড়াও হয়ে তাদের লোহার রড দিয়ে মারধোর করে এবং জেলেদের নৌকোটি লঞ্চের ধাক্কায় ডুবিয়ে দেয়। এরপর পরেশ হালদার ছাড়া বাকী জেলেরা কোন রকমে আধমরা অবস্থায় সাঁতরে ডাঙ্গায় এসে ওঠেন। তার মধ্যে দু'জন জেলেকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ওই জেলেরা অভিযোগ করেন যে কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর প্রহারের ফলে পরেশ হালদারের মৃত্যু হয় এবং তার মৃতদেহ জলের তলায় তলিয়ে যায়। এরপর একদল লোক কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর দোঁয়ী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ফরাক্কা থানা ঘেরাও করে। ফরাক্কা পুলিশ কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর দু'জন জওয়ানকে গ্রেপ্তার করে।

আরও জানা গিয়েছে যে এই অঞ্চলের জেলেদের উপর প্রায়ই কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা অত্যাচার চালায়। বর্তমানে এই অঞ্চলের পরিস্থিতি বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। এখনও পরেশ হালদারের মৃতদেহটির খোঁজ পাওয়া যায় নি। জাল ফেলে মৃতদেহ উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

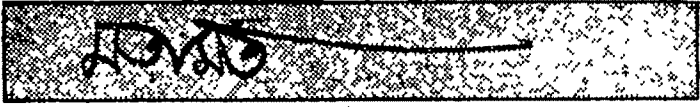
ভগলীর পুলিশ সুপারের অন্যায় অবিচারের শিকার

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ভগলীর পুলিশ সুপার তথা কর্তৃপক্ষের ক্রমাগত অন্যায় অবিচার আর অবিবেচনার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিক্ষুব্ধ এস আই শ্রীপ্রিয়শঙ্কর দাশ অবশেষে মহামান্য আদালতের আশ্রয় নেন। প্রতিবেদনে তিনি জানান, ১৯৭৫ সালে বিশেষ বাছাইয়ের পর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের চারজনের একজন হিসেবে নির্বাচিত করে ইন্টিগ্রেটিড মার্টিনিকিট দিয়ে তাঁকে সেন্ট্রাল ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুলে পাঠানো হয়। সেখানে প্রশিক্ষণের পর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ৩য় স্থান অধিকার করে তিনি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের গৌরব বৃদ্ধি করেন। কিন্তু এস পি ভগলী কোন কারণে তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে আগের বার তাঁর প্রমোশন বন্ধ করেন-ও মাত্র সাত মাসের মধ্যে বে-আইনিভাবে চার বার বদলী করে তাঁকে নিগৃহীত করেন এবং পুলিশ অর্ডারের বিরুদ্ধে তাঁকে পোষ্টিং করেন। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে উক্ত এস পি তাঁর এ বছরের প্রমোশন বন্ধ করার জন্য হিংসাত্মক মনোভাব নিয়ে ও বে-আইনিভাবে

বোর্ডের দু'দিন আগে তাঁর সি সি রোল কলংকিত করেন ও প্রায় একই সময়ে দীর্ঘ বৎসরাধিক কাল আগের ও মিথ্যা প্রমাণিত একটি অভিযোগকে দাঁড় করিয়ে অভিসন্ধিমূলক প্রসিডিং করেন। এমন কি তার স্বাভাবিক বিচারের প্রার্থনাও অগ্রাহ্য হয়। সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় দরখাস্ত করেও কোন সাড়া না পেয়ে অবশেষে শ্রীদাস মাননীয় উচ্চ আদালতের আশ্রয় নেন।

মহামান্য আদালত গত ৩১/১২/৭৭ তাং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আই জি-কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আগামী ৩ সপ্তাহের মধ্যে উক্ত অফিসারের প্রমোশনের ব্যাপারে বিবেচনা করা হয় এবং বিবেচনার সময় যেন উপরোক্ত প্রসিডিং এবং গুপ্তবৃত্তিতিক বিরূপ মন্তব্য ধর্তব্যের মধ্যে না আনা হয়। মাননীয় আদালত আরো নির্দেশ দিয়েছেন বিবেচনার ফলাফল যেন ৩ সপ্তাহের মধ্যে আদালতকে জানানো হয়। দরখাস্তকারীর পক্ষে হাজির থাকেন মিঃ এস পি ঘোষ, বার, এ্যাট-ল।



নেহরু ও তার মেয়েমানুষ

আনন্দবাজার গ্রুপের 'সান্ডে' সাপ্তাহিকের কভার স্টোরির শিরোনাম "নেহরু ও তাঁর মেয়েমানুষ"। উক্ত সংখ্যাটি রাজ্যসভায় পেশ করে সমস্ত ভূপেশ গুপ্ত এই অসম্ভাব্যতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য আনন্দবাজার পত্রিকার কলমটি সন্তোষবাবুর ঘোষ সি পি আই তথা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে এবং "মুক্ত ছুনিয়ার" দেবক আমেরিকার পক্ষে দপ্তরমতো কলমবাজি করেছেন। আমেরিকার এ দেশীয় স্তাবকদের আমরা দীর্ঘকাল চিনি, স্তবরাং সন্তোষ ঘোষ যে প্রকাশ্যে নামবেন সেটা জানা কথাই। কিন্তু ইয়ারকির একটা সীমা আছে সে সম্পর্কে সন্তোষবাবুকে আমরা সতর্ক করে দিতে চাই। 'সান্ডে' পত্রিকা মার্কিনী ধাঁচে ইয়েলো জার্নালিজম করে যেতে চায়, উদ্দেশ্য অচেতন পাঠকদের পকেট কাটা। মজার বিষয় এরা এইসব ইতরামো করে যাবেন, আর একই নিশাসে ববীন্দ্রনাথের নামে শপথ নেবেন! তা যদি সাহস থাকে লিখুন না সন্তোষ ঘোষ "ববীন্দ্রনাথ ও তাঁর মেয়েমানুষ" নিয়ে আরেকটি কভার স্টোরি! এই কলমটি জীবটিই একদা আসন্ন শতাব্দীর শতাব্দীর চক্রের "আলুর দোয়ের" কথা লিখেছিলেন। এই লোকটিই বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং রবীন্দ্রনাথগীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের কৃতিত্বকে নস্টাং করে একদা চিংকার তুলেছিলেন। এই লোকটিই একদা সমরেশ বহুর An American Dream নামক মার্কিন উপন্যাসের তর্জমা বেরোলো "বিবর"-এর তড়িঘড়ি সার্টিফিকেট ছাপিয়ে তার পক্ষে জনমত তৈরী করার জন্যে কতিপয় চামচে জাতীয় জীবনের দ্বিগুণ একটা হৈ চৈ বাধাবার চেষ্টায় ছিলেন।

সেই আদি ও অকৃত্রিম সন্তোষ ঘোষ এবার "নেহরু ও তাঁর মেয়েমানুষের" সমর্থনে কোয়ার্টেবে খেউড়ে নেমেছেন। সচেতন মানুষকে কী আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে কেন, মাথাইয়ের বই থেকে বদমায়েসি করার তাড়নার অংশ বিশেষ সান্ডেতে ছাপা হল? কথায় বলে চোরের মায়ের বড় গলা! সন্তোষবাবু কী ভেবেছেন স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে তিনি পার পেয়ে যাবেন? নোংরামো করতে চান কখন, কারণ সেটাই এখন তাঁদের ব্যবসা হয়েছে, কিন্তু সত্যী সাক্ষ্যের চেষ্টাটা হাস্যকর। আমরা জানি সন্তোষবাবুর মতো লোকদের এই জগতই বেশি মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে খামোকা সোভিয়েতকে এনে শাপাস্ত করে লাভ নেই। আমেরিকার 'মুক্ত ছুনিয়ার' তত্ত্বও আমরা বিশ্বাসী নই। দেশের মানুষ এত অজ্ঞ নয় যে এ ধরনের নীচুজাতের কলমবাজির আসল লক্ষ্য বুঝতে পাবেন না। তাঁদের পক্ষে শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। কথায় বলে খুঁটির জোরে মেড়া নাচে।

আমরা এই জাতীয় হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে তীব্র যুগ্ম জানাই।

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'গণদেবতা' ছবির পরিবেশনা প্রসঙ্গে

'গণদেবতা' পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত একটি ব্যয়বহুল রঙ্গিন ছবি। এ ছবির নির্মাণ কাজ এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু এ ছবির পরিবেশন স্বয়ং বিশেষ একটি পরিবেশক সংস্থাকে দেবার জন্য ইতিমধ্যেই বেশ তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে; যদিও এই পরিবেশক সংস্থাটি জরুরী অবস্থাকালে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী স্বরত মুখার্জীর কোলে আশ্রয় নিয়েছিল এমনকি তাঁদের সম্পূর্ণ রঙ্গিন ছবির পরিচয় লিপিতে স্বরত মুখার্জীর নাম 'কৃতজ্ঞতা স্বীকারের' মাধ্যমে প্রকাশ করে নিজেকে কৃতার্থ ও ধন্য করেছে। 'গণদেবতা'র পরিবেশন স্বয়ং ব্যাপারে এই বিশেষ পরিবেশক সংস্থার বড় সহায়ক হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি নিজেকে বিভাগীয় মন্ত্রীর পরবর্তী পদাধিকার বলে জাহির করে থাকেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত 'সোনার

কেলা' ছবির পরিবেশন তার দেওয়া নিয়ে তৎকালীন মন্ত্রী স্বরত মুখার্জীকে কম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়নি।

প্রকৃত অবস্থায় 'গণদেবতার' পরিবেশন তার কখনই গোপনে বা কোন ব্যক্তির প্ররোচনায় একটা বিশেষ সংস্থাকে দেওয়া উচিত হবে না। সরকারী অর্থে যে ছবি নির্মিত হচ্ছে তার পরিবেশন দায়িত্ব যদি দিতেই হয় তবে সরকারী নিয়ম অনুসারে প্রকাশ টেন্ডারের মাধ্যমেই তা করা যেতে পারে, এবং এটাই হবে আইন সঙ্গত। আশা করব বামফ্রন্ট সরকার তার ঘোষিত নীতি মেনে চলবেন।

শ্রীমল সরকার

সরকারী ফ্ল্যাট

দর্পণে (৭।১০.৭৭) প্রকাশিত "সরকারী ফ্ল্যাট বিলির ব্যাপারে দুর্নীতি" শীর্ষক সংবাদটি পড়লাম। পূর্বতন সরকারের আমলে সরকারী ফ্ল্যাট নিয়ে যে দুর্নীতির প্রবাহ বহে চলেছিল সেই প্রবাহ এখনো বয়ে চলেছে। কিন্তু বর্তমান জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এটা আশা করতে পারিনা। আপনার প্রচারিত সংবাদের সমর্থনে আর কিছু বক্তব্য আমি যোগ করতে চাই।

ফ্ল্যাট বিলি বন্টনের ব্যাপারে তো চূড়ান্ত গলদ আছেই, তার ওপর ফ্ল্যাটগুলি দিন দিন বেশরকারী পরিস্রাব্য লোকদের পীঠস্থানে পরিণত হচ্ছে। কিছু সংখ্যক অতি-লোভী সরকারী কর্মচারী আছেন যাদের ফ্ল্যাটের কোন প্রয়োজন নেই অথচ তাঁরা নিজেদের নামে ফ্ল্যাট নিয়ে এবং উক্ত ফ্ল্যাটে নিজেরা বাস না করে বেশী টাকায় অস্ত্রের কাছে ভাড়া দিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছেন। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ সংগৃহীত দপ্তরকে জানিয়েও কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। গৃহ সমস্যায় জর্জরিত এমন বহু কর্মচারী আছেন যারা বছরের পর বছর অপেক্ষা করেও একটা ফ্ল্যাট পাচ্ছেন না, আর তাঁদেরই চোখের সামনে এ জিনিষ ঘটছে। এখন প্রশ্ন হল, সরকারী ফ্ল্যাট নিয়ে এইসব দুর্নীতী কারবার আর কতদিন চলবে? আর যে সকল ব্যক্তি এ সব কারবারে যুক্ত তাঁদের কি কোন শাস্তি হবে? সরকারের কাছে আবেদন অবিলম্বে সরকারী ফ্ল্যাটের দুর্নীতি বন্ধ করুন।

কল্পনা সরকার

শিবেনবাবু সম্মাচার

(দর্পণের ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি)

দর্পণে শিবেনবাবুর কুর্কীতির খবর ফাঁস হতে হগলী জেলা শাসক দপ্তরে নির্দাৰ্শ চাকল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শিবেনবাবুর সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য পাঠিয়েছেন রাণাঘাট থেকে দর্পণের সংবাদদাতা। রাণাঘাটে জে, এল, আর, ও থাকা কালীন শিবেনবাবু কার কি কি সর্বনাশ করেছেন এবং কাকে কি ভাবে চরম শাস্তি দিয়েছেন তার তথ্য পাওয়া গেছে এক বছর আগেই।

বলা বাহুল্য হগলী জেলার

হগলী জেলার আর টিএ-তে দুর্নীতি

(দর্পণের সংবাদদাতা)

কালীপুর ১০ই ডিসেম্বর: হগলী জেলার আর, টি, ওর, বিরুদ্ধে নানা রকম দুর্নীতির দর্পণের অভিযোগ কাছে এসেছে। আর, টি, ও এবং জেলা পরিবহন কর্তৃপক্ষ টাকা কামাবার জন্য মাঝে মাঝে নাকি হগলীর বিভিন্ন এলাকায় অস্থায়ীভাবে চালাবার জন্য বাসের পারমিট দেন। আবার পারমিট কেড়ে নেব বলে হুমকী দিয়েও কিছু টাকা আদায়ের চেষ্টা করা হয়। হগলীতে চাঁপাভাড়া দক্ষিণেশ্বর রুটের ছাবিশ নম্বর বাস চলে মাত্র দশটি। পারমিট পেয়েছে মোট ত্রিশটি বাস। ঠিক আর কত বেশী পারমিট কে কোথায় পেয়েছে তা বলা শক্ত। ছাবিশ কখনও দক্ষিণেশ্বর যায়, কখনও বা হাওড়া যায়।

এদিকে বাস চলেছে আরও কম। শীতের মরুমে বিয়ে বাড়ীতে ছাবিশ নম্বর রুটের রিজার্ভ বাস যাচ্ছে। বাস যাত্রীদের চরম দুর্ভোগে ফেলছে। এদিকে বকপোতা

শিবেনবাবুর হিটলারী মনোবৃত্তি ও বড় বড় অফিসারদের কাবু করে চালা বানাবার কৌশল লিখলে বিরাট গুস্তক হয়ে যেতে পারে। ধনেখালির করগুয়ার্ড রকের জনৈক কর্মী (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) অভিযোগ করেছেন যে তারকের জে, এল, আর ও এবং থানাকুলের জে, এল, আর ও সাহেবকে শুধুমাত্র শিবেনবাবুর চক্রান্তেই দীর্ঘকাল সাসপেন্ড করে রাখা হয়েছে। ইনি আরও জানালেন যে থানাকুলের এম, এল, এ রূপসিদ্ধি সাহার মাধ্যমে সুখি-রাজস্ব মন্ত্রী বিনয় চৌধুরীকে এ ব্যাপারে জানিয়েছেন। এই দুই জে, এল, আর, ওর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্যাদা অভিযোগের জরত তদন্ত করা হোক, এদের বক্তব্যও সরকার শুধুন। শিবেনবাবু তার কুর্কীতি ঢাকার জন্য মরিয়া হয়ে রেভিনিউ বোর্ড ও ডেপুটি সেক্রেটারীর কাছে মহাকরণে ধর্না দিচ্ছেন অফিসের কাজ ছেড়ে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও কি চোখ রাঙিয়ে এতসব দুর্নীতির খবর ফাইল চাপা দিয়ে রাখা যাবে?

বাট থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী পচিশ নম্বর বাসের পনেরো থানা পারমিটে বাস চলে মাত্র পাঁচটি। মাঝপথে প্রায়ই পচিশ নম্বর বাস খারাপ হয়ে যায়। পচিশ নম্বরের রুটে মশাট থেকে আইয়া পর্যন্ত সাতান এ নম্বর বাস চলতো। পচিশ নম্বর বাস কর্তৃপক্ষ তা বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা কোর্ট থেকে ইনজাশন পেয়েছেন। জেলা পরিবহন কর্তৃপক্ষ সাতান এ বাসকে আইয়া পর্যন্ত যেতে অনুমতি দিয়ে টাকা ঘুষ নিয়েছেন বলে অভিযোগ। আবার পচিশ নম্বরের পথের ফাঁটা সাতান এ নম্বর বাসকে অস্ত্র জায়গায় সরানো বা মামলা অস্ত্র পথে হটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে জেলা পরিবহন কর্তৃপক্ষ পচিশের থেকেও ঘুষ আদায় করছেন বলে অভিযোগ। দক্ষিণেশ্বরের সাজেহুল হক চৌধুরী অভিযোগ করলেন যে অস্থায়ী পারমিটের নাম করে শত শত টাকার ঘুষ খাওয়ার খবর তার কাছে আছে। এর প্রতিকার কি কিছু নেই?

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

৮ টাকার হার।

বার্ষিক ২২ টাকা

ষাণ্মাসিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাণার ঠিকানা

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, মট লেন। কলিকাতা-১৩

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ক্রীড়নক হিসেবে পুলিশের একাংশ বরাচক হত্যাকাণ্ডের তদন্ত বানচাল করতে চাইছে

সাধন শুহ

বরাচক হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে আসানসোলে রাজনৈতিক চক্রান্তের কথা গত সংখ্যায় বলেছি। বাজারী কাগজের দুই স্থানীয় সংবাদদাতার অত্যাশাহিতার পরোক্ষ কারণও এই প্রতিবেদনে বর্ণিত হয়েছে। ৫ জন সাংবাদিকের যে দলটি দুদিন ধরে এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে ব্যাপক তদন্ত চালিয়েছেন তা থেকে হত্যাকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে বলে আমরা মনে করি না। নিহতদের ৩ জন বিধবা অরুণা বাদব, লখিমার্তাগা এবং শোভা কৈরী ওরফে বুড়ীর বিবৃতিতে প্রতিভাত হয় যে, হত্যাকাণ্ডের রাতে আকাশ ছিল অনতিবর্ষণ মুখর এবং গ্রামের কয়েকজন যথা জিতদত্তেলী, দিলীপ তেলী, হুলাল বাউরী এবং অতুল বাউরী প্রমুখ ব্যক্তির নিহতদের ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যায়।

পুলিশের কাছে প্রদত্ত বিবৃতিতে ওরা বলেছে যে, উক্ত গ্রামবাসীরা নিহতদের খেলার জন্ত ডেকে নিয়ে যায় কিন্তু আমাদের কাছে বলেছে যে ওদের মাঠে ধানের পালই বাঁধবার জন্ত ডেকে নিয়েছে। ওদের বিবৃতি অনুসারে জনৈক লালের মাঠে পালুই পোড়ার চিহ্ন ছিল, নড়ুলের দাগ ছিল এবং রক্তের দাগ ছিল। আমাদের কাছে প্রদত্ত ওদের বিবৃতি অনুসারে এই মাঠটি ছিল মৃতদেহ প্রাপ্তির জায়গা সেই পরিত্যক্ত কয়লা খাদ থেকে দু-তিনটি মাঠ ছাড়িয়ে। ৬ই ডিসেম্বর ডি এম পি (হেড কোয়ার্টার) জীরাযক্ষ্য রায় এবং আসানসোল থানার ইন্সপেক্টর ইন-চার্জ শ্রীদেবী দত্তকে সঙ্গে নিয়ে আমরা যখন পুনরায় এই পূর্বোক্ত কয়লা খাদের কাছে যাই তখন সেই মাঠটি আমরা দেখি। সেখানে রক্তের দাগ ছিল, কুড়ুলের দাগ ছিল কিন্তু পালুই পোড়ার কোন চিহ্ন ছিলো না।

৬ই ডিসেম্বর এই মাঠের পাশেই একটি মাথার খুলি পাওয়া যায়। যুগান্তরে আসানসোল সংবাদদাতা প্রেরিত খবরে বলা হয়েছে যে, খুলিটি পাওয়া গেছে কূপের মধ্যে। খবরটি মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মাঠে পালুই পোড়ার চিহ্ন আবিষ্কারের জন্ত দুই বাজারী সংবাদদাতা সেদিন পার্শ্ববর্তী ১ মাইল রাস্তা পরিক্রমা করেও সফল হননি। খুলিটি মাঠে আবিষ্কৃত হবার ফলে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয় যে, মৃতদেহ এই মাঠেই নামানো হয়েছিল এবং পালুই

পোড়ানোর ঘটনাটি স্রেফ সাক্ষানো এবং উক্ত বিধবাদের দিয়ে একথা বলানো হয়েছে। বিধবাদের বিবৃতির ওপর আমি গুরুত্ব আরোপ করছি কারণ এই বিবৃতির পোস্টমর্টেম হলোই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য অনেকটা বেরিয়ে আসবে।

৬ই ডিসেম্বর আমি আসানসোল থানায় আনন্দবাজার এবং যুগান্তরের স্থানীয় সংবাদদাতাদের সামনেই ডি এম পি (হেড কোয়ার্টার)-কে ৬ই ডিসেম্বর সকালে আমার সঙ্গে উক্ত বিধবাদের সাক্ষাতের অস্বরোধ জানাই এবং তিনি রাজীও হন। ঐ দিনই আমি ৮টি লিখিত প্রশ্ন ডি এম পি-কে দিই এবং পরবর্তী সকালে ওগুলোর লিখিত জবাব দাবী করি। ডি এম পি সে অস্বরোধও মেনে নেন। পরদিন সকালে থানায় ঐ সব প্রশ্ন সম্পর্কিত অনেক জিজ্ঞাসাবাদের ফলে বেলা প্রায় ১২টা বেজে যাওয়ায় আর উক্ত বিধবাদের কাছে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ, ১২টার সময় আসানসোল থানার অর্গানাইজেশন অফিসে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডাঃ অশোক মিত্রের সংগে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার পূর্ব নির্ধারিত ছিল এবং ডি এম পি নিজে তাঁর গাড়ীতে আমাদের উক্ত অফিসে পৌঁছে দেন।

মন্ত্রীর সংগে আমাদের সাক্ষাৎকার হয়ে যাবার পর আনন্দবাজার এবং যুগান্তর প্রতিনিধিদের কাছে জানতে পারি যে, তাঁদের সঙ্গে ডি এম পি র নাকি ঘটনাস্থল পরিদর্শনের প্রোগ্রাম করা হয়েছে। অথচ যুগান্তর প্রতিনিধি শ্রীশিবসনাতন ব্যানার্জী সকাল ৯টার সময় যখন আমার সংগে দেখা করতে যান তখনও তিনি এ ধরনের কোন প্রোগ্রামের কথা বলেন নি। এখানে বলা দরকার যে, আসানসোল রক কংগ্রেস বলে বর্ণিত এক কমিটির সভাপতি শ্রীকেশ মুখার্জীর কাছে উক্ত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে পুলিশী শিথিলতা তথা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগকে ভিত্তি করে আমিই একটি প্রেস টিম করে ব্যাপক তদন্তের প্রথম উদ্যোগ নিই এবং স্থানীয় প্রেস ক্লাবকে এ বিষয়ে জানাই, অথচ, শেষ পর্যন্ত আমাকেও আনন্দবাজার-যুগান্তরের স্থানীয় দুই সংবাদদাতা টেকা দিতে চাইছিলেন। বেলা প্রায় ২টা নাগাদ আমরা যখন রওনা হই তখন কেরো কোম্পানীর গেটে আনন্দবাজারের ডাঃ জয়গোপাল শর্মা নেমে যান উক্ত বিধবাদের নিয়ে আসার জন্ত। প্রায় ১ ঘণ্টা পেরিয়ে

গেলো ডাঃ শর্মা কিরছিলেন না। ডাঃ শর্মা আমাকে বলেছিলেন যে তিনি ফোন করে সব ঠিক করে কলেছেন। ডাঃ শর্মার সঙ্গে যদি এদের যোগাযোগ না থাকে তবে কেমন করে তিনি ফোনে সব ঠিক করে রাখলেন? আগের রাতে অর্থাৎ ৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় যখন আমরা একই জায়গায় এসে নিহতদের ৩ জনের জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তখন দেখছি ওখানের সমস্ত লোকজনের কাছেই ডাঃ শর্মা খুব পরিচিত। আবদুল সামাদ, আর পি দাস, জগদীশ, কলী রায় নামক অনেকেই ছিল এবং এদের কেউ কেউ পুলিশের মতে সন্দেহভাজন।

পরের দিন উক্ত বিধবাদের কিন্তু পাওয়া গেল না এবং দেখা গেল ডাঃ শর্মা মাঠের মধ্যে এলা দাঁড়িয়ে আছেন এবং আমাকে বলেন যে, ওরা আসছে, অথচ তিনি জানেন না যে, ইতিমধ্যেই আমি আগের দিনে রক্তের মাঠে গিয়ে খবর নিয়েছি যে উক্ত বিধবারা কেউ তখন সেখানে নেই। ফলে ওদের নিয়ে যাবার সমস্ত ব্যয়ানটাই যে ডাঃ শর্মার সাক্ষানো বিবৃতি মাত্র সে বিষয়ে কি সন্দেহের অবকাশ আছে? উক্ত বিধবাদের পুলিশ এবং আমাদের সামনে আবার হাজির করালে থানায় এবং আমাদের কাছে ওদের প্রদত্ত বিবৃতির পরস্পর বিরোধিতার রহস্যটি উদ্ঘাটিত হতো। এটা মহাবীরের পক্ষ চায়নি এবং ডাঃ শর্মা বাহতঃসেটা প্রকাশ না করে স্বকৌশলে আমাদের চোখে ধুলো দিতে চেয়েছেন।

যুগান্তর প্রতিনিধি শিবসনাতন ব্যানার্জী অনেক বেশী ধূর্ত। তিনি চাইছিলেন না যে বিধবাদের সঙ্গে আমাদের আবার সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি অজ্ঞাত দেখাছিলেন যে এর ফলে ওদের জীবনবিপন্ন হতে পারে। সে কথা আমিও অস্বীকার করি না। কিন্তু কাদের হাতে এদের জীবন বিপন্ন হতে পারে? মহাবীর চক্র নয় কি? ওরা এখন মহাবীরের আশ্রয়েই রয়েছে। আমরা নিশ্চয়ই পুলিশকে অস্ববোধ করতে পারতাম যে সে ক্ষেত্রে ঐ বিধবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের অহমতি নিয়ে কোন “হোমে” রাখা হোক। আসানসোলের সর্বজনপ্রিয় বামপন্থী নেতা জীবামপদ মুখার্জীও এই বিধবাদের জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নটি ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সি পি আই (এম) দলভুক্ত এম এল এ জীবামুখার্জী জোর দিয়ে বলেছেন যে,

এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে প্রভাবশালী হাত রয়েছে এবং তাকে খুঁজে বের করতে হবে—সমাজ বিরোধীদের সংঘর্ষ বলে ঘটনাকে লঘু করা উচিত হবে না। দুই বাজারী সাংবাদিক কিন্তু বামপন্থাবাদ বিবৃতিটিও বিকৃত করেছেন। অর্থাৎ ঐ দুই বাজারী প্রতিনিধি এখন আসানসোলের স্বার্থান্বেষী মহলের প্রচারের জয়টাকে পরিণত হয়েছেন।

বরাচক হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য রহস্য উদ্ঘাটন করা খুব দুরূহ নয় আদৌ। গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলাপ করেই জানা গেছে যে নিহত ৪ ব্যক্তি নানাবিধ সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত ছিল কিন্তু গ্রামবাসীর সঙ্গে ওদের কোন বিরোধ ছিল না। গ্রামের অনেকেই চোরাই মাল রেখে থাকে এ সব অঞ্চলে। এই অঞ্চলটি মহাবীরের কার্যকলাপের কুখ্যাত সীমানা বলে জানা যায়। সমস্ত ঘটনা পর্বা-লোচনা করলে দেখা যায় যে, নিহতরা মহাবীরের দলভুক্ত ছিল কিন্তু সম্প্রতি ওদের আত্মগত্যা সন্দেহাতীত ছিল না এবং মহাবীরের দলেব মতে পুলিশের গুপ্তচর বলে বর্ণিত জনৈক “মাষ্টার” ওরফে নারায়ণ সিংয়ের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মহাবীরের দল মাষ্টারকেও খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু তার পাক্ষা মিলছে না, ফলে, হত্যাকাণ্ডের মূলে মহাবীরের দলকে দায়ী করার মত আপাতদৃষ্ট প্রমাণ নষ্টাং করা যায় না। আসল দোষী কে তা বিচার করবেন আদালত কিন্তু

আসানসোল পুলিশ যে ভাবে মহাবীরের ভিত্তিমূলে যা দিয়েছে তা প্রশংসনীয়। জানিনা, এই নিষ্ঠা ওরা শেষ পর্যন্ত বজায় রাখবে কিনা। কিন্তু এইক্ষেণে ওদের পক্ষপাতদৃষ্ট বলা যায় না।

আগেই বলেছি আসানসোল পুলিশের একাংশ এখনও আগের মতোই চূর্নীতিপরায়ণ। আমরা এবারই সেই অংশের নামের তালিকা প্রকাশ করছি না। তাদের উদ্দেশ্য শুধু সতর্কবাণী করছি যাতে তারা নিজেদের সংশোধন করেন। তবে আমাদের এই সতর্কবাণী যে শূন্য-কুন্ডের আগুয়াজ নয় তার প্রমাণস্বরূপ একটি ছোট নজির মাত্র রাখছি। হটন রোডে (হরিশ গড়াই লেন—রামডাঙ্গা) বহি রায়ের বাড়ীতে তাড়াধাকেন সেনর্যালের কর্মচারী মিটু সেন। এই সেন মশাইয়ের ঘরে নিয়মিত মদ এবং জুয়ার আড্ডা বসে। আজও নানা ধরণের সমাজ বিরোধীদের ভীড় হয় সেখানে। এখানে নিয়মিত খারা হাজিরা দেন তাদেরই একজনের নাম বারীন কোলে। লম্বা, মোটা, কালো রঙ এবং ডুড়িওয়ালী, ব্যাকব্রাস চুল। বারীনবাবু আসানসোল পুলিশেরই একজন। ঝিড়ি মহলায় কোন ডাঃ মালেক নামক রহস্যজনক ব্যক্তির ঘরে (এর নাগরিকতা সন্দেহমুক্ত নয়) কোন কোন পুলিশ অফিসারের গোপন অভিসার ঘটেছে তারিখ ও সময়সহ তার পূর্ব তালিকা আমরা সময় মত প্রকাশ করবো। শুধু সতর্ক করে দিচ্ছি, ওয়াজন ব্রেকারদের কাছে তাদের মোটা মাসিক বরাদ্দের বিশদ বিবরণ আমাদের হস্তগত হয়েছে।

(সমাপ্ত)

সি পি এম সম্পর্কে শাহী ইমাম

(দর্পণের সংবাদদাতা)

আসানসোল থেকে ধানবাদ যাবার পথে স্থানীয় শিল্পপতি শ্রীমালেক সিং-এর গৃহে সাময়িক যাত্রা বিরতির সময় আসানসোলের স্থানীয় সাংবাদিক শ্রীএম, এ, এ, বেগ এবং শ্রীএস, এস, বস্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে গত ২৫শে নভেম্বর দিল্লী জুমা মসজিদের শাহী ইমাম বলেছেন যে, জনতা পার্টির চেয়ে সি. পি. আই (এম) জনগণকল্যাণে অনেক বেশী সক্রিয়। পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্মস্ট্র মরকার সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, মাত্র কয়েক মাস আগে এই রাজ্যে ব্রাহ্মস্ট্র মরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের প্রশাসনিক দক্ষতা বিচার করা উচিত নয়।

কিন্তু, তাঁরা যতপাতেই স্বগভীর নিষ্ঠার সঙ্গে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্রতী হয়েছেন। তিনি বলেন, অবশ্য এ ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা জনতা পার্টির চেয়ে অনেক ভাল।

জনতা পার্টি কি প্রশাসনে ব্যর্থ— এই প্রশ্নের জবাবে শাহী ইমাম বলেন— যে, জনতা পার্টির নেতারা ব্যর্থ অথবা সফল দিন আসলে জনগণই তার জবাব দেবেন, কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, জনতা পার্টিতে বহু দক্ষতাকারী অল্পপ্রবেশ ঘটেছে এবং তাঁদের জন্তই এই দলের ভাব-মূর্তি ধ্বংস হতে চলেছে।

গ্রন্থ সমালোচনা

বাঙালী মধ্যবিত্তের চরিত্র বিচার

বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজ ভাবনা: মিহির আচার্য।
লেখক সমাবেশ, এ ১৮এ কলেজ
স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭। আট
টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রবন্ধের সঙ্কলন। মিহির আচার্য মূলতঃ ছোট গল্প এবং উপ-
স্থাসের লেখক হিসেবেই গণপ্রসিদ্ধ।
বাংলা সাহিত্যের চিহ্নিত নাম হলেও
প্রবন্ধকার হিসেবেও তার মূল্যায়ন।
ইতিপূর্বেই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ
করেছে যুক্তিসঙ্গত পাঠক সমাজের
কাছে। তাঁর প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত তত্ত্ব
যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন
বিশেষ মতাদর্শের যান্ত্রিক অনুসৃত
নয় এবং যেহেতু যুক্তিনিষ্ঠ তথ্য
প্রয়োগ ভিত্তিক বিশ্লেষণের আশ্রয়
লোকবর্ষই তার গল্প রচনার মূল
বৈশিষ্ট্য সেই হেতু বাঙালী প্রকাশনার
ছাড়পত্র না নিয়েও মিহির আচার্য
সম-সাময়িক বাংলা প্রবন্ধের জগতেও
স্বকীয় রৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট একটি নাম।

যেটা এই টালমাটাল সত্তরের
দশকে সবচেয়ে বেশি আলোচ্য বিষয়
হওয়া দরকার তা হচ্ছে উনিশ
শতকের "রেনেসাঁস" বলে অভিহিত
নব সংস্কার আন্দোলনের "তত্ত্ব" ও
তথ্য ভিত্তিক মূল্যায়ন। যুরোপীয়

মিউনিসিপ্যাল গেজেটের বিশেষ সংখ্যা

কলকাতা পৌরসভার মুখপত্র
ক্যালকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের
বিশেষ সংখ্যা "কলকাতা-কলকাতা"
এবার সবাইকে চমকে দিয়েছে বলা
যায়। প্রতি পনেরো দিন অন্তর
গেজেটের সংখ্যা প্রকাশিত হয়।
মার্কে মধ্যে প্রকাশিত হয় বিশেষ
সংখ্যা, যেমন এর আগে হয়েছে
বিপ্লবী লেনিন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র
বহু, কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু
চিত্তরঞ্জন।

এবার কোনও নামকরা সাহি-
ত্যিক, বিপ্লবী, চিন্তাবিদেও ওপর
গেজেট দৃষ্টি দেয়নি। এখাপারে
গেজেটের বিচক্ষণ সম্পাদক বেছে
নিয়েছেন এই কলকাতাকেই। শহর
কলকাতার স্বত্বস্বাধীন, গণ আন্দোলন,
সঙ্গীত, সাহিত্য, গাছপালা, বেকার,
বাণিজ্য, শিল্প আরও হরেক জিনিস
স্থান পেয়েছে গেজেটের এই বিশেষ
সংখ্যায়। রাজ্যের চিন্তাবিদদের
স্বলেখনী থেকে নিঃসৃত হয়েছে
মহানগরীর নামকরণের ইতিকথা,
জগলী নদীর নানাকথা, কলকাতার

রেনেসাঁস আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল
কমার্শিয়াল বুর্জোয়াদের হাতে কিন্তু
কৃষক সমাজ ছিল তার সক্রিয় সহ-
যোগী এবং তা ছিল সামন্ততন্ত্রের
উচ্ছেদের লক্ষ্যে নির্দেশিত কিন্তু
উনিশ শতকের যে তথাকথিত বঙ্গীয়
রেনেসাঁস নিয়ে আজও নাগরিক
বাঙালী বুদ্ধিজীবী মহল নানাবিধ
আপত্তিকোর বাতাবরণে জাতীয়
চিন্তাকে বিলাস্ত করে চলেছে তার
মূল শক্তি ছিল ভারতীয় মুসলিম
শ্রেণীর ইংরেজ বণিকী অর্থনীতির
সব্বদ লালনপুষ্ট এক রূপান্তরিত গোষ্ঠী
ভারতীয় বুর্জোয়াদের আদিপুরুষ।
এই গোষ্ঠীর হাতেই রচিত হল
আমাদের দেশের তথাকথিত জাতীয়-
তাবাদের সংজ্ঞা যার সৌধ রচিত
হয়েছে ১৭৭২ সাল থেকে উনিশ
শতকের প্রায় অস্তিমপর্ব পর্যন্ত পরি-
ব্যাপ্ত কৃষক বিদ্রোহের জাতিধর্ম
সম্প্রদায় নির্বৈশেষিক যুগলবন্দী প্রতি-
রোধের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ধর্ম-
তুপের ওপর এবং যার ফলশ্রুতি
খণ্ডিত এবং সঙ্গীর্ণ এক জাতীয়তা-
বাদ। সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ এই
"রেনেসাঁসের" লক্ষ্য ছিল না এবং
তৎক্ষণিক কারণে প্রথম যুগে
কোম্পানীর বণিকী পুঞ্জি এবং
পরবর্তী কালে ইংলণ্ডের শিল্পপুঞ্জির
নিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধিদের পাশবিক

উপাসনালয়ের জন্মবৃত্তান্ত, এমনকি
গাঁটকাটা পকেটমার প্রসঙ্গ।
জন্ম থেকে মৃত্যু এর প্রত্যেকটা
স্তরই "কলকাতা কলকাতায়" নিজের
স্থান করে নিয়েছে।

প্রত্যেকটা লেখা-ই মননশীলতার
ভরপুর। রয়েছে অতিরিক্ত কয়েকটি
ছাপা ছবি। পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত
শ্রী একটাকে বলে দিয়েছেন
কলকাতা পৌরসভার "সাম্প্রতিক
হালচালের কথা।

সব মিলিয়ে বলা যায় এক মূঠায়
কলকাতাকের ধরার পক্ষে "কলকাতা
কলকাতা" একটি অনবদ্য সৃষ্টি।
পৌরসভার নানা জটিল সমস্যার
মধ্যেও একটু আলোর রেখা। বইটির
জন্ম অভিজ্ঞ, কর্মনিষ্ঠ সম্পাদক
সমরেশ চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ।
বইটির প্রাপ্তিস্থান কলকাতা পৌর-
সভা, ৫নং এস, এন, ব্যানার্জি রোড,
কলকাতা-১৩, সেন্ট্রাল রেকর্ড
সেকশন, একতলা। দাম—চার
টাকা।

অত্যাচারে কৃষক বিদ্রোহগুলো যে
ভাবে পরাস্ত হয় তার সক্রিয় সমর্থনে
ছিল এই তথাকথিত রেনেসাঁসের
নাগরিক। এবং স্বাভাবিক কারণেই
কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
আইন পাশের পর রামমোহন, ঝারকা-
নাথ ঠাকুর, প্রসন্ন ঠাকুর প্রমুখ মূলতঃ
স্বার্থানুগামী তৎকালীন রেনেসাঁ-
সের নাগরিকদের নাগরিক চেতনাটি
ছিল ইংরেজ শাসনের ওপর নির্ভরশীল
এবং মেকলের ১৮৩৫ সালের এডু-
কেশন মিনিটসে স্পষ্ট করেই বলা
হয়েছে যে, এমন একটি শ্রেণী
ইংরেজরা এদেশে গড়ে তুলতে চায়
যারা হবে Indian in blood but
English in taste and culture.

১৯১৮ সালের মস্টেঞ্জ চেম্বার্স
রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এরা
ইংরেজ প্রদত্ত শিক্ষারই ফসল এবং
তাদেরই চিন্তার সন্তান সন্ততি।
৪৭ সালে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক
স্বাধীনতা লাভ করে এবং ভারতীয়
বুর্জোয়াদের হাতে আসে রাষ্ট্রীয়
ক্ষমতা। ৩০ বছরের কংগ্রেসী অপ-
শাসনে দেশ আজ পরিণত হয়েছে
অশ্রানে। এর যুক্তির পথ কি?
এটাই তো এ যুগের সবচেয়ে বড়
সারস্বত সমস্যা। অথচ এই সমস্যা
সম্মাননের লক্ষ্যে যে জাতীয়
ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন হওয়া দরকার
সে দিকে এমন কি আমাদের বাধা
বাধা কমিউনিষ্ট চিন্তাবিদরাও নজর
দেন নি। এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ না
হলেও আলোচ্য গ্রন্থের "উনিশ
শতকী বুদ্ধিজীবী মানস" গুরুত্বপূর্ণ
প্রবন্ধটিতে মিহির আচার্য এক উজ্জ্বল
যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তাৎপর্য ও উনিশ
শতকী প্রতিক্রিয়া" "বুদ্ধিজীবী
শ্রেণীর সাহিত্য ঐতিহ্য: বক্ষিম-
রবীন্দ্রনাথ" ইত্যাদি এই গ্রন্থের
অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি এ যুগের বিকৃত,
বিক্রীত ও বিলাস্ত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী
মানসিকতার স্বরূপ উদ্ঘাটনে এক
ধারালো হাতিয়ার বলা যায়। ক্ষেত্র
বিশেষে কেউ কেউ হয়তো মিহির-
বাবুকে আপাতদৃষ্টিতে উগ্র বলে তাৎ-
ক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিয়ে বসতে পারেন
কিন্তু বইটি আত্মোপাস্ত পাঠ করার
পর মনে হবে অতি রক্ষণশীল বাঙালী
বুদ্ধিজীবী মানসকেও মিহিরবাবু
নাড়া দিতে পেরেছেন।

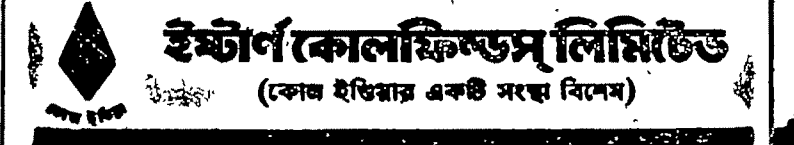
ছাপা ও বাঁধাই খুব প্রশংসনীয়
না হলেও ভাল। বোধহয় গ্রন্থের
সুসজ্জিত বহিরঙ্গণে মিহিরবাবু
আত্মবিশ্বাস নন। সেটাও এক দুঃসাহ-
সিকতা বৈ কি, অন্তত সত্তরের
দশকে।

সাধন গুহ

সাংবাদিকতার কর্মশালা

আসানসোল টেলিগ্রাফ অফিসের
প্রেস রুম আসানসোল প্রেস ক্লাবের
উদ্যোগে ২৬শে ও ২৭শে নভেম্বর এবং
৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হলো
৪দিন ব্যাপী সাংবাদিকতার
কর্মশালা। আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে
উপস্থিত ছিলেন দর্পণের সাধন গুহ।
অন্যান্য আলোচনাকারীদের মধ্যে
ছিলেন ডাঃ জয়গোপাল শর্মা, শিব-
সনাতন ব্যানার্জী, দামোদর গুপ্ত,

গৌরীশংকর কেডিয়া, জ্যোৎস্না
সামন্ত, হুম্মিল মালশণী, সিদ্ধার্থ
পার্শ্ব মুখার্জী, সত্য কর্মকার, স্বধা
কৃষ্ণ গুপ্ত, বিনয় সেন, প্রদীপ ঘোষ,
বিশ্বদেব ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেকে।
ইকো এবং ই, সি. এল-এর পক্ষে
আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন
দুই সংস্থার জনসংযোগ দপ্তরের
প্রসাদকমল নিয়োগী, জয়ন্ত রায় এবং
কে, সি, মাধান। সাংবাদিকতা ও
আইন প্রসঙ্গে বলেন বিশিষ্ট আইন-
জীবী নিখিলেশ দাস।



নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে

১। ড্রিং প্যানেল সরবরাহ
টেওয়ার নং ই সি এল/পি ইউ আর/ড্রিং/প্যানেল/৭৭/৭৬
ই সি এল পি ড্রিং প্যানেলের জন্ম উপাদানকারী/সরবরাহকারীদের কাছ থেকে
টেওয়ার নং ও নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দুকপি সীল করা টেওয়ার। প্রয়োজনীয়
পরিমাণ ৩০টি এবং প্রতি সেট টেওয়ারপত্রের দাম ১০ টাকা। টেওয়ার দেবার
শেষ দিন ১০/১১/৭৮ তারিখ বেলো ১টার আগে এবং ১০/১১/৭৮ তারিখ বেলো
৩টায় টেওয়ার খোলা হবে।

কন্টোলার অব পারচেজ, ইস্টার্ন বুক হাউস লিমিটেড, সীকতোড়িয়া,
পোঃ ডিশেরগড়, জেলা বর্ধমান এর অফিস থেকে স্পেন্সিকেশনের সিডিউল
ও সরবরাহের শর্তাবলী সহ টেওয়ার দলিল পাওয়া যাবে যে কোন কাজের
দিনে একই অফিসে অ্যাডিশনাল কন্টোলার অব অ্যাকাউন্টসের কাছে
নির্দিষ্ট টেওয়ার ফি নগদে দেওয়ার রসিদ দেখিয়ে। একই
ঠিকানায় অ্যাডিশনাল কন্টোলার অব অ্যাকাউন্টসের কাছে নির্দিষ্ট
টেওয়ার ফি-র জন্ম পাঠানো মনি অর্ডার গ্রহণ করা হবে যদি টেওয়ার
দলিল পাঠাবার জন্ম টেওয়ার সিডিউল অস্থায়ী অতিরিক্ত ২ টাকা (দু টাকা)
অথবা তার বেশি পাঠানো হয়। এই মনি অর্ডারের কুপনে টেওয়ার নম্বর ও
নির্দিষ্ট তারিখ সহ টেওয়ারদাতার পুরো ঠিকানা লিখতে হবে। টেওয়ারের
নির্দিষ্ট তারিখের অন্ততঃ ১৫ দিন আগে পাঠানো মনি অর্ডারই কেবল গ্রহণ
করা হবে। টেওয়ার গ্রহণের শেষ তারিখের তিন দিন আগে টেওয়ারপত্র
ডাকে পাঠানো হবে। ডাকে বিলম্ব হলে তার জন্ম ইস্টার্ন বুক হাউস লিমিটেড
দায়ী থাকবে না। পোষ্টাল অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/চেক পাঠানো টেওয়ার ফি
গ্রহণ করা হবে না।

২। হাসপাতালের সরঞ্জাম সরবরাহ
টেওয়ার নং ই সি এল/পি ইউ আর/হসপিটাল ইকুইপমেন্ট/০৩/৭৭/৬৮
হাসপাতালের সরঞ্জাম সরবরাহের জন্ম কেবলমাত্র উপাদানকারী/
সরবরাহকারীদের কাছ থেকে টেওয়ার নম্বর ও নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দুকপি সীল
করা টেওয়ার। পরিমাণ প্রয়োজন স্পেন্সিকেশন অস্থায়ী এবং প্রতি সেট
টেওয়ারপত্রের দাম ১০ টাকা। টেওয়ার জমা দেবার শেষদিন ২০/১১/৭৮
তারিখ বেলো ১টা পর্যন্ত এবং ১১ এদিন বেলো ৩টায় খোলা হবে।

কন্টোলার অব পারচেজ, ইস্টার্ন বুক হাউস লিমিটেড, পোঃ ডিশেরগড়
জেলা বর্ধমান-এর অফিস থেকে স্পেন্সিকেশনের সিডিউল ও সরবরাহের
শর্তাবলী সহ টেওয়ার দলিল পাওয়া যাবে যে কোন কাজের দিনে একই
অফিসে অ্যাডিশনাল কন্টোলার অব অ্যাকাউন্টসের কাছে নির্দিষ্ট ফি
নগদে জমা দেওয়ার রসিদ দেখিয়ে। একই ঠিকানায় অ্যাডিশনাল কন্টো-
লার অব অ্যাকাউন্টসের কাছে নির্দিষ্ট টেওয়ার ফি-র জন্ম পাঠানো মনি অর্ডার
গ্রহণ করা হবে যদি টেওয়ার দলিল পাঠাবার জন্ম টেওয়ার সিডিউল
অস্থায়ী অতিরিক্ত ২ টাকা (দু টাকা) অথবা তার বেশি টাকা পাঠানো
হয়। এই মনি অর্ডারের কুপনে টেওয়ার নম্বর ও নির্দিষ্ট তারিখ সহ টেওয়ার-
দাতার পুরো ঠিকানা লিখতে হবে। টেওয়ারের নির্দিষ্ট তারিখের অন্ততঃ
১৫ দিন আগে পাঠানো মনি অর্ডারই কেবল গ্রহণ করা হবে। টেওয়ার
গ্রহণের শেষ তারিখের তিনদিন আগে টেওয়ারপত্র ডাকে পাঠানো হবে।
ডাকে বিলম্ব হলে তার জন্ম ইস্টার্ন বুক হাউস লিমিটেড দায়ী থাকবে না।
পোষ্টাল অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/চেক পাঠানো টেওয়ার ফি গ্রহণ করা হবে না।

সত্যনারায়ণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শীল গোষ্ঠী এবং রাজ্য পুলিশের একাংশ সেই চক্রান্তে মগ্ন হয়েছিল। তখন হঠাৎ ক্ষুণ্ণ প্রতাপের সার্থিত পতাকা উড়িয়ে “হাটি হাটি পা পা” রাজনীতির স্বয়ংস্ফুট সেনাপতি সন্তোষ রাণা আবিষ্কার করলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থ রায় সরকারের সঙ্গে জ্যোতি বসুর সরকারের কোন তফাৎ নেই। এই মন্তব্যেও আমরা বিস্মিত হইনি কারণ বারা নিজ স্বার্থ পূরণের জন্য এবং নিজদের মুক্তির জন্য সহযোগীদের আটক থাকাকে মাশুল হিসেবে গণ্য করে সেই আদর্শব্রষ্ট লজ্জাহীনদের আমরা শুধু করুণাই করতে পারি।

এইতো কিছুদিন আগেই কারা-কার জল বন্টন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বলিষ্ঠতা এবং প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইর ষ্টেটসম্যানশিপকে প্রশংসা করে জামশেদপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফতোয়া জারী করেছেন সত্যনারায়ণ সিং এবং কারাকার জল বন্টন প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার তথা সি, পি, আই (এম)-এর গৃহীত নীতিকে ত্রাশনাল অভিনিয়ম বা জাতীয় সুবিধাবাদ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। গাধা যদি পাগল হয় তবে তার রূপ কি হতে পারে সত্যনারায়ণ সিং নামক

মানবাধিকার লঙ্ঘন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

রিকার অবস্থা কি? সেখানে কৃষ্ণাঙ্গরা তো বিপন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে নিগ্রোদের ট্রেড ইউনিয়ন গভীর অধিকার আদায়ের স্বীকৃত নয়। আমেরিকার বন্ধু দেশ-ছোটো রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে মানবজাতির অধিকার বলতে জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ শ্বেতাঙ্গদেরই অধিকার বোঝায়। গত দেড় বছরে দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশ হেফাজতে ২১ জন কৃষ্ণাঙ্গকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। শেষ যিনি মারা গেছেন, তিনি হলেন নিগ্রো জাতীয়তাবাদী নেতা স্তিভ বিকো।

ইন্দোনেশিয়ায় আজ তেরো বছর হতে চলল প্রায় ষাট হাজার বামপন্থী রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের আটক করে রাখা হয়েছে।

হাজার হাজার ব্যক্তিকে আটক রাখা হয়েছে আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, চিলি প্রভৃতি দেশে। সম্প্রতি লওনের অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সংস্থা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আটক লক্ষাধিক রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির জন্য এগারো লক্ষাধিক ব্যক্তি ও সংগঠন

রাজনৈতিক পুতুলটিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জনতা পার্টি এবং দেশের সর্বস্তরের প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে নতজাহ্নু এবং বিক্রীত আদর্শ এই রাজনৈতিক মীরজাকররা প্রতিক্রিয়া-শীল চক্রান্তের নতুন স্থপতি হিসেবে আবিষ্কৃত হচ্ছে। একথা ভাববার কোন কারণ নেই, কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত জনতা পার্টির সরকার পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে মন থেকে মেনে নিয়েছে। এই সরকারকে হয়ে প্রতিপন্ন করার জন্য একটা সুপরিচালিত এবং সুসংগঠিত চক্রান্ত দ্বারা বাধ্য হয়ে রেশ ধরে শেষ পর্যন্ত রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে ছলে বলে কৌশলে গদীচ্যুত করার কেন্দ্রীয় সরকারী প্রচেষ্টা চক্রান্ত একেবারে অবিচল নয়। সত্যনারায়ণরা কর্ণাটক, অন্ধ্র, আসাম ইত্যাদি রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জনতা পার্টির সঙ্গে যে কোন শর্তেই ফ্রন্ট গড়তে রাজী। এটাই ভবিষ্যতের স্বপ্ন চক্রান্তের এক পূর্বভাস। সময় থাকতে সি, পি, আই (এম) এবং পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট ও সরকার সতর্ক না হলে তাদের ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। মনে রাখতে হবে বাজারী কাগজগুলোর দৌলতে সত্যনারায়ণ-সন্তোষ রাণারা কিংবদন্তীর নায়কের গৌরব অর্জন করে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের সোল এক্ষেত্রেই আসরে নামছেন।

প্রতিনিধিদের স্বাক্ষরিত এক স্মারক-লিপি রাষ্ট্রসভার কাছে পেশ করেছেন।

বর্তমানে আমেরিকার বন্ধু পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের জিয়া সরকারও এ ব্যাপারে পেছিয়ে নেই। সেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা একপেশে। মুজিবুর রহমানের শাসনে দেখেছি মস্কোপন্থী মতবাদ প্রচারে অবাধ স্বাধীনতা, অন্যদের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ। আর এখন দেখছি, মস্কোপন্থীদের স্থান কারাগারে অন্তরা ওয়াশিংটন, পিকিং যুরে বেড়াচ্ছেন। গত ১৪ই অক্টোবর বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি, ডেমো-ক্রাটিক লীগ, জামদ সব নিষিদ্ধ হয়েছে। মনি সিং সহ অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছেন।

দেশে বিদেশে আজ মানবাধিকার বিপন্ন। কারণ পুঁজিবাদীরা আজ অর্থনৈতিক সংকট জনসাধারণের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। সেক্ষেত্রে প্রতিবাদের অধিকার খর্ব করতেই হবে। মানবাধিকারের ঐ বিশ্বজনীন ঘোষণার প্রয়োগ আর হয় না।

প্রণব মুখার্জী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেসী মনোনয়ন নিয়ে রাজ্যসভার সদস্য হন। এখনও তিনি রাজ্যসভার সদস্য। তারপর ইন্দিরা মন্ত্রিসভায় ব্যাকিং ও রেভিনিউ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে বহু বিশিষ্ট শিল্পপতি, নিরপরাধ মানুষের বাড়ীতে থানা-তল্লাশি চালিয়েছেন। অনেককে সর্বস্বান্ত করেছেন। অতীতকে নিজের নামে টাকা চুরির তদন্তটিকে সমস্ত ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিলেন। কেননা, আমরা এই ফাইলে দেখছি ১৯৭৬ সালের ২১শে অক্টোবর পশ্চিম বঙ্গ পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চার ডি-আই-জি এস, কে, সিং রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী ডি, এল, গুহকে লিখছেন, বিজ্ঞানগণ শিক্ষা সংসদের হিসাবপত্র সম্পর্কে এ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের স্পেশাল অডিট রিপোর্টের কি হোলো? সমস্ত ফাইলটি পড়লে দেখা যাবে, প্রণব মুখার্জীকে বাঁচানোর জন্য কত রকম কায়দা করা হচ্ছে। এই স্পেশাল অডিট করানোর ব্যাপারটিও মজার। ফাইলে দেখছি, ১৯৭১ সালের জাহ্নুয়ারী মাসে পশ্চিম বঙ্গের এ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলকে বিজ্ঞানগণ কলেজের হিসাবপত্র অডিট করতে বলা হচ্ছে। তারপর দেখছি, ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে বিজ্ঞানগণ শিক্ষা সংসদের অন্তর্গত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে হিসেবপত্র স্পেশাল অডিট করতে এ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলকে অহরোধ করা হচ্ছে আর ১৯৭৬ সালের অক্টোবরে পুলিশের ডি-আই-জি খোঁজ করছেন, স্পেশাল অডিটের কি হোলো? সমস্ত ব্যাপারটায় স্কাপনা খেন ফুটে উঠছে। ছ’বছর ধরে বিজ্ঞানগণ কলেজের হিসেবপত্র অডিট করানো গেলনা। আসলে অডিট করানোর ব্যাপারটা অছিলামাত্র।

খবর হচ্ছে, প্রণব মুখার্জী যখন ইন্দিরার ঘনিষ্ঠ মহলে প্রবেশ করে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের বিরোধিতা করতে শুরু করেন তখন সিদ্ধার্থ রায় এই তদন্ত চালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর তখন ক্ষমতাহীন। তাঁকে তদন্ত চালাতে দেওয়া হয়নি। অতীতকে ইন্দিরা-সম্মুখের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে প্রণব মুখার্জী নিজের নামে টাকা চুরির অভিযোগ চাপা দিয়ে অপরের পিছনে লেগেছেন। তখনও তিনি ইন্দিরা ভজ্জানাই করে গেছেন।

রাজনৈতিক পটভূমিকা এখন পাশেটেছে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে দর্পণ এখন প্রণব মুখার্জীর

বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করানোর জন্য অহরোধ জানাচ্ছে। বিষ্ণুপুর থানা (২৪ পরগণা) আর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চে সমস্ত কাগজপত্র আছে। যদি না পাওয়া যায় তবে দর্পণের কাছে কাগজপত্র পাওয়া যাবে।

শুধু বিজ্ঞানগণ কলেজের টাকা চুরির অভিযোগই নয়, ফাইলে দেখছি, ১৯৭০ সালের যে মাসে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চার একজন অফিসার ওপরওয়ালার কাছে লিখছেন, বিজ্ঞানগণ কলেজের অফিসিয়েটিং প্রিন্সিপ্যাল পি, কে, মুখার্জী ও সেক্রেটারী ধীরেন বোরার বিরুদ্ধে তদন্ত করার সময় দেখছি উপরোক্ত দুজন ১৯৬৭

সালের মার্চ ও মে মাসে নয়াদিল্লির ইউনিভারসিটি গ্র্যান্টস কমিশন থেকে লাইসেন্সের বই কেনার নামে ৭৩৩৩ টাকা নিয়েছেন এবং পরবর্তী দিনে লাইসেন্সের বই কিনেছেন বলে ১১০০৭ টাকা ১০ পয়সার ভুরো হিসেব দাখিল করেছেন। আরো তদন্তের জন্য আমার দিল্লি যাও দরকার। ওপরওয়ালার দিল্লি যাবার সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু তারপর কি হয়েছে বোঝা যাচ্ছেনা।

মোটকথা, ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব কংগ্রেসী রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর বিরুদ্ধে তদন্ত করার প্রচুর মাল-মশলা রাজ্য সরকারের হাতেই রয়েছে।



ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডাস্ট্রি একট সন্থা বিনেশ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে

বালি পরিবহন
রেফা: নং ই সি এল / এস এ এম / এন এস এ / এস-টি / টি-এন-১ / ৭৭ / ১৫৭ / ১০ / ৭৪ তাং ৭. ১২. ৭৭।
‘ট্রাকে কয়লা পরিবহন’-এই কথাগুলি নির্দিষ্ট কর্তৃক লিখে, সাব-এরিয়া ম্যানেজার, নিরশা সাব-এরিয়া, পো: নিরশাচিট, জেলা ধানবাদ-এর নামে উল্লিখিত সূত্র থেকে ১৯৭৭-৭৮ সালে কয়লা পরিবহনে সক্ষম প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে সীল করা টেণ্ডার-বরাকর নদীতে বারমুরি মোজা থেকে খাস বারজানা টোয়িং বাক্সারে ১৫,০০০ কিউবিক মিটার বালি সংগ্রহ, লোডিং, পরিবহন ও আন-শোডিং। অল্পমিত দূরত্ব ১৬/১৭ কিলোমিটার।
টেণ্ডারের সঙ্গে ১,০০০ টাকা দিকিউরিট ডি:পার্সিট: কাল ইন্ডিয়া লিমিটেড, ইস্টার্ন ডিভিসন, নিরশা গ্রুপ-এব অহু:ল আদানদোলে নগদে দেয় (স্বত্ব বিহীন) ডিমাও ড্রাকটের আকাবে পাঠাতে হবে এবং অসফল টেণ্ডার-দাতাদের যাকেরত দেওয়া হবে। রয়্যালটি সহ ভ্যালুয়াটিক ভিত্তিতে অর্বাং আন-লোডিংয়ের আগে ট্রাকে প্রতিকিউবিক মিটার বালির দর দিতে হবে। নিয়মিত পেমেন্ট দেওয়া হবে সাধারণতঃ যে সময়ের কাজ তার পরবর্তী শনিবারে এবং বাক্সারে রক্ষিত রেকর্ডের ভিত্তিতে যে সময়ের জন্য পেমেন্ট তখন সরবরাহ করা বালির পরিমাণের ১০% ভাগের জন্য এ / সি পেরী চেকে। বাকি ১০% ভাগের জন্য পেমেন্ট দেওয়া হবে প্রতি মাসের শেষে কোল বোর্ড সার্ভেয়ার ও কোলিয়ারী সার্ভেয়ারদের কাছ থেকে জয়েন্ট ষ্টক ইয়ার্ড মেজারমেন্ট পাওয়ার পর। বালি সরবরাহ না করার জন্য কোলিয়ারীর যে কোন ক্ষতি ঠিকাদাররা পূরণ করবেন এবং সাব-এরিয়া ম্যানেজারের সিদ্ধান্ত অহুযায়ী ক্ষতির অল্প ঠিকাদারদের বিল থেকে কেটে নেওয়া হবে। ঠিকাদারদের পূর্বাঙ্কে জানিয়ে প্রয়োজন অহুযায়ী বালির পরিমাণ বাড়ানো বা কমানোর অধিকার থাকবে সাব-এরিয়া ম্যানেজারের। ঠিকাদারকে তার কর্মচারীদের স্কাওয়ার্ড ও অন্তান্ত বসবাস শ্রম আইন অহুযায়ী পেমেন্ট দিতে হবে। ওয়ার্কমেন্স কম্পেন্সেশন আইন মতে কর্মচারীদের দেয় যে কোন ক্ষতিপূরণের জন্য ঠিকাদাররা দায়ী থাকবেন। নদী ও বাক্সারের অহুমোদিত পথ ঠিকাদারদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে তাঁদের ট্রাক যাতায়াতের সুবিধার জন্য। শর্তাবলী সম্পর্কে অত্যান্ত বিবরণ ইত্যাদি এবং টেণ্ডারপত্র সাব-এরিয়া ম্যানেজার, নিরশা সাব-এরিয়ার অফিস থেকে যে কোন কাজের দিনে অফিসের সময়ে গাওয়া যাবে।
২৮. ১২. ৭৭ তারিখ পর্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ করা হবে এবং ৩০. ১২. ৭৭ তারিখে ৩.৩০ টায় সাব-এরিয়া ম্যানেজার, নিরশা সাব-এরিয়া, পো: নিরশাচিট (ধানবাদ)-এর অফিসে খোলা হবে। টেণ্ডারদাতাদের টেণ্ডার খোলার সময় আই টি ও এস টি ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দেখাতে হবে, এ ছাড়া টেণ্ডার বাতিল করা হবে।

ইন্দিরা গান্ধী তলবী সভা ডাকছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ঐক্য আলোচনায় লাভ নেই স্বেনও কংগ্রেসের ইন্দিরা ও রেড্ডী গোষ্ঠী আলোচনা করছেন। এই রিপোর্ট প্রেসে দেওয়ার সময় পর্যন্ত পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বলা যায় ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষ থেকে তলবী সভার দিন ২৮শে ডিসেম্বরই ঘোষণা করা হবে। তবে তা কোন কারণে পিছিয়ে ২৯শে ডিসেম্বরও হতে পারে।

রাজ্য রাজ্যে প্রস্তুতিও সেইভাবে চলছে। প্রত্যেক রাজ্য থেকে ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থনে যত বেশী সম্ভব এ আই সি সি সদস্য তলবী সভায় হাজির করানোর চেষ্টা চলছে। বিহার, কর্ণাটক, অন্ধ্র, তামিল-

নাড়ু, কাশ্মীর এবং উত্তর প্রদেশের অধিকাংশ এ আই সি সি সদস্যের সমর্থন শ্রীমতী গান্ধীর দিকে। তাছাড়া মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যেও বেশ কিছু সদস্য ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থনে থাকবেন।

তবে একথা ঠিক গভীর অঙ্কোবরে তলবী সভার জন্ত যে, ৪০৫ জন এ আই সি সি সদস্য শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থনে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন তার মধ্যে কিছু সদস্য এখন শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষ থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছেন। অঙ্কুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পি ভি নরসিংরাওকে নতুন সভাপতি নির্বা-

চাও, এন, বোম্ব, ডি চ্যাটার্জী প্রমুখ সরাসরি গোড়াউনে চুকে পড়েন। সেখানে তারা দেখেন এম পি এল ২৭৪ নম্বরের তেলের ড্রাম ভর্তি একটি গাড়ী। আর এখানে সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে আরও একগাছা ড্রাম। পুলিশ অফিসাররা ঘটনাস্থতি সংগে সংগে জেলা শাসক লীলা চক্রবর্তীকে জানান। শ্রীমতী চক্রবর্তীর নির্দেশে পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট প্রকাশ তট্টাচার জেলার গোয়েন্দা শাখাকে বিষয়টি জানান। সেখান থেকে ডি ই বি (ওয়ান) এন বোস দলবল নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। সন্নী সহ তেলের ড্রাম আটক করা হয়। সাকরাইল থানা থেকে জানান হয় ড্রাইভার ও স্ট্রীনারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা যায় এর সংগে আরও দুজনকে পুলিশ খুঁজছে। তাদের মধ্যে একজন কালিপদ দাশ।

অজুত ঘটনা হল, ঘটনার নেপথ্য নায়করা বে-পাতা। সাধারণ চুনো-পুটির ধরেই পুলিশ চুপচাপ। অথচ চাও, এন, বোম্ব, ডি চ্যাটার্জী প্রমুখ সরাসরি গোড়াউনে চুকে পড়েন। সেখানে তারা দেখেন এম পি এল ২৭৪ নম্বরের তেলের ড্রাম ভর্তি একটি গাড়ী। আর এখানে সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে আরও একগাছা ড্রাম। পুলিশ অফিসাররা ঘটনাস্থতি সংগে সংগে জেলা শাসক লীলা চক্রবর্তীকে জানান। শ্রীমতী চক্রবর্তীর নির্দেশে পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট প্রকাশ তট্টাচার জেলার গোয়েন্দা শাখাকে বিষয়টি জানান। সেখান থেকে ডি ই বি (ওয়ান) এন বোস দলবল নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। সন্নী সহ তেলের ড্রাম আটক করা হয়। সাকরাইল থানা থেকে জানান হয় ড্রাইভার ও স্ট্রীনারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা যায় এর সংগে আরও দুজনকে পুলিশ খুঁজছে। তাদের মধ্যে একজন কালিপদ দাশ।

অজুত ঘটনা হল, ঘটনার নেপথ্য নায়করা বে-পাতা। সাধারণ চুনো-পুটির ধরেই পুলিশ চুপচাপ। অথচ

চন করার ব্যবস্থাও প্রায় পাকা। তবে বেশীর ভাগ কংগ্রেস নেতা এখনও ঠিক করে উঠতে পারছেন না কি করবেন। কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতাই মত শ্রীমতী গান্ধীর দোষ ক্রটি সম্বন্ধে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দলকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে পারেন। তবে তা নিয়ে দল ভেঙে থাকে। এটা তারা চান না এবং দল ভেঙে গেলে কোন দিকে যাবেন তা এখনও ঠিক করে উঠতে পারেন নি তারা।

শ্রীমতী গান্ধী পক্ষে কিছুটা উৎসাহজনক ব্যাপার হল কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা ও তামিল-নাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম জি রামচন্দ্রনের বিবাহীন সমর্থন।

অপরপক্ষে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী এবং তার পরামর্শদাতারা ঠিক করে উঠতে পারছেন না ইন্দিরার পদত্যাগ গ্রহণ করবেন কি না। তবে সিদ্ধান্ত একটা নিতেই হবে। তাই আলোচনা চালাচ্ছেন ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী সবার সঙ্গে। বাঁতে বিপরীত কিছু হলে দোষটা তার একার ঘড়ে না চাপে।

এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য জেলার বেপারোয়া তেলের চোরাকারবারের সংগে বিবিচার, বানোয়াটিলাল, এস কে ট্রেডিং, গোলাবাড়ি থানা এলাকার অবনী দত্ত রোডের রাধা শান্তিসের ভ্রাম্যবাস সহ এখনও পুলিশের ধরা-ছোয়ার বাইবে। দর্পণ অন্ত্যস্ত দায়িত্বের সংগে বলতে পারে-হাওড়ার বেশ কিছু পুলিশ অফিসার এই চোরাকারবারীদের কাছ থেকে নিয়মিত ভেট ও টাকা পেয়ে আসছেন। শুধু হাওড়াতোই নয় কলকাতাতেও এই কারবার এখন বেশ তেজী। ট্র্যাণ্ড রোডের নরসিং গুপ্তা চেতলার গোড়াউন মারফৎ দুঃসাহসিকভাবে এ কাজ চালিয়েছেন।

প্রকাশ্যেই নরসিংই বলে বেড়াচ্ছেন যে রুগু গুহনিয়োগীর ঘনিষ্ঠ কতিপয় পুলিশ অফিসার তার হাতে। অতএব কলকাতা এলাকার কারো ক্ষমতা নেই তার ভেজাল তেলের কারবার বন্ধ করে। রাজপথ গুপ্তা, শিউনাথ গুপ্তা প্রমুখের ব্যবসাও জোরদার চলেছে। অভিযোগ, নরসিং এখন সরবর তেল নিয়েও নানা কারবার শুরু করেছে।

এদিকে বিভিন্ন মহলে দাবী উঠেছে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের যৌথ উদ্যোগে ব্যাপক অভিযান চালান সম্ভব হলে এ কারবার বন্ধ করা সম্ভব। রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর ও কলকাতা গোয়েন্দা দপ্তরের কতিপয় ব্যক্তি ভেজাল তেলের কারবারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এদের কথা মনে রেখে পুলিশী অভিযান শুরু হলে একাজ বন্ধ করা যায়।

বিশ্বরূপা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চাইছেন কিছু কর্মীকে ছাঁটাই করতে। ব্যাপারটি নিয়ে বিশ্বরূপার কর্মী মহলেও বিক্ষোভ শুরু হয়েছে।

বিশ্বরূপার সাম্প্রতিক হালচালের খবর পেয়ে সি, পি, আই (এম) প্রত্যাখিত বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন নেতৃত্ব বোধ সম্ভব নয়।

উদ্বিগ্ন। এদের জটিল মুখপাত্র জানান কলকাতার পেশাদার সমস্ত শিল্পী কর্মীদের প্রতি এক শ্রেণীর মালিক ধৈর্যের ব্যবহার করছেন তা বর্ণনাতীত। শিল্পী কর্মীদের চাকুরী, বেতন কোনও কিছুই নিরাপত্তা নেই। এর প্রতিবাদ করতে যাওয়া মানেই ছাঁটাইয়ের বলি হওয়া। এ জিনিষ বরদাস্ত করা সম্ভব নয়।



ইন্টার কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য স্বেচ্ছা আহ্বান করছে

কোয়ার্টার নির্মাণ

টেণ্ডার নং জি এম / কে এ জে / ই ই (সি) / টি (৩বি) / ৭৭ / ১১২৮৬ তার ১৪, ১২, ৭৭
অভিজ্ঞ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ঠিকাদারদের কাছ থেকে আইটেম দর/শতকরা ভিত্তিতে নিম্নোক্ত কাজের জন্য সীল করা টেণ্ডার—(ক) কাজের বিবরণ (খ) অঙ্কিত খরচ (গ) বায়নার টাকা এবং (ঘ) সম্পূর্ণ করার সময় নিয়ন্ত্রণ :—(১) (ক) মাধবপুর কোলিয়ারীতে ২৪ নং এন এইচ এস কোয়ার্টার (খ) ২,৯৫,০৮০ টাকা (গ) ২,৯৫১ টাকা ও (ঘ) ১ মাস; (২) (ক) নব কাকোয়া কোলিয়ারীতে ২৪ নং এন এইচ এস (খ) ২,৯৫,০৮০ (গ) ২,৯৫১ টাকা ও (ঘ) ১ মাস; (৩) (ক) খাস কাকোয়া কোলিয়ারীতে ৮নং 'বি' টাইপ কোয়ার্টার (খ) ১,৮৩,৮০৪ টাকা (গ) ১,৮৩৮ টাকা ও (ঘ) ১ মাস; (৪) (ক) এরিয়া অফিসের জন্ত ৪নং 'এ' টাইপ ও ৮ নং 'বি' টাইপ কোয়ার্টার (খ) ২,৫৩,৬৩০ টাকা (গ) ২,৫৩৬ টাকা ও (ঘ) ১ মাস; (৫) (ক) জাহাঙ্গির কোলিয়ারীতে ৪ নং 'এ' টাইপ ও ৮ নং 'বি' টাইপ কোয়ার্টার (খ) ২,৫৩,৬৩০ টাকা (গ) ২,৫৩৬ টাকা ও (ঘ) ১ মাস; (৬) (ক) জাহাঙ্গির কোলিয়ারীতে ৪ নং 'এ' টাইপ ও ৪ নং 'বি' টাইপ (খ) ১,৬১,৪২৮ টাকা (গ) ১,৬১৪ টাকা ও (ঘ) ১ মাস; (৭) (ক) জাহাঙ্গির কোলিয়ারীতে ২৪নং এন এইচ এস কোয়ার্টার (খ) ২,৯৫,০৮০ টাকা (গ) ২,৯৫১ টাকা (ঘ) ১ মাস; (৮) (ক) জাহাঙ্গির কোলিয়ারীতে ৪০ নং এন এইচ এস কোয়ার্টার (খ) ৪,২১,০০০ টাকা (গ) ৪,২১৮ টাকা ও (ঘ) ১২ মাস; (৯) (ক) লাচিপুর্ কোলিয়ারীতে ৩২ নং এন এইচ এস কোয়ার্টার (রিম পাইল, পাইল ফাউণ্ড) (খ) ৪,২৪,৮০২ টাকা (গ) ৪,২৪৮ টাকা ও (ঘ) ১২ মাস (১০) (ক) এরিয়া অফিসের জন্ত ৪নং 'সি' টাইপ ও ৪ নং 'ডি' টাইপ কোয়ার্টার (খ) ৩,৯০,৬৫১ টাকা (গ) ৩,৯০৭ টাকা ও (ঘ) ১২ মাস।

জেনারেল ম্যানেজার, কাকোয়া এরিয়া, পোঃ কাকোয়াগ্রাম, জেলা বর্ধমান-এর অফিস থেকে প্রতি সেটের জন্য ২৬*২৫ টাকা নগদে (বিক্রয় কর সমেত) দিয়ে (অগ্রত্যাগযোগ্য) ২. ১. ৭৮ তারিখ থেকে ১৭. ১. ৭৮ তারিখে শনিবার ছাড়া যে কোন কাজের দিনে বেলা ৪টা এবং শনিবার বেলা ১১* ৩০ পর্যন্ত টেণ্ডার দলিল পাওয়া যাবে। এই অফিসের এরিয়া ফিন্যান্স ম্যানেজার কর্তৃক নগদ টাকা গৃহীত হবে। যারা ডাকে টেণ্ডার দলিল পেতে চান তাদের মনি অর্ডারে প্রতি সেটের জন্য ৫ টাকা পাঠাতে হবে। টেণ্ডার দলিল ডাকে পৌছতে দেয়ী হলে তার জন্ত এই বিভাগ দায়ী থাকবে না। প্রতিটি কাজের জন্য সীল করা খামে টেণ্ডার দলিল ন কাজের নাম, বায়নার টাকা জমার বিবরণ, তারিখ ও টেণ্ডার খোলার সময় লেখা আলাদা টেণ্ডার ১৮. ১. ৭৮ তারিখ বেলা ১টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে এবং ঐ দিন ৩টায় টেণ্ডারদাতা অথবা তাঁর / তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খোলা হবে। টেণ্ডার দলিল কেবলমাত্র সেই সব টেণ্ডারদাতাদের দেওয়া হবে যারা এরিয়া সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের কাছে তাদের অতীত অভিজ্ঞতা ও সঙ্গতির সন্তোষজনক প্রমাণপত্র দেখাতে পারবেন। বায়নার টাকা ছাড়া টেণ্ডার বাতিল করা হবে। এক বা একাধিক টেণ্ডারদাতার মধ্যে কাজ ভাগ করে দেবার অধিকার এই বিভাগ সংরক্ষিত রাখছে।



ইন্টার কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

দ্বিতীয় সংশোধনী

বাল্যশাড়ি নির্মাণ

রেকা: জি এম/কেও/ই ই (সি)/১৬৫৩ তার ১৪.১২.৭৭
টেণ্ডার নোটিশ নম্বর জি এম/কেও/ই ই (সি)/টেণ্ডার/১৬৫৩ তার ২৬.১১.৭৭
সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে বিভিন্ন কাজের টেণ্ডার খোলার সময় ও তারিখ মূল টেণ্ডার নোটিশে উল্লিখিত তারিখের পরিবর্তে নিম্নলিখিতভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে :—

সিরিয়াল নং ১ ও ২—৪.১.৭৮ তারিখ ৩টার। সিরিয়াল নং ৩ ও ৪—৫.১.৭৮ তারিখ ৩টায়। সিরিয়াল নং ৬ ও ৮—৬.১.৭৮ তারিখ ৩টায় এবং সিরিয়াল ৯ ও ১০—১১.১.৭৮ তারিখ ৩টায়। অন্ত্যন্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

সম্পাদক—বীরেন বসু

৩৩ কলকাতা প্রেস, ১২৩১ আচার প্রকল্পের ফো. ককাতা-৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ হট লেন কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

বাম ফ্রন্ট সরকার বর্গাদারদের অধিকার রক্ষায় অগ্রণী : জোতদারের পক্ষ নিয়ে প্রফুল্লবাবুর মিথ্যা প্রচার

দঙ্গল

বিশ্ব বর্ষ ১১ ৪৭শ সংখ্যা ১১ শুক্রবার ৩০শে ডিসেম্বর, ৭৭ ১১ ৪০ পৃষ্ঠা

প্রয়াত রাষ্ট্রপতির ডায়েরী গায়েব

(দর্পণের সংবাদদাতা)

পরলোকগত রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দীন আলী আমেদের ব্যক্তিগত ডায়েরী গায়েব হয়ে গেছে। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন রাতে রাষ্ট্রপতি ভবনে কি ঘটেছিল এবং কি পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণার আদেশে স্বাক্ষর করেছিলেন এই ডায়েরী না পেলে সেকথা কোনদিন জানা যাবে না।

তথ্যভিত্তিক মহলের মতে এই ডায়েরী পরলোকগত রাষ্ট্রপতির পুত্র বদর ডুরেকের প্রথম নজরে আসে। কিন্তু তাঁকে এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, “আমি এ সম্পর্কে কিছু জানি না।

তিনি একথাও বলেন যে, কোন সরকারী দপ্তর বা শাহ কমিশনের অফিসার এ সম্পর্কে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। যদিও রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত সহকারী আব্দুল

আলম শাহ কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এই ডায়েরীর কথা বলেছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি সোজা-সুজি উত্তর না দিয়ে বলেন ডায়েরী শ্রীআমের পরিবারের কাছে থাকতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির পরিবারের লোকেরা একেবারে যুক্ত হয়ে আছেন। তাঁর পরিবারের অনেক ব্যক্তি বলেন, “শ্রীআমেদ তাঁর ডায়েরীতে কয়েকটি বিশেষ “চাকল্যকর ঘটনা”র কথা লিখে গেছেন। ডায়েরীর বিষয়বস্তু যদি জানা যায় তাহলে তাতে বর্তমান অনেক রাজনীতিকের রাজনৈতিক জীবন খতম হয়ে যেতে পারে।”

জানা গেছে পরলোকগত রাষ্ট্রপতি তাঁর ডায়েরীতে সমকালীন অনেক ঘটনা সম্পর্কে নিজের মতামত লিখে রাখতেন। এখন প্রশ্ন হল, এই ডায়েরীটি কি করে এবং কার দ্বারা গায়েব হল।

(দর্পণের প্রতিনিধি)

বর্ধমান ও চব্বিশ পরগণার এবং হুগলী ও বীরভূমের বেশ কয়েকটি জায়গা ঘুরে এনে একথা আমি পরিষ্কার ভাষায় বলতে পারি এই রাজ্যের প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন বামফ্রন্ট সরকার ও সি পি (আই) এমের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনছেন তা জোতদারদের স্বার্থক্ষার চেষ্টার ফুঁসা প্রচারমাত্র। একথাও পরিষ্কার যে, এই রাজ্যে বামশাসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে জোতদারদের স্বার্থের দিন শেষ হতে চলেছে। বিগত ৩০ বছর ধরে স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় জোতদারদের স্বার্থক্ষা করে গেছেন এবং সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতার বর্গাদারেরা জোতদারদের হাতে চূড়ান্ত নাজেহাল হয়েছে, এমনকি তারা যে ভাগচাষী সে স্বীকৃতিও তাদের দেওয়া হয় নি। আজ রাজনৈতিক পরিবর্তনে বারা অমি চাষ করেছে সেই ভাগচাষীরাই গ্রামে গ্রামে ধান কাটছে আর জোতদাররা তাদের কাছ থেকে নিজেদের প্রাপ্য সংগ্রহ করছে লিখিত রসিদ দিয়ে বার কয়ে ভাগচাষীরাই আইনসম্মত স্বীকৃতি পাচ্ছে। তাই আজ প্রফুল্লবাবুদের “সেল-সেল” রব।

বর্গাদারের অধিকার রক্ষায় কংগ্রেস সরকার কোনদিনই এগিয়ে আসেনি। তারা দেখেছে বর্ধিষ্ণু চাষী আর জোতদারের স্বার্থ। এটা বিজ্ঞান কোন ঘটনা নয়—এটা কংগ্রেসের শ্রেণী-রাজনীতিরই প্রতিফলন মাত্র, পক্ষান্তরে বামফ্রন্ট সরকার চেয়েছে বর্গাদারদের স্বার্থক্ষা করতে, হুমিহীনদের হাতে জমি

দিতে, ক্ষেতমজুরদের মজুরী বৃদ্ধি ও কর্মক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ঘটাতে—গরীব চাষীকে বাঁচাতে এবং এক কথায় গ্রামবাংলার বুকে সমাজিক শান্তন তুলতে। মেছোমেছীর মালিকরা মোনামুজল চুকিয়ে বহু চাষের জমি নষ্ট করেছে এতাবৎকাল। এখন চাষীদের মধ্যে তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

এখানেই প্রফুল্ল সেনের ঝাঁতে যা লেগেছে। যে কোন শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন লোকই স্বীকার করবেন (তিনি যে কোন দলেরই হোন না কেন) যে, ধানকাটা নিয়ে সংঘর্ষের সাজা এবার

নাকশীরাবে করে গেছে। বাজারী কাগজগুলো পর্বস্ত ধানকাটার সংঘর্ষ নিয়ে আঘাতে কাহিনী রচনায় অগ্রসর হতে ভরসা পাচ্ছে না কারণ প্রফুল্লবাবুকে তো প্রায় কিংবদন্তীর নায়ক বানিয়েও তারা আসার জমাতে পারলো না। এবার তাই আসরে নেমেছেন প্রফুল্লবাবু নিজে। তিনি প্রায় প্রতিদিনই একটি করে বিবৃতি দিচ্ছেন আর সংঘর্ষের অভিযোগ তুলছেন। বাজারী কাগজেও ফাঁকে ফাঁকে এ ধরনের প্ররোচনামূলক খবর বের হচ্ছে বার কোন ভিত্তিই নেই। যেমন বাগবাজারী কাগজে আসান-সোলের সংবাদদাতা প্রেরিত খবরে বলা হয়েছে যে, বারাবানী ও হীরা- (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

জোতদাররা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাঁধাতে চেষ্টা করছে

(দর্পণের সংবাদদাতা)

ধান ভোলার মরুভূমে জোতদার-জমিদার চক্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধাবার জন্ত সচেষ্ট হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এই জোতদার চক্রকে দণ্ডবদ্ধ করছে কংগ্রেস ও কংগ্রেস অঙ্গগামী জনতার কিছু নেতা। বীরভূমের হুবরাডপুর, ইলামবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে হঠাৎ চাষী সংঘ নামে একটি সংগঠন গজিয়ে উঠেছে। অভিযোগে প্রকাশ, প্রাক্তন কংগ্রেস এম পি শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় চাষীসংঘের একজন বড় পাণ্ডা।

প্রকাশ, জোতদার চক্র চাষীর ভাষা অধিকার রক্ষার নামে গ্রামে গ্রামে জোর জবরদস্তি চালা তুলছে। এবং সারাদিন-রাত জমি পাহারার নামে নাঠি, বন্ডর, বোম্বার মজ্জিত

কুখ্যাত কংগ্রেসী যান্ত্রিকরা গ্রামে গ্রামে ভীতিপ্রদর্শন করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমলে গরীব চাষীকে জমি দেওয়ার নাম করে কংগ্রেসীরা ছোট চাষীদের জমি অত্যাচারে বন্টন করে গেছে; এমন কি অনেক চাষী জানেন না যে, তাঁদের জমি বেহাত হয়ে গেছে। বর্তমানে চাষীর যখন ঐ সব জমি চাষ করেছেন তখন জোতদাররা গিয়ে জোর করে ঐ সব জমির শস্ত নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এই সব ক্ষেত্রে পুলিশ গ্রামের জোতদারদের হয়ে কাজ করছে। জোতদারদের বড়বড়ের বিরুদ্ধে কোন কোন ক্ষেত্রে সি পি এম ও নকশালপন্থীরা যৌথভাবে প্রতিরোধ করছে।

জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রফুল্ল সেন পুলিশকে উসকে দিচ্ছেন

(দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

রাজনীতিতে হতাশা মাহুসকে কোন স্তরে নিয়ে যেতে পারে তার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ তথাকথিত গান্ধীবাদী নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন। অল্প কয়দিনে বিবেকে দ্বিধিকম্পিত এই বৃদ্ধ এখন পশ্চিমবঙ্গের অরাজকতা সৃষ্টির ইচ্ছা বোঝাবার ‘মহান স্বতঃ-গ্রহণ’ করেছেন। গত সপ্তাহে একটি প্রকাশে জনসভায় দাঁড়িয়ে তিনি পুলিশবাহিনীকে বিদ্রোহের প্ররোচনা দেন এবং তাদের আঘাত করে বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার

তাদের চাহুরীর নিরাপত্তা বিধান করবে। গণতান্ত্রিক দেশে বাক স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে। তবে দেশবাসী তাকে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে পারেন যে, বিগত বৎসরভ্রমিতে ভারতের মহান জনগণ এইরূপ প্ররোচনামূলক, বিভেদ সৃষ্টিকারী বিবৃতি দানের অধিকারের জন্ত কি ইন্দিরার তানাশাহীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হয়েছিল? দেশবাসী প্রশ্ন করতে পারেন, প্রফুল্ল সেন যিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য নন তিনি

কোন অধিকার বলে পুলিশের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সহযোগিতার আশ্রয়বানী শোনানেন?

প্রফুল্লবাবু কয়দিনে বিরোধিতার একেবারেই কাণ্ডজানহীন, তাই মিজ নির্বাচনেও তিনি অদূরদর্শী। জনগণ পরিত্যক্ত এস, কে, পাতিল জুটেছেন তাঁর এক স্বহৃদ, আরেক স্বহৃদ হার্ডহাউটে ট্রেনিংপ্রাপ্ত স্বরক্ষণ্য স্বামী। এদের কিছুই হারাবার নেই। জনগণের কাছে। জনগণ গণতন্ত্র হারাত্তে পারেনা। কেননা, জনগণই সংগ্রাম

করে গণতন্ত্র অর্জন করেছে। তাদের কষ্টার্জিত গণতন্ত্রকে জনগণ যে কোন মূল্যে রক্ষা করবে প্রফুল্লবাবুর সর্বপ্রকার প্ররোচনা ও অপপ্রয়াস দূরেষ্ট।

কেন প্রফুল্লবাবুরা চীৎকার করছেন? আজকের পশ্চিমবঙ্গ সন্ত্রাসমুক্ত। লুটের রাজত্বের অবসান ঘটেছে। সারা ভারতবর্ষের অন্তর্বে কোন প্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা অনেক বেশী শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে

আছে। ধান কাটার মরুভূমে সংঘর্ষের সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধির তুলনায় এবার অনেক কম। এ সব কিছুই কি প্রফুল্লবাবুদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে? না, তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন সস্ত্র কারণে। পশ্চিমবঙ্গের শর্তা সরকার কমিশন বসছেন। ক্ষমতা অপব্যবহারের অসংখ্য অভিযোগ এসেছে। কংগ্রেসের বহু ছোট বড় নেতার কোলেঙ্কারী উদ্ঘাটিত হতে চলেছে। তাদের (শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

হাওড়া পৌরসভায় দুর্নীতির জঞ্জাল

প্রতিবাদ

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৭ তারিখে আপনার সাপ্তাহিক পত্রিকায় (বিংশ বর্ষ, ৪৫শ সংখ্যা) "হাওড়া পৌর সভায় দুর্নীতির জঞ্জাল, অফিসার ও ইউনিয়ন নেতাদের অন্তর্ভুক্ত আতাত" নিবন্ধের ২য় অঙ্কে লিখিত আছে "অনেক রঙের জামা পাণ্টে অর্ধেকবাবু নাকি এখন জমতার সমর্থক," কিন্তু বাস্তব সত্য হল এই যে, ১৯৪৮ সালে অর্ধেকবাবু কংগ্রেস ছেড়েছেন। যখন কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি কংগ্রেস ছাড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারপর থেকে তিনি ডঃ রামমোনো-হর লোহিয়ার নেতৃত্বাধীনে সোশালিস্টদের শিবিরেই ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ওই দল জনতা পার্টিতে মিলিত হওয়ার সময় থেকে অর্ধেকবাবু আজ পর্যন্ত জনতা পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য।

নির্মল সরকার ১৯৩৮ সাল থেকেই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। এবং ইউনিয়নের দায়িত্বে আসার পর থেকে মিউনিসিপ্যাল কর্মচারীদের স্বার্থ বিরুদ্ধে কোন কাজ আমাদের দ্বারা কখনও অসম্পন্ন হয় নি। এমনকি জরুরী অবস্থা চলা-কালীন কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়েও আমরা সততার সঙ্গে ইউনিয়নের কাজকর্ম চালিয়েছি। কোন ছবি ও প্রলোভনের কাছে আমরা কখনও মাথা নত করিনি। অফিসার গ্রেডে প্রমোশন দেবার জন্য আমাদের কাছে বারবার প্রস্তাব করা হয়েছে, কিন্তু আমরা সে প্রস্তাব প্রতিবারই প্রত্যাখ্যান করেছি। ইমারজেন্সীর সময় মিসার গ্রেগোর হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও লক্ষ লক্ষ টাকার মিউনিসিপ্যাল কাণ্ড অপ-চয়ের যে অভিযোগ আমরা করেছি সে সময় তার কোন প্রতিকার হয় নি। আমরা আশা করি বর্তমান সরকারের আমলে তার প্রতিকার হবে। সেইসব অভিযোগপত্রের অনুলিপি সম্বলিত লিখিত অভিযোগ শ্রী সরকার কমিশনের কাছে আমরা দাখলের করছি।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

সংস্পর্ক পত্রিকা আয়োজিত "রবীন্দ্র বর্ষ ও বাংলার কৃষক" এক-হাজার শব্দের মধ্যে প্রবন্ধ পাঠ্যবার শেষ তারিখ ২৫শে জানুয়ারী। যোগাযোগ : রমা ঘোষ, ১২৩ নং দেশবন্ধু রোড (পশ্চিম) কলি-৩৫।

শ্রী ইউনিউন আইন মোতা-বেক ইউনিউনের প্রতিটি সভ্যের বার্ষিক ৩ (তিন) টাকা চাঁদা দেওয়া বাধ্যতামূলক। প্রতিটি ইউনিয়নের তার আমলের ইউনিয়নগুলিও যাদের মাঝে কিছু অতিরিক্ত চাঁদা সাধারণ সভ্যদের কাছ থেকে আদায় করে থাকে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই "রসিদ" ব্যতিরেকে চাঁদা আদায় করা হয় না।

নির্মল সরকার সম্বন্ধে উক্ত নিবন্ধে যা বলা হয়েছে তা সর্বোত্তম বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে নির্মল সরকার দ্বারা সিগারেট ত দূরের কথা, ধূমপানই করেন না। আর কৌটানো ধূতি পরায় চিরদিনই তার কচিতে বাধে। তার স্ত্রী উপযুক্ত বোধ্যাতালম্পন্ন হয়েই হাওড়া পৌর স্থলের প্রধান শিক্ষিকা এবং তিনি শিক্ষার পথ পেয়েছিলেন ১৯৫৪ সালে, যখন নির্মলবাবুর ইউনিয়ন গঠিত হয়নি। তাঁর পালিতা কন্যা একজন আছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি কোথাও শিক্ষার পথে নেই। স্রীমতীর মুখার্জী যখন পৌর দপ্তরে বহাল হয়েছেন তখন নির্মলবাবুর কন্ডার বিবাহ হয়নি। বীমা কোম্পানীর এজেন্ট হওয়াটা যদিও কোন দুর্নীতিমূলক ব্যাপার নয়, তথাপি আপনার সংবাদমাতা খোঁজ নিলে জানতে পারতেন নির্মল সরকার কোন বীমা কোম্পানীর কখনও এজেন্ট ছিলেন না বা এখনও নেই। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করতে চাই, ব্রিটিশ আমলের কারাবরণকারী স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে তিনি পেনসন পাবার বোধ্যা হলেও তার পার্টির (মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি) ঘোষিত নীতি অনুযায়ী পেনসন-এর জন্য আবেদন করেন নি, অতএব তার এখন "বামপন্থী সাধারণ" গ্রন্থ নেই। তাছাড়া চাকুরীর "এক্স-টেনশন বাড়ানোর তালে" থাকার যে ইচ্ছা করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আপনার সংবাদমাতার জানা উচিত যে পূর্বতন সরকারের ২০শে আগস্ট, ১৯৭৩ সালে প্রচারিত ৬৬৬৭-এ সাকুলার অঙ্গসারে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চাকুরীর মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বর্ধিত হওয়ার বোধ্যা। সেই সাকুলার অঙ্গসারেই নির্মলবাবু চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ পেতে অধিকারী, কোন ভবিষ্যের ফলে নয়।

নির্মল সরকার
অর্ধেকবাবু

দুর্গার উত্তর

হাওড়া পৌরসভা সম্পর্কে কিছু সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়ায় নির্মল-বাবুরা ক্ষুব্ধ। এটা স্বাভাবিক। কেননা হাওড়া পৌরসভার যাবতীয় দুর্নীতির সংগে কমবেশী অফিসার ও পৌর ইউনিয়ন সাতকররা সরাসরি জড়িত। এ কথা হাওড়ার কারো অজানা নয়। 'গন্ধা' শহর হাওড়ার নরক যন্ত্রণা ভোগকারী সাধারণ নাগরিকরা জানেন হাওড়া পৌর-সভার হালচাল কি? কাদের কেরা-মতিতে পৌরসভা চলেছে। দুর্গা বিদ্রোহভাবে না হলেও কিছুটা আরে-ঠারে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চরম অবস্থার কথা তুলে ধরেছে। এরই প্রতিবাদে নির্মলবাবুদের তিন পাতার দীর্ঘ চিঠি।

প্রতিবাদে নির্মলবাবু, অর্ধেকবাবু দু'জনেই লম্বা এই চিঠিতে নিজের "সং" "নির্ভেজাল" একজন ইউনিয়ন নেতা হিসাবে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। যদিও নির্মলবাবুর বক্তব্যই তিন পাতার অধিকাংশ ছুড়ে রয়েছে। অর্ধেক প্রথমেই বলেছেন—তিনি নাকি রাজনৈতিক জার্সি একেবারেই বদল করেন নি। অর্ধেক প্রথমে তিনি করতেন কংগ্রেস, পরে হলেন সোশালিস্ট এখন জনতা। এ তারই কথা। এছাড়া হাওড়ার সাধারণ মানুষ জানেন—অর্ধেকবাবু নিজের স্বীকারোক্তি মত কংগ্রেস, সোশালিস্ট ও জনতাই নয়, এর মাঝে মধ্যে তিনি পি,এস, পি-ও করেছেন। মাঝে কিছুদিন বাংলা কংগ্রেস সন্যাসি না করলেও অঙ্গ-বাবুর নামে গদগদ হয়ে উঠতেন। তিন দশকে যে ভল্লোলক এতবার রাজনৈতিক রঙ পান্টান তাকে কি বলা যায়? ধান্দারাজ? সুযোগ সন্ধানী? দুর্গা তা বলেছে না। পার্থক্যবর্গই তা ঠিক করুন।

এবার আসা যাক নির্মলবাবুর প্রসঙ্গে। তাঁর দাবী তিনি একজন কমিউনিষ্ট। কর্মীদের বিরুদ্ধে তিনি কোনদিন কিছু করেন নি। তার কাছে মাত্র কয়েকটি গ্রন্থ—৫১ সনে হাওড়া পৌরসভায় যে আন্দোলন শুরু হয় তার পরিণতি কি হয়েছিল? কর্তৃপক্ষের কাছে কর্মীদের আপনারা মুচলেকা দিতে নির্দেশ দেন নি, আপনারাও কি মুচলেকা দিয়ে ছুড়-ছুড় করে কাজে যোগ দেন নি? শুধু তাই নয়, কর্তৃপক্ষ বরখাস্তের নোটিশ পাবার পর আপনারা কি অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা ফেঁদে বসেন নি? ব্যবসার নাম দিলেন "ইন্ডিয়া

শ্রী এম.সি.এ" পরে এটিই গবেষণা উঠে হল "শ্রী এম.সি.এ"। আরও পরে শুরু হলো জমির ব্যবসা। অতিক্রম লোক চুকিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন। হাওড়া পৌরসভার কতিপয় সাতকর যার মধ্যে নির্মল-বাবুরাও রয়েছেন এ সব ব্যবসা চালানেন দীর্ঘদিন। সে এক বিরাট ইতিহাস। সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। শুধু একটাই জিজ্ঞাস্য এই সব ব্যবসার আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে কোনও নথিক তথ্য কি সবাইকে জানান হয়েছে? যাদের কাছ থেকে ধার হিসাবে টাকা নেওয়া হয় তাদের কি পাওনা সব মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে? দুটোরই নথিক উত্তর—না।

অর্ধেক ব্যাপার হলেও সত্যি '৭৪ সনের এপ্রিল মাসের পর নির্মলবাবুর ইউনিয়নের কোনও সাধারণ সভা হয় নি। মাসের পর মাস সভ্যদের কাছ থেকে টাকা আদায় হচ্ছে, নির্মলবাবু ভাউচার দিয়ে নানা কাজের জন্য টাকাও তুলছেন, কিন্তু সাধারণ সভা না হওয়ার জন্য ইউনিয়নের আদায়ীকৃত আয়ের খরচাদি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠলেও কেউ তার নথিক জবাব পাননা। নির্মলবাবু বলবেন কেন হিসাবপত্রের অডিট তো হচ্ছে। তা হোক, তাই বলে ইউনিয়নের সাধারণ সভা বন্ধ থাকবে কেন। আর অডিটই তো শেষ কথা নয়। কর্মীদের বক্তব্য শেখ করতে না দিয়ে সাধারণ সভা বন্ধ রাখা কি ধরনের শ্রমিক দরদেব নমুনা তা বোঝা চলেছে।

আশ্চর্যের কথা দুর্গার প্রতিবাদ করার জন্যই যেন নির্মলবাবু প্রতিবাদ করেছেন। নইলে নির্মলবাবু এমন নির্মল বিশ্বাস কথা বলতে পারেন যে, তিনি "ধূমপানই করেন না"? আমি বলছি তিনি চুকট খান, মিকমচার খান, ইন্ডিয়া কিং দেহটা দিয়ে থাকা মানুষগুলির মুখ সিগারেট খান। হয়তো এখন এই

ধাওয়ার পরিমাণ কিছু কম। কিন্তু তিনি ধূমপান করেন না বলে বা বলেছেন তা সর্বোত্তম বিশ্বাস। বাকি সে কথা, ইউনিয়ন করবেন কিন্তু বিশ্বাস কথা বলবেন না এমন তো নয় তবে তিনি "স্বাধীনতা সংগ্রামী" হয়েও সি, পি, এমের নির্দেশে পেনসন নেন নি, অর্ধেক কংগ্রেস সরকারের সাকুলার অঙ্গসারী পাঁচ বছর এক্সটেনশন পাবার বোধ্যা বলে তিনি বা বলেছেন তা নিতান্তই হাস্যকর। "স্বাধীনতা সংগ্রামী" নির্মলবাবু সি, পি, এমের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী পেনসন নিচ্ছেন না। অর্ধেক ঐ একই স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে বাম সরকারের এক্সটেনশন দেওয়ার ব্যাপারে কিছু "রিজার্ভেশন" থাকা সত্ত্বেও নির্মলবাবু কংগ্রেস সরকারের ঘোষিত নীতিকে কাজে লাগাচ্ছেন। বাঃ চমৎকার রাজনীতি। হয়তো এই রাজনীতিকে কাজে লাগিয়েই আপনি বছরে দু/একবার দার্জিলিং কান্ট্রীর ভ্রমণে বেরোন, নিজের বাড়ীটি ছিমছাম করে গড়ে তুলতে পারেন, পৌর দপ্তরে স্ত্রী/কন্ডার দেবর, শালীর মেয়ের চাকুরী করে দিতে পারেন, পৌরসভার ঠিকদার ভবানী হুগুকে মোটা অংশের কাজ ধরিয়ে দেবার জন্য যেতে উঠতে পারেন।

আরও অনেক তথ্য রয়েছে। ক্রমশ তা প্রকাশ্য। তার আগে ছোট্ট একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। বাজে শিবপুরের তাজা ছেলে সি, পি, এম কর্মী সমীরণ চ্যাটার্জী আজ থেকে ছয়/সাত বছর আগে এক পরমাণু কংগ্রেসী গুণ্ডা ও নক-শালদের হাতে খুন হন। সকাল বেলা বাজে শিবপুরের অসংখ্য মানুষ সমীরণের শোকে সেদিন কান্নায় ভেঙে পড়েন। সমীরণের রক্তাক্ত দেহটা ঘিরে থাকা মানুষগুলির মুখ (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিস্ট লিমিটেড
(কমল ইন্ডিয়া একমাত্র সংস্থা হিসেবে)

সংশোধনী

বাসাবাড়ি নির্মাণ

রেফা: নং জি এম/কে এ জে/ই ই (সি) টি-৩ (বি) ৭৭/১১৪০০ তার ২১. ১২. ৭৭

টেওয়ার নোটিশ নং জি এম/কে এ জে/ই ই (সি) টি-৩ (বি) ৭৭/১১-২৮ ও তার ১৪. ১২. ৭৭-এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পরিবর্তন করা হয়েছে :—
(১) কেবলমাত্র আইটেম দ্বয়ের ভিত্তিতে টেওয়ারের প্রস্তাব দিতে হবে; (২) দশটি কাজের অঙ্কিত খরচ পর্যায়ক্রমে নিম্নরূপ—৩, ২৬, ৭১৫ টাকা ৩, ২৬, ৭১৫ টাকা, ১, ২৪, ২৭৬ টাকা, ২, ৬৭, ১৬৮ টাকা, ২, ৬৭, ১৬৮ টাকা, ১, ৭০, ৮৩০ টাকা, ৩, ২৬, ৭১৫ টাকা, ৫, ৪৪, ৫২৫ টাকা, ৪, ৬২, ১৬০ টাকা এবং ৩,১২,২০২ টাকা; (৩) বায়নার টাকা ঐ অঙ্কমিত খরচের ১ (এক) শতাংশ। অত্যন্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত।

স্তালিন প্রসঙ্গে সি পি এস ইউ-র বিরুদ্ধে প্রমোদবাবুর অভিযোগ

(দর্পণের প্রতিনিধি)

“কমরেড লেনিনের মৃত্যুর পর ত্রিশ বছর ধরে কমরেড স্তালিনই ছিলেন আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নেতা। কমরেড স্তালিন লেনিনের সুযোগ্য শিষ্য।” ২১শে ডিসেম্বর কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে অল্পাধিক সভার মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির পলিটবুরো সভাপতি শ্রীপ্রমোদ দাসগুপ্ত উপরোক্ত মন্তব্য করেন। স্তালিনের ১৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির রাষ্ট্র কমিটি এই সভার আয়োজন করেছিলেন। বর্ষায়ান কৃষক নেতা জনাব আবহুদা রহমান সভাপতিত্ব করেন।

বহুতা প্রসঙ্গে শ্রীদাসগুপ্ত জানান যে, স্তালিনের জন্মবার্ষিকী আরও বড় করে পালনের ইচ্ছে তাঁদের ছিল। স্তালিনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে তিনি সোভিয়েত কমিউ-

নিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলেন যে, তারা স্তালিনের ইতিবাচক দিকগুলোও নস্যাৎ করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। স্তালিনকে নস্যাৎ করার পর বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলোর মধ্যে একটি ক্ষতিকারক ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, তা হল নিজেদের সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থানুযায়ী কাজ করা, বিশ্ব বিপ্লবের হাতিয় অস্বীকার করা। মৌলিক প্রসঙ্গে স্তালিনকে নস্যাৎ করার পর প্রমিক প্রোগ্রাম রাষ্ট্রের পরিবর্তে সম-গণের রাষ্ট্রের তত্ত্ব আনয়ন করা হয়েছে ও বিকৃতি হচ্ছে হচ্ছে এখন ই উ রো-ক মি উ নি জ মে এ মে কাড়িয়েছে।”

প্রসঙ্গত তিনি আরও বলেন যে, ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক বিচারে অবশ্য সমাজতান্ত্রিক ছুনিয়া এগিয়ে চলেছে,

সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হচ্ছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কমিউনিষ্ট আন্দোলনে অবনতি হয়েছে। কমিউনিষ্ট আন্দোলনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুই বিচ্যুতি দেখা দিচ্ছে। এই দুই বিচ্যুতি হল, সংকীর্ণ জাতীয় ও শোষণবাদ। লেনিনের অবর্তমানে এই দুই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে কমরেড স্তালিন লড়াই করে গেছেন, কোম কোন ক্ষেত্রে স্তালিনের যে ভুল হয় নি এমন নয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীদাসগুপ্ত ইন্ডোনেশিয়ার জর্নাল কমিউনিষ্ট মেচার উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন যে, হাতিয় দাঁতে চিড় খেলো হাতিয় দাঁতই থাকে। স্তালিনের সামান্য কটি বিচ্যুতি ছাড়া তার সমগ্র জীবন হল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধের ক্ষেত্রে একটি উৎসাহী প্রাণ। প্রসঙ্গত তিনি জানান যে, কমরেড স্তালিন কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের অবদুষ্টিত্ব পরও বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ দিয়ে গেছেন।

সভায় শ্রীদিলীপ সেনগুপ্ত ও সম্প্রদায় জাভিন সম্পর্কে দুটি গণস্বীকৃত পরিবেশন করেন।

পুফুলবাবুরা একবার উত্তরপ্রদেশ ঘুরে আসুন

(দর্পণের প্রতিনিধি)

পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকার কমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে জনতা পার্টির বর্ষায়ান নেতা শ্রীপ্রমোদ সেন বামের প্ররোচনার আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে বলে চীৎকার শুরু করেছেন তারা একবার উত্তর প্রদেশের কয়েকটি জায়গা ঘুরে আসুন। প্রমোদবাবুকেও অসু-রোধ একবার উত্তর প্রদেশে যান।

উত্তরপ্রদেশ দারা দেশের মধ্যে বৃহৎ রাজ্য। বর্তমানে সেখানে জনতা পার্টি শাসন কমতায় অধিষ্ঠিত। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রামনরেশ বাদব প'চিশ হাজারের বেশী ভোটে জয়লাভ করেছেন। আমি গত সপ্তাহখানেক ধরে উত্তর প্রদেশের লক্ষৌ, কানপুর, এটাওয়া, কৈজীবাদ, বেরিলী, গোরখপুর, মোরদাবাদ প্রভৃতি জায়গা ঘুরে জানলাম যে সেখানে প্রতি দশ মিনিটে একটি বা একাধিক অপরাধ-মূলক কাজ হয়। তার মধ্যে খুনের সংখ্যা বেশী।

গত সপ্তাহে যে ঘটনা ঘটেছে তাকে হিন্দী শোলে ছবির সঙ্গেই তুলনা করা চলে। এখানে কালী কাচ্ছি নামে জর্নাল ডাকাত একটি ধোবী পরিবারের আট-জনকে একই সঙ্গে গুলি করে মারে। সাতজনকে যখন গুলি করে মারা হয় তখন অষ্টম জন পালিয়ে গিয়েছিল ভাকতরা তাকে রাস্তা থেকে ধরে এনে জলন্ত চুল্লির মধ্যে ফেলে দেয় এবং পরে গুলি করে হত্যা করে।

লক্ষৌ ও কানপুর শহরে ছুরি মারার ঘটনা যেন জল ভাত। গত তিন মাসে লক্ষৌ ও কানপুর শহরে প্রায় দুশো ব্যক্তি ছুরিকাহত হয়েছে। এদের মধ্যে দশজন ঘটনা-স্থলেই মারা যায়। বেশীর ভাগ ঘটনার মধ্যে মেয়ে নিয়ে ফটিনটি থেকে ছুরিকাঘাত। বলাৎকার করা এখানকার সমাজবিরোধীদের যেন একটা বড় নেশা। তথাকথিত নীচ জাতের বৌ, মেয়ে বা মা এই সমস্ত সমাজবিরোধীদের বলাৎকারের শিকার। কারণ সমাজবিরোধীরা জানে এদের ওপর কোন অত্যাচার করলে তাদের হয় মজী না হয় এম, এল-এ-রা বাঁচাবে। অতএব তারা যা ইচ্ছে তা করতে দ্বিধা করে না।

লক্ষৌতে উত্তর প্রদেশের জর্নাল সাংবাদিকের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম যে পুলিশ এখানে সব শোনে, কাজ করে না। আমি নিজে দেখলাম জর্নাল ব্যক্তির

পকেটমার হওয়াতে পুলিশ আসল পকেটমারকে ছেড়ে দিয়ে নিরীহ ছদ্মন লোককে পেটাতে লাগল। সময়ের জনতা যখন আসল পকেট-মারকে চিনিয়ে দিল তখনও পুলিশ তাকে ছেড়ে দিল।

লক্ষৌ ও কানপুর শহরে ঘুষ ছাড়া কোন কাজ হয় না। ইতিমধ্যে অয়েলের ইওন গ্যাস সিলিণ্ডার ত্র্যাকে এই শহরে ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এমন কি কোন সংবাদ ছাপাতে গেলেও এখানে সাংবাদিক-দের মোটা ধরনের ঘুষ দিতে হয়। রামনরেশ বাদবের সরকার আসার পর তামাম উত্তর প্রদেশে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ হলে তাকে কোন রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে না।

উত্তর প্রদেশের জর্নাল রাষ্ট্র-মন্ত্রীর বাড়ীতে আমি যখন বসে আছি এমন সময় একটি যুবক এসে মজী মহাশয়কে জানাল যে সে একটি চাকরীর নিয়োগপত্র পেয়েছে কিন্তু সে ব্রাহ্মণ বলে তাকে কাজে যোগ-দান করতে দেওয়া হচ্ছে না। মজী দাব শুনে বললেন তাঁর কোন কিছু করার নেই। ছেলেটির সঙ্গে পরে কথা বলে জানলাম ছেলেটি এম-এস-সিতে কাষ্ট ক্লাশ। দশদিন স্লিপ দেবার পর মজীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। সে ব্রাহ্মণ বলে মজী দেখা করতে রাজী হননি।

রামনরেশ বাদবের জয়লাভের খবর বের হতে না হতে ট্রাক আর বাস বোকাই করে লোক আনা হতে লাগল লক্ষৌ শহরে। আরো দেখ-লাম যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংয়ের জন্মদিনে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলা হয়েছে। কি জন্ত, না কিবাণ বাহিনী তৈরী করার জন্ত। চারদিকে শুধু পোষ্টার “চরণজী কি জন্ম দিবসে দিল্লী চলে।”

পূর্ণেন্দু পত্নী চিত্র ব্যবসায়ীদের চক্রান্তের শিকার

(দর্পণের প্রতিনিধি)

স্থায়িত্ব চিত্রপরিচালক পূর্ণেন্দু পত্নী প্রায় তিন বছর হয়ে গেছে কোন ছবি করতে পারেননি। তিনি এ যাবৎ মাত্র তিনখানি ছবি পরিচালনা করেছেন—‘স্বপ্ন নিয়ে’, ‘প্রীর পত্র’ এবং ‘হেঁড়া ভরসুক’। কিন্তু এর মধ্যেই তিনি পরিচালনা নৈপুণ্য দেখিয়ে বিশিষ্ট পরিচালকের স্বর্গদা লাভ করেছেন। অথচ তিনি এই দীর্ঘকাল ছবি পরিচালনার কোন সুযোগ পর্যন্ত পেলেন না। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে পূর্ণেন্দু পত্নী তাঁর জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শোনান। তাঁর ভবিষ্যতের কিছু কার্যক্রমের ঘোষণাও করলেন সম্প্রতি অল্পাধিক এক সাংবাদিক সম্মেলনে।

পূর্ণেন্দু পত্নীর কাছে ছবি তৈরীর অফার যে আসেনি তা নয়। তাঁকে দিয়ে ছবি তৈরীর জন্ত যে সব ফাই-ন্যান্সিয়ার ও প্রোডিউসারের দল এসেছিলেন, তাঁদের অজ্ঞান আবদার শিল্প-নীতিজ্ঞানশূন্য নির্দেশ ও নিষে-দের কামনা বাসনা মেটাবার চাহিদা যেনে নিতে পারেন নি পূর্ণেন্দুবাবু। সেই অপরাধে এতকাল তিনি ছবি করতে পারেননি। ঠিক এমনই অবস্থা ঘটেছে মুম্বইয়ের কিছু শিল্পমনা সৃষ্টি-ধর্মী পরিচালকের ক্ষেত্রেও। আর তারা অসাধু চিত্র ব্যবসায়ীদের আদেশ নির্দেশ শিরোধার্য করে যৌন উদ্বেজনাকর সত্তা ভাবাবেগ সর্ব

অকিঞ্চিংকর ছবি তৈরী করতে রাজী হন, তাঁরাই পরপর ছবি পরিচালনার সুযোগ পান—তা সে যতই তাঁরা অনধিকারী হোন আর যতই তাঁদের ছবি রূপ হয়ে অর্থের প্রাণ হোক। কিন্তু আর্ট ফিল্ম তৈরী নৈব নৈব চ। চিত্রজগতের বেনিয়ার হল যজ্ঞ বেড়ান, আর্ট ফিল্ম বাজারে চলে না—এ সব ছবি তৈরী করে পরস্রা নষ্ট করতে তাঁরা একেবারেই নারাজ। কিন্তু কথা হল—তাঁদেরই পছন্দমত তৈরী বিগ বাজেটের ছবিগুলি যে বক্স অফিস জয় করতে শোচনীয়ভাবে অপারগ হয় ছুরি ছুরি তাতে অর্থের আত্মহানি হয় না? আসল কথা হচ্ছে এই যে, আজ বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে ফিল্ম কুচিহীন, কামনালোলুপ ও হতলববাক বেশ কিছু অসৎ ব্যবসায়ী কালোচাকার কারবার করতে এসেছে,—তাঁদের কাছে লাভ লোকসানটা বড় কথা নয়। এইসব বেনোজল ঢুকে পড়ার বাংলা ছবির আজ এই জাহি জাহি অবস্থা!

পূর্ণেন্দুবাবু এইসব বিকৃতকটি চিত্রব্যবসায়ীদের হীন চক্রান্তের শিকার হয়েছেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু তিনি মোটেই হতাশম হন নি। একথা ঘোষিত হয়েছিল তিনি

‘অভাগীর ঘর’ চুলবেন, ‘কপাল-কুণ্ডলা’ ছবি করবেন। সে সব আজ স্বরীচিকা। পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকার তাঁকে প্রতারণিত করেছেন। আর কোন সরকার নয়, কোন চিত্র ব্যব-সায়ী নয়—তিনি আজ সরাসরি জন-সাধারণের কাছে ছবি তৈরীর জন্ত গহবোগিতার আবেদন জানিয়ে-ছেন। তারা চান পূর্ণেন্দুবাবুর ছবি তৈরী করা উচিত, তারা তাঁর পরি-চালন-শক্তির ওপর আস্থা রাখেন, তাঁরা অবশ্যই অরূপ অর্থদানে তাঁর ভিকার তুলি পূর্ণ করবেন। পূর্ণেন্দু-বাবু স্থির করেছেন, স্ববীজনাথের হালধর চিত্ররূপ বেবেন কালারে। আহমানিক ব্যয় হবে পাঁচলক্ষ টাকা। ইতিমধ্যেই তিনি শিল্পী কল্যাণশী-দের কাছ থেকে বিমা পারিশ্রমিকে কাজ করার প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন। যে সব চিত্র-প্রেমিক ও রসিক অর্থ সাহায্য করবেন, ছবির আর্থিক লাকল্য ঘটলে তাঁদের প্রত্যেকের প্রথম অর্থ বিমা হয়ে কিরিয়ে দেবার কথাও তিনি ঘোষণা করেছেন। মালধর সম্ভাব্য অভিনয় শিল্পীরা হলেন মাধবী চক্রবর্তী, প্রব মিত্র, ভিক্টর ব্যানার্জী, আশি দে প্রভৃতি। পূর্ণেন্দুবাবুর এই অভিনব প্রয়াস সার্থক হোক—এ কামনা সকলেরই।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

। চাঁদার হার ।

বার্ষিক ২২ টাকা

ষাণ্মাসিক ১১ টাকা

ত্রৈমাসিক ৫.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাণার ঠিকানা

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১, মট লেন। কলিকাতা-১৩

আইনবাদের কবলে সংবিধানের প্রাণান্ত ক্ষমতার ব্যতিচার, না বিভ্রান্তি ?

রমাপ্রসাদ মল্লিক

আর যাই হক, জনতা পার্টি অকৃতজ্ঞ নয়। সরকারী তথ্যে আসীন সরকারী দলের “শীর্ষ নেতারা, প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এবং আইনমন্ত্রী তাঁদের পূর্বসূরীদের কাছে জমা-পড়া রাজনৈতিক স্বপ্ন চূকোতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। না হলে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী রক্ষার্থে তাঁদের কালঘাম ছুটতো না।

শাসক দলের হাতে ভারতের পার্লামেন্টে কংগ্রেসী এমার্জেন্সী আমলে যেমন, আজও রাজনৈতিক সম্মান এবং ক্ষমতাপ্রয়োগের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রয়োজন হলে পার্লামেন্টের সর্বোচ্চ সার্বভৌম আইন-প্রণয়ক ক্ষমতার দোহাই দেওয়া হয়—যেমন বিগত প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর আইনমন্ত্রী (গোবেল সাহেব) দিতেন। এখন অবশ্য শাহ কমিশনের সামনে গোবেলজীর স্বর পালটেছে; কিন্তু এমার্জেন্সীর হাওয়া বতদিন পালে ছিল, ততদিন পর্যন্ত সংবিধান অপেক্ষা পার্লামেন্টের বিধান-প্রদায়ী কর্তৃত্ব বেশী বলে প্রচারিত হয়েছে। যদিও ৪২তম সংশোধনী বিল পাশ হবার সময় পার্লামেন্টের অবস্থা ছিল যেন ঠুটো ও বোবা জগন্নাথের!

আজ পার্লামেন্টের বাণী বাইরে প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা অপরিণত তাই ১৬ ডিসেম্বর তারিখে জনতা পার্টির এম পিদের মাঝেই যে কত বিক্ষোভ (জনতা সরকারের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী এবং ৪২তম সংশোধনীর মূলকাঠামো রক্ষার্থে ৪৪তম সংশোধনী বিল আনার বিরুদ্ধে) তা জানা গেল। পি, জি, মাতলঙ্গর অথবা শ্রামনন্দন মিশ্র—এরা কেউই বামপন্থী নন। কিন্তু জনতা দলের প্রাক-নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির খেলাপ স্বরণ করিয়ে দেওয়ায় তাঁদের ভূমিকা সি, পি, এম মেম্বারের চেয়ে কম স্পষ্ট ছিল না।

জনগণ জনতা পার্টির নবতম আবিষ্কার-মহিমা দেখে বিমূঢ়, “এমন কি সম্ভব হয়ে থাক না কেন, আইনমন্ত্রী শ্রীশান্তিভূষণ তাতে বিচলিত হবেন না! তিনি আজীবন আইনের জগতে বিচরণ করেছেন; জীবিকা রূপে তো বটেই, আইনকে দেখেছেন সামাজিক-রাজনৈতিক পদ্ধতির রক্ষক ও জ্ঞাতা হিসেবে। তিনি তাই আজ মনে করেন, যে কংগ্রেস দল তিন দশক ধরে স্বৈরাচারী শাসন ‘কালো’ আইনের জোরে চালিয়ে গেল, যে

দলের কারসাজীতে ভারত রাষ্ট্র বারম্বার এমার্জেন্সী ধারার বলাৎকারে শাসিত হয়েছে, যার প্রশাসনী যন্ত্রের কতোটা অপ্রতিরোধ্য করার উদ্দেশ্যে ৪২তম সংশোধনী বিল পাশ করান হয়েছিল সংখ্যাধিক্যের পাশবিকতাবলে, সেই সংশোধনীকে কোনো ‘এক লাইনের’ লেখায় নিষিদ্ধ বিল এনে সরিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ? এই কুখ্যাত সংশোধনীতে—যার বিরুদ্ধে উদগার অন্তান্ত জনতা পার্টি নেতাদের সঙ্গে তিনিও নির্বাচন পূর্ব অধ্যায়ে জোর গলায় করেছিলেন—নাকি এমন কয়েকটি ধারা আছে যেগুলি ইতিমধ্যে কার্যকরী করা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর এই অদ্বৈতপূর্ব আইনী মনোভঙ্গী নস্যাৎ হয়ে যায় তাঁর নিজেরই এলেমে তৈরী ৪৪তম সংশোধনীর “উদ্দেশ্য এবং হেতু” সম্পর্কে যে বয়ান, তার ভাষায়! শুধুন: ‘স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র আনীত হচ্ছে, ৩২-এ, ১৩১-এ, ১৪৪-এ, ২২৬-এ এবং ২২৮-এ ধারাগুলি তুলে দেবার জন্য। সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্টগুলি যাতে জমে-বাওয়া কেস সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে অবিকল সেইভাবে যেন উক্ত ধারাগুলিকে ১লা ফেব্রুয়ারী ’৭৭ তারিখ থেকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল, (যে তারিখে ওগুলি কার্যকরী করা হয়), সেই উদ্দেশ্যে বিশেষ আইনী সাজসরঞ্জাম তৈরীর প্রস্তাবও আনা হল।’ পার্থক্য, ভেবে দেখুন, আইনের প্যাচ যেমন বর্তমানকে রেহাই দেয় না, রেহাই দেয় না অতীত কালের ব্যাপারকেও। বর্তমান জনতা-মন্ত্রিবর্গ চাইলে শুধু কয়েকটি ধারা নয়, মায় ৫১-ধারা সম্বলিত ৪২-তম সংশোধনী আইনটাকেই গঙ্গা-ময়ূরার সঙ্গে বিসর্জন দিতেন। কিন্তু তাঁরা তা চাননি।

নির্বাচনী বিজয়ের পর এমনটা ঘটল একবছরও পেরতে না পেরতে! বুধাই জন কয়েক এম পি কল্পনা করেছেন, জনতা পার্টির নেতৃবৃন্দ বৃষ্টি কংগ্রেসকে ডরায়! অর্থাৎ, পাছে রাজ্যসভায় কংগ্রেস দলের সংখ্যাধিক্য রয়েছে বলে ৪৪-তম বা অমনি কোনো বিল পার্লামেন্টের যুগ্মসভা বৈঠকীতে দুই তৃতীয়াংশ সমর্থনের অভাবে নাকচ হয়ে যায় সেই ভয়েই বৃষ্টি জনতা নেতৃবৃন্দকে তাদের পূর্ববর্তী ক্ষমতাধারীদের সঙ্গে আপোষ করতে হল। আসল সত্য

কিন্তু রয়েছে লুকনো, কংগ্রেসের সঙ্গে জনতা পার্টির রাজনৈতিক সমঝুতায়।

উদাহরণতঃ, নাগরিকদের ‘কতব্য’ বুজোয়া জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের প্রতি কি হবে, কতদূর বাধ্যতামূলক, সেই প্রশ্নে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর রাজনীতি দর্শন। হুজুনেই চান, সংবিধানে নাগরিকদের কর্তব্য আক্ষরিক অর্থে স্পষ্টীকৃত করা থাক। অল্পচ বিশ্বের খুব কম দেশের সংবিধানেই কর্তব্যের বিধান দেওয়া আছে; কারণ বাহু—নাগরিকদের রাষ্ট্রীয়তাবোধের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত থাকে, নইলে নাগরিকরা সমবেত প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক পদ্ধতি এবং তার মূল-অঙ্গ রাষ্ট্রের জয় দিত না। কোতুহলের বিষয় এই যে, সেই দেশের শাসকশ্রেণী অহেতুকভাবে নাগরিকদের ‘কর্তব্যাবলী’ বাধ্যধরা আইনরূপীবিধানের আওতায় আনতে চেষ্টা করছে, যে-দেশে উক্ত শ্রেণী ও শাসিত জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক অর্থনৈতিক বিভাজন ও ব্যবধান অত্যন্ত গভীর, এবং সে কারণে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব অবিসংহারী। জনতা দল কি এত শীঘ্রই কংগ্রেস দলের সঙ্গে জয়যুক্তে বাঁধা একই শ্রেণী-চারিত্র্যের মিল একেবারে কথা স্বীকার করে নিতে চায়?

তাহলে ফেব্রুয়ারীর প্রথমার্ধ থেকে (যখন শ্রীজগজীবন রাম কংগ্রেস-ক্যাবিনেট থেকে পদত্যাগ করায় জনতা পার্টির সম্ভাব্য আস্তর সংহতি রূপ নিতে আরম্ভ করে) মার্চ-জুন অবধি নির্বাচনী অভিযানের সময় একাধিকবার যে সকল আপাত চরম, হুলু-জনবাদী কথা বলা হয়েছিল জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে, সেটা ছিল কেবল ভোট কেনবার অজুহাতে দেওয়া অচল টাকার মত বুটো আশাস-বাণী?

তবে, সমষ্টিগত দায়িত্বের টানে কিনা বলা কঠিন, প্রধানমন্ত্রী মহাশয় আইনমন্ত্রীর স্ববিরোধ প্রকট হয়ে পড়ায় ৪৪-তম সংশোধনীর সাফাই গেয়েছেন। ১৭ই ডিসেম্বর সর্দার প্যাটেলের স্বরণার্থে আয়োজিত দু’ দিন ব্যাপী বক্তৃতামালায় গুরুগম্ভীর সাবধানবাণী বিতরণ করেছেন জাতির উদ্দেশ্যে: “৪২-তম সংশোধনীকে খতম করার অত্যাংসায়ে আমাদের আসল বস্তু থেকে নজর

সরিয়ে নেওয়া উচিত হবে না।” কি সে আসল বস্তু? তা হল ঐ সংশোধনীর অন্তর্গত “দু’ একটি নির্দোষ ধারা!” তিনি অবশ্য স্বীকার করলেন যে, ‘কিছু লোক’ সামগ্রিকভাবে ৪২-তম সংশোধনীটাকে তুলে দিতে চায় এবং তারপর নাকি চায় তা থেকে কয়েকটি “ভাল ধারা” আত্মসাৎ করে নতুন আইন পাশ করতে। কিন্তু নীতিবাগীশ শ্রীমোহরজী দেশাই মনে করেন তা তো ঠিক হবে না নৈতিক দিক দিয়ে দেখলে। আর তাছাড়া, অতশত করবার সময় বা কোথায়? যদিও তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অমুখ্যায়ীই চলতে চান এবং সে কারণে বিরোধী দলের সহযোগিতা চেয়েছিলেন, কার্যতঃ কেবল কংগ্রেসের—কিন্তু তড়িঘড়ি এগোবার প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ সেই ধারাগুলি সরাবার জন্য যেগুলি ভারতের সংবিধানকে মৃতপ্রায় করে ফেলেছিল বিশেষতঃ এমার্জেন্সী যুগে। স্তোক দিয়ে বললেন, প্রথম অবসর যেই পাওয়া যাবে, অমনি নাকি সেই সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বলা বাহুল্য, বিরোধী দল অর্থাৎ কংগ্রেসের সঙ্গে পরামর্শ করে।

হায় বিশ্ববিশ্রুত, অহম্মতাসম্মত মোরারজী মহাশয়! (জ গার্ডিয়ান পত্রিকার পত্রকার তেওঁর গদীনসীন হবার পর প্রথম ইন্টারভিউ বা সাক্ষাতে তাঁর নিজেকে সত্যপন্থী বা self-righteous মনে করার অপার ক্ষমতা দেখে চমৎকৃত হয়ে যান) আপনাদের অভিমত এই নয় কি যে, ৪২-তম সংশোধনীর পূর্বে সংবিধান যে রূপে বিরাজমান ছিল তাতে ঐ মৌল আইনী কাঠামোর মাঝে শক্তি ছিল (১) সামাজিক-আর্থিক পরিবর্তন আনার, (২) স্বাধীনতা ও নাগরিকের অধিকার রক্ষা করার, (৩) বুদ্ধি থেকে মুক্তি দেবার, (৪) অবিচার, অন্যায়, নিপীড়ন থেকে বাঁচাবার, এবং প্রত্যেকে যাতে ‘সন্তোষজনক’ পারিশ্রমিক পায় সে ব্যবস্থা করবার ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে বাধা কোথায় ছিল, উক্ত প্রগতি-হস্তা ৪২-তম সংশোধনীকে নস্যাৎ করে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়াতে?

জনতা পার্টি! যদিও গতিতে কংগ্রেসের সঙ্গে আইনী পদক্ষেপ মেলান কিসের খুচনা—ক্ষমতার ব্যতিচার না, বিভ্রান্তি?

শিক্ষাজগৎ ও সরকার

পশ্চিম বাংলার শিক্ষার ক্ষেত্রে এই রাজ্যের নবগঠিত বামফ্রন্ট সরকারের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে সর্বপ্রকার অরাজকতা দূর করে পড়াশোনা ভালোভাবে চালানোর পক্ষে অমুকুল পরিবেশ ও স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা।

- * পরীক্ষায় টোকাটুকি শুধু বর্তমান সমাজকেই নয়, ভবিষ্যৎ সমাজকেও পঙ্গু করবে—তাই, ছাত্রসমাজের কাছে সরকারের আবেদন, তাঁরা যেন নিজেরাই এই অত্যাচার ও অসততার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।
- * সর্বপ্রকার সমাজবিরোধী প্রবণতা থেকে ছাত্রসমাজ নিজেদেরকে দূরে রাখুন, স্থূল-কুলোজে শৃংখলা বজায় রেখে চলুন।
- * দেশের সুস্থ ও সুরুচিপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করুন,—পচাগলা সংস্কৃতির পংকিল আবর্তে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দেবেন না।

নিরক্ষরতা আমাদের জাতীয় জীবনের আভিশাপ—সেজ্ঞাত সরকার জনগণের সহযোগিতায় একটি বাস্তব ও ফলপ্রসূ কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। তাছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা প্রভৃতি বিশেষ অগ্রাধিকার পাবে।

শিক্ষাজগৎকে দুর্নীতিমুক্ত করে শিক্ষা সম্প্রসারণে

জনগণের সহযোগিতাই সরকারের কাম্য

এক্যবদ্ধ হউন বিভক্ত হবেন না

কালিদাস কুণ্ডু

“এক্যবদ্ধ হউন, বিভক্ত হবেন না”
এই সে তুংএর এই উক্তিটি আজ-
কার ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরি-
স্ଥିতিতে গভীর তাৎপর্যবহ। ভারতীয়
যুগ্মাধিকার বিভক্ত হয়ে পড়েছে।
দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক
তত্ত্বশক্তি কংগ্রেসের ভিত্তি ভগ্ন-
পরিণত। বুদ্ধোদয়ের দ্বিতীয়
কালের পরস্পর বিপরীত মতা-
বাদী কয়েকজন সেনাপতির নেতৃত্বে
মতাদল রাষ্ট্রের পরিচালক শক্তি-
পরিবর্তিত হয়েছে। সংক্ষেপে
বর্ণনা করে, ১৭এর নির্বাচনোত্তর
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক শক্তি-
বিস্তারের অবস্থাটি বৈপ্লবিক শক্তি-
বৃদ্ধির পক্ষে একটি চমৎকার, অসু-
স্বস্থ অঙ্কুল সুযোগ উপস্থাপিত
করেছে।

ইতিহাসের এমন একটি অসুস্থ
পরিস্থিতিতে বিপ্লবী শিবিরে একেবারে
পরতা দৃষ্টিগোচর হচ্ছেনা কেন?
সংগ্রামের রণ-স্থলিতে কম্যুনিষ্ট
বিপ্লবের বহু বিচ্ছিন্ন দল ও উপ-
দল একত্ব বিচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক
চেষ্টার আশ্রয় নিয়ে জনসাধারণের
মনে উপস্থিত হতে বিধাগ্রস্ত
ন? কেনই বা তাঁরা গণসংগ্রামের
কাল তরঙ্গ সৃষ্টিতে নিজস্বতার
কাটিয়ে উঠতে পারছেন না?
কি ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট
গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে
ইন্দোনেশিয়া ও চিলির
পথে?

এই পথ, ইন্দোনেশিয়া না
ভিয়েতনাম?
আমাদের সামনে কোন পথ,
ইন্দোনেশিয়া, না ভিয়েতনাম?
গায় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়ার রণাঙ্গনে
এই পথ উন্মুক্ত হয়েছে। একটি
ইন্দোনেশিয়ার পথ, অপরটি ভিয়েত-
নামের পথ। ভিয়েতনামের একা,
গ্রাম ও সাকল্যের ইতিহাস রমা,
ইন্দোনেশিয়া ও মালয় এশিয়ার সু-
ভাগ্যে বৈপ্লবিক সংগ্রামের জোয়ার
করেছে। অপরদিকে ইন্দো-
নেশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির আন্ত-
র্জাতিক ফলে ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিষ্ট
ও জনগণের ভাগ্যে যে বিপ্লব
এসেছে তার ফলাফল এসে
ছে এশিয়ার অন্যান্য কম্যুনিষ্ট
পার্টির উপর। প্রতিক্রিয়াশীল
পার্টির সঙ্গে মৈত্রী ও সমঝো-
তা নীতি অনুসরণ করে ডি, এম,
ভেতর নেতৃত্বাধীন পার্টি যে ভুল
দাঁড়ায় তার চরম ফল্য দিতে
হাজার হাজার তরুণ কম্যুনিষ্ট
শীল মানুষকে।

ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে
ভিয়েতনামের পথই অসম্ভব।
প্রতিক্রিয়াশীল পার্টি ও তার কর্তব্য
অনেকে প্রমাণ করে থাকেন,
“মশাই বিপ্লব করবে কে? ভারতবর্ষে
কি প্রতিক্রিয়াশীল পার্টি আছে?”
ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল পার্টি-
রূপে নিজেকে কেউ জাহির করেন
বলে আমার জানা নেই। মার্কস-
বাদী কম্যুনিষ্ট পার্টিও একথা কখনও
বলেনি যে, সে বর্তমান অবস্থায়
মধ্যবর্তী প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধি
স্থানীয় পার্টি। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট
পার্টির নিয়তম নেতৃত্ব থেকে উচ্চতম
নীতি নির্ধারক সংস্থাতে এখনও
মধ্যবর্তীদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও
প্রাধান্য বিদ্যমান। তৎসত্ত্বেও উক্ত
পার্টি প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শকেই প্রচার
করে থাকে, প্রতিক্রিয়াশীল জীবন
দর্শনকেই প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প
ঘোষণা করে থাকে। প্রতিক্রিয়াশীল
নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় দুট সংকল্প একটি
রাজনৈতিক দলের এইরূপ অবস্থায়
কোন ইতিহাসিক দায়িত্ব পালন করা
উচিত? প্রতিক্রিয়াশীল ভিত্তিতে
জনগণের বৃহৎ ব্যাপক অংশকে একত্ব-
বদ্ধ করাই তাঁর ইতিহাসিক দায়িত্ব।
কেননা, সংগ্রামী একা গড়ে তুলতে
পারে একমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শে
বিশ্বাসী একটি পার্টিই। মার্কসবাদ
লেনিনবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত
কোন সংগ্রাম ব্যতিরেকে জনগণ
কখনও একত্ববদ্ধ হতে পারেননা।
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ কখনও
কখনও জনগণকে সাময়িকভাবে
একত্ববদ্ধ করতে প্রয়াসী হতে পারে,
কিন্তু সেই একত্ব প্রয়াস কালের মতোই
ভুল।
কম্যুনিষ্ট একা, না বামপন্থী একা?
কম্যুনিষ্ট পার্টি বিভক্ত হওয়ার
আগে বামপন্থী একাই ছিল আলোচ্য
স্থলীয় অসুস্থত্ব। কম্যুনিষ্ট পার্টি
ভেঙেছে—প্রথমে দু’টুকরো, পরে
তিন টুকরো, এখন বহু টুকরোতে।
এটা বাস্তব অবস্থা। কোন একটি
টুকরো, যত বড়ই হোক সমগ্র হতে
পারেনা। টুকরো যত ছোটই হোক
তার বৈপ্লবিক চরিত্র ছোট করে দেখা
উচিত নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমান
কম্যুনিষ্ট শিবিরের দিকে দৃষ্টিপাত
করলে একেবারে সন্তোষ আছে—
এখনও আছে।
বামপন্থী একা ভাল কথা।
ব্যাপক গণতান্ত্রিক সংগ্রামে দক্ষিপন্থী
প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বামপন্থী একা
মঞ্চ গড়ে তুলবে কে? কম্যুনিষ্ট

পার্টিই সেই একেবারে বিধায়ক ও
নির্মাণা, শক্তি। তাই বামপন্থী
একেবারে প্রথম প্রয়োজন কম্যুনিষ্ট
শিবিরের একা।
আমাদের রণ-কৌশল কি?
বুদ্ধোদয়ের রণ-অগ্রসর হয় আমরা
তখন পশ্চাদপসরণ করি। ওরা
যখন পশ্চাদপসরণ করে, আমরা তখন
অগ্রসর হই। ওরা যখন বিভক্ত হয়,
আমরা তখন হই একত্ববদ্ধ। ওরা
বিভক্ত হয়েছে। আহুন, আমরা
একত্ববদ্ধ হই। আমরা মিলিত মঞ্চ
রচনা করি—আমরা অগ্রসর হই।
কম্যুনিষ্ট বিরোধী শক্তিগুলি
আগামীকাল একত্ববদ্ধ হবে। আহুন
আমরা অগ্রসর হই।
মুখের কথায় একা হয় না
ই, এম, এম, নাট্যবিদ্যাপদ বলে-
ছেন মুখের কথায় একা হয়না।
আমরা বিশ্বাস করি কাজের একা—
“Unity in action” নকশাল
বন্ধুরা সি, পি, আই-এর বিরোধী যু-
গোষ্ঠী ও সি, পি, এম-এর যু-
গোষ্ঠী মিলিত হয়ে ভাবুন
কোথা থেকে একেবারে কাজ শুরু হবে।
শহরগুলোে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে
সাংস্কৃতিক মঞ্চ নির্মাণের কাজ শুরু
করা যেতে পারে। ধর্মঘটী প্রতিক্রি-
য়ার পাশে তিন লাল নিশান এক
হতে পারে। গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন
কৃষক, কৃষি-মজুর ও নির্ধাতিত হরি-
জনদের পাশে তিন নিশান এক হতে
পারে। কর্মসূচিতে একা চাই—
একাই হোক কর্মসূচি।
একেবারে পথে একটি মাত্র বাধাই
আছে—তার নাম একগুয়েমি।
“ক” পার্টির ছেলেরা ‘অতিবিপ্লবী’,
“খ” পার্টির ছেলেরা ‘নয়া সংশোধন-
বাদী’-এবং ‘গ’ পার্টির ছেলেরা
‘সংশোধনবাদী’—এইসব সংস্কারবদ্ধ
ধারণাই রাজনৈতিক একগুয়েমি
সৃষ্টি করে থাকে। ভুল সবারই
হয়েছে। শিক্ষাটাই শুধু হয়নি।
একা প্রয়াসই হোক সেই শিক্ষার
প্রথম পাঠ। স্বতন্ত্রগণ্যম স্বামীরা
যুগে বেড়াচ্ছে। প্রতিক্রিয়াশীল গণেশ
তেল নাকে দিয়ে ঘুমচ্ছেনা। “একা-
বদ্ধ হউন, বিভক্ত হবেননা।”
নামনে লড়াই।

একটি সমাবেশ

(দর্পণের প্রতিনিধি)

রবিবার মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে
অনুষ্ঠিত এক সভায় গণতান্ত্রিক
অধিকার প্রতিষ্ঠা সমিতি নামে একটি
সংস্থার জন্ম হয়। সংস্থার উদ্ভোক্তা-
দের মধ্যে রয়েছেন বহিষ্কৃত সি,
পি, এম, সদস্য সুধাংশু পালিত,
সুধাংশু নিয়োগী, তেজস্বরত হোসেন
এবং নকশাল রঙ্গে পরিচিত কিছু
গোষ্ঠী ও ব্যক্তি। অত্যন্ত প্রধান
বক্তা প্রতিক্রিয়াশীল শীতাংশু দাস তাঁর
ভাষণে বলেন যে, সত্যকার গণতন্ত্র
প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম দীর্ঘ ও কঠিন।
প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য
চাই মজবুত সংগঠন। সংগঠনবিহীন
কিছু ব্যক্তির বক্তৃতাভাজিতে গণ-
তান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে না।
এই জন্য সমস্ত গণতন্ত্র প্রিয় মানুষকে
প্রতিক্রিয়াশীল ও কৃষকের বাচার লড়াইয়ে
অংশ গ্রহণ করতে হবে, না হলে
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হবে
কাণ্ডজে লড়াই। সুধাংশু পালিত
সমাবেশে সভার ঘোষণাপত্র পাঠ
করেন। ঐ ঘোষণাপত্রে সংবিধানের
সমস্ত দমনমূলক ধারা সহ ‘যুক্তি-
সংগত’ নিয়ন্ত্রণের ধারাগুলো
বাতিলের দাবি করা হয়।



প্রধানমন্ত্রীর বাণী

পরিবার নিয়ে তৈরী হয় দেশ। পরিবার যদি বড় হয় আর হাতের বাইরে চলে যায়
তাহলে তারা সুখী জীবন যাপন করার আশা করবে কি করে। এ অবস্থায় সবচেয়ে কষ্ট পায়
বাচ্চারা কারণ তারা ভালো ভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় না, আর মায়েরা, উপযুক্ত পরি-
গর্ভধারণের ফলে যাদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়।
দেশের উন্নতির জন্তে আমরা যা কিছু বিনিয়োগ করছি, তলিয়ে দেখতে গেলে, তার
চূড়ান্ত লক্ষ্য হল আমাদের জীবন ধারণের মান উন্নীত করা। পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা এই
বিনিয়োগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আমি আশা করি যে, জনগণ এই পরিকল্পনার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝে
নেবেন এবং বিনা সংশয়ে এটি গ্রহণ করবেন।
আমি জেনে সুখী হলাম যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং বিভিন্ন রাজ্যের সংশ্লিষ্ট
দপ্তর ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখ থেকে ৩১ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় পরিবার কল্যাণ পক্ষ পালন
করছে। এই কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই যাতে সাক্ষ্য লাভ করেন এই আমার শুভকামনা।

নতুন দিল্লী
নভেম্বর ৩০, ১৯৭৭

মোরারজী দেশাই

বাগমারী শাস্ত্রী স্মৃতি বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে অভিযোগ

বাগমারী শাস্ত্রী স্মৃতি বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি শ্রীপ্রণবের ধর এক বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত স্কুলের সম্পাদক শ্রীসত্যরঞ্জন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অর্থ সংক্রান্ত ও নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ এনেছিলেন এবং ডি, আই-কে হস্তক্ষেপ করবার জন্য চিঠি দেন। ডি, আই তার ২৭শে মে ১৯৭৭ তারিখের চিঠিতে প্রধান শিক্ষিকাকে নতুন কমিটি গঠন করার নির্দেশ দেন। সেই আদেশ অমুসারে কমিটি গঠন করে ডি, আই-কে অল্পমোহনের জন্য পাঠান হয়। কিন্তু ডি, আই ১৪ই জুলাই তারিখের চিঠিতে পুরনো কমিটিকেই কাজ চালিয়ে যেতে আদেশ দেন। এতে স্থানীয় জনসাধারণ ও অভিভাবকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

একই স্থানে শাস্ত্রী স্মৃতি বিদ্যাপীঠ ইউনিট ২ নামে সকালের অন্তঃ একটি সরকারী অল্পমোহিত স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার পদ নিয়ে স্কুল গণহত্যা

অপসংস্কৃতির প্রতিরোধে পাণ্ডা স্মৃতি জনগণের সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য 'অভিনয়' পত্রিকা প্রতি শনিবার বিকেলে দক্ষিণ কলকাতার হাজরা পার্কে 'গণমঞ্চ'-র আয়োজন করেছেন। ৩রা ডিসেম্বর এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। গত ১৭ই ডিসেম্বর তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান খুবই আকর্ষণীয় হয়েছে। সোনারপুরের কৃষ্টি সংসদ গাজীর গান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করে। 'ব্রু হাই মিউজিকাল কয়ার', সাগর চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'বেঙ্গল থিয়েটার' ও দক্ষিণ কলকাতার নাট্যবীক্ষণ সংস্থা গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। ক্যালকাটা সাইলেন্ট থিয়েটারের সমবেত মুকাভিনয় ভালোই হয়েছে। সবশেষে অনুষ্ঠিত হয় হাওড়ার আঞ্চলিক গোষ্ঠী কর্তৃক 'বিষম মধ্যাহ্ন' নাটক। বেকার সমস্তার ভিত্তিতে রচিত এই নাটক প্রশংসার দাবী রাখে।

'অভিনয়ের' এই প্রচেষ্টার পাশে সকলকেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। দক্ষিণ কলকাতাবাসীর কাছে এ এক বিশেষ উপহার। উদ্বোধনারা যেমন বর্ষার পূর্ব পর্যন্ত এ অনুষ্ঠান নিয়মিত চালাবার চেষ্টা করবেন, অমুরাগীগণকেও হাইক, লাইট, মাঠে বসার চট ইত্যাদির ভাড়া বাবদ কিছু অর্থ সাহায্য করতে হবে। তাহলে গণসংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'গণমঞ্চ' আগামী দিনে এক দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিরোধ চলছে। সেই বিরোধ আজ কলকাতা হাইকোর্টের বিচার্য্য। উক্ত স্কুল কমিটির বিরুদ্ধে অল্পমোহিত অভিযোগ থাকায় কমিটি বাতিল করে একজন প্রশাসককে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এবং তিনি এই স্কুলে কিছুটা নিয়ম শৃঙ্খলা আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। হঠাৎ বিনা কারণে কোর্টে কেস চলাকালীন এই প্রশাসককে বহর্য করে অল্প একজন প্রশাসিকা নিযুক্ত করা হয়েছে। সেই প্রশাসিকা কার্যভার গ্রহণ করার পর থেকেই নানারকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ এবং এইসব ঘটনায় স্কুলের অভিভাবক স্থানীয় জনসাধারণ বিব্রত।

বনগ্রাম লাইব্রেরীর ৬০ বর্ষ পূর্তি উৎসব

বনগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী এণ্ড টাউন হলার ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২৮শে ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারী ১৯৭৮ পর্যন্ত পর পর পাঁচদিন ব্যাপী হীরক জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হল। এই উৎসবে প্রখ্যাত শিল্পী, সাহিত্যিক সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও রাজ্যের মন্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিনে রাজা, মঞ্চাভিনয়, পুতুল নাচ, আদিবাসী-নৃত্য যাচুবিজা, চলচ্চিত্র, শিক্ষামূলক প্রদর্শনী, প্রভৃতি কর্মসূচীর ব্যবস্থা ছিল। এ ভিন্ন আবৃত্তি, অঙ্কন, পল-লেখা, প্রবন্ধ, বিতর্ক ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর বেলা ১২টা থেকে 'পশ্চিমবঙ্গের জন আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে সেমিনার হবে।

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে পথসভা ও শোভাযাত্রা

রবিবার, ১১ই ডিসেম্বর সিনে কমিউন, বাদবপুর অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এবং সঙ্গীত বিজ্ঞাপন বাতিল ও বে-আইনী করা এবং সেই সঙ্গে জীবনধর্মী চলচ্চিত্রের সমর্থনে পথসভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করে। বর্ণাচ্য এই শোভাযাত্রার বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে গড়িয়া পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করে কয়েকটি পথসভায় বক্তব্য রাখেন সিনে কমিউনের পক্ষে অধ্যাপক সত্যব বহু, মিটু হস্ত, বীরেন দাস। এ ছাড়া কৃষ্ণা অল্পমোহিত গ্রাম প্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক

ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মটু বহু, ভারত ভিয়েনাম সংহতি সমিতির অধ্যাপক শান্তিময় রায়, বাংলার বহুভারী সমিতির সভাপতি সেনগুপ্ত এবং সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটার সভাপতি হালগুপ্ত, গণতান্ত্রিক লেবক শিল্পী ও কলাকুশলী সখিলনীর অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় পথ সভাপতিগণের বক্তব্য রাখেন। প্রত্যেকেই চলচ্চিত্রে অপসংস্কৃতির কর্মবর্ধমান প্রভাবে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এরই পাশাপাশি স্ব স্ব জীবন-বোধে অল্পমোহিত চলচ্চিত্র নির্মাণের স্বপ্নকে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন। প্রতিটি পথসভাতেই এলাকার মানুষ গভীর আগ্রহের সঙ্গে বক্তব্য শোনেন এবং এই আন্দোলনের স্বপক্ষে তাদের সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন।

চিত্র প্রদর্শনী

আসানসোলি বিধানচক্র কলেজের উদ্যোগে কলেজের মাঠে ১৫ই ডিসেম্বর একটি চিত্রকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল। আসানসোলি শিল্পা-কলে এ ধরনের প্রদর্শনী এই প্রথম বলে উদ্বোধনারা জানান। প্রদর্শিত মোট ৩৮টি ছবির মধ্যে দেবব্রত ঘোষের তেল রঙের ছবি 'জটায়ু', 'বক্ষপ্রিয়া' এবং 'প্রেম নেই', কুমকুম চক্রবর্তীর ছবি 'রঙের নৈসর্গিক হৃদয়' এবং অমুরাধা ত্রিবেদীর পেনসিলের ড্রইং সবিশেষ আকর্ষণীয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সাংবাদিক শিবসনাতন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অধ্যাপক প্রশান্ত হাশগুপ্ত।

একাংক প্রতিযোগিতা

হুগাঁপুর বেশবন্ধু চিত্ররঞ্জন ভবনে (বি-জোন কমিউনিটি সেন্টার হুগাঁপুর) আগামী ১৫ই জানুয়ারী থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গ একাংক নাটক প্রতিযোগিতা শুরু হবে। মক তৈরী, অভিনয় ও মঞ্চভাষা সহ অন্যান্য ১০ মিনিটের কচিনীল বাংলা একাংক নাটকই প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণের অধিকারী। পাণ্ডুলিপি নাটকের ক্ষেত্রে আবেদন পত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাটকের পাণ্ডুলিপি অবশ্যই পাঠাতে হবে। অংশগ্রহণের জন্য আবেদনের শেষ তারিখ ২৬. ১২. ৭৭ এবং আবেদন পত্রের সঙ্গে ২০.০০ (দুই) টাকা প্রবেশ মূল্য ও ৩০.০০ (ত্রিশ টাকা) জামানত জমা দিতে হবে। নাটক মঞ্চস্থ করার পর জামানতের ৩০.০০ টাকা ফেরত দেওয়া হবে। সামগ্রিক প্রয়োজনার জন্য যথাক্রমে নগদ ২০.১, ১৫.১ ও ১০.১ টাকার তিনটি পুরস্কার দেওয়া হবে। পাণ্ডু-

লিপি নাটকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারকেও পুরস্কার দেওয়া হবে। শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী এবং শ্রেষ্ঠ শিশু অভিনেতা ও অভিনেত্রীকেও পুরস্কার দেওয়া হবে। বিজয় বিবরণের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা—পারানাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক নাট্য বিভাগ, বেশবন্ধু চিত্ররঞ্জন ভবন (কমিউনিটি সেন্টার-বি জোন)—হুগাঁপুর ৭।

বাসযাত্রীদের অসুবিধা

বেহিনীপুর জেলার ঘাটাম-পাশকুড়া বাস যাত্রীদের যাতায়াতে প্রতিদিন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পাশকুড়া টেশন একটি শুষ্ক-পূর্ণ টেশন। এখান আবার হলদিয়া লাইন হওয়ার সঙ্গে এর শুষ্ক আরও বেড়ে গেছে। পাশকুড়া টেশন যাত্রার মোট তিনটি পথ আছে: (১) পাশকুড়া বনমালী কলেজের পাশ দিয়ে; (২) পুরনো পাশকুড়া বাজার ও প্রতাপপুর হয়ে; (৩) বোম্বে রোড হয়ে পুরনো পাশকুড়া ও রেলপুলের ভিতর দিয়ে। দশ থেকে আশ্রয়ের ব্যাপার কোন বাসই নির্দিষ্ট স্টপ ধরে যাতায়াত করে না। বহু সরকারী অফিস, ব্যাংক ও বোকামপাট পাশকুড়া পুরাতন বাজারেই অবস্থিত। কিন্তু বেশির ভাগ বাস বনমালী কলেজের পাশ দিয়ে যাত্রার সঙ্গে যাত্রীরা বেশ অসুবিধার মধ্যে পড়েন। এ ছাড়া যাত্রীদের অভিযোগ যে বাসের নির্দিষ্ট ভাড়া বেঁচে দেওয়া হচ্ছে ও যাত্রীদের কাছ থেকে বেশী ভাড়া নেওয়া হচ্ছে।

হালতু অঞ্চলে

মিছিল ও পথসভা

১৮ই ডিসেম্বর সকালে হালতু উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কমিটির উদ্যোগে হালতুর রাজভাঙ্গার বিদ্যাপীঠ অঞ্চলে মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে অধ্যাপক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও অসহযোগের গণতান্ত্রিক বাহু অংশ গ্রহণ করেন। বিগত কয়েক বৎসর যাবত হালতুর রাজভাঙ্গা অঞ্চলের মানুষ সন্ত্রাস ও বিভীষিকার মধ্যে দিন কাটাতো বাধ্য হয়েছিল। হালতু কলবার কংগ্রেসী সমাজ বিরোধীরা রাজভাঙ্গা অঞ্চলকে তাদের বখা-ভূমিতে পরিণত করেছিল। এই সমাজ বিরোধীরাই বর্তমানে জনতার স্থানীয় নেতৃবৃন্দের আশ্রয়ে থেকে হালতু কলবার চাকুরিরা অঞ্চলে নতুন করে একের পর এক সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করে যাচ্ছে। এরা কিছুদিন আগে কলবার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মী স্বপন চক্রবর্তীকে

হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে। হালতুর বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক বাহুদের মিছিল বেধে রাজভাঙ্গার সন্ত্রাসের বাহু উৎসাহিত হন। পথসভাগুলিতে উপস্থিত থেকে যুদ্ধের বক্তব্য শোনেন। গণেশ ঠাকুরতা, দাদব দে এবং অধ্যাপক স্বপন চক্রবর্তী হালতু কলবার সম্পর্কে উদ্বেগ-ব্যবহার পরিবেশনের বিরুদ্ধে জনগণতর্ক করে দিতে বলেন যে, প্রতিক্রিয়াশীল কায়দা ধারাবাহী কর্মের প্রতিরোধ করতে হবে। হালতু কলবার ও চাকুরিয়ার বাহু বিবংসরগুলোর সম্মান নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে বর্তমানে আভাবিক জীবন যাপন করেছে। সমাজবিরোধী স্থানীয় জনতা নেতৃবৃন্দের আশ্রয় হয়ে নতুন করে এই শান্তিপূর্ণ জীবন যাত্রা ব্যাহত করার চেষ্টা করা স্থানীয় জনগণের কাছে এতটুকু যথোপযুক্ত বলে গেছে, কাজেই আত্মরক্ষার শত চেষ্টা করেও জনগণ বিব্রান্ত করতে পারবে না।

পাঁপের প্রস্তুত কেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক আর্থনৈতিক উন্নতি এবং বিপুল কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্য কুটির ও ক্ষুদ্র বণ্টর যে সমস্ত পরিকল্পনা করতে চলেছেন, পাঁপের তৈরি প্রকল্পের অন্তর্গত। এই প্রকল্পে সমাজের দুঃস্থ মহিলার অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হচ্ছে।

বর্তমানে হাওড়া জেলার সাংকিয়ান, ২৪ পরগণার বাদবপুরে দুটি পাঁপের প্রস্তুত কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বণ্টরের শ্রীচিন্তব্রত মজুমদার, যথাক্রমে ২০ ও ২৯শে ডিসেম্বর, বেলা ১ টায়। দুটি প্রকল্পের উদ্বোধনা ওয়ে বেঙ্গল স্টেট হাণ্ডিক্রাফটস কো-অপারেটিভ লিমিটেড।

লক্ষ টাকার এই প্রকল্পে ৮০০ মহিলা উপার্জনের সুযোগ পাবেন। উৎপাদন ক্ষেত্রে দৈনিক উৎপাদন হবে ১০ হাজার টাকার পাঁপ। বাড়িতে বাড়িতে এই পাঁপ বিক্রয় ব্যবস্থা থাকবে। কেন্দ্র সাধারণ সমবায় বিপণী ও সাধারণ দোকানের মাধ্যমে 'হুকচি' নামে এই পাঁপ পাবেন ভাষ্য দাও সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত এই পাঁপ বিক্রয় কাজে সরকার জনসাধারণের যোগিতা কামনা করেন।

মেলের মেজ সাহেবের দুর্নীতি

(দর্পণের সন্বাদদাতা)

দমকল বাহিনীর মেজ সাহেব মিটারের বিক্রেতা নানা অভিযোগ। তিনি দমকলের গাড়ি পেট্রোলের অপব্যবহার করেন ক্ষমতার পর নিজের প্রমোদ বিহারের মত। প্রমোদ বিহারের অর্থ কোথা থেকে আসে সেটা অবশ্য ক্রমশ প্রকাশ্য, কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুর্নীতি। আরও একটা কথা দমকলের নিয়ম অনুযায়ী ঐ আয়নার দ্রব্য ভিউটিতে থাকার কথা। ব্যক্তিচারী আচরণের জন্য মিটার একসময়ে শিলিগুড়ি বদলী হন। ইতিমধ্যে পূর্ববর্তী ভিউটি ডিরেক্টর ঐএম, কে, ঘোষকে প্রতিরোধে বাধ্যতামূলক পদ গ্রহণ করানো হয়। মিটার ঐ পদে বসতে চাইলেও তার নানা দুর্নীতি তার পক্ষে কাল হয়। শেষে কংগ্রেসী যুব নেতা দেব-প্রসাদ রায়, বীরেন মহান্তি ও সুদীপ চান্দালাকে ধরে ইনি মন্ত্রী স্বরূপ মুখার্জীর নেকনজরে আসেন। এই

প্রফুল্লবাবু উচ্চানী দিচ্ছেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কুকীতি সব কীস হয়ে গেলে প্রফুল্ল-বাবুর খোয়াব ব্যর্থ হয়ে যাবে। কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব বেনা। তাই, তার আগেই পশ্চিম বাংলায় একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপ-চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কংগ্রেসের ভাষী প্রফুল্ল সেন। প্রফুল্লবাবু এখনও সময় খাচ্ছে। ইতিহাস আর জলস্রোত কারো ক্ষত অপেক্ষা করেনা। আপনি নেতৃত্ব না দিলেও জনতা দলের গণতন্ত্রী মাছুষ পিছিয়ে থাকবেন। গোটা ভারতবর্ষে ইন্দিরাশাহীর বিরুদ্ধে লড়াই নবজাগরণের চেউ হয়ে দিয়েছে, তারা একনায়কতন্ত্র প্রতিহত করেছে, গণতন্ত্রের হাওড়া পৌরসভা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

মাগে দুঃখে শোকে যেন বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নির্মলবাবু, আপনি তখন কি করছিলেন? তৎকালীন কংগ্রেসী শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শান্তি দাশগুপ্তের সঙ্গে আপনি তখন মস্তরায় মত্ত ছিলেন। শিবপুত্রের অনেকেই আপনাকে মীরপের কথা জানান। কিন্তু আপনি নির্ধিকারচিত্ত, সেদিন আপনি আসেন নি। অলকা সিনেমা লে সেদিন আপনি কংগ্রেসী মন্ত্রীর সঙ্গে একত্রে বসে সিনেমা দেখে-লেন—খিক, আপনাকে খিক। আরও আপনি নিজেকে 'কম্যুনিষ্ট' রিচয় যেন?

সময় কমিশনার শ্রীমদ্রমদার অহঙ্কারে দীর্ঘদিন ছুটিতে চলে যান। এই সুযোগে মিঃ মিটার ডেপুটি ডিরেক্টরের পক্ষে প্রমোদন পেয়ে কলকাতার শোভেট হলেন।

এই ভজলোক যখন ইকুইপমেন্ট অফিসার ছিলেন তখন দমকলের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কশপের দায়িত্বও এর হাতে ছিল। 'সুতরাং ব্যাপকভাবে শেয়ার পার্টস ও মোটরের নানা সাজ-সরঞ্জাম কেনার সুযোগ নিয়ে বেসার্ল রাজেশ ট্রেডিং ও হিন্দ অটো-মোবাইলের সঙ্গে আঁতাত করে লক্ষ লক্ষ টাকার মাল ক্রয় করেছিলেন। তাতে কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হয়ে ভজলোককে উক্ত শপ থেকে অপসারণ করে দমকলের ডি, ও, 'বি' বিভাগে বদলী করেছিলেন। আরো জানা যায় বিখ্যাত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক যে আশ্রম লাগে তাতেও ভজলোক বেশ হু'পয়সা কামিয়েছিলেন। জানা যায় রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ২২ বানা

সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। আপনি, এস, কে, পাতিজ, স্বরূপচন্দ্র খারী প্রমুখ গুটি কয়েক মাছুষ সেই সংগ্রামী অভিযাত্রাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেননা।

১৯৬৭ সালে অজয় মুখার্জীরা পারেননি। ১৯৭৭ সালে ঢালহীন, তলোয়ারহীন প্রফুল্লবাবু স্বপ্ন দেখছেন সেই অসাধ্য সাধনের।

বামপন্থী সরকার আগের চেয়ে চের বেশী অভিজ্ঞতা নিয়ে ক্ষমতায় বসেছেন এবার। বামপন্থী শক্তিও সংহত হয়েছে অনেক বেশী। বিপ্লবী শিবিরে এসেছে ব্রেকের চেউ। একাবদ্ধ গণশক্তি পশ্চিমবঙ্গের ভারতবর্ষের কাছে তুলে ধরবে বিকল্প পথের সম্ভাবন। ইতিহাসের এই ইজিতময় মুহূর্তে কোন প্ররোচন জনগণকে বিভ্রান্ত করতে পারবেনা।

২রা জানুয়ারী প্রকাশিত হচ্ছে,

আলবেনিয়া ও

চীনের মহাবিতক

দাম—দেড় টাকা

দেশকথা প্রকাশনী

৬১ নং মট লেন, কলিকাতা—১৩

ট্রাম ভবীকৃত হয়েছিল তার জন্য এই ভজলোকও দায়ী ছিলেন। কারণ আশ্রমের প্রথমাবস্থায় এই ভজলোকই তারপ্রাপ্ত ছিলেন। নিয়মদম অফিসাররা ভজলোককে বারবার বলেছিলেন নিকটবর্তী ঝাল থেকে জল আনার জন্য কিন্তু ভজলোক তাদের কথায় কর্ণপাত না করে নিজের বৃশি বত হাইড্রেন্টের সাহায্য গ্রহণ করেন বার কলে ট্রামগুলি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কলকাতার অধিবাসীরা জানেন যে, কর্পোরেশনের হাইড্রেন্ট প্রায় সবই ধারাপ। যদি তিনি জরুরী প্রয়োজনে জল ব্যবহার করতেন, তা'হলে শতকরা ৭৫ ভাগ সম্পত্তি রক্ষা করা যেত। পরবর্তী কালে এই দুর্ভাগ্য চাপা দেওয়ার জন্য হাইড্রেন্টের উপর ঘোষ চাপানো হোল। কিন্তু কেউ প্রশ্ন করল না কেন নিকটবর্তী ঝালের জল ব্যবহার করা হয় নি।

ভজলোক শিলিগুড়িতে বদলী হওয়ার পর শিলিগুড়িতে একটি মোটর কোম্পানীর সঙ্গে গোপন আঁতাত করে দমকলের ব্যবসায়ী মোটর পার্টস ও মেরামতী কার্খ উক্ত কোম্পানীর মাধ্যমে শুরু করেন এবং তাতে প্রচুর টাকা আমদানী হয়। শিলিগুড়িতে এই সময় এক বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটে। কিন্তু দমকলের শিলিগুড়ি কেন্দ্রের সমস্ত অগ্নিনির্বাপন পাম্প কার্খক্ষেত্রে ফেল করে। তখন জলপাইগুড়ি দমকল কেন্দ্র থেকে পাম্প এনে এবং মিলিটারীর সাহায্য নিয়ে অগ্নি নেভানো হয়। এ ব্যাপারে এস, ডি ও এবং স্থানীয় সংবাদপত্র কঠোর সমালোচনা করতে বাধ্য হন।

বর্তমানে ভজলোক চাকরীতে এক্সটেনশানের চেষ্টা করছেন। বাম ফ্রন্ট সরকার একটু তদন্ত করে দেখুন।

সরকারী ক্যাটিন কর্মীদের সভা

(দর্পণের প্রতিনিধি)

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারী অফিস ও কারখানা সমূহের ক্যাটিন কর্মী সংস্থার এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার পি, অ্যাণ্ড, টি, সমন্বয় কমিটির সভাপতি শিশির ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করেন এবং মোট ২০টি উদ্যোগী সংস্থার কর্মীরা সভায় প্রতিনিধিত্ব করেন। ক্যাটিন কর্মী সংস্থা সমূহের একটি সমন্বয় কমিটি মারফৎ সারা ভারতের ৬০ হাজার ক্যাটিন কর্মীকে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল করবার লক্ষ্যে কর্মসূচী ও কমিটি গঠনই ছিল এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। ২৩ জন সদস্যের একটি অস্থায়ী

বর্গাদারের অধিকার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পুর ধানায় ধান কাটা নিয়ে কয়েকটি সংঘর্ষ হয়েছে, আমি উভয় ধানায় ধর নিয়েছি এবং এতদঞ্চলের কিছু গ্রামও ঘুরে ঘেঁষে এসেছি। কোথাও ধানকাটা নিয়ে সংঘর্ষের ধর সমর্থিত হয়নি। বারাননী কেন্দ্রের জনপ্রতিনিধি এবং আসানসোল মহকুমার বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা স্থানীয় বহু রায় এম এল এ এ ধরনের প্ররোচনামূলক সংবাদ প্রচারের নিষা করে বলেছেন যে, ধানকাটা নিয়ে এই অঞ্চলে কোন সংঘর্ষই হয়নি। তিনি বলেন যে, অমির মালিকানা নিয়ে কিছু কিছু বিরোধ আছে কিন্তু তার অধিকাংশই শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাধান হয়ে গেছে।

আমি বর্তমান জেলার বিত্তীয় অঞ্চল ঘুরে ঘেঁষেছি। প্রফুল্লবাবুর অভিযোগে উল্লিখিত রায়না ধানার গহারায়পুরের বলরাম দে তাঁকে আক্রমণের বে গল্প ফেঁদেছেন তা একেবারেই ভিত্তিহীন। এই বলরাম দে নামক ভজলোকটি 'আদৌ' চাষী নন এবং ইনি গত সংসদ নির্বাচনে জনতা পার্টির হয়ে কাজ করেছেন এবং এখনও জনতা পার্টির একজন সক্রিয় সমর্থক বিনিকংগ্রেসী জমানায় এতদঞ্চলের সি পি আই (এম) কর্মীদের অঞ্চল ছাড়া করার কাজে সক্রিয় ছিলেন এবং থানা পুলিশের বশব্দ ছিলেন। ইনি একজন জোতদার। এখানে আসল ঘটনা হচ্ছে যে, বলরাম দে এবং তার দলবল কৃষি শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী ৮ টাকা ১০ পয়সা দিতে অধীকার করায় খেত মজুররা ধর্মঘট করে এবং বলরাম-বাবুরা বাইরের লোক দিয়ে ক্ষেতে কাজ করাতে চেষ্টা করলে শ্রমিকরা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এই প্রতিরোধ ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ। আমি নিজে ঘুরে ঘেঁষে এসেছি।

অতএব, প্রফুল্লবাবুরা যদি জোতদার-দের অবৈধ আর্থরক্ষাকে বলেন আইন শৃঙ্খলা তাহলে অবশ্যই এই রাষ্ট্রে অরাজকতা শুরু হয়েছে।

হুগলী জেলার বড় সরসা গ্রামের এ ধরনের কৃষি শ্রমিক ধর্মঘটদের ওপর জোতদাররা আক্রমণ চালিয়েছে। এরাও প্রফুল্লবাবুদেরই লোক। বর্মান, বীরভূম এবং ২৬-পরগণা জেলার বিত্তীয় অঞ্চল ঘুরে এসে একথা অনাস্রাসেই বলতে পারি যে, গ্রামবাসী শান্ত। ছোটখাটো গণ্ডগোল যে হয়নি তা নয় কিন্তু সেগুলোকে যদি ধরতে হয় তাহলেও প্রফুল্লবাবুর লোকজন এবং কংগ্রেসী-দেরই ধরতে হয়। প্রফুল্লবাবু অজি-যোগ করেই কান্ড। তিনি ও পূর্ববী মুখার্জীরা নেমেছেন রাজ্য সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে। অথচ ফারাকা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যখন পশ্চিম-বঙ্গের স্বার্থকে পদদলিত করলো তখন প্রফুল্লবাবু-পূর্ববী মুখার্জীদের মুখে রা নেই। পণ্যপ্রবোয় মূল্য হ্রাসের জন্য যখন রাজ্য সরকার সর্ব-ভারতীয় স্তরে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আন্তঃরাজ্য সমন্বয় দায়ী করছেন তখন প্রফুল্লবাবু পোস্তায় গিয়ে আবিষ্কার করলেন বামফ্রন্ট সরকার এখানে অরাজকতা দমন না করার কলনই নাকি জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে। প্রফুল্লবাবু এবং বিজয় সিং নাহাররা জানেন না যে কারা পোস্তায় গণ্ডগোল করছে? জ্যোতি বহু মন্ত্রিসভা যদি আজ আসল জায়-গায় হাড দেন তবেই তো আবার চীৎকার শুরু হবে প্রফুল্লবাবুদের কর্তে। তবে প্রফুল্লবাবুরা যদি ভেবে থাকেন যে, কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপে এই সরকারের পতন ঘটাবেন চিরায়িত কায়দায় তাহলে প্রফুল্লবাবুরা যেন মনে রাখেন পশ্চিমবঙ্গের আগ্রহ মাছুষও সেখানে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা নেবে না।

INTERESTED REPRESENTATIVE FOR HANDLOOM/POWER-LOOM FABRIC SHOULD CONTACT SHARPLY WITH FULL DETAILS TO NORTH-INDIA TEXTILES CORPORATION, GUZIR-BAZAR, MEERUT-250 002 (U. P.).

ভবঘুরের মহাপ্রয়াণ

মৃগাক্ষশেখর রায়

পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত ভবঘুরেটি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আজ থেকে আটশী বছর আগে এক নির্বাসিত সন্ন্যাসী যখন তাঁর জন্ম হয়েছিল, তখন স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হয় নি, অখ্যাত পরিবারে, ছোট ঘুপচি ঘরে তাঁর জন্মক্লেষ মা আর বড় ভাইয়ের শুভকামনাই ছিল একমাত্র সম্বল। কিন্তু যখন এ বছর বড়দিনের সকালে, তাঁর জন্ম ওপারের বটী বাজলো, সারা পৃথিবী তখন এই ভবঘুরেটির শোকে আকুল হয়ে উঠলো। কারণ এই ভবঘুরে যে সবাইয়ের অতি আদরের জন শুধু তাই নয়, তার সামনে আমরা সবাই প্রকৃত মাথা নীচু করি। সমস্ত মানুষকে ভালবেসেই তিনি সবাইকার পরমপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। এই ভবঘুরের নাম চার্লস স্পেন্সার চ্যাপলিন, আমাদের কাছে মাছুষ চার্লি।

চ্যাপলিনকে অনেকেই সিনেমার একমাত্র জিনিয়াস বলে মনে করেন। অসামান্য দক্ষ অভিনেতা চার্লি। শুধু কৌতুকরস হুটিতেই তাঁর অভিনয়ের সবচেয়ে বড় কথা নয়, সমস্ত রকম

অভিব্যক্তি, সব রকম আবেগ, মানব মনের জটিলতম অস্থিতির স্ফুটন-স্বপ্ন প্রকাশের বৈচিত্র্য চার্লির অভিনয় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। নির্বাসিত চলচ্চিত্রের তরঙ্গিত অভিনয় শৈলীতেই যে তাঁর স্বল ছিল তাই নয়, কথার ব্যবহারে তাঁর মৈথুণ্য আমাদের অবাক করে। চ্যাপলিনের গোড়ার দিকের সবাক ছবিগুলোতে কথা খুব কম ছিল, কারণ সবাক ছবি সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া কটরে উঠতে চ্যাপলিনের সমর লেপেছিল। কিন্তু “মসিয়ে ভেঙ্ক” থেকে চ্যাপলিনের ছবিতে কথার ব্যবহার বেড়ে চলে। চ্যাপলিন তাঁর শিল্পীজীবনে গোড়ামির প্রয়োগ করেনি কোনদিনই। তাই প্রাথমিক বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সবাক ছবির শিল্পসত্তাবনাকে তিনি স্বাগত জানাতে দ্বিধা করেন নি। কথা ও চিত্রকল্পের সার্থক সমাহারে তাঁর ছবিতে এক নতুন রাজ্য সংঘোজিত হল।

অভিনয় ছাড়াও ছবি তৈরীর বিভিন্ন শাখাও চ্যাপলিনের দক্ষতা সম্পর্কে নতুন করে বলবার কিছু নেই।

চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রায়-প্রতিটি বিভাগই নিয়ন্ত্রণ করেছেন তিনি তাঁর ছবিগুলোতে। চলচ্চিত্র পরিচালকের সম্পূর্ণ শিল্পীসত্তা, বা কিনা ইদানীংকার সমালোচকের তথ্য বহু আলোচিত, চ্যাপলিনের কাজের মধ্যেই তার প্রথম ছাপ দেখা যায়। চ্যাপলিনের স্বাধীনতার বৃত্ত ভিত্তি হল তাঁর সংবেদনশীল মন এবং অপরিণীত মানবিকতাবোধ। চ্যাপলিন তাঁর ছবিতে সাধারণ মানুষের কথাই বলেছেন বারবার। তাই বহুভাষা, আশা-নিরাশা, বর্ণা-আনন্দের ছবি এঁকেছেন। সব রকম সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বা সাধারণ মানুষকে বকনায় শিকার করে তোলে তার বিকল্পে প্রতিবাদে মূগু চ্যাপলিন। তাই সংগ্রামী মানুষের নিছিন্দে তিনি অগ্রণী নেতা।

ভবঘুরে চাইপ চরিত্রটি চ্যাপলিনের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি, প্রায় আর্কিটাইপাল। ম্যাক সেনেটের কাছে চ্যাপলিনের কৌতুক অভিনয়ের হাতেখড়ি। সেনেটের কীটোন ঠুঙিতে চ্যাপলিন নিলেন তার বিখ্যাত ট্রাম্প চরিত্রের রূপসজ্জা। চোলা টাইডজার, পায়ে ছেঁড়াফটা ভারি জুতো, ছুঁচোলো পোশাক ও চড়ি, কাঁদাছুর বাবুরানি হাটা চলা। মনে হয় সেই সমাজকেই ব্যঙ্গ করছেন চার্লি। এর সঙ্গে যুক্ত হল “ফ্রেক কিং”, ঘোড়ার চাটের মত ভক্তি। বার উৎস ছিল ফরাসী কমেডির রাজা ম্যাক লিগারের অভিনয়ধারা। এই চরিত্রের আরও সংশ্লিষ্ট বিকাশ হয় ১৯১৫ সালে এসেনে ঠুঙিতে তৈরি “দি ট্রাম্প” ছবিতে। ভবি বিজ্ঞপের হলেও বলিভ মানুষের হতাশা ও বেহুনা-বোধের ছায়াই বেন আবছাভাবে এসেছিল এই চরিত্রের মধ্যে। ভবঘুরে চরিত্রটি চ্যাপলিনের নির্বাসিত ছবিগুলোতে বারে বারে ঘুরে এসেছে বিভিন্ন ভঙ্গিমা। কখনো ব্যঙ্গের কশাঘাতে ছিন্নভিন্ন করেছে চারপাশের জনগণকে, কখনো বিবাহ-বিব্রু কাতর চোখে রমণীর স্বরভিক্ষে করেছে, কখনো বা শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ের হাতকর প্রচেষ্টায় নাস্তানাবুদ হয়েছে। সবাক ছবিতে এই চরিত্রেরই নতুন চেহারা, বড় হাতিয়ার হল কথা। কথার চাবুকে জর্জরিত করেছে সবাইকে, অনাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে ছুঁড়ি। আমাদের চিরসার্থী ভবঘুরে বন্ধু আজ আর আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তার অসংখ্য ছবি-গুলো সব সময় অতীতের বিরুদ্ধে জেহাদে আমাদের প্রেরণা যোগাবে চিরকাল।

‘রাজদ্রোহী’ দেখার মত নাটক

(দর্পণের সমালোচক)

পঞ্চ পূর্ণা তিসের রজনীতে ‘রাজদ্রোহী’ নাটকের বিশেষ প্রদর্শনী হলো। শরদ্বিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কাহিনী নিয়ে এই নাটক দেখে অভিভূত হয়েছি।

নাটকের ঘটনাস্থল রাজধানীর আরাবলী পর্বতমালার গাজেশ্বর নামক বাদী শোষণে জর্জরিত মানুষের ছোটবড় হয়ে বারবেটিয়া দল গড়ে নামকপ্রভুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার কথা বলা হয়েছে এ নাটকে। গোহুলদাসের মতো নামকপ্রভু মহাজনরা কিতাবে ছদ্মবেশে গ্রীষ্ম চাবীকে কিছু কসন খার ত্রিয়ে, বটি বাটি জমা নিয়ে আসনের দশজন স্বয়ং হিসেব করে যথাসময়ে স্বয়ং শোধ করতে না পারার হরণ চাবী-বোয়ের শেষ সখল বিয়ের সাক্ষী স্বরূপ হারপাছা গলা থেকে কেড়ে নেয়, যথাসময়ে স্বয়ং শোধের জামিন হিসেবে চাবীর এক-মাত্র হুয়ের শিক্তকে চোরাকুঠিতে আটকে রাখে তার জলন্ত চিত্র রাজদ্রোহী। শুধু কি এই, যের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী থাকে সেও গোহুলদাসেরা শিকারে বেরিয়ে বন্ধুত্বের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দেয়। আবার ঘরের স্ত্রীরও নেহাৎ ভোগ্যসামগ্রী হিসেবেই দেখে, স্বামী গোহুলদাসের

আলসারিতে গচ্ছিত, বন্ধক দেওয়ার গহনার প্রতি গ্রীষ্মকে অধিকারই স্বীকৃত নয়।

এই রকম সামন্তবাদী শোষণজরিত মানুষ অবশেষে প্রতাপ বা বোটিয়ার নেতৃত্বে সংঘটিত হয় গুহার-অরণ্যে রাত-দিন আশ্রয় নিতে গোহুলদাসের উপর আক্রমণ চালায়, সমস্ত দলিলসম্পত্তা বজা পুড়িয়ে দেয়।

অবশেষে জমিদারদের অসংখ্য রক্ষা করতে এগিয়ে আসে রাজবাহিনী, দর্পণে রাজদ্রোহীর অংশ সেনাবাহিনী। বারবেটিয়া বিশাল শক্তিবাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়িয়ে গিয়ে গোপনে আক্রমণ চালায়। কিন্তু লড়াই একটা অসমীয়াবদ্ধ থাকার জন্য শেষ পর্যন্ত প্রতাপ গ্রেপ্তার হলেন ও তাঁর মৃত্যু হলো।

‘রাজদ্রোহী’ নাটকে আরও নাটকের মতো নয় নারীদে প্রদর্শন নেই, অথচ প্রেম আর সোহাগ আছে, নাচ আছে। পরিচালক তথা প্রতাপবেশী দিলী রায়, জিলি চক্রবর্তী, কল্যাণী চক্রবর্তী অভিনয় খুবই ভালো হয়েছে।

এশিয়াটিক সেস ইটি কর্মীদের আন্দোলন

(দর্পণের সংবাদদাতা)

অগণতান্ত্রিক নীতির প্রতিবাদে বিভিন্ন দাবিতে এশিয়াটিক লোসাইটির কর্মীরা ২রা জাহুয়ারী প্রতীক ধর্মঘট করবেন। ধর্মঘটের পূর্বে ২৩শে ডিসেম্বর থেকে ২৬শে ডিসেম্বর তাঁরা ‘হু’ বটী করে কলম ধর্মঘটের কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। এশিয়াটিক লোসাইটির এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের জনৈক মুখপাত্র অভিযোগ করেন যে, মেটিক্যাল সার্টিফিকেট দেওয়া সম্বন্ধে এখানে পাওনা ঠুটি দেওয়া হয় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মীরা যে সব সুযোগ সুবিধা পান এখানে তারা তা পান না। এখানে চলছে এক ধামধেয়ালির রাজত্ব। যখন জনৈক কর্মী পনেরো বছর ধরে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন, এখনও তাঁকে স্থায়ী করার প্রচেষ্টা নেই।

প্রথমতঃ উল্লেখ্য, এশিয়াটিক লোসাইটি কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা করে মোট ছ’ লক্ষ বিশ হাজার টাকা অর্থায়ন পায়। ভারতের সব প্রাচীন এই প্রাচ্য

বিভাগ কেন্দ্রটিকে বাঁচাতে আরও টাকা প্রয়োজন। শুধু টাকা নয় বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ জোনসও আদর্শ ও উদ্দেশ্য এই প্রতিষ্ঠান সংগঠনের প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর প্রতি প্রকা জানাতে হলে নিষ্ঠা সঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন বলে জনৈক পণ্ডিত-গবেষক মন্তব্য করেন।

হাইকোর্টে বেআইনী কাজের অভিযোগ

কলকাতা হাইকোর্টে জনৈক সমরেন্দ্র মিত্রের প্রমোশনকে কেন্দ্র করে সাধারণ কর্মীমহলে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কর্মীদের বক্তব্য শ্রীমন্ত বেশ কিছু কর্মী টপকে এই প্রমোশন পাচ্ছেন। তাঁর কাজ জজদের টি এ বিলম্বজ্ঞা কাজকর্ম করা। কর্মীদের অভিযোগ এ ব্যাপারে আইন সংক্রান্ত কাজে সংগে জড়িত পঞ্চ অফিসাররাই বেআইনী কাজ করছেন। বিষয়টিতে তারা প্রধান বিচারপতিরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের সুযোগ নিন

- প্রতিটি পরিবারের কল্যাণ সাধন পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।
- এই প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছামূলক। কোনো রকম জোর জুলুম বা জবরদস্তির স্থান এই প্রকল্পে নেই।
- মাতৃমদল ও শিশুকল্যাণ কর্মসূচীও পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের অন্তর্গত অঙ্গ।
- জগন্নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ্ধতি এতদিন সম্প্রতি গ্রহণ করে আসছেন সেইসব সুযোগ এখনও বিনামূল্যে প্রতিটি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাওয়া যায়। তবে শুধু যারা ভ্যাসেকটমি, টিউবেকটমি বা লুপ গ্রহণ করবেন তাঁদের জন্যই আর্থিক অর্থায়নের ব্যবস্থা আছে। বেসব মহিলা লুপ গ্রহণ করবেন তাঁদের প্রত্যেককে পাঁচ টাকা এবং যারা টিউবেকটমি করিয়ে নেবেন তাঁদের প্রত্যেককে ৭৫ টাকা ও পুরুষদের ভ্যাসেকটমি করিয়ে নেওয়ার জন্য প্রত্যেককে ৮০ টাকা আর্থিক অর্থায়ন দেওয়ার ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে।
- পশ্চিমবঙ্গে ১৬ই বৈকে ৩০শে ডিসেম্বর জাতীয় পরিবার কল্যাণ পক্ষ উদ্ঘাষিত হচ্ছে। এই পক্ষ উদ্ঘাষন কালে যাতে পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের সুযোগ ও সহায়তা আরও ব্যাপকভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হয়েছে।

সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে পরিবার কল্যাণ প্রকল্প

সার্থক হোক, জাতীয় পরিবার কল্যাণ

প্রকল্প সফল হোক।

বিজ্ঞাপন নং— ২০০ / ৭৭—৭৮

(রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মাস মিডিয়া ডিভিশন কর্তৃক প্রচারিত।)